

ব্রহ্মশ্রী

[তদ্ব নদী, ২২ নং]

বাৎসরিক সূচী

শ্রাবণ-পৌষ
(১৩৪২)

756.3
002/8



সম্পাদক

শ্রীশুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৫৬, বঙ্গতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

৯ বর্ষ-২২ খণ্ড]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বহুভূতা (গদ্য)	শ্রীমদেবকৃষ্ণ রায় ভৌদ্রী	৮২	কবি এটনি সাহেব	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে	৩৭৪
হৃদয় (গদ্য)	শ্রী উষা দ্বিবাণ	৮৬১	কবি কামিনী রায়		
জগৎ	শ্রী কাকদামণিকা দেবী	১১২	(সচিত্র কামিনী)	শ্রীমন্তধন্য যোগ	৮৩১
	১৭৪, ১১০, ৭৪২, ৭৮১		কবিজ্ঞান	শ্রীহরেক্ষ মুখোপাধ্যায়	৩৪২
অনুশিখা		১১২	কলিগাত্য মেডিক্যাল-কলেজ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে	
ঐ টানা কি ১১টি নয়?		২৭৭	(সচিত্র)	৭৮, ১২০, ৪১১, ৭৪৪, ৭৭২	
বিশাল প্রাণোৎসব ও মঙ্গলবার বেলা		১১০	কবায়ান (কবিতা)	শ্রীমদেব গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৬
অন্য		৭৮৬	কবি ডাক্তি নিগালায় (কবিতা)		
শক্তিমান				শ্রীপ্রতিভা যোগ	৭৪৮
শক্তিচিহ্ন (গদ্য)	শ্রীসৌদামোহন মুখোপাধ্যায়	৩৪১	হুটারের গান (কবিতা)	শ্রীমদুখী ভট্টাচার্য	২৩৬
প্রকাশ (কবিতা)	শ্রীমদাশ্বিনী দেবী	৩৪৩	চতুপাতী (সচিত্র)	১০৪, ১৭০, ৪৮৪, ৭২৪, ৮১৭	
গনি ও অস (গদ্য)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মহন্তরায়	৪৫০	পটনেশ্বর পুস্তক-মন্ডির-এর কীর্তি	শ্রীমদেবকি শিত্র	১০৪
গাণ্ডিক টেনের চিত্রকলা			নির্দেশ কী-পোষ্ট		১০৭
(সচিত্র)	শ্রীবিদ্যকৃষ্ণ কল্যাণ	৭২০	শিখড়র লোক		১০০
গীতারের ব্যাখ্যা-১৩৫			আমেরিকার কবির চারি পুস্তক		১৭৪
(সচিত্র)	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪২	সম্মতের আদি রোহাণ		৪০৪
মলোচনা	৪৪৮, ১০৭, ৮৮০		কৌটিল্যের তত্ত্ব		৮২৭
পবিত্র পঞ্চম সত্য	শ্রীকল্যাণ চট্টোপাধ্যায়	৭৮০	কটকটকি গ্রন্থ দিগন্তের দশ	শ্রীমদেবকি চট্টোপাধ্যায়	৭৪৪
অন্য		১০৭	চিত্র-বৈদ্য (গদ্য)	শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস	৪৭০
অরণ্য ও অসত্যের প্রতি	শ্রীমদেবকি চট্টোপাধ্যায়	১০০	চীনা প্রবন্ধের ভারত বর্ষ	শ্রীমদুপাধ্যায় দেব	৮৭
ইতিহাস	শ্রীবিদ্যকৃষ্ণ	১৮২	চোখে কেন জল আসে না?		
উপলব্ধি (কবিতা)	শ্রীঅপরূপ চট্টোপাধ্যায়	৪০	(কবিতা)	শ্রীমদিকীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	৪২২
৪৭১ (কবিতা)	শ্রীপ্রবীণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০২	ছিন্নমতা (কবিতা)	শ্রীমদেবকি যোগ	৭৭৮
একটুটে হরিহর-ছন্দ			জাতিগঠন ও কৃষ্ণায়	শ্রীমদাশ্বিনী দেব	১০
(সচিত্র)	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৪	কলিগাত্য (সচিত্র ভ্রমণকাহিনী)		৪৬১
এক গদ্য (গদ্য)	শ্রীসৌদামোহন মুখোপাধ্যায়	১৭	মিসি (কবিতা)	শ্রীমদাশ্বিনী দেবী	৩৪২
এক-কিছরের উল্লেখ করি			কল্যাণোত্তম (অগ্রবাহ-কবিতা)		
(সচিত্র)	শ্রীমদেবকি দেব	৩৩৪		শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে	৩২৪
অজ্ঞান বিদ্যে বৈজ্ঞানিক	শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০১	বৈদ্য (গদ্য)	শ্রীকল্যাণদেব যোগ	৪১৮
কত রাত্রি? (কবিতা)	শ্রীঅপরূপ চট্টোপাধ্যায়	৮১২	দয় (কবিতা)	শ্রীপ্রতিভা যোগ	৮৪২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নামকরণ	বানী চন্দ্রানন্দ	৭০৬	বিজ্ঞান-ভগ্নঃ (সচিত্র)	শ্রীশ্যামচন্দ্রকান্ত চৌধুরী	১১৭, ১১৮, ৪৪১, ৭১৪, ৮৮১
নৌকায় উৎসর্গ (অহুবাণ-গল্প)	শ্রীকীবোধচন্দ্র রাই চৌধুরী	৮০৭	ভারী হাইড্রোজেন ও ভারী মল		১১৭
পদ্ম-রক্তা (অহুবাণ-গল্প)	শ্রীপুণ্ডরীক বোধ	১৮৪	কাগজবায়ু বিদ্যুত বাতী		১১৮
পদিক-বন্ধু (কবিতা)	শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৭	নৃতন এলা-পিন্স বা উদ্ভোজাগত		১১৮
পদে পদে (কবিতা)	শ্রীবীণেশচন্দ্র দাশ	১০৬	অগ্নিগোলাকারী গ্রীষ্মক		১১৯
পাখাখী (গল্প)	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫২৪	নৃতন এলা-রে বহু		১২০
পুস্তক ও পত্রিকা		৬২, ৬১৪	কবিতা-সংগ্রহ ও পুস্তক ও পত্রিকা		১২১
পূর্ণ ও পশ্চিম ভারতের চিত্রকলা (সচিত্র)	শ্রীবাণীদীপক সেন	৩৮১	বিজ্ঞান ও ইতিহাস সাহিত্যিক গ্রন্থ		১২২
প্রতিভা (কবিতা)	শ্রীশরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০০	কলার গোপন সত্য		১২২
প্রতিভা, গাফী (অহুবাণ-কবিতা)			তাল তাল		১২২
	শ্রীঅমল দাস	৭৪	একবারে হাঁড়িয়ার ইমান ও		
প্রতীকিত (কবিতা)	শ্রীঅহুতলা দেবী	৬০	কোঁকিলের গল্প		২৩৭
প্রাচীন ভারতের রত্নসমূহ			পুঁথির পুঁথি ভাষা		২৩৮
	শ্রীঅশোকনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩৩৪	দৌধার বটোয়ায়বর ও পুঁথি		
প্রাচীন ভারতে খেলা-পতাকা			লোকিত পুঁথির কথা		২৭০
	শ্রীমতিলাল দাস	৮২০	নৃতন অটোমোবাইল বাতী		২৭১
প্রাচীন শিল্পের ধারা (সচিত্র)	শ্রীমণীপ্রসূদ ঘোষ	৪৬৬	নৃতন বাগের বৈজ্ঞানিক আলো		২৭১
প্রবেশের গল্প (কবিতা)	শ্রীঅহুতলা দেবী	৭১২	দ্যাদেবীদেবী-বোধক অশ্রুমান		২৭১
প্রাণ (উপন্যাস)	শ্রীবিজয়চন্দ্র বসু	২৭, ২৪২, ৪২৬, ৭০১, ৭০১	বিজ্ঞান-প্রবাহের সাহায্যে প্রবাহ		
কোঁকিল কুল	শ্রীমণীপ্রসূদ ঘোষ	৪২২	বুদ্ধিমান-নিয়ন্ত্রণ		২৭১
বন্ধু (গল্প)	শ্রীসৌরীন্দ্রবোধেন মুখোপাধ্যায়	৬০৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাইকেল		
বঙ্গপ্রিয় বঙ্গীয় অভিবাসন		৭৬০	অনুপ লক্ষ্য		২৭২
বঙ্গালীর অগম্য-কীট খাণী প্রেমাম্ব		৪০০	অন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাইকেল		
বঙ্গালীর পিতা	শ্রীমণীপ্রসূদ ঘোষ	৪১২	অন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাইকেল		
বঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাস			অন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাইকেল		
	শ্রীমণীপ্রসূদ ঘোষ	৮২, ২০১, ৪২০, ৬৪৮, ৮২৪	অন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাইকেল		
বাগে (কবিতা)	শ্রীঅহুতলা দেবী	২১০	অন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাইকেল		
বাগ (গল্প)	শ্রীমণীপ্রসূদ ঘোষ	২১২	অন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাইকেল		
বাগীশের লালমোহন (সচিত্র চিত্র)	শ্রীমণীপ্রসূদ ঘোষ	৮১২	অন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাইকেল		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

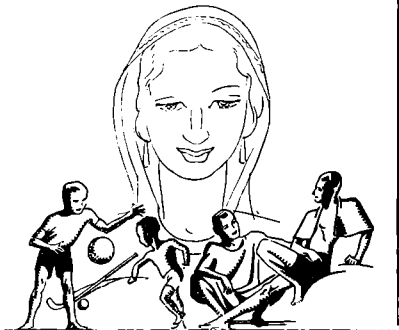
স্বামী গঙ্গাধরানন্দ	বিষয়	শিলা	পৃষ্ঠা
বাল্যের আশ্রমের সঙ্গীত	১০০	এক টুটে হরিহর-ছত্র	
স্বামী ভূদ্যানন্দ		ভোগের খাট। ভোগের খাটের অপর দৃষ্ট	
নামকরণ	১০৬	শোণপুত্রের মনুষ্যের পক্ষ	৬০৬
ঐশ্বর্যের সুখোপাখ্যান		ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কল্পনা	৬০৭
কবিতার	৬০৯	ঐশ্বর্যের কল্পনা : ঐশ্বর্যের কবিতা। ঐশ্বর্যের কবিতার অপর দৃষ্ট	
হাসিরাশি দেবী		অপর দৃষ্ট। ঐশ্বর্যের কবিতা	৬০৯
• হরি হরি হরি (কবিতা)	৬০৯	ঐশ্বর্যের কবিতার কবিতা	৬০৯
হেমচন্দ্র বাগতি		নামকরণ : ঐশ্বর্যের কবিতা। অপর দৃষ্ট	
মহাশক্তি (কবিতা)	৬১২	ঐশ্বর্যের কবিতার কবিতা	৬১২
হেমচন্দ্রের উচ্চারণ		নামকরণ : ঐশ্বর্যের কবিতা	
হাসি হরি হরি (কবিতা)	৬১২	ঐশ্বর্যের কবিতার কবিতা	৬১২
হেমচন্দ্র প্রসঙ্গ বোধ		হাসি হরি হরি : ঐশ্বর্যের কবিতা	
অন্য (পদ)	৬১২, ৬১৩, ৬১৪	ঐশ্বর্যের কবিতার কবিতা	৬১২
কীর্তনচন্দ্র রায় চৌধুরী		ঐশ্বর্যের কবিতার কবিতা	
কীর্তনচন্দ্র (অপর দৃষ্ট)	৬১২	ঐশ্বর্যের কবিতার কবিতা	৬১২

চিত্র-সূচী

[illegible]

বিষয়	পত্র	পৃষ্ঠা	বিষয়	পত্র	পৃষ্ঠা
১৩. ১৪. ১৫. ১৬.			১৭. ১৮. ১৯. ২০.		
২১. ২২. ২৩. ২৪.			২৫. ২৬. ২৭. ২৮.		
২৯. ৩০. ৩১. ৩২.			৩৩. ৩৪. ৩৫. ৩৬.		
৩৭. ৩৮. ৩৯. ৪০.			৪১. ৪২. ৪৩. ৪৪.		
৪৫. ৪৬. ৪৭. ৪৮.			৪৯. ৫০. ৫১. ৫২.		
৫৩. ৫৪. ৫৫. ৫৬.			৫৭. ৫৮. ৫৯. ৬০.		
৬১. ৬২. ৬৩. ৬৪.			৬৫. ৬৬. ৬৭. ৬৮.		
৬৯. ৭০. ৭১. ৭২.			৭৩. ৭৪. ৭৫. ৭৬.		
৭৭. ৭৮. ৭৯. ৮০.			৮১. ৮২. ৮৩. ৮৪.		
৮৫. ৮৬. ৮৭. ৮৮.			৮৯. ৯০. ৯১. ৯২.		
৯৩. ৯৪. ৯৫. ৯৬.			৯৭. ৯৮. ৯৯. ১০০.		

ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব আপনার-ই—



ছেলেমেয়েরা নিজেরা দায়িত্ব মনে করে, তাই যেরূপ অনেক বৈদ্য তাঁরা আপনার দৃষ্টিপথে। তাঁরা পুষ্টি-ভিত্তিক ভাগ্য হতে পড়তে যত্ন, তবু এখনও তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব আপনার-ই। এমন যে সব স্ব-অভ্যাস তাদের মনে বহুদূর ক'রে দেবেন বড় করে সংস্কার-সংগঠনে নানাবিধ সমস্ত সেইগুলি তাদের সবচেয়ে ভাঙে লাগবে।

সংস্কারের দ্বারা আত্মকর্তা তাঁরা ছেলেমেয়েদের মনে ব্যাধান, শক্তি ও পানীর সংকেত ভাল ধারণা করে গড়ে উঠতে পারে, যে-বিষয়ে সাহায্য করেন। তাদের ভেতরে চা পানির অপ্রয়োগ বড়ান যে ভাল দিয়ে কোন সংকেত নেই। নিজের বেশের মাটির উৎপন্ন এই বিভ্রম ও তৃপ্তির পানীপ্রয়োগে মনে তাদের শরীর ও মনের উৎকর্ষ হয়। পানি বরেন হ'লে এ অভ্যাস তাদের উৎকর্ষে আসবে।

চা প্রস্তুত-প্রণালী—চা পানি চা মিনি। টাটকা জল ফোটান। পানির ও তরলতা নাটক চাহের পাত গ্রহণ করে পানি মিনি। যে ক'জনের জন্যে চা হলে তার প্রত্যেকের জন্যে এক চামচ করে চা পাতের নামে আর এক চামচ বৈদ্য মিনি, চাহের পাতের পাতা-গুলির ওপর সূঁচের পরম জল ঢালুন। পাঁচ মিনিট, চা পাতা পানি হালুন; তার পর পেছলার জলে দুধ ও চিনি মেশান।



দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা।

For every Indian to know—

How **METROPOLITAN INSURANCE CO., LTD.** has in the last four years of its existence served this society and what it stands for. In this respect we are placing below the Actuary's report and the opinions which count.

Actuary's Report

To

The Directors,

THE METROPOLITAN INSURANCE CO., LTD.,

CALCUTTA.

Gentlemen,

In accordance with your instructions I have completed the Valuation of the liabilities of your Company under its policy-contracts as at 31st March, 1935 and now have pleasure in submitting my report thereon.

The Company was incorporated on 1st May, 1930 and commenced work in July of the same year and it is a matter of congratulation that during the short period of $4\frac{1}{2}$ years it has secured an unprecedented amount of business. The rapid increase of the business of the Company can be judged from the premium collections during each year of the period under review.

1931	1,46,018/-
1932	1,96,996/-
1933	2,91,010/-
1934-35	5,76,184/-

The amount of business in force on the date of valuation is Rs. 1,17,29,199/- under 7299 policies with a premium income of Rs. 5,86,845/-. The ratio of expenses of management including commission to renewal premium income on the basis that 90 per cent. of the premiums of new business are spent in its procurement, is gradually diminishing each year as shown hereunder.

1932	79.7 per cent
1933	63.1 per cent
1934-35	47.6 per cent

The Valuation has been made on a stringent basis, namely :

Mortality—O^m C^o Table with five years addition to age.

Interest—4 per cent.

Loading—Reserve for with profit policies 20 p.c.
Reserve for without profit policies 12.9 p.c.

The result of the valuation shows a surplus of Rs. 52,904/- of which Rs. 11,182/- has been carried forward unappropriated and the balance of Rs. 38,715/- has been divided amongst 2886 policies which were in force for more than one complete year. The bonus has been allowed as a Simple Reversionary Bonus at the rate of 1.5 per cent per annum on the sums assured among policy-holders for the Whole Term of Life and 1.1 per cent. per annum among Endowment Assurance policy-holders. There is no provision in the Articles of Association for apportionment of the surplus among the share-holders and the policy-holders and the Directors have the right to determine the amount of profit to be divided amongst them. I am given to understand that the share-holders will be glad to forego their portions of the surplus if substantial bonus be given to policy-holders which it is hoped will better further their interest than taking a small dividend at this stage of the Company. On this understanding I advise you, Gentlemen, not to declare any dividend to share-holders.

Gentlemen, you ought to be proud with the progress of the Company and if this be maintained it may be anticipated that the Company will hold a unique position at the next valuation.

Considering the sound way in which your business is conducted, prospective assurers need have no hesitation in joining your Company.

I am, Gentlemen,

38, Sitaram Ghose St.,

Calcutta,

11th September, 1935.

Your most obedient servant,

(Sd.) Jogesh Ch. Sen,

Actuary.

"STATESMAN" says:—

Dated 11-9-35.

METROPOLITAN RESULTS

There are very few new Indian life offices that can point to such a rapid advance as the Metropolitan Insurance Company has made after only four years of existence. The new business obtained last year consisted of Rs. 93,15,000 in proposals received and Rs. 68,97,000 in sums assured under policies actually issued, comparing with Rs. 44,33,000 in the previous year. The Company has made a feature of efficient organization and with premiums framed on a very moderate scale has succeeded in attracting an exceptional degree of popularity in spite of the intensive competition in the field today. The life fund has increased during the year from Rs. 1,16,855 to Rs. 2,77,152; premiums less reinsurance amounted to Rs. 5,76,184, while expenses, including commission, totalled Rs. 3,77,689 or about 65 per cent of the premiums as against more than 72 per cent in 1933. The net interest revenue of Rs. 10,733 shows a return of 5.6 per cent on the mean life fund. The

total of the assets side of the balance sheet is Rs. 4,23,689, of which Rs. 1,06,258 is invested in Government securities and an almost equal amount in industrial concerns against securities and with the personal guarantee of two of the directors.

An actuarial valuation has been made of the company's affairs covering the first four years' working and reveals a substantial surplus. A meeting of the directors is about to be held with the view of sanctioning the declaration of the rates of bonus recommended by the actuary—viz. Rs. 15 per Rs. 1000 per annum on whole life policies and Rs. 11 per Rs. 1000 on endowment assurances.

AMRITABAZAR PATRIKA says :—

We have received a copy of the Audited Balance Sheet and Account for the company for its fourth year ending on the 31st March and directors' Report relating thereto.

The "Metropolitan" was established in the latter part of the year 1930 at a time of the greatest national awakening of the recent times, and organised under very highly influential auspices of some of the most distinguished industrialists and insurance men of Bengal, it fell to the happy lot of this concern to take the pride of place among the young life offices that are contributing to the phenomenal growth of India's Life Assurance.

Reviewing its progress for the last four years we find that the Metropolitan, despite the world economic crisis, has in the first four years done exceptionally well and has attained an enviable position among the Indian Insurance Companies. In the very first year of its working its operations resulted in policies being issued for nearly 40 lacs, which is claimed to be record for the opening year of an Indian Life Office. The second year showed a satisfactory progress and the business completed was 42½ lacs with an expense ratio of 81%, lapse ratio of 20%, a premium income of Rs. 1,66,995 - and a life fund of Rs. 62,353 -. The third year's working disclosed a bright career of this prodigious Indian Life Office, the new business completed being Rs. 44,31,375 with the expense ratio of 72.8 p.c., lapse ratio of 19.6 p.c., premium income of Rs. 2,91,040 and Life Fund of Rs. 1,16,855 -.

The fourth year has shown a brilliant achievement of this young Life Office. During this period business amounting to Rs. 93,15,225 was placed with the company, out of which proposals of the value of Rs. 68,96,725 resulted in policies. The ratio of expense has come down to 63 p.c., the lapse ratio has been 19.8 p.c. The premium income has gone up to Rs. 5,76,184 and Life Fund to Rs. 2,77,162. Claims to the value of Rs. 47,600 - were paid within the year.

The investments of the Company are made in Government Securities and also in sound industrial concerns at an interest of 6%. In the opinion of the Directors, the Company has adopted such a policy of investment in the best interests of its policy-holders.

The Company has embodied in itself all the highly redeeming features in modern life practice including revival of lapsed policies without payment of accumulated arrears premium, permanent disability benefits, joint-life assurance, children's higher and foreign education policies, automatic extension plan after payment for two years, loan and surrenders after two years and 2½% rebate on annual payments.

On the top of the above, this young company has made an actuarial valuation of its first four years' work and declared a bonus of Rs. 15/- for Whole Life Policies and that of Rs. 11 for its Endowment Policies per thousand per year. And the Company claims thereby to have achieved another success among the Indian Life Office of the same age.

This unparalleled success of the "Metropolitan" is attributable to the public confidence that the Directorate and management have been able to earn and also to the most attractive and beneficial terms for both policy-holders and agents.

We congratulate the company on its rapid progress and wish it a steady and successful career.

"ADVANCE" says :—

Dated 15-9-35.

It was only four years back that the Metropolitan Insurance Co. Ltd., of Calcutta was started and the Reports and accounts for the fourth year ended 31st March last, reveals a striking advance.

The new business obtained last year consisted of Rs. 93,15,000 in proposals received and Rs. 68,97,000 in sums assured under policies actually issued, comparing with Rs. 44,33,000 in the previous year. The company has made a feature of efficient organization and with premiums framed on a very moderate scale has succeeded in attracting an exceptional degree of popularity in spite of the intensive competition in the field today.

The life fund has increased during the year from Rs. 1,16,856 to Rs. 2,77,152; premiums less re-assurances amounted to Rs. 5,76,184, while expenses including commission, totalled Rs. 3,77,889 or about 65 per cent of the premiums, as against more than 72 per cent in 1933. The net interest revenue of Rs. 10,733 shows a return of 5.6 per cent on the mean life fund.

The total of the assets side of the balance sheet is Rs. 4,33,689 of which Rs. 1,06,958 is invested in Government securities and an almost equal amount in industrial concerns against securities and with personal guarantee of two of the directors.

An actuarial valuation has been made of the company's affairs covering the first four years' working and reveals a substantial surplus. The declaration of the rates of bonus recommended by the actuary viz. Rs. 15 per Rs. 1,000 per annum on whole life policies and Rs. 11 per Rs. 1,000 on endowment assurance, has been sanctioned by the shareholders' meeting.

"THE INDIAN INSURANCE JOURNAL," says :—

The history of Life Assurance in India has produced few more remarkable phenomena than the origin and growth of the Metropolitan Insurance Company, Limited of Calcutta which, though started only in 1930, has already come to be ranked as a strong and popular Life Office in the country.

The Board of Directors of the Company consist of some of the most influential and distinguished industrialists and Insurance men in Bengal and the progress of the Company during the first four years is indicated by the following figures :—

	New business.	Life Fund at the end of the year.
	Rs.	"Rs."
1st year	40,00,000	37,116
2nd year	42,50,000	62,353
3rd year	44,33,000	1,16,858
4th year	68,96,726	2,77,152

The success of the Metropolitan is due not merely to the power of organisation of the men who conduct its affairs but also to the excellent contract that the Company offers—a contract the liberality of which has never been surpassed by any other Company in India before.

Coming now to the Directors' Report and accounts of the Company for the year ended 31st March 1935, we find that during this period the Company received proposals for Assurance amounting to Rs. 93,15,225, out of which proposals for the value of Rs. 68,96,725 resulted in policies. The income from premiums amounted to Rs. 5,76,184 and from interests and other sources amounted to Rs. 23,170. Claims by death and disability amounted to Rs. 54,786 and the expenses of management including commission to Agents were Rs. 3,77,889. As a result of the year's working the Life Assurance Fund increased from Rs. 1,16,854 at the beginning of the year to Rs. 2,77,151 at the end of it. The total assets of the Company at the end of the year under review amounted to Rs. 4,33,688 out of which Rs. 1,06,958 is invested in gilt-edged securities and sum of Rs. 1,05,500 has been advanced to industrial concerns. A gratifying feature of the Company is that inspite of more than 50 per cent increase in new business the expense ratio has come down from 72.8 per cent in the previous year to 63 per cent in the year under review.

An actuarial valuation of the liabilities under policy contracts of the Company has been made as at 31st March 1935 and the valuation has disclosed a surplus which will enable the Directors to allot a bonus per thousand per year of Rs. 15- on whole-life policies and Rs. 11- on endowment assurances.

This is undoubtedly an occasion when congratulations may be extended to the Metropolitan's Staff, not only at the Head office but in the many branches throughout the country. The Company is in a powerful position and its field force can now offer policies which will compare favourably with those of any competitor. The combination of substantial financial resources, excellent organisation and the right policies, will send the Company ahead from strength to strength and we confidently anticipate that it will outstrip all past records during the next and the following years.

“THE INSURANCE & FINANCE REVIEW”, says :—

The Metropolitan, a purely Indian institution having its head office in Calcutta, was ushered into existence in the year 1830, and has been doing exceedingly well since then. It succeeded in writing a new business of about 40 lacs of rupees in the very first year which, so far as we are aware was a record breaking achievement in India and gave unmistakable proof of the popular regard in which the Company—its Directors and its management—are held. The year that followed showed a steady upward movement and fully justified the hopes that were raised by this initial achievement. The following figures will illustrate the substantial progress it has made from year to year :

	Now Business.	Life Fund.
First year	... 40 lacs	Rs. 37,000
Second year	42½	92,000
• Third year	45	1,17,000
Fourth year	69	2,77,000

With the permission of the Actuary to the Government of India, the last working period of the Company was closed after fifteen months on the 31st of March, 1935. This period was a fitting sequel to the years that went before.

Business :—During the above period business amounting to Rs. 93,15,225 was placed with the Company, out of which proposals of the value of Rs. 68,96,725 resulted in policies and the rest were either rejected or postponed or are awaiting completion. That the Company's progress is very satisfactory and most encouraging is evident from the increase in the volume of business.

Expense :—The expense-ratio of the year under review has been 63% as against 72.9 per cent of the last year.

Lapses :—The lapse-ratio has been 19.8 per cent.

Claim :—During the period under report claims to the extent of Rs. 54,086-11 arose out of death and Rs. 700 out of Permanent Disablement. Outstanding claims as at 31st December, 1933 amounted to Rs. 20,655. Of the total claims of Rs. 75,442-7 claims to the value of Rs. 46,600-8 only were paid within the year.

Life Assurance Fund :—The Life Assurance Fund as at 31st March, 1935, has come up to Rs. 2,77,151-13-7, as compared to Rs. 1,16,854-12-2 of the previous year.

Barely has a Company done so splendidly on the initial years, and the Metropolitan can justly be proud of its achievements.

The first actuarial valuation of the Company was made as at March 31, 1935, i.e. after a little over four years' working, and in spite of the stringent methods employed, it has enabled the Company to declare a simple reversionary bonus of Rs. 15 per thousand per annum on its participating whole life policies, and of Rs. 11 per thousand per annum on participating endowment policies.

The Company's total business in force as at March 31, 1935 amounted to Rs. 1,17,30,000 and its total assets as at that date were valued at Rs. 4,34,000.

THE INSURANCE REVIEW Says :—

31st December 1935.

It gives us great pleasure to review the latest Balance Sheet and Valuation Report of the Metropolitan Insurance Co., Ltd., Calcutta for the period ending 31st March 1935. The accounts submitted are for 15 months.

During the period under review the Company received proposals for assuring a sum of Rs. 93, 15,225, out of which proposals to the value of Rs. 68,96,725 resulted into policies recording an increase of nearly Rs. 25 lacs over the last year's figures.

The Total Premium Income amounted to Rs. 5,76,184 and the Total Income to Rs. 5,99, 335. The expenses of management absorbed Rs. 3,77,889 giving a highly satisfactory ratio of 65.5% to the Total Premium income as compared with 75.9% during the last year.

During the period under report claims to the extent of Rs. 54,086 arose out of death and Rs. 700 out of Permanent Disablement. Outstanding claims as at 31st December 1933 amounted to Rs. 20,655. Of the total claim of Rs. 75,442 claims to the value of Rs. 41,600 were paid within the year leaving a balance of Rs. 27,811 only as outstanding of which Rs. 8,266 have since been paid before the publication of the balance sheet and the balance could not be paid partly because complete claim papers were not yet received and partly because the claim in some cases were still under enquiry.

The lapse ratio is reported to be only 19.8% which is very creditable in view of the large business completed every year. The claims are also being paid very promptly. The Life Fund amounted to Rs. 2,77,152 as compared with Rs. 1,16,855 during the last year recording an increase of over cent per cent over 1933 figures.

The valuation for four years ending 31st March 1935 has been made on the following basis:—

Table of Mortality used OM (5) with five years addition to age.

Rate of Interest assumed 4%.

Premium reserved for future expenses 20% for 'with profit' and 12.9% for 'without profit' policies.

The amount of business in force on the date of valuation was Rs. 1,17,29,499 under 7299 policies with premium income of Rs. 5,35,245. The ratio of expenses of management including commission to renewal premium income on the basis that 90 per cent of the premiums of new business are spent in its procurement, is gradually diminishing each year as shown hereunder.

1932	79.7 per cent.
1933	63.1 per cent.
1934-35	47.6 per cent.

The result of the valuation on sufficiently stringent basis above shows a surplus of Rs. 52,904 of which Rs. 39716 has been allocated to 2886 policies which were in force for more than one year. The balance of Rs. 14189 has been carried forward unappropriated. The sacrifice of the policyholders has enabled the actuary to recommend a simple reversionary bonus of Rs. 15 per thousand per annum on Whole Life and Rs. 11 on Endowment Assurances and the management deserves every credit for these results. The other notable feature of the valuation is that the shareholders have agreed to forego their share of the surplus and thus strengthen the position of the company to a great extent. This sacrifice of theirs will, we are confident, bear fruit in the future valuation and compensate them suitably by way of better dividend. The Chairman made the following remarks while presenting the report to the Board of Directors:

"The satisfactory features of the Company during the period under review i.e. from its inception to 31-3-35 are:

- (1) the progress of the premium income from year to year, and
- (2) the gradual diminution of the ratio of expenses.

Gentlemen, I am at one with the Actuary when he observes that you should be proud of the progress of the Metropolitan Insurance Co. Ltd. This progress indicates that the Company has found favour with the public, and I think that the low rate of premium with which the Metropolitan has offered maximum benefits to its policyholders is one of the many reasons behind this public appreciation.

In this connection, I must add that the present cry of protecting the Indian Insurance Companies against the competition of the foreign Companies, so far as it may help the Indian Companies to sell their policies at a higher rate of premium will find disfavour with the insuring public and will thus harm the Companies themselves. The problem before us is to see how we may make our policies cheaper and thereby be able to serve a bigger and bigger majority. It is curious that we as policyholders seek the lowest rates in the market but as Manager of Insurance Companies like to sell our policies at a higher rate. In thus attempting to raise our premium rates we naturally recede from the zone of popular availability and thereby defeat the end of an Insurance Company.

There are of-course, difficulties in keeping the rate of premium, sufficiently low, and I must attract your attention, Gentlemen, to the principle cause of these difficulties, as it is not only alarming to Insurance business but is also eating into the very life of the nation. It is the daily growing death rate among our countrymen.

Following is a table showing death rates among Indians at ages between 30 and 55 —

Years	Percentages of death at ages.		
	30-40	40-50	50-55
1901-11	26.2%	35.6%	32.7%
1911-21	31.9%	37.7%	35.0%
1921-31	30.6%	40.7%	54.0%

The above table shows that the death rate of Indians aged 30 and above is on the increase. This increase in mortality will very soon affect the Insurance Companies seriously and if sufficient attempts for checking this tendency are not immediately made the Insurance Companies will very soon have many black tales to tell. In my opinion, the cardinal interest of all Insurance Companies is to see how our people may easily earn their livelihood and may thereby retain their youth for a longer time and enjoy a longer life, and to this end every Indian Company should endeavour.

Gentlemen, without detaining you further, I now beg to move that the Consulting Actuary's Report on the Assets and Liabilities of the Company as at 31st March 1933 be adopted and that this meeting decides that the bonus to policy-holders as recommended by the Actuary be declared".

A few Claim Testimonials

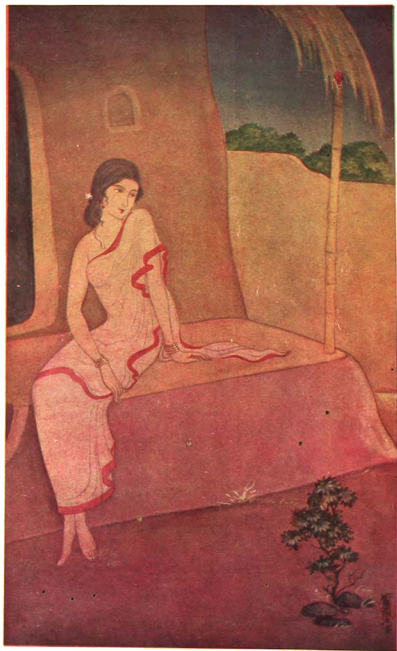
"Re :—Claim against the policy No. 45 on the life of
Surendra Nath Das (deceased) for Rs. 2,000/-

I feel great pleasure in acknowledging the receipt of the amount of the above claim which has been paid to me to-day by Mr. B. D. Mozumdar B.A., LL.B., the Company's Secretary, who has been deputed to shillong for the purpose. My husband the late Surendra Nath Das insured with the Metropolitan Insurance Co., Ltd., for Rs. 2,000/- for which he had paid only Rs. 26/- as the first quarterly premium. After his death the Company very promptly sent the necessary claim papers and its chief-agent Mr. Bhubaneswar Chakravarty helped me enormously in completing the necessary formalities.

Thanks very much to the extraordinary courtesy and sympathy of all the officers of the Company that as soon as the necessary papers duly completed were received by them, arrangements were made to pay the claim with the greatest promptitude. I cherish the best opinion for the Metropolitan Insurance Co., Ltd. and wish this Company all prosperity. Insurance is a real boon to a bereaved family like that of ours and I would recommend the public to insure their lives and represent this first class and respectable Life Insurance Co."

Dated 8th May, 1931,
Shillong.

Sd/- Chaki Baniani.



ସନ୍ଧ୍ୟା

ସନ୍ଧ୍ୟା — ଶ୍ରୀମତୀ ସାମୁ



ভারতের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

—জ্ঞানৈক “অর্থনীতির ছাত্র”

আমরা ভাবতবর্ষের সমস্যা কণা বসিচ্ছি। বেশের উন্নতি ও অবনতি কি তাহা না জানা থাকিলে বেশের সমস্যা কি তাহা বুঝা যায় না। আবার বেশ কাছকে বলে তাহা না জানা থাকিলে, বেশের উন্নতি ও অবনতি কি তাহাও বুঝা যায় না। কাজেই ‘বেশ’ কাছকে বলে তাহা জানিয়া প্রথমেই স্থির করিয়া লইয়াছি।

ভৌ, জীব ও জলজগতের সমগ্রিক নান ‘বেশ’, তাহা আনানিয়ার পাঠকগণের সজ্ঞান মস্তিষ্কে স্থাপিত হইবে।

বেশের উন্নতি ও অবনতি কাছকে বলে তাহা সম্পূর্ণরূপে চিত্তাধীন করিতে হইলে, ভৌ, জীব এবং জলজগতের উন্নতি ও অবনতি কি হইলে হয়—তাহার ধারণা বাস্তবিকভাবে। কি হইলে ভৌর উন্নতি ও অবনতি হয়, কোনটা ভৌর উন্নতির অংশ, আর কোনটা ভৌর অবনতির অংশ, তাহার স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে, ভারতবর্ষের ভৌর এমন উন্নতিস্থ অংশ অথবা অবনতির অংশ তাহা বুঝা যায় না। কাজেই ভৌর উন্নতির অংশ এবং অবনতির অংশ কি হইলে বস, তাহার আলোচনায় অবস্থা প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই আলোচনার সময় অবস্থা বেশটাইচ্ছি যে, ভৌর উন্নতি সাধন করিতে হইলে কৃষকের উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু কি হইলে কৃষকের অংশ উন্নত হয়, তাহার ধারণা না থাকিলে কৃষকের উন্নতি সাধন সম্ভব হয় না। মাছুষের উন্নতি, ও অবনতির অংশ সফল প্রাপ্তি ধারণা না থাকিলে কৃষকের উন্নত অংশ অবনত অংশ বুঝা যায় না। মাছুষের কোনটা উন্নতির অংশ আর কোনটা অবনতির অংশ তাহা ঠিক করা অসম্ভব। বর্তমান জগতে ইহা সঠিক ধারণা মাছুষের

নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে ইহা লইয়া চিত্তাধীন মনোবিদগণের হস্তে এত পার্থক্য হইত না। কাজেই মাছুষের কোনটা উন্নতির অংশ আর কোনটা অবনতির অংশ, তাহা বলাসম্ভব পর্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

মাছুষের কোনটা উন্নতির অংশ কোনটা অবনতির অংশ, তাহা অনুমান ভাবে স্থির করিতে হইলে, মাছুষ কাছকে বলে, মাছুষের কি চাওয়া উচিত, মাছুষের বাহ্য চাওয়া উচিত, তাহা না চাওয়া মাছুষ অস্ত্র ভিন্নিষ চায়ে কেন, মাছুষ অধিকতর যশস্বত্বলিমে সুখি কেন করিতেছে, মাছুষ দুর্দশায় দুঃস্থ হইয়াও কেন পাতিত্যাভিমান পোষণ করে এবং অধিকতর অসহ্যক ভাবে নিজে ও নির্ভর্যগ বহুগতবর্ণের হত্যা সাধন করে, কোন উপায় অবলম্বন করিলে মাছুষের বাহ্য চাওয়া উচিত, তাহা চাওয়ায় প্রবৃত্তি প্রাপ্ত করা সম্ভব,—তাহা জানা একান্ত আবশ্যক।

সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রাণে প্রাণে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন সে সাধনা আশাযোগ্য নাই। একটা মূর্তন বেশকে অংশ মূর্তন জাতিতে বুঝা বস সহজ, একটা প্রাচীন বেশ অংশ একটা প্রাচীন জাতিতে বুঝা তত সহজ নহে। উই শত বংশের একটা বেশ ও জাতিতে বুঝিতে—উই শত বংশের কালের মধ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহা অনুমান করিলেই সম্ভব হয়। কিন্তু উই হাজার বংশের পুণ্যতন একটা বেশ ও জাতিতে বুঝিতে হইলে, উই হাজার বংশের ঘটনায় অনুমান করিতে হয়। উই হাজার বংশের ঘটনা জানা উই শত বংশের ঘটনা জানার তুলনায় বহুগত পরিপ্রসঙ্গপূর্ণ, তাহা বলাই বাহুল্য।

মাহুঘের এক একটা দিন গরম আর পূরাতন ঘটনায় বিশ্বাসি আসে। কোনোই ছুটি পত্র বঙ্গদেশের তুলনায় ছুটি মাতার বঙ্গদেশের ঘটনা অধিকতর বিশ্বাসিত্ব লাগতে নির্মলিত হয়। ভাবভাবের ইতিহাসের অংশও তখন ঘটিয়েছে। বর্তমান জগৎ ভারতবর্ষের প্রাচীনতার তত্ত্ব তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ বুলিয়া দিয়াছে। ভারতের ইতিহাস বলিয়া যাহা শুচিত আছে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতমুখ্য।

—মহাশয় অতি মনুষ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে 'না' আদ্যের এই বীণায় রক্ষা কবিত্তে পারিতেন না। জগতের আর কোন দেশ অধবা ভাষা তাহার ভিত্তিকে এত মনুষ্য কবিত্তে পারে নাই। তাই আর কেহ আদ্যের মনের মত এত বীণায় লাভ কবিত্তে পারে নাই। বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি মনুষ্য কবিত্তে সমর্থ হয় নাই, তাহারিণের নিকট প্রাচীর ভাঙার ভিত্তি কি করিয়া মনুষ্য কবিত্তে হয়, তাহার জ্ঞান অধবা শিক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে। কাহা হইয়াছে, ভাষানী, তব অধবা মার্কিনের নিকট প্রকৃত প্রাচীর ভাঙা কি, মাহুঘের প্রকৃত উচিত কি এবং তাহার সাধনোপায় কি, তাহার জ্ঞান পুঁজি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। অপর আদ্যের সংস্কৃত ও ইংরাজী পণ্ডিতগণ মহাশয়দের পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান বঙ্গ করিয়া লইয়াছেন।

গোড়া গ্রাম্য পণ্ডিতগণ, যেন কেহন, তাহার বৈদিক আচার রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাহারদের মধ্যে কেহই যে, বৈদিক প্রাচীর আচার কি তাহা জানেন না এবং তাহার বাহ্যিক প্রাচীর আচার বলিয়া বনে করেন, তাহার উপর তাহারদের নিয়ন্ত্রণই যে সম্পূর্ণ অধবা নাই, তাহার জ্ঞান তাহারদের পুত্রকর্তৃগণের শিক্ষা। এমন মাত্র এমন কোন গ্রাম্য পণ্ডিত দেখা যায় না, যিনি তাহার সমানমাত্রিক ইংরাজী শিক্ষা যেন না : বাহ্যতে সমানমাত্রিক অতীত লাভ করিত পারে এমন কোন শিক্ষাগ্রাণী উদ্ভাবন করিতেও কেহ পারেন নাই।

প্রাচীনতম মনীষিগণ যাহা বলিয়া থাকেন তাহাতে বুঝায়, ভারতবর্ষের উন্নতি করিতে হইলে ভারতবর্ষের নিজস্ব সভ্যতার ধারা জগৎব্যব করিতে হইবে, এবং এই ধারা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু কাহাঃ তাহার বিজ্ঞান

প্রতিবেশ (Passive Resistance), বিদেশি পণ্যবর্জন (Boycott of foreign goods), অসহযোগ (Non-Cooperation), সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) প্রভৃতি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকটি পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রত্যেক অধবা পরোক্ষ অঙ্গকরণ।

বিলাত প্রভাষিত মিডিলিংহাম, মার্কিনের ও ডাক্তারগণের মধ্যে অনেক দেশ-প্রেমের কথা, দেশোদ্ধারের কথা, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার কথা মূগ্ধ বলিয়া পাকেন বটে, কিন্তু সে সমস্তই যে মূগ্ধের কথা এবং তাহারদের মধ্যে যে এই সমস্ত করার কোন স্থান নাই, তাহারদের মধ্যে কাহারও কাহারও সাংসারিক ও সামাজিক জীবনব্যাপনপ্রণালী লক্ষ্য করিলে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় না কি? বিলাত-প্রভাষিত এমন কে আছে, যিনি পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব (Discipline) যেখা মূগ্ধ না হইয়াছেন? কিন্তু পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব যে মাহুঘের মস্তজ্ঞানিতব্য করিয়া মাহুঘের বুদ্ধি বাহ্যতার হযোগ করাটা দিতেছে এবং জগৎ মাহুঘের বুদ্ধিভীত করিয়া পর-মুগ্ধপেকা এবং অজ্ঞান করিয়া তুলিতেছে, তাহা করণ বিলাত-প্রভাষিত প্রাণে প্রাণে অসম্ভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন?

নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব : আপাতদৃষ্টিতে মাহুঘের হিতকারী তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু মর্দকবাহার উহা হিতকারী নহে। কোন্ বস্ত্র এবং চালচলন প্রকৃত হিতকারী, তাহার জ্ঞান যখন মাহুঘের থাকে এবং তদনুসারে যখন মাহুঘ তাহার চালচলন নিয়ন্ত্রিত করে, তখন নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব তাহার স্বভাবমিষ্ট হয় এবং এই স্বভাবমিষ্ট নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব সর্বদা ইষ্টপ্রদ এবং বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোন্ বস্ত্র এবং চালচলন প্রকৃত হিতকারী তাহার জ্ঞানের অভাব হইলেই মাহুঘের হিতের চূর্ণকরণের প্রারম্ভ্য ঘায়, তখন কোন্ বিধের কোন্ চালচলনে কি ফল হইতেছে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত বিধেয়। যে বাবদ্য কোন্ বিধের কোন্ চালচলনে কি ফল হইতেছে, মাহুঘ তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া এবং তদনুসরণ কার্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, কেবল অকর্তব্য মতকে নিয়ম পালন করে, সে বাবদ্য কোন্ কার্যে কি ফল হইতেছে তাহা জানা যায় না এবং কিরূপ চালচলন মাহুঘের প্রকৃত হিত সাধিত হইতে পারে, তাহাও নির্ণয়িত হয় না। এবং বিধ নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব কি

মাহুগের অধিত্যগো নহে ? অল্প সম্পূর্ণ নিয়মবিন্যাসের
তুলনায় নিয়মহীনতা সর্বদা বাক্যবীৰ্য্য ।

বিলাত-অশ্রুভাগ্যত দেশের ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ
ও সাধারণ মাহুগের মধ্যে পাক্ষাত্য ঐতিহাসিকের অল্পতরুণ
ক্রমণ: বিজ্ঞানগত কঠোরত্ব । প্রায় সকলেই সাহেবেরা
কি করিয়া থাকেন, কি খাটয়া থাকেন, তাহা বর্ণনা করিতে
পারিলে এবং উদ্ভূতকৃত জীবন বর্ণনা করিতে পারিলে পৌরস
অল্পতরুণ করিয়া থাকেন । তাহা না হইলে কুটনয় খেলাস মাষ্ট্র
এবং সিনেমাগামনে এত জোড় দেয়া বাইত না, শির ও
বাণিক্যবিক্রয় লোপুত এত বৃদ্ধি পাইত না, বিলাতী কাফদার
এতগুলি রেস্তোরাঁ চলিত না, স্ত্রী-পুরুষের সমাজিক এবং
অর্থিক মেলামেলা এত প্রকার লাভ করিত না, শিক্ষা, সাহিত্য
এবং রাজনীতিকক্ষেত্র ধাতাগ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাতি অর্জন করিয়া-
ছেন, তাহায়া ঐ ব্যাতি অর্জন করিতে পারিতেন না ।
যদি সকলেই প্রত্যক্ষ অর্থ প্রাপ্তকৃত তাহে পাক্ষাত্য জ্ঞান
ও বিজ্ঞান ব্রহ্ম করিয়া না লইতেন, তাহা হইলে পাক্ষাত্য
শিক্ষাশক্তি, সাহিত্য, সর্গ, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এক
রাজনীতি পড়িয়া ঐ সমস্ত পুস্তক হইতে যে, আলস বিধ
সমস্তই কোন জ্ঞানই লাভ করা যায় না এবং জ্ঞানের নামে
কু-জ্ঞান লাভ হয়—এই কথা ধাতাগ্য মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন
না, তাহাযের পক্ষে প্রতিষ্ঠাতা সম্ভব হইত না ।

বাকী ছিল দেশের কৃষক ও গৃহকোণের মা-জননোপন ।
কৃষকসম্ভাবনগণও এক একটি করিয়া কলেক্ট-হোটেলে ভক্তি
করিয়া ভুজিগেছে । মা-জননোপন এখন আর গৃহ কোণে
আবদ্ধ থাকেন না । এখন তাহাদিগকে ঐ গৃহ-কোণ ছাড়িয়া
আর প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় ।

ভারতবর্ষের অল্প অল্প উল্লি হইয়া পড়িয়াছে । বিন
বত বাইতেছে, ততই উল্লিগত ব্যক্তি বাইতেছে । একদিকে
পাক্ষাত্য বিজ্ঞানে সাংসারিক ক্রমবর্তি হইতে বৃদ্ধি পাইবার
উপায় বৃদ্ধি পাওয়া অসম্ভব, অথচ সাগর ভারতবর্ষ তাহাকেই
ক্রমবর্তি হ্র করিবার উপায় বহুবিধ বরণ করিয়া লইয়াছে ।
এমন কি পাক্ষাত্য বিজ্ঞানে যে সাংসারিক ক্রমবর্তি হ্র
করিবার উপায় নাই, তাহার বোধও ক্রমণ: লোপ পাইতেছে ।

অল্পদিকে ভারতবর্ষের নিজস্ব রক্তের শেষ চিহ্নটি বিলুপ্ত
হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে । এখনও যে সমস্ত

উপকরণ ভারতবর্ষের অগ্রাধিকারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অটুট
পরিচায়ক, তাহাদের কিছু কিছু বর্তমান আছে । কিন্তু সতর্কতা
অবগমণ না করিলে তাহাদের সমস্তই অস্তিত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত
হইবে । আমাদের বর্তমান বৃদ্ধিমান যশে ঐ সমস্ত উপকরণ
দখাণ বৃদ্ধিবার সামর্থ্য এখনই কমিয়া গিয়াছে । অস্তিত্ব
এই অবস্থার পনিপত্তন না হইলে উহা বৃদ্ধিবার সামর্থ্য একে-
বারে বিলুপ্ত হইবে ।

এই অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে ভারতবর্ষের ও
ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস বৃদ্ধি বহির্বিদ্য
একান্ত প্রয়োজনীয় । ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস
মাহুগের উন্নতির ইতিহাসের কথা পণ্ডিতগণ । মাহুগ কত
উন্নত হইতে পারে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা না করিতে
পারিলে ভারতবর্ষের ইতিহাস বৃদ্ধি সম্ভব নহে । মাহুগ কত
দূর উন্নত হইতে পারে, তাহা বর্তমান পাক্ষাত্য শিক্ষার চমক
বিদ্যা বৃদ্ধি উহা অসম্ভব । কাহেই ভারতবর্ষের সমস্ত কি
ও তাহা পুণর্গঠন উপায় কি, তাহা নিষ্কারণ করিতে হইলে
মাহুগ কত উন্নত হইতে পারে, তাহার ধারণা করিতে হইবে ।
এই ধারণা করিতে হইলেও মাহুগ কাহাকে বলে এবং মাহুগ
সমস্তই বিবিধ ভগ্ন কি, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয় ।

কাহেই দেখা যাইতেছে, একদিকে কৃষকদিগের উন্নতি
উপায় নিষ্কারণ করিতে হইলে, মাহুগের উন্নতি কাহাকে বলে
তাহা জানিতে হয় এবং মাহুগের উন্নতি কাহাকে বলে,
তাহা বৃদ্ধিবার জন্য মাহুগ কাহাকে বলে, তাহা জানিবার
প্রয়োজন হয়; অত্রিকের ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস
বৃদ্ধি বহির্বিদ্য করিতে হইলে ও মাহুগ কতদূর উন্নত হইতে
পারে তাহা বৃদ্ধিবার জন্য মাহুগ সমস্তই ভগ্ন জ্ঞান নিষ্কার
আবশ্যক ।

উপযুক্ত কারণে আমাদের মাহুগ সমস্তই বিবিধ ভগ্ন
বলিতে আরম্ভ করিয়াছি । মাহুগ কত বন্ধনের হয়, কেন
মাহুগ বিভিন্ন বন্ধনের হয়, তাহার আলোচনাও আমরা এতাবৎ
বিবিধ প্রসঙ্গে করিয়াছি । তাহাতে দেখা গিয়াছে, বৃদ্ধি
ভারতবর্ষের জন্য মাহুগ ইতিহাসগত ও মন:প্রবণ হইয়া পড়ে ।
দেশের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রবণ লোকের সংখ্যা বাড়িলে দেশের
সাধারণ লোকের ক্রমবর্তি থাকিত পারে না । বর্তমান
সময়ে ভারতবর্ষের সাধারণ লোক, এমন কি অল্পেও, মাহুগ,

সমীচীন ওৎকর্ষে পতিত। শুধু সাধারণ লোকের কোন, বাহাৎ উচ্চশক্তি তাঁহাদের নানা একমের ভণ্ডালের কথা ও সম্মান-সম্বন্ধিত ভবিষ্যৎ তাঁহাদের অসামান্য আকৃষ্ট। বৃদ্ধিপ্রবণ মোটে হইত কেহ কেহ ভবিষ্যৎের ভাবনা ভাবেন না, কিন্তু ভবিষ্যৎ শব্দকে চক্ষুস্ত্রাশ্রয় হইবার কারণ নাই, এমন অসঙ্গতশব্দ লোক বোধের ভাবতবে এমন আর এক-জনও নাই। ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে না যে, ভাবতবে বুদ্ধিপ্রবণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি কমিয়া গিয়াছে? বাহাৎপ্রবণ আশা বুদ্ধিপ্রবণ বলিয়া কান্না কবিতা থাকি এবং বাহাৎ আশাবাদের আশ্বর্ষ্য বুদ্ধিপ্রবণ বলিয়া মান-সম্বন্ধিত কবিতা থাকেন, তাহাদের মধ্যে কয়জন এমন আছেন, বাহাৎপ্রবণ নিজেদের বস্তুর মধ্যে চক্ষুস্ত্রার কারণ বিজ্ঞান নাই? বাহাৎ নিজেদের বস্তুর সমস্তোৎসাহে প্রবাসিতা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন না, তাহাদের নিজেদের বুদ্ধিপ্রবণ বলিয়া ধনে কথা অথবা অপবের প্রত্যা-করণের চেষ্টা করার মুক্তিপ্রাপ্ত কোন কারণ আছে কি?

কোনই যেন বাহাৎ বুদ্ধিপ্রবণ লোকের সংখ্যা বাড়িয়া গায়, তাহাও চেষ্টা করা সমীচীন বিবেচ্য।

মাত্রকে বুদ্ধিপ্রবণ করিবার প্রাথমিক উপায়, বুদ্ধি কি করিয়া বাড়িতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষার তিনটী অংশ; যথা:—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাহিত্য। বুদ্ধি বাড়াইবার মত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাহিত্য কি করিয়া উত্তমরূপে হইতে পারে এবং কেন অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং সাহিত্য, বুদ্ধি না বাড়িবার বুদ্ধি বর্ধনিত আনয়ন করে তাহাও জানিতে হয়।

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা কিরূপ হইলে বুদ্ধির উন্নতির সহায়ক হইতে পারে এবং কেন তাহা উন্নতির সহায়ক না হইয়া অধনতির কারণ হয়, তাহা আমরা ঐ দুই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

বর্তমান সংখ্যার সাহিত্য কিরূপ হইলে বুদ্ধির উন্নতির সহায়ক হইতে পারে এবং কেন তাহা উন্নতির সহায়ক না হইয়া বুদ্ধির অপহারক হয় তাহাও আলোচনা করিব। এই আলোচনার কোন সাহিত্যকে আশ্বর্ষ্য সাহিত্য বলা সম্ভব

এবং কি কবিতা তাহা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের হাতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, দেখাইবার চেষ্টা করিব।

কোন বিষয় শব্দকে কিছু বলিতে হইলে বাহাৎ শব্দকে বলা হইবে, তাহার অর্থ অথবা সংজ্ঞা কি, তাহা লক্ষ্যপ্রদান জানিবার প্রয়োজন হয়। বাহাৎ শব্দকে বলা হইতেছে তাহার পরিচয় জাননা না থাকিলে তৎপক্ষে কি বলা হইল, তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। কোনই আশাশ্রিত প্রথমে ব্রিৎ কবিতা হইবে, 'সাহিত্য' বলিতে কি বুঝার, অথবা 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ কি।

কোন শব্দের অর্থ কি তাহা ব্রিৎ কবিতা হইলে সাধারণতঃ শব্দ কি করিয়া লক্ষিত হয়, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

অর্থ সাধারণতঃ উদ্ভবকেন্দ্র লক্ষিত হইয়া থাকে। মানুষের শরীরের কোন অঙ্গ ক্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে অসুস্থতায়ে শব্দের উৎপত্তি হয় এবং তাহা কিরূপে মানুষের অভ্যন্তরে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়া ক্ষুধিপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষ তাহা স্বভাবতঃ কোন অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহা জানা এবং তদুপায়ে শব্দের প্রয়োগ করা শব্দ-সম্বলন করিবার বৈজ্ঞানিক উপায়। শব্দ-বিজ্ঞানসম্বন্ধে ভালো শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে শব্দের অর্থ, অস্তর এবং বাহিরক জানিতে হয়। তাহার শব্দ-বিজ্ঞানসম্বন্ধে কোন শব্দ ব্যবহৃত হইলে তাহার অর্থ উহার উৎপত্তির বৈশিষ্ট্য (ব্যাংগু) লক্ষ্যে রাখিয়া নিশ্চিত ভাবে বুঝিতে পারা যায়। শব্দ-বিজ্ঞানসম্বন্ধে কোন শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্য অভিধানের প্রয়োজন হয় না এবং একই শব্দ অথবা শব্দ অথবা কথ্য বুঝাইতে যদিও বহু শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে, কোন শব্দই একাধিক শব্দ অথবা শব্দ অথবা কথ্য বুঝায় না। বিজ্ঞানীরাই লক্ষ্যে রাখিয়া শব্দের আপন আপন বিশেষ অর্থ স্বতঃই প্রকাশ থাকে এবং প্রাথমিক: কোন শব্দের একাধিক অর্থ থাকে না, যেন বিজ্ঞানসম্বন্ধে তাহা-বিজ্ঞান জানা থাকিলে বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না।

শব্দ-বিজ্ঞান না জানা থাকিলে ইচ্ছাশ্রুত অর্থ ইচ্ছাপ্রকৃত শব্দের ব্যবহার করিতে হয়। এতদূর শব্দের প্রাথমিক

• বহু 'অর্থ', 'অস্তর', এবং 'বাহির' লক্ষ্যে রাখা যত সাধারণ লক্ষণ হইয়াছে।

ব্যুৎপত্তি থাকে বটে, কিন্তু তাহার ব্যবহার ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধে অর্থে হয় না। কাবেই ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহার অর্থ নির্ধারণ করা যায় না। বস্তু কেন্দ্র নব কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাহার নিজেরই বলিয়া দিতে হয়। যখন নব-বিজ্ঞান মানুষের অপরিস্রব পক্ষে, তখন পশুপক্ষের ভাষা পশুপক্ষের বোধসম্মত করিবার জন্য নতুন সাধনায়ঃ মিলিত হইয়া কোন্ নব কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইবে তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করে এবং অভিধানের সৃষ্টি হয়। এইরূপ ভাবে লম্বত পথের অর্থ তিক করিয়া লওয়া সম্ভব নহে। ফলে যে সমস্ত নব বিজ্ঞানসম্বন্ধ ভাবে সঙ্গতিত অথবা ব্যবহৃত হয় না, তাহাদের অর্থ লষ্টয়া প্রায়শঃ মতভেদতা উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেক পথের একাধিক অর্থ গঠিত হয়। যে ভাষায় বিজ্ঞানসম্বন্ধ অর্থে নব প্রযুক্ত হয় না, তাহার বাক্যের অর্থ লষ্টয়া মতভেদ পাক্য অনিবাধ্য। ভাষার উদ্দেশ্য আপন মনোভাব প্রকাশ করা এবং পরের মনোভাব বুঝিতে পারা। যদি বাক্যের অর্থ লষ্টয়া মতভেদ উপস্থিত হয় এবং নিঃসন্দেহ ভাবে কোন বাক্য বুঝা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ভাষার সার্থকতা থাকে না। কাবেই নব বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভাষাকে অর্থহীন বলা হইতে পারে।

বর্তমান সময়ে ণপতে ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে, সেগুলির প্রত্যেকটির প্রায় প্রত্যেক নব একাধিক অর্থে প্রচলিত। প্রত্যেক নব একাধিক অর্থে প্রচলিত বাক্যের বর্তমানে কোন ভাষায় কোন বাক্য নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝা যায় না। বস্তু সমস্ত তাহেই বাক্য সঙ্গতিত হউক না কেন, এমন কোন বাক্য পাওয়া যায় না, যাঁহার একাধিক অর্থ অসম্ভব হয়। আইনের দ্বারাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের কথা পরিষ্কার হইবে।

একই উদ্দেশ্যে এবং একই অর্থে আইন-প্রণয়নগণ আইনের দ্বারাগুলি প্রণয়ন করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যবহার্য-কৌশল প্রত্যেক দ্বারা বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ বর্তমানে যে সমস্ত ভাষা প্রচলিত আছে তাহার কোনটি নব-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কোন ভাষা নব-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে বলিয়া বর্তমানে

প্রচলিত সমস্তগুলি 'প্রাথমিক নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝা সম্ভব নহে—সম্মতাদিসম্বন্ধ সম্পূর্ণ সংজ্ঞানূত বহু নব প্রচলিত আছে।

'সাহিত্য' শব্দটি ভাষার মধ্যে একটী।

বাঙ্গালা ভাষার প্রায় সমস্ত ইংরেজী শব্দ সমস্ত ঐ ভাষায় সাহিত্য শব্দেই রূপ পাওয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটি অপ্রকারিত আধুনিক। ভারতীয় ধর্মের মূল স্বয়ং, বেদের মূল নব এবং উপনিষদের মূল জগৎ ইহার 'বাবচরিত্র' আশ্রয় খুঁজিয়া গাই নাই। সংস্কৃত ভাষার পরবর্তী যে সকল গ্রন্থ ইহার ব্যবহার দেখা যায়, তাহার কোনটিতেই 'সাহিত্য' শব্দেই কি বুঝায়, তাহার অপরিস্রব সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাঙ্গালা ভাষায় কোন কোন লেখক 'সাহিত্য' শব্দটি সংজ্ঞাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ত্রাধ্য সত্য, কিন্তু কাহারও বক্তব্য আমাদের কাছে পরিষ্কৃত হয় নাই এবং যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাকে অসম্পূর্ণ এবং অপর্যাপ্ত বক্তব্য হইতে শুধক বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে।

'সাহিত্য' শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'লিটারেচার' (Literature) কোন সম্মতাদিসম্বন্ধে অর্থ ইংরেজী অভিধানে আমাদের স্পষ্টপ্রকাশ হয় নাই। 'উল্লেখযোগ্য পাঠ্য' সংজ্ঞারপরে মধ্যে অনেককই সাহিত্যের দ্বারা কি তৎসম্পর্কে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কেহই লিটারেচারের উদ্দেশ্য কি অথবা লিটারেচার বলিতে কি বুঝায় তাহা সম্পূর্ণভাবে অলোচনা করেন নাই। তর্কের ফলে তাহাদের বক্তব্যের অর্থাস্থল প্রদূর্ণ করিয়া সাহিত্যের সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে বলিয়া যদি দ্বিগুণ লক্ষ্য হয়, তাহা হইলেও ভবিষ্যৎ পাঠ্যঃ প্রকারের বক্তব্যমধ্যে কোন সামঞ্জস্য পরিদৃশিত হয় না।

কিছু চিরদিন ভাষায় এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ভাষায় অবস্থা একদিন অপরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়। অপরূপতম সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত নব ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রত্যেকটির অর্থ যে তাহার ব্যুৎপত্তি বিশেষ করিলেই নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝা হইত, তাহা অজ্ঞান করিবার কারণ আছে। পথের সৃষ্টি হয় কেন, পথের মধ্যে কোন্‌তাল মৌলিক, যৌগিক সমস্তগুলি কিরূপে

মিশ্রিত হইয়া মিশ্রিত শব্দের উৎপত্তি হই, মৌলিক শব্দের ক্ষয়ের সত্ত্বে মিশ্রিত শব্দের ক্ষয়ের প্রভেদ কোণার এবং পক্ষমিলনের প্রাকৃতিক ধারা কি, তাহা বুঝিতে পারিলে প্রত্যেক শব্দের প্রাকৃতিক অর্থ কি তাহা নিঃসন্দেহ ভাবে বুঝা যায়। শব্দের ক্ষতি হই কেন, উৎপত্তি লক্ষ্য করিয়া যে সংস্কৃত ভাষা গণ্যযোগ্য তাহাদের ভাষা প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাও প্রমাণ পানিনি দ্বয়ের প্রত্যাশার হৃদয়লি। পতঞ্জলি কেবল ঐ প্রত্যাশার হৃদয়লি বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শব্দের হস্ততাবস্থাঃ প্রত্যাশার অভ্যাস করিয়া শব্দের ক্ষতি হই কেন, শব্দের মৌলিকভাগ, মৌলিক শব্দের মিশ্রণ, শব্দ-মিশ্রণের ধারা, বিভিন্ন মিশ্রিত শব্দের ধ্রুপদ বিশেষ বস্তু যৌগিক অস্ত্রের অস্ত্রভব করিতে না পারিলে, পতঞ্জলি দ্বয়ের ব্যাখ্যা অথবা মূল প্রত্যাশার হৃদয়লি উপলব্ধি করা সম্ভব হইত না।

মূল সম্ভব পতঞ্জলি দ্বয়ের পরস্পরী কালে শব্দের প্রত্যাশার কি কথিয়া অভ্যাস করিতে হয়, তাহা সংস্কৃতবিদগণ বিস্তৃত হইয়াছিলেন এবং অসংখ্য শব্দের প্রত্যাশার অভ্যাস করিয়া প্রত্যাশার হৃদয়লি বর্ণনাও তাহা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। এত সমস্ত সংস্কৃত ভাষাভাষীর প্রাণেরও মূল সম্ভব অভ্যাস কথিয়া গিয়াছিল। ইহার পর বাক্যের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কথিবাব চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারা অসংখ্য প্রত্যাশার হৃদয়লি বর্ণনাও বুঝিতে সমর্থ হই নাই এবং সংস্কৃত ভাষার সংস্কৃত হই অথবা শিষ্টান সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত হইয়া পানিনি দ্বয়ের প্রদত্ত শব্দের ও বাক্যের আদি, অন্তর ও বাহির বুঝিবার প্রণালী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ফলে পরস্পরী ব্যাকরণ-প্রণেতৃগণের ভাষা ব্যাকরণ হ্রস্বাধা ও মূলমুদ্রিত করিবার নামে যে সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের কোনটিকেই শব্দের ও বাক্যের আদি, অন্তর ও বাহিরের সহিত যে ভাষার সামঞ্জস্য আছে, তাহা দেখান হয় নাই এবং পরস্পরী কোন ব্যাকরণ হইতে শব্দের “প্রস্তুত” অর্থ

* সংস্কৃত-সংস্কৃত + হ।

সংস্কৃত-সংস্কৃত + হ (কথ) + হই, : “সংস্কৃত” অর্থে “সম্পূর্ণ-রূপ, অর্থ, আদি, অন্তর এবং বাহির (যেখানে) কলে ধারা উৎপন্ন হয়” তাহা বুঝিতে হইবে। “সংস্কৃত ভাষা” বলিতে বুঝিতে হইবে সেই ভাষা যাচার দ্বিত ব্যাকরণ আদি, অন্তর এবং বাহিরের সামঞ্জস্য আছে।

নিঃসন্দেহভাবে কি কথিয়া উদ্ভাব করিতে হয়, তাহার প্রণালী শিক্ষা করা যায় না। ফলে পরস্পরী সংস্কৃতবিদগণ “চুট”-শব্দ ও “অপ”-শব্দ কাঠকে বলে তাহা বুঝিতে পারেন নাই এবং অসংস্কৃতভাবে বর্তমানে যে ভাষা সংস্কৃত বলিয়া প্রচলিত, তাহার মধ্যে বহু অসংস্কৃত “চুট”-শব্দ ও “অপ”-শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই “চুট”-শব্দ ও “অপ”-শব্দগুলি প্রায়শঃ “সেচ্ছ”-শব্দ কাঠ। শব্দের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া “সেচ্ছ”-শব্দগুলির লক্ষণ হয় না বলিয়া, তাহাদের উৎপত্তির বৈশিষ্ট্য (অর্থঃ ব্যুৎপত্তি) বিবেচনা করিয়া বুঝা যায় না। বর্তমান সংস্কৃতবিদগণ কোনটী “চুট”-শব্দ এবং কোনটী “অপ”-শব্দ তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন না বলিয়া, এই শব্দগুলির লক্ষণে তাহারা মনে করিয়া থাকেন যে, সংস্কৃত ভাষারও ব্যুৎপত্তিগত শব্দ আছে। কিন্তু তাহা সম্বন্ধীয় নহে। প্রাচীন বর্ণনগুলির সূত্রে, পেনের মধ্যে এবং উপনিষদের স্মৃতিতে এখন কোন শব্দ পাওয়া যায় না, তাহাদের ব্যুৎপত্তি পানিনি দ্বয়ের নির্দিষ্ট উপায়দ্বারাও উদ্ভাব করা যায় না। পতঞ্জলি দ্বয়ের পর অসংখ্য শব্দের প্রত্যাশার অভ্যাস করিয়া পানিনির ব্যাকরণ বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়া পরস্পরী সংস্কৃত ব্যাকরণগুলি কিছুতকিমাকার হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যেভাষে তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, শব্দের অর্থ নিঃসন্দেহ ভাবে বোধগম্য করা ব্যাকরণ পড়িবার অন্ততম উদ্দেশ্য। অথচ বর্তমানে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার কোন ব্যাকরণে “শব্দের” অর্থ নিঃসন্দেহ ভাবে উদ্ভাব করিয়া কোন উপায় বুঝিয়া পাওয়া যায় না। এখন সংস্কৃত শব্দের অর্থ হির করিতে হইলে, আমাদের বৈজ্ঞানিকগণের অভিধানগুলিবার প্রয়োজন হয়, অসংখ্য তাহারা পদমাখনপ্রণালী শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং শিক্ষা দিয়া থাকেন। যদি শব্দের অর্থ বুঝিবার জন্য অভিধানেরই ব্যবহার হয়, তাহা হইলে পরমাধনপ্রণালী শিক্ষা করিবার কি সার্থকতা তাহা আবশ্য বুঝিতে পারি না। আসল কথা, ব্যাকরণের সম্বন্ধিত্ত্ব ও ব্যাক্যবিজ্ঞান বর্তমান সংস্কৃতবিদগণের অপরিস্কার এবং ঐ বিজ্ঞান তাহারা কোনে না বলিয়াই বর্তমান জগৎ ভারতীয় কবিগণের প্রাণগুলিতে বাহু বাহাতে তাহাদের অতীত লাভ করিতে পারে, তাহাদের উপায় লক্ষ্য যে অসম্ভব ভাষা যুক্তি আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। পরন্তু বিস্তৃত

সংস্কৃতভাষা ব্যাধি বর্ণন এবং বেশ বহিরাগতীয় করিয়া থাকেন, তাহা অস্বাভাবিক এবং অব্যোমা কতকগুলি কথার ভুলভাষ্যে পরিণত হইয়াছে এবং অত্যাধৈবমিথি জীবনে প্রাপ্যঃ ব্যবহার করা যায় না এবং ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিলেও সাংবাদিক জীবনে বিপর্যয় হইতে পারে। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার এই অস্বাভাবিক ভুলই নানা সুনি নানা মতেই বহিরাগতীয় ভাষ্যে হইয়াছে এবং আধুনিক সংস্কৃতগ্রন্থগুলি ‘ওট’ ও ‘অপ’ শব্দের ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে।

শব্দের প্রত্যয়টির অর্থাংশ করিয়া শব্দ-বিজ্ঞান ও বাকা-
বিজ্ঞান প্রাণে প্রাণে অনুদান করিতে না পারিলে কোনটী
'ছট' এবং কোনটী 'অপ'-শব্দ তাহা সঠিক বুঝা যায় না।
'ছট'-শব্দের উদ্ভব হয় বহু কারণে। 'শব্দ' কি হইলে ছট
হয় তাহা' ঘটোবস্তি বৃষ্টিতে হইলে মনে রাখিতে হয় যে,
নাহুসেব বর্ষ ও জানে সাবজ্ঞত আছে। যে নাহুস বেতন
কর্ম করিয়া পাকে, তাহার জ্ঞান অথবা বস্তু সংঘে ধারণা বা
প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ উপস্থাপন হইয়া থাকে। নাহুসের জ্ঞানের
তারতম্যানুগায়ে তাহার কর্মের তারতমা হইয়া থাকে। কয়েকই
মানুষের জ্ঞান (qualification), কর্ম (activities) এবং
জ্ঞান (knowledge) ও প্রাপ্ত ভাবে ভিত্তি।

মাথায় তাহার কোন্ কাঁধে। কোন্ অস্থায় উপনৌত হয়
 অথবা কোন্ কাঁধে গবে কোন্ কাঁধে পণ্ডিত হয়, তাহার
 'প্রত্যয়' অথবা 'জ্ঞান' সংকুত 'ক্লমত' প্রত্যয়গুলি হইতে লাভ
 করা যায়। প্রত্যেক ক্লমত গ্রন্থের শৃংখল শৃংখল অর্থ আছে।
 যে কাঁধে যে প্রত্যয় অথবা জ্ঞান ওয়া সম্ভব অথবা বাস্তবিক,
 সেই কাঁধে অথবা 'ধাতু'তে সেই প্রত্যয় যোগ না করিয়া
 অথ কোন্ প্রত্যয় যোগ করিয়া পদ সম্বলন করিলে পদ
 'দ্রুত' হইয়া যায়। এইরূপে যে বস্তুত যে গুণ হইতে পারে না,
 সেই বস্তুতে সেই গুণপ্রকাশক কোন্ 'ভাষিত' প্রত্যয় যোগ
 করিয়া পদ সম্বলন করিলেও পদ 'দ্রুত' হইয়া যায়।

ଆସନ୍ତା ଆଗରେ ବଳିହାହି, ‘ମାହିତା’ ନବୀ ଆଚାରୀଙ୍କ ମଝୁତ
 ଶ୍ରେୟ ଲାଭ ହୋଇ ନା । ଶ୍ରୀ ଆଧୁନିକ ଲେଖକ ଏବଂ ଶ୍ରୀହାତେ ‘ହରି’-
 ଲେଖକ ବଳିହାତେ କାହାଣୀ ଆସିବ ।

‘সাহিত্য’ শব্দটা দুইই হটক খার অর্থেই হউক, ভাবাব
 ধনন ইহার প্রচলন আছে, তখন ইহার ব্যবহার একটা সংজ্ঞা
 হওয়া বিধে।

সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য ভাষায় গীতাঙ্গা ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া আদিতেছেন এবং পাশ্চাত্য ভাষায় গীতাঙ্গা ইত্যাদি প্রাতিশব্দ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাঙ্গা কি অর্থে ইত্যাদি ব্যবহার হইতে, তাহা বন্দন বিলিতি হইয়া সঙ্গীতগোবিন্দভাষ্যে কির কয়েন নাই, তখন ব্যুৎপত্তি অনুসারে ঐ শব্দে কি সংজ্ঞা হইয়া উঠিত, তাহা বিব্রত করিতে চেষ্টা করা লম্বা বহিরা আনয়ন মনে করি।

ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য করিলে 'সাহিত্য' বস্তুতে বৃত্তিতে হয় সেই বৃত্ত, যাঙ্গা রাগুণের নিকট হইতে প্রকাশ পায় তখন, বন্দন রাগুণ তাহার 'নিত্যসব'ের স্ফিগত প্রভাবাবিষ্ট হয়।

অন্য রাগুণের যাঙ্গা 'নিত্যসব' তাহার স্ফিগ রাগুণের অচাঙ্ক্যে প্রকট (predominant) হইলে রাগুণের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় রাগুণ যাঙ্গা প্রকাশ করে, তাহার নাম 'সাহিত্য'ক।

‘নিভাসন্য’ বলিতে বুঝিতে হয় সেই বস্ত্র, যাঁহা মানুষের
 জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ।

বাবা বাগা ইষ্ট্রিবেব বাবা অদ্বৈত কবিগা মাগুথকে পশ
 অথবা অস্ত কিছু না বলিগা 'মাগুথ' বলা হয়, তাহাযেব দ্বিত্ব
 মাগুথের 'পঞ্চই' একমাত্র পুত্র বাবা তাহাযে 'নিভ্যাস্তা'।
 'পঞ্চ' ছাড়া মাগুথের আত্মকেও আপাতপুষ্টিতে 'নিভ্যাস্তা'
 'পঞ্চ' বলা বাটতে পায়ে। কিন্তু 'আত্ম' কেবল বাবা ইষ্ট্রিবেব
 বাবা অদ্বৈত কবি বাবা না এবং মাগুথ বলিতে স্মৃত: তাহাযে
 'আত্ম'কেই বুঝায়। মাগুথ আবে বাগুথের 'আত্ম' একই
 অর্থ প্রকাশক। এই কহই মাগুথের 'আত্ম'কে তাহাযে 'নিভ্যাস্তা'
 'পঞ্চ' বা বলিগা তাহাযে 'পঞ্চকে' 'নিভ্যাস্তা' বলিগা বাবগা
 লগা পুষ্টিস্মৃত।

আস বাবা বাহা ইঞ্জিরেব বাহা অহুতব কহিা মাহুগে
মাহু বলা হু, তাহাৰে মখে মশী ইঞ্জিৰ, বক্ত, মাংস এং
মহিষমশিচ মাহুগেৰ অববহ, তাহাৰ ইচ্ছা, হেৰ, এৰত, অৰ,
হেৰ এং জ্ঞান উমেৰখোলা । ইহাৰ মখে কোমীই তাহাৰ
‘মখে’ৰ মত ‘বিভাৰণী’ নহে । মন্তোজাত পিত্তৰ চেহাৰা
চক্ৰ প্ৰকৃতি কানেগ্ৰিৰ এং কঃপিত্তিৰগলি দেখা বাব বটে,
কিহু তাহাৰ সমস্তগলি মন্ত পত্ত একমন্তে বিকশিত হু না ।
পিত্তৰ মশী ইঞ্জিরেব তিতব প্ৰথম পুংগ হু তাহাৰ

বারিষ্টিয়ের এবং ‘শব্দ’ তাহার প্রথম কথ্য। তুমিষ্ট হওয়া মায়ের সন্ত, মাংস এবং অস্থির জিহ্বা আরম্ভ হয় না এবং জীবনের শেষ দুর্ভাগ্য পর্যন্ত বস্তু, মাংস এবং অস্থির বস্তু থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের বিকাশ অটুট থাকে না; সুতরাং অনেক পূর্বেই তাহাদের বিকাশ বিনষ্ট হইয়া যায়। শিশুর উচ্চা। খেণ প্রকৃতির উদ্ভব হয় তাহার ‘শব্দ’-মুদ্রণের পর এবং তাহাদের বিশেষণ হয় সুতরাং অনেক আগে। সুতরাং অনেক আগেই ক্রমশঃ বারিষ্টিয়ের মূদ্রণ, অর্থাৎ কথ্য বস্তু হইয়া যায় বটে, কিন্তু জীবনের শেষ দুর্ভাগ্য পর্যন্ত মাতৃগণের অভাবকে নিঃশাস প্রবাহের ক্রিয়ারূপিত্য প্রকাশক ‘শব্দ’ অতুলন করা যায়। যে দুর্ভাগ্য মাতৃগণের পর বস্তু হইয়া যায়, সেই দুর্ভাগ্যই ‘তাঁহার মৃত্যু’ হয়। মাতৃগণের অভাবকে শব্দে বিকাশে—তাঁহার জীবনীশক্তি প্রবাহিত এবং এষ্ট শব্দের বিশেষণে—তাঁহার বিনাশ। কখনো ‘শব্দ’কেই মাতৃগণের একমাত্র ‘নিত্যসঙ্গী’ বলা হইতে পারে।

মাতৃগণের অভাবকে শব্দের ক্রিয়া প্রকট হইলে মাতৃগণ ক্রমশঃ শব্দের বাহির, অন্তর, আদি এবং তাহাদের আদির আদিক বৃত্তিতে সমর্থ হয়। ইহাটাই নাম ‘শব্দ-বিজ্ঞান’ অথবা শব্দের ‘বস্তু-জ্ঞান’। কোন মাতৃগণেরই শব্দের পূর্ব ‘বস্তু-জ্ঞান’ বিশেষ লাভনা ব্যতীত লাভ হয় না।

মাতৃগণের অভাবকে শব্দের ক্রিয়া প্রকট হইলে মাতৃগণ যে সমস্ত বস্তু, গুণ এবং কথ্য তাহাদের প্রত্যেক বিভিন্ন শব্দ প্রকাশ করে, সেই বস্তু, গুণ এবং কথ্য প্রকাশ করিবার ভিত্তি এই শব্দ ব্যবহৃত হইল কেন, তৎপক্ষে প্রায় উপস্থিত হয়। তখন প্রথমতঃ, মাতৃগণ তাহার অভাবজন্য কোন শব্দের কোন অবস্থার সহিত তাহার প্রকাশিত কোন শব্দ বিভিন্ন শব্দ-বিশিষ্ট তাহার অভাবজন্য পাঠ। দ্বিতীয়তঃ, অভাবজন্য বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন পরিবর্তিত হওয়া বিভিন্ন বস্তু-জ্ঞানের এবং বিভিন্ন শব্দের উদ্ভব হইতেছে তাহার উপলব্ধি হয়। তৃতীয়তঃ, কোন অভাবজন্য বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার অস্বাভাবিক ভাবে। চতুর্থতঃ, তাহার গুণ অভাবজন্য বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহার উদ্ভব হয় কোথায়, তাহার জ্ঞান ও অস্বাভাবিক ভাবে। এই চারিটি অবস্থার প্রত্যেকটীতে মাতৃগণ বিভিন্ন কথ্যের উদ্ভব হয় এবং তিনি এক এক চারিটি অবস্থাতেই উপনীত হইতে পারেন,

তিনি অপরিণীত শক্তিবানী হইয়া থাকেন এবং তাঁহার অভাব কিছু থাকে না।

প্রথম অবস্থার উপনীত হওয়ার নাম শব্দের ‘বাহির’ জ্ঞান। দ্বিতীয় অবস্থার উপনীত হওয়ার নাম শব্দের ‘অন্তর’, তৃতীয় অবস্থার উপনীত হওয়ার নাম শব্দের ‘আদি’ এবং চতুর্থ অবস্থার উপনীত হওয়ার নাম শব্দের ‘আদির আদিক’ জ্ঞান। বাহ্যিক শব্দের ‘বাহির’ পর্যন্ত অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহাদের অভাবকে শব্দের কোন ক্রিয়া প্রকট হয় নাই বৃত্তিতে হইবে। শব্দের ‘বাহির’ পরিচ্ছিন্ন হইতে পারিলে মাতৃগণ যে যে বস্তু অথবা যে যে অবস্থার সংজ্ঞা আনে, তাহার ‘বাহির’ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে পারে এবং ঐ ‘বাহির’ বস্তুর অন্তরের সহিত বিভিন্ন কোথায় সন্নিবিষ্ট তাহাও বৃত্তিতে পাবে। শব্দের ‘বাহির’ আদির্য্য তিনি কোন বস্তু শব্দকে কিছু বস্তুতে আরম্ভ করেন, তাঁহার বস্তুরা হুপ্পট ও সহজবোধ্য হয় এবং তাহার বর্ণনা হইতে ঐ বস্তু ও তাহার অবস্থার বাহির ও অন্তর শব্দকে সঠিক ধারণা হুপ্পট ভাবে প্রোক্তর মনে স্থিত হয়। অভাবজন্য কোন শব্দের কোন অবস্থার সহিত মাতৃগণের কোন শব্দ বিভিন্ন শব্দ বিশিষ্ট, তাহা অতুলন করিয়া কোন বস্তুর অথবা অবস্থার বর্ণনা আবিস্কৃত করিলে ঐ বর্ণনার শব্দ অগম্য হইতেই এষ্ট রূপ ভাবে বিস্তৃত হয় যে, তিনিই নিজ প্রোক্ত সঙ্গীকে বিস্তৃত উপলব্ধি করেন এবং তাহার মনে বসিত বস্তু ও অবস্থার কারণ ও পরিণতি জানিবার গুণ ঐচ্ছিক অতুলন করে।

তিনি তাঁহার অভাবজন্য কোন শব্দের কোন অবস্থার সহিত তাঁহার কোন শব্দ বিভিন্ন শব্দ বিশিষ্ট, তাহা অতুলন করিয়া কথ্য শব্দ-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই নাম ‘কবি’। প্রকৃত কবি নিজ যোগ্যতার, লেখার এবং শব্দ ও বর্ণবিজ্ঞানে বৈশিষ্ট্য থাকে।

তাঁহার নিজ যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য এইটি, যথা:—

(১) প্রকাশিত প্রত্যেক শব্দের সহিত যৌক্তিক সম্বন্ধের কারিক অস্বাভাবিক;

(২) যে শব্দ যে অর্থে প্রকাশিত হয়, সেই অর্থে সেই শব্দ কেন প্রকাশিত হইবে তাহার আঙ্গিক জ্ঞান।

তাঁহার লেখা হুপ্পট ও সহজবোধ্য। প্রকৃত কবি যে বস্তু অথবা অবস্থা বর্ণনা করেন, পাঠকের মনে ঐ বস্তুর অথবা

অন্যদিক দিগে অংশ নান্দিক ভগ্নে প্রকাশিত থাকে, সেটাই সম্পূর্ণ ও সঠিক ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। উক্ত সম্পূর্ণ ও সঠিক ভাবে অঙ্কিত হইলে, কেন এই বস্তুর অথবা অবস্থার প্রকাশ এইরূপ হইল, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন পাঠকের মনে বসাই উঠিয়া হয়। যদি তাহা না হয় তাহা হইলে বৃত্তিতে চট্টবে, এই বস্তুর অথবা অবস্থার বাহ্য বর্ণনা কথ্য হইয়াছে, তাহা সঠিক এবং সম্পূর্ণ নহে এবং যিনি উক্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কবি আথবা পাঠকের উপায়ক নহেন।

কবির বর্ণনার শব্দ ও বর্ণনামাত্র যতই এবং যিহে চমকিত হইয়া থাকে যে, পাঠকের কর্ণে তাহা পৌছিয়া নান্দীভাব সঙ্গীতের একটা সিন্ধুত্বা মাথাটো ঘেঁষে এবং বর্ণিত বস্তুর ও অবস্থার কাল ও পান্থিত জানিবার ক্ষমতা উৎসৃষ্টা প্রাপ্ত করে।

কাহান ও অভ্যন্তর শব্দের জিহা প্রকট হইলে, প্রকটই শব্দের 'বাহির' জানিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা আশ্রয় আশ্রয় বসিয়াছি।

শব্দের 'বাহির' জানিবার প্রবৃত্তি আশ্রয় কবির প্রকাশিত প্রত্যেক শব্দের সঠিত বীর আভ্যন্তরীণ অর্থের সন্ধানের কামিক অসুস্থতা এবং আশ্রয় শব্দজ্ঞান অক্ষম করিতে পারিলে, মানুষ 'কবি' হইতে পারে তাহাও আশ্রয় আশ্রয় বসিয়াছি।

কিছু ক্ষেত্রে কেবল শব্দের বাহির জানিবার প্রবৃত্তি আশ্রয় কবির প্রকাশিত 'শব্দ-জ্ঞান' লাভ করিতে সক্ষম হন না, অল্প প্রকাশিত প্রত্যেক শব্দের সঠিত বীর আভ্যন্তরীণ অর্থের সন্ধানের কামিক অসুস্থতা এত প্রবল রূপে লাভ করেন যে, কবির বর্ণনা পড়িলে পাঠকের অর্থ যে বিস্তৃত এবং মনে যে উৎসৃষ্টা উৎসৃষ্ট হয়, সেই বিস্তৃত ও উৎসৃষ্টা তাহাযের আভ্যন্তর মনে বেশা বেশ। ইহাযেরই নাম 'গায়ক'।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মানুষের অভ্যন্তরে শব্দের জিহা প্রকট হইলে মানুষ প্রকট 'গায়ক' ও 'কবি' হয়।

তাহার পর দ্বিতীয়-অবস্থার উপন্যাস হইতে পারিলে অর্থ শব্দের 'অন্তর' জানিতে পারিলে, আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন অবস্থার কি রূপে পরিবর্তিত হইয়া বিভিন্ন মনোভাবের এবং বিভিন্ন শব্দের উদ্ভব হইতেছে— তাহার উপলব্ধি হয়। এই অবস্থার মানুষ পরীক্ষিত-জ্ঞান লাভ করে। ঐশ্বর্য্য এই

অবস্থার উপন্যাস হইতে পারেন, তাহাযিগকে 'পরীক্ষিত-জ্ঞান' অথবা 'বৈজ্ঞ' বা 'চিকিৎসক' বলা হয়।

তৃতীয় অবস্থার উপন্যাস হইতে পারিলে, অর্থ শব্দের 'আদি' জানিতে পারিলে, কেন আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন অবস্থার প্রাপ্ত হয়, তাহার অসুস্থতা জন্মে। এই অবস্থার মানুষ বাহ্যতঃ বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। বর্তমান পরীক্ষিত ও রক্ষণ নিচুণ ভাবে বস্তুর আদি-জ্ঞান পর্যায়ের অগ্রসর হইতে পারিলে, বস্তুর সম্বন্ধে বস্তুর জানিবার কল্পনা করা সম্ভব, তাহাকে বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান বলা যাইতে পারে। বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন কণ্ঠ করে কেন, অর্থ বস্তুর কণ্ঠকল্পনা কিরূপ ও কতখানি তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। বস্তুর কণ্ঠ-কল্পনা কিরূপ ও কতখানি জানিতে পারিলে কোন বস্তুর কি কি গুণ এবং তাহার প্রত্যেক কি তাহা সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয়। প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক গুণ ও কণ্ঠ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করার নাম বস্তুর-জ্ঞান লাভ করা। ঐশ্বর্য্য শব্দ-জ্ঞানের তৃতীয় অবস্থার উপন্যাস হইয়া বস্তুর-জ্ঞান লাভ করেন, তাহাযিগকে 'বৈজ্ঞানিক' অথবা 'প্রাচীন' বলা যাইতে পারে।

চতুর্থ অবস্থার উপন্যাস হইতে পারিলে, অর্থ শব্দের আদির আদিগে জানিতে পারিলে, বাহ্যিক আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন অবস্থার প্রাপ্ত হয়, তাহার উদ্ভব কোথায় তাহার জ্ঞান ও অসুস্থতা জন্মে। এই অবস্থার মানুষ বাহ্যতঃ বস্তুর গণনা বর্ণনা কবির বাহ্যিক লাভ কবির্য্য প্রকট-জ্ঞান লাভ করে। ঐশ্বর্য্য এই অবস্থার উপন্যাস হইতে পারেন, তাহাযিগকে 'প্রকট-জ্ঞান' অথবা 'বিশ্ববিদ' অথবা 'কবি' বলা যাইতে পারে।

উপরে বাহ্য বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, মানুষের নিজস্ব 'শব্দ' এবং তাহার জিহা মানুষের অভ্যন্তরে প্রকট হইলে মানুষ গায়ক, কবি, অথবা বৈজ্ঞানিক, অথবা বৈজ্ঞানিক হইয়া থাকেন। গায়ক পড়ি অসুস্থতায় মানুষের বাহ্য নিজস্ব, তাহার জিহা মানুষের অভ্যন্তরে প্রকট হইলে মানুষের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় মানুষ বাহ্য গণনা করে তাহার নাম 'সাহিত্য'।

কাণ্ডে 'সাহিত্য' বলিতে বুঝিতে হইবে ভাষা, বাগ্য
মাহাত্ম্য, গায়ক, কবি, অথবা বৈজ্ঞানিক অথবা
দার্শনিকের জ্ঞান অর্জন করিবার প্রকাশ করে। অথবা
প্রকৃত গায়ক, কবি, বৈজ্ঞানিক, অথবা দার্শনিক বাগ্য
প্রকাশ করেন তাহাও নাম সাহিত্য। কাব্য, নাটক, উপজ্ঞান,
ইতিহাস, নব্য-তত্ত্ব, বিজ্ঞান এবং ধর্ম সম্বন্ধে সাহিত্যসম্পদ।

মনে রাখিতে হইবে, প্রকৃত লক্ষণ-সম্পন্ন গায়ক, কবি,
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক না হইয়া কেবলমাত্র নামে
'গায়ক' গায়ক, কবি প্রকৃতি, ভাষ্য বাগ্য প্রকাশ করেন,
তাহাকে প্রকৃত সাহিত্য বলা যায় না।

প্রকৃত সাহিত্য সমাজ গড়িবার তুল্য এবং জনসাধারণ
সাধারণে তাহাওঁষে অর্জিত লাভ করিতে পারে, তাহাওঁ
সামর্থ্য আনিবন করে। জনতের সর্ববিধ বস্তুর উদ্ভব
কোথা হইতে, বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন অর্থ কি কি এবং কেন
তাহারা গৃহক পৃথক অর্থবিশিষ্ট হইতেছে, বিভিন্ন বস্তুর
বিকাশ কি কি এবং কিভাবে তাহারা বিভিন্ন বিকাশ প্রাপ্ত
হইতেছে, বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন ব্যবহার, গুণ ও কর্ম কি কি
এবং কেন তাহারা বিভিন্ন ব্যবহার, গুণ ও কর্মসম্পন্ন হইতেছে,
এবং নিম্ন উল্লেখ্য সম্পূর্ণ সঠিক জ্ঞান সমাজে বিস্তারিত থাকিলে
এবং ঐ জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা থাকিলে
সমাজে কতদূর কোন ক্রমবর্তী থাকিতে পারে কি?

জনতের সর্ববিধ বস্তুর উদ্ভব হইতেছে কোথা হইতে,
তাহার জ্ঞান লাভ হয় 'দার্শনিকের' নিকট। বিভিন্ন
বস্তুর বিভিন্ন ব্যবহার, গুণ ও কর্ম কি কি এবং কেন তাহারা
বিভিন্ন ব্যবহার, গুণ ও কর্মসম্পন্ন হইতেছে, তাহাওঁ জ্ঞান লাভ
হয় 'বৈজ্ঞানিকের' নিকট। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন অর্থ কি
কি এবং তাহারা গৃহক পৃথক অর্থ বিশিষ্ট কেন, তাহাওঁ জ্ঞান
লাভ হয় 'বৈজ্ঞানিক' নিকট। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন বিকাশ
কি কি এবং কেন ও কিভাবে তাহারা বিভিন্ন বিকাশ প্রাপ্ত
হইতেছে, তাহাওঁ জ্ঞান লাভ হয় 'গায়ক' ও 'কবির' নিকট।
কাণ্ডে যে সমাজে প্রকৃত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক,
গায়ক এবং কবি বিজ্ঞান পাঠক, সেই সমাজে ক্রমবর্তী
থাকিতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে।

উহা হইতে ইহাওঁ বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত সাহিত্য
যে সমাজে থাকে, সে সমাজে কাহারও ক্রমবর্তী থাকিতে
পারে না; কারণ সাহিত্যের সংজ্ঞাসমূহে প্রকৃত দার্শনিক,
বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক, গায়ক এবং কবি বাগ্য প্রকাশ করেন,
তাহার নাম সাহিত্য।

সাহিত্যের আভাস হয় কবির হস্তে এবং তাহার পূর্বভা
সাহিত্য হয় দার্শনিকের হস্তে।

যখন কোন বস্তু মানুষের উজ্জ্বলপ্রাণ হয়, তখন ঐ বস্তু
দ্বারা মানুষ তাহার উজ্জ্বল বাগ্য কত বকবের বেলা করে

এবং ঐ বস্তুটাই বা কত বকব কাব্য করে, তাহা সম্পূর্ণ সঠিক
ভাবে দেখাইয়া দেওয়া এবং বর্ণনাক্রমে ঐ বস্তুর কারণ ও
পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য করা 'কবির' ও
'গায়কের' কাব্য। ঐ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভেরা প্রাপ্ত
হইলে ঐ বস্তুর অর্থবর্তী কি কি অর্থ আছে এবং তাহাওঁ
কাহার কি কাব্য, তাহা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে জানাইয়া দেওয়া
'বৈজ্ঞানিক' কাব্য। বস্তুর আভ্যন্তরীণ অর্থের কাহার কি কাব্য
তাহা আশ্রিত থাকিলে, কেন বিবিধ অর্থ উদ্ভব বিভিন্ন কাব্য
করিতেছে, তাহা জানিবার প্রকৃতি বস্তুই মানুষের মনে প্রাপ্ত
হয়। কেন বস্তুর আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন কাব্য
করিতেছে, তাহা জানাইয়া দেওয়া 'বৈজ্ঞানিকের' কাব্য।
কেন আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন কাব্য করিতেছে তাহা
জানিবার উপায় হইল—একটি 'অধ্যয়ন' এবং আর একটি
'প্রত্যক্ষ'। যে কারণে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন অর্থ বিভিন্ন
কাব্য করিতেছে, সেই কারণ কি, তাহা সঠিক ও সম্পূর্ণভাবে
জানিতে হইলে, সেই কারণ কোথা হইতে উদ্ভূত হইতেছে,
তাহা প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন হয়। কোথা হইতে বস্তুর
আদির উদ্ভব হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ অথবা 'ধর্ম' করিয়া
জানাইয়া দেওয়া 'দার্শনিকের' কাব্য।

কাণ্ডে সমাজ সম্বন্ধে কবির এবং গায়কের সর্বপ্রথম
বাণী; কারণ বর্ণকের মনে বস্তুর ও অবস্থার বর্ণনা
ও গান দ্বারা বস্তুর অবস্থার কারণ ও পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞান-
লাভের উদ্দেশ্য করা তাহাওঁয়ের কাব্য।

বর্ণনা অথবা গানের দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা
প্রাপ্ত না হইয়া, বস্তুর উপভোগের ইচ্ছা প্রাপ্ত হইলে, কবি
ও গায়ক সমাজের সঙ্গীত-সাধক হইয়া থাকেন। জ্ঞান-
লাভের ইচ্ছার প্রাপ্ত না হইয়া উপভোগের ইচ্ছার প্রাপ্ত
হইলে মানুষের যে সঙ্গীত হয়, তাহা আশ্রিত আশ্রিতের গত
সংসার বোঝাইয়া। যখন বর্ণনা অথবা গানের দ্বারা বস্তু
সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা প্রাপ্ত না হইয়া, বস্তুর উপভোগের
ইচ্ছা প্রাপ্ত হয়, তখন বর্ণনা বিকৃত হইয়াছে এবং বিকৃত
সাহিত্যের উদ্ভব হইতেছে বুঝিতে হইবে।

প্রকৃত সাহিত্যের রূপ সর্বদা একরকম, যথা—
বস্তুকে সুস্থানুসূচক দেখাইয়া দেওয়া এবং তৎসম্বন্ধে
বিবিধ জ্ঞানলাভের ইচ্ছার উদ্দেশ্য করা। আর বিকৃত
সাহিত্যের রূপ বহু; কারণ, বিকৃত সাহিত্যে উপভোগের
কল্পনা ও চিত্র সর্বদাই অসংখ্য রকমের হইয়া থাকে।

প্রকৃত বুদ্ধিবৃত্তি না হইলে মানুষ প্রকৃত সাহিত্যের বস্তু
করিতে পারে না। আবার মানুষ মনঃপ্রবণ ও ইন্দ্রিয়প্রবণ
না হইলে বিকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হয় না।

কাণ্ডে সাহিত্যকে আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিপ্রধান, মনঃপ্রধান ও
ইন্দ্রিয়প্রধান—এই চারটি শ্রেণীতে বিভাগ করিলে প্রকৃত

সাহিত্যকে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিপ্রধান বলিতে হয় এবং 'বিশুদ্ধ সাহিত্য'কে ইন্দ্রিয়প্রধান ও মনোগ্রধান বলিতে হয়।

যে গান, কাব্য, নাটক, উপহাস, শব্দগুচ্ছ, বিজ্ঞান ও মননের পুস্তক পাঠকের মনে বস্তু ও অসংজ্ঞার কারণ ও পরিণতি জানিবার ইচ্ছা জাগ্রত করে, তাহা 'বুদ্ধিপ্রধান' অথবা 'জ্ঞাত সাহিত্য'।

যে গান, কাব্য, নাটক, উপহাস, শব্দগুচ্ছ, বিজ্ঞান ও মননের পুস্তক পাঠকের মনে বস্তু ও অসংজ্ঞার কারণ ও পরিণতি জানিবার ইচ্ছা উৎকল না করিয়া তাহার উপভোগের লালসা জাগ্রত করে, তাহার নাম 'ইন্দ্রিয়প্রধান' ও 'মনঃপ্রধান' অথবা 'বিশুদ্ধ সাহিত্য'।

ইন্দ্রিয়প্রধান সাহিত্য

স্বরূপ

কেন, কি উদ্দেশ্যে লিখিতেছি তাহা বিস্ম না করিয়া, লেখক বাহ্যে লিখিতেছেন, তাহাতে কোন বস্তু অথবা অবস্থার দামন্তর আছে কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বাহ্যে লেখা হইতেছে, তাহা কোন বস্তু অথবা অবস্থার প্রতীতি হয় কি না, তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদান না করিয়া, লেখকের মনে বাহ্যে উত্তর হইল, তাহা লিখিয়া বাহ্যে অথবা প্রেক্ষার বাহ্যে লেখা হয়, তাহার নাম 'ইন্দ্রিয়প্রধান সাহিত্য'।

প্রণালী

দ্রষ্টব্য ইন্দ্রিয়প্রধান কাব্যের মত সাহিত্যগণ্যে বিধে বাহ্যে ইন্দ্রিয়প্রবণ, তাহাও তাহাদের সচিৎ বিধে কর্ণে তুলিকার হইলেই পূর্ণতা পন পূর্ণতা রচনা করিয়া গান; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে রচনা করিতেছেন, রচনার পাঠক অথবা নিজের কোন শুভ ফল হইতেছে কি না, তৎপ্রতি বিশ্বাস ও পূর্ণতা করেন না।

পরিণাম

কি উদ্দেশ্যে রচনা করিতেছেন, রচনার পাঠকের অথবা নিজের কোন শুভ ফল হইতেছে কি না, তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিলে রচনাযাত্রা পাঠক অথবা লেখক উভয়ের কাহারো হিতসাধন করা সম্ভব হয় না। ফলে উভয়েই অনির সাধিত হয়।

মনোগ্রধান সাহিত্য

স্বরূপ

অনুক অনুক বস্তু অনুক অনুক ভাবে অনুক অনুক বস্তু অথবা অবস্থা বর্ণনা করিয়া ব্যাতি অর্জন করিতে পারিয়াছেন, তখন আশ্রয় ও আশ্রয়পন্ন সাহিত্যিক হইতে হইলে একরূপ ভাবেই এই বস্তু এবং অবস্থার বর্ণনা করিতে হইবে—এবংবিধ আশ্রয়পন্ন হইয়া রচনা করা মনঃপ্রধান

সাহিত্যের স্বরূপ। কেন এই ভাবেই এই বস্তু এবং অবস্থার বর্ণনা করিয়া, আশ্রয় রচনার পাঠকের কোন হিতসাধন হইতেছে কি না, মনঃপ্রধান সাহিত্যিক তৎপ্রতি কোন লক্ষ্য রাখেন না।

প্রণালী

মনঃপ্রধান সাহিত্যের বিধ ও তরী, তাহা অল্পকণ ও অল্পকণকণ হইয়া থাকে। অল্পকণ কথা উদ্ধৃত করিয়া রচনা বোঝাই করিয়া দিয়া প্রসূতি মনঃপ্রধান সাহিত্যে অত্যন্ত প্রকট থাকে।

পরিণাম

মনঃপ্রধান সাহিত্যরচনার কোন হিতসিদ্ধি উদ্দেশ্যে নিহিত না থাকায় ইহাযাত্রাও লেখক ও পাঠকের কোন হিত সাধিত হয় না, বস্তু অল্পকণই হইয়া থাকে।

বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্য

স্বরূপ

কেন, কি উদ্দেশ্যে লিখিতেছি, কি ভাবে লিখিলে পাঠকের সুযোগ হইবে, কোন বিষয় কিরূপ ভাবে লিখিলে লেখকের ও পাঠকের হিত সাধিত হইবে—এবংবিধ চিন্তা বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্যরচনার স্বরূপ।

প্রণালী

সেইরূপে মনঃপ্রধান কি অসংজ্ঞা আশ্রয় উপনীত হইয়াছে, এই অবস্থার ভিতরে বাহ্যের ও অব্যক্তীয় কি কি আছে, কিরূপে জান লাভ করিলে অথবা কর্মপ্রণোদিত হইলে অব্যক্তীয় অথবা দৃষ্ট হইবে ও দৃষ্টীয় অবস্থার উদ্ভূতি সাধিত হইবে, মনঃপ্রধানের পাঠকরূপে যে অবস্থা ও প্রসূতি, তাহাতে কিরূপভাবে ও ভাবেই রচনা করিলে রচনা তাহাদের সুযোগ হইবে—ইহা চিন্তা বুদ্ধিপ্রধান রচনার প্রণালী।

পরিণাম

লেখক ও পাঠকের হিত কি করিয়া সাধিত হইবে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিত হওয়া বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্য সর্বদা লেখক ও পাঠকের হিত সাধন করে। বস্তুতঃ বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্য আশ্রয় ও বাহ্যেই অশ্রয় ও বাহ্যেই অশ্রয় ও বাহ্যেই অশ্রয় এবং কি কিরূপে তাহা উপার্জন করিতে হয়, তাহার জ্ঞান ও তদনুসারে চরিত্র বুদ্ধিপ্রধান সাহিত্য হইতে লাভ করা যায়। আশ্রয়ী বস্তু আশ্রয়ী সাহিত্যের স্বরূপ প্রসূতি, আরও কিছু সাহিত্য সম্বন্ধীয় কথা আলোচনা করিব।

[ক্রমঃ

স্মৃতি-মন্দিরে

— শ্রীমাবিক্রান্তোপ্রমদ চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতি-মন্দিরে ভাগ হে দেবতা, ভাগ ভাগ সুন্দর
মহিমাবিত্ত প্রভাবে পূর্ণা হোক ক্ষুদ্র-কন্দর।

তব চরণের অরবচ্ছিন্ন ধরিয়া চলছে যারা
তব কর্তব্য আস্থান তুমি শ্রদ্ধায় গৃহহারা,
তোমার আলোকে হেরিয়া তোমারে,

তোমারই মন্বলে,

হাতে পায়ে বীধা শৃঙ্খল তব নির্ভয়ে পথে চলে,
আজি প্রাপ্তবে, তারা জনে জনে

নীরবে পাড়াল এসে,

কি আদেশ তব বলিবে না আজ ?

পাড়াবে না তুমি হেসে ?

ভঙ্গুর দেহ চিতায় নিখাল, অমর আত্মা ভয়
মৃগদৃগদ্য ছাপায় কীর্তি বহিল মহিমবদী।

মৃত্যুর দ্বন্দ্ব ফিরে গেল ঘরে অমৃত-ভাষণ রাখি
একবার তুমি মাড়া কি গিবে না,

জাগিয়া উঠিবে না কি ?

সাত কোটি প্রাণ বেঁধেছিলে তুমি একটি গ্রন্থি দিয়া

চিত্তমেশের হে সেন্সবদ্ধ, ওগো ঘুম-ভাতানিয়া,

প্রাণে প্রাণে তুমি জাগিয়া রয়েছ,

ভাই সে প্রাণের বাণী,

মূর্ত্তি লভিল স্মৃতি-মন্দিরে, পরম ভাগা মানি।

তোমার বাণীরে মূর্ত্তি দিবার আজি মাড়া পড়িয়াছে.

দয়ামায়াহীন পাব্যগদ্য এতদিনে নড়িয়াছে।

জড়ের পাথর কড়ের নিশান বেঁধে দিয়েছিলে তুমি

সে নিশানে আজ হাওয়া লাগিয়াছে; জননী জনকুমি,

বিরহে তোমার মোহে আঁখিজল, স্মৃতিমন্দির ঘিরে,
আবার গগনে বেঘ নামিতেছে আদিগঙ্গার তীরে।

সে কি ভূযোগ বাহিরে সেদিন, এল পথে বাহিরিয়া,
বিহ্বাং লেখা অঙ্কিত ভালে, তুর্গম পথ দিয়া ;

রুচ আননে হাসি প্রসন্ন, আসন্ন অমরাতি,
চারিদিকে চলে বলদগুপ্তের অরুণ মাতামাতি ;

সমরাস্থানে সে কি উল্লাস, লক্ষ্য অগ্রগতি,

পন্দাতে এল মন্থনিত্র অমৃত অভয়ত্রয়ী ;

পার হয়ে গেলে হস্তব নদী, লজ্জিতা গিরিদরী

মরু-মাকতের দহন-উন্মি নির্ভয়ে সমুদ্র'

পথের নিশানা জাগিল সেদিন তোমার চরণাব্যাহতে

নবপ্রভাতের অরুণ আলোক বিকীর্ণ আঁখিপাতে।

সেই আঁখি দিয়া দেখ সেনাপতি, তোমার বাহিনীমাঝে
কাটা সৈন্তের দেহ-পিঙ্করে প্রাণ-পাখী মরে লাঞ্জে।

জীবন-মরণ মধুন করি ওঠে সেখা ইলাহল,

হে মৌলকর্ত্ত তুমি নাই আজ ;—অবহলি' ফলাফল

কর্ত্তে ধরিবে এ হেন শোধ্য ধরে আজি কোন্ বীর,

তুমি জাগ গুরু, ভাগ এ শ্মশানে সচকিতা মন্দির।

মরণে অমৃত বিলাইয়া গেলে স্মৃতি অহঙ্কারে

পাব্যে করুণা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নিরুদ্ধ কারাগারে।

কর্ত্তে তোমার উঠুক গর্জি রক্তের আস্থান

চিত্তভ্রমের অণু পরমাণু লুক্ক আঞ্জিকে প্রাণ।

তোমার মন্থ মূর্ত্তি লভিয়া আজি স্মৃতি-মন্দিরে

যজ্ঞহোমের বহ্নিশিখায় জলিয়া উঠুক ধীরে ;

সে আশ্রমে পুড়ে সোণ হয়ে যাক যত বলহ কালো

জাগ মন্দিরে হে নর-দেবতা আলাও অমৃত আলো।

জাতিগঠন ও কুসংস্কার

— জিন্নাহ প্রদান চন্দ

জাতি অর্থ বংশ। বাহায়া এক বংশোদ্ভূত ভাষায় এক জাতি। বাহায়া পুরুষাঙ্কুরে এক পেশা অবলম্বন করিয়া ভৌতিকা উপার্জন করে, কিন্তু মধ্যে তাহানিকে এক বর্ণ বা জাতি বলে। এইরূপ বর্ণায়ন মূল বোধ হয় অসুস্থ। পুরুষাঙ্কুরে এক পেশাবাসীর জনসমষ্টিতে এক বংশোদ্ভূত অসুস্থান করা হয়। জাতি শব্দের ইহাই মূল্য অর্থ।

জাতি শব্দটি কতগুলি দেশে অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটু ধর্মাবলম্বী জনগণকে জাতি বলে। বঙ্গা মোসলমান জাতি। ইহানীঃ ইংরাজী জাতি (nation) শব্দের প্রতি-শব্দরূপে, অর্থাৎ একই রাষ্ট্রের বা রাজ্যের অধিবাসীনিগূঢ়ক, জাতি বলা হয়। যেমন খ্রিষ্টান জাতি, মুসলমান জাতি, জাতি। জাতি-তা যুরোপে উৎপন্ন হইয়া বিশেষ প্রবলতা লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রীয় জাতীয়তা বা জাতি-তা বর্তমান যুরোপের ধর্ম। রাষ্ট্রগত জাতীয়তার এবং বংশগত জাতীয়তার মূল এক না হইলেও ফল এক। এক বংশোদ্ভূত এক জাতির লোক যেমন পরস্পরকে জাতীয় মনে করে, যে দেশে যে রাজ্যে প্রকৃত জাতি-তা চলিয়াছে, সে দেশে সে রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীরা পরস্পরকে জাতীয় মনে করে। এইরূপ বেশগত জাতীয় ভাবের সহিত এদেশের লোকের প্রেক্ষণে যে পরিচয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। এক সময় এদেশের গ্রামগুলি এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের মত ছিল। গ্রামের পক্ষাৎ গ্রাম শাসন করিত; গ্রামের "পাঁচজন পরমেশ্বর" অর্থাৎ বর্তা-কর্তা-বিধাতা গণ্য হইতেন। যে দেশে পেশাগত জাতিভেদ এবং ধর্মভেদবুদ্ধি এত প্রবল, সে দেশে প্রাথমিকের মধ্যে একতা না থাকিলে অবশ্য গ্রামের পাঁচের শাসন লুপ্ত হইত না। বহুদিন হই, গ্রামের প্রাচীন ধর্মের পাঁচের শাসন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে গ্রামে একতার বাহা ভিত্তি ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। সেখানে গ্রামের একতার ভিত্তি ছিল প্রাথমিক। সেই প্রাথমিকের চিহ্ন এখনও গ্রামে বর্তমান আছে। আশাধের বেগের গ্রামের মধ্যে জাতিধর্মনির্জিন্বে লক্ষ্য অধিবাসীই এখনও

পরস্পরকে প্রাথমিককে আবদ্ধ মনে করে এবং পরস্পরকে প্রাথমিক ধরিয়া থাকে।

এই প্রাথমিকজনিত একতা না থাকিলে সেখানে প্রাচীন বংশাভা, গ্রামের স্থানান্তি-বিধান লুপ্ত হইত না। হুতরাঃ তখন প্রাথমিক বা প্রাথমিক জাতীয় ভাবের স্থিতির আবশ্যক হইয়াছিল।

এইখানে রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য রাষ্ট্রগত লক্ষ্যের, সমস্ত রাষ্ট্রবাসীকে এক রাষ্ট্রগত জাতিতে গঠিত করা আবশ্যক হইয়াছে। এই মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্য ৪০ বৎসর ব্যয় করিতে চেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু কি ফল ফলিয়াছে? ফল ফলিয়াছে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা! এ বাটোয়ারার কর্তা খ্রিষ্টান প্রধান বর্তা। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যাবে এই বাটোয়ারার জন্য বোঝাই এই দেশবাসী। কিন্তু এ দেশবাসী এইরূপ বিভাগের জন্য সোণী হইলেও তাহাদের কৃতকায বা অকৃতকায (omission) ইহা ঘটায় নাই। গ্রামের লোক যেমন গ্রামের হিতের জন্য বর্ণগত এবং সম্প্রদায়গত ভেদ উপেক্ষা করিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রাথমিক স্থাপন করিয়া লইয়াছিল, তারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক যদি সেই রূপ রাষ্ট্রলক্ষ্য স্থাপন করিয়া বা রাষ্ট্রগত জাতি গঠন করিয়া লইতে পারিত, তবে এইরূপ বাটোয়ারার আবশ্যক হইত না। সাত শতাব্দী ব্যাপী বৃটিশ জাতির সং সংগর্ষ এবং অধ্বন্যতা বাণী অধিবাসী চেষ্টার ফলে, এককাল সকল সংস্কারের অগ্রদূত বাণালীর মধ্যেও এত লক্ষ্য স্থাপিত হয় নাই কেন? উচ্চতর কারণ জাতিভেদ বা ধর্মভেদ নহে; কোনও বাহ্য বাহা নহে; কতকগুলি মনোগত (psychological) বাহা বা সংস্কার এবং কুসংস্কার। এই সকল সংস্কার এবং কুসংস্কার জন-সাধারণের মনে জাতীয় ভাব (political feeling) জাগ্রিত হইতে দিচ্ছে না।

অদৃষ্টবাদ

জাতির শাসনব্যবস্থা দুই পদার্থ। শাসনব্যবস্থা কায অকায, বিবি নিবেদ, আইন কানুন এবং তাহার ফলাফল

মানুষ-সম্মানোত্তর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে। মহাশাস্ত্রাবলম্বকে লোক অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন এবং অলৌকিক শক্তিমান বলিয়া কল্পে এবং উৎসাহের নিকট অলৌকিক ঘটনার ঘটন আশা করে।

পরলোকের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে কোন একদেশের লোক মহাপুরুষের বা মহাশাস্ত্রের অমূল্যমান কবে ভ্রষ্টা হয়ে, ঐহিক কল্যাণের উত্তর অলৌকিক শক্তির আকর্ষণে ধ্রুপদ পরিণামিত ভাষী মহাশাস্ত্রাবলম্বের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বহু উচ্চ-শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে এবং খিলাফাত আন্দোলনের সময় বহু উচ্চ-শিক্ষিত বোঙ্গলমানবের মধ্যে মহাশাস্ত্র প্রাক্তন মহান্ প্রভাবের মূল খোঁজ হয় এইরূপ অমূল্য ঘটনের আশা নিহিত ছিল। বিদ্যতে ১৯২০ সনে মহাশাস্ত্র প্রাক্তন একদেশের লোককে সতর্কায়ী চাক্ষুশী, আশ্রয়গত ওকালতী ব্যতিরিক্ত ভাষ্য করিতে, সতর্কতার সহিত সকল প্রকার সাহচর্য ত্যাগ করিতে, নিজে হঠাৎ কঠিন পন্থা অনুসরণ পরিচালনা করিতে এবং কংগ্রেসের সমস্ত হইতে আত্মদান করিয়াছিলেন এবং আশা বিচাছিলেন, এইরূপ অমূল্য কর্তব্যে এক বঙ্গদেশের মধ্যে প্রচলিত লাভ হইবে। হাজার হাজার শিক্ষিত লোক উৎসাহে আত্মদানে উৎসাহ পূর্ণা গ্রহণ করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী উৎসাহ তিলক প্রভৃতি ভাষ্যে চাহা বিচাছিল। শৌক্যক হিসাবে মহাশাস্ত্র প্রাক্তন অনেক জন্মের আকর্ষণ এবং দেশ বিদেশে উৎসাহ অসামান্য প্রাপ্তি আছে। কিন্তু মহাশাস্ত্র প্রাক্তন শৌক্যক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কি এত প্রশিক্ষিত ব্যক্তি উৎসাহ অমূল্য করিয়াছিলেন? কি প্রকারে পণ্ডিত গুরুত্বের স্বরূপ চক্কা জন্মের অমূল্য হইয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা প্রত্যক্ষ-কারীর মুখে শুনিয়াছেন, এমন অনেক প্রকীর্ণ লোকও মহাশাস্ত্রের আশ্রয়ে চক্কা চলাইতে এবং স্বল্প পরিচিত অসম্পন্ন করিয়াছিল। আধ্যাত্মিক বল (soul force) সংঘর্ষে ত্রিটি-প্রতিটি বিপুল স্বয়ংলব্ধে পরাজিত করিতে পারিলে, এ কথাও বোধ হইত পান্ডিত্য বিচারে * প্রশিক্ষিত ভারতবাসী স্বাক্ষর করিয়া গিয়াছিলেন। এই বিষয়ের মূল কি মহাশাস্ত্রের ত্রিটিস্বরূপ বল এবং চরিত্রের বল, না অলৌকিক ঘটনার (miracle) ঘটনের আশা? আশার অমূল্য হই, মহাশাস্ত্রের তত্ত্বগণের, মনে তখন অলৌকিক শক্তি ঘটনের আশা

আশ্রয় উদ্ভিগ্ন ছিল। তাই উৎসাহ অমূল্য ভাবে উৎসাহ অমূল্য করিয়াছিলেন। অলৌকিক ঘটনার (miracle) ঘটনের আশার দীক্ষা আশ্রয়ের স্বেচ্ছা শিক্ষিত লোকের মনে এখনও বর্তমান বহিয়াছে। অমূল্য অমূল্য উপস্থিত হইলেই তাহা অমূল্য হইয়া উঠে। ১৩ দিন এত দীক্ষা আশ্রয়ের মনে নিহিত থাকিলে, তত দিন আশ্রয় কোন গুরুতর শৌক্যক ঘটনা ঘটাইবার শক্তি লাভ করিতে পারিল না।

মুদ্রা

মহাশাস্ত্রের দৃষ্টি অনুসারে উপর নিবন্ধ এবং ব্যাখ্যার মনে সহজেই অলৌকিক ঘটনার আশা জাগিয়া উঠে, শৌক্যক উপরে ঐহিক স্রষ্টার উদ্ভিগ্ন সাধনের উত্তর স্বাধীনতার মত পূর্ণ উদ্ভিগ্ন তাহাশ্রয়ের পক্ষে সম্ভব না। উৎসাহ উপর হিন্দুধর্মের মুদ্রা বা মোক্ষের ইচ্ছা তাহাশ্রয়কে সকল প্রকার ঐহিক বিষয়ে উদাসীন করিয়া রাখিয়াছে। সকল সম্ভাব্যের হিন্দুর মতেই ভগবৎস্বরূপেই কর্তব্যের ভোগ করিবার উত্তর পূনঃ পূনঃ করিতে এবং মতিতে হয়। কর্তব্য-ভোগের উত্তর উত্তর গ্রহণ করিয়া তাহাই বহন পুনরাবৃত্ত কর্তব্য হয়, তখন কর্তব্যভোগের শেষ হয় না, এবং উত্তর-স্বরূপের শেষ হয় না। কর্তব্যভোগের এবং উত্তর-স্বরূপের হাত হইতে অস্বাভাব্য নাম দৃষ্টি বা মোক্ষ। মোক্ষ লাভ করিতে হইলে উত্তর-শক্তি লাভ করা আবশ্যিক; এবং জ্ঞান-তত্ত্ব সাধন করিতে হইলে বিষয়-বৈরাগ্য এবং বিষয়ভোগ সম্ভব হয় না। কিন্তু হিন্দুধর্মের মনে ভোগের মিত্তি অস্বাভাব্য আকর্ষণ আছে। এই ভোগের আকর্ষণ হিন্দুকে ঐহিক বিষয়ে অনেকটা উদাসীন করিয়া রাখিয়াছে, এবং ত্যাগের প্রতি অস্বাভাব্য তত্ত্বের দৃষ্টি করিয়াছে। ত্যাগের আকর্ষণ এবং ত্যাগের প্রতি তত্ত্ব মহাশাস্ত্র প্রাক্তন পন্থা এবং অসম্পন্ন আন্দোলনের বিস্তারিত স্বরূপে সাধারণত করিয়াছিল। ব্যাখ্যার মনে মোক্ষের আদর্শ জাগ্রিত হয় নাই, ব্যাখ্যা সাধারণত আদর্শ বিষয়ী, তাহাশ্রয়ের পক্ষে এইরূপ আকর্ষণ এবং তত্ত্ব ও সঙ্গীতের সাধন মনে করিতে হইবে।

মোক্ষের এবং আধ্যাত্মিক বৈরাগ্যের হিসাবে দেশাত্মবোধের স্থান যে কোথাও, মহাভারতের একটি ঘটনা তাহার পরিচয়

পাওয়া যায়। মধ্যভারতের আদিপর্বে (১১৪১৬-৩৩) কলিও
হেঁয়ালেক, হুতরাইব কোঠপুর প্রাচীনকাল জ্ঞান গ্রন্থ কবিবাহাব
গাথার গ্রন্থ বোধন এবং পঞ্চ কবিবাহাব। সেট পঞ্চ
তিনটি গাথা, গৃহিণী, পুণ্যল এবং কাঞ্চলক পঞ্চ
কবিয়া উদ্ভিগাছিল, প্রথম বাণু বহিগাছিল এবং
চারিত্রিক আত্মন গাথিগাছিল। এই সকল গ্রন্থকণ দেবিগা
তিনটি হুত হইয়া গাথা হুতবাঈ ভিত্ত, বিদ্র, বত ব্রাহ্মণ
এবং অত্রাঙ্গ হুতবাহুকে উক্তিগা আনিয়া ভিত্তগা কবিয়া-
ছিলেন, “গৃহিণী কোঠ, হুতবাঈ দেই প্রথম বাণা হুতবে।
তারপর এই নবজাত কুমার (হুতবাঈ) বাণা হইবে
কিনা প্রাণা আনাকে বল।” উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ এবং
বিদ্র হুতবাঈকে বলিলেন, “মহাবাহু, আপনাত এই কোঠ পুণ্য
কণগ্রন্থ কবিবাহাব যে সকল গ্রন্থকণ দেখা দিগাছে, তাহাতে
মনে হয়, হুতবাঈ বাণা আপনাত কুলের ক্ষণে দাখিত
হইবে। হুতবাঈ হইলেক পরিত্যাগ কবিগা আপনি আপনাত
পুন ব্রহ্মা কখন।” এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণগণ এবং বিদ্র
এই মোকটি উচ্চারণ করিলেন—

অনন্তক-পুণ্যগ্রন্থ আদিপর্বে কণ: ১২০৭।

অন্য: অনন্তকগ্রন্থ আদিপর্বে পৃষ্ঠা: ১২০৮।

(আদি পৃ: ১১৫০০)

“কুলের বা বাণের হিতের জন্ত একজন (বাণদগকে)
হাগ কবিবে; প্রাণের হিতের জন্ত কুল উৎসর্গ কবিবে;
জনপদের হিতের জন্ত গ্রাম উৎসর্গ কবিবে; আশ্রয় হিতের
(মোক্ষের) জন্ত পৃথিবী ত্যাগ কবিবে।”

মধ্যভারতের উপত্যাক উপাখ্যানের আলোচ্য বিষয়, কুলের
হিতের জন্ত বাণা হুতবাঈ কোঠ পুণ্যক ত্যাগ করিলেন
কিনা। এখানে কুলত্যাগের, গ্রামত্যাগের এবং পৃথিবী-
ত্যাগের কথা অপ্রাসঙ্গিক। হুতবাঈ এই মোকটি উপাখ্যানের
অন্য নহে, এগুলি প্রাচীন বাত, বাতাব একাংশের দখিত
উপাখ্যানের সম্বন্ধ আছে। এই প্রাচীন হিন্দু মনের গতি
হিন্দু প্রাচীনকাল হইয়াছে। জনপদের হিতের জন্ত,
গ্রামজনকে, কুলকে এবং গ্রামকে ত্যাগের বাবস্থার প্রতীক
দেখাইতেন। প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তারপরই আশ্রয়
হিতের বা মোক্ষের জন্ত পৃথিবীত্যাগের বিধান থাকার
বোধাত্মকভাবে কুল ত্যাগাত কণ হইয়াছে। জনপদের হিত
অর্থ অর্থবাহাদীর হিত। হুতবাঈ আশ্রয় হিত বা মোক্ষের
সাধনকে দেখের হিতের উপর স্থান দেওয়া হইয়াছে। মোক্ষের
সাধন সহজসাধ্য নহে। তাহা এই সাধন বাস্তবের সর্বোচ্চ
কর্তব্য পণ্য হুতবাঈ সাধার হিন্দু কাছে বেশিই উচ্চা জ্ঞতি
কর্তব্য বর্ণ হইয়াছে; এবং প্রাক্ত সুবুদ্ধ হুত বা হইলেও,
মোক্ষের দুর্লভ হইয়া বা দ্রুত মাত্র বাস্তবক জ্ঞতর পানির
আশ্রয় সম্বন্ধে উদ্বোধন কবিয়া গাথিয়াছে। ভারতবর্ষের
মোসলমান বিজয়ের ইতিহাসে পথে পথে এই উপাখ্যানের
পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুকার বাত বতদিন না দেশের
লোকের মন হইতে অদূর সম্বন্ধীয় এবং অলৌকিক ঘটনা
সম্বন্ধীয় কুমারের দুর্ভাগ্য হুত এবং বতদিন না এ দেশের
লোক বেশিই উচ্চ বাস্তবিক হিতের সমান আশ্রয়
দিত সম্বন্ধীয়, বতদিন এ দেশে বাস্তব জাতি বা জ্ঞান গঠন
কণ সম্বন্ধ হইবে না।

অনন্তকগ্রন্থের সংস্থান

অনন্তকগ্রন্থের কবিবাহু ওই আদি মোকটলোকে প্রকাশিত উপর হুত উপস্থাপন হই। অনন্তকগ্রন্থের পেশা চিত্রার চিত্রার উপর দেহ—
যার যোগ্য কি বাক্য? কেন যে হুত পুণ্য-বাহু বাক্যল। দেশের মোকটলোকে অনন্তকগ্রন্থ কবিবাহু উপর নির্দেশ দে, অপর্যাপ্ত পুণ্য
পোনান। কর্তব্যপন্যগ্রন্থ হুত ইহিক অন্তর হুত বা হুত, কেউ কর্তব্য কণ বোধে না। আগে আপনাত ভিতর স্বর্ণবাহু, আশ্রয়কি হুত বত,
প্রাচীন দেশের উপরপ্রাচীন সকলের ভিতর বতটা পানি, ই প্রকৃতি বিদ্যায় প্রাক্ত করে, প্রথম অনন্তকগ্রন্থ পুণ্য বর্ণকাল কর্তব্য হুতের পেশ।

এক পথ

— জীমোরীস্রামোহন বুপোপাখ্যায়

সজ্জাপাড়া টাউন ১২ নম্বর বাড়ী হইতে এই যে ভ্রম-লোকটিকে নিভা যেনেন, বেলা নটা পনেরো মিনিটে বাড়ির হইয়া ভ্রম-পারে ট্রাম-স্ট্যান্ডের দিকে চলিতেছেন, যাতে মস্ত টিকিন-বাগ্গ—পাথ চিবাউজেরূপ,—পাড়ার কাণাথো দকে বেলারোনা রাই, কাণাথো পানে ভিজিরি গায়েন না, এই ভ্রমলোকটির নাম ভানেন ?

উহার নাম প্রশান্ত বুপোপাখ্যায়। ১২ নম্বর বাড়ীটি তিনি বৎসর ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিতেছেন। ডাক্তারি দোখারের কোন অকিলে কেরাখিদিরি করেন। তা হোক—ও ভ্রমলোকটির মনের গতি আশ্বাসের পাচকনের মত নহ।

সে কথা বুলিতে হইলে বায়ো বৎসর পূর্বেকার বহনিকা তুলিতে হয়। বায়ো বৎসর পূর্বে ভ্রমলোকটি বহন ছিল রাইল বৎসর। তখন তিনি কলেজে পড়িতেন—খাতিভেন বেনেটোলায় হইলে। কবিতা লিখিতেন—বেলভুয়ার ছিল বিলম্ব লক্ষ্য। এখন বেঘন মাথার সামনে টাক দেখিতেছেন, তখন টাক ছিল না; টাকের পরিবর্তে বড় বড় চুলে দিদির মাগার ছিল পুং! কলেজের ভার যথলে দোদৌন বলিয়া উগার বেশ একটু গ্যাতি ছিল।

কিন্তু এত দুটীনারী কথা বলিতে গেলে প্রশান্তর জীবন-চরিত লিখিতে হয়। জীবন চরিত এ-রূপে কেও পড়ে না, কাজেই চরিত-কথা লিখিয়া লাভ নাই।

প্রাণ মাসের কথা। সেদিন কলেজের ছুটি। সন্ধ্যা হইতে বিদ্বান্য পড়িয়া প্রশান্ত অনেক কথা ভাবিতেছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যেখ যেখিয়া সে কবিতা লিখিতে বলিল; কিন্তু ভরা আর ভাব এ দুটোকে কোথায় লেগ হুঁকি দিয়া লুকাইয়া রাখিল, প্রশান্তর কলমের সূখে কিছুতে আসিয়া থোকা দিল না।

বিদ্বান্য পড়িয়া প্রশান্ত বিশেষ করিয়া ভাবিতেন—আবর্তির কথা।

কেশবের বোন্ আবর্তিত। কেশব আব প্রশান্ত এক

গ্রামের ছেলে। উক্তনে এক রূপে পড়িত। কেশব মায়া বিগাহে। তাহ লাগ ছিলেন এক ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টারের বাবু। মন্দিরের রূপা অঙ্গনভাবে পাটবে ভাবিয়া বেচারী ব্রাহ্ম-সনাতনে নাম লেখাই; বিবাহ করে ব্রাহ্ম-সনাতনের এক প্রচাককের কন্যাকে। কেশবের মা লেখা-পড়া ভাবিতেন—একটা খেয়ে-দুগে নীতকার রূপে তিনি পড়াইতেন। কেশব খাতিয়া থাকিতে কেশবের দূরে প্রশান্ত তাহ ঘূষে বহুবার আনিয়াছে কে কেশবের মস্তিষ্ক শয্যার তার শিল্পের বসিয়া মাথায় আটলুগাপ চাপিয়া তু'মিন বসিবার ভাগ্যক সে লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে এ পুত্রের হাত আঙো অব্যাহিত আছে।

বিদ্বান্য পড়িয়া আবর্তির কথা সে পুন বেসী করিয়া ভাবিতেন। আবর্তি নাইক পড়ে। তাহ টানলেনবন পাতা টানিয়া প্রশান্ত ডা'বিতা দুল শুদবাটয়া বের; আবর্তির অঙ্ক বুকাটয়া বের; এবং...

চিত্রা ক্রমে অঙ্গল চইয়া উঠিল। প্রশান্ত উঠিয়া ভায়া গায়ে বিরা হটেল ছাড়িয়া কেশবের প্রগতিবধে লাভা কবিল।

নিমলায় চাব-তলা একটা বাড়ীর দন উপরতলায় গুটী দন লইয়া কেশবের মা বাস করেন; কন্যা আদিত থাকে সঙ্গে। প্রশান্ত আসিয়া চার তলায় দি'ভির ধারে করাখাত কবিল। মকতা ভিতর হইতে বড় ছিল। চাব-তলায় এই গুটীনার দব; অল্প ভাড়াটিয়া এ তলায় থাকে না।

ধারে করাখাত কবিত আদিত আসিয়া বাব পুদিয়া দিল। কটিল—প্রশান্ত-মা!

পড়ীর কটে প্রশান্ত কহিল—হঁ।

—কি বদর? কলেজে গাওনি?

—না। কলেজের ছুটি।

—ও! আক কলেজ-মোখাক-কোঠান দটে!

প্রশান্ত কহিল—মা কোথায়?

আরতি করিল—প্রকাশ্য বাবু বাড়ী গেছেন ; তাঁর মেয়ে গান শিখছে বাবের কাছে । লক্ষ্যের সময় তাঁরা বাড়ী থাকবেন না—তাই যা এখন পেতে দেখানো : মজিককে লেন্দু দিতে ।

প্রশান্ত আরতির মুখের পানে চাহিল : কহিল,—সে অন্ধগুলো কয়েক ?

মুখ ঝাঁকিয়া আরতি কহিল—একটা অন্ধ তাই শক্ত ।

প্রশান্ত কহিল—চল, বুঝিয়ে দিই ।

ভক্তনে আসিয়া যত্নে বসিল । আরতি ট্রান্সপেন্সন করিতেছিল । প্রশান্ত কহিল—আমি তোমার এবিধমটিক...

এবিধমটিক আসিল ; খাতা আসিল ; পেন্সিল আসিল ।

বই বেধিয়া প্রশান্ত খাতার আঁকের রেখা পাড়িল ।

কিন্তু আঁকের লাইনে-লাইনে মেঘের চমট অন্ধকার হুণলী পাকটো বহিতেছে—যেন সন্দের ডেট ! পাঁচ মিনিট... দশ মিনিট... বিশ মিনিট কাটিল । প্রশান্তের হাতের পেন্সিল হাতে রহিয়া গেল...

উজ্জ্বলিত হাতে আরতি কহিল—কেননা মশার... নিজেও পারেন না তো !

প্রশান্তের মুকের কুলে কুলে যে অন্ধকার ভগ্নট বাধিয়া ছিল, এ হাতের ঢগল আঘাতে সে অন্ধকার ভবিয়া চূর্ণ হইয়া গেল । অবশিষ্ট স্নেহে প্রশান্ত চাহিয়া রহিল আরতির পানে...

লক্ষ্য আরতির গু' গালে স্নানোশান হুটিল । ভু হাঙ্গি সে চাপিতে পারিল না ; আঁচলের খুঁট টানিয়া টোটার উপর চাপা দিয়া ক্রু হাতে আরতি কহিল—কি বেগড় ?

প্রশান্ত কহিল—তোমার !

কথাটা আসিল যেন পাতালের কোন অন্তর হইতে বহিয়া আসিল । তার পর । সে পর যেন পাতালের অন্ধকার বাপের স্পর্শে আঁধি রহিয়া গিয়াছে ।

আরতির মুখ হইতে বাহির হইল—ছোট একটু কথা । সে কহিল—আমাকে আঁক নতুন বেগড় ?

খাড় নাড়িয়া স্তব্ধ কণ্ঠে প্রশান্ত কহিল—তাই...

সঙ্গে সঙ্গে নিখিলের কড় বহিয়া গেল । প্রশান্তের চোখে নুতন-কি দেখিয়া আরতি মুখ নাখাইল ।

প্রশান্ত কহিল—কাল রাত্তির থেকে শুধু তোমাকে

দেখছি আরতি । আমার মন তুমি এখন ছেঁবে বলে আঁক যে, আমার এমন আঁক আঁক কিছু নেই !

আরতি মুখ তুলিল না, তাঁর চোখের দৃষ্টি ঐরিখনেটিকের খোলা পাতার উপর বিচলন করিতে লাগিল । ছাপার অক্ষরে দেখা আছে—If three labourers working seven hours a day...

কল অর্থ প্রি ।

নীরব দৃষ্টিতে আরতির পানে প্রশান্ত অশ্রুত চাহিয়া রহিল, পরে নিজের হাতে তার একখানা হাত চাপিয়া বহিয়া বাপাত কণ্ঠে ডাকিল—আরতি...

চমকিয়া হাত ছাড়াইয়া আরতি দরিয়া বসিল ।

প্রশান্ত কহিল—আমি তোমার ভালবাসি আরতি ।

কাল থেকে অনেক কেবেছি—কেব বুঝছি, তোমার বিহনে আমার জীবন অকৃত্রিম ! আমি মরে যাব আরতি । দস্তি বদছি, তোমার না পেলে আমি বাঁচব না...

বলিতে বলিতে উজ্জ্বলিত হাতে আরতি আরতির হাতখানা আবার নিজের হাতে তুলিয়া প্রশান্ত সে-হাত বুকের উপর রাখিল ।

আরতি সবলে হাত ছাড়াইয়া এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—এ কি প্রশান্ত-না ?

প্রশান্তও উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—আর কিছু নয় । আমি তোমার বিয়ে করতে চাই, আরতি... বিয়ে...

আরতি নিঃশব্দে ভক্ত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ছই গোথে তৎলনা করিয়া কহিল—আমি বুঝি নই প্রশান্ত-না—বংশ হয়েছি পন্থেয়া বহন । আমার একলা পেয়ে এ-সব কথা বলা তোমার উচিত হচ্ছে ? তোমার না আমি বাবা, হনি ?

প্রশান্তের বুকের আঁক করিয়া উঠিল । অপ্রতিভ-ভাবে সে কহিল—তুমি যা বলে ভাবছ, এ তা নয় আরতি । আমি তোমার ভাল বাসি । খুব বেশী ভাল বাসি । তোমার আমি অন্ত ভাবে চাই—সে-কথা আমি বদছি না । আমি তোমার বিয়ে করব আরতি । তোমার; আমার কাছে যেই আর্থের আঁক কানোতে এসেছি...

আরতি কহিল—মাঝের কাছে যদি বললে তো... তাই বল পে । আমার কাছে এ কথা কি বলে তুলছ ?

আরতি একবারা চেয়ারে বসিল। তার নিশ্বাস বহিতে ছিল সুগিয়া সুগিয়া !

প্রশান্ত কহিল—তার আগে শুধু জানতে চাও, তুমি আমার ভাল বাণো কি না ! আমাকে বিয়ে করতে তোমার আগ্রহ আছে কি না !

জু ফুকিত করিয়া আরতি কহিল—আমি যদি বলি, আছে আগ্রহ ? আমি যদি বলি, আমি তোমাকে ঘোটে ভাল বাসি না ?

প্রশান্ত যুগে শপাৎ করিয়া কে বেন ঢাবুক নাহিল : তার যুগ নিষেধে বিবর্ষ হইল। সে কহিল—তাহলে মরণ ছাড়া আমার আর উপায় থাকবে না...

এই কথা বলিয়া সে চুপ করিল, আরতির পানে চাহিল—ঝড়ের পূর্বে আকাশের বেমন চেগরা হয়, নিমর, নিম্পদ...আরতির যুগের তাব ষ্টিক তেমনি।

তার বুকবানো হুগিয়া উঠিল। তবে কি আরতির বুকও মমতা...মাগা...

নিশ্বাস কেলিয়া প্রশান্ত কহিল—ভাবন আমার শূক হয়ে থাকে। শূক ভাবন নিয়ে কে বাচতে চায় আরতি ? আলো নেই—জীব অন্ধকারে...?

একটি ঢৌক দিলিয়া আরতি কহিল—তুমি অন্তহতা করবে ?

অক্ষর বাশে হুগিয়া বেন আর্ত হইয়া উঠিল। প্রশান্ত যুগে কথা ফুটিল না—টোটে টোটে চাপিয়া সে শুধু মাথা নাড়িল : মাথা নাড়িয়া জানাইল, ই।

টোটে উঠাইয়া আরতি কহিল—অন্ততঃ আর কাক নেই ! তের হয়েছ ! তুমি করবে আশ্চর্য্য ! হ' : ! সে সাধি তোমার নেই !

সেখানটায় দাঁক দাধা, সেখানটায় কেহ বুট পরিয়া বাড়াইয়া খরিলে বাধা বেমন টন্টনিয়া উঠে, প্রশান্তর অন্তঃ...

কোন মতে নিশ্বাস চাপিয়া মলিন হাতে সে কহিল—বনেন লব আশা বদন চূর্ণ হয়, সাধন তখন অসাধা সাধন করে।

বিজ্ঞপের ঘরে আরতি কহিল—দে অসাধা সাধন করতে তুমি পার না !

—বেশ। তাহলে তোমার শেষ কথা...আমাকে তুমি বিয়ে করবে না ? প্রণাস্তর বন লঙ্ক হুগিয়া।

—না।...আরতির বর লঙ্ক হুগিয়া।

—আমাকে ভালবাস না ?

আরতি কহিল—ভালবাসা এক বক্তব্যই নয়...

প্রশান্ত কহিল—আমাকে তোমার প্রাণের বদন বলে ভালবাস না ?

আরতি বেশ সত্যেরে কহিল—তুমি যা বলতে, সে ভালবাসা নয়...

প্রশান্ত নীরব রহিল...বহুক্ষণ ; তারপর কোনো মতে বর লঙ্ক করিয়া কহিল—তা হলে এই আমাষের চির-বিবাহ ?

আরতি জবাবে বিল না : উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া গাড়িল।...বুরে কলো আকাশ আরো কলো করিয়া দাঁক-তলাব কোন্ কারখানায় চিহ্নি আকাশে অনর্দল কলো খোঁয়া ছড়াইতেছে !

প্রকাণ্ড নিশ্বাস কেলিয়া প্রশান্ত ঘরের দিকে চলিল।

আরতি সিঁরিয়া চাহিল, কহিল—আমার অঙ্কটা...?

প্রশান্ত হাসিল...মলিন হাসি। অঙ্ক ! হাছের, ভীমন-নাটকের শেষে অঙ্কে যে বহনিকা টানিয়া দিতেছে...

প্রশান্ত চলিয়া গেল। হাসিয়া আরতি সিঁড়ির ধার বক্ত করিয়া ডুয়ার টানিয়া অন্ধ-পট্টিত কোনানু ডয়েরেল হাউও বক্ত দি বাত্কারতিল্ বই খুলিল...বাহালা অন্ধকার।

[২]

প্রশান্ত বদন পথে আসিল, তখন বৃষ্টি নামিয়াছে। সে বৃষ্টি সে গ্রাহ করিল না। জিজ্ঞেতে ভিজিতে সে হট্টলে ফিরিল। মাঠে ছিল মোহনবাগানের মাচ—হট্টল-পুচ্ছ ছেলে মাঠে গিয়াছে।

প্রশান্ত নিতের বরে আসিল। ভিজা জামা-কাপড় গারে আছে, সে কথা মনে ছিল না। মাথার আঙন অক্ষিত ছিল। বৃষ্টি, তারই আঁচে মনে পড়ে নাই।

খোলা জানালা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া সে লাড়াইয়া বসিল। বাড়ীর পর বাড়ী—তারপর বাড়ী—লোক একেবারে শিশু করিতেছে ! ভীমনে এরা কি পাঠিয়াছে ? কি এরা চায় ? লকানে উঠিয়া সেই চাদের পেয়ালা আর

পথের কাপড় : তাবলর গা, হস্তা : কেত হাণ কপেত, কেত
অকিলে—সেখানে গাধার মত খাটে—বিকালে ছাড়া পর :
ছাড়া পাউর ভাড়া ফিরে, ফিরিয়া আবার সেই বলা, গাড়াবো
গর, হাঙ্গি, তাল পেটা, আহার, তাবলর পরন : হিবের পর
বিন গড়াইয়া চলিয়াছে, এই একটু ধারায়। জুগু অগাণ আর
অহার : মাথা ওনিয়াখানা বেন মাতুরে কয়ে আশিয়া
এবেল করিয়াছে : মন নাই : সে মন দয়া নাই, স্মৃতি
নাই, বেহ নাই, মাগা নাটন : কবিতা এই যুগে যুগে
গাহিয়া গিয়াছেন,

কখন অবিধি হৃৎকপ নেহারহ

সে সব মায়া : মস্তোতিকা :—

The fountains mingle with the river

মাঝে সেদিকে কখনো চাটিয়া দেগিয়াছে ?

শিবস-রতন : আমি বেন কাণ

অশাণ অশাণ থাকি।

থাক তো, উনিয়ার কাহার তাহাতে কি বচিয়া গেছে :

মাথার মধ্যে মেন কাষ্ঠানি বুদ্ধ চলিয়াছে : কটাকটু শেল
কাটিতেছে—কেপলিন চলিয়াছে—লাবেরিগের সমারোহ—
চারিদিক সৌন্দর্য বোঁসাকার :

ছেলেবেলা হইতে তার মন কি ছুকে না গড়িয়া উঠিয়াছে !

এই গভীরসত্যিকের পথ ছাড়িয়া এমন অসাধারণ কিছু করিলে
...কালের সান্ধ্যকাল তীরে তার পথেরা গ্রহিবে অনন্ত কাল
ধরিয়া—অক্ষর, অমর হইয়া !—

অতীত জীবনের দিনগুলার পানে সে ফিরিয়া চাহিল।

এখনো চাষার ফিলায় নাই ! কালের ভুলি সে ছবি মুছিতে
পারে নাই। প্রবেশ বুদ্ধিয়া সে ফিরিতেছে চিরদিন।

পাচ বৎসর পূর্বের কথা মনে পড়িল। গ্রাণের নবীতে
বান আশিয়াছিল, কৈবর্তের জাপনা বানের জলে কি
করিয়া আশিয়া বাইতেছিল—ভুব-জলের বিকে। সে ছিল
জীরে। বান সেখিতে আশিয়াছিল। কৈ-২৫ রং চলিয়া চকিতে
কর্তব্য স্থির করিয়া কেলিন—পাথের ক্ষুদ্র, গায়ের জাণা মুদ্রা
সনে ব্যাঘ্র মাংসকোচা আউতেছে—আঁটা। চটলেই জলে
ন্যাপাটের পড়িলে জাপলাকে উদ্ধার করিতে...

এমন সময়ে ডিন-চারিটা মাঝি কোথা হইতে সাঁতরাইয়া

আশিয়া জাপলাকে টানিয়া ডাকার তুলিল। প্রণামের আর
জলে তাঁপ দেওয়া হইল না ! এত বড় সুযোগ—

তাবলর সেবারে সেই মাচ কেলিতে গিয়া পুলিন
মাফেটকে আর একটু হটলেই মাঝিয়া বসিয়াছিল : মাচের
বহু পূর্বে ফটক বন্ধ হইয়াছে—সে টিকিট কিনিবে, পুলিন
মাফেট বোড়ার চড়িয়া সকলকে জাড়া করিতেছে—সে দিকে
কাহাকেও দেখিতে নিবে না—প্রণাম জু বাইবেই !
মাফেটের খোড়া আশিয়া তার গায়ে বেশ দিয়াবান—সে
ছিল কপিল : বোড়ার সুখ তার গায়ে টেকিলে হয়—
মাফেটের কি পেয়াল হইল, বোড়া লইয়া গিয়া সেল—
তার মতখানি গ্রাণ বিয়া নিয়াবার ফিলাইয়া গিয়া।

বিষেটারে গিয়া অভিন্ন দেখিতেছে—কেন অভিন্নতার
অভিন্ন তার জাপ পারিয়াছে—ড্রল পড়িয়াবাত প্রণাম
তুলিল, হুমন মর্শক সেই অভিন্নতার অভিন্ন লইয়া বাহ-
বিভল করিতেছে ! উৎকর্ষ হইয়া সে শুনিতেছিল—ভাবিয়া-
ছিল, আর একটু ভাংচাইলে হুমনের মাথা এমন কোরে
ঠিকিয়া দিবে—কিন্তু তাহা ঘটিল না। খিটোয়ওয়ালা
টুপটু ড্রল ভুলিয়া পরে অকের অভিন্ন জড়িয়া গিল।

এবনি করিয়া সকল দিকে বিস্তারের হুয় উঠিয়াছে—
চিরকাল। সকলে মেন বিস্তার করিয়াছে : তাহাকে
বাধা তৈলিয়া মহা-মানবের পৈঠায় কিছুতে ভুলিয়া দিবে না !

আজ এই আরতি ! তার মনে এতদিনের অন্তরকাততেও
অরতি তাকে চিনিলা না ! তার প্রার্থনা অক্ষর নয়—সে
ভালবাসে, আরতিবে জীবনের চিরদিনীয়া করিতে
চাহে !

হুয়ের উপর বসিয়া বসিল—না ! আরতি কাহিয়াছে
কি ? মাটিক পড়িতেছে বসিয়া নিম্নে একম জ্বরিত
কান্নার বন মনে করে সে ? বিবাহ করিবে তো শ্রমে ঐ
ব্রাহ্ম-সমাজেরই কোনো বেতনকোণী বীন প্রচারকে !
তোমার বাপ ছিল কারিগরের বাবু ! প্রণাম কি তার
চেরেও হীন ?

অদ্বত ভাষণা এই পৃথিবী ! এখানে কেহ কাহারো
গান বুঝে না। বত শোক বেকির কাঠাল। হাং রে,
এ পৃথিবীতে বাচিয়া লাভ ?

প্রশান্ত বলিল, 'তার জীবন মল্লকৃষি হইয়া হইবে ! সে আশ্চর্য্যতা করিবে : সে-কথা হালিয়া উড়াইয়া দিল । জীবন-মল্লকৃষি কথা এমন তুচ্ছ করে !

মত আকোশে বরষা সে পাখ্যচাষি করিতে গাঙ্গিল । মাঝার মধ্যে ঘেনে নায়েগ্রা-প্রশান্ত টপবধ করিয়া স্তুতিতে-ছিল—সে প্রশান্তে জুনিয়া তাগিরা বায়, জালিয়া বায়, গায়ায় এমন বেশ ! এমন লাহ !

হুইচ্-চিপিয়া আলো জালিয়া প্রশান্ত চিঠি লিখিতে বলিল । প্রেমের লিখিল আন্তরিক ।

আরও,

তোমার কথা বিব বলিল মজিত যদি নাই । আমি, আমার মল্লক-তোমার কিছুই জালিয়া গায়ে না । জুনি বিভাচার মত ট্রান্সপার লিখিবে, অথ কতিবে, বিসেসেই লুখ করিবে ; তা নয় । মজিত বলিল তববনের বাহ্যে ব্যস্তকর লিখন জানাইতেছি—তোমার লুখের হাদি অক্ষর হোক ! তোমার সারা জীবনে এ হাদি কেন বলিল না হু—জালিয়া বা বায় !

তোমার আমি জালবাদি । জীবনের শেষ ঘাশে লুকাইয়া একলা বসিতেছি, বিলাস কর—তোমার জালবাদি—আমি জালবাদি । আমার যে-হাত এ-কথা লিখিতেছে—সে-হাত একলা চলিতেছে । তা না, জুনি গতিয়া নাই—জলিয়াহি । আমার আশ এ-বেহ তাগে জলিয়াহি ।

কখন তাগে করিয়াছে, বাব : যে-কখন আমার জুনি কটন খিলাসে এতখানো করিয়াহি ।

সারা জীবনের কথা মনে পড়িতেছে—এই বাইশ বৎসরের লীধ করিহী । পরে আবার কিবা না আছেন : আমার লিখি আছেন : মোটে যোন আছে । তারা কেহই আমার বুঝিল না ! আমার বন্ধু আছে—পরোক্ষ বন্ধু—তার লিখিতেছে জলিয়া বন্ধু—কোনোদিন আমার বুঝিল না ! তারপর জলিয়া-জিলাস, তোমার লুখে বন্ধ আছে, মারা আছে, জালবাদি আছে । তোমার কত জ্ঞান কত বেশে পর দেখিলাম ! হালস, সে শু শু বধ ! কিবা বসিতিয়া !

জালবাদি যদি মজিত হইলো, কি লীধ গতি ? লীধটা কি ? কতকজা দি বায় মজিত আশ-জলিয়া—সেই লুখে মনে, আহার, হাদি, ক্ষ, পজার্ডা বায় লিখের দার্ব : এ জীবন লীধা বায় যে গতিতে চায়, গাহুক । আমি গতিব না : গতিতে পারিব না ।

জুনি হিলে ও বন্ধুজিত কামল জেঙ্গিল । আমার এ ওক মনে লিখ : আমার খোলা-লুক যদি-প্রবীণ । কখন কখন আমি জিলাস লিলাম : আজ সে বধ জলিয়া লুখ হইয়াছে । আশ যদি কোহ তো জীবনটাকে লুখ করিয়া বিহি ।

জুনি মনে এ চিঠি পড়িবে, এখন আমি এ জুনিয়ার কোষে বসি—জুনিয়া-মজি ! যদি তোমার মল্লকৃষি করিয়া থাকি, জুনি জিলা—সে মল্লকৃষি মনে করিয়া ।

তববনে তোমার মল্লক কখন : জুনি চিঠি-হাদি হও !

প্রশান্ত

পেখা শেষ করিয়া চিঠিখানা সে পড়িল । মধ্যমেদের জিহ্মে জিহ্মবিজির মজির মেহের মত তার লুখ মল্লকটাকে চিঠির কাগজে বিছাইয়া সে কেন মালা গতিয়াছে ! নিশাস কোলিয়া চিঠিখানা মাশে পুরিয়া বৈড় বড় অক্ষরে মাশের উপরে সে আগতির নাম-টিকানা লিখিল ।

তারপর আর একখানা কাগজ লইয়া মাঝে চিঠি লিখিল ।

জিলাস,

না,

তোমার চরণ মত মল্লকৃষি মল্লকৃষি । কুপুজার সে মল্লক মল্লকৃষি কথা কর । তোমার মত না পাইয়া মত হইয়াছিলোহি । কিব বিলাস মারি ।

মালা কামল জীবন মালায় গতি বাই । পুদিবা হইতে আমি বিলাস লইতেছি ।

মালায় কতিপয় লুখিক বিলাস জিলাসে বিলাস লিখিতে । মালায় মল্লকৃষি প্রায় লইয়া মালায় মল্লকৃষি আছে ।

চিঠিখানা

প্রশান্ত

মাশের উপর টিকানা লিখিল

মল্লকৃষি

জিলাস, মালা জিলাস

জিলাস-কামল

• মল্লকৃষি মল্লকৃষিয়ারে মালা

ইলাস

Via মল্লকৃষি (মালাকৃষি)

E. B. Hy.

তারপর বন্ধুর মল ।

জাই জলাহি

বধ এ চিঠি পাইবে, এখন আর আমি ইলাসকে ব্যক্তিবে না । জীবনে প্রেম যদি না পাইলাম, জিহ্মি না পাওয়া করিয়াম তো সে জীবনে প্রেমের মল্লকৃষি কি ? তাই আমি জিহ্মি-লুখে মালা মল্লকৃষি বলা করিতেছি ।

তোমার

মল্লকৃষি

P30220

23/2/19

আজ্ঞাও পাঠকন বহু ছিল; তাহানিগকেও চিঠি লিখিল।
প্রাঙ্গণে চিলার কথিয়া তিন টাকা বাগো আদ্য এক টুকরা
কাগজে লুটিয়া আর একখানা চিঠি লিখিল হট্টেলের
ম্যানেজারকে।

সামান্য করে যে টাকা আর লইয়া রাখেন না; সেই কিনিয়া লিখায়,
সে টাকা খোঁষে বিশেষ। বহুক্ষণ।

কিন্তু তাহঁতে, টাকায় নাটক; সে পোটে অর্ধেক লক্ষ!
উপায়? চিঠি লিখা ডাকে না সিংহাসিক করিয়া বহুক্ষণে
হট্টেলের বন্যালীল-কাছে লিখিল একখানি মার্কট-পত্রপত্র
টুকিট।

—মহতের খাম হসে-টুকিট জাতিয়া সে-চিঠি লিখে-গিয়া
ডাক-বাগে সিংহাসিন; তারপর জাবিন, একটা লি-
নিকপায় হইয়া ব্যক্তিহেই হট্টেল; তারপর গাঠার নিশেখে—
এই চোখের সামনে নামিয়া আসিবে হুত্বপ নীল বনিকা!

তার আশা বহুখানি পাগে, শেষবস্তের বহু পুখিবাঁকে
সেখিয়া লইতে কতি কি!

[৩]

গাঠি বাগেটা পথান্ত কলিকাতার পথে-পথে ঘুরিয়া প্রায়
১৫০০ প্রাণান্ত আসিয়া হট্টেলের বাগে কড়াঘাত করিল।
হুত্বা আর, হুগিয়া বিন; হুত্ব-চোখে কহিল—আপনার ঘরে
চাবি দেওয়া ছিল, তাই তাহুর পথে-পথে, প্রায়তনি।
দাবার ঢাকা আছে খরের সামনে একটা কানের টুলের
উপর।

প্রশান্ত হাসিল। দাবার! হুনিয়ার এই কিলক বাতাসের
স্পর্শ ছাড়িয়া থাকিবার উপায় নাই, তাই! আহায়ে
এখনো কতি! হায়রে, সে টুকিট কিনিয়া বসিয়া আছে,
শুধু সমর-একিন হুত্বা-টুকিটকে টানিয়া আনিবেই সে-টুকিট
চড়িয়া বসে!

তার বহুখানা ছোট—সে-ঘরে সে একা থাকে। কাঁছেই
কোনো উপপাতের আলতা ছিল না। শিশালীল পদা
শুকাইয়া টাকায় লিপিতেছিল। এক শাসে মল পান করিয়া
সে উঠা পড়িল। মনে পদে বোর নৈরাস্ত! তার উপর
দীর্ঘ পথ ঘুরিয়া বেড়ানোর কালি! পুখিবার বহু হুদ আসিয়া
তার দ্রোখে নিমেষে চাপিয়া বসিল।

হুদ জাবিন ভায়ে—হুত্বার জাফনা। মাহুয়ের-বহু
বেহ—পক্ষভূতে মিশিতে গিয়াও হুত্বার-মাথা ছাড়িতে, প্যারে
না!

নিকপায়! হাত-পা শুলা পথান্ত, উনরের সহিত বহুক্ষণ
করিয়াছে! উঠিতে গেলে মাথা ঘোরে!

গা-আলমারির মাথা ছিল বিকুটের টিন। মাহের আসেন
ছিল, কাজারের খাবার শাবিনে বাগা—আলার প্য ছুঁয়ে
বলে বা—বিকুটের একটা টিন লক্ষ্য কাছে রাখি! তাই
খাবি। প্রাণত মাহের আসেন-বজাবর পাশে করিতেছে।

চিঠি শুলা ডাকে নিতে হইবে; তার আসে মজা চল
না! হট্টেল থাকিবে না—এখানে এখনি হাসি-গরের মোত
বহিবে। সে-সব তার ভাল লাগে না।

বিকুট গাইয়া গলায় মল চাপিয়া প্রাণান্ত' পথে বাহির
হইল।

দিনে মজা চলিবে না—বহু-বির হট্টেল পাগে। বহিবে
হায়ে—দীর্ঘ হায়ে।

কিন্তু কি করিয়া বহিবে? হাঙড়ার পুণ হইতে গলায়
তাঁপাইয়া পড়িবে মা-না!

মোটর—বাস—পরি—তাহার তলায় পড়িয়া?—না!

রেপের শাইনে দিয়া শুইয়া থাকিবে—প্রাণত সতী-সুপের
বহু ট্রেপ আসিয়া—? না!

বড় বাগা! বড় বাতনা! প্রাণ বহি না যায়, তাকা-
হাত-পা লইয়া থাকিতে হইবে!

বহু?

কি করিয়া জোগাড় হয়?

—আকির!—লক্ষ উপায়! কিন্তু কতখানি আকিরে হুত্বা
হয়? কিনিতে গিয়া যদি বিশেষ পড়ে?

—বহুরের কপকে পড়িয়াছিল, কবে আকির বাইয়া কে
বহুতে সিংহাসিন, বহু আসে নাই! বেচারীকে শেষে পুখি
আসিয়া একে-তার করে। কাছারীতে তার মোটা টাকা
করিয়া বসে!

গাঠ ধরিল। ইচ্ছা করিয়া আদি বহুতে চাবি—তাহাতে
বাগা দিয়া আদ্যকে বাজাইতে তোমাদের এত মাথা-মাথা
কেন, বাপু।

প্রশান্ত নিঃশ্বাস উঠিল। জীবন মল-কৃষি! মরণের
মাত্রের অধিকার নাই! বা রে গনিয়া!

প্রভীর হাতের বস্ত্রের ধার বন্ধ করিয়া পিঠের চাপরের
কান টানিয়া...সেই বেশ! নিঃশাপন ভুড়া! হিঙ্গের আশঙ্কা
থাকিবে না!

নশটার শোই অক্লিষ্ট স্মৃতিস্মারক একদলো। ডাক-টিকিট
কিনিয়া। খাম্বালায় খাঁড়িয়া প্রশান্ত সেঙলা-ডাক-বাক্সের মধ্যে
ভাঁড়িয়া দিল।

প্রাণের স্রুত হইল নিঃশ্বাসের পাড়ি! ..

পা মার মাঝাটনিত চার-না! পথে লোক-জনের ভিড়।
প্রশান্ত হাতের দললের পানে জাকাটনিতছিল। এট সর
লোক ঐক্য তুচ্ছ জিনিষের মোহে-ছুটাইয়া কনিয়া গিয়েছে!
কিন্তু প্রশান্ত জীবন-ভার বহিয়া বেড়াইল। সে কেন
ইহাদের কেহ নয়! সে কেন কোন ভ্রম-বিশেষ হইতে
আসিয়াছে, এমন লোকের সঙ্গে কোথাও তার এতটুক
মিল নাই!

এনি করিয়া পৃথিবী তার ভ্রম-ভ্রম-গন্ধ-স্পর্শ নষ্ট
তার কাঁধ চটতে ধরে, আঁখো ধরে সরিয়া বাটাইতেছিল...

সে-হাতের বগন সে হঠাৎ কিনিয়া, তখন গাতি একটা
বাঁজিয়া গিয়াছে। ভুড়া মরণের ধার পৃথিবী দিল। প্রশান্ত
আদিয়া বোতলার নিভের ঘরে প্রবেশ করিল। গার্মির্ক
নিভাঃ...

বীড়ের ভ্রম-বহিরা তুচ্ছ জলের স্রোত চলিয়াছে—
তাহারি একঘেরে সব এ নিভাঃভার স্রুত বাজিতেছে...

শিঙের চাপর স্রুত উপর বাঁধিয়া প্রশান্ত বিজ্ঞান-পন
করিল। বগন করিয়া কান টানিয়া বিবে...? না, ঐ শোনার
কড়িতে চাপরের একপ্রান্ত বাঁধিয়া পলায় কপার প্রান্ত...

কিন্তু টুটা ছিটকীয়া কিনিয়া বিবাহ সময় দল হইবে
বে! সে পথে যদি কারাও ঘুর ভাই? ঘুর ভাইলে যদি
কেহ আসিয়া...

তাহা হইলে দরা হইবে না তো! শুধু তাই নয়—কত
হাসি-বাস, কদম্ব ইন্দি—অসহ প্রশান্ত!

বেলা প্রায় মাটিটা। হঠাৎ পনের মাঝে প্রকাণ্ড
ভিড়। বহুলা কৃষক বিবাহের পর পাঠা দল-কোফ্রসে
হুটী আসিয়াছে। হাত মাফল কলসে বাধ, গবে বসিয়া
কনিয়া লোক—সে কনিয়া পড়িয়া লকলক শব্দ। হঠাৎ
তার কি এমন ভ্রম—এমন করিয়া পাত দিবিয়া আশঙ্কতা
করিতে ধায়!

আশঙ্কিত আসিয়াছে তার মাথের সঙ্গে।

কাহারো মুখে কথা নাই! হঠাৎ মানেকার পুনিশ
আদিয়া ছাডির করিয়াছে। তার বিরক্তির অস্থ নাই।
হাসিয়া খেলিয়া দিন কটিয়েছে, তার মনে দুই-তিনদিন
কালার লইয়া এমন খান-খার করিতেই প্রাণের বাহির চেষ্টা
বাটবে!

পুনিশের কলসে হুটান ডাকা হইল। কনিয়া বাতির
কনিয়া হু-হুটীতে পাচ টানিয়া কোণে সে মনের কপাট
পুলিল।

ধার খোলা হঠাৎ দল্লোলে ঘরে প্রবেশ করিল পুনিশ।
তার পিছনে হুটুক কনিয়া প্রকাণ্ড ভিড়।

কাহারো মুখে কথা নাই। ভাড়াতে কিনিয়া লকলক
শব্দ। ঐ বে, নিঃশাপন পড়িয়া আছে প্রশান্ত! তার
কলস উপর একখানা শিঙের চাপর। টুট করিয়া কে-একজন
আদিয়া নাকের মাঝে হাত বাড়াইয়া দিল, দিয়া বদিল,—
বেচে কাছে। নিঃশাপন পড়ছে এখনো।

পুনিশ তখন হুট চোখে লকলক হোঁচকা দিয়া
সরের মাঝে-মাঝে দূরী হুটাইতেছে। এ কথার লাসের
কাছে আসিয়া তার পানে চাছিল।

হ্যাঁ, নিঃশাপন পড়িতেছে! আ!

সে কহিল—আত্মলাল। চই করে কেউ একটা
টেকিফান করে দিন। কাছে কারো বাক্সে টেকিফান
বেই?

ভিড়ের মাঝে হঠাৎ একজন কহিল—আছে তার
বাহারের বাজী।

ইনসপেক্টর কহিল—বান, ইগদির বান।

লোকটা হুটী বাহির হইয়া গেল!

ঘরের মধ্যে নিম্নে কলরব চাছিল। সে কলরবে
প্রশান্ত চোখ খেলিয়া চাছিল; চাটনিমাত্র বিস্তৃত হইত চোখ
যেন ঠিকাবাদী পড়িবে, সে চোখে এমন দৃষ্টি।

বহুক্ষণ পোক হয়ে কঠি! হানো পাইল না কি?

প্রশান্ত উঠিয়া বলিল। এ কি? ঘরে টেন্সপেট্টর!

প্রশান্ত কহিল—বাপার কি? ঘরে এত ভিড়...না,
ক'র দেখি?

টেন্সপেট্টর কহিল—আপনি আত্মহত্যা করেছেন না?
লক্ষকে চিঠি লিখেছেন তাঁর বসে! ত্যাগা! কটে!
আত্মহত্যার কথা রইতে তাহা! পুন্নিপের সঙ্গে চালাকি!
হঁ! মজা টের পাবেন'খন।

প্রশান্ত কহিল,—ও! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই
তো শিখের চাদর। মরব কেবেছিলাম—মরা হারনি
ঘুমিয়ে পড়েছি...

ভিক্টর মধ্যে ছিল এক রসিক ব্যক্তি। সে কহিল—
একেই বলে রাগে রক্ত, মারে কে!

টেন্সপেট্টর পর হঠাৎ বাহিরে আসিলেন। খুশী-মনে।
পূর তক পাইয়াছেন! তাগো লোকটা ঘুমাটয়া পড়িয়া-
ছিল! বস্ত্রিল এট লকালে ডাকেও হারিত! হাদপাতাল
...বর্গ...কর্তোনা কোট! বাপ্ রে, চুটিতে চুটিতে জান
গিয়াছিল আর কি!

বক্তা বলিল—এ ব্যক্তি খুব বেঁচে গেছে! তাগো মাঝরা
চিঠি পেয়ে চুটে এসেছিলাম!

আরতি ছিল বাহিরে; সে ক-কৃষ্ণিত করিল। আরতির
মা কহিলেন—নে, বাড়ী চ। কি-রকম ছোটলোকের
মত মাঝো। চ। তাকে বস্ত্র করছি আরতি, পবর্ধার,
ওর কাছে আর দেখাপড়া করতে হবে না। মাঝো! কি
ভেলে, মা!

কটা খানেক পরে একখানা লোকও আস পাকী আসিয়া
হঠাৎ ঘরে পাড়াইল। পাকী হঠাৎ নামিলেন এক

অজস্রখী বিধবা; সঙ্গে বাবো-বেরো বংশল বজ্রদেব কুমারী
সঙ্গে।

মা বলিলেন—আমার প্রশান্ত...

ভূগাটা এতক্ষণ ঘেন হকচকিয়া গিয়াছিল! সে কহিল—
তাল আছে। সোতলার তাঁর ঘরে মাদেন। এস মা।
সিঁড়ি এদিকে।

বিধবা নিখাল কেলিলেন। স্বস্তির নিখাল!

বারের কাছে আসিয়া মা ডাকিলেন—ও বাবা প্রশান্ত...

প্রশান্ত চা পান করিতেছিল। পাশে ছিল অনাদি, লম্বাচ,
বিকৃতি, অশ্বিনী, তরত। বারের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত
ডাকিল—মা...

সমস্ত চোখে বাসার কণ্ঠে মা কহিলেন—এখন চিঠি
মাঝে শেষে, বাবা!

পেছালা রাখিয়া প্রশান্ত বারের পায়ের কাছে ভুজিট হঠাৎ
প্রশান্ত করিল।

প্রশান্ত গান্ধী স্তম্ভ বেতে হুত মনে এখনো বাজিয়া
আছে। উক্ত ঘটনার এক বৎসর পরে বি-এ কেস করিয়া
চাকরিতে চুকিয়াছে। তার এক বৎসর পরে তত্ত্বকালী-
নিবালী ৮৮৭শতর তটীচাখোর দ্বিতীয়া কলা ত্রিমতী জনস্বাস্থ্য
দেবীর সহিত হুতমিত্র-বোপে প্রশান্তর বিবাহ হইয়াছে।
পরী জনস্বাস্থ্যই এ ৮৮ বৎসরে প্রশান্তকে তিনটি কলা ও
তিনটি পুত্র উপহার দিয়াছেন।

ছনিয়ার উপর প্রশান্তর সে বিষে আর নাই! তবে
কাহারো সঙ্গে সে মেলামেলা করে না। তার কারন, অক্ষি
হইতে কিরিয়া হোটে খুকীকে ঘোঁষতে হয়; তার উপর ছুবেলা
পুহে বতটুই থাকে, ছেলসেমেসের পড়াদি। আছে, মানে
লিখিয়া বেওয়া আছে, টানসেদন অধ্যাইয়া বেওয়া আছে;
তার উপর মাদেন ত্রিমতী জনস্বাস্থ্যই দেবী...

বেচারীর অবসর কোথায়?

শ্যুর রমেশচন্দ্র মিত্র

—**ଅନନ୍ତଧନାଳ ଘୋଷ**

ਸ਼ੁਭਨਾ।

[illegible]

उत्तर सत्यमेव जयते ।

বর্তমান প্রবন্ধের মাধ্যমে তৎকালীন প্রবন্ধগুলিকে
সম্প্রতি সংশোধিত ও বহু পরিমার্জন করা হয়েছে। পূর্বের ভাষা
গঠিত ছিল। আলাদা ইংরেজি, বাংলা, ফরাসি, ইত্যাদি কট। বাংলা কবি,
এই সমস্ত কবি সম্বন্ধেই বহু প্রবন্ধ বা উপস্থাপনা করা হয়েছে।
যেহেতু বর্তমান একটি সমীক্ষা। কবিগণের নামের ও প্রকারের প্রমাণ-
মতেই বহু পরিমার্জন হয়েছে।

ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପରିଚୟ

[illegible]

করকালের প্রণয়নের দ্বারা পুনরায় বিশ্ব নবীক বিলাস বংশের
 মহিমে মহাভারত বিলম্ব। সেখানে এই পদের দৃষ্টে মহান বিলাস
 পদে মহাবীর ভবের দৃষ্টে তিনি সামান্যতক লভ্যে প্রদিশ। গাও
 কলিবিলাস।

ସାମ୍ବଲପୁର ଶିବାସିଂହ ସାହାୟନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ

এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকের যৌক্তিকতা গ্রহণ করেন যে, প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন।

নিত সুন্দরী অপর্যাপ্ত কীর্তি। এ ক্ষেত্রে কোনও বস্তু বিচার্য্য করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে কোনও বস্তু বিচার্য্য করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে কোনও বস্তু বিচার্য্য করিয়াছেন।

প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন।



কোর্টের বিচারক।

কোর্টের ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন।

প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন। প্রমাণিত করিয়াছেন যে, প্রত্যাশাবাদীরা যে কীভাবে ও কখনো প্রমাণিত করিয়াছেন।

ইংল্যান্ড বিচারের আন্দোলন

লর্ড বিয়ার্সের সময় ইংল্যান্ড বিচারের আন্দোলন। লর্ড বিয়ার্সের সময় ইংল্যান্ড বিচারের আন্দোলন। লর্ড বিয়ার্সের সময় ইংল্যান্ড বিচারের আন্দোলন।

লর্ড বিয়ার্সের সময় ইংল্যান্ড বিচারের আন্দোলন। লর্ড বিয়ার্সের সময় ইংল্যান্ড বিচারের আন্দোলন। লর্ড বিয়ার্সের সময় ইংল্যান্ড বিচারের আন্দোলন।

একদম কাছাকাছি দাঁড়ান হইয়াছে এবং উহার সম্মুখনি অধিক লক্ষ্যকর
বিশ্রাজ্ঞকন। বিস্তৃত দেখিলে উহা একটি বিস্তৃতের মতো ছিল এবং তার
সম্মুখনি দিগন্তের দূরত্ব ব্যতীত অন্য সম্মুখনি অধিক লক্ষ্যকর ও
মনোহর হইয়াছিল, কারণ তিনি লক্ষ্যকর হইতেন অত্যন্তের সম্মুখনি করিতে
কোনদিক হইয়া কখনও সামান্যতম লক্ষ্যকরিত্ব প্রদর্শন করেন নাই।
তারতীয় বেতারী উহারই অধিকতরক এত জিন জিন করেন যে, দিগন্ত
অধিকতরক লক্ষ্যকর অধিকতরক এক দিগন্ত উৎকর্ষক লক্ষ্যকরকর তেজস্বিনী
কিন্তু বসে করেন। উহারই অধিকতরক এক লক্ষ্যকর তখন দিগন্তই
কম লক্ষ্যকর, আর কাছাকাছি নাই।”

ঊরুর মতো রমেশচন্দ্র জ্যোতিষাৎ বহুদূর পাঠ করিতে পারেন নাই।
কোনদিকের বিদ্যা-নির্মাণের সম্মুখনি অধিকতরক লক্ষ্যকরিত্বের সম্মুখনি কোনও
বিদ্যা জ্ঞানোন্মাদ করিতে করিতে তিনি হৃদিত হইয়া পড়েন। তৈত্তর্য
সম্পাদিত হইলে তিনি কৃষ্ণ ভগিনী প্রদর্শন। পার্শ্বিক দৃষ্টান্তকরঃ
তিনি বসে অধিকতরক লক্ষ্যকর করিতে পারেন নাই। তার লক্ষ্যকরিত্ব
যেহ উহার বহুদূর পাঠ করেন।

জন্মভূমির ঐতিহ্য অনুসরণ

জন্মভূমি এটি রমেশচন্দ্রের আত্মিক অনুসরণ ছিল। অনেকই
কল্পিতভাবে লক্ষ্যকরিত্ব অধিকতরক লক্ষ্যকরিত্ব করিয়া পান্ডিত্যের
ঐতিহ্যকর একদম করেন। রমেশচন্দ্রের লক্ষ্যকরিত্বের লক্ষ্যকরিত্ব ছিল না।
তিনি আরও উহার জন্মভূমি কিছুই প্রদর্শন করেন এবং তারই উৎকর্ষক ও
লক্ষ্যকর প্রদর্শন পাইতেন। তিনি তখন একটি উৎকর্ষক ইংরেজী বিদ্যালয়,
একটি হিন্দী বিদ্যালয় ও একটি লাতিন শিক্ষণশালায় অধিকতরক ছিলেন উহার।
সবকাল ব্যস্ততার জন্ম করিতেন এবং উইলে উহার লক্ষ্যকরিত্ব টাকা লক্ষ্যকরিত্ব
করিত বিদ্যালয়। অনেক লক্ষ্যকরিত্বক তিনি লক্ষ্যকরিত্ব করিতেন।

কিন্তু (একদম লক্ষ্যকরিত্ব) লক্ষ্যকরিত্ব হইলো তিনি লক্ষ্যকরিত্বকর
উৎকর্ষক লক্ষ্যকরিত্ব করিতেন।

স্বর্গীরোহণ

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে ১০ই জুলাই (১০শে আষাঢ় ১৩০৬ জ্যৈষ্ঠ) রমেশচন্দ্র
স্বর্গীরোহণ করেন। কলিকাতা হইতে কলকাতার উত্তর দিকের হইয়াছিল
এবং দুই লক্ষ্যকরিত্বের উত্তর একদম কলকাতার হইয়াছিল তিনি লক্ষ্যকরিত্ব
কলকাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্রের কলকাতা লক্ষ্যকরিত্ব হইয়াছিল। জাতীয় কবি
রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় জাতীয় জাতীয় লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব হইয়া
উৎকর্ষকিত্বঃ—

এবং কোথা উৎকর্ষকিত্ব ?

আমরা লক্ষ্যকরিত্ব

উৎকর্ষকিত্ব হইয়া

এইদিক লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব,
লক্ষ্যকরিত্ব কলকাতা কোথা উৎকর্ষকিত্ব ?

লক্ষ্যকরিত্ব উৎকর্ষকিত্ব

লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব

ইংরেজ কোথা উৎকর্ষকিত্ব হইলে,

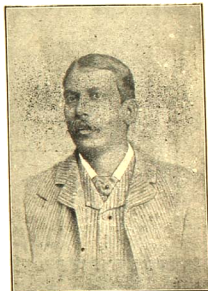
কোথা উৎকর্ষকিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব ?

কোথা লক্ষ্যকরিত্ব কোথা উৎকর্ষকিত্ব,

কি লক্ষ্যকরিত্ব

লক্ষ্যকরিত্ব কি উৎকর্ষকিত্ব,

লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব কি লক্ষ্যকরিত্ব ?



ঊরু রমেশচন্দ্র মিত্র (১৮৬৮)।

উৎকর্ষকিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব,

লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব

লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব

কোথা উৎকর্ষকিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব

হা উৎকর্ষকিত্ব ? উৎকর্ষকিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব

লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব

উৎকর্ষকিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব

লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব

লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব লক্ষ্যকরিত্ব

বোলসের প্রতিবাদ

কলিত পার না আর ?

হাত লগা সে অমর্য্য কেন কি এখন ?



ক্রিষ্ট, সি কামজি ।

জগি যন্ত্র অধিকার

"স্বাধীন" জন হাতি কত,

নিবারণ অধিকার যে দেশে এখন,

কোন জাতি লগা কুসি কুলিলে পরম ?

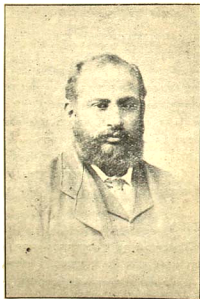
রসমজ্ঞের ইচ্ছা:বাহ বিজ্ঞাপিত হইল হাইকোর্টে। চলকীকন এখন
কিরাণীও প্রভৃৎ জাগিল যাক্‌নৌন বলিরাফিলেন,—“his reported judg-
ments bore traces of the impartiality of the Judge, the
credulity of the lawyer and the polish of the scholar,”
অর্থাৎ “উন্নত মোকদ্দমার রাষ্ট্রকর্ত্তে জিজ্ঞাসকের সম্মানভাবের, যাক্‌না-
কৌশলের জ্ঞান এবং পণ্ডিতের অসঙ্গত বিচার নিশ্চয় পাওয়া যায়”—ইহাও একটি
বলি অতিবলিও বহু। সন্দেহ হাইকোর্টে রসমজ্ঞের একমতের অভিজ্ঞি
অভিধা উপলক্ষে প্রভৃৎ সন্দেহের সরকারে রসমজ্ঞের জিজ্ঞাসকের অসঙ্গত
বলি বলিরাফিলেন, উহার অধিকার নিষাধ অতি কাটলি অসঙ্গত
বলি এখন কলিরাফিলেন এবং এখনও উহার লিখিতসমূহ জিজ্ঞাসকের সম্মানভাব
কলিরাফিলেন। এক্ষণে আদালতের কোন দলই অসঙ্গত হইতে পারে।

১৮৯২ হইতে দলই নবদীতে জাতীয় বোর্ডের সম্মানভাবের আদল হইতে
নবদী রসমজ্ঞের বহু প্রভৃৎ রসমজ্ঞের ইচ্ছাতে মোকদ্দমার কলিরাফিলেন—

“You have not had amongst you a stronger friend of the
congress, a greater patriot and a more sincere and
thoughtful son of India than Sir Romesh Chunder
Mitter. অর্থাৎ “জাতিবাহের অধিক প্রভৃৎ রসমজ্ঞের দিগ্‌ভ্রম জাতীয়
সম্মানভাবের অধিকার হইতে জাতীয় বহু, নবদীতে রসমজ্ঞের অধিকার
জিজ্ঞাসকের ও জাতীয় কলিরাফিলেন জিজ্ঞাসকের ছিল না।”

রসমজ্ঞের জিজ্ঞাসকের যে সকল দলই মোকদ্দমে দিগ্‌ভ্রম হইতে, তাহাতেই
উহার লিখিত, অতি, অধিকার, কলিরাফিলেন, অসঙ্গতবাহ, অসঙ্গতবাহ
ও বর্জ্জাপ্রভৃৎ প্রভৃৎ পণ্ডিত পাওয়া যায় এবং তাহাও জিজ্ঞাসকের লিখিত
লিখিত সম্মানভাব অসঙ্গত। তাহার আদালতের যে সকল পণ্ডিত জিজ্ঞাসকের
হুটাইবার নাই।

রসমজ্ঞের জাতীয়বাহ জিজ্ঞাসকের অতি বহুবার ছিল। তাহার জাতীয়বাহ মোকদ্দমার
লিখিত অতি বহুবার জিজ্ঞাসকের ছিলেন এবং তাহার মোকদ্দমার জাতীয়বাহ
কলিরাফিলেন। রসমজ্ঞের জাতীয়বাহ কলিরাফিলেন কলিরাফিলেন কলিরাফিলেন
কলিরাফিলেন কলিরাফিলেন। অধিক পণ্ডিত অতি বহুবার জিজ্ঞাসকের নাই। জিজ্ঞাসকের
পণ্ডিত বহুবার জিজ্ঞাসকের নাই। তাহার এক পণ্ডিত বহুবার জিজ্ঞাসকের কর্ণন-



বিহারিলাল জগত ।

পণ্ডিত অসঙ্গত জাতীয় বর্জ্জাপ্রভৃৎ জিজ্ঞাসকের অধিকার অসঙ্গত এবং
“জিজ্ঞাসকের অধিকার অসঙ্গত জাতীয় পণ্ডিত। সন্দেহ পণ্ডিতবাহ
জিজ্ঞাসকের পণ্ডিত প্রভৃৎ জিজ্ঞাসকের ও কলিরাফিলেন রসমজ্ঞের অধিকার
জিজ্ঞাসকের পণ্ডিত প্রভৃৎ জিজ্ঞাসকের নাই।

চীনা-অর্থপত্রের ভারতদর্শন

— শ্রীঅম্বাচন্দ্র সেন

হিউয়েন তৃত্ত্বের সঙ্গে কামরূপে পেলেন ; কুমার-
রাজা মহাপ্রয়াগে তাহাকে আশ্রয়-অভ্যর্থনা ও পোষা
করিলেন । এই ভাবে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইবার পর
হর্ষবর্দ্ধন খজাৎ হইতে ফিরিয়া গুম্বাং পাইলেন যে, হিউয়েন
কামরূপে আছেন । পূর্বে কয়েকবার অগ্রগোষ করিলেও
হিউয়েন শিলাদিত্যের কাছে আসেন নাই, অতএব এখন তিনি
কামরূপে গিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিয়া শিলাদিত্য
কুমাররাজাকে আবেশ করিলেন যে, চীনদেশের ভ্রমণকে যেন
অবিলম্বে তাহার কাছে পঠান হয় । কুমাররাজা শিলাদিত্যের
দৃষ্টক বসিলেন, “শিলাদিত্য আমার মাথা নাইতে পারেন, কিন্তু
হিউয়েনকে এখন পাইবেন না ।” দূত ফিরিয়া শিলাদিত্যকে
এ কথা জানাইলে শিলাদিত্য ক্রোড়ে জ্বলিয়া উঠিলেন ও পরি-
দেববর্গকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, কুমাররাজা তাহাকে অবজ্ঞা
করিয়াছেন । শিলাদিত্য দ্বিতীয় দৃত্তের দ্বারা কুমাররাজাকে
বলিয়া পাঠাইলেন, “মাথাই পাঠাইবেন, আমার এই দৃত্ত যেন
শীঘ্র তাহা আমার কাছে উপস্থিত করিতে পারে !” কুমার-
রাজা ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া ২০,০০০ হস্তী ও ৩০,০০০
নৌ-বাছিনী সঙ্গে লইয়া গম্বাংবে হিউয়েনকে লইয়া
শিলাদিত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন ।

শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

শিলাদিত্য যেখানে ছাউনি করিয়াছিলেন, সেখানে
পৌছিয়া গম্বাং উত্তরকূলে আশ্রয় স্থাপন করিল, হিউয়েনকে
সেখানে রাখিয়া, যাত্রার সঙ্গে লইয়া শিলাদিত্যের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন । কুমাররাজাকে যেখান শিলাদিত্য
ফিরে গেলেন এবং হিউয়েনের প্রতি কুমাররাজার অশ্রদ্ধাভক্তি
কথা শ্রবণ করিয়া, পূর্নক্রোধ-বিস্তৃত হইয়া, শুধু চীনদেশের
ভ্রমণ কোথায় আছেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । হিউয়েন
আবাসে আছেন তিনি শিলাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি
কুমাররাজার সঙ্গে আসিলেন না কেন । কুমাররাজা বলিলেন,
“মহাশয় ঋণীক পোককে সম্মান করেন ; নিজেও হর্ষপ্রিয়া,

আশ্রয়িতা আসিয়া তাহাকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে
বলুন না কেন ?” হর্ষবর্দ্ধন ইহাতে ভূত হইয়া কুমাররাজাকে
তখনকার মত তাহাকে শিবিরে ফিরিতে অধ্যবসিত করিলেন এবং
বলিয়া গেলেন যে, তিনি নিজেই প্রথম পাইবেন ।

কুমার শিবিরে ফিরিয়া হিউয়েনকে বলিলেন, “সত্য যদিও
কাল আসবেন বলিয়াছেন, আশ্রয় যেন এখন তিনি আসে তাহাই
আশীর্বাদ । তিনি যখন আসিবেন তখন আশ্রয়ের তাহাকে
সম্বাদনা করিতে হইবে, তাহাকে বেশিয়া আপনি ভাত
হইবেন না ?” হিউয়েন বলিলেন, “হিউয়েন-বসিমাং বৃদ্ধের
যশ অমুমারী আচরণ করবেন ।”

কুমাররাজার অমুমারী সত্য হইল । এই সত্যই সেরে
গিয়েই আসিলেন । রাজির প্রথম প্রহরে লোকমুখে সংবাদ
পাওয়া যেন যে, গম্বাংকে কয়েক সহস্র প্রজাপিত মশাল লেখা
বাতেছে ও ভগ্নাতকের বাজনা ওয়া বাতেছে । শিলাদিত্য
আশ্চর্যেছেন বুঝিয়া কুমাররাজা ১২কোটি লোকের হাতে মশাল
দিয়া মন্ত্রীদের সঙ্গে হর্ষকে অনেক দূর হইতে অগ্রগমন করিতে
চলিলেন ।

শিলাদিত্য যখন চলিতেছেন তখন কয়েকশত লোক হর্ষের
চাক লইয়া তাহার সঙ্গে চলিত এবং শিলাদিত্যের প্রতি পদ-
ক্ষেপে একবার করিয়া চাক বাজাইত । শুধু শিলাদিত্যেরই
এই প্রথা ছিল, অপর রাজাদের একজন করিবার অধিকার
ছিল না ।

আবাসে পৌছিয়া শিলাদিত্য হিউয়েনের চরণে প্রণিপাত
করিয়া তাহার সম্মুখে দূর ছাড়াইয়া ভক্তিপূর্ণ নরনে তাহাকে
নিরীক্ষণ করিলেন এবং বহু শ্লোক পাঠ করিয়া তাহাকে বন্দনা
করিলেন, ত্রাণপর বলিলেন, “আপনার শিষ্ট পূর্বে বহুবার
আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, আপনি আমার নিমন্ত্রণ বন্ধা
করেন নাই কেন ?”

হিউয়েন বলিলেন “হিউয়েন-বসিমাং বহু দূরদেশ হইতে
বৃদ্ধের দম ও ‘যোগহৃদিশাং’ শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়া-
ছিলেন ; এখন আপনার আমন্ত্রণ আসিয়াছিল, তখনও আমার

শাস্ত্রাধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়া নাই, তাই আমি তখন মহাশয়ের অঙ্গরোধ প্রকাশ করিতে পারি নাই।”

তারপর সন্ধ্যাট হিউয়েনকে চীনদেশের রাজ্যের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন এবং উত্তরে হিউয়েন চীনদেশের স্থপতি করিয়া অনেক কথা বলিলেন। পরদিন হিউয়েনকে লইয়া ঘাইবেন এই কথা জানাইয়া র্ব্ব সন্ধ্যায় বিদায় লইলেন।

পরদিন শিলাদিভ্যেতার পুত্রের সঙ্গে হিউয়েন ও কুমারস্বামী সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইলেন, শিলাদিভ্যে। বেশ কয়েক অল্পসং পরিবৃত্ত হইয়া উভয়ের সম্বন্ধনা করিলেন। আসব অভ্যর্থনার পর সন্ধ্যা, হিউয়েন প্রার্থিত “বিজ্ঞানমতঃখণ্ডক” গ্রন্থখানি চাচিয়া লইয়া হারা পরীক্ষা করিয়া সমস্তের প্রকাশ করিলেন। শিলাদিভ্যেতার তপিনী রাজ্যের পক্ষান্তে বলিয়া ছিলেন, তিনি অতি পুঙ্খমতা ও লক্ষ্যভীষ্মমতে স্থাপনা ছিলেন; তিনিও হিউয়েনের ব্যাখ্যা শুনিয়া অবশ্বপাত করিলেন। তারপর শিলাদিভ্যে হিউয়েনের প্রশ্নের প্রশ্ননা করিয়া বলিলেন যে, চীনবাসীরাও অনেক এখনও ভ্রান্তমতে বিশ্বাস করে এবং তিনি মহাবানের শ্রেষ্ঠত্ব বোধনা করিবার জন্য কাকতল্যে একটি মহাপরিচালনা করিয়া তাগাতে ভ্রান্তবিশ্বাসীদের নিকট নিঃসংশয়রূপে হিউয়েনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিয়াছেন।

সেই দিনই শিলাদিভ্যে সমগ্র ভাবভের বিভিন্ন সম্ভাব্যের পোককে কাকতল্যে সমবেত হইয়া হিউয়েনের গ্রন্থ বিচার করিতে আসেন প্রচার করিলেন।

শিলাদিভ্যেতার সঙ্গে হিউয়েন কাকতল্যে গেলেন। হর্ষের আশ্রমে বহু সাক্ষাৎ, সাক্ষ্য, মহাবান ও চীনবাসীরা স্থপতিত শিল্পী হাজার লক্ষ, শিল্পী হাজার শ্রমণ ও নিম্নরূপ এবং এক হাজার নান্দ্য-পতিত সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। উদাহরণ মতে হস্তী, রথ ও শিবিলায় আগ্রহণ করিয়া আরও বহু সহস্র লোক আসিয়াছিল। মহাপরিচালকের জন্য দুইটি বিশাল মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল এবং র্ব্ব একটি প্রকাণ্ড স্বর্ণ-ময় কুমুদিত বাসাইয়াছিলেন। শিলাদিভ্যে ও কুমারস্বামী উভয় ও প্রচার বেশে সম্মিত হইয়া এই দুইটির উত্তর পার্শ্বে পাড়িয়া রক্ষিত হস্তীর পৃষ্ঠে স্থিতি শিলাদিভ্যেতার শিবির হইতে সন্ধ্যায় লইয়া গেলেন। দুইটির পিছনে দুইটি লক্ষিত হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে কয়েকজন লোক স্থল ছাড়িতে

ছাড়িতে চলিল। তাহার পিছনে হিউয়েন, সাক্ষ্যবর্ণ প্রকৃতি হস্তীপৃষ্ঠে দুই সারি বাহিয়া চলিলেন। সন্ধ্যায় শৈলীয়া সকলে বন্ধাক্ষে দুইটি পূজার্থীয়া করিবার পর এক হাজার বোধপতিত ও পাচশত শ্রমণ ও অল্পসংের আচাধ্যা লইয়া পরিবৃত্ত আসন্ন হইল। হিউয়েন পরিবৃত্তাধ্যাক নিম্ন হইয়া একটি স্থানবান উচ্চ আসনে বসিয়া মহাবান-মত ব্যাখ্যা করিলেন ও বোধনা করিলেন যে, কেহ তাহা মতন করিতে পারিলে তিনি স্বীয় মন্তক ধান করিবেন। পাচ দিন পরিয়া এইরূপ সমাগোহ চলিল এবং হিউয়েনের বিরুদ্ধে কেহ অঙ্গসং হইলেন না। চীনবাসীরা এই অশ্বাসনে লুপ্ত হইয়া হিউয়েনের প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছে, এইরূপ সংবাদ শুনিয়া শিলাদিভ্যে বোধনা করিলেন যে, হিউয়েনের কেহ কোন কতি করিবার চেষ্টা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আঠার দিনের মধ্যে কোন বিরোধী লক্ষ উপস্থিত না হওয়ায় (স্বয়ং সন্ধ্যা হিউয়েনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় এরূপ হইয়াছিল) পুনরায় মহাবান-মতের অর্থ বোধনা করিয়া পরিবৃত্ত ডক হইল। শিলাদিভ্যে ও অল্প সাক্ষ্য হিউয়েনকে বহু স্বর্ণ সৌ্য বসাদি উপহার দিলেন, কিন্তু হিউয়েন সে সব কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তারপর শিলাদিভ্যেতার আসনে হিউয়েনকে হস্তীপৃষ্ঠে বসাইয়া হস্তীরা উদ্বাহর কর বোধনা করিলেন। উদ্বাহরও হিউয়েন আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশের প্রশ্না বলিয়া শিলাদিভ্যে উদ্বাহকে রাজি করাইলেন। মহাবানীয়া হিউয়েনকে “মহাবানং” এবং চীনবাসীরা “বোধক-সেব” উপাধি দিলেন।

হিউয়েন এইবার নান্দ্য-ভিক্ষুর কাছ দিয়া লইয়া বেশে করিবার প্রস্তাব করিল শিলাদিভ্যে উদ্বাহকে প্রস্তাবের “মহাসৌ্য পরিবৃত্ত” পদ্যত থাকিয়া বাইতে অল্পন করায় হিউয়েন সানন্দে সম্মত হইলেন।

পরিবৃত্তের শেষ দিন আশ্রম লাগিয়া সমগ্র মণ্ডপ ভরীভূত হইয়াছিল এবং পরে ভিক্ষুর মুখে একজন লোক ভিক্ষাক্ষেত্রে স্বর্ষকে আক্রমণ করিয়াছিল। স্বর্ষবর্জন এরূপ অত্যন্ত আক্রমণে দুই পা হইয়া দিয়া লোকটিকে ধরিয়া ফেলেন ও পরে তাহার স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ পায় যে, স্বীকারিত শ্রমণেরা কলত্র ভীরা সারিয়া মণ্ডপে আশ্রম লাগায় ও রাজাকে বধ করিতে তাহাকে

প্রস্তুত করায়। ইহাঙ্গ কলে পাঁচশত ব্রাহ্মণকে বেশ হঠাতে
বিতাড়িত করা হয়।

প্রাণপের মহাপ্রাণ হৃৎক ও সর্গসম্প্রদায়ের লোক ও অশ্বা
অশ্বসমূহের হৃৎক ও সর্গসম্প্রদায়ের লোক ও অশ্বা
নিলাইয়া গিলেন। প্রায় দশ দিন ধরিয়া এত বড় চলিল,
শেষে হৃৎক ও অশ্বসমূহের হৃৎক ও সর্গসম্প্রদায়ের লোক ও অশ্বা
চাওয়া লটগা তাহা পরিধান করিলেন।

“মহামোক্ষ পরিশ্রমের” পর হিউয়েন নিদার লটে চাছিলেন
শিলাদিয়া তাঁহাকে আরও দশ দিন ধরিয়া রাখিলেন। পরে
কুমারসমূহা বর্ণিলেন যে, তিনি যদি কামরূপ গিয়া বাণ করেন,
তবে তাঁহার ভক্ত কুমার একশত সঙ্গারাম নির্মাণ করিয়া
দিলেন। রাজারা তাঁহাকে এ দেশে রাখিবার চেষ্টা
করিতেছেন বুলিয়া হিউয়েন বিনয়ের বিনতি জানাইলেন।
শিলাদিয়া বর্ণিলেন, তিনি যদি সন্ধি পথে (সমুদ্রপথে)
কিরিতে চাহেন, তবে তিনি সঙ্গে লোকজন দিয়া সব বাহন
করিলেন, কিন্তু কাউ-চাং-এর রাজার সঙ্গে পুনরায় দেখা
করিলেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বর্ণিয়া হিউয়েন যে পথে
অনিচ্ছাছিলেন সেই পথেই যাঁতে চাছিলেন।

রাজারা হিউয়েনকে পথের বাধনির্মাণের ভক্ত অনেক
স্বর্গরোপা নিতে চাছিলেন, কিন্তু হিউয়েন সব প্রত্যাখ্যান
করিলেন, শুধু কুমারসমূহের নিকট হঠাতে পথে গতি হঠাতে
আশ্রয়কার ভক্ত একটি চামড়ার আভরণ প্রাণ করিলেন।

এইবার হিউয়েন সত্যাই বিদায় লইলেন। শিলাদিয়া
বহু অশ্বচর পরিবৃত্ত হইয়া ৩০৫০ মি পথ তাঁহার সঙ্গে প্রত্যু-
গমন করিলেন। শেষ বিদায়ের সময় কেহই অশ্ব সঞ্চয়
করিতে পারেন নাই। গ্রহ ও প্রতিবাদি যোড়ার বর্ণিতে লগা
হইল; উত্তর ভারতের উখিত নামক একজন রাজা দেখা সঙ্গে
নিয়া তাঁহার পাহাঙ্গার বাহন করিলেন। যোড়ার গতি হঠাতে
ক্রত নহে বর্ণিয়া শিলাদিয়া একটি বড় হস্তী ও পথের বাধ-
নির্মাণের ভক্ত তিন হাজার স্বর্গরোপা ও দশ হাজার রোপা-
দ্বারা উখিতরাজার সেনার হাতে গিলেন। বিদায়ের তিন দিন
পরে শিলাদিয়া কুমারসমূহ ও সন্ধি ভারতের প্রবর্তকরাজকে
সঙ্গে লইয়া বেগবান যথে ভ্রমণ করিয়া আবার হিউয়েনকে
ধরিয়া অনেক দূর তাঁহার সঙ্গে গেলেন এবং বাহন দুবিধার

ভক্ত হিউয়েনের সঙ্গে রাজকর্মচারী ও পথের সব রাজার
নামে অনুমতি পত্র দিয়া গিলেন।

হিউয়েন আবার ভারতের দখা বিদ্যা শীলভবন পার
হইয়া পরিপূর্ণত উন্নয়ন করিয়া ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে
পৌঁছিলেন। পথে তিনি অনেক দূরে কিছুদিন করিয়া
পাকিয়া গিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু বাধাবিপত্তিও কোথ
করিয়াছিলেন। রাজারা এবং জনসাধারণও সর্গসম্প্রদায়ের
প্রতি দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।

চীনদেশে পূর্ণাঙ্গ করিয়া হিউয়েন চীনদেশটিকে তাঁহার
আগমন-সংবাদ পাঠাইলেন এবং সন্ন্যাসের আসনে তাঁহার
অভ্যর্থনার সন্নিবিষ্ট বাহন করা হইল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের
ভিক্ষু একত্র হইয়া সমুদ্রপথে গিয়া তাঁহাকে সন্মান
করিয়া ‘চ’ (পরমানন্দ) বিদ্যা লটগা দেখেন। এখানে
হিউয়েন ভক্ত ভ্রমণ হঠাতে আনীত সামগ্রীসমূহ বন্ডিত
হইল; বর্ণা—

(১) ১৫০ বর্গ ফাট (বৃহৎ সন্ধান) অর্থাৎ প্রায় ১৫০
বর্গফাটের।

(২) একটি বর্গফাট, ১৫০ বর্গ ফাট উচ্চ ফটিক-
বোঁর উপর স্থাপিত।

(৩) একটি চন্দ্রকান্তের বৃহৎ, ১৫০ বর্গ ফাট উচ্চ
ফটিকবোঁর উপর স্থাপিত।

(৪) একটি বৃহৎ, ১৫০ বর্গ ফাট ফটিকবোঁর উপর
স্থাপিত।

(৫) একটি বৃহৎ, ১৫০ বর্গ ফাট ফটিকবোঁর উপর
স্থাপিত।

(৬) একটি বৃহৎ, ১৫০ বর্গ ফাট উচ্চ ফটিকবোঁর
উপর স্থাপিত।

(৭) একটি চন্দ্রকান্তের বৃহৎ, ১৫০ বর্গ ফাট উচ্চ
ফটিকবোঁর উপর স্থাপিত।

বৃষ্টি ছাড়া হিউয়েন-আনীত ২২৭ পানি মহাপ্রাণ বৃষ্টি,
১২২ পানি মহাপ্রাণ, ১৫ পানি হৃৎকসমূহের (হীনপান) গ্রহ,
সমসংখ্যক সন্ধানসমূহের গ্রহ, ২২ পানি যতীশকবোঁর গ্রহ,
৬৭ পানি অর্ধাঙ্গসমূহের গ্রহ, ১৭ পানি কান্তপীর যতের গ্রহ
৪২ পানি সন্ধানসমূহের গ্রহ এবং ৩৬ গ্রহ সন্ধানসমূহের
সেখানে বন্ডিত হইল। এই গ্রহগুলি বহন করিতে বৃষ্টি
যোড় পাগিয়াছিল।

প্রধান সাক্ষরকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পর সম্রাটের সঙ্গে হিউগেনের সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ আলাপ হইল। সাক্ষরকারীরা অস্বীকৃত হইয়া ডিউগেন ১৬শু দিহায়ে বাস করিয়া শাখাফবাদ আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি বাজাপ্রসাদে সে-এন বিহারে গিয়া বাস করিলেন। প্রত্যাহ অতি প্রত্যয়ে উদ্ভিগা কিছু মনঃবাণেব পর তিনি চার ফটা ছাত্রদের কাছে শাস্ত্র বাখ্যা করিতেন এবং বহু মাক্ষণ্য লোক এই বাখ্যা শুনিতে আগ্রহিতেন। বাকি সময় তিনি অস্ত্রাশ্র পনিম্নে সাক্ষরতা দাখ্যব বোধ শাস্ত্রগণি চীনাঃ দাখ্যব অস্থাব্য করিতেন, বহু প্রতিমার প্রতিষ্ঠিত অস্থান করিতেন এবং শাস্ত্র-এরন প্রতিপিন বানাইতেন। বিহারের ভিক্রুবনও তদ্বাবধান ঈশ্বাকে করিত হইত। এ ছাড়া সম্রাটের অত্ররোধে ঈশ্বাকে ভারত-ভ্রমণের বৃত্তান্তও শিনিতে হইয়াছিল।

১৬শু পুষ্টাৎ মধ্যভারতের মহাবোধি-বিহার হইতে একজন পণ্ডিত চীনদেশগিয়া ডিউগেনকে ঈশ্বানের প্রত্যাশাশন করেন।

কিছুদিন অবনিশ্চিত সি-মিং বিহারে বাস করিবার পর শরীরে বান্ধকা লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় অস্থির সময় আগন্তু বৃত্তি হিউগেন সম্রাটের অস্থখতি শইয়া “ইউ-কা” (মণিপুশ) প্রাশাদে বাস করিয়া বহু পরিশ্রমে ১৬১ পুষ্টাৎ ১০২ খণ্ড ও ১০০ অধ্যায়ে বিভক্ত “মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র”-এর অস্থবায় সম্পূর্ণ করিলেন। সব শুদ্ধ ১০৩৪ অধ্যায়ে বিভক্ত ৭৪ খানি গ্রন্থ হিউগেন অস্থবায় করিয়াছিলেন। এ গ্রন্থের আবৃত্তি শ্রবণ শ্রমে করিয়া তিনি বৃত্তিত নমনে বিহরবোধে বৃত্তার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তারপর ঐদের বোধিসত্ত্বের স্বতিগান করিতে করিতে ঈশ্বার ভাবনানীপ কণ চটয়া আসিল এবং ১৬৪ পুষ্টাৎ ৬৪ বৎসর বয়সে হিউগেন ইহলীনা সম্বরণ করিলেন।

১৬১ পুষ্টাৎ সম্রাটের আদেশে ঈশ্বার দেহাবশেষ কান-চুয়ান উপত্যকার উত্তরে হানাত্তরিত করিয়া ঈশ্বার উপর একটী স্তূপ রচনা করা হয়। [সমাপ্ত]

প্রতীক্ষিত

—ঐশ্বর্যরূপা দেবী

তোনারই পথ চেয়ে তে মন প্রিয় মাধি !
কাটাই সারাদিন কাটে যে সারাবার্তি,
তুনি তো আসিবে না আমারে যেতে হবে।
যাত্রাতিথি মন জানি নে হবে কবে !

একলা আসি হেথা বাড়িছে বড় ব্যথা
জানিনে দিন তব কাটে কি শূণ্যে মাতি।
মেখাতো দিতে পারো স্বপনচরে এসে,
তেমনি অনুমাখা রিক্ত হাসি হেসে।

সময় পাও না কি ? ব্যস্ত এত কাজে ?
আমার দিন হেথা কাটিতে চাহে না যে,
জানিনে কবে যাবো, তোমায়ে কৃক পারো
অলিবে প্রাণে পুনঃ স্নিদ্ধালোকভাতি।

দ্বিপ্রহরে কীৰ্ত্তনের শেষে শিতা পুতে বনন প্রথম সাক্ষাৎ হইল, পাহু কহিল, বাবা এ মাধু নয়, সন্ধ্যানী নয়, কিছু নয়, ও একটি দয়াজোর তও, ওর আচ্ছা তুলে বাও।

সন্ধ্যা কীৰ্ত্তনের পরে হুগেন্সনাথের ঘন তখনও বাধা-সতল ছিল, কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, কিস কথা বলছিস?

—ওই বামোতি, ও তও বাবা, ও সন্ধ্যানী নয়, সবাইকে হিপনটাইজ করে রাখছে বাসি।

শিতা জ্বল হইয়া কহিলেন, হুগ কহ পাহু, ঐটুকুন ছেলে, কি বোঝে তুমি? কত সব বিদ্যান বড় বড় চাকুরে ভেঁকে যেনে চলেন, আর তুমি কি বলছ এসব?

পাহু মাথা নত করিয়া কহিল, সবাইকেই ও তুলিয়েছে বাবা, তুমি এখন বুঝতে পারছ না—

শিতার ক্রোধ সন্ধ্যানীত হইয়া উঠিল, কহিলেন, না, আমি বুঝতে পারছি না, আর তুমি সব বুকে নিজেছ! বাও, বাও খেলা করগে বাও।

নির্বন্দা কি কাজে এদিকে আসিয়াছিলেন, শিতা পুত্রের কথা শুনিতে পাঠিয়া একটু পাড়াইলেন, তাহার পর গালে হাত বিছা নিছরের ভাবে কহিলেন, শুধু মাটি-কাট পাশ করেছে বাবা, এরই মধ্যে এত? বাপের সঙ্গে পাড়িয়ে সমানে তর্ক? এর পরে আর ককে থাকবে না যে!

হুগেন্সনাথ হুগ করিয়া রহিলেন, কিন্তু পাহু একটু ভোলে ভোলেই কহিল, একে তুমি ভাড়াও বাবা, এবে দিডাট কত খাওয়া তুমি জান না! যদি এখানে থাকেই ও, আমি আটট কলকাতায় গেলো বাব।

যদি নিরঙ্কি প্রকাশ করিয়া, হুগেন্সনাথ কহিলেন, এত উচ্চ হওয়া উচিত নয় পাহু, ওইসবের সমান করতে দেখ, দিনের বাড়ী যাবেন হুগ, এ রকম উচ্চ তুমি হলে কি করে আমি তাই ভাবছি।

নির্বন্দা কঠোর বোঝায়ে করিয়া, অতি মধুর ভাবে কহিলেন, 'এখা, মাছ কসার কথা বলো না গো, কি মাছবট

করেছেন তোমার দিনসবাবুর হী, তা দেখতেই পারছি, তখন ত বড় বাগ বেগিবে নিয়ে কলকাতায় যেনে এসে! দিনসবাবুর হী পূন ভাল করে মাহু কসরেন বলে, নিজের মেয়ের সঙ্গে এক রকম করেই যদি বেগতেন, তা হলে ও অত ভাল পাস করল আর তোমার ছেলেকে এ রকম কবে, তলার জুগছে কেন? ভাল ও বাড়ীর মেজ বউ তিক্তের করছিল, বলতে আমি লজ্জায় মরে যাই।

পাহুর চম্ হুট সতল হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু প্রাণপনে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল, আজ এই একটার টেনেট আমি কলকাতায় বাব, বাবা, তুমি যদি ও দিকে থাক তখন, তাই, আগেই বলে রাখছি।

—খেতে ছব, পরে খেয়ে। আজই বাবার ভাড়া কিলের! বামোতিস সঙ্গেও তুমি কি রাখাবগি করছে শুনসাব, আজ তাঁর কাছে তোমার কথা চাইতে হবে, আজ কীৰ্ত্তনের সময় আমার সঙ্গে তুমি যাবে দেখানো।

সে আমি পারব না, ওখানে আমি কিছুতেই যাব না—ও তও, ও জুজোর,—খেতে না খেতে সন্ধ্যানী সেজেছে—

শিতা বসিয়া ছিলেন সন্ধ্যা আসন ত্যাগ করিয়া পাড়াইয়া উঠিলেন, তারপর, হাঘের নিকে আসুন দেখাইয়া, রক্ত কণ্ঠে কহিলেন, বাও, বেরিয়ে বাও বর থেকে—

পাহু নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া বাবা ওর আসিয়া পাড়াইল, হুগেন্সনাথ কুন্তার হাত হাতে পাখাটি টানিয়া লইয়া, প্রথম বেগে ঘাঘের উপর পাগা নাড়িতে নাড়িতে বলিয়া পড়িলেন, তাহার পর নগ্নাঘমান কুন্তার নিকে আকাইয়া কহিলেন, এক খেলায় জল বে তরল।

নির্বন্দা কহিলেন, এনা এখন চল কি গো, তাত বাবে না?

হুগেন্সনাথ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই কহিলেন, চল আনু যমেন।

পাৰ্শ্ববর্তী কণ্ঠ হঠাৎ এক গোলায় মরবত দষ্টয়া উঠা আসিয়া শিতার কাছে পাড়াইল, তত যেনে কহিল, এখন

চল না বাবা, দরখাস্ত খাও,—পাখাটা আমার হাতে দাও
বাবা ।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কলিঙ্গ থাকিবে, হুত্রেজ্ঞানকে আমার
আন্তে করিলেন, তেঁওরা সব খেয়েছিল না ?

—না বাবা, আমার একটু হেরা হতে গেছে আর ।
ওমিকের হোগের রাজা হয়ে গেছে, লুটু এসে খবর দিলে ।

—খবর দিয়ে গেছে ? আমি বাড়ি তা হলে ।

হুত্রেজ্ঞান উঠিয়া গাড়াইলেন ; যাদের দিকে একটু অগ্রসর
হইয়া আমার কিরিয়া করিলেন, উমা, রাজা হলে ওটাকে দেকে
নিরে খাওয়াস । আমার একটু অগ্রসর হইয়া আর একটু
গাড়াইয়া করিলেন, বড়িতে বাসতা ও বেতে গেল দেখছি,
ওটা যদি সত্যিই সপ্ন যায়, তা হলে বেওয়ান মশারকে দিয়ে
খবর দিস বুঝি ?

উমা বাড়ি নাড়িল, হুত্রেজ্ঞানখ নামিয়া গেলেন ।

ইহার নিমিত্ত কয়েক পরেই ছোট একটা হটকেল হাতে
নইয়া পাহ ত্যাকারডি সিঁড়ি দিয়া নামিয়েছিল, আসা
বাসীত উমা ও আর সব কটি তাই কোনই পাহুর পক্ষাতে
পক্ষাতে নামিয়া গিলিল । উমা অতঃপর করিয়া করিল, খেয়ে
দাও লাগ, অনেক সময় আছে এখনো ।

—না ভাই কিবে নেই ।—পাহুর ডকু ৩টি গাল, উমা
বেদিকে ত্যাকাইয়া করিল, কঁসেজের এখনো চের সেরা আছে
দাদা, আর নাই বা বেলে ।

—না তাই আরই স্নেত হবে ।

—তুমি রাগ করে বাক্স দাদা, যেয়ো না ওরকম করে ।

পাহ ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া খব অতিক্রম করিয়া
বাগানের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, উমা চোঁকাইয়া করিল,
হেঁটে যেয়ো না দাদা, জ্যাঠামশাইকে খবর পাঠাই, তাঁর সঙ্গে
গাড়ী করে যাও ।

পাহ ক্রত পথ অতিক্রম করিয়া চলিল ।

বেওয়ান মহাশয় বন্দন ববর পাঠিয়া এ বাড়ী আসিলেন,
তখন পাহ ট্রেনে গিয়ে পৌঁছিয়াছে ।

উমা একটা টিকিন-কেয়িয়ার মাজাইয়া আনিয়া বেওয়ান-
জির পাশে গাড়ীতে রাখিয়া করিল, দাদা কিছু খেয়ে যার নি
জ্যাঠা মশায়, এটা সেবেন তাকে, আর টাকাকড়িও ও কিছু

নেহনি সে । বেওয়ান করিলেন, সে সব আমি বিবেচি না,
কিন্তু একটা নাকে, গাড়ী দরতে পারলে হই ।

বেওয়ান মশাই গিয়া স্ট্রাটকরণে গাড়ীতেই গাড়ী ছাড়িয়া
দিল । তিনি টাংকার করিয়া করিলেন, টাকার কি করণ
পাহ ?

পাহ জানাশার মূখ বাহির করিয়া গাড়ীয়াছিল, করিল,
সে সব ভাববেন না জ্যাঠামশাই, সব ঠিক আছে ।

পাহ তাহার ক্যাজেটেন পেন বিক্রম করিয়া কলিকাতার
চলিল ।

বেওয়ান মশাই খানিকক্ষণ শুভ হইয়া গাড়ীয়া থাকিয়া,
কলিকাতার বিনয় বাবুকে একটি টেনিশ্রাক করিয়া দিলেন ।

[১১]

গাড়ী ছাড়িতেই সেই যে পাহে মাথাব নীচে একটি হাত
রাখিয়া, অস্ত্র হাতটিতে কপাল ঢাকিয়া বেকির উপর তইয়া
পড়িল, সমস্ত দিন ব্যাপিয়া ট্রেনগানি কতবার খামিল, চলিল,
কত গাড়ী নামাইল এবং তুলিল, কিন্তু পাহ একটবার উঠিল
না । অবশেষে কলিকাতার পৌছিয়া গাড়ী বন্দ সেই স্রাতির
মত তাহার শেখ কাশিটি বাকাইয়া সেইখানেই খামিয়া পড়িল,
তখন পাহ মাথা তুলিয়া একবার একটু বাহিরের ভিত্তির পাশে
তাকাইয়া আমার বেকির উপর তইয়া পড়িল, মনে মনে বলিল,
ভিড় কলুক, তারপর আমারে আরো একটা কলীকে জেক
রওনা হলেই হবে । বিনয় বাবুর বাড়ীতে সে উঠিবে না,
সেখানে আর সে থাকিবে না, একথা পেতেই পরীক্ষার ফল
জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বির করিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, কলি-
কাতার নিজের বাড়ী ও একটা আছেই, তবে আর ভাবনা
কি ! পরীক্ষার খবর জানিয়া দীয়ার না বাবার, তাহার উপর
যে কি রকম একটা কপাল ভাব আসিয়াছে, সে ভাবটা নিজের
মনে করনা করিয়াই দাক্ষ অতীবনে পাহুর হৈম পূর্ব
হইয়াছিল । এখন চোখ বুজিয়া আশ্রয়ণ বলের সহিত নিজের
মনেই সে বার বার বসিতে স্মারিল, বাব না আমি, কলখো
না, কলখো গিয়ে আর ওঁদের সঙ্গে মেলাও করব না,
আমার কেউ নেই তা ত' আমি জানি, আমার বাবাও আমার
পর হয়ে গেছেন ।—বন্ধ চন্দ্রকটিক কোণে কোণে জল
দিক্ত হইয়া ভাবা হইয়া উঠিতে থাকিল, একটা দাক্ষ

অবশ্য ও স্রাস্তি আসিয়া সাধামনের অনাহারী পাত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

হঠাৎ একটি শব্দ সে চমকিত হইয়া বাঁকু ক্রিয়াটল। মীরাগের লাবোয়ান কৃষ্ণ রামচন্দ্র গাড়ীর ভিতরে যুগ বাঁকুটয়া লোমশাঘে করিতেছে, নাকি এট ত এট গাড়ীতে পাহারাবানু ঘূমির আছেন।

যা করিলেন, গাড়ীতে উঠে ড্রেক ডোল, রামচন্দ্র না। যাবন পড়েছে, অল্প কয়েক নি ত, কে জানে বাপু। দেখ দেখ। রামচন্দ্র ততক্ষণে গাড়ীতে উঠিয়া পড়িয়াছে, পাহা বৃহৎ মধ্যেই হুটা ক্রিয়াটয়া বর্তমান অবস্থাতে। তাহিয়া লইতেছিল, কোন চুকিল খিলখিল শব্দে মীরাগের মিলি হাসি।

উঠেছেন না কি ? ও রামচন্দ্র উঠেছেন নাকি বাবু ?

এ যে কামাখ্যারই কৌড়ি, পাহা নিঃশব্দেতেই তাহা বুদ্ধিগাছিল, কিন্তু এখন না উঠিয়া কোন উপায়ই যে আর নেই, তাহা বুদ্ধিগাই পাহা বীরে বীরে উঠিয়া গাড়ী চাইতে নামিয়া যাকে প্রণাম করিয়া ধাক্কাটল, যা গাড়ীর বেহে তাহাকে কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শরীর ব্যাথা হই নি ত পাহা ? ঘূমিগি কেন ?

মীরা মুখে কপাল গাপা দিয়া বিব্রত পাত্রের পানে তাকাইয়া তখন হাসিতেছিল, কহিল, নেবে আসতে পারলে পাহা ? আশ্রয় যদি না আসতাম তা হলেই হয়েছিল আর কি ! কাল সকালে জেমে দেখতে আবার বিনাভাড়াতেই একবারে সেই ফুলপুরের টেশন !

যা করিলেন, বা, হাসিছিল কি ? তাহাড়া এই গাড়ী ত আচ্ছন্ন করিয়ে আর বাবে না, সান্ট করে গাইজিঙ নিয়ে যেনে যেনে।

মীরা কহিল, তা হলে ত আরো মজা হত, স্রাস্তিরে গাড়ী পরিষ্কার করতে এসে কুনীয়া সুমের চোখে আর অন্ধকারে বেশ ভাল একটি ঘোট মনে করে কে নেবে বলে কাড়া-কাড়ি গাঙ্গিরে দিত যে।

যা রাসের ভাব দেখাইয়া করিলেন, খাম ত মীরা, ছেলেটা নাম্বোলা খালি গাড়ী থেকে জেরে মধ্যে কি আরম্ভ করেছে দেখো না ! ও রামচন্দ্র, কই বিছানা কই লামাবাবু ? খালি হুটকোট নাম্বোলা যে,—

—বিছানা ত নেই মাজী, বলিয়া রামচন্দ্র খাম একবার গাড়ীর ভিতরটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।

না বিমিত হইয়া করিলেন, সে কিসে পাহা, বিছানা কৈ ?

অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া গাড়, হুৎ, কপাল ব্যা ব্যা বহিতে বহিতে পাহা কহিল, বিছানা ত নেই না, কুলে খেছি মাঝে—

এইবার আর মীরাগ হাসি কিছুতেই বাধা মানিল না, মুখে ভিতর কপাল চাকিগা দিয়া উজ্জ্বলিত হাসিতে কাটিয়া পড়িয়া দেখিখানেই সে বসিয়া পড়িল।

যা বৃহৎকাল অবাক হইয়া তাহার এই আশ্চর্যকোলা ছেলেটির পানে তাকাইয়া রহিলেন, তিনি ছাড়া যে একবৃহৎ ও এই ছেলেটির স্পেন না—তিনি কাছে নাট, তিনি স্ফটিক সেন নাট, নিকেও সে তাই তিনিবদ্য তার শুভাইয়া অনিতে পাবে নাট, তাহিয়া প্রাণ বেহ উপলিয়া উঠিয়া, বুকখানি তাহার হৃদয়া হৃদয়া উঠিতে লাগিল, মুহু হাসিয়া কহিলেন, কি করে প্রচেষ্টা বাবা ? লাগেনি শিটে ?

পাহা হাসিয়া কহিল, কি জানি না, তাও বুঝি বিশেষ।

স্রাস্তার উপর নিত্যকাল অচল হইতেছে মনে করিয়া মীরা প্রাণপনে নিঃশব্দে সন্ধ্যা করিয়া উঠিয়া গাড়ীয়া ছিল, পাহা কহিল, থামলে কেন ? হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ এখনকার মত অসুস্থ,—বাড়ী গিয়ে ডাক্তারের আবার হবে।

সহক কথাবার্তার, এবং হাতপরিচয় পাহার মন কতকটা হাফা হইয়া উঠিয়াছিল, শরীকা বা শাসের কথা যে ইহারা একবারও জুলিলেন না, পাহা মনে মনে তাহাতে তথ্যবাক্যে ধন্যবাদ দিল ; কিন্তু বাড়ী গিয়া, আশ্রয়াদির পর বিছানার ভইয়া, মাথাটা বদন বেশ হুপাট ভাবে তাহিয়ার ক্ষমতা পাইল, বিগ্রহের কথা মনে করিয়া, মনটা তখনই আবার একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। পিতার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার যে সে কখনও করিতে পারে, ইহা একদিন তাহার ধারণারও অতীত ছিল, কিন্তু আজ মতাই তাহা ঘটয়া গেল। হুত ঘটনাটা এতটা বিস্তীর্ণ রূপ ধারণ করিত না, যদি নিমাতা আসিয়া দেখানে ঐ রকম কথাগুলি না বলিতেন ! বাক, সে যা ইহবার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা একপ্রকার ভাবে, পিতার কাছে ভাল করিয়া অল্পমতি না লইয়া

একবারে কণিকাটা চণিয়া আসিবে কি হৃদয়েভর করি
হইয়াছে ? না হয় সে স্বামীভার কাছে নাই ঘাইত,—হৃদয়
পিঠা তাহারে বৃদ্ধ হইতেন, জুড় হইতেন, তবুও হৃদয় সে
পরে তাহার মনোভাবিতা তাহারে বৃদ্ধিয়া দিতো পারিত,
‘ওহু—কে এই স্বামীভি, বাহার ভগ্ন পিতার সঙ্গে সে বিবাহের
কষ্ট করিল ! পাত্তর অমৃতপুত্র মন নানা ভাবে নানা রকমে
পিতার অমৃত বেহাগার কথা মরণ করিয়া, বেহনাতুর হইয়া
কহিল ।

রাত্রি বিশ্রামের অতীত হইয়া যেন, পাত্তর শব্দায় শুইয়া
এগাশ এগাশ করিতে করিতে, সহসা তাহার আর একটি
কথা মনে পড়িয়া গেল । পুত্রের পড়ি নিয়া বহির্লগ্নি
অভিভূত করিয়া যখন সে ক্ষুণ্ণপরে বাহিরের পথে দিকে
আসিতেছিল, তখন বাপানের এক প্রান্তে একটা স্বেদলক
গাছের ঈশ্বর ছায়ার একজন তরল সঙ্গীতকে বেধিতে
পাইয়াছিল, স্বামীভির যে সব শিশু তাহার সঙ্গে আসিয়াছেন,
চিনিও তাহাদেরই একজন, বিশ্ববিজ্ঞানের উপাধিধারী তাহার
সকলই, ইনিও তাই,—এ—এ পাশ করিবার পর যখন
বন্যারশি পাইয়া বিশ্রাম ঘাইবার আসন্ন সম্ভাবনাকে পরশিত
করিয়া ইনি স্বামীভির সঙ্গে চণিয়া আসেন, পিতামাতার তখন
হৃদয়ের আর আর ছিল না,—এ সব কথা ভাটান্যপাথের কাছে
সে ভবিয়াছে । সকলের কীৰ্ত্তনের পর বিশ্রামের যখন
ভোগের ব্যবস্থা চণিয়াছে, ইনি তখন নীরবে সবিয়া আসিয়া
পাছতলার নির্জন ছায়ার তাহার ধ্যানে বসিয়াছেন । তীত
আলোকসৌন্দর্য আকাশের নীচে, প্রভৃতি বৈশ্যানে তাহার
উপর বসতি বিকৃত করিয়া ধরিয়াছে, সেখানে এই তরল
তাপের এই ধ্যানমগ্ন নৃসিং পাত্তর চোখে ভাঁও কি রকম
তাপ লাগিয়া গেল, চলিতে চলিতে বারককে ইহার
পানে পাত্তর তাকাইয়া তাকাইয়া গেল, ঈশ্বর উন্নত মুখখানি,
সুখিত চক্ষুভিঃ নীচ নিয়া ছুটি গাল বাহিরা কৌণ ছুটি জলের
রেখা,—কি লুক্কায়ই লাগিল পাত্তর চোখে !

পাত্তর আবিতে লাগিল এই স্বামীভির এমন সব শিশু !
কি করিয়া এ রকম হইল ? পাত্তর ভুল হয় নাই ত ? পাত্তর
অভিভূত করে নাই ত ? নিশ্চয়ই না, সে যে তও নশ্ট, পাত্তর
তাড়া নিজের চোখে দেখিয়াছে । তবু তাহার যে কি একটি
অস্বাভাবিক আক্ষেপ হৃদয়ে বস করিবার, তাহার আর ভুলনা

নাই, পাত্তর তাহা স্বীকার করিল : যখন তরল ভাগ করিয়া, নিজে
সে পরমহংস সাজিয়া বসিয়াছে সত্য, কিন্তু এতগুলি শিশু ত
সত্য সত্যই ইচ্ছাকৃত অবলম্বন করিয়া, সত্য বর্ষের জন্তই
পাশল হইয়া উঠিয়াছে । তার পাচটি প্রাণের লোক যে কি
করিয়া, ইহলোকের হৃদয় হৃদয় ভাগ করিয়া, পাঁচ কতি সুলিঙ্গ
শেষে সত্য পরমহংসকে পাঁচ করিবার আশায় পাশল
হইয়া উঠিয়াছে, শত্রু নিরা সুলিঙ্গা নিয়া সকলে কি করিয়া
এক হইয়া গিয়াছে, ইহা ত পাত্তর নিজের জোখেই দেখিয়াছে—
সে নিজে ঘাইয়া হইক, এই যে লোকশিক্ষা সে নিতেছে, এই
অনাচারে তরা পৃথিবীর বুকে ইহারই মূল্য কি কম ? জাতিকে
যত্নের দিক নিয়াই হৌক বা যে কোন দিক নিয়াই হইক, এই
যে উচ্চচিত্ত, একতাবদ্ধ করিয়া তোলা ইহারই বা করণে পারে ?
এই দিক নিয়া জাতির সে পুণ্য এবং পাত্তরও সে মমত !
পাত্তর মন হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল । মনে মনে
কহিল, বাহু ওয়া বতসিন ইচ্ছা আমার বাবার ক্ষরে, আমার
বাবার আশ্রয়ে থাকিয়া বতসিন পারেন, নির্ভিয়ে ধর্ম সাধন
করিয়া লউন পাড়াগায়ে বঙ্গভাষাটির চেয়ে এ শতগুণ ভাল ।
সেই রাত্রির সিদ্ধ হাওয়া জানালাপথে গর ঢুকিয়া বীরে
বীরে পাত্তরকে ঘুম পাড়াইয়া গিল ।

সকাল বেলা মাতা কস্তা একই সঙ্গে ঘুম ধুইয়া আসিয়া
সোতলার বাগাওর চায়ের টেবিলে বসিলেন । ছোকরা চাকরটি
একতলা হইতে কেটলী করিয়া তল আসিয়া বিলে বীরা
পাড়াইয়া চা করিতে লাগিল, বা পাত্তর বরের রুচি হারের পানে
তাকাইয়া কহিলেন, উনি ত ঘুম বুঝেন, এখনই এগ
পড়বেন, কিন্তু পাত্তর ত এখনও ওঠে নি, ও উঠলে আমার চা
তৈরি করে দিও বৌদ ।

বীরা হস্তিত হস্তে রুচিতে মাখন মাখাইতে মাখাইতে
হাসিয়া কহিল, পাড়াও মা, একটা মজা করছি ।

—কি আমার মজা করবি ?

সেই না, কি করে ওর ঘুম তাড়াই ।

বাগাওর দিকে জানালাটার নীচেই পাত্তর মধ্য এক
সেইদিকে মাথা তুলিয়াই পাত্তর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল । বীরা
নিজের মৈত্রিকথানা হইতে কদিন-বেলাটি আসিয়া যাবের
পানে তাকাইয়া হাসিতে হাসিতে সেই জানালাপথে হাত
বাড়াইয়া পাত্তর কানের কাছে ধরিয়া প্রবল গতিতে বোতাঘ

চিপিতে লাগিল। না হাসিয়া কহিলেন, থাক থাক হরহে, ও তারপর তবু পেয়ে ঢেকে-টমকে উঠে একটা অশ্রু-টপক করবে খ'ন, চলে এস।

—না যা, অশ্রু হ'বে কি, এত বেলা অবধি ঘুমে কেন। এ তার শান্তি। দেখ না, এক্ষণি উঠে পড়বে।

বিনয় বাবু কথায় মুখ মুছিতে মুছিতে টেবিলের দিকেই আসিতেছিলেন, হাসিয়া কহিলেন, ও কি হচ্ছে পাগলা?

—কিছু না বাবা, পাহুবা খুন থেকে উঠতে ভুলে গেছে, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি।

বিনয়বাবু হাসি মুখে কহিলেন—তার মানে?

—পাহুবা বড্ড সব ভুলে থাকে আত্মকাল, বাবা কাল বিছানা আঁকতে ভুলে গেছে বেশ থেকে, তাহে খাড়া থেকে নামতেও ভুলে গেছেন, আজ আবার—

না কহিলেন, চুপ কর যাক।

বিনয় বাবু কহিলেন, আচ্ছা বসুক বসুক, এই ত ওদের মেয়ে বেড়াবার সময়। ভূমি কি পার এখন ঐ রকম থাকে জিনিস নিয়ে হেলে সময় নষ্ট করে বেড়াতে?—আমরা কাতনে অকাতনে ও রকম যদি হাসতে পারতাম, তা হলে আর এ রকম বুড়ো হতাম না ঈশানির। হাসিতে আনু কত বাড়িয়ে দেয়,—তা জান?

—তা হলে হাস তোমরা বসে বসে, আমি বাপু চা খেয়ে নিয়ে নীচে চলে যাই, বসে কস খালি হাসলে পেট ত আর ভরবে না।

—আচ্ছা বোস বস, এক সঙ্গে চা না খেলে কি আর খেলে আসন হয়?

পাহু উঠিয়া ছাত্র বুলিলে, বীরা হাসিতে হাসিতে সরিয়া আসিল।

বীরা পেয়লায় পেয়লায় চা ঢালিয়া সকলের সম্মুখে আগাইয়া দিলে, চা পান চলিল। যা চা পান করিতে করিতে পাহকে, তাহার গ্রাম এবং শিতা বাড়ী লক্ষ্যে প্রায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বীরা হঠাৎ হঠাৎ এ কথা সে কথার বোস দিতে লাগিল এবং বিনয়বাবু লজ্জা আগত খবরের কাগজ লইয়া বসিলেন।

তারপর হঠাৎ একবার কাগজখানা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া, পেয়লায় অবশিষ্ট চা-টুকু শেষ করিয়া কহিলেন—হঁ,—তার-

পর, পাহ তোমার বাপা তোমার বেজান্ট ভ্রম কি বললেন? নিশ্চয় ছাপিত হলেন খুব! হনারট কথা, তা সে আর বলে কি হবে? তবে এইবারে কলেক্ট টুকে একটু ভাল করে পড়ায় নন নাও বিক'ম। আই-এ টা খুব ভাল করে পাস করা চাই। বুঝলে ত? কলেক্ট-টলেক্ট জগো খুশে হবে?—

হায়ের মোক, খোঁজ-টোজ নিগেছিন ত? টেবিলটিকে বিরিয়া যে একটি বেসোয়ান কোনল আসো এই গুজবরত মালুমজানকে পরস্পরের নিকটে মধুরতর করিয়া ভূমিগতছিল, সহসা তাহা কোথায় মল্লহিত হইয়া গেল, পরস্পরকে মানিয়া লইতে মেহেই যে সংসারে যথেষ্ট নয়, বিচার তার প্রত্নদুষ্টি বরিয়া অহুসলই যে মেহের উপরে কড়া পাহারায় দিয়া খুশিতেছে, পাহুর চোখে তাহা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়া উঠিল।

নীচে নতুন আসিয়াছে খবর পাইয়া বিনয়বাবু উঠিয়া পড়িলেন, পড়াগ পানে তাকাইয়া কহিলেন, ওসো আবার আজ একটু ঈশানির ভাত নিতে বল ত, একটু আগে বেকুও হবে।

আচ্ছা বাজার কি এল মোক দেখ ত।

—না না আসে নি এখনো, বাজার এসে না আবার পরব দিও, আমি বাছ হুটন আত,—এল পাহুবা, আমরা লাইব্রেরী থেকে কতগুলো বই বেছে নিই গে।

ফুত হুত মোরা চাকুর চাকুরের চা খাবার টিক করিয়া দিয়া, চাকুর চিন চিনি সব পানের বিটপেকটাগ ভুলিয়া রাখিল, তারপর বাজার আসিয়াছে কিনা আর একবার খোঁজ করিয়া, পানের ঘরে চুকিয়া লাইব্রেরার চাবী আনিয়া ডাকিল, চপ পাহুবা নাচে বাই। পাহু নারবে উঠিয়া তাহার অহুসরণ করিল।—

[১২]

মাল দুই কাচিয়া গিয়াছে; পাহু, বীরা উভয়েই কলেক্ট ভর্তি হইল, একজন বেছুন, আর একজন খুটন মিশনারীরের একটা কলেক্টে। নূতন বই নূতন খাতা নূতন বন্ধ-বাঁধব, উভয়েরই উৎসাহের আর সীমা রহিল না। কলেক্টে ভর্তি হইয়া আসিয়া মাথা কহিল, পাহুবা এস, আমরা প্রতিজ্ঞা করি, দুজনেই আমরা কেউ কান্না চোরে নাচে পড়ে থাকব না,

এমন ক'রে এবার আমরা পড়ল, কেউ ঘেন কাণ্ডককেই না হারিয়ে পাই। তা হলে সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে মত কেউ আমাদের সঙ্গে থাকবে না, আমরা হু মনেই হ'ব ড্রাকেটে ফাইট।

পাহু হাসিল।

আর বাপ চট মক কাটিল না, প্রোফেসরের বক্তৃতা খোলা, নতুন পাতার মোট দেখা বেশ পাগে, প্রবণর হটেতেই পাহুর একটু একটু করিয়া পূরিবত্তন আরম্ভ হইল। তবে কোনটা পড়া হইবে, তবে কোনটার মোট দেখা হইবে, তাহার কত অংশেরা করিয়া থাকিতে পাহুর ভাল লাগে না। বাকীর পাইরেদী এবং কলেক্তর পাইরেদী গাঁতীরা একমনে পাহু কেবল বই-এর পর বই পড়িয়া শেষ করিয়া চলিল। পঠো-অঙ্গিকার ঐ পড়িবদ্ধ করেকখনা বহির ভিতর পাহুর মন আর আরব্দ থাকিতে চাহিল না, বহির পর বহি খুলিয়া কখনো বিভ্রম কখনো ইতিহাস নষ্টা, তাহাদেরই অকনিহিত সৌন্দর্য্য সন্তোষ করিতে করিতে মুখ পাহু এখনই তত্ত্ব হইয়া থাকিত যে, কলেক্তর ক্লাস বা পড়ার বহিগুলি কোন সিক মিহাই পাহুর মনকে স্পর্শ করিতেও পারিল না।

যাহে যাহে বীরা আসিয়া কহিত, পাহুরা কি হচ্ছে ? জানচরকা ?

—হী ভাই, জাই।

টেলির উপরে চট তিনটি বহির পাতা খোলা, এবং কপি পেন্সিলে তাহাতে অক্স লগ কাটা, বীরা একবার সে গুলিতে একটু চোখ ব্লাইয়া লষ্টা কহিত, তা জানচরকাটা একটু পরে করলে হবে না ? আগে বিভ্রাচরকাটা করে নাও না।

পাহু হাসিয়া কহিল, বিভ্রাচরকা এবং জানচরকা তকায় আছে নাকি ?

—নিচই আছে, জান আমাদের ঐ উড়ে বাহুন্টারও থাকতে পারে, কিন্তু বিভ্রা নেট—এবারও হাসিয়া পাহু কহিল, তা যদি হয়, তবে ছোটোটে চরকা করবার সময় কই,—বিভ্রা আমি রস পাই না, আবার এটো জানচরকা এত বেশি সেটা পাই, জান-সমুদ্রের রস এত বেশি,—বড়ই অশেষ ভালো ডুবছি ভাই, তার আর শেষ নেই,—

বীরা পাহুর হট্টা বানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। বানিকক্ষণ বইগুলি নাড়াচাড়া করিয়া কহিল, ভীষ্মটা এত ছোট নয় পাহুরা, যদি নই না কর, এ ভীষ্মটার বিভ্রা জান দুটোই লাভ করা যেতে পারে,—বে পুথের বা :—এ হুগে বিভ্রা না থাকলে আমার নেই ভাই। তোমার কি পড়তে বেশি সময় লাগে ? মোটেই না,—যদি পড় মন নিরে, ভাল পাশ করতে পারবে আমি জানি,—আগে পাশ কটা করে নাও না, জান চরকা তোমার ভাতে কি বেশি হুবিধে হবে না ?

পাহু মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া হাসিয়া কহিল, চাহুগীর কথা বলছে ?

একটু থামিয়া পাহু আবার বলিল, আজকালকার দিনে চাহুগীর আর সম্মান পেতে হলে লাভ থাকা দরকার, সেই লাভটাই আমার নেই, তা নাই বা পেশাম চাহুগীর, চাহুগীর না হলে কি পাব বলছ ? ভগবান এখন প্রাণটা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং কিংবদন্তি রেখেছেন পেটে, তখন এক বিষয় থাকে যে জমিও কোথাও রেখেছেন নিস্তর, থাকার তাহনা কি বীক,—আর সম্মান ? চাহার যে সম্মানে, সেই সম্মানেই বখেই হবে, তার বেশি দরকার কি ?

বীরা আরও বানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বীরে বীরে উঠিয়া বাইত। পাহুও এবিক এবিক হাত পা ছড়াইয়া দিয়া চোখ মুদ্রিয়া চেয়ারে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিত। পাশ চুটি কুচিত, বদ্ধ চোখ চুটির পাতার পাতার দলীর চিন্তার রেখা ! কতক্ষণ কাটিয়া গেলে দেখা হইয়া উঠিয়া টেলির একপ্রান্ত হইতে কলেক্তর বইগুলি টানিয়া আনিয়া খুলিয়া বসিত, পাশেই সেই নোটবুক, পাতায় পাতায় তার কত অতি প্রয়োজনীয় লাইনগুলি পাশ পেন্সিলে লিখ করা, সেই ক্লাস, সেই পক্ষা—একমুখে ভাবন !—অসম্ভব,—কি বিজ্ঞিই লাগে এইগুলি, সবটিকে বিরক্ত করিয়া দেয় ! পাহু কোরে কোরে সব বদ্ধ করিয়া টেলির এক পাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত। তার পর কি ভাবিয়া টেলিটা হইতে তাহার পরম আদরের বাঁশটা তুলিয়া লইয়া জলাপারি বাহিরে পা ছড়াইয়া দিয়া চেয়ারটতে হেলান দিয়া বসিয়া বাঁশ বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিত। পাছাটতে বাজাইতে চোখ চুটি কখন আপনি আপনি বদ্ধ হইয়া আসিত, প্রায় বিলুপ্ততন পাহু স্রবের পর স্রব তুলিয়া রাখার পোককে তত্ত্ব করিয়া দিয়া আকাশ

বাতাস কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া কতকক্ষণ দরিয়া কেবল বাজাই-
তেই থাকিত—কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তুমিহা চব্বিশ
চাহিত—বাতাস ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে, ওগো প্রা-
বিলানী,—সুহৃদের বজ্রের সাতার শোক যে সব ভেঙ্গে গেণ ।
দয়া করে থাওয়া এখানে ।

—কে, দ্বীপ ?

—হা আমি ! সন্ধ্যার পরগুণা নিয়ে এসেছি, ডাঃের
সময় বলিবে এসেছে, ওঠ এখানে,—

পাশ উঠিয়া, দরিয়া আনিয়া চানিয়া করিত, অর্থাৎ
কলমেয় ?

—ইয়া দশাই, নটা বাজল, চান করে খেতে এস, ঈশ্বরের
করে, আমাদের কলমেয় যেনে এসে তারপর ব্যবাকে নিয়ে
গাড়ী কোটে যাবে ।

—তোমার হয়েছে ?

—আমার ত পাচ মিনিট, এল ঈশ্বর,—

বিহীনটি সাধনে আনিয়া চুল খুঁটিতে খুঁটিতে বীণা বাজক
গিয়া চুকিল, পাশ তোমারে দৃষ্টি লইয়া নীচের বাজককে ঘাইতে
ঘাইতে তুলিল, কলের জল পতনের উপর দিগাও ঘোঁরাগানের
জ্বর পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে,—

যে মূল না খুঁটিতে, করবে ঘনাইতে,

যে নীচের দরিয়া দিয়া

জানি যে জানি তার জ্বলি যাবে ।

সন্ধ্যা ওনাইয়া আনিয়াছে, বোতলার বৈঠকখানা
জয়ের গিঠানের পাশে বীণা গাহিতে বসিয়াছে, এখন আর
সকলের সেই বিশ্রামের ভাব তাহার চোখে নুখে কোথাও
নাই, চিরকথা চিরকোতুকমারী অপূর্ণ প্রবন্ধ দিয়া
গাহিতেছে,

“ক’বল কলমেয় তার দেখানো কেন

আমার দিগে বাজবে নী, সেই যে কলমেয়—

গিঠানের পাশে দাঁড়াইয়া, পাশ তাহার বাঁশিতে বীণার
মিষ্ট শব্দে যেন হরিয়াইয়া দিয়াছে । বাজার জোয়াং-
শোকে প্রতিদিনকার মত বসিয়া আছেন, বিনয়বাবু এবং
তাহার পত্নী । বিনয়বাবু সেই হাসিমুখি সর্বদা স্মৃতি এখন
আর নাই । নানা দিক দিগা উঠিত ও পন্থাচার মতে মতে
তামার চেহারা এবং মনেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । এখন
একমাত্র পত্নী কলমেয় মতে হাসিয়া কথা বলা ছাড়া, অত দূরে

প্রারম্ভে তাগাকে হানিতে দেখা যায় না । হাটকোটের ভিত্তি
প্রাপ্তি এবং অগো কতকগুলি উপাদান কবিতা, সংগ্রহটাকেই
এখন তিনি মত চোখে দেখিতে আসিয়া করিয়াছেন । গৃহের
দাদ দাদী, গৃহস্থের অমায়িকত্ব, পথে প্রবাহিত কলমেয়
তখন ছাত্র—গোড়াকের চোখে মূগ্ধতা নানাকরন ক’উচ্চ
সর্বদাই তিনি দেখিতে পান, এবং এই মত প্রতিনিষতই
মতভাবে থাকিতে থাকিতে, প্রকৃতি তাহার একমাত্র শ্রম ও
কঠিন হইয়া পড়িয়াছে । বাহ্যিক পানের পর হইতে পান
উপর হইতেও তাহার সেই মনের দৃষ্টি অন্তর্হিত হইয়া
গিয়াছে । সে কথা একজন কবিতা কাগকেও কিছু না
বলিলেও, বীণার মা সর্বদা গৃহীতে পারেন ; বুদ্ধিও তিনি
চূপ করিয়া থাকেন ।

গান তুলিতে তুলিতে বাবা হাতে বৃষ্টিয়ে আদ্য
হইতেছিল,—

—ওগো, তোমার পাশ্চাত্য দিকে একটু লক্ষ্য রাখ ।

—কেন ?

—ও যে কিছু পড়াওনা করছে, তা’ত আমার মনে
হয় না ।

—কি আর করব বল, সব ছেলেদেরই কি আর পড়া হয়,
তা ছাড়া ও পড়ে ত ।

—পড়ে কি, কি করে, কে জানে ।

পত্নী নীরবেই বাগানের দিকে চাহিয়া বসিয়া বসিলেন ।

যানিকল্প চূপ করিয়া থাকিয়া বিনয়বাবু কহিলেন,
রাগ করলে নাকি ?

—না, রাগ কিলে ?

—তোমার মনে মনে একটা আশা ছিল, আমি জানতুম,
ছিল কেন, মৃত এখানে আছে, কিন্তু তা অসম্ভব, বুঝলে ?

—কি আশা ছিল ? কিলে আশা ? কিছু না, কেন
তুমি ও সব বলছ ?

বিনয়বাবু হাসিলেন । একটু পরে কহিলেন, একটা
‘এট হোম’ (At home) দিতে চাই, কি বল ?

—তা বেশ ত’ কিন্তু হঠাৎ ?

—হঠাৎ মানে, বছর বারেক ত বিট নি কিছু, ছেলে
থেকে খুব, আমাদের মি: এন্টো গেলি বলছিল, তোমাদের
বাগানী রূপগোনা খাওয়াও, চেহারাও বদলে গেলি
পারিবে মন টাকার রপগোনা আদ্যবাবু ।

—সব টাকার বসগোলা? বল কি! খেলে নাকি সব
ত্রেমাল ত্র গ্রাউট?

—না, না পাগল নাকি! লাভ আট জন ছিলুম আশ্রয়,
গোটা কতক করে তুলে নিলে সবাই, আর সব ত বেচারী
নাছোয়ানদেরই ভোগে গেল।

ঘরের হিতর গান তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মা মুকুন্দার
পরে বেশিদিন, গান বন্ধ করিয়া উঠিলার ঘূর্ণিত বীণা ক্ষত
হস্তে এতটা নাচের গং বাজাইতে থাকিতে চোটে চোটে
চাপিয়া স্তব্ধ হইয়াছে, আর পাহাড় ঠক ঠক করিয়া
টেবিলের উপর বাঁকিত দিয়া ত্রান দিতেছে। মা বেশিতে
লাগিলেন, হুটুটু মুকুন্দ, হুটুটু তুলনটান।

বাক্য না শেষ করিয়া, হাতের কথা কহিতে কহিতে
একই সঙ্গে বাজা গার ব্যতির হইয়া অসিল। তারপর একবার
এটিকে একটু তাকাইয়া পাহাড় সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া
গেল, আর বীণা অসিয়া পিতার চেয়ারের হাতলের উপর
বসিল।

আসারান্তি সমাপ্ত হইলে মা কিস্করদের খাওয়ার তদা-
বধান করিতে গেলেন, উদ্যানে ভাল তরকারী এবং মাছ
লগ্না লইয়া, উড়ে ঠাকুরটি যে একটু গোলবাশ করে, মা তাহা
ভান্বিতেন, এট সমস্তটার বীণা সর্বস্বাই মাতার সঙ্গে সঙ্গে
যোরে, মনস্তিক পরীক্ষার পূরণ হইতেই মা এই ব্যবস্থা
করিয়াছেন। কোন কোন দিন কলার উপরই এট মল কাচের
সম্পূর্ণ পরিষ ছাড়িয়া দেন, মীরসাদাচল ঠাকুরের চাবিটি
বাঁধিয়া ছোটখাট একটি গৃহস্থের মতই চাকরদের প্রার্থনা-
বস্ত, কাগকেও একটু বই, কাগকেও একটু তেলুতিনি,
কাগকেও বা আর কিছু দিয়া, তাঁড়ার বন্ধ করিয়া, ছোট
শিকড়ির মত প্রায় নাচিতে নাচিতেই উপরে উঠিয়া যায়।
তারপর কোন কোন দিন, পড়িতে বসিন আর ভাল লাগে না,
বীণা তাহার এসবখানি লইয়া বাজাওয়ার আসিয়া বলে। বীণার
বাক্যের সুরে অক্ষিরদেয় পিতার কাছের গোলবাশ হইয়া
যায়, কাঁচকর্ণ কেলিয়া তিনি বাজাওয়ার আসিয়া, কলার পানের
টিকি চেয়ারটিকে বসেন,—সিগারেটের আবেশের ঘূর্ণ ঘূর্ণ,
বীণার বাক্যের তরঙ্গ রাগিণীর মতই বিশিয়া কখন এক সময়
ঠাকুরকে ঘুম পাড়াইয়া দেয় গীতীর বা প্রায়ই এ সময়ে, ঘরে
নিসিয়া ঠাকুর মারদিনের অসদাশ কতকগুলি কাণ্ড শাসিয়া

বাগেন, আশ্রয়-বন্ধকে চিঠিপত্র দেখা, বাজানের হিসাব
টঙিয়া দিয়া, বাজাওয়ার বন্ধন আসেন, বিষয়বাস্তু তখন
গভীর নিস্তাধ নিমগ্ন হইয়া আছেন আর বীণা,—বীণা তাহার
সমস্ত চেতনা পূরীভূত করিয়া, নিবৃত্ত প্রকৃতির মধ্যে, নিজেদেরই
স্বপ্নের ভালে যে বাজাপুরী স্বপ্নের কনিদা তুলিয়াছে, তাহারই
মধ্যে বসিয়া সাধনার মত!

আজ মা স্নানোত্তরের কাণ্ড সমাপ্ত করিয়া, উপরে উঠিয়াই
আগে পাহাড় ঘরে গেলেন, টেবিলের উপর পা দুটি তুলিয়া
দিগা, চেয়ারে উপবিষ্ট পাহাড় অস্ত্রমনতভাবে উর্ধ্বে চাহিয়া বসিয়া
আছে, সম্মুখে গেলো একখানি বই, দুই তিনটি খাতা এবং
একটি কলম পেলিল। মা ডাকিলেন, পাহাড়।

পাহাড় চাকরিয়া উঠিয়া সোফা হইয়া বসিতে বসিতে, কহিল,
মা!

—ইয়া সেপেতে এলাম, তোয় জলটল ঠিক করে' দিয়ে
গেছে কিনা, বিছান টিছানা পাতা হয়েছে, বা তেমনই
রয়েছে। আজ বিকালে এসে সেখে যেতে পারি নি।

কথাটা মিথ্যা, প্রতিদিনকার মত আজও বিকালে আসিয়া
মা চাকরদের কাছের তদাবধান করিয়া গিয়াছেন। পাহাড়
হাসিয়া কহিল, সব ঠিক আছে মা, তুমি শোও সে খাও।

মা সেলেন না, খাটে আসিয়া বসিয়া টেবিলটির পানে
তাকাইয়া কহিলেন, ইংরে পাহাড়, টেবিলটাকে এত নোংরা
করে রাখিস কেন, বল ত? সকালে গোপাল এসে সব
পরিষ্কার করে' শুষ্কিবে নিজে ঘাস, এরই মধ্যে এত নোংরা
করে কেন?

পাহাড় উত্তর দিল না, টেবিলের উপর বই খাতা পেলিল,
বীণা, কখাণ, ছত্রার বাক, অংক জলপানের মোড়া প্রকৃতি
বিশিয়া, এ উল্লার গারে পড়িয়া যে বিষয় ভিড়
ভয়ইয়া কেলিয়াছে, সেটিকে তাকাইয়া শুধু হাসিতে
লাগিল। উদ্যানের এতোকটিরই উপরে তাহার যে প্রাণ
হেঁহ এবং কোনটিকেই যে সে কাঁছছাড়া করিতে পারে না,
মা তাহা কি করিয়া বুঝিবেন?

মা কহিলেন, গুরুকম করে' বসেছিলি কেন, ঘুম
গেয়েছে!

—গেয়েছিলি মা, এখন আর নেই।

—ওগুলো কি সব কপোতের বই?

—হ্যাঁ, যা কলেক্টর পড়ান নই সব।

যা হাসিয়া কহিলেন, পড়ান বটে মনে আসলেই বুঝি বুঝ পেরে যায়? ইহারে পাত্র, তোমার পরীক্ষার ত আর তেরী নেই, বেশি ভাল ক'রে পড়ছিস ত?

পাত্র চুপ করিয়া বহির পাতা উন্টাইতে লাগিল। যা খানিকক্ষণ একমুঠে তারার পানে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন, এবারে পূর্ণ ভাল পান করা, চাই বাবা, ফাই হওয়া চাই, বুঝলে?

পাত্র হাসিল।

—তোরা নাকি কিসের একটা ক্লাব করছিস, তাতে মিটিং হয়, তোরা বক্তৃতা করিস, সভা নাকি রে, ও সব কি ভাল? পড়ার সময়, এখন ওসব কেন বাবা?

—হ্যাঁ মা। কিন্তু মা, তাতে তোমার ভয়ের কিছু নেই, আমাদের একজন মিশনারী প্রফেসরই সেটা খুলেছিলেন, সেই সেবারে প্রাচীন উত্তর বঙ্গ বন্দন ভেসে গেল, তখন,—ছেলেদের নিয়ে তখন তিনি কাজে বেরিয়েছিলেন—তখনেছি, আমরা ত তখন আসিনি, কিন্তু সবাই বলেছে মা, কি ব্যর্থভাগ করে তিনি তখন কাজ করেছিলেন। তারপরও এটা বেধে দিয়েছেন, তিনি বলেন,—তুমি ছিছির উপকার ত পত্রও করে, তোমরা তার চেয়ে উন্নত হও, তোমরা পরের সেবা কর, পরের ভাল করতে দেখ,—কি বন্ধন তিনি বক্তৃতা বেন মা, আমাদের ইচ্ছে হয় তোমাকে নিয়ে গিয়ে একদিন শোনাট। তিনি বিদেশী হয়ে এই পরের দেশের ছাত্র বড় বুঝেছেন, আমরা তা বুঝতে পারি না মা।

যা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, এখন কি হয় সেই ক্লাবে?

—এখন শুধু ব্যাংক মটনে দিতে পারবে না, গরীব জমী, তাদেরই পড়ানো হয় মা, ছেলেরা দিনে ত সময় পাখ না, নিজের পড়াশুনা আছে, তাই সন্ধ্যায় গিয়ে পড়ান, আমাদের কলেজেই শুল বুঝে।

—সন্ধ্যার পর যে তুই বেরিয়ে যান মাকে মাঝে, পড়াতেই যান বুঝি?

—হ্যাঁ মা। যাদের শেষে একদিন করে আমাদের সেট মিশনারী প্রফেসরটিও আসেন, তিনি সব দেখে তবে গান, এই ত কিছুদিন হ'ল শুলের প্রাইম হয়ে গেল, কত বড় বড়

লোকেরা এসেছিলেন, গভর্নমেন্ট যেন একটা রপোর বাট পারিবে মিনেন, সব চেয়ে ভাল ছেলের মত, তুমি কেন তবে তব পাছ মা? আমাদের এতাই ত কোন কিছু ব্যাংক কাম করে না।

যা শুনিয়া হস্তির নিঃশ্বাস কেণিলেন। অমর মল্লিক বসিয়া তাঁহারই সম্পর্কিত একটি ছেলের কাছে ক্লাব এবং ক্লাবে পাত্র ব্যতীত শুনিয়া আত দুই দিন খরিয়া মনটা তাঁহার আত্মতা ও বিবাহে ভাগ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল, পাত্রকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রসঙ্গ এ পর্যন্ত তিনি করিতে পারেন নাই,—এং আর বিছানা এবং কলের ছল করিয়া এখনো আগের কারণ তাঁহার ইচ্ছাই।

কোটা চটতে পান এবং তখনা যুগে যিয়া মা কহিলেন, সে ত ভালই পাত্র, পরের উপকার করা ত ভাল কথাই, কিন্তু তার ভয়ে নিজের পড়ার কতি ক'র না বাবা, তুমি যাদের পড়াছ তাহের উন্নতি দেখলে মন তোমার খুলি হয়, তোমার গায়া পড়াছেন তোমার ভাল দেখলে তাঁদেরও ত কত আনন্দ হয়। পরীক্ষার সময় এ তোমার, নিজের পড়ার দিকে তোমার আগে দৃষ্টি রেখা উচিত। তোমার এবারে ফাই হওয়া চাই পাত্র, বুঝলে? তোমার কাকাদানু আমরা বিভ্রান্ত কয়েন, পাত্র কি বন্ধন পড়ছে, আমি বর্ণি বর্ণি ভাল, পাত্র এবারে ভাল পান করবে, আমরা তুমি বুঝা দিয়ে না পাত্র।

মনির যুগে পাত্র চুপ করিয়া বসিয়া বহিল।

বড়ির দিকে তাকাইয়া মা কহিলেন, মাত অনেক হ'ল, আন পড়তে হবে না বাবা, আমরা নিবিরে এবারে তবে পড়।

বাহির চটতে বাজি বন্ধ করিয়া মা ধোবে ধোয়ে বাহির হইয়া গেলেন। ব্যাংক গার আদিয়া দেখিলেন, প্রতিদিনকার মত বন্ধানিয়মে পিতা ও কক্স পরস্পরের হানে এবং কর্ম্মে অতিবাহিত হইয়া আছেন। পিতা নিমিত্ত, কক্সার হাতেও হুগট এখন আর ঠিক বাজিতেছে না বটে, কিন্তু এসবের ছড়িতে ছাটটি সাদিগা চুপ করিয়া সে বাহিরের নোংরা অন্ধকারের দানে ব্রিহ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে, যে বাহিরেই সে এখনই বাতাইয়া পেশ করিল, বাহিরের গাছপালা এবং অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে এখনো তার যে রেশটি ভাগিগা আছে, তাহাইই হয়ে সে তাহার বোন অমরমল্লিকের বাহিয়া পইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

আরও খানিকক্ষণ কাটিল। গেল, পিতার ঘরোয়াখানি, মাঝের বিছানাখানি একটু বেগিয়া দিয়া, একটু এখানে ওখানে টিক করিয়া দিয়া, মীরা তাহার শরনকে চলিয়া গেল : সন্ধ্যার পর বসিও চাকরই এইগুলি টিক করিয়া দাখ, তথ্যাপ নিভের শরনের আগে আর একবার করিয়া, এইগুলি দেখিয়া যাওয়া মীরার বহুদিনের অভ্যাস।

মীরার কুত্র কক্ষখানিতে খাটের উপর নয়া পাতা, নীচে খেতের শুইয়া অকাতরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন মঙ্গলাদিদি। এই মঙ্গলাদিদিটি মীরার মাতৃশালসেব বহু পুরাতন বৃদ্ধা দাসী। বছর দিন চার আগে মীরার মা পিত্রাশয়ে গেলে, এই বৃদ্ধা দাসীটি প্রসন্নাসনের ক্ষুদ্র ভাষার সঙ্গে কলিকাতার চলিয়া আসিয়াছিল, মীরার মা এবং মাঝা মাঝীরা এই বৃদ্ধাকে পিসী বলিয়া ডাকিতেন। মঙ্গলা অতি বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতের গৃহে আসিয়া এই গৃহেই সারাজীবন কাটাইয়া এখন বয়স এবং অল্পবয়সী দিগা গৃহের বড় এবং কস্তার উপর কষ্টের চাপাটয়া চলিত, গৃহের প্রতি মাঝুর এবং প্রত্যেকটি ভ্রমের ক্ষুদ্র ভাষার এত বেশি ভাবনা ছিল যে, বয়স এবং কস্তার তাহার এই কষ্টের মানিয়া সম্বোধ করিয়াই চলিত। মীরার মাঝের আসনে এই বাড়ীর দামদাসীরাও তাহাকে সম্বোধ করিয়া চলিত, মঙ্গলাও কোন রূপে মতাব কিছুই ছিল না। শায়েয়াসেব মস্ত প্রাণের প্রত্যেক একবার কথিত প্রসঙ্গান করিয়া আসিয়া মাঝারিন সে বেশ চম্পিতই কাটাইয়া দিত।

মীরার ঘরে আসিয়া টেবিলের উপরে বসিও দিগা খানিকক্ষণ মাড়োচাড়া করিল, তাহার পর সব একপাশে সরাইয়া রাখিয়া জানালার পাশে দিগা চুপ করিয়া বাহিরের পানে প্রত্যেকটা দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়টার ঘরে বাহিরে—যখন কোথাও আর প্রবেশ চেষ্টার লেশমাত্রও নাই, তখন মীরার এই ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সুখোন্মুখী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে ভারী ভাল লাগে।

বাহিরে কুহুরে চাঁৎকারে সহসা যখন তাহার ধ্যান ভাঙিয়া গেল, তখন কিরিতা দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর নিত্যকই কর্কশভাবে মাদিকাগর্জনরতা নিদ্রিতা বৃদ্ধার পানে প্রত্যেকটা সহসা তাহার কেমন হাসি পাইয়া গেল। সুবাইসে মাতল যে এখন ভাবে জানহারা হইয়া এমন অদ্ভুত হইয়া বাব,

তাহার ভাষা জানা ছিল না। দ্ব্যত তাহারও এককালে এই রকম অবস্থা হইবে ভাবিয়া মীরার ভারী কৌতুক বোধ হইল, একটু মজা করিবার উদ্দেশ্যেই বৃদ্ধার পাশে বসিয়া তাহার কাবের কাছে সুখ শইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে ডাকিতে লাগিল,—দিদি, দিদি শ্রীদেবির গুঠ—সর্বনাশ, সর্বনাশ হয়ে গেল।

বৃদ্ধা চমকিয়া আশিয়া উঠিয়া ব্যস্তভাবে কহিল, কি দিদি, কি হয়েছে?

চোর হয়েছে যে, চোর চোর, সর্বনাশ, সব নিয়ে গেল আত।

—মা: চোর...কোথায় কি নিয়ে গেল?

—সব নিল...সব, দিদি তোমার কান কই? কান?

সত্য হইয়া হতবুদ্ধি বৃদ্ধা কাণে হাত দিতেই বিল বিল করিয়া হাসিয়া মীরা সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘুমের ঘোরে এবং সহসা ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বৃদ্ধা কেবল তাহার খোশাটে চোখ দুটোতে মীরার পানে অন্ধক নিশ্চয়ের সহিত ডাকিয়া কাণের কাছে হাতটি রাখিয়াই বসিয়া রহিল। মীরার উজ্জ্বলিত হাসির শেষে পাশের ঘর হইতে মা আসিয়া খোশা জানালার পাশে দাঁড়াইয়া কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেই, বৃদ্ধা ব্যাপারটা বুঝিয়া রাখিয়া উঠিল। মা হাসি চাপিয়া মীরাকে তিরস্কার করিলেন, মীরা উঠিয়া বসিল কিন্তু হাসি থামাইতে পারিল না, মার পানে চাহিয়া কহিল, 'দিদি কাণে চাত দিয়ে কাণ আছে কি না বুঝছে না। দিদি, আছে নাকি তোমার কাণ, দেখ দেখ, ভাল করে দেখ।

কস্তার হাসির স্রোতকে মা কোনদিনই থামাইতে পারেন নাই, আঙুল আর সেই বার্ষ চোঁটা না করিয়া কিরিতাই চলিলেন ও পাশের ঘর খোলায় নথ হইল। পাহা ঘরে দাঁড়াইয়া কহিল, কি হয়েছে না, কিসের এত গোলমাল?

মা হাসিয়া কহিলেন, কিছু না বাবা পাশের ঘর শুটো হামুদে তখন থেকে, তা হামুদে গিয়ে একলা একলা বসকণ পারে। তুমি আর এস না বাবা এখানে, ঘরে যাও, শুতে পড় যে।

পাহা ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া আবার ঘাব বদ্ধ করিল, কিন্তু কাণে তাহার শুধু রাখিয়া আসিতে লাগিল মীরার বিল বিল হাসির শব্দ।

[ক্রমশঃ]

ସୂକ-ବାଧିରମିତ୍ତେର ଶିକ୍ଷା

[६]

अन्त-संज्ञा

[illegible]

বর-কর মর্দনকর নবী কোমলাহি থাকে। সমতরলি অধিঃ বিকঃ
 আনন্দঃ বিদ্যঃ কলিঃ কলিবারঃ প্রত্যক্ষঃ নাই। মর্দনঃ প্রত্যক্ষঃ অধিঃ
 নাই নাই। এ-এই নবীর নবীত্বঃ প্রত্যক্ষঃ নাই। ইহাঃ
 প্রত্যক্ষঃ মর্দনঃ প্রত্যক্ষঃ নাই। আনন্দঃ কলিঃ মর্দনঃ কলিঃ প্রত্যক্ষঃ
 কলিঃ প্রত্যক্ষঃ। উক্তঃ মর্দনঃ কলিঃ প্রত্যক্ষঃ নাই। ইহাঃ প্রত্যক্ষঃ
 প্রত্যক্ষঃ 'মোক্ষঃ' প্রত্যক্ষঃ। প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ
 ইহাঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ। বর-করঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ
 কোমলাহি থাকে, তাহাঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ। প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ
 নাই। এ-এই কোমলাহি থাকে। বর-করঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ
 বর-করঃ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যক্ষঃ।

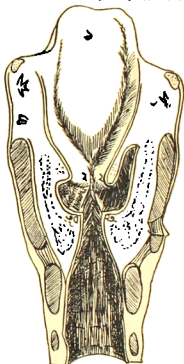
ଓମର ହୁଇଟ ଡିମର ଘଣ୍ଟାଘୋର ବା-ବନ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତଜ୍ଞାନ ମତୀବା କରଣ
 ସେବା ସାଧ ସେ, ହୁଇଟିର ଡାସେ ବିତକ । କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସିଂହାସ
 କରେ । ଓମରର ପର୍ଯ୍ୟ ହୁଇଟିକେ ବୁଝିବ ବା-ବନ୍ଦର କଳ ଏବଂ ଚାନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟ
 ହୁଇଟି ଆମେ ବା-ବନ୍ଦର । ଓମରର ପର୍ଯ୍ୟ ହୁଇଟି ସାଗର ବା-ବନ୍ଦର ହେବା
 ବଦଳ ହେଉଥିବାର ସେହିତ ବା-ବନ୍ଦର ବଦଳ, ଏହି କ୍ରମେ ହୁଇଟିକେ ବୁଝିବ
 ବା-ବନ୍ଦର କଳା ହେବ ।

ধর-ভর যে নগর পৌরী আশ্র, ভাংহরর মাগাং কোকোখিচিগি।
 অসান-লে হোয়া, বত-তরীয়াং টান পত-এব: উয়াংর মগহিত ককলন
 লুচিও হু। অঁহাংরী বাসু এই পাশে বাহির হইখুং লনন তরীয়াংক
 মাগাও কং: এব: কের উংগাংন হু। বত-তরীয়াং বত কেই টান পত-
 তত কং: অস উক হু। কের অস বত উক হু, লগর বা-বহিও তত
 উপরর বিক উ। একই লক কহিলেই ইহা বেহিও পাওয়া যায়।
 পাও কলন পু উক অসে আন কলন, তখন ঠোয়াং 'শোয়াং' আভাং
 উপরর বিক ঠেগিয়া উ। অঁহি কোংও ইহা লেং বেগা যায়। কলা
 অঁগাংর দং: একই বহু কহিলেই অগুতং কং: যায়, অসেও উকহাও

—শ্রীমৎ স্বর্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ਅੰਤਿਮ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ । ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਅੰਤਿਮ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ । ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਅੰਤਿਮ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਠੇ । ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

କେମି ସାଫଲ୍ୟ ସିନିଦାର ସମୟ ସହ-ସହ ନିର୍ମାଣ ସହ ସାଧନା ହେବାର
 ନିମ୍ନ ସାଫଲ୍ୟ ସାଧନା କେବଳ ଏହି ସାଫଲ୍ୟ କିମ୍ବା ସହ ସାଧନା
 ସହ ସାଧନା ହେବାର ନିମ୍ନ ସାଫଲ୍ୟ ସାଧନା ହେବାର ନିମ୍ନ ସାଫଲ୍ୟ



(कलिकाः। सू-रविः निशादयः ५३३ विनां उक्तान् प्रयोगाणां
करीष्यते ।)

(୧) ଅଧ୍ୟାୟିକା; (୨) ଶ୍ରୀମତୀ ସା. ଶର୍ମା; (୩) ସା. ଶର୍ମା ।

ବିନିବାର ନକ, ଏକ୍ସିଜେଣ୍ଡ ହୁଏଟି ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମା ସାଧ୍ୟ ଏବଂ
 ଏକ୍ସିଜେଣ୍ଡର ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମା ସାଧ୍ୟ ଏବଂ
 ସେ ।

ସାଧୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଏହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଠ୍ୟ ଦିଆ ଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାଦି । ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏକ
କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି । ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ । ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି । କିନ୍ତୁ

ସାଧୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସାଗର ଛିନ୍ନର ବିଶାଳ ସୁଦ-ଘଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା କିରାଣି,
ସହ, ଓହ୍ଲାର ଓହ୍ଲାର ନନ୍ଦ ଯଦି କଳ୍ପ ହୁଏ । ଶ୍ରୀମତୀ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ
ଓପିନିଟ ମାଣି, ତଥାପି ହିନ୍ଦୁ ବାହାରେ ସାମାନ୍ୟ କର୍ମର ସ୍ଥଳ ଡିଜାଇନ । ସାଧୁ ବାହାରେ
ଆଗିଆଗି ନବ ଯଦି ସହ-ଘଟ କରନ୍ତୁ ଓହ୍ଲାର କିରାଣି ସୁଦ-ଘଟର କିରାଣି
ସୁଦ-ଘଟ ନାମାଘାଟ ହୁଏ, ତଥାପି ଯେ ଓହ୍ଲାର କିରାଣି ସାମାନ୍ୟ ଓପିନିଟ ମାଣି, ତଥାପି
ହିନ୍ଦୁ ବାହାରେ ସାମାନ୍ୟ କର୍ମର ସ୍ଥଳ ଡିଜାଇନ । ସହ ନାମାଘାଟ ନବ ବାହାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା,
ସାମାନ୍ୟ କର୍ମର ଡିଜାଇନ ଓପିନିଟ ମାଣି । 'ଫ' ଡିଜାଇନ କିରାଣିର ନବ ସୁଦ-
ଘଟର ଓହ୍ଲାର, 'ଫ' ଡିଜାଇନ କିରାଣିର ନବ କିରାଣି ଓ ଓହ୍ଲାର ନବସାମାନ୍ୟ, 'ଫ'
ଡିଜାଇନ କିରାଣିର ନବ କିରାଣି ଓ ଓହ୍ଲାର, ଏବଂ 'ଫ' ଡିଜାଇନ କିରାଣିର
ନବ କିରାଣିର ନବସାମାନ୍ୟ ଓ ଓହ୍ଲାର ଓହ୍ଲାର ସାମାନ୍ୟ ଓପିନିଟ ମାଣି ।

• **वार्कर्स।** विद्यार्थी या सहित। विशेषतः मध्य-महानगर। कौन का

ଧ୍ୟାନ ଗ୍ରାମେ ହେଲା । ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତାର ଦିବସ ହେଲା । ସୁଧ-ସମ୍ବେଦନା
ଆକାଶରେ ଉଠିଲା । ସୁଧ-ସମ୍ବେଦନା ହେଲା ଏହି ଶବ୍ଦରେ କହେ ହିତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା
କଥାରେ । ଉଦାହରଣ ସହ 'ଓ' ଓ 'ଶ' ଶବ୍ଦରେ ଧ୍ୟାନ । 'ଓ' ଉଦାହରଣ କହି-
ଲା । ନୟା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାରେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ଉଠିଲା ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା
ଧ୍ୟାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏହି ଧ୍ୟାନ ହେଲା । 'ଶ' ଉଦାହରଣ କଥାରେ ନୟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା
ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ୟାରେ ଉଠିଲା ହେଲା ହେଲା । ସମସ୍ୟା ଓ ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା
ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ୟାରେ ଉଠିଲା ହେଲା ହେଲା । ସମସ୍ୟା ଓ ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା
ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ୟାରେ ଉଠିଲା ହେଲା ହେଲା । ସମସ୍ୟା ଓ ଧ୍ୟାନ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା

[illegible]

উন্নয়নশীল

— **ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ** —

এ নহে ধ্বংস-মুখ বিহবহরিত দারপদ্যাদ
 স্রাবপ্রিতিরিশে নৃপ বেদনা বাখানো পূরণ রাস !
 অম্ব পদমাম্ব নৌহারিকাম্পন বৈবে ওড়ি তরা সব,
 মন্থ মন্থা তুও খামে না, তুণিতয়েছে কেঁকাবন ।
 ওয়া হো বৃহে না বেবে জমেছে—নহে ভ্রাবের মেঘ,
 মহাসিদ্ধর হবের আগার উদগন্ধি বেগ !

ওরাতো কুৰে না যে মেঘ জন্মেছে রক্ত অহরিত নাচে,
 আঁগুন বদলে নবীচির বেগুলা কুন্তবধের বাজে ।
 হর হর সব পগনে পঞ্চমে গুনিয়া শব্দ। পাই,
 আঁপনার হাতে রচিত কুন্ত হরর বাণে বৃষ্টি ছাই ।
 বিপুল কথা এসেছে এবার মেঘের মধ্য চাকি,
 বিমলী চমকে কলিত ধরা, নীচ-হারা বনপখী ।

বিধি বিধি আগে অনানে অনানে শত শত নর-চিত্র,
 পীড়িত দুবন ভয়কণ্ঠে কখন মন্ত্রশিখা ।
 বিলাস-প্রাঙ্গণ, নরকুটীর কোর্সি-সৌধে বস,
 দ্বন্দ্ব ভিমিরে কাগের হিশুলে নিবিবেই হবে হত ।
 তীর্থ-পথিক দুই হ'তে আসি ঘন্টির বাহি পাশ,
 তীর্থ-শিখার বিরাট সমাধি—তারি পানে বৃথা চার ।

স্বাভাৱ-বদল হঠাৎকৈ নিম্নলিখিত নক্সাৰে পৰিণত,
 হাবানি উপৰে পৰাফলম আৰু বহিৰে পৰাফলম !
 প্ৰত্যেকৰে মাজে পৰাফলম-পৰা, নিৰাশা আশাৰে নিৰা,
 পৰিণত-জিহ্বা বাহু-কো-ফলম হ'ল পৰাফলম-ফলম !
 ফলম পৰাফলম হঠাৎকৈ পৰাফলম পৰাফলম
 নিৰাশা ফলম পৰাফলম পৰাফলম ফলম পৰাফলম !

জ্ঞানের প্রাণে তখন বিজ্ঞান মানব শক্তিদায়,
 বিধাতার মাঝে কপি অভিমান কাণিরেহে পর পর ।
 নুকে নাই সেতো এক লজ্জার ছায়েশায়ে বাবে সব
 হ্রিদয়-গর্ভ পরদপুষ্ট করিলে শময়ব !
 মানব এনেছে হৃৎকের স্বপ্নের জুড়ের অস্ত্র-শিখা
 দুহিত-সেয়েছে আপনার বলে নির্মম বিধিনিধা ।

সেখী তো মানব ?—ঈশ্বর-প্রোহি কহে তাই মহাকাল
 নবপত্নী বকে এবার নব তপ্ত কতাপ ।
 এই যে ধূপের ঘণ্ডাঘণ্ডা দেবতার নাম জুগি,
 ইহা কি কারণে অকারণ মরে নিরীহ পলায়-জুগি ।
 বৈদিক ধ্বংসস্ত্রী কিরিয়া আদিয়ে প্রলম্বগণে,
 স্বত্রিবাচন করিবে স্ত্রী মহামানবের তরে ।

[১]

শেষ অগ্রহায়ণের অন্ত্যাহ্নিক। নব্যাচের পর হঠাৎই বৌদ্ধের তেজ স্তম্ভ হ্রাস পাইয়া ভ্রামবীরের আলোকময় বিচরণ করিতেছে। বাজনে ধৈর্য পূর্ণ অস্থিত হস্ত। অধিকার ভ্রামবীরের নবায়ন প্রাপ্ত লইয়াছে। খাটের পার্শ্বে একখানা ছোট টি-টেবলের উপর কাচের গ্লাসে জল—তাহাতে বরফ দেওয়া হইয়াছিল, তাই গ্লাসের পার্শ্ব বহিরা সঞ্চিত বাষ্প জলগরুর নামিয়া আসিতেছে, একটা ছোট শিকিতে এদমপিরিন উত্তরের চাকুটী ও একখানা তেগালে। তাম্র পর একখানা টুলের উপর একটা চিলিমটি ও নিম্নে একটা শিরসের ভাগে জল। উপরে বৈজ্ঞানিক পাখা স্তম্ভে ঘুরিতেছে। অধিকার চক্ষু মুগ্ধিত করিয়া ছিল—এক বার তাহা দেখিল, ঘড়ীতে সাত্বে তিনটা বাজিয়াছে।

অর আন কেহ ছিল না। কেবল দোস্তী কথা এক এক বার আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাউতেছিল। পাঁচ বৎসরের এই নার্তিমোটি প্রথাক্রমে একবার পূর্ব প্রান্তের প্রথম স্তম্ভ—প্রান্ত বড় অধিকারের। গোধ দেখিয়া অধিকার গৃহে দ্বিগুণিত অধিকার ডাকে—“বাচ!” সেট বো কথা তাহাকে অধিকার করিয়া বসে, আর অধিকার বাতির না চংগা পথায় তাহাকে ছাড়ে না। দেখিলে সে নিজের ব্যতিক্রম হয়, সেদিন ওপর মনে যেন অধিকার না। অধো অধো যে সে নিজের ব্যতিক্রম হয়, সে অধিকারের শিরঃশিঙার কষ্ট। এই শিরঃশিঙা অধিকার তাহার শিরঃশিঙার নিকট হইতে উত্তম-বিবাহের হস্ত ও লক্ষ্যবিন্দু টাকার সঙ্গে পাইয়াছিল। অধিকারের অধিকারের বেধে এই শিঙার অধিকার সর্বদাই অধিকার ও অধিকারিত তাহে অধিকারিত করিত। বৌদ্ধে ইহা তাহাকে “পাইয়া বসিয়াছিল”—এখন গোষ্ঠাবস্থায়ও তাহা করে নাই—বনন তখন অধিকারিত হয়। আজ একটা বড় রক্তের অধিকারের দিল কাচের লবণ একটু অস্থির বোধ করিলেও সে বিপ্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। অধিকার বাবলা অনেক সময় অস্থিরকে বস্ত পদ্যবিন করে, তও আর

কিন্তুতেই নহে। কষ্টবাহু থাকিলে ভ্রামবীর গোপন, উকিল মস্তকের, সম্প্রদায় সংবাদপত্রের কাব হাতে লইলে আর আশনার স্থান অস্থিবিধা বিবেচনা করিতে পারেন না। বৌদ্ধের বাড়ীতে বাটয়া অধিকার দেখে, তাহার সঙ্গে যে বিশেষত “অর করিবেন” কথা ছিল, তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আসিতে পারিবেন না। স্তম্ভায় তাহাকেই এক জন সহকারী লইয়া “অর করিবেন” হইয়াছে। সেই কাচের স্তম্ভ অধিকার অস্থিরতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং সে অধিকার মাথাওয়া লইয়া পুর্বে দ্বিগুণিত। একর অধিকার বাটা হয়, তাহাই হইয়াছে—সে প্রবল বিবাহিত ভোপ করিয়াছে—কিন্তু অধিকার করে নাই। শেষে কয় বার চৌর পরে এক বার বসি করিয়া ও পরম জলে “হুটবাথ” লইয়া সে চূর্ণ করিয়া তাইয়া আছে; নার্তিমোটি লইয়াও একটু আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই। এখন সে ঘড়ী দেখিল—বেলা পাঁচটার তাহাকে আর একটি রোগী দেখিতে যাউতে হইবে।

কনাকে দেখিয়া অধিকার জিজ্ঞাসা করিল, “বাচ, তোমার দিনা কোথায়?”

কথা বলিল, “নামনে বারান্দার; দেখ বিবাহের সঙ্গে কথা কইছেন।” দেখিয়া অধিকারের শরী কল্পনাময়ী দেখিলি।

“তাঁটি কোথায়?”

“বিবাহের কাছে।”

বারান্দার কল্পনাময়ী দেখিলি অধিকার মতো নার্তিমোটি-ঠাকুর-সংবাদ ভবিষ্যৎ পাইলেন। তিনি তদ্বিনীতক বসিলেন, “তোমার কথা জিজ্ঞাস্য করছে—বা।”

কল্পনাময়ী বসের তুলনার নদিক “প্রবীণা” হইয়াছিল। সে চণ্ডা লালপাড় “অপকই” পরিচ, ভাষা বসি কল্পনো সংবাদ করিত তখন সে সাধা কাগড়ের, স্বামীর দেখিলে তাহা গায় তাহা করিয়াছিল। সে বলিল, “কেন?”

“অস্থির করছে। জুই বা। আমি বৌয়ের চূর্ণ দেখে যেন।”

“কেন বল, যেভাবে !” উচ্ছ্বাস, আমি কাছে এসে পাকি ।
আমি কি এখনও ক’লে খোঁটা আছি ? লজ্জা করে না ?”

“তাই বলে” অগ্রহে সেবা করবি নি ?”

“এ অগ্রহ ত চাব কালই আছে—সেবার ঠর কি ক’লে,
যেভাবে ?”

“তোকে ত আর কেউ ডাক্তারী করতে না—সেবা
করবার কথা করবি নি ?”

কল্পাময়ী কি বলিল, সুধাকর তব্বিতে পঠিল না ;
কারণ, সেই সময় কণার ভাইটি একটা কি ভিনিশ চাহিল—
“নাও, না !” কল্পাময়ী বলিল, “দিক্‌, নাহা, দিক্‌ ।”

আম্বলের ভগ্নার মাংসেব মধ্যে বহি গোলাপ ফুলের কাটা
বিধিগা থাকে তবে শাখার স্পর্শও বেমন পড়, করিয়া উঠে,
কল্পাময়ীর কথা সুধাকরের নুকের মধ্যে তেমনই বেমন পড়,
করিয়া উঠিল—বার্ণ আবার কাটা তথায় প্রতিই হইয়াই
ছিল । আজ পঞ্চাশ বৎসরের কুলে দাড়াইয়া তাহার যৌবনেব
কথা মনে পড়িল । তখন তাহার শিরঃশিউড়ার আক্রমণ হইলে
সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হইত—কল্পাময়ী । তখন কল্পা-
ময়ীর ব্যবহারে মনে হইত—কেমন করিয়া সে বামোয় দাবল
হুলায় উপনয় করিয়া দিবে, সে কেবল তাহাই ভাবিত, তে,
তাঁহাবই উপায় লভান করিত। সে সময় এক এক দিন
দাবল হুলা ভোগের পর খুয়াটখা পড়িলে নিদ্রাতন্বে সে
সেবিয়াছে, কল্পাময়ী তাহার পয়াপার্শ্বে বসিয়া আছে ।
আর আর ? আর এাথ জিন বৎসর পরে কল্পাময়ী
তাহার যোগ-বহুবার বিরক্তি অহুতব করিত।—বলিত, “
এ অগ্রহ ত চাব কালই আছে”—ইহার ভক্ত আবার
ব্যাকুলতা কেন—তত্ত্ববার প্রোত্তরন কি ? তাহার মনে
পড়িল :—

“অস্বস্তি, বহুবার কি মাঝে তোমার ;
উত্তর কোণ কোণ, মনুতি, আর ?”

কিছু—কিছু কেন এমন হয় ? ভালবাসা—প্রেম বহি
এক বার উৎসাহ হয়, তবে কি তাহার বিপর্যয় বা বিকৃতি সম্ভব ?
তাহার ত তাহা মনে হয় না । তবে ? তবে যাহা কর্ণনেবও
বস্তুতঃ, তাহার ত সঠিক থাকে, বা ঘটতে পারে । জীবনে
যে মনোনাশের এমন পরিবর্তন হয়, তাহা সে বুঝিতে পারে
না, আলনি অহুতব করিতেও পারে না । কিছু কল্পাময়ীতে

সে সেই পরিবর্তিত প্রত্যক্ষ করিতেছে ; প্রত্যক্ষ করিতেছে,
আর তাহার নুকের মধ্যে কেবল বাতনা পুত্রীভূত হইয়া
উঠিতেছে, তাহাকে বাধিত কবিত। জিন বৎসরে
মাংসের এত পরিবর্তন হয়—তোমার লক্ষ্য এত পরিবর্তিত
হয়—সুখভোগের মাংস এত ভিন্ন রূপ দাবল করে ! আজ
সে মনোরে থাকিগাও এত দূর বাইয়া পড়িয়াছে ! অগত
সে আশ্রয় মনে কোনরূপ দৃষ্টি অহুতব করিতে পারিতেছে
না !

আজ কল্পাময়ীর কাছে বামী আর কেউই নহে—আর
সংসার—পূর্বপৌরাণিক চিন্তা ও ননোযোগেব কেন্দ্র ।
ভাবিয়া সুধাকর আশ্রয় মনে আলনি হাসিল সে কি
পেয়ে তাহার “দাড়াইয়া” ইচ্ছাও মূর্তিতে দেখিবে ? সে আবার
ঘড়ীর দিকে চাহিল—চাটটা বাজিয়া গিয়াছে । সে ডাকিল,
“দাড়া !”

কথা, যোগ চব, দাড়র ডাক শুনিয়াব ভক্ত উৎকর্ষ হইয়াই
ছিল—সে আসিয়া সুধাকরের পয়াপার্শ্বে দাড়াইল ।

সুধাকর বলিল, “আজ আশ্রয় গল্প হল না ।”

কথা বলিল, “না, দাড়া, তোমার যে অগ্রহ কবেছে ।”

সুধাকর আশ্রয় করিয়া তাহার কপোলে কবচল পূর্ণ
কবিল : বলিল, “দাড়া এক বার দীক্ষক ডাক ত ।”

কথা চলিয়া যেল এবং অল্পক্ষণ পরেই তৃত্য দীননাথ
আসিয়া দর্শন বলিল । সুধাকর তাহাকে বলিল, “দাড়ী
বাব করতে বল ।” হুঃচলিয়া গেল ।

সুধাকর উঠিয়া বলিল—তখনও মাংস বহুগা । শিশি
হইতে উঠিয়া আদ্যুপকিনেব চাকতী লইয়া দাব কেলিয়া দিল
ও পরে ভল লইয়া পলিয়া ফেলিল । বেণ পরিবর্তন করিতে
তাঁহার ইচ্ছা হইল না । হুঃচলিয়া পড়ায়ী কামা
পরিয়া—দুইটা পাখ বিয়া ভুবেব পাখের কাপড়খানা লইয়া সে
বাছির হইল । দীননাথ তাহার পশ্চাতে চলিল ।

সুধাকর কণার কাছেই শুনিয়াছিল, কল্পাময়ীর দেও-
নিদি আনিয়াছেন ; প্রাসন্ন পর সে বহু হইতে তাঁহার কথাও
শুনিয়াছিল—বাছির হইয়া তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া নবভার
করিল । তিনি অভ্যাসেব চিন্তায়া করিলেন, “ভাল আছে
ত ?”

কৃষ্ণপ্রভা তুমিগা হুখাকর একটু চামিল—বলিল,
“বেশতেই পাচ্ছেন।”

‘তিনি বলিলেন, “আজ মাথাটা খুব খরবেছে?”

“এ অস্থর ত চার কানই আছে”—বলিয়া কৃষ্ণাকব
কর্ণাময়ীর দিকে চাহিয়া বলিল, “আমি ব্যস্তিগত কিছু
খাব না।”

হুখাকব নামিয়া গেল।

কর্ণাময়ীর দিবি বলিলেন, “দিনে উপোস পেছে,
ব্যস্তিগত উপোস?”

কর্ণাময়ী বলিল, “বেশী মাথা ধরলে, তাই ত কয়েত
হর।”

হুখাকবের মোটর গাড়ী চলিয়া গেল— অগ্রহর পথ শুনা
গেল।

[১]

হুখাকব ব্যস্তিগত হটগা হাটবার প্রায় পনের মিনিট পরে
হুখীর আফিস চেষ্টে করিয়া আসিল। সে এটী পূজীকার
উদ্যোগ হটগা এক এটীকার আফিসে অস্ট্রেলিয়ার হটগাচে।

চেষ্টের লাড়া পাটখাই কর্ণাময়ী বখুৎ বলিলেন, “খাও,
বোনা, হুখীর প্রেমকে।” বখু অর্ণপার উপর কর্ণাময়ীর
আবেগ ভিল, হুখীর বাড়ীতে কিবিলেট সে তাগাব করে
হাইবে। অর্ণপা ঘোমটাটাই একটু টানিয়া দিয়া অরে গেল।
কণা না’র সঙ্গে গেল।

চাকর তাগাব হুখার কিতা পুলিয়া দিতেছিল, এমন সময়
মা ও মেয়ে খবে চুকিলে হুখীর কণাকে জিজ্ঞাসা করিল,
“আজ কি খাব শুনলে, কণা?”

কণা গম্ভীরভাবে বলিল, “আজ গরু হর নি।”

“কেন?”

“নাওর অস্থর।”

হুখীর ততক্ষণে কোটটা পুলিয়া ফেলিয়াছে, সাট পুলিতে
পুলিতে অর্ণপার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবার
অস্থর কয়েছে?”

অর্ণপা উত্তর দিল, “হ্যাঁ। মাখার অস্থর।”

চিন্তিত ভাবে হুখীর বলিল, “শুঁত পড়ল, এখনও বন খন
মাখার অস্থর হ’তে লাগল?”

সে তাড়াহাড়ি কাপড় ছাড়িয়া কণাকে বলিল, “চল
মাঠকে বেধে আসি।”

অর্ণপা বলিল, “বাবা বেশিরে গেছেন।”

“বেস্তিরে গেছেন।”—হুখীরের হর বিশ্ববিরুদ্ধিত।

“—মাথা ধরা ছেড়ে দেছে?”

“তা’ ঠিক বগ্নেত পারি না।”

“তুমি কাছে ছিলে না?”

অর্ণপাও যে ভাবে যোগ বীকার করিয়া অর্ণপার কাণের
সম্পর্কচেষ্টা কতে, অর্ণপা সেই ভাবে বলিল, “না। বাবার
কিরেত দেবী হয়েছিল। ষোকায়ে দুখ পাড়িয়ে বা’র, এমন
সময় মের মাগীনা এসে পড়লেন— না ডাকলেন—”

তাছাড়া কণা শেন কল্পিত না মিয়া অধীরভাবে হুখীর
বলিল, “আমি তোমাকে এক শ’ বার বলেছি, তুমি কা’রও
কথা শুনে না, বাবাধ অস্থর হ’লে তাঁ’র কাছে থাকবে।”

অর্ণপা কিছু বলিবার পূর্বেই হুখীর পিতার অরুর দিকে
চলিল। বাবারাধ কর্ণাময়ী তখনও তাহার বেধ দিহির
সঙ্গে নানা কণার বাস্ত ছিল। হুখীর তপার বাইয়া একটু
উচ্চ কর্ত্তে বলিল, “বাবার অস্থর—তু’ তিনি বেললেন।”

পুস্ত্রের কষ্টকবে কর্ণাময়ী তাহার কোথ বুকিতে পারিল,
এই কোথ পে পিতামহের নিকট হইতে পাইয়াছিল।
হুখাকবও কোথপথন ছিল, কিছু বিশেষ চেষ্টার কোথ
সংঘত করিয়াছিল। হুখক হুখীর তাহা কবে নাই।
কর্ণাময়ী বলিল, “তানিল ত কি মনিজি—হ’ মত কি চূপ
করে থাকতে পারেন?”

“তিনি ত চূপ কবে থাকতে পারেন না, কিছু কেউ কি
তাঁ’কে চূপ করে থাকতে বলে? কেউ কি তাঁ’কে বেলতে
বাগন করেছিল?”

কর্ণাময়ী কিছু বলিতে পারিল না।

হুখীর তির্যকারেব ভাবে বলিল, “তাঁ’র অস্থর হ’লে,
আমি বাবী না থাকলে, কেউ তাঁ’র একটু সেবাও করে না।”

কর্ণাময়ীর মাতীল শ্রোতি বাবগার তাহার বেধ দিহির
ভাল লাগে নাই, তবুও মাতাপুস্ত্রের এই কণাকটাকাটিকে
তিনি ভগিনীকে রক্ষা করিবার কষ্টে বলিলেন, “সেবা যে
তিনি চানও না।”

স্বপ্নের উদ্ভব চক্ৰ নীলীমা'র মুখে স্থাপিত হইল। সে বলিল, “নীলীমা, সেই চক্ৰট তাঁ'র দেখা করা আরও বেশী সম্ভব। এই যে অশ্রুধা নিয়েও টাকার চক্ৰ বেরলেন—এ ত আমাদেরই কাজ।”

“তোর কি টাকার অভাব আছে?”

“নীলীমা, সেই চক্ৰট আমার বেশী কষ্ট হয়—বেশী লজ্জা হয়। তাঁ'র বাবা তাঁকে দা' বিয়ে পেয়েছেন, সে টাকা, আর তাঁ'র উপর আরও টাকা আমার ক্ষত রূপেও বাবার কৃপিত হয়েছে না। আগে বললে বলতেন, আমার কথা; এখন আমার আমার ছেলেমেয়ের চক্ৰ তাই। আমি ত দেখছি, বাবার অশ্রুধা বয়সের সঙ্গে, না কমে’ বাড়ছে। কোন দিন একটা বিশ্রাম হবে। আমার এখন মধ্যে মধ্যে বলেন, বংশে তিন পুরুষে চারটা আশ্রয়তা হয়েছে।” বলিয়াই স্বপ্নের দি'ড়ি বিধা নামিয়া গেল। অশ্রুধার নিয়ম ছিল, সে যেসব স্থানে থাকে তাহা টেবলের উপর দিনপঞ্জীতে টুকিয়া রাখিত, পরে নোটবুকে তুলিত। সে বৈকালে কোথার কোথার ঘাইবে তাহা সেবিধা স্বপ্নের উপরে আসিল এবং একখানা মোটা চামর লইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল।

কল্পাসমী পুস্তকস্থ উদ্দেশে বলিলেন, “বোনা, স্বপ্নেরের খাবার দাও।”

স্বপ্নের ঘাইতে ঘাইতে বলিল, “এখন খাবার সময় হ'বে না।”

“কেন?”

“আমি খাচ্ছি।”

“খেয়ে যা।”

“দেবী হয়ে গেলে বাবাকে খরতে পারব না।”

“কোথার খাচ্ছিল?”

“তিনি খেতে যে রোস্টার বাড়ী গা'য়েন দেখানো।”

নীলীমা ভিজাঙ্গা করিলেন, “কেন?”

“তাঁকে মাঠের হাওয়ায় একটু ব্রুিয়ে আনব, নইলে এমনট কিরে আসবেন।”—বলিতে রঞ্জিত স্বপ্নের দি'ড়ি বিধা নামিয়া গেল।

কল্পাসমী বলিলেন, “দেখ দেখি—সাতা দিন খেটে এসে মুখে হাতে জল না দিখেই বেরল! আর পানি নি বাপু।”

দিবি বলিলেন, “কিন্তু ওদের বাগছেলের ঐ যে সবুজ,

ওটি সবাবন আবার বড় দিষ্ট লাগে। বাপ যেমন ছেলে-অল্প পান, ছেলেও তেমনি বাপ-অল্প প্রাণ। অজকালকার দিনে এমন ছেলে বেগা ধার না।”

“কিন্তু দেখ—না খেয়ে গেল।”

“বেশ, কখনো। স্বপ্নেরক বাট বলি, মোহ তোব, ছেলে বা' বলেছে, তাই ঠিক। তাঁ'র উপর ঐ যে কি আশ্রয়তার কথা বললে, অনে আমার পা নিউতে উঠছে।”

যেন তিনি সেই তাৎকালিক ভাবিতছিলেন, এমনই তাবে কল্পাসমী বলিল, “আর ভাবতে পারিনি, দেখবি! জেবেই বা কি হবে—অবশেষে বাহিরে ত আর পূর্ণ নেই।”

“কিন্তু তাই বলে ত মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। আমি তখন বললাম, ‘তুই বা’।’ তা তুই দেখিলে—তমনি ত, যেমন টেটটির হাঙ্গে পাটেকেলটি বেগে গেল, বাবার সময় বলে গেল—অশ্রুধা ত চাই কালই আছে। ছেলে ত দেখছি, নিরাক হয়ে উঠেছে। এক ভাল। এমন ছেলে—আহা, খেঁচে থাক; শোবার চাই। তোর বড়নির ছেলের মত নয় যে, এক বাবুন—তা-ও লম্বাশে গোড়া।”

কল্পাসমী কতকটা অভিমানের সহরে বলিল, “আজ্ঞা, আমার কি অপরাধ। এই বুড়ো বললে আমি কি বলে ঘোড়ার মত খাবার কাছে বসে থাকব। ছেলে, ‘বো, নাভো, নাভনী, সংসার—এসব দেখব না, ঠাকুর দেবতার নাম করব না।”

বেকদিবি হাসিয়া বলিলেন, “তুই যে সেই কথা অনে করিয়ে দিলি, ‘বে বা'য়ে, সে কি চুল বাঁধে না?’ ছেলে, বো, সংসার, ঠাকুরদেবা এ সব সগাই কবে। তাই বলে খাবার অশ্রুধা দেখা করতে লজ্জা, এ ত নতুন কথা।”

“ও অশ্রুধা, ও ত আর নতুন নয়; ও'ত বাস্তব হয়েই থাকি কল?”

বেকদিবি তিরস্কারের ভাবে বলিলেন, “তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এমন কথা মুখে আনতে আছে? তিনি অল্পার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “বোনা তোমার শাস্ত্রচীর মাথা খাবার হয়েছে, তোমার শতককে বললে, আমি চিকিৎসা করতে বলে গেছি।”

এই সময় ঘরে মোটরের “ভেঁ” তম্না গেল এবং তাহার পরেই বেকদিবির মোটর-কালক নির হইতে বলিল, গাড়ী আসিয়াছে।

যেহ দিহি উট্টিলেন; বসিলেন, “জাজ আসি।”

কল্যাণদ্বীপ বসিলেন, “একুনি ঘা’বে ?”

“হাঁ। তোর ভাবাই বাহু আফিস থেকে এসেছেন, আর বেরী করতে পারব না। জুই এক দিন ঘোমতকে ছাশ ছেয়েদের নিয়ে বাস।”

হাটবার লম্বা তিনি বলিয়া গেলেন, “জাজ এসে তেল লনটা তার করে চললুম, স্থায়ী না খেয়ে গেল। কল্যা, জুই ছাশ অমন কবিল নে।”

তিনি অকপাকে বলিলেন, “জাজ আসি, না।”

অকপা তাঁহাকে প্রণাম করিল। বা’র প্রণাম কথা যেখা কপাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি কপাকে কোলে লইয়া তাহার মৃগচূষন করিয়া তাহাকে নানাইয়া লিঙ্গা পাঠীয়ে উঠিলেন।

[৩]

স্বধাকর করিয়াছিল—কবির প্রভৃতি লইয়া; সে বাসনা অবলম্বন করিয়াছিল—চিকিৎসকর। যদি ইচ্ছা অল্পটের উপহার হয়, তবে যে অদ্ভুত এই মধ্যমিক উপহার করিয়াছিল, সে তাহার পিতার অকপা খাশন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহার পিতা স্থানাপ অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাহার পিতার প্রতিষ্ঠিত পাটের ব্যবসারে অসামান্য দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তখনও বাঙ্গালার পাটের ব্যবসা বহুলাংশে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর হাতে ছিল—বাক্যালার লোক কেবল পাটের চাল করিয়া এবং পাটশতা তাল পাট কাটিয়া বোপ লক্ক করিয়া ভুড়ান পথে অগ্রসর হইত না, পরন্তু পাট বস্ত্রাদি করিয়া লাভবান হইত; “বার্জী” তখন বাঙ্গালীরা ছিল এবং বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা তাহা নাড়োঘাড়ীকে দাড়ী দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই। বরের দিন “মাত্রা” কপিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা তখন কষ মালে পাটে মোটা টাকা লাভ করিতেন।

স্বজন্য ব্যবসায়ী লোক ছিলেন—টাকা আনি পাই হিঙ্গাব করিতেন, আর মনে করিতেন—যেহ, প্রেয়, ভালবালা প্রভৃতি যে সব কোমল মনোবৃত্তি হংসার রমণীর ও জীবন বহনীর করে, ব্যবসায়ীর পক্ষে সে সব অকারণ ঘোঁসলা। তাহার বিখ্যাস ছিল, তিনি সে সব মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং

নিক ব্যবসারে তিনি তাহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করিতেন। সেটা যে কত ভাল তাহা অদ্ভুত বন্দন দাক্ষণ দাখাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল, তখন সে আর তাঁহাকে সে সুখের প্রতীকবের অবসর দেয় নাই।

তখন তাহার পুত্রস্বরের বিবাহ দিয়া তিনি প্রত্যেকের মত বস্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কোঠ লম্বাশ্রক তিনি তাহার ব্যবসায়ে লইয়াছেন। ব্যবসায়ে তিনি তাহাকে একটা অংশ দিয়াছেন এবং তাহাকে সর্বতোভাবে অঙ্গীকারের বত ব্যবহার করিত হইয়া। তাহাকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া গাইয়া শিক্তবত অন্ন পুর্বে বাস করিত হইয়া এবং পিতা তাহাকে তাহার সক্তি অর্থ হইতে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। যথাস—স্থাকর। স্থাকর বন্দন কলেক পড়ে, তখন এক দিন একখানা বাঙ্গালী মানিকপন্ন ঘটনাক্রমে পথ হারাইয়া রবিবারে স্থানান্তরে হাতে পড়ে। সেখানির পাভা উঠাইতে উঠাইতে তিনি দেখিতে পান, একট অদভির্ঘ কবিতার নিয়ে লেখকের নাম—শ্রীস্থাকর বহু। তখনই পিতার নিকট স্থাকরের ডাক পড়ে এবং পুত্র আসিলে পিতা কথিতটি সেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, “একি তুমি লিখেছ ?” পুত্র “হাঁ” বলিলে, পিতা জিজ্ঞাসা করেন, “কবিতা লিখবার কারণ কি ?” পুত্র ইহার কোন সঙ্গতত্ত বিবেচ্য পাবে নাই। মূল ফুটে কেন, পানী গাছে কেন, বাতাল লগাইত হই কেন, এ সব প্রশ্নের উত্তর হইত বিজ্ঞানের দিক হইতে যেহা বাহ, কিন্তু সাধারণ ভাবে যেহা বাহ না। কাজে পুত্র নিকন্তর থাকাই সর্বত বগিয়া বিবেচনা করে। স্থানান্তরে পুত্রের তেই পিতার নিকট মূখ তুলিয়া অধিক কথা কহিত না—বত অন্ন কপার সন্তান কপা মাথিয়া চলিয়া গাইত; তিনিও তাহা চিহ্নিত করিতেন। স্থানান্তর তখন বলেন, “ও সব ব্যক্তি কবে পড়াই কহিত হয়।” পিতার সেই কপার পুত্রকে কবিতা রচনা ত্যাগ করিত হইয়া; কারণ, পিতাকে বুঝাইয়া তাহার অতিগ্রাণবিকল্প কপা করা স্থাকর তাহার মত শিক্ষার ফলে অস্ত্রার বগিয়া বিবেচনা করিত। তাহার পর স্থাকর বন্দন পরীক্ষার উত্তর হইয়া আসিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কামি কি পড়াই ?” তখন স্থানান্তর তাহার কবিতা কপা বিবেচনা করিয়া গ্রাহ্য করেন। কবিতা রচনা যে মনোভাবের অভিব্যক্তি, তাহাকে মত করিত হইলে কোন্ ব্যবসায়ে আশ্চর্যনিয়ে

সাক্ষর, প্রাণনা অধিক, তাগা তিনি তাগিয়া রাখিয়াছেন।
ও মানবের অধিত কখনো কবিতা-কুহ্ম বিকশিত হয় না—
হিস বুঝিয়া তিনি হিস করিয়া রাখিয়াছেন—স্বথাকরকে
ভাঙার কঠিন। স্বথাকর ভাঙাশাখা তিনি উত্তর দিলেন,
“ভাঙারী।” স্বথাকর ভাঙারী পড়িতে পেল।

প্রতিভাবান যুবক—ভাঙারী পাঠ তাহার নিকট বস
অন্তীকরই কেন হউক না, কর্তব্যজ্ঞানে তাহাতে মনোনিবেশ
করিল এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষার সম্মুখীন উত্তর হইতে
লাগিল। যে দিন সে শেষ পরীক্ষার উত্তর হইল, তাহার
পূর্বেই তাহার কল বচিৎ গৃহ তাহার অত্যন্তার কল প্রেরণ
ছিল। স্বরনাথ তাহাকে বলিলেন, “তুমি নিব্বাট হয়ে
‘প্রাকটিকসের’ চেষ্টা কর।” তিনি তাহাতে পরীক্ষা তাহার
বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন এবং সে বখান ঘর তখন তাহার হাতে
যোটা টাকার একখানি “চেক” বিরা দিলেন। সর্বদা এক
সময় থাকিবার ফলে যে বন্নিষ্ঠা অকুর থাকে, গৃহ হইলে
তাহা আর সেজন্য পূর্ণ থাকে না; বস দিন যাঁহ ব্যবধান ভত
বদ্ধিত হয়। হুতবাস শমধর ও স্বথাকর দুই জনের ও তাহা-
বিশেষ সম্মানবিশেষ লিখিত স্বরনাথের ও তাহার পরীক্ষা—
হিন্দু পরিবারে একম সম্বন্ধে যে বন্নিষ্ঠা বাতাবিক—তাগা
আর চলিল না। স্বরনাথ তাহাতে ক্ষিপ্ত হইলেন না বটে,
কিন্তু তাগা তাহার পরীক্ষা শকে বিশেষ খেদনার কাবণই হইল—
তিনি কেবল উপায়াভ্যুপবিদ্যো হইয়াই তাগা সহ করিতে
লাগিলেন।

পিতামাতার নিকট ছিল—কনিষ্ঠ পুত্র জনবর। তাত্ত
জনের অগা তাহার মনোবাই, বোধ হয়, সঙ্গোপক প্রাণের ছিল।
সে কখনো কোন পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নাই—
সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছে। স্বরনাথ
অগ্র পুত্র হইবন্ধক বস্ত্র ভাবে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলে
তাগাবিশেষ মাথা টাফকে ও ইহার স্ত্রীকে লইয়াই সেই পুত্র
পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেন। এম-এ পরীক্ষার সফলোত্তর
অধিকার করিয়া সে সর্বশেষ পরীক্ষা দিল। এই পরীক্ষার
কল বখান প্রকাশিত হইল, তখন দেখা গেল, সে দ্বিতীয় স্থান
লাভ করিয়াছে। সে যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিতে পারে
ইহা সে কখন কখনও করে নাই। কারোই পরীক্ষার কল
তাহার কাছে অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আঘাতের মত অক-

হৃত হইল। সফল পূর্বে পরীক্ষার কল প্রকাশিত হইল—
পরদিন প্রাতঃ পথার প্রাতঃ পদ পাঠয়া গেল। স্বরনাথ
পাঠয়া হুথাকর চুটিয়া আসিল—আনিয়া দেখিল, অতি উগ্র
বৈশ্বদেবনকলে তাহার জীবন একম পূর্বে শেষ হইয়া গিয়াছে।

যে বৃদ্ধ চিকিৎসক সাধারণতঃ স্বরনাথের পরিবারে
চিকিৎসা করিতেন এবং পরিবারের হঠাৎ আকস্মিক, তিনি
কথা কথার বলিয়া কহিতেন, “এইচ বৎসে তিনি পূর্বে
তিনটা আশ্বস্তা।”

স্বরনাথের পরী এই শোকে বৈন কোন হইয়া গেলেন—
শোকেই আত্মপথ ঠাংকিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাকে
অধিক দিন সুস্থশোক সহ করিতে হইল না—শোকের
আঘাতে তাই মাসের মধ্যে তাহার সকল বৈশ্বদেব অবশ্য
হইল।

স্বরনাথ তখন একা। জনবরের স্ত্রীর পর শমধর ও
স্বথাকর পুত্রজন গৃহে কিরিয়া আসিত তাগিয়াছিল—তিনি
শম্মতি বৈন নাই। তিনি মনে কথিয়াছিলেন—বাংলা এক
বাগ পূর্ব থাকিত অত্যন্ত হয়, তাহা আর কখনো পূর্ণবৎ
এক সময়ে থাকিত পারে না। কিন্তু তিনি তাগিয়া দেখেন
নাই, শোকেই অধিত অনেক স্ত্রী স্ত্রী বিবর্তন, বিষয়
ত্যাগিত হইয়া যায়।

যা’র স্ত্রীর পর আর একটা ব্যাপার ঘটিল—জনবরের
বস্ত্র আর তাহার কলকে তাহার বস্ত্রালয়ে রাখিত
চাছিলেন না। তিনি বখান জিন করিলেন, স্বরনাথ তখন
আব আপত্তি করিলেন নী। গৃহ বৈন বখান হইয়া গেল।

শমধর তখন জিন করিয়া লপবিগানে পিতার কাছে
আগিল। কিন্তু স্বরনাথের মনে তখন চিন্তার বিকস্ম
আরম্ভ হইয়াছে, বৃদ্ধ চিকিৎসক সে চিন্তার ব্যাঘ্র জোহাতি
করাইয়া গিয়াছিলেন—পরিবারে তিনি পূর্বে তিনটা আশ্বস্তা
হইল! বন্ধক স্বরনাথ বৈন প্রেম ভাষণসারই বস অকাবণ
মৌল্যের পরিচায়ক—সুশংসার বলিয়া মনে করিতেন, কেবল
তাহারও কাহ, অস্ত্রের অধিকারস্বত্বক না হইলে, তাহাতে
বাধা দিবার অধিকার কাহারও নাই—এই মত ক্ষম্বে শোণ
করাই তিনি কখনো অপরের বর্ণাচরণে বাধা বৈন নাই।
কাহেই বধ হইতে কোনরূপে শান্তি ও শান্ত্যলগ্নের উপায়
তাহার ছিল না। তিনি কেবলই ভাবিতেন—একা থাকিতে

ভালানিতেব। পাটের মরতম বসন শেষ হইয়া গেল, তখন তাঁহার অবশর আরও বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে চিহ্নও বাড়িল। যেমন মশে যে দিক দিরাই কেন প্রবাহিত হইত না, সত্যের বাইরা পড়ে—এমনই তাঁহার চিহ্ন একট দিকে ঘাইতে লাগিল। সে চিহ্না যেন তাহাকে “সাইরা বলিল।” তিনি অনিশ্চাকার হইলেন—চিকিৎসক ঔষধ দিলেন। এক দিন তিনি সেই ঔষধ অধিক আশ্রয় লেবন করিলেন—পরদিন তাহাকে কথার কুতাবস্থার পাওয়া গেল। লোক বলিতে লাগিল—তিনি পুস্তকোক্ত সর্গ করিতে পারিলেন না; কিন্তু বাস্তব বৃত্ত চিকিৎসক পড়িত হইলেন—ইহা বংশগত বিকৃত প্রকৃতির অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রকৃতি প্রবল হইলে মানুষ আর তাহাকে বশ আনিতে পারে না।

এদানিই হুখাকর সময় সময় বংশের এট অভিসম্পাতের কথা বলিত। তাহাতে হুখাকর পড়িত হইত। কারণ, সে জানিত, যে বংশে এরূপ অভিসম্পাত থাকে, সে বংশের কাগরও মনে তাহার কথার উদয়ও বিপর-সম্ভাবনা পুড়িত করে।

[৪]

হুখাকর যে শিখার সন্ধানে বাতির গটগাছিল, তাহা বার গটগাছিল। কারণ, সে বসন যোগের গৃহে উপস্থিত হই, তখন হুখাকর তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে। পরীক্ষার অবস্থা বেরণ ছিল, তাহাতে হুখাকরের সঙ্গে প্রবল কঠোরজ্ঞানের প্রয়োজনা ব্যতীত আর কিছুই সে দিন তাহাকে অধর বাহির করিতে পারিত না; তাই সে বলাবল্যই ঈশ্বর কাণে সাগিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

বার্ষিকমোক্ষ হুখাকর গৃহে ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই হুখাকর ফিরিয়া আসিয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তখন অগ্রদূতের বরাহু দিবাভাগ শেষ হইয়া গিয়াছে।

হুখাকর ফিরিয়া আসিবার অরূপ পূর্বে অকণা বস্তুরের কাছে গিয়াছিল; আর কণা তাহার সঙ্গে “সাহর” করে বাইরা উপস্থিত হইয়াছিল। হুখাকরই বলিয়া দিয়াছিল, মাঝার অস্থল প্রবল হইলে হুখাকরের বস্তুরের কর্তব্যও কঠোর হয়, সে সময় তাঁহার পথে হাত ব্লাইশে তাহা একই আশ্রয়গ্রহ বোধ হইতে পারে। অকণা আসিয়া বস্তুরের পাশে হাত দিতেই হুখাকর মুদ্রিত চক্ষু মেদিল—জিজ্ঞাসা করিল, “কে,—যা?”

অকণা উত্তর দিল, “হাঁ, বাবা।”

হুখাকর অকণাকে বস্তুরের মতই দেখিত এবং তাহাৎ মাড়লগোবন করিত। অকণাও তাহাকে এত শ্রদ্ধা করিত যে, সে কণাকে ছাড়িয়া থাকিতে কঠোরতা করে বলিয়া কখনো অধিক দিন পিতৃলগ্নে থাকিত না—প্রায়ই সকালে বাইরা বৈকালে ফিরিয়া আসিত। হা’র সঙ্গে কণাকে দেখিয়া হুখাকর বলিল, “হাত তুমি এদিকে এল।”

কণা তাহার পার্শ্বে ঘাইতেছে এমন সময় হুখাকর অধর প্রবেশ করিল।

হুখাকর পুস্তকে জিজ্ঞাসা করিল, “বেড়াতে গিয়েছিলি?” হুখাকর বলিল, “না, বাবা: তোমাকে খুঁজতে গিয়ে-ছিলাম।”

“তোমার বাবা কি তারিখে গিয়েছিল; আর তুমি কখন ব্রমিগ শেষে বাড়ীতেই থাকে গেলি?”

“না, বাবা, তোমার সঙ্গে আমার বড় বগড়া আছে।”

“আমি যদি বগড়া না করি?”

“আমি একাই করব। তুমি অস্থল হলেও কেবোবে—কেন?”

“এই শু এটাই হয়েছিল; এখন দেখবি, মজেলের কোন বড় মাংসা হাতে থাকলে নিজের হুখাকর অস্থলিখা ফিবেচনা করবার হুখাকর থাকবে না; তার হুখাকরটাই আগে দেখতে হবে।”

“তাই যদি হয়, তুমি ‘প্র্যাকটিক’ ছেড়ে নাও।”

হুখাকর হাসিয়া উত্তর দিতে ঘাইতেছিল। কিন্তু তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া হুখাকর বুঝিল, কণা কহিতে তাহার কষ্ট হইতেছে। সে বলিল, “আজ আর কোন কথার কথ নাই—তুমি মুখোবার চেষ্টা কর। কিন্তু আমি আর কোন কথা কখন না; তোমাকে বিশ্রাম করিতেই হবে।”

“মানুষ কি কিনা কাণে থাকতে পারে?”

“তোমার চের কাণ আছে। তুমি কণার সঙ্গে গল্প করবে।”

হুখাকর কণার ছোট হাতখানি হাতে লইয়া তাহাকে আলস করিতেছিল। হুখাকর বলিল, “তুমি মুখোবার চেষ্টা কর।” সে আলোর আবরণটা মুখোবার দিল—যদি বজ্রাভকারে পরিবর্তন হইল। হুখাকর চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহার কণ পুস্তকের এই যে উৎকর্ষ ইহা যেন বস্তুহিত্তে কিছু বাহিরবর্ণ।

নিকট কখনো তাহার শিতার ঘেঁষে বিকাশ ঘেঁষে নাই—
সর্বদা তবে অথ শিতার সহিত বাহ্যিক করিগাছে। বৃষ্টি
দেই কতই শিতার প্রতি ভাববাগা ও পুষ্পের প্রতি যেরূপ
উত্থাই সে পুষ্পকে দিগাহিল। আর কখনোবায়ী ঘামের নিকট
হইতে বত কুর খাইতেছিল হৃদয়কর যেন সে অতীত পূর্ব
করিবার কত পুষ্পকে তত বিবিড় দেখে নিকটে টানিয়া আনিতে
ছিল। তাহাদিগের শিতাপুষ্পে দখল যেমন খনিষ্ঠ, তেমনিই
সুখিত ছিল; এবং বত দিন বাইতেছিল, তাহা যেন ততই
অধিক বসিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল।

কত কটা ছোটকট করিবার পর গ্রামি প্রায় বনটার সময়
হৃদয়কর ঘুমাইয়া পড়িল। তখন, আলোটি নিবাইয়া দিয়া
অন্ধা চলিয়া গেল।

সাধারণতঃ হুনিয়াত পর হৃদয়করের বিরোধিতার আক্রমণ
যেন হইত এবং নূতন আক্রমণ না হইয়া পথান্ত সে ভাল
ধাকিত। আজ কিন্তু তাহার অধুনা স্তমিত-স্বপ্নাগ হইল
না; হারি একটা ব্যক্তিতে না ব্যক্তিতে যাহে একখানি ঘোড়ার
পাড়ী পানিল এবং ব্যত জিজ্ঞাসা শুনা যেন—“জানকি যাহ
বাড়ীতে আছেন?” যথেষ্ট সতর্ক হারের কড়া নাক চলিল।
তুড়া উঠিয়া যার খুলিল। সেই ডাকে ও পক্ষে হৃদয়ের শিতা-
কত হইয়াযাত্র সে পথ্য ত্যাস করিয়া নানিয়া গেল; উদ্বেগ-
আগন্তুকক বসিবে, ডাক্তারবাণী অস্বপ্ন, আত্ম আর যেন
উল্লাসকে বিরক্ত করা না হয়। কিন্তু অনিষ্ট বাহ্য হইবার,
তাহা ততক্ষণে হইয়া গিয়াছে; তখন পথ্যাত্মক করিয়া
হৃদয়কর বাহ্যাব্যাস আনিয়াছে এবং আগন্তুককে রোগীর বিরক্ত
জিজ্ঞাসা করিতেছে। সে দিন যে রোগীর বেহে অস্ত্রোপচার
হইয়াছিল, তাহারই অস্বা-পরিবর্তন তাহার স্বতন্ত্রা নষ্টিত
হইয়া জ্ঞানরগমকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। হৃদয়কর
বলিল, “আমি থাকি।”

হৃদয় শিতার ককে প্রবেশ করিল; বলিল, “বাবা, আজ
তোমার বাগা হইবে না।”

হৃদয়কর বেহিস্তি অথ নুতন যথেষ্ট বলিল, “কেত বে হইবেই,
বাবা।”

“আর কোন ডাক্তারকে টেলিফোন করে বাড়া।”

“রোগী আহার—আমি হারিয নিজে ‘অল্প করেছি’—এখন
ত না গিয়ে পারি না।”

“কিন্তু তুমি নিজে যে রোগী।”

“ডাক্তারকে তা’ ডাকতে গেলে সে বা, বাবা।”

হৃদয়কর তাহা পরিয়া পাত্রবস্ত্রবিধি কড়াইয়া লইল এবং
টেলিফোন ও হস্তের ব্যাপট। লইল। হৃদয়কর ব্যাপট শিতার

হস্ত ঠেঁটে লইয়া শিতার মধ্যে চলিল এবং হৃদয়কর গাড়ীতে
উঠিলে সেও উঠিতে উত্থ হইল।

হৃদয়কর বলিল, “তুই কোথায় যা’নি?”

হৃদয়কর বলিল, “তোমার সঙ্গে যা’নি।”

হৃদয়কর হাসিয়া বলিল, “পাগল ছেলে! একখানা গা’র
কাশড়ও নিল নি; তা’রা লেগে অস্বপ্ন করে। তুই যা’। আমি
কখনোই ফিরে আসছি।”

হৃদয়কর চলিয়া গেল বটে, কিন্তু দিগিয়া ঘুমাইতে পারিল
না।

হৃদয়কর বাহা বলিয়া গিয়াছিল, তাহাই হইল—সে আর
সময়ের মধ্যেই কিরিয়া আনিয়া। বোম্বের শিতাভাষে তাহার
চাকলা সেবিয়া তাহার স্বতন্ত্রা নষ্টিত হইয়াছিল; হৃদয়কর
দিগা উপস্থিত হইবার পূর্বেই রোগী আহার ঘুমাইয়া
পড়িয়াছিল।

হৃদয়কর আদিগা ঘরে যথেষ্ট বয়সস্থর নিঃশব্দে আগমন
কর গেল। ইগাই তাহা অতীত—পাছে বাড়ী নষ্টকরণ
শিতাভাষ হয়, সেই কত বারের বোম্বের শিতাভাষে আসিলে সে
এইরূপে যথেষ্ট আশিত। নিশেব কখনোবায়ী বয়সস্থর সে
করিয়াছিল, সে ব্যক্তিগে সেলে সে কখনও তাহার আগমন-
প্রতীক্ষার জামিয়া থাকিবে না।

হৃদয়কর পথ্যাত্মক নিঃশব্দে আসিল বটে, কিন্তু হৃদয়
তা’র ডাকিতে পারিয়াছিল।

হৃদয়কর ঘরে আসিয়া আলোটি নিবাইয়া পথন করিতে
না করিতে হৃদয়কর আসিয়া তাহার চরণপ্রান্তে পাটের
উপর বসিল। হৃদয়কর জিজ্ঞাসা করিল, “কে?”—তাহার
মনে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বেব কথা উমিত হইল। সে
দিন কি আর দিগিয়া আসিতে? পারে? কখনোবায়ী তাহার
কত জামিয়া ছিল—ইহা কি সম্ভব?

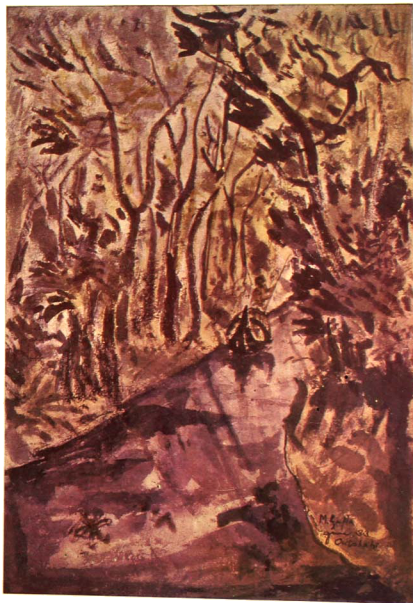
হৃদয়কর উত্তর দিল, “আমি, বাবা।”

এই তাহার পুত্র—তাহার একমাত্র সন্তান—বাগকে সে
কোন দিন তিরস্কার করে নাই, কেবল যেরূপ দিয়া “নাভু”
করিয়াছে—ইহার ভাববাগ তাহার অশান্ত ভাবের শক্তি।
যেহা’র কষ্টে হৃদয়কর বলিল, “আবার উঠে এলি কেন?”

“তুমি ঘুমাবার চেষ্টা কর”—বলিয়া হৃদয় শিতার চরণ-
তলে হস্ত ঘুমাইতে লাগিল। শারীরিক ব্যক্তি অগ্নেব্যাধ
তা’রতে মানসিক ব্যক্তি হৃদয়কর অধিক লক্ষ্যকর করিতে লাগিল
—পুষ্পকে বারন করিতে তাহার আর ইচ্ছা হইল
না।

এ বার আর সময়ের মধ্যেই হৃদয়কর ঘুমাইয়া পড়িল।

[ক্রমশঃ]



কলার ফুল

শ্রীমদেবকৃষ্ণ কল

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিম্নলিখ কথা।

‘জীব যিহেছেন যিনি, আহার যিবেন তিনি।’ বাতায় এই মাস্তিসের কাছে ‘অজবের বুদ্ধি-তর্ক-কলহ সব ভাসিয়া গিয়াছিল। তাই, বি-এ পাসের খবর বাহির হইবার দিন আটক পড়েই তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বি-এ’র পরে যিহে হইলেও, পড়ার তাহার বিয় খটিল না এবং যেদিন ‘অজবের প্রথম পুত্র প্রজ্বল খতার মূণ সেখিল, সেইদিন বৈব-জনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, প্রথম স্থান ‘অধিকার কথিয়া অজব এন্-এ পাশ করিল। যে বছর প্রথম শ্রেণীতে ল’ পাশ করিল, সে-বছর তাহার দ্বিতীয় সন্তান অথবা প্রথম কন্যা জগা জন্মগ্রহণ করিল। সে’র ডট বছরের কথা—এবার প্রজ্বল ও তথাব ভাই হইবে, না যোন্ হইবে, এ সম্বন্ধেও ভটিম হইয়া উঠিয়াছে। তবে ভরদ্বার মনে এত যে ইঁহা লইয়া দীর্ঘ গবেষণা গ্রেগরকন হইবে না, ডট মশ যিবেন যথোই সমস্ত তখন ইঁহা ঘাইবে।

এখন সেই মাস্তিসটির কথা। জীব দিবাব মাসিক যিনি, তিনি সুকৃৎস, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, হেতুও নাই; কিন্তু আহার যিনি যিবেন, তিনি সত্য-সত্যই ‘অজব’ অথবা নাই, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের গুরুতর কারণ বলিতেছে। বাতা এখনও জীবিত, তাতে এখনও হরিনামের মালা; এবং সুখ এখনও সেই মাস্তিস।

অজব ছোট্টা টিউলনী করে, গোটা পুরাতামিল টাকা আসে। বাড়ীকাড়া দিতে হয় বার টাকা; খাটেতে পাঁচটি প্রাণী—আর একটি বাড়িল গিয়া—, একটি বি আছে, একবেলা খাব, আর চার টাকা খাবিনা। পুরাতামিল টাকার পচিশ দিন চলে, পরের পাঁচ দিন যেনে ‘আব, চলে না। তখন ছাত্রদের বাড়ীতে হাত পাতিতে হয়। এইভাবে দিন চলে।

এমন চলাকে প্রোমত্তা পাঁচজন কি চলা বলিতে প্রমত্ত আছে? তোমরা বাহাই কল না কেন, এমন চলকে চলা বলে না। কেন চলে না তবিরে? ভোট খেয়েটার ক’দিন হইতে মূলদুগ্ধ দ্রব হইতেছে, ডাক্তারখানাও বেথাইয়া আন।

হইয়াছে, ডাক্তার ঔষধের যে স্থাবী বর্ষ বিধাছেন, তাহার মৈথো সে কীত না হইলেও ক্লান্তির মৈথো; তাহাকে মস্তিসের চিত্তিত করিয়া তুলিয়াছে। হুইবিন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয় নাই এই কৈম্বিং মিয়া কাটান হইয়াছে, কিন্তু আর ত কাটে না। খেয়েটার অস্থবও যিবেন হটিল হইয়া পড়িতেছে। হুজ্ব ছেলোট্টা চট্টর বাড় পাছ হইতে পড়িয়া হাত ভাসিয়া আসিয়াছে, সে ‘বাহ’ ‘পাড’, ক্লান্ত প্রকৃতির হাম আজও বাকী, ডাক্তারদ্ব্যনুটি কি ভাবিতেছেন কে জানে! পত নামে যের পাশীর কস্তার বিবাহ। শুধু হাতে বাঙা খাব না, মনোনা পানের বাঁচার বধ্ব দারকতে একলোড়া গুলু আনাইয়াছে, হাম চার টাকা। এ নামে একটু টাকা বিতেই হইবে। নহিলে, মনোনা বলিতেছে, ‘পাশের বাঁচার দোয়ের দাবনে বাব হওয়া বাব না।’ ‘আজকালকার কুল-বলগেতে পড়া-শুনা যে কত হয়, তাহা কাগরও অমান্য নাই; কিন্তু উপদ্রব যে কত বকবের তাহা সকলে জানেন কি? ছেলোট্টা কান (cobb) না কি হইয়াছে। কাব মানে বাবের বাজা, বাহুবেগ ছেলে বাবের বাজা কিভাবে হয়, কে জানে! কুলের বাড়িটা-মাঠেরেব চকুম চট্টাছে, গোখাক কিনিতে হইবে। চকুম করা সহজ, চকুম তামিল কথিতে পুস্ত্রণ পিতাণ যে গোখাক ঘটে, চকুম-ঘাটা সে খবর জানেন কি? মনোনা মূণ বৃত্তিধা সব লজ করে মতা; কিন্তু যে তাহাকে দর্শন-মগা কথিয়া তুলিয়াছে, তাহার অমর কথা কে বুদ্ধিতে পারে?

বখন বিবাহ করিয়াছিল, তখনকার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। পর-পর এন্-এ, বি-এন্-এ পাশ করিয়া বখন আত্মীয় পর সকলের আশীর্বাদভাজন হইয়াছিল, তখন তাহার মন-কম্বুতে যে মূখ-মুখের একটি মাত্র, বিজ্ঞ, মুখ্য, শ্রীমতিত চিত্র ছুটিয়া থাকিত, যে-চিত্র বর্ণন করিয়া এই বুক-পুঁত) জাবে ফিরার হইয়া ‘অনন্ত নীলাকাশে সুকপক বিহবের মত উড়িয়া বেড়াইত, সে চিত্রখানি গেল কোথায়? সেই নীলাকাশেই গামছদ্রব মত কখন যে উঠিল, অব কখন যে ডুবিল, চিন্তামারও হরিল না।

এমন কোন আশিষ নাই, কোনো না বশপাত পাঠান হইয়াছে। এমন কোন আত্মীয় বন্ধু নাই, গাধার কাছে না উদ্দেশ্যী করা হইয়াছে। এমন কোন খবরের কাগজ নাই, শব্দের এমন কোন বৃক্ষকাণ্ড বা গাঙ্গশাণ্ড নাই, বাহার কণ্ঠখানির তালিকা অঙ্কন না মূবত করিয়াছে।

মুন্সের মস্তিষ্ক, কল্লেকের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বপতিত, কামার বাড়ীর রাজা না হ্রস্ব করিয়াছে! কিছ মল কি হইয়াছে? কি হইয়াছে, পাঠক, জানিতে চাও, না বৈখিত চাও? এই যে, এই যে টিপি-টিপি বৃত্তিতে উকলিগিটি তালি ও পয়ছিত্রক ছাতা নাথায় অবশেষে বৃদ্ধ বৃক্ষপূর্ত ছাকসেং লোকটি অতি কঠোর জ্ঞাতা বীজাঙ্কি চব চব্ কবিত্তে কবিত্তে বাগ্না চকিত্তে, উদাহরে দেখিয়া তুমি কি বিবাল কবিত্তে পার যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শব্দভাট্টা জ্ঞানবর্ধকমেলের পাশক্তি খলাইয়া বাব বাব এই লোকটির কবিত্তে বিকল্পমাণাসম পরাটো বিচারিলেন? আরও যে, এই যে অজ্ঞাতবে জীর্ণ, তৈল; বাবে দ্বৈর্, বশপাতবে মলিন ছেলেদের কবিত্তে শুদ্ধবৎ এই ভাষা বোঝাকে বসিয়া আছে, একদিন উদাহরে পিতামহা ইগামিগের উদ্ভল চবিত্তে লক্ষ্যে কত চিন্তা, কত গবেষণা না করিয়াছে, আগর মলল আশা-আকাঙ্ক্ষার সমানি লাভ হওয়ার প্রচেষ্টার মনের অঙ্গাঙ্গি বা কি, পাঠক তুমি তাঙ্গ কল্পনা করিতে পার না কি? *

অতঃ পরালে বিকাশে টিউনি কর: আর মধ্যাৎ কালটা কলিকাতায় অগণিত আশিষ আশাসনের অলংঘ্য ষাৎ জালাসা, লাভেব বাবু বোঝা চাপরাঙ্গী বশপাতান গণিজ বোঝা। প্রায় শব্দ আশিষের প্রবেশ-পলে মল্লভ অকরে লেখা 'নো ছেলেগি'। যে আশিষগুলি ভ্রষ্টতা করিয়া অলংঘ্য বাহ-মস্তাচেক্ষেত্র নিরাপাণাঙ্ক অক্ষর কবিত্তে লিখে নাই, এই কথা কবিত্তেই যুখে বসিত্তে তাহাদের বাধে না। অনেকগুলি আশিষের, অনেকগুলি বাবু, অনেকগুলি বোঝা, অনেকগুলি চাপরাঙ্গী বোঝার সঙ্গে সে বেশ জমাইয়া লইয়াছে। কেহ তাহার বাধা, কেহ কবিত্তে, কেহ বাবু বাহা হইয়া পড়িয়াছে। এই বশপাত আত্মীয়-বন্ধুরা প্রায় এক-বাক্যে তাহাকে বলিয়াছে, কোন কাজ খালি হইবামাত্র তাহারা সর্ব্বোচ্চে তাহাকেই শব্দ বিবে।

কবিত্তে আছে, বসিত্তে তাহা উৎপাদন করে। আশাশ্রয়

অভিজ্ঞতা, বসিত্তে আত্মীয়-বন্ধুরা সচাচক। যে শব্দ আশিষে আশাশ্রয়না করিয়া, অতঃ আত্মীয়তা করিয়াছিল, তাহাদেরই ভিতর একজন একদিন শব্দ বিল, একটি কাণ্ড খালি হইয়াছে। যেহ সাংসারের বাস-বাসু (পার্সেজাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট) হঠাৎ গতাযু হইয়াছেন, নতুন লোক লওয়া হইবে। আজই বশপাত দিন।

বশপাত বেওয়া হইল, "আত্মীয়বর্ধ" তথিও কল্পিলেন। কিন্তু মল্লভারক হইল না। বহুতল মিলই এক মল্লভারক মূবক কণ্ড পাঠিলেন। আরও একস্থানে অঙ্কন ঘটিল। সে-আশিষের সাংসারি স্পষ্ট বসিলেন, আমি অত্যন্ত প্রবিত্ত, তোমাকে লইতে পারিলাম না। আশিষের মালাকিং বোর্ডের ইচ্ছা মূবক আমাকে কল্পিতই হইবে, আমার হাত বাধা।

গবর্ধনেষ্ট আশিষ, হেল আশিষ, কর্পোরেশন সর্ব্বত্রই এই কথা। 'উশরওয়াশার ইচ্ছা', 'হাত বাধা' 'অত্যন্ত প্রবিত্ত'। সর্ব্বত্রই এই নীতি! নীতিটি নিশ্চল, এমন কথাও কোষ করিয়া বলা যায় না। বেদান্তাদিক বহুকাল হিন্দুই ভ্রষ্টতর সর্ব্বত্র চাকুরী-গতবৃত্তে প্রাধাত্ত বোপ করিয়া আসিয়াছে, আজও যে কোন আশিষে কণ্ডচাকুরী-সংখ্যার মূললম্বান-তরর সংখ্যা যে শব্দকরা আশিষ জন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। হুতরাং সমান-সমান না হউক, কিছু দিন যদি মূললম্বানবিগের মংগ চাকুরী বসিত্তে হয়, তাহাকে অক্ষর বলিবে কে?

চাকুরীজীবী হিন্দুদের মধ্যে অক্ষরতার উত্তর হইয়াছে সত্য; যুখে বাহাই কেন বসন না, হিন্দু-মূললম্বান-বিলনাহুল হিন্দু হান্দনৌতিকরাও অঙ্করে অঙ্করে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন সত্য; বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপ্রাণে যুখ ও জ্ঞানবর্ধ অভিতাবকৃত্ত প্রচিন্তায় কালাতিপাত করিতেছেন এবং গবর্ধনেষ্টের পক্ষপাতিস্থের ঘোরতর নিষা করিতেছেন, এ সবই সত্য; কিন্তু নিয়মকর্ত্তবে বিচার করিতে বসিলে সত্যই কি নিষা করা যায়? বহুকালমল্ল যুখ-মূললম্বান বাধাত ঘটিলে নিয়মক বিচারণাক্তির দ্বাঙ্গ হইবেই; অথবা না হইলে, কেহই গবর্ধনেষ্টের এ নীতির নিষা করিতে পারিবে না। সে কথা যাক্। আশাশ্রয় গল্প বসিত্তে বসিমাছি, প্রত্নিনৌতি আশোচনা আশাশ্রয়ের সঙ্গে অনতিকার-চক্কা।

যে সময়ে নানা সংবাদপত্র আপিস-আদালতে প্রবেশিত হইত। বিক্রেতা তাঁহা আদালত হইতে পেল, কিন্তু পত্র-পত্রিকাগুলিই যখন ‘আর কোন আদালতই’ রূপে আবেশ করিতে লাগিলেন, তখনকে প্রাপ্ত হইতে নিষ্কল করিতে পারিলেনই যেন যখনই সিদ্ধ হইল, বলিয়া দক্ষিণ অধোবদন প্রকাশ পাঠ্যে লাগিল, সেই সময়ে দুইটি ঘটনা ঘটিল।

একটি ঘটনা, অজয়ের পত্নী মনোবা বিনাক্ষে একটি কথা প্রকাশ করিল। কস্তার নাম হইল বিজয়া।

অপর ঘটনা, বিকালে যে ছেলেকে পড়াইয়া কুড়ি টাকা মাহিরা আসিত, সেই ছেলের শিশু। যন্ত্রেক্ষেপে চাকরী হারাইয়া, চিউট হারাইয়া বিতে বাধা হইলেন।

আপিস আদালতের বস্ত্রাও রান মুখ বলিয়া বলেন, ও পৈতে-টৈতে মেলে, বাড়ী রেখে নাম বসলে আত্মন, তখন দেখা যাবে। ওরূপের সময় কি মাথার মুখে হাসি আসে? আসে বৈ কি! নহিলে এমন মর্ষভঙ্গী থাকে বস্ত্রা ও প্রোতা উভয়েই হাসিলেন কি করিয়া?

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল। সে ঘটনার লক্ষণ পক্ষে দুইখানি পত্র রচিত হইল; দ্বিতীয় সর্বে অজয় নিবন্ধন।

প্রথম পত্র-এইরূপ :—

শ্রীচরণেশ্বর, মা, আমি যেনভাগ করিলাম। আশা আছে এক বৎসরের মধ্যে ফিরিব; যদি এক বৎসর মধ্যে মা ফিরি কিংবা আমার সংবাদ না পাও, তাহা হইলে জানিও, আমি আর নাই।

হস্তাঙ্গা অজয়।

দ্বিতীয় পত্রও এইরূপ, কেবল লেখকের প্রভেদ। বক্তব্য, হুবহু এক।

দুইখানি পত্র ডাকবাণে, একই সময়ে একই পিওনের হাতে একই বাড়ীতে আসিল। দুইজন প্রাপক পত্র পাঠ করিয়া একই কাফ করিলেন। সে রাতে এবং পরে আরও অনেক রাতে দুই জনেরই বিনিময় নবন অজয় ভুলে করিয়া গেল।

মনোবা বিলাস করিয়া বলিগাছে, গৃহভাগের দিন অজয়ের হাতে তেরটি শস্যনা মাত্র ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাহানী আত্মন জাতি।

তেরটি শস্যনা কত দূর ও কোন্ দিকেরে গাওয়া গায়েত পায়ে? এ সমস্যা যে শুধু আত্মনের মনেই জাগিয়াছে, তাহা নহে; অজয়ের মাতা কস্তার কথা শ্রুত, সেনা-কানা সকলেই ইহা চিন্তা করিতেছেন। তবে আত্মনের মনে হইতেছে, এই গবেষণা নিতান্তই নিষ্ফল। কারণ আত্মনা বৈজ্ঞানিক, তের শস্যনা বস্তু দূর বাগড়া বাহ, অজয় তরুণক। অনেক দূর আশিগা পড়িয়াছে। অজয় লক্ষ্যে পথে উপনীত হইয়াছে। পত্র পড়ে, তেরশস্যনাতে চকিয়া ওড়িয়া আসা সম্ভব হইল কিরূপে, তাহা আত্মনা জানি, কিন্তু বলিব না। বলিয়া, যেনের বেকার হস্তাঙ্গাণের অঙ্গা দুইতে প্রোতসাহিত করিবার ইচ্ছা আত্মনের নাই।

অজয় লক্ষ্যে-এ আশিগা দুই দিন পত্র বৈজা দেড়টিল; তৃতীয় ও চতুর্থ দিন আপিস সকল পরিদর্শন করিল; পক্ষন বিকল হইয়া লক্ষ্যে বসিল। বস্তু পত্র-অলোকন করিল; বস্তু বিকলে এক বোলতা লেখকের সঙ্গে তাহা করিয়া, লক্ষ্যন বিকলে তাহার সঙ্গে ওয়াইয়া লক্ষ্যে অস্ত্রকে তাহার সঙ্গে ও পান করিল। লক্ষ্যে লক্ষ্যে লোকটি বড়ই বহাগ্রহণ। অজয়ের আগের সংগান নাই, বাগের হান নাই ভনিয়া তাহার চক্ষুরে বেননা কুটিয়া উঠিল। অজয়ের বাগের কত বস্তুবিলাস? এক বস্তুবিলাস-পরিবাসের বস্তুবিলাস একখানি বস্তুর বাগের লক্ষ্যে লক্ষ্যে করিয়া ছিলেন এবং নিজ লোকের কৈ হইতে একটি গোপা মৃত্যু হান করিলেন। অজয় তাহার কুটিয়াণ করিল।

করদিন পরে, মাথা ভাঁজিয়ার ঘর ও মাথার বিলাস বালিগ পাঠিয়া অজয় কর্তৃক অহত করিল। দূর অহত মাতা, মস্তানপত্রবিলাস বিলাস পত্নী প্রোতের কথা চিন্তা করিতে তাহার অস্তর দিক হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে নিতাক্ষণ হওয়ার তখনকার মত সে বাচিয়া গেল।

যে পরিবাসের বস্তুবিলাসে অজয় হান পাঠিয়াছে, সেই পরিবার বস্তুনিষ্ঠ, পরোপকারী, আশ্রিতবৎসল ও সন্তান। অতি প্রত্যয়ে পরিবাসের প্রোতগণ বস্তুগত পাঠ করিতেন; প্রোত হইতে বস্তুগত পত্র শ্রুত মাত্র আত্মনক ভিক। যিচেন—অ-ভিকৃৎক অর, কী ভিগাৎক কী,

নিরুৎসাহ, একখানা এক-হাত-ফেরত ছোটখাট মোটর গাড়ীরও সমান করা হইত। হকের হাতে পরস-কড়ি নাই বটে, আশ্রয়ভাড়া পুষ্পণ বিনামূলীে অগ্রিম বিয়া গাড়ী কিনিয়া দিবে, নিজেরাই এইরূপ অতিপ্রাণ ব্যস্ত করিয়াছেন।

সত্যায় পর কৃতপূর্ণ আশ্রয়ভাড়া পরেই হক সাহেবের মতলব বলে। বাড়ির পান-ভোজন-কাপড়গুলি সেখানেই সন্ধান হয়। তিনিও মাঝে মাঝে ইষ্টানের নিমন্ত্রণ করেন। ছুটি-ছাটায় মিনে পথের বাহিরে পিকনিক পাঠি ট্যাগবিও অঙ্কিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পাঠি পূর্ন-পাঠি, একতরফাই চলে। কেহকি সুন্দরানসন্ধান এ বিধে এমনও অসত্য পছন্দে পড়িয়া আছেন। কিন্তু, অগ্র্য সংস্কার পাঠি কথিতে বাধে না। এই ত আশ্রয় ভাড়া বোণ্ডাবাধে নবীর ধারে চতুর্ভুজিত করিয়া, হক সাহেব বন্ধুদের পুত্র শৌচিৎ বিয়া ছিন্নের নিম্নে শিল্প দিতে দিতে বন্দন বাসায় ফিরিলেন, তখন কি ঠাধাকে একটুও ক্লান্ত অবসর দেখাইল? আশ্রয়ভাড়া গৃহধারে বন্দন তিনি বন্ধুর নিকট বিহার গইতেছেন, তখন রাত্তার আলো বাগানকার যে অংশটুকু আলোকিত করিয়াছিল, সেখানে একখানি পুষ্পণ বৃন্দ উজান-গোলাপের মত প্রস্তুত ছিল, হক তাহা দেখিয়াছিলেন—সুখবানি দেখিবার মত, একখান দেখিলে আবার দেখিবার মত, দেখিবার সময়ে আঁকিয়া লইবার মত, আঁকিয়া ধ্যান করিবার মত—কিন্তু হক সাহেব কি সেই আনন্দবানি সম্বন্ধ-কান্দে আঁকিয়া আনিয়া ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন? আনন্দ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সত্যায়নের পর পথ্য গ্রহণ করিবার। তিনি হতচেতন।

মৌলভী সাহেব ধরা একদিন আসিয়া গোপন কথাটি জানিবার চেষ্টা করিলেন। হক হাসিল, বলিল, সম্বন্ধ মত বলি।

মৌলভী সাহেবও হাসিলেন; তিনিও পীড়াপীড়ি করিলেন না। তিনি লোকসুখে সন্নিবিষ্ট ছিলেন, আগে বাগানীয়া বিবাহ করিবার জন্য ছুটফুট করিত। দেওয়া আট বছরে, ছেলেরা পকেটে বোল বন্ধ বন্ধেই বিবাহ করিয়া বলিত। এখন যেহেতু বিশ জিন ও ছেলেরা সৌকর্য্য পথ্য বিবাহ সম্বন্ধে নিশি ও উদ্বোধন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আরও এক

অনুত কথা সন্নিবিষ্ট। সন্নিবিষ্ট যেন বাগানী ছেলেরা বিবাহ করিত আদৌ ঠিক নহে। তাই ইচ্ছা থাকিলেও বাগানী দেওয়া বিবাহ করিয়া সংসার হইতে পারিতেন না। আবার কেহ কেহ বলে, তাহারা লেখাপড়া শিখিয়া, বি-এ এম-এ পাশ করিয়া বাগানী থাকিতেন চাচিত্র, পরাধীন হইতে আর চাহে না। আনন্দ কি বলি জানেন? আনন্দ বলি, পর ছুটিতে পরাধীন হইতে তাহাদের সম্মত নাই, পর না ছুটিতে কাহার আনন্দ হইবে? হুতায় বোধ ছেলেবই।

হকও যে বিবাহ করিতে চাচিত্র, আনন্দ গোপন কথাটি তাহাদের মত অগ্রিম বন্ধুর কাছের বলিতে পারিতেন না, বাগানীই তাহাদের কারণ। নারী সম্বন্ধে বাগানী ভাতি যে কাপড়ের তাহা ত মনস্তত্ত্ববিদিত মত। এত বেশ না, তুচ্ছ কথাটা প্রকাশ করিতে হক ছ'বলেও পাবিল না। হকের বন্দনমা যে একজন আছে এবং এত পক্ষীয় পথ্যই তাহাদের অস্বাভাবিক, মৌলভী সাহেব সে বিষয়ে নিঃশঙ্কিত এবং তাহাদের মত ভগ্নাও আছে যে, তিনি মনস্তত্ত্ব পাঠে খোঁজাখোঁজের রূপের চারিভিত্ত এক করিতে পারিবেন, এ কথা তিনি একাধিকবার হককে জানাইয়া অগ্র্য দিয়াছেন, তবুও ছোকরার সাহসে ক্লাইতেছে না। এত বাগানীই আবার বন্ধেই করে, কংগ্রেস করে, বাগদ-শালন মারো করে! সংসার করিতেই ভয়ে মরে, বাস্তব পরিচালনা করিলে! হাসির কথা বটে।

আরও কিছুদিন সময় ইচ্ছাকে দেওয়া বাক্য। আনন্দ কথা বলে ভাল, না-বলে সম্বন্ধ করা বাটবে, তাহারা মৌলভী সাহেব কিছুদিনের জন্য হককে অব্যাহতি দিলেন।

হুতায় একদিন বন্ধর স্ত্রী পেল, হক বেলেস গাভিরাবান ভোগ্য বলি হইয়াছে। পথ্যটা হক্ট দিল। পান্ডিরাবান ভোগ্যর স্বামী ভাল নয়, ভোগ্য-অধিকার শোকটিও হুনিয়া নয়, বলির বিকল্পে হক বলাবান ভোগ্য করিয়াছিল, কিন্তু হাওড়ার বেড-আগিল কোন কথা সন্নিবিষ্ট না।

কৃতপূর্ণ আশ্রয়ভাড়া একবার শেষ চেষ্টা করিবেন বলিলেন, হক তাহাতে ভয় পাইয়া পেল, সন্নিবিষ্ট নিবেদন করিল, আনি একটু-আমটু চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সাহেবটা আগুন হইয়া উঠিয়াছে; আবার—ইত্যাদি।

বৃত্তি অগার নয়, আশ্রয়বিহীন নিরুত্তর হইলেন।
মৌলভী সাহেব নিরুত্তর পাঠিয়া কহিলেন, এইবার
হুক্ হামিল, বলিল, সময়নত বলিব।
আর কবে বলিব ?

কিন্তু চুট লটয়া দিগিরেছি।

গল্পেই হইতে বিবাদের দিনে ভূতপুঙ্গু আশ্রয়বিহীন অর্থাৎ
নিজের ব্যক্তিগত কি পুত্র ছিল ? হকের তখনও মূর্খ কি বাব
বার ব্যক্তিগত জাতকের মত সেই দিকেই আকৃষ্ট হইতেছিল
না ? মৌলভী সাহেব প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হইয়া পাড়িলেন। এই
পরিবার সমাজে বিশেষ লক্ষ্য, তাঁহারা যে অজ্ঞাতসূচনীলকে
কল্পনাময় করিবেন এমন সম্ভাবনা নাই। হুক্ বোধহয়
অন্যমনে তাহা বৃত্তিতে পারিয়াছে, হকের বাবা তাই হুক্কেই
চাপিয়া রাখিয়াছে ! হুক্ বাইরেছে, ভালই হইতেছে।
ইত্যদ্যদে তিনি একটি স্ত্রীস্বামী বয়স শত্রুর সন্ধান করিয়া
রাখিবেন।

হুক্ একমাস পরেই আসিবে। পাঠী সন্ধান প্রাপ্ত
একমাস বধেই সময়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কোমর ও কাপড়।

হুক্ সাহেব যে সময়ে পাতিয়াবানে বেলগরে বাড়ীলগার
প্রথম-মহাভি সম্মেলন করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার ভূতপুঙ্গু
মাতা, বনিয়া ও সন্তানসম্বন্ধিত সাংবাদ লটয়ার আগ্রহ কি
পাঠিক পারিকার হইতেছে না ? অন্তর্যমানে তাঁহাদের আগ্রহ
বুঝিয়া আসিয়া ভাঙ্গের ভূতপুঙ্গু প্রাচ্যবানী প্রাসাদকীর্তিনী
সৌন্দর্য্যবানী কলিকাতার দিগিয়া আসিলাম। আসিয়া
দেখিতেছি, না আসিলেই ভাল করিতাম।

না হস্তিনমেঘ মালা সিংহ, বাব স্ত্রী, উপরাল, গদা-
দান, এই সব ত আছেই; বহুকাল বাঁচিয়া আসেন, বাহুবলি
কেমন বেন হইয়া গিয়াছেন। নিজে একাধিকবে বস
পরেবা বিন অন্যায়ের পাঁকিলেও শুদ্ধমুখে কোন বৈচিত্র্যই
যেমন যেবা যায় না, অজয়ের ছেলেকেবলগা না গাইয়া,
কক শুদ্ধমুখে বাঁকিম সীমিয়া কীদিয়া বেড়াইতেছে, তাহা
যেবিয়াও তাঁহার ভাব-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। মাঝে মাঝে
পুত্রবৃত্তি ডাকিয়া বলেন, তুমি ভেব না বট মা, এতগুলি

কোমর বিনি পাঠাইয়াছেন, তাহাযেব বাবারও তিনি বাবরা
রাখিয়াছেন। একদিন সে বাবার আসিবেই আসিবে, তুমি
দেখিও মা, আমার কথা মিথ্যা নয়।

কথাগুলিতে বুকু কতখানি মাখন পান, তাহা বলা শক্ত।
কুখাতি ছেলেকেবলগা তাঁহাবনাভার কাছে যায় না, আসে
তাঁহার কাছে, কীমে তাহার জাহা পরিয়া। পুত্রটোয় পুত্রটোয়
বুকু লখননা কুখার আলার চট্‌চট করে। বস্ত্র ও এ
গুত্র বেবেবন নাই, যে বেবে, আলো যে কত, তাহা সেই জানে,
সেই বোঝে।

মনীষা পানীপ্রাণের বেবে। পানীপ্রাণে হস্ত পানীপ্রাণের
সংখ্যা নাই। সেই সব পরিবারের মেয়েদের মননবাহা
মনীষা ছেলেকেবলগা দেখিয়াছে। পাঁচ পুত্র হইতে কন্যা,
তখনো বাক তুলিয়া, পঞ্চ-মারি-ঘাট হইতে গোবর কুড়িয়া
ঘুটে দিয়া, বন হইতে বৈচিত্র্য তুলিয়া, ফুল জড় করিয়া হাতে
বাঁধার পাঠাইয়া বা অন্ত লোকের বাড়ীতে বেচিয়া কোনও
মতে তাহাদের দিন কাটে। শহরে কোন হুখিই নাই।

বাড়ীভাড়া ছব আসের বাঁকী, বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে বড় ভাড়া-
লোক, তাই দয়া করিয়া তাড়াইয়া যেন নাই। সুদীর্ঘ নিভা
ছোট লোক নয়, কি মানেই শাসায় বটে যে আর ধার দিতে
পারিবে না, কিন্তু মাসকাবারে শাসায় শাসায় জিনিষ পাঠাইয়া
দেওয়া বন্ধ করে নাই। জিনিষপত্রের বাহা বেব, তাহাতে
এতগুলি প্রাণীর হই বেলায় আসাচ্চাষন চক্ষিত পারে না,
মকলের একবেলায়ও পূর্ণ হয় না। আর কিছু 'জুইনা'
বাড়াইতে বলার সুদী ছিল শুধু গালি-গালাজটা করিতেই
কল্পব করিয়াছে। ছেলেকেবলগার পরে কাপড়, ইজার ত
হুতের কলা, ক্রাকড়টিপুও বুটিয়াছে।

আর বিনি বিয়াছেন, আবার তিনি দিবেন, কথটা
ভুক্তিও বেশ, লতা হইলে আরও বেশ হইত। কিন্তু, মনীষার
অনুটে ?

আর সেই লোকটি ? ছব মাস নিকছেন ! কোথায়
গিয়াছে ? আছে, না, সব আলার বোঝা একা মনীষার বাড়ী
চাপাইয়া সব এড়াইয়াছে কে জানে ! বাঁচ বৎসর বিবাহ
হইয়াছে, এগার বৎসর মনীষা বস্ত্র-বস্ত্র করিতে আসিয়াছে,
একটি বেলা মনীষাকে না দেখিলে হাজার দিন কাটা যায়
হইত, সেই লোক ছ'মাস বেশ ছাড়া, বস্ত্র ছাড়া, মনো

ছাড়া! নাহা যিনেব স্রাতি, স্রাতি, অবসানের বোকা
ঠেলিয়া স্রাতিয়া বে লোক নতকণ ভাগিয়া পাকিত, ছেলে-
মেয়েগুলিকে কুক কুক মুখে মুখে স্রাতিত, ছেলেমেয়েদের
কথা মনে করিয়াও কি একখানি একছত্র চিঠি সে লিপিতে
পারে না? আকালকার যিনেও, মাকে তকি হইত মনে
মনে মন ঘেঁসেই করে, কিন্তু বুড়ীরা প্রকাশ পোনে ভালবাসে
জানিয়া তকি দেখাইতে অনেক ছেলেই লক্ষ্য পায়—
মনীষার ঘাবী সে লক্ষ্যে নহেন, তিনি কোন দিন বাতায়
চরণ বন্দনা না করিয়া জল গ্রহণ করেন নাট; গতি রাত্রে
শয়ন করিতে বাটবার পূর্ণক্ষয়ে মনীর চরণপূজি মস্তক
ধারণ করিয়া তবে তিনি শয্যা প্রবেশ করিয়াছেন। সেই
মা বার্ককো, অন্যায়ের, মনস্ত্রিভাষ চর্চা, শূঁর্ষ, আত্মর, কাতক,
তবুও যে লোক মাকে ঘেঁষিতে আসেনা, একটা মনশাসনশিল্প
ধর বেধ না, সে কি আর আছে? তাহিতে তাহিতে
মনীষা কঠি হইয়া যায়, হাতে পায়ে শিল ধরে। সবধর তাহে
শয্যা পড়িয়া ছিন্ন কাঁপার মুখ শুভিগা পড়িয়া থাকে।
কাঁথা ভিজিয়া যায়, বুক ভিজিয়া যায়, মনীষা ভগবানকে
ডাকিতে চাহ, পোড়া ভগবান নিরুপ, চুই চক্ষুতে বান
পাঠাইয়া দেন। অগতির পতি, বীনের বন্ধ, অন্যায়কে
ডাকিতেও সে পারে না। হাঃ, তাহার মত হতভাগিনা কি
কেহ আছে?

মনীষার কোঠ ভাড়া মহেন্দ্র প্রথম প্রথম কবেক মাদ
পাচটি করিয়া টাকা বোনটিব হাতে দিয়া বাইত, পত্ন মাদ
হইতে তাহাও বন্ধ—মাঝার মাঝি হঠাৎ পচিশ টাকা কমিয়া
দিয়াছে। এই পাচটি টাকা আদিত, বেবতায় আশীর্বাদে
মত। এই টাকা হইতেই ছোট বুকাটায় হলিঙ্গ, ছাপল চপ
হইত; পত্ন মাদে এই টাকা হইতেই সামান্য কিছু বাচাইয়া
নিজের জন্ত একটা গুখুও আনাইতে হইয়াছিল—বিক্রাণের
থিকে যোমই যেন একটু অর হয়, সঙ্গে একটু একটু কানিও
আছে। গুখুটা খাইয়া ভালই মনে হইতেছে। তা সে
বাক্, নিজের জন্ত মনীষা আখোঁ তাহেঁ না, এসেই থাকিলেই
বা কি, আর পেণেই বা কি! শুধু তাহনা এই পাণ কটাগ
কত!

ছোট বুকাটায় যে কি হইবে তাহিলে মাঝের প্রাণ
সুকাইয়া উঠে। ডাক্তারখানা হইতে ধাব এক বোতল

চলিত পাওয়া যিহাছে, ছাপলের চপ যে মাঝি দিত, মাদ
দান পাওয়া হইতবে না জানিয়া এ পথই সে ছাড়িয়া যিহাছে।
তাহার বুক একদিন কত দুখই ত ছিল, অন্যায়ের, হতভাগ্য
হুর্ভাবনার বুক কি আর কিছু আছে!

এমনই যখন অবস্থা, হঠাৎ বিপ্লবের শিঙন আদিয়া
হাঁকল, বাহিঙ্গি-মনীষা-যেহা, মদি-অটায় আছে।

মনীষা যেহা, মদি-অটায়! মনীষা দেহকে মদি-অটায়
কে করিবে? মায়া? মাগা, তাহাই একগালা টাকা
মাঝিরা কমিয়াছে, তাহার এক গালা ছেলেমেয়ে, দুধবার কি
দোনা আছে? তবে?—তবে? ভগবান! হাঃ, ভগবানের
নাম মুখে আনিতেই পোড়া পাণ গোপে জল আগে কেন?

কিছু, একি, “এ, হুক্, লাক্” কে? হুক্ কোন্ জাতি?
সাহেব, না মুনবান? যে জাতি হউক, বেই হউক, সে
তাহাকে টাকা পাঠাব কেন? তিনি পাঠাইয়াছেন কি?
কিছু সে লোক যেই হউক, তাহার নাম শিল না কেন?

এ টাকা লংখা কি উঠিও হইবে?

শোটে-পিঙন এতাকণ খাড়া থাকিতে পারে না, বাব বাব
মাঝিরা সবেমানে উভায় করিয়া টুলিতেছিল। মনীষা বন্ধ
শরণ লইল। মাতা নিকটবে করিলেন, একশ টাকা,
আমার অজুই পাঠিয়েছে। কিছু ভেব না না, নাম লিখে
টাকাটা নাও।

পিঙন বিদায় লইয়া চলিয়া বাইতেছিল, মাতা আদিয়া
বলিলেন, একটু গাড়িও ত বাছ।—বুক্ বলিলেন, হাতের
লেখাটা ভাল কবে দেখ ত যোনা!

পিঙন কুবখানা উঠাইয়া-পাঠাইয়া দেহিয়া বলিল,
কণের টাটন করা লেখা, হাতেই লেখা নহ।

অরে আদিয়া বন্ধ বুক্ করিলেন, দেখলে যোনা, যিনি
জীব যেন, তিনিই আমার যেন কি না।

—কিছু মা, কে পাঠালে, কি বুজাও, আমার কিছু ভাগ
লাগছে না।

—অজু, অজু, আমার অজুই পাঠিয়েছে, অজু ছাড়া
আবার কে পাঠালে অত টাকা?

বুক্ উচ্ছ্বসিত অঙ্গ বোধ করিতে করিতে বলিল, তিনি
হলে কি একখানা চিঠিও লিখেন না! কান বে টাকা,
কি মতে যে ক পাঠালে—

—তোমার কোন বাবা পাঠায় নি বাচা। তা তুমি দেখে নিও। পাঠাতে আমার বাবাই পাঠিয়েছে।

ছেলেটা নূতন কামা পবিয়া বাঁচিল, বড় মেয়েটা শিশুর স্তম্ভ পণিয়া, আনন্দে মুগ্ধ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট মেয়েটা লেবিন চটেতে একটু গাণ্ড কপে নাই। ভবা পেট থাকিলে কচি-কাচায়া কাঁধে না; লেখক অগ্রহান করেন, বুড়াবুড়ীবাও শান্ত থাকে।

পুত্রর মাগেও 'দণি অটাব' আসিল। পিওন কৃষ্ণখানার লেখা পত্রিকা কবিয়া বসিল, টাইপে লেখা কবন; কৃপনটি মাথা পড়িয়া বসিয়াছে। লেখক, পেট এ. হৃৎ। প্রেরণ-জান লজ্জা নয়, এগার থাকিয়াগান।

সংসারে কোন অচাই নাই; বাড়ী-বালা প্রাণ; দুই-মিলে নিজে আসিয়া নান্দকাসী কদ লটরা বার, আঁধাটো না কাঠিতে, বিধব মুঠের মাথা তিনি পাঠাইয়া দেয়। ছেলেটা কৃপণ বাঁচিতেছে। ননীয়া বড় ছেলেটিকে বাঁচিতে পড়াইবার জন্য একটা নান্দা বানিয়া দিয়াছে। বড় মেয়েটিকে দে নিজেই পড়া দে এখনও বিদ্যায় তাগের উপরে উঠিতে পারে নাই কি না। বোধোব, চাকমাঠ, পত্নালা পথ্যজ ননীয়াই তাগের দেখিতে তিনিতে পারিবে। তাপনর অগ্র সে আস পারিবে না, তারপ তাগার বিদ্যায় কৃপণাইবে না। তখন না-তপ স্তম্ভের 'বাইসকে' আস গুটী টাকা খেই দিয়া ইহাও পড়াইতে বলিতে চাইবে। সে এখন অনেক দিনের কথা! তত দিনও কি—? ননীয়াই চোখে কঁক্সি-আগিয়া গহিল। তপনর মনে যে কি আছে তিনিই জানেন! বাসিতে বাসিতেও ননীয়াই গই মরনে লগ্ন দায়া বহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মালিক মালিকানা।

তিন মাস আগে লজ্জা বেল-আগিলে ধাওয়া ছোট স্থপারিনটেনডেন্ট হৃৎ সাহেবকে দেখিয়াছেন, আত তিনমাস পরে পাঞ্জাবাসে সেই হৃৎ সাহেবকে দেখিলে তাঁহারও চিন্মিত পারিবে বসিয়া মনে হয় না। হৃৎ সাহেব খানিকটা নুই রাখিয়াছেন; হৃৎ সাহেব নুই বোঝানো হয় নাই, বসং বেশ মানাইয়াছে। কিন্তু ঐ নুই-নুইর ভিত্তি যে তাঁহার

চিন্মিত কই হইবে তাহা নয়। তাঁহার চেহারারও অসম্ভব পরিবর্তন হইয়াছে।

তিনি একহার্য ছিলেন, এক্ষণে আড়াইহার্য হইয়াছেন। যে ধরে মাংস বেশ মজা বুঝি পাইতেছে, সেই ধারে চলিলে তিনহার্য, চারহার্য অবশেষে অচল পথার হইতেও বিলম্ব চাইবে না। পূর্বে তাঁহার বর্ণ ছিল শিতল-বর্ণ; এক্ষণে বর্ণ-বর্ণ হইয়াছে। নূতন পালিশ-করা বর্ণে যেমন লাগিয়া গুই হয়, এক একদিন লজ্জাতে হৃৎ সাহেবের কপোল ছুটতেও উদ্ভগ রক্তিমতা দেখা যায়। হৃৎ সাহেব একমিষ্ট মূলমান, ধর্মে তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা, তবুও, কেন জানি না, চক্ষুমান বাঙ্গালী হিন্দু হৃৎ সাহেবের চেহারায় বাঙ্গালীর সহজাত দাব্যটুকু লক্ষ্য করিয়া বিশ্ববোধ করিয়া থাকেন।

জাতিতে তিনি বাহাই হউন, হৃৎ সাহেবের মধ্যে সাম্প্র-ধারিকতা বা গোঁড়ানী একবারেই নাই। আগিলে তিনি সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। এমন কি হিন্দু মহাসভার ভক্তগণও কোনদিন তাঁহার ব্যবহারে তুই ছাড়া কই বন নাই। তিনি বলেন, ভক্তবানীর জাতি, ধর্ম, সবই এক; আমায় সকলেই ভক্তবানী, ভায়ত-জাতি, ভায়ত আমায়ের ধর্ম। কথাত সাহেবের কপেও উঠিয়াছে। একবার এক সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃৎ, তুমি কি কোনদিন রামনীর পণিল অবর্থে পড়িয়াছ? হৃৎ বলিলেন, আমার রামনীর, আমার উত্তর। সাহেব সন্ত।

এই ত মেল খানির কথা। তাঁহার বয়ের কথা তিনে? তিনি বলেন যে বাঙালীতে আছেন, তাঁহার আপো-পাশে অনেকগুলি বাঙ্গাল হিন্দু বাস করিয়া থাকেন, পাছে তাঁহার মনে আঘাত লাগে, তাই একটি দিনের ভক্ত হৃৎ সাহেবের বাঙালিগণের নিষিদ্ধ মাংসাদি প্রবেশাবিকার পায় নাই। তাঁহার বর্মাতায় বাঙালীতা বাঙালীর পরমা চুই করার অপর্যবে কণ্ঠ্য হইলে, তিনি পানের বাগার রাখাল বাহুর স্থপারিন একটা হিন্দু পাচক নিযুক্ত করিয়াছেন। আগিলে একটা অর্ডারলী তাঁহার বাঁওগেই থাকে (পদম সকল কণ্ঠ-চাইই এই স্থবিদ্যাক্ষেপ ভোগ করিয়া থাকেন), এই সোকাট হিন্দু, বাগার সামান্য খুচা-খাচরা কাঁচ পেট করে; মাসন-কোসন দুইবার ভক্ত একটা মাই আছে; হুতগাং অস্ত চাক-বাকর রাখিবার প্রয়োজন হয় না। একটু মূলমান 'বর্ম'

রাশিতে বাগনা আছে বটে, কিন্তু শরৎকৃষ্ণিণ অথ পারি-
তেছেন না। হৃৎ মৌলভী সাহেবকে লিখিয়াছেন, টাকা
পরমা ভ্রাতার চেষ্টা করিতেছি। সাংসার পারিতে বহু
অর্থের প্রয়োজন।

হৃৎ সাহেবের গুণের কথাই বলিলাম; যেন যে নাট এমন
নহে। এইবার শুট একটি দেখেন কথা বলিব। লোকটি
বিশেষ লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সামাজিক কাল
জান আছে বলিয়া মনে হয় না। চার সামাজিক কাল
পাণ্ডিত্যমানে বহুলি হইয়া আসিয়াছেন, কত লোকের সঙ্গে
ভাব হইয়াছে, অশ্রুতকথা হইয়াছে, কত নিবন্ধ আমন্ত্রণ
হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, লোকটি একটি দিনের তরফ কাহারও
গৃহে আসার কসে নাই। হিন্দুর বাড়ীতে না বাস, না খাবু,
মুসলমান—সম্রাট মুসলমানদের গৃহে থাকে না কেন? হৃৎ
বলেন, উই বৎসর পূর্বে তাঁহার পিতৃশ্রুণের ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল,
তিনি অধিকতর ব্রিজে বাঁচিয়া গিয়াছেন। সে হিন্দু হৃৎবরে
জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন, নিরন্তর থাকিতে তাঁহার স্ত্রুতর
নিষেধ আছে।

এ কথার পর আর কে কি বলিলে?

হৃৎ সাহেবের আশ্রয় একটি ঘোষ আছে। পনিয়াসে
আগিল কদিনাই তিনি দিল্লী ছুটেন, ববিবার দিল্লীয়াস করিয়া
সোনগারে লোভা আশ্রয় আসেন। অস্ত্র ছুটি-ছোটর দিনেও
এই বাবদ্য। রসবত্তী দিল্লী নগরীর কথা না জানে কে?
লোকে নানা বকম কাণাযুগা করে। লোকেরই বা ঘোষ
কি? বিবাহাদি হয় নাই, বহুস কাঁচা, মোটা ঘাতিনা
ইত্যাদি। দিল্লীতে তিনি কোথায় থাকেন, কি করেন, এ
সকল কথা কাহারও বলেন না। কাহাকে কাণাযুগা দখলে
লোকের কোন ধারণাও জ্ঞানশ: বহুদল হইয়া লাড়তেছে।
ভাগ্যে মৌলভী সাহেব এখানে নাই, থাকিলে যে কি হইত,
তাহা বলা যায় না।

লাহরী হটক, ভালবন্দ্য, যোবে গুণে লোকটি সন্তানের
সঙ্গে পরম সুস্থানে দিন যাপন করিতেছিলেন। হঠাৎ হৃৎ
সাহেবকে ঘোষ হুত বালেগিয়ায় অক্রমণ করিল! যেন কাক
কর্ণ করিতেছেন, হঠাৎ কো কো করিয়া অস্ত্র, আত্মাঙ্গীর
কাথে ভন বিধা, কাণিতে কাণিতে বাতলোয় চলিয়া গেলেন।
আট মন খটা পরে অস্ত্র বিস্ময় হইল: হুই দিন ভাল বেশ,

ভৃতীয় দিনে আবার অস্ত্র! কাপুনী যেখিয়া সাহেবসেইও ভয়
হইয়া গেল। তেজের ভক্তার বোতল বোতল কিয়ার-
মিস্ত্র্য, কাইল কাইল হুইনিং প্রেরণ করিতে লাগিলেন,
কিন্তুতেই কিছু হয় না। শিথিগ্রতিকাল কিয়ার হুইয়াইয়া
গেল। বাখালা বেশ চটেতে বোতল বোতল ডি: গুপ্ত,
পাইবেল, বোলা, বীশে, তানগুগো, কতনা বেখানকার
বত পাচন ছিল, তানাতোকেন, কালকানা, পাইবেল,
বচিটোন কিছুই বাদ পড়িল না; তবুও অস্ত্র বাহ না।

বহু বাস্তব বলিলেন, ব্রাহ্মণানী দিল্লীর ব্রাহ্মণিক ম্যালেরিয়া
সংকে থাকে না। আবারের কথা না তনিয়া দিল্লী-বর
কহার বস ফলিবেই।

হৃৎ সাহেবের ব্রাহ্মণ-পাচক অল, সাহেব বাস্তব অল
ছাড়া আর কিছুই বান না। আর পাইবেলই বা কিভাবে?
পেটে কাণা থাকিলে ত? এই একটি গুরুতর বোতল খোলা
হইল, পানিক পরেই দেখা গেল, মন শেখ। এত বহু
পাইলে পাচক কখনও কতি থাকে? না, পাচকের বান থাকে?
বহু লোক, সাহেব বাস্তব, প্রায়বের কথা ত কাণে তুলিবেন
না! আবার হইলে ঐ ডি: গুপ্ত পাইয়াই বসিয়া থাকিত।
প্রায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণানী কোন্ কাণেই গিয়া থাকি থাকি?
সাহেব অল একটা এ গোরগ পানি করিতেছেন, কাল
একটা সে-বোতল বেশ করিতেছেন, এমন খায়া অল চাখিলে
কখনও অল সাহেব?

লোকটি ঠিকই বলিয়াছে—লড়াই অস্ত্র সাহিল না। দেড়
মাস হইয়া গেল, বাস্তব মাঝে কম্পদ্বয় আসিতেছেই।
হৃৎকে বাস্তব হইতে দেখিয়া এত যে অস্ত্র, নুখাই যায় না!
বিবিা নাহদ-প্রদ্র চোখাটী বহিয়াছে, কেবল মূখে সে লাখণা
ও গালিনা নাই, চোখের নীচে ও উপরে কালা পড়িয়াছে।
চোপমা লোকগুলা চট করিয়া কাঁচল হয় না বটে, তবে
তাঁহাদের ভিতরটা বহু বের খোপণা হয়, অস্ত্র কাহাবও
ভেবন হয় না। এই দেখ না, হৃৎ সাহেবকেই দেখ না!
অনন ভুঁড়িগালা চোপগাতি ত, আপিলেন এই কটা
নির্দি ভাবিয়া উপরে উঠিতে বন মিনিট লাখিয়া বাস:
চোবের বসিয়া আশ্রয়টা উপর লাগে, বন গুটতে।

হেলেগে পাচক ভক্তার বলিলেন, হৃৎ আবার অল হয়,
হান-পরিবর্তনে ভোনার উপকার করিবে।

পুত্ৰ, কন্যা। বড় মেয়েটা বাবা বলিগা চিনিবৈ ত? ছোট মেয়েটা পুট পুট কৰিয়া চাতিয়া থাকিবৈ। নতন লোক বেগিয়া কেলৈ ত আশিবেই না, বহু কাহিৰেই থাকিবৈ। হুজৰ নিশ্চয় হুপে যাব। না, কেবল বৃণা-কাৰা মানিগা মাখিগা বেড়াইতেছে।

মনীষা কি খুৰ গোপা হইয়া গিয়াছে? এমনট ত তাহাৰ বেহেৰ কোথাৰও মাংস ছিল না, এই কথমাশে ভাখিগা ভাখিগা সে হুজত কাট্টি। হইয়া গিয়াছে। আজ তাহাব মূখে হাদি ও কজা বোব চহ-একই স্বে দেখা ঘাইগৈ।

মা? মাও কি ভাখিগা পড়িয়াছেন? হুজত কাহিগা কাহিগা চকু ওটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, চহত বিভানাত্ৰেই পড়িয়া থাকেন।

প্রথম কথমাশ চহত কলৈ গল বাহিয়াট—মাঃ, সে কথা আৰ ভাখিতে পাৰি না।

হেটুসমান পুলিয়া চকু বৃণাটতে বৃণাটতে চঠাং কুহু একট সংবাব বহুগৈ পড়িল। সংবাবটি এই:—

"গত বংশে জুন, দ্বিতীয় ৩ ৩ বেল-মাখিপেৰ কৰ্ম-

চায়ী মিঃ এ হক্ দ্বিতীয় দ্বিত্ব মগানতাব অশাক বাবী অশ-
তপানম কবুক দ্বিত্বদ্বিত্ব দ্বিত্বিত তইগাছেন। দ্বিত্ব-সত্য
বহু লগত দ্বিত্ব নর বাবী উগতিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই
হক্ পৰিবেশিত দ্বিত্বত্ব অংশ কৰিয়াছেন। হক্ৰ দ্বিত্বনাম
অজয়মুখার তট্টাচাৰ্য হইয়াছে।"

হক্ ভাখিগা কাখকশানা ছিঁড়গা ভানোগা গলাইয়া
কলিগা গিলেন। এটাচি কেম্ হট্ৰেও কুণ যাহিব কৰিয়া
মুণটি বন্ধন কৰিলেন। ঘোঁৰকাখাটিও গাড়ীতেই লাগিয়া
লটিলেন।

অনেকদিন গবে মৌলভী মাংগেৰ কলিকাতাৰ আশিগা
অজহেৰ লগে লাকান কৰিয়া মাত্ৰ সেলান আমেজুদ কৰিয়াই
চলিয়া গেলেন।

হক্ৰেৰ বাপাবৰ লইয়া কিছুদিন লগজ অলোচনা চলিয়া-
ছিল। সকল বাপাবে যেমন উট বলা বহু, এ বাপাবেও
তাৰাই হইল। এক পক্ষ গামিলেন, অপর পক্ষ হামিলেন।
তৃতীয় পক্ষ নীতব বহিলেন।

প্রতিষ্ঠা

ঐ বাঙালি মনো অধিকারী

মনো যে গতি প্রতিষ্ঠা

— কবিতা

বাক্য ঘোঁর মনোমাকে গোন্ধ প্রতিষ্ঠিত,
মন ঘোঁর বাক্য-মনে হউক্ বিলিত।
প্রকাশিত হও বাবী, সমূখে আশ্বাস;
কহিব 'বহুতব'-বাবী, কথ্য সত্য-সার।

— শ্রী অমিলা দেবী

পান্ধাৰী

ঐ তৎ কবিত্বময়ঃ

অৰ্ণাভেবত বোম্বাই।

— কবিতা

দীপ্ত সন্নিভা—বিনি আশ্বাসে
চলিত কতেন ঘতি,
যান কৰি তাঁর দিবা পৰম
বহুগৈ শুভ জ্যোতি।

— শ্রী অমিলা দেবী

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਰਤਿ)

—ঐপূর্ণচন্দ্র দে

संस्कृत कलेजे मेडिकल क्लास
(Medical Class in the Sanskrit College)

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার জন টাইটলার। Dr. John Tytler। 'স্বাস্থ্য মেডিক্যাল স্কোলে' শারীর-জ্ঞান-বিজ্ঞান (Anatomy) সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিতে গিয়াছেন। তিনি স্বদেশান্তরে গেলেন। অনেক ভাষণ উচ্চারণ করিয়াছেন।



અરુણ: હવે જાણે ।

অধিকাংশ ছিল। ১৮৩১ পৃষ্ঠাযে ডাক্তার জন্ গ্র্যান্ট (Dr. John Grant) তাঁহার পদে নিযুক্ত হন।

এই বৎসর অনন্ত পরিগ্রহ করিয়া সমুদ্রবন চিকিৎসা-
বিভাগ বিশেষতঃ শরীরস্থান-শাস্ত্রে (In the science of
Anatomy) পারদর্শী হইয়া উঠিলেন । ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে,
দে-মাসের প্রথম-ভাগে জুভিয়াস নিম্নোক্ত দফায় কোন
কার্যবশতঃ কর্মতাগ করেন । ডাক্তার উইলসন সাহেব,
সমুদ্রবন শুণ্ডকে সর্গাপেক্ষা কৃতবিদ্য জানিয়া তাঁহাকেই সুবি-

বাবেন পক্ষে বিজ্ঞ কথন। ইতোহে মধ্যবনের সমপাত্রী বৈষ্ণ-
ছাত্রগণ অভিমান-বশতঃ বিশেষ আপত্তি করিয়া কয়েক
পন্থিত্যাগ করেন। তৎকালে এ সম্বন্ধে 'সম্ভাচার-চলিতকার' বাহা
শিখিত হইয়াছিল, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে, ১৫ই মে তারিখেই 'সম্ভাচার
সম্পদে' ডে-দি মার্শম্যান সাহেব (J C. Marshman) তাহা
উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই উদ্ধৃত অংশ নিয়ে অবিকল
প্রকৃত ঘটনা :-

[illegible]

১। ১৮৩২ পুঠায়ে, ২৫ বৈ তারিখে 'জেনারেল-কমিটী অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন' (General Committee of Public Instruction) এর সেক্রেটারী (Secretary) গভর্নমেন্টকে একখানি পত্র পেশেন। ইহার ভাবার্থ এই :—
'সম্ভূত কলেজের 'বেডিক্যাল ক্লাসে' এখন ১৫ ছাত্র (১) দক্ষাৎকৃত হইয়াছে। প্রাচীনা পাক্ষাতা প্রাপ্য



ডেপুটি সার্জন জি. এ.

অনুসারে বিপক্ষণ এনাটমী (Anatomy) শিখিয়াছে।
এই পত্র চর্চাত কয়েকটা ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া চলিয়া গিয়াছে।
প্রাচীন এদেশের বাসান্দীদিগকে চিকিৎসা করিতেছে। একজন ছাত্র 'সিভিল সার্জন' (Civil Surgeon) হইয়া হিজলীতে গিয়াছে। আর একজন ছাত্র 'সম্ভূত কলেজের ক্ষুদ্র হাসপাতালে' রোগিগণকে ঔষধ দিবার ও আলোচনাকে পরিচর্যা করিবার ভার গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। ডাক্তার জে. গ্র্যান্ট (Dr. J. Grant) সাহেবের তদাধিনে এই হাস-

পাতাল তদা সঃস্রম করিয়া "স্ববর্তক" প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সেই পত্রগুলির সাগঃস্রম গ্রহণ করিয়া এই প্রবন্ধ পরিচালন করিলাম।—লেখক

(১) এই পটী বহুদূর অথবা যথুদূর ক্ষুদ্র ও বহুক্ষুদ্র গুণ বর্ধিত হইয়াছে। কৃত্রিম জলবায়ু, তাহা বহু পুষ্কর ভাঙ্গন-পত্র প্রকাশন করিয়াও বর্ধিত পাইলাম না।—লেখক

পাতাল নিয়মান বহিরাছে। এই হাসপাতাল যাত্রা বেশী পোকদিগের নিয়ন্ত্রণ উপকার হইতেছে।

২। ১৮৩২ পুঠায়ে, ১২ মুন তারিখে ডাক্তার হোরেল হেম্যান উইলসন (Dr. Horace Hayman Wilson) গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী এন্ট প্রিন্সিপকে (N. T. Prinsep কে) এই পত্র লিখিয়াছিলেন :—

প্রতিষ্ঠা প্রাপ্যী অনুসারে ছাত্রগণ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতেছে। এখন যে হাসপাতাল বোনা হইয়াছে, উদ্ভাষা দেশের বোনের যথেষ্ট উপকার হইতেছে।

৩। ১৮৩৩ পুঠায়ে, ১লা ভাদ্রাবাসি তারিখে 'বেডিক্যাল রাসেন' তপাতিমেন্টে ডাক্তার জে. গ্র্যান্ট (Dr. J. Grant) সাহেব, সম্ভূত কলেজের সেক্রেটারী মেজর ট্রায়ার (Major Trower) সাহেবকে যে পত্র পেশেন, তাহার মন্ত এই :—

(ক) এই ক্ষুদ্র হাসপাতালের উপকারিতা লক্ষ্যে যাত্রা পূর্বে লিখিয়াছি, তাহা যেমিয়া আপনি স্থবী হইলেন।

(খ) নানু গ্রামবন্দল দেন অতি মহাপ্রদ পোক। 'বেডিক্যাল রাসেন' উদ্ভাষে ভূত ত্রিনি প্রাণপনে পরিচর্যা করিয়া আবারে অত্যন্ত সাধায়া করিতেছেন। ১৮৩৩ পুঠায়ে শেনভাগে একটা হাসপাতাল পোনা হইয়াছে। উদ্ভাষে ১০টা রোগি রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

(গ) আমাদের হাসপাতালের জন্ত একজন ইউরোপীয় এপথিকারী (European Apothecary), ঔষধ ও বর্ষ রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাহ্যতার বহন করিবার জন্ত গভর্নমেন্টকে পত্র লেখা হইয়াছিল। কিন্তু গভর্নমেন্ট তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই।

(ঘ) নবব্রহ্ম গুণ সর্বোচ্চ জেগের সর্বোচ্চ হ্রাস। তাহাকে এপথিকারী (Apothecary) নিবৃত্ত করা হইয়াছে। আরও প্রেরণ নিবৃত্ত করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ছাত্র এক মাস করিয়া তাহার সহকারী থাকিবেন, এবং দুই জনে দ্বিনিমি হাসপাতালের কার্য করিবেন।

(ঙ) আপাততঃ ২৫ জন রোগি হাসপাতালে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতেছে, এবং ১৫ জন রোগি গ্রামে দেখাইয়া ঔষধ লইয়া যায়। বাহ্যতা হাসপাতালে থাকে, তাহারাই এই স্থানেই আহার্য্যি করে। বাহ্যতা ঔষধ লইবার জন্ত না

আদিতে পারে, দস্তব হইলে এপথিকারী স্বয়ং বিরা-
দিক্ষকে বেধিয়া আসেন।

৪। ১৮৩৪ গুটাবে, ১লা জাহাঙ্গীরী তারিখে ডে গ্র্যান্ট
(J. Grant) সাহেব, মেজর ট্রয়র (Major Troyer)
সাল্বেকে যে পত্র লেখেন, তাহার ভাবার্থ এই—

(ক) এ বৎসর ৮৬ জন রোগী হাসপাতালে আছে,
এবং ১১২ জন রোগী বাহির হইতে আদিগ ও যোগ দেখাইয়া
ওঁস লইয়া যায়।

(খ) মধুসূদন গুপ্ত ও নব-
কৃষ্ণ গুপ্ত ‘মেডিক্যাল-কলেজ’
জন্ত কয়েক পরিগ্রহ ও আহার
দ্রব্যের রূপ সাহায্য করেন। মধু-
সূদন হাসপাতালের ভার লইয়া
যাত্রা পাকেন। নবকৃষ্ণ এপথি-
কারী (Apothecary) হই-
য়াছেন।

(গ) বাবু রামকমল দেন
‘মেডিক্যাল-কলেজ’ জন্ত প্রাণাধার
পরিগ্রহ করিতেছেন।

(ঘ) ডাক্তার জন টাইটলার
(Dr. John Tytler) ও
ডাক্তার মাউন্টফোর্ড ভোসেক
ডায়ালী (Dr. Mountford



কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ।

Joseph Bramley) ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিয়া তাহার
কল আপনাকে পাঠাইয়াছেন। আমি বহু ছাত্রগণকে
পরীক্ষা করি নাই, পাছে আমার প্রিয় প্রভুগণ তাহাদিগকে
বলিয়া বিধি।

৫। ডাক্তার জন টাইটলার (Dr. John Tytler),
মেজর ট্রয়রকে (Major Troyer) যে পত্র লিখিয়াছিলেন
তাহার ভাবার্থ এই :—

(ক) সংস্কৃত আর্সেন-বার্নে অনেক জ্ঞানগর্ভ তথ্য
আছে। কোন কোন বিকর আর্সেন-বার্নের সহিত আমাদের
নাহেব মিল না থাকিলেও আমি আর্সেন-বার্ন ভাল বলিয়া
মনে করি। ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ যে আর্সেন-বার্ন
চিকিৎসকগণ অপেক্ষা ভাল চিকিৎসা করিয়া থাকেন,

তাৎপরে আমার বিশ্বাস চর না। এ বেশীর রোগিগণ, এ
বেশীর প্রাণহান্যের এ বেশীর চিকিৎসক যাহা চিকিৎসিত হই-
লেই ভাল হয়। তাহাদের চিকিৎসা-প্রণালী অগ্রাহ্য করিয়া যে
আমরা ভোর করিয়া তাহাদিগকে আমাদের প্রণালীতে
চিকিৎসা করিব, প্রকট কিছুমাত্র অদিকার আমাদের নাই।

(খ) যে সকল ছাত্র আমাদের ‘মেডিক্যাল কলেজ’ হইতে
উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়া যিগাছেন, তাহারা পান অর্জেন্ট-মডার্ন-
মারিট চিকিৎসা করিয়া থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে

তবে তাহারা বিনামূলী প্রণালী অবলম্বন করেন। তাহাদের
রোগিগণ অর্জেন্ট-চিকিৎসাই ভাল বলেন।

(গ) আমার এই অভিপ্রায় যে, অর্জেন্ট-মডার্ন গ্রাম
করা কিছুতেই উচিত নহে। আগও আমার ইচ্ছা যে,
ইংরাজী ‘মেট্রিকা মেডিকা’ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অস্থায়
করিয়া ছাত্রগণকে অধ্যাপনা করা হউক।

৬। ১৮৩৪ গুটাবে, ২ সেপ্টেম্বর তারিখে সংস্কৃত-
কলেজের ইংরাজী-অধ্যাপক উল্ফস্টন (Mr. Woolleston)
সাহেব, সংস্কৃত কলেজের মেজর এ ট্রয়র (Major A.
Troyer) সাহেবকে যে পত্র লেখেন, তাহার মূল বস্তু
এই :—

মৃত্যুদণ্ড শুধু পূর্বে 'মেডিক্যাল-সাসের' ছাত্র ভিনেব, এক্ষণে তিনি ইহার শিক্ষক হইয়াছেন। কবেও যে সকল পণ্ডিত অর্জেন, টনি তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি 'চপম্যান এনটনিষ্টম্ ভেডমেকা' (Hooper's Anatomists' Vade mecum) নামক ইংরাজী গ্রন্থখানি সংস্কৃত ভাষায় অনূবাদ করিয়াছেন, এই হেতু তিনি ১৮৩৩ টাকার পুরস্কার পাইয়াছেন।



৮৬ ছাতিসের বৈজ্ঞানিক।

১। 'সংস্কৃত মেডিক্যাল-সাস' যে সকল পুস্তক পণ্ডিত হট্ট, তাহাদের নাম এই :-

Hooper's Anatomists' Vade mecum, Physicians' Vade mecum, Surgeon's Vade mecum, Thomson's Conspectus of the Pharmacopoeia, Toyle's Manual of Chemistry, Conquest's Outline of Midwifery, Tropical Diseases by Twining and Smith, Plagues by Dr. Thomas, Book on Vaccination — J. C. C. Sutherland, G. C. P. J. and A. Troyer.

মাস্তালা-কলেজে মেডিক্যাল-সাস। (১)

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'সংস্কৃত-কলেজে মেডিক্যাল-সাস' খোলা হইয়াছিল। তিন এক দিনেই 'মাস্তালা কলেজে

মেডিক্যাল-সাস' খোলা হয়। পূর্বেকার সাস হিম্মতবাব জয় এবং পরোক্ষ সাস মুদনজান-গণের জয় নিশ্চিত হইয়াছিল। মাস্তালায় 'মেডিক্যাল-সাসে' আরও ভাষায় পণ্ডিত কয়েক-গনি আর্গেন্টের-পাশ পণ্ডিত হইত। এতদ্ব্যতীত 'নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশনে' (Native Medical Institution-এ) ইংরাজী চিকিৎসা গ্রন্থের যে সকল উচ্চ অনূবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও সেখানে ছাত্রগণ পাঠ্য করিত। কিন্তু তখনকার দিনে এট যে, অতি অল্প ছাত্রই ভর্তি হইয়াছিল, এবং তাহারা বিশেষ উচ্চত করিতে সক্ষম হয় নাই। সংস্কৃত-কলেজ ও মাস্তালা কলেজের 'মেডিক্যাল-সাস' ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, ২৮ ভাদ্রয়ার তারিখে লর্ড উইলিংদন বেটিক ডুগিয়া দিয়া-ছিলেন।

মাস্তালা-কলেজে নিম্ন-লিখিত আরও আর্গেন্টের পুস্তক সকল পণ্ডিত হইত :-

Ayurveda, Akshuraca, Shurub, Suleedra, Kananchah, Ancooool mooharra-hara (translation of Hooper's Anatomists' Vade mecum) --General Committee of Public Instruction, 1833, Vol. XII.

সুদীর্ঘান বিশারদ-কর্তৃক 'বৈজ্ঞ-সমাজ'-গঠন

ঐচ্ছিক-কলচ্ছানি সুদীর্ঘান বিশারদ মহাশয় 'সংস্কৃত-কলেজে' আর্গেন্টের পাশের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে যে মাসের প্রথমদে কোন অজ্ঞাত কারণ-বশতঃ তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন মৃত্যুদণ্ডে ভগ্ন ঐ পদ প্রাপ্ত হন। বিশারদ মহাশয় গোড়ামার্কো-বিদ্যার ইচ্ছাবশতঃ বহুয় বাটীতে একটা সভা-স্থাপন করেন। এত সভার নাম 'বৈজ্ঞ-সমাজ'। ১২৩৮ বঙ্গাব্দে, ৪ শ্রাবণ, বুধবার দিবসে তিনি এই সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। মধ্যমত বৈজ্ঞ কবিরাজদিগকে তিনি যৌথ অধিগ্রহণ জ্ঞাপন করিয়া করিলেন, 'আমরা এই 'বৈজ্ঞ-সমাজ' হইতে আর্গেন্টের ঐচ্ছিক সকল প্রস্তুত করিব, এবং বৈজ্ঞ কবিরাজ ভিন্ন অন্য ভাটী কবিরাজকে ইহা বিক্রয় করিব না। বিশেষতঃ, অল্প ভাটী কলিগ্রাহ যদি কোন যোগ্য চিকিৎসা করে, তবে আমরা (বৈজ্ঞ-কবিরাজ-গণ) সেই যোগ্য চিকিৎসা করিব না।'

(১) মাস্তালা-কলেজের 'মেডিক্যাল-সাস' লক্ষ্য ছিলেন তখন পাণ্ডুলিপি নাই। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, ১৪ জুলাই তারিখে বহুমান 'কলিগ্রাহ মাস্তালা'

মাস্তালায় জন্ম হাপন হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, আশ্বিন-মাস হইতে নির্দিষ্ট-অল্প কলেজ খলিত হইতে হয় :- শেষক

[৮০]

সত্যজিৎ ভাষা বাহ কবীন্দ্র বিবচিত পা ও ব বি ভ র বা
বি ভ র পা ও ব ক খা টে বাঙ্গালার ম হা তা র তে র
প্রাচীনতম ‘অমৃতবান’। অমৃতবানপে গঙ্গাপের ‘অমৃতবান’
বুজিতে চাইবে। উনবিংশ শতকের পূর্বে সমগ্র ম হা-
তা র তে র কোন বাঙ্গালী অমৃতবান রচিত হয় নাই। দৈবাৎ
চুই একটি পুঁথিতে ‘কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল পদ্যর’^১ ইত্যাদি-
কায় ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়া অনেক মনে করেন যে, কবির
নাম ছিল পরমেশ্বর এবং তাঁহার উপাধি ছিল ‘কবীন্দ্র’। কিন্তু
কোন প্রামাণিক পুঁথিতেই ‘পরমেশ্বর’ নাম পাওয়া যায় না।
‘কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল পদ্যর’ ইত্যাদির ভণিতাই সিঁচিকার
প্রদানে ‘কবীন্দ্র পরমেশ্বর’ পরিণত হইয়াছে এই অতৃণন
কবিরার পক্ষে সম্ভব কারণ আছে। অথবা এমনও হইতে
পারে যে, পরমেশ্বর নামক কোন ব্যক্তির নাম কথামতো
প্রথিত কবিতা দিয়াছেন।^২

কবীন্দ্র ম হা তা র তে র সমগ্র কাহিনীরই অমৃতবান
কণ্ঠাঙ্কিতেন, স্বীকর্ত পদ্যর নহে। কবীন্দ্রের সমগ্র
ম হা তা র তে ত্রিগৌতম শাবী কবুঁক সম্পাদিত হইয়া
প্রকাশিত হইয়াছে। কবীন্দ্রের দ্বারা সংকল্প, কবীন্দ্রায়
প্রবৃত্তির কাব্যের মত স্রুত্বং নহে। সংক্ষেপে রচনা কবিরার
ইতিহাস কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন।

[৮১]

কবি এবং কাব্যের বিষয় বাহা পা ও ব বি ভ র হইতে
জানা যায় ত্রায়া এই। গোড়ের স্রুত্বন আলাউদ্দীন হুসেন
শাহের অষ্টম প্রদান সেনাপতি (শবর) পরাপল পান
চট্টগ্রাম ও ত্রিপুয়ার গুর্খাে প্রেরিত হন। তথায় বিজয়ী
হইয়া স্রুত্বানের নিকট প্রচুর সন্ধান ও বিশাট প্রাপ্ত হন

১। এই গ্রন্থে বাদ্য অষ্টম ‘পরমেশ্বর’ নাম (৭) পাওয়া যায় না।

২। ব বী চ র চিত্রিত অষ্টম শতক ম হা তা র তে, ত্রিগৌতম
শাবীকবুঁক সম্পাদিত ও হুঁকী, আগায় হইতে প্রকাশিত। কুঁদিকা,
পৃঃ ৯০।

এবং ঐ অষ্টমশতাব্দী রচিত। সত্য ম হা তা র তে র কাহিনী
তমিতে তমিতে একদিন পরাপল পানেন ইচ্ছা হইল, তিনি
সংক্ষেপে ‘মহাভারত পাচালী’ তমিবেন। পরাপলের আদেশ
শিত্রোথাক্ষ কবিতা কবীন্দ্র ‘মহাভারত পাচালী’ রচনা করি-
লেন। ইচ্ছাই কাব্যরচনার ইতিহাস। হুসেন শাহ ১৪১২
খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। স্রুত্বর কাব্যরচনার কাল
যৌক শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক ধরা হইতে পারে।

কবীন্দ্র অমৃতবানপে আঘা। পুঁথিতে রচনা বাহ কবির বিজয়।
কুঁদিকা আগালীন ৩ অষ্টম শতাব্দী। এ তিন কুঁদিকা বাহ কবির আগায় ৪
সাতা টোপার নিম্ন কবিতাে রোড়া। পরাপল পালক নিম্ন এক শত রোড়া।
ঐশ্বর্য্যর বাহা অতি সে কবিতা। এ তিন কুঁদিকা বৈক অমৃতবান রচিত।
সত্য পরাপল ও সত্য কাহিনী। সেন যত পাওয়ে হাঙ্গুলি মাহতাবী।
অমৃতবান কবিতাক্ষ বাহ কবিতা। কোন মতে কবিতা হইল কবিতা।
অমৃতবান কবিতাক্ষ অমৃতবান কবিতা। কোন মতে সত্য ম হা তা র তে র
এই সব কথা কবি লিখিয়া। কবিতাক্ষ তমিতে পানি পাচালী রচিত।
সত্য ম হা তা র তে র কবিতা কবিতা। কবীন্দ্র পরমেশ্বর পাচালী রচিত।

চাকি বিবিত্তাপনের ২০২৩ সংখ্যক পুঁথিতে (সিঁচিকার
১৯১০ শতক) আছে—

অতি বাহ ১ তম কবিতা কবিতা। পুঁথিতে কবিতাক্ষ সিঁচিকার কবিতা।
কুঁদিকা আগালীন ৩ অষ্টম শতাব্দী। ঐশ্বর্য্যর বাহ কবিতা।
সত্য ম হা তা র তে র কবিতা কবিতা। পরাপল পালক নিম্ন এক শত রোড়া।
সত্য ম হা তা র তে র কবিতা কবিতা। কবীন্দ্র কবিতা কবিতা পাচালী রচিত।

কবীর সাহিত্য পরিষদের ১৯২৩ সংখ্যক পুঁথিতে আছে—

ঐশ্বর্য্যর বাহ কবিতা। কবিতাক্ষ অমৃতবান কবিতা।
কুঁদিকা আগালীন ৩ অষ্টম শতাব্দী। ঐশ্বর্য্যর বাহ কবিতা।
অমৃতবান কবিতাক্ষ বাহ কবিতা। কোন কোন কবিতা কবিতা কবিতা।
অমৃতবান কবিতাক্ষ বাহ কবিতা। ঐশ্বর্য্যর বাহ কবিতা।
এই সব কথা কবি লিখিয়া। কবিতাক্ষ তমিতে পানি পাচালী রচিত।

১। আগালীন, আগালীন কবিতা পাঃ। ২। ‘পরমেশ্বর’।
৩। ‘সত্য’। ৪। ঐশ্বর্য্যর বাহ, কবিতা পতিত ও সত্য কবিতা মাহতাবী
—ঐশ্বর্য্যর বাহ কবিতাক্ষ। কবীন্দ্র অমৃতবান পতিত, কবিতাক্ষ, চট্টগ্রাম
কবিতা, পৃঃ ১৯০। ৫। অতি বাহ পাতাক্ষের নিম্ন কবিতা। ৬।
সিঁচিকার ১৯১০ শতক। ৭। বাঙ্গালী আত্মীয় পুঁথির বিবরণ, কুঁদিকা
—দ্বিতীয় মতে, পৃঃ ১১০।

করিলে বাগ্যাবলি বুঝা নাটবে। 'সত্তর বচনা' এবং
অল্পমিত্তি ব্যক্তি 'কৈল পাচানী প্রচার'।

গিনিই হন, একজন সংগ্রহকার (৩ কবি) যে জোড়া-
ত্যাগ দিয়া 'সত্তর মহাভারত' সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা
অস্বাক্ষর করা অস্বাভাবিক। এবং এটী সংগ্রহকার যে
পৌরাণিক সত্তরের অন্তর্গত আত্মগোপন করিতে চেষ্টা
করিয়াছিলেন তাহাও স্বাভাবিক। এখন কথা হইতেছে তিনি
কে? এটী সমস্যার সমাধান একটুই টান্ডা পাওয়া যায়
একটি মহাভারত পুঁথির ভূমিকা। 'মহাভারতের পুঁথিতে
একাধিক কবির ভূমিকা আছে। তন্মধ্যে সত্তরের কণ্ঠকত্তনি
ভূমিকা নথ্যমান। ভূমিকাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া বিচার
করিতেছি।

হরিদাসেন দেব কবি বীর খতি : সত্তরভাষ্যানে কৈলা অমূল্য ভাবতী ॥

বাল্লভের ভাষ্যে বাক্যভর জ্ঞান : সত্তর গুণী কৈল পাচানি প্যার ॥

১। সত্যেন স্বাক্ষর্য পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সর্গ, বনবি-
ল্লিখিত কবির সন্ধান, বীর খতি : পুঁথি-লেখক হইতে প্রকরণত,

পৃঃ ১১২।

জ্যোতীর্ষ্য শোভা

কবিগণ সত্তর ভাষা

ব্রহ্মদেব হইতে কৈলা।

বীরবীর খতি

হরিদাসেন খতি

জ্যোতীর্ষ্য কবির সত্তর।

জ্ঞান বিশেষত নানাসময়।

হরিদাসেন দেব স্বাক্ষর সত্তর।

এখানে দ্বিতীয় ভূমিকাটিতে 'হরিনারায়ণ দেব' বার্ষ-
স্বাক্ষর; কিন্তু অপর দুইটি ভূমিকায় 'হরিনারায়ণ দেব'
অন্বিতভাবে কবির নাম বৃদ্ধাইতেছে। প্রথম ভূমিকাটি
হইতে আরম্ভ আরম্ভ ভূমিকায় পানি যে, কবি 'সত্তর' এই
উপনাম (অভিমান) আশ্রয় করিয়াছিলেন। 'দেব'
ব্রাহ্মণের উপাধি হয় না, সুতরাং 'হরিনারায়ণ দেব' কবির
নাম হইলে, কবির ব্রাহ্মণত্বের হইতে পারেন না। ত্রীমূর্ত্ত
দোমেনপেত্র পেন মহাশয়ের মতে কবি বৈদ্যবংশীয় এবং বিক্রম-
পুর বান্দী ছিলেন, কিন্তু কোথা হইতে যে এই সংবাদ পাওয়া
গেল তাহা তিনি বলেন নাই।

(ক্রমঃ)

পুস্তক ও গ্রন্থ

পুস্তক : বীর জ্যোতীর্ষ্য খতি, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ডে বিজয়ল চরিত্র উল্লেখ করা যে বৈদ্যো পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট হয়, একটি অপরটির
পুস্তক : একটি যে খণ্ডে আত্মক করেন, অপরটি তাহা পেন করেন : সত্তর ভাষ্যের আত্মক পুস্তক হইতে, পেন গ্রন্থ হইতে : সত্তর-পাচানির আত্মক গ্রন্থ
হইতে, পেন পুস্তক হইতে : উপাধি-সত্তর আত্মক পুস্তক হইতে, পেন গ্রন্থ হইতে : বাল্লভের বীর-পাচানির মত বৎ কিন্তু কর্তৃক কথিত হয়, তাহাও অত্যন্ত
কর্তৃক কথ্যে পুস্তকটিতে ওপলভিত পুঁথি হইতে সম্বলীভূত এবং কথ্যে-পুঁথি বীর-পাচানির ওপলভিত পুঁথি হইতে সম্বলীভূত। দুই জনের কর্তৃক
নইল একটি পুঁথি বাল্লভের কর্তৃক হয়। দুইজন সমর্থ অথবা সমস্ত অথবা সমস্ত কর্তৃক বর্ণিত নহে। দুই জনের সমর্থ কর্তৃক বাওঁ তাহাও
আত্মকরণ কর্তৃক অসম্বলীভূত এবং তাহাতে বীর-পাচানির লিপ্যন্তর প্রাপ্তি। কয়েক বাল্লভের ব্যক্তিগত কর্তৃক অসম্বলন করিত হইলে, একজনই
গ্রন্থকরের কর্তৃক বিতর হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে ব্যক্তিগত হইবে, এই বিচার শুধু কর্তৃক করা যকস। সত্তর এক কর্তৃক—দুই জনের দুই পুস্তক
রকসের কর্তৃক তাহাও সম্ভব। কয়েকই কর্তৃক অসম্বলন করিবার সময় গ্রন্থ-পুস্তকের মত দুই জনের কর্তৃক পাওয়া যায় না।

হাম্বুর্গ—কলি—লণ্ডন

—শ্রী অমূল্যচন্দ্র সেন

মার্চের শেষেই শ্রী কবিরা বঙ্গের আবির্ভাব হইল। বঙ্গের একাশটি এদেশে বসন্ত-সমাগম নহ, বঙ্গের অঙ্গমন হাত। 'ইন্দিকান' বাঙালীলোকে যেমন মৃগা অস্ত্রস্তার লক্ষ্যে আসে, মুকুল, উগ্রগন্ধ মূল, কোকিলের কলার ও কোড়ো দক্ষিণে হাওয়া লটখা পাগলের মত বঙ্গের আবির্ভাব হয়, এখানে তার বিপরীত। এই আচমকা প্রচুর্যের অন্তরে, লোক 'ফ্রুংলিং' (Frühling, বসন্তকাল) আসিয়াছে, ফ্রুংলিং আসিয়াছে' বলিলেও আশাওর প্রশংসা বিখ্যাত চণ না, বহু মনে একটু অবজার ভাব আসে এই ভাবিয়া যে, "ও এ তোমাদের বসন্তকাল!" কিন্তু হুট এক দিন-বাইতে ঘাইতে তফাৎটা বুঝা যায়। চাঁদ একদিন বাগানে পাণীর হাঁক শোনা যায়, হাঁস একদিন সেবা যায়, নৈত্তিক গাছগুলির ডালে ডালে অসংখ্য মধুমা 'ব্রণ' নির্গত হইয়াছে। তার পরদিন আশ একটু, তার পরদিন আরও একটু, এইভাবে অতি নীরে এত ব্রণগুলি বাড়িয়া পাতার আকার ধারণ করে, ক্রমে গাছে গাছে ফুঁড়ি পড়ায়; কি বড় গাছ, কি ফুলগাছ, সবতেই এইভাবে অতি নীরে কিছু অতি সুস্পষ্টভাবে, যেন বাণা বাহ এমন ভাবে, যিনের পর দিন চোখের মাঝে ফুলপাতা ও মজারী বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপ নিঃশব্দ লম্বু আবির্ভাবের একটা চারি দিক্তর বৈচিত্র্য আছে। অচর্ধ্য বহু বয়স্কদের "ক্রেসকোগ্রাফ" বস্ত্রের "হুনে" উজ্জিসের বৃত্তি, মাধকগ্রন্থোপে মত্ততা ও বিহগ্রন্থোপে ছটকট করিয়া স্তম্ভার গতিরেশান্তি বহু সহস্রগুলি বিন্দিভভাবে প্রকাশিত হইয়া যেমন শুড় প্রকৃতির অন্তরালে প্রাণবক্তির অদ্ভুত নীলাকে পরিষ্কৃত করে, সেইরূপ বঙ্গের আগমনে সুশ্রুৎপ্রতির মনোভাগরণের যে নীলা খচিত আশাদের দেশে ভিন্ন দিন লাগে, এখানে তাহা ভিন্ন দণ্ডায় ধরিয়া দেখার প্রকৃতির প্রাণবক্ততা যেন বেশী সজীব হইয়া ধরা পড়ে। যোড়ার লাক বা খেলোয়ড় শোর্টল্যান্ডের যে কারিকুটি বর্ণিত চমক লাগে, তাহাই এখন আবার সিনেমাতে "স্ট্রো" ছবি আকারে দেখা যায়, এখন অল্প বকবন একটা তপ

পাওয়া যায়, হা বাপারটা বেশ বুঝা যেন। সেইরূপ এদেশে বঙ্গের এট "স্ট্রো" ছবি যিনের পব তিন ধরিয়া দেখি। যেন হয় যে, প্রকৃতির ঐশ্বর্যবহুর যেন আরও একটু বেশী পবর পাইলাম।

বঙ্গের মতো অর্থাৎ প্রীতির আগেট, দিন কয়েক বেশ পবম পড়িল। ক্রমে পূর্বা গীর আসিল, বড় বড় গাছের

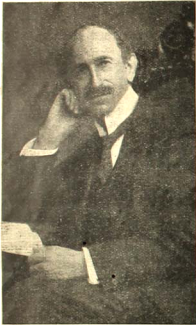


বিজনবর্ণ ও হিন্দুঃ।

ফুলের ফুলকে বাতাস ঘিট হইয়া উঠিল, বাতাস ও উত্তানের নানাবিচিত্র বর্ণের, নানা আকারের ছোট বড় ফুল ফুলের উজ্জল খেলাটা দেখিবার মত। এদেশের আবহাওয়া এত পরিবর্তনশীল যে ছদিন আকাশ পরিষ্কার থাকিলেই তা হয়, কালট বৃষ্টি হইবে! তবে এবার আশাওর ভাণা তপ,

কুণ্ডলভিত্তি বর্ণিত হইল, পত্নী পঞ্চাশ বৎসরে নাকি এমন সুন্দর ও দীর্ঘ প্রাচুর্যসম্পন্ন দেখেন হয় নাই। এত দিনটায় জোপ হইয়া বেশ আলো হইয়া বাহ্য আর সকল দৃষ্টিতে নটা দশটা পর্যন্ত বাহিরের আলোতে দৃষ্ট পড়া যায়। গরম ভাষা কাপড় কেবল ছাড়ে না দৃষ্টে, তবে ছলটী আঁপটে এক একদিন শুধু গেলি গালে না একেবারেই যদি গালে গলে বলিয়া কটাইয়াছি। গরম পড়িলে এখানে লোকের মাংস খাওয়া কনষ্টেবল, নানাসকনের সার্ভিস, ফরেষ্ট, আইনজীবী

সহিত নিম্নলিখিত মাংসভোজনের তুল্য কলসপত্রী নাকি মানব-শরীরের পক্ষে অসম্ভব আছে, তিনি বলেন সচ-কল্পিত ভোগের মূল না হউক এখানে কারণ, নিত্য আদিত্য ভোজন; তিনি বহু চিন্তাক্রমে সৌন্দর্যকে যে চিকিৎসা করিয়া লাইয়াইছেন, তাহার প্রধান ব্যবস্থা খাদ্যখাদ্যবিচার ও সর্গপ্রকারের আদিত্য এককালে ত্যাগ; কেবলি প্রমাণের উপর তিনি ভাঙনবের জোপে আবদ্ধ দিয়া দেখাইয়াছেন, নিয়মিত ভোজনে সৌন্দর্যের পরীয়েই কিরণ পরিবর্তন আসে ও রোগনাশে সহায়তা করে। ডাঃ দাসগুপ্ত বলেন যে, আধুনিক কেমিস্ট্রির জ্ঞান না থাকিলেও এবং কেমিস্ট্রির ভাষায় বিচার ও ব্যবস্থাদি না দিয়া থাকিলেও আমাদের প্রাচীন কবিতাভাষা তাঁহাদের empirical অভিজ্ঞতা হইতে রোগচিকিৎসা ও খাদ্যখাদ্য সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন তাহা অল্পের অল্পের সত্য। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া কেমিক্যাল গবেষণা দ্বারা সুনিশ্চিত হইয়াছেন যে কবিতাভাষার প্রত্যেক কথাটির প্রগতি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। ডাঃ দাসগুপ্ত শ্রীযুক্ত তাঁহার গবেষণাগুলি প্রকাশ করিবেন। এ পর্যন্ত তাঁহার সব পরীক্ষাগুলিতেই তিনি সন্তোষজনক ফলাফল করিয়াছেন : তাঁহার পরীক্ষা ও প্রমাণ-গুলি বৈজ্ঞানিক মূল্যে প্রকাশিত হইলে আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। ডাঃ দাসগুপ্ত আরও একটা কথা বলেন যে, এদেশের দেশে আমাদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া বেশী “ন্যায়েনটিক্‌”, কারণ এরা দৃশ্য ছাড়া অল্প সব জিনিষ যে ফলে সিদ্ধ করে, খাইবার সময় সে ফলটা ফেলিয়া দিয়া জিনিষটিকে টেবিলে রাখিয়া করে এবং ইহাতে বাহ্য মাংস তরীতরকারির অনেকগুলি উপকারী দ্রব্যগুণ দ্বারা ফলে সিদ্ধ করিয়াখাদ্য বাক্সি হইয়া আসে, তাহা পরীক্ষাখণ্ডের কাজে লাগে না; আমাদের রাসায়নিক জ্ঞান আদিত্য কোল গ্রাহিবার সুবুদ্ধি করিয়া এই অগচ্চ নিয়মের করি।



শ্রীযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত জাভানজি স্ক্রাডার (Schradet) :

প্রকৃতির ধর্ম পড়িয়া যায়, দৃষ্ট বোশও বেশ চলে। আমাদের দেশের অনেকে বোর গ্রীষ্মেও মাংস ভিন খাইয়া দ্বাদ্বা ও আত্ম হারান, রোগেও ভোগেন, কিন্তু ভাবেন যে বুঝ সাহেব হইয়াছেন, কারণ সর্গব্যবস্থা মাংসাদি বরাদ্দ করিতে না পারিলে নেতিভব প্রমাণ হইয়া গাইবে! আসল সাহেবরা কিন্তু দেখিতেছি সরসের সময় পরীর গায়ে ঠাণ্ডা থাকে সমস্ত সেইরূপ পাখি খায়—তবুও আমাদের গ্রীষ্মের দেশে এদের গ্রীষ্ম কত কম। এখানকার ডাঃ দাসগুপ্ত

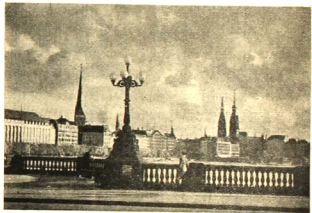
বেশী মতে কাঁচা মাংস মূল্য প্রকৃতি খাওয়া ছাড়িয়া বাহ্যায় বিলাতি মতে স্নানাদ খাইয়া ভিটামিনের পাতিব বজায় রাখেন তাঁহাদের জ্ঞান প্রমাণিত হইয়াছে একটি স্নানভেদে শব্দ বিতেছি। ‘জিনিথট’ পুই সোজা ও খাইতে কুই সুখাঙ—স্নানভেদে (বুঝ পাতলা বাঁধাকপি জাতীয় নাকি) ভিতরের সিকের কচিলাতা ঘিনিট বন পনের একটা পুয়া লেবু রস ও মাখা চিনি মিশ্রিত আধাটি বোশে ভিজাইয়া পরে ঝোলমাখা সেই পাতা গাইয়া দেখিলেন, কেমন তৃপ্তি

হয়। এখনকার লোকের ঐতিহ্যবিশ্বাস অনেক বহুকের। চারিদিকে টবের ভুলে বেয়া "বাস্তবিক" উপর নানা বর্ণের চামোয়া বা "সান্-পেড" ছাড়া খাড়া করিয়া তাহার নীচে বসিয়া সকাল বিকাল চা কফি খাওয়া, মুসলিমিত বাগানে বসিয়া বৈকালে চা খাওয়া খুবই আনন্দ ও শোভার ভিনিব, আশাবের মত প্রত্যয়েনে খোলাখোলা জমিগা অনেক খাড়া সবেও, এই মুকুট অভ্যাসটি যে কেন চলে নাই বলিতে পারি না। সহরের মধ্যে কক্ষেগুলি ভিতর ছাড়াইয়া কুটপাথে চড়াও হইয়াছে, সহরের উপকণ্ঠে বেখানে একটু ভল বা পাছাড়া বা অস্ত্র বহুকের সন্মানবধ আছে, তার কাছাকাছি কক্ষেগুলির বাগান। ও বাগান লোকে গিলগিল করিতেছে। তারপর আছে নৌকাবিহার, বনে বেড়াইতে খাওয়া, নদী ও সমুদ্রে স্নান, বা সহরের বাহিরে মাঠখাতে ছুটির দিন পটান। ছুটি পাটলেই লোকে একটু "এক্সক্যুরশন" করিয়া আসে। রোড-সেবনটা এই সব বহুকের ঐতিহ্যবিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল। বটটা' সমুদ্র তাক্ষবসন হইয়া প্রবেশ দিকে মুখ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া "সান-বার" খাটতে এদের মহানন্দ। রাত্রে একটু "পানবারক্ট" হওয়া বড়ই কামনার ভিনিব। আগে এই রোড-স্নান বা স্নানঘনে উপলক্ষে "নিউড-কাণ্টের" খুব চকো ছিল, এখন নাটসি-সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ইংলণ্ডের অনেক শাসনভীরের ছোট সহরগুলির নিউ-নিশিগারিটি ও পুলিশকে এই নমস্তাবাসীর উপর কড়া দৃষ্টি রাখিতে হয়, যাতে বেশী বাড়াবাড়ি না হয়। হুই সবাই, তবে স্ত্রীবাঈশ্বরী বেশী আগন্তি করিলে পুলিশও একটু আগন্তি করে এবং কায়মে লেখালেখি প্রকৃতি কেলেকারি হইলে কর্তৃপক্ষ "অফিসিয়ালি" প্রকাশ করেন যে "কিছুই হয় নাই, আশাবের পুলিশের কড়া দৃষ্টি আছে যে স্ফুটি স্নেদ লক্ষিত না হয়!" কি নৌকাবিহারে, কি নদী বা শাসনভীরে, কি বনে বা মাঠে বেখানেই তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী একত্র হয়, সেখানেই প্রণয়ী-প্রণয়িনী বন্ধ-বান্ধবী আশ্রয়ন-

স্থানাদি অস্বাদী ভাগের নিমিত্ততার আধিকা লেখা যায়। কল্পকল্পীভার বিবিধ বিধির প্রকাশ লীলা অবশ্য এ বেশে জোখ-সজা না করিয়া লইলে উপায় নাই।

গত মাস কয়েকের মধ্যে জার্মানিতে অনেকগুলি উত্তেজনা-ভরক বাপার ঘটয়া গেল। প্রথম, রাষ্ট্র-তাইন্-চাপেনবার কোন্ পাপেনের (Von Papen) মাতৃদুর্গ টাইনিভাসিটিতে বন্ধুতা। এ বন্ধুতার কোন্ পাপেন্ নাটুসিনের কার্যে প্রণালীর কিছু বিলম্ব সমালোচনা করিয়াছিলেন। বন্ধুতার পূর্বেই কোন্ পাপেন্ পাহুনিপি প্রেসিডেন্ট হিগেনবুর্গকে সেপাটয়াছিলেন এবং হিগেনবুর্গ তাহা অমূল্যলেন করিয়া-ছিলেন। কোন্ পাপেন হিগেনবুর্গের দিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।



হামবুর্গ।

বন্ধুতার পর হিগেনবুর্গ টেলিগ্রাফে কোন্ পাপেনকে অভি-নন্দন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই নাটুসি-সরকার ঐ বন্ধুতা বায়েগ্রাণ করিয়া ভাণ্যানিব কোন কাগজে উহার প্রকাশ নিষেধ করিয়া হেন। ইংরেজি, কয়ানী ও হুইন্স কাগজে লোকে কিছু খবর পাইল। কাগজে প্রকাশ বিলম্ব হইলেও কিছু টাইপ-করা পূর্ণ বন্ধুতাটি গুপ্তভাবে হাতে হাতে অনেক দূর গাণন হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্যায় গুপ্তভাবে নাটুসি-সরকারের বিরুদ্ধে বিতর্ক করিবার বহুবল করিতেছিল, তাহাদের হত্যা। এ খবরও বিশদভাবে আসিয়া বিদেশী কাগজে হাতে হাতে পাইলাম। বিতর্ক সহজে হতনকাওর

পুলিশ বা পথের সাধারণ লোকের কোন ধরনই ছিল না। জনৈকের বিশ্বাস যে, গবর্নমেন্ট-প্রকাশিত সংখ্যার চেয়ে আসলে অনেক বেশি লোক নিহত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, প্রেসিডেন্ট হিওনস্‌ফোর্ডের সত্যাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত-পত্রম। এই বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধী বৃদ্ধ বোদ্ধদের কল্পনামাত্রের চরিত্রবল টলটলানমান কাম্বান-শোণিতকাল-সমুদ্রে যেন একটা বিরাট অটল পেলু-বজ্রের মত ছিল। দুইবৎসর তিনি ব্রেন্ডেলসের আশ্রয় ও পরশপত্রের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। অবশেষে প্রাপ্ত বৃদ্ধ ভেনারেল যখন প্রেসিডেন্ট হইলেন তখন তিনি আপাদ্রম্যসাধারণের বিশ্বাসপ্তম হইয়াছিলেন : লকস্টেট ডামিট ব্যার সক্ষে কোন চাপাকি খাটিবে না, কষ্টব্য চাড়া অস্ত্র পক্ষে কোন মতেই তাঁহারকে কেহ লইতে পারিবে না। অতি চরিত্রমান খাটি লোক সব বেনেই যেমন চর, স্টেডল, ভেনারেল ও গ্যানিংটন বা বিজ্ঞানসর মহাপ্রের মত হিওনস্‌ফোর্ডের কথা ইহারই মধ্যে একটা বিশ্বস্তোতে লাড়াইয়াছে।

হিটলার যখন ভেনিসে গিয়া মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করিলেন তখনও এখানে গুরু হইতে হইয়াছিল। "হুস"র সঙ্গে খাতির রাখিতে সবাই চায়। তবে হিটলার বোধহয় এমন বিশেষ হাবি কিছু করিয়া আসিতে পারেন নাই। অস্ত্রিয়ান নটসিগের হাতে ডাঃ ডলফসের হস্তা আর একটা চাকলার স্তম্ভ করিয়াছিল। এট গ্রাহকানির পথের পাওয়াবার হুচে বনি বিজ্ঞানক্ষেপে ইটালিয়ান কৌতকে অস্ত্রিয়ান-সীমারে হাতিত ও খোঁজাফেন করিয়া না রাখিতেন, তবে যে বাগশার ফোন্টিকে কতক গড়াইত তাহা বলা যায় না। শেষতঃ, প্রেসিডেন্ট ও চাকলার পর একত্রীকৃত করিয়া হিটলারের স্তম্ভপতি-নিয়োগ। "ইল হুস"র মত হিটলারের উপাধি এখন হইয়াছে "ডের ফুহরার—der Führer" অর্থাৎ "নেতা"। ভোটার দিন কতক আগে হিটলার হামবুর্গে আসিয়াছিলেন। বার্লিন হইতে উড়িয়া আসিয়া এখানকার এয়ারপোর্টে নামিলেন, সেখান হইতে মোটরে সহরের মধ্যে হোটেল স্কেনেন। পথের দুইপাশে লোকারণ্য হইল; পুলিশ, গি.ও.ও.

খাড, ও ভেনারেল গোয়ের্গের লেখাপা শুভ পুলিশ রাস্তা পাহারা দিল। প্রথমে কয়েকখানি পুলিশ ও S.S.দের মোটর গেল, তারপর গুমানি পুলিশ-মোটর-বাইক দুইপাশ ঘেঁষিয়া আগাইয়া আসিল, ট্রিক পিছনেই একখানা মোটরে ড্রাইভারের পাশে লাড়াইয়া হিটলার এবং হাতে ছাত তুলিয়া অগ্লে, তাঁহার পিছনেই আবার পুলিশের গাড়ী, তাহার পরে ডাঃ গোয়ের্গের প্রভুতি অস্ত্র স্তম্ভনেভারের গাড়ী। হিটলারের চেহারা খুব সাধারণ লোকের মত; তাঁহার চোখে একটা "ফ্যানাটিক"র উদ্ভত ও স্বপ্নবর ভাব আছে, কিন্তু মুখে ও চোটে মুসোলিনির বহুসূতা নাই, বরং একটু কোমলই। মহাত্মা গান্ধীর শীতল অকর্মেণী ও সাব আ-ভোষের তীক্ষ্ণ প্রাণবাহকারী স্তম্ভির মত হিটলারের স্তম্ভিতেও একটা বোঝিনী শক্তি আছে, তাঁহারও স্তম্ভির সামনে কিছুকণ থাকিলে নাকি লোকে নিজে বাক্তির হারাইয়া ফেলে। বাক্তিপত ভাবনে ও বেশদ্বারা হিটলার অতি সরল ও সহজ মাহল, তিনি নিম্মাধিপত্যোত্তম ও এত কোমলচিত্ত যে, মাঠে বাগানে বেড়াইতে খেলে বন্ধুদের সাবধান করিয়া যেন, যেন গাছপালাকে কেহ নিরর্থক কট না দেয়। তাঁহার লম্বা উত্তম ও প্রাণস যেনেরও মনের ভুল, বস্ত্রতপকে যেনের রাজা হইলেও এতটুকু নিজের স্বার্থচিন্তা ও এতটুকু আত্মাভবর তাঁহার নাই।

হামবুর্গ হইতে কীল (Kiel) একসংগ্রেস ট্রেনে প্রায় কটা ঘুরকের পথ। কীল দুইখর সহর, এখানকার ইউনিভার্সিটি ১৬৬৬ সালে স্থাপিত। ব্যক্তিগত সাধারণের কয়েকটি বাসু পাহাড়ফর বসকুনির মধ্যে প্রসারিত হইয়া ফিজর্ডের (fjord) আকার ধারণ করিয়াছে। তাহারই তীরে তীরে কীল সহর ও বন্দর। ইউনিভার্সিটি প্রাচীন বাকীটি অকস্মাৎ ফিজর্ডের ধারে। ফিজর্ডের ধারে দুইর পাছাফ ও বনগুনি দুইখর বেড়াইবার জায়গা। এখানকার আরততবের অধ্যাপক প্রোফেসর অটো স্চ্রাডারের (Otto Schrader) বাকীতে নিম্নের ছিল। প্রোফেসর, স্চ্রাডার যখন অনেক মাস্ত্রাজের অভিজ্ঞতাহু খিয়লকিকাল পোসাইটর লাইব্রেরিয়ানরূপে ভাবতে ছিলেন ও দুইবৎসর ভারতবর্ষে অধ্যয়ন ছিলেন। ইহার স্বী কারিত্ত স্তম্ভ। তাঁহারের দুইটি মেয়ে, দুইমেয়েই ৩য় ভারতে, নাম সীতা ও ললিতা। প্রোফেসর ও ক্রাউ

* হিটলারের ডটম-লিটল ট্রিকলে বিতক—(১) S. A. অর্থাৎ ইল' আফটাইলু-Storm Abteilung,—ইংরেজি সাধারণ "ইল টপার": (২) S. S. অর্থাৎ Sturm Schutz ইল' টপল—ইংরেজি সাধারণ "ইল টপার"।

গ্রোফেনারের সঙ্গে ডুইসভর্গে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে বলিতে তিনিতে পাউলার, যেন আর একটি ধরে নারীকণ্ঠে থিরেটোরের হিহাঙ্গাশেষ মত শোনা বাটতেছে—জাউ গ্রোফেনার হাঙ্গিয়া জানাইলেন যে তাঁহাদের বড় মেয়েটি সম্প্রতি এন্গেভর্ড হইয়াছেন, সেই উপলক্ষে উহারা কিছু আদ্যোব-প্রয়োজের আয়োজন করিতেছে। অতঃপর অস্বাভাবিক যাত্রার আশ্বাসে ভারী জানাচাকে সঙ্গে লইয়া ছুড় মড় করিয়া ক্রিস্তী সীতা ও ললিতার ডুইসভর্গে আবির্ভাব ও অতিথির সঙ্গে আদ্য-আপ্যারবাদি হইল। ছেপেলেবার আডিরারে থাকিতে সীতা-ললিতা, তুলিয়ার, অর্শ্বণ তালিল বলিতে পারিতেন, এখন একটি কথাও মনে নাই। কিছুকণ

আলাপামির পর গ্রোফেনারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইলাম। কিগর্ডের ধারে একটা সাহাফের মাথায় রেতরীতে বসিয়া গ্রোফেনার অনেক পর করিলেন। ইনি বিখ্যাত অধ্যাপক ডরসনের (Dorson) ছাত্র; ডরসন এই কীলসেই মর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ডরসনের নাম ভারতীয় মর্শন-ইউনিয়ন খাগিয়া আশোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে সুপরিচিত। আখ্যাবের উপনিষদগুলি লইয়া ডরসন যে ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রমাণীতে বিশদ গবেষণা করিয়াছেন এমন বোধ হয় আর কোন পণ্ডিতই করেন নাই, যদিও উপনিষদ সম্বন্ধে

তিনি বহুটা নারী করিয়াছিলেন তাহার সবটাই বর্ধমান পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হয় নাই। উপনিষদের উপর ডরসনের একটা প্রগাঢ় ভ্রান্ত ছিল। প্রাডের গম করিলেন যে, ডরসন ইহুদন শোককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনে করিতেন, প্রথম নব্বাচাখা ও দ্বিতীয় শোপেনহাউয়ার এবং বলিতেন যে, এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এত বড় ইহুদন শ্রেষ্ঠ তিহাশিল দার্শনিকের ইহুদনেরই মনোভঙ্গের প্রধান বিত্তি ছিল উপনিষদ! তুত্যানবারও উপনিষদ পাঠ ও চর্চা ডরসনের প্রধান কাজ ছিল এবং অস্ত্রিন বুহর্ডে ছাখোখা উপনিষদের স্রোত উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার প্রাণবাধু বাহির হইয়া যায়।

প্রাডের গম করিলেন যে, মাত্রাকে থাকিতে থাকিবে, পণ্ডিতেরা তাহাকে “শ্রীমত” নাম নিয়াছিলেন। ভারতীয় নাম পাওয়া এখানকার ভারততত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বিশেষ সম্মানের বিষয় মনে করেন। ডরসন “সেবসেন” নাম পাউরাছিলেন। একবার হিম্মী অক্ষর “ক্রীদেবসেনচাখ্যার - কীলসে” ও ইংরাজীতে জাখানী দেখা থিকানাখাগা একখানি চিঠি জাখান ডাকবিভাগের হাতে আসে। ডাকবিভাগ উহার অর্থের করিতে না পারিয়া বালিন ইউনিভার্সিটির কতৃ-পক্ষকে অগ্রগোষ করেন যে, লিপিট বখন ডাকবিভাগের জানিত কোন ইউরোপীয় ভাষায় নহ, তখন উহার জাতি-নির্ভরে বালিনের অধ্যাপকদের সাহায্য প্রয়োজন। চিঠিখানি তখন



কিগর্ডের ধারে কীল নদী।

ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিশেষ বিভাগে বুরিয়া ভারতীয় বিকাশে উপস্থিত হয় এবং কথা সময়ে কীল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডরসনের হস্তগত হয়। এতেনের সামান্য একখানা চিঠি সম্বন্ধেও লোকের এইরূপ কণ্ঠবাদৃষ্টি। পণ্ডিত মাক্সমুলায়ের “মোকশুলার” নামকরণ লইয়া ইংরেজ ও আমেরিকান ভারত-তত্ত্ববিদরা “Salvation Meuller” বসিয়া রহত করেন, কিন্তু ভারতীয় সাধনার প্রেতবস্ত্র মোক্ষপংক্ত নাম পাওয়ার সকলেই তাহাকে মনে মনে হিংসা করেন। প্রাডের মন্তব্য করিলেন যে, বিশেষকৈ বেনে নাম দেওয়া ভারতীয়দের বিশেষত্ব; আমি বলিলাম, প্রাচীন গ্রীকরাও তা আমাদের ১৩ ও ১৪শতকে “সান্ত্রোকোতোদু”, পুঙ্কে “গোরোদু” পাটলিপুত্রকে

“পানিবোধা” ও পত্রাবের নদী ও বিভিন্ন জাতিসমূহ অসুস্থ
অসুস্থ ঐক্যবদ্ধ নাম দিয়াছিলেন।

পত্রাবের নিজ বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক চর্চা ছাড়া সবসময়
এক একটা “ইনসেক্টুয়াল” বাস্তব থাকে। পাণ্ডুর মাথা
বসিয়া কতিপয় কথিত শিখার টানিতে টানিতে প্রাচীর
বলিলেন, তাহার অনেক দিন হইতে একটা সমস্যা আছে যে,
ভারতে ভাষাকের প্রচলন হইল কবে হইতে ও কিভাবে।
প্রধান বিশেষ পত্রিতে ও অর্জুনে এ বিষয়ে অনেক
আলোচনা হইল কিন্তু সমস্তার ফলাফল কিছু হইল না,
আদি শেষে বলিয়া যে, অসম্ভবতঃ ঐক্যভাষার প্রসিদ্ধ
অধ্যাপক বালিদাস কলকাতার অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ
এ বিষয়ে কৌতূহল ছিল; অসম্ভবতঃ তাহার চাক্ষুশের মধ্যে
যে সব ইংরেজ বৃক পেকলে “সি-সিগন” ইত্যাদি ভাষাতে
আদিতেন, তাহাতে তাহার বসিতা হইত যে, তাহার বস
চাক্ষুশ তাহার প্রচলন সম্বন্ধে অসম্ভব কথিত তাহার
জান। তাহাওটের চিত্রিত্যের মধ্যে অসম্ভব কথিত হইত
এ বিষয়ে ইংরেজ সি-সিগনকে গবেষণা করিয়া কি সিদ্ধান্ত
করিয়াছিলেন তাহার কিছু ধর নির্দিষ্ট পারে।

প্রাক্তম্যের প্রাচীর প্রথম তৈরী ও বৌদ্ধধর্মের চর্চা
করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতে তিব্বতের মধ্যে বাস করিয়া তাহার
মন হইল যে, তাহা না পার ও সারিত্যের চর্চা করা তাহার
কঠিন। শৈব “পাক্সা” প্রভৃতি অনেক বিষয়ে প্রাচীর
উল্লেখযোগ্য কাক করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।
তিব্বতী ও ভারতীয় প্রাচীর শিখার সম্বন্ধে তিনি এখন
কিছু আলোচনার বাগুত আছেন; উপনিষৎ সম্বন্ধে একটা
বড় লেখাও হাত দিয়াছেন এবং বলিলেন যে এ বিষয়ে
ঐক্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাপ্রভুর উপনিষৎ সম্বন্ধে কয়েকটি
পুস্তক লেখা তাহার কাক লাগিয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার
মহাপ্রভুর ইটালি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দুরিমা অফিসে আকা-
জের নিয়ন্ত্রণে হামবুর্গ ও জার্মানীর ভ্রমণ কয়েকটি স্থানে
বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ফ্রাউ ফেরার প্রেসিডেন্সী হামবুর্গ ইউনি-
ভার্সিটির ভারতীয় বিভাগ ও অল্প টুটী সমিতির তরফ হইতে
অধ্যাপক সরকারকে অভিনন্দন দেওয়া হয়। টুটী বক্তৃতা
তিনি হামবুর্গে দিয়াছিলেন। ফ্রাউ ফেরা তাহাকে নিজের

বাড়ীতে আতিথ্য দান করিয়াছিলেন এবং বহু বিশ্বাসকে ও
মেরুরক নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকার মহাপ্রভুর মধ্যে আলোচনা
আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শুক্রিও
নিজের বাড়ীতে একটা চা-পাট দিয়া ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন
প্রাচীরবিভাগকে প্রেসিডেন্সীর সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া
বেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ শোভিত্রে তাহাকে হামবুর্গ হইতে লণ্ডন পেশায়।
এখানে সরকারি ফিন্যান্স বিভাগ হইতে নিয়ম হইয়াছে যে
পঞ্চাশ মার্কের (প্রায় পঞ্চাশ টাকা) বেশী কেহ সঙ্গে লইয়া
জার্মানীর বাহিরে যাইতে পারিবে না, লইতে হইলে ফিন্যান্স-
বিভাগের বিশেষ অনুমতি লাগিবে। কিন্তু ইংলিশ পাউণ্ড
এখানে হইতে কিনিয়া সঙ্গে লইবার ভয় অনুমতি পাওয়াছিল,
কিন্তু পাউণ্ড কিনিবার ভয় আমেরিকান এক্সপ্রেসের কাছে
থেকে তাহার বসিল যে, দিন সাতেকের মধ্যে হইবে না, কারণ
ফিন্যান্স-বিভাগের অনুমতিপত্র সহ কত পাউণ্ড সরকার
জানাই। রাইশ-ব্যাঙ্কের কাছে হইতে পাউণ্ড আনাইতে
হইবে। আবার তাহার পরদিন ছাড়িবে, কি করিব তাহা
ইতিহাস ট্রেড-কমিশনার মিঃ গুপ্তের কাছে পেশায়। মিঃ
গুপ্ত “অক্সিগনি” টোমাস কুকের কাছে টেলিফোন করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কালই আবার জাহাজ ছাড়িবে, কত
কত পাউণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারে কিনা। কত জানাইল
যে, তিনদিন হইল নিয়ম হইয়াছে যে, রাইশ-ব্যাঙ্কের বিনা অনু-
মতিতে কোন ব্যক্তি পাউণ্ড বা “ট্রাভেলার্স চেক” দিতে
পারিবে না, কতএব সময় লাগিবে। গতকাল লাবাশ দেখিয়া
মিঃ গুপ্ত বলিলেন, তিনি তাহার লণ্ডন ব্যাঙ্কের উপর চেক
লিখিয়া দিচ্ছে, লণ্ডনে পৌছিয়া তাহাই সেই চলিবে। ফিন্যান্স-
অফিসে গিয়া পাউণ্ডের বসলে চেক ও পনের খরচের ভর
মার্ক সঙ্গে লইবার অনুমতি চাহিলাম; অফিসের লোক পত্রি-
বর্তনের কারণে শুনিতে চাহিল ও রাইশ-ব্যাঙ্কে চেষ্টা করিতে
বলিল। আমি বলিলাম সময়ে ফ্লাইবে না, কালই আবার
জাহাজ। অনুমতি লিখিয়া দিয়া অফিসের লোক জিজ্ঞাসা
করিল, কোন শাহিনের জাহাজে যাইতেছি। বর্তমান জার্মান
গবর্নমেন্টের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার অধিনায়ক সম্বন্ধ।
উজ্জ্বল করিলে দিয়া বলিতে পারিলাম, কিন্তু শুধু আবার
কাক উজ্জ্বল হইয়া গিয়াছে, বাক্য দেখিবার ভয় বাটী সত্যই

বসিলাম। মোভিয়েট ভাড়াহেল নাম ভূমিবাণীর কিনাঙ্গ-
অফিসের কেব ফাফালে, কেব না চতুর্থ হইয়া গেল।
তথু পদার্থকেট অফিসে নস, পরিচিত মধ্যমে সকলেই মোভিয়েট
আহায়ে বাইতেছি পুনিয়া বিশ্ব প্রকাশ করিলেন। কিপ্রিয়া
অসিলে অনেক অনেক রকম প্রসন্ন করিলেন, এমন কি
বিছানার চারপাশকার কথাও বাদ পড়িল না। সকলেরই
ধাৰণা—“বাবা! মোভিয়েট ভাড়াহেল! না তিনি যে কি
বিশীলিকা!” আমি কিছু নিশ্চিন্তই ছিলাম, কারণ এখনকার
একটি ইংরেজ বন্ধু গুটবার এই লাইনে বাতায়ন করিয়া
ছিলেন ও তাঁহার কাছে সব ধৰণ ভবিষ্য তবে প্যালেস বৃক
করিয়াছিলাম।

হামবুৰ্গ বন্দরের খাট হইতে মোটর-গোটে মিনিট কুড়ি
সিদ্ধা বন্দরের আর এক দিকে মাকনবীতে ভাড়াহে উঠিলাম।
ভাড়াহ পেনিনগ্রাভ হইতে হামবুৰ্গ হইয়া লণ্ডনে যায়।
পেনিনগ্রাভের অনেক প্যালেস্‌জার ভাড়াহে ছিল। বৈকাল
পাচটায় ভাড়াহে ছাড়িয়া বীরগরিতে এসেই নদী বাহিয়া
চলিল। রাত প্রায় ঠাটটায় ভাড়াহে লণ্ডনে পড়িল। তারপর
সারানিন সাংঘাত নর্থ লীতে। পেন সাংঘের দিকে
টেম্‌স নদীতে প্রবেশ করিয়া বেলা নটার সময় ভাড়াহ
একবারে লণ্ডনের দাৰ্ঘ্যগনে, লণ্ডন ব্রিজের কাছে Hay's
Wharf-এ আসিয়া গড়াইল। এই লাইনের ভাড়াহগুলি
বোটের চলে, মাণ ও প্যালেস্‌জার দুই বের এবং আকারেও
পূর্ব বড় নহ। কার্ট সেকেন্ড ক্লাসের ডাইনিং হল একসঙ্গে,
খার্ড ক্লাসের আলাস। ক্যাবিন ও ডাইনিং হল ছাড়া অল্প
সবট সাধারণ, অর্থাৎ সাউজ, মোকিং রুম ও যে কোনও ডেক
সব ক্লাসের নোকাই সমভাবে ব্যবহার করিতে পারে। সাজ-
সজ্জা অল্প খুট সাধারণ রকমের, কারণ এই লাইনের ভাড়া
একটু লম্বা। রাশিয়ান খাওয়াও বন্দ নহ। ক্যাবিনে বা
অল্পত কোন বোয়াগি নাই, বরং পরিচ্ছন্ন। তবে খার্ড
ক্লাসের ডাইনিং হল বড় সজ্জা ও টেবিলরূপ একটু বেগীতে
বন্দান হয়। বিছানা বেশ পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন, ছায়াপোকাও
নাই, তবে রাশিয়ান বোয়াগি প্রকাশ পাইয়াছে খার্ড ক্লাসের
বাধকমণ্ডিতে। দুখ দুইবার বেলিনে জল সহজে বাধির
হয় না, পাখানা অতি সৰ্পী, স্বচ্ছককে ভাব মোটেই নাই।

মোভাগ্যক্রমে লণ্ডনের পথে কিরিবার সময় দুইবারই
লম্বা তাল পাইয়াছিলাম, কাজেই সময় অল্প হইলেও লোক-
জনের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের অসুবিধা হয় নাই। পেনিন-
গ্রাভ মেথিয়া বা কিছুদিন রাশিয়াকে বাদ করিয়া অনেক
আমেরিকান ও ইংরেজ এই ভাড়াহে বাইতেছেন। মোভিয়েট
রাশিয়ার বাস্তবিক অবস্থা লম্বা বড় বড়ভেব ভূমিলাভ।
আমেরিকানদের অধিকাংশই মোভিয়েট শাসনের নিষা করি-
লেন, সেনের কোনই উন্নতি বা উপকার হয় নাই, রাজ্য-
ঘাটের ৩৩শ্রী অবস্থা, দেশের দাঙ্গা দারিদ্র্য ও অভাব

প্রভৃতির কথা বর্ণিলেন। জাপান ইংরেজের অনেক
কাছে খুট প্রাণনা ভূমিলাভ, সাধারণ মোকের উন্নতির
কল্প তখনবের বাস্তবিকতা প্রভৃতির কল্প মোভিয়েট পদার্থকেট
কত আগ্রহ, কত চেষ্টা করিতেছেন, তারও অনেক প্রমাণটি
ভূমিলাভ। মোভিয়েট এই বুঝা গেল যে, সাধারণ খাটি
মোশালিই বা কমিউনিষ্ট মতের প্রতি আকর্ষণ, তাহারা রাশিয়ার
বর্তমান অবস্থার মোটেই চম্পন হয় নাই। উন্নতির একান্ত
চেষ্টা হইতেছে, তাহাল মধ্যে কাকি নাই; বাধাও কিছু কিছু
আছে এবং আদর্শ অস্বাভাবী কাণ্ড করিতে লম্বাও লাগে,
কাজেই অভাবব্রতী থাকিলেও তাহা এমন কিছু মারাত্মক



মুসোলিনি ও হিটলার।

নয়—বাহায়া রাশিয়ার প্রতি বিজ্ঞ লম্বা তাল ভাড়াহের মতট
এই রকম। বাধকমে একটি ভাড়াহে লম্বা তাল ভাড়াহের
মত্রে গুণাণ-বেলিনের মল বাধির না হওয়া প্রসঙ্গে কথা আরম্ভ
হইল; ভাড়াহাছিলাম ভাড়াহোক বন্ধিণ আমেরিকান, কিন্তু
ধখন তিনি বসিলেন, ব্যক্তি ভাড়াহে, তখন লম্বা তাল ভাড়াহা
করিয়া আরও ভাড়াহায যে তিনি বাহালা, নাহ কি: ধোব।
ইনি পূরা কমিউনিষ্ট-বাদী: পবে বৃথিলাভ, এবং কথাপ্রসঙ্গে
গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অনেক নিসা করিলেন।

বেলা নটা আলাহের সময় ভাড়াহে আসিয়া পাটে

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পল্লব! আশা। কবে, কোন্‌ সে মৃদু স্রোতে মনো-
কবির মানস-সন্ধান বিরহবিহ্বল লগ্নে, কোন্‌ রামদিগি হঠতে
শেষকে দূত করিয়া, মেঘের বুধে, তাহার তব্বের গোধনী-
সকাশে বিহ্বের বার্তা পৌর্য করিয়াছিল, আশ্রিতার আকাশ
দেখিলে, মেঘের এক গতি, এক লক্ষা দেখিলে সেট কপটি
তব্ব মনে পড়ে। আশ্রিত কে-যেন মেঘের বুধে তাহার
বিহ্বের বার্তা পাঠাইয়াছে, মেঘের বিহ্বী-বন্ধের পতীল
বেধনা অহুতব করিয়াট, অবিশ্রান্ত গতিতে বিরহিণীর উদ্দেশে
ছুটিয়া চলিয়াছে। আশ্রিত যেন তাহার একটি বৃহৎ অঙ্গন
নাই, আশ্রিত নাই, আশ্রিত নাই, বিহ্ব নাই, বিহ্ব নাই।
কেবলই ছুটিয়েছে।

সামান্য, আকাশে মেঘের ছুটাকাট, হোড়ানোড়ি খেলাট
চলিয়াছিল, অপরাক্রম হঠতে রুটি আরম্ভ হইল। পক্ষিপাশ্রয়
মৃদুগদগদ রুটিপতনের পর, রুটি বহু চটল বটে, উদান বাহু
অনিশ্রান্ত গতিতে বহিতে লাগিল। এলোমেলো বাতাস,
কখনও পূর্ণ দিক হঠতে, কখনও উত্তর, কখনও দক্ষিণ,
কখনও বা পশ্চিম দিক হঠতে সোঁ সোঁ স্বর ছুটিয়া আসে।
কখনও বাতাসের সঙ্গে বহু বারিকণাও ভাগিয়া আসে।
আলো বহু না করিয়া বলা যায় না, আবার আলো বহু
করিতে উচ্ছ্বাস হয় না; হুঃ হুঃ। অনেক হুঃ কি যেন দেখা
হইবে না, কিসে যেন আঁকি পড়িয়া গাইতে হইবে।

ছায়া আত্মসম্মত দিন মেঘের খেলা দেখিয়াছিল শৈলীর
কবিতা তাহার ভাল লাগিত, কখনও শৈলীর মেঘোচ্ছন্ন
আকাশের কবিতা পড়িয়াছে। কখনও মেঘবৃত্ত খুঁজিয়া
বসিয়াছে। সমস্ত দিন এই ভাবেই কাটিয়াছে। রুটির
সময়ও সে আলো খুঁজিয়া বসিয়া ছিল, আলোর কাছের
শেষের স্পর্শটো ভিজিয়া বিখাছে, টেকিলেব বই পাঠা
শুনিও ভিজিয়া, স্যাঁতাইয়া উঠিয়াছে, ছায়া তাহা দেখিয়াছে,
তব্বও লাগিটা বহু স্বর নাই। আশ্রিত সে সারাদিনমান
খোলা আলোপাঠা কাছের বসিয়া বসিয়া ভাবিয়াছে, মেঘকে

যদি তাহার ভাল বুঝাইতে পারিত, তবে তাহাকে কাছে
ডাকিয়া, আত্ম কবিতা, তাহার প্রণয়ন কথা বলিত; বসিয়া,
তাহাকে দূতরূপে বরণ করিত। তাহার দূতরূপে বার্তা
প্রেরণ করিত। কিন্তু কোণার, তাহার কাছে পাঠাইত
মেঘবৃত্তকে? ছায়া নিজের মনে, নিজের এট প্রণয়ের জীব
পুঁজিয়া গিয়া নাই।

অশোকের কাছে?

আশ্রিত বিহ্বের ব্যাপারটাও কি নিশ্চয়! অশোকের
সঙ্গে অনেক দিনের জানা-শোনা ছিল বটে; কিন্তু কোন
দিন কি তাহা পশ্চিমদিকের জগৎ দিয়া জানিবার ও ভিজিগণ
সেটা করিয়াছে? অশোকের না ও তাহার মা মিলিয়া
কণাবার্তা করিয়াছেন, অশোক ভক্তিও কোন দিন তাহার মা'র
গতি-এ বাড়ীতে আনিয়াছে, ডুবিং স্বর সকলের সঙ্গে
বসিয়াছে, সকলের সঙ্গে বেদন কণাবার্তা করে, ছায়াও সঙ্গে-ও
তেরমই গুটি চাকিটা কণাবার্তা হইয়াছে। অশোক তখন
নিমিষের কবিতার শেষ পরীক্ষার জগৎ বিশেষ নাক্ত, কালে
তরুণ একদিন আশ্রিত। স্বরও চুড়াগা, দীর্ঘ কন্ঠ মেঘ, দীর্ঘ
আত্ম বহুতর ওট চকু, দীর্ঘ বহু তর, পাঠা। চুটুকে
গুটি গুটি, বক্তির কণেশ, উত্তর নাসা, মৃদুগদগদ কণা
বলিবার একটি বিশেষ কণা—এই মা মিলিয়া মিলিয়া
ছায়াও জগৎপাথে বসিয়াছেন হইয়াছিল তাগতে সন্দেহ নাই।
অশোকের পরীক্ষা যেদিন শেষ হইল, তাহার পরদিনই
একজনকেই উৎসব। উৎসবের অঙ্গ হিলাবে উপাঙ্গনা,
অস্বীয় মান, শ্রীতান্ত্র ও জগৎগোপনি হইয়াছিল। উৎসবান্তে
অশোক তাহাকে লইয়া সেই প্রথম বেড়াইতে গিয়াছিল।
গাড়ীতে গুটি তিনটো বৈদী কণা হয় নাই, অশোক বাকু পটু
নহে, একটু যেন বৈদী লাভক, ছায়া তাগ বসিয়াছিল।
বুজিয়া একটু স্বর, একটু প্রণয় হইয়াছিল।

অশোকের মা ও ছায়াও মা'র মধ্যে কণাবার্তা বহুকাল
খসিয়া চলিলেও, উত্তর পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত
হয় নাই। তাহার কারণ ছিল; অশোকের পিতা কবিত্র এবং

হঠিত থাকিতেই চাহিতেন। কিন্তু খনী সংশয় ঘেমে বসিয়া অশোকের মা'র প্রতীতি ছিল অকল্পন। তিনি হেলেকে বালাকাল হইতে শিশুালয়ে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতে-
ছিলেন এবং সেখান হইতেই ছাত্রের মা'র সঙ্গে বৈবাহিক।
সম্বন্ধ পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ণ-
দিন পর্যন্ত, অশোকের পিতা 'এক্সপেক্টেট' কি পদার্থ তাহা
অনবগত ছিলেন : বিবাহের দিনে সমাপষ্টর সম্বন্ধে লম্বাক-
জ্ঞান করিল বটে, কিন্তু তখন সব ঠাটছাড়া হইয়া গিয়াছে।
উভয় পরিবারে ঘনিষ্ঠতা না থাকায়, অশোকের সঙ্গে অমনি
মোমোদা ছাড়াও হয় নাই এবং আধুনিক মতে জন্মের আলান
প্রদান নামক আধুনিক উদ্যোগ অত্যাবশ্যকীয় পূর্ণাঙ্গতানও
সাহিত্য হয় নাই। আশোকের কালে কি হইত, এখনও
অনিশ্চিত ও অন্ধকারাক্ষর সমাজে ও পরিবারে কি হয় না
হয়, তাহার সঠিত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া নাসা কৃত্রিম
করা খাটতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল নাই। জন্ম
আলান প্রদানের কথাই এখনকার কালে বড় কথা হইয়াছে
এবং সেট আবার প্রশ্নবোধক। বিবাহের পরে নয়, আগে ওয়াই
খোঁজাড়াইয়াছে।

বিশ্রান্ত কবি-
বিশিষ্ট বিখ্যাতগণের সিনেমা ও
বহুদিন হইতেই চলিতেছিল, ছাত্রের পিতাই চোঁতা করিতে-
ছিলেন। হঠাৎ সংবাদ প্রাপ্তি, অবিলম্বে রওনা হইবার
কল্প। পালপোন্টের তবির, পটচিত্র-পর্দা-সংগ্রহ, আত্মীয়-
বিশেষের গৃহে ভোজন, বন্ধুবান্ধব সহপাঠীদের পাঠি, ক্রমে
বিদায়-সভা উত্থানি শিশুচারণালয় পাঠি সাহিত্যে সাহিত্যে
হুই পক্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল। সেই সমস্ত শেষ হইতে
না হইতে বিবাহ! বিবাহের পরই অশোক বিলাত যাত্রা
করিল।

এই বিবাহ!

বিবাহের পূর্বকালে আত্মীয়স্বজন অশোককে খরিয়া জোর
করিয়া ছাত্রের ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঘরে চুকিয়াই
হাসি। হাসি আর থাকে না। কি বিশিষ্ট লাগিয়াছিল সেই
হাসি। কতদিন, কতকালের কল্প চলিয়া গাইতেছে, কত
সুখীর্ণ বিচ্ছেদ, তাগযোগ্য একটি কথা নাই, একটি মেহ-
সত্তাবধ নাই। একটু আশ্রয় নাই। সে কথা ছাত্রের মনে
আছে আজও।

ঘন হইতে বাহির হইবার পূর্ব বৃদ্ধের অশোক বিলাতী
কায়দার ইংরাজিতে একটি চুপন মাগিয়াছিল। লক্ষ্য,
কোঁতে ছায়া লাড়া দেখ নাই; অশোক ঘর পুলিয়া চলিয়া
গিয়াছিল। ছাত্রের আজও মনে আছে, সে সময়ে ছাত্রের
মন তাগিতেছিল, ভিতর প্রয়োজন কি! জোর করিয়া
লইতে কে তাহাকে মানা করিয়াছিল!

এই বিবাহ! এই মিলন! আর, এই বিচ্ছেদ!

আজ যদি মেয়েরা মোটা খোকার করিত, ছায়া তাহাদের
কোঁখের বা কাহার কাছে পাঠাইত? অশোকের কাছে
নিশ্চয়ই নয়। তবে কাহার কাছে পাঠাইবে?

তাহার মত হুখী এ পৃথিবীতে কেহ আছে কি? যদি
কেহ থাকে, ছায়া তখু তাহারই কাছে তাহার ব্যথাভরা চরমের
কাহিনী মেঘমুখে পাঠাইতে পারে। মেয়েরা সকল মেয়ে
যায়, সব ঘর বেধিতে যায়, সকলের কাছেই বাইতে পারে,
কেবল সেখানে যে ঘরে তাহার মত হুখী আছে, তখু
তাহারই কাছে ছায়া থবর পাঠাইতে চায়।

এই মেয়েরা কি বিলাতেও যায়? বিলাত মেয়ের রাজ্য
তথা যায়, সেখানকার আকাশ সকল সময়েই মেঘে আচ্ছন্ন।
এখানকার মেঘ বোধ হয় সে দেশে বাইতে পারে না। কিন্তু
যদি বাইত, আর মেঘকে তাহার তাগা যদি সে বুঝাইতে
পারিত!

—ছায়া।

ছায়া চিত্তাশ্রয় ছিন্ন হইয়া গেল। দিক মল্লক, দিক
বলন সুবিমলসর প্রবেশ।

—মি: দায়। এই বৃত্তিতে।

—বৃত্তি বেশী পড়ছে না, হাওগাটা তখু—

—এই বাসলায় মাছুর বাড়ীর বাস হয়?

বিমল হাসিয়া বলিল, নইলে যে ভোদায় পড়ায়—কথাটা
শেষ করিল না। তাহার প্রয়োজনও ছিল না। যে
কথাটা সে মুখে বলিল না, যে কথাটা তাহার—তখু তাহার
কেন, পরোব বাড়ীরই মনে অহরহ ধ্বনিত হয়, সে কথাটা
যে কখনো যায় না। চাকরীর ভয় বৈবাহিক্যের চেয়ে
কত তীব্র, পতীৰ চাকরীজীবী ছাড়া কে তাহা বুঝিতে পারে?

বিমল জামায় পকেট হইতে কম্বল বান্ধি করিয়া মাথাটা,
হাত দু'টা, বুট দুখিা লইয়া, চেঁচিয়ে বসিত, ছায়া বলিল,
চা দিতে বলি?

—বহর লোক আমার দেখাচ্ছে, চা আনছে। আলোটা
জ্বলছে বই।—বিমল উঠিয়া, হুটচ টপিয়া আলো জালিল।

ছায়া হ'তে চোখ হ'টার আড়াল করিয়া বলিল, আজ
আলো ভাল লাগছে না।

বিমল বলিল, অল্প ক'টা কমেছিলে ?

—না।

—পার নি ?

—বেশই নি।

বিমল হাসিত ভাবে বলিল, চোঁটা ক'রে দেখলে না কেন
একবার ?

ছায়া দৃঢ়বরে বলিল, কি হবে চোঁটা করে !

একটু খামিয়া আবার বলিল, আচ্ছ পড় না।

এক মুহূর্ত খামিয়া পুনরু কহিল, শুধু আজই নয়, কোনও
দিনই আর পড় না।

বিমল নীরবে ছায়ায় পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। ছায়া
আলোর দিকে হাত হ'টা আড়াল করিয়া বাহিরের পানে
চাহিয়া বলিল, পড়তে আমার ভাল লাগে না, একটুও না,
একটুও না।

কেহ যেবিল না, কেহ জানিল না, বিমলের দুখখানি
আগ্রে আগ্রে বিবর্ণ পাতুর হইয়া আসিল।

ছায়া বলিল, আজ বাবা বাড়ী এসেই একটা হেত-নেত
হবে বাবে। পড় না আমি, কিছুতেই না।

বহ চাহের সরঞ্জামাবি লইয়া ককে প্রবেশ করিয়া,
টেকিলের উপর টে নামাইয়া নিগা চলিয়া গাইডেট, ছায়া
উঠিয়া আসিয়া, চা প্রস্তুত করিয়া, চাহের বাটী আগাইয়া দিতে
দিয়া বিমলের শুক পাতুর মুখ বেঁধিতে পাইল। চায়া নিজ
হাতের, অপর হাতের বাখা সে বুলিল। নিজের চেয়ারে ফিরিয়া
আসিয়া পুত্র মনে চাহের পেয়ালায় চাষচট নাড়িতে নাড়িতে
বতসুখ বলিল, বাবাকে বলে কাজ নেই, যেমন চলছে চলুক।

বিমল বলিল, তার মানে ?

ছায়া বলিল, মানে—আমি যদি বলি, পড় না, তা হলে
ত আপনার কাজটি হবে। তার চেয়ে, আপনার বতদিন অল্প
কাজ না হয়, আমি বলে হলে বইয়ের পাতা উন্টে বাব ;
আপনি বলে বলে দেখবেন।

—তোমাকে না পড়িয়েও আমি পড়ানোর পারিশ্রমিক নিয়ে
বাব ?—কথাগুলো এত নীরস, এত করিন ও এত ভীত
করিয়া সে বলিল যে, ছায়া চমকিয়া উঠিল। বিমল পুনরায়
বলিল, না ছায়া, এমন চাকরী আমি করি নে! আমি
সত্যই, কিন্তু জোজোর নই।

মস্তিষ্ক অভিব্যক্তির সহিত ছায়ায় গ্রন্থটি পরিচয় ছিল
না; থাকিলে সে ঐ কথা উচ্চারণও করিত না। অশোক
পত্নী ; কিন্তু অশোককে জানিবার, বুঝিবার, চিনিবার প্রয়াস
তাহার কবে মিলিয়াছে ? এক্ষণে, বিমলের কল্যাণ ভাবে
মস্তিষ্কর দৃষ্ট অভিব্যক্তির যে কি, তাহা বুঝিয়া, অহুতাপ-আহ্নি
কণ্ঠে কহিল, আপনি রাগ করলেন কি? রাগ ?

বিমল কথা কহিল না।

চাহের পেয়ালাটা খট করিয়া টেকিলের উপরে নামাইয়া
রাখিয়া, ছায়া উঠিয়া আসিয়া বিমলের হাত দুখানি চাপিয়া
ধরিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, না কেনে যে কথা বলে
কেসেছি, তার জন্য আপনি আমার মাপ করুন, মিষ্টার বাব।

তবু বিমল কথা বলে না বেশিয়া ছায়া কীম-কীম হইয়া
উঠিল, আমার কথা করুন, আপনার হাতে করে মিনতি করছি
মিঃ বাব ! আমার মনটা আজ ভাল ছিল না, অসাবধানে
বলে কেলেছি, আমার ক্ষমা করুন।

বিমল ছায়ায় হাত হাতে নিতেন হাত ত'পানি টামিয়া
লইয়া বলিল, তুমি বল ছায়া। * আমি তোমার ওপর রাগ
করি নি, সত্যি বলছি, রাগ্তু করি নি।

ছায়া বলিয়া অশ্রুধরনকণ্ঠে নিতনবের বলিতে লাগিল,
আজ সন্ধ্যা বিন মনটা আমার কি খাপসে যে হয়ে উঠেছে,
তা আমিই জানি। তাই কি বলতে কি বলে কেলেছি ; নইলে
আপনার মনে আমি কখনও কই দিতে পারি ? একে আমার
মন ভাল নেই, তার ওপর আপনি রাগ করলেন...

বিমল আতঙ্ক সজ্ঞাভেদে সহিত বলিল, আমারও মনটা
ভাল নেই ছায়া, নইলে ঐ তুচ্ছ কথাটার জন্যে এত কড়া
কথাই বা তোমার বলব কেন ? তুমি আমার ক্ষমা কর
ছায়া।

একটা বেন বুঝাপড়া হইয়া গেল। চ'তনেই পরিত্যক্ত
পেয়ালা তুলিয়া চুম্বক বিল।

চা খাটতে খাটতে বিমল বলিল, ছাড়া তুমি মিঃ বোসের চিঠি পেয়েছ ?

ছাড়া বিলাতের ভেতর থেকে, আধুনিক সমাজের ও বটে, তবুও একটু লক্ষ্য রাখা হইয়া নতুনবে বলিল, না।

—কতদিন পাও নি ?

—অনেক দিন। কেন বলুন তো ?

—বলছি, তুমি চিঠি খাও ?

—না : আগে আগে জগদা না পেয়েও ক'খানা লিখে-ছিলুম, তারপর ছেড়ে দিয়েছি। কেন, বলুন না ?

—পর বলছি। মিঃ বোসকে তোমার চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় না ?

—না।

—বিমল আমার ভিজ্ঞান কবিতা, ইচ্ছে হয় না ?

ভাষা বলিল, না। কিন্তু কেন জিজ্ঞাস করছেন এমন ?

—আমি এক মন্ত সমস্তার পড়ে গেছি ছাড়া।

ভাষা সাগ্রহে কহিল, কি বলুন না মিঃ রায় ?

বিমল বলিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাষা কিন্তু আগ্রহ সমন্বিত দৃষ্টিতেছিল না, কহিল, কৈ বললেন না ?

—বলছি, ব'লিয়া আমার কিছুকল চুপ করিয়া রহিল।

ভাষা বলিল, বলুন না মিঃ রায় ?

—বলা উচিত হবে কিনা তাই ভাবছি।

—তবে থাক্ বলতে হবে না, বলিয়া ছাড়া জানালায় দিকে কিহিয়া বলিল। বাড়ির তখন সূর্য, সূর্য, সঙ্গে স্ত্রী নাহিয়াছে : লজ্জার অন্ধকার ঘনাইয়া আদিগাছে।

বিমল বলিল, বলছি শোন।

ছাড়া হুসিয়া বলিল।

—একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালবাসে : মেয়েটিও ভাল। মেয়েটি বড়লোকের মেয়ে, ছেলেটি পুত্র পত্নী। কিন্তু ভাষা চ'কমই প্রতিজ্ঞা কবেছিল, ভাষা পরম্পরক ছাড়া আর কাউকে দিবে করবে না। মেয়েটির মা চাটভেন, পুত্র বড়লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয় : মেয়েটি প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিছুতেই না। যা পছন্দ করতেন না যে পত্নী ছেলেটি তাঁর বাড়ীতে আসে : ছেলেটিও কাজ-কর্ম না হওয়া পর্যন্ত তাবের বাড়ীতে থাকে না, স্থির করেছিল। কিন্তুদিন থেকে ছেলেটি মেয়েটির বাড়ীতে থাকে না বটে, তবে তাবের

ভাষালাগা ঠিক ছিল। চট্রাৎ একদিন দেখা গেল—বিমল বাসিল।

ছাড়া বলিল, কি দেখা গেল ?

বিমল বলিতে লাগিল, দেখা গেল, পুত্র ব'লিয়া একদিন মেয়েটি অল্প একটি বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মেয়েটির কাচিটা বন্ধ করে গর করতে করতে বেড়াতে গিয়েছে। সঙ্গে আর কেউ নেই।

—তারপর ?

—তারপর আর কিছু নেই।

—তবে যে বললেন, সমস্তা ?

—ঐ ত সমস্তা।

—ঐ বেড়াতে যাওয়া ? তাতে যোগ কি ?

—যোগ নেই ?

—কি যোগ ! কিন্তু মেয়েটি কে ?—বলিয়া মিটি মিটি হাসিতে হাসিতে ছাড়া বলিল, আমি বলব কে ? ইচ্ছা ? না, মিঃ রায় ?

বিমল নিকীক বিষয়ে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

ছাড়া হাসিয়া বলিল, বড়লোকটি যোগ হয় আমার সুবিখ্যাত প্রথম বামা।

বিমল সন্মুখের কহিল, তুমি কেন্দ্র ক'রে জানলে ?

ভাষা যে কথা উত্তর না দিয়া বলিল, পরীক্ষা লোকটি কে, তা যোগ হয় না বললেও চলবে। কিন্তু কখন যোগলেন তাগের ? আজ আদ্যবাস সময় ?

—হ্যাঁ।

বিকট পক্ষে বাত ডাকিয়া উঠিল, পরমুহর্তে সারা পৃথিবী ঘন আলোয় আলো হইয়া গেল। মিলেই যোগ লনবায়ের দ্বারা চুকিয়া,বলিলেন, বাতটা কাছের কোথাও পড়েছে মনে হচ্ছে, না ?

এই অহেতুক প্রস্তাব জবাব কেহই দিল না।

মিলে যোগ বলিলেন, উনি হয় ত এতক্ষণ কোট থেকে বেরিয়েছেন। বেশি একবার কোন করে। না বেরিয়ে থাকসেই ভাল।—ভিনি বাহির হইয়া গেলেন।

বিমল ভাবিতেছিল, এ সময় ইচ্ছা বাড়ীর বাহির হইল কেন ?

ছাড়া ভাবিতেছিল, প্রথম বামা এদিকে আগে না কেন ?

আকাশ আব একঝল বিসট সজ্জন করিয়া উঠিল ;
আবার খরিত্রী আলোকোন্মায়িতা হইল ।

বিমল বলিল, এ বকম বেড়ান যোগেন নব তুমি বল ?
ভায়া কুণ্ডলরে বলিল, নিশ্চয়ই নহে । বহুত্ব সংশে সগর
বেড়াতে যায়, কোন যোগ হয় না ।

“না, তিনি আশ্বিনেই ছিলেন ।” বলিয়া মিলেঙ্গ ঘোষ
সেই স্তরে আসিয়া বসিলেন ।

ছায়া বলিল, আজ আনন্ডা পর কহছি, মা ।

— কি পর ?

ছায়া বিমলের পানে অর্ধপূর্ণ চুটিতে চাচিয়া হাসিয়া বলিল,
এই বৃষ্টি, বহু, বিস্তৃত এই সব ।

মিলেঙ্গ ঘোষ বসিলেন, আজ আর তুমি হেঁটে বেও না
বাধা । ঐরা গাড়ী কিনিলে, সেই গাড়ীতে লকাল লকাল বাড়ী
গলে বেও ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিমল ভুল ঘেষে নাট ।

কিন্তু কল্পে কি হইল সেটা জানা বরকার । ‘আব-বি’র
কুতিত্ব অনাধারণ ; তিনি যাহা বলেন, তাহা করেন । দাখা
যদিবার বিমল অপত্যকে হঠাৎ প্রণয় সাধেবের গাড়ীখানা
ইন্দ্রের কটকে চুটিয়া পড়িয়া ইন্দ্রকে বাস্তব করিয়া ফেলিল ।
বাস্তবতার কারণ মা অনাকে লইয়া কিছুকাল হইল ইন্দ্র
‘পিতৃবন্ধু ও পানার পিতৃভবী মহেন্দ্র বাবু’ কল্যাণ পাকা
যেখার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বাচির হইয়াছেন । ইন্দ্র লগ্নচর
কোথাও যায় না, বাইতে চায় না বলিয়া মা আজও তাহাকে
জানেন নাই । মা বুঝিতে হইলেই ইন্দ্র বাচে । কোথায়
পেলেই, চারিদিক হইতে ঘরঘরের আক্রমণ হইতে থাকে,
এক নানাস্থানের ও নামারকমের পাত্র-পরিচয় প্রকাশ পাইতে
থাকে, ইহা লক্ষ করা অতীব কঠিন । তাহার অনাধারতও
বহুদেয় বন্ধা বহিতে থাকে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সে তত্ত্বিতে
পায় না, এই সাধনা ।

সারাদিন মেঘ করিয়াছিল, কিছুক্ষণ পূর্বে খুব বৃষ্টি হইয়া
দিগছে, এখন বৃষ্টি পানিয়াছে, গাওয়া চলিতেছে, ইন্দ্র কান্দীরা
যাত্রাখার আসিয়া বসিয়াছিল । নীচের ফুলবাগানে এখন
আর ফুলের ছড়াছড়ি নাই । শীতল ক্রাওয়ায়ের গাছগুলি

তুলিয়া ফেলা চটরাছে, তানটি খালি পড়িয়া আছে, পাতা-
বাহার গাছের বেড়ার ধারে ধারে বেগু নীলকান্ত কাড়-
গুলিতে গুলি চারটি করিয়া ফুল দেখা যায় । ফুল ধাক্কা আর
নাই পাখী—নববর্ষার প্রথম প্রবল বাহিরাত্যাত তরলতা
গুলির বিস্তরকশে নখন ভবিষ্য বাহ । কে যেন ঘর করিয়া
এল বাবাইয়া তাহাদের পান করিয়া দিয়াছে । ঘরঘি যেমন
কলহাটকে নিশেপে প্রায় করিয়া দুগিয়া কাপিয়া ভারী হইয়া
উঠিয়াছে, এই গাছশালাগুলিও যেন লজ লজ বাড়িয়া গাঝড়া
দিয়া উঠিয়া গাড়াইয়াছে । প্রথম বর্ষার সঙ্গে মানুষের অনেক
কেমন একটা লম্প্রীতি আছে ; নববর্ষাকে বরণ করিয়া লইবার
চপ মাগে উবুণ হইয়া থাকে, উবুণ ছিল । কি ভাল
লাগিতেছিল ঐ তেজা কাপা রাটী আর লজবিশোধগার পাছ-
পালাগুলি !

এমন সময়ে প্রণয় সাধেবের শুভাখন । ইন্দ্র যেন
হইল, অস্ত্র বাবু বাড়ীতে বাইলে এ বিপদে পড়িতে
হইত না ।

কিন্তু মা নাট, আমার আগাঘন করিয়া বসাইতে হইল ।

প্রণয় সাধেব বসিলেন, তুমি নাকি আমার ওপর বড়
বেগেছ, ক’বিন আসি নি বলে ?

ইন্দ্র গাধাটা নির্দোষ হইয়া দিগাহিল, পরে বলিল,
আপনাকে কে বললে ?

— বোধি । আমার কে ! “ ক’বিন আসতে পারি নি ।
মিলেঙ্গ লগ্নচরের মিউজিক রূপের গ্রাইড ডিক্ট্রিবিউশন
সেরিগনির ভক্ত একটা সেলেট (নাটক) লিখতে হচ্ছিল ।
কালই সেটা শেষ হয়েছে । তুমি বাগ কেনেছ ইন্দ্র ?

ইন্দ্র বলিল, সেখা হবে বেগ ?

প্রণয় করিলেন, হ্যাঁ, কাল লিখে, বেগের মাঝা ফ্রিক।
ডিক্ট্রিবিউট (বটন) করে দিয়ে এসছি । “অক্টোবর পরিদর্শনে”
তুমি বালক চরিত্র ছিল ত, “কিশোরী”তে শুধু কিশোরী
চরিত্র আছে । ২০এ জুলাই মোবে সে হবে । তুমি যাবে
ত ইন্দ্র ?

ইন্দ্র বলিল, আপনাকে থাকার কিছু বিতে বলি ? কি
যাবেন ?

— বাবল্য কি ভাল লাগে, বল দেখি ?

— তা কি জানি ?

—তাহা না? বাবলায় ভাল লাগে, কবিতা দেখা, পাঁচশ

ভাড়া, আঁপ—

ইন্দু গাঢ়াআড়ি বলিয়া উঠিল, তাই বলে আমি।

প্রবন্ধকার কহিলেন, আঁপ ভাল লাগে শিখাসক।

ইন্দুর কানখাড়া ক'ণ ক'ণ তিরিয়া উঠিল। অতিথি নাথায়, অসম্মান কবিত্তে নাট—এই নীতিগত কারণ মনে আসিল না; মনে হইল, যে লোকটা এই সুখে ও কথা বলিয়াছে, সেই সুখে একটি চপেটাঘাত করিতে পারিলে তাহা বেশ ভাল হইত। ইন্দু সতল অঙ্গ পদ বদন করিয়া ঝাঁপিতেছিল।

প্রবন্ধকার ইচ্ছাকৈ নজর পরিকরনা করিয়া বহির্ভূতভাবে বসিতে লাগিলেন, বাঙালীর কাব্যসাধিতা বধা-বন্ধনার সম্বন্ধ হইতে আছে; আঁপ তাহা মনে আছে, এট প্রমাণসক।

তবে বিদ্যোত প্রবন্ধকার বঙ্গবন্ধু হুসর আকাশের পানে চাহিয়া বসিতে লাগিলেন, “কিশোরী” নাটিকার আমি সেট কখনো নিশেছি।

—অপমান বাবান দিতে বলি, বলিয়া অরক্তরূপে একরকম উচ্চহাস্যে ইন্দু চলিয়া গেল। কনহীন অন্ধকার সিঁড়িতে পাড়াইয়া সে ভাঙার বন্ধের স্পন্দন প্রশ্রিত করিতে লাগিল। কেন মস্তক বাঁকু বাকীতে বাহু নাট, কেন মস্তক বাকীতে ঝিল, কোন্‌ নৃপণে এই লোকটা ভাঙার গুহে আসিয়াছিল, কোন্‌ অতঃকালে সে ইহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল, আঁপ কেনই না ভক্তভার আভরণটা কেলিয়া দিয়া অরক্ত ইষ্টা ইচ্ছাকে বিভাজিত করিতে পারিতেন না, এট সব কথাই ভাবিতেছিল। লোকটা হস্ত পদে বধা পাড়াইয়া করিতেন, ছাত্র বন্ধু বন্ধু নব তনু বাইতেছে, হস্ত বা এই বিকেই আসিয়া পড়িবে, ইন্দু ভ্রুতপনে নীচে নামিয়া গেল। ঠাকুরকে পাণ্ডুর ভাজিতে ও চা করিতে বলিয়া, বাবার বৈঠকখানায় চুকিল। কক জনসুত্র! বাবা একদিন যদি সকাল সকাল ফিরেন! রোজই যেহী, রোজই রাত!

ইন্দু যে তব করিতেছিল, তাহাই ঘটিল। লোকটি বাবাখা হইতে ডাকিল, ইন্দু, ইন্দু।

ইন্দু ছ'হাতে দুক চাপিয়া চুই হুসিয়া সে ডাক শুনিতে লাগিল। ডাক ত নয়, যেখান দিয়া, যে পর্বত নব বাইতেছে, সব বেন পুড়াইয়া দিতেছে।

আবার আহ্বান, চমৎকার অতিথিসেবা করছ ইন্দু, চমৎকার।

ইন্দু হাতে পাঁচ চাপিয়া পাড়াইয়া রহিল। কিন্তু অধিক-কল থাকিতে পারিল না। কি জানি, লোকটার অন্যথা কথা নাই, যদি এখানেই আসিয়া হাত ধরয়া বসে।

উপরে আসিতে, প্রথম বলিলেন, হ্যাঁ ভাল কথা!

তোবার ইয়ের সঙ্গে আলাপ হল যে!

এ লোকটির মুখের পানে চাহিতেও প্রস্তুতি হয় না, কিন্তু ইয়ে টি কে জানিবার কোতুল দমন করিতে না পারায় চাহিতে হইল। প্রথম বলিলেন, দুকতে পারছ না, এ যে তোমার ইয়ে গো। কি নামটা ভাল, হুসিমলপ্রকাশ না কি, ভাল যে!

ইন্দুর নিঃশব্দ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

প্রবন্ধকার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার একটি গাল' ফ্রেন্ডকে সে পড়াত, আলিপুরের এক মি: ঘোষের মেয়ে, সম্পর্ক আমার ভায়েও হয়। তাকে পড়াত, তা' সে আর পড়বে না, সেই এক তোমার কি বলে ইয়ের চাকরীটি গেছে। সমস্ত বেহ, রক্ত মাংস অধি মেন মজা, সমস্ত লোমকূপ দিয়াও ইন্দু শুনিতেছিল।

—ছায়া তার মাটির মশাবের এক আমাকে অনেক বললে-টললে, যাতে কোথায়ও একটি চাকরী-বাকরী হয়...

—চাকরী-বাকরী যে বাকর, হওয়া মুক্তি...

—ছায়ার কাছে আরও অনেক কথা শুনসু...

ইন্দুর মনে হইতেছিল, তাহার হস্ত মজা লোপ পাইবে, না-হয় তাহার মজাও পক্ষাঘাত হইবে।

—তুমি স্তব জুগে পাড়িয়ে রইলে কেন ইন্দু! এখানে এলে বস না। বলিয়া যে লোকটির তিনি বলিয়াছিলেন, তাহারই গর্ভের গালি স্থানটুকু নির্দেশ করিলেন।

ইন্দু কথা বলিল না, নড়িল না, বুদ্ধি তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ অবশ হইয়া আসিতেছিল।

প্রবন্ধকার আবার ও অভিমানমিষিত্বের কহিলেন, আসবে না ত? তাহলে আর বস না।

ইন্দু অতিক্রমে শুককণ্ঠে কহিল, আসছি, আসনি বসুন। বলিয়া সে ঘরের দিকে চাহিতে পারিল। বাবার লইয়া ঠাকুর আসিয়া পড়িলে বেশ হয়।

বুদ্ধত্বমণ্ডা ঠান্ডা আসিয়া পড়িল। পানাস গুছাইয়া, গন্ধের মাখন ধনিয়া দিয়া, গানের একাদশ কোঁচটায় বসিয়া অগলক বেয়ে চাহিয়া রহিল।

—তুমি নাকি তাকে খিয়ে করবে ?

প্রশ্নের উত্তর লক্ষ্য এবং সরল, 'হাঁ' বলিতেও কিছু মাত্র বিধা ছিল না ; কিন্তু প্রশংসার ভাষা, প্রশংসার তরী ও কঠোর এইই কথার বসিয়া মনে হইল যে, উত্তর দিতেও ত্রুণা হইল ; ইহু কোন কথা বলিল না।

—তার একটা ভাল চাকরী হলেই তোমাদের খিদে মতে পায়বে, এই বকম ঠিক আছে, না ?

তবুও ইহু বুদ্ধি বিধা কথা বাড়ির হটল না।

—একটা কাজ আছে, চেষ্টা করলে যে না-হয়, তা'ও নয়, তাই ভাবছি।—বলিয়া তিনি পক্ষীয়ভাবে আশ্রিত লাগিলেন।

ইহু বুদ্ধি দিয়া এইভাবে কথা বাড়ির চাইল, তা যে ভাল হবে বেশ।

—না, এমনও কালের পূর্বাভাস—অর্থাৎ বাস্তবতা আছে। ঐ বেশ, দেখা উঠছে।

—খবর দিন না।

—নিই। বেড়াতে যাবে ? চল, বেড়াতে বেড়াতে পরামর্শ করব এখন।

আবার সেই স্বপ্ন প্রত্যাব।

—যাবে ? স্বপ্নার দিনে বেড়াতে বেশ লাগে।

ইহু বলিল, তুমি গড়ছে যে!

প্রশ্ন বলিলেন, বন্ধ গাড়ীর তেতর তুমি চোকে না।

ইহু বলিল, বাড়ীতে যে কেউ নেই।

—না-ই বা থাক! বাড়ী ছুটি বাবার ভব আছে কি ?

ইহু হাসিল।

প্রশ্ন বলিলেন, আর কবে গল্প করতে ভাল লাগে না। চল, বেরিয়ে পড়ি। সত্যি, পরামর্শ আছে।

বাণী উচ্চিৎ, অথবা নয়, সে কথা আগেই ভাবা হইয়া গিয়াছিল। ইহার লক্ষ ভাল লাগে না, সেই বা ; নইলে শুধু বেড়াইতে বাণীর আগন্তিকি কিলের।

—পাঁচ মিনিট, আমি আসছি, বলিয়া ইহু বাহির হইয়া গেল। খুব যে আগ্রহ ছিল, তাহা নহে ; তবে অনাগ্রহও ছিল না। বেড়াইতেই এখন বাণী হইতেছে, একটু প্রমাণ

করিতে চয়, ভাল কাশড়ও পরিতে চয়, কপালে একটা চোঁটাও দিতে চয়! বেশবিত্তাস করিয়া সে যখন এসে চুকিল, মন্থলোতে মস্ত আলি পুষ্পদ্বিধানে আসিয়া যেমন গল্পন তোলেন, প্রশ্নও তেমনই গল্পন করিয়া উঠিল। কি বলিল না বলিল তাহা বুঝা গেল না বটে, তবে উল্লস সৌন্দর্যের উজ্জ্বলশালাই যে তাহার কর্তে উজ্জ্বলিত হইল তাহা বুঝিতে বাকী বহিল না। ইহু যদি পানিত, সেই বুদ্ধিতে সাজসজ্জা দূর করিতেও বিধা করিত না।

পথে একটা লোক ছাতি নাখার ভিলা জুড়ায় চুপ্ চুপ্ করিতে করিতে চলিয়াছে, বহু দূর হইতে ইহু তাহাকে দেখিয়া সাক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। গাড়ী যখন পথিককে অভিক্রম করিল, ইহু চাই উৎসাহ নেবে তাহাকে দেখিয়া লইল। সে-ই বটে! ইহু যে তাহার ছায়ায় দেখিলেও চিনিত পারে। গাড়ী থানাইতে বলিতে উচ্চ হইল, পানিল না।

পল্লব বলিতেছিলেন, কাকটা ভালই; দেখুন টাকার আয়ত্ত, চার পাঁচ' পর্যন্ত হওয়া আশা আছে। আমি কালই সব খোঁজ নিয়ে এসে পল্লবের সব তথ্যের বসন, কেমন ?

ইহু গাড়ি বাড়িয়া জানাইল, আছে।

প্রশ্ন বলিলেন, আমার মনে হয়, আমি তোমার উত্তর-কে বলিয়ে দিতে পারব।

ইহু গৌণে অল্প কৃতজ্ঞতা কৃত্য উঠিল।

—কিন্তু আমার পুণ্যবান ?

মিষ্ট হাসি হাসিয়া ইহু চুপ্ নত করিয়া লইল।

—বিশেষ করে কি আসে আমাদের মনে থাকবে ?

—না, থাকবে না! বলিয়া ইহু হাসিল।

—সেখা যাবে, কেমন মনে থাকে !

—সেখাবে না।

তাহা করিয়া প্রশ্ন যখন ইহুকে বাড়ীতে নামাইতে আসিলেন, যা শুধনও ফিরেন নাই।

গাধাবাস্য বাণী হইয়া নিঃশব্দ হইয়া, আমি যাই, বলিয়া কণ্ঠের যবে মিনতি আশ্রয় করিয়া ইহু ভিতরে চলিয়া গেল।

হুই তিন দিন পরে প্রশ্ন বলিলেন, ইহু, এইবার তোমার উত্তর-কে—

মাউটকে তিনি চুমো খেলেন। মাঝের তখন জোৎস্না চল, বুধে হাসি। আগ সব কাউলের ত্রি তেখে বৃষ্টি হিংসে হল। না, হিংসে হবে কেন? মাউটের দিষ্ট দুখখানা তেখেলে অমনিই যে আস্ত কথতে ইচ্ছে কবে। তার উপর কি হিংসে হয়!

এখনি কসে ছোট মাউট সিরে এন মাঝের কাছে।

টান্ধা মাঝের পাচ ছেলে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠল; পাচ ছেলেই দস্ত বাঁধ, কিন্তু দস্ত লেগা হল মাউট। যেখন তার পাতে কোন, তেখনি তার ধাবাশো বৃষ্টি। বেণের বা কিছু সে সব কেলসে লিখে। তার মত জোতা বান্নাতে কেউ পাবে না, বইতেও না। কিছুকের বড়ুনি সিরে পছন সমস্তের বড় বড় মাছ গেঁথে তুলতে তার ছড়ি মেলে না।

কিন্তু তার কিছুতে স্থখ নেই।

একদিন মাছ-ধরা সেরে পাচ তাই জোতা বেয়ে গবে কিরছে। হ্যা বসেছে পাটে। হ্যাং মাউই বললে, “দিনগুলো তাই বস্ত ছোট। মাছ ধরে আস বেটে না।”

দান্না বললে, “তার আর উপায় কি! দিন ত’ আর টেনে মাছাতে পারবি নে?”

“কেন পারব না?” মাউই তার জোতার লোকা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বললে, “হ্যাি ঠাকুর বড় চালাক! কাকি সিরে তড়া-তড়ি কাক সেয়ে শালান। দাঁড়াও, তাকে ভব করছি!”

“হ্যাি ঠাকুরকে ভব করবি কি রে? অমন কথা মুখে আনাও পাণ।” দান্না সব ছোট মাউই-এর কথা শুনে একবারে থ।

কিন্তু মাউই বিবধ এককর্ত্তরে, থা ধরছে তা সে করবেই। বললে, “হ্যাি ঠাকুরের পদার ঠাস সিরে বেঁধে কেশব।”

“কি সিরে ঠাস দিবি! কল্যাণাছের আসে ত’ আর হবে না!”

“কেন?” অমন দিকে ছেরে মাউই বললে, “ওই শবদাছ সিরে!”

দান্না হেসে উঠল। কিন্তু ছোট মাউই-এর আবদার না শুনে ত চলো না। জোতা থেকে নেমে তারা শন গাছ গেল তুলতে।

কিন্তু তুলেই সবাই অধাক, শন গাছে এমন ঠাসের বড়ি

দুকিয়ে ছিল কে জানত। দড়ি দড়ি পড়ে গেল মাউই-এর। তার পর শন থেকে দস্তবড় বড়ি তৈরী হল। সে বড়ি এত লম্বা যে বেগে শেষ করা যায় না। সেই বড়ি সিরে পাচ তাই চলল হ্যাি ঠাকুরকে বাঁধতে পূব বিকের উম্ম-পর্কতে। কত নদী মাঠ, কত সমুদ্র পার হয়ে, কত পাহাড় ডিঘিরে, তারা যে গেল তার হিলেব নেই। রাতের বেলায় তারা হাতে আর সিনের বেলা থাকে দুকিরে। হ্যাি ঠাকুর টের পেলে ত’ আর গকে নেই।

কত মাল কত বছর বায়ে পাচ তাই পৌছল সিরে উম্ম-পর্কতে। তখন রাও তোর হয় হয়। হ্যাি ঠাকুর পাহাড়ের উপর সিরে উকি বেবার উজোপ করছেন। পাচ তারে ঠাস-বেগা বড়ি বাঁধিয়ে ধরে’ বইল দুকিরে।

হ্যাি ঠাকুর সেই মাথাটি তুপেছেন, অমন মাথার ঠালটি লাগিয়ে, যে টান আর যে টান। হ্যাি ঠাকুর বম বম হয়ে যান আর কি!

“ওরে কে এমন সর্গনাশ করলি রে, ছেড়ে সে ছেড়ে দে।”

কিন্তু ছেড়ে কি আর বের। ঠাসের বড়ি হাতে করেই এসে এলাদ করে মাউই বললে, “কিন্তু অমন ক’গোনা ঠাকুর। যোম ঠাকি সিরে শালাও। এমন করে না ধরলে আর ত মাথাসের কথায় কান হবে না। তাই একটু কষ্ট বিতে হল।”

হ্যাি ঠাকুর ছোট ছোট পাচটা মাছ তাকে বেঁধেছে নেবেই ত’ অধাক। বললেন, “কি তোমের চাই?”

“এখন থেকে দিন রাত মাথাসের মাথো দিতে হবে। রাতের বেলা সমুদ্রের তুবে থাকা আর চলবে না।”

কিন্তু তা কেমন করে হয়! হ্যাি ঠাকুর অনেক ভর বেগালেন, ধবকাপেন, শেষকালে মিনতি করে বললেন, “তুচ্ছ। মাছ, মাথার একটু খুন্সতেও দিবি নে বাপু!”

তাও ত’ কটে, কিন্তু আসোও যে আসের চাই।

হ্যাি ঠাকুর কেবে চিন্তে বললেন, “তাহলে এক কাণ কহু! মাথার মেয়ের কাছে গিয়ে জা বে, সেই একটা বাব্বা করে যাবে।”

হ্যাি ঠাকুরের কাছে ঠার মেয়ের ঠিকানা ভেবে সিরে মাথার চলল মাউই। এবার সে একা। দান্না কেউ তার দস্ত নেই।

হুঁমি ঠাকুরের ঘরের বেশ—সে কি বুঝে পাওয়া সহজ !

কত কাল পাহাড়-পর্বত বন-বাগাড় ঘুরে, সেবে মাউই পেলে তাঁর বেণা। পাহাড়ের ভিতর গহন গুহ, সেখানে তাঁর বাস। হুঁমি ঠাকুরের সেবে কিছু তারী ভালো। মাউইকে কি আদরটাই না করলেন ! মাউই তাঁর কাছে সাহস করে সব কথা বলতেই তিনি একটা নখ দিলেন খুলে। 'অর্থনি সেখানে থেকে বেরিয়ে এল আশ্রয় আর আলো ; সবসময় অন্ধকার গুহ। আলোর আলো হয়ে দেখ। তিনি বললেন, এখন একে যে পাছে ঠেকাবে সেই পাছই হবে আশ্রয়ের বাহন।

মাউই-এর খুঁশি আর ধরে না। নখে করে আশ্রয় নিয়ে সে চলল বেগে ফিরে। কিছু মাউই-এর স্বভাব বড় মন্দ। কিছুতে তার মাশ বেটে না। পশে যেতে যেতে তার ঘনে হল একটা নখ খুলে বণন এমন ভিঁবন বেরিয়েছে, আর একটা নখ খুলে না জানি কি বেছেবে !

গুহে বৃদ্ধি মাথার চাপতেই মাউই একটা কলসের গাছে আশ্রয়ের নখ লুটিয়ে রেখে কানতে কানতে আবার ফিরে গেল হুঁমি ঠাকুরের ঘরের কাছে।

আশ্রয়ের নখ সে হারিয়ে ফেলেছে। আর একটা নখ তাকে খুলে দিতে হবে।

হুঁমি ঠাকুরের ঘরে এমিকে ঘনে ঘনে সব জানতে পেরেছেন আর খুব রেশ দিয়েছেন। 'তথ্যাত' বলে তিনি একটা নখ দিলেন খুলে, আর হু হু শব্দে বেরিয়ে এল কল। সে কলসের তেড়ি কি সোজা ! মাউই ত' ভেঙ্গে পেলই, সমস্ত মাউই পাট কলস নিয়ে সমস্ত বেশই সেল ফুবে। মাউই-এর অনেক কান্নাকাতিতে হুঁমি ঠাকুরের ঘরের মেজাজ ঠাণ্ডা হল। কলও কমে গেল। কিছু তখন গাছে গুলকান আশ্রয়ের নখ সেয়ে কলসের বোতে হারিয়ে। সে নখ আর তিনি দিতে রাজী হলেন না।

কি আর করে ! মাউই এদ্যর মতী কানতে কানতে ফিরে চলল। তাই বেখে শেষ কালে হুঁমি ঠাকুরের ঘরের বৃদ্ধি হল বহা। তিনি তাকে ডেকে বললেন, 'কানিসনে ! যে পাছে নখ লুটিয়েছিল সে পাছ খুঁজে বার কর। এখন থেকে তুমি সেই হবে আশ্রয়ের বাহন।'

তাই হল। সেই একটি গাছই আশ্রয়ের বাহন। মাউই-এর গুহে বৃদ্ধি হলে আর সব পাছ কলসে পাতে, কিন্তু আশ্রয় জলাতে পারে না।

হাই হোক বেশে আশ্রয় নিয়ে আলো ত' কম কাজ নয়। আর কেউ হ'লে তাই নিজেই সমস্ত পাকত দান্য জীবন। কিছু মাউই ত' ভেবন নয়। কিছুতে তার খুঁশ নেই, কিছুতে তার মাশ বেটে না।

কিছুদিন বাবেই আবার তার মন উলখুল করতে লাগল। কিছু একটা না করলে আর চলে না।

দিন কয়েক বাবে একদিন সে আবার বেরিয়ে পড়ল। এদ্যর সে বাবে মরণের দেবতার কাছে। পৃথিবীতে কৃত্য আর থাকতে দেবে না।

এমন কথা কেউ কখনও পোনে নি। না মানা করলে, ভাবেরা মান্য করলে। কিছু মাউই নাছোড়বান্দা। তাকে কেউই হবে !

সকলকে কানিসনে মাউই গেল একলা চলে গুর পাহাড়ের ওপারে মরণের দেবতার বেণে। পৃথিবী থেকে কৃত্য না খুঁজিয়ে আর সে ফিরবে না।

মাউই আজও সেখানে থেকে ফেরে নি। কে জানে হুহুত সে মতীই একদিন সেখানে থেকে ফিরে আসবে।

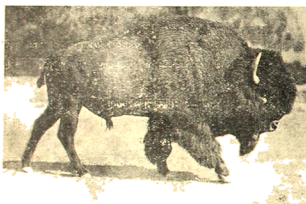
নির্বংশ জীব-গোষ্ঠি

১ বিলুপ্তির দূর্ভেদ্য রহস্য

কলকাতা সহরের কোন পুরাতন বাসিন্দা যদি রিপ ক্যান উইকল-এর মত ৩৯ বা ৪০ বছর বাবে আজ আবার চট্টাং খুঁজ থেকে ফেরে ওঠে, তাহলে কি রকম অবাক সে সে হবে, তা কত শক্ত নয়। কলকাতার সে চেহারা আর নেই, তখু তাই নয়, ঘান-বাহনও পেছে একেবারে বদলে। কোথায় গেল সে মোড়ার টানা ট্রাম আর ছাককা গাড়ি ! তার জায়গায় বিহুভেদে ট্রাম চলেছে মাথায় ঝাঁকশী তুলে, মোটর আর বাস চলেছে রাস্তা নিয়ে হুল হুল করে। তখন যেখানে শৌছোতে হু'কশী মেসো যেত, এখন সেখানে পোনেজো ঘিনিয়ে অনাচারে চলে যাওয়া দায়। মোটরের আর বৈজ্ঞানিক ট্রামের কাছে হার মেনে মোড়ার গাড়ি ঘীরে ঘীরে পোপ গেয়ে আসছে।

ভুঁ মাগুনের সন্ধ্যা নয়, প্রাণিকথ্যেও এমন পুরানো অনেক প্রাণীর জীব কেন ক্রান্ত হয়েই এক এক সময়ে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে সরে গেছে। তাদের চেয়ে ঢালাক আর টেপটে প্রাণীর সঙ্গে পাল্লা তিতে না পেয়ে তারা অনেক সময়ে হটে পেছে সভ্য। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাদের বিলোপের এত সহজ বাধ্যতা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর বহন বহন অত্যন্ত অল্প ছিল, তখনকার হিমাট-কার হাটনোসের নামে স্ত্রীকপের কথা আজ এখানে তুলব না। এক দক্ষ বছর পৃথিবীতে বসেও কবে আমাদের আগতানকার হাটনোসের তিন খবর পূর্ণ বড় হওয়া সত্ত্বেও



হুয়াপুস হাটনোস। বইসন।

কেনন কঠে তারা লোশ পেয়ে গেল, তার আশুখা কাহিনী আর একদিন বলা। আজ ভুঁ দেই সব প্রাণীর কথা আলোচনা করব, মাত্র গুড হাজার বছরের মধ্যে গঙ্গা পৃথিবী থেকে লোশ পেয়েছে বা এখন পেতে বসেছে।

আমাদের ভারতবর্ষে সেকালের কাবো, গয়ে, সিংহের কথার চড়াছড়ি। গুপ্তর মধ্যে সিংহ হল রাজা, সবচেয়ে প্রধান কোন লোককে, সব চেয়ে জোরালো কিছুকে বোকাতে হলেই সিংহের উপমা দেওয়া হ'ত।

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশেরই সেকালের এক রাজার নাম ছিল সিংহবাহু, হার ছেলে বিজয়সিংহ লতা জয় করেছিলেন। বাঘের চেয়ে সিংহ এদেশে বেশী না হ'ক, কম ছিল না বদেই সিংহের কথা এখনওও শোনা যায়,

বাঘের কথা তত নয়। কিন্তু আশুখের কথা এই যে, আশুখাল দেই ভারতবর্ষে সিংহ নেই বললেই হয়। চিড়িয়া-খানায় যে সব সিংহ থরে রাখা হয়েছে, খোঁজ করলে দেখা যাবে, তাদের সবগুলিই এসেছে আফ্রিকা থেকে। এসেদের সিংহকে অনেক কষ্টে গোরাশিয়ারের কাছে রাজার খাস জঙ্গলে করেকটা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের শিকার করা মানা। কিন্তু এত বড় পাহারা সত্ত্বেও তারা কতদিন আর টিকবে বলা শক্ত।

ভারতবর্ষের প্রধান হিংস্র জানোয়ার এখন হল বাঘ। বাঘ ও সিংহ, হিংস্র প্রাণী হিমায়ে দুটাই মানুষের শত্রু।

মাগুণ ওকল কেটে বগতি করার সঙ্গে এই দুই হিংস্র প্রাণীকেই উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু বাঘ এখনও টিকে থাকা সত্ত্বেও সিংহ যে কোন এক-বারে হটে গেল, সে রহস্যের গ্রিক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীতে যে সময় জানোয়ার সম্রাতি লোশ পেয়েছে ও পাচ্ছে, তার ক্ষেত্রে মানুষই অবশ্য প্রধানতঃ হারী। মানুষের হাতেই বা মানুষের প্রভাবের দর্শনই অনেক প্রাণী নির্মূল হয়েছে।

উত্তর-মেরু কাছাকাছি সমুদ্রে এক কালে নানা জাতের তিমি প্রচুর দেখা

যেত। সমুদ্রের এই অতিকার প্রাণীকে দেখলেই ভয় পাবার কথা। শোচ্যর শোণার মত আয়েকার জাহাজ বড় বড় তিমির একটা পেজের কাণটাই ভুবে যেতে পারত। ভুঁ মানুষ ত' কিছুতে ভয় পাবার নয়! এই বিশাল তিমি শিকার করতেও যে লেছা হ'ল না। শেষ পর্যন্ত নরওয়ে আর সুইডেনের লোকের তিমি-শিকার একটা বাবসা হয়ে গাড়ান। তিমি একটা মাত্রতে পারলে লাভ ত' কম নয়। একটা তিমিমাছের গারে যে প্রচুর চর্পি থাকে তা বিক্রী করেই বড়শোখ হয়ে বাওয়া যায়। তখনকার পানতোলা ভাঙোতে দিনে হার্পুন নামে হাতে ধোঁড়া এক রকম বয়স দিয়ে তিমি-শিকার করা হ'ত। হার্পুনিটার গোড়ায় বড়ি বাধা থাকত। হার্পুন তিমির গায়ে বিধে বাওয়া মাত্র তিমি বহন

সমুদ্রে ছুট দিত বা ডুব দিত অবাধ ভাবে, তখন চটপটের হুতোম
যত সেই বড়ি ছেড়ে বেগা চত। তারপর অবাধা বেগন



মহাশয়ের অবাধা বেগা চত।

করে বাছ বেগিছে তুলি, তেমন করে সমুদ্রে হার্পনে গাথা
তিমি তারা খেলিছে হারগণ করে ঘেরে ফেলত। হাতে
ছোঁড়া হার্পন দিয়ে তিমিনিকারের বিপন সেদিন কম ছিল না।
তিমি একবার ঘুরে নৌকো উঠে গিয়েই হল!

যতদিন হাতে তিমি শিকার করতে হয়েছে ততদিন কিস
তিমির বংশ-গোণের সম্ভাবনা বেধা যায় নি। বিজ্ঞানের
উন্নতির সঙ্গে এখন বাস্পের জাহাজে, ক্যান-থেকে হার্পন
ছোঁড়ার ব্যবস্থা হল, তখন তিমিনিকার সহজ ও নিরাপদ
হওয়াতেই তিমির সর্বনাশ হ'ল দ্রুত। নোভের বর্ধিত
হয়ে অবাধা জাহাজ নির্মিতারে তিমিনিকার করতে শুরু
করলে। শেষ কালে এখন অবাধা এখন গাড়িয়েছে যে, উত্তর
দিকের সমুদ্রে তিমি আর দেখা যায় না বললেই হয়। পৃথিবীর
দল জেয়ে বড় জানোয়ার, যে অভিকার নীল তিমি একদিন
উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রে হোলপাড় করে ফিরত, আজ
তাদের একটিরও দেখা পাওয়া হ'ল। তিমি-শিকারী

জাহাজ চৌকি করলেও উত্তর-সমুদ্রে আর হারবার কিছু খুঁজে
পাবে না। এখন এই সব তিমি-শিকারী জাহাজ বন্ধ-বন্ধ
দিকে তিমির খোঁজে ফেরে, অবাধে সেখানেও তাদের
তিমি হত্যা করতে দিলে পৃথিবীতে কিছুদিন বাবে আর
তিমি থাকবে কিনা সম্ভব।

তিমির মত, উত্তর-আমেরিকার 'বাইসন' নামে মহা
জাতীয় প্রাণীর বিলোপের চতুর্থাধী একমাত্র দায়ী।
আমেরিকার দক্ষিণাংশের পশ্চিম দিকের বিশাল প্রান্তরগুলি
এককালে এই বাইসনের বিচরণ-ক্ষেত্র ছিল। এক এক



নিউ জর্জিয়া চতুর্থাধী অবাধা বেগা চত।

পালে দল দল বাইসন তখন এই বিশাল দেশের এক প্রান্ত
থেকে আর এক প্রান্ত চলে বেড়িয়েছে। আমেরিকার আদিম

অধিবাসী ব্রেড-টর্ডিগানদের অনেক ভাতির এই বাইসনট
একমাত্র শিকার ও ভীতিকার উপায় ছিল। তারা তরিতরিত
জান্না নিয়ে এসে পিছনে পিছনেই দেশের ঘুরে বেড়াত।
কিন্তু অধিবাসীরা যত্নে বেটুই প্রয়োজন তার বেশী তারা কখনও
হত্যা করত না। বহু প্রাচীনকাল থেকে শিকার করে এসেও,
বাইসন তাদের হাতে তাই লোপ পায় নি। ১৮৭১ সালেও
আমেরিকানদের একজন পর্যটক পূর্বে থেকে পশ্চিম দিকে
যাবার সময় বাইসনের একটি বিরাট পালের সাক্ষ্য পান।
১৫ মাইল ধরে শুধু বাইসন ছাড়া তিনি আর কিছু দেখতে
পান নি। তিনি লিখেছেন—“মতি আর কোথাও দেখা যায়
না। শুধু কালো মরিচ। বানিকজনদের থেকে খবর মনে হয়,



৬

বহু প্রকারের বৃদ্ধ বাইসন।

কালো ভেদের একটা দেখে-ছোড়া বহু। যেন পশ্চিম থেকে উত্তর
দিকে ঘুরে চলেছে।” এ ব্রহ্ম বড় পাল সে সময় আরো
অনেকে দেখেছে। একটি পালে বৃদ্ধ কম করে হিসেব করেও
অন্ততঃ চল্লিশ লক্ষ বাইসন আছে বলে সে দিন জানা
গিয়েছিল।

কিন্তু ১৮৭১ সালে একটি পালেই যেখানে চল্লিশ লক্ষ প্রাণী
সেখা যেত, ১৮৮৭ সালে সেখানে একটি বহু বাইসনও আরো
দেখা গেল না। কোম্বাভীতে সমগ্র আমেরিকা থেকে বাইসন
যেন উবে গেল। আমেরিকার বাইসনের বিলোপ যে কত
তাড়াতাড়ি হয়েছে, সেখানকার একটি রেল কোম্পানীর
চামড়ার চালানের হিসাব দেখলেই বুঝা যাবে। ১৮৮২ সালে

যে রেল কোম্পানী দিয়ে ২ লক্ষ চামড়া চালান দেখা হয়,
১৮৮৩-তে হয় ৫০ হাজার, ১৮৮৪-তে হয় আর ৩০০ আর
১৮৮৫-তে একটিও চামড়া চালান যায় নি। এত অল্প সময়ে
এমন আশ্চর্যভাবে আমেরিকা বাইসন-মুক্ত হয়ে যাওয়ার
একমাত্র কারণ অবশ্য ইউরোপের লোকের চামড়ার দোকান
সেবিন আমেরিকায় যে যেখানে পেরেছে যতখুন্সি অবশ্যে
বাইসন হত্যা করেছে এই চামড়ার দোকান। অতিরিক্ত
জিসের দোকান, যে হাঁস ডিম যেহেতু তাকেও যে যেহেতু ফেলা
হচ্ছে এ হাঁস কান্নার সেবিন হয় নি। হাঁস হল যেদিন আমে-
রিকার সীমান্তীয় প্রান্তরে বাইসনের রাষ্ট্রকৃত শাসনা ছাড়
ছাড়া অতীতের আগমন বাইসনমত্তের অস্তিত্বের শাস্তি আর
কিছু ঘটন না। চামড়ার বাবলা শেষ হবার পর, কবির দার
হিসাবে এই ছাড়ের বাবলা করেও সেখানকার লোক অনেক-
দিন চালিয়েছে। ঘাসের সঙ্গে প্রাণ দিয়েছিল, বাইসনমত্ত মৃত্যুর
পর অতি দিগে তাদের জমিই তারা উর্বরা করে দিয়ে গেল।

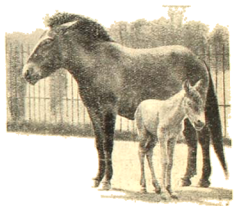
আমেরিকার কোন কোন পশু-সংরক্ষণ-উদ্যানে এখন
কয়েকটি মাত্র পোষা বাইসন দেখা যায়, তাদের বায়ান্ন জাতি
মৃত্যুতে হলে, এখন যেতে হবে কানাডার ম্যাকেন্সি নদীর
অঞ্চলে। সেখানে বাইসনের মদ্যে এক ব্রহ্ম বহিষ্ণ এখনও
বহু অবস্থায় বিস্তৃত করে।

তিনি ও বাইসনের বেলায় বাহুবলক বেদন প্রাণকভাবে
দেখা বলা চলে, ডোডো পাখীর বেলা তেমন চলে না।
ডোডো মরিশাস দ্বীপের একব্রহ্ম বড় পাখী, সেখতে
খানিকটা পাতিহাঁসের মত হলেও, তারা পাখীরই বৃদ্ধ
সম্পর্কের জাতি। ডোডো বেদন কসাকার, তেমন তারা
বৃদ্ধিহীন ও সব বিষয়ে আনাড়ি। না পায়ে তারা আকাশে
উড়তে, না চুপট ডালার দোড়োতে। মরিশাস দ্বীপে সব
বাহুবলক শব্দটির কলমে ডোডো পাখী লোপ পায়, কিন্তু
বাহুবলক হাতে তাদের গ্রিক উদ্ভেদ করেছে বলা চলে না,
বাহুবলক আমবাণী-করা ইঁদুর, মুরার ও বানরই মরিশাস দ্বীপ
থেকে এই নিরীহ নির্দোষ প্রাণীটিকে বিলুপ্ত করে দেয়। যে
সমস্ত ইউরোপীয় নাবিক প্রথম মরিশাস দ্বীপে নামে, তারা
ডোডো পাখীকে দেখা করেছিল ভাবেনা কিন্তু ভুল হবে।
পাখীটির আগ বাবার উপস্থিতি নয়, অল্প কোন জিনিসও তার
দেহ থেকে পাওয়া যেত না, তবু প্রথমে পর্বতপীঠ ও পরে

গলদাখ নাবিকরা অহেতুক হিংসাবশে মাখান মৃত্যুর যেনে
সে যোগেশ অসংখ্য ডোডো পানী লুণ্ঠন করে। নির্দোষের
মৃত পানীগুলি লুণ্ঠনের তায়ে নিহত হ'ত বলেই তাদের নাম
গলদাখো ঘের ডোডো। ডোডো নামে গলদাখ দাখান
বেদুক্ষ। পর্তুগীজেরা যত্রিণাল ঘাঁপ আবিষ্কার করে ১৫৭৭
খৃষ্টাব্দে, ১৬৮১ খালে দেখানো একটি ডোডো পানীও আর
নেখা যায় না। নস বন্ধুর ও খালা মায়াবের লভ্যতার আওতায়
চিৎকতে পায়ন না, তাদের ত' বোকা বলাই লম্বত।

ডোডো পাখীর অনেক পরে আর একটি পাখী পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, কিন্তু সত্য কথা বসতে গেলে ইউ-রোপীয়দের তাদের বিলুপ্তিত কোন হাত নেই। এ পাখীর নাম 'বোয়া'—তাদের বাস ছিল নিউজিল্যান্ডে। বোয়ার আফ্রিকার উট পাখীরই সগোত্র, তবে আকারে অনেক বড়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারো ফুট লম্বা অর্থাৎ লম্বা ষোলো ফুট মাথারের সমান 'বোয়া' বিলুপ্ত ছিল না। নিউজিল্যান্ডের মাওরী জাতি 'ব' পাখির বহুর আগে তাদের প্রধান বাসস্থান থেকে উত্তরের একটি দ্বীপে পৌঁছে 'বোয়া' প্রাণের আধিক্যের কমে। তার মাংস দুখান্ন রসে' এবং নিউজিল্যান্ডে বড় প্রাণী আর কিছু না থাকতে 'বোয়া' মাওরীদের প্রধান পিকার হয়ে ওঠে; এবং একশ বছরের মধ্যেই উত্তরের দ্বীপ থেকে কেবলো লোপ পায়। উত্তরের দ্বীপে আগে লোপ পেলেও নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ দ্বীপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রোড়া পর্যন্ত 'বোয়া' যে টিকে ছিল, তার প্রধান পাওয়া গেছে। তবু কোন ইউরোপীয়ের দ্বীপের 'বোয়া' পাখী চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। দক্ষিণের দ্বীপে 'বোয়া' পাখীর পোপ পাওয়াও তাই বিশ্ববন্ধ ব্যাপার। মাওরীরা দেখানে গিয়ে সমস্ত 'বোয়া' মেরে যে ফেলেনি এ বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত নেই। যে সমস্ত চূর্নিত দুর্বল ভায়সার প্রচুর পরিমাণে

‘মোহা’র ককাল পাওয়া গেছে, মাওদীরা দেখানে কোন কালে হুকুমত পাবে নি। তা সত্ত্বেও ‘মোহা’ দাবী যে অকস্মাৎ কেমন করে সবংশে দেখানে লোপাটী হয়ে যেন, সে রহস্যের কোন ব্যর্থ মায়াংলা বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্যন্ত করতে পারেনি।



ଆବଶ୍ୟକ ସହ ଅନ୍ୟ : ଯାହାକି ୧୫ ମଇ ୨୦୧୮ ରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୮ ଯାଏ ।

তথু মেথো নহ, পৃথিবীর অনেক প্রান্তই কেন বে লোপ পেয়েছে ও থাকে, তার কোন দৃষ্টান্ত এখনো বৈজ্ঞানিকেরা নিতে পারেন না। আফ্রিকার ‘ওল্ড ওয়ার্ল্ডের জিলাকোর জাতি ‘ওকসিদি’, কুটামেণ পার্শ্বের অস্ট্রেলীয় আধা-ভেড়া অধা-ঘরিণ ‘টাক্সিন, ব্রেজিলের বাঁশগাছ মানে বেকুই, মঙ্গোলিয়ার বক ঘোড়া প্রভৃতি ভয়, সমগ্রপ্রবীর ‘বহিষ্কৃত’ প্রাণিদের চেয়ে বৃষ্টিতে বা বলে এমন কিছু পাটো মনে গ্রহণ্য পাওয়া যায় না, তহু কেন বে তারা কাণের বিবর্তনের বিচ্ছিন্ন থেকে পথের পাণে মরে থাকতে বাধ্য হয়েছে ও হুকে, তার বহুস্ত এখনও পত্তীর অধকারে আবৃত।

ହାଏ କଲେଟର ମୂଳ

[illegible]



জীবনশিক্ষা

—শ্রীকাকনমালিকা দেবী

আমাদের বাড়িতে একখানি ইংরাজী, একখানি বাংলা খবরের কাগজ আছে। আমরা অর্থাৎ 'শাড়ী-বধোঁবা' বাসনা কাগজখানিকে 'অধিকার' কল্পনা বসি। ছিপ্রাচর আহাবাদি লেখ কবিতা বিচার্যায় ভ্রমায় খবরের কাগজখানি পুনি। প্রথম বড় বড় অক্ষরে যে সব কথা বা সংবাদের চুখক থাকে, সেগুলি পড়িয়া বই, পত্র পত্রীর পর পূজা উল্টাউয়া ছাউ। ইংরাজের বসি মিষ্টা আসিয়া পড়ে, তাক্য চইলে স্বতন্ত্র কথা

আকাল এমন সিন পুং কমই বাব, বেশি কাগজ পুনিবা মারিদের সম্পত্তি কোন না কোন পরব না থাকে। বেশির ভাগ পরবই লক্ষ্যকরক। পরবগুলি পড়িতে পড়িতে লক্ষ্যে আমাদের মাথা চইয়া পড়ে। বনে সব পরবগুলি না থাকিলেই বেশ চট্ট, আরও মনে তার ট্রিঙলা না ঘটিলে আরও বেশ চইত। কিন্তু বেশ চওগা চুলায় দুইক, খটনা সেন বেশি করিয়া বহিঃস্থে; খবরের কাগজে বেশ করিয়া ছাপা চইতেছে।

একটি বিশেষ ঘটনাব কথা আমার মনে পড়িতেছে, যাত সেটাই বর্ণিব। * * * নামে এক ভরপোকেয়র দা আশপতে নাকিষ্টেইর সামনে পাড়াটয়া বসিয়াছেন, তিনি স্বামীর গৃহে যাওয়া বাস করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার স্বামীর ব্যবহার ভাল নয়, স্বামী ও শাড়ী তাঁহাকে দুর্ভাষা বলেন।

এই রমণিকে আমি জানি। আমরা এখন ... সেনের বাসায় থাকিতাম, আমাদের পালের বাড়ীর একতলাটি ভাড়া দিয়া ইংরাজী থাকিতেন। সংসারে তিনি, ইংরাজী স্বামী ও শাড়ী। শাড়ী পুং বুঝা, ছইটি চকুতেই মোহ চইয়াছে, সেখানে পান

না, তাই কাকক্য করিতেও পারেন না। স্বামী এক মঙ্গা-গলা আকিমে কাক করেন, কত ঘাটিনা জানি না, তবে বেশি যে নয় উঠা জানি। বাড়ী ন'টার সময় নাকে মুখে আলুসিছ, চালসিছ রাত শুভিগা বাহির হইয়া থাকিতেন, আর আসিতেন রাতি পাড়ে আট-টা, ন'টার। সকালে প্রায়ই আশপটে থাকিতেন, আবার রায়ে প্রায়ই তাঁহাকে অনাধারে থাকিতে ছইত।

মিতা গুপ্তবাবো যে কোন ভুতা-নাভার এই রমণীট শান্ত-ভীর সতে মগড়া দাড়াইয়া দিতেন। শাড়ী কাষিয়া কাটিয়া ঘরে গিয়া ভুতা পড়িতেন, বৃৎ গোমলাঘরে ঢুকিতেন। উদানে আশ্রম পড়িত না, কুলুই চইতে হাড়ী নাবিত না। ভ্রম্পোকট আকিল হইতে কিরিয়া একবার না'র, একবার গ্লাস চরণ ধরিয়া সাধা-সাধনা করিয়া বেড়াইতেন। পুত্রের কাতর বিষয় মুখ বেশিঃ মা অধিকক্ষণ রাখ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু বৃৎ উঠিতেন না। নিতেও থাকিতেন না, সময় দিনের কর্মকাজ পরিচাল্য স্বামীকেও খাইতে দিতেন না। মালের মধ্যে মশ পনের দিন এই বকব ছইত।

আমাদের বাড়ী হইতে তাঁহাদের সব কথা শুনিতে বা বৃকিতে আমরা পারিতাম না। তবে আকিমের ভুলি-ছাটার দিন বঝাচ্ছে বখন শওগদর বাসিত, তখন অনেক কথাই কানে আসিয়া পৌছিত এবং একটু একটু করিয়া মশ বৃকিতে পারিতাম।

বৃকিতে পারিয়াছিলাম, বাবুটির এককালে থিয়েটারের লখ ছিল। এনেকার থিয়েটারে পাট করিয়া করিয়া শেখালে তিনি পেখাশা থিয়েটারে ঢুকিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বিবাহ হয় নাট, তাঁহার মা সেখ থাকিতেন। বাবুটি তখন

ঘেসের বাগধা বাগ করিতেন। বিবাহের পরে, তাঁহার ঐ
অনিচ্ছাস্থানে তখন তিনি এবে বাগধা করিতেন না ;
খিচটোরের এক মটর বাড়ীতেই থাকিতেন।

এই সব কথা সত্য অথবা নয়, তাহা জানি না ; তবে যদি
সত্য হয়, তাহা চলে যতই যত্ন হইবে, এমন দোক বিবাহ
না করিলেই পারিতেন। কিন্তু তা পারিলেন না। তাঁহার
অঙ্গিরের ডেলপাচার বাবু অষ্টাবদ বর্ষী ভূমিকো বিবাহ
করিয়া গিল্লেন। এখন পতীর বয়স পঁচিশ, বাবুর বয়স
কত হইবে? বোধ হয় চল্লিশ বা কাছাকাছি।

বাবুট লম্বা একহাঙ্গা, কালো, গৃহিণী মোটা ও বেটে এবং
খানিকটা কুরল।

বিবাহের পর কয়েকবৎসর তাঁহার কোথায় ছিলেন কে
জানেন, এক বর্ষকালে আশাবের পাশের বাড়ীতে আসিয়া
উঠিলেন। পাড়ায় কোন বন্ধু সোক (বীলোক) আসিলে
তাঁহার সম্বন্ধে কোঁচন্দী হইতে আশাবের মেয়ে হয় না।
আশাবও হয় নাই। যেন আছে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে,
তবু ছায়ে উঠিয়া সেই বাড়ীটার দিকে ঈর্ষাকুলি মারিতেছি,
যদি সৈবাৎ নরায়ণতাকে দেখিতে পাওয়া যায়। চোখোচোখি
হইলেই ভাল। ডাকিয়া মাগণ জমাটতে ঘেঘেদের বেশী
সময় লাগে না। দেখিতে তাঁহাকে অনেকবার পাইলাম, কিন্তু
চোখোচোখি হইল না, ডাকিতে পারিলাম না। বিবি বেটে
চণ্ডা বোটাসোটা আলাদি-আলাদি বোটী, ছেলেপুলে হয়
নাই বলিয়াই যেন হইল (সত্যই তাই), বেশ আটলাট গড়ন।

একমুহুরেই তাঁহার কতকটা পরিচয় পাইলাম। বোধ
হয় বাড়ী বদলাইবার সময় পাড়ার ছাত্র ভেদ করিয়া খানিকটা
বৃষ্টিও তখন পাড়ার ভিতরে পড়িয়া, তাঁহার বাসিন বিদ্বান
ভিক্ষাওয়া সিদ্ধাছিল, তিনি মাঝে মাঝে উঠানে বাহির হইয়া
লাগিতেন আর উহনমুখো সেবতার মূখ্য বারবার হুড়ো
আসিয়া বিবাহ' অজ্ঞান প্রকাশ করিতেছেন। সেবতা
রানমুখে নীরব রহিয়াছেন, তাঁহার স্বামী ইহাতে কেবল
বাড়িয়া বাইতেছে। স্বামী বাড়িতে বাড়িতে যে বেশ' পোড়ের
অসাবধানতার দ্বারা বাসিন বিদ্বান ভিক্ষাওয়া, তাঁহার
উপরে আসিয়া পড়িতেছে।

সেদিন রবিবার, সোকাট মাখা চুসকাইতে চুসকাইতে
নাগির হইয়া আসিলেন। তখন সেবতা উহনমুখা কিংবা

এই সোকাট চুসাবদন, তখননাটী সে বিদ্বত নিঃসংশয় হইতে
না পারিয়া উত্তরও বুঝেই অনল দায়োপ করিতেছেন।
সোকাট খুব ভালমাসন, হোকে পাও করবার উদ্দেশ্যে কত মিষ্ট
কথা বলিলেন, একদিন রৌদ্র হইবেই, সেদিন রৌদ্রে দিলেই
বাসিন বিদ্বান'র বোধ পড়ন হইবে, এই স্বপ্নের কত সান্নাট
দিলেন, তবুও কোন কাজই হইল না।

দেখিতে লাগিলাম, সোকাট তপ্ততবেলা বাড়ীটার একটা
না একটা কাণ্ড ঘটাইতেছে ; তাঁহার জেব বাসিন পঞ্চাঙ্গ চলিত।
একটা রবিবারের কথা বলি। সকালে ছালে কাপড় বেশিয়া
দিতে আসিয়া বেবিলাম, একটা বড় গোছের বীলোক
সিঁড়ির নীচে বসিয়া রীক্ষিতেন, কুটি খুব ঘটন সমে
তাঁহাকে সব বোঝাও দিতেছে। বাবুর মা সোকা যে ছানে
তোলা উহনে পিছলের সর চাপান, সেদিনও সেইখানে সর
চাপাইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময় বাবু বাজার দিয়া
আসিলেন। বাজারের খণ্ডেতে হাত পুরিয়া বৃন্দা পাঠিলেন,
সবই সিঁড়ির নীচে বসি রীক্ষিতেন, তাঁহার কাছে দিয়া
আসিলেন। শান্তকী গোটা গুট আনু ও পটল চাহিয়া-
ছিলেন, আর বাবু কোথায়? বৃন্দা নাক-চোখ-কাপ-মাখা
পুরাইয়া বার বার এমন মূখ-কাপটা দিলেন, যেন জুগে বড়ী
উহনে দটিহুত মল চলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন। ইহাতেও
তাঁহার দৃষ্টির শেষ হইল না। সিঁড়ির নীচে যে বীলোকটি
রীক্ষিতেন, তিনি বাবুকে ডাকিয়া বৎসবোনাতি তিরস্কার
করিতে লাগিলেন। ততক্ষণেই সেই যে বাড়ি গৌর করিয়া
গাড়াইলেন, একট বার মূখ ডুকিলেন না বা মূখ খুলিলেন না।
বীলোকটি অনেকক্ষণ পরে থাকিলেন, তখন আবার বৃন্দা
আরম্ভ করিলেন। বৃন্দা কথায় বৃন্দাম, এই বীলোকটি
তাঁহার জননী! বৃন্দা বক্তব্য এই যে, তাঁহার মা চিরদিন
জামারের বাড়ীতে পাঠ পাঠিতে আসে না, একদিন
আসিয়াছে, তাহা'ও তাঁহার মা'র পক্ষে তাহাও অসম্ভব হইয়া
উঠিয়াছে।

জামাই এখানে মূখ খুলিল, বলিল, আরে আরে,
অপরাধীর দত্ত, মা'কে হুঁটো আনু দিলেই ত' পাঠতে!

যেদন এলা আর নাট হাট করিয়া আসুন জামাই উঠা,
এই অধিকাংশের শেষ মূখও আমি দেখিয়া রাখিয়াছিলাম।
ততক্ষণেই অদৃক অবগতেই চাটা বাড়ে করিয়া বাসিন

হুইয়া গেলেন : যা ও ঘরে পরগাছা করিতে করিতে ঘণ্টাখানেক আহার সমাধা করিয়া, তাঁহার কত ভাত বাড়িয়া, কলাপের বাসন চাপা দিয়া সিঁড়ির নীচে রাখিয়া শুইতে গেলেন। ঘরে হেলের মা এবং পশে ছেলে, ছ'ভনেরট পেন্ডিন একাধার উপবাস গেল।

বয়ে প্রলয়-কাত। বাব অনেক রাত্রে ক্রিড়া বনে কামা-কপড় ছাড়িতেছেন, তাঁহার গৃহিণী উঠান চইতে কপাধ ছাড়িলেন, কোন্ মা-মাসীর বাড়ীতে এত রাত্তির করা হল, তাই শুনি নু নিশ্চরই মরতে 'খাটাবে'র মাগদের দয়তায় মরতার বোঝা হুঙ্কিল। তা সেই পেনে সেই মা-মাসীতের কাছে থাকগেই ত হত, এত রাত্তিরে আবার হাড় আলাতে মাস গোড়াতে এখানে আসতে কে মাথার দিকি নিষেছিল, তিনি ?

ভ্রলোকটি বহিরে আসিয়া, দ্বীর মাঝে পাড়াইয়া বীর কণ্ঠে বনিনেন, ভ্রলোকে কতদিন বসিছি না, আমি থিরেটারে বাই নে।

—তবে কোন্ চুলোর দাকা হয়েছিল তিনি ? গোলাই বা হল কোথায় ? কোন্ মাসী-পিসির বাড়ীতে বেমতর ছেল বে বাড়ীতে ভাত রুচল না ?

ভ্রলোক কতর কণ্ঠে করিলেন, সেলা চর নি সত (পরে জানিয়াছি নামটি সৌমিনী। সৌমিনীই বটে !) রাত্তার কদের হল খেয়েই দিই কেটেছে। বাড়ীতে চুকগেই ত কাক চিল উড়ে প্যাপাবে, তাই আমি নি।

সৌমিনী নাকিস্তরে বসিতে লাগিলেন, তা আসবে কেন ? আবার মা'কে বে ছুটি চোকে দেখতে পার না, পাছে আবার মা'কে দেখতে হয়, আবার মা'র সঙ্গে ব'সে ছ'বও কলা কসতে হয়, বাড়ী চুকতে আছে ? নাও, এখানে কুঁড়ো পাতর রাখা আছে, গিলে কানামের কেরতাপ কর।

ভ্রলোক বসিলেন, হাত পা হুট, বুয়ে পাঙ্কি।

সৌমিনী চপিয়া গেলেন। রূপূর বেনা ঐ কলাপের-খাপা-জাকা ভাত টিক ঐ পানেই বেশিছাছি, বিকালেও বেশিছাছি, এখনও বেশিতেছি। সকাপের সেই ভাতই যে সবরে খাবী-সেবতার ভর সৌমিনী রাখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আবার কোন সম্ভেদ ছিল না, ভ্রলোকটি পানু

কিনা অথবা খাইতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে আবার সম্ভেদ এবং কৌতূহল দুটো ছিল। অতকারে আশিয়ার খিগা পাড়াইয়া বহিলাম।

বাবু হাত-মুখ ধুইয়া, গামছার পা মুছিতে মুছিতে তাহের ধামার কাছে বসিতে গিয়া না বসিয়া মা'কে ডাকিতে ডাকিতে মা'য়ের ঘরের দিকে চলিলেন। পূব সম্ভেদ, এট সম্ভেদ বনে পড়িল যে, ঘরনীও অন্যাহারে আসেন। ক্রিড়িতে অনেকখানি ঘেরী হটল। ক্রিড়া আসিয়া, ঢাকা পুগিয়া খাইতে বসিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাতগুলি নাড়াচাড়া করিয়া টিপিয়া টিপিয়া খেলিলেন, পরে একবার এদিক, একবার ওদিক চাহিতে চাহিতে আবার ভাতগুলি ঢাকা দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভ্রলোক যে রকম কলম দুইতে ভাতগুলির দিকে চাহিতে চাহিতে উঠিলেন, তাহা দেখিলে কষ্ট হয়। মায়াদিন অন্যাহার, খাইতে বসিয়া কতকগুলি ঢাল খেলিতে খাইলেন। আবার চোখে ঞ্চল আসিয়া পড়িয়াছিল। মাসো, নারীতে এখন কলরও আগ্রবের মাঝে ধরিয়া দিতে পারে।

বাবু কলকলার গিগা হাতটি সবে ধুইতেছেন, সৌমিনীর বিকাশ হইল। সৌমিনী কতর দিয়া বসিলেন, খেল না যে বড় ? কোন্ মাসী-পিসী সোলাপ করে গিলিয়ে দিচ্ছে বুকি ?

ভ্রলোকটি একবার কটনট করিয়া চাহিলেন ; পর মুহুর্তে বেন আঘতবধন করিয়া গঠা বড় নীচু করিয়া জ্ঞপ্ত হইলেন, বোধ করি ঘরের ভিতর গেলেন। তাঁহার সৌমিনী তাঁহার দিল্ল দিল্ল চপিলেন, মুখে ঐ মুছিতেছিল।

হুইং একদিন পহরের কাগজে “আইন-আদালত” সংবাদ মনো সৌমিনীর নাম বেশিয়া ঘটনাট। এক নিঃখালে পড়িয়া কেদিলাম। সৌমিনী অভিযোগ করিয়াছেন,

তাঁহার খাবী অত্যন্ত হ্রাবহার করেন।

তাঁহার উপর অকথা অত্যাচার করেন।

তাঁহার মা ও ভ্রাতা অতীত স্বজনবর্গের সহিত তাঁহার খাবীর ব্যবহার অত্যন্ত কর্ণা।

তাঁহার খাবী তাঁহাকে পেট ভরিয়া খাইতে বেন না।

তাঁহার খাবীর মজার বোধও আছে।

তাঁহার খাবী থিরেটার কবিতেন, এখনও করেন।

কাৰ্ণেই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন যে, ভক্ত গাহেব যেন এমন খাবীর বস করার বিড়ম্বনা হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিয়া কৃতার্থ করেন ।

আমি এখন সৌদামিনীকে দেখিতাম, তখন বিপন্নতা বাহ্যিক ছিল, তখন সৌদামিনীর অকথা অত্যাচার ও অসংখ্য দুর্দশাব্যথা তাহার বাম্বীষ্ট সহ করিতেন । পোকেট অল্প অত্যাচার কথা হুই থাকুক, কখনও সৌদামিনীর একটি কথার একটি কথা উত্তরও দিতেন না । সৌদামিনী তাঁহাকে কুবাপুত্র অথ বোম্ব নাট, যদি বা বিনাছে, অসংখ্যক গালি পাশাঘায়ে মর্দা এখন উন্ন কোড় লিগছে যে বাইবার আশেই তাঁহার চক্ষু হইতে বস কর করিয়া জল করিত ।

সেই বাম্বী সৌদামিনীর সঙ্গে দুর্দশাব্যথা করিয়াছে, অকথা অত্যাচার করিয়াছে শুনিলে বিচলিত করিতে প্রগতি হয় না । নিষ্ঠুর, ভালবাসু, অহুগত বাম্বী পাওয়া ভাগ্যের কথা বাম্বী : 'কিন্তু পোকেট চেয়ে বরম আর ভুতর চেয়ে অম্বয় বাম্বীর প্রতি দ্বীপ লজা পোকেট কিনা, আবার তাহাতে নন্দক আরছে । সৌদামিনীর বাম্বীর বস বাম্বী পাটরা কোন বম্বী যদি আপনাকে ভাগ্যবতী বনে করে, তাঁহার সহিত আমায় আপাণ করিতে টঙ্কা ভাগে ।

আলাপতে সৌদামিনীর বাম্বী হীকে ওরে দটকা হাটবার জন্ত অনেক কাহুতি-মিনতি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু দ্বী গাভী হয় নাই । সৌদামিনীর হটকা তাহার না, হাট, হাটেরে দ্বী লাক্ষা দিয়াছিল, "কিন্তু বাম্বী-ভক্তলোকটি একটি লাক্ষীও ডাকেন নাই । হাকিম সাহেবের প্রানের উত্তরে কেবল এট বসিয়াছিলেন যে তিনি কখনও দুর্দশাব্যথা করেন নাই । লাক্ষী অনেক আছে, কিন্তু তিনি কাহাকেও ডাকিবেন না ।

বিচারে তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত হইল, সৌদামিনীকে প্রতি মাসে ২০ টাকা করিয়া মাসোমাসা দিবার চুক্তি হইয়াছে । সৌদামিনী তাঁহার ভনবীর সঙ্গেই বাস করিতে থাকিবেন ।

এত বড় একটি গর বসিয়া পাটিকাসিপের বৈধেয় হানি ঘটাইয়াছি, সেই জন্ত আমি গুণিতি : প্রদত্তি না বহিলে যে কথা বলা সাধারণ উদ্ভেদ, তাহা বলা হইত না ।

সৌদামিনী নারীজন্ম লইয়াছিল, নারীজন্মের অভিশাপ হইতে আত্মরক্ষার উপায় তাহার ছিল না । তাহাকে পরের

বস করিতেই হইলে ; পরব্রহ্মতা জির তাহার গতি নাই । তাহাকে তাহার না কাপড় পরিতে শিখাইয়াছিল, টিপ পরিতে শিখাইয়াছিল, লাজগল্লাও শিখাইয়াছিল, হরত (জানি না) দেখাপড়াও শিখাইয়াছিল, কিন্তু যে একটি মাত্র কাজ শিখাইলে তাহার নারীজীবন ধর হইত, সেই শিক্ষাটিই তাহাকে দেওয়া হয় নাই । তাহাকে কেহ বলিয়া বেশ নাই যে, কোন কারুণেই শ্রীলোকের পক্ষে উগ্রব্রতাব হওয়া লক্ষণ অপাঙ্গিত মূল । শ্রীলোক সুপরা হইলে সংসারে কাকপক্ষী হিহিতে চাহ না, মাহুত অনেক বড়, অনেক উঁচু ।

ব্রহ্মকে ব্রহ্মভীর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । গ্রাম্যজন, মহাভারত প্রকৃতি আদর্শ পুস্তকে নারীর যে আদর্শ আদ্যা দেখিতে পাউ, তাহার কথা যদি আদ্যা আজ গর-কথা বলিয়া হাঙ্গি উড়াইয়াও দিই, আমাদের পিতামহী, মাতামহী, প্রপিতামহী, প্রমামামহীর জীবনের গরও কি আদ্যা শুনি নাই ? তাঁহার যে ব্রহ্মভীর বস লক্ষণগা ছিলেন, তাহার কত কথা আদ্যা প্রেতঃকই উনিয়াছি ।

আমাদের কবিতা বঙ্গলন্দব মূখের সঙ্গে কমলের তুলনা করিয়াছেন । কমলের গোড়াই কি শু শু গ্রাহ্যের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে ? কমলে মধু অস্ত্রি কি তাঁহার জানিছেন না ?

সৌদামিনীর কথা আলোচনা করিতে আবার আশে টঙ্কা হয় না, বসঃ বলা হয় । শু শু অত আমাকে সেই কথা আলোচনা করিতে হইতেছে । সৌদামিনীর ভালবাসু বাম্বী বিবাহের আগে কুি ছিলেন, না ছিলেন, তাহা সৌদামিনী জানে না । জানিবার কথাও নয় । লোকমুখে হরত ঐ থিয়েটারের কথা শুনিয়াছে । সেই কথাতে বেধাকা মানিরা লইয়া বাম্বীকে উত্তিতে বসিতে গৌটা এ দিয়াছেই, আবার কহিলে সঙ্গে অপ্রজ্ঞা, অসত্যও পরিবেশন করিয়াছে । এ তরুণক ঐ হুটাই সহ করিতেন, হতমও করিতেন ; অত কোন পূর্ব হইলে, প্রথমটা দিলেও, আঁহারে অপ্রজ্ঞা ও অসত্য সহিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না ।

আমরা আধুনিক কালে জন্মিয়াছি বটে, কিন্তু আধুনিক মনোভাবের শিক্ষা-লীলা লাভ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই । আধুনিক সমাজে যেসবের বাহ্যবাহ্য শিক্ষানু হয় না, যদি বা হয়, শৌখীন হু' একটা ডিপ তৈয়ারী করিতে শিখাইলে বস কাজ করা হইল মনে করা হয় । এই মনোভবে কোন বেয়ে

যদি হুঁচারটা না-ন-না-মল-না-মি-মি তরকারী গাঁথিয়া একদিন বৈশাখ বাড়ীর লোককে পাওয়ায়, তাহা হইলে বাড়ীতে ত' বটেই, সেনা-সেনা বড় বাড়ী আছে, সব বাড়ীতে খবর (বের বেতাবে) চাখিয়া যায় ও হৈ হৈ পড়িয়া ঘর সবাই হু হু করিতে থাকে। আমরা যে সমাজে চরিত্রাধি, সে সমাজে “কথাখানা”র সঙ্গে সঙ্গে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে বস্তাবস্তি না করিলে মা'রা মেয়েদের গরর নাখিয়া নিতেন। আমাদের সমাজে গলা মাখিয়া গলা মিঠে করিয়া গান গাইবার তাগাদা ছিল না, তবে কথা কহিবার সময় কণ্ঠস্বর বাহ্যতে কর্কশ না হয়, তার জন্য কড়া শাসনের ক্রটি ছিল না।

আমার পিতামহী কিছুটা চব্বলস্বর শোক ছিলেন তাহা আমি আমাদের এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, পাটিকানের ঘরে আছে বোধ হয়। পিতামহী দেবালের লোক, আমাদেরও দেবালের শিক্ষা দিয়া “মাসী করিতে” বলিয়াছিলেন। “মাসী করিতে” কথাটি আমার নয়। কণিকাতা হইতে আমাদের অনেক আত্মীয় ও আত্মীয়া আসিতেন, তাঁহারা আমাদের হই বোনের “মসী” বেঁধিয়া মাঝে চুপি চুপি বলিয়া গাইতেন, বেয়ে ওঠিলে “মাসী” করতেন তাই। না শুধু গুনিয়াই গাইতেন, কথা বলিবার সাধন তাঁহাদের কোন দিনই হইত না।

পিতামহী শিখাইয়াছিলেন, জোরের কথা বলিবে না। ছেলেমেয়ে “সদা সত্য কথা বলিবে” এট নীতিবাক্য কুণ্ডিতও যেমন শেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদের এই শিক্ষা বিশ্বস্ত হইতেও তেমনই শেখাইয়া দিয়া। তাহার ফলে সোজা হুঁচারবার উদ্ভব-মধ্যম হইত। উদ্ভব-মধ্যমের শিক্ষা বড় ভাল

হয় না। শুধু আমার নয়, সে শিক্ষা ভাল কাহার বড় হয় না। আরও শিখিতে হইয়াছিল, কাহারও কথার গিঠে সমান হেতে কথা বলিবে না। বড় কথারই বাসুক, বশিতে হয়, পরে বলিবে, তখন কথাকাটা কাটি করিবে না।

বাগ কালে এই উপদেশের মর্ম যেমন বুঝিতাম না, পালন করিতেও তেমনই অবহেলা করিতাম। পিতামহী ছাড়িবার শোক ছিলেন না। পানীকে যেমন করিয়া রাখা কষ্ট বুঝি শিখায়, তিনি তেমনই করিয়া আমাদের এই উপদেশ অত্যন্ত কঠোরইতে লাগিলেন।

আজ বুঝিয়াছি, এত বড় অমূল্য উপদেশ মারীর পক্ষে আর নাই। কত অশান্তি, কত সংঘর্ষ, কত বিপর্যয়ের হাত এড়াইতে পারা যায়, তাহা বলিবার নয়।

সৌম্যমিনীকে সে শিক্ষা কেহ দেয় নাই। বিশেষ, বাবার ঘর হইতে পলায়ন করিয়া বামী থাকিতে, বিধবা মায় ঘরে আগ্রহ পইয়া বাড়িয়া মরিয়া থাকিতে তাহাকে হইত না।

আমার মনে হইতেছে, সৌম্যমিনী এত কাণ্ডের পর আজও নতুন করিয়া জীবন ও সংসার শুরু করিতে পারে। কিন্তু সে কি তাহার ক্ষুধার রসনার অগ্রভাগ কাটিয়া আসিতে পারিবে? বলা নিশ্চয়োক্ত, ছুরী কাটি দিয়া কাটিতে হইবে না, মনে মনে কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

সৌম্যমিনী কি তাহা পারিবে না? পারিলে তাহার বামীর গৃহ আমরণ তাহাকে আদর আশ্রয় দান করিতে পারিবে।

সাহিত্যের খবর

কবী কল্যাণ বসুর দ্বারা বঙ্গ লগ্নে জ্ঞানকালের ইচ্ছা প্রকাশিত না হইয়া বঙ্গ উপত্যকায় ইচ্ছা প্রকাশিত হইলে কবি ও পাঠক-স্বার্থের সর্বজন লাভক হইল। জ্ঞানকালের ইচ্ছা প্রকাশিত না হইয়া উপত্যকায় ইচ্ছা প্রকাশিত হইলে বাস্তবের সর্বজন লাভক হইল। কল্যাণ বসুর দ্বারা বঙ্গ লগ্নে জ্ঞানকালের ইচ্ছা প্রকাশিত না হইয়া বঙ্গ উপত্যকায় ইচ্ছা প্রকাশিত হইল, তখন কবী বিকৃত হইবার এক বিকৃত পথিকের উদ্ভব হইল, বিকৃত হইল।



বিজ্ঞান জগৎ

ভারী হাইড্রোজেন ও ভারী জল

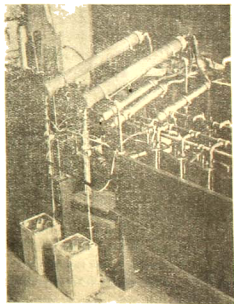
— ড. হুমায়ুন কবীর

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে দুই দশক পূর্ণ হইল। এই সময়ের মধ্যে বিজ্ঞানের অসংখ্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে।

এই সময়ের মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের অসংখ্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে। এই সময়ের মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের অসংখ্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে।



অধ্যাপক স্যার লুইস ব্র্যাউন



ভারী জল প্রস্তুত করার যন্ত্র

বিশেষতঃ একটি ভারী কণিকা (nucleus) ও ইহা হইতে উৎসৃত দুর্বল আলোক-তরঙ্গ, — ইহা হইল তখনকার পর্যায়ের অগ্রগতি। তখন জানিবার সময় হইত যে, একটি পরমাণুর কেন্দ্রে অসংখ্য প্রকারের কণিকা আছে। এই কণিকাগুলি, কিন্তু প্রত্যেকটিতেই (radio-activity) স্বতন্ত্র শক্তি আছে।

এই সময়ের মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের অসংখ্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে। এই সময়ের মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের অসংখ্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে।





ট্রয়ের হেলেন কি আমাদের সীতা ?

—খ্রীশিশিরকুমার মিত্র

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃৎপূর্ণ অধ্যাপক জীকৃৎ অস, এ. পদা বিশ্ব-সভাস্থায় ইতিহাস-অন্যায় তাঁহার ভীষণ উৎসর্গ করিয়াছেন। এত সম্পর্কে তিনি ৩০০০ হইতে ৫০০০ বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ দল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা হাথা প্রবাদিত হইলে যে, বাস্তবিক বারমাসট হোমনের 'ইলিয়াডের' মূল প্রেরণ। তিনি বলেন, তেমন 'ট্রয়' হইতে আসেন নাই, বরং আসিয়াছিলেন 'লতা' হইতে এবং 'হোমার' পুঙ্খের' নামক ছিল অসামান্য ও লক্ষ্য অধিবাসিগণ। হোমার, রাম, সীতা এবং রামের মতন রাম করণ করেন বেনেগল, হেলেন ও প্যারিস।

প্রফেসর দাবা আপত্ত বলেন যে, গ্রীক, মিশরী ও মধ্য- (মধ্য-আমেরিকান) সভ্যতার আদি কেন্দ্র হটল ভারতীয় সভ্যতা— ভারতীয় সভ্যতাকে কেন্দ্র করিয়া তাহারের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্য হইতে গ্রীকরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়েন এবং মাছালা ও মেসিডন নামের মূলও ঐ মধ্য।

মধ্যে সাক্ষরক নামে এক বংশ ছিলেন, পরে উচারাট গ্রীক বলিয়া পরিচিত হন।

সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষাতেও সামন্তত লক্ষিত হয় এবং উভয়ই যে এক ভাষা হইতে উদ্ভূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রীক সভ্যতার পূর্ববর্তী ভারতীয় স্থাপত্যের একখানি চিত্র অধ্যাপক দাবার নিকট আছে। উহা বর্ণন মেছুসার চিত্র বলিয়া অস্বীকৃত হয়।

বিচার-বিভ্রাট

কেব কিছু অগ্রসর করিলে তাহার বিচার হয়—এক বিচারে অপরাধী দাব্যত হইলে তাহার দাড়া হয়—মহুত-লম্বাকের

টহাট চিরায়িত বিশ্ব—অনানি কাল হইতে এট বিশ্ব চলিয়া আসিতেছে। কিছু যদি বনি কোন কোন দেশে ভয় ভাবোয়ারাণেও বনি অপবাদ করে, তবে তাহাণিকেরে অপবাদের কাঠগড়ের পাড় করাটো বিচারের দল কিছু অগ্রসর করে লগ্নে অগ্রসরও করা হয়, তবে তবু আপনাতা তাহা নিতান্ত আভগরি বলিয়া মনে করিলেন; অথচ সভা বলিয়া কথিত উইগোপের অনেক প্রদেশে মধ্য যুগে মতট ভয়-ভাবোয়ারদের প্রবলকার বিচার-প্রচলন নিতান্ত ঘটত।

দোড়ল সভ্যতার লম্বা আইনটির ব্যবস্থাপোষিত চ্যাসেনি (Bartholomew Chassanee) ইক্সের উকিল রূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। একবার কয়েকটি উদ্ভব কোন ক্ষেত্রে বলি নই করিয়া দেয়। বিশেষ প্রতি-নিধির নিকট তখনই লালি কচ্, করা হটল এবং তিনি বিচারের ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট নিষ্কারিত করিয়া চ্যাসেনিকে উদ্ভবের পক্ষে উকিল নিযুক্ত করিলেন।

মত নই করা ব্যাপারে উদ্ভবের বড়ই গুরুত্ব। তাই চ্যাসেনি বাধ্য হইয়া আইনের ঠিকত্বের দলন করিতে লাগিলেন—যদি এই ভাবে লিখ্য কথিত করিতে কোন প্রকারে অপরাধীদের আইনের কলন হইতে বাহির করিয়া আনিতে পারেন। প্রথমতঃ তিনি আপত্তি করিলেন, তাঁহার মতেলসম্ব এক স্থানে বাস করে না, ব্রহ্মাৎ একটি মাত্র মনন দ্বারা লকনকে হাতিব করান সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি হটল, প্রতি গ্রামের দল-মন্দির হইতে আবার পূজক করিয়া মনন-গুলি চাৰি করিতে হইবে। এট আদেশ পালন করিতে খেটে মনন লাগিল এবং দোড় সভ্যতার বিচারের নিম্নে চ্যাসেনি পুনরায় আপত্তি জুগিলেন—তাঁহার মতেলসম্ব বিচারালয়ে

আমিতে প্রবৃত্ত হইয়াই আছেন, কিন্তু পথে বিপদাপন্ন অনেক, বিশেষতঃ মাক্ষারোগে ভোগাবের ভয় ও পাত্ৰতা বোধ আছে, কাজেই তবে তাহারা আদিতে পারিতেছে না। একশ ক্ষেত্রে অল্পপতিত হইলে আইনতঃ তাহাদের অপব্যয় মাক্ষারী।

একবার বিউনির (Braune) অধিবাসিত্ব অটনের (Auton) বাচক-বিজ্ঞাপনকে আশিষ প্রদান করিল যে, পতঙ্গদত্ত তাহাদের শত্রুদিগে নষ্ট কাঁচা ফেনিতেছে, সুতরাং তাহাদিগকে শত্রুদের হইতে বহিষ্ঠত করিয়া দিবার আদেশ দেওয়া হইক। তখনকার কালে পোকে বিশ্বাস করিত যে, ধর্ম্মবাক্যকৃত্য যদি অনিষ্টকারী পতঙ্গদত্তের বিরুদ্ধে অভিসন্ধাত্ত্বকৃত্য আদেশ জারী করেন, তবে তাহারা তৎক্ষণাতঃ বিনষ্ট হইবে। একবার নাকি রিশেনসিট (Reichenssitt) ষোণে ভগ্নাক লানের মোরাডা চয়, তাহা পর সেট পিরমিনিয়াম (St. Pirminium) নামক এক সাধু ঐ ষোণে পদার্থ করিয়া যার সেই সকল সাপ তৎক্ষণাতঃ তৎক্ষণি পবিত্রাণ করিয়া জলে বাঁধা আগ্রহ পায়। কখনও কখনও বা কোন দেশের অধিবাসিত্ব শোণের নিকট হইতে অভিশাপ নিখাট্টা পট্টা আশিত—তাহারা বিশ্বাস করিত যে, সেই অভিশাপের ষণে তাহাদের অনিষ্টকারী ভীষণতা বিনষ্ট হইবে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লুর্নার্ন (L. uerna) এর অধিবাসিত্ব—এইরূপ একটি দলিল শোণের নিকট হইতে জব্দ করেন।

কিয়ারে সকল ক্ষেত্রেই যে অসদাধিগ্ৰহ অব্যাহতিও পাটত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সেট জুপিডেনের (St. Julien) মঙ্গলপ্রভ-কারকরা দলদলিতকারী পতঙ্গদের বিরুদ্ধে নাশন কল্প করে। পিয়েরী ফকন (Pierre Falcon) এবং ব্রড ময়েন—এই দুইজন পতঙ্গদের পক্ষে উকিল নিযুক্ত হন। এই ক্ষিয়ারে পতঙ্গদেরই জয় হয়। কিয়ারক নির্দেশ দেন—“সর্বসম্মতান ইব্বর সকল জীবই স্বপ্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার বাবদ্যাহুগী পৃথিবীর শাকসব্বী-কসলাদি যে তত্ত্ব মাছদের ভোগের ভয়ই বৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, কীট-পতঙ্গেরাও ঐ সকল কসল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। সুতরাং এই সকল কীট-পতঙ্গদের বিরুদ্ধে অভিযান করা কোন প্রকারেই যুক্তিপূর্ণ নহে। পরন্তু, আমাদের এখন উচিত, ভগবানের নিকট দয়া প্রার্থনা করা—যে পাপের ভয় তিনি আমাদের এমন শান্তি

বিস্তেজেন তাহা যেন তিনি কবা করেন।” সভাপন কি ভাবে এই দয়া ভিক্ষা করিতে চাইবে, কি ভাবে তাহারা সন্তোষের দাপন করিয়া ভগবানের কণা লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশও তিনি দিলিবে করিয়াছেন।

৪২ বৎসর পূর্বে আগার সেই প্রদেশে পতঙ্গের অভ্যাসের আদ্য হইল। ১৮৮০ সালের ১০ই এপ্রিল বিপ্লবের সময়ে ইহার বিচার আরম্ভ হইল। পতঙ্গ পক্ষের উকিল তাঁহার মতে পতঙ্গের অস্ত্র দণ্ড কণা বিনাশ দিলেন, “বাটফেল আছে, ভগবান মাছদের পূর্ণে কীট-পতঙ্গকে সৃষ্টি করিয়া বলেন—ভোমরা যক্ষ্মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। বাত না হইলে কীটপতঙ্গও ধ্বংসিত পারে না; পৃথিবীর ত্র্যম্ব পতঙ্গ তাহাদের দ্বারা এবং তাহা প্রভব করিয়া তাহারা ইব্বরের অভিশ্রোত্বগী কাঁচাই করিতেছে। তাহা ছাড়া, এই সকল বোম্বদীরা জীবগণের বিরুদ্ধে সভ্য সমাজের আইন পাটান উচিত নয়, একবার প্রকৃতির নিয়মাক্ষরগীত তাহাদের বিচার করা উচিত। মাছদের পাপের দ্বারা দিবার ভয়ই হইত ভগবান এই সকল পতঙ্গকে পাঠাইয়া দেন, সুতরাং ইহাদের বিনাশ লাভন করার অর্থ হইতেছে, ভগবানের কাহ্নে হস্তক্ষেপ করা। একশ ক্ষেত্রে সকলের উচিত—পতঙ্গদের কণা ও কণা ভিক্ষা করা।”

অতঃপর খেপতিক মেথিরা বাদী পক্ষের উকিল ক্রোধাতঃ দমর লইতে থাকেন এবং অবশেষে বিরপার হইয়া গ্রাম্য অধিবাসীদের লষ্টা একটি বিশ্রুতি-দণ্ড আদান করেন। সেই সভার বিবরণ হইল যে, গ্রামের গ্রামে একটি পৃথক পতঙ্গের ঐ সকল পতঙ্গদের জয় বিদ্যারিত করা হইক। যদি প্রতি-বাদী পক্ষের উকিল বীকার করেন যে, তাঁহার মতে পতঙ্গ উক্ত পতঙ্গের হইতেই তাহাদের দ্বারা সংগ্রহ করিবে, তবে গ্রামের মোকদ্দারী রীতিমত দলিল করিয়া উক্ত পতঙ্গের পতঙ্গ-দের দান করিতে পারে। বর্দ্ধনার পরবর্তী তারিখে বাদী পক্ষের উকিল ঐ গ্রামের কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং বলেন যে, এই লায়সবৃত্ত প্রভাবে প্রতিবাদী পক্ষের কোন আপত্তি থাকি উচিত নয়। প্রতিবাদী পক্ষের উকিল এই সম্বন্ধে বিশেষতঃ করিবার ভয় দমর চাহিলেন এবং পক্ষে জানাইলেন যে, তাঁহার মতে পতঙ্গ এই গ্রামের সমস্ত নয়। এই দাবীকে পক্ষে পরিণতি কি হইল তাহা আমরা বলিতে পারি না,

কারণ, যে প্রথমে এট ইন্ডিয়ান পিপিলিকা ছিল, তাহার শেষে
কমটি পূর্ণা শোকার কাচিয়া নিয়াছিল। অনেক অর্থহীন বসনে
যে, পতনের নিম্নে কখনও এট কৃদায়া সাহিত্য হইত।

আর একবার মেট্র এটনির সম্বন্ধে কেহা যেত পিপিলিকা-
লিঙ্গাধার বিবর্তে বিশেষ নিকট নাগিন করেন। পিপিলিকা-



লিঙ্গাধার ব্রহ্মজ্ঞানাত পূর্ণা। [আশে চিত্র]।

যে বিবর্তে শব্দ বাহির হইল এবং বিচারকালে প্রতিবাদীর
উক্তি পিপিলিকাদের সম্বন্ধে চিত্রায়িত সকল তর্কই ধ্বংসী
উত্থাপন করিয়া লক্ষণে বসেন যে, পিপিলিকাগুলি
যেই অধাবসায়ী এবং সে হিসাবে তাহারা বাদীপক্ষের
সম্মানীয়ের অঙ্গভাৱে বসে উঠত। তাহা ছাড়া, যে সকল
গ্রন্থ তাহারা আশ্রয় করিয়াছে, সেই সকল গ্রন্থে তাহাদের
মালিকানা অধিকার ধর্মধর্মকর্মের ঐ সকল সম্পত্তি দাবী

করিবার বস্তুপূর্ণ হইতে সাধারণ হইয়া আসিতেছে। প্রত্যয়
যদি তাহাদের বিভাজিত করা নিম্নোক্ত আশ্রয়ক হয়, তবে
যেই তাহাদের ভগ্ন পূর্বক একটি দান নিম্নে করিয়া দেওয়া
হয়।

কর্মধর্মকর্মের প্রথমে দেখা আছে যে, এট আশ্রয় যেমন
পিপিলিকাদের জানান হইল, অর্থাৎ তাহারা মনে মনে
যাইবা নিভারিত হানে আগ্রহ হইল। এতদ্বারা বুঝা
যায়, তাহাদের তাহাদের বিচার অগ্রবাহন করিয়াছেন
ধর্ম-ধর্মকর্মের ইহাই ছিল অর্থহীন।

বড় বড় অনিষ্টকারী ভগ্ন-ভগ্নাধারের ক্ষেত্রেও
এইরূপ বিচার প্রদত্ত চলিত। দ্যুতানিয়ার অন্তর্গত
মেট্রানিকার (Metronica) ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ
একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক শ্রমিক এক বস্তুর
বস্তা একটি মালিকার কর্তৃত্ব করে। বিচারে
শ্রমিকের মৃত্যু হইল এবং তাহার মাংস কুকুরকে দিয়া
পাওয়াইবার নিম্নে দেওয়া হয়। ঐ শ্রমিকের মালিক-
কেও মালিকার বিবর্ত-কালে যথেষ্ট যৌতুক দেওয়ার
আদেশ দেওয়া হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারে অপর্যাপ্ত ভগ্নের
ভাব্যত্ব দ্বারা কিংবা প্রোথিত কনিষ্ঠ আশ্রয় দেওয়া
হইত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বীকরোক্তি-
আশ্রয়ের ভগ্ন শ্রীকৃত-বস্ত্র মালিক তাহাদের উৎপীড়ন
করা হইত। অর্থাৎ বিচারকেরা জানিতেন যে,
দ্বীকরোক্তি যদি বা তাহারা সহ্যই করে, তবে তাহা
বৃদ্ধির ক্ষমতা তাহাদের নাট, কিন্তু তাহা বিচার-
কল প্রকাশের পূর্বে বিচারের বড় কিছু আশ্রয়িক
বিধিবাহন আছে, সব তা' মানিয়া চলিত হইবে। ঐ

সকল মাংসার আশ্রয় মালিক চলিত। আশ্রয়ে কখনও
কখনও দত্তিত আশ্রয়ী বেকম্বর মালিক পাঠিত, কখনও
বা তাহাদের মাল্য কমাইয়া দেওয়া হইত।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের নিকটবর্তী একস্থানে (Fon-
lenay-aux-Roses) একটি শিশুর উদ্বাসন করার
অপর্যাপ্ত বিচারকেরা একটি শ্রমিককে ভীষণে দণ্ড করিবার
আদেশ দিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে Falaise-এর একটি



ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্তমান অবস্থা

কলিকাতা সংকলিত কয়েকজন অধ্যাপক ডাঃ প্রবেশনাথ দাসগুপ্ত বিগত ঠেঁগেব চুতীতে যোম শহরে ইংলেণ্ডে ইউনিট চিটি বৃশ (Unity History School) নামক সমিতিস সার্থিক অভিযেধনে “ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারণা” লক্ষ্যে একতী হুদৌষ বক্তৃতা প্রেবনে কবিয়াছেন। ঐ বক্তৃতাধে তিনি বাধা বসিযাছেন, তাগেব অভিযাংষ্টে অারবা বৃষ্টিতে পাশি মাইে এংগে অারবেব বিদ্যাস, কেচষ্টে, হেংগে তিনি নিহেংগ তাগা বৃষ্টিতে পাবেন না। ঐগেব বক্তৃতাধে যে যে অংগে বৃষ্টি বাধা, তাগেংগে মনাস্থক। ঐগেব বক্তৃতাধে সাধে এই :—

(১) প্রাচীন ভারতীয়গণে গাংগেব ঘটনা কংখ্যামি পথাবেষণ ও পসীকা কবিতে পাশিযাছিলেন। তাগা বলা শক্ত। (It is difficult to assert how much opportunity the ancient Indians had of observing and experimenting upon facts).

(২) প্রাচীন ভারতীয়গণেব বিজ্ঞানের ধারণাধে হুং মাইে—

(ক) লক্ষ্যাত জ্ঞান (intuition), অন্তর্দৃষ্টি (insight) এংগে কল্পনা (imagination).

(খ) শক্ত পদার্থেব লক্ষ্যবস্তু গুণলক্ষ্যেব মনসিক অসাম্প্রদায়িক ধারণেব বিচার (A priori abstract logical reasoning regarding the possible nature of matter.)

(গ) সিদ্ধান্তবস্তুক পদ্ধতিসে প্রয়োগেব ধারা কবিব নির্ধেবেব ওক বিধিযে ঘটনা বা কংগেবে পথাবেষণ ও পসীকা (Observation and experiment upon facts and effects towards the determination of causes of things by the application of the Inductive method).

(৩) ‘সাম্যাপ’ (Science) শব্দতী ইউরোপীয় এংগে ইংগেব নিহেংগ একতী অংগপদার্থক ইংগেব অংগে। (This word ‘Science’ is European and has a connotative history of its own.)

(৪) ভারতীয় শব্দ ‘বিজ্ঞা’ পদার্থক প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশার্থে বংগেংগে হেংগা থাকে। (The Indian word *Vidya* is used to denote primarily the true knowledge).

(৫) পিত্তীকৃত অসাম্প্রদায়িক অভিযাংগ এংগে লক্ষ্যে বৈদগ্ধিক লক্ষ্যবস্তুগে গাংগেবা লক্ষ্যে যে জ্ঞান হেংগ, তাগেব নাম প্রকৃত জ্ঞান। (The true knowledge—a knowledge of the reality through concrete inner experience and intuition.)

(৬) যে সমস্ত পুস্তকে বিভিন্ন পিত্তা কামনিক অংগেবা বাব্ধায়িক জ্ঞানে বর্ণিত হইত, তাগেবিশব্দকে ‘দ্বাং’ বলা হইত। (The treatises which described

either theoretically or practically the different *Vidyas* were called *Sastras*.)

(৭) সর্বোচ্চ বাস্তবতার বিজ্ঞান বুঝাতে ‘ব্রহ্ম-বিদ্যা’ শব্দটি ব্যবহৃত হইত। (The word *Brahma Vidya* used to denote the Science of the highest reality.)

ইহা ছাড়া কৈশিক দর্শন, জৈন দর্শন, সাংখ্য দর্শন এবং পাণ্ডুল দর্শন ইনি একটা পন্থাশূন্য ভেদিত পাঠ্যভেদ, তাহাও তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ।

ভাষ্যের কথা সমালোচনা করিয়া আগেতেও চাত্তোপ্য কবিবার চোটা কথা আমাদের মন নীতির অত্মত্বকে নষ্ট, তত্ত্বক্ষেত্রে আমরা তাঃ দৃষ্টান্তের বক্তৃতায় আলোচনা করি-
তেছি না। আমাদের বিশ্বাস, মাতৃশ্রম বাস্তব ও কামনিক।
কুণ্ডল সম্পূর্ণভাবে কি কবিয়া দ্ব্য কণিতে হই, তাহার উপায়
একমাত্র ভাবতী দর্শনে ও কেবল শিপিষক আছে, তাহা
বর্তমান দর্শনিকগণ দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারেন না এবং দর্শন
নামে অথবা কলকল্য আর্থগীন এবং সনাতন কণা পণ্য
করিয়া গাছেন। তাঃ দৃষ্টান্তের তাহাটি করিয়াছেন।
ভাবতী দর্শনের জ্ঞান মাতৃশ্রম সংস্কারানির্দেশে ক্রিয়
নিভা প্রয়োজনীয় এবং তৎকালিত পণ্ডিতগণ তৎসম্বন্ধে বিতর্ক
অজ্ঞ, তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। ভাবতী দর্শনের
বক্তব্য প্রকৃত সম্পূর্ণ এবং তৎসম্বন্ধে, কণ্যের অজ্ঞ কোন ভাষ্য
কোন দর্শন অথবা বিজ্ঞানের পুস্তক যেতল সম্পূর্ণ ও
তৎসম্বন্ধে নহে। বর্তমান কণ্ডে যে হাঙ্গামা উদ্ভিষ্ট, তাহা
দ্ব্য কবিবার প্রধান উপায়, ভাবতী দর্শনের ও
বেদে জ্ঞান পুনরুদ্ধার কথা। ঐ জ্ঞান বর্তমানে বিস্তৃত
ভাবে প্রচাতিত। অন্যতরিলে ঐ বিস্তৃত প্রকার হই কণিতে
না পাঠ্য উপায় পুনরুদ্ধারের আশা প্রত্যাশ্যত।
ভাবতী দর্শনের এই বিস্তৃত প্রকারের কণ দ্ব্য ভাবতী
পণ্ডিতগণ। ইহায়া প্রায়শঃ প্রকৃত সত্যত জানেন না এবং

জানেন না বলিয়াই ভাবতী দর্শনগুলি অমূল্য যে অর্থ
প্রচলিত, তাহা হইতে মাতৃশ্রম কোন কর্তব্য করিয়া ক্রিয়
সম্পাদিত হইয়া উঠিত, তাহার নির্দেশ পাওয়া যায় না।

অন্য ইহায়া দ্ব্য পাঠ্যভাষ্যমানে প্রায়শঃ অজ্ঞ। এক
দিশে ইহায়া সাধারণ লোক হইতেও নিষ্ঠুর। ভাবতী
কবিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান কি ছিল এবং ভাবতী দর্শনে কি
যাচি তাহা যে তাহা জানেন না, এ দ্ব্য সাধারণ লোকের
আছে; কিন্তু পাঠ্যভাষ্যমানে তৎকালিত পণ্ডিতগণ যে
এই বিজ্ঞান ও দর্শন জানেন না, যে দ্ব্য হইতেও তাহা
বিকৃত। বৈশিষ্ট্য, প্রায়, সাংখ্য, পাণ্ডুল প্রাচ্য
নামে তাহা যে সনাতন কণ প্রচার করেন, তাহাদের যে কোন
অর্থ হয় না, তাহা যে মাতৃশ্রম কোন কর্তব্য-নির্দেশক নহে,
তাহাও তাহাদের বুঝি অপ্রায়। বর্তমান ভাবতী পণ্ডিত-
গণ যদি কোন প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা জানিতেন,
তাহা হইলে ভাবতী তাহা বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে
পারিত কি?

বর্তমান পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন বলেন যে,
তাঁহার ভাবতী দর্শন বলিয়া বাহা জানেন, তাহাটি ভাবতী
দর্শন, এবং ভাবতী দর্শনে মাতৃশ্রম নিভা বাবদ্যোগ্যগণী
কোন পণ্ডিত জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা নাই; বাহা আছে, তাহা
মাতৃশ্রম পণ্ডিতগণের কথা। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ভাবতী
দর্শন যে মাতৃশ্রম নিভা বাবদ্যোগ্যগণী কণ পণ্ডিত এবং
তাহার জ্ঞানলাভ কণিতে পানিলে যে, মাতৃশ্রম ‘পাঠ্য’ ও
‘কামনিক’ সমস্ত হই দ্ব্য হইতে পান, তাহা ভাবতী
প্রাচীন অবস্থায় পণ্ডিতগণ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

বর্তমান ভাবতী ও ভাবতীদ্ব্য সত্য হইয়া কণিতে
বিলম্বে দৃষ্টান্তের ভাবতীদ্ব্য আর্থিক স্বাধীনতা ও
কামনিক পরাধীনতার কথা মনে আসে।

মাতৃশ্রম আশা ও বাবদ্যোগ্য উপাধানে ভাবতী পণ্ডিত-
গণ। আর্থিক স্বাধীনতা মাতৃশ্রম দৃষ্টান্তের আর্থিক কথা।
মাতৃশ্রম আর্থিক ও বাবদ্যোগ্য কণ পণ্ডিতগণের না হইতে হই,

* “মাতৃশ্রম”..... কণিতে আর্থিক ও বাবদ্যোগ্য অবস্থায় হইয়া
যায়।

† “কামনিক”..... আর্থিকভাবে অর্থের উচ্চতর নির্দেশ কোন
বস্তুর অর্থ, ইহা মনে করিলে যে কণের উপস্থিতি হয়, তাহা
নাম কামনিক হয়।

* পরদ্যোগ্য না হইয়া মাতৃশ্রম ও বাবদ্যোগ্য বিকল্পে উপায় কণ
মাতৃশ্রম নাম ‘আর্থিক স্বাধীনতা’। মাতৃশ্রম ও বাবদ্যোগ্য মাতৃশ্রম দর্শন
প্রাচীন এক মাতৃশ্রম দ্ব্য আর্থিক হয়, তাহাটি তাহার আর্থ; কণ, আর্থ
নাম আর্থ, মাতৃশ্রম হইতে উপায় এবং আর্থ, মাতৃশ্রম আর্থ প্রাচীন হয়।

তাহার ব্যবস্থা করিয়াও তত্ত্ব রাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় তাহা সত্য, কিন্তু যে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা আর্থিক স্বাধীনতা অনায়াসে কল্পিত অসমর্থ, তাহা অস্বহীন।

মাহুদ রাষ্ট্র-পরিচালনকাণ্ডে স্বাধীন, অগতঃ বাহ্যে অগতঃ নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহার সমস্ত সর্বস্বা সে পদব্রূষপেক্ষ—এবং স্বাধীনতা অস্বহীন নহ কি ?

অগতঃ ইতিহাস তত্ত্ব-ভর্য্য কথিয়া অল্পদক্ষান করিলে হেতু ঐক্য আভিষ্কৃত অল্পদক্ষের আপেক্ষে ভারতবর্ষ ছাড়া অত্যন্ত মনোহর আর্থিক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঐক্য আভিষ্কৃত অল্পদক্ষ-কাল হইতে বর্তমান মূল পর্য্যন্ত ভগ্নভেদে যে যে আভিষ্কৃত ও দেশের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ও চীন ছাড়া আর কোন দেশে আর্থিক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য আভিষ্কৃত তাঁহাদের সত্যতা ও বিজ্ঞানের অতি-মান অল্প, কিন্তু যাহাদের আভিষ্কৃত ও বাহ্যিকভাবে তত্ত্ব পরের নিকট সত্য পাতিতে হয়, অথবা অল্পের উৎপন্ন বস্তু লক্ষ্য করিবার সম্ভব কোনমতে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের সত্যতা ও বিজ্ঞানের সার্বভৌমতা কোথায় এবং তন্মধ্যে অতি-মানেরই বা স্মৃতি কি, তাহা স্মৃতিয়া পাওয়া যায় না।

প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে কাহাণ্ড পক্ষে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় কি ? আর্থিক স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের অধিকার, অগতঃ অগতঃ অল্প কোন দ্রাতি তাহা লাভ করিতে না পারিলেও চীন ও ভারতবর্ষ তাহা পারিয়াছিল, ইহা কি চীন ও ভারতবর্ষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনন্তসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয় নহ ?

অগতঃ এই আর্থিক স্বাধীনতা সাদিত হইয়াছিল তাহাও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠন দ্বারা এবং এই সংগঠনের মূলে ছিল জ্ঞানের পূর্ণতা ও প্রাণীকৃত্য এবং তাহা অর্জন করিয়াছিলেন অসম্ভবতঃ কবি। কবিগণ যে তাহা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। কবিগণের অল্পদক্ষের পরবর্তী কালে যে আর কেহ কোন নিষ্করণের জ্ঞান সম্বন্ধে ভারতবর্ষে কোন বৌদ্ধিক চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

যে সংগঠনের ফলে ভারতবর্ষ আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছিল, সেই সংগঠন অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে

সত্য, কিন্তু তাহা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতি এবং তাহার প্রকৃতির সত্যই দেই সংগঠনের পরিচয়। আর ভবিষ্যৎ উন্নয়নশীল ক্রমিক অবনতি এবং প্রকৃতির অর্জাধীন-প্রশ্ন ও অস্বহীন ইহাও বিকৃতির পরিচয়।

এই সংগঠনের মূল জ্ঞান যে কবিগণের ঐক্য প্রকৃতিমূহে আছে, তাহা এই প্রকৃতি অতিমাত্রায় লক্ষ্যে অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারা যায়।

যে সমস্ত প্রকৃতি ভারতীয় কবিগণের জ্ঞান নিশ্চিত আছে, তাহা বিকৃত হইয়াছে এবং এখন জ্ঞান মাহুদ তাহা ব্যবহার বুঝিতে পারে না বলিয়াই ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনও বিকৃত। অগতঃ পক্ষে তিন দিকের ব্যবহার হইতে এই প্রকৃতির বিকৃতি এবং তাহা বুঝিবার অসামর্থ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

যে সমস্ত প্রকৃতি ভারতীয় কবিগণের মৌলিক জ্ঞান নিশ্চিত আছে, তাহাদের নাম ভারতীয় বর্ণন ও বৈদ্য।

ভারতবর্ষ বর্ণন ছাড়া এবং বৈদ্য চারিটি, ইহা আধ্যাত্মিক সাধারণ বিশ্বাস। ছত্রী বর্ণন-বর্ণন নাম দ্বারা অগতঃ মৌলিক বর্ণন, বৈদ্যবিক, সাংখ্য, পাটঞ্জল, পূর্ণ-মোক্ষাঙ্গ ও উদ্ভব-মোক্ষাঙ্গ অগতঃ বৈদ্য। চারিটি বৈদ্য নাম—অদ্ভুত, সাদ, স্বচ্ছ এবং অধর্ম। 'বর্ণন' বৈদ্যক সংগঠিত অর্থাৎ চিন্তা করিলে দ্বারা বুঝা, তত্ত্বমূহের পার্থক্যিক ও একক 'বর্ণন' বলিতে হয় এবং তাহা হইলে 'বর্ণন' হয় সত্যকী।

বাহ্যে মাহুদ তাহার 'অর্থা'-লাভ করিতে পারে তাহার উদ্যোগ ভারতীয় বর্ণন ও বৈদ্য আছে। কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে কিন্তু বিকৃতকর্তা 'অর্থা'-লাভ করা সম্ভব, তাহার একটা সাধারণ ব্যবস্থা থাকে আবিস্কৃত।

মাহুদ সর্বস্বা একটা না একটা কিছু পাইবার ইচ্ছা করিতেছে। অগতঃ অগতঃ ভারতীয় বস্তুই এবং তাহার সর্বস্বা ব্যবহার মাহুদের বিকৃতকর্তা নহে। কোন বস্তু অথবা তাহার কোন ব্যবহার মাহুদের প্রকৃত বিকৃতকর্তা তাহা বাক্য না জানা থাকিলে, প্রকৃত অবিহিতকর্তা বস্তু বিকৃতকর্তা বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে এবং তাহার ব্যবহার করিয়া মাহুদ স্বীয় অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

কানেই কোন্‌ স্রোতের কি উপাধান, কি গুণ এবং তাহার
কি কৰ্ম্মশক্তি অথবা ব্যবহার, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।
‘জান’ বাগ্মনটি কি তাহা বুঝিতে কিংবা উপলব্ধি করিতে
না পারিলে কোনও বস্তু কথায় জানা হইতেছে কি না, তাহা
নিশ্চয়ই কণা সম্ভব নহে। কাজেই কোন্‌ স্রোতের কি উপাধান,
কি গুণ এবং কি কৰ্ম্মশক্তি তাহা বুঝিতে হইলে ‘জান’ কি
বস্তু, তাহা সৰ্ব্বপ্রথমে বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান বখাবন হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা
হয় তখন, যখন মানুষ ঐ জ্ঞানবাহী বীজ কণের বাগ্মা ও
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। মানুষ সমগ্রা তিল তিল করিয়া বাগ্মা
গোড়াইতেছে, অলঙ্ঘ্য ও অশান্তি তাহার নিত্যসঙ্গী হইয়াছে,
অপর্যব সমগ্রা অথবা বাহ্য বাস্তব বীজ আধাৰা ও
ব্যবহার সংগ্রহ করিতে পারে না; অথচ কোন যে তাহার
অধাৰা, অলঙ্ঘ্য, অশান্তি ও পরমুখাপেক্ষা, তাহার কারণও
সঠিকভাবে নির্দেশ অথবা বাগ্মা করিতে পারে না, কি
করিলে তাহার অধাৰা, অলঙ্ঘ্য, অশান্তি এবং পরমুখাপেক্ষা
দূরীভূত হইতে পারে, তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে
না। এত অসম্ভব মানুষ যদি নিজেই জানা মনে করে, তাহা
হইলে তাহাকে কি বিশ্রান্ত বলা যায় না?

মানুষ কোন কোন্‌ কৰ্ম্ম করিতেছে এবং কি করিলে বীজ
অনৌট লাভ করিতে পারে, তাহা জানিতে হইলে ‘মানুষ’
বস্তুটি কি, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

কোন্‌ উপাধান, কোন্‌ গুণ সম্বলিত হইয়া মানুষের
উদ্ভব হইয়াছে এবং কোন মানুষের কৰ্ম্মসামগ্রী বিভিন্ন
হয়, তাহা জানিতে স্পষ্ট হইলে মানুষ বুঝিতে পারে যে, বীজ
বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলে, কোন কোন বস্তুই
বাহির ও অন্তর আংশিকভাবে বৃদ্ধা সম্ভব হইলেও, কোন বস্তুই
সম্যাকভাবে বৃদ্ধা সম্ভব হয় না। কাজেই কি করিয়া বৃদ্ধির
উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইলে, কি করিয়া বস্তুকে সম্যাক-
ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন
করিবার প্রয়োজন হয়।

কি করিয়া বস্তুকে সম্যাকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে
পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবিত হইলে, যে উপায়ে বস্তু সম্যাক-

ভাবে উপলব্ধ হইতে পারে, তাহার প্রয়োগ করিয়া বস্তুকে
উপলব্ধি করার আবশ্যকতা আছে।

বস্তুই বাহির, অন্তর, আদি এবং আদির আদিকে সম্যাক-
ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে বস্তু সম্যকে পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়।
তখন বিশ্বজনিত্যের পরস্পর বস্তু পরস্পর কিস্তপভাবে সংঘর্ষ
তাঁহা বুঝিতে পারা যায় এবং মানুষ তাহার অনৌট লাভ
করিতে সমর্থ হয়।

কানেই যেথা বাটতেছে, অনৌট লাভ করিতে হইলে
মানুষের এই সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন :—

- (১) জ্ঞান কাহাকে বলে এবং জ্ঞেয় বস্তু কি?
- (২) বস্তুর উপাধান, গুণ এবং কৰ্ম্ম কি?
- (৩) মানুষের উপাধান, গুণ এবং বুদ্ধি কি?
- (৪) বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিবার উপায় কি?
- (৫) বস্তুই বাহির, অন্তর ও আদি উপলব্ধি
করিবার পদ্ধতি কি?
- (৬) বস্তুই বাহির অন্তর ও আদিকে উপলব্ধি
করিবার উপায় প্রয়োগ করিবার নিয়ম কি?
- (৭) বস্তুই আদির আদি কোথায়? কৰ্ম্মশক্তির
উদ্ভব হয় কি করিয়া এবং ব্যবহার পরস্পর
পরস্পর সম্বন্ধ কি?

সাধনা করিলেই উপলব্ধি লাভী ‘বস্তুজ্ঞান ও বস্তুই
বাহির, অন্তর ও আদি উপলব্ধি করিবার উপায় কিস্তপভাবে
প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় বটে,
কিন্তু সকলের পক্ষে ঐ সাধনা সম্ভব নহে। কাজেই যাহারা
ঐ সাধনা করিতে সক্ষম, তাহাদের উপলব্ধি বাহ্যেতে অন্তর
সকলের বোধগম্য হয়, তদনুসৃত ভাষা প্রয়োগ করিতে হয়।

মানুষের ভাষা চই বস্তু—প্রাকৃত ও সংকৃত। যে ভাষায়
মানুষ জ্ঞানার্থী কথা করে, তাহার নাম ‘প্রাকৃত ভাষা’।
বস্তুই বাহ্যিক রূপ প্রাকৃত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব বটে,
কিন্তু বস্তুর অন্তর এবং আদি নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করিতে
হইলে শব্দই বাহির, অন্তর এবং বাহির পরস্পর করিয়া
বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাষায় প্রয়োজন হয়। শব্দই
মৌলিকতা ও বিশেষ সম্যাকভাবে পরস্পরিক হইলে, যে ভাষায়
উদ্ভব হয় তাহাই নাম ‘সংকৃত’। সংকৃত ভাষায় এমন
কোন শব্দের প্রয়োগ থাকিতে পারে না, যাহা কোন পরস্পর

ইন্দ্রিয় দলদ্বা কৌন না কৌন বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। কাহেই মানুষের ইন্দ্রিয় বাহ্য প্রার্থনা করে, তাহার নাম বস্তু। বস্তুর স্বভাব উদ্ভব, বৃদ্ধি ও বিকাশ নির্ধারণ করা, আর তাহার আদি, অস্তর ও গািহি কেন তাঙ্গুণ, তাহা স্থির করা এতটাই কঠা। কাহেই পৌত্রমহাত্ম্যপারে কৌন্ বস্তু কি উপাধানে নিশ্চিত এবং কি পদ্ধতিতে তাহার নিশ্চায হই, তাহার কৰ্ম্মশক্তি কত স্বকমেব এবং কোথা হইতে তাহার উদ্ভব হয়, তাহার শুণ কি কি এবং কেন তাহা ঐ সমস্ত জন্ম-সম্পন্নিত ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার কাহা হইতে যাগা লাভ হয়, তাহার নাম 'জ্ঞান'। 'জ্ঞান' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেও ণ্ডিত এই অর্থই পাওয়া যায়। 'অজ্ঞান' শব্দের 'জ্ঞান' শব্দটী বেধানে বেধানে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেটাব্যনাই এই অর্থই প্রযুক্ত হই।

পৌত্রমহাত্ম্যের মত জ্ঞান লাভ করিবার উপায়, ইন্দ্রিয় বাহ্য প্রার্থনা করে, তাহার, অর্থায় বস্তুর বিশ্লেষণ করা। মানুষ সাধারণতঃ বস্তু দেখিলেই তাহার অর্থের উপলভ্য কল্পিত চাহে। উপলভ্যে প্রবৃত্ত হইলে কোন বস্তুর বখাবণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। মানুষের ইন্দ্রিয় যে বস্তুর বাজা কহে, তাহার উপলভ্যে উদ্ভব না হইয়া বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। তাবতীর অজ্ঞান শব্দের জ্ঞানলাভ করিবার কত মূলতঃ বস্তুর বিশ্লেষণ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে।

তাবতীর বর্ধমান সংস্কৃতবিদ্যু পতিতগণ পৌত্রমহাত্ম্যের উপসংকৃত হুতী বৈকণ ভাবে বাখ্য্য করিয়া থাকেন, তাহাতে অবস্ত 'জ্ঞানের' এবং বিধ পরিষ্কার এবং কাথাকসী লজ্জা হয় না। তাহার দাবিই ভক্তের কথির মতে। যদি তৎসক কাহারও কোন দাবি থাকে, তাহা পরবর্তী ভক্তকর পতিত এবং তাহারের অহুতবর্ধের। প্রকৃত সংস্কৃত ভাবের জ্ঞানের অধ্যবসনতঃ বর্ধমানে শর্মনগুলি গ্রাযণঃ বিকৃত ভাবে বাখ্য্যত হইয়া থাকে, তাহা আবস্তা অপেই বলিবাছি। পৌত্রমহাত্ম্য অজ্ঞান বিকৃত অর্থে চক্ষিতহে, তাহারই কত তথাকথিত বর্ধমান পৌত্রমহাত্ম্যবিশ্লেষণ সম্পূর্ণ প্রে পড়িয়াও 'জ্ঞান' কাহাকে কল এবং তাহা লাভ করিতে হয় কি প্রকারে, তাহা পরিষ্কার হইতে পারেন না।

কপ্তের সমস্ত বস্তুর মূল উপাধান (প্রবাহ), শুণ এবং কৰ্ম্মশক্তিবিশিষ্ট একজ্ঞান বিরত হইয়াছে টেম্পেশনিক শর্মনে। তাহার প্রমাণ এই শর্মনে প্রথম অব্যাহের প্রথম আশ্চিকের চতুর্থ প্রে। বাহার কত প্রেত্যাক বস্তুর তাঙ্গুণ কল এবং কৰ্ম্মশক্তি অথবা তাঙ্গুণ বিকাশ, তাগকে বস্তুর 'ধর্ম' বলিয়া নিশ্চিত বহা হইয়াছে; বস্তুর প্রবাহ অথবা উপাধান কি, তাহার শুণ এবং কৰ্ম্মশক্তি কি, বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুর সমতা কোথায়, প্রেত্যাক বস্তুর বৈশিষ্ট্য কোথায়, কৌন্ বস্তুর কৌন্ উপাধান, অথব কৌন্ উপাধানের সহিত মিলিত হইলে মিলিত কি বস্তুর উদ্ভব হইতে পারে, তাহান আলোচনা করিলে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন 'ধর্ম' কি, তাহা জানিতে পারা যায় এবং কৌন্ বস্তুর মানুষের চিত্তাধিক ও কৌন্ বস্তু অহিতসাধক তাহাও বৃদ্ধিতে পারা যায়। কথামদেব তাহাবই আলোচনা করিরাছেন এবং তাহার প্রে ঐ আলোচনা আছে বলিয়াই উহার নাম হইয়াছে 'টেম্পেশনিক' শর্মন। 'টেম্পেশনিক' বলিতে বুঝায় তাহা, বাহা বাহা বস্তুর 'বিশেষ' অথবা প্রেত্যাক বস্তুর বৈশিষ্ট্য কি জানিতে পারা যায়। কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্য জানিতে হইলে সম্ভবতঃ ঐ বস্তুর উপাধান, শুণ এবং কৰ্ম্মশক্তি কি তাহা জানিতে হয়। তাহার পর অপর বস্তুর সহিত তাহার সমতা কোথায় তাহা বৃদ্ধিতে হয়। বস্তুর বৈশিষ্ট্য কি তাহা জানা আর তাহার বিজ্ঞান জানা একই কথা। বিজ্ঞান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, বিশ্লেষণে জ্ঞান অথবা 'বৈশিষ্ট্য' জানিবার প্রবন্ধের কলে বাহা উদ্ভূত হয়, তাহা। কোন বস্তুর বৈশিষ্ট্য কি তাহা জানিতে হইলে নিরলিখিত বিষয়সমূহের আলোচনা করিতে হয় :—

(১) ঐ বস্তুর উপাধান কি, কি উপাধানে ঐ উপাধানের উদ্ভব, কি তাহা ঐ উপাধানগুলির বিশ্রণ হয়, কেন ঐ উপাধানগুলির বিশ্রণে অস্ত কোন বস্তুর উদ্ভব না হইয়া ঐ বস্তুর উদ্ভব হয়, কেন ঐ উপাধানগুলি অস্ত কোন ক্ষণের উৎপত্তি না করিয়া তাঙ্গুণ ক্ষণের উৎপত্তি করে, কেন ঐ উপাধানগুলি বস্তুর অস্ত কোন কৰ্ম্মশক্তির উদ্ভব না করিয়া তাঙ্গুণ কৰ্ম্মশক্তির উদ্ভব করে—বস্তুর উপাধান সম্বন্ধে এবং বিধ বাবতীর জ্ঞান।

(২) ঐ বস্তুর শুণ কি, কি উপাধানে ঐ শুণের উদ্ভব, কেন ঐ বস্তুর অস্ত কোন শুণ না হইয়া তাঙ্গুণ

গুণ হইল—বস্তুর গুণ সম্বন্ধে এবং নিম্ন বাবতীয় জ্ঞান।

(৩) ঐ বস্তুর কণ্ঠশক্তি কি, কি উপায়ে ঐ কণ্ঠশক্তির উদ্ভব হয়, কোন ঐ বস্তু অল্প কোন কণ্ঠশক্তি না হইয়া অল্প কণ্ঠশক্তি হইল—বস্তু কণ্ঠ সম্বন্ধে এবং বিধ বাবতীয় জ্ঞান।

বস্তুর উপাধান, গুণ এবং কণ্ঠ যে ওতপ্রোতভাবে চর্চিত এবং কোন বস্তু সম্বন্ধে প্রকৃত বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে যে, বস্তুর উপাধান, গুণ, কণ্ঠ এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ আলোচনা করিতে হয়, তাহা ভারতীয় জীবনগত বহু সহস্র বৎসর আগে বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন। বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন বসিরাই একই প্রহে তাহার আলোচনা উদাহরণ করিয়াছেন।

কোন বস্তুকে সম্যকভাবে বৃত্তিতে হইলে যে, তাহার উপাধান, গুণ এবং কণ্ঠ ও তাহার পরস্পরের সম্বন্ধের আদ্য আলোচনা করিতে হয়, তাহা বর্তমান জনগণের বৈজ্ঞানিক অজ্ঞাবোধ বৃত্তিতে পায়ের নাট। তাহার প্রমাণ উদাহরণে প্রদর্শিত। বর্তমান বিজ্ঞানে এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহাতে বস্তুর উপাধান, গুণ এবং কণ্ঠ সম্বন্ধে আলোচনা এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

রসায়ন শাস্ত্রের (Chemistry) পুস্তকগুলিতে বস্তুর উপাধান এবং গুণ সম্বন্ধে আংশিক ভাবে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বস্তুর কণ্ঠশক্তি সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

পদার্থ-বিজ্ঞানের (Physics) পুস্তকগুলিতে বস্তুর গুণ এবং কণ্ঠশক্তি সম্বন্ধে আংশিক ভাবে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার উপাধান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা বিবরণ জানা যায় না।

বর্তমান বিজ্ঞান নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না, কারণ তাহা অত্যন্ত অনস্পর্শ্য। কোন জ্ঞানের কথা আদ্য জানিতে না পারিলে, তাহা জানা হয়, তাহা বুঝাও জানা হইয়াছে কিনা তাহা বুঝা সম্ভব হয় না। কাজেই অনস্পর্শ্য বিজ্ঞান কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

‘বিজ্ঞান’ বলিতে তাহা বুঝা, তাহার আলোচনা ভারতীয় বৈশেষিক দর্শনে সম্পূর্ণভাবে আছে এবং ঐ আলোচনা

বর্তমান বিজ্ঞানের পুস্তকগুলির মত আংশিক নহে। কাজেই উহা নির্ভরযোগ্য।

তাবতর্কি বাবতীয় গ্রন্থে ও কণ্ঠ শব্দতঃ ইহা না বলিয়া অনেক মনে করেন যে, ভারতবাসী বিজ্ঞান জানিত না। যদি কখনও বৈশেষিক দর্শন বাবাবল অর্থে আশা বা ব্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে মানুষ জানিতে পারিলে যে, গ্রন্থে ও কণ্ঠ ভারতীয় কবিত্ত হইলে বস্তুর উপাধান, গুণ এবং কণ্ঠশক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই জ্ঞানের পরিচয় বর্তমান যুগের তুলনার অনেক অধিক ঐ দর্শনে আছে। ঐ সম্বন্ধে বর্তমান যুগের জ্ঞানের তুলনার প্রাচীন ভারতবাসীর জ্ঞান এত সম্পূর্ণ ছিল যে, গ্রন্থে ও কণ্ঠ ভারতীয় কবিতার মাধ্যমেও উদাহরণে ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হযত উদাহরণ এতদিন উহা বৈজ্ঞানিক কবিত্তন এবং যুগ সম্বন্ধে মাথুনের দ্বারা ও শব্দমাৎ বলা সম্বন্ধে উহা অহিতকালী, ইহা বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া পরবর্তী কালে ঐ সকল বিজ্ঞান পরিচালক হইয়াছিল। তথাকথিত বর্তমান বৈজ্ঞানিকের নূতন আবিষ্কারগুলি যে অসম্ভব ভাবে মানুষের দ্বারা ও পরমাণুর কত অনিষ্ট লাঘন করিতেছে, তাহা বর্তমান জনগণ বৃত্তিতে পারিয়াছেন না বলিয়াই তথাকথিত বর্তমান বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞানতা পোষণের সহায়তা করিতেছেন। আনাদের মনে হয়, বর্তমান জনগণের দ্বারা যথার্থ বৃত্তিত হইবার পূর্বে বৈশেষিক নাই।

বৈশেষিক দর্শন যে এখন আর বাবাবল অর্থে প্রচলিত নহে, তাহার কারণ, বর্তমান সংস্কৃত-বিশ্বদর্শন প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা, অথবা যে ভাষার বৈশেষিক দর্শনের মূলগুলি লিখিত, তাহা পরিজ্ঞাত নহেন। প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার কল্পন বিকল্পিত সাধিত হইয়া তথাকথিত বর্তমান সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আমাদের ‘অর্থনীতির ছাত্র’ তাহার ‘ভারত-বর্ষের বর্তমান সমস্তা ও তাহার পূর্বের উপাধ’ শিরক প্রবন্ধের বর্তমান সংস্কারে দেখাইয়াছেন। আমরা আমাদের পাঠকদিগকে তাহা পড়িতে অনুরোধ করি।

বর্তমানে বৈশেষিক দর্শন যে অর্থে প্রচলিত, তাহা ভারতবর্ষের কলয়ের পরিচয়। সমস্ত গ্রন্থাবলি এই অর্থে পড়িয়া কি জ্ঞান লাভ করিলাম, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যায়, তাহা হইতে কোন জ্ঞান লাভ হয় নাই। তাহা

প্রধানি এই অর্থাৎসাহে কতকগুলি অংশের এবং অর্থহীন শব্দে পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত। এই অর্থে এই গ্রন্থে যে নিত্যক নিশ্চয়োক্তনীর এবং অজানতসাহিত্য, বস্তুমান সংস্কৃতবিদ্যাপ্রাণ তাহাও বুঝিতে পারেন না। ঐ গ্রন্থের ঐ অর্থ বীকার করিয়া লইলে পর্য্যাকভাবে ভবি-
গণকে জানহীন উদ্ভাষ বলা হয়, ইহাও তাহাও বুঝিতে পারেন না। কবিগণ যে কখনও জানহীন উদ্ভাষ হইতে পারেন না, তাহাদের জ্ঞানের কোনরূপ অসম্পূর্ণতা থাকিলে যে, চানতকর্তৃক অনন্তসাহাবণ আধিক বাহ্যিকতা সংঘটিত হইতে পারিত না এবং তাহাও তাহাও বস্তুমান আগে অজ্ঞানভাবে কালের কাল গতে নিমজ্জিত হইয়া যাউত, তাহা তাহাদের গোপনতা হয় না।

বস্তুমান পরিমাণ করিবার বিবিধরূপে বৈশেষিক বর্ণনে 'অ' ও 'মহা' শব্দে কেরকটী সূত্র আছে। বৃহৎ বৃহৎ অর্থবসম্পন্ন বস্তু সমাকারে বুঝিতে হইলে, তাহা কত ক্রমান্বয়ে বিশিষ্ট করিতে হয় এবং তাহা করিতে পারা যায়, ইহাও বুঝা এই দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য। অথচ এই দৃষ্টান্তের একটা অর্থহীন পদমাণবদ্য আশেপাণ করা হয়; ও পরমাণুগণের সার্থকতা যে অতি সাধারণ, তাহা পক্ষ্য তথাকথিত সংস্কৃত-
বিশেষণ বুঝিতে পারেন না।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বৈশেষিক বর্ণন জানাধের বৈশেষিক ভাবমাত্রার পক্ষে অসুগা উপস্থানে পরিপূর্ণ। এবংবিধ প্রয়োজনীয়, বর্ণনের বধ্যবণ ব্যাখ্যা অনতিবিলম্বে ব্যাখ্যেত পুনরুদ্ধার করা যায়, তাহাও ভেটী করা একান্ত আবশ্যিক। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার বধ্যবণ ব্যাকরণ প্রকাশিত হইবার পূর্বে, বর্ণন বধ্যবণ ব্যাখ্যাত হইলে তথাকথিত বস্তুমান সংস্কৃতবিদ্যাপ্রাণ সেট ব্যাখ্যার বিরোধিতা করিবার সম্ভাবনা থাকিবে। কাজেই সর্বপ্রথমে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার প্রকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ কি তাহা জানিতে হইবে।

মাত্র কোন উপস্থানে গঠিত, কেন মাত্র বিভিন্ন স্তর এবং কর্মক্ষমসম্পন্ন হয়, তাহাও জানের প্রায়স্ত হয় সাংখ্য্য দর্শনে এবং সম্পূর্ণ হয় যোগ বর্ণনে।

যাহা লইয়া মাত্রের বিকাশ, তাহাও কতকগুলি

বাক্য আর কতকগুলি অক্ষর। মাত্রের শরীর বাক্য আর তাহার শরীর কেন এইরূপ হয়—তাহার কারণ অক্ষর।

মাত্রের ইতিপূর্বাধি কর্মোক্তির বাক্য, অক্ষর তাহাও কর্মোক্তিরগুলি স্বকীয় কাহা ব্যাখ্যার সহায়তার সাধন করিয়া থাকে তৎসমুদয় অক্ষর। মাত্রের চক্ষুবাধি জ্ঞানোক্তির বাক্য, অক্ষর তাহাদের কাহা ব্যাখ্যার সহায়তার সম্পন্ন হয়, সেগুলি প্রায়স্ত: অক্ষর।

ইহা ছাড়া মাত্রের বৈশেষিতা তাহাও বুঝি। যাহা হইতে মাত্রের বুদ্ধির উদ্ভব হয় তাহার নাম—'জ'।

মাত্রের 'বাক্য' ও 'অবাক্য' অংশের এবং 'জ'-এর জ্ঞান লাভ হইলে মাত্রের কোন উপস্থানে গঠিত, কেন মাত্রের বিভিন্ন স্তর এবং কর্মক্ষমসম্পন্ন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং তখন মাত্রের পক্ষে নিজ সামর্থ্যের উন্নতি সাধন করিয়া স্তর দূর করা সম্ভব হয়।

কি করিয়া যৌর 'বাক্য' ও 'অবাক্য' অংশের এবং 'জ'-এর জ্ঞান লাভ করিতে হয় এবং এই জ্ঞান ব্যাপ্ত কি উপায়ে নিজ স্তর দূর করিতে হয় তাহাই সাংখ্য্য বর্ণনে আলোচ্য। ইহাই যে সাংখ্য্য বর্ণনের আলোচ্য, তাহা তাহাও প্রথম অধ্যায়ে প্রথমমাণে পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

মাত্রের সাধারণ বুদ্ধি বাহা তাহাও 'বাক্য' ও 'অবাক্য' অংশের এবং 'জ'-এর সম্পূর্ণ (অর্থাৎ আদি, অদ্বয় এবং ব্যাখ্যার) জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। কাজেই এই সর্বকর্ম সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কি উপায়ে মাত্রের বুদ্ধির উন্নতি সাধন করা সম্ভব, তাহা জানিতে হয়।

'যোগ বর্ণন' পরিভ্রান্ত হইতে পারিলে কি উপায়ে মাত্রের বুদ্ধির উন্নতি করা সম্ভব তাহা জানা যায়। যোগ-বর্ণনের জ্ঞানভাষার পর বুদ্ধির উন্নতি সাধন না হওয়া পক্ষ্য মাত্রের 'বাক্য' সর্বকর্ম জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হইবে, কিন্তু 'অবাক্য' এবং 'জ'-এর পূর্ণ জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে।
কাজেই সাংখ্য্য বর্ণনে 'বাক্য' সর্বকর্ম সর্হিত 'অবাক্য' এবং 'জ'-এর সর্বকর্ম কিন্তু, তাহাই বুঝিবার চক্ৰ অবাক্য' এবং 'জ'-এর সর্বকর্ম কিন্তু আলোচনা আছে বটে, কিন্তু তাহাও অবিবাক্যই বাক্য' সর্বকর্ম আলোচনার পরিপূর্ণ।
বাক্য' সাংখ্য্যাক্ত করা যায় এবং প্রথমত: তাহার অংলো-
চনার চক্ৰই কপিলদেব তাহাও প্রথম রচনা করিয়াছিলেন

বলিয়াই যোগ হয় এই গ্রন্থের নাম বিরাহিনীসেন 'শাংখ্য'।
যাহার দ্বারা শাংখ্যবীদ বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়, ব্যুৎপত্তি অঙ্গুণ্যে
'শাংখ্য' বলিতে তাহাকে বুঝায়।

শাংখ্য বর্ণন পড়িলে মানুষের মাংস, অস্থি ও উদ্ভিদাদি
কি কি উপাদানে গঠিত, তাহাও যে গঠিত এবং বিকৃত কি,
তাহা জানিতে পারা যায়।

এই বর্ণনও অত্যন্ত বিস্তার্তে চলিতেছে। তাহাতে কত
তথাকথিত বস্তুমান শাংখ্যবীদ গ্রন্থাবলি সম্পূর্ণ পড়িয়াও নিত
মাংস, অস্থি ও উদ্ভিদাদি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করেন না।
কেহ কেহ শাংখ্যের ভিতরও লবণাদিও দেখিতে পাউয়া
থাকেন। তাহাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

জাননা আছেই বলিয়াছি, অঙ্গাঙ্গলক্ষণ পরিজ্ঞাত
হইতে পারিলে, কি উপায়ে মানুষের বুদ্ধির উন্নতি করা সম্ভব,
তাহা জানা যায়। নিত বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ ভাবে বস্তুরূপের
সহিত যুক্ত করিয়া এই বস্তু বিশেষণ না করিলে উহাকে যোগ-
গম্য করা যায় না এবং বুদ্ধিরও উন্নতি সাধিত হয় না।
কাহ্নেই বুদ্ধির উন্নতি সাধন করিতে হইলে কি করিয়া বস্তু
সহিত তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত করিতে পারা যায়, তাহা
দিকা করিতে হয়। বাহ্যের সহায়তায় বস্তু সহিত নিত
বুদ্ধি কি করিয়া সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করিতে হয়, তাহা দিকা
করা যায়—ব্যুৎপত্তি অঙ্গুণ্যের তাহার নাম যোগ। পঞ্চাঙ্গ-
দেব তাহার প্রথম এই বিচার বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়াই যোগ
হয় তাহার নাম দিয়াছেন যোগ বর্ণন।

কোন বস্তু সহিত সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হইতে হইলে বুদ্ধি
যিকোন পৃথকুত করিয়া একান্ত হইবার চেষ্টা করিতে হয়।
যোগ বর্ণনও আরম্ভ হইয়াছে বুদ্ধি যিকোন পৃথকুত করিয়া লইয়া।

বুদ্ধির উন্নতি সাধন করিতে হইলে সমাধিক্রমে বৃত্তা
কাহ্নকে যল এবং তাহার উন্নতি সাধন করিবার উপায় কি
তাহা জানিতে হয়, আর বুদ্ধির উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে
মানুষ একটী একটী করিয়া তাহার আত্মতত্ত্বীয় বিভিন্ন অঙ্গ
অঙ্গুলক করিবার সাধ্য লাভ করে এবং ক্রমশঃ বোধ সমস্ত
অঙ্গ পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যেক বস্তুর উপাদান এবং গুণ কি
করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহার জ্ঞান
কমে।

সমান্য ভাবে বৃত্তা কাহ্নকে যল তাহা লইয়া যোগবর্ণনের
প্রথম পাদ অথবা 'সমাধি পাদ'। সমাধি শব্দের ব্যুৎপত্তি-
গত অর্থ—যাহা হইতে সমাধি রূপে বৃত্তা কাহ্নকে যল তাহা
জানা যায়। এই আলোচনা যোগবর্ণনের প্রথম পাদে আছে
বলিয়া উহার নাম হইয়াছে 'সমাধি পাদ'।

যোগ বর্ণনের দ্বিতীয় পাদেব নাম 'সাধনা পাদ'। বুদ্ধির
উন্নতি সাধন করিতে চলে কি করিতে হয়, তাহার বিবৃতি
অছে বলিয়া এত পাদেব ঐক্য নাম হইয়াছে।

বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে লবণ জ্ঞান এবং সামান্য
অথবা 'বিকৃতি'র উদ্ভব হয়, ততীয় পাদে তাহার বর্ণনা আছে
বলিয়া উহার নাম হইয়াছে 'বিকৃতি পাদ'।

বুদ্ধির উন্নতি সাধন সম্পূর্ণ হইলে গুণ হইতে পৃথক করিয়া
'কেন্দ্র' ভাবকে উপলব্ধি করিবার যে সাধ্য অছে, তাহার
বর্ণনা চতুর্থ পাদে আছে বলিয়া উহার নাম হইয়াছে 'কেন্দ্র-
পাদ'।

বর্তমান যুগে মানুষের শরীরতত্ত্ব নিরূপণ করিবার উপায়,
মুত মানুষের অথবা জীবের শরীর ব্যবচ্ছেদ করা।

জীবন্ত মানুষের শরীরে বায়ু যে লোচল থাকে, শবের
শরীরে তাহা থাকে না। ফলে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া মানুষের
প্রাণবায়ু তাহার আত্মতত্ত্বীয় কোন ব্যাধি দিয়া কিরূপ ভাবে
বাতাসায়ত করে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না এবং আত্মতত্ত্বীয়
কোন দৃশ্য অঙ্গ জীবিত অবস্থায় কোথায় থাকিয়া কিরূপ কাহ্ন
করে, তাহারও সঠিক নিরূপণ হয় না। কাহ্নেই শব ব্যবচ্ছেদ
করিয়া তাহার জ্ঞান হইতে যে শরীর তত্ত্ব উদ্ভব হয় তাহাতে
অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্তি পাকা অসামান্যিক নহে।

বর্তমান যুগে শরীরতত্ত্ব বলিয়া চিকিৎসকগণ যাহা ব্যবহার
করিয়া থাকেন তাহা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিকর। তাহা যে
অসম্পূর্ণ তাহার প্রমাণ, আমদেব ডাক্তারগণের মানুষের বুদ্ধি
ও মন লব্ধকর জ্ঞানের অত্যাধ। বুদ্ধি ও মন মানুষেরই অঙ্গ।
বুদ্ধি ও মন কি বস্তু, মানুষের অত্যাধকো কোথায় তাহাও
জ্ঞান, তাহাও বস্তু ও বিশিষ্ট কার্যগত কি, তাহা না
জানা থাকিলে, শরীরতত্ত্ব শরীর জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়
না কি? কেহ কেহ হেতু বলিবেন, বুদ্ধি ও মন কি বস্তু,
তাহা জানা মনস্তত্ত্ববিদগণের কাহ্না, চিকিৎসকগণের
নহে। ইহা সমীচীন কি? বুদ্ধি ও মনের সহিত মানুষের

শরীরের কতখানি লক্ষ্য, তাহা বর্তমান জগৎ পরিজ্ঞাত নহে বলিয়া, বর্তমান জ্ঞানে শরীরতত্ত্ব ও মনতত্ত্ব পৃথক করিয়া রাখা চাইত। এবং তাহাটাই তত্ত্ব মানসিক অম্লসত্যবশতঃ যোগের কোন যোগের উদ্ভব হইলে বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চিকিৎসা করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য মনতত্ত্বের বুদ্ধি ও মন কাহাকে বলে তাহা এখনও পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই। উদ্ভূত মন ও বুদ্ধি সম্বন্ধে যে লক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহা প্রায়শঃ অর্থহীন কথার কথা। মানসিক অম্লসত্যের চিকিৎসাক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করা যায় না। মানুষের মনটী ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্বের অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ইন্ড্রির নিজ শরীরভাগবৎ কোন উপাধানে অথবা কার্যকরতায় তত্ত্ব বিভিন্ন কার্য করিয়া থাকে, তাহার কোন কথা নাই। কলে চক্ষুখানির অম্লসত্যের চিকিৎসা নাই অতি সাধারণ অথবা পর্যাপ্ত সাধিত হয়।

শরীরের আভ্যন্তরীণ যে পক্ষে প্রাপ্যব্যব চলাচল চেষ্টা থাকে বলিয়া বর্তমান বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস, তাহাও নিজ শরীরের ভিতর অস্তিত্ব করা যায় না এবং তাহাকে লবাস্ত্রক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। শরীরতত্ত্বজ্ঞানে বর্তমান বৈজ্ঞানিকের যদি কোন দৃষ্টই না থাকিলে, তাহা হইলে তাহারা কোন কোন যোগ প্রাবল্যবিশিষ্ট সহিত নির্বিকারিত সর্বত্র চেষ্টাও, সম্ভবিত্ব যোগ সেই প্রাবল্যবিশিষ্ট সহিত নির্বিকারিত সর্বত্র করেন কেন ?

শরীরতত্ত্ববিজ্ঞানেও ভারতীয় ভবিষ্যৎ অনন্তসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শরীর, মন ও বুদ্ধি ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক ভবিষ্যৎ জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে—সাংখ্য ও পাঠকল মর্মে। ভাবত মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রাপ্যব্যব চলাচল অম্লসত্য করিবার উপায় কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া এবং প্রথমতঃ প্রাপ্যব্যব উপলব্ধি করিয়া মানুষের মন ও বুদ্ধি পর্যন্ত কি হয় এবং তাহাদের স্থান কোথায়, তৎসম্বন্ধে তাহারা স্থিরনিজান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের পক্ষে শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞানলাভ সম্ভব হইয়াছিল। ভারতীয় ভবিষ্যৎ শরীরতত্ত্বের জ্ঞানে সম্পূর্ণ ও সঠিক, তাহা সাংখ্য ও পাঠকল মর্মে বর্ণনাও প্রাপ্যব্যব করিতে পারিলে এখনও বুদ্ধিতে পারা যায়। অল্পবুদ্ধি মানুষকে কি করিয়া বুদ্ধিমান করিতে হয়, তাহার জ্ঞান একমাত্র ভারতীয়

ভবিষ্যৎ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া রাখাছেন। জগতের অল্প কোন জাতি তাহা অজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতীয় ভবিষ্যৎ এই অনন্তসাধারণ জ্ঞান আজ সংস্কৃত ভাষার বিকৃতির জন্য সাধারণের অপরিজ্ঞাত এবং অগোচর হইয়া পড়িয়াছে। যেহেতু ব্রতপ্রায় ব্যক্তির ভাবন নান করিতে পারেন, এবং যিনি প্রায়শঃ এখন অজ্ঞানতায় পন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়, কিন্তু যদি আহার কখনও যোগ মর্মে বর্ণনাও প্রাপ্যব্যব করা লভ্য হয় এবং প্রকৃত যোগের উদ্ভব হয়, তখন মানুষ জ্ঞানিতে পারিলে যে, ঐ প্রায়শঃ অজ্ঞানতায় পন্ন নহে, পরন্তু উদার মনো প্রকৃত মন্য নিহিত হইয়াছে। মানুষ কি করিয়া নিজেকে যোগী করিয়া তুলিতে পারে, তাহারও ব্যবহারযোগ্য উপদেশ আছে।

যৌতমহত্বের শরীরতত্ত্ব জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি তাহা বুঝিতে পারিলে ‘বৈজ্ঞানিক’ মর্মেই লক্ষ্যতত্ত্ব ব্যবহার বস্তুর উপাধানে, জ্ঞান ও কর্ম কি এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা জ্ঞানিত পারা যায়। ব্যবহার বস্তুর উপাধানে, জ্ঞান ও কর্ম নির্ধারণ করিবার সাধারণ লাভ করিতে পারিলে সাংখ্য ও পাঠকল মর্মেই লক্ষ্যতত্ত্ব মানুষের সম্পূর্ণ ও সঠিক শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। তখন মানুষ তাহার বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের উন্নতি সাধন করিবার সাধারণ লাভ করে এবং কোন অঙ্গের অম্লসত্য ঘটিলে তাহার আবেগা সাধন করিতে পারে। তখন প্রত্যেক বস্তুর ব্যক্তি, অঙ্গ, এবং আদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু কোন বস্তুর ‘আদির আদি’ সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। বস্তুর আদির আদিকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানলাভ হইল কিনা, তাহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায়।

আদির আদি সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে ব্যবহার বস্তুর সমস্ত কোণাং এবং কি পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সমস্ত বস্তুর ব্যক্তি, অঙ্গ ও আদি নিঃসন্দেহ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, প্রথমতঃ—তাহার নির্ধারণ করিতে হয়। তাহার পর, দ্বিতীয়তঃ—যে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে সমস্ত বস্তুর ব্যক্তি, অঙ্গ ও আদি নিঃসন্দেহ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহার বিবিধ প্রয়োগ করিতে হয়। বিবিধ প্রয়োগের ফলে যে বিবিধ জ্ঞান হয়, তাহাদের সামঞ্জস্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, কোন বস্তু এবং তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে আর কিছু অজ্ঞাত

পাকে না এবং তখন আর মানুষের অত্যাচার এবং অত্যাচার উপস্থিত হইতে পারে না।

কোন বস্তুর 'আদির আদি'কে সাধারণতঃ স্পর্শ করা যায় না এবং কোন বস্তুকে স্পর্শ করিয়া বৃত্তিতে না পারিলে তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। বস্তুর আত্মসত্ত্বগণ 'আদির আদি'কে বিকশিত এবং বর্ধিত করিয়া স্পর্শযোগ্য করিতে পারিলে তাহার উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

যাহা বস্তুর আত্মসত্ত্বগণ 'আদির আদি'কে বিকশিত এবং বর্ধিত করিয়া স্পর্শযোগ্য করিবার সহায়তা করে, তাহার নাম মস্ত্র : ইহাট পানিনি যেবেব শব্দ-জ্ঞানের পদ্ধতি অনুসারে 'মস্ত্র' শব্দের অর্থ। ভারতীয় কবিশ্রম প্রত্যেক বস্তুর 'মস্ত্র' অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহাদের চাচিটী বেলে লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুর আত্মসত্ত্বগণ 'আদির আদি'কে বিকশিত এবং বর্ধিত করিয়া স্পর্শযোগ্য করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বস্তুজ্ঞান সর্বভৌমভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। ষায়াহা মনে করেন, ভাবতীর কবির 'মস্ত্র' ও 'বস্তুজ্ঞান' 'কালনিক', তাহারা যথেষ্ট গুঢ় ইচ্ছা বৃত্তিতে চটলে, যে বৃত্তির প্রয়োজন হয়, যোগ দর্শন সহায়তার সেই বৃত্তিলাভ করিতে সর্বত্র হন নাই বলিয়া সম্ভব হয়।

কি উপায়ে বস্তুর 'আদির আদি'কে উপলব্ধি করা যায়, তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্বসমীক্ষাংশে দর্শনে লিপিবদ্ধ আছে। 'মস্ত্র' দ্বারা বস্তুর 'আদির আদি'কে উপলব্ধি করিতে পারিলে তাহা হইতে যে বিবিধ জ্ঞান হয়, তাহার পরস্পর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য সাধন হইয়াছে উত্তরসমীক্ষাংশে।

'মস্ত্র'-প্রয়োগে অত্যাচারের পূর্বে বস্তুর 'আদির আদি'কে উপলব্ধি করিবার উপায় সম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল বলিয়া, যে প্রথমে ঐ বিচার ও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার নাম হইয়াছে 'পূর্বসমীক্ষাংশ'।

'মস্ত্র'-প্রয়োগে অত্যাচারের পর উপলব্ধিকৃত জ্ঞানের সামঞ্জস্য ও পরস্পরের গ্রন্থি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রথমে উপলব্ধিকৃত জ্ঞানের সামঞ্জস্য ও পরস্পরের গ্রন্থি নির্দ্ধারিত হইয়াছে—তাহার নাম যেওনা হইয়াছে উত্তরসমীক্ষাংশে।

পূর্বসমীক্ষাংশে, যেহেতু উত্তরসমীক্ষাংশে আলোচ্য বিষয় যে

অন্যদের সিদ্ধান্তের অন্তরঙ্গ, তাহা ষায়াহা ঐ ভিন্ন ভিন্নের মধ্যে একেবারে নিম্নোক্তরূপে ও রস প্রণেয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহায়া বৃত্তিতে পারিলেন। যেহেতু ও প্রকৃতিসমীক্ষাংশে যে অর্থ বর্ণনায় প্রচলিত, সে বিচারে চিন্তা করিতে বলিলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, ঐ প্রকৃতিসত্ত্বের প্রকৃত সত্ত্ব ভগ্নত বহু সহস্র বংশসহ আগে বিস্তৃত হইয়াছে। যোগ দর্শনের জ্ঞান লাভ করিয়া বৃত্তির ও ইন্দ্রিয়াদির কর্ণ-সামর্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলে, যেহেতু ও সমীক্ষাংশের জ্ঞান কি, তাহা অনুমান করা সম্ভব নহে। বর্তমান ভগ্নতে কি করিয়া বৃত্তির ও ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ সাধন করিত হইত, তাহার জ্ঞান মূঢ় হইয়াছে, এবং তাহারই ফলে পূর্বসমীক্ষাংশে, যেহেতু ও উত্তরসমীক্ষাংশে এখন আর কেহ বৃত্তিতে পারেন না।

পূর্বসমীক্ষাংশের সিদ্ধান্তানুসারে বস্তুর আত্মসত্ত্বগণ 'আদির আদি'কে বিকশিত এবং বিবর্তিত করিবার উপায় দুইটী, (১) বস্তুকে একাক্ষর করিবার তত্ত্ব সাধারণতঃ লৌকিক ও যে শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বস্তুর আত্মসত্ত্ব যে শব্দ থাকে, তাহার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা, এবং (২) বস্তুকে তেজসম্পন্ন করিয়া তাহার প্রত্যেক উপাদানের প্রকটতা সাধন এবং তাহার পর প্রত্যেক উপাদানের পূর্বাভূষণ পরীক্ষা করা। প্রত্যেক উপাদানের নাম আত্ম-জ্ঞান লাভ করা এবং দ্বিতীয় উপাদানের নাম আত্ম-জ্ঞান লাভ করা। প্রকৃত শব্দ-জ্ঞান ও তত্ত্ব-জ্ঞান বহু সহস্র বংশসহ আগে মূঢ় হইয়াছে হইতে, কিন্তু শব্দ-জ্ঞানে ও তত্ত্ব-জ্ঞানে যে কীভাবে মুক্তি হয়, সেই সংস্কার এখনও বহু ভারতবাসীর মধ্যে আছে। প্রকৃত জ্ঞানের লোপ হইয়াছে, অথচ তাহার অসাধারণত্ব সম্বন্ধে সংস্কার এখনও বিজ্ঞান চর্চিয়াছে বলিয়াই ভারতবাসী শব্দ-জ্ঞান ও তত্ত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক আবগুণি গম করিয়া থাকে এবং তাহা বিশ্বাস করে। তাহারই তত্ত্ব ভাঙের অল্পবুদ্ধি পণ্ডিত-গণ মনে করেন, ভারতবাসীর বস্তুজ্ঞান কল্যাণপ্রসূত এবং তাহার মধ্যে কোন বাস্তবতা নাই। কিন্তু ভারতীয় কবির বস্তুজ্ঞান যে নিম্নোক্ত ও কালনিক নহে এবং তাহা যে সর্বভৌমভাবে বাস্তব, তাহার অটুট সাক্ষ্য ভারতবর্ষের অনন্তসাধারণ 'আদিক বাহিনী'।

• সাধারণ লোক যথেষ্ট বৃত্তিতে হইবে, ষায়াহা নির্দ্ধারিত লোক যথেষ্ট অধিকারমণ্ডল হইবে।

শব্দ-জ্ঞান লাভ হয় বেবেশ 'মহা'-প্রয়োগে এবং বস্তু-জ্ঞান লাভ হয় পূর্বদীক্ষাশার উপবিষ্ট বিবিধ বস্তু দ্বারা। বস্তু-প্রয়োগ ও বস্তু, এই দুইয়ের ব্যবহার অভ্যাস করিবার ক্ষমতি বেবেশ আছে।

বেদ-প্রদর্শিত শব্দের প্রয়োগাভ্যাস দ্বারা যে শব্দ-জ্ঞান লাভ হয়, তৎসাহায্যে তাহার সৃষ্টি কবিলে, কোন শব্দের প্রাকৃতিক উচ্চৈশ্বৰ্য্য অর্থ কি, তাহা নিঃশেষে তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত ভাষা এবং বিদ্য শব্দ-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাণিনিরূপে ঐ শব্দ-জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এখন আর কেহ 'বেদ'-প্রদর্শিত শব্দের প্রয়োগের অভ্যাস করেন না এবং কাহারও প্রকৃত শব্দ-জ্ঞান লাভ করিবার সামর্থ্য হয় না। ফলে পাণিনিরূপের ব্যাকরণ সম্পূর্ণ বিদূষ হইয়াছে। সিদ্ধান্ত কৌতূহী প্রকৃতি যে সমস্ত পরবর্তী ব্যাকরণ বর্তমান সংস্কৃত ভাষা বাৎসল্য করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা পাণিনিরূপ-প্রদর্শিত শব্দ-জ্ঞানের উপর আরো প্রতিষ্ঠিত নহে। ফলে তৎসম্ভূত জ্ঞান দ্বারা যে ভাষার বেদ ও বর্ণনাদি লিখিত, তাহা নিঃসিদ্ধ তাহে ভাষা সত্ত্ব হয় না।

শব্দের বিকৃতি হইতে প্রকাশ পায় উচ্চারিত হইতে শব্দ যে পতিত আশ্রয় করে, সেই পতিত বিকাশ সেই শব্দের 'রূপ'। ইহা 'রূপ' শব্দের মধ্যগত অর্থ। বস্তুতঃ সারাদ্বয় বাহ্য শব্দ-জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যায়, 'অ', 'আ', 'ক' 'খ' প্রকৃতি যে রূপে লিখিত হয়, সেই রূপ আর তাহা সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিতে কিস্তার যে পতি অবলম্বিত হয়, তাহার রূপ এক। 'অ', 'আ' প্রকৃতির লিখন-প্রণালী যেখানে তাহার সম্পূর্ণ উচ্চারণ কি হইলে হয়, তাহা অনুমান করা যায়। কায়েই সংস্কৃত ভাষার যে সমস্ত বর্ণের ব্যবহার হয়, তাহার উচ্চারণ, অর্থ ও লিখন-প্রণালী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংস্কৃত ভাষার বর্ণের লিখন-প্রণালীর পরিবর্তন সাধন করিবার কল্পনা সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচায়ক।

অনন্তসাধারণ ভারতীয় আর্থিক স্বাধীনতা যে ভারতীয় জীবিত অনন্তসাধারণ জ্ঞানের ফল, তাহা উপরে দৃষ্ট হইয়াছে।

বর্তমান ঐ অনন্তসাধারণ জ্ঞান বিশুদ্ধ হইয়াছে অস্তঃপ্রাণে তিনি হাজার বৎসর। ঐ জ্ঞানের বিকৃতির জন্য দায়ী ভই, অচাৰ্য্য ও বিশ্রামক ভাষাকার পতিতগণ। বর্তমান সংস্কৃত-বিশ্রামক পতিতগণকে উহার জন্য বৃত্তিমত্ত তাহে দায়ী করা যায় না।

ভারতীয় জীবিত অনন্তসাধারণ জ্ঞানের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, ভারতীয় বর্ণন, বেদ ও পাণিনি ব্যাকরণের বর্তমান প্রচলিত অর্থ যে ভ্রমাত্মক, তাহা প্রথমতঃ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে। ভারতীয় বর্ণন, বেদ ও পাণিনির বর্তমান প্রচলিত অর্থ যে ভ্রমাত্মক, তাহা উপলব্ধি করা সামান্য নাত্র বিবেচনা-পত্তি থাকিলে কঠিন হয় না।

নিম্নলিখিত কথা অপরকী শ্রবণ শাস্ত্রলেখ ভারতীয় জীবিত প্রচলিত যে বিকৃতার্থে প্রচলিত, তাহা বুঝা যায় :—

(১) ভারতবর্ষের আর্থিক স্বাধীনতা এখন অনন্ত-সাধারণ, তখন ভারতবর্ষে নিকটই অনন্তসাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল, কারণ অনন্তসাধারণ জ্ঞান বাতীত অনন্তসাধারণ সংগঠন সত্ত্ব হয় না।

(২) ভারতবর্ষের বর্ণন ও বেদ এখন মানুষ অস্বাভাবিক কাল হইতে বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে, তখন উহার ভিতর মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য কথা নিকটই আছে। যে পুস্তকে মানুষের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য কথা থাকে না, সেই পুস্তক যে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না, তাহা নিজ নিজ জীবনকালে যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের স্বাধিক ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

সংস্কৃত বর্ণন ও বেদের যে সমস্ত দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে, তাহাতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য কথা থাকিতেও পারে এবং নাও থাকিতে পারে। ঐ সমস্ত ভাষা মূল বর্ণনের ও বেদের ভাষা বলিয়া প্রচলিত। উহাদের প্রচার দীর্ঘস্থায়ী হইলেও বিকৃত হইতে পারে, কারণ মূল বর্ণনের ও বেদের প্রতি প্রগাঢ় সত্যাবলম্বন মানুষ তাহা বৃদ্ধিবার ক্ষমতা সহায়ক কিন্তু না পাঁশেও অর্থবোধক বলিয়া দায়ী পায়, তাহাই ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। ঐ ভাষাগুলি যদিবেই মূল প্রচার নামের সহিত জড়িত না

হইয়া স্বাধীন তাহে প্রচলিত থাকিলে উহাদের প্রয়োজনীয়তা সন্দেহ নিন্দনীয় হইতে পারে বাক্তি ।

(৩) প্রচলিত ভাষার সাহায্যে মূল বর্ণন অথবা বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ করিয়া যদি নিজেতে প্রেরণ করা যায় যে, ভাষা(১) মানুষের স্বাভাবিক ও কার্যকর গ্রন্থ ব্রহ্মীকৃত করিবার সহায়ক কি শিক্ষাগত করিবার, তাহা হইলে কোন সমস্যা পাত্তা হইবে কি ? যদি তাহা পাত্তা না যায়, তবে বুঝিতে হইবে, ভাষাকারদের বাধ্যতাপূর্ণে বর্ণনামূল্য কতকগুলি অর্থহীন অসংলগ্ন কথা সমাবেশ, কিন্তু তাহাও মূল বর্ণনে কোন অর্থহীন অথবা অসংলগ্ন কথা থাকিতে পারে না। কার্যেই প্রচলিত বাধ্য নিম্নবর্তী প্রমাণক ।

আমাদের গ্রন্থ, বর্তমান সংস্কৃতবিশ্ব বার্ষিকপত্র বর্তমান বাধ্যতায় প্রমাণকতা পদ্ধতি উপলব্ধি করিতে পারেন না এবং তাহারই প্রমাণ সাধারণ ভাষক পদ্ধতি অর্থহীন কথা করিতে যে বৃত্তি অসুস্থ করে, তাহার অন্তর্গত সেই অর্থহীন কথা করিতে বৃত্তি অসুস্থ করেন না ।

ডাঃ দামপুত্রের টীকালী বক্তৃতা তাহার পরিচয় ।

দামপুত্র মহাপুত্রের বক্তৃতাধারা "প্রাচীন ভারতীয়গণ স্বাভাবিক বটনা কতকগুলি পদ্ধতিবিশেষ ও পন্থা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত ।" স্বাভাবিক বটনা যে বর্ণন-প্রণেতা প্রাচীন ভারতীয়গণ আমূল পদ্ধতিবিশেষ ও পন্থা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার চূড়ান্ত দাক্ষিণ্য ভারতের অনন্তসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা । ডাঃ দামপুত্র যদি তাহা না বুঝিতে পারিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ দ্বিতীয় বক্তৃতা নহে, দ্বিতীয় তাহার নিঃসঙ্গ । স্বাভাবিকই যদি তিনি বুঝিয়া থাকেন যে, ভারতীয় বর্ণন-প্রণেতাগণ স্বাভাবিক বটনা পদ্ধতিবিশেষ ও পন্থা করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, তাহা পদ্ধতি তিনি সঠিক বুঝিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি নিজেতে ভারতীয় বর্ণনজ্ঞানসম্পন্ন মনে করেন কেন ? এবং বর্ণনের কথার স্বাধীনতা কতক দ্বারা বার্ষিকের অভিন্ন করিয়া আত্মতা ও পুণ্যবীর্ষ বক্তৃতির অপমান সাধন করেন কেন ? তিনি যে ভারতীয় বক্তৃতির বর্ণন কিছুমাত্র প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, তাহা তাহার ওয়াহ পরিচয়কল্পে প্রকাশ পায় না কেন ?

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "প্রাচীন ভারতীয়গণের বিজ্ঞানের ধারণার মূল বীতি—

(ক) সঙ্কটজন্য, অস্বস্তি ও কলহ ;

(খ) জ্ঞানপন্থার সন্তোষ ও সন্তোষ মানসিক অবস্থার প্রায়ের বিচার ;

(গ) শিক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা কতক নির্দিষ্ট প্রমাণ বিধি যতনা বা কাগজ পদ্ধতিবিশেষ ও পন্থা ।"

(খ) ও (গ) লিখিত কথা তিনি ভারতীয় কোন বর্ণনের কোন বৃত্তি হইতে পাইয়াছেন, তাহা জনসাধারণকে জানাইবেন কি ? এই সমস্ত কথা কি প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহার প্রমাণ কি করিয়া করিতে হয় তাহা তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি ?

আমরা বক্তৃতা বুঝিতে পারি, তাহাতে তাহার (খ) ও (গ) লিখিত কথা অর্থহীন, কাগজ : তাহার প্রমাণ হইতে পারে না এবং তাহা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা পাইয়াছে ও প্রমাণিত দাক্ষিণ্য বার্ষিকবিশেষের বর্ণন । ভারতীয় বর্ণনে এই ভাষার কথা কোথায় পাত্তা বাক্তি না ।

ভারতীয় বক্তৃতির বিশ্লেষণের জ্ঞানপন্থা করিবার পদ্ধতি মূলতঃ চারিটি— (১) প্রত্যক্ষ, (২) অণুমান, (৩) উপমান, এবং (৪) পক্ষ । এতদ্বিতরিক যে সমস্ত উপায়ের কথা বর্ণনের কথা বলিয়া প্রেরিত, তাহা ভাষাকারদের কথা । মূল বৃত্তি তাহার অসংলগ্ন পাত্তা যায় না । কোন কোন বক্তৃতা উপমান ও পক্ষকে পৃথক পদ্ধতি বলিয়া নির্দেশ করেন নাই । এই চারিটি পদ্ধতি যে স্বাভাবিক ও প্রমাণসাধ্য, তাহা "প্রত্যক্ষ" প্রকৃতি বক্তৃতা বৃত্তি পন্থা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায় ।

বক্তৃতির উপলক্ষধারা সঙ্কটজন্য হইতে সাধারণতঃ 'কামের' এবং 'সন্তোষ ও বিকল্পের' অথবা 'কলহ' উদ্ভব হয় । 'কাম' এবং 'সন্তোষ' পদ্ধতিগণ না করিতে পারিলে কোন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না এবং তাহা কি করিয়া পদ্ধতিগণ করিতে পারা যায় তাহাও নিঃসঙ্গ ও নিঃসঙ্গ ভারতীয় বর্ণনে বহু স্থানে প্রমাণ হইয়াছে ।

সম্ভবতঃ জ্ঞানের উপর আত্মা স্থাপন না করিয়া এবং
এমনাবলম্বী না হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবার বিধিবিধি
শেখা কথা—সর্বস্বীয় ভবিষ্যতের উপদেশ। অথচ ডাঃ
দামগুপ্ত প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, ‘সম্ভবতঃ জ্ঞান,
অমরত্ব এবং বল্লাহ’ প্রাচীন ভারতভরমণের বিজ্ঞানের
বর্ণনায় স্থান নাই।

‘অমরত্ব’ বলিতে ডাক্তার দামগুপ্ত কি বুঝেন এবং
আরও প্রমাণ কি তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আত্মা
বৈজ্ঞানিক বৃত্তিতে পানি, তাহাতে মনে হয় অমরত্বই একটা অর্থহীন
শব্দ এবং অমর ও অমরীয় পৃথক পৃথক ভাবে যে অর্থ হয়, তাহা
অমরত্বই বলিতে পারে বুঝা সম্ভব, তাহার কোন প্রমাণ
কাহাতঃ হইতে পারে না।

‘সম্ভবতঃ জ্ঞান’ এবং ‘করনা’ হইতে যে জ্ঞান হইতে
পারে, তাহা ভাবভীর বধি তাহাদের মূল হস্তে স্থাপন
করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বহু জ্ঞানলাভ
করিয়াও কত বিপরীত নির্দেশ দিয়াছেন।

সম্ভবতঃ জ্ঞান এবং করনা হইতে প্রকৃত জ্ঞান হইতে
পারে, ইহা ভাব্য পাকাতা দার্শনিকের কথা। ডাঃ দামগুপ্ত
“ইহাও পিতৃ বৃদ্ধের বাড়ে” চাপাটেন কেন?

ডাঃ দামগুপ্তের বক্তৃতাগুলিতে ইউরোপীয় ‘Science’
শব্দটির নিজস্ব একটা অর্থ-প্রকাশক ইতিহাস আছে।
‘Science’ শব্দটির পরিভাষ্য অর্থ ইউরোপীয় কোন প্রকারের
কোন প্রকার আছে, তাহা তিনি দৃঢ় করিয়া দেখাইয়া দিবে
কি? যদি তিনি তাহা না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে
তাঁহার বক্তৃতার এই অংশ ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে
তাঁহার অজ্ঞতার এবং গুরুপ্রতি অথবা ভক্তির পরিচায়ক
বলিয়া লোকে যদি মনে করে, তবে কি নিতান্ত অস্বাভাবিক হইবে?

তাঁহার মতে ‘বিজ্ঞা’ ও ‘প্রকৃত জ্ঞান’ একার্থ-প্রকাশক।
‘জ্ঞা’ বাহুর উত্তর ‘অনটু’ প্রত্যয় করিয়া ‘জ্ঞান’ শব্দ নিশ্চয়
হয়। তদনুসারে বক্তৃতা দ্বিবার উদ্দেশ্যে যে প্রথম, তাঁহার মনে
নাহুৎ বাহ্য লাভ করিয়া থাকে, তাহার নাম জ্ঞান। আর
বিজ্ঞা শব্দের ব্যুৎপত্তি—বি+জ(গণ)—এ আণ। তদনুসারে
‘বিজ্ঞা’ শব্দ বলিতে বুঝায়, ‘বাহ্যের বাহ্য বক্তৃতা অর্থাৎ বস্তুর
দর্শনাত্মক জ্ঞান বাহ্য।’ ‘জ্ঞানের’ কলে ‘বিজ্ঞা’ লাভ হয়,
আবার বিজ্ঞার সহায়তায় জ্ঞানলাভ হয়। ‘জ্ঞান’ ‘বিজ্ঞা’র

কারণ হইতে পারে, আবার ‘বিজ্ঞা’ও ‘জ্ঞান’র কারণ
হইতে পারে এবং সাধারণ লোক এই দুই পার্থক্য
না বুঝিয়া জ্ঞান এবং বিজ্ঞাকে একার্থে প্রয়োগ করিতে
পারেন; কিন্তু প্রকৃত দার্শনিক এবং সংস্কৃতভাষাবিদ
যে কি করিয়া ‘বিজ্ঞা’ ও ‘জ্ঞান’ একার্থে ব্যবহার করিতে
পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ডাঃ দামগুপ্ত
ছাড়া অন্যত্র তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যেও ‘অবিজ্ঞা’ ও
‘অজ্ঞান’ একার্থে ব্যবহারের পরিচয় আছে, তাহা আমরা
বীকার করি। কিন্তু যে পণ্ডিত ‘অবিজ্ঞা’ ও ‘অজ্ঞান’ একার্থ-
বোধক বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি যে মূল সূত্রের উদ্দেশ্য
পরিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার ব্যাখ্যা ব্যবহার-
যোগ্য কি না নির্দেশক হয় নাই, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

ভারতীয় দর্শনে ‘জ্ঞান’ কথাকে বলে তাঁহার সংজ্ঞা এবং
তাঁহা লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধীয় কথা যে অতি পরিষ্কার
এবং সম্পূর্ণ, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

অথচ ডাঃ দামগুপ্ত বলিতেছেন, “পিতৃদত্ত আভ্যন্তরীণ
অভিজ্ঞতা এবং সমস্ত বোধশক্তির সহায়তায় বাস্তবতা সম্বন্ধে
যে জ্ঞান হয় তাহার নাম প্রকৃত জ্ঞান”।

ডাঃ দামগুপ্ত ‘প্রকৃত জ্ঞান’ই এই সংজ্ঞা। ভারতের কোন
দর্শনে পাইয়াছেন? তাঁহার এই সংজ্ঞা অর্থহীন নহে কি?
“পিতৃদত্ত আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা” বলিতে কি বুঝায়? তিনি
যখন ‘আভ্যন্তরীণ’ অভিজ্ঞতার নাম করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই
‘বাহ্যিক’ অভিজ্ঞতা বলিয়া একটা কিছু বস্তু আছে। অভিজ্ঞতা
বুদ্ধির কার্য। তাহা আভ্যন্তরীণ না হইয়া বাহ্যিক হয় কিরূপে?
‘জ্ঞান’র সংজ্ঞা বলিতে দিয়া “.....অভিজ্ঞতা...সহায়-
তার বাস্তবতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান...” উহা বলা আর কিছু না
বলা একই কথা নহে কি? ‘জ্ঞান’ কি তাহা না বুঝিতে
পারিলে ‘অভিজ্ঞতা’ কি তাহা বুঝা সম্ভব কি?

ডাঃ দামগুপ্তের কথানুসারে “যে সমস্ত পুস্তকে বিভিন্ন
বিজ্ঞা কালিনিক অথবা ব্যবহারিক ভাবে বর্ণিত আছে, তাহা-
দিগকে ‘শাস্ত্র’ বলা হইত।”

‘বিজ্ঞা’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানা থাকিলে এবং ঐ
অর্থের প্রাতি কোনরূপ সন্দেহ থাকিলে ‘বিজ্ঞা’ কখনও
কালনিক (theoretical) হইতে পারে তাহা মনে করা যায়
কি? “কালনিক ভাবে বিচার বর্ননা”, এবং বিধ বাহ্য ব্যবহারে

বাণকোচিৎ চিত্তাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ‘বিশেষ্য’ ও ‘বিকল্প’ মাত্রের ‘প্রকৃতিমত’ হইতে পারে, কিন্তু ‘জ্ঞান’ অথবা ‘বিশ্বাস’মত হইতে পারে না—উহা ডাঃ দাম্পত্য বৃত্তিতে পাসিবে ন কি? অথবা এবং বিধ লম্বু বাহ্যিক বর্ণনালোচনা-ক্ষেত্রে বাণক-বক্তাবের পরিচয়ক নহে কি?

‘পাত্র’ ও ‘প্রহ’ পদ তথাকথিত সংস্কৃতবিদগণ বহুদিন হইতেই লম্বু ভাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, কাৰ্যেই ‘পাত্র’ পদের লম্বু ব্যবহারের এক আদর্শ ডাঃ দাম্পত্যের স্বত্ব দান্বিত্য চাপাইব না। ‘প্রহ’ বলিতে বুঝায় তাহা, যাঁহা বিভিন্ন বস্তুর পরস্পরের গ্রন্থি (interlinking or correlating) বৃত্তিয়ার সহায়তা করে। ব্যুৎপত্তিসহ অর্থানুসারে ভারতীয় বর্ণনের পুস্তকগুলি ও ‘মহাপুৰাণ’গুলি ‘প্রহ’।

‘পাত্র’ বলিতে বুঝায় তাহা, যাঁহা মন্ত্রের চলা-ফেরার নির্দেশ প্রদান করে। বিভিন্ন বস্তুর পরস্পরের গ্রন্থি অবগত হইতে পারিলে কিঞ্চপ ভাবে মন্ত্রের চলাফেরা কর্তব্য, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। কাৰ্যেই ‘প্রহর’ উক্তব না হইলে ‘পাত্র’র উক্তব হয় না। তদনুসারে একমাত্র ‘সংহিতা’গুলিকে শাস্ত্র বলা হইতে পারে। যাহা বস্তুর বিকাশ অথবা উক্তব সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করে, তাহার নাম ‘সংহিতা’, ইহাই সংহিতা-শব্দের ব্যুৎপত্তিসহ অর্থ। বস্তুর বিকাশ অথবা উক্তব রক্ষা না করিয়া যে আচরণ-পদ্ধতি বস্তুর কাৰ্যক্ষমতা অথবা অগ্রিম-বিনাশের সহায়তা করে, সেই আচরণ-পদ্ধতিকে সংহিতা-নির্ধারিত বলিয়া প্রচার করা, প্রকৃত সংহিতা না বৃত্তিয়ার এবং তাহার অবমাননা করিবার পরিচয়—ইহা আমাদের তথাকথিত সংস্কৃতবিদ পণ্ডিতগণ বৃত্তিবেন কি?

ডাঃ দাম্পত্যের ‘ব্রহ্মবিজ্ঞান’ জ্ঞান যে অগাধ, তাহা তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞান সত্ত্বীয় কথাই পরিষ্কৃত হইয়াছে। অবশ্য আমাদের সকলেরই ‘ব্রহ্মবিজ্ঞান’ জ্ঞান যে অগাধ, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের মনে হয়, ব্রহ্মবিজ্ঞান বুঝা যে কত কঠিন এবং সাধনসাধন, ইহা প্রাণে প্রাণে বৃত্তিতে পায়

এবং অতিমান ত্যাগ করা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান বুঝা হয় নাই, উহা বুঝাই ব্রহ্মবিজ্ঞানসত্ত্বীয় জ্ঞানের পরিচয়। আমাদের চাষ মে ডাঃ দাম্পত্য তাহা পশ্চাত্ত না বৃত্তিয়ার ভারতীয় দার্শনিক নামে নিজেই চিত্র দেখে লজ্জা করিয়া আসিয়াছেন এবং নানা রকমে মনোরম নিকট ভারতীয় ভবিষ্যৎ এবং ভারত-বর্ষের অসম্মান সাধন করিয়াছেন।

‘সর্বোচ্চ ব্রহ্মবত্তা’ শব্দটী দাম্পত্য মহাশয় ব্যবহার করিয়াছেন। ‘ব্রহ্মবত্তা’ সর্বোচ্চতা ও সঙ্গনিবৃত্তা কি, তাহা ডাঃ দাম্পত্য মহাশয় বুঝাইয়া দিবে ন কি?

বৈশেষিক নর্মে পরমাত্মার আয়োগের দ্বিবিধ ডাঃ দাম্পত্যের নহে, তাহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু মাংসা ও পাণ্ডুর নর্মেই যে পরমাত্মার ডাঃ দাম্পত্য বিলাইয়া আসিয়াছেন, তাহা এই দুইটী বর্ণনের কোন কোন স্থান হইতে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের তত্ত্বিজ্ঞান দাম্পত্য মহাশয় বুঝাইয়া দিবে ন কি?

মোটের উপর ডাঃ দাম্পত্যের বক্তৃতায় বাংলা পরিলক্ষিত হয় তাহা অনন্তসাধারণ। এতদ্ব্যতীত অমরা ভবিষ্যৎ বর্ণনের মূল সূত্রের ব্যাখ্যায় বিকৃতি দেখাযাই। ঐ বিকৃতি আমাদের নিজস্ব। উহা কাহাবও নিকট দৃষ্ট করা হয় নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথাই আমাদের তথাকথিত সংস্কৃতবিদগণের বিকৃত বর্ণনাব্যাপা হইয়া পাইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য দার্শনিকের ব্রাহ্মত্ব-কথা ভারতীয় নর্মেই রক্ষা বলিয়া প্রচার করিবার পরিচয় বোধ হয় এই প্রথম।

ভারতীয় বর্ণন জনস্বর্গম কথ্য হইলে যে চিত্তাশীলতার প্রয়োজন, তাহা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন বর্ণনাব্যাপকের সাহায্যে মাত্রই পশ্চাত্ত নাই, ইহা যাহা কি লোক তাহাই বৃত্তিবে না?

এবং বিধ দার্শনিকগণই যে ভারতের এবং ইউরোপের বর্তমান হৃদয় প্রদান করণ, তাহা আমরা আপাতী বাবে দেখাইব। ইহা ছাড়া এই ভারতীয় দার্শনিক ও বর্ণন সম্বন্ধে নকর্ণক্ষেত্রে ও জনসাধারণের কর্তব্য কি তাহারও আলোচনা করিব।

শিক্ষা

আমাদের পত্রিকার বিগত সংখ্যায় প্রকাশ-কাল হইতে শিক্ষাবিক্ষেপ বেদন সংবাদ দৈনিক পরে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিবেচ্য বিবেচ্য ঘটনাগুলি লক্ষ্য করিলে, প্রকাশনা, বোঝাই এবং মাত্রাও খাফাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, তাহার ৩য় প্রাথমিক গবেষণেগুলি যে বখাশাখা চেষ্টা করিতেছেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়।

বখাশাখা বেশে শিক্ষাবিক্ষেপকে যে সমস্ত ঘটনা এই সময়ের মধ্যে ঘটনাছে তাহা হইতে যে সব নিশ্চয় পাওয়া যায়, সেগুলি এই :—

(১) কি কি বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, তন্মধ্যে গবেষণাক্ষেত্রে প্রকৃত দৃষ্টির এবং তৎসম্বন্ধে আত্ম সিদ্ধান্তের অভাব।

(২) প্রচলিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্ধতিতে যে লোপ আছে, তৎসম্বন্ধে গবেষণাক্ষেত্রে কিছু অতিষ্ঠতা থাকিলেও কি করিয়া তাহা দূর করিতে পারা যায়, তদ্বিচারসম্মত অক্ষমতা।

(৩) শ্রীশিক্ষার বিস্তার, অথচ শ্রীশিক্ষা কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে অজ্ঞতা।

(৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের 'বিদ্যা' কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব।

(৫) বাঙ্গালীর 'তথাকথিত' সংস্কৃতবিদগণের 'পতিত' কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব, অথচ নিতদ্বিগ্নকে 'পতিত' বলিয়া আখ্যাত করা।

(৬) অতি সাধারণ বিষয়ে গবেষণাক্ষেত্রে অভাব থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালী যে কাহাকে কাহাকেও 'বিদ্বান' বলিয়া আখ্যাত করিতে পারে তাহার দৃষ্টিভঙ্গ।

মাত্রাও প্রদেশে বাহা বাহা ঘটনাছে তাহা হইতে নিম্ন-লিখিত নির্দেশগুলি পাওয়া যায় :—

(১) জনসাধারণের সহ-শিক্ষার প্রতি বিরক্তির উদ্বেগ।

(২) আইন-শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা-বোধ।

(৩) প্রমাণাধ্যক্ষ নিয়মলব্ধ শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা, অথচ তৎসম্বন্ধে আত্ম সিদ্ধান্তের অভাব।

আর বোঝাই প্রদেশে বাহা বাহা ঘটনাছে তাহার নিশ্চয়—

(১) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা।

(২) বিবিধ গবেষণা বিস্তারের প্রবৃত্তি।

মূলমানবধর্মের মধ্যে শিক্ষাবিক্ষেপে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে, তাহার আভাস—

(১) ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতিগণের উপ-কারিতা লক্ষ্যে তাহারের সমাধাওয়া এবং ঐ সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির কর্তব্যজ্ঞানের অভাব আছে বলিয়া তাহারের সন্দেহ।

(২) মূলমানবধর্মের শিক্ষাবিস্তারে প্রয়োজনীয়তা-বোধ।

কংগ্রেস-কর্মীদিগের মধ্যে শিক্ষা লক্ষ্যে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে, তাহার আভাস—

(১) কংগ্রেস-মহলে দেশসেবার গোঁড়ামির অস্তিত্ব।

ইউরোপে শিক্ষা লক্ষ্যে বাহা বাহা ঘটনাছে, তাহার আভাস—

(১) ইউরোপীয়দিগের কাহারও কাহারও মতে প্রদর্শনী ও সিনেমা শিক্ষাবিস্তারের উপায়।

(২) প্রান্তরকল ও বরকতাল দ্বারা ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব বলিয়া ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস।

(৩) ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ভাবমতে তত্ব বিচারসম্মত প্রকৃতির বিশ্বাসমত।

(৪) শরীরতত্ত্ব বিচারের চর্চা এবং বর্তমান ইউরোপীয় শরীরতত্ত্ব জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ এবং প্রমাণতত্ত্ব তন্মধ্যে তাহারের অজ্ঞতা।

(৫) ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞান লক্ষ্যে ইউরোপীয়-গণের অসুস্থচিত্তা এবং তৎসম্বন্ধে ভারতীয় তথাকথিত পণ্ডিতগণের অজ্ঞতা এবং তাহারের দ্বারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিস্তার প্রচার।

(৬) ইউরোপীয়গণের তাত্ত্বিকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বোধ।

(৭) পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের অবিকৃত জিনিসকে বিকৃত করা এবং 'জ্ঞান'কে 'বিজ্ঞান' বলিয়া প্রচার করা।

প্রবেশিকা পত্রীকার নূতন নিয়ম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইবুলিয়াল পত্রীকার নূতন পত্রীকার প্রতিষ্ঠা হইবে। বাইবুলিয়াল পত্রীকার পত্রীকার এই নূতন পত্রীকার নূতন পত্রীকার হইবে। ইহাতে প্রত্যেক প্রত্যেক ইতিহাস ও ভূগোল জ্ঞান করিয়া পত্রীকার হইবে। এই পত্রীকার পত্রীকার পত্রীকার পত্রীকার হইবে। প্রথমিক জ্ঞান বিষয়েও প্রত্যেক পত্রীকার হইবে।

এই নূতন পত্রীকার পত্রীকার পত্রীকার হইবে। প্রথম ইতিহাস জ্ঞান হইতেও প্রত্যেক পত্রীকার হইবে। প্রথম ইতিহাস জ্ঞান হইতেও প্রত্যেক পত্রীকার হইবে।

কি কি বিষয়ে ছাত্রবিশিষ্ট শিক্ষা দেওয়া উচিত, গভর্ণমেণ্ট যে তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন—ইহা তাহারই বুটায়। বর্তমান ইতিহাসের পুস্তকগুলির পরিবর্তনের নোতি স্থির না করিয়া এবং তাহার পরিবর্তন সাধন না করিয়া, এই পুস্তকগুলিকে ছাত্রবিশিষ্টের ইতিহাস-শিক্ষার পুস্তক বলিয়া ব্যবহার করা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের তৎসম্বন্ধে আত্ম চিন্তাশক্তির অভাবের পরিচায়ক।

মানুষের জ্ঞান, কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার ব্যক্তিগত ও জাতীয় অবস্থা ও প্রকৃতির ভাবে অভিন্ন। যার যৈশ্বিন কার্য পত্রীকার করিতে শিখিলে আমাদের কথার সার্বজনীন বুদ্ধিতে পায় যায়। জাতীয় জ্ঞান, কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃপক্ষের তত্ত্বব্যাখ্যায় জাতীয় অবস্থার কিরূপ ভাবন্য হইবে, তাহা দেখাইয়া দেওয়াই ইতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব। যে ইতিহাস এই সমস্ত দেখাইয়া দেয়, সেট ইতিহাস মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয়, উন্নতিসাধক এবং অবতরণীয়। মানুষের জ্ঞানের, কর্তৃপক্ষের এবং কর্তৃপক্ষের কোন্ অবস্থা হইতে তাহার সাংসারিক ও রাষ্ট্রীয় কোন্ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা বিচার না করিয়া যে ইতিহাস লিখিত হয়, সে ইতিহাস কখনও সত্যিকারী ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। একট ঘটনা যে বিভিন্ন প্রেক্ষার জ্ঞানসম্পন্ন লোক বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকেন এবং যিনি কার্যকরণ সম্বন্ধে অভ্যস্ত, তিনি সত্য বলিতে চেষ্টা করিলেও আসল ঘটনার ভিতর যে কি সত্য আছে, তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন না এবং তাহার বর্ণনার প্রকৃত মতের যে প্রচার হয় না, তাহা আশ্রয় সহজেই প্রাপ্য করিতে পারি।

কাণ্ড ও কারণের সামঞ্জস্য বিচার না করিয়া যে ইতিহাস লিখিত হয়, সেই ইতিহাস ইতিহাস-শিক্ষার কল হইয়া পড়ে ;

তাহা পড়িলে মানুষের জ্ঞানের উদ্ভব হয়, এবং মানুষকে তাহা বিস্তৃত পথে চালিত করে। কাজেই এই জাতীয় ইতিহাস ব্যতীতে অগ্রবর্তন ব্যাপকবিশেষ হইতে না পারে, তাহা সঙ্গীত হইবে। বর্তমানে ইতিহাস বলিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই যে কার্যকারণ বিচার করিয়া লিখিত হয় নাই তাহা একটু চেষ্টা করিলেই বুদ্ধিতে পায় যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া বাহ্য প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কয়েকখানি পুস্তকে চিন্তার পাত্র আছে। এই পুস্তকগুলি ইউরোপীয় প্রকারণগণের দ্বারা লিখিত। বাহ্যের এই পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহারা যে অসহস্রাব্দ ছিলেন এবং ছাত্রবিশিষ্ট কার্যকারণ বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাহাদের লেখার পরিচয়। যে সমস্ত ইতিহাস অনুমান ছাত্রবিশিষ্টের মধ্যে পায়। বলিয়া লিখিত, তাহার মূল সামান্যতঃ ইতিহাসিক “পণ্ডিত”গণের বিকৃত হইতে প্রাপ্য। বর্তমান পণ্ডিতগণ প্রায়ঃ কার্যকারণ আত্মসম্বন্ধে বিচার করেন না। তাহারা বাহ্য বলিবে, তাহা বর্তমান লিখিয়া-গতের পদ্ধতি অনুসরণে আশ্রয় হইতে জনসাধারণ মানিয়া লইতে বাধ্য।

যেহেতু এই কারণে ভারতীয় ইতিহাসিক “পণ্ডিত”গণ ইতিহাস বলিয়া বাহ্য আশ্রয়গণের ছাত্রবিশিষ্টের মধ্যে বিশিষ্টেছেন, তাহার ভিতর প্রায়ঃ কার্যকারণের কোন সামঞ্জস্য বুদ্ধি পায় না এবং তাহা আশ্রয়গণের পুস্তকবিশিষ্টের বিখণ্ডনগণের সহায়তা সাধন করিতেছে। যদি কখনও প্রকৃত ইতিহাস অনুমান করা সম্ভব হয়, তখন মানুষ বুদ্ধিতে পারিবে, ভারতবর্ষের ও ইউরোপের এক বৈশ্বিক ও মূলমতান মতাত্মক ইতিহাসে কত বিকৃত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাহ্যের ইতিহাসিক পণ্ডিত বলিয়া আশ্রয়, তাহাদের ভিতর ছাত্রবিশিষ্ট লুপ্ত হইয়া তথাকথিত পাণ্ডিত্যের বিকাশ হওয়ার আমাদের সহ্য অনিষ্ট সাধন করিতেছে। যখন গ্রন্থিতে হইবে যে, ইহা অন্য ইউরোপীয়গণ দ্বারা লেখেন, কারণ বৈশ্বিক জ্ঞান কতখানি ছিল এবং মূলমতানগণ তাহা কতদূর রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাদের পক্ষে তাহা বুঝা সম্ভব নহে। তাহা বুঝা সম্ভব ভারতীয়গণের, কিন্তু ভারতীয়গণের মধ্যে বাহ্যের পণ্ডিত বলিয়া আশ্রয়,

ঐহায্য প্রাথমিক "পণ্ডিত" না হইয়া পাণ্ডিত্যভিমানগত
হওয়ায় এই অবস্থা ঘটয়াছে।

সাধারণ প্রয়োজনীয়তা কি, কি করিলে বাঙ্গালা ভাষা
প্রয়োজন-সাধক হইতে পারে, তাহার নিদর্শন না করিয়া এবং
বাঙ্গালা ভাষার তৎসম্বন্ধীয় পরিবর্তন সাধন না করিয়া, উহাকে
শিকার বাহন করা শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের চিত্তাধীনতার
অঙ্গতন পরিচয়।

ভাষার উচ্চতর নিজ মনোভাব ব্যক্ত করা এবং পরের
মনোভাব বুঝা। নিজ সাধারণ মনোভাব ব্যক্ত করিবার
জন্য কোন ভাষা গঠনের প্রয়োজন হয় না, কারণ ভগবানই
প্রত্যেক মানুষকে এতটা প্রাকৃতিক ভাষা দিয়া থাকেন। যে
সমস্ত অবস্থা দাতব্যিক পক্ষে ঘটনা থাকে, অথচ সাধারণ
মানুষ তাহা সাধারণ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না,
তাহা ব্যক্ত করিবার জন্যই ভাষাগঠনের প্রয়োজন হয়। ভাষা-
বিভাগের সম্বলীকৃত ভাষা এবং তাহার জ্ঞান না থাকিলে
পরের মনোভাব নিরূপিত ভাবে বুঝা কখনও সম্ভব হয় না।
অন্য বিজ্ঞানের সম্বলীকৃত ভাষা বর্তমান ভগতে নাই, তদন্ত
আমরা গভর্নমেন্টকে শরী করিতে পারি না। কিন্তু বর্তমানে
বাঙ্গালা বলিয়া যে ভাষা চলিতেছে, তাহারা প্রায়শঃ
গ্রন্থকারের মনোভাব সঠিক বুঝিতে পারা যায় না এবং বস্তুর
সর্ববিধ অবস্থাও প্রকাশ করা যায় না। এই ভাষাকে বর্তমান
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহুদিন হইতে প্রচার দিয়া
অচলিতেছেন। গভর্নমেন্ট তাহা পরিবর্তন সাধন না
করিয়া—ঐ ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার ক্ষম, আমাদের
বাঙ্গালীর শিক্ষা আরও বিকৃত হইয়া বাটবে, উহা আনন্দ
করিয়াই আমরা গভর্নমেন্টের উপর চিত্তাধীনতার সাক্ষি
আগোপ করিতেছি।

যে সমস্ত গ্রন্থকারের পুস্তক মানুষের অবোধতা, অথবা
বীহাসের সচিহ্ন চিত্র মানুষের চরিত্রগঠনের বিরোধী, ঐহায্য
বিবিধ উপায়ে আশ্ব-বিভাগপদের ফলে "কবি-সন্ধান" এবং
"সাহিত্য-সন্ধান" বলিয়া আখ্যাত হইলেও প্রকৃত শিক্ষার
বাহ্যতে ঐহায্যের কলার কোন স্থান না হয়, তাহার চোঁটা না
করিলে গভর্নমেন্টের চিত্তাধিকার অমানিত হইতে চর না
কি? গভর্নমেন্ট অস্বস্তান করিলে ভানিতে পারিবেন, বাঙ্গালা
মধ্যে বহুদিনের পর বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা মনোভাব

বোধগম্য করিবার যে চোঁটা হইয়াছে, তাহাও বেশী চোঁটা
হইয়াছে তাহা দ্বারা মনোভাব অবোধতা করিবার এবং বীহাস
তাহার সাধারণ করিয়াছেন, ঐহায্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ-
পক্ষের নিকট অধিক পরিমাণে আদর লাভ করিয়াছেন।
জনসাধারণ তাহা পছন্দ করেন না, অথচ তাহা সুখ কুটুর
কি করিয়া বর্ণিত হয় তাহাও জানেন না। জনসাধারণ
যে তাহা পছন্দ করেন না, তাহার পরিচয় ঐ বিকৃত
গ্রন্থকারগণের বিকৃত গ্রন্থের মাধ্যমে। শিক্ষিত লোকের
বর্তমান সংজ্ঞাভ্রাসেরও বাঙ্গালার অঙ্গত: পক্ষে পায়ত্রিশ লক্ষ
শিক্ষিত লোক আছেন। একপানি পুস্তক বন ভন লোক
পড়িবেন ধরিয়া নইলেও—যে পুস্তক জনসাধারণের আদৃত,
তাহার সাড়ে তিন লক্ষ বও বিক্রয় হওয়া উচিত। কিন্তু
বাঙ্গালা দেশে বীহাস বর্তমানে "কবি-সন্ধান" অথবা তৎসমূহ
বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর লাভ করিতেছেন, ঐহায্যের
কলারের করণানি গ্রন্থ সাড়ে তিন লক্ষ ত' দূরের কথা, সাড়ে
তিন হাজার বিক্রীত হইয়াছে? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে,
জনসাধারণ আর্থিক অভাব বশত: পুস্তক কিনিতে পারেন
না। কিন্তু লোকের যে অর্থাত্য, তাহারও পর্যাপ্ত কারণ
এই বিকৃত শিক্ষা এবং বিকৃত পুস্তক। বস্তুত: জনসাধারণ
কি পছন্দ করেন, অথবা পছন্দ করেন না, তাহা গভর্নমেন্ট
ভানিবার সুযোগ পান না এবং তৎসম্বন্ধে গভর্নমেন্ট-কর্তৃকারি-
গণ বর্থাৎ চিন্তা করেন না এবং তাহারই জন্য গভর্নমেন্ট
লোকপ্রিয় হইবার চোঁটা করিয়াও এতাবৎ ভায়তনাসী
অগ্রহই হইয়া আসিয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার

বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিকশিক্ষিতে যেসব বো-
তাই আছে তাহা কার্যকর অর্থাৎ নাই। সমস্ত বাঙ্গালী মাধ্যম
সৌকর্য্য এতি পর্য্যন্ত হইলেন। সত্যকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
সকল। একজন সমস্ত চিন্তা করিলেন। সত্যকায় ঐহা—সত্যকায় এই
নূতন পর্য্যন্ত প্রকাশ করিলেন।

আমরা ইতি বহুতে, কলিকাতায় একটি "শিক্ষা-বজা" অনুষ্ঠিত
হইয়াছে সত্যকায় আছে। এই সমস্ত বাঙ্গালী দেশের বিভিন্ন স্থানের
শিক্ষক ও গভর্নমেন্টের এক সভাদিবেশনের বাগতাও হইতে পারে।

প্রচলিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পদ্ধতির মোদ
সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট যে অবকাংশ সচেতন, উহা তাহা পরিচয়।

ও মনের সমন দৃষ্ট্যব নহে। উদ্ভিগ্ন ও মনের সমন করিতে হইলে প্রথমতঃ বুদ্ধিমান হইতে হয়। ইহারই চতুঃ ব্যাসনের তাহার উত্তর চতুঃ অর্থাৎ “পতিত” কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার আগে “বুদ্ধিমান” কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়াছেন।

ব্যাসনের নির্দেশানুসারে বুদ্ধিমানের লক্ষণ—

চরিত্রগুণঃ বা চরিত্রবর্ণনঃ ১ বর্ষ ২।

ন বুদ্ধিমানঃ মনঃসংগতঃ ১ বর্ষ ৩।

(ঐতা. ১৭ অধ্যায়, ১০ শ্লোক)

পতিতের লক্ষণ—

৪য় অধ্যায়ঃ মনঃসংগতঃ ১ বর্ষ ৪।

মনঃসংগতঃ ১ বর্ষ ৫।

উপরোক্ত নির্দেশানুসারে যে দেশে একটী পতিত থাকেন, সে দেশের জনসাধারণের কোনরূপ প্রাণশৈল্য থাকিতে পারে না। এই ভারতবর্ষে বাসাসেব-নির্ধারিত লক্ষণসম্পন্ন বহু পতিত ভ্রমগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষে সর্বজন-কাম্বিক্ত অননুসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছিল। এক সময়ে প্রকৃত পতিতের দ্বারা দেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং সমগ্র জগৎ ভারতবর্ষের আদর্শ ও নির্দেশ দানকারিত্বে গ্রহণ করিয়াছিল। এই পতিতগণের কার্যক্ষমতার ফলে ভারতবর্ষের উন্নতি এত দ্রুত হইয়াছিল যে, তাহা বিস্তৃত হইতেও তিন হাজার বৎসরের অধিক কাল লাগিয়াছে। প্রকৃত পতিত যদি গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে একজনও ভ্রমগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ তাহার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত না; পরন্তু ভারতবর্ষের অবদান বহুদিন আগে অবলম্ব হইত।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে প্রকৃত লক্ষণসম্পন্ন কোন পতিত ভ্রমগ্রহণ করেন নাই। বরং পতিতাত্ম্য বা কাম্বিক্ত গত তিন হাজার বৎসর হইতে ভারতীয় বর্ণন বৃদ্ধিতে না পারিয়া তাহাকে কতকগুলি কাম্বিক্ত কথার ভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে জনগণের পূজনীয় কৃষিবিদগণের হত্যাসাধন করিয়াছেন। এখনও এই পতিতাত্ম্যবাহী শোকগুলি প্রায়শঃ কৃষিবিদগণের ‘ঘাতক’তার কাঁধেই নিপুণ আছে। সাধারণতঃ ইহাদের বুদ্ধি এত বিকৃত হইয়াছে যে, ইহারা যে আশ্বাসের প্রাণের বেনতানগণের হত্যাকারী, তাহা পঞ্চাশ বৃদ্ধিতে পারেন না। গভর্নমেন্ট

ইংরাজের দ্বারা। ইংরাজ ইহাদের অপরাধ কত গুরু তাহা বৃদ্ধিতে পারেন না। তাই শোকতঃ ইহাদের কোন শাস্তি হয় নাই। কিন্তু ভগবান ইহাদের শাস্তি ত্রিকই নিগ্ৰাহেন। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত করিয়া ভাবিকার উপাধাতুর গ্রহণ না করা পঞ্চাশ ইহাদের বর্ণন অনেক স্থলে গোপ পাঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ইহারা নিঃসর ত্রিকুত হইয়া পড়িতেছিলেন।

ইহাদের লক্ষ্য নাই। তাই ভারতীয় কৃষির বচিৎ এত বড় ভারতবর্ষের এত বড় অনিষ্ট সাধন করিয়াও নিভবিনকে “পতিত” বলিতে স্তুতি হন না।

ইংরাজ গভর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীন “পতিত” বলিতে কি বুঝায় তাহা বুঝেন না বলিয়াই ইহাদিগকে “মহামহোপাধ্যায়”, “পতিত” বলিয়া সম্বোধিত করেন। বর্তমানে কেবলমাত্র তথাকথিত সংস্কৃত ভাষা—এবং বিকৃত বৃত্তির কয়েকটি নির্দেশ টিয়াপাখীর মত উচ্চারণ করিতে পারিলেই “মহামহোপাধ্যায়” উপাধিলাভ করা যায়। কৃষিবিদগণের নির্দেশানুসারে ‘জ্ঞান’ লাভ করিতে না পারিলে “পতিত” হয় না এবং ‘বর্ণন’ না পড়িলে জ্ঞান হয় না। ‘ভাষা’ বর্ণন-লিখার উপায় হইতে পারে, কিন্তু শুধু ভাষা লিখিলেই বর্ণনের শিক্ষাপ্রাপ্ত করা হয় না। তাহার কোন বর্ণন লক্ষ্যে কিছুই জানেন না, তাহাদিগকে মহা-মহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করা কি, তাহার গভর্নমেন্টের উপাধি-বিতরণের পরামর্শবাহী, তাহাদিগের “পতিত” লক্ষণের প্রকৃত অর্থের অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে?

কি করিলে নিজের অথবা নিজ আত্মীয়-স্বতন্ত্রের উন্নতি সাধন হইতে পারে, বর্তমানে তথাকথিত সংস্কৃতবিশ্ব পতিতগণের মধ্যে তাহার নির্ধারণ করিতে পারিবেন, এমন লোক বৈশি আছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না।

অন্তান্ত প্রদেশ এবং ইয়োরোপে শিক্ষা লক্ষ্যে এই সমস্তের মধ্যে বাধা ঘটানো, তাহারও বিশেষণ করিয়া আমাদের কণার সার্থকতা যেখানে যায়। হানাতাব বশতঃ আমরা তাহা করিতে পারিলাম না।

মোটের উপর শিক্ষা লক্ষ্যে জনসাধারণের ও গভর্নমেন্টের কাঁধে বাধা পরিচালিত হই, তাহা চিন্তা করিলে বলিতে হয়, জনসাধারণ বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির উপর বিরক্ত হইয়াছেন এবং তাহার শিক্ষার পরিবর্তন চাহেন। আমাদের ইংরাজ গভর্নমেন্টও শিক্ষাবিস্তার চাহিতে হয়, তাহার ভ্রম বরাবর

উপাসনের জ্ঞানবুদ্ধিমত্তা চোরা করিয়া আনিতেছেন। ঐহিকায় যখন যে, ইংরাজ আশান্বিতকে অস্বাভাব্য করিয়া তুলিতে চাহেন, উপাসনের কথার যৌক্তিকতা আঘাত বৃদ্ধিতে পারি না। ইংরাজ উপাসার বিরুদ্ধে যেন যে শিক্ষা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, হতবিন পণ্যের আশাসের ইংরাজ ভাইস-রোয়ালের ছিলেন, ততদিন আশাসের বেশে সেই শিক্ষার প্রবর্তন না করিলে আশার ইংরাজকে যাহা করিবার যুক্তি বৃদ্ধিতে পারিতাম। কিন্তু যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, ইংরাজ উপাসার বিরুদ্ধে যেন যে শিক্ষা নিতে চেষ্টা করেন, সেট শিক্ষাই আশাসের বেশেও প্রবর্তিত হইয়াছে, তখন ইংরাজকে কোন দোষেরা হয় না।

বস্তুতঃ ইয়োহান্নিসগণ প্রকৃত শিক্ষা কি এবং তাহার পদ্ধতিই বা কি তাহা অজ্ঞানগণ পরিজ্ঞাত নহেন। তাহারই ভুল উপাসনের অচ্যুত পদ্ধতি আর্থিক পরামর্শনতা এবং নিজেদের মধ্যে এত বাসাবাসি, কাটাগাতি।

প্রকৃত শিক্ষা কি এবং তাহার পদ্ধতি কি, তাহা একমাত্র ভারতীয় কথিত্বই জানিতেন, ইহা যেন করিবার কারণ আছে। বৈদ্য গোবিন্দ তাহা বুঝা হত সর্বত্র, বিশেষতঃ পক্ষে তাহা বুঝা হত সর্বত্র নহে। তাহাতেই আশান্বিতের শিক্ষার বিরুদ্ধিতা হত নহা আশার নিজে।

প্রথমতঃ ঐহিকায় সংস্কৃতগণ 'পণ্ডিত' বলিয়া নিরান্বিতকে যেন করেন, উপাসার উপাসারগণ আশান্বিতের শিক্ষার বিরুদ্ধিতা সাধন করিয়াছেন। সেট বিরুদ্ধিতা রূপে ভবিষ্যৎ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পর্যন্ত তুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর ইংরাজের জ্ঞানপিপাসার ফলে উপাসার সংসর্গে আশার পুনরায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধিতে পারিগাছি, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কি, ইংরাজের সে জ্ঞান না থাকায় আশাসের প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই। শুধু আশাসের কেন, সারা ভগবতেই প্রকৃত শিক্ষা কি তাহার জ্ঞান নাই। তাহারই ভুল সারা ভগবতে হাহাকার উঠিয়াছে।

প্রকৃত শিক্ষার উন্নয়ন না হইলে এই হাহাকার কিছুতেই দূরীকৃত হইবে না। "প্রকৃত" শিক্ষা নাই বলিয়া বর্তমান ইংরাজগণ বর্তমান বিপদের গুরুত্ব বোধগতভাবে বৃদ্ধিতে পারিতেছেন না। ভ্রাতৃ অর্ধনীতির অগ্ররূপ, ভ্রাতৃ ইংরাজ অর্ধনীতিবিদগণ ভিতরে কত ব্যথিতা উপরে তাহা শুক হইয়াছে, ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন কট্ট, কিন্তু কত একেবারে বিব্রিত না হইলে ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্য পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা, তাহা যেন সম্ভব আছে।

কত একেবারে বিব্রিত করিতে হইলে প্রকৃত শিক্ষা কি,

তাহা আশে আশিতে হইবে এবং তাহার পর ইংলণ্ডে এবং এদেশে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধন করিতে হইবে।

প্রকৃত শিক্ষা কি এবং কি তাহা তাহা। কার্যকরী করিতে হয়, তাহা আশার আশেই দেখাইয়াছি এবং তৎসম্বন্ধে আরও অনেক কথা ভবিষ্যতে বলিব।

দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির

মণিপুর কেওড়াশায় যেখানে দেশবন্ধু গিরীন্দ্রনাথ মল মহাপুত্রের দেহাধি অবস্থিত হয়, খ্রীঃ ১৯০৭ খ্রীঃ সেইখানে উপাসার চিত্রার উপর



দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির

[ইকুইট্রাল ৩৭ ৪৫° ৩০' উত্তর দিকের দিক]

একটি স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই উপাসনায় হাহাকার যাহা যেখানে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিজে চমুত হইল—

দেশবন্ধু জীবন আশার যে সকল গুণের পরিচয় পাঠ্যগণ, সেই সকল গুণ যদি আশার আশাসের ভিতরে বর্ণ্য করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলেই আশাসের দ্বারা উপাসার প্রকৃত স্মৃতিসৌ মণিও হইল।

হীরাব্রাহ্মণ এই উপাসনায় একটি কথিতা জানা করেন।

হীরাব্রাহ্মণ জীবন হইতে সার্বভৌমত্বের দিকের—স্মৃতিসৌ-প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশবন্ধু যেন আশার দিকের দিকের প্রতিষ্ঠিত হয়।



शिक्षक।

ପଞ୍ଚିତ ବଂଶଦେବ ଉତ୍ପତ୍ତି

বিদ্যুৎ, টেলিফোন, হেঁচ ও বৈদ্যুতিন, কল-ম៉াসিন, বায়ুল,
 ক্রম-চালিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-প্রদত্ত বিদ্যমানতা। বিশেষ উল্লেখিত
 লোকসমূহের মধ্যে বহুজনকে উল্লেখ।

আমেরিকার আবিষ্কর্তা কে ?

କୋଡ଼ାକୋମିଆର, ଘାଟବୁଦ୍ଧ ବନ୍ଧେ, ଆଉ ଯାତି ବଜାର ମୁଖେ ଶ୍ରୀ
ଏକବାସି ଅନୁଷ୍ଠାନ-କଳଙ୍କେ ଅଭିଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କହଣ, ତଥ୍ୟାଶିରେ
ଯୋଗେନ, ଚଳକ ଡାଢ଼ପଣ ବିଚିତ୍ତେନ, କଳାସୋର ଆଉ ଗାଁର ମଞ୍ଚ ବନ୍ଧେ
ମୁଖେ ବନ୍ଧ ଦଳପ୍ରୟ ସ୍ୱାଦେଶିକେ ମହାମଣି କଳାକାରି ।

ভাৰতৰ ইতিহাস

ମୁଖ୍ୟ ଏକଟି ଐତିହାସିକ ଅନ୍ଧାରୀ। ଡି.ସି.ଏସ. ଟି.ଏସ.ଏସ. (ସୋସାଲିଜମ୍)
 ସର୍ବତ୍ର ଅନ୍ଧାରୀ ଡି.ସି.ଏସ. କାଗଜାଫିଲ୍ମ। ଏକ ଗୁପ୍ତାଂଶୁ ଓ କୁଳାଂଶୁ ହିଲି-
 ମାହି ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧାରୀ ହିଲିମା। ଅନ୍ଧାରୀ ଡି.ସି.ଏସ. କାଗଜାଫିଲ୍ମ।

[illegible]

ଦିଗନ୍ତ-ସାଧିତ ଶକ୍ତ ବିଚାର ଗ୍ରନ୍ଥଟିଟି ହିଁ । ସେବାନେତ୍ର ଆ
 ଶକ୍ତ ଶାକ୍ତର ସହକାରୀ କଲିଳ, ଟିପ୍ପଣ, ଗ୍ରନ୍ଥର ଚିନ୍ତା ଓ ସୂଚି ଶକ୍ତି ।
 କାରଣ ସହକାରୀ ଇଂଲିଶିଆଲ ହେକ୍ଟ-ବିହାର ଉପାଦାନ ପ୍ରାୟଶଃ କଟକ-
 ଜାଣି ଶ୍ରୀ ଓ ମହାଦୀ ପ୍ରମାଣି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ: ଡି. ଶ୍ରୀରାମ ମୂର୍ତ୍ତି — ସଂଳାପ: ଡି. ଶ୍ରୀରାମ ମୂର୍ତ୍ତି
 ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ: ୧୯୮୩

सह शिक्षण

ବୁଦ୍ଧକାବ୍ୟ (କାହାଣୀ) । କାବ୍ୟର ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରେଣୀ-
ଦ୍ୱାରା ଗୁଣାଯିବା, ଆଧୁନିକ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର
ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବାବଦ ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗ୍ୟ ।

કાલેશ્વરના એ અગાધ સિંચાઈ વાળા નળ છે. અતિથાન
કરિયાદાન ।

১৩. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অতিবাহিত হওয়ায় বাকী
 ১৪. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অতিবাহিত হওয়ায় বাকী
 ১৫. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় অতিবাহিত হওয়ায় বাকী

कालेजिए एकटि करिहि नैन कइता ओ प्रताप मण्डरक अरुनाम ।
 ७ अरुनामन अरुनाम ॥ १०८॥

ভারতের গৌরব-যুগ

[illegible]

ঐতিহাসিক গবেষণা

সম্রাট শূন্য সম্রাটের বিভিন্ন ভারতীয় ইতিহাস ব্যাখ্যাসহ
 মনোনিবেশ ছিল। নিম্নোক্ত: সম্রাটের উইল অফ ল্যান্ড অফ দ্য
 ওয়ার অফিওস ইন্ডিয়ানস পবিত্র গার্ডিয়ান অফ দ্য
 সলজিটস। অসামান্য অসুখের কারণে। তিনি একটি গার্ডিয়ান
 পলীস প্রদত্ত পলীস পলীস। অসামান্য অসুখের
 ওয়ার অফিওস ইন্ডিয়ানস পবিত্র গার্ডিয়ান অফ দ্য
 সলজিটস। অসামান্য অসুখের কারণে। তিনি একটি গার্ডিয়ান

অতীতকালে হিন্দুর যুক্তিঅনুসারে তর্ক করে না, আর হিন্দুর সেট
কত সহকারী তাকারী জ্ঞানের একত্বের পরিচয় স্থাপন করিয়া
বিস্ময়কর।

বিজ্ঞান ও ঈশ্বর

‘ঈশ্বরানুসারে স্থাপিত’ এমনকি ‘পৃথক’ হইলেও ঈশ্বর
বিশ্বব্রহ্ম

মহান সৃষ্টির স্রষ্টা ঈশ্বরিক অস্তিত্ব বিবরণের পক্ষেও যে
প্রমাণ একটী পৃথক বা বহির্বিবরণ বিবরণ অর্থাৎ, তাহার প্রকাশ
একত্বের দান করিতে সক্ষম হইতে পারে।

আইনষ্টাইনের ভাষায় বলা যায়—Here is something
you can call God. এই সেট, যাঁহাকে যুগ্ম ঈশ্বর নামে
অধিষ্ঠিত করিতে পার।

শিল্প

শিল্প-সাহায্য সমিতি

বৃহৎসংখ্যক শিল্প-সাহায্য সমিতি, ইংল্যান্ডের শিল্পের উন্নতিকল্পে
কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমিতি সমিতি ভাষায় শিল্পের সাহায্যের
নিকটেষ্ট পদে পরিণত হইল। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইল—শিল্পের
আর্থিক সমর্থন প্রদান। প্রায় সাধারণতঃ শিল্পের উন্নতিকল্পে
সমিতি।

সমিতি যে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য সুলভ এই—

(ক) শিল্পের সাহায্যের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা সুলভ হইয়া
একটি ব্যাংক (Industrial Credit Bank) স্থাপিত হইবে।

(খ) মোট-মোট শিল্পসমূহকে অর্থসাহায্য দিবার ও শিল্প-
সাহায্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) সমস্ত শিল্পের এক-সংখ্যক বহির্বিবরণ প্রদানকরণে
যাহা হইবার প্রয়োজনীয় করিবার প্রয়োজন হইবে।

(ঘ) ভবিষ্যৎ একটি ইক-এককক ব্যাপিস স্থাপন
প্রদান করা হইয়াছে।

পঞ্জী-শিল্প

বৃহৎ-সংখ্যক যোগ-যোগের মাধ্যমে “পঞ্জী” লক্ষ্যে
বৃহৎ-সংখ্যক বস্তুসমূহ—

“পঞ্জী” লক্ষ্যে ও বস্তু লক্ষ্যে তদানন্তর শিল্পের উন্নতি
লক্ষ্যে—যাহা হইয়াছে, বস্তু লক্ষ্যে, বস্তু লক্ষ্যে। তদানন্তর
লক্ষ্যে—৩০ কোটি—যাহা হইল পঞ্জী লক্ষ্যে করিতে হইল।
তদানন্তর হইল যাহা হইল শিল্পের উন্নতি লক্ষ্যে একটি সুলভ পুঁজি
লক্ষ্যে করিতে হইবে।

একদিন তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা
হইল তদানন্তর, যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর
হইল।

“তদানন্তর” লক্ষ্যে পুঁজি লক্ষ্যে তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর
লক্ষ্যে—যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল।
তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল।

“যাহা হইল” লক্ষ্যে পুঁজি লক্ষ্যে তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর
লক্ষ্যে—যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল।
তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল।

“যাহা হইল” লক্ষ্যে পুঁজি লক্ষ্যে তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর
লক্ষ্যে—যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল।
তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল। তদানন্তর যাহা হইল।

কৃষি

পঞ্জীবাসীর ক্ষণ

কোম্পানীর ইক-এককক তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর
তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর
তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর

জমিদারী প্রথার বিলোপ

বৃহৎ-সংখ্যক জমিদারী প্রথা এই লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব দান
হইয়াছে যে, এই প্রস্তাব হইতে জমিদারী প্রথা বিলোপ প্রদান করা
হইবে।

প্রায়ের উন্নতি

সহকারী সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিশেষতঃ কৃষি লক্ষ্যে পুঁজি লক্ষ্যে
প্রায়ের উন্নতি লক্ষ্যে তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর
তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর

প্রায়ের উন্নতি লক্ষ্যে ১১ হইল লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব দান করা
হইয়াছে। তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর
তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর

প্রায়ের উন্নতি লক্ষ্যে ১১ হইল লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব দান করা
হইয়াছে। তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর
তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর তদানন্তর

সরকার ও ভারতের কৃষির উন্নতি

হটল লক্ষ্যে লক্ষ্যে হটল লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে
লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে
লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে

লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে
লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে
লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে লক্ষ্যে

[illegible]

ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୁଅନ୍ତା ୧୧,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଟାକ୍ସର ସମ୍ମାନ
ବାରିଷ୍ଟର ସମ୍ମାନୀ କରାଯିବ ।

পান্নী-উন্নতিতে ব্যয়

পাঞ্জাব সরকার পাঞ্জাবের পল্লী-উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ডায়েরী নম্বর ১৮৩৩
তারিখ ১৫/০৫/৫০ অনুযায়ীতে ভুক্ত প্রজ্ঞা কলিফোন : ১৮৩৩ ১৫/৫/৫০
অধীন ৩ উল্লিখিত। বিদ্যমান ভুক্ত বসতিতে পরিবর্তন বিক্রয়, ভাড়া
মিথ্যে প্রদত্ত হইল।

(考) ① 本 文 中 有 關 於 文 學 的 描 寫 , 請 選 出 正 確 的 答 案 。
 答 案 請 寫 在 下 列 空 格 中 。

— ११४ — ० ॥ १०० ॥ १०० ॥

(୪) ମଲ୍ଲୀମୁକ୍ତ ବେଢ଼ାମୁକ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧନ—

(५) गणेशोत्सव निम्न १ आदित्यस्य विजयस्य दायक " ४६ " "

(੪) ਭਾਗ ੬੧੯ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ— " ੪੬ " —

। एतद्दिनं वेदपालनं, पञ्चम-सिद्धेर उत्पत्तिके ए वल्लभ बालिक
 कथनं भवे। शिखःपलायकः अर्थं बालित इति ।

পাটভাষা

বাঙ্গালো লোকসমূহের পাঁচ জন নিরস্ত্র-অস্ত্রহীণ হুজুরদের হস্তগত, এই
 বিষয়ে সন্দেহভিত্তিক নিরস্ত্রদের সন্ধান আর এক কক্ষের ৩৩ মুন্সি
 কর্তৃক ৩০ পায়সে খরচা যোগ্য করা যাবে।

ବାବନା ଓ ବାରିଗଛ

सर्वज्ञानी

[illegible]

ଆୟତ୍ତ ବୃଦ୍ଧି

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান কিসানজি বাবুর দ্বারা প্রাপ্ত
প্রাথমিকভাবে বিবর্তন, অধ্যয়ন, বুদ্ধিবৃত্ত: মাধ্যম: মোকদ্দমা
কিছু দায়িত্ব।

বেকার-সমস্যা

মণ্ডলের প্রসিদ্ধান পৰ্ব্বসেইটের কাছাকাছানী লম্বা বহুতা অক্ষর
 ক্রীশ অক্ষর যদী বি: প্রাণেই বহু ইন পলিঅক্ষর—

যদি এমন কথা কখনও হ'ল নাও, বলিতে পারিও না যে,
যদি কেউ-কোনও সাধন করিও নাই। তবে আমাদের
সংস্কারের চোরাই ফলে লালসার মনে আসা চিন্তাও যে, অসংস্কার
উচিত নহইবে। ১২০৪ সালের প্রথম পাঠ মাসের প্রকাশের

बाह्य

সাংস্পর্শিক বোম্বardment

[illegible]

ଯାହାହିଁର ଅଳ୍ପ କେତେକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଯାହାକିର ମୂଳିକ
 ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଏକ ଶବ୍ଦ-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର
 ମୂଳିକ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର
 ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର

ডোমিনিয়ন ষ্টেটস

লর্ড হেটলাও স্বলভায়ে - ছোবিনিক্স টেট্‌সৰ সঠিক লাজ
নিৰ্ণয় কৰা তাৰ লগত -

ভারতের আর্থনিক জড়ত্ব পান অকাল ভবিষ্যৎ পূর্ণ
 বিশ্বজনীন যোগ ২০১৩-১৪ অর্থবছর অগ্রা নকশা তৈরি করা
 হয়েছে।

ଡାଉନସିଡ଼ିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରମ (depression) ହେଉଛି ଏକବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ରୋଗ। ଏହା ଖୁସିର ଅଭାବ, ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ, ଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ନିଦର ପ୍ରତି ଲାଭହୀନତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଯାହାକି ଯଦି ଉପଚାର ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଜୀବନର ବାକି ଅଂଶ ପାଇଁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

କାର୍ତ୍ତିକ ୧୫ ତାରିଖ ସାନ୍ତାଳପୁର ମଧ୍ୟ ଶାସନାଳୟ, ଗୁମ୍ଫା, ଗୁମ୍ଫା, ଗୁମ୍ଫା

विविध

পরিণাম-পরিণতি

আমেরিকায় প্রতি দিন বিক্রি একটি বিনামূল্যের গটে
আমেরিকায় শতকরা ১৩টি পরিবার প্রতিটি ১৫ বিল্ডিং; শতকরা
০৫টি বিল্ডিং মূল মূল্য ১০০০০০ ডলার।

कार्मण नात्री

कार्त्तिके। नाशोपनासः। ज्येष्ठौ शिवयोः केवाट्टुड सोल्लुग्न रुक्क

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ত্রিশত-বিদ্যোপ

ବେତକା/କା (ବାହା) କଳ୍ପ, ଆଶେନିକ ମନାତନ ବର୍ଷ ମହାନ
 ଇସ୍ତାହନ ଉପଲବ୍ଧ ନିଧି ବିକାଶନକ ତାହା ଶାନ୍ତି ସମାପାଦନ-ମାନବ

কিয়ার হিচ্চক ও ভরুসার) কপাল বিধাতার ভুলে নিশ্চেষ্ট কিলোপ
সকলো! সত্যই ইহাও আশ্চর্য আছে।

সমাজতত্ত্ববাদ

মিছিল দারিদ্র্য কংগ্রেস সমাজতত্ত্ববাদ সমাজ একটী বিকল্পিত কথা
হইতে যে—ব্যক্তিগত কল্যাণাদিকার কর্তব্যে এমন একটী বিলম্ব
নাই, তাহা সমাজতত্ত্ব (অর্থাৎ সমাজতত্ত্ববাদ-কিয়ারসের) দ্বারা
কল্পিত আছে।

সোনার পাগড়বাড়ী

হুইং মেরী ট্রোপের নাম অনেকের ভাল লাগিতে পারে। যৌন
সমস্যা ও কল্যাণের সম্পর্ক তিনি সত্য সত্য লিখিয়া থাকিত অর্ন্তর
বলিয়াছেন। সমাজিক ত্রিবি এক নূর্য কর্তা। কল্পিতেন।
হিবি মনন, এমন অনেক সুখ দুখী আত্ম, যাহারা মিলাই করিত

যদি ঝড় আসে

পদতল সাঁকে সেদিন সঙ্গস কড় এসেছিল তাই
ঘরবী ঘুলায় ঢাকি
গভীর অন্ধকারে,—
সে কড় গাবনে আশা-নীড়বাণি নীরবে ফিস্ফিসে তাই
আজিও পরাশপাখী
স্বপ্নের বঙ্কমাতে।
সে দিনের কড় ডানা জেদ দেল, সুকণ্ঠে বিঁচিল আশি
মিঠুর ব্যাধের পর
য়েকবার বিদ্যাকি,—
তবুও সঁগেছি নীচে অন্ধরে মুখে নিষে স্তম্ভ হাসি,
কীমন-স্বাদুকাশর
সোপানের রেখা আঁকি।

নতুন পোতের পলম কাকালী বত ছিল কমা কথা
লগরের বীণা-তারে
সুখ আশাবসী স্তম্ভ,
সে-তার চিঁড়েকে, বাসা বীণা কোথা গড়ে আছে ঘুলা কমা,
কীমনের কোন ধারে
কোন নিসতলপুখ।

ইচ্ছক ব্যক্তিতেও লগের পরিচিত অক্ষয় ঘনিষ্ঠ মিলাই করিতে পারেন
না। চুইং মেরী ট্রোপের মতে যা-কিছু বিধানে কোন কোন
আই। কিয়ারের পর দ্বারা হুইং মেরী ট্রোপের দ্বারা
কল্পিত আছে। এমন কি কলমে লেখাশ্রুতি কল্পিত পারেন।
যখন অমরা ভাল হইবে, যা-কিছু থাকিলে, এমন বলাগে
পাটিলে, তাহাতে কোন কোন আই।

শোক-সংবাদ

আমাদের কিছু কবি মেয়েপ্রাণে যার নিজের অকালে কালহাসে
পড়িত হইয়াছেন। সত্যলো মেয়ে প্রায় সবই সত্যিক পত্র-পত্রিকা
চলার কবি কবি ও কবি প্রকাশিত হইত। হাজার কয়েকখানি বই
পত্রিকাসমূহে আছে লিখিত। আমরা শোকসংগ পত্রিকা-
কর্মে গেলক লক্ষ্যে প্রায় করিচ্ছি।

—প্রিয়ারাশি মেঘ

যে মাঝে সুন সুকলে বয়েছে সে মাঝে কোটনি আত,
হেঁদিত আশার ছবি
উৎসবগান পাঠি,
সেদিন যে আশি এসেছিল, আজও আশার কাটে না তার
আকাশে ওঠেনি ছবি
অতল নগ্নে চাহি।
সে দিনের সাঁকে বুঝিয়ে সাধী কমা কোলকর মাঝে
যেত-কলবীর বনে
আমারে জাগাবে রাশি,
তাই আজও তারে জাগাইতে চাই প্রতিদিন সন্ধ্যাতে
কামালো মেঘ মনে
নীলব যোহনে জাকি।
চোখের সীমার জল নাই, আছে সুকর অতল কত,
করিছে কবির বাসা,
সে বাসা লুকায়ে বগি,
তোমারও কীমনে যদি কড় আসে সহসা আমায়ই মত
যদি হও বিশালাকা,
তবু শব বুঝে, চলি।



মাই-বোন

শিল্পা—ঐশ্বর্যনাথের চক্ৰবর্তী



ভারতের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

পূর্বসূত্র :

—জনৈক “অর্থনীতির ছাত্র”

আমরা এই প্রবন্ধটা আরম্ভ করিচ্ছি গত অগ্রহায়ণ মাস হইতে। এই নয় মাসের মধ্যে অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং প্রবন্ধটির বিস্তৃতি ক্রমশঃই বাড়িয়া গাইতেছে।

বর্তমান ভগ্নতে হতভাগি দেশের অস্তিত্ব আছে তাহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ ও চীন দর্শনশাস্ত্র প্রাচীন। কাথের প্রাচীনতা ভারতবর্ষের একটা বৈশিষ্ট্য; আধিক বাধীনতা ইহার অস্তিত্ব বৈশিষ্ট্য। ইগা ছাড়া ভারতবর্ষকে একদিন ভগ্নতের অস্তিত্ব সমস্ত দেশে আসন আসন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষয় বিনাশ বরণ করিয়া লইয়াছিল, ইহাও মনে করিবার কারণ আছে। অথচ সেই ভারতের অধিবাসী আজ বীর শিকার ও পশ্চাত্তাত্ত ভগ্নতের রূপান্তরী এবং নিজ রাষ্ট্র পরিচালনা-কার্যে পরামর্শী। যে দেশের এতগুলি বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক পরিবর্তন এত আনন্দ, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্ন করিতে ও সমস্ত-পূরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে যে অনেক কথা বলিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমের। অথচ কোন ক্রমে অনেক কথা বলা হইলে তাহার সমস্ত পাঠকবিশেষ দাখ্যায়ত্তঃ অরণ্য রাণা সন্তান নহে। কাথেরই দেশের কর্তব্য পূর্ণে বাহা বাহা বলা হইয়াছে তাহা মাঝে মাঝে অরণ্য করাইসা যেওনা।

অধিকার প্রথমে মূলতঃ নির্দিষ্ট, বিচ্ছিন্ন আলোচনা করা হইবে বলিয়া ইহার প্রথমধর্মের প্রকাশ করা হইয়াছে—

১। বাবতীয় সমস্ত-পূরণের উপায় কি ?

২। কোন দেশের জাতীয় সমস্তা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার উপায় কি ?

৩। ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্তা কি ?

৪। ভারতবাসীর বর্তমান অবস্থা ও লক্ষ্য ক্রিয়ণ ?

৫। ভারতের বর্তমান সমস্তার পূরণ কোন প্রকৃতি বিজ্ঞা-বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব কি না ?

৬। যদি প্রকৃতি বিজ্ঞা-বুদ্ধি দ্বারা ভারতের বর্তমান সমস্তার পূরণ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কি উপায় দ্বারা তাহা হইতে পারে ?

৭। যে মূল স্বাধীনভাবে ভারতের বর্তমান সমস্তার পূরণ সম্ভব তাহা কার্যে পরিণত করিবার পদ্ধতি কি হইতে পারে ?

উপরোক্ত সাপ্তাহী মূল বিষয়ের মধ্যে বাবতীয় সমস্তা পূরণের উপায় কি তাহা অগ্রহায়ণের সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে।

“কি উপায়ে কোন দেশের জাতীয় সমস্তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইতে পারে” তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, কোন দেশের জাতীয় সমস্তা বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমতঃ “জাতি” বলিতে কি বুঝায়, দ্বিতীয়তঃ “দেশ” বলিতে কি বুঝায়, তৃতীয়তঃ জাতি-সংস্কৃতির প্রয়োজন ও উপায় কি, চতুর্থতঃ জাতীয় সমস্তা কাহাকে বলে এবং তাহার উদ্ভব হইবে কেন, ইহা জানিতেও ও বুঝিতেও হয়।

আমাদের নির্ণয়দ্বারা “জাতি” বলিতে “দেশ”কে কেহ

• “জাতি” বলিতে আমরা বুঝি “দেশের কথা কান মিলে পুনরাবৃত্তি করা।”

১। “দেশ” বলিতে আমরা বুঝি “একটি রাষ্ট্রের জাতীয় সমস্তা পূরণের পদ্ধতি।”

করিয়া তত্বে তত্বে লেখাশিখণের সমষ্টি অথবা সংশ্লেষণ, এবং “বিশ” বলিতে জমী, জীব ও জলাজলার সমষ্টি বুঝিতে হইবে।

কি কবিলে জমীর উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে তাহার আলোচনা আরম্ভ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রসকের কোন অবস্থা আকাজকীয় তাহা ব্যতীত চান্না না থাকিলে জমীর উৎকর্ষ বলিতে কি বুঝার তাহার সম্যক উপলব্ধি হয় না এবং বাহ্যিকের উন্নতি ও অবনতির অবস্থা কি তাহা চান্না না থাকিলে রসকের কোন অবস্থা আকাজকীয় তাহার নির্ধারণ সম্ভব হয় না। কাজেই জমীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য কি করিতে হইবে তাহার আলোচনা সমাপ্ত হইবার আগেই বাহ্যিক লক্ষ্যে বিবিধ প্রশ্নের উত্থাপন করা হইয়াছে। বাহ্যিক লক্ষ্যীয় যে যে জাতবা কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে তাহার বর্ণনা শেষ হইলে পুনরায় জমীর উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য বাহ্যিক আবেশক তাহার বিচার করা হইবে।

মাত্র লক্ষ্যে আধারা এতাবৎ নির্দিষ্ট বিবরণগুলি আলোচনা করিয়াছি—

- ১। বাহ্যিক বলিতে কি বুঝার ;
- ২। বাহ্যিকের মধ্যে ভাবতমোর কারণ ও তাহার রূপ ;
- ৩। বাহ্যিকের প্রাথমিক কর্তব্য।

ইহার পর কোনটা বাহ্যিকের “প্রয়োজন” আর কোনটা তাহার “আকাজক”, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে বাহ্যিক আবেশক প্রয়োজন তাহার কথা আরম্ভ হইয়াছে।

আত্মিক সাহিত্য

“আত্মিক সাহিত্য” লক্ষ্যে কিছু বৃত্তিতে হইলে “আত্মা” কাছকে বলে তাহা আগে বৃত্তিতে হয়, কারণ বস্তুর আত্মকে অধিকরণ করিয়া যে সাহিত্য অথবা আত্ম-সম্বন্ধীয় সাহিত্যের নাম “আত্মিক সাহিত্য”।

“আত্মা” শব্দের প্রচলিত অর্থ “আমি”। “আত্মা” বলিতে যে “আমি” বুঝার সে “আমি”-র বিস্তৃতি যে কতগুণি সম্বন্ধপূর্ণ আত্মার তাহা অপরিসীম।

পাণিনি বেদের পঞ্চ বৃত্তিয়ার পদ্ধতি অনুসারে জীবের আত্মা বলিতে বুঝার সেই অবস্থান বাহ্যতে নিঃশব্দ প্রকাশ, গুণ এবং কার্যের বিকাশ হইয়া থাকে।

“আত্মা” এষ্ট শব্দটির মধ্যে আছে ‘আ’, ‘হ’, ‘দু’, ‘মা’।

‘আ’ শব্দের অর্থ ‘নিঃশব্দ প্রকাশ’ ‘হ’ শব্দের অর্থ

এই প্রশ্নে নির্দিষ্ট বিবরণগুলি আলোচিত হইয়াছে—

- ১। বাহ্যিকের বিভিন্ন কার্যের প্রতীকিতাপ ;
- ২। বিভিন্ন কাহাঙ্গল্যের বাহ্যিকের প্রতীকিতাপ ;
- ৩। আত্মকণন অথবা বাহ্যিক কোন প্রতীকিতাপ তাহা নির্ণয় করিবার উপায় ;
- ৪। ‘কাহা’ ব্যাখ্যা করা কি ?
- ৫। বিভিন্ন বাহ্যিক বিভিন্ন রকম কার্য করে কেন ?
- ৬। বিভিন্ন বাহ্যিক বিভিন্ন রকমের বস্তু চাহে কেন ?
- ৭। বিভিন্ন বাহ্যিক যে বিভিন্ন রকমের কার্য করে তাহাতে তাহাদের পরিণাম কি হয় ?
- ৮। আত্মকণনের বিভিন্ন রকম ও তাহা হয় কেন ?
- ৯। অধ্যাপনার বিভিন্ন রকম এবং তাহা হয় কেন ?
- ১০। জ্ঞান কাহাকে বলে এবং জ্ঞানবানী যে এক লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে রূপের সবত জ্ঞানির মতো সর্বপ্রতি হান অধিকার করিতে পারিয়াছিল তাহার প্রমাণ কি ?
- ১১। প্রকৃত ও বিকৃত সাহিত্য কাহাকে বলে এবং তাহা বিভিন্ন রকমের হয় কেন ?

বর্তমান অধ্যায় আত্মিক সাহিত্যের স্বরূপ ও তৎ-সংশ্লিষ্ট বিষয় লক্ষ্যে আলোচনা করিবার কথা।

“অহংকৃতি” অথবা গুণ, ‘দু’ শব্দের অর্থ “শব্দ” অথবা কার্য, ‘জ্ঞা’ শব্দের অর্থ গুণ এবং কার্যের প্রকাশ, অথবা বিকাশ।

আত্মার স্ববিধিগণের কথা অনুসারে চরাচর সমস্ত জীবের মূল কারণ একটী নিঃশব্দ প্রকাশ। জ্ঞান, চেতন, অজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত চর-জীবের এবং পদা-শব্দাদি অচর-জীবের মূল উপাদান এই নিঃশব্দ বস্তু। এই নিঃশব্দ বস্তুর প্রকাশ হইলে তাহা গুণসম্বলিত এবং কার্যশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই পাণিনি বেদের সংজ্ঞাঙ্গল্যে নিঃশব্দ বস্তুর প্রকাশ হইবার পর তাহা গুণসম্বলিত এবং কার্যশক্তি সম্পন্ন হইলে যে অবস্থানের উদ্ভব হয় তাহার নাম “আত্মা”।

নিঃশব্দ বস্তু বলিতে বুঝার “বোধ্য”। কবির কথাগুলো বোধ্য মডল, অটল। বোধ্যের অর্থ যে জীবের জ্ঞান বোধ্যের পরিণাম বোধ্য, সেই জ্ঞানে অথবা সেই জীবের আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ শক্তি থাকে না। আকর্ষণ অথবা

বিকৰী নকি না থাকিলে জীৱ আকাশে উড়িত্তে এবং বায়ুওলৈ অথবা ভলৈৰ উপৰ বসিত্তে পাৰে । খেচৰ জীৱেৰ ভিতৰ বোম্বেৰে পৰিৱাণ অণেকাকৃত বৈশি বসিত্তা তাহাৰা আকাশেৰে বহুদূৰ পৰ্য্যন্ত উড়িত্তে পাৰে ।

যে বোম্বেৰে বৈশি পৰিৱাণ বোম্বেৰে সজিত থাকেন, সেই জীৱেৰে মধ্য বিজ্ঞা কোন বৃক্ষাবয়বসম্পন্ন জীৱ বাতাহৰে অত্যধিক পৰিৱাণ বোম্বেৰে সংস্থান না কৰিত্তে পাৰিলে বাতাহাত কৰিত্তে পাৰে না । আকাশেৰে যে অংশ নীল বৰ্ণ, সেই অংশে বোম্বেৰে সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক পৰিৱাণে সজিত । ঐতিহ্যক ভুলীয়া ভাৱকাৰে মধ্য বোম্বেৰে সৰ্ব্ব অৰ্থে বসিত্তা একতী ভাৱকাৰ আৰ একতী ভাৱকাৰ উপৰ পড়িত্তে পাৰে না ।

বোম্বেৰে কোন স্তৰ নাই । তাহাকে মানুহ হাত বিজ্ঞা স্পৰ্শ কৰিত্তে পাৰে না, তাহাৰে বস অংশ কৰিত্তে পাৰে না এবং তাহাৰে কোন গন্ধও নাই । তাহাৰে ভিতৰ দিয়া মানুহ কেবল মাত্ৰ শব্দ শুনিতে পাৰে ।

মানুহেৰে কৰ্ম্মক্ষেত্ৰে (কৰ্ম্মক্ষেত্ৰ নহে) বোম্বেৰে আছেন বসিত্তা মানুহ শব্দ শুনিতে পাৰ এবং কৰ্ম্মক্ষেত্ৰেৰে মধ্য বিজ্ঞা এক শব্দ হাত্তা অস্ত কোন বস্তু বাতাহাত কৰিত্তে পাৰে না । মানুহেৰে অবস্থেৰে যে যে অৰ্থে বোম্বেৰে অধিক পৰিৱাণে আছেন, সেই সেই অৰ্থে অস্ত কোন বস্তু অংশ কৰিত্তে পাৰে না এবং সেই সেই অৰ্থে কেবল মাত্ৰ শব্দ শুনা পাৰ ।

বোম্বেৰে না হইলে চৰাচৰ কোন জীৱেৰে উত্থৰ ও বস্তু সন্তব হয় না । এই স্তৰ বোম্বেকে বস্তুৰ “বীজাকার” বলা হইয়া থাকে ।

এইখানে জাৰিয়া থাকিত্তে হইবে যে, ঐতিহ্যক বস্তুৰ তিনিটা আকাৰ আছে । তাহাৰেৰে নাম বীজাকার, বস্তুাকার অথবা বস্তুাকার এবং বৃক্ষাকার ।

“বোম্বে” গতিশীল হইলে তাহাৰেৰে একাংশ হইবাহে বসিত্তে হইবে । বোম্বেৰে গতিশীল হইলে বস্তুাকার বায়ু উত্থৰ হয় । বস্তুাকার বায়ু কোন স্তৰ নাই, কোন বস নাই, কোন গন্ধ নাই । তাহাৰেৰে অতিশয় অতুলন কৰা পাৰ কেবল মাত্ৰ স্পৰ্শ দিয়া এবং জীৱেৰে পৰীৱে বস্তুাকার বায়ু এবাহিত্ত থাকে বসিত্তা জীৱ স্পৰ্শ কৰিত্তে পাৰে এবং স্পৰ্শৰে চাৰ । মানুহেৰে অকল ও বাসেৰে মধ্য বিজ্ঞা বস্তুাকার বায়ু এবাহিত্ত থাকে

বসিত্তা অকল ও বাসেৰে স্পৰ্শৰক্তি বহিৰাহে । যে যে অৰ্থে বস্তুাকার বায়ু এবাহিত্ত হয় না সেই সেই অৰ্থেৰে স্পৰ্শৰক্তি থাকে না । বস্তুাকার মধ্য বিজ্ঞা বাতাহাত্তঃ বস্তুাকার বায়ু এবাহিত্ত হয় না বসিত্তা বস্তুাকার কোন স্পৰ্শৰক্তি নাই ।

বস্তুাকার বায়ুৰ উত্থৰ হইলে জন্মঃ বস্তুাকার ও বৃক্ষাকার জন্ম, তেজ এক কিত্তিৰে উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং জীৱ বিবিধ স্তৰ ও কাৰ্য্যশক্তি সম্পন্ন হয় ।

কাৰ্য্যেই সেবা হাইতেছে, নিউটনেৰে একাংশ হইলেই বায়ুৰ উত্থৰ হয় এবং বায়ুৰ উত্থৰ হইলেই বস্তুাকার ও বৃক্ষাকার জন্ম, তেজ এবং কিত্তিৰে উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং জীৱেৰে উত্থৰ হয় এবং জীৱ স্তৰ ও কাৰ্য্যশক্তি অৰ্জন কৰে । কাৰ্য্যেই আত্মা বসিত্তে বস্তুাকার চৰাচৰ জীৱ এবং আত্মাৰ জ্ঞান বসিত্তে বসিত্তে হইবে জীৱ-সম্বন্ধীৰ জ্ঞান এবং তাহাৰে মাত কৰিত্তে হইলে ঐতিহ্যক বস্তুৰ উপাদান কি, স্তৰ কি—এবঃ কাৰ্য্যশক্তিৰে কি তাহা জানিত্তে হইবে ।

প্রচলিত বাহালা ও ইংৰাজী ভাষাদ্বাৰা আত্মাৰ জ্ঞান বসিত্তে বসিত্তে হইবে ঐতিহ্যক বস্তুৰ পৰ্য্যৰ্থ-বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন (Chemistry) জান । অৰ্থে বৰ্ত্তমান জগতে যে পৰ্য্যৰ্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন আছে তাহা ঐ দুইটা নামেৰে কলক । সংস্কৃত ভাষাৰ ভাৰতীয় ভাষিণেৰে বস্তুৰ আত্মা-সম্বন্ধীৰ যে জ্ঞান নিৰ্ণয় আছে অথবা ভাৰতবাসীৰে যে পৰ্য্যৰ্থ-বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন (Chemistry) সংস্কৃত ভাষাৰে নিৰ্ণিত আছে, তাহাৰে বৰ্য্যৰ্থ অৰ্থে একাংশ হইলে বৰ্ত্তমান জগতেৰে পৰ্য্যৰ্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন যে ঐ দুইটা নামেৰে কলক তাহাৰে ঐতিহ্যকেই বসিত্তে পাৰিলেন ।

বাহাৰা আত্মাকে “সজ্জিগানময়” বসিত্তা থাকেন তাহাৰা কি কলেন তাহাৰে জানেন না বটে, কিন্তু বাহাৰে কলেন তাহাৰে ঠিকই বসেন । “সং” বসিত্তে বস্তুৰ “সত্তা” অথবা “উপাদান”, “চিত্ত” বসিত্তে বস্তুৰ “কাৰ্য্যশক্তি” এবং “জানক” বসিত্তে বস্তুৰ “স্তৰ” । উপাদান, কৰ্ম্মশক্তি এবং স্তৰবিশিষ্ট বস্তু বসিত্তে

▲ মানুহ, পৰ্য্যৰ্থৰ ও সজ্জিগানময় জীৱেৰে পৰীৱাণময় জীৱ (Anatomy), পৰীৱাণময় (Physiology), পৰ্য্যৰ্থৰে সজ্জিগানময় (জীৱ বিজ্ঞাৰে কোন বিজ্ঞানেৰে নাম পৰ্য্যৰ্থৰে জীৱময় সজ্জিগানময়) পৰ্য্যৰ্থ-বিজ্ঞান ও সজ্জিগানময় সজ্জিগানময় ।

চরায়-জীংকেই বুঝায়। কবেই তাঁহারাও পরোক্ষভাবে চরায়-জীংকেই “আছা” বলিতেছেন।

“আছা”কে বুঝিতে হইলে “ঐশ্বর্য”কে জানিতে ও বুঝিতে হয়। ইহা বাহ্যিক বসন তাঁহারাও ঠিক বর্ণনা থাকেন। আশ্বাসের কথাগুলারে কোন ভাবেই “আছা”কে বুঝিতে হইলে তাহার উপাধান, গুণ এবং কণ্ঠস্বর কি কি তাহা বুঝিতে হইবে। সমস্ত উপাধানের উদ্ভব হইয়াছে কোথা হইতে, তাহা না বুঝিলে কোন ভাবেই উপাধানকে সম্যক ও অত্রাণ্ড ভাবে বুঝা সম্ভব হয় না। জীবের সমস্ত উপাধানের উদ্ভব হইয়াছে “বোম্ব” হইতে। কবেই কোন জীবের উপাধান সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে “বোম্ব”কে জানিতে ও বুঝিতে হইবে। এই “বোম্ব”কেই ভারতীয় কসিগণ “ঐশ্বর্য” নামে অভিহিত করিয়াছেন। “ঐশ্বর্য” শব্দের মধ্যে আছে ‘ঐ’-
শু-ব-...-র।

‘ঐ’ শব্দের অর্থ ‘চিৎকণার দীর্ঘত্ব’ অথবা গুণের বৃদ্ধি।

‘শু’ শব্দের অর্থ ‘সহগুণ-সম্পন্ন’।

‘ব’ শব্দের অর্থ অধু।

‘র’ শব্দের অর্থ বহি।

বাঁহায় হইতে গুণের বৃদ্ধি, সহগুণসম্পন্ন অধু এবং বহির উদ্ভব হয় জীবাণ নাম ‘ঐশ্বর্য’। ইহাই ঐশ্বর্য শব্দের মূলগত অর্থ।

নিগুণ “বোম্ব” হইতেই প্রথম স্পর্শগুণযুক্ত বায়ুর উদ্ভব হয় এবং তাহার পর গুণের বৃদ্ধি হইলে হৃদ্যকার (হৃদ্যকার ও সহগুণসম্পন্ন একই অর্থ-প্রকাশক) অধুর এবং বহির উদ্ভব হয় ইহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। কাজেই “বোম্ব”কে ঐশ্বর্য বলা ঘটিতে পারে।

বোম্ব যে নিগুণ এবং তাহা না হইলে যে চরায়ের কোন জীবের সৃষ্টি এবং দ্বিতি অথবা তৃত্বা সাধিত হয় না এবং তাহার বিহনে যে জীব সৃষ্টানুখে পতিত হয় ইহাও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

একটি মাহুষের দিকে চাহিয়া যেখান এবং প্রথমতঃ চিত্তা কল্পন, মাহুষ কি কি কাণ্ড করে এবং তাহার কি কি গুণ। মাহুষ অনেক কিছু কাণ্ড করে এবং তাহার গুণও অনেক। কিন্তু তাহার সমস্ত কাণ্ড ও গুণ সংক্ষেপ করিয়া বলিতে হয়—

(১) সে অবিরত তাহার নাসিকার সাহায্যে গন্ধ লই-

তেছে এবং মূত্র পাইতে চাহে। তাহার নিজের বেহেও গন্ধ আছে এবং তাহার তারতম্য হয় নিজ অন্ধ ও মানুষের তারতম্যমুদ্রারে।

(২) সে অবিরত বাতের ও তাবের রস গ্রহণ করিতে চাহিতেছে এবং পছন্দ-বিস্ক হইলে “দো-রস” দেখাইয়া থাকে। তাহার নিজের অশ্বেরও একটা রস আছে এবং তাহার তারতম্য হয় তাহার অশ্বের উত্তানের তারতম্যমুদ্রারে।

(৩) সে অবিরত কিছু-না-কিছু জলীয় ত্রব্য পান করিতে চাহিতেছে এবং তাহার শরীরেরও রক্ত-রূপ জলীয় ত্রব্য রহিয়াছে। তাহার অশ্বেরও একটা রূপ আছে এবং সেই রূপের তারতম্য হয় রক্তের তারতম্যমুদ্রারে।

(৪) সে অবিরত প্রকোষল অথবা বায়ুর স্পর্শ চাহিতেছে। এবং তাহার অশ্বেরও একটা স্পর্শ পাওয়া যায়। ঐতল বায়ুতে থাকিলে তাহার স্পর্শ শীতল এবং উষ্ণ বায়ুতে থাকিলে তাহার স্পর্শও উষ্ণ হয়।

(৫) সে অবিরত কথা কহিতে অথবা শব্দ করিতে চাহে। নিজের সম্বন্ধেও তাহার শব্দের বিরতি নাই। কারণ তখনও নিশ্বাসের শব্দ শুনা যায়। সূত্বার পূর্ণ হুহুত পথ্য তাহার নিশ্বাসের শব্দ তনিতে পাওয়া যায়। শব্দের বিরতিতে তাহার সূত্বা। অথচ তাহার অশ্বের কোথায়ও শব্দের অস্তিত্ব দেখা যায় না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, “জিহ্বা”র শব্দ রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সেহে বেরূপ পদ্ধ, রূপ, রস এবং স্পর্শ পাওয়া যায়, সেই-রূপ জিহ্বা না বড়ানিলে জিহ্বার উপর কি “শব্দ” পাওয়া যায়? জিহ্বা হেমন করিলে সর্বদা শব্দের উদ্ভব হয় না। অশ্বের কোন কাণ্ড না হইলেও বেরূপ মাহুষের সেহে পদ্ধ, রূপ, রস এবং স্পর্শ পাওয়া যায়, জিহ্বার কোন কাণ্ড না হইলে সেই-রূপ শব্দ পাওয়া যায় না এবং এই শব্দের তারতম্যই বা হয় কেন তাহা বুঝা যায় না। কবেই “শব্দ” একটি কাণ্ড মাত্র, তাহা গুণ নহে। বাঁহায়া

“নন্দ”কে গুণ বর্ণনা মনে করেন তাহার্য্য ভ্রাতৃ।
অন্যদের ভ্রাতৃগণের বর্ণনের ভাষাভাষ-
বিশেষ মতো। কেহ কেহ নন্দকে না বৃত্তি গুণ
বর্ণনা মনে করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন বর্ণনের
কোন মূল হয়ে নন্দকে গুণ বলা হয় নাই।

মাত্ৰের দৃষ্ট কিছু কাব্য এবং গুণ দেখিতে পাওয়া যায়
এহা উপর্যুক্ত পাচটি কথায় প্রকাশ করিতে পারা যায়।
কাবেই বর্ণিত হইবে, মাত্ৰের কাব্য পাচটি, কথা, পদ লগ্না,
রস লগ্না, অম্বু গ্রহণ করা, স্পর্শ করা এবং শব্দ করা।
তাহার গুণ চারিটি, কথা, পদমানতা, রসমানতা, রূপমানতা
এবং স্পর্শমানতা।

আরও দেখা যাইতেছে যে, মাত্ৰের বস্তু ও মাত্ৰের
রস তাহার পদমানতা এবং তাহার নিজের পদমানতা আছে
বলিয়াই সে গ্রন্থক চাহিয়া থাকে। বস্তু ও মাত্ৰকে যদি ক্রিতি
নাম দেওয়া হয়, তাহা হইলে বর্ণিত হয় যে, মাত্ৰের ক্রিতি
নামক একটা উপাদান আছে এবং তাহার গুণ পদমানতা এবং
তাহার কথা পদ লগ্না।

এইরূপে আরও দেখা যাইতে পারে যে—মাত্ৰের বস্তু
অথবা ত্রেম নামক একটা উপাদান আছে, তাহার গুণ রস-
মানতা এবং কথা রস গ্রহণ করা। তাহার নিজের রসমানতা
আছে বলিয়াই সে অস্ত্র রস গ্রহণ করিতে পারে।

অম্বু নামক আর একটা উপাদান আছে। তাহার গুণ
রূপমানতা এবং কথা অম্বু গ্রহণ করা। তাহার নিজের রূপ-
মানতা আছে বলিয়াই সে অস্ত্র রূপ গ্রহণ করিতে পারে।

বায়ু তাহার রূপ উপাদান। বায়ুর গুণ স্পর্শমানতা
এবং কথা স্পর্শ গ্রহণ করা। তাহার নিজের স্পর্শমানতা
আছে বলিয়াই সে পিতৃ-প্রিয়তম হইয়া থাকে।

চিহ্নিতঃ পদ্য কল্পন যে, স্পর্শাদি চারি প্রেয়স গুণ
বস্তুতঃ যে চারি প্রেয়স কাব্য মাত্ৰ বর্ণনা থাকে এবং ঐ চারি
প্রেয়স গুণ ও কাব্য যে তাহার বায়ু প্রকৃতি উপাদানের রস
তাহা জানা হইল বটে, কিন্তু মাত্ৰের শব্দ-কাব্য যে কি হইতে
উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা জানা হইল না।

নিম্নক বায়ু হইতে শব্দের উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি
নিম্নক বায়ু হইতে শব্দের উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে পিতৃ পিতৃ

যোজনবাসী উদ্ভুক্ত প্রাণের এক শব্দ হইতে অপর শব্দের
শব্দ স্পষ্টতঃ প্রবণ করা সম্ভব হইত, কিন্তু কাব্যাতঃ পিতৃ পিতৃ
যোজনবাসী উদ্ভুক্ত প্রাণের তৎপরে কথা, তিনি চারি
মাত্ৰ গুণের নীতির এক পার হইতে অপর পারের শব্দ
করা যায় বটে, কিন্তু স্পষ্টতঃ শুনা যায় না। কাবেই বায়ুকে
শব্দের কারণ বলা যায় না, অথচ স্পষ্টতঃ ভাবে বস্তু বায়ুর মধ্যে
শব্দের গতি পরিলক্ষিত হয়, তখন বৃত্তিতে হইবে, নিম্নক বায়ু
শব্দের কারণ নহে বটে, কিন্তু বায়ুর মধ্যে শব্দের কারণ বিস্ত-
মান আছে। “অম্বু”ও শব্দের কারণ হইতে পারে না, “অম্বু” যদি
শব্দের কারণ হইত, তাহা হইলে অম্বুর মধ্যে নির্ভজিত হইলে
পিতৃ পিতৃ যোজন ব্যবধানেও স্পষ্টতঃ শব্দের আদান-প্রদান
সম্ভব হইত। কিন্তু কাব্যাতঃ তাহা হয় না। অম্বুর মধ্যে স্পষ্টতঃ
শব্দের আদান-প্রদান সম্ভব না হইলেও স্পষ্টতঃ শব্দের গতিবিধি
পরিলক্ষিত হয়। ইহা হইতে বৃত্তিতে হইবে যে, নিম্নক অম্বু
শব্দের কারণ নহে বটে, কিন্তু অম্বুর মধ্যে শব্দের কারণ
বিস্তিত আছে।

এইরূপে নিম্নক বস্তু অথবা নিম্নক ক্রিতিও যে শব্দের
কারণ নহে অথচ তাহাদের মধ্যে শব্দের কারণ যে বিস্তিত
আছে, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

কাবেই দেখা যাইতেছে যে, শব্দের কারণ ক্রিতি, বস্তু,
অম্বু, বায়ু বাতীর অপর কিছু এবং শব্দের বিনি কারণ তিনি
নিষ্ঠা এবং বায়ু, অম্বু, বস্তু ও ক্রিতির সহিত সঙ্গীত বিস্তিত
রহিয়াছেন।

চর্য্যচর সমস্ত জীবের উপাদানেই বায়ু, অম্বু, বস্তু এবং
ক্রিতি রহিয়াছে। কাবেই শব্দের কারণ তিনি, তিনি চর্য্যচর
সমস্ত জীবের মধ্যেই আছেন, ইহা বলা যাইতে পারে।

সমস্ত জীব-মহাবিশ্ব এই নিষ্ঠার নাম “বোয়াম” এবং
“বোয়াম”ই শব্দের কারণ।

“অম্বুতুক” বায়ুর ঐক্য-বিজ্ঞান হইতে তাহার স্পর্শাত্মক
হয় তাহার নাম “বোয়াম”—ইহা বোয়াম শব্দের সমস্ত কারণ।

বোয়াম না হইলে যে কোন জীবের রক্ষা সাধিত হয় না,
তাচার প্রাণ জীবের অস্থানিহিত “শব্দ”। আশেই বলিয়াছি,
যে যুদ্ধে শব্দের বিধিত সেই যুদ্ধে জীবের মৃত্যু। “বোয়াম”
বস্তু শব্দের কারণ, তখন বোয়ামের অভাবে হইলে জীবের মৃত্যু
হয় ইহা বলা যাইতে পারে।

যেই পরিমাণে 'নিঃশব্দ' বোঝাবুঝি হইবে তাই মোহাৎ হইয়া থাকে এবং লক্ষ্য সাধন সাধন করিতে সক্ষম হয়। ইহার চক্ষু নিঃশব্দ বোঝার অপর নাম "শিব"।

যৌর পরীক্ষাভাষ্যের এবং লক্ষ্যকটক বাবুওয়ে নিঃশব্দ "বোম"র মাত্রায় কৃষ্টি সাধন করিতে পারিলে তাঁদের সঙ্গতি অক্ষয় দৃষ্টান্ত হইতে পারে। তাহারই চক্ষু ভাবভার কৃষ্টি-গণ তাঁদের সম্মানগণের নিত্য শিক-পুষ্কার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং "নিঃশব্দ বোম"ই যে "শিব", তাহা স্বতঃপক্ষে ভাগ্যভর্য্য গ্রাণিয়ার চক্ষু "শিব"-পুষ্কতে "বোম", "বোম"-ধ্বনির ব্যবস্থা।

বৈকল্পিকের কাছে ঈশ্বরের আর এক নাম "নীলমণি"। এই "বোম"ই সেই "নীলমণি"। তাহারও রূপ "নীল"।

যে বিজ্ঞান সত্যভার নিঃশব্দ "বোম"র লক্ষ্যকৃতি ভয়ে, তাহার নাম "ব্রহ্মবিজ্ঞান"। লক্ষ্যকৃতি অর্থমুদার "ব্রহ্ম" শব্দের অর্থ "অন্তর তেজ" এবং "বোম" লক্ষ্যকৃতি। "ব্রহ্ম" শব্দের মধ্যে আছে "ব", "র", "ত", "ম"। "ব" শব্দের অর্থ "অন্তর হইতে উৎপন্ন"। "র" শব্দের অর্থ "তেজ"। "ত" শব্দের অর্থ "বোম হইতে উৎপন্ন"। "ম" শব্দের অর্থ "লক্ষ্যকৃতি"।

"উত্তর-নীলমণি" অথবা "বোম" অধ্যয়ন করিতে পারিলে "ব্রহ্মবিজ্ঞান" লক্ষ্য করিতে পারা যায় এবং অন্তর তেজ ও বোম লক্ষ্যকৃতি কি করিয়া লক্ষ্য করিতে হয় তাহা জানা যায়।

পাঠক, আমরা কি বলিয়ায় তাহা লক্ষ্য করিবেন। আমাদের কথামুদার বোম-বর্ণন "অন্তর তেজ" শব্দের কথা অর্থাৎ চল হইতে কি করিয়া সত্ত সত্ত তেজ উৎপন্ন করা যায় এবং তাহার বহুল প্রবেশ কিরূপে হইতে পারে তাহার বর্ণনা আছে।

আকাশপথে তেজ-চালিত বান বাহ্যার করিলে যেগুলি ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া কোন স্থানে অনাবৃত্তি এবং কোন স্থানে অতি-বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

স্থল-পথে তেজচালিত বান বাহ্যার করিলে জ্বীর অধর অধর বশস্ত জ্বীর মধ্যে অতিব্রহ্ম তেজের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতে জ্বীর উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হয়। অধিকত

হাওয়ার তেজ-পদার্থের মাধ্যমে বহিত হইলে সত্ত প্রকৃতি তাঁদের অক্ষয়তা এবং অক্ষয়কৃতি অনিবার্য।

তাঁই আমাদের কৃষ্টিগণ অস্তিত্ব পক্ষে সত্ত হাতার বসন্ত আগে চল হইতে তেজ উৎপন্ন করিয়া কি উপায়ে চলপথে স্তম্ভগতি-বানের চালনা করিতে হয় তাহার আলোচনা করিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শন ও বেদের সত্ত কথা আমরা এখনও পরিচয় হইতে পারি নাই। তাহার সত্যক যে অংশ যাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি তাহাও সম্পূর্ণরূপে আমাদের পাঠক-বিশ্বকে বলিতে তরসা হয় না, কারণ বর্তমান ভগতে মানুষের গ্রন্থ-কষ্ট বৈকল্পিক অধর চলিতেছে, তাহাতে মানুষকে যে এক-বারে গ্রন্থবীন করা যায় তাহাতে পারে এবং তাহার উপায় যে ভারতীয় কৃষ্টি বর্তমান ভগতের অপরিস্রুত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি-পূর্ণ কথার বহু সম্বল বসন্ত পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রাণিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবেন কি ?

আমরা "বোম"কে "ঈশ্বর" বলিয়ায় বলিয়া আপনারা সন্তুষ্ট হইতেছেন ? আমরা কৃষ্টিগণের কথা বৈকল্পিক বুঝিয়াছি তাহা বুদ্ধিপূর্ণ মনে হওয়ার আপনাদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া। একটা প্রকাশ কিছু হুল না হইলে কৃষ্টিগণের রচিত সোনার ভারতের এই অবস্থা হইত না, তাহা আপনারা সন্তুষ্ট হইতেছেন কি ?

আমাদের সকলেরই ধারণা "ঈশ্বর" আকাশপথের সত্ত, অথবা "বায়ুর বাহা"। অথচ আমরা তাহার সম্বন্ধে কতক-গুলি কথাই মাত্র বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। সেই সত্ত কথা হইতে তিনি কোথায় কিরূপে আছেন, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। বিনি আমাদের সত্ত, আমাদের গ্রন্থ-গ্রন্থের কষ্ট, তাহার অতিব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে না পারিলে আমাদের জীবন বিষয় হওয়া অস্বাভাবিক কি ? বর্তমান ভগতে যে ঈশ্বরের অতিব্রহ্ম সম্মুখে এত অবিস্মারী গোপের উত্তর হইয়াছে, তাহার কারণ কি তাহার অতিব্রহ্ম কোথায় তৎসত্ত্বীয় জ্ঞানের অভাব নহে ?

কাজেই আমাদের কথার সন্তুষ্ট না হইয়া আমরা কি বলিয়াছি এবং বলিতে চাহিতেছি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন।

বস্তুর বৈকল্পিক বীজ, বস্তু এবং স্থল এই তিনটা আকার

আছে, সংস্কৃত ভাষারও ঐক্য তিনটী আকার আছে। সংস্কৃত ভাষার বীজাকারের উপর দ্ব্যাকার প্রতিষ্ঠিত এবং দ্ব্যাকারের উপর ত্র্যাকার প্রতিষ্ঠিত। এই ভাষার বীজাকার না দৃষ্টিতে পারিলে দ্ব্যাকার বুঝা যায় না এবং দ্ব্যাকার বুঝিতে না পারিলে ত্র্যাকার বুঝা যায় না। সেই ভাষার বীজাকারের ও দ্ব্যাকারের সহায়তায় লিখিত, বর্ণনগুলি দ্ব্যাকারের সহায়তায় লিখিত এবং পুথ্য ও সংহিতাগুলি ত্র্যাকারের সহায়তায় লিখিত।

বর্ধমানে যে ব্যাকরণগুলি সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বলিয়া প্রচলিত, তাহাদের প্রত্যেক পানিতে ভাষার বীজাকার ও দ্ব্যাকারের আলোচনা উপেক্ষিত হইয়াছে। ঐ আলোচনা আছে একমাত্র অষ্টাধ্যায়ী পানিনিতে। ভূর্ভাগ্যক্রমে এখন আর কেহ অষ্টাধ্যায়ী পানিনি বধ্যবন বৃত্তিতে পারেন না। তাহা একটা কাল্পনিক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

কোনই আশ্রয়ের বেষ ও বর্ণনের প্রকৃত অর্থ বর্ধমান ভাষার অপরিজ্ঞাত।

যদি কখনও বেষ ও বর্ণন বধ্যবন অর্থে আবার প্রচলিত হয়, তাহা হইলে আপনারা আমাদিগের কথার সার্থকতা বৃত্তিতে পারিবেন।

পাশ্চাত্য বাণনিকগণের মধ্যে ঐহারা আত্ম (soul) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের ভিতর স্টোটা, এপিক্টেটাস, ডেকার্ট, লুক, লিভনিজ, স্পিনোজা এবং হিউমের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কথাগুলি প্রায়শঃ কথার কথা। তাহাদের কথাগুলি “ইহাপানী”র মত বৃথক করিয়া রাখা যায় বটে এবং পাণ্ডিত্যবিশ্বাসও গোপন করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু কাহারাও কথা হইতে ‘আত্মা’ যে কি বস্তু তাহা বুঝা যায় না।

ঐহারা “বোমের” প্রতিশব্দ ইংরাজী “ইথার” বলিয়া মনে করেন তাহারাও ভ্রান্ত। “বোম” বিস্ময় আর “ইথার” সত্ত্ব প্রভা। ঐহারা “বোমের” কথা বলিয়াছেন, সেই কথিণ নীলাকাশ পর্যন্ত বায়ুওল তর-তর করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন এবং কি করিয়া নীলাকাশ পর্যন্ত তর-তর করিয়া অস্ত্রাণ্ড ধাবে দেখা সম্ভব তাহা লিখিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আর ঐহারা ইথারের কথা বলেন, তাহারা এখনও পর্যন্ত ২৮০০০ ফুট উচ্চ আবেগন করিতে পারেন নাই।

আধ্যাত্মিক সাহিত্য

সংজ্ঞা

আধ্যাত্মিক সাহিত্য বলিতে বৃত্তিতে হইলে সেট সাহিত্য, যে সাহিত্য হইতে ভগবতের সমস্ত বস্তু উপাধান কি, ‘তবু কি এবং কালসামর্থ্য কি তাহা বৃত্তিতে পারা যায়।

যে সাহিত্য হইতে সমস্ত বস্তু উপাধান, ‘তবু এবং কথ-বক্তি কি তাহা বৃত্তিতে পারা যায়, সেট সাহিত্য যে অতীত বিদ্যুত এবং অতীত মনন তাহা বলা বাহুল্য।

প্রকৃত আধ্যাত্মিক সাহিত্যের জ্ঞান থাকিলে কি কি বস্তু মানুষের প্রকৃত অতীত এবং উহা পাত করিতে হয় কি উপায়ে তাহা জানা যায়। আধ্যাত্মিক সাহিত্য নিতুল হইলে কোন মানুষের কোন কাণের কি উদ্বেগ হওয়া উচিত এবং কি উপায় অবগত করিলে তাহার উদ্বেগ সঙ্কল হয় তাহা অসম্ভবভাবে জানা যায় এবং তদনুসারে কার্য করিলে সাংসারিক জ্ঞান-করের দ্বািত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আর আধ্যাত্মিক সাহিত্য সম্বন্ধক হইলে তাহা হইতে যে জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাহাতে মানুষ পরলকে অস্ত্র মনে করে। সম্বন্ধক আধ্যাত্মিক সাহিত্যগ্রন্থকে কাব্য করিলে মানুষের পক্ষে পক্ষে বিধ্বস্ত হইতে হয়।

জ্ঞানী, কুজ্ঞানী এবং অজ্ঞানী

সংজ্ঞা

নিতুল আধ্যাত্মিক সাহিত্য হইতে প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং যে মানুষ নিতুল আধ্যাত্মিক সাহিত্য জ্ঞানিতে ও বৃত্তিতে পারিয়াছেন তাহাকে “জ্ঞানী” বলা গাইতে পারে।

সম্বন্ধক আধ্যাত্মিক সাহিত্য হইতে বিকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হয় এবং যিনি বিকৃত আধ্যাত্মিক সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহাকে “কুজ্ঞানী” বলা গাইতে পারে।

যিনি নিতুল অথবা সম্বন্ধক কোন আধ্যাত্মিক সাহিত্যেরই ধার ধারেন না তাহাকে “অজ্ঞানী” বলা হয়। অজ্ঞানী লোক সাধারণতঃ তাহাদের প্রাণে ধারা চাহে তাহা করিয়া থাকে।

আশ্রয়ের সাধারণ ধারণা যে কোন সাহিত্যের ধার না ধারা অপেক্ষা স্রষ্ট সাহিত্যের চর্চা বরং ভাল। ইহা সত্য নহে।

অজ্ঞান বরং ভাল, কিন্তু কুজ্ঞান অতীত ভীষণ।

কি ভাল কি মন্দ তাহা না জানা থাকিলে, কি করিলে যায়া মানুষ চায় তাহা পাওয়া গাইতে পারে, কি করিলে

- (৬) এই কালের পাত্তে নর্থবিশ্বাসী যোগেশ সংখ্যার পাত্তা এবং বর্তমানে তাহার স্থান ।
- (৭) বর্তমান কালে জগদ্বাদী অধ্যয়ন, অলম্বী, পুঁচ এবং কলহ-প্রবৃত্তি ।

ইহোৎসোগে, ভারতবর্ষের এবং চব্বতের ইতিহাসের উপ-
 যোক্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি সাময়িক বিধান করিয়া পাঠ
 করিলে বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষে একদিন প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভা-
 বইয়াছিল এবং সেই জ্ঞান সাগর অগ্নয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ।
 তাহারই ভক্ত যৌদ্ধধর্মের পূর্ণ বৈদিক ধর্ম ছাড়া আর কোন
 ধর্মের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না । ভারতবর্ষের এই
 জ্ঞান তথাকথিত পরলোক সম্বন্ধীয় নহে । উহা মানুষ কি
 উপায়ে পৃথিবীতে পৌঁছাইয়া আসিয়াছে তাহা নির্ণয় করা
 এবং বাস্তব ও সম্বন্ধীয় সহিত দীর্ঘকালীন ও দীর্ঘকালীন লাভ
 করিতে পারে তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান । ভারতবর্ষে তাৎক্ষণিক জ্ঞান
 ছিল বলিয়াই ভারতবাসীরা কোনদিন অস্ত্রের ভয় দেখে ছাড়িয়া
 অস্ত্র দেখে দাঁটতে হয় নাট এবং দেখে ভয়সামান্যত্বের মধ্যে
 অস্ত্র ও নাব্যবহার প্রাচুর্য ও সম্বন্ধী ছিল বলিয়াই কোন
 রাষ্ট্রের পরিচর্য্যে তাহারা জগৎ করেন নাট । ভারতবর্ষের
 এই আর্থিক প্রাচুর্য্যের ভয়ই বন যে ভাতি ভারতের রাজত্ব
 পাইয়াছেন, সেই ভাতি উৎসাহবাহী এবং ব্যাভিমান হইতে
 পারিয়াছেন । ভারতবর্ষের প্রকৃত জ্ঞান পূর্বকালে ইহোৎসো-
 গীষণ পদ্ধতি সর্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহারই
 ভক্ত গ্রীকগণের পূর্ণ ইহোৎসোগে কোন বিজ্ঞানমূলক
 সারোচ্চের পরিচয় পাওয়া যায় না । এই জ্ঞান সর্বতোভাবে
 পুণ্ড্র হইবার কালে ইহোৎসোগে ও বাগ্ম্যে কোনরূপ অগ্রগতি না
 হয় এবং অস্ত্রের ভয় পূর্বে ছাড়িয়া অস্ত্র দেখে না দাঁটতে হয়
 অকলঙ্ক অকলঙ্ক সঞ্চিত হইয়াছিল । তাহারই ভক্ত নবন
 শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহোৎসোগীষণ ধর্ম লইয়া কলহ এবং পুঁচ কদি-
 বার অলম্বন পাইয়াছিল এবং তাহাতে কালক্ষেপণ সত্ত্বেও তাহা
 বৈদ্যবৈদ্যন কোনরূপে নির্মোহের ভয় দেখ ও আত্মীয়-স্বজন
 ছাড়িয়া বিপদমুহুর প্রাপ্তির বিশেষে পরিচর্য্য করিতে হয় নাট
 এবং বৈদ্যবৈদ্যক শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা করিতে হয়
 নাট । ভারতবাসীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধীয়
 সংস্কার তৎকালিক ইহোৎসোগীষণের মধ্যে তখনও পর্য্যন্ত
 বিদ্যমান ছিল । এই সংস্কার বশতঃ তাহারা প্রত্যেকে দলন

শতাব্দীতে তাহারের অধ্যয়ন উপস্থিত হইলে পর, তাহান
 যোগেশের ভয়ত্বের আবির্ভাব ভক্ত উৎকর্ষ হইয়াছিলেন ।

ভারতবাসীর এই প্রকৃত জ্ঞান অগ্নয়ের সমস্ত ভাতি গ্রহণ
 করিয়াছিলেন । তাহারই ভক্ত অগ্নি, জল এবং পুঁচ-পুঁচ
 সমস্ত ভাতি বনো প্রাচুর্য্য হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ, শূদ্র এবং
 মূলমূল্যন ধর্ম্যকরণের তাহার বিশেষ প্রভাব হইয়াছিলেন
 এবং তাহারই প্রাচুর্য্যের দ্বারা ধর্ম্যগণ্যের ভক্ত যে দেশে বিদ্যা-
 ছেন, সেই দেশেই অগ্নি-জগদ্বাদি পুঁচ প্রাচুর্য্য দেখিয়াছেন ।
 ভারতবাসীর এই জ্ঞান ও তাহার বিস্তারের কালে অগ্নয়ের
 সর্বম সম্পূর্ণ শক্তি প্রতিষ্ঠিত এবং বিস্তারিত হইয়াছিল ।
 তাহারই ভক্ত ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক সময়ে কোন মুহুর
 উল্লেখ দেখা যায় না এবং যখন হয়, এই সময়ে অগ্নিতে কোন
 লোকই বন ছিল না ।

কতদিন আগে এবং কবে যে ভারতবর্ষে উপরোক্ত প্রকৃত
 জ্ঞান বিদ্যমান ছিল তাহা বর্তমান ইতিহাসের সাহায্যে বলা
 যায় না । তবে ভারতবর্ষে যে একদিন অগ্নয়ের নিত্য-
 প্রয়োজ্যের প্রকৃত জ্ঞান ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা দাঁটতে
 পারে । এমন বন এই জ্ঞান কি তাহা বলায় ভাতিতে
 পারিতে তখন তাহার সাহায্যে ভারতবাসীর এতাদৃশ উন্নতির
 সমন্বয় ছিল তাহাও নির্ণয় করিতে পারিবে ।

ইহার পর এই জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়াছিল এবং সর্বম
 নৃজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল । এই নৃজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল
 বলিয়াই মানুষ দ্বারা ভাবনামাত্র অগ্নিবিশি ভাষা করিতে
 আরম্ভ করিয়াছিল এবং অলম্বীর উদ্ভব হইয়াছিল । তাহারই
 ভক্ত মানুষ আর দ্বারা প্রাচুর্য্য চাপ চাপে সমস্ত শক্তিও পাবে
 নাট এবং নৃজ্ঞানের বন নৃতন চাপচাপের পদ্ধতি (ধর্ম)
 প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন কোন কোন মানুষ
 তাহা মান্যের সহিত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ।
 কিন্তু যৌদ্ধধর্ম অগ্নয়ের বৈদ্যন চাপ দূর করিবার কোন
 পদ গ্রহণ করিতে পারে নাট । কারণে সমস্ত মানুষ তাহা
 গ্রহণ করে নাট এবং পুঁচের বন তাহার চাপচাপের পদ্ধতি
 (ধর্ম) প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন মান্য
 কোন কোন মানুষ তাহার প্রবর্তিত পদ অবলম্বন করিয়া-
 ছিলেন । তাহাতে মানুষের নৈতিক চরিত্রের অনেক উন্নতি
 সাধিত হইয়াছিল বটে এবং এমনও পুঁচের প্রবর্তিত পদ

মহাত্মার নৈতিক চরিত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব হইতে এবং পরোক্ষভাবে মাদ্রাসের বৈদাম্বিনী জীবনের সুখ-স্বাস্থ্যকে বিধান করাও সম্ভব হয় বটে, কিন্তু পুত্রদ্বয়ের প্রদর্শিত পথ ভগ্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহাদের অগ্রাধি সংস্থানের কোন বাধ্যতা নাই। তাহাদের প্রদর্শিত পথও সকল মাদ্রাস প্রণয় করে নাই। ইংল্যান্ডে ভ্রমণ করার সময় নবী মাদ্রাসের প্রদর্শিত পথ মাদ্রাসে স্থাপিত পারিবারিক ভাষ্ক ও অনেক অংশে পরিণত হইয়াছিল। তাহাতেও মাদ্রাসে প্রণয় করা প্রকৃত সুখ-স্বাস্থ্যকে বিধান করার অনেক উপায় আছে বটে, কিন্তু পরিত্যক্ত এবং প্রাকৃতিক মাদ্রাসের অগ্রাধি সংস্থানের কোন বাধ্যতা নাই। তাহাদের ধর্ম ভগ্নান মাদ্রাসের প্রদর্শিত পথ সকল মাদ্রাসে স্থাপিত হইয়া প্রণয় করে নাই এবং তাহা মাদ্রাসে মাদ্রাসের ভিতর নবন পড়াশোনা পদ্ধতি যেরূপ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিল।

ভারতীয় জীবন প্রকৃত জ্ঞানোন্মত্ত পথের সংগঠনের ফলে নবন পড়াশোনা পদ্ধতিও ভগ্ন হইয়াছে। অগ্র-সংস্থানের বাধ্যতা ছিল, কিন্তু এই জ্ঞান বিকৃত হইয়া যাওয়ার অগ্র-সংস্থানের বাধ্যতাও বিকৃত হইয়াছিল এবং নবন পড়াশোনা পর পরেরই অগ্রসংস্থানের বাধ্যতাও ভ্রমণ একটা আকর্ষণীয় উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদেরই ভ্রমণ নবন পড়াশোনাতে বর্ধিত হইয়া বৃদ্ধি-কল্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং মাদ্রাসে কি করিয়া অগ্র-সংস্থানের বাধ্যতা হইতে পারে তাহার বাধ্যতা ব্যতীত আন্তরিকতা করিয়াছিল। ইংল্যান্ডের ভ্রমণ পরিত্যক্ত হইয়া এবং বৈদেশিক বাণিজ্যপ্রদায়ের চেষ্টা অগ্রসংস্থানের বাধ্যতাও ভ্রমণ আকর্ষণীয় পদ্ধতি।

এই সময় ভারতবর্ষে অনেক ঠিক অভাব হয় নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়ও বর্ধিত অবনতি ঘটাইয়াছিল। তাহার পদ্ধতির ভারতীয় পদ্ধতিগণের মধ্যে বিবাহ-বিবাহ। 'মাতা' ও 'পিতা' প্রভৃতি পদ্ধতিগণই এখন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য করিতেন।

ভারতীয় জীবন প্রকৃত জ্ঞান যে তখন হইতেই বিকৃতভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ—তখন হইতেই ভারতীয় দর্শন ও যেরূপে অর্থ বাধ্যতা হইয়া আসিতেছে, তৎসময়ে এই প্রণয়ন মতো আর কোনো উন্নয়ন-সাধনের উপায়, পরিত্যক্ত উপায় অথবা মাদ্রাসে বৈদাম্বিনী জীবনের সুখ-

স্বাস্থ্যকে বিধানের উপায় পুঁজি পাওয়া যায় না; তাৎকালিক আচাৰ্য্য ও ভ্রম প্রভৃতি পদ্ধতিগণ উদাহরণ মতো কেবল অগ্র-সংস্থান পরিকল্পনা করাই (Methaphysics) মৌলিক পদ্ধতিগণ এবং দর্শন ও যেরূপে বর্ধিত করাই যে প্রকৃতকি অর্থ, অর্থ অর্থাৎ কোন-সংস্থা অথবা শুধু অর্থ-কর্ম পুঁজি, তাহা অগ্র-সংস্থান নিশ্চিতকি হয় নাই। মাদ্রাসা-পথে বর্তমান উদাহরণ বাধ্যতামূলক আচরণের পথে পথিত হইয়াছে। ইংল্যান্ডে ভাষ্ক-জীবন বিকৃত পদ্ধতিগণ তাহার পদ্ধতি নির্ভর মাদ্রাসার বিকৃত অর্থ। প্রত্যেক ভাষ্ক-পথে পুঁজি ছিলেন, অর্থ উন্নয়ন ভাষ্ক-পথে একই-প্রকৃতি যে বাধ্যতা করিয়াছেন, তৎসময়ে একই প্রকৃতি বর্তমান-বিশ্ব মাদ্রাসে বিকৃত পুঁজি প্রকৃতিগণ হইয়া আসিতেছে এবং কোন বাধ্যতাই অগ্র-সংস্থান, অগ্র-সংস্থান নির্ভর এবং কোন বাধ্যতাই প্রণয় পদ্ধতিগণ কোন-সংস্থা, অর্থ কোন-সংস্থা অর্থ কোন-কর্ম পুঁজি, তাহা পুঁজি উদাহরণ মতো। ভাষ্ক-জীবন যে বিকৃত পদ্ধতিগণ, তাহার অগ্র-সংস্থান পদ্ধতি নূতন নূতন ব্যাকরণের উদাহরণ। যদি ভাষ্ক-জীবনেরই বিকৃতি না হইত, তাহা হইলে অগ্র-সংস্থান কাল হইতে একমাত্র যে ব্যাকরণ ভাষ্ক পুঁজির সংস্থান করিয়া আসিতেছিল, সেই অগ্র-সংস্থান পুঁজির ব্যাকরণকে পদ্ধতিগণ করিয়া তাহাকে নূতন করিয়া মাদ্রাসার অর্থ বাধ্যতা ব্যাকরণ প্রণয়ন কি প্রণয়ন হইতে পারে?

তাহা হইলে মতো হইতেছে যে, অগ্র-সংস্থান কাল প্রকৃত জ্ঞান ভগ্ন হইয়াছিল এবং সেই জ্ঞানের উদ্বাহন হইয়াছিল মতো-সংস্থান ভারতীয় জীবন বিকৃত হইতে এবং তাহা যে মাদ্রাস ভগ্নের সমস্ত মাদ্রাসের বৈদাম্বিনী অগ্রাধি প্রণয়-স্বাস্থ্যের বিধান করিতে পারিয়াছিল ইহা মনে করার কারণ আছে।

ভগ্নের 'মাদ্রাস' উদ্বাহন হইয়াছিল বৃদ্ধি-কল্যে প্রণয় করিয়া কয়েক শত বৎসর পূর্বে এবং তাহার পূর্ণ প্রণয় চলিয়াছিল পুঁজি নবন অর্থ বাধ্যতা পড়াশোনা।

নবন অর্থ বাধ্যতা পড়াশোনা পর হইতে ভগ্নের 'মাদ্রাস' প্রণয় মৌলিক দিগন্তে এবং তাহা চলিয়াছে পদ্ধতিগণ অর্থ বাধ্যতা পড়াশোনা পদ্ধতি। এই সময় ইংল্যান্ড-পদ্ধতিগণ জীবন তাৎকালিক তাহারও উপর মৌলিক পদ্ধতিগণ পুঁজি পুঁজি এবং নিজ নিজ বৃদ্ধি অর্থ-পথে ভগ্ন পরিত্যক্ত করিয়া অগ্রাধি

নিভা-প্রহেলানীর বস্তু উপাধ্বন্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তখনই যে ইংরেজেরে বাস্তবজ্ঞাত্বপত্রির অন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাহা মনে করিবার কারণ আছে। তখনও ইংরেজেরে আভাষ দ্বিধা, দ্বিভাষ্য, ম্যালমশ গুপ্তিত অর্থনৈতিকগণের আবির্ভাব হয় নাই, কলোয় শিক্ষাবিধি প্রচাৰিত হয় নাই, খনি হইতে কয়লা ও শৌহ প্রভৃতি বাতু উৎপিত করিয়া তাহার বহুল চোচের উদ্ভব তখনও এত অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হই নাই, বাশ ও বিড়াল প্রভৃতি তেজ-পদার্থের ব্যবহার তখনও মাত্র এক অধিক পরিমাণে করিতে আশ্রয় করে নাই। কিন্তু এই সময়ে কোন তথ্যাকথিত পত্রিও হয় নাই। সন্নিহিত বৃত্তি অল্পমাত্র চিনিয়ার কলে ইংরেজের সন্তান ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাত্‌কালিক জগতের সমস্ত যেনের মধ্যে প্রোদিত লাভ ওসিত পারিষাছিল এবং বৈদ্যিক জীবনে আবার অশেষকৃত শূণ্য-বাক্যের উদ্ভব হইয়াছিল।

আমাদের সংজ্ঞায় প্রকৃত অর্থাত্‌ তথ্যাকথিত পত্রি-গণের কোন কথা না সন্নিহিত বৃত্তি অল্পমাত্র চিনিলে মাত্র “অজ্ঞানী” এর তাহা আমরা আপোই বলিষাছি। এবং তৎকালে ইংরেজীপীতাপ বস্তু শতাব্দী হইতে যোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত “অজ্ঞানী” ছিলেন। সন্তান ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহাদের উদ্ভিতও হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তব জ্ঞানের অভাব বশতঃ এই উদ্ভিত কি করিয়া দ্বিধা করিতে হয় তাহা তাহারা জানিতে পারেন নাই এবং মাত্রের জীবিকা প্রকৃত উপাধ্য কি এবং উহা লাভ করিবার বিধি কি তাহা তাহারা বৃত্তিতে পারেন নাই।

এই সময়ে ভারতবর্ষেও অজ্ঞানের প্রভাব দেখা যায়। তাহাবাদীও প্রাচীন ধর্ম, পুণ্য ও সংহিতাক্রিতে সম্বৃত্ত থাকিতে পারেন নাই। তৈত্তির্যেব প্রবৃত্তি ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা, নব্য-জ্ঞান, নূতন নূতন উপ-পুণ্য, নব্য-জ্ঞান তাহার পরিচয়। তাহাবাদীরা অজ্ঞান হইবার পূর্বেও হয় নাই এবং এই সময়েও হয় নাই। মূলমানে রাজ্যদিগের প্রভাব একটা নূতন ভাবে সজাগতার উদ্ভব হইয়াছিল।

প্রকৃত জ্ঞানের অভাববশতঃ জগতের কোণাও পাত-পাতোপত্তির অর্থাত্‌ জমীর উন্নয়নপত্রির উদ্ভিত বিধান করিবার চেষ্টা এই সময়ে হয় নাই। বরং সর্বত্রই জমীর উন্নয়নপত্রি ও পাত-পাতোপত্তির পরিচয় করিয়া আসিতে-ছিল।

ভারতীয় কবিদিগের কবিতা ‘জ্ঞান’, ‘জ্ঞান’ এবং ‘অজ্ঞান’ের বিবিধ ক্রমবিশেষে যোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ‘অজ্ঞান’ অবস্থার পর সন্তান এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমাদের পৃথিবীতে প্রকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হইবার কথা। প্রকৃত জ্ঞানের মূল ভিত্তি বাস্তবতার পদার্থবস্তু এবং তৎকালে চোচলনের বিধি-প্রণয়ন। বাস্তবতা-পদার্থবস্তুের ইচ্ছার উদ্ভব যে যোড়শ শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও চিত্র বর্তমান বিজ্ঞান।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের বাস্তবতা-পদার্থবস্তুের ইচ্ছা যে চেষ্টাছে তাহা নিম্নেরে বলা বাইতে পারে। বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ তাহারাও থাকেন যে, তাহাদের বিজ্ঞান বাস্তবতা-প্রকৃত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের এখন পর্যন্ত বাস্তবতা দেখিবার ইচ্ছা পর্যাপ্ত হইয়াছে, এখনও যে তাহারা বস্তুর বাস্তব অর্থাত্‌ কি উপায়ে দেখিতে হয় তাহা জানিতে পারেন নাই এবং তাহার ফলে তাহারা বাহ্য বিজ্ঞান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহা আসলে বিকৃত বিজ্ঞান এবং ঐ বিকৃত বিজ্ঞানই বর্তমান জগতের অভাব ও বৈজ্ঞানিক কারণ, তাহা তাহারা অর্থাত্‌ বর্তমান জনসাধারণ বৃত্তিতে পারেন না।

তৎকালে আমাদিগকে বাস্তব জীবন দেখিবার জন্য পাচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়াছেন। তাহাদের নাম চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ঘ্র্ণ। চক্ষুর সহায়তার আমরা বস্তুর রূপ দেখিয়া থাকি, কর্ণের সহায়তার আমরা শব্দ অর্থাত্‌ কথা শুনিয়া থাকি, প্রচলিত ধারণানুসারে নাসিকার সহায়তার আমরা গন্ধ শইয়া থাকি ও জিহ্বার সহায়তার আমরা রস গ্রহণ করিয়া থাকি এবং ঘ্র্ণের সহায়তার আমরা স্পর্শগ্রহণ করিয়া থাকি।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক তাহারা পদার্থবিদ্যায় কোন মূল বস্তুর গুণ অর্থাত্‌ কর্ণপত্রি দেখিবার জন্য চক্ষুর ব্যবহার করিতে পারেন না, কারণ অতি মূল বস্তু দেখিতে হইলে চক্ষুর যে তীব্র দৃষ্টিপত্রির প্রয়োজন সেই তীব্র দৃষ্টিপত্রি তাহারা নাই। কাজেই বাহ্য চেষ্টা তাহাকে অপরীক্ষণ বস্তু ব্যবহার করিতে হয়। অপরীক্ষণ বস্তু ব্যবহার করিলে প্রকৃত জ্ঞান বস্তুকে যে বস্তু করিয়া লওয়া হয়, ক্ষুদ্র গুণ ও কর্ণপত্রিকে যে বস্তু করিয়া লওয়া হয় এবং তাহাতে যে মূল বস্তুকে দেখা যায় তাহা অল্প রকম করিয়া দেখা হয় এবং তাহার ফলে যে উপলব্ধি লাভ হয়, তাহা যে প্রকৃত মূল বস্তু লক্ষ্য

উপলব্ধি হইল না এবং তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান যে ভ্রমাত্মক হইয়া গেল, তাহা তাঁহারা চিন্তা করেন না।

দুরবীক্ষণ বস্তুর সাহায্যে কোন বস্তু দেখিয়া তাঁহারা যে সমস্ত উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাও ঐ রূপে ভ্রমাত্মক হইয়া যায়।

অণুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণের সাহায্যে কোন বস্তু দেখিতে চেষ্টা করিলে তদনুসঙ্গ একটা কিছু দেখা হয় তাহা সত্য, কিন্তু ঐকি ঐকি সেই বস্তুটিকে যে দেখা হয় না তাহা অসত্য বা কণা যায় না। অতঃপর একটা তিনিশ দেখিলে যে সমস্ত সত্যকে আমরা বস্তুটিকে দেখা হইল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ আছে কি?

অতঃপর বস্তু দেখিয়া ‘আমল বস্তু’ কি হইতে পারে, অথবা একটা বস্তু দেখিয়া তদনুসঙ্গ বস্তু আর কি হইতে পারে তাহার একটা অনুমান করা সম্ভব নহে, কিন্তু আমল বস্তুকে গ্রহণপূর্ণ চক্ষুর দ্বারা বর্ণাধার না দেখিতে পারিলে তৎসম্বন্ধীয় ভ্রমবহীন জ্ঞান অথবা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে ইহা আমাদের ভারতীয় ভাবের কথা। ইহারই ভিত্তি কি উপায়ে চক্ষুরাশি ইন্দ্রিয়ের শক্তি বন্ধন করিয়া তাহারিগকে বিবিধ বস্তুতে জীব শক্তিসম্পন্ন করা যায়, তাহার চিন্তা তাঁহারা করিয়াছিলেন এবং এই উপায় তাঁহারা পরিচ্রান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। বহি আহার কখনও ভারতীয় ভাবের ধর্ম ও বর্ণন বর্ণাধার অর্থে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে চক্ষুরাশি ইন্দ্রিয়কে যে বাস্তবীয় হয়ে হইতেও তাঁহা শক্তিসম্পন্ন করা যায়, তাহা ভগবৎ চান্দ্রে পরিবে।

নাহুয়ের চক্ষুরাশি ইন্দ্রিয়কে কি উপায়ে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন করিতে হয় এবং বায়ুগুণের আপাত অসত্য স্থান-গুলিকে কি করিয়া গম্যমানময়্যার করিতে হয়, তাহা পরিচ্রান্ত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা ভগবৎ সমস্ত বস্তুর “আত্মা”-সম্বন্ধে ভ্রমবহীন সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত বস্তুর “আত্মা”-সম্বন্ধে ভ্রমবহীন সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তারা ভগবৎ ব্রহ্মবাক্যধর্মের ব্যবস্থা হইয়াছিল। আর বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ ছত্রের সাহায্যে, বর্ণন ও ভ্রমণ করিয়া থাকেন বলিয়া কোন বস্তুকে বর্ণাধার দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন নাই। কোন বস্তুকে বর্ণাধার দেখিবার সামর্থ্য লাভ করেন নাই বলিয়াই বস্তুর প্রকৃত উপাধান কি, তাহার প্রকৃত গুণ কি এবং কণ্ঠশক্তিই বা কি তাহা নিহুঁশভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাহারই ভিত্তি বর্তমান বৈজ্ঞানিক কোন বস্তুর মূল কারণ কি এবং তাহার পরিণতি কি তাহা বলিতে পারেন না। কোন বস্তুর কি কারণ এবং কি

পরিণতি তাহা না জানা থাকিলে উহা নাহুয়ের ব্যবহারযোগ্য অথবা অব্যবহারযোগ্য তাহা বলা সম্ভব নহে। ইহারই ফলে বর্তমান বৈজ্ঞানিক নাহুয়ের ব্যবহারের ও আচার্যের ভিত্তি যে সমস্ত বস্তু ও ব্যবস্থা বিদ্যমান, তাহারই ব্যতিক্রম পক্ষে নাহুয়ের ধর্ম সাধন করিতেছে এবং তাহারই দ্বারা ভগবৎ বর্তমান ভগবৎস্বরের কারণ। পরন্তু তাহা প্রত্যেক মানুষ তাহারি থাকে তাহা ব্যতিক্রম নাহুয় পাঠিতে পারে, তাহার কোন ব্যবস্থা বর্তমান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পারেন নাই এবং বিকৃত বিজ্ঞানের প্রচলনে নাহুয়ের শক্তি ও শক্তি এত মত হইয়া গিয়াছে যে, সকল মানুষ কি চাহিয়া থাকে, কোন কোন তিনিশ নাহুয়ের পাঠিবার ব্যবস্থা কল্পিত হইবে, তাহা সমস্ত বর্তমান ভগবৎ কোন মানুষ পরিচ্রান্ত আছেন বলিয়া মনে করিবার কারণ বুঝি তাহা যায় না। অতঃপর এই বিকৃত ভিত্তি ভিত্তি কোন মানুষকে বোঝা যায় না।

এক শত কি দুই শত বৎসরে কোন বস্তুর সম্পূর্ণ বিজ্ঞান নিহুঁশভাবে পরিচ্রান্ত হইয়া সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিকদের যদি কোন দাবি থাকে তাহা এই যে, তাঁহারা একটা মূল বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে না বুঝিয়াও অবলম্বনক্রমে তাহা নাহুয়ের ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে মনোহর বস্তু যে পরিণতিতে বিকৃত মনে হইতে পারে তাহা তাঁহারা বুঝেন না।

কোনই দেখা যায়, প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করিবার ইচ্ছার উদ্বিগ্ন অষ্টাবদ শতাব্দীতে ত্রিকট হইয়াছে। কিন্তু মানুষ ভিত্তি পূর্ণ চলিতেছে বলিয়া প্রকৃত বিজ্ঞান এখনও বাহির হয় নাই। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করিবার ইচ্ছার উদ্বিগ্ন যে হইতেছে, তাহার অষ্টাবদ শক্তির ইগোরোপীদিগের জ্ঞানলিপিসা। বর্তমান ইগোরোপীদিগের যে জ্ঞানলিপির তত্ত্ববিদ্যে কোন সন্দেহ করা যায় না। তাঁহাদেরই প্রত্যক্ষ ফলে ভগবৎব্যবস্থা মূল্য বৈ ও বর্ণনের চর্চা আবার আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতঃপর বর্তমানে সমস্ত ভাষার বিকৃতির ভিত্তি ভারতীয় বৈ ও বর্ণন অসংলগ্ন এবং অসম্বন্ধ অর্থে চলিতেছে। কে জানে যে অষ্টাবদ আবার এই বৈ ও বর্ণন ব্যবহার অর্থে প্রচলিত হইয়া নাহুয়ের প্রকৃত বিজ্ঞান জানিবার এবং বৈশিষ্ট্য কীভাবে গ্রহণ-ব্যবস্থা বিধান করিবার ব্যবস্থা হইবে না!

প্রচলিত অষ্টাবদ, শব্দ-বিশেষ, বলায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের ভিত্তি যে বর্তমান ভগবৎব্যবস্থা ভগবৎ-আচার্যের ও অকাঙ্ক্ষিত সাধন কারণ, তাহা আমরা অস্বাভাবিক দেখাইব এবং আমাদের কি কর্তব্য তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

[ক্রমশঃ

রাশিয়ার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

—শ্রীমতীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণ সনকোৎসব প্রকাশিত গাইড বই-এ দেখিলাম, মস্কো 'ভোক' (Voks) নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে : আর্থনৈতিক সম্পর্কপূর্ণ উপদেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্টগত যোগসূত্র এবং ব্যবহার চক্র এটি প্রসিদ্ধ। আমান প্রদর্শককে বললাম, আমি তা প্রতিষ্ঠানে গেলো চাই, এর প্রিকার ১৭ ত্রুবনিকাইরি পেরেনলোক, মস্কো ৬২ (17 Trobnikovsky Perenlok, Moscow 69)। এই প্রতিষ্ঠানটি আমান প্রদর্শক জানত না, কারণ সীতিমত শৌক কবে বাড়ীটিকে আবিষ্কার করল। বাড়ীটি অবশ্য বেগান ছোট নয়—রাষ্ট্রের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। প্রদর্শক সেখানে গিয়ে বললে, আমি একজন ভাবতগামী ও আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। তরক মিনিট অপেক্ষা করার পর একজন বয়স ভুলোক এলেন—তিনি প্রোভা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। ওঁরোগোদ বিষয় তিনি ইংরেজী পূর্ব কন জানেন, কাজেই প্রদর্শকের মারফত এখানেও কথাবার্তা চালাতে হল। তখন বাকী পূর্ব সনকোৎসব ইংরেজী ও ফরাসী বলতে পারত : এত প্রশ্ন ইংরেজী বলত যে তার উচ্চারণে বিশেষ বিকৃত হবার পড়ত না।

এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'সোশিয়েট কান্ট্রার সিকিউ' নামে একটি ইংরেজী মাসিক ও 'সোশালিস্ট কনষ্ট্রাক্শন উন দি ইউ এস এস আর' (Socialist Construction in the U. S. S. R.) নামে একটি বৈদেশিক পত্র—ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। এই তিনটিতে রাশিয়ার অগ্রগমনের ও উন্নতির চিত্রিত্য আলোচিত হয়—বিশেষে প্রচারকাল চালাবার ক্ষমতা এগুলি পরিচালিত। আমাকে এগুলির ব্যয় সংখ্যা জিজ্ঞাসা উপহার দিলেন।

কথাবার্তার মাঝে আমি বললাম, "আপনারে কৃতি, শির ও সংকতি সম্বন্ধে বড়টা সন্তান আমি দেখছি, সে সব বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করব না। রাশিয়ার রাষ্ট্রতন্ত্রে কঠোরো আদ্যর কাছে এখনও রহস্যময়। গাইড বইগুলিতে পড়েছি, রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে সোভিয়েটগুলিই সর্বসম্প্রদায়, কিন্তু সোভিয়েটের কর্তব্যবহুর নামের মধ্যে আমি শুভোপা ও টোল-বের নাম খুঁজে পেলাম না; অথচ তুমি তিনি ডিক্টেটর।"

—"টোলিন কনিউনিটি পার্টি কেমারেল সেক্রেটারী"—প্রদর্শক ভদ্রমা করে ভুলোকটির কথা বোঝাতে লাগল, "কিন্তু তার ইউনিয়ানের (বাষ্টের) সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। সমস্ত রাশিয়া বিখ্যাতগতি স্বয়ংশাসিত 'ইউনিটে' (unit) বিভক্ত। এর মধ্যে নগরী ফেডারেল মেম্বর ষ্টেট (federal member state), পদবটি স্বয়ংশাসিত বিখ্যাতগতি (autonomous republics) এবং আঠারটি স্বয়ংশাসিত গ্রিকিয়ন region)। এই সব ইউনিটগুলি নিজের আতন্ত্রীয় শাসন ব্যাপারে স্বাধীন।"

—"আতন্ত্রীয় শাসন মানে—কি কি মিলে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "আতন্ত্রীয় আইনকাহন, লেখার স্বাধা, শিক্ষা, সংকতি, শির প্রভৃতি। অর্থনীতি, রাজস্বের আদ্য (financial) এবং শ্রমিক সম্বন্ধীয় সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করে এদের চলতে হয়। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি (Central Executive Committee) সব সময়েই সমস্ত আতন্ত্রীয় ব্যাপারে সর্বময় কর্তা।"

—"আতন্ত্রীয় ব্যাপার বলতে কি শৈল্প, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক সংশ্লিষ্ট উত্থাপি বোঝায়?" জিজ্ঞাসা করলাম। —"ঠ্যা, এ সব ছাড়া সেখেন দানবাচন, বৈদেশিক বাণিজ্য, বেগান ও ফেডারাসি আইনকাহন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, —এসবও কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির এলাকায়।"

—"তা হলে কেমন করে আপনারা করেন যে অতীত রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন? প্রকৃত পক্ষে আপন ব্যাপারেই তাদের হাত থাণা"—আমি বললাম।

বিস্মিত হয়ে প্রদর্শক জিজ্ঞাসা করলে—"কেন?"

—"তা ভিন্ন কি? আবাদিক কৃষী পরকার গ্রিক অতীতই অধিকারী দিতে চেয়েছে—তারা সবই আদ্যেই হাতে দিতে চায়; খলি শৈল্প, বৈদেশিক বিভাগ, নৌবিভাগ, ও টাকাকড়ির ব্যাপারটুকু নিজের আদ্যে রাখতে চায়। শ্রমিকশাসিত মেম্বর ও কৃষীশাসিত মেম্বর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উভয়েই প্রভুত্ব মান, পরাধীনদের কপালে একই

এবং। কি এক লোকের তোমাদের মত গ্রহণ করে তোমাদের অধীনতা দীক্ষার করবে ?”

—“অধীন রাষ্ট্রগুলি টান্ডা করলে কেন্দ্রীয় ইউনিয়নে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে—“প্রাথমিক বঙ্গদেশ।—“এবং কাগজ কলমে তা থাকতে পারে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। ইউনিয়ন তোমাদের এ উদারতায় বিকশিত হওয়া হবে। আরমেনিয়া, জর্জিয়া, আর্মেন বৈতান প্রভৃতি প্রদেশকে তোমরা কোর করে নিজেদের অধীনে এনেছ—“আমি পুনঃ কোর দিবে বললাম।

—“কিন্তু আমি জানেন আমরা পোলাভ, ফিনল্যান্ড, এলথোনিয়া, লিথুয়েনিয়া, ল্যাটভিয়া প্রদেশকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত করি নাই! তারা আজও পূর্ণক বিশাখিক—“প্রাথমিক নিজের পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করলেন।

আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করে বললাম—“সেকলো মোটেই কখন সরকারের উদারতায় রক্ত নয়; অবশ্যতঃ রক্ত। পোলাভ ও ফিনল্যান্ডকে নিজের স্বতন্ত্রতা করার চেষ্টা করতে রাশিয়া কবুল করে নাই, কিন্তু শক্তিতে শেষ পর্যন্ত জুলায় নাই। নিজেরের অগ্রিম বচাও রাখবার জন্য রাশিয়াকে বাধ্য হয়ে নিজেরের সীমানা থেকে ঐদল দেশকে বাস দিতে হয়েছে। নয় কি ?”

চাত্রগণিক প্রদর্শক আশ্চর্যজনকভাবে অতিক্রমে ছাত্রগণিক উপরে তুললেন—আমি তেঁকে ফেললাম। সহসা আমার স্মৃতি ফিরে এল; মনে পড়ল আমি দাভানবুর্ডের মতো পাইব রাশিয়ায় বসে কথা বলছি; তাহলে যখন বসেই তাহলে সরকার দখলে এমন তীব্র বিরোধ করা অসম্ভব, বিশদ্রবক; কিন্তু মতামতের বর্জ্যবোধ করতে সকল দেশের সকল-পন্থী সরকার সম্মত ব্যক্তি; বিশেষ রূপ সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত। আমি অল্প কথা পাড়লাম।

—“আজ্ঞা, কেন্দ্রীয় সরকারের গঠনশক্তি কি ?”—তিনি বোঝাতে লাগলেন, “কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি (Central Executive Committee)।” উক্ত ‘সোভিয়েট’ বিভক্ত। একটির নাম “সোভিয়েট অব ইউনিয়নসন” (Soviet of Unions), এটিতে বিভিন্ন ইউনিয়নে থেকে গণন ও প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। এই সোভিয়েট প্রত্যেক ইউনিয়ন

অর্থাৎ প্রদেশ নিজেরের লোকসংখ্যান অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠায় আন ‘সোভিয়েট অব জাতিগণগণ’ (Soviet of Nationalities) নামে বিভিন্ন ‘সোভিয়েট’ের মধ্যে সমস্ত প্রদেশ লোক-সংখ্যান অনুপাতে ও সমস্ত সংখ্যা-গুণিত বা গুণিত ভাতি সমানভাবে নিজেরের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে; এতে দেশব্যপী সর্বপ্রকারের স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষিত হয়। রাশিয়ার ১৮৮টি ভাতিগণ ও ১৭৭টি জাতিগণ এবং কয়েকটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে। পূর্বে একবার কেশীর ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হত; তাহলে আমলে বিভিন্ন প্রদেশ তাহলে প্রাদেশিক ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতে শেত না। কিন্তু এখন প্রত্যেক ভাতি এবং উপভাতি তাহলে প্রাদেশিক ভাষা নিজে নিজে-প্রদেশের সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। পূর্বে এক প্রদেশের স্বার্থে অন্য প্রদেশের স্বার্থ বিচারে হত, এখন তা বন্ধ হয়েছে; প্রত্যেক প্রদেশকে নিজ নিজ জাতি থেকে বার নির্বাচ করতে হয়, এক প্রদেশের স্বার্থে অন্য প্রদেশ আর্থিক বাধ্যতা বোধ্য করে না।”

রাষ্ট্রপঠন-ব্যবস্থা বৃকলাম, এবং কনিটনিট মলের কথা কেবলই মনে মনে ফিরতে লাগল; পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “টোলিন কে ? কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি ?”

—“কোন সম্পর্ক নাই—”

—“তবে তাঁকে ডিক্টেটর বলা হয় কেন ?”—জিজ্ঞাসা করলাম, বৃত্ত মধ্যে তখনই প্রদর্শক বললেন—“কারণ তিনি ডিক্টেটর।”

—“তা হলে এই সব সোভিয়েট ও বিভিন্ন সোভিয়েট প্রভৃতি বাড়ি করে যেখানে লাভ কি ? যে সোভিয়েট সঙ্গে সার্বভৌম কার্যকরী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনো যোগ নাই, যে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত নয়, এমন কোন লোক যদি তোমাদের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের মনে হইত তবে একে জনসাধারণের শাসন কেমন করে বলবে ? আজ্ঞা, আইনমতঃ রাষ্ট্রের প্রকৃত নিয়ামক কে ?”

বৃহৎ ভরলোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনার পর প্রদর্শক

বললে—“কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সভাপতিই প্রকৃতপক্ষে বেপার নেতা, আর ষোল্লিান তাঁর বলের অর্থাৎ কনিউমিট পাবেন না।”

কথাটা প্রাথমিক ‘অবস্থান’ হ’ল টিট গণ’র মত করে আবার বলবার চেষ্টা করলে। সে বললে, “শেটা টিটট : কিছু কনিউমিট মল এখন রাশিয়ার সর্জনশক্তিমান চতুর্থ এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল বিভাগ কনিউমিটদের হাতে থাকার কনিউ-নিউমিটের নেতাই প্রকৃতপক্ষে দেশকে পরিচালিত করেন এবং ‘জিউটট’ নামে পরিচিত। ক্রেনলিন জুর্গেন ভিগর থেকে এই মনস্কেই বেপার রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগ খেলেন (G. I. V.) দৈত্য বিভাগ, নৌ ও বিমান বিভাগ, দেশব্যপী বিভাগ, রুবি শিল্পের উৎসর্গ পবিত্রতা পুত্রি গোয়েন্দার বিভাগগুলি পরিচালিত করেন। বেপার প্রায় সমস্ত সবকারী পথেই কনিউমিটরা নিযুক্ত, যদিও তারা বলেন যোগ্যতা থাকলে বাবা কনিউমিট নন তারাও এই সব পর পেতে পারেন। অম্ব কিছু দিন আগে ষোল্লিান একটি বন্ধুত্বের যৌবন করেছেন, নিজ-নিজ কনিউমিট বলেন না অম্ব মনে প্রাণে কনিউমিট এখন বহু লোক বেপার আছেন, কাজেই সবকারী পথে এখন লোকও নেওয়া যায়।”

আবার চোটেসমুখো তুলানকারী পদগুলি উঠলে যখন এক একে হেঁটে পেরিয়ে ফেলছিলেন তখন প্রাথমিককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

—“তোমাদের ব্যাংকে টেট তিন নং কোটি ক্রবল খার মিছেছে। এই খাব কে বলে ও কি জুয়ে মিছেছে?”

—“কনসাধারণত এটা টাকা হেঁটকে খাব মিছেছে এবং তাগা মূল পাথ। তুমি চানছ কেন? তুমি বৃষ্টি ভাবছ রাষ্ট্র আবার একটা ধনী সম্প্রদায় গড়েছে? না তা নয়। ওদিকে পুর চড়া গার আর্থক ও উত্তরাধিকারকর (inheritance tax) দিতে হয়—প্রাথমিক ওজনালি করলে।

—“যদি বহু, তোমাদের রাষ্ট্র এখন কতকগুলি লোক তৈরী করছে, বাগা বিনামূল্যে তাদের সঙ্কিত অর্থ থেকে কিছু না কিছু আর্থ ভোগ করে। বাড়ীর আমদান-পত্র, জামা-কাপড় ও তৈরীকরণের মত এই সব জগৎসত্ত্বগুলিও ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এইটাই ত তোমাদের পরাজয়ের মূল

গোধান। ধনোৎপাদনের ব্যক্তিগত পথ লোপ করাই শোভা-লিভের মূল স্বয়, কিন্তু তোমরা তা পার নি।”

—“কিন্তু রাষ্ট্রের বিখাল পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টে তার বিশূল অর্থের প্রয়োজন। তবে রাষ্ট্র একজনকে কাছ থেকে বেঁধে টাকা খাব নেব না, কাজেই একজনকে বেঁধে স্বয় পানার আশা নাই; তুমি ত জান এখন রাষ্ট্র ব্যক্তিগত ব্যবসার প্রতি তার মনোভাবের কিছু পরিবর্তন করেছে”—সে বললে।

আমি তবে অম্ব একটি হট-এ দেখেছিলাম যে, রাশিয়ার চতুর্থ জন প্রাণের সব জগৎসত্ত্ব সংখ্যা চার কোটি ও কণের পরিমাণ তিন নং কোটি ক্রবল, কাজেই মনে হয় গাঢ়ত্বের কথা অতিরিক্ত নয়। অম্বেকের খাওয়া রাষ্ট্র এই চাবি জন গ্রহণ হবে কনসাধারণের সক্ষমত্ব আয়ুর্দায় স্বয় ও মন একত্বিত্ব হতে হবে না। জিজ্ঞাসা করলাম—“কোন বিভাগ স্বয় নেয়? কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি কি?”

—“না, কার্যকরী সমিতি শুধু শালন ব্যাংক নিয়েই থাকে। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘গোসব্যাংক’ (gosbank) এই স্বয় গ্রহণ করে”—সে বললে।

—“এই ব্যাংকেই বৃষ্টি বেপার সমস্ত ব্যক্তি: কাজ চলে?” জিজ্ঞাসা করলাম।

—“অর্থাৎ বেপার সাধারণ লোকেও এখানে টাকা মলা গ্রাণে কিনা জিজ্ঞাসা করছ?”—সে জিজ্ঞাসা করলে।

—“হ্যাঁ, শুধু সাধারণ লোক কেন? কলকারখানা, কেন্দ্রীভূত কৃষি:কর্মগুলি এবং বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির কথাও বলছি।” সে উত্তর দিলে—“সাধারণ ব্যক্তিগত হিগাব রাখে সববার ব্যাংকে (co-operative bank) এবং সোবিস ব্যাংকে (সর্বসম্মত বাট হাচার শাখা আছে) কিন্তু কলকারখানা, বানগার প্রতিষ্ঠান, বড় বড় শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রকৃতি গোসব্যাংক (gosbank) বা প্রোম ব্যাংকে (promo bank) কাছ থেকে টাকা খাব হবে ও তাদের কাছেই টাকা আমদানত গ্রাণে।”

—“প্রোমব্যাংক আবার কি?” জিজ্ঞাসা করলাম।

—“এই প্রতিষ্ঠান কোন নূতন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে প্রথম প্রতিষ্ঠান সবর বীণ বেরানো বিনা মূল্যে টাকা খার বেশ আগ গোসব্যাংক অম্ব সববার বেপারে এই সব প্রতিষ্ঠানকে সাময়িক

কণ্ঠে এবং পতকনা পাচ থেকে লাভ কণ্ঠ হইয়া আসিল
কণ্ঠ—সে বলিলে।

বিদিত হইলে খানি ভিত্তাসা কখন—“গোমবাগ
তা হলে তুমি শুধু টাকার খাতির কেন? রাষ্ট্রের একটি
প্রতিষ্ঠান টাকার দ্বারা বের করিবে না, এ কারণ কি?”
—“তুমি শুধু দায়িত্ব দিবে না; যে সব প্রতিষ্ঠান এখন
থেকে দায়িত্ব নিবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের লাভের পতকনা রাষ্ট্র
ভাণ্ডার এটী ব্যাধি দেয়; ইচ্ছা করলে এটা সব লাভই নিতে
পারে। প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের এই প্রতিষ্ঠানটি নূন্য বাসনা-
বাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠান উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি। গোমবাগ এই সব
প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয় অথবা কখনো প্রয়োজনে
বহু সময়ের জন্য কণ্ঠ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাধিরূপে অন্তর্ভুক্ত
ও বহির্ভুক্ত, সব বস্তুই শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, বন্যায়
সম্পদ, মোট প্রকৃতি এবং ভাষ্য বিভাগ পরিচালিত করে—
সে কৃষিকে বলিলে।

কাবখানাগুলির দায়িত্ব-গোমবাগের কথাই শ্রুতি লাগিল,
তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—“আমার বাসনা ছিল গোমবাগের
কাবখানাগুলো তুমি বৈদ্যের পরচর্চা দিবে কিনা লাভ
অনিক্রমিকভাবে তিনিও বলিলে; কিন্তু তুমি কাবখানার লাভের
কথা বলছ। তার পরেই এই লাভ দায়িত্ব কেন লাভ করা
হয়?”

দুই মিনিট উত্তর দিলে—“গোমবাগ জল দায়িত্ব, বহু।
বেলগে, বৈদ্যতিক কাবখানা, মোট ট্রাকটর কাবখানা
ও সবই সব শিল্পগুলি এক একটি পৃথক ‘ট্রাকটর’ অর্থাৎ
পরিচালিত হয় এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে তাদের লাভ-
লোকসানের হিসাব নিতে হয়; সব প্রতিষ্ঠানই নিজেদের
পদ্ধতির উপর লাভ দিবে বিক্রী করে। কাচামাল-
সববস্তুসমূহ প্রতিষ্ঠান নিজে উৎপাদন উপর লাভ দিবে,
সেই দায়িত্ব কাবখানাকে কাচা মাল বেচে দেও কাবখানা
আবার তার উৎপাদন উপর লাভ দিবে রাষ্ট্রের বিভিন্ন
প্রতিষ্ঠানকে বা দায়িত্বকে নিজেদের বৈদ্যিকি হিসাব দেবে।
দনতরী দেশের ক্ষেত্র ও বিস্তারিত দায়িত্ব লক্ষ্য, এখানেই
বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব সেই সম্পর্ক।”

এই সমস্ত কথা শুনে দেশের অল্পত বাবদায় দায়িত্ব তখনও
পরিচালিত হয় না। বললাম—“আমরা শুধু তুমি যে গোমবাগের
সবই তিনি কেন্দ্রীয় পরিচালনা দ্বারা পরিচালিত, সে ক্ষেত্রে
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্রভাবে কেন্দ্রীয় হয়ে চলে যুগলান না।”
সে বোঝাতে লাগিল—“সবই ট্রাকটর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান
গোমবাগ দ্বারা পরিচালিত। সমস্ত ট্রাকটর কাচা বা বৈদ্যিকি
মালের দায়িত্ব গোমবাগ নির্ভর করে দেয়; এই দায়িত্ব দি

কোনো ট্রাকটর দায়িত্ব থাকে, বৈদ্যিকি গোমবাগের কাছে তা
কিন্তুই হয়। দায়িত্ব, কাবখানা কলগুলির ট্রাকটর বেখাল যে
গোমবাগের নির্ভরিতা অল্পত দায়িত্ব-উৎপাদনকারী ট্রাকটর দায়িত্ব
দিয়ে সেলে তাদের লাভ থাকে না; এখন তারা জুগলার
ট্রাকটর সে বিক্রয় না কিনিবে গোমবাগের কাছে। গোমবাগ
পরিচালিকা কাবখানা পরিচালনা (pyatolika) বৈদ্যিকি করে
ও বিভিন্ন ট্রাকটর ডিপোকেই কাছে তাদের দায়িত্বের
পরিচালনা দায়িত্ব দেয়; তারা আবার তাদের অর্থাৎ
ক্যাঙ্কটরগুলিতে সেটি দায়িত্ব দেয়, ক্যাঙ্কটরী প্রমিতকরা
এ পরিচালনা দায়িত্ব গোমবাগ করে, প্রয়োজনে নত দায়িত্ব
করবে পুনরায় ওপরে দায়িত্ব দেয়। ট্রাকটর নিজেদের
দায়িত্ব সব পরিচালনা গোমবাগের দায়িত্ব দিবে গোমবাগ
ক্যাঙ্কটরকে তা বোঝায় করে। এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পরিচালনা
—বলিলে?”

—“এই উৎপাদন দায়িত্ব দায়িত্ব, কিন্তু যদি দেশের
বিভাগও কেন্দ্র থেকে পরিচালিত না হয়, তা হলে অল্প
দেশের দায়িত্ব প্রয়োজনীয় দায়িত্ব উৎপাদন হয়ে, দায়িত্ব
সৃষ্টি করবে”—বললাম। —“তা হইবে; কিন্তু সে দায়িত্ব
গোমবাগের কাছে। দেশের উৎপাদিত কলকরা, বিভিন্ন পদার্থ,
ও কাচামাল রাষ্ট্র পরিচালিত কাবখানাগুলি বাবদায় করে,
কোনো প্রয়োজনে অল্পত উৎপাদন পরিচালিত করা বিশেষ
করিন কিছু নয়।”

উত্তরটির সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে পড়লাম না—“তাই
আবার জিজ্ঞাসা করলাম—“এখন গোমবাগ ব্যক্তিগত
বাবদায় ছাড়পত্র দিবে, কলকরকে এখন তুমি দেশের
কিন্তুই কাচামাল স্বতন্ত্র বিক্রয় হয়, উৎপাদিত পত্ন কলকরা যে
কোন হয়ে বাতাবে বেচে পায়—এ দায়িত্ব রাষ্ট্র-পরিচালিত
উৎপাদন পরিচালনা কম বেচী হতে পারে না কি?”

হলে ব্যক্তিগত উত্তর দিলে—“দায়িত্ব আইনও কলকরা
বাতাবে নিজেদের উৎপাদন বেচে পায়, কিন্তু বাতাবে বেচলে
দেশের এই দায়িত্ব রাষ্ট্রের কল কল হইবে যে, তারা ট্রাকটর
ক্যাঙ্কটর নিজেদের পত্ন বিক্রী করত পছন্দ করে। তারা
ইচ্ছামত দায়িত্ব বেচে পায় না, রাষ্ট্রের নির্ভরিতা দায়িত্ব
বেচে বাতাবে। তাছাড়া দায়িত্ব ব্যক্তিগত বাতাবে করে—এমন কি
ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত পদার্থ, দায়িত্ব-টিকিট পায় না, ফলে
দেশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন প্রকৃতি হয়। পত্ন ছাড়া ব্যক্তিগত
বাবদায় দায়িত্ব এমন কিছু উৎপাদন হয় না দায়িত্ব কেন্দ্রীয়
পরিচালনার পরিচালনা কম বেচী হতে পারে।”

কথা কইতে কইতে মস্তক নাখা পেতে পেয়ে আমার
হোটেলেই দায়িত্ব এনে দেওয়া হয়। হোটেলেই প্রকৃতি
কিন্তুই বোঝানো দায়িত্বের দায়িত্ব দায়িত্ব দায়িত্ব দায়িত্ব।



পিঁপড়ের সমাজ

এদেশের মানাশ্রেনী

—ঐপ্রিয়েন্দ্র মিত্র

রাত্রিপূরীতে চৈত্রি পাত খোঁচে। সবাই শব্দবাক্য।
পূরীর মতোই পদ মচল পাত হয়ে চারোদল মনকান
ডোলায় একটু মতিলা। কোথেকে বাজলি বসন্ত মনে হয়।
কিছু মিস্ত্রি চির কোম সোপান, চির কোম ছাড়েব। পূরীর
সোপান উড়ে চলে ন। তবু খাতিয়া সবলে তাঁকে পদ

ধাবে অল্পবেগে বদ, কিছু কেউ একটি দাতও তুলে না।
তারে বিষয়ে তারা হতভুঁি হয়ে গেছে।

সেই দিন থেকে নতুন বাতির সত্য হল। সমস্ত
পূরীর লোক তাঁর গোলাম। প্রতিবাদের ক্ষমতা তাদের
নেই, সাহসও নয়। নতুন রাণি সন্ধান-সম্বন্ধিও বড় হয়ে
তাদের উপর প্রভুত্ব করতে লাগল। ক্রীড়া-
সাহসের মত পূরীর লোকজন তাদের চক্রে আঁচাব
সংগ্রহ করে, তাদের পাকবার বাড়ী তৈরী করে,
এমন কি তাদের সুখে স্বাধীনও তুলে দেয়।
নব্বিৎ ছেলে-মেয়েরা ঘট্টা বন্ধন বন্ধন মগ্ধা
হয়ে উঠল, তখন তাদের চক্রে বরকার হল
আগে নতুন ক্রীড়াসাহস। শাহাওয়ার
সম্মানেরও আর নিজেদের ভাগে কিছু করবেন
না!



ক্রীড়াসাহসের রক্ত 'আমাতন' পিঁপড়ের অঙ্গ ভাঙের পিঁপড়ের বিরুদ্ধে মতিবদ।

ছেড়ে দিচ্ছে। লোকজন শব্দবাক্যে লড়ে দাড়িয়েছে। এরা
নিরীহ ভাত। এট চব্বদন্ত রাজরাণিকে আটকাবার সাহস
এদের নেই।

এক এক করে সব মচল পাত হয়ে বিশেষী রাজরাণি
একবারে গিয়ে উঠলেন রাত্রিপূরীর সব চেয়ে গোপন, সবচেয়ে
পবিত্র কক্ষে—এ পূরীর রাজ-মাতার ঘাস-মহলে।

সোভা দে ঘরে ঢুকেই বিশেষী রাণি, এট পূরীর
রাজমাতার দিকে অস্বাভাব করে তাঁকে চত্যা করলেন। গরি

পাণে আর এক নিরীহ ভাতের রাজা।
ক্রীড়ামান সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার উপর চড়াও হ'ল
এই বিশেষী রাণির দলবল; নিদুরতাবে তাদের
ছত্রভঙ্গ করে লুটে নিয়ে এল তাদের সমস্ত শিত্ত-
সম্মান। এরাই বড় হয়ে এ পূরীর ক্রীড়াসাহসের অঁচাব পূরণ
করবে—

উত্তিহাসের পত্নী কাহিনীই বসতি, তবে মজবুত নয়—
পিঁপড়ের। আমাতন নামে এক মগ্ধের পিঁপড়েরা ঠিক এই
ভাবেই আর এক মগ্ধের নিরীহ পিঁপড়কে ক্রীড়ামান করে
তাদের উপর রাজত্ব করে। নিরীহ পিঁপড়েরের খাণির
আমাতন 'পাতার' রাণিও গণেশ ও হত্যাধীনা নিত্যই
বটড়ে।

তারতরবে অল্প এট ভাঙের পি'পড়ে বেটে। নিতেন জাতক জীভবাস করে রাখে এমন পি'পড়ের লতান এখনো এখানে পাওয়া যায় নি।

বিস্তৃত না গেলেও এখানে এখন অনেক অল্প ভাঙের পি'পড়ে আছে, আদ্যাদেব ফের আনাচে-কানাচে, মাঠে-খাতে নিভা দেখা দলেও থাকে বহুত আমরা জানি না।

উইপোকা ও মোমাছির মত পি'পড়ও কীটজগতের বিষয়। সমগ্র জীবনের সুশৃঙ্খলার তারা মাহুকেও ছাড়িয়ে গেছে। উইপোকায় তারা চিরন্তন শত্রু হলেও এবং সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর কীট থেকে উদ্ভূত হলেও উভয়ের সমাজের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়েই সাদৃশ্য আছে। শুধু উইপোকা ও পি'পড় নয়, কীটজগতে যারাই সমগ্রত্ব হয়ে জীবনধারণ করতে শিখেছে, তাদের সকলেরই সমাজ অনেকটা এক রকম। এ সমাজে নারীরাই প্রাধান্য। উইপোকা, মোমাছি ও পি'পড়ে, —তিন জাতীয় কীটই, রাজা নয় রাণীরই মাসন্দ করে। তাদের সমগ্র সমাজ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গঠিত। তারা সেই রাণীরই সমাজ, তাদের মধ্যে কেউ সৈনিক কেউ বা শুধু নাস। তিন জাতের রাণীই অসংখ্য ডিম প্রসব করে, রাজার লোকবল সহযোগ করে। মাসদের কাজ সেই ডিমের বহু করা, সমগ্র সমাজের ভক্ত আক্রান্ত তৈরী করা, রাণী এবং লোকের ভক্ত আহার্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি। সৈনিকদের কাজ তাদের রাজা পাহারা দেওয়া, বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সরকার হলে অপরদের রাজ্য আক্রমণ করা। কীটদের সমাজে পুরুষের স্থান অত্যন্ত নৃণ্য। সংখ্যার তারা বেশী থাকে না, তাদের কোন কাজও নেই। অকর্মণ্য বিলাসী ভগ্নে তারা পরগাছার মতই সমাজে বাস করে।

মূলতঃ কীট-সমাজের গঠন এতই রকম হলেও পরস্পরের মধ্যে বাইরের কয়েকটি পার্থক্য তাদের আছে। এক সমাজের ভিত্তিও অনেক রকম সমাজের দ্বারা দেওয়া যায়।

উই, পিপড়ে বা মোমাছি হঠাৎ একদিনে নয়, বহু যুগের বিবর্তনের ফলেই যে এ রকম সামাজিক সমগ্রত্ব জীবনের আদর্শ লাভ করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে যাহুদের চেয়ে তাদের সমাজে আরো অনেক প্রাচীন। বৈজ্ঞানিকদের মতে মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবার বহু যুগ আগেই পি'পড়েরা তাদের বর্তমান জীবন-প্রণালী আবিষ্কার

করেছিল। শত কোটি বছর আগের পি'পড়ের দেহও আশ্চর্য্য ভাবে বৈজ্ঞানিকেরা পেয়ে গেছেন। সে যুগের গাছের আটার তখনকার কোনো কোনো পি'পড়ের দেহ আটকে গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকেরা সেই 'অ্যাথার' বা প্রাচীন গাছের আটা পেয়ে তার ভিতর তখনকার পি'পড়ের দেহ পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছেন। পরীক্ষার ফলাফল দেখে, সেই যুগ অতীতের পি'পড়েরা তাদের বর্তমান বংশধরদের থেকে খুব আলাদা ছিল না।



ক্যানো-পিপড়ের দৃশ্য: বাঁশের শব্দে বা।

মাহুকের সমাজের মতো পি'পড়ের সামাজিক জীবনের নানা দ্রবের মিল আছে। মাহুকের মতই প্রথম আতর্য্য শিকারী থেকে বাহাবর বেবেগ কামবাহা-প্রণালী পার হয়ে কৃষিপ্রধান সমাজ ও তার পর আরো জটিল ও উন্নত সামাজিক প্রতিষ্ঠান তারা গড়ে তুলেছে। পৃথিবীর নানা দেশে, লতা, অর্ধ-লতা ও অসতা, নানা জীবিত জাতির ভিতর মাহুকের বিবর্তনের এই নানা ধাপের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, পি'পড়ের ভিতরও পাওয়া যায় তেমনি। পি'পড়েরা সবাই একই দ্রবের উঠে আসে নি। তাদের ভিতর অনেক জাত এখনও আবরণ শিকারীর দ্রব আছে। তারা একা একা বা সমগ্র মিলে শিকার করে ফেরে। তাদের সমগ্রত্ব জীবন নেই বললেই হয়। এই জাতীয় পি'পড়ের উইপোকার

প্রধান শক্তি। কোন কোন উইটিবির ভিতরে একবার
 প্রবেশ করলে পানির ভাঙ্গা দে কতালীলা হুৎ করে, তার
 কাছে কলিস বাঁধ অত্যাচারিত নয়না। দুঃ-সুখস্বপ্ন যবে উই-
 পোকাদের উপর এসে এই অত্যাচার যবে আসছে। উই-
 পোকাদের চিৎকার-নিশ্বাসের অশ্রুত বিজ্ঞা হলের আক্রমণের
 জিহবার তরবার প্রত্যেকের খেঁচকে যাবে উঠেছে। মানুষের
 বেশে বড় বড় হলে উই পোকাদের হুক হলে অনেক সময়ে
 দু'চোপেতে এই ভাঙার শিশুর আমদানি করা হয়।



কালো ডেমা-পিনডের বাসা।

আমাদের বাড়ী-ঘরে অত্যন্ত চটপটে কালো রঙের খুব
 ছোট এক ভাতীর পিনডকে আমরা 'হুৎ-হুৎ-পিনডে' বলি।
 এরা একদো বাগাবর বেঁচেও গুরে আছে। এসেই হাতী বহ-
 বাড়ী কিছু নেই, কেবলের ফটলে মেকের বা ছাদের কোন
 গর্ভে যেখানে দেখানো এসা আত্মনা গাড়ে। বাগার কিছু
 পেলে বতখানি সম্বল যুখে করে বাগার মিরে যাওয়াই এদের
 রীতি। একতনের পক্ষে হয়ে মিরে যাওয়া যেখানে সম্বল নয়,
 দেখানো হল বেঁচে এসা খাদ্য বহন করে নিয়ে যায়। চিনি,
 গুড় প্রভৃতির মত দ্রব্যাল ভিনিস হলে এসা শতখানি সম্বল রস
 সুরে পেট ভর্তি করে নেয়। আত্মনাগ পাতি এসে কোন
 নাগা নেই। কোনোরকম অসুবিধা হলেই তরুণরা ভর্তি
 দলকে হল ঢল ঢল আর এক বাগার গোড়ে।

যে সব লাল-পিনডে গাছের পাতা ছুঁড়ে বাসা তৈরী করে
 এবং এসেদের ডেমা-পিনডে—পতঙ্গালনের সুরে পৌছেছে।
 এই ওই ভাতীই হিংস্র মাংসাশী। যবে এই সব ডেমা-
 পিনডের বড় বড় গাছের ডগাতেই বাসা করে। উইপোকা
 পিটার এরাও করে, কিন্তু আসল কাজ হ'ল গো-পালন।
 কালো ডেমা-পিনডের বাসা দু'চোপেই ভাবের বড় বড়
 গোয়াল দেখা যাবে। পিনডের গোয়াল 'খাণ্ডি' নামে
 ছোট এক ভাতীর মত কীট, কয়েকভাতীর প্রোপতির
 ভর্তি, নানাভাতের সুরে পোকা ও নরম ছারপোকার
 মত বা ভুলের কণা মত কয়েকটি পোকানার। এই
 পোকানাকড়গুলিকে মেরে খাবার করে তারা পোকা না,
 মতাই তাদের গোকা মত বোমন করে তাদের রসপান
 করে। মানুষের ভঁড় দিয়ে পিনডেরা তাদের গোকাবের
 প্রথমে হুৎহুৎ করে। এই হুৎহুৎ করে পোকা-
 গুলির বিচ্ছিন্নতার গিহ থেকে একরকম রস বার হয়।
 সেই রসই পিনডেরের খাদ্য।

করেক ভাতের পিনডেরের গোয়াল তাদের বাগার
 বাটরে থাকে। কোন কোন ভাত আবার বাগার
 ভিতরেই পোকাদের বাগার বাগার করে। ডেমা-
 পিনডেরা অনেক সময়ে তাদের গৃহপালিত পতঙ্গের
 করে বিশেষভাবে বাসস্থান তৈরী করে। প্রথমে একটি
 পাতকে ভাগা নলের মত পাকিয়ে পোল করে, তার
 পর সামান্য একটু ছিদ্র রেখে নলের হৃদিক বড় করে

যেয়। পোকা পোকানাকড়কে এই নলের মধ্যে রেখে দিয়ে
 এক সঙ্গে আহার ও আশ্রয় উভয় সবটাই তারা নিভিয়ে
 ফেলে। পোকানাকড়গুলি যেখানে বাস করে সেই গাছের
 পাতাতেই তাদের আহার পায়।

লাল ডেমা-পিনডেরের পাতার বাগার ভিতর বাড়ী ও
 বাচ্চা নানারকম পোকা দেখা যায়। তারা শুধু পোকা
 সংগ্রহই করে না, তাদের বংশবৃদ্ধি করতে দিয়ে নিজেদের
 পতঙ্গাল বাড়িয়েও তোলে।

অবশ্য বাটরে পোকাদের সম্বল পেলে তারা ছেড়ে যায়
 না। 'বহ' পোকাদের পাল দেখতে পেলেই লাল-পিনডেরা
 পাতালতা দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে। পাতা-টাতার অলাব
 হলে রেশমী এক রকম আবরণ নিজেদের লাগা থেকে তৈরী

করে তারা সে পোকাদের ঢেকে দেয়। সমস্ত সময়ে আগ পোকা ধরেও তারা সেখানে নিজে থাকে।

লাল-শিপড়েরাই বেশির ভাগ প্রজাতির গুটি পাগে থাকার জন্য। 'ফ্রাইসোম্যানিস' নামে একজাতীয় মৌল প্রজাতির গুটির উপরই তাদের লোভ বেশি। অস্বাস্থ্য প্রজাতির গুটি তারা যেখানকার ঘরে ফেললেও এট জাতীয় গুটিকে ধ্বংস করতে পারে বাঁচিয়ে রাখে নিজস্বের আশ্রয়ে।

আমাদের বাড়ী-ঘরে ছোট লাল যে শিপড় দেখা যায়, তারা ঠিক কৃষিকাণ্ড না করলেও কাঁচাকাড়ি গুণে এসেছে। চিনির কণা, মসি পোকানাকড় থেকে নানাপ্রকার বীজ পথ্য তাহা বাগান নিয়ে গিরে জমা করে রাখে। তাদের সামাজিক জীবনও অনেক উন্নত।

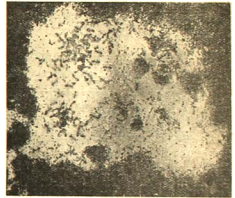
আমল কৃষিকৌশল বাগান ঘরে মৌচা-শিপড়ের। বৈজ্ঞানিকেরা এদের নানা প্রকারে বিভক্ত-ভাগ্য ৬টি নাম দিয়ে ভাগ করেছেন। সে নাম আগন্তুক: আনন্দের জননীর প্রয়োজন নেই। এরা মাঠেই থাকে। ঘানের দান্য সংগ্রহ করতে এদের প্রধান কাজ। মাঠের মাঝে এটি শিপড়ের বাসা চেনা কঠিন নয়। এদের গর্ভের চারিদিকে ঘানের বাকের ভূমি জুলাকান করা থাকে। ঘানের বীজ মাড়াই করে এরা ভূমি বাইরে ফেলে আসে। এক একটি এই জাতীয় শিপড়ের বাসার আয়তনের পথ্য ঘানের চাল অনেক সময়ে মজুৎ থাকতে দেখা যায়। এদের আর একটি বিশেষত্ব তারা তৈয়ারী। পাণ্ডুলি ছোট বলে এগুলোকে বড়ো জায়গায় এদের চলেতে বোধ হয় অস্বাভাবিক হয়। সেই জন্য গর্ভের চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত এরা পরিষ্কার পথ তৈরী করে রাখে। সে রাস্তাগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি বহুদূর। কোন বকম জলা বা গাছ-টান্দ সেখানে দেখা যায় না।

মৌচা চাষী-শিপড়ের পরিষ্কার পথ দিয়ে পথ করে আনবার সময় তারা চমৎকার দৃষ্ট দেখা যায়। মাঝখান দিয়ে চলে প্রমিষ্টের দল মুখে ঘানের বীজ নিয়ে। তাদের পাশ পাশে জ্বরবস্ত্র চোরাচার সৈনিকেরা চলে পাঠায়া হিসাবে। সৈনিকেরা অকারে অনেক বড়, তাদের মাথার 'বাড়ী'ও খুব বড়বড়। সৈনিকের কোন যোদ্ধা বহন করতে দেখা যায় না। বোধ হয় তাদের সর্বাঙ্গের বাধে। বাসার

ভিতর কিছু ভাগাই তাদের ভীত বাড়ী দিয়ে বীজগুলি ভেঙ্গে ভূমি বার করে দেয়।

উষ্ণ স্তরের শিপড়ের ভিতরই দৈনিক ও প্রমিষ্টের পথ বিভাজ দেখা যায়। মাঠের সমস্তের মত যে কেউ সেখানে দৈনিক হতে পারে না। ডিম থেকেই দৈনিক বা প্রমিষ্ট হিসাবে তৈরী হয়ে তারা বেগোয়। কি উপায়ে শিপড়েরা একটু দিনকে দৈনিক বা প্রমিষ্ট শিপড়ের পথিকত করে, তার রকম এখনও বৈজ্ঞানিকেরা জানতে পারেন নি।

সৈনিকেরা বাসা পাঠায়া দেয়, প্রমিষ্টের বাইরের



শিপড়ের গুটি: ইহার গুটি-বিশেষত্ব দেখে মনে হয় যে এরা বীজ ও নিম্নস্তরের সন্ধি মাঠের পাঠায়া দেয়। শিপড়ের পাঠায়া, তবে জীবন-চক্রের একই রকম হয়।

কালের সর্বাঙ্গী করে এবং বসবাস হয়ে অল্প পোকানাকড় বা অল্প শিপড়ের বাসা আক্রমণ করে। কয়েক জাতের শিপড়-দৈনিকের বাসার দরজা আগলানোর পদ্ধতি তারা মজার। তাদের মাথাগুলি প্রকাণ্ড। সেই মাথা দিয়ে ঠেলে তারা বাসার বাবার আদ্যের পথে মজুত ভিতর থেকে বহু করে রাখে। ভিতর থেকে বেরকার দরকার হলে শিপড়েরা ঘরোয়ানের পেটে তড়ি দিয়ে ঢোকা মাতে। ঘরোয়ান তখন মাথা লগ্নিরে তাদের বাবার পথ করে দেয়। বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকবার সময় এই বকম ঘরোয়ানের মাথার ঢোকা দিতে হয়। এই ঢোকা যেমন তেমন করে ফিলেই হয় না। প্রত্যেক জাতের উপায়া আলাদা। ভিতর জাতের কেউ এসে যেমন তেমন তাহে ঢোকা ফিলে দরজা খুলবে না।

বেলজিয়ামের পিণ্ডে ভাঙা আর সমস্ত ভাঙেই বাসাব উপর চান অত্যন্ত বেশী। বাড়ির নাচে ভাঙে নগর তারা পবন যন্ত্রে তৈরী করে। সে নগর বকাও করে প্রাণ দিয়ে। বাড়ির পথ জালী বদল করে এক একটি মনুষ্যকে ধরার বন্দন পথের টিকে থাকতে দেখা যায়। বাসায় এখন পিণ্ডের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হয়, কারণ আর ভাঙবে এখন আর স্কোয়াই না, তখনই তারা মৃত উপনিবেশ স্থাপন করতে বেগায়। এখানে পিণ্ডেরের সঙ্গে উইপোকাকের আর একটি মিল আছে। আমরা পাখাওঢালা পিণ্ডের কীক প্রাণ দেখতে পাই। মরবার ভাঙেই পিণ্ডের পালক ওঠে বলে প্রবাদ আছে। কিন্তু প্রাণটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ভাঙিতে বাড়ির বাসবার ভাঙেই পিণ্ডেরা এমন করে নিজেরা গাণ দেয়। উপ-নিবেশের ওর অসংখ্য পিণ্ডের কুমার ও কুমারীরা পাখার তর করে মৃত্যুপন দিয়ে যার হয়। পথে সকলে দাঙ্গা পেলেও একটি কুমারী যদি কোন রকমে নিবেশ মৃত্যু ভাঙে খুঁজে পায় তাহলেই তারের অভিমান সার্থক। সেই একটি কুমারীই যদি হয়ে মৃত পিণ্ডের স্বাক্ষর পড়ন করে। তাকেই বেত্র করে আরো সবুজ নগর গড়ে ওঠে। বাড়ির সুখ চেয়ে বাড়ি দেখানে তাই আমরাসে নিজেই বলি দেয়। 'অতঃপরে, প্রভু ও মহাত্মা এই ভাঙি-প্রভুত কৃত্ত ভরল ব অসংখ্য এই ভাঙি-মহাত্মাও দুঃখ-দুঃখের সমস্ত বিশেষ ভিতর থেকে বাড়ির দেখেছে।

আমেরিকার আদিম জাতির পুরাণ

১ 'মাম্বুস কেন অমর হ'ল না'

পৃথিবীর ওপরে আকাশ, সে আকাশের ওপরে হ'ল 'ওলেস পাড়ি'; 'ওলেস পাড়ি'তে দেবতারা থাকেন, আর থাকেন সেবাদেব 'ওলেসিস'।

ওলেসিসের একদিন ঠাণ্ড উপর থেকে পৃথিবীর উপর জোখ পড়ল। সবুজ মাটি, নীল নদী আর বরফ ঢাকা পাহাড় নিয়ে পৃথিবীকে তি হুবহুই দেখাচ্ছে। ওলেসিসের মনে হ'ল এমন সুন্দর ভাঙার কেউ না থাকলে যেই মানব না।

সেই মনে হওয়া সেই কাল। ওলেসিস তখনই নানা রকম প্রাণী করবার তৈরী করে ফেলেন; বাঘ, বাইসন,

শেয়াল, বরগোশ, তালুক, র্যাটল-মাণ—কত রকম যে প্রাণী তার লেখা-কোলা নেই।

সব প্রাণী করবার তৈরী করে ওলেসিস ভাবের পৃথিবীতে দিলেন পাড়িয়ে। বাবার সময় বলে দিলেন—সব বিলাস ভাঙা বিলাস, ভাঙ করে নিও, নল বিলাস মূল বিলাস, মিলে মিলে দেখো।

ওলেসিস সবাইকে পৃথিবীতে পাড়িয়ে ত নিশ্চিত আছেন। এমিকে দেখানে কিন্তু দাবি পড়গোল কেব দেখে। কোথায় মিলে মিলে থাকবে, না তারা পরস্পরের সঙ্গে ছুড়ে মিলেছে মারামারি। ফলমূল খাবে, না তারা এ জেত খাওয়া-খাওয়ার হুক করেছে।

সব চেয়ে হাফা মা বাবিকেই বুঝে তালুক আর হুঁকে র্যাটল-মাণ। তাদের একজন উঠেছে পাহাড়ে আর একজন লুকেছে বাড়ির ভিতর, তবু তাদের আগার সবাই অস্থির।

মাম্বুসেরই তৃপ্তি সব চেয়ে বেশী। বাইসনের মত তার ক্ষুধা নেই শিঙা নেই, পুখার মত তার দাঁত নেই নখ নেই। যে পায়ে সেই তাকে মারে। যেখানে যায় সেখানেই দে ভাঙা যায়। তার ক্ষুধার আর অবধি নেই।

ওলেসিসের অনেক দিন বাবে আবার একদিন পৃথিবীর কথা মনে পড়ল। পৃথিবীর দিকে চেয়ে ত তিনি অধো সবাই দেখানে আছে কিন্তু মাম্বুস কই!

অনেকক্ষণ ধরে ভাবো করে নজর করবার পর হাউসার আঘাতা গোছের গোটা কয়েক জীব তার চোখে পড়ল। আহা! এমি হাস হয়েছে মাম্বুসের!

ওলেসিসের সন্তা বড় হ্যা হল। তিনি তাবতে বন্দন, ছুর না নখ, দাঁত না শিঙা, কি দিয়ে মাম্বুসকে বড় করা যায়? অনেক ভেবে ওলেসিস ঠিক করলেন, মাম্বুসকে এ সব কিছুই দেওয়া হবে না; নখ বাহ তঁঁঁঁঁঁ হয়ে, দাঁত বাহ জেব, শিঙা বাহ উঠে, ছুর বাহ করে। এসব নিয়ে মাম্বুসের কি হবে।

মাম্বুসকে তিনি মিলেন তার চেয়ে বেশী কিছু—আবার তার হুঁ। মাম্বুস তারই-কোরে পাখর দিয়ে বাসলে সুন্দর, কাঠ খসে আগলে আগুন। নখ, দাঁত, ছুর, শিঙা সব খেল তার কাছে হটে। এবার আর মাম্বুসকে পার কে! পৃথিবীর তারই রাক্ষব।

কিন্তু 'হু' পৃথিবীর নিকে চেয়ে জনবিশেষ হু হু হু না।
পৃথিবী ত আর 'ওলেস পাতি' নয়। সেখানে কান গাওয়া
বল হলে সবাই বুড়ো হু, সেখানে সবাই একদিন গা হু।

ওলেস টিক করলেন পৃথিবী থেকে মরণ দিতে হবে
বুড়িয়ে। 'ওলেস পাতি' চই বড় কারিগর চ'ল 'হু'রা চই
ভাই। তবেই ওতের ডাক পড়ল ওলেসের বহাগে।

তাদের উপর হু হু হু, পৃথিবী থেকে 'ওলেস পাতি'
পর্ষা লগা সিঁড়ি বানায়। সিঁড়ি মাঝে মাঝে থাকে
ঝিলি ওলের কোমরা আর বিনা বুঝে কল। বাহু বুড়ো
হলে সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেই আবার নবযৌবন নিয়ে
বিরে ছেত পাগবে পৃথিবীতে। মরতে আর কাউকে হবে
না।

হুই ভাই 'হু' হু হু হু পেয়ে গেল পৃথিবীতে। সোভা
কারিগর ত তারা নয়। যেথতে যেথতে তাদের কাক
এগিয়ে চলল। কিন্তু সে পানিকর পর্ষা। তারপর আর
পাড়া নেই। ওলেসি বোক থাকেন আশার আশার,
'হু'-ভায়েগা সিঁড়ি গড়ে তুলল বলে। কিন্তু সিঁড়ি আর
এগোয় না।

'হু'-ভায়েগা একদিন ভিডি-বিরক্ত হয়ে এসে জাতি।
সিঁড়ি গড়া তাগের দিয়ে আর হবে না।

কেন, বাণ্য কি?

বাণ্য আর কি! তারা বোক যেই হু গড়ে, সেহিং
হলে এক বুড়ো বোক এসে তা বের ছেলে।

এমন কথা কে কবে শুনেছে! তলব হল সেকিৎক
পৃথিবী থেকে ধরে নিয়ে আসবার।

ওলেসি বিজ্ঞান্য করলেন, "তুমি বোত সিঁড়ি ভাঙ
কেন?"

সেহিং বুড়ো পাঠিয়ে তল দিয়ে সোভা চরে পাড়িয়ে কি
বললে জান? বললে, "নইলে দে পৃথিবীতে মরণ থাকলে
না।"

ওলেসি অবাক হয়ে বললেন, "তুমি অন্যর হতে চাও
না।"

"না, চাই না। মরতে চাও বললে 'ও' বৈতে হু হু।"

ওলেসি বললে, "কি সত্য?"

সেহিং বললে, "পৃথিবীতে সব প্রাণী মরে যায় বলেই
এত মাস এত ভালবাসা। চিরদিন থাকতে পাবে না বলেই,
নতীর হল আর মাঠের হল, মনের হুগা আর সাতের চাঁদ
এত ভালো লাগে!"

"সবাই যদি অন্যর হয় তা হলে কারুর উপর কারুর আশ
টান থাকবে না। বহুবেব পর বছর একই হু একই
ভিলি দেখে দেখে, বাড়ী-ঘর লোকজন সব পুরোনো একবেয়ে
হয়ে যাবে। যা ছেলের ভগ্ন কাপে না, ছেলে, বুড়ো বাপ-
নায়ের ভক্তে থিকারে হেবোবে না, বহু বছর ভক্তে ব্যাংল
হবে না। তেমন অন্যর হু বৈতে থেকে লাভ কি?"

ওলেসি খানিকক্ষণ চুপ করে বসেগেল। তারপর বললেন,
"ঠিক বলেছে! বাগেতে হলে মহাই পরকায়।"

সেই থেকে 'ওলেস পাতি'র সিঁড়ি আর গড়া হয় নি।
মহুগ আর অন্যর হতে পারে নি।

মাতমিন সাতরাত যদি সোভা উত্তরে যাও ত' 'ওলেস
পাতি'র সিঁড়ি এখনো সেথতে পাবে। সে সিঁড়ির পাহাড়
যেখের সোভা ছাড়িয়েও 'ওলেস পাতি' পর্ষা পৌছায় নি।

সেহিং বুড়ো, বাহুগেভ ভালো কতবে না মন কতবে,
কে জানে!

ঐতিহাসিকের দাবি

—হাউস জেন, কর্তৃপক্ষ ও কর্মসূচী স্মরণসম্মত হাউস মন্থার কিংবদন্তি স্মরণ্য হু, সোভা বেগাইয়া সেগাই ঐতিহাসিকের অন্য দাবি। যে
ইতিহাস ই স্মরণে যেখাওয়া যে সেই ইতিহাস বাস্তব। একাত্তর ওলেস, ঐতিহাসিক এবং মরণ-পাতি। বাস্তব আবেগ, কর্তৃপক্ষ এক কর্মের কেন
মরণ্য হইতে স্মরণ্য পাঃপাতি ও হাউস কেন মরণ্য হইতে পারে, সোভা ভিঃ আ কবিগা যে ইতিহাস বিবিন হু, সে ইতিহাস কখনও স্মরণ্য ও
বিঃপাতি হইতে পারে না।...

সুন্দর মন অশ্রুতম,
 অক্ষরভেদ কহল নব !
 অজি ঘন-ঘোর জীবনের ভোরে
 জলে ডবিল কি নয়ন তল ?
 অদ্য রাতের জ্যোৎস্না, মোর
 অক্ষর চাপায় উঠিল তটে,
 নিরুৎসাহ কামিনীকুলে,
 প্রাচীন বটের ছটিল ছটে ।
 কানিছে আকাশ, কানিছে বাতাস,
 ছল-ছল ঢেউএ শিরের সেত ;
 সলিলে অমর কলস ভরিতে
 সুপরিচিতার আসনি কেত ।
 মেঘের কুয়ায়-বলিল উষ্ম
 জাগেনি ভর, ডাকেনি পানী ;—
 এটি কি হে মোর অমল কমল,
 সলিলে ডবিল তোমারও অঁখি ?
 এত চাসিমুখ খোয়ানে ধরিয়া
 কাটিল আমার তিনির-রাতি,
 প্রহর-দেখা সুন্দর গুণে,
 কুনি অজি মোর একক সাধী !
 এত বরষা অক্ষ-খিতানো
 পঙ্ক-শয়নে অতলে মন
 ঘুমায়ে ছিল কি বৃণ-বৃণ ধরি',
 সিদ্ধ-অস্ত্রে লক্ষ্যীসম ?
 জলভার ভেদি' আপন ঝুগালে
 জাগিলে যেদিন আমার কৃক —
 ভাগ্য আমার,—সেদিন মেঘের
 কাশো গুণ্ডন উদার মুখে !

সেদিন কানিছে আকাশ বাতাস,
 ছল-ছল ঢেউএ বক দোলে,
 বধূ ভুলিল ভরিতে কলস,
 কাননের পাখী কাকলি তোলে !
 আমি জানিতাম—হে মোর কমল,
 যতই গভীর হোক না বাধা,
 আনন্দময় প্রকাশ তোমার,
 জলে ভেজে না ও-চোখের পাতা ।
 তাই প্রাণপণ তোমারি স্বপন
 অন্তরে ধরি' কাটাহু রাতি,
 তাই ভোরে ভোরে ও-মুখ দেখিছু,
 গুণে অদিনের শরণ সাধী !
 একি তেরিলাম ?—তোমারও নয়নে
 উছলি' লেগেছে অক্ষ মন !
 আমার সাধনা, আমার বেদনা
 কালা'ল কি তোমা হে প্রিয়তম ?
 গুণে সুন্দর, আমার কীবনে
 আনন্দরূপে ফুটিবেনা কি ?
 মজল এ চোখে রাখিবে না তব
 চান্দ-উজল মোহন অঁখি ?
 বেবল প্রভাতে আলোকের মল
 গুটা'ল অরুণ মর্ষকোবে ;—
 কত সাধনার সুন্দরে পেয়ে
 কীটুয়া কাটাহু কর্মদোষে ।
 জীবন-প্রান্তে এ অক্ষমতে,
 কুটিল কমল নব নির্মল,
 তারও চোখে চাহ, অক্ষ বহে !

যক্ষসূদনের অযিত্রচ্ছন্দ

—**ବିଷୟସନାଥ ମୋର**

মহাকবি মাটেকল মধুসূদন সন্তের চরিত্রকণ
 ৮ গোষ্ঠীগ্রন্থে বহু লিখিয়াছেন যে, যখন কবির ত্রিগোডমাগম
 কবে। সর্গপ্রথম বাহালা সাহিত্যে অবিরাজকের পশ্চিম
 করেন, তখন "যেপের অনেক কৃতবিদ্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি
 তাহার প্রতি অবজ্ঞার প্রকৃতি নিক্ষেপ করিত-
 ছিলেন।" তিনি লিখিয়াছেন, "নিজা, অবজ্ঞা
 এবং উপহাস অসম্বোধের উদ্ভাব উপর বর্ষিত
 হইয়াছিল। একদিকে শুভ্র কবির শিষ্যদল,
 অপর দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বার সমুত্তম
 পণ্ডিতবলী এবং সেই সঙ্গে পার্যটরণ সম্ভার
 মহাশয়ের দ্বার ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী
 ব্যক্তিগণ, সকল সম্মুখাথে মোকট উত্তমকে
 উপহাস ও বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে
 উপহাসাশ্রয় করিবার জন্য অবিরাজকের বিকৃতি
 করিয়া কহতেন কত গোত্রোদ্ভাবক কবিতা
 প্রচার করিয়াছিলেন।" কিন্তু মহাকবি এই
 নূতন অবস্থানের সমাধার করিবার মত করেকজন
 স্থপিতিক ও প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ও তখন
 ছিলেন। তিনি নিজাবায়ে ত্রিগোডমা ব্রুতি ও
 প্রচারিত করিয়াছিলেন, সেই বিজ্ঞোদমাও মণা-
 রাক্ত্র প্রকৃতিগোদন ঠাকুর, প্রতিভার বরপুত্র
 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পাদক হাজা রাক্ত্রসাগল
 দিত, 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর
 দ্বারকানাথ বিজ্ঞান প্রকৃতি মুকুতম মধুসূদন-
 প্রবর্তিত নূতন ছন্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন।
 কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজী লেখক ও বারী 'ইণ্ডিয়ান
 কীট' সম্পাদক বিশপারীটাম দিত, তিনি মাত্রাভ
 হইতে কণ্ঠকম্বর অবস্থার প্রোদ্যোগ করি-

মাইকেল

বন্ধুগণের পরিত্যক্ত নিগাহছিলেন, তিনি কষ্টকর সাহিত্যক্ষেত্রে
 প্রতিষ্ঠিত করিতে যে সাগর্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বিষয়
 এখন অনেকটাই অসংগত নহেন। কিশোরীদাস ঊগর্য্য বন্ধু
 বাঙা সাহেজুলানের দ্বারা পরসাম্বিত্যের বিখ্যাত সেবক



ଆମେ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ।

বন্ধকে বহুদিন নিম্ন উক্তানবাটিকার অতিথিযন্ত্রণ প্রাধিকার
 ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে পুলিশকেটে দ্বিতীয়তঃ (২) ক
 করিয়া কনিষ্ঠ ডঃসহরে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আন্তরিক

রাজনারায়ণ বসুকে 'ভিলান্ডমাস্টার'এর একটি বিখ্যাত
মহাশয়ানা লিখিতে অঙ্গোপাঙ্গ করেন এবং উহা স্তম্ভসম্মানিত
পুস্তক প্রকাশিত করেন। সেখানে 'ইন্ডিয়ান কীন্স' পত্র

হেমন্ত কালের পতীর অন্ধকার রাতি। বৃহৎ মহাভব
 তাঁর পড়বার ঘরের এক কোণ থেকে আসে এক কোণ পর্যন্ত
 পাখচাঁপি করে নেড়াছিন্নে আসে পনের বছর আগেকার এক
 হেমন্তকালের একটি পাটের কথা ভাবছিলেন। পাটের অনেক
 গলাবাত, বিহান ও পদব লোকের সমাগম হয়েছিল।

অতীত বহু দিনের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক কথা উঠেছিল।
 অতিথিদের মধ্যে অনেক দিচ্চ পণ্ডিত ও সংবাদপত্রদেবী
 ছিলেন। তাঁরা স্নান করলেই প্রাপ্তবয়স্ক বিবর্তন ও প্রকাশ
 করলেন। তাঁরা বললেন যে, শান্তি রিসার্চে ওটা অত্যন্ত
 পুণ্যভূমি, তাছাড়া যে কোন খ্রীষ্টান রাইটের পক্ষেই বড়টা
 অনুপম, নীতিশাস্ত্রের বিরোধিতা বটে। কেউ কেউ বললেন
 যে, চরম বড় রিসার্চে প্রাপ্তবয়স্কের পরিবর্তে বাবজীদার কাগ-
 বাসেই বাবজা বড়টা উঠিত।

গুরুত্বপূর্ণ বললেন, “আমি কিছু এ বিষয়ে জানলেই সঙ্গে
 একমত হতে পারলাম না। যদিও প্রাপ্তবয়স্ক বা বাবজীদার
 কাগবাস, ব্যক্তিগতভাবে এ প্রচেষ্টার কোনটাই আমার
 কোনই অভিজ্ঞতা নেই, তবুও আমার বিশ্বাস যে প্রাপ্তবয়স্ক,
 বাবজীদার কাগবাসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নীতিসম্মত ও
 নতুনোচিত শাস্তি। আসি লোককে বৃহৎবয়স্কের মধ্যে বেয়ে
 ফেলে, কিছু বাবজীদার কাগবাস হিলে হিলে একটু একটু
 করে হটাৎ করে। এমন কেন্দ্রিক বৈধ ‘সদস্য’ বললে —
 যে বিবেকের মধ্যে তোমার সব শেষ করে দেয়, তাকে, না যে
 বহুতর পদ বহুতর সঙ্গে সঙ্গে পলে তিল তিল করে তোমার
 গোপনীয় গোপন করে, তাকে ?”

অতিথিদের মধ্যে একজন বললেন, “ও বড়োই নীতি-
 শাস্ত্রের বিরোধী, কারণ স্ট্রাট্টের নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই
 এবং যা সে কখনও ফিরিয়ে দিতে পারবে না, সে তিনি নিজে
 নেবার ও তার কোন অধিকার থাকতে পারে না।”

সেই বলের মধ্যে একজন তখন আইনবাদসাগী ছিল,
 বয়স তার বেশী নয়—বছর পচিশ। তার মত ভিদ্ভাণা করা
 হলে সে বললে, “প্রাপ্তবয়স্ক আসে বাবজীদার কাগবাস প্রচেষ্টা

নীতিবিপ্লবিত, কিছু আশাযে যদি ঐ প্রচেষ্টার কোন একটি
 বেঁচে নিতে বলা হয়, আমি নিশ্চয়ই বিচ্যুত হতে নিই।
 একেবারে না বাঁচলেও চেয়ে কোন বস্তুতে বেঁচে থাকতে ভাল।”

তারপর খুব ভোর তরুণ আরম্ভ হল। মহাভবের বয়স
 তখন অনেক কম—সঙ্গে মাত্র বোঁধনে পা দিয়েছেন, বস্তু পর্যন্ত,
 নেমাওটা তাঁর হঠাৎ পদব হয়ে উঠল।

টোবলের উপর সন্ধ্যানে সূর্যাস্ত করবে আইনবাদসাগীর
 দিকে চেয়ে তিনি টেবিলে ঝুঁকলেন, “না—তোমার ব্যক্তিগত কথা,
 একজন বলে কথা। বাবজীদার তুৎবৎ কথা, তার বয়স
 নেই। তুমি যদি পাটের বহুতর ও একটা অন্ধকার পথে একাকী
 বহুতর পার, আমি একমত টাকা বাজী রাখব।” বলে
 তিনি পূর্ণ বয়সে সকলের মূলের দিকে বার বার চাইতে লাগলেন।

তখন আইনবাদসাগী বললে, “টিক ?”

“টিক।”

“বেশ, তাই হবে। পাট কেন, বাবজীদার কাগবাসের
 যে বিষয়,—চোখ বন্ধ, আমি সেই চোখ বন্ধই বহুতর পারব।”

“চোখ বন্ধ ! সত্য আজ্ঞা—তাঁর মধ্যে—তত্ববোধ-
 গণ, আপনাতঃ সব ভুলছেন। আমি এক লক্ষ টাকা বাজী
 রাখলাম।” এই বলে মহাভব টেবিলে উঠলেন।

এই চল সেই অল্পতর হস্তগতক বাজীর প্রবাহ। মহা-
 ভবের তখন কেটী কেটী টাকা ব্যক্তিগত পণ্ডিত। লোকটিও
 অত্যন্ত গাম্ভীর্যবান ও উগ্র প্রকৃতির। কোন কিছুতে
 কোঁক পড়লে বা যেন চাপলে তিনি আসে নিজেই লংঘন করতে
 পারতেন না। বাবার সময় তখন বাবজাওজন্যে ঠাট্টা করে
 বললেন, “প্রবোধকতা, সময় থাকতে থাকতে মালা টিক
 কর। এক লক্ষ টাকা আমার কাছে কিছুই নয়, কিন্তু তুমি
 তোমার জীবনের সব চেয়ে ভাল সমস্ট্রাই ঐ তিন চার বছরে
 হারাবে। তিন চার বছর এই ভুল বলাই যে, আমি জানি,
 তুমি ওর চেয়ে বেশীদিন কখনই থাকতে পারবে না। তাছাড়া
 তুলে নেওনা যে, নিশ্চয়ই বসিবে চেয়ে বেজ্ঞানতর বসিবে
 চেয়ে বেশী ভরস। তুমি যে উজ্জ্বল কালোই বসিবে ওর দিক

শেতে পারবে এট চিহ্নটি অচর্মিত হোমার বসিভৌন বিনয়
কবে কুলাবে। তুমি হেবে বৈশ্ব, তোমার কবে আনান সৌতি-
মত কই হুগে।”

তখন আইন-বাবসারী অটল, অটল।

কতকাল কেটে গেছে তার পর। গানের ভিতর পাড়গারি
করতে করতে মহাজন আর সেই পুণ্যভূমি কথা ভাবছিলেন।
ভাবছিলেন, “হাঃ! হাঃ! কেন আমি এমন বাকী রাখতে
দিয়েছিলাম? কি লাভ হল এতে? আইনবাবসারীর
ভাবনের পরব বহুত নষ্ট হল আর আমারও একটি লক্ষ টাকা
বেল, কিন্তু এতে প্রাপ্যও ভাল কি বাসআবাস কাবালাস ভাল,
সে বিষয়ে মগতের লোক কি কোন ছিল মত পোষ্য করতে
শেতছে? কখনই না।

“সবকাল মিলে এটি একটি অত্যন্ত বোকামীর কাণ
হয়েছিল। পদ্যগাওয়া লোকেরের যেমন নানা অদৃষ্ট বেয়াল
পাকে, আমি সেই রকম বেয়ালের কশেই এটা কবেছিলাম আর
আইনবাবসারী করেছিল, তাঁকার লোটে।”

ক্রমে ক্রমে সেই সত্যাবগার সমস্ত কথাই তাঁর মনে
পড়তে লাগল। ঠিক হয়েছিল যে, আইন-বাবসারী মহাজনের
বাগানবাড়ীর এক অংশে সতর্ক প্রেরণীর প্রেরণার বন্দী
পাকবে। আরও ঠিক করা হয়েছিল যে, বন্দী অবস্থার সে
তার ঘরের চৌকাঠ ডিকোতে পারবে না, কোন লোকের
সেবা সে পাবে না, এমন কি কোন মানুষের গলায় লক্ষও
তাকে ক্রমতে দেওয়া হবে না। কোন চিঠি বা খবরের কাগজ
পারায়ও তার কোন অধিকার থাকবে না। কেবল একটা
কোন বাজনা রাখবার, বই পড়বার ও চিঠি লিখবার স্বাধীনতা
তাকে দেওয়া হবে এবং মন বা তাবাক খেতেও তার কোন
বাধা থাকবে না। একটা ছোট জানালায় মধ্য দিয়ে সে নীচের
বহির্জগতের কাছে তার মনোভাব জানাতে পারবে। বই,
বাজনা, মন বা অস্ত্র কোন তিনিবেদনকার হলে ঐ জানালাটার
উপর একটা কাপড়ে দিবে বেখে দিলেই তাকে সেই তিনিব
দেওয়া হবে। এই ছিল সর্ব।

সেই সর্বের নির্দেশানুসারে তখন আইনজীবীর ১৮৭০
খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর
পর্যন্ত বন্দীভাবে থাকবার কথা ছিল। সেই চুক্তিতে আরও
নির্দেশ ছিল যে, বন্দী যদি এই সমস্ত সর্ব ওতুই-ও লজ্জন

করতে চেষ্টা করে, এমন কি নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ৩’মিনিট
আগেও যদি স্তম্ভিত করবার চেষ্টা করে, তা হলে মহাজন
অব্যাহতি দেবে বাবে, তাকে আর টাকা দিতে হবে না।

তার সেই জানালার রেখে-ধেওয়া কাপড়ের ইচ্ছাগোস্তো
থেকে বহুতর বোকা বেত, তাতে মনে হত যে বন্দিদের প্রথম
বহুত আইন-বাবসারী নির্জনতা ও নিশ্চেষ্টতার ভয় পূর্ব কই
শেত। তখন তার ঘর থেকে দিনরাত শিগানোর লক্ষ
আমত। সে কিছু মন বা তাবাক খেতে চাইত না।
সে নিজে দিয়েছিল যে, মন বাসনার উত্তেজিত করে, আর বন্দীর
লক্ষ বাসনার মত বড় লক্ষ আর কিছু থাকতে পারে না,
তাছাড়া ভাল মন এটা একা খাওয়াও এক কষ্টের শাস্তি-
বিশেষ। তাবাকের বিষ সে বলেছিল যে, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
বাক্যে বিবাক হয় বলে সে তাবাক খাওয়ার অভ্যাস
পরিচাল্য করেছে।

বন্দিদের প্রথম বংগের আইন-বাবসারী হাস্যাতা বহুতর
পর উপভাস পড়তে চাইত। অপর্যাপ্ত ও কল্লাবহুল পর,
মিশ্রভাষ্য বা জটিল সপ্নবস্তুবাহুল বই—এই সবই ছিল
তার পাঠ্য।

যিভীর বহুতর বন্দীর ঘরে আর শিগানোর লক্ষ শোনা
যেত না। বন্দী তখন নানাবিধ পাঠ্যপুর্ন বই চাইত।
লক্ষ বংগের আবার বাজনার লক্ষ শোনা গেল। এই সমস্ত
বন্দী মন চেয়েছিল। দ্বারা তাকে এই সমস্ত লক্ষ করেছিল,
তারা বলে যে, এই সমস্তটা সে খানি হলে, খেলে এবং অলস
ভাবে শুয়ে হলে কাজিয়ে দিয়েছিল। তখন সে মন মন
চাই তুলত এবং নিজেই নিজের সঙ্গে পূর্ব তর্ক করত। এই
সমস্ত সে কোন বই পড়ত না; কখন কখন সাক্ষিবলার সঙ্গে
হল লিখত। সমস্ত সমস্ত সে অনেককাল ঘরে লিখত
এবং তার পর দিন সকালে উঠে দেখা কাগজগুলি হিঁড়ে
ফেলত। প্রেরণীর বলে, অনেককাল তার কাহার লক্ষও
ক্রমতে পাওয়া যেত।

লক্ষ বংগের যিভীর ভাষে সে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে
বিভিন্ন ভাষাসমূহ, বর্ণনাশাস্ত্র এবং ইতিহাসপাঠ্য অনুমানিবল
করেছিল। সে এমন উৎসাহের সঙ্গে এসব পড়তে আরম্ভ
করল যে, মহাজনের তার প্রেরণাবন্দীর লক্ষ বই ভোগ্যত করতে
গীতিমত বেগ শেতে হয়েছিল। তার বংগেরের মধ্যে তার

কত কত পথের চেয়েও বেশি বই আনা হয়েছিল। যে সময় সে এই সকল পত্রের আগ্রহ ও মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিল, সেই সময় মহাজন তার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিল। তাতে লেখা, “কাব্যরসক মহাপ্রাণ! আমি এই চিঠিটা ছাড়াই বিভিন্ন ভাষার লিখছি। বিশেষতঃ পণ্ডিতদের এটা দেখিও। যদি তাঁরা একটাও মূল দেয় করতে না পারেন, তা হলে বাগানে বন্ধুর আগ্রহ ক’রো। তা হলে আমি বুঝতে পারব যে আমার চৌদ্দ বর্ষের নি। সর্বস্বত্বের ও সর্বকালের প্রতিষ্ঠা-শালী বক্তৃত্ত্বের প্রতিষ্ঠার বিকাশ বিভিন্ন ভাষার মধ্য দিয়েই হয় সভা, কিন্তু তাঁদের সকলেরই চিত্তাঙ্গণালী সেই একটি চিত্তবল ভাষণের জোড়িতে উদ্ভাসিত। এই সব মনীষিনের লেখা বুঝতে গেলে আমি যে কি ধীরে হৃদয় অহুত করি তা বহি তুমি বুঝতে।”—বন্দীরা উজ্জ্বল পূর্ণ করা হয়েছিল। মহাজনের আত্মজ্ঞানের বাগানে বন্ধুর আগ্রহ ক’রো হয়েছিল।

আরও পরে। ধর্ম বৎসরে আইন-বাবারী তার টেবিলের সামনে বসে হয়ে কবে কেবল মাত্র “নিউ টেবিলেট” পড়ত। মহাজনের কাঁচী আত্মজ্ঞান বোধ হত যে, যে লোক তার সহস্রের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই পড়ে শেষ করেছে, সে পুরো এক বছর ধরে কেবল মাত্র এমন একখানি বই পড়ত, যেটা পূনর্ই সর্বত্র এবং অত্যন্তই ক্ষুদ্র। “নিউ টেবিলেট” পর সে বর্ষ ও বর্ষান্তরের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করল।

শেষ হ’বছর বন্দী বিভিন্ন প্রকারের অনেক বই পড়ত। কোনো সময়ে সে প্রাচীনত্ব গির্জান, কোনো সময় বা বায়বন ও সেকুন্ডার পড়ত। অনেক সময় সে একটু সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্রের বই, ডাক্তারী বই, উপন্যাস এবং বর্ন ও বর্ন শাস্ত্রের বই চেয়ে পাঠাত। তার পড়ার ধরণ দেখে মনে হত, সে যেন এক ভয়তরী নাকিরের মত সূত্রে সীতার দিকে এবং জালের কাছে বা পাছে তাকেই চোখে ধরেছে।

মহাজনের এমন এ সবটীক একে একে মনে পড়ল। তিনি তাহতে লাপলেন, “কাজ সকালে বন্দী মুক্তি পাবে এবং সেই সর্ব অত্যাচারে আমার তাকে এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও পনের স্কটও।”

পনের বছরে মহাজনের অত্যাচার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তার সে কোটি কোটি টাকা নেই, বড় বড় বাসগা

নেই—আমি সেই শাখাখানো গরম যোজ্ঞও নেই। দুয়ার, আধোবে প্রদোষে, বিলাপ বাগানে সবই গিয়েছে। মাত্র বাতীর একটি লক্ষ টাকা ব্যাচে আছে।

“দেই অর্থীন, অদুত, ব্যাচে বাতীরটা কতই—” মহাজন চ’রতে মাথা চেপে করে বিঃ নিজেই বলতে লাগলেন,— “আচ্ছা, ও লোকটাই বা এতদিনে মরে গেল না কেন? ওর ত এখন ঘোটে চম্পন বছর বয়স—ও আমার শেষ কর্তব্যটি পূরণ করে নেবে—তারপর বিঃ করবে, দুঃখ খেলেবে, আরও কত কি করবে—নাানাভাবে জীবন উপভোগ করবে, আর আমি? আমি ইঈশাপাষণ ভিক্ষুরের মত চেয়ে পাকব। ও হয়ত যোগেই আমাকে দেই একই কথা বলবে, “আমার জীবনের সর্ববিধ সুখশান্তির জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার প্রাণময় তোমাকে কিছু সাহায্য করতে আমাকে অসমর্থিত দাঁও।”

“না—না—সে অসম্ভ—তা আমি সহ করতে পারব না।

কিন্তু তেঁলিয়া হয়ে অপমানের বোঝা বড়ো থেকে নিত্যগ পাবার জন্য উপায়ই বা কি? ইঃ—আছে—একবার উপায় আছে—সে হল ওর সুত্বা।”

জঃ জঃ করে ব্যক্তিতে তিনটা বাজল। বাতীরে সবাই সুনাচ্ছে—চরিত্রিক নিত্যগ; বাইরে খালি বরফ পড়ার শব্দ ও বাতাসের কাপটার সঙ্গে বসন্তমত গাছপোকার আর্দ্রাব শোনা যাচ্ছে। কোন শব্দ না করে মহাজন—পনের বছর যে করার মরজা খোলা হয়নি—সেই ঘরের চাষিটি পকেটে নিয়ে আস্তে আস্তে বোজবে পড়লেন। তখনও বৃত্তি পড়ছিল—বাগানে কনুয়ে ঠাণ্ডা। গভীর অন্ধকার। একটা তীব্র, তীব্র, আর্দ্র বাতাস গাছপোলাকে অধিগ্রাসী ঠাণ্ডাছিল। মহাজন অনেক চৌদ্দ করেও বাগানের পশ, মাথা পাঞ্জর মৃতিগুলো, বাগানের বেড়া বা সুপগাছ কিছুই দেখতে পেলেন না। আনন্ডকে হাতকাতে হাতকাতে বন্দীর ঘরের কাছে গিয়ে সে গাছপা-গাছপালাকে হ’বার ডাকলেন কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। সে নিশ্চয়ই এই দ্বিতী ওলকড়ের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সাধাও বা লজাকুও আগ্রহ নিয়েছে। মহাজন মনে মনে ভাবলেন, “বহি আমি কখনই সাধন সক্ষম করে আশা অতিপায় পূর্ণ করতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই পাগোলাগালাটাও উপস্থই সর্বপ্রাণন ঘোষ পড়বে।”

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ তিনি বাপান-ভাইর
 মি'ছি ও বরতা খুঁজে প্রথমেই হলবহটার মধ্যে ঢুক পড়লেন—
 ভাবলেন সে বরজেশ্বর নামের নর পশ্চাতে এসে হাঁড়ালেন
 এবং অগ্রে অগ্রে একটা বেশলাইয়ের কাঠি জাললেন।
 সেখানে জনপ্রাণীও ছিল না—পালি একটা চাষর-না-সেও
 বিছানা ও এককোশে একটা হোত পড় ছিল। বন্ধীর ঘরে
 বরতার 'মৌল'গুলো আশ্রয় ছিল।

হঠাৎ বেশলাইয়ের কাটিটা নিতে পেল। মংগুন
উত্তেজনাপূর্ণ ছয়ে সেই ছোট জানালাটা দিয়ে ফরের মধ্যে
উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন।

বন্দীর ঘরে খুব মুখ একটা লাগে জলছিল। বন্দী একটা টেবিলের ব্যার চূপ করে বসে। বাইরে কেবল কেবল মাত্র তার পিঠে বিকটা, মাথার পিছনে বিককাগ চুলওগে। এবং হাতদুটো দেখা বাচ্ছিল। টেবিলে, দেয়ারদুটোর ও কার্পেটটার উপরে অনেক খোলা বই ছড়ান।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল—কিছু বাকী একবারও নয় না ;
 পনের বছর বন্দিবের কলে তার নিশ্চলভাবে রয়ে থাকবার
 অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল । মহাজন আঁতুল দিয়ে আনাচার পাথে
 টোকা দাখলেন, কিন্তু সোকাট নির্ভীক, নির্ভীকার, নিশ্চল ।
 মহাজন আঙে আঙে, সতর্কতার সঙ্গে দরজার “সীল” ভেঙে
 খুব সম্ভবশ্যে তালাতে ঢাবি চুকিয়ে দিলেন । বহুবনের পুরাণো
 মন্ডে-পড়া তাগার একটা বিস্তীর্ণ কর্কশ পথ হল । মহাজন
 ভেবেছিলেন যে, এখনি একটা বিশমহতক পথ ও পথধনি
 সোনা পাথে, কিন্তু তিন মিনিট কেটে গেল, তবু ভিতর থেকে
 একটুকুও পথ এল না । তিনি খয়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন ।

টেবিলের সামনে একজন পোক বসে ছিল বটে, কিন্তু তাকে দেখলে কিছুতেই সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না। ঠিক যেন একটা ককাল। তার চামড়া গেছে ইঁটকে, চুলগুলো হয়ে গেছে মেয়েদের মত লম্বা ও ঝাঁকড়া, আর দাড়িও গেছে গুব্ব বৈশী রকম বেড়ে। তার মুখের রঙটা হৃদয়েতে ধরণের—অনেকটা মেটে মেটে দেখাচ্ছিল। গালগুলো বসে পিয়েছিল, গিটটাও খুব সজ আর লম্বা দেখাচ্ছিল, যে ঠাটের উপর মাথা ছেঁবে সে স্তরে ছিল, তার সেই হাতটা এমন কাঠির মত সজ হয়ে গেছে যে, যেখালেই কেমন যেন মারা হয়। তার চুল এর মধ্যেই শাকতে সুক করেছিল এবং তার সেই বর্ণ

মুখে বিকে ত্রাকালে কেউ ভাবতে পারত না যে, তার বয়স মোটে চল্লিশ বছর। টেকিলের উপরে, তার মুখ-পদ্ম মাথার সামনে পানকয়েক কাগজ পড়ে ছিল; 'তোমার কেউ ছোট অক্ষরে কি লব লেখা ছিল। মজান তাৎপণ্যে, "আহা ! যেভাগ্য নিভিত্তি চিত্তে সুবিধে পড়েছে এবং চরিত্র সুবিধে সুবিধে লাভ টাকার স্বপ্ন দেখছে। আমি যদি এখনও এই অর্ধ-বৃত্ত বেহটা তুলে বিছানার নিচে গিয়ে, লেপ ঢাকা দিয়ে রেখে শেষ করে ফেলি, তা হলে অতি দৃষ্টি স্তম্ভের স্লেগেও কাগজ সন্বেদ হবে না যে, এটা অস্বাভাবিক নৃত্য। কিন্তু তার আগে একবার দেখা যাক কাগজগুলোতে ও কি লিখেছে।"

যাযাযি কাগজগুলো তুলে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন, "কাল রাত্রি বাগেটটার সমর আমার মৃত্যু। কাল আমি আবার জনসমাজে মেলবার অধিকার অর্জন করব। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, এটো বণ ছেড়ে যাবার মুখ বেখবাব আগে তোমানের কিছু বলে যাওয়া আমার কষ্টবা। আমার নিছের বিবেকের বিকে চেয়ে এক সন্ন্যাসী ঈশ্বরের নামে পণপ করে আমি বলছি যে, আমি এখন স্বাধীনতা, জীবন, স্বাধা এবং পৃথিবীতে বা কিছু জীবনের সুখশান্তি বলে মনে করণ হয়, সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করি।

“পনর বছর ধরে আমি অসামান্য হুমকিতে পাবিছি কীভাবে
বিলম্ব চিন্তা করেছি। অশ্রুত আমি বাটেরের পৃথিবী বা
পৃথিবীর মাগুর কিছুই দেখতে পেতাম না, কিন্তু আমি বই পড়-
তাম ও বইয়ের মধ্য দিয়েই সব কিছু অহুত্ব করতাম। পাতার
অভিনিবেশ দিয়ে পড়ার ফলে বইয়ের সঙ্গে আমি একত্ব হয়ে
একাক্ষ হয়ে যেতাম এবং বই পড়ছি আমি মন পান করার
আরাম পেতাম, মনুর স্বরলহরীপূর্ণ গান গাইতাম, হাটল ও
বজ্রা শিকার করতাম এবং সৌন্দর্য ও বাণ্যাদময় নাতীকে
ভালবাসতাম; তোমাদের কবিদের প্রতিভা সৃষ্ট অপরূপ
হুমকী নাতীর নক্ষত্রবাসীদের মত রাতে আঁখির কাছে
আলুত এবং এমন আশ্চর্য আশ্চর্য কবিতার উল্লেখ করত,
যাতে আঁখির মন মগ্ন হয়ে যেতে মোহিত হয়ে যেত।
তোমাদের বই পড়েই আমি “এলগু” ও “মট ব্রা”র লোকো-
নিধের আন্তোয়ন করেছি, সেখান থেকে আমি সফল কিন্তু
উদ্ভাসিত করে যের কীপে প্রাণঃস্বার্থের উদ্দেশ্য এবং আশাঃ

নেত্রেব গায়ে, সমুদ্রের তলে ও পঙ্কজমালায় শিখবদনে রক্তাক্ত সোনারদী বয়েষ তুলি বৃষ্টির সন্ধ্যা-স্বপ্নের অন্তঃসমন, এ সবই ঘেঁষেছি। আমি আরও ঘেঁষেছি, কেমন করে আমার মাথার উপর দিয়েই মেঘের বৃক জিরে বিভাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা-বন্যী, বিস্তীর্ণ তপস্কমি, কল্লোলিনী নদী, বিশাল, স্থির হ্রদ, প্রাসাদখালিনী নগরী—এ সবই আমি ঘেঁষেছি। আমি “সাইরেন”বের মোহিনী সজীতধ্বনি শুনেছি: “পানেন”র স্বাক্ষর স্বর আমার কানে এসে পৌঁছেছে। যে সকল স্নানর মেঘ-কুতরা আবারও উষ্মের কথা বলতে আসত, আমি তাদের স্বসীম পাখার স্পর্শ শুনিয়েছি। তখনকের বইয়ের সারাবোই আমি গভীর ঘামে অবতরণ করেছি—সহর পুড়িয়ে ফেঁস করে দিয়েছি, নৃতন বর্ণ প্রচার করেছি এবং বড় বড় দেশ ভর করেছি।

“বই পড়ে আমি বহু জ্ঞান সঞ্চয় করেছি। সাহসের অস্ত্রায় চিত্তার ফলে বহু শত্রুদ্বী ধরে যে জ্ঞানভাণ্ডার করে উঠেছে—সে সবই আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ঠালাঠালি করে রয়েছে। আমি খুব ভাল করেই জানি যে, আমি তোমাদের সবাইকার চেয়েই ডের বেশী জানি।

“এখন আমি প্রমথাক্রমে তপা করি, সমস্ত পার্শ্বি দৃশ্য-পার্শ্ব ও জ্ঞানকে তপা করি। পৃথিবীর সব ভিত্তিই নৃত, অপর্যায়ী, স্বপ্নের মত বিখ্যা এবং মনোচিকার মত ব্রাহ্মিজগৎ-দূর্গ: তুমি যদি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জানি, সবচেয়ে বিজ্ঞ ও সবচেয়ে সৌন্দর্য্যশালী হও, তাহলেও সামান্য একটা ইচ্ছার মতই নৃত। পৃথিবী থেকে তোমার সব চিহ্ন গোপন করে দেবে। তোমার তবিস্বয় বংশধরেরা, তোমার ইতিহাস, তোমাদের কাছে যে সব প্রতিভাশালী লোককে আজ অন্ধ বলে মনে হচ্ছে, সে সবই ক্রমে ক্রমে কমে-বাঙরা বরফের তপের মত অসল, অসদৃ, কড়পদার্থবিশেষ হয়ে থাকে এবং অবশেষে পৃথিবীর অংশবিশেষের সঙ্গে ভাঙা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

“তোমরা পানলের মত তুল পথে চলেছ, তোমরা মিশ্রাক সত্য জাব এবং কুদিতক স্নানর তাব। হঠাৎ যদি আশেপা ও কমলাস্বেদ গাছে যাং ও টিকটিকি কপতে আরম্ভ করে এবং সোপাশ ফুলে যদি হঠাৎ ঘোড়ার ঘানের

পঙ্ক পাওয়া যায়, তা হলে তোমরা নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্য হয়ে থাকবে। ঠিক সেই বকম ভাবেই আমি তোমাদের দেশে আশ্চর্য্য হয়ে বসে—তোমরা, যাঁরা স্বর্গকে ত্যাপ করে পৃথিবীকে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। আমি তোমাদের কোন ওয়া দৃষ্টে চাই না।

“আমি যে সভাসভাও তোমাদের জীবনযাপনের সঙ্গ-প্রকার উপায়ক আভ্যগিক যুগা করি, তা বোঝানর উক্ত—যে এক লক্ষ টাকা পেলে আমি এক সময় স্বর্গস্থিত অশ্রুত্ব করতে পারতাম এবং বা আমি এখন অত্যন্ত স্থগার চোখে দেখি—সেই লক্ষ টাকার সঠক আমি ত্যাপ করছি। যাতে সে টাকাতা আমাকে না পেতে হয়, সে উক্ত আমি নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক দু’ মিনিট আসে এখান থেকে বেরিয়ে দাব এবং তা ফলেই সঠক ভর করার মকম এ টাকাতো আমার আর কোনো অধিকার থাকবে না।”

পড়া শেষ করে কাগজটাকে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে মহাজন ঘীরে ঘীরে দেই আশ্চর্য্য-লোকটির মস্তক চুখন করলেন, —“তার দু’ চোখ বয়ে তখন বস্তু বস্তু করে চল পড়ছিল। তারপর সে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

জীবনে কখনও—এমন কি কখন তিনি জুয়া-খেলায় গার সঙ্গস্বাস্ত হয়ে গিয়েছিলেন—তখনও তিনি নিজের উপর এমন বিতৃষ্ণা অহুকব করেন নি। বাড়ী এসে তিনি চূপচাপ নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন, কিন্তু প্রবল মানসিক উত্তেজনা ও ক্রন্দনের ফলে বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতে পারলেন না।

পরদিন সকালে বন্দীর স্বরের প্রহরী ঘোড়তে ঘোড়তে এসে মহাজনকে বলল যে, তাহা বন্দীকে জানাশা বেয়ে বাগানে নেন সমস্ত বরজা নিয়ে বাড়ীর বার করে যেতে বৈশেষে। মহাজন তখনই তাঁর চাকরবাকরদের নিয়ে বন্দীর স্বরে গেলেন এবং চারিদিকে বন্দীর পলাতন-সংবাদ প্রচার করে দিলেন। অনতিক্রমে অনবরত হাত থেকে উদ্ধার পাবার উক্ত তিনি টেবিলের উপর থেকে সেই কাগজটি তুলে নিলেন ও তাঁর পোহার দিক্কে ঢাবি বন্ধ করে রেখে দিলেন। ৩

ফ্রেডম ড্রিং: পেনসিল

প্রান্ত পলাশ বৎসর পূর্বে আমবা বনন বুলে পড়ি গ্রাম, তখন কুমোলে পড়িতে আরম্ভ করিবার নয় মাগ্য আঁকিবার পুণ পড়িয়া যাব। কেবল outline আঁকিবারে আমরা সম্মত হইতে পারিতাম না। উহাতে রঙ দেওয়া চাই; নচেৎ খানাইবে কেন?

মাগে রঙ দিবার জন্য তখন আমাদের কাছে এখনকার মত এক সরঞ্জাম থাকিত না। একটি পাতলা কাঠের বায়ে কয়েকটি ছোট ছোট চোকা রঙের 'কেক', সর বোটা কয়েকটি তুলি, একটি চীনা খাটীর স্টেট (রঙ শুকিবার জন্য), আর কয়েকটি ডিশ (ছোট)।

এক কয়েকটি রঙের কেক ছাড়া সবুজ রঙের জন্য আমরা বাড়ী বাড়ী খুঁজিয়া সম্ভান করিতাম—কোন বাড়ীতেই পিতা গাছ আছে কি না। কখনে রঙের জন্য অন্তঃসূত্র বন্ধনশালায় অভিযান করিতে হইত। লাল রঙের কাজ লাল কালিতে পারিয়া লইতাম।

পলাশ বৎসর পরে এমন দেখি, বাড়ীর প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে একটি করিয়া কার্ড-বোর্ডের বাস্তব যোগাড় করিয়াছে। বাস্তব উপর লেবেল হিসাবে একটি লুপ্ত ছবি আছে। প্রত্যেক বাস্তব তিন্তর গারোটি করিয়া যেটা পেনসিল। প্রত্যেক পেনসিল এক এক রঙের।

যাওয়া 'নিরীক্ষণ' করিয়া দেখিলাম, উহা ভাগ্যানে ভৈয়াতী। প্রত্যেক বাস্তবের নাম ছয় পলাশ, কোথাও কোথাও চার পলাশও পাওয়া যায়। কিছু কাল পূর্বে এইরূপ বাস্তব যাত্রার ধারে বৈরাগীরাগারের কাছে দেখিয়াছিলাম। সেগুলি আশাশ। তাহার নামও বৈরাগী।

ছেলে মেয়েরা মাগ্য আঁকিতেছে, ছবি আঁকিতেছে—ঐক্যবন্ধ, বাস্তব—এমন কি 'আমারও! আর পেনসিল খরিদা মনের সাথে রঙ করিতেছে।

ঐক্যবন্ধ ছবিগুলি এমন সুন্দর হইতেছে যে কোন প্রথম শ্রেণীর বাসিকগণে জিব্ব ছবি রূপে মুদ্রিত করিলেও সেহাও খারাপ দেখায় না।

মাগ্য ও চিত্রাঙ্কনের এইরূপ আধুনিক কত রকমের

আগেচন্দ্র না চন্দ্রকে! সে সকলের মধ্যে সঙ্গাপেকা লিখ-পছন্দ কিনিম এই crayon pencil। এট পেনসিল প্রস্তুত করা কঠিন নয়—মাগ্যের রকমের বড় বড় কলকলার প্রয়োজন নাই—অল্পই মূল্যে প্রকাণ্ড তারখানা স্থাপন না করিলেও কতি নাই।

এট পেনসিল প্রস্তুত করিবার উপকরণও অতি সামান্য। (১) মোম, (২) চর্কি, (৩) রঙ। মোমটা যেত পলাশ হইবে, রঙের বাস্তব ততই খুলিবে। কয়েকটি পাত্র চাই। একটি—মোম ও চর্কি গলাইবার পাত্র। আর একটা কল গরম করিবার পাত্র, বাস্তব তিন্তর মোম গলাইবার পাত্র বলাইয়া দিয়া গরম কলের তাপে মোম গলানো যায়। ইহাতে যদি সুবিধা না হয়, অর্থাৎ মোম ও চর্কি গলিয়া না যায়, তবে উত্তমের মৃত্তা দ্বারা গলাইতে হইবে। বেশী তাপ দিলে তিনিসটি পুড়িয়া বা আঁকিয়া দিয়া বিবর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

রঙগুলি খুব মিহি চূর্ণ হওয়া চাই। ভাল রকম চূর্ণ না হইলে, কিবা বিঁচ থাকিলে পেনসিল ভাল হইবে না। মিশ্রণও উত্তমরূপে হওয়া চাই।

কালো রঙের পেনসিলের জন্য কৃষ্ণ ভাগ, সাদা মোম চম্প ভাগ, চর্কি বন ভাগ।

সাদা—জিৎ হোয়াইট চম্প ভাগ, সাদা মোম কুড়ি ভাগ, চর্কি বন ভাগ।

নীল—ফ্রিসিয়ান ব্লু পেনেংহো ভাগ, মোম পাঁচ ভাগ, চর্কি বন ভাগ।

কিরোজা—ফ্রিসিয়ান ব্লু বন ভাগ, সাদা মোম কুড়ি ভাগ, চর্কি বন ভাগ।

হলসে—ক্রোম ইয়েলো বন ভাগ, মোম কুড়ি ভাগ, চর্কি বন ভাগ।

চর্কি ও মোম গরম করিয়া গলাইয়া রঙগুলি তাহার সঙ্গে মিশাইতে হইবে। মিশ্রণ যেন নিশ্চয় হয়। মশিনার তৈল বা সর্জন তৈলের সঙ্গে রংভরা যে ভাবে রং মিশায়, সেই ভাবে মিশানো চাই। রংভরা একটা পাথরের শিলের উপর কিছু তৈল ঢালিয়া তাহার উপর রঙ মিশা একটা পাথরের কুড়ি দিয়া বহুক্ষণ ঘরিয়া মচন করিয়া তৈলের সঙ্গে রঙ মিশায়, দেখিয়া থাকিবেন। ইহাও সেট ভাবে মিশাইতে হইবে।

এক কণ্টক কণ্টকে ঘেঁষা হঠাৎ হঠাৎ জ্বিন্দা আসিবে।
ক্রমে তিনটি জ্বিন্দা মিলিয়া তাল শাকাইলা থাকবে। নরম
খাতিতে খাতিতে ছাঁচে ঢালিয়া ঢাল দিয়া পেনসিলের আকাব
দিতে চাইবে। পেনসিলগুলি কেঁড়ে আঁড়ুলের ডগার মত ঘোটা
হলেই চলিবে। প্রত্যয় ঐ কালের ছাঁচ চাই। পেন-
সিলের কারখানার গ্যাংলারটের কাশা লত নলেব তিতর দিয়া
ঢাল দিয়া যেমন করিয়া পেনসিলের শিল তৈয়াব করা হয়,
ইহাও তাহাই।

ক্রমে ভ্রুহি পেনসিল তৈয়ার করিবার ইচ্ছা একমাত্র
পদ্ধতি নয়। পদ্ধতি অনেক রকম আছে। মপলাও নানা
রকম ব্যবহৃত হয়। তবে রঙ সকল পদ্ধতিতেই একই রকম।
বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আরও একটা পদ্ধতি
দিতছি। ইহাতে উপকরণও ভিন্ন প্রকার।

চর্চি নক্সাই ভাগ, সাধা রজন আড়াই ভাগ, রক্তনের
সাধন এক ভাগ। বাকী রঙ দিয়া এক শত ভাগ পূরণ
করিতে হইবে। প্রথম তিনটি জ্বিন্দা অতিশয় গলাইয়া
ঘাসা হইল তাহা base। উহার সহিত প্রসিদ্ধান দুই রঙ
আরও অক্সাইড (ইয়ার্ডী লাল রঙ), মেটে লিন্থ, চৌনের
লিন্থ, ক্রোম ইয়েলো প্রভৃতি যে-কোন রঙ মিলাইলেই
হইল। মিশ্রণ ও ছাঁচে ঢালা প্রথম পদ্ধতির মত।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতির উপকরণগুলির মধ্যে চর্চি ও রজন
এবং রঙগুলির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে। কিন্তু
রক্তনের সাধনটা কি? উহার সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনাদের
পরিচয় নাই; কলিকাতার বাজারেও যোগ হয় উহা। আপনারা
সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে উপায় কি?
উপায় আছে—উহা আপনাবিধকে তৈয়ার করিয়া লইতে
হইবে। উহা তৈয়ার করাও শক্ত কাজ নয়। কেমন করিয়া
করিতে হইবে তাহাও বলিয়া দিতেছি। ২২৪ ভাগ রজন,
২২৫ ভাগ নারিকেল তৈল ও ২৮ ভাগে শক্তির ৩১১২ ভাগ
সোডা লাভ দিন। রজন অল্প চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।
তার পর cold processএ উহাকে সাধনে পরিণত করুন।

রজন ও তৈল একটা পাত্রে নাড়িয়া চাটুয়া মিশাইয়া
উহাতে সোডা লাই বীরে বীরে ধারার আকারে ঢালিয়া একটা
কাঠের হাতার দ্বারা মিশাইতে থাকুন। সমস্ত জ্বিন্দা
মিশিয়া গেলে ময়ূর মত ঘন হইবে। হাতের দ্বারা নাড়া-
চাটুি বেশী করিবার ব্যবস্থা নাই। শুধু মিশাইবার ক্ষম
যেটুকু মরকার তাহাই যথেষ্ট। বেশী নাড়াচাড়া করিলে
একটা প্রতিক্রিয়া হইয়া জ্বিন্দা গারাপ হইয়া বাইবে।

ইহার পর ২৪ ভাগে বি-শক্তির লবণ-জল তৈয়ার করিয়া

উহার সহিত মিশাইয়া লইলে সাধনটা পূর্ণক হইয়া উপরে
ভাসিয়া উঠিবে। লবণ-জলটি তলায় পড়িয়া থাকিবে। সেটি
ফেলিয়া দিয়া সাধনটি লইতে হইবে। কিছুক্ষণ বাবে উহা
কমটা বাহিরে ছাঁচে ঢালিয়া কাটিয়া লউন।

রক্তনের সাধন বাজারে পাওয়া গেলে অল্প আপনাদের
এত মেহনত করিতে হইবে না।

অবশেষে রক্তের কথা। যে কণ্টক রক্তের নাম দেওয়া
হইল, তা ছাড়া আরও অনেক রক্তের পেনসিল হইতে পারে।
মূল বর্ণের সংখ্যা অল্পত বেশী নয়। কিন্তু দুই বা তিনটি রক্তের
ভিন্ন ভিন্ন অংশেতে মিশ্রণের দ্বারা হাজার হাজার রকম রঙ
তৈয়ার হইতে পারে। আপনাদের বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী-
শক্তি কিছু কম নয়। আপনারা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি
বাটাইয়া নিজেসাই অনেক রঙ তৈয়ার করিয়া লইতে
পারিবেন।

যে দুইটি পদ্ধতি দেওয়া হইল এক উপকরণগুলির যে ভাগ
দেওয়া হইল তাহাই চূড়ান্ত নহে। ক্রমে ভ্রুহি পেনসিল
কি পদ্ধতিতে তৈয়ার হয় তাহার একটা মোটামুটি আভাস
মিলাম। এইগুলি লইয়া ভাবিতে থাকুন। মূল তথ্য মনে
রাখিয়া বুদ্ধি বাটাইয়া চিন্তা করিতে করিতে অনেক নতুন
পদ্ধতির idea আপনাদের মনে আসিবে—আপনারা
নিজেসাই নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারিবেন।

ভাগগুলির সম্বন্ধেও এই কথা। কাজ করিতে করিতে
ভাগগুলির ইত্তর বিশেষ করিয়া, কিম্বা নতুন নতুন উপকরণ
লইয়া experiment করিয়া তাহার তাৎপর্যিক করিয়া লইয়া
আপনারা দৃষ্ট বিশেষ হইতে আশ্চর্য্য পেনসিলের অনেক
বৈশিষ্ট্য উৎকৃষ্টতর পেনসিল তৈয়ার করিতে পারিবেন।

কাঠের খোলের ভিতরে যে সব লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি
রক্তের পেনসিল তৈয়ার হয়, তাহার শিলটি তৈয়ার করিবার
পদ্ধতিও অনেকটা এই প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন বেকারের এই
ধরনের পেনসিল সংগ্রহ করিয়া তাহা দিয়া লিখিয়া ও অল্প
প্রকারে পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন, উহাদের গুণগত
মধ্যে উপকরণের ও প্রস্তুত-প্রণালীর কত পার্থক্য রহিয়াছে।
আপনার বা আশ্রয় ক্রমে ভ্রুহি পেনসিল দুই চারি বাহ্য
সংগ্রহ করিয়া তাহাও পরীক্ষা করিতে থাকুন। একই একটুকু
টুকু পোড়াইয়া, চূর্ণ করিয়া, রাসায়নিক প্রণালীতে
analysis করিয়া নানা প্রকারে পরীক্ষা করিতে পারেন।
তাছাড়া আপনাদের বুদ্ধি খেলাইবার, উদ্ভাবন করিবার শক্তি
বুদ্ধি পাইবে। শুধন ভাল ভাল জ্বিন্দা তৈয়ার করা
আপনাদের সঙ্গে কিছু কাজ কঠিন হইবে না।

লণ্ডনের ব্রিটিশ দানগুলির মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম। এখানেকার সংগ্রহ খুব ভালই, কিন্তু সর্বশেষ ভাটিকানের সঙ্গে তুলনাটা মনে আসে, কারণ ভাটিকানের অনেক বিভাগ এখানেকার চেয়ে বড়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সৌজিকর খুব চমৎকার। বা পাওয়া যায় এমন বই বা কাগজ নাই, বসিমা লেখাপড়া কবিতারও খুব সম্বাদবা আছে। ব্রুট ট্রাটের বড় বড় পথের কাপড়ের অফিসগুলি খুলিলাম। হিন্দু টেম্পল, গ্রেস্ টেম্প ও লিংকল্ন্স টেম্পগুলি খুলিলাম। মধ্যযুগ-যুগের পুথান বড় বড় বাড়ি, যাকবানে প্রাণত পুথান বহুপথ আছিল। এই টেম্পগুলিতে আমায়ের বেপার বড় ছোট কত ব্যস্তিটার তৈয়ারী হইয়াছেন, মধ্যযুগ গাভী, বেশবন্ধ প্রভৃতি কত বিখ্যাত লোক ছায়াবস্ত্রা এখানে যোগাখুঁর করিয়াছেন। হাইকোর্ট অফ জাষ্টিস্ খুব প্রকাণ্ড বাড়ি। ওয়েস্টমিনষ্টার পাড়ার পদার্থবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিভাগের বাড়িগুলি, কটলাও ইয়ার্ড, ডাইনিং ট্রাটে প্রধান মস্তার বাড়ি প্রকৃতি ন্যায়না জার্মাণি দেখিতে বড় আনন্দ লাগিল। অল্ড উইচে ভারতীয় হাই-কমিশনারের প্রকাণ্ড নতুন অফিস বেশ সুন্দর ভাবে সাজান। নীচের তলার ছোট একটা ভারতীয় একত্বিগুন রাখা হইয়াছে। হন্স-পার্ভ-এর পাহারা বরলির অক্সফোর্ড হিথেনবীরা সকলেই তীর্থ করিয়া দেখে। অ্যাড-মিস্টার-অর্ডের তলা দিবা সেন্ট-জেনস্-পার্কের মধ্যে বেড়াইতেছিলাম, দেখিলাম ব্যাপপাটন বাজারী ব্যাংক-অফ-ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবর্ষের পত্রিকাব্যবসায়ী পার্ভ হন্স-পার্ভের দরজা দিবা পার হইতেছে; হন্স-পার্ভের মাস্ত্রীরা প্রেক্ষাগৃহে লোকালি দিল, ব্যাংক-অফ-ইংলণ্ডের পাহারা ওয়ালাদের অফিসার বোলা তলোয়ার হাতে "হাইজ লেফট, হাইজ ব্রক্ট" হুইন করিলেন; ছোট ব্যাপার, কিছু কি হুনিপুত্র ওঁ হুইটাবে অস্ত্রীত হইল! বেশবস্ত্র কত ওষিগিটের মধ্যে পাল'কেট ট্রাটে লোকারণ্য জমিয়া গেল। ওয়েস্টমিনষ্টার আদি রাজাদের অভিনয়, বিবাহ, টেম্প ওষ বিখ্যাত লোকসেন সমাধিস্থলরূপ প্রসিদ্ধ।

ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের সর্বদিকাপের বড় বড় লোকদের নাম দেওয়াসে ও মেয়েক পড়িতে পড়িতে ও পূর্ণদর্শি, অর্ধদর্শি দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ডের নৌগণ-ইতিহাস মনে জাগ্রদমান চক্কর উঠে।

আর্ট-গ্যালারী, মিউজিয়াম বা ঐতিহাসিক বাড়িখর লণ্ডনের অনেক আছে, কিন্তু টেম্প খুলিয়া আসিয়া এসবের দিকে আর বিশেষ দৃষ্টি দিবার অবকাশ হয় না। ব্রিটিশ শাসনের কলে ও ইংরেজি সাহিত্য, ইংরেজি ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকার এবং মধ্য-যুগের, ধর্মের কাপড় ও মিনেখার কল্যাণে এবং শেষতঃ বিলাতকেন্দ্রের সংসর্গ-মহিমায় লণ্ডন সহরের অনেক জিনিষের সঙ্গে বেশে থাকতেই আমায়ের কিছু কিছু পরিচয় হইয়া থাকে। "রহস্ত-লহরী"-তে প্রাতিভাত্তিক বহুল বুদ্ধিতে নাবালক একটা ছোকরাকে লণ্ডনে হঠাৎ বেকার ট্রাট আবিষ্কার করিয়া মগ্ন উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছি। খুব হইতে লণ্ডনের যে সব জিনিষ আনায়ের খুব বড়ই দেখিরা আশা হয়, কাছে আসিয়া দেখা যায়, সেগুলি আসলে এমন কিছু বৃহৎ নয়—বিশেষতঃ লণ্ডনে আদিবার আগে যদি কটিনেন্ট পোয়া থাকে, তবে লণ্ডনের সবই বেঁটে, ছোট ও সরু মনে হয়। পিকা-ডিলি, অক্সফোর্ড সার্কাস, চেয়ারিং ক্রস্ প্রভৃতি বলিতে যা সম্মিত বাহাযের ভিত দিবা চল পড়ে, এখানে আসিয়া তাঁরাযের খুব বড় হইয়া যায়, অবশ্য দেশে কিরিয়া গা'ল দিবার সময় খুব গোলে। "বিগ-বেন"-এর নাম না শুনিয়াছে কে? মধ্যে বিগ-বেনের কিছুদিন অস্থায় করিল, সারাইবার ভদ্র মিস্ত্রী বজ্র লাগিল, রাজা-রাজকুমার অক্সফোর্ড স্কুলটিনে বস বিগ-বেনের উপর সন্তোষবানেক ধরিয়া টাইমেলয় বস কাপড়ের বৈদিক প্যাগাগ্রাফ বাহির হইল, কিন্তু বেশিয়া মনে হইল, এমন উচ্চতা, আকার বা মাগলায়ের ব্যক্তি অর যে কোনও সহরে ও অনেক আছে। নিজেই জিনিষ লম্বকে ইংরেজের খুব একটা সর্গ আছে। ইংরেজের মত এমন 'আন্তরসমান জ্ঞান, এমন মধ্যপদার্থ ও 'ডিগনিটি' কোন জাতির নাই। নিজের সামান্য জিনিষের একটা গুণ থাকিলে ইংরেজ তাকে শুধু যে

পাতিব্রত ও সম্মান করে তা নয়, তাই সুখ্যাতির কথা সম্বন্ধে কে পড়ায় তিনিও তিনিই নিঃকরই যেন অস্বস্তি-ভ্রম-ভ্রান্তি নাড়াটাকা দেয়। পদবানের খাটটি কপাটটিও সত্ত্ব ৪৪ এবং গুণগোষ্ঠের কাছে আসতেই হইলে প্রাণের শোক আরও গুণগোষ্ঠের প্রকাশ করে, তাই এতদেব সব ভিনিয়ে 'রাগার্ড' এত উচ্চ। অমাবস্যা যেন উল্টা ভাব, অজ্ঞতা ও ভুলভুল বস্তু আমবা পাঠগণকে নিঃস্বপ্নে তাল ভিনিয়ে প্রাণের বা সম্মান করি না এবং যাহা বাস্তবিকই উচ্চ বা ভাল বা সুন্দর, তাগণকে কল্প করিবার চক্রে খেলা ভিনিয়ে খুব বাহা দিয়া বড়াই বজায় রাখিবার চেষ্টা করি।

এই বাহিনে খুব নাম-ডাক কিন্তু আসলে নাতিবুদ্ধ হইলে-
 মের এরূপ আর একটি ভিনিয়ে হইতেছে 'পাশায়েট'।
 হাইসেন্স অফ পাশায়েটের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সত্ত্ব বেধিলাম। প্রথমে একটি ছোট্ট হল, রাজার 'রোবিং কন'। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাজা মহাশয় কি সত্যই এই হলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া 'রোবিং' করেন? প্রহরী একটু হাসিয়া হলের পাশে একটি ছোট্ট কামরা দেখাইয়া বলিল, রাজা সেখানে 'রোবিং' করিয়া এই হল হইতে আসিয়া দাঁড়ান। প্রতি বৎসর নভেম্বর মাসে পাশায়েট উদ্বোধনের সময় রাজার 'রোবিং' করিয়া এই হল হইতে পরের ছোট্ট সলিতে আসেন, সেখানে রাজপুত্র ও রাজকন্যার অঙ্গনা করেন। এখানে হইতে প্রবেশন করিয়া রাজার 'রোবিং' একটা কবিত্বের নম্বা দিয়া যে বসিতে আসেন, সেটি হইতেছে হাইসেন্স অফ লর্ডস্—রাজসভার লাইব্রেরীর আকরের একটি হল, এক পাশে প্রাচীরের উপর রাজার 'রোবিং' ও প্রিন্স অফ ওয়েলসের সিংহাসন, সামনে বেকের উপর লর্ড-চ্যান্সেলারের আসন, হ'পাশে লাল চামড়া বোড়া লম্বা লম্বা বেঞ্চি, উপরে গালাস্ট্রী। পাশায়েটের উদ্বোধনের সময় রাজা এখানে আসন গ্রহণ করিয়া কমান্ডারের ডাকিয়া পাঠান। রাজ-নিঃস্বপ্নের সান্নাধ্যনি হলের অপর প্রান্তে একটি রোবিং আছে, 'স্পীকার'-পুত্রের কমান্ডার এই রোবিং এর কাছে দাঁড়াইয়া রাজার 'সিগ্‌নাল' হইতে বক্তৃতা (speech from the throne) করেন, এই বক্তৃতা-এর বেশি অঙ্গন হইবার অবিচার কমান্ডারের নাই। প্রিন্স-কাউন্সিলের সভা চিনিয়ে অপর প্রধান মহী কমান্ডার হইলেও রাজসিংহাসনের

পাশায়েট বসিতে পারেন। হাইসেন্স অফ লর্ডসের পরে লবি ও কবিত্ব, আরো পাশে লর্ড চ্যান্সেলার প্রকৃতির বসিবার ঘর, এই লবিই সোমনার মধ্যে বসিবার না তাঁহাদের পুত্রেরা চাড়া অস্ত্রের প্রবেশাধিকার নাই। আভিজাত্য-পুত্রের এই সব নিয়মে এখন কোন অর্থ বা প্রয়োজন নাই, সমস্ত ইংরেজ জাত এই সব সাবেক আদর-কাজে লাইয়া এখন কত ঠান্ডা ভাষা কবে, কিন্তু আভিজাত্য-ক্রিয়ের সময় প্রাচীন রীতি লক্ষ্য করেন। হাইসেন্স অফ লর্ডসের মহীয়েব বেকগুলি বেশি স্বার্থে লর্ড সিংহের কথা মনে হইল, তিনি বক্তৃতা দিয়া এই মহামন্ত্র সুপ্রাচীন ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানেরও সন্মান অর্জন করিয়াছিলেন।

হাইসেন্স অফ লর্ডসের লবি পার হইয়া হাইসেন্স অফ কমন্স, ব্রিটিশ জাতীয় জীবনের মস্তিষ্ক। সেই রানবোনে লাইব্রেরীর বহু ছোট্ট হল, এক পাশে 'স্পীকার'ের আসন, তাঁহার সামনে কমান্ডারের বসিবার জায়গা, টেবিলের উপর স্পীকারের আসনও, স্পীকার আসন ছাড়িয়া উঠিলেই কিংবা হাইসেন্স বহন 'কমিটি অফ দি হোল হাইসেন্স, Committee of the whole House' হইয়া লবি ভবন এই বহু টেবিল চটেতে নামাইয়া নীচে বেকের উপর রাখা হয়। হলের অপর প্রান্তে 'সার্কেল অফ আর্মস' এর আসন, হ'পাশে কাল চামড়া বোড়া সারি সারি বেক, উপরে গালাস্ট্রী। স্পীকারের ডান পাশের দ' ডিন সারি বেক মহী ও ক্যান্টিনেট বেকসের ভিত্তি, ইহার প্রথমটিতে কোন্ বিনীত জারবার প্রধান মহী বসেন, তাহা প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলাম। হাইসেন্স অফ কমন্স সান্নায়ে ব্রিটিশ জাতীয় জীবনের বহু কিছু ভাল, যাহা কিছু বড়, তাহার বৃত্তি ও কীর্ত্তিবৃত্তি। বেশি বইয়ে পড়া কত কথা মনে পড়িল—কত দুরূহ রাস্তারাজ এই হাইসেন্স অফ কমন্সের হাওয়ার জীবন কাটাওয়া গিয়াছেন, অসুখ সাপেই বহু-একটা এখানে যে বসে ও কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকের ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। বেওলালের মাঝার রকম কালের সারি বেশি মনে পড়িল, একদিন হাইসেন্স আলোচনা সভার সভাপতি বসিয়া 'চলিতকাল, তাকে স্বর্গের আলো এই সাদৃশ্যে প্রবেশ করিয়া যে দৃষ্ট স্ট্রী করিয়াছিল, তাহা যাহা অস্বাভাবিক হইয়া উঠিলেও পিউ যে বর্ণিত হইয়া গিয়া কাটা দেখাইয়াছিলেন তাহাতে বেশি দর দর বস উঠিয়াছিল;

এখানে সম্ভবতঃ তাঁহার স্বাভাবিক বিন্যাস করিয়া প্রো-
থেন মন্ত্রের কথিত্য বর্ণিতেন, সাধাবশতঃ যেখানে গ্রাম ৫০০
ঘেঘোনে ঘনো ৫০০০ বৈশি উপস্থিত থাকেন না, সেখানে
সম্ভবতঃ বক্তা আরম্ভ করিয়াছেন শ্রুতিগেট লবি, লাইব্রেরী,
ডাইনিং-রুম হইতে মেঝেয় বোড়ি আদিয়া হাউল কানার
কানার তহায়া তুলিতেন। হাউল অক কমলেন মতিয়া
বর্ণনা করিতে হইলে ইংলণ্ডের আর্থনৈতিক ইতিহাস আবার
দমস্তা আবার করিতে হয়। ছোট্ট খসি বটে, কিন্তু
ব্রিটনের চিত্রপট; ইংরেজের চিত্র আছে, বুদ্ধি আছে, কাজ
কি করিয়া করিতে হয় জানে; সাধসম্মা নাই, আভ্যবর নাই,
কোন ভীষণতম নাই, নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে
“শ্রীকার” নিষেধ করিয়া কোন বাধাবোধি নিয়মের মধ্যে না
সিদ্ধা একমাত্র “লিঙ্গিডেন্ট”-পরিচালিত হইয়া, বহু দলানি
তর্ক-বিতর্ক বিবাদ-বিতণ্ডা লগ্নে ও ভাতি ঐ একই ছোট
দরত হইতে সেখানে যেমন ক্ষুদ্র ইংলণ্ডে, একালেও তেমন
বৃহৎ এশিয়াতে, লমনি বসন্তায় “হিজ ম্যাজেস্টি গবর্নেন্ট”
চালাইছে। এক একটা ভাঙে মধ্য এক একটা গুপের
উৎকর্ষ দেখা যায়, আদ্যের বেগের কাগজে যেমন সামা-
তিক ভাবের পরিপূর্ণ হইয়াছিল, ইইয়োগে তেমন উন্নতির
ধারা পলিটিক্সের পথ লইয়াছে। ইউরোপের সব ভাতি
সীকার করে—পোলিটিক্যাল সুবুদ্ধি, পোলিটিক্যাল অভিজ্ঞতা,
কর্মসূচনতা ও পটু ইংরেজের যেমন, এমন কাহারও নাই।
“পার্লিমেণ্ট-মাতা”কে দেখিয়া ও তাহার বাহুস্বর্গের পিছনে
ব্রিটিশ-চরিত্রের পরিচয় লাভ করিয়া এ ধারণা স্পষ্ট হইল যে,
‘মেকন ওয়ান’ ব্রিটিশের বক্তা ও বিতরণ ও মেকন ওয়ান
আমাদের পলায়িত ও বিবাবে অনেক তরুণ।

হাউল অক কমলেন আশেপাশে লবি, করিডর, লাইব্রেরী,
নিশি মেঝেয় বসিবার ঘর প্রকৃতি আছে। সারা হাউসেল
অক পার্লিমেণ্টের অব্যে কতিভার প্রকৃতিতে যেখানে অনেক
পূর্নায়ে ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি আঁকা বা স্কালান আছে,
যেখানে মেঝেতে অনেক তার ও প্রান্তর-কমরও বসান
আছে। ওয়ারেন স্ট্রীটের বিচারের সময় তিনি কোথায়
সাক্ষীরাছিলেন, সম্ভবতঃ স্মরণে লমাদিত হইয়া আশে
কোথায় রাখা হইয়াছিল, রাজা ও পার্লিমেণ্টের নিবাসের
পূর্বে পার্লিমেণ্টকে কনভেনশনে অনিচ্ছুক অমক রাজা কোন

রানডিতে নিবাসী পার্লিমেণ্টের সম্মুখীন হইয়াছিলেন প্রকৃতি
হাসেন লিপি পড়িয়া অতঃপর ঘটনাবলী স্পষ্ট হইয়া উঠে।
লগ্নে ইংলণ্ডের “কনস্টি-ভান” মোটেই গোপে পড়িল
না। কন্টিনেন্টের সাংসদের মত এখানকার সাংসদরাও
সাধারণ স্বাভাবিক মত, পাড়িতে পড়ে-পাটে অমরক কথা বা
শৌক-বসন্তে সকলের সাহায্য করিল। ততঃপরেও তাহার
নুন বহে। তবে কন্টিনেন্টের চেয়ে এখানকার লোক একটু
কম কথা বলে, একটু বেশী গাভীয়া দকা করে, একটু বেশী
আস্থান্যাদি ও আস্থাত্তর ও অস্তর সঙ্গে গায়ে পড়িয়া বস্তু,
আস্তরতা এমন কি আশাপণ্ড কম করে। এশিয়াতে
কল্যাণে অমর এদেশে বর্ণিষ্যবট কন্টিনেন্টের চেয়ে বেশী।
বর্ণন অপরিস্রবের সঙ্গে এখানকার লোকের সাধারণ
বাংলার কন্টিনেন্টের তুলনায় কিন্তু বেশিবাংলার অপ্রয়ো-
জন ও লগ্নের লোককে এটা-ওটা ভিজ্ঞান্য কনিতান, দর্শন
মৌল্যই পাইয়াছি। বিশেষতঃ সাধারণ লোক বা লোকান্য
প্রকৃতি বর্ণন “সর” বর্ণিয়া করা বলে ও ইংলণ্ড তরুণদের
সঙ্গে যেমন করিত তেমন বাংলায় করে, তখন হাস ভাটীর
আদ্যের বেশ ভালই লাগে। সেইজন্যে আদ্যের এমন
হইয়াছিল যে, বেশ লোককে কিছু ভিজ্ঞান্য করিয়াছিলেন,
তাগনের কয়েকজন বর্ণিল, তাহার ভাবতে কিছু দিন ছিল,
ওঁ পাঠটা তিনি বাংলা প্রকৃতিও বর্ণিল। ইংলণ্ডের মধ্যে
তরুণদের একজন লোক ভারতীয় পলিটিক্স লগ্নে ভিজ্ঞান্য-
বাং করিলেন। যেখানে বাণে আঘাত না লাগে বা
প্রতিযোগিতার কথা না শুনে, সেখানে তরুণের চলিলে
সাধাবশতঃ তরুণবর্গেরই পাড়া যায়। কিন্তু আদ্যের
অনেক এদেশে আদিয়া অমর একটা কাণে একটু সুস্থি
বাধায়া বসেন; সেখানে পাড়িতে সাংসদের ভয় করিয়া দূর
হইতে সেলান করিয়া এখানে আদিয়া বসন যেমন ভয়
করিবার কিছু নাই, অনেক “সাব”ও বলে, তখন হঠাৎ
তাগনের মাথাটা কি রকম গোলমাল হইয়া গায়, আদ্যের
আদ্যও এক একজন বড় বড় সাংসদ, লুন ওয়াসি
চালিযাতি করিতে আরম্ভ করেন, ইংলিড তরুণের নিয়ম-
বাহন ভূমিগা দিয়া সাংসদরা তাগতে ভারতবাসীর সঙ্গে যেমন
আদ্যের সাংসদ করে, এখানে বর্ণিয়া পাঠিয়া সাংসদের
উপবই দিগিয়া লেট সাংসদরাই দোষ করেন, সবত বা

লাগেবেক) তি তাদিহা বাওহাও চীংকার করিহা কথ্য বলা, ক্যাহকেও প্রাণ না কথ্য, নিজেহ রেগে নিতপন বা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে হাঁকিয়া সমকায়িহা কথ্য বলা, বেশানে লেখানে সব বিহরে নিজের উচ্ছাস্ত বাবহাও প্রকৃতি খোর অ-কৃতিপ নিতপন বেগলোহা দেই ঙ'ল অসিত্ত করেন—সঙ্গে বে এখানকাহ লোকে ঔগাহের 'সাহবেদিকান' সাবাস্ত করিহা বন্ধন বা বহিষ্কার প্রকৃতির বাবহাও করিহে, তাগাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

১১নং পাওহাও ইংরেজ গলাই-এ-লি-এ চট্টোলেতে অনেক ভারতীয় ছাত্র থাকেন। আগে এখানে আরও লোক থাকিত, কিন্তু অনেক কারণে এখন লোক কনিহা গিয়াছে, যথা বলাদলি, কক্কপক প্রভৃতি নিম্নম সঙ্কে অসচ্ছিত্ত প্রকৃতি; বিনা অসুখতিতে খরে থাকবীনের উচ্ছাস্ত হিবাস্ত লটহা অসিহিছ বসিহা অনেকের স্বভাবই একটু অসুখিহা হহ। শুনিলাম, আগে ছাত্রেরা সাত্তা হইতে বে সে নেয়ে ধরিহা হট্টেলের রেবরীতে আনিহা পাওহাওহেন, লাইউতে, খরে আছা হিহেন; সাধারনতঃ সাত বাসটার মধ্যে চট্টোলে কিরিবার নিম, তবে বে কেক আগে অসুখতি লটহা সাতিলে নাইট-পোটারকে আগাইহা বত সাত্তে ইচ্ছা ফিরিত পাহেন, কিন্তু অসুখতি কেন লটব অনেকের এট অচিনমান হটল; এমণে নিম—আগা-বাওহা ওলা-কোরা সব নিঃশবে করিত হইবে, হিহেনতঃ সাত্তে, বাগাতে অসু লোকের অসুখিহা, বিকি বা কুমের বাবহাও না হহ! হট্টেলের একজন প্রাক্তন পরিচালকের কাছে শুনিহাছি বে, অনেক ছাত্র সবাস্তবসলে ক্ষতিভরা প্রাণে অনেক সাত্তে কিরিহা হোয়া করিতে করিতে সি'ফি ওয়া, খরে ঢোকা প্রকৃতি করিতেন, পরিচালক আগতি কহাও ঔগাহা অপমানিত হোহ করিলেন। এই সব কিসের নিরমাহি হজাং অনেক বাহিরে দাকা পছন্দ করেন। এই হট্টেলের ষ্টিক সামনেই লওন টেনিসফিল্ডির একটি বৈতর' আছে, সেখানে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ। কারণ শুনিলাম, ইংহা 'বানান' ভানে না, বিপেনতঃ নিজের বা পানের টেবিলের খেজের সঙ্গে চট্ট করিহা অতিমাত্রায় খনিটত। করিহাও চোঁ করে। ইকায়সাপানাম ইন্ডেন্ট মুলসেন্ট লওনের পূব বড় একটি অরগানিকেশন, এখানে সব বেশের ছাত্রদের ভক্ত স্রাব, রেগব' প্রকৃতি আছে। সব বেশের ছাত্রছাত্রী-বাগাতে

অবধে পরম্পরের সঙ্গে সামাজিক ও ইন্টেলেকচুয়াল সংযোগে আসিত্তে পাবে, সে চোঁরা এখানে কবা হহ, কিন্তু পোশন খবর শুনিলাম বে, কক্কপক মেহে-মেহাওহের প্রথম হইতেই ভারতীয়দের সঙ্গে সাবহানে নিবনবার উপদেশ দিহা যেন। "কনমার-হাউল" নামে লওনের অনেক পাড়াহা একটা জিনিষ আছে, বিশিষ্ট মোড়ে মোড়ে প্রকাও প্রকাও চার পাঁচতলা বাড়ী, চিত্রি তলাহ ব্যাও থাকিতছে ও পাওহা-বাওহা হইতেছে, বাহও সস্তা। এখানে বহু সহস্র গ্রীষ্মকূল বৈকাল সন্ধ্যা কাটাও এবং নেত্র-বস্ত্র-বিক্রয়াদি চেষ্টিত সস্ত-ইহিতে বস্ত্রাভরীও সংগ্রহ করে। একটি ভারতীয় ছেলে একটি টেবিলে বসিহা হিলেন, পানের টেবিলের একটি খুতী কুকর্ক লোক বেখিহা ঔগৎ হাত্ত করিলেন, চেসেট তাকিলেন বাস, তবে আর কি ? বস করিহা নিজের টেবিল ছাড়িহা খুতীও টেবিলে গিয়া প্রগর-সম্মুখে ভানাইলেন, খুতী উঠিহা গিহা মানেভাহের কাছে দাশি করিলেন, মানেভাহ আসিহা এক হাত্তা পোকতরতি কানের নাকথান দিহা বাড়ে হাত্ত দিহা ভারতীয়কে সি'ফি পথ বেশাইলেন। সা থোন ছাড়া অনাস্তীয়া অস্ত্র গ্রীলোক বর্ণনে অনভাস্ত আদাহের বেশের মাল-পিলির অকলের নিখিহা এমণে আসিহা নারীসখ লাভ করিহা টাল সামলাইতে পারেন না, অধিকাংশেরই তাগো কিছু বেখিলাম, পরলাখোর বা হোটেলের চাকরাণী বা হোকানের কর্তাসিহির বৈদী কোটে না, বিবাহ কারহা যেনে লইহা সেলে অবত সন্মুখেই ওর্ড-বোহা ক্যামিলির খেয়ে হইহা বাহ! কলিনেটের ভারতীয় ছাত্রেরা চোঁরা করিলে ঐবেশে ভক্ত-পাড়াহাওে বিশিষ্টে পান, কিন্তু ইংলণ্ডের ছাত্র বেভারদের বড় দুঃখহা। বাহারা অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ পড়েন বা লওনে ব্যাবিগারির ভিনার খান, ঔগাহা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে আবহ থাকিলেও এবং নিজেদের স্বতন্ত্র টেবিলে বসিহাও, তবু অস্ততঃ বসবস ভক্ত ইংরেজের বক্তৃ-সকন বেখিহা অনেকটা শিখিতে পারেন, কিন্তু লওন অভিবহা প্রকৃতি হানের ছাত্রেরা চপাচ বসলর থাকিহাও ইংরেজ ভক্তলোক বা ভক্ত-পরিবারের ছাত্রাও বাড়াইতে পান না। সাত্তাও-টের লোকজন, সস্তা হোটেলের কি চাকর, বহিঃ ল্যাবেলভিদের বেখিহা ইংহাওে বিলাতি শিখা সম্পূর্ণ হহ। এবেশে কি বাড়ী কি চেসেট সর্গদ 'গাপকন' ঔগাহের

মত কক্ষকে তত্ক্ষণে থাকে এবং সিংহাসনের ছাই বা শেখ-
টুই কেহ কখনও আশপটে ছাড়া অস্ত্র ধরে না ; পাওয়ার
ট্রাটে বেধিলাম, পারধানাগুলির পাশে উপরে বাহিরে আরই
যেখের মত অবস্থা হইয়া উঠে এবং লাউকে আশপটের
ব্যবহার নাইই । পাওয়ার ট্রাটে আত্মকাল নষ্টনা ও নষ্টিনি
ছাত্রদের আধিকা, বাহিরের বাসালী ছাত্রেরা ইহার “চিড়িয়া-
খানা” প্রকৃতি অনেক নান্য দিয়াছে । অব্যাহত ভারতীয়
ছাত্রদের ধর্মমত, কথাপ্রতি রকমসকল সম্বন্ধে মারালী
ছাত্রেরা অনেক রকম মজার মজার গল্প, পরিহাস প্রকৃতির
ভাণ্ডার জমাটাইয়াছে, সেগুলি বেলাৎ সিংহাও নয় । ক্রমে
সিদ্ধি চুপ করিয়া লেকচার শুনা, বাড়ী আসিয়া নিজেদের
মতো ছোট বড় গল্প অজ্ঞা কমান বা গল্প করা ; নথত
নিজেরা কয়েকজন একত্র হইয়া সিনেমা বা “করণার-হাউসে”
বা রোটেল গাওয়া, ইচ্ছা : ইচ্ছা পূর্বক প্রেমের ব্যক্তির
লাইয়া চিঠিবোঝন করা—এই করিয়া অধিকাংশ ভারতীয়
ছাত্রদের দিন, মাস ও বৎসর কাটে ; ইংরেজদের সঙ্গে কথা-
বার্তা বন্ধুর মতো থাকুক, সেখানকারই হয় না । বেশে ফিরিয়া
সবাই মত সাহেব হন বটে, কিন্তু বড় ভোর ডিক্রিট ছাড়া
অস্ত্র বেশী কিছু ভাল জিনিষ এসে হইতে সংগ্রহ করিয়া
লটখা থাইবার সৌভাগ্য অধিকাংশেরই ঘটে না । কটিনেন্টের
ছাত্রেরা এবং কটিনেন্টে পড়িতে আসে, এমন ইংরেজ ছাত্রেরা
কাপড়চোপড় সম্বন্ধে খুব সাধারণ, লন্ডনের ইংরেজ ছাত্রদের
সেই রকম বেধিলাম । সেকালে অক্সফোর্ড প্রকৃতি কয়েকটি
ফানে কাপড়চোপড়ের খুব বাধাবোধ ছিল, স্নাড্‌স্টোন বুড়া
বক্স অক্সফোর্ডের ছেলের বহুশৈথিল্য দেখিয়া আশ্চর্য
হইয়া বিব্রাভিলেন যে, তাঁহার ছাত্রবাহ্য অক্সফোর্ডে
প্রত্যেককে অস্ত্রতঃ এমন একজুট শোখাক রাখিতে হয়,
যাটা পরিয়া সে কখনও বাড়ী গাড়িয়া থাকা ছাড়া বসিত না,
পাছে তাঁর একটু নই হইয়া যায় । আক্সফোর্ড হো “অক্সফোর্ড
বার” সত্য চিলা গোথাকের আদর্শ । লন্ডনের ভারতীয়
ছাত্রেরা অনেক বেতন বহুবাহুল্য করেন, তাঁরা থাকের বড়
কম্বলারী ছাড়া অস্ত্র ইংরেজরা সহজে পারিয়া উঠেন না ।
লন্ডনে এত ভারতীয় ছাত্র আছেন, তাঁহারা যদি পরিচ্ছন্ন,
বাহুবী, পান্ডোজন, আবোধ-প্রমোদের বাহুল্য কমাইয়া
নিজেরা সমবেত চৌর্য হইলে চালাইয়া থাকেন, তবে খুব কম

খরচ লগেন বাস করিতে পারেন ; ইচ্ছা হইলে অনেক
ভাল টাকা লোকসান বহু হয়, এবং অনেক মেধাবী প্রতিদ্ব
ছাত্রও বিলাতি প্রকৃতির মতো পায় ।

লন্ডনের ভারতীয়দের খুব সাধারণতঃ তাই বেধিলাম ।
কটিনেন্টের ভারতীয়দের মধ্যেও এভাবে বেশ দেখা যায় ।
এসে বৎসরখানেক বাস করিবার পর অধিকাংশেরই
মোহ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া যায় । ইহার কারণ যে নিকট সংস্পর্শে
আসিয়া বিলাতি সভ্যতার অস্ত্র কতকগুলি বিক্রমে পড়ে,
বা খুব হইতে সস্ত্র হয় না । বিত্তীয়তঃ দেখা যায় যে, এদের
সভ্যতার সঙ্গে আমাদের দেশের কালচার ও মনোবৃত্তির কত
তফাৎ ; একটু চিন্তাশীল প্রকৃতির ব্যা, তাদের উপর এই
কারণটির ক্ষিপ্রা বড় গভীর বাগ দিয়া যায় । কৃত্রিমতঃ বেশে
থাকিতে যাহারা কেবল-মার্গের সাধনা করেন অর্থাৎ বিলাতি
আহার, বসন প্রকৃতির নিকট অতুল্য, সঙ্গার সময় নিউ-
মার্কেট অক্সলে ব্রিগা ইন্সপিরেশন সংগ্রহ ও মনের গুহ
এখানে একদিন কমেতে বিনবার লোভ শোষণ করেন,
তাঁহারা এখানে আসিয়া ৩’দিনেই বেধেন যে, এত সাধনা এত
অহর্যাসাধিত সব বিফল গিয়াছে, বতই যানী বিলাতি কাপড়
পকন, বতই মানী রোটেল বান, কিছুতেই সাহেবদের মত
হইতে পারিতেছেন না, কুলিন্দ্রব পথ্য তাঁহাদের “বিসার”ই
মনে করে, তখন তাঁহাদের “ভালাই বেরা ঠান্ডা বাস”
রকমের বক্তাবিদ্য প্রবল হইয়া ওঠে । অল্পদিন এসে
থাকিয়া বেশে ফিরিয়া যাহারা সাহেব হয়, তাঁহারা নির্দোষ ও
অস্ত্র বলিয়াই প্রবল হয়, তাঁহাদের সম্বন্ধে এসেের ভারতীয়রা
টিকই বলেন, “বেশী দিন হো থাকেন নাই, তাই একটু
দেখিয়া তাক শাসিয়া গিয়াছে ।” যাহারা বেশী দিন অর্থাৎ
দুই তিন বা ততোধিক বৎসর এসে কাটাষ্টা গিয়াছেন,
তাঁহারা বেশে ফিরিয়া কেন যে সাহেব হন এখনও বুঝিতে
পারিলাম না, হয়ত দুটোমি করিয়া লোককে ঠকাইবার চক্ৰ,
নথত দেশের লোকের প্রত্যাশবশত, কারণ ভুক্তকোশী অনেকের
কাছে শুনিয়াছি যে, সিংহা চলে চলিলে লোকে প্রাণা
মর্যাদাটুকুও হেরে না, বাকী চলে চলিলে খুব ভয়ভীতির
করে । একান্ত্রিমং বা পথ্যে পথ্যে এসে পাচ দশ
কুড়ি পচিশ বৎসর থাকিয়াছেন, এমন অনেক ভারতীয়দের
কটিনেন্ট ও লন্ডনে দেখিয়াছি, সকলেই সেই ভাব

পক্ষপাত, ভাবগত বা বাস্তবিক সঙ্গমের উৎসাহ, নিজেদের সারের বলিতে বা সাহেবি চাল দিতে রূপা খোঁপ করেন। এখানে আমরা একটু দোঁরা ডাল ভাত, একটু ঘেঁষে তরকারির খবর পাইলে সেট লোকে বড় চোটেলের হানী তিনার ছাড়িয়া বাইতে প্ররত, বদেবদের বাড়ীতে দোঁরা কানে খাওয়ার মনঃন পলম আগম্যন ও আত্মগতর চিক মনে করি। একটা বাস্তবী হস্তলোক মাপ কয়েকের ক্ষেত্রে এদেশে আসিয়া কতিবোটে এক বিশিষ্ট বাস্তবী হস্তলোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া সমাপনের পতিত দোঁরা কোঁচা খাইয়াছিলেন, তিনিই তিন দোঁরা ফিরায়া নিকা করিয়াছেন, “জান্না কে মনঃন করিয়া ডালভাত খাওয়াইয়াছিল! এমন আর কি লোক!” আমরা তিনা বলিলাম, “দেওর গ্রামে কি? তিন দোঁরা ফিরায়া যেন সারাভোঁবন পাড়ার সারার মোড়ের কেবিনটিতে বসিয়া প্রাণ তরিয়া চার পরবার চপ কাটিলেই খানি।”

এদেশে প্রাণবান কলে ভাতীয়দের আত্মগতন কান্তত হওয়া খুব ভাল চিনি, কিন্তু এই আগবণটি প্রত্নপূর্ণক হওয়া উচিত। এদেশের একটু বেশিয়া যেনে ফিরায়া দোঁরাভাব বিলম্বন দিয়া সারের চাইবার চোঁরা যেমন নির্ভুলিছা ও বিকল, তেমনই এদেশের খাগলটা বা আনাদের সঙ্গে অসামঞ্জস্য দক্ষ্য করিয়া এটা মনে করণে তুল যে আমাদের সব ভাল, এদের সব মন্দ। বিচারবুদ্ধিতে ইউরোপের ভালটুকু যদি সরলভাবে দেশের উপযোগ্য করিয়া আমরা গ্রহণ করি ও তৎপরায়ে আমাদের সেই সেই বিকল যে দুর্লভতা তাহা পোষণাইবার চেষ্টা করি, তবেই দেশ স্বার্থ লাভবান হইবে। বাস্তবিক আস্ত, বাবহার বা সামাজিক রীতিনীতির কথা তুলিতেছি না, কিন্তু এখানে আসিয়া আমরা সকলেই যে তিনিবটা বুঝিতে পারি সেটা এদেশের কর্তব্যোপ। এখানে সকলে কেমন করিয়া কাজটা ভাল করিয়া করে, সব কাজ এখানে কি ভণে যেন নিজে নিজেই প্রসঙ্গ হই, কেনই বা আমাদের দেশে কিছুই কাজ হইয়া উঠে না, সব সাধনাই শূন্যে বিলীন হয়—এই রহস্য যিনি ভেদ করিতে পারিবেন, এই তত্ত্ব যিনি নিজে বুঝিয়া লন অনেক শিখাইতে পারিবেন, তিনিই দেশের প্রকৃত উপকার করিবেন।

একদিন লন্ডনের ষ্ট্রট-এওর হারিট পলী দেখিতে গেলাম।

আগ্রাওরট্রাও দেখানে আগিয়া নামিলাম, সে জায়গাটাকে লন্ডনের অর্ধ ভ্রমপাড়ার তুলনায় হারিট মনে হইলেও আগ্রা-বার্তা স্থগিত মনে হইল না। এর চেয়েও বেশি নিস্তর দেখিবার আছে মনে কনিয়া পুলিশমানের লগ্ন লটলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ষ্ট্রট-এওর পলীবা পাড়া কোথায় দেখা যায়? পুলিশমান বলিল, “এট তো, চারিট পের্ট।” আমি বলিলাম, “না, এর চেয়েও খুব পলীবরা দেখানে থাকে সেটা কোথায় চাই,” পুলিশটি বলিল, “খুব নোংরা লোক দেখানে থাকে?” আমি বলিলাম, “হাঁ, খুব নোংরা পলীব লোকদের দেখানে অতি হস্তাগা অবস্থার দেখা যায়।” বর্ধমান বিশেষী লন্ডনের উন্টান্টিও খুঁটাওয়া দেখিতে চানিত্তেছে স্থিতি পুলিশমানের ব্রিটিশ আত্মগতনে আঘাত লাগিয়াছিল, একটু ধোঁচা দিয়া সে এই অপমানের শোব দইল, শান্তবরে পথের বদর দিয়া সে এই হুঁড়িয়া দিল, “এসব ভাষণায় অনেক কালা আদমিও হাল করে দেখিতে পাইবে!” অনেক গদি, বুঁচি, ঘুরিয়া ফেড়াইলাম। ওরো-এওর তুলনায় ষ্ট্রট-এও চমকপ্রবণ বটে, কিন্তু তার হারিট। বা নোংরাগি আনাথের কাছে এমন নুতন কিছু ভিনিস মোটেই নয়, অমন হারিটের প্রকাশ তো আমাদের দেশে বহুতর দেখা যায়। বাস্তবীক ও বাড়ীর হারিট। অপরিস্রব হইলেও ঘরের মধ্যে যেটুকু নুট্টেও পড়িল তাহার সাধলক্ষ্য ও আসবাবপত্রের সৌভব আমাদের দেশের অনেক মধ্যবিত্ত ভ্রমভরের চেয়ে শ্রেষ্ঠই মনে হইল। লগ্ন-লেনির অনেক কালা আদমিও দেখিলাম, ইংরেজ অনেক আবার চুপি তুলিয়া গেলামও করিল। একটা ছোট বোকানে কালা বোকানদার দেখিয়া চুকিয়া পড়িলাম, লোকটি দিল্লী অকলের, একটা ভাণ্ডার মেয়েকে বিবাহ করিয়া এখানে ব্র-সংসার ও কাহবার পাতিয়াছে, খুব কমিউনিষ্ট, পাকী মধ্যাজকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল।

দিন কয়েক হাইড-পার্ক বন্ধুতা তুলিলাম। পুলিশের লাইসেন্স লাইয়া বিভিন্ন লগ্ন বা সমিতির লোক রাউনডিক, সামাজিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ বিধে বন্ধুতা করিতেছে। সব বন্ধুতাই স্রোতা কোটি, অনেক লগ্ন হই বিবোরা লগ্ন পাশাপাশি হাড়াট্রা পরস্পরের হস্তাসের বিকল্পে ভীত সমা-লোচনা করিতেছে, যদিও তাহাতে পৌকস্তের কোন অভাব লক্ষিত হয় না; প্রত্যেকেই পরস্পরের কথা বলিতে হইলে

my friends over there বলিতেছে। বস্ত্রাগ্রাণী দৌড়
বন্ধ। কবিলেও শোভাভাণী কিছু নয় মনঃপ্রভাণী থাকে না।
দেখিল এটল ফ্যানসিষ্টরা হাউজ পার্কে সভা করিবেন শ্রীয়া
কমিউনিষ্টরাও সভা করিল। পাণ্ডে শান্তিভবন ১৪ একত্র
সম্মিলিত, বোম্বাইগোয়া, মেট্রি ও এডোয়েনগারী প্রাণী সমগ্র
লণ্ডন পুশিনফোর্ড জমাবৈত ইয়াডিল, “মার্কস-বার্ল”
ভোরসের উপর ঈদারিয়া উল্লেখ্য পুশিন-অফিসাররা অনবরত
বেতাবে পুশিন-কমিশনারের কাছে মিটিংএর ব্যবস্থাপন
পাঠাইতেছিলেন।

পাণ্ডার ট্রট ছাড়া লণ্ডনে “পাকি”, “কোফিহু”, “ইণ্ডো-
বার্ণা”, “মিল্লী” প্রভৃতি কয়েকটি ভারতীয় রেষ্টরান্ আছে।
আছে। “পাকি” পাকিস্তানী বাগা এবং “কোফিহু” ও
“মিল্লী” মিল্লী-অফিসের লোকস্বাধ্য পিটগালিত, “ইণ্ডো-বার্ণা”
বাঙ্গালীর হাউজ আছে। সবেস মধ্যে পাণ্ডার ট্রটই সভা,
বিশেষতঃ “শিলিং শোপাল” নামে এখানে যে মেসুর বাসনা
আছে তাহাতে বেশ পট করে। “পাকি”র নাম বেশ চড়া,
ভারতীয় একটি আর্থোথোডক্স, হাউজ টেবল কনফারেন্সের
ভেলিগেটরা এখানে মজলিস করিতেন। “কোফিহু” মধ্য
বক্সের নামের ভাণ্ডা, লোকও অনেক হয়। “ইণ্ডো-বার্ণা”
ও “মিল্লী” নৃতন ভাণ্ডা, নাম মাকারি রকমের। পাণ্ডার
ট্রটের বাসুন ঠাকুর ভাতে গোয়ানীও এবং কয়েকদের মধ্যে
বাকিশিখের প্রাণাও হওয়াও এখনকার রাজ্য ও মেসু মজলি-
ভাবেস, গোয়ানীও র’পুনির হাউজ উত্তর-ভারতীয় ডিনগুলি
ভাল করে না। “পাকি” ও “মিল্লী”তে পাকিস্তানী রাজ্য, যি
(অর্থ্যাৎ ফাট) মশলা প্রভূত, কিন্তু কালের অভাব, এটি
পাণ্ডার ট্রটের মজলি রাজ্যের বেশ পাণ্ডা যায়। বাঙ্গালী-
গালিত “ইণ্ডো-বার্ণা”তেও কিছু বাংলা রাজ্যের প্রভাব পাণ্ডা
যায় না। পাণ্ডার ট্রট ছাড়া অন্তর্গত কয়েকটি রেষ্টরান্ দেখি
লোক, বাঙ্গালী বা মেসু। পুণ্ডান কপড়ের বোতান হইতে
কীর্ণ জুজ কোট প্রভৃতি কিনিয়া অঙ্গরূপ সাধে-ওয়েটার
পাকিস্থানে। দেশমহই ভো সাধে-ওয়েটার, এই নাম
গোটা তিনচার ভাণ্ডাতে মেসুর লোকস্বের মধ্যে বলিয়া দেখি
বাণ্ডা বাইতে আসি, এখানেও যদি সাধে-বাধরাই দেখিতে
হয়, তবে ভো আর প্রাণী থাকে না? বাণ্ডার ট্রটের মধ্যে একটা
আট-বোথের দৃশ্য অভাবেস পরিচয় আছে। সাধেবাধ

লণ্ডনের মাকসানে-এট ভাণ্ডা কয়টি রেষ্টরান্গুলিকে যদি
ভারতীয় পানশাখার প্রভুত পোষাকে সাজান হইত এবং
অপাণ্ডাও ও গুরুসম্মার মধ্যে একটি ভারতীয় ভাবেস আন-
পান করা হইত, তবে বাণ্ডার ট্রট দেখিতে অনেক বেশী প্রভুত
হইত, এবং অধিকার ও “ওরিয়েন্টাল টাউ” থাকার দরুন
অনেক ইংরেজ ও লণ্ডনবাসী কটিনেটান ও আমেরিকান
কয়েকদেরও আকর্ষণ করিয়া বাসনার বৃদ্ধি করিত। নাকি
ও পাকিস্থা অনেক তরকারি প্রভৃতির মেসুর লিখিত মেসু-
নাম পাণ্ডার ট্রটের মেস-কিনের মধ্যে উচ্চারিত হইয়া অশুভ
আকার ধারণ করে। (এই প্রসঙ্গে প্রাকেরের কিতর
লিখিলে বোধ হয় নিত্যই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে “হোঁড়া”
দের উপস্থানে পাণ্ডার ট্রটের করুণক তরুণী বা যুবতী
রাখিতে করনা পান না; বৃত্তী বা ভগ্নসীমা যে কর্তিকে
রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কয়েক মত নাকমুখপারিত্রী একটি
কির বহুসী। যুব বৈশী না হওয়ায় এবং গালে চোটে হু মাথাটা
যে বৈশী হওয়ায় “হোঁড়া”রা অনেক তাহার এমনই খাতি
করেন যে, নিজেসু মহাপ্রবী মনে করিয়া সে এখন তার
বক-নাসিকটো আত্রও নুড়ে ঢুলিয়া ফেড়ায়। শুনিলাম কিছু
দিন আগে একটি মিস্ত্রিমুখ প্রেমীর ইংরেজ গলায় এটি
সাক্ষাৎকী ভুলাইয়া পাণ্ডার ট্রট হইলেস সামনে ঈদারিয়া
খাতিত “একজন ইণ্ডিয়ান আমায় নোকে ভাণ্ডাইয়া লটরা
দিয়াছে।” বহু-সম্মার গল্প-বাহারের সময় কিছু শোনা যায়,
দকলেরই বাঙালী “ইউনিভার্সিটি গাল”, ভাণ্ডানিতে হইলে
ধনী ব্যাণ্ডারের উত্তরাধিকারিণী।)

পাণ্ডার ট্রটে একদিন একটি সাক্ষাৎমিতি ছিল।
অনেকদিন পরে কয়েকটি বাংলা ও হিন্দী গান শুনিত মেসু
বোধ হইল। পাণ্ডার ট্রটের লিঃগী চাকরবাকস্বের মধ্যে
একজন লোক কয়েকটি সিংহী “কোব্ ডান্স” নাচিল, তাহার
মধ্যে “ব্যাং-নৃত্য” নামক একটি নাচের সখীয়া কিন্তু সহজ
বিক্রমকর্মিয়ার উচ্চাং লালিতা এমন “একসম্মারিত” হইয়াছিল
যে, আট-লিগ দকলেই যুব হইয়া গেলেন। সাধে আবহুল
কানের সভাপতি ছিলেন, তাহার পত্নীও উপস্থিত ছিলেন।
বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তৃতার পর আহুত না হইলেও ইংলেও
নবাগত, শীর্ণঅঙ্গরী, মধ্যবয়সী একজন শিখ ক্লিককি
প্রক্ষেপার বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ

জনসংখ্যার সব আশাশ্রয় দেশের অনেক কোইকুইকুই ইউরোপে খাতিব পাটখান ওটো প্রভৃতি 'কম্প্রোক্স' থাকে। শিব অধ্যাপক বেগম হর এদেশে আসা অবধি মূখ্য গুলিতে না পাইয়া বড়ই মনঃকটে ছিলেন, এখন স্থাবরা পাটখা এমন মৌষ প্রাক্কের অবতরণা করিলেন যে, চেপেটা বাগা হইয়া ঘন ঘন হাততালি পাতালি দিয়া তাঁহাকে বশবিহার চেষ্টা করিল, কিন্তু উটো সম্বন্ধেই শিবরান, এইবার ইউরোপে নান কাছির ও দেশের কাগজে রিপোর্ট হইবে তাবিয়া কল্প-লোকের উৎসাহ এমনই বাড়িয়া গেল যে, শেখটা একটা কেলেকাতির কোণাড়ি হয় আর কি !

লণ্ডন হইতে আবার সোলিডেট কাহাকে হাবুর্গ ফিরিলাম, এয়ারও নর্থ-সী বেল ঠাণ্ডাই ছিল। তিনজন ভারতীয় ছাত্র কাহাকে ছিলেন, একজন মহারাষ্ট্রী, ত্রিংশে এনিমিয়ারিং পড়েন, কিছুদিন কাম্বোপুত্রে কাছ করিয়াছিলেন তাই বেশ বাহালা বলিতে পারেন। দ্বিতীয়টি কচ্ছিক, তৃতীয়টি দিহলী তামিল—ইহারা চকন কেম্ব্রিক গণিত পড়িয়াছেন ও আই-সি-এস পরীক্ষা দিয়া দেশের পথে কিরিবার উত্তাপ করিতেছেন। আমেরিকা ও লণ্ডন-প্রবাসী কয়েকটি গণিয়ারন পরিবার বেশে ফিরিতেছেন—তাঁহাদের ইঙ্গুল বয়সের ছেলে-মেয়েরাও সঙ্গে আছে। অতি-ভরসা সোলিডেট-শিক্ষা কেনন হজন করিয়াছে বোঝাবার লোভ হইল, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সোলিডেট শুধু আলোচনা করিলাম, সে সঙ্ঘটি লাউক-বর বেশে ভবিষ্য উঠিল, তরুণস্বয়ং মা-বাগরাও আদিয়া সাঞ্জহ আলোচনার যোগ দিলেন। তরুণরা মেঘলায় খুব সতেজ ও উৎসাহী কনিটিনিট, বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে ও বৈশেষ্য সয়লতার সঙ্গে কমিউনিজমের মূলতত্ত্বগুলি বুঝিবার ও এরোয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে, একটা দুসাইয়া বা কলাইয়া প্রভৃতি করিলে ছেলেদের বেগানে উত্তর দিতে আটকাইয়া দেন, সেখানে মেয়েরা ছেলেদের খামাটয়া দিয়া সমস্ত সমাধান করিতে অগ্রসর হইল। ছেলেরা নিরুৎসাহ জ্ঞানবুদ্ধি অহুসারে আলোচনা করিল, ঠটিল প্রভৃতিতে সমাধানের অল্প পথ না পাইলে পুরুষোচিত বন্ধুপ্রয়োগের দ্বারা সব বাধাবিপত্তি খণ্ডনের ব্যবস্থা করিল; কিন্তু মেয়েরা নিরুৎসাহ বাটাইবার-

চেষ্টা না করিয়া সোলিডেট-ইঙ্গুলের শিক্ষকের নিদিষ্ট পথেই উত্তরের দ্বারা চালাইল, কাজেই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উত্তর সঠিক ও যথাবল হইল; শিক্ষকের যে ব্যবস্থা মনে পাইয়া দিয়াছে তাহাতে আপত্তি তুলিলে মেয়েরা কথিয়া কথড়া আরম্ভ করিল, এবং আরও বেশী বিরক্তিকর প্রভৃতি তুলিলে উল্লিখ্য বলিল, “আচ্ছা, তুমিই বল এটা কি ব্যবস্থা করা উচিত ?” মা-বাগরা মেঘলায় তরুণ উৎসাহে বহা উৎসাহী ও আলোচনার যোগদানে মনঃস্থক; তরুণরা কিন্তু আবার মা-বাগকে খামাইয়া দিয়া নিজেদেরই সমস্ত আলোচনাটা চালাইতে চায়।

হাবুর্গ হইতে একটি বছর মোটর-বাইকের গিছনে চড়িয়া একদিন বাস্টিক শাপরে মান করিতে গেলাম। পূর্ণে পূর্ণের Lubook সহর গড়িল, এখানে মধ্যযুগের অনেক বাড়িঘর আছে। সাগরতীরের কাছগাটির নাম ট্রাবেমুণ্ডে Travemünde, ছোট সহর, আর সাগরতীর ব্যাপিয়া হোটেল ও ক্যাকো। প্রায় দুই মাইল বেলাভূমি মান-কিলাসীতে ভরিয়া গিয়াছে। সাতদিন সাগরতীরে কাটাইয়া দিলাম, যাহারা হোটেলের না ওঠে তাহারা সবাই সঙ্গে লোক লইয়া আসে, বাসিতে বসিয়াই লোক দাঁড়াইয়া লয়। তীরময় অনেক লাউক-শীকার বাড়ী করা আছে, বাসিতে শুইয়া শুইয়া অনেক গানবাঁজনা শোনা যায়। সন্ধ্যার সময় একটি ছোট ক্যাকোতে আহার করিলাম। একটি বুড়া লোক এখানে বসিয়া সাতা-সাতা বিহার টানিতেছিল, শোকাটী লড়াইয়ে ছিল এবং আবার সঙ্গে আসা করিয়া তাহার পূর্বস্মৃতি মনে পড়িল, বিহারের কোঁকে বারে বারে উত্তেজিত হইয়া আসাকে বলিতে লাগিল, “তোমারই দেশের সেপাইয়া ধীতে কুড়ির লটকা ক্রল্লের বুদ্ধকেতে রাজি বেগালের মত চুপে চুপে আশাধের ট্রেকে পড়িয়া আশাধের পলা কঠিত !” আশার লটকা মলা দেখিবার জন্য লোকটিকে খুব উৎসাহিত হিতে লাগিলেন, আমিও বচনিক ছাড়িয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতে তাহার শারীরিক আক্রমণের প্রতীকার বসিয়া হাসিতে লাগিলাম, অবশেষে কাকের মালিক আশিরা লোকটিকে বিরত করিয়া লড়াইয়া দিলেন।

যুগ-বধিরদিগের শিক্ষা

[5]

कथा-शिक्षा

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ଆଜ୍ଞାନ ସର୍ବ

ଅ-ସର୍ଗ - ମହାତ୍ମା ବାଳକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାଉଥିବା ବେଳେ

—श्रीदेवालेखनाथ वन्द्यापाशाय

ସମ୍ଭାର ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ । ଶାନ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କାହାଣୀ କେଉଁ କାହିଁକି
କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି ।

স্বাধীনতার দাবিতে বীর-শিখ এই সর্বত্র সজাগ। ইজমত করিত ওই-
 দ্বারে স্বাধীন প্রাপ্তি অসম্ভব। জাতি। হায়ে উত্তর প্রান্তে পথে।
 এইখানে প্রকৃতি সৃষ্টি একই দিক, পাতল বায়ু, যা পাতল বা বোম-বতি।
 হায়ে দেখায়ে যব-বায়ু কত কোরে ও কোন দিক ঘিরে হইত।

୧. ସା-ହୃଦ, ହୃଦ, ତ୍ରିହୃଦ ଧର୍ମ କରାଣା ଘରର ଚନ୍ଦନ କରାଣା କରାଣା
 ୨. କରାଣା ଚନ୍ଦନ ଧର୍ମ କରାଣା କରାଣା ହା ନା; କରାଣା ହାରେତ ନିଧନ
 ୩. ପୂର୍ବ ଦିଗ କରାଣା ଧର୍ମ ନିଧନ ହାରେତ ନାରେ, ଏବଂ ସା-ହୃଦ ଧର୍ମ କରାଣା
 ୪. କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା
 ୫. କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା କରାଣା

২. অনুসন্ধানিক—এইভাবে সংযোগের সুবিধা হয় না, এ.স. যা বসিদ্ধাপন
 দ্বারা হয়। প্রথমে উপর বর্ণিত কলম অনুযায়ী করা যায়। বসিদ্ধা
 পূর্ণ করিলে, যা বসিদ্ধাপন দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে যায়। কিন্তু
 নিম্নোক্ত প্রয়োজন না হইলে, নিচের বসিদ্ধা পূর্ণ করিতে বেগুন হয় না।
 ৩. উচ্চাংশ—কিছার সমস্ত, অনেক বংশে নিম্ন প্রকারে পদ্ধতিগতক উপর
 সুবিধা কোনও তালুহ সমস্ত পদ্ধতি করিয়া সু উচ্চাংশ করে। এই বিবেক
 নিম্নেরক কোনও পদ্ধতি হইতে প্রয়োজন।

১. ও হ উচ্চারণ কথিয়ার সময় ১ ও ২ ভেদক। যে অধিক কতীর ও
অল্পক বন্ধু কথিয়ার হয়, তাহা ওরোয় সঙ্গুণে কাণক বা বোহু-বতি ও হ
কিণে অল্পক কয়। বার। সুলভ উচ্চারণ ১ ও ২-এর সহিত ১ ও ২-
এর কোন পার্থক্য নাই। অপরোয় সহিত সঙ্গুণ কথিয়ার ১ ও হ উচ্চারণ
কথিয়ার সময় পার্থক্য নাই হয়।

[illegible]

निष्कः प्रियः । अनालो न-कथं । यत् ।

ଟି-ସର୍ବ—କିହନ ଯଦ୍ୟାଦକ ବିକାଶିତ ଓଡ଼ିଏ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆଦେଶ
 ମହିତ କରୁଛନ୍ତି କହା ଯାଏ । ସାମାନ୍ୟ ବାସ୍ତବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ
 କବିତା ସାହିତ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତା (ସାମାନ୍ୟତା) ଉପାଦାନ କରେ, ତାହା ଏହି କାରଣରୁ କବିତା
 ମୂଳ ଉପାଦାନ । ଏ ଉପାଦାନ କାରଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ବା, ଏକ ସବୁ ସାମାନ୍ୟତା
 ଯାହା ଥାଏ ।

উ—কণ্ঠের মধ্যে কখনো সর্গলগ্নতা হয়, একটি স্পেন্টিশ্ প্রকরণে কখনো হয় উপদ্রুত পদে মাত্র থাকে। কিসের পক্ষান্তরও সর্গলগ্নতা উক্ত হায়ে বাবা হয়। শিত্ত কিসের পক্ষান্তরও অধ্বনি বহিঃত বা পার্শ্বগে, প্রত্যেক বৃ পক্ষটি কলাইয়াঃ চেষ্টা করা হয়। ইহাতে সে কৃষ্ণ স্মিত তুলনা করিত, উ বহিঃত কিসের অধ্বনি ঠিক করিয়া লইত পারে।

ইহাভিত্তি কৃষ্ণ ও বীর্ষ উচ্চারণের পার্থক্য খিমে লুই হয়। বিস্তারিত বোলে এই পার্থক্য লক্ষ্য হইত না। এইজন্য উ ও ই, ঊ ও ঈ,—এই উচ্চারণগুলি একই ভাবে, অর্থাৎ কৃষ্ণ ও বীর্ষ বা তেখাউয়া, শিলা বোঝা হয়।

ঊ—কিসের অধ্বনি সর্গলগ্ন হইলে থাকে, এবং বহু কিসের ও পক্ষের অধ্বনি উদ্ভূত পক্ষের ভিত্তি দিয়া বহিঃত হয়।

কৃষ্ণ-বীর্ষ শিত্ত অধ্বনি করিয়া কিসের অধ্বনি বহিঃত বা পার্শ্বগে,

একই ইচ্ছাটি vocalised 'th' বোঝা দাঁড়িতে পারে। পক্ষ—কিসের বীর্ষে শিমে ঐশিলা লইলে, ই বহিঃত লক্ষ্য হইত। ইঃভিত্তি ঊ হইত, অর্থাৎ বহুত লু হইতেও ই পার্শ্বগে বহিঃত পারে।

ঐ—উ অধ্বনি ও বহিঃত বহু বহিঃত হইবার পক্ষ বোধ উদ্ভূত থাকে। ইঃ বহিঃত তুলনা করিয়া শিলা বোঝা হয়।

স্রা (ঐ) —কিসের অধ্বনি সর্গলগ্ন উদ্ভূত পক্ষ বহু বহিঃত হয়।

বর্ণমালায় ঐ ও ঊ মাত্র এই দুইটি দ্ব্যবধি (diphthong) থাকে, কিন্তু স্মৃতি বাংলা কথার প্রায় ২০০০টি দ্ব্যবধি উচ্চারিত হয়। মূল বহুত্বের উচ্চারণগুলি পক্ষা দিয়াঃ পক্ষ দ্ব্যবধি লইয়া অধ্বনি বহিঃত হয়। শিত্ত মূল বহুত্বগুলির উচ্চারণ ভাল করিয়া করিতে পারিলে, দ্ব্যবধির উচ্চারণ সর্বত্রই করিতে পারিবে। কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ঐঃ বহিঃত (glide) লক্ষ্য ও সত্য হইবে।

—শ্রীপরমিস্থ বন্দোপাধ্যায়

সবার কাছে পেয়েছি বহু মান

আপন ভাবি করিছ প্রত্যাবণা ;

আজিকে মোর চোখেছে অবিধান

বীকার করি দাগিয়া অনা-অনা

আমার কিছু বাহি গো কিছু নাহি

জীবনে শুধু হয়েছি দানস্রাবী।

কবের চাটে করিতে আনাগোনা

পেয়েছি বহু রতন হীরা ধোতি ;

দেদিতে আঁধি আকাশভরা সোনা

পড়েছে চোখে উদয়-নব-জ্যোতি।

তিবির-হাতি বীহার-চায়া-পথে

সিঁড়িতে পচি নীহার ঘরকতে।

মাংস, তুমি দিয়াছ মুখে ভাষা

দিয়াছ হাসি, দিয়াছ আশিষল :

সবার বড়, দিয়াছ ভাপবাসা—

ভাবারি ভারে কবর টলমল।

আশাত ধনি দিয়েছে ফুক, তবু,

সে ধান আনি বিকল করে কছু।

গাছগা শুধু নবন ছটি তুলে

কিরায়ে গ্রীবা চকিতে সেন চপি,

হাসিয়া স্কন্ধ অধর কুলে কুলে—

বাতুল পায়ে দরবানি দপি'

বাগানো দাড়া নুপুর রিদি রিদি

আমেরো কাছে রহিছ 'আমি কণি।

কণের বোকা বাড়িছে দিনে দিনে

সবার কাছে খাতক আমি এক।

দরিব তুবে পায়ের কণে কণে

লসটিমিদি আমার ভালে দেখা।

এধন করি ধনি দাড়া পাই

কিরায়ে দিব কবতা হেন নাই।

ভগতে ছিল যতক মৃদুসি

আমার কুক বাঁধিল তারি পব

মধুতে হবে উঠিল ভরি পূহ

উড়িয়া গেল লকল মধুকর।

কহিতে কথা বাধিয়া গেল মুখে

মধুর বোকা রহিল চাপি কুক।

আজিকে কহি সবার কাছে আমি

তব গো বহু আমার মহাভ্রম

শুভিতে কণ চেয়েছি দিবাবানী

কিরায়ে দিতে করছি প্রাণপণ।

কবর চিরে দিয়াছি পোছ চাপি—

সেনার খাতা রহিল তবু খালি।

ছড়িয়া পাণি কহি গো তোমা সনে

আশিস কর ভবের নয়নারী

সবার সেনা শুদ্রা'দিয়া তব

রিক্ত করে বাইতে বেন পারি।

বে-মান দিয়া করিলে চিরকণি

দাগিয়া ভাল লই গো বেন ভিনি।

সকাল বেলা খবরের কাগজখানি হাতে তুলিয়াই পাহা
দিয়ে বসে বসে পেল, চিন চারটা এসেছে সোকেই নাকি
ভগবান, তাহার পিতার গুরু ভ্রমং যানীতিকে পুনিশ বন্দী
করিয়া থানার চালান নিয়াছে, কি সর্গনাশ, কি ভীষণ কথা !
—পাহা কাগজখানি টেবিলে রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল,
বহুক্ষণ পরে কাগজখানি তুলিয়া ঘটনাটি ভাল করিয়া পড়িয়া
বেধিল, পাঁচ বৎসর আগে কোথায় কোন্ গুরুতর অপরাধ
করিয়া পুন্সিরে চোখে ধূলা দিয়া এতকাল বসিয়া তিনি
পশাতক ছিলেন,—এখন কি করিয়া পুন্সি তাহার সজান
পাইয়া, স্বাধীনতাপ্রতির উচ্চুড়া পলাঘাতে ধূলায় লুপ্তি করিয়া
নিয়াছে । পুন্সিরে ডায়েরিতে ইহার বহু অপরাধের বিবরণ
লিখিত আছে, সোকেস্বার সিন সে সবই প্রকাশ পাইবে ।

ইহার পর কাগজে আরও বাধা লিখিত আছে তাহা
পড়িয়া পাহা একটু বেদনা বোধ করিল । এই সম্বাসীপ্রবর্তকে
শ্রেণীর করিয়া আনিবার সময়, আর দুই তিন হাজার অস্ত্রের
জীকু হইয়াছিল, জনতা পুন্সিরে কাছে বাধা দিতেও যথেষ্ট
চেষ্টা করিয়াছিল । ফলে পুন্সিকে দারুন বিপদে পড়িতে
হইয়াছিল, এসেছে অবিশ্বাস্য পুন্সিকে বা জনসাধারণ কাহাকেও
কোন সাহায্য করেন নাই, পুন্সি-প্রবর্তক বেধিয়াসাই
তিনি তাহার বজায় চড়িয়া মহান পরিদর্শনে বাহির হইয়া
সিদ্ধাছিলেন ।

পাহা বসিয়া বসিয়া পিতার কথাই ভাবিতে লাগিল,
তাঁহার এই পলায়ন যে কেন পাহা তাহা বুঝিয়াছিল, কি যে
দারুন লক্ষ্যের বেদনা অন্তরে অন্তরে বহন করিয়া তিনি সকলের
সম্মুখ হইতে আত্মপোষন করিয়া গিয়া পড়িয়াছিলেন, পাহা
তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল ।

ইহার দিন পাঁচ ছয় পরেই হুবেলনাথ হঠাৎ কলিকাতা
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কিয়ৎ বাবুর বত পরিবর্তনই
হোক, তাঁহার এই ধনী পুত্রজনকেসকল তিনি সমস্তান্দেই
অত্যাচার করিয়া লইতে পূর্বভাবের কোন ব্যতিক্রম করিলেন
না ।

পিতার অন্তরের বেদনার ছাপ মূলেও তাঁহার স্মৃতি
পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, পাহা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া
নিভেও অন্তরে অন্তরে সেই বেদনারই খোঁচা অহুতব করিতে
লাগিল । স্বাধীনতার কথা পিতা-পুত্রে কিছুই হইল না । পাহা
আসিয়া প্রণাম করিয়া কাছে বসিয়াইলেন, তাঁহার মাথার তাঁহার
বেহতরা হাতখানি সুস্থকাল বসিয়া রাখিয়া, অতি কোমল
হাসি হাসিয়া করিলেন, অনেকদিন ত বাড়ী গাও নি যোকন,
কবে যাবে ?

—পরীক্ষার আর মাস দুয়েক দেয়া আছে বাবা, তার
পর যাব ।—

—বেশ ।

এইরূপ বিনা আড়ম্বরে পিতা-পুত্রে দিলন হইয়া গেল ।

মাস দুই কাটিয়া গেল, যেমন মধ্য উৎকর্ষ ও ব্যাকুলতা
লইয়া পরীক্ষার দিনগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল, এবারেও
তেমনিভাবে আসিল এবং চলিয়া গেল ।

এসেছে বাড়ীতে বসিয়াই পাহা খবর পাইল, মীরা
এ বৎসরও ইউনিভার্সিটিতে কাট হইয়াছে, আর পাহা ? পাহা
হইয়াছে—ফেল !

[১০]

গেজেটখানি বার দুই তিন উন্টাইয়া পাড়াইয়া এপিঠ-
গপিঠ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, পাহা মিনিট কয়েক চোখের
চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; হাত দুটো যাবে ভিড়িয়া উঠিয়া
কামজখানি ভিড়িয়া গেল ; পাহার শরীর অথবা মনসা বেন
কি ব্রহ্ম কল্পিতে লাগিল । মীরে মীরে উঠিয়া পিতার শরন-
কঙ্কের টেবিলপিতে সেজেটখানি রাখিয়া পাহা তাঁহার নিজের
মহাঘাতে শুইয়া পড়িল ।

পড়িতে তাঁহার বত অনিচ্ছাই থাক, পরীক্ষা বেগুণ
বিকছে মুখ সে বত গুরুতরই তুলুক, ভগবান জানেন বেশ
হইবার ইচ্ছা তাঁহার একটু ছিল না এবং শেষের দুই তিন
মাস সভাই সে প্রাণপণে ব্যতিয়াছে, তবু সে ফেল হইয়া

গেল! সে গেল, আর নীচা পাস, মীরা শুণু পাস নদ, ফাট' হইয়া কত উচ্চ সম্মান লইয়া উপরে উঠিয়া গেল!

আপাসমতক চাবরে ভাবুত করিয়া পাহা নিচেতে কেন ওপসামাগের কাছ হইতে লুকাইয়া দ্বিগ হইয়া পড়িয়া বহিল। এতক্ষণ হাত পা কপাল তাহার বামে ভিড়িয়া দিয়াছিল, এখন কেনন একটা তাঁর কম্পন আদিয়া, তাহার সমুদ্র দেহবানিকে অধন করিয়া দিল।

সারাদিন কাটিয়া গেল, পাহা উঠিল না, বিকলপেথো উঠা ভোর করিয়া এক পেয়ালা চা খাওয়াইয়া গেল, খাবারের স্টেট চাকর যেমন আনিয়াছিল তেমনই ফিরাইয়া লইয়া গেল, দাঁদার মুখ দেখিয়া উঠা আর ভোর করিতে সাহস পাইল না, স্নানিতও পাহা উঠিল না। কিছু সবস্ত স্নানিত হস্তা এবং মাথ-ভাগরনের মাথখানে বাত বাত দরশন একটা। বেবনা কেবলই তাহার দূক স্টাটার ঘত হইয়া দৃষ্টিতে লাগিল—মীরা পাস,—যে ফেল—মীরা পাস, মীরা ফাট'।

দীর্ঘ স্নানিত এমনি করিয়া বাখার স্কলতার বহিয়া প্রভাত হইল। মুক্ত বাতাপনের মধ্য দিয়া প্রথম স্মারগনি তাহার চোখে মুখে পড়িয়া বহন তাহার খুব ভাড়াইয়া দিল, তখন সন্ধ্যায় তাহার এই কথাই মনে লাগিল, মীরা পাস—মীরা পাস হইয়া গেল।

উঠিবার কিছুদূর চোঁকা না করিয়া পাহা আখার পাস ফিরায়া শুটল। বেলাবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবের খর গৌত্র পাহার চোখে মুখে পড়ার কষ্ট বোধ হইতেছিল, তথাপি সস্ত্রল একটি অবদান ও আনতে পাহা শয্যাভাগ্য করিতে পারিতোঁহেন না, শুইয়া শুইয়াই তনিত পাইল, যা কহিতেছেন, কিসে রমণ চা এনেছিল? হোঁর বাবু মুখ খোঁজা হইছে কি? চা হাওয়া হয়ে বাবে না ত? আর দেখ ত দাবাবাবু কি এখনও ওঠে নি নাকি ঘুম থেকে? কাল সারাদিন খেলে না কিছু, এখনো পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে?

রমণ জানালাপথে একবার দেখিয়া লইয়া কহিল, ঘুমুচ্ছেন না এখনো দাবাবাবু।

পিতার মৃত্যুর শব্দ শোনা গেল একতলা হইতে সোতলা উঠিতেছেন, কিভাঙ্গ করিলেন কে ঘুমুচ্ছে? পাহা?

মা কহিলেন, ইংগো তোমার পাহা, অত যে খুবোৰ দিন রাত, সে ফেল হবে না ত কে চাবে!

মাত্র কণ্ঠস্বরে এতবারে একটু তিক্ততা দৃষ্টিয়া উঠিয়াছে। পাহা ভাবিল—আগে কতবার সে ভাবিয়া আসিয়া হইয়াছে, তাহার সচিব বাবুজীর বা কণ্ঠস্বরে বিনাভার বেহ বা বিরক্তি কোন্টাই অত কখনো না দৃষ্টিলেও পিতার সমুখে তাহার সমুখে কোন কথা উঠিলেই কি করিয়া হোঁর কণ্ঠস্বরে তাঁহার এত পরিবর্তিত হইয়া যায়।

খিনিট থিন চার পরে আর টেলিগ্ৰাফের আদিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—পিতার আখ্যান আদিয়াছে—চা খাইতে বসিয়া পাহাকে তিনি ডাকিতেছেন। পাহা উঠিল। খুব হাত খুঁটা আদিয়া আরম্ভের কাছে পাড়াইয়া দেখিল, খুব-চোখের অবস্থা অত্যন্ত খাবার হইয়াছে। এইভাবে পিতার সমুখে উপস্থিত হইতে একটু সন্তোষ বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু উপায় নাই, চুল খাঁচড়াইয়া, খালি গায়ের উপর একখানি চাবর জড়াইয়া লইয়া ঘরে ঘরে পিতার শব্দ-কণ্ঠে দিগা উপস্থিত হইল—মতিথি অত্যাগত না থাকিলে সকালে বিকালে পিতা এই ব্যস্তেরই দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসিয়া চা খান।

ছোট একটি টিপরের উপর চাবের পেয়ালা ও স্টেট পরম দৃষ্টি বোহনভোগ রক্ষিয়াছে। পাশেই আর একটি টেবিলে খবরের কাগজ ও খান ছই বই। চা-পান শেষ করিয়া পিতা একটি আদ্য-কেন্দ্রায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়েন ও চিঠিপত্র লেখেন, বারান্দার নীচেই ফুলের বাগানে রজনীগন্ধার লাইন, বর্ষার জল পাইয়া একটি চুটি করিয়া শিব-স্তম্ভ ফুলের গোছায় করিয়া উঠিতেছে; বাগানটির ভূপাশে আনন্দাধির বহু শৈতল কণে প্রভাতের রোণ চিকচিক করিতেছে। পিতা এখনও চাবের পেয়ালায় হাত ঘেঁষে নাই, পরম চাবের খোঁজা উঠিতেছে। সমুখের চোঁক্রে বসিয়া পিতা সন্তকলাকার ডাকে যে খবরের কাগজখানি আসিয়াছে তাহাই হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। ওপাশের একটি ঘর হইতে ছোট ভাই বোনদের অগাধাবাদের সঙ্গে সঙ্গে হাদি-পায়ের কোলাহল শোনা বাইতেছে। পাহা চারিদিক দেখিল, দাকে কোণাও দেখিতে পাইল না; মনের খর হইতে ভোরে জল-পতনের শব্দে মা মান করিতেছেন এবং হস্ত শীত তাহার এখানে আদিবার সজ্জাবনা নাই, ভাবিয়া মনে মনে আশ্বস্ত হইল।

উমা নিজের চাবের পেয়ালাটি হাতে লইয়া এতদে গবরে পিতা ও ভাইবোনের খাবার তৈয়াধান করিতেছিল, কাছে আসিয়া করিল, দাসা ব'ল, তোমার চা আসছে রবেণ ।

পিতা খবরের কাগজ হাতে সুখ তুলিয়া এসে কাগজখানি পানের টেবিলটার নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, খোকন এসেছি, ব'ল । উমা, তোর দাচার চা কই রে ?

—আসছে বাবা, তুমি খাও ।

পাত্র একটা ত্রোণে বসিয়া খবরের কাগজখানি সমুখে টানিয়া লইল, নিজের বেদনাময় পরাজয়ের ভাবটুকোনি কিছু প্রভায়ে পুকাইয়া কোনমতে নিজেকে সহজ করিয়া লইতে পারিলই বেন সে বাঁচে ।

—ভাষণর খোকন, কি করবার ইচ্ছা এখন, কি করতে চান ?

পাত্র চূপ করিয়া রহিল ।

—কলেজ খুললে আবার কলেজে গিয়েই ভর্তি হয়ে যা, কেমন ?

দীর্ঘ পাত্র সুখ খবরের কাগজের উপর আরও একটু নত হইল—পিতা একবার একটু চাহিয়া বেশিলেন ।

—দাসা তোমার চা এসেছে, খাও ।

—অন্তগুলো মূচি খেতে পারব না উমা, নিবে খাও ।

—পারবে দাসা, ওইত মাত্র কথানা, খেয়ে নাও ।

প্রবীণা গৃহিণীর মত সুখের ভাব ও তন্ম করিয়া উমা মাঝের বাস্তু খুনিয়া বাজারের লগ্না বাহির করিতে বসিল ।

—কলেজ কবে খুলছে জানিস ?

পাত্র বাঁধ নাড়িয়া জানে না বলিল । পিতা কহিলেন, নিজের চিঠিও এসেছে কালকে, তোমার খাবার দিন ঠিক হল কি না জিজ্ঞেস করেছে ।

এইবারে পাত্র মুখ তুলিয়া কহিল, এবারে আর আমি ওদের বাড়ী থাকব না বাবা ।

বিস্মিত হইয়া পিতা কহিলেন, যানে ?—কোথায় থাকবে ?

—আমাদের নিজস্বের বাড়ীই ত রয়েছে, যা ত হট্টে ।

মুহূর্তকাল চূপ করিয়া পিতা একটু ভাবিলেন, ভাষণর কহিলেন, না না সে কি হয় ? সে কি ভাণ বেধাবে ? নিজস্বের বাড়ী কিংবা হট্টে—না না, সে ভাণ বেধাবে না,

এতকাল গুণা ভোমার মনঃ করলেন, তুমি যখন কত ছোট ছিলে—কিছু বুঝতে না কিছু জানতে না, সেই তখন থেকে, এখন কি করে ভোমার অস্ত কোথাও রাখার কথা আমি ওদের বলব ?

পাত্র চূপ করিয়া বসিয়া রহিল ।

চা-পান শেষ করিয়া পিতা ইচ্ছা-চোরাটায় বসিয়া আবার কাগজ হাতে তুলিয়া লইলেন । পাত্র চূপ করিয়া বসিয়া বসিয়া অন্তরনে কেবল মূচি ঘোরানোয় খাটতে লাগিল । কথা বলিবার শক্তি তাহার তখন দিলে ছিল না । সে কেল হইয়াছে, পরীক্ষার পাস করিতে পারে নাই, পিতা তথাপি সে সবচে কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না, বরক এমন তাহেই কথা কহিলেন, বেন সে পরীক্ষা পানের পর কলেজের নতুন স্কপে গিয়া ভর্তি হইতেছে । পরাজয়ের এমন বেহমর কথা কোন পুত্র এমন করিয়া পিতার কাছে পায় !

পাত্রের জ্ঞান এখানে সত্যাকারের মর্শ্মশ্রী হইয়া উঠিল, মোটখানি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে সে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল । পিতা কাগজ হাতে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বেশিলেন মাত্র, কিছু বেশিলেন না, কিন্তু হঠাৎ তাহার কেমন মনে হইল, পুত্র একটি শিশুর মতই তাহার এই সন্ধান-টিও বেন নিতান্তই অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব । বিশ্বতপ্রায় কোন একটা ক্ষেত্রে মুখ হইতে সহসা যেন এক ঝলক রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া বুকখানি তাহার ভিতরিতা দিয়া গেল । খবরের কাগজ টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, অধিন-খরে গিয়া তিনি তাহার কাছে বসিলেন ।

[১৪]

একটা তাঁত বেদনাময় অশ্রুভিত্তি কখন যে বাস্তু একটা অভিমানে ক্রপাক্রান্ত হইয়া থিয়াছে, পাত্র নিজের তাহা জানিতে পারিল না । তাগা তাহাকে চিরদিন কেবলই বস্তুত করিয়া আসিতেছে, যখনই যে কোন দিকেই তাহার জীবনের গতি প্রবাহিত হইতে চাহিয়াছে, তখনই কিরিয়াছে জীবনভাবে প্রতিহত হইয়া ।

কিন্তু এখনই তাহে বাধা নত করিয়া শুধু আশ্রয় কেবল ভাষণকেই ত মানিয়া লও চল না । শাশুরের আর মক্কে যে তাহে কপালে কতখান করিয়াই শুধু নীতবে ভাগ্যের বিধান

মানিগা নয়, পাহাড় তাহা করবে না,—বিমাতা পিতাকে বলিগা-
ছিলেন, ওর ভাষা না আছে তাই হবে, তুমি তার ভক্ত ভেবে
সাতা হও কেন?—পিতাও অবশেষে তাহাষ্ট মনে করিয়া
নিষ্কৃত হইয়াছেন, কিন্তু পাহাড় তাহা মানিবে না,—কে এই
ভাষা, ভাষা কি? সেখা দাঁক, কোন অল্পতান হইতে কি
সে করিতে পারে তাহার? পাহাড় এবারে নিজের জীবনের
তার নিজেই গ্রহণ করিল।

একটা কাকুনি সিগা ট্রেন আসিয়া শিলালসহে
খামিল। বাবার টেনিগ্রাফ পাইয়া, বাড়ীর সরকার অধিবাসী
এবং চাকর-বাকসেয়াও বে দুই একজন তাহাকে অভ্যর্থনা
করিয়া লইতে ট্রেনের হাভির হইবেই, সে বিষয়ে সম্বন্ধযাত্র
নাই, কিন্তু পাহাড় কি মনে হইল কে জানে, একটা কুশীর
মাথার চিনিগত কুশিরা সিগা দ্রুত সে পাকী হইতে নামিয়া
পড়িল। তাহার পর ঘরে ঘরে ভিতরে ভিতর সিগা অল্প
হইয়া গেল।

এ রাত্তা সে রাত্তা ফুরিয়া বে রাত্তার আসিয়া সে উপস্থিত
হইল, সেটা তাহার নিজের বাড়ীর রাত্তা নয়। নিজেদের
বাড়ীতে বাইবার বে সহক রাত্তাটি সমুখে পড়িয়াছিল, পাহাড়
ইচ্ছা করিয়াই সেটা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, চলিতে
চলিতে যেখানে আসিয়া পাহাড় গতি সহসা রুদ্ধ হইয়া পড়িল,
সেখানে সমুখেই আলোর কলনও বে কলর, চিত্রপরিচিত বড়
বাড়ীখানি পাহাড় চোখে পড়িল, তাহাতে চোখদুট তাহার
ছলছল করিয়া উঠিল।

পরিচিত—পরিচিত বটে—কিন্তু এত বে আকাঙ্ক্ষিত,
এত বে প্রিয় ছিল,—আগে কে তাহা জানিত! সেলে
বাইবার পর এবং ফল বাহির হইবার পরও মীরা হই শ্রিনথানা
চিঠি পাহাড়কে পিথিয়াছিল, পাহাড় ইচ্ছা করিয়াই তাহার উত্তর
সেই নাই—কে জানে কেন, মীরা কথ্য মনে পড়িতেই দক্ষ
একটা অভিনয়ে চোখে তাহার মালা ধরিত। এ বে কিসের
অভিনয়, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না।

তাহাকে পাড়াইতে বেবিয়া ছোঁকরা কুশীরা কহিল,
কোন বাড়ী বাবু? এই জন্ম সাহেবের বাড়ী?

বিস্মিত পাহাড় কিরিয়া কহিল, কি করে জানিল যে তুমি
জন্ম সাহেবের বাড়ী, তুমি যেহাঙ্গি কখনো?

ছোঁকরা হাসিয়া কহিল, এই বাড়ী এ বাড়ীর কে না চেয়ে
বাবু? বড় ভারী সাহেব জন্ম সাহেব।

পাহাড় উত্তর দিল না, ঘরে ঘরে আবার সমুখে অগ্রসর
হইয়া চলিল। প্রাণের প্রাণতো তাহা এই ছোট কুশী ছেপেটা
সমস্ত রাত্তাই শিশু দিতে দিতে এবং তাহারই মনে ছন্দ
দিশাইয়া পা কলিতে কলিতে যেন কতকটা দ্রুতের ভয়ভেত
পাহাড় পক্ষান্ত পক্ষান্ত আসিতেছিল, এইবারে বাবুজর জন্ম
তাহার একটু দয়া হইল, বাবুজি বে কলিকাতায় নতুন
আসিয়াছে, এবং অত্যন্ত দরদর, সে বিষয়ে তাহার আর দ্বন্দ্ব
ছিল না, বাবুজি হইত ছোটখাট কোন সেল-টেলের মতান
করিয়াই ফুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা কহিল, বাবুজি এই
গলিতে আসিসে বাবুজের একটা মেল আছে।

পাহাড় অস্বস্তক ছিল, উত্তর দিল না।

ছোঁকরা তাবিল, কোরাণির দত অত ভাড়াও বোধ হয়
বাবুজি দিতে পারিবে না, বসিল, আর একটু এগিয়ে গিয়ে
মিরাটির একটা মেল আছে বাবু, সেটা খুব মত, পেটার
যাবে?

পাহাড় এবারে অস্বস্তক ভাবে উত্তর দিল, হ'।

কিন্তু সেই মতায় খোলায় বরখানি ঘেঁষিবার পরও
বাবুজি যখন তবুও কেবল চলিতেই লাগিল, তখন সে বেচারা
একটু সম্বন্ধের সঙ্গে বাবুজ পক্ষান্তে পক্ষান্তে চলিল। হঠাৎ
এক সময় হি হি করিয়া উচ্চ হাসিতে পাহাড় তাহার পানে
কিরিয়া চাহিতেই সে কহিল, বাবুজি এই রাত্তা থেকে যে
একটু আগেই বের হয়ে গেলান, আবার এই রাত্তাতেই
হুক্ক কেন?

অগ্রসর হইয়া পাহাড় কহিল, তাইত রে, তুল হয়ে গেছে,
চলু এ গলিটা দিয়ে চলু।

বাবুজি পাগল কি না সে বিষয়ে ছোঁকরাটার একটু সম্বন্ধ
হইয়াছিল, হাসি বামাইয়া কহিল, বাবুজি ঐ রিফটা ডেকে
দিই, তুমি বাড়ী চলে যাও, আবার পক্ষান্ত দিতে হবে না,
আমি চাই না পক্ষান্ত।

—আরে না, চলু চলু, আর মেরী নেই, এই ত এসে
পাড়াছি।

অথবা ছেলেটা গল্পে গল্পেই চলিল, তাহার দলের কার্য
বৃদ্ধি। এইবারে পাহা মনে মনে একটু চাপিয়া চাই একটা কথা
আরও করিল, তোর নাম কি রে ?

—তুম্বা, বাবুজি ।

—তুম্বা, চাকরো করবি ?

—না বাবুজি, আমার চাকরি করি না, চাকরি করলে
বন্ধু কথা শুনেই হু, আমার বাপ মাঝে কেউ চাকরি করে
নি, এই কাজে আমার বেশ আছি বাবু, টেকে হ'ল কাজ
করলাম, ইচ্ছে না হ'ল না করলাম ।

পাহা অত্যন্ত পুণী হইয়া ছেলেটার পিঠি চাপড়াইয়া দিল ।

সন্ধ্যাই বাজীর সেটে ঠাড়াইয়া অপরবাসু চাকর-চাকরদের
নইয়া পাহার না আসায় এমন কি কথা বাইতে পারে সেই
বিষয়ে আলোচনা-সভা জবাইয়া তুলিয়াছিলেন, ধরোয়ান
বসিতেছিল, আমি বলি কি সহকার বশাই, একবার ভুল
মাঝের বাজীতে বোঝ করে আসি গে—

এমন সময়ে পাহা আসিয়া উপস্থিত হইল । অত্যন্ত
বিষয়ের সঙ্গে দুহুত্বমধ্যে ঘরপ্রান্তের সভা ভাঙিয়া পেল ।
পাহা পকেট হইতে ছোট টাকা বাহির করিয়া ভিক্ষার হাতে
দিতে বাইতেই ধরোয়ান এবং অপরবাসু চীৎকার করিয়া
আসিলেন । ভিক্ষা প্রদান হাতপানি সবই সরাইয়া গেল ।
পাহা বিরক্ত হইয়া অপরবাসু পানে তাকাইয়া কহিল, দরুন,
টাকিতে এলে আমার চীৎকার চেহেও বেশ লাগত, তা
জানেন ? ওরে ভিক্ষা নে, নে, অর কি ? মাঝে মাঝে
এই দিকে আসিল, বুঝি ?

ভিক্ষা বর্ধ সেলাম করিয়া বাজীপানির পানে চাই একবার
তাকাইয়া চলিয়া গেল, মনে মনে বোধ হই করিল, বাবুজি ত
পর্যন্ত নর, এবং রাগা মজারাজ ! মাথাটার একটু গড়গড়
আছে...‘বোমা !’

[১৫]

বাজী পৌছিবায় সঙ্গে সঙ্গেই হাঙ্গল একটা অবমান
আসিয়া পাহার বেহ মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং কোন
কিছু বুঝে না নিশাই বিতর্কে তাহার ভুল নির্দিষ্ট শব্দকণ্ঠে
গিয়া শুভা পড়িল ; তাহার পর—ঠিক ঘণ্টে নর, কেমন
একটা তত্ত্বার গোবে অগা ভাঙত যন্ত্রের মাঝে, সারাটি
হাত তাহার কাঁচিয়া গেল ।

মা—বীণার মা—তাচার মা—তাচার কথা সে মনে
করিতেই পাগে না, কি করে নে সে তাহার আকর্ষণ ছিন্ন
করিয়া আসিতে পারিয়াছে, তাহা সেট জানে, মায়ের কাছে
তাচার এই অস্বাভাবিক ব্যবহার কোন দিন কি ফলাফল হইবে ?
কে জানে !

ছেলেবেলায় বীণার প্রতি অত্যাচার পাতালাল কোন দিন
কিছু কন করে নাই । বীণাও শব্দী শাও মেয়েটির মত তাহা
কেবল লক্ষ করিয়াই চলে নাই, অত্যাচারের প্রতি-অত্যাচার
বলিতে পরিমাণেই কিরাইয়া বিত । কিন্তু পাহার সে অত্যাচারে
কথাচারই থাকিত বেশি, আর বীণার ব্যবহারে থাকিত কেবল
ছোট্টা এবং বহুত ।

ইদানীং নর হইয়া পাতালাল আপনাকে কখনে পরিমাণে
শাও ও শব্দে করিয়াছিল সভা, কিন্তু বীণার ব্যবহারের
পরিবর্তন কোন দিন আসে নাই । তাপনি তাচার ব্যবহারে
এমন একটা গভীর প্রাণের পরিচর সূচিয়া উঠিত যে, পাহা
তাচার পরিবর্তন কখনো চাহিতও না । পরিবর্তন চাহিত না
সভা, কিন্তু, কে জানে কেমন একটা কিসের যে তাঁর অভিমান
কবে কোন দিন তাহার মনের অত্যাচারেই, তাহার মনের দুখে
বীজ বপন করিয়াছিল, বাহা, তাহার বেহ ভালবাসা এবং
বোঝাতির সঙ্গে সঙ্গে কেবল বাড়িয়াই চলেতেছিল । বীণার
কথা পাহার মনে হইত বেমন মনোবল চেয়ে বেশি, চেমনই ঐ
প্রিয় সূচিটুকু অহমিশ অস্তরে তাচার খোঁজও বিত দরুন
কিছুর চেয়েই বেশি ।—

ছাঃমের শেষে পাহা তাপিয়া এখন বিছানায় উঠিয়া
বসিল, প্রকৃতির লগাটে তখন সন্ধ্যা-চন্দন মাখিয়া বিয়া
কেন্ এক অশরীরী শক্তি এক শুভ নবজীবনের সূচনা করিয়া
বিতছে । নর পাহা সন্ধ্যায় সে দিকে চাহিয়া রহিল ।

কাশমাসির অবশ্যে নতুন গুণে নতুন অহুত্বিত,
এই যে নতুন দিন তাহার ভগ্ন লটতেছে, বিছানায় বসিয়া
বসিয়াই, পাহা একাগ্র চিত্তে আল তাহাকে বরণ করিয়া
সহিল । ঐ যে স্বপ্নের গুণবী, স্বপ্নের আকাশ, প্রকৃতির এই
স্বপ্নের সজ্জা, উচ্চাৎ মেঘের নির্ভর অত্যাচারে এখনই হস্ত
সঁকত নাই হইয়া বাইবে, কিন্তু কই, ধরুন ত হইয়া যায় না,
নই হুহ, কণিকের ভুল দীপন হইয়া গায়, আসার আসিয়া বেগা
মেঘ এখনই চাপি বুঝে, আশার আনন্দে, এখনই উচ্চল

কর্ণে। মাথার ভেতরও প্রায় হঠাৎ নয়, তাই তখন নিশা
কাটে, তাই তখন প্রত্যেক আবার কুল কোটে। পাখী গান
গায়, অশ্বার অশ্বের মন উদ্ভব হয়। সকল মাথারই

পাখীরই হইবে।—হঠাৎ মত, কিন্তু মাথার চার ধার
মত তাহার কল্পনার তুলি আশার যে প্রকৃতি ছবি আঁকিয়া-
ছিল—সে আশা? সে স্বপ্ন? পাখীর বুকের ভিতরটা
আবার একটু অস্বস্তি হইয়া উঠিল। অন্য তখন কল্পনা
ও পাখীর ছোট বাগানটিতে গিয়া পাখী হাত ছুটি দৃঢ়ভাবে
বুকে বসে কল্পনা চক্রে পড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কখন এক সময় শব্দ হইয়া পাড়াইয়া দেখিল, পূর্বে
সিগকেই সেই বস্তু-চকনের প্রলেপটুকু ঘূরিয়া গিয়া, বিশ্বব্যাপী
এক অনন্ত আলোকের মাধ্যমে অস্বস্তি অগতঃ একটু
সিন্দুরবিন্দু প্রভৃতির কপালে উদ্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

নিশা পরিবর্তনবিন্দু চক্রে একই অবস্থাতে কোথাও
কিছু স্থির হইয়া থাকে না, বিশ্বপ্রকৃতির চক্রে স্থা অস্থা হইতে,
চীর চর উদ্ভিদ বা মানুষ নৃহর্ষে নৃহর্ষে সকল কিছুই
পরিবর্তন চক্রে—কালরও ঘরে, কাহারও বা ক্রম।

বাক্যের রেনিং দ্বিতীয় পাড়াইয়া পাখী তাইতে লাগিল,
মাথার চক্রেই হইবে—নিশা হইবে। বিস্তার যে সমান,
আঁতরাইয়া যে গৌরব, তাহা আবার চাই, একবার ফেল
হইয়াছে, তাহাতে কি, আর একবার পরীক্ষা দিয়া পাস
করিব। বাক্য হইতে কেন নিব তাঁবনটাকে? মাথার মত
কল্পনা মাথার চক্রে,—ভাষারই মতই যদি কেহ থাকে, তবে
তাহার হাতের খেলার পুতুল হইবে না, নিজের পৌরুষ দিয়া
তাহাকে আনি ভয় করিয়া আসিব।

নিশা প্রাথমিকের নিক হইতে চাকরদের কর্ণ-বাক্যের
মাড়া পাওয়া যায়—নূতন মনিবটির অল্পতঃ অল্পতঃ কাল
যে তাহার মতই হয় নাট, তাহা নিশা—আজ তাহারিগকে
একটু আশ্বস্ত করিয়া দিতে হইবে।

[১৬]

বেশ বাড়িবার সঙ্গে মান, চা-পান ইত্যাদি বস্তুসমূহ
হইয়া গেলে, পাখীর কাছে মিনতি বেশ সহজ ও সহজ বোধ
হইতে লাগিল। বাড়িবার চারিদিকে ঘুরিয়া কিরিয়া বেশি
বাগানের একটি কোণের প্রকাণ্ড একটি কুকুড়া পাখীর নীচে
পাখীপাল তাহার বসিবার ভাষা ঠিক করিল। একটি
টোপিল এবং মোটা ডট চোখের আঘাত এবং বহির ঠাক
পুসিয়া, বাস্তবিক পাখী পুতক টোপিলের উপর লাগিয়া

লাগিল। তাহার পর ঘরের উপর একটু মাছের বিছাটয়া,
লম্বা হইয়া দেখানে শুইয়া পড়িল।

কম্বোয়ারি অধবাসী আদিবা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবার
পেতে মাছ তরকারি সবই ও এনেছে, কিন্তু পাখী, কি খেতে
তুনি ভালবাসে, এটা ও জানে না, তুনি একবার বলে দাও,
আমি ঠাকুরকে ডেকে দিই, কেমন?

অসম্ভব ভাবে বাচ্চ তুলিয়া পাখী কহিল—কি যে বলেন,
কি নিজে কি খাংতে হবে, আর কি খেতে ভাল হবে,
আমাকেই যদি বলে নিতে হবে, তবে ঠাকুর চাকরগুলো
ওকেই কি করতে?

—না বাবা, সবার রুচি ত সমান নয়, তাইবার কি ভাল
লাগবে না লাগবে ওরা জানে না ত! তেমন পাখী শোক ওরা
নয় কিনা, তু বলে দিলে, একসকল করে—

পাখী কিরিতে কিরিতে পাখী কহিল, যেমন করে পারে
ওরা দিক তাই দিক করে, মিলতে পারলেই হ'ল।

অপর বাচ্চ চলিয়া গেলে, পাখীর মন আবার বিচ্ছিন্ন
পূর্ণ হইয়া উঠিল। মাস দুয়েক আগেও পাওয়া লইয়া কত
আলোচনা চর্চা, কত হাত পরিচাল হইত তাহা মনে পড়িল।
মাকুলীন অত্যাচার পরের মাথার মেহের কথা মনে পড়িয়া
সোখ গুটি ছল ছল করিয়া উঠিল।

বা হোক, পাখীর মনের বোঝার পরিচাল মাগিয়া, তাহার
নূতন সংসারের গতি কিছু অল্প হইয়া গিয়া না। মিন
এবং বারিষ সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারী এবং হুতা পরিবেষ্টিত নানি-
বৃহৎ সংসারটি তাহার চলিতে লাগিল।

পাখী কলেক্ট বসি হইল এবং সংসারের ও পৃথিবীর সকল
কিছুকেই যেন অবহেলা করিবার অভিপ্রায়ে ঘোর করিয়া
পড়ি এবং উৎসাহ লয়ে করিয়া, অত্যন্ত ঝাঁক-ঝমকে পড়ার
আয়োজন করিতে লাগিল। তৎকালে নূতন বইও নূতন
মাকুল টেবিলখানি তাহার কক্ষকে করিতে লাগিল। সকলে
বিকালে মধ্যাহ্নের ছোট ছোট ছেলেরা হই, বাবীরা ও
বৃদ্ধ, সাজি করিয়া মূল আদিবা বাবুজির টেবিলের উপর কুল-
দানীটি মাড়াইয়া বসে, পাখী পাখীর নীচে আশ্রয়-কোয়ার
বসিয়া চা পান, এবং ওয়ার্ডসওয়ার্ড ও শেলী লইয়া মন্ত হইয়া
পাকে। তাহা শুইতে বাহিবার আগে বাগানে ঘুরিয়া কিরিয়া
বেড়াইয়া মনে মনে বলে, বা, বেশ আছি!

এইরূপ চারিদিকের অসীম শ্রুতির বাক্যে পবিত্রতা সৃষ্টি
করিয়া, পাখী সে সকলের প্রভাব দ্বারা নিজেই পূর্ণতা প্রদান
করিবার বশাবধা চেষ্টা করিতে লাগিল। [ক্রমশঃ]

রাজীবলোচন রায় রামমোহন রায়ের দুঃসম্পর্কের আট্টাশ ও এক জন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ১৮০০ সনে অপরিস্রবত অন্নধর্মের বন্দন তিনি বিশেষে গান, তখন রামমোহন রাজীবলোচনের হাতেই তাঁহার নিজেস্ব বিবাহসম্পত্তির তত্ত্বা-বধানের ভার দিয়া গান। রাজীবলোচন এক সময়ে রাম-মোহনের কোন-কোন সম্পত্তির বেনামদারও হইয়াছিলেন। এই বনিষ্ঠতার জন্য রাজীবলোচনের হৃৎকণ্ঠের বিকট রামমোহন-সংক্রান্ত অনেক বলিদপত্র এখনও রক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি রাজীবলোচনের প্রণোদিত গ্রীষ্মক স্মরণার্থ রায়ের সৌভাগ্যে আবার সেবিবার সুযোগ হইয়াছে। এই দলিল কয়গড় হইতে রামমোহন সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তবে অনেক সময়ে সংবাদগুলি এত দৃষ্ট বৈয়াক্য বাগ্যর্থ সংক্রান্ত যে একমাত্র জীবনিকার ভিন্ন অন্য কাহাণীও উহাতে অগ্রহ হইবার কথা নহে। সেই জন্য বর্তমানে রামমোহনের স্বাক্ষরিত একটি মাত্র দলিল উদ্ধৃত করিয়াই কাণ্ড হইবে।

এই দলিলটির তারিখ ১৮১০ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর। উহা হইতে দেখা যায় যে, রামমোহন তাঁহার বন্ধুর বিকট একটি ডিক্রি বিক্রয় করিয়াছেন। এই ডিক্রি বিক্রয় খুব সাধারণ বাগ্যর্থ নহে বলিয়া হয়ত একটু বাগ্যর্থ প্রয়োজন। রামমোহন ১৮১৭ সনে “কেন্দ্র হুগলীর কাহানাবাব পরগণার লাবন সিংহপুর সাকিনের সিংহর বংশ জৌমুর্জি, তাহার তালুক হুগলী কেন্দ্রের কাহানাবাব পরগণার লাট গোপালনগর বন্দক গ্রামিয়া ছয় হাজার টাকা কর্তব্য” সেন। এই টাকা ঐ জমীদার আলগা না করাতে রামমোহন ১৮২০ সনের হিসেবের দানে কলিকাতার হুজীম-কোর্টে নালিশ করিয়া হুসে-আলগে সাত হাজার ছয় শত চার টাকার ডিক্রি পান। কিন্তু কোন কারণে এই ডিক্রি গঠি না করাতে ১৮৩০ সনে উহা আরও দশ বৎসরের দুঃখ লইয়া যেট চৌক হাজার ছয় শত আট টাকার গড়ায়। এই সময়ে রামমোহন বিপত্ত-বাজার উল্লেখ করিতেছিলেন। তাঁহার টাকার প্রয়োজন অল্প দিলান্ত চিনিয়া গেলে বাসনা-বোকাছনা করিয়া টাকা আহার করিতে পারিবেন কি না অনিশ্চিত। সুতরাং বহু রাজীবলোচনের বিকট হইতে আট হাজার ছয় শত টাকা

লইয়া ডিক্রিট বিক্রয় করেন। তাঁহার দত্ত রাজীবলোচনের কথা থাকে যে, সম্পূর্ণ টাকা আহার হইলে রাজীবলোচনই উহা পাইবেন, রামমোহন আট হাজার ছয় শত টাকার বেশী আর কিছু দাবী করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে রাজীবলোচন যদি টাকা আহার না-করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি রাম-মোহনকে যে টাকা বিক্রাছেন তাহা ফিরাই চাহিতে পারিবেন না। সমস্ত বাগ্যর্থটা স্পষ্ট দলিলটি পড়িলেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে। ইহার অবিকল প্রতিশ্রুতি এত পরিষ্কার যে ছাপার অক্ষরে প্রতিশ্রুতি সেও নিশ্চয়োক্তন মনে করিয়া।

এই দলিলের আলল বিষয় বিয় আরও ত্র-একটি চিনিব দলিল করিবার আছে। প্রথমেই দেখিতে পাই যে, বলিদ-পত্রের শীর্ষে যে-চারগার হিন্দু বেন-বেদীর নাম থাকে সে দৃশ্যে রামমোহনের স্বাক্ষরে দেখা “সত্য” এই কথাটি রহিয়াছে। রামমোহন ত্রয়োদশক বনিগা একবার আলাদা হিন্দুর সাধারণ শপথের অতিরিক্ত বেনাঙ্গ-ওর হাতে দইয়াও শপথ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা ছিল। এই দলিলে তাঁহার যথেষ্ট পিণ্ডিত “সত্য” এই কথাটি হইতে দেখা যায় যে, হিন্দু বেন-বেদীর শপথ ইচ্ছা-হৃৎক কোন শব্দ ব্যবহার করা তাঁহার রীতি ছিল। দ্বিতীয়তঃ, রামমোহন ১৮১৭ সনে, হুগলী হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পর টাকা কর্তব্য নিতেছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। অনেকের ধারণা আছে, পরজীবনে রামমোহন কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার দইয়াই বাপুত ছিলেন। উহা ঠিক নহে। বর্তমান দলিলটি হইতে দেখা যায়, তেজারতি বাসনা তাঁহার জীবিকার একটি অঙ্গ ছিল। ইহা ছাড়া সম্প্রতি আমি ১৮১৭ সনের ২৭এ এপ্রিল তারিখের “দবয়েন্ট গেজেট” নামক ইংরাজী সংবাদপত্রে রামমোহনের উল্লেখ পাইয়াছি। উহাতে তিনি নিজেকে “বেনিয়ান” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।^{১০} সুতরাং তখনও যে তিনি বাসনা-বাতিতো লিপ্ত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। রামমোহনের এই দলিলে “সাকিন্ কলিকাতা” ইয়াও বোধ করি পরিশেষে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার একজন গন্যমান্য অধিবাসী হইবার আকাঙ্ক্ষা রামমোহনের প্রথম বৌধন হইতেই ছিল। সেই জন্য তিনি নিজেকে প্রাচ্য জমীদার বনিগা পরিচয় না কিং কলিকাতাবাসী বনিগারই পক্ষপত্তি ছিলেন।

* List of Persons qualified and liable to serve on Juries in the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal, prepared by the Clerk of the Crown, and published by order of the said Court.

Name of Jurors.	Their style or Calling.	Their Residence.	Their Native Country.	Their Religion.	Their qualification to serve on Juries.	Their exemption from serving on Common Juries.
Rammohun Roy,	Daniam,	Manicktullah	East Indies	Hindoo		Possessing Property worth of 2 Lacs of Rs.

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(পূর্বাশ্রয়)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

(১) মেডিক্যাল-কলেজ-স্থাপনের কারণ

১৮-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশের লোকদিগকে ইউরোপীয়-প্রণালী-মতে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার কথা উঠে। প্রথম মাসের ‘বঙ্গভিত্তি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, ‘মেডিক্যাল-কলেজ’-এর স্থায়ী হইবার পূর্বে কলিকাতায় গভর্ণমেন্ট-কর্তৃক স্থাপিত ওই ‘মেডিক্যাল-স্কুল’ ছিল। প্রথমতঃ, ‘নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন’ (Native Medical Institution)। দ্বিতীয়-পক্ষের হালপাতায়, ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হইয়া, ব্যাংকোৎসর্গ-বিদ্যার ও বংশাব্যাস ডাক্তার করিবার নিমিত্ত কম্পাউন্ডার (Compounder) ও ড্রেসার (Dresser) শিক্ষিত। তাহারাই এই স্কুলে শিক্ষা পাইত। তাহার পরবর্ত্তে উক্ত-পক্ষ-বাকুল-বায়ী হবিদাসদাসের পুত্র অথবা অধিকারী। এই স্কুলে অতি সামান্য ডাক্তারী-শিক্ষা দেওয়া হইত। চিকীৎসা-বিদ্যায় লিপিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক পড়ান হইত। চারুপত্র ছাপান, ভেড়া ও কুকুর কাটা শারীর-স্থান-বিজ্ঞা (Anatomy) শিক্ষা করিত। ডাক্তার উইলিয়াম জেমসন (Dr. William Jameson), ডাক্তার জন ব্রেলন (Dr. John Breton) ও ডাক্তার জন টাইটলার (Dr. John Tytler) ক্রমান্বয়ে এই স্কুলের শিক্ষক ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট (Teacher and Superintendent) ছিলেন। ইহাতে যেটামাত্র ডাক্তারী-বিজ্ঞার অধ্যয়ন হইত, এবং ফলও তত ভাল হইত না। ছাত্রগণ ইংরাজী জানিত না; এই জন্য, শিক্ষক মহানদ্বকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। দ্বিতীয়তঃ, ‘মাদ্রাসা-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস’ (Medical Class in the Madrasa College)। এখানে কেবল মুসলমান-ছাত্রগণ শিক্ষাদাত করিত। আরবী ভাষায় যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থ আছে, উর্দু-ভাষায় তাহাদিগের অনুবাদ করিয়া তাহাই পড়ান হইত। ছাত্রগণের সংখ্যাও অতি অল্প ছিল। তাহারও ইংরাজী জানিত না। তৃতীয়তঃ, ‘সংস্কৃত-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস’ (Medical Class in the Sanskrit

College)। ডাক্তারগণের প্রথম কর্তব্যসী রস-মাক্লেব (Mr. Ross) প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান সংক্ষেপে ইংরাজী-ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শিক্ষা দিতেন। ছাত্রগণ ইংরাজী বুঝিত না। বহু-কর্ম-ভার-নির্ভরিত ডাক্তার টাইটলার (Dr. Tytler) ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। ডাক্তার গ্রান্ট (Dr. Grant) এনাটমী ও ফিজিয়লজি (Anatomy and Physiology) পড়াইতেন। এতদ্বিধা ইউরোপীয়-মতে রোগ-নির্ণয় ও অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত। কলেজের সংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র হাসপাতাল ছিল। সেখানে ৩০টা রোগী থাকিত। বৈদ্য ছাত্রগণ সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম ও কৃত্তি-শাস্ত্র পড়িত। পুনশ্চ তাহার হাসপাতালে গিয়া রোগ-চিকিৎসা ও অস্ত্র-প্রয়োগ করিতে শিখিত। এখানেও অধ্যয়নের নিয়তি ছিল না। চরক, ব্রহ্মসূত্র, নিবান, ভাব-প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থও তাহাদিগকে পড়িতে হইত। এইরূপ মিশ্রিত শিক্ষার নানাদিগ অগ্রবিদ্যা ও পোষণযোগ্য বস্তুতে লাগিল।

কোন কোন ইংরাজ ডাক্তার বসিলেন, এইরূপ স্বল্প-শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; এক-প্রকার শিক্ষা দেওয়াই হইত। ডাক্তার টাইটলার (১) স্বল্প-শিক্ষার ঘোর পক্ষ-

১। ডাক্তারগণের বিদ্যার বর্নও অল্পতালমিহি বহান ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে হোমারের কুলম্বান ধর্মোপাখ্যায়ের সহিত পানার পক্ষের কলিমা ছিল। ফিলসফি, বহ্মোপাখ্যায়ের বহ্মোপাখ্যায়ের সহিত পানার পক্ষের কলিমা ছিল। তৎকালে তিনি কলি-টাইটলার এবং বস্তুতে বস করিতেন। তাহার কথা ‘অনেকেরই হইল’ ও ‘অনি ভাষায় বিকট প্রাচীন কলিমা’র বহু পুণ্যবান। অধি-প্রাচীন ‘বহু-কলিমা’র বহ্মোপাখ্যায়ের সহিত পানার পক্ষের কলিমা ছিল। তিনি কলিমা কলিমা কলিমা, ‘মন টাইটলার’ মাক্লেবের কলিমা জাতি। মাক্লেবের বহ্মোপাখ্যায়ের সহিত পানার পক্ষের কলিমা ছিল। ‘সোডা’ (Soda) বহু ওয়াই কলিমা টাইটলার ইনি উক্ত হইল পক্ষের বহ্মোপাখ্যায়ের সহিত পানার পক্ষের কলিমা ছিল। এই বহ্মোপাখ্যায়ের ‘সোডা’ (Professor Soda) বহ্মোপাখ্যায়ের সহিত পানার পক্ষের কলিমা ছিল।

পতিত হইল। সেন মহাপন্থ এই কলিকাতা একমাত্র বাঙ্গালী মেম্বর ছিলেন। উপরি-উক্ত প্রাণটি-সাথেই এই সভার সভাপতি হইলেন। রায়কমল সেন মহাপন্থ তৎকালে সাধারণ-জন-হিতকর কার্যের অগ্রণী থাকিতেন। তিনি বিজ্ঞ, ধার্মিক ও দেশ-হিতৈষী ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ লোকের খায়া-কিঞ্চল এবং কিঞ্চল-ভাবে বর্তমান সময়ে কলিকাতার চিকিৎসা-প্রাণী চণ্ডিহে, তাহা জানাইবার জন্য রায়কমল বাবু ও কাক্সন-সাথেই উপরি ভাষা অন্তর্ভুক্ত হইল। এই দুই জন যে রিপোর্ট দিলেন, তাহার মার মর্মে এই :-

১। ব্রিটিশ পোকবিশেষের চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় একটা হাসপাতাল খোলা উচিত।

২। তবানীপুরে একটা 'জেনারেল হাসপাতাল' (General Hospital) আছে। কিন্তু সেখানে কেবল সাধারণবিশেষের চিকিৎসা হয়। বরিত্ত বাঙ্গালী-গণ সেখানে 'বাইতে পারে না'। কলিকাতায় এখন একটি 'নেটিভ হাসপাতাল' (Native Hospital) ও দুইটা 'ডিসপেন্সারী' (Dispensary) আছে। কিন্তু সাধারণ লোক সেখানে যিগা বিশেষ উপকার পায় না।

৩। কলিকাতায় এখন বাহ্যিক দেশের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। অত্যন্ত সাধারণ অধিবাসি-গণ দেশের অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। এখানে এখন এটা বড় বড় পুষ্করিণী আছে—লালদাঙ্গি, ওয়েলিংটন রোডের পুষ্করিণী, পটোল-ডাকার মোলদাঙ্গি ও বেহুড়া পুষ্করিণী। প্রথম পুষ্করিণীর জল লইবার জন্য লোকেরা প্রাতঃকালে এটা হইতে গাড়ি ১০টা পর্যন্ত সেখানে ব্যতায়িত করে। পক্ষার সহিত ইহার যোগ না থাকিলে এপ্রিল ও মে মাসে ইহার জল শুকাইয়া যায়। দ্বিতীয় পুষ্করিণীর জল তত ভাল নহে। তৃতীয় পুষ্করিণী তত গভীর নহে। এই হেতু, ইহাতে অতি অল্পই জল থাকে। এই জল ঐশ্বর্যকালে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত নহে। বিশেষতঃ নানা নর্দারার জল এখানে আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে। চতুর্থ পুষ্করিণীর জল কেহই ব্যবহার করিতে চায় না। কেন যে লোকেরা ব্যবহার করিতে চায় না, তাহা আমরা জানি না। গঙ্গার জল, নবসরের অধিকতর সময়েই, অত্যন্ত অপরিস্রব ও অস্বাস্থ্যকর থাকে।

৪। কলিকাতায় ব্রিটিশ পোকবিশেষ পানা পুড়িয়া ও

তাহার মাটি লইয়া বর তৈয়ারী করিয়া থাকে। এই সকল পানা তাহার ব্রুইয়া না দেওয়ায় তাহাতে বৃষ্টির জল ও নানা আবজ্ঞনা পড়িয়া বা-গাশি দূষিত করিয়া ফেলে। এটি হেতুই লোকের সাংঘাতিক মন হয়।

৫। সময়ে পাটপানার অথবা অতি শোচনীয়। তাহার বসন্তাশি মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির জলে বৌত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

৬। কলিকাতার উপকণ্ঠে অনেক বড় বড় লোকের বাগান আছে। এই সকল বাগান হইতে জল বাহির হইবার উপায় নাই। অধিকতর তাহার উপর অনেক আবজ্ঞনা আসিয়া পড়ে। এই হেতু, বাবু দূষিত হইয়া পড়ে এবং লোকের তীব্র ম্যালেরিয়া হয়। আরও প্রত্যবে কি ধনী, কি দরিদ্র, অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৭। অনেক লোক চাকরী পাইবার চেষ্টার মন্বয়ল হইতে কলিকাতায় আসে। তাহার। পুরাতন অস্বাস্থ্যকর বাড়ির এক একটা ঘর ভাড়া করিয়া বাস করে। প্রত্যেক ঘরের ভাড়া ৮/- হইতে ২/- টাকা পর্যন্ত। তাহার। ঈশ্বর-কলসে আরও ভিতরে বাড়ির উপরে ভাইয়া থাকে। ঐশ্বর্যকালে তাহার। অনাহৃত হানে বা বাস্তব খায়ে পড়িয়া থাকে। ঈশ্বর্য তাহার। যে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইবে, তাহা বিচিৎ নহে।

৮। এখন উক্ত পোকবিশেষের মর বা ওপাউটা হয়, তখন তাহাদের কষ্টের নীচা থাকে না। এক পরমা দায়ের পানচ কিনিবারও অথবা তাহাদের নাই। কেহ একটা পরমা দান করিলেও পানচ প্রস্তুত করিবার দান ও উপায় তাহার। বেধিতে পায় না।

৯। যদি কোন মন্বয়লের লোক কলিকাতায় কোন গৃহস্থ লোকের বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে বাস করে, এবং সেখানে থাকিয়া রোগাক্রান্ত ও মৃতপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহার গৃহস্থানী তাহাকে পক্ষাতীরে পাঠাইয়া দেয়, এবং তাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন লোককে সেখানে রাখিয়া রাখে। এই লোকেরা রোগীকে মধ্যে মধ্যে পক্ষাকালে চোবাইতে থাকে, এবং পরিপূর্ণ তাহার মৃত্যু হয়। ইহাকেই লোকে 'ঘাট মূর' (Ghat murder) বদিয়া থাকে।

১০। তাই আমরা বলি যে, উক্ত প্রকার পোক বিনা চিকিৎসায় কলিকাতায় থাকিয়া যারা যায়। এখন কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে একটি অন্ততঃ কুস্ত হাসপাতাল খোলা উচিত। ইহা করিলে বহু নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় পোক মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা পায়।

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, লর্ড উইলিয়ম বেটিক ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, অক্টোবর-মাসে ৬ জন যেশ্বর লিঙ্গা একটি কমিটী গঠন করেন। পূর্ব এক বৎসর কাল অতীত হইয়া গেল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ২০ অক্টোবর তারিখে উক্ত কমিটীর যেশ্বর-পণ, চাইটলাব-প্রবুখ প্র্যাচা-পণের এবং ডাক-সাহেব-প্রবুখ প্রাচীনা-পণের মস্তের তত্ত্ব-তত্ত্ব বিচার করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেটিকের নিকটে উক্ত কমিটীর লিখিত্যর সম্বন্ধ পাঠাইয়া দিলেন। এই সম্বন্ধে বহু প্রথমতঃ দুইটা বিষয় বিবেচ্য ছিল। প্রথমতঃ, সংস্কৃত ও আরব-দেশীয় আবর্জনা-মতে চিকিৎসা-কার্য চলিলে কি না? দ্বিতীয়তঃ এ দেশীয় ভাষায় অথবা ইংরাজী ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইবে? কমিটীর অধিকাংশ যেশ্বর লিখিলেন, “ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা-দান করা সর্বতোভাবে বিধেয়: কারণ, এই ভাষায় নানাবিধ শাস্ত্র লিখিত আছে। সুতরাং এই ভাষায় শিক্ষাদান করিলে ছাত্রদের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইবে। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ-সমূহে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট লিখিত আছে, তাহা তত বিজ্ঞান-সম্মত নহে। বিশেষতঃ, সূত্র-মানব-সেহ ব্যবহৃত করিয়া ছাত্রগণকে ‘এনাটমী’ শিক্ষা দেওয়া উচিত। নচেৎ তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না।”

উক্ত কমিটী তৎকালিক এী ‘মেডিক্যাল স্কুলের’ (Medical school) যে ১০টা সেশ ও ক্রটি দেখাইলেন, তাহা এই :—

১। যে প্রাণী অধলন করিয়া ছাত্র-গণকে ভর্তি করা হয়, তাহার মুখপার অভাব।

২। শিক্ষাদান করিতে হইলে যে সকল বস্তু বা উপায়ের প্রয়োজন, তাহার অভাব।

৩। মানব-সেহের কোথায় কি আছে, শিক্ষাদানের সময়ে কথায়: তাহা না দেখাইয়া দেওয়া।

৪। ছাত্র-গণকে ভর্তি করিবার সময় বিশুদ্ধতা।

৫। শিক্ষাদানের সময়ে যাহাতে ছাত্রগণকে উৎসাহিত করা যায়, তাহার অভাব।

৬। কলেজে পাঠ করিবার সময়ে অন্তর।

৭। যে সকল বস্তু বা উপায় অবলম্বন করিলে ছাত্রগণ খিঁচিতে বসিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহার অভাব।

৮। শিক্ষক-কর্তৃক শিক্ষাদানের সময় ছাত্রগণের অশ্লীল-ব্রিতি ও অব্যবহারিকতা।

৯। স্থপারিন্টেন্ডেন্টের কমতা-প্রাপ্তির ও কর্তব্য-প্রদর্শনের অভাব।

১০। শেখ-পরীক্ষা-প্রদানের সময় বিশুদ্ধতা।

উক্ত কমিটী, লর্ড উইলিয়ম বেটিককে যথেষ্ট লিখিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই :—

“আপনি বহুদূর ভ্রমভরণ শাসন করিতেছেন, সেইরূপে দেশীয় লোকের উপকার করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের অল্পবয়স্ক এই যে, ‘নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন’, ‘সংস্কৃত কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস’ এবং ‘মাদ্রাসা-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস’ (Native Medical Institution, Medical Class in the Sanskrit College and Medical Class in the Madras College) এখনই তুলিয়া দেওয়া হউক। ইংরেজের পরিবর্তে এখন একটি ‘মেডিক্যাল কলেজ’ করুন, যাহাতে ইউরোপীয়-প্রাণী-অনুসারে ইংরাজী-ভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এক সম্রাজ্যের ছাত্রগণ কেবল ইংরাজী ভাষায় সাহায্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা করুক, এবং অল্প সম্রাজ্যের ছাত্রগণ যাহাঙ্গা অথবা হিন্দী এবং কিঞ্চিৎ অল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করুক।”

(২) মেডিক্যাল-কলেজ-স্থাপন

লর্ড উইলিয়ম বেটিক (১) কমিটীর কথা বিশেষ-রূপ

১। আমরা ইংরেজে পড়িগছি, লর্ড উইলিয়ম বেটিক যথেষ্ট প্রতি মুখ্যতঃ, বিজ্ঞিত ও চাক্ষুঃ-পূর্ণ লিখিলেন। কিন্তু যেসকল লোকের চৈতন্য ইহার লিপ্যন্তর করা বলিবারিচ্ছা: তিনি (Hon. Professor of Sanskrit at the Oxford University) ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, ২২শে মার্চ তারিখ রামকমল সেন মহাশয়কে এই কথা লিখিবারিচ্ছা:—“Lord William Bentinck is an ignorant man, He has a vigorous mind and quiet observation, but he never reads, and therefore often judges wrongly.”—Peadar Chand Mitter's *Life of Lord Bentinck* Vol. I.

বিভাগ করিয়া 'জিব কর্পোরেশন, বহমান জী 'মেডিক্যাল ক্লাব' (Garrison Surgeon of the Fort William), 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ দি হাট ইনফার্মারী' (Superintendent of the Eye Infirmary) এবং 'এপথিকারী অফ দি অনারেবল কোম্পানী' (Apothecary of the Honourable Company)

"গভর্ণমেণ্ট জেনারেল অর্ডার, নং ২৮, ২৮ জানুয়ারি, ১৮৫৫" (Government General Order, No 28, 28th January, 1855)

১। আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে 'সংস্কৃত-কলেজে মেডিক্যাল-ক্লাস', 'মাদ্রাস মেডিক্যাল-ক্লাস' ও 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্সটিটিউশন' (Medical Class in the Sanskrit College, Medical Class in the Madras College, and the Native Medical Institution) উন্নিত হইবে।

২। 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্সটিটিউশন' যে সকল ছাত্র শ্রেণী (তৃতীয় বর্ষিক) পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার বোধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে 'নেটিভ ডাক্তার' (Native Doctors) করা যাইবে। অতীত ছাত্রগণ এক্ষণে যে বৃত্তি পাইতেছে, এত পাইয়া তাহাদিগকে কেন্দ্রীয় চৈনিক সনের সাহায্যে পয়স করিতে হইবে, এবং 'মেডিক্যাল কমিটি' (Medical Committee) কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহাদিগকেও 'নেটিভ ডাক্তার' বানান গণ্য করা যাইবে।

৩। একটা নতুন 'মেডিক্যাল-কলেজ' (Medical College) স্থাপিত হইবে। ইহাতে নিম্নোক্ত-সংখ্যক ছাত্র আশ্রয় করিবেন এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় বাবতীয় বিষয় পরিত হইবে।

৪। 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন' (General Committee of Public Instruction) এই কমিটির বাবতীয় কার্য পরিচালনা করিবেন।

৫। উক্ত কমিটি এই ব্যবস্থা-জন ডাক্তারের সাহায্য লইয়া কার্য করিবেন,—'সার্জন অফ দি জেনারেল হস্পিটাল' (Surgeon of the General Hospital), 'সার্জন অফ দি নেটিভ হস্পিটাল' (Surgeon of the Native Hospital), 'সার্জিস্ট সার্জন অফ ফোর্ট উইলিয়াম'

(Garrison Surgeon of the Fort William), 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ দি হাট ইনফার্মারী' (Superintendent of the Eye Infirmary) এবং 'এপথিকারী অফ দি অনারেবল কোম্পানী' (Apothecary of the Honourable Company)

৬। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করা হইবে।

৭। কতকগুলি দেশীয় ছাত্রকেই ভর্তি করা হইবে। তাহাদের বয়স ১৫ বৎসর অগ্রে এবং ২০ বৎসর অপেক্ষা অধিক হইবে না। বাহ্যিক সঙ্গ-প্রাথমিক ভর্তি হইবে, তাহাদের নাম 'ফাউন্ডেশন প্যাপিস' (Foundation pupils) হইবে।

৮। যে সকল ছাত্র সর্গ-প্রাথমিক ভর্তি হইবে, তাহাদের বয়স-সংখ্যা ৩৮টির বেশি ভাগ হয়। তাহারা যেন ইংরাজী ও বাঙ্গালার অথবা ইংরাজী ও হিন্দী ভাষার লিখিত ও পড়িতে পারে। তাহাদের বয়স যেন ১৫ বৎসর অপেক্ষা অধিক ও ২০ বৎসর অপেক্ষা অধিক না হয়। ছাত্রগণ জাতি-নির্ণেয়ে ভর্তি হইতে পারিবে।

৯। কমিটির সুপারিন্টেন্ডেন্ট (Superintendent) ও 'এডুকেশন কমিটি' (Education Committee) ছাত্রগণের বয়স-সংখ্যা, চরিত্র, বয়স ও বিজ্ঞান-সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবেন।

১০। যে সকল ছাত্র সর্গ-প্রাথমিক ভর্তি হইবে, তাহাদের সংখ্যা ৫০এর অধিক হইবে না।

১১। যে সকল ছাত্র সর্গ-প্রাথমিক ভর্তি হইবে, তাহারা ৭ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইবে। নিম্ন-লিখিত নিয়ম-সারে এই ৭ টাকা অপেক্ষা আরও কিছু বৃত্তি হইতে পারে।

১২। যে সকল ছাত্র সর্গ-প্রাথমিক ভর্তি হইবে, তাহাদের তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যাইবে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ ৭ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ২ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ১২ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইবে।

১৩। কমিটির 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট' (Superintendent) ও 'এডুকেশন-কমিটি' (Education Committee) উক্ত শ্রেণী-বিভাগ করিবেন। ছাত্রগণের বিজ্ঞান-সম্বন্ধে প্রবেশ-বিভাগ করা হইবে,—তাহাদের পঠন-কালের

উপর নির্ভর করিতে না। কোন ছাত্রই প্রথম ৩ট বৎসর ৭ টাকা মাসিক বৃত্তির অধিক পাইবে না। কিন্তু পরিশেষে যদি কোন ছাত্র খাতি বিঘ্নাদিহীন উৎকর্ষ দেখাইতে পারে, তবে সে ৭ টাকার অধিক মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইবে।

১৪। ছাত্রগণ কলেজে ৪ বৎসরের অধ্যয়ন ৪ ৬ বৎসরের অধিক কাল থাকিবে পারিবে না।

১৫। ইউরোপে যে প্রণালীতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, ঐক পদ্ধতি প্রণালীতেই এই কলেজে শিক্ষাদান করা হইবে।

১৬। ছাত্রগণ নিম্নোক্ত নিয়মাবলীর নিম্নোক্ত পাঠ্য-পুস্তক শেষ করিলেই তাহারা একখানি 'ম্যাট্রিকুলেট' পাইবে। কলেজের 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট' (Superintendent) টাঙ্কে স্বাক্ষর করিবেন। এই 'ম্যাট্রিকুলেট' দেখাইলেই তাহারা 'শেষ পরীক্ষা' (Final Examination) দিতে পারিবে।

১৭। 'এডুকেশন-কমিটি' (Education Committee) ও উপর-নিমিত্ত মেডিক্যাল অফিসার-গণ (Medical officers) ছাত্রগণের 'শেষ-পরীক্ষা' গ্রহণ করিবেন। যে সকল ছাত্র পরীক্ষার সম্ভাব্যত্বক ফল দেখাইতে পারিবে, তাহাদের প্রত্যেককে একখানি 'প্রোগ্রা-পত্র' পাইবে। তখন তাহারা ঊন প্রোগ্রা ও অফ-চিকিৎসা করিবার অধিকার পাষ্টয়া গভর্নমেন্টের অধীনতায় চাকরী করিতে সমর্থ হইবে।

১৮। পরীক্ষার উদ্যোগ ছাত্রগণ যে প্রোগ্রা-পত্র পাইবে, তাহাতে এই সকল লোকের স্বাক্ষর থাকিবে,—'এডুকেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট' (President of the Education Committee), 'এডুকেশন কমিটির সেক্রেটারী' (Secretary of the Education Committee) এবং এই 'কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট' (Superintendent of the College)

১৯। বাহ্যিক গভর্নমেন্টের চাকরী নইবেন, তাহাদের প্রত্যেককে এক জন করিয়া 'সেন্ট্রাল ডাক্তার' পাইবেন। ৫টী পরীক্ষার সমাপ্তী কালে যদি কোন চাকরী খালি হয়, তাহা হইলে যে ছাত্র গত পরীক্ষার ভাল করিয়া পাশ হইয়াছে, তাহাকেই সেই চাকরী দেওয়া হইবে। তবে যে ছাত্র ভ্রষ্টবিশ, তাহারই অ্যাপলন অসমর্থন।

২০। যে সকল 'সেন্ট্রাল ডাক্তার' পাশ হইয়া প্রকৃষ্ট-

পত্র পাষ্টয়াছে, তাহাদের মাসিক বেতন প্রথমতঃ ১০০ টাকা হইবে। ১ বৎসর চাকরী করিবার পরে তাহাদের মাসিক বেতন ১০০ টাকা, এবং ১৭ বৎসর পরে মাসিক বেতন ৪০০ টাকা হইবে। ২০ বৎসর চাকরী করিবার পরে তাহারা পেনশন প্রাপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করিবে।

২১। 'মেডিক্যাল-কলেজের' ভূত একখানি উপকূল বাড়ী, একটা পাঠ্যদ্রো, এনাটমী ও অঙ্গার বিদ্যা শিক্ষা দিবার ভূত প্রোগ্রামের উপায়-সামগ্রী, —এই সকল বস্তু সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত 'এডুকেশন কমিটির' (Education Committee) উপর ভার অধিত হইবে।

২২। 'মেডিক্যাল-কলেজের' পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত একজন 'ইউরোপীয় সুপারিন্টেন্ডেন্ট' (European Superintendent) থাকিবেন। তিনি সমস্ত-দিন কলেজের কাছাকাছি বাস্তু থাকিবেন এবং বাহিরে যিহা চিকিৎসা করিতে পারিবেন না।

২৩। উক্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রেসিডেন্টে থাকিলে যে বেতন ও ভাতা পাইতেন, তাহা তিনি পাইবেন, এবং তাহা বাড়ীত তিনি ১০০০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।

২৪। সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাহার 'একজন ইউরোপীয় সাহায্যকারী' (European assistant) থাকিবেন। প্রেসিডেন্টে থাকিলে তিনি যে বেতন ও ভাতা পাইতেন, তাহা তিনি পাইবেন, এবং তাহা বাড়ীত তিনি ৪০০ টাকা মাসিক বেতন পাইবেন।

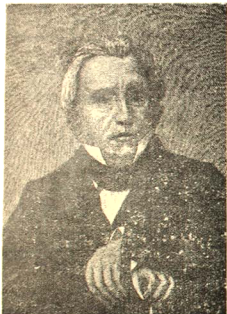
২৫। উক্ত ইউরোপীয় সাহায্যকারী (European assistant) সমস্ত দিন কলেজের কাছাকাছি নিবৃত্ত থাকিবেন। তিনি বাহিরে যিহা চিকিৎসা করিতে পারিবেন না।

২৬। উক্ত ইউরোপীয় সাহায্যকারী, কলেজের কোন কার্যে কর্তৃত্ব প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তবে সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমুদতি করিলেই তিনি তাহা করিতে পারিবেন। ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত সুপারিন্টেন্ডেন্টকে তিনি সাহায্য করিবেন, ইহাই তাহার সর্ব-প্রধান কার্য।

২৭। কলেজের সমস্ত কার্য-পরিচালন, ছাত্রগণের স্বাস্থ্যাবেক্ষণ, শিক্ষা-বান-পদ্ধতি প্রভৃতি বাবতীয় কার্য সুপারিন্টেন্ডেন্ট করিবেন। তবে তিনি 'এডুকেশন-কমিটির' অধীন হইয়া কার্য করিবেন।

১৮। কলেজের কার্যে কিরূপে গণিত-প্রদে, তদ্বিষয়ে ১৮ মাস অল্পের স্থপারিন্টেন্ডেন্ট, 'এডুকেশন কমিটিতে' রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। 'এডুকেশন কমিটি' এই রিপোর্ট 'ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের' নিকটে প্রাতিষ্ঠিত করেন।

১৯। স্থপারিন্টেন্ডেন্টের কি কার্য এবং তাহার সহকারীর বা কি কার্য, তাহা স্থপারিন্টেন্ডেন্টের দ্বারা বর্ণিত হয়। তবে এ বিষয়ে তাহাকে 'এডুকেশন-কমিটির' পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত।



৭ষ্ঠ বোর্ডের।

২০। স্থপারিন্টেন্ডেন্ট ও তাহার সহকারী উভয়ে শিক্ষার ছাত্রসংখ্যক এন্ট্রান্স, সার্ভিস, ইন্স প্রয়োগ ও ইন্স প্রস্তুত করণ সম্বন্ধে শিক্ষাগণন করিবেন; এবং তাহাদিগকে প্রদান শিক্ষিত করিবেন যে, তাহারা যেন শিক্ষিত ও মিলিটারী বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করিতে পারে।

২১। ছাত্রগণ এই সকল হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারীতে প্রিয়া সেবাস্থানে সমস্ত বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আসিবেন,—'জেনারেল হাসপাতাল' (General Hospital), 'অন্যদের কোম্পানীর

ডিসপেন্সারী' (Honourable Company's Dispensary), 'নিরীশ্বরের ডিসপেন্সারী' (Dispensary for the poor) এবং 'চক্ষুরোগের হাসপাতাল' (The Eye Infirmary)।

২২। কলেজে ব্যবহার করিবার জন্য মাসে মাসে বাহা কিছু কাগজ, কলম, কাণী প্রভৃতি প্রয়োজন, তাহার খরচ সরকারেই হইতে দেখা হইবে। তবে 'এডুকেশন-কমিটি' দেখিয়া বিবেচন, এই খরচ ঠিক কিনা।

২৩। 'এডুকেশন-কমিটি,' কলেজের নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া দিবেন।

২৪। যে কয়েক জন প্রেসবীট্রিয়ান সর্জ-প্রথমে ভর্তি হইবে, তাহাদেরও অপেক্ষা আরও ছাত্র লওয়া হইবে। ছাত্র-গণের বয়স ১৪ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। তাহাদের আতি-কিয়ার করা হইবে না। তবে তাহাদের বংশ-বধ্যাবা ও সম্মতিত্বা থাকা চাই। তাহারা যেন ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার অথবা ইংরাজী ও হিন্দী ভাষার লিখিতে ও পড়িতে পারে। প্রকৃত ছাত্রকেই কলেজে ভর্তি করা হইবে।

২৫। কলেজের স্থপারিন্টেন্ডেন্ট, কলেজের খরচ সম্বন্ধে একপানি বিল করিবেন এবং 'এডুকেশন কমিটির' সেক্রেটারী ইহাতে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন। এতদ্বিধ 'মেডিক্যাল-কলেজের' ও 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্সটিটিউশনের' বাড়ী-ভাড়ায় অন্য আর একপানি বিল করিবেন। 'এডুকেশন-কমিটির' সেক্রেটারী ইহাতেও স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) সর্ব-প্রথমে কোন বাড়ীতে 'মেডিক্যাল কলেজ' বসিয়াছিল ?

বর্তমানে বিষ্ণু-কলেজের উত্তর-দিকে যে স্থানে এখন 'এলবার্ট ইন্সটিটিউট' (Albert Institute) আছে, পূর্বে সেই স্থানে 'এলবার্ট-কলেজ' ছিল। রামকমল সেন মহাশয় এই বাড়ীর অধিকারী ছিলেন। এই বাড়ীতেই ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, ২১শে জুন বিবলে 'শুল কং নেটিভ ডক্টর' (School for Native Doctors) বসিয়াছিল। এই বাড়ীতেই সেন মহাশয় 'সংস্কৃত কলেজের' অধ্যাপকদিগের দ্বিতীয় শাসনাধীন করিতেন। এই বাড়ীতেই সর্ব-প্রথমে 'মেডিক্যাল কলেজ' বসিয়াছিল। এই

বাটীতেই প্রেসিডেন্ট 'ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন' (Captain D. L. Richardson) সাহেব বাস করিয়া 'হিন্দু কলেজ'র ছাত্রগণকে বিভাবান করিতেন। (১) এই বাড়ীতেই থাকিয়া 'ক্যাপ্টেন' (Mr. Kerr) হিন্দু কলেজের অধ্যাপকতা করিতেন। সেন মহাপণ্ডের এই বাড়ীপানিশে পৌঁছান বিশেষে অসুখ হইয়া গিয়া।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে, ১লা জুন মোঘল (১৮০২ বঙ্গাব্দে, ১২শে জ্যৈষ্ঠ দিবসে 'মেডিক্যাল-কলেজ' (Medical College) স্থাপিত হয়। তখন 'মেডিক্যাল-কলেজ'র গাঠী নির্মিত হয় নাই। এই হেতু, রায়কমল সেন মহাপণ্ডের উক্ত বাড়ীতেই 'মেডিক্যাল-কলেজ' বসিতে লাগিল। মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলী (Mountford Joseph Bramley) সুপারিন্-টেন্ডেন্ট (Superintendent) নিযুক্ত হইয়া ছাত্রগণকে শিক্ষাবান করিতে এবং এই বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন। ৬০ টাকা মাসিক ভাড়া দিয়া হইল। তখন 'লর্ড মেকলে' (Lord Macaulay) 'জেনারেল কমিটী

অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন' (General Committee of Public Instruction) সভাপতি ছিলেন। তিনি বলিলেন, "রায়কমল সেনের বাড়ী-ভাড়া সম্বন্ধে আমি সম্মত হইতে পারি না। এখন জাহেজ বাড়ীতে চাকর রাখিলে সাহেবের লজ্জা হইবে না, তখন আমরা কি শুধু রায়কমল সেনকে মাসে মাসে ৬০ টাকা করিয়া ভাড়া দিব? যাহাতে জাহেজ সাহেবের প্রতিমা হয়, তাহা করিতে পারিলে আমি বিশেষ আনন্দিত হই। তবে আমরা গর্ভাঙ্কে হইতে এই টাকা নিতে পারিব না। ওঁহাকেই যথ্য এই টাকা নিতে হইবে।" (২) বাহা হউক, এই বাড়ীতেই সর্ব-প্রথমে 'মেডিক্যাল কলেজ' বসিয়াছিল। (৩)



লর্ড মেকলে

১। এখনে একই অমার্শিক বন্ধ কলার প্রাচীন। কলিকাতা হইতে কলিকাতা-বাহনবার গাঠিত হইলে কলিকাতার যাত্রা যথ-পাঠ এবং বাসি ভিত্তি পুত্রান ও বিখ্যাত বাড়ী বেহেজ পাওয়া যায়। ইহা এখন 'কেলসাল হাউস' (Kelsall House)। ইহাতে একখানি 'অটো-কোথ' (Octagon House) ছিল। এখনও ইহা অক্ষাংশ দেখান। লন্ডনবাসের 'পেন্ট-হাউসের বাগান' এইরূপ আর একখানি 'অটো-কোথ' ছিল। সিরাজ-উদ্দৌলার ১৪ প্রাচীরের আর বাগান বাস এই হই-খানি বাড়ীকে বোলা হইল কলিকাতা সিরাজ-উদ্দৌলার লগাইয়া দেয়। ইহা হইত নিম্নোক্ত ভাষায় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে, ১৮ই জুন, লন্ডন বিশ্বাস লোকাল। যদিও লন্ডনবাসের হুজু করেন। কলিকাতা-সাহেবের পরে 'জাহা হাট' (Sir Robert Chambers) এই বাড়ীতে বাস করেন। জাহা হাট, এই বাড়ী হইতে কলিকাতার প্রথম-কোটে বিদ্যা বাহাজত নককনহায়া কমিয়া জাহা হাট হইল। 'জাহা হাট পিল' (Sir Robert Peel) তখনই এই বাড়ীতে বাস করেন। জাহা হাট পরে 'ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন' (Captain D. L. Richardson) এই বাড়ীতে বাসি ১৮০০ টাকা ভাড়া দিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখন ইহা হিন্দু-কলেজ পড়িহিত গাঠিত জাহাজ যাত্রা কলিকাতা হইত। এই হেতু, রায়কমল সেন বাসি জাহাজে বিদ্যা ভাড়া উক্ত 'এলিট কলেজ' (Allott College) বাড়ীর উপর বাস করিতে গিয়াছিলেন। উক্ত 'কেলসাল হাউস' (Kelsall House) এখন শেখ-বাগানে অবস্থিত। জাহা হাট এখন 'শেখ-বাগান-বাড়ী'।

২। Lord Macaulay writes, "Principal's House. I cannot agree to the proposition about Ramcomul Sen's house—I do not see why we should pay 60 Rupees a month, when we can have accommodation for nothing. I should be most happy to afford any convenience to Dr. Bramley, but I cannot consent to do it out of our fund." [Folk E. Page 109] 19th April, 1835.

৩। "The Institution consisted of an old house in the rear of the Hindu College, in which two young Assistant surgeons, to whom a third was subsequently, and after much difficulty added were expected to teach the whole circle of medical science to a class of upwards of fifty students." H. H. Goodere's Lectures in the Medical College, 1848

(৫) কোন মালে, কোন মাসে ও কোন তারিখে
'মেডিক্যাল কলেজ' খোলা হইয়াছিল ?

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর ২৫-২৬. ডক্টর গুডেভ (Dr. H. H. Goodenough) মেডিক্যাল কলেজে মেডিক্যাল-কলেজ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "মেডিক্যাল কলেজের নিষিদ্ধ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, ২০শে ফেব্রুয়ারী চইতে আরম্ভ প্রাথমিক পরিচয় করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন।" (১) এই তারিখেই যে 'মেডিক্যাল কলেজ' খোলা হইয়াছিল, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। যে সকল ছাত্রকে ভর্তি করা হইবে, তাহাদিগকে সর্বাঙ্গো পরীক্ষা করা গাই। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, ১লা মে, তৎকালীয় ছাত্র-নির্বাচনের নিষিদ্ধ পরীক্ষা-প্রবেশ করা হয়। হুতরাং ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলেজ খোলা হইয়াছিল, একথা হইতেই পারে না। কলেজ খোলা সহজ ব্যাপার নহে। নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা গাট : বিশেষতঃ শিক্ষাবানের নিষিদ্ধ নানাবিধ ব্যস্তির প্রয়োজন। এমন কয়েকটা অসুবিধা অসিয়া বেগা দিল। প্রথমতঃ, কয়েকটা ছাত্র ভর্তি হইবার জন্য আসিল। কিন্তু দায়ম করিয়া তাহারা হুঁড়ি হইতে

(১) "Our labours began on the 20th February. 1868"—H. H. Goodenough's Lecture, 1888, quoted by J. E. D. Bethune, 1899

পারিল না। তৎকালের হিন্দু-সমাজ দৃঢ়-বদ্ধনে আবদ্ধ ছিল। পাছে পড়ার লোক বা অধ্যাপকজন ছাড়েই বাড়ী-পিতাকে "একঘণ্টে" করিয়া প্রাণহিংসে খোপা-নাশিত বদ্ধ করে, পাছে তাহাদের বাড়ীতে বৈশাচিক আশান-প্রবান বহিত হয়, ইয়া শতাই বিপদ সম্ভা হইল। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাবানের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক বহাদি নাই। তৃতীয়তঃ, পাইত্রেরী নাই, মিউসিয়াম নাই, হাসপাতাল নাই। চতুর্থতঃ, যে শব-ক্ষেত্র-বিজ্ঞা না শিখিলে ডাক্তারী বিজ্ঞা অসম্ভব করা নিত্যই অসম্ভব, তাহাও তৎকালের হিন্দু-সমাজে এরূপ প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও ছাত্রগণ সমাজের অধঃশব-ক্ষেত্র করিবার চিন্তার উত্তরতঃ করিতে পারিল। এই সকল কারণেই ছাত্রগণা অতি অল্পই হইল। এইজন্য মোশবোগে প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল। অন্তঃপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১ জুন (১৮৬২ বঙ্গাব্দে, ১২ চৈত্র, সোমবার) তারিখে মেডিক্যাল কলেজ সর্বাঙ্গপ্রথম খোলা হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, ৩০ বর্ষে তারিখে 'লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক' (Lord William Bentinck) তারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যমেন-যাত্রা করেন। হুতরাং তাহার দানের 'মেডিক্যাল-কলেজ' তিনি সেখা বাইতে পায়েন নাই। বরন 'মেডিক্যাল-কলেজ' গোলা হয়, তখন 'জার গারল্ড বেন্টিনক' (Sir Charles Malcolme) এ দেশের পরবর্ত্তি চেম্যান।

বাদলে

—শ্রীঅমুরূপা দেবী

সকল কুকের কালা আজি ছড়িয়ে গেছে বাদল-বায়।
থেকে থেকে ব্যাকুল দিটি দিকে দিকে চমকে চায়।

অন্তীত দিনের ব্যাকুলতা

অসুখানো শ্রুতির বাধা—

কড়ের হাওয়ার হাহারবে কহছে আজও হায়রে হায়।

অকোর কুরে কহছে বারি

অশ্রু করে সঙ্গে তারই,

গুহরে নরা প্রাণের দাধা সকলখানে ছড়িয়ে যায়।

বাস্তব

— শ্রী প্রফুল্লকুমার মণ্ডল

সন্ধ্যার দিকে আকাশ কাগো চ'য়ে উঠছে যেখান
পরে যেখান জমে। যদিও কেবল সেট আকাশের পানেই
চাইছে। কুকের নীচে বৃষ্টি আর একটা দীর্ঘশ্বাসও জমা
নেই; রাশি রাশি হুঁতাবনার মাঝে পড়ে তার জলে এতটুকু
ভাষাও বৃষ্টি খালি ছিল না।...

হুঁত তাত পর্ষাৎ মুখে না দিয়েই স্বামী সেই কোন দিকালে
বেরিয়েছেন নগরের দিকে, যেটা উচিত ছিল তো অনেক
আগেই, তবু কে জানে কেন এখনও ফিরলেন না!

ছেলেদের খাওয়া-পাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে
এখনো তারা চোঁচোখিটি করছে। যদিও আর ঘরের মধ্যে
বসে থাকতে না পারে বাইরে পাওয়ার উপর এসে বসেছে।
কে জানে, এখনি হুঁত তা কড় উঠবে, কড়ের মুখে তার ডাক
হুঁত তাই তার কাণে এসে পৌঁছবে না—বাইরে থাকলে তবু
শোনা যাবে।

বড় মেয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে একেবারে বাঘের
পিঠের উপর হুঁত পড়ে বসলে, দেখে না বা, কি করছে
তোবার ঐ আঙুরে ছেলেরি! খালি বাঘেরে আঁদালের।

না বিরক্তির তাঁক দিয়ে বলে উঠল, বাঘেরে তো আমি
কি করব!

ভিতর থেকে ছেলে অমনি চোঁচিয়ে বসলে, না গো বা,
মিছে কথা! মিনি আমায় আসে যেহেছে!...

—হ্যাঁ, যেহেছে! তাই মিথ্যুক তুই!

কথা কাটাকাটি মণিকার একেবারেই ভাল লাগছিল না।
সে চোঁচিয়ে উঠে বসলে, মিথ্যুক ও, না তুই! নিজর তুই
আগে যেহেছিল...বলেই ঠাস করে ঘরের পিঠে এক চাপড়
বসিয়ে দিয়ে বসলে, এত বড় বাড়ি মেয়ে হ'লো, তা কি ছাই
তাই বোনদের বৃষ্টিয়ে নিয়ে খেলবে একটু!

অকারণে ঘর থেকে ঘরের মুখ কাণী হ'য়ে উঠল এবং
পরমুহুর্তেই টপ টপ করে বড় বড় ফোটা তার চোখের কোণ
বেরে করে পড়ল।

যা নিজের মূল বৃত্তে পেরে যেহে হাত ধরে একটু টান
দিয়েই মেয়ে একেবারে দু'পিরে ঝেঁপে ফেললে।

—আহা, ততট বেন যেহেছি...শোন না বলি...

মণিকা জোর করে বেয়েকে কোণের উপর টেনে ফিলে।
...বড় আগেরের প্রথম সন্তান...কবি-স্বামীর আগেরের নামকরণ
তাই—স্বরখা!

মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে নিতে নিতে তারের দশ বৎসরের
দাম্পত্য-জীবনের একটা নিশ্চয়জ্ঞান ছবি মণিকার চোখের
দামনে ভেসে উঠল।

বৃষ্টি নামল: লগে লগে মণিকারও বৃক ফেটে কাজা
এল।

কোলের ভিতর থেকে মেয়ে হুঁত চোঁচিয়ে উঠল - ও বা,
বাগা ঐ দরজা খোললেন। বগার মুখে মাও, ভিত্তি একেবারে
নেয়ে গেছেন।

দরজা খুলেই মণিকা হেসে ফেললেন।

—খসি মেয়ে বাবা! আমি সেট কখন থেকে হা
গিডোল হয়ে বলে আছি, আমি একমন শ্রমতে পেলব না,
আর ও কিনা ঠিক ধরছে!

স্ত্রীর হাসির উত্তর স্বামীর মুখে এতটুকু স্টেট উঠল না।
স্বভাব্য মণিকার হাসিটুকুও বিভ্রান্তের মত তখনি নিয়ে পেল।
সে আন্তে আন্তে ভিজাফা করলে, হ্যাগো, খোঁজ কিছু পেলেন
না কি?

স্বামীর বসলে, পেলব। ও বাগা আগে নোণাম হুঁতছে।
ইতিবসোই মণল নেয়ার জন্তে দরখাস্তও গুঁতছে।

মণিকা স্বত্ব হয়ে পেল। পানিক পরে আন্তে আন্তে
বসলে, তা হ'লে উপায়?

স্বামীর বসলে, উপায় আর কি বল?...ও বাগা থেকে
ফিরে স্বামীবারেরে সেওবাহুব লগে বেথা করলুম। তিনি
অলস্বে রকম দখাও দেখিয়েছেন।

মণিকা উত্থক হ'য়ে বসলে, কি বললেন?

—বললেন, নীলাম হ'লো বাকু আর ঘাট হোক, টাকটা দিতে পারলেই তিন সব মিথিরা দেবেন।

—টাকা? কত টাকা হবে?

—আমার দু'শো।

মদীর্ঘ আকাশের বুকের নীচে কোথাও এতটুকু কেউ তরাও দেখা যায়নি না। তারই পার্শ্ব আশা মদিকা আকাশের পানে চেয়ে বসে রইল।

ভাবনকে সমীর সত্যি করেই উপলব্ধি করতে চেয়েছিল—পরশার দিক দিয়ে নয়, সহস্রমত কবিরের দিক দিয়ে। নিতের অস্তরের অহুস্তিত্তিককে সে চেয়েছিল ভাবন করে বুপড়ে—পরশার পিছু পিছু মায়ারমত উত্তপ্ত বুকে ছুটে বেড়িয়ে তাকেই শুকিয়ে মারতে সে গাভী হরনি।

তাই, সহস্রের শোষণাঙ্গ সাক্ষ করে সে বলল এসে তার প্রায়ধানিতে। বহুতা ঠাই করলে। সে বলল, গ্রামকে অবহেলা করে সহস্রের উটকাই নিয়ে পড়ে থাক। আমার সইবে না। সহস্রের ভাবনের ব্যর্থবাদ এই কান্টবিশাখীর কণা-কাপট তার ভেত্রে নয়। সে চ্যপ, কালবৈশাখীর লামনে থাকবে বহুস্তের 'হকোল, আর পিছনে থাকবে বর্ষার প্রানলিবা!...

বহুতা বলত, বহু পাগল! রবি বাবুট তার মাথাটা পেয়েছেন!...

নবম্বু মদিকাও প্রায়শটা আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু সে কীপ আপত্তি ভেসে গিয়েছিল তার স্বামীর অকাটা বৃত্তির স্রোতে। স্বামী বলেছিল, পরশাকেই বহু করে ধরলে পেটটা ভাবনটাকেই এড়িয়ে চলা হয় যে মদি! সে আত্মপ্রবন্ধনা আমার ভেত্রে নয়!...

তাই, অতীতের সেই এক সুখ-দুঃখ বেয়া প্রভাবে যেদিন সে তার অস্তর-বাহিরের কবির আর প্রায়শরী কাব্যপ্রতিভা এই মদিকাকে নিয়ে তার পত্নী-মাতের চরমপ্রান্তে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, সেদিন পত্নী-লম্বা বুনী হ'য়ে উঠলেও ভাগ্যলম্বী তার শান্তিরায় সেই শান্তিটুকুকে কোনো দিক দিয়েই হস্ততা মার্কনা করেন নি।...

মদিকা পরীষের থরের ঘেয়ে। সৌন্দর্যের তার অভাব ছিল না। কিন্তু সমীরের চোখে তার ঐ পরিচয় আর সহায়-সমর্থনীন অবস্থাটুকুই বেন তার সৌন্দর্যকে অনেকখানি

বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই যেখানে হস্ত ইচ্ছা করলে খমীর ঘরের ঘেয়েও তার গন্ধে হুঁকিত হত না, সেখানে সে মাথা দিলে ঐ নিঃশব্দ ঘেয়েটিরই গলাহ।

পৈতৃক বিধা মলেক জমার সঙ্গে ঐ ভিটটুকু, আর তার সঙ্গে যোগাড় করে নিলে পাশের গ্রামের টুকুণে একটা কুড়ি টাকা মাহিনার মাহারা। সমীর একেবারে উৎসাহ হয়ে উঠল। এত বেশী তাইবারই বা তার কী আছে?... চব্বৎকার চলে যাবে তার ভাবনের তত্ত্বাখানি! পাশে সুব্যত্যাসের এতটুকুও অভাব হবে না।

রত্নান প্রভুত্বের সেই বিচিত্র আশোকছটা আর দুপুণের প্রচণ্ড কাঁমে নিশ্চেষ্ট হয়ে গেছে। তার কলনাইটুকু বেন আর মনে আসে না। যে পারিশ্রমিক সে তার বিচিত্র অহুস্তির আশ্রাধা পরিয়ে মনের মাকে খাড়া করে রেখেছিল, সে রত্নান আশ্রাধা তার মনে পড়ে গেছে; তার নীচে ফেঁক বেস্তিরে এসেছে এক কনাকার নানবহুতি, তার চোখে সুপে হিংস্রতা ছুটে বেলেছে। একে একে চারটি ছেলেসময়ে তার সে কবিত্বকে কাকলী তুলেছে; মদিকার স্বায় ভেসে গিয়েছে, মাদ্যলিয়ার সঙ্গে নুহ করে করে পেয়ে দুই গন্ধে মাক্ষাখি রকমের একটা রক্তা বনোবৎ হয়ে গিয়েছে।

সবই তনু এক রক্তম সঙ্ঘ হ'য়ে থাকে এবং বাবেও, কিন্তু, বৃষ্টি বা ঐ এক বোড়ের কিস্তিতে মাং করলে—স্বর্ণগত পিতার মেয়ের গান ঐ তমস্তকের মেনাইটুকু!... হুশো টাকা! কোথা থেকে পাবে এই হুশো টাকা! না-দিত পারলও যে আর বিন-পনোরের মতোই অদাপিতের পারোয়ানা আনবে এবং তার অনিবাধা পরিণামটুকু যে ঠিক কি, তা যে সে দেখতে পাকে তার নিরাশ্রয়ী মর্দহলের সহস্র চক্ষু মেলে!

হুস্ত্রাং, বেনন করেই হাকু দিতে হবে ঐ হুশো টাকা! কিন্তু এই অতি হুশ্পট সমস্তটুকুকে সাক্ষ্যের কোঠায় পৌছে তোলা যায় কেমন করে? থরে যে তার মা-লম্বীর সঙ্গে অসম্ময়গণ লেগেছে। গত বছরের অনাটুগীতে যে কয়েক নগ বান পাওয়া গিয়েছিল, তাতে সেবতার ভোগই কুলায় নি।... হাং আম সর্গপ্রণব সমীরের মনে হয়ে গেল, মাহমের ভাবনে একেই তে কয়েক সীমা-পরিমীমা নেই, তার উপর আবার মাহম নিজে মধ করে' রেখেছে—সেবতার সঙ্গে এই চিহ্নহারা ৭৭! ভাবন আশিগুণো যেখানে শুকিয়ে না-খেতে-পেয়ে

মরতে বসেছে, সেখানে সেট অদ্যাতনে বিতস্ততার মাঝেই তাকে যুগ্মত সেবায় আছাব ছুটিয়ে বেতে চলে ১০০ চবৎকার বনগা পূর্ণপুরুষের !

—নাথ !

—কিরে ?

উত্তর কোন-কিছু না-বলে' করণা তার ছুটি সঙ্গ সঙ্গ হাত বাপের গলায় চপায়ে ছড়িয়ে নিয়ে একবারে তার কোলের উপর শুয়ে পড়ে' বসলে, বা বস দেখছি বাবা !

সদীর একটা স্নাত্তির নিবাস ছেড়ে বসলে, কি যন্ত্র সে ? করণার ছুটি চোখের তারা একবার বেতে উঠল। বাপের বুকের উপর জোথ রেখে বসলে, কাল স্নাত্তির ঠাঁকুসকে আমি গু-ব ডেকেছি বাবা ! তাই ঠাঁকুর বসেছেন, আমাকে এ্যাক্সো টাকা দেবেন।

সদীর হেসে কেসে বসলে, বা, বা, আর আশাসনে ভুট... করণা কিন্তু পথে বাবার ঘেমে নয়। বসলে, ইয়া, সাতা বসছি, এ্যাক্সো টাকা !...সেখো ভূমি...

—আজ্ঞা, আজ্ঞা, এখন বা। বহন 'এ্যাক্সো' টাকা পাবি, তখন ঝাঁচল করে' আমার মাখনে চেপে দিও।

ঘেমে উৎসবের সুরে বসে' উঠল, বেবই তো! গ-ব তোমাকে মোব। শুধু আমার ভুলে...সেই যে বড় একটা ডলি-পুতুল এনে নেবে বগাছিলে—সেটি আমার ভূমি এনে দিও বাবা, সবাই মিলে খেলব।

...সদীরের অন্তরের ভিতর হাট-হাট করে' ঝলে' গার। বাইরে শুধু কি এ যন্ত্র প্রলেপ !

ঘনে হর, ঘেয়ের ঐ কণ্ঠাংশিতাই ছড়িয়ে পেল তার সব আশা, সমাধান হ'ল তার গব-কিছু সমস্তা !

ভারপর ঘিন পশেক কেটে গিয়েছে। সদীর ইতিমধ্যে কম-সে-কম গম্ভীর জীবনাবস্থার কাছে ছুটোছুটি করেছে ; নাথের, পোষা, বড়বাবু, সেবাবাবু—কাজিকেই বাস যেন নি। কিন্তু সব কথারই সেই চরম সংক্ষিপ্তগার—টাকা চাই। টাকা না-মিলে ছাড়তে হবে জমী-জায়গা, ছাড়তে হবে শৈল্পিক ভিত্তিটাই !

হাতা হ'লে সে স্ত্রীকে বলে, কিছুই হয়কার নেই যদি ! ছেড়ে বাই চলে এই প্রাণের মাথা।

মণিকা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বসে, কোণার ঘাবে ? আর, বাপের ভিটে ছেড়ে মাগার কি চাটখানি কথা না ? কত-কালের ভিটে, কতকালের কৃন্দসেবতা...

সদীর হেসে উঠে বসে, সেবতার বচ—বহনিন যুগ্মত পড়েছেন যদি ! দেখু-ব ছিট বা কোনোদিন ভাঙে, তা কালানের ঠাঁকুরিতে ভাঙবে না, বড়লোকের হস্তায়ে ভাঙবে।

ও সব আশা ছাড়—

মণিকা ভিত কেটে বসে, ছিঃ ! তোমার যুগ্ম দিন-দিন ভারী আশুগা হ'লে পড়ছে !...

সাঁকের আকাশে সেবতারের প্রাণীপ ঝপেছিল। মণিকা তার নাকীর প্রাণীপটি নিয়ে ঠাঁকুরত্বের দিকে চলে' গেল। সেখানে গলবয়ে প্রশাব করে' শু শু এইটুকু নিরববই আত সেবতার চরণতলে ভান্নাতে পারলে, বেখো ঠাঁকুর ! যেন সে-ছাড়া ছিটে-ছাড়া ক'রো না। যেন...

কাণে এল সাদীর গলা—হলি ইয়গো, মেয়েটার বেখা পাচ্ছি না যে ! কোণার গেল করণা ?

মাঝের প্রাণটা হঠাৎ যেন অকারণে চকিত হয়ে উঠল। ...সতাই তো ! সে তো আত ফেরনি এখনো ! ভুলে মেয়ে কোণার যে খেলতে যায়—

আবার একবার সেবতার উদ্দেশে মণিকা প্রণাম করলে। কিন্তু বয়ছাড়া মেয়ের কথাকে ছাপিয়ে মনটিকে তার সেবতার চরণ পদ্যত পৌছে দিতে পারলে না।...

...প্রচুর যোগ থাকতে থাকতেই খেলতে বেরিয়েছে, এখনো খরে কেবলগার নাথটি নেই। প্রথমে খানিকটা বিরক্তি, তার পর ক্রোধ ক্রমেই সেই ক্রোধ পলে পলে একটা স্তীভিত্ত হস্তিতার সৃষ্টি করে তুললে।

সন্ধ্যারতির কঁদুর-কটা খেমে গিয়ে চারিদিকে শুধু 'বি'বি'র একতায়্যটি বেতে চলেছে। প্রাণের বুক যেন সাত চুপারের নিতম্বতা বেমে এসেছে। করণা এখনো বাড়ী ফেরনি। বাপ মা দুজনে শুধু স্তব হয়ে বাড়ীর উপর যুগ্মত্বিত্ব বসে। তাদের চারিপাশে অল্প ছেলেগুলো কলের পুতুলের মত নিরর্থক ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন ঐ নিরর্থক আকাশের এক নির্ধর বয়ছাড়া বাড়ীর সব প্রাণীগুলি এক সঙ্গে ছড়নাক্ হয়ে পরস্পর পরস্পরের কাছে অন্তরের বাঘাটুকু ভান্নাতে চাচ্ছে—কিন্তু পারছে না।...

প্রলম্ববস্ত্রের সে-প্রকৃতি কিস বেষ্টন্য গ্রাসী হ'ল না।
অখণ্ডতা যেহেতু না যেহেতুই একটা। বিপুল কঠোর বাড়ীখানা
বিপদায়িত্ব হ'তে উঠল।

একটির পর একটি করে অনেকগুলি গোয়ালারী সমীরের
বাড়ী এল এই খবর বহন করে যে, স্নিক শকার মধ্যে বড়
সড়কের ধারে স্বর্ণাঙ্গ অস্ত্র কথেকটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে খেলা
করছিল, সেই সময় হঠাৎ কোথাকার একখান: চাউতা গাড়ীতে
সে চাপা পড়েছে। ...গাড়ীর বাহুটি থাকে তুলে নিয়ে সরকারী
ডাক্তারখানায় গেছে। ...এখনো তারা সব সেখানেই।

সারা গ্রাম ছুড়ে একটা হটগোল উঠে পড়ল। বনে
বনে লোক ছুটল সরকারী ডাক্তারখানার দিকে।

কোন এক হুস্তর দল্লার শৈথিল্য-লিঙ্গ চারুক্যের একটি
আঘাতে বেন দুমহ পলীখানি হঠাৎ আর্ন্তনাক করে কেখে
উঠেছে!

সিন পাচেক পরের কথা।

বড় খরের শাওরা লসে তার অগ্নিসার নেহখানা বিশ্লিষে
দিয়ে মণিকা পড়ে আছে; হঠাৎ দেখে কেচে আছে কি না।
তাই সকেচ হয়। নিম্বাস টানবার মত শক্তিটুকু বেন এক
দিনে তার নিলম্ব হতে গেছে। শু শু সেই অবস্থাতেই পড়ে
পড়ে একটা অস্তি অক্ষুট গোড়ারানো কামার পথে সে তার
বেচে থাকার প্রমাণ দিকে।

সবীর লসরে গেছে দারোগার কাছে। স্বর্ণাঙ্গ ব্রভাত
প্রতিশোধ নিতে হবে যে। ...যে খবরী মস্তান চূরচুরে নেপার
ঝোঁক পাকী হাঁকিয়ে নিয়ে যেত যেত পরীরের এ সর্গনাশ
করলে, পুলিশ তার বিরুদ্ধে বামলা ঢালাবে; তার শাস্তি না
হওয়া পর্যন্ত সবীরের আহার-নিদ্রা বন্ধ হবে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে সবীর বাড়ী ফিরে এল। মণিকা তখনো
সেই মাজার উপরই পড়ে। কোলের ছেসেটা তার বুকের
মধ্যে মাথা শুঁকে সেই অহিসার নেহখানারই খবটুকু নিজে

নিখে নিজেই খুঁজগতি করছে; অপর ছেলেমেয়ে দুটো একটা
বড় বাজীতে কতকগুলো বড়ি নিয়ে গোয়ালে গিলছে।

বাড়ীতে ঢুকেই সবীর বেশ সন্তর্পণে মদর দরজাটা বন্ধ
করে নিয়ে চাপা পলায় বলে উঠল, ডমো ওঠ-ওঠ!
আজ আমাদের ভারী হুদিন!

—তুমি?

—নিশ্চয়! স্বর্ণাঙ্গ হাকুরের স্বপ্ন মিথো চরনি গো...
এক ডাউল কর্তৃ টাকা সে আবার নিয়ে গেছে।

—টাকা?

—হ্যাঁগো, টাকা। এক আখটা নল, একেবারে পাচ
পায়েশা। ...ভবিষ্যর বাড়ী ছুপো টাকা দিয়ে বাড়ী এখনো
পাকে তিনশো। চট করে ফক করে ফেল কি কলতে
গাও এই তিনশো টাকায়!

মণিকার বেহের হাড়গুলো পয়াল বেন বিস্ত্রোহের শিখায়
বুছ হয়ে উঠে বদল।

—টাকা?...তুমি তবে টাকা নিয়ে সেই মাকুসদের সঙ্গে
মামলা মিটবে এসে?...আমার শোণার স্বর্ণাঙ্গ কাছে বড়
হল তোমার টাকা?...তুমি না তার বাপ?

বুক-কাটা কামার মণিকার মাথাটা মালীর উপর আছড়ে
পড়ল। আর তারই তাগে তাল দিলিয়ে মদার হা-হা করে
ছেলে উঠল। সে বেন মল্লভূমির উপর বিয়ে উত্তর-
বাত্ত উজ্জাস উজ্জাস! সেই উজ্জাসের সঙ্গে সকেই সে বললে,
আমি বুঝছি—বুঝছি যদি! এত বড় শোভা কথাটা আজ
এতদিন পরে আমি বুঝতে পেরেছি। যে ব্যার সে আর সত্যি-
করে করে না। শু মব-হেয়ে আল-...মব চেয়ে সত্যিকার
বস্ত্র আবার এই কাপড়ে বাধা!...ওঠো—ওঠো—লম্বাটি!
সন্তো হয়ে গেল। দুমহ দেহভার দুম বেগেছে, তাকে
অন্ধকারে রেখ না। ...কালই তার ষোল আনার ভোগ-দিও,
বেন—আর আমার মারের করে বড় একটা ডলি-পুতুল...

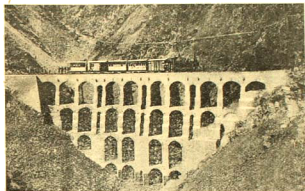
ঘোণালমের ঠাহুরবাড়ী থেকে পেটাবড়ি আর কাসরের
শব তখন সবীরের কথাগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে বহু বহু উজ্জের
মুস্ততাকেও বোমাকিত করে তুলছিল।

সিমলা শৈলে

— শ্রীমণীন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত

২০শে মে, সোমবার রাতে আলকা-এক্সপ্রেসে চাণ্ডী থেকে রওনা হ'য়ে দুইবার ভোগ বেলায় কালকা রেশনে

তলায় নতুন সিমলায় পৌঁছান, যিহাও তলায় অতিথিগালা, তৃতীয় তলায় হ'ল বিহেটোরের ট্রেক, চতুর্থ তলায় গ্যালারী।



কাছ-সিমলা চলেয় লকোজ বিলানকা সাঁকো (viaduct)।

পৌঁছুলাম। চাণ্ডী রেশন থেকে এক টানা কালকা, কোথাও গাড়ী বদলাবার দরকার হয় নি। কালকার চাণ্ডীর গাড়ী ছেড়ে উঠতে হ'ল ছোট গাড়ীতে।

সিমলায় কান্ট্রাফোর্সি এক রেশন, ভারসেবী। বড় এক বাধান সাঁতা নিয়ে গাড়ীর ভিতরে জনৈক বসন্তাসী এসেন— "আপকা নাম, আপকা নাম—" ইত্যাদি ইত্যাদি গণিচয় দিতে হ'ল।

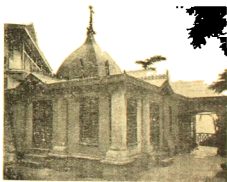
পৌঁটা ব্যারর সমগ্র সিমলায় পৌঁছুলাম। আমার এক আত্মীয়ের বাসার উঠছি। বাসার পৌঁছে বেশ একটা কুস্তি পাওয়া গেল; প্রথম বায়ান্না থেকে পর্তুগীজের বেশ দেখা যায়। এখনকার বাড়ীগুলি একটার উপর আর একটা পাথরের মাঝে মাঝে গ্যালারীর মত করে বেন সাজান। বরগুলির চাল টিনের, বেওলা, হুয় মাটির এবং খন্ডির, অর্থাৎ ভিতরে কাঠ ও পাথরের সূচি থাকে।

সিমলা কালীবাড়ী

বিকাল বেলা কালীবাড়ী বেড়াতে গেলাম। পাথরের উপরে গায়তলা প্রাণালোপন অট্টালিকা। সকলের নীচের

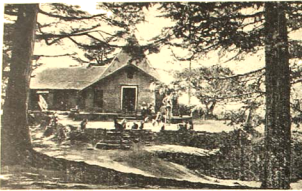
কালীমন্দির ও তৎসংলগ্ন নাট্য-মন্দির পূর্ণক। এটি প্রতিষ্ঠানটি বাসালীর পৌরব বললে অস্বাভাবিক হয় না। বাসালীর তো নিতের খরই স্থান নতুন হয়ে আসছে, বাইরে বাসালীদেয় থেকে অনেক দূরে সিমলা পাথড়ে যে এ ব্রহ্ম একটা গতিষ্ঠান মন্তক উন্নত করে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ক্রমশঃ উন্নতির দিকে থাকে, তা কম আশ্চর্য কথা নহে।

গুৱণা দুইয় পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সিমলাতে কলকাতা থেকে মার্চে পাউ যায়, এটি পাউতে বা মনে অনেক বাসালী ছিলেন। বর্ষমানের বেখানে কালীমন্দির, পূর্বে দেখানে পাথড়ের গুহার চতীয়েথোর মূর্তি ছিল। শেনো যায়, এক বাসালী ভাঙ্গক মন্ডালী দেবীস পুতক ছিলেন; তাঁর সূত্রায় পর মার্চে-পাউর বাসালীরা চতীয়েথোর পুত্রার ভাব গ্রহণ



কালীবাড়ীর মন্দির : সিমলা।

করেন। বর্ষমানের কার্ণামূর্তির ডানদিকে চতীয়েথোর, বায়ে ক্রামলা দেবীস মূর্তি। কানপাল্লেরী নাকি ছিলেন পূর্বে



মাকো পাঠাউর বাড়ি।

মাকো পাঠাউর উপরে। প্রবাদ এট
লে, এক মিসিটাবী মাঠের ওখানে এক
মাংলো তৈয়ার করেন এবং ক্রামলাদেবীর
মূর্তি খাতে নিবেশ করেন। মাঠের কাছে
যত্ন নেন, খোড়-সওয়ার সিপাহীরা
উপরে কাটতে উন্নত। মাঠের বস্ত্রের
এখা এক হিন্দু চাকরকে জানালে, সে
বলে, মাঠের দেবীমূর্তি খোলে বিধে অস্ত্র
কয়েছেন, তাই দেবী কুপিতা হয়েছেন।
ক্রামলাদেবীকে নিয়ে আবার প্রতিষ্ঠা
করলে কোপের উপশম হবে। মাঠের
তাই চতুর্দেবীর পাশে ক্রামলাদেবীকে
প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবী-হাণনার সকল
সামগ্র্য বস্ত্র বহন করেন। কালীমূর্তি
পাথরের—অস্ত্রপুত্র থেকে পরে বাহালীরা
এনে হাণন করেছেন। এই ক্রামলা
পথ থেকেই নাকি দিবসার উৎপত্তি।
১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাহালী কর্মচারীদের
উদ্যোগে কার্টের বাড়ীর পরিবর্তে ইটের
বাড়ী এবং পুরোহিতের ভবন দুটির
নির্মিত হয়; অতিথিশালাও এই সময়ে
স্থাপিত হয়। বর্তমানের প্রাঙ্গণোদয়
অষ্টালিকাটি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

কথন কথা।

লেফটেন্যান্ট এড্. এল্. রাভা তার
যোগেই সেন বাহাদুর কে-সি-এল-আই,
মতি বাহাদুর রাভালাদেব বাহাদুর ১৩ই
মেম্বের (১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ) মম্বির এবং
নতুন অষ্টালিকা স্থাপন করেন।
তার বক্তৃতার নিকট বিশেষ করে
বাহালী বলে পরিচয় দেন, বলেন যে,
রাভার বংশের পূর্বে, তাঁর পূর্বপুরুষ
বাহালাদেব থেকে এ দেশে এসে-
ছিলেন।

কালীবাড়ীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,
তদুপরে বহুতর।



[১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ]

যে কোন হিন্দু আগন্তুক কালীবাড়ী এসে আস্রয় পান। কোন অতিথিকে বানোতাব ফল কেতান হয় না। অতিথিগণা যথি ভরতি হয়ে যায়, তখন খিচড়ী-হলে নতুন আগন্তুকের ভাষণ করে দেওয়া হয়। এই প্রিটানটির জন্ত দিয়লার হিন্দু স্রমকর্তাদের যে কত সুবিধা, বলে শেষ করা যায় না। সকল অতিথিই পূব আদর-বস্ত্র পেয়ে থাকেন। কিছু ভ্রমণে বিধে, অনেক বাহালী তার প্রতিমান বা মিরে বান, ডাঙে লজ্জার কারণ থেকে যায়। বাওরার সময় দরত, কেউ সামান্য ঘের অর্ধ না দিয়ে পালিয়ে যান, বাঁজার ব্যবহারের জন্ত অতিথিগণা থেকে রাস্টা-কটীটা সংগ্রহ করে নিতেও অনেকের বাসে না। বিছানা বাঁধবার জন্ত, দড়ির বস্তাকার হলে, কালীবাড়ীর হাই-লাইট-টানা দড়িটা কেটে নেওয়া হয়—ইত্যাদি ছোট-খাট উপদ্রব সময়-সময় সঙ্গ কথিত হয়। অন্যত্র এ ধরেন্দ্র সংখ্যা গুন কম।

কালীবাড়ীর কালীপূজা ও অতিথিগণার ব্যবহার বচন করে থাকেন দিয়লার চাকুরে বাহালীরা মাসিক টাকা মিরে। অবস্ত্র বাইরের অবস্থালী এবং বাহালীর বড় বড় রানও ধপেই আছে। বাহালা বেশ থেকে এ প্রিটান আরো বান আশা করত পারে।

সকল জাতির যৌগুককরেন যেবেছি, কালীমন্দিরে পূজা দিতে। এমন কি অনেক বিন যেবেছি, যোবখাপনা বদলনান স্টীলোক্ত এগেছেন। পানীয়াও ভরছি মানত করে থাকেন। পাচড়ী ও পাচড়ীরা অধিক সংখ্যার এসে থাকেন, দিয়ল মাঝে মাঝে বেগেছি। এ স্থান দিয়লায় সকল জাতির মিলনভেদে বসলে ভুল হয় না।

যেই আশ্রিত হয়, সঙ্কাপনন প্রতিধ্বনিত করে কাঁদার, ঘটী, টিকায়ার পদ উল্লিখিত হয়। রাউমিরে বদলনায়, বাইরে চারদিকে ঘূরের পাখাড়ে পাতি ও নোনতা বিরাটমান, কেপুঝে কেবল বাতাস বাঁধে পন্ পন্। বাইরে নোন একুতিয় দিকে হাকালে মনে হয়—

“প্রিয়েরে প্রীত

অসংখ্য জনক-জনা এ লিখ-খলিত

এলা আশ্রিত বসে। ওই ভূমি বাজে

মিলেব নবীক কর্তে অন্যত্র বাজে

পথচৌকনি।”

এখানকার অনেক কিছু লক্ষণে ভাল লাগলেও একটা দিহর অনেক হিন্দু বিস্তারিত অগ্রবোধন করবেন না। সেটা পত্রবগি। কালীবাড়ীর কষ্টপক্ষ, মন্দিরের পক্ষ থেকে আর তিনটা পত্র বগি বেন, পূর্বে অনেক দেখে ছিল। অনেকের আশ্রিত-একবারে বগি বক করে দেওয়া সম্ভব হয় নি। বৃষ্টিগ হয় পাছাড়ীসেই নিয়ে। পূর্বায় সময় বনির ওত্র এরা অনেক পত্র নিয়ে আসে; পত্রবগি ছাড়া



কাড়াই।

[লেখক অচিত]

কালীমাষ্টিকের কি করে পূজা হতে পারে, এটা তারা পুজিত চায় না। তখনই ওরা পূজার সময় কালীমন্দিরে ভূতা পেব লি পত্রকে লাগ হয়ে ওঠে। সে পাচড়ালী বাজপূত।

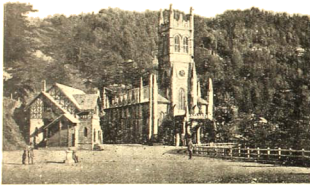
কোনো কোনো ভক্তগাটা ভরছি, এখানে এসে পত্রবগি প্রতিবাদ করেছেন; কিছু প্রতিবাদ নিফল হয়েছে।

দয়াল বাবা

কালীগাড়ীতে আশি বৎসর অধিক বৃদ্ধ এক মানুষ বস করে থাকেন। বৃদ্ধ হলেও তাঁর জন্ত বলিষ্ঠ চেহে; দিয়লার

বাস্তব ত্রীকে দেখাও হয়ে উঠিতে দেখা যায়। সিমলায় সকলে তাঁকে দখল বাবা বলে ডাকে; তাঁর পাঠশালা নাম খ্রীষ্টক ধর্মালম্বিত সুশোপাধ্যায়। তিনি বহু পুণ্যে সিমলাতেই সন্তোষার্থী কষ্ট করতেন; কষ্ট ভোগ করে সন্তোষ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এখানে বাঙ্গালী কি অবাঙ্গালী সকলেই তাঁকে ভক্তি করে। সাধু হয়ে ভাষ্যের সকল প্রবেশের ভীর্ণত্বনে, নেপালে, হিমালয়ের কৈলাসখান প্রভৃতি ভীর্ণ ভূরত্বনে। তিনি নাকি কোনো কারণে একবার একমাস উপবাস করেন, সিমলায় সমস্ত ব্যক্তিরা এবং এমন কি পাশ্চাত্যের মহী তার ডাঃ গোল্ডস্টাদ নামক বংশোদ্ভূত তাঁকে এ সময় থেকে

সভার সাংসদিক নাম-কর্তনেন দিন উপস্থিত ছিলেন। প্রবেশ-পথে সকলকেই কপালে চন্দন ও গলায় সুন্দর মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। কর্তনের পরে পুস্তক দেখে সকলের কালীগড়ী-হলে বিরাট ভোজ; নিরামিষ বাবু, গোলাও, ছাঁচড়া এবং বট, মিষ্টি। বাঙ্গালীঘের এ সামাজিক বিশদ খুবই আনন্দের ব্যাপার; বাঙ্গালীর বাইরে সহস্র মাইল দূরে এবং আট সপ্তম স্টেট উভয়ে যে আছে, তা যেন ভুলে যেতে হয়, যেন তার নিজের দেশে নিজের লোকদের মতোই যেন বাস করছি। এখানে বড় বড় চাকুরীরা ছাট কোট পরে' আশিনে যান; বাড়ীতে খুঁত চামর পরে' খেল করতাল ব্যক্তিরে বিভাগিত, চতুর্দশের যান পেয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।



সিমলা : ডাঃ গোল্ডস্টাদ।

বিষয় হওয়ার সমস্ত অঙ্গুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি সন্তোষপ্রাপ্ত হন নি।

হরিসভা ও কর্তন

কালীগড়ীতে নাট-মঞ্চের প্রতি প্রতিবার হরিসভার কর্তন হয়। অনেক বাঙ্গালী কর্তন উপলক্ষ্যে সমবেত হন। সুব্রত সিমলাতে বাঙ্গালীদের এই বৈশিষ্ট্য দেখে খুবই আনন্দ হ'ল। হরিসভার বর্ণনায় "দুর্গাধা" সিমলায় বাঙ্গালীদের সকলেই জানা এবং প্রচুর; তিনি দিনব্যাপী অনাচারিত ব্যক্তি। আবার কথা শুনে দুর্গাধা খুব খুশি হলেন। এখানকার কর্তনীয় হলেন খ্রীষ্টক ধর্মালম্বিত সন্তোষ দাশ, তাঁর মোহর আছে। কালীগড়ীতে এবং অল্প এক বাঙ্গালী তত্ত্বাবধানে বাড়ীতে তাঁর কর্তন হনোনি। কর্তনে তাঁর দক্ষতা আছে। হরি-

বঙ্গীয় সম্মিলনী

বঙ্গীয় সম্মিলনীতে বাঙ্গালীরা বেড়াতে আগমন, একটি লাইব্রেরী ও ইন্ডোব-গেদের বন্দোবস্ত আছে। সকলের সঙ্গে আগল হ'ল, সাহিত্যসাধনা, শিমাধা, নাট্যসাধনা প্রভৃতি বিচিত্র বিভাগের কর্ণ-ধারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, সকলেই আনন্দে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। সিমলাবাঙ্গালীদের দৃষ্টি ও আহিষেখতা আনন্দকে অপরিমিত আনন্দ দিয়েছে, সে

কথা আনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করছি।

বঙ্গীয় সম্মিলনীর সাংসদিক সভা হ'ল একদিন। সভাপতি হয়েছিলেন, বঙ্গভাটের আইন-সচিব হার সুপ্তসনান সন্তোষ কে-টি; এই সভার এক বাঙ্গালী যুবক শারীরিক কষ্টগ্রস্ত দেখান। নাম খ্রীষ্টান লেন, বাড়ী ঢাকা জেলা। এখানে বেড়াতে এসেছিলেন। হুনোল লেন পরে আর এক দিন কালীগড়ী-হলে শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন; সেদিন টিকিট বিক্রয় করে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বার্ষিক সভার পর বাঙ্গালীদের প্রীতিভাও হয়। এই উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে চিংড়ী মাছ আনা হয়েছিল। সিমলাতে দিয়ে সেখান থেকে ১০০ আনা করে। বাঙ্গালী-দের সাংসদিক লক্ষ আছে বটে!

দ্বিঘোটারের কর্তৃপক্ষদের এক বিধেয় আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, টেকের ঘবনিকার হং লাগ : বড় কটকটে হং, চোখে এর তীক্ষ্ণতা লাগে। বলেছিলাম, ঘবনিকার হং হওয়া উচিত নয় নীল, বা চোখে বেবে আরাম এবং বিবর্তি, যেমন ঘের নীল আকাশ বা নীল সমুদ্র।

সভার পূর্বে একজন বাঙ্গালী মহিলা পান পেয়েছিলেন “স্বাধীনগাথা—”

শ্রীমত সত্যানন্দজি

গিমলা থেকে ৬০ মাইল দূরে কোটাগড়ে আবার

আমাকে বকৌর সচিবালয়ের অফিসে, এক বিশেষ সভার কানীবাড়ীস হল, ‘কারতে প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প’ লম্বা এক প্রবন্ধ পড়তে হয়েছিল। সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীমত অমলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এম্-এ মহোদয়। লেজিস্লেটিভ আয়েবলীর আর্গিষ্টেন্ট সেক্রেটারী বার বাহাদুর দেবপতি বসু মহোদয় আমাকে সভায় পরিচিৎ করে দেন।

বাঙ্গালীদের বিজ্ঞানলয়

এখানকার বাঙ্গালীদের স্থাপিত প্রাচীন বিজ্ঞানলয় হারকোট গাটলার ইন্সলুপ্লিমেন্টালনা এবং ছাত্রদের কৃত্তিদের সমস্ত পাকাবে ইন্সলুপ্লিমেন্টালনা লাত করেছিল। কিন্তু কৃত্তিদের নিবন্ধ, বহুদ কয়েক হ’ল, পাকাবেদের সংখ্যা-খিকোন জুত এট ইন্সলুপ্লিমেন্টালনা হারকোট হয়ে গেছে। বাঙ্গালীরা নতুন করে আর একটা ইন্সলুপ্লিমেন্টালনা নাম, বেহলি বয়েজ হুগ। বাঙ্গালী ছেলেরা এখন এখানেই পড়ে।



হিমালয় ব্রহ্ম-মন্দির

দিকলা-বন্দ : মিলি।

[লেখক স্বাক্ষর]

আত্ম-সম্বোধের প্রতিষ্ঠান আছে, নাম হিমালয় ব্রহ্ম-মন্দির -- ছোট্ট একটা হল ও আচাধ্যকের থাকবার বাড়ি। এখানে উপাসনা, বক্তৃতাও হয়ে থাকে। এক মহিলাকে গিয়েছিলাম, এগুত পায়ে বস্ত্রতা দিয়েছিলেন। হাঙ্গারিস বৌদ্ধধর্মের পণ্ডিত ডাঃ ফাবরি কিছু বলেন, তিনি কিছুকাল বিশ্বভারতীয়ে ছিলেন। আরো কেউ কেউ কিছু বলেছিলেন খস লম্বা।

বাবান ইজা ছিল, উষ্মেত্র ছিল কোটাগড়ের কাছে দানেশ্বর গ্রামের শ্রীমত সত্যানন্দজির সঙ্গে দেখা করা। কিছু বখন রাস্তা-ঘাটের খরচ ও অসুস্থতা তথ্যের ধর পাওর গেল, তখন বাঙ্গা-আসা মিলিয়ে ১০০ মাইল হাঁটার সময় ছিল না।

গ্রাম বছর তের পূর্বে, তাঁর নাম শুনেছিলাম, তখন তাঁর

নাম ছিল মি: এন্ট-টোকস্; তিনি ছিলেন আবেগিকান।
 টনি আভায়া নন্দ্যাল বহু মহাপুরুষ বহুলা ক্রমার্জনের
 (স্বীকৃতি) চিত্র গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এখন হিন্দুধর্ম
 গ্রহণ করেছেন, এবং একজন শাস্ত্রা মহিলায় পরিগ্রহণ করে
 হিন্দু নাম নিয়েছেন সত্যানন্দ। তিনি এবং তাঁর পুত্রকল্যাণ
 সকলেই আচার্য-বাবার, গোষ্ঠ্যক, ক্ষম সম্প্রদায় ভাগ্যের
 এবং পাগড়ী। সিমলা অকলে দল-বাসিন্দার কণ্ঠে শ্রুত
 সত্যানন্দকির গুণ নান। প্রকৃত ভাষায় হুড়ে কোটগড়ে
 তাঁর কণ্ঠের গাথ। সিমলায় বাঘাবে তাঁর বাগান থেকে
 আশেপাশে গুহিত কন আসে এবং কলকাতা, বেবে মহরত
 চানান যায়। তিনি পাগড়ীকে পিকাধারেরও সাহায্য
 করেছেন: বোটগড়ে একটি এন্ট টক্সেন পরিচালনা করে
 থাকেন।

একদিন সিমলায় বাগারে ভ্রমণ করতে করতে কোটগড়ের
 এক বাবলারীর সঙ্গে আশাপ হ'ল; সত্যানন্দকির সঙ্গে তাঁর
 গুণ পরিচয় আছে। তাঁর যোকানে এক পাগড়ী হুত্ব হয়ে
 ছিল, তাকে দেখেই বললেন যে, সে সত্যানন্দকির বাড়ির
 ঢাঙ। আমি তাকে নন্দ্যাল বাবুর ক্রমার্জনের প্রিয়ের কথা
 জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে হ্যাঁ, সে চিত্র সে দেখেছে,
 সত্যানন্দকির বাড়ীতে টিহান আছে।

সিমলায় চিত্রশিল্পী

এই বছর সেন্টেবর মাসে সিমলা কাউন্সিল আটস
 সোসাইটির ডিসকিউশন শির-প্রবর্তনা হবে। সরকারী
 ইউরোপীয় কল্যাণসেবের নেতৃত্বে এই প্রবর্তনা প্রতি বৎসর
 হচ্ছে। কলকাতার প্রবর্তনীতে সিমলায় ক্যান্টন ফস্বেগের
 আঁকা চল-রংয়ের ছবি দেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এম সত্যানন্দ
 তিনি বাড়ী পাঠাতে চলে গেছেন।

চিত্রকরদের মধ্যে তাঁর প্রেস্টন কলভি, মেজর হেলন্স,
 মিসেস গেল, মিসেস বার্নেটের সঙ্গে আশাপ পরিচয় চল,
 তাঁদের আঁকা ছবি দেখলাম। মিসেস বার্নেট ছাড়া সকলেই
 চল-রংয়ের ছবি এঁকে থাকেন। মেজর হেলন্স সিমলা কাউন্সিল
 আটস সোসাইটির সেক্রেটারী।

মিসেস গেল বুঝা, চুল পাচ হয়েছে, তাঁর বাবী লেকটে-
 নার্ট কর্ণেল গেল, নিভিল সার্কন। তাঁর বাড়ীতে দুকতেই
 মিসেস গেল বললেন, "We belong to the same

world" অর্থাৎ আমরা একই গোষ্ঠীদূত; আপনাদের কথা
 পুর্বেই মেজর হেলন্সের মুখে শুনেছি। তিনি তাঁর আঁকা
 সব ছবি দেখালেন, সিমলা, হরিদ্বার ও কাশ্মীরের ছবি।
 মিসেস গেলের রং কলারের ক্ষমতা আছে।

ব্যারিস্টার রক্তি সাহেব পাণ্ডারী মুলদান, গেলিস্কেলিট
 আলেমলীর সেক্রেটারী। শুনেছিলাম তিনি ছবি এঁকে
 থাকেন; আমায়েদলীর মুখে, তাঁর আশিপে দেখা করলাম।
 তিনি বললেন, "আগে এক সময় ছবি আঁকতাম বটে, কিন্তু
 এখন আমায়ের আইন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে, আর
 ছবির চর্চা করার সময় হয় না; আঠার বছর হ'ল, ছবি আঁকা
 ছেড়ে দিয়েছি।"

মিসেস বার্নেটের কয়েকটি ছবি আমার ভাল লেগেছিল,
 মেজর বার্নেট এঁর বাবী। এঁর ছবি এখনকার চিত্রকরদের
 কাজ থেকে একবারে সুবক। তাঁর প্যান্টলে আঁকা
 এক পাগড়ী আলোকের প্রতিফলিত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম,
 "আপনার পিকা বোধ হয় পাগড়ীতে?" উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ
 আমি পাগড়ী এবং গোমে পিকা পেয়েছি।"

আবার নিজের আঁকা ছবি কিছু নিয়ে গিয়েছিলাম; তাঁর
 ভাল লেগেছিল যেহেতুতে কয়েকটি চিত্র। মিসেস বার্নেটকে
 জিজ্ঞাসা করলাম, "মানসি কি আধুনিক ভাগ্যের চিত্র
 দেখেছেন?" উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ যেহেঁচি বৈ কি? তোমার
 (ইংলণ্ডে) এক প্রবর্তনীতে অবদানবাহ ঠাকুরের আঁকা
 ছবি দেখে খুব ভাল লেগেছে।"

এই সময়ে বলা যেতে পারে, অবদানবাহ বিবেচনার কাছে
 সম্মান পেলেও, মেনের লোকেরা তাকে সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে পারে
 নি। আমায়ের মেজর শিকিত লোকেরাও অবদানবাহের
 চিত্রকে ব্যস্ত করতে ছাড়েন না। ঔপন্যাসিক জীৱনচক্র
 চট্টোপাধ্যায় তাঁর এক বইয়ে অবদানবাহের চিত্র নিয়ে বাস্তব
 করেছেন।^{১০} বাবেতে এক বই বেরিয়েছে "ফ্রম হেলেনিজম্
 এণ্ড হাবেলিজম্ টু আইটাল আর্ট" (From Hellenism
 and Havelism to Vital Art)। হাবেলিজম্ মানে
 কি, না হাবেলিজান, কথ্য অবদানবাহ প্রবর্তিত চিত্রের
 বিশ্রণজনক উক্তি। এতে লাত আছে কি কিছু?

* এই প্রসঙ্গে লিখিত সংখ্যা "সুখাবার উদ্ধৃত কর্ণেল বহোপাধ্যায়ের
 এক একম পত্রত অবদানবাহ করি—লেখক।

এই ধরনের চিত্র-দর্শনাগোচনার প্রকাশ পাও কেবল বিদেশী পাহাড় ও পাহাড়বনের আনাখোনা। তাহা যোতা পিঠে করে ও শব্দীকাণ্ডত। অবদীপ্তবোধে প্রসিদ্ধ ডিবকরা অঞ্চল পাহাড়ী স্থানী গণ্যে। এখানে ভিতর ঘের একটু চুড়ি



সিদ্ধান্ত : বড়গাউন বাড়ী, শিবের দুধাও-পেল :

সারা ভাবত গ্রহণ করেছে। অবদীপ্তবোধ কেবল নৃতন শিল্পী-গোষ্ঠী সৃষ্টি করেই কাজে নন, শিল্পধর্মীরা চিত্রা-বাস্যই কলে দিচ্ছেন।

জম্বন

সিদ্ধান্ত প্রথম রাগা মাল গোট : বড় বড় হোকান পলায় এর ছই দিকে। মাল গোট প্রশস্ত, গ্রামে আগলোক সমুদ্র। মাল গোটের নীচে বিজলু বাজার, তার নীচে ছোট বাজার ও চোয় বাজার। বলা বাহুল্য, এ সব দেশের হোকান ও পলী মণ্ডলগঞ্জ। অদিকাল হোকানবাহাই পাহাড়ী কাংড়াই, পাহাড়ীও আছে। এ সব হোকানবাহ হাঙ্গতায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, কাঠের ছোট ছোট কুঠরী, কাঠের তক্ত ও বরজাতে কারকাথা আছে। পাহাড়ী বা কাংড়া স্থলীয় চিয়ে বেশব খবরজীর ছবি দেখা যায়, একটা তাই স্বপ্ন করিয়ে দেয়। নীচের বড় রাগা থেকে

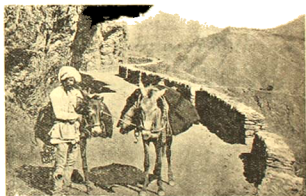
ছবি এল আছে, একটু বেশ ক্রান্তিকাল আনন্দ পাবার বাহ্য : বাহ্যে স্বপ্ন লোক চলাচল কলে এসেছে, হোকান-পলায় এক রঙে রয়েছে, নিম্নব পলায়টি অবদ কীবের রয়েছে :—

“অবদ পলায়টি হুই বাহ পলায়
মহাকার হুইপার সফার্ট্র পলায়”

মাল গোট দ্বিগে বেশ বেরেছে রিয়ে। কতকটা শোণা কাংড়া, লকলে এখানে বিকালে বেরেছে আসে। লগ্নাহে ভবিন হাঙ্গতায় প্রবন্ধের বাহ্য বেরে। পালে কারমট চার্ট, দর্শনীয় : হুইগের হুইগ

গ্রহীন কাংড়া বাহেরেছে ছবি (stained glass) আছে।

দ্বিগের উপরে গোটী গ্রিনেক বেক আছে, বেসে লকাত্তী উপলোপ করা যায়। সিন্দার প্রাকৃতিক দৃষ্টে তেমন আকর্ষণের কিছু নেই—চারপনেক বৈচিত্র্যবাহীন পাহাড়। কিছু বিবেচন উপর থেকে লকাত্তী-আহবের যে দৃষ্ট দেখা যায়, তা অতিপূর্ণ করবে। হুইগের ভেটেরে মত পাহাড়ের



চিলক-বিশ্বদান-গোট।

উপরের বড় রাগার বাওয়ার গুপ্ত মাঝে মাঝে দিড়ি গেছে প্রেই চলেছে। বঃ কনক : মিক হতে হতে আকাশের ঘুরে ঘুরে। বিরাট পাহাড়ীওয়াল কাংড়াই ও বিচিত্র বেলে লম্বা বিশে গেছে। হুইগের লম্বা থেকে রাই পলায় হু

বাক্সালা সাহিত্যের ইতিহাস

—ঐত্বম্বার সেন

[৮২]

দেবীমাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্যের মধ্যে চৌ মঙ্গল গুণিত পাটনতন। বোড়প শতকে লেখা অন্ততঃ তিনখানি চৌমঙ্গলেন এখনও প্রচলন আছে। বোড়প শতকের পূর্বের লেখা কোন চৌ মঙ্গল কাব্যের অস্তিত্ব না থাকিলেও মনসা মঙ্গল কাব্যের মত উচাও যে পঞ্চমঙ্গল শতকে এবং তাহারও পূর্বে বাক্সালা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল তাহা ঐ ঐ চৈতন্যভাগবতে বুঝাবন-বাদের উক্তি হইতে জানা যায়—

পঞ্চমঙ্গলোক মনে এইবার জানে। স্বরসজ্জার শ্রীতে করে মাগরণ।
সকলের বেশি কল নিখাই পড়ত। কড়াইয়া সম্পূর্ণ বসন্তজ্যৈষ্ঠ শ্রীতে।
যায়েন সব ছাদ দূক দেখিবার চড়ে। মরণ মাখিয়া বিবদ্যা খেই পাওয়ে
রাত্রিকালে শ্রীচ হইত বলিয়া চৌ মঙ্গল কাব্য
আগরণ নামেরও কথিত হইত। পূর্ববঙ্গীয় পুথিতে
চৌ মঙ্গল বলে আগরণ নামই বেশি পাওয়া যায়।

বোড়প শতকে লিখিত যে কয়খানি চৌমঙ্গল পাওয়া
গিয়াছে তাহার রচয়িতা এই-ছেন, বলাকসে মণিক-মন্ত,
মাধবাচাধ্য এবং বৃহস্পতি-চক্রবর্তী কবিকল্প। ইহার মধ্যে
মাধবাচাধ্যের কাব্যে রচনার তারিখ বেওয়া আছে। বৃহস্প-
তি-মন্তের কাব্যে রচনার তারিখ বেওয়া না থাকিলেও তাহা
মূলতাবে অনুমান করা যায়। কিছু মণিক-মন্তের কাব্য-
রচনার কাল জানিবার কোনই উপায় নাই। সম্পূর্ণ পুথিও
পাওয়া গাইয়েছে না। সুতরাং মণিক-মন্তের কাল নির্ধারণ
সম্পূর্ণরূপে অসম্ভাবনিক। কাব্যটি বোড়প শতকের পূর্বেকার
হওয়াও কিছুমাত্র বিচিহ্ন নহে।

[৯০]

মণিক-মন্তের কোন পুথির সন্ধান এখন বড় পাওয়া যায়
না, অন্ততঃ আমি পাই নাই। একথা বঙ্গীয় রজনীকান্ত
চক্রবর্তী এবং ঐত্বম্বার হরিদাস পালিত মহাপ্রবর মণিক-

মন্তের পুথি লইয়া কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রবন্ধ আকারে বাহির হইয়া-
ছিল।* চরিত্রাল বাবু মণিক-মন্তের প্রটখানি পুথি দেখিয়া
ছিলেন, তাহার মধ্যে একখানি লিপিকাল ১১৮১ শাল।
বঙ্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাপ্রবর এবং চরিত্রাল বাবু
প্রবন্ধই বর্তমান কাল মণিক-মন্ত শব্দটা আলোচনা করিবার
একমাত্র উপাধান। ঐত্বম্বার মৌলেনচন্দ্র সেন মহাপ্রবর তাঁহার
মূল্যবান বঙ্গ সাহিত্য পরিচিতিতে মণিক-মন্তের চৌ মঙ্গল
হইতে কিয়ৎপংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথা
হইতে যে এই অংশটুকু পাঠলেন তাহা জানান নাই। ঐ
অংশটি কথাব্যতাবে রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাপ্রবর প্রবন্ধে
আছে, সুতরাং মৌলেন বাবু যে চক্রবর্তী মহাপ্রবর প্রবন্ধ হইতে
অংশটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চক্রবর্তী
মহাপ্রবর উদ্ধৃত অংশে কিছু কিছু পাণ্ডিত্য ও একটু-আদর্শ
ভাঙ আছে, তাহাও সংশোধন ও পূরণ করিয়া বাবু প্রবন্ধে
পাওয়া যায়। মৌলেন বাবু যোগ্য ও বিনিমাল বাবু প্রবন্ধ
যেখেন নাই, দেখিলে অন্ততঃ ছাড় অংশ পূরণ করিয়া
দিতে।

মৌলেন বাবু মন্ত মণিক-মন্ত শব্দবহুঃ ভ্রমোৎপন্ন শব্দখান
সোক্ত*। অথবা হরিদাস বাবু মন্তে, মণিক-মন্ত বৃহস্প-
তি-চক্রবর্তী কবিকল্পের নিকট কই*। এমিকে হেথি,
কবিবক্তব্যেব কাব্যে মণিক মন্তে উল্লেক গ্রহিয়াছে—

মন্তবলিত্যর্থেই অর্থ্য করিলস। অবিবরি অর্থ্যই বৈলু দুই বাস।
মণিকমন্তের আদি করিল কিয়। যাহা মন্তেই বৈল শ্রীমন্ত পত্রিক ১০

হুগল না করিয়াও বলা চলে যে, এই অংশটি প্রকৃষ্ট
নহে। মণিক-মন্তের কাব্যের এক পুথিতে আছে—

৩। মণিকমন্তের মন্তবহুঃ, ঐত্বম্বার হরিদাস, মন্তীয় সাহিত্য
পরিষৎ-পত্রিকা, একাদশ ভাগ। মৌলী মহাপ্রবর শ্রীতে মৌলেনচন্দ্র,
ঐত্বম্বার পালিত, মৌলী-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, মন্তবহুঃ ভাগ। ৪। বঙ্গ-
সাহিত্য-পরিষৎ, প্রথম বৎ, পৃঃ ৪০০। ৫। মৌলী-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,
মন্তবহুঃ ভাগ, পৃঃ ২৪০। ৬। বঙ্গবাসী মন্ত, মৌলী মন্তবহুঃ, পৃঃ ৩।

১। অদি বহু, দ্বিতীয় ভাগঃ মন্ত বহু, চতুর্থ ভাগঃ।

২। বহু বহু, তৃতীয় ভাগঃ।

ইহা ঘটতে আরও বেশ। যাতেবে যে, ভাঁজুদত্তের চিত্তবল্লভনাথ
নৃসিংহরামের দত্ত সংঘম মাধবাচার্য। নেপাট্টে পালেন নাই।

कर्मणि वाच्ये ।

ନବର ଅନ୍ତରାଧର ବେଳେ ସାରି ସାରି । ଦେବର ମଙ୍ଗଳା ଉଡ଼ି ବାଜିବ ଡଙ୍ଗର ।
 ନବର ବସନ୍ତ ଛଡ଼ା ବସନ୍ତ ଅନ୍ଧାରୋଳେ । ଦୁର୍ଗାର ଆବାସେ କଳେ ସାରି ଶୋଷଣେ ।
 ଶେଷିତ ନାହିଁ ଅନ୍ତେ ସାହିଁ ବହୁଜିତ । ଦୁର୍ଗାର ଅନ୍ଧାରେ ଲୋକ ବାଞ୍ଛେ ହରିଜିତ ।
 ଶାନ୍ତସାଗର ବାଡ଼ ବସ ବାଞ୍ଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଳେ । ଆଶିଷେ ମନ୍ଦିରା ସାରି (୧) ମାଧବେ ।

[illegible]

ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତେଶ୍ଵର ମହାଦେବଙ୍କ ଦୟା । ସାମୁଦ୍ରୀୟ ଅଗ୍ର ଭାଷା ବିଶିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ॥
ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ି ଏହି ନାମାଧାର କଥା । ତାହାପରେ ନାମାଧାର ହୋଇ ବିଲେଖ
ସୂଚନା ॥

କାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାହା ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ । ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ।
 ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ । ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ।
 ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ । ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ ।

ଉତ୍କଳ-ସକଳ ଗୋଷ୍ଠେ ମନାଏ ଟାଣିଲ ସେ ଗୋଷ୍ଠେ । ଉଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି କଢ଼ି ନିଆ
ହାସିବୁ ଗୋଷ୍ଠେ ।

ବନାଈକି ବୋଲେ ଶ୍ରୀମୁକ୍ତ ଚାଟୁରୀ ନାହିଁ ଏଥୁ । ବାରେ ବାରେ ଚାଟୁରୀ ଖାତ
କାହିଁ ଦିଆ ଉଦା ।

সত্য কাম্বাইয়া আশে মজুত ঘেহ কড়ি । হানু (?) নিয়া পাঠাইব
চট্টল লাইব বাড়ি ।

କିନ୍ତୁ ନବର ବୋଲେ ନବାହି କହିବେ ଶୋଭାରେ । ନବର ଗର୍ବେ ନନ୍ଦ ବନ୍ଦା
ବୋଧିଲି ଆହ୍ୱାରେ ।

স্বভাব ভিতরে ঘন রূপ পোকা পোকা । খিরির মাথা চুল নাকি
 আবার মাথার সে পোকা ।৩

কাল মোর অধিকার আছে বশেরে । ভালুকা পাইবু তোরে হস্তের উপরে ।
 তঁহুই জনে বলাই বাসে নয় বর । আস্তে হস্তে টিপিয়া চাপিয়া ধরে কর ।
 স্তম্ভিলা কলিলায় করি বড়াতি । চোটে নিজে থাকে বুঝি ভক্তি বিহ বাতি ।

১। 'কিরাত'। ২। 'লি'। ৩। 'ভা'। পূর্বকবিতার পুঁথি
 'কিরাত' সর্বত্রই কৃৎ হ্রস্ব। ৪। 'ভা'। পূর্বকবিতার পুঁথি
 'কিরাত' সর্বত্রই কৃৎ হ্রস্ব। ৫। 'ভা'। পূর্বকবিতার পুঁথি

১। 'ভালু' পান্ডিত্যঃ ১। 'কব' পান্ডিত্যঃ ৩। 'বিত্ত' মাৎস কুল
নাকি কৌশল্যের মাৎস সে যেখা' পান্ডিত্যঃ ১। 'ভালু' নবপতি যোগ
কুল-এ নবপ' পান্ডিত্যঃ ৩। 'কব' ১। 'কৈশব' ভাটি পান্ডিত্যঃ

ଏହକ ଉଲ୍ଲିଖ କାହୁଁ ଶକ୍ତିମ ଗାମ୍ପିୟା । ସେହ ଉଦ୍ଧାରଣ ଗାମ୍ପିୟା ଶକ୍ତିମ ଗାମ୍ପିୟା ।
 ଗାମ୍ପିୟା ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ । ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ।
 ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ । ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ଶକ୍ତିମ ।

ବୈଷ୍ଣବ ଆବାସ ।

ନିମ୍ନା ନିମ୍ନା କୋଳେ ଶ୍ୟାମଲ ବେଶ ପୋଷେ । ତପା ଜାହାଜେ ଚଢ଼ି ସିନ୍ଧୁ
କାହିଁ ମୋର ।

সত্য নীতি কৃষ্ণি হংসে কোণে কান্নাই কান্নাই । শব্দ খাটাই (?) নক্সা
লাইন ডায়ালিক :

ସୂକ୍ତି ୧୨ ସୂକ୍ତି ବର୍ଗ ଦ୍ଵେଶ ଡାକିଲେ । କାଳୁକାର ସବୁତ ବୋନ ଡେଞ୍ଜା ।

ବିଳାସ (?) ଗୋପାଳୀୟା ଦୀପେ:ରାମ ମୋହନ । ଅମଳ ସମୁଦ୍ର କଢ଼ି ବୋଲେ ।
 ମହନ୍ତ ୧୧ ।

আত্মকল্পা কল্পিত হইল। (১) অতীত (২) ভবিষ্যৎ (৩) মৃত্যু
ভোগে ।
নাম (১) নরকি তথা বৈদ্য চোলে উদ্ভব । বৌদ্ধের আচার করিল

১০. কাকার হোমের কোন কথ বারি কিনি। প্রেক্ষিত ভাষ্যে দেখি হানে।

অন্যে বিবেচ্য অর্থিক বহিলাভ নহি। একবার দুইইটা পাত্রে কেবল বীজপত্র।
 তবুই সেখানে বীজ-পত্র কেবল বীজপত্র। কিন্তু সেখানে বীজ-পত্র

सत्य मेदिनी इति कौटिल्ये भवति । देवदत्त भवति । विद्या विद्या भवति ।

କି ଟେକା କି ଟେକା ବୁଲି ଶାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ । ଆମ୍ଭଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ଦିନ ହେଉଥିବେ ।

কোথ না ক'ত তাঁ'র সেরে নিখে চাহ । এক শাপ্ত তৈল বিহু বাড়ি লৈলা

୩୧ ।

ଡେଣ୍ଟା କବିତା ହିସାବ କ'ରୁଛୁ । ସମୟ : ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୫ ମସିହାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ବ୍ୟବହାର ।

[illegible]

ମାନେ ଯାହା ହାତେ ଚଢ଼ିବ ସବୁ । ଶୁଭାର ମନରେ ମିଶା ବିଳା ବହନ ।

কিছু-কিছু বসন্তে গেলো পদারি শুভা। সেই ঘোরের : তথা জাহাঙ্গীর। কড়ি বিজ্ঞ
কইনু মোরে ।

তত্তা ভাষ্যহিমা আসে বহুত দেহঃ ৫ কড়ি । মল্ল (?) বিজা শাখিবি জমা ।

ଆଇବା କହି ।
 ଭଲ୍‌ ବୋଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦା ଲାଗିନି ଟହନ । କହାବ କହି ଯେତେ ବାଧା (୧)

१०। "गुड"। ११। "अनिल" वा "अनिल" भाषायाः। १२। "अनिल"

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ବରୋପାଦେଶ ଶର୍ତ୍ତ" ଧାର୍ଯ୍ୟକର । ୧୦ । "ଅଭିମାନ ବିଦ୍ୟା ମାତ୍ର ଗୋ" ଧାର୍ଯ୍ୟକର । ୧୧ । "ସଦୃଶ ଆଦି" ଧାର୍ଯ୍ୟକର । ୧୨ । "କାର୍ଯ୍ୟାଦି ମାତ୍ର ଗୋ" ଧାର୍ଯ୍ୟକର ।

সেই বাস যদি আরে পৌকি-পালিত : কি কৈলা কি কৈলা তাঁরু লতা
জিসিত ।
তাঁরু-বন্ত যোগে এরা বারি নরিত পাত : কুসে আর জল বাত হুংব দিতা
বাত ।
মহাবীর হানে লেখিত বন্তব : এর রে সারিইলা যেহ জহরটের কর ॥
পত্র পতি চাহি যোগে আদম্বর : যোগে কোন করু তাঁহ ভাষাটের বন ।
হেনকালে বহির্জিলায় কোরে এক ধারে : পত্রক ব্যাধার (?) তারে দিলেক
আকারে ।
হও কথা কহে বীর আশা করি তরা : পান্ডু কখন : নিল পাটের
পাথোরা ।
কালুকা এততে পাইক পায়ব আর পাঃ : জুগিয়া দিবত চান পাঃক
উপব ।
যা বহু বীণ বেশি কোপ কোপ হব (?) : পূত্র আকিতে বনে বাপ
আইবের ।
তাঁরুহ জলে এরা কৈল পাথর : যাত্রা যাত্রা উটরা তাঁরুহ পত্র বহর ।
পাশায় বজিয়ায় করি বড়াড়ি : এ বা নিয়া যোগ তুচ্ছি বাহি বিক
কড়ি ॥
ভদ্রা গইলা হইল যে তাঁরুহ পদ : কান্দুরা হটে নিয়া বিল বংশন ।
যত বকরে তাঁরু আচারে করে কল : চিড়া ঘিরা কৈল তাঁরু সন্দেশ
বহর ।
হোণতি কহর তাঁরু ভাষেব না যোগ কড়ি : পদার দিল বসি আড
যোগে যত হুতি ।
ঠের বৃষ্টি যদি তাঁরু বন্তে করি হইল : সেই লবি লই তাঁরু সতর চলিল ।
তাঁরু-বন্তে যোগে শুন সোমের মাও হুতি : বহিষদন হইলা ঘাই কড়ি
সইও বাড়ি ।
পজিয়াব লবি হোণাইতে পাই : শুকিয়া (?) ব্রহ্ম বহে ভোর বারে
নিয় পাই ।
কহর তৈরক হুতি যদি বাইতে গাই : আসনা মাথা বাও যদি এড়ি খাই ।
তাঁরু-বন্তে যোগে বৃষ্টি কি মূল্য ভোর : ফের পদমে এত যোগিল আকার ।
যে পূত্র স্নান-কোন তেজস্বী সবি : অত্র চন হইল এহার কল করি ।
ভোগে পাই সৈরক হুতি তোমার কল : এহার ঘাঘি হইমারে আসে রাত্র ।
বাঁড়ুর জলে কুন্ড লজ্জত কাঁপিল : কহেত বজিয়া তাকে কহিতে পাশিল ।
পরিবাস কৈল আশু করি- দলোড়ি : বাও নিয়া যদি হুচ্ছি কলি ।
নিহ কড়ি ।

বহিষদন হইলা হৈল তাঁরুহ পদ : মৎস্তের পদাংক নিয়া বিল বংশন ।
বহিষদনি বহিষে মৎস্তের পদার পের কোনে : পদার হোঁতে মৎস্ত তাঁরু
বাঘি বাঘি হোলে ১২ ।
মৎস্ত বজিয়া তোমার ১০ পান্ডু টালাদিবি : কড়ি না নিয়া মৎস্ত হইয়া
পাত কৈবি ।
তাঁরু-বন্তে যোগে ভোগে বসিএ রেজারে : হও কাল মৎস্ত হেত কর
বেহ কাইরে ।
তোমারীও যোগে তাঁরু তুলি হও কোঃ : কহের দাসি বহিঃক
জোমতি হও বে ।
এই হুংব হুচ্ছি আশা মৎস্ত বাইবা : সোঃ লজ্জা এখনে কৈরে হানে বাইবা ।
পদাংকি বজিল কহে হুতুড়ি : কোমের কাকিয়া তার পদ ১০
জালা কড়ি ।
তারা কড়ি পদে তাঁরু আ গায় পাঃ : মৎস্ত এড়িয়া তাঁরু উটরা পদাংক
পাশায় চণে-সরাস-মৎস্ত-গোত : খিত মাঝে তথি দলি হইয়া পোত ।
সেই বিন তাঁরু-বন্তে বজিয়া মৎস্তে : এততে উটরা ঘর কোল করিগারে ।
সেই বিন মহাবীর সিগিল মৎস্ত : মহাবীরে বৈলে তাঁরু আদম্বি মৎস্ত ১০
সেই বিন কালেকতু পাইছিল ১০ মন : তখনে না যোগে কিল মৎস্ত ১০
কাল ।
পূত্র চন্দন নিয়া এরাপদর তরে ১০ : সোঃ ভাষিয়া এরা কোল নিয়া আর ।
আগে চন্দন পাইলেক মতল দুই : তাহা লেখি তাঁরু-বন্তে পুড়ি উঠে মন ।
কহরে পোড়র ইহা সজিও না পাঃ : সূতাবী ১০ হইয়া কহে মতল
জিতরে ।
তাঁরু যে কহরতি কি বৃন্দু হোরে : হুচ্ছি কি কহিয়া কৈল আশা
বহর ।
বহরুল অল হাতি তোমার বেমন : তাঁরু-বন্তে বজিতে চন্দন পাঃ মান
যখনে আছিল যা নদর পোঃটে : মৎস্তের পদে গইল কুলায় পাঃ ১০
হাটে ।
এখনে ১২ পেরে মন পাইব ১০ হুতুয়াল : বেনে মনে সেই বন তোমার
হইব কল ।
আকারে দেখিয়া হুচ্ছি কহরে মত জান : এই পুত্র মৎস্তেই চলিল কোল ।
মহাবীরে কোল যোঃ মতঃ আড বে : নিজস্ব করিয়া কিল তাঁরু তরে
বে ১০ ।

১২. 'পদারের মৎস্ত যদি তাঁরু-বন্তে তোমার' পাঠ্য । ১০. 'ভোগে'
পাঠ্য । ১০. 'তুই তার কে' পাঠ্য । ১০. 'কহ' হোঁতে তাঁরু-বন্তে
পদ' পাঠ্য । ১০. 'মৎস্ত', 'মৎস্ত' । ১১. 'বিলাসি' পাঠ্য ।
১০. 'অহার' পাঠ্য । ১১. 'সি' পাঠ্য । ২০. 'সুতাবী' ।
১১. 'আইত' পাঠ্য । ২২. 'মৎস্ত' । ২০. 'হইব' পাঠ্য ।
২০. 'আহারে কুন্ড লেখি মন' পাঠ্য । ২০. 'নিঃকল্যাস কলি' ।
তাকর যোগে তোমার 'মৎস্ত' পাঠ্য ।

১. 'কল' । ২. 'মৎস্ত' হুতু' পাঠ্য । ৩. 'কল'
কোন 'পুন্ডি' এই 'পদাংক' নাই : ৪. 'কৈল', 'কড়ি' । ৫. 'কাল'
কল', 'কাল' । ৬. 'কালেক' পাঠ্য । ৭. 'কল' । ৮.
'কলি' পাঠ্য । ৯. 'কলি' পাঠ্য । ১০. 'কল' পাঠ্য ।
১১. 'কল' ।

চাঁদু-বরঃ সাইক করি বসাবতিঃ ।
ক্রান্ত চাপড় মরে উপাড়ে
পোলা বাড়িঃ

বিলের কাগজ চাঁদু কাটি দান কৃত ।
জুহিতে পড়িয়া বেধে মত্তের মূখ ।
মত্তেরে ধোলাও বাপু করি নিঃস্বয় ।
সাথে হইল তাঁড়ু রান্ধে জ্বলন ।
মত্তেরে ধোলাও তাঁড়ু এড়ান পাইল ।
কাড়িয়া ধারের মূগা বাড়িতে চলিল ।
বাড়ির দিকটে থিয়া ডাকবে রক্ত ।
স্বপ্নার আনিয়া দেহ এক রীতিও পানি ।
স্বপ্নার বচন শুনি হতভম্ব অধির ।
ভাষা বাহায়ে করি মানি ছিল বীর ।

চাঁদু-বরঃ হেন্সিয়া যে রক্তের ধোলাও ।
যেখানেতে ফেলা তুমি মূগা কেনে
পারে ।
চাঁদু-বরঃ বেলে জিলা ওনার কর্তব্য ।
সহাবীরের সঙ্গে আনিঃ ধোলাও
পানি ।

এবে ঠাণ্ডে মহাবীরঃ হালিলা মন পাতি ।
সঙ্গের মলিক হৈলা কৈলা মূগাখলি ।
মূগাখলি করিয়া যে কাপ পাইল চন্দ ।
মহাবীরের পথে চিহ্ন এমন
চাপন (?) ।

কি বোলিতে পারি ফিরা বীরের সহঃ ।
তাহার পিঠাতে বস হৈল
চাঁদু-বরঃ ।

বিজ্ঞানবাক্যে রক্তেরে করিয়া স্নানঃ ।
বাড়ির খোদার অঙ্গে ছুঁন বিশেষ
ভাতিঃ ।
যেখানেতে আর কাঁদু মনে নাহি হোয়া ।
চুরি করি গহবরত মূল কাটকণা ।
বীরের কানি বৈরা ভাঁদু দেহানেত বাহ ।
স্বপ্নার পিলাঃপুঃ স্বপ্নার
এড়ানঃ ।

বিলম্বপূরঃ এড়ানি দার চড়ির হাট ।
চপড়িতে হৈল পিয়া বর রক্তপাট ।
তেট সজ্জা হুইল ভাঁদু দান এক তপে ।
বও এখান কৈলা কুপ্তির অগ্নে ।
লালার চন্দন-সংগ্রহ-মণ্ড-গোতে ।
বিজ্ঞানবাক্যে অধি মনি হৈল সেতেঃ

প্রাচীন বাজালা সাহিত্যের কলিন্দঃ ও অমৃত রসের
একধেরেদার মধ্যে ভাঁদু-বরঃ এই চরিত্রবর্ণনা
অতিশয়।
যেবসুক হইলেও যোড়ের উপর ভালই লাগে । [ক্রমঃ

১। 'ভাল হইল' স্থিরঃ পাঠকে করে 'হাখরি' পাঠ্যঃ ২।
'সঙ্গের' ব্যক্তি উপস্থিতি 'সরি' পাঠ্যঃ ৩। 'হাখিঃ' ৪। 'মহাঃ',
'আখিঃ' ৫। 'ব্রাহ্মণি' করিয়া পাইলি বর রক্ত' পাঠ্যঃ

৬। 'তাহার' পাঠ্যঃ ৭। 'সাপনার পুরি' এরি চিত্রঃ হাট 'শাখ'
পাঠ্যঃ ৮। 'চন্দন' ৯। 'কলিন্দাঃ' বিবর্তিতঃ ২০১৬ ও ২০১৭
সংস্করণে পুঁথি অক্ষয়নঃ ।

কুটীরের গান

— শ্রীমাধুরী ভট্টাচার্য্য

পথে যেতে তুমি ঘোরে ঢেউক বাও গহিত আঘাত,
তোমার ভাষায় পথে সঙ্গিনীরে নিতে ছাও সাথে ;
সাদা দিতে পারি কই ?—বেদনার কাঁধে নিরাশ্রিতে—
পুঞ্জীকৃত অক্ষয়তা হুঃ তবু বের বার বার ।

আমার মনেই প্রিয় ভবিষ্যৎে সংস্র জ্বাল,
তোমার চোখ পথে পায়ে পায়ে পারি না চলিতে,
কুটীরের কল-কোল পারি না যে হৃদয়ে ঘলিতে
ভাষা লোর তবু মনে রচিয়াছে আরা-ইন্দ্রজাল ।

তুমি চল যে পথিক আমি থাকি শুধু প্রতীকার,
চলিবার পথে রাস্তা অবসর আনিবে এখন
যেই বিশ্ব সেবা-করে ভরে যেন উঠে বেহ মন—
আমার প্রেমের নীড়ে পথরাতি যেন চলে যায় ।

যোরে তুমি দিলো বন্ধ চিরমুকু পথের সন্ধান,
তোমারে শুভাব আমি প্রেমের কুটীরের গান ।



আকাশপথে

উত্তর-আমেরিকা হঠাতে দক্ষিণ-আমেরিকা।

—শ্রী বিকৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্রেড স্লিক দ্বন্দ্বিক উড়ো-কাঠকে ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে বুথমান্‌ এরিন্স পর্যন্ত দিয়েছিলেন কারিব সাগরের পথ দিয়ে। পথে কারিব সাগরের নবোদয় দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করেন, তারপর গ্রিনিয়াকে ও আমাজন্‌ নদীর ব-দ্বীপ, তার পর ব্রেজিলের গ্রানন উপদ্বীপ।

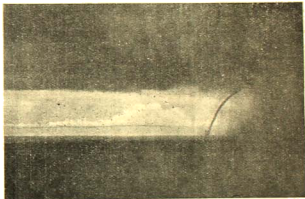
তার লিখিত বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করা গেল :—

‘হাতান্না বন্দর পার হয়েছি মিনিট চল্লিশ হয়ে, এমন সময় দূরে সমুদ্রতটে ঘন কালো কোড়ো মেঘের নীচে একটা প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ দেখা গেল। আনন্ড তার চারিদিকে চক্রাকারে উড়লাম, এবং উড়োকাঠকে থেকে জলস্তম্ভের ফটো নিলাম। ঠিক একটা কক্ষস্পর্শের মত সেটা প্রথমে মেঘের কোল থেকে নামল—ক্রমে সেটা মোটা হ’তে হ’তে ৬০০ ফুট দীর্ঘ চিম্নদীর আকার ধারণ করল।

বেগানে তার সঙ্গে সমুদ্রের জলের মিলন ঘটল, জলস্তম্ভের তলভূমি সমুদ্রের সেই অংশটা ঘন বহন করছে। তার পর জলস্তম্ভটা একটু বেঁকে গেল এবং এমিক-ওমিক ভুলতে লাগল, ঘন কোনো অতিকার অব তার পৃষ্ঠ আন্দোলন করছে—এই পৃষ্ঠটা ক্রমে ক্রমে বেঁকে আকাশের দিকে উঠে যেতে যেতে ঘন বৃষ্টির বাতাস মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমাদের ভাষা ছিল ভাল। জলস্তম্ভের এ-ধরনের ফটো নেওয়া বড় একটা ফটো না।

আমাদের বাতাস উদ্ভ্রম ছিল শুধু পৃষ্ঠাবলীর ফটো নেওয়া নয়, শব্দে যে সকল স্থান শব্দবে, তাদের লোকজন, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অতুলনান করা ছিল আমাদের প্রধান কার্য। আর মনে ভাবুন, আমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছি। কিউবা, হেইটি,



জলস্তম্ভ : আর সাত মিনিট কাগ হাতী হইয়াছিল।

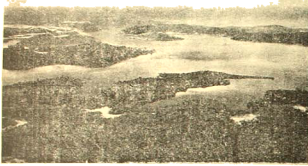
| উড়ো-কাঠকে হঠাতে ফটো তোলা

পোর্টো রিকো, আর্জেন্ট দ্বীপপুঞ্জ—তারপর আন্তিক পর্বতমালা অতিক্রম করে চিলি এবং শেরু—কত ধরনের হাঙ্গর, কত ধরনের ভাষা, ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, স্থাপত্যরীতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য !

যে মাসের ১৫২তার সকাল বেলাটিতে ওয়াশিংটন থেকে আমরা আকাশে উড়লাম—নিউইয়র্ক ও বুথমান্‌ এরিন্স সহরবস্তুর মধ্যে যে বায়ু ও ডাকবাহী উড়ো-কাঠকের পারি বাতাব্যাস করে, তাদের মধ্যে বৃহত্তম উড়ো-কাঠকে আমরা

বাজিলান। আমাদের কাগজের নাম “আন্তর্জাতিকা”— নিউ-ইংল্যান্ড, বিজি, ব্রুসেলস এন্ডিস, সংক্ষেপে “নিউস” লাইনেস ;

মনে আছে একবার চীন-সমুদ্রে এক জলপ্রপত্তের সাক্ষ্য। এড়াবার ভয়ে আমাদের জাহাজ অনেকদূর বিয়ে বুকে গিয়েছিল, আর আত উড়ে-ভাঙা পোকে আমরা তাকে এড়াতে করলাম না—উপরন্তু তার দটে নিলাম।



সাক্ষ্যগো ডি ভিউ বন্দ : পশ্চিম বঙ্গ আরে এই বন্দার মুখে স্পেন আর আমেরিকা দুই মহাদেশের বৈধি উঠে।

পান আমেরিকান এয়ারওয়েজ কোম্পানী এর পর এই ভাষায় থাকাকে কিনে নিয়েছিল।

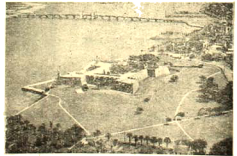
মিঃ চেয়ে বেশ পটোমাক নদীতীরের তরুশ্রেণীর উপর দিয়ে উড়ে চলেছি—রাইট লার্ন, হ্যাম্পটন রোডস্—এ মনর-করা আমাদের বগরতীর সারি, নরকোঙ্ক লন ছাড়িয়ে আমরা সমুদ্রের উপর অনেকটা চলে গেলাম—পশ্চিমে দিখাত ‘বিস্ময়’ (dismal swamp)-র নীল রক্ত, অস্পষ্ট সীমারেখা অদৃষ্ট দেখাচ্ছিল।

মিঃমির দলিগে স্ট্রোয়াডের নিয় উপকূলস্থি দেখা দিল। বর্ধনবর জনহীন ও মান্বগোষ্ঠ গাছেব জঙ্গলে ভরা। যাকে যাকে ছোট ছোট খাল ও গোনাকলের খাড়া। সমুদ্রে নানা ধরনের সিঙ্ক-লুন উড়ছে, তরুকের দল চলার উপর ভেসে উঠে খেলা করছে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে প্রবালের বাথের উপর সমুদ্রপশীল মৎস্তের ভাঁক চোখে পড়ছে।

মার্কিন বৃত্তান্তের সর্বমুখি প্রান্তে সমুদ্র তীরে কি-জব্বই-সহর। আমরা এর উপরে অনেকদূর চকাকারে ঘুরে এই সহর ও চারি পালের দৃষ্টান্তলী রক্টো নিলাম। তার পরে যেমন আবার আমরা সমুদ্রে পড়েছি—একবারে উচ্চগুণের কড় ও জলপ্রপত্ত আমাদের সামনে! এই জলপ্রপত্তের কথা প্রবক্তের প্রাণেই বলেছি। বিশ বছর পূর্বে প্রথম যৌবনে

এই জলপ্রপত্ত পূর্ণ শ্রামণীপটি আড়াআড়ি ভাবে পায় হয়ে খাড়া বস্তুগুরু বরনা হ’ণাম।

তার পরে কতকগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান পরে পড়ল সিরেন্টিফাইংগো নামক ছোট একটি সহরে আমাদের উড়ে-ভাঙাকে গালাম তবে নেওয়া হ’ল। তার পরে আমরা সাক্ষ্যগো বন্দেব চুকলাম। বিশ বছর আগে লেক্টেন্যান্ট হবলন মেসিমাঙ্ক ভাঙাক এই বন্দরের মুখে ডুবিয়া দিয়েছিলেন,

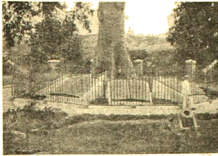


স্ট্রোয়াড : সেট আমেরিকা-ব্রিটিশ বর্ষ লেট বেলিগন। চারি দিকের দল-বলী-কল্যা—খাল, পলল দেহ, লুকু রাখিয়া যান ইত্যাদি ইতিহাস।

কাজভার বগরতীরমত বন্দরের মধ্যে আটকাবার ভয়ে!

বন্দর থেকে একই ধরে সান্ধ্যমান পাহাড় স্পেনীয় আমে-

বিকান্‌ যুদ্ধের ইতিহাসে ভিন্নগদিত হয়ে আছে। ঐ শাখাভেদে পাঠ ভাবন সাহায্যে সেই বিখ্যাত ‘শাস্ত্রবুক’টি এখনও



মানজুরাঃ সাংগেয়ে শাস্ত্রবুক : ইংরাজ সরকারকর্তৃক শিল্পে।
সহিত কৃষ্ণ পতিত আমেরিকার ইতিহাস প্রসিদ্ধি।

বর্তমান, বার তলার সেনাপ্রাণে প্রাক্টার স্পেনীয় সেনাপতির আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

সান্তিয়াগোর হোটেলে আমরা রাত্রি কাটানাম। আমেরিকান্‌ ভাইস্‌-কনসাল্‌ ও একজন স্থানীয় বাসিন্দার দ্বারা আর কোনো নিজের বেশের লোকের দেখা পেলাম না। এ সব অকলের সহরগুলি আমেরিকায় ছাড়ে তৈরী। বাড়ী-দরের স্থাপত্য সৌন্দর্য, লোকজনের বেশকথা, হোটেলেস বাসস্থান, দিনেরা ইত্যাদি—যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন সহরের মত।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের লোক এসে এখানে কিউবার সাধারণ লোকের সঙ্গে চাহুগীতে বা কুলীদিগের প্রতিযোগিতার পথে গঠে না। কিউবার লোক বহু কম মাইনে নিয়ে থাকেন, কোনো আমেরিকান্‌ তত কম খরচ চালাতে পারবে না।

আমেরিকা ও প্রাচীন সান্তিয়াগো বন্ধন সন্তীত স্থিতির বন্ধনে আবদ্ধ। কতকগুলি বন্ধন বেশ প্রাচীন, যেমন এই সহরের দেয়র হার্মেণো কন্ট্রা ভাভাভ ভানিয়ে একদিন এখনি থেকে রক্তপাত হয়েছিলেম যেহিঁত্বে-বিভক্তের ভিত্তে।

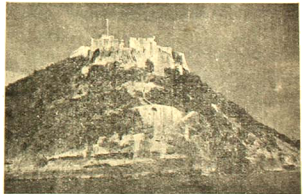
চাষী শ্রমিকের বহু কড়কথা, মহামারী, কৃষিকল্যাণ, মনোবাহার উপগ্রহ ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই সহর স্পেনের লগান ঘাটি ছিল।

এই ঘাটি স্পেনের শেষ ঘাটিও বটে। ১৮৯৮ স্ত্রীত্বের জুলাই মাসে এই নকলেরই অন্তিমস্থান মানজুরা সাহায্যে একটা বড় দিবা (cabin) গায়েল বগে প্রাক্টার, বরহেণ্ড ও উড্‌ মিলিত হয়ে পশ্চিম মহাদেশে স্পেনীয় আধিপত্যের শেষ দিন ঘোষণা করেন।

মানজুরা পাঠক এখন একটা পার্ক। সকালে বিকালে সহরের অনেক লোক সেখানে বেড়াই। সানজুরানের যুদ্ধে যে সকল আমেরিকান, স্পেনীয় ও কিউবা যৌগেণ লোক মারা গড়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যে এই পার্কেইর পায়ে স্থপিতকৃত নিশ্চিত হয়েছে।

কিউবা যৌগ আজ বাধীন। অনেক স্থল বললে এখানে স্থাপিত হয়েছে। আজ শিক্ষার প্রতি এদের পূর্ব সৌক্য। তিনি ও স্তানকের বাবদ্যে কিউবা বিস্তারালী। এখানে যে চুক্তি তৈরী হয়, তার পৃথিবী জুড়ে নাম।

বেলা পড়ে এসেছে। সহরমালীকা সঙ্গে সঙ্গে চলছে শিল্পমতে। একটা দিনেরা ‘টম কাকার কুটীর’ (Uncle Tom's Cabin)-এর বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। কাছের স্ট্রাশোনের উপর একটা ভীষণ পত্র ঘোষণা—এ আমর জুতো পাশিণ করতে ছুটে এল। আনি বলমান—বাপ জুতো, পাশিণ করবাম সরকার নেই।

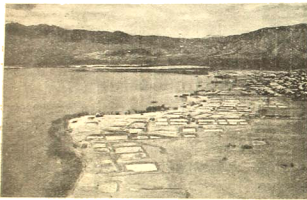


মাক্সিমো ডি কিউবা উপাধ্যায় উপস্থিত। অগ্রে ছবি আমেরিকার ইতিহাসে অব।

সে বললে, আমর মতা বরে পক্ষাণ পেটাই বেধেন। আনি ঐ নতুন কিল্লিমা না দেখলে আজ মরে যাব। সরাট আছে। যথেষ্ট উপর ছোকসকে ‘না’ বলতে যাবল।

তান পর আরও কত ঘোঁষ, নদী পূর আঁখির বেগবান
উড়ে চাঞ্চল্যে হুগার উড়ে গেল। বড় বড় পল্লভ বেন
দোঁরে দোঁরে নিকটে এগিয়ে আসছে। একবার আমি ঘুঁষে
উঠে দেখি, নীচে হেইট বীণ ও তার স্নাকদানী পেটো-মা-
গিলা, আনানের চাহাচ তাই উপরে চক্রাভাবে ঘূঁষছে।

সারদানী সবুজ পাছপালায় মধ্যে হেইট বীণের দান। মাঝে
বাড়ীগুলো কি চন্দ্রকান্ত দেখাচ্ছে! কত টিওহান চড়ানো
অছেছে হেইট বীণের সঙ্গে! লাকার্ক (Leclark), যে নেপো-
লিওনের ভটীকে বিবাহ করেছিল, নিয়োগ দাতা ক্রিস্টোফ,



হেইট বীণে উপস্থল: এখনও স্টাটন কবরস্থ বড় পরিচয় এখনে পাওয়া যায়।

.....হেইটতে প্রান্তর প্রবর্তিত হবার লনতের সেই সব নিদুর
চত্যাশাও!

দশন এখানে স্পেনীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত ১৭, তখন বিশ
লক্ষ টিওহান বাস করত এখানে! তারের বংশের এক-
জনও এখন বেঁচে নেই। বর্তমানে হেইটের প্রাচীন উপত্যকা-
গুলিতে ও পাগড়ের ধারের গ্রামে যে সব লোক বাস করে,
তারা আফ্রিকা থেকে আনীত ক্রীতদাসগণের বংশধর।

হেইটের লোক বে করাদীভাষার কথাবার্তা বলে, তা
কোন করাদী বুঝতে পারবে না। এ এখানকারই ভাষা,
বহু শতাব্দী ধরে আফ্রিকার নিগ্রোদের মূগে মূগে করাদী
ভাষা পরিবর্তিত হয়ে তার এখন এই রূপ ধাঁড়িয়েছে। আনে-
রিকার প্রভাব এখানেও বড় কম নয়। আনোরিকান মিশ-
নরীরা এখানে মূল-কলেজ স্থাপন করেছে, এখন উচ্চ শ্রমের
কৃষিকাণ নিশিগছে।

সহর ছেড়ে কিছুদূর যাও, মনে হবে আফ্রিকার অপরিস্রুত
অবস্থা-ভীষনের মধ্যে এসে পড়েছ। ছাতার মত গোল ঢালা-
ঘর, তার নীচে এসে নিগ্রো মেয়েরা কাফিকল গুঁড়ো করছে,
রাখালেয়া গরুর পাল চরাচ্ছে সাহাড়েব নীচে। কামেরা
বেশলেই তাগা ঘরের মধ্যে ছুটে পালাবে, নয় তো হেসেই
খুন হবে।

হেইটতে ফলের বাগান রয়েছে। বড় বড় উপত্যকাগুলি
আম, পেঁপে, কলালেবু, কলীকল, নারিকেল প্রভৃতি ফলবৃক্ষে
পরিপূর্ণ। বাজারে এসব ফল খুব সস্তা। এক বয়সের
অল্পত পাছ দেখলাম, তার ডালে বেন
বড় বড় সবুজ ফুটবল ফুলছে। এই ফলের
বিতরণটা নাকি ঠাণ্ডা, শ'ম নেই।
স্থানীয় অধিবাসীরা এগুলিকে জলপাত্র-
রূপে ব্যবহার করে থাকে।

হেইটের অরণ্য অকসেস বহু কাফি
১৭। আবার কতক চাষও করা হয়।
কাফি এখানকার প্রধান ফসল। কাফি
চূর্ণের উপর তত্ত্ব ইকুয়াল চেলে সবটা
গুঁটে কাগর মত করে ফেলে। এই
তিনিস এসেণের একটা প্রিয় খাদ্য।

পাছতলায় ছোট একটা গ্রাম
বাজার। বোকানে বাজীর পাইপ, কুশ, সাবান, কাপড়ের
কলী, আদা ইত্যাদি বিক্রী হচ্ছে। তিনিসপত্র খুব সস্তা।
ফলনে বেচের শেষ করা যায় না—এমন একটা কলীকলের বাস
বাজ এক সেট। পাছতলা এত সস্তা বলে হেইট বীণের
মজুরেরা দৈনিক ২৫ সেন্ট মজুরীতে খাটতে পারে।

বিবাহের সকাল বেলা আমরা পোটো প্রিন্স ছেড়ে
আকাশে উড়লাম। আখের নীচে শতপ্রাচীন উপত্যকা,
মূত্রে এনরিকিলা হ্রদ, হ্রদের উত্তরে বন হাজার ফুট উচ্চ
পর্বতমালা। হ্রদের কর্ণধর্য তীরে কুইয়ের বল রোদ
পোহাচ্ছে, উড়ো-আহাৎগের লব তখন ফলের মধ্যে ঢুক
গেল।

হ্রদের পূর্বে অনেক দূর পর্যন্ত লোকালয় দেখা গেল না।
কোন দূর প্রান্তরের মধ্যে, পাগড়ের নীচে, বনের ধারে বহু
অশ্বের বল বিচরণ করছে। তার পরই আবার সবুজ, কতক-

কিন্তু ছোট ছোট বস্তুর বহু সমুদ্রতীরে । লোকে সমুদ্রের
জন জাল দিয়ে লবণ তৈরী করছে ।

সমুদ্রের একটা ছোট খাড়ি পাশ ধরে সাটা ডোমিকো
গর । আমেরিকান ফ্রান্স 'মেম্বিক' এখানে কড়ে গ্রন্থালের
বীথে দাড়া খেয়ে ভেঙে গিয়েছিল, এখনও তার তদ্ব্যবস্থার
আছে । এই গররের দিক্কার কলৎলের অতি রক্ষিত
আছে ।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সাটা ডোমিকো গরর শক্তিশীল হয়ে পড়ে
এক ত্রায় দশে তার ফ্রান্সিস ড্রেকের চাটে অধিবাসীরা
অত্যন্ত নির্ধারিত হয় । ড্রেক গররের
অধিবাসীদের কাছে যে টাকা চেয়ে-
ছিলেন, তা বেওয়া তাদের লক্ষ সহস্র
ছিল না । তখন ড্রেক গররের বহু বহু
বাড়ী কাড়তে লক্ষ দিলেন । পুরোনো
আবগের অধিকাংশ তাল বাড়ী এই
ভাবে নষ্ট হয় । অতি কমে গররের
লোকে তাঁকে হিন হাফাস ডলার চান
তুণে দিয়েছিল ।

এখানকার বাসিন্দাদের প্রধান শ্রম
চিনি । গররের চাষিদের আখের ক্ষেত ।
উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আখ
মাড়াই করা ও রস জাল বেওয়া হয় ।

সাটা ডোমিকো ও হেইটরি মধ্যে ভাগর পার্শ্বক্য লক্ষ্য
করবার বিষয় । সাটা ডোমিকো লোকে যে ভাষা ব্যবহার
করে তা স্প্যানিশ বটে, কিন্তু আসল স্প্যানিশ থেকে এত
বড়ই যে, ইউরোপ থেকে নবাবত কোনো স্পেনীষ কল্পলোক
এখানকার ভাষা আধো বুঝতে পারেনেন না । কিন্তু হেইটরি
ভাষা ফরাসী—বহিঃ ক্রমের ফরাসী ভাষার মধ্যে তার সাদৃশ্য
বড় কম ।

সমুদ্রের দিক থেকে বড় বড় উঠল । আমরা বাতাবিস্কৃত
নোনা-পান্যভেজ উপর দিয়ে উড়ে পোন্টো-রিকো পৌঁছলাম ।
পোন্টো-রিকো প্রাচীন বন্ধুর, এর বেওয়াগে কত শতাব্দীর
শৈশব পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, এর ভগ্নবশের পাথর কত
অলমহা, বিশ্রোভী ও শব্দহীন বোড়ান কুসল যাবে

অগ্রগাম্য হয়েছে, এম বড় কাণ্ডিভুলের লংঘন ইমামি-স্থমিতে
মাড়িয়ে সেই সব প্রাচীন বিহীন কথা আবারে মনে এসে,
কলৎলের কথা মনে এসে দ্বিবি লগ্নে 'এখানে উপনিবেশ
স্থাপন করেন, প্রথম এই অক্ষয় পানন করেন ।

পোন্টো-রিকোর অল্পের মান-ভেরিনিমো গুরু । বহু অর্থ
বায়ে এ গুরু তৈরী হয়েছিল । এর পুত্র পাথরের বেওয়াগের
গারে এখনও সাধ ফ্রান্সিস ড্রেকের কামানের গোলায় লগ্ন
আছে ।

কিন্তু কলৎলের আদলের পোন্টো-রিকো এখন নবীন জুগের



এক দিনের অস্ত্রোপাত : পরদর্শক হইতে ফিলমান লাক্সা পোন্টো-রিকো দৃশ্য ।

সভ্যতার স্রোতে নিকেচে তালিয়েছে । এখানেও আমেরিকান
সিনেমা, স্ট্রীট্‌সের স্থান, বহুধর কাগজের কামেরা ওয়ালাদের
ভিড়, গিলোটিনের ভিড়—বুজুগের যে কোনো সমুদ্রের
সব উৎপাতই আছে । হুঃ হয় এই যে, জাতিটা এক ছাঁচে
চলাই করা হচ্ছে, এর প্রাচীনত্ব আর বইল না ।

কৃষি এখানকার লোকের জীবিকানির্ভারের প্রধান উপায় ।
সাধারণতঃ আনারস, আম ও তামাকের চাষই বেশী ।
এদেশে ধান হয় না, কিন্তু চাউলই এখানকার প্রধান শস্য ।
মাংস অত্যন্ত হুশাণা । বিশেষ থেকে আমদানী 'গুরু কড়'
মাছ বাজারে সবচেই পাওয়া যায় । চাউলও বিশেষ থেকে
আসে । একদম স্বাদ এখানে সস্তা নয়, অল্প সমুদ্রীয় হার
সস্তা । পোন্টো-রিকোর প্রধান সমতাই এখন মাড়িয়েছে এই ।

লাইসকালের মেগার্মি ভেদ বসে আবারে জাহাজ

[৭]

আপনার প্রশ্নকে আমিও গ্রহণ করি, এখনও তখনও বুঝার নাই—অতীতে চিত্তাঙ্গী কতিল, “যা যা ঘূমিয়েছেন?”

গ্রহীণ বলিল, “হাঁ।”

“এখন আগুন কেউ ঘূম না তাগালে চর?”

“আমি টেলিফোনে ‘বিসিফার’ নামিগে গেসে এগেছি, আর চাকরদের বলে এগেছি, তারা একজন একজন করে’ মেগে থাকে—কেউ যদি আসে, তাহে বসিয়ে রেখে আমাকে খবর দেবে।”

“বেশ কবেছ। এখন তুমি ঘূমাও।”

গ্রহীণ আলোটা নিবাইয়া দিল, শুভা পড়িল। তাহার পর একটা কথা তাহার মনে পড়িল—কথা প্রকৃষে উত্তীয়া তাহার হৃদয় কাছে যায়, আত্ম যদি তত প্রকৃষে প্রথাকরের নিম্নাঙ্ক না হয়, তবে কাল যাওয়া অতীতে না ভাগাইলে ভাল হয়। সে ক্রীকে বলিল, “তুমি গিয়ে মাঝে বলে এস, কথা যেন তোরে গিয়ে যাবাঝে না ভাগায়।”

অরুণা বলিল, “যা যা বত রাত্রিতে কেন ঘুমু না, ভোর পাচটার উঠবেনই, আর উঠে কণাকে ডাকবেন; কথা ত তার আগে উঠে না।”

গ্রহীণ বলিল, “যা কি ঘূম! অত পোলেও তিনি উঠেন নি!”

একটা কথা বলিতে বাইয়া অরুণা আপনাকে সংঘত করিল। যার যে নিম্নাঙ্ক হয় নাই, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না—তিনি উঠেন নাই, এই কথাই। কিন্তু সে তাহা বলিল না। স্বপ্নের লক্ষ্যে শাক্তীর ব্যবহার তাহার কাছে কেমন রহস্যজনক বলিয়া মনে হইত। প্রথাকরের ঘোষীল চরণে পুস্তকের প্রতি, পুস্তকবৃত্ত প্রতি, কণার প্রতি ও যোকার প্রতি বের বেন অস্বস্ত ছিল—কল্পনাময়ী প্রতি তাহার ভালবাসাও অরুণা তাহার ব্যবহারে, বিচ্যবৃদ্ধির পরিসরে ঘূমিতে পারিত। কল্পনাময়ী বাহা ভালবাসিত না, তেমন কোন কাছ বুঝাক

করিত না এবং কল্পনাময়ী কল্পিত ভাষার আশ্রয় তাহার গলে লগকান হইত। কিন্তু কল্পনাময়ী বেন যানব লক্ষ্যে আপনাব সব কর্তব্য শেষ করিয়াছে মনে করিত—সে বেন এমন অনেকটা দূরে যাওয়া পড়িয়াছে। নবীন যৌবনের প্রেমের ব্যাকুলতা লটকা কল্পনাময়ীর এই যানব আশ্রয়লিপ্সান অতাব শিখিত করিয়া অরুণা বিমিতা হইত। বিশেষ যুধাকরের যে অগ্রহে সে গ্রহীণকে অতিমাত্র ব্যস্ত হইতে দেখিত, তাহা যে কল্পনাময়ীকে বিমুগ্ধা শিখিত করিত না, ইহাতে সে কিছুতেই কল্পনাময়ীর অসাধারণ ঐশ্বর্য প্রকাশ্য করিতে পারিত না, লক্ষ্য মনে করিত—সে তাবাই অসা-দাবিক। যার ব্যবহার যে গ্রহীণেরও ভাল লাগিত না, তাহা সে ঘূমিতে পারিত। তাহা সে আত্ম প্রকার লক্ষ্যে কথাই প্রকাশ করিল না—তিনি তামি, যার লক্ষ্যে লক্ষ্য কণা হইত পুস্তকের কাছে প্রীতিপ্রদ হইবে না।

গ্রহীণ বলিল, “কণা যাবার তরত ঘূমি শূন্যশিত।”

অরুণা বলিল, “সে কথা বলবার উপর নাই—যাবার শূন্যশিত একটু নয়।”

গ্রহীণ বিমিত হামি হাসিয়া বলিল, “তা বটে—আগে ছিলাম, আমি একা; তাহ পরে গেসে তুমিও। কিন্তু আমার উপর তাতে যাবার ভালবাসা এতটুকু কমল না, আমি এত একটা ঐশ্বর্য অস্বস্ত করতে পারি। তারপর এখন আগার কথা, বোকা।”

এ কথাই যাবার অরুণা অস্বস্ত অস্বস্ত করিল। তাহাকে এত বেশ বৃষ্টি তাহার শিতাও হিতে পারেন নাই—এমন ঘোষীল মনুষ্য হয়ে “মা” লগেযন বৃষ্টি সে তাহার যাবার নিম্নাঙ্ক পাছ নাই! সে কখনো অস্বস্ত হইলেও যে শিতাঙ্গের বাইয়া থাকিতে চাহে না, সে শক্তির স্বত্ব; তিনি যে বলেন, “বাইবে—তা যাও, কিন্তু এই বৃত্তকে কেবল তাবাইবে আর চুটাইয়া করাইবে”—সে উত্তির আন্তরিকতার অরুণা কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতে পারে না। তিনি বেশ দিয়াই গ্রহীণ, তাহাকে ভালবাসা দিয়া বেন কিছুতেই মনে হয় না—যেহে দেওয়া

হইল। প্রতি শতভূগের ব্যবহারে অর্থাৎ বিখ্যাত হইত। অথচ শতভূগী যে ভাষাশাসিত্রে পাঠেন না—এমন সে মনে করিতে পারে না। সভা বটে, তিনি তাহার প্রতি ব্যবহারে অব্যাহতের বা বিশুদ্ধতের কোন ভাবই দেখাইছেন না। কেবল সংসারে তাহার নিখিলি স্থানটি তাহাকে প্রসন্ন ভাবের প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুনঃপৌত্তৌর্য প্রতি তাহার প্রেক্ষণে মনে পড়িবার আত্মপ্রকাশ করিত—প্রাথমিকের লইয়া তিনি সঙ্গতাই বাস্তবিকতেন, ভাষাশাসিত্রে সব কামের এও তিনি লইয়াছিলেন।

স্বামীকে ভাষাশাসিত্রা ও স্বামীর ভাষাশাসিত্রা নামক গ্রন্থের বৈচিত্র্য ও বাস্তবের আদর্শের বৈধন্য সঙ্কট অনতিক্রম করিয়া মনে করিতে পারিত না—যেমন অনেক পুস্তক মনে করে, বিবাহের পর কয় বৎসরের মধ্যে পুত্র হইত তিনি পুত্রকল্পা হইল, স্ত্রী সংসারের ভাব লইলেন, তখন তাহার কাব্যক্ষেত্র সংসার, মনোবোধের পাত পুস্তক—তখন আর বৌদ্ধের উৎসে, ভাষাশাসিত্রা তাহা পায় না—তখনই কতকগুলি স্তোত্রাক মনে করে, স্বামীকে পুস্তকস্ত্রা দিয়া, স্বামীর সংসারের ভাব লইয়া তাহার ভাষাশাসিত্রে স্ত্রী-জীবনের কথন শব্দ করিল—স্বামীর প্রতি ভাষাশাসিত্রা তখন সাংসারিক কথন পথবিনতি হয়—প্রথম যৌবনেই শোভা পায়। বাস্তবিক অনেক নারীর যেমন ধারণা, স্বামীকে বহু ভাষাশাসিত্রা, বহু বহু, বহু সেবাই কেন দেখা যায় না, কিন্তুতেই মনে হয় না, দেখেই দেখা হইল, তখনই কোন কোন পুস্তকের মনে হয়, স্ত্রীকে তাহার বহু ভাষাশাসিত্রা কেন প্রদান করুক না—ভাষাশাসিত্রা কখনও তৃপ্তি হয় না—মনে হয়, আরও ভাষাশাসিত্রা তাহার কর্তব্য। সেও যেন—

“গাথ শাখ দুপ হিরে হিরে গাথব।

তু ফিলা হুদন না বেনি।”

আবার কোন কোন নারীতে ইহার বিপরীত ভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহার মনে করে—স্বামীর ভাষাশাসিত্রা বাহা পায়, তাহাই লক্ষ্যে এবং স্বামীকে তাহার যে ভাষাশাসিত্রা যেহ তাহাও লক্ষ্যে। এই ভাব-বৈধন্য ও আদর্শের বিচিত্রতা অনেক স্থানে অল্পবয়সের কারণ হইয়া উঠে। আপনার ভাব ও আশুনা আদর্শ যেমনই কেন হউক না, ভাষা ভাষা করিয়া, স্বামী পক্ষে স্ত্রীর ও স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর ভাব ও আদর্শ আপনার করিয়া

লইতে পারিলেই সে অনুপের কাণ দূর হইতে পারে, নিকটে নহে।

অত্যা ইহা বুঝিত না—যৌবনের ভাষাশাসিত্রা প্রবাহে সে কোনরূপ বাধা অল্পবয়সে করে নাই। যে প্রেমের কারণে সংসার স্থানের সুখ বর্ষে বর্ষে ত্যাগ দেখিতে পায়, যে আপনার সঙ্গীতে জীবন ও সমগ্র জীবন স্থান অল্পবয়সে করে, সে মানব-চরিত্রের এই বৈধন্য বুঝিবে কেনন করিয়া? এ রহস্যের কারণ সন্ধান সে কেনন করিয়া পাইবে? তাই অত্যা শতভূগের ব্যবহারে বিম্বিতা হইত। সে যে সে-কণার আলোচনা স্বামীর লিখিত ও করিতে পারিত না—করিত না, তাহাতেই তাহার বিশ্বাস প্রবাহপন্থীন কলস্রোতের মত মনের মধ্যেই লক্ষিত হইত। সে দেখিত, স্বভাব বেধ-ভাষাশাসিত্রা কলস্র বহিলেও অত্যা হইত না। স্ত্রীর প্রতি তাহার ভাষাশাসিত্রা, তাহার ব্যবহার, স্ত্রীর সামান্য অনুবিধার বা অনুবিধার কলস্র তাহার কলিত ভাব সে সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিত। কিন্তু সেই বিচলিত ভাব বহন তাহার শতভূগের কাছে “বাড়াবাড়ি” বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাতে বহন শতভূগের কলস্রের বিজ্ঞপের হাসি দেখা দিত, তিনি বহন স্বামীর আগ্রহ, অত্যা ও স্বামীর সামান্য পরিচয় করিতেন, তখন অত্যা ভাবিত—এক? অথচ শতভূগের অল্প কোন ব্যবহারে সে নিজের কোন অবসর পাইত না। তাহার পরিচয়লেন সংসারের কাণ দ্বার কলস্রের মত চলিত; সামাজিক ব্যবহারে লোক-লৌকিকতার তিনি যে ভাবে কাণ করিতেন, তাহাতে কেহ কোনরূপ কট্টর সন্ধান পাইত না; তাহার সঙ্কট তিনি সর্বদা কর্তব্য পালন করিতেন; পৌত্র-পৌত্রীর পালন-ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহাশাসিত্রা কামার ও সামান্য অনুব্রততার তিনি আহার-নিদ্রা ভাণ্ড করিয়া সেবা-প্রদান করিতেন; সূত্রের তত্ত্ব তিনি কোনরূপে ছুদ হইতে দিতেন না; দিম্ব নারীর চিহ্নপত সংসারস্থলার ধর্মোচ্চতানে তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এই এক অল্পবয়সের সময় সময় তাহাকে যেন কোন রহস্যবয় বহিল মনে হইত।

এক এক সময় অল্পবয়সের মনে হইত, পিতার সঙ্কট স্বামীর এইরূপ ব্যবহার স্থায়ীর মনে বৈধন্য লক্ষ্য করে। কিন্তু সে সবেম তাহা মনে—কলস্র উপর পথচালিত মেঘের প্রতিবিম্বের মত পড়িত হইয়াই আবার সরিয়া গাইত; কেন

না, মা'র সম্বন্ধে সুখীর কোনরূপ বিবর্তিত বিকাশ হইতে বিত না। বাতরক্তি টোহার কাণে না ও চুইতে পারে। কারণ সে জানিত, তাহার মনে সেতন কানের সকার বৃত্তিতে পারিলে, তাহাতে তাহার পিতার মনেই বিশেষ বেদনা অন্তর্ভুক্ত হইবে। মা'র প্রতি তাহার পিতার প্রগাঢ় অমুখ্যপের এত পরিচয় সে পাইগাছে যে, সে পিতার প্রতি অপরিণীত ভাল-বাসার ক্ষত ও মনে মনেও মা'র প্রতি বিবর্তিত উত্তর হইতে বিতে চাহিত না। 'তাহার প্রতি মা'র মেয়ে সে কোন ক্ষতি লক্ষ্য করিতে পারিত না; আর সেই জন্যই বৃত্তি, পিতার প্রতি মাতার ব্যবহার তাহার নিকট অধিক বিদ্বেষের কারণ বলিয়া মনে হইত। পিতাকে মাতার উপলক্ষ্যকরিত বেদনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার বার্ষ্য বাস্তুত্যা পথে পথে তাহাকেই বাবিত করিত, আর সঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রতি তাহার ভালবাসা পীড়িত লজ্জার প্রতি জননীর মেয়ের মত বিবর্তিত হইত।

[৬]

অকণা বাহা বলিয়াছিল, তাহাই হইল। বারবার বাহা-প্রাণে সুখাকরের তরল নিস্তা ঘড়ীতে পাঁচটা বাজিলেই জাতিয়া গেল। প্রভুঘবে ম্যাতাগ্য তাহার বালাকালাবধি অভ্যাস। ব্রহ্মনাথ ঘর প্রভুঘবে উঠিতেন। বৈবরণাসনকীণ গৃহকর্তার স্বভাব—তিনি চাহেন, তিনি বাহা ভালবাসেন, সকলকে তাহাই করিতে চায়, তাহার বাহা টাক্স, গৃহে তাহাই নিগদ; সেইজন্য গৃহে ঘূহিণী হইতে ভৃত্য পদাঙ্ক সকলকেই প্রভুঘবে উঠিতে হইত। বালো অজিত সেট অভ্যাস ব্রহ্মনাথ কখনো ত্যাগ করেন নাই; তাহার সেট অভ্যাস বালাপাঠে পণ্ডিত সেট কথা স্বরণ কলাইয়া দিত—“বর্তম সর্কোপরি প্রবল বটে, কিন্তু অভ্যাগও কম প্রবল মছে।” তবে পিতার ও পুত্র এই প্রভেদ ছিল যে, সুখাকর বহু প্রভুঘবে উঠিলেও বাড়ীর আর সকলকে তখনই উঠিতে বাধ্য করিত না। কিন্তু কণার প্রভুঘবে উঠা অভ্যাগ ছিল। তাই সুখাকর উঠিগাই কণাকে ডাকিত, আর কণা তাহার আঙ্গান তুলিলেই বিবারণ নিকট হইতে ছুটিয়া তাহার কাছে ঘাইত। কাণেই কল্পনাময়ীকেও উঠিতে হইত। আজও সুখাকরের নিস্তাক্ত হইলে সে ডাকিল—“হাত!” কণা উঠিয়া বলিল—কল্পনাময়ী তাহার গায়ে একখানি পা'র কাপড় জড়াইয়া দিলেন, বলিলেন—

“জুতা পাও বিত্ত।” সে জড়াডাকি চুটুজুতার মধ্যে পা কোন রূপে পুঁজিয়া পার্বের কক্ষে চলিয়া গেল—বাটগা বাহির বুকুর উপর শুইয়া গড়িল। সুখাকর তাহাকে আদর করিয়া বলিল, “কাল আর তোমার গল্প শুনা হ'ল না?”

পূর্ণ গভীরভাবে কণা উত্তর দিল, “তোমার যে অমুখ করল!” তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা, বাত, অমুখ শেরে বাত না কেন?”

সুখাকর বিব্রত হইল—অমুখ কেন সারে না, তাহা কণাকে কিরূপে বুঝাইবে? সে বলিল, “সব অমুখ কি সারে?”

“সারে না? তবে অমুখ হ'লে তোমাকে ডেকে নিয়ে বাত কেন?”

সুখাকর মনে মনে হাসিল; তাহার মনে হইল, বলে—সেটা ফুলাফুর, আর তাহার কোষ্ঠেই খনলাক ও তাহারের কোষ্ঠেই খনকন যোগ আছে বলিয়া। সে বলিল, “কতকগুলো অমুখ শেরে বাত বলে।”

“কাল তোমার অমুখ হ'ল, তবু তুমি বেতলে কেন?”

“আমার যে সোপী বেথতে বেতে হয়েছিল।”

“তবে বাহা গাণ করলেন কেন?”

“বাহা বৃত্তি গাণ করলেন?”

“হ্যাঁ।”

“তোমার উপর গাণ করলেন?”

“না বাত—বিবারণ উপর; গাণ করে' না খেয়ে চলে গেলেন।”

সুখাকরের বুকুর মধ্যে ঢাকলা অন্তর্ভুক্ত হইল—যেন নবোত্তে বান আগিল—নদী তরিয়া উঠিল। শংসারের এক রহস্য? তাহার একদিকে যেমন শুভ বস্তুভূমি, আর এক দিকে তেমনই বিস্ত্র ভ্রামশোভা—এক দিকে তপ্ত বায়ু, আর একদিকে নিরুৎসাহত বহু বায়ু! একদিকে কল্পনাময়ীর উপেক্ষা, আর এক দিকে সুখীরের ভালবাসা; একদিকে কল্পনাময়ীর ভালবাসার প্রতিদান-বিশ্বস্তার বেদনা, আর একদিকে সুখীরের এই বাবহারের নিদ্র শান্তি! এই নিদ্র শান্তি যে হুত্মাশা, তাহা সে জানিত—বৃত্তিত; কিন্তু সেই শান্তির মধ্যে বদন বস্তুভূমির গুণ বাস আগিত, তখন তাহা যেন আরও অধিক কষ্টকর মনে হইত।

এই সব কথা নাথিয়ে নাথিয়ে স্থাধাকর কণাকেও বুঝিয়া গিয়াছিল। কণা কিন্তু নিজেও ভুলিতে ছিল না; কিজামা বলিল, “নাও, তুমি বুঝি বুঝেছ?”

“না, নাও”—বলিয়া স্থাধাকর তাহাব কোনল হাতেও উপর গাত বুলাইতে লাগিল; বলিল, “আজ গল্প শুনেও হ’বে ত?”

“আজ না হয় তুমি একটু বুঝিও।”

“আর তুমি কি করবে?”

“আমি প—”

কণা কি করিবে তাহা নাথিয়া স্থি করিবার পূর্বেই কণশাননী ডাকিল—“কণ্!”

কণা স্থাধাকরকে বলিল, “শিলা ডাকছেন—আমি যাউ।”

কণা চলিয়া গেল। কণশাননী তাহাকে সুখ বোয়াইয়া কাপড় পরাইয়া দিয়া আপনি কায়ে বাটত।

স্থাধাকরও শব্দভাগ্য করিল; শব্দভাগ্য করিবার সময় মস্তকে বহুলা অল্পস্ব করিল; বুকিল—এবার মস্তকে অব্যাহতি নাই। এই শিরঃকঁড়ার আক্রমণ যেমন বায়োসেরে বস্ত্রাঘ মত অতিক্রান্তাবে আসিত, তেমনই সেই বস্ত্রাঘই মত আপনার চিহ্ন রাখিয়া বাটত। বস্ত্রাঘ চল সন্নিহিত হইবার পরও যেমন বিধবস্ত গৃহে ও বিনষ্ট শতক্ষেত্রে তাহার আগমন ও গমন বুঝিতে পারা যায়, পাঁড়ার বহুকালস্থায়ী বেগ অপস্থত হইলে তেমনই নৈহিত দৌরঙ্গা তাহার আক্রমণ-চিহ্ন রাখিয়া যায়; কেবল তাহা কখনো অধিক হয়, কখনো অল্প। পত প্রান্তিতে যে তাহাকে বাহিরে বাইরে হইয়াছিল এবং তখন ও তাহার পূর্বেতে তাহাকে অস্থায় অস্থায় কায করিতে হইয়াছিল, তাহাতেই এবার এমন হইয়াছে।

স্থাধাকর উঠিল—উঠিয়া দানাগারে প্রবেশ করিল। আজ কণার কথা শুনিয়া একটা নূতন চিন্তা তাহার মনে প্রবেশ করিয়াছিল—সে কিরূপে স্থাধাকর তাহার কণ্ড অগ্রভূত যেনা হইতে চক্ষা করিবে? এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার কণ্ড স্থাধাকর তাহার মাতার প্রতি বিরক্ত হইয়াছে। আজ কণার কণার সে তাহা বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াই মনে করিয়াছিল, এই ভাব বহিত হইলে স্থাধাকরের জীবন ভিত্ত হইবে। জীবন ভিত্ত হইলে কি হয়, তাহা সে আপনায় অভিজ্ঞতার অক্ষর করিতেছিল। এক এক সময় এক একটা কণার প্রত্যাব কত দুঃখানী হয়। কে বঞ্চিত পারে, অসাবধান

উক্ত কোন কথা বুঝেবকে বাধ্যকরাসুতঃ-তাহিত মানবেশ নথিতঃ চিন্তায় মুক্তির সকনে সর্গভাগী করিয়াছিল!

স্থাধাকরের কেবলই মনে হইতে লাগিল—স্থাধাকর কেন তাহাকে এত ভালবাসিয়াছে? সেই চিন্তা তাহাকে অস্থময় করিয়া রাখিল।

স্থাধাকর দানাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া যোবিল, স্থাধাকর মস্তকের ব্যস্ততা দাড়াইয়া আছে। সে তাহাকে দেখিয়া কিজামা কহিল, “বাবা, মাথাখণ্ডা ছেড়ে গেছে?”

তাহাকে তুই করিবার আগ্রহে স্থাধাকরের মনে হইল, সে বলে, “হাঁ।” কিন্তু এই পুত্রের কাছে সে মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। সে বলিল, “কবে গেছে।”

স্থাধাকর বলিল, “আজ তুমি আর বেরিও না।”

“তা’ কি হয় বাবা?”

“কেন হ’বে না? তোমার শরীর ভাল নয়; তবু তোমাকে বেরুতেই হ’বে?”

স্থাধাকর বলিল, “আজা, আমি বস সকাল-সকাল পানি, কিয় আসব। তুই অত ভয় পাচ্ছিল কেন?”

“তোমার চোখের ভাব দেখে মনে হচ্চে, অস্থর এখনও রয়েছে। মুখের চোখাটা এখন হয়েছে—যেন কত দিনের যোগীর।”

“মুখ ফুটছিল?”

“হাঁ।”

“তবে নীচে চল—চা খা’বি।”—বলিয়া স্থাধাকর ডাকিল, “মা’দ!”

কণার কোনল কণ্ডে উত্তর আসিল, “বাই বাছ।”

স্থাধাকর নিম্নতলে আপনায় বসিবার ঘরে গমন করিল। তৃত্য চাঁর সরঞ্জাম লইয়া আসিল। কণা আসিল, স্থাধাকর আসিল।

চা পান করিতে করিতে স্থাধাকর বাব বাব পিতাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল—তাহার মুখ-চোখে সে অস্থকের লক্ষণ দেখিতে লাগিল। তাহার সেই লক্ষ্য করতা স্থাধাকরের দৃষ্টি অভিক্রম করিল না।

সেদিন আকস্মে ঘাইবার সময় স্থাধাকর অকণাকে বলিয়া গেল, “বাবার অস্থর নায়ে নি। তুমি দেখো, আজ দুপুর বেলা যেন একটু সুখান—নইলে আবার বাড়বে।”

[৭]

স্বধাক্ষরের অস্থল যে সাতো নাই, তাহা অক্ষর্য তাহার আধারেই বৃষ্টিল। স্বধাক্ষর নামমাত্র—যেন নিষ্কলঙ্কান কল্প আধারে বসিল, খাখার লইয়া নাড়াচাড়া করিল, বাছ চড়াইয়া ডিম কপাকে মিহা বাছ লয়াইয়া রাখিল, ইত্যাদি।

অক্ষর্য বলিল, “বাবা, কাল প্রান্তরে কিছু খান দি, আরও কিছু খেলেন না?”

স্বধাক্ষর বলিল, “খেতে পারছি না, মা! খুশা নেই।”

“নাখাখা কি বেড়েছে?”

স্বধাক্ষর ভিজাসার লমল উত্তর না মিহা বলিল, “যেমন বহু—সকালের পর একটু বাড়ি।”

অক্ষর্য বলিল, “আজ আর আগনি কপাকে গর লগাবেন না। ওকে আগনার গবে দেও যেন না—কোথল বকাই। আগনি আজ ঘুমায়েন।”

গাঢ় ভি হলেন, তিমির আগ্রহে কথা স্বধাক্ষরের মুখে বধিক চাটিল। স্বধাক্ষর যখন বলিল, “না মা, ও’ত’ আমাকে ঘোটে বকাই না, আমিই বকি”—তখন সে মা’র ধিক চাটিল। তাহার দৃষ্টিতে যেন বিকস্পর্শ; ভাবটা—বেশিলে ত? গাঢ় কি বলিলে তুলিলে ত?

অক্ষর্য বলিল, “আজ আর গর বলে কান নাই।”

স্বধাক্ষর বলিল, “না, আর কতদিনই বা আমি গর লব?”

স্বধাক্ষরের কথার ধরে একটা যেন কেমন অবাচ্যবিক আর্জতার ভাব।

স্বধাক্ষর বৃষ্টিল অক্ষর্যর এই আগ্রহ হৃদয়ের প্রতিফলিত আগ্রহ। হৃদয় তাহার জ্ঞানোদয় হইতেই পিতাকে যথো ন্যো এই যোগ্যভোগ করিতে দেখিয়া আদিয়াছে—কিন্তু সে যেন করে নাই, এ যোগ যখন “চারিকাল” আছে তখন ইহার কল্প কাহারও বাত হইবার প্রয়োজন নাই—বাত হইলে বাতস্তা কেবল অপব্যাহিত হইবে। সে যেন করে নাই, ধামা-ধিপের বহু যেনেকটা অঙ্গণর হইয়াছে, তাহাধিপের ওল দোণ-ভঙ্গমা অকারণ বাহুলা বাতীত আর কিছুই নহে।

নামমাত্র তাহার খেব করিয়া স্বধাক্ষর আগনার ঘরে গেল। কথ নিমিত্ত কাটীয়া যাঁইতে কথা আদিল না দেখিয়া সে বৃষ্টিল, অক্ষর্য তাঁমকে আদিত দেখ নাই। এট বেহেটের

সংলগ্ন অংশের নানা কথা তাহার নিকট এত মিষ্ট বোধ হয় যে, তাহা না তুলিলে যেন গু, দিনটা কৃপা দেয়। প্রভাতে উদ্ভিগা যে বিহবের কাকলী তবিত পায় না, সে হুর্জাণা! সে ডাকিল—“লীছ!”

উত্তর আসিল, “বাই বাত!”—স্বধাক্ষর তুলিতে পাইল, কথা বলিতেছে, “মা, তবতে পাছ না, বাত ডাকছেন?” বাতভাষা জল যেমন ছুটিয়া আসে, কথা তখনই ছুটিয়া তাহার কাছে আসিল।

স্বধাক্ষর একপানো আগ্রাস-কোনায়া অর্জগণন অঃস্থার ছিল—এক পার্শ্ব কণার ওল চেয়ার ছিল। কথা আদিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া বলিল, “আজ বাত, একটা কথা আছে।”

কথা এমন গল্পার ভাবে এট কথা বলিল যে, স্বধাক্ষরের গামি আসিল। সে গাঙ্গুয়ের ভাব কবিতা বলিল, “কি কথা?”

“তুমি আজ ঘুমাও?”

“কেন?”

“বাবা বাবার মনর যেনে যেতেন, নইলে অস্থল বাড়বে।”

“তোমাকে বলে গেছেন?”

“না—আমাকে না।”

“ওবে কাকে?”

“কেন, থাকে। জানলে, বাত, বাবা তোমার কথা মা’কে বলেন। দিবাকে বলেন না কেন, বাত?”

ছেলেদেরা লমল-লমল যে সব প্রশ্ন করে, সে সকলের উত্তর দিতে বিব্রত হইতে হয়। উত্তর দিতে স্বধাক্ষরকে একটু ভাবিতে হইল। তাহার পর সে বলিল, “বাবা ছেলেনাহন—তাই তব গান। দিবা জানেন, বুড়ার ঘরে না।”

“ঘরে না?”

“আজ মরলে প্রশ্ন হয় না।”

এই লমল অক্ষর্য স্বধাক্ষরের গবে প্রবেশ করিল। সে কপাকে বলিল, “এই না বলে এলি, বাবাকে বকানি না?”

কথা বৃষ্টিল, সে তাহার প্রতিজ্ঞাটী রক্ষা করিতে পারে নাই। সে বলিল, “আমি বাড়কে ঘুমাতে বসেছি।”

স্বধাক্ষর বলিল, “আমি মাঝে মিছি, ও তাই বলেছে।”

অক্ষর্য হামিয়া বলিল, “ও যখন পণ্ডিত, কিন্তু আচরণে কৃত।”

স্বধাকর কণকে আদর করিয়া বলিল, “ভুলে, হাত, না বওঁছেন।”

অরুণা বলিল, “আপনি আত্ম ভুয়োম বাবা।”

“যুব বে আসে না মা! আমার বাবার কড়া শাসন ছিল, ছেলেরা দিবে কুমোতে পাবে না; সেই থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে।”

“আজ্ঞা, আপনি একটু শুন; আমি পায়ে হাত বলিবে দিই; আর কণা চুপ করে থাকুক—বেশবেশ, যুব আসবে।”

“তাইটি কোথায়?”

“হাত কাছে”—বলিয়া অরুণা আবার বলিল, “আপনি একটু কুমোবার চেষ্টা করুন।”

অপত্তা স্বধাকর উত্তীর্ণা পিতা শরণ পরম করিল—একখানা পাথের কাপড় টানিয়া শটয়া পায় দিল। অরুণা তাহার পায় কাছে বসিয়া পাবে হাত বুলাইয়া নিতে লাগিল; আর কণা তাহার মাথার কাছে বসিয়া মাথার পাকাতুলের সন্ধান করিতে লাগিল।

প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল আটটি ঘেল। তখনও দুগন্ধবের নিস্তাকর্ণ হইল না। সে অরুণাকে বলিল, “মা, ববগের কণকণানা বাও ত।”

এই সময় টেলিফোনেশ ঘটা বাজিয়া উঠিল। অরুণা দ্বিতীয় টেলিফোনেশ বলিল—কে কি বলিতেছিল বৃত্তিতে পানিল না। তখন স্বধাকর দ্বিতীয় বলিল—এক মাড়োয়ারী বোম্বির যাকী হইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বোম্বি নীত বনখানি কটি খাইয়াছে, আরও খাইতে চাহিতেছে, দিবে কিনা। “আউট মাং দেও” বলিয়া টেলিফোন হাড়িয়া আসিয়া স্বধাকর চানিতে চানিতে ব্যাপারটা অরুণাকে বলিল, তাহার পর আর কিব্বা শব্দ আর পেল না—আগুন-কেন্দ্রার বসিয়া পড়িল।

বিশ্রামলাভ তাহার কাগো ছিল না—বিশ্রামলাভের ক্ষণ সে ব্যস্ত ছিল না। সে কেবল ভাবিবার অবসর সন্ধান করিতেছিল। সে দ্বির করিয়াছিল, অনেক শক্তিতে সে বেহের রোশনয়া প্রকাশ হইতে দিবে না—স্বধাকরও তাহা কামিত দিবে না।

অরুণা বলিল, “বাবা, বোটাই কুমোমেন না?”

স্বধাকর হাসিয়া বলিল, “কেনন করে কুমোই বন? হাত

বনখানি কটি বোম্বির পেটে পড়ছে। কেনন কটি তা’ত জান না—বেশ শ্রুণনি চক্র।”

কণা বলিল, “বাবা এলে আমি বলে দেব, তুমি খুজোও নি।”

ক্লিমন তীতিতাব বোম্বিয়ার স্বধাকর বলিল, “এই বৃত্তি তুমি নাগকে ভালবাস?”

“কেন?”

“বাবা যদি মানেন?”

“বাবা কি কখনো মানেন?”

“না”—বলিয়া স্বধাকর অরুণাকে বলিল, “আমি বত বুড়া

হজি স্বধার তত আমার বাবার নত আমার অতিভাবক হয়ে উঠেছে। প্রভেদ এই যে, আমার বাবার শাসন ছিল কর্তার কঠোরতার পূর্ব, আর এ বাবার শাসন—বেহের শাসন।”

শেষ কথা কয়টা বলিবার সময় স্বধাকরের কণ্ঠস্বর এমনই দৃঢ় হইয়া আসিল যে, তাহা অরুণা লক্ষ্য করিল। স্বধাকর আপনিকও তাহা বুঝিল। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিল—এত দিন বাহা মনে করে নাট, এখন তাহা মনে করিবার সময় হইয়াছে; সে বুদ্ধ হইয়াছে, আর তাহার মনের উপর এমন অধিকার নাই যে, সে ছব্বের ভাব গোপন রাখিতে পারে। এই অল্পবৃত্তি তাহাকে চিনিত করিল। মনের উপর কর্তৃত্ব এখন ক্ষুণ্ণ হয়, তখন বাহুব আর সর্বভোভাবে আপনাকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে না। সে পিতার বেহ কোন দিন অল্পভব করে নাট, কিন্তু এক দিনের ক্ষণও পিতার ব্যবহারে বিরক্তি এমন কি বিষমও প্রকাশিত হইতে দেখে নাই। বিবাহের কয় বৎসর পর হইতেই করুণাময়ীর ব্যবহার তাহার তুচ্ছ করিতে বিরত হইয়াছে; কিন্তু সে স্ত্রীর প্রতি তাহার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সে কেবল মনের উপর কর্তৃত্ব যেহু। আজ সে সেই কর্তৃত্ব হারাইতেছে। যে পিতার বেহ পায় নাই ও বাতার বেহ অল্পভব করিবার সুযোগ লাভ করে নাট, পত্নীর ব্যবহার তাহার ছব্ব শ্রীতিতে পূর্ব করে নাই—যদি লোক স্বাভাবিক প্রাণ্য বলিয়া বিবেচনা করে, যে তাহা পায় নাই, আজ পুস্তক, পুস্তক ও পৌত্রীর ভালবাসা তাহাকে অতিক্রম করিয়া দিয়াছে! যে নবীতে কোন দিনই বেহের প্রার্থনা ছিল না, সঙ্গা তাহাতে বতার বারি প্রবেশ করিয়াছে।

অন্য বলিল, “না, আর পোনে না ?”

বাড়ীর দিকে চাহিয়া মুখ্যকর বলিল, “না না, আর সব
নাই—তিনটা থাকে।”

অন্য আর কি বলিলে ? কথা কিছু চূণ করিয়া থাকিল
না ; সে বলিল, “তোমাকে এখ কতক পাবে—নিশা।”

মুখ্যকর ভিজা গা তুলিল, “কেন ?”

“ভাটটির মত তোমাকে চাপা দিবে—চাপড়ে ঘুণ পাড়ালে,
হবে ঠিক চর। চোখ না বুজলে ‘সে’তো কখন’ বলে ভয়
দেখাতে চর, ‘কালো নিমিক’ ডাকতে চর।”

অন্যার ঘুণ চাপিতে ভনিয়া উঠিল—বাত্তভাবের দ্বিত্ততা
দেবীভাবপূর্ণ সেট মুখে সে হাসি বসন্তের প্রভাতে অফলস্রাবের
মত মধুর—বাফালাব বীজী প্রতিমা পতিত করিলে প্রতিমার
মুখে এট মধুর হাসিটি বিতে ভাবে। সে যেখন অন্ধার চারি
দিকের পতঙ্গাঘাতি চাইতে, তাগাব রত্নাব আদর্শ আহরণ করে,
তেনমত বৃষ্টি বাফালাব বাব ঘুণ চাইতে সেট চাপিটির আদর্শ
প্রাপ্ত করে।

মুখ্যকর হাসিয়া উঠিল, তাগাব ভিজানোখাকার মনেও
আনন্দে আলোক বিকাশ হইল। সে বলিল, “যাও চল—
আজ তোমাকে একটা কালো বিনি পুতুল কিনে’দেব।”

কণার চকুতে আনন্দলগ্নি বেধা গেল। বাচকে ভাগ-
নাসা বাব, সেট শিশুর মুখ এট আনন্দলগ্নি যেনইলেন কাছে
অনুগা পুত্ৰবাব।

পড়িতে তিনটা থাকিল। শব্দের কাগজখানা লইয়া
মুখ্যকর নিরতলে বসিবার ঘরে চলিয়া গেল—বাটাব সমস্ত
কণাকে বলিয়া গেল, “নাচ, চাইটার সব বেরতে হবে।”

[৮]

ঘরের বল মত সবলই কেন হউক না, ঘেহের উপর
তাগাব প্রভাতের একটা সীমা আছে। সাধারণ মানুষ
কখনোই সে সীমা অতিক্রম করিতে পারে না ; বহায়া জলেব
সেগ যেমনই কেন হউক না, সে হুকোকে ভাগাইয়া লইয়া
যাইতে পারিলেও পর্য্যন্তকে স্থানমত করিতে পারে না। শব্দ
চিকিৎসক মুখ্যকর যে তাগা বুঝিত না, এমন মনে করিবার
কোন কারণ নাই। শুধু সে যে স্থির ক্ষর করিয়াছিল,
সেই অসাদাশমন করিবে, তাগা রহত নহে—সে ইজা

করিয়াই হুল জাঁকিয়া খসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল,
কিছুতেই স্থায়ীকর তাগাব অস্ত চিত্তিত চাইতে মিলে না।
তাগাব এট অসাদাশমন-চেষ্টার অন্ততানী কল কি, তাগাও
সে বুঝিত। কিন্তু সে বতই ভাবিতছিল, ততই তাগাব মনে
চইতেছিল, সে সংসারে জন্মমত হইয়া আছে—সংসারে
তাগাব আব কোন প্রয়োজন নাই ; আব তাগাব উপর
অধকে লইয়া স্থায়ীকর কেন শক্তি নাই। তবে সে কি
করিলে ? সে কোনো দিকে অগ্রসর চইতেছিল, তাগা সে
যেন বুঝিত ও বুঝিতে পারিতছিল না—বুঝিলেও আপনাকে
নিবারণ করিবার ক্ষমতা সে দিন দিন হারাষ্টেছিল।
বিশেষত বন্দ একমাস পর্য্যন্তের অস্ত চইতে বড়াইয়া পড়িতে
পাকে, তখন সে কি আপনাব প্রতি বোধ করিতে পাবে ?
ভাক্তাবোতে তাগাব পলাব ভাগই ছিল। কিছুদিন পূর্বে সে
একটি হাসপাতালে শারীরবিজ্ঞার অধ্যাপক ছিল—পলাব
বাড়িয়ার পর তাগাব কৈছাছিল। তাগাব এক বন্ধ
সেট কান করিতেছিলেন ; তিনি অস্থূল হইয়া জালালে
কেউইতে ঘাইলেন শুনিয়া মুখ্যকর বাচিয়া বিনা পারিষ্রমিক
তাগাব কাব লইল—কাব বাড়টল। ভনিয়া স্থাবর আপত্তি
করিলে সে বলিল, “বন্ধবাক্যের পরোক্ষেন লাহায়া না করিলে
কি চলে ?”

কাণেব মাজা যেমন বাড়িয়া গেল, চিন্তাও তেনমত বাড়িয়া
চলিল। ইংবাজিতে একটা কথা আছে—বর্ত্তিভাব ৬’ দিক
মত কথা—অর্থাৎ অতি দ্রুত বিবেচন কথা ; তাগাব তাগাই
চইতে লাগিল। অতিপ্রম ও অর্চিতিয়া উভয়েব কল দেহের
উপর দলিতে লাগিল, দেও বিন দিন পাক্ত চাবাইতে লাগিল।
বিশবিদ্যা যেন লাগিয়াই বসিল, দেহে বস্তি অচাবও অতুত
চইতে লাগিল।

নিঃশীড়া ছাড়িয়া দিলে মুখ্যকরেন সাধারণ বাফা তাগাই
ছিল—তাগাকে কখনো যোগোপ করিতে হয় নাই বসিলেও
বলা যায়। কখনে তাগাব বাফা সবৎ ওড়ানাব লজ্জাবাব
কথা কল্পনাময়ী মনে উচিত হয় নাই। নিঃশীড়া—“ও চার
মুণ্ট আছে”—মনে করিয়াই সে নিশ্চিত ছিল। বিশেষ কিছু
দিন হইতে সে স্থাবর কাগজাব একতর তাগাই করিয়াছিল
—সঙ্গে সঙ্গে স্থাবর বাফোব দিকে লক্ষ্য রাখাও আর ছিল
না। সেট শুধু অফা বসি কখনো তাগাকে বসিত, “বাবাব

শরীরটা ঘোটেই লাগছে না ; বোধ হয় কোন ‘অস্থব রহস্য’—
—হবে কল্যানময়ী বলিও, “আপনি ৩ ডাক্তার ; অস্থব বৃদ্ধে
তাব চিকিৎসা অসম্ভব কহবেন ।” এত কথা বলিয়া সে যে
কেবল অলপাকৈর নিকটবর্তী কহিত, তাই নহে ;
পবন আপনাকেও উত্তরপূত্র করিত ।

কিন্তু অলপা সে কথা শ্রবীয়েক বলিলে শ্রবীয বড় পড়িত
চাইত । সে শিতাব বেছে অত্যন্ত সতর্কচিত্তেই গল্প
আনিবার খোঁজা চিকিত্ত হইতেছিল । সে কথা সে শিতাকে
বলিলে সুখাকব হাসিয়া বলিত, “তুই এখনও ভিজ্জালা করনি
কেন নাছ ? বাঁচাটা কি কম দিন হল ? তুই কি মনে
করিস, তোরা বাবা ভাইদের মোবলীপাদ্রী দ্বিবে রপতে
এলোকে ?”

সে কথাই কিন্ত শ্রবীয দ্বিবে থাকিতে পারিত না । সে
আর সঙ্গে বাবা’র কথা’র আলোচনা একতরপ ত্যাগই করিয়া-
ছিল । সে আর উপযুক্তিমানেন । তবুও সে বড় একবার
আর কাছে শিতাব বাতাবানির কথা পাড়িবার চেষ্টা করিত ;
কিন্তু কল্যানময়ীর বিরুদ্ধে তা’র লক্ষ্য করিয়া আর অগ্রসর
হইল না । তাহার মনের মধ্যে চিকিত্তার বিধর-ভিষ উৎপেদ
তাপে কাটিয়া গেল—সে বিধর শাবকের গংগনবিয়ে কর্মকর্তিত
হইতে লাগিল । তাহার মনে চিত্তার ছায়া দ্বারী হইল—
বহুসর পক্ষ তা’র এতই অস্বাভাবিক যে, সুখাকর লজ্জাই
তা’রা লক্ষ্য করিল ।

সুখাকবের তানবা আরও বাড়িল । কল্যানময়ী প্রাতি
তা’র ভালবাসা অভিমান আচ্ছাদিত হইলেও নির্ভাশিত
হয় নাই । তাই সে কোনদিন কল্যানময়ীকে ঘোঁরী মনে
করিয়া আপনি শাঙ্কিল্য কহিত পারে নাই । সে বৎ
আপনাকেই ঘোঁরী মনে করিতে চাতিত ; মনে করিতে চেষ্টা
করিত, তা’হার ভালবাসার কোথাও এমন অসম্পূর্ণতা ও ক্রটি
আছে যে, তা’রা কল্যানময়ীকে তা’হার এক আপনার বৈশিষ্ট্য
তাপ কহাইতে পারে নাই । সে আপনাকে আপনি বিচ্ছার
দিতে পারিলে কেন চাকলা হইতে কতকটা অব্যাহতি লাভ
করিত ।

শরীরের উপর অভ্যাচার শরীর বীর্ণকাল লক্ষ্য করে না ;
কলে যদি তৈল না পড়ে, কল যদি পবিত্রের রাগা হয়, তবে
তা’রা যেমন একদিন ভাষিয়া পড়ে, বৎসর অভ্যাস হইলে শরীরও

হেমনই ভাষিয়া পড়ে । কল যেমন ভাষিয়া পড়িবার পূর্বে
মধ্যে মধ্যে—সময় সময় নিপড়াইয়া যায়, ঘেহেরও হেমনই
হয় । হৃদাকবের তা’রই চটল । এক দিন কলকে ‘অপা-
পনার কাষ দাখিয়া গুচে ফিরিবার সময় দেহ প্রথম বিপদ-
হুচনা জ্ঞাপন করিল । শিঁড়ি দিয়া দানিয়ার সঙ্গে সঙ্গে
তা’র মাথাটা কেনন ঘুরিয়া গেল—সে পড়িয়া ঝটতেছিল,
শৌভাগ্যক্রমে কখন ছাত্র তা’র সঙ্গেই দানিয়া আনিত-
ছিল—তা’রা তা’রাকে দরিয়া ফেলিল এবং লটখা দিয়া
টেবলের উপর লখন কহাইয়া দিল । সে সময় সেমিকে আব
যে কখন ডাক্তার ছিলেন, লংগন পাঠিয়া, তা’রায় তখায়
আনিলেন এবং তা’রার নাকী’র অবস্থা পরীক্ষা করিয়া ব্যস্ত
হইয়া একটু উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন । অল্প সময়ের
মধ্যেই সুখাকর সামান্যই উঠিল—সে কতকটা বেহের
পুনরাগত পতিবৃত, কতকটা মনের বলে । একজন ডাক্তার
তা’রার সঙ্গে আহার বাড়ী পর্যন্ত বাড়িতে চাইলে সে হাদিয়া
বলিল, “আমাকে বৃষ্টি বড় বকম যোগী করতে চাও ?”

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ এখন হ’ল কেন ?”

সুখাকর উত্তর দিল, “ট্রিক বসতে পারি না ।”

“বোধ হয়, ভাল খুঁষ ঘনি ।”

“তাই হ’তে পারে”—বলিয়া হৃদাকর দিয়া মোটেই
উঠিল ।

হৃদাকর চলিয়া গেলে ডাক্তাররা আপনাবিশেষ মধ্যে
তা’রার কথা’র আলোচনা করিতে লাগিলেন । এক জন
বলিলেন, “নাকী’র অবস্থা বেধে আহার ৩ ভয় হইছিল ।”

আর একজন বলিলেন, “কেন এমন হ’ল বল ত ?”

তৃতীয় ডাক্তার বলিলেন, “ভিতরে কোন বোগ হয়েছে
—ডায়েবটিস কি এলুমিনিয়া একটা কিছু হয়েছে ।”

প্রথম ডাক্তার বলিলেন, “লক্ষ্য বটে । দেখছ না অমন
চোরা ছিল, অল্প দিনের মধ্যেই বেন বৃদ্ধা হয়ে গেছে ।”

“বৃদ্ধা লগাইকেই হতে হ’বে—তুমিও বাব বাবে না ।”

“আর তুমি ?”

ততক্ষণে সুখাকবের মোটর কলেজের পেট ছাড়াইয়া
সাতার পড়িয়াছে, আর সেই পাড়িতে বসিয়া হৃদাকর ভাবি-
তেছে—ট্রেন ছাড়িবার ঘন্টা পড়িয়াছে । কিন্ত কেবল
তা’রই নহে । এখন বহুদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তত

আমাদের ব্যাঙ্গহত্যা

দ্বিতীয় পর্ক •

— প্রিৎপেন্সরুফ বন্সোপাখ্যায়

অল্পলপুর হইতে ভিবিয়ার ভাড়া পড়িয়া গেল।
 যাহের ও চিতাবাহের চামড়া "মাইট" করিতে যিয়া তৎপর-
 বিন বহনা হইব। সকলেই নবাবের খেয়াল হইল পুথান-
 রাসায় গিয়া কাঁচ নাই, যদি বিলাসপূর্ব চট্টা কোম ও পল
 থাকে তবে আটবুদ্ধ পথ নবলাইয়া বাতাই উঠান অচিন্ত্য।
 যোগ্য আদিল, মোটর-সাইড ও একখানি সঙ্গ্রহ হইল, কিন্তু
 সঠিক পল বাতির হইল না। তবে এটা বুঝা গেল, যদি
 বিলাসপূর্ব ও লম্বলপূর্ব চট্টা বাতির হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে
 আমাদের হিংস্রতা চট্টা বাতাইতে হইবে। বেগা চট্টা সমস্ত
 যাত্রা করা গেল, সঙ্গে "অধিকৃত" "পরম অজ্ঞান" এবং ভাণ্ডার
 এক বন্ধ। যিব চট্টা ভাণ্ডারের অধব-কটক বেগাইয়া
 পেত। সোডে হৈনে চাপাটয়া যিয়া আমরা দেখান হইতে
 হস্তস্ব সম্ভব লোভা কলিকাতার পথ দরিব। কিন্তু ভাবা
 উচিত ছিল, এত সহজে অধব-কটকরূপ মহাপ্রতি দর্শনের
 পুণ্যসিকর ও সেই সঙ্গে বাকীর পথেও বহুব্র অল্পল চট্টা
 বাতাই যেন "tempting fate with a vengeance"—
 "বাহুমে পদ" র মত চট্টা পড়ে। রাস্তার মহানদী পার চট-
 লাব, যদিও আরও কুত্র ভাণ্ডার বেশিলেট বুঝা যায়, যহার
 এই নীর প্রকাশ অতি বিশাল হওয়াই সম্ভবপর। ডাক্তার
 মোটর-সাইড লটয়া বিনা আছেন। তাহাতে নাকি
 রাস্তার প্রতি মাইলের অবস্থা অতি বিশদ ও সঠিকভাবে বর্ণিত
 আছে। ডাক্তার শিখন হইতে হাঁকিলেন, "সাবধান, সামনের
 রাস্তা অত্যন্ত ব্যাপক;" পাকীর প্রতি সংজ্ঞা করলাম, মাইলের
 পর মাইল শিখনে পড়িয়া রহিল, কিন্তু রাস্তা ব্যাপক নহে।
 বললাম, "ডাক্তার ব্যাপক রাস্তা কোথায়?" ডাক্তার সাইড
 খানি উঠ করিয়া দিয়া চৌক দিলিয়া বসিলেন, "কিন্তু সাইডে
 দিখিয়াছে, এটাবার ২৭ মাইলের পর পুন ভাল রাস্তা, কোরে
 চপুন।" যেমন পাকীর প্রতি বাড়াইয়াছি, এক "শট বেও"
 পড়িল, পার হইয়াই পাকী যেন হস-কর্ষিত ক্ষেত্রের উপর

বিল চলিতে লাগিল, আবারোই যেন মাথা ও "হেডের সংজ্ঞা"
 বড় আশায্যবাক হইল না, প্রতি সংজ্ঞা করলাম এবং ক্রমশঃ
 পাকী একবারে খামাইতে হইল। সকলেই ডাক্তারকে
 মাথিতে উদ্ভত। মোটর-সাইড ও তত্ত লোকের আত-
 আত ও শণিতীকরণ একসঙ্গে সমাধানের ব্যবস্থা হইতে
 লাগিল। সাইড চাতে লম্বা প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখি
 ১২০৫ সালের সংজ্ঞা, ২০ সংজ্ঞা বন্য ভাল হইয়াছে এবং
 ভাল মন্ত হইয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। অতঃপর
 ডাক্তারের হাতে এক প্রস্তাব না থাকাই ভাল বিবেচনা করিয়া
 প্রাইডখানিক রূপ করিয়া চাপিয়া বসিল। হুড়ে মাথা
 ঠুকিয়া অনেকট ডাক্তারের উপর কান্না হইয়াছিল।
 একটা হাসির পর বলিয়া সকলের বেজাউটা একটু নয়ন
 হইলে পুনরায় অতি সজ্ঞা:র রঙা হওয়া গেল। পরটি
 বহুদিন পূর্বে বিখ্যাত পাক (Ponoh) এর একটি নমুনা হইতে
 সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অপবিত্রিত হেনরী ফোর্ড একজন
 পরোপকারী লোক, তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ, তাহার
 নাম "How to ameliorate the distress of man-
 kind (মানুষের দুঃখ নিবারণের উপায়)।" পাক একখানি
 বাহু-চর ও চৌকা-চিহ্নবোটে তাহার সমালোচনা এইরূপ
 করে:—একখানি মোটরগাড়ী চপিতেছে, সামনে পুন বড়
 করিয়া দেখা "ফোর্ড", আরোহীদের মাথা গিয়া হুড়ে থাকা
 খাঃতেছে এবং সকলে "alar" (সংজ্ঞা দুঃ) বেশিতেছেন;
 উপরে দেখা হেনরী ফোর্ডের বর্তমান মনোভা—মানুষের দুঃখ
 নিবারণের উপায় Henry Ford's latest effusion
 "How to ameliorate the distress of mankind",
 নীচে দেখা সাংস্কা আর একটু আশায্যবাক করিয়া, জুনি
 হেনরী ফোর্ড, মানুষের দুঃখ দূর করিতে পার, "By making
 your springs a bit more comfortable, Henry".
 বাহুপুত্র হইতে ডিক্টারী পথ্য রাস্তা, পাখাঃ ভিখাইয়া,
 কপলের তিতর যিয়া, নানা নদ-নদী অতিক্রম করিয়া

চলিয়াছে। সমসাময়িক দৃষ্ট দর্শিত হইতেছিল, প্রত্যেক যুগ্মে প্রকৃতির নানাবর্ণ বিভিন্ন বস্তু কৃষ্ণিকর লাগিতো ছিল। কোথাও একটু একেবারে ভাব নাই, সমস্ত মনে হইতেছিল আগের “বাক” পূর্বমুখই স্বভাবের আশ্রয় এক নতুন রূপ দেখিবে এবং অধিকাংশ সময়েই হঠাৎ হঠাৎ হইতে নাই। কে বেন গাছিয়া উঠিল, “নর, নরো, গাছ, বন, উপলব্ধি মতিমা তোমার প্রচাবে পো”! মনের ভাবের লক্ষণের এমন সেই হয়ে থাকা, কাজেই পান বড় নিষ্ট লাগিল। একটি নরো, অশেফাকৃত প্রাণের, পান হইতেছি, একজন পান পান কানো-ইয়া গাড়াইল। প্রাণ হইল, “নরোকা নান কেবা”? উত্তরে বলিল “কানাহি”। প্রাণকর্তা বলিলেন, “বলাই কোমার?” লোকটা রক্ত বৃষ্ণ কানো বলা বাব না, কিছু বলিল না। মটিল দুই দিগা আর এক নরো, নান জিজ্ঞাসা করিয়া আশ্রয় হইতে হইল, নরোর নাম “বলাই”। স্থানীয় এক ব্যক্তিকে প্রাণ করা হইল, “কানাই কেবা ব্র?” এবারের পোকটি রক্ত বৃষ্ণ, বলিল, “কানাই বলাই শাশাশাশি চলিয়াছে।” সমস্তাই জাতি, “কানাই বলাইকে” এক ক্রোশের মতোই রানিয়াছে।

একটি পাগড়ের উপর হইতে “জিজ্ঞাসী” দেখা গেল। সমস্তের কোলে প্রায় সমস্তকে বেঁধে করিয়া নর্থনা প্রাণিত। পাগড় হইতে পূর্বদিক পূর্বদিক তাতা নাথিয়াছে এবং পাগড়ের নীচেই আইরিশ-ব্রিড (Irish Bridle)-এ উপর দিগা নরো পান হইয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছে। নরোর স্রোত বড় পানল, তবে জল বৃষ্ণ বৈধ নাই। এখানে নর্থনান বন্ধ প্রস্তাবনাকর্প, নরো প্রাণে বরজ উপলব্ধিও আহত হইয়া এমন একটা মনুষ্য ধনি কামিতেছিল, একটু তুলিলেই আপন চোখ বৃষ্ণা আশ্রিত চাহ; নরোর এই ঘূর্ণ-পাড়ানো পান বিনি একবার তদ্বিষয়ে, তিনি আর কোনে তুলিবেন না।

জিজ্ঞাসী পৌছিয়ায় পূর্ণে নর্থন পড়িল, পাড়ার “ডাইনামো” (dynamo) কাষা করিতেছে না। তদারক করিয়া দেখা গেল ডাইনামো-বেল্ট (dynamo belt) ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বড়ি বাধিয়া ডাইনামো চালাইবার চেষ্টায় অকৃতকাণ্য হইলোম। আশা ছিল, জিজ্ঞাসী পৌছিয়া নিশ্চয় কেউ পাইবে। বেশা ৪০-টার লম্বা জিজ্ঞাসী (কলসপুর হইতে ১০ মাইল) পৌছিলোম।



টপের : সমস্ত-কটক পড়িয়া : উদ্ভাণ ভগ্ননরো চোপা নর্থন।

মন্ত : অবন-১৩৪ : পোপ১৩৪।

নোট :—সমস্ত-কটক পান : নরো বেঁধে করিয়া ছবি ডাইনামো-পন পাগড়ের উপর হইতে।

প্রথম রাত্ৰির প্রথম লগ্না হইল। নানা মূর্খিত্ব নানা মত। কেহ বলে, ‘অমর-কটক মোটিন ঘাইবে না।’ কেহ বলিল, ঘাইতে পারে। কেহ পদ্মীরদ্বারে বৃদ্ধিমানের মত বলিল, ঘাইতেও পারে, না ঘাইতেও পারে। কথায় বুঝা গেল, মোটিন লগ্নি ‘অমর-কটক’ কেহ বায় নাই, অতি বড়ই গো-বকট বাওয়া যায়, “শরৎ-গো-বকট” ঘাইবার নাম নাই, অমর-কটক বিশেষ সুবিধা, দুইয় ডিগ্রীতেও চড়ে মাত্র ৬৩ মাস। বড় শ্রেষ্ঠ ৬৩ বাস চালকের নিকট-একটি পুরাতন লোক সংগ্রহ হইল, তবে তার অবস্থা বেকশ তাহাতে বিশেষ ভাবনা হইল না; উপস্থিত ডাইনামো কাছা করিতেছে, পরে কি হইবে বলা যায় না। “শরৎ-আত্মীয়” ও উত্তর বড় বাস-এ বসিলেন, তাহার কলমপুর কিস্তি, আদায়ের সব পরিত্যাগ, কারণ আমায়ের প্রতিবিধি সম্বন্ধ-অসমস্তান বড়ই অনিশ্চিত; তাহাযের মোদবার আশিষ করিতেই হইবে। চাকুরের তাগো বাহা হয়; সদাই চাকুরীর মাত্র অবসর, কি হয়, কি হয়! ছুটি না লগ্নি অগ্রপ্ৰস্থ হইলে নাকি চাকুরী বাওয়াও আচ্ছা নহে।

এমন সময় একজন বস্ত্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি পথ সম্বন্ধে “ওয়াকিফ হান্।” ২২ মাইল পথান্ত ভাল রাস্তা, ২৭ মাইল পথান্ত উত্তর তান্না আছে, মোটর করে ঘাইবে, পরে পথ তিনি আর জানেন না। বাওয়াই বিস হইল এবং নবাব বসিলেন, যে সব ভূমি এবং অকথা পথ বিস্তার মোটর আদায়ের অসমস্তান বহন করিয়া আনিয়াছে, তাহার অসমস্তান পথ আর হইতে পারে না অতএব “শরৎ-আত্মীয়” ও তার বন্ধুকে সঙ্গে লগ্না হইল। আজ সব নিবারণ, মোদবারের আন্তে নিকট উত্তর কলমপুর কিস্তি, তাহাই হইল, তখন বুঝা যায় নাই, “the pitcher went to the well once too often”, আমায়ের প্রতিও অসমস্তান হইতে পারে। সবলে অমর-কটকের রাস্তা ধরিলাম। ২২ মাইল পথান্ত রাস্তা বেশ ভালই, সেখানে একটি ছোট ডাকবাংলো পাওয়া গেল। রাস্তার উপর এক কটকলক, তাহাতে বড় বড় করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে “Road not motorable ahead”, সমানে মোটর চলার পথ নাই। সে কথা কে শোনে? সোজা চলিলাম।

বেবেটটি জিহ্বাশীত সংগ্রহ হইয়াছিল এই সময়ে তাহাও বেচ রক্ষা করিল। এমন ভরসাও মনে এত যে, বাটাগিতে চান্দ আছে। বেট পুনরায় কতকটা গিয়া পাওয়া ঘাইবে এবং বাটাগি হস্তস্থান পাড়া চলিয়াই লগ্নি ঘাইতে পারিবে কি না এবং না পারিলে যে কি অবস্থা হইবে, অমর-কটক মর্শনেব আশাও তখন এতই নিভার যে, সে সব চিন্তা মনে স্থান পাইল না, সামনের অসমস্তান বন্ধ পথ দখল হইতে সন্তুষ্ট অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তখন পথ বিশেষ পরিণত হইল। উত্তর পাশে ঘালের মস্তুর, বস্তুর দৃষ্টি দায়, চতুর্দিকে উঁচু ঘাল, নাকে অতি সজ পথ, হানে হানে বাস আশিষ দেউড়িও চাকিয়া দিয়াছে। বাবে বা ডাইনে একটু মরিয়া গিয়া যে রাস্তার সম্বন্ধে (নিষ্-পথ-পাড়াই চাকার বাস) কাকি দিব, তাহাও উপায় নাই। এইরূপে কিছুকাল অগ্রসর হইবার পর রাস্তার অবস্থা আরও সাংঘাতিক হইল। যেখানেই রাস্তা দাঁড়াইয়াছে, ঐ সর্বত্র পথের উত্তর পাশে জলের প্রবাহে কাকিয়া গিয়া পড়ার দৃষ্ট হইয়াছে, “চরণ” যদি এক টাকি এমিক বা ওমিক বায় তবে আর রক্ষা নাই, পাড়াইতে অন্ততঃ ২০ মিনিটে পড়িতে হইবে। তবুও আমায় মোদাভাবনা, অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অমর-কটকবস্ত্রী আমায়ের যে কি ভোর আবেশ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না; এমন যে সব সন্দেহের কথা মনে হইলে জ্বরের স্পন্দন দুই চারিবার বামিয়া যায়।

একদল তীর্থযাত্রীর সহিত দেখা হইল। সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাড়া বাবাইলান। তাহার কাঁচি হইতে পথান্তে অমর-কটক মর্শনে আশিষাছিল এমন “শামস” (সি-সি) ঘাইতেছে। পথের সংবাদ জানিতে চাহিলাম। একটু আচ্ছা হইয়া আমায় বুকের পানে চাহিয়া বলিল “বাক্তিক মর্শনকে বাড়িতে” উত্তরে যখন জানিল সেইতাই বাসনা, তখন সে বলিয়া কেলিল, “দেবীমাকে মর্শনে দিল ততপূর হো পয়া, রাস্তাও বিজ্ঞান তো নেহি কিয়া?” ৩৪ মাইল পথ চলিয়া আশিষাছে, কিন্তু তার অন্তর বাহির বৈদ্যসর্শনের আশে-এতই উত্তর যে, ভাল রাস্তার আসিল কি পথ বন্ধ হইয়া লক্ষ্য করিবার অবসরও হয় নাই। পথ ভক্তি, পথ বিজ্ঞান। এইরূপ ভ্রমভ্রম আছে বসিয়াই প্রত্যয়, সুস্থ বা মাক্শুতিতে থেবী অভ্যাস করেন;

শিক্ষার্থী গণিত আরম্ভ করত নীচে কত পিছনে পড়িত।
আছে।

কালে শাখাটি যে সব বস বিহা আচ্ছাদিত ছিল, নতুন
কালে বেগমত না হওয়ায় কালের প্রবাহে সব দুইটা গিয়া

নন্দরা পায় হঠাৎ। মোত অত্যন্ত প্রবল; পূর্ণ না
তুল্য কিছুই বাক্যটি নাই। নবীদর্শ প্রত্যক্ষণ হওয়ায় পাব
হইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। এতদ্বারা পথে মাঝে মাঝে কলা
এবং কর্ম্ম আরম্ভ হইল। এক এক স্থানে এত বাড়তি
যে, পাড়ীর রেডিওর আকাশের সচিত সমান্তরাল চটয়া
পড়িতেছে, তত্বে চলিয়াছে। এজন্য প্রবল চটয়া পড়িতেছে,
পাখা অচল, এজন্য ঠাণ্ডা হইতেছে না। আলো আলোতে
হইল। বাটারিও চার্জিং উপর আরও দোহন আরম্ভ
হইল, নতুন উপায় নাই।



একটি ছোট গাম পাইলাম। বহু অল্পকালের ফলে
জানি গেল কবীর-চরুয়া সেখানে হইতে ১২ মাইল, সেখানে
ডাকবাংলো আছে; কবীর-চরুয়া হইতে আমরা কটক
অতি নিকটে, গো-সকট গিয়া থাকে, মোটর পেত্র। হইতে
কষ্টে আসে, এমিক বিহা প্রাইই মোটর গাইতে দেখা যায় না।
আমরা পাইতে হইলে কবীর-চরুয়া গাইতে হইবে। আগে
গাভা পাঠাডের নীচে অত্যন্ত কর্ম্মময় এবং আমরা কটক
পাঠাডে উঠিবার রাস্তা বড়ই প্রদীপ এবং অত্যন্ত বায়ুচীতি-
সম্পূর্ণ। সংবাদ সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হইলাম; সকলেই
কিছু কিছু পড়িতেছিল, কেবল ডাক্তারের আগ্রহ সমভাবে এবং
তিনিই নানাতর উৎসাহ দিয়া অগ্রসর হইতে গোয়ালাতি
করিয়াছিলেন। পাঠাডের পাথরবেল পড়িবার অল্পে প্রবেশ
করিলাম। এট প্রথম দি-পিতে আলোর বস দেখিলাম।
কি পড়িবার অঙ্গ, হটটি পাঠাডের মধ্য বিহা অতি অল্প পরি-
লব; মাঝে মাঝে পথ আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। পাড়ীর
আলোও ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, অতি সম্ভবঃ
অগ্রসর হইতে লাগিলাম, যেহেতু অগ্রসর হওয়া চাহা উপায়
নাই, কবীর-চরুয়া না পৌঁছিলে আমরা মিলিবে না। একটি
ছোট নদী পার হইলাম, তাহাও পরই ওত্থ পক্ষ পাড়ী
প্রাপ্ত। প্রায় মাধ্যমী দ্বিতীয়া কবীর পন গাড়ী
উদ্ধার হইল খটে, কিন্তু এজন্য প্রত্যক্ষণ হইলো, বাটারিও
নিস্তেজ, গাড়ী আর টানিতে পারে না। উপরন্তু পাড়া চড়াই
উঠিতে হইতেছে। বাবে পাড়াই মোতা উঠিয়াছে এবং
ডাইনে পড়িবার বাম, গাভা ত্রিক পাড়ীর নতুন প্রস্তু এবং



উপর :- অমর-চরুয়া পন :- 'অমর-চরুয়া পন'।

কথা :- অমর-পন।

নীচে :- লক্ষ্মী উপর পন :- বা অমর) দেখ।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রত্যক্ষণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তাহাও উপর
বিহাই কোনও ক্রমে গাড়ী অগ্রসর হইতেছে। আগের
অবস্থা ক্রমেই ক্ষীণতর হইতেছিল, তত্বে চলিয়াছে; লোককে

“ভূতে গাও”, আমাদের অমর-কণ্ঠকে পাইগাছিল। এমন সময় সন্মানে পড়িল এক কাঠি নোকাটি গো-শকট, একবারে বাত্মা ছুঁড়া নিশ্চিত চিন্তে মজাবমান। গোড়োমান গাড়ী ঘোড়াই করিয়া ওলল হইতে কাঠি লইয়া বাইরেছিল, সন্ধ্যা-সন্ধ্যায় বেথিয়া গরু পুণিয়া সইয়া বাবেয় হইবে গ্রামে পলাইয়াছে, গাড়ী যে বাত্মা বন্ধ করিয়া গিয়া, তাহাতে অকারণ নাই। সেখানে পুণিয়া নাই এবং বাত্মা আটকের এক চাপান বাইরে হই নাই, পদব্রজে মাল্লম এবং গো-শকট চাড়া অরুণ-বাহন হলে না; আনন্ডা কিন্তু দেই গাড়ী বাবে এটো আশ্চর্য আটক পড়িয়া গিয়াছিল। অনেক হৈমোর্থিক কথিয়া গো-শকটপাশেই বহুটুকু মস্তব পায় কাটাওয়া গাওয়া যেটো কোনও রূপে বাহিন কথিয়ার চেহারা এক পাশের চাড়া আটকওয়া তারক-বন্ধ মনোজ্ঞবিশ কতঃ অভিন দেয় রঙ্গ। কথিল, শত চোঁদা দেবেয় আসি গাড়া দিল না। বাটাগিতে যে চাড়া আছে তাহাতে গাড়ী চালু করিতে পারিল না; এতক্ষণে বুঝলাম, হাঃ! বিশ্ব গাড়ী তরফে কথায় দিল। বহু চোঁদকার কথিয়া গয়া কথিয়া গেল, তৎপরাণ সাড়া নাই। ডাক্তার ইচ্ছায় সকল উর্জ ও বন্ধু আঁচি লইয়া আগ্রয়ের আশায় “পরদল” অগ্রসর হইলেন, আমি ও নবাবু গাড়ীতে বসিয়া বহিনাম। আমাদের আনন্ডমত কথী-চলুয়া সেখানে হইতে দেড় বাইলের মধ্যে। চুল কথিয়া গাড়ীতে বসিয়া বিনাইতেছি, মাকে মাকে পাগাড়েয় উপর হইতে বাঘের ডাক কানে আসিতেছিল এবং আশেপাশে বাঘের চোঁদকারও শুনিতেছিল। পটা রুবেক শেষ হইবে বর্জ্য আগুও শুনিতে পাইলাম, আগুও কখনঃ আনন্ডের বিকেই আসিতেছে। বহু আশা হইল। কিছুক্ষণ শেষে আনন্ডের মুক্তিলাভেরা দিগিয়া আসিলেন, আমাদের ডাক্তার দ্বিতীয় বহিনাম জুগো হইয়া থান তাড়াইবার জন্য একটু দৈবের বগ বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন। বহিনাম জাহায়া অনবরত চলিয়া অস্তিত্ব তিন মাইল পথ থিয়াছেন কিন্তু পাগড় ও তরঙ্গ ছাড়া কোনরূপে আশ্রয়ে সকল পাওয়া যায় নাই, কথী-চলুয়া বা তাহার আশ্রয়ের দিল পর্যন্ত বিনুশ। পথে বিস্টাকার একটি প্রস্তর মেলিয়া বাঘ-ব্রজে সকলে অত্যন্ত ভয় পান এবং ডাক্তারের চোঁদকার এবং লাফা-লাফির বহু বেথিয়া সকলে দিগিয়া আসিতে থায়া হইয়াছেন।

বিস্ফাষ ছাড়া গোণী আনন্ড গাড়ীর মধ্যে নিশা-বাগনের বাসনা করিলাম।

সামনে আমি ও নবাবু এবং শিঙ্কনে আর চারিজন। নবাবু আশ্রয়ে আসিতে বহিলেন, “একটা বড় মনোবাহার সামনে পার হইয়া থেগ।” আশ্রয়ে বহিলেন, ডাক্তারের ভয় পাওয়ার ভয়ে কিন্তু ডাক্তার আনন্ডপক্ষে প্রবর্তী নিশ্চয় কথিয়া থোর হইবে নানিকরণধনে বাস্তুত। পূজীর বন, আলোম্বকতারের মেলা, হইবে আনন্ড ও মনে হইল কি যেন একটা মনোবাহার চুলপাড়ের গাড়ীর আশেপাশে ঘুরিতেছে; দেহাৎ যাতে আনন্ড না পড়িলে দেইতপ অনবাহার বন্ধু চাপান নিশাপম নহে, কাঁব লক্ষ্যে উপর আলোকাভার। চুলচাপ বহিনাম মজুতভাবে পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া পড়ি নাই। অবশ্য কালী, রূপা, তাগা, কাঠিক, গণেশ প্রভৃতি রক্ষাকরী ও কথীবেয় নাম করিতে থায়া নাই, সকল সংগেই তাগা কং। বাইতে পারবে। তাহাটো কং। বাইতেছিল, এমন সময়ে হাঁট-নাউ করিয়া শিঙ্কনে ডাক্তার চোঁদাইয়া উঠিল, তজ্জাতিত কর্তে বহিল, “বাঘা বগ বেগেছি।” বগ নহে, কঠোর মজা, বাঘ বগ চাও তরফে বহিনাম পুঙ্খ আনন্ডান করিতেছে। “কেউ গুলি চালিও না” কঠোর বহে আবেশ দিয়া বন্ধু চালিয়া বহিনাম কাঁকা গেল, নেহাৎ প্রাজীতে লাফাইয়া না পড়িলে অরু-বাহার মৃগতার পরিচায়ক হইবে। বাঘ মজু ন, গাড়ীও কথী আলো আনিলাম; বাঘ মোচায়ে পথিয়া বাত্মার পড়া-ইয়া পড়িল, কিন্তু অত্যাগ বাইবে কোথায়? মাকে মাকে শুকনোখায়া হই লেচন সমানেই করিতেছে। পরদল কথিয়া খোঁদেয় হর্ষ, ডাক্তারের “টিনের মণ-বাগ”, মনবেত চোঁদকার ইচ্ছাবি উজ্জ এবং বিকট শব্দ আনন্ড হইতেই সত্ত্ব থায়া “হাঁহু” কথিয়া ডাক ছাড়িয়া আবেশ মাকে লাফ দিয়া পলাইল এবং মখে মখে প্রাজীবে চারিবিদ হইতে আশ্রয় হই চারিটি বাঘ চোঁদকার করিতে করিতে ঘেঁড় দিল। যেন গুলি দিয়া বাঘের মল বহিনাম গেল, তাহাযের সহিত বহু বহিনাম পরিচয় করিতে আসিলাম, এমনই অচতুরভাবে আনন্ডেয় তাড়াইলো। আনন্ডা কিন্তু তাহাযের তিরোধানই হইক ছাড়িয়া বাচিলাম। ব্যাঘের ডাক দুই হইতে দুইজনে চলিয়া গেল, বুঝিলাম নামওপ থিয়া করি নাই, এ দায়া ছাড়া কাটিল।

তাহা কি ভাবে কাটিল তাহা বোধ হয় বুঝিতে চেষ্টা না ; বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গি আছে, বৃত্তিরা লইছেন । পরে তিনসামে গেল । হঠাৎ আদিবার কালে মার করে কদিন পূর্বে “সবুজা”



অমর-কটকের পথে : আমরী নদ ।

এইরূপে যথেষ্ট ঘেরিয়া-কেনা মোটর চটতে চটটি বায় নদ কবেম এবং এট “হে-আইনী” কাঁধের ওপর বন-বিভাগের কর্তৃপক্ষ হুগুগু কাণ্ড বাখাটাছেন এবং এমনও “আমর সতগরহ” বাখাছেন : আমরা বাঘ বাজিলে আর বকা থাকিত না । নি-পিত বায় প্রাচুর্যের নব্বা এতকণে পাওয়া গেল ।

অতি প্রত্যয়ে সকলে গা কাড়া দিয়া উঠিয়া পড়া গেল । আবেশ দিন অরোগ্য, যাহে আহার এবং নিদ্রা উভয়ই নাষ্ট, তাই উপর হস্ত পবিত্রমে ও মানসিক উত্তেজনার সত্বেই অমর-পোতৌর । হঠাৎনে গোড়া রাত্রা পরিমা অগ্রসর হইলেন সাহায্যে অগ্রসর । হাতল যুগাইয়া গাড়ী চালু করিয়া বৃদ্ধা চোরা কথিয়া সকলে আরও হস্তাণ হইয়া পড়িলেন, এমন সময় হৃদমকে এক “বাহাতি”র আবির্ভাব । তিনি পরিষ্কার জবাব দিলেন, শোক-জন বা সাহায্য নিকটে মিথিলে না । সর্জনিকটর গ্রাম অন্ততঃ ছয় মাইল দূরে । কবীর-চন্দ্রা ১) মাইল, সেখানে ডাকবাঙালো ও ডাহার খানসামা ছাড়া আর কিছুই নাই । “বেগারের” চিরদিনই আমরা বিগোবী, কিন্তু এতদপ ক্ষেত্রে নাচির । প্রথম “বাহাতি”কেই আটক করা গেল, আমরা উদ্ধার না হইলে যে আদিবে কাহারও উদ্ধার নাই । তার পর আশিল পলাতক গরুর গাড়ীর গাড়ওয়ান ডাহার বন্দ মোড়া লইয়া । চালক মার বলবৎ “কাপচারড” । ডাহারই মুখে

মনস বিলিল, গরুর পাশ লাইয়া বস গোক জমলে ডাহারই আশিয়াছিল, বাঘের উপস্থানে “ডেবা” কথিয়া “বঃ পলাতকিত স জীবতি” করিতেছে । পাছাড় অতিক্রম করিয়া, বনকে বল প্রেরণ করিয়া ফেলিলেন । ডাহারা “মারকু” করিতে লাগিল যে, যথেষ্ট শোক না থাকিলে গরুর পাশে বাঘ পড়িলে ; কর্তব্যও কথিয়াই মত অবস্থা আমাদের নাই । যিনি যদি বাঘ গরু ধরে, তবে শোক থাকিলে গাড়ী-রমে যে ডাহারেরই ধরিলে না ডাহারই বা টিক কি ? এট বলিয়া বনকে প্রার্থনা দিয়া সব “পাছাড়” করা গেল । কথিয়া যেন আরও তিন চারিটি গরুর গাড়ীর পাড়ওয়ান মোপাড় হইয়াছে । প্রথম কাক চাইল সকলে নিশিগ্ধ কাঠ-হুদ গরুর গাড়ী রাত্রা হঠাৎ পাছাড়ের গায়ে নামাইয়া দিয়া এক সঙ্গে আটকাইয়া রাখা এবং তারপর পাশের গরুর আশ্রয় হইতে গাড়ীকে উদ্ধার করিয়া বিশেষ হঠাৎ পথে আনা । এক্ষেত্রে horse power অথবা man power অধিক কার্যকরী হইল । কোনও পরিচয় গাড়ীর নূর ফিরাটো চালুর বিকে গাড়ী টেনা আরম্ভ হইল । ডাইনামোতে গাড়ী বাধিয়া লেট হাড়ী চল দিয়া তিওরটা ডাইনামো ঘোমান গেল । অর্ধ ঘণ্টা টেনাটেলি ও নানা বৃদ্ধি ধার ও খরচ করিয়া গাড়ী চালু হইল ও পুনরায় যুগাইয়া কবীর চন্দ্রাবার বিকে মোঃ—অগ্র প্রার্থনা যথিলেও সেগাবিলেও স্বাধোগো পূর্ণস্থান বিধেয়ব পর । সত্যই ১৫



অমর-কটকের পথে : আমরী নদ ।

মাইল পরেই ডাক বাঙালো পাইলেন ; যিনি বলিয়া পাওয়া গেল, তাহে চোরা কথিলে “নির্দিষ্ট” ধরিত । রাত্রা হইতে অর্ধ মাইল দূরে সাহায্যের উপর বাঙালো, কিন্তু কোনও নিশানা

নাট, বাগ চটতে এ কোন চর্চন হানে বাড়লো আছে বুঝা যায়। গায়েব বল বাড়লো ছাড়াইগা চলিয়া গিয়াছিল, এমনই আশ্বাসের সুস্বাদ। অশ্রুভেগা চোখটি ও তরকারির বন্ধাবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকলে শানভার করিয়া দ্রুত চলেলাম; তখনই পুণ্যসঙ্কর-বাসনা ত্যাগ হইল। অমর-কটক বেষ্টিত হইবে। দেখান হইতে আরও উপরে উঠিয়া উঠে মাইল দূর বন্ধি। ন-বাবু বন্ধিগেন, অমর-কটক আশিতে বে গনিমান কটকোপ হইয়াছে তাহাতে কুলাশির সম্পূর্ণ সজ্জাবনা—এখান হইতে কিরিগার আশা বধন আর নাট, তখন আর এক পথার আহার্যদির পর পুণ্যসঙ্কর কোনও যাপা দেখা যায় না; তাড়াতাড়ি কি? আর এক পক্ষ ভোজনব্যবস্থা হইল।

তাকারালো কণীষ-কেন্দ্রের উপর; একটি বৈদ্য বোধান হইয়াছে এবং উঠিয়া গি দিচ্ছি আছে। বানাহুতর নিকট নীচা লইবার ওক কণীষ পালল, কিয় উপায় নাট, অশ্রুত বীক্ষা পাইবার অনিবার্য নহে। তক্তি যদি থাকে তবে চ্যাত্তিক নিয়ম কবে কে? বাবাহুতর ব্যতীতের পথে ভক্ত কণীষ পড়িয়া থাকেন, কণীষ কণীষ ত্রিভুজকেই মনে মনে ওক বলিয়া বধন করিয়াছেন। একদিন পাতে ওকর পর কণীষকে স্পর্শ করিল; পছাচানো সঙ্গাণো “গাম, গাম” বলিয়া বধন-স্পর্শে অধিবাদ ব্যতীত চটল গেল; ওকবুধ চটতে নির্বৃত দেউ বান-বান চটল কণীষের ওকবুধ, দেউ হানে বলিয়া লাদক নিজেব নৃত্তির লব পুঁজিয়া লইলেন। স্বত বধন কণীষ, হোবার লাব্যব কের আর ভাগতে বিধিত আর আশ্বাসের মত বৈশ্বকোষ materialism-বিপ্লবের পান-আহোহো লব্ধে নাপা আপনা হইতেই বত হইয়া গড়িল।

অমর কটক অতি প্রাচীন নানা সৈন্যবীর্য বন্ধিগ আছে। বন্ধিগাশিখা এক উচ্চ গ্রন্থবন হইতে নর্বাতি উৎপত্তি। আশাও বেড় মাইল দূর সেই পাণ্ডু হইতে শোণহস্তের (চিহ্নিত গৌণ নব) উৎপত্তি; চন্দ্রগার ওলম্পতে নবী পাণ্ডু হইতে নীচে নামিয়াছে। অতি সঠিকটে গোবাবীর্য উৎপত্তিহল।

বেলা ১০টার সময় সাতিকতর নবা হইতে হঠাৎ বাস্তব আসিলাম, বধন অমর হইল কাল ৭টার পূর্বে চটকনতে ওকলপুব পৌছাইতেই হইবে। উদ্যোগ এ ব্যাঘ্র আশ্বাসের

মত “বৈজ্ঞানিক” নহেন। গেলো ৭৭৭ পাণ্ডা বাঘ না, এমন সময় একবল বানী পেছ। রোড চটতে আসিলেন। তাঁগাঘের কাছে সঠিক কানা সেল, পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্বে ট্রেন ওকলপুব পৌছান হইবে না, এবং পেছ। হইতে নিশানপুব বাইবার মোটর উপযোগী রাত্রা নাই। প্রাতে ওকলপুব পৌছিতেই হইবে; পাড়ী কিবাটো তৎক্ষণাত ওক-যান চলেলাম; আবার সেই পথ। কিন্তু পাড়ী এগার মানসন্ধ্যা করিল। সন্ধ্যা ডিজোবী পৌছিলাম, মাঝে এক ফানে man power আশ্বাসের উচ্চারণ করে, পাড়ীর horse power উত্তেজিত কর্দনে ঢাকা পুঁজিয়া দিতেছিল। বাবু বাবু করিয়া সকলে দ্রুতগাম। বাবু নাই। এখানে বাবু ইচ্ছামত চলে, সন্ধ্যার বড় পার ধারে না। আরোপী পূর্ব হওয়ায় সব বাবু তিনটার সময় ওকলপুব চলিয়া গিয়াছে। পরদিন ছাড়া উপায় নাই। সকলে অতি করণ দৃষ্টিতে আশার প্রতি চাহিলেন বেন বলিতে চান, ইংলিশ পর Cruelty to Animals-এর আইন তক হইবে, তবুও যদি একবার চেষ্টা করেন। তাহাই চলে। কিন্তু পেট্রোল সংগ্রহ হইল তাক বলিয়াও গণ্যবন নাই। তবে এটাই বলা যায় যে, সঙ্গ ত্রি-প্রত্যাপত বলিয়াই বোধ হয় দেবী করুণা করিলেন। পেট্রোল অতি অগত্যাশিত ভাবে বিলি ও পুনরাবরণ হইল। পরো অতি, অতি কণ চক্রকরণ নত ভরণ, পাড়ীর আলো নাট, পথ ওর্ধ্ব, কণ বাটারির চার্জ কোনওকালে এজিন চালাইয়েছে। তবু চলিলাম এবং সব যথা অতিক্রম করিয়া ৮টার সময় প্রাতে ওকলপুবে পৌছান সেল। সব দিক বজায় হইল। দেবীর সাহায্য নথ কি?

ওকলপুব হইতে অমর-কটক মোটরে বাগা একবারেই বুদ্ধিবানের কাণ্ড নহে, কারণ বিপদ পরে পবে ঘটতে পারে। তবে এই রাত্রাব স্বপ্নানের নথ নৃত্তির সঠিক যে থনি পড়িয়া হয়, তাহা বোধ হয় কীধন বিশদ না করিলে মেলে না। যদি কেহ এই পথে বাইতে ইচ্ছা করেন খুল মোটা টাকার কীধন-বীমা করিয়া বাহির হওয়াই সুক্টিমি। কোম্পানী যদি টাকার হার বাড়াইগা মেন কলের কারণ নাই, অত কোনও hazardous enterprise অপেক্ষা এই ব্যাঘ্র কম বিপদজনক নহে।

সম্প্রদায় পরিচয়

সিদ্ধান্তে তবো বাণিজ্য, ইচ্ছা উত্তীর্ণা বসিল। সে-
হুইচ্ছা টিপিখা অলো জালিখা, চিঠিখানা আস একবার পাঠ
করিল। প্রথমটা তাহার মনে বড় আশা লাগিয়াছিল।
লাগিয়াই কথা। প্রণয়ের সঙ্গে কেউইতে গিয়াছে বলিয়া
বিলম্ব তাহার উপর রাগ করিয়াছে, ইচ্ছা মনে করিতেও তাহার
গুণা ও লক্ষ্য হয়। যেহেতু কি এষ্টে লক্ষ্যিত যে
পুঙ্খের হোঁচলও লব না? নারীরে এত লক্ষ্যিত
তাবিহার কি কারণ তাহার আছে? বিমলের উপর ইচ্ছা
রাগ হইল।

রাগ আধিক্য হইল হইল না, তাহার হাসি পাইল।
পুঙ্খ কত সহজে তুল বুঝিতে পারে! তাহার উপর রাগ
করিয়া বাবু বিশেষ চলিয়া যাউতেছেন! হে! কি রাগ গো!
বাবুই পুঙ্খের লক্ষ্য! ইচ্ছা খুব হাসি পাইতেছিল।
ছেলেবেলা হইতেই বিমলের তাগতি বিদ্ধ বৈশি। এত অল্পে
এত বৈশি রাগ লজ্জার দেখা যায় না। ছেলেবেলায় মার্সেল
বোমার সময় টিপে একটু তুল হইলে, বাবুর অমনি রাগ হইত :
বিলম্ব এখন তাহারের চায়ে উত্তীর্ণা ফুটি উড়িতি, ইচ্ছাকট
বহুতা নিতে হইত : ধরতাহ তুল হইবার কথা নয়, তুল হইতও
না; কিন্তু যদি ফুটি না উড়িত বা কোন কারণে লাগি যায়
পড়িত, বাবুর রাগের শেষ থাকিত না। বিমল এখন ইচ্ছাকে
পড়াইত, মাঝে মাঝে উত্তীর্ণা করিয়া ইচ্ছা অঙ্কের বাতা হারাইত,
টাকালেনদের বই হারাইত, ছুটির অহায়ে পেলিল কাটা না
হওয়ায় টাক্ অসমাপ্ত রাখিত—তাহাতে বিমল এত রাগিত
যে, কখনও কখনও পূর্বা হই বা তিনদিন পর্যন্ত ইচ্ছার সঙ্গে
কথা পর্যন্ত বলিত না। ইচ্ছার আভ্যন্তর মনে আছে, মাস্ট্রিক
পত্রীকার কিছুদিন পূর্বে পত্রীকা দিবে না বলার, বিমল আট-
দিন ইচ্ছার বাড়ীতে পা দেয় নাই। সেই আটদিনে ইচ্ছা
বোশদিদের পড়া, অর্থ করিয়া রাখিয়া, লোক পাঠাইয়া বিমলকে
ডাকিয়া আনাইয়া, তবকাইয়া বিধাছিল। রাগ করিতে বিমল
চিরকাল নিতপুঙ্খ।

বলিয়াই ইচ্ছা রাগ আধিক্য হইল হইল না—বহু
তৎপরিবর্তে যে ভাবটি তাহার মনে আগিল, তাহার বহুনাতেও
দে তাগি অহুতব বহির্ভুক্তি। ইচ্ছা তাগিতেছিল, কাজ-
কন্দের লক্ষ্যে বিশেষে বাগেও চাটিতেছে, বাবু-না, সে ত
ভালই। কলিকাতার বহন কাজ হইল না, তখন বিশেষে
চেষ্টা করাই ত ভাল। সেও করাই ত উচিত। সেদিন
ইচ্ছা একদা অতি লক্ষ্য হইয়াছে মনে পড়িতেছিল, তাহাতে
এইরূপ একটি ঘটনা ছিল :

একটি বড়লোকের ছেলে এক বহুবেশ মেথেকে ভাল-
বাসিত। তাহারা বিবাহ করিতে উচ্চ হইয়াছে, এমন সময়
ছেলের বাপ এত পোশাক কাপড়াদির কথা জানিতে পারিয়া
ছেলের অসুখ, এক দমীর কলার সজিত বিশেষে উচ্চাণ
আজ্ঞাকর করিতেছেন জানিয়া ছেলেটি মেথের নিকট হইতে
বিহার গিয়া আশ্রয় লাগিয়া গেল। সেখানে, সেখানে বসিতে
কাজ করিয়া বহুকলারের মধ্যে অনেক টাকা গোপন করিয়া
দিগিয়া আশ্রয় তাহার প্রিয়তমকে দিলে বাবু করিল,
বিবাহ করিয়া, বহুসংখ্যার পাতিয়া হইল।

গল্পটি কি স্মরণ! বিশেষে, বাবুর কাণ্ডে ছেলেটি বহন
কৃত উচ্চাণ করিতেছে, বহির মাগিকের একটি বহুতা মেথের কত
রকমে কত তাহে ছেলেটির সন্ধানের কত চেষ্টাই না করিয়া-
ছিল; ছেলেটি কিন্তু কিছুতেই টলিল না। একদিন নৈশ-
নাচের আসরভঙ্গে উচ্চাণ বহন বাহুসংখ্যাবহুয়ে ছেলেটিকে
শ্রেম নিবেদন করিল, তখন তাড়াতাড়ি বাহার করিয়া ছেলেটি
তাহার প্রিয়তমের ছবিখানি খুঁজ করিয়া গানি কাটাইয়া দিল।

আর সেই মেথের বাহা ও মা নানান ভাবগার নানা
লোকের সঙ্গে মেথের আশা করাইয়া নিতে লাগিল—
যদি কাহারও সঙ্গে শ্রেম হইয়া, মেথের কাহাকেও বিবাহ করে।
মেথের সকলের সঙ্গে বিশেষ, ভাবও হইল, অনেকের শ্রেম-
ভিক্ষাও তলিল; কিন্তু অল্প অল্প গিতিশৃঙ্খলের মত মেথের
বহু-বিগলিত বহুর আশ্রয় পায়ে চাটিয়া তলিল। বহুসংখ্যের
পর বহুর কাটিল, কত দোত কত বড় হইল, কত বড় বড়।

হইল, পৃথিবীর কত পরিবর্তন হইয়া গেল, যৌবন চলিয়া গেল, অল্প বৃদ্ধি জ্ঞান অক্রমণ হুশিই হইয়া আসিল ! এমন সময়ে অসময়ে বনস্ত বিকাশ হইল। লতাঃ পতাঃ পাতাঃ পাতাঃ ঋতুর খেলা লাগিয়া গেল; পুষ্পতরু ফুলে ভরিয়া উঠিল; নাথে নাথে অগ্নির শুভ্রন উঠিল; শরতের কৃষ্ণকটক অস্তবিত হইল; বিংশের কণ্ঠে কলকিত ধ্বনিও হইল। বনস্ত বাহিত অভ্যর্থনা আসিয়া গোধ-মস্তাবণ করিল।

গরের উপন্যাসটির আশ্রয় মিত। ছেলের বাপ পুত্র বড় লোক—ঐ একদমই ছেলে, বাপের সঙ্গে বগড়া কথিয়া কোন কৃষ্ণমণে চলিয়া গিয়াছে, কোন খবর নাই। বাপ এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, পথ্য হইতে উঠিতেও বড় পাবেন না, এমন সময়ে একদিন সংবাদপত্রে শুভ-বিবাহ-সংবাদ-বস্ত্রে পুত্রের বিবাহের খবর দেখিলেন। দেখিয়া বুঝা কি করিলেন ? — তাঁর সমস্ত বিশ্ব-অস্বের মানসের সঙ্গে পিতৃ-দ্বয়ের অস্বস্তি আশ্রয়িত এক মন্ত লোকটার মধ্যে পুরিয়া বিবাহ-বাস্তবে পাঠাইয়া দিলেন। ঈর্ষার বর্ষাকালক পাত-পাতী উভয়ের শিরে মঙ্গলনর হাতের কল্যায় বাধি ঐটি করি-তেছেন, সেই সময়ে মন্তোর খেবতর আশ্রয়িতও তাড়াতাড়ি হস্তমত হইল। বিবাহশেষে বর-কন্যা বহন শীঘ্র হইতে শোভাযাত্রা করিয়া বাহিরে আসিতেছিল, তখন বরের আশ্রয়িতা অস্তবিন্দু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই দৃষ্টি, পবিত্র, ক্ষুদ্র অস্তবিন্দু উপহার দিয়াই গর-লোক গর শেষ করিয়াছেন।

আমি এই নিম্নোক্ত নিবন্ধে নিম্নে গরমার আভ্যন্তরীণ ইন্দ্র মনের উপর দিয়া খেলা করিয়া গেল। ইন্দ্র মনে হইতেছিল, বিবল আফ্রিকা-বাহার প্রস্তত হইয়া তাহার নিকট বিবাহ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। বিবাহ দিতে ইন্দ্র চোখে জল আসিয়া পড়িতেছে সত্য, ইন্দ্র প্রাথমিক অল্প গোপন করিয়া, হাসি মুখে বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছে। বলিতে চাহিতেছে, হাও, বতহুয়ে ইচ্ছা বত দিনের জন্ত হয়, তুমি হাও; তোমার বনভাসনা সিদ্ধ করিয়া এস। আমি তোমার, চিরদিন তোমারই থাকিব। খবর দিতে ইচ্ছা হয় দিও, খবর লইতে ইচ্ছা হয়, লইও। আমি চিরদিন তোমার! চিরদিন এই জায়গায়, এই ভাবে তোমাকে অত্যাধীন করিয়া লইবার জন্য গাড়াইয়া থাকিব। কথাগুলো শ্রুতি করিয়া বলিতে

পারিতেছে না। বাহ্যিকীয় মেঘের লজ্জা আসিয়া হুঁহাতে গলা চাপিয়া ধরিতেছে, তবুও ইন্দ্র যেন সজল চোখ দিয়া, তাহার বিকম্পিত ললন অঙ্গ বিধা এই কথাগুলো তাহার বিবাহকারী প্রিয়ভগ্নকে বলিয়া দিতেছে।

তাহার ভাবিতে আবেশে তাহার সঙ্গীত অবশ হইয়া আসিল। সেই আবেশের বেন-টুকুকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করিবার জন্য, আলোটি নিবাহিয়া দিয়া, অন্ধকারে সে চন্দ্র সুদীর্ঘ ভূত্যা পড়িল। অন্ধকার আব অন্ধকার রহিল না। অন্ধকার-সমাজ বন্যাদিক অন্ধকারকে সহসা যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, ইন্দ্র মনও আলোকভোটিসমাকর্ষ হইয়া উঠিল। সে যেন সকল অসুখপ্রায় ও ইন্দ্রিয়াদি দিয়া বিমলক উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু একটা কথা কীটাস মত থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতেছিল। গরের মাঠে প্রাণের সঙ্গে গাড়ীতে সেবার সহিত বিবলের বিবেচনাত্মক কথাটা তাহার প্রাণে কীটার মত হুটাইয়াছিল। কেন সে প্রাণের সঙ্গে গিয়াছিল, তাহা জানিলে বিবলের যে তাহার উপর বিরক্তির কোনই কারণ থাকিবে না, বরং তাহার আনন্দই হইবে—মনে মনে ইহা নিশ্চিত জানিলেও এ কথাটা তাঁর মনকে কেবলই অগলও করিয়া তুলিতেছিল যে, মানুষ এত আরে তুল বুকে কেন ?

বিবলের সঙ্গে তাহাকে দেখা করিতেই হইবে, তাহার বিবেচনাত্মক অস্তর: কবেক দিনের জন্ত-বস্ত করিতে হইবে, কিন্তু কি বলিয়া বন্ধ করিবে, ইহাই এখন সমস্ত হইয়া গাড়াই-য়াছে। প্রাণকে দিয়া চাকরির চেষ্টা হইতেছে এ কথা সে এখন কিছুতেই বলিবে না। কাজটি হইলে প্রাণের গাড়ী চড়িয়া গরমকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে সংবাহ দিতে বাইবে, ইহাই আছে ইন্দ্র করনা। কিন্তু এখন যে অবস্থা গাড়াইয়াছে তাহাতে এখনই সেখা না করিলেই নয়। আত্মই এই সুদূর্ভেদ দিয়া বলিয়া আসিতে পারিলেই যেন স্বর্গলাভ হয় যে, তপো আরও কয়েকটা দিন এখানেই থাক। বিবল হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, কেন ? ইন্দ্র কি উত্তর দিবে ? কালের চেষ্টা হইতেছে ইহা বলা হইবে না। সে কথা বলিতে সেলেই প্রাণের কথা, তাহার গাড়ীতে বেকানর কথা, এই বকম অনেক কথা উঠিয়া পড়িতে পারে। তখন বলা হইবে না। তবে কি বলা হইবে ? অকস্মাৎ ইন্দ্র মুখখানি হাতে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিল। কেমন জ্ঞানবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। বলিলেই হইবে, আমার ইচ্ছা, তুমি আরও কয়েকদিন অপেক্ষা কর। বিদল বে রক্ত এক ভয়ে শোক, হৃৎ স্তনান্ন গুরু আগন্তি তুলিলে, তখন আর একটি কথাই ভাবিলে ঠাণ্ডা করিয়া দিলেই হইবে। সেই কথাটি মনে হইবার ইচ্ছা লক্ষ্যে মনে হাসির লহরী-গীতা উঠিত হইল। কিন্তু সে কথাটি কি? বত তব, ততই হাসি আসে। শ্রেয় হাসি আর চাপিতে পারিল না, নিজের মনে বিন্দু বিন্দু করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিদল বখন কেবলই গুরু আগন্তি করিতে থাকিলে, তখন একটু হাসিয়া, একটু পক্ষী হইয়া, একটু কটাক্ষ করিয়া ইচ্ছা বলিলে, আমার লক্ষ্য, তুমি এখনই ঘাইতে পারিবে না। কেমন, আর তোমার বলিবার কিছু আছে?

বিদল নিশ্চয়ই বলিলে, না আর কিছুই বলিবার নাই।

বলিবার আর কি-বা থাকিতে পারে?

বাণী স্নাতটা ভালই কাটিল। সমস্ত বেগের ভিত্তি দিয়া একটা মনে অতিশয় পুলকিত প্রবাহ ছুটাইয়া দিতেছিল। একটর পর একটি করিয়া হৃৎকলিতে কত হৃৎপূর্ণ বৈষ্ণব, নিশ্চয়ের লাগ্নীলনকে কত হৃৎভার্য বৈষ্ণব, তাহার সংখ্যা নাই। চিত্তের গতি বৈষ্ণব কত ক্রম, কত হৃৎ-প্রসারী তাহা বলা যায় না। তাহাতে তাহাতে বিদলের বা, সেই ক্ষুদ্র গৃহ, ক্ষুদ্র সংসারের একটি মনুষ্যের চিত্ত ইচ্ছা চিত্তাক্রমে ছুটয়া উঠিয়া আসিলে আশ্চর্য করিয়া ফেলিল।

আকাশে তখনও তোরের বেগা নাই, নীচনিম্নিত পক্ষী-কলনে তুমিই ইচ্ছা আসে। আলিয়া গড়া বৈষ্ণব, চোর হইতে বৈষ্ণব সৈন্য নাই। ইচ্ছা লগ্না ভাগ করিল। মান-কামরাই চুকিয়া হাতমুখ হইয়া বস্তু পরিবর্তন করিয়া নিঃশব্দ পলকবারে বাতাস কক্ষ প্রবেশ করিয়া আসে আসে কক্ষকে তুলিল। কক্ষকে বাহিরে আনিয়া বলিল, বেড়াতে যাবি? তাহা যাবি?—না, হাত ধোব কোথা?

—যাব দিদি, যাব।

—তবে চট করে হৃৎ পূর্ণ কাগজ ছেড়ে দে, শব্দ করিলে। আস্তে আস্তে নীচে আস, আমি ততক্ষণ গাড়ী বার করাই।

কক্ষা বাহরুমে, ইচ্ছা নীচে চলিয়া গেল। ইচ্ছা কেবলই ভর হইতেছিল, বা না উঠিয়া পড়েন। বা উঠিয়া পড়িলে

বাহির হওয়া মুশিল। বিদ্যা কথা বলিতে পারিবে না, কিন্তু সত্য কথা বলাও মুশিল। বা উঠিলেন না, কক্ষা আনিয়া পড়িল।

গাড়ী কটক পাত হইলে, কক্ষা ভিজালো করিল, কোথায় যাবে দিদি? জিজ্ঞাসিয়া জিজ্ঞাসিয়া?

—চল না, যেকোনো তা পারি।

ড্রাইভারকে ইচ্ছা পূর্বেই নির্দেশ দিয়া গাড়িখানছিল, গাড়ী একবারে বিদলের গৃহস্থানে আনিয়া গেল। তবে আর ভোর হইয়াছে। মিউনিখপলিটির বাসভাষা বাসা বাস্তু নিতেছে। কতিং কোন গৃহস্থানে টিকা-কি গাড়ীয়া খটখট শব্দ কড়া নাড়িয়া, গাড়ীর গোকের নিম্না ভাষাইতেছে; হই এক জন প্রান্তর মণিলালী বৃদ্ধ লায়ী ঠক ঠক করিয়া ধীরদগ্ধ গমনে বেড়াইতে চলিয়াছেন; লঙ্কায় লক্ষ্যে প্রতী যেন তখনও গড়ান রহিয়াছে।

ড্রাইভার নাথিয়া দিয়া কড়া নাড়িতে লাগিল।

ইচ্ছা লঙ্কায় যাবের মিকে চাখিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই সমস্তকার মনের কথাও কি আমার পাঠিকারাবিরের বুঝাইতে হইবে? তাহারের বেগ বা অস্বাভাবিকতার উপর-আমার এতখানি হৌন পারনা নাই, তাই আমি নিবৃত্ত হইলাম।

শরতের নীলাকাশ, কত রোম, কত বেগ, কত বর্ণের কত লীলা! আজি সুপ্রভাত, এক হৃৎকল পূর্ণ ইচ্ছা এই কথাটিই বলিলে, হৃৎকল এই কথাটিই বলিলে। সত্যই—সত্যই আজি সুপ্রভাত! ইচ্ছা যেদিন পূর্ণাতন বাগা ছাড়িয়া নিজেদের প্রাণাশোষণ পূর্ণ উঠিয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত প্রথম প্রভাতে শ্রবণমণ্ডল-বৃদ্ধ হইতে তাহারো বকিত। এখন পাশাপাশি বাড়ী ছিল, তখন প্রত্যেকটি প্রান্তর সুপ্রভাত হইয়াই তাহারিগকে অভিনবিত করিত, প্রত্যেকটি বৃদ্ধীও তাহারের নিকট তত্বাভি বিজ্ঞাপিত করিত। সে হৃৎকলের অবসান হইয়াছিল।

ইচ্ছা পূর্ণের সেই বাড়ীটার মিকে চাখিয়া বৈষ্ণব, ইচ্ছা তুমিছিল, সে বাড়ীটার মাড়োলাগীয়া বাস করে, বৈষ্ণবা তাহারই মনে হব বটে। বাগাঝা চট, ছেঁড়া খলের পর্দা, হুড়ি—কত কি টাখানো।

যার গুলিয়া গেল—বিদল নব, তাহার জননী। ইচ্ছা তড়া-তড়ি নাথিয়া তাহার পাথের উপর মাথা রাখিয়া প্রাণ

করিল : বিঘলের মা তাহাকে বুক চাপিয়া কপাকে ডাকিয়া বলিলেন, আঁহ, আঁহ সন্তু মা আঁহ।

স্নান-প্রণাম কণা কাহাকেও প্রণাম করিতে বড় চাহ না, বাড়িকতা নহ, লজ্জা। পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে তাহার বড় বৃত্তা। আশল কণা, বৃত্তাটো প্রণাম করিতে চর না, প্রণামের পর, বহর পোকেরা যে চিবুক দখিলা আনর ও আশ-কণা করেন, তাহাতেই তাহার বড় লজ্জা। কোন গতিক মাখাটা না-চৌকাঠে না-পায়ে চৌকাঠের সে আড়ট চাহে পাড়াইয়া বহিল।

বিঘলের মা প্রণামের অপেক্ষা না করিয়াই কপাকে বুক চাপিয়া লইলেন। হঠ বাহুতে হঠ বোনকে চাপিয়া ধরিয়া চলিতে চলিতে বিঘলের মা বলিলেন—হুতভাণা ছেলে এক পোর বাত খাওতে বেরিয়ে গেছে, জ্ঞান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। আটটার আগেই জ্ঞান সাহেব বেরিয়ে যান কি-না, তাই বাত খাওতে বাহুকে বের করে রেখেছে। সে যে অনেকদূর, চিড়গলনা চাড়াইয়ে যেতে হয়, বিলম্ব বলে কি-না ! জ্ঞান সাহেব প্রসঙ্গবনে বা কোথায় পাঠাবেন ডাক। তাই রেখেছি।

ইন্দু নতবুণে বলিল, প্রসঙ্গবনে কেন মা ?

‘মা’ ! মাতুলস্বাধানে কত বোধ, কত নম্র, কত সন্তোষ !

স্বভাব চরম ভবিষ্যৎ গেল, দেহলসঙ্গী কানার কনোয় চাশাটো উঠিল। ইন্দুর উপর বের চিরদিন ছিল, তাহার মূখে মাতুলস্বাধানে বের যেন আরও উজ্জ্বলিত হইল, পরম পরিভূক্তিতে তাহাকে আরও জোরে বুকের উপরে চাপিয়া বলিলেন, ইয়া মা, জ্ঞান সাহেবের এক সাহেব বন্ধু অনেক ছবি নিয়ে সেখানে গিয়ে কাক করছেন, জ্ঞান সাহেব বিন্দুকে সেইখানে পাঠাচ্ছেন। কে জানে মা সে কতদূর যেন, কেমন আশা !

স্বভা একটু গামিয়া, একটু বীর্ণনিখাস ফেলিয়া বলিলেন, কলকাতায় ত বাছুর কাঁধকণ্ঠ হল না, তোমার বাবাও কিছু করলেন না, যে দেহটিকে পড়াছিল, সেও আর পড়বে না। একটা ত কিছু করতে হবে মা, সবল ছেলে, যেন থাকতে ত পারে না, আর কদম থাকলে চট্টো পেট চলেই বা কোথেকে ? তাই বাচ্ছো, বিঘলে।

ইন্দুকে নতাননে নীরব থাকিতে দেখিয়া স্বভা পুনর

বলিলেন, ঠাকুরপো চৌকাঠে কবলে কি কিছু করতে পারতেন মা বা ? কি ছানি, বাছা, আনি ওলব বুকি নে। দেবিন তোমরা চলে বাওগার পর বিনু বাড়ী এল, আনি বসল, জোর কাকা বাগু চোকে ডেকেছেন, একবার দেখা করিল বাছা। তখন বললে যাব, তাই পর কি বেচল, কতবার বললাম, কণা কনোটে তোলে না। কাল যখন প্রসঙ্গবনে কণা বললে, আনি তোমাদের সঙ্গে দেখা ক’বে পর দিনে আসতে বলল, বললে, কি বরকার মা ! অনেক রাত ক’বে কাল দিলে ; আনি ভাবল, পেছল বুকি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে ; জিজ্ঞাস করল, বলল, গেলুম। কিছু দেখা করি নি !

ইন্দু চুপ করিয়া পাড়াইয়া বহিল।

স্বভা বার বার তাহার মুখে পান চাড়াইয়া, অবশেষে বলিলেন, একটু মোহনভোগ ক’বে মোব ইন্দু, খাও ?

— না মা, বাড়ীতে বলে আনি নি, তোরে বেকাতে বেরিয়েছি, দিলে গিয়ে বাড়ীতেই খাব।

স্বভা আর কোন কথাই বলিলেন না। ইন্দু জাঁঝ পায়ে কানে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতেই, তিনি তাহার মাথার চাত মাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন সত্য, কিন্তু যে ঘেঁহের উভাশের সহিত তিনি ইন্দুকে প্রত্যাশন করিয়া লইয়াছিলেন, সে উভাশটুকু যেন অপ্রত্যাশিত হইয়া গিয়াছিল। ঘেঁহের উভাশের অভাবটুকু ঘেঁহকানো মাতেই বৃষ্টিতে পাত।

কণা প্রণাম করিবার দ্বার একটুখান প্রসঙ্গ আগে-ভাগেই দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল। ইন্দু গাড়ীর দিকে ঘাইতে ঘাইতে ভিড়িয়া আসিয়া কানোয়া কলিল, জ্ঞান সাহেবের বাড়ীর ঠিকানাটা আপনি জানেন মা ?

—আনি ত জানি নে বাছা, তবে জ্ঞান সাহেব পরন্তু যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠিটা আছে, দেখবে এস ত মা, তাতে যদি ঠিকানা লেখা থাকে।... বলিয়া ইন্দুকে লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিলেন।

ছোট, অক্ষকার বহর, প্রণামে প্রণামে ভক্তগোষ পাঠ। বৃষ্টিতে বিলম্ব হয় না, একখানিতে খাতা, অপ্রশান্তিতে পুত্র বিশ্রাম গ্রহণ করেন। বিঘলের শব্দার একপাশে এক গালা বই, খাতা, পেন্সিল, মোহাত, কলম, চিঠি, খবরের কাগজ রক্ষিত। ইন্দু সেই বিছানায় বসিতে, বিঘলের মা বলিলেন, ঐ বড় খামটা দেখ ত বাছা, ঠিকানা আছে কিনা।

—বেশছি। স্বপ্না বৃষ্টি পাড়তেই যেন বইল।

—আমি ভাবছি তাকে, তুমি দেখ।—বৃদ্ধা বাহির হইয়া পেলেন।

ইশু ইহাট চাহিতেছিল। এই বৈজ্ঞানিক নিরুত্তর, একান্তে যে যেন প্রাণ তরিয়া বেঁধিয়া লইতে চাহে। যবধানির সর্বত্র দাতিয়া দৃষ্টি পরিগ্রহ করিয়া বর্ণনাবান।

ইশু বৈজ্ঞানিক, আসলবসন্তগুলিকে একবার যেন চরম দেখিয়া দেখিয়া লইল। তারপর একটি ক্ষুদ্র দৌরনিখাস ফেলিয়া নিখিষ্ট পত্রখানি পুণিয়া তাহাতে বেঁধিকানা ছিল, সেই ঠিকানাটা যেন টুকিয়া তুলিয়া বাহির হইবার আগে আর একবার পত্রখানি, খণ্ডাটি দেখিয়া বাহিরে পেল।

বৃদ্ধা ভিজায়া করিলেন, ঠিকানা পেলেন ইশু ?

ইশু হাসিয়া বলিল, পেয়েছি না।

একটু ইতস্তত করিয়া বৃদ্ধা ভিজায়া করিলেন, তোমরা কি লেখানে যাবে না ?

ইশু লজ্জাকর মুখে কহিল, হাঁ না। একবার সেবা ক'রে যাব।—বলিয়া ভাড়াভাড়ি একটা প্রাণের সানিয়া সতপনের দিয়া পাড়তে উঠিল। একটু আগে যেরকম উত্তাপটুকুর অভাব বৃষ্টিতে উদ্ভব বিলম্ব হয় নাই। এবার বিবাহকালে সেই উত্তাপ হ্রদে-আগলে বশস্তর বদ্ধিত হইতাকে, তাহা বৃষ্টিতেও ইশুই দেখে হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

স্ববিদগ ৩৩ সাংবেদ্য বাড়ার বাহিরে আনিতেছিল, ইশুই বাড়ার বাহিরে। ইশু মূখ বাড়াইয়া বলিয়াছিল, যেখান বিদগ আস্তে আস্তে পাড়ার কাছে আসিয়া পাড়াইল। বলিল, তোমরা এখানে ?

ইশু হাসিয়া কহিল, ছায়ায় সবে আশ্রয় করত !

—ছায়া কি এত সকালে উঠেছেন ? শুনেছি, তিনি অনেক বেলায় ওঠেন। পরে যেখানে আছে নাকি ?

ইশু হাসিয়া বলিল, না।

বিদগ বলিল, বাও ভিতরে, ছায়ায় যা আছেন।

—তুমি কোথায় যাবে ?

—দেখি,—বলিয়া বিদগ অকস্মিক মূখ করিয়া পাড়াইল।

ইশু হাসিতে হাসিতে বলিল, পাড়তে ওঠ না। তারপর দেখো এখন।

বিদগ লক্ষ্যেরা কহিল, তুমি ছায়ায় সঙ্গে যেবা করবে না ?

—না করলেও ক্ষতি হবে না।

—এলে যেবা করত, অক্ষ—

—আজ্ঞা, সে তাৎপর্য তোমার দরকার কি ! তুমি ওঠ ত—বলিয়া সে পাড়ার দ্বার পুণিয়া বিল।

—কিন্তু—

ইশু বলিল, কিম্ব-বিন্দু-টুক লব শুনব 'যম' উঠে এল।

—সেটা কি ঠিক হবে ?

—কিন্তু অস্টিক হবে না।

—কিন্তু—

—আঃ।

বিদগ স্বপ্নার পানে চাহিয়া বলিল, স্বপ্না কি বলে ?

স্বপ্না হাসিয়া বলিল, পরব বসে হজ্জে—

আবে ১৬ বাড়া

পর ১৭ বাড়া

—হা রে স্বপ্না !—বলিয়া বিদগ পাড়তে উঠিলে, ছায়া কটকট সাহসে আসিয়া ভাঙিল, নিঃসর যাব !

বিদগ কিংবা পাড়াইল।

—পাড়তে কে ?

ইশু মাঝিয়া পাড়াটো বন্যায় করিয়া বলিল, দেখুন ত, চিনতে পারেন কিনা !

—নন্দকার। আগনি ইশু। আহন, আহন।

—আজ রক্ত হেরী হয়ে গেছে। আব একদিন তখন—

—তখনকার কথা তখন, আজ আহন ত। কাক পাড়াতে

এসে না বলে গেলে কি হয় জানেন ?

—না, কি হয় ?

ছায়া ইশুই একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, বিয়ে হয় না।

লক্ষ্যায় ইশু বাড়া হইয়া উঠিল।

ছায়া বিদগের দিক ফিরিয়া বলিল, দেখছেন মিঃ রাগ, তবুও উনি নামছেন না !

বিমল বলিল, আমি নাই।

—ও কথা আপনাব উপরও খাটে-ভালবেন।—ইন্দ্র হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, এস না তাই।

ইন্দ্র বলিল, বাড়ীতে বলে আসিনি, মেয়ে হলে বাড়ীর লোক ভাববেন, তাই—

—কিছু ভাববেন না, আমি লবে গিয়ে পৌছে গিয়ে আসব। বহুনি খেতে হবে আমি পাব। আমার পূর্ব অভ্যাস আছে।—বলিয়া ছায়া হাসিল। বিমলের উদ্দেশ্যে করিল, ক'দিন ধরে, বৃক্ষলেন মি: রাধ, মা'র বহুনি ছাড়া আর কিছু খেতে হয় নি।

বিমল বলিল, পড়া ছেড়েছেন বলে?

—না, অস্ত্র কাশণও আছে। চলুন না, সব বহুনি। এল তাই।

ইন্দ্র আর আপত্তি করিতে পারিল না, স্ফাও নামিল।

পড়ার পূর্বে ভাস্কর্যের বসাইয়া, বসকে খাবার ও চা আনিতে বলিয়া ছায়া বলিল, তোমাদের বাড়ীতে কোন আছে তাই? আছে? কত নম্বর বল ত? আমি একটা কোন করে দিই।

ইন্দ্র, সেট সন্ত বিমল সহ্য হইয়া উঠিল। ইন্দ্র বলিল, কোন কলবার লবকার নেই; একটু পয়েন্ট ত দাও।

ছায়া বুঝলনি বিমল করিয়া কহিল, একটু পয়েন্ট দাও কেন তাই? তুমিও পূর্ণ-কলেক পড় না, আমিও না, ভাড়া কিসে? এক কাজ কর, তোমাদের বাড়ী ছেড়ে দাও, আমাদের বাড়ীতে আমি তোমাদের বেগে আসব।

গাড়ী ছাড়িয়া বেগাও সমীচীন বলিয়া ইন্দ্র মনে হইল না। না বু'টিয়া বু'টিয়া প্রসন্ন করিয়া ড্রাইভারের নিকট হইতে তা'র ভক্তকল্যাণ কথা বাতির করিয়া অনর্থ ঘটাইতে পারেন।

ইন্দ্র বলিল, আর সকাল সকাল বাই, এর পরে একমিনি এসে আপনাব কাছে অনেকক্ষণ থাকব।

—আমি কারও আপনি, আপনাব হতে চাই নে।

—বেশ, তোমার কাছে, চল ত?

চা ও খাবার আদিল। পাওগার পরে বিমল বলিল, আমি হাই।

ছায়া বলিল, এখার বুকি আপনাকে খোসাখোস করতে হবে।

বিমল হাসিয়া বলিল, না, না, তা করতে হবে না। নিষ্ঠুর ঘোষ একখানা চিঠি দিয়েছেন, এক সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তাই।

—কখন দেখা করতে হবে?

—দুপুর বেলা।

—দুপুরের এখনও পাঁচ বটা মেয়ে আছে। পাঁচ বটার

পয়ার পৌছান যায়—ছায়া হাসিয়া, ইন্দ্র পানে চোঁটয়া বলিল, প্রথম আমার 'কিনোয়ী'র নির্দেশাঙ্গ দেখছ, কেমন?

ইন্দ্র মুখ লাগ হইয়া উঠিল। এ কথা বিমলই ছায়া'কে বলিচ্ছিলে ভাবিয়া আরক্ত মুখে একবার বিমলের পানে একটু ভীরু কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, নির্দেশাঙ্গ দেখে কিছু বুঝা যায় না।

—মাতুল মহাশয় কাল রাত্রে যখন ক'বে আমাদের এখানে এসেছিলেন।

তবে বিমল বলে নাই। ইন্দ্র মনে অনেকখানি ভাড়া হইয়া আসিল।

—তোমরা একটু ব'স তাই, আমার বা সফালেই কোণার বেকছেন, একটু দেখা ক'বে দু'টো বহুনি খেয়ে আসি। তোমার বোনটি তাই বড় লম্বা। সেই যে বাড়ি গুঁজে বসেছে, মাথাটি তোলবার নাম নেই। তোমার নাম কি পা লম্বী মেয়ে?

পয়ার মাথা বুকেব লম্বা দিগা দেল। কখন দিল না, ইন্দ্র বলিল, ওর নাম কণকভা, আমার বলি, কণা।

—এল, কণা লম্বা, তোমাকে আমার স্নেহ-প্রার্থনা দেখিয়ে আমি।—বলিয়া সে একরকম টানিতে টানিতেই কণাকে লইয়া চলিয়া গেল।

ইন্দ্র মুখে সলজ্জ হাত দুটো উঠিল। সে হাসিল অর্ধ চক্কোখা নয়। ছায়া যে ভাস্কর্যের চাই জনকে নিচুত বাক্যা-লাপের সূত্রের নিচেই কণাকে লইয়া অস্ত্রদান করিল, তাহা বুঝিয়াই এই হাসিটুকু। বিমলেরও হাসিবার কথা; কিন্তু বুঝলনা ভাব করিয়া সে বসিয়া বহিল; কোনজন তা'রাজরই দেখা দেল না।

৪ত বড় ভাস্কর্যায় লোকই হোক, ঐ রকম অবস্থায় কথা আরম্ভ করা কি যায়? বিমল এমন নিঃসম্পর্ক, এমন বিচ্ছিন্ন হইয়া বসিয়া আছে যে, কথা আরম্ভ করিতে লড়াই ইন্দ্র বুঝে বোণ হইতেছিল। কিন্তু এই অচ্যুত অসুখ্য সমস্তই বেলায় হারাইতেও পাঠা যায় না। তাহা যায় না বলিয়াই ত আরও গুণে, আরও কষ্ট।

ইন্দ্র চাই তিন মিনিট অপেক্ষা করিল, তারপর বলিল, তুমি হুন্দরবনে যাবে?

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ।

—কাজের চোঁট?

—হ্যাঁ।

—কবে যাবে?

—যোথ হয় কালই।

—মার কয়েক দিন পরে গেলে হয় না?

—কেন?

এই গল্পট ইচ্ছা মনে কাল সায়েগে জাগিয়াছিল। যাহার
সায়েগে সন্তুষ্টও ঠিক হইয়াছিল; সে উৎসব প্রদর্শন মনে
ছিল, কিন্তু এই দ্বোটিটির নিঃসঙ্গক নিশ্চয় তাই হেঁচিয়া উঠে
পলায় উদ্ভব আসিল না।

বসিল, এর মধ্যে কলকাতার কোন কাজ হইবে ত
পারে।

—না।

ইচ্ছা বসিল, কি না?

বসিল কহিল, কলকাতায় হইবে না।

ইচ্ছা রাগ করিয়া বসিল, হেঁচও পালে, কদিন থেকে
পেলে যোগ কি?

—যোগ কিছুই নেই; তবে মিছে সময় নষ্ট করত ভাল
পালে না।

ইচ্ছা এইভাবে কিঞ্চিৎ সাধন সঙ্গ করিয়া বসিল, সময়
নষ্ট হবে না।

বসিল বসিল, আমি আজই জাঙ্কি নে, হঠাৎ দু' দিন দিন
এখনও আছে।

ইচ্ছা মনে স্বস্তি অনুভব করিয়া বসিল, যাবার আগে আমায়
না বলে যাবে না ত?

বসিল কহিল বরং কহিল, তা বলতে পারি নে। নিজের
ইচ্ছার উপর ত সব নির্ভর করে না, এখন ডাক পড়বে, তখনই
যেতে হবে।

ইচ্ছা বসিল, বেশ, কিন্তু যাবার আগে একটান দেখা
করে যাবে না কেন?

—কি পরকায়?

ইচ্ছা তাঁহা দৃষ্টিতে বিমলের পানে চাছিল। সে ব্যক্তি
পূর্বের মত নির্জীবা, নিশ্চয় ও নিঃসঙ্গক।

ইচ্ছা বসিল, রাগ করে?

—না, রাগ কিসের?

ইচ্ছা হাদিয়া বসিল, বস্তু রাগ কবেছ; কিন্তু কেন রাগ
করেছ? মাংসের নিজের ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করে না,
এ কথা কেন বুঝ না?

বসিল ইচ্ছার সুখের উপরে চক্ষু রাখিল।

ইচ্ছার চোখ ছল ছল করিতেছিল, সুকর কিতর হঠাৎ
অজ্ঞ বেন উৎসাহকারে উপরে উঠিতে চাহিতেছিল। হায়,
একথা লইয়া আলোচনা করা যায় কেমন করিয়া? কিন্তু
সময় সন্ধ্যা, এতদ্বারা বড় বৈশি, আলোচনা না করিয়াও
উপায় নাই।

চক্রে ডেইটী আলোচনা সোকার বসিয়া ছিল। ইচ্ছা উঠিয়া,
বিমলের সোকার আসিয়া বসিয়া, ভাতের একখানা হাত
পরিয়া বসিল, কেন তুমি আমার ভুল বুঝলে?—বসিতে

বসিতে ড'টোটা অস্ত্র টপ টপ করিয়া ভাতেরে ঘূর্ণকরের
উপর করিয়া পড়িল। বিমল চাচা দেখিল।

ইচ্ছা বসিল, আমার না আমার ব্যবহারে গুণী নই;
যা যা আমারে সোকা বাপের, তিনিও বাক্ত হয়ে রহেছেন;
আমার মনে যে কত অশান্তি তাঁ'ত তুমি জানে। সব কেনে
তবেও তুমি যদি আমার ভুল বুঝ—কথাটা পে পে করিতে
পারিল না।

বসিল তবুও নিরুত্তর।

ইচ্ছা কহিতে কহিতে বসিল, সব কথা বলবার এখন
সময় নেই; কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার ভুল বুঝ
আমাকে কই দিও না, বিবেক কই পেও না। বল, লক্ষীটি,
আমার এ কথা রাখবে? চুপ করে বসেলে কেন? বল,
লক্ষী-লোনা-মদি আমার বল, ভুল বুঝবে না?

এইবার বিমল কথা কহিল; বসিল, ইচ্ছা, তোমার মা
যা করতে চাইবেন, তোমার পক্ষে সেই ত ভাল।

ইচ্ছা বিশ্বাসীকামিতকরে চাহিয়া বসিয়া বসিল।

বসিল বসিল, সবদিক তেবে দেখলে, সেই বালুঘাট ত
ভাল।

—না, না, ভাল নয়, একটুও ভাল নয়।

—কেন ভাল নয়?

—মাংস জীবনে কি চায়, বল ত ইচ্ছা?

ইচ্ছা কোন কথা বলিবার পূর্বে বিমল বসিতে লাগিল,
মাংস চায় আবলম্বী হতে; মাংস চায় সন্ধ্যা, মাংস চায়
দীর্ঘ ঘোঁসার হুঁসীর্ষ জীবন। বহিঃস্থের ঘরে, পরিঃস্থের
হাতে পড়লে জীবনের সাধ মিটবার অংশ থাকে কি?

ইচ্ছা বসিল, কে বললে মাংস ঐ সব চায়? আমি জানি,
মাংস এসব কিছু চায় না। মাংস চায় স্বপ্ন, লাভি। এর
বেশি সে চায় না; চায় না।

অন্যের বাহিরে ছায়ায় মগ্ন কর্তব্যের প্রত্ন হইল। ইচ্ছা
গাড়াগাড়ি বসিল, আমার কথা মনে থাকবে?

—থাকবে।

—কেন না ক'বে কোথাও যাবে না?

—না।

ইচ্ছা উঠিয়া অস্ত্র গোকার বসিল।

ছায়া অস্ত্র চুকিয়া কোমরিতে না গাছিয়া বসিল, সকালেই
এক পদলা হয়ে পেল। যথা শুনেছে। না কণা?

কথা বুঝ শুভিহা বসিয়া রহিল।

ছায়ায় বুঝে আকাঙ্ক্ষা ঘনবটা। ছায়া বসিল, আপনায়
সুখে আমার অনেক পংখ্য আছে মি: বাবা। আমার এ
বিপদের সময় আপনাই আমার একমাত্র বন্ধু।

একটু পামিরা বসিল, বিপেতেস বসত জানেন না বোধ
হয়?

বিলল বলিল, না।

—অনেকদিন থেকে বহুত পাঠান বন্ধ হয়ে গেছে। মা-ই বন্ধ হয়েছেন; আমি জানতুম না, কাল চিঠি এসেছে তাতেই জানলাম। এটী দেখুন চিঠি।—ডুগ্লেসের ভিতর হইতে ভাষা একগুণা হইয়া খাম বাহির করিয়া তাহার চোখে দিতে গেল, বিলল বলিল, চিঠি খাও, তুমি বল।

—না, দেখুন-না!

বিলল অসুখ্যা চিঠিখানি পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইল দেখিয়া ছায়া বলিল, পড়লেন?

—হ্যাঁ।

—এখন আমার কর্তব্য কি তাই বসুন।

বিলল দীরবে বলিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, শুধু মিষ্টার রাথ, আমার গদনা ক'খানি আঙঠ আপনি নিয়ে যান, বেচে আঙঠ বিলতে টাকা 'কেবল' করতে হবে। তারপর কাল বা পরত আমাকে আবার বহুতগাড়ীতে আপনাকেই দেখে আসতে হবে। আমি আর এখানে এ বাড়ীতে থাকতে পারব না।

বহুত লোক ছায়ার পানে চাহিয়া বলিয়া রহিল।

ছায়া বলিল, আমি আর সকলেই আপনাকে জেক পাঠাতুম মিঃ রায়। তেঁরো ঘুম জেক উঠেই বাবার ড্রিং-রুম আপনার দল্য গুনসুখ; বাইরে এসেই দেখি আপনি ঢল লাঞ্জন। কালই হয়েছে দেখা হয়ে গেল। এগুলো আপনি নিয়ে যান। বলিয়া ড্রয়ার বুলিয়া রেখনের কয়লা বাধা একটা পুঁটলী তাহার সম্মুখে রাখিল।

বিলল বলিল, তুমি ভাল ক'রে ভবে দেখেছ ছায়া?

—কাল সারা রাত ভেবেছি। আমার পথ আমি বেছে নিয়েছি মিঃ রায়। তিনি গরীবের ছেলে, বহুশোকের জানাই হয়ে বিলতে গেছে—নানা কারণে দেখানে সময় নাই হয়েছে। এখন টাকার জন্তে খেতে পাচ্ছেন না, রাস্তার রাস্তার ঘুরছেন। আমার এত গদ্যপাঠি থাকতে সে কই তিনি কেন পান? পান-টালের স্বরকার নেই, তিনি দ্বিগে ছাত্রন, আমি তাঁর দেশের সেই ভাড়াথরে গিয়ে উঠেই গরীক্য করব।

কথাগুলো এত দৃঢ়তার সহিত ছায়া বলিয়া গেল, কোনখানে একটা ঝাঁকও রহিল না যে, কেহ কোন কথা বলিতে পারে। থর যেন শুষ্কতার আত্মকানে শুক হইয়া রহিল।

—দা তাঁকে দাড়া দিতে পারেন, মাগোহারা বন্ধ ক'রে না গেতে দিতে বাহুতও পারেন; আমি ত তা পারি নে। আমাকে তিনি ভুলেছিলেন, ভুলে যে সব কীর্ষি করেছেন, তাও যে আমি জানি নে, তা নয়, আমি সব। তবুও যে

পারি নে তাঁকে দাড়া দিতে—সে কথা যে ভাবতেও আমি পারি নে। আমার যে তিনি ভিন্ন আর পতি নেই!—

ছায়ায় নত ঘেঁরে যে এইভাবে যোগাযোগেটক বস্তুতা করিতে পারে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। কথগুলো বলিয়া কমাগে মুখটা চোখে উঠিয়া সুখিয়া লইল।

তারপর ইকুন দিকে ফিবিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে আজ গল্প করার সময় হবে না তাই। আর কোনদিন হবে কি না, তা'ও জানি নে, তবে এখনে এ বাড়ীতে যে হবে না, তা ঠিক। এখ পথে কোনদিন যদি বিললবাস্তুক নিয়ে আমার আপন ঝুঁড়ে করে যাও, প্রাণ রুগে গল্প করব তাই। মিঃ রায় এটা তা হ'লে আপনি নিয়ে যান—বলিয়া কোন দিকে না চাহিয়া ছায়া বরেন বাহির হইয়া গেল।

কিংকর্তব্যবিমুক্ত বিলল ইন্দুর পানে চাহিয়া যেন তাহারই নির্দেশ প্রার্থনা করিল। ছায়া বে-পথে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ইন্দু সেইদিকে চাহিয়া শুকভাবে বলিয়া রহিল।

বিলল বলিল, কি বিপদ?

ইন্দু বলিল, বিপদ কিসের?

গদনার পুঁটলি দেখাটয়া বিলল বলিল, এই ত বিপদ! বড় লোকের ঘেরের জিনিষ, আজ কোঁকর মাগার বন্দুছে যেতে যাও, তার পর—

ইন্দু বলিল, কোঁকর মাগার বলে মিঃ তাই ওর আর 'তারপর' কিছু নেই। ছায়া তার কর্তব্য বেছে নিয়েছে।

বিলল বলিল, তা হ'লে দিতে বাট, কি বল?

—হ্যাঁ। আঙঠ যাতে টাকট্যা বিলতে পাঠাতে পার, তাই কর।

ছায়া আবার গবে চুপিল; চিঠিখানা সোঁকার উপরে পড়িয়াই ছিল, তুলিয়া লইয়া বিললের হাতে দিল; বলিল, এতদেই তাঁর ঠিকানা আছে, আঙঠ পাঠাতে পারবেন ত মিঃ রায়?

—চেষ্টা করব ছায়া।

—চেষ্টা নয়, মিঃ রায়, পাঠাতে হবে। তিনি আজ এক মগে অনাধারে পপের নুহুবের নত ঘুবে বেড়াজেন, আর আমি এখনে—বলিয়া ছায়া চোখে কাপড় দিয়া বাহির হইয়া গেল।

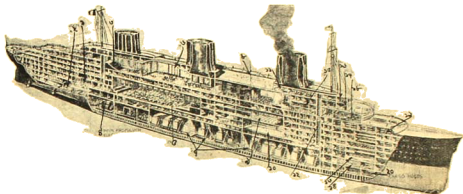
বিলল পুঁটলীট তুলিয়া লইল। ঘরের বাহির হইতে ছায়া বলিল, কল সকালে একবার আসতে পারবেন মিঃ রায়? আমি কানাই বহুতগাড়ী যাব মনে করছি।

—আমাব।

{ ক্রমশঃ

তাহার পরে ১০ হইতে ২০ জন সম্পূর্ণরূপে কোক পরিষ্কৃত হয়। এই
কক্ষের মাঝারি কক্ষ বড় করিতে লোক যার যে, যে পরিমাণ কোক জ্বালান
হয়, তাহা অপেক্ষা তখনই অধিকতর পরিমাণ কোক প্রস্তুত করা যায়।

প্রয়োজন, অর্থাৎ সকল যন্ত্রাঙ্গের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। তাহাওই
১০০ টেনিসকোর্ট এবং ২০টি 'লিফট' (lift) আছে।
আগে অধিকাংশ জাহাজে কয়লা বা ইন্ধনগুলি ছিল, কিন্তু এই জাহাজ



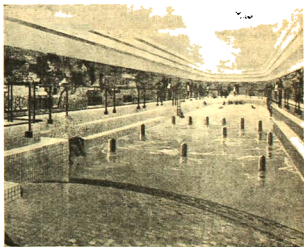
বন্দুর্বিদ জাহাজের যন্ত্র-পত্র ।

- ১। যন্ত্রের কেন্দ্রীয় যন্ত্রাঙ্গ-কক্ষ । ২। কক জেনারেটর-কক্ষ । ৩। মি-ডি । ৪। জাহাজ চালানোর যন্ত্র । ৫। ১ম জেনারেটর-কক্ষ । ৬। টেনিসকোর্ট-কক্ষ । ৭। কল্যাণ-কক্ষ । ৮। বিজ্ঞান । ৯। জাহাজ-কক্ষ । ১০। সমুদ্র-জাহাজ । ১১। লিফট-বের যন্ত্রাঙ্গ । ১২। লিফট । ১৩। জেনারেটর-কক্ষ । ১৪। যন্ত্র-পাত্র । ১৫। ২ম জেনারেটর-কক্ষ । ১৬। জিও-ও-ইল-কক্ষ । ১৭। পাইপ-কক্ষ । ১৮। কক্ষ । ১৯। জাহাজ-কক্ষ । ২০। জাহাজ-কক্ষ ।

দৃকপটের ভিত্তি যে একটি বেগান হইয়াছে তাহাতে
১০ পাউন্ড কোক প্রস্তুত করা যায় ।

পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ

সংক্ষেপে পৃথিবীর জেটস ও গুপ্ত জাহাজ
"নরম্যান্ডি" (Normandie) আটলান্টিক মহা-
সাগর অঞ্চল দিয়া এবং প্যারিসের নূতন বৈকুণ্ঠ
স্থাপন করিয়াছে। নরম্যান্ডি জাহাজের নাম। ইহা
নির্মিত করিতে কয় মাসের পরে কয়েক মাস
পর্যন্তই। জাহাজের একটি বিশিষ্ট ও সর্বোচ্চ-
স্থায়ী জাহাজ কখনও নির্মিত হয় নাই, তবে স্ট্রীম
জাহাজ "কুইন মেরি" (Queen Mary) আর
ইহাও সমতুল্য। জাহাজটি নির্মিত করিতে ব্যয়
পঁচাত্তর কোটি টাকা।



জাহাজটি ১০ জন। কয়েক মাস। এই
জাহাজ পত লোভন লক্ষ্যে ১০০ পুন্ড জৈবত।

নরম্যান্ডি জাহাজের জাহাজের সমস্ত জাহাজ (swimming pool)।

১০০০ ফুট, লম্বা ১২০ ফুট, "ভলিফ" (keel) হইতে ১২০ ফুট হুট
ওজন (tonnage) ৭১,২০০ টন। জাহাজের কর্মচারীর সংখ্যা
১,৩০০ তাহাদের লক্ষ্য জাহাজ চালানোর কাজে যাত্রা ১০০ জন পেরেক।

লিফটের জাহাজের ১০০ এবং লেভেল ১,০০০ জন-সমস্ত জাহাজের জাহাজ-
কর্মচারীর (turbo-alternator) বসান হইয়াছে। ইহাতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ
উৎপাদিত হয় তাহা ৩ মাসের একটি জাহাজের জাহাজের পক্ষে যথেষ্ট।

কিছুকাল পরে একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এ-কোলাউ (collar) নামে নামের বহু সিকা বিদ্যুৎ-প্রকার চালিত করিলে বৈদ্যুতিক, তাপমাত্রা বিক



যদি সিকার সার্কিট প্রদীপ্ত
বৈদ্যুতিক প্রবাহ সাহায্যে
পুষ্টি করা হইলোহে; তখন
সিকার পাতাও অস্বাভাবিক।

অনুশোধে সার্কিট প্রদীপ্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অন্যথ্যে হইতে
৩য় সিকার চালিত করিলে প্রদীপ্ত বা বন্ধিত হইতে পারে।
বহিঃস্থ প্রদীপ্ত করিয়া দেয়। ইহার ফলে সার্কিট ফল ইত্যাদি
পাতার উপরে পড়িলে বা বৈদ্যুতিক প্রবাহ সার্কিটে গেল
পাতার উপরে পড়িলে প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত

গিয়ার ও চেনবিশীন সাইকেল

শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী (Phil Hayseng) নামে জনৈক
শ্রীমতী এক প্রকার সাইকেল নির্মাণ করিয়াছেন। ইহারে কোনকাল
(gear) বা চেন (chain) নাই। ইহার পিছনের চাকার উপর
কোন হইতে কিছু দূরে আছে এক প্রকার সার্কিট একটি পাতার
নামে। পাতার উপর উপর পাতার উপর একটি উপর উপর
পা নিরক্ষিত হইতে সার্কিট পাতার উপর উপর পাতার উপর
সাইকেল চালান হয়।

অদ্ভুত বস্ত্রাবলী

সার্কিটবিশী একজনকার “অদ্ভুত বস্ত্রাবলী” প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহার
বস্ত্রের প্রকারবিশেষ বস্ত্রের সীমার (creases) ভাঙে। হাতে সার্কিট ইহার
অদ্ভুত হইলে হয়, কিন্তু হাতের উপর সার্কিট বস্ত্র একটি অদ্ভুত
যদি এক প্রকার বস্ত্র, তখন, তখন প্রস্তুত হইতে পারিত
ইহা প্রকারের কোনকাল সার্কিট বস্ত্র হয় না। সার্কিটবিশী
কোন প্রকারের পাতার উপর উপর। ইহার উপর উপর
পাতার উপর উপর উপর উপর উপর উপর উপর উপর

প্রকার বিবরণ হওয়া নিবারণ

একটি বা একাধিক প্রকার প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত

১। ১ গিটার ১ প্রকার ১০ প্রকার প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
(Chromium Trioxide)।

২। ১ গিটার প্রকার ১০০ প্রকার প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
(Sodium Dichromate)। ইহারে প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত

৩। ১ গিটার প্রকার ১০ প্রকার প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
(Sodium Nitrate or Nitrite); পরে প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত

৪। ১ গিটার প্রকার ১০ প্রকার প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত

৫। ১ গিটার প্রকার ১০—১০ প্রকার প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
(Hydrofluoric acid)।

৬। প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত



গিয়ার ও চেনবিশীন সাইকেল।

৭। প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত ১ গিটার প্রকার ১০ প্রকার প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
(Sodium Sulphide) এবং পরে প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত
(Sodium Cyanide) প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত

৮। ১ গিটার—১ প্রকার প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত



ନୀଳକଣ୍ଠ

ଶିଳ୍ପୀ—ହିମେଶ ଦେବଦାସ ବଳେଶ୍ୱରପୁରୀ

(ହିନ୍ଦୁ ନିର୍ମାଣର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ)



গণী টানা কি উচিত নয় ?

—শ্রীকাকমহালিকা দেবী

আজ্ঞা সেই জোয়ারেই টুটি ভাঙিয়াছে, ভাঙিয়াছে নানি নাই । মাঝে মাঝে পুৰ বেগের আশ্রিতরে অগার কখনও কখনও টুটির বেগ ভাঙিয়াছে, একটা ব্যর্থত ঘনান নাই । এরমাত্র জিহা কাশনের টুটি লইয়া শেষ তপর বেতাইক কতকগুলোকে মিড়ির মিড়িরে, কতকগুলোকে গায়েয়ের মিড়িরে, হাতীতুল্যক পুটিলার ব্যত ভবিষ্যেগে আসলবার ব্যত টাকাইয়া পুটিলিয়া মিঃ আসিলান । একে ত আকাশ পুৰ পুটিলিয়া হইয়াছিল, বহু-তুল্যক মাঝে মাঝে নাই বলাগেত হই, তার উপর ভিতর কাশনের ব্যত পুটিলিয়াই — বহু হইয়াছে মিঃআসিলে, মনও হুশ ।

একদিন জিহা পুটিলিয়া সারা হইয়াছিল । মিনি ব্যত ব্যত করিয়া বানান বহিষ্কারেইক তব কহিলে, ব্যতের ব্যত পুটিলিয়া নাই, এমন পুটিলিতে শুকনাব্যত কহা না দেখার কি ভুল । এমনভাবেই আবার এ টুলেই শীত। শুকাইতে গেল না, তার উপর এই শুকন কা, জিহা পুটিলিয়া কহিলে শরীর ব্যতাল হই, আশ্রিল ।

ব্যতের কাশন লইয়া বিদ্যায় আসিলি, মিনি প্রত্যেককো আবার শুক কখন করিলেন, বহিষ্কার, জিহা পুটিলিয়া পুটিলিয়া হই, বহু দেখেবহু ।

মহিলে যে বহু দেখিবার প্রত্যেক ব্যত হই না এ কথা মিনিও শুকাইবার লাইছিল না হা না, তার লাইত ছিল না শুক । ব্যত হইলি, না মিনি শুক না । কাশনি দেখেন ।

মিনি বিত-বিত করিলেন । বিত-বিতের ব্যত মনি হইয়া আনি চাই । হইয়া এই, সে কহাৰ দেখা মাঝে মাঝে আসিল ।

লইয়া বহু কহি দুমাইক না, পুৰ হইত ত কহি, দেখে পাইক কেমন যে দুমাইক পড়ি, কিছুতেই পারি না ।

কিছু ব্যত পুৰ হইল না । ব্যতের কাশন পড়িতে পড়িতে নীচেই লিখিত লাইকটি শাওনা গেল :—

বিবর্ত পনিবার হইতেই চাকুলিগ লোক এক বহুদিন পোকাটির ব্যত পটীয়া গিয়াছে । বহুদিন বানান ব্যত পটীয়ার আশ্রিতকি ব্যতিলি দিহাল এই :—

হীনদী অদুৰ একা হীনান অদুৰ ব্যতির মির্জাপুর হোটে গাল করিত । হোটারে ব্যতী কাশনাকি । হীনদী বহু ১৮ বহুদর একা হীনাদের ১৮ বহুদর । টুটি পটীয়ারে বহুদর বেশ ব্যতিলিহ ব্যতিলি । পটীয়ারে ব্যতীত ব্যত-আসিলে বহুদর উদাহরণে বহুদর লকীর হইয়াছিল । কিছু

হোটারে ব্যতিলিহ লিখ হইল না, নান টুটি পুৰে বিদ্যায় এক টাকাবহু লকি হীনদীর বিবর্ত হইয়া গেল ।

মিনি কহেত পুটিল দুমাইকি ব্যতিলিহ হইতে কলিহাভয়ে গিয়ালায়ে আসে, বহুদর আশ্রিয়া ব্যতের প্রণীক লকি হোটার দেখা হই ।

পনিবার বহুদর হোটার লকি প্রণীক হোটার এক বহুদর হোটারে করিয়া প্রণীকিহে লইয়া হোড়াইতে ব্যতিলি হই । হোটার বহুদর পোকাবহুদর পটী হোড়াইতিলি । হোটারা পলাজীয়ে হুগত হোটে একবার এলিক একবার উলিক পটী হোড়াইতে ব্যত । এইভাবে জিহা প্রায় ১১টা হই এবং হোটারা পোকাবহুদর চাকুলিগ লোকের লিক পটী হোড়াইতে বহু ।

লোক লিখি দুমাইকি হোটারে বোটি পটীতে ব্যত একা দুমাইকি লইতে লকি কহিবার বহু পটী হইতে লকিহাল কহে । হোটারা পোকাবহুদর বহু লোকের ব্যত একটু বেড়াইয়া ব্যতিলি পটী হইয়া আসিলে । হোটারে করিয়া আসিলে বহু হইতেই লেবীয়া ডাইলার বহুদর কহিত ব্যত একা কহে ব্যত এক হোড়া হুতা লেবীতে পায় । হোটার লেবীয়া হোটার বহুদর ব্যত এক সে লাইহোত কহি লোক চাকুলিকি কহে । লিখিত লাইকেরে একটু লোক হোটারে বহু যে, কিছুকথ পুটিল সে একটু দুমক একটু দুমাইকি কহে ব্যত লেবীহোত একা হোটার পাই কহে কহি করিয়া কিছু পটীয়ার বহু লকি লিখিত ।

হুদরব্যত লাইকাকি পুটিলে লাইক বেতয়া হই । পুটিল আশ্রিয়া দুমাইকি হোটার লকিই একটু চিহ্নি পায় । চিহ্নিহাল ব্যত দুমাইকি হোটে দেখা । পায় লিখিত ছিল যে, হোটারা লোকাবহুদর কহিত চলিগতে ।

হুদীর লাইকো লিখিত লিখিত হোটারের লাইকো কহি হইতে হোটার হই । লাইকি হইতহোটার পাই হোটারের পাই হোটারে পিঠাখোটার লিকি হোটার হই ।

প্রত্যেকবার পটীয়া ব্যত বীড়া বিদ্য হইল । আর একবার পটীলায়ে । তার পুৰ কাশনখানা লাইকি লিখি পটী লাইক । মিনি ব্যত ছিলেন না । হোটারে লোকাবহুদর জিহা-কাশনচকুলিগ লকি ও লিখ লকি লিখিত হোটারে লাইকি লিখিত পটীয়া কহিতছিলেন । মিড়ির লোকে একটু হইলিকেন লকি আসিল । ব্যত লাইকেন নাই, কোকাবহুদর লোকাবহুদর কহে হইতে,

—(বিবিধ: এইরূপ মত) : ফেটি ফেটি জামা কাপড়গুলোকে 'বট্ট-সেঁকা' কলিজায়েন।

কাকতই সেই জ্ঞানপটী খুলিয়া ফেলিয়া, শব্দে । বিবি ফেলেন, 'অঃ
হল' আমি জানি ।

[illegible]

যদি প্রাণ-তাপদ্বয় নষ্ট। তবে কতটা দূর আশ্রিতা খলিলে, যে ঘেঁষে
কি দূর আছে।

বদলিও পড়িয়া কামলধামকে আঘাত পালে দুইটুকু কিংবা তিনটা
হেট্রিক্স মলমল খাব কি :

आदि किताबों का जिक्र, का. ३ पृष्ठ १५ लिखि ?

ବିଜି ଶାସକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ କାନ୍ଦି ନାହିଁ ।

—অর্থাৎ কি কোন কঠোর যে আবার সরলবৃত্ত হতে পারে।

বিদ্য (মেকা) জাতি কাপড়খানাঃ আলমার কুচাইল মখিত মখিত
 মনিকর দেহটো কি পাশটো ?

আমি কয়েকজনকে আর একবার ঘেঁষে নীচা ছলিলাম, তেঁ, তা ত কিছু
সেয়ে বি বিবি।

— বিদ্যার পাপকরা যেরে। কলমে না পড়লে কি অস্তিত্ব হয়! হাবি
একটা আশিন তেরে কি পদ্যে বড়ী বিদে মানেই পার্শ্বতঃ। এতটা ভাব-
কবের যেরেতে বড় হাবি বেশ ধাপ। কীটী মার কীটী মার।

सावि अत्यंत कठोरता अभिलेख ।

কিছু খসিবে লক্ষ্যে, এ দু'কোঠা মনোর পলায়ন বিবেকে হেঁড়ান, নিশ্চয় নিশ্চয়।

—**ଓଁ ଆର୍ତ୍ତନି କି କରେ କାହାନ୍ତି !**

— বেশকিছু বৈ, হেট ঘোষণা হয়েছে বেশ পর পর। পঞ্চদশ দিনে ২৪টি হত্যাকাণ্ড। হেরেন্সট্রাফি বন্দাগার ইজালাতন থাকত, তা' হলে সেও অন্যতম। বেশ চিল্লি দিয়ে যেত। তা সে ছেড়েগা বি। ইনি তাকে বেড়ায় নিয়ে যেত বালুজ, সে তাই কবর। ইনি দাড়া তাপা তরক কুমারদেব, চলে গরি, চলে গরি। হোকথা যে বেশ পরপর অনুবাহ এড়ায় না দেয়—

- ବିବିଧ ଏ ଜାତୀ "ଏକ ଡୋସା" ବନ୍ଧା : ଡାଃ ଉତ୍ତମାୟ ।

সিহি অগ্নিজন, যেহেতুইন্থ বসন্ত ঋতুতে শুল্ক বসন্ত নী বসন্ত পাত্রে নী ।

৩. ১৯৮১ ফেব্রুয়ারি ১৯ খ্রিঃ সেংগেড।

—ଜେ ହ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳେ, ସିଦ୍ଧି ।

তা অংক, তাই মনাই উচিত ; সে অংক, বেশ অংক। (নিজের
 পায় কে বেয়েমাগুকের খাণীতে হন প্রব্রী দা, তাই মনাই ভাল।)

উদাহরণ ৭: বিজি স্বাধীনতা স্বাক্ষর চুক্তি

આમિ ઉત્તર ગુજરાત માટે કમલોદયિ થાનિય ।

ଆଜ୍ଞାତମାନ Free mixingର ନୁହେଁ । କଂଗ୍ରେସ ଆଦିର ଗୋଡ଼ା-ପତନ କରେ । କଲେଜରେ ଶାସ୍ତ୍ରାଚାରୀଙ୍କର ନବତା, ଆଦି-ନବ ଶାସ୍ତ୍ରାଚାରୀଙ୍କର ନବତା, କଂଗ୍ରେସ ଏକତ୍ରୀକରିବେ କେମିତି ସେହରା ପାପୀ-ପାପି ଏକତ୍ର କାହା କଲେଜ, ହେଉକରେ, ସେହରା, ଛୁଟକେ, ଦିବରା ଥେକେ, ବିଚାରିବେ ମୋହ । ଏକତ୍ର କଲେଜିଆରି କଲେଜ । ଶାସ୍ତ୍ରୀର ବାମ୍ଫା ବାଟେ ସେହରା ଧବାବେ ନୁହେଁ ହେଉକେ, ନବ ନବେ ବା ହେଉକେ କେହେରା ସାଥେ ଆତ୍ମା-ପରିତର ଦେଖିବିନି ଯେହେତୁ । ଏହା ନୁହେଁ କି Coeducation, ସମ-ବିଦ୍ୟା । ସେ କଲେଜେ ସମ-ବିଦ୍ୟାର ବସ୍ତା । ଆଜ୍ଞାତ, ସେ କଲେଜେ ହାତ କରେ ନା । ଯଦୁ ଗୋବେରା କଲେଜେ ମହତ ଆଜ୍ଞାତମାନ-କାହା କେହେରା ସବ ଗୋ ନା ।

ବୌଦ୍ଧ ଚଳଣେ ଗାଆଁ ଗାଈ ଯାହାକାଳ ଯୋଗେବ ତହିଁ ବା ନାମାବେ ବନ୍ଧୁ-
 ଯାହାବେବ ଆବାସୋନା ନବ ଲାଢ଼ିଏହି ଶେତ ଦେବ : ଆସେ ସେ ବେଦେବେ
 ମାନାବେ ବନ୍ଧୁକା ଆସତ ବା, ବା ନବ, ଦାସବ ତବ ଦେବକା ବଡ଼ ନାମାବେ
 ନବ ତତ୍ତ୍ୱବୁଦ୍ଧେ ବନ୍ଧୁକାବେ ବାସେ ବନ୍ଧୁକାବେ ଦେବ ଦାସବ-ବନ୍ଧି ବା ବନ୍ଧୁକା
 ଶେତେବିଦାବେ ଦିନ ନ : ତବବକାବେ ଦିନ, ମାନବ ବନ୍ଧୁକାବେବେ ବାସିବେ ବଡ଼
 ନାମାବେ ନବେ ବଡ଼-ବଡ଼ବେ ବାସିବେ ଦିନ ନିତ ଏବେ ମାନବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣବେ ବା,
 କାବ, ଶେତେବିଦା ବଡ଼ ଦିବେବେ ବଡ଼େ ବେଦେବେ ନବେ ତାବ ଦାସବେ ବୁଦ୍ଧବେ
 ନବେ ମାନବେ ।

এই ১৩ম হাতে হাতে কোন কোনও বানান কোন বস্তু উপর দান পড়ায়
কিন্তু আশ্চর্য নয়। এক সাতক থেকে বড়ান উল্লেখ নাহল, সিনেমা দেখা
কাল : হাতে হাতে দান দান করে গেল। এখন বর, সেজেই দান বৈশাখ আতি
দান বানান সেই বস্তু উপর।

সেয়ে। যিহে কাল হ'ল এক। তা হলেও বেশ, লক্ষ বোঝা হইল। হইল
ত হইলই। এক বছর, দু'বছর, তিন বছর—সেখের সেখের পায় পায়
হ'ল, বোঝা শাওন মিলা, যিহের কথা শাওন। যেহেতু হু, গুহির মেয়ে,
যাহার যত্নও তাই। তাহাও ওহিন সহঃ সহই পায়ে দাখ গড়ল।

[illegible]



বর্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক

“বিজ্ঞান সভ্যতার দায়ক কিনা” তাহা লইয়া কলিকাতা রেটারী-সম্মেলনে গত ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে এক বিতর্ক-সভা হইয়াছিল। বিশ্ব-বিজ্ঞানসম্মেলন-কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার দত্ত ঐ প্রসঙ্গে একটা সুবীণ বক্তৃতা করিয়াছেন।

“বিজ্ঞান সভ্যতার আদর্শের বিকাশ সাধন করিয়া ইচ্ছা, বেকার-সমস্যা, উৎপন্ন হওয়ার অধিকা এবং বাণিজ্য-বিভাগের উন্নয়ন করিতেছে, এটো যে একটা ধূম উঠিয়াছে, ঐ ধূম ভিত্তি-হীন”, ইহাটো তাঁহার প্রশ্ন বক্তব্য। পরন্তু তাঁহার মতে বিজ্ঞানই সাধারণ মানুষের কষ্ট ও শিক্ষার ক্রমোন্নতি বিধান করিতেছে।

তাঁহার বক্তৃতায় অত্যন্ত অংশের উল্লেখযোগ্য কথা—

- (১) প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য—চলিবার সমস্ত পরি-দৃশ্যমান দ্রব্যের মধ্যে বাহ্যে বাহ্যে দেখা যায়, তাহা ব্যাখ্যা করিবার উপযোগী প্রকৃতির মূল নিয়মগুলির আবিষ্কার করা।
- (২) প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বলিতে ঈশ্বরের বৃষ্টি ঘাইতে পারে, তিনি ঈশ্বার আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োণের দৃষ্টিতে মানিষ্ট নহেন। তিনি সত্যের চকুট সত্যের অহমস্বাদন করিয়া থাকেন।
- (৩) “সভ্যতা” বলিতে যদি মেননামিন জীবনের ব্রহ্মবীজতা ও স্বাধীনতার বুদ্ধি বাতীত মানুষের জ্ঞানের সীমানার উন্নতি, বুদ্ধির জীবনের উপযোগের সুযোগবুদ্ধি, সাধারণের চিত্তের শিক্ষার বিস্তার বৃদ্ধি, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ধর্মবিশ্বাস সমস্যার

যে সভ্যতার পক্ষে না করিয়া ইহা উন্নতির মধ্যে সহায়তা করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে।

- (৪) এক শত বৎসর পূর্বে ভগবতের যে দার্শনিক বিবরণ ছিল এখনও ঠিক ঠিক তাহা ত’ আছে, বরং একটু বাড়িয়াছে।
- (৫) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রগতি এবং ইহার প্রয়োগ নূতন নূতন বিবরণ স্রবত করিয়া দিয়াছে এবং কায়িক প্রণেয় উৎপাদিকা-শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া দিয়াছে।
- (৬) এখন আর কাহারও বহির্ভূত ইহাচার কারণ নাই। প্রত্যেকেরই শাস্ত্র, শিক্ষণ ও আবাস-গৃহ থাকে উচিত। এখন আর কাহারও কঠোর পরিচালনা করিবার প্রয়োজন নাই। গারিসিকে শিক্ষা ও জীবন উপভোগ করিবার চকু প্রভৃৎ অবসর পাইবার সুযোগ বিস্তার পাও করিতেছে।
- (৭) যদি বিজ্ঞানকে শিক্ষা করিবার কিছু থাকে, তাহা এই মাত্র যে, ইহা আশাশ্রিত জ্ঞান (knowledge), শক্তি এবং বিবরণ দিয়াছে, কিন্তু বিচার করিয়া প্রয়োগ করিবার বিজ্ঞতা (wisdom) দেয় নাই।

ঐ বক্তৃতার সমর্থন করিয়াছেন মিঃ জে. ড্যান ম্যান। অমত, ইনি কোন মাতীই এবং প্র-পরিচালিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক পণ্ডিত “পণ্ডিত” কি না, তাহা আমাদের ঠিক জানা নাই।

আমরা এই বক্তৃতার মতবাদ সমর্থন করি না। প্রকৃত "বিজ্ঞান" বলিতে কি বুঝায়, তাহা পর্যাপ্ত বর্ধমান "বৈজ্ঞানিক"-পদের মধ্যে বর্ণনায় অন্তর্ভুক্তই জানা নাহি। প্রকৃত "বিজ্ঞান" বাস্তবিকই মানুষকে তাহার সর্গাচারে প্রদান করে। বর্তমানে বাহা দ্বারা "বিজ্ঞান" বলিয়া চর্চিত হইতে, তাহার মধ্যে কোনটাই প্রকৃত "বিজ্ঞান" নহে। তাহার প্রত্যেকটিকে "জ্ঞান" বলা হইতে পারে। এই "জ্ঞান"-গুলি মানুষের প্রকৃত সভ্যতা বিনষ্ট করিয়া তুলিয়াছে এবং মানুষের বুদ্ধির পর্যাপ্ত দান সাধন করিতেছে। এই "জ্ঞান"-গুলির মনে মানুষ গবনকে অমৃত এবং অমৃতকে গরল মনে করিতে আরম্ভ করিয়া সর্গাচারের লক্ষ্যবীন হইয়াছে।

ডাঃ মিলের বক্তৃতা আত্মপাণ্ড অসমর্থন এবং তিনি কি বলিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেই জানেন না। আমরা প্রশ্নে ডাঃ মিলের বক্তৃতার কি আছে তাহা দেখাইব, তাহার পর আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত করিব।

ডাঃ মিলের বক্তৃতার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অংশদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, "প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বলিতে বুঝিতে হইবে তাহাকে, যিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন।" অতএব তাহার কথোপকথনে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কখনও তাহার আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন না। বলা বাচসা, যিনি বাস্তব প্রয়োগের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, তাহার পক্ষে বাস্তব প্রয়োগের ফলাফল জানা সম্ভব নহে, কারণ কোন বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের কি ফলাফল, তাহা জানিতে হইলে, তাহার বাস্তব প্রয়োগের দিকে সর্গাচার লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যিক।

কাহেই এই ভাড়াই যে, ডাঃ মিলের কথামুতারা, যিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধী বাস্তব প্রয়োগের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তিনি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নহেন। অতঃ ডাঃ মিলের সম্পূর্ণ বক্তৃতা হইতে দেখা যাইতেছে, বিজ্ঞানের প্রয়োগ হইতে মানুষের সভ্যতার ও কষ্টের যে এতখানি উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার দিকে তিনি নিজেই সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, তিনি নিজে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নহেন? এবং ইহাও কি বুঝিতে হইবে যে, তিনি যে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নহেন, তাহা নিজেই স্বীকার করিতেছেন? তিনি যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিকই না হন, তাহা হইলে সার্বজন-

কভাবেই বিজ্ঞানপ্রয়োগের ফলাফলখানি জড়িত্য বলিয়া আছেন কেন?

ডাঃ মিল ভাবিয়া লাগুন, কোন বৈজ্ঞানিক আচার আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগের ফলাফলের দিকে কাঁধাতঃ লক্ষ্য না রাখিয়া পারেন না। যে আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগ কোন কণ ক্ষণ উৎপাদন করে, তাহাকে মানুষ শব্দ-প্রয়োগের বিধি অনুসারে জ্ঞানোদ্ধৃত বলিতে বাধ্য। এবিধ আবিষ্কারকে বিজ্ঞানোদ্ধৃত বলিলে, "বিজ্ঞান" নামটী কলঙ্ক করা হয় এবং যে বৈজ্ঞানিক আচার আবিষ্কারের ক্ষমতার দাবি প্রদান করিতে সক্ষম এবং "জ্ঞান"-কে "বিজ্ঞান" বলেন, তিনি কাণ্ডকার এবং আত্ম-প্রত্যয়ক।

বর্ধমান বিজ্ঞান যে কিছু কিছু ক্ষমপ্রয়োগ করিয়াছে, তাহা বলা যথঃ নিজ বক্তৃতার স্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ মিল যে ইহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কি তিনি স্বীকার করিবেন? যদি স্বীকার না করেন, তাহা হইলে বর্ধমান "বিজ্ঞান" যে ডাঃ মিলের মতামতদ্বারা "জ্ঞান"-বিশিষ্ট, তাহা বলা যায় না কি?

বক্তৃতার প্রথম উল্লেখযোগ্য অংশদ্বারা, "জনিবার সমস্ত পরিস্রবধান বস্তুর মধ্যে বাহা বাহা দেখা যায়, তাহার বাধ্যতা করিবার উপযোগী প্রকৃতির মূল নিয়মগুলির আবিষ্কার করাট প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।"

প্রকৃত "বিজ্ঞান" অথবা "সার্বজন" এই শব্দ দুইটির মূল্যপতি-গত (etymological) অথবা শব্দগত অর্থ চিত্রা করিলে, ঐ শব্দ দুইটীতে বাহা বুঝায়, তদনুসারে কেবল বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে সমান (common) কি কি আছে, তাহা জানিতে পারিলেই বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। ঐ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে, বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতি মধ্যে বাহা বাহা সমান (common) আছে, তাহা ছাড়া আরও কিছু জানিবার প্রয়োজন হয়, ইহা আমরা "বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত," তাহা আলোচনা করিবার সময় দেখাইব।

ডাঃ মিল বাহা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাহার পোষকতা করিবার লোকের সংখ্যাই স্টেটোর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকপণের মধ্যে অধিক, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকপণ যদি "বিজ্ঞান" অথবা "সার্বজন" শব্দের শব্দগত অর্থানুসারে, ইহার সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত এবং

বর্তমান বিজ্ঞানের পরিণতি

- (১) সৌর, কক্ষ প্রভৃতি বস্তু পদার্থের উৎপত্তি এবং তাহার বস্তু ব্যবহার।
- (২) জ্যোতিষি সমুদ্র-বানের নির্মাণ ও তাহার প্রচলন।
- (৩) রেল, যোঁট প্রভৃতি স্থল-বানের নির্মাণ এবং তাহার প্রচলন।
- (৪) এলোমেল প্রকৃতি আকাশ-বানের নির্মাণ ও তাহার প্রচলন।
- (৫) টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতি শব্দ-বানের নির্মাণ ও তাহার ব্যবহার।
- (৬) কৃত্তিক উপেক্ষা করিয়া জীবিকার ভর পির ও বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ।
- (৭) শিল্পের ভর বিবিধ কলের নির্মাণ এবং শিল্পের বহুল প্রচলন।
- (৮) আবাস-গৃহ-নির্মাণে সৌহার্দ্য ব্যবহার ও তাহার বহুল প্রচলন।
- (৯) পানীয়-ভল-বিভরণে নৌগনির্ভর নলের ব্যবহার ও তাহার বহুল প্রচলন।
- (১০) পান ও পানীয়রূপে ঘাসের ও মস্তের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন।
- (১১) পরিষ্কৃত জল, দূত প্রভৃতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্থাপন।
- (১২) বৈজ্ঞানিক আলোক ও পাণর বহুল প্রচলন।
- (১৩) বাতাসের ভর নৌ ও নাল-পথের প্রতি উপেক্ষা করিয়া স্থল-পথের প্রসাধন।
- (১৪) চক্ষুসি ইন্দ্রিয়ের পরিচালিত জন্তু সিনেমা, গ্রামোফোন এবং রেডিও প্রচলন।
- (১৫) বর্তমান অবনীতির উৎপত্তি ও প্রচলন।

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বর্তমান বিজ্ঞানের স্বরূপ কি তাহা চিন্তা করিতে যদি, প্রথমেই ইহার অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি পড়ে।

উদাহরণ স্বরূপ (solid), তরল (liquid) এবং বাষ্প (gas) সম্বন্ধে কথা আছে, কিন্তু এমন কোন কথা নাই, যদ্বারা বস্তু কেন তরল পরিণত হবে, কেন তাহার তরল এবং বাষ্প হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু

ঐ তিনটি কেন হয়, তাহা অগোচর। করিবার জন্ত যে কোন বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিগা, তিনি অস্বস্তিকারী হইয়াছেন। অপর আন্তঃপ্রাণণ করিয়া কতকগুলি পরিভাষা (terminology) দ্বারা করিগা, তাহা সম্বন্ধেই বুঝা যায়।

পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নে বায়ু, জল এবং তেজ সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। অথচ কোন্‌ স্থানের কি বস্তু হইতে এবং কি বিধিতে তাহাদের উদ্ভব হইতেছে এবং কোন্‌ নিয়মাবলী-মতে তাহাদের দ্রুতি ও বিস্তৃতি নির্ণয় করিতে হইবে এবং কেন ঐ নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোনও কথা নাই। বর্তমান রসায়ন শাস্ত্রে সূত্রি সূত্রি সম্বন্ধে (formule) এবং পরিভাষা আছে সত্য, কিন্তু বাস্তবের বিভা-প্রয়োজনীয় বায়ু, জল ও তেজকে কি উপায়ে বিস্তৃত ভাবে ব্যবহার করিয়া জীবক নীতিগত ও মৌলিক করা যায়, তাহার কোন স্থাপ্তি সন্ধান নাই।

রসায়ন শাস্ত্রে “বিবিধ ধাতু” সম্বন্ধেও অনেক সম্বন্ধে (formula) ও পরিভাষা আছে এবং সেই ভূমি পড়িলে এক ধাতুক অস্ত্র ধাতুর রূপ কি রূপে দেখা গাইতে পারে অথবা প্রকৃত বস্তুকে কি করিয়া বিস্তৃত করা যায়, তাহা শিক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু ধাতুগুলির মূল উপাদান কি, কি হইলে তাহারা জীবের উপকারী ও অপকারী হয় এবং কেন তাহারা জীব উপকারী ও অপকারী হইয়া থাকে, তাহার কোন সন্ধান নাই।

পদার্থ-বিজ্ঞানে শব্দ, উত্তাপ, বায়ু, আলোক, চুম্বক এবং বিভা সম্বন্ধে অনেক অগোচর আছে বটে, কিন্তু কোন-টারই মূল কারণ কি এবং কোন্‌ অবস্থায় তাহারা জীবের উপকারী অথবা অপকারী, এবং কেন জীব উপকারী অথবা অপকারী, তাহার কোন আলোচনা নাই।

এইরূপে যে কোন বিষয়ক বিজ্ঞানের পুস্তক খরিদাউক না কেন, তাহাতে সমস্ত সমস্ত পৃষ্ঠার অসংখ্য বস্তুর ও বিধানের আলোচনা দেখা গাইবে বটে, কিন্তু কোন বিজ্ঞানেই সমালোচিত বস্তু অথবা বিধানের মূল উৎপত্তি কোথা হইতে এবং কি উপায়ে তাহাদের জীবন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, ঐ অবস্থা জীবের উপকারী অথবা অপকারী এবং কেন তাহাদিগকে উপকারী অথবা অপকারী বস্তুতে হইবে, তাহার কোন পরিচয় এবং বিধানমোখা সন্ধান পুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

উপরে থাকা যেখান হইল, তাহা চটতে বশিত পড়া যায় যে, বর্তমান বিজ্ঞানে যে যে বিধে লক্ষ্যে আলোচিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নহে এবং কোন বিষয়েই সম্ভব উদ্ভব হইয়াছে কোথা হইতে এবং তাহার পরিণতি কোথায় এবং ঐ বস্তু ভাবের হিতকারী অথবা অহিতকারী এবং কেন তাহা তদুপ হিতকারী অথবা অহিতকারী, শুভসম্বন্ধে কোন আলোচনাই নাই।

কোন পদার্থের কোন প্রকৃতি সম্বন্ধীয় কোন কথাও বর্তমান বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ ভাবে আলোচিত হয় নাই।

পদার্থ-বিজ্ঞানে পদার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সঙ্গীতশাস্ত্র প্রাচীন আলোচনা হইল—একটা, গণন-কাণ্ডের প্রকৃতি এবং অপরটা, বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতি।

গণন-কাণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনাটিকে প্রাচীন গ্রীক গণের সময়কার এবং তাহা গ্রহণ: অপরিবর্তিত ভাবে বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

গণন-কাণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনাটিকে আপাত-দৃষ্টিতে বস্তুর কর্শনক্তি বিশেষ সম্বন্ধীয় আলোচনা বলিয়া মনে হয়।

মাধ্যাকর্ষণ, বস্তুর উপাধানের এবং অবস্থার (অথবা গুণের) ভারসাম্যসাধনে তাহার কর্শনক্তির ভারত্বা বস্তুনা থাকে। একই দ্রব্য শীতল অবস্থায় যে আরতনের এবং বহু ওতনের হইয়া থাকে, উচ্চবায়ুর ঠিক ঠিক সেট আরতনের ও তত ওতনের হয় না।

ভাষ্যেই, বস্তুর উপাধান এবং অবস্থার (অথবা গুণের) সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করিতে পারিলে তাহার কর্শনক্তি সম্বন্ধীয় কোন সম্বন্ধীয় আলোচনা করা সম্ভব নহে।

বস্তুর গণন সম্বন্ধে আকিমিডিসের দৃষ্টি (Principles of Archimedes) নামে যে বিখ্যাত তথ্যটি বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যে বস্তুর কোন প্রকৃতি (উপাধান-প্রকৃতি, অথবা গুণ-প্রকৃতি অথবা কর্শন-প্রকৃতি) সম্বন্ধীয় আলোচনা, তাহা আশ্রয় বুঝিতে পারি না। পতীর ভাবে চিত্রা করিলে, উচ্চাঙ্কেও কোন বস্তুর কোন প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তথ্য বলা যায় না এবং একটা সংজ্ঞা মাত্র বশিত হয়।

বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) প্রকৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন স্যার আইজাক নিউটন অষ্টাদশ

শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই তথ্যটি হইতে বর্তমান পদার্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গণিতের উদ্ভব হইয়াছে।

ইটা বাস্তবিক পক্ষে বস্তুর কর্শনক্তি সম্বন্ধীয় একটা আলোচনা। বস্তুর উপাধান এবং গুণ সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করিলে, তাহার গণনাগণন-শক্তি অথবা কর্শনক্তি কি হইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ ও নিতুল ভাবে নির্ধারণ করা যায় না। বস্তুর উপাধান, গুণ এবং কর্শনক্তি ওজস্রোত ভাবে অভিহিত। একই বস্তুর শীতলাবস্থায় গণনাগণনের যে কর্শনক্তি থাকে, উচ্চাবস্থায় সেই কর্শনক্তি থাকে না, তাহা বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। বস্তুর তাপের অস্বাভাবিক পরিবর্তন প্রতিবিহিত ঘটতেছে, তাহাও বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিতে পারেন। বস্তুর তাপের যে প্রতিবিহিত পরিবর্তন হইতেছে, তাহা নিজ নিজ শরীরের তাপের পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য, বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টিতে, যে, বহিঃস্থিত কারণের জন্য বস্তুর তাপের পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং তাহারই জন্য তাহার নিউটনের গতি সম্বন্ধীয় প্রথম সূত্রটি মানিয়া লইয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুর উপাধানেরই এমন কারণ আছে, তাহার জন্য অবশ্যই বস্তুর তাপের পরিবর্তন ঘটতেছে, ইহা জানা থাকিলে, “চাপোদ্ধৃত শক্তির দ্বারা পরিচালিত না হইলে প্রত্যেক বস্তু হয় কর্শন-বিহীন থাকে নতুবা একটা সরল দৃষ্টি (straight line) নির্ধারিত গতিসম্পন্ন হয়,”^{*} এই তথ্য গ্রহণ করা যায় না। তাপজাত শক্তিকে চাপোদ্ধৃত শক্তি (impressed force) বলা যায় না।

প্রত্যেক বস্তুর উপাধানের অন্তর্গত যে তাপের কারণ আছে, তাহা ডে. জে. টমসন তাহার “আরন” (Ion) সম্বন্ধীয় বিখ্যাত তথ্য পর্যালোচনা করে বস্তু করিয়াছেন। কয়েক ঘণ্টার জন্য বস্তু হই পংক্তি বস্তু একত্রিত করিয়া রাখিলে বস্তু শরীরাকৃতির উদ্ভাষণের বৃত্তি হয় এবং দস্তের হইল পংক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ছোট ছোটকে একত্রিত করিয়া রাখিলে তাপের হ্রাস হয়, ইহা সম্বন্ধেই পরীক্ষাসাধ্য। ছোট

* A body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line, except in so far as it is compelled by external impressed forces to change that state. (Newton's 1st Law of Motion)

লিপির (lips) মিলনে শব্দটির ত্রাপের বাস হয় এবং পস্তুর মিলনে শব্দটির ত্রাপের বৃদ্ধি হয়, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কি বর্ণিত হইবে না যে, মাতৃভাষা বর্ণ উপাদানেই ত্রৈ ও ভ্রমের কারণ আছে ?

ব্যাকবিক পক্ষে, ভ্রমের চরিত্র-জীবনের বর্ণ উপাদানেই ত্রৈ ও ভ্রমের অর্থ উদ্ভাব ও ঈশ্বরত্বের কারণ আছে এবং বস্তুর কাব্যশক্তি ও গতিশক্তি গোপনিত শক্তি ব্যতীত উপাদানের ত্রৈ ও ভ্রমের শক্তির দ্বারাও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কালে, নিউটনের তথা অসম্পূর্ণ এবং ব্রহ্মত্বক।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণও কাব্যক্ষেত্রে নিউটনের আবিষ্কৃত তথা পুরাতন বীজের করিয়া লইতে পারিতেছেন না। অতঃ, উদ্ভাস্য যে পরোক্ষভাবে নিউটনের তথা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ-যোগ্য বলিয়া মনে করেন না, তাহা উদ্ভাস্য চিত্র করেন না এবং মুক্তিভেদে পারেন না।

গৃহ ও 'পূর্ণ'-নির্মাণকালে অথবা কোন বস্তু-নির্মাণকালে অত্যাশ্চর্য্যভাবে বিভিন্ন অংশের যে বিভিন্ন আয়তনের প্রয়োজন হয় বলিয়া হিসাবে প্রতীয়মান হয়, সেই সেই অংশে সেই সেই আয়তন ব্যবহার না করিয়া তাহার চারি গুণ অথবা পাঁচ গুণ অথবা ছয় গুণ পর্যন্ত আয়তন কাব্যতঃ বর্জনিত হইয়া থাকে। ইহা কি অক্ষপাতের উপর অর্থ? এং চিত্রিত্যবী নিউটনের তথ্যের সম্পূর্ণতার উপর পরোক্ষভাবে অবিশ্বাসের পরিচয় নহে ?

শেখর-জীব কেন ইচ্ছামত উড়িতে এবং ভ্রমে ও ঘূর্ণে বিচরণ করিতে পারে, ভ্রমে কেন কোন কোন চর-জীব ও অচর-বস্তু ভাসিতে থাকে, আবার কোন কোন চর-জীব ও অচর-বস্তু নির্মল্লিত হইয়া যায়, যৎসামি ভ্রমের জীব কেন ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারে এবং ঘূর্ণে উঠাউঠে কেন কিছুদূর বীর অঙ্গ ঘূরাইয়া ফিরাইয়া পরিশেষে মৃত্যুদূরে পতিত হয়, ফলস্বরূপ জীব কেন ইচ্ছামত পতিসম্পন্ন হয় এবং কোন কোন ফলস্বরূপ জীব কেন ভ্রমের উপর ভাসিতে পারে এবং কোন কোন জীব কেন পারে না, ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া চিত্রা করিতে বসিলে, নিউটনের তথ্যের অসম্পূর্ণতা এবং ব্রহ্মত্বকতা উপলব্ধি করা যায়।

কেহ কেহ মনে করেন, নিউটনের গতি-বিজ্ঞান কেবলমাত্র

ইচ্ছামত (without volition) বস্তুর পক্ষে প্রযুক্ত। উদ্ভাস্য জানেন না যে, অর্থাৎভাবে ইচ্ছা বর্ণিত বাহ্য বৃক্ষ্য তাহা নাই, এমন কোন বস্তু প্রকৃতিতে নাই। বাহ্য ইচ্ছামত বস্তু প্রকৃতিতে করিতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতি কোন ইচ্ছামত বস্তু সৃষ্টি করেন না। কালেই, যদি বলা হয় যে, নিউটনের "গতি-বিজ্ঞান" ইচ্ছামত বস্তুর পক্ষে প্রযোজ্য নহে, তাহা হইলে উচ্চাঙ্ক প্রকৃতিক কোন বস্তু সন্মতীয় বলা যায় না এবং উহা আর বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

বর্তমান জ্যোতিষ শাস্ত্র, গতি-বিজ্ঞান সন্মতীয় অক্ষপাত এবং অত্যাশ্চর্য্য সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের অক্ষপাত প্রধানতঃ নিউটনের গতি-বিজ্ঞান সন্মতীয় তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালে, নিউটনের গতি-বিজ্ঞান সন্মতীয় তথা অসম্পূর্ণ এবং ব্রহ্মত্বক প্রতিপন্ন হইলে বর্তমান বাবতীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র ব্রহ্মত্বক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বর্তমান বিজ্ঞানের মূখ্য সংস্কারগুলি পরিভ্রমণ করিয়া প্রকৃত ভ্রমসংশ্লিষ্ট হইলে এবং ভারতীয় জীববিদ্যার বিজ্ঞান বলাবৎ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে, আমাদের কথার সত্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রদর্শন করা যায়। আমরা ভারতীয় জীববিদ্যার বিজ্ঞান আশিক ভাবে অধ্যয়ন করিয়া বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে বাহ্য বলা উচিত বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাই বর্ণিতেছি। অতঃ, সংস্কৃত ভাষা বৃদ্ধিবার ক্ষমতা আমরা যে পদ্ধতির ব্যবহার করিতেছি, তাহা প্রচলিত পদ্ধতি হইতে পৃথক্। তার আইজাক নিউটনকে হীন প্রতিপন্ন করিবার ক্ষমতা কোন কথা শিখি নাই।

লিয়োনার্দো দা-ভিক্কির কার্যকালের আগে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভ্রমের যে অবস্থা হইয়াছিল এবং তাহার যে পরিবর্তন ঘটিব, কোপার-নিকাস, ফ্রান্সিস বেকন, গ্যালিলিও, নিউটন ও লামার্স সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা চিত্রা করিতে বসিলে, উদ্ভাসিককে কল্পিত ভ্রমে ব্রহ্মত্বক না করিয়া পরা যায় না। সংস্কৃত ভাষাশাস্ত্রে ইহা প্রত্যেক "জিজ্ঞাসু" ছিলেন, ইহাদের তথা অত্যন্ত পরিচয় এবং কাহারও যে পারিভ্রমণের দায়িত্ব ছিল না, তাহা উদ্ভাসের প্রচারিত কথাগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তার আইজাক

নিউটনের প্রচারিত তত্ত্বের বিরোধী কথা বলিতে হইতেছে বলিয়া আমরা তাঁহার মৃত-আত্মার(?) বিকট কথা চাচ্ছি। আমরা জানি, তাঁহার অত্যাশঙ্ক উদ্বেজিত হইলেও তিনি আত্মবিশ্বাসকে ক্ষয় করিবেন। জাগিল বেকন, গ্যালিলিও ও আইজাক নিউটন ছিলেন প্রকৃত মহাত্মা। তাঁহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল অত্যাশঙ্ক ঝুং ইগোয়েগের এবং তৎসঙ্গে ভগবতের ভুলে বোঝান করিবার ভয় এবং তাঁহাদের আবির্ভাব সার্থক ও হইয়াছিল। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাঁহাদের কার্যের ফলে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে ক্রাউচের মত বৈশিষ্ট্যের এবং বেলগন ও ওয়েলিংটনের মত নৌ-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ইংলণ্ডে ভগবতের মধ্যে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতীয় পার্থক্য, ক্রাইস্টকে "বিশ্ব-প্রেমিক" নামে অভিহিত করিয়া সম্মান দেখাইতেছি বলিয়া আশ্চর্যবোধ হইতেছেন? একবার তাহা দেখুন, ক্রাইস্ট কত বড় বিশ্ব-প্রেমিক ছিলেন। যে চতুর্ভুজ লাভায়ে তিনি ভারতবর্ষের রাজ্যে তাঁহার বসতি করিয়া অর্জন করিয়াছিলেন, সেই চতুর্ভুজের ঘরাই ঐ রাজ্যে দেশীয় কোন মূল্যবোধে বিক্রয় করিয়া তিনি যৌরবাস্তবিকতায় অসীম সম্পদ অর্জন করিতে পারিতেন না কি? যে লাভ্য বৈতন্যে তিনি চাহুত করিতেন, তাহাতে নিজের সম্পদ অর্জন না করিয়া যৌর দেশের ও জাতির ও ভারতবর্ষে করিয়া বসতানি পোষ সমস্ত করিবার ও বিশ্ব-প্রেমের পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা ভগবতের পিণ্ড ইতিহাসে আর কখন দিতে পারিয়াছেন?

আমাদের ভারতবাসীরও ক্রাইস্টের কাছে এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের রাজ্য-চালক ইংলণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে।

আমাদের ভারতীয় জীবির বৈশিষ্ট্য ও বর্ণন হইতে আমরা বিবিধ সত্তার অহুলভান করিতে পারিতেছি, তাহা ইংলণ্ডের জ্ঞান-শিলাসার ফল। আমাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও বর্ণন মূল হইয়া গিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইংলণ্ডের চোরা ফলে এখন প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত পুস্তকই পাওয়া যায়। অবশ্য গুরুত্ব ভাষার বিকৃতি ঘটিয়াছে এবং তাহার উচ্চারণ এখনও হয় নাই এবং তাহার ওষুধ ভারতীয় জীবির এই পুস্তকগুলি বর্ণনা করিবে প্রদানিত নহে, তাহা নয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করা প্রাকৃতিক কারণসমূহ; ইংলণ্ডের

পক্ষে সম্ভব নহে। সংস্কৃত ভাষার বিকৃতির ভয় এবং তাহার উচ্চারণ হয় নাই বলিয়া যদি কাগজের কোন বাধা থাকে, তবে তাহা ভাবতাসী "কনি" বসমান প্রাপ্যপণের। এমন কি, "কনি"-বসমান প্রাপ্যপণেরও তাহার ভয় নাই করা যায় না।

হইতে পারে, ইংলণ্ডে শিখ-জাতি, জ্ঞান-নিষ্ঠার উদ্ভিতি করিতে হইলে জাতীয় ভাবনের যে বহুসংখ্য প্রয়োজন, ইংলণ্ডের এখনও তাহা হয় নাই, এমন কি ইংলণ্ডে মানিয়া লওয়া যায় যে, বর্তমানে ইংলণ্ডে তাহার ভারতীয় শাসন-কার্যে কৃপা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু ইংলণ্ডে আমাদের কোন উপকার করেন নাই, কেবল ভারত দেশে করিয়াছেন এবং আমাদের জগতির কারণ কেবলমাত্র তাহাদের সম্মান, ইহা কিছুতেই প্রতিপন্ন করা যায় না।

শিক্ষা ও শাসন সম্বন্ধে ইংলণ্ডে নিজের বেশে এখন যে বিধির প্রচলন করিয়াছেন, ভারতবর্ষে প্রায়শঃ সেই বিধিই প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যদি কিছু পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ, ভারতের সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ভারতবাসীর অগ্রগতি ও উপগতি। খেলোয়াড়ের জাতি,—শোককে সাধারণতঃ অবিশ্বাস করিতে জানেন না; কাহাকে বিশ্বাস করিতে হয় ও কাহাকে অবিশ্বাস করিতে হয় তাহা বুঝিতে পারেন না এবং তাহার ফলে বাহ্যবিশ্বকে সম্মুখে পাইয়াছেন, তাহাঙ্গিরের শ্রীতি অক্ষয় করিবার চেষ্টা করিয়া পরোক্ষভাবে বেশের ভদ্র-সাধারণের অগ্রগতি হইয়া পড়িয়াছেন। যে বিধিতে যৌর দেশের শিক্ষা ও শাসন পরিচালনা করিবার চেষ্টা তাহারা করিয়াছেন, এ বেশে তদ্বিষয়ে কিছু করিবার চেষ্টা করিলে, তাহাবিশ্বকে আত্মবিশ্বের জগতির ভয় নাই করা হইত। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্মোচিত হইয়া জাতি যে তাহা করে নাই, তাহা সম্বন্ধেই প্রতীক্ষমান হয়। পদম, আমরা আমাদের শিক্ষা ও অগ্রগতি উপার্জন করিবার ভয় এখন বাধা চাহিয়াছি, প্রায়শঃ তাহার পূরণ করিয়া আত্মবিশ্বকে ইংলণ্ডে সম্বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন পূরণ করেন নাই আমাদের যাত্র-পাশের বাচ্চা। এই বাচ্চা কি "তুমি দূর হও",—অবশিষ্ট অগ্রগতির ভয় নহে? এত অগ্রগতি বাচ্চা কি কেবল অগ্রগতিতে পারে? এই অগ্রগতি বাচ্চা কি চর্যাচিত?

ইংল্যান্ড-শাসনকালে ভারতবাসীর পরিচয় বাড়িয়া গিয়াছে তথা! সত্য, কিন্তু ইংল্যান্ডের নিজেব দেশের পরিচয় কি প্রত্যয়িক বাড়িয়া যায় নাই? কারণে, ভারতের পরিচয়ও শুধু ইংল্যান্ডের স্বভাব অথবা সভ্যতাকে সন্দেহ করা যায় না।

অতএব ইংল্যান্ডের প্রতি অতন্তর হইয়া তাহাদের সহিত বিরোধ করার কোন বুদ্ধিবৃত্ত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। ধাঁহায়া মনে করেন, ব্যবসায়-শাসন হইলেই দেশের অজ্ঞানতা দূরীভূত হইতে পারে, তাহারা ভ্রান্ত। ব্যবসায়-শাসন হইলেই যদি অজ্ঞানতা দূর করা যায়, তাহা হইলে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ইতাল্যের অজ্ঞানতাকে কেন্দ্র করে কেন? ইংলণ্ড প্রকৃতি দেন যে ভারতবর্ষ অপেক্ষাও অধিক-তর অজ্ঞানতাপ্রসূ এবং চর্চাশাস্ত্র, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিবেন?

আমাদের পাঠকগণ হস্ত মনে করিতেছেন যে, আমরা গভর্ণমেন্টের অগ্রদূত-দাতার আশ্রয় এতখানি ইংল্যান্ড-বৃত্তি করিতেছি। আমরা যে কাহারও কোন অগ্রদূত পাইবার আশায় কিছু করিতেছি না, তাহা আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যাবলী হইতে পাঠকগণ বৃত্তিতে পারিবেন। যেন লক্ষ্যীয় আমাদের কর্তব্য প্রতিপাদন করিবার জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্মোচন। আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করিতেছি। ভারতের, তথা বর্তমান জগতের বারিত্তা ও প্রবর্তনার জন্য ইংল্যান্ড জাতির উপর কোন দায়িত্বের আরোপ করা যায় না। পরন্তু ইংল্যান্ড জাতির পক্ষে বিচক্ষণতার চরম বর্ধমান জগৎ এক একটা আশা মহাশূন্য হইতে এবং চরম চর্চাশাস্ত্র অথবা হইতে রক্ষা পাইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইংল্যান্ড বিচক্ষণতার সহিত না চলিলে, আমেরিকার, জাপানের ও জার্মানীর প্রবর্তন আবার লজ্জা উদ্ভিত এবং জগৎ সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইত, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

জগতের বর্তমান চর্চাশাস্ত্রের জন্য বুদ্ধিবৃত্ত তাকে যদি কাহারও কোন দায়িত্ব থাকে, তাহা মূলতঃ বর্তমান বিজ্ঞানের, বর্তমান দৈনন্দিনিকের, ভারতের শিক্ষা-বিভাগীয় বেশীর পরিচালকগণের ও বহির সন্তান ভারতবাসী জাতির প্রাঙ্গণের।

জগতের বর্তমান চর্চাশাস্ত্র পরিচালনা যে কতখানি এবং তাহা কত ভীষণ, তাহা সাধারণতঃ যে আমাদের নেতৃত্ব সন্ধান উপলব্ধি করিতে পারেন না, তাহাও মনে করিবার কারণ

আছে। একবার ইংল্যান্ড পর্বোক্তভাবে লজ্জা জগতের এক চূর্ণের দ্বারা তে না অস্বিত পাবে, তাহাও কাহা করিতেছেন। ইংল্যান্ডের গত পনের বৎসরের কাগজই যে জগৎকে তাহার চরম চূর্ণের হইতে আংশিকভাবে রক্ষা করিতেছে, তাহা দূর সম্ভব ইংল্যান্ড নিজেও জানেন না। কিন্তু জগতের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া আবার লক্ষ্যজাতির যুগ-যাক্ষণিকের বিধান করা প্রাকৃতিক কারণবশতঃ ইংল্যান্ডের অথবা জগতের কোন জাতির সাধ্যাধীন নহে। তাহা সম্ভব হইতে পারে একবার ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর দ্বারা। আমাদের এই কথা আপাত-দৃষ্টিতে অসম্ভবপ্রবৃত্তি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জগৎ যখন বেশীর "প্রকৃতি" কাহাকে বলে এবং তাহার ভারতবর্ষ হয় কেন, তাহা বুঝিতে পারিবে, তখন আমাদের কথা সার্বজনীন উপলব্ধিযোগ্য হইবে। ধাঁহায়া মনে করেন যে, বন্দোবস্তক রূপী, অথবা যুগোপনিয় ইটালী, অথবা হিটলারের জার্মানী, অথবা বর্তমান আমেরিকা জগতের বারিত্তা ঘোচন করিবার পক্ষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তাহারা ভ্রান্ত।

জগতের এবং ভারতবর্ষের বারিত্তা ঘোচন করিতে হইলে ইংল্যান্ডের সহযোগে ভারতবাসীর কাগজের প্রবণ করিতে হইবে এবং তাহার প্রধান উপায়, ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় অলঙ্কারের প্রকৃতি পরিচয়গ করিয়া তাহার প্রাণা কৃতজ্ঞ হইতে তাহাকে নেওগ। ইংল্যান্ডের ও ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে।

আমাদের মনে হয়, ইংল্যান্ডবিশেষের মধ্যে ধাঁহায়া বুঝিবার, তাহাও তৎসম্মত সত্য। যদি সত্য না হইয়া ইংল্যান্ড কর্তব্যব্রতী হয়, তাহা হইলেও কি ভারতবাসীর বীর কর্তব্যের অবহেলার কোন বুদ্ধিবৃত্ত কারণ থাকিতে পারে? আমরা কোন ভারতবাসীর নিকট হইতে কি কার্যতঃ ইহার ধোঁয়া-বুদ্ধি উদ্ধার পাইব না?

মনে রাখিতে হইবে, বৈজ্ঞানিকবিশেষের মধ্যে ধাঁহায়া জগতের বর্তমান চর্চাশাস্ত্র কারণ, তাহারা উন্মোচন শতাব্দীতে জগৎগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বিংশ শতাব্দীতে তাহাদের অল্পতর জগৎ (Society) বাহিয়া বিবিধ বিশেষত্ব নামে বর্তমান আছেন।

গ্যালিলিও, নিউটন ও পাস্কাই ছিলেন অগ্রদূত-দাতার। তাহারা নিরুদ্বিগ্নক পণ্ডিত মনে করিয়া অসম্ভ-

প্রত্যক্ষ করেন নাট, ন্যায়সঙ্গত সত্যের আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহারই দ্বারা সত্য মনে করিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ ও সম্ভবতঃ বসিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যে এখনও অসম্পূর্ণ ও সম্ভবতঃ বসিয়াছে এবং তাহার উপর যে “বিজ্ঞান” নামক বিবিধ “সূত্রান” প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিস্তৃত লাভ করিতে পারিয়াছে, তদন্ত দ্বারা তাঁহাদের পরবর্ত্তী উনবিংশ শতাব্দীর পাণ্ডিত্যচিন্তা-বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞগণ।

ইহাদের কথা প্রাথমিক অস্পষ্ট এবং সম্ভবতঃ এবং ইহারা “অস্ব-প্রত্যয়ক।” কতকগুলি পরিভাষার স্রষ্টা করিয়াছেন অথচ তাঁহারা কি বলেন, তাহা নিম্নেরই প্রাথমিক বৃত্তিতে পাইব না।

ডে. ডে. টমসন এই মনের ব্যক্তিক। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে টমসনের “স্বাধীন” সত্যত্ব বিখ্যাত তথা সম্পূর্ণ ভ্রমস্থান না হইলেও চিত্তাঙ্গীভূত পরিপূর্ণ। টমসন বস্তুর সর্বাপেক্ষা কৃত্রিম অথচ কেবলমাত্র “তত্ত্ব”-র বিকাশিত দেখিতে পাইয়াছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ আরও অতুলন্য কণিণে চানিতে পারিবেন যে, বস্তুর প্রত্যেক অণুতে “স্বত্ব”-র সচিৎ মিশ্রিত আরও বহুতরী পদার্থ আছে।

বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান জগৎকে ধারাত্মক সর্বাপেক্ষা বিভাজ্য করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে অর্ধনৈতিক মালম্ভের ও ভেতনদের নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান বিভাজ্যের ভিত্তি আইনস্টাইন ও মিক্সোগণিতের দ্বারাও দেখে।

১৯০৫ সালে আলোকের গতিবিধি সম্বন্ধে ও ১৯১৫ সালে মাধ্যমিকের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে গণিত-ভিত্তি আইনস্টাইন জগতের সমস্ত উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা যে অসম্ভব প্রতিভার পরিচায়ক, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে প্রতিভার সম্ভাবনার অপেক্ষা অসম্ভবতঃ পরিচয়ই অধিক।

“আলোক” একটা “গুণ-পদার্থ।” ইহা হেতুর “গুণ।” যেখানে “স্বত্ব” থাকে, সেইখানেই “আলোকের” উৎপত্তি হয় এবং হেতুর প্রাথমিক তারতম্যাদ্বেষ ও সচিৎ সত্যের প্রকৃতি অতুল্য আলোকের বিস্তৃতির তাৎপর্য্য ঘটনা

থাকে। ইহা যে সত্য, আশ্রয় তাহা সত্যই উপলব্ধি করিতে পারি। কোন “তত্ত্ব-ভাষা” হইতে আলোকের উৎপত্তি হইতেছে এবং সেই তত্ত্ব-ভাষার সচিৎ সত্য স্থান কি প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহা না জানা থাকিলে, তৎসম্বন্ধে আলোকের বিস্তৃতির প্রকৃতি কি হইতে পারে, তাহার বিচার করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতির উপস্থান, গুণ এবং কণিকার ও তাহাদের সম্ভাব্যতা বাস্তবতায় কোন কোন প্রকৃতিসম্পন্ন, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান যে খুবই অল্প, তাহা খুব সম্ভব অজানতায়ই যে কোন বৈজ্ঞানিক বীকার করিবেন। আইনস্টাইন তৎসম্বন্ধে জ্ঞান-ভাষার পূর্ণ প্রকৃতি চেষ্টা না করিয়া “গুণ-পদার্থ”-র কণিকার দ্বারা করিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা ঠিক “ভাল ফেল”-র কণিকার কি হইতে পারে, তাহা অতুলন্য করিতে বসিয়া “ফেল”-র উপস্থান ও সংসর্গের দিকে লক্ষ্য না করিয়া “ভাল-স্ব”-র গতিবিধি দ্বারা আলোকের কণিকার সত্য। ফেলের “ভাল-স্ব” ফেল চাড়া থাকিতে পারে না এবং তাহার তারতম্য হয় ফেলের উপস্থান ও সংসর্গের দ্বারা। কয়েক, ফেলের উপস্থান করিয়া তাহার বিশেষণ দ্বারা আলোকের গতিতে বিশেষ, যে সমস্ত কথা অথবা অসম্ভব আবিষ্কৃত হয়, তাহা বস্তুর সম্ভাব্যতাবিশিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু অসম্ভব হইতে পারে না এবং তাহাও পক্ষে তাহা সত্য সম্ভব হয় না। আইনস্টাইনের আলোকের গতিবিধি সম্বন্ধে কথাগুলি ও তৎসম্বন্ধে অসম্ভব হইয়াছে ঠিক তদ্রূপ। ইহা সম্পূর্ণভাবে তাহাও যোগ্যতা স্বতন্ত্র হইতে পারিবে কি না তাহাও সন্দেহ আছে, কারণ আইনস্টাইনের সমস্ত কথা মিথ্যা হইয়া চিত্তা করিলে তাহাকে অসম্ভব ও অসম্ভব বসিতে হয়। আমাদের গুণ বিশ্বাস, আইনস্টাইন সত্যই তিনি কি বলিতেছেন তাহা বুঝিতে পারেন না। আমরা সম্ভবতঃ ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

মাধ্যমিকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কথাগুলিতেও যে সন্দেহ আছে, তাহা আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাতে যে কতখানি সন্দেহ আছে, তাহা কিংবা কতিপয় হইলে বস্তুই চিত্তার গোষ্ঠ্য, আশ্রয় তাহার অসম্ভব এখনও পাই নাট। কয়েক এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্যতঃ আমরা এখন প্রকাশ করিব না। মাধ্যমিক সম্বন্ধে দুই তথ্য অসম্পূর্ণতা থাকিলে, তাহা হইতে কোন ভ্রমস্থান তথা আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব কি?

হোটেল উপর, বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে ‘অনশূঁড়া’ ও ‘বপের’ দ্বয় আছে, তাহা উপরে দ্বারা দেখান হইল, তাহা হইতে প্তিতপন্ন হয়। আমরা এক্ষণে তাহার প্তিপত্তি মানুসের হিতকর অথবা অহিতকর হইতাকে তাহার বিচার করিব।

বিজ্ঞানের প্তিপত্তি মানুসের হিতকর অথবা অহিতকর হইতাকে, তাহার বিচার করিতে হইলে, মানুসের কি হিতকর অথবা কি অহিতকর, তাহা জানে হিব কথিত হইবে। মানুসের কি হিতকর অথবা অহিতকর, তাহা লইয়া অনেক মহতের আছে। আমরা এই প্রেক্ষে তাহার বিচার না করিয়া সমস্ত মানুস দ্বারা চাপ এবং যে উপারে মানুস তাহা পাইতে পারে, তাহাই মানুসের হিতকারী বলিয়া ধরিয়া লইব।

মনে রাখিতে হইবে, মানুসেরই হিতর বুদ্ধিব, শ্রুতব, এবং নবী মাঅন্যের মত মতাপূর্বক; প্যালিসিও, নিউটন, আচাৰ্য্য স্পেন্সারের মত প্তিত; ক্রাইলের মত মেন-পেনিক; স্পেন-লিমান, মেলন, হেরলিটনের মত বী-পূর্বক মত প্তিগ্রহ করিয়া থাকেন। আবার সাধারণ মন-পাক, ছাত্র, মেন-সেনক, লৈনিক, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, মাতাল, লম্পট, সন্তানদের ও কৃষ্ণকরের পোকের মানুসের ভিতরই এক-প্রকর করেন। ইহাদের প্রত্যেককেই নিজের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার বশ আছে। সমস্ত মানুস কি চাহিয়া থাকেন, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে, প্রত্যেক মানুস দ্বারা দ্বারা চাহেন, তাহাদের মধ্যে সমান (common) পদার্থ কি কি আছে, তাহা ব্যতির করিয়া লইতে হয়।

প্রত্যেক মানুস দ্বারা দ্বারা চাহেন, তাহাদের মধ্যে সমান (common) পদার্থ কি কি, তাহা হিব করা অসম্ভবতার দিনে একটি বৃহৎ ব্যাপার। বর্তমান কালে জানি জানি বিজ্ঞান-পুস্তকের উত্তর হইতাকে তাহা সত্য এবং সেইজন্যে জানি জানি বলাও অসম্ভব তাহাও সত্য, কিন্তু সকল মানুস যে যে পদার্থ চাহেন, তাহাদের নান, অথবা যে যে উপারে মানুস ঐ সন্তানকাকাক্ষিত পদার্থগুলি পাইতে পারে, তাহাদের বর্ণনা কোন পুস্তকে বৃত্তি পাতা দ্বারা দ্বারা না।

কাহেই, সন্তানকাকাক্ষিত পদার্থ কি কি, তাহা নির্ধারণ করিতে হইলে, মানুসের নিজের বুদ্ধি হাত দিয়া নিজেই চিন্তা করিতে হয়।

এই প্রকরে আমরা এই বৃহৎ ব্যাপারের ভিতর না বাইয়া

ধরিয়া লইব যে, সমস্ত মানুস বাচিয়া মত কোন না কোনকর পাত্র, বাসগার এবং পরিবেশ, সমষ্টি, ব্যবসায়, শান্তি, শাস্তা এবং দীর্ঘায়ু চাহিয়া থাকেন। এবং কোন মানুস সন্তান, অথবা, অশান্তি, পদস্থাপনিকতা, অনশ্রুতি এবং অস্বাস্থ্যের অভাব চাহেন না।

কোন মানুস যখন সন্তানকে প্তিত হইতে অথবা বীর শাস্তা হারাতে চাহেন না, তখন মন্ত-পদার্থে এমন কোন ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়, দ্বারা মানুসের শাস্তা মত অথবা সন্তান সন্তান হইতে পারে, ইহা বোধ হয় আমাদের সমস্ত পাঠকই বীকার করিয়া লইবেন।

এক্সে দেখা বাটক, মানুস কোন মত অথবা শাস্তা হারায়ে। সন্তানদ্বারা শান্তি মানুসের দিকে চাহিয়া দেখিলে, আমরা কি দেখিতে পাই? প্রাথমিক দেখিতে পাওয়া যায়, সন্তান পূর্ণে মত পূব দ্বারা উঠে এবং চাহে অথবা হইয়া নীতলতা প্রাপ্ত হয়।

পদার্থে উত্তরের অথবা তেজের বুদ্ধি হইলে, আমরা বলিয়া থাকি, ‘অব’ হইয়াছে। আর তলেব ভাগ দেখে হইলে আমরা বলি নীতলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কাহেই বলিতে হইবে, মানুসের পদার্থে তেজের অথবা তলেব অত্যধিক বুদ্ধি হইলে, মানুসের সন্তান অপত্তা হয়।

আমাদের ভারতীয় কথি-পদার্থ পদার্থ-উত্তরদ্বারা মানুসের পদার্থের উপাদান পাটী, বলা, বোঝ, বায়ু, অশ্রু, বহি এবং কিত। মানুসের পদার্থের ‘কিত’ বলিতে বীকার মানুসের ‘অশ্রু, মাস এবং অশ্রু; ‘বহি’ বলিতে বীকার তেজ অথবা উত্তাপ; ‘অশ্রু’ বলিতে বীকার তরু। উত্তরের মত চাহে প্রত্যেক জীবের পদার্থের উপাদান এই পাটী। ইহাদের মধ্যে কিত, বহি এবং অশ্রু, এই তিনটি উপাদানের যে কোন উপাদান বুদ্ধি অথবা হু-প্রাপ্ত হইলেই জীব অস্বস্থ হয়।

জীবের জীবনের প্রধান উপকরণ ‘বোঝ’। কিত, বহি এবং অশ্রু এই তিনটি উপাদানের যে কোনটি বর্ধিত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, জীবের অস্বস্থিত বায়ু হইয়া যায় এবং তাহার ‘বোঝ’ের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বোঝের পরিমাণ অত্যধিক কথি-পদার্থে জীব সন্তানকে প্তিত হয়।

কিত, বহি এবং অশ্রু এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কিতের বুদ্ধিতে ও ভাগে জীব অস্বস্থ হয় বটে, কিন্তু সন্তানকে

পতিত হয় না। বহিঃ এবং অস্থ অত্যধিক বৃদ্ধিতে ও হ্রাসে চরমের সম্বন্ধ ভীষের কঠিন পিড়া এবং সূক্ষ্ম অনিবার্ধ্য। কালে, ভীষের ব্যাধি ও পরমাত্ম অটুট থাকিতে হইলে, ব্যাধিতে তাহার পরীক্ষার বহিঃ এবং অস্থ অত্যধিক বৃদ্ধিলাভ অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত না হইতে পারে, তাহার বিবেচনা লক্ষ্য রাখিতে হয়।

“অস্থ” ও “বহিঃ”-র মধ্যে, মাহুয়ের পরীক্ষার বৈকল্য মঠন, তাহাতে তাহার “বহিঃ” অসহ্য বৃদ্ধিত হইতেছে।

মাহুয়ের সূক্ষ্মের বিবেচনা চারিদিক বেলিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার চট পংক্তি বহু অবিরত বর্ধিত হইতেছে। ইহা ছাড়া তাহার চট ও পদ-লক্ষণের দুইখানি ধর্মের চারিদিক সংযোগ-হুল এবং দুইখানি পায়ের চারিদিক সংযোগ-হুল অসহ্য এই দুইখানি অস্থির বর্ধন চমকিতেছে। চট্টী কঠিন বস্ত্র বর্ধনে যে, তাপের অথবা বহিঃর উত্তর হইয়া থাকে, তাহা বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণও পরিজ্ঞাত। কাষেই বেগা বাইতেছে যে, মাহুয়ের পরীক্ষার যে পরিমাণ “অস্থ”-র উৎপত্তি হয়, তাৎক্ষণিক অনেক অধিক পরিমাণে “বহিঃ”র উৎপত্তি অসহ্য হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মের তাপও বহিঃ-বৃদ্ধির অপর একটি কারণ।

এত অধিক পরিমাণে বহিঃর উৎপত্তি হয় বলিয়াই মাহুয়ের সূক্ষ্মের উত্তর হয় এবং বাস্তবক্ষেপে মাহু “অস্থ” গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। যে পক্ষে অসীমায়ণ কন অথবা অত্যন্ত বৈদ্য, সে পক্ষ কথ্যচিত্র মাহুয়ের উপকারী হইয়া থাকে। ইহারই কল্প বিভিন্ন মাহুয় নিজ নিজ লালসা পরিকল্পিত বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তি বাইয়া থাকে নটে, কিন্তু কেহই চটিল অথবা পয়ের প্রান্তর ব্যক্তি না বাইয়া পারে না।

কালে, মাহুয়ের ব্যাধি ও পরমাত্ম অটুট থাকিতে হইলে, প্রথমতঃ, মাহু ব্যাধিতে নিঃশ্বাসের সহিত “ভেদ” অথবা “বহিঃ”-পদার্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য না হয়, পরন্তু “অস্থ” গ্রহণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাধিতে প্রচুর পরিমাণে বান এবং পয়ের উৎপত্তি হয়, তাহার ব্যবস্থাও একান্ত সঙ্গোক্তনীয়। ভীষের উৎপত্তির পরিমাণ অটুট রাখিতে হইলে, ভীষেতে ব্যাধিতে “বহিঃ” অথবা “অস্থ”-র পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অথবা অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

এক্ষেপে বেগা বাউক, বর্তমান বিজ্ঞানের ফলে মাহুয়ের সমস্যার উদ্ভবের ন্যানে যে সে নতন ব্যবস্থা উদ্ভব হইয়াছে, তাহা হিতকরী অথবা অহিতকরী।—

(১) লৌহ, কয়লা প্রভৃতি পন্থিত পদার্থ ভীষের প্রয়োজনীয় বহিঃ অথবা ভেদ বর্ধন করিয়া থাকে। তাহা ভীষে হইতে উত্তোলন করিলে ভীষের উৎপাদন-শক্তি কমিয়া বাউবার আশ্রয় হয়। তাহা হইলে ভীষের সঙ্গত ভীষের উৎপাদন-শক্তি হ্রাস হইয়াছে। আশ্রয় বাহ্যিক ভেদে পক্ষণ বংশ পূর্ণ যে ভীষের কলনের পরিমাণ প্রাপ্তি বিচার ৭ মণের উপর ছিল, এক্ষণে তাহার পরিমাণ হইয়াছে কিকি-বুধ ৩০ মণ।

(২) ব্যাধিতে ভীষের পদার্থ বান ব্যবহার করিলে পদার্থের তরলবস্তুতঃ আঘাতীয় মস্তিষ্কের এবং ট্রিগলারি ব্যাধি-প্রতিষেদক লক্ষ্য করিতে হয়। মস্তিষ্ক “বৃদ্ধি”-র আশ্রয়-হুল এবং তাহা অত্যন্ত ক্ষম বস্তু। ইহা ব্যাধি-প্রতিষেদক সহ করিয়া অটুট থাকিতে পারে না। ফলে বর্ধন পদার্থের ভীষ পদার্থ-পথে ব্যাধিতে করিলে মাহুয়ের বৃদ্ধি ও চক্ৰগতির প্রয়োজনীয় শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। একটী ব্যস্তকের মস্তিষ্ক আসাবদি কাল প্রতিদিন কিছুকালের ভীষ ব্যাধি প্রদান করিলে এই কপাল সত্যতা উপলব্ধি হইতে পারে।

(৩) ফেল, ঘোটক প্রভৃতি স্থল-বান্ধের ব্যবহারে বাহু মণ্ডল অত্যধিক “বহিঃ” অথবা “ভেদ”-সংস্কৃত হইয়া থাকে এবং নিকটবর্তী ভীষের পদমাপ্তগতি বর্ধন-প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত “ভেদ”-র কাণ্ডার হইয়া পড়ে। তাহার ফলে ভীষের উৎপাদন-শক্তি কমিয়া বাউবার এবং পদের অশ্রয়ের উত্তর হইবার সম্ভাবনা হয়।

(৪) এরূপে প্রাপ্ত আশ্রয়-বান ব্যবহার করিলে বাহু মণ্ডল বিকৃত “বহিঃ”-র আশ্রয়-হুল হয় এবং যেগুলি ছিঁড়িত হইয়া যায়। বাহু মণ্ডল বিকৃত “বহিঃ”-বৃদ্ধি হইলে, মাহু তাহার নিঃশ্বাসের সহিত ভেদ ও বিকৃত বাহু গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং অস্থ হইয়া পড়ে। যেগুলি ছিঁড়িত

হইলে কোথাও অতি-বৃষ্টি এবং কোথাও বা অনাবৃষ্টি দেখা যায় এবং দক্ষর বাস্তব-ক্ষেত্র অগ্রাধু্য অনিবার্য হইয়া পড়ে।

(৫) টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং বৈতার প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার অত্যধিক পরিমাণে আরম্ভ হইলে, বায়ুমণ্ডল অত্যধিক বহিঃসূক্ত হয় এবং তাহাতেও মাপ্তবেষ বাতা, ভয়ী উল্কাগতি এবং বাস্তব-ক্ষেত্র স্বাভাবিক হইবার সম্ভাবনা হয়। অধিকন্তু মাপ্তবেষ কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মাপ্তবেষ বৃদ্ধির দ্রাসের আশঙ্কা ঘটে।

(৬) কৃত্তিক উপেক্ষা করিয়া ভৌতিকর চক্র শির ও বায়ুজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মাপ্তবেষ সমগা তাহার পশ্চাদ্ভাগ প্রান্ত ও বিক্রমের চক্র পরস্পর-পেক্ষ হইতে বাধ্য হয়। আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের পত্রিকায় বহুবার আলোচনা করিয়াছি। ভৌতিকর চক্র শির ও বায়ুজ্য পৃষ্ঠীত হইলে, বিভিন্ন মাপ্তবেষ ভিত্তর স্বয়ং, কলর, হিংসা এবং পরস্পর-কাতরতা অনিবার্য। শির ও বায়ুজ্যের দ্বারা জগতের এক-অষ্টাংশিক লোকের অরুণ্যমান কিছুতেই হইতে পারে না।

(৭) শিরের চক্র যে স্থানে হয় বায়বস্ত হইতে, সে স্থানের বায়ু অত্যধিক তেজঃসূক্ত হইয়া থাকে এবং তাহার বহু-চালনার চক্র নিরুদ্ধ হইয়া, তাহার অত্যধিক বহিঃসূক্ত বায়ু নিখালের সহিত প্রলম্বিত হইয়া হইতে পারে এবং অল্পই হইয়া পড়েন ও তাহাদের অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু ঘটে।

(৮) আবাস-পৃষ্ঠ-নির্মাণে লৌহের ব্যবহার হইলে মাপ্তবেষ তাহার নিখাল-প্রস্থানে লৌহসংযুক্ত বায়ু প্রলম্বিত হইয়া যায়। লৌহে যে উপাধানের আধিক্য, তাহা মাপ্তবেষ শরীরেও বিদ্যমান আছে। ঐ উপাধান হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, মাপ্তবেষ পক্ষ লৌহ প্রলম্বিত করার প্রয়োজন হয় এবং ইহারই চক্র মাপ্তবেষ প্রলম্বিত করে এবং লৌহ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে লৌহ ব্যবহার হইলে মাপ্তবেষ অস্বাভাবিক অনিবার্য।

(৯) পানীয় জল বিস্তরণে লৌহনির্মিত নলব ব্যবহার হইলে, মাপ্তবেষ তাহার পানীয় জলের সহিত সামান্য সামান্য মাত্রায় লৌহ প্রলম্বিত হইয়া যায় এবং তাহার অস্বাভাবিক অনিবার্য।

(১০) মাপ্তবেষ ও মাপ্তবেষ ও পানীয়জল ব্যবহার হইলে মাপ্তবেষ “বহিঃ” উপাধান অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মাপ্তবেষ অস্বাভাবিক অনিবার্য।

(১১) পত্রিকায় জালা-দ্রুত প্রভৃতি অল্পই ব্যবহার হইলে, মাপ্তবেষ “বহিঃ” উপাধানের বৃদ্ধি হইয়া অল্পই তার ক্রম উপস্থিত হয়।

(১২) বৈজ্ঞানিক আলোক ও শব্দের নহল প্রচলনে বায়ু-মণ্ডলে “চক্র”-পদার্থ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং মাপ্তবেষ তাহার নিখাল-প্রস্থানে অত্যধিক “বহিঃ” প্রলম্বিত হইয়া যায় এবং তাহার অস্বাভাবিক অনিবার্য হইয়া পড়ে।

(১৩) পূর্বে যাহা বোঝান হইয়াছে, তদনুসারে বাতাসের চক্র সমুদ্র-বান, স্থল-বান এবং আকাশ-বান মাপ্তবেষ পক্ষে যে অস্বাভাবিক, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব মাপ্তবেষ পৃথিবী গায়েতে মাপ্তবেষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে পারে, তাহার ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয়। এইজন্য ভারতীয় ভবিষ্যৎ নদী ও পাল-পথে ক্রমশঃ জল-বানে বাতাসের ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে বায়ুমণ্ডল অত্যধিক বহিঃসূক্ত হইতে পারিত না এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠের দ্বারা মাপ্তবেষ বৃদ্ধির মাত্র উপাধান হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা ঘটিত না।

এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকা পৃথাক পৃথক পৃথিবী মেননবার জল-পথে পরিভ্রমণ করিবার উপযোগী জল-পরিপূর্ণ নদী যে ৩০০ বিঘ্রমান ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও পাওয়া যায়। ভারতের ভবিষ্যৎ যে জল হইতে সত্ত্ব লভ্য “তেজঃ” প্রলম্বিত করিয়া কি উপায়ে জল-বান-চলনে ব্যবহার করিতে হয় তাহা জানিতেই, তাহাও মনে করিবার কারণ আছে। আমরা বর্তমান যুগে যে সমস্ত সংবাদ পাইয়া থাকি, তদনুসারে অনেক বৈধি সংবাদ যে

উপাসনের কোন ছিল, তাহা “প্রমাণপূর্ণতা” বলায়
অর্থ প্রচারিত হইলে মানব নৃত্তিতে থাকিবে।

জগতের নবোত্তলি ধর্মোত্তে মায়া বসন্ত কালে পরিপূর্ণ
যাকে, তাহার বাসনা হইলে, মানব ক্রতমাণে জগৎ
বাস্তবত্বের “বহিঃ-নৃত্তি” এবং জগৎ উৎপাদিকা-
শক্তিই হইল না কথিতা মায়া পুনির্নো পদব্রজ
করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু, মায়া জগৎ-বসন্ত
নবো মায়া বসন্ত কালে পরিপূর্ণ বাসনার
বাসনা সাধিত হইলে, জগৎ উৎপাদিকা শক্তি
হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যায় এবং বাসনা দ্বারা
জগৎ-প্রাকল্পন “আনন্দ” কথিতা যায়। বর্তমানে নবো
ও বাসনা-পূর্ণতা প্রতি উৎপাদিকা কথিতা পূর্ণ-পূর্ণ
প্রমাণের প্রমাণবসন্ত: মায়া জগতের নবোত্তলি
জগৎ-প্রাকল্পন কথিতা হইতেছে। তাহাতে জগৎ-
প্রমাণ আর মায়া বসন্ত জগৎ-প্রাকল্পন না এবং তাহারই
ফলে জগৎ উৎপাদিকা শক্তি জগৎ-প্রাকল্পন
হইতেছে। অধিকন্তু নবোত্তলি পরিপূর্ণ ও পদব্রজ
কথিতা বাসনার বাসনা দ্বারা প্রমাণ অনিবার্য
হইয়া পড়িয়াছে।

(১৪) দ্বিতীয় দ্বৈততার প্রমাণবসন্তের ফলে মানব
নিষ্কাশের সহিত অতিরিক্ত “তত্ত্ব” প্রমাণ করিতে
যায় এবং প্রমাণবসন্তে তাহার অস্বাভাবিক
অনিবার্য হইয়া পড়ে। প্রমাণবসন্ত ও হেতিও
বাসনার ফলে মানবের বাসনিক শব্দ-
চর্চায় মায়া কথিতা যায়। বাসনিক শব্দ-চর্চা
যে কত প্রমাণবসন্ত, তাহা প্রমাণবসন্তের “অন্যোত্তর
চর্চা” গত মায়া উপাসনা “জগতের বর্তমান সমাজ
ও তাহার পূর্ণতার উপাসনা”-শব্দ প্রমাণ “প্রমাণ ও
নিষ্কাশ সাধিতা কি, এই প্রমাণবসন্তে দেখাইয়াছেন।

(১৫) বর্তমান অন্যান্য নবোত্তলি চারিত্রী:—

(ক) শির-বাসনিক বসন্ত প্রমাণিত হইতে পারে, কথিত
ও প্রমাণ লাভ করিতে পারে না। কথিত
জীবিকার জগৎ শির-বাসনিক প্রমাণ প্রমাণ
কর। ইহা যে কতদূর জগৎ-পরিপূর্ণ, তাহা
অজ্ঞানত্বের জগৎ-প্রমাণের দ্বারা উচিত।

(খ) চারিত্রিক নৃত্তি কর। সমস্ত বাসনা বসন্তে হয়
“মানবের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া গ”। ইহা অস্বাভাবিক
নবো কি?

(গ) “প্রমাণের দ্বারা নৃত্তি কর,” অর্থাৎ মানবের
প্রমাণবসন্তে তিনি বাসনিক প্রমাণ না হয়, তাহার
চর্চা কর। তাহা কি অস্বাভাবিক নবো?

(ঘ) পদব্রজ প্রমাণের জগৎ প্রমাণবসন্তের বাসনা
কর। অস্বাভাবিক যে অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক,
তাহা কি কতদূর নৃত্তি কর অস্বাভাবিক করিতে
পারেন?

কথিতা যেহে হইতেছে, বর্তমান বিজ্ঞান যে যে বিষয়ের
আলোচনা করিতেছে, তাহার কোনটাই সম্পূর্ণ আলোচনা হয়
নাই এবং তৎকালে প্রমাণিত নিয়ম বসন্তে মায়া প্রমাণিত
হইতেছে, তাহার অন্যান্য পরিপূর্ণ (terminology)
এবং সংজ্ঞা (definition) মায়া। যে যে বিষয়কে
প্রমাণিত নিয়ম বসন্তে মায়া প্রমাণ, সেগুলি প্রমাণ: অসম্পূর্ণ এবং
মূলত: অস্বাভাবিক। বর্তমান বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতা সমাজের
প্রমাণের মায়া বাসনা উৎপাদ ও বাসনিত হইতেছে,
তাহার প্রমাণবসন্তে মানবের অস্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক
কথিত।

এই সমস্ত দ্বৈততা যদি বলা হয় যে, বর্তমান জগতে প্রমাণ
“বিজ্ঞান” নাই এবং বাসনা বিজ্ঞানের মায়া চর্চিতেছে তাহা
“জ্ঞান”, তাহা হইলে কি অসম্পূর্ণ হইবে?

তা: দ্বিতীয় তাহা প্রমাণবসন্তে মায়া করিতে বর্তমান
বিজ্ঞানকে “জ্ঞান” বলেন না কেন এবং অস্বাভাবিক তাহার
কতগুলি মায়া প্রমাণের কথিতা মানবের বিজ্ঞানের কথিত
হয় কেন? তা: দ্বিতীয় সমস্তগুলি মায়া করিতে কি
নৃত্তি কর তাহা বলা যায় না, বর্তমান “জ্ঞান” মানবকে
নিষ্কাশ করিয়া দেয়?

তা: দ্বিতীয় বসন্তের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মায়া তিনি
বসন্তেছেন যে, “বর্তমান জগতে মানবের সমাজের উন্নতি
হইতেছে।” অস্বাভাবিক বসন্তবসন্তে বাসনিক মায়াই যে
বসন্ত, তাহা মায়া মায়া কর। ইহাও বর্তমান জগতের
মানবের জীবন-সমাজের অস্বাভাবিক পরিপূর্ণ। “সমাজ” শব্দটির
অর্থ মায়া তাহা চর্চা কথিতা থাকিলে, বর্তমান জগতে যে

জনগণ: সমাজের ধর্ম হইতেছে, তাহা বৃত্তিস্থিত ভাবে স্বীকার করিতে হয়।

“সভা” শব্দটি বাংলা ভাষায় আধুনিক। সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটির প্রচলন একবারেই হেথা যায় না। এই শব্দটি ইংরেজী ভাষা হইতে গৃহীত। ইংরেজীতে সভ্যতার প্রতিপদ নিতিভিত্তিক (civilisation) এবং ইহার বিপরীত শব্দ মিলিটারীজম (militarism), অর্থাৎ ৬৭ অথবা ৬৮ প্রিয়তা।

স্বার্থানুসারে “সভা” বলিতে কি বুঝায়, তাহা প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়—যে, হিংসা, ৬৭, কলহ এবং বুদ্ধ-প্রিয়তার অভাবে মানুষের যে অবস্থা হয়, তাহার নাম “সভ্যতা”। বর্তমান জগতে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে যে, হিংসা, ৬৭, কলহ এবং বুদ্ধ-প্রিয়তা কি জন্মগত বাড়াইয়া দাঁড়িয়েছে না? ১৯১৪ সালের মত একটা মহাযুদ্ধ জগতের ইতিহাসে আর কখনও বৃত্তি পাওয়া যায় কি? যখন বাণিজ্য দৃষ্টি বর্তমান জাতিগুলির মধ্যে যে যে-হিংসা চমিকতেছে, তাহা কি ইতিহাসের আর কোনও সময়ে বৃত্তি পাওয়া যায়?

এই সমস্ত পেশিয়াও যদি বাস্তবতার প্রতি অন্ধ চেষ্টা কেহ বলেন, “সভ্যতার” উন্নতি হইতেছে এবং তীব্রতর যদি চিন্তা-দীপ্ততা-বিশেষ নির্দেশ দলা হয়, তাহা হইলে কি অস্বাভাবিক হইবে?

ডাঃ মিলের বক্তৃতার চতুর্থ অংশানুসারে, “একশত বৎসর পূর্বেও জগতের যে আভাবিক বিভব ছিল, এখনও ঠিক ঠিক তাহা ত’ আছেই, বরং একটু বাড়িয়াছে।”

“আভাবিক বিভব” বলিতে ডাঃ মিল কি বুঝেন, আমরা তাহা জানি না। তবে আমরা আভাবিক বিভব বলিতে বৃত্তি, প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটি বস্তু :—

- (১) জমির উর্বর্যাপত্তি,
- (২) উৎপন্ন পণ্ডের পরিমাণ,
- (৩) দেশের জনসংখ্যার আয়।

ইহার তিনটি পদ তিন হাজার বৎসর হইতে কনিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। অবশ্য, বিশেষ চিন্তাশীলতার সহিত অধ্যয়নশীল না হইলে, তিন হাজার বৎসরের প্রাতিষ্ঠিত অবস্থা ও তাহার পরিবর্তন অধ্যয়ন করা

যায় না। কারণ, বর্তমান জগতের লোকের বৃত্তি যেমন হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তদানী পক্ষণ বৎসরের আগেকার অবস্থা বৃত্তিবার উপযোগে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

গত পক্ষণ বৎসর হইতে বিভিন্ন দেশের বাৎসরিক কৃষি-বিবরণী ও বাণ্য-বিবরণী প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। তাহা পর্যালোচনা করিলে, জগতের প্রত্যেক দেশে প্রতি বিঘা জমীর উৎপাদিকা-পত্তি যে, পক্ষণ বৎসরের মধ্যেই ত্রুণ্য: অল্পেক পরিণত হইয়াছে এবং মানুষের অক্ষয়-বৃত্তি: প্রায় শতক শতাংশ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ ভাবে বৃত্তিতে পাওয়া যায়। বর্তমান জগতে কৃষিক্ষেত্র হই শত হই কোটি লোক আছে। কাষাক্ষমতা-কর উপযোগী আয়: বজার রাখিতে হইলে, মানুষের অন্ততঃ পক্ষে প্রতিদিন পড়ে এক পাউণ্ড চাউল অথবা সমজাত ত্রুণা খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে হয়। বর্তমান বিশ্বে “শততর” সমাজ ভাবে কেহ আলোচনা করেন নাট। কবেই, বর্তমান বিশ্বে চমকায় আয়: মানুষের যে প্রতিদিন এক পাউণ্ড চাউল অথবা সমজাত ত্রুণা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা না দেখা ও বুঝা সম্ভব হইতে পারে। সারা জগতের সমস্ত লোকের সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্যের মাত্র অন্ততঃ পক্ষে ৩০ কোটি টন সম এবং চাউলের প্রয়োজন হয়। তাহার মধ্যে বর্তমানে উৎপন্ন হয় মাত্র ২০০ কোটি টন। প্রতি বৎসর মানুষের ১০০ কোটি টন সম ও চাউলের অভাব পড়িতেছে এবং প্রত্যেক মানুষ অপ্রত্যক্ষ ভাবে অর্ধাহারী থাকিয়া অকালে মৃত্যুরূপে পতিত হইতেছে। চমিক বৎসর পূর্বেও জগতের এই অবস্থা ছিল না। এই অবস্থার জন্যই জগতের সর্বত্র হাহাকার আরম্ভ হইয়াছে। মানুষের বৃত্তি কি জিনিষ, বর্তমান “বৈজ্ঞানিক” সভ্যতা না জানায়, মানুষের বৃত্তি ত্রুণ্য: কনিয়া দাঁড়িয়েছে এবং তাহারই জন্য জগতের হাহাকারের কারণ নির্ণয় হইতেছে না। এ সমস্ত বস্তু অতি বিদ্বত। তাহা এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নহে।

যোড়ের উপর, জমীর উৎপাদিকা-পত্তি যে অতি ক্ষুদ্র গতিতে কনিয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যা যে ত্রুণ্য: অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে, তাহা গত পক্ষণ বৎসরের কৃষি-বিবরণী ও বাণ্য-বিবরণী দ্বারা পাওয়া যায়,

তাঁরা পর্যালোচনা করিলেই প্রাতিশ্রুত হইতে পারে।
ডাঃ মির যে ঐ বিষয়গুলি পর্যালোচনা না করিয়া
সম্পূর্ণ উক্তিই গণ্য করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ।
তাঁরা তাঁহাদের দাবিরজ্ঞানহীনতার পরিচয় একে অব্যাহত করিয়াছেন।

ডাঃ মিরের পক্ষের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের, “বর্তমান
বিজ্ঞান কায়িক প্রদেয় উৎপাদিকা-শক্তি বহুগুণ বাড়িয়া
বিদ্যছে।” বহুচলিত নিম্ন-প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে নজর দিলে
এই উক্তি আশ্চর্যজনক মত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সে
সমস্ত মাত্রণ ভৌতিকের ক্ষুদ্র পরি-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা-চলনার
কার্যে নিষ্ফল হয়, তাহাদের বাধা ও পরামর্শ বেতন-ক্রম
পতিতে অগ্রগতি হয়, তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিন্তা করিলে
ঐ উক্তি অসমর্থ্যবাহু হয়ে প্রতিলোভিত করা যায় না। তবেই,
ঐ ভাষ্যের উক্তি একেবারেই ভুল। একজন মানুষ
প্রত্যহ এক ভোজ্য হিসাবে কাপড় উৎপন্ন করিয়া যদি পচিল
বস্ত্রের কার্যক্ষমতা বজায় রাখিতে পারে এবং কাঁচা কপড়,
আর অপর একজন প্রাতিদিন পাঁচ ভোজ্য হিসাবে কাপড়
উৎপন্ন করিয়া যদি চারি বৎসরের মধ্যে কাঁচা-কপড় প্রায়ই
বলে এবং প্রাতিদিনই তাহার চিকিৎসার ব্যয় সংগ্রহ করিতে
হয়, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে না যে, বাধা বজায়
রাখিয়া প্রত্যহ এক ভোজ্য কাপড় উৎপাদন করিতে পারিলেও
কায়িক প্রদেয় উৎপাদিকা-শক্তি অসম্প্রসারিত বৈ?

ডাঃ মিরের বক্তৃতার ষষ্ঠ অংশ অস্বাভাবিক। “...কায়িক
শক্তি হইবার কারণ নাই, প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক শক্তি ও
অধ্যায়-পূর্ব্ব পাকা উচিত...” ইত্যাদি কথা বর্তমান সমাজের
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি বলিতে লজ্জা
হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে ঐ কথাগুলি বলিতে
পারিতেন না। বারিষ্টা ও বিবিধ অভাবের যদি কোন কারণ
নাই থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক সমাজে বারিষ্টা ও বিবিধ
অভাব থইতেছে কেন? আমাদের ধারণা ছিল যে, “স্বাভাবিক”
কি করিয়া নিরীক্ষণ করিতে হয়, তাহা যদিও বর্তমান বৈজ্ঞানিক
পরিজ্ঞান হইতে পাবেই নাই, তথাপি তাঁহাদের স্বাভাবিকতা
নিরীক্ষণ করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু ডাঃ মিরকে “বর্তমান
বৈজ্ঞানিক” আখ্যা অর্থাৎ করিতে হইলে, ঐ স্বাভাবিকতা
পরিবর্তন করিতে হয়, কারণ, ডাঃ মিরের যে স্বাভাবিকতা নিরীক্ষণ
করিবার ইচ্ছাটাই পূর্ণাঙ্গ নাই, তাহা তাঁহাদের বক্তৃতা হইতে

পরিষ্কৃত। তিনি কি বৈজ্ঞানিক, না কখনোই “তথাকথিত
বৈজ্ঞানিক”?

তিনি জাতিগত বাণী, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকবিদ্যের বৃত্তান্ত
অন্যত্র ভুলের উৎপাদিকা-শক্তি এতটুকু করিয়া দিয়াছে যে,
এখন আর নানা অন্যত্র লোকের শ্রম ও পরিশ্রমের
উপযোগ্য প্রকৃতি গর, ধান, তুলা, বেগুন এবং পশুদের
উৎপত্তি হইতেছে না। ফলে, ভুলের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি
করিতে না পারিলে কিছুতেই সমস্ত লোকের অন্ন-বস্ত্রের
সংগ্রহ হইতে পারে না। “অর্থনীতিবিদ” নামে তাঁহাদেরই
মত কয়েকটি-“সীমা-পারী” আদ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যাঁহারা
উৎপাদক কথা না বুঝিয়া যেসব নিম্ন-বাণী প্রদানের
পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা আমরা জানি। তাঁহাদের শ্রম
ও বাণী কি, তাহা না জানিয়া না বুঝিয়া, নিম্ন ও বাণীকণ
পরামর্শদাতা।

ডাঃ মির যদি তাঁহাদের চাক্ষুণ্য ছাড়িয়া দিয়া কার্যক্ষেত্রে
অন্যত্র হইতে পারিতেন, তাহা হইলে বৃদ্ধিতে পারিতেন যে,
মানুষের অন্ন-বস্ত্র অত্যাশ্রিত আছে কি না। তাহা তিনি
ভুলার ফলে কি?

তাঁহাদের বক্তৃতার মূল্য অংশ অর্থহীন। “নিজ্ঞান
জ্ঞান (knowledge) বিজ্ঞান, কিন্তু.....বিজ্ঞান
(wisdom) বৈজ্ঞানিক।” “জ্ঞান লাভ হইলে বিজ্ঞান লাভ
না হইয়া পাবে কিভাবে? এট উক্তিটি “বৈজ্ঞানিক”-
বলিয়াবিস্তার লক্ষ্যে অত্যাশ্রিত পারিতেন? বৈজ্ঞানিক
হইলে কি সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান হইয়া পরিভাষ্য হইয়া
করিতে হয়?

যোটার উপর দেখা গিয়াছে, ডাঃ মিরের বক্তৃতাটি
আত্মোপায় অসমর্থ, চিন্তাশীলতা-হীন, এমন কি বৈজ্ঞানিক-
হীনতার পরিচায়ক। ইহাও সমস্ত করিয়াছেন একটী
ইউরোপীয়। আমরা ইংল্যান্ডের লোকের লক্ষ্যে হস্তান্তর
করিয়া, তাঁহাদের সাধারণতঃ বুদ্ধিমান হীন হন না এবং বিশেষ
চিন্তা না করিয়া কোন মতের প্রকাশ করেন না। তাঁহাদের
শ্রমের দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদেরকে বুঝাইয়া দিলেই
তাঁহা বুঝিতে পারেন। আমাদের কি বুঝিতে হইবে
যে, ইংল্যান্ডের পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ ভাষ্যের
“সীমা-পারী”গুলির সংগ্রহ আদিয়া “পঞ্চাৎ”-লাভ করিতে
আরম্ভ করিয়াছেন?

“প্রকৃত বিজ্ঞান” নামকে যেন এম্‌ ত্যাগই উদ্দেশ্য ও প্রণোদন কি, তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল, কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা তাহা পারিলাম না। প্রবন্ধাক্রমে এই আলোচনা আশ্রয় করিব।

গণতন্ত্রের বর্তমান বিপন্ন অতি ভয়ঙ্কর। অবশ্য, তাহার

পরিবর্তন একদিনই সাধিত হইতে পারে না, এই “জীবা-পানী”-ভিত্তিক খাদ্যের পুষ্টিয়া ইহাদের দেওয়া সংতার পরিভাষা না করিতে পারিলে যে, কি উপায়ে জগৎ অক্ষয়ন ও অর্ধ-বন্দনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।

আমাদের শিক্ষা-বিভাগের পরিচালকগণ ও গৱৰ্ণমেন্ট এই দিকে মূৰ্ত্তিপাত করিবেন কি ?

স্বার জন এগারশন ও ভারতের বর্তমান অবস্থা

গত একশালের ত্রিতম বাৎসর্যের গৱৰ্ণমেন্ট জাৰ্জ জন এগারশন বাৎসর্যের বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তন করিয়াছেন এবং বিভিন্ন আশ্রয়-বন্ধুত্বের প্রত্যাহারের বাহানোকে বিভিন্ন এককের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহার উপদেশ অগাভ্যন্তরীণ বিভিন্ন হইলেও মূল্যবান: এক। তাহার কথায় বাহা দুই বাহা, তাহাতে বাহানোকে “জীবা-পানী” কলা তাহার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণিত। আমাদের মনে হয়। অবশ্য, কি করিয়া বাহানোর সঙ্গে পল্লীগোমে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার কোন ব্যবস্থাব্যবস্থা উপদেশ আমরা তাহার কোন বন্ধু-ত্ব পুষ্টিয়া পাই নাই। তথাপি তিনি আমাদের কতকগুলি পাত্র, কারণ বহুদিন আমরা এইরূপ ভাবে পল্লীগোমে দিগ্বিদ্যা ঘাইবার কথা কাগজ ও নিকট হইতে শুনি নাই।

স্বার জনের কার্যকলাপ ফেলিয়া ও কথাবাহী গুলিয়া আমাদের মনে হয়, বর্তমান গুণের বহু একজন কার্যকর লোক বাহানোর শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। শুধু বাহানোর কোন, ভারত-শাসনেও তাহার বহু চিত্তাঙ্গিন রাজনীতিজ্ঞ বহু দিন বেধা বাহা নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভারত-বর্ষে যে কাল মেঘ ঘনীভূত হইয়াছে, তাহা তাহারও মূৰ্ত্তিতে পড়িতেছে না। তাহা ভারতবাসীর প্রতীক। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে তিনি এমন সময়ে কথায় উদ্দেশ্য-প্রয়োজনোপায় উপদেশ দাতার শুধু কীবা কথা বলিয়া সম্বন্ধে করিতে পারিতেন না। তিনি যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন, তাহা গৱৰ্ণমেন্টের বর্তমান রাজ্য-পরিচালনার নীতি-

প্রকৃত এবং ঐ নীতির সম্বন্ধীভূত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু দেশের অসুখা বহানন বিচার না করিয়া শাসন-নীতি গঠিত হইলে অসুখপূর্ণ ও আর্থনৈতিক বিপদের সম্ভাবনা থাকে না কি ?

আমাদের মনে হয়, সারা ভারতবর্ষের ২৭ কোটি রূষক নিজেহোমুপ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, এমনও তাহার বিস্তারিত কথায় নাই তাহা সত্য, কিন্তু নিজেহোমুপ সমস্ত পূর্ণগণের প্রকাশ পাইয়াছে। রূষকেরা দর্শনহট তাহাদের জীবনের ও মহাজন-দিককে সন্থিত বাহা হইতেছে যে, তাহাদের ইচ্ছা সবেও তাহারা জীবনের পাখান ও মহাজনের জাগা নিতে পারিতেছে না। ইহাকেই আমরা বিস্তারিত পূর্ণগণ বলিয়া মনে করি। তাহাদের এই কথা প্রবন্ধমান্বক নহে। তাহারা কথিক পরিপ্রব করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। কথিক পরি-প্রবের সীমা আছে। তাহারা বহুই পরিপ্রব করুক না কেন, এক একজন রূষক সারাদিনে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবন বেশি চাহ করিতে পারে না; অর্থাৎ, তাহাদের প্রত্যেকের সংসারব্যাবসিয়ার্থে এমন কয়েকটা বস্ত আছে, বাহা না হইলে চলে না। কোনরূপ আমাদের বহু তাহারা ব্যবহার না করিয়া বিনাতিপাত করিতে পারে বটে, কিন্তু জীবন ধারণের জন্য প্রতিদিন এক বেলায় (দুই বেলায় নয়) অন্ন, রাজ্যের পুষ্টিয়ার জন্য জীবনের পাখান ও মহাজনের পুষ্টি, শাস্তা-নিবাহণের বহু একটুকরা দুটি ও শাকী এবং যৌক্ত-বৃষ্টির দাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে কোন রকমের একটা আচ্ছাদন। তাহাদের নিত্যই প্রয়োজনীয়।

যায়া নহুৎ সর্বোচ্চ (maximum) যে কয় বিধা জন্ম
 গণ করা তাহাদের কার্যিক পরিণাম দ্বারা সম্ভব, সেট কয় বিধা
 জন্ম হইতে যদি তাহাদের দ্বারা পরিণামের এক বেলায় অত্র,
 জন্মোৎপত্তির পাতন, মগজনের প্রভ, মজা-বিভাগের বহু এবং
 গৃহের অক্ষাংশের বহু-নির্দেশ্যগোষ্ঠী পত্র উৎপন্ন না হয়,
 তাহা হইলে তাহারা নিপন্ন হইয়া পড়ে। কবেই দেখা
 যাইতেছে যে, জন্মের বাৎসরিক উৎপন্ন ফলস্বরূপ পক্ষে
 একটা সর্বনিম্ন (minimum) পরিমাণের দ্বারা হইলে, কৃষকের
 জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। জন্মের উৎপাদনশক্তি
 অত্যন্ত কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে, তাহার উৎপন্ন শক্তির
 পরিমাণ কমিতে আরম্ভ করে। তখন কৃষক বাহ্য হইয়া
 প্রাণবন্ত, তাহার আশ্রয়ের বস্তুগুলি পরিচালনা করে। উৎপন্ন
 শক্তির দ্বারা আরও কমিয়া গেলে, দ্বিতীয়তঃ, কৃষক বাহ্য গৃহাঙ্ক-
 বনের প্রতি উপেক্ষাশীল হইতে বাধ্য হয়; তাহার পর ক্রমশঃ
 তাহার জন্মের ও মহাজননিগ্ধের প্রাণা পরিণাম করিবার
 অসামর্থ্যের উদ্ভব হয় এবং পরিণামে একান্ত প্রয়োজনীয়
 (বিশাসিত্যের নহে) অন্ন-বস্ত্রের অভাব হয় এবং প্রকান্ততঃ
 বিদ্রোহী হইয়া পড়ে। উৎপন্ন শক্তির দ্বারা প্রাণপ্রাপ্ত
 হইবার ফলে, কৃষক যখন জন্মোৎপত্তি-মহাজননিগ্ধের প্রাণা
 দিতে অসমর্থ হয় এবং বাণশক ভাবে কান্তরতার সহিত
 তাহাদের অসামর্থ্যের কথা জন্মোৎপত্তি ও মহাজননিগ্ধকে
 বলিতে আরম্ভ করে। তখন বৃদ্ধিতে চটবে, বিদ্রোহের
 পূর্ণলক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য, সময় সময় কোন
 কোন কৃষক প্রকৃত অসামর্থ্যের উদ্ভব না হইলেও
 অসামর্থ্যের অভিনয় করিয়া থাকে। এতদূর অভিনয় দ্বারা
 দ্বারা কোন কোন কৃষক করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা যুব
 বাণশক হয় না। যখন গোঁর সর্বস্বত সমস্ত কৃষক অসামর্থ্যের
 কথা প্রকাশ করে, তখন যে তাহা প্রাণশঃ সত্য, তৎসম্বন্ধে
 নিঃসন্দেহ হইতে হয়।

আমরা কার্যবাপনেষে শিল্প জীবনের বিরোধগোষ্ঠী
 বাস্তবের অবস্থা ব্যক্তিগত ভাবে অনুমান করিয়া এবং
 প্রত্যক্ষের বাৎসরিক কৃষি-বিবরণীর পর্যালোচনা করিয়া বাহ্য
 বৃদ্ধিতে পারিরাছি, তৎকালে বলিতে হয়, বাস্তবতার, তথা
 ভাষ্যস্বার্থের প্রায় সর্বত্র, জন্মের উৎপাদনশক্তি এবং প্রতি বিধার
 উৎপন্ন শক্তির দ্বারা বহু দিন হইতে (এখন কি ইংরাজ বাৎসরিক

পূর্ণ হইতে) কমিয়া আসিতেছে, এবং গত দিন বৎসর হইতে
 এই হ্রাসের দ্বারা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরাজ রাষ্ট্রের
 পূর্ণ হইতেই প্রতি বিধার উৎপন্ন শক্তির দ্বারা বহু দিন
 হইতেই এবং বহুবার এই হ্রাসের দ্বারা বৃদ্ধিতে ব্যক্তিগত,
 তিন বৎসর পূর্ণ হইতে প্রতি বিধার যে ফল হইত, তদ্বারা
 কৃষক ক্রমশঃ সহিত কোন ক্রমে জীবনবাহ্য নির্মাণ করিতে
 পারিত এবং মাঝার মাঝার আশ্রয়-উপভোগের বস্তুও ক্রম
 করিতে পারিত; কিন্তু গত দিন বৎসর হইতে প্রায় সমস্ত
 কৃষকই তাহা পারিতেছে না। তাহারই ফলে, গত দিন
 বৎসর হইতে ভাষ্যস্বার্থ অন্নবস্ত্রের হ্রাসের ক্রম-বিক্রম
 যুব কমিয়া গিয়াছে এবং তাহার বৈদেশিক আশ্রয়ীও
 হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৈদেশিক আশ্রয়ী যে হ্রাসপ্রাপ্ত
 হইয়াছে, তাহা তাহার দ্বারা যেট পরিমাণ সেবিবে বৃদ্ধিতে
 পাওয়া যায় না, কারণ হ্রাসের ফলার দ্বারা (role) বৃদ্ধিত
 হইলে, বাৎসরিক হ্রাসের পরিমাণ কম হইলেও তাহার যেট
 দ্বারা পরিমাণ বৃদ্ধিত হইতে পারে।

গত দিন বৎসর হইতে বস্ত্রের কটতিও ক্রমশঃই
 কমিয়া আসিতেছে। তাহারও কারণ, জন্মের উৎপাদনশক্তি ও
 প্রতি বিধার উৎপন্ন শক্তির দ্বারা এবং তৎসম্বন্ধে কৃষকের
 দুরবস্থা।

এখন যে ভাষ্যস্বার্থের প্রায় সর্বত্র, প্রায় সমস্ত কৃষক তাহা-
 নিগ্ধের জন্মের ও মহাজননিগ্ধের তাহা-নিগ্ধের প্রাণা দ্বারা
 অসামর্থ্যের কথা প্রাণশঃ করিতেছে, তাহারও কারণ জন্মের
 উৎপাদনশক্তি ও প্রতি বিধার উৎপন্ন শক্তির দ্বারা এবং
 তৎসম্বন্ধে কৃষকের দুরবস্থা।

এখনও বৎসরব্যাপি কার্যিক পরিণামের দ্বারা সর্বোচ্চ
 অধিক (maximum) যে কয় বিধা জন্ম গণ করা
 তাহাদের সামর্থ্যবাহী এবং তাহা হইতে তাহারা যে কয় ফল
 ফল পাইয়া থাকে, তদ্বারা কোন আশ্রয়ের বস্তু
 অথবা গৃহাঙ্কবনের অথবা জন্মের ও মহাজনের প্রাণা-
 পরিণামের বহু সম্ভাব্য হয় না বটে, কিন্তু কোন ক্রমে
 অতি ক্রমশঃ সহিত প্রাণশঃ অক্ষাংশ ও অর্থ-বসনোপযোগী
 অন্নবস্ত্রের সম্ভাব্য তাহাদের হইতেছে। তাই এখনও তাহারা
 প্রাকান্ততঃ বিদ্রোহ কল নাট। কেবল মাত্র তৎকালে
 তাহাদের জন্মের ও মহাজননিগ্ধের তাহাদের অসামর্থ্যের

কথা বলিতে অবসর কবিগাহে। কিন্তু গত বিশ বৎসর হইতে ভদ্রীষ উর্ধ্বাশক্তি হ্রাস, উৎসর্গ পতন অস্বাভা-
বিক এবং বঙ্গের সময়ে বঙ্গের বিকৃতি। পবিত্রাণে বৃদ্ধি পাইতে
অবসর কবিগাহে, তাহার গতি অন্তিমবিশেষ অবসর কবিগাহে
নঃ পশ্যে, প্রতি বৎসরই সারা ভারতবর্ষের সমস্ত কৃষকের
অধঃপতন ও অধঃপতনোপযোগি অধঃপতন ও অধঃপতন
পাকিবে এবং আগামী দুই তিন বৎসরের মধ্যেই স্থানে স্থানে
প্রকার বিশেষ অস্বাভা হইয়া পশ বৎসরের মধ্যে সারা
ভারতবর্ষ অগ্নি উদ্ভিগে—ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

ভারতীয় পাঠক, যেনের অস্বাভা একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া
পেখুন। একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে
পরিবেন যে, আমাদের ভাষা অস্বাভা নহে। অতি দ্রুত-
গতিতে ভারত যে অগ্নি বিশেষের সম্মুখে আগুমান হইতেছে,
তাহা ২৭ কোটি বৃদ্ধ কৃষকের বিশেষ। মনে রাখিবেন,
তাহার নিম্নে এবং নিম্নে ও সংখ্যা ২৭ কোটি এবং
কৃষক বাসীর অধিক হইয়া সারা সমগ্র ভারতের আশঙ্কিত
করিতে চক্ষুগাহে। কোন কামান-বন্দু ও অস্বাভা কটনোতি এই
বিশেষের মনে করিতে পারিবেন না। ২৭ কোটি কৃষক অস্বাভা
বিশেষ করিলে ভারতের বাকী আটকোটি লোক যে অতি দুঃ-
স্বচ্ছন্দ অস্বাভা পূরণ করিতে পারিবেন, তাহা মনে করিবার
কোন কারণ নাই। ভগ্নত এমন কোন স্থান নাই, যে স্থান
হইতে ভারতের ৩৬ কোটি লোকের অস্বাভা উপস্থিত হইলে
তাহার পূরণ হইতে পারে। একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া
ভারতের সর্বত্রই অস্বাভা। কেবলমাত্র ভারতবর্ষে এতদিন
পূর্বেই অস্বাভা সংখ্যা অস্বাভা অস্বাভা অস্বাভা
ভারতের ভদ্রীষ উর্ধ্বাশক্তি হ্রাস হইতে এবং ভারতবর্ষের সহিত
বাবলার সম্মুখ হইয়া ভগ্নত এতদিন পূর্বেই কোনরূপে কার্যকর
নিমিত্তপাত করিতেছিল। গত নয় বৎসর হইতে ভারতের
ভদ্রীষ উর্ধ্বাশক্তি হ্রাস অস্বাভা বৃদ্ধি গিয়াছে এবং সারা
ভগ্নত ও বিপন্ন হইয়াছে। আমরা জানি, ইয়োথোপিরগণের
মধ্যে অনেক এবং তাহাদের দ্বারা শিক্ষিত ভারতীয় 'সীমা-
পানী'-গুলি আনয়নের উপযোগি কথার সমর্থন করিবেন না।
তাঁহারা সমস্তের একটা কামনিক সংজ্ঞাসূত্রে মনে করেন যে,
ইয়োথোপ পূর্ব সমস্তি পাত করিতে পারিয়াছে এবং
ইয়োথোপিরগণের সমস্তি তাঁহাদের বান্ধিয়া হইতে উদ্ভূত।

কিন্তু তাঁহারা একবারও চিন্তা করেন না যে, ভদ্রীষ উর্ধ্বাশক্তি
পতি অটুট না রাখিতে পারিলে এবং তাহার ক্রমোন্নতি
সাধন না করিতে পারিলে এবং পরোপকার না হইলে
নিম্ন অস্বাভা বাণিজ্যের বিপন্ন হইয়া সমস্ত নহে।

এখন ঐ অস্বাভা-করতের ভিতর প্রতিটি হইলে চক্ষুগাহে না।
যেনের বাস্তব অস্বাভা দিকে লক্ষ্য করুন। সমস্ত কৃষক অস্বা-
ভা-বিশেষ হইয়া বসিয়াছে। তাহাদেরই অস্বাভা অস্বাভা
নিম্ন কথার তাহাদের ভদ্রীষ ও অস্বাভা-প্রাণ। পরিণাম
করিতে অস্বাভা-কথা জানাইতেছে এবং উকীল, ডাক্তার
ও বাসিন্দার প্রকৃতি যেনের সকলের অস্বাভা অস্বাভা
হইয়াছে। তাহাদের অস্বাভা পরিবর্তন না হইলে অতি দ্রুত
তাঁহারা একান্ত বিপন্ন অস্বাভা করিবে। তাঁহারা একবার
বিশেষ করিয়া বলিলে তাঁহা বসন করা অস্বাভা হইবে, কারণ,
ভারতবর্ষের পুরাতন ৩৬ কোটি লোকের অস্বাভা উপস্থিত
হইলে, অপর কোন দেশ হইতে তাঁহারা পূরণ করা সম্ভব
নহে।

এই বিশেষের আশা বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপায়,
ভদ্রীষ উর্ধ্বাশক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা। আমাদের পূর্ববর্তী
যে একবারে তাঁহা করিতেছেন না তাঁহা বলা যায় না। কিন্তু
পূর্ববর্তী যে সমস্ত উপায় এতাবৎ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহা
সার্থক হয় নাই এবং অস্বাভা-বিশেষে যে উপায় অবলম্বন
করিবেন বসিয়া অস্বাভা-বিশেষের কার্য হইতে মনে করা যায়,
তাঁহাও সার্থক হইবে না। ইহার কারণ ভদ্রীষ উর্ধ্বাশক্তি
উন্নতি কি উপায়ে সাধন করিতে হয়, তাঁহারা কোন কথা বর্ত-
মান অস্বাভা-irrigation-বিজ্ঞানে নাই। এবং বাস্তবতা
নিরীক্ষণ করিবার যে সার্থক থাকিলে বিজ্ঞানের এই অস্বাভা
পূরণ করা সম্ভব, সেই সার্থক বর্তমান অস্বাভা-বিজ্ঞান
বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কাহারও আছে, তাঁহাও মনে করিবার
কারণ নাই। তাঁহারা মনে করেন, আমেরিকা অথবা ব্রুসিয়া
প্রভৃতি বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিয়াছে, তাঁহারা ব্রাহ্ম।

কেবলমাত্র ভারতীয় কবিগণ এই উপায় জানিতেন এবং
তাঁহারা এই উপায় জানিতেন বসিয়াই ভারতবর্ষ এখনও
ভগ্নতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শত্রুপানি। কিন্তু আমাদের
চর্চাপাশতঃ, সংস্কৃত ভাষা এখন নিম্নত এবং ভারতীয়-
কবিগণের বসন ও বর্নন এখন নিম্নতর্থে প্রচলিত। বর্তমান

অধ্যায় ভিত্তীয় কবির এই উপায় কার্যকরী করিতে হইলে
সারসংক্ষেপ ও পৰ্য্যবেক্ষণের বিশিষ্ট হইতে হইবে।

বাহ্যিক হইলে অথবা ভাবের যে, বিশেষণ শোষণ
পৰ্য্যবেক্ষণে সুসীদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা লাভ না করিতে
পারিলে, আশ্রয়ের অজ্ঞানতা দূর করিবার কোন উপায়
নাই—ঈহাদের কথা ঠিক অথবা বৈঠক, তাহার বিচার
আশ্রয় আপাততঃ করিব না। ঈহাদের আশ্রয় সেপন,
বর্তমানে ঈহাদের ও ইংল্যান্ডের যে অথবা, তাহাতে
আশ্রয় চারি পাঁচ বৎসরের ভিতরে ইংল্যান্ডকে ত্যাগীয়া
হিতে পারিবার যে কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা বাস্তব সত্য।
অথচ চারি পাঁচ বৎসরের ভিতরে বৈশ্বাঙ্গী অজ্ঞানতা এবং
ভ্রমের বিশেষ উপস্থিতি হইবার আশঙ্কা আছে।

যদি ঈহাদিগকে কখন বায় যে, পৰ্য্যবেক্ষণের সহিত
বিশিষ্ট হইয়া কার্য করিলে অন্তিমভাবে আশ্রয়ের অজ্ঞানতা
দূর করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলেও কি ঈহাদের
পৰ্য্যবেক্ষণের সহিত সৰ্ব্বভাষায় বিশিষ্ট হইতে বিরত
কাম্বিবে ?

আশ্রয় আরও বহিরা রাধি যে, এই তার জন এগ্রন্থের
শোকটী এখনে থাকিতে একটা চেষ্টার আরম্ভ হওয়া
উচিত। কারণ, আশ্রয় বহুদূর বৃদ্ধিতে পারি, তাহাতে
জনতার সর্বত্রই দ্বন্দ্বের বৃদ্ধি অত্যন্ত করিয়া দিয়াছে এবং
পক্ষপাত বৎসর পূর্বেও জনগণ যে সংখ্যক দ্রবদী পোত
পাওয়া গাইত, এখন আর স্মৃতি তাহা পাওয়া যায় না।
তদুপায়ে ইংলণ্ডে দ্রবদী লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই করিয়া
আগিতেছে। তার জনের কাম্বালাপ সেবিয়া আমাদের
বাধ্য হইয়াছে, তাহাতে বঞ্চিত হই যে, তার জনের যত
কাম্বালাপ লোক এখন আর ইংলণ্ডে পূর বৈধি নাই,
এং হইত তিনি এখন হইতে চিন্তা পেলে তাহার তার
লোক আরওই কিছুদিন পাইবে না। অতএব তার জন যে
দুঃখভিত্তি অতীত আশ্রয় তাহা মনে করি না।

সেদের সমুদ্র বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া সেদের লোকের
পক্ষে এই কাম্বালাপেরতাইই অত্যাশ্রয় করা কি একান্ত
অসম্ভব ?

ভারতের অজ্ঞানতা এবং ২৭ কোটি লোকের বিশ্রোহের

আশ্রয় নিক আশ্রয় তার জন এগ্রন্থের দৃষ্টি
অকর্ষণ করিতে চাই। আমাদের মনে হয়, বর্তমানে তিনি
যে সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, দুঃখঃ তাহা তিনি—

- (১) বৈষ্ণবের শিক্ষা-বিষয়ক অনুসংগ্ৰহণ ;
- (২) স্বাধীনতার আন্দোলন নামে বাস্তবী যে উৎপাত
আরম্ভ করিয়াছে তাহার পূর্ণ উচ্ছেদ ;
- (৩) স্বাভাবিক বাহ্যেই আর পুনরুদ্ধারিত না হইতে
পারে, তাহার আয়োজন।

সেদের শাস্তি বলায় রাধিতে হইলে যে ঐ তিনি কার্যের
প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু
তদুপেক্ষাও বেশী প্রয়োজনীয় কার্য ক্রমের অনুসংগ্ৰহণের
বাহ্যে। এই কার্যে তিনি একবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই
তাহা বলা যায় না হইত, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য যে তিনি
বাহ্যে বৃদ্ধিতে পরিচালিত, তাহা তাহার কাম্বালাপ
হইতে এখনও বৃদ্ধা যায় নাই। প্রত্যয় অনুসংগ্ৰহণের কল
যে যে উপায় তিনি অত্যাশ্রয় করিয়াছেন, তাহার কোনমু
কার্যকরী হইবে কি না, তদ্বিকল্পেও সন্দেহ করা যায়।

ক্রমের অনুসংগ্ৰহণের একমাত্র উপায়, অতীত উপরতার
উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা এবং যে পদ্ধতিতে ঐ চেষ্টা সম্ভব
হইতে পারে, তাহার সন্ধান তিনি তাহার বিশেষজ্ঞদের
নিকট হইতে পাইবেন না, কারণ, ঈহাদের বিজ্ঞানে ঐ
পদ্ধতির বিবরণ নাই।

আমাদের মনে হয়, এদেশের কোন কোন অজ্ঞানতাবা
অতি-সাধারণ লোকের কাছে এখনও এই পদ্ধতির সন্ধান
পাওয়া সম্ভব।

তার জনকে মনে রাধিতে হইবে যে, পড়াটের প্রতিদিন
কল্পে কাহারও নিকট হইতে কোন তথ্যের অনুসন্ধান পাওয়া
যায় না, কারণ, সাধারণ মানুষের কাছে সম্রাটের প্রতিদিন
সম্রাট এবং কেবল তার অতিমানস পাইবার উপযোগী।

ঈহাদের নিজ দেশ ও নিজ জনের প্রতি কর্তব্য শ্রবণ করিয়া
একজন প্রাকৃতিক জনগণে তিনি অত্যাশ্রয় প্রদেশের শাসনকর্তা ও
বহুলাট মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ পদ্ধতির সন্ধান
করিতে সক্ষম হইবেন, অথবা একজন আশ্রয় করিতে পারি
না কি ?

বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের নূতন পরিকল্পনা

বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা-বিভাগ দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিকে প্রগতিশীলতার দ্রোত চট্টে উৎসাহ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপে সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে একটা পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখনও তাহা সন্দেহভাবের চিত্তা করিবার অবসর পাই নাই। কাহেই, বর্তমান সংখ্যার ২২শব্দকে কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যাহাভাবে এ সংকে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের অর্থ সাহায্যে হইবে যে, বর্তমান শিক্ষার সত্যের বিধান করা উদ্দেশ্যের পক্ষে অসম্ভব হইবে। কারণ, শিক্ষার মূলনীতি কি হওয়া উচিত, তাহা জনগণের বর্তমান শিক্ষা-বিজ্ঞান বহাৎ তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই।

হাউট স্পেনসার, রবার্টস, অ্যাংলী, কলো, কোং, মুলে সাইমন, পেনিং প্রভৃতি মনীষিগণ শিক্ষার মূলনীতি কি হওয়া উচিত, ২২শব্দকে অনেক কণা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের শিক্ষা-সংস্কারকগণও তাঁহাদের কাহারও কণা অবিকল গ্রহণ করিতে না পারিয়া ইংলণ্ডের শিক্ষার মূলনীতি গৃহ্য ভাবে স্থির করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু ইংলণ্ডের শিক্ষানীতি ইঙ্গিত মূল প্রদান করে নাই। ইংলণ্ডের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে উন্নয়ন শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীতে তাহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবহার মূলে উন্নয়ন শতাব্দীর উন্নতি এবং উন্নয়নশীল শতাব্দীর অব্যবহার মূলে বিংশ শতাব্দীর অবনতি বলা হইতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কোন উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা যে ছিল না, তাহা শিক্ষার ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। ইংলণ্ডে উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে ১৮০২ সাল হইতে এবং তাহা ফলশ্রুতি হইয়াছে উন্নয়ন শতাব্দীর শেষ ভাগে।

কাহেই বলিতে হইবে যে, তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষার ফলে ইংলণ্ডের উন্নতি আর্য্যো হয় নাই, বরং তাহার ফলে তাহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রকৃত উচ্চ-শিক্ষা কি, তাহা ইংল্যান্ডিদের জানা নাই।

আমাদের মনে হয়, শিক্ষার সত্যের পক্ষে গভর্নমেন্টের খুব খোঁজা অবলম্বন করা উচিত।

সংবাদ

শিক্ষা

১২ মাসে প্রকাশিত শিক্ষাবিষয়ক সংবাদসমূহের মধ্যে ২২২-সংখ্যার গঠিত। সমগ্র উল্লেখযোগ্য :—

[১] গিদলার ২২ আগস্ট তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ, ভারত-সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পরিদর্শন-সভার (Central Advisory Board of Education) পুনরুজ্জীবন-সংকল্প।

[২] বাঙ্গালা-সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক সংবাদ :—

(ক) ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে বাঙ্গালার লাইসেন্সের বক্তৃতা ;

(খ) ভিক্টোরিয়ার অর্থ পার্সনাল ইন্সট্রাকশনের ১৯০০-০১ সনের বিবরণী-প্রকাশ ;

(গ) শিক্ষার নূতন পরিকল্পনা-প্রকাশ ও তথ্যবিষয়ে জনসাধারণের সন্ধানত আওতায়। এই পরিচয়গ্রহণ-

যাত্রী দুই বার, বাঙ্গালা-সরকার বর্তমানে শিক্ষাকে পরা-উপযোগী এবং মঙ্গল-বিশ্ব কার্যেতে সজ্জিত। তদুপরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক-শিক্ষা ব্যবহার সংস্কার-করনা ; কিন্তু করনাগ্রহণ কার্যের অর্থাভাবের উল্লেখ।

(ঘ) অদ্বৈতবিশিষ্ট কলিকাতার শিক্ষা-সংস্কারোদ্দেশ্যে-মূলক একটি প্রদর্শনী ও শিক্ষা-সংস্কারে ব্যবহার ও শিক্ষানবী কঠক একটি সভার আহ্বান এবং সেই সভার এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কমিটি গঠন।

[৩] বাঙ্গালা-সরকারের এই শিক্ষা-পরিচয়নার বিভিন্ন সমালোচনার প্রকাশ :—

(ক) দেশের পত্রিকাগুলিও দেশের শিক্ষা-সমস্যা বিষয়ে চিত্তার অভাব এবং সরকারের ক্ষেত্রে বিক্ষোভ

সম্বন্ধে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, সরকারের এই পরিকল্পনা কেবল টেক্সটাইল শিল্পের বিভিন্ন শ্রবণ হইতে সাধারণ পাঠ্যবাহিনীকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা হইতে উদ্ধৃত—কারাগার কারাগার এমন সম্বন্ধে।

(খ) বিদেশীয়-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন নত—শিক্ষা-বিষয়ে দেশবাসীর স্বতন্ত্র কর্তব্য সর্বোপরি এবং সরকারী চেষ্টা অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক।

[৬] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ :—

(ক) তাইল্যান্ড-দেশের কর্তৃক আন্তর্জাতিক কলেজের নতুন অট্টালিকার উদ্বোধন উপলক্ষে এক বক্তৃতায় দেশের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সন্নিবিষ্ট বিশাল ও ভরসার প্রকাশ ;

(খ) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চট্টগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল অধ্যাপক কর্তৃক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইতিহাস ও ভূমি বিষয়ে বক্তৃতা।

[৭] বোম্বাই প্রদেশের সংবাদ :—

(ক) কংগ্রেসকর্মী শ্রীমুক্ত নারায়ণের বক্তৃতায় প্রকাশ, পাঁচ কিংবা দশ বৎসরের মধ্যে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব করিতে পারা ১০০ জন যুবক কর্মী আবশ্যিক।

(খ) চিত্র-বিজ্ঞানতত্ত্বের ছাত্র-ভূমি।

[৮] মাদ্রাস প্রদেশের সংবাদ :—

(ক) কলিকাতা প্রাদেশিক অর্থবিষয়ক সরকারী প্রতিষ্ঠান (Provincial Economic Council) যে শিক্ষা-কক্ষেও প্রচেষ্টা হইবে ইহার উল্লেখ ;

(খ) মাদ্রাস বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমুক্তাচন্দ্র মণিলালদেবের দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের লোকসংখ্যা-বৃদ্ধিতে আশঙ্কা প্রকাশ।

[৯] বিহার-উচ্চশিক্ষার সংবাদে প্রকাশ :—

(ক) শ্রী-শিক্ষার বিস্তার ;

(খ) শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে সরকার কর্তৃক নতুন বিভাগে কর্মচারী-নিয়োগ ;

(গ) ইউরোপীয়-পরিচালিত শিক্ষারতত্ত্বের ভারতীয় ছাত্র-ভূমি।

[১০] পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ :—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃক বাণিজ্যিক বিজ্ঞানের (technology) নতুন পাঠ্য-বাহিনী।

[১১] মাদ্রাসের সংবাদ :—

(ক) কলিকাতা বর্তমান শিক্ষা-সমস্যার বিতর্ক এক্ষেত্রে অর্থ-পত্রিক চন্দ্রকান্ত কর্তৃক ভারত সরকারের মন্তব্যে তত্ত্বের পরামর্শ-সভার উল্লেখ।

[১২] অন্ধ্রের সংবাদ :—

(ক) বিশেষতঃ পাঠ্য-গ্রন্থকে বিশেষ উপাধি-বাহিনী বিষয়ে তত্ত্ব ;

(খ) ওয়াশিংটনের ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্রদের বিতর্ক :— ভারত-দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যকরী না ও এহার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঠিক অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ-সাধন আবশ্যিক।

[১৩] মূল্যমান জগতের সংবাদ :—

(ক) আকর্ষণীয়ভাবে মূল্য-ভুক্তিকে আর্থনিক শিক্ষার বাহিনী করিবার আবেদন।

(খ) গভর্ন মানসীর আগা খাঁ কর্তৃক প্রাচীন ভূমি বিষয়ক ৫০টি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাবের উল্লেখ ;

(গ) মূল্যমান-বাহিনী বালিকাশিক্ষার বাণিজ্যিক শিক্ষার বিস্তারে আবেদন ;

(ঘ) মাদ্রাসের মূল্যমান ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীর প্রদেশ-সংস্কার বান্ধে প্রকাশ্যে করিয়া, জিরেটের বক্তৃতা ;

(ঙ) বাম্পাল কলেজের মূল্যমান-শিক্ষার তত্ত্ব বিশেষভাবে নিয়োগিত কর্মচারীর অগ্রগতি-বাহিনী বিষয়ক এই পত্রের গোপন প্রকাশ্যে করিয়া, জটিল মূল্যমান-মন্তব্যের বক্তৃতা ;

(চ) ইরানের নতুন ভারতীয় জগতের সমর্থন করিয়া কলিকাতায় জটিল মূল্যমান অধ্যাপকের বক্তৃতা।

[১৪] শিক্ষা-জগতের বিভিন্ন সংবাদ :—

(ক) বেঙ্গল-দেশের সংপ্রতিষ্ঠিত পাত্রিক মূল্যের সং-নিয়ুক্ত অধ্যাপক শ্রীমুক্ত বৃন্দ কর্তৃক এই মূল্যের উল্লেখ যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট উপাধি ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার প্রেরণ উপাধানের মিলন-সংগঠন, ইহা জ্ঞাপন ;

(খ) ত্রিপুরার অভিভাবকদের অগ্রগতি-বিদ্যালয়ে আর্থনিক সহ-শিক্ষা প্রবর্তনা ;

(গ) হাওয়া কলেজের অধ্যাপক বেঙ্গল-প্রদেশে প্রাচীন কর্তৃক বর্তমান শিক্ষার উপরি-কর্ম-প্রতিষ্ঠানের বাণ-বাহিনীর উল্লেখ ;

(ঘ) বাম্পালের মাদ্রাস ইন্সটিটিউটের অর্থ অপেক্ষা বহু-বাহিনী ;

(ঙ) ইংলও-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মূল্য ;

(চ) ক্রিষ্ণুর রাজ্যে শিক্ষিতদের অর্থ-প্রতিষ্ঠানের সংবাদ।

(ছ) প্রচলিত বিজ্ঞান বিষয়ে বাম্পালী বৈজ্ঞানিকদের কার্য-অর্থ তত্ত্ব এবং কার্য-কার্য-সম্বন্ধে ;

- (৮) শিক্ষাপ্রদেশে চাকরির মধ্যে পরিচিত কলকর্তা
নিয়োগের পাশ্চাত্যের অগ্রগতত্বের আচরণ ;
(৯) পুণ্যতত্ত্ব বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান ;
এবং (১০) সিংহের কোনও কলেক্টর অধ্যক্ষ কর্তৃক
‘জিজ্ঞাসা-বান’ (spirit of enquiry) যে সকল
জ্ঞানের মূল জিজ্ঞাসাবাদ করে—এই মত প্রকাশ ।

কৃষি

কৃষি-বিষয়ক প্রকাশিত সংবাদ :—

[১] বাঙ্গালা

- (ক) ভবিষ্যৎকালের এবং জগদীশ, বর্দ্ধমান, সাতমাগী,
কালনা, রাণাঘাট ইত্যাদি স্থানের লোকের বিকল্প
মত প্রকাশ সত্ত্বেও কৃষি-উন্নতি বিষয়ক বিল
আইন প্রণয়ন পুঙ্খানুপুঙ্খ ;
(খ) বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিভাগের ১১০০-০৫ শতকের
কাঁচা-বিবরণী প্রকাশ : সাইটটি বিশেষ বিস্তারিত
মধ্যে কৃষকদের কল্যাণকর প্রবেশ্য, আশ্চর্য্য,
করিমপুরে রত্ন-বৃন্দাবনের কৃষি-শিক্ষা : এবং ঢাকা
ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-প্রবেশবার্তা
উল্লেখ ;
(গ) ভারত-সরকার কর্তৃক বঙ্গীয় সরকারকে পল্লী
অফিসের উন্নতি-বিধানার্থে ১৮ লক্ষ টাকা দান ;
(ঘ) টম্পিন্সন কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার কর্তৃক
বঙ্গীয় সরকারকে নতুন বিধি প্রবেশবার্তা ১০০০
টাকা প্রদান ;
(ঙ) মৈনামতি সড়ের ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রণায়ন
বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সত্যেন্দ্র বোস কর্তৃক পুষ্টি-
তত্ত্ব—বাঙ্গালা দেশে পুষ্টি-পরিচালিত ক্ষেত্র-পরিচালনা-
নীতির সাহায্যে আর্থিক উন্নতির প্রাথমিক ও
মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার-সমস্যা দূর করা যাচ্ছে
পারে—এই মত প্রকাশ ;
(চ) বীরভূম ও বর্দ্ধমান অফিসে চুক্তি-স্বত্ব ;
(ছ) সরকার কর্তৃক বীরভূম ও বর্দ্ধমান অফিসে
১,০১,০০০ টাকার কৃষি-কলের ব্যবস্থা এবং
বর্দ্ধমানে কৃষকদের ৩৩ বিঘে (last relief
work) পরীক্ষামূলক সহায় ব্যবস্থা ;
(জ) ব্রিটিশ অফিসের চুক্তি-স্বত্ব বর্দ্ধমান অফিসে
সরকার ও জনসাধারণের মতের ;
(ঝ) প্রজা-সমিতি কর্তৃক কোটাধিকার আলোচনা ;
(ঞ) আগামী বৎসরের ৩৩ পাউন্ড-চাষ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ।

[২] মাদ্রাস

- (ক) সরকার কর্তৃক মদ্য-বিক্রয় কৃষি-উন্নতি-পরিচালনা
পল্লী : চাউল উৎপাদন হ্রাসের ক্ষেত্র, কলকর্তা

কলকর্তা জগদীশ, চাউলের সাতা বাউলো এবং
জিজ্ঞাসাবাদকে কৃষি-বিভাগের উন্নতিসাধন সাহায্য
বিধি প্রবেশবার্তা উন্নতি এই পরিচালনার
অন্তর্গত ;

- (খ) ভারত-সরকারের দান হইতে ৫০০ লক্ষ টাকা
কৃষকদের ও পল্লী অফিসে বাণিজ্য-সহায়তা ও লক্ষ
টাকা ব্যবস্থা ;
(গ) অফিসের বাড়ি উন্নতি-কর্তৃক নৌ-চালনার উপযোগী
করণ ;
(ঘ) অফিসের ও বোম্বাই অফিসে চুক্তি-স্বত্ব অফিসে
ভারপ্রাপ্ত সরকারী কলকর্তার অংশ-প্রদান ;
ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই অফিসের সাহায্য-
ব্যবস্থা বন্ধ হইলে ৪৮০০০ লোকের বিশেষ এইবারে
আশঙ্কা প্রকাশ ;
(ঙ) কলকর্তার চাউল-প্রবেশবার্তা হ্রাস ;
(চ) ইন্দোর অফিসে পল্লী-সহায়তা-সমিতির পরিচালনা
পরিচালনা ;
(ছ) সহায়তা-সমিতির কলকর্তার-কর্তৃক চাউল-
চাউলের সহায়-পরিচালনা ;

[৩] কৃষি-বিষয়ক অগ্রগতির সংবাদ

- (ক) কলকর্তার অফিসে উন্নতির ৩৩ ডেনমার্ক,
ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের অগ্রগত ব্যবস্থা
করা প্রবেশবার্তা—জটিল পত্র-লেখক কর্তৃক পত্রিকার
এই মত প্রকাশ ;
(খ) ‘টাইমস্’ পত্রিকার সম্পাদকীয় তত্ত্ব ভারত-সরকার
কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশের পল্লী-অফিসের ৩৩ এক
কোটি টাকা প্রবেশবার্তা প্রকাশ ;
(গ) কলকর্তার সহায়তা অফিসের উন্নতি ;
(ঘ) ১৫৫ হইতে ২০০০ ফ্রাই পল্লী টম্পিন্সন
কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল হিসাবের পরামর্শ-
বৈধক্যের অগ্রগত প্রবেশবার্তা, গভর্ণর, কৃষি
উন্নতি উন্নতি নানা বিভাগের পরিচালনা-কমিটি
নির্ধারণ ;
(ঙ) লক্ষ্য-এ পল্লী-উন্নতি কাঁচা-সত্ত্ব ;
(চ) উন্নতি-পল্লী সোমাল সরকারের পল্লী-উন্নতি-ক্ষেত্রে
০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তি ;
(ছ) বিহারে পল্লী-উন্নতি কাঁচা-সত্ত্ব ;
(জ) শিক্ষা-সরকারের কৃষি-বিভাগ কর্তৃক ২০ জন
কর্মচারী-সম্প্রদায়কে কৃষিক্ষেত্রে ৫ বৎসরের জন্য
শিক্ষাদান-ব্যবস্থা ;
(ঝ) ব্রিটিশ ও কলকর্তার পল্লী-উন্নতি কাঁচা-সত্ত্ব ;

- (ক) বহোদা সহকায কৰ্তৃক আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানভূমিকা
কৃষি উৎসর্গ-চেষ্টা, এবং
(ট) ডেনমার্ক ৪০০০ হেক্টর কৃষক কৰ্তৃক শাসন-
সংক্রান্ত সকল পদ চট্টে—বিশেষ কৃষি
সংক্রান্ত পরিকল্পনা চট্টে, রাজনীতিকদের বিচক্ষণতা
দ্বারা, ন্যেৎ শক্তিশালীন-গোথের ভিত্তি-প্রদর্শন।

শিল্প

শিল্পবিষয়ক প্রকাশিত সংবাদসমূহ :—

- [১] গত ১২০৩-০৪ সনের অল-ট্রিগা-ইনকান-ট্রাঙ্ক-
রিপোর্ট চট্টে, বাহালা ও আশামের এই দুই বংশের
শিল্পসম্পত্তি সংবাদ প্রকাশ ;
[২] শর্ভা-শিল্প :
(ক) ভারতবর্ষের শর্ভা শিল্পের ইংলণ্ডের বাজারে
সম্প্রদান—১৯০৪ সনের শর্ভা বাহিকাতে এই মত
প্রকাশ ;
(খ) কেন্দ্রীয় শর্ভা-পরিষদের প্রবর্তন-বোধ ;
(গ) ব্রিটিশের আন্তর্জাতিক পরিষদে ভারত-সরকার
কর্তৃক শর্ভা-বিশেষজ্ঞ প্রেরণ ;
(ঘ) কলিকাতা মেট্রোপলিটেন বোর্ডের দ্বারা কৰ্তৃক
ভারতের শর্ভা-শিল্পের অবস্থা বৃদ্ধি উন্নয়ন।
[৩] টাইল-বোর্ড :—
(ক) কাচ-বাহালা বিষয়ে এই বোর্ডের নির্ধারিত বিকল্প
কম্পেন্স বাহালা বাবদীয় শার্ভারিত পত্র
প্রকাশ ;
(খ) বেঙ্গল প্রদেশের টাইল কৰ্তৃক এই বোর্ডে বাহালা
সম্প্রদান অনন্যসের অল্পবোধ ;
(গ) টাইল-বোর্ড কৰ্তৃক কলিকাতার কাগজ-শিল্প বিষয়ে
তদন্ত ;
[৪] জাপানের ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত ;
[৫] বেকার অফ কমার্স কৰ্তৃক প্রতিভেট বীমা কোম্পানী-
দের অন্তর্ভুক্ত প্রক্তি দৃষ্টি আকর্ষণ।
[৬] ইংলণ্ডের শিল্প-বাণিজ্য :—
(ক) সরকার কৰ্তৃক ইংলণ্ডে শিল্প-সম্প্রদান প্রতীকার
অল্পবোধে বিকল্প কম্পেন্সের বিবরণ-প্রকাশ ;
(খ) প্রিন্স অব ওয়েলস কৰ্তৃক কোনও সভার (The
International Congress of Scientific
Management) ইংলণ্ডের শিল্প-কার্যের পূর্ণা-
পেক্ষা বৈশিষ্ট্যবৃদ্ধি উন্নয়ন ;
(গ) ১৯০৭ সন চট্টে বৃটিশ শিল্পের স্থায়ী বেলার ৯৮
১২ একর পরিমিত স্থানের ব্যবহার ;
(ঘ) লাভাণ্যের ভারতীয় ভূগা চালাইবার পক্ষে এই
ভূগা বর্ধমান যে মানস ক্রটি ভাঙ্গা দ্বয় চট্টে

উগা ওপরে চট্টে পাস—ভাইক টেক (Mr.
Short) কৰ্তৃক এই মত প্রকাশ।

ব্যবসা-বাণিজ্য

বাংলা-বাণিজ্য বিষয়ক প্রকাশিত সংবাদ :—

- [১] ইংলণ্ডের বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি মিঃ কলিম্যান ও
ব্রাঙ্ক-সভার মিঃ ওয়াশলন, দুই জনের ইংলণ্ডের
বাংলায় উন্নতি চেষ্টা, এই মত প্রকাশ ;
[২] বিশ্ব ও ব্রিটেনের বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রশংসার চেষ্টা ;
[৩] প্যাসা সংঘে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সংগঠন (Inter-
national Chamber of Commerce) কোন
সভার ব্রিঙ্ক ওয়াশলন চারটার কৰ্তৃক ভারতীয়
কাগজ-বাহালা বর্ধমান বৃদ্ধি প্রদর্শন ;
[৪] দ্বিবাচক কাগজ বাহালা-বৃদ্ধি চেষ্টা ;
[৫] নদীপুর চেম্বার অফ কমার্স কৰ্তৃক ভারত-সরকারের
বাণিজ্য-সম্পর্কে বিশেষ ভারতীয় বাণিজ্য-
প্রতিনিধি (Indian Trade Commissioners)
সংবাদবৃদ্ধি ও প্রদর্শন।

রাজ্য-শাসন

বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রকাশিত সংবাদ সমূহ :—

- [১] ভারতবর্ষ :
(ক) পার্লামেন্টে কৰ্তৃক নতুন ভারত শাসন বিল আইন
রূপে গৃহীত ও সভ্যদের সন্মত ;
(খ) আগামী যে মাস চট্টে দর্শক লিঙ্কগার বড়সিটি
পদে নিয়োগ ;
(গ) কলিকাতার গিলটিট প্রদেশের শাসন-ভার ভারত
সরকার কৰ্তৃক প্রদান ;
(ঘ) লাহোর অফিসে সাম্প্রতিক সংবাদ ; বড়সিটি কৰ্তৃক
এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির উত্তর-প্রদেশকালে
সাম্প্রতিক সংবাদের ও প্রদর্শন প্রকাশ।
[২] বাহালা :
(ক) কুমি-উন্নতি বিষয়ক বিল আইন রূপে গৃহীত ;
(খ) বাহালায় অল্পবোধের বিষয়ে বিকল্প অন্তর্ভুক্ত ;
(গ) বেলুচ ডিপার্টমেন্ট ও ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি রিপোর্টে
বাহালায় বাহালা ক্রমিক অবনতির সংবাদ ;
(ঘ) বাহালায় ডাকতির সংবাদবৃদ্ধি ;
(ঙ) বেকার-সম্প্রদান বিষয়ে বড়সিটির সমালোচনা ;
(চ) বাহালা অফিসে প্রচার-বিভাগ-প্রেরিত বেনি-
পুর পত্রী-অফিসে মঙ্গল সময়সীমার কার্য বিবরণী
প্রকাশ।

અનુર્થ મણીયની

বন্যুশিঙ্গাও তার শিরসে একতরফে স্থাপিত, 'তুফার' পবিত্র কবি
হোয়াঃকো বাঃ আসে তাকে এক পায়ঃ। বিঃ কিসাংলুঃ। শিঙ্গায়াঃ যে
কায়ঃ তারঃ প্রিঃ সত্যীকঃ স্থাপঃ কঃ চারঃ পায়ঃ খোয়াঃ বঃ স্থাপিঃখোয়াঃ
শোভঃ কিসাংলুঃ বাঃ প্রিঃ পায়ঃ। তুফার' পবিত্রকে চারঃ পায়ঃ লাব
কতঃ কঃ তাই বন্যুশিঙ্গাও শিরসেঃ উপলঃ স্থাপিতঃ। মানবঃ
বর্গঃতঃকঃ লিঃসেঃ সেই বহাঃ লাবঃকঃ লাবঃ আঃ লাবঃ প্রিঃ লাবঃ।

৪। যাহার বিজ্ঞানায় অনুষ্ঠান বোঝাই পড়িত হইত সেখানেই যেন বার
মানবতায় স্বেচ্ছা তার গুরু চিত্তিত আছে। সেই ক্ষেত্রে ঐ পদে আশ্রয়
সংগঠিতের মনুষ্য কল ফলে আশ্রয়কার মনে করি। রোগের প্রধান পদ এই
যে রোগে আশ্রয়কার সে যে কল মনুষ্য হইতে পারে। তদুপস্থিতের ক্ষেত্রে
পরিচিত কল ও আশ্রয়িত আশ্রিত মনুষ্যকেই আশ্রয় রোগের আশ্রয়কার
পিত্ত রোগ। কোন বিজ্ঞান ও আশ্রিত মনুষ্যকে—এই মনুষ্য পানীয় মনুষ্য
কিছরের মনুষ্যের পানীয় আশ্রয়কার মনুষ্যকে মনুষ্য।” অতএব ঐক মনুষ্যের
অনুষ্ঠিত মনুষ্য। যে পানীয় মনুষ্যের মনুষ্য মনুষ্য পানীয় পানীয় মনুষ্যের
আশ্রয়কার মনুষ্যের মনুষ্য।

[illegible][illegible]

ସର୍ବତ୍ର ସହ ମାୟାକୃତି ହୋଇ ବା କୃତି ସହ ହୁଏନି ହୋଇ, ନୟନ ଚକ୍ର
 ଦେଖିବା ସମୟେ କଥାଟା ସହ ନୟନ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ହୁଏ ଏହାଟା କାଳକର୍ମ
 ଓହ୍ଲାଇ ବା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ । ସାବଧାନ ଜାଣିଲେ ଡା ଗୋଟି ଆସିବା ଅମରତଥେନି
 ସିତକର ଏକଟି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇ । ଏ କଥା କଲାଣି ସମ୍ଭାଷଣ ଦେ ଡା ଗୋଟି ଆସିବା
 ଏହାଟା କାଳ କର୍ମ ନାହିଁ ନାହିଁ କାଳ କର୍ମ ନାହିଁ ବାହା । ଏ ପରି ଦେଖିବା ସାଧୁ
 କାଳ କର୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ ।

ৰোগেৰে ৰাজ্য কে ?

পুথিটির মধ্যে কোন কোন খণ্ডেরই বাংলা দেশের ভাট জমিদার ও গোপ-
খ্যার পরিশুভি হইয়া অত্যা ক্রমবর্তি ও প্রতিষ্ঠার আদ্যোপবর্তি নষ্ট করে। তা-
হুে বাংলা দেশে ১০ হাজার প্রায়ের কুলমাত্র ১০০০টি মাত্র লোক হইলগত।
পতীর যোজকের দোষে নষ্টকৃত হইয়া ক্রমশঃ মরার নিকট পৌঁছিয়াছে।
এইজন্য যেটি ছোট্ট স্মৃতিস্তম্ভ লক্ষ্যকর। পুঁ হইয়া পৃথিবীর সত্য
কৃত্ত করে। কিয়দ ভাগের যোবা বিচারে যে, নব্বই ৯৯ লক্ষ লোক ধাম
করে, দাবী দর প্রাপ্য। আর্থনৈতিক আধাবিহীনতা, ভাণ্ডার পল্ল মরগত
জমিদার দোষ অনেক কেন্দ্রমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট জারজর্য ১০ লক্ষ বাকসীরা
মুদ্রা। অত্যা খনিয়া ইত্যদে গোপনভাবে। অত্যা খনিয়াফেন।

বন্দ্য বা খালিরা খালিরা হুইতে পারে না, এ বিবেকে কোন সন্দেহ
নাই। ইন্দু-রোহিণী ধোয়েছে ভাত ইত্যাদি ভাতের খালি বিতরণিত হইয়া,
কম্বার ভাত মুখিকণা ভাগ ইত্যাদি সন্নিবিষ্ট হইয়া, টানবল্লভের ভাত ইত্যাদি
বীজান্ত্র জলের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতে না। খালিরা খালি বিতরণিত হইতে
ইহকে সম্পূর্ণরূপে বন্দ্য উপর নির্ভর করিতেই হইবে। জ্ঞান যোগ্যত্ব জ্ঞান
১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্দ্য। সর্বত্র খালিরা জ্ঞান লব্ধি প্রদান করিয়াছে।
খালিরা খালি জ্ঞানবিত্তের পথ পথ প্রকারের বন্দ্য জ্ঞান। জ্ঞানের পথ
জ্ঞান একজন ইন্টারভিউর জ্ঞানিক জ্ঞানি বন্দ্য। জ্ঞানের পথ
খালিরা খালি জ্ঞান বিতরণিত হইতে না। বন্দ্য ইত্যাদি খালিরা-বীজান্ত্র
বন্দ্য খালিরা খালিরা এই বীজান্ত্র ইত্যাদি খালিরা খালিরা খালিরা। জ্ঞান-
জ্ঞান ইন্টারভিউর জ্ঞানিক জ্ঞানি। খালিরা খালিরা খালিরা খালিরা।

এই প্রসিদ্ধিগত জাতিস বলা কক বিজ্ঞানবৃত্ত হইলেও তাহাও অসম্ভব।
হেটুগোষ্ঠ ও অকুটিয়ট খাটবৃত্তেই বই হয়। বিলিপাইন যেনে কক ন লোকা

[illegible]





ভারতের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায় (পূর্বাভাস)

—শ্রীমঙ্গলনাথ ভট্টাচার্য

“আধ্যাত্মিক সাহিত্য” কাহাকে বলে তাহার আলোচনা আমরা গত সংখ্যায় করিয়াছি। ঐ আলোচনা-প্রসঙ্গে “অজ্ঞান” বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উপশান্তি করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিপত্তি জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, তাহা দেখান হইয়াছে। আমরা যাহা বলিয়াছি, তদনুসারে কোন ভাবে “অজ্ঞান” বলিতে বুঝায়, পুরাপুরি সেটী ভীষ্মকে এবং তাহার উপশান্তি করিতে হইলে ভীষ্মের উপশান্তি, গুণ এবং কর্মসম্বন্ধে সর্বত্র জ্ঞানলাভ করিতে হয়। কোন ভীষ্মের উপশান্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তাহার সমস্ত উপশান্তির “আদির আদি”কে বুঝিতে হয়। সমস্ত উপশান্তির “আদির আদি”র নাম নিগুণ “বোধ” অথবা “ব্রহ্ম” অথবা “ঈশ্বর”। যদে রাখিতে হইবে, নিগুণ “বোধ” আশ্রয়ের পরোক্ষ প্রত্যক্ষ অংশ—বাস, মন, ইন্দ্রিয় এবং অহি ও মাংস রূপে বিদ্রিত অবস্থায় বহিরাগত এবং তাহার প্রকাশ হয়—নিরা এবং ধর্মীয় শব্দে। ব্রহ্মপদ পূর্ণতা তাহার অস্তিত্ব এবং কাৰ্য্য বজায় থাকে, তৎক্ষণ পূর্ণতা আমরা প্রাপ্ত হইবার করিয়া থাকি। যে মুহূর্তে আমাদের পরোক্ষপ্রত্যক্ষের তাহার কাণ্ডের বিরতি হয়, সেটী মুহূর্তে আমরা ব্রহ্ম হইয়া থাকি। কখনই আমাদের পরোক্ষ প্রকাশ করিবার সর্বোৎসাহে বাস্তব উপকরণ “বোধ” অথবা “ঈশ্বর”। বাস্তব জিনিসেরই “মর্শী” (observations) সম্ভব হয় এবং ব্রহ্মপদ পূর্ণতা বস্তুর বাস্তবতা নিরীক্ষণ করিবার সাধন। বাস্তব বজায় রাখিতে পারে, তৎক্ষণ পূর্ণতা তাহার জ্ঞান অটুট থাকে। বাস্তবতার পরিবর্তে বস্তু কল্পনার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়, তখন “বিকল্পিত” উদ্ভব হয়

এবং “কল্পন” প্রকৃত জ্ঞানের নামে চমকিত থাকে। তাহার ফলে মানুষের মনোবল চর্চা নষ্ট করিতে হয়। মানুষ রক্ষণ-কারিতা ভোগ করিতে করিতে মানুষ অবশেষে অজ্ঞানের আগ্রহ লয় এবং অজ্ঞান হইতে আবার জ্ঞানের উদ্ভব হয়। এইরূপে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ-সমাজে, জ্ঞানের পর কল্পন, কল্পনের পর অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের পর জ্ঞানের কাৰ্য্য প্রতিনিয়ত চলিতে থাকে। ভারতীয় জীবন এই কথার প্রমাণ। পত্নী হইয়া বংশধরের ইচ্ছাপূরণের, ভারতের এবং জনতার ইতিহাস যাহা যে প্রমাণিত চটতে পারে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। জ্ঞান, কল্পন এবং অজ্ঞানের বিধিবিধি ক্রমাগত বর্তমান জগতে জ্ঞানের উদ্ভব হইবার কারণ। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে সত্য যে হইতে পারিতেছে না, তাহার প্রমাণ—বর্তমান সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক কল্পন-কারিতা। প্রকৃত জ্ঞান বর্তমান থাকিলে কি এইরূপ সর্বজন “হাদ্যকার” উচিত পারিত? যে জ্ঞানে মানুষের বৈশিষ্ট্য কল্পন-কারিতা দূর করিতে না পারে, সে জ্ঞানের সার্বজনীন কোথায়? এই জ্ঞান ব্যক্তিগত পক্ষে কি কল্পন নহে? আমরা এই প্রশ্নের “কল্পন”কে “জ্ঞান” বলিয়া অভিহিত করেন, তাহা হইলে কি কল্পনসমস্ত ভাবে আত্মপ্রত্যয়ক বলা যায় না?

অনেকে মনে করেন, “বোধ”কে “ঈশ্বর” বলা ভারতীয় জীবন বর্ণনাবিধি কথায়। ইহা তাহারই প্রমাণ।

ঐ পক্ষপাতি হইতে কখনই মনে জ্ঞান হইলেও অজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে কোন্‌রূপে জ্ঞান হইলেও তাহার কোন প্রমাণ অস্তিত্ব না এবং ঐ পক্ষপাতি হইয়া কোন প্রমাণ উপস্থাপন, গুণ অথবা কর্মসম্বন্ধে বুঝা যায় না। এক কথায় অর্থহীন পরিভাষা (terminology) বা “বিশদ”।

* “পঞ্চাঙ্গনাথের ব্রহ্মপূজা বিবরণ” (পাঠ্যগ্রন্থ পত্র—১৪ অধ্যায় ২৪ পৃষ্ঠা)। “বিশদ” বলিতে বুঝায় কতকগুলি নামের সমষ্টি এবং

“দর্শন” শব্দকে ঔপাধের ধারণা ও জ্ঞান যে “দর্শন”ের ভাষ্য-
একত্ব এবং ঔপাধা যে চিন্তা করিয়া ভারতীয় কবির দর্শনের
মূল দৃষ্টি পড়েন না এবং তাহার অজ্ঞানতাবশতঃ তাহা পড়িতে
পারেন না, ইহা ঔপাধা বিবৃত হন। “দর্শন” চকুর অবস্থা-
বিশেষের একটী কাঁচা এবং তাহার বিধ—বস্তুর বাস্তব
উপস্থান, স্তম্ভ এবং কর্মক্ষমতা।

যে বসন্ত চকুর উপলব্ধিব্যোগ্য নহে, সেবোপলব্ধি কথিত হইয়া
ঔপাধের “দর্শন”ের আলোচনা দ্বারা করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন
হইলে “দর্শন” শব্দ যে অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং তাহাতে
কথিনিগদ্যকে যে অশ্রুতান করা হয়, ইহা বুঝা কি খুবই কঠিন ?
বিবিধ ভাষ্যকারগণ ভারতীয় কবির “ঐশ্বর্য”কে অব্যবহৃত করিয়া
তুলিয়াছেন, ইহা কি অস্বীকার করা যায় ? “ঐশ্বর্য” আশ্রয়ের
স্রোত এবং তিনি সর্বদা সর্বদা আছে, ইহা বুঝিতে পারিলে,
ঔপাধ বাস্তবতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বসন্তঃ
ঐশ্বর্যের ভাষ্য বাস্তব আর কিছু জগতে নাই। অতঃ পরে
ঔপাধকে অব্যবহৃত করিয়া তুলিয়াছেন। ঔপাধ বাস্তবতা
ঐশ্বর্য কথিত হইয়া না করিয়া ভাষ্যকারগণ যাহা বর্ণিত
ছেন, তাহাটী ঠিক, ইহা মনে করিয়া ঔপাধকে অব্যবহৃত করিয়া
তুলিলে ঔপাধ অশ্রুতান করা হয় না কি ? *

আশ্রয়ের মনে হয়, ভাষ্যকারগণের কথা তুলিয়া উপলব্ধি
ভাবে আশ্রয় ঐশ্বর্যের এবং সেবোপলব্ধি কথিত হইয়া
কথিতেছি বর্ণিত ইহা আশ্রয়ের বর্তমান সর্বব্যাপী চর্চা।

ভাষ্য পঠিতপন, আশ্রয় আশ্রয়ের শিখা-শিখার
অভিধান ত্যাগ করিয়া এখনও কি সত্য হইবে না ?
যোদ্ধা হইয়া আশ্রয় তাহার সন্ধান তাহা তুলিয়া
গিয়াছেন। আশ্রয় আশ্রয়ের গোত্র এবং প্রবর্তিত হইয়া
চৌকি করুন। যেখানে পাইবেন, আশ্রয় সর্বদাই পাঠি
কবির অবস্থা পাঠি বুঝির সন্ধান। আশ্রয় আশ্রয়
পাঠিতাভিধান ত্যাগ করিতে পারিলেই ভারতীয় কবির পাঠি
জ্ঞান ও বিজ্ঞান আশ্রয় পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।
আশ্রয়ের প্রকৃত পাঠিতা চিন্তা গিয়াছে বটে, কিন্তু
এখনও প্রাকৃতিক বৈদিক অশ্রয়বর্ধন (physical inability)
উদ্ভব হয় নাই। আশ্রয়ের মধ্যে ঔপাধা অশ্রয়

অশ্রয় শ্রুতি পাইয়াছেন এবং সন্ধান করিয়াছেন, ঔপাধের
শিখা ও শৈবিক শিখা (maosha membrane) বিকৃত
হইয়া শৈবিক অশ্রয়বর্ধন উদ্ভব হইয়াছে। আশ্রয়
কথিতপন প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান উদ্ভাবন করা আশ্রয়
পক্ষে বসন্ত, আশ্রয় পক্ষে বসন্ত নহে। আশ্রয়
আর একবার তাগ করিয়া কিছুদিন ধরিয়া আশ্রয় উদ্ভাবন
করিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে আশ্রয় ও আশ্রয়
কি বসন্ত, তাহা বুঝিতে পারিবেন এবং তখন আশ্রয় প্রকৃত
সংস্কৃত ভাষা * আশ্রয়বর্ধন চলেই বাহিয়া উঠিবে।
তখন মনুষ্যজাতির বাহিয়া থাকিতে হইলে বাহা বাহা
প্রকৃতবর্ধন, তাহার লক্ষণ যে ব্রহ্মী যৌবন্যের আছে—সেই
“পূর্ণ” ও “উত্তর” যৌবন্য আশ্রয়বর্ধন পক্ষে বসন্ত
সম্ভব হইবে। তাহার পর মনুষ্যের বাহিয়া থাকিতে হইলে
যে যে “বিকৃত” প্রকৃতবর্ধন, তাহার বিকৃতি যে “অশ্রয়বর্ধন”
আছে, সেই অশ্রয়বর্ধন বসন্ত ভাবে আশ্রয়বর্ধন
পারিবেন এবং মনুষ্যজাতির পক্ষে বর্তমান আশ্রয়
বিনশ হইতে
তক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে।

আশ্রয় আশ্রয় প্রকৃত যৌবন্য, উত্তর-যৌবন্য ও
অশ্রয়বর্ধন বসন্তেছেন, তাহা আশ্রয়বর্ধন ভারতীয় কবির
যৌবন্য অশ্রয় বসন্ত নহে। তাহা ভাষ্যকারগণের যৌবন্য ও বসন্ত
আশ্রয়বর্ধন কবির যৌবন্য ও বসন্ত যৌবন যৌবন
সব মনুষ্যজাতির মিন্দ সম্ভব করিয়া দিয়াছে, কারণ ঐ
ঐশ্বর্য প্রকৃত কথা সন্ধান এবং সব মনুষ্যজাতির
অশ্রয় প্রকৃতবর্ধন। আর ভাষ্যকারগণের কথাগুলি
প্রারম্ভ: ভাষ্যবর্ধন। ভাষ্যকারগণের কথাগুলি
ব্রহ্মী ভাষ্য সর্বদাভাবে একত্ব নহে এবং তাহা
পড়েন, ঔপাধের ব্রহ্মবর্ধন পক্ষ সর্বদাভাবে এক
অশ্রয়বর্ধন করা সম্ভব হয় না। ভাষ্যকারগণ
আশ্রয়বর্ধন ভারতীয় কবির বসন্ত, যৌবন্য, দর্শন, পূর্ণ, সংহিতা প্রকৃতি

* এখন যাহা সত্য হইয়া বসন্ত আছে, তাহা যে প্রকৃত
কথা নহে এবং প্রকৃত সত্য হইয়া যে বসন্ত হইতে বিকৃত
হইয়া বসন্ত, তাহা আশ্রয় এই প্রকৃত বসন্ত
বসন্ত এবং “বসন্ত” নামক বসন্তবর্ধন প্রকৃত
(এই বসন্ত প্রকৃতবর্ধন হইয়াছে) বসন্তবর্ধন
কথিত হইয়া পঠিতবর্ধন পঠিত অশ্রয়বর্ধন।

* বসন্ত পক্ষে বসন্ত ঐশ্বর্য অশ্রয়বর্ধন পঠিত
আশ্রয় ঐশ্বর্য আশ্রয়বর্ধন কথিত হইয়া পঠিত
আশ্রয়বর্ধন হইয়াছে।

একদিকে যে “বিকল্পিত” করিয়া দিয়াছেন, তাহা একবার আপনাতা চক্ষু বোলিয়া দেখুন। চাতুকার্যমণের মধ্যে “শত্রু”, শব্দ, প্রমত্তপার, অনিষ্টক, “বাংতায়ন”, বোণামেব, “কাভায়ন”, তটোক্তি-পীড়িতপ্রভৃতি মনোবিগল আছেন তাহা সত্য, কিন্তু আপনাতাও ৩ বলিয়া থাকেন, মনোবিগলেরও মতিভ্রম হইতে পারে—পরম সত্যি মতিভ্রম হইতে পারে, এই জাতীয় কোন প্রকার আপনাতার মধ্যে নাই।

একটু চক্ষু খেলিয়া চাহিয়া দেখিলে বেগিতে পাইবেন যে, বড়ই সম্বলটর সময় আসিয়াছে। সত্যিদিগের জ্ঞান ও বিজ্ঞান অনতিবিলম্বে উদ্ধার করিতে না পারিলে প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক মানুষকে অতি ভীষণ ভাবে বিপর্যয় হইতে হইবে। আপনাতা আপনাতার বর্তমান সমস্যা ও বোধ পরিচাণ করিয়া তাহার চেষ্টা একবার করিবেন না কি ?

কোন গভীর তথ্যে প্রবেশ করিতে চাইলে মতিভ্রম ও সেরে দ্বিতীয়তর প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমস্ত ত্রুটির উদ্ভব করে এবং সমস্ত গভীর ও মতিভ্রম প্রথম করিয়া দেয়—ইহা আপনাতা বুঝিবেন না কি এবং ইহা বুঝিয়া সমস্ত পরিচাণ কথিয়ার একটু চেষ্টা করিবেন না কি ?

প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা অস্বাভাবী পানিনি বখাখ অর্থে পড়িতে পারিলে বুঝিতে পারা যায়। বর্তমানে পানিনির বিচ্ছিন্ন স্বত্বগুলি যে যে অর্থে প্রচলিত, তাহা প্রায়শঃ অসম্ভব। এই স্বত্বগুলির এক একটা শব্দ বাচুশ অর্থে বাখায়াত হইয়া থাকে, তাহা কেন যে বাচুশ হইবে, তাহার কোন কৈফিয়ৎ যেওয়া যায় না। এক সময় ছিল, যখন আচার্য্যপণ সংস্কৃত ভাষার প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ কি এবং কেন তাহার সেই অর্থ হইবে তাহা জানিতেন এবং বিজ্ঞান-গণকে তাহা বিধাইতে পারিতেন। প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ কি এবং কেন তাহার সেই অর্থ হইবে, তাহা জানা থাকিলে বর্তমানে স্বত্বগুলি যে বিচ্ছিন্ন অর্থে প্রচলিত, তাহা চেষ্টা করিলেই বোধগম্য করিতে পারা যায়।

আপনাতার মধ্যে ঐচ্ছিক প্রকার এবং সত্যত, তাহাও “বিকৃত” উচ্চারণ অন্ত্যাস করিয়া “অ”-কার উচ্চারণ করিতে পরোয়ের কোন কোন স্থান ব্যবহৃত হয় এবং “অ”-কার হইতে “আ”-কারের উচ্চারণের কিরণ উদ্ভব হয়, তাহা পরিজ্ঞাত

হইবার চেষ্টা করুন। “অ”-কার হইতে “আ”-কারের উচ্চারণের কিরণে উদ্ভব হয়, তাহা জানিবার নাম, “আ”-পদ-উচ্চারণ অথবা “আ”-গম্ম। “আ”-পদ-উচ্চারণ করিতে পারিলে অথবা “আ”-গম্ম হইলে সংস্কৃত ভাষার কোন অক্ষরের কি অর্থ এবং তাহার লিখন-প্রণালী কি হইবে, তাহা জানা যায়। কোন অক্ষরের কি অর্থ, তাহা বখাখ তাহে জানা হইবার পর, সারস্বত-ব্যাকরণ পড়িলে সত্যই ভাষার প্রত্যেক অর্থ বোধগম্য হয়। সারস্বত-ব্যাকরণ প্রথম-শিক্ষাবীর সঙ্গোপকা প্রাচীন ব্যাকরণ। উহা যে অতি প্রাচীন কাণ হইতে প্রথম-শিক্ষাবিগণের তত্ত্ব ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা সচেষ্টই অনুমান করা যায়। কলাপ, সুদ্রব্যোদ, লক্ষ্মণসার, সুপার, শব্দকল্পণের, লক্ষ্মণকৌমুদী, লিঙ্কনকৌমুদী প্রভৃতি অপর সমস্ত ব্যাকরণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং তাহাদের প্রত্যেকের উদ্ভব হইয়াছে পানিনির বিচ্ছিন্ন হইতে। এই সমস্ত ব্যাকরণের কোনো পড়িয়া প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানা যায় না এবং তৎসমস্ত জ্ঞান হইতে ভাষার বিনা সহায়তার কোন মর্শনের মূল হয়, যেসকল মূল নয় অথবা কোন তত্ত্বের বীজময় বুদ্ধিতে পারা যায় না। আপনাতা যে কোন মর্শনের মূল হয়, বেগের মূল ময় অথবা কোন তত্ত্বের বীজময়, কোন ভাষার বিনা সহায়তার বুদ্ধিতে পাবেন না, তাহা কি অস্বীকার করিবেন ? কোন ভাষার বিনা সহায়তার যখন মর্শনের কোন মূল হইয়া আপনাতা বুদ্ধিতে পাবেন না, তখন আপনাতা সংস্কৃত ভাষা জানেন, ইহা মনে করেন কেন ?

সারস্বত-ব্যাকরণ এখন যে অর্থে প্রচলিত, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমশ্রুত নহে। “আ”-গম্ম অথবা “আ”-পদ-উচ্চারণ পরিজ্ঞাত হইয়া সারস্বত-ব্যাকরণ পড়িলে, কোন বৃত্তি অথবা ভাষার বিনা সহায়তার উচ্চারণ বখাখ অর্থ বুদ্ধিতে পারা যায়। তখন প্রত্যেক অব্যয়, উপসর্গ, বাচু এবং প্রত্যয়ের কি অর্থ হয় ও কেন সেই অর্থ হয় তাহা জানা যায় এবং শেষের ও বাক্যের অর্থ কি করিয়া বুদ্ধিতে পারা যায়, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। “আ”-গম্ম অথবা “আ”-পদ-উচ্চারণ পরিজ্ঞাত হইয়া সারস্বত-ব্যাকরণ পড়িলে, যে যে এই ভ্রমশ্রুত অর্থের ১৪ ও ২২র ভীতের “ব্যাক্তাংশ” (physical part) সত্যে নিশ্চিত, তাহার অর্থ নিহুঁলভাবে কোন

প্রথমতঃ নহে। “আ”-গম্ম অথবা “আ”-পদ-উচ্চারণ পরিজ্ঞাত হইয়া সারস্বত-ব্যাকরণ পড়িলে, কোন বৃত্তি অথবা ভাষার বিনা সহায়তার উচ্চারণ বখাখ অর্থ বুদ্ধিতে পারা যায়। তখন প্রত্যেক অব্যয়, উপসর্গ, বাচু এবং প্রত্যয়ের কি অর্থ হয় ও কেন সেই অর্থ হয় তাহা জানা যায় এবং শেষের ও বাক্যের অর্থ কি করিয়া বুদ্ধিতে পারা যায়, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। “আ”-গম্ম অথবা “আ”-পদ-উচ্চারণ পরিজ্ঞাত হইয়া সারস্বত-ব্যাকরণ পড়িলে, যে যে এই ভ্রমশ্রুত অর্থের ১৪ ও ২২র ভীতের “ব্যাক্তাংশ” (physical part) সত্যে নিশ্চিত, তাহার অর্থ নিহুঁলভাবে কোন

জন্মের বিনা সহায়তার বৃত্তিতে পাতা যায় বটে, কিন্তু যে সমস্ত এই কোন “অব্যক্তাংশ” (unseen and abstract ideas) সম্বন্ধে লিখিত, তাহার অর্থোচ্চার অর্থ্য মনোচ্চার করা যায় না। কোন বস্তুর অব্যক্তাংশের অর্থোচ্চার ও মনোচ্চার করিতে না পারিলে ব্যক্তাংশের মনোচ্চার বর্ণনা করা হইয়াছে কিনা, তাহার পরীক্ষা হয় না। কাহ্নেই পুরোক্ত উপরে কেবল সারস্বত-বাক্যরূপ পড়িলে, যে সমস্ত এই ভাষার ভূগাণ্ডের সহায়তার লিখিত, তাহার অর্থোচ্চার করা যায় বটে, কিন্তু মনোচ্চার বর্ণনা হইয়াছে কিনা তাহা বৃত্তিতে পাতা যায় না। আবার বেদ (আত্মিক ও ভাস্কর্য সম্বন্ধ), উপনিষদ, ধর্ম, ভূগুণ্ডপ্রভৃতি জ্যোতিষের এই মুদ্রা: বস্তুর অব্যক্তাংশের আলোচনার পরিপূর্ণ এবং এই এই-গুলি সংকৃত ভাষার সহায়তার লিখিত। মহা-পুণ্ড, উপপুণ্ড, বৃত্তি এবং বৃহৎসংহিতাপ্রভৃতি জ্যোতিষের এইগুলি প্রধানত: বস্তুর ব্যক্তাংশসম্বন্ধী আলোচনা বটে, কিন্তু এই এইগুলির প্রত্যেক বান্ধির মধ্যে আলোচ্য ব্যক্তাংশ কি করিয়া তাহার অব্যক্তাংশ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় বহু তথ্যের সন্ধান আছে। কাহ্নেই “আ-গম” সাহায্যে কেবল সারস্বত-বাক্যরূপ পড়িলে—সংকৃত ভাষা বহুতরু জানা যায়, তদ্বারা মহাপুণ্ড, উপপুণ্ডপ্রভৃতি এই আদিক ভাবে বৃত্তিতে পাতা যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিতে পাতা যায় না এবং বেদ, ধর্ম ও জ্যোতিষের হ্র-এইগুলির মনোচ্চার একেবারেই করা যায় না।

এই হ্র-এইগুলির মনোচ্চার করিতে হইলে পানিনি অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের যে সমস্ত “অব্যক্ত”-ভাব (unseen and abstract ideas) আছে, তাহা তাহার শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গের ও কি কি উপাদানের কোন্ কোন্ রকম কার্য হইতে উদ্ধৃত হয় এবং এই “অব্যক্ত”-ভাবগুলি (unseen and abstract ideas) তাহার কিরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে হয়, তাহার আলোচনা আছে পানিনি-ব্যাকরণে। কাহ্নেই “আ-গম”, সারস্বত-বাক্যরূপ ও পানিনি-ব্যাকরণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে সংকৃত ভাষা সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব হয় এবং তখন বেদ, ধর্ম ও জ্যোতিষপ্রভৃতির হ্র-এইগুলি কোন ভাষার বিনা সহায়তার পড়িতে পাতা যায় এবং প্রচলিত ভাষা বর্ণনা লিখিত হইয়াছে

কিনা, তাহাও বৃত্তিতে পাতা যায়। বেদ, ধর্মপ্রভৃতি হ্র-এইগুলির প্রকৃত মনোচ্চার করিতে পারিলে পুণ্ড, বৃত্তি ও জ্যোতিষের সংহিতা-এইগুলির বর্ণনাও মনোচ্চার করা অতি সহজ হয়।

আপনার মনে কেহ উপরোক্তভাবে সংকৃত ভাষা পুরাপুরি ভাবে জ্ঞানিতে পারিয়াছেন কি? তাহার জ্ঞান যদি পুরাপুরি ভাবে অক্ষম করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারা কেন মনে করেন যে, পুণ্ড ও বাবস্থা-শাস্ত্রাদি যে মনোচ্চারিত হইতে ও বিবিধ ভাষাকারগণ বিবিধ গ্রন্থের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা? তাহার পর যখন পরিভাষার দেখা দাইতেছে যে, বাবস্থারিক ভাবেই আদ্য পস্তর অর্থ হইয়াছে, এমন কি দেবভাস্কর্য কবির ভাষাতে অপ্রত্যক্ষ পদার্থ দেখা দিয়াছে, তখন আপনারা কেন মনে করেন যে, প্রচলিত ভাষাকারগণ আবার দেবভাস্কর্য কবিরূপের জ্ঞান অটুট রাখিতে পারিয়াছেন এবং আপনারাও এই জ্ঞান অটুট আছে? জ্ঞানের বিস্তৃতি না হইলে আবার এতদূর ভ্রমবস্থা হইতে পারিত কি?

মানুষের যে সমস্ত “অব্যক্ত”-ভাব (unseen and abstract ideas) আছে, তাহা শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গের ও কি কি উপাদানের কোন্ কোন্ কার্য হইতে উদ্ধৃত হয় এবং এই “অব্যক্ত”-ভাবগুলি (unseen and abstract ideas) তাহার কিরূপে প্রকাশ করিতে হয়, তাহার আলোচনা পানিনি-ব্যাকরণে আছে এবং “আ-গম” ও সারস্বত-বাক্যরূপ পড়া হইলে পানিনি-ব্যাকরণ পড়া সম্ভব হয়, ইহা আমি পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু পানিনি-ব্যাকরণ যখন মানুষের শরীরের অঙ্গের ও তাহার উপাদানের কার্যের আলোচনা আছে, তখন বৃত্তিতে হইবে যে, কেবল “আ-গম” ও সারস্বত-বাক্যরূপের জ্ঞান থাকিলেই পানিনি-ব্যাকরণ পড়া সম্ভব হয় না। পানিনি-ব্যাকরণ পড়িতে হইলে মানুষের অঙ্গের ও তাহার উপাদানের ও তাহার কার্যবিধানের কিছু জ্ঞান অর্জন করিবার প্রয়োজন হয়।

আবার মনে হয়, এমন এক সময় ছিল, যখন পানিনি-ব্যাকরণের অধ্যাপকগণ মানুষের শরীর-পট্টন-তত্ত্ব (Anatomy) ও শরীর-বিধান-তত্ত্ব (Physiology) পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং বিভার্ণগণের তৎসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ না পড়া

বাঁকিলেও পাণিনি-বাগকরণের পত্রের মত পরিষ্কার করিতে হইলে শরীর-পঠন-তত্ত্ব ও শরীর-বিধান-তত্ত্ব যে যে অংশ কৃষ্টিবার প্রয়োজন হয়, তাহা তাঁহারা কৃষ্টিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু এখন আর পাণিনির ঐ শ্রেণীর অধ্যাপক পাওয়া যায় না। কয়েক বর্ষমান ধরে পাণিনি-বাগকরণে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে “মা-প্রম” ও সারস্বত-বাগকরণ পড়া হইবার পর শরীর-পঠন-তত্ত্ব ও শরীর-বিধান-তত্ত্ব বিভাগি-গণের নিম্নোক্তের পড়িয়া লইতে হইবে।

যে সমস্ত গ্রন্থ পড়িলে পাণিনি বৃত্তিবার উপযোগী শরীর-পঠন-তত্ত্ব ও শরীর-বিধান-তত্ত্ব বৃত্তিতে পারা যায় তাহাদের নাম—

- (১) শিবসংহিতা
- (২) প্রত্যভিজ্ঞানসম্বৎ
- (৩) স্পন্দসংহাঃ
- (৪) স্পন্দকারিকা
- (৫) বহুবিংশতর সংহাঃ
- (৬) মহানরপ্রকাশ
- (৭) মহার্ষিসম্বতী
- (৮) শ্রী-বিজ্ঞান-চৈতন্য
- (৯) শ্রী-নেত্র-তত্ত্ব
- (১০) শ্রী-বক্ষস-তত্ত্ব
- (১১) শ্রী-অঙ্গশৌক্য

ঐ গ্রন্থগুলি কাহার দ্বারা শিখিত, তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি। তবে উহার প্রত্যেকখানি যে বহু লক্ষ বৎসরের প্রাচীন, তাহা উহার ভাষা হইতেই বুঝা যায়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পড়িলে উপরোক্ত মূল গ্রন্থগুলির বাক্যের মর্মোচ্চার করিবার সহায়তা হয়—

- (১) চরুপাণিনাথের ভাবোপহার
- (২) অভিনবগুপ্তের তত্ত্বশৌক্য
- (৩) অভিনবগুপ্তের বোধপঞ্চদশিকা
- (৪) অভিনবগুপ্তের দ্বাদশব্যাখ্যিক
- (৫) অভিনবগুপ্তের পঞ্চাঙ্গি-পত্রিকা

* এই গ্রন্থগুলি পড়িয়া যাহা মনে হয় তাহাতে মূল দ্বারা যে, প্রত্যেকখানি উহারের দ্বারা একজন লোক নাই—এ নামগুলি তাহাদের। একজন ভদ্র-ব্রাহ্মণ-সর্বদা উপস্থিত।

- (৬) অভিনবগুপ্তের ভাবোপহার
- (৭) উপদেশবোধ শিখণ্ডী
- (৮) প্রাকৃতপঞ্চম
- (৯) বরকচির প্রাকৃতপ্রকাশ

যদি জানিতে চাইতে, “মা-প্রম” না চাইলে এবং সারস্বত-বাগকরণ বাক্যের ভাবে পড়া না বাঁকিলে, উপরোক্ত গ্রন্থগুলি পড়া যায় না এবং ঐ গ্রন্থগুলি পড়িতে পারিলে পাণিনির বিভিন্ন হ্রস্ব সম্পূর্ণ ভাবে বৃত্তিবার ক্ষমতা শরীর-পঠন-তত্ত্ব ও শরীর-বিধান-তত্ত্বের যে যে অংশ জানিবার প্রয়োজন হয় তাহা জানা যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ শরীর-পঠন-তত্ত্ব ও শরীর-বিধান-তত্ত্বের জ্ঞান দর্শন ও বেদ না পড়িলে লাভ করা সম্ভব হয় না।

আমার মনে হয়, আগুনাদিগের মধ্যে এখনও বহু অভিজ্ঞান-দীন সভ্যত্বপূর্ণিত্ব শৌক্য আছে এবং তাহারা উপরোক্ত উপায়ে চেষ্টা করিলে পাণিনি-বাগকরণ সম্বন্ধে পড়িতে পারিবেন ও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার যে কতখানি বিকৃতি হইয়াছে, তাহা বৃত্তিতে পারিবেন।

“বোম”ই যে “ঈশ্বর”, তাহা অভিনবগুপ্তের “ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞান” সাহায্যে “প্রত্যভিজ্ঞানসম্বৎ” অধ্যয়ন করিলে অনুমান করা যায়। তাহার পর প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানিয়া বেদান্তধর্মের হ্রস্ব সম্বন্ধে ভাষার বিনা সহায়তার নিজে নিজে পড়িতে পারিলে এই কথার সার্থকতা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি হয়। বেদান্তধর্মের তাৎপর্য নামক অথবা তাহার মর্মোচ্চার করিবার ক্ষমতা রচিত হইত। এই আমি বোধিচ্ছি, তাহা প্রাণে বেদান্তধর্মের বিকৃতি সাধন করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। বাগকরণের কথাগুলোতে “ব্রহ্ম”কে উপলব্ধি করিবার উপায় তিনটি—

প্রথমতঃ, নিজের শরীরভাষায় ;

দ্বিতীয়তঃ, নিকটবর্তী ব্যক্তির দ্বারা ;

তৃতীয়তঃ, “ব্রহ্মলোক” অথবা “তর্কলোক” (এই “তর্ক-লোক”ই দ্বায়তীর “তর্কলোক”)।

নিজের শরীরভাষায় “ব্রহ্ম” (আমার কথামুদার “বোমেন”) উপলব্ধি হইলে, ইচ্ছাস্বত শরীরের আভ্যন্তরীণ ব্যক্তি হইতে তেজের ও জলের সৃষ্টি করিতে পারা যায়। শরীরের ভিতর ইচ্ছাস্বত তেজের সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য হইলে

বাস্তবের কথাগুলো শরীরের লম্বুতা (intermolecular space-এর চুক্তি) সম্পাদন করা সম্ভব হয় এবং তখন মানুষ বর্তমান ইচ্ছা ততক্ষণ অন্যায়গে ভুলের উপর বসিতে ও ত্যাগিত পারে। বাহু হইতে কি করিয়া তেজের উৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহা না জানা থাকিলেও বৈজ্ঞানিক কোণসে গিয়া ভুলের উপর ভাষা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্প সময়ের জন্য এবং তাহাতে মানুষের কষ্ট হয়।

বোম্বার্ডমেন্টের কথাগুলো কাঁধা করিলে যে, নিজের শরীরের অভ্যন্তরে বায়ু হইতে তেজের সৃষ্টি করা যায় এবং শরীরের লম্বুতা সম্পাদন করিয়া ভুলের উপর ভাষা ও তাহার উপর বসা সম্ভব হয়, ইহা অতি সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

শরীরের ভিতর বায়ু হইতে কি করিয়া ভুলের সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে, ইচ্ছাগুলোতে নিজ শরীরের ও মস্তিষ্কের ঐশ্বর্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়। বোম্বার্ডমেন্টের এই সমস্ত কথা যে অতীত বাস্তব, তাহাও প্রত্যক্ষ করা যায়।

বোম্বার্ডমেন্টের দ্বিতীয় কথাগুলো কাঁধা করিলে, নিকট-বর্তী বায়ুতে ঘনত্ব তেজের সৃষ্টি করা সম্ভব হয় এবং পক্ষের প্রাণ বিনাশ না করিয়া, তাহার আক্রমণ হইতে নিজেকে ও দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই দ্বিতীয় কথাগুলো কাঁধা করিলে, নিকটবর্তী বায়ুতে হইতে কি করিয়া ভুলের উৎপত্তি করিতে হয় এবং ভুল হইতে কি করিয়া তেজের উৎপত্তি করিতে হয়, তাহা জানা যায়।

বোম্বার্ডমেন্টের তৃতীয় কথাগুলো কাঁধা করিলে, মানুষের পক্ষে কি করিয়া নীলাকাশ পর্যন্ত যাওয়া এবং এক গ্রহ (planet) হইতে অন্য গ্রহে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহা জানিতে পারা যায়।

বলা বাহুল্য, বোম্বার্ডমেন্টের দ্বিতীয় কথা এবং তৃতীয় কথা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই এবং আশ্বাসের মনে হইয়াছে, ঐ কথাগুলি প্রত্যক্ষ করিতে হইলে নিকটবর্তী বায়ুতে বিতর্ক-সাধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান কালে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ কোন তথ্য রাখা না জানিয়া তেজের বহুল প্রয়োগ আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে নিকটবর্তী বায়ুতে (atmosphere) হইতে এই অবিচ্ছিন্ন ভাবে বোম্বার্ডমেন্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কথা প্রত্যক্ষ করা বর্তমানে অসম্ভব হইয়াছে ত' বটেই, পরন্তু মানুষ অজীর্ণ,

বহুদূর, বৈজ্ঞানিক ও রক্তের চাপ প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যৎ অবস্থার অর্জন রহিয়াছে এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কবিদিগের সমসাময়িক কবিতার বায়ুতে ভুলের ও ভুলের ভুলের বিতর্কিততার জন্য গভীরতর অর্থবা অনাধারের কতকগুলি কথা করিবার বাসনা ছিল এবং তখন বায়ুতে ও ভুলের ভুলের পরিষ্কার ভাষা হইতে বলিয়া সাধারণ মানুষের নীরোগ পথ্যবা (healthy longevity) দেখুত বয়সের উচ্চ পথ্য বায়ু হইয়াছিল - ইহা মনে করিবার কারণ আছে। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের কৃত্রিমের জন্য বায়ুতে ও ভুলের ভুলের পরিষ্কার সাধন করিবার চেষ্টা করা ত দুইয়ের কথা, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের ভাষা যে প্রতিবিম্বিত তাহার অবিচ্ছিন্ন (impurity) সাধিত হইতেছে, তাহা পথ্য রোগ করিবার আশ্বাসের কোন বাসনা বর্তমানে নাই।

সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানিলে বোম্বার্ডমেন্টের মূল মূল পড়িতে কোন ভাষার সহায়তা প্রয়োজন হয় না এবং তখন বোম্বার্ডমেন্টের বাস্তবতার কথা অথবা নর্ণনের (observations) সার্থকতার (meaningfulness) কথা বুঝিতে পারা যায়।

আমাদের মধ্যে কেহ কি বোম্বার্ডমেন্টের মূল মূল ভাষার বিনা সহায়তার পড়িতে ও বুঝিতে পারেন? যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে আমাদের আপনাদের আপনাদিগকে “বৈজ্ঞানিক” মনে করেন কেন? আমাদের এখন “শব্দ”ের ভাষা অথবা “প্রাথমিক”ের ভাষা পড়িয়া বোম্বার্ডমেন্ট বুঝিয়া থাকেন, তখন আমাদের আপনাদিগকে “বৈজ্ঞানিক” মনে না করিয়া “প্রাথমিক” ও “প্রাথমিক” মনে করিবেন না কেন? আমাদের হয় ত বলিবেন যে, শব্দ ও প্রাথমিক প্রভৃতি ভগবৎ-সদৃশ মানুষের বোম্বার্ডমেন্ট রাখা ভাবে বুঝিয়াছিলেন বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধি আছে। আমি তাহার উত্তরে বলিব, আমাদের এখন ভাষার বিনা সহায়তার মূল মূল বুঝিতে পারেন না, তখন শব্দ ও প্রাথমিক রাখা ভাবে বোম্বার্ডমেন্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহা আমাদের বুঝিতে যে অসম্ভব, ইহা আমাদের স্বীকার করিতে বাধ্য।

আমি বাহা দেখিতেছি, তদুপরে বর্তমানে “প্রাথমিক” বলিয়া বাহা প্রসিদ্ধ, তাহাতে এবং “প্রাথমিক” বোম্বার্ড-

দর্শনের প্রকৃত মর্মের উদ্ধার হয় নাই, কারণ তাহাতে বস্তু-বাস্তবতা নষ্ট হইয়া “বিকল্পের” উদ্ভব হইয়াছে। পরন্তু যদি “দর্শন” শব্দও অর্থহীন হইয়াছে, কারণ শাস্ত্র বস্তু বাস্তব কোন কায়দিক বস্তু “দর্শন” করা সম্ভব হয় না।

আমার মনে হয়, বর্তমান কালে যে-সকল বৈদ্যের শাস্ত্র-ভাষ্য বলিয়া প্রচারিত, তাহা প্রকৃত শাস্ত্র-ভাষ্য নহে। প্রকৃত শাস্ত্র-ভাষ্য যে একটা কিছু ছিল এবং তাহা হইতে যে বৈদ্যের প্রকৃত মর্ম বুঝা যায়, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। এখনও “ব্রহ্মসূত্রের” একটা স্মৃতি পাওয়া যায় এবং তাহা যদি বস্তু-বস্তুতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানা থাকিলে, ঐ স্মৃতির ও ভাষ্যের মূলের প্রাণিত “বৈদ্যসিক্কায়ালাপ”ের সহায়তায় বৈদ্যদর্শনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। “ব্রহ্মসূত্রের” ঐ স্মৃতিটী শ্রীমদ্ভক্ত-তদন্বয় শিষ্য প্রদত্ত বলিয়া প্রচারিত এবং তাহাতে বুল মর্মের বাস্তবতার কোন অনিশ্চয় সংঘটিত হয় নাই। পরন্তু তাহা স্থানে স্থানে বর্তমানে থাকা শাস্ত্র-ভাষ্য বলিয়া প্রচারিত, অসম্ভব। কার্যেই বর্তমানে শাস্ত্র-ভাষ্য বলিয়া বাহ্য প্রচারিত, তাহা প্রকৃত শাস্ত্র-ভাষ্য নহে এবং প্রকৃত শাস্ত্র-ভাষ্যের সহায়তায় বৈদ্যদর্শনের প্রকৃত মর্ম বুঝা যায়—ইহা স্বীকার করিতে হয়।

বর্তমানে বাহ্য শাস্ত্র-ভাষ্য বলিয়া প্রচারিত, তাহা পুণ্য সম্বন্ধ কোন তথাকথিত সাধারণ পণ্ডিতের লেখা এবং তাহা “বিকল্প” ও “বিশ্বাসের” উদ্ভাবক ও উৎসাহ।

আমি অস্বীকার, নগণ্য, এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের “কালোপাহাড়” বলিয়া আমাকে চণ্ডা করিতে আপনাদের প্রতীতি হয়, আপনারা গ্রহণ করুন। তাহাতে আমায় আপত্তি নাই। কিন্তু আমার প্রার্থনা, আপনারা এখনও আমার উপরোক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া তাহার দ্বিতর কোন গৌতিকতা আছে কিনা, তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করুন এবং প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার উদ্ধার করিয়া ঈশ্বরের বাস্তবতা বাহ্যে জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারেন, অন্যভাবে তাহার ব্যবস্থা করুন। নতুবা যে পার্শ্বজনীন ও পার্শ্বমৌলিক বিপ্লবশীল কালযুগের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত ভাঙিয়া নষ্ট হইতে পারে, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। ‘আপনাদের মধ্যে কাহারও কি প্রাণটা বুদ্ধিরে জল বিগলিত হইবে না ?

এই সঙ্কট-ময়ণে যদিও সম্মানপণের মধ্যে কাহারও প্রাণ বুদ্ধিরে জল ও কাপিয়া উঠিলে না, আমি ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না বলিয়াই পাপদের মত চিরপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের (৭) বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি। আমাকে শাস্তি দিতে হয় পরে হিবে। আপাততঃ আমি আপনাদের সহায়তা চাই এবং তাহারই ভিলা আমি আপনাদের নিকট করিতেছি।

আপনাদের মধ্যে বাহ্য টংগা-শিক্ষিত এবং বাহ্য ম্যাকডোনাড সায়েন্সের ব্যাকরণ পড়িয়া যেসব মর্মেচ্ছার করিবার চেষ্টা করেন, অথবা ভট্ট যোদ্ধাপুর এবং ডাঃ খিলা প্রভৃতির বাহ্য ও অভ্যন্তর বৈদ্য ভাবের কথার বেশ ও দর্শনাদির মর্ম উপলব্ধি করিবার জল পরিগ্রহ করেন, তাহা-বিগত আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রাত্যহিক কারণ বস্তু-উদ্যোগের উপলব্ধির পক্ষে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা বুদ্ধিতে পারা সম্ভব নহে। বলি কেহ পারে, তাহা কেবল আপনাদের এবং সেই বিন হইতেই তাহার আরম্ভ হইবে, যেদিন আপনাদের “বস্তু” বিনষ্ট হইয়া আপনাদের কায়, মন ও বাহ্য বিনয়ের উদ্ভব হইবে। মনে রাখিবেন—লিলা বিবর্তন সমাজ। বহিঃ উদ্যোগের উপলব্ধির পক্ষে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানিতে অসমর্থ এবং তাহা-বিনে কৃতকাৰ্য্যে সংস্কৃত ভাষার উদ্ভিৎ অসম্ভব অবনতিই বৈদ্য দাখিত হইয়াছে, তাহা-আপনাদের উপলব্ধির নিকট কৃতজ্ঞ থাকিতে হইবে, কারণ ঐচ্ছিক জ্ঞাননিগম এবং মূগ্ধ হইবার উদ্ভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও মূগ্ধ পুত্রগুলি পুনঃ পাইবার সহায়তা করিয়াছেন।

আমাদের জনসাধারণের মধ্যে বাহ্য চাচেকার শাস্ত্রজাচার-প্রকৃতিক মনোভাব বলিয়া ব্রহ্ম করিয়া থাকেন, তাহা-বিগত জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, তাহা-কেহ কি সম্ভব-প্রকৃতির ভাষ্য পড়িয়া এবং তাহা চিন্তা করিয়া তাহা-বিনে উপলব্ধি পৌষণ করিয়া থাকেন? বলি বাস্তবিক ভাবে তাহা-বিগতের চাচেক না পড়িয়া থাকেন এবং বৃষ্টির চেষ্টা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেবল পরের যুদ্ধের কথা ভাবিয়া একটা অভিনত শোষণ করা বুদ্ধিগম্য কি?

আমরা আমাদের সাধারণ বৈদ্য চিন্তা বাহ্য বুদ্ধিতে পরিণতি, তবু-সাধারণ বিনে হইতে হয় যে, আমাদের মত সাধারণ মানুষের প্রকৃত জ্ঞান পাট করিবার ইচ্ছার উদ্ভব হইয়াছিল

তাহা সত্য, কিন্তু বর্তমান “বিজ্ঞান” ও “বৈজ্ঞানিক” তাহাতে যথ্য প্রাধান্য করিতেছেন। বর্তমান বিজ্ঞানের প্রত্যেক শৃংখর কতকগুলি “বিকল্পিত” পরিভাষার (terminology) সৃষ্টি হইয়াছে এবং তদনুসারে একটা “অভ্যুদয়”ও সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ঐ পারিভাষিক শৃংখরির প্রায় কোনটীর অর্থ হয় না এবং তাহার প্রায় প্রত্যেকটা “বিকল্প”। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যে অভ্যুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও প্রায়শঃ অর্থহীন এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া মানুষ তাহার কোন প্রয়োজনীয় কাৰ্য্য করিতে পারে না।

পরিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভ্যুদয় (Statics, Dynamics, Applied Mechanics) বর্তমান বৈজ্ঞানিকের সৃষ্টি। তাহার মূল ভিত্তি নিউটনের গতিসম্বন্ধীয় বিধি (Newton's Laws of Motion); ইহা যে অব্যাহত তাহা আমরা গত সংখ্যার প্রকাশিত “বর্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-স্মরণক-প্রবন্ধে” দেখাইয়াছি। এই অভ্যুদয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যে, কোন প্রয়োজনীয় কাৰ্য্য করা যায় না, তাহা সিভিল (Civil), যান্ত্রিকশাস্ত্র (Mechanical), ইলেক্ট্রিক্যাল (Electrical) প্রভৃতি ইঞ্জিনিয়ারী বিভাগের যে কোন ইঞ্জিনিয়ার একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যদি ঐ অভ্যুদয় সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হইত, তাহা হইলে একটা কারলিক “ফ্যাক্টর অফ সেকিউরি” (Factor of Safety) প্রয়োজন হইত কি?

এংবিধ অবিবাক্যযোগ্য অভ্যুদয়ের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমান জ্যোতিষবিজ্ঞান সৃষ্টি হইতেছে। তাহাও বিশ্বাস করা যায় কি? হয়ত কেহ কেহ বলিবেন যে, বর্তমান জ্যোতিষ-শাস্ত্র যদি বিশ্বাসযোগ্য হইত, তাহা হইলে গ্রন্থাবলির কাল নির্ধারিত হইতেছে কি করিয়া? যে সারণীকে (table or almanac) অবলম্বন করিয়া গ্রন্থাবলির কাল নির্ধারিত হয়, সেই সারণী বর্তমান কোন জ্যোতির্বিদগণের কল্পিত সঙ্ঘ কি? আমরা বহু অভ্যুদয় করিয়াও বর্তমান জ্যোতির্বিদগণ ঐ সারণী প্রস্তুত করিবার উপযোগী কোন পদার্থ-প্রণালী পুঁজিয়া পাই নাট এবং আমরা বহুদূর জাতি, তাহাতে ঐ সারণী কবে কাহার দ্বারা কোন্ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা বর্তমান জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে কেহ “অভ্যুদয়” পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাট।

অভ্যুদয়ের মধ্যে জ্যামিতি (Geometry), বীজ-গণিত (Algebra), নীলানবী (Arithmetic and Mensuration), কনিক-সেকশন (Conic Section), ত্রিকোণ-মিতি (Trigonometry) অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি মানুষের কোন্ কোন্ প্রয়োজনের জন্য কোন্ শ্রেণীর চিন্তা হইতে কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ “অভ্যুদয়” দ্বারা জানিতে পারেন নাই। পরন্তু ঐ গ্রন্থগুলির বহু অংশের প্রয়োজনীয়তা না জানা থাকায় বর্তমান বৈজ্ঞানিকবিদের হস্তে উহার যথেষ্ট বিকৃতি সাধিত হইয়াছে। প্রবন্ধান্তরে ঐ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক রসায়ন- (Chemistry)-শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় তেল, হাওয়া এবং পাছাদি কি করিয়া বিতরিত করিতে হয়, তাহা তাঁহারা প্রাথমিক জানেন না। তাঁহারা বাহ্যকে পাছাদির বিতরিত বলেন, তাঁহা প্রাথমিক: অব্যাহত, নতুবা বর্তমান জগতে প্রায় প্রত্যেক মানুষ বিংশতি বর্ষে পদার্থপর করিতে না করিতে একটা না একটা অভ্যুদয় ভোগ করিত না।

আমরা বহুদূর বুঝিতে পারি, তদনুসারে বলিতে হয়, বর্তমান বসায়ন-শাস্ত্র বর্তমান বিজ্ঞানগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা “নিপথগত” এবং তাহার দ্বারা মানুষের অথবা কোন জীবের কোনরূপ উপকার সাধন করা ত ত্বেরে কবা, পরোক্ষ ভাবে তাহা সর্বত্র আমাদের অবলম্বন সাধন করিতেছে। মানুষের জ্ঞান সাধারণতঃ ভটল বিষয়গুলিকে সরল করিয়া দেয়, কিন্তু বর্তমান রসায়ন-শাস্ত্র সরল বিষয়গুলিকে ভটল করিয়া তুলিতেছে। তাহার প্রথম রসায়ন-শাস্ত্রের বিবিধ “এলিমেন্ট” (element) ও সূত্রের (formulae) সৃষ্টি। যে রসায়ন-শাস্ত্র পড়িয়া আত্মকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্যিক পণ্ডিতগণ বিবিধ সম্মানযোগ্য উপাধি লাভ করেন, তাহা আমরা বহুদূর জানি, মানুষের কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় না। পরন্তু ইহা ব্যবহার করিতে গেলে ব্যবহারক্ষেত্রে বিপর্য্য হইতে হয়। আমাদের এই কথা বুলি সন্তান সন্তান, ঐ প্রভৃতির কারখানার ডিহাইল বহাদিকারিগণ পথ্যত স্বীকার করিবেন। প্রস্তুত জানের উদ্বন হইতে আরম্ভ করিলে মানুষ কেবল সারগর্ভ

কথা কহিয়া থাকে এবং তাহার পরিভাষা অল্প হয়। আর বাইরের প্রকৃত জ্ঞান কথিতা বস্তু বিকৃত জ্ঞানের উদ্ভব হয় ততই তাহার পরিভাষা বৃদ্ধি পাইতে অব্যাহত করে।—ভারতীয় পরিভাষার এই ব্যাকরণ সম্বন্ধে উদাহরণ বর্তমান সমাজ-শাস্ত্র।

বর্তমান শরীর-গঠন-বিজ্ঞা (Anatomy) ও শরীর-বিধান-বিজ্ঞা (Physiology) উভয়ই হইয়াছে শব্দ-ব্যবচ্ছেদ হইতে। বৃত্ত বাহুরের শরীর নামকরণ করিয়া যে শরীর-গঠন-বিজ্ঞা (Anatomy) উদ্ভব হয়, তাহা বৃত্ত বাহুরের শরীর-গঠন-বিজ্ঞা (Anatomy)। বৃত্ত ও ভীষিত বাহুরের শরীরের গঠনে যে বহু পার্থক্য হয়, তাহা অমরা একটু ঠোকা করিলেই বুঝিতে পারি। বৃত্ত বাহুরের শরীর পরীক্ষা করিয়া ভীষিত বাহুরের শরীরের বিধানমাত্র কি হইতে পারে, ইহা অনুমান করিতে বসিলে এর ইচ্ছা যুব স্বাভাবিক এবং হইয়াছেও তাহাই। যদি কখনও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার পুন-সংস্কার হয় এবং আবার ভারতীয় কথার শরীর-গঠন-বিজ্ঞা (Anatomy) ও শরীর-বিধান-বিজ্ঞা (Physiology) বাহুর জাম্বিতে পারে, তাহা হইলে বর্তমান শরীর-গঠন-বিজ্ঞা ও শরীর-বিধান-বিজ্ঞা যে কত অসম্পূর্ণ এবং ভাষাত্মক, তাহা বোধগম্য ভাবে বুঝা যায়। শরীরের চকুরাদি কোন বস্তু দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যে তাহার আরোপা বিধান করিতে পারেন না, ইহা কি অসত্য? বেগীনের, রক্তের চাপ (Blood-pressure) প্রভৃতি কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ (terminology) রোগের নাম বলিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, অথচ তাহা যে শরীরস্থলের কোন স্থানের কৌশল-ব্যাখ্যা, তাহার কিছুই দ্বিগত হয় না, ইহা কি সহজেই অনুমান করা যায় না? যদি প্রকৃত শরীর-গঠন-বিজ্ঞা (Anatomy) ও শরীর-বিধান-বিজ্ঞা (Physiology) বর্তমান বৈজ্ঞানিকের সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে কি ঐক্য স্বত্বীন পরিভাষার সৃষ্টি হইতে পারিত?

ঐক্য ভাবে বর্তমান বিজ্ঞানের যে কোন সাধারণ প্রতি-লক্ষ্য করা যায়, তাহাতে আন্ত-প্রভাবণার চিত্তবৃত্ত কতকগুলি পরিভাষার সৃষ্টি যাত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রায়শঃ কোন লক্ষ্য পূর্ণতা পাওয়া যায় না। এই বিকৃত বিজ্ঞান ও বিকৃত বৈজ্ঞানিকতাই ভগবতের সঙ্গত শাসন-

বিভাগের কল্যাণার্থেই কল্যাণার্থেই অগ্রিম কথিতা কথিতা থাকে।

বর্তমান ভগবতের প্রায় সর্বস্বত শাসন-বিভাগের কল্যাণার্থে কল্যাণ, বাস্তবতা-নিরীক্ষণে এবং শৌক-ভক্ত-প্রায়শী। কিন্তু বিকৃত বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার ফলে ভীষিত উৎপাদিকা-শক্তি অত্যধিক কথিতা দিয়াছে, কল্যাণ পক্ষে লাভজনক কথিতা করা একতর অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং বাস্তব প্রতিভার অস্তিত্ব ও অকালমৃত্যুর বংশ ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক কথায় এখন কল্যাণার্থে তাহাদের ভীষনের প্রায় সর্বস্বত অসম্ভব অসম্ভব করিতে বাধ্য হই, অথচ সর্বস্বত কারণ যে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতাই বিনেবলগণ, তাহাদের অসম্ভব পান না। কারণ বিনেবলগণ (experia) সর্বস্বত সাধারণ শৌক-ভক্ত অস্তিত্ব তাহাদের কাৰ্য্য করিয়া থাকেন। কল্যাণার্থের সম্পূর্ণ থাকেন সাধারণতঃ শাসন-বিভাগের কল্যাণার্থে এবং তাহাদের শাসনের উপর অমরা সাধারণের অসম্ভবতার দ্বারা আরোপিত হয়। ইহারই ফলে ভগবতের প্রায় সর্বস্বত প্রতিভার সর্বস্বত-ভক্তের পরিচালকগণের পরিচালনা এবং নতুন নতুন কাব্য-পদ্ধতির (epocha) উদ্ভব হইতেছে বটে। কিন্তু কল্যাণ-সাধারণের কল্যাণ-সংস্কারের বিলম্বিত ও পাতক হইতেছে না।

প্রতিভার সর্বস্বত, পদার্থ-বিজ্ঞা, সমাজ-প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রকৃতি যে বর্তমান ভগবতের কল্যাণ-সংস্কার ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ, ইহা যেখানে আধারের বস্তুতঃ সংস্কার কাব্য-তানিকা।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

বর্তমান বিজ্ঞানের জ্ঞানই যে এই ভগবতের কল্যাণ-সংস্কার ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ, তাহার কারণে “বস্তু”র ভিত্তি সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে “বস্তু”-বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-শব্দ প্রবর্তে যেখানে হইয়াছে। আরও বিস্তৃত ভাবে ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, “বিজ্ঞান” কাব্যেই বসে, অথবা প্রকৃত বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কি, তাহা প্রথমতঃ নির্ধারণ করিতে হইবে।

বিজ্ঞান এই শব্দটির মধ্যে আছে “ব”, “ই”, “জ”, “ক”, “খ” এবং “ন” এই ছয়টি শব্দ।

ইহার মধ্যে “১” শব্দের অর্থ “স্বতঃ”।

“২” শব্দের অর্থ “অন্যের বৃত্তি”।

“৩” শব্দের অর্থ “প্রোতঃ”।

“৪” শব্দের অর্থ “স্বতঃ”।

“৫” শব্দের অর্থ “বৃত্তি”।

“৬” শব্দের অর্থ “কর্মকর্মতার লোপ”।

কোনই শব্দগত অর্থানুসারে, তাহার সহায়তার কোন ভাবেই হকের গুণের বৃত্তি হয় কত বাক্যের এবং কেন, অর্থাৎ ব্যক্তিক গুণ কত বাক্যের হয় এবং কেন হয়, প্রোতঃ-মিসিত শব্দের বৃত্তি কি পদ্ধতিতে হইয়া থাকে এবং কেন হয় অর্থাৎ উপাদানের পরিবর্তন হয় কেন ও তাহার পদ্ধতি কি এবং কর্মকর্মতার লোপ হয় কেন ইত্যাদি জানা যায়—তাহার নাম “বিজ্ঞান”।

“বিজ্ঞান” শব্দের উপরোক্ত শব্দগত অর্থটী সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিতে চাইলে বলিতে হয়, বাহার সহায়তার চর এবং অচর সমস্ত ভাবেই সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যায়, তাহার নাম “বিজ্ঞান”।

ব্যুৎপত্তিগত (etymological) অর্থানুসারে, বাহার সহায়তার চর এবং অচর বস্তুর প্রত্যেকটীর বৈশিষ্ট্য কি তাহা জানা যায়, তাহার নাম “বিজ্ঞান”। প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য—তাদের উপাদান (ingredients), গুণ (qualities), এবং কর্মকর্মতা (mechanical activities)। ভগ্নতে বস্তুকি চর এবং অচর বস্তু আছে, তাহাদের কতকগুলি উপাদান (ingredients), গুণ (qualities) এবং কর্মকর্মতা (mechanical activities) সমান (common)। আবার প্রত্যেক বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্মকর্মতার স্বকীয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (special features) আছে। প্রত্যেক বস্তুর আপন আপন বৈশিষ্ট্য সংঘটিত হয়, সমস্ত চর এবং অচর বস্তুর মধ্যে যে যে উপাদান (ingredients) সমান (common), তাহাদের বিভিন্ন বস্তুদের মিশ্রণে। কাহেই চর এবং অচর সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকটীর বৈশিষ্ট্য জানিতে হইলে—প্রথমতঃ, তাহাদের কোন কোন উপাদান, গুণ এবং কর্মকর্মতা সমান (common); দ্বিতীয়তঃ, এই সমান উপাদানগুলির মিশ্রণের নিয়ম কি কি ; তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে কি কি উপাদান, গুণ ও কর্মকর্মতার উৎস হয় এবং চতুর্থতঃ, প্রত্যেক বস্তুর আপন আপন উপাদান,

গুণ এবং কর্মকর্মতার বৈশিষ্ট্য কি কি তাহা জানিতে হয়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুসারে সংক্ষেপতঃ “বিজ্ঞান” বলিতে বুঝায় সেই শাস্ত্র—বাহার সহায়তার প্রত্যেক বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্মকর্মতা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য সংবাদ জানা যায়।

উপরোক্ত শব্দগত অর্থ এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মিলাইয়া “বিজ্ঞান” শব্দের সংজ্ঞা কি তাহা প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয়—“বাহার সহায়তার—প্রথমতঃ, ভগ্নতের চর এবং অচর সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ সাধিত হয় কেন এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের উপাদান, গুণ এবং কর্মকর্মতার পরিবর্তন সাধিত হয় কেন, তাহা জানা ও বুঝা যায়, তাহার নাম “বিজ্ঞান”।

বৈজ্ঞানিক পাঠক, এমন একবার সহ্য করিয়া ভাবিয়া দেখুন, “বিজ্ঞান” এই শব্দটির মধ্যে তাহার কত পরিচায়ক এবং বিস্তৃত সংজ্ঞা ভারতীয় ধর্ম লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের এই সংজ্ঞা সাধারণ পাঠকের অসম্প্রতিত ভক্ত বিভিন্ন গ্রন্থেও লিখিত রহিয়াছে এবং বিভিন্ন গণ্যে বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ সংঘটিত হয় কিভাবে এবং কেন, তাহাও লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমাদের চর্চাপ্রায়শতঃ সংস্কৃত ভাষার বিস্তৃতির ভক্ত নান্দশব্দে গত ছয় শব্দের বঙ্গীয় হইতে এই সমস্ত গ্রন্থ “বিস্তারিত” অর্থ প্রচারিত হইতেছে।

অজমিকৈ চারিগা দেখুন, প্রাচীন গ্রীক কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, যে সমস্ত পুস্তক বিজ্ঞান-শাস্ত্রাভ্যন্তরিত বলিয়া প্রচারিত এবং বাহা অধ্যয়ন করিয়া বৈজ্ঞানিকতার অভিমান আশ্রয় পোষণ করিয়া থাকি, তাহার একখানিতেও বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশসম্বন্ধীয় আশ্রয় তথা তদ্ব্যবহার কথা, “বিজ্ঞান” বলিতে কি বুঝায়, তাহার ব্যাখ্যায় অর্থ পর্যন্ত পরি-
ভূতভাবে অভাববিধি লিখিত হয় নাই। হিপোক্রেটিস (Hippocrates), অ্যারিস্টটল (Aristotle), অ্যাকুইনাস (Aquinas), রোজার বেকন (Roger Bacon), ডেকার্ট (Descartes), ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon), লক (Locke), লাম্বার্ট (Lambert), কান্ট (Kant), কোন্ট (Comte), হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), আর্থার টমসন (Arthur Thomson), গেডিস (Geddes), ফ্লিট (Flint), পিয়ারসন (Pearson) এবং হোয়াইটহেড (Whitehead) প্রভৃতি প্রকারখণ্ড

ঐহাদের বিভিন্ন প্রণেয় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, পদ্ধতি এবং উদ্দেশ্য কি হজ্জা উচিত, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নয়, কিন্তু ঐহাদের কেহ এত লম্বা কৈন দ্বিঃ দিচ্চাঃ উপনীত হইতে পারিয়াছেন কি? ঐহাদের বিভিন্ন পুস্তকগুলি আমাদের সামান্যতঃ তত্ত্ব-তঃ অনুসন্ধান করিয়াও আমরা কোন বস্তুবৎ দ্বিঃ দিচ্চাঃ উদ্দেশ্য বাহির করিতে পারি নাই। আমরা কেহ পারিয়াছেন কি?

আমাদের ইংরাজী অভিধানেও "Science" শব্দের কোন অর্থ পরিষ্কারভাবে লিখিত হয় নাই। অভিধানগ্রন্থে Science শব্দের অর্থ systematised knowledge, অথবা পুথনিত জ্ঞান। Knowledge অথবা "জ্ঞান" কি বস্তু, তাহার system অথবা পুথনা বসিতে কি বস্তুঃ এবং এই পুথনাঃ যে পুথন (chain) বসিত হয়, তাহার আদি অথবা প্রারম্ভ কোথায় এবং শেষে বা কোথায়, তাহা না বলিয়া কেবল "পুথনিত জ্ঞান" অথবা systematised knowledge বসিলে কিছু পরিষ্কার বস্তু গার কি?

ঐহাদের কোন পুস্তকে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা লম্বাঃ পুথিঃ পাওয়া যায় না, ঐহাদিনকে "বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক" বলিয়া অভিহিত করিলে অথবা ঐহাদের পুস্তক পড়িয়া নিচিনিকে "বৈজ্ঞানিক" বলিয়া অভিধান পোষণ করিলে, "বৈজ্ঞানিক" শব্দের এবং শব্দ-শব্দের অর্থমান করা হয় না কি?

সাধারণ পাঠকগণ, "বিজ্ঞান কাহাকে বলে" অথবা "বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কি"—এই প্রশ্নকে বাহা বলা হইল, তাহা হইতে আমরা যেখাঃ রাখুন যে, আমাদের বর্তমান ইঞ্জিনিয়ার (engineer), ডাক্তার (doctor), ভিজিসিট (physicist), কেমিস্ট (chemist), ইকনমিস্ট (economist) প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞগণ "বিজ্ঞান কাহাকে বলে" তাহা পদাঃ নিদ্বারঃ করিতে পারেন নাই। অথচ ঐহাদের অনেকই যে নিচিনিকে আমাদের বস্তু জনসাধারণের তুলনায় উচ্চতরের বাহুঃ বলিয়া মনে করেন, তাহা ঐহাদের প্রতি চাপ-চাপে সর্বদা হুঁচকা উঠে।

বিজ্ঞান লাভ করিবার উপায়

ভারতীয় ভূমিদগণের নিঃসাহস্যঃ বস্তুগতঃ বিজ্ঞান লাভ করিবার উপায়, প্রশ্নমতঃ হইত। এক—যিনি বস্তুগতঃ

বিজ্ঞান লাভ করিতে অভিধান হইবেন, ঐহাঃ বস্তুগতঃ (self-construction & organisation) এবং উঠে, —যে বস্তুগতঃ বিজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তাহাঃ বিভিন্ন বস্তুগতঃ (treatment or dealing of the object)।

বিজ্ঞান লাভ করিবার উপযোগে সামর্থ্য অর্জন করিবার যে বস্তুগতঃ বস্তুগতঃ লাভ করিয়া থাকে, তাহাঃ নাম "পুথি"। বুদ্ধি (intellect) কি বস্তু, বাহুঃ অর্থমান কোথায় তাহাঃ লক্ষ্য-স্থান (storage), কি বসিতে এবং কোন্ কোন্ নালীঃ (passage) বাহা বিঃ তাহাঃ লক্ষ্য-স্থান (distributed) হইয়া বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ার কৰ্ম্মগতঃ (activities) সাধন করিয়া থাকে, কোন তাহাঃ দাপ ও বুদ্ধি (increase and decrease) সাধিত হয়—ইহাঃ জানা থাকিলে বাহুঃ উচ্চতর বস্তু বুদ্ধিঃ উচ্চতঃ সাধন করিতে গারে এবং তখন বাহুঃ ইঞ্জিনিয়ার (instruments of understanding) ও বাহুঃ কৰ্ম্মগতঃ (instruments of work) মনোঃ লাভ করে। ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ও বাহুঃ কৰ্ম্মগতঃ কৰ্ম্মগতঃ সামর্থ্য (efficiency) হইলে যে, তাহাঃ মনোঃ (bedding a real man) বলা যায়, তাহাঃ বর্তমান কালে কোন উদাহরণ বাহাঃ বস্তুঃ মনোঃ নহে, কারণ ঐ সাধুঃ যে লক্ষ্য কৰ্ম্মগতঃ নিঃসঃ করিয়াছেন, তাহাঃ আমরা আজকালকার কোন বাহুঃ তিতঃ দেখিতে পাও না। আজকালকার বাহুঃ তিতঃ ঐ সামর্থ্য কোথায় না বলিয়া কৰ্ম্মগতঃ নিঃসঃ লক্ষ্যগতঃ "বিকল্পিত" (terminology) বলা যায় না, কারণ তাহাঃ উপনিঃ দাপঃ লক্ষ্যঃ করা অসাধ্য নহে এবং ততঃ লক্ষ্যঃ লক্ষ্যঃ করিলে যে, বুদ্ধিঃ প্রশংসা সাধিত হয়, তাহাঃ লক্ষ্যঃ প্রত্যক্ষ করা যায়।

ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ও বাহুঃ কৰ্ম্মগতঃ মনোঃ লাভ সামর্থ্য সাধিত হইলে বস্তুগতঃ বস্তুগতঃ বস্তুগতঃ না লইয়া অত্যন্ত লক্ষ্যঃ অর্থমান বস্তুঃ উচ্চতঃ বাহুঃ লক্ষ্যঃ হয় এবং তৎসম্বন্ধীয় লক্ষ্যঃ বিজ্ঞান নিঃসঃ লাভ করা যায়।

যে বস্তুগতঃ বিজ্ঞান লাভ করিতে হইবে তাহাঃ বাহুঃ (treatment or dealing) বিঃ অর্থঃ বিঃ। লক্ষ্যঃ খোঁজ হইবে ঐ বাহুঃ (treatment)

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (summary or abstract) বলা যাউতে পারে। দ্রোণ-দ্রব্যকে আর কথার প্রকাশ করিতে হইলে বর্ণিতে হয় যে, কোন বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার ব্যবহার (treatment) করিবার বিধি (method) প্রদানঃ তিনটি—

প্রথমতঃ—তাহার “জাতি” (genus ; species) নিরূপণ করা।

দ্বিতীয়তঃ—তাহার বাস্তব “অবস্থা” (real anatomy) পর্যবেক্ষণ করা।

তৃতীয়তঃ—তাহার কোন কোন অংশ নষ্টা করিতে হইবে (প্রয়োজন) অথবা তাহার ভিতর অঙ্গ (organ) ও কি থাকিতে পারে, তাহা স্থির করা।

যদি চক্ষুরাশি থাকিলেও দৃশ্যক এবং বায়ুদি কণ্ঠবোনি-
ভংগকে অব্যাহিত (necessary) সামর্থ্যবৃত্ত (efficient) করিয়া উপদ্রোহ বিবিধ উপায়ে কোন বস্তুর ব্যবহার (treatment) আদৃত করিলে যে, তৎসম্বন্ধীয় প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।
কিন্তু বর্ণিতে হইবে, ভারতীয় কৃষিগণ প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করিবার বাস্তব উপায় পরিত্যক্ত ছিলেন। তাহাদের অস্ত্র কোন গ্রন্থ না পড়িয়া কেবল বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক সৌতম-
দ্য পড়িলে এবং তাহার অর্থ ধ্যানবশতঃ বুঝিতে পারিলেই তাহারা যে প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা সম্ভব হয়। অস্ত্র আর তাহার বিস্তারিত রূপে তাহাদের সমস্ত কথাই “বিকল্পিত” (terminology) অর্থে প্রদর্শিত এবং তাহাদের প্রত্যেক গ্রন্থ এতটা কালমিত “মৌল-
কিঙ্কণ” (metaphysics) অর্ধকৃত হইয়া গাড়াইয়াছে। ইহা দেখিয়া যদি একবার প্রাণের আবেশে বলিয়া কেলি যে, আর আমাদের প্রাণের যেহেতা কৃষিগণের সঙ্গী তথাকথিত ভাষণগণের দ্বারা কচকচিত পথাবলিত হইয়াছে, তাহা হইলে কি আমাদের ভাষণ-পাঠকগণের মধ্যে এককমেরও প্রাণে সূহর্ষের ও সৌখ্য দৃষ্ট বিনাশ করিবার উচ্চারণ হইবে না?

বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণের বিজ্ঞান লাভ করিবার উপায় অনুশীলন এবং পুনরীক্ষণপ্রতি বহু। বস্তুর সম্বন্ধে যে কোন বস্তু বর্ণনাধীন হইবে সেখা সম্ভব হয় না এবং তাহারা যে

কোন প্রকৃত বিজ্ঞানের উৎস হইতে পারে না, তাহা আশঙ্কা এই প্রবন্ধের পূর্বে সংখ্যার প্রকাশিত অংশে ও “বর্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-শির্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

ভারতীয় কৃষিগণের কথারপারে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, মানুষের ‘অর্থ’-নির্দিষ্ট করা। ‘অর্থ’ বলিতে বুঝায় সেই বস্তু, বাহ্য মানুষ তাহার জীবন ধারণ করিবার জন্য চাহিয়া থাকে। “অর্থ-
নির্দিষ্ট” বলিতে বুঝায় সেই বাসনা এবং জ্ঞান, বাহার সম্বন্ধে তাহার জীবন ধারণ করিবার জন্য বাহ্য চাহিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটি পাইতে পারে।

মানুষ তাহার জীবন ধারণ করিবার জন্য বাহ্য চাহিয়া থাকে, ইহা বাহ্যেই সে পাইতে পারে, তাহা শিখান অর্থ তাহার বাসনা করা কোন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইলে, সেই বিজ্ঞান যে প্রত্যেক মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। কখনই ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানকে মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু বলা যাউতে পারে।

মানুষ কি কি চাহিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে কোনটি তাহার উপকারী ও কোনটি অপকারী, ইহা বুঝাইবার জন্য ভারতীয় কৃষিগণ তাহাদের বিবিধ গ্রন্থে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

তাহার প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যবোধ এবং প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তাহার বিশদ আলোচনা হওয়া সম্ভব নহে।

আমি আপনাদিগকে “বংশী”র দ্বারা সংখ্যার প্রকাশিত “ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্তমান অবস্থা”-শির্ষক প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ প্রবন্ধের ১২২ পৃঃ হইতে ১৩৬ পৃঃ পর্যন্ত পড়িলে ভারতীয় কৃষিগণ তাহাদের বিবিধ গ্রন্থে কোন কোন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন এবং ঐ ঐ বিষয় যে মানুষের অর্থনির্দিষ্ট সহায়ক, তাহা স্পষ্টতঃ পাওয়া যায়। মানুষের অর্থনির্দিষ্ট কি করিয়া হইতে পারে, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য ভারতীয় কৃষিগণ—প্রথমতঃ মানুষ কাহাকে বলে, দ্বিতীয়তঃ মানুষের প্রকৃতি কাহাকে বলে, তৃতীয়তঃ মানুষের প্রকৃতি কত রকমের হয়, চতুর্থতঃ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ কত রকমের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাক্রমে, পঞ্চমতঃ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ কত রকমের বিভিন্ন কার্যক্ষমতাক্রমে

হয়, বস্তুতঃ বিভিন্ন কাব্যাক্রমভাঙ্গার মাধ্যমে কি করিয়া নিজ নিজ ইচ্ছাধীন করিতে পারে, সম্ভবতঃ আদর্শ বাস্তবের আদর্শ কি হওয়া উচিত এবং কি উপায়ে ঐ আদর্শের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব, ইত্যাদি কথার আলোচনা করিয়াছেন।

তাহাদের প্রত্যেক প্রত্যেক তাহাদের অর্থনীতির অন্তর্গত বলা বাইতে পারে। যদি কেহ কোটিলোর অর্থশাস্ত্রকে ভারতীয় ভবির “অর্থনীতি” বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে ভ্রান্ত বোধিত হইবে। কোটিলোর অর্থশাস্ত্র বহুদূরে ঐশ্বর্যসৌন্দর্য হইলেও বিবিধ প্রকারের ভ্রমে পরিপূর্ণ এবং তাহা ভারতীয় ভবির মূল অর্থশাস্ত্র হইতে অতীত পরিমাণে বিভিন্ন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য দুইটা; যথা—
(১) বিভিন্ন বস্তু প্রকৃতির মধ্যে সমান (common) কি তাহা বাহির করা এবং (২) সত্যের মত সত্যের আবিষ্কার করা। তাহাদের কথাগুলি শ্রুতিতে একরূপ মনে লাগে না, কিন্তু উহাওয়া কি বলেন, তাহা তাহাদের কোন পুঙ্ক্ত হইতে অপরাধ কাহারও বক্তৃতা হইতে পরিষ্কার হইয়া যায় না।

বিভিন্ন বস্তুর ‘প্রকৃতি’র মধ্যে সমান কি, তাহার আবিষ্কার করা বর্তমান বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু বর্তমান কোন বিজ্ঞানের কোন প্রায়ে ‘প্রকৃতি’ কাহাকে বলে অথবা ‘প্রকৃতি’ কত রকমের হয়, তাহার কোন তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ‘প্রকৃতি’ কাহাকে বলে, অথবা ‘প্রকৃতি’ কত রকমের হয়, তাহা না জানা থাকিলে বিভিন্ন বস্তুর ‘প্রকৃতি’র মধ্যে সমান কি, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব কি?

যে বস্তুর সম্বন্ধে কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে হইবে, সেই বস্তুর কাহার নাম অথবা তাহার সংজ্ঞা কি, তাহা না জানা থাকিলে, তাহার সম্বন্ধে কোন তথ্য আবিষ্কার হওয়া সম্ভব কি? তাহার সম্বন্ধে কোন তথ্য আবিষ্কার করিতে হইবে, সেই বিন্দুর কাহার নাম অথবা তাহার সংজ্ঞা কি, তাহা না জানিয়া তাহার সম্বন্ধে তথ্য বাহির করিবার চেষ্টা করা কি কর্তব্যবিহীন নোকা-চাণদ্যর সম্মুখ নহে? কর্তব্যবিহীন নোকা পরিচালনা করা আর উদ্বেগবিহীন কাণ্ড করা কি এক কথা নহে? কর্তব্যের বাস্তব নোকা পরিচালনা করিলে

কখনও পছন্দা গানে পৌছান সম্ভব হয় কি এবং তাহাতে কেবল “বৃন্দাবন” গীতে হয় না কি?

“সত্যের মত সত্যের অগ্রসরকান করা”—বর্তমান বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যলব্ধ্যর বিভিন্ন উক্তি, অথচ সত্য কাহাকে বলে, তাহার কোন সংজ্ঞা অজ্ঞাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। “সত্য” কাহাকে বলে, উহার প্রকৃত তথ্য যদি কখনও আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে বাস্তব জগিতে শান্তিবে যে, “সত্যের মত সত্য” এইরূপ বাক্য হইতে পারে বটে, কিন্তু “সত্যের মত সত্য” এইরূপ কোন অর্থসম্পন্ন বাক্য হয় না। ঐ কাণ্ডের বাক্য অসম্ভব-প্রত্যাহার নামান্তর মাত্র।

বর্তমান বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যোগ্য মনে তাহা হইতে বলা বাইতে পারে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ উদ্বেগ-বিহীন কাণ্ড করিতেছেন। উদ্বেগবিহীন কাণ্ডের কোন পদ্ধতি (method) থাকিতে পারে না এবং পদ্ধতিবিহীন (non-methodical) কাণ্ড কখনও বাস্তবের অর্থসিদ্ধির সহায়ক হয় না।

বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ তাহাদের কাণ্ড পূর্ব শূন্যস্থিত পদ্ধতি-বৃত্ত মনে করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা অসম্ভব বিশৃঙ্খল। নিউটন অথবা আইন্সটাইন প্রকৃতির প্রচারিত কোন তথ্য সম্পূর্ণ অথবা ভ্রান্ত নহে। তাহাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলির সহায়তা গ্রহণ না করিলে বাস্তবের পক্ষে শূন্যস্থিত ভাবন নির্বাহ্য করা সম্ভব নহে। তাহাদের এই ধারণা সত্য নহে। পরন্তু বর্তমান বিজ্ঞান বহুদূরত্বের জন্মদায়ক অকাণ্ডিকতা, অসত্য এবং অসংগঠনীয়তার নিকট অগ্রসর করিয়া দিতেছে। “বস্তুত্ব”র তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত “বর্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক” শব্দক এবং পাঠ্য করিলে তাহাদের উপরোক্ত কথাগুলি সহজেই প্রতীত হয়।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি

কোন বিজ্ঞান প্রকৃত অথবা বিকৃত তাহা স্থিরতার নাম বিজ্ঞানের “স্বরূপ” বোঝায়। যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তবের সমস্ত রকমের অর্থসিদ্ধি হয়, তাহাকে বিজ্ঞানের সংজ্ঞালাভের প্রকৃত বিজ্ঞান বলা হইবে, আর বাস্তব মনে নাহয়

বিজ্ঞান হইয়া নামঃ যক্ষ্মের হৃৎ-যন্ত্রনা ভোগ করিতে আবশ্য করে, তাহাকে বিস্তৃত বিজ্ঞান অথবা কৃচ্ছান বসিতে হইবে।

ভারতীয় ভবিত বিজ্ঞানের কলে এক সময়ে লক্ষ্য করণের লক্ষ্য মানুষের অর্থনৈতিক লাভিত হইয়াছিল, ইহা মনে করা যে পুষ্টিমন্ডল, তাহা আশ্বাসের গুণ সংলাপ প্রকাশিত এই প্রবন্ধের “কণ্ডের ইতিহাসে মানুষের জ্ঞান, কৃচ্ছান ও অজ্ঞানের পরিচয়” শব্দক অংশ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। কবেই ভারতীয় ভবিত বিজ্ঞানকে উন্নীত বিজ্ঞান বসিতে হইবে।

বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে উন্নতিশীল শক্তিতে। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে ইয়োহান্নে মন্থাচ্ছ বেখা গিয়াছে এবং তাহার পরে সাগা কণ্ডের লক্ষ্য বেকার, অধ্যাপনা, অকালমৃত্যু এবং অরুচি সোনা বাইতেছে। কবেই বর্তমান বিজ্ঞানের কলে মানুষের ভিতর নানাবকম হৃৎ-কণ্ডার উত্তর হইয়াছে—চৈ। বসিতেই হইবে এবং তৎক্ষণাত্রে বর্তমান বিজ্ঞানকে আশ্বাস “কৃচ্ছান” বসিতে বাধ্য।

অর্থ ও ধন-বিজ্ঞান

সংস্কৃত ভাষার লক্ষ্যত অর্থশাস্ত্রে—ভাষার সহায়তায় মানুষের “আসিত আসি”কে উপলব্ধি করিবার, এবং যে যে বস্তুর দ্বারা মানুষের পথবাণী (longevity) চুট্টে থাকিতে পারে তাহা উৎপন্ন করিবার, এবং যে যে বাবস্তার দ্বারা নৈরোগ থাকিতে পারে সেট সমস্ত বাবস্তা কি করিয়া করিতে পারা যায় তাহার জ্ঞান লাভ করিবার উপায় জানা যায়, তাহার নাম “অর্থ-শাস্ত্র”। ভারতীয় ভবিতদের ভাষার লক্ষ্যত অর্থশাস্ত্রে—ভাষার দ্বারা মানুষের অর্থ-সৌভাগ্য সাধিত হয় এবং মানুষ কর্মবর ভাবের অধো কর্ম-বিস্তিতি অথবা বিভ্রান্ত-ম্রুণ লাভ করিতে পারে, তাহার নাম “ধন”। ঐ ভাষার বাৎসরিক-গত অর্থশাস্ত্রে বাগা জীবী চুট্টে উৎপন্ন হয়, তাহারও নাম “ধন”।

আশ্বাসের ভবিতদের কথাগুলিতে মানুষের অর্থ লাভ করিবার দ্বারা উপায় তিনটি :—

(১) জীবী উন্নতিশীল রক্ষা এবং উন্নতি বিধান করিবার বাবস্তা ;

(২) বাৎসরিক ও ত্রৈমাসিকের বিশুদ্ধিবা এবং উন্নতি বিধান করিবার বাবস্তা ;

(৩) মানুষ বাহ্যতে প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণভাবে তৎক্ষণাত্রে উন্নতি-কামী (desirous of improvement) হয়, তাহার বাবস্তা।

ভারতীয় ভবিতদের “অর্থ-শাস্ত্রে” যে ঐ তিনটি বাবস্তার অঙ্গলক্ষ্যন আছে, তাহা ভারতবর্ষের বাবস্তর অধ্যাপনা এবং ভবিত-গণের প্রবৃত্তি পথ্যাণোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ভবিত “লক্ষ্য”কে ধনের সেবা বলিয়া আশ্বাস করিয়াছেন এবং তাহার “লক্ষ্য”র আশ্বাসের মন্ত্র “ও লক্ষ্যবাঃ ধাতুগুণাদি প্রাপিনাং প্রাপ্যাদিনো ০ ০” ইত্যাদি। এই আশ্বাস-মন্ত্রটির অর্থ অতি বিস্তৃত, কারণ ইহার আরম্ভেই “ও” লক্ষ্যী আছে এবং “ও” লক্ষ্যীর দ্বারা যে যে বস্তু, গুণ ও কাহা দ্বারা, তাহা সংস্কৃত ভাষার বীজ-আকারের সহায়তায় প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার বীজ-আকারের সহায়তা হইলে ছোট ছোট এক একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যের দ্বারা বস্তু, গুণ এবং কর্মক্ষমতা প্রকাশ করা যায় এবং ঐ বস্তু, গুণ এবং কর্মক্ষমতাগুলি আশ্বাস সাধারণ বুদ্ধির (common sense) অগোচর এবং তাহাতে বস্তুর “অসম্পূর্ণতার” (concrete and abstract ideas) প্রকাশ হইয়া থাকে। এই “ও” লক্ষ্যীর দ্বারা যে বাগা প্রকাশ করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে। তাহা এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

ঐ মন্ত্রের শেষাংশ—“...লক্ষ্যবাঃ ধাতুগুণাদি প্রাপিনাং প্রাপ্যাদিনো...” ইহার অর্থ—যে লক্ষ্য, দ্বারাই ভাষার রূপ এবং তুমিই ভাষার জীবন মান করিয়া থাক।

কাজেই দেখা বাইতেছে, ভবিতদের কথাগুলিতে “বাক্য”কে প্রধান “ধন” বলিয়া বুঝিতে হয়।

বস্তুতঃ পক্ষে ভারতীয় ভবিত অর্থ শাস্ত্রের প্রথম লক্ষ্য, মানুষের অর্থবস্ত্রের বাবস্তা করা, দ্বিতীয় লক্ষ্য, মানুষের বাবস্ত্র-রক্ষার বাবস্তা করা এবং তৃতীয় লক্ষ্য, মানুষের প্রকৃত জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা।

উপরোক্ত তিনটি লক্ষ্য কার্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল বলিয়া হয় তাহার বৎসর আগে মানুষের ইতিহাস বিজ্ঞান যক্ষ্মের হইয়াছিল এবং এই তিনটি লক্ষ্য কার্যে পরিণত হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই গত ছয় শতাব্দীর বৎসর হইতে ভারতবাসীর তথাকথিত “ভক্ত মন্ত্রণার” প্রকৃত মন্ত্রণা নামের অধ্যাপনা বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ভারতবর্ষের রূপক সম্প্রদায়

কিছুদিন আগেও প্রায় সমগ্র ভগতের অচ-সংস্থানেই লগ্ন্যতা কথিতে পারিয়া আনিতেছিলেন এবং ভাষ্যভরণে ভগতের মধ্যে অনন্তপ্রাধান্য আধিক-স্বাধীনতা পরিচালিত হইত।

কবিবিশেষের লক্ষ্যমাত্রিক ভগতে ভবীত ইচ্ছা হইত। বর্ধমান সমস্যের তুলনায় অসুখতঃ পক্ষে ত্রিশগুণ ছিল এবং বাস্তবের সংখ্যা অসুখতঃ পক্ষে পচিশ গুণ ছিল, ইহা মনে কবিবার কান্দন আছে।

বর্ধমান অর্থনীতি-শাস্ত্রের সমস্যা কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলে “বকশী”তে যে আরতনের পূজা রহিয়াছে, তাহার মন্তব্যপক্ষে একশত পাতা পড়িতে হইবে। অবশ্য তাহা হইতে অর্থ-শাস্ত্র বলিতে যে কি বুঝায় এবং তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহার কোন প্রাণালীকৃত (methodical), প্রয়োগযোগ্য (capable of application in the practical field) ধারণা লাভ করা যায় না। অবশ্য আদ্যা বার্মান, পেণ্ড, অশিয়া ঠাম্প প্রভৃতি বিখ্যাত প্রকাশকগণের পুস্তক সাধারণত মনোনিবেশ লক্ষ্যেই পড়িয়াও বর্ধমান অর্থনীতির কি সংজ্ঞা এবং তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারি নাই এবং অর্থনৈতিকগণের দ্বারা ভগতের বর্ধমান সর্বস্বাস্থ্য হাঙ্গামার কোন প্রতীকার চেষ্টাতেই নাই, ইহা বেশিতেছি বলিয়াই উপরোক্ত উপদংশেই উপনীত হইয়াছি। আদ্যা বাস্তব ভগতে বাহ্যে বেশিতে পাইতেছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, ক্রমশঃই বাস্তবের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে এবং আদ্যের পানিয়ামেন্টের অর্থনীতির মিসে নৈতিস চেম্বারের দ্বারা বাহ্যে বলিতেছেন, তাহা বাস্তব অর্থদ্বার বিরুদ্ধ। তাহা অশিয়া ঠাম্প যে চিত্রাঙ্কিত ব্যক্তি তাহা অর্থীকার করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার বিখ্যাত কোন প্রণে ইংলণ্ডকে তাহার আদ্যের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায়ের সম্ভাবনা পাওয়া যায় না। আমি কখনও ইংলণ্ডে গাই নাই তাহা লগ্ন্য, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ইংলণ্ডকে আদ্যের নিজের দেশের একটা অংশ বলিয়া মনে করি। কারণ ইংলণ্ড বিপদ হইলে ভারত-বর্ষও বিপদ হয়, ইহা আদ্যের বিশ্বাস। ইংলণ্ড যে বিপদের দিকে ক্রমশঃ অগ্রগমন হইতেছে, তাহার স্পষ্ট বৃত্তিবার মত বস্তিত্বলক্ষণ একটা লোকও বর্ধমান ইংলণ্ডে আছেন, ইহা মনে করিবার বৌদ্ধিকতা কাহারও কাণ্ড হইতে খুঁজিয়া পাই না। আদ্যের বর্ধমান প্রাণন মন্ত্রী বদন্তউইন গো লোক হিসাবে

পূর্ণ ভাল। তাহা তাহার বিবিধ কার্য হইতে দৃষ্টি দৃষ্টি দৃষ্টি, কিন্তু তাহার কোন কার্যে সমস্তপ্রণোদিত চিত্তাঙ্কিতভাবে কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি? যদি পাওয়া নাইত, তাহা হইলে আদ্যের দাবদা-দাবিত্যের অসুখ ক্রমশঃ একজন অবনত হইতে পারিত কি? পানিয়ামেন্টের মন্ত্রী-সভার যে কতজন লোকের কাণ্ডতৎপন্নতা (activity) পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও তার হাতের মেরের মনে ছিলেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাহারও কোন কার্যে কোন দৃষ্টিতার (far-sightedness) পরিচয় পাওয়া যায় কি? দৃষ্টিতার অসুখা বেশ-প্রাণতা (patriotism) থাকিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই বিপদের সময় জাতিবর্ষের বেশ-প্রেমিক নামে প্রসিদ্ধ (known as patriots) কয়েকটা অভিনেতাকে (players) লগ্ন্য ভারত-শাসনের পুনর্গঠন (re-organisation of Indian administration) নামক একটা প্রহসন (farce) তিনি এতদিন দ্বিগুণ চালাইতে পারিতেন কি? অবশ্য তাহার মন্তব্যসম্মে, একটা প্রয়োজনীয় কার্য করিতেছিলেন বলিয়া তিনি যে মনে করেন, তাহা পরিহার করা যায়, কিন্তু ঐ কাণ্ডখোয়া ভারতবর্ষীয় এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণের অসুখের অভাব, শিল্পী ও বাৎসরিক-গণের বাৎসর্য অবনতি রোধ (arrest of the fall), ক্রমশঃগণের রূপের অবনতির বোধ সংগঠিত না হইলে অসুখ তাহার অংশ করিতে না পারিলে, আদ্যা উহাকে বুদ্ধি অগ্রসারে প্রহসন (farce) বলিতে পারি না কি?

এইরূপ ইংলণ্ড, ইরোপোপের এবং আমেরিকার যে কোন মন্ত্রী-সভার দিকে লক্ষ্য করা যাক না কেন, প্রায় সর্বত্রই মন্তব্যগণের পুষ্টিগণতার অভাব এবং বস্তিত্ববাহিতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য তাহারও মধ্যে কাহারও মন্তব্য হিসাবে অদ্য এবং দম্ব বলা যায় না।

সর্বত্র দাব্য-পরিচালকগণের মধ্যে এই যে দৃষ্টিতার অভাব হইয়াছে, তাহার কারণ—বর্ধমান অর্থনীতি-বিজ্ঞানের বিকৃত ভাব।

বর্ধমান অর্থনীতি অগ্রসারে “খন” বলিতে বুঝায় সোনা, রূপা ও তাম্র। প্রকৃতি দাতৃ-নির্ধিত মুদ্রা ও কাগজ-নির্ধিত নোট।

বহুমান অর্থনীতি মতাদর্শের প্রকাশ "ধন" (wealth) বাড়ানোর উপায় শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার করা।

বহুমান অর্থনীতির "ধন" (wealth) ও বহুগুণিত্তি ক্রিয়াকার উপায় (means of increasing wealth) এটো দুটোই বিস্তার। এটো দুটোই বিস্তার ও অস্বাভাবিক বস্তুকে ধনবিজ্ঞান-বস্তুে বিকাশ করিয়া এবং তাৎক্ষণিকভাবে ধনবহন করিতে দেয়া। এখানে বহুমান ভগ্নের বাচ্য-পরিচালক মন্ত্রীকে বাচ্য করেণা অতি-মাত্রার (superman) মত বিনিময় বক্রণে (sleepless night) বাচ্য করিয়াও মিত্র মিত্র সাক্ষ্যের অর্থদাতার কোন প্রতিভাও করিতে পারিতেছেন না।

জগতের জমীর উর্বরতার ও বহুরে মূল্যবোধতা যদি থাকে উপযোগী শক্তির এবং বহু প্রস্তুত করিবার মত কৃষা, বেশের ও পশুদের প্রস্তুত অভাব হয়, তাহা হইলে যানি যানি কর্তৃ, বোদা, ধান ও কাগজের মত প্রাকৃতিকের কি অল্পবহুর অংশে পূরণ করা সম্ভব হয়? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ঐ মতাদর্শকে প্রস্তুত ধন (real wealth) বলা যায় কি?

মানুষ ধন উপার্জন করে জীবন ধারণ করিবার জন্য। মুক্ত মানুষের জীবন নষ্ট করে। কাজেই মানুষের জীবন ধারণ করিবার জন্য এমন কোন উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত নহে, যাগর মত পুঙ্খের উদ্ভব হইতে পারে।

জাতীয় বহুগুণিত্তি কর শিল্প ও বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বহু অবলম্বনীয় চইয়া পড়ে না কি?

উন্নয়ন শক্তিকার এবং বিংশ শতাব্দীর ভগ্নের ইতিহাসে যে কতটা দৃষ্টের উল্লেখ দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটিই কারণ কি বৃদ্ধিভাবে (directly) অথবা সোপানভাবে (indirectly) বাণিজ্য-প্রতিযোগিতা (trade rivalry) নহে?

কোনই বহুমান অর্থনীতির মূল কথা যে "পন ও ধন-উপার্জনের বিধি", তাহাই ব্রাহ্মণ্যক।

এই ব্রাহ্মণ্যক কথাগুলি বিখ্যাত করিতে চেষ্টা করিলে অর্থনৈতিকগণের মস্তিষ্ক এত ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে, তাহারা এখন আর কোন ভিনিয়েই বাস্তবতা পর্যন্ত লক্ষ্য করিতে চায়েন না।

অর্থনৈতিকগণের ধারণা যে, বহুমানের ক্রিয়াকার প্রয়োজন্য-বিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে এবং অধিকতর পরিমাণের ক্রিয়াকার বিক্রয় করিবার উপযুক্ত বাচ্য কৃষানি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অল্প কথার আশ্রয়ে বক্তব্য শেষ করিতে হইলে, আশ্রয় যার প্রদ করিব যে, কোন যোগে কোন-কণ পাশ্চাত্য সমস্ত অথবা নরোগের প্রক্ষেপ (throw) করিবার অথবা অধিনায়োগে ভবিষ্যৎ করিবার কোন মূর্ত্তা আছে কি? এক বস্তুয়ের পাশ্চাত্য অথবা বহু প্রস্তুত করিবার কৃষা পরমতী বস্তুয়ের বহন করিয়া লইবার (carry over) কোন পরিণত কোষাণ্ড পাওয়া যায় কি? যদি উদ্ভূত পশুগুলি নরোগের প্রক্ষেপ করিবার অথবা বহন করিয়া নষ্ট করিবার অথবা এক বস্তুয়ের উৎপন্ন পশু পর বস্তুয়ে বহন করিবার বাস্তব মূর্ত্তা খুঁজিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি বৃদ্ধিতে চইবে না যে, জমী হইতে যে যে পাশ্চাত্য ও বাহ্যিক শক্তির উৎপত্তি প্রতি বস্তুর হইতেছে, তাহার সমস্তই মানুষ ব্যবহার করিতে পারিতেছে? এবং ইহার পর যদি বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সর্বত্রই জনসাধারণের ভিতর আর ও বহুর অভাব আছে, তাহা হইলে কি বিনিতে হইবে না যে, জমীর উৎপন্ন পাশ্চাত্য ও বাহ্যিক শক্তির পরিমাণ কম হইতেছে? ধন-বিতরণে (distribution of wealth) নিশ্চলতা (irregularity) থাকিলে, কৃষিভাষ্যে ব্যবহার উৎপত্তি কম হইলেও কি তাহার ক্রয় বিক্রয়ের অর্থনৈতিক হইতে পারে না? কোন Statistics-এ যদি ইহার বিরুদ্ধে কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি বৃদ্ধিতে চইবে না যে, ঐ Statistics প্রশংসনে বৃদ্ধিমান বস্তুয়ের ব্যবহার হয় নাই?

বহুমান অর্থনীতি আরও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিলে, ইহা যে কোনও বিজ্ঞানই নয়, পক্ষ ইহা এক বিস্তৃত যে, অতি-বাহ্মণ্যক মস্তিষ্কের ক্রান্তি পর্যন্ত ইহার দ্বারা সানিত হইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন করা যায়।

আইন-বিজ্ঞান (Jurisprudence)

সংস্কৃত ভাষায় আইন-বিজ্ঞানের নাম "ধর্ম"। ঐ ভাষার লক্ষণত অর্থনৈতিকগণের যে ব্যবহার দ্বারা বাস্তব জামদিক অথবা সামাজিক হইলে, সে যে সামাজিক ও জামদিক হইয়াছে, তাহা অল্প কয়টিই দেখা যায় এবং তাহাকে সহজলভ্য করা

যাষ প্রাচীন নাম “কৃতি”। ভারতীয় ধর্মবিশেষের কথামতে যাষের গুণ ও কার্যক্ষমতা নির্ধারণ করিতে হইলে, যে যে বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়, তাহার প্রত্যেকটির আধিক্য এবং অল্পতা নির্ধারণী। যাষ এমন কোন কার্য করে না অথবা এমন কোন গুণসম্পন্ন হয় না, যায তাহার প্রত্যেকটির নহে। অল্প ও গুণ ও কার্যক্ষমতার প্রত্যেকটির আধিক্য ও অল্পতা যাষের রূপ-রঙের উদ্ভব করিয়া থাকে, কালেই যাগতে এই আধিক্য ও অল্পতা সংঘটিত না হইয়া ধাপাধাপের উদ্ভব হয়, তৎক্ষণে দৃষ্টি তাঁহাদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তাঁহাদের প্রতিপাদ্যে প্রধান লক্ষ্য ছিল যে, যাষের একবার চুরি করিলে অথবা মিথ্যা কথা কহিলে অথবা অল্প কোন নির্ধারিত কার্য করিলে, আর যাগতে তাহার এই ভারতীয় নির্ধারিত কার্যের প্রযুক্তির উদ্ভব না হয়, তৎক্ষণে ব্যবহার করা। তাঁহাদের ব্যবহার যে তৎক্ষণেই হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বর্তমান আইন-বিজ্ঞান লক্ষ্যে আদ্যমাত্র বিদ্যুৎ আলোচনা করিয়া না, কাগজ পত্রাদি পর্যন্ত এই আইন-বিজ্ঞান অল্পসময়ে রাজ্যের শাসন পরিচালিত থাকিলে, তৎক্ষণে পর্যন্ত প্রকাশ্য ভাবে উহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা অনুমোদনের পক্ষে অসম্ভব এবং গর্হিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমান কালে একজন চোর বাহুবাহুর চুরি করিয়া বহুবার ভেঙ্গে প্রেরিত হয় এবং জীকনিদের সমস্ত হইতে কোন রাজ্য ১০০ বৎসরের অধিক প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন হইতে পারে নাই—ইত্যাদি লক্ষ্য করিলে বর্তমান আইন-বিজ্ঞানেরও বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিবার যত যে বহু বিষয় আছে, তাহা লক্ষ্যেই অনুমান করা যায়।

এই সংখ্যায় “বিজ্ঞানের সংজ্ঞা”, “বিজ্ঞান লাভ করিবার উপায়”, “বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য”, “বিজ্ঞানের বস্তুগত”, “অর্থ ও ধন-বিজ্ঞান” এবং “আইন বিজ্ঞান” লক্ষ্যে ব্যাখ্যা বলা হইল, তাহাতে বোঝা গিয়াছে যে, বর্তমান বিজ্ঞানে বিজ্ঞানের ধর্মাবলি কোন লক্ষ্য নির্ধারণিত হয় নাই, কোন বস্তু বা বস্তুগত কি করিয়া ধর্মাবলি ভাবে বর্ণিত হয়, তাহার উপায় দ্বিধা বলা হয় নাই, কি উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের আলোচনা হওয়া উচিত, তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। আমাদের কোন প্রকৃত অর্থ-বিজ্ঞান নাই এবং আইন-বিজ্ঞানেরও বিরুদ্ধ-সমালোচনা করিতে

পায়া যায়। বর্তমান বিজ্ঞানের যে যে আবিষ্কার মানুষের ব্যবহারে প্রচলিত হইয়াছে, সেইগুলি আশাতত্ত্বগতভাবে মানুষের মনোবৃত্তি হইলেও তাহার প্রত্যেকটি যে আমাদের অস্বাভাবিক এবং অসম্ভবতা সংঘটিত করিতেছে, তাহাও আদ্যমাত্র পত্র সংখ্যায় “বৈজ্ঞানিক”-এ প্রকাশিত “বর্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক”-লিখিত প্রবন্ধের ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮ এবং ২৮৯ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি। এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক গুনিয়া “বর্তমান তথ্য-কথিত বিজ্ঞানেই অসম্ভবতার বর্তমান সমস্ত রূপের কারণ” এই ভারতীয় উপসংহারে যদি আমরা এখন উপনীত হই, তাহা হইলে কি আমাদের গণিতের পাঠ্যপুস্তক “পাণ্ডা” মনে করিয়া উড়াইয়া দিবেন?

যদি আর একবার বলি যে, বর্তমানে কোন প্রকৃত বিজ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক নাই, আছে কেবল কতকগুলি বিজ্ঞানিক অন্ধকার, তাহা হইলে কি আমাদের চিত্তাঙ্গীল পাঠ্যপুস্তকের কাছে আমরা উপহাস্যাম্পন্ন হইব?

এই সংখ্যায় এই প্রবন্ধের শেষের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। আপনাবা অনুমান করিলে জানিতে পারিবেন যে, তিনি একজন অন্ধবিশিষ্ট সোকারবার এবং তাঁহাকে মিত্রের অথবা দূর্বল সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু একজন দুর্ভাগ্য লেখকের লগ্ন্যস্তায় সেখানেও তৎক্ষণের কথা বর্ণিত হইতেছে বলিয়া আপনাবা এই বর্ণনায়ের কথা উপর তাক্যোলা দেখাইবেন না—ইহাই আমার অনুমান।

বর্তমান যুগে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া কোন বস্তু নাই তাহা সত্য হইলেও, কতকগুলি প্রয়োগ (practices) যে আছে, তাহা অস্বাভাবিক করা যায় না। কোন প্রয়োগের (practices) মূল কোন বিজ্ঞান না থাকিলে এবং মানুষের ব্যবহারে তাহাদের প্রয়োগ হইলে, সেইগুলি হইতে মানুষের জীবনযাত্রায় ঘটনাতর উদ্ভব হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক। বর্তমান যুগের যাত্রা হইতেছেও তাহাই। প্রকৃত বিজ্ঞানের জানহীন প্রয়োগকে আমরা প্রচলিত ভাষায় “কারিকরী” (craftsmanship) বলিয়া থাকি এবং ঐহিক কারিকরী (craftsmanship) কথন, তাহা হইলেও বহুদলসমাবে কারিকর (craftsmen) বলা হয়। তৎক্ষণে বর্তমান তথ্যকথিত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে গণ্যের কারিকরী এই প্রয়োগগুলি অংশগত করিয়া জীবনযাত্রা নির্ধারিত করেন, তাহাও নিম্নলিখিত

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়া ঘোষণা করিলেও লব-পাত্রাদিগণকে
জ্ঞানদ্বিপকে “পণ্ডিত” বলিয়া বীকার করা যায় না। মহত-
সমাজ জ্ঞানদ্বিপকে অস্বীকারী “কারিকর” বলিতে বাধ্য।

জনতার বিভিন্ন বিশ্ববিজ্ঞানের হইতে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে যে
সমস্ত ডি. এস. সি. এস. এস. সি. সি. এইচ. ডি. প্রভৃতি
উপায় হইয়া বিশ্ববিজ্ঞানের ঘোটা ঘোটা যেমন পত্রীকাপারেই
জীবন নির্বাহ করিতেছেন, জ্ঞানদ্বিপকে “কারিকর” (grafic-
man) পৰ্য্যন্ত বলা যায় না। এই লক্ষণগুলি প্রায়শই
অর্থহীন পরিভাষার (terminology) সৃষ্টি করিয়া জন-
সমাজকে বিভ্রান্ত করিতেছেন এবং আমাদের “উচ্ছন্ন” যুবক ও
যুবতীদিগের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া মহতসমাজের ভবিষ্যৎ পথান্ত
অন্ধকারায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাদের চাল-চলন ও
চরিত্র-প্রদর্শন: বাহা দেখা যায়, তাহাতে ইহাদ্বিপকে মহত
বিদ্যাবোও অস্বাভাবিক একটা কিছু বলিতে হয়। ইহাদ্বিপকে
কি নামে অভিহিত করিব, আমি তাহা শ্রুতিয়া পাইতেছি না।
ইহাদের নামকরণের চার আমাদের পাঠকদিগের উপর
পাকিল।

বৈজ্ঞানিক পাঠকদিগকে মনে রাখিতে হইবে, আমি
কাহারও উপর কোন ব্যক্তিগত বিষয়ে পোষণ করিয়া কিছুই
নির্দেশ্যেছি না। মহতজাতির আসন্ন লক্ষ্যকালে তাহারা
জ্ঞান-বাহু-মনে উঠাচ্ছে এবং এই লক্ষ্যে বাঁচিয়া থাটাইতেছেন,
জ্ঞানবোধের বহুত লক্ষণ সম্মুখে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হাথা
বলা বুদ্ধিবৃত্ত বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই বলিয়া গাইতেছি।

ডি. এস. সি. প্রভৃতি উপাধিধারী শাস্ত্রকর্মণ, আপনাতা
উদ্ভেদিত না হইয়া একবার ভাবিয়া দেখুন যে, আপনাতা
প্রায়শ: মহতসমাজের অথবা আপনাদের নিজেদের কি মঙ্গল
সাধন করিতেছেন? আপনাদের মধ্যে যদি কাহারও বিশ্ব-
বিজ্ঞানের প্রকৃতির বেগে চাক্ষুসী ছাড়িয়া দিয়া শোকহিতকর
কাণ্ডের দ্বারা স্বাধীনভাবে আপনাদের পরিবারবর্ষের ভাবিকা
উপার্জন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা করিবার সামর্থ্য আপনা-
দের মধ্যে কমন্সের আছে? যে বিভাষ দ্বারা স্বাবলম্বনে
নিজ পরিবারবর্ষের ভাবিকা পূর্ণত উপার্জন করিবার সামর্থ্য
লাভ করা যায় না, সেই বিভাষ অভিমান করিবার অথবা
তাহাকে “বিজ্ঞা” বলিয়া অভিহিত করিবার কোন বুদ্ধিবৃত্ত
কারণ আছে কি? আপনাদের বিভ্রান্তির (mislake)

কর আপনাতা দ্বারা মনে তাহা সভা, কিন্তু তাই বলিয়া
আমাদের জনসমাজের ভবিষ্যৎ উচ্ছন্ন-রক্তপটিকে বিভ্রান্ত
করা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্ত কি? আপনাদের মধ্যে
হাওয়া প্রবীণ, জ্ঞানবোধের কি একবার সচেতনের মত
উজ্জ্বলবে বলা উচিত নয় যে, “তাই ও তথ্যীয়া, আমারা
বুদ্ধিতে পারিবাছি যে, আমাদের বিভা প্রকৃত বিজ্ঞা নহে,
তোমরা তাহাও বুঝিতে পার নাই। আর তোমরা কেহ এই
বিজ্ঞা লাভ করিতে আসিও না।” মহতসমাজের আসন্ন
বিপদের দ্বারা কি আপনাদের মধ্যে একজনও চক্ষু মেলিয়া
নেই? তারপরে উপরোক্ত কথা কহী বলিয়া অক্ষয়কীর্তি
রাখিয়া গাইবেন না?

প্রকৃত বিজ্ঞানের বিভা লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধীয় আমাদের বর্তমান কর্তব্য

বর্তমানে বাহা বিজ্ঞান বলিয়া চলিতেছে, তাহা বিভ্রান্তিকর
হইলেও এবং প্রকৃত পক্ষে তাহা জ্ঞান হইলেও একদিনেই
তাহার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নহে ও একদিনের মধ্যে
তাহার পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করাও সম্ভব নহে। আগার
একদিনের মধ্যে তাহার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া
একবারেই তাহার পরিবর্তন না করিবার চেষ্টা করা শূন্যসিদ্ধ
নহে। তাহার পরিবর্তনের চেষ্টা কোন “বিস্ফোরক” (draslio)
চেষ্টা না করিয়া আগে আগে অতর্কিতভাবে বাহাতে পরিবর্তন
হয় তাহার চেষ্টা হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানের বিভাবী যুবক-
দিগকে বিজ্ঞানের কোন বর্তমান গ্রন্থ না পড়াইয়া—“বিজ্ঞান
কাহাকে বলে,” “বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি,” “বিজ্ঞান লাভ করিবার
উপায় কি” ইত্যাদি বাহাতে তাহারা জানিতে পারেন এবং
উপরোক্ত উপায়গুলি বাহাতে তাহারা কার্যত: অভ্যাস করেন
ও ক্রমশ: বাহাতে প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, তাহার
চেষ্টা করা উচিত।

মনে রাখিতে হইবে, বর্তমান তৎকালপিত উচ্চ উপাধিধারী
বৈজ্ঞানিকগণের দ্বাতির চক্ষু তাহারা নিঃসঙ্গ দ্বারা নহেন।
কামেই বাহাতে তাহারা জনসমাজে কোনরূপ আত্মপ্রকাশ
সহিত ব্যবহৃত না হন, তাহাও প্রত্যেকের লক্ষ্য রাখা উচিত।
বর্তমান উচ্চ-উপাধিধারী বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে হাওয়া দ্বিতিক
অথবা দ্বিতিক অভিধানী, চিত্র-বাহাদুরে অসংখ্য, তাহারা

যাহাতে জনসমাজে অবলা দর্পণবোঁটার চোখে বিশেষ প্রভাব পান না হন, তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ অসুপেক্ষ (unworthy) লোক সাধারণের প্রভাব পায় হইলে উপেক্ষিত (worthy) লোকের উন্নয়ন ও উন্নতি হয় না। নিম্নলিখিত অঙ্গের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণিতা যোগ্য করিবার প্রকৃতির নাম “বস্ত্র,” ইহা আনান্যিককে সঙ্গম মনে জাগ্রিত হইবে।

“ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়”— এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য কি তাহা জানিবার জন্য অনেক উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন বহিরা জাতির কালে আসিয়াছে। এই প্রবন্ধে আবার বাঁধা বাঁধা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপতঃ এই—

১। জনতের সর্বত্র জমীর উর্বরতা অত্যন্ত কমিয়া গাইতেছে। তাহার জন্য এখন আর কোথাওও কৃষি করিয়া কৃষক লাভবান হন না এবং সর্বত্রই ভীষণ কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে আশ্রয়শীল হইয়াছেন।

২। লাভজনক কৃষিকার্য্য করা অসম্ভব হইয়াছে এবং তাহার জন্য কৃষকগণ শিল্প, বাণিজ্য ও চাকুরী অবলম্বন করিতে চাহিতেছেন বহিরা জনতের সর্বত্র বেকারের উন্নয়ন হইয়াছে এবং উকীল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রকৃতি সমস্ত শ্রেণীর লোক আপন আপন জীবনযাত্রার অসুবিধা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

৩। কৃষিকার্য্য হইতে মানুষের স্বাস্থ্য—দাঁড়, গম্বির এবং বস্ত্রের উপস্থান—তৃপ্ত উৎপত্তি হয়। কৃষিকার্য্য না হইলে মানুষের অস্বাস্থ্যের অত্যন্ত বটিনার আশঙ্কা হয় এবং সমাজে শিল্প ও বাণিজ্য-পরিচালনার অসুবিধা ঘটে। কাষেই কৃষিকার্য্য অসম্ভব হইলে মানুষের জীবন ধারণ করাও অসম্ভব হইতে পারে।

৪। বর্তমান কালে জনতের সর্বত্র জমীর উর্বরতা যে ক্ষত পতিতে কমিয়া গাইতেছে, তাহা অনতিবিলম্বে লক্ষ্য করিতে না পারিলে আদামী ৮১০ বৎসরের ভিতর মানুষের জীবন ধারণ করা আরও কষ্টকর হইয়া পড়িবে এবং সর্বত্র মানুষের অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু আরও বাড়িয়া যাইবে।

৫। সর্বত্র জমীর উর্বরতা হ্রাস পাইবার এবং মানুষের অস্বাস্থ্য ও অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইবার প্রধান কারণ, বর্তমান সভ্যতা ও বর্তমান বিজ্ঞান।

৬। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ প্রভৃতির ব্যবহার লইয়া বর্তমান সভ্যতার অনুদান হইয়াছে। ভারতীয় কৃষির কথাহুগারে স্বর্ণ ও রৌপ্য “মুক্তিকার” “ভেজ” ও “স্নেহ” বৃত্তি ও রক্ষা সাধিত করে এবং লৌহ তাহার “উৎপাদনের ইচ্ছা”র উন্নয়ন করে। ভারতীয় কৃষির কথা যে সভ্যতা, তাহা কিংবা পরিমাণ মুক্তি-কার সহিত অতি সামান্য মাত্রায় একটু একটু স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের স্তূভা নিশ্চিত করিয়া দুই বৎসর রক্ষা করিলে এবং ঐ মুক্তিকার উৎপাদিকাগণিত রক্ষা করিলেই বৃদ্ধিতে পারা যায়।

ভারতীয় কৃষির কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তাহা হইলে যমিত পদার্থের উৎপাদন করিলে জমীর উর্বরতা হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য এবং বর্তমান সভ্যতাকে তাহার জন্য দায়ী করা যায়।

৭। মানুষের স্বাস্থ্য ও বয়স বাড়িবার জন্য ঐতল বায়ু সর্জন্যলেকা অধিক প্রয়োজনীয়— ইহাও ভারতীয় কৃষির কথা। ঐতল বায়ুতে যে মানুষের শরীর তাল থাকে, তাহা আবার সহজেই বৃদ্ধিতে পারি। বর্তমান বিজ্ঞানের আরম্ভ হইয়াছে প্রধানতঃ বাষ্প, বিদ্যুৎ, রেডিওর প্রকৃতি “ভেজ” পর্যাণের ব্যবহার লইয়া এবং তাহাতে যে বায়ু উৎপাদিত হয়, তাহাও অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মানুষের অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু যে ক্রমশঃই অত্যন্ত বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাও আবার আমাদের নিজ নিজ পরিবারের ও আত্মীয়-স্বজনের স্বাস্থ্য ও মৃত্যুর বয়স লক্ষ্য করিলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কাষেই বর্তমান বিজ্ঞানকে মানুষের অস্বাস্থ্যের এবং অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী করা গাইতে পারে।

৮। শিল্প ও কৃষির পার (manure) দ্বারা জমীর উর্বরতা কণকিত বৃদ্ধি করা যায় এবং তাহার দ্বারা যে সমস্ত শক্ত ও ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা দেখিতে অসংকল্পিত বৃহৎ ও লক্ষ্য হয়—ইহা সভ্যতা। কিন্তু জমীর উর্বরতা বৃদ্ধি করিবার জন্য কৃষির পার ব্যবহার করিতে হইলে কৃষিকার্য্যে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাহা সমুদান করিয়া কৃষক লাভবান হইতে পারেন না এবং উহা হইতে যে সমস্ত শক্ত ও ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা মানুষের স্বাস্থ্যকর না হইবে, পরন্তু অস্বাস্থ্যকর। এই কথা যে সভ্যতা তাহা কৃষির পার হইতে উৎপন্ন বল ব্যবহার করিলে পরোক্ষরূপে কি অস্বাস্থ্য হয় উহা একটু সম্ভাব্য হইয়া পরীক্ষা করিলেই বৃদ্ধিতে পারা যায়। “বিশ্ব-

মিত্রের পক্ষ” বলিয়া কোন কোন উরকারী, ফল ও শত্রু
মানুষের অব্যবস্থাপনা, এই কাজের একটা প্রথা যে অসামান্য
মধ্যে আছে, তাহার ফলে “কৃত্রিম শত্রু”—ইহা মনে কৃত্রিম
কারণ আছে।

১। বর্ষমান জল-সিকন (irrigation) -প্রণালী
 জলীয় উর্জগতা স্বাভীতপে বৃদ্ধি কতিবাহ উপযোগী নহে।
 তাহাতে কয়েক বৎসর জমায় 'হল' একটু বৃদ্ধি করে এবং
 প্রাক্ত্ত কলগও কথকিং বৃদ্ধি পায় তাহা সত্য, কিন্তু তাহা
 স্বাভী হয় না। ঐ প্রণালী অল্পমারে জল একস্থানে আবদ্ধ
 করিয়া রাখা হয় এবং তাহাতে কয়েক বৎসর পরে একটা
 বাষ্পের উদ্ভব হইতে থাকে। তাহাতে নিত্যনতী স্থানসমূহ
 ক্রমশঃ বাহুবের পক্ষে অস্বাভাবক হইয়া উঠে এবং ঐ স্থান-
 সমূহের শক্তও বাহুবের অস্বাভাবক হয়। আমাদের কথা
 যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে, তাহা কোন প্রকল্পনটোব বিশেষাটোব
 উপর নির্ভর না করিয়া যে যে স্থানে যৎ বৎসরের অধিক কাল
 বর্ষমান জলসিকন-প্রণালীর প্রবর্তন হইতাহে, সেই সেই
 স্থানে বিস্তারিত বৃদ্ধি লইয়া অহুসতান করিলেই জানিতে পারা
 যায়।

১০। জন্ম কর্তব্য কবিবার ভক্ত বাস্প্যাদিত লাভল (tricolor) বাবাহার করা হিতকর নহে। তাহাতে জন্ম অত্যধিক পরিমাণে উত্তপ্ত হয় এবং জন্মের কারণে উত্তপ্ততা কবির বাইবার আশ্রয় ঘটে। জন্মের কর্তব্য বাস্প্যাদিত লাভল বাবাহার হইলে সম্বন্ধে "বেকাগ" গোষ্ঠের উত্তর হওয়া অনিবার্য।

১১। বর্তমান বিজ্ঞানে জীবের উৎপত্তি বৃদ্ধি
করিবার জন্য এবং কৃত্রিমভাবে লাগান কৃষিবিদ্যায় জল যে যে
উপদেষ্টা আছে, তাহার প্রত্যেকটিতে বৃক্ষনিষ্কাশন অর্থাৎ আছে
এবং তাহারই কলমে আঘেটিকা প্রস্তুত হইবে "বেকারের"
সংখ্যা এবং হাটকাগের মাত্রা। জাতিগণের জীবনব্যয় অংশকও
অধিক—ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

১২। জবাব উল্লিখিতা এবং বাস্তব প্রকৃতি সমস্ত
চর ও পল্লব জীবের ব্যবহার উন্নতি কি কঠিন সাধিত
করিতে হয় এবং তাহার প্রকার উপায়ে বা কি, তাহা একমাত্র
তাত্ত্বিক। জীবগণ সম্বন্ধেই গাণিতিক এবং তাহা শিশিষ্য
কঠিন সাধিয়া নিদায়েন উৎকৃষ্ট বৈদ্য, বর্শন ও পুরাণাদি
প্রভৃতি। যে কারণে এই প্রকৃতি লিখিত তাহার নাম সংকট

অর্থাৎ এবং অর্থাৎ অগতির মাহুত বহমিন হইতে দুনিয়া
গিয়াছেন ।

১৩। আমাদের ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ এখন বাহ্যিক সংস্কৃত ভাষা বলেন, তাহা তাহাজের ভবিষ্য উপযোগ্য সংস্কৃত ভাষা নহে। তাহারই ভিত্তি এখন আর কোন ভারতীয় পণ্ডিত বোধ ও বর্ণনের সুসঙ্গত এবং সুপ্রসিদ্ধ তাহা বখাবণ বৃত্তিতে পারেন না এবং তাহাদের সংস্কৃত লাইতে থাকা হইল। যে যে “ভাষা” বর্তমানে প্রচলিত, তাহাদের সংস্কৃতগণকে আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ দেবতাবোধে বহুদিন হইতে পূজা করিয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাদের প্রায় সকলেই ভারতীয় ভবিষ্য উপযোগ্য সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণভাবে জানিতেন না— ইহাও মনে করিবার কারণ আছে। তাহারই ভিত্তি বাস্তব-দর্শন (observation) এবং বোধ (knowledge) বাস্তবতা-মূল্য কালমিক মেটাফিজিক্স (metaphysics) চাইয়া থাকিয়াছে।

১৫। জমীর উর্ধ্বতায় দ্বাৰীকাথে উন্নতি বিধান
করিয়া মনুষ্যতাত্ত্বিক আশঙ্কিত হুইবে হইতে বক্ষা করিবার
একমাত্র উপায়, প্রথমতঃ যে ভাষায় ভাৰতীয় জমিদার এবং ও
বৰ্ণনাদি লিখিত তাহার পুনঃস্থাপন করা, দ্বিতীয়তঃ যে ও
বৰ্ণনাদি প্রকৃতপক্ষে বলাবল্য অর্থে প্রসারিত করা, তৃতীয়তঃ
ভাৰতীয় জমিদার যে যে উপায় অবলম্বন করিবার উপদেশ
দিয়াছেন, তাহা পঠিতা করিয়া কাৰ্য্যে পরিণত করিবার
চেষ্টা করা। এই তিনটী উপায় কাৰ্য্যকরী করা বহু সময়-
সাধক।

অন্য ক্ষেত্রেও সর্বাঙ্গ প্রত্যেক মানুষের অবস্থা ক্রমশঃ
 উন্নতিতে যোগ্য হইয়া আসিতেছে এবং ১৯১০ বঙ্গের
 মধ্যে অধিকাংশ মানুষের জীবনধারণ করা অসম্ভব হইয়া
 আসিয়াছে। কয়েক কোটি দারিদ্র্যে ভোগিতা সাধন করিবার
 একমাত্র উপায়—ভারতীয় জনতার বিচার পুনঃস্থাপন করা মুক্তি-
 দূল হইলেও, আগত পার্শ্ববর্তী বিপদ হইতে মানুষকে রক্ষা
 করিতে হইলে, অব্যাহতিমাত্র কতকগুলি উপায় এখনই অবলম্বন
 করিতে হইবে।

১৫। অব্যাহতভাবে যে সমস্ত উপাধের আশ্রয় লইতে হইবে তাহার সংখ্যা বহু এবং তাহার সমস্ত সর্জ-সাধারণের ভিতর প্রকাশিত হওয়া দৃষ্টিভঙ্গ নহে। এমন বহু উপাধ

আছে, যাহা একমাত্র রাজপুত্রদিগের প্রাধান্যবোধ্য এবং কংগ্রেসের বর্তমান জটিল অবস্থার তাহা সর্গসাধাবোধের মধ্যে প্রচারিত হইলে জটিলতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তির অধিত সাধন করিতে পারে।

১৬। আগত সার্গজমীন বিপর হইতে বাহুধক বন্ধা করিতে হইলে, অস্থায়ীভাবে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি :—

(১) আকস্মিক বিপদে কিম্ব হইয়া কোন মজুত বস্তুতে কোন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিরোধী না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(২) বর্তমান সমাজ ও বিজ্ঞান আশ্রয়ের বর্তমান অবস্থা, অকালমৃত্যু, “বেকার” এবং জনস্বাস্থ্য হিংস্রতার কারণ, ইহা মানুষের বিশ্বাসযোগ্য হইলেও বাহ্যতে তাহার কিম্ব হইয়া একদিনের মধ্যেই তাহার ধ্বংস সাধন করিতে না পারে, তদন্তব্য ব্যবস্থা করা।

(৩) কংগ্রেসের সর্বত্র বাহ্যতে নবোদ্ভূত উৎপত্তিবাদ হইতে সাধারণতঃ পর্যাপ্ত পরোক্ষত্বের দ্বারা অর্থাৎ নতুন গভীরতা বাহ্যতে বাড়িয়া যায়, তাহার ধ্বংসপ্রবণতা বৃদ্ধি বাহ্যতঃ করা।

১৭। ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর যে সমস্ত দ্বারা এবং অস্থায়ী উপায়ের কথা লিখিত হইল, তাহা ভারতবর্ষে কাৰ্য্য-করী করিতে হইলে অসম্ভবযোগ্য অথবা স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের বুদ্ধিমান লোক-পক্ষে সর্বতোভাবে গভর্নমেন্টের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

১৮। “স্বাধীনতা”-র কোন আন্দোলন না চালাইয়া “কমীর উন্নয়ন” ও “কৃষকের অসম্ভব” ভারতীয় কংগ্রেসের মূলমন্ত্রের ব্যবহার করিতে হইবে।

স্বাধীনতার অথবা অসম্ভবযোগ্যের কোন আন্দোলন চালাইলে হিংস্রতাবোধের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য এবং তাহাতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে দলদলিগের বৃদ্ধি অবশ্যজারী। দেশের জনসাধারণ মিলিত না হইয়া তাহার মধ্যে দলদলিগের উদ্ভব হইলে, দেশের কোনরূপ স্বাধীনতা কাৰ্য্যতঃ লাভ করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। অতর্কিতে হিংস্রতাবোধের সহিত

মিলনের আন্তরিক ইচ্ছা তাহা রাখিয়া কমীর উন্নয়নবোধের অথবা কৃষকের অসম্ভবযোগ্যের চেষ্টা করিলে, সমস্ত জনসাধারণের মিলন সংঘটিত হইয়া একটি প্রকৃত জাতি গঠিয়া উঠিবার অথবা করা খুঁট গুঁজ সম্ভব।

১৯। মাত্রের দ্বারা উন্নতি সাধন করিবার জন্য কতি-বিধের বিধি বিচার পুনরুদ্ধার করিতে হইলে বর্তমানে বাহ্য সংস্কৃত ভাষা বিনশ প্রচারিত, তাহা যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা নহে, তাহা জনসাধারণের মধ্যে বাহ্যতা বৃদ্ধিমান তাহা মিলকে বৃদ্ধিহিত হইবে।

অথচ বাহ্যতা প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার (১) সহায়তায় নিজ নিজ জীবিকার অর্থন করিতেছেন, সেই প্রাচীন-পণ্ডিতগণের অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যাগজীবিকিত সংস্কৃতভাষাশাস্ত্রের জীবনযাত্রার কোনরূপ অনুবিধা বাহ্যতে না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

২০। ক্রমে ক্রমে শিক্ষার সংস্কার করিতে হইবে। ক্রতগতিতে তাহা হওয়া সম্ভব নহে, কারণ বর্তমান জন-প্রকৃত শিক্ষিত জাতির সংখ্যা অথবা উদ্ভেদ প্রচলিত নহে। বাহ্যতে দেশের প্রত্যেক লোক নিজ নিজ মাতৃভাষা এবং জাতিগতের ব্যবহার্য ভাষা পুষ্কণিত ভাবে বৃদ্ধিতে ও প্রকাশ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করাই শিক্ষা-বিভাগের এখন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। মস্তান্তর বিধনের শিক্ষা সম্বন্ধে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বাহ্য বাহ্য শেখান হয়, তাহা আংশিক ভাবে গ্রহণযোগ্য হইলেও উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত অধিকাংশই পরিত্যক্ত হওয়া উচিত।

২১। সংস্কৃতভাষাশাস্ত্রের মধ্যে বাহ্যতা বিন্ধ্যাশ্রয় বাস্তবিক অথবা ইঞ্জির-ব্যবহারে অসম্ভব অথবা চট্টকারিতা-প্রিয়, তাহা বাহ্যতে গভর্নমেন্টের অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে কোনরূপ সম্মান অথবা প্রভা না পান, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বাহ্যতা বাস্তবিক অথবা অসম্ভব ভাবে ইঞ্জির ব্যবহার কথিবা থাকেন অথবা চট্টকারিতায় সম্বন্ধ হইয়া অসম্ভব লোকের পূর্ণশিক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহাদের উপর জনসাধারণের কোনরূপ প্রভা থাকিলে কতিবিশেষ বিভাব

পুনরুদ্ধারকরে উপাত্ত (worthy) লোকের উৎসব হইতে পারে না ।

২২। অত্যন্ত বিদ্যার গুণ ও কলেজের অধ্যাপকগণের দান্তিকতা, ইঞ্জিন-বাহ্যানেস অসংযততা, চট্টিকারপ্রিয়তা আংশিকভাবে মার্জানীয় হইলেও তাহা যে ছাত্রের প্রকৃত শিক্ষার অভ্যন্তর বিয়োজ্য, ইহা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে কণিকাক প্রাপিবীর ক্ষমতা প্রেমীর অপর্যায়ের স্তম্ভভাঙ্গণের বাহ্যতে ক্রমবাহক

পাণ্ডিত্য সাদিত হয়, তাহার বাবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ।

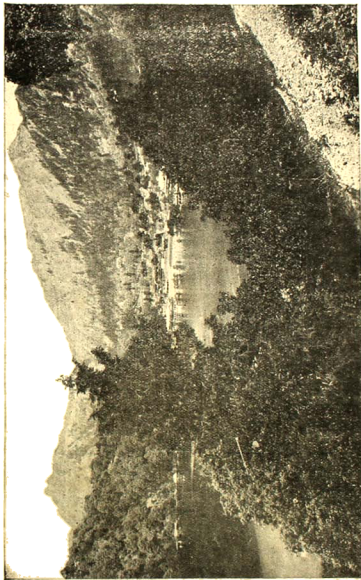
২৩। দান্তিক, ইঞ্জিন-বাহ্যারে অসংযত এবং চট্টিকারপ্রিয় লোক অনেক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কাৰ্য্যক্ষম বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও বাহ্যতে কোন বিদ্যামন্দিরের কোনজন পরিচালনার ভার না পান, তাহার বাবস্থা কল্পিবীর চেষ্টা করা । [ক্রমশঃ]

সন্ধ্যাবিধবা

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

পূরবে নিবেছে আলো,
পশ্চিমে নিবিছে আলো,
মেঘে-মেঘে হুটিছে না তারা ।
বাহুড় ছেড়েছে বাসা,
কাকেরা পেরেছে বাসা,
হ'য়েছে দিনের কাজ সারা ।
মলিনা বিধবা সন্ধ্যা
আলিল না শুভ-সন্ধ্যা,
শুভপানে চাহে একাকিনী ।
নিঃশব্দ গগন ভ'রে,
নিঃশব্দ নগন ভ'রে,
নেমে আসে কালো নিকীথিনী ।
কোথাও উঠেছে চাঁদ ?
আজ উঠবে না চাঁদ ;
ঘরে ঘরে কাঁপে দীপশিখা ।
প্রান্তরের পরপারে,—
অন্তরের মরুপারে ?—
মিলা'ল আলোয়া-মরীচিকা ।

কুটীরে বাজিল শব্দ,
নিছে পিছু-ডাকে শব্দ,—
সে চলে অসীম শূন্য বেয়ে ।
করে নি সে সন্ধ্যাসাজ ?
বিধবার সন্ধ্যাসাজ !
নিভ্রাময় রাত্রি আসে ছেয়ে ।
প্রাতে উঠেছিল রবি ;
সায়াক্বে ভুবিল রবি ?
কাল সে উদিলে পুনরায় ।
আজ উঠে নাই চাঁদ ?
আবার উঠবে চাঁদ ।—
এ সবে তার কি আসে যায় ?
অভ্যাসের অঙ্ককারে,
ভাত্র-অমা-অঙ্ককারে,
এ সন্ধ্যা ভুবিছে যারে চেয়ে,
অনন্ত দেশে ও কালে,
সন্ধান কি কোন কালে
পাবে তার বিধবা ও মেয়ে ?



নৈনিতাল ।

উত্তর-ভারত ভ্রমণে যে শিক্ষালোক যত্ন, বিভাষতনে হাংগের সন্ধান আশে-পাশে না। ভ্রমণের
সময়তঃ আমলা যেনেব যে ইতিহাসের নতিস্ব পাট, কুল-পাট। ইতিহাস-
পুথকে তাহার সন্ধান বিলিয়ে না। — রজনীকান্ত গুপ্ত

[১]

নবস্তে পৰমেশানি ব্ৰহ্মৰূপ সনাতনী ।
সুৰাসুৰজগদ্বন্দ্বাঃ কামৰূপনিবাসিনী ॥
তুমিষ্ট পৰমেশ্বরী এই ত্ৰিকূৰনে,
তুমিষ্ট বহুঃ ব্ৰহ্ম, বসে সৰ্বগুণে ।
কিবা কুত, কবিভাং, কিবা বটবান,
নকল কালেই যা গো ! তুমি বিতম্বন ।
কিবা দেব, কিবা ঈশ, কিবা ভীষণ,
নবাই বন্দনা করে তোমারি চরণ ।
কামৰূপে নিভা যা গো ! তোমার বিচার,
নবস্তর নবস্তর চরণে তোমারি ।

[২]

মাতঃ প্রভাবঃ জানন্তি ব্ৰহ্মাচ্ছাসিমেশ্বরঃ ।
প্রসীদ ভগতানাত্তে কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥
বহু-বিষ্ণু-শিব-আদি প্রেত দেবগণে
তোমার অসীম শক্তি বৃদ্ধিভাং মনে ।
সব্ব হইবার পূৰ্বে এই ত্ৰিংশাগর,
কেবল তুমিষ্ট যা গো ! করিতে বিচার ।
যেহ প্রাতি হুপ্রসন্ন রহ অনিবার,
ও মা কামেশ্বরী ! তব পদে নবস্তর ।

[৩]

হঃ বীজঃ সৰ্বভূতানাঃ হঃ বৃদ্ধিশেষতমা গুতিঃ ।
হঃ প্রবোধশ্চ নিভা চ কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥
সমস্ত ভীষণে যা গো ! তুমিষ্ট কাশণ,
তুমিষ্ট বৃদ্ধি, তুমিষ্ট বৈরাগ্য, তুমিষ্ট চেতন ।
নিভা আর ভাগরণ বহুগ তোমারি,
ও মা কামেশ্বরী ! তব পদে নবস্তর ।

[৪]

হঃ মারুগা নভোশোপি কৃতকৃত্যক নস্ততে ।
আদান পরমাত্মা চ কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥
বহুঃ পরম ব্ৰহ্ম দেব বিগৰ্হণ,
কেবল তোমারি ধ্যান করি নিরন্তর ।
কৃতার্থ হইহু, ইহা করেন বিচার,
ও মা কামেশ্বরী ! তব পদে নবস্তর ।

[৫]

দুৰ্গভক্তসংহতি পাণপূজ্যকলপ্রদে ।
লোকানাং পাণসংহতি কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥
অতি দ্বে কৃত্যবহে ক'রেছ মিশন,
পাণ-পূজ্য-কল তুমি কর বিতরণ ।
দানবের পাণ-রাগি করহ সংহার,
ও মা কামেশ্বরী ! তব পদে নবস্তর ।

[৬]

হমেকা সৰ্বভূতানাঃ সৃষ্টিস্থিতান্তকারিণী ।
করালবদনে কালী কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥
এ সংসারে রহে যা গো ! বত প্রাণি-চর,
সবারি করহ তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ।
করাল-বদনা কালী তুমি অনিবার,
ও মা কামেশ্বরী ! তব পদে নবস্তর ।

[৭]

প্রপন্নান্তিহরে মাতঃ সুপ্রসন্নমুখাবুজ্জে ।
প্রসীদ পরমে পূৰ্ণে কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥
বিগৰ্হ হইয়া যা গো ! পড়ে যেই জন,
তুমিষ্ট বিগৰ্হ তার করহ খণন ।
পরম প্রসন্ন তন বদন-কমল,
তুমিষ্ট পরমা পূৰ্ণা শক্তি অবিরল ।
যেহ প্রাতি হুপ্রসন্ন থাক অনিবার,
ও মা কামেশ্বরী ! তব পদে নবস্তর ।

[৮]

হামাশ্রয়ন্তি যে ভক্ত্যা যান্তি তে পরমঃ পদম্ ।
জগদ্ব্যং ত্ৰিজগদ্ব্যং কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥
ভক্তিরে লয় যাত্রা তোমারি আশ্রয়,
তাছারা পরম পদ পায় সুনিশ্চয় ।
তুমিষ্ট ধরিয়া আছ এই ত্ৰিংশাগর,
ও মা কামেশ্বরী ! তব পদে নবস্তর ।

[৯]

শুদ্ধজ্ঞানময়ী পূৰ্ণা প্রকৃতেঃ সৃষ্টিকারিণী ।
হমেব মাতৃবিশেষী কামেশ্বরী নমোহস্ততে ॥

তুমিষ্ট বিগৰ্হ জ্ঞানময়ী ত্ৰিকূৰনে,
তুমিষ্ট যা পূৰ্ণা শক্তি,—বসে সৰ্বগুণে ।
প্রকৃতি নামেতে নিভা নির্দেহ বাহাব,
তুমি তার সৃষ্টিকর্তা বলিয়া প্রচাণ ।
বিশেষত্বী নামে খ্যাত তুমি অনিবার,
ও মা কামেশ্বরী ! তব পদে নবস্তর ।



પાસાની

—**ଶ୍ରୀ** ଶେଷାବନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥୋପାଧ୍ୟାୟ

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক গাথাগান বাহু বেনুজাখীনে খনন কর্য (excavation) করিতেছে। এইখানেই নাকি বৌদ্ধগুর শিকাক্ত নালদার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। চারিদিকে লোকজন কাজ করিতেছে। পাথরের অনেক মূর্তি উঠিয়াছে। গাথাগান বাহু সেই মূর্তিগুলি পরীক্ষা করিতেছেন।

পাশাপাশি তিনটি মূর্তি। একটি পরমানন্দময়ী নারীমূর্তি, একটি বৃদ্ধমূর্তি, আর একটি বীতংগ-বর্ণন কৃৎসিত পুরুষের মূর্তি। এই তিনটি মূর্তির দিকেই একাত্ত্র মূর্তি নিবদ্ধ করিয়া রাখাশদাগ বাবু বসিয়া আছেন। এত এত মূর্তি তিনি বেশিয়াছেন, কিন্তু এত তিনটি মূর্তি কেনন যেন একটুখানি জ্বলন্ত রকমের। খানী বুকের প্রাশ্রয় মূর্তিটি দেখন হইবে তেমন। তাহাতে বিশেষের কিছু নাই। কিন্তু পরমানন্দময়ী ঐ নারীমূর্তিটির নীচে প্রথমে একবার লেখা হইয়াছিল 'বর্ষের নবী', তাহার পর সে লেখাটি কাটিয়া দিয়া কাটিয়া কাটিয়া খানিকটা অশ্লষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার নীচে পুনরায় লেখা হইয়াছে 'নরকের নানবী'। বীতংগ পুরুষের মূর্তিটির নীচেও প্রথমে একবার লেখা হইয়াছিল 'নরকের নানব', তাহার পর সেটিকে কাটিয়া আবার লেখা হইয়াছে 'বর্ষের নবতা'।

মুর্শিব নীচে এইকমভাবে দুই হুইয়ার নামকরণ করিবার
যেতুই তিনি ঐক মুখিয়া উল্লিখে পারিতছিলেন না। অনেক
বাহিন্স, অনেকবার খুঁটাইয়া ফিরাইয়া উন্টাইয়া পাটাইয়া
সেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি ইহার মানেট। ঐক হুবহব
করিতে পারিগেন না, তখন একট। বারনিখাল কেদিয়া মুর্শি
দুইটি তিনি একট।খানি পুখে দগাইয়া রাখিলেন।

জনবিহীন আকরের উপর পাশাপাশি তিনটি গাছ খাটানো
হইত। তাহারই কিছর একটি ইটি-চোরে রাখালাল
হাং তইসা আসেন। চোখ হুঁজিয়া বোথ করি ঐ মূর্তি
দেখিও কথাই কহিতছিলেন। চারিদিকে হাতির অঙ্গকার
নাছিল আদিয়াছে। অবিস্মৃত কিংকিপোকার ডাক শোনা

বাইতেছে। সুখে একবার একমল শূণ্য ডাকিও উঠিল।
 কোথায় কোন্‌ সুখের প্রাণে মাঝে মাঝে কতকগুলি স্মৃতি
 ডাকিতেছে।

তাহালাদাস দাবু হোম কবি ঘুমাইয়া পড়িলেন ।

ପ୍ରସାରିତା ବସ୍ତ୍ର ସେବିଲେନ :

তথাপিত বৃদ্ধের স্বভাবগানে সুখচিত্ত নানানকার বিখ্যবিভাজন।
বৌদ্ধবিহার। বৃদ্ধসেবের সম্বন্ধবৃত্তিগত পথে ধূমপান
হইতে ধূপের ধোঁয়া উঠিতেছে। সেখানে নৃপ পানে নাচিয়া
নাচিয়া অরতি করিতেছে। ঐতিহাসিক পুণ্যভোগে প্রসজিত
বৃদ্ধসমিহ।

অধিকার ব্যতীতে বিশ্ববাস্যত্ব প্রদান অসম্ভব আদর্শ।
 ঈশ্বর বসিমা বসিমা স্বভাবতঃ স্বপাঠ করিতেছিলেন।
 চীন পরিভ্রমক হাইউন্‌ শাং বিঃখল লক্ষ্যে গাওর শাং
 আসিয়া বসিলেন।

পূজারুতি শেষ হইল। হাইটেন সাং জোড়হুগে বলিলেন,
'আমার একটি নিবেদন আছে আচার্য্য দেব।'

‘ସନ୍ତାନ !’

‘এবার গঙ্গা-বদ্বীপসমূহে হঠাৎমুখে পতিতের যে প্রতর্শনী হবে, আমার ইচ্ছা সেই প্রতর্শনীর স্তোভ-স্বার লাগাবার তার আমাদের শিষ্টব্রিতিগেব শ্রির ছাত্র গুরুকে বেগুনা হোক।’

শ্রীমতঃ বলিলেন, 'শতরের তৈসি বৃষ্টি আপনার ঘূষ ভাল লাগে, না ? তা বেশ, তাই হবে।'

হাইড্রো জেন বসিলেন, 'তোদগের মাফখানে থাকবে ভগবান
তথাপতের দৃষ্টি, বামপার্শ্ব থাকবে পরমাশ্রুতী একটি নারী-
দৃষ্টি—সর্বোৎসেব, আর ডান দক্ষিপার্শ্ব থাকবে হীরক
সুন্দিত একটি পুত্রবৎ দৃষ্টি—নবজের দানব! এই আমি
পরিকল্পনা করেছি। প্রবর্তনী হ'ত এখনও হ' বঙ্গের দেয়
আছে। এই পুত্রবৎসের মধ্যে দৃষ্টি তিনটি তাকে চৈত্রি
করতে হবে। 'আপনি ভেবে তাকে একবার যেন দিন।'

ମାନବ୍ୟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେଷ ନିରବିତାମ୍ । ମତ ମତ ହାତ
ମାଧବେଷ ଉପମ ନାଟାମି ମୃକ୍ତିୟା ହୃଷ୍ଟି ବିନ୍ୟାସ କରନ୍ତି ଯେତେ ।

আচাৰ্য ঈশ্বরত্ব হাইটেন সাক্ষ্যে লগ্নে লইয়া দেখানে গিয়া পাড়াইলেন। শব্দ উঠিয়া পাড়াইতে অভিযতন করিল।

কুন্সিত পুৰুষ বৃত্তি পাওয়া ঘাইতে পারে, কিন্তু আদৰ্শ করিবার মত পন্থাসম্বন্ধী নাকো সে পার কোথায়? বিচারে মত ভিত্তিই থাকে, শব্দৰ তাৎপৰ্য্যে প্রত্যেককেই আব এতবার ভাল করিয়া দেখিল। কিন্তু তাৎপৰ্য্যেও তাহার নিখুঁত সম্বন্ধী বলিয়া মনে হইল না।

শব্দৰ আচাৰ্য্যত্বকে জানাইল, আদৰ্শ একটি নারীবৃত্তির লক্ষ্যন করিবার জন্য তাহাকে কিছুদিনের জন্য বৈশ্বকল্যের অসুস্থতি বেঁধো যোক্ত।

ঈশ্বরত্ব অসুস্থতি লিখেন।

পশ্চিমের কবেকটি শব্দৰ পথটান করিয়া শব্দৰ আসিল বাঙ্গালার সাম্বাদী কর্তৃকর্মে।

তর্কতর্ক শব্দে প্রবেশ করিতেই লজ্জা নাছিল। আকাশে টানটান মনো চান উঠিয়াছে। যোৰ করি পুৰ্ণিমাৰ গাড়ি। শব্দ এক কৃষ্ণৰ বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

গায়ে আচাৰ্য্যগিৰ পৰ শব্দৰ পথন করিগাছে। লজ্জা মধ্যস্থত্রে নুপুৰত পথে তাহার ঘূৰ তাগিয়া গেল। জানালার পথে চাৰিখা দেখে মূৰে একটি গাছের তলায়, মনে হইল একটি মেয়ে বেন নাচিতেছে। এত রাতে এখানে ও এতকমভাবে নাচে কেন বেদিগার জন্য শব্দৰ ঘোঁরে ঘোঁরে ঘর হইতে বাহির হইল এবং নিশ্চয় তাহার কাছে গিয়া আর একটি গাছের আড়ালে চুপ করিয়া পাড়াইল। দেখিল, এতদিন গরিগা সে নাচা গাছিতেছে তাহাই—পরমপুৰুষী এক নারী! উজ্জ্বল চোখাংখালোকে লীল নিখিল আকাশের তলায় যেতেই এক বেদ-মুদ্রিত লক্ষ্মণে বৃত্তাসলকায়ের আশ্রিত করিতেছে। বিশ্ববাসিষ্ট শব্দৰ যৌগল্যিকপে আরও একটুখানি অগ্রগত হইয়া গেল। দেখিল, মূর্তি আর কাহাও নহ, যৌগ লক্ষ্মণ অসিত্যত বৃত্তি, আর তদন্তগ্রাণী কৃষ্ণী ঠাণ্ডারই অর্জন্য বৃত্ত।

বৃত্তাসলতা কৃষ্ণী শব্দকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই। তাহার পর দেখিতে পাইয়া নাক সে তাহার মৃত্য বন্ধ করিয়া লজ্জা সংক্ষেপে নতমুখে পাড়াইয়া গ্রহিল।

শব্দৰ বলিল, 'আবার অলপখ কম করুন।'

কৃষ্ণী বলিল, 'এমন চোখের মত এখানে আসা আপনাব উচিত হয় নাই।'

শব্দৰ হাসিয়া বলিল, 'লোভ লক্ষণ কবতে পারি নি। আপনি কে বন্দু! কোথায় থাকেন?'

কৃষ্ণী বলিল, 'দে-গৃহে আপনি আতিথ্য গ্রহণ করেছেন সেই আবার গৃহ। যিনি আপনাকে আশ্রয় বিয়েছেন তিনি আবার বা। বাঙালার বাতা লক্ষ্যলব্ধ বৌদ্ধধর্মের বিচারী, তাই আমি প্রত্যয় রাখে এখানে আসি তদন্তন বুকের অর্জন্য করতে।'

শব্দৰ চিন্তাশা করিল, 'আপনাব নাম?'

'উৎপলা'।

চিন্তিত মনে শব্দৰ গৃহে ফিরিল। এতদিন পরে সে তাহার ঘানলীকে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

উৎপলার বুদ্ধা যাচাকে শব্দৰ তাহার পথের ঘিন জানাইল যে, উৎপলাকে সে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে লইয়া ঘাইতে চায়। দেখানে যদি সে তদন্তন বুকের চরণে আয়োজন করিয়া শিক্ষা লাভ কবে তাহার জন্য বুদ্ধাকে আর চিন্তা করিতে হইবে না। তবিয়েই সে তাহার নিজের ভার নিজেই গ্রহণ করিতে পারিবে।

সংসারতথ্যে বীতরাগ বুদ্ধা তথাগতের চরণসেবার কল্যাকে অর্পণ করিবার এ প্রয়োণ উপলক্ষ্য করল না। তৎকথায় সে তাহার সম্মতি জানাইল।

উৎপলাকে সঙ্গে লইয়া শব্দৰ নালন্দায় ফিরিয়া আসিয়াছে।

উৎপলা কৃষ্ণী, উৎপলা বিজয়ী, উৎপলা সমগ্রমুদ্রিত অজ্ঞান পুণ্ডর মত মনোহাটবি!

শব্দৰ তবিতে লাগিল, কেনন করিয়া এই উৎপলাকে আদর্শ করিয়া একটি মনঃমুদ্রি সে নিষ্ঠান করিবে।

দুই বৎসর পরে মহানোদ পশ্চিমের মেলা। সেই মেলায় অর্ধবর্নাক্তে সেই বৃত্তি তাহাকে উপহার বিতে হইবে। আচাৰ্য্যের আবেশ।

শব্দৰ সেদিন উৎপলাকে নিবৃত্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহার আর্থনা তাতাকে জানাইতেই উৎপলা নতমুখে নিম্নবন্দন চুপ করিয়া পাড়াইয়া থাকিগা তাহার সেই হৃদয়িত ঐশা হেলাইয়া তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

আমকে আশ্বাসিত হইয়া উৎসাহিত করি। শব্দ তাহার
মুখের পানে দৃষ্টি করিয়া তাকাইতেই দেখে উদ্ভিগ্নমুখের
স্বামী উৎপলাও তাহার দিকে দৃষ্টি করিতে তাকাইয়া দৃঢ় বৃত্ত
হাসিতছে।

এইবার চাই নব্বইত স্টেট পিলাডের মূর্তি।

তাহার ওপর নব্বইত বিপ্লব বেগ পাঠে হটল না।
তৎক্ষণাৎ হৃৎ-সদর রাজার বিচারালয়ের হস্তাধিকার
মাথাকে তাহার ওপর নির্ধারিত করা হইল। তৎক্ষণাৎ
আবিস্তে হৃৎ, বিকটবর্ণন, পরীক্ষিত, তৎক্ষণাৎ, বীভৎস।
শব্দ তাহার কান আঘাত করিল।

আদর্শ হইলিক সন্মুখে রাখিয়া কান করিতে তৎক্ষণাৎ
শব্দের একান্ত মূর্ত্তি দেখন উৎপলায় দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ
হইয়া থাকিত, তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ উৎপলায় দিকে ঘন ঘন
দৃষ্টিপাত করিয়া কি বেগে, সেই জানে।

তাৎক্ষণিক এই দৃষ্টি-কিম্বদন্তি বোধহয় শোকা
তাহার মনের গোপন বাসনা প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

মর্জিত মূর্ত্তি হইল এখন শেষ হইয়া গিয়াছে।

গৃহে শব্দ ছিল না। তৎক্ষণাৎ তাহার গোপন দৃষ্টি
প্রকাশিত করিয়া উৎপলায় দিকে আগ্রহী গেল। বলিল,
‘উৎপলা, তোমাকে আমি চাই। তৎক্ষণাৎ বাইরে এখনও
আমাদের মধ্যে প্রতিপত্তি। তুমি চল আবার দাও।’

উৎপলা করে একবারে কাঠ হইয়া গেল। বলিল,
‘আমি তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখি। তুমি—তুমি—
তৎক্ষণাৎ, এ প্রত্যয় করছ তুমি তার কাছে?’

তৎক্ষণাৎ বলিল, ‘তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ পূজা অর্জনা আমার
গৃহে থেকেও সম্ভব উৎপলা। তবে আমি অপ্রিয়বর্ণন, বৃংগিত,
কম্বাকার, তোমার অস্বাভাবিক—এই যা।’

শব্দ গৃহে প্রবেশ করিল।

তৎক্ষণাৎ তাহার পারিশ্রমিক দিয়া শব্দ তাহাকে
বিদায় করিয়া গেল।

বাণিত মূর্ত্তিতে তৎক্ষণাৎ তাহা রহিল উৎপলায় দিকে।

এইবার উৎপলাকেও তাহার পারিশ্রমিক দিয়া এ-বিভাগ
হইতে তাহাকে বিদায় করিতে হয়। কিন্তু...

শব্দ কল্পিত হইতে তাহার গুলি মুকোবল একখানি হাত
চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ‘তোমাকে আমি আর কি বেশ
উৎপলা?’

উৎপলা ঠেং হালিয়া বলিল, ‘বেবে না? আমাকে
তোমার কি কিছুই বেগার নেই?’

‘কি আছে উৎপলা তুমি বল।’

‘তাও কি আমার বেগে দিতে হবে?’

শব্দ বলিল, ‘তোমাকে আমার কিছুই অনেক নেই
উৎপলা, তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব।’

উৎপলায় আঘাত শুধু হইল মলমল উদ্ভিগ্ন হইয়া উঠিল।
বলিল, ‘কবে? বল—অস্বাভাবিক করলে?’

‘হ্যাঁ, অস্বাভাবিক করছি। তুমি বল।’

উৎপলা বলিল, ‘আমি তোমাকে চাই।’

এই বলিয়া সে একটু দাঁদি দাঁদি গেল। দাঁদিয়া আবার
বলিল, ‘আমি চাই তোমার ভালবাসা, তোমার প্রেম, তোমাকে
মিছে আমি সংসারমুখ।’

কপাটা তাহাকে বেশ করিতে না দিয়া শব্দ বলিয়া
উঠিল, ‘আজ হবে তোমাকে আমি আমার অনেক কথা
অস্বাভাবিক জানাই উৎপলা, তুমি শোন। এ কামনা যে
একদিন আমারও মনে জাগে তা নয়। আমিও ত্রিক
তোমারই মত বেবেছিলাম। কিন্তু অতি কালে সে কামনাকে
আমি চর করবার চেষ্টা করছি। আমিও মাহু, তোমার
ঐ অস্বাভাবিক জগৎব্যবস্থা আমাকেও মূর্ত্তি করেছে, কিন্তু তোমার
দান কাছে আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলাম—নাশবার বোধবিহারে
তোমাকে আমি কিছুই করে’ ভগবান তৎক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ দান
করে দেবে, তাছাড়া আর কিছুই নয়।’

উৎপলা বলিল, ‘বেগ ত’, সংসার দয় প্রত্যাশন করলে
কি ভগবান মুখের চরণে আগ্রহ লাভ করা যায় না? আমাদের
জন্মের এই কামনার কি কোনও মূল্যই নেই?’

শব্দ মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘না।’ অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দীক্ষা
লাভ করেছে আমার। আমার জন্মস্বামী। চিত্তের সংঘ
আমাদের একান্ত কর্তব্য। দৈনিক মিলনের এ কামনা অতি
পুঙ্খ উৎপলা। এর উদ্দেশ্য অস্বাভাবিক কবে না পারলে জন্মের
কোন দিন তুমি লাভকার আশ্বাসের আশাও পাবে না।’

উৎপলা বলিল, 'সে আনক আমার তোমাকেই লভন কর। তোমাকে পেলে আমি ভগবানকেও পাব—এই আমার বিশ্বাস।'

শব্দ বড় গুণে একটু খানি হাসিল। বলিল, 'শিলা তোমার এখনও সম্পূর্ণ হয় নি উৎপলা।' শীতল তুমি—'

উৎপলা বোধ হয় হাস করিল। বলিল, 'বুকেছি। তুমি যাও। তুমি যাও আমার চোখের স্রুণ খেঁক সবে যাও। আমার এ সন্ধান করবার কোনও প্রয়োজন তোমার ছিল না শিলা!'

'তাই লাব, তোমার চোখের স্রুণ খেঁক আমি লবে' বার উৎপলা।' শব্দর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল। 'নইলে তোমারও কল্যাণ নেই, আমারও নেই।'

শব্দ তাহারই প্রয়োগ হুঁতুতেছিল।

প্রয়োগ একদিন মিথিয়াও গেল।

যৌদ্ধবিশেষী বাহালাস রাজা শশাঙ্কসেব এবং পরাক্রমে রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য আক্রমণ করিলেন।

আক্রমণের আসন্ন উদ্দেশ্য যৌদ্ধধর্মকে সন্মুখে বিদ্যমান করা। যৌদ্ধতলে বিদ্যা ভগবত বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শশাঙ্কসেব সেই বোধিসত্ত্ব কিনে ক্রয় করিতে চাহিলেন। এই সংবাদ শুধন গ্রহণিতক হাত্ত হইয়া গেল, তখন রাজা হর্ষবর্দ্ধন তাহার রাজ্যের প্রত্যেকটী যৌদ্ধবিহারে এই বলিয়া সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, এই বর্ষেই যৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রত্যেক নন্দারীর গোপদান করা একান্ত কর্তব্য। অধিঃসা-ব্রতসাতী যে সব যৌদ্ধ বুদ্ধ প্রাণ-নাশের পক্ষপাতী নহেন, তাহারা নিরস্ত্র অবস্থায় প্রাণপণে শুধু পরাক্রমের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিবেন। অগ্রহীরের প্রতি অস্ত্রচালনা বুদ্ধের স্বীকৃতি নহে। তাহা সর্বত্র শশাঙ্কসেবের বৈরিতা বহি বর্ষবুদ্ধের স্বীকৃতি লক্ষ্যন করিয়া নিরস্ত্র যৌদ্ধদের হত্যা করে ত' সে শাপ তাহাদেরই সর্বনাশ করিবে।

শব্দ এ আদান প্রত্যাখ্যান করিল না।

বুদ্ধ যোগদান করিবার পূর্বে উৎপলাকে গোপনে যে একখানি পত্র লিখিয়া গেল।

লিখিল :

উৎপলা, প্রাণের উৎপলা, তোমারই কল্যাণের জন্য আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আমি জানি,

যৌদ্ধবিহারের সুপরিচিত শাস্ত্র আচার্য্যগণের মধ্যে বাস করিয়াও চিত্ত তোমার চকল। যে চাকল্যের একমাত্র কারণ—আমি। সেই আমি আজ চলিলাম বুদ্ধকে। তুমি তোমার অন্তরের বাসনাকে জয় করিবার চেষ্টা করিও। বুদ্ধে যদি আমি মরি ত' হুঃ নাই : কিন্তু যেহেতু, মরিবার সময় আমি যেন ভাবিতে পারি তুমি নিশ্চাপ, নিঃস্রুণ, বেদান্তের পদপ্রান্তে উৎসাহিততা একটি পুষ্পের মতই পবিত্র। আমার আর কিছু বিদায় নাই। আমি চলিলাম। ইতি।

তোমারই—শব্দ।

প্রথমতঃ যৎসংলিখিত গোপন এই লিখিত প্রত্যেকটি অক্ষর তীক্ষ্ণদৃষ্টি শব্দের মত উৎপলার বুদ্ধে দিয়া বিচিত্র লাগিল। কিন্তু বীরবে সহ করা ছাড়া উপায় নাই।

সেদিন শাস্ত্রা বিহারের সম্মুখের আচার্য্য বীরবে বিহারের প্রধান শিষ্য সুপ্রিয়া, সোমা ও উৎপলাকে উপলক্ষ্যে প্রবাসের আয়োজন করিলেন।

নিখিষ্ট দিবসে এক বৃহত্তী লতা আচ্ছাদন করা হইল। লতাখণ্ডে সকলেই উপবিষ্ট। সুপ, বীণ ও পুনর্বালো প্রসঙ্গিত লতাখণ্ডের মক-বেদিকার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট। সুপ্রিয়াকে আচ্ছাদন করিয়া আচার্য্যসেব বলিলেন, 'তোমাকে আজ আমি উপলক্ষ্য দান করব না, সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে তুমি অহুতি প্রার্থনা কর।'

সুপ্রিয়া কতজোড়ে তাহার বিনীত প্রার্থনা বিবদন করিল।

সকলেই সমবেত অহুতি দিলেন।

সুপ্রিয়া ও সোমা উভয়েই এইরূপে সমবেত অহুতির অহুতি লইয়া আচার্য্যসেবের কাছে বীক্ষা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু গোল বাদিল উৎপলার বেলায়।

অহুতি লইতে গিয়া উঠিয়া লাড়াইয়া কতজোড়ে উৎপলা ত্রিক তাহার বিপরীত কথায় বলিয়া ফেলিল। বলিল, 'পূজনীয় সমবেত তিহুগণ, আমি সন্তোষিত উপলক্ষ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নই, উপলক্ষ্যের যোগ্যও আমি নই। আমার চিত্ত অতীত চকল, সুতরাং আমাকে আপনাতা করা করন।'

উৎপলার জেজাবী এই নির্ভীক স্পষ্টভাবে সকলেই বিম্বিত হইয়া গেলেন। আচার্য্যসেব বলিলেন, 'তুমি জান উৎপলা, নিজ মূখে নিজের অসংবেদন কথা বোকার করবার

পর বৌদ্ধবিহারে কোনও শিকারী বা জিহ্মশীল থাকে চলে না! উৎপলা, তুমি আমার গ্রিহ শিষ্টা, তুমি অগচ্ছোৎ বস—কেন তোমার চিত্ত চকল হয়েছে!

উৎপলা বলিল, 'আচার্য্যসেব, আমি একজনকে ভাল-বেশেছি। আমার বেহ মন প্রাণ তাহাতেই সমর্পিত হয়েছে।' আচার্য্যসেব শুকনজীর করে বলিলেন, 'কে সে?'

উৎপলা বলিল, 'তার নাম আমি প্রকাশ করতে পারব না আচার্য্যসেব, সে প্রাণ আমার করবেন না।'

'বিহারের বিধি তুমি লঙ্ঘন কর' না উৎপলা, তার নাম প্রকাশ কর।'

'আমায় কথা করুন শুকনসেব।'

'তা হ'লে বলবে না?'

'না।'

'আমায় আবেশ।'

উৎপলা মাথা বাড়িয়া হেঁট মুখে নীরবে ঠাঁড়াইয়া রহিল। নান্দ সে কিছুতেই বলিল না।

আচার্য্যসেব বলিলেন, 'আমাদের এ বৌদ্ধবিহার তোমার মত অসংযত্টিত বৃত্তীর জন্ত নয় উৎপলা, অষ্টমূল তোমার আচরণীয় নয়, প্রব্রজ্যা তোমার পক্ষ বার্থ নয়। তুমি আজই আমার এ পবিত্র প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ কর।'

প্রত্যক্ষপথ দূর দিক্ষন্তর দিকে চাহিয়া চাহিয়া উৎপলা ভাবিতছিল, কোথায় বাইবে সে? তাহার এই ভ্রম, এই যৌবন, - কোথায় তাহার স্থান?

এমন সময় সেই কৌণকায় ভোরমাণ তাহার পক্ষাতে আসিয়া ঠাঁড়াইল। বলিল, 'উৎপলা, তুমি এস আমার সঙ্গে। আজ তুমি বিহার থেকে বিতাড়িত, পক্ষরও তোমাকে ত্যাগ করেছে, চল তুমি আমার আশ্রয়ে। তোমাকে আমি স্নেহ রাখব, যেই বলে' নিত্য পূজা করব।'

উৎপলা বলিল, 'শব্দর আমাকে পরিত্যাগ করেনি ভোরমাণ।'

ভোরমাণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'পাক্ষিতা নারী, আরও অপমান আরও লাঞ্ছা যদি সহ করতে না চাও ত' চল আমার সঙ্গে। আমি তোমার পক্ষরকে বুকে এনে ধব! আমাকে বিশ্বাস কর।'

'তোমাকে বিশ্বাস আমি করব কেমন করে ভোরমাণ?'

ভোরমাণ বলিল, 'আমাকে বিশ্বাস না কর, আমার কান্দনাসাকে বিশ্বাস কর। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে যেদিন আমি প্রথম স্নেহেছি সেদিন থেকে তোমার হৃদ-পাক্ষিতই হয়েছে আমার একমাত্র কামা। আমি তোমাকে স্নেহে রাখব উৎপলা।'

উৎপলা অনেক ভাবিল। কতই-না আর ভাবিল? স্নেহ তাহাকে না বধন বাড়াইতেই হইবে, শুধু 'আর ভাবিয়া লাভ নাই। উৎপলা বলিল, 'চল ভোরমাণ, তবে তোমার সঙ্গেই যাই।'

ভোরমাণ কিছু উৎপলাকে তাহার গৃহে লইয়া পক্ষরের নামও আর মুখ আনে না।

উৎপলা বলে, 'কোথায় ভোরমাণ, তুমি না বলেছিলে—শব্দরকে বুকে আনবে!'

ভোরমাণ বলে, 'কি হবে তার খোঁজ করে উৎপলা? যে তোমাকে বৈজ্ঞান্য পরিত্যাগ করেছে, তুমিই বা তাকে পরিত্যাগ করতে পারবে না কেন?'

'এ-সব কথা শোনবার ভরত' আমি এখানে আসিনি ভোরমাণ!'

'আমিও এ-সব কথা শোনবার ভরত তোমাকে এখানে আসিনি। আমি এখনই তোমাকে নিজে করে পাবার ভরত। কিছু—কিছু আমি স্মৃতিত বলে তা কি সঠিকই অনুস্মব উৎপলা?'

উৎপলা বলে, 'অসম্ভব।'

এই কথা শুনিয়া ভোরমাণের গুই চোখ জলে করিয়া আসিল। বলিল, 'এ চোখে কোনদিন কোনও কারুণ্যই জল আসেনি উৎপলা, জল তুমিই এই প্রথম আনলে। তুমি যদি বৈজ্ঞান্য না আস, তোমার উপর বসপ্রবেশ আমি কোনবিনই করব না—তুমি নিজের জেন।'

এই লোকটার জন্ত উৎপলার হৃৎক হয়। তাও, দাঁত যে হতভাঙ্গা হুণ!

ভোরমাণ বলিল, 'তোমার জন্ত আমি নীরবে অলক্ষ্য করব যেই, এ-জন্মে না পাই, পরজন্মে তুমি আমারই হবে।'

ভোরমাণ একদিন বৃদ্ধকে-প্রত্যাগত হইলেন সৈনিককে উৎপলার কাছে ধরিয়া আসিল। বলিল, 'শব্দরের সংবাদ এনেছি উৎপলা।'

সৈনিকেরা ভগবান তথাগতের নামে নমস্ করিয়া বলিল,
'শতর আর এখানে আসবে না।'

কান্দ তাহারা দেখানে দেখিয়া আসিয়াছে, শতরের সঙ্গে
এক পরমাশ্রমণী রমণী কিয়তাবি পুরিয়া বেড়ায়। শতর
বোধ হয় তাহাকেই বিবাহ করিব।

উৎপলা ভিজালা করিল, 'হৃৎকেশের প্রমত্ত রমণী দে
কোথায় গেলো ?'

সৈনিক বলিল, 'পেবারতখারিণী ভক্তব্যাকারিণী এক
নারী।'

আহত সৈনিকদের আরোগ্যশালায় তাহাদের চ'কনকে
তাহারা বসকে দেখিয়া আসিয়াছে।

হইতেও পারে বা :

কিন্তু আসলে তাহা নয়। রাজা স্ববৎসরের ভগিনী
রাজকন্যা আরও অনেক ভিকৃত সঙ্গ লইয়া গুপ্তকক্ষে আহত-
দের সেবাশ্রমণ করিবার জন্য গিয়াছিল। শতর আহত
হইয়া বধন অযোগ্যশালায় বাস করিতেছিল, এই রাজকন্যাই
তখন তাহাকে সেবা করিয়া ভক্তব্যাকারিণী গান শুনাইয়া বীণা
বাজাইয়া বাঁচাইয়া তুলিয়াছে।

সৈনিকেরা তাহাই দেখিয়া আসিয়াছে।

যাহার নেপথ্য, উৎপলা কিন্তু সহসা তাহাই বিশ্বাস করিয়া
বলিল।

তোষমাণের গুরু বাস করিতে উৎপলার আর ভাল লাগে
না। শতর বধন সামান্য একজন ভক্তব্যাকারিণীকে লইয়া
তাহাকে তুলিয়াছে, তখন সে আর তাহার কথা চিন্তা করিবে
না। আবার সে বোধবিহারে কিরিয়া থাকিবে। শুধু সংঘত
হইয়া শতরের কথা তুলিয়া দিয়া সে উপসম্পাদা গ্রহণ করিবে।

কিন্তু এখানে হইতে সে যায় কেনম করিয়া !

উৎপলা দেখে, সেনাপতি কলোবর্ষসেবের পুত্র কুমারসেব
এতদূর অশ্রুপূর্ণ বৈকালিক নগরপ্রমণে বাহির হয়। এতদূরই
দেখে, সে তোরমাণের এই বাকীর পাশ দিয়া পার হইয়া যায়।
উৎপলা ভাবে, সে তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিলে। কিন্তু
পারে না।

তোষমাণের অনেকগুলি সংবাদবাহী পারাবত ছিল।
তাহারাই একটি সংগ্রহ করিয়া উৎপলা একদিন একখানি পত্র
লিখিয়া সেই পারাবতের পায়ে বাঁধিয়া উল্লু কানালার কাছে

চূপ করিয়া পাড়াইয়া দিল। পাড়াইয়া দিল কুমারসেবের
আগমন-প্রতীক্ষায়।

কিয়ৎকাল পরে দেখা গেল, কুমারসেব আসিতেছে।
উৎপলা তৎক্ষণাৎ সেই পারাবতটিকে তাহার উচ্চৈশ্বরে উড়াইয়া
দিল।

পত্র পড়িয়া কুমারসেব উর্ধ্বে চাতিয়া দেখে, অট্টালিকার
অলিঙ্গ এক পরমাশ্রমণী যুবতী উচ্চৈশ্বরে আশার বাতুল নবনে
তাহারই দিকে তাকাইয়া।

পরদিন রাতে ঘোড়ার চড়িয়া কুমারসেব আশিল
উৎপলাকে উদ্ধার করিতে। উৎপলা প্রস্তুত হইয়াই ছিল।
অতিক্রমে শিহনের দরজা খুলিয়া প্রান্তর ডিনাইয়া উৎপলা
আসিয়া পাড়াইল কুমারসেবের কাছে। কুমারসেব তাকে
ঘোড়ার চড়াইয়া ক্রান্তকণে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

কুমারসেবকে উৎপলা পিথিয়াছিল,—সে বোধবিহারে
গিয়া ভিকৃত হইতে চায়। তাহাকে পলায়নের সহায়তা
করিয়া—বীর সে—বর্ষকাকো সহায়ক হউক !

কিন্তু কুমারসেব তাহাকে লইয়া গেল একবারে তাহার
বিলাস-ভবনে।

বিলাসের প্রচুর উপকরণ উৎপলার চোখের সমুখে ! শত
প্রলোভন তাহাকে প্রলুভ করিতে লাগিল।

শতরের প্রতি চক্ষুর অভিমানে উৎপলা তখন পাখলের
মত হইয়া উঠিয়াছে।

অশ্রুপূর্ণ সে বারবার উচ্চারণ করিতে থাকে,—'হৃৎকেশী
সেবাশ্রমণী ভক্তব্যাকারিণী ! না ?'

খলিয়াই ঠিক উদ্ভাবিনীর মত সে শিল্প শিল্প করিয়া
ধসিয়া পড়ে।

কুমারসেব তাহাকে সহজে ছাড়ি না। ছাড়িবার পাত্রই
সে নয়। উৎপলাকে বিলাসের স্রোতে ডুবাইয়া ফেলিতে
তাহার বেশি সময় লাগে না।

তাহার পর প্রতিদিন তাহারা অশ্রুপূর্ণকে বিভিন্ন সজ্জায়
সজ্জিত হইয়া ভ্রমণে বাহির হয়। আহতা উৎপলা যেন
সংঘম, নির্ভা, পবিত্রতার প্রতি চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইতে চায়।

হৃৎকেশী হইতে শতর কিরিয়া আসিয়াছে। বিষম মুহূর্ত্তমান
শতর !

নব্ব্ব কিম্বা আদিয়াছে আবার তাহার সেই পবিত্রাঙ্গ শির-গুহে। গৃহে এখনও তাহার সেই বরত্নখোদিত মৰ্ম্ম-মুষ্টি টুটি বিচাৰ করিতেছে। একটি উৎপলার, আর একটি তোরণালের। উৎপলার মৰ্ম্মরসুষ্টির নীচে লেখা—‘বর্ষের হেরী’; আর তোরণালের মুষ্টির নীচে—‘নরকেব নানবী’।

গৃহে প্রবেশ করিয়া নব্ব্ব একমুঠে উৎপলার সেই মুষ্টির নিকে তাকাইয়া থাকে, আর চোখ ওঠাট তাহার কলে ভরিয়া আসে। এখান হইতে কোথায় সে চলিয়া গেল কে জানে!

এ গৃহে বেশিকণ সে পাকিতে পারে না। তাই সে অধিকাংশ সময় নালদ্বার প্রসিদ্ধ ‘রত্নোদধি’ পুস্তকাগারে বিয়া নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার অন্তর চিত্তকে শান্ত করিবার চেষ্টা করে।

একদিন হঠাৎ একটা কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া সে গণ্ডে আসিয়া যেনে, কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসী প্রাণভরে ছুটিয়া পালাইতেছে, আর তাগানের পত্নাৎ পত্নাৎ ছুটিতেছে এক অধমকট। পকটগোষ্ঠী শ্রিয়নর্পন এক বৃংক ও মূষারী এক বৃংকী সেই মিনীহ সন্ন্যাসীদের উপর চিল ছুঁকিতেছে। সন্ন্যাসীরা ছুটিয়া চলিতেছে সেই চিলের ধরে।

শলাগ্নবৎ ও ধর্ষণভ্রমের গত হৃৎকর পন যৌক্তনের হিন্দু-বিষয়ে অত্যন্ত লোভল চেষ্টা উঠিয়াছে। তাহারই মনে এত বাগশর।

পকটগোষ্ঠীদের প্রতিবিন্দুত করিবার ওস্ত শব্দ ছুড়িতঃ আরম্ভ করিয়াছিল। কিংবদন্তি বিয়া সে চিন্তিতে পাবিল পকটগোষ্ঠী শ্রিয়নর্পন দুগা আর কেহই নহ, ধেনাশতির পুত্র কুমারসেব, আর কলহান্তে চারিদিক মূর্ণিত করিয়া যে-নারী তাহার পার্শ্বে বসিয়া— কে ও?

নব্ব্ব বমকিয়া ঝাড়াইল। সে—উৎপলা!

অন্যে হুগুগু নব্ব্বের বিহারে ফিটিল।

কিন্তু সেই মিনই রাতে তৌণ একটা অঘটন ঘটিল।

যার বাইয়া সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের কোনও একজন গ্রহিণেণ লইবার ভ্রম নালদ্বার ‘রত্নোদধি’ পুস্তকাগারে দিল আগুন হরাইয়া।

‘রত্নোদধি’ যু পু করিয়া জলিতে লাগিল। যম্যমূল্য এখাবশী পুঁজিখা ভাঙি হইয়া যাইতেছে। চারিদিকে হৈ হৈ চাঁৎকার! গোশমাশ ছুটাছুটির আর অস্ত নাই। নব্ব্ব ভাবিল, কি হইবে তাহাৎ এই কুজ্জ ভীতনে! ভাবন দিয়াও বঁদ সে ‘রত্নোদধি’র কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ উদ্ধার করিতে পারে

ত’ তাহারই চেষ্টায় অবিলম্বে সেই প্রথমলভ্য বহিস্কৃতের মধ্যে সে ক’ণ দিগা পড়িল।

‘রত্নোদধি’ বাটিল না, তবে নব্ব্ব বাটিল। বাটিল বটে, কিন্তু সর্ভাঙ্গ তখন তাহাৎ পুঁজিখা পিছাতে। যাকাতী এবং অগ্রান্ত ভিক্ষুগণ তাহার লেখা করিতে লাগিল। মাগাবিহাঙ্গল তাহাকে আর পণ্য ত্যাগ করিতে হইল না।

সম্পূর্ণ নিয়াম হইয়া নব্ব্ব বখন উট্টিয়া ঝাড়াইল, বেখা গেল, শুষ্ক ওঠাট তখন তাহার নই চেষ্টা পিছাতে।

পন বিয়া চলিয়াছে অজ্ঞ নব্ব্ব। যৌক্ত ভিক্ষু নব্ব্ব!

হাতে ভিক্ষার পাত্র। বলিতেছে—

‘ভবতি ভিক্ষাং বেহি!’

এমন সময় সেই পন বিয়া পার হইতেছিল কুমারসেবের সেই অধবান। নব্ব্ব ভাবিল, কোনও ঘনী পার হইতেছে। নব্ব্বের একপাশে দখিয়া পড়িয়াই বলিল, ‘ভবতি ভিক্ষাং বেহি!’

পকটে গ্রন্থাহ যেমন থাকে, সেদিনও তেমন ছিল কুমার-বেব ও উৎপলা।

কষ্টবর শুনিয়া উৎপলা চমকিয়া উঠিল। কুমারসেবকে গাড়ী পামাইতে বলিয়া তৎক্ষণাতঃ গাড়ী হুটেতে নামিয়া সে ছুটিল সেই অজ্ঞ ভিক্ষকের কাছে। নিঃসঙ্গ কাঠরকতে ভাকিল, ‘নব্ব্ব!’

নব্ব্ব বলিল, ‘কে? উৎপলা?’

উৎপলা ক্রম্বিতে ক্রম্বিতে তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। বলিল, ‘আবার তুমি কমা কর নব্ব্ব! আমি তোমারই!’

কুমারসেব ডাকিল, ‘উৎপলা!’

উৎপলা তখন ক্রম্বিতেছে। তাহার ডাকে সে সাড়া দিল না। কুমারসেব আবার বলিল, ‘উৎপলা, তুমি কি আসবে না উৎপলা?’

উৎপলা চুপ করিয়া বসিল। কুমারসেব আসিয়া অমিসুষ্টি হইয়া একাকী পাকী লইয়া চলিয়া গেল।

আবার সেই শির-গুহ। এবার আর নব্ব্ব একা নয়, উৎপলাও আসিয়াছে। নব্ব্ব ভিক্ষু, উৎপলা ভিক্ষুণী।

প্রথমই উৎপলা তাহার মৰ্ম্মরসুষ্টির নীচে লেখা—‘বর্ষের হেরী’ কাটিয়া কটিয়া অশ্লষ্ট করিয়া সেই লাবণ্য বোমাই করিয়াছে—‘নরকেব নানবী’।

শব্দর ভিজ্ঞান। তবে, 'কি কবছ উৎপলা? ও তুতি
তুমি নই ক'র না; ও আমার বড় সাথের বৃদ্ধি।'

উৎপলা হাসিয়া জবাব দেয়, 'ও বৃদ্ধি তুমি নিজেই বড়ছ
আবার নিজেই নই বড়ছ শব্দর! এর ভেত্রে বাকী তুমি
নিজ।'

এই বলিয়া ও'ভনেই হাসিতে থাকে।

ক্লান্ত হইতে উৎপলা একদিন কল আনিতেছিল, লক্ষ্য
হোতমাত্র তাহার কাছে আসিয়া ঠাড়াইল। ভিজ্ঞান। কবিল,
'ক্লান্ত শব্দরকে নিয়ে তুমি হলে আছ উৎপলা!'

উৎপলা বলিল, 'সে সত্যে তোমার কি প্রয়োজন
হোতমাত্র?'

হোতমাত্র বলিল, 'তুমি তা বুঝে না উৎপলা! হাজার
বহন আমি তোমার অঙ্গদলন করি—এখনও, চিরদিন করব,
বহনই বাঁচব। কিন্তু তুমি তর পেয়ে না নেবী, কোব কবে
কোনদিন আমি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করব না। আমি জানি
তুমি আমার ক্লান্ত কর।'

উৎপলা বলিল, 'তুমি যাও হোতমাত্র, এমন করে' আর
কোনদিন এস না আমার কাছে।'

হোতমাত্র ক্লান্ত করিয়া ঠাড়াইয়া তছিল।

এইবার একদিন আসিল কুমারদেব। অল্প শব্দর তাহার
উৎপলাকে হিনাইয়া লইয়াছে, আর সে তাহাকে হত্যা করিয়া
উৎপলাকে পুনরায় নিজের কাছে লইয়া আসিলে।

কুমারদেবকে দেখিয়াই উৎপলা চীৎকার করিয়া উঠিল।

কুমারদেব তাহাকে একদ্বার দিয়া কড়াইয়া ধরিল, আর
একদ্বারে ধারালো ছোরা তুলিয়া শব্দরকে হারিতে গেল।

চারিদিকে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। লক্ষ্য পশ্চাতের
অন্ধকার হইতে কে যেন একটা লোক গোরের মত আগাইয়া
আসিয়া কুমারদেবকে আক্রমণ করিল। তাহার পর অশ্রু
অন্ধকারে কি যে ঘটিল কিছুই ভাল বুঝা গেল না। বানিক-
জন তাপটা-তাপটি চলিল, কুমারদেব বার-কতক চীৎকার
করিল, তাহার পর সব শেষ! উৎপলা তাড়াতাড়ি প্রাণী
আসিল। দেখা গেল, শব্দরের শব্দরকে কুমারদেব পড়িয়া
আছে, সুকর উপর আবুলবিছ তীক্ষ্ণতার ছুরিকা, তাকে তাহার
পরিচ্ছদ রক্তিত হইয়া উঠিয়াছে।

উৎপলা ধর ধর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

শব্দর ভিজ্ঞান। করিল, 'কি হল উৎপলা!'

উৎপলা তাহাকে সব কথা বলিতে বলিল। কুমারদেবের
হত্যা কৃতমেব তাহার পদতলে পড়িয়া রহিল।

শব্দরকে শব্দর পরদিন বিচার।

অপর্যায়ী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পী ছাত্র অল্প শব্দর।
অভিযোগ তাহারই বিরুদ্ধে। সেনাপতি-পুর কুমারদেবের
কৃতমেব তাহার পদে পাওয়া গিয়াছে।

সকলকে সাক্ষ্য বলে, উৎপলাকে লইয়া কুমারদেবের
মধ্যে শব্দরের বিরোধ বহুদিনের। কুমারদেব-কুমার অতঃ
এতদিন কেব তাহারও কোনও অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

অধ্যাপক শীলভদ্র, আচার্য্য বীরদেব অনেক চেষ্টা
করিয়াও শব্দরের পক্ষে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে
পারিলেন না।

শব্দরের কৃত্যসও অনিবার্য।

উৎপলা কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার পদপ্রান্তে আছাক
খাইয়া পড়িল। বিচার-পূর্ব লোকে গোঁড়াগা!

এমন সময় লোকজনদের কিছ ঠেঁসিয়া বিচারকের প্রস্থে
আসিয়া ঠাড়াইল—হোতমাত্র! হাসিতে হাসিতে বলিল,
'কুমারদেবকে হত্যা কবেছি আমি।'

'তুমি! হোতমাত্র, তুমি!'

'হ্যাঁ আমি। শব্দর নিরপরাধ।'

'তুমি হত্যা কবেছ তার প্রমাণ!'

হোতমাত্র বলিল, 'যে ছুরি দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে,
পরীক্ষা করে দেখুন সে ছুরি আমার। কুমারদেবের হোতমাত্রের
নাম তাকে লেখা আছে।'

দেখা গেল সত্যই তাই।

হোতমাত্রের হইল গোপনওর আসেন।

প্রহরী তাহার হাতে ধরিয়া লক্ষ্যবাহু করিয়া বলিল,
'ল'।

অ'কামি বিদ্যা তাহাকে ঠেঁসিয়া সরাইয়া দিয়া সন্ধ্যা মূল
সে তাকাইয়া তছিল উৎপলাব বিরুদ্ধে। উৎপলাব দুই চোখে
তখন অশ্রু পড়িয়া।

গৃহে কিহো হোতমাত্রের মর্মান্বিত্তির দিকে উৎপলা
একদ্বারে কিহুৎকল তাকাইয়া রহিল। তাহার পর হাতুড়ি ও
বাটালি লইয়া সে সেইদিকে আগাইয়া গেল। মৃত্তি নীচে
লেখা ছিল—'নরকেব মানব।' লেখাটি কাটিয়া উৎপলা
লিখিল—'বর্ধের দেবতা।'

তাহার পর সব শেষ।

সকল এই কামন-নাটকের উপর বহু শতাব্দীর বর্ধনকা
পাত হইয়া গেছে। মৃত্তি ওইটি মাটির নীচে কোণার যে
তলাহিয়া গিয়াছিল কেব তাহার সংখ্য রাখিত না।

চাকর আসিয়া বলিল, 'আপনার ঘাবার মেওয়া হয়েছে।'

শাখাল হাস বাবু উঠিয়া বসিলেন।

আজ কোন মিথ্যা নয়। সুরঞ্জিত কল্পনার বাণী !
যৌন শিল্পে হাও ছুটি আঁচি তার বড় ক্রান্তি মানি' ।
সত্যের কিরণস্পর্শে প্রভাতের ফুহলির মত
সর্ব্ব অপরাধগ্রানি আঁচি তার হোক অপগত ।

ভয়ে আর পরাজয়ে এ জীবন ধূলিবিপ্লুহিত
আজ্ঞাও পক্ষাশিঙাপারে, পলে পলে করিয়া কুঞ্চিত
মনের ময়ূরধর্মে । কোনমতে কেটে চলে দিন—
অবিচারে অত্যাচারে অভাবে ও অভিব্যোপে হীন ;
—তবু এই জীবনের প্রাণপণে বেগেছিন্ন ভালো,
মনতার মূহনেত্রে কালোর কিনারে হেরি' আলো ।

প্রেরণী প্রেরণী নহে—রূপে গুণে অবরুদ্ধ সীমা ;
মহাবীর মহাকাশে সিক্‌বদ্ধ মনের মহিমা ।
অন্তরের মধুশ্রবা বহ্নতাতা—নহে সে পাথার,
ঈশ্বরের পীযুষধারে ভরিয়া তুলে না চারিধার ।
আপন প্রাণের গণ্ডী ত্যাগের কুঙ্কুত আর ক্রেশে
বাঁকিয়া রেখেছে শুধু হেসে কৈসে সেধ ভালোবেসে
নিতান্ত নিঃস্বের জনে । কোন খেদ নাহি তায় মনে ।

বন্ধুরা ঘের না ধরা চম্বরের নিবিড় বন্ধনে
জীবনের হৃৎপিণ্ডে :—আপনার ভারে অবনত—
কে চাহে কাছার পানে কর্ণশ্রোতে নিয়ত বিব্রত !
মিষ্টভাষে মিষ্টহাসে হৃৎগেওর অভিনয়শ্বেবে
নিষ্কলমে চলি' যায় রেখা হ'তে আপনার দেশে ।

সখা ভাবি' যার কাছে জীবনের ময় নিহু ঘাচি',
ভেবেছিন্ন ঈষ্টপথে কাটাইব যার কাছাকাছি
এবারের কর্ণপথে :—চেয়ে দেখি প্রয়োজনকালে,
আপনারে জড়াইয়া আন্তঘাতী তুচ্ছতার জালে,

নিভেটে তুলিয়া তার চিরতানার রসের সন্ধান,
মানসের রাজতাস পবলে কবিরে পদস্থান ।
হায় অদৃষ্টের লেখা ! চেতনের প্রেমময় আঁচি
নেড়ানেড়ী-গোপীমহেশে নেতৃতবে উঠে ব্রহ্ম বাজি !

কোথা সে চোখাব্যবোধ—কমলার সেবার সম্পদ !
কোথায় পৌরুষস্বর্ষ সাধনার রক্তকাকনর—
প্রাণাত্য ত্যাগের অর্ঘ্য বনবের নকরেন্দ্র মাথা ?
অন্তনিত নাকি সূর্য্য ? বিগম্ভে সেপি যে শুধু অঁকা
রক্তাধরা ছিন্নমস্তা ! আপনার বক্ষরক্ত লয়ে
বেলিছে মৃত্যুর হোলি সর্ব্বনাশা স্বার্থের কলাহে !

অন্ধকার নেমে আসে মল পূর্ণ আবরি' আকাশ ;
পৃথিবীতে বহে বায়ু ; চারিদিকে উঠে নাতিহাস—
আর্দ্রের অস্ত্রিন চেষ্টা । আরও কিছু সেবিবার আগে,
হে বিধাতা ! যেন তব নরপের ত্রিমস্পর্শ লাগে
এ শীর্ণ জীবনরীপে । কোন মগ্ন নাহি আর মনে,
কেটে দাও এ বন্ধন হে কর, তোমার পরশনে ।

তবু এই জীবনের প্রাণপণে বেগেছিন্ন ভালো,
কিরে বলি আরবার :—মূহনেত্রে হেরেছিন্ন আলো ।
কালের জীবনপটে । হৃৎ'বপ তৎসবিতুর্জ্ঞানে
করগা সে ভগ্নসেবে ভেঁকেছিন্ন দী-এর সন্ধান ।
মিথ্যা হ'ল সে গায়ত্রী—স্বপ্নের নাহিক অধিকার—
গোপ্পনে মিলিবে কোথা অসৌমের শক্তি-পায়াবার ।
হায় রে এ ক্ষুত্র চিত্ত ! হায় হৃদ্ধ জীবনের গতি !
হায় অন্ধ ভবিষ্যৎ ! হায় 'বলহীন'-এর নিয়তি !

প্রাচীন ভারতে রঙ্গসজ্জা

— শ্রী অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

অভিনয়স্থান দুখ্যঃ চতুর্বিধ—(১) আর্ষিক, (২) গাভিক (৩) আধাধা ও (৪) সার্বিক*। আর্ষিক অভিনয় ও দুখ্য সঙ্ঘে একটি অতি সংকীর্ণ বিধবৎ তৈলেন "বঙ্গশ্রী"তে দেওয়া হইয়াছে। বর্ধমান প্রদেশে আধাধাভিনয় সঙ্ঘে সংক্ষেপে কিছু বলা গাইয়াছে।

'আধাধা' নামটির অর্থ অধঃপদ—অধঃপদে বোধ্য। ধাধা স্বাভাবিক নহে—কৃত্রিম—নানাতান চইতে বিবিধ উপায়ে সংগ্ৰহ করিতে হয়—সেই বেশভূষাবিধানের নামই আধাধা-ভিনয়।

অঙ্গুরণবোধ্য নামক-নারিকাদির অঙ্গুরণে অঙ্গুরারক নটনীর কর্ণক রত্নহার, কেশ্য, কিত্রীট প্রভৃতি ভূষণ ও নানা-বিধ বোধানির ধারণ এই আধাধাভিনয়ের অন্তর্গত। অঙ্গুরণ, বখ-পতাকা, অঙ্গ-হস্তী প্রভৃতি সর্বপ্রকার নাট্যোপকরণকেই আধাধাভিনয়ের মধ্যে কোলা চলে। নহি তত বলিয়াছেন—আধাধাভিনয় বলিতে বুঝা নেপথ্যবিধান (নেপথ্য=শেখ-ভূষা)। আর এই নেপথ্যবিধানের উপরই নাট্যের স্তম্ভস্বত অনেকটা নির্ভর করে। অতএব, নাট্যের স্তম্ভাকালি-নাট্যেরই এ বিধের বিশেষ মনোযোগী চোখা প্রয়োজন।

নেপথ্য চতুর্বিধ—(১) পুত, (২) অঙ্গুরণ, (৩) অঙ্গ-পতাকা ও (৪) সজায।

নাট্যাভিনয়ে কৈল, হান, গিমান, চর্প, বর্ষ, পাত প্রভৃতি যে সকল পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে নির্মিত হয়, তাহাদিগের নাম দেওয়া হয় "পুত"। এই পুত আবার জিবিধ—(১) সন্ধিম, (২) বাজিম ও (৩) চেষ্টিম। রূপ ও প্রমাণভেদে জিবিধ পুতের অনন্ত ভেদ। কিলিক*, বস্ত্র, চর্প প্রভৃতির দ্বারা যে সকল নাট্যোপযোগী কৃত্রিম পদার্থ নির্মিত হয়, সেই সকলের নাম সন্ধিম। আর বস্ত্রের দ্বারা বাহ্য নিপাদিত হয়,

তাহাই বাজিম। পক্ষান্তরে চৌর্য্য নগীরবাগ্যার দ্বারা বাহ্য নিপাদিত হয়, তাহার নাম চেষ্টিম*।

অঙ্গুরণ বলিতে বুঝা, অঙ্গ ও উপাঙ্গে মালা আভরণ ও বস্ত্রাদির সংযোগ। ইহাদের মধ্যে মালা পঞ্চবিধ—(১) চেষ্টিত, (২) বিতত, (৩) সজাতা, (৪) গ্রহিব ও (৫) প্রেলবিত। চেষ্টিত বলিতে বুঝা চকল, অতএব বস্ত্র হালুকা। বিতত—বিশেষ বিস্তৃত—খুব চওড়া। সজাতা—নানাবিধ পুষ্পাবিধানে প্রদিত। গ্রহিব—গ্রহিষ্ক। প্রেলবিত বা প্রেলবক—বহু দীর্ঘ—লম্বমান। চেষ্টিত 'একহারা' মালা, ও বিতত 'গোড়' মালা বলিয়া যথেষ্ট হয়। সজাতা—বিভিন্ন জাতীয় পুষ্প বা রত্নাদির দ্বারা প্রদিত।

বেহের আভরণ চতুর্বিধ—(১) আবেত, (২) বহনীয়, (৩) প্রকোপা ও (৪) আরোগ্যক। আবেত—মৃণালদি কর্ণভূষণ। বহনীয়—প্রোদিত, অঙ্গুর, চকলভাণ প্রভৃতি। প্রকোপা—নুপু, বস্ত্রাভরণ ইত্যাদি। আরোগ্য—বর্ণহস্ত, নানাবিধ হার ইত্যাদি।

বেশভূষণ, জাতিভেদে ও স্ত্রী-পুরুষভেদে ভূষণের ভেদ নাট্যাগারে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের উপযোগী ভূষণের একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল*।

শিখোভূষণ—চূড়ামণি ও মুকুট। কর্ণভূষণ—কুণ্ডল, মোচক ও কীল। কর্ণভূষণ—বুজাবলী, হর্ষক, সংহৃত (বর্ণ-হর?) প্রভৃতি। অঙ্গুণাবিভূষণ—কটক, অঙ্গুদিসুত্র। হস্তভূষণ—হস্তবী ও বলয়। মণিবন্ধভূষণ—কৃত্তিক ও উজ্জি-তিক। কুর্ণের (কহই-এর) উপরে কুর্ণের ও অঙ্গুর ধারণীয়। কঙ্কভূষণ—ত্রিসল (ত্রিসল?), চার। বিলম্বিত

* এই বেশটির অর্থ খুব পরিচয় নহে : এজন্য অর্থও সম্ভব—মালা চৌর্য্য অর্থাৎ জিলাবু-চকল, তাহাই চেষ্টিম।

*। মুদ্রা-বোধ্য বিধ এই সকল আভরণের অধিকাংশই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের কালে আভরণের বর্ণবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রবীর্ণ কর্ণভূষণ গণি খণ্ডকলা কলেব, তবে অনেক লুপ্তপ্রায় তথ্যের পুনঃস্থাপন ঘটিতে পারে।

১। "জাতিব ভাষাতে বুঝকলা" প্রথম খণ্ড—বঙ্গভি, কোল, ১৮৫২
পৃঃ ১১০। ২। কিলিক, কিলিক, কিলিক (ক) মাছুর, বসমা, চোটেই, (খ) কুণ্ডলি নির্মিত পতাকা, ঠিক বা সজায। বেতু, (গ) কুণ্ডলি নির্মিত বস্ত্র, (ঘ) পক্ষান্তর বা বাত্রীর পাচনা সজায।

মৌক্তিক হার মুশখালা, তরুমালা প্রভৃতি সর্বযেহেতু ভূষণ।
কটিকূষণ—তরুণ ও হৃদয়ক। ইহাষ্ট হইল পুরুষের বাহ্যাবলি
আভরণের তালিকা। দেহতা, নৃপতি ও নারীসাধারণের
ধারণাবোধে ভূষণের তালিকা আরও বৈধ। শিখাকূষণ—
শিখাশাণ, শিখাভাল, শিখাপাত্র, চূড়ামণি, মকরিকা,
মুক্তাভাল, পদাঙ্ক, বিচিত্র, শিখাভালক, কৃণ্ডল, শিখাপাত্র,
যোক্ত, বৈশিকক (কক=পত্র)। লগাটের হিলকে নানাবিধ
শিল্পকাৰ্য্য থাকিবে। ঙ্ককাকার উপর মূহুমূহুমারী ওঙ্ক
নিবেশ করিতে হইবে। কর্ণকূষণ—কণিকা, কর্ণবলয় (কাণ-
বালা), পত্রকর্ণিকা, আবেষ্টিত, কর্ণমুদ্রা, কর্ণবিন্যাসক,
নানাক্রম চিত্রবিচিত্র রত্নপাত্র, কর্ণপুর ইত্যাদি। পদকূষণ—
তিলক ও পত্ররথ (অলকা-তিলক)। বকোঙ্কণ—ক্রিবেদী
ও বিচিত্র শিরহুক হার। নেত্রের অঙ্গন ও অধঃপ্রস্থান ছিল
একান্ত স্নেহজনক। মস্তৃপের অস্তরঃ চারিটি দন্তকেও সজ্জিত
করিতে হইত; বিগত যুগের মাতে যিনি বেগুণ বোধ হয়
ইহারই স্মরণ। ইহার নাম ছিল বনবনবাণ বা দন্তগ্রাণ
(কা ম স্ত্র প্রভেদ)। উচ্ছল ভরুর্ধ্ব বা বর্জিতর বাবা বহুরাগ
নিশ্পাদিত হইত। ননোহারিষী মুকৌরীগণের দন্ত মুক্তার দ্য
সিহ্মোভন বর্ণে অথবা পতঙ্গলাবের দ্য রক্তকর্ণে সজ্জিত করার
ক্রিয়া ছিল। নবোদগত পল্লবের দ্য আকর্ষিত অধঃপ্রস্থানের
মধ্য হইতে যেত-প্রান্তরের দ্য দন্তপঙ্ক্তির স্রোতা বিশেষ শোভা
বিস্তার করিত। ইহার উপর নারীগণের সখিস্রম নৃপ্পিত
এক অঙ্গুরি বিদ্যায়ের স্তূতি করিত।^১ কণ্ঠকূষণ—মুক্তাবলী,
ব্যালগুপ্তি, বস্ত্রী, তরুমালা, রত্নাবলী, ও হৃদ (হেমহৃদ)।
ইহা ছাড়া বিরল, ত্রিল, চতুর্দশক শুমলিকাও কণ্ঠকাক্রম
বাহ্যক হইত। স্তনকূষণ—মণিভালবন্ধন। বাহুমূলকূষণ—অঙ্গন
ও বলয়। হস্তকূষণ—বর্জিত, বৈজিতক। অঙ্গুলীকূষণ—
কটক, কলশালা, হস্তপত্র, হস্তপূরক ও মূহুমূহুমারী (অর্থাৎ
অঙ্গুলিমুদ্রা)। শ্রোণীকূষণ—মুক্তাভালক, কাঁকী, কুলক,
মেঘলা, রশ্মি, কলাপ। কাঁকী একবারী অর্থাৎ একপ্রকার।

মেঘলা—অষ্টগুণী অর্থাৎ আটনগুণী। রশ্মি—বৈদ্যশক্তি।
আর কলাপ—পক্ষিবিংশতি বর্গ। বেনতা, নৃপতি ও নারী-
গণের মুক্তাভার সাধারণতঃ বহিঃ, সৌখিনী অথবা একত্র আট
নগী হইত। গুলককূষণ—নৃপুং, কিত্তি, বস্ত্রালক ও
সম্ভোষকটক। কণ্ঠাকূষণ—পাদপত্র। শাখামূলিকূষণ—
অঙ্গুলীক। শাখামূলিকূষণ—তিলক। ইহাষ্ট শাখাভরণের
লক্ষণ তালিকা। ইহা ছাড়া শাখাভরণে ও পদপত্রপ্রান্তে
নানা আকারের (ভক্তি) অলঙ্কারগণ সজ্জা করা হইত।
অধোভেদ বনবনবাণের দ্য স্তন স্তন অঙ্গবর্ণ অথবা লাকার
সাজাবিও হইত এই অলঙ্কারের। এইরূপে নারীর বেশ
হইতে পাদময় পঙ্কজ ভাব, হৃদ ও অঙ্গমূহুমারী অলঙ্কার নিবেশ
করা হইত।^২ কিন্তু এই প্রকার যাহা একটি বিশেষ মূল্যবান
উপবেশ বিবাহের। নিবেশ টঙ্কানত বর্ণ, মুক্তা বা মণি
বাগা নাটোর কূষণ বিদ্যায় করা হইত। শুধু তাহাই নহে,
নাট্যপ্রয়োজে ভূষণের বাহুল্য নিম্নোক্তজন; কারণ বহু ভূষণ
ধারণে নটনটীর শাস্ত্রিক সেন উৎপন্ন হয়, আর সে স্তন
শাখা আকর্ষিত অস্তিত্ববিশিষ্ট হইয়া পড়েন। কখন কখন
অতিরিক্ত গুরু আভরণভারে অঙ্গবর্ণের নটনটীর শরীর
হইতে অতিরিক্ত বর্ণ নির্গত হইতে থাকে ও পরিমাণে
কাহাকেও কাহাকেও মূর্ছাগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। অতএব,
মুকর্ষের স্তনভার আভরণ নাটো ব্যবহার্য্য নহে। অঙ্গবর্ণ-
খচিত ও ভূষণ (কাঁকী, কিত্তির পাণ্ডা: বেগুণ) অলঙ্কার
ধারণে সজ্জিত হয়ে না বলিয়া ঐক্লপ আভরণ নাট্যপ্রয়োজের
উপযোগী।

ইহার পর বিজ্ঞানবরী, বকী, অঙ্গপ্রাণ, নাসকজ্জা, বদ-
কুমারী, দেব-সিদ্ধ-গন্ধর্ব-রাক্ষস-অস্তর প্রভৃতি জাতীয়া নারী-
গণের ও বিভিন্নদেশীয়া মাহুমৌরীগণের বিভিন্নপ্রকার কুমিকা ও
অবতাহুমারী বিভিন্ন বেশভূষণ নিবেশ নাট্যশায়ে বাস্তবায়িত
ভাবে প্রবর্ত হইয়াছে।

বিভাশাস্ত্রিগণের বেশ-ইহাও শুদ্ধ ও স্তনবর্ণ। অলঙ্কার
মুক্তার বাহুল্য থাকিবে। শিখাকূষণবন্ধনে শিখামুটি ও শিখা
ব্যবহার করিতে হইবে। বকমু ও অঙ্গপ্রাণের কূষণ রত্ন-

১। কলাপ—শোভা, বিরলকিত্তি মুটি, বিচিত্রা খচিত ও শিখামূল
কন: ইহাঙ্কর্ণের খচিত, খচিত, উপবেশ, হৃদ, ক, মেঘ, হৃদ প্রভৃতি বিশেষ
জন। পঙ্কজা যক্ষম প্রভৃতি কাকী, অঙ্গপ্রাণ ও হৃদাঙ্ক: অঙ্গান
কুমারি বিদ্যায় ও বাহুমূলকুমারিগণের হৃদাঙ্ক বিদ্যায়। শিখা-
মূহুমারী শোভা।

২। গুলক—পাণ্ডা: নট। কলা-ভাণ্ড (কাঁকী) হইত গুলক
অর্থ শাখা:। ভক্তি নানাকার সৌন্দর্য্য করা: ornamental
decoration, lines of painting.

খণ্ডিত হইয়া প্রযোজন। বক্সগণের শিখোদ্ধরণ হইবে কেবল শিখা। কুমিতা ও অস্বাভাবিক স্নেহকল্পগণের বিভিন্নপ্রকার বৈশিষ্ট্য। যেখানে বসন্ত : সম্পাদিত হইবে। নাগকল্পগণের কৃষ্ণ হইবে স্নেহকল্পগণেরই মত : তবে উহাতে মুক্তাশি-
খণ্ডিত লতাশাখার বাহুলা থাকিবে। মুক্তিকল্পগণ হইবেন একবৈধিধারিত। তাঁহাদের শরীরে অতিরিক্ত কৃষ্ণনিবেশ থাকিবে নাহে। সিদ্ধ মুখগণের অলঙ্কার মুক্তাশিখরতত্ত্বচিত হইয়া উচিত। উহাদিগের পরিচ্ছদ হইবে পীতবর্ণ। গন্ধকী-
গণের কৃষ্ণ পট্টাঙ্গবস্ত্র বাহুলা থাকিবে। কোমলবসনা ও নীলাভাঙ্গনে তাঁহারা রম্য অবতীর্ণ হইবেন। রাক্ষসী-
গণের কৃষ্ণ ইন্দ্রনীল থাকিবে। উহাদিগের সঙ্গী হইবে উচ্ছল শ্বেতবর্ণ ও বহু হইবে বোরতর কৃষ্ণবর্ণ। দেববালা-
গণের বেশভূষা যেখানে সম্পাদিত হইলে ও বৈশিষ্ট্য ও মুক্তা-
খচিত আভরণের বাহুলা থাকিবে। শুক্লখচিত হইয়াই বহু হইবে তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ। দিবা নরনারীগণের কৃষ্ণ হইবে পট্টাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যখচিত। দিবা বানর-নারী-
গণের পরিচ্ছদ হইবে নীলবর্ণ। আর পুংসাদিগের বেশ হইবে দিবাভঙ্গ্যগণের মত। কিন্তু অস্বাভাবিক শুভ বেশই প্রাপ্য।

নানাস্থোৎপত্তা নারীগণের বেশভূষা নিরাক্ষর প্রকারে করিতে হইবে। অবস্থিভূতিগণের^{১০} মস্তকে অলঙ্কৃত কুন্তল থাকিবে। গোড়ীগণের অলঙ্কার বাহুলা : আর তৎ-
সঙ্গে শিখাখণ্ড^{১১} ও বৈধি থাকিবে। নারীগণের বেশই ৩৫টি : মস্তকটি লেখিত^{১২} : বহু প্রায় নীলবর্ণ। পূর্ণ ও উচ্চ
বৈধি রমণীগণের শিখা^{১৩} ধারণ করা উচিত ও বেশ
পন্য রমণীর আচ্ছাদিত করিতে হইবে। বক্ষীগণের
নারীগণের পক্ষে উল্লেক্য, কুন্তল^{১৪} ও বর্তলস্ফটিকা ধারণীয়।^{১৫}

গণিকাগণ ইচ্ছাবিশিষ্টমণ্ডল^{১৬} ধারণ করিবে। এইরূপে
ভাতি, বেশ, ও অবস্থারূপে বেশভূষার ভেদ কর্তব্য। অস্ত্রা-
অলঙ্কার বেশ গোড়া লম্বাইতে পারে না। কঠিনবেশের যেখানে
বক্ষ্যমণ্ডলে বন্ধন করিলে হাতোস্ত্রকই করে।

প্রোথিতকুন্তল নারীর অঙ্গ বাসনাভিচ্ছাদিত^{১৭}
পক্ষে মলিন বেশ ও মস্তকে একবৈধি ধারণ করা কর্তব্য।
বিগলভ পূর্ণা^{১৮} নারীর বেশ হইবে শুভ : অলঙ্কারগুলি
মার্জিত (অর্থাৎ পালিত করা) হইবে না, বা অধিক অলঙ্কারও
পাকিবে না। ইহাই হইল বেশাভিচ্ছাদনে নারীর বেশ-বিধি।

পূর্বের বেশ ও অলঙ্কারের পরিচয় নিয়ে যেখানে সেল।
শেত ও নীল বর্ণের সংমিশ্রণে পাণ্ডুরবর্ণের উৎপত্তি হয়।
এইরূপে শেত ও অন্ধর মিশ্রণে পট্টবর্ণ (গোলাপী), পীত-
নীলসংযোগে হরিৎ (সবুজ), নীল-রক্ত সমাযোগে কণাশ ও
রক্তপীতের এককরণে গৌরবর্ণ জন্মিয়া থাকে। এইগুলি
“সংযোগক” বর্ণ—কেবল ৫টি মাত্র মূল বর্ণের সংমিশ্রণে
উৎপন্ন। আর তিন চারিটি বর্ণ একত্রে মিশাইয়া একটি
বর্ণের সৃষ্টি করিলে উহা “উপবর্ণ” নামে খ্যাত হয়। এই বর্ণ
সংমিশ্রণের প্রক্রিয়া ও ন্যাট্যগারে বস্তুতঃ উল্লিখিত হইয়াছে।
যে বর্ণটি পূর্ব প্রায়, তাহার একভাগ ও সূর্য্যল বর্ণের দুই ভাগ
একত্রে মিশাইয়া মিশ্রবর্ণ উৎপাদন করার উপদেশ তরত
দিয়াছেন। কিন্তু সকল বর্ণের মধ্যে নীলবর্ণ অত্যন্ত বলবান।
অতএব, নীলের সহিত কিছু মিশাইতে হইলে নীলের একভাগ
ও অল্প বর্ণের চারিভাগ দাঁড়িতে হইবে। অল্পখান নীলের
আধিক্য ঘটায় বর্ণবিকৃতি মোহ জন্মিবার সম্ভাবনা।

সেই, বর্ণ ও অলঙ্কারগণের বর্ণ হইবে গৌর। রক্তপণ,
জহিণ (ব্রহ্মা) ও স্বর্ণ হইবেন তত্ত্বাক্ষরপ্রভ। সোম

১২। ইচ্ছাবিশিষ্টমণ্ডল—কেছার অলঙ্কার শোভা। বিধি—অল-
ঙ্কার : ভগ্নকর্ণে বসিত হইয়া বেশভূষার শৈলী।

১৩। প্রোথিতকুন্তল—যে নারিকার দ্বারা আবদ্ধমস্তক। ঘনলিখিত
—লিখাশিখা, অর্থাৎ বৈধি প্রাপ্ত অস্বাভাবিক বাহুলা।

১৪। বিগলভ—পূর্ণাধি। (১) লক্ষ্য ও (২) বিগলভ।
লক্ষ্যপূর্ণা—নাক-নারিকার মিলনে স্তম্ভিতমণ্ডল। ইহাও লিখিত
বিগলভ—অলঙ্কার-বিধি-সংক্রান্ত-লক্ষ্য-পূর্ণা-মস্তক-বিগলভ :
পূর্ণা-পূর্ণা-বিধি-বর্ণনা মিলনাভিচ্ছাদনে অতিরিক্ত লালিন্যবোধ অর্থাৎ
বিগলভ পূর্ণা উৎপত্তি হয়।

১। অস্বাভাবিক—অস্বাভাবিক—স্বাভাবিক উচ্ছিন্ন।

২। দিবা-পাল—অস্বাভাবিক উপাধি ও মুক্তাশিখরিত বৈশিষ্ট্য।

৩। বৈধি—কৌশল, অর্থ বাহুলা অলঙ্কার প্রভৃতি বাহুলা—
তাহার উচ্ছিন্ন নাই।

৪। শিখা, শিখা, শিখা, শিখা—পূর্ণাধি পক্ষে মুক্তা, নারীর পক্ষে
বর্তলস্ফটিকা বৈশিষ্ট্য।

৫। উচ্ছিন্ন, কুন্তল ও বর্তলস্ফটিকা—পক্ষ কঠিন অর্থ নারী
না। নারীকর্ণে—অস্বাভাবিক কুন্তল স্ফটিকা—লক্ষ্য বা গোড়া
না।

ମହାମର ବୁଦ୍ଧିପ୍ରସନ୍ନ, ଅବଶ୍ୟେଷ ଇଚ୍ଛାସିଦ୍ଧକରକେ ବେନାଟିରେ ଚଢ଼ିଲେ
 ନାନା ପ୍ରହରଣ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଲେଖନ କରନ୍ତା ।
 ଅହରହରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗିରିତା ବା ଗିରିତା ଚଢ଼ିବେ ସାମଗ୍ରୀର ପରିଚିତ ।
 ବୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣମାନ : ପଦ୍ମ, ଲୁଗ, ଗୋବର ଓ ମାଟି ଉଠିଗଲ ।
 ସହ ଉଠିଗଲ ଓ ଉଠାଣ ବିକୃତି ଚଢ଼ି ଗଲ । ମଞ୍ଚ, ଗଲା ଓ ମଞ୍ଚ
 ଚଢ଼ିବେ ଚଢ଼ିଗଲ ; ଉଠି ଗଲିର ଅଞ୍ଚଳି ; ଚଢ଼ି ଗଲିର ଅଞ୍ଚଳି ଓ
 ମୋର ଛବି ଅଞ୍ଚଳି* । ପଞ୍ଚମ ପ୍ରାଣେର ଗଲ ; ବଞ୍ଚି ଗଲ
 ଅଞ୍ଚଳି ; ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିବେ ଗୋଟିର ଅଞ୍ଚଳି ନିକଟ, ଗୁଡ଼ି ଚଢ଼ି ଗଲି ।
 ଗୋଟି ଚଢ଼ିବେ ଗଲ ଅଞ୍ଚଳି । ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗଲ ଅଞ୍ଚଳି* ।

କଟକର ଚର୍ଚ୍ଚିତା, ଦିନୁକେର କୃଷିର ସଫଳତା,
 ଐତିହାସିକା, ହସ୍ତ, ଚାନ୍ଦର, କାଢ, ଦୁଆର ଶ୍ରୀରାମ ନାଟୋପକରଣ-

[illegible]

२४। पणिन, पणिन—काश्याय मते कृशार्द्धमन्त्र, काश्याय मते
 योग्य इति। किञ्च नाश्याय एव आस ७ पण्डितेभ्यः ७३ अन्त्ये
 मन्त्रादन्त्ये, उच्यते इति, इति अन्त्ये अन्त्ये अन्त्ये इति।

২২। ইজবল, শ্রাবণ বা জর্জর—ইহার বিবৃতি বিবেচ্য। হারবার্ট
ব্রিটানায়ের হোন্ডার কথ্য। শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় প্রকৃত ইতিহাস (ইজবল, প্রাচীন, ১০০ :
কৈবল্য, ১০০১)। জর্জরের পৌরী পূর্ণ বা শাব্দ। ইজবল দ্বিতীয় দ্বিতীয়
জ্ঞান অধিকার ও উচ্চ বৈজ্ঞানিক। ইজবল দ্বিতীয় জ্ঞানদ্বিতীয়—দ্বিতীয়। ইজবল
আনন্দোৎপন্ন জ্ঞানদ্বিতীয়—দ্বিতীয়। ইজবল দ্বিতীয় জ্ঞানদ্বিতীয়—দ্বিতীয়।
দ্বিতীয় জ্ঞানদ্বিতীয়—দ্বিতীয়। ইজবল দ্বিতীয় জ্ঞানদ্বিতীয়—দ্বিতীয়।
জর্জরের দ্বিতীয়জ্ঞানদ্বিতীয়—দ্বিতীয়। ইজবল দ্বিতীয় জ্ঞানদ্বিতীয়—দ্বিতীয়।

২৩। প্রতিদ্বন্দী, বৈদিকা বা কবচিকা, ত্রিভুজা, পট্ট, অপরী
 ইত্যাদি পণ্যের পথ ইহা পর্যাবসায়—অস্বচ্ছন্দ প্রসঙ্গিক ও বেপস
 দুইট পূর্ণ করিয়া রাখিত। ইহা বর্তমান যুগের Drop অর্থ।

କଳିଙ୍ଗ ବିଜୟ ଗୀତାମାତ୍ରେ ମନସ୍ତ ହେଉଅଛି । ସେତଦ୍ବାର୍ଥକ
ପରିବ୍ରଜିତେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଶୁକ୍ରାକ୍ଷୟଃ ସା ବ୍ୟାଘ୍ରଃ ପୁଣ୍ୟବନ୍ଧବଃ
ଏ ଯାତେନ୍ଦ୍ରବ୍ୟୟଃ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଥେ । ଓହା ଉଚ୍ଚତାପ ହାବେ
ଏକମତ ଅଟ ଅଗୁଣି । ଓହାତେ ଧାକିବେ ପାଞ୍ଚଟି ମାସ ଓ
ଗାଦିଟି ଶୀତ । ମାସଶୁଣି ଲକ୍ଷ ଓ ଲକ୍ଷା ହଠାତ୍ ଉଚିତ ; କୋନଟି
ପୁଅ ଛୋଟ ହଠାତ୍ ଉଚିତ ନା । ଶୀତଶୁଣି କୋନଟି ପୁଅ ଲକ୍ଷ ଓ
ମୁଁ ବୋଟା ହାବେ ନା । ଚର୍ଚ୍ଚନ ବଞ୍ଚିତେ ଡାକମାଣା ଧାକିବେ
ନା ଅପଣା ଓହା ବୁଦ୍ଧତା ଚଳିବେ ଓ ଚଳିବେ ନା । ଗ୍ରହ ଓ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରା
ଓହାସ ଯାନ୍ତନ କରନ୍ତି ହାବେ । ମତେ ଯାନ୍ତା-ମନ୍ତ୍ର ଦୁଃଶ୍ରୀମ ସିନ୍ଧା
ଓହାତେ ଚର୍ଚ୍ଚନକ୍ଷେପ ଶୁଦ୍ଧକେ ଗାମନ କରନ୍ତି ହାବେ ।

বিধ, কলিঙ্গ বা বংশ প্রকৃষ্ণের উপজ্ঞ। ইহা ত্রিধায়ে
বহু অর্থাৎ ত্রিভুজ চওড়া একান্ত প্রসারিত। কিন্তু তাঁতি
ঘলিয়া কাঠটি দুইদগা, বা অল্পতপ শোকা-বাওড়া, অথবা
তোপপ্রস্ত বৃক্ষের কাণ্ড হইতে নৃসংহীত হইলে চলিবে না।
এতদ্ব কাঠ শিথিল অমূলকতর গুণতিষ্ঠনক।

রক্তশিখের ৩৩ বে পটী নির্মিত হইবে, তাহা বিকৃত্তিত
হইবে বসিগ জুগলি। নেপথ্য হইতে রমকে জেগে কসি-
বাব ৩৩টি বায়ের মুখে এই ৩৩টি পদ্য বেগা পাখিবে—
ইহাশিগেহ বাগা সমগ্র রক্তশিখ আত্মগে কতর প্রাণা হিগ না।
বিষকক^{১১} ভাবনা বিধা ব্রহ্ম কবিত হইবে। পরে উহাশ
সহিত কক বা কুম নিশাইয়া প্রতীক রচনা করা উচিত।
চীয শেধে বন কগিা বিষকক নাখাইয়া ব্রহ্মগলি দ্বক করিসেই
পটী নির্মিত হইবে। এই পটী পূব মোটা, কথবা পূব পাটগা,
কথবা পূব মুগ হইতে পারিবে না। কোধে শুকহিবার পব
পটী দেখিতে ইকং লগিন হইবে।

ইহাৱ পৱ পটীক্ষেত্ৰবিধান। হাতীৰ অহাৰা পটীকে
অৰ্দ্ধঅঙ্কি ভাগ কৰা উচিত। তাহাৰ পৰ লগাটোৰ আকাৰে
উমাক কোণাৰ্হণি কাটিতে হইবে; এই ছোৱটিৰ পৰিমাণ
নিম্ন ইংৰাজেৰে ছহ অঞ্জুলি। ইহাৱ পৱ কটকুলে^{১৭} তিন
অঞ্জুলি ছেতা। অতঃপৰ কৰবিবদ—তিন অঞ্জুলি। তাহাৱ
পৱ মাঘৰ অঞ্জুলি পৰিমিত বাবু। ইহাই সংক্ষিপ্ত পটীক্ষেত্ৰ
বিধান।

୧୨ । ସ୍ଥିତିପଦ—(କୃତାଃ କାଠିଃ ସମସ୍ତା ନାମିତ ।

৬৮। কটে-কণাশলাখ, কবচ কটীশ, মিঠা। পটিলকটবিহীন
কটাল ফুলোকা। বাবুট জাতিঃ-১৫৪ স্বর্ন টে নুমা ২৫৮।

উৎস পথ নাটোপক্ষেপী নানা সরণোচিত বিভিন্ন আকারের মুহূর্ত নির্যাসের কথা এলা উঠাচ্ছে। এই মুহূর্তের উপকরণ নানাবিধ হইতে পারে। কিন্তু লৌহময় মুহূর্ত হওয়া উচিত নহে; কারণ উহা অত্যন্ত ভারী বলিয়া নটনটীর খেল উৎসাহিত করে। পৃথিবীতে যে সকল ব্রহ্ম বেশভূষারূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, নাটো অনেক সময় ঠিক সেট ব্রহ্মাণ্ডটির ব্যস্ততা বলে না; চরমরূপে অল্পরূপ কৃত্রিম বেশভূষা নির্মাণ করিতে হয়। বিশেষতঃ প্রাঙ্গণ, গৃহ, বাস, বাসন প্রভৃতির ব্যাখ্যায় তাহে রসিক প্রসঙ্গ সঙ্গত নহে। এই প্রকার পর্যায়গুলির নাটোপকরণ ব্যাধা হইয়াই কৃত্রিম করিতে হয়। মহবি বলিয়াছেন, লোকের ব্যবস্থা উপকরণ বিবিধ—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। লোকধর্মী স্বাভাবিক ও নাট্যধর্মী কৃত্রিম—বিকারজাত। এইজন্য মহবি পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছেন, যেন নাট্যধর্মী উপকরণ পৌরহিনির্ষিত বা প্রত্যক্ষ না হয়। জড় (পালা), চালুকা কাঠ, চর্ম, বস্ত্র, বেতুল (বাগের চ্যাচড় বা চ্যাটাই) প্রভৃতি দ্বারা চালুকা নাটোপকরণ নির্মাণ করা কর্তব্য। যদি লম্বু নাটোপকরণ নির্মাণের উপযোগী বস্ত্র না পাওয়া যায়, তবে তালবৃক্ষজাত মৃতদেহ বস্ত্রের দ্বারাও কার্য চলিতে পারে^{১০}। অস্থানি নির্মিত হইবে তুণ ও বেতুল হইতে; উহাদের উপর পাঙ্গার আবরণ দিয়া বেতুল টেক্সা সেইরূপ আকার করা হইতে পারে। হস্ত, পদ, মস্তক ও কঁকর উপর আবরণ দিবার তিনিওলি তুণজাত বা কৌলজ (কাটির তৈয়ারী) ভাণ্ডের দ্বারা নির্মাণ করা উচিত। অস্ত্রকবলে মুদ্রা ব্রহ্মাও ব্যবহৃত হইতে পারে। কাণ, বস্ত্র, মঞ্জিষ্ঠ, লাঙ্গা, অঙ্গনয় প্রভৃতি দ্বারা পর্জন্ত, চর্ম, বর্ষ, ধ্বজ নির্মাণ করা কর্তব্য^{১১}। ফল, ফুল প্রভৃতি গাঙ্গার দ্বারা তৈয়ারী করিলে শোভন হয়। কান্দ্র-বর্ষ দেখাতে হইলে জাও, বস্ত্র ও মোম ব্যবহার। কৌলবর্ষ প্রদর্শনে নীলরঞ্জিত অঙ্গনয় উপযোগী। মুহূর্তাদিও অঙ্গনয়ে নির্মিত হইলে উজ্জ্বল রূপটিত বলিয়া মনে হয়। মহবির মতে সুবর্ণভূষা নির্মিত মুহূর্ত অঙ্গনয় অঙ্গনয়নটিত তাত্র-পত্রের মুহূর্ত রসমকে অধিক উপযোগী। কারণ, সরসোৎকর

নটনটীগণ সাধারণতঃ অঙ্গনয়। শুকতার নাটোপকরণ বহন করিতে হইলে তাহাদের পক্ষে আঙ্গিক অভিনয় সম্ভব নয় তাহে প্রশংসা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। বিশেষতঃ অতিরিক্ত পরিমাণে খেদ, খেদ ও মূর্ছা পর্যন্ত বটা কিছু বিচিত্র নয়। অতএব, আসল রসালভাষার পরিবর্তে অঙ্গনয়িত কৃত্রিম ভূষণ ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাণ্ড।

মহবি আরও বলিয়াছেন যে, রসমকোশের সত্যকার অঙ্গ দ্বারা ছেদন বা আঘাতের অভিনয় করা কর্তব্য নহে। বাণ প্রভৃতি নিক্ষেপ করাও অসুচিত। যদি একান্তই অঙ্গ নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা হইলে অঙ্গরূপের প্রেক্ষিতা বিশেষ বরণহকারে এমন ভাবে শিখা করা উচিত—যাহাতে ভয়ঙ্কর কাহারও কেন্দ্রণ আঘাত না লাগে, অথচ বর্ষকের চক্ষুতে যেন ধাঁধা লাগে যে, সত্যই অঙ্গনিক্ষেপ করা হইতেছে। ইহারই নাম “শিখায়াণ” বা “স্টেজায়াণ” (stage illusion)।

মহবির আধার্যাঙ্গিনের বিবরণ এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। অত্যন্ত গুরুতর বিষয় এই যে, বহু মূলেই এই বিবরণ অতি অস্পষ্ট। তাহার কারণ—প্রথমতঃ, তাহাদের সর্বত্রই নাটোপকরণের সম্ভার অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে^{১২}। দ্বিতীয়তঃ, প্রথমতঃ এত সূক্ষ্মাচার্য্য পারিতোষিক শব্দ বহিয়াছে যে, প্রচলিত সংস্কৃত অভিধানের সাহায্যে তাহাঙ্গিনের অর্থ করা অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, পাঠের গোলমাল ও ছাপার ভুল এ বিধের বিশেষভাবে দ্বারা। শিপিকারের অজ্ঞতা বা অনবধানতার ফলে অনেক সময় অনেক সঠক বিষয়ও অতি ভুলিল ও অর্থহীন হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্থতঃ, নাটোপকরণের গহন অথবা প্রবেশ করিবার যে একবার পথ—আচার্য্য অভিনয়ভূমির টীকা অতি নবজাতী—তাহার সমগ্র অংশ অজ্ঞানি প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণ অবস্থায় অনেক মূলেই কেবল অঙ্গনয়ের উপর নির্ভর করিয়া অর্থ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে হইয়াছে। অতএব, প্রথমতঃ প্রথম প্রমাণ দ্বারা বুঝই সম্ভব। তদ্বিষয়ে অতি নবজাতী প্রকাশিত হইবার পর স্তবীর্ণ এ বিধের একটু অবহিত হইলে অনেক ল্পটপ্রাণ অঙ্গার পুনরুদ্ধার হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

১০। “কৌলবর্ষ ও কৌলবর্ষ” শব্দ দুই ভাষা। কৌলবর্ষ হই, কৌলবর্ষের টেক অর্থ অঙ্গনয় কাঠি দুই সেক করিয়া কাটিয়া তাহার দ্বারা কাপড়ের বস্ত্র তৈরি যোগ্য হইত। কৌলবর্ষ কৌলবর্ষের বস্ত্র তৈরি যোগ্য হইত।

১১। কাণ—চ্যাচড় প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত পাঙ্গার বস্ত্রের ফল ও ফুল। কাণবর্ষা বস্ত্রের basket-weaving প্রভৃতি বর্ণ বস্ত্রের ফল ও ফুল। কাণবর্ষা—কাণ।

১২। বলিভাষ্যতে নাটোপকরণের সম্ভার অধিক বিবরণ আছে। তাহাঙ্গিনের অর্থ অঙ্গনয় পথি করিয়া গহন। অঙ্গনয়ভূমির কোন কোন অংশ (মুখ প্রভৃতি অংশ) সম্ভারের বস্ত্রভূমিতে অঙ্গনয় প্রচলিত অঙ্গনয় নহা, কিন্তু সমগ্র নাটোপকরণ অঙ্গনয় সম্ভার (শিখা) করিয়া, আধার্যাঙ্গিনের সম্ভার ও তাহাঙ্গিনের অর্থ প্রকাশিত হইত।

অপরিসীমতা

কান্টন্যন্ত দিকে কোন দিনই আমার কোঁক নাই।
কথা-কথাও বলিত বসি নাই।

এম-এ পাশ করিয়া খেয়ায় ছইল, জীবনে কি-বা নিখ-
লাশ! পাশাপাশি এই যে অগণিত নর-নারী—তারের সঙ্গে
কি-বা পরিচয়!

খেয়ালের কোঁক বাড়ী ছাড়িয়া নাহির হইলাম। তীরে
নয়, বেশ বেধিত; মানুষ বেধিত।

দেখনের সঙ্গীত রূপ! প্রাণ বুঁতিয়া প্রাণের নাকুল
বাগনা! কথাগুলো পড়িয়াছিল। পড়িয়াছি অনেক কথা!
মনে তার কোনোটো পিঠাইয়া বসিল না।

কিছু না, এ বেন গুরু-গম্ভীর বর্ণনের আলোচনা করি-
তেছি। বর্ণন পাঠ বসি কেহ পড়িতে চাহতো আমার কান্টন্য
পড়িবে কেন? মোটা মোটা অনেক বই আছে—আমের
আধাংক।

দেখনের কথা বলি। দার্কিনিয়ে আছি। যে
হোটেলের থাকি, ছুটির দিনে সে হোটেল দৌতীন নর-নারীতে
ঠাণ্ডা দিয়াছে। বাগানী আছে, গুল্মস্রাটী আছে, মস্ত্রাটী
আছে—এই ভয়তৎবের ছোট-খাট একটি ‘এপিস্টোম’!

আমি খুঁজিয়া বেড়াই। কাহারো সঙ্গে মেলাশোনা নাই।
আমাদের বেশায় সারাক্ষণ এখা বেন প্রবৃত্ত হইয়া আছে—
এ প্রবৃত্ততার আঘাত তেমন কচি নাই। হোটেলের হুপচাপ
থাকি—বান করি, বাই-বাই, ঘুমাই; বাকী সবটো সম্পূর্ণ
উদ্বেজবীন ভাবে বাটে-বাটে খুঁজিয়া বেড়াই। চোখের সামনে
দিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়, চট্টনী জপতের বিচিত্র ছবি,
বাল্যকালের বিভিন্ন দিনের টুকরার মত।

জলাশয়ের ওদিকে একটা পাহাড় দিয়া উঠিলাম।
পাহাড়ের পায়ে পায়ে-চলা পথ। বেলা তখন প্রায় তিনটা
যাতিয়াছে। এক মাছবার বেগি, মেয়েদের গানের এক জোড়া
নগরা ছুতা পড়িয়া আছে; তার কাছে নানা রঙের একতাল
পাহাড়ী ফুল। হুঁসিলায়, ধীর ছুতা, তিনিই ফুলগুলি ভেড়া।

—শ্রীমৌর্যসম্বোধন মুগোপাধ্যায়

করিয়া রাখিয়াছেন। পানিক আগে বৃষ্টি হইয়াছে; পাহাড়ের
পায়ে ছোট পাথরের রেখা চোখে পড়িল।

হে-অন কেমন একটু পুঙ্কলব সকার হইল। পাথের
রেখা একজোড়া। যিনি আসিয়াছেন, তার সঙ্গে সাধা কেহ
নাই। একা। কে ইনি?

অলস মনের কোঁকুল! পাহাড়টা খুঁজিয়া চাওয়া দেখিলাম
—কাহারো সেবা দিগিল না।—না সাধার কালো বেশ, না
পাড়ীর ঝাটল! খুঁজিতে খুঁজিতে শেটখানে মাগিয়া বসিলাম।
নাগরা জোড়া তেমন পড়িয়া আছে। পায়ে শেট ফলের
রাশি।

কত বার স্থান হইল, ফুলগুলি হাতে তুলিয়া লই—নাথবা
ছুতা জোড়া দেখিয়া যদি কোনো পরিচয়—

হামি পাইল। কেন এ বাগনা? পাগলামি।

বসিয়া রহিলাম। চারিদিক স্তব্ধ শুধু ‘একটা পাহাড়’
ডাক সে স্তব্ধতার বুকে ভাসিয়া উঠে। কাছে কোথায়
পাহাড়ের গা বসিয়া জলধারা করিয়া পড়িতেছে, তাহার
অবিবাক একঘেরে রব। উঠিলাম। কাঁচাকাড়ি খানিকটা
খুঁজিলাম। একটা কোণ। কোণের পাশে ছোট একখানি
খাতা পড়িয়া আছে। চারিদিকে চাট্টিলাম; তারপর চোখের
মত খাতাখানি তুলিয়া তার পাতা খুলিয়া দেখি, প্র’ চারিটা
পাতার হস্তাক্ষর। খাতার কাঠাখো নাম নাই। কোনো
পাতার লেখা—“কণ্ডো নকটে আছে অক্ষর টাক;। কেহ
বা অতাবের আশায় হা-ধা কবিতাছে! মাছের পরিচয়
কেন? না, মনে?”

কোনো পাতার লেখা—“মনটাকে লকল বাধ-বন্ধের
উর্ধ্বে তুলি কি এমনি অসম্ভব?”

—“যৌয়ে আকাশ তরা। একটু পরে যেথ করিয়া কি
বৃষ্টি! মাগো! মাছের জীবনও তাই বেধি! এই মূখ!
একটু পরেই প্রঃ! কিসের আশার মাছের সংসার গড়িতে
বলে!”

“কোথার এমন মানুষ - সহাই আছে? যে ঠিক তলের

হুকে পড়বে মত—পারে জল না মাখিরা, কাঁসা না মাখিরা
চল-চল মনে ফুটজা আছে সংসারের হুকে ? আশেপাশে
গুজন তুলিয়া অচিন্তি পাখা খুলিয়া বেড়াই, তবেই দেখিরা
লক্ষ্য হত, তথা ধরে ? তারা যা চাই, সে অতীত কোন নারী না
মিটাইতে পারে ! এমন বাস্তবিক সাধী করিয়া জীবন-পথে
চলিত আবার কোনো সাধ নাই ! লোকে বলিবে, পাগল !
লোকে বলিবে, এ সাধ সইছো ? কিছ এ-বহুশে বেটুই
বেশিলাম—মনে আতঙ্ক ধরিয়াছে—বিয়ান জাগিয়াছে ।”

তারপর খাতার পের পাড়ায়—“এই যে স্থলগুলিকে
আজ ত্যাগ করিয়াছি—”

লেখা এইখানে শেষ । খাতার বাকী পাঠাওয়া সারা ।
পড়িয়া দেখে তোমার হৃদয় । আশ্চর্য্য এ ঘরের মন !
কত বহন ? জুতা ত্যাগের পানে নতর পড়িল । লেখার
তরী ! সামনে এট জড়ো-করা স্থল ! বহন বাই থেকে, মন
এখনো থাকে নাই । পাকিলে বিজন পাড়াতে আসিয়া এখন
কাব্য-কথা খাতার পাড়ায় লিখিয়া রাখিত না ।

কিছ সেল কোথায় ? পাড়াটায় উপরে নীচে প্রদক্ষিণ
করিয়া বেড়াইলাম । সূর্য্য একত্রাণ ঘরের ছাড়াইল সন্নিহা
পড়িল আমিও পাড়াতে বহিয়া ধীরে ধীরে হোটেলের ভিত্তি-
লাম ।

সন্নে ভাল ঘুম হইল না । মন সেট পাড়াতে কেন
করিয়া খুলিয়া বেড়াইতে লাগিল ।

প্রদিন সকালে চায়ের স্নেহ ত্যাগ করিয়া আবার সেট
পাড়াতে গিয়া চড়িলাম । লেখানে—না, সে নাগদা জুতা নাই,
সে স্থল নাই, সে খাতা নাই !

পাড়াড়ের হুকে বসিয়া রহিলাম । আজ আসিবে না ?
তখন—

কিছ কি শুধন ? গোখে দেখা ! লাক ? হস্ততা
বিষ্ক হইবে ! ফুটজা ! তবু এ ফুটজা ত্যাগ করিতে
পারিলাম না ।

বেলা বাড়িল । নির্ধের আকাশ । জোত্রে বেশ তেম ।
কৌত-হসিত দিগন্তের পানে চাহিয়া দেখিলাম । দুটিপানী-
গুলার জীবনের চাক্ষু ! হুবে ঐ আকাশের পথ-বৈধা

কালো ধূমের দেখা ! হৈন চমিগাছে ! নীচে কোন নির্জা-
ঘরে ঘটা বাজিতেছে—ওদিকটা বেন জিগ জগৎ !

সবদা বেধি, পাড়াড়ের নীচে তরুশ্রেণীর মধ্যে এক
কিশোরীর মূর্তি ! পথের লাল রক্তের শাক্তী । কিশোরী স্থল
তুলিতেছে ।

পাড়াড় হইতে নামিয়া পড়িলাম—পথের সন্ধান না রাখিয়া
কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া—পা বেগ পিছলিয়া । হুকে
করিয়া পড়িয়া গেলাম । পড়াইয়া একটা ঘোলের মধ্যে পড়িয়া
পড়িবে সে বেগ থাকিল ।

নড়িবার শক্তি নাই । হ' চারিজন ফুটজা নিকটে ছিল ।
তারা আসিয়া আমাকে ধরিয়া তুলিল । পরে একটু পথে বল
পাইলাম । পরে স্থা-কাবা সমত কোনবতে হোটেল
কিহিয়া ।

পথে এক বাস্তবীর সঙ্গে দেখা । বাস্তবী বলিল,—
পড়ে গিয়েছিলেন ?

কহিলাম,—ক বললে ?
বাস্তবী কহিল—আমি হোটেল থেকে বেরিয়েছি, পথে
একটু বাস্তবী মেয়ে আমার বললেন—একজন বাস্তবী জ্ঞ-
লোক পাড়াতে থেকে পড়ে গেছেন । আপনিই—?

কহিলাম,—মানে নি ।
বাড়াইলাম না । মনটা হার-হার করিতে লাগিল ।
তিনি দেখাচ্ছেন ! তবু একবার কাছে আসিলেন না ?
পা ভাঙিল কি না ? কেন পড়িলাম ? সে যোগ --

এই হোটেলেরই তবে বাস করেন ? বাস্তবীর সঙ্গে দেখা
হইয়াছে । বাস্তবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম না, তিনি কে ।
বাস্তবী বহু দূর চলিয়া গিয়াছে । কিহিয়া বিদ্যা প্রাণ—
ভাল দেখাইবে না ।

হোটেলের অছি । মনে বাক্য বাহ । একই গৃহে বাস ।
তিনি আমার দেখিতেছেন । আমি কিছ—

সন্ধ্যা দেখে বেনা । চপুং বেলা পথ্য ছাড়িয়া নড়িবার
শক্তি নাই । হোটেলের জাকার কি কতকগুলি লোক
দিয়েন—

সন্ধ্যার পর বিছানার পড়িয়া আছি । হোটেলের বেগার

আমি আমার ছেঁচ চুকিল, তার হাতে এক রাশ মূল।
পাহাড়ী মূল। কহিলাম,—কর মূল?

বেয়াস বলিল,—আপনার।

কহিলাম,—কে দিলে?

সে কহিল,—একটি ঘেরেলোক। এতে কাগজ আছে।

মূলভগা হাতে লইলাম। মূলের সঙ্গে ছোট এক টুকরা
কাগজ পিনে-ঝাঁটা। কাগজে লেখা আছে—“পার্শ্বী-
সংবাদ!”

পার্শ্বী? ঠিক! পাহাড়ে কাল এই মূলই দেখিরাছিলাম।
অবে...

মনের সে অসহ্য ভাবের প্রকাশ করিয়া জানাইতে পারিব
না। কখনো কবিতার চর্কা করি নাই। শুধু মনে হইতে
লাগিল—আমি যেন নাগপাশে বাধা রহিয়াছি! এ বাধন
যদি কাটতে পারিতাম! লোকালয়ের বাহিরে সেই বিজন
গিরির দুকে...হোক রাতি...ওষধ থাকিত না!

‘আগে হু’ বিন বিজ্ঞানার পড়িয়া রহিলাম। ‘ও’ বিনট
সন্ধ্যায় মূল পাইলাম। তেমনি টিকিট-ঝাঁটা। টিকিটে হুখর
অঙ্করে,—“পার্শ্বীর উপহার!”

বেয়াসকে ডাকিয়া বলিলাম,—এ মূল কে দেয়, সন্ধান
নিতে পারিল? বখশ দেব।

সে কহিল—সে মেয়েলোক বের নি। এ মূল আর
আমার হাতে দিচ্ছে উদ্দী হাই।

—তাকে বিজ্ঞাপা কর—তাকে এ মূল কে দিচ্ছে?

বখশদের গোতে বেয়াস ঝুটিল। কহিল। সন্ধান দিলিল
না। রহত!

পায়ের বাধা সান্তিলে সকালে আদিলাম সেই পাহাড়ের
ঘাটে।...ঐ লাল পাহাড়ী। এক-মনে মূল জুড়িতেছেন।

নিম্নে আদিয়া কাছে ঝড়াইলাম। কহিলাম,—বস্ত্র-
বান!

কিশোরী বাঙালী। তপসী। আমার পানে কিরিয়া
চাহিলেন। হুই চোখে বিষয়! আমি হাসিলাম। হাসিয়া
কহিলাম—কলধাশের আবেশিকা-আবিষ্কার! কি বলেন?

ঔর হুই চোখে বিরক্তি! তিনি সরিয়া বাইতছিলেন,
আমি কহিলাম—একটা কথা!

তিনি পাড়াইলেন—সদ্যকো!

আমি কহিলাম—আজ পরিচয় পেরেছি। আপনার
দেবার বে-পরিচয় আগে পেরেছিলুম...কিন্তু তার আগে
ধন্যবাদ দি...আপনার পুণ্ড-উপহারের জন্য।

কিশোরী ঝ কৃত্তিক করিলেন। আমার বুটটা ধক্ক করিয়া
উঠিল।

তবু ছাড়িলাম না। কহিলাম,—আমার কাছে নিজে
গোপন রাখতে পারলেন না তো! আমি অনেক সন্ধান
করেছি। লুকিয়ে থাকতে পারলেন কৈ!

কিশোরী নির্ভাক...নিষ্কম্প! যেন সেই কলধা-লব্ধের
পার্শ্বী আজ ঐ গিরি-নিখর হটেতে নানিরা আমার সামনে
আদিয়াছেন—তেমনি তবী!

আমি তাঁর পানে চাহিয়া রহিলাম...নিজেকে ভুলিয়া,
চলিয়া ভুলিয়া।

সন্ধ্যা পুঙ্খবৎ কর্তব্য। সাহেবী শোষক-পরা এক
ভ্রমলোক ডাকিলেন,—বীরা...

আমাকে বেধিয়া ঔগ কণ্ঠ বীহব ধরিল। আমার পানে
চাহিলেন। বিষয়-ভরা দৃষ্টি। কহিলেন,—এর মানে?

মানে তিনিই বুকাইয়া দিলেন। অর্থাৎ বীরা আদিয়াছে
স্বাক্ষরিত তার মা-বাপের সঙ্গে। ব্যারিটার মিটার রায়ের
কন্যা। আর এই ভ্রমলোকটী কয়েকটি চাকির করেন মিটার
বাশ গুপ্ত। হুজনে প্রেয়স হইয়াছে।...এ সংবাদ আর কেহ
জানেন না...হুজনে স্থির করিয়াছে, মিটার রায়ের কাছে একদিন
গিয়া লাপ-গুপ্ত তাঁর কন্যার পানি চার্জনা করিবেন। আমাকে
মিনতি জানাইলেন, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। কহিলাম,
—তথ্য!

কিন্তু সেই বাসরা? সেই খাতা?

তনিসাম, বীরা বৈদী কলিনকালে নাগরা গায়ে যেন না—
নাগরা গায়ে দিলে তাঁর গায়ে কোথা পড়ে! তিনি পানে
যেন হাই-হীন্! ও! খাতার কথা তিনি জানেন না।

ভুল করিয়াছি!...

অৈখ্যক ব্যক্তি।

বীরা বৈদী চলিয়া গেলেন। একা পাহাড়ে বসিয়া রহি-
লাম। নিজের মনের ভুল লইলাম। আমার এ চাকলা—এ
কৌতুহল কেন? এ কি প্রেয়? ভালগালা? কখনো থাকে

କେହି ନାହିଁ—ହାବ ନାମ ଜାନି ନା—ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ପାଦର ଏକତୋଢ଼ା
 ଶାମରା ଆମ ହାତର ଲେଖା ବେଦିଆ...

পরে উপস্থানেও নে এমন হয় না !

আগে একদিন কাটিয়া গেল। ননকে বুঝাই : তবু তার
অদীৰ্ঘ। কাটিতে চার না।

ডাকে চিঠি লাইলাম। লোকাল্প পোষ্ট-বাক। যেহেল
হাতে খামের উপর নাম টিকানা দেখা ! বিদ্যে খাম
ছি'কিরা চিঠি লুইলাম। পড়িলাম,—

ସମ୍ପାଦକ: ଅନୁଗ୍ରହଚନ୍ଦ୍ର

দেখিছ কি হোয়ার অ্যোয়ার লো নাই! অথবা বুঝিছ? কিন্তু
কি করিলাম অথবা কেন পাঠাই? হোয়ার অ্যোয়ার সেলা এক একক
কর হইতেছে, দেখা দিই! কিন্তু সে দেখা বৈরাগ্যের সেনা বানিয়ে।
কি জানিছ, আমি তাই! দুনি জাতিভর, প্রাণী, বিদ্যার? কিন্তু...
সে কথার কাক নাই। এনি অর্থাৎ হোয়ার অ্যোয়ারে বসি থাকি,
আরো কত কি দিই!

ଦୁଇ ଯାଏର ଜଳ ଏ କୋଇଲି ଶବ୍ଦ କଲା ଉକ୍ତକୋଟି ହୋଇଲେ ଲିପିକା
 ଜାଣିଥାନ୍ତି ପାରି । ଯେତେକ ଜାଣିବାର ହୋଇଲେ ଆସା ଛୁଟୁ । ଯେତେକ
 ଆସି ବିନା ଦେଖି । ଦେଖିବ ତାହା ଲାଗେ । ଯେତେକ ଆସା ପଢ଼ିବ ଦୁଇ
 କୋଇଲି ଲାଗେ ନା । ଡିମ୍ବି ଲିପିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲିପିକା । ଡିମ୍ବି ଘାସରେ ପାଣି
 ଲେ ଘାସ କରୁ ।

ସୋମନ କରିବ ନା : ତୋହାର ଉପାର କି ଦେବ, କି ସହଯା ବି ସାଧିବାର :
 ଗଲେ ବାସିଦାହି : କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଲସ୍ବାରୀ ବୁଦ୍ଧି ମରବୀ ବର : ତୁମି
 କହାର ବହୁ : ତିରିମି ବହୁ ସାଧିବାର : କେବନ ? ଆସାର ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର,
 ବୁଦ୍ଧିରେ : କେବନ ଆସାର କହ କି ବୁଦ୍ଧିରା ଦେହାର—କେବ ବର୍ବ, କେବ
 ବା ମରବୀ : ବାହର କ ତାର, ତାହି କି ପାର ? ତୁମି ବରି ଆସାର ବା ମରବୀ,
 କରବି ତୋହାର ବା ମରବୀ—କି କରବି ? ହାତେ ମାତାର ଉପାର ନାହି : ଇତି—

অতিভূত হইয়া পড়িয়াম : শাইব না ! শ্যাম লিখিয়াছে ।
কিন্তু চিঠি লিখিতে চাই । কাহাকে লিখিব ? কোথায়
লিখিব ?

সকান ছাড়িতে পারিলাম না। সেই পাখাড়ে গিয়া
বসিয়া থাকি। তোনোহিন আর সে নাগরা জোড়ার বেথা
দিলিল না। খাতা নহ, সে কলও নহ।

किन्तु पाहेबाय चाणा केन नाहे ? कणसौ मन ! किनात्रो
नन ! अरब....?

তিনি যেমন হোন—আল বাসিরাছেন ! আমার উপর
লক্ষ রাখিরাছেন । হয়তো কোন ক্ষণে...

মতুর্ক হুসিলায়। আমার ব্যবহারে কোন ক্রটি না
থাকে...

ଦ୍ଵିନି ମତେ ଡାକେ ଆଦାର ଚିଠି ଆଇଲା । ତାର ଚିଠି ।
ତୁନି ଲିଖିଛାନ୍ତି,—

তুমি তরিকত, আমি তোমার উপর কতু চোমাইছি ! মাঝে মাঝে যেনই তুমি থাকিবে। সেট কেনে স্মৃতিতে রাখা। তোমার কথিয়া 'শিখিহিতা' থাকিবে না। তুমিইয়া ৩৭-৪০-৪১-৪২ ইত্যে বিবেকে যে বহিঃ কথিত হা, সে কি বাহ্য ? না, না, তুমি যখন জীবিত হা প্রথম জীবিত, তোমার জীবিতা নির্ভরই একজনে বহিঃ যিনি কথিয়াইয়া না। যেকোন যোগ্য, যাহা যেকোন অথবা অসত্যের যৌন পরিণতি হা, শব্দক হা। সে কথা তুমিইয়া না।

তোষায় জীবন-দাতার। যে অধিকার চণ্ডিগড়ের, সে নরসিং। দ্বাদশ
শতক। তেজস্বর চিঠি পাইবার কত আশার বন আকাশ। কি তোষায়
মনের কথা—কি স্বপ্নের জুড়ি যে কথা জাগাইতে চাও—বন কি ঘে—অতীত
দ্বীপে চিঠি লিখিও জানাইলো। চিঠি হোটেলেসের লেগার ঘন্থর কবর
দ্বাদশ। আবার লোক দিগে সে চিঠি লইল অধিকার।

সে লোকটি কে—যেখানে চাও ? তার সঙ্গে দুই কথা করিয়ে ?
 শব্দ দুইয়ে বা । ইতি—

চিঠি লিখিলাম। ছোট চিঠি। শেলি-কীট্‌ন্স আসিয়া
বকে বসিলেন। লিখিলাম—

ଦାସି

তোমার আদি পূজা করি : তোমাকে শাইবার অঙ্গাঙ্গি হই। সে
আশা হুজুগ !

ଘନେ ହେ, ଆସାର ଘନେ ତୁମି ବିରାଜେ କରିବେ ସେନ ଦୁଃସ୍ବର୍ଗ ଭିତ୍ତି ।
 ତୋହର କୃପିତ ଆସାର କୌତବ୍ୟ ଏକହସ୍ୟ କାନ୍ଦଣା ହେବୁ । ତୋହାର ଘନେ ବସି
 ଆସାର ଛନ୍ଦ ଆସନ ପାଞ୍ଚିଲ ଆସ, ତେ ଆଗନେ ଭିତର ମୋହନ ସେ ନାଥ
 କରି—ଆହାରି ହେବୁ ଆସାର ଲାଭ୍ୟ । ଦେବା ଦିବ୍ୟ ନା, ସ୍ବପ୍ନାୟ । ତୋହାର
 ସେହର ଆସନ ଆସାର ପ୍ରାଣେ । ଶକ୍ତ ଆସାର ତୁମି ଦେଖିବେ—ସଦ୍‌ବ୍ରତ !
 ଆହା ହେବୁ । ଆସାର ବିରାଜେ ହେବୁ ତୁମି ବିରାଜେ କର—ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ତର
 ଦେଖି କାନ୍ଦଣା ଆସି କରିବ ନା ।

চিঠিখানা ব্রহ্মচূর হাতে নিশাম। কে আদিরা সে চিঠি
 লইয়া কাহাকে দিবে জানিবার সৌর হাশি; সে সোত
 সবরণ করিতে পানিব না হুঁকিয়া নির্জন পাথাকে চলিয়া
 গেলাম।

কবাব বিসিল এক লণ্ঠা পুরে । এ কয়টা দিন প্রাণের
মধ্যে কেন অধীরতার নায়েগ্রা ছুটিয়াছিল ।

ଚିହ୍ନିତ ଚିନ୍ତି ମିଳିତାବଳୀ—

এখনে বলি কি না? জীবন অনেক কাজ কথিলা আছে।
উপরে তুমি তোমার কাজ করিত হইবে না, যদি। সেখান কথ
কথিলা। অত্যাশা সে—এই ছিল পথ অত্যাশ, যখন কখনো। সে
অত্যাশ বুঝাইতে কিছু কথিবে না। সে উচ্চ। করিত রেখা—সে
কথা বলি না। ওলিবে হাতী কিছু। ও কিছু জ্ঞান কথিবে মনে
আর পথার্থ কথিবে না। হিংসা, ঘোষণা, কথাবলি বুঝে পথার্থ
হইবে। সত্য আছে। সে সত্যই হইবে। সে বুঝে ঘোষণা
করিত না।

অতি চমিকি ফাইটাই। কোথা—অঁদন না। তবে যেহা হইবে।
 সৌন্দর্য্য সেহ নহ। সে নহে তুমি চমিক, অতিত চমিক। পান্যপানি
 ষাড়াইবা না, এমন কথা বলিত পাঠি না। কেনে করেছ হরত পান্যপানি
 বৈদ্যবৈদ্যি অতিলা হুজবে দ্বিবিদ। তুমি আবার চমিকবা না। অতি চমিকবা।
 তাহার হরতে একদিন লক্ষ্যহরের মাড়ল ভাঙিল হুজবে দান্য-দান্য
 ষাড়াইবা। অতি তুমি, হরত সেদিন আবার চমিকবা। চিঠি চিঠিবা রসজু
 হরত কিতো। অতি পাঠিবা।

তোষাঃ উপাঃ অথাঃ ব্যক্তিগণঃ । তোষাঃ তিষ্ঠি যেষাং কে অসে,
যেষাং জন্মিষাঃ কোদো অসাদ শাও নাই—এ কি শব্দ কাম ! ইতি—

ଏ ଚିଠିର କଥାରେ ଜାଣିଲା—

ତୋଷାକ ସେ ବୃଦ୍ଧ ନୟନ କାଳକ୍ରାନ୍ତି—ବର୍ଣ୍ଣବ । ହୁଏ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣୀ
 ଚକ୍ର । ହୁଏ ସେ ଗୋପା । ତୋଷା ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମ ବସ, କୁହଣ
 ହୃଦୟ । ନାୟକ ଉପନାୟକ ଦେଖିତ ପାର ସା—ପ୍ରଣା କରେ, ସାହିତ ସାହା,
 ଜନନାୟକ ତୋଷ ଦେଖିବେ ସା—ଆଜ୍ଞା ଅହଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି । ତୋଷା
 ସାହି ପୂଜା କରି । ପ୍ରିୟମ ସାହି ।

ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଡାର ତାଳବାନିତ—ନିକଟା ବ୍ରହ୍ମ-କିରୀଟ ନିକଟା ଡାର ନାମ
ଦାନ କରନ୍ତି । ତୁମ୍ଭି ମୋ ନାଣି ମଂ—ଦିବ୍ୟାସି ।

অবাব বিলিঙ্গ,—ছোট্ট অবাব ।

इ'वाल अइहऽ कोर छी' सिधिय ना । (कम—बिज्या) कहियो ना ।

পাঠ্য, সে কাব্যে পাতা স্থলি। ইতি—

বার্জিনিয়ের আকাশ দেখে কাণো হইবা সেল । বাতাল
নাই । পাহাড় খেন কুকে চাপিবা বসিরাছে । গ্রাম বাহ !
বার্জিনি! ছাড়িবা পলাইলাম ।

দুচারি কাঁধেই বুরিমা মনে হইল—বেলায় আবেশ,
ঐক্যে জীবন বন্ধি না। কান আছে। তাই যোক!
বেদনার বুক যদি অস্তিত্ব ধায়, তবু বেশ আছে—সমস্ত
আছে...!

সাবিহা মাঝে পড়িয়া একটা কাজে মাদিলাম।
 হরিণালের ওদিকে একজন তলাটির দিগা কচুগিপানার
 উদ্বেগ করিওছিল—তারে সঙ্গে যোগ দিলাম। সে কাজ
 করিতে করিতে মাগেলিয়ার দণ্ড হারিতে কামান মাদিলাম :
 পা পুতুরে গড়াছায়া, জল কাটানো—একবারে বেন
 দণ-প্রবেশধারী হইয়া উঠিলাম। বোবীর উপর অভিমান
 কাটিয়াছিল। এক কাজ করিতে প্রচুর লোক ছিল! তবু-

পূর্বের পাক উঠিল। দু'চারিটা জেলায় মাগেদিয়ার
জড় যিহিল। কচুগিপানার ডাঁই গেলে বেশ ছাড়িয়া। যব
বিলাস কস্তাবার চুটাইতে, মালা-মকদদার ছালা মা মুছিতে !

আমাত বাজিল। ম্যাগেস্ত্রাট জনাবাদিস মণাকে
কায়দা করা যায়; কিন্তু বাহুবের মনে পোডেগ হিংসার
বে বিরাট ব্যাঙ্গিণি জমিরা আছে, মাহুগ্র ভয়ের ছাড়িতে
চাহে না, মাহিজে চাহে না। বুকের রক্ত মিথ্যে ম্যাগিসি-
গলাকে লালন করিতে, পক্ষিমান করিয়া কুশিতে তাদের
লাখনার বিবাদ নাই।

निष्ठायाः श्रेयाः ।

এর দু'শাল কাটোয়া গেল। নোহাখালির ভবিকে বন
কাটানো হইতেছিল। ক্যাম্পে বসিয়া মজুতের হিলাব কবি-
ত্বছি। ডাক চিঠি আসিল। পরিচিত অক্ষরে অপরিস্ফুট
চিঠি। হিলাব ফেলিয়া চিঠি পড়িলাম। বোবো লিখিয়াছেন,—

প্রোথ। ওই হাঁচকে ! খবী আমায় কুণিগা বাক, তলে। এ
 ওই নাম কুণিগা তপসায় বর বাক, বাট। অ-খিলাসে। অথচ ঐক্যকে বাক
 ওই বাট, পেল্ল আমায়। অথচ। মোবা নাই :

এ হ'লসে হোয়ার সেবিয়াহি, —কি মদ্যপান হোয়ার বিষ্ট, আর
 পক্ক—ভাও সেবিয়াহি। সকলের সঙ্গে মিলে বসে—
 এতদিন চাকলা ধাই। ওহি মাসুমে বসে মাসুমে।

[illegible]

বার মিছিলাম ? তাহা তখন ব্যক্তিগত সাহসের ঠাঁই হইত হোমের ডাক আসিল—তুমি এসিয়া গেলে । আমি হুজি পারিলাম ।

হোমের কণ্ঠ হঠাৎ চিঠি আমি প্রকাশ করি না । চিঠি লিখিবার পাতি নাই । কোনও এমন অশ্রুজিহাই থাকিবে । চাপা নাই । শুধু চিঠি লিখিবার চাও, কিংবা করিবে না । চিঠি লিখিবে সে চিঠি C/৩ পোষ্ট হইবে, তবুই—এই টিকিয়ার পারাইতে পারি । সে চিঠি আনাটবার কথা আমি করিবে । ইতি—

চিঠি পড়িয়া দেখে করিবার সঙ্গে সঙ্গে বুক আমার নিখাসে ভরিয়া গেল । তুমি কি দিয়াছি ? হারি তে, চান তখনো স্বত্বক ভোলে—যে-স্বা তার বুকখানাতে আলোর আলো কবিতা কুলে ? কুল তার গন্ধ তুমি কি বাইবে ? কে-পক্ষে তার বুক করিবার থাকে ?

দেখা হইয়াছিল—শ্রমগারে । দেখা হইয়াছিল বেল-টুপিতে ! মাঝিটেকের ডাক আসে ! ডাকের কথা মনে পড়িল । কিম্ব তার পূর্বে তার সঙ্গে কথা করিতেছিলাম ? কোন নাস্তি ?

মনে পড়িল না ।

আমাকে লইয়া খেলা খেলিতেছে ! কেন এ খেলা ? যে-খেলার অর্থ নাই !

চিঠি না লিখিবার কাকিতে পারিলাম না । লিখিলাম,—

আমার বঁচি পায় করিলেন, তবে কেন এ অপরিচয় ? আপনাকে কত রকমের হুজি আসে ! লিখিবার মনে মনে করিতেছি ।

কেন যে পরিচয় চাই, হুজি না । এই তো চিঠির আরম্ভ পত্রের চলিতে । শুধু মনে কথা কুলাইবার চেষ্টা করি । আমি চাই নাই—যে নাস্তিক ভালবাসিবে—কেনারী আমার ভালবাসিবে !

এ নৃককুরি কোল । হতে হুজি লাজপ পাট, মন তাহাতে আপন আমলে রচনা গেল । একটু বিবর্ত, একবার অপরিচয়ের আল্পন জামিয়া পালে দ্বারের দ্বারাইতে বিন । নবিলে জিহবার পত্রের কি করিয়া পাইবে ? আমার মনে এই যে আত্মলতা—এ আত্মলতার অর্থ আর পূজিতকি না । পূজিতার জন্মের কখনো খিলাবে না ?

চিঠি লিখিবার উত্তরের প্রত্যাপন্য বসিয়া রহিলাম । হুজি, চার দিন, বন দিন কাটিয়া গেল ; একমাস, দু'মাস, এক বৎসর কাটিয়া গেল । জবাব আসিল না ।

মনে মনে অস্বীয়তা । এই অস্বীয় অন্তর আকাশ-তলেই আছে—সে আছে ! আমাকে সে দেখিতেছে—আমাকে সে জানে । আর আমি—

এ অস্বীয়তা হুজি বহিরা কাক করা দ্বার ?

অথচ অকাক লইয়া উভয় বহন করিতে ভয় হয় । সে ভয় করিবে ; বাবা পাইবে । ভুতের মত এ আতঙ্ক দ্বারা মনে ছাইয়া রহিল ।

হুজিলাম আসিলে ; বহুর পাচ-পাচখানা গ্রাম ধলিয়া গিয়াছে । হুজিলাম কটকে, মহানবীর জল কাশিয়া তুমি বহু গ্রাম ভাসাইয়া গিয়াছে । তারপর বেহায়ে—তুমিকেশের প্রলয়-মোলে বেথানে পশ্যনের বিজীকি। অটমাসি হুজি দিয়াছে ।

মহনের তাওব লীলা ! সে নৃপতির অন্তরালে হুজি কোথায় অনুভব হইয়া দ্বার । ভালবাসা, মেহ, মায়া সে নৃপতি শিহরিয়া করিয়া পক্ষে বুকের বাধন কাটিয়া । শুধু মনে হয়, জনতে সব মিথ্যা, মনীতিকার...সত্য শুধু এই কষ্টের নির্ভয় সত্য !

মহাককুরি তাঁহু পড়িয়াছে । আর্ন্ত অলহাব দ্বারা হুজিয়ার হুজি পড়িয়া আছে—রিক্ত সর্গহারা ভুতের মত বেহাওয়া শুধু নড়িয়া বেড়াই—মন নাই, অহুজি নাই—তাদের লইয়া কোন হতে দিন কাটিতেছে । হঠাৎ নিতাই আসিয়া অধর বিল, হুজির তাঁহুতে একবার আসিতে হইবে ।

নিতাই আমার সঙ্গে কাক করে ।

আসিলাম । দেখি, লগায় পড়িয়া আছে এক নাস্তি । মুখে-নাথার বাওঁতে দ্বাৰা । শীর্ণ একখানি হাত বোটা চাবরের আবরণ টেলিয়া তুলিয়া পড়িয়াছে ।

নিতাই করিল—ইনি আপনাকে ডাকছেন ।

কাছে গেলাম ।

কহিলাম—আমায় ডাকছেন ?

চোখ জুটতে বাওঁয়ের বাধন ছিল ।

হোসি কহিলেন—আপনি হুজি বাবু ?

কহিলাম—ইয় ।

তিনি কহিলেন—আমায় আপনি দেখতে চেয়েছিলেন—

পত্রের জেরেছিলেন । তাই ডেকে পাঠিয়েছি ।

বিশ্ব বোধ করিলাম । দেখা ! পরিচয় ! এত বড় পৃথিবী—সে পৃথিবীতে নর-নারীর প্রকাণ্ড ভিড় । এ

বিড়ের মতো শুধু এক জনের দ্বারা পরিচয় চাওয়া কাণ্ড—
গুণ-গুণ... ভক্ত-ভক্তান্তর বহিরা...

টনি—

নারী কহিলেন—আমি। তবু এ ঘোর আঘাত আচ্ছন্ন
রেখেছে চিরদিন। পরিচয় ঘোর উপায় আমার ছিল না।
আমি... আমার মা ছিলেন উদ্বাহ। আমার দিদিমা ছিলেন
উদ্বাহ। আমার সবচেয়ে ভালবাসার বসেছিলেন, এ রোগ
এড়িয়ে থাকে হঠাৎ সত্ত্ব হয়ে না! বিবাহ করিনি।
বাধা বিবাহ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এত বড় বিশিষ্ট
কথা শুনে আর-কাকেও বিপর্যয় করতে পারিনি।
দারিদ্র্যের বশে আমার লঙ্কান কর, ভেবেছিলেন,
আমি কিশোরী—আমি বৃদ্ধা! কিন্তু আমি তা নই।
তোমার সে লঙ্কানের অসীমতা বুঝেছিলাম, আমার তুমি
বা কেবল, বা হেবে হাশমেসেছ—আমার লতা পরিচয়
পেলে তোমার সে বিবাহ ভেবে গিয়ে—এইটুকু বর্ণনা
মন কিভাবে নেবে। তাই পাছে তোমার সে-বিবাহ ভেবে
গত, এইজন্য বেধা দিইনি, বস দিইনি। ভাবনা সেদিন বসন্ত
ভেগেছিল, সেদিন অনেক এসে এলুম ওরন তুমিওকে।
তারা আমার বংশের ইতিহাস জানত। তবু তাদের গুণ
খানেক। তাদের এ গুণের অর্থ ছিল। আমি জানতুম।
আমার বাবার ছিল অগাধ ঈর্ষা—আমি আমি তাঁর একটু
হাত মেয়ে। সেদিন তাদের পানে কিরে তাকাইনি অজ্ঞান,
তুমি। তখনই পাতি দিলেন। বসন্ত এসে গেল—ভাবনা
কুজানিকে ভীষণ করে। নিঃশব্দে অস্বস্তি বোধ করতুম।
পাশে কাকেও পায়ার উপায় নেই—অবশ্য মন তা ভক্ত
চাইল না। পাগল হাওয়ায় মত ঘুমে খেঁড়িয়েছি দিকে দিকে
—গুরুতর উপর মনকে বিতরণতার ভরিয়ে, বিবাহে ভরিয়ে!

তাতপর দারিদ্র্যের নেই পাহাড়। দ্বৈতা বেধে,
বেধা রেখে কর্তব্য বেকত দিয়েছিলেন। দেবতার পূর্ণ পূর্ণ
কেউ দেখি,—তুমি আমার সেবা পড়ছ। ভাল লাগল।
মনে হল, হুনিয়ার বুক থেকে লব মুখে গেছে—ভেগে আছে
তবু এই ছোট পাহাড়! আর সে পাহাড়ের বুক তুমি
আর আমি! কিন্তু আমি কিশোরী নই, বৃদ্ধা নই—
নারীকে পুঙ্খ কে-বেশে, যে-রূপ চায়—আমার সে-বেশ সে-
রূপ অনেকদিন অর্থ থেকে বচে গেছে। তবু মনের

তাকনা খোঁচেনি। তাই বেধা দিতে পারিনি—বেধা দিটনি
—দেহ! তুল করে মীনাথ সঙ্গে তুমি পরিচয় করতে
গিয়েছিলেন, তাও জানি।

সেবা করবার জন্য, আশা করবার জন্য মন অসীম
হ'ত। লোভ প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু অনেক পানিয়েছি
—না! যদি আঘাত বিট ?.....

অনেক কথা। ক'বৎসরে বস কথা বুক সঞ্চিত ছিল,
অপরিস্রা বে-কথার এতটুকু গোপন রাখিলেন না।

নিজে তাঁব পরিচয়ই তার লইল। তিনি কহিলেন—
আমার জন্য আর-সকলক ত্যাগ কর না।

কহিলাম—ত্যাগ করিনি। সকলের কাছ ত্যাগ করা
আছে। আশনার পরিচয়। তিনি করতে, তাঁর সঙ্গে এ
কালের বল করেছি মাত্র।

ওট টোটে বৃত্ত হাসি করণ—সে বেন প্রাক্ষের নিশীথ
মেঘে বিকলার রেখা!

পথা আমিরা দিই। হাতের তাঁব শরীর পাশে বসিয়া
থাকি। মনন ভ্রমট পাখার বাতাস কবি। ঘুম ভাঙিলে
বলেন—ভেগে আছে! অনেক হারি হুয়েছে। বুঝেও পে!
আমি জবাব দিই,—হাতের সেবা বুকের ভেগে বড়।

তিনি বলেন,—এক জনের উপর সারাক্ষণ এমন করে
মনোযোগ রেখা কি ঠিক?

আমি বলি,—অন্ত জনের কাছে লোক আছে।

তিনি বলেন,—না, না। এত পরিচয়ই প্রয়োজন নেই।
তুমি যাও, বুঝেও পে। যদি অহুবে পড়, সেবার কাছে
শক্তি কমবে!

অজ্ঞান বিনতি! অবিজ্ঞার হাতের পাখা বেলিয়া দিই।
উপায় শরীর তলে ঘরে এক প্রান্তে পড়িয়া থাকি।
ভেগে ঘুম আসে না—আদিত চায় না। গাখিা থাকি
বোধ-শরীর-পারিতোষ বাওণ-বাধা শ্বের পানে। বেধা দায়
তবু টোটে ছুটি! সর্বাঙ্গে মাংস!

ক'দিন কাটিয়া গেল। ডাক্তার আসিয়া নিতা দেখেন।
শ্বের শরীর বাওণ খোলা হয়। সে সময় ঘরে আমার
থাকবার উপায় নাই। নিবে আছে। বলিয়া দিচ্ছিলেন,
সে সময় সবে থাকিলে আমি ত্যাগ করিব।

কি পাথর বৃক্ক বহিয়া ঘবেব হাটবে আসিয়া দাঁড়াই।
বৃক্ক একেবারে ব্যাখার টনটন করিতে থাকে।

সেমি ডাক্তার বলিয়া সেলেন,—কাল বাণেশ্বর পুলিশ
দেব। যা সারিগাছে।

বৈকালের দিকে আমার বলিলেন,—একটা কথা আছে।

কহিলাম,—বলুন...

কহিলেন,—কাল থেকে আমারই সঙ্গে দেখা করবে না।

মজুনের মন—সে মনের সঙ্গে কোর সেলেন না। কথা রেখ।

আশার উজ্জ্বলে বৃক্ক পুলিশ উঠিতেছিল। এ-কথার
সে বৃক্ক পাঠালে নানিয়া সেল।

কহিলাম,—ঠাট হইবে।

কহিলেন,—বড় আনন্দ পাই। এত-বড় কাজে নিজেকে
দেখে দিচ্ছ—চিরদিন এমনি মনে-মনে পরিচয় থাকুক!
চোখেব দেখাও অনেক মলা-মালী ফেসে গঠে। কাজ কি এ
পরিচয়কে মর্শন করে!

কোন কথা বলিতে পারিলাম না। অক্ষর বাপে কণ্ঠ
ভরিয়া ছিল।

তিনি কহিলেন,—একদিন আমার কথা বল। আজ
নয়। কাল নয়। অনেক দিন পরে।

সন্ধ্যার দিকে খবর আসিল, মতিহারীর দিকে মহামারী
পেচা বিধাছে। চকন ভ্রাসাতিয়ার মাত্রা গিয়াছে। সেখানে
সৌভাগ্যবিত্ত বিকীর্ণিকা!

গাজেই মতিহারি ছুটিলাম। থাকিতে পারিলাম না।
সন্ধ্যার দিকে ফিরিলাম। কিরিয়া তাঁর ক্যাম্পে চুঁকিয়া
বেধি, তিনি নাই।

কোথার সেলেন?

সন্ধান লটয়া জানিলাম, সন্ধ্যাে বাণেশ্বর পোলা হই,
প্রপূব বেলায় চলিয়া গিয়াছেন—ট্রেণে। কোথায়—কায়াকেও
বলিয়া যান নাই। একথানা চিঠি রাখিয়া গিয়াছেন। খায়ে
যোড়া চিঠি। খায়ে আমার নাম।

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলাম। একটিমাত্র লাইন,
—বরডের জন্ত একশো টাকা রাখিয়া দেলাম।

একখানা একশো টাকার নোট খায়েব মধ্যে ছিল।

এমনি কিরিয়া চলিয়া গেলেন। নাথইহু...?

অভিমানের বাখার বৃক্ক ভরিয়া উঠিল। অনেককে
ডাকিয়া ভিজালা করিলাম—উনি কে?

কেই নাম জানে না। বলিল, রিপিকের কাজে সঙ্গে
সঙ্গে আছেন। একটা গৃহের মধ্য হইতে কাহার সম্পত্তি
উদ্ধার করিতে গিয়া দাটা ছাচ মাখার আদিয়া পড়ে—
তাঁহাতে খুব আঘাত পান। এং ক্যাম্পে আনা হয়...

এই পণ্ডিত!

তাই দেখা! এমনি অপরিস্ফুট অস্তরালেই তুমি থাক!
আমার তুমি দেখ। যে তার বিয়াক, সে তার বহিরাব
গোপাতা আমার কতখানি!

হালের পর মাল কাটিয়া চলিয়াছে। কাজের শিবলে
নিজেকে বাখিয়া বলিয়া আছি।

কায় জন্ত, কিসের জন্ত এমন করিয়া...

সেই ৫টি ট্রেট শুধু চোখের সামনে আসিয়া গঠে।
সে-ট্রেটে হাসির মুঠ বীণ্ডি! আখার-মেখে বিজলীর রেখা!

অবশ্যই ট্রেটে। কাজ করি। কোথায় আমার অলকো
চাহিয়া আছে সে ৫টি চোখ! কোথায়, কে জানে!

অনেকে বলে, পাপল! আবারো মনে হয়, বৃষ্টি তাই!

স্টোটাঙ্গনা

—শ্রী মলিনা দেবী

তত্ত্বজ্ঞেয়বহিঃ পুণ্ডাক্ষু-ব্রহ্মত্বং। ইত্যাদি—বহ্মর্ষেব।

ঐ চৈতন্যে ধাম পূর্ণ দিক

তব্ব জগতঃ।

সেবের সে যে প্রিয়, ওরে

জীবন সমস্তক!

সে পত পত্ন প্রিয় চোখে,

পতি পত্ন পত,

পত পত্ন তব্ব কামে,

বহি পত্ন তত।

পত পত্ন কবীর বেগে

বহি দ্বিজদান,

পত পত্ন পত্নও দেব

বৃষ্টি বজ্রপাত!

कविरत्नञ्जन

—**শ্রীহরেকৃষ্ণ** মুখোপাধ্যায়

স্বাভাবিক বাণিজ্য প্রসিদ্ধি একটা বড় সিনেমা
পুনরো কথা। শ্রীধর দত্ত শতাব্দীর রচিত শ্রীধর "কাহ-
কল্লী" নামে পুঁজি বিখ্যাত। পঞ্চমতী বৈদ্যিক উপাখ্যানাধা
প্রতিষ্ঠার নাম কে-না জানেন? তাইনি কেন জানি না,
বাণালীকে প্রান্তের পেশ-শিক্ষা লাভের বা পেশ-পলীকা দেওয়া
কর মিথিলার হাটের হাট। বাণালী মিথিলার
হাট, বেশ শিক্ত হাট হাট এবং লেখান হাট বোপা-
সদান লটাই কিহিত। কিহ মনে যেন কেমন একটা
অন্তর্গত, একটা অস্তিত্ব! তাইবা যেক বিশেষ হে, বিজ্ঞা-
কিহ বিশেষ হাটে তিকা করিগা শিক্ষা হে।

ਜਾਏ (ਯੋਗ) ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ।

প্রীতম চৈব পতাকো ; মিথিলায় বিভাগতির তখন খুব
নাহ। এক পণ্ডিত, তার কবি,—মিথিলায় রাজার সভা-
কবি। তার প্রতি পদাবলীর খ্যাতি মিথিলায় ছোট বড়
নরনারী সকলেরই মূখে। বিভাগতির গানের ক্ষমতা: প্রেত
একটা 'চরণ' বা জানা খুবই ক্ষমতা কথা। এই বাতাস
বাগানী ভাষারের গবেষণাশিল্প, বিভাগতির পদ প্রাধিকারকে
নু্য করিল। টোলের ছাত্র, ক্ষুদ্র কাব্য-নাটকের রচনা
রসিক ছাত্র—নৈরাধিক হইলে কি হয়! কতকটা বেপাচারে,
হৃদয়ের খাতিরে, কতকটা সভ্যতার নৌকায় সাহসী কবি
বিভাগতির পদ মুদ্রা কথিতে রাখা হইল। বেপে বধন
কিঙ্গিল, ভাষাশাস্ত্রের সঙ্গে বিভাগতির প্রেত সম্ভা পদও লইয়া
দাঙ্গিল। এমনই করিয়াই বিভাগতির পদ বাগানায় প্রচায়ে
হস্তপাত হয়।

বাহালী ভাষা বিদ্যালয় বাইত, বিদ্যালয় কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব, স্বত্বত: তার শ্রেষ্ঠত্বের সাধারণ বাহালীর মনে নিশ্চয়ই ছিল। অকথ্যর লোকালে এমন রাজধান্য তো ছিল না যে, শিকা তুলারূপ হইলেও বিদ্যা খুরিমা না আনিবে তোমার বিবেক স্বত্ববে না, তোমার চাকরো মিসিবে না। তথানি তাহার স্বত্বর বিস্তারি হইয়া উঠিল। সেদিনও বাহালী গভাবিন ছিল, কিন্তু বোধ হয় এমন করিয়া

আনন্দকে বিকটিতা দেয় নাই। তাই জাতির ধর্মানাধার
এক নবিত্ত স্বাধীন যুগের নথি। লোকের ও সাংসার হইয়া
উঠিল। ইনিই শ্রমোৎসব যাত্রার লক্ষ্যভেদ। মিথিলার
পতিভেদ হইবার নিকট হইতে সমস্ত পুঁজি-পাতি কান্ডিয়া
লুণ্ঠাভিগেন। তাই ইনি সমস্ত শ্রাম-পাতি কর্তব্য করিয়া
কৃতিত্ব তুলোটে মিথিলা লইয়া বাঙ্গালার ফিরিয়াছিলেন।
ইংরাজ বন্দুকের ছাত্র কাণা শিবোদয়ী যুগের বিদ্যায় পঞ্চম
মিলকে হারাইয়া বিরাট্রাণে বাঙ্গালীর প্রাণক প্রতীতি
করিয়া আসেন। সেই দিন হইতে বাকলোর ছাত্র আর
মিথিলার ছাত্র নাই। নব-শ্রম বাঙ্গালী-মিত্রের সূত্র।

বাঙ্গালী ছাত্রের নিষিদ্ধার বাণী স্বরূপে, নৃতন পদের
আবহাবীণ হুগোপ আর রচিত না। কিন্তু পরে
আনিয়াছিল, তাহাতেই বিজ্ঞপতি বাঙ্গালীর জঘন্য স্বার্থ
লাভ করিলেন। বাঙ্গালীর বিজ্ঞানোন্মাদ, বাঙ্গালী
সাংস্কৃতিক—তত্ত্বাবধানের সঙ্গে বিজ্ঞপতির পদের
মাধ্যম পাঁছিয়া
পলাই গেলেন।

প্রীতির মোড়ন পড়াবীতে বাসালার একটা দুগ্ধাক্ত—
 বাসালার একটা কণাক্তর পলি। রসুনকনের স্বতি, কবুদারের
 ক্রাধ, আগমদ্বাধীনের তহ এবং সর্বোপরি মহাপ্রভুর প্রেম
 কিছু কম-বেশী অগ্র-পড়াং বাসালার পুথানো ক্রমের উপর
 একটা নতুন গড়ন দিল। সবলের অদিক দৃষ্টি আকর্ষণ
 করিলেন,—সবলের আগামোড়া নাড়া দিলেন, বাসুরের
 পরিবর্তন ঘটাইলেন—মহাপ্রভু খ্রীষ্টেতত্ত্ববেব। বিভ্রান্তি ও
 চৌকালের পর গুণার সাধনের অর হইল, গুণার আত্মাধন-
 সৌধবে এই কবিদের পরের আর একটা দিক বুলিঙ্গা গেল।
 লোকে সবিস্ময়ে চাহিয়া বেছিল তাহাধের গলার বালা—
 চৌকাল ও বিভ্রান্তির পরে পাখা বালা স্বরূপে কণাক্তরিত
 হইয়াছে। রনে-ভাবে, রূপে, রঙে, গন্ধে-মগ্নেত জমাই বাসিয়া
 অশতপ পোতাধে দৃষ্টি ধরিয়াছে—কাকনে নীধে মন্থিত
 কণ! বিভ্রান্তির পর বাসালার হাতে ঘাটে ঘাটে মাঠে মাঠে
 ছড়াইয়া পড়িল, সে সব বাসালার নিম্ন হইয়া গেল।

বলত বন্দন আছে, একটা অগোচর হঠাৎ বনস্পতি
মাথার ওপর হঠাৎ আসন্নবীর বদ বগাবড়া । নৃতন
পাতাল, নৃতন কুলে একমাত্র মোহায়ে বেন কাটিয়া পড়ে ।
কত বেশ হঠাৎ কত অজানা পানী আসে, পরিচিত অপরিস্রুত
কত বকরের গ্রহে কত মধুর গান গাথ । উৎসবের
সে কি সংযোগ ! বাকালী একদিন এই উৎসবে মাতিয়াছিল,
বাকালীর বলত আদিয়াছিল । হঠাৎ প্রভু আদিলেন :—বেন-
ফৌর তব্ব বুদ্ধিমত্তি, নগর কলকার থায়া, অনুভব-কর্তে
উক্ত হস্তিকর্ষন ! বাকালী সে ভগ্ন দেখিল, দেখিয়া ধস্ত
হইল । চিত্র-অনুচিত কলকার বস্ত্রের দ্বারা কতিয়া ছুড়াইল ।
কর্তে কর্তে মিলাইয়া গগনে পবনে ধ্বনি কুলিল—“কি কবর রে
সখি আমর ওর, চিত্রদিনে মাথব বন্ধিরে ঘোর !” কবিরজন,
স্বপ্নেশ্বর, বাহু ঘোষ, বংশস্বাক খান, মাথবাচিয়া, মাথব ঘোষ,
নগরসি সঙ্গকাত গল্পতি মহাপ্রভুর সমদামরিক কবি । এত
সমস্ত পুণ্যবর্তি ভগবৎপ্রেমিক পিক-পাণিয়ার নহুর কর্তে
আজিও বাকালীর প্রতিধ্বনি ভাগায় । আমরা কবিরজনের
কথা বলিব ।

গৌন্দলীয়া এবং রাধাকমলীয়ার পদ গিথিয়া কবিরজন
পদ নাম করিয়াছিলেন । এক সময় এমন হইল—প্রাচীন
পদ বাকালীর মুখে মুখে গ্রাম হঠাৎ গ্রামান্তরে ছড়াইয়া
পড়িল, লোকে তাঁহার গান শুনিয়া মুগ্ধ হইল, মজিল—তাঁহার
নাম দিল “ছোট বিজ্ঞাপতি” । বিজ্ঞাপতির পরিচয় তখন
লোকে তুলিয়া গিয়াছে । তুলিয়া গিয়াছে বিজ্ঞাপতি কোন্
দেশের লোক, কোথায় তাঁহার বহবাড়া । অননি পদ
তৈয়ারী হইয়া গেল—“বিজ্ঞাপতির বাড়ী ছিল ধলোয়ে, তিনি
ছিলেন ঘোড়ার রাজার সভাকবি, রাজার রাণী লছিমার সঙ্গে
তাঁর প্রণয় ছিল । লছিমাকে না দেখিলে তিনি কবিতা
লিখিতে পারিতেন না । একদিন রাজার সন্বেহ হয়,—রাজ-
বাড়ীতে চোর আসে, তিনি পাথরার বহোবস্ত্র না করিয়া
বিজ্ঞাপতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন । বিজ্ঞাপতি পাটালের
পাশে মূল পুঁথিয়া রাখিতে পরামর্শ দেন ; এবং বিতে ভানিয়া-
তুলিয়া রাজিকালে পাটাল টপকাইতে গিয়া সেই মূল পুঁথিয়া
প্রাণ হারান” । আমার মুখের কথা নহ, এ গল্পের মন্ত মন্ত
কংকটী কবিতা আছে, এবং সে কবিতা অস্তরঃ হ্রোৎ বহরের
পূর্বানো পুঁথির নথো পাওয়া গিয়াছে ।

কালে লোকে তুলিয়া গেল, কোন্ পদ তার দেখা । “ছোট
বিজ্ঞাপতি” ও “বড় বিজ্ঞাপতি”-ব পদের খোলসোথ বটিয়া
গেল । সাধারণে মনে করিল, কবিরজন বিজ্ঞাপতিরই একটা
উপাধি । পরে যখন বাহালাব পদাবলী-সাহিত্য আলোচনার
চেউ টেলি, বাহালাব সভার নাম কিনিতে চাহিলেন, তাঁহার
অত পত পৌত করিলেন না, বিজ্ঞাপতি ও কবিরজন ভালগোল
পাকাইয়া একটা নৃতন-কিন্তু-কথার সাধ মিটাইলেন । এই
অপকল্পের প্রধান ভাণী হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ নগেন্দ্রনাথ শুভ
বহাণয় ।

প্রায় বহু বিনেত্র আগে বকী-সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত
“বিজ্ঞাপতি”-সম্পাদনের তার লইয়া তিনিই ছাপার অক্ষরে
বিজ্ঞাপতি ও কবিরজনকে ভেড়ি বাঁধিয়া দেন । তাহার পর
হইতেই আমরাও, বাহালা ছাপার অক্ষরকে অশ্রু-কন বসি,
সকলেই বলিলাম, “আমের !” কিন্তু পূর্বেরকার সংগ্রহে কোণাও
একপ নাই । সাধারণে যাই মনে করুক, পণ্ডিত বাহালা,
পদের সংগ্রাহক বাহালা—তাঁহার পরিচয় জানুন আর নাই
জানুন, পদের পোশমাল কখনই করেন নাই । বিজ্ঞাপতির
পদ বিজ্ঞাপতির ভণিতাব এবং কবিরজনের পদ কবিরজনের
ভণিতাব সংগ্রহ করিয়াছেন । অস্তরঃ হ্রোৎ একটা পদের উদ্ভা-
পাতী বক্তব্যের মধ্যেই নহে । দূর্বোক্তবস্ত্র একটা ছাপা বইয়ের
উল্লেখ করিতে পারি । বইখানির নাম প দ ব ক ল তি ক ।
ছোট বই, কিন্তু অনেক উৎকৃষ্ট পদ সংগ্রাহকের রসজ্ঞতার
পরিচয় দেয় । এই বইএ কবিরজন-ভণিতাব পদ পাওয়া
যায় । বইখানার মূল্যপাত এইরূপ—

“পদকল্পলিতিকা । কণ্ঠ্যঃ প্রাচীন পদকর্তা মহাপ্রবণ
রচিত শ্রীগৌরচন্দ্র প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিবরক পদ
সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ পৌরসোহন দাদ বায়া সংগৃহীত হইয়া কলি-
কাতার রাক্ষসে বস্ত্র বস্ত্রিত হইল । মূল্য ১৭১০” ।

এই সংকলন কিছু কম শতাব্দেকের বংশের পূর্বের কথা ।
প দ ব ক ল তি ক প্রকৃতি প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থও কবিরজনের
পদ কবিরজনের ভণিতাতেই সংগৃহীত হইয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণ
নগেন্দ্রনাথ শুভ বহাণয় কি “চন্দ্রাভি” ইত্যাদি কেবল
পরের উপাধি কাড়িয়াই দ্বার হইয়াছেন, কুপতি সিংহ
প্রকৃতি নামগুলিও তিনি বিজ্ঞাপতির গল্পবৃত্তপ জড়িয়া
দিয়াছেন ।

রায়গোপাল দাস—সংক্ষেপে গোপাল দাস নামে প্রথমে
এক কবি ছিলেন। প্রথম বর্দ্ধমান জেলার একটা সমুদ্র পাতি,
শ্রীল নরহরি সরকার তাঁর মহাপুত্রের পাট। গোপালদাসের
র স ক র ব দ্বী নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই
গ্রন্থের চরিত্রানা প্রতিপাদি আমি সংগ্রহ করিয়াছি। এই
গ্রন্থ দ্রুত রচিতা লিখাছেন—

ବାମ ପୃଷ୍ଠ ୩। ଛାନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବୀ ।

कायदे हीच आ प्रत्यक्ष देखावा ।

প্রথমানি এই শাক্তের ঐতিহাসিক নামে সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর বেংগের ছবি, আচর্য্যেদের আদি ও ভক্তির নবায় তিনটাই গণ্য হইল। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ অর্থে ছবি বহিরা ১৮৩৭ বঙ্গাব্দ, ঐতিহ্য ১৮৩৩ পাণ্ডা বর্ষ। সুতরাং বলিতে হইত, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে রচিত, এই জাতি-রচনাকাল পুঁথিখানির মধ্যে ঐতিহাসিক মূল্য আছে, এবং এই পুঁথির সাহায্যে পদাবলী সাহিত্যের গহনে কিঞ্চিৎ আলোক-সম্পাত হইতে পারে। আমি উক্তপুঁথি পরিব্রজ-পত্রিকায় এই পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। নাটিকা-ভেষে পুঁথি, আদি-রসের অংকাজেই নাটিকার ছবি ছুটাইতে গিয়া গোপালদাস মহাকবির পথ তুলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। আসে পদকর্তার নাম তুলিয়া পরে সম্পূর্ণ পদ বা পদ্যাদি তুলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও অনেক পদের রচয়িতার বোঝ পান নাট, ভণ্ডা ঠাহর করিতে পারেন নাট। সেই সব পদের পূর্বে “সহাকবর”, “কচিৎ” এইরূপ লেখা আছে। ইনি ঐক্যের নিজ সর্বপুরুষের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

वैदिकविद्वान्, महाभारत प्रवक्तृ ।

कृपा।।कृपान् कृपि कृप कृपार्थः ।

কবি হামোথের হুগ্রাণ্ড গোবিন্দ কবিরাজের হাতামহ।
 কশোরাঙ্কনান অল্পতম পথকর্তা, টগোর একটা পথে "শ্রুত
 হসন কলতকুল সেহ এহ বনভান। পক্ষগোড়ের কোগ-
 পুংম্বর অশে কশোরাঙ্কনান" — তবিতাংপে এইরূপ উল্লেখ
 আছে। এই হসন নাহ ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়গিরিসনে
 আরাধন করেন। এই ব্রহ্মন কবি এবং কবিরজন ইহার
 ব্রাহ্মসেবা অর্থাৎ গৌড়েশ্বরের অমুগ্র-পাত্র ছিলেন।

মোংলাবাসের লিখিত পাখা-নির্ঘণ্ট নামে আর এক-
খানি কুস্ত পুঁপি পাওয়া গিয়াছে। পুঁপিখানি প্রথম হইতে

ছাপানো হইয়াছিল, এখন আর পাওয়া যায় না। এই
 পুথিতে এমন অনেক কথা আছে, যোগের অংশস্থান ও
 অঙ্গোপাঙ্গনা হইলে শব্দবলী সাধিতাব অনেক নূতন খবর,
 অতীত খবর পাওয়া গাটতে পারে। যা যা-নি যিবে নবরহি
 পরকায় ও তাঁহার ক্রান্তশূর ঐতিহ্যরূপপাঠ বন্ধনকেন
 শব্দর কথা আছে, বন্ধনকেন শব্দর সাংগোপাল
 লিখিতছেন—

कविग्रन्थान् टेबल वाङ्मय ५७-५८।

ਵਾਸਤਵ ਕਵਿਤਾ ਜੋੜ ਫਿਰਕਾਵਾਂ ਭਰਦੀ ।

३।१. ५५ विद्यमानान् सर्वान् यत् ।

आहुतः सर्वज्ञः भव कश्चिन्नम १५ ।

॥ ॥

* 'ଆମ ଗୌରବ ଏବଂ ଡର' ଟାଇଟଲ

१५३३ विद्यापीठस्य विभागः ।

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ମାତ୍ରାଃ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାଃ ।

କଳେଷା ବିର୍ତ୍ତମିତ୍ର ପଦ୍ୟାଂଶ:

विष्णुः सत्यं वदति ॥

ফোটো বিজ্ঞান প্রতি বর্ষে আড়াই ঘণ্টা চলে।

ଆହାରି କବିତା ପାଲେ ବାହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିତ ।

এ গ্রন্থসো কতিপয়োকি দলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।
কিরিজন সেকালের একজন পুং বড় কবি না হইলো গোশাল
হাল কখনই মুক্তকণ্ঠে এমন উচ্চ প্রশংসা করিতেন না। উদ্ধৃত
কথিতা হইতে মনে হয়, কবির নাম ছিল রজন। তিনি কবি-
রজন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন, তাই স্মৃতিত পথেও
কবিরজন তপিত্রাতি বিভেদ। ইনি থাকলোব কিছু কথিতা ও
পথ রচনা করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত সৌক বা কোন
কাব্য-নাটকাদিও রচনা করিয়া থাকিবেন। হয়তো ইনি
দোকের মনরকার কত কিবা গুণবুড় (একালের ঘড়
সেকালোও ছিলেন বৈ কি) বসুধপের অহুয়োবে স্মৃতিত
পথে বিভ্রান্তি কথিতাও ব্যবহার করিতেন। ইহার অধিক
কবির দৃষ্টে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

সোপানমাল "ভ্রামগৌরবরণ" যে পদ্যপটী তুলিয়াছেন,
আমরা সেই পদ্যটী পদ্য তুলিয়া দিলাম।

କାହିଁ ଯୋଗଦେଲେ ଶୁଣି ଯାଏ ।

ମାସକ ୨୫ ଟିଏ କଂପେଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ।

যত্ন হাজরা ও শিখিধ্বজ

—শ্রীবিহুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনারা একালে যত্ন হাজরার নাম যোগ্য হয় অনেকই শোনেন নি।

আমাদের বাস্যকালে কিছু বড় হাজরাকে কে না জানিত? চক্ৰিশ-পরগণা থেকে সুরশিলাবাড় এবং গম্বিকে বহুমান থেকে খুলনার মধ্যে যেখানেই বাজারে বা পথে বড় বায়োহারীর আদরে বাজা হ'ত, সে সব স্থানে সপ বার কোশ পর্যন্ত যত্ন হাজরার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়াত। কার্ত্তির পুতুল জোখ বেলে চাইত যত্ন হাজরার নাম তখন। আপনারা কেউ যত্ন হাজরাকে 'নল-বমহরী'-পালাতে 'নলে'-র পাট করতে দেখেন নি? তা হলে ভীষনের ভাল ভিনিসের মধ্যে একটা সেরা ভাল ভিনিস হারিয়েছেন।

আমি দেখেছি।

সে একটা অদ্ভুত দিন আমার বাসালীখনে। তখন আমার বয়স হবে বার কি তের। আমাদের গ্রামের একটা নববিবাহিতা বয়স বাণের বাড়ীতে কি একটা কাজ উপলক্ষে, নববদীকে নৌকা করে তাঁর বাড়ীতে আনাকেই রেখে আসতে হ'বে ঠিক হ'ল।

শৌখ মা। বৃষ্টি পড়ছে। বয়সী গ্রামসম্পর্কে আমার গুরুজন, আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ও বড়। তখন গরুগজবে লাগাপথ কাটাঙ্গ। তাঁর বাণের বাড়ী, গৌছে আমি কিছু পড়লুম একটু মুক্তি। যত্ন বড় বাড়ী; উৎসব উপলক্ষে অনেক জায়া থেকে আত্মীয়-সুইয়ের বল এসেছে। তাঁর মধ্যে চুঁচী নর অকলের ঢালক চতুর জ্যাঠা ছেলে আমার বড় অম্বতির কারণ হয়ে উঠল। আরও এত ছেলে থাকতে তারা আমাকেই অপ্রতিভ করে কেন যে এত আনন্দ পেতে লাগল, তা আমি আজও ঠিক বুঝতে পারি না।

একটা ছেলের বয়স বছর পনের হবে। রং কলা, ছিপছিপ, শিখের রাঙা পাঞ্জাবী গায়ে—নাম ছিল বতীন, নামটা এখনও মনে আছে। সে আমাকে বললে—কি পড়? আমি বললাম—হাইনর সেকেন ক্লাসে পড়ি।

সে বললে—বল ত হাইট মাইনাম কালি কত?

গ্রর শুনে আমি অবাক।

বাসালা ফুলে পড়ি, 'মাইনাম' কথার মানে তখন জানিনে—তা ছাড়া এ কি অদ্ভুত গ্রর? আমার চুপ করে থাকতে দেখে সে অবনি আবার জিজ্ঞাসা করলে—'হবগবলি' মানে কি?

আমি ইংরাজী পড়ি বটে, কিন্তু সে হুশীল ও হুযোগ আবহুলের গর, দারোয়ান ও জেলের গর, বড় ছোর 'ভট্ট-শোকা' ও রেশমের কথা। সে লবের মধ্যে ঐ অদ্ভুত কথাটা নেই। লজ্জার লাল হয়ে বললুম—পারব না।

কিন্তু তাতেও আমার রেহাই নেই। জগদান সেদিন লোকসমাজে আমাকে নিতান্ত হেয় প্রমাণিত করতেই যোগ্য হয় বতীনকে গ্রের বাড়ীতে হাজির করেছিলেন। সে ছহাতের আঁকুলগুলো প্রসারিত করে আমার সামনে বেধিয়ে বললে—এতগুলো কলা যদি এক পরলা হয়, তবে পাঁচটা কলার দাম কত?

আমি বিম্বমুখে ভাবছি, ওর ছহাতের মধ্যে কতগুলো কলা পরতে পারে—সে খিল খিল করে হেসে উঠে বিভের ভদ্রীতে বাড় বেড়ে আমার হাইনর ফুলের গেকেও ক্লাসে অর্জিত বিজ্ঞার অকিঞ্চিৎকর প্রতাপ করলে।

তাঁরপর থেকে আমি তাকে ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। বয়স তার আমার চেয়ে বেশীও বটে, লহর অকলে ইংরাজী ফুলে পড়ে বটে—পরকার কি ওর সঙ্গে মিলে! তাছাড়া চৌমাখার মোড়ে গাড়িয়ে আমি আর কত অপমানই বা সহ করি!

কিন্তু সে বতই আমার আলাতন করুক, ভাবলে সে আমার একটা বড় উপকার করেছিল—সেজন্তে আমি তাঁর কাছে চিরকাল রক্তজ। সে যত্ন হাজরার অভিনব আমাকে দেখিয়েছিল।

লজ্জার কিছু আগে সে আমার বললে—এই, কি তোমার নাম, রাজকোষের বাজারে বায়োহারী হবে, শুনেও যাবে?

রাজপুত্র ওখান থেকে গ্রাম আড়াই ক্রোশ পথ। হেঁটেই যেতে হবে, কিন্তু দাস্তা শুনার নামে আমি এত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম যে, এই দীর্ঘ পথ এর সাহচর্যে অতিক্রম করার বস্তার দিকটা একবারে মনেই পড়ল না।

তখানি সাধারণ বটীন ও তার বনের তারই বদলী ভন-করক ছোকরা অসীল কথাবার্তা ও গানে আমাকে বিভ্রান্ত উতাক্ত করে তুললে। আমি যে বাড়ীর আধাওয়ার বাহুব, সে বাড়ীর সবাই ধর্মাতীক বৈষ্ণব-প্রকৃতির মানুষ—আমার বাবা, মা, ভাগ্নিমশাই সকলেই। গ্রাম আবারই বদলী ছেলের মূখ ও বুকম টরা ও খেউড় শুনে আমার অন্তিম হাসক-মনের নীতিবোধ ক্রমাগত বাধা পেতে লাগল।

গ্রামা কিছু আমার রাজপুত্রের বাজারে পৌছে একবারে রেহাই দিলে। সেই অপরিচিত জনগন্থুয়ে আমার একা কেনে ওরা যে কোণায় অসুস্থ হয়ে গেল—আমি কোন সন্ধানই করতে পারলুম না।

গ্রামা বোধ হয় রাতে, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, বাজার-হারীর পূব আশ্রয়, অনেক কাড়-লঠন টাকিয়েছে—বাসের জাকজার গায়ে লাগ-দীল কাপকের মালা ও ফুল, আসরের চারিধারে রেগিল দিয়ে ঘেরা, রেগিল-এর মধ্যে বোধ হয় ভ্রমশোকের বদলার ভাবনা—বাইরে বাজে লোকদের।

রাজপুত্রের বাজারে আমি জীবনে আরও ছ একবার বাবার সঙ্গে এর আগে না যে এগেছি এমন নয়, কিন্তু এখানে না আমি কাজিক তিনি, না আমাকে কেউ চেনে। রেগিল-এর ভিতরে জাপগা আমার মত ছোট ছেলেকে কেউই দিলে না—আমিও সাহস করে তার মধ্যে ঢুকতে পারলুম না—বাইরে বাজে লোকদের ভিড়ের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে ইট পেতে বসতে গেলুম—তাত্তেও নিজার নেই—বাতোহাড়ীর মুক্খি-পক্ষের লোকেরা এসে আমাদের এক জামগা থেকে উঠিয়ে দিলে দেখানো বিশিষ্ট লোকদের ভক্ত বৈকি আমিহে পাতিরে বের ;—আবার বেখেনে দিয়ে বগি, দেখানোও কিছুকল পরে সেই অবস্থা। অতি কষ্টে আগরের কোণের দিকে দাঁড়াবার জামগা কোনমতে খুঁজে নিলুম। অন্ত্যস্ত বাজে লোকদের কি কষ্ট! তারা প্রায়ই চাখাচুখো লোক, পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর থেকে পথান্ত অনেক বহা আগ্রহে গ্রামা শুনতে এগেছে—এই ক্ষেত্রে তারা কোথাও বদলার জামগা পায় না, কেউ তাদের

বদলার বকোবস্ত করে না—সেখন-বাটার বাণ, মাল বাহু, কোণিবাহু ও গোঠিবাটার বাহুনেস বচ করে বসাতে সবাই মহা বাস্ত।

গ্রামা আরক্ত হ'ল। 'নন্দ-নন্দরতীর'-র পালা। একটু পরেই বহু হাজরা 'নন্দ' সঙ্গে আসরে ঢুকতেই—তখন হাত-তালির রেওয়াজ ছিল না—চারিদিকে হরিধ্বনি উঠল। অত বড় আসর বহুদূরবৎ দূর ও দীর্ঘ হয়ে গেল।

আমি বহু হাজরার নাম কখনো এর আগে শুনিনি, এই প্রথম শুনলুম। বৃথ হয়ে চেয়ে রইলুম—দীর্ঘাকার, জাদবর্ক, হুপুসন—বল তখন বস্তার ক্ষমতা হয় নি, মিলও হতে পারে, পকাশও হতে পারে। কিন্তু কি কথা বদলার তর্জি, কি চোখমুখের ভাব, কি হাত পা বাড়ার ঢাল! আমার এগারো বৎসরের জীবনে আর কখনো অমনটী দেখিনি। তীক্ষ্ণের কষ্ট তুলে গেলুম, কিন্তু খেয়ে বেকই নি, খিলেতে পেটের মধ্যে বেন বোলতার হল ফোটাচ্ছে—সে কথা তুললুম—গ্রামা খেসে গেলেন তত রাতে একা অজানা স্থানে এই ক্ষেত্রে কোণায় ধাব—সে সব কথাও তুলে গেলুম—পক্ষেবস্ত। পক্ষনলগুণে নন্দরতীর বহুবদ-সভার এসে বসেছেন, আসল 'নন্দ'-রত্নী বহু হাজরা বিশ্ববিজ্ঞান দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে বসেছেন—

এ কি রে! জৌলিক আমার—

মন সব কল কল চুইলুম—

মন সব লগে লগি ধলিলে

সহস্রায়ে।

বুজতে না পারি কিরা বসোজাল—

ঈদ্রব,

পুরাও লাক্সা সোর, বালজাল কেন দ্বিঃ করি।

এমন সবরে বসবাপাহতে নন্দরত্নী সভার গবেশ করিতেই নন্দ বলে উঠলেন—

বদলতী, বদলতী, মনে পড়ে হারীকুম

আলম-বাহরা? এই আমি নন্দ-সার

কনি ওতপালে :

অপর চারজন নন্দও সঙ্গে সবদ্বারে বলে উঠল—

বদলতী, বদলতী, মনে পড়ে হারীকুম

আলম-বাহরা? এই আমি নন্দ-সার

কনি ওতপালে :

ঐকান্ত নন্দর তখন কি নিম্ভ দৃষ্টি!

তারপরে বনে বনে সামান্য সামান্য লগুন-লগুনভরী
উদ্ভিদ মনের সে কি কখনও মনোপলী চিত্র! কতকাল তো
হয়ে গেল, বহু হাজার সে অশ্লীল অভিনয় আরও ভূমি।
যেখের চল কতবার গোপনে দুহুদ্য লগুন সন্নিহিত হয়ে,
পাছে আশপাশের লোক কাটা বেগতে পারি বলে কতবার
হাঁচি আনবার ভিত্তিতে কান্ড দিই মূখ্যে লগুন!
বাহ্য শেখারো তখন। আমি সে রাত্রে আলয়েই একটা
বেজিতে তবু কাজিই সন্ধ্যা একা নিজেই প্রাণে ফিরে
গেলুম।

তারপর যখনই-আকাশের আরম্ভ হ'ল। তখন আমি
আরও একটু বড় হয়েছি—কলে ভর্তি হয়েছি। বহু হাজার
কথা প্রায় এই গুর মুখে শুনি। যেখানেই বাতাসের কথা
ওঠে, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে, বাতাসের মধ্যে
অগ্রিমধনী অভিনেতা বহু হাজার।

আমি কিন্তু বহুদিন বহু বিষয়কে আর দেখেন না।

এর অনেক কারণ ছিল।

আমি দুই বছরের কুল-বোডিং-এ গেলুম। বন গেল
সেখানকার দিকে, ধরাবাধা কটনের মধ্যে জীবনের মুক্ত পতি
বহু হয়ে পড়ল। এলোমেলার আঁক, আমিত্তির একটুটা,
ইংলিশ ভাষার বেশা, কুটন, ডিবেটিং-ক্রাফ, খবরের কাগজ
—জীবনের মধ্যে নানা পরিবর্তন এসে গিলে। ছেলেরা
বহু বে, যেখানে বাতাসের নাম শুনি—সেখানেই সোড়ে ঘাব
—তাকে ভানে চার জোশ, কে জানে ছ'জোশ—এ মন
ক্রমে ধীরে ধীরে বসলে বেতে লাগল। তাছাড়া ইচ্ছে হলেও
চমকো কলে ছুটী থাকে না, কলে ছুটী থাকলেও বোডিং-এর
সুপারভাইজেন্ট ছাড়তে চান না—নানা উপায়ে।

পাঠ্যপুস্তকের ছেলে ছিলুম, খিচোরী কয়েক খেলে আনন্দ
না। যে বছরে পড়তুম, সেখানে উকীল-মোক্তারদের একটা
খিচোরী-ক্রাফ ছিল, তাঁরা একবার খিচোরী করলেন, পালাটা
টিক মনে নেই—বোধ হয় 'প্রতাপাদিত্য'। তাহা ও
খটনার বিভাগে খিচোরীর পালা আমাকে হুঁ কখন—
ভালুম, বাতাস এর চেয়ে ডের খাওয়া মিলি। প্রুটের এখন
চমকোর বাঁদুই তো বাতাসের পালাতে নেই? তারপর
অনেকবার উকীলের ক্রাফে খিচোরী সেপলুম—ডেবেলার
মন ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে; বাতাসে বাতাস চ'ল

বারোবারী বহু, ক'লকাতার ভাল মন, কিন্তু তাতে
আগেকার মত আনন্দ দেখেন না।

তারপর ক'লকাতায় এলুম। তখন নতুন মতের অভিনয়
সবে ক'লকাতায় শুরু হয়েছে। বহু বহু বহু-বিখ্যাত মতের
অভিনয় সেখানকার লগুন জীবনে এই প্রথম ঘটল, তাঁদের
নানা পালাতে নানা অভিনয় দেখলুম—বিসিতি কিস্তি
বিখ-বিখ্যাত মতের অভিনয় অনেক দিন ধরে দেখলুম—
মতের ক্রমে ক্রমে বিজয় হয়, উকীল-মোক্তারদের ক্রাফের প্রধান
অভিনেতা শুকলাপ ঘোষ—থেকে এতকাল বনে মনে কত বহু
বলে ভেবে এসেছি—এখন তাঁর কথা ভালবে আবার হাসি
পায়।

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। কলে থেকে বেরিয়ে
চাফুরী করি। ক'লকাতার খিচোরীর অভিনেতারও তখন
আবার কাছে পুঠানো ও একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে—খিচোরী
সেখাট বিয়েছি ছেড়ে। কিন্তু সন্ধ্যাও জাই। খুব নামদার
অভিনেতা না থাকলে সে ছবি বেগতে ঘাই নে—থাকলে
অভিনয় বেগে হুঁ হয়েছি একদিন—এখন তাঁদের অনেকের
সন্ধ্যাও মত বসেছি।

এই বহু বছর, তখন কি একটা ছুটিতে বাতাসি গিয়ে
শুনি সেখানে বারোবার। শুনলুম, ক'লকাতা থেকে বহু বাতাস
বল আসছে—সেখান টাকা একরাতির জন্ত নিয়েছে, এখন
বল নাকি এসেছে আর কখনও আসে নি। ভাল বিসিতি
কিন্তুট বেগিলে, খিচোরী সেখাট ছেড়ে বিয়েছি ভাল
লাগে না বলে—এ অবস্থার সাত জেগে বাতাস বেগবার যে কিছু
বাতাস ইচ্ছাও বনে আগের না—এ কথা লগাই বাহুল্য। বাতাস
আবার কি বেগে? নিতান্ত বাতাস মিলি—কে কত করে
এই সবের মধ্যে লোকের হিড়ে বসে বাতাস সেপতে
যাবে?

কিন্তু বহু-বাহুল্যের ছাড়লেন না। বারোবারী
কর্জুকেরা কিনে অল্পোখ করে গেলেন—আবার বাতাস
চাই-ই। কি করি, তবুতা বলেও তো একটা বাতাস
আছে। বাতাসটা বেগে না হয় উঠে এসেই হবে। নিতান্ত
না বাতাসটা ভাল দেখানো না হয় তো—বিশেষ, বেগে বহু
ভত বহু বাতাস নেই।

লক্ষ্যের দ্বারা বাতাস বদল। বাতাস ভিন্নতা দেখি
অনেককাল—কেনে বুঝব দোকানের বাতাস আর নেই। ভড়প
গান, মেডেলখাওয়া মেয়েলিগানের দাঁত কলহ—এমন অস্বাভাবিক
ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। লক্ষ্য-চুম্বকীয় কাল কাল সাক-
শ্যে থাকে ও আর নেই—ক'লকাতার খিটখিটের হৃদয় অস্বাভাবিক
যেমন সাক-শ্যে থাকে, তেমনি তরল অধিনেতায়েন অধিনেতায়েন
করে। এখন কি কয়েকজন অধিনেতার ব'লগার দল, বৃন্দ
ভবি ও হাত পা বাড়ায় কাছাকাছি, ক'লকাতার ঠেকের কোন
কোন নামজাদা বিশিষ্ট অভিনেতার দল। মেঘদূত, আগের
প্রোক্ত দলের মধ্যে বাতাস তরলবরত (এবং তারের সংখ্যা
নিজস্ব কল নয়, কাগজ, দুই ঘাইলের মধ্যে আমনের দশে
ছোট্ট ছোট্ট—তা ছাড়া ক'লকাতা-কেনে কলেক্টর ছেলেও
অনেক আছে), তারের কাছে এরা পেলেন বন ঘন হাততালি।
কেউ কেউ বললে—ও কি চমৎকার নকলই করেছে
ক'লকাতার ঠেকের অস্বাভাবিক—বাতাসিক বেগবার ভিন্নতা
বটে।

এমন সময় আগের তরল একজন বোটা কাপো ও বেটে
শোক। কিসের পাটে তা আগের মনে নেই। নোকটায়
বয়েন ঘাটের উপর হবে, তবে বাতাসটা ভাল। কেউ তার
বেলা একটা হাততালিও দিলে না, যদিও সে ব'লগারের পুঁদ্র
করবার ভগ্নে অনেক রকম মুখভঙ্গি করলে, অনেক হাত পা
বাড়লে। আগের সাথে একজন বনের ছেলেরা বসেছিল,
তারের মধ্যে একজন বলে উঠল—এ বুড়োটাকে আগের
কোথা থেকে ছুঁয়েছে? বেগতে যেন একটা পিঁপে।
গ্যাংস্টার করেছে বেশ না টিক বেন দঃ!

পাশের আর একজন গৌড় চরিত্রের বদলে—ও
এককালে বৃন্দ নামজাদা এ্যাটর্নি ছিল হে, তখন তোমরা কত
নি। ওর নাম বড় হাজরা।

আমি হঠাৎ ভুলোকে বৃন্দের দিকে চাইলুম, তারপর
একবার বৃন্দ অধিনেতার দিকে চাইলুম। বাতাস-দিনের একটা
রাত্রির ঘটনা আগের মনে পড়ে গেল। সেই কলকাতার পুঁদ্রের
রাত্রি, সেই দলবে বৈশ্য-ছেলের দল, সেই তারা আমাকে
কেনে কোথায় পালালে—তারপর বাড়ী থেকে অনেক দূরে
এক অপরিচিত পথের বাতাসের আগের আগের সেই এক
বলে হাত কাটান। সে রাতে বার অধিনেতায়েন আগের

বালক যন বৃন্দ, পিঙ্গল, উৎকর্ষ হলে উঠেছিল—সেই বড়
হাজরা এটা?

এক দলবে তারা বৈশ্যের বৃন্দকে দেখে ও কথোপকথন
উভয়দিক পুঁদ্রের আগের আগের উঠল হলে উঠল, আর ও বড়
হাজরা সেই দল চলে গেল বলে বলে আগের আগের সামনে—
অন্য দলকে পুঁদ্রের বৃন্দ কেন? পুঁদ্রের আগের আগের
মধ্যে অনেক বার বিভ্রান্ত করে কেন, বলে বলে এই কথাটা
চললুম।

মন বেন কেনে দিলে হলে উঠল। অন্য দলকে বলা
কি, আগের আগের বড় হাজরার হা-বাতাস হাজরার ঠেকের!
কেন এমন হল?

বাতাস-দিনের সেই বাতাস আগের একে আমি দেখেছিলাম,
এই সে অধিনেতায়েন এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বাতাস-বাতাস
সেমাগতির সঙ্গে বাতাস কনিষ্ঠা পত্নী ভগ্না—বাতাস একদিন
হুতনকে নির্ভরনে প্রেমালোকে নিবন্ধ বেগতে গেলে ভগ্নিত
হলে গেলে! কি হলে বললেন—মুখেরা, আমি স্পষ্ট,
তুঁদ্র তরল, এই বদলে তোমার বিবাহ করে তুল করেছে।
তোমার আমি এখনও বাতাস, প্রাণে বাতাস না—তোমরা
হুতনে আগের আগের সামনে প্রেমিক-প্রেমিকার মত হাত
ধরাধরি করে চলে বাতাস। কিন্তু আগের আগের বাতাসে।
আর কখনও তোমাদের বৃন্দ না দেখি। ওরা হাত পড়ে
হুতনে হলে ও দলকে লক্ষিত হলে পড়ে। বাতাস সামনে
এ কাল কেনে করে করবে? হাত-ধরাধরি করে কেনে
করে বাবে? বাতাস তোমাদের পুঁদ্র বদলে—বাতাস, মনে
হুতনকেই কেটে বেলন—টিক ওটা হলে বাতাস।

পেলে তারা তাই করতে বাধ্য হল। বাতাস দ্বি-দৃষ্টিতে
তারের দিকে চেয়ে ছিলেন—তার এখন কিছু বৃন্দ চলে গিয়েছে,
তখন তিনি হঠাৎ উল্লাসের মত মুখ তুলে তারের হাতে 'হা—
হা-হা-হা'—হলে একটা চমৎকার করে তারের দিকে ছুটে
গেলেন—লক্ষ্যে লক্ষ্যে তারাও আগের বাতাসে চলে গেল।
মনে আছে বাতাস সেই চমৎকার ভগ্নিতে, তার হুতন 'হা—
হা-হা'—হলে এখন একটা ঠিকি বৃন্দ ছিল, আগের বৃন্দ
দলকে তা বিভ্রান্ত করেছিল। আমি তখন যদিও নিজস্ব
বালক, কিন্তু বাতাস মনে সেই দৃষ্টি এখন গভীর দল
দিয়েছিল হে, এই এত বদলে ও তা তুমি।

পরের দিন বড় হাজরার দরজা খোলা হ'ল। কতক
যেখানে বাসা গিয়েছে, তাই সামান্য একটা টুপের উপর বসে
তামাক টানছে। আমি বললুম—কাল আপনাব পাট বড়
চমৎকার হয়েছে। বড় আগ্রহের সঙ্গে আমার দৃষ্টির দিকে
দেখে বললে—আপনার ভাল পেয়েছে? বললুম—চমৎকার।
এখন অনেক দিন পেখিনি।

কথাটার মধ্যে লতায় অলপাঙ্গ ছিল। বড় খুব খুশি
হ'ল, মনে হ'ল প্রশংসা ভিনিস্টা হোকারী ভাষায় অনেক
দিন তোটেনি। আসলে কাল বখন তরুণ অভিনেতাদের
বেলায় ঘন ঘন হাজতালি পড়েছে, বড় হাজরার ভাষায়
সে ভাবগাম্ভীর্য বিহীন ছাড়া আর কিছুই তোটেনি।

বড় বললে—আপনি যেকোন ছাট আপনাব ভাল
পেয়েছে। আর কি মশার সেদিন আছে? এখনকার সব
হয়েছে ছাট—ছাট, সে যে কি মাথাবুঝু তা বুঝিবে। বো-
ম্বাইয়ের পল ভুগ্ন সরকার ছিল, তারদের পাটে এখন এন্ট্রাটো
আর কেউ কখনও করবে না। আমি সেই ভুগ্ন সরকারের
দাক্ষিণ্য—বংশধর? আমার হাতে ধরে শিখিয়েছেন তিনি।
মরহুম সময় আমার হাত ধরে বলে গেলেন—বড়, তোমার
না গিয়ে খেলাশ, তোমার ভীষনে আর ভাবনা থাকবে না।

আমি বললুম—এ বসে আপনি আর চাহুরী কেন
করেন?

—না করে কি করি বলুন? বড়ছেলেটী উপযুক্ত
হয়েছিল, অতঃপর বড়ই হ'ল কপোতী হয়ে মারা গেল।
তার সংসার আমারই উপর, নাতনীটার বিয়ে নিতে হবে আর
কিছুদিন পরেই। পরমা আগে যা রোজগার করেছি, হাতে
রাখতে পারিনি। এখন আর তেমন মাইনেও পাইনে।
সেইকণা টাকা পর্যন্ত মাইনে পেয়েছি এক সময়—আমার ভ্রাতৃ
অধিকারী আমারা দুই বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল, বখন কুল
বাসের হলে থাকতাম। এখন পাই পরজিন টাকা মাইনে।
আর সটান বলে ওঠে যে ছোড়কা কাল হামের পাট করলে—
সে পার আশি টাকা। ওয়া নাকি ছাট ভাবে! আপনিই
বলুন তো, কাল ওর পাট ভাল লাগল আপনাব, না আমার
পাট ভাল লাগল? এখনকার আমলে ওদেরই খ্যাতি
বেশি অধিকারীর কাছে। আমাদের চাকরী বজায় রাখাই
কঠিন হয়েছে।

মনে মনে চেয়ে দেখলুম, বড় হাজরার এতদিন বেঁচে
থাকাটাই উচিত হয়নি। চরিত্র বহুর আগে তরুণ বড়
হাজরাকে বো-ম্বাইয়ের পল ভুগ্ন সরকার যে ভাবে হাত
পা নাড়বার নৃশংস ও উজারকের পদ্ধতি শিখিয়েছিল, বড়

বড় হাজরার আতঙ্ক বিনীত আমার দেখাতে বসি, তবে বিতর্ক
ছাড়া তার যে আর কিছু প্রাণাণ হবে না—একথা তাকে বলি
কেনন করে? কালের পরিশ্রুতি তো হয়েছেই, তা ছাড়া
তরুণ বয়সে বা মানিক্কে, এ বসে তা কি আর সাজে?

এই ঘটনার বছর পাচ ছয় পরে নেতৃত্বের গণি দিয়ে
যাকি, একটা বেবেটী মশার দোকানে বড় হাজরা বেশি
বসে আছে। সেখান থেকেই বালুখ শরিফের চরম সীমার এসে
লে ঠেকেছে। পরণে অর্ধমণি খাম, পিঠের মিকটা হেঁচকা
এক মগা ভাষা গারে। আমার বেবে সে চিনতে পারলে
না। আমি ওকে খুশি করবার ওস্তে বললুম—আপনি
জিনেত পাকন আর নাই পাকন, আপনাকে না চেনে কে!
আমুন কি ছাই চেপে ঢেকে রাখা যায়? তা এখন খুশি
ক'লকাতার আছেন?

বুকের চোপে জল এল প্রশংসা শুনে, বললে, আর বাবু
মশায়, আমাদের বিন দুখিয়েছে। এই সেদুন আত্ম ভিন
বহর চাহুরী বৈই। কোন মশে নিতে চান না। বলে,
আপনাব বহর হয়েছে হাজরা মশাই, এ বসে আর চাহুরী
আপনাব পোষাবে না। ভাল কথা আমাদের আর চার
না। ভাল ভিনিয়ের দিন আর নেই, বাবু মশায়। এখন-
কার কালে সব হয়েছে বেকি, বেকি। বেকির আসর
এখন খাঁটা ভিনিয়ের চেয়ে বেশি। আমার গুরু ছিলেন
বো-ম্বাইয়ের পল ভুগ্ন সরকার, আজকালকার কোন বাটা
আজকাল ভুগ্ন সরকারের পায়ের পায়ের ঘুরা আছে!

আরও হারকরক প্রশংসা করে এই ভয়ঙ্কর বড়
নটকে শান্ত করলুম। জিজ্ঞাসা করে ক্রমশঃ জানলুম এই
মশার দোকানই বুকের আগ্রহ-স্থল। কাঁছেই গদির মধ্যে
কোন কাঁকর-বাড়িতে এতবেলা যেতে বের, রাতে এই
শোকাবৃত্তিতে পরে থাকে।

কার্যোপক্ষে গণিটা দিয়ে প্রাতিদিনই বাতাব্যত করি
আর বালাকাদের সেই একটা রাজির বৃত্তির চানে কিরকার
সময়ে বড় হাজরার সঙ্গে একটু পর করি। একদিন বড়
বললে—বাবু মশাই, একটা কথা বলব? একদিন একটু
মাংস খাওয়াবেন? কতকাল খাইনি।

সেদিন সঙ্গে পরমা ছিল না। পরের দিন একটা ভাল
হেট্টোকে তাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানুম। তার খাওয়ার
তকি দেখে মনে হল, বড় কতদিন ভাল ভিনিল খেতে পার
নি। দুকমে গিয়ে একটা পার্কে গিয়ে বললুম। রাত তখন
নাটা বেয়ে গিয়েছে। ঈশকাল, অনেক পার্কে থেকে চলে
গিয়েছে। একটা বেকে বলে বড় নিজের মনকে কত কথাই

বললে। কোন্ জমিনার কপে তাকে আদর করে ছেকে
নিভের হাতে সোনার মেডেল পরিবে বিয়েছিলেন, তার
অভিন্ন মেখে কবে কোন্ মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল, হাতী-
বাথার হাতা নিভের গায়ের শাল গুলে এর পারে ভড়িয়ে
বিয়েছিলেন।

আমি বললুম—বিশিষ্টকর আর যথুজ্ঞান পেট অভিন্ন
আমার বড় ভাল লাগে, সেই বখন সাতা বললেন, ‘তোমরা
প্রেমিক-প্রেমিকার মত হাত-খরাবরি করে চলে যাও’—
সেই ভাষাটা। এখনও ভূমি। বৃদ্ধ নট সোভা হয়ে
বলল। তার চোখে বৌবন-কালের পুরোনো দীপ্তি বেন
কিরে এল। বলল—ও! সে কতকালের কথা বে! ও
পালা খেয়েছি এদের নিছোড়ির দলে থাকতে। সেখবন—
করে দেখাব?

এ প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত। আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম—
যবে আছে আগনার? সেখান না?

ভাগ্যে পার্কে শুখন বিশেষ কেউ ছিল না। বৃদ্ধ উঠে

দাড়াল—আমি চললুম যথুজ্ঞান। ও নিভের পাট বলে
বেতে লাগল—দেখলুম কিছুই তোলে নি। তারপর আমার
দিকে কিরে চললগছীর হয়ে বললে—বাও যথুজ্ঞান, তোমরা
প্রভব প্রেমিক-প্রেমিকার মত হাত-খরাবরি করে চলে যাও।
তারপর আমি কয়েক পা এগিয়ে বেতেই বৃদ্ধ তার পেট
পুরোনো ট্রাজিক গুয়ে ‘হা-হা-হা-হা’ করে আমার দিকে হুটে
এল। কি অপরূপ সে হুহ! কি অপরূপ ভক্তি! তখনও
বৃদ্ধ নট তার জীবনের সবটুকু ট্রাজেডি এর মধ্যে ঢেলে দিলে।
যেন মতাই ও তখনও প্রেত সাতা শিখিত, অবিবাদিনী
যথুজ্ঞান ওকে উপেক্ষা করে তার তরল প্রেমিকের সঙ্গে
হাত-খরাবরি করে চলে গেল। অত্ন কবের দুহুঠের ওকে
বৃদ্ধ বড় হাতেরা হিশ বছর আগেকার তরল নট বড় হাতেরাও
ছাড়িয়ে গেল।

এট বড় হাতেরার শেষ অভিন্ন। এব মাল বানেক পরে
একদিন বেহুতলার পেট মশলার শেকানটাতে খোঁজ করতে
গিয়ে শুবলুম সে মাগা থিয়েছে।

দিদি

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

আজকে আমি তো চাটা খাব না মা, চা সিতে বারন কর!

ভাইকোটা আজ, ওও ভুলে গেছে? মা ভূমি কেমনতর?...

বিশ্ব অমূল্যকে কোটা দেব আমি, উঠছি তাই তো ভোর!

বাগানেতে গিয়ে দূর্বো ও কুল এনেছি আঁগেলে কোরে।

নিউলীর মালা গাথা হয়ে গেছে, দূর্বো হয়েছ বাছ!

স্নান-টান সব সেরেছি সকালে, খয়েছে কাপড় কাটা।

লন্দনটুকু ঘবা হোল শেষ; ধান চাই হুঁটিখানি,

আর কি কি চাই বলে দাও না মা, আমি কিগো সব জানি?

কিয়ে হয়ে 'বধি তিনটি বছর দিইনি তো ভাইকোটা!

প্রতি বছরেই কৈয়েছি এ'দিনে, ননসে দিয়েছে খোঁটা।

সারাদিন মাগো মন করে হু হু—ভল আসে চোখে শেষে,

ভাইখিভীয়ার দিনটিতে কি মা থাকে ঘার দূর দেশে?

কোটার জোগাড় বা' করেছি দেখো বাটার আর কি রাখে?

এইবেলা মাগো বলে দাও যদি ভুল কিছু হয়ে থাকে!

চুয়া লন্দন, ঘীরের শিদিম, টাটকা কুলের মালা,

নতুন আসন কলমুল মেওয়া মিঠি সাজানো খালা।

নতুন কাপড় নতুন চামর,—মশলা এলাচ পান,

জপার রেকাবে আশীর্বাণের রেখেছি দূর্বোধান।

ভায়েদের আজ পরমায়ুটা বোনট রেখে দেয়,—নয় ?
 কাঁচা দুধ আর গাওয়া বী নিশিয়ে গল্প দিতে হয় ।
 পায়স তা' ছাড়া রাঁধবই আমি, ওটা তো নিয়মই আছে ।
 আরে! আবদার আছে না আমার অভ্যেস তোমার কাছে ।
 মছেব কাঁচিয়া পোলাও মাংস রাঁধব নিজের হাতে,
 পায় পড়ি মাগো, মত দাও তুমি, বাবা না বেকন যাতে ।
 ...খুব পারব না,—হবে না কষ্ট, পুড়বে না হাত মোটে !
 দেখে! মা এ' কথা এখন যেন না বাবার কাণেতে গঠে ।
 যাওয়ানো পাওয়ানো! চুকে গেলে সব, তখন বোলো মা তাকে !
 অবাক্ হবেন নিশ্চই বাবা;—বকুনি সেবেন কাঁকে ?...

পশমের ছুটি আসন বুনেনি,—ছাঁটাকুল কাটা নিখে !
 “আশী দ্বাদশ দিদি—” এই কথা ছ'রঙে দিয়েছি নিখে ।
 বাপের বাড়ীর জগ্নে সেখানে তৈরী করতে কিছু
 লজ্জা করে না !—জবাবদিহিতে মাথা যেন হয় নীচ ।
 ওদের আমি তো নানান জিনিষ দিয়েছি তৈরী ক'রে,
 সে বাড়ীর কেউ থাকে নেই,—তবু মন তো ওঠেনি ভ'রে ।
 অমূল্য কিছুকে কিছু করে দিলে অনেক তৃপ্তি হয় !...
 কোলে পিঠে করে ছোটো: ভাই যে মা, এ মায়! বাবার নয় ।
 মনটা আমার সব চেয়ে বেশী ওদের জগ্নে কাঁদে,
 বিকেল বেলায় ঘুড়ি নিয়ে যেই ছেলেরা উঠত ছালে—
 বিস্তর কথাই মনে হোতো: খালি, জল এসে যেত চোখে ।
 লুকিয়ে আড়ালে ফেলতুন মুছে, দেখে ফেলে পাছে লোকে ।

ভান না, আমার খোকন কিন্তু ঠিক নামাদের মত ।
 এখন থেকেই বিস্তর মতন ধরণ-ধারণ যত ।
 বিশেষ করে ও ছোটমানাটির স্বভাব কেন যে পোলে !
 —সমনি বিষম অভিমানে আর মহাভয়স্ত ছেলে ।
 মনে আছে কি মা ছোটবেলা বিস্তর বা হাতে ছুঁড়ত বল !
 খোকাও আমার বা হাতেই খেলে তেমনিই অবিকল ।
 বাথটবে বিস্তর জলের ভিতরে করত কেমন চান !
 জল চাপড়িয়ে দ্ব'হাতে ছিটোত, গাউত চেঁচিয়ে গান ।
 চানের সময় খোকাও তেমনি কাটায় গানের চোটে !
 খল খল হেসে জল চাপড়ায়, উঠতে চায় না মোটে ।
 সত্যি মা, আমি খোকর কাণ্ড চেয়ে চেয়ে দেখি বত !
 বিস্তর অমূল্য ছোটো বেলাটাই মনে পড়ে যায় তত ।

সব গোছগাছ সাঁরা হল, অ—বি ! ‘দাদাবাবুদের ডাক !
 বস—ফোটা নিতে ডাকছেন দিদি’— অ—মা, তুমি ধর শাঁখ !

কবি কামিনী রায়

— শ্রীমদ্ভগবতী দেবী

বর্ষচক্র দ্বিতীয়বার অগতির হঠকা আদিল, গত ১০৪-বর্ষাধরে ১১ই আশ্বিন মহাশ্রমী তিথিতে, ঠেং ১২৩০ পূর্বাষাধে ২খণ্ড পেটের, গুণানতর সাত্তা কামসোদন রাগের পতনম সূত্বেদগে, স্রুতিভার বচনুদী, “আলো ও ছায়া”-র ধন্বিনী রচয়িত্রী, সুকবি কামিনী রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। পৈন্য হইতে আমি সেই বিধুদী মহিলা কবির নাম প্রভা করিতে উপনিষ্ট হইয়াছিলাম। কৈশোর হইতে আমি তাঁহার রচনার বিস্ত্র সৌন্দর্য, শাস্ত্র প্রাণীক, অনির্দমনীয় রস-মাধুর্য, সরল আন্তরিকতা, পবিত্র কৃতি ও অতুণনীর ভাব-সম্পদে থিমাহিত হইয়াছিলাম। পবে, যাবৎ বর্ষকাল তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত হইয়া, সাহিত্যোপাস করিয়া এবং তাঁহার নিকট নানা বিষয় উপদেশ লাভ করিয়া পণম উপকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার সৎকর আমি এ পর্যন্ত একটু কথাত লিখিবার প্রয়াস পাট নাই। কবি কামিনী রায়ের স্বর্ণাঙ্গোদগের কয়েক মাস মাত্র পূর্বে আমার পরমাতাধা মাতৃদেবী স্বর্ণাঙ্গোদগ করিলে আমি “নাটু-বুতি” লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে বুঝিয়াছিলাম, যেখানে যেহেতু অণ অপরিণীত, সেখানে কথ্য গাঁপিয়া প্রভাশুলাভলি প্রদানের প্রয়াস ব্যর্থ হইবেই। সেই কল্প আমি দ্বিতীয়বার এক্ষণ প্রয়াস হইতে বিরত ছিলাম।

আমি যে কখনও কবি কামিনী রায়ের সহিত আলোপ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব, তাঁহার সহিত সাহিত্য-গোচনার সুযোগ পাইব, তাঁহার জনমের ও মৃত্যুর বিবিধ সঙ্কল্পের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া থক হইব, ইহা আমার স্বয়ংও আশোচর ছিল। তাঁহার সৌজন্য ও বৈষ্ণব ব্যবহারের, দিনর ও শিষ্টাচারের সত্ত্ব বৃত্তি চিরদিন আমার জগৎপটে সন্মুখ থাকিবে। তাঁহার বহু-লিখিত কয়েকখানি পত্র আমি সন্তোষে রাখিয়া রাখি। তাঁহার জীবৎ জীবন-চরিত-সচিবতার উপকারে আদিত পাবে মনে করিয়া এই পত্রগুলি আজ এই ক্ষুদ্র ভূমিকা সহ প্ৰকাশিত করিতেছি।

কবি কামিনী রায়ের পিতা, “সহস্রাঙ্ক নন্দনুদগের ঠানী”, “বেগুনান গঙ্গাগোবিন্দ লিঙ্গ”, “অব্যোধ্যাব বৈষ্ণব” প্রভৃতি বিখ্যাত ইতিহাস-মূলক গ্রন্থের প্রণেতা। ১৩৩৭ শেন মহাপ্রভেত



কবি কামিনী রায়।

সহিত দুন্দীপজ, বোধ রহ ১৮২১ পূর্বাষাধে, আমার শিষ্ঠমের পত্রম পূজাপার শ্রীপুত্র অতুলচন্দ্র যোব মহাপ্রভেত আলাপ রহ। ১৩৩৭ ব্রহ্মন দুন্দীপজ ম্পেদ ছিলেন। ইতিহাস নেভিকগল সার্ভিলের উচ্চল বক্ত লেফটেন্যান্ট কর্বেল জোতিগ বে,

মহাপুত্রের পিতা (যেহেতু অবলম্ব-প্রাপ্ত লবজক) প্রকাশ্যে
শ্রীযুক্ত অমিত্য প্রসাদ (৩ এবং লবজ যোগেই বাকীর ৯ অমিত্যম
যোগে) ইত্যংক চতুর্থাৎ পত্নীর স্বর্গ নরায় চক্ৰ "মহাবি" আখ্যা



চৈতন্য সেন।

দিয়াছিলেন। মহাপুত্রেরও সেখানে তখন যুগলক ছিলেন।
‘পিতৃসেব অরকারের কল্প সেখানে অত্যাধী ভাবে যুগলক
হইয়া গিয়াছিলেন। পিতৃসেবের যুগে চতুর্থাৎ নানা প্রকার
স্ব-স্বত্বপূর্ণগর আমি বাল্যকালে শুনিতাম। পিতৃসেবের
যুগে তন্মিহাি যে, চতুর্থাৎ বাদ্, তত্ কখন পুত্র স্তম্ভাতি করিতেন।
একজন ষ্টাটুটায়ী শিভিলিয়ান ৯ কোমরনাথ রায় এবং অপর
জন (অধুনা অবলম্ব-প্রাপ্ত জিনা কক) শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্ৰ-
নাথ ঘোষ লাহাভর। তখনও কোমরনাথের সহিত কামিনী
সেনের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু উভয়েই পরস্পরকে পুত্র প্রভা
করিতেন। তখন “আলো ও ছায়া” প্রকাশিত হইয়া
গিয়াছিল এবং কোমরনাথ রায় এবং অত্যাধী হুগিওত ব্যক্তির
উচ্চ প্রেমসাপূর্ণ লবালোচনা কবির নামগোপনের প্রয়াস
বিস্মা কবিগা গুরে গুরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্কণেই মরিয়া কবি
কামিনী সেনের নাম প্রসিদ্ধি কবিগাছিল। আমি বৈশ্ববটে
‘আলো ও ছায়া’ পুস্তকখানি দেখিয়াছিলাম। সেকালে

অভিকালিকার মত হৃদয় ছাপা ও বাধাই হইত না বটে,
কিন্তু সেকালের পক্ষে বইখানি গোট-আপ (got-up)
যে পুত্র হৃদয় হইয়াছিল, একথা বৈশ্ব অসম্ভব।
পিতৃসেব রাজকাব্যে নানা স্থানে গিয়াছিলেন, আমার
সাহিত্যাহুগিনী জননী এখানে অবলম্ব-বিনোদনের কল্প
যে লকল বাছা বাছা পুস্তক লকে রাখিতেন, তন্মধ্যে “আলো
ও ছায়া” একখানি সর্বদা থাকিত, এবং যখন ভাবগরিষ্ঠের
সামর্থ্য ছিল না, তখনও বৈশ্ববকালে আমি নিঃসঙ্গ প্রবাসে
কবি কামিনী সেনের ‘আলো ও ছায়া’-র লগল কবিতাগুলি
পড়িবার চেষ্টা করিতাম। বিভাগলের তৃতীয় প্রেষিতে পাঠ-
কালে দাবকানাপ গল্পোশাখারের “কবিসাখা”-র কবি কামিনী
রায়ের কয়েকটি অতুলনীয় কবিতাপাঠ ও বক্তৃতা করি।
অতঃপর তাঁহার এই ও সাময়িক-পদ্মনিতে যে লকল কবিতা
প্রকাশিত হইত, লম্বতট্ অদম্বলহকারে পাঠ করিতাম।
“লাহিতো” আমার পুস্ত্যাপান পিতৃসেবের লগলগী (পরে
পাটনার হুগুগিষ্ঠ বাসগরাজীব) ৯পূর্বধুনাতারাপ গিয়া
মহাপুত্র ‘আলো ও ছায়া’-র যে হৃদয় লমালোনা লিখিয়া-



কোমরনাথ রায়।

ছিলেন, তারার প্রতিও আমার বাস্তবধী কৈশোরেই আমার
দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

যখন আমি নিত্যন্ত যক্ষণের সহিত বাঙাল্য সাময়িক

পরে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমার অবাণী বহু প্রিয়তম
কবিশ্রীশ পাণি মহাশয়ের অকল্যাণে তৎসম্পাদিত “বদনা”



কামিনী রায় (১৯০৪)।

কবি কামিনী রায়ের সংগঠিত পুস্তকালা “অধা”-র সমা-
লোভনামূলক একটি প্রবন্ধ লিখি। আমার রায় সাহিত্য-
ক্ষেত্রে অপরিসীম-নাশা দেখে কব পক্ষে লক্ষ্যবিত্তি কবির
কাব্যসমালোচনা করিতে যাওয়া যে কিস্তি বৃত্তির পরিচায়ক
তচো বলা বাহুল্য। এ রচনা কবির গোচরে কখনও
আনিয়াছিল কি না জানি না, আমি এখনও তাঁহার নিকট
উল্লিখিত করি নাই।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আমার পরম অধ্যাপক বহু,
“গোষ্ঠায় গোষ্ঠায়” প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তৎ-
সম্পাদিত “বানী ও মর্মবাহী” নামক মাসিকপত্রে বাস্তবায়িক
ভাবে কবির হেমচন্দ্র স্বকোণাধ্যায়ের জীবন-চরিত্র লিখিতে
অগ্রগণ্য করেন। হেমচন্দ্রের জীবন-চরিত্র সম্বন্ধে তৎকালে
আমার কোন জ্ঞান ছিল না বলিলে অস্বাভাবিক হয় না। ঐহারা
হেমচন্দ্রের সম্পর্কে আনিয়াছিলেন, তাঁহাবিগকে তাঁহাদের
পুস্তিকা ও সংকিত পত্রাদি পাঠাইতে অগ্রহণ করিয়া কয়েক
পাশি পত্র লিখিয়া। এখানে ঐহারা জীবন-চরিত্র সম্বন্ধে

কার্যে চমকপ্রদ কবিরাজেন, তাঁহারা কখনো যে, উপকরণ
সংগ্রহ করা কিস্তি তৎসম। নিকটতম আত্মসম্প্রদায় নিকট
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা উপকরণ-সংগ্রহে অবি-
কাম্যপক্ষে সাহায্য করেন না। বলা বাহুল্য, আমি যে পর-
গতি লিখিয়াছিলাম, তাঁহার কতকগুলির উত্তর পাইলাম,
অনেকগুলিই পাইলাম না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর
কবি কামিনী রায়কে যে পর লিখিয়াছিলাম, বদনাময়ে তাঁহার
উত্তর না পাইয়া তাহা পাইলাম উত্তর উত্তর আর পাইব না।
আমি একজন অপরিসীম-নাশা নবীন লেখক, যে কার্যে
চমকপ্রদ করিয়াছি, কোনও বড়ই তাঁহার উপলক্ষ নহি, হস্ত
কাম্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কবিত্বের পক্ষেই লক্ষ্যবিত্ত
হইব, সেই কত কবি বোধ হয় উচ্চা করিয়াই পত্রের উত্তর
দেন নাই। আরক-লিপি প্রেরণে সাহস তুলি না।

‘আলো ও ছায়া’-র পূর্বে কোন ইংলিশ-পত্র ছিল না,



কামিনী রায় (বিকলাসের পূর্বের ভাষা)।

কেবল উল্লিখিত শেষভাগে “মহাভাষা ও পুণ্ডরীক” নামক বহু-
কাব্যের তাঁহার এক অজ্ঞানতান্না দত্তের উল্লেখ ইংলিশ

চলিত। এই সত্যেরই প্রমাণ অতঃপর পোষ বেপুন
কবিতার 'কবিতা' (১৯১৩) কবিতার পদ্য ভাষা এবং



কবিতার পদ্য ভাষা।

অনেক রকম কবিতা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আলো
ও ছায়া'-র বর্তমান সংস্করণে কবিতার 'পিতৃপ্রতিম কবিতা'র
কবি বেপুন কবিতার 'কবিতা'কে রচয়িতা উৎসর্গীকৃত করেন।
উৎসর্গ-পত্রটি আবার বড় ভাল লাগিয়াছিল :—

বিশাল উল্লস যব পদম মাগত,
কুকাটীয়া পুত্ৰ তপ্ত, তপ্তে স্বীকৃত,
বাৎসল্য অলঙ্কারে বাক্যে কবিতা পানী,
কৌতুকে আপদে কুকাটীয়া বাক্যে,
তব বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে, পেরেছিল পান
লালুক এ কীট কবি পুণি বর্তমান।
বোম্বার আশা, কৈব, আশীর্বাদ ভব,
সম্মেলন এত। বিনা কবিতার নব
বিশেষতঃ যব 'বিত' বৈষ্ণব কবিতা,
আজ পোকাভর হ'লে তাই উৎসর্গ
পদ্য ও কবিতার রচনা :—আজ কবিতা
তবে পুণি নিম্নলিখিত অলঙ্কারে তা' নব :

বিশাল উল্লস যব পদম মাগত
কবিতা-সংস্কৃতিতে, নব প্রকাশিত
পাণ্ডে কবিতা, বাক্য এই। অলঙ্কারে আশা,
পৌরুষ বৈষ্ণব কবিতা কবিতা ১৯১৩।

উপরিবৃত উৎসর্গ-পত্রটি পাঠ করিয়া প্রতীত হইয়াছিল যে,
কবি বেপুন প্রতীত কবি কবিতার বাক্যের পদ্য ও আশীর্বাদ
প্রকাশ আছে। প্রত্যয় এ বৈ কবিতা আশার অব্যাহত
কবিতা বেপুন প্রতীত কবিতার বাক্যের পদ্য ও আশীর্বাদ
কবিতা পারিভাষিক না, সে বৈষ্ণব পুণি আশা কবিতা।

বাক্য হউক, বাক্য উৎসর্গ পত্রের কবিতা পারিভা-
ষিক, তাহা লইয়াই কবিতার কবিতা। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে
কবিতার মাগে বাক্যের (কবিতা ১৯২০) 'বাক্য ও
মহাবাক্য'তে "বেপুন"-এর প্রথম পত্রের (উৎসর্গ-পত্রিকা)
প্রকাশিত হইল। উহা আশা-পত্রের কবিতা করিয়াছিল কি



বেপুন কবিতার পদ্য।

না কবিতা পারি না, কিন্তু উহা কবিতার পত্রের কবিতা
প্রকাশিত হইল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল

বীৰ্য পৰম্পৰা চিত্ৰণত চইল। উঠাৰ প্ৰথম অৱশ্যেৰে পঢ়োৱা-
তৰ প্ৰদানে আশা বিলম্বৰ ভয় কবি বৈকল্যত বিগ্ৰহেচন।



ঈশ্বৰা মল্লা ৰায় (কলেজ পি. কে. ৰায়)।

কি হুৱে হেমচন্দ্ৰৰ সহিত তাঁহাৰ প্ৰথম আলাপ পঢ়িচহঁ হব
এবং হেমচন্দ্ৰ ‘আলো ও ছায়া’-ৰ ভূমিকা লিখিবা বেন, তাহা
কিনেৰ ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কৰিগছিয়াম। মাননীয়া
ঈশ্বৰা মল্লা ৰায় (জেদিয়েলি কলেজৰ কৃতপূৰ্ণ অধ্যাপক
৬ ডাক্তাৰ প্ৰশান্তকুমাৰ ৰায়েৰ পত্নী) এবং সেতি অবলা বহু
মহোদয়গণেৰ বনামধৰ্ম পিতা তুৰ্ণামোহন বাস মহাপুৰুষেৰ
মধ্যস্থতিত কিঞ্চে হেমচন্দ্ৰৰ সহিত কামিনী পেন পৰিচিতা
হন, তাহা পৰম্পৰাণিতে সন্নিহিত বৰ্ণিত হইছাছে।

হাতাংকল্ল

২৪ মাৰ্চ ১৯১৮

শান্তনন্দ

আপনো ২০শে ডিচেম্বৰেৰ পৰম্পৰাৰ উত্তৰ বিতৰ এক বিলাস
হৈল সেমন্ত অতিথি লম্বিত ও সুবিত আদি। পৰম্পৰা কংগ্ৰেছেৰ
লনৰ হৃদয়ত হব। আমি তাহাৰ ৭৮ বাৰ পূৰ্ণেই ৪২ হাজাৰ বোড
হাতিয়া হোমায়িগণেৰ আদিবা বাস কৰিঃভিলাস। ডিচেম্বৰেৰ পেন
মগ্ৰেৰ কলিভাৰা কই; আপনো চিঠি কলিভাৰা হইত হোমায়িগণ

এক হাতাংকল্ল হইত কলিভাৰা পূৰ্ণ হোমায়ি হব। তখন অলপেৰ
অলপেৰ লনৰ হৃদয়ত হব। আমি তাহাৰ ৭৮ বাৰ পূৰ্ণেই ৪২ হাজাৰ বোড
হাতিয়া হোমায়িগণেৰ আদিবা বাস কৰিঃভিলাস। ডিচেম্বৰেৰ পেন
মগ্ৰেৰ কলিভাৰা কই; আপনো চিঠি কলিভাৰা হইত হোমায়িগণ

আপনি কবিতাৰ হেমচন্দ্ৰৰ হোমচন্দ্ৰৰ শিখিৰে কামিনী হুই
হইলো। কিছ আপি তাঁহাৰ কৌশলৰ কণা কিছুই লানি না।
গণমালা হইত তাঁহাৰ কবিতাৰ ভিতৰ লিখি তাঁহাৰ পৰে আশাৰ
পৰিচয়। ইতি আশাৰ পিতৃসেবাৰ ‘কু’ ছিলেন ঠিক একপাত কলা
না। আশাৰ পিতৃসেবাৰ পৰিচয়ৰ ইতি হেৰ হুইত বিকট হইত
কিছ কুৰ্ম-মাৰ্গেৰ পাইকৰেৰ এই এক কুৰ্মিহাতি।

আমি কৌশল একদিন তাঁহাৰ মাথাত লাগ কলিহাতি। তখন
‘আলো ও ছায়া’ হুইত।

আশাৰ পিতৃসেবাৰ কৌৰ্ম হুইলোহন বাস মহাপুৰুষ ইতিপূৰ্ণে আশাৰ
কবিতাৰ খাতাংকল্ল লইতা তাঁহাকে লেখিত বেন এক কৌশল হুইলো
হিলাস। কলো। আমি কলো হুইত কলিভিলাস। আশাৰেৰ না।
খাতাংকল্ল আমি কলো পি, কে, ৰায়েৰেৰ লেখিত বিলাসিলাস।—
কলিহাৰ কলিভিলাস কবিতাৰ উপৰ ‘হুইত Beautiful ইতিহা এক



লোভি অলপা বহু (তলৰ বহু)।

খাতাৰ উপৰ A true poet লিখি তুৰ্ণামোহন বাহু হুইত কলিহাতি
লিখন এক জিজ্ঞাসা কলিহাৰ “এ ছোৱাৰেৰ কে হে?” তুৰ্ণামোহন বাহু

কলিকাতা "হেপার্ন অফিস" তিনি অতিশয় আনন্দ এবং বিস্তার লভ্যতা
কাজের সাধিতেন।

আমার কবিতা তাঁহার মত পোড়ের ভালে সাধিতোই কামিনী
আমার মত এবং অস্বাভাবিক পৰিমাণে দুঃ হইল। তিনি হৃদিকা
লিখিত বিবেক কামিনী কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিতও আর কি
হইল না। তখন কয়েক সপ্তাহ ভাণ্ডা হইতাত, একদিন সকাল বেলা
মিসেস সি. কে. রায় (মহাশোভন নামের ভেঁজা কল্যাণী) আমার নিকট
গাড়ী পাঠাইয়া গিলেন। ঐকালের মধ্যে কামিনীকে আমার সহিত পরিচিত
হইতে ইচ্ছা একাল কথোত কবিতারূপে তাঁহার আশ্রয়ের বিবেক
করিয়াছেন। আমি কলিকাতার কলে হইতে দুই মাইল তাঁহারের নিকট



দুর্গামোহন দাস।

টুকু কলমে আঁসিয়া। সেখানে হেপার্নের সহিত উৎসাহী সুখ-
পাওয়ার ও হেপার্নের বোধ সাপেক্ষে আঁসিয়াছিলেন। কবি তাঁহার
নয়-মুদ্রিত বলা-প্রত্যেক স্তব্ধ লিখি আঁসিয়াছিলেন। আশ্রয়ের পর
উৎসাহী দ্বন্দ্ব তাঁহাকে তাঁহার বিবেক কোন কবিতা গাড়ীতে লিখিত
হইলেন। তিনি কবিতাবলী হইতে "হর কল্যাণী দেবীর কল্যাণে"
ইচ্ছা করিয়া পড়িয়া গিলিলেন, "না, মিল সেবার কবিতা হইতে
পড়ি।" তখন খুব জ্বরের সহিত "কল-স্বাভাবিক", পড়িয়া চলাইলেন।

এই বোধ-সাধারের পর তিনি আমাকে কয়েকবারি পত্র
লিখিয়াছিলেন। আমার দুর্গামোহন সে প্রেক্ষায় চিত্তবিন্দিত সব নষ্ট
হইয়া গিয়াছে। তিনি আমার চিত্ত পড়িয়া আমার কবিতার মত আমার
দুঃ-স্বাভাবিক পুত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক কথা তিনি বোধ

দুর্ভিক্ষের না, জ্ঞান দুর্ভিক্ষের সৌন্দর্য লেখবার চেষ্টা থাকিলে সর্বত্রই
বোধ গেল।

তাঁহার প্রথম লিখিত কবিতারূপে আমার লালিত্যের চেষ্টা ছিল
কিন্তু তাঁহাতে আমার আশ্রিত হইল। তিনি সেইকাল বিদ্যাবোধে দুর্ভিক্ষ
লিখিয়া গিলিলেন। তাই "মালা ও হারা" নিকট অনেকের দৃষ্টি
আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার এই বিবরণ।

তিনি আমার উৎসাহের সহিত "মালা ও হারা"-র সমালোচনা
কলি। কল্যাণী কল্যাণী থাকিতেন এবং কোন কল্যাণের সমালোচনা
কলি হইলে সে সবচেয়ে তাঁহার নিকট মত আমাকে জানাইলেন।
কয়েক বাল পর হইতে তিনি চিত্ত বোধ কোন বস্তু করিলেন জানি না।
একবার উত্তর না পাওরতে আমিও আর লিখিত সাহস পাই নাই।
"নির্ভালা" ও "শোভনিকা" প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়াছি, কিন্তু
তিনি প্রতি বাক্যের কলম নাই। হস্তের লক্ষ্যেই কল্যাণী চিত্ত
লিখিত পালে নাই।

আমি বালকালে কল্যাণ-কলমে, আমার বিবরণে তাঁহাকে আমার
পিতা লিখি কলম করিয়াছি। সত্তা সত্তাই তিনি আমার দ্বন্দ্ব-পিতা।
কিন্তু তিনি যে আমার কবিতা লিখিলেন এবং প্রকাশ করিলেন এবং
আমার "বিবরণ কল্যাণ"ও প্রকাশিত ছিল। কি সত্তা তাঁহার উৎসাহ
নাম আমার প্রথম পুস্তকের সহিত প্রকাশিত হইল এবং করিল আশ্রয়
বোধ হইল।

আমি তাঁহার মতে কলমও কিছু লিখি নাই, অল্প আমার কলম
তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা পূর্ণ। তাঁহার থাকোই আমার লিখিত
প্রতি প্রভা ও বিবরণ লিখিয়াছিল। তাই লিখ বাল্যের পর, মালা ও
হারা-র ১৪ সংস্করণের সময় তাঁহার নামেই "মালা ও হারা" উৎসর্গ
করিলাম।

তাঁহার সত্তা সংস্করণ প্রকাশিত হইলে।

আমি তাঁহার কলম লিখিত পিতা "মালা ও হারা"-র কল্যাণ
লিখিলেন। তাঁহার কলম লিখিত আমার কলম লিখিত পালিতোই না।
সমালোচকের লিখিত। আমার কলম আমি কল্যাণীভাবে কলিকাতা
পাইতেছি। এবার নানা এককর যত থাকিবার লভ্যতা। অল্প কলম
আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে দ্বন্দ্ব হইল।

কবির হেপার্নের দ্বন্দ্ব-সহিত লিখিত আমার কল্যাণ আমায় সত্তা
হইল। হইত

কৃতজ্ঞতা
দ্বন্দ্বিতা দ্বন্দ্ব

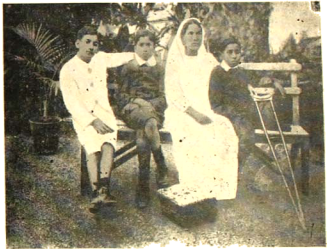
এই পত্রপ্রাপ্তির পর আমার সত্তাও কল্যাণ-পরিমাণে দুঃ
হইল। অন্তঃপাতি আমি নবো নবো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতাম এবং কোন বিধের সংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহার উপবেশ লইতাম। আমার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে বহুতর উপহার দিয়া আশীর্বাদ এবং তিনিও তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ আমাকে উপহার দিতেন। প্রথম যেদিন তাঁহার ৪২-এ হাজরা প্রোভিত বাটীতে দেখা করিতে গাই, সেদিনের কথা আবার বেশ স্মরণ আছে। প্রথমে বিতলের ডুইংডনে কবির দরোহরা ডাক্তার কামিনী সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, কবির একটি কবিতা স্কটল্যান্ডের পিউর ডাক্তার, কবি তাঁহার কবিতার গোপন্য-পার্শ্বে আছেন। বাহা হউক, সংবাদ পাইবামাত্র কবি আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। নানা বিধের সাহিত্যোৎসাহ হইল। কবির নবীন-চন্দ্র সেনের কাব্য লক্ষ্যে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল না। তিনি তাঁহার এক আই-এ পরীক্ষার্থী কল্লকে “প্রভাস” কাব্য পড়াই-তেছেন। তাঁহার স্থানে স্থানে এরূপ অর্থহীন প্রকাশ আছে যে, তিনি বলিলেন, সে সকল অংশের মূলমন্ত ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টির অস্বাভাবিক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকাল হইতেই তিনি কবি হেমচন্দ্রের বেশ-প্রবেশদোষক কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার কবিতার অস্বাভাবিক হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি “উঠ মা আমার” “জায়ে মা আমার” ইত্যাদি অংশের কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ইঙ্গ্রাণে কমে-গা-পাখার মহাশয়ের “ভারত-উদার” পাঠ করিবার পর সেগুলি লস্কর করেন। তাঁহার সর্বজনপ্রিয় কবিতা “বেইবিন ও চরণে ডালি মিহ এ কীন্দন” ইত্যাদিতে একটি গানের শ্রবণ দিবার অকিঞ্চিৎকর প্রকাশ করেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ লম্বোত্তরগণও “মা আমার মা আমার” এই অংশটিতে তাঁহার মনের মত শ্রবণ দিতে পারেন না।

লিভার নিকটে তিনি তাঁহার সাহিত্যিক লেখনার ৩৩

কমী। তাঁহার দিভার ‘উনকোবর স্ট্রীটের অনেকাংশ পাঠ্যব্যবহার তিনিই লিখিয়াছিলেন।

কবিতার গোপন্য হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আমি শ্রী বাটীতে প্রত্যাগমন করিবার উত্তোলন করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া পাত্তাভায়ে আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনা করিলেন। মনে হইল, সাহিত্যোৎসাহী বা সাহিত্য-সেবকগণের সহিত চট বস্ত্র আলোচন করিলে যেন তিনি আত্মিক আনন্দ লাভ করেন। তিনি আমাকে তাঁহার



পুত্রগণ পরিবেষ্টিত কবি কামিনী রায়।

প্রকাশিত বইগুলি উপহার দিলেন। অধিকাংশই আমার পুত্রকণায় ছিল, যে বই একখানি ছিল না, (যেমন পারিবারিক আভ্যন্তরীণ পঠিত গ্রন্থাবলী) সেগুলি সংগ্রহীত হইল।

‘মানসী ও মনোবান্ধ’তে “হেমচন্দ্র” ব্যাখ্যাত্মকভাবে প্রকাশিত হইবার সময় মধ্যমই কোন বিধের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত বা উপবেশ লইবার আবশ্যকতা বোধ হইত, তখনই কবি কামিনী রায়ের সহিত আলোচনা করিতে গিয়া উপস্থিত হইয়া আসিয়াছি। তাঁহার অভিনবগুলি অধিকাংশ সময়ে আমার ব্যক্তিগত অধিনেতৃত্ব দ্বিতীয় দিলিত। ইহার কারণ বোধ হইতে পারে, আমার মাতৃদেহীর নিকট আমি আমার সাহিত্যকর্মে ৩৩ সঙ্গোপক। কই ছিলাম, কোন প্রত্যাগতির

পর তাঁহার সহিতই উহার লেখকগণের আলোচনা করিতাম এবং যাক্সবন্দী কবি কামিনী রায়ের তিন বৎসরে মাত্র বয়স-কটী ছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে একই প্রত্যাবের মধ্যে থাকার উল্লেখের সাহিত্যচর্চা প্রায় একই প্রকারের ছিল। কবি কামিনী রায়ের সহিত সাহিত্যালোচনাকালে অনেক

ছিলেন। আমার পদ পাঠে তিনি নিম্নোক্ত পত্র লিখেন—

১১ এপ্রিল ১৯১৫, শালিগ্রাম
২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫

শ্রদ্ধাভাজন,

আপনার পরম্পরি উত্তর দিতে বড়ই বিলম্ব ঘটিল, তবুও আশ্বাস্য। আমার উপর যিহা অনেক ক্রোধবিশিষ্ট বিলাসে সন্তোষের সহ লিখিয়াছে অস্বস্তিক নাই। সম্প্রতি একটু মনো দুঃখের অধস্তন হইয়াছি। আপনার সুবিধামত যে কোন দিন আসিবেন—কেবল সুখের একটু সংবাদ দিলে ভাল হয়।

লিখিকা
কামিনী রায়

শ্রদ্ধাভাজন

আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

দিলেন। আমার পদ পাঠে

কবি কামিনী রায়ের লিখিকা।

সময় অনেক হইত আমার মাতৃবেদীর সঙ্গেই সাহিত্যালোচনা করিতেছি।

যেদন হইত কবিগণ তাঁহার সহিত আলোচনা কর। প্রায়কাল যোগ হইয়াছিল বলিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার সাক্ষাৎ পার্শ্বনা করিয়া পদ লিখিয়াছিলাম। বহুদিনের পরে তিনি তাঁহার পিতৃ ভ্রাতৃ নীলাকে চানাইয়া-ছিলেন এবং যোগ হয় কলিকাতায় সম্প্রতি প্রত্যাবাসন করিয়া

আমার ডায়েরীতে দেখিতেছি ২৪শে ফেব্রুয়ারি হাওয়া রোডে কবি কামিনী রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। কবি হেমচন্দ্রের আবৃত্তিশক্তি সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ অভিমত সংঘর্ষিত হইয়াছিল। তত প্রমত্তাচরণ বন্ধোপাখ্যায় আনন্ডে লিখিয়াছিলেন এবং আচাৰ্য্য কৃষ্ণকমলও বর্ণনাছিলেন যে হেমচন্দ্র sing-song way-তে পাঠ বা আবৃত্তি করিতেন। তদন্তান্ত আবৃত্তিলাস বহু আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে কান্নিতে অবস্থানকালে হেমচন্দ্রের ত্রাতা পুষ্টিগুণ তাঁহাকে ‘ভারতমণ্ডীত’ আবৃত্তি করিতে বলিতেন এবং বলিতেন হেমচন্দ্রের আবৃত্তি শুভ ভাল লাগে না। পক্ষান্তরে সাহিত্য-মন্ডাট বহিমস্ত হেমচন্দ্রের ‘দশমহাবিদ্যা’ আবৃত্তির উচ্চ স্থাতি কবিগণ গিয়াছেন, এবং তত সেবপ্রদান মর্মান্বিত্যে হেমচন্দ্রের আবৃত্তির প্রণামা করিয়া বলিয়াছেন, যিনি হেমচন্দ্রের ‘ভারতমণ্ডীত’ আবৃত্তি শুনিয়াছেন তিনি অন্য পরদী পাঠের যোগা। কবি কামিনী রায় হেমচন্দ্রের আবৃত্তি স্বকর্মে শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ অভিমতের সামঞ্জস্য বিরূপে হয়, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমার বেশ মনোমুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে আবৃত্তি ভাল লাগা বা না লাগা সের্ব-কাল-পাত্রে উপর নির্ভর করে। বুঝানীয় মহিলাদের ‘পদ’ অনেক বাঙালীর ভাল বা লাগাই সম্ভব, আবার আমাদের দেশে বহু বুঝানীয়দের ভাল বা লাগিতে পারে, সেকালে আমাদের দেশের লোক যে শুভ ভাললাসিত, একালে আমাদের দেশের লোকের তাহা ভাল বা লাগিতে পারে,

স্রোতার ব্যক্তিগত শিক্ষা, কৃতি ও অভ্যাগেব উপর কোন আত্মিক ভাল লাগা বা না লাগা প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। এই দিনেও তিনি হেমচন্দ্রের কবিতার উচ্চ প্রশংসা করেন। আমি ঔৎসাহিক বলিয়াছিলাম, এ যুগে অনেকই মতীয় যুগের সৌন্দর্যের কোন সম্ভাবনা রাখেন না। হেমচন্দ্রের কবিতা বিভিন্নচন্দ্রের যুগে যেমন সমাদৃত হইয়াছিল, এখন সেজন্য সমাদৃত হয় কি না সন্দেহ। আমার নিজের মতের কোন সন্দেহ নাই বলিয়া আমি হেমচন্দ্রের জীবনীতে লক্ষ্য প্রদত্ত সাহিত্যসমালোচকদিগের অভিন্নত লক্ষিত করিতেছি, কিন্তু আধুনিক জীবিত মনীষিগণ তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কি অভিন্নত পোষণ করেন, তাহা প্রত্যাশা করিয়া দিলে ভাল হয়। উহা হইত আধুনিক পাঠকগণকে হেমচন্দ্রের কাব্যের আলোচনার প্রবৃত্তি করাইবে ও হেমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক যুগে যেমন, এ যুগেও সেইজন্য বখাযোগ্য। সমসাময়িক লোক কহিবেন; আরও কয়েকজন সাহিত্যিককে এইজন্য অভিন্নত লিখিয়া বিবাহের মন্ত্র অঙ্গুরোধ করিয়াছিলাম। কামিনী রায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া যিতে প্রতিজ্ঞিত হইয়াছিলেন।

বাঁকী ক্রিয়ার সময় তিনি বলিলেন, “আমার ‘অশোক-সদীপ্ত’ আপনাকে বিদ্যা কি?” বালক পুত্র অপেক্ষের স্বর্ণমোহনপুত্র পুত্র শোকমুগ্ধ হইলে কবি যে ক্ষুদ্র শোককবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন তাহাই এই পুত্রিকার সঙ্গীত হইয়াছিল। পুত্রকথাখনি পূর্বে পাই নাই তন্নিমিত্ত তিনি উহার এককণ্ড আমাকে দিলেন। কবিতাগুলি অতি স্বর্ণমোহন, কিন্তু উহার সূত্র কত তাহা কয়েক মাস পরে দরমামা করিতে পারিলাম। ছন্দ মানে আমার নব বংসর বয়স কোষ্ঠ পুত্র অমলচন্দ্রকে জনকজননী নিজ কোড়ে তুলিয়া লইলেন। সেও অপেক্ষের মত আগাগোড়াইটলি রোগে অল্প কয়েকদিন মাত্র জুড়িয়া অকস্মাৎ আত্মবিগ্রহে ছাড়িয়া গেল। শেষ দিনও সে প্রশান্ত চিত্তে হাস্য বসন্তা লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে সাধনা দিয়া বলিয়াছিল, তাহার কোনও কষ্ট নাই, তাহার মন্ত্র আমায় খেদ কান্দার না হই এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তম্ব বালক গভীর আনন্দে “হা এসেছে, হা এসেছে” বলিয়া জনকজননীর কোড়ে চলিয়া যায়। তাহার কণ্ঠগুলি কণা, কণ্ঠগুলি বাসন্তীর কামিনী রায়ের কিশোরবয়স পুত্র অপেক্ষের সহিত যেন মিলিয়া যায়। অমলের পরলোক

প্রয়াণের পর ‘অশোক সদীপ্ত’ পুনঃ পুনঃ পাই যে সাধনা ও শোকবিবিক্রিত আনন্দ পাইয়াছি, তাহা আর কোন প্রবেশ পাই নাই। যে ভাষা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, যে বাঁকী উচ্চারণ করিবার শক্তি নাই, তাহা যেন কবি এক শব্দীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই চরুচরিত্র বংসরের মধ্যে এই ক্ষুদ্র কবিতা-প্রবন্ধখনি যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

আমার কোষ্ঠ পুত্রের স্বর্ণমোহনপুত্রের পর আমি গোকে উদ্বৃত্ত হইয়াছিলাম। শবীর ও মন উভয়ই ভগ্ন হইয়াছিল।



কামিনী রায়।

বেটুকু কর্তব্য সম্পাদন না করিলে নহে তথ্যভিত্তিক আর কিছুই করি নাই। গুটী বংসরের মধ্যে আর কবির সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।

হেমচন্দ্রের জীবনচরিত্রের শেষ পরিচ্ছেদগুলি লিখিবার সময় আগর হইল। আমার কবি কামিনী রায়ের শরণাপন্ন হইতে হইল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তন্নিলাম তিনি শিল্পও গিয়াছেন। ‘নবান্ধার’-সম্পাদিকা ৮মুদ্রনালিনী রায় জৌহুরীর নিকট হইতে তাঁহার প্রিয়তমা লইয়া তাঁচাকে পত্র লিখিলাম। তিনি কামিনী রায়ের কবিতা তাঁচাৰ পিণ্ডামদ বেলতলা রোড হইতে নিম্নোক্ত পত্র লিখেন।

৪৩৭৪ আদি উঠা 'বিচিত্রা' ও 'পথ' কবিতা সম্বন্ধে কবিতা
অনুবর্তিত্ব করা। নিম্নোক্ত পত্র কবি আদির প্রার্থনা
মুদ্রণ করিয়াছিলেন।

১৯১৫ সালের ১০ই, জানুয়ারি, কলিকাতা
৩৩শে ফাল্গুন ১৩৪০

কবিগণঃ

আমাদের ১৯১৫ সালে প্রকাশিত পত্রগুলি সেই গ্রন্থের সাজাই
পাইলাম। অনেক বইয়ের, আদি আমাদের যে পত্র গ্রন্থেরা নিম্নোক্ত
এক পত্র সাজাই ১৯১৫ সালে গ্রন্থের যে পত্রগুলি পাইয়াছি তাহা
আমাদের ১৯১৫ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে



কবিতা (১ম খণ্ড)

ও ৪৩ পাইয়াছিলেন। এরূপ আমাদের নিকট হইতে কোন পত্র না
পাইয়া এবং যদিও অনেক কবিগণ আদি না দেখিয়া একই বিন্দু ও
গিষ্ঠিত হইতেছিলেন। আদি কবি আদির এ চিত্র আদি পাইবেন।

বিচিত্রা বাক্যগুলির স্তি হইতে হয় তাহাতে আদি কোন
আদির নাই। কিন্তু উহা যে তাঁহার বাক্য ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে
আদির লিখিত ও পত্রিত হয় তাহার উদ্দেশ্য থাকে উচিত। সন্দেহের
বিনোদ আদির ভাল করিয়া এবং অল্প আদির দেখা হইতে। আদির
শিক্ষণগুলির একটি গ্রন্থের, তাহাতে আদি এবং আদির বাক্য
আদি লিখিত নাই। আদির লেখকের আদি গ্রন্থের কলিকাতা
হইতে পারে, কিন্তু বিস্তারিত পত্র না।

আদি যে কোন একজন আদির আদির এ বিধে কথা হইতে
পারে। বিচিত্রা ১৩৪০ ও ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে

আদি পত্রিকা আদি ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে
কোনটির আদি এ পত্র হই নাই, সেই আদির আদি ও ১৩৪০
সালে হই নাই। সন্দেহ হই নাই। আদি ১৩৪০ সালে ১৩৪০
সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে
উক্তকালের ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে

আদি ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০
সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে

কবিতা
কবিতা (১ম খণ্ড)

অতঃপর একদিন ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে
সম্পাদক শ্রীমতী উপেন্দ্রনাথ প্রকাশনাধ্যক্ষ মহোদয় লইয়া
কবিগণের আদি-আদির কবিতা লিখিত। তিনি তাঁহার
পত্রগুলির আদি ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে
কবিগণ "আদিগণের" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ কবিগণের
তাহা উপহার দিলেন। তাঁহার আদিগুলির সহিত প্রকাশের
অল্প কতকগুলি কবিগণের বাক্য কবিগণের নিমিত্ত চাহিয়া
আনিলাম। দেখিলে আদিগণের ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে
কবিগণের অনেক আদি পত্র তিনি উপহারের সহিত
আদিগণের সহিত আদিগণের আদি করেন। ১৩৪০ সালে ১৩৪০
সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে
পত্রের ঠিক কবিগণ লন কিনা তাহা আদি নানা প্রশ্ন উপহারকে
ভিত্তাস। করেন। তাঁহার 'দীপ ও ধূপ' সঙ্কে কোন বাক্য
লেখিকা নাকি লিখিয়াছিলেন, কবিগণের লিখিত না ছাপিলেই
ভাল হইত, উহাতে তাঁহার লিখিত লিখিত হইবে। কিন্তু তিনি
লিখিলেন, উহার উদ্দেশ্য আছে। তাহা তিনি লিখিত কবিগণের
লিখিত কবিগণের। তাঁহাকে কবিগণ হইতে পত্রিতে
লিখিলেন। তিনি তাঁহার আদি আদির আদির লিখিত
কবিগণের পত্রিতে :—

আদিগণের

আদি ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০
সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে ১৩৪০ সালে
কি যে তাহা হইবে, কি যে হইবে,
কি যে তাহা হইবে, কি যে হইবে,
কি যে তাহা হইবে, কি যে হইবে,
কি যে তাহা হইবে, কি যে হইবে,

যাহক কিছু চিত্তরত সর্বদেবে কালে
মানবমাত্রেঃ যত্মমণে,—
কখনো কখনো চোঁক কবে আর স্তরে
শব্দেতে বহুঃ প্রাণে প্রতিধ্বনি কালে,
কালে কহা করনে নাই কালে,
কীবাধে অলসারে যার পূরে ।

সেই চিত্ত অমরতা গাহি,
সে চিত্তে সত্যমেরি ধানী :
নিজবসা করতা বাঁতে নাই ।
হৃদি যোহ কোনো কৃত নীত
পূরে তাহা থাকে কোনো দিতে
সব কটা তাই রেখে নাই ।

আমার ভাবন

আমার ভাবন হই না লয়ে যত,
আমার বসনেত হই নাই পায় যত,
পদে যোহ নাই পদে পদে কবিতা,
অনুপ্রাণিত পদে হিঁক অলসার
হই লয়ে, সেই ভবে বসে যেনে
বসে চোঁক । এ কলে স্তব কিছু দেখা ?
যে কহা এসেছে যেনে লিখিলি সোনা
যেনে সত্য পূতে : পদে যোহ যোহা
করি নাই পুণ্যকার : যেনে লস্কানে
ভবে করি নাই প্রাণে লোপ-পতনে ।

কোনো সেকেন্দ্রে কালো চোঁক সোনা বস
কলস, বিজ্ঞান-কলস করিলে পূ
সমকলনেত আস । তার কৌ কিছু
ছিল না প্রকাশ্য কলস । জনতার পিত্ত
হুট নাই লগলগ । অতলে বিজ্ঞানে
লা সেকেন্দ্রে আশা তাহা ছিল না ত বসে,
লা সেকেন্দ্রে বসিলে লগলগ কলস
হুটলগ লগলগ কলসে কলস ।

আমরা এই কবিতা গুটে 'নিচিআ'র ছাপিবার কল লইয়া
আসিলাম । কামিনী রায় আশা করে তাঁহার জননীকে কবিতার
অসিলাস ।

টির একটি সংক্ষিপ্ত কবিতা লিখিয়া দিতে গেলেন । লিখিত
কৃত কবিতাসহ কবিতা ১৩১৭ সনের 'নিচিআ'র
প্রকাশিত হইল ।



কামিনী রায় (লিখিত সনে) :

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিলের মধ্যে আমি রাজকোষাধ্যক্ষের
দিল্লী গাই । সেখানে অক্টোবর মাসে আমায় প্রথম কবিতা
পূত্র, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কলকাতার মাসে আমার প্রাণাধিকা
বৌদ্ধি এবং পরবর্তী মার্চ মাসে আমার পরমপুত্রনোহা
জননীকে হারাই । এই সকল পারিবারিক বিপদের জন্য
তাঁহার নিকট আমি আর গাইতে পারি নাই, তখনও তখনও
সত্য-সমিতিতে বেগা হইয়াছে মায় । তিত্ত বেগা না হইলেও
আমি প্রাই তাঁহার কাব্যগ্রন্থাদি পাঠকালে তাঁহার সান্নিধ্য
উপলভি করিতাম এবং তাঁহার আকস্মিক বিরোধানে আমার
মাতৃবিরোধকাতর হইয়ে আমি যিতীয়বার মাতৃবিরোধবাধা
অনুভব করিয়াছিলাম ।

কবি এন্টনি-সাহেব

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

কলিকাতার দিগ্বজ্রে সুপরি-পাড়ার এন্টনি-বাগান পেন নামক একটা গদি আছে। এই অফিসে এন্টনি-নামক একজন পটুগিজ বাস করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে এই গদির নাম “এন্টনি-বাগান পেন” হইয়াছে। ইংরাজ-রাজত্বের পূর্বে কলিকাতা, বেহালা-বড়িয়ার প্রাকৃতিক সার্বভৌমতা বাহুরের ভবীসারী ছিল। উক্ত এন্টনি-সাহেব তাঁহারের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। এতদ্বিধা তাঁহার লবণের ব্যবসা ছিল। লালদিগর উত্তর-পূর্ব দিকে যেখানে এখন “ওয়েস্ট-এন্ড-ওয়াচ কোম্পানীর” (West End Watch Co.) সেকান আছে, সেখানে সারবা-চৌধুরী বাহুরের বাড়ী ছিল। এন্টনি-সাহেব এই বাড়ীতে বসিয়া কাছাড়ী করিতেন। সারবা বাহুরের ৬০০০০০-নামক বিগ্রহ ছয় মাস বেহালা-বড়িয়ার ও চর মাস এই কাছাড়ী-বাড়ীতে থাকিতেন। ৬০০০০০ের লবণ কাছাড়ী-বাড়ীতে বিশেষ সমারোহ ও ভাণ্ড-পেশা হইত।

১৬২০ খ্রীস্টাব্দে, ২৪শে আগষ্ট, বসিবার ভব-চার্জক কলিকাতার আসিয়া উপস্থিত হন। এই দিনট ইংরাজ-রাজত্বের শুরুরাত। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে ১০ই জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। জেনারেল পোস্টঅফিস (General Post Office) হইতে ফেয়ারলি প্লেস (Fairlie Place) পর্যন্ত স্থানে ভব চার্জক মোরা ও অস্ত্রস্ত্র ভ্রমের গুলাম কবিরাছিলেন।

একদিন সারবা বাহুরের কাছাড়ী-বাড়ীতে ৬০০০০০-এ মাপ-পেশা হইত, এমন সময় ভব চার্জকের কর্মচারিগণ সেই স্থানে ভ্রমাসা দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহার ক্রিম্ভান বসিয়া কাছাড়ী-বাড়ীতে প্রবেশ করিতে অস্বস্তি না পাওয়ার ভব চার্জক আসিয়া এন্টনি-সাহেবকে বোঝানত করেন। এন্টনি অনেক রূপে সারবা বাহুরের অস্বস্তি-রূপে ভ্রমাসনপথে দিয়া বাড়ী-নির্দাশ করিয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন। মৃত্যুকালে এন্টনি-সাহেব বহু টাকা রাখিয়া গান। তাঁহার ভ্রাতা পোন্ট ছিলেন, কলি-এন্টনি (Cally Antony) ও হেনসমান-এন্টনি (Henaman Antony)। এই পোন্ট

এন্টনিই কবি হইয়াছিলেন। কলি-সাহেব শিতাঘরের সন্নিহিত অল্পে টাকা লইয়া পটুগালে গমন করেন। অবশিষ্ট অল্পেই টাকা লইয়া এন্টনি সাহেব এসেপেট আত্মীয় বাস করেন।

ভ্রাম্যমাণ-নিবাসী দৌলদিগী-নারী একটা ভ্রাম্য-কস্তার রূপে মুক্ত হইয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া পোন্টপাড়ার নিকট-বর্তী পরীটার বাগান-বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। ভ্রাম্য “বাস বাসে ভের পার্শ্ব” করিতেন। এন্টনি সন্তোষিত হইয়া বাসভার বহন করিতেন। এন্টনি স্বভাবতঃ বিলাসী ছিলেন। ভ্রাম্য-কস্তার সহবাসে থাকিয়া তিনি হিন্দুর উপবোধী আহার করিতেন ও কাশড়-চোপড় পরিতেন। ক্রমে ক্রমে নিজ বাড়ীতে যাত্রা ও কবির দল দিয়া এবং বিলাসিতা প্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি নিঃব হইয়া পড়িলেন। ভ্রাম্যের নিকটে এন্টনি বিলম্ব বাহালা-ভাষা শিখিতে লাগিলেন।

অংশেবে এন্টনি-সাহেব কবির দল করিবার ইচ্ছা করিলেন। ভ্রাম্যকে এই কথা বলিলে তিনি তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। এন্টনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি গোরক্ষনাথ বোধী নামক একটা লোককে মাসিক ২০ টাকা বেতন দিয়া বাধনবার নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে পাঁচ ছয় আসর তিনি কবি-পান করিলেন।

(১) তেলিনীপাড়ার ভোলা ময়ুরা ও এন্টনি সাহেব

তেলিনী-পাড়ার বাবুঘো বাবুরা অত্যন্ত শব্দভাণ্ডার। তাঁহার একবার ৬০০০০০-র সময় ভোলা ময়ুরা ও এন্টনি সাহেবকে বাধন করিয়া তেলিনী-পাড়ার লইয়া দিয়াছিলেন। এন্টনির আসরে বাধিবার সময় উপস্থিত হইল। গোরক্ষনাথ বোধী এন্টনির বাধনবার ছিল। এন্টনি তাহাকে আশ্বস্তি পান বাড়িতে বসিলেন। গোরক্ষনাথ কহিল, “আমার তিন মাসের বাধিনা পাওনা আছে। এই টাকা অগ্রে না দিলে আমি আগমনীয় পান বাধিব না।” এন্টনি কহিলেন, “কলা বাবুরের নিকটে প্রাতঃকালে টাকা পাইলেই তোমাকে দিব।” তথাপি গোরক্ষনাথ তনিল না। এই সকল কথা

তোলানাথের কর্ণপাচর হইবার্য তিনি ঐক্যনির নিকটে
গেলেন। ঐক্যনি ও তোলানাথ আসরে বসিয়া বিবাহ ও
পাশাপাশি করিতেন, কিন্তু আসরের বাহিরে তাঁহাদের পরস্পর
পরম সৌহার্দ্য ছিল। তোলানাথ বলিলেন, “ঐক্যনি !
গোরক্ষনাথ পান বাহিরে না, বলিতেছে ; এখন উপায় কি ?”
ঐক্যনি কহিলেন, “আমি স্বয়ং গমন বাহির। যা জগদেব্য
প্রতি যদি আমার বর্ণার্থ তত্ত্ব থাকে, তাতা হইলে তিনিই
আমার সুখ বিধা গান বাহির করিয়া দিবেন।” ইহা বলিয়া
আসরে বাসিয়াই ঐক্যনি এই গান বলিলেন। ইহাই তাঁহার
জীবনের প্রথম গান :—

(চিত্রক)

জল, গুল্ম-কান, মহাভাষা, মহিমা কান কান।

(পর চিত্রক)

একবার হুঁত হুঁত হ'লে যে ভাবে না তোলায়,
হুঁত ভর ভর ভর-সিক্ত-পার।

(কুণ্ডল)

না জই পদে এই ভবের কুণ্ডল
হুঁত হুঁত হুঁত হ'লে বিপদ-কল,
চাকি হুঁত কোষের না, হুঁত কোষের না ;

(কেল্ল)

তু সত্যের লুপ্ত হইলে না যা,
আমার লুপ্ত কোষের না যা,
পাখোয় গুল্ম হুঁত হুঁত, হুঁতের লুপ্ত এই কি না ?

অতি হুঁত হুঁত হ'লে
আমনিও হুঁত হ'লে আমার লুপ্ত-পার,

তোলায় লুপ্ত কোষের পাখোয়-কুণ্ডল

লুপ্ত কোষের কোষের।

(কল্ল)

কল্লকল্ল ! আম আমার লুপ্ত কল্লকল্ল কি না,
কল্লকল্ল না কল্লকল্ল হুঁত হুঁত কল্লকল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল,

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল
আমার লুপ্ত কল্লকল্ল কল্লকল্ল, কল্লকল্ল কল্লকল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

(কল্ল)

নাহ কল্লকল্ল কল্লকল্ল, কল্লকল্ল কল্লকল্ল

(২৪ কুণ্ডল)

না হুঁত লুপ্তকল্ল-কল্লকল্ল, লুপ্তকল্ল লুপ্ত কল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল
না কল্লকল্ল কল্লকল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল
কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

(২৪ কেল্ল)

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

(২৪ কেল্ল)

না কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

(২৪ পর-চিত্রক)

একবার কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

(২৪ কুণ্ডল)

না কল্লকল্ল-কল্লকল্ল কল্লকল্ল, কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

(২৪ কেল্ল)

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল কল্লকল্ল

(২) বাগবাগানের ভোলা-ময়রা ও এটনি-

সাহেবের কবি-লড়াই

একবার বাগবাগানে বাগ্‌দাদার ভোলামাথ ও এটনি-
সাহেবের কবি-লড়াই হইতেছিল। এটনি-সাহেব স্বয়ং
জুনা সজিয়া ও ভোলামাথকে শিব করান করিয়া এই শাস্ত্রীয়
প্রকৃতির উত্তর দিতে বলিলেন :—

যে নজি হ'তে উৎপত্তি, সেই নজি তোমার পত্তি কি কাণে,
কহ দেখি ভাই ভোলামাথ ! এর ছিলে বিহলে ।

জান না কি শিব : আমি তোমার শিখায়ে,

তোমার দ্বন্দ্ব হ'লে আমি, এখন হলেম তোমার রক্ত ।

লম্বা-বন্ধ-কালে, বিব পান ক'রেছিলে,

তখন জেতছিলে জুনা হ'লে, তখন কর আশি ।

চলে ছিলে কিশানে, বাগানের চক্করনে,

সেই দিব কি কুসে মাঝে বলে ছিলে জননী !

ভোলামাথ এই শাস্ত্রীয় প্রশ্নের জবাব দিতে না পারিয়া
অকৃতাবে ইহার জবাব দিয়াছিলেন :—

(ওরে) আমি সে ভোলামাথ নই,

(আমি সে ভোলামাথ নই)

আমি মরজা ভোলা, হুজর রোশ,

বাগবাগানে হই ।

চিহ্নাধারের চাম চিহ্নি ভাঙনা-খোলায় তাজি নই ।

হামি যদি সে ভোলামাথ হই,

মথাই পূর ভোলা ০ ০

আবার ০ ০ পূর কই ।

মেজা আমার খই, মেজা গিটারের খই,

পেরি(১)এর সুখে গিরে গলে লাগে খই,

কাতে বাগবাগানে খাল, আম তোমার বিদ্যে জ্বাল,

শক্তি ওলটা নিজে খাটা : হ'লে জল-দই ।

(৩) ভোলা-ময়রা, এটনি-সাহেব ও

রাজা হরিনাথ*

রাজা হরিনাথ কবি-গাহনা শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

১। বাগবাগানের হজরাত সিরাজ টুটু হইতে গম্বাতিয়, এক মাছকী
ডিফ হইতে বাগবাগানের টুটু পর্যন্ত এই চকু-লীমায় মধ্যে পেরিন্ গার্ডেনের
বাগান (Perrin's garden) ছিল। এই গানেই প্রাক্তন মেট্রোপলিটন বটান-
বাড়ী ছিল। এই স্থানে এখন "সরকারী বাগান" বলায় থাকে। এই স্থানেই
এখন শ্রীমত হিলিস রাজা হরিনাথের চিত্রের তথ্য ও শ্রীমত নৃসিংহের বস
মহাপ্রভুর বাড়ি ও প্রবন্ধের কল হইলো ।

২। রাজা হরিনাথ, গগাওন মেট্রোপলিটন প্রভিন্স কোথায় কবিগাহবাগান-
বিহারা কাটুবাগুর পোষ্ট, রাজা মোকামেরা পুত্র ওয়া কর্তৃক মাহাত্ম্য
১৮৬৫-৬০ নবী মাহাত্ম্যের মাহাত্ম্য ।

তাহার কবিগাহবাগানের বাড়ীতে প্রত্যেক বৎসর ভোলা-ময়রা
ও এটনি-সাহেবের কবি-গাহনা হইত। একবার উভয়ে
তাহার বাড়ীতে গাহিতে গিয়াছিলেন। রাজা বলিলেন,
“ভোলামাথ ও এটনি ! তোমরা বাগালা-মেখে অনেক স্থানেই
গিয়া থাক। কোন স্থানে কি ভাল জিনিস দেখিয়াছ, তাহা
বল।” এটনির উত্তর শুত ভাল হয় নাই এবং সে উত্তরও
দুঃখের পরিণতি পায় নাই। ভোলামাথ তৎক্ষণাত্ এই উত্তর
দিলেন :—

মহানদীরের সুখ ভাল, পুলনার ভাল নই,

গাভার ভাল খাত-কীর, বাগ্‌দাদার ভাল নই ।

কুমারের কীর-পুত্রী ভাল, মালমের ভাল নাই,

উলার ভাল ধান-বাগ, মাহিনার ভাল নাই ।

চাকুরের খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই,

মেট্রোপলিটনের খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই,

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

মাহিনার খণ্ড ভাল, মাহিনার ভাল নাই ।

(৪) বাগবাগানের এটনি-সাহেব ও ঠাকুরদাস সিংহ

বাগবাগানে ভগ্নপ্রাচীন গাঙ্গুলী মহাপ্রভুর বাড়ীতে

একবার এটনি-সাহেব ও ঠাকুরদাস সিংহের কবি-লড়াই

হট্টাছিল। কবির গ্রাম বহু, ঠাকুরদাস সিংহের সঙ্গে
বান্দনার ছিলেন। রাম বহু এটনিকে লক্ষ্য করিয়া গান
বাঁধিলেন :—

কল হে এটনি ! আমি একটা কথা শুকুত চাই,
এক এ বেশে এ বেশে তোমার গারে কেন ফুলি বাট।

ইত্যাদি।

এটনি ছাড়িবার লোক নহেন। তিনি তখন সুপের
মঠন এই জবাব দিলেন :—

এই বালাগার বালাগী। বেশে আমনে মাটি,
হ'বে ঠাকুরসিংহের বাগের মালাই কুড়ি চুপি খেড়েকি।

ইত্যাদি।

পুনর্বার গ্রাম বহু গান বাঁধিলেন :—

গরম, দিবা দুই কুলঙ্গর বাগা দুড়ানি,
ও তোমার পাখী-নাচেনে কলকত পাবলে গালে লেবে চুপকাই।

ইত্যাদি।

এটনি এইরূপে টোহার জবাব দিলেন :—

কুঁড় আন কুলক কিংব লেব নাই হে তাই,
তলু বামে। ফের বাহুর লেব, এও কথা শুনি নাই।

আবার খোকা যে, বি'জর হরি সে,

ঐ বেব প্রায় বিড়িয়ে হ'য়ে,

আমার হানক-জনম লক্ষ্য হ'বে যদি বাগা চরণ পাই।

(৫) কান্দীমবাজারে ভোলা ময়রা ও এটনি-সাহেব

একবার কান্দীমবাজার-রাস্তাবাড়িতে ভোলা-ময়রার সহিত
এটনি-সাহেবের কবি লড়াই হইয়াছিল। এটনি-সাহেব
কোঁর্দা-চুপি ছাড়িয়া বালাগীর বেশে আসরে ঠাঁড়াইয়া বালাগী
কাধার ছড়া বাঁধিতেছেন ও গান ধরিতেছেন, ইহা দেখিলে
বিশ্বয়জনক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। শুনিতে পাওয়া যায়,
এটনি অত্যন্ত পেটুক ছিলেন। খনাচা লোকের বাড়িতে
গাধিতে বাইলে এটনি আকর্ষণ আহার করিতেন। ব্রাহ্মণের
সাহসর্গে খাওয়ার বালাগীর মত তাঁহার আহার ও আচার-
ব্যবহার হইয়া আসিয়াছিল। একথা ভোলা-ময়রা স্বরচিত
কবিতার প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ভোলাবাথ আসরে
ঠাঁড়াইয়া গিয়াছেন :—

পেটুক কিনিবী খাটা, পেচ কাটা,

খাটা কি লেবে কলিঙ্গর।

খাটা দিলে খালা, সাহেব দিলে,

হ'লো কান্দীগী,

এখন কবির লেব এসে দিলে

খাটা পেটের কালাগী।

এক বেলে ঘা, কণ্ঠ চেমন চাই,

এ খাটা কেড়ের ছেড়, লেবক ছেড়, (১)

কবির লক্ষ্য ধরিতে।

কেউ ক'রেনে কান্দিগী, কেউ বা খান্দিগী,

এলেবের খোর কেউ বা ক'রেনে কলখিই,

খার এ খাটা লুতার খাটা কুখোর লোকে

• • • বাচতে এসেছে।

(৬) তেলিনী-পাড়ার ভোলা-ময়রা ও

এটনি-সাহেব

একবার তেলিনী-পাড়ার ব্রহ্মসিদ্ধ সন্ন্যাস-প্রিয় ষাঁড়ুহো
বাণুয়ের বাড়িতে ভোলাবাথের সহিত এটনির কবি-লড়াই
হইয়াছিল। এটনি আপনাকে 'কলক' ও ভোলাবাথকে 'জুর্গা'
সাজাইয়া গান ধরিল :—

এলা শিব বাজল !

তরল-সামন জারি বা মা,

আমি কেতে কিনিবী।

ইত্যাদি।

উক্ত গানটা শুনিয়া ভোলাবাথ জুর্গা সাজিয়া এটনিকে
উত্তর দিলেন :—

কুই জাং-কিনিবী, মগদ-জাং

আমি পালক বাকো বহতে।

(তোকে পালক বাকো তহাতে)

লেনু হে জই, বলি শব্দ,

কুই হে কই, মগদ,

তোমার কি ইষ্ট কলিকুল,

তহাৎ ও কুই নিগল

ঈজলসুংগ নিকতে।

(৭) কান্দীমবাজারে রাজা হরিনাথের নিকটে ভোলা-
ময়রা ও এটনি-সাহেবের আত্ম-পরিত্র প্রধান

রাজা হরিনাথের মননে ভোলা-ময়রা ও এটনি-সাহেব

(১) কবি হেন্দুধারন এটনি-সাহেবের শিষ্যের, এটনি সাহেব লক্ষণর
বন্দ্যার করিতেন। এই 'হেতু', 'লেবক ছেড়' কথা হইয়াছে।—লেখক

প্রত্যেক বঙ্গের কাশ্মিরবাহাণে তাঁহার বাটীতে কবি-গান করিতে হইতেন। কবি-গাহনা শেষ হইলে রাজা হস্তিনাথ ভোলানাথকে বন্দিলেন, “তোমার আদ্য-পরিচয় শীগ্ৰী” তখন ভোলানাথ করিলেন :—

আদি মরহা-ভোলা ভিঁজাই-বোলা

১ গুণ্য ১ নদী নদী নদী নদী

কুয়াইনে বাব নাস বড়-বড় বড় নাস

১ গুণ্য ১ কল এই কল্যানি ভানি

বাই ভাতি হুঁড় বড় বড়-কল্যানে লোক মট

বাবনাস ভিঁজাই-মল্য

বাই ভোলা-বোলা এটনি-কিঁকিঁসি-বোলা

২০ ১২ ভাতি লোক লোক

কল্যানে-বড়-কল্যানে বড়-উড়-লোক-লোক

বড়-বড়-লোক-লোক

বড়-বড়-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

এই কবি-কল্যানে লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

(৮) ফরাসি-ভাষায় ভোলা-মরহা ও এটনি-সাহেব

একবার ভোলা-মরহা ও এটনি-সাহেব ফরাসি-ভাষায় কবি-গান করিতে গিয়াছিলেন। একখানি বাটীর দ্বিতরেই দুই দলের লোক বাসা পাউরাছিলেন। ভোলানাথ ও এটনি পরস্পর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু আসরে বাসিলেই কাহারও দিগু-বিদগু-জ্ঞান আকিত না। এটনি হাসিতে হাসিতে ভোলানাথকে “মরহা” বলিয়া তাঁহার ভাতি-নিজা করিলেন। তখন ভোলানাথও হাসিতে হাসিতে বন্দিলেন, “আজ আসরে গিয়াই ইহার জবাব দিব।” আসরে বাসিয়া ভোলানাথ গাহিলেন :—

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

লোক-লোক-লোক-লোক লোক-লোক-লোক-লোক

(৯) ভোলা-মরহা এটনি-সাহেব ও

বিজ্ঞানাগর মহাশয়

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের বাড়িতে গিয়া “উদ্ভট-কবিতা” সংগ্রহ করিয়া আনিতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন প্রেসিডেন্সী-কলেজের সঙ্কট-প্রোক্সের রাজকুমার মহাশয়ের মহাশয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কথায় কথায় তিনি ভোলা-মরহার কথা তুলিলেন। রাজকুমার বাবুর কথা শুনিয়া বিজ্ঞানাগর

(୧୪୪)

ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଗତି ।
ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଗତି ।

(୧ ଗିତ)

କଥାଟି ଯେହା ନା ଯାଏ, ହାତେଇ ଯାଏ ନାହିଁ ।

(୧ ପଞ୍ଚ-ଗିତ)

ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନବ ଗ୍ରନ୍ଥରେ
କହେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାହିଁ ।

(୧ କୁହ)

ହୁଅନ୍ତି ତ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗିତ-ଗିତ
କାନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଗିତ-ଗିତ ।

(୧ କେନ୍ଦ୍ର)

ମନେ ପୋହୁଣାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଡାକେ କୁହ ବାଣେ
ତାହେ ନବେଇ ଗଳେ ଗାଳିବେ ଗଳେ ।

(୧ ଗଳ)

ଆଜ୍ଞା-ଆଜ୍ଞା ମନେ ଗାଳି କି ଗିତ-ଗିତ ଗାଳି ।
କହେ କୁହ କୁହ କୁହ କୁହ କୁହ
କୋଳିରେ କୁହ କୁହ
ହାଲେ ଆଜ୍ଞା ହାଲେ ମନେ ମନେ ।

(୧ ପାଞ୍ଚ)

ଏ ଆଜ୍ଞା କୁହ କି କହେ ବିଶ୍ୱାସ

(୧ କୁହ)

ହୁଅନ୍ତି ତ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗିତ-ଗିତ
କାନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଗିତ-ଗିତ ।

(୧ କେନ୍ଦ୍ର)

କେତେ ଗୋ ଆଜ୍ଞା-ଗିତ
ଆଜ୍ଞା-ଗିତ କୁହ କୁହ
ମନେ ହେଉ ଏକ ଆଜ୍ଞା-ଗିତ ।

ଉତ୍ତର ।

ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଗତି ।
ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଗତି ।

(୧ ଗିତ)

ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଗତି ।
ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଗତି ।

(୧ ପଞ୍ଚ-ଗିତ)

କହେ ବହି ନାହିଁ ତାହେ ଗାଳିବେ
ତାହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ ।

(୧ କୁହ)

କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ ।

(୧ କେନ୍ଦ୍ର)

କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ ।

(୧ ଗଳ)

କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ ।

(୧ ପାଞ୍ଚ)

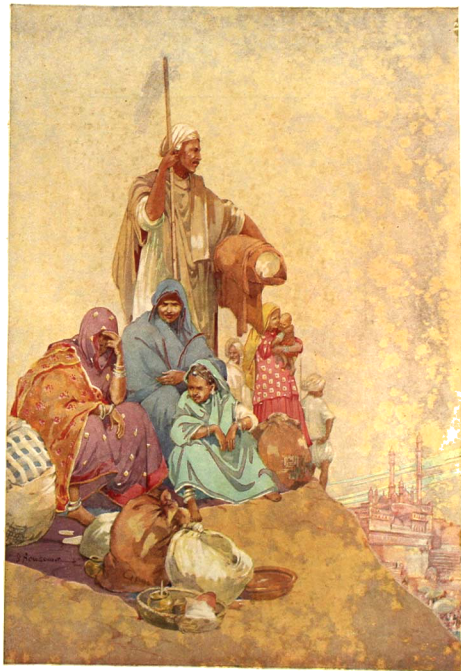
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ ।

(୧ କୁହ)

କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ ।

(୧ କେନ୍ଦ୍ର)

କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ
କହେ ଗାଳିବେ ଗାଳିବେ ।

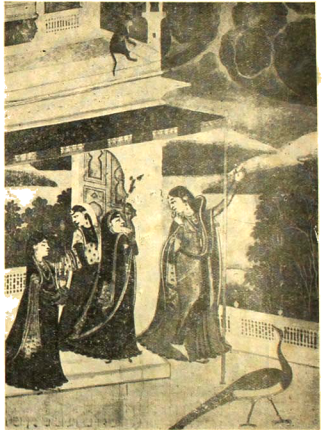


পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের চিত্রকলা

— শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ভারতীয় রূপশাসনানুসারে যে বিভিন্ন সম্পদ পূজীকৃত হয়েছে চিত্রকলাই তার ভিতর সব চেয়ে তলিল সমতা সঙ্গী করেছে। ধারাবাহিকভাবে চিত্রকলায় পরম্পরা পাওয়া গুল ত এবং যা কিছু পাওয়া গেছে তা নিয়েও কালগত ও দেশগত বিতর্ক কেনিধ হয়ে উঠেছে। রীতিগত বিচারও লাবাষ্ট্রভাবে আলোচনা-কেন্দ্রকে প্রবাহিত করে নি।

ঐতিহাসিক তারানাম বেধরীতি, বক্ষরীতি ও নাগরীতির উল্লেখ করে-ছেন। এতে উপলব্ধি হয়, ব্রহ্ম-ঐশ্বর্যের অঙ্গশাসন মধ্যেও চিত্রকলা ভারতে কখনও নীরস বা একচেত্রে হয় নি। তারানাম দেশগত বৈচিত্র্যেরও উল্লেখ করেছেন। তিনটি প্রধান চিত্রকর পশ্চিম, মধ্যদেশ ও পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। মধ্যদেশ হ'ল অনেকটা আধুনিক ব্রহ্ম-প্রদেশ-স্থানীয়, রামপুতানা হচ্ছে পশ্চিম-অঞ্চলের রীতির চমকুতি এবং পূর্বাঞ্চল ছিল পাল সাম্রাজ্যের বাসনা দেশ। বস্তুত: তারানাম ভারতীয় চিত্রকলায় ত্রিবিধ অঙ্গবান করে মধ্যাঞ্চলে এসবকে বক্ষ, সেব ও নাগরীতি বলে উল্লেখ করতে কুণ্ঠিত হন নি।



মধ্যাঞ্চল: রামপুত চিত্রকলা।

অঞ্চল এগুণে আদ্যায় কিছু শীলতার এই পরিপূরক রূপ-গ্রীষ্ম নানাবিধ বেধতে কুণ্ঠিত হই। প্রতিপনৈত লম্বহ ও সংঘব। বাসালার চিত্রকলায় কৌলীত্ব স্থলবিশেষে অবীকৃত হয়েছে, মধ্যপ্রদেশের সাগবান্ সংগ্রহ অন্তত হয়েছে এবং

পশ্চিমের নানা ভূভাগে অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিত্রকলায় একটা নতুন নব শেখের, সেটা বকে পাৎপুত চিত্র। বস্তুত: মধ্যাঞ্চল চিত্রকলাই রামপুত -এর নিয়ে বাতারে চলে

যাচ্ছে। অঞ্চল এ সব একান্তভাবে রামপুতানায় যে আদ্য তা নহ।

যাকে রামপুত-চিত্র বলে আধুনিক বর্ণে আলোচকগণ আদ্যহারা হন, তা নিয়েও অনেক গল্পে আশ্রিত হয়েছে।

দার বহুনাথ সরকার কিতুকাণ পুর্বে এই প্রেরিত চিত্রকলায়
বাজপুত-র সঙ্কেত সঙ্কেত প্রকাশ করে বলেন :-

"What Dr. Coomaraswamy calls the Rajput School of Paintings is not an indigenous Hindu product, nor has it any natural connection with Rajputana. It is the work of immature pupils of the old masters of the Mughal Court working in a less cultured atmosphere."

সরকার মহাপণের অধুনান্নেব লিখিত অভিলাষ আলোচক
একমত করেন না, সঙ্কেত বৈধ। তবে প্রেরিত আলোচনার



বাজপুত-চিত্রকলা : রাম।

বিভি হুইছে এই উত্তরপ্রদেশী চিত্রকলায় সমসাময়িক অস্তিত্ব।
মুদলমান বুগেই যোগল-চিত্র ও রাজপুত-চিত্র এই উভয়ের
উত্তরকাল; অন্ততঃ পূর্ণবর্তী যুগের রাজপুত-চিত্র পাওয়া
হল। অতঃ হস্তলিখিত লিখিত পুঁদিস মেহোই দিয়ে হিন্দু-
চিত্রকলায় কালক আরও প্রাচীন প্রমাণিত করার চেষ্টা
হয়েছে। তৈম পুঁখির ছবি বা রস ও বিলাসের নমুনা ঠিক

অবিস্মৃত রাজপুত-চিত্রকলায় মত ব্যাপার নয়। মুদলমানী
বলেছেন, বোষ্টন মুজিহাবের ও অজিত যোগ মহাপণের সংগ্রহের
রাজমালা চিত্রগুলি খাতি রাজপুত-চিত্রকলায় অধিতম নমুনা।
একটির ব্রহ্মকাল হুইছে যোগল পত্রাকীর শেষভাগ। কাজেই
বহুনাথ সরকার মহাপণের উক্তিকে প্রতিবাদ করার উপযুক্ত
ও সারবান্ বাগদলনা এ পথায় আবিস্কার হয়েছে যেন হয়
না। একজন পাশি ব্রাইন (Percy Brown) সাহেব
বলেছেন :-

"With the decline of Buddhism in India in the seventh century A. D. the art of painting appears to have come to a standstill and for nearly a thousand years except for a few Jaina book illustrations of the fifteenth century, there is not a single specimen of Indian painting revealed to us."

বস্তুতঃ রাজপুত-চিত্রকলা নামে পরিচিত চিত্রপথায়ের
উৎপত্তি, প্রকার ও ঐশ্বর্য লব্ধে নানারূপ গভীর সন্বেহ এই
জন্তই চারিমিক মুখর হয়ে উঠেছে। এ সব নিয়ে এ পথায়
বা আলোচনা হয়েছে তা অনেক সময় অকিকিংকর ও
আত্মবিরোধী। প্রতি পক্ষেই সে সব কটকে পরিপূর্ণ।
রাজপুত ঈশতার প্রকৃতি ও রূপভঙ্গ নিয়েও বিশেষ আলোচনা
হয় নি, বা হয়েছে তা একান্ত লব্ধ ও বহিস্খীন।

একজন শুভ ইতিহাস নিয়ে ধারা চর্চা করেন, তাঁরা হিন্দু
চিত্রকলায় বর্ণস্থলে আঘাত করতে ইতস্ততঃ করেন নি।
যোগল ইতিহাসে অজিত বহুনাথ সরকার মহাপণ এই জন্তই
বলেছেন, তিনি অনেক হিন্দু-চিত্র মুদলমান কর্তৃক রচিত
হয়েছে যেখানে পেয়েছেন :-

"I have seen some beautiful and genuinely old Indo-Saracen Hindu pictures which represent the elders of Mathura dressed and armed like Mughal courtiers going out to meet Krishna and Rama, advancing to the conquest of Lanka with his army marching in exact divisions with all the arms, equipment and transport of the Mughal Imperial army, artillery not left out."

সরকার মহাপণের উক্তিকে একান্ত উদ্ভট বলা যায় না,
অথচ অপর পক্ষেও বলবার অনেক আছে। মুদলমান
চিত্রকরের আঁকা দেবদুর্ভাগলির গলন যে সহজেই ধরা যায়,
তম্ এই কথাটাই তাঁর উক্তি হতে প্রমাণিত হয়। রাজপুত-
কলায় অসংখ্য নমুনার এরকমের বিরোধ পাওয়া যাবে না।
মুদলমান চিত্রকর কর্তৃক হিন্দু-বিষয় আঁকা বা হিন্দু চিত্রকর
কর্তৃক মুদলমান-বিষয়ে রচনা করা ভারতে বিশ্ববের বিবর

নয়। তারপরবের সময়টোয়, অন্ততঃ ধারা চিত্রকলার পক্ষপাতী ছিলেন, কখনও উৎকট ধর্মগত বৈষম্য নিয়ে আশঙ্কায় হন নি, বরং সম্রাট আকবর প্রভৃতি ইসলাম ধর্মের যে একটা দর্শনোন্মী নিক ছিল, তাকে পূর কজার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। 'আকবরের ধর্মকেও টিক মূলদান ধর্ম বলা চলে না। তিনি বিবাহাদি বন্ধনে একটা সাধারণ দর্শনপ্রায় ভারতীয় শৈলভার চমকান করেন। বাহালাসেনের বাসনাধরণও সামান্য, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যয়ন করতে ইতস্তত করেন নি। কাজেই চিত্রকলাদিক্ষেত্রেও কোন কোন দশা একটা সমৃদ্ধি পড়ে উঠা অস্বাভাবিক নয়।

অন্য এ কলাও বলা যোগ্যজন, হিন্দু শৈলভার যে একটা বিশিষ্ট ধর্ম ও প্রাণের 'আছে, তা' কিছুতেই মূলদানের কলসায়ী সাম্যের সবুজিতে নাযেনি। সেটা আনন্দেরই বিষয়, কারণ সাম্যবাদী উদ্দেশ্যের রচনাও এমন একটা রসবস্ত্র বান করেছে, যা অধিগারবাণী হিন্দুধর্ম বিচিত্র, বিভিন্ন ও উচ্চশির মৌলভতরকে কখনও বিকশিত হয়ে উঠেনি। এখনি করে সহজেই প্রাণপাত করেছে দুটি স্রোত—সাম্যবাদী ও বৈচিত্র্যবাদী। বৈচিত্র্যবাদীর রসসুধনা একান্তভাবে ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার সুরধার গণে গেছে এবং কোণাও উচ্চাসের অন্ধকৌরী রূপধানে নিজেকে বিকশিত করেছে।

হুঁজুগাজেম, এ দ্বিতলটি চিত্রকলাপ্রসঙ্গে পূর কম আলোচকই লক্ষ্য করেছেন। যোগল বরবানের ক্ষীত আড়বর, ধনপুট গর্গের উচ্চ পঙ্কতা, অপ্রাপ্ত প্রবের অনির নৈপুণ্য অশেষাকৃত রিক্ত অবহাওবার পাওরা গুণ'ত হবে। এই গুহুই বহুনাথ লসকর মহাপুর যোগল-কলার স্রোততা বিষয়ে পূর হয়েছেন। এই অস্ত্রই তিনি রামপুত-চিত্রকলা লক্ষ্য হয়েছেন :—

"The immature pupils of the old masters of the Mughal Court working in a less cultured atmosphere and for poorer patrons."

অন্য প্রাথমিকীয় সম্বন্ধ-সাবনা, অক্ষত রসপুষ্টির তাকনা ও আশ্চ-লক্ষণের স্ফূর্তা বর্ধের যে আলোক ও বেগার, যে উর্ধ্বভবের চমকান করেছে, তা যোগল বরবানের লক্ষ্যকৃতিক চক্রে পাওয়া বাবে না।

পশ্চিম হিমালয়ের রাজ্যভূমিতে অর্থাৎ তিরিচ-গাড় হুওয়াল হ'তে কাছার পর্যায় যে চিত্রপদ্ধতি চলে এসেছে, তাকে

এক কথায় রামপুত-শাফাফী বলা হয়। এর ভিতর কাণ্ডাই বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। রামপুত-চিত্রের সরল রেখাকৌশল, বর্ণের স্বচ্ছ ও গোছনীয় গটা এবং অক্ষনশ্রীর গুণ'ত ভল্লো যোগল-দরবারের সন্ত ও ক্রমমায়েসে খই হ'তে পারে নি। কাণ্ডার ক্ষীতির সৌন্দর্য্য বোষ্টন স্মৃতিস্ময়ের রক্ষিত মল ও রসবস্ত্রের চিত্রপদ্ধতিতে পরিষ্কৃত হয়। বস্তুতঃ কোন কোন বিষয়ে কাণ্ডার চিত্রকলা যেরকম আলোকের মত ভারতীয় শিল্পের প্রতিভাকেও মুক্ত করেছে। গাড় হুও-



ধরোয়া : রামপুত শাফাফী।

ধারের চিত্রকলা পাগাড়ী রচনার মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও রসবিজ্ঞান উন্মোচনে এবং দৃশ্যভঙ্গ অলঙ্কারের কৃতিত্বে বিভব-মুগ্ধ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে বোলারামের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পাগাড়ী শিল্পের কিছুটা ইংরাজ আমলের স্ফূর্ণ স্পর্শ হ'তে মুক্ত ছিল—অস্তর বস্তুগণের আঙ্গমনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই নিভাত হয়েছে।

দক্ষাতি পশ্চিম ভারতের চিত্রকলা বসন্তে পুণ্যতঃ এটো ভূতি খাবাই হুমান। বসন্তঃ এটো ভূতি খাবার ভিতর দিয়ে

সমসাময়িক পশ্চিম-ভারতের জীবনসম্পর্কের ছবি দিকই উন্মোচিত হয়েছে। বঙ্গদেশে চিত্রকলায় আছে ভারতীয় রূপ-



গোপাল চিত্রঃ

দীনার অসীম রূপ ও অসংখ্য-বেশভূষনিত হইল। অস্ত্রপের রূপ নিয়ে মন্থ হিন্দু শিল্পী এ যাকো অঙ্গুরাগিনীকে চিত্রাশিত করতে উৎসাহিত হয়েছেন। প্রাচ্য রূপকে চক্ষুখোঁড় করবার জেটা অগতের চিত্রশাস্ত্রে নতুন ভারতেই সম্ভব হয়েছে। অতি হৃদয়তম ভাবসমাবেশ, চমকাত্মক সাধনা ও পেশব রূপ-চর্চায় ভিতর দিয়ে সোপানমান হয়েছে রাগিণীকলনার বায়বীয় ধর্ম। সাধাবানী ও রূপপ্রেমী উপলব্ধীর মিলনই তা সম্ভব হয়নি। একমিকে সফাতিত হয়েছে তপোবনের মিত্র স্মৃতি, বোচাগের মাঠ, খোরদীলাপি এবং প্রাকৃতিক রূপবিজ্ঞানের মনস্ত সমাবেশে সঙ্গী কথন উৎসাহ। শ্রীকৃষ্ণের নিয়ে এসেছে, সমগ্র হিন্দু-চিত্রকলার ভিতর জীবন-মরুতের বহুস্বামী সমস্তা, দারভারী অকুসল ও অসীম গমক। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার ভিতর জোঁতিত হয়েছে মানব-জীবনের অসীম রূপসম্পর্ক ও রূপপ্রাপ্ত। এসব বোগল-চিত্রকলার জন্মস্থান। ঐশ্বর্যের অজগণী গোলাচলে ও সন্তোষ কঠিন শাসনে বোগল প্রাক্যের শিল্পমন্ডলে জীবনের অসীম বোগল-ভাটার প্রকমের অভিন্ন সম্ভব হয় নি। অপর দিকে বোগল-কলা নিয়ে

এসেছে দরবারের সুসজ্জিত চিত্রকলা। আবব-কাঁথার হিমোলিত শাসন ও কঠিন রূপবিধানের শৌহবেটনীতে জীবন মণ্ডিত হয়ে ফেনিল করে তুলেছে বিগলিত ও আড়ষ্ট চরিত্রকে। ভারতীয় আবহাওয়ায় তাত্ত্ব ও রূপত মূল্য ফলেছে। চৌধুরী কলার বিকৃত পট উচ্ছিন্নের উচ্চতা ও চমকাত্মক চমকাত্মক বেন গোলাচলা করে ভারতের বকে রূপসাধনার দ্বিগুণী সমাবেশে উপস্থিত করেছে। বোগলের বাহ্যসংস্কার রূপের খেলার সম্ভবনার ছিলেন। চীনদেশের বোগল-মন্ডল কাঁথার ভারতীয় অনিকোকে (Anio) নিয়ে রূপ শিল্পের মস্তুরের নাসক করেছিলেন। ভারতের বোগল দরবারেও হিন্দু রূপগর্ভের সমাদর সাধন ছিল না। রূপবিশুদ্ধ উপলব্ধির ভাঙে আব্বার পুনর্জন্ম হয়েছিল। সাধাবানীর বিরাট ও নিরুৎসাহ ঐশ্বর্য, মনস্তাত্ত্বিক প্রাতি বিদ্যুৎমিতা, জাতিবৈষম্যের বহুস্তরের প্রাতি নির্ধন দৃষ্টি বোগল শিল্পে এসে-



বোগল চিত্রঃ সাধাবানী

চিল বহুস্তরীয় মন বাস্তবতা। সমগ্রকণ্ড ও হিরটিংস স্মৃতি অনেকটা মূর্খ হয়ে যায় শিল্পীর আবহাওয়ায়। আব্বল

কতনের উচ্চ করতৃ আবরণ সমাপ, দৈর্ঘ্য আদৌ প্রকৃতি
মূলদাননি চিত্রকরণে বাসোয়ান, বননাগ, কেশবণা। প্রকৃতি
চিহ্ন শিরীর প্রকাশ হতে মুক্ত হতে পারেন নি। কিন্তু

রচনার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে আকৃতিক সূত্রাবির অবতারণা।
অপর দিকে দৈর্ঘ্য ও দৈর্ঘ্য সাধনার ঐতিকলক রচনার
সংযোগ সমাপ্ত হয় নি। এর ভিতরও প্রাণ ও আরণ্য
মুগ্ধে এই বাস্তবতার ক্রিয়া বিশিষ্টভাবে
দেটে উঠেছে।



শারী বহুত: বেণাল।

শিরীষাও পাতল কবি বিভাবীর গ্রন্থক চিত্রবৃত্ত করেছিল।
এবনিভাবে গড়ে উঠে মুক্তরোহে বেণাল রণায়ন—বা' কপনও
বা প্রত্যাহের সিদ্ধতা, কখনও বা বেবাদিত্তি দ্বাবান
কাক্তা দ্বারা ভারতীয় ভাবের গাণিচাকে বর্ণে ও ছন্দে বিচিত্র
করে তোলে। ঈশ্বরের ঈদিকতা যে বাস্তব-প্রিয়তার
ভয়নান করে, তার বশে ব্রহ্মী মুক্তক পরিণতি ঘটে ব্রহ্মী চিত্র-
শাপার, অর্থাৎ বেণাল ও গ্রন্থপুত-প্রতিচিহ্নে। ইউরোপীয়
সমসারামণও বেণাল-কণার এই বাস্তবপ্রিয়তা লক্ষ্য
করেছেন। পাদি ব্রাইন বলেছেন :—

"Realism is its keynote."

গ্রন্থপুত-রচনাক্ষেত্রে এই বাস্তব রচনার সম্পর্ক যে
প্রতিচিহ্ন সৃষ্টি করে, তার মূল্য উপাদান ছিল পরী-ভাবন।
কোন লেখক বলেছেন—

"When the artist represented realistic scenes of
rural life, his animal drawing indicated a knowledge of
nature surpassed only by the Japanese."

এ প্রশংসা সমাপ্ত নয়। অতি বিপুল ভাবে আকৃতিক

বেণাল-প্রতিচিহ্ন-রচনাও কেবল
(Portraiture) ভাববৃত্তি ও হবার
প্রকৃতি কিন্তু শিরীর বাণ পাওয়া যায়।
অপর দিকে গ্রন্থপুত-শিল্পেও ঐতিকলিত
সমসারামণিক বাস্তবতার চেটে ছ'টি চিত্র-
চক্র সৃষ্টি করে—একটা ছন্দে কাঙড়াচক্র,
অন্যটি ছন্দে গুরুচক্র। অন্যটি কিন্তু
চিত্রকলা মূল্যে বাস্তব-প্রিয় ছিল না।
ব্রাইন গায়েব স্বীকার করেন :—

"Unlike the Mogul the Rajput
artist was not by inclination a por-
trait painter, but probably owing to
the fashion set by the Mogul em-
perors he was responsible for a
considerable number of likenesses of
a very interesting type."



১৩৬ : ৩৪৮।

পট্টা জীবন, আলম-বৃক্ষ ও পৌরাণিক কাহিনীর মিত
জরী রয়েছে বাতপুত কদম্ব : আরণ্য-বাগা, বিকার-কাহিনী,
ভাবুর জীবন, ভয়োহাণ চম্পট ঘটা : কদিত হয়েছে যোগেশ-
শিরে। চাচা/ভোহের আদেশে বাতুর শিল্পীরা দুনা পাবা :
ও মতকে হস্ত ভবের ঝিকড়ে উৎসাহিত হ'ত। এসের বসনা
সেবে ইউরোপী : শিল্পীদেরও তাক দেখে গেছে।



কল্যাণ : বাতপুত পট।

"The Palm tree found against the sky or the
fleshy leaved plantains with its purple flower hanging
heavily : the golden Palm tree or the young red shoots
of the mango and all the numerous trees and shrubs of
the garden are to be readily identified in the pictures
of the Mogul school."

এমনি ভাবে দেখা যাবে, এ হুঁট চিত্রশ্রীতির চিত্তি বিভিন্ন
হলেও সবদাম্বিক বসে' সেকালের বিশাল চাহতায় জীবনে
এ ছোট্ট একটা সনান ভূমি অবলম্বন করে' অগ্রসর হচ্ছিল।
আলমবোহর বিষয়, পশ্চিম-ভারতের এ গুটি রীতিই পূর্বাঞ্চলে
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দ্বা-প্রতীচা
আলোচকের অক্ষ-ভবকার লেখক পশ্চিম-ভারতের রীতিকে
দীর্ঘাবধি থাকতে চলেছিল। ভ্রম্যমান পূর্ণ-ভারতের মাপকাঠি

প্রবর্তিত দেখতে পান। যোগেশের আলোচনে মধ্য ও পশ্চিম-
ভারত একটা মিশ্র শক্তির অঙ্গমান করে। পূর্বাঞ্চলের
রীতি নিজেও স্বাভাবিক করেই অগ্রসর হয়। এ অঞ্চলে
অনেক খাওবাহার হয়েছে এবং কলোপাহাড়ী আমলে ধ্বংস-
দীপার প্রবর্তনও সামান্য হয় নি। বিশ্ববিক্রিত প্রাচীন বিশ্ব-
বিজ্ঞানবর্ণনাকে নিশ্চিক করার উৎসাহও এ অঞ্চলে
দেখা গেছে। দোড় লানাকোর মধ্য, বস, উড়িয়া, আলম
এবং পূর্ণ-ভারতের অসুতম ধোরবহিতক নেশাপকে নিয়ে
পূর্ণ-ভারতীয় ঈদগা একটা মুক্তকর বস-বিজ্ঞান সৃষ্টি করে।
বহুত : ভাব্যাক্ষেপে প্রাক-ভারতীয় শিল্পের বান অদ্যাবধি।
কোন হুনিপুণ আলোচকের মত দোড় এক মতাবীতে বহু
মুষ্টি রচিত হয়েছে, পশ্চিম-ভারতের পক্ষে সমগ্র মুষ্টিগঞ্জ
যোগ করেও সে সংখ্যাকে অতিক্রম করা সম্ভব চলে না। এ
প্রবন্ধে আলমবোহর আলোচনার অবসর নেই। প্রাক-ভারতীয়
চিত্রকলাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে' সমগ্র বিচারের দ্ব্যপাত করাও
সম্ভব নয়।

যোগেশ বাসমাহসের প্রভাব এবং পশ্চিমের রাজপুত
হাওয়ার মধ্যবর্তী বা বাগা বৈশ্যক বা পূর্বাঞ্চলক অবনত
করতে পারেনি। নালন্দার যে কাশড়ের উপর চিত্রাঙ্কন হ'ত,
একথা চৈনিক সাহিত্য হ'তে জানা যায়। বাসলা সেনের ও
উড়িয়ার শোকচিত্র (folk painting) বৌ অদ্যাবধি
প্রভাবের মধ্যবর্তী অবত হয়ে আছে। মূলমতান প্রভাবে
সে সব জর্প হয় নি। সেগুলি অসুতম বা expressional
হয়। এ প্রবন্ধের সৃষ্টি মাত্র জগতের দর্পত্রই বহিত হচ্ছে।
প্রাচ্যকলীনা, চৈতন্যলীনা প্রকৃতি বিষয় পূর্ণ-ভারতীয় শিল্পের
হলে একটা স্বাধীন রীতিতে চিত্রিত হয়ে আসছে। উড়িয়ার
এখনও এ রীতি জীবন্ত ও প্রাণবান। ইউরোপের গ্রীণ
প্রদেশে অলস (Aibos) পাহাড়ে পাবসী শিল্পীরা ঐশ্বর্য
বৈশ্যক মুষ্টি এখনও আকর্ষণ, তাই সহিত তুলনা করলে বুঝা
যাবে, পূর্ণ-ভারতীয় অসুতম রীতি কিতপ মার্জিত ও
মূলমতান।

অপর দিকে অসুতম রীতির প্রভাবও সামান্য নয়। মুষ্টি-
প্রচলন সহিত চিত্রশ্রীতি একান্তভাবে জড়িত। অনেক সময়
মটির মূর্তির পরিবর্তে দেহাত চিত্রও অঙ্কিত হয়। 'দগা'-র
উপর আঁকা দেবীমূর্তি অতি বিচিত্র মৌখ্যে মণ্ডিত হয়ে

পণ্ডিত ও শিল্পীদের অনেককেই নেপালে প্রেরণ করেন। বহুতঃ নেপালে চিত্রকলাপ্রসঙ্গে যে ভাবিক দেবদেবতার রচনা সম্ভব হয়েছে, তা একান্তভাবে পুরাণকালের। পশ্চিম-ভারতের রচনার এ প্রেক্ষিতে স্বেসৃষ্টি আশা করা যুখা, এমন কি সে রীতির সঙ্গে এ প্রেক্ষিতে ভাবগত ঐশ্বর্যকে ইঙ্গাটন করা অসম্ভব ছিল। রাজপুত-কলার প্রভাব বাস্তবায়ন ও ঐচ্ছিকতা পশ্চিম-ভারতীয় রীতিকে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন করে তোলে। প্রাক-ভারতীয় রীতি চীন, জাপান ও তিব্বতকে অসুস্থ রসদগ্ধ হান করে মস্তান, বস্ত্রহীন প্রকৃতি অলংকার্যবোধনকে রূপের ভাষা দান করে। এ দান রূপের ইতিহাসে সামান্য নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রাক-ভারতীয় রীতি এদেশের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। অগণিত ভাবনা ও রুচির চিত্র-দ্রিকের সম্মিলন করে এ রীতি অমর হয়ে গেছে। ইংরাজ আমলের সময়কালে এ রীতিকে প্রস্তুত করতে পারেনি। কবিবর হাউসিংএর কবিতার হেমেলিনের (Hammelin) বংশবাহকের একটা বিবরণ আছে। বাহকের বাঁধির আগুকের প্রভাবে পাড়ার লক্ষ লোকের সঙ্গে উঠতে হয় এবং পিছনে যেতে হয়। এমন করে দেশের শিশুসকল মৃত্যু করে বংশবাহক ঘরে ঘরে মরীতে নামে। বহুদূর শিশুসকল তার পিছনে গিয়ে মৃত্যু হয় এবং প্রাণ হারায়। ইংরাজ আমলেও প্রাচীন-শিল্পের বাঁধির আগুয়াজ এমনি করে রাজপুত-শিল্পকে বিপথগামী করে চিত্রকালের রুচি অতল লুপ্তিতে নিমজ্জিত করেছে। ভগবৎ অকতা শূন্যস্থিত চলে মসির দ্বার পড়ে আছে—

যোগল-কল: রাজস্বাসী আমলের সঙ্গে সম্মত অস্তমিত হয়েছে। ভারতের নর-মহারাণারবাধা মুগলদান-সম্প্রদায় ভারতের-মিসাদক ইসলামীয় শিল্পের পুষ্টি হয়েও একটা নতুন coast বা জাত-রচনার উৎসাহিত। ইসলামী অনেকেরই আরব ভাষার ব্যবহার বলে নিজের মর্যাদা বাড়িয়েছেন—কুস্তর 'ত' বহুকাল প্রভাষ্যাত হয়েছে। এতদ অবতার ভারতীয় যোগলরীতির প্রেমিক কোথা?

বহুতঃ প্রাক-ভারতীয় শিল্পটাই একটা বিখ্যাতরীতির রূপ-রচনার অধিকারী, কারণ এখনও চিত্রকলাক্ষেত্রে একটা বিনষ্ট প্রেরণা এ ক্ষেত্রে সম্ভব। বিধাতার রূপায় পাশাপ-প্রতিষা বজ্জিত হবে—এদেশে রুচির কঠি প্রবর্তিত হয়েছে। তাতে করে পূর্ব-ভারতীয় রূপের ধারা এখনও জীবিত ও প্রাণবান্। বাহালায় চালচিত্র ও পট, উড়িয়ায় মূর্তি ও চিত্র-শিল্প এখনও চলছে। কাজেই এদেশ হ'তে অস্তঃশিল্পী কল্পকে আবার উদ্ভল তরঙ্গে প্রবর্তিত করার কল্যাণ অগ্রা-মণ্ডিক হবে না। এতদ অবতার রূপের পবন বা রূপের হান পাওয়ার ভয় পূর্ব-ভারতের শিল্পেরা যদি কখনও অজ্ঞানতা, কখনও বা যোগল, কখনও বা রাজপুত, পারস্য বা জাপানের দ্বারে ধন্য দেশ, তবে কবীরের সেট প্রাচীন বাক্য মনে হয় :—

মরুত কোণ হাজারে

বসে এমনি পাল।

হাজার জেল পৌড়জ বটে, কিন্তু নাকী পাশেই বসে আছেন।

ভারত-শিল্পের ধারা

...প্রকৃত উন্নতি হুণ দারা পুঁজিতে সমস্ত জাতি ভিতর লক্ষন হুণ বিদ্য-ব্যবহার সাধুত বিনোদিত হয়। এই হিসাবে, ভারতের উন্নতির হুণ লক্ষন হুণের শিল্পের অর্থের অর্থ দিল, ওয়া লক্ষন হুণ হুণের সমস্ত জাতি, কিন্তু কোনও শিল্পের বাহা উন্নত জাতিসকল অজ্ঞাত জাতিকে না শিল্পের এক অজ্ঞাত কল্যাণ হুণের না দিল বিদ্য বিনোদিত হয়। ভারতের, এইরূপ হুণের কল্যাণের মূর্তি হুণের।

অনবগুণ্ঠিত।

—ঐন্দ্রোজকুমার রায় চৌধুরী

বিষ্ণুস্বপ্নের উদ্ভূত একই বেল। চটগা দিয়াছিল।
বাহিরের বড় চুল-করে তখন মাথা পড়িয়াছে। চটজন
খেসিতেছে, আর বাঁকি সকলে একটা না একটা পকে চাপ
বসিতেছে। উকি দিয়া একবার বেশিয়াই বিষ্ণুস্বপ্নের আর
ফেরে বাইরে উজ্জ্বল হইল না। বাহিরের বায়ান্দার একটা
চেষ্টার পড়িয়া ছিল, তাহাতেই উপবেশন করিল।

ওহিকের বায়ান্দার কণ্ঠস্বরীয়া চটজন নিরীহ প্রজ্ঞাকে
লইয়া কি যেন একটা স্তম্ভতর বায়ান্দারের দর কষাকষি
করিতেছিল। বিষ্ণুস্বপ্নকে বাহিরে বসিতে দেখিয়া তাহার
হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও ধবন
হাজার্যে বেশিল বিষ্ণুস্বপ্নের ভিতরে বাজার উজ্জ্বল নাট, তখন
অসহ্য ইন্দিতে প্রজ্ঞা চটজনকে তিতবে ডাকিয়া লটগা গেল।
বিষ্ণুস্বপ্ন তাহারে দিকে একবার ঘূর্ণি মিগাই ঘূর্ণি কিরাইগা
লটগ। বায়ান্দা সে বেশিয়াও খেসিতে চাহিল না।

পূজার আর বেশী দেরী নাই। সকলের নোনালা হোসে
তাঁহায়েই আভাগ পাওয়া বাইতেছে। কোণের টিউলি
গাছের নীচেটা অকস্মৎ বসে ফুলের রাশিতে শাখা হইয়া
গিয়াছে। অকস্মৎ একতারার কঙ্করে বিষ্ণুস্বপ্ন চমকিয়া
উঠিল।

—বাবু দশাঙ্কে একটা গান স্নিবে দি।

একজন বাবাভি। হঠাটা মাঝ কালো। দীর্ঘ সেহ
মাংসল না হইলেও হাড় বেশ মোটা। গায়ে শতপ্রসিদ্ধ
বিচিত্র বর্ণের বহির্কাল পানের গোছ পথীক নামিয়াছে। চুল-
দাড়ি গেঁসো মিগা বাধা। গায়ে নুপুর। বাম বগলে একতারার
ও ডান হাতে ডুবকি।

বাবাভি কোন প্রকার গায়ের সজ্জাধরণে অপেক্ষা না করিয়া
সমুদ্রের পাছতলায় ভাষার আরাধন করিয়া বসিল। একখণ্ড
ভাকড়া মাথার পাশড়ীর বস্ত করিয়া বাধা ছিল। পেটা
খুলিয়া দুখ দুছিরা গোঁফতোড়া চোমকাইয়া লইল। তারপর
একতারারটা কানির কাছে আনিয়া হুটা বজান দিয়া দুখ টিক
করিল। ডান হাতের ডুবকিটা ডান হাঁটুতে হুকিয়া তাল

বিল এবং প্রদানিত বা পা বাইতে হুকিয়া নুপুর বাজাইয়া
পান দগিল :

চলন কলন প্রস্তুতকৈ ফুটে বস্ত দুখ খঁচ,
তারে সুমিও বাধা আনিও বাধা দগায় কি করি।
ফুটে ফুটে কলন হুটার না হুচ লেব :
এই কলনের যে এক নুপুর হুচ যে তারে জ্বলন।
ফেটে ফেটে মোরো জ্বল পা না যে তারে,
তাই সুমিও বাধা আনিও বাধা দুকি কোণাও বসি।

বিষ্ণুস্বপ্ন চেষ্টায়ে ভাল করিয়া উঠিয়া বসিল। এ বাউল
গায় কি ? দুকি কোণাও নাই ? মাংসের মনের কলন
কোটে, কোটে কোটে—তাহার আর শেষ নাই ? সে কলনের
মধুর গোতে বহর প্রভুও বাধা পড়িয়াছেন ?

বাবাভির কণ্ঠ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, গিচ্ছ আচ্ছন্ন মধুর। চোখ
বুজিয়া দুকিয়া সে যেন হুচ হুচ কলনের পর কলন
হুটাইয়া চলিতেছে, তাহারও যেন আর শেষ নাই।

এ অকস্মে প্রাণ সকল বাহ্যিককেই বিষ্ণুস্বপ্ন জানে, অস্তিত
দুখ চেনে। কিন্তু টাহাকে যেন নুতন মনে হইল। বাহ্যার
মাথা খেলায় চাল বসিতেছিল, তাহালাও ইতিমধ্যে উঠিয়া
আনিয়াছে। তাহারাই হৈ হৈ করিয়া আবার ধরিল, আর
একখানা বাবাভি, আর একখানা।

ওদিকে বর্ণচরীরের বর হইতে একটা ঢাকের একটা
সাকো কলিকা আনিয়া বাবাভির সম্মুখে নামাইয়া দিল।
বেশিয়া বাবাভির মন প্রফুল্ল হইল। স্থূল হইতে একটা
ছোট কার্টের হুকি বাহিন করিয়া আপন মনে গুহমন্ড
হাসিতে হাসিতে নিঃশব্দে ঘূর্ণান করিতে লাগিল।

তার পরে আবার একতারার কঙ্কর মিগা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা
সুন্দর কণ্ঠে গান ধরিল :—

আমার কুবচো মরন কলন তিচ্ছ
কলন যে তারে জ্বলন লল বাধারের তীরে :
পজার কালোর দ্বন্দ্বোরে ললাহে লহরী

—ভগ্নের লহরী—

৩ নং ভগ্নে ভাগে কলমে আদ্যে ভগ্নে দাঁড়ী ।

—দাঁড়ীয়ে ভগ্নে—

৪ নং ভগ্নে ভাগে ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে ।

—৪ নং ভগ্নে—

৫ নং ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে ।

—৫ নং ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে ভগ্নে—

গান শুনিতে শুনিতে কিছুকালের মন নীবাচীন পথের ভ্রম
উভায় চাইতে উঠিল। গুরু-পরিচয়ের মনতঃ, শক্তি ও স্বভাবের
মোহ ভীর্ণ পথের মত বসিয়া থাকা পড়িতে লাগিল। ভাঙার
সময় মন বীজে বীজে বীজে বীজে ভিসিয়ে ভুজিয়া গেল।

গান শুনিয়া ভাল সকলেরই লাগিয়াছিল। একজন
জিজ্ঞাসা করিল, বাবাভি আশা কোথায়?

কলিকাতা চাকরে বসিয়াছিল কিংবা দিয়াছিল। বাবাভি
একমুখ ঘোঁষা ছাড়িয়া বলিল, আশা আর পাতে পেলায়
কই বাবু মশায়? ঠাকুর আমাকে পথ বসিয়েছেন।

বাবাভি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিল, দুহুতে দুহুতে, ভাগতে ভাগতে এসে কাল সন্ধ্যায়
আপনাদের ওই দাঁড়ীয়ে থাকে রসিকদের আশা আর এসে
উঠেছি। এখন বেশি, প্রভু আমায় কেন পথে টানেন?

বিজ্ঞানের বন্ধু ভাঙতে ছাঁকিয়া ধরিল। বলিল, আর
পথের চানচানি শুনি না বাবাভি। এসে এখন পড়েছ,
তখন আর ছাড়ি না।

বাবাভি এক গাল হাসিয়া হাত বাড় করিয়া বলিল,
আজ্ঞে, আপনাদের কথা বলে কি না হয়।

—এই কথাই হবে। তুমি খোদ বসায়ের কাছে এসে
হাজির হয়েছ। ইনি আমায়ের বাবু। স্ব-ছাওয়ায় থেকে
আরও করে বা বা স্বাক্ষর সব ঠিক করে দিচ্ছেন। কোনো
ভাবনা ভেদকে ভাবতে হবে না। সকলে সন্ধ্যায় কিংবা
রাত্রে গান শুনিতে বাবে আর ভুটি করে এসেছে পাবে।
এক তো? না সঙ্গে...

—আজ্ঞে বই কি বাবু মশায়। আমায় রসের বেলায়
করি। এটা থাকার যো কি।

বাবাভি সকলের মুখের দিকে চাহিয়া শিশুর মত হো হো
করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বন্ধু বলিল, তা হোক। তাতে কিছু অসুবিধা হবে

না। যেটি কথা এখন থেকে ভোমার পাশের বাগা হাজে
না। কি বল চে বিষ্ণু বাবু?

বিজ্ঞানের কিছুই বলিতে চাইবে না। গান শোনা পথের
ভাঙার মন বাবাভির প্রতি আঁকতে হইয়াছিল। তবু গান নয়,
ভাঙার জোছে, হাসিতে, কথা বলার ভিত্তিতে এমন একটি
চমৎকার লাগল। আজ্ঞে যে, দুই না ইয়া পায় বাবু না।
বিজ্ঞান তখনই কণ্ঠস্বরদের হৃদয় মিল, আভ্যন্তর মতোই
রসিকদের আশা সংসার করিয়া দিতে হইবে। সংসার
করিবার বিবেক কিছু নাই। চমৎ চলে একটু গোঁড়াগতি
দিতে চাইবে। বহুদিন অব্যবহার পড়িয়া থাকার উঠানে
আপাছা হইয়াছে, সেগুলি পরিষ্কার করিতে হইবে। স্বরভা
জানালা আশা করা যায় ঠিকই আছে। না থাকিলে বসলিয়া
বিলেই চলবে। বিবেক চানচান নাই।

বাবাভি এই বাবায়ের খুশী হইয়া গুল গুল করিয়া গান
গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। বিজ্ঞানের দেখিয়া ভাঙার
কাল লাগিয়াছে। এখানে প্রান্তে দাঁড়ীয়ে থাকে এই ভাঙাটিও
মনোহর। বাবাভি এতদিন পথে একটা মনের মত ভাঙা
পাইয়া বাঁচিয়া গেল। ভগ্না হইল, ভগ্নের বাক্য করিয়া
দিন এই বান্ধেই গাভারকের নাম গান করিয়া, আর বিনোদ
রাব ভিউর জগদীশ পাইয়া পদমানন্দে করিয়া বাইবে।

দাঁড়ীয়ে এখানে লোকালয়, ওখানে রসিকদের আশা।
লোকালয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। এ অলপটা একবারে
কাঁকা। চারিদিকে কেবল খানের জমি। যাকে নাথে ছই
একটা আম-বাগান, ভালের বন অবশ্য আছে। কিন্তু ভাঙার
সংখ্যা খুব কম। কোপ-জলের বালাই একবারেই নাই।
কেবল রসিকদের বাবাভির চোঁড়া ও করে এই স্থানটি
বোঁড়া-বললে, বড় বড় গাছের ছায়ায় সন্ধ্যায়। কাঁকা
মাঠ পায় হইয়া এই স্থানটির আসিলে নদন দিচ্ছ হইয়া যায়।
ভিতরে গিয়া বলিল আর মনেই হয় না যে, ইহার বাহিরে
লোকালয় আছে। মনে হয়, সমস্ত পৃথিবী এইটুকু
সম্পূর্ণ। ছোট ছোট পানীর কিচ্ কিচ্ শব্দে, ভ্রমরের
গুঞ্জে, বৃক্ষপত্রের নর্ঘরে এই ছায়ায় স্থানটি সর্বকালের
বদন।

এই ছোট ভবনটুকু পার হইলে সাংঘাতিক বেড়া। তার পরে ছোট এক টুকুয়া উঠান দর্শনা স্বকৃষ্ণ করিতেছে। ঐ দিকে তুলসী-বন, তার উপরেই চারিদিকে উঁচু মাওয়া-গালা একখানি এক-কুঠারী ঘর। শিল্পে আরও একটু কাছাকাছি আছে। বাবাভির আশুভার সবর খিড়কীর বালাই নাই। এখন হইতেই এক লক্ষ পঞ্চাশ লক্ষের আলো পড়া পড়িতেছে। হিন্দুকলা বাবাভির মূর্তির পূজা লক্ষের শিল্পের ছোট ছোট রাস্তাই ঘাসে চাকিরা পড়াছিল। নতুন বাবাভির আশুভে আরও লোক-চলচল আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তাও বাহির হইতেছে।

তখন ছোটরা কাছাকাছি। বেশা শেষ হইতে আর বড় বাকী নাই। নতুন বাবাভি মাওয়ার উপর একা বসিয়া শুন্ শুন্ করিয়া কি একটা স্থর ভাঁকিতেছে আর হাঁটুতে ভাল বিয়া ভাল বলা করিতেছে। ওদিকে বড় নিয়মিতের তলার যে উঁচু করিয়া বেনী বাধানো হইয়াছে, তাহার উপর দুপুর বেশা হইতে গোমের একদল বাকটে ছোটতাপা পাড়িয়াছে। এখনও খেলা শেষ হয় নাই। তাহারো ক্রমাগত বিড়ি হুঁকিতেছে আর এক একটা পাশার বানে এক এক পক্ষ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। এমন সময় বেড়ার আগড় ঠেলিয়া বিক্ষুব্ধ প্রবেশ করিল। একা বিক্ষুব্ধ, সঙ্গে মোগায়েবের হল নাই।

ছেলের বলের চীৎকার বড় হইল। বাবাভি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

—এই যে বাবু মণাশ, আহ্নান আহ্নান। ক’দিন থেকেই ভাবছিলাম, আমার নতুন আশুভার সবাই এলেন, কেবল বাবু মণাশের পায়েই ফুলা পড়ল না। আহ্নান, আহ্নান। আলনটা কোথায় সেল, ও রাইমনি ?

একটি একশ বাইশ বৎসরের অপূর্ণ মূর্ত্তী মেয়ে উঠান কাঁটে দিতেছিল, সেই রাইমনি। বিক্ষুব্ধের আশেতে দেখিয়া কাঁটে বেগা বন্ধ করিয়া একমুঠে তাহাকে ধেঁতেছিল। তাহার দিকে বিক্ষুব্ধের দৃষ্টি পড়িতেই তাকাতাড়ি আসন আশেতে ঘরের ভিতর গেল।

ছেলোটা তখন পাশার ছকু গুটাইয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা ছিল। বাবাভির শিল্প শিল্প বিক্ষুব্ধ কুঠিরের পাওয়ার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাবাভিকে জিজ্ঞাসা করিল, এই হতভাগা কি যোজাই আসে নাকি ?

বাবাভি এসব হাতে বলিল, আসবে বই কি বাবু মণাশ ! আমার এ তাহাক্কের আশুভা, পাঁচজনের আশা বাওয়া যে চাই !

হ্যাঁ, চাই। ছেলেরের কতক কতক ইতিমধ্যেই সরিয়া পড়িয়াছিল। যে ক’জন ছিল তাদেরই ধবক বিয়া বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা করিল, তোরা এখানে কি করতে আসিস যে হতভাগা ? কেত যদি কোনো দিন...

বাবাভি তাকাতাড়ি হাত বোড় করিয়া বাবুপ তাবে বলিল, বাবু বাবু, বাবু মণাশ, ওদের কিছু বলবেন না। আঁহা, কুকুরেরের মসিক,—ওগাই তো আমার ঘর ভাঙে। আহ্নক, আহ্নক, সবাই আসবে। নইলে ঘর ভাঙবে না যে ! পঞ্চ পাং কি করে ?

বাবাভি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাইমনি মাওয়ার আলন পাতিয়া দিতেছিল। বাবাভির কথায় কিছু করিয়া হাসিয়া ঘরের ভিতর লুকাইল।

ঘর ভাঙিবারই বাপার ! এতগুলি কুকুরেরের মসিক এক সঙ্গে ছুঁলে লোহার ঘরও ভাঙিয়া যায়। বাবাভি বলিয়াই এতদিন চিকিয়া আছে, অত কের হইলে কোন্ দিন পঞ্চ বেশিত।

আসন প্রবেশ করিয়া বিক্ষুব্ধ বলিল, মনটা ভাল নেই বাবাভি। তোমার পান শুনতে এলাম। একটু অদবর হয়ে সেল বোং হয়।

বাবাভি একবারে মাকাইয়া উঠিল। বলিল, বিলম্ব ! তাহাক্কেরের নাম শোনাও, তার আবার সময় অসময় আছে নাকি ? একতারাটা মাওতা রাইমনি, বাবু মণাশকে একখানা পান গনিয়ে দিও।

রাইমনি নিঃশব্দে আসিয়া জুবকি, একতারা বাবাভির পায়ে কাঁছে মাখাইয়া দিয়া সেল।

বাবাভি একতারাতে একটা বজ্জার বিয়া কি মনে করিয়া বলিল, তুমিই একখানা পাও রাইমনি। বাবুমণাশ এত কত করে এগেছেন। আমার পান তো যোজাই শোনে।

বাবাভি একতারাটা ভিতরে পাঠাইয়া জুবকিতে চাট দিল।

সাইমনি নীরবে একতারাটা লইয়া বরতীর ঠেস দিয়া একটু আড়ালে বলিল। বৈক্যবের মধ্যে, গান গাহিতে তাহার লজ্জা নাই। বলিতে গেলে ইহা শুধু তাহার পেশা নয়, ধর্মের অঙ্গ। সাইমনি গাহিল :—

হৃদি বেলুন না বান

হৃদি না বেধি তার প্রথম স্তব্ধে।

প্রাণে পড়ে অন্তর হল, বল যে প্রবল—

সে এসে, সে এসে, সে পূর্ণ পদনে।

প্রাণে বল মো প্রাণে বল, বল যে প্রবল—

তার বন্ধ এসেছে এসেছে সে পূর্ণ পদনে।

এমন কোণে কি রাখি

প্রাণে সঙ্গ না বেধি,

এবং মরণ এসে মিলে বলো: বরতীর পদনে।

হৃদি বেলুন না বান

হৃদি না বেধি তার প্রথম স্তব্ধে।

সাইমনির গলা বাবাভির মত ভাঙা-ভাঙা নয়, বাশীর মত নিম্ন। তাহাকে দেখা হইতেছিল না, শুধু সুখানি তো দেখা। কিন্তু গানের কথা ও সুর তাহাকে বর্তমানের সবল কিছু হইতে চৈনিয়া গিচ্ছাইয়া দূর অতীত কালের বিরহিনীর কাছে পৌছাইয়া দিল, যে বহুক প্রাণের না দেখিয়া কিছুতেই চোখ মেলিবে না।

গান শেষ হইয়া গেল, কিন্তু হাওয়াও তখনও স্তরের তেজ হুসাইয়া যায় নাই। কুলে কুলে তখনও থাকিয়া থাকিয়া শিরশ উঠিতেছিল।

বিক্রমণ অনেকক্ষণ পরে শুধু বলিল, বেশ।

বাবাভি ডুবুক রাখিয়া দৃষ্টিতে চৈনি দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। বিক্রমণের কথাও চোখ মেলিয়া চাহিয়া হাসিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া সাইমনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। একতারাটা বাবাভির কাছে নামাইয়া রাখিয়া উঠানে যে পানছাড়া কলগী পড়িয়া ছিল, তাহা কক্ষে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বাবাভি একতারা হাতে বহুক্ষণ নিঃশব্দ হইয়া মুগ্ধিত নেয়ে বসিয়া রহিল। বিক্রমণেরও কথা করিতে ভাল লাগিতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে বাবাভি হাসিয়া বলিল, এর পর আস আবার গান কবে না। কি বলেন বাবুমাথা?

বিক্রমণ একটু ইতস্ততঃ করিল। দুইজনেই ভাল গায়।

তার মধ্যে কে বেশি ভাল গায় বলা কঠিন। বিক্রমণ কি বলিবে ত্রিক করিতে না পারিয়া বলিল, কেন? তুমিও তো ভালই গাও বাবাভি!

বাবাভি একতারা ডুবুক স্পর্শও করিল না। বাড়ি বাড়িয়া বলিল, না, না। এর পর আর গান কবে না। আত্মকে এই খান্দ বাবুমাথাই, আচ্ছা গান আর একদিন আপনাকে পোনাও।

বিক্রমণেরও মনে হইতেছিল, এই খান্দ। এমন গান একখানি শোনাই ভাল। সে আরও একটুকু নিশ্চেষ্টে বলিয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িল।

প্রাচিয়ার বেড়ার পরেই একটি সপক্ষ কলসের মধ্য দিয়া দীর্ঘ উঁচু পাত্ৰ অতিক্রম করিয়া ঘাটে পড়িয়াছে।

এ ঘাটে আর কেহ নামে না। প্রায়ের খর সোঁত্রে তৃষ্ণার হইয়া বড় জোর দুই একটি ভাণাল, কি দুই একটি গন্ধ বাতুর নামিয়া চল পান করিয়া যায়। এটি বিশেষ করিয়া বাবাভির আখড়ার সমস্ত এবং বিড়কির ঘাট। কলসের মধ্যে পড়িয়াই বিক্রমণ দেখিল, কক্ষে কলসের কলগী লইয়া সিন্ধবনে সাইমনি হন বন করিয়া আসিতেছে।

কাছাকাছি আসিতেই বিক্রমণ পাশ কাটিয়া চলিয়া বাইতেছিল। কিন্তু কি তাবিয়া বনকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোন। এসব গান তুমি কোথায় শাখের করেছ?

সাইমনি তাহার প্রশ্নে চমকিয়া মুগ্ধ কিরাইতেই অন্তরঙ্গ হওয়ার শেখ আলো তাহার অনবগুণিত দৃষ্টির সূত্র উপর পড়িল। 'আন্তে আন্তে বলিল, কত কারগার কত গান পেয়েছি, ত্যাকি আর মনে থাকে বাবু মাথা?

—হঁ। আর এই বাবাভির সঙ্গে কোথায় আলাপ হ'ল?

সাইমনি বাবাভির প্রশ্নকে কৌতুক বোধ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, এমন একদিন পথে পথেই আলাপ, আর কি! পথ ছাড়ুন, সত্যে বসে যাব।

—হ্যাঁ।

বলিয়া বিক্রমণ চলিয়া গেল। একবার মনে হইল, কলে, তোমার গান শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু তাহার সমস্ত পাইল না।

অতঃপর বিজুবনের আখড়া পরিদর্শন ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম তই একদিন অস্তর ঘাইত। এমন প্রত্যাহার যাহা বহুদূর টাঙ্গা লটকা গাভ-পরিচাল আনন্দ করিয়াছে। কিন্তু বিজুবন সে সমস্ত গ্রাহ্য করে না। হাসিগাই উড়াইয়া দেয়। কথাটা তাহার হার কোনও পৌছিয়াছে। সে মুখে কিছুই বলিতেছে না, ঈশানের মেঘের মত ধ্বংস করিতেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বিজুবন আর সেখান হাড়াইতেছে না। বেতাসা মনে মনে লজ্জা পায়। চেষ্টা করে আখড়ার নিকে আর ঘাইবে না। কিন্তু পারে না, বিকাল হইলেই কে যেন তাহার পা ছুটতে চালাইয়া লইয়া যায়। আরও দুদিন হইয়াছে, বাবাভির লম্বাশ্রমের মুখ ঘেঁষিয়া কিছুমাত্র সুখিয়ার উপায় নাই যে, তাহার মনে বিলুপ্তময় সম্বোধের উদ্বেগ হইয়াছে; তাহা হইলে বিজুবন কোনো বকমে নিকেতে সামলাইয়া লইতে পারিত।

সেদিন বিজুবন ঘাইতেই রাইমণি আসন পাতিয়া দিয়া অদূরে বসিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজুবন এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবাভি কোথায়?

—চুলায়।

বিজুবন তাহার উত্তর দিবার কসিতে হাসিয়া উঠিল। বলিল, কাছের চুলায়, না হরের চুলায়?

রাইমণি আশ্চর্য হোখে নিলো। কটাক হাসিয়া বলিল, তার মানে হরের চুলায় চলে কুকি যত বসতেন?

বিজুবন বিভ্রান্ত ভাবে হাসিয়া লাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

রাইমণি স্তব্ধ হইয়া পেল। বলিল, না। কাছেই গেছে।

বিজুবন আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। রাইমণি উঠিয়া বলিল, বরন সন্ধ্যাটা ঘিরে নিই।

রাইমণি নোপ আসিয়া জুলুমীতলায় গড় হইয়া সন্ধান করিল। তার পর সেই প্রসঙ্গ তুলিয়া আনিয়া বিজুবনের মুখের কাছে একবার ঘুরাইয়া হাসিতে হাসিতে ঘুরে গেল।

ফিরায়া আসিয়া বাহিরের নিকে চাহিয়া উন্মিষভাবে বলিল, গুপ্ত বেলার গেছে, এখনও ফিরল না কেন, কে জানে!

—তাই ভাবনা হচ্ছে?

রাইমণি হাসিয়া লাড় ফিরাইয়া বলিল, তা হবে না? আপনি না হয় আরও একটু থাকবেন, সমস্ত রাত ত আর আমাকে লাগিয়া বিতে পারবেন না!

বিজুবন চোখ টিপিয়া বলিল, একটা রাতই তো। না হয় বিলাস।

অল্প দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে রাইমণি বলিল, হুঁ! তা হলে আর ভাবনা ছিল কি! গুপ্ত রাত পিঠী এনে লাড় করে নিয়ে যাবে। তখন?

কামলীর কথায় বিজুবন লজ্জা লজ্জা তব পাইয়া গেল। সে যে ব্রহ্ম ভেদে মেয়ে, সব পাতে।

কথা ঘুরাইবার কল্ল বলিল, রাইমণি, বাবাভিকে সন্তা সন্তাই পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে? না...

—সন্তা সন্তাই পথ থেকে।

—পথেই আলাপ, পথেই মালাবদল?

—হুঁ।

বিজুবন আর একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা রাইমণি, বাবাভি যদি আস না ফেরে? ওরা তো পথের পথিক, খসে ফেরার ভাগিদ কিছু নেই।

এ সম্ভাবনা যেন নূতন কিছু নয় এমন নিশ্চিতভাবে রাইমণি উত্তর দিল, তখন আপনি তো আছেন?

—আমার উপর ভরসা করতে পার?

—না পেরে উপায় কি?

ইহার উপর আর কথা নাই। বিজুবন নিকটরে রাইমণির হৃদয় হৃদয় দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। এমন সময় বাবাভির গলা শোনা গেল:

রাইমণি, রাইমণি গো!

রাইমণি ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল।

বিজুবনকে সেখান বাবাভি আশ্রয়ভাবে বলিল, এই যে, বাবু মণাথ হচ্ছেন! রাইমণি একলা আছে বলে আমি যে কি তাকাতাড়ি আসছি! রক্তা হে! প্রাণসৌর! বেশ বেশ!

রাইমণি বাবাভির পা ধোঁয়ায় ঝল আসিয়া লাগায় উপর প্রাণিল। কলিকায় তামাক সাঁজাই ছিল। চিকার আওয়াজ

হঠাৎ ফুঁ দিতে নিতে বলিল, বাবু মশায় তাবছিনেন তুমি যদি আঁধা না দেখো :

বাঁধাতি পা দুইতে দুইতে চো গো করিয়া আসিয়া উঠিল। বলিল, না ফেরাট বটে। পথে বেকলে আর ইচ্ছা হয় না যবে ফিরি।

রাইমণি বলিল, ততঃ আমিও ভয় পাট না। বাবু মশায় আমাব ভার নিতে খুব পারবেন।

বাঁধাতি আবার অটোয়াত করিয়া উঠিল।

—তা পারবেন। বাবু মশায় কুকুরদের বলিক খাচ্ছেন। তোমার ভার নিতে খুব পারবেন। কক্ষ বে! প্রাণ-পোহ!

কিন্তু এট প্রলম্বে কিছুকাল অত্যন্ত অবস্থি বোধ করিতে লাগিল। ইহারা কি তাহাকে লইয়া পরিহাস করিতেছে? অথবা এই ব্যাপারটা ইহাদের কাছে অত্যন্ত সহজ হইয়া গিয়াছে?

—রাইমণি, বাবু মশায়কে একটা গান স্নিহে নাও।

‘কিছুকাল ভাড়াভাড়ি উঠিয়া বলিল, আত পাঙ্ক বাবাতি। সাত হুগেছে। এইবার উঠি।

বাঁধাতি বসন্ত হইয়া বলিল, সে কি! কুকুরনাম গান একটু সুনবেন না?

রাইমণি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, না না। আর একদিন শোনাও বরং। সাত হু নি? উনি তো রোজই আসেন, গান শোনাও, তাহনা কি?

বাঁধাতি অসন্তোষ বলিল, তা হলে বাবু মশায়কে আসোটা একটু বেখিয়ে এস বরং। অঙ্ককার হয়েছে। এই কললটাও বড় ভাল নয়।

রাইমণি আসো লইয়া আগে আগে চলিল। কললটা সভাই অঙ্ককার। সাপ-খোশের জরও আছে। নিঃশব্দে গার হইয়া খোলা মাঠে আনিয়া রাইমণি ঝাঁড়াইল।

হালিয়া বলিল, এইবার খেতে পারবেন তো? না, আরও এগিয়ে দিতে হবে।

কিছুকাল কি যেন ভাবিতেছিল। অন্তরমনক ভাবে বিড় বিড় করিয়া কি বলিল বুঝা গেল না। রাইমণির দিকে একবারও না চাহিয়া, এতখানি পথ আলো দেখানোর জন্য একটাও দৃষ্টান্তের কথা না করিয়া শোকা প্রবেশের পথ খরিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল। রাইমণি আরও কিছুকাল আলো হাতে করিয়া সেইখানে পাড়াইয়া রহিল। তারপর কি ভাবিয়া একটা দৌরখাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে আখড়ার দিকে চলিল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই কিছুকাল সংবাদ পাইল, বাঁধাতি রাইমণিকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। বাঙালীর সমস্ত কাহারও সঙ্গে দেখা হয় নাই। বেথ হয় লোক উঠিবার পূর্বেই রাত থাকিতে চলিয়া গিয়াছে।

কিছুকাল আখড়ার গিয়াছিল, আখড়া খা না করিতেছে। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্রের বাহুল্য কিছু ছিল না। দুটি লোকের পক্ষে নিত্যও না হইলে নয় তাহাই মাত্র ছিল। সে কবটা জিনিস বাঁধাতির কোলাতেই দিয়া ছাটিয়া যায়। পড়িয়া আছে মাত্র, যে মাটির কলসী লইয়া রাইমণি কল আনিতে বাইত সেইট। এখনও কল ভরাই আছে। কয়েক ঘণ্টা মাত্র গিয়াছে, ইহারই মধ্যে উঠানটির দিকে যেন চাওয়া যায় না। কেমন শ্রীহীন দেখাইতেছে।

কিছুকাল ভর ভর করিয়া সব্ব স্থান খুঁজিল। কোথায় যে তাহারা গেল, রাইমণি তাহার একটা চিহ্ন পর্যন্ত রাখিয়া যায় নাই,—একখানা চিঠি, কিবা একটা ইঙ্গিত, কিছুই না। কিছুকালের খাবার ভান্নিও, বাঁধাতির ওপরে যাহির হইয়া বাঙালী আর কিছুই নয়, সে কেবল আর একটি মনের বস্তু আখড়ার অবস্থানে গিয়াছিল।

এখন কথা এই, রাইমণি এ সংবাদ পূর্বেই জানিত, কি জানিত না? তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোর করিয়া লইয়া বাঙালী হইয়াছে, অথবা বেজায় গিয়াছে? এতদিন যে মেলাদেশা করিল তাহার সঙ্গে, তাহা কি শুইই বেগা, না তাহার মধ্যে সভ্য বস্তু কিছু ছিল? কিন্তু রাইমণি নাই, এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবারও যে উপায় নাই।

এল জিজিরের ইসলাম-তীর্থ

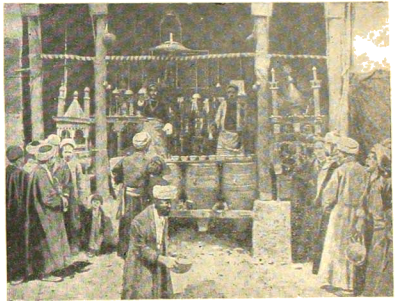
— শ্রীমরেন্দ্র দেব

ভারতের বন্য ছেড়ে পশ্চিমাভিযুগে পাড়ি বেগান সমর ভাংগে প্রথম বিগ্রাম দেব এতেন বকরে। এ বন্য অত ইংরেজের নগলে, কিছু স্থানটা আরব দেশের উপস্থলে। আরবেয়া ভাংগে দেশকে বলে 'এল জিজিরে' অর্থাৎ 'বীণ'। বহিও ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারে আরব দেশটাকে টিক

বীণ বলা চলে না বটে, তবে এর ভিতরিকে সমুদ্র ও একদিকে। দু'তর এক মক্কাম্বিন খাফার দেশটা বোশেরই সাদিল হয়েছে। এই বিশাল মক্কাম্বিন ভূগোলা বাবা অপর পাঠের সঙ্গে এদের সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে। জলপথে সমুদ্র পার হয়ে অত্রিবে পৌছানো সহজ, কিন্তু স্থলপথে এই মক্ক উত্তীর্ণ হয়ে আরবে প্রবেশ করা

বাস্তবায়িত হলে অতি পোচমৌর শেন-শয্যা গ্রহণ করতে হয়।

মক্কাম্বিন ভ্রমণ মক্কাম্বিনকে আরবেয়া বলে 'কথা এলখানি' অর্থাৎ 'সিদ্ধান্ত আসিল।' এই মক্কাম্বিন বিশাল বাবায়ান সাপ্তাহোপকূল হ'তে মেনে অক্লান্তক এত বুরে ঠেলে



রেলপথের জগৎ এই পথের সুশীল মল বিক্রয় হয়। কথিত আছে 'ইসলামের' মক্ক 'হাজিরে' এই স্থান থেকেই মল কুলে বিক্রয়লেন। এর জল ইয়াং উক। মুলমানোয়া বিখ্যাত করেন যে, এই স্থানের জলে সকল রোগ অধোদ্য ইত্য: সকল পাপ হুত যায়।

অসু উক্তই নয়, এ পথ একান্ত ভয়ানক। মক্কাম্বিনে কণকালের মত পথে কোথাও বিভ্রাম নিক্ত পাথে এমন কোনো আগ্রহ নেই দেখানো। মধ্যপথে বহি ভাংগে খাদ্য বা পানীয় কিছু নিঃপথে হয়ে যায় তা হলোই সর্বনাশ। কিতরে যাওয়া বা অগ্র-গত হওয়া এই উক্তই মক্কাম্বিনে কাল চায়া ত্রাণ স্বাধার কল নিয়ে ঘনিষ্ঠে জুটে। এ অবস্থায় নিরুপায় পদিককে সুখা-তৃষ্ণার চর্চ্ছাদিত হয়ে অক্লান্ত মক্ক-প্রাণব্রহ্মে অকল্প উক্ত

যেথেকে যে, সমুদ্রতীর হতে অত পথান্ত কোনো মনুষ্য এ পথে আরবেয়া অক্লান্ত প্রবেশ করতে পারেনি। সারা দেশ কখনো সুশীতল মেঘাধার স্পর্শ পথান্ত পায় না। তরলতা, ভূগর্ভস্থের মিষ্ট স্রাবলতা হতে সে দেশ একান্তভাবে বঞ্চিত। বন্যদের অধিকাংশ সময় দেখানকাল সমস্ত শরণাপ্রার্থী নিরুদ্র তরলতা নিয়ে তৃষ্ণাস্রব উপহাস করে। কাজেই লোকের বসবাস এদেশে অতি অল্প। আরবেয়া আরবেয়া

মধ্যে মিশে দিগন্তে ছন্দবদী তীর্থযাত্রীরা এই পূণ্যস্থানে প্রবেশ করবার প্রবেশ পান বটে, কিন্তু যুগোত্তরযুগের চক্রে ধলা দিতে না পারলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা যুব বেনী, কারণ তাদের কাছে চক্ৰযাত্রীদের সাত-পুরুষের নাম-নাম লেখা থাকে, তবে ভুগোল সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান যুব বেনী না থাকায় তাদের ঠিকানো হত কঠিন নয়। এমন একটা কারমিক বেশের মান কত্যা যেতে পারে, যে বেশের সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় নেই। সব চেয়ে হুনিয়া, কোনো একজন আশপাশের কতীর সহবেশ বা শরীফান সেজে যাওয়া, কারণ তা হলে আর পরিচয়

রেলপথ হওয়ায় হাকীমের যুব হুনিয়া করেছে। ঐশ্বর্যে একেবারে মলিনার শেষ প্রান্ত পর্যায় হাকীমের গিরে গিরে পৌঁছে দিলে। কিন্তু, যে সব পুণ্যলোভাত্মক তীর্থযাত্রী প্রাচীনপন্থী লোক, তারা আতঙ্ক পরব্রহ্ম হান, হেলে গঠন না।

মদিনার চক্ৰত মহেশ্বরের সদাধিনক্ষিত আছে। চক্ৰ-যাত্রীদের মধ্যে লভ্যতা তিরিশতক প্রায় পরমেশ্বরের কবলে থাকে প্রত্যক্ষিত চিত্রে যার। তত্বে সঙ্গে চক্ৰতের সদাধি মলিন প্রদর্শিত করবে কোন শরীরে দিগন্তে বৈ বৈ অধিকাংশ যাত্রীই মাত্র মক্কা মলিন প্রদর্শিত করে ফিরে



যাত্রার পরিত্যক্ত হক্কায়া। যাত্রার পরিত্যক্ত এসে 'বুলা' পান করতেন। হুনিয়ায় পান পানি দিয়ে বসে বসে থাকতেন।

ইসলাম ধর্মের প্রত্যেক খুঁটিমাটি, বিদ্যাব্যবস্থা ও আচার-ব্যবহার পুণ্যপ্রস্থানরূপে যেনে চলবার মধ্যে কোনো জটী-বিচ্ছাদিত কার্য চক্রে ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে না। পাগলার সাতযুব মাপ।

পবিত্র মক্কাখান গিরিবেষ্টিত একটা পার্শ্বতা পূজার মত। হাভান পর্যন্ত যে পাখান-প্রাচীর তেজ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। সাগরবিশেষ প্রথম যুগ্মতাপ সেই পাখানের মুখে এমন অক্ষর হয়ে সজ্জিত থাকে যে, সাগরযাত্রী তার উত্তর অক্ষর অক্ষর করতে পারা যায়। পূর্ণ তীর্থ-যাত্রীদের সকলকেই পদব্রজে যেতে হ'ত, আত্মকাল যেতাক

যায়, মদিনার আব নামে না।

চক্ৰযাত্রীদের তাদের কারণ হয়ে গঠে বেড়ীনের মত। বেড়ীনের জীবিকানির্ভারের কোন দিব্যতা নেই। পক্ষের মুকের উপর দিয়ে পড়ে' তারা যিশের কিছু হুনিয়া করতে পারে না। নগরের উপকণ্ঠেই শিকার-সন্ধানের অপেক্ষা করে তারা। মুঠ-তরাজই তাদের একমাত্র উপাভাবিকা। কারিক পরিভ্রম করাকে তারা অত্যন্ত ছোট কাজ ভেবে তপাল চক্রেই বেবে। আরবরা পর্যন্ত বলে ওয়া কর্তন। মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত রেলপাড়ীতেও আজকলে জোবের উপস্থাপ হুক হচ্ছে। বেড়ীনের ঠিক পাটি হুনিয়ায়।

নিযমিত্ত সমাজ গঠন না। তবে বিদেশ ও বিদেশীরা এসে
যে পুত্র মতঃ প্রাপ্তি না। যখন, বড়ো প্রাপ্তি
সহ কল্যাণ প্রাপ্তি না।



আর্য সমাজ : লক্ষ লক্ষ ভক্তগণের সমাজ
সমাজে হয়ে সমাজ গঠন। এই সমাজে সমাজ এক অঙ্গ
নয়। এই সমাজের সমাজে সমাজের সমাজ গঠন
হয় না।

আর্য ভক্তগণ, লক্ষ লক্ষ প্রভৃতি সমাজের ভানসনাতোহে
চিরদিন অত্যন্ত, তাঁরা ঠিক আর্যের অবস্থা বোধ হয় ধারণা
করতে পারবেন না। বহুভূমির বেশ বলে আর্য দেশের
সংস্কৃতিতে বৃষ্টি আঘাতের অনেকটাই কর্মমার গৃহীতে তেজে
উঠতে পারে। মনে হ'তে পারে সেখানে প্রকৃতির রূপ
নেই, বৈচিত্র্য নেই, লোকনা নেই, শোভা নেই—কোন এক-
ঘরে বায়ুকারাশি অনন্ত বিস্তৃত পড়ে আছে। প্রকৃতির এই
রূপ বৃষ্টির মধ্যে কোন সুখনা নেই—কোন বিদ্যে শ্রী নেই,
সবই ছয়ত নীরস কঠিন ও কঠোর বলে মনে হবে। কিন্তু
প্রকৃত পক্ষে তা নয়। আর্যের বহুভূমি দ্বারা পায় হয়ে
কিহে এসেছে, তারা বলে নরকে প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের
অন্ত নেই। উষাকালে, অরুণোদয়ে, মৌল্য নদীতে, শান্ত
অপসর্যে বা শিবে সন্ধ্যায়, চন্দ্রোদিত রাত্রে বা কোৎলা-
দিমোত নিশীথে বহু-প্রকৃতি নিত্য নব নব রূপে কণে কণে
নবীনা হয়ে দেখা দেয়। মঠাটকার মাধুরী শুধু অভিন্ন
নয়—অতি অপরূপ!

ভক্তগণের প্রকৃতি সমাজ গঠে শ্রীতের প্রারম্ভ বা শ্রীতের
শেষ। কারণ অতঃপর এ সবদেশের উদ্ধার অঙ্গ হয়ে
ওঠে। এটি প্রারম্ভের শাস্ত্রীয় বিধান গঠে, মোক্ষমণ্ডপ বর্ণ-
পত্রীয় শেষ মাসের শেষ মণ-দিনের মধ্যে প্রারম্ভের শ্রীতক্রিয়া
শেষ করতে হবে। মোক্ষমণ্ডপ বর্ণ-পত্রী চন্দ্রমাস হিসাবে
গণনা করা হয় বলে বর্ষচক্র দুর বাগার মতে মনে প্রত্যেক
কতুতেই একমাত্র করে পিছিয়ে পিছিয়ে বর্ণের বিবর্তিত হ'য়ে
আসে। প্রত্যন্ত শ্রীতের প্রারম্ভ বা শ্রীতের শেষে ভক্তগণের
স্বযোগ ভাবনে একাধিকবার ঘটতে পারে। গুরু বর্ষ শেষ
রূপ ও বিপর উত্তীর্ণ হয়ে আধ্বাভীরা বর্ষন মক্কা বা মদিনার
রুমারে এসে ঈদাধ, তখন সমস্ত বৈষ্ণব মন তার আনন্দে বেগমু
হ'য়ে ওঠে। বহু দিনের সাধ, বহু দিনের ব্রহ্ম, জীবনের
ঐকান্তিক কাননা তার চরম সার্থকতার সম্মুখীন হয়ে তাকে
অঙ্গ পুলকে নির্লাক করে দেয়। একটা অনির্বচনীয় কাব-
ঘন বলে তার মনস্তত্ত্ব অস্তর কাণার কাণার হয়ে ওঠে। সকল
কল্যাণ ও চাপলা দ্বিহ হ'য়ে গিয়ে তার চিত্ত শান্ত সমাহিত
ও তক্লিপ্ত হয়ে পড়ে। তার মনস্তত্ত্বের আলোকিত করে
এই সত্যটুকুই সেদিন বড় হয়ে ওঠে যে, চিত্র-আকর্ষিত সেই
মহাভীরের পান্ডুলে যে আত্ম এসে পৌছতে পেরেছে, যে



আম-কল্যাণ : মেঘাভবনী ভক্তগণের সহ সূর্যবর্ষ
আপুতা।

ভীরের দিকে সারাভীকন ধরে দিনের পর দিন বহুভূমি ভাবে
সুখ কিরিয়ে চেয়ে চেয়ে সে ভগবানের দায় কয়েছে। প্রত্যাহ

অন্ততঃ পাঁচবার করে যে পূজাগোলের উদ্দেশ্যে তার মাথা নত করে, আর সপত্নীতে দেখানো উপস্থিত হয়েছে সে।

পার্বণ করবার সময় সৌভাগ্য তার ঘটে, তার মানব-কল্প ধর্ম ও পার্বণ হয়ে যায়। সকল শাস্ত্রাণ হ'তে সে উদ্ধার পায়।



মাবিনা: কৃপা থেকে পানীর জল নিয়ে করে কিছের।

মাবিনা ঘুম হ'তেই বাড়ীদের দৃষ্টিপথে পড়ে। তারা মহা উন্নতি হয়ে আবার তরফদারি কর'তে কর'তে যিগুণ উৎসাহে আগ্রসর হয়। কিন্তু তীর্থশ্রেষ্ঠ মজা উপত্যকার অস্ত্রাশে বাড়ীদের দৃষ্টিপথের আগোচরে সংযোগনে লাগে। পথপ্রান্ত প্রতীকাত্মক উৎস্রক বাড়ীদের সাগ্রহে দৃষ্টির সমুখে অবশেষে পবিত্র মকা-খাম্বা এখন সহসা আত্মপ্রকাশ করে—পরমবরের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রথম ইসলাম ধর্মের উপাসনা মন্দির অর্থাৎ মজার মহান্ মসজিদের চূড়া তাদের চোখে পড়ে, সকলে তারমতে চীৎকার করে, “কর আমার তহ!” ধর্মগ্রাণ মুলদমনেরা অকপটে বিখাস করেন, এই অলোকসামান্য পূজা-কৃদি আমার হৃদিত ধর্মক্ষেত্র। ভীকনে একবার এখানে



মবজিগী: পথ থেকে হলে আরক-মণ্ডার অমন্তকনের অস্ত্রাশে সংযোগনে ৩১২ পথ চলেন।

ଆନର୍ଷ । ଇକାଦାଶିତ ପ୍ରାଥମ କାଳ ହିଁରେ ତାହୁକ୍ ବା 'କା-
ଆଦା' ଆନର୍ଷ । 'କା-ଆଦା' ହିଁର ଦେଃତ ଓ଼ମାହ ବା ଓ଼ମାହ

[illegible]

থেকে জানা যায়, আরম্ভ নাকি এটি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁর ভূতপূৰ্ণ বাসস্থান স্বর্ণ-শোধের অঙ্গুরণে। স্বর্ণশ্রষ্ট হয়ে মধ্যলোকে তাঁর পতন হবার পূর্বে নাকি বেহেস্তের এমনি একটি ঘরোঁ তিনি বসবাস করেছেন। তারপর পৃথিবীতে নব্বাঈলয় ঘটে। প্রকৃতির পরে আত্মহান ও ইসমাইল এ নাকির পুনর্নির্মাণ করে ঈশ্বরোপাসনার ভর উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে নব্বাওয়ায়া শৌভলিক যক্ষ গ্রহণ করে বশন লাভমণ্ডে এখিরে চলেছিল, সেই সময় তাযের রক্ষা করতে ও শাযত মতাপনে পরিচালিত করতে স্মি-পয়গম্বর হজরত নব্বাযের আবির্ভাব হয়। হজরত তাযের কাছে পবিত্র ইসলাম ঘরোঁর পুণ্য বাণী প্রচার করে তাযের শতাব্দেঁয় দোফা দিয়েছিলেন এবং স্মিযের যে উপাসনা-নাকির তারা শৌভলিকতার সংলগ্নে অপবিত্র করে তুলেছিল, তিনি তাকে পুনরায় নির্মল ও পবিত্র করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে নব্বা হয়ে উঠেছে ইসলাম নামের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। পৃথিবীর যেখানে যখন কোন মুসলমান নব্বা করেম, তাঁর লক্ষ্য চলে পশ্চিমের দিগন্ত তেব করে নব্বাযামের উদ্দেশ্যে, তাঁর



ସଂସ୍କରଣ : ୫୩ (ବୃତ୍ତେୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଶ୍ୱିନ ୧୫ ଶ୍ରୀମତୀ ସଂସ୍କାରୀ ମାତାମାତା କଠେ ।

নিকেতনের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সেট পূর্ণাঙ্গের—বা ইসলাম
জগতের পণ্ডিতসমূহ ঠিক। প্রাক-ইসলামিক যুগেও 'কা-
আবা' পুস্তকই কেবল প্রসিদ্ধ ছিল। আরবদের পূর্বাধিকারী

ଧ୍ୟାନମୂଳି କଥା ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ, ସହଦ୍ରୁମ, ନାମ, ନଗରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଭବ
କରେ ଚଳେ ବାସ ଶେଫି ହୁଏ ହେତାହେତୁ ଏକପ୍ରାଣେ ପୂର୍ବଦେଶାନ୍ତ
‘କା-ଆବା’-ର ପବିତ୍ର ନିକ୍ଷେପ, ସେଠାରେ ଯେଉଁର ନିବାସୀମାନେ ବଢ଼ି



খদিযার হাফস : খদিযার হাফসের হাফসাবাদ। কিসের
সকলের দুই মাথায় বসে।

তক্ত নুসলমান এল পৌরুষ, সে কেমন যে এক গভীর
তগবদ্বাণে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। 'কিস্-বাব' যম্ যম্ জ্বলিতুই
তার কাণে এল পাণে বেন বেনবৃত্তপনের পকবিবৃত্তনের মত।
তাগা আনশাক্তবগণিত নেত্রি অশ্বিন-দ্বারের ধবনিকা যুগে
শেপে ধরে, 'কা-আবা'-র পবিত্র কক্ষপ্রস্তরের উপর ত্বিষ্ট
হ'রে সাঠিকে প্রগতি জানার, ব্যস্ততার সেই পূণ্য বিলাস
প্রভা করে চুপন করে, 'কা-আবা'-র চারিদিকে সন্তবার প্রদক্ষিণ
ক'রে ঘোরে। তাহের কণ্ঠে জ্বলিত হ'রে গুঠে তপবানের
শ্রেষ্ঠ বন্দনা, মুক্তাওজিস্তা তাহের হাত খ'রে সাদক্ষিণ
করায। প্রত্যেকবার পবিত্র-অগ্নে পাবন কক্ষাবলার তাহের
সত্যিক চুপন একে রাখে। এই সন্তবার পত্ৰিকনা প্রত্যেক
হৃদয়াক্ষিকে প্রথন সাড়দিন প্রভাহ ক'রতে হয়। তারপর
যাইগা পবিত্র নূপ জেদ্-জেদের তীর্থবারি পান করেন।
মলকিরের অভ্যন্তরস্থ পাতাবতগুলিকে নগ্ন বা শুক্লবর্ণা খেতে
বেন। তারপর তাহের 'এল-শাঈ' অধুতান পালন ক'রতে
হয়। 'এল-শাঈ' জেদ্—সাতা ও মারতগা নামে এই পবিত্র
পূর্বতের মনো, সাতবার ছুটে ছুটে আশা-বাগবা ক'রতে হয়—
পূণ্য কোরাণবাগ উচ্চারণ ক'রতে ক'রতে। এই পূণ্য



'কা-আবা' মণ্ডল : তক্ত তীর্থবারি বস করেআলু কা-আবা' মণ্ডল ও মলকিরের ক'রতন।

ঈশ্বরের দরবারে এল দ্বাভিগা দেবার তক্ত মলকিরের ক'রতন অধুতানের বসে তীর্থবারি জীবনের সমস্ত পাপ খণ্ডন হ'য়ে
নিগত আত্মান করছে। এ এখন তীর্থে যেদিন সভাই কোন
যায়।

এখানে হাজার হাজার হাজারী যখন একত্রে নমাজ করেন, তার মধ্যে একটা বিশেষ দৃশ্যের সৃষ্টি পড়ে। প্রত্যেক মসজিদে ও উপাসনা-স্থানে চক্ৰবাক্তি বলে বলে সতর্ক রেখার স্বেচ্ছিবদ্ধ ভাবে পশ্চিমদিকী হয়ে ‘কিব্‌লা’-র দিকে ফিরে দাঁড়ান। কারণ কিব্‌লায় অবস্থানবিধি সঠিকভাবে তাঁদের ‘কা-আবা’-র দিক নির্দেশ করে দেয়। অর্থাৎ নমাজের নিয়মই হচ্ছে ‘কা-আবা’-র দিকে লক্ষ্য রেখে তৎপরতার উপাসনা করা। কিন্তু হাজারীরা যখন সেই খোদ ‘কা-আবা’-তেই উপস্থিত, তখন তাঁদের আর ‘কিব্‌লা’-রও প্রয়োজন নেই এবং পশ্চিম মুখে ফিরে দাঁড়াবারও আবশ্যক করে না। সুতরাং তাঁরা ‘কা-আবা’-র চারিদিকেই ঘোঁল হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে নমাজ করেন। নমাজের এ অতিনব সূত্র জনতের অঙ্গ কোথাও আর দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

সমগ্রকাল ‘কা-আবা’ প্রদক্ষিণের পর অষ্টম, নবম ও দশম দিনে হাজারীরা ‘আরাকাত’ সম্পর্কিত যেতে হয়। আরাকাত যেতে না পারলে হাজারীরা বুধা, কারণ ‘কা-আবা’-র পর আরাকাত যাওয়াটা এই তাঁরীকাদের একটা প্রধান অঙ্গ। কেবল মাত্র ‘কা-আবা’ ঘুরে এলেই হাজারীরা সম্পূর্ণ হয় না। বীরা আরাকাত দেখে ফিরতে পারেন, তাঁরাই কেবল ‘হাজী’ এই পৌনঃপুন্য উপাধিতে ভূষিত হবার অধিকারী হন। এই আরাকাত বাহা একটা অপরূপ সূত্র। কারণ কেবলমাত্র হাজারীরাই নয়, সাগর হচ্চা সমুদ্রের ছোট বড় সমস্ত লোক অবিবাসীগণও সেদিন হাজারীরাই হলে শুধুপক্ষে দক্ষিণ হয়ে

নয় শিরে ও নয় পদে আরাকাত পরীক্ষাক্রমে পদব্রজে অগ্রসর হন। কেউ কেউ ঘোড়ার চড়েও যান। নবম দিনে আরাকাত পরীক্ষার উপর দাঁড়িয়ে হুজ্বাঘর থেকে হুজ্বাও পঞ্চাশ উপাসনা চলে। একে বলে ‘হাফ্‌জ্’ অস্তুত। দশম দিনে তাঁরা পৌরনিকতা ধ্বংসের পুনরুজ্জীবন করেন। গ্রীক-ইসলামিক যুগে যে যে নৃশি বোঝানে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সেই স্থান চিহ্নিত করে এক একটা স্তম্ভ নির্মাণ করে রাখা হয়েছে। হাজারত পঞ্চদশ বছরে সেই সব নৃশি ধ্বংস করেছিলেন, তাই আজও প্রতি বর্ষপরে সেখানে সেই ধ্বংসলীলার পুনরুজ্জীবন হয়। অর্থাৎ সমগ্র হাজারী প্রান্তর বিক্ষেপ করে সেই স্তম্ভ-গুলিকে আঘাত করেন। এ থেকে একটা ব্যাপার বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পৌরনিককে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা কঠোর ঘৃণা করেন।

ধ্বংসোৎসবের পর, শব্দ-শব্দ ও মাথার চুল কাধিরে কেলে হাজারীরা ‘কা-আবা’ হয়ে যে ধার ঘরে ফিরে যান। ঘাবার পথে কেউ কেউ মদিনার নেমে হাজারতর সমাধি দেখে যান। সেখানেই আবু বেকর ও ওম্মান—এই দুই হাজারতের ও কাদিরের কবর আছে। কিছু ঘুরে পরলবরের কব্রা ফতিমারও সমাধি দেখতে পাওয়া যায়।

আরও বেশ হাজারত মগধের যুগে যে অবস্থান ছিল, আজও অনেকটা সেই অবস্থাতেই রয়েছে। বারোশো বছর আগে সে চেনের ধর্ম, লড়াই, সমাজবিধি যেমনটি ছিল, আজ তা দেখে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি।

মুর্শীওসব

মুর্শীওসবে বিলম্বী ও আত্মবী এক চরিত্রকেন্দ্র। যা মাঝার দণ্ডভুক্ত, কণ্ঠস্ব-প্রদর্শিত, ক্রোধেও ভাগ্যবিতী। মাঝার বা মাঝার (যেহেতু-মহাত্মা কব্রা ইয়া—মুর্শীও কালী।) নব্বই দশক-কোড়া বৎসর-করা এতিয়ার দিক তাকাইলে বেশ বেশি! মাঝিকলার মধ্যে কেন্দ্র জল থাকে, কি জারি কোণ হইতে সে জল আসে, কেন্দ্র করিয়া আসে কেবল জানে না, তেমনই কেহও নব্বই দশক-কোড়া বৎসর-করা, কালীও কালী কালপন্থিক সে কেন্দ্রের বিজ্ঞান করিবার। এই চরিত্রকেন্দ্র—এই মাঝার এক করিবার ইচ্ছাশক্তি মুর্শীওসব।

বঙ্গালীর আগমন-সঙ্গীত

—স্বামী প্রেমচন্দ্রানন্দ

ভারত-সভ্যতায় বাঙালীর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এ বৈশিষ্ট্য তার ধর্ম, সনাতন, শিল্প, সঙ্গীতে রূপ লাভ করেছে। হুতরা হুতলা বাঙালী মাথের ঘান ভাবত কখনো অস্বীকার করতে পারবে না।

মাহুয়ের চুটি চিনিব,—জব্বর ও মস্তিক। মস্তিক করে বিচার, জব্বর করে অহুতব। মস্তিক করে—বস্ত্র ভাগবত, লাতকতি, উচিষ্ট-অহুচিষ্ট বিচার; আর জব্বর করে তার রসাবাসিন। মস্তিকের বিকাশে মাহুয় হয়,—জানি, পণ্ডিত, বার্নিক, বৈজ্ঞানিক। জব্বরের বিকাশে মাহুয়—ভাবুক, কবি, শিল্পী, গায়ক, তক্ত, বাতা, সেবক হয়। এ গুটি বৃত্তির সমান বিকাশ সাধারণতঃ মাহুয়ের হয় না। বসের মধ্যে হয়, তাঁরা ভগ্নতে বিশেষ উন্নতি করেন।

বাঙালী জাতির মধ্যে যেমন মস্তিকের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়,—তেমনি পাওয়া যায়, জনরের পূর্ণ পরিণতি। যেখানে মস্তিকের অসাধারণ বিকাশ, মাহুয় সেখানে গুটি বেবে অর্থাৎ হয়, প্রশংসা করে। কিন্তু তার অম্বরের ঐকান্তিক পূজা, শ্রদ্ধা, পার জন্মবান। বাবা,—গুরু, পূজা, দেবতা; বা কিন্তু তুমি গুরুই নন, তিনি অন্তর-মাতোব অধিতারী বেবী। বাবা ও মায়ে কি তফাৎ তা বলার চেয়ে অসুভব করা সোজা।

মস্তিকের স্রোতে বাঙালী বিশেষ উন্নতি করলেও, লোকে বলে—“ভাবুক বাঙালী জাতি”। প্রাকৃতিক লীলাবতী বাঙ্গালার মাহুরে নিখুট খেকেই হয়ত এ ভাবুকতা বাঙালী শেষে থাকবে।

ভারত-জননীর হৃদয় ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পূজারীর হল, দেহকের হল, মলে বলে সুখ-নিম্নায়িত। এই মন্দিরে জাগল প্রথম—বাঙালী; জেগে হুগে ধীপে মাহুরে মঙ্গল আরতি করল; হ্রস্বগুর বন্দনা গীতি গাইল; শব্দ, বক্টা, বামাধা, কাক্কা, ঘেঁষার ঘায়ে বাঙাল। ধীরে ধীরে ভাগল তখন নিম্নাতুর সন্ধানগণ। তন্ত্রাভক্তি চক্ষু, অর্থাৎ হয়ে ভাঙা চেয়ে দেখল, আর নূন রূপ, আশার আলোয় দীপ্ত সুখছটা,

বেদপ্রসারিত যথাক্রম। নব-ভাবতে এমনছে বাঙালী, নবীন রূপ, অভিনব চেতনা—ধর্ম, বাটে, সনাতন, শাস্ত্রোত্তা, শিল্প, নৃত্য, গীতে।

একটা জাতির বিশেষত্ব কোথায় বেশতে হলে, দেখতে হয়—তার সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প ইত্যাদি। যে যেমন, তার প্রতি চিন্তাটি পেই তাইবেই হয়,—প্রতি কাকটিক তার সেইরূপই হয়। কপার বলে,—মাহুয়ের হাতে পড়ে ভগবানকেও মাহুয়ের মত হতে হয়েছে। কেউ বা তাঁর হাতের সংখ্যা, মাণস সংখ্যা বাড়িয়েছেন; কেউ সর্গপ্রকার অর্থাৎ খেকে তাঁকে নিষ্কটি দিয়েও হাত, পা, কোণ খেকে অব্যাহতি বিতে পারেন নি। কি জানি তাঁকে ছোট করে ফেলা হয়, এই করে কেউ তাঁর কোন সত্য রূপ কমনা করতে মানা করেছেন, তবুও তিনি বর্ণের সিংহাসনে বসেন, নানা কর্মজাতী বেষ্টিত হয়ে বিচার করেন, পুণ্ডরাক বেন, বও বিধান করেন। উপায় নেই। স্বর্গসিমান মানব থাকবে, ততদিন তার প্রতি কমনা, প্রতি কর্ম মানব-ভাবনায়া হারই পাবে না। হুতরাং বাঙা বাঙালী—তারের লখনাথ, ভাষের কন্দহারায় একটু বাঙ্গালীও থাক। কিছু অব্যাহতিক নয়, অস্ত্রায়ও নয়।

বেদী-পূজা, বেদী-মন্দির, বেদী-উপাসক ভারতের বহু স্থানে আছে। তবুও দুর্গাপূজা বাঙ্গালার একান্ত নিখুট। দুর্গাপূজা শাস্ত্রীয় পূজা—বাঙ্গালীদের বেনাজার বা আর কিছু নয়। বহুরে ডগাং মায়েব পূজা হয়। পরৎ-কালে শারদীয়া পূজা আর বাসন্তী পূজা বসন্তে। বাসন্তী পূজার চেয়ে শারদীয়া পূজা বেশী ব্যাপকভাবে হয় এবং জাতে উৎসবানন্দও অনেক বেশী হয়। দুর্গাপূজা বলতে সাধারণতঃ এই শারদীয়া পূজাকেই বুঝার।

গোপ, মহামায়া, বজা, ব্রহ্মিক, উপবাস, বাড়িয়া এবং তার কলসজপ অগ্নি ও কলহ-বিবাহের জাগলীয়া চলছে আজ বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে। তবুও মায়েব আগমনে, অনাহায্যকিষ্ট, কতালগার বাঙালীর মন উৎসবানন্দে বেৎত,

উঠে। যেথের ভুল ভ্রান্তিতে না ভ্রান্তিতে, সত্যবৈদ্য যুগে
হাসি ফেটে, মাথের আগমনে। বাণী আত্মীয়-বন্ধ ছেড়ে,
শেষ ছেড়ে, কতক ভুল ভ্রান্তিতে বাস করেন, এ সময় উপাশ
হবে কিসে ঘান। ষায়া তা পাথেন না, ষায়া যেখানেই থাকুন,
এ সময় সারের পায়ে চুটি জবা-বিধবল দেবার মাগোজন,
সেখানেই তবে থাকেন।

বাঙ্গালার লোক-সাহিত্য, পল্লী-ঐতিহ্য শিব-ভূগর্গার
কাহিনীতে ভরা। ভূগর্গা পূজা যেমন বহুকাল ধরে চলে আসছে,
এই সব কাহিনীগুলোও লোকপন্থাচার বহুকাল হতে চলে
আসছে ও ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করেছে। অবশ্য এগুলোর মূল
হিসাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ। যে ভাবধারা নিয়ে বাঙ্গালার আগমনী-
সঙ্গীত ভঙ্গ্যলাভ করেছে ও চলে আসছে, তা অপূর্ণ।
আনা কবিগণ ও রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণ
এই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন,—নিপুণ তুলিকার।

গুণাব আগমনই আগমনী-সঙ্গীতের বিষয়-বস্তু। ভূগর্গা
গিриতাক গিনালয়ের কত। উমার বার নাম মেনকা।
ভোগানাপ শিবের সঙ্গে জীরা মেয়ে বিয়ে নিয়েছেন।
বিয়ের সব করতলে মেয়ে চলে গেছে কৈলাশে। অনেক দিন
যাত্র, মেয়েকে না বেঁধে সেনকার মন বড় উতলা হয়ে উঠেছে।
গিহিতাক পাখান, তাঁর মনে গুণের লেপও যেন নেই। কিন্তু
না আর থাকতে না গেলে মিনতি করে বাবীকে বলছেন,—

নাও বাও গিহি, আনিতে দৌরী, ইনা নাকি বড় কৈলয়।

আনি, বেথেরি বদন, নাগর বদন, উমা, না মা বল কৈলয়।

সোনার বর্ণ দৌরী আবার ভাঙত দিবাশী কানাই তোমার
মাথের কন কুল সব আচরণ, তাও খেতে নাকি তার খেয়ে।

সত্যই বাঙ্গালার বাউলগণ রূপ নিয়েছে তার আগমনী-
সঙ্গীতে। কোথায় ভূগর্গা বিধবমনী, মহাশক্তিভূগর্গা ?
তিনি যে আসার বাঙ্গালারই এক ভূগর্গা মাথের একমাত্র
সম্মান। মাথের প্রাণে যে বাণী মূল গুণ করে বেতে এসেছে,
তাই মূর্ত হয়েছ,—বাংলার সাধক কবিরের কণ্ঠে। না
ভাবেন,—আমি না দেখলে উমাকে আবার কে দেখবে ?
কাহা! বাছার হুঁহি কত ধোঁবেই না হচ্ছে! আবার নিজের
অবস্থা কত অসহায়। বাবী গিহিতাক, তিনিও যে পাখান।
পাখানের মধ্যে কি আর সমাধায় থাকে ? তবুও অসহায়
হমসীর বাবী ছাড়া উপায়ও নেই,—

নাও বাও বস গিহিতাক, দৌরীর আনিতে।

বাপু ন হাংকো ত্রাণ কামারে সেরিতে।

দৌরী নিয়ে গিহিতাক

আনকে হাংকো সেরে,

কি আর তব অসহায়, না পারি বুঝিতে।

কাহিনী করিল কিনি

তাই যে তোমাকে লাগি,

মাতীর জনন কেমন বদন্য সহিতে।

হস্তিনী মরগা বহ

কালী সে মরগা অহ

হুহি যে পাখান হাত, না কার মনেতে।

ভক্তি-সাধনার বৈকুণ্ঠ মাথের পাঁচটি পথ বলা হয়েছে।
শাক্ত, বাক্ত, মধ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ভক্তি সাধককে
ভগবানের একান্ত আগনার করে। তরু তাই ভগবানের
সঙ্গে একটা ভাগ্যতিক সম্পর্ক পেতে নেয়। এই পাঁচটি
ভাণের মধ্যে সত্বগুণের স্রেষ্ঠ মধুর ভাব, তদ্রূপই বাৎসল্য-
ভাণের স্থান। বাৎসল্যভাণে ভগবানকে আশ্রয় সম্মানের
মত ভালবাসতে হয়।

বহু-ভমনীরা না মেনকার স্থান গ্রহণ করে মহামাধাকে
নিজ কস্তাক্রমে আরাধনা করে থাকেন। বাঙ্গালার আগমনী-
সঙ্গীত এই। উমা মনে করেন উমা বামীর স্বর থেকে তিনি
দিনের ভক্ত ভূগর্গা নাকে দেখতে আসেন।

ছেলে বেবে সংসারে পূব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বহু লোক
তাকে মাত্র করছে, প্রচুর ঐশ্বর্য লাভ করেছে, এসব দেখবার
কল্প কোন না বাপের না কামনা হয় ? বেয়ের কথা ভেবে
ভেবে গিরিতাপি যন্ত্রে দেখেছেন—উমা রাজত্যাগেবস্ত্রীঃ

উমা আবার সমাজ থেকে বদ,

গিহি তোমারি কুখারী, তা না গ বহ।

অব না বেথেরি গিহি, কহিতে অদ বসি তব,

কেব কার চুতুর্দ্ব, তাই পক্ষপ,

উমা তাথের বহকে কহ।

গাম্যগেবস্ত্রী হতে হাত বদন কণ বহ,

তবে বহুদাবন, কলোবহণ

কোড় হাতে করে বিনে।

সম্মানের কল্প অকাতরে হৃদয়ের সম্মান মান করাই
মাতৃহ। উমার ভক্ত মেনকা মাত্র ইন্দ্রাশ্রিনী পলক, হপনে,

ভাগবৎ, তুমি উমা, উমা, এক ডিঙ্গা। বসন্ত-সবে মেঘের
আমার কত কষ্ট, কেউ বা ভেগে! পাখালা কামাই, পশানে-
মশানেই তার দিন বাগ,—

খিচি, এখার আদার উমা এলে, আর উমা পাখালা না।

কল কলক লোকের মল, কলক কলক উমা না।

গমি এম সুভাষ

উমা মেঘের মল, কল,

মাগে কিলে কলক কলক, কামাই কলক মলনা না।

খিচি কলক কলক কল,

এ কলক কি কলক কল,

কামাই, পলক মলনা কিলে কলক কামাই কলক না।

ভাগবৎ অনেক কামাকামিতে, সাধা-সাধনার, সত্যট
একদিন—

যাক শুভ নিশি সোমাইল হোমো—

এই যে খিচি মলিনী আইল।

গিরিবাথ কৈলালে গিরে মেঘের নিয়ে এসেছেন। উমা
এবার মলকল, মলিনমলিনী রূপ ধরে এসেছেন। সঙ্গে
এসেছেন, লক্ষী, সরস্বতী, কান্তিক, মল্লিক। বা বাগ—যেন
ভেলেনেরে ঐশ্বর্য, সুখ-লক্ষ্য এ সব মেঘের চান ভেলেনি
আবার চান—মেঘে যেন চিরদিন মেঘের থাকে। অধিকার
এ রাষ্ট্রভাষ্যেরী-রূপ ধরে বা ভগ পেলেম,—

কতী অর্ধি পুর আমিন যে করে, কৈ খিচি মল মলিনী।

আবার অধিকা খিচুতা মলিনা, এ যে মলকল। কলকলমলিনী।

কিল সে মলিনে কলকলমল, কলকল মল মলিনী মল,

কলকল মলকল মলকল, কলকল কলকল মলকল।

কলকল মল মলকল মলকল আর মল মলকল মলকল,

মলকল মলকল মলকল মলকল, মল মল মল মলকল মলকল।

ভাগবৎ বা কলক মলকলে পালেন, মলকল আর কেউ
মল, ভাগবৎ মলকল উমা, বাগ কলকল ভাগবৎ মলকল
তখন মলকল মলকল কি মলকল!

একি কি মল উল, মল মলকল,

কৈলাল মলকল মল কি উল?

মল মলকল, আর কলকল মলকল

মল মলকল মলকল মলকল।

মল মলকল মলকল মলকল,

মলকল মলকল মলকল,

মলকল মলকল মলকল,

মলকল মলকল মলকল মলকল।

মিলনের প্রথম ভাবটা খেল কেটে গেল, তখন আল
মলকল, মলকল মলকল। মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল, মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল, মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল, মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল, মলকল মলকল মলকল

কেন মলকল মলকল মলকল, মলকল মলকল মলকল।

কত মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল।

মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল,

এবার মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল।

মলকল মলকল মলকল, মলকল মলকল মলকল

কতী মলকল মলকল মলকল, মলকল মলকল মলকল মলকল।

এভাবে মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল। মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল

বাগা ছোটবেলাকে বাগা মলকল মলকল, মলকল
ছোট কলকলকে মলকল মলকল মলকল মলকল। মলকল
কলকল মলকল, মলকল মলকল মলকল মলকল— এই মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল

মেঘানে ভাব নেই, অমলকল নেই, তুমি কলকল বা মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল

মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল
মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল মলকল

[১]

কর্ণাটক দেশের হাবলী শহরে সিদ্ধারা নিবসিনারা।
শেঠি তামাকের একজন বড় বাগানী। তাহার তানাক এক-
হিকে বাহাদুর, অপর দিকে কলিকাতা ও রেঙ্গুনে রপ্তানি হয়।

বাজারের বড়-চাপার উপরে শেঠির প্রকাণ্ড বাড়ি।
তার এক কোণে একখানা বড় তক্তাপোলের উপর বসিয়া
সিদ্ধারা কোচেন্দা করে। পাশে একটা ঘোশান-বেড়া বেক
ও চুইখানা চোহর। সেখানে বহলোক ও বহুজাতের লোক
সিদ্ধারার কাছে আসে যায়। স্বজাতীয় লিঙ্গাঘেড়েরা আসে,
ঠেন আসে, বাঢ়াঠা আসে, মাস্তাকো চেষ্টা আসে, গুজরাটী
শেঠি ও থোকা আসে। কখন কখন কলিকাতা হইতে
বাগানী বাবু পর্য্যন্ত সেখানে বেথা সেব। তাহা ছাড়া
ইন্সপেক্টরাল টোবাথো কোম্পানীর লাহেবেয়া আসা-যাওয়া
বনে, কখনও কখনও বাগানের পানী কন্দচারীও আসিয়া
পাকে। সিদ্ধারা নিজ কব্জ তাহা ছাড়া মাগাঠী বিনী
গুজরাটী তেলও এবং তামিল ভাষা বেশ সহজ ভয়েই বলিয়া
পাকে। তাহার লোকানের হতা থোকাই হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত
সর্বত্র সমাদৃত হয়।

সিদ্ধারার যে কত অন্ন তাহা গোচর করনাই করিয়া
উঠিতে পারে না। সে কয়েক শত টাকা ইনকাম-ট্যাগু বেধ,
কিন্তু সরকার কি শেঠির মত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে লব
আদায় করিতে পারে? ইনকাম-ট্যাগু তাহার খনের সামান্যই
পরিমাণ হইয়া থাকে।

সিদ্ধারার চেহারাটা কৃষ্ণবর্ণ, গব্ববহত, গোলগাল।
হুঁড়ির দিক দিয়া একটু অতিরিক্ত রক্তব বিকৃত। বেশ
জামরেল বেধ, দেখিলেই ব্যবসায়ীদের মনে প্রত্যয় জাগে।
অর্দ্ধক মাথার টাক, ঘন রু, শক্ত জোড়ালো গোফ। পত-
বেশের পরিমাণ বেবিধা মনে হয়, বহন পকাশ অতিক্রম
করিয়া গিয়াছে। দাড়ি কাশানো, তবে পাভলা বহনপের
শাটের নীচে, দাড়ির অভাব পূর্ণ করিয়া, বকের উপর এক-
রাশ অর্দ্ধপক লোন শোভা পাইতেছে। তাহারই উপর দিয়া,

তাহার ধর্ম্মের লক্ষণ স্বতঃ, একটা হুতলীতে বাধা রূপার
ডিঘার তিতর শিবলিঙ্গ খুলিতেছে।

শাটই সাধারণত তাহার উপরের শোষাক। তবে
কোনওখানে দাঁতে হইলে তাহার উপর দিঘের দলাবন্ধ লম্বা
কোট পরে, মাথার ভরিয়ার লাল শাপড়ী বাঁধে এবং পায়ে
ভরিয় ফুল বেওয়া একলোড়া পাগড়ন লাগায়। সিদ্ধারার
চোখগুলি বড় বড় এবং খুব দৃঢ়তাপূর্ণ। নাসারন্ধ্রগুলি একটু
বেশী রক্তম ক্ষীত, সে অবসরের সময় তাহাতে হান্তের মুঠা
ভরিয়া নত দেব।

এমন ব্যক্তির জীবন কানার কানায় মূখে পরিপূর্ণ থাকে
উচিত। কিন্তু বিধাতার নিয়মই এই, ভগতে নিরবস্থির স্থল
হয় না। আত্ম সন্ধান হইতে সিদ্ধারার যুকের ভিতরটা
একটু অস্বাভাবিক রক্তম চিন্, চিন্ করিতেছে। তাহার
কারণ বিধাতা তাহার জীবনের প্রতি খুব সদয় হন নাই।

[২]

সিদ্ধারা আর সকালে বোঝান খুলিয়া, কর্ণচরীদিগকে
গরীতে বসাইয়া বস্তাখানেকের মনোই বাড়ী ফিরিল। তাহার
বাড়ী বোঝান চাইতে আর মূখে বাজারেরই সঙ্গে। বিশাল
একখানা ঘর, তিন পুরুষ যাবৎ তাহাতে শেঠিবেশ বাস।
এখনও ত্রী-পুরুষ শিশু বিলিগা পটিন ত্রিশজন শেঠি তাহাতে
বাস করিতেছে।

কিন্তু বাড়ীখানা দেখিলেই মনে কেমন অসন্তোষের ভাব
জাগে। বাহিরে আন্তর, রং, ভিত্ত, সকলই আছে, কিন্তু
ভিতরের দিকে বড়ই বেথা যায়, ততই এক অশ্রুগীর
অশ্রুগীতা গোপে তাক লাগাইয়া দেয়। বড় বড় অঙ্ককার
ঘর, বিনের বেলায় তাহাতে আলো আলাইতে হয়, অঙ্ককার
শিঁড়ি, হাতকাইতে হাতকাইতে উপরে উঠিতে হয়। দৃষ্ট
অর্গতে নিরাশয় করিবার জন্য, এক সমুদ্রের ও শিল্পের
দরজা বাতীত বাহিরের সঙ্গে কোনই সংজব রাখা হয় নাই।

ঘরের সমুদ্রের চাতাল পাথর দিগা বিধানো। আত্ম
তাচার উপর চাঁটাই ফেলা চটাইছে। সে চাঁটাইে একদল

বাহকর বগিচা ঘনেন আনন্দে বাশি সানাই তোল বাজাইতেছে ।
বাহকরের সন্মার গল্প চৌগান মাথা খুটাইয়া খুটাইয়া চোলের
উপর হাত বুলাইতেছে । আর তাহার ভেগে লক্ষণ গাল
ফুটাইয়া ফুটাইয়া সানাই কুঁকিতেছে ।

সিদ্ধাঙ্গা বাগান্ধার উট্টিয়া দেখিল, সমুখের ঘরের,
চৌকাঠের উপর চটতে পোশার মূল কুসিতেছে, ঘরের
সেতের উপর মস্তরক, তার উপরে চানর ও তাকিয়া পাতা
চটাইছে । এবং সেখানে তাহার পড়শী স্বভাতীর দুইচাতি-
কন লোক আসিয়া বসিয়াছে ।

সিদ্ধাঙ্গা অত্যাশা করিবার পূর্বেই তাহাজ্ঞা উট্টিয়া তাহাকে
অত্যাশা করিয়া ঘরে গইল ।

বাহকর ও অতিথিদের আগমনের কারণ, আজ সিদ্ধাঙ্গার
বিবাহ,—চতুর্থ বাতর । তাহার প্রথম তিন ভাণ্ডা পরলোক-
গতা ।

[৩]

সিদ্ধাঙ্গার পিতা শিবসিদ্ধাঙ্গা বাসবাঙ্গা সেটি বখন ইহ-
লোক ত্যাগ করেন, তখন সিদ্ধাঙ্গাকে বিয়া দান, বিশাল
তামাকের কারখানাটি, অনেক বিধা তামাকের কলি, তিনটি
বৈমাত্রেয় ভাই, একটি বৈমাত্রেয় ভগ্নী এবং জগদান বয়ীরা ভাণ্ডা
গৌরী-আশা । তাহার মাতা এবং দুইজন বিমাতা পূর্বেই
অর্ধগতা হইয়াছিলেন । গৌরী আশা বখন বিবাহের আড়াই
বৎসর পুরে পিতৃমৃত ত্যাগ করিয়া স্বামীপুত্রে বাস করিতে
আসিল, তখন দার্শনিক অধুতাদের তার পড়িয়াছিল সিদ্ধাঙ্গার
অনুগা ভগ্নী পার্জতীর উপর । সে ঘটনার ছয় মাস পরে
সিদ্ধাঙ্গা বেশ ঘটা করিয়াই পার্জতীর বিবাহ দিল । কিন্তু
তখন হইতে তাহার বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা পৃথক হইয়া গেল ।
সে তাহাদিগকে ভাগ করিয়া খাড়ীর, কবির এবং গোকানের
মূলঘরের অংশ দিল ।

গৌরীর সঙ্গে তাহার জীবনভাড়া বেশ সহজ ভাবেই
পড়িয়া উঠিল । তাহার এক কারণ গৌরী তাহার মামাতো
বোন । বোনের ছেলের কাছে মেয়ে দিয়া ভাইবোনের
লক্ষ্যটাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রথা এসেছে খুব প্রচলিত ।
এত বেশী যে, কল্লভ ভাণ্ডার সাধারণতঃ স্বত্বকে যামা বলা
৪৪ । পিতার বাড়ী ভাইবির অপরিস্ফুট নব, হুস্তাঃ গৌরী

বসলে কাঁচা চটলেও অতি আর সময়ের মধ্যেই গৃহস্থির পথে
পাকা হইয়া বসিল ।

বাসিতে সিদ্ধাঙ্গা দোকান চালায়, তিতরে গৌরী-আশা
সন্মার চালায় ; উভয়ের কাজ এমন নিপুণ এবং স্বচ্ছ-
পঙ্কিতে চকিতে লাগিল যে, পাঁচটি বৎসর কেমন করিয়া
কটিয়া গেল, কেহ বুঝিতে পারিল না । সে পাঁচ বৎসরের
পথে বিবাহ তাহাদের আহার যত্নের কোণে একটু আগের
কণা বেশিয়া গিলেন—কুহ এলটি নিত্যর রূপে । ছোট
মৈত্র হইল না-বাসের অতি আশ্রয়ের ঘন । বৃদ্ধা পড়শীবিলা
ঠোট বাঁকা করিয়া বলিল, “যেবে বকেছে !” কিন্তু যোথ ঘর
মেয়ে বলিয়াই মৈত্র পিতার জ্বর বোধী করিয়া ছুঁচিয়া
বসিল ।

মৈত্রর কন্ডের সময় গৌরীর যে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিল, তাহা আর
পড়িল না । সিদ্ধাঙ্গা তাহাকে গইয়া পনের ক্রোশ দূরে
বীরশৈব নটে গেল, সেখানে শুককে বোড়ালোশজারে পুলা
দিল, কোনও প্রকার অর্ধক্ষুভতা করিল না । শুক
আশীর্জন করিয়া গৌরী-আশার হাতে বারিকেল, মাটির
ভার, শুকনো কল তুলিয়া গিলেন । কিন্তু তাহার কল দখিল
না । ঘীরে ঘীরে গৌরীর দেহ শুকাইয়া গাইতে লাগিল ।
প্রথম সামান্য জ্বর হইত, তার পর দ্রব বাড়িল । প্রথম বসু
পুসে কানি ছিল, পরে তাহা প্রবল বেগ ধারণ করিল । এক-
দিন গৌরী স্বামীর পায়েব কাছে মাথা রাখিয়া মাথনের মত
কোমল মৈত্রর সোনার হৃদয়না গোলা হাত ছুটি বহিয়া
চোখের কলে ভাসিতে ভাসিতে ইহলোক ত্যাগ করিল । মৈত্র
মাতামহীর আশ্রয়ে গেল ।

[৪]

সিদ্ধাঙ্গার বয়স তখন এখনকার অর্ধেক । গৌরী-আশার
সুভার আর কিছু কাল পরেই তাহার দ্বিতীয় বার বিবাহের
যোগ্য হইল । সোকে বলে, বিবাহ নিষত্তির ব্যাপার ।
এবার সিদ্ধাঙ্গার নিষত্তিতে ছিল মৃত্যুর এক মহাশত্রু-ভিত্তি
(অবশ্য ধর্মে লিখাওত) । মৃত্যুভিত্তি মহাশত্রু বৃত্তলে
(শেষ ছুটি নাম তাহার পিতার এবং পিতৃবংশের) বিবাহের
মৃত্যু পরিহা চটয়া গেল ভাগীবদী সিদ্ধাঙ্গা সেটি । ভাগীবদী
পিতামহী অর্থে দাত্ত । কিন্তু ভাগীবদী রূপে ঐশ্বর্যবতী ।

শেষে পরিচয় লই বসন ফলা' হুয়েত বধু গোহ হর এই প্রথম।

ভগবান বাতাসিকে তপ সেন, তাম্রনিগকে সে তপ হুয়া করিবার ভঙ্গ একটা নিশিত রকম ক্রটিও নহে। ভাগীরথী নামগুণে আসিয়া যৌবন যৌবন নিকের বেশভূষার চালে-চলনে এমন একটা দৌলীনন্দা আনিব যে, সিদ্ধাম্মা প্রথমতঃ তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। হাস হই পলায়, সে তার স্রাব শুধু রূপ দেখিয়া বহু হর নাট, তাহার পোষাকের বর্ণভাষার ও পারিপাট্যে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছে। ভাগীরথী বাহিরে বাইতে রত্নিন পাড়ী ভা পতিতই, গেরত ভিতরের ও কখনও কতি ঘাসের পংখের, কখনও আশ্রয়ানী সংস্কার, কখনও কেশর সংস্কার কপড় পরিচা পাকিত। আর সে কপড়ের রিতর সিগা তাহার অমরোখাগুলি এমন শালীনতার সহিত সূচিয়া উঠিত যে, সিদ্ধাম্মার জাহিহুতা পথত অনেক সময় তাহা বিস্ময়িত নৈতে নিরীকণ করিত।

কিছু সিদ্ধাম্মা কণ্ঠের লোক এবং ব্যবসায়ী নাহু। তাহার ভাষা বেশভূষার অথবা সমগ্র এবং অর্ধনৈক ক'রিতেছে একদা যৌবন যৌবন তাহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল। তাহার পক্ষে পুত্র মনে পড়িল পৌত্রী-আশ্বাস কথা; সে কেমন সাহসিগ্ধে কর্মময় জীবন গাশন করিত। বাড়ীতে অতিথের ভিক্ষু হইলে কতদিন সে বিবরণের সন্ধানবশতঃ কাটাটাইয়াছে। পৌত্রী-আশ্বাস শুধু সিদ্ধাম্মার বদন্যী ছিল তাই নহ, সে তাহার স্বভাবটি ছিল। ভাগীরথী বদন্যী হইলেও বিজাতীয়। এ যেন আশা-অনাখোর চিত্তস্থান বিরোধ, যদিও শেখি হুয়ে এত দুগের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটা আশা রক্তের দিশ্রণ হইয়াছে।

একাতীর্থ বিরোধের সঙ্গে ছিল আর একটা বৈষম্য, তাহার। সিদ্ধাম্মা অজ্ঞান কহু ভাষা বলিয়া, লিখিয়া আসিয়াছে। শুধু ব্যবসায়ের খাতিরে যোকানে কাহারও লকে মারাতী বলে। কিছু ভাগীরথীর বক্ষ-জান অতি সাধারণ এবং তাহাও বহু ভুলপ্রবণপ্রবৃত্ত। সে অনেক কথাই মারাতীতে বলিয়া থাকে এবং এমন এক একটা ছেলেটি কল বলে, যাহা সিদ্ধাম্মা জীবনেও শোনে নাট। সিদ্ধাম্মা কখনও কথা না বুঝিলে ভাগীরথী কোণার বুসটিতে স্টো করিলে,—তাহার বদনে সে ছিল দিল করিয়া

হাসিয়া উঠে। ইহাতে সিদ্ধাম্মার মেজাজ খাপস হইয়া যায়। সে তাহে শুকনক বৌ বর করিবার ভঙ্গ নহ, তাকে তুলিয়া রাখিবার ভঙ্গ। আজ যাহা তাহে, কাল তাহা আচাল্যে বলে, পরন্তু সেটা আব একটু পরিষ্কার হইয়া পড়ে। এ রকম করিতে কতি অকস্মেৎ সে সব কথা রানের চোটে চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে।

ভাগীরথীর সহিত সিদ্ধাম্মার বিরোধটা বদন্যীতঃ চইয়া উঠিল, বৈষ্ণব আগমনে। সিদ্ধাম্মা ভাবিল, এমন পাকা তাহে লংগার পাতা হইয়া গিয়াছে, এহার বৈষ্ণবকে নিবেশ কাছে আনিবে। কিন্তু আনিয়া দেখিল, বৈষ্ণু ভাগীরথীর চক্ষু-মূল। বাহা হইয়া বৈষ্ণবকে আবার পাশতীর কাছে পাঠাইতে হইল। ইহাতে তাহার মেজাজ বিপথে রকম খাপস হইয়া গেল।

মেজাজ ভাল থাকুক আর মন্দ থাকুক, সময় বলিয়া থাকে না। শত সংসর্গ, শত বিরোধ, শত চিত্তবিকোচের ভিতর দিয়া যিনের পর দিন, মালের পর মাল, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া বাইতে লাগিল।

ভাগীরথী যখন পিতৃগৃহে যায়, তখন স্বগড়া বাবে, কিরিয়। অসিলে করেক দিন পদ্যন্ত পাতি পিগ্রাম করে, কিছু আবার স্বগড়া কিরিয়। মালে। ভাগীরথী সিদ্ধাম্মাকে পুত্রবৃত্ত দেখাইল, কিছু সে পুত্র মায় গাশন দিন ধরাতে বাস করিয়া পংলোকে চলিয়া গেল। ইহাতে সিদ্ধাম্মার মন ভাগীরথীর প্রতি আরও বিরূপ হইয়া গেল। সে স্থির করিল, ভাগীরথী অলক্ষণা স্ত্রী। মনে মনে সংকল্প করিল, ঈশ্রাই আব একটা বিবাহ করিবে। কিছু সে সংকল্প কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই ভাগীরথী ক্রমাগত তিন চার দিন রক্ত-বসি করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া গেল এবং সেখান হইতে একমাস পরে বহর আসিল, সে আর ইহকালে নাই।

[৫]

ভাগীরথীর মৃত্যুর পর সিদ্ধাম্মার বৈশাখের যৌন পার্শ্বতী আসিয়া বলিল, "মায়া, তুমি আবার বিয়ে কর। নইলে এত বড় লংগার চারোপারে বাবে।" সিদ্ধাম্মা নিজে বিবাহ না করিয়া পার্শ্বতীর বার বৎসরের ছেলে বৌমাখার সহিত নিকের অতি বহুর মেয়ে মৈষ্ণব বিবাহ দিল। এ বিবাহে বহু ঘটনা করিল। ইংরাজী বাগ আনিব, পরের সময় লিখাযত্নের

গেল, সিদ্ধাম্বর ভ্রমুর্ভিত মাথাটা যেন বাড়িয়া উঠিয়াছে। একবার বাবলা উপলক্ষে বোঝাই গিয়া সে এমন অস্থির হইয়া পড়িল যে, তাগাব এড়া যাবে কেবা কঠিন হইল। তাহার ভীর্ণগতি তথা বেগাই পলায় তাড়াতাড়ি আনিতে গেল। গৃহে আসিয়া সিদ্ধাম্বর বহুদিন পর্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বসিল। পরাম্বার কথাই বোঝাতে ডাক্তার দেখাইয়া দ্রব ও ইন্ডেক্সন লটাইল, অনেক দিন পর্যন্ত তাহারই চিকিৎসা চলিল। রোগ আর সাধে না, সিদ্ধাম্বর সেই মন উত্তরই ব্রিট হইয়া পড়িল। সীতাকে দেখাইয়া লোক বলিতে লাগিল, ‘কশাল একবার ভাঙিলে আবার তোড়া কঠিন’।

[৭]

কথা বল, ডিসমিন সমান ব্যাধ না, সুখেরও না, চরখেরও না। সিদ্ধাম্বর অস্থির সারিল। এবার বৃষ্টি ভগবান তাহার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বিবাহের ছয় বৎসর পরে দৈহিক আশা পূর্ণ হইল। সীতার কোল আলো করিয়া দৈহিক একটা ভাই আসিল। সিদ্ধাম্বর যেন, তথা বেহান পার্শ্বভী, আর যেরে দৈহিক, গৃহে মিলিয়া গৃহে আনন্দের হয়। তুলিল।

এক উৎসবের পর আর এক উৎসব আসিল। সিদ্ধাম্বর দৈহিক বিবাহে বৈরত আত্মবশ করিয়াছিল, যেমনি আত্মবশের সহিত এবার দৈহিক স্বামী গৃহমাতার উৎসব সম্পন্ন করিল। শেক্টরের আবাদ-গৃহ লোকে গোকারণা ঘটিল। শরীরে ভিতর দিয়া বাণ্ড বাস্ত সত্বে একত্রে মিছিল বাহির চলিল। স্নাত্তি গোলের আলোকে সমস্ত যন্ত্রাটী উজ্জল হইয়া গেল।

[৮]

বৈহিক স্বামীগৃহমাতার পরদিন সিদ্ধাম্বর সেলিল, তাহার স্ত্রী সকালে বহুকাল পর্যন্ত বিছানার ভেতর আছে। সে ক্রমক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি হয়েছে?’ সীতা বলিল, ‘কিছু না।’

কিন্তু তার পর হইতে মাঝে মাঝে সীতা তাহার ছেলেকে পাশে বেলা দিয়া বসাইয়া নিত বিছানার ভেতর থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ‘কিছু না, খেটেপুটে পরীক্ষা ক্রান্ত হয়েছে।’ বিছানা ভেতরে উঠিয়া গাভাওয়া করে, পাওয়ার পাওয়ার আবার পোয়। কিন্তু দিনের পর দিন তাহার সেই ভাবিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুকাল পরে যখন

আগানে অকতি বেলা মিল, শরীর স্বীকৃতি হইয়া উঠিল, চোখের ভেতরে কালি পড়িল, তখন সিদ্ধাম্বর গোটা ও ভাবিতবীর কথা শ্রবণ করিয়া নিঃশব্দ হইল।

সিদ্ধাম্বর শরীরে বড় ডাক্তার ডাকাইল। ডাক্তারের কাছে তাবের আবেগে বলিয়া উঠিল, ‘ডাক্তার সাহেব, আমার স্ত্রীকে আগাম করে দাও, আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দেব।’

ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া মুহূর্ত্ত হাসিয়া বলিল, ‘সে সম্বন্ধে চলে গেছে। রোগের প্রথম অবস্থার যদি তাহাকে বাহিরে কোথাও খোলা চাওয়ার মধ্যে নিয়ে রাখতে, তবে বেলা যেত।’

সিদ্ধাম্বর উত্তেজিত হইয়া বলিল, ‘বাইরে কেন? এ যে আমার পৈত্রিক ভিত্তি!’

ডাক্তার একটু বক্রভাবে বলিল, ‘তোমার এসব ঘর বন্দার বাসা। শুধু তোমার স্ত্রী কেন, আরো লোকের ভিতর বসতে পারে!’

সিদ্ধাম্বর পূর্ব্বক উত্তেজিত ভাবে বলিল, ‘আমার পূর্ব্বের এই স্ত্রীও এইখানেই মারা গেছে। তবে এ বরকে অপরাধ বলতে হবে?’

ডাক্তার ঘরে ঘরে বলিল, ‘ঘরের গোঁব নেই, ঘরতে এক সম্বন্ধ বন্দার বীজাণু প্রবেশ করেছিল, তাহা জীবাণু পোয় বেঁচে রয়েছে, আর একের পর এক জীবাণু মই করছে।’

‘বীজাণু কি?’

‘ছোট্ট গোকা।’

‘এ সব ছোট্ট গোকার একের পর এ বর্ণিত গোকাগুলোকে মেরেছে? তাও সম্বন্ধ? তা’ কখন হয়? আমাকে ঠাট্টা করছ ডাক্তার!’

‘কুস্ত শব্দ অনেক সময় বড় শব্দর চেয়ে বেশী আনিতে করে।’

‘কুস্ত শব্দ? ওরা আমার শব্দতা করেছে? এই সব ছোট ছোট গোকারা?’

‘শব্দরের বাইরে গিয়ে বাংলা বেঁচে বাস করলে এসেই গাভ থেকে কথা পাড়া যেত।’

‘ও কথা আমি এক সুহৃৎের ভয়েও বিশ্বাস করিনে, ডাক্তার সাহেব। ওসব শুধু হেঁয়ালি।’

সিদ্ধাঙ্গা গভীর বিস্মিত ও অসন্তোষের সহিত ডাক্তারকে
বিস্ময় করিল। ডাক্তারের ওপার পর চোখে অগাধ সমস্ত
মন নির্বিড় বিষয়ে ভাবিয়া গেল। শাস্ত্রাভ্যাস দৈ ক্রম
করিয়াই গিয়াছে। অতীত কঠোর অধ্যয়ন পার নাই।
আজ ভীষনের সন্ধিত বাধা তাহার জন্মে উদ্ভূত হইয়া
উঠিল। শোকে অত্যন্ত হইয়া বেঁধিল, সিদ্ধাঙ্গা শৈবিরে বৃষ্ণ
বানশ্যাদ্বৈল্যত মোক্ষাধেনে গানি আন নাই : তাহার পরিস্থিতি
নিরবচ্ছিন্ন বিষম।

মাল্য বাহুর আর কাঁধক, ভীষন নিক প্রবাহে দ্রুত বহিয়া
যায়। ডাক্তার দেখাইবার কিছুদিন পরেই সীতা টঙ্কলিয়া
সংবরণ করিল। সিদ্ধাঙ্গা তাহার ভৃত্যের প্রত্যেক সনাতন
করিয়া যৌন চিত্তে, নিশ্চয় যেহে পরলোকগতা স্ত্রী পুত্র
সম্ভার পাশে দিয়া বসিয়া পড়িল।

সিদ্ধাঙ্গা শিবসিদ্ধাঙ্গা শৈব, বাহ্যস হস্ত টঙ্কলিয়া হইতে
বোঝাই পর্দা লোকে মাথা পাতিয়া বীণার কবে, বাহ্যস
মাল কল্যাণী হইতে হেঁচন পর্দা সমস্তই হয়, যে ভীষনে
অর্ধের স্তম্ভের উপর মালিত পাশিত হইয়াছে, বাহ্য স্ত্রী সে
অক্ষরের সমস্ত মস্তিষ্ক, ধর্মপীঠ সমস্ত—তাহার সমস্ত ভীষন
বার্ষ করিয়া দিল ক্ষুদ্র বানশ্যকর অঙ্গ কতকগুলি
পোকা? হস্ত ও কথ্যতা একটা বাস মাগ, মস্ত ভাগ-
নিরস্ত্রা আভ্যাস তাহাকে বাস করিয়া আসিয়াছে।

বীরে বীরে সিদ্ধাঙ্গার মনে পড়িতে লাগিল, গৌরী,
ভাস্করী, সীতা ও তাহারের কথা। তাহার এতই ভাবে
তোমার ভূগিয়াছে, একই ভাবে বীরে বীরে মূর্খ হইয়া
পড়িয়াছে। একই অস্বাভাবিক ক্রম প্রাপ্ত পতিত
হইয়াছে।...তবে কি ডাক্তার বাহ্য বলিয়াছে তাহাই ঠিক?

শৈবিরে সিদ্ধাঙ্গা পানাহার করিল না। বহুতাল
পর্দা পুত্র গৃহে, পুত্র পর্দার পাশে বসিয়া রহিল।

ভাবিল, যদি সে এখন বিশ্ব পূর্বে আসিত, আর যৌরীকে
লইয়া এ বাড়ীতে থাকিত না আসিত—তবে হস্ত তাহাকে
দ্বিতীয় বাহ্য দাব্যপরিগ্রহ করিত হইত না! যদি গৌরী
মহিবার পরও সে বিশ্ব আসিত, আর ভাস্করীর অঙ্গোপ-
স্থত পুণ্য বা বোঝাই দিয়া বোঝান খুঁত? যদি সীতাকে

লইয়া সরসের বাহিরে পাটনে উকিলের বাড়ীর পাশে একখানা
বাংলা বাড়ী করিয়া থাকিত!

বাহির শৈবের দিকে সিদ্ধাঙ্গার মাথাটা যেন ঘুরিয়া
গেল। পত্ন মন অস্বাভাবিক ভাণ্ডারে লাগিল। একবার
মনে হইল, মাঝে, ঐ বাটনে উকিলের বাড়ীর কাছে যদি
উকিলের বাড়ীর মতই একটা বাংলা-বাড়ী থাকিত সে বাস
করিত, তবে কাগজে লইয়া বাস করিত সে সর্বাপেক্ষা
মুখী হইত? মৌরীকে, না ভাস্করীকে, না সীতাকে?...
কিছুক্ষণ পর্দা সে প্রবেশ উত্তর বিতে চোঁকা করিল, কিন্তু
হার মানিয়া সে চোঁকা ছাড়িয়া দিল।

তার পর তাহার মাথা আর একটা নৃতন করনা
ভাগিল। সেটা প্রথম এত অতীত মনে হইল যে, সিদ্ধাঙ্গা
কতক্ষণ নিঃশব্দে প্রতি নিজে অস্বাভাবিক হইয়া রহিল। সিদ্ধাঙ্গা
ভাবিল, ওরফে বাংলা-বাড়ীতে থাকিলে যদি সীতা সীতার
ভীষন বাসন করে, আর একটা নৃতন সংসার পাতিয়া, তাহা
পত্রিকা করিয়া বেঁধিত বাধা কি? আবার বিবেচনাটা কি
অসম্ভব?

[৯]

তাঁহা যে অসম্ভব নয়, তাহার প্রমাণ মালিকার উৎসব।
প্রাস্তর সংসারের মনে এ উৎসব শৈবিক বাড়ীতেই হইতেছে।
সে বাড়ীর সামনের ঘরের বহুতাল শোলাস কল হুগিয়াছে!
তিতরে দেকের উপর পলিগা, চান্দ, ভাস্করী পাতি হইয়াছে;
শোলাসে এক দিকে অতিথিরা এবং অপর দিকে সিদ্ধাঙ্গা
বসিয়াছে।

বাহিরের চাতালে চাঁটাই পড়িয়াছে। তাহার উপর
বসিয়া বাস্করীর মল মনের আশ্রয়ে বাসী সানাই চোলা
বাঝাইতেছে। বাস্করীর সরসার গৃহ চৌকান মাথা ঘুরাইয়া
ঘুরাইয়া চোলের উপর চাঁট মাঝিতেছে আর তাহার চেঁপে
লক্ষণ মাল কলিয়া কলিয়া সানাই হুংকিতেছে।

উপরের ভান্সা বিধা লক্ষণবদ্বীপ বৈষ্ণব তাহার হই
হংসের বৈষ্ণবের তাই ইন্দ্র আর তাহার এক বংসের
কল্যাণ লগি, এ ভিনভনের ছোট কোমল চক্ষু অনিবেশ ভাবে
সে দৃষ্ট নিরীক্ষণ করিতেছে।

वाङ्मनाय शिव

—**শ্রীদ্বারেন্দ্রচন্দ্র শর্মাচার্য্য**

ইংরাজীতে এটী কথা আছে God created man after his own image. এটী উক্তিটিতে তত্বটুকু সত্য নিশ্চিত বহিঃস্বত্রে সত্য সাংখ্যিক বৃত্তির অঙ্গনা। আশ্চর্যের বসে হয়, এটী উক্তিটিকে একটী যুক্তিগত বলিদে প্রত্যাহাষণে ভুলী হইতে হইবে না। আশ্চর্য বলিবে "Man created God after his own image." ইংরাজী সূত্রস্থ আশ্চর্য বহুবল্যে পাইগাছি, অতঃ পরে একটি ফিকেল আলোচনা করিতেছি।

মাতৃমুখ ধ্বনিত দেবদেবীর কন্ঠনা করে, তখন নিজেস
কীরেন্দ্র নান্দকারিত্তে বেদভাষা শ্রুতগুণে নির্ণয় করে। এমন
কি দেবভাষা সৃষ্টি-করনারও সেই কথা পাটে। বিহস্ত-বিশিষ্ট
মানবের বিহস্তের অস্থবিধায় কথা চিন্তা কঠিন। মনকুলে মন
প্রবেশপারিত্বি মনকুলার কন্ঠনা চটপটে বলিয়া অস্থমিত হয়।
আমরা এতলে পৌরাণিক বা বৈদিক দেবদেবীর আলোচনা
করি না। আমরা বর্তমানে বাস্তবের লৌকিক দেবতা শিব
স্বর্গ করকটি কথা বলি। অস্ত্র হাওয়া শিবের কোণীক্লের
গবেষণা মতে, বাস্তবায়নে সাধারণ লোক-সমাজে শিবের যে
সাধারণ আদর্শ প্রকাশ পাওয়াছে, তাগত আমাদের আলোচ্য
বিষয়। লৌকিক দেবদেবী, শিব, সত্যদেব, স্রিমাণ, চণ্ডী
ও মনসা প্রভৃতি কুলীন দেবতা নহেন, যদিও ব্রাহ্মণা মতে
ঈগণের অনেকগুলি সত্যের শাসিত চটপটে, তথাপি আমাদের
যেখ ঈগণের প্রকৃত স্বরূপ মতেই প্রকাশ পাওয়া থাকে।
শিবের কোণীক্ল শ্রুতগুণিত চটলেও ব্রাহ্মণা আদর্শের 'নত-
শিখিন্দ' মৌমালায় নির্মিতার শিব সম্পূর্ণ বিপরীত সৃষ্টিতে
বাস্তবায়ন পত্তিতে, তথা বাস্তবায়ন লোক-সাংঘেই বিহস্ত
করিতেন।

বালালাব শিব 'বাগদ কুড় চাষ'। এট শিল্পকে অব্যবহিত
কল্পিত জীবিত মনন নতাবী হইতে বালালাব ধৈ লোক-মারিত্য
নভিগা উত্তিগত, তাহার সঙ্গে বালালাব বহু ত্রুণ ওপন
কাহিনী জড়িত। শিবের গানে বালালাব বারের কত অল্প
জড়িত ত্রুটিগত, শিবের গানে বালালাব মাতাশিষ্যের বহু

অস্বাভাবি মিশ্রিত। এখনও যখন গ্রামে 'ভাৰতবৰ্ষ'ৰ বেব-
মকিনে সূৰ্য্যকৃত 'বাবুবেজিভাং' মচেনং বজতমিগিনিং' মন্ত
উজ্জাতিত ৪৬, তখন পাঁচু মন্তলৈ বাকীতে মিনাথেণ সেবাৰ
অথবা গাভনতলাৰ ভাৰত মিনেং ৬৬-গানে মন্তীৰ চাৰাচুবা
মুতা করে। অথবা বাকীলৈ মন্তীৰ বৈদিক মন্তে নহে,
ঠাকুৰা অথবা মিনাৰ বাৰা-ছাৰা শিবেৰ কাছে মনোনীত
বৰ বাগিলা লহ। নহ গণ বচনৈৰ মন্তে মন্ত বচুৰ কৰ্তে
"নিব মিনাটম মিনে বাটন" ছাৰা মন্তীৰে আহ্বান করে,
তখন বাৰালীৰ গাৰ্হা-কোমেন শিবেৰ এতদ অতদ পৰিস্ফুট
৪৬৪ উঠে। বাকীলৈ মন্তীৰ বাৰীৰ আনং উঠালৈ মন্তৰ।

ନବର ନିର୍ମିତ, —କିନ୍ତୁ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ବାହାଣୀର ଦେହେକ ଆକର୍ଷଣ
 କରିପାରେ, ନବରର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବାହାଣୀର ସେହର ଅଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପଦ,
 ହିସ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟ ୨୫୧ । ଶିବ ଓ ଉଦାକେ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ବାହାଣୀର
 ଗାର୍ହସ୍ଥୀ ଭବନ ଗଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଗୁଣେ ଶୂନ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟର
 ଗାନ୍ଧାର ଦେବେ ଉଦା ଡିହାରି ନବରକେ ବସନ କରିପାରେ ।
 ବାହାଣୀର ଲୋକ-ସାହିତ୍ୟେ ଉଦାର ଗାନ କରଣ ବେନନାର ଅସ୍ମୁତ ।
 ବାହାଣୀର ଉର୍ଗା ବାହାଣୀର ସ୍ବରର ଦେବେ । ବାହାଣୀର ସମାଧେ
 ମୋହନ—ଏହି ଶିତିକେ ଆରତ କରଣ କରିବା ଦୃଶ୍ୟାରେ ।
 ବାହାଣୀର ଶିବ ଗାନ୍ଧାରୀ ଶୂନ୍ୟେ, ମହା ବାହାଣୀର ଗୟନେ :—

|| দেহা|| || দেহের স্রষ্টা বাহ্যিক পুরুষ ||

ସାହସିକା ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ।

কেই নাহি পারে বাক্য শুদ্ধে। তবে ।

কাল থেকে চড়ে বাঁচে মশানে বেড়ায় ।

हम्यन् यन्निष्ठः। इति। अथ वा। अथ गीतः ।

कृष्णः श्वेतः च मणिः शङ्खः ।

वेबसाइट/मोबाइल नम्बर में बदल सकते हैं।

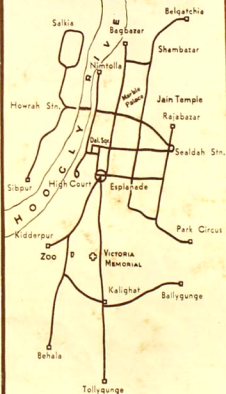
তাই কক্সের প্রাণ কাগিরা উঠিগাছে। তরুণা ত্রাণ
 কাগের আশ্রণ জানে না, সে তাগের প্রাণের ঠাণ্ডের
 বাহুল হইয়া উঠিগাছে। শিবের হস্তিরা হাওয়ার চোখে
 হাশিয়া উঠিগাছে। নির্মিতাশ যেদি শিবকে তরু
 চানী হইয়া উঠিগাছে।

सन् १९८०-८१ च्या वर्षाकऱ्क शीतल भितरतऱ्क ।

४८६ ॥ ५८६ ॥ श्रुत्या प्राप्तिना नृणां देवता ।



THE CALCUTTA TRAMWAYS CO., LTD.
ROUTE MAP
Calcutta & Howrah.



ভেনী পরভতে তিক্কাই বাপি ঘাই ।
 বুঝাও পাঠ বুঝাও না পাঠ ।
 হস্তী বকড়া ভায়ে করি নিপাত ।
 কত হুস খোলাকি তিক্কাই ভাট ।
 মাগেই কলস খোলাকি মুক্তি ভে গায়ে ।
 কখন আর হাও খোলাকি কখন উপবাস ।
 আর বাক খাবিলে পরলু গুণে অন্ন খাব ।
 কতক বিদনে পাছু কত গুণে পাব ।
 কলসে চব্বা পরলু পূর্ণাং কলস ।
 কত না পূর্ণাং খোলাকি কেমনে গুণে কড় ।

বক্তার মিনতিতে প্রভুর আশন টগিরাজে । বেদাদিবেব
 মহাদেব বাঙ্গালার মাঠে চাষীজগৎ নাখিরাছেন । কি পরিমাণ
 মনের অঙ্গে যে, তত্ত্ব তার আরাধ্য দেবতার কৈলাসের উত্তম
 পুষ ছইতে বাঙ্গালার মাঠে টানিয়া আনিয়াছে, তাহা অস্থান
 করা সম্ভবসাধ্য নহে । মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বাহা
 পারেন নাই, সরলপ্রাণ চাষা ভাবা করিয়াছে । চাষা তার
 আপোষ ঠাকুরের সুখ-দুঃখ নিজেই সুখ-দুঃখ বলিয়া বুঝিয়াছে ।
 হিমাশ্বতের খাবধান তাহাকে ঘুরে রাখিতে পারে নাই ।
 তাই আহার বৃদ্ধ শিবকে বাঙ্গালার মাঠে দেখিতে পাঠে—ইহা
 হুঙ্কার হুঙ্কার বাঙ্গালার মাঠেই সম্ভব ।

কেও কসি কিলেগে উপাধি দিলে অল ।
 চাষিকও চৌধুরে জোলা কৈল প্রেলে ।
 বাব বাহি বাব কেন কসি গরবে গুল ।
 গরীবেরে গরি উঠে পর লত কুড়া ।

বাঙ্গালার মাঠে লত লত বৃদ্ধ শিব যে প্রাণপাত করিয়া
 শোনা কলাইবা থাকেন, টেহা ভালাইই চিক । কে না জানে
 চাষীর সে অক্লান্ত মহিচ্ছাত্র্য কথা । তাহারই প্রাণপাতে
 বাঙ্গালার মাঠে ঐশ্বর্য কাল হইতে কত ধানের শ্রী সৃষ্টি
 উঠে—

হরিদেব হইল বাজ হারিপাঞ্জব হড়া ।
 হরিদুলি হরিদোষ দিক হুং হুড়া ।
 কেলকানু কেলকীয়া কালিয়া কালিকা ।
 কলা খজা কলিঙ্গুল কলোত কলিকা ।
 কলিনী কটকী কলকলিকা কলকলিকা ।
 কলকলি কলকলি কলকলি কলকলি ।
 কলকলি কলকলি কলকলি কলকলি ।
 কলকলি কলকলি কলকলি কলকলি ।

আমরা শিবের গায়নে এতকাল অসংখ্য প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া
 পাঠে । বিশেষতঃ কত অপ্রত্যাশিত প্রভেদ চাষ-আচারের
 কথা ও নিয়মপ্রণালী অতি স্পষ্টরূপে তাহে প্রাপ্ত হইতে
 চেষ্টা করে ।

এই সকল নিয়মপ্রণালী বর্তমান কৃষিবিজ্ঞানের চেয়ে
 কোন অংশে অগ্রসর ছিল বলিয়া মনে হয় না । বাঙ্গালী
 চাষী তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অতিজ্ঞতা ফল ছাড়া ও গায়ে
 রাখিয়া গিয়াছে । তাহার সম্ভাবনা কৃষিবিজ্ঞান-কলেক্ট
 কৃষিশাস্ত্র শিক্ষা করে না ।

চাষী তার পরিপ্রভ মানব কবিরূপে কত মহত সিদ্ধি-
 রীতির মেধা করিয়া থাকে, তাই নিরক্ষর দুর্গ চাষী তার
 প্রাণের বেগতার প্রশংসা করিবার জন্য তাহাকে সিদ্ধিবার
 ভাষা করিয়াছে । আহার বৃদ্ধ শিবকে ‘সুচনী’ পাড়ার লইয়া
 রসিক করিয়া তুলিয়াছে । বাঙ্গালার কিশোরপল্লীতে এইরূপ
 চিত্র বিরল নহে—

বৈশ্য বাসে বৃদ্ধ শিবের দিল গায়ে ।
 আখাচ বাসে শিবের দুলি কাপাস ।
 কাপাস বুঝি শিব গেল কলকলিকা ।
 কলকলিকা হইতে গেল এল পাড়া ।

সুচনী-পাড়ার রক্ষসের চিত্র ‘আমাদের ‘সত্য’ চক্রে
 পিড়িত করিলেও, বাঙ্গালী পল্লী ঠাকুরদাস বা বাণেশ্বরের
 রক্ষসের চিত্র মিথ্যা করনা নহে । পল্লীর বৃদ্ধ দায়বশতিকে
 খিঁচিয়া যে রঙ্গের সাগর লোকজনকে হাসান করিয়া তুলে,
 তাহার মূল্য কন নহে । শব্দের অবলম্ব-প্রাপ্ত বুদ্ধের ভ্রাত
 তাহাকে দীর্ঘ দিন পার্কে অথবা ময়দানে নিরস্ত্র মনে কাটাউতে
 হয় না । পাড়ার নাতি-নাতিদিগকে লষ্টয়া পল্লীর জীবনকে
 সরল করিয়া তুলেন ।

কলিকালে গরি বত কলিকালে কলি ।
 কলি আলা কলি কলি কলি কলি কলি ।
 কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি ।
 কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি ।
 কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি ।
 কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি ।
 কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি ।

এইরূপে শিবের বত কাপাস ।
 কলি কলি কলি কলি কলি কলি কলি ।

ভিকলনে গার ঘুপ পাঁচ হাতে পার ।
এই নিতে এই নাই ধাড়ী পানে আর ।
সেবি সেবি পল্লবটী যদি একপানে ।
কলনে কলন দিলে মন মন হানে ।
তল খেতে তেলের রাস হতে দিলে পানে ।
আর আন আর আন রসহুতি করে ।
করিত রূপে রূপে আর আন না ।
হেবনটী তল বহা বৈধি হাং না ।

নানা বাজনে উষা পরিবেশন করিতেছেন, বাঙ্গালার মা
অরুণী । নিজহাতে খাই-পুত্রের পরিচর্যা যে কত আনন্দের,
তাঁহা বাঙ্গালার মা-ই জানেন । তাঁই যেবি স্নাত উষার
মাকুতি—

চন্দা চরণেতে নুপুর ধরে আরা ।
জা হন কিচিই কখন কখনকার ।
নিত নিতে পরাগের নারি অবলার ।
এবে হৈল মল্ল কামল কলমার ।
ইন্দুর মন মন করুক নাহি ।
মৌক্তিকের সাক্ষি হৈল বিহের মার ।
হলধু মল্ল নিতে আবার ।
খিল খাঁসি হৈল সত্যের জা ।

আবার রজনীগন্ধার মধুর কোমলে বাঙ্গালার কুটার সুপ্রতিত
হইয়া উঠে ; রক্তার বেয়ে তিথারীর গৃহিণী উষা ছ’গাছি
নাগার লজ কোমল করিতেছেন—

তার হেঁদার হাত হইলান তো’ লেবের লব ।
কর করি চন্দনে নানা না পিচ্ছিল লেবের ।

বাঙ্গালী মেয়ে বসন্তরাজে একবার ‘মাইও’র বা পিতৃগৃহে
আদিবার লজ কিত্রপ ব্যাগ রত, তাহাও বেগিতে পাই—

একবা কুসিও রঙে কামিত মন ।
নাইও লাগিয়া রঙে কলিল মন ।
করিত মন মন মন তাই’র হাং মাইয়া ।
অঁদাটা মাই’র মন পরিচরন করিয়া ।

ঊর্টার মন পত্নীও হইতে অঁদাটা পত্নীও পত্নীও শিব
সবকে এইরূপ বহু চড়া-পান ও কাবা বাঙ্গালার সতিত
হইয়াছে । বাঙ্গালীর স্ত্রীর নৈবতা শিব, আন বাঙ্গালীর
পত্নী—বাঙ্গালার নিজের মন । বাঙ্গালীর হিন্দুদের হিন্দুদের
তাঁহাকে হিন্দু জাতির অস্ত্র শাখা হইতে হাতের মন
করিয়াছে । আনন্দের মন হই, মন পত্নীতে প্রাচীনা
ধর্মের নব অভ্যাসের মন উত্তর-ভারত পশ্চ-বর্তী ও কান্ত-
কামিত সুপ্রতিত হইয়া উঠিয়াছিল, মন বাঙ্গালী মনে
রাজ্যভোগের অরুণীও কখনো উঠিলে অথবা কৈলাসে
শিবকে বকী করিলে অরুণী পত্নীমণ্ডা বাঙ্গালীর বহু
কলমে বাঙ্গালী-কুটারে কুটারে অরুণীও করিতেছেন ।
আর বেগামির শিব বাঙ্গালার চাঁদীর বেশে অরুণীর ভাড়া
পূর্ণ করিতে বাঙ্গালার মনে নাইয়াছেন । কান্তিতে অরুণী
অথবা বিবেচকের প্রতীকটি আছে বটে, কিন্তু তাহাদের
নামের সার্থকতা বিহাছে বাঙ্গালী ।

• এই প্রবন্ধ উক্ত কবিতাগুলি এবং বাঙ্গালীর শিব-পত্নী-
মন বি, এ, ডি, স্নিট মাল্লার ‘বসন্ত মাই’র পত্নী’ হইতে গৃহীত ।

তিনদিন বর্ষাপ জলধরে আর
হুই করি মল্লকার ; তিনদিন যদি—
কিটম এ স্নিট এ করুক মন !
‘বিজয় মাই’র মন হই, মাই মাই
বিজয় এ মন যদি’—কলিলা মাই
মাই’র মন মাই’র মন মাই’র মন ।

—মাই’র মন

[বন্ধুতার কথা । চন্দ্রনাথ বিদ্যাপুৰ্ণিমাৰ চাঁচৰ আগলৈ একজালি খালি হোৱাৰ উপৰি পঢ়িওৱাৰ । খাটীৰ উপৰি খাটী নিহিহ । খী অকমাৰ কথিত পাইল অকৰ একটী বন্ধুত্ব হুঁচি পাইলি আছে । কথিত পাই, বিহাৰে হুঁচৰ হুঁচৰ পেল ।

হুঁচি । বণা ! বণা !

হী । (নিৰুত্তৰ ।

হুঁচি । বণা !

হী । কে ?

হুঁচি । আমি ।

হী । তুমি কে ?

হুঁচি । চিনতে পাবছ না ? এখন তা পাবহে না বটে,

নতুন বন্ধুত্বকে পেহে লব তুলে পেছৰে ।

হী । (কথা কহিল না)

হুঁচি । না তুলতে পালে কি আবার এমন হয় ! অতি নিৰ্দ্দেশ আমি 'ক না, তাই অনেক আশা কৰোঁচনু ।

হী । তুমি কে ?

হুঁচি । আমি কে ? প্ৰেমমতী, জীৱনৰ পদৰ শুভলক্ষ্যে সাধাৰীকল্প হাৰে বহু কৰে নিৰুচ্ছিন্ন, আমি সেটী হুঁচনা । প্ৰেমমতী ছাড়া বাকি আৰ অক কিছু ধান নেই, সেই সাধী হীকে একবাৰ দেখতে এলু, অগ্ৰহাৰ হুঁচৰে কি ?

হী । (বিহবল মনে চাতিয়া হুঁচিল)

হুঁচি । চিনতে পেছছ এবাৰ, কি বল ?

হী । তুমি কেন এল ?

হুঁচি । কেন এল ? তোমাকে দেখতে এলু, তোমাৰ গ্ৰন্থৰ লগত দেখতে এলু, আৰ কেবল নতুন জীৱনকে আন পেতে ধৰেছ, তাই দেখতে এলু । বাহাৰী আছে তোমাৰ, লীলাবতীৰটী ভাত বটে । আজ্ঞা দেখ, আমাৰ বৃত্তা-ন্থাৰ কি বৰ্ণেছিলে, মনে পড়ে ?

হী । (নিৰুত্তৰ)

হুঁচি । পড়ে না ? না পড়াই ভাল । বৰ্ণেছিলে কি জান, বৰ্ণেছিলে, তুমি চলে গেলো আমি কিছুতেই বাচতে পাব না, আমাৰ জীৱন ধৰ্ম্মৰ হৰে পড়বে, এখন আৰও কত কি ! আমি এখন বহুত কৰে বৰ্ণেছিলু, আমাৰ বিহে ক'তো, তা হলেই লব টিক কৰে যাবে । সে কথা শুনে তুমি কি বৰ্ণেছিলে, মনে আছে ? দুকানে আতুল বিহে কত অভিনৱৰ কথা বৰ্ণেছিলে, আমাৰ পাতে নাথ পুড়ে মৰবে বৰ্ণেছিলে, মনে পড়ে ? উত্তৰ দাও ।

হী । (অশুভবৰ্ণে কি কহিল, বুঝা গেল না)

হুঁচি । আমাৰ জান, তোমাৰ সেই লব কথা শুনে আমাৰ বড় তৃপ্তি হৈছিল, বৰ্ণে বহুত নহি ? কিন্তু নিমিত্তি কৰি, কেন এ কৰলে, আমাৰ বুলে বল । আমাৰ এত ভালবাসাৰ প্ৰতিবাদ কি এই ভাবেই কৰতে হয় ? কেন কৰলে একবাৰ বল । (হীকে নিৰুত্তৰ দেখি হুঁচৰ জোৰ বৰে) বল ।

হী । (চমকিয়া উঠি) আমি আগ্ৰহ —

হুঁচি । আগ্ৰহ । কচি মুকি আৰ কি ! আগ্ৰহ ! পদৰ হাৰে হাৰিৰে বাজিলেন ! এখনও থালাখাচি দিতে ছাড় না দেখছি । বল টিক কৰে, কি বল ।

হী । (ভয়ানক ভাবে ছল ছল চোখে চাতিয়া হুঁচিল)

হুঁচি । ছিঁচকায়েন বৰাৰটা এখনও বাজনি দেখছি । (হুঁচৰ কৰণ বৰে) চোখেৰ ভলটা মুছে ফেল বণা, তোমাৰ চোখে ভল দেখলে এখনও আমাৰ বুকটা হু হু কৰে উঠে । চোখটা মুছে ফেল, (বণা চোখ মুছিল) । কিন্তু বণা, যদি এইই কৰবে জানতে, তা হলে মিথো কথা বিহে আমাৰ তুলিয়েছিলে কেন ? ভালবাসি, জগো, ভালবাসি । এই ছলনাৰ কি জগোজন ছিল ? এবাৰ থেক বাহা ভালবাসাৰ নাম কৰবে, তাৰে হাড় শুঁড়িৰে নেব । (বণা শিকিয়া উঠিল) ভব পেছো না । দেখ, এই কৰিছিলো, এটাই বত বহাৰীল, শুণু প্ৰেম, আৰ প্ৰেম, এই কৰেই বত লোকৰ মাথা বাগাণ কৰে সেই এই হুঁচকাৰে বল । তা থাক, এই বন্ধুটী হৰেছন কেনন ?

হী । ভাল ।

হুঁচি । আমাৰ চেহে ? টিক কৰে বল ।

হী । (উত্তৰ দিল না)

হুঁচি । বনি বল আমাৰ চেহে ভাল, তা হলে কি হিগেবে ভাল বুকিৰে লাও, আৰ যদি বল, না, তা হলে এই বাহাৰটাকে—আহা এই কৰলোককে আমাৰ লগৰ বুলোবাৰ কি বৰকাৰ ছিল বল ।

হী । (সবাতৰ পঢ়িবা বাহুল্যৰে চাতিয়া হুঁচিল)

হুঁচি । আজ্ঞা থাক, আৰ বলতে হবে না । (মেহেৰ বৰে) বণা, আজ্ঞেৰ এই পুৰ্ণিমা ৰাতি, তোমাৰ মনে পড়ে, এমনি ৰাৱে কতদিন তুমি আমাৰ নিজেৰ হাতে পেঁহে থালা পৰিহেছ, ছাৰে দল কত ভালবাসাৰ কাহিনী শুনিবছ, নুও হেনে কত আশা-নুহেনেৰ কথা বলেছ, ও, সে লব ভাবলে আজ বড় কঠি হুঁচৰে থাকে । এখন আমাৰ দিন আৰ

কটিলে চোখ না বীণা, বড় একলা, বড় নিঃশব্দ আমি, প্রাণ
যেন এততক দুহুঁতে হাঁপিয়ে উঠেছে! বীণা, তুমি আমার
সঙ্গে ঘাবে? এই লোকালয় ছেড়ে আমার সঙ্গে পালিয়ে
চল। অতি দূর এক গ্রামের নবীণ ঘরের একটি কুটীরে
আমরা বাস করব, শুধু তুমি আর আমি। বাবে?

বীণা। (অতি দুঃখের) না—

মৃতি। না কেন? এত সাধের সংসার ছেড়ে যেতে
মন চাচ্ছে না, না? যদি সাধের সংসারটা আমি নষ্ট করে
দিই, তা হলে কি হবে? জান, তোমার নবীন বহুটির ভংগীলা
একুনি শাখ করে বিতে পারি এমন করে। (বলিয়া পলা
টিপবার তরোটা দেখাইয়া দিল)

শ্রী। (জবে বিবল হইয়া থিরা) মা গো!

মৃতি। তব পাঙ্ক? তব নেই, কিছু করব না। আমি
অন্ত চীন নই। তুমি আমার দর্দনাশ করলেও উল্টে আমি
তোমার দর্দনাশ করব না। তব নেই। তা ছাড়া এ
বেগুনীকে আর মেয়েই বা লাভ কি, তুমি বলই রহত আমার
একটাকে ধরে বলবে, কি বল?

শ্রী। (নিরুত্তর)

মৃতি। হাবু, তোমাকে আমি কমা করব না। কমা,
বীণা, কমা। বীণা, বীণা—আ—আ—

শ্রী। ও গো—

৪১৭ যুব হাবিরা বেশ। ৪২৭ হাবিরা ৪৩৭ বেশ, কোণে কি
না, লক্ষ্য নিম্নে বহ। কি হাবিরা, কি না হাবিরা, কিছুই হাবিরা না
পাল্লা উঠিল বলিল। ৪৪৭ কি যেন পাল্লা উঠিল হাবিরা হাবিরা
হাবিরা হাবিরা হাবিরা হাবিরা হাবিরা হাবিরা হাবিরা হাবিরা
তগবাব!

পথিক-বধু

—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অধার মেঘময়ী রাতি
ভবন কোণে কোণে পবন শনশনে
শয়ন-শিরে নাই বাতি।
নবীর কুলে কুলে লহর কুলে কুলে
গরজ করে মাতামাতি।

গহন সুনিবিড় নিশা
গোপন চপলার চকিত অবিধার
পথিক নাহি পায় দিগ।
দাঁড়িয়ে বাতায়নে আকুল ছ'ময়নে
চাহিয়া আছে সুগদশ।

হায় রে মরনের কথা।
লুকায়ে মনে মনে রাখিল সবতনে
চাকিয়া যার ব্যাকুলতা—
কেন সে আজি এই বরষা নিশীথেই
হানিল নিদারুণ ব্যথা।

প্রবেশ হিয়া নাহি মানে
আজিকে তার বুক বাঘল শতমুখে
বেদনা সূতীসন হানে
শীকর, মুখে তার সুচায় বারেরবার
অঙ্কুর গুরু অভিমান।

অশনি ডাকে ঘন ঘন
করিছে অনিবার মূল্য বারিধার
পবন বহে শন-শন।
ঘাটের পদমূলে অস্বাভি কুলে কুলে
তটিনী ভাঙে তন-মন।

আসিবে নাকি আভ্য সেহ!
শয়ন হবে হায় শীতল নিরাশায়
নীরব হবে কি রে গেছ!
নয়নে টলমল করিবে অখিঞ্চল
মকল নাহি হবে দেহ?

তালের তরু শিরে শিরে
উঠিছে হাহাকার, রোদন খরধার
মেঘের হিয়া চিরে চিরে।
কেয়ার বনে কার আকুল কেশভার
ছড়ায় ঘন সুরতি রে।

—অধার মেঘময়ী নিশা
পথিক-বধু গেলো কুসুম-ভূষা ধোলা
বাঘল মিটারে না ভূষা।
মুপূর নাচিবে না কাঁকণ বাজিবে না
হায় গো হায় সুগদশ।

বাড়ী দিক্‌দের যে সামান্য কিছু টাকা অবশিষ্ট ছিল, চাকুরীর লক্ষ্যন করিতে করিতে তাহা প্রায় বিশেষ হইয়া আসিল। অসিত মাথার হাত নিঃ বসিয়া পড়িল। এক-তনের নীচের তলার ছোট্ট ছুইটী ঘর ভাড়া লইয়া সে থাকে, মাসে পন্থী করিয়া টাকা তাহাকে হিতে হয়। নিজেরা দুইজন, দুইটী ছেলেমেয়ে, তাহাদের স্কুলের মাথিনা, গুল গুল-খাবার, তাহাও বন্ধ করা যায় না। ঘর না সত্তা, কিন্তু দুদিন পরে তাহাও যে বন্ধ হইয়া বাইবে, পেটে ত মাংস দুইটো ভাত পড়া চাই।

নিজের অসিত মনোবলকে করিল, “প্রতি ত মন্ত,—বাড়ী বিক্রী করে ত আমার বাঁচিয়ে তুললে, তার পর? এইবার আমরা কি খেয়ে বাঁচব, আর ত কোথাও কিছু নেই! চাকুরীর যে বাজার, কোন আশা নেই।”

মনোরবা করিল, “আমি অত ভাবি না, ওপরে একজন আঙ্কেল, তিনিই সাহায্য করে দেবেন।”

অসিত জান হাসি হাসিয়া করিল, “সে বিশ্বাস আর দুদিন পরে থাকবে না।”

মনোরবা ভোর বিয়া করিল, “খুব পাকবে। এ বিশ্বাস আমি কোনদিন হারাতে না।”

অসিত আর কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে পড়ার লুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এত দূর বিশ্বাস! তাহার হস্তাশ্রয় অস্ত্রের মধ্যে বেন আশার লক্ষ্যন হইল।

পরদিন শিশুশ্রম উৎসাহে সে চাকুরীর চেষ্টায় প্রেরিত হইল। যেখানে সেখানে এক পক্ষ কাটিয়া গেল, চাকুরী ত নিম্নলিখিত না, শ্রম নিম্নলিখিত এমন আশাও সে কোথাও পাইল না। বন্ধুস্বাক্ষর আকীর্ণকর প্রায় সকলের সঙ্গেই সে দেখা করিয়াছে। অনেকটাই বৈধিক সমবেদনা জানাইয়াছে, এট পঞ্চাঙ্গ। নিজের বাজার বিস্তার, পরের ভাবনা কে ভাগিতে যায়! তবে একেবারে যে কেত ভাবে না, এমন কথাও বলা যায় না।

সেদিন রবিবার। তাহার চাই বন্ধ যীত্রেণ ও বামিনী তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যীত্রেণ করিল, “ওহে অসিত, মোকান চাপাতে পারবে?” অসিত করিল, “আবার বা অবস্থা, যে কাজ বলবে তাই করতে পারব।”

যীত্রেণ করিল, “একটা মনোহারী বোকারের সমস্ত ভাব তোমার নিতে হবে। পার ত বল, আমি মোকানটা কিনে কেলি, খুব সস্তায় বিক্রী হয়ে থাকে। পাঁচ হাজার টাকার মাল আছে, দু’ হাজার টাকার পাওয়া থাকে। অত টাকার জিনিষ আর, তার হাতে ত বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে পারি না। আমার নিজের সময় নেই তা ত তুমি জান, দেখা পোনা আমার বাবা কিছু হবে না। তা ছাড়া তোমার হাতে চলে যায়, সেই ক্ষেত্রেই মোকানটা নেওয়া,—আমার আসল টাকারটা মাল্য না যায়, আর কিছু হ্রস্ব পেলেই হল।”

গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে অসিত নব্বুর লুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যীত্রেণ করিল, “তা হলে তুমি রাজি ত?”

গমগম কর্তে অসিত করিল, “তুমি আমারই অস্ত্রের সংস্থান করে দিচ্ছ—”

বাধা মিমা যীত্রেণ করিল, “ঐ ত তোমার মোহ। একটা স্থবিধা পাওয়া গেল তাই। লক্ষ, আচ্ছই সব লেখাপড়া করে নিতে হবে, অল্পদিন আমার সময় হবে না, তা ছাড়া যেটা হ’লে হাত-ছাড়া হয়ে যেতেও পারে।”

বামিনী করিল, “সেখ যীক, তুমিও আমার বন্ধ, অসিতও আমার বন্ধ। মোকান দখলে আমি তোমাদের একটা কথা বলতে চাই।”

যীত্রেণ করিল, “যা বলবার বলোই কেলি না, অত ভণিতার দরকার কি।”

বামিনী করিল, “তোমাদের দু’জনের মধ্যে একটা পাকা লেখাপড়া করে নেওয়া দরকার।”

দীপেন কহিল, “খুব ভাল কথা, তুমিই একটা বৃত্তি নিয়ে করে বিত্ত।”

গামিনী কহিল, “তা মেম, কি রকম সঠিক থাকবে, সেটা তোমরা জানে বল।”

দীপেন কহিল, “আমার যা সঠিক তা ত আমি আগেই বলে দিয়েছি। খোট কথা, এই বোকান থেকে অসির সংশয় চলা চাই, আমার টাকাটারও ভয় বলে কিছু চাই। বাস শোনা কথা।”

অসিত কহিল, “না গামিনী, দেখাপড়ার কোন দরকার নেই—যে আমার কষ্ট বৃদ্ধ করবার চক্রে ছ’আমার টাকা বেশ করে দিচ্ছে, তার সঙ্গে—”

বাধা দিয়া দীপেন কহিল, “তোমার বক্তৃতা বাধাও অসি। এখনই গিয়ে আগে ত বোকানটা কিনি নি, তারপর গামিনী যে ভাবে বলবে, সেই রকম একটা দেখাপড়া করে নিলে হবে। আমি এখন চললাম,—তুমি তৈরী হয়ে থাক অসি, দুই একদিনের মধ্যেই কাজে লাগতে হবে।”

উভয়ে হালিরা গেল। মনোরমা কক্ষমণ্ডা আসিয়া ঠাড়াইয়া হাসিয়া কহিল, “তুমি ত চেয়েই শয়ান নিছলে, কেমন, এবটা কিয়ারা হ’ল ত?”

অসিত কহিল, “আমি ত হচ্ছে, কিন্তু শোকান চালাতে পারব ত? কখনও ত এ কাজ করি নি।”

মনোরমা কহিল, “কত নি তাতে কি হচ্ছে, তারি ত কাজ, শিখে নিতে কতকণ, আমাকে তার বিশেষ আমিও পারি।”

অসিত হাসিয়া কহিল, “তা তুমি পার—এ কথা আমি স্বীকার করি: একটু বাধিয়া গন্তীর হয়ে। আমার কহিল, “তবু হব যদি শোকসান হয়ে যায়। আমার উপর বিশ্বাস করে অতগুলো টাকা বীজ বেশ করছে, তার না ক্ষতি হয়।”

মনোরমা কহিল, “শোকসানই বা হতে পারে কেন, ও রকম কথা মনেই আনতে নেই।”

অসিত কহিল, “না, ও সব কথা আর ভাবব না, কাজে ত লেগে পড়ি, তারপর যা হয় হবে।”

গামিনীর একান্ত চোঁরা পাকা দেখাপড়া হইল বটে, কিন্তু দীপেন বুঝে যে সর্বের কথা বলিয়াছিল, দেখাপড়া করিবার সময় তালা অন্তর্য ধারণ করিল। খোটাস্ট এইরূপ

ধাড়াইল—সোকানের সময় সব দীপেনেরই মন, অসিত পরিভ্রমিক স্বরূপ দৈনিক এক টোকা কবিতা পাঠবে এবং বঙ্গবীরের খেলে বা লাভ হইবে, তাহারও অর্থেই সে পাঠবে। তবে গামিনী আর একটা দর্পণ দিয়া মন, তাহারে দীপেনও কোন অপরি করিল না বরং আগ্রহ প্রকাশ করিয়াই বলিল, “অসিতের চক্রেই শোকান নেওকা, সে ত আমি আগেই বলেছি—আমার ত আর বোকান থেকে সংশয় চালাতে হবে না।”

দর্পণী এই,—তিন বঙ্গবীরের মধ্যে দীপেন ইচ্ছা করিলে অসিতকে বোকান হইতে সরাইতে বা শকের অংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিলে না। তারপর যদি কোন দিন উভয়ের মনোমালিন্য হয় এবং অসিত নগদ দুই হাজার টাকা এবং শকের অংশ বাহা নাকি থাকিবে,—তাহা দীপেনকে দিতে পারে, তাহা হইলে—শোকান অসিতেরই হইয়া যাইবে।

দেখাপড়ার সময় অসিত কোন মনোমত প্রকাশ করিল না।

নিম্ন পাঠকে পরে অসিত শোকান দুলিয়া বলিল, প্রথম প্রথম তাহার খুবই অসুবিধা হইতে লাগিল। একটা জিনিসের নাম বলিতে অসু জিনিসের নাম বর্ণনা কেলে, কোন একটা জিনিস বুঝিয়া ব্যাখ্যা করিতে অনেক বৈশ্ব হইয়া পড়ে,—হয় ত বুঝিয়াই পারে না, পরিষ্কার কিসিয়া না। দীপেন ও গামিনী প্রতিদিন সন্ধ্যার পর শোকানে আসিয়া বসে, অসিত তাহার শেখারের কথা উল্লেখ করিলে, তাহাকে উদ্ভাস বোধ,—“আরে প্রথম প্রথম ও রকম হয়, ত’ দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।” হইলও তাহারি—এক নাম বাইতে না বাইতেই অসিত নিজের বোধ ক্ষতি সব সংশোধন করিয়া মন। তখন আর বিস্তারিত কত কিবা কোন জিনিসের অভাবে পরিষ্কারক করিয়া বাইতে হয় না। বাস্তব অংশে কোন জিনিসের দৃশ্য এক পরমা বৈশ্ব কাহারে দিতে হয় না। বরং দুই এক পরমা কয়েতেই সকলে জিনিষ পায়। রূপে তাহার বোকানে পরিষ্কারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অসিতের সে কি উদ্ভাস! সে যেন অহায়ে-বিভা দৃশ্য গেল।

বাড়ী ভিরিতে তাহার অধিক ব্যক্তি হইত। মনোরমা হাসিয়া বসিত, “কোন দিন আমাদের সঙ্গে সখচটা না একেবারে ভাগ করে বল।”

অসিত বলিত, “দেখচাই মনে করি সকাল সকাল ফিরবে, কিন্তু ‘কিছুই’র কাজ শেষ করে উঠেই পাবি না। না, কাজ ফেরে বেগেই সকাল সকাল ফিরবে।”

মনোহরঃ তখনই তাহা হাসিয়া বলিত, “তা বা ফিরবে, তা বুঝি আমি যে,—কাজ দিন দিন বাড়বে বৈ ত কখনো না।” অগাধ হঠাৎ যত্নের চট্টা বলিত,—“কিন্তু অত পরিশ্রম ত তোমার শরীরে সহ্যই না—খানিকটা বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩পূর বেলা ত নাকে মুখে ভাত শুঁবে ছোট্ট,—ত’ মিনিট ২২৫০০ সময় পাও না, তা করলে চলবে না।”

অসিত কহিত, “সোকানটা প্রায় গুছিয়ে এনেছি,—অল ৬টা’ দিন, তারপর ভাত মুখে দিয়ে আর ছুটতে হবে কিছুকালের সময় পাব। সোকানের উপর এমন মায়া পড়ে গেছে যে কি বলব—নাওয়া-খাওয়ার কথা যেন মনেই থাকে না। চাকরীর চেষ্টা দেখছি এতে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়—অথচ এর পেছনে কত বেশী গাটতে হয়, তবে সে গাটনি তৈরী থাকেই লাগে না।”

মনোহরঃ বলিত, “আমার আর অত বোকাতে হবে না, মোটে কথা,—অত খাটী তোমার চলবে না।”

তবু মুখে বলিয়া মনোহরঃ কাজ হইল না, সস্তায় পানিক পরে মাধ্যাক-আহারের পর সে ঘানীতে কটা খানেক বিশ্রাম লইতে এবং রাত্রে এগারটার মধ্যে বাড়ী ফিরিতে বাধ্য করিল।

বাস তিনেক সে সৈনিক এক টাকা করিয়াই লইতেছিল, কিন্তু ২৯ টাকা বাড়ী-ভাড়া দিয়া বাকি বৃদ্ধি টাকার সংসার চালান কঠোর হইত, তাই দীর্ঘশ্রমে বলিয়া সে পারিশ্রমিক বাসে আরও ২৯ টাকা বাড়ীটায় দিল।

দীর্ঘশ্রমে বসিতে সে হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, “আমাকে আমার ভিজেন্দ্র করছ কেন যে, তোমারই লোকের ভাগ থেকে তুমি নেবে, তাতে বদলার কি আছে?”

অসিত বলিয়াছিল, “তুমি সোকানের মাসিক, তোমাকে না বলে নেওয়াটা অসম্ভব।”

দীর্ঘশ্রম বলিয়াছিল, “কথা বুঝ শিখছ বটে।”

দেখিতে দেখিতে প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইল। গেল। দীর্ঘশ্রম ছয় বাস অসুর মাসিক এক টাকা হারে,

স্বপ্নের টাকাটা নিশ্চিত তাহে বোকান হইতে লইয়াছে। লোকের অংশও ফেলিয়া রাখে নাই।

এখন সময় ঘোরেন একদিন অসিতকে তহিল, “সেখ অসিত সোকানে একজন লোক রাখা বরফার। তোমার পুর বেলী পরিশ্রম হচ্ছে।”

অসিত কহিল, “আমিও তোমার দেই কথা বলব মনে করেছিলাম। একজন বিখ্যাত লোকের সন্ধান করতে হবে।”

দীর্ঘশ্রম কহিল, “আমার এক লম্বকী বসে আছে,—তাকে বলে কয়ে যদি সোকানের কাজে লাগতে পারি যেখি, তার ত খাওয়া-পচার ভাবনা নেই—বাড়ীতে সে সংসার তাদের কাল রক্ষাই আছে, মাথার উপর তার বাগ রয়েছে। মাস দুই পরে তাকে হাত-গরুচ বলে কিছু বিলিয়ে হবে।”

অসিত আশ্রয়ভয়েই কহিল, “বেশ ত, সেখ না যদি তাকে কাজে লাগতে পারত,—আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।”

দীর্ঘশ্রম কহিল, “সেখি চেষ্টা করে, যদি যামি না হয়, তখন অত লোকের চেষ্টা দেখলেই হবে।”

তদ্বিষা যামিনী কহিল, “কাজটা ভাল হচ্ছে না অসি।”

অসিত কহিল, “কেন বল দিকি? এর ভিতর মন্ডা কি দেখলে?”

যামিনী কহিল, “প্রথম কথা,—সে কোন লোভ করলে তুমি তাকে কিছু বলতে পারবে না, সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, সেই হয় ত দু’দিন পরে সোকানের সর্বস্বত্বই হবে বসবে, তোমাকেই তার উদ্যোগের হয়ে থাকতে হবে। এত পরিশ্রম করে সোকানটিকে তুমি গাড় করিয়েছ, তার হাতে পড়ে হয় ত সোকান আমার পড়তি হবে বাবে, সে কথা কি একবার ভেবেছ?”

তাই ত, এ কথাটা ত সে একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। এখন যে হইতে পারে, সে সংসার ত তাহার মনে আসে নাই। কিন্তু উপায়ই বা কি? দীর্ঘশ্রম যদি তাহাকে বোকানে আনিয়া বলায়, সে কি করিতে পারে? কিন্তু লভাই যদি তাহার হাতে-গড়া বোকান নষ্ট হইয়া যায়? প্রকৃত্তে সে যামিনীকে এই সব কথাই বলিল।

যামিনী কহিল, “দুইয়ের কথা বটে! দীর্ঘশ্রম ত আর

এ সব কথা বলা চলে না, অথচ কি বে কথা বাহ, তাও ত হেবে শাস্তি না।”

অসিত কহিল, “করবার আর কি আছে। তবে সে বে খাণ্ডাণ শোকটাই হবে, এমন কোন কথা নেই। ঘিমে-ঘিমে কাজ করলে জ্বিমেও হ’তে পারে।”

হামিনী কহিল, “হু ত হ’তে পারে। তবে তোমাকে পুর সাধন হবে চণ্ডে হবে।”

ইকরাই দিন ঠাই পরে বীণেশ ত্রাণের শ্রাসক নিরাশকে আনিয়া বোঝানে বলাইয়া দিল। অসিতের সহিত তাহান পরিল। কড়াইয়া দিয়া কহিল, “অসি যা বলবে, তাই করবে, কুলে ? তার কথা মত চলবে।”

নিরাশ কহিল, “ইহা তাই কর।”

বীণেশ কহিল, “নিয়মত আসবে, কাজ কামাই করবে না।” ত্রাণের অসিতের শিক চাহিয়া কহিল, “তুমি একে শিখিয়ে পড়িয়ে নিও ভাই।”

অসিত কহিল, “সে তোমার বলতে হবে না।”

মাসখানেক পরে অসিত হামিনীকে বলিল, “বড় বুদ্ধি হয়েছে,—সাবানটা, এসেগটা প্রায়ই হারান্ধে। কি কদিন বল দিকি ?”

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া হামিনী কহিল, “একটা খোদোদান বে হবে আমি তা খুঁজ করে নিয়েছিলাম, তবে বে এক বকম ছুঁত করবে তা আমি ভাবতে পারি নি। বেশ আর ছুঁচার দিন, ত্রাণের তকে সরাবার চেষ্টা করতে হবে। ও বকম শোককে বোঝানে রাখা চলবে না। তবিল পুর সাধন, টাকা-পয়সার বাস্তব তকে হাত দিতে নিও না।”

অসিত কহিল, “তা দিই নি, কিন্তু ও যা দিকী করে সব পরলা ওয়া বেখ বলে ত মনে হয় না,—তবে এখনও টিক করতে পারি নি।”

হামিনী কহিল, “যার ও বকম অতোদ সে পরলাও টিক সরাচ্ছে। পুর ব’লিয়ার হ’বে চ’ল হাই, আর কি বলব ! তবে বত ঈশ্বরী হ’ক তকে সরাতেই হবে। বেখি বেবে কি উপায় করা যায়।”

আরও কিছুদিন গেল। বোঝানে ছুঁতর বাজা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। একদিন অসিতের সতর্ক দৃষ্টি নিরাশের একাইতে পড়িল না, সে হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গেল।

চোদ্দ আনার এক শিনি এসেদা বিক্রয় করিয়া পয়সাটা সে পকেটে ফেলিবার আর অসিত তাহাকে ডাকিয়া কহিল, “এসেদের পয়সাগুলো পকেটে রাখলে কেন ?”

নিরাশের প্রশ্নটা কেমন পছন্দ খাটয়া গেল। কিন্তু আর কদের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া দিয়া কহিল, “আপনি কি বলতে চান, আমি ছুঁত করছি ?”

শ্রী উত্তর দিতে অসিতের বুখে বাধিল, সে বুঝাইয়া কহিল, “পকেটে রাখলে তাই বলছি।”

নিরাশের কথিয়া কহিল, “পছন্দার, আমার আপনি চোর বলবেন না।”

অসিত আর কি বলিলে ! নাথ্য হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। সে বে কাহার ভোরে তাহাকে চোখ রাঙাইল, তাহা ত সে বোঝে। নাত্রে হামিনীর সহিত বেখা হইলে তাহাকে আভিকার বাশাবটী জানাইয়া কহিল, “গমন চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে আসন্ত কয়েক, তখন সে ত সাধনাসাধনি ছুঁত করবে।”

হামিনী কহিল, “আপ চুপ করে পাকা চণ্ডে না, এখনই বকম কাছে থাকি, গিয়ে শ্রীশ্রী সব বলব। বোঝানে তকে রাখা হবে না তাও জানিয়ে দেব।”

অসিত কহিল, “যা ভাল বোধ কর, বে তাবে পার তকে বোঝান থেকে সরাও ভাই।”

হামিনী তখনই দিয়া বীণেশের সহিত লাকাত করিল।

বীণেশ কহিল, “এস হে হামিনী, এত নাত্রে বে—কি বলব ?”

প্রশ্নেই হামিনী কিছু কথাটা শ্রী করিয়া বলিতে পারিল না। কহিল, “বিশেষ কাজে তোমার কাছে এসেছি—বেখ, নিরাশকে তুমি অত কোন কাজে লাগিয়ে দাও, বোঝানের কাজ তার থায়া হবে না।”

বীণেশ হঠাৎ পছন্দ হইয়া কহিল, “অদি পাঠিয়েছে ব’লি তোমার ঐ কথা বলতে ?”

বীণেশের কানে কি ছুঁতর কথা উঠিয়াছে ? একই ভাবিয়া হামিনী কহিল, “না অদি পাঠায় নি, আমি নিজেই এসেছি।”

বীক কহিল, “তা বেশ কয়েক, কথাটা শ্রীশ্রী হতে যাওয়াই ভাল। কিন্তু ওপর ছুঁতর অপবান দিতে এসেছে এই ত ?”

দীর্ঘ ভ্রম। ঠিকই চুরির কথা শুনিয়াছে, কিন্তু তাহান কথা বলান হুঁই আমিও না। সে কহিল, “ক’দিন থেকে লোকানে এটা-ওটা চুরি ঘাচ্ছিল—”

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বীরেশ অসীম ভাবে বলিয়া উঠিল, “আজ মগন পয়সা চুরি গেছে কেমন? আর নিক সেট পয়সা চুরি করেছে? কিন্তু কার নামে চুরির অপবাদ দিতে এসেছ তু তান?”

বাঘিনী ফুৎ হইয়া উঠিল, কহিল, “তানি সে তোমার লবলী।”

বীরেশ ভোর বিয়া কহিল, “ঐতুই শরিচর ওর লসেই নহ, সে ক’ন বড় খরচে ছেলে তু তান? চুরি করার প্ররতি তার হ’ত পারে না। তার বিরুদ্ধে যে একটা বড়বহ চলেছে সে খবর কবিন থেকে আমি পাচ্ছি।”

পতীর বিষয়ে বাঘিনী কহিল, “এদর কি বসেছ ঘর?”

বীরেশ স্নেহ বিয়া কহিল, “ঠিকই বসেছি বাঘিনী, এতটুই বেশিক বসিনি। চুরির নাশিন যে আবার কাছে আসবে তু আমি আগে থেকেই জানি। শুধু তাই নহ, কেন আসবে তাও জানি। লোকানের ভিতরের খবর কেউ জানে অসির এটা উচ্ছে নহ, নিরাপন লোকানে থাকলে অসির নানা রকম অবস্থি—তাকে লগান বরকার,—নাও চুরির অপবাদ গাণিয়ে।”

বাঘিনী মনে মনে বলিল, কি সর্বনাশ! বাপার এতদূর গড়ায়ছে! নিরাপন এত বড় শরতান। বীরেশের নিকট প্রতিভারের ত কোন আশাই নাই। তাহার কোন কথাই ত সে বিশ্বাস করিয়ে না।

বীরেশ কহিল, “লোকানে কি হয় না হয় তুমিও কোন খবর রাখ না, আমিও রাখি না। অসি বা তোমাকে বুঝিয়েছে তুমি তাই বুঝেছ। ভিতরের বাপারটা তপিয়ে লোকবার স্টো কর নি। এখন বুঝে ত?”

বাঘিনী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, “না, কেন বা অসিকে আমি তোমার চেয়ে ভাল করেই চিনি, কোনরকম বীচ কাচ করা তার স্বভাবের বাইরে। বা মতা তাই সে বলেছে।”

বীরেশ প্রবৃত্ত হইয়াই ছিল, সে কহিল, “তুমি ত ওকথা বলসেই। কেন না বটকিছু খোলাবাদের বদল হচ্ছ তুমি।”

বাঘিনী ওট চুপ নিভারিত করিয়া কহিল, “আমি!”

বীরেশ কহিল, “ইয়া তুমিই।” সিন বছর পরে হুঁহাজার টাকা গিলে লোকান অসির হয়ে গাবে এসেই কে করিয়ে নিয়েছিল? সে তুমি। তখন আমি অত বুঝি নি। তসি থেকে পাচ্ছিল না, তাই আমি মগনের টাকা বের করে তার সাহায্য করতে গিয়েছিলাম, বড় বোম আবার হয়েছিল! আমিই এখন চোরের দারে খস পড়েছি। থাক বা হবার হয়েছে। তুমি এসেছ তানই হয়েছে, না হলে কানই আমি তোমার কাছে যেতুম। বেশ এখন সঠি করিয়ে নিয়েছ তখন উপায় নেই—লোকানটি অসিই নিয়ে নিক, আমার হুঁহাজার টাকা আবার কেনে নিক, লাভের টাকার যদি কিছু পাওয়া হয় তাও দিয়ে নিক। ইয়া আর এক কথা, বেশী বেশী আমি করতে পারব না, সাত দিনের ভিতর টাকাটা আবার দিতে হবে, যদি না বেশ, লোকানের সঙ্গে অসির কোন লবল থাকবে না। তাও তাকে বলে দিও।”

বাঘিনী শুক হইয়া বলিয়া বহিল। সে শব্দ বুঝিল, এই মতলব করিয়াই বীরেশ তাহার জালককে লোকানে পাঠাইয়াছে। লোকান যে পূব ভাল চিন্তেছে সে খবর সে পাইয়াছে, লালপত্রও যে বখটে আছে তাহাও সে জানিয়াছে এবং ইয়াও সে বেশ জানে, এত কম সময়ের মধ্যে অসিতের পক্ষে হুঁহাজার টাকা সংগ্রহ করা সহজ নহে, বরং অসম্ভব। তাহার নিজের অবস্থাও বীরেশের অবসিত নাই।

বীরেশ কহিল, “এনেক রাত হয়ে গেছে। আমার বা বলবার তা তোমার কল দিগুন, তুমি অসিতকে জানিও।”

“ইয়া জানাব।” এই বলিয়া বাঘিনী সে স্থান ত্যাগ করিল। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে চিন্তিত পায়িল, ঐ রকম সঠি করিয়ে নিয়েছিলেন, তাই সাতদিনের সময় দিয়েছে, না হলে সঙ্গে সঙ্গে অসিকে বিসেহ করে দিত। পোত এখনই জিনিস,—মাহুতকে অব্যাহত করে তোলে, কর্তব্য অকর্তব্য, ধর্মার্থ কোন জানই মাহুতের থাকে না। এখন টাকার কি হবে? লাভের অংশ ত ঘর বাড়ি কেনে রাখবে নি—হুঁহাজার টাকা বিসেই হবে—সেখি অসিকে বলে, যদি সে লোণাড় করতে পারে। তার শালা অনেক বেশ অবস্থাপন, সে হয় ত তাকে সাহায্য করতে পারে। লোকান হাত-ছাড়া

হবে গেলে সে বেচারী তারি কষ্টে পড়ে যাবে। লম্বার চলাই গার হবে।

পরদিন প্রাত্যহেই বামিনী অদিতের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন অদিত লোকান বাহির হইবার উদ্দেশ্য করিতেছিল।

অদিত কহিল, “আজ পূর্ণ তোর উঠেই দেখছি। চল গম করতে করতে এখানে থাক।”

বামিনী গভীর হইয়া কহিল, “তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। যেকোনো পরে গেসেই চলবে।”

অদিত তীত হইয়া কহিল, “বাপায় কি হে! তা হলে বদি।”

উত্তরে বদিল। বামিনী তাহাকে সবিত্তরে সমস্ত কথা বদিল। অদিতের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মাথার ঘন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। তাহাকে যোকান ছাড়িতে হইবে? হুঁহাভার টাকা সে কোথায় পাইবে! আবার ছুটি অম্বের চেষ্টায় তাহাকে পথে পথে খুঁটিয়া বেড়াইতে হইবে। কিন্তু সোকানের দায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে? কি করিয়া সোকানের উভিত করিবে, ইহাই যে তাহার একমাত্র ভিত্তা ছিল। থাইতে বদিয়া সে সোকানের কথা ভাবিত, পথ চলিতে চলিতে সে সোকানের কথা ভাবিত, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে সোকানের স্বপ্ন দেখিত।

হত্যাশঙ্কায় অদিত কহিল, “কি হবে বামিনী?” বন্ধ বিনোদ করিয়া কথাগুলো যেন বাহির হইয়া আসিল।

বামিনী কহিল, “টাকাটা ঝোপাক্ষ করতে হবে।”

অদিত বাশবন্ধকর্মে কহিল, “অত টাকা কে আবার থেবে?”

বামিনী কহিল, “তোমার শাণা দিতে পারেন না?”

অদিত কহিল, “অন্যায়সেই পারে, কিন্তু সেবে কেন?”

বামিনী কহিল, “যেবেন না কেন, তোমার স্ত্রীকে আজই সেখানে পাঠিয়ে দাও।”

অদিত কহিল, “যেতে বলব। সেখ ভাই, আমি ত কোন অপরাধ করি নি, আখার তাড়াত্তে কেন?”

বামিনী কহিল “অপরাধ কর নি! তার শাণাকে চুরি করতে বেখেচ্ছ, অপরাধ করনি! বল কি! তার শাণা কত বড় ধরের ছেলে তা জান, সে করতে চুরি।”

অদিত আর কি বলিবে, চুপ করিয়া থাকিল।

বামিনী কহিল, “ভেবে আর কি করবে, চেষ্টা করে দেখ। সেরী হ’বে সেল, লোকান গেল গে। সাত দিন সোকান চলাও ত।”

বীর্ণনিঃশ্বাস কেনিয়া অদিত কহিল, “ইয়া বাই, আজ যেন না চলছে না। ভিতরে একবার খবরটা দিবে আসি।”

ভিতরে থাইতে মনোরমা কহিল, “সব তখনেছি, তুমি অত মূঢ়কে পড়লে কেন? যা হব একটা ব্যবস্থা হবেই।”

অদিত কহিল, “ব্যবস্থা আর হবে কোথেকে, এক বদি তোমার দায়া দার বলে টাকাটা বের।”

মনোরমা কহিল, “সে যা হব হবে, তুমি এখন সোকানে যাও ত, সেনেই সেরী হবে গেছে।”

বীর্ণনিঃশ্বাস কেনিয়া অদিত কহিল, “ইয়া বাজি।” এই বদিয়া সে ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে কোন ব্রহ্ম উদ্দেশ্য প্রকাশ না করিলেও, ভিতরে ভিতরে মনোরমা চক্ষু হইয়া উঠিয়াছিল। দাযার কাছে টাকা পাইবার আশা নাই, সে তাহা বের জানে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, শুধু হাতে অতগুলো টাকা দার দিবে। কিন্তু ভাবিগাও ত কোন লাভ নাই! উপরে বিনি আছেন, তিনিই ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই বিশ্বাসের জোরেই কোন অবস্থাতেই সে বিচলিত হয় নাই, আজই বা সে কেন হইবে? যন হইতে সমস্ত ভিত্তাকে ধূরে টেনিয়া বিয়া সে লগালের কাছে মনঃসংযোগ করিল।

সমস্ত খুঁটিয়া সোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া অদিত কিছুকণ মুখ নীচু করিয়া শাড়াইয়া রহিল। নানাধিষ ব্রহ্ম ধরে ধরে সাজান রহিয়াছে, সেবিকে আজ যেন সে চাছিতে পারিতেছিল না। এ সবই তাহার নিজের হাতে সাজান। কত ঘর করিয়া সে সাজাইয়াছে। আর কটা দিন! সাত দিন পরে এ যোকান ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া থাইতে হইবে। তাহার চোখ কাটিয়া চল বাহির হইয়া আসিল।

এখন সময় একজন খবরদার আসিয়া কহিল, “শুধুগির এক পরমা নতি দিন ত! গাড়ীর দম্ব হইবে এসেছে।”

অদিত তাড়াত্তি কৈচার খুঁটে চোখ মুছিয়া মস্ত সিত গেল। তাহার যে চোখ এতদিন বাদা যত্নের মত কাক করিত

আজ প্রহর বাড়ির দরজা খুলে। নতুন বস্ত্রের দুইটি নিব
খরিদারের হাতে কেশিয়া বিল।

খরিদার বিরক্ত হইয়া কহিল, “কি হয়েছে আপনার ?
৫৫টি বস্ত্র, গিলে নিব। রটন আপনার জিনিস, আমি
৮৮টি, গাড়ী কেন করব নাকি।”

সে চলিয়া গেল, অসিত শব্দ হইয়া শাড়িগা রহিল।
তাই ত এ বসন তুল ত তাহার কোন দিন হয় না। না না,
তাঁহাকে শব্দ হইতে হইবে, এত বিচলিত হইলে ত চলিবে
না। এখনও ত সাত দিন সময় আছে। প্রতিদিনের মত
শে কানন লইয়া এটা-ওটার খুলা কাড়িতে লাগিল। জিনিষ
তলায় উপর তাহার কত মায়া।

আজ আর নিরাপত্তা আসিল না, সে একাই খরিদারকে
কিনয় সমগ্রতা করিতে লাগিল। চোঁটা কংগা সঙ্গেও তাহার
মাথায় বাকো তুল হইতে লাগিল। বে জিনিসটার চোঁচ পরমা
ধান, সেটার চারে আনা বসিয়া কেশিয়া খরিদারের কাছে
কথা শুনি। আবার ছয় আনা দানের জিনিষ খরিদারকে
চারি আনার দিয়া দুই আনা লোকসান করিল। এখনই
গবে তাহার কেরাঝা চাপিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর ঘামিনী বখানিরনে সোকানো গিয়া সেদিন
সোকান বন্ধ। সে তাড়াগাড়ি অসিতের গৃহে গিয়া উপস্থিত
হইয়া অসিতকে ডাকিতেই সে বাহির হইয়া আসিল।

ঘামিনী কহিল, “কি হে আজ থেকেই সোকান ছেড়ে দিলে
না কি ?”

অসিতের ছই চোখে জল ভরিয়া আসিল। বাস্তবিক
কর্তে সে কহিল, “বীক নিজে এসে সোকান বন্ধ করে দিয়ে
গেছে।”

ঘামিনী ভুরুকিত করিয়া কহিল, “ও এত বড় বদমায়েদ।
কিন্তু সোকান ত এখনও তার হয় নি। টাকা না দিতে
পারলে তবে ত তার সোকান হবে।”

অসিত কহিল, “সাতদিন সোকান বন্ধ থাকবে, আমি
যদি টাকা দিতে পারি, তবেই সোকান আমি খুসিতে পারব,
না হ’লে এই পর্যন্ত।”

ঘামিনী কহিল, “ত”, “কি করব, আমি গরীব মানুষ, এমন
কিছু নেই যে গেছে কিনে তা’রতার টাকা ভোগাড় করতে

পারি, তা হ’লে একবার দেখে নিতুম। ইয়া তোমার
পাশের কাছে পাঠিয়েছ ?”

অসিত কহিল, “অদম্যে বাড়ী ফিরে আসতেই ব্যাপার
কি শুনে, তখনই সে তার পাশের কাছে গেছে।”

ঘামিনী কহিল, “বাক, অনেকটা নিশ্চিত হয় গেল।
একবার সোকানটা তোমার হাতে আনুক, তারপর বীককে
দেখব।”

অসিত কহিল, “বীক উকিলের চিঠি দিয়েছে। তাতে ঐ
কথাই লেখা আছে। সাতদিনের ভিতর উকিলের বাড়ী
গিয়ে টাকা পেয়েছি যিরে আসতে হবে। সোকানটার উপর
এত মায়া পড়েছিল। আবার অসিতের সংস্থানও বন্ধ হয়ে
গেল।”

ঘামিনী কহিল, “কি ধড়বাস্ত, কি পাগল। তখন যে
কি করে” ঐ বসন সঙ্গে রাখি হ’ল তাই ভাবছি। সে ঠিক
ভেবেছিল, যদি টাকা কোথায় পাবে, দিতে পারবে না,
সোকান ওইই থাকবে, বসন টেকে ৪৪ তোমার ডাকিয়ে দিতে
পারবে। কোন রকমে টাকাদা হাতে এসে পড়ে।”

হঠাৎভাবে অসিত কহিল, “সে আশা খুব কম, আবার
মত পরীক্ষা জানীকে কোন ভরসাও লোকে টাকা দেবে,
আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। কি করে সংসার চলবে, এখন
তাই বাসি ভাবছি।”

ঘামিনী কহিল, “একবারে হাল ছেড়ে বিচ্ছিন্ন কেন ?
আমিও চোঁটা দেখি। তা হ’লে এখন চলব, তুমি অত
ভেব না।”

একটু পরে মনোমুখা দ্বারের গৃহ হইতে কিরিয়া আসিল।
অসিত জিজ্ঞাসার সূত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল, কোন
প্রশ্ন করিতে তাহার সাহসে কুশাইল না।

মনোমুখা একটু ইতস্ততঃ করিল, তারপর নিজেকে শব্দ
করিয়া লইয়া শুধু কহিল, “মায়া বসলেন, পরের টাকা নিয়ে
সোকান করতে যাওয়া বোকামি।—ও সব বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে
চাকরীর চোঁটা ককক।”

অসিত মায়া মৌদিনি যে দল বস্ত্রাভিক টিপ্পনি
কাটিয়াছেন, তা’র উপরে মত করিল না।

পরিও অসিত জাতি, টাকা নিবাহ লোক তাহার জালপ নহেন, তবুও সে একেবারে আশা ছাড়ে নাই, ছোট বোনের কাছিত-বিনতিতে যদি বাহার মন ভেঙে! তাই মনোরমার কথার সে একেবারে তানিয়া পড়িল।

স্বামীর বিবর্ষ সুখের বিকে চাহিয়া মনোরমা শিরিষা উঠিল। ‘আশান্তঃ’ কথাটা তাহাকে না বলিলেই হইত। নিজেকে সাবলাইয়া লটকা সে অস্ত কথা পাড়িল, কহিল, “পাক্ষণের কথা তোমার মনে আছে?”

অসিত ভয় করে কহিল, “কে পাক্ষণ?”

মনোরমা কহিল, “সেই যে আমাদের বাড়ীর পাশে থাকত, খুব গরীব। তুমি এখনই যেতে—”

অসিত কহিল, “হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। যেনেটাকে আবার বেশ লাগত, কথা কি মিষ্ট।”

মনোরমা কহিল, “আজ দ্বারের ওখানে তার সঙ্গে দেখা হ’ল। কি লক্ষ্যের চেহারা হয়েছে, গায়ে এক গা পরনা,— তার দ্বারা পাটনার একজন বড় উকিল হয়েছে, অনেক টাকা রোজগার করে। কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। সে-ই আমার বৈঠক করিয়ে দিলে, না হ’লে অনেক আগে চলে আসতুম। পাক্ষণকে দেখে মনে হ’ল,—নাহকের অবস্থা কখন কি লাড়ায় কে বলতে পারে! আর আমরা কষ্টে পড়েছি, দু’দিন পরে এ কষ্ট থাকবে না।”

অসিত গীর্ষনিঃস্বাস কেশিয়া চুপ করিয়া রহিল, সে বুঝিল, তাহাকে দুসাইবার জন্য মনোরমা পাক্ষণের অবস্থার কথা করিয়াছে।

মনোরমা কহিল, “আমল কথাই তোমার এখনও বলা হয় নি,—দ্বারা পাক্ষণকে তোমার চাকরীর কথা বলে দিয়েছেন, দেখানে তার স্বামীর খুব বাড়ি। পাক্ষণ আবার ভিজেল করলে, বহুবিধি পণ্ডিত্যে বেতে পারবে ত? আমি বললুম, আমাদের পশ্চিমই বা কি, আর কলকাতাই বা কি! পাক্ষণ হেসে বললে, জামাই বাবু হচ্ছেন কারবারী লোক, তিনি কি পণ্ডের লক্ষ্য করতে পারবেন? আমি বললুম, ছিট ভাতের জন্য তিনি সব করতে পারবেন। পাক্ষণ তখনই ভাবে হেসে বলল, বহুদিন সঙ্গে কণার পারবার জো নেই।”

অসিত কহিল, “কি বুঝলে—চাকরী পাওয়ার আশা আছে? লোকানের আশা আমি অনেক আগেই ছেড়ে

দিয়েছি—যার চাল নেই চুপো নেই, তাকে কেউ টাকা দেয়? —তা দু’পাচ টাকা নয়, হ’ল হাজার টাকা!”

মনোরমা কহিল, “চাকরী একটা তোমার হবেই। আমল্য ছেলেসময়ে নিয়ে না গেবে থাকবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। এই ত লোকান থেকে তিন বছর ত চলল। না হব চাকরী করেই চলবে।”

অসিত কহিল, “সে হয় ত চলবে,—কিন্তু আমার নিষেধ হাতে গড়া লোকান থেকে আমি এবিধ ভাবে বঞ্চিত হব। তুমি ত জান কি পরিশ্রমই আমার করতে হয়েছে।” বর্ণিত বর্ণিত তাহার কর্তব্যর আবার ভারী হইয়া উঠিল।

“অনেক রাত হবে গেছে, রাতা চড়াতে হবে।” এই বলিয়া মনোরমা তাকাতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করিল।

বেশিতে বেশিতে পাচ দিন কাটিয়া গেল। অসিত ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কত কথাই ভাবে। তাহার কেবলই মনে হয়, লোকানের লাজন বিনিময়গুলির গারে এত দিন কত খুলা পড়িয়াছে, কত ভিন্দিবের গারে যাপ ধরিয়া গাইতেছে, লেজগো আর পত্রিকার লইবে না, লোকলান হইয়া গাইবে। তখনই আবার মনে পড়ে, লোকানের সহিত তাহার কি সম্পর্ক? সে ত বিতর্কিত হইয়াছে। লোকানের কথা সে আর ভাবিবে না।

যামিনী প্রত্যাহ হই বোলা আসিয়া তাহার খোজ লইয়া যায়। লোকানের নাম উল্লেখও সে করে না। সেও চোটা করিয়া দেখিয়াছে, টাকা সংগ্রহ হইবার কোন আশাই নাই।

কিন্তু ছব দিনের দিন এক অচটন ঘটিল। অসিত মাথার হাত দিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, হঠাৎ বাড়ীর লাক্ষন মোটর খামার পথে সেইদিকে চাহিতেই দেখিল, একটা খুবড়ী মোটর হইতে নামিয়া সেই ঘরের দিকে আসিতেছে। অসিত তাকাতাড়ি উঠিয়া পাড়াইল। খুবড়ী অঙ্গুর হইয়া আসিয়া হেঁট হইয়া তাহার পারের খুপো লইয়া দাঁদিয়া কহিল, “বেশ লোক বা’ হক আশনি জামাইবাবু, আমাদের চিনতেই পারলেন না?”

অনেক দিন ভেবে নাই। অসিত মস্তাই চিনিতে পারিল না।

দুইতী হাঙ্গিয়া কহিল, “আমি পাকল, এটাবারে চিনতে পারছেন ?”

অসিত অগ্রসর হইয়া কহিল, “অনেক দিন দেখিনি।”
পাকল কহিল, “হী, অনেক বসলে গেছি। মহুদিদি কোথায় ?”

অসিত কহিল, “ঐ যে আসছে।”
মনোরমা অগ্রসর হইয়া আসিলে পাকল হেঁট হইয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, “আমি নয় দিনই তোমার এখানে আসব মনে করেছিলাম মহুদিদি, তা’ হলে উঠল না, বেতী হয়ে গেল।”

মনোরমা কহিল, “তুমি যে মনে করে এলেছ, এই আশা-
বের কত ভাগ্য।”

পাকল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, “এ রকম তাহে আমার
সঙ্গে কথা বলবে জানলে আমি লজ্জাই আসতুম না।”

অসিত কহিল, “আমি এখনই আসছি, একটু কাত
আছে।” এত বলিয়া সে চলিয়া গেল।

মনোরমা কহিল, “বেশ তাই আর বলব না। তুমি
পাড়িয়ে বসিলে, কিছ্র কোথাই বা তোমার বসবে ?”

পাকল কহিল “আবার ঐ কথা। আর না হয়
ভগবানের সন্মত উনি ছ’পরল রোজগার করেছেন, দিবার
আশে আশাবের কি অসহ্য ছিল, তা ত তুমি জান। তবে
একটা কথা তোমরা মান না মহুদিদি ? কার জন্তে আর
আমার এই সৌভাগ্য, তা জান ? মেসোমশায়ের।”

পাকল মনোরমার স্নিতাক্ষে মেসোমশায় বসিয়া ডাকিত।
আশ্চর্য হইয়া মনোরমা কহিল, “আমরা ত কিছু জানি
না তাই।”

পাকল কহিল, “তিনি কি সে কথা প্রকাশ করবার
মায়ুম। তোমাদের বাড়ীরও কেউ জানত না, আমাদের
সংসারের বা কিছু খরচ সব তিনিই বিহীন, আমার বিশ্বের
সকল খরচই তিনি দিয়েছেন, পরও তিনি ঠিক করেছেন।
পরীষের মেয়ের মত আমার বিয়ে হয় নি, তা ত তুমি দেখেছ—
অন্ধ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল কেউ কিছু জানতেই পারলে
না। পাড়ার পাচকনে বলাবলি করতে লাগল, আমার মার
হয়ত লুকোন টাকা ছিল। অস্ত্র লোকে বা বলুক আশ্রয় ত
আমি। থাক সে কথা, তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা
আছে সব দেখি।”

মনোরমা কহিল, “কি তাই ?”

পাকল কহিল, “তোমার দেখলুম, জামাইবাবু কারবারী
লোক, পরের দাসত্ব করা তাঁর পেশাবে না।”

মনোরমা কহিল, “সুব পেশাবে। বরাবর চাকরীই ত
করে এসেছে, আর না হয় তিন বছর কারবার করছিল।
তা ছাড়া টাকা কোথায় ? তুমিও ত ছিলে তখন, মাথা
বোঁদার কথা ভুললে ত ? কি রকম বিঁদিয়ে বিঁদিয়ে কথা
বললে, আমি কি সে সব কথা এখানে কিছু বলেছি তাই।”

পাকল কহিল, “আমার চোখ কেটে জল বেরিয়ে
আলছিল মহুদি, তাই ত উঠে পেলুম। মেসোমশায় ছিলেন
বেশত, আর তাঁর ছেলে কিনা—কি আর বলব ?”

মনোরমা কহিল, “আমি ঈদিনি তাই, এক কোটা
চোখের জল বেরতে দিই নি। কিছ্র কি করে যে জল চোপে
রেখেছিলাম, তা কপবান জানেন।”

পাকল কহিল, “আমার এখনই বাড়ী ফিরতে হবে,
বিশেষ কাত আছে, আর একদিন আসব তাই মহুদি। বেশ
মহুদি, এই চিঠিখানি তুমি যথেষ্ট নাও, এখনই পড়ে সেখ,
কেনে রেখে নিও না—আমার আসতে বেতী হয়ে গেছে তাই।”

এত বলিয়া মনোরমাকে প্রণাম করিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে কক্ষ
হইতে বাহির হইয়া ঘোঁরে গিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোঁর
সঙ্গে হান ডাং করিল।

গভীর কোঁকরল বনত: মনোরমা তড়াতাড়ি খামখানি
ছিঁড়িয়া দেখিয়া ভিতরের কাগজ টানিয়া বাহির করিল।
এটি ? দুই চক্ষু বিচ্ছারিত করিয়া মনোরমা দেখিল, তিন
খানি হাজার টাকার নোট। সেট সঙ্গে একখানি ছোট
চিঠিও ছিল। কম্পিত হস্তে তাহা সে পড়িতে লাগিল।

চিঠিতে লেখা ছিল,—মহুদি, মাথা বোঁদার কথা আর
বড় আশাত পেরেছি। মাথা যে মেসোমশায়ের ছেলে!
জামাই বাবুর বোকা উদ্ধার করতেই হবে। আমার নিজের
এই তিন হাজার টাকা ছিল, তুমি নিও তাই মহুদি। নিতে
কিছ্র ক’র না, না হয় ধার বসেই নিও। তোমার মেয়ের
দ্বিবার সময় আমার দাখ করে তাকে ঐ টাকার পরমা পড়িয়ে
দিও, তা হ’লেই তোমাদের দার শোধ দেওয়া হবে। ইতি,

তোমার ছোট বোন

পাকল।

আধুনিক চীনের চিত্রকলা

— ব্রিটিশমেন্দু ক্যাল

চিত্রকলার কল্পনা যে তাঁর। তাঁর খাতির করিয়ে, এতটা বার্তা চৈনিক শিল্পের কখনও পোষণ করেন না। অবশ্য সময়ে চিত্রবিনোদনের ভিত্তি করে মতামতের ও নতিসাপেক্ষ কৃতিক। গ্রন্থ করিয়ে, অথবা কলাটিং কেবল সারকারী ধরনের চিত্রকলার নিয়ন্ত্রণ হইতেন। বর্তমানে অগোষ্ঠা শিল্পী পাশ্চাত্য বার্তা শিক্ত হইয়া বহুলাংশে জাতীয়তাবাদ করিতেছেন এবং তাঁরাই তাঁরাই শিল্পকে অর্থকরী করিবার প্রথম অগ্রদূত করিয়াছেন। এইরূপে আধুনিক চীনের চিত্রকলা যৌবন যৌবন প্রাপ্ত। তাৎক্ষণিক নিত্য প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিতেছে। মনে মনে চিত্রকরগণ এই ধারার চিত্রকলার কথা অস্বপ্নের প্রাণে অর্জন করিতে পারুক বা না পারুক, নিজেই প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

অতীত যুগ হইতে চীন চিত্রকলায় সমৃদ্ধ ব্যক্তি অর্জন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আত্ম ও গোষ্ঠী কালের শিক্ষা-নিয়ম শিল্পীদের সনাতন পথ হইতে আধুনিক চৈনিক শিল্প প্রভাবমূলক হইতে পারে নাই। গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে এই সনাতন রীতি ভগ্ন করিয়া বিহীন-পুণের তাই-চীন এবং তাং-ইন্ প্রভৃতি চিত্রকরগণ নতুন ধারার প্রবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ওয়াশিংটনে ফ্রিয়ার-

গ্যালারীতে (Freer Gallery) বসিত তাই-চীনের "ওয়েলিংটন ও হংগাং" শিল্প চিত্রশিল্পী এই নব প্রকার অর্জিত এক অসুখী ভাবের চিত্র। মাস-পুংয়ের প্রভাব হইতে অসুখকাল করিতে সত্যের এক চিত্র চীন-শিল্পে আবির্ভূত হয় নাই বলিলেই হয়।

আমরা বলিয়াছি, বর্তমান চীনের শিল্পধারা পাশ্চাত্য প্রভাবে যুগে প্রভাবান্বিত। এই প্রভাবের উচ্চ বিধান করিতে হইলে প্রাচীন কালের চীনের শিল্প তাৎক্ষণিক ও এই



ফর ও এম।

(শিল্পী-জান হু)

আধুনিক পাশ্চাত্য তাৎক্ষণিক প্রভাবের উচ্চ। অতীত প্রাচীনকে পুনঃপ্রাণিত করিতে হইলে সমস্ত চিত্রকর ও বার্তা শিল্পীদের সত্য বিশেষের প্রয়োজনীয়তা আছে। পাশ্চাত্যের শিল্পধারা অতীতের শিল্পকলাকে আরও সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিতে পারে।



୧୭୧—୬୨ ବର୍ଷ



୧୭୧—୬୨ ବର୍ଷ



୧୭୧—୬୨ ବର୍ଷ

୧୭୧—୬୨ ବର୍ଷ

୧୭୧—୬୨ ବର୍ଷ



জীৱ ও মৃত্যু।



শিল্পী—জান হু

বর্তমানে চীনে যে সকল শিল্পী চিত্রাঙ্কন করিতেছেন, তাঁহাবিগকে চারিটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। অধিক-সংখ্যক চিত্রকর পুণ্যতন পন্থী; ইহারা চিত্রাংকনের দ্বারা এবং কখনও কখনও শক্তিপঞ্জির দ্বারা অল্পপ্রাপিত হইয়া প্রাচীন শিল্পরীতিগণের চিত্রের অঙ্কন করিয়া থাকেন। কখনও কখনও একজন বিজ্ঞানী হয় যটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ইহা চিত্র-কিনোমেনের সহিত অভিন্ন হয়।

এই সমাজতন-কর্মী মঙ্গল প্রদান চিত্র-

কর চিত্র-পাট-সি : ইনি বর্তমানে শিল্প-বহন-বাহন করিতেছেন, চীনে চিত্র-কলাতে ইহাও নাম বিশেষ পরিচিত। প্রাচীন প্রাচীন ইহাও বিখ্যাত স্পর্শ করে আছে। বর্তমানে ইহাও বহন একমুখি বহন হইয়াছে। ইনি পুণ্যতন চিত্র-কর নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। সমসাময়িক শিল্পীগণ ইহাও শিল্পী হইতে সত্যি তুলনা করিয়াছেন; শিল্পী হইতে সত্যি-তার অভাবে সম্পূর্ণ ঐচ্ছান্য-পাত করিতে পারে না যটে, কিন্তু ইহাও স্বাভাবিক হইতে বড় কম নহে। চিত্র-পাট-সি যে প্রাকৃতিক মানা ওবালোতে বিচ্ছিন্ন, সে বিষয়ে বিখ্যাত মনেই নাই। ইহাও অতিত সত্যপ্রাপিত প্রাকৃতিক সত্য-বর্ণনা-বর্ণনা-বর্ণনা 'কল্যাণ-বর্ণনা' পুণ্য-মঙ্গল চিত্র-স্পর্শ প্রাচীন আনন্দে অল্প-প্রাপিত; অধিকার শিল্পী শিল্প-বাহন ইহাও শিল্পী।

স্বা-পা-কিং হিওর শ্রেণীর চিত্রকর-গণের অগ্রণী। কয়েক বহন হইল ইনি চিত্র-বহন পতিত হইয়া আধুনিক চৈনিক



স্বা-পা-কিং হিওর

শিল্পী—হু শিহন

নিরীক্ষণ একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ হাবার্টস্ট্রোম। তাঁদের আবহমানকাল-প্রচলিত শিল্পদশা এখন পরদোষ্টব চরিত্র উদ্ভিষ্টাছিল, তখন ইংল্ট প্রত্যেক মজারিত কবিতা আশ্রয় প্রো কবিতাছিলেন। তাঁদের অমর অবস্থানেব কবিতা বোধ হয় তাঁদের বস্তুমান শিল্পশিল্পাঙ্গণের কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইনি সন্ধ্যা ও ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং স্ব-বাহে এক কলাভবন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানে প্রাচীন শিল্পকলাগণের চিত্রাবলীর অঙ্কনদ্বারা ছায়াপথ শিল্প-শিল্প কবিতা থাকেন। এইকালে ইনি অতীত ও বর্তমান

উভাবের পক্ষে একেবারেই অসম্মত; হুতরাং পুণ্ডিতন যাত্রা-যাত্রা অধিক চিত্র আধুনিক বটে চিত্রিত চরিত্র কলে পুণ্ডিতন চিত্রের সচেতন এই নবীন শিল্পের সাদৃশ্য একেবারেই নাই বলিলে চলে।

তৃতীয় শ্রেণির চিত্রকরগণ আধুনিক প্রাচীন চিত্র-কৌশল অনেকাংশে আশ্রয় করিয়াছেন। এই সকল চিত্রের মধ্যে পাক্কাতা কৌশল থাকিলেও নিপুণতায় ঘুণেই অভাব। পাক্কাতা নমুনাচিত্রও চীন চিত্রকরগণ অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত নীরস ও ভাবশূন্য।



সান্স-ল্যান্ড।

লিউ-সু তৃতীয় শ্রেণির একজন বিখ্যাত চিত্রকর। তাঁহার সকল গুলিই তৈল-চিত্র,—পাক্কাতা প্রথায় অধিক। সকল-গুলিরই পাক্কাতে এক অস্পষ্ট বাস্তবতা ও বিখ্যাতগণের কাল ছুটিয়া উঠি-তেছে। ১৯০২ সালের চীন-জাপান-সংঘর্ষের চিত্রও তিনি অধিকতর করিয়া-ছেন। এই বাস্তবতার স্পষ্ট ইতিপূর্বে কখনও নৃষ্টিগোচর হয় নাই। চীন-চাক-শিল্পে এই বাস্তবতার প্রভাব প্রথম পরি-লক্ষিত হইল।

বর্তমানে জাপানিদের দু শিরদাঁ এই তৃতীয় শ্রেণির শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। ইনি জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত করিয়াছেন, ইংরাজ

[শিল্পী - লি হু]

অধিক তৈলচিত্রগুলি বিশেষজ্ঞগণের বিশিষ্ট প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে ইনি পাক্কাতা প্রোভাব হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁদের অতীত ধর্মের শিল্প-সাধনার খাতিয় চিত্রাঙ্কন করিতেছেন। এই চিত্রাবলীর পরিবর্তনীয়ও তিনি আগমন করিয়া ও চিত্রাঙ্কনা সংযোজিত করিয়াছেন।

কো-কি-কোং এই শ্রেণির একজন বিশিষ্ট শিল্পী। জীব-জগতের (material world) চিত্রাবলীর অন্তর্গত এবং যে কোন অননুভূত আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রাবাহিত হয়, তাঁহার অভাব পাক্কাতা শিল্পে অনুভব করিয়া তিনি অক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি উষা, গোপলি, জ্যোতিষ্ক

কালের চিত্রাঙ্কন-বিধির একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। ইংরাজ-শ্রেণির সকলেই চিত্র-বিজ্ঞান পারদর্শী হইয়াছেন ও হইতেছেন। ইংরাজ মহোদয় শ্রীযুক্ত ওয়াং-ও একজন লক্ষ্যপ্রতি শিল্পী। ইংরাজ উভয়ে পাক্কাতা খাতিয় শিল্পিত চরিত্র এবং পুণ্ডিতন জাতীয় খাতিয় একেবারেই বিস্তৃত হন নাই।

চীনের নিম্ন প্রাচীর চিত্রাঙ্কন কল্পিত হইলে এই শ্রেণিরই সর্বোচ্চ কাল হইতে প্রচলিত বহুগুণ বাহ্যিক কল্প উচিত বলিয়া সাধারণে পরিগণিত হয়; কিন্তু এই খাতিয় বহু অত্যন্ত দুস্তাণ্ড ও গুপ্তা। সাধারণ চিত্রকরগণ উহা সাধারণ কল্পিত পারেন না, কেন না উহা তাঁহাদের পক্ষে ভয়ানক ব্যয়সাধ্য। অতীত চিত্রাঙ্কনের উপযোগী বহু সংগ্রহ করা

পুত্রাবলী ও সন্তান-সমাগমে গৃহান্তিমুখে আস্ত পক্ষিনলের
চিত্র অঙ্কন করিতে ভালবাসেন। ইহার পরিকল্পনা অখ্যাত
আবশ্যতার লব্ধ।

চতুর্থ ধরনের আধুনিক শিল্পীগণ কদম্ব
আদর্শে ‘অল্প প্রাপ্তি, উদাহরের চিত্রাবলী
অধিকাংশই কোন না কোন রাষ্ট্রনৈতিক
উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিবার জন্য অঙ্কিত।
উদাহরের অঙ্কিত ‘কাটুন’ চিত্রের
লক্ষ্যই অধিক; বিজ্ঞানসম্মত চিত্রের
কাব্যমাত্রা ইহারা বিশেষভাবে আকর্ষিত
করিয়াছেন। ইতিপূর্বে চাত্রলক্ষ্যক
কটন্যব অস্তিত্বের পরিচয় চিত্রাঙ্কন করি-
বার প্রথা চীনে এককাল অজ্ঞাত ছিল
বলিলেই চলে।

বর্তমান চীনের চিত্রকলা বিখ্যাত
কটন্যব শিল্প-বিবেচনা (Daggy Car-
er) সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন :

Chinese painting to-day, far
from resembling a corpse is
more like a newborn babe. It
is as difficult to predict the future
of Chinese painting as it is to
tell the child's future, but in the
light of history—and in no other
country has history repeated
itself as it has in China—we
must believe that Chinese paint-
ing is entering on a new era, an
era that holds great promises
for the future.

—অর্থাৎ, চীনেসের বর্তমান চিত্র-
কলাকে কোনক্রমেই মৃত শবের সম্বন্ধে
তুলনা করা চলে না, বরং উৎকর্ষে নব-
জাত শিশুই বলিতে হইবে। এই চিত্র-
কলা সম্বন্ধে কোনও কবিদ্ব্যর্থী শ্রদ্ধা কোনও শিল্প সম্বন্ধে
কবিদ্ব্যর্থী কথার মতই স্বকটিন। কিন্তু ইতিহাসের দিক হইতে

দর্শিলে—এখানে মনে প্রাপ্তিই চলে, পৃথিবীতে অজীত ইতি-
হাসের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চীনেসে দেখা হইয়াছে, একশ
আর কোথাও নয়—আমাদের দৃষ্টি নিবারণ করিতেই হইবে



দর্শ।

[শিল্পী—জ় শিল্প

বে, চীনেসে চিত্রকলায় দেখে নূতন যুগ খুলিয়া হইয়াছে এবং
এই যুগের চরিত্র উজ্জ্বল।

[১]

জীহ্বার চেহারাটা কট-খুঁট ছিল না, স্বর্ণও ছিল না—নাফানাকি। তিনি চেপাও ছিলেন না, পাটও ছিলেন না—মাল সই। গানের রং ফসাঁও নয়, কাদও নয়—অর্থাৎ থাকে বর্ষা উজ্জল-প্রাণ স্বর্ণ—তাই। মাঝার সব চুলেই শাক ধবে নাই, অথচ সবই যে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নয়—কাঁচা-পাকা মিশ্র। পিতার তিনি কোষ্ঠ পুষ্টও করেন, কনিষ্ঠও করেন—তিনিই নয়। নাম জীহ্বা—প্রাণচরণ।

দেশের অধিকাংশেরই এবং জীহ্বার কলিকাতার অধিকার সকলেরই তিনি প্রাণবান। হ'ন। পুণ্য নাম জীহ্বা—প্রাণচরণ। জীহ্বা বৈদ্য।

কাটোয়া হইতে জেগে সেতু পশ্চিম রতনপুরে জীহ্বার বাড়ী। দেশে বৃহ পিতা, দী, ছোট ভাই গৌর, নিজের ছ' একটা শিশু পুত্র-কন্যা এবং ১২ বড় ভাইদের একমাত্র পুত্র শত্রুজয়—এই কলকাতা থাকেন। তিনি নিজ কলিকাতার চাকরী করেন এবং গৌরবাদের এক সেল থাকেন। শত্রুজয় বয়সে এক ছোটবেলা থাকিবা পড়াশুনা করে। প্রতি পরিবার ভাঙা হইতে সত্তা তিনটার কাটোয়া-লোক্যালে চাপিয়া প্রাণ না' পকার পুণি কাটোয়ার টেনে নানেন এবং পাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসেন। জীহ্বার সোমবার উভয় মেয়ে—শত্রু কাটোয়ার এবং প্রাণ না' কলিকাতা। 'জীহ্বা পনের বয়সে ঘরিতা এইরূপ পতিত হই প্রাণ না' জীহ্বার দিন জগি কাটোয়া আসিতেছে। জীহ্বার কর্মজীবনের এই এক-ধরে গতির আর বিঘ্ন নাই, বৈচিত্র্য নাই, পরিবর্তন নাই।

কিন্তু সম্ভ্রান্ত একটুখানি বিচিত্রতা আদিতাছে। কনিষ্ঠ সন্তান সৌর গুরুকে কলকাতার দিবা।

বিবাহ হইতেছে কালীঘাট বনোবনপুরে রোডে। প্রাণ-কাটোয়া আসিতে। ভাইয়েরা থাকেন—লেক-রোড অকলে রাজা বসন্ত রায় রোডে। জীহ্বার বাবাট এই বিবাহের যোগাযোগ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। বিবাহের কথাবার্তা সবই পাকা-পাকি হইয়া গিয়াছে। জীহ্বা কলকাতা পিতা ছেলেকে পাকা

দেখিতে যাইবেন। বাবু হইয়াছে, কাটোয়া লোক্যালে পরিবার কত জীহ্বা পুণি হইতে হাওড়ার টেনে আনিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন। প্রাণ না' সাংঘের কাছ হইতে একটু সকাল সকাল ছুটি লইয়া জীহ্বার সহিত মিলিত হইবেন এবং জীহ্বার হইয়া যেনে যাইবেন। তথায় গিয়ে থাকিবা পরিবার প্রাণে জীহ্বা কলিকাতার ভিত্তি আদিতেন।

বেলা বাজটার সময় টার্মিন কোম্পানির ক্রিয়ারিং ডিপার্ট-মেন্টের একখানি চেয়ারে বসিয়া প্রাণ না' এই বিবাহের কথাই কহিতেছিলেন।—'কি করা যায়? জীহ্বার পাকা বেপার কাকটা ছুকে গেলেই একটা মত হাসানো বিটে যায়। বিয়ের দিনের ভাবনা বড় একটা নেই, বসন্ত রায় রোড থেকেই বয়সগমন হবে। সে দিনের মে-সবের তার মেনে আয়-রাখেশের ওপর।' জীহ্বার কলিকাতা ওরা ছ' ভাই গোহায়ে এখন। তারপর দেশের বাড়ীতে বো-কাটের আয়োজন। সেইটেই শুকতর ব্যাপার।'—জীহ্বার হাতে কলম, সামনে, টেবিলের উপর একখানি হিসাবের কাগজ এবং কাগে একটা পেনসিল। টাকা-আনা-পাইয়ের একটা হিসাব তিনি ঠিক দিতে বলিয়াছিলেন। ঠিক দিলে উহা ৪১২২১/৮ পাই হইবার কথা। কিন্তু প্রাণ না' জীহ্বা তিনবার উহা ঠিক দিয়াছেন, কোন বাগই নিলিতেছে না; একবার হইয়াছে—১০৩২১৮/৮ পাই, জীহ্বার পরের বার হয় ৩২২১৮/৮ পাই এবং শেষ বার হইয়াছে ৪২২১৮/৮ পাই। অপরূপ তিনি কাগে পেনসিল ভাঙিয়া কাগজখানি টেবিলের উপর কেলিয়া রাখিয়া, আঁজিকার পাকা-বেপার বাবু ও আয়োজনের কথা বলিয়া বলিয়া একান্ত মনে চিন্তা করিতেছিলেন।—'বেলা ত একটা বাজে। আঁজিক থেকে অন্তত দুটো কি আড়াইটার সময় থেকেই হবে। দুটা পেলে হয়। দুটা বেদন করে হোক গেতেই হবে।'—জীহ্বা হিসেবটাও ত কিছুতেই মেলাতে পারলেন না। জীহ্বা ও আর হিসেবও না। চুলোয় থাক যোড়ার ভিনের হিসেব।'

ਭ੍ਰੰ: 1 ਸਾਫ਼ ਰਾਗੀ: ਸ਼ਾਮਲ: ।

একটা বাবু ব্যতঃ হইয়া গ্রাম বা'র পাশে আসিয়া
 থকিয়াছিল। গ্রাম বা' তাহার কুণ্ঠের নিকে তাকাইয়া করিলেন—
 “কি? নিতে এসেছ? বেলাতে পাঞ্জি না তাই। পত্রাটো
 দাও, জান বিধু বাবু, যেন কেমন-কেমন কছে। মাথাটা
 বৃহৎ, দুটো খেতে-খেতে বড়-বড় করে উঠছে। লাদেব
 কি এখন চাইছে নাকি?”

“হ্যাঁ। সাহেব বলছে, ওটা হয়ে গেলে ‘ইনভেস্ট’ শুণো
আজই সেবে ফেলতে হবে।”

‘‘তাম দা’’ শ্রবণ পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন—‘‘দেবে
 ফেগছি এই। একটা ত বাজে। ছুটী ত সেবেই না—বোকা
 বাজে,—ভূতরাং।’’ গৌ—ও—ও—ও—ও। ‘‘তাম দা’’
 বিবীলিত ভক্কে অজ্ঞান হইয়া চোখের চণিরা পড়িলেন।
 দোহিত্তে বেশিত্ত ‘‘গৌ-গৌ’’-র ত্য্যাক বুদ্ধি এবং পরক্ষণেই—
 ধপদ! চোয়ারত্ত ‘‘তাম দা’’ কোরে উপর টিকরাইয়া
 পড়িলেন।

তখন পিণাটমেন্টের সকলে ছুটিয়া আসিল। হৃদয়ল
বাণীর। প্রায় বাঁকে বিরিজা চাহিষিকে তড়িৎ গমিয়া
গেল। কেহ বলিল—‘ফিট’, কেহ বলিল—‘বুদি’, কেহ বলিল
‘ডাইব্বেল’। বখাশসমূহ সকলে মিলিয়া সেবা-পুত্রা করিতে
লাগিলেন। বাস্তবিকতঃ তল আসিয়া পড়িল, মঙ্গলবাসনের
গোটা আসিল, পাখা আসিল। তারপর প্রায় অর্ধ ঘণ্টা
পরে যখন প্রায় বাঁক জাবের সফর হইল, তখন আসিল—
উপর উপর দুই কাণ পর্বত ৬৪ আর সাফেয়ার ঘন্ট—
‘একবার টাঙ্গি ডাকিয়া প্রায় বাঁকে উবার যেতে পৌছাইয়া
যেওরা হোক।’

হাওয়ার খেপে কড়া-কড়াই হাতির ছিলেন। ত্রান বা'র
খামোড়া ভাই রাধেণ তাঁহাদের দহিত আশিরাহিল। ত্রান বা'
তাহাকে চুপি চুপি অনেক কিছু বলিয়া শ্বেকালে করিলেন—
‘ঐ বুড়িহু না খাটালে আজ সকাল সকাল ছুটও পেতুম না,
জানতও পারতুম না। ঐ দিবের কানের নীচেই একটু
কেটে গেছে।’ বলিয়া কানের নীচে সেই স্থানটিতে হ'
একদা হাত দিলেন।

বাবেশ সত্যাক হটেয়া ক্রায় বা'ন মুখের দিকে একদৃষ্টে
চাহিয়া রহিল ।

121

রাজা বলজ্য রাণি গৌড়ে, রাণেশ দা'র গৃহে 'অশপাণ্ড' বেলান
 ঠেঠক বসিরাছিল ।

আজ তথিবার। বুধবার গোবের বিবাহ। সেদিন এইখান হুইতেই বর ও বরষাঙ্গীরা ঘাইবে। অথো আর হুইটী দিন মাত্র বাকী। আজ প্রাতে প্রান বা'র এখানে আদিবার কথা ছিল। অবেক কিছু বাসস্থা-বন্দোবস্তের স্বরকার। কিন্তু প্রান বা'র আজ সমস্ত দিনের মধ্যে দেখা নাই। বাথেন, তাহার কোঠা জাতা সোবেশ, বাড়ীর মেরেয়া সকলদেই সমস্ত দিন খরিয়া প্রান বা'র এ বাড়ীতে আদিবার অপেক্ষার ছিল। কিন্তু প্রান বা'র আসেন নাই। হুপুর বেলা যৌবাঝারে তাঁহার মেলে লোক পাঠান হইয়াছিল, সে লোক প্রান বা'কে খুঁজিয়া পাঠ নাই। মেসের লোকজন কেহ কোন সংবাদ বলিতে পারে নাই। মেসের একটা রত্নলোককে প্রান বা' বেয়াই বলিয়া ডাকিতেন। সেই রত্নলোকটা শুধু বলিয়াছেন— 'বেয়াই, হঠাৎ লোটা-চিনুটে নিরে, গেকবা পরে বিস্ময় হয়ে গেছে।' সে লোকটা প্রান বা'র শোকে দিয়াছিল, সে একঝারে গো-বেচাৰী এবং অভ্যস্ত দরল প্রকৃতির লোক। হরত ইহা বেয়াইয়ের তানাসা হইতে পারে, কিন্তু সে তা' না খুঁজা কথাটাকে এম দতা বলিয়াই খুঁজিয়াছিল এবং এ-বাকীতে কিরিয়া সেইরূপই বলিয়াছিল। তাহা শুনিয়া সকলের মধ্যে তখন একটা হাসির গোল পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঘাই হোক—'প্রান বা' আজ এলেন না কেন এবং দেখেনই বা কোথায়? কালের যে আর অস্ত নাই। প্রান বা' না এলে যে কিছুই হবে না।'

কামেশ্বর স্ত্রী সোমেশ্বর স্ত্রী কামে হুগি হুগি কহিল--
 "লভু বা কলমে দিদি, স্ব স্ব সত্যিই তাই হবে। ভাস্কর
 ঠাকুরের ও চিরকালই এই রকম ভাব, মানুষগুলো দেখলে
 একবারে--"

বাণা বিয়া বড়বুর্জীসেন—“তুই কি কেপেছিল ছোট-
বৌ ?”

ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପାଦନା ସୁଧେଶ ଦିକେ ଘାଣ୍ଟିବା କହିଲେ — “ଆମି
ନା ହେଉ ଆମ ଏକତାର ଠାରୁ ବେଶେ ମିଶେ ମୋଡ଼ କରେ ଆମି ।”

ভাৱে বোঝিদি বলিলেন—“ঠাকুৰপোৱাৰ কথা শোন
একবাৰ। মন্ত্ৰ গিৱে দেখে-জনে এল, আঁবাৰ তুমি গিৱে।

সেখানে নতুন করে কি সন্ধান আনবে? তার 'মাথার ঘণ্টে কুহুর পাগল'। যেসে থাকলে সে সকাল-বেলাতেই ছুটে আসতো।"

রাধেশ্বর শ্রী তাহার বড় মাথের কাণে কাণে কহিল—
"একবার মানাহরপুকুরে বেছেলের বাড়ী বংব নিলে ওহ না, ওখানে এসেছিলেন কিনা, কিংবা ওদের কোন খবর-টবর পাঠিয়েছেন কিনা।"

সোমেশ কহিলেন—"কাল সাধেবের কাছ থেকে তাঁর ছুটি মেথার কথা ছিল। এক হস্তার ছুটি নিজেছেন নিশ্চয়। ওহ ত ছুটি পেয়ে বো করে একবার বাড়ী চলে গেছেন। কিন্তু তা পেলেও আত তাঁর এখনে কিংবা আশা উচিত 'চল'।"

সত্বে এতক্ষণ একবারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে কহিল, "মেসের চন্দ্রলোকটি কিন্তু 'হাসলা-টামলা' করে বলেন নিক। 'স্রাম দা' বিবাহি হয়েই ওহ ত কোথা চলে গেছেন।"

"তাঁর মাথা ধোকেছে" বলিয়া বড়বু উঠিয়া দিয়া হোয়াকর নীচে বর্কমাখ পানের শিক কেলিয়া আসিয়া বসিলেন।

সেই সময়ে পাশের বাড়ী হইতে নন্দবাবুসের ঢাকর আসিয়া কহিল—"টেলিকোনে আপনাদের কে ডাকছেন।" নন্দবাবুর বাড়ীর টেলিকোনে ইহাদের অনেক সময় অনেক কাক হইত। রাধেশ তাক্কাহাতি উঠিয়া নন্দবাবুর বাড়িরের দর পিয়া প্রবেশ করিল।

"হায়ো!"

"হালো। তুমি কে?"

"আমি রাধেশ। —স্রাম দা' নাকি? কি বংব?"

"কবার ভেড-!"

রাধেশ ঔৎকটিকা উঠিল। টেলিকোনের ত্রিসিভারটা তাহার হাত হইতে বসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

"শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে বাড়ী গিয়েছিলাম। এই কিংবি। সব বাড়ী থেকে, আমি এখন বাড়ি।"

অধবট্টা তিন কোয়ার্টারের মধ্যে স্রাম দা' এ-বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের সিমধ ভাব আরও বাড়িয়া উঠিল। রাধেশ তাহার পিসেমহাশয়কে পূব

ভালবাসিত। অত্র-ছল-ছল ঢকে সে জিজ্ঞাসা করিল—
"হঠাৎ কি অম্ভটা হোল?"

"শোন না। একহস্তার ছুটির জন্তে বংবাত লিখে সাধেবকে দেবার জন্তে প্রচাষবার তার দরদর দরদর সামনে গেলুম। বাইরে বাড়িরে কাণ পেতে শুনলুম—সাধেবের মেথাক একবারে ওড়া পড়ায়। বোম্বের মেথের সঙ্গে কড়া-কড়া বংব এসেছে। বড়বাবুকে পদাত ধমক-ধমক একবারে অস্থির। আমি দেখলুম, পড়িক ব্যাপার; ছুটি পাবার আশা মোটেই আর নেই। 'হটা-১১'তে চলে গেলুম একবারে কাটোয়া।"

রাধেশের অস্ত্র-রল হইতে বেদনাকর একটি ঘর্ষণাল ঘরে ঘরে বাহির হইল।

"একবারে শ'জের রেটেলে গিয়ে উঠলুম। তখন টেলিগ্রামের 'করদ্' একথানা যোগাড় করে তাকে দিয়ে লেখালুম—'কাণ্ডার এম্মপার্বত, কাম্ হ্যাট ওয়াল'। কাল সকালেই ছাড়তে বলে দিয়ে এসেছি। কাল ১১টার অফিসে গিয়েই পাব এখন। এইবার ছুটি কেমন না হর দেখি।"

সকলের মুখ একসঙ্গে স্রাম দা'র মুখের দিকে করিল। রাধেশ চোয়ার হইতে উঠিয়া পাড়াইয়া কহিল—"উঃ! তা চলে ১১০০?" রাধেশের নাকী বেন আবার খাচে আসিল।

সোমেশ হতভবের মত হইয়া গিয়াছিলেন। এতক্ষণ নির্দাক হইয়া থাকিবার পর এইবার লম্বা ঘো-হো করিয়া হানিয়া উঠিলেন। বৃৎব বৃৎ কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে এ-ঘর হইতে পালাইয়া গেলেন। সত্বে লুটো-পুটি খাইতে খাইতে তত্তব্যপ হইতে নীচে পড়িয়া পেল। আর স্রাম দা' সকলকে একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মাঃ, হচ্ছে কি? য়াপারটা সব শোন একবার।"

[৩]

তত্তকর্ণ গজ কল্য হ্রস্পার হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ গজ-কল্য বৃথায়, অতীর্ষি ভিথি এবং রোহিণী নক্ষত্রের তত্তকর্ণে তত্তকর্ণে স্রাম দা'র কনিষ্ঠ সৌর গ্রহকে কিংবদন্তে তত্ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ প্রাতে বং-বু লইয়া স্রাম দা' ঘরে বাইরেন। কাল সেখানকার হাটের দিন, স্রাম দা' কাল বো-ভাতের হাট-বাজার করিবেন। তাহার পর শনিবার সেখানে বো-ভাতের বিপুল আয়োজন।

সময়ব্যাপী হঠাৎ শনিবার পর্যন্ত পাঁচদিনের ছুটি শ্রাম দা'ব সম্বন্ধে হইয়া গিয়াছিল। এত সম্বন্ধে হওয়ায় গোড়াই হ'ত একটা ছোট কথা আছে। শনিবার দুটির দশপাশ্চাত্য শ্রাম দা'ব সাধারণত দিতে গিয়া বন্দন তাঁহার মিলিটারী মেজাজ দেখিয়া ক্রিয়মাণ আদিয়াছিলেন, তখন যে তিনি অল্পমান করিয়াছিলেন যে, নিম্নের গৃহে 'আজ মেঘ-সাহেবের সহিত কণ্ঠা হইয়াছে, হয় ত তাঁহার সেই অনুমান সত্যই এবং এ অল্পমানও হয় ত সত্য যে, সেই কণ্ঠা পরদিন রবিবার আগেবে বিটগা যায় এবং তাহার ফল সোমবার বন্দন সাহেব আড়িসে আসেন, তখন তাঁহার সুশ্রাব্য প্রকৃতি এবং হাসিভরা এবং বেগুণ ওঁহার অসম্ভব রূপ বিলম্বিত। আশিরাটে তিনি শ্রাম দা'কে ডাক দেন এবং শ্রাম দা' আসিলে তিনি বলেন—“শ্রামচরণ সেদিন তোমার কীট হোইয়াছিলো—তোমার মাস্তি তারি উইক্ আছে, ইনি 'তাল ভট্টর ডেখাইয়া একটা টমিক লুন্ড খাও, উঁহার ডাম হারি তোমাকে ভিহে জেবে!”

শ্রাম দা' তখন বাবিত্তেছিলেন—“টেলিগ্রামখানা এখনো আসছে না কেন, এই সময় এসেই ভাল হোতো।’

সাহেব কহিলেন—“ইনি এখন চীতে চীতে আফুটে আফুটে কাজ করিবে। হারি হারিগকে বলিয়া জেবে তোমার খুব কম কাজ ছিটে।”

হরি! হরি! শ্রাম দা'র টেলিগ্রাক আদিয়া হাতির। টেলিগ্রাক পড়িয়া শ্রাম দা' সাহেবের সম্বন্ধে মেজের উপর থপাল করিয়া বলিয়া পড়িলেন। তবে অজান হইয়া পড়িলেন না। কতক জ্ঞান, কতক অজ্ঞান, এইরূপ ভাব। হাত হইতে টেলিগ্রাম খানা বসিয়া পড়িল। সাহেব তাহা তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন:—

Father Expired Come Sharp

Goor.

সাহেব 'সামবার বাকো শ্রাম দা'কে কহিলেন—“শ্রামচরণ, ইনি এখন টোলিয়া যাও, তুমি ডিম তোমার Special Man হইল। চিঠি করিও না, ভোণোবান তোমার সহায়তা কোমিবেন।”

পিতৃ-কৃত্য-সংঘর্ষে ব্যর্থবোনাতি কাতর ও বিচলিত হইয়া শ্রাম দা' তৎকণ্ঠে আকিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় ওখানেই তাঁহার কাটিয়াছে। এই দিন

দিন শ্রাম দা' বসেন ভিতরই বিন্যাস আবিষ্কৃত হইয়া আসেন। একটীকানব শব্দে পাণ্ডিগ জন বাট। তি কানি ঘরি অকিলেন কাহোতো পড়িত বৈধাং তেমা চটয়া যায়। পদ পতের কথা, এই কথানি তিনি লেঠকথানার পর্যন্ত বসেন নাট, যদি অ-বাহিত কেহ আসিয়া পড়ে। শুধু কাল বরাহুগমনের সময় তাঁহাকে গুণ্যভ্যন্তর ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তবে তখন ত্রিাকাল, আর সময় এবং সোজা তাক্তা বলা সোজা বিদ্যা বর না লইয়া গিয়া, তিনি একটু খুঁটিয়া অশ্বরের তাক্তা খরিয়া বহোহরপুত্ৰর সোজে খাটবার নানত্বা করিয়াছিলেন।

তরশর নিয়ের কাণা নির্মিগায়েই হুস্পার হইয়া যায়। কেবল একটু গোল গদিয়াছিল, ছোট ছোট করেকটা বন ও কতাবাখীতের মধ্যে। সোমণ ও সোবেশের পুন্ড কর্তী অর্থাৎ শাবু, ফাণ্ড, ডাবু, বাবু ও বাবু বরগাখী হইয়া আদিয়াছিল। কতাবাখীত একটা ক্ষুদ্র বেতিবেট আদিয়া তাহাদের করজকে বিরিয়া কেলিয়াছিল এবং তাহার পরই তাগাদের গুণগণ নিম্পণ:—

“তোমার নাম কি ভাই?”

“আমার নাম তাবু।”

“তাবু? আমার নাম গাবু। কোন্ রূপে পড় তানাত?”

“ক্লান্ত হু-তে।”

“আজ্ঞা বল দেখি, কোন্ ভিনিগটা কাউলে বাড়ে।”

তাবু কাল্ কাল্ করিয়া চাহিয়া তহিল। তহানক আগ্রহত হইবার উপক্রম। শাবু তাবুকে রক্ক করিতে একটু এখিক সুরিয়া আদিয়া বলিয়াই তহিল—“কোন্ ভিনিগটা কাউলে বাড়ে? তোমার নাক কাণ কেটে দেখ, সঙ্গে সঙ্গেই খেড়ে বাবে। নিজে না পাত, ছুরি নিয়ে এস, আমরা কেটে দেখিবে দি।”

উত্তর তহিয়া ও-বসের ছেলোটা একটু হুঁড়িয়া গেল। তখন কাবু তাহার সিকের পাঞ্জায়ের বুক-পকেট হইতে ফুল-তোলা ক্রমালখানা লইয়া সুখখানা একবার হুঁড়িয়া লইবার পর ও-বলকে প্রের তহিল—“আজ্ঞা, এইবার তোমরা বল দেখি—

“How many elephants can stand upon the needle-point?”

এমন সময় আধোরেখ ডাক আদিগ। সে ডাকেন্দে বজায় হুঁচও আদিয়া গেল, হাতীও আদিয়া গেল।

ভাষার পল বিপের কোন ঘটনা হবে তেই মাই।

আজ সাতটা ঘণ্টা না? বস বস! লক্ষ্যে দেখে বসিয়েন, সেট
একটা মন্ত ঘটনা। রাশেলকে কহিলেন—“তোমাকে সঙ্গে
নেতে হবে! আর বৌমানের নিয়ে সোমেশ না তব কাল
গাবেন্দ্র না।”

রাশেল কহিল—“হাট হবে।”

“আজ একটা কথা! এখন থেকে বেকরে সেখানি ১০টা
হেতে পারে। গাড়ী চড়ে বসি এগারটা? আচ্ছা, কোন
পথ দিয়ে হেলেনে যাবে?”

“বরাবর রাসা বোড দিয়ে, তারপর চৌরসী, ড্যানহাউসী,
আপনাম আকিসের সামনে—

“ওহে বাবা যে!” লাক্ষ্মীমা উঠিয়া ক্রাম দা’ বলিলেন—
“ওহে বাবা যে! তুমি কি আমাকে ‘ওহে মজাতে’ চাও
নাকি? অকিসের সামনে দিয়ে বাই আর সব আমাকে
বেগতে পাক, শেষকালে সাহেবের কানে উঠুক! সে হবে
না; গাড়ী গুলির নিয়ে যেতে হবে।”

“বেশ তাই হবে। কোথা দিয়ে যাওয়া হবে, বসুন।”

একটু ভাবিয়া ক্রাম দা’ বলিলেন—“আচ্ছা, লাক্ষ্মীমা!
বেল শিয়ালদহ ছাড়ে কখন?”

ক্রাম কথাকে ভুলিয়া রাশেল কহিল—“তোমার মাথা কি
গায়াপ গেল ক্রাম দা’? যাবে তুমি বাঙাল হোয়ে কাটোয়া,
তুমি ট. বি. আরের নৈমিত্তিক গুর—”

“আবে, ঘুরি কি সাথে! কেউ দেখে কেমনে যে মজা
বিপদ! তুমি বৃদ্ধ না কায়। চল-ভীষণ দলদলকে
একপাশেই করা কোয়েছে, হুতরাং—”

“হুতরাং বা কতবার সে আমি করব, এখন তোমার
ও-সব চিন্তার দরকার নেই।”

ক্রামদা’র চিন্তা অতঃপর বাহিরে ছুটিয়া বাহির না
হইলেও ভিতরে তাহা কমিয়া গিয়াছিল।

বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় ঔষানের ট্যান্ডিখানা
বন্দ গড়ের মাঠের ভিতর দিয়া, হাইকোর্টের বন্দ পথ ধরিয়া
গদার ঘাটে ট্রাও ব্রোডে আসিয়া পড়িল, তখন ক্রাম দা’র
মস্তকিত ভাব। ঔষানের আদলের পিছনকার কটক—ঐ
সামনে! রাশেলের হবে, বৃদ্ধ আর কিছু প্রকাশ করিতে
পারেন না। অন্য গাড়ী টার্মিনাল কোম্পানীর আকিসের

পিছনকার দটেকের কাছে আসিয়া পড়িল। ক্রাম দা’ মনে
মনে বলিলেন—“আজ আবাব ঘোড়ার ডিম—‘মেল ডে’!
ঐ বে! বড় মিথিরা গাড়িরে গাড়িরে দিগারেট থাকে!
লবনাশ! বেটা যে আমার পরম পত্নী! বেগতে পেলে
নাকি?” তিনি ভাড়াভাড়ি গায়েব চাষরখানা পুলিয়া তদ্বারা
মাথা ও বৃদ্ধ চাকিয়া ফেলিলেন। রাশেল কহিল—“এ কী
ক্রাম দা’?” ক্রাম দা’ কহিলেন—“চূপ কর তাই, বিপদ যে
কত, তা তুমি বুঝবে না। Fifteen years-এর service,
—বৃদ্ধ না?”

রাশেল আর কিছু না বলিয়া একটু হাসিল, কিন্তুও
মনে মনে বোধ হয় একটু হাসিল। নব-বয়সী হাসিল কি না,
ভাষার এক-গলা ঘোমটায় আঁড়ালে তাহা আর দেখা গেল
না।

[৪]

বাঙাল টেলন।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে।

কাটোয়ার গাড়ী ১টা ৩২এ ছাড়িলে। ক্রাম দা’ বলিলেন
—“রাশেল।”

“কি বলছ?”

“না—ধাক্কা।”

“ধাক্কা কেন—বল না।”

“বলছি কি, বাড়ী গিয়ে পৌছতে পারলে বাঁচা যায়।”

“হ্যাঁ।”

“বেশ, রাশেল?”

—“বলি, ‘অ ক্রাম দা’—ক্রাম দা’!” ও বিস্ফোরিত প্রাণ-
দরবে কতকগুলি ভক্তগোত্র বলিয়া ছিলেন, ঔষানেরই মজা
হইতে কেহ উৎসাহেরে ক্রাম দা’কে ডাকিতে মান্দিলেন।

“ক্রামদা’ ওরতে পাছ না? ‘অ ক্রামদা’?”

ক্রাম দা’ নীরব, নিশ্চল, নির্জিকার। মুখখানাকে
অসম্ভবরূপ বিকৃত করিয়া পিছন কিরিয়া বসিয়া রহিলেন।
রাশেল কহিল—“গাড়ী যাও না ক্রাম দা’।” ক্রাম দা’ ক’কি
দিয়া কহিলেন—“তুমি চূপ কর, রাশেল। লক্ষ্মীছাড়ীকে
বল দেখি? তুমি ওরিকে আর চেও না।”

পুনঃবার চীৎকার—“বাড়ী যাওয়া চড়ে না কি, ‘অ ক্রামদা’?
নিরে কার চোখো?”

রাগেশ করিল—“গাড়া বাও, জাম বা’; তোমার কোন ভয় নেই।”

“কে জাম বা’! জাম বা’ কাম্ বা’, এখানে কেউ নেই বাবা! উঃ! এখানে পঞ্চাত্ত—। মাঃ,—Father expired নিয়ে একটা বিশব না খুঁট আর ধাব না বেগছি। ছোড়ার ভিমের চাকরী এবার না হয় ছেড়েই দেবো। ৩০ বিয়ে করী ত আছে তাগে বেওয়া। চাব-বাসই লাগিয়ে দেবো। এতেও ত ভাল-ভাতের বেশী কিছু চাব না, তা’তেও ভাল-ভাত চুটী গোয়ে যাবে’খন। বসঃ এই তব তব, উষেণ আর খোলাখীর হাত থেকে বাঁচা যাবে।”

৩-প্রাণটকবের ভ্রলোককীর কিম্ব ‘অমীম বৈরা’। এবার গাড়াইয়া উঠিয়া চাবকার ব্রু করিল—“জাম বা’ কি কালা হোল, না, চিনতে পাছ না?”

জাম বা’ এবার বরিয় হইয়া উঠিলেন। একেবারে মোতা গাড়াইয়া উঠিয়া, ভ্রলোককীর দিকে কিরিয়া উঠ কর্তে করিলেন—“এই, ছোট ভাইয়ের পে দিবে বস-কনে নিয়ে বেগে যাচ্ছি। Father expired বলে দিন মশেকের ছুটী নিয়েছি। জাম ঈগুণবত চাকরীর মাধ্যম তিনটে লাগি যেরে, চাব-বাসের ব্যবস্থাটাই করব। জুড়ি ভাল আছে ত? বাওয়া হ’চ্ছে কোথায়?”

লোককী সব কথাগুলোয় নামে বৃথিতে পাইব না। করিল—“ক্রিবেবীতে একটা ভাগ্যনা ছিল, তাই এগেছিন্ম, বৈচি কিয়ে যাচ্ছি। বতনপুনের ববর সব ভাল ত?”

মনে মনে অতি মাতার বিরক্ত হইয়া, দুখানাকে তোলা-ইাড়ি করিয়া, বাস করিয়ার নত হয়ে জাম বা’ করিলেন—“ববর খুব ভাল—চবংকার। আর কিছু বলবার-উলবার আছে?” পত্ পত্ করিয়া জাম বা’ অতঃপর কি বলিতে লাগিলেন, তাহা বুঝা গেল না।

রাগেশ করিল—“জাম বা’, তোমার মাথা ঠিকই খারাপ হয়েছে।”

“ভাই, বোক না; fifteen years’ service। বড় ভয়ে চলে, ব্রু-ব্রুয়ে হ’সিয়ার হয়ে ভবে কাজ করতে হয়। লোকটাই কি অক্সেল দেখে মেথি! বসি, জাম বা’ কি তোমার মেগে, না পিলে, না তরীপতি বে, এত ডাকা-ডাকি

করে শুধু ছুটা বাজে কণা কইতে চলে? ধানের আড়তসার কিনা তাই ঐ বকম ‘খান-কাটা’ বৃদ্ধি।”

রাগেশ হাসিতে হাসিতে করিল—“আজ্ঞা, জাম বা’,—”

“খাদি নয় রাগেশ, ব্যাপার খুব মরীম কেনো। ট্যাণ্ড রোডের সড়কে বসে নিতির বেটা যদি বেগতে পেয়ে থাকে, তা হ’লে জানবে—সবনাশ। এই পনের বছর ‘মার্সিস’ করছি, পনের বছরই বেটা পেছনে লেগে আছে। না—রাগেশ, যা বলছিলাম; চাকরি আমি মতাই ছেড়ে দেবো।”

“দিবে চাব-বাসে লাগবে?”

“হইম। আজ্ঞা, লেবেশ বরি একটু মেথিমে ভনিবে দেবে, তা’ হলে ওর মত, সব কাগজে কবিতা-গল্প-উষ লিখতে পারিব না? তা পারব যোগ হয়। তা’ হলে তা’তেও কিছু কিছু চলে।”

মনে মনে রাগেশ হাসিয়া করিল—“তা, তাই হবে’খন। ঐ গাড়া এনে পড়েছে, চলুন এখন, গিয়ে সব উঠে বসি।”

গাড়া শেষ করিয়া কাটোয়ার গাড়ী আদিয়া মগটকরমে লাগিল।

[৫]

বতনপুর্ন। জাম বা’র গৃহ।

কাম-কর্ম সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বিয়ের উপলক্ষ্যে আখা-গোড়া বাহা খরচ হইয়াছে, জাম বা’ তাঁহার হিসাব লিখিতে বসিয়াছেন। কাল তাঁহার বস দিনের ছুটী শেষ। কালই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইবে। খাদি খরচপত্রের হিসাবটা একবার মিলাই পরকর।

সেনি আফিসের ৪১২৩৮/৮ পাইয়ের হিসাবটা মিলাইতে না পাড়িলেও, জাম বা’ হিসাবে কিছু খুব পাকা। তাঁহার কাছে একটা আখলা গণসিলা হইবার যো নাই। বিয়ের ব্যবহ তাঁহার কাছে ছিল—সর্বসমেত ৫০৭৪/০ আনা। কিছু সব বকম খরচ মিথিয়া জাম বা’র ‘টোটাল’ হইতেছে ৫০৬৮/০। তের আনা পয়সা আর কিছুতেই মিলাতেছে না। একবার, দুইবার, তিনবার যোগ দেওয়া হইল;—সেই ৫০২৮/০ আনা। জাম বা’র মাথা ঘুলাইয়া গেল। আর ৮/০ আনার হইল কি? লক্ষ্যেই দেখানো বসিয়া ছিলেন। কিছর করিল—“বাক গে ৮/০। তের আনার কাজে আর অত মাথা ঘামিয়ে পরকর নেই বাবা।”

“তা কি হয় যে বোকা, ৮/০ আনি যাবে কোথায় ?
মিলতেই হবে।”

ক্রান বা'র মুখ শিঙা হেমবাবু তক্তাগোলের একধারে
পুইয়া ছিলেন। তিনি ভিজাসা করিলেন—“জু তের আনা ?”
কিছুত করিল—“হাঁ।”

রাধেশ বলিল—“ডাঃটে পরমা হাওড়ার যে সেই
কিশিটীকে দিয়েছিলে,—বাক্যে বললে—আকিলা কত, বেশ
কত মিথির মা দেখতে শেষ থাকে ?”

“টিকই বটে। কিছু ও ত চার পরমা, আরও বার আনা
যে চাই।”

শচীন লাকটেরা উঠিল,—“কাকা, Father expired—
এর বার আনা যে আমার গিবে গিরছিলে, সেটা খরচ ত ?”
হেমবাবু কলিলেন—“Father expired ? বাপারটা
কি ?”

ক্রান বা' তাছাড়াও কথটাকে চাপা বিবাস অভিজ্ঞারে
বলিয়া উঠিলেন—“ও কিছু নয়। বাবা, আপনি আজ ওয়
খেতে ভোগেন নি ত ?”

যাক, হিসাব টিক মিলিয়া গেল।

* * * *

আবার ব্যাঙেল হৈলন।

ক্রান বা' লকালের টোপে কলিকাতা ভিগিয়া বাইরেছেন।
দশম হাওড়ার খৌচাটোয় সবাসরি তাঁচাকে আকিল
করিতে হইবে। সঙ্গে আছে রাধেশ।

“বেশ রাধেশ, একটু একটু লিপতে গতিই আমি অভ্যাস
কর।। সোমেশ বই লিখে বছরে চার পাচ হাজার পায়,
আমি চার পাচ ন'ও ত পাব বটে। বাড়ীতে কল কাল
একটু খেটী কজিগুম্ব।”

“কবিতা না গর ?”

“কবিতা। কবিতা ক' লাইন কিছু বেশ মিলিয়ে ফেলে-
ছিগুম্ব। মনে আছে আমায়। ওমবে ?—

কিহি বঁটা, বস কুম্ব বাস,

কিহি বঁটা কুম্ব হুগিবে বাস,

আকরল লোমকই হারের ফেলা,

গাখিহে কে আর তিকণ ফেলা ?

বীজবে একেলা, কে কুম্বি গো ফেলা,

কে কুম্বি গো ফেলা ?—

—রাধেশ রাধেশ ! সন্দেহ ! আপন কাকেই একবারে
তুল !” বলিয়াই ক্রান বা' লাকটেরা উঠিয়া গাড়াইল। “টেন
আলবার আর দেবী কত বল দেখি ?”

“তা অধি বস্টার ওপর হবে। কেন ? হঠাৎ তোমার
আবার চোলা কি ?”

“কবে হোল আমার মাথা আর মুখ। Father
expired—মেড়া হতে হবে না ? উঃ তাগুগিসু মনে পড়ে
গেল ! নইলে এত এক মাথা তুল শুধু আকিলে গিয়ে
পড়লেই—এ একটা নাপিত রাস্তার গায়ে বসে রয়েছে,—
ডাক—ডাক একে শীগুগিব।”

শীগুগিবই নাপিতকে ডাকিয়া আনা হইল এবং ক্রান বা'
মাথোটা তারের দিকে আখাইয়া দিয়া বসিলেন।

শ্রবণ

(হর ও বর-লিপি—ঐন:রাক্তমাল যোব)

কথা—শ্রীঅমরুপা দেবী

আম শরতের সুপ্রভাতে

নীল গগনে মেঘের তরী

মিঠিলি ফুলের নালা গলায়

বাছে ভেসে দেশবিন্দে

কাশের গুচ্ছ কারি হুহাতে।

হাজার ফুলের গন্ধ হরি'

করছে হাওয়া পাগল এসে ॥

মধুরিলা লতার পাতায়

উড়ে কী গান আছ প্রভাতে

কোয়েল কোয়েল পাখিয়ার

কণ্ঠ মিলায় কাহার সাথে ॥

মিশ্র-চৈতন্য-কাওয়ালী

সা গা সা সা । হা । সা সা । জা জা । জা ।
 • আ ছ শ । র • তে র সু • প্র ।

অ । সা । । । সা সা সা । পা মা জা রজা ।
 তা • তে • । • আ ছ শ । র • তে • • ।

। মা । জা । অ । সা সা ।
 র সু • প্র । ভা • তে • ।

। সা পা পা । পা । কা পা । । পা বা বা ।
 • মি উ মি । ক • নে • র না • সা ।

দা । পা পা । । সা অ জা । পা । গদা কা ।
 গ • লা য় । • কা লে র । শু • ছ • ।

মজা জা জা জা । ক । সা । ।
 • • কা র হু । হা • তে • ।

। মা দা দা । দা পা পা সা । । সা অ না ।
 • মৌ ল গ । গ • নে • • নে বে র ।

জা অ সা । । সা পা পা । পা পা ।
 ত • হৌ • । • যা ছ ছে তে সে ।

। জা মা দা । দা বা বা সা । । পা দা বা ।
 • দে শ বি । নে • লে • • ছে তা ব ।

স । জা । । । দা বা সা । দা । সা ।
 নু • লে র • গ ন্ ধ । ত • রি • ।

। পা বা দা । পা । জা । । মা না জা ।
 • ক ন্ ছে তা ও যা • • পা গ ল ।

অ । সা । ।
 এ • সে • ।

। জা মা মা । বা দা দা বা । । বা সা সা ।
 • ম র্ ম । বি • যা • • ল তা য় ।

সা । সা সা । । পা দা বা । সা রা জা জা ।
 পা • তা য় । • উ ঠ ছে কৌ • বা ন ।

সাঁ সা অ মা । জা অ সা ।
 • • আ ছ প্র । তা • তে • ।

। সা সা সা । সা অ সা সা । । গসা বা ।
 • কো য়ে ল । মো • য়ে ল । পা • পি • ।

দা । পা । । । সা অ জা । পা । গদা কা ।
 যা • বা • • ক ব্ ঠ । মি • লো র ।

মজা জা জা জা । ক । সা । ।
 • • কা হা র । সা • থে • ।

আদি ও অন্ত

প্রথম পর্ভ

শিক্ষালব্ধ শৈশব ।

শৈশবে ভাবনা দেখা ধরেছের ধড় হইতে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম করিল । আমেরিকা মিলের নম্রা স্বাক্ষর চাপের বাণিশ সুঁড়িগ, গাড়ী হইতে নামিয়া সে হাঁ করিয়া শোকের ভিড়, সুঁড়িরে দৌড় কাঁপ, মাল কাড়াকাড়ি, কথা কাটাকাটি লক্ষ্য করিতেছিল, একটা ভিড় আসিয়া তাহাকে অধঃস্থ করিয়া লইল এবং সহজেই শৈশব পার করিয়া দিল । সহজে বটে, তবে অক্রেম নহে—বিড়ে ভুঁড়িট বাৎ-চাপ্টা হইয়া গিয়াছিল, সাত দিন গায়ে বাধা ছিল, এক পাট ক্রমশে পাওয়া গেল না ।

শৈশবের বাহিরে বধন শোকের ভিড়, গাড়ীর দৌড়ানোড়ি একটু কমিল, ধরে প্র একজন শোকের ভিজ্রাসা করিল, যেসের বাসা কোথায় ?

লোকটি বলিল, কোন্ যেসের বাসা ?

ধরে বলিল, যেসের বাসা ।

এইবার লোকটি একটু হাসিল ; ভিজ্রাসা করিল, কোথায় বাড়ী ?

—চাকা ।

লোকটি শৈশবের সামনে কতকগুলো বাড়ী দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐখানে বাও ।—বলিয়া চলিয়া গেল ।

ট্রাম, বাস, মোটর-গাড়ী, লরী, খোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা, মাল-গাড়ী ইত্যাদি ইত্যাদির করাল কবল এড়াইয়া ধরে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পাঁজাইতেই সৌজন্য একটা লোক মহাসমারের তাহাকে অত্যাধনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেল । একটা ধরে বাহুর বিছানো ভক্তাণেবের উপর বেরজাই-পারে একটি লোক হাঁকার তামাক খাইতেছিল, হাঁকাটা সুখ হইতে একটুখানি সরাইয়া, পুসে ফুসে চোখ দিয়া অগভীরে আগামতক দেখিয়া লইয়া, বেশ খাতির করিয়া বলিল, বহন ।

ধরে প্র 'বিছানা' বগলে বলিল ।

—আপনার বাড়ী ?

—চাকা ।

হাঁকা-হাতে লোকটি ভড়াক্ ভড়াক্ শব্দে হাঁকা টানিতে লাগিল ।

—রমেশ না কোথায় ?

—রমেশ পাকড়াই ?

—না, না, রমেশ শমনিদি ।

—রমেশ শ-শ-শ-শ-শ ! আধাত্মি গোটেল টিকানা দিয়েছেন ?

ধরে প্র তাহার বগল হইতে বিছানাটি নামাইতে ছিল, পুনশ্চ বগলবাবার পুরিয়া বলিল, এটা হোটেল নাকি ?

—হ্যাঁ, কেন বাইরে দেখা রয়েছে, দেখেন নি ?

—না—বলিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল ।

হাঁকাহাতে লোকটি বোধ হয় হোটেলের ম্যানেজার, তাহারও বাড়ী চাকার । একটু বয়্য হইল ; ভিজ্রাসা করিল, যেসের বাসার টিকানা জানেন না ?

—না, রমেশ দাঁর যেস, কলকাতার ভ্রমলোক সবাই জেনে ।

ম্যানেজার একটু ক্ষুদ্র হইল—যেন, সে ভ্রমলোক পর্যায়ে অতুর্ভুক্ত নয় । ক্ষুব্ধের বলিল, হুঁজে দেখ সে কোন্ চুলোয় তোমার রমেশ বা ।

—হ । সেখবই ত ! বলিয়া ধরে প্র বাহির হইল । বাহিরে আবার সেই জনতা । ফুটপাথে মাহু ধাতাখাতি করিতেছে আর রাস্তার গাড়ী মোটরগুলো যেন কি খাই ও করে খাই করিয়া টুটাটুটি করিতেছে ।

ফুটপাথের উপর ভুড়ি রাখিয়া কয়েকটা সুটকা বসিয়া ছিল, তাহারো শিক্ষাভেল করিতেছিল, আক্রমণ করিয়া একটানে বিছানা (যানে সেই চারপাশে বাণিশ) ছিনাইয়া লইল । ধরে প্র এক্ষণ অতর্কিত আক্রমণের ভগ্ন আশো প্রত্নত ছিল

বলিয়া আসিয়াছিলে। তিকানাও তিনি একটা দিচ্ছিলেন, সেটা খোঁজা দিচ্ছিল; আর রমেশ দা' একবার বলিয়া ছিলেন, 'ভ্রাণদা' নামেই আমাদের মন্ত বন্ধু। রমেশ দা'র কথা সে মানিত। কলিকাতার 'অগ্নিমা' গ্রন্থমেই তিনি বেদ করেন, তারপর উইলসন, তারপর ব্যাণ্ডোপের বাবু! পূজাপান রমেশ দা'র এখন ঘর বোম্বে-বোলাও। রমেশ দা'র গ্রন্থগত সে তিনটি হচ্ছে, যে বাড়িতে হু'টি ছেলেকে পড়াইয়া যাটার পূর্বে দশ টাকা আদায় করিত, রমেশ দা' সেই হু'টি ছেলেকেই পাচ টাকা কর পড়াইতে শুরু করিয়াছিলেন। এইরূপ করিতে করিতেই রমেশ দা' আজ উজ্জ্বল গিরিশখরের শিকড়ের আগ্রহণ করিয়াছেন। পূজাপান রমেশ দা'কে লামনে পাঠলে ভাপ হইত; কিন্তু তা' এখন পাওয়া গেলই না, পাহার আদর্শ লইয়া ভ্রামন ধরেন্ত কলিকাতার সবুজে ভীষন-তরঙ্গী ভালাইয়া দিল।

ধরেন্ত বন্ধু-ভোজন শেষ করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে অধরে কলিকাতা চিয়া সন্ধ্যার পর ভীষনভোষিতের কিরিয়া আসে। গোল ঘর গোল আসে। একদিনও ভুল করে না—না ঘাইতে, না আসিতে। কিন্তু কাজকর্মের কোন স্রবীয়া আজও হয় নাই। না হইবার অনেক কারণ, কলিকাতার পোকেরা হঠাৎ উল্লস হইয়া উঠিয়াছে; বাব-বিচারে তাহাদের কিছুমাত্র স্তম্ভ নাই, সস্তার কপার তাহারা আর ভিত্তিতে চায় না। কলিকাতার 'ঘটি'দের ফোতো যথুহানীতে ও বাঙে খরচের চাপেই তাহারা যে মরিতে বসিয়াছে, ইহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখিতে চায় না। মনসোহিনী সব দেখে, সব বোঝে। একদিন বলিল, কি গো বাবু, চাকরী-বাকরী কিছু হ'ল?

হয় নাই তবুই সেই লোকসোহিনী বলিল, চাকরী কি নারকলের কাঁদি নাকি যে হাত বাড়িয়ে পেড়ে নিলেই মরনি হ'ল? সেই কাণেই বলল, বাবু ভাতের হোটেল যাও, তা'ত শুনে না! শুনে এতদিনে টাকা রাখবার টাই মৃত্তক না।

অতঃপর একটি দ্বৈতবিশিষ্ট পদার্থদ্বায়ীও জুটিল! দ্বৈতবিশিষ্ট কবিল, হোটেল যাও, তুমি দেখবে, এই যে এত খন্দের সব কৌটিকে তোমার হোটেল ঘাবে।

—কেন, এখান থেকে ঘাবে কেন?

—আ তোমার পোড়াবুঁটি! হোটেল এত যে খন্দের আসে, সে কি ঐ বুধপোড়া কণ্ডাক্ষিকের মধ্যে আসে, না ঐ উইলসনকে উড়ে বাড়াসের মধ্যে আসে?

—ওরা ত সব খেতে আসে।

—তোমার বাছা, রূপ ক'র না বাবু, বুঁদিশাখি কিছু নেই। তুমি যে টাকার থেকে পাহার ধপাস ক'রে পাড়ে ঘাওনি কেন আমি শুধু তাই ভাবি। বলি, এতদিন এখানে আছে ত! চোখ বুজে থাক, না খুলে থাক? একদিন যদি খাবার সময় আমি না থাকি কি রকম কাওকারখানা হয়, তা কি চোখ মেলে কোনদিন দেখনি?

কাঠের উনানের মত, বুঁদিশ খুঁও একটু ইন্ধন জোগান দিলে অনেকেরই বুঁদিশ খুলিয়া যায়; ধরেন্তেরও বুঁদিশ খুলিয়া গেল; বলিল, তা বটে। বুঁদিশ নিয়ম এই, একবার খুঁসিতে শুরু করিলে আর তাহাকে থেঁকাইয়া রাখা যায় না। ধরেন্ত দ্বিতীয় দফার বলিল, আমি হোটেল খুঁসে তুমি আমার হোটেল ঘাবে ত?

মনসোহিনী একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করিল। প্রথমে গালে হাত দিল; পরে ততলী করিল; তারপর মুচকি হাসিল; তারও পরে সাগরতরঙ্গের মত বেলানুমেতে গড়াইয়া পড়িল; অধরে আদর নমন সোহাগ আনিয়া বলিল, তবে আর বলছি কি গো! বাব গো, বাব, তবে আধাখানি বখরা। আমি সব করব কখনো, তুমি দেখবে শুনবে, বিড়ি সিগ্রেট ঝুঁকবে, হল একদিন বা থ্রিস্টার-মিটোটার দেখলে, একদিন বা টাকিগান শুনে। কেমন, রাঁজী ত?

—বাব রাঁজী।

—দেব কালে অবস্থা কিরলে আমার ভাগ্যে না ত?— বলিয়া সেই ভুবনমনসোহিনী বিলাস কটাক্ষের নিকেপ করিল।

ধরেন্ত ভাষাচালাকা হইয়া বলিল, ভাগ্য কেন? আর কোথায় ভাগ্য?

—তোমার ভাগ্যের বুড়ীদাদার। আমার কোথায়?

—বুড়ীদাদার মল নেই! বলিয়া ধরেন্ত হাসিল।

—এই যে কথা বেরিয়েছে। বা ব'ক বাবু, এখন কাউকে কিছু ব'ল ট'ল না; আমি বাড়ী-টাড়ী হুঁজি, লোকজন সব

টিক কৰি, মোকান-টোকাৰে উটনোৱা বাদ্য কৰি, তুমি শু-
মেলা যাও।

আমাৰে মাড়াকাত পাঠক ও পুত্ৰাচ্চকাস পাটি-
বিহাৰিদি পাঠিকা, সাওদিয়ে কি অসুখা লাভিত হইয়া গেল,
৩০ চৰ্ম-পাণ্ডাৰ সন্তু-কৃতগাথী মেটৰগানে আবেশণ
কৰিয়া কলশকে চুটীচুটি কৰিলেও আপনাতা তাহা কমন
কৰিতে পাৰিবেন না। মিছাই হাত পা আঁকি: শটান-
শাৰী হইবেন। আপনাতা রাখ কৰিবেন না; কমন-
এবণ বাহালী পাঠক-পাঠিকাৰেও বে আদি কটকাটো
কৰিতে লাহী হইলাই ইহাতেই কুৰিবেন, অসন্তুষ্টৰ উপৰেও
কিছু শটীয়াছে! কি গতিয়াছে এখন তাহাটো বলি শুধন:
শুনিয়া চকু বিন না হুৰ ত—খুঁজি থাকিল!

শিৱালবৰ্ণ নৰ্ব টেনেৰে সন্তুপে ঐ বে বিয়াট হিতল গুত,
উহাৰ বাস্তাৱক মধ্যস্থলে কি লোনা ৰহিয়াছে, বেগুন ত!

পল্লবিনী প্রাণতোষিণী ভোজনালয়

আজ্ঞা ভিত্তে আহন! কেমন, বেপিয়া চকু ভুড়া না
কি? চাৰিঘাৰ তক তক তক কৰিতেছে, বৰে লখা লখা
টেবিল, বড় বড় ইলেক্ট্ৰিক কান, গোণ গোণ বলা কাচেৰ
বাতি; আবার ঐ বেগুন, বামদিকে Ladies Section,
মহিলা বিভাগ। ডান দিকে মানেভাৱেৰ আফিস। আফিস-
ঘৰেৰ মাথমে কাঠেৰ বোৰ্ডে—

ভাত ১০

ইত্যাদি। [জীৱনতোষিণীৰ নকল, ইহা কপিৰাট
আঠেৰ অক্ষত্ৰু কৰে।]

নিয়ে—N. D. এখানে থাকিবার স্থিৰ বন্দোবস্ত আছে।
হাৰিলাগাও থাকিব পাৰেন। ভাত ও অন্তৰ্নিয়েৰ ভত পুনৰল
মানেভাৱেৰ বিকট ও হাৰিলাগা মেটী মানেভাৱেৰ বিকট মনুলখন বকন।
মানেভাৱ কে, আৰ সেউী মানেভাৱই বা কে? এ
এপেৰেও যদি জবাব একতাশাৰ কোন বুটে পাঠক (বা পাঠিকা)
লেগকেৰ মুখেৰ পানে হী কৰিয়া চাহেন, তিনি বেন এইখানেই
এম পাঠ বন্ধ কহেন, এই আৰাৱেৰ মাখাৰ বিয়া ৰহিল।

জীৱনতোষিণীৰ (পাঠক জীৱনতোষিণী ও প্রাণতোষিণী
একাৰ কৰিয়া কেলিবেন না) অধিকাৰী চন্দ্ৰাজি
কাছে পাওনাগণা বাৰা ভনা ছিল, তাহা তুলিয়া দিয়া বে এত
বড় কাণ্টো চকুৰ নিমিত্তে পড়িয়া তুলিল, মাইনবোৰ্ডে তাহাৰ

নাৰটা ধৰেস্তই উত্তোণ কৰিয়া বিল। তাহাৰ পেতেত ক'টা
টাকাটোৱা ছিল? পকাশট বট ত নহ! কত পকাশ বে
সে চাৰিঘাৰে তাহাৰ কি আৰ ইহাৰ আছে? তাহাৰ নাম
পলবিনী। গোহুৰ অটনশ শতাধীৰ শেষভাগে বা উনবিংশ
শতাধীৰ প্ৰথমার্ধে ইহাৰ মেৰ 'সকলিখি পলবিনী শতব' ছিল,
নাৰটা তখনকাৰ; এখন পলিবৰ্তন বিশেষ একোজন চহিলেও
তাৰা সন্তুষ্ট নহ। কৰ্মাৰ বলে, খেলতে ভাবিলে নিমিকড়িত
মেলা যায়। পলবিনী তাহা বেনাটোৱা বিয়াছে। চন্দ্ৰাজি
গপনে বাহা পাওনা ছিল, তাহা বাকীওলাকে অগ্ৰিম দিতেই
নিশ্চল, বাকীটা কিহলে কি চটীয়াছে, ধৰেস্ত তাহা ভানে
না। পলবিনী বগন বে কাগজ বিয়াছে, সে তাহাতে সই
কৰিয়াছে, পলবিনী তাহাকে মানেভাৱ কৰিয়া বলাটো
বিয়াছে—সে বলিয়াছে, বলিয়াছে, আধাআধি বগলা—পাকা
কথা।

এখন দিনে লতা হটল, কুড়ি টাকা বার আনা।

তাতি ১১টাৰ সময় ধৰেস্ত বগন আহাবানি কৰিয়া পৰা
বলিয়া (পৰা এখন আৰ সে আবেলাবানেৰ চাৰত ও আনবণ-
বিহান একটা বলিল নহ, এখন পৰা। হু-পৰাও বলা বাহ)।
বিড়ি কুঁকিতেছে, পলবিনী অ'শিয়া খাটেৰ ধাৰে
বলিল। আচলৈৰ বুট তুলিয়া ২শটাকা ছ'আনা বাহিৰ
কৰিয়া বলিল, এটে নাও গে, হোনাৰ আভংকণ পাওনাগণা।
ধৰেস্তেৰ কালোবুথ ব্ৰক্ত বগাইয়া বেগনে বা ভায়েলটে
হইয়া উঠিল। পলবিনী বলিল, বাবু কি একটু গাৰে পাৰে
হাত তুলিয়ে সোব?

হামলেটেৰ মত বিধাৰ পড়িয়া ধৰেস্ত বলিল, তা, না,
বাৰু। বিধাৰ কাৰণ ছিল, মায়ে বাগাই হটক, পলবিনী
বিশ শতাধীৰ লোক নহ। বনটা কেমন বেন ছুং ছুং কৰে।
পলবিনী লাত হইল, ছাৰ্জিন টাকা ছ' আনা এক পৰলা।
স্তেৰ টাকা তিন আনা আৰ পৰলা পাইয়া ধৰেস্ত বিছানায়
উঠিয়া বলিল। পলবিনী দেবা 'মফাৰ' কৰিল। ধৰেস্ত
হামলেটেৰ মত অত বোকা নহ, আত বলিল, তা—

সেবাগন্ত ধৰেস্ত বলিল, আতকাল ডাক্তাৰগা এখন গাত
বাধিয়ে দেৱ বে বুঝা যায় না।

পলবিনী কঠিন, মাখাৰ বাধিলে দেৱে গা?

বিড়ি ছাড়িয়া সিগারেট খরিয়াছিল বসিয়া। পরদিনী বাগ করে নাট, তার আনার টকী দেখা যায় জানিহাও ধরেন্ত এক টাকা হুট আনা নষ্ট করিয়া টকী দেখিয়াছে তমিয়া পরদিনী বণ্ড গীর রূপ ধারণ করিল।

—অবাক করলে না! এমনি করলেই তুমি হাতে পরলা রাখবে আর কি! ওঁটিনে ছারে গোলায় বাবে! না, আর এতটী পরলা আমি তোমার হাতে বিজি নে বাবু! আমার কাছেই এমন, বেশে দাবার সময় পাবে।

সেইদিন হইতে সেই ব্যবস্থাটাই হইল। অবন্ত, লাভের কড়ি হাতে না মাদিলেও ধরেন্তকে অর্ধকণ্টে পড়িতে হইল না। বখন বাহা চায়, সে তাহাই পায়; উপরিও কিছু পায়, সেটা পরদিনীর রুহিম লাভের অকরুিম হাসি। রান্নি বিগ্রহে পরদিনী রোভট ডিসাব-নিকাশ বুটাইয়া, সেবা করিয়া যায়। মাসান্তে ধরেন্তের ভাগে তিনশত টাকা চমিয়াছে।

দ্বিতীয় মাসান্তে তিনশত—প্রায় ছয় শত; তৃতীয় মাসের শেষে সহস্র পূর্ণ হইল। ধরেন্ত এতবার বেশে বাটবে, পরদিনীকে ডাটা বলিল। পরদিনী একটু শুক চটল, একটু দিব্ব হইল, ভোরে ভোবে নিশাং ফেলিল, বলিল, গিয়ে বেথা করবে ত? তখন কি আর অব্যবের কথা মনে থাকবে?

মনে যে থাকিবেই, ইহা বুঝিয়া নিতে ধরেন্ত ক্রী করে নাই। ধরেন্ত কাল ঢাকা মেলে বেশে বাটবে, কাল হুপুতে পরদিনী পোষ্টাফিস হইতে টাকা তুলিয়া আনিবে কথা স্থির আছে। ঠাং সন্ধ্যায়ে হোটেলে বড় ঠাসুর আদিয়া নিবেদন করিল, গিল্ডো-মাকে দেখিতে পাওয়া গাটতেছে না।

পায়খানা, কলবর, ছাব, গদি, খুঁজি, নর্দায়া, আতাঈকু পাতি-পাতি করিয়া সজান করা হইল, গিল্ডো-মাকে কোণাও পাওয়া গেল না। পোষ্টাফিসেও নাই, শিখালসহ ট্রেনেও নাই। শেষে ঘাটে বাতারেও না।

উাহাকে পাওয়া গেল না বাটে, তবে উত্তম-মধ্যম অনেক পাওয়া গেল। যে সুখী চাল ভাল মনেতে দিত, যে হিম্মত্বানী ফেরিগালা আসু ও আনাত দিত, যে গোয়ালা হুখ দিত, যে ব্যক্তি ডিম দিত, যে কুসাই মাংস দিত, সকলে বলিয়া ধরেন্তকে 'গো-বেড়েন' দিল। কত যে দিল, আর

কত যে দিল না, তাহার একটা হিসাবনিকাশ হইবার পূর্বেই বাড়ী ওগালা তাহাকে পুণিপের হুক-কমলে-সমর্পণ করিল।

দ্বিতীয় পর্ব

কলেক্ট ষ্টাট ও হারিসন হোন্ডের লক্ষমপুনে পাড়াইয়া ধরেন্ত দেখিল, খবরের কাগজ বিক্রয়ে বিশেষ কোন কষ্ট নাই, পাঠ নিভরই আছে। একখানি সাক্ষ্য-পত্রের খুবটী বিক্রম—ট্রামে বাসে প্রত্যেকে না হউক, একশত জনের মধ্যে পঞ্চাশ জন সেট কাগজ ক্রয় করে। ধরেন্ত একখানি কাগজ ক্রয় করিয়া, কাগজ-প্রাপ্তির ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া, ন্যানেঝারের সঙ্গে বৈশা করিল। কদিনের মধ্যেই ক্রয়-কাগজের হকার-পদ লাভ হইল।

কাগজ বিক্রয় চলিতে লাগিল। ধরেন্ত কাগজ বিক্রয় করিয়াই নিশ্চিত হইল না—সোকে কাগজ কেনে কেন, কাগজে কি থাকে, কি থাকিলে কাগজ হু হু করিয়া কাটে, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করিতে লাগিল। রাত্রে সৌবনতোষিণী (পঠিত প্রাপ্ততোষিণী ও সৌবনতোষিণী একাকার করিয়া কেম্বেন না যেন! প্রাপ্ততোষিণী প্রাপ্তবাসিনী হইয়া নিকছেন।) হোটেলে এক পরশার ভা'ত, হ'পরশার কানিয়া ভক্ষণান্তর বাসার কিরিয়া হারিকেন লুঠনের সামনে বলিয়া বখন সাক্ষ্য-পত্রখানি লুটয়া গবেষণার নিবৃত্ত থাকিত, তখন নিম্নলিখিত বিবরণ কণ্ঠিই যে সংবাদপত্র পঠিকের নিকট বিশেষ আকর্ষণের বহু তাহা জনহাসন করিতে তাহার বিলম্ব হইত না। নিম্নে যে সংবাদ-ভালিকা প্রস্তুত হইয়েছে, প্রাত্যহিক পত্রের আলিকাভুক্ত সংবাদমূহ হয় সম্পূর্ণ, না হয় আংশিকভাবে স্থান পাঠ করিত।

ভালিকা

- ১ নম্বর, বড় অরের কেলেকারীর পথ
 - ২ নম্বর, কলেক্টের ছাত্রদের কেলেকারীর পথ
 - ৩ নম্বর, মাল্পা-কলহের বিশাল বুজাত
 - ৪ নম্বর, মাল্পা-কলহের মাংসার বিবরণ
 - ৫ নম্বর, অকৈষ প্রেবের কাহিনী (পত্র ও পত্র)
- গবেষক ধরেন্ত ইহাও লক্ষ্য করিল, যেদিন লক্ষ্যপত্রের এক বা ততোধিক বাণের অভাব থাকে, সেদিন কাগজ বিক্রয় কম হয়, অবিক্রীত সংখ্যা লুটয়া বাসার কিরিতে চয়। আর

বেদিন পঞ্চপত্রের অধিক পর নিকিষ্ট হয়, সেদিন কাগজ পড়িতে পার না—ইচ্ছিত হয় না, নেবেন বাবু, নেবেন বাবু বসিয়া সাধিতে হয় না, বাবুহাই টার বাসের জানালা দিয়া হাত পলাইয়া ইচ্ছাটুকি ডাকাডাকি করিতে থাকেন।

হয় বাসে হাতে হুঁপসা হইয়াছে। ধরেন্স হির করিল, আর কাগজ বেচিবে না; একপানা কাগজ বাহির করিবে। বিজ্ঞেরা বলেন, পুঙ্খনিহরণ কখন নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন না।

হকারগণের সঙ্গে ধরেন্সের সৌহার্দ্য ছিলিছিল। তাহার নকশেট উৎসাহ বিতে লাগিল। একটি শুভ দিন বেশিরা ধরেন্স সাপ্তাহিক “পূর্বাকাশ” বাহির করিয়া ফেলিল। নিম্নেরে লিখিত হইল :—

“সমাজের সর্বস্বোপযোগী বা—সর্বনাশি পুঁজ, ব্রজ নির্ভত হইতেছে, চর্চকে তিষ্ঠান দায়। আমরা সমাজ-পতিগণের দৃষ্টি সেই দিকে আকষ্ট করিব। আমরা নিরপেক্ষ-ভাবে বড় ছোট, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূখ সকলের সোথ ও গুণ দেখাব। আমরা কাগরও প্রোচাকা রাখিব না। আমাদের বিশেষ্য হইবে—

১ নম্বর, বড় পত্রের কলেক্টরীর নম্বর
২ নম্বর, কলেক্টর ছাত্রদের ঐ ঐ
৩ নম্বর, ছেলের ছাত্রদের ঐ ঐ
৪ নম্বর, মেয়ে-বোহিঃ সন্তানের গুণ নম্বর
৫ নম্বর, বাস্তবতা কলেক্টর বিশেষ বৃত্তান্ত
৬ নম্বর, বাস্তবতা কলেক্টর মাথার অমূল বিবরণ ও
টিকানা ইত্যাদি

৭ নম্বর, অবৈধ প্রেমের কাহিনী (গড়ে ও পড়ে, ছড়ি ও গাথা)।

আমাদের পাঠকগণ দেখিবেন, পূর্বে যে সাপ্তাহিকের কথা আমরা বলিয়াছি তাহার বিশেষণের উপরে দুই নম্বর বিশেষ্য “পূর্বাকাশে” চাপিয়াছে।

সম্পাদক হইলেন, খ্রীঃরেন্সনাথ খাঙ্গারী। প্রথমটা, সম্পাদক হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। ছিল না, কারণ তাঁহার বিদ্যা বিভাগের মধ্যবর্তক উপাধ্যায়ের গয়ের গভী অভিতম বয়ে নাই। আরও কারণ, তাঁহার ধারণা ছিল, সম্পাদক হইতে হইলে কাগজে লিখিতে হয়। কিন্তু তাঁহার হকার বন্ধরা তাঁহার প্রম অচিরাৎ ত্যাগিা নিনেন।

তাঁহার বহু বৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের নবীর সেধাইয়া বসিলেন যে ক’অকর নিমিত্ত মাংস এমন ব্যক্তিও বদধর্মে ও বদগোবনে পর-সম্পাদনার কাজ করিয়া প্রগল্ভী আখ্যা লাভ করিয়াছেন। সম্ভ্রাহারে গুটী করিয়া সচল প্রোশাস্ত্রা দিলে অকর সেখক হইতে অকর সেখক পর্যন্ত কাগজ তরাইয়া, চাই কি, ভাগাইয়া দিয়া দাউবে। তাঁহারাই সেইকল কয়েক জনের নাম ও টিকানা দিয়া নিনেন। বলা বাহুল্য, কাগজ বাহির হইল।

শুধু বাহির হইল বলিলে সব বলা হইল না। অনেক কাগজই ত বাহির হয় কিন্তু সেই পর্যন্ত! পাঠকে তাহাদের মূখ বেগে না, তাহদের তাহল সম্পর্ক। কয়েক দিন যা কয়েক সপ্তাহ বাহির হয়, তাহদের বাধালা যেসের শিভসের মত, স্বাভাবিক স্তূতা বরণ করে। বাধালা সেসের বেকারসের সম্মুখে গুটী ঘর উন্মুক্ত—(১) ইপিওরেলের মালী (২) পত্রিকা সম্পাদনা। ইপিওরেলের মালীতে কখন কখন গুটী চারি পরলা খবে আসে; পত্রিকা সম্পাদনা প্রোচক বেনোজলের মত, ঘরের ভিঁও বাহির করিয়া গইয়া যায়। তাই যে প্রতি মাস, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি দিন, প্রতি প্রভাত, প্রতি সন্ধ্যা—এমন কি প্রতি বৃহর্ষ কাগজ জগাইতেছে, ইহা বিজ্ঞেরও বিজ্ঞ। সে বাহাই হইক, “পূর্বাকাশের” অষ্ট ভাগ। কয়েক সপ্তাহ কাগজ বিরূপ হইতে লাগিল যেন hot cases, অথবা ব্রতদার পাগড় ভাঙা মত। গরি দিকে একটা লাড়া পড়িয়া গেল, কলিকাতা শহরের ভ্রম ও নিভজনগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। “পূর্বাকাশে” প্রোচাই যেসর লাভ নম্বর, কখনও কখনও আট দশ নম্বর পর্যন্ত হড় হড় গড় গড় করিয়া বাহির হইতেছে, তাহাতে শঙ্কিত হইবার কথা বটে। কিন্তু অম-বিতর বা ছোট-বড় সকলেরই আছে—তাহাতে কুংলার তৈলের মশাল জালিয়া গড়ে পড়ে ছড়ায় গাথা প্রোচরিত হইতে থাকিলে কুংলাবুহু লোকের কাছে সেই সামান্তও যে অসাধারণ, সাধারণ অসাধারণে পরিণত হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি!

পল্লবীর শোক করিয়া আসিয়াছে। পুস্তকদ্বারা জননী বেন নবকুমার কোলে পাইয়াছে। আজ ধরেন্স একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। তাহার নামে সভাপতিত্ব নিমন্ত্রণ-পত্র আসে, খ্রীঃ-টার বাধ্যকোণ চিঠি পাঠায়, সাপ্তাহিক সম্পাদনাতেও অস্থান

আল। এখন সে একজন কিশোর-বিশুণ্ড মতো। তবে সে কোণাশ্রম নাহি; বসে, অনেক কাজ সম্বল করিতে পারি না। কাজটাক বাজে কথা, আসল কথা একবার পলায়নীয় কাছে কিনিয়াছে, আর আর ঠিকিতে সে রাজী নয়। সভাসমিতি-গণিকে সে দিব্য বস্ত্র করিয়া চলে, তাহার ভর বিভা ধরা পড়িবার অমন ভান আর নাই! তাহার বেরকম নাম-ডাক, তাহাতে কেহ বসি ধরিয়া বক্তৃতা দিতে তুলিয়া দেয়, তাহা হইলেই হইয়াছে আর কি! পৃথিবী অবিরত গুরুত্ব, মামুল তাহার হৃদয় বড় পায় না, বক্তৃতাটুকু পাড়াইলে পূর্ণায়মান ভগ্নত তাহারে নাগরালেপার চাপাইয়া ছাড়িলে। একবার এতেন একটি ঘটনা ঘটবার উপক্রম করিয়াছিল। সাতু গানসামার গদীর গুণগুরু-কবির যেখানে তাহার এক সভার ধর্মশ্রমে সভাপতি করিয়া ভোজনের উপর চোরাণে লটকাইয়া দিল। বক্তার পর বক্তা বক্তৃতা করিয়া গেল, সর্ব-শেষে সভাপতির অভিভাষণ। শৈব বড় গুণট, কোথাও এতটুকু হাওয়া ছিল না, দ্বৈতের মধ্যে সকলে প্রদলবৎ হইতে ছিল, ঠাণ্ডা সভাপতি সন্ধিগর্ভিতে আক্রান্ত হইয়া চেতন হারিয়া পড়িলেন; চেতন উঠিয়া নীচে পড়িয়া বাইতেন, চেতনের পশ্চাদিক্রমে হেঙাল সে বাক্য প্রাণ বাড়াইল। শব্দ আঙঠে বড়িয়াছিল, এখন প্রাণও বাছিল। তবধি সভাপতির নামে উদার বড় ডর।

এতদিনে হাতে প্রণয়ন ভবিষ্যৎ, ধর্মশ্রম শ্রমই দেখে করিবে। বেশ হইতে মাতৃগুরুদেব পত্র দিগিরাদেব, আড়াল-লজ্জার দহনশ্রমের একটি ডানকাটা পত্রীর সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়া আছে, ধর্মশ্রম আসিবা দ্বার শুভকাম্য স্তম্ভ হইবে।

হঠাৎ একই মুহূর্ত্ত বাহিরে গিয়াছে। দুই সপ্তাহ হইতে কাগজ আর বিকাশ না। দ্বারদ্বারা নইতে চায় না, বিভাজনসভাও বিভাজন বন্ধ করিয়া দিতেছে, প্রেসের দিল বাকী পড়িতেছে, অকস্মাৎ এই ব্যাধির ঘনিষ্ঠ লাগিল।

দ্বারদ্বারের নিকট অসুস্থতার কলে জানা গেল, সেখা-টেখা আর তখন পরমাগম হইতেছে না বলিয়াই পাঠকগণ বিতণ হইয়াছেন। আভ্যন্তরীণ পাঠক বাজারে মন্ত-ক্রেতার দ্বার বাড়াই করিয়া কাগজ ক্রয় করে, তাহারের চোখে দৃশ্য দিব্য যো নাই।

ধর্মশ্রম তাহার লেখককে বৃত্ত করিল। এই ঘরে ত সেই দ্বার! তাহার বাড়ী বহির্দেশে, আর পাঠ্য চূর্ণ করিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়। দেও চন্দ্র পাড়াইয়া দুই বাগাইল ধর্মশ্রম উপর ঠাত চাশিা পাড়াইল। যেন, গান, টু, পি, ওয়াহ!

দুই মনই যেখানে ধর্ম ১০০ ডিগ্রীর নীচে নামিল, তখন দেখক বাহা বলিল, তাহার দ্বার দ্বার এইরূপ— কল্পিত মি: সেন, মি: রায়, মি: সেন, মি: চট্টোপাধ্যায় কেলে-জারী কণা অর্থাৎ খোঁড় বড়ি খাড়া ও খাড়া বড়ি খোঁড় নাড়াচাড়া করিয়া আর কত সেখা বাহ? তাহার ভাঁড়ার শাপি!

আসল কথা, সে পোকটিকে মাত্র এক কাগজগুণা কাগাইয়া মইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই কিছুদিন ধরিয়া পূর্ণাঙ্গের বৃত্ত বাজে কথা দিখিতেছে, আর কাগজের কথাগুণা সেই কাগজটাই বাহির হইতেছে। ধর্মশ্রমের নিকট সেই ব্যক্তি যেন দশ টাকা পাইত, নতুন কর্মস্থলে গেলো পাইতেছে। দুইটাকে হাতে রাখাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য, তাহা এখন সম্ভব হইতেছে না, তখন মূল্য বাহার অধিক মিলে, তৎপ্রতি অগ্রহিত হওয়াই বিধেয়।

পোকটার দহিত বস্তু করিয়া কোন দাত নাই বহিরা ধর্মশ্রম গানার দ্বিগির পূর্ণাঙ্গের ফাইল মইয়া বলিল; বলিল, যানে গবেষণা করিতে বলিল। গবেষণার মম হইয়া দেখিল, ভিনিমটা বুইই শোভা। এতই শোভা যে বড়ই আবে, ততই তাহার দানি পায়!

পূর্ণাঙ্গের সেখাগুণার নান-খানগুণা বদশাইয়া নতুন করিয়া পরবর্তী সংখ্যার মাত্র 'কাপি' প্রেরিত করিয়া কেলিল। পুরাতন মি: রায়, নতুন মি: চট্টোপাধ্যায় হইলেন; তখনকার মি: চট্টোপাধ্যায় এখনকার মি: পাকড়াই, মি: গুপ্ত মি: চাকলাবার হইয়া আবার 'পূর্ণাঙ্গ' গাড়াইয়া তুলিলেন। কাগজ আবার বিক্রয় হইতে লাগিল।

একদিন হারিসন রোড ও কলকাতা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে পাড়াইয়া আছে, দেখিল একটি দ্বতী ও একটি দ্বক রঙ-তামালার গদীর চাশিা বাইতেছে। মেথের হাতে কতকগুণা বই, চোখে চশমা, পায়ে জাপান, সে যে কংগ্রেসের ঘেরে মেনিয়ে বুঝা যায়। ছেপেট বোঝ হয় তাহার কাছিন

(কলিকাতার আমকাল কালিদাসের খুব চেন সে তনিয়াছে), কংগ্রেস হাটে সেয়েটিকে শইয়া থিয়েটার, বায়োথোগে বা অস্ত্র কোণার দৃষ্টি করিতে শইয়া বাটতেছে।

পর সপ্তাহের কাগজে ধরেন্ত্র খুব রত কলাইয়া বাপারটা লিখিল। লিখিল, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, লেখক স্বয়ং যেন উটুরায় ঘাটের জনবিরল গাতি-আগ্রয় কক্ষে স্ব'মনকে প্রেমালাপ করিতে দেখিয়া আসিয়াছে। কাগজ বিক্রয় হইল।

আর একদিনও সেই খুবক খুবচোকে দেখা গেল। তাহায়া রাত্তা পার হইবে বলিয়া গাড়ীয়া ছিল। ধরেন্ত্র তাহাদের পাশেই আসিয়া গাড়ীয়া। আজও হাসি-তামালা রঙ-চং চলিতেছিল। ট্রান্স-বাসগুলা চলিয়া বাইতে, রাত্তা একটু থাণি হইলে খুবক বলিল, ওলু অফ!

নাট্যটা তবে অফ! অফ! কিহা অফকৃতী? অফবালাও হইতে পারে! পর সপ্তাহে লিখিল—

কে কুহিরে তখন? অফরে
কংগ্রেস হাটে কুহিরে শইয়া
যাও নিতি নিতি—

ইত্যাদি।

কথার বলে, লিখিতে লিখিতেই সরে। কথাটা ঠিক। এই দেখুন না, ষ্টেশন-সাহেবের গর-মাত্র-সমল ধরেন্ত্র আম-কাল কিতাপ হুম্বর হুম্বর কবিতা (অহো, কি হুম্বর!) লিখিতেছে।

এবার সেদিন সেই খুগল দৃষ্টিকে বেলিল, সেদিন তাহার এক অস্বপ্নত হকারকে দিয়া একথানা কাগজ খুবকটিকে উপহার বরণ প্রদান করিল। হ্যাও লইবে না, হকারও ছাড়িবে না।

পর সপ্তাহে পূরীকালে লিখিত হইল—

আহা, ভাণীন্দ্র হাট নির্জন সে বাট উটুরায়
প্রেমী অফরে গবে নিরুলা পরিতে বিলাস—

ইত্যাদি! শেষকালে বলা হইয়াছে, আদ্যা সব ভানি। শইয়া অফর অফকৃতক লুখান দিচ্ছেছি। ইত্যাদি।

বিবাহার ধরেন্ত্র বাসার কিত্তিতেছে, দরজার কাছে সেই খুবকটিকে দেখিয়া তাহার মন যেখোদয়ে মকুরের মত নৃত্য

করিয়া উঠিল। সে তনিয়াছিল, কেলেকারীর আভাসখাও প্রকাশ পাইলে, কেলেকারীর আলাবীয়া কাগজের খুবক করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে স্তুতি হর না।

ধরেন্ত্র কাছে আসিয়া মাঝেই বলিল, কি চাই?

বেসের পাচক হারের কাছে বলিয়া গতি-পাণ চিবাটতে-ছিল, ধরেন্ত্রকে বোঝাইয়া দিয়া বলিল, এই ধরেন্ত্র বাবু।

খুবক পকেট হাটে “পূরীকাল” বাহির করিয়া বলিল, এ সব কাগ দেখা?

—হেঁ হেঁ।

—যোড়া ডাক ডাকছে রে! গাড়ীও যোড়ার চালুকটা বের কর।

উন্টা বুঝিল রামের কণে কি হইল, তাহার বিশব বৃদ্ধান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। ধরেন্ত্র ধরাশয্যার বশন চক্ষুকামীদন করিল, তাহার কম্পিত অকরোঠ হাটে শল বাহির হইল, না!

খুব চিড় ভরিয়াছিল: জনতা সহানুভূতির সহিত অভিভাষা করিল, তোমার না কোথায়?

ধরেন্ত্র দৃষ্টে শিখালসহ ষ্টেশন দেখাইয়া দিল।

লোকগুলা ধরাধরি করিয়া তাহাকে ট্রেনে পৌছাইয়া দিয়া বলিল, কৈ তোমার না?

—জাকা।

লোকগুলা ভাল, সলবর, সহানুভূতিসম্পন্ন, চায়া করিয়া টিকিট কিনিয়া, গাড়ীতে গোড়াইয়া দিল।

পায়ের বাধা মরিয়াছিল, গাড়ী ছাড়িবারও নেই ছিল! আর সেই লোকগুলাও ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছিল, ধরেন্ত্র ‘জীবনতোষিত’তে গিয়া, বিছানা-বলিল, টাকা পয়সা, জুতা ভাণা, ব্যাগ ছাতা, ঘটি, বগ, বিভিন্ন কোটা, সিক্রেটের বাস, পূরীকালের কাউল, পারবিনীর পরিত্যক্ত একথানা গাড়ীতে বাধিয়া ট্রেনে কিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই, গার্ড সাহেবের বাণী বাধিয়া উঠিল।

আপনার ১২শে ভাষ্য ভাষ্যের সংখ্যার 'পতিত' শব্দের
সংজ্ঞা-সদৃশ্য 'বহুত্ব'র অর্থপূর্ণ পাত্তিত্য স্বয়ং একটি বিবৃতি
আমাদের নবোন্মোদন আকর্ষণ করিগে। ঐ বিবৃতিটির

সেখক ঐক্যব্রজনাথ পকতীর এবং উহা আমাদের ভ্রাণ্য সংখ্যার 'বহুশ্রী'তে প্রকাশিত 'গতিতর পতিত' মধ্যবসন' শীর্ষক মন্তব্যের প্রতিবাদ।

"অম্বকাল গীতার নিমিত্তক 'পতিত' বলিয়া অভিহিত করেন ঐহাঙ্গিককে সংস্কৃতবিদ বলা যায় না" ইহাই ছিল আমাদের বক্তব্য। আমাদের কথা আরও পরিষ্কার বাঙ্গালার প্রকাশ কল্পিত হইলে বলিতে হয় যে, পকৃত সংস্কৃত ভাষা জানা থাকিলে বর্তমান কালে আর নিজেই কেহ 'পতিত' বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন না, কারণ উহা একটা উপাধি এবং কোন উপাধিতে বর্ণনাভাবে বিবৃতিত হইতে হইলে উহার পদগত অর্থহীনতার যে যে গুণ ও কাব্যকমতা বুঝা, তাহার সমস্ত অর্থন করিতে হয়। আমরা গীতা লক্ষ্য করিয়াছি, তদনুসারে 'পতিত' শব্দে যে যে গুণ ও কাব্যকমতা বুঝা, তাহা গত তিন হাজার বৎসর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। কবেই মুক্তির অনুশরণ করিলে এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে গীতার অনুশরণ করিয়াছেন, ঐহাঙ্গিকের কাব্যকেও বর্ণনাভাবে 'পতিত' বলা যায় না। অথচ এই কালের মধ্যে অনেকেরই নিজেকে বস্তৃত্য পক্ষে পতিত বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। 'পতিত' আখ্যায় বিবৃতিত হইতে হইলে ঐ শব্দের অর্থহীনতার—যে সমস্ত গুণ ও কাব্যকমতার প্রয়োজন, তাহা অর্থন না করিয়াও যদি কেহ নিজেকে 'পতিত' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাহা হইলে বৃদ্ধিতে হইবে হয় তিনি প্রত্যয়ক, নতুবা 'পতিত' শব্দের অর্থ তাহার অপরিজ্ঞাত। 'পতিত' শব্দের উভয় হইয়াছে সংস্কৃত ভাষা হইতে। যিনি এই শব্দের অর্থ জানেন না, তিনি সংস্কৃতবিদ নহেন, ইহা বলা হইতে পারে। কবেই বর্তমান কালে গীতার নিমিত্তক 'পতিত' বলিয়া ঘোষণা করেন ঐহাঙ্গিক। যে সংস্কৃতবিদ নহেন তাহাও বলা হইতে পারে।

'পতিত'—শব্দের বর্ণনা অর্থ কি হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য প্রথমতঃ আখ্যায় সংস্কৃত ভাষার মূল ব্যাকরণ 'পানিনি' ব্যবহার করিয়াছি এবং তদনুসারে আখ্যায়ের বিবেচনামুযায়ী 'পতিত' শব্দের যে অর্থ হয়, তাহার সূক্ষ্মভাষ্য দ্বিধা করিবার জন্য 'পীতা'র 'পতিত' শব্দের যে সংজ্ঞা আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া 'পানিনি' এবং 'পীতা'র অর্থ যে এক, তাহা দেখাইয়াছি।

উপরোক্ত অর্থানুসারে 'পতিত' বলিতে যে গুণ ও কাব্যকমতা বুঝা তাহা যখন যে-যেপনর একজনও লাভ করিতে পারেন, তখন সেই যেরূপে অবনতি হইতে পারে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা হইতে পারে; মধ্য ভাগতর্কের ইতিহাস পড়িলে পাঠাই প্রতীক্শন হয় যে, গত তিন হাজার বৎসর হইতে আমাদের দেশে ক্রমশঃ অবনতি হইয়া বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কবেই মুক্তির অনুশরণে পতিত হয় যে, এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রকৃত 'পতিত' কল্পনা করেন নাই।

ইতিহাস পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয়, ভারতবর্ষে একদিন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং তৎপরেই ধাপে ধাপে উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাদৃশ উন্নতি আর কোনও জাতি অত্যাধি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য যে সূক্ষ্মভাষ্য, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা গত কয়েক মাস হইতে আমাদের 'বহুশ্রী' পত্রিকায় বহু প্রবন্ধের সমাবেশ করিয়াছি ও করিতেছি।

ভারতবর্ষের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন ভারতীয় জগদগণ এবং তাহার পতিতর আছে ঐহাঙ্গিক বৈদ্য, বর্মান, পুরাণ এবং সাংহিত্যাদি গ্রন্থে। এই বৈদ্য, বর্মান, পুরাণ এবং সাংহিত্যাদি গ্রন্থগুলির অর্থ পরবর্তীকালে বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া কি উপায়ে ভারতবাসীরা সৈন্যদল ভৌবন্যাত্মক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা এখন আর বুঝিয়া পাওয়া যায় না এবং সমস্ত ভারতবাসী অর্থদান ও অর্থবসনক্রমে হইয়া পড়িয়াছে। যে ভাষায় এই গ্রন্থগুলি লিখিত—তাগাইই নাম সংস্কৃত ভাষা এবং প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই এখন আর কেহ আমাদের কবিশ্রমের গ্রন্থগুলি বর্ণনা অর্থ বুঝিতে পারেন না। 'বহুশ্রী'তে এই লক্ষ্যে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়।

ভারতীয় কবির বৈদ্য ও বর্মানাদি গ্রন্থের অর্থ বিস্তৃত করিয়া তাহাবিধকে কতকগুলি কালমিক কথার ভাণ্ডার করিয়া ভুলিয়াছেন ভারতবর্ষের গত তিন হাজার বৎসরের তথ্য-বিশিষ্ট 'পতিতগণ'। আমাদের মতাদ্রুশ্যে, গ্রন্থকারের বক্তব্য বর্ণনা অর্থ বাখ্যা না করিয়া বিস্তৃতার্থে প্রচার করিলে গ্রন্থকারকে হত্যা করা হয় এবং এতদূর বিস্তৃত বাখ্যাকারি-

গুরু 'স্বাতক' বলা হইতে পারে। 'তত্ত্বজ্ঞান' আদ্যা গত তিন চাকার বঙ্গবের এবং বঙ্গবানের ভারতীয় 'স্বাতক' পতিতগণকে 'স্বাতক' বলিতে বাধ্য এবং তাহাই বলিয়াছি।

শক্তির মহাশয় আমাদের উপরোক্ত লেখার কোন কোন অংশের প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহা হ্রস্টে ভাষে আমরা বুঝিতে পারি নাই।

আমরা লেখা হইতে আমরা বাধ্য বুঝিচ্ছি, তাহা লক্ষ্যপত: এই—

(১) তাহার মতে আমাদের গুণিত হস্তাঙ্গক এবং 'দ্বিবিজ্ঞান'ের যে গণ্য কোন 'ডিগ্রি' আমাদের থাকিলে তাহা 'ডিগ্রি' লগ্না উচিত।

(২) অমরকোষ, হেমচন্দ্র, 'লক্ষণকরকর্ম'(?) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে "পতিত" শব্দের যে অর্থ, তাহা পানি-নিবোধের ব্যাকরণ ও ব্যাসদেবের পীতাম্বরে ঐ শব্দের যে অর্থ হয়, তাহার বিচ্ছেদ: কবেই পানিনিবেদের ব্যাকরণ ও ব্যাসদেবের পীতাম্বরে পতিত হইতে হইলে যে যে গুণ ও কর্তব্যমত: অর্জন করিতে হয়, তাহা অর্জন না করিয়াও পতিতভাবে হইতে পারে।

(৩) গত তিন হাজার বঙ্গবের ভারতবর্ষে কোনও প্রকৃত পতিত জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং বাহ্যিক লোকত: পতিত বলিয়া আখ্যাত, তাহারা বস্তুত: শকে কবিরিগের স্বাতকতার কাব্য করিয়াছেন, ইহা বলিলে অথবা স্বীকার করিয়া লইলে, যখন বিজ্ঞানবিভাগের নবগত-সভার রত্নগণ, ভগবান্, শতগাথা, কুমারিলকট, বাচস্পতিমিশ্র, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি প্রখ্যাতনাথ পতিতগণকে 'অপতিত' অথবা 'কবিরিগের স্বাতক' বলা হয়, তখন নিশ্চয়ই এই কথা অযৌক্তিক।

(৪) 'বক্সি'তে প্রকাশিত "ভারতীয় বিজ্ঞান ও মননের বর্তমান অবস্থা" শিরক প্রবেছে যখন "ভারতীয় বর্তমান সংস্কৃতবিশ্ব পতিতগণ" ইত্যাদি ব্যাক্যের ব্যবহার আছে—তখন 'বক্সি'র সম্পাদকগণও ভারতীয় বর্তমান সংস্কৃতবিশ্ব-গণকে প্রকৃত পতিত বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। অতএব তাহাদের কথার সামঞ্জস্য নাই।

(৫) মেট্রোপলিটান ব্রিটিশ ও পাবলিশিং কোম্পানীর

নি: যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত গ্রন্থের সম্পাদকগণকে যখন তাহারা নিজেরাই পতিত নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন, তখন কাহাকেও অপতিত বলিবার তাহাদের অথবা 'বক্সি'র সম্পাদকগণের অধিকার নাই।

(৬) 'বক্সি'র সম্পাদকগণের বিভ্রাট গভীর এবং তাহারা "অপতিত"।

(৭) পানিনিবেদের গত তিন হাজার বঙ্গবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৮) আমরা স্বাতকনাথ পতিতগণকে গালাগালি করিতেছি এবং আমাদের এবং বিধ গালাগালির আদোচনা করাও চুপার ঘোষা।

শক্তির মহাশয়ের বক্তব্যগুলির প্রত্যেক অর্থই বাধ্য বলিতে চাই, তাহা এই—

(১) আমাদের কোন গুণিত হস্তাঙ্গক এবং কোন তাহা হস্তাঙ্গক, তাহা তিনি আমাদেরকে অথবা জন-সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি? তিনি কি বলিতে চান যে, কোন বিশেষ বিশেষ গুণ এবং কার্যক্ষমতা অর্জন না করিতে পারিলেও এবং ব্যবহার-ক্ষেত্রে তাহার পরিচয় না হিতে পারিলেও, ভারতীয় কবিরিগ মাহুজকে পতিতভাবে হইবার অথবা করিবার অধিকার বিদ্যেছেন?

বর্তমান জগতে পরস্পর-ভগ্নকর্তনকারী-সমাজের (Mutual Admiration Society) সভ্যগণ সম্পূর্ণ স্বাধাধ ভাবে মাহুজের গুণ ও কার্যক্ষমতা পরীক্ষা না করিয়াও মাহুজকে যে বিবিধ উপাধিতে ভূষিত করিয়া থাকেন তাহা সত্য এবং তাহার ফলে প্রায়শ: বিন্দুশূন্য উৎস হইয়াছে ও হইতেছে তাহাও সত্য, কিন্তু ভারতীয় কবিরিগ তাহাদের কোন দূর প্রান্তের কোন স্থানে এবং বিধ উপাধিদের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা তিনি দেখাইয়া দিতে পারেন কি?

সংস্কৃত ভাষার জন্মভূমি কবিরিগের ব্যাকরণসমূহে "ব্রহ্ম", "ভগবান্", "বাচস্পতি", "সরস্বতী" প্রভৃতি শব্দের কি অর্থ এবং ঐ সমস্ত আখ্যায় বিদ্যুতি হইতে হইলে কবিরিগের নির্দেশসমূহে কোন কোন গুণের ও কার্যক্ষমতার অধিকারী হইতে হয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন কি? যদি বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে গত তিন হাজার বঙ্গবের হইতে পতনশীল ভারত বাহাদুরগণকে ব্রহ্ম, ভগবান্, বাচস্পতি, সরস্বতী

প্রতি উপাধিত কৃতি করিছেন, তাঁহাদের গুণ ও কার্যক্ষমতা যে সর্বত্রোচ্চ এবং সমস্ত উপাধি উপযোগী, তাহা উইসের কার্যাবলী ও প্রতিভা ভাঙে চটে মনোমাতৃক বৃথাইয়া দিবে কি ?

“পতৌদীন” অথবা “অলীন” নিজাবব অভিকারী পক্ষীয় মহাশয় পাঠকাল বর্ণনের “শব্দভান্ডারশাস্ত্রী বহুশব্দে নিবৃত্তঃ” (১ম অঃ : ২ম পৃঃ) এই বৃত্তীর অর্থ বুঝিতে পারেন কি ? যে সমস্ত কথা কোন বস্তু প্রকাশদান না করিয়া কেবল কণা পর্ষাদিত হয়, সেই সমস্ত কণার ব্যবহার অবশ্য করিলে মাত্র অসংখ্য হইয়া পড়ে, ইহা পঠকাল সেবের নির্দেশ, তাহা অলীন নিজাবব অভিকারী পক্ষীয় মহাশয় মাংগা করিতে পারিবেন কি ? গুত্ব তিন হাজার বৎসরে ভাবতবর্ষে যে সমস্ত ‘সত্তা’, ‘ভগবান্’, ‘বাচস্পতি’, ‘দশমতী’ প্রভৃতি আখ্যাতার উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা যে বৈশেষিক উপপাদ্য-কর্তা ভাবতীয় ভূমির বাসব বর্ষন ও বৈশেষিক ‘বিকল্পিত’ বাগ্ধার মাংগাত কথিতা তাঁহাদের বাসবতা নষ্ট করেন নাই, অথবা কণার কণা পর্ষাদিত জ্যোতিষ্কত্বের (Metaphysics) সৃষ্টি করেন নাই, তাহা পঠিতবর্ষ প্রমাণিত করিতে পারিবেন কি ?

আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে তাহা ঠিক এবং আমরা তাহার উপলব্ধি নহি তাহাও ঠিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাদের ডিগ্রী কাড়িয়া লইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিবেন কিনা তাহা আমরা জানি না, তবে পক্ষীয় মহাশয় জানিয়া যাবুন, আমরা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তপ বাবা করিয়া থাকি হটে, কিন্তু কখনও উহার বিরোধী নহি। তাঁহার নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় মানিয়া লইলে তাহা কার্যকরী করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

আমরা আশা করি, পক্ষীয় মহাশয় উপলব্ধি কথাতলি বপাবন ভাব বিয়া এবং তাঁহার প্রমাণগুলি ভনমাধ্যমের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া আমরা যে প্রকৃত পক্ষে হাতাম্পন তাহা প্রতিপন্ন করিবেন, নতুবা মনোমাতৃক লজ্জা অগ্রহ করিয়া পুনরাব লেখনীধারণ হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন।

(২) সংকৃত ভাষার মূল ব্যাকরণে ন্যস্তা পানিনিয়ের অমরা পুস্তক রচয়িতা ব্যাকরণের নিখিষ্ট কোন পক্ষে অর্থ

অবরোধ, যেমন অথবা শব্দকল্পত্রয় প্রভৃতি নিখিষ্ট কোন অর্থের বিধায়ী হইলে পানিনিয়ের অমরা ব্যাকরণকে উপেক্ষা করিয়া অমরকোষটির প্রণেতৃগণকে মানিয়া লইতে হইবে— ইহাই কি পক্ষীয় মহাশয়ের শিকলোক্ত জ্ঞান ?

(৩) তাঁহার মতন কণা ভবনে আমরা বাঙা বলিয়াছি, তাহাতে কি এই তৃতীয় কণার ভাব যে ওয়া হয় নাই ?

(৪) কেবল “ভারতীয় সংস্কৃতবিদ পঠিতবর্ষ” না বলিয়া একটা “বর্তমান” শব্দ বোঝ করিলে এবং “ভারতীয় বর্তমান সংস্কৃতবিদ পঠিতবর্ষ” এবং “ভারতীয় বর্তমান” এবং “ভারতীয় বর্তমান” পঠিতবর্ষের উপক কটাক করা হয় না ? অত্র যেমন ভাবে শব্দ ব্যবহার করিলে কটাক করা হইয়াছে বলিয়া মাত্র বুঝিতে পারে, সমস্ত ভাষার পক্ষে তাহা সম্ভব না হইতেও পারে। আমাদের কি বুঝিতে হইবে, “পক্ষীয় মহাশয়” মনোমাতৃক একটা কিছু জীব ?

(৫) পক্ষীয় মহাশয়ের বক্তব্যের এম বক্তার নিখিষ্ট অমর্যানে আমরা অমর্যাদী, তাহা সত্য। কিন্তু গুত্ব তিন হাজার বৎসরের অমরা তথ্যিক সময়ের জ্ঞান একধিনের মধ্যে পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিলে, যে ভাষার মন্তব্যাদিকারের পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা পঠিতবর্ষের থাকিতে পারে হটে, কিন্তু আমাদের নাই।

(৬) ভনমাধ্যম এবং আমাদের “পক্ষীয় মহাশয়” জানিয়া যাবুন যে, “বংশী” সম্প্রদায়ের বিদ্যা এত গভীর যে, তাঁহানিগকে “অপঠিত,” “মূর্খ” ইত্যাদি বলা যায় এবং তাঁহারা যে মূর্খ তাহা তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। পক্ষীয় মহাশয় এবং তাঁহার সমস্তপ্রিয় ন্যস্তিক পঠিতবর্ষের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য এই যে, তথাকথিত ন্যস্তিক পঠিতবর্ষ জানেন না যে, তাঁহারা কত বড় মূর্খ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন। আর “বংশী” সম্প্রদায়ের তাঁহাদের নিজ মূর্খতার কথা পরিজ্ঞাত।

(৭) পানিনিয়ের যে গুত্ব তিন হাজার বৎসরের মধ্যে ভনমাধ্যম করিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রমাণ বৃত্তিমূলক কি না, তাহার বিচার করিবার সামর্থ্য পঠিতবর্ষের আছে কি ?

(৮) আমরা যে ভাষার প্রমাণভনমাধ্যম পঠিতবর্ষের পরোক্ষভাবে মাংগাগুলি কথিত হই তাহা খুঁই লভ্য এবং প্রকৃত মাংগাগুলি কথা যে মাংগাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে তাহা

যোগ্য তাহাও সত্য; কিন্তু ভারতীয় কবিগণের মর্শন ও বোধানি
এয়ে কোন শ্রেণীর প্রাণোন্মীয়া বস্তু আছে এবং তাহা
কিঞ্চন ভাবে বিকৃত হইয়া রহিয়াছে, ইহা যদি পঞ্চতীর্থগ্রন্থ
পণ্ডিতগণ বিমূঢ়াভ্যন্তর অল্পমান করিতে পারিতেন, তাহা
হইলে আশঙ্কা যে কি বৈদ্যনার সহিত উপযুক্ত পণ্ডিতগণের
বিকল্প সমালোচনা করিতে অসম্মত করিয়াছি, তাহা বৃত্তিতে
পারিতেন। পঞ্চতীর্থ মহাশয় জানিয়া রাখুন, ঐশ্বর্য্য এই
জাতীয় বিকল্প সমালোচনার স্বরূপে পরিগণ্যে, তাহাও
জ্ঞানবদ্বান এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষগণও উপযুক্ত
জাতীয় পণ্ডিতগণকে সেব্যতাসম্পন্ন বলিয়া মনে করিয়া
আনিতেছেন।

ভারতীয় কবির জ্ঞান একদিন সারা জগতের সমাব্দ
স্বাক্ষর্য্যে বাদ্য দিতে পারিয়াছিল এবং তাহাদের জ্ঞান
বিস্তৃত অর্থে প্রসারিত হওয়ার আশা জন্ম হইতে মনুষ্যজাতির
অস্তিত্ব পর্যন্ত বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা হইয়াছে।

জগতের কবির পক্ষে কবিবার্থ্য অসম্ভব হইলে মানুষের
অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হইতে পারে, ইহা বুঝা কি পূর্ব
করেনা?

মনুষ্যজাতিকে এবাধিগত চরিত্র হইতে রক্ষা করিবার
একমাত্র উপায়, ভারতীয় কবিগণের গ্রন্থের বখাবণ অর্থ
পুনরুদ্ধার করা।

আমাদের কথা যে বিবেচনাব্যাপ্য তাহা “একত্রিংশ” ক্রমণ;
জ্ঞানটী করিয়া তুলিলে।

ভারতীয় কবিগণের গ্রন্থগুলির বখাবণ অর্থ উদ্ধার করিতে
হইলে প্রচলিত অর্থ যে ভ্রান্ত্যক, তাহা না বলিয়া পাঠা
যায় না। কয়েট প্রচলিত ভ্রান্ত্যকবর্ণকে বাধ্য হইয়া
পত্রোক্তভাবে লিখা করিতে হইতেছে। জনসমাখ্য কি
আমাদেরকে তুলত্ব করা করিবেন না?

মোটের উপর পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের সমালোচনার বাধ্য
বোধ হইতেছে, তাহাতে তাহার অগ্রাধি পারিতোষ(?) পরিচয়
আছে। ইহাটী কি বর্তমান সংস্কৃত শিক্ষার স্থপতিগণের
নিষ্পন্ন?

সম্পাদক মহাশয়, সর্ব্বশেষে আপনাব কাছে আমাদের
একটী নিবেদন আছে। সে নিবেদনটী এটী যে, বর্তমানে
ভারতবর্ষ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ভারত

কবিবার্থ্য অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ, ভারতীয়-
জ্ঞানীর উন্নয়নশক্তি এত কমিয়া গিয়াছে যে, এখন আর
কৃত্রিম কবিবার্থ্য করিয়া নিজ জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয় না।
যে দেশে কবির পক্ষে কবিবার্থ্য অসাধ্য হয়, সে দেশে
মানুষের জীবনধারণ করা বড়ই কষ্টসাধ্য, তাহা বলা যাইয়া।

তাহারই ফলে বর্তমান ভারতের বর্তমান দুর্গতি।
এই দুর্গতি বোধ করিবার একমাত্র উপায় জ্ঞানীর উন্নয়নশক্তি
বৃদ্ধি করিয়া। কবিবার্থ্য লাভজনক করিতে হয়, তাহা অল্পতে
একমাত্র ভারতীয় কবিগণ জানিতেন, ইহা মনে করিবার
কারণ আছে। অনেক মনে করেন যে, বর্তমান আবেদিকা
এবং কলিকাতা প্রভৃতি কবিবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারিয়াছেন,
কিন্তু তাহাও সত্য নহে। বর্তমান কোন কোন জাতি একটা
তথাকথিত কবিবিজ্ঞান সস্তী করিয়াছেন, তাহা সত্য এবং
তদনুসারে কাঁধা করিলে জ্ঞানীর উন্নয়নশক্তিও কিম্বদন্তিমাণে
বৃদ্ধি পায় তাহাও সত্য, কিন্তু তাহাতে কবিবার্থ্য কবির
পক্ষে লাভজনক হয় না এবং উৎসর্গ ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ব্যাধার
হয় না।

আমরা বহুদূর বৃত্তিতে পারিয়াছি, তদনুসারে বলিতে হয়
যে, ভারতীয় কবির উপযুক্ত কবিবিজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে।
ভারতের “ঋতু”, “গগান”, “বাচস্পতি”, “শরৎ” প্রভৃতি
পণ্ডিতগণের কৃতকর্মে ফলে—এবং এখনও ঐ বিজ্ঞানের
পুনরুদ্ধার-কাঁধা বোধ প্রবল করিবেন এই “পঞ্চতীর্থ” জাতীয়
কাণ্ডজানহীন তথাকথিত পণ্ডিতগণ। আমাদের এই কথা
যে বৃত্তান্ত, তাহা পঞ্চতীর্থ মহাশয়ের বক্তব্যের প্রথম দফার
অবধি আমাদের বাধ্য বলিয়াছি, তাহা বিচার করিলেই বুঝা
হইবে। বাস্তবতে ভারতীয় কবির কবিবিজ্ঞান পুনরুদ্ধার করা
যায় এবং তাহা জনসাধারণের বাগা গৃহীত হইতে পারে,
তাহার চেষ্টা করা “একত্রিংশ” অস্ত্রতম উদ্দেশ্য।

আমাদের আশঙ্কা হয়, পঞ্চতীর্থজাতীয় পণ্ডিতগণের কথা
প্রচারিত হইলে, জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইতে পারেন এবং
বাহ্যতে ঐ বিভ্রান্তি না আসিতে পারে তদনুসরণ প্রভৃতির
সেওয়া আমাদের কর্তব্য। কয়েট এই জাতীয় কথা প্রচারিত
হইলে তাহার অর্থ দিতে বুঝা সম্ভব করিতে আমরা
স্বাধ্য হই। ঐ বিভ্রান্তিকর কথাগুলি আপনাদের কাগজে ছাপা

না চেষ্টা প্রতিবাদিগণ যৌনিক জবাবের জন্য আমাদের নিকট প্রেরিত হইলে, অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যে তাঁহাদের সম্বেদনশক্তির জাগরণ হয় এবং তাহাতে সকলের প্রয়োজনীয় কর্তব্য কার্যে আমাদের দিকে যোগ দেওয়া হয়। আপনার নিকট হইতে কি আমরা এইটুকু সহায়তা আশা করিতে পারি না? ইতি—

বিনীত—শ্রীমন্তেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদক, কলিকাতা সংস্কৃত সমাচার

অষ্টোপনিষৎ (প্রতিঃ ৩০) পার্শ্ববর্তিঃ হট্টন দিঃ

৪০ বর্ষাবস্থা হিট, কলিকাতা।

ভারতীয় দর্শন

[১৪ ১৫ ইত্যে। 'বৈদিক' পরিবার সম্প্রদায়ের প্রথম দুইটি প্যারাগ্রাফ প্রকাশিত হইল; ইহার যে উদ্দেশ্য তাহা হইল যে 'বৈদিক'-এ প্রকাশিত হয়, 'বৈদিক'-এর সম্বন্ধে তাহা যথেষ্ট স্পষ্ট হইল।]

কলিকাতা সংস্কৃত সমাচার প্রকাশিত ও পাল্লভ ভাস্কর প্রকল্পনাথ রায়চন্দ্রের সম্পাদিত ও সম্পাদক প্রকাশিত কথিত রক্ত একজন লোক যেমন ইষ্টার পুত্রের সম্প্রদায়, তাহাতে মনে হয়। ইহা মনে আসিলে শুই হইয়া যুক্তির দ্বারা আসে, এমন কোন ব্যক্তি মাপনীয় বা আপনায় বৃদ্ধির ব্যক্তি ও অসুস্থের ব্যক্তির সম্ভাবনা এই ব্যক্তি আসিলে শুই করিতে হয়। তাহাও উচিতভাবে উল্লেখ করেন—

দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে মনে—পার্লভক বসন্তাচারে কীর্তি করিয়া উঠা করিলে পার্লভক কিছুই হইবে না, নিজেই বসন্তাচারে হইয়া সন্তান হইবে। তাহাও মাপনীয় যে শুই ভাস্কর মনে—কলিকাতা অস্ত্রের ঐক্যবর্তি, ভারতীয় দর্শনিক শাস্ত্রের মতই হইয়া মনে হইল যে ভারতের দর্শন ও অস্ত্রের বুদ্ধি করিতে হয়, একজন আর লোকের মনে। তাহাও মাপনীয় মনে হইবে, এমন ব্যক্তিও মনে হইবে যে মনে করিতে পারে না।

ভারতীয় দর্শন ও ভাঃ মাপনীয় : শ্রীমন্তেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

['বৈদিক'-এ প্রকাশিত]

শ্রীমন্তেন্দ্র 'বৈদিক'-সম্পাদক বসন্তাচার

কলিকাতা—

মাপনীয়,

আপনার ১০ই তারিখের বৈদিকের সংখ্যার সংস্কৃত

কলিকাতার অধ্যক্ষ ডাঃ মন্তেন্দ্রনাথ মাপনীয় দ্বারা একটি "প্যারাগ্রাফ" আবার মনে হইল আকর্ষণ করিয়াছে।

আপনি তাহাতে লিখিয়াছেন যে, একজন লোক ডাঃ মাপনীয়ের অস্ত্রের ও অস্ত্রের প্রকাশিত কথিত রক্ত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে। আপনি তাহাদের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন, তাহা আপনার লেখা হইতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না বটে, কিন্তু তাহার মনে হইয়াছে, আপনার উপরন্তু প্যারাগ্রাফে "বৈদিক" প্রাথমিক সংখ্যার প্রকাশিত "ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্তমান অবস্থা"-বৈদিক প্রকল্পের উপর কটাক্ষ আছে।

"বৈদিক" এই প্রথম আদি দ্বিতঃ প্রকাশিত হইয়া লিখিয়াছিল এবং তাহার সম্পাদকগণ অল্পপ্রাথমিক উদ্দেশ্যের সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রথমটি তাহাও প্রতি কোনজন যে-হিংসামূলক বিবেচিত হইলে লিখিয়া আবার। তাহাও জনসাধারণের অবগতির জন্য আমার কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন আছে মনে করি এবং তাহাই আমি নিতে বলিয়াছি। আপনার ভাষ্যের আমার কৈফিয়ত প্রকাশিত হইলে আমি অসুস্থ হইব।

আমি একজন অর্ধদর্শনিক বৈদিকবাসী দোকানদার। কথিতদের রক্ত শরীরে আছে বলিয়া লিখিয়া বটে, কিন্তু নিজেও ভাস্কর মনে করিতে পারি, এমন কোন কারণ নিজের রক্তের বুদ্ধি পাঠ না। পার্লভক, বৈদিক, পার্লভিক, অথবা কোনজন প্রকৃত শিক্ষার শিক্ষিত বলিয়া জনসাধারণের নিকট কখনও পরিচিত চই নাই এবং ইহাও চোঁও করি নাই এবং এই তাহা কোন আকর্ষণ আদ্যে নাই। মাপনীয় সাংসারগণের কথিতদের পুত্রকগুলি বাড়ীচড়া করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাহা হইতে সাধারণ ভাষা বুদ্ধিহীন, তাহাতে নিজেও অস্ত্রের বুদ্ধি বলিয়াই মনে করিতে হয় এবং তাহাই কথিত থাকি। আমি বলি বলি যে, কোন ব্যক্তিগত দর্শনের আশা ডাঃ মাপনীয়ের বিবন্ধ সমালোচনা করি নাই, তাহা কি আপনি অথবা আপনার পাঠকবর্গ বিশ্বাস করিবেন না?

বিনীতভাবে ভাষ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতি এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার দিকে আমার লক্ষ্য তাহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বলাই বাহ্য। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, গত বিশ বৎসর হইতে বর্তমান জগৎ ক্রমশঃই বিপন্ন

সমুদ্রে অগ্ৰহান হইতেছে এবং তাহার প্রধান কারণ জগতের সর্বত্র ভূমীর উর্ধ্বতাপশক্তি ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। কোন ভূমিতে একটা সর্বত্রই উর্ধ্বতাপশক্তি না থাকিলে ক্রমশঃ পক্ষে তাহার চাপ করিয়া লাভবান হওয়া সম্ভব নহে এবং ক্রমশঃ লাভবান না হইতে পারিলে কৃষিকার্য্য পরিচাল্য করিতে বাধ্য হয়। কৃত্রিম সাহায্য ভূমীর উর্ধ্বতাপশক্তি কতক পূরণ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু আমি বহুতর বুঝিয়াছি, তাহাতে তদ্বারা ক্রমশঃ লাভবান হইতে পারে না এবং তাহারই জন্য জগতের সর্বত্র কৃষিকার্য্যে উপর উৎসাহ উদ্ভব হইয়াছে। কৃষিকার্য্য না চলিলে পিন্ন অথবা বণিষ্ঠা চলি সম্ভব হয় না এবং ক্রমশঃ মানুষের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইতে পারে।

কি করিয়া ভূমীর উর্ধ্বতাপশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার অধ্যয়ন করিতে বলিয়া কয়েক বৎসর হইতে আমি ভারতীয় কৃষিদের সর্ব্বত্র উৎসর্গের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছি এবং আমি অধ্যয়ন করিয়া আমার বুঝিবার বহুতর বৃদ্ধিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয়, জগতে বর্তমান বিজ্ঞান বলিয়া বাংলা বাংলা চলিতেছে, তাহার সমস্তই বিকৃত এবং প্রকৃত বিজ্ঞান একমাত্র ভারতীয় কৃষিগণ ভানিতেছেন। ঐ বিজ্ঞানের লক্ষণ বহিরাছে কৃষিগণের “পূর্ণ” ও “উত্তর” বীনাংলা নামক দুইটি বীনাংলা, তদনুসারে কার্য্য করিয়া “বিস্তার” বহিরাছে “অধঃস্রব” এবং ইহার ভিত্তি “কৃৎ”, “যতু” এবং “শাস” নামক তিনটি বৈধ। কৃষিগণ প্রকৃত বিজ্ঞান ভানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এক সময়ে সারা জগতের গ্রন্থ-বাঙ্কায়ার বিধান করিতে সর্ব্ব হইয়াছিলেন এবং সারা জগৎ এক-নভালবী হইয়াছিল এবং তাহারই জন্য বোধ ধর্ম্মের আগে “বৈদিক” ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ধর্ম্মের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। যে ভাষার কৃষিগণের ঐ বিজ্ঞান লিখিত, তাহা কাশ্মীরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই জন্য এখন তাঁহাদের বাস্তব সন্দেহ (observations) বৈদ্যগণ তাহা ব্যাখ্যাৎ হয়, তাহাকে বাস্তব কারণিক মেটাফিজিক্স (Metaphysics) বলিতে বাধ্য হইয়াছে।

অন্য গণিতেন, উৎসাহিত সমস্তই আমার ব্যক্তিগত ধারণা এবং আপনাদের প্রকৃতি না হইলে আমি কাহাকেও উহা বিশ্বাস করিতে অস্বস্তি করি না।

দৈনিক সংসারগত পরিচর্যা সমগ্র ভাঃ দাশ জগতের বহুতর আশার নকশে পড়ে। ভাঃ দাশ গুপ্ত আশার সূক্ষ্মগঠিত এবং তিনি দার্শনিক বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। ইয়োথোনে আমার পরিচিত লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা একজন দার্শনিক ভারতীয় কৃষির কথা প্রচার করিতেছেন দেখিয়া আমি আশ্চর্যের সহিত তাঁহার পড়িতে আরম্ভ করি। কিন্তু তাঁহার বহুতর আমি মর্মান্বিত হইয়াছিলাম। হয়ত অপর কেহ ঐ ভারতীয় কথা বলিলে আমার উৎসাহ আসিত, কিন্তু ঐহাণ উপর বাহালা দেশের সংস্কৃত শিক্ষার দ্বিতীয় কৃত্ত বহিরাছে, তাহাও মূণ হইতে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অত্যাধিক কতকগুলি বিকৃত কথা কৃষিদের কথা বলিয়া ভিন্নরূপে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম, তাহা আমি বীকার করিতে বাধ্য।

আমি নিক্ত বেদগণ অশিক্ষিত, তাহাতে মত বড় লক্ষ্য-প্রতিষ্ঠা দার্শনিকের বিকৃত সমালোচনা করা আমার পক্ষে নিরাশ অগোচর, তাহা আমি বীকার করি, কিন্তু কৃষিদের কথা আমার মত্যাধিকারে বিকৃত ভাবে ভিন্নরূপে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া কোন্ সময়ে কনিত পানি নাই। পরন্তু কৃষিদের উপবেশনের বিকৃত প্রকৃত্য নানে ভাঃ দাশ গুপ্তের বিকৃত সমালোচনা আমি করিয়াছি, উদ্ভট আমি আমার অপগাণ বীকার করি।

“দার্শনিক” বলিয়া যে প্রতিষ্ঠা ভাঃ দাশ গুপ্ত লাভ করিয়াছেন, তিনি তাহাও উপযোগ্য কিনা, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বহুতর আমার সন্দেহ হয়। তদনুসারে আমি তাঁহার সমালোচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু তখনও আমার সন্দেহ বহুতর হয় নাই।

“ভারতীয় বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বর্তমান অবস্থা” শীর্ষক গ্রন্থে আমি তাঁহার যে যে কথা অত্যাধিক বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহা পাঠকগণকে দেখাইয়াছি এবং ভাঃ দাশ জগতকে কতক-গুলি বিষয়ে প্রেরণ করিয়াছি। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, তিনি তাঁহার স্রবাস মিলেন এবং আমি তাঁহার উপর আমার বিশুদ্ধ স্রবাস আশার কিগাইয়া আনিতে পারি। ভগবতের জন্য “বঙ্গ-প্রবীণ” সম্পাদকগণ আমার অত্যাধিকার্য্যে তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহাও উত্তরে তিনি সম্পাদক-গণকে আনিয়াছেন যে, তাহাও বহুতর বহাষণ ভাবে সংবাদ পত্রপ্রকাশগণ প্রচার করেন নাই।

“বঙ্গভূমি”, “ভারতের বর্তমান অবস্থা”

ও পাণ্ডিত্যভিমান

[“বঙ্গভূমি” নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ২৪শে তারিখের সংখ্যা প্রকাশিত “পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী”র পত্র অবলম্বনে লিখিত]

শ্রীমুক্ত অবতার সম্পাদক মহোদয়ের

কৃতকর্মণে—

মহাশয়,

আমার নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি আপনাদের বিখ্যাত সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইলে অল্পগ্রন্থীত হইবে :—

“বঙ্গভূমি” একখানি নূতন মাসিক পত্রিকা। ইহা মেট্রো-পলিটান প্রিন্টিং ও পাবলিশিং হাউস লিঃ নামক কোম্পানী দ্বারা ৭৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীট (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত।

আমি ঐ কোম্পানীর অস্ত্রতম ডিরেক্টর এবং পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ কর্তব্যী। নিম্নলিখিত কৃত্ত মহোদয়েরগণ আমাদের ডিরেক্টর সভার সভ্য :—

শ্রী বাবুদেব শ্রীমুক্ত বটেশ্বর জ্যোতী—বরেন্দ্র কটন মিল লিঃ
প্রবন্ধকার

বিখ্যাত শ্রীমুক্ত বটেশ্বরনাথ বসু, এম-এল-এস, এমবী

“ হার হারিকর ” পাল, লেখক

শ্রীমুক্ত হরপ্রসাদ বিশ্বাস

যে সমস্ত কথা বাঙ্গালী পাঠকসম্প্রদায় নিকট “বঙ্গভূমি” নিবেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা সুখাতঃ এই—

[এইখানে বর্তমান সংখ্যা “ভারতের বর্তমান সমস্তা ও তাহার পূরণের উপায়” প্রবন্ধের শেষাংশ “(১) ভারতের সর্বত্র জমীর উর্বরতাশক্তি অত্যন্ত কমিয়া যাউতেছে” হইতে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করিতে হইবে। ঐ অংশই “অবতার”-এর পাঠক-বৃত্তের অবগতির জন্য বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ অংশ ব্যতীত এই আলোচনার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝা যাইবে না, সুতরাং এই “আলোচনা”র পাঠকগণ অগ্রদূতপূর্বক ঐ অংশ পাঠ করিয়া এই আলোচনা পাঠ করিবেন।]

সংক্ষেপতঃ উপরোক্ত কথাগুলি হুটাইয়া উঠাইবার জন্য আমি পত্র অগ্রদূত মাস হইতে “বঙ্গভূমি”তে “ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্তা ও তাহার পূরণের উপায়” শিরোনামে প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছি।

আমি যে এই কথাগুলি বাঙ্গালী পাঠকগণের সমক্ষে নিবেদন করিতে আরম্ভ করিবাঁচি, তাহাও একবার কারণ আমার বীর “প্রাণের দার”। দেশবাসী যে হাহাকার উঠিয়াছে তাহার ভক্ত্য এই অধিক বর্ণনা আমার মনে হইয়াছে যে, তাহার প্রতি অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ করিতে না পারিলে, আমাদের কাচাও বাবসা লাভজনক থাকিবে না। আমি যে কথাগুলি বলিতেছি, তাহা সাধারণতঃ নেতাগণের মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। হস্ত কেষ্ট কেষ্ট মনে করিবেন, আমি নেতৃত্ব করিয়া অধর হইবার আকাঙ্ক্ষা এই কথাগুলি বলিতে আরম্ভ করিবাঁচি। আমার কাহারও উপর কোনরূপ নেতৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই—তাহা আপ-নাগা বিদ্যমান করুন। আমি ঐহাদের পরিচালক, তাহাদের কাহারও অনুসরণের উপর নেতাগণি করিবার আশা করা অনঙ্গতঃ; কারণ আমি নিজেই একজন অদর্শিত বৈষ্ণব-ভাষণের বণিক।

আমি কৃত্ত হইয়া যথোপযুক্ত প্রণীত লাভ করিতে পারি নাই হইতে, কিন্তু প্রায় শকাব্দগণিত বর্ষ বিবিধ প্রমত্তীসম্প্রদায় মধ্যে কাটাইতেছি এবং সুখাতঃ তাহাদের বেগা অরে বীর শরীরের পুষ্টি সাধিত হইতেছে এবং তাহাদের বেগা অর্থে অতিমানসজ্ঞানক মোটরগাড়ী, অট্টালিকা প্রভৃতির ব্যবহার করিতেছি। আমার জীবনব্যাপী সামান্য কার্যের কণে নিজের চরিত্র সংকে বাধা বুঝিবাঁচি তাহাতে বলিতে হয়, একজন সাধারণ প্রমত্তীবীর যে ধৈর্য এবং সহনশীলতা আছে, তাহা আমার নাই। কাহেই যদি আমায় প্রভাষণ না করিয়া থাকি, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে হয় যে, যদিও আমাকে ঘটনা-চক্রে আমার ব্যবসায়ের কার্যাক্ষরে নেতৃত্ব করিতে হয়, তথাপি আমার শিক্ষা ও চরিত্র যে কাহারও উপর নেতৃত্ব করিবার অঙ্গনবাসী, তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য।

সুখাতঃ আমি আমার অঙ্গনমুক্ততার কথা পরিজ্ঞাত বলিয়াই “বঙ্গভূমি”তে প্রাণের দারে আমি বাধা দিখিতেছি, তাহা প্রক্সর নামে চলিতেছে।

“শকটোর্ব” মহাশয় “বঙ্গভূমি”তে প্রকাশিত পণ্ডিতবিশেষের সহকে যে মন্তব্যের প্রতিধান করিয়াছেন, তাহা আমার লেখা।

তিনি বলিয়াছেন যে, আমি ধর্ম ভাল জানি—ইহা ইচ্ছিতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবাঁচি, তাহা ঠিক নহে। খুব সম্ভব

তিনি মনোযোগসহকারে আমার লেখা পড়েন নাই। আপনারা প্রাণ মাসের ‘বনজি’র ঐ অংশ পড়িয়া দেখুন। আমি ঐ জাতীয় কোন কথা লিখি নাই; কারণ ঐ জাতীয় মনোভাব আমার ক্ষরে নাই। আমার আশায়া কবিরসের বিশাল ধর্মন-শাস্ত্রের (observations) কথিক ‘আবান’ আমি অমূল্য কল্পিতছি। তাহা সত্য, কিন্তু ঐ ধর্মনগতিক বর্ণন ‘ধর্মন’ কবিরার উপযোগী চকু আমি চোঁটা করিয়া ও লায় করিতে পারিতেছি না বলিয়া সর্বদা দৈর্ঘ্যপ্রকব করিয়া থাকি। যদি আমার লেখার বৈশ্ব বাতীত কোনরূপ দস্তুর প্রকাশ হয় তাহা হইলে আমিই বৃত্তিতে হইবে, আমি আন্তরিকতায়ক এবং লাভি পাইবার উপযোগী এবং আমার লেখা অনতিবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে।

গাহার উপস্থিত সৃষ্টিপত্তি লাভ করিয়া ভারতীয় কবির ধর্মন কাণ্ডে: উপস্থিত করিতে পারেন না, তাহার পত্তিত বলিয়া অভিহিত হইবার অমূল্য—ইহা বর্ণনাময়ের উপস্থিত বলিয়া আমার বিশ্বাস। ব্যাকরণময়ের উপস্থিত অমূল্যের প্রকৃত পাণ্ডিত্য বলিতে বাহা বুঝার, তাহা দেশের মধ্যে একজনদেরও থাকিলে ধোঁপে সর্বব্যাপী এইরূপ হাফাকার উদ্ভিত পারিত না—ইহাও আমার ধারণা। ইহারই জন্য আমি লিখিয়াছি যে, গত তিন হাজার বৎসর হইতে আমাদের ভারতবর্ষে প্রকৃত পত্তিত ভয়েন নাই এবং গাহার নিম্নলিখিত পত্তিত বলিয়া প্রচার করেন, তাহার বস্তুর: সংস্কৃত ভাষা পদ্ধতি জানেন না।

পক্ষতীর্থ মহাশয় তাহার চিত্রিত এক স্থানে লিখিয়াছেন—
“ * * * যদি কোনও বর্তমান মহামহোপাধ্যায় একখানি মহাকাব্য লেখেন, তাহা যদি পাঠ্য নির্মাণিত হয় এবং আধুনিক মহাকাব্য পাঠ্য করিলে, সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য ও ধর্মন দ্ব্যাত্মক হইবে এই বলিয়া চীৎকার করিয়া যদি উক্ত পাঠ্য পরিবর্তন করিবার চোঁটা করা যায়, তাহা হইলে বুদী হইয়া ব্যক্তিবিশেষ মাসে মাসে পাঁচ সাত পত টাকা করিয়া দিলেও নিতে পারে” ইত্যাদি।

ইহার সঙ্গে তাহার মূল বক্তব্যের কি সম্বন্ধ আছে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। পক্ষতীর্থ মহাশয় কোন প্রকৃত ঘটনা লক্ষ্য করিয়া তাহার চিত্রিত ঐ অংশ লিখিয়াছেন কি না তাহা প্রকাশ করেন নাই। আংশিক রূপে তাহার উপস্থিত একটা ঘটনা আমার জানা আছে। আমি পাঠকবিশেষ

লিখিতার্থে তাহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন অমূল্য করিতেছি, কারণ তাহা না করিলে আমার ‘আশায়া’র, একটি নির্দোষ লোকের অন্তি হইতে পারে।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস দ্বিজেন্দ্রনাথ নামক একটা পত্তিতক ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। তিনি আমার কাছে কয়েক বৎসর আগে কিছু টাকার জন্য ‘আদিদাখিলেন এবং আমাকে তাহার সম্বন্ধে বলিয়া একটা সম্মান দেখাইবার অন্তিমপ্রসঙ্গে আমার সন্তুষ্টি উপস্থাপন করিবার চোঁটা করিয়াছিলেন। তাহার লিখিত কথাবার্তার আমার ধারণা হয় যে, তিনি অত্যন্ত দান্তিক। তিনি ভারতীয় কবির কোন ধর্মন অথবা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানেন কি না তাহাও আমার সম্বন্ধে হয় এবং আমি তাহার বাস্তব পূরণ করি নাই; তাহার উপর আমার বিচার দস্ত হইল কি না তাহা নির্ণয় করে তাহার প্রবৃত্তি ২১১ পানি কায়ের জীবা ও অমূল্য স্থানে স্থানে আমি পড়িয়াছিলাম এবং তিনি যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা জানেন না, তৎসম্বন্ধে আমার ধারণা বহুদূর হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পূর্বে তদ্বিত পাইলাম যে, তাহার প্রবৃত্তি একখানি ‘কাব্য’ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক: হাফগুপ্ত মহাশয় পাঠ্যরূপে নির্মাণিত করিতে বিশিষ্টছেন। ঐ জাতীয় পুস্তক ছাত্রলিঙ্গের পাঠ্যরূপে নির্মাণিত হইলে, তাহাদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের অধিকতর বিকৃতি সাধিত হইতে পারে, ইহা অশঙ্ক্য করিয়া বাহাতে উহা পাঠ্যরূপে নির্মাণিত না হয়, তদন্তরূপ প্রতিবাদ করিবার জন্য আমার বন্ধু—বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতভাষায়ক ডা: শ্রীকৃষ্ণ অমরেশ্বর ঠাকুরকে আমি অনুরোধ করি। পরিশেষে আমি জানিতে পাই যে, ঘটনা-চক্রে ডা: ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ পদ্ধতি করিবার সুযোগ পান নাই।

ডা: ঠাকুর আমাদের কোম্পানীর শাস্ত্র-প্রচার বিভাগের অবৈতনিক সম্পাদক। আহা তাহাকে এই কার্যের জন্য অত্যাধিক কোনরূপ আর্থিক সহায়তা করি নাই, অথবা বেতন প্রদান করি নাই।

আমার বিশ্বাস, মহামহোপাধ্যায় হরিদাস দ্বিজেন্দ্রনাথ মহাশয়ের গ্রন্থ বাহাতে পাঠ্য ন হইতে পারে, তাহার উৎসাহ্য তিনি দেখাইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি বাহাতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কণ্ঠস্বয়নের বিরক্তভাষন হয়, তাহার একটা

চেষ্টা হানে হানে চলিতেছে এবং পক্ষতীর্থ মহাপন্থের উপবোধক উক্তি প্রবৃত্তরূপ একটী মনোভূতির প্রকাশক।

অতীতকালকার পণ্ডিতদিগের মধ্যেও অনেক অদ্বৈতিক, মতাবলম্বী লোক আছেন। আমি তাঁহাদিগকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। পক্ষতীর্থ মহাপন্থ যদি আমাদের লেখা হইতে বুঝিয়া থাকেন যে, আমি সমস্ত পণ্ডিতসমাজের হুঁশা রটনা করি, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত।

মহানরোপাখ্যায় চরিত্রাল সিদ্ধান্তবাগ্যেণ বৃথা অভিমানী হইলেও পরিশ্রমী এবং সমস্ত সমস্ত লোকসমূহের কথা কহিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি। বাক্যগত ভাবে কোন্ পণ্ডিত কতখানি বিচার অধিকারী, তাহা আমার আলোচ্য নহে।

সিদ্ধান্তবাগ্যেণ মহাপন্থ যদি বাস্তবিক পক্ষেই ভারতীয় দর্শন ভাবিবার ও বুঝিবার উপযোগী হয়ই থাকেন, তাহা হইলে বৃত্তান্ত হইবে, তাঁহার শব্দকে আমার ধারণা ত্রাস্তিসূলক এবং আমি অপরায়ী এবং আনাকে তাঁহার নিকট কখন চাহিতে হইবে।

অন্য আমার এখনও বিশ্বাস, তিনি সংস্কৃত ভাষেন না এবং অসম্ভবভাবে তাঁহার পুস্তক পাঠ্যরূপে নিষ্কাষিত হইয়াছে এবং তাহা অসংলগ্ন ঠাকুর উহার বিশেষত্ব কহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারই প্রয়োচনার স্বেপের এই লক্ষটাকালে পক্ষতীর্থ মহাপন্থ আমাদের “বকশী”কে হাত্যাশব্দ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

পক্ষতীর্থ মহাপন্থ আরও সিদ্ধিলাভেন—“আমি লেখককে আক্ৰান্ত করিয়া বলিতেছি—তাঁহার ইচ্ছানুসারে যে কোনও মহানরোপাখ্যায়কে বিচারে আক্ৰান্ত করিয়া যদি ১০ মিনিটকাল তিনি দর্শন শাস্ত্রের বিচার চালাইয়া বাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই মহানরোপাখ্যায় সেই মিনিট তাঁহার সকল উপাধি বর্জন করিবেন।”

পাঠকগণ, আপনারা বিচার করিয়া দেখুন, উপাত্তক উক্তি লক্ষ্যপ্রসূত কিনা এবং ইহার পক্ষান্তে কোন মহানরোপাখ্যায় আছেন কিনা। যদিও আমিই লেখক, তথাপি ইহার ভর আমি কাহাকেও বিচারে আক্ৰান্ত করিব না, কারণ আমার বিশ্বাস, ভারতীয় দ্বিগণের “দর্শন”গুলি যৌর মনে মনে বিচার করিয়া “দর্শন” করিবার ও উপলব্ধি করিবার বস্তু। তাহা

বুঝিবার জন্য অধ্যাপক ও সতীর্থগণের সহিত তাহার আলোচনা করা বাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা লইয়া নিজ প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য কাহারও সহিত বাদগ্রহণ চলিতে পারে না।

বাহ্যিক নিম্ন প্রাধান্য-স্থাপনের জন্য অধ্যাপকের সহিত “দর্শন” লইয়া বাদগ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহার ভারতীয় দ্বিগণ দর্শনের প্রথম উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া আমার ধারণা; অধিকন্তু আমি ভারতীয় দ্বিগণ “দর্শন” বুঝিবার মত যথোপযুক্ত দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইতে পারি নাই—তাহা আমেরই বলিয়াছি।

সিদ্ধান্তবাগ্যেণ মহাপন্থ একতঃ সংস্কৃত ভাষেন না বলিয়া আমার ধারণা—তাহাও আমি প্রকাশ করিয়াছি। দ্বিগণের সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ভাষার মূল বাক্যরূপ পার্শ্বনির্ভর সহিত কথকিত পরিমাণে যথার্থভাবে পরিচিত হইলে উহার “ক কার্যনি” বর্ণনালার কোনটীর কি অর্থ এবং কেন তাহার ঐ অর্থ, তাহা জানা যায়।

কৃষিদিগের বাক্যসূত্রে মাহুয়ের শরীরে যাহা প্রবেশ হইলে তাহার তাত্ক্ষণিক “বৃত্তি” অঙ্গুলারে অঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন রূপে কণ্ঠ্য হয় এবং প্রবৃত্তরূপ শব্দ নির্গত হয়। তাহাও মাহুয়ের অঙ্গ, বৃত্তি, উপাদান, গুণ অথবা অধ্বা তাহার শব্দের অর্থের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহারই জন্য “বাক্যদণ্ডের” নামক গ্রন্থ নির্দেশ আছে যে—

“মিত্যঃ শব্দার্থলব্ধাঃ সমাধাতা মহাবিভিঃ”

(১ম কাণ্ডের ২০ শ্লোক)।

একতঃ সংস্কৃত ভাষাসূত্রে কোন একতঃ সংস্কৃত শব্দের অর্থবা পদের একতঃ অর্থ কি তাহা পরিভ্রান্ত হইতে হইলে, এই শব্দটি অর্থবা পদটিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হয় যে, উহা মাহুয়ের কোন্ অঙ্গের কোন্ অর্থবা কি উপাদান-সম্মত হইয়া উচ্চারিত হইয়াছে এবং উহা উচ্চারণের কালে কোন্ শ্রেণীর অধ্ব্যার উত্তর হইয়াছে।

আমার মত অর্ধশিক্ষিত লোকের পক্ষে কাহাকেও পরীক্ষা করিতে বাধ্য নিত্যক অসম্ভব, তাহা আমি বুঝি এবং বীকার করি। অথচ বাহ্যিক বৃথা বস্তু উদ্ভব, তাঁহারই বাদান্তিক, তাহা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করাও লোক-লোভের প্রয়োজনীয় বলিয়া আমার মনে হইতেছে।

কাবেই সিদ্ধান্তবাহিন মনঃশয়ক আমি এর কবিত্তে বাধা
হইতেছি।

পঞ্চতীর্থ মনঃশয়ের কথাগুলোই হিঁদী আমাকে মন নিমিত্ত
মনঃশয় হইল।

প্রথম মিনিটের প্রশ্ন—

“মর্শন” শব্দের মনঃশয় মর্শ কি? এবং “মর্শন” বলিতে
যে কার্য বুঝায় তাহা কৌশল কার্য এবং পরিতের কোন কোন
অন্তর কোন কোন অস্বাভাবিক কোন কোন উপাদানের মিশ্রণে
ঘটিয়া থাকে, তাহা মনঃশয়কে বিশ্লেষণ করিয়া এবং তাহার
সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সিদ্ধান্তবাহিন মনঃশয় পাঠকবিশেষকে
বুঝাইয়া দিবেন কি?

দ্বিতীয় মিনিটের প্রশ্ন—

আমার পাঠকবিশেষের মধ্যে যদি কেহ বলিয়া বলেন যে,
বাহ্য্য পৌর শাস্ত্রবাহিনের ছোট-বড় প্রতিলিপ্য করিয়া
কল্প বাস্তুস্থানে প্রকৃত হই, তাহার মনঃশয়বহী হইলেও অস্বাভাবিক
সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইলেও, কবিবিশেষের ভাষা অঙ্গুলারে
“মাহু” ও “ব্রাহ্মণ” নহে, পণ্ডিত “পণ্ডিত” ও “চণ্ডাল” এবং কবি-
বিশেষের ভাষা অঙ্গুলারে এই সত্যবানমহাবাহু, সিদ্ধান্তবাহিন এবং
পঞ্চতীর্থ, এই তিনটি ভাষাকে “পণ্ডিত” ও “চণ্ডাল” বলা হইতে
পারে, তবে বাক্যটি অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে, কিন্তু
যুক্তি অঙ্গুলারে করিলে, আমার যে “পণ্ডিত” এবং “চণ্ডাল” নহি,
তাহা জনসমাজে প্রতিলিপ্য করিতে প্রথমতঃ “মাহু” ও
“ব্রাহ্মণ” এই দুইটি শব্দের মনঃশয় মর্শ বিশ্লেষণ করিয়া
আমাবিশেষকে দেখাইতে হইবে যে, “মাহু” ও “ব্রাহ্মণ” বলিতে
যে যে উপাদান, গুণ ও কর্মকর্মমতঃপদার্থ ভাব বুঝায়, আনন্দের
সেই সেই উপাদান, গুণ ও কর্মকর্মমতঃ আছে, অতএব আমরা
“মাহু” এবং “ব্রাহ্মণ”।

সিদ্ধান্তবাহিন মনঃশয় “মাহু” এবং “ব্রাহ্মণ” এই দুইটি
শব্দের “মনঃশয়” মর্শবাহিনে কি কি উপাদান, গুণ এবং
কর্মকর্মমতঃপদার্থ ভাব বুঝায়, তাহা উহার অন্তর্গত প্রত্যেক
মহাটির সহিত সামঞ্জস্য দেখাইয়া আগামী সংখ্যায় পাঠক-
বিশেষকে বুঝাইয়া দিবেন কি?

যদি বলা যায় না বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি
স্বীকার করিবেন কি যে, পঞ্চতীর্থের উপাদানের পরামর্শ-

মতঃশয় প্রত্যাহিত হইয়া তাঁহাকে অস্বাভাবিক “মনঃশয়-
পাধ্যায়” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন এবং তিনি “পণ্ডিত” ও
“চণ্ডাল”?

যেহেতু বর্তমান অস্বাভাবিক আমি নিজেই সর্বসম্মতি “পণ্ডিত”
ও “চণ্ডাল” বলিয়া মানিয়া লইতে স্বীকৃত আছি। কাবেই
আমার বাংলাই নাই।

“পঞ্চতীর্থ” ভীষণতরক্কি বুদ্ধি বলা যায়
না, কারণ তিনি মনঃশয়পাধ্যায় সিদ্ধান্তবাহিনের প্রয়োজনীয়
লিখিতগ্রন্থের বলিয়া তাহার মনো হইতে মনে হইতেছে।
যদি সিদ্ধান্তবাহিন তাহা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে পাঠক-
বিশেষের বুদ্ধিতে হইবে যে, আমি সিদ্ধান্তবাহিনকে কিছুই
বলিতেছি না এবং আমার মনঃশয় উক্তি “সিদ্ধান্তবাহিনের” ফলে
“পঞ্চতীর্থ” বলিয়া প্রকৃত।

পঞ্চতীর্থের কথাগুলোই, যে-কোন মনঃশয়পাধ্যায় আমার
প্রশ্নের জবাব না দিতে পারিলে তিনি তাহার মনঃশয় উপাধি
পরিচয় প্রকৃতি প্রশ্নের অঙ্গুলারে। মনঃশয় মনঃশয়পাধ্যায়ের
মনঃশয় উক্তি করা পঞ্চতীর্থের কাণ্ডকারখানার ন্যায়
পরিচয় হইলেও, এতটী মনঃশয়পাধ্যায় যে তাঁহার পণ্ডিতে
আছেন এবং সেই মনঃশয়পাধ্যায়টি যে তৎপাক্ষিত
“মনঃশয়পাধ্যায়” প্রণেতা “সিদ্ধান্তবাহিন”, তাহা মনঃশয়
করা যায়। কাবেই সিদ্ধান্তবাহিনকে আমরা বলিতে হইতেছে
যে, তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে না পারিলেও আমি
তাঁহাকে তাঁহার “উপাধি” বিশুদ্ধতরক্কি বলিয়া না, কারণ
এতগুলি মনঃশয় প্রকৃতি বলা করিয়া অস্বাভাবিক হইলেও উহা
হাস্য্য তিনি তাঁহার পরিচয়বর্ণনের অঙ্গুলারে করিয়া থাকেন।
যদি তিনি আমার প্রশ্নের জবাব না দিতে পারেন, তাহা হইলে
তাঁহার নিকট আমার অস্বাভাবিক থাকিবে তিনটি, বলা—

(১) তিনি মনঃশয় পরিচয় করন এবং নিজে যে প্রকৃত
ব্রাহ্মণ নহেন, তাহা বুঝিতে অস্বাভাবিক এবং ব্রাহ্মণ হইবার
চেষ্টা করন।

(২) তাঁহার ন্যায়ের মনঃশয় মনঃশয়পাধ্যায়ের ব্রাহ্মণ
পরিচয় প্রকৃতি অস্বাভাবিক করন এবং তাঁহারের মধ্যেও যে
প্রকৃত ব্রাহ্মণ এখন আর নাই, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করন
এবং তাঁহারা কি হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তাহার
চিন্তা করন।

(৩) 'সংস্কৃত'-শিক্ষাবিধিগণ যাহাতে তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত অনেক অনভ্যন্তরিত শব্দের ব্যবহার করিতে ইষ্টাচ্ছে।
না হইতে পারে, তৎক্ষণ তাঁহাদের তথাকথিত "মহাকাব্য"খানি
আর দ্বারাতে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক বন্ধুর ডাঃ দাশগুপ্তের দ্বারা ইতি—
পাঠ্যরূপে নিষ্করচিত না হয়, তাহাদের ব্যবস্থা করুন।

পাঠকগণ, আমি আপনাদের অনেক সময় লইয়াছি।
এখন আপনাদের দিচ্ছান্তব্যাপী নবায়নের জবাবের প্রতীক্ষায়
থাকুন। শেষের ও মাত্রের অবস্থা বিশেষনা করিয়া আনাকে

বিনীত
ঐগজিবানন্দ ভট্টাচার্য্য
স্বদেশী কলিকাতা
২০ শ্রাবণ ঈ.স. কলিকাতা।

শারদ-স্মৃতি

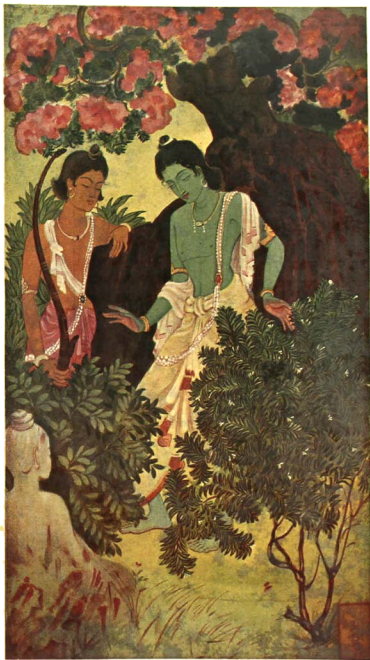
—ঐ অপরূপ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বালকের দ্বারা বহু না ক'র অস্ত, বাবল বাজে না গগননাথকে,
লিপিল বেইনে নিকৃৎস্থল, শরৎ উদার আনোকে রাত্রে।
সামান্য-মাত্রা ধানের শিত্তা বাতাসের সাথে তরিতে বেলা,
বিলের তিতরে গাছ-পাশিকেরা স্মিহা মেড়ার প্রভাতবেলা।
এপাতের ওই পুষ বাগুদের বটের স্তম্ভের চরণস্থলে,
তাদের নদীর 'ভগ্নবোধন-জলতরঙ্গ' উঠিছে ঢলে।
নৌকনৈভোপাঙ্গে গায়ন করিয়া লব্ধ তরঙ্গ পাড়িটি পনি'
শরৎ-লক্ষী আসে ঘোরে ঘোরে ধাক্কা'লিটী ঈর্ষে দরি।
আঁধারী ফুল ঘন ভেঙে উঠে শিশির-সিক্ত স্রাবসনাগ,
মৃগ সেপায় গুহনরত বিছারে তাহার কাকল্যপাণ।

বেলা আঁধার হু করে ওই আশাবরী গাহে অরুণ কবি,
তব্ব কানের পড়িয়াছে লাড়া প্রবের পুঙ্ক পঙ্ক লতি';
কুহল চাঁদ্রার মর্ঘবন্ধনি বেগুনে ভাসে মধুর জ্বাচে,
পরীরগণি যে শ্রাবন বোধিতে সাপ-পা জ্বলের নালী রাঁধে।
স্মৃতি নিয়ে কত ছোট ছোট মেঘে চলেছে পুষ্প-চয়ন তরে
তাদের নুপুর-নিকল তনি' আকাশ-বহু দ্বাদিষ্ট করে।
বিহব-বলাকা হরবে ফিটল তব্ব আকাশে উড়িয়া যায়,
পানিরা বোলে তরুণা'পরে আপনদী-গান বুসিয়া গায়।
মহা-শীত বাজিছে কোথায়? আমি কি মোদের পুণ্যতিথি!
তোদের বেলায় ভেসে আসে কানে দেবী-বোধনের বাতসীতি।

মনে পড়ে যায়, হু অতীতের স্মারস্মী কথা এ শুভগণে,
সীতার লাবিরা রত্নকলমনি দেবীতে পুজিল মরমপণে।
আঁধারের ঘোষানে গভীর মন্ত্র জাশিল সিদ্ধান্তে,
হিবালর হুঁতে জননী আশিরা ঈড়ালো পুণ্য বোধন-বটে।
সেমিন ভারতজাতির জীবন বিশ্বচুবন করেছে আলো,
স্বর্গ হেথার প্রেমের নামিরা নগ্নভারতেরে বাসিরা ভাল;
আমি ভারতের অতি উজ্জ্বল ঈশ্বরি তুলে অত্যাধা বেশ,
নাহি আর সেই শৌণ্ডা অগাধ, অতীত হরের রয়েছে বেশ।
স্মৃতি পুণ্ডিত আঁধারান গুণবলিত স্নানবে তানে,
বাহুকী-নাগের রক্তধোষেই ভূমিকম্পনে বহিছে জ্বাশে।

ধর্মিও জানি যে, এমন দিনেই কত না চোখেই বহিছে জল,
জীবনের পথে শুকায়ে গিয়াছে সাথের কুহল ছিন্নফল,
তবুও সে সব বেধনা বাপিরা খেক না বন্ধ নীরব জ্ঞান।
দেবীর চরণে প্রণাম করিয়া নবজীবনের রচিব গান।
পুণ্যের বেলায় স্বর্গ-বালন করিছে দেবীর চরণতলে,
তব্ব, সেবার আঁধার কর দেবীর তক্তি পদাঙ্গলে।
পুণ্য-উপজায় সাক্ষারে শেকলি শপিনে জঘন-অর্থ-ডাল,
অজলি গিচে-পত-দুর্হিত। ঈড়াবে চুয়াতে কনকবালা।
শক্তিপুণ্য বহু মাশিরা আহগা কিয়ান দেশের পতি,
পাক্তি-সমীহ রয়েছে ধরাধ, লভিব আবার স্বরগ-তোমারি।



দক্ষিণাপথ

পানোরো দিনে ভ্রমণ শেষ করতে হবে ; সবর অন্ন, কিছু আকাজক নিত্যজ্ঞ অন্ন ছিল না। আন বড়, হাত ছোট হ'লে সেরব হয় চেমন আর কি! ইচ্ছেটা পানোরো দিনে ভারত ভ্রমণ শেষ ক'রে বসি সবর থাকে, এমিয়া খুটটোও বেগে নিই। পুঁজি কত তা আর বলে কার নেই! The loss



কুঁচাটা : মন্দিরস্থলী।

said the latter. বিবের আগে কোন্ ছেনা বা কোন্ বেয়ে রাতা মগরাশা খত্তর করনা না করে ?

কনকাতা থেকে এক দোড়ে পুরী,—পুরী থেকে কশরক, কনারকটা আগে দেখা হয় নি। কি-বারই “পঞ্চমাংন”, খুঁড়ি, “ভক্ত-নান-দি ‘চিনি’ ও তাঁগ শাবকস্বক সঙ্গে থাকতেন, এবার অতি কষ্টে পড়িও পুণ্যে সত্যের পুণ্য। এই মহাভদ্র বাঁকাটি

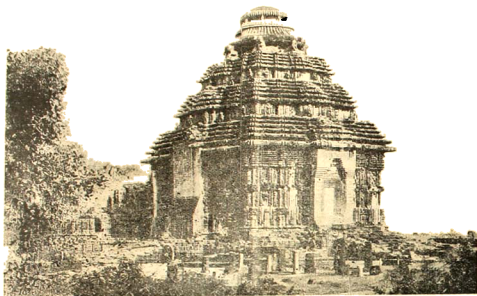
সেবে বিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। ভগবান সেবের পূজা দিয়েই রওনা হওয়া পেল—কণারকের উদ্দেশে। মোটরগাড়ী, মোটরবাস চলে, গোকর গাড়ীও চলে। বিশেষ কারণে আমি গোকর গাড়ীর শরৎ বেওয়া লম্বত বোধ করলাম। বিশেষ কারণ ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ ছিল, কথা—(১) গোকর

গাড়ী বসেনী নিজের নিবর্নি (২) এই থেকেই অনেকের ছোটো গোক একটা চালক, আর চালকের পরিবারের অমের সংস্থান হবে। মোটরগাড়ীর গুরুগাণ-কতা করলে আনৈরিক হবী হতে পারে, তাতে আশার কি!

কণারকের হৃদয়মন্দির বেগে জোপ ধাপিয়ে পেল। তখন আকাশে সবে মায় তরুণ অন্নদের রাঁধা আলো ফুটেছে, কালো মন্দিরের গায়ে এসে পড়ছে সেই অরুণ আলো! ভারতের ভারতের নিগাটব ও কল্পনার অভিনবব চারতে বসলে জান হারিয়ে দে। কত মূল অতীত হয়েছে, চরমের কাল কত জিনিষ, কত শোভা, কত সম্পদই ত নষ্ট করেছে, তবু যা আছে, তাতেই মাথা ঘুরে পড়ে জীবের পাবের কাছে,—থাক! এই সব বিরাট জিনিষের কল্পনা ক'রে তাকে মূর্খি মিরেছিলেন।

ভুবনেশ্বর গাওয়ার কথা ছিল ;

কিন্তু সমস্যাভাবে হ'ল না। ভুবনেশ্বরটা ভাল করে দেখা হয় নি, মনের মধ্যে কিছু অস্পষ্ট হয়ে গেছে ভুবনেশ্বরের চিত্র, কেবল মুক্তেশ্বর মন্দিরের বিচিত্র দৃশ্যের তোরগটি মনের জোখে আঁক ও অল্প অল্প করছে। হাত-বাগে তাঁর একটি ছবি রয়েছে দেখলাম। এবার চম্ মনে ভুবনেশ্বরের স্নাতুল চরণে বাব বার প্রণিপাত করে মুক্তেশ্বরের সন্ধ্যাবেলায় পড়লাম।



খজুরাহো : মন্দির ।



মণিরো মণিরো : (মণিরো) ।

তিনি ত দুইয়ের ঐক্য, তিন-তুইয়ের কোন খবরই তাঁর
জ্ঞাত নহ, আমি যে 'মিত্র'ই আমি সাক্ষ্যদাতা, কেবল
সম্মানার্থে তাঁর সহযোগে 'প্রতি' চালিয়ে গেলাম, এটা জানতে

আমি বাকী নেই, স্মরণ! অপর্যাপ্ত যে তিনি নেবেন না তা
আমি জানি! এত করে দেখানো অপর্যাপ্ত নিলে বাস্তবের
সমা কি ছিল, পৃথিবীতে ছ'ত ও টে'কে!

খুবসানোতে ঐশ্বর্যের চমকায়। পলে পড়প ডিঙা।
সলে যায় সবুজ (বক-উপদ্রাণের) দেখে এসেছি, তবু ডিঙা
যেখানে থাকার পাশে না। খুব প্রমত্তী চমকায় তবু দেখেও
একটি শাসনিতা ব্রীচাকন্যা গোয়েন্দা গোয়েন্দা দেখতে পাশে
নাযে কি? তারা ডিঙা ঘান, তারা প্রস্থান নানেন; আর

চুখির কাছে নেবে এসেছে। ডিঙা খুব গভীর নদ, মাঝে মাঝে
কট গভীর, মাঝে ছয় কট মাহুল উচ্চ। কারণে হেঁটে নেড়োতে
পাশে। বায়ুতড়নে তলে যে গুরু লম্বা-লম্বা উঠে তার
বোধে ডেউ কোথায় নেই, তবে মানিকপতনের কাছে তলেছি
খুব উচু ডেউ,—সমুদ্রের সঙ্গে ডিঙার কোণাকুলি সেইখানেই
হেঁটে।



হুতবাহু বঙ্গিলাপন বোলে : হুতবাহু।

যারা স্নাত পাড়ীতে বসেই ডিঙার পোতা উপভোগ করেন,
তারা হুতবাহু পর থেকেই পাড়ীর বোর জানালা আগ্রহ
করেন। বিপদবিপদ নীল বায়বায়ের মাঝে মাঝে লজ্জা-
সমাকর্ষ ধীপগুলি মাথা উচু করে ঝাঁকিয়ে আছে; ডিঙার
এক পাশ থেকে চলে গেছে, সেই বিখ্যাত ওয়েটার্স ঘাট
পূর্বতমালা—কোথাও হুতবাহু গগনম্পর্কী কোথাও বা সমতল-

আমার পাড়ীতে একটি গুহাটি
সম্পন্ন হারী ছিলেন। খুবসানো ছাফার
পরেই তারা বিভিন্ন বার্থে শব্দা নিলেন,
হুতবাহুে নানিগত অহরোহ আনিবে
তলেন যে, ডিঙা এসে নেন তালেন আনি
তলে দিষ্ট। কথা নিলাম, না বিবে কি
করি? বিশেষ করে মহিলাটি অহরোহের
সহে মিনতি বিশিষ্টে নিগেছিলেন।

তেননের পর তেনন পার হচ্ছে আর
আনি টাইমটেল ও হাত-খড়ি বিশিষ্টে
যাচ্ছি; উচু, বঙ্গিলাপন হুতবাহু আশের
তেনন।

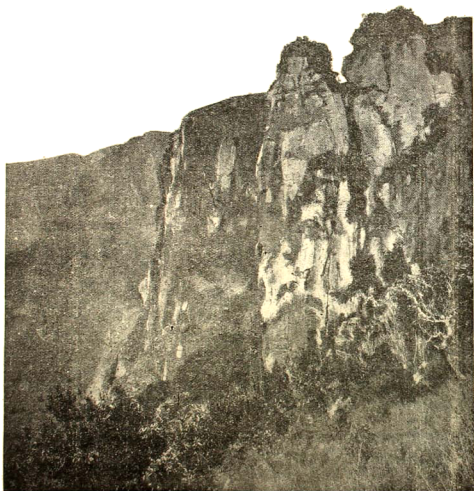
উপরের বার্থে যানী আর নীচে
ওপাশের বার্থে যানী, তলেনই গাত নিভার
অভিহৃত। যানী মহাপ্রতি ধরত
গোলাক ভানান নিগে হুতবাহু : হী
নিগেহ বটে, কিন্তু গার স্পন্দনহীন।
এখন তালেন ডাকতে হবে! যানী
মহাপ্রতির কাছে গিরে ডাকডাকি মুক
করে নিলাম, তলেনোক্তির হাঁস হাঁস
বলে মনে হচ্ছে না : নিশান একই টোপা,
তাতেও না; এনার হালা। হালা খেয়ে
হুতবাহু পার্শ্ববর্তন করলেন এবং
বিশ্ব উৎসাহে নানায়জ্ঞান হুত কর-

লেন। আর একটা হালা, আর একটু হোরে। তলেনোক্ত
আবার right about turn করলেন; তারা নানিগত বর্কীর
কথা 'হুতবাহু' সম্পন্ন করে যেতে লাগল। কি হুতবাহু
পড়া গেল গা!

বহু এসে এক গেল—এইবারই ডিঙা। টাল উঠেছে—
ধরই বিবাহের বধূ মত সেজেছে, হয় পূর্বদা, না হয় প্রতিপদ,

প্রকৃতি সৈবীর সঙ্গীতে তপালী কাণড়। ঐ চিহ্ন! তাঁপনে যে বা যাবা তাল বেলেছে, বাদেব ভালবাসা বেহের
মৌলিয়া যেন আর কোথাও নেই, সব ঐ বাঁশ চালের উপর রক্তের সঙ্গে পলকের সঙ্গে ছড়িয়ে আছে, 'অ' পরমাণুতে

২

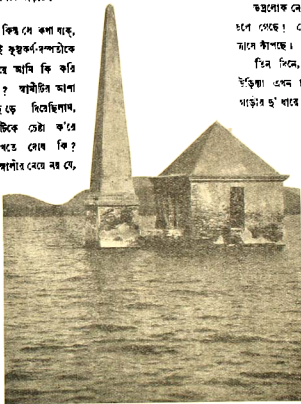


পিলার রক (Pillar Rocks) কোদাইকানাল।

ছড়িয়ে পড়েছে। একলা জুতোখে এ মৃত্তক বেপে যেন আশা নিশে গেছে, তাকেই ছেকে এনে দেখাই! একটা তাল
যেটে না! সাধ পুরে না। যনে হয়, বাকে ভালবাসি, কিছু, হৃদয় কিছু, বেধেদেই আবার কি তানি কেন, তাদের

কথাই মনে পড়ে, ঘাসের আনি ভালবাসি, বায়া আনা
ভালবাসে। জীবনে কাকে কত বেশী বা কত কম ভাল
বেসেছি, তার বাপ করবার চেষ্টা কখনও করি নি, আনি
কত লোককেই ভালবেসেছি, আর কত লোকের ভালবাসাই
পেয়েছি। এই সব সময় তাঁরা এসে মনের মধ্যে বাধি
লাগিয়ে গাড়ল।

কিন্তু সে কথা থাক,
এই কৃষ্ণকর্ণ-বন্দ্যটাকে
দিয়ে আমি কি করি
গা? আবিষ্কার আনা
হেঁড়ে দিচ্ছেলাম,
স্ট্রীটকে চোরা ক'রে
বেশতে দেখে কি?
বাঙ্গালীর বেয়ে নয় যে,



চিনা।

হুঁকো শালীনতার আঘাত লাগবে বা ভয় পেয়ে কাণ্ড করে
বসবে। ডাকলাব, ‘মার্জাব’ বলে! বেশখান যোগা স্থানীয়
যোগা সহধর্মিণী বটে! ভদ্রবান যেন বুঝে বুঝে ভোড়
মিলিয়েছেন। অনেকবার অনেক বসে ডাকলাব, সা রে গা
বা পা বা নি, মগধবরের খেলা যেখানায়, কিন্তু কোন ফলই
কমল না। অগত্যা স্ট্রীকে ছেড়ে আবার স্বাধীকে অক্রমণ
করণ—বাথার বালিগটা ঘরে এক টান। তত্নলোক রক্ত-

চক্রেতে চেয়ে বেখতেই বলাবান—বশাই গো, চিনা চলে যায়
যে।

—ওকে তুলে মাগনি?—বলে নিয়াট বপুটিকে নানাবার
চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমি চুপ করে থাকিবে রইলাম; ভাললাম, তিনি নান্নন,
নেনে তাঁর স্ট্রীকে তুলুন।

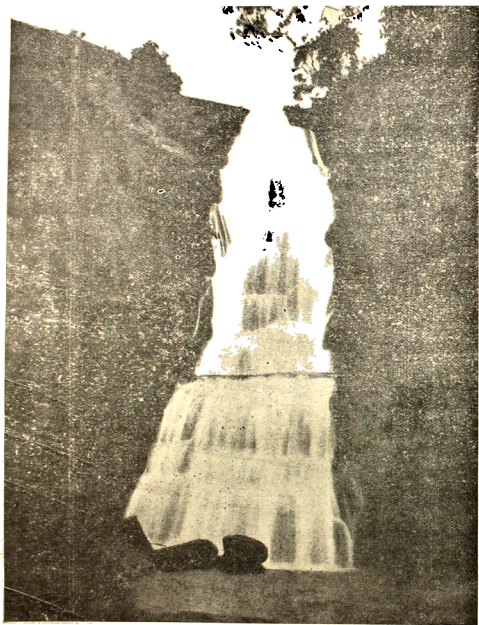
তত্নলোক নেনে স্ট্রীকে তুললেন, কিন্তু চিনা তখন লড়াই
চলে গেছে! মোংলাঘাত গ্রাহন ট্রেন-বৈতোর হাফারে
মানে কাপছে।

হিন হিনে, হিনটী-প্রশ্নে চলে এসেছি বাঙালি, বিহার
উড়িয়া এখন চলতে মাভাভ। হিন সাত পাড়ী ছুটছে,
মাড়ীর হু' ধারে নদ-নদী, পল্লী-প্রাচীর, আদ, মল্ল-সংঘাত,
‘ছুটছে’। পাড়ী ধামলে ওরাও ‘খানছে’,
মটলে লমানে হুটে চলছে। দেশেতে
দেশেতে চোখে শ্রান্তি এসে পড়ে।

কলস তিরকম হইবে আমি বে,
তবে বৈশ্বের ভাগ মাঠই গড়ে রয়েছে,
অকর্ষিত। দেশের লোক যেন চাষের
কাছ তুলে গিয়েছে। বিচার করে
লেখলে বুঝা যায়, চাষ করতে তারা
কোলে মি বটে, তবে বাধা ছবে তুলতে
বসেছে বা ছাড়তে বাধা হচ্ছে। প্রাক-
ত্মিক বিপ্লবের তার অস্তিত্ব কারণ।
আগেকার কালে—হেনী দিনের কথা নয়
—পনের সৃষ্টি বছর আগেও চাষের বয়-
কার ও লম্বা মত প্রাকৃতিক বর্ষণ হ'ত,
চাষীরা ঘনের আনন্দে লাঙ্গল ঝড়ে পল্লর
পল্লর মলতে বসতে মাঠে যেত, চাষ

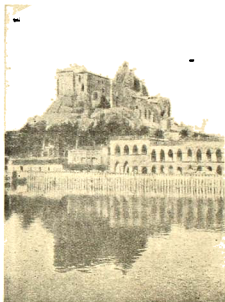
করত, সময় মত কলস তুলে ক্ষেত আনত। প্রকৃতি তার
স্বভাব বা নিয়ম বললে কেলেছে। গত ক' বছরই চাষের সময়
হচ্ছে অনাকৃষ্ট। আর সময় অজ্ঞাত হলে ময়, অতিবৃষ্টি।
একে ত কলস নেই, তার ওপর অতিবৃষ্টি বলা প্রকৃতি
প্রাকৃতিক বিপদগাত্রে চাষী বিপদ ও বিপর্যাস হচ্ছে।

দেশের কোন নদী বৎসরের অধিকাংশ সময় তলভাগ-
লব্ধ থাকে না। নদী বৎসর জলভারশক্তি না থাকলে আমি



ରୂପସାଗର (Silver Cascade falls) : କୋସାରି(କୋସାଗର) ।

বলগ্রহণে বঞ্চিত হয়, আকাশ রুটি না দিলে ভবি ভুটখাটা ও উষ্ম পড়ে থাকে। গত ক' বছর ধরে এট রকমই হচ্ছে। ফলশ্রুতি ভাঙ্গলে কৃষক থাকেই বা কি, ভবিষ্যতের আশাট বা সেবে কি করে, তার প্রয়োজনীয় হয়ানিই বা কিনেবে কি করে? তাই (অতঃপূর্বের দৃষ্ট চোখে না দেখলে ও থাকাদির শ্রে দৃষ্ট সমস্তরূপে চোখে পড়ছে) বাঙালী দেশে কৃষকের অবস্থা শোচনীয়তম হয়ে উঠেছে। কৃষক কৃষিকাজের আশা-



ত্রিভঙ্গী।

ভরসা ছেড়ে দিয়ে আশ্বাসের বস্ত চাকরী-বাকরীর আশায় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, দলবাকী দেখতে পাচ্ছি।

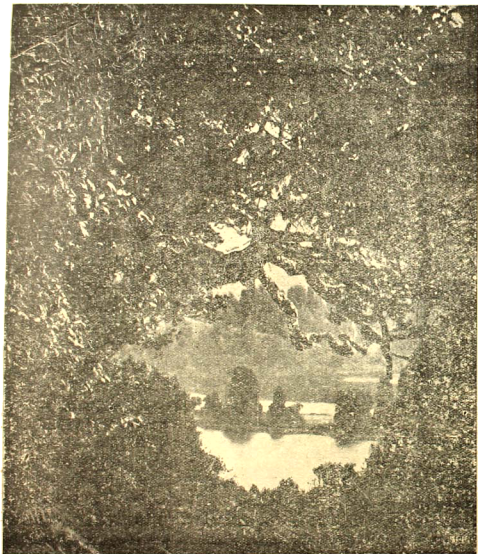
এই ভিন্ন গিলে কত মল-নদী, পাল-বিল, বেলেবর তলা বিলে, পাখি বিলে 'চলে যেন', কোনটার বুকভরা ভল রেখণান না। কোনটাতে ভল আছে—নায়ে, পায়ের পাতা ভোবে না, কোনটার বুক শুধু বাসুভরা, কোনটা সম্পূর্ণ সমস্তল হয়ে গেছে। এট সকল নদীর বান্ধা উদ্ধার করে বাসিদ্দয় করা কি একাক্ষত অসম্ভব? থাকে থাকে আশ্বাস সবকারের চৌটার খাল (Irrigation Canal) খননের কথা শুনি, লবণার যে কৃষকের চাষবাসের কাজের উন্নতি সাধন কবরার

ভক্তে খাল খনন করান, তাও বৃষ্টিতে পারি; কিন্তু সেলের প্রয়োজনবল ভুলনার কয়েকটা Irrigation Canal যে সম্ভবের ভুলনার গোশ্ববলন, তা কি আর বৃষ্টিতে হবে? চাষেরে মানচিত্রে ভারতবর্ষের নদীসমূহ ও ভবির অবস্থান লক্ষ্য করলে এ সত্য সহজেই জবরদস্ত হয় যে, দারী বেলেবর ভবি থাকে নদীর ভল থেকে সকল সমস্টই রল সংগ্রহ ক'রে উর্দ্বা ও কলসলভর হয়, 'মস্ট্রীত—মস্ট্রীত' অস্ট্রীতকালে কে বেল চৌটা করে তাই অগ্রহণ। নদীর উৎপত্তি-স্থান পর্গতপিবর হতে নদীর সমস্তস্থান সাগর পর্যন্ত সমস্ত নদীতে 'আধার' যদি ভলরকার বাবস্থা করা হয়, তা হলে যে কৃষি-কাজ রবক ছাড়াত মূল কয়েকে, যে কৃষির অবস্থার মতে সেলের অবস্থিতি ওয়গোতভাণে ভড়িয়ে আছে, সেই কৃষি-কাজ আবার লাক-রনক হবে, কৃষক আবার ভাত-খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে; সেলের লুপ্ত লভি ফিলে আসবে।

আমি বৈজ্ঞানিক নট, বিজ্ঞানের কথা বলবার অধিকার আবার নেই, তবু বিজ্ঞান-বিজ্ঞান এককটি 'বস্ট্রী'তে বা সেলের ভো পঠি কবে এ বিখাল আবার ভলসেছে যে, বর্ধমান বিজ্ঞানভে সেলের কৃষি-সম্পদ অপরূপে লগেই লগরতা করছে। 'বস্ট্রী'র পাঠিকেরে দৃষ্টি আধি ঠে অল্লা তথলপূর্ণ প্রকটভবির প্রতি সমস্তর আকৃষ্ট করছি এল সেলের একতম অস্টি ভুঁক সেবকরণে ভলসাধারবকে সেলের 'ভলসা' ও ভাস ভোভনের উপার লগকে অবস্থিত হতে লনির্দিক 'অস্ট্রীত' ভলপন করছি।

এট যে সেলের 'ভ' দানে লিগ্টি-প্রলস্কিত উষ্ম কের পড়ে রবেছে, তাতে চাষের বাবস্থা ক'রে পাগল নে, ভাগকুর ভুর্ধিষার অবস্থান হবেই সে বিধের আশাল বিল্কাভ লসেব নেই। কৃষি উন্নত হ'লে, কৃষকের অবস্থা ফিলে, সেলের শিল বল, বাগিভা বল, খনবল বল—সবট লক্ক হবে। 'আম' যে ভলগ্যাপী হারোকাগ, ভলের ভল, বহের ভল, প্রয়োজনীয় প্রবাসাভগীর ভল হারোকার ভলিত হচ্ছে, তার অবস্থান অবস্ত্রাবী হবে। কৃষি উন্নত হলে, উন্নতি আবার মনের আনন্দে ভীত বুলবে, শিরী শিল কাজে ভলবে, বগিধ বাবণারে একাগ্রচিত হবে, পাঠবিদ লিচিভচিত শাক্তকীর মনোনিবেশ কববে, অধ্যাপক সম্ভব বনে পঠন-পাঠনের কাজ কববে, গুহর গুহমধ্যে লপেব লক্ষ্যন পাবে। কলমান্নেতে সেলার ভারতবর্ষের এট লক্ক-ভিল ভেব'তে লগেতে চোখে ভল

এসে পড়ে ! মনে হয়, আজ তা করুণার স্বেচ্ছা, বাস্তব কি চাঁকচমকের কথা বলতে গেলে দিবাটিকার একটি প্রবন্ধ
কেনে ভিতর তা সত্য হলে না ? নিখতে হলে—আজ আস তা দৃঢ় নব : পলে নিখতে ফটা



১৩ : বঙ্গ-সংস্কৃত-সংস্কৃত

যাত্রাভের কথা পলে প্রবন্ধভাষা বলব। শুধু যাত্রাভ ভবব। তাগাবশে মহিলা (মহিলা নব!) 'মহিলা'
নব, পলে যে 'মহিলা' তেখে বিদ্যুৎ হয়েছিলান, তার কথা, তার 'মহিলা' দেখা হয়ে গেল।



[সম্পাদকীয়ের সম্বন্ধিতম উপস্থাপনক কীৰ্ত্তি কবুৰ গিৰিত]

বঙ্গীয় শিক্ষা পরিকল্পনা, বাঙ্গালী জন- সাধারণের দাবী এবং ইংরাজের কর্তব্য

৭২ মাসে শিক্ষা-বিষয়ক পরিকল্পনা লব্ধে জনসাধারণের সমালোচনা ছেতু বঙ্গীয় গভর্নমেন্টে চলিয়া উল্লেখযোগ্য বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিগাছেন।

আচাৰ্য্য জ্ঞান পি. সি. গাঙ্গ, ব্রীজ কামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-প্রবৃথ দেশনেতাগণ সহকারের নূতন পরিকল্পনায় বিবন্ধে আশোজনীয় “এডুকেশন-লীগ” গঠিত করিগাছেন।

যেই-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের মতে গভর্নমেন্টের এত নূতন শিক্ষা পরিকল্পনায় দেশবাসীকে ইংরাজী শিক্ষার হিম্বি হৃদয় হইতে বঞ্চিত করা হইবে। তাঁহারা এই মতামত প্রকাশ করিয়া গভর্নমেন্টের নূতন পরিকল্পনায় বিবন্ধে আশোজন আশঙ্কিত করিগাছেন।

আমাদের মতে, গভর্নমেন্টের প্রস্তাব অথবা “এডুকেশন লীগ” ও যেই-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের সমালোচনা কতখানি লম্বত অথবা অসম্বত, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রকৃত দেখিতে হইবে, জনসাধারণ “শিক্ষা” চাহেন কেন। জনসাধারণ কেন শিক্ষা চাহিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে অনেক অনেক কথা বলিবেন। “আমরা শিক্ষার জন্য শিক্ষা চাহি” অথবা “পেটের জন্য শিক্ষা চাহি” অথবা “কৃষ্টিগ জন্ম শিক্ষা চাহি” অথবা “মানবতাব্যবস্থা শিক্ষা চাহি” অথবা “শরতালের জন্য শিক্ষা চাহি”,—একটি বড় বড় কথা বাহায়া বলিবেন, তাঁহাদের জন্য আমাদের এই আলোচনা নহে। আমরা জানি, এই জাতীয় কথা বাহায়া বলেন, তাহারা হইলেন বর্তমান কালের প্রকৃত প্রতিভাশালী (talented) উচ্চতরের মহামানব (?)। তাঁহাদের কথার অর্থ জনসাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য নহে, কারণ উচ্চতরের (?) এই কথাগুলি প্রায়শঃ বাস্তবতাপন্ন এবং উদ্দেশ্যকে সংকৃত তাহা অহুসায়ে “বিকল্প”

বলিতে হয়। ভারতীয় কবির মতে এই জাতীয় কথা সাধুদের “কিটাবৃত্তি”মূলক এবং তাহাতে সাধুর অমায়ুষ্য হইয়া পড়ে।

জনসাধারণ কেন শিক্ষা চাহেন, তাহা স্থির করিতে হইলে, জনসাধারণের নিজ নিজ বৃত্তে হাত দিয়া নিজের প্রতি প্রশ্ন করিতে হইবে, “আমি আমার ছেলেকে অথবা ভাইকে কুলে পাঠাই কেন”, অথবা “আমি কুলে বাই কেন”। ছেলে ছাড়াতে লেগাপড়া শিখিয়া কিছু যোজন্য করিতে পারে এবং তিনিও কীভাবে ছাড়াতে তাহার যুগ-যাজ্ঞক্যে দিন কাটান সম্ভব হয়, তাহাই বড় ছেলেকে লেগাপড়া—উচাই কি উপবাস্তব প্রশ্নের উত্তর হইবে না? উচ্চতরের মহামানব-গণ (?) বাতীত জনসাধারণের মধ্যে এমন কেহ আছেন কি, তাহারা শিক্ষার উদ্দেশ্য লব্ধে উপবাস্তব কথা বাতীত আর কোন কথা বলিবেন?

কাহেই শিক্ষা লব্ধে গভর্নমেন্টের বিকট আমাদের কোন বাজ্ঞা করিতে হইলে, আমাদের বিবন্ধে বলিতে হইবে যে, “হে গভর্নমেন্ট, আমাদের বিবন্ধে এমন শিক্ষা প্রদান করুন, যাহার দ্বারা আমরা কিছু যোজন্য করিতে পারি এবং তিনিও যুগ-যাজ্ঞক্যে আমাদের দিন কাটান সম্ভব হয়।”

ইহার উত্তরে, গভর্নমেন্টের ইংরাজ-পরিচালকগণ যদি বলিয়া বলেন যে, “আমরা বিশেষ, তোমাংদের কি হইলে যুগ-যাজ্ঞক্যে দিন কাটান সম্ভব হইবে, তাহা আমরা জানি না”—তাহা হইলে হৃদয়-আনন্দিতের যুগ-যাজ্ঞক্যে দিন কাটান সম্ভব হয়, তাহা পরিহার করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়।

কি হইলে আমাদের যুগ-যাজ্ঞক্যে দিন কাটান সম্ভব, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা

আছে। এই দাওয়া ও আকাঙ্ক্ষাগুলির অধো বৈজ্ঞানিক সাধারণ (common), তাহাদের নাম—

- (১) জনশ্রুতি বৈজ্ঞানিক অর্থেদের ঠাউল অথবা আটা, কিছু ডাল অথবা মন্ত, তিলু শাকসকলী, একটু লবণ, একটু তেল।
- (২) খাট দিচ্ছ করিবার উপযোগী লাহাট কিছু বাসন এবং কাঠ।
- (৩) জনশ্রুতি বাৎসরিক চুইখানি হুঁতি অথবা পাড়ী, একখানি উড়ানি অথবা একটা ভায়া, একখানি পামড়া এবং প্রোতি তিন বৎসরে একটী ছাতি।
- (৪) পরনের কল একটী মাদুর, একটী বাগিন এবং গোলপাতার অথবা বে কোন রকমের একটী আচ্ছাদন।
- (৫) বাহ্যিকর খাট, পরিচ্ছন্ন ও অগ্ন্যসংগত নির্বাচন করিবার উপযোগী জ্ঞান।
- (৬) পরম্পর স্ব-কলহ না করিয়া পরম্পরের প্রতি সহ্যবহার করিবার মত জ্ঞান।
- (৭) সত্য, যেন ও সমাজ-নেতাগণকে প্রভা করিবার মত জ্ঞান।
- (৮) মন বাগাতে শান্তিতে রাখা যায়, তত্ত্ববোধী জ্ঞান।
- (৯) শরীর বাহাতে ভাল রাখা যায়, তত্ত্ববোধী জ্ঞান।
- (১০) সর্বত্র বায়ু বাহাতে বিত্তম থাকে, তত্ত্ববোধী বায়ু বায়ু মত জ্ঞান।
- (১১) সর্বত্র জল বাহাতে ভাল থাকে, তত্ত্ববোধী বায়ু বায়ু মত জ্ঞান।
- (১২) অল্পই হইলে আরোগ্য লাভ করিবার মত জ্ঞান।
- (১৩) পরম্পরের স্ব-কলহ হইলে তাহার মোহালা করিবার মত জ্ঞান।

উপরে তের দফার বাহা বাহা যেখান হইল, তাহা চাহেন না, এমন কোন মাদুর জন-সমাজে আছেন কি? যেটিরপাড়ী, বৈজ্ঞানিক পাখা, সিনেমা, প্রোজেক্টর, বেডর, টেলিফোন প্রভৃতি যে যে ভিন্দিব সভ্যতার (?) কল অনেক চাহিয়া থাকেন, সেই ভিন্দিবগুলিকে এখনও জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার বসিয়া নির্বাচিত করা যায় না। বাহালা বেগের লোকসমষ্টির বড় অংশ (majority) কৃষক। তাহারা

এখনও এই সমস্ত ভিন্দিব আকাঙ্ক্ষা করিবার উপযোগী “সভ্যতা” লাভ করিতে পারেন নাই। সভ্যতার (?) উন্নতি সাধন করিয়া যদি কখনও তাহাদের প্রাণে এই বস্তগুলির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা যায়, তখন অবশ্য এই ভিন্দিবও জনসাধারণের গ্রন্থ-আচ্ছাদন উপকরণ বলিতে হইবে।

জনসাধারণের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বাহালা এবং তাহাদের কার্যবিধি

গুরুত্বপূর্ণ বসন আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনা আশ্রয় করিয়াছেন, তখন এই পরিকল্পনা বাহাতে আমাদের জীবনের উদ্বেগ-সাধনের সহায়ক এবং, তদন্ত বাহাদুরী জন-সাধারণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণের নিকট নিম্নলিখিত বাহালাগুলি উপস্থাপিত করা হুঁজুক :—

(১) বাহাদুরী জনসাধারণ বাহাতে নিম্ন নিকটোয় বীর পরিবারবর্গের কল উপত্যক ১ম দফা হইতে ৪ম দফা পর্যন্ত আহার্য, ব্যবহার্য ও আবাস-পূর্ণ উপার্জন করিতে পারে, তত্ত্ববোধী সাধার্ম্য অর্জন করিবার শিক্ষা।

(২) বাহাদুরী জনসাধারণের বাহালা বজায় রাখিবার কল বাহাদুরী কল-হাওয়া ভাল রাখিতে হইলে ১০ ও ১১ দফা যে যে ব্যবহার্য প্রয়োজন, তাহা হুঁজিবার মত জ্ঞান লাভ করিবার শিক্ষা।

(৩) স্বকীয় শরীর ও মন ভাল রাখিতে হইলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন (৮ম ও ৯ম দফা দেখুন) তাহা লাভ করিবার উপযোগী শিক্ষা।

(৪) পরম্পর স্ব-কলহ না করিয়া পরম্পরের প্রতি সহ্যবহার করিবার এবং স্ব-কলহ হইলে তাহা মিটাইবার জ্ঞান লাভ করিবার উপযোগী শিক্ষা (৭ম ও ১০ম দফা)।

(৫) বর্তমানে যে বস্তু বিংশতি বর্ষে পরম্পর করিতে না করিতে প্রায়শঃ একটা না একটা রোগে আক্রান্ত হইয়া সভ্যভাবে (?) অর্জনত্যাগ জীবন বাপন করিতে হয়, তাহা না করিয়া বাহাতে অল্পই হইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়, তত্ত্ববোধী জ্ঞান লাভ করিবার শিক্ষা (১২ম দফা)।

৬। রাজপুত্র ও নৈকুণ্ঠের উপর বাহাতে প্রভা
সর্বদা ছুটি থাকে, তদনুসারে জ্ঞান লাভ করিবার শিক্ষা
(৭ বক্য) ।

বাহালী পাঠক, আপনাতা রাবির্যে দেখুন, উপরোক্ত
বাক্যের একটিও অপ্রাকৃত কি না। আপনাতের জনসাধারণের
মধ্যে একদিন যে ঐ ছুটি জ্ঞান ছিল এবং তাহা লাভ করি-
বার উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতিও একটা বিস্তারিত ছিল, তাহা কি
আপনাতের কলকর্ষণের চাপচাপের দিকে লক্ষ্য করিলে এখনও
বুঝা যায় না? বাহালী জনসাধারণের মধ্যে অনেকটাই বিশ-
বঙ্গের পূর্বেও পত্তনপ্রাপ্ত থাকিয়া চাকুরী না করিয়া বীর-
পরিবারবর্ষের আহার্য্য, বাহালী ও আবাস-পুত্রের সম্বন্ধে
কহিতে পারেন নাই কি? চল্লিশ বৎসর পূর্বে বাহালীর
প্রায় সর্বত্র জল-হাওয়া ভাল ছিল না কি? পক্ষাণ বৎসর
পূর্বে বাহালীর প্রায় সর্বত্র লক্ষের লোক সারা বৎসর আনন্দে
উৎসব থাকিত না কি? আনাতের সমাজে বলাবলির
প্রবৃত্তি অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু
আনাত কথায় কথায় এখনকার মত আনাতের নামগণ করিতে
হইতাম কি? সাত্বী ও সমাজপতিগণ আনাতের কল-কল-
কিছুদিন পূর্বেও মিটাইয়া দিতেন না কি? এখন আনাতের
‘সকল’ নামে সচক্রে বৈদ্য ছিল-ছিলে পত্তন ও বিদ্যুৎ-
বৈদ্যের প্রচলিত বৈদ্য বাটতেছে, তাহা বিশ বৎসর পূর্বে
এক ছিল কি?

এখন বৈদ্য কথায় কথায় আনাতের ভাক্যের প্রয়োজন
হয়, আনাতের নিত্যমহীপনের সময়ে তাহা হইত কি? এখন
বৈদ্য ভাক্যের হাতে একবার পেলো আর তাঁহার নিত্য-
প্রয়োজনীয়তা বুলিবার উপায় নাই, চল্লিশ বৎসর পূর্বেও
ঐক্য ছিল কি? এখন বৈদ্য কথায় কথায় আনাতের
ছেলেদা বিকলতার ও লাগি হাতে লইয়া রাজপুত্রবর্ষের,
নৈকুণ্ঠের ও জনসাধারণের জীবন বিধা করিয়া তুলেন, চল্লিশ
বৎসর পূর্বেও তাহা কহিতেন কি?

একদিন বাহা ছিল, এখন তাহা নাই বলিয়া খেদ করিলে
চল্লিশ না। বাহা ছিল তাহা হাওয়াইয়া দিচ্ছে বলিয়া
কাহারও উপর নোযায়েগণ কহাও বুলিবার মত নহে।
প্রাতঃকালের পর বিপ্রহর এখন আসে, এখন প্রাতঃকালের

মিহরা ও শিশুগণ থাকে না। কিন্তু ঐ মিহরা ও শিশুগণ
থাকে না বলিয়া কাহারও উপর নোযায়েগণ কহা যায় কি?

আপনাতা আর একবার চেষ্টা করিয়া আপনাতের শিক্ষা
সম্বন্ধীয় বাছাগুলি জ্ঞান জন এতাবৎসরের মধ্যে পৌছাইবার
চেষ্টা করুন। তাঁহাকে বলুন, “শিক্ষা কি পদ্ধতি অবলম্বন
করিলে—আনাতের শিক্ষা আনাতের উদ্দেশ্য-সাধক হইবে,
তাহা আনাতা জ্ঞান না এবং আপনাতের পত্তনবৈদ্য ঐ পদ্ধতি
সম্বন্ধে যে পত্রিকার: আনাতের সম্বন্ধে উপস্থাপিত করিয়াছেন,
তাহা যে বিদ্যায় আনাতের মূল উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক
হইতে পারে, তাহা আনাতা বুঝিতে পারি না। আপনি যদি
মনে করেন যে, তাহা আনাতের প্রার্থিত উদ্দেশ্যগুলির সাধনের
সহায়ক, তাহা হইলে ঐ পত্রিকারগুলির বুদ্ধিমত্তা
আপনাতের শিক্ষা-মন্ত্রী বাহাতে আনাতিককে বুঝাইয়া দেন,
তাহার বাহা কহুন। নতুবা, বাহাতে শিক্ষাপদ্ধতি
আনাতের মূল উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক হয়, তদনুসারে তাহার
পরিবর্তন সাধন করুন।”

আপনাতের মনে রাখিতে হইবে যে, পত্তনবৈদ্যের বিদ্যুৎ
হইতে কোন কিছু বাছা করিতে হইলে তাহার লক্ষ্য অসম-
যোগের প্রবৃত্তি রাখিলে চলিবে না। কারণ, অসমযোগের
প্রবৃত্তি থাকিলে আপনাতা কপট ও কৃত্রিম হইয়া বাটবেন এবং
তাহাতে আপনাতের নৈতিক সামর্থ্য ক্ষয় হইয়া পড়িবে।
আনাতের পত্তনবৈদ্যসারের আপনাতিককে গত্তনবৈদ্যের উপর
সম্পূর্ণ অস্তিত্ব প্রদান হইতে চাইবে।

আপনাতের সকলের পক্ষে কহাও বাক্যগত ভাবে জ্ঞান জন
এতাবৎসর পর্যন্ত পৌছান সম্ভব হইবে না, অতএব আপনাতের
প্রত্যেককেই আপনাতের সম্বন্ধে পত্তনবৈদ্যের অথবা বাহালীর ভবিষ্যৎ
উদ্দেশ্য-সাধনের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কহাও আছে। আনাতের
বাহালীর শিক্ষার প্রধান বাহন—ঐ হস্ত-সম্বন্ধিত আনাতের
পত্তন—তাঁহার একটি হস্তের নাম “শিক্ষামন্ত্রী” এবং অপর
হস্তটি হই বহু বিশিষ্ট। এক পত্তনের নাম, কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইন্-চ্যান্-সেলার এবং অপর পত্তনের নাম
চাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইন্-চ্যান্-সেলার। শিক্ষা বিভাগের
অপরপার বাহনপত্তনের নাম—ডিস্ট্রিক্ট অফ পাবলিক
ইন্সট্রাকশন, সিনেটের সভাপতি, সিনেটের সভাপতি, কলেজের
সপারিটন অধ্যক্ষগণ, কলেজের সপারিটন প্রধান শিক্ষকগণ।

সকলের পক্ষে গভর্ণর পদান্ত পৌছান সম্ভব না হইলেও উপরোক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য কাহারও না কাহারও কাছে পৌছান আপনাদের প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবপর। শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য কাহারও কাছে যিনি পৌছিতে পারেন, তাঁহার কাছে পৌছিয়া আপনাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় উপরোক্ত দাবী পেশ করুন এবং তিনি বাহ্যতে আপনাদের ঐ দাবী তাঁহার উপরওয়ালার নিকট পৌছাইয়া দেন এবং ক্রমশঃ বাহ্যতে উহা গভর্ণর মহোদয়ের নিকট পৌছাইতে পারে, তাঁহার সম্মতনাম বাধ্যতা করুন। মনে রাখিবেন, ঐ শিক্ষার ব্যবস্থাই আপনাদের ভাবন-মস্তকের অঙ্গভূত প্রধান ব্যবস্থা।

শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য এবং তৎসম্বন্ধীয় কার্যসূত্র

কোন গভর্ণমেণ্টের চিন্তি পূর্ণন করিতে হইলে, শিক্ষা-পদ্ধতি যে কতদূর সুচিন্তিত এবং জনসাধারণের সাধারণ আকাঙ্ক্ষা (common desire)-পূরণের সহায়ক হওয়া উচিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। জনসাধারণ বাহ্যতে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বাস্তব, ব্যবস্থার এবং বাস্তবায়ন উপাধীন করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে এবং কথিতঃ জনসাধারণের পক্ষে তাঁহাদের বোধ্যাধীন বাস্তবায়ন সাধন করা সম্ভব হইলে, তাঁহারা স্বতঃই গভর্ণমেণ্টের উপর অধিকার হইয়া থাকেন। ইহার পর, যদি আবার তাঁহাদের দাবী ও শাস্তি বাক্য সাধিব্যবস্থা ও জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কি কোন পক্ষ চূড়ৈব হইলেও জনসমষ্টির সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বিদ্যমানও অন্তরীক্ষণ করিতে পারে?

শিক্ষা সম্বন্ধীয় পদ্ধতির অপূর্ণতা বশতঃই গ্রীকসম্প্রদায় সম্বন্ধে হইতে অভ্যাবি কোন রাজস্ব জগতে ছয় শত বৎসরের অধিক প্রকৃষ্টপন্থার হইতে পারে নাই, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। শিক্ষা-পদ্ধতির অপূর্ণতার জন্যই বর্তমান ইয়োয়োগের অশান্তি এবং বেকারের প্রাচুর্য্য এবং তাহারই জন্য ভারতবর্ষে বর্তমানে নানা রকমের অশান্তি স্থান পাইয়াছে। বর্তমান অশান্তি যেখানে দৃষ্টান্ত করিতে হয় যে, লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সংস্কার প্রকল্পগ্রন্থ হয় নাই। লর্ড কার্জনের শিক্ষা-সংস্কার যে প্রকল্পগ্রন্থ হয় নাই, তাহা আমাদের বর্তমান গভর্ণর

ভারত জন-এগারদশ বৃদ্ধিতে পরিগায়েন—ইহাও মনে করিবার কারণ আছে।

ভারত জন-এগারদশ যে ভাবে শিক্ষার নূতন পরিকল্পনাগুলি লইয়া অগ্রগতি হইতেছেন, তাহা দেখা করিলে, তিনি যে তৎসম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি সতর্ক না হইলে ঐ পরিকল্পনাগুলি বিচারের জন্য জনসাধারণের সম্বন্ধে উপস্থাপিত হইত না। আমরা তাঁহার পূর্ণনিশ্চয়তা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছি যে, কিছু তাঁহার পরিকল্পনাগুলি যে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের সহায়ক হইবে না, তাহা তাঁহাকে দেখাটয়া দিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

জনসাধারণ যে যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্য বিচার্য্য হইয়া থাকে, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। শিক্ষা-পদ্ধতিতে ঐ আকাঙ্ক্ষাপূরণের সহায়ক করিতে হইলে—প্রথমতঃ, কোন কোন ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণের প্রত্যেকের পক্ষে চাক্ষুসী বিনা সাহায্যতার সাহায্য, ব্যবস্থার ও বাস্তবায়নের সাধন হইতে পারে, তাহার নির্ধারণ করিতে হইবে—দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে যেনের জন-সংগঠন বাস্তবায়ন থাকিতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে। বর্তমানে যখন কথিতঃ দেখা দৃষ্টান্তে যে, জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, ব্যবহার্য্য ও বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা একটা অনন্ত উচ্চ হইয়াছে এবং প্রায় সকলেই অল্প বয়স হইতে একটা না একটা অগ্রহৃত্যুর ভূমিতে আগ্রহ করিয়াছেন, তখন বর্তমান ব্যবস্থাগুলি যে সোমস্কৃত, তাহা সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। কি কি উপায়ে জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস, ব্যবহার্য্য ও বাস্তবায়নের সাধন অথবা যেনের জন-সংগঠন বাস্তবায়ন সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্ধারণিত না করিয়া তাহার উপাধীন করিবার কোন-শিক্ষা-পদ্ধতি বিচলিত হইতে পারে কি?

এই দ্বিতীয় বিষয়। করা পূর্ব সম্বন্ধ নহে, কারণ ভারত জন-এগারদশের নিজের বেশ ইংলণ্ডকে ভূমিতে চলিবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক দেশ হইতে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে হইবে, নতুবা কোন যেনের কোন নূতন ব্যবস্থা—বিশেষ ব্রিটিশ-জনসাধারণের দাবী তাঁহাদের বর্তমান অবস্থার গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে, তাহা আত্মবিশ্বাসকে

মনে রাখিতে হইবে। তাঁর জন এতদসময়ের শ্রম কি তাঁহার মন্ত্রী-সভার সহায়তার উত্তর কুল রক্ষা করা হইতে পারে, এমন একটা অস্ব-বস্তুর সংস্থান-বিধারক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা সম্ভব নহে? আমরা তাঁহার কার্যাবলী পর্যালোচনা করিয়া বাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার দ্বারা ঐক্য একটা বাহা হওয়া অসম্ভব নহে। যদি সূচনিত ভাবে তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে একটা শিক্ষা-সংস্থারের অভিনব করিয়া কি কলোপ হইবে?

শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে এডুকেশন-লীগের ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলির সমালোচনার বৌদ্ধিকতা

“এডুকেশন-লীগ”-গঠন-সভার সভাপতিত্ব করিয়াছেন আমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং সেখানে বাহা বাহা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই আমাদের নেতা ও সমানার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের অনেকেরই শিক্ষা-গুরু। কিন্তু আমাদের এমনই হুঁজুয়া যে, তাঁহার বক্তৃতা পূর্ণাঙ্গী বৃত্তিতে পাবি, এমন শিক্ষাও আমরা তাঁহার নিকট পাই নাই। আংশিক ভাবে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বক্তৃতা হইতে আমরা বাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে হয় যে, তাঁহার মতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিকাশ সাধন করিয়া পণ্ডিতের উৎপত্তি সাধন করিতেছেন যত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অতীবে তাঁহাদের প্রবেশাভিত্ত্যের উৎপত্তি হইতেছে।

তাঁহার এই কথার উত্তরে আমরা তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রের কলী বিভালা করিতে চাই—

(১) বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিষ্ঠার বিকাশ সাধিত হইতে পারে এবং হইতেছে, এই বিশ্বাস যদি তাঁহার থাকে, তাহা হইলে তিনি এতদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়টিকে প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন কেন এবং বর্তমান শিক্ষার সংস্থারেরই বা প্রয়োজন কি?

(২) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন প্রকৃত প্রতিষ্ঠানীয় পণ্ডিতের উত্তর যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এতদিন পর্যন্ত আমাদের অস্ব-বস্তুর সংস্থানের ক্ষেত্রে অতীবে হইতেছে কেন? আমাদের পণ্ডিতগণ জনসাধারণের অস্ব-সংস্থানের ক্ষেত্রে যে যে বৃত্তি-বৃত্ত দাবী গভর্ণমেণ্টের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার কোনটা গভর্ণমেণ্ট পূরণ করেন নাই, তাহা আচার্য্যগণ আমাদের সমক্ষে দেখাইয়া দিয়েন কি?

আমরা অস্বপূর্ণ করিয়া বস্তুই যে দেখিতে পারিয়াছি, তদনুসারে আমরা বলিতে বাহা যে, গভর্ণমেণ্ট আমাদের অস্ব-সংস্থানের কোন বৃত্তি-বৃত্ত দাবী অঙ্গীকার করেন নাই। কিন্তু কি হইলে আমাদের সকলের অস্ব-সংস্থান হইতে পারে, তাহার শিক্ষা আমাদের পণ্ডিতগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে পান নাই বলিয়া এবং তাঁহাদের তাহা জানা নাই বলিয়া আমাদের সার্বজনীন অস্ব-সংস্থান হইতে ও ঘটতেছে। বৃত্তির অঙ্গপূর্ণ করিলে, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট অপেক্ষা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ অধিকতর দাবী। মনে রাখিতে হইবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণই আমাদের গভর্ণমেণ্টের মেধার, মন্ত্রী, ইত্যাদি। জনসাধারণ, এই পণ্ডিতগণকে চিনিবার চেষ্টা করুন, নতুবা আপনারদের রক্ষা নাই।

দেশীয় সংবাদপত্রগণের সহায়তায় ইংরাজী শিক্ষা আমাদের বিবিধ উপকার সাধন করিয়াছে। আবশ্যক হইলে তাহা ব্যবহৃত হয়, তাহা জানা নিত্য প্রয়োজনীয় এবং তদনুসারে ইংরাজী তাহা আমাদের জানা বরকার, ইহা আমরা বীকার করি। কিন্তু ইংরেজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আমাদের অনিষ্ট বাড়াইতে কি ইহা সাধন করিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যদি ইংরেজের জ্ঞান এতই প্রয়োজনীয় ও ইষ্টপ্রিয় হয়, তাহা হইলেই বা শিক্ষার সংস্থারের কি প্রয়োজন আছে?

কৃষি

যত দূর এক মনে সমস্তকে যথা প্রমাণিত কৃষিক্ষেত্রে কয়েকটি
কৃত্রিম উদ্ভেদনো :

সমস্তে সৌভাগ্যবশত বোম্বের ক্রান্তন কয়েকটা চা: ডি.
ডি. লুডন কর্তৃক পাঠ্যবসে পঠি। অথবা বিল্ডে কৃত্রিম।
গীটার মত বহু বৎ কয়েক পাঠ্যবসে কৃত্রিম অথবা
কৃত্রিম। জেনে বালিকার, ১৯২০ সন পর্যন্ত কিত্র পাঠ্যব
কৃত্রিম অথবা সর্বোত্তর ছিল এক এই উদ্ভিতির মূল প্রদেশ-
ফানি ময়করের বাস ঘন এক দায়ী ও জেনে নির্মাণ, কিত্র
এই সন মধ্যে কৃত্রিমের বালিক অথবা কোন পরিচালনা না
অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃত্রিম।

[কিপ্রসে ক্রিষ্ণু—১৯ই আগস্ট এক: এই মেসেজের প্রাচীরে প্রেসমানে
সম্পাদকীয় প্রসে নির্দিষ্টকেন, কয়েক কৃত্রিম। বালিক
অথবা: পরিচালনা জায়েন করিত্র হইবে কৃত্রিমকৃত্র অর্থনৈক
প্রমাণ নির্দিষ্ট করিত্র হইবে।

ইংলণ্ডে বেঙ্গল কৃষিপ্রধান দেশ তাহাতে উৎসাহের
পক্ষে কৃত্রিমের পূর্ণ উদ্ভিতি সহজীয় তথা নিরুৎসাহে জানা
অবস্থাভাবী! আমায়ের মনে হয়, কৃত্রিমকৃত্র উপস্থিত 'সত্যতা'-
মূলক দিকায় শিকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অতাব
পূরণ করিবার জন্য কৃত্রিমকৃত্র পুরুষকৃত্র ও শক্তী পরাব্যায়
বাহ্যতা করিবার প্রয়োজন আছে। কোন সত্যের যদি অম্বা
এই প্রমাণ করি, তাহা হইলে কি আমায়ের পদ্ধতিকল্পের
নিকট হইতে একটাও ত্রুটি পাইব না?

মূল প্রদেশের সৌভাগ্যবশত প্রধান ইষ্ট্রিনিয়া: তা: উল্লিখিত
প্রাচীর কর্তৃক কৃত্রিমকৃত্র উৎসাহের প্রমাণকৃত্র ইষ্ট্রিনিয়া:র
পাঠ্য বিল্ডে কৃত্রিম। গীটার মত বহু বৎ কয়েক পাঠ্যবসে
কৃত্রিম অথবা সর্বোত্তর ছিল এক এই উদ্ভিতির মূল প্রদেশ-
ফানি ময়করের বাস ঘন এক দায়ী ও জেনে নির্মাণ, কিত্র
এই সন মধ্যে কৃত্রিমের বালিক অথবা কোন পরিচালনা না
অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃত্রিম।

নিষ্কর! ইষ্ট্রিনিয়ায়রপ যদি এই কাণ্ডী না করেন, তাহা
ইলে তাহাদের শান্তির বাবস্থা হওয়া উচিত। ব্যক্তের সঙ্গে
মুষ্টির সমতা আছে ইহা পাঠ্যকরণ স্বীকার করেন না? যদি
না করেন, তাহা হইলে অম্বা প্রমাণ দেখাইব।

মূল প্রদেশের সৌভাগ্যবশত প্রধান ইষ্ট্রিনিয়া: তা: উল্লিখিত
প্রাচীর কর্তৃক কৃত্রিমকৃত্র উৎসাহের প্রমাণকৃত্র ইষ্ট্রিনিয়া:র
পাঠ্য বিল্ডে কৃত্রিম। গীটার মত বহু বৎ কয়েক পাঠ্যবসে
কৃত্রিম অথবা সর্বোত্তর ছিল এক এই উদ্ভিতির মূল প্রদেশ-
ফানি ময়করের বাস ঘন এক দায়ী ও জেনে নির্মাণ, কিত্র
এই সন মধ্যে কৃত্রিমের বালিক অথবা কোন পরিচালনা না
অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃত্রিম।

'হাট্‌জুলিক-প্রেস' দায়ী অনেক বস্তুর সংযোগিতা সাধিত
হয় বলিয়া অম্বা তদীয়। আমায়ের বোণ চর, ঐকল
একটা কিছু বাবস্থা করিলে, আমায়ের সংযোগিতাও সম্ভব
হইতে পারে। বিজ্ঞানের মূলে একটা 'একশ্রেণিকর্ম' করিত্র
আপত্তি কি?

সমস্তে সৌভাগ্যবশত বোম্বের ক্রান্তন কয়েকটা চা: ডি.
ডি. লুডন কর্তৃক পাঠ্যবসে পঠি। অথবা বিল্ডে কৃত্রিম।
গীটার মত বহু বৎ কয়েক পাঠ্যবসে কৃত্রিম অথবা
কৃত্রিম। জেনে বালিকার, ১৯২০ সন পর্যন্ত কিত্র পাঠ্যব
কৃত্রিম অথবা সর্বোত্তর ছিল এক এই উদ্ভিতির মূল প্রদেশ-
ফানি ময়করের বাস ঘন এক দায়ী ও জেনে নির্মাণ, কিত্র
এই সন মধ্যে কৃত্রিমের বালিক অথবা কোন পরিচালনা না
অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃত্রিম।

তৎপরেণী সাহিত্যেরও প্রয়োজন আছে। আমায়ের মনে
৪৪, ৩ই একজন পি. এইচ. ডি. নিম্নকৃত্র কিত্রই উপস্থিত
সাহিত্যের অম্বা পূর্ণ হইবে এবং শিকারী মধ্যপ্রদেশ
অম্বাভাঙ্গা কাণ্ডে পরিণত হইবার সম্ভাবনা পড়িবে।

৩

সম্পাদকীয় কৃষি-বিষয়ক সমাধ: :

বস্তুর বস্তুগত সত্য প্রত্যেক উৎসাহের সঙ্গে তা
বিশেষভাবে দিহ তাহা বস্তুগতের উচিত নির্দেশ বাহ্যিক
কৃত্রিমের বস্তুগতের সত্য প্রমাণ করিত্র হইবে কৃত্রিমকৃত্র অর্থনৈক
প্রমাণ নির্দিষ্ট করিত্র হইবে।

এত বড় অধিষ্ঠিত কথা সত্যিদের কিছুতে বিশ্বাস করা
উচিত নহে! কৃত্রিমের ওরফে গোপাল তাহা ত আমায়ের
খেঁচেতে পাইতেছি না! মূল্যের প্রদেশের কৃত্রিম দামনিক একটু
কিছু বাধা হইতেছে, পূর্ব সম্ভব তৎপার-বিজ্ঞানের মৌলিক
অম্বাভাঙ্গা বস্তুগত একটা 'শেডা' দিহে 'পারিসদ' তাহাকে
বাড়াইয়া বেড়াই দাইবে। এ কথার 'অম্বাভাঙ্গা' (authority)
অছে, যথা heat expands body ইত্যাদি।

কৃত্রিমের বস্তুগত সত্য প্রত্যেক উৎসাহের সঙ্গে তা
বিশেষভাবে দিহ তাহা বস্তুগতের উচিত নির্দেশ বাহ্যিক
কৃত্রিমের বস্তুগতের সত্য প্রমাণ করিত্র হইবে কৃত্রিমকৃত্র অর্থনৈক
প্রমাণ নির্দিষ্ট করিত্র হইবে।

অম্বাভাঙ্গা করি, এই বিশদীকরণ বাধা উচ্চতর, তাহা
কি উত্তমর প্রেষীর মধ্যে আমায়ের না নিম্ন সম্পন্ন করা সম্ভব
নহে?

কৃত্রিমের কৃত্রিম পাঠ্যবসে-বিষয়বস্তু প্রমাণকৃত্র ইষ্ট্রিনিয়া:র
প্রাচীর কর্তৃক কৃত্রিমকৃত্র উৎসাহের প্রমাণকৃত্র ইষ্ট্রিনিয়া:র
পাঠ্য বিল্ডে কৃত্রিম। গীটার মত বহু বৎ কয়েক পাঠ্যবসে
কৃত্রিম অথবা সর্বোত্তর ছিল এক এই উদ্ভিতির মূল প্রদেশ-
ফানি ময়করের বাস ঘন এক দায়ী ও জেনে নির্মাণ, কিত্র
এই সন মধ্যে কৃত্রিমের বালিক অথবা কোন পরিচালনা না
অন্তর্ভুক্ত করিয়া কৃত্রিম।

পাট বেঙ্গল প্রয়োজনীয় তিনিপ এবং তাহা 'মোনোপলি'
(monopoly) যখন বাহ্যিকের অছে, তখন ইষ্ট্রিনিয়া:র তাহা
মূল্য-নিষ্কাশন বাহ্যিকের সত্য প্রমাণ করিত্র হইবে কৃত্রিমকৃত্র অর্থনৈক
প্রমাণ নির্দিষ্ট করিত্র হইবে।

কৃষি-বিষয়ক সমাধ: :

(ক) মূল্য-নিষ্কাশন বাহ্যিকের সত্য প্রমাণ করিত্র হইবে কৃত্রিমকৃত্র অর্থনৈক
প্রমাণ নির্দিষ্ট করিত্র হইবে।

- [illegible]

এই সভাপতির সমর্থন 'স্বাধীন' ছবিটি হাতে হাতে গড়া।
সাইফের উপস্থিতি হওয়ায় ভাষা বেগ নুতন হইতেছে। শেটে
হাত পাশ্চিক আর না পাশ্চিক, বিজলী পাখা আর টেলিফোন
হওয়ায় আরও উত্তম ভাবে কি ?

कृषि-विप्लवक विधिवत नदणाय

- [illegible]

প্রাণ সমগ্র কৃষির ব্যাপারেই বর্ধনানে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ চলিতেছে। সব ভেদেই মিলিয়েও মতিতে পারে, তাহাণি অস্ত্র-প্রয়োগ (operation) যে ভাল হইতাকে, তাহা বলিতেই হইবে।

निम्न

ମୃତ ଏକହାସ କାମ ସମାପ୍ତ କରା ଶିଳ୍ପୀଗିରି କହେକଟି କହୁଥା ।

ସିନିଆଁ ଡାକିଲେ ମହା ବାହାଣୀ ଅଧିକାରୀ କୃତ୍ରିମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଳାବଳି ଡିସ୍କ୍ (ବି. ଏସ୍. ସିଲ୍ୟା) କହୁଥା। ତାହାର କଥା ବାହାଣୀ ମହା ସିନି ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ଡେମ୍ଫ ଓ ଡାହାଣ ଡେମ୍ଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନରେ ମହା ଡେମ୍ଫ ଡାହାଣ ଦିଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତାମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ଡେମ୍ଫ ।

কোথায় জাতিগত তুল্য-কেন্দ্রীক-নির্বাচিত সভার প্রা. টি. বিজয়
আনন্দাচার্যের বক্তৃতা। তাঁহার বক্তৃতাও গাভোপাচার্যের বক্তৃতা
ও। তাঁর তুল্য অনুবোধের বৃত্তি। উল্লেখ আছে।

କୃତାର କୃଷକମିଶେର ଗର୍ବିଣୀ ଏବଂ ସୁଦ୍ଧିତ ।

- [illegible]

[illegible]

এই সমস্ত বক্তৃতা শ্রুতের কেতাবের কথা। উহা কলকাতার
কালে আবৃত্তি করিলেই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত ভাল শুনা য়।

4

উইদন মনকর কলিক শিষ্টাচারি কার্য :-

- (ক) ২০০০ সনের ১লা এপ্রিল হইতে শিল্প বিদ্যার ব্যবসায়ের সমগ্র
সরকারিগত ও প্রাচীনকৃত জমি শিল্প-সংক্রান্ত ও ব্যবসায় বিভাগ
অধীন।
- (খ) ভারত সরকারের প্রোগ্রাম এবং অধীনস্থ সংস্থাগুলোর
দ্বারা প্রদত্ত অর্থনৈতিক সহায়তার প্রদান ও কার্যসম্পাদনা।
- ভারত-সরকারের কর্তৃব্যবস্থার পরিচয় লই কি ?

ক্রিয়াপুৰণ বহুশূন্য ইত্যাদি কতিপয় বৈশিষ্ট্য চাওক। ইয়াৰ, নিম্নেই
ইত্যাদি শিষ্টাঃ কিতাঃ।
উদাঃ একমী সৰ্বভাসী পুসংবাদ।

•

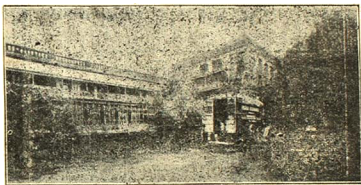
निम्न विवरण विनिर्दिष्ट अनुसार—

- (ক) পর্বত শিখর কাছাকাছি কুঠি
- (খ) জাপানের অন্যত্র। বিশেষ বামানে ও বোম্বাই মিল মালিকদের
সতর্কতা
- (গ) খোয়াং ভারতীয় যবান শিল্প প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর
- (ঘ) পাটের বাজারের কথা
- (ঙ) বাঙ্গালী সরকারের দুই-তিনজন মন্ত্রীকে এই কুঠি আক্রমণ
- (চ) ইংল্যান্ড হেলিকোপ্টার উন্নত
- (ছ) শ্রমিক ও ধর্মিক মনোবৈজ্ঞানিক দলে শিখর কলি
- (জ) আদামের ঠিক শিখর জলাধি চৌকি
- (ঝ) হা-শিখর জলাধি চৌকি

আমাদের পার্টিকিপণ, আগন্তু চমকানি দিবেন না ?

বেঙ্গল ইন্সটিটিউট—গবেষণা-মন্দির

বেঙ্গল ইন্সটিটিউট কোম্পানীর খ্যাতি আজ শুধু ভারতেরই সীমাবদ্ধ নয়, সামন্ত-শাসনে যে সমস্ত দেশ গবেষণার প্রধান কেন্দ্র, সেখানেও তাহাদের সুনাম গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহাদের কৃতিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বহানগরে বিখ্যাত ভবিষ্যৎ উপরে তাহাদের গবেষণাগারের বাড়িগুলি অনেক বাড়ান হইয়াছে। সেগুলিতে আধুনিক গবেষণার উপযুক্ত কোন যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব নাই। অচিৎ, বিজ্ঞানের নানা বিভাগের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে সেখানে নতুন প্রকার গবেষণা ও ঔষধ প্রস্তুতের কাজ চলে।



বেঙ্গল ইন্সটিটিউট গবেষণা-মন্দিরঃ এণ্ট্রি পোর্টাল

বেঙ্গল ইন্সটিটিউট গবেষণাগার চাইতে যে সমস্ত চিকিৎসার উপকরণ এ পর্যন্ত বাহির হইয়াছে, সেগুলি বিশ্বের প্র্যেক্ট ঔষধের সঙ্গে অনাগ্রাসে প্রতিযোগিতার পাড়াইতে পারে। কোন কোন বিষয়ে বিশ্বের জিনিষকেও তাহারা হার মানাইয়াছে।

পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞা বিষয়ে গবেষক—যেমন ডাঃ স্ট্রীয়া, ডাঃ হাটা, হাফকিন্স ইন্সটিটিউটের কর্ণেল জাকি, পাক্সনের অট, ডি, এটচ কর্ণেল হ্যাক্সল, নিভাম রাকোর ডি, ডি, দেবর শাখা মহিমুদ্দিন, বোম্বাই-এর গ্র্যান্ট মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ দাশাল ও ক্যাপ্টেন হাট্টয়া, ল্যাংগাই-এর ডাঃ হিঙ্গল প্রভৃতি বেঙ্গল ইন্সটিটিউটের গবেষণাগার পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

যাফাল। দেশে বেঙ্গল ইন্সটিটিউটের মত বৈদ্য ঔষধ প্রস্তুতের কারখানার পরিকল্পনা প্রথম অত্যাধিক তাকনা হইতেই আসে। গত মহাযুদ্ধের সময়, দরকারী সমস্ত ঔষধ হুজুপা হইয়া উঠায় রোগী ও চিকিৎসকের অসহ্য অনেক ক্ষেত্রে সলীন হইয়া পড়ায়। যিহেই ঔষধের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করার বিপদ ভালো করিয়াই সকলে উপলব্ধি করেন। যুদ্ধের সময়ের মত ক্ষত্র সময় যিহেই ঔষধ চাহিয়া না হইলেও সব সময়ে সম্পূর্ণ

নির্ভরযোগ্য হয় না। যিহেই হইতে সমস্ত-পক্ষে বহুদূর প্রতিফল অবশ্যোগ্য আনার কলে সেগুলি ঠিক সরল থাকে না। তা ছাড়া সেতান, ক্যান্সিন প্রকৃতি স্থানীয় রোগ হইতে টাটকা তৈয়ারী হইলেই যে অধিক ফলপ্রসূত হয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অত্যাধিক অসুস্থ হইতেই বেঙ্গল ইন্সটিটিউট কোম্পানীর প্রথম সৃষ্টি হয়। গোড়ার দিকে কিছু কোম্পানী ত্রুটন স্রুতিয়া করিতে পারে নাই। বর্তমান যানেজিং জটিলেই ক্যাপ্টেন এন, এন, দর, কোম্পানীর তার নিজ স্বত্ব তুলিয়া লওয়া পর হইতেই কোম্পানীর উন্নতি আরম্ভ হয়। সে উন্নতি এখনও সমান ভাবে চলিয়া আদিতেছে। গবেষণাগারে ও ঔষধের বাজারে সর্বত্রই তাহাদের কর্তৃত্বের ত্রুশনঃ ত্রুশনঃ প্রদর্শিত হইতেছে। শুধু চিকিৎসা-জন্যেই অত্যাধিক ঔষধীয় পরিপূরণ করেন নাই, যাহাশার অর্থ মৈত্রিক ত্রুশনঃ মোচনে সাধায়া করিয়া যাবলী হইবার উচ্ছল স্রুতিয়াও বোম্বাইয়াছেন। ঐক্টিত মানবের কল্যাণ ও দেশের আর্থিক উন্নতি এই দুই আদর্শ তাহাদের কাছে একাকার হইয়া আছে। *

পূজার্ম প্রিয়জনের শ্রীতি-উপহার যাবতীয় বাজযন্ত্রের বিপুল আয়োজন



হিজ্ মাস্টারস্ ভয়েস্
গ্রামোফোন ও রেকর্ড
হিন্দুস্থান, কদাঘিয়া, মেগাকোন
ও টুইন রেকর্ড



মেলোডিনা গ্রামোফোন
তালিকা বিনামূল্যে পাঠান হয়।

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮২নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাস্থ্যেতে পারিব কি?

স্বাস্থ্যের অবস্থা! খারাপ, চাকুরীরও স্থায়িত্ব
নাষ্ট। এ অবস্থায় 'পলিসি' ঠিক স্বাস্থ্যেতে
পারিব কি?

লান্সেটের সান্সাইনে

বীমা করিলে আপনার এ ভাবনা ভাবিতে চইবে না।
দীর্ঘায়ু সময় সাময়িক অনটনে ও সকল রকম অসুবিধার
প্রতিবিধান করিয়া বীমা বজায় রাখিতে পারিবেন।
পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানান যায়।

কলিকাতা ব্রাঞ্চ

দি সান্সাইন ইনসিওরেন্স লিঃ
৮৪এ ক্লাইভ স্ট্রীট।

ডাঃ যধুসূদন পালের আবিষ্কৃত পাণপনের মহৌষধ

ইহা দেহের অতি দুর্ধার্য পানপত্র লগ্ন্যহকাল মধ্যে নিশ্চিত আরোগ্য
দায়। পাণপ নিম্নে পরে কথায় অসীম বয়সী বইতে সুত্রসূত্র করিত এক
পাণপের অর্থ অকলংক আবার অর্থের করিয়া সুশ্রুতিতে ইহার প্রায় অর্থ
কলগ্ন ইত্যং আর নাই। ইহাতে যাহা উপকার লাভ আদি, মরকিয়া,
গোলাইড, কোলাল হাইড্রোজ এন্ড ইত্যং অর্থের অর্থের অর্থের
সংক্রান্ত নাই। মূল্য প্রতি দিন ৭০ পাঁচ টাকা।

চুক্তি করিয়াও পাণপ আরোগ্য করা হয়। চার্জ
৩৫, ৪৫তে ৫২৫ টাকা। বিকলে সময় টাকা
ফেরৎ দেওয়া হয়।

বার্ষিক স্ট্রোল—মাত্র তিন দিন দেহের বৎসরায়িক
কাল যাবৎ বিরোধ থাকি।
মূল্য ২০০ টাকা।

পরিচালক—শ্রীপঞ্চদাস প্রামাণিক
গ্রাম - নদিয়া, পোঃ পটুতলা, ২৭ পরগণা।





ভারতের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায় পূর্বসূচি

—প্রিন্সিপালস ভট্টাচার্য্য

এই প্রশ্নে কি পছন্দিত কোন কোন বিষয় দেখা
হইতেছে তাহা আর একবার স্মরণ করিতে হইবে। আমরা
পঠকবিশিষ্টকে তাহা সংখ্যার “পূর্বসূচি” অংশ পড়িতে
অনুরোধ করি।

প্রথমতঃ, “বাবতীয় সমস্যা পূরণের উপায় কি” হইতে
আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয়তঃ, কোন
দেশের একটা সমগ্র জাতির জীবন-গাথনে অসুবিধার উদ্ভব
হইলে কি কি কারণে এবং কি অসুবিধার উদ্ভব হইতে পারে,
তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কোন
কোন কারণে একটা দেশে একটা সমগ্র জাতির প্রত্যেকের
জীবন-গাথার অসুবিধা হইতে পারে, তাহা বঙ্গাবধভাবে জানা
থাকিলে তদন্তবশে আমাদের জীবন-গাথার কতখানি অসু-
বিধা আসন্ন হইয়াছে, তাহার কারণ কি এবং কি হইলে ঐ
অসুবিধাগুলি দূর করা যায় ইত্যাদি স্থির করা সম্ভব হইতে
পারে।

কোন কোন কারণে একটা দেশে একটা সমগ্র জাতির
প্রত্যেকের জীবন-গাথার অসুবিধা অসুবিধা হইতে পারে,
তাহা জানিতে হইলে “দেশ” কাহাকে বলে, “জাতি” কাহাকে
বলে ইত্যাদি জানিবার প্রয়োজন হয়। তদনুসারে আমরা
প্রথমেই “জাতি” ও “দেশ” কাহাকে বলে তাহার আলোচনা
করিয়াছি।

জাতি ও দেশের মূল উপাধান মানুষ, জমী ও জলহাওয়া।
এই তিনটা উপাধান বঙ্গাবধ ভাবে সংরক্ষিত থাকিলে কোন
দেশে কোন জাতির কাহারও জীবন-গাথার কোনরূপ অসুবিধা
ঘটিতে পারে না। যখনই কোন দেশে কোন জাতির
অধিকাংশ লোকের নৈনন্দিন জীবন-গাথনে বাধাপক ভাবে

অসুবিধা অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে
ঐ দেশে হয় মানুষের আপন কর্তব্য-পালনে, নতুবা জমী ও
জলহাওয়ার অসুবিধা অসুবিধা কিসের উদ্ভব হইয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষে আমাদের প্রত্যেকের জীবন-গাথার
যে অসুবিধা অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আমরা আশা
করিয়া নিম্ন নিম্ন বৃত্তে হাত দিয়া ভিত্তাসা করিলে অসুবিধার
পরিমাণ নাই। কবেই আমাদের বুঝিতে হইবে, হয় আমরা
আমাদের দেশের কর্তব্য-পালনে বিনষ্ট হইয়াছি, নতুবা
আমাদের জমীতে ও জলহাওয়ার কোনরূপ বিঘ্নিত দেখা
দিগাহে।

আমাদের প্রত্যেকের জীবন-গাথার যে অসুবিধা
হোগা করিতে হইতেছে তাহার কারণ এই হইবার সম্ভা-
বনা নাই, তাহা জানিতে হইলে মানুষের কর্তব্য কি কি, জমী
কি হইলে জলসম্পদ হয় এবং কেনই বা তাহার উৎপাদন-শক্তি
কমিয়া যায়, জলহাওয়া কি হইলে বিঘ্নিত হইয়াছে নতুবা যায়,
এবং কি তথা জানিবার প্রয়োজন হয়। মানুষের কর্তব্য কি
কি তাহা সঠিকভাবে জানিতে হইলে মানুষ কোন কোন
উপাধানে গঠিত, কোথা হইতে মানুষের উপাধানগুলির
সংরক্ষণ হয়, কি কি কারণে তাহার কাৰ্য্যশক্তির উদ্ভব হয়,
কেন বিভিন্ন মানুষের কাৰ্য্যশক্তি বিভিন্ন রকমের হয়, কি
করিলে মানুষের কাৰ্য্যশক্তির উন্নতি সাধিত হইতে পারে
ইত্যাদি বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন আছে। মানুষ-
সম্বন্ধীয় তথ্য সম্পূর্ণ জানা না থাকিলে নিম্ন নিম্ন কর্তব্য
অন্যথায় ভুল আশাগুলির বর্তমান দুরবস্থার উদ্ভব হইয়াছে
কি না, তাহার সঠিক বোঝা করা সম্ভব হয় না। তাহারই
জন্য এই প্রথমে মানুষসম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞানকে বিষয় আলোচিত
হইতেছে। ঐ তথ্যগুলির আলোচনা যে রূপ বিঘ্নিত ভাবে

করা হইতেছে, তাহা শেষ করিতে হইলে এখনও ই বিদগুণি পৃথিবী 'পদ্মপ্রী'র অনেক সংখ্যা অভিযোজিত করিতে হইবে। অষ্ট ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্ত কি এবং তাহা পূর্ণবয়স উপাদানবদ্ধ এই প্রবন্ধের বক্তব্য কি, তাহা জানিবার জন্য আমাদের পাঠকগণ কোতুলক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কারণই আমরা এই সংখ্যার প্রকাশের সংক্ষেপে তাহার আশোচনা করিব।

ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্তার

সংক্ষেপবর্ণনা

যেদের চারিদিকে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া চিত্রা করিলে বলিতে হয়, বর্তমানে আমাদের প্রধান সমস্যা তিনটি :—

- (১) রসিক, তাঁতী, ঘৃণ, হৃদয়কার এবং কর্মকার-প্রভৃতি প্রযৌগিকের অভাব।
- (২) শিক্ষিত পুরুষদের ও প্রযৌগিকের বেকারতাব্যবস্থা এবং অসম্পূর্ণতা।
- (৩) সমস্ত অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, অসম্পূর্ণতা এবং পরম্পরাগোপিত।

ভারতবর্ষের প্রযৌগিকের মধ্যে বাহ্যিক আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানপ্রতির কার্যে নিম্নতম প্রবর্তা, তাহারা সর্বতোভাবে তাল আছে ইহা স্পষ্টতরূপে বলা যায় না। আবার তাহাদিগকে অভ্যন্তরে জর্জরিত বলিয়াও মনে করা যায় না। ভারতবর্ষের প্রযৌগিকের সম্পূর্ণ সংখ্যার তুলনায় বাহ্যিক আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কার্যে নিম্নতম আছে, তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত নূর্য্য। এই নূর্য্যের কারণে কলার সমস্তকে বাদ দিলে সারা ভারতবর্ষে প্রায় ২৭ কোটি প্রযৌগিক অবশিষ্ট থাকে। তাহারা যে প্রায়শঃ য য অভাবের তাড়নায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা তাহাদিগের কার্যকলাপের দিকে একই মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলেই স্পষ্টতরূপে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের যেকোন উপর বিদ্যা সহস্র সহস্র বংশের হইতে নানা বস্তুকের কল্যাণ চর্চিয়া আসিতেছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই কল্যাণে ভারতবাসীদিগের মধ্যে ঈর্ষান্বিত বর্তমান কালে উজ্জলোক, দখলিত অথবা ধনী বলা হয়, তাহাদিগের মধ্যে চাকলা সেবা গিয়াছে, কিন্তু ভারতের

প্রমৌখিলসমূহ বহুদিন পর্য্যন্ত প্রাপন: অচল ও অটল ছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

যে প্রায়শঃ আত্মপ্রতি এবং অসম্পূর্ণতা, সেই প্রায়শঃপণ্ট যে ভারতের ভবিষ্যৎ ও সুখের লক্ষ্য, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আজ কোন রাজ্যের চালচলন দেখিয়া প্রকৃত প্রায়শঃ কি বস্তু তাহা বলা যায় না বটে, কিন্তু প্রায়শঃ যে অত্যন্ত মনোহর এবং তাহা যে এক সময়ে সমস্ত ভগবতের আরাধা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একদিন যে সারা ভগবৎ বৈষ্ণব, হিংসা তুলিয়া গিয়া একমুখাবলম্বী হইয়াছিল এবং ভারতের প্রায়শঃের নির্বীণ পদ্য পরিচালিত হইয়া সর্ব বস্তু হুঃখস্বপ্নের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাও সহজেই প্রমাণ করা যায়।

অগতের ঐকমত্য নষ্ট হইয়া যে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইয়াছিল, সেই সময়টিকে বলিতে হইবে যদুত-জীবনের বর্তমান কল্যাণের প্রায়শঃ-কাল। প্রায়শঃপণ্ট সারা ভগবতের ঐকমত্য বিধান করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাদেরই কার্যে কল্যাণের ভগবৎ ফল, হিংসার প্রথম উদ্ভব হইয়াছিল। "কারণ" ও "চরিত্র" ও উদ্ভব-কালকে বর্তমান অগতের লক্ষ্য-বাতের প্রায়শঃ-কাল বলিতে হইবে। এই সময়ই সর্ব-প্রথমে সাম্প্রদায়িক ভগবৎপ্রবর্তা প্রায়শঃপণ্ট আশ্রয়দায়কে গঠিত করিয়া "প্রাচীন-পথ" ও "আধুনিক" নামক দুইটি সম্ভায়ে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রায়শঃপণ্টের এই সাম্প্রদায়িক ভগবৎ প্রবর্তা ও বৈষ্ণবগণ যে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শঃ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তখনও ভারতের প্রযৌগিক প্রায়শঃ অচল এবং অটল ছিল। ভারতের ভগবৎপ্রবর্তা তাহার পর একে একে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, শ্রীমন্তপ্রভৃতি বিবিধ সম্ভায়ে আপনাদিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূললবানগণের রাজ্যের পূর্বকাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রযৌগিক প্রায়শঃ সর্বতোভাবে অগতীত ছিল। মূললবানগণের রাজ্য-কালে কতিপয় প্রযৌগিকের সর্বপ্রথমে প্রায়শঃ প্রবর্তা করিয়া কল্যাণ

* ভারতীয় প্রায়শঃ পণ্ট যে সমস্তভাবে সারা ভগবৎ একদিন প্রায়শঃপ্রবর্তা, তাহা এই প্রায়শঃ প্রায়শঃ ও ভারত মনে প্রায়শঃ কল্যাণ প্রবর্তিত হইয়াছে।

১. আধুনিক প্রায়শঃ প্রবর্তা "কল্যাণ" বলা হয় এবং তাহা প্রায়শঃ "কল্যাণ" প্রায়শঃ প্রবর্তা-পুরুষের দ্বারা প্রবর্তিত "কল্যাণ" বলা হয়।

প্রযোজিতব্যায় আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের যেটি সংখ্যায় তুলনার বাহ্যিক স্বার্থস্বার্থ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা নষ্টব্যে। একটীর পর একটী করিয়া কত রাজস্বের পরিবর্তন হইয়াছে। তাহাতে ভ্রম-শোকগণ বিভ্রান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রযোজিতব্যায় ভ্রমশোক করে নাই। একজন বঙ্গের আগে ভ্রমশোক ও বৈত-সম্মানের আপন আপন বৃত্তি ছাড়িয়া অল্প বৃত্তি অবলম্বন করিবার সহ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কুবক, ভীতা, স্তম্ভকার, কণ্ঠ-কারপ্রভৃতির সম্মানগণের মধ্যে য য বংশীয় শেখা পরিচয় করিয়া জীবিকার ভয় মন্ত কোন পক্ষ অবলম্বন করিবার দৃষ্টান্ত অশেষাক্রমে বিরল ছিল।

হিন্দু বঙ্গের আগেও বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত কুবক কৃষি ছাড়িয়া কলের চাকুরী করিতে অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আজ তাহাদের কি অবস্থা হইয়া গিয়াছে, তাহা একবার অগন্যার চাহিয়া দেখুন। যে কুবক একদিন কলের চাকুরী স্থগা করিয়াছে, আজ সেই কলের চাকুরী বাছা করে না, এমন কুবক দূর্গত হইয়া গিয়াছে, পরন্তু এখন তাহাদের অধিকাংশই কলের চাকুরীর ভয় লাশাষিত হইয়াও তাহা পায় না। বাহারা একদিন “অনিম”কে নতর দিতে পারিলে নিজস্বগত কৃতার্থ মনে করিত, বাহাদিগের বিকট হইতে চালা ও তেট পাইয়া ভবীসারগণ বোল-জ্বালায়ন করিতেন, আজ তাহাদিগের বিকট হইতে নির্যাসিত বাহাদিগী পর্যায় পাওয়া গাইতেছে না। কৃষিতে যে এখন আর তাহাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় বাস নির্বাহ হইতেছে না, ইহা কি তাহারই পরিচয় নহে? একদিন বাহারা বাড়ী ছাড়িয়া অস্ত্র গাইতে অসম্মত বোধ করিত, আজ তাহারা পেষ্টের জন্ত যেখানে সেখানে গাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের কষ্ট যে চৈর্যার সীমা অভিক্রম করিয়াছে, তাহা কি ইহা হইতে বুঝা যায় না?

প্রত্যেক দেশে কুবকপ্রভৃতি প্রযোজিতব্যায়ের অধাভাবই এখন সর্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা। কৃষি ছাড়া বাহাদের জীবিকা-নির্বাহের উপায় আছে আর তিনটী। তাহাদের নাম—(১) কলকারখানা, লোকানবাসী, গালাবীপ্রভৃতি শিল্পের ও বাণিজ্যের কার্য। (২) ওকালতী, ডাক্তারীপ্রভৃতি বাহাদিগ ও শিক্ষকতা। (৩) সরকারী চাকুরী। কুবক লাভজনক না

হইলে এবং কুবকের জ্ঞান করিবার সামর্থ্য না থাকিলে শিল্প, বাহাদিগ ও বাণিজ্য লাভজনক হইতে পারে না। কৃষি, শিল্প, বাহাদিগ ও বাণিজ্য শোকগণ হইতে আরম্ভ করিলে দেশের সর্বসাধারণের বিশেষ অবস্থান, কারণ সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক বাহাদের জীবিকার উপায় তিনটী। সর্বসাধারণের বিশেষ হইবার অসম্মততার পরিণতি গভর্ণমেণ্টের বিশেষ হওয়া। গভর্ণমেণ্ট বিশেষ হইলে কোন চাকুরীও নিয়োগ থাকিতে পারে না। কাজেই কৃষি এবং কুবক বিশেষ হইলে দেশে সর্বসাধারণী বিশেষ ও অসম্মত অবস্থান।

অন্যদিকে কৃষিমাধ্যম দেশের বহু বাহাদের জীবিকা নির্বাহ সম্ভব, আর কোন পক্ষ তাহা হওয়া সম্ভব নহে। আগেই বলিয়াছি, কৃষি ছাড়া বাহাদের জীবিকার উপায়ের উপায় আছে আর তিনটী, যথা—শিল্প ও বাণিজ্য, বাহাদিগ ও শিক্ষকতা এবং চাকুরী। এই তিনটী উপায়ের মধ্যে ওকালতী, ডাক্তারী-প্রভৃতি বাহাদিগ ও শিক্ষকতা এবং চাকুরীতে যে দেশের যেটি লোকসংখ্যায় তুলনার ভিত্তি আর শোকগত স্থান হইতে পারে, তাহা বাহাদিগ ও কুবক কলমেই বুঝিতে পারা যায়। যে সমস্ত বহু প্রস্তুত করিবার ভয় শিল্পের প্রয়োজন হয় এবং বাহাদিগী বাহাদিগ বাণিজ্য করিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটী, হয় বাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে নতুবা সমস্ত জীবনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহাদিগ ও কুবক বহু কিছু বহু ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার সমস্তই কুবক, শিল্পী ও কুবকের সমস্তগত-প্রযোজ্য। বাহাদের খাইবার ভয় তাহাদের প্রয়োজন হয়। তাহা পাঠতে হইলে প্রথমতঃ বাহাদের প্রয়োজন হয়, তাহা কুবকের প্রযোজ্য। দ্বিতীয়তঃ বাহাদিগ হইতে চাইল প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা শিল্পের পরিপ্রযোজ্য। তাহার পর তৃতীয়তঃ এই চাইল বাহাদিগ সর্বত্র পৌছিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা বাণিজ্যের প্রযোজ্য।

বাহাদের নিয়োগের থাকিতে হইলে দেশের প্রয়োজন, শিল্পের প্রয়োজন, লোকানবাসী ও বেওয়ানী আলস্যের প্রয়োজন। তাহা গভর্ণমেণ্টের কৰ্মচারিগণের প্রযোজ্য। প্রত্যেক বাহাদের প্রয়োজনে বহু কিছু বহু লাগে তাহার প্রত্যেক-টীর কোন কোন অংশ কৃষিজাত, কোন কোন অংশ শিল্পজাত, কোন কোন অংশ বাহাদিগ ও বাণিজ্যজাত এবং কোন কোন অংশ গভর্ণমেণ্টের কৰ্মচারিগণের পরিপ্রযোজ্য, তাহার পক্ষ

করিলে এবং ঐ ঠাণ্ডে কয়লার কলেক্টর, শিলার, বাবদারীর, বশিষ্ঠের এবং গভর্নমেন্টের কর্তৃপক্ষের পরিগ্রহের প্রয়োজন হয়, তাহা হিচাব করিলে দেখা যাইবে যে, মাগুরের বাহা বাহা প্রয়োজন হয়, ৩৬২পানসার্থ সর্বসংবেত যে কয়লার বিভিন্ন বাবদারীর পরিগ্রহের প্রয়োজন হয়, তাহার ৫ ডাগ কয়ল, ৫ ডাগ শিলার এবং ৫ বশিষ্ঠ, উকিল, ডাক্তারপ্রভৃতি বাবদারী ও গভর্নমেন্টকর্তৃক। কাবেই বর্ণিতে হইবে, দারাজ অগতের সময় মাগুরের জম হইত কিছু বস্তু লাগে, তাহা উৎপাদ করিতে হইলে সম্পূর্ণ কর্তৃক মাগুরের সংখ্যার আট ভাগের ছয় ভাগ কৃষিকার্যে, ১ ভাগ শিলার এবং ১ ভাগ বাগিচা, বাবদার এবং গভর্নমেন্টের চাকুরীতে লাগান যাইতে পারে। কোন দেশে ছোটিকার্কনের কোন পেশার উপযোগ্য অস্থাপত্যস্থাপত্যে যে পোকসংখ্যা হয়, তদতিরিক্ত লোক নিযুক্ত হইলে নিম্ন দেশে প্রোগ্রোনতিরিক্ত প্রবোধ উৎপত্তি অবশ্যস্বাভাব্য হইয়া পড়ে এবং সেই দেশের পরম্পরগণক; হওয়াই অনিবার্য।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কৃষি উপেক্ষিত হইয়া শিল ও বাগিচাসিতে প্রয়োজনতিরিক্ত অধিক লোক নিযুক্ত আছে বলিয়া তাহাদের মাল কার্টিজর জম অস্ত্রপেশের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যস্তর নাই। এখন কোন পেশার সাধা ভগ্নতের প্রয়োজনতিরিক্ত লোকসংখ্যা নিযুক্ত হয়, তখন সর্বত্র অস্থ্য-ভাতির রূপে অনিবার্য। বর্তমান কালে যে ভগ্নতের সর্বত্র হারাকার উদ্ভিগছে এবং লক্ষণ দেশেই শিলজাত প্রবোধ অতিরিক্ত উৎপাদনের (over-production) কথা শুনা যায়, তাহার কারণ কৃষির প্রতি উপেক্ষা এবং শিল, বাবদার, বাগিচা ও চাকুরীতে প্রয়োজনতিরিক্ত লোকের নিয়োগ। আবার অল্প দিকে দেখা যাইতেছে, কৃষিকার্যে যাহারা নিযুক্ত আছে, তাহারাও বিপন্ন। একদিক দিয়া সেখানে বর্ণিতে হয়, শিল, বাবদার, বাগিচা ও চাকুরীতে যে লোকসংখ্যা নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার দ্রাব সাধন করিয়া কৃষিকার্যে অধিকসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন আছে। আবার অল্পদিক দিয়া সেখানে বর্ণিত হয় যে, যাহারা কৃষিকার্যে নিযুক্ত তাহাদেরই চলিতেছে না, এই অবস্থার আরও অধিকসংখ্যক লোক কৃষিকার্যে অবলম্বন করিলে—মাগুরের জীবনসাহায্য উৎপন্ন হওয়ায় আশা কোণার?

কাবেই বর্ণিতে হইবে, কৃষি-সমস্তা অথবা কৃষক প্রভৃতির

অজ্ঞানতাই এখন বহুগুণাতির লক্ষ্যলক্ষ্য অধিক উৎপন্নের কারণ।

মাগুরের বিভিন্ন উৎপন্নের কারণ, শিল্পিত পুষ্করিণের বেকার অবস্থা। আশাবাদের শিল্পিত ভেগনের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিশ্বাসের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও কার্যকরতা লাভ করে না। তাহা সত্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বভাবতঃ উচ্চল রত তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রতি বৎসর বিশ্ববিশ্বাসলগণ হইতে লক্ষ লক্ষ পুষ্করিণ বিভিন্ন রকমের অতিক্রম করিয়া উচ্চ উপাধিগুলি অর্জন করিয়া থাকে। তাহারা কত আশা তরঙ্গা বৃক্ক লইয়া কর্তৃকীয়নে প্রবেশ করিবার জন্য কি কঠোর পরিগ্রহ করে, তাহা বেকার পুষ্করিণের মুখের দিকে চাহিলে সহজেই অবলম্বন করা যায়। তাহা-দিককে বাহা শিখান হইয়াছে তাহাই তাহারা শিখিয়াছে, যে রকম ভাবে তাহাদিককে চলকেরা করিতে বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভাবেই তাহারা চলকেরা করিয়া থাকে। তাহারা প্রাথমিক চাহে মাগুরের বস্তু পরিগ্রহ করিয়া বিবদা মাতা ও ভৃত্য প্রভৃতি পরিবারবর্ষের প্রয়োজনীয় অস্ত্রপেশের সংস্থান করিতে। মুক্তিযুদ্ধভাবে তাহাদিককে কোন ঘোষ বেওয়া যায় না, অথচ আশাবাদের ব্যবস্থা এইরূপ হইয়া গড়াইয়াছে যে, ছেলেরা পরিগ্রহ করিয়া অজ্ঞানপার্জন করিতে, চাহিলেও পরিগ্রহের ক্ষেত্র কোথায় তাহার লক্ষ্যন কেহ তাহাদিককে দিতে পারেন না। কেহ তাহাদিককে বলেন, কৃষি কর, কেহ বলেন, বাগিচা কর, কেহ বলেন, শিল কর, কেহ বলেন, জুতা সেলাই কর, কেহ বলেন, হকারী কর, কেহ বলেন, পানের পোকান কর, কেহ বলেন, রিক্স টান, কত অস্বাচিত উপদেশ তাহাদিকদের উপর বর্ণিত হয়। যিনি বাহা তাহাদিককে বলিতেছেন, অবিলম্বেই তাহারা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত। তবুও তাহাদের মধ্যে অনেকেরই “বেকার” থাকিয়া যায়। অল্প কয়েকজন যাহারা কর্তৃক-নিয়োগ পায় তাহাদের মধ্যেও অনেকেরই প্রাথমিক চাহিদারক্রেতা জীবনের নিত্যসঙ্গী করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদের শারীরিক স্বাস্থ্য, অর্থভাষ্যনিত সৌন্দর্য, তাহাদের মানসিক চালচলনে বিষয়ে প্রতি অবস্থান সর্বদা সূচক বাতির হইতেছে। প্রাথমিক তাহারা স্ব প মনোবৈদ্য। বৃক্কের বিভিন্ন লক্ষ্যনিত

রাখে এবং তাহাদের এক এক যানি বুক এক একটা প্রমিত অস্তিত্ব এবং ইচ্ছা থাকে। যানি পাইলে নিজেস্বাধীন এবং প্রোতাহক নীতায়; কিন্তু প্রায়শঃ কোন কল হইয়া না। আপনাতঃ চাটিয়া বেগুন, অমাব্যের কত উচ্চল রস কি ভীষণ ভীষণ কাহিনী যনে লুকাহিত গ্রাথিয়াছে, এমন কি অবশেষে আত্মহত্যা পন্থায় করিতে বাধ্য হইতেছে। যিনি একবার সত্যের দিতা হইয়াছেন অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় হইয়াছেন, তিনি কি ঐ সমস্ত নিবারণ কাহিনী ও ঘটনা শুনিয়া অবিকলিত থাকিতে পারিবেন? কাষেই শিক্তিত প্রবর্তনগের বেকার অবস্থাও আত্মবিশ্বের একটা ভীষণ সমস্যা হইয়া গড়াইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

সমস্ত মানুষের আত্মাধীনতা, অকালমৃত্যু, অসম্পূর্ণতা এবং পরমুপেক্ষিতা আত্মবিশ্বের কৃত্রিম উদ্দেশ্যের কারণ।

মানুষ যে ক্রমশঃই ব্যাপকভাবে আত্মাধীন হইয়া পড়িতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কাহারও কোন রিপোর্ট অথবা আত্ম-বিবরণীর প্রতি নির্ভর না করিয়া বাহ্যিক আপনাদের দ্বাৰা পরিচিত উদ্দেশ্যগের সকলের আত্মা কি অবস্থার গড়াইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করুন। সার্বভৌমত্বে চোপের হটক, অথবা ধাতের হটক, অথবা বৃক্কের হটক, অথবা পেটের হটক, অথবা শরীরের কোন অঙ্গের কোন ব্যাধিধীন কর্তী দিন আমরা অতিবাহিত করিতে পারি তাহার হিসাব করুন। ধনবান্ হউন অথবা নিধন হউন, বিকৃত হউন অথবা অশিক্তিত হউন, বৃক্ক হউন অথবা বৃদ্ধ হউন, হৃদিত টাক। বেতনের কর্তৃত্বাধীন হউন অথবা ৫০০০ বেতনের কর্তৃত্বাধীন হউন, উকিল হউন, ডাক্তার হউন, শিল্পী হউন, বণিক হউন, ভ্রমক হউন—সকলেই জীবনের অধিকাংশ সময়ই যে, কোন না কোন ব্যাধিগ্রস্ত থাকিতে বাধ্য হন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, মানুষের জীবনে এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া আত্মবিশ্ব এবং ইচ্ছাকে কোন সমস্যা মনে করা সম্ভব নহে। তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, বর্তমানে যেসকল প্রায়শঃ জীবনের অধিকাংশ দিনই কোন না কোন রোগে কষ্ট পাঠিতে হয়, ত্রিশ বৎসর আগেও শারীরিক অসুস্থতা এত ব্যাপক ছিল কি? তাহা যদি না দেখা যায়, তাহা হইলে কি বলিতে চষ্টবে না যে, এত

অসুস্থতা আত্মবিশ্ব মনে? তাহার পর যদি একটা মানুষকেও দেখা যায় যে, তিনি ষাট বৎসর পর্যন্ত জীবনের প্রায় সমস্ত সময়ই কোন অসুস্থতা ভোগ না করিয়া নির্মিতভাবে বীরা কৰ্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে কি স্বীকার করিতে হইবে না যে, মানুষের পক্ষে অসুস্থতা ছাড়াও জীবন গাণন করা সম্ভব এবং প্রতিবিরত অসুস্থতা অস্বাভাবিক? মানুষের অকালমৃত্যু যে ক্রমশঃই বাড়িয়া গাইতেছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। মানুষের অকাল-মৃত্যু হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে কত বৎসর মানুষের জীবন-কাল তাহা প্রমত্তঃ নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি একটা মানুষকেও দেখা যায় যে, তিনি একশত বৃদ্ধি বৎসর পর্যন্ত পরমাৎ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা হইলে বাকী মানুষ যে কোন ১২০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে আর উপস্থিত হইতে পারে এবং ১২০ বৎসরের আগে বাহ্যিক মৃত্যুগ্রস্ত পতিত হন, তাহারা অকাল-মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন ইহা বলা বাইতে পারে। কোন দেশে অকাল-মৃত্যু না থাকিলে, প্রতি বৎসর যে কর্তী শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাহারা একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে ইহা আশা করা যুক্তিসঙ্গত। কাষেই অকাল-মৃত্যু না থাকিলে ৩০ বৎসর আগে যে কল্পনাময় এক বৎসরের ছিলেন তাহাদের সকলের আয় ৩১ বৎসরের হইবার কথা, বাহ্যিক হই বৎসরের ছিলেন তাহাদের আয় ৩২ বৎসরের হইবার কথা ইত্যাদি। যদি তাহা না চষ্টয়া তৎপেক্ষা কম সংখ্যক লোক ৩১ বৎসরের অথবা ৩২ বৎসরের হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলেই বৃদ্ধিতে হইবে, দেশে অকাল-মৃত্যু চাপিতেছে। তাহার পর যদি দেখা যায় যে, কোন বিশ বৎসর জন্মহারের যে অংশ মৃত্যুর দ্বারা ছিল, তাহার তুলনায় তৎপরিবর্তী কোন বিশ বৎসরে মৃত্যুর দ্বারা জন্মহারের অসংকলিত অধিকাংশ হইয়া গড়াইয়াছে, তাহা হইলে বন্দিতে হইবে, দেশে অকাল-মৃত্যু বাড়িয়া গাইতেছে।

ভারতবর্ষে শোক-গণনা কাষা আরম্ভ হইয়াছে ১৯০১ সাল হইতে। তৎপরি প্রতি বৎসর অন্তর সর্বসম্মত চারিবার শোক-গণনা হইয়াছে। শোক-গণনার এই চারিটা রিপোর্ট পরীক্ষা করিলে আত্মবিশ্বের দেশে অকাল-মৃত্যু কি ভীষণভাবে বাড়িয়া গাইতেছে, তাহা সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

ঐ রিপোর্ট হারিটি পরীক্ষা করিলে মৃত্যুর হার বাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বয়স	১৯১১ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত মৃত্যুহার	১৯১১ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত মৃত্যুহার
২০-২৪ বৎসর	২০.৪%	৩৪.৪%
২৫-৩৪ "	৪৪.২%	৪৮.২%
৩৫-৪৪ "	৪৩.৪%	৬৮.৪%

ইয়োয়োগ এবং মার্কিন দেশে প্রতি বৎসর বহু শিশু ওষুণ্ডগ্রস্ত করে তাহার শতকরা ৪৪ জন মৃত্যুবশে পতিত হয় ৪০ বৎসর বয়সের আগে।

সেবার প্রত্যেক দোকান যে স্ব স্ব জীবন-ব্যায়ের অসম্পূর্ণ তাহা নিজ নিজ বৃদ্ধ হাত দিয়া প্রেরণ করিলেই জানিতে পারা যায়।

স্বদেশের সম্মানজনক শিক্ষিত হইয়া মনে করিতেছেন একটা বড় চাকুরী না পাঠিলে জীবন কৃথা, জীবন-সম্মানজনক মনে করিতেছেন শিল্পী অথবা বণিক না হইতে পারিলে আত্মকাল-কার প্রভুত ধনবান হওয়া যায় না, উকিল এবং আইন-বাবসারিগণ মনে করিতেছেন একটা নিশ্চিত বেতনের চাকুরী না হইলে জীবনব্যায়ের অন্ত্রবিধ অসম্পূর্ণতা, শিল্পী ও বণিকগণ মনে করিতেছেন যে, তাহাদের কল্যাণের জীবন অপেক্ষা বাড়ী-ভাড়ার আর অথবা কোম্পানীর কাগজের মূল্যের আর অনেক নিরাপত্তা, আবার বড় বড় চাকুরীগণ দেখিতেছেন যে, চাকুরীতে পাস্তি নাট এবং ততপেক্ষা পানের পোকান করিয়া ভাল ভাত পাওয়া ভাল, কেহ কাগজের স্বীয় বাবসারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছেন না। কেহ বা স্বীয় উপার্জননের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ, কেহ বা অল্প বাবসারে অসম্পূর্ণত অধিক উপার্জন হয় মনে করিয়া সর্বদা আগুন বাবসারে অসম্পূর্ণতা ভোগ করিয়া থাকেন।

এমন কোন মানুষ নাই, যিনি পরমুখাপেক্ষী হইতে চাহেন, অথচ বর্তমান অগতে প্রায় সকলেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মাথারপত্তা বনে করিয়া থাকি যে, চাকুরীগণগণই একমাত্র পরমুখাপেক্ষী এবং বাহারা জীবিকার জন্য রুচি, শির অথবা বাবসারে ও বণিজ্য অবলম্বন করেন তাহারা স্বাধীন : কিন্তু এত ধারণা দৃষ্টিপন্নত নহে। ক্রমক তাহার উপর মস্তের পরিমাণের ক্রম মতকারী জলসিকন-

প্রণালীর উপর নির্ভরশীল এবং উপর মস্তের মূল্যের ক্রম ব্যাকারের মস্তের উপর নির্ভরশীল। তাহার স্বীয় চেষ্টায় ক্রমের মূল্যের হ্রাস এবং বৃদ্ধি হয় না এবং যথোপযুক্ত মূল্য না পাঠিলে তাহাকে অভাবগ্রস্ত হইতে হয়। আটম-বাবসারিগণ মোকদ্দমার সংখ্যা ও মক্কেলের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা-বাবসারিগণ রোগের সংখ্যা ও অবস্থার উপর নির্ভরশীল। শিল্পী ও বণিকগণ বাজার-মূল্যের উপর নির্ভরশীল। যিনি অশেষ পরিশ্রমের ফলে কিছু লক্ষ্য করিতে পারিয়াছেন তাহারও নিত্যের নাই। কোম্পানীর কাগজ, সেগার, ক্রসম্পত্তি প্রভৃতির মস্তের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য আত্ম যিনি লক্ষ্যপতি, কাল হ্রস্ত তিনি হই লক্ষ্যপতি, আবার পরন্ত তিনি লক্ষ্যপতি হাজারের মানুষ হইয়া পড়িতেছেন। ভারতবর্ষে এক দিন ছিল, এখন মানুষ পুরুষাত্মকিক জীবনসারী ও তেজস্বিত প্রভৃতিদ্বারা বহুমানুষী করিতে পারিত, কিন্তু গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে বাহারা বহুমানুষ হইয়াছেন, তাহাদের সম্মান-সম্মতিগণ আবার একে বেক্ষত বৎসরের মধ্যেই গরীব হইয়া পড়িয়াছেন। তিন পুরুষের অধিক এখন আর প্রাণশঃ কাহারও ভাল অবস্থা রক্ষিত হয় না।

কাহ্নেই বেলা বাইতেছে সময় মানুষ বাহা বাগা চাহে, ভারতবাসীর পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয় পাইবার অন্ত্রবিধা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে সংখ্যার সর্বাপেক্ষা অধিক রূষক। তাহারের মধ্যে অল্প, বহু প্রভৃতি মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় ভিনিষের অভাব অভাব দেখা দিয়াছে।

মহাবিশ্ব সম্মানজনকের মধ্যে অধিকাংশই বেকার।

যাহা, সৌখিন্য, সমৃদ্ধি এবং আবলম্বন প্রত্যেক মানুষের কাম্য, অথচ ভারতবাসী প্রায়শঃ স্বাভাবিক, অসম্পূর্ণ, পরমুখাপেক্ষী এবং অকালে মরণশীল।

অনেকে মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাবই আমাদের প্রধান সমস্যা। ইহা সমীচীন কি না তাহা চিন্তায় যোগ্য। স্বাধীনতা থাকিলে দেশের অধিবাসিন্দ্র বাহা বাহা চাহেন তাহা পাইবার ব্যবস্থা করিবার সুবিধা হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকিলেও যে মানুষ অত্যন্ত কাম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে তাহা সত্য নহে। তাহার-মৃত্যু হইয়া উত্তরোত্তর এবং মার্কিন প্রভৃতি

অপরায়ণ ভাতিগণ। তাঁহাদের বস্ত্রীয় স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু ঐ ঐ দেশেও অসংখ্যের অভাব, বেকার সনাত, অস্বাস্থ্য, অসামর্থ্য, অসদ্বৃষ্টি, পরস্থাপনেক্ষিতা পূর্ব ব্যাপকভাবেই বর্তমান আছে।

ভারতবাসীর বর্তমান দুঃস্থতার কারণ

ভ্রমক প্রভৃতি প্রমোদবিধিগণের অস্বাভাবিক প্রবাস কারণ দুইটী :—বন্দা (১) জমীর উর্বরশক্তির হ্রাস, (২) পশুপক্ষের নৃণের সাদৃশ্যের অভাব (want of parity)।

এক জন ভ্রমক সারা বৎসরে ৭৮ বিঘার বেশী জমী চাষ করিতে পারে না। ঐ ৭৮ বিঘা জমী হইতে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তদ্ব্যতী অথবা তাহা বিক্রয় করিয়া ভ্রমক-পরিবারের প্রয়োজনীয় পণ্য নির্মাণ না হইলে তাহাদের অস্বাভাবিক হওয়া অনিবার্য। পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতবর্ষের জমী হইতে প্রত্যেক বিঘার গড়ে কিলোমিট্র ১১/৪৭ পণ্ড উৎপন্ন হইত। ঐ স্থানে বর্তমানে পাড়াটীয়াছে কিলোমিট্র ০১/৪৭ অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম। তাহাতে ভ্রমক-পরিবারের এখন পর্য্যন্ত কাংশেই উন্নতির সংস্থান হইতেছে। কিন্তু প্রায়শঃ জমীদারের খাজানা অথবা স্ব স্ব পরিবারের বহুরি ক্রয় করিবার জন্য কিছু উদ্ধৃত থাকিতেছে না। প্রতি পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বিঘার যে পরিমাণে উৎপন্ন পণ্ডের হার কমিয়া বাইতেছে, তাহার অংশোদয় সংঘটিত না হইলে, অনতিবিলম্বে ভ্রমকের উন্নতির জন্যও অধিকতর ক্রয় ভোগ করিবার আশঙ্কা আছে।

যে যে স্থানে উৎপন্ন পণ্ডের হার অপেক্ষাকৃত একটু বেশী, সেট সেট স্থানে ভ্রমকের উন্নতির সংস্থান করিয়া কিছু পণ্ড উদ্ধৃত থাকে এবং তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার বস্ত্র ক্রয় করিবার সামর্থ্য লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন বস্ত্র নৃণের মধ্যে কোন সাদৃশ্য (parity) না থাকায়, কাঁধাতঃ ভ্রমকের বহু প্রয়োজনীয় বস্ত্রই অভাব থাকিয়া যায়।

শিক্ষিত বর্গাধীন দুঃস্থবিধিগণ ও প্রমোদবিধিগণের বেকার-বস্ত্রাণ্ড ও অসদ্বৃষ্টির কারণ তিনটী—(১) ভ্রমকপ্রভৃতি প্রমোদবিধিগণের অস্বাভাব্য; (২) জীবিকাকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি উপার্জন-সম্ভাবনার অসাম্যকত; (৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-বিভাজি।

প্রত্যেক দেশেই জীবিকা উপার্জননের পদ্ধতি সাধারণতঃ চারিটা—বন্দা (১) কৃষি; (২) শিল্প ও বাণিজ্য; (৩) শিক্ষকতা ও ব্যবসা (৪) সহকারী চাকরী। এই চারিটা বিভাগে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে :—বন্দা (১) প্রমোদবিধি (manual worker); (২) সহকারী পরিচালক (sub-ordinate officer); (৩) পরিচালক (officer)। হস্তশিল্পী কার্যক্রম হইলেই প্রমোদবিধি হওয়া যায়, কিন্তু কোন কার্যের পরিচালনা করিবার উপযুক্ত হইতে হইলে শিক্ষা দ্বারা মস্তিষ্কের অঙ্গাণু বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিবার প্রয়োজন হয়। হস্তশিল্পীর পটভাষ্যেই প্রমোদবিধিগণের কার্যক্রমতার তারতম্য হয় বটে, কিন্তু ঐ তারতম্যের পরিমাণ খুব বেশী হয় না। প্রমোদবিধিগণকে জীবিকাকর্মের যে কোন পদ্ধতিতেই নিযুক্ত করা যাক না কেন, তাহারা তাহাদের হস্তশিল্পী দ্বারা প্রায় এককম্য কাখাট উৎপন্ন করিয়া থাকে। কাখেই প্রত্যেক বিভাগের প্রমোদবিধিগণের বহুবীর্য হাতের সাদৃশ্য থাকে।

শিক্ষার দ্বারা সাধারণতঃ বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং তাহার ফলে কার্যক্রমতা বৃদ্ধি: যায় বিন্যাস শিক্ষিত লোক-গণকে প্রমোদবিধিগণের উপার্জনিত পথে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তাহারা অধিকতর বেতনে প্রমোদবিধিগণের পরিচালনা কার্যে নিযুক্ত হন।

বৃদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্যগুলোতে পরিচালকগণের (officers) কার্যক্রমতার তারতম্য হইয়া থাকে এবং তদুপায়ে তাহাদের বেতনেরও তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক।

বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া কার্য-পরিচালনাব্যোগ্য হইতে হইলে “বৃদ্ধি” কালেতে বেশ এবং শরীরের মধ্যে কোঁথায় তাহার স্থান, তাহা অনিবার্য প্রয়োজন হয়। বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা হইতে পারে একবার কার্যক্রমে। কোন পুরুষকে কি লেখা আছে তাহা স্মরণ আছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা প্রকৃত বৃদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার নির্ণয় করা যায় না।

বৃদ্ধির প্রকৃত উৎকর্ষ সাধিত হইলে মানুষ জীবিকাকর্মের যে কোন পদ্ধতিতেই নিযুক্ত হইতে পারে না কেন, তাহার কার্যের উপাদানিকা শক্তি প্রায় এককম্যই হইয়া থাকে। বিনি ভাগে বাণিজ্যেই হইতে পারেন, তিনি জীবনের প্রায়শ্বে ডেটা

করিলে ভাল ভাষার অঙ্গ। ভাল আইন-বানসারী অঙ্গ। ভাল অধ্যাপক অঙ্গ। ভাল বাবসারী অঙ্গ। ভাল ক্রম-পরিচালক কোন হইতে পারিবেন না ভাষার কারণ নৃত্য: পাওয়া যায় না।

কাছেই সেন-সংগঠনে নিয়মিত বাবসা কর্তার উপর দৃষ্টি রাখা করা একান্ত প্রয়োজনীয় :—

- (১) ক্রম প্রবৃত্তি ভৌতিকার্কনের চারিটি পন্থাতেই বাহ্যতে ন্যূনতমে পরীবান: ভাবে পরিবার প্রতি-পালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।
- (২) চারিটি পন্থাতেই বাহ্যতে প্রমত্তবিশেষের সমুদায় সাধু থাকে তাহার ব্যবস্থা।
- (৩) প্রকৃত বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা বাহ্যতে প্রমত্তবী ও বিভিন্ন পরি-চালকগণের পদগোচর্যের তরতম্য স্থিরীকৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা।
- (৪) ভৌতিকার্কনের চারিটি পন্থাতেই বাহ্যতে সর্বোচ্চ (maximum) উপার্জন একত্রণ করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা।

বর্তমান কালে শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষতা, বাবসার ও সরকারী চাকরীতে প্রমত্তবীর কার্য সংগ্রহ করিতে পারিলে বেতন লাভবান হওয়া যায়, কৃষিকার্যে সেতপ লাভবান হওয়া যায় না। পরন্তু জমীর উৎপাদিকা শক্তির ভাল চরমায় কৃষিকার্যে পরীবান ভাবেও য য পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না। তাহার ফলে প্রায় সমস্ত কৃষি ছাড়িয়া নিয়া শিল্প ও বাণিজ্য প্রবৃত্তি ভৌতিকার্কনের অস্তায় পন্থায় নিয়োগপ্রবী হইয়াছে। ভগবতের প্রায় সর্বত্রই পূর্ব কার্যক্ষম লোকসংখ্যার মধ্যে ক্রমবৃদ্ধির সংখ্যা সর্গাপেক্ষা বেশী। যে কলী বেষে ইহার ব্যতিরেক দেখা যায়, সেট কর্তী বেশ প্রাথম: কোন না কোন কৃষিপ্রধান দেশের সহিত সন্নিহিত। আরতবধি ক্রমবৃদ্ধির সংখ্যা প্রায় বার আনা। যে পন্থায় এতগুলি লোকের অঙ্গসংস্থান হইত, সেট পন্থা উপেক্ষাবোধ্য হইলে অল্প কোন পন্থায় তাহাদের কর্মনিয়োগ হওয়া সম্ভব নহে। ফলে বহু প্রমত্তবী বেকার ও অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ভগবত বর্তমান উচ্চশিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে। তদবধি পরীক্ষার উপাধি প্রদান করিবার প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে। উচ্চশিক্ষা আরম্ভ হইবার আগে মানুষের শিক্ষিত বলিয়া খ্যাত হইতে হইলে কর্মক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইতে হইত। নিউটন, লামার্স প্রভৃতি য য কার্যক্ষমতার ফলে তাঁহাদের খ্যাতি অর্জন করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিকভাবে ডিগ্রীলাভ করিতে পারিলেই মানুষ শিক্ষিত বলিয়া ব্যাতিপাত করেন এবং প্রায় সমস্ত ক্রম পরিচালনার কার্যের উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হন। অথচ বৃত্তি কার্যকে ফলে, পরীক্ষার মধ্যে তাহার স্থান কোথায়, কোন্ কার্যে বৃত্তির ব্রহ্মতা হয় এবং কোন্ কার্যে তাহার উৎকর্ষ হয়, তদ্বিবরক কোন শিক্ষা পাঠবার সুযোগ ছাত্রগণকে দেওয়া হয় না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রদান করিবার ক্ষমতা সমস্ত পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে ছাত্রের বৃত্তির কোন উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না এবং তাঁহারা কার্যক্ষম হইয়াছেন কি না তদ্বিবরে কোন প্রশ্ন করা হয় না। ফলে প্রকৃত বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন এবং কার্যক্ষমতা লাভ না করিয়াও শিক্ষিত ও কার্য-পরিচালনাবোধ্য বলিয়া অভিহিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

এক প্রমত্তবিশেষের উপার্জন অত্যন্ত কম, তাহাতে আবার শিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত হওয়া অতি সহজ হওয়ায়, তথাকথিত শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া বাইতেছে। ফলে শিক্ষিত দ্বৈতবিশেষের অধিকাংশেরই বেকার হওয়া অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে।

অন্তরিক প্রকৃত বৃত্তি ও পরিচালনা-শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা না হইয়াও শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত হইবার সুযোগ হওয়ায় বহু অসহ্য লোকের সাধিবপূর্ব উচ্চ পদে নিয়োগ পাইবার সম্ভাবনা হইতেছে এবং বাহ্যতা ব্রহ্মত: বৃত্তিমান তাঁহারা বেকার থাকিয়া বাইতেছেন। ইহাতে বেকারত্বের অসহ্যতার মাত্রা এবং নৈরাস্ত আতঃ বাড়িয়া বাইতেছে এবং অসহ্য লোকের হাতে সাধিবপূর্ব কর্ম-পরিচালনার ভার পড়ায় জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশই অধিকতর অসহ্যতার উদ্ভব হইতেছে।

যিনি সর্গাপেক্ষা ১৩০ কর্মচারী অথবা অধ্যাপক, তাঁহার পক্ষে সর্গাপেক্ষা কৃতী আইন বাবসারী অথবা বঙ্গিকর

সমতুল্য উপার্জন করা সম্ভব হয় না বলিয়া ধারণা উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যেও হিংসা, ঘেব ও অসহ্য অসন্তোষাদি হইয়া পড়িয়াছে।

সবস্ত অবিদ্যাসিদ্ধের স্বাভাবীনতা, অকাল-মৃত্যু, অসহ্য এবং পরমুখ্যপেক্ষিতার কারণ বলী :—

- (১) প্রকৃত শরীরবৃত্তগঠন-বিজ্ঞান (Anatomy) অজ্ঞান।
- (২) প্রকৃত শরীরবৃত্তবিধান-বিজ্ঞান (Physiology) অজ্ঞান।
- (৩) প্রকৃত পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) অজ্ঞান—
- (৪) প্রকৃত রসায়ন-শাস্ত্রের (Chemistry) অজ্ঞান—
- (৫) জল ও বায়ু বাহাতে অস্বাভাবিক না হয় তাহার ব্যবস্থার অজ্ঞান।
- (৬) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা বাহা বাহাতে প্রমত্তীকৃত ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officer & sub-ordinate officer) পরস্পরের ভারতম্য স্থিরীকৃত হয় তাহার বাস্তবতার অজ্ঞান।
- (৭) জীবিকাকর্মেণ চারিটি পদ্ধতিই বাহাতে সর্বোচ্চ (maximum) উপার্জন একতরু হয় তাহার ব্যবস্থার অজ্ঞান।
- (৮) জ্ঞাপেলার বিভ্রমভাষ্য।
- (৯) যে শিক্ষার দ্বারা মানুষের বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে এবং যাবলগী হওয়া সম্ভব সেই শিক্ষার অজ্ঞান।
- (১০) পণ্যপ্রবাহের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত পরিবর্তন ও সামুদ্রিক (parity) অজ্ঞান।

স্বাভা ও পরমায়ু অষ্টট জনিতে হইলে কোন্ জল ও বায়ু শরীরের পক্ষে উপকারী, কোন্ খাদ্য ও বাসস্থান পুষ্টিকর তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। শরীরের পক্ষে কোন্টী ভাল অমবা কোন্টী মন্দ তাহা জানিতে হইলে একদিকে জানিতে হয় শরীরের গঠন ও বিধান কিরূপ, আবার অন্যদিকে জানিতে হয় কোন্ বস্তুগুলি শরীরের গঠন ও বিধানের পোষকপোষ্যাদি এবং মানুষ বাহাতে তাহা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। কাহেই শরীরগঠন-বিজ্ঞা, শরীরবিধান-বিজ্ঞা, প্রকৃত পদার্থবিজ্ঞা এবং প্রকৃত রসায়ন-শাস্ত্র জানিবার প্রয়োজন হয়

ও দেশের জল এবং বায়ু বাহাতে অস্বাভাবিক না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

বর্ধমান জগতে বাহা শরীরগঠন-বিজ্ঞা, শরীরবিধান-বিজ্ঞা, পদার্থ-বিজ্ঞা ও রসায়ন-শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা যে ব্রহ্মসূত্র এবং বিকৃত বিভ্রান্তির ফলে দেশের জলবায়ু যে অস্বাভাবিক হইয়াছে তাহা ভ্রমে ও অবিদ্যার মানে 'দৃষ্টি'তে দেখান হইয়াছে।

শিক্ষার দ্বারা প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত না হইলে, বুদ্ধির প্রকৃত ভারতম্যমাত্রায় উপার্জনের ভারতম্য হ্রাসিত না হইলে এবং জীবিকাকর্মেণ চারিটি পদ্ধতিই বাহাতে প্রকৃত বুদ্ধিমানদ্বয় সমান উপার্জন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা সংঘটিত না হইলে যে, জনসাধারণের মধ্যে সমৃদ্ধি ও যাবলগ্ন হ্রাসিত হওয়া অসম্ভব, তাহা আগেই দেখান হইয়াছে। দেশে জ্ঞাপেলার বিভ্রমভাষ্যে ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা অক্ষয় না করিয়া উপার্জন করা সম্ভব হয় এবং তাহাতে ঘেব, হিংসার উদ্ভব হইতে পারে।

অনেক মনে করেন লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ভারতের বর্ধমান প্রদর্শনার অন্ততম কারণ; কিন্তু ইহা বুদ্ধিস্কৃত নহে। প্রথমতঃ প্রকৃতির এইই নিয়ম যে, মানুষ যখন ঐ নিয়ম স্বাভাবিকভাবে জানিতে এবং তৎপ্রমাণে চলিতে পারে, তখন জীবীকর্ষণশক্তি ইচ্ছানুসৃত বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয় এবং জমী উর্বরাশক্তি হ্রাস হইয়া বৃদ্ধি পায়, তত বেশী লোকের জীবনমাত্রা নির্ভর করিবার ব্যবস্থা হয়, কারণ জমী হইতে মানুষের খাদ্য, পরিধেয় এবং বাসস্থানের উপকরণ উৎপন্ন হয়। কাহেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বৃদ্ধি পাক না কেন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের দিকে এবং ভূমি গতি লক্ষ্য রাখিলে মানুষের স্থান-ব্যক্তি-অভাব হয় না। এক সময়ে যে, লোকসংখ্যা বর্ধমান কালের তুলনায় অনেক বেশী ছিল তাহা বিস্ময় করা যুব কইনাগা নহে।

বর্ধমান কালে মোট লোকসংখ্যা কিয়ৎ-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা সত্য, কিন্তু লোকসংখ্যার তালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক বৎসরই মৃত্যুর হারও বাড়িয়া গাইতেছে। বস্তুতঃ এখন সারা ভারতব্যপী চলিত বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক ব্যক্তের সংখ্যাই সর্বাধিক অধিক এবং পরিণতবয়স্ক লোকের সংখ্যা যুব কম। মোট লোকসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ ভ্রমের দ্বারা পূর্ণাঙ্গশক্তি

ও বিশেষী মূল্যমানবণ নিশিত হইয়া পরিচালনা করিয়াছেন এবং বহুমান্নে ভারতবাসী ও বিশেষী ইংরাজবণ নিশিত হইয়া তাহা পরিচালনা করিতেছেন। কায়েই বলিতে হয় ভারত-বর্ষের গভর্নমেন্ট-পরিচালনার ভারতবাসীর বাহিষ চিরদিনই ছিল এবং এখনও আছে। এক সময়ে ছিলেন শুধু ভারত-বাসী আর তাহার পর তাহারা নিশিত হইয়াছেন বিদেশীর দহিত।

ধননই মনে মনে তাহি যে, মা আমাদের, আমাদেরই তাহার গভর্নাক, তাহার সেবা ও পরিচায়া করিবার বাহিষ আমাদের, অগতঃ আমরা যাদের সন্তানকে লইয়া আমাদের বাহিষ নির্মাহ করিতে হইতেছে, তখনই প্রেরণ উদ্বাহ হয় যে, কেন এমনটা হইল ?

তাহার একমাত্র উত্তর—আমরা প্রথমে অশুশুভ হইয়াছি এবং আমরা আপনাদের দাহিত নির্মাহ করিতে পারি নাই। তাই অশু মায়ের সন্তান আসিয়া আমাদের দায়ের সেবা ও পরিচায়া গ্রহণ করিয়াছে। মা আমাদের, তাহার সেবা—আমাদের কাৰ্য, আমরা হতভাগা—তাই কর্তব্যবিশুদ্ধ হইয়াছিলাম, অপর আসিয়া আমাদের কর্তব্যভাৰ গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আমাদের দায়ের সেবা কি করিয়া করিতে হয় তাহা জানে না তাহা সভা এবং তাহার

কলে আমাদের দায়ের অশুশুভ পরিচায়া হইতেছে না তাহাও সভা। কিন্তু আমরা হতভাগা হইয়াছিলাম বলিয়াই তাহারা আদিত্তে পারিয়াছে। তাহাদের বাবদায় আমাদের দায় অশুশুভ পরিচায়া হইতেছে না তাহা সভা, কিন্তু তাহাদের বিভাধুগ্নিত তাহারা চেষ্টা করিতেছে! কায়েই আমি তাহাদের মোদ তুষ্টিয়া পাই না।

আমার মনে হয়, আমাদের কর্তব্যবিশুদ্ধতাধনতঃ প্রাথমিক উপরোক্ত তেরটা কারণের উদ্বাহ হইয়াছিল এবং তাহার পর আমাদের ভারতবর্ষের গভর্নমেন্টের পরিচালনার প্রাধান কাৰ্য-ভাৰ বিশেষীগ্রহণের হস্তে চণিয়া গিয়াছে। সমস্ত দাহিত আমাদের, তাহা আমাদেরকে লগ্না অগ্ন রাণিতে হইবে।

এখনও ভারতবর্ষের গভর্নমেন্টের পরিচালনার প্রাধান কাৰ্যভাৰ বিশেষীগ্রহণের হস্তেই রহিয়াছে। অর্ধ বস্তুনি বিভাগ (finance) ও সৈনিক বিভাগ (military) ধনন ইংরাজবণের হস্তেই রহিয়াছে, তখন প্রাধান কাৰ্যভাৰ যে আমরা পাই নাই তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। এই বাস্তব অবস্থার মধ্যে কি পদ্ধতিত কাৰ্য্য করিলে আমাদের তৎপ-দাহিতপ্রাণ উপরোক্ত তেরটা কারণ দূরীকৃত হইতে পারে, তাহা হিব করিতে হইবে।

আমাদী বাস্তব এই প্রলম শেষ করিবার চেষ্টা করিব।

বাথিভের পূজা

বজ্রাব প্রাণিত বক; বৈষ্ণ, হাঠাকার,
রোপ, পোক, সব আমি ঘিরিয়াছে বেশ;—
কেমনে হইবে সেবি! অর্ধনা তোমার
হেথা,—হেথা নাহি কোন আনন্দের লেপ ?
বিস্তৃত মোরা সেবি! কাবালের ক্রোধ;
আছে শুধু তপ্তখাল, উক অক্ষল;

—শ্রীকৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এ ঘিরে তেমনে বল পূতি মা তোমার ?—
বাথিভের পূজা না গো, তবে কি সফল ?
তাই হোক,—বজ্রাকলে পূজাধৌ তব
হটক স্থাপিত হেবি!—উক অক্ষলে
কক্ক কক্কন আতি অধা অভিনব;—
তপ্তখালে হ'ক দগ্ধ চরণদ্বন্দ্ব।

সেবি তাহে লহ কি না বাথিভের পূজা !

নাশ কি না হুখে বৈষ্ণ, গঙ্গো দপকতা !

আজকালি সবে কলিকাতার সিনেমা, টকি-হাউস লুম্বে চিত্রাভিনয়ের অস্তিত্ব অর্ঘ্যকাকাল পূর্ণ একপানি নোটিন-বোর্ড দেখা যায়,—খার্ড ক্লাস ফুল, ফোর্থ ক্লাস ফুল, ইত্যাদি। চিত্রাভিনয়ের বহু পূর্ণ হইতেই যে ঐশ্বর্য প্রদায়ী চিত্রিত বিস্তর হইয়া গিয়াছে, নোটিন-বোর্ড তাহাই জানাইয়া দেয়। একপাটা কানিয়ার ও বৃত্তিবার আরও বেশী সুযোগ হয় চিত্রাভিনয়ের অবাধিত পূর্ণ সিনেমা, টকি-হাউস লুম্বে সন্মুখের হুটপাথে ও গজগণের তথ-যোগের ভিত্তি দেখিয়া। সে সময়ে মানুষকে লক্ষ-পাশাণেরে জ্ঞান হাতে লইয়া চলিতে হয়, এমন সেই ধানবাহনের ছড়াছড়ি!

এমন এখন জানা কণা। ইহা ত এখন সন্মুখের নিত্য-নৈনিতিক ঘটনা। যাহাও সিনেমা-টকির দ্বারা মাড়ান না, অথবা যোগের অপর্যাপ্তত্বের দ্বারা মাকে মাকে লুকাইয়া অগ্নের অস্ত্রাণ্ডে সিনেমা দেখিয়া আসেন, তাহারিগণকে আক্ষেপ করিতে শুনা যায় যে, “এই সিনেমা-টকিতে অশেষ সন্মোহন হইল। মানুষের পেটে ভাত ছুটে না, কিন্তু সিনেমা দেখা গাট। বাকীর বট-বাটী বেচিয়া, বাপের পকেট হাতড়াইয়া, মায়ের কাপনবাস তাগিয়া, খুল-কলেকের পড়ায় বই বেচিয়া, এমন কি কুন্সি বা কলেক-দ্বির কিছু গ্যাক করিয়া সিনেমা দেখা চাইই, না হইলে পেটের ভাত চকন হয় না, মজিতে সুনিষ্ঠা হয় না! বাপ পাশীগ্রামে ছেঁড়া শেঁকাদুন ঘোড়া গরিয়া, কাড়ারীর গাছতলায় মকেল বসিয়া, টাকাটা দিকিটা উপায় করিয়া সন্মুখ ছেলের হেম-হোটেলের পরচা পাঠাইতেছেন, ছেলে সেই পরচা হইতে পান সিগারেট ও চা-ডাবল সবে সন্মুখ সিনেমার পরচাটাও ছুটিয়া লইতেছে। সন্মোহন কি আর গাছে ফলে!”

আক্ষেপ করিবার কথা কটো। কিন্তু উপায় কি? সিনেমা-টকি এখন আসিয়াছে, তখন তাহাকে কেবল আক্ষেপ করিয়া ত্যাগন হইবে না। উপায়ের কে এক মহিলা সখ্যাক্ষী বিদ্যা আটলান্টিক মহাসাগরের তরঙ্গতল যোগ করিতে গিয়াছিলেন। ইহাও তাই। এ দেশে বাঙা আসে তাহা শিকড় গাড়িয়া কল, এমন ত অনেক দেখা গিয়াছে। কেবল এদেশে কেন, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই অবস্থা সমান। বহুদিন পূর্বে কবি গোল্ডস্মিথ ইংলণ্ডে কল-কারখানার আমদানীতে প্রবেশ করিলে ও মজুরের উন্নতি দেখিয়া “হুইট অবাস্ট” বলিয়া বুক চাপড়াইয়া ভগ্নবিশ্বায়ত কবিতা “ডেভাটেড, ডিপ্রেসড” আক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সেই “Trade’s unfeeling brain” এখন ইংলণ্ডের ঘাট-মাঠ-বাট ছাইয়া ফেলিয়াছে, ইংরেজ এখন মস্ত-কড়

বাবলাবার জাতি। বহুদিনের ত্রুত শূন্যপন যুরোপ ও মার্কিন যুক্তক ধনিক ও শ্রমিকের সংঘর্ষ-বিবাদ অবিরাম প্রতিতে (chronic) চলিয়াছে এবং তাহার ফলে অসংখ্য “fren”-এর আমদানী হইয়া লম্বাচে অশান্তি ও অসংযম এবং রাষ্ট্রে অসংকলতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে, একদা যুরোপ ও মার্কিনের লোকও যে কোন না যুক্ত না তাহা নহে। কিন্তু জানিয়া বুঝিয়াও কল কি? এই শ্রোতের গতি যোগ করিতে কেহ পারিতেছে না।

সিনেমা-টকির সন্মুখও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। বাহা আসিতেছে তাহার গতিগোচর করিবার সাধা কাহারও নাই। কাল তাহার ধর্ম শালন করিয়া গাইতেছে। অবতারণাও বিদ্যাসী হিন্দু আমতা, আমতা কেবল এইটুকু জ্ঞান হইতে লাভ করিতে পারি যে, এখন প্রয়োজন হইবে, তখন লক্ষ্যবিস্তারী একমত অসমীয়া হইবেন।

কোন কোন মনোবীকে একথাও বলিতে শুনা যায় যে, এখন এই দেশে যোগ করা অসম্ভব, তখন যাহাতে আমদানের দ্বারা ভারতীয় মূলধন, ভারতীয় মজুর, ভারতীয় শ্রম এবং ভারতীয় মালমণ্ডলার বহুত্ব সন্তান হিসেবের আমদানী এই বাবলায়কে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হঠাৎতে পাড়া যায়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। যেমন লাগানোযাও ও জাপানের কলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমদানের তীতের কাপড়ের ব্যবসায় ধ্বংস হইয়া গেলে পর আমাদের দেশের কলের আমদানী করিয়া বস্ত্র-ব্যবসায়কে জাগাইয়া তুলিতে হইয়াছে এবং বোম্বাই ও আমেরিকার আমদানের আমদানের বাণিজ্যের কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে, তখনই যে হেতু সিনেমা-টকি বিদেশী, অতএব উহার বর্জনীয় বলিয়া হাত খটাইয়া বলিয়া না থাকিবা এই বাবলায়কে আমদানের দেশে বস্ত্র করিয়া তুলিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে, কারণ এই বাবলায় এদেশের বহু বেকারের অন্নসংস্থান হইবার সম্ভাবনা আছে, মজুর মজুর বরের অনেক টাকা বিদেশে না গিয়া ক্ষয়েই থাকিবা হাইবার সম্ভাবনা আছে।

অর্থনীতির দিক দিয়া সিনেমা-টকির আমদানীর সমর্থন করা যায় কি না জানি না; কিন্তু সমাজনীতির দিক দিয়া যেখানে ইহার পথ অনিষ্টকারিতার প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সমাজে সন্মুখের পর পর এখন কয়েকটি মামলা এবং ঘটনা ঘটনাছে বাহাতে বিশ্বাস্যত লজ্জার দ্বাণ আত্মকে বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বলিতেছে, “এ কি সর্বনাশ হইল! সিনেমা-টকির প্রভাব যে এমন পোচনীয় হইবে, তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল?” একটি ঘটনা বাণিজ্য

চাহিয়া দেখে কিছু তরল প্রবাহী-প্রণালীর আয়তনের কল
কাহিনী সম্পর্কিত, অপরটি উৎসাহের মাধ্যম সম্পর্কিত।
অবশ্য এই দুইটি ঘটনার মূলে যে সিনেমা-টিকের প্রভাবই
একথাও প্রত্যয় তাহা বলা যায় না, অপর পারিশার্ভিক
অবস্থাও যে ইহার মূল অব্যাহিক মাত্রা বিস্তারমান তাহাও
অস্বীকার করা যায় না। উৎসাহের মাধ্যম সম্পর্কে কোন
স্বাধীন সংবাদগ্রন্থ লিখিয়াছেন,—“এ ইল্ড্রাল বিলাসী সিনেমার!
এ ইল্ড্রাল বিলাসের মোটরে চড়িয়া ভাল ড্রাইভের! এ
ইল্ড্রাল পরীক্ষার ঘোড়ারোপের! এ ইল্ড্রাল হালের
আমদানী সিল’জ যৌন সাহিত্যের!”

সত্যই তাই। সত্যই এ সব সিনেমার ইল্ড্রালের কল,
মোটর-বিলাসীর ভাল ড্রাইভ বা ঘাইডের কল, সিল’জ যৌন
সাহিত্যের কল। এ সব হালের আমদানী শিকারীকা,
আবহাওয়া আবাসের সমাজে কি প্রভাব বিস্তার করিতেছে,
তাহারই চাক্ষুষ প্রমাণ। এ কথা বলি না যে, ইতিপূর্বে
সমাজে বিবাহিতা তরুণী পরপুরুষের সহিত মূলতঃপ করে
নাই, অথবা প্রণয়ীর সহিত একযোগে আশ্বস্ততা করে নাই।
এ কথাও বলি না যে, অনুষ্ঠান দুইটা এদেশে পূর্বে কখনও
ব্যক্তিগত করেন নাই। কিন্তু অনুষ্ঠান দুইটা পরপুরুষের সহিত
মূলতঃপ করিয়া অস্তিত্ব হইলে একান্ত আশ্চর্য্য সে
এমন যে সব কথা বলিতেছে, তাহা কখনও বলে নাই,
বিবাহিতা দুইটা বর্ষ ভ্রাম্য করিয়া স্বাভাবিক তাহার প্রীতি বর্ষ
গ্রহণ করিতে বলে নাই বা স্বামী বর্ষ ভ্রাম্য না করিলে তাহার
সহিত বিবাহবিচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়া আশ্চর্য্যত পরণামের হয়
নাই। এ সব ব্যতিক্রম কিসের কল?

এই সিনেমা-টিক যে দেশের সৃষ্টি সে দেশেই উহার
কি রূপ দুই প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে এবং তাহাও ক’ল সমাজ
কিভাবে উৎসাহ হইতেছে, তাহার একটু নুষ্ঠান দিতেছি।
মার্কিন যুক্তপ্রদেশ আধুনিক সভ্যতা ও প্রগতির শীর্ষস্থানীয়।
সে দেশে সিনেমা-টিকের বহু উন্নতি হইয়াছে, এমন আর
কুখ্যাপ নহে। সেখানকার হলিউডের এক একটি কিন-
টারের মাসিক বেতন ও বায়ানার কথা শুনিবে বিশ্বের
স্বাক্ষ হইতে হয়। মেট্রো-গোল্ডউইন-মেরার ‘শিকচাস’
কোম্পানী তাহারের চিত্র-অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যে বেতন
নেয়, ভগতে কোন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী অথবা রাজপুরুষও
সে বেতন পান কি না সম্ভবঃ। এখন মার্কিন দেশেরই
শিকারী, তরিত, নিউইয়র্ক, ইয়েন এবং গোল্ডিনস্যানিয়া
স্টেট কলেজের খোর্ট কিউবিন পূর্বে একটি Motion Pic-
ture Research Council পঠন করিয়াছিলেন। তাহারের
উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্বজনন হইতে স্ত্রীপুত্র মূলক্ষেপ করা।
বিস্ময়কর কাউন্সিল তদন্ত করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন:—
“ছোঁকা-জেলের যে সব হস্তাঙ্গা পবিত্রত বালক ও কিশোর

ওপহীত জীবনভার বহন করিতেছে, দুর্ভাগ্যের প্রেরণা তাদের
মধ্যে শতকরা ২০ জন পাইয়াছে কিন হইতে। যে সব
বালিকা ও কিশোরী স্ত্রীপুত্র পবিত্রতা ও হুঁতগিনী হইয়াছে,
তাহারের মধ্যে শতকরা ১০ জন বিশপদ্যাদিনী হইয়াছে
উচ্ছ্বাসে স্ত্রীপুত্র মূল কিন হইতে। তাহার মিশ্র হইতে
প্রাণে প্রেরণা পাইয়াছে বিন’জ অভিনয় মন্তব্যত, অবাধ
মিশ্রণে, সমাজ-পুণ্যসাহীন দুর্ভৃত্য বাননসে। Miss Jane
Adams মার্কিন দেশের একজন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও
লেখক। তিনি তাহার *The Spirit of Youth and
the City Streets* গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

“Cheap Theatres and Motion Picture Halls are
places where the thrill-hunters get inspiration for
their various activities...The immoral stage helps to
increase the number of thieves, burglars and
murderers...Wild parties, joy-rides, roadhouse toots,
park and beach frolics, street froivotics, sensuous
hilarities, promiscuous associations are other modes of
the follies of the flappers and their boy friends. And
there is the booze in connection with most of the ac-
tivities of the pleasure seekers.”

ইহাও বাল্য—“ভ্রাম্যঙ্গা (বাটো) মোহক-পরিহিতা বাটো মূল’ত’টা
সিগারেট-সংকোচা দ্বিতীয় রূপে বিলাসিনীয়া। তাহারের ‘বালক মূল’ত’
সক্রে যেভাবে উৎসাহ বহির্ভূত তাহা ক’ল’ত’টা। সমাজ বিলুপ্তি বা
সিনেমা-বহু হইতে এই সব চমক-অন্যতঃ অসুপ্রভা লাভ করে এবং সেই
অসুপ্রভা হইতে তাহারের বাবা বিকৃত কর্তৃত্বের বিকাশ করে।...এই
সব স্ত্রীপুত্র মূল আয়তন-সংকোচের বাব চোর, সিনেমা ও নারতাকারিত
এ সমাজে গুটি করে।...দেশেরা উৎসাহ বহু বর্ষের তরল-তরুণী অভিনয়,
মেট্রো-গোল্ডউইন, পরিবার্য্য হুঁতগিনী আভ্যন্তর অথবা ভৃত্য বিলাস, পাতে
ও সমুদ্র স্রষ্ট নর্তক-নর্তকী, কামোদনক আয়োজ-সৃষ্টি। হেয়ে, তরল-তরুণী
অথবা বিলাসিনী, এ সব হইল উৎসাহের মূল’ত’টা স্ত্রীপুত্র ভিত্তি ভিত্তি
করী। আর এ সব স্ত্রীপুত্র মূল’ত’টা মূল’ত’টা বেলসের পর কোলস
মতগণ।”

মার্কিনের সমাজ-সংস্কারকবিশেষ রচনার একখাটো
পাঠ্য তাহা,—

—“It is the street and the working places as also
the places of amusement that corrupt the city girls.”
অর্থাৎ, “সমাজে তরল-তরুণী বায়াম হয় রাস্তার বাহির মল্লি, কারখানা বা
লোকের কল করিতে থাকা, অথবা আমোদ-মালাসের স্থানে সৃষ্টি করিত
থাকা।”

মার্কিন যুক্তরাজ্য কোন কোন স্থানের সামাজিক অবস্থা
এমন পোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, সে দেশেরই লেখক
লিখিয়াছেন,—

“The whole amorphous field of clandestine vice will
defeat any census.” অর্থাৎ, “বিবিধরূপা স্ত্রীপুত্র ভৃত্য পাপলীলার
ক্ষেত্র ও নারতাকারী সমাজ নির্দেশ করা আয়তনসাহীত ১৯১৫-১৬
অঙ্গাণা।”

এ ত গেল কুল-কলেজের ভিতরের চিত্র। উহার বারি-
য়ের চিত্রও চমৎকার। কতক আত্মগ ত্যাহার পূর্বে
বিদ্যাচি। কোন কার্তিক লম্বা-সংস্কারক লেখিকা লিখা-
ছেন,

"Every holiday girl wants to enjoy herself. When
she is lucky, she has her own boy friend: if she is
on her own, then Heaven help her!"

স্বপ্নে বিদ্য-মান, চকুটোভাতি উভাধিগ কথার লেখিকা
বলিতেছেন, "Sea air is one of the greatest known
sex stimulants" নৈশলম্বিত, নরলম্বিত, নাচের, গানগন,
লতার সিনেমা বিখ্যেটার প্রভৃতির অব্যাহ মিলায়িমার বাণীতে
নিউইজর্কর কোন সম্ভার-সংস্কারক-সমিতির রিপোর্টেও বক্ত
এই যে, পত্র ১৫ বৎসরের মধ্যে বাৎসরিকের চক্র এমন পাশ
(commercialised vice) আর কখনও অচলিত হয় নাই।
প্রত্যেক সমুদ্রে ০৫ হাজার হটতে ৫০ হাজার তরুণ তরুণী
কেবল নাচবেগই স্তুতি করিতে থাকে। সম্প্রতি Motion
Picture Research Council তদন্ত করিয়া দেখিগাছেন
যে, যে সব সত্বে সিনেমা-লটুসের সংখ্যা অধিক, সেই সব
সত্বেই বেলেগবেলেগর উচ্চাখণ্ডতা, অসমাপ্ততা, হুমুঁচি-
পথ্যলতা এবং পাণ্যচারণও সমধিক

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের এদেশে এখনও এই 'লতা
ও প্রগতির তরঙ্গ' তেমন করিয়া লম্বা-জীবনের গাতে
প্রগাহিত হয় নাই, ইহা এখন কেবল লম্বা-জীবনের উপকূলে
আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে মাত্র। কিন্তু খেঁকুই তব
সেখা দিগাহে, তাৎকালেই সম্ভার লত্ন হইয়া উঠিয়াছে।
স্বলোগ পাইসেই যে তটের তরঙ্গের গাত-প্রতিগাত
বেশা অতিক্রম করিয়া লম্বা-জীবন প্রাপ্তি করিলে, সে
আপত্তাও আছে। সুতরাং আমাদের ঘোর বা ক্রুটি
কোথায় তাহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে এবং
কিভাবে সেই ঘোম-ক্রুটির বধ্যালাখা সংশোধন করিয়া লম্বা-
জীবনকে বধ্যালম্ব্য বধ্যলম্ব্য কল্পা বাহ, তাহার প্রাপণও চেষ্টা
করিতে হইবে।

দেখিতেছি, এক প্রেমের লেখক গুরুবান্দন্যের মত বেত
হুতে কেবল তরুণ-তরুণীদের শাপন ও তর্জন গন্ধন করিতে
ছেন। কেহ কেহ মহাবিভূ লম্বা-পতির মত তর্জনী

সোয়াইরা তরুণ-তরুণীকে উপবেশ দিতেছেন,—"লম্বায়ে
মো-কুতি চবিত্তার কতটিই কি লম্বায়ে বড় কাক? প্রেমী-
প্রেমিনী সাধিয়া কোথায়গোলে দিগবন এবং চূষন ও
আলিঙ্গন—তাগা চটলেই কোথায় চমক প্রাপ্তি ঘটয়া গেল?"
পুনক—"সে সব পুরুষ তোমাদের ভোমা লিখা জানে, ভোমো
লিখা চিহ্নিত কবে—তাগায়েই লিখাচন কবে লিখিয়া না?"
কিন্তু এই প্রেমের গুরুবান্দন্যের লিখা বান যে, বাহায়ে
লম্বা করিয়া এই অপ্রাচিত উপবেশগ্রহণ বটন করা হইতেছে,
তাহাও মহাভারতের শান্তিপর্য বা গীতাব্যায় অপর পঙ্কতের
যোজন্যের পাঠ করে না বা তাহায়েক পাঠ করান হয় না;
অপর তাহায়া কল্লি-টলক ধারণ করিয়া ও নাক টিপিয়া
কপে লিখা তাগা ও বৈবাণ্যোংগে অজ্ঞান কবে না, তাহায়া
সকল বেগের সঙ্গল লবের তরুণ-তরুণীর মত বৌদলম্ব্য
ভায়া প্রগাহিত। নৈহিক ক্খা রিপুতাক্তিত মাল্যের লম্বা-
ভাত। মাল্যের এমন একটা বহল আছে, বহন তাহায়া লম্বা
মৌনবুতি চবিত্তারভার দিকে লইয়া থাকে। সুতরাং লম্বা-
পতিদের চেষ্টা করা উচিত, কিভাবে এই লম্বা ও প্রবল
প্রবৃত্তিক অজ্ঞান ও লম্বা ভায়া জন্ম: লম্বা-মত নিবৃত্তি
দিকে লইয়া যাওয়া যায়। পত্র উপদেশ ও দ্বিত্যলম্বাভাতে
ভায়া লম্বা না হয়, তাহা বাস্তবজগতে বৈদম্বিন জীবনম্বাভার
বৈদম্বিন নিবৃত্তির ভায়া অজ্ঞান: কতক লিখায়ে লম্বা হইতে
পারে।

লম্বা-মত লম্বা-পতি মূল তরুণ-তরুণীদের পাশাইতে-
ছেন, উপবেশ দিতেছেন লম্বা-মত হইতে, লম্বা তাহায়ে
অনেকে বাস্তবজগতে কি করিতেছেন? যে বেগে ১৫ বৎসরে
কল্পা এবং ১৬ বৎসরে পুত্রের যৌবন্যের সঙ্গল হয়, সে বেগে
যে কারণেই হউক, তাহায়েক বিবাহ বেগে হইতেছে কল্পা-
পক্ষে ১৮ হইতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত, আর পুত্রপক্ষে ২০ হইতে
৩০ বৎসর পর্যন্ত। অতঃ সেই অবস্থায়িত পুত্র-কল্পাকে
গৃহ বা কুল লম্বা, নীতি বা বধ্যলিকা লিখার কোন বাস্তব
নাই। শিতা অষ্টমশী অনিবারিত্য কল্পাকে বিলাসলম্বা
সাতাইয়া পাঠাইয়া নৈব লুল-কলেজে বিদ্যাধারন করিতে,
বাকীতে মাতার ভাষেন গীতম্বা লিখাইতে, আর তাহায়েক
অথবা হইতে ও লিখিতে হেন বহু তজ্ঞ। বালিকা লিখা
কল্পাকে একাধিক দিন লিখু উপবেশ কল্পলম্বায়া বালিকা

আধুনিক পিতামাতা কল্যাণের বিলাসলিপ্যায় হারিবার করিতে যেমন লক্ষ্যব্রত করেন না, তেমনই এখনকার পিতামাতা পুত্রকন্যা কেমন লাভিতা পাঠ করিতেছে, কোণার কাহার সহিত সিনেমা-টিকি অথবা 'ভয় বাড়ি' করিতে বাহির হইতেছে, তাহার খোঁজ না রাখিয়া আপনরা সাক্ষিরা ভক্তিয়া হইতেছেন বাহিরে কোথাও অসোহাগ্রহণ উপেক্ষা করিতে। উপযুক্ত শ্রম, শ্রমের অসুখস্বাস্থ্যে, তরুণী ভগিনীকে বাহির করিতেছেন তাহার বন্ধুস্বজনদের টি-পার্টিতে অথবা রাখে 'টি' পরিবেশন করিতে। আবার তাহার উপর তাহারের আশঙ্কিতও নাই কল্যাণদায়ী সাপেক্ষা!

এই সহনকারি বিমর্ষ কলের কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখানে আরও কিছু বলিব। Dr. Arabella Keneally বয়ঃ নারী হইয়াও তাহার *Feminism and Self-Instinct* গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"Self instinct is not identical in men and women. A man being less complex in his psychology, that which in him is but a biological lapse, is in woman a vice. Man disperses, woman absorbs."

বিভিন্ন পুরুষ ও নারীর এটী অলম্ব্য ব্যবধানের ব্যবস্থা করিলেও পুরুষ ও নারীকে একসঙ্গে পড়াইতেই চটবে, নতুবা প্রবৃত্তির পক্ষে বাধা পড়িবে। তাহার একথা বলেন, তাহার প্রগতি অর্থে কি হুঁকন জানি না। William Macdonald-
ball তাহার *Character and Mind of Man* গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"...False assumption that a lapse on the husband's part is as grave an offence as on yours (wives'). It is not so and no change of law or custom or tradition can abolish this difference, which is deeply rooted in biological fact. A lapse on the part of the woman is more serious in its consequence."

যৌনের উদান বাস্তবিক বৃত্তির প্রেরণা তীব্র, একথা সকলেই স্বীকার করেন। চাকর্যের নত মহাজানী ভাষা না হইলে 'বৃত্তমুদ্রা সমা নারী', ইত্যাদি কথা লিখিয়া হইতেন না। একত্ব কৈশোর ও যৌবনে পুরুষ ও নারীকে স্বাধীনভাবে পৃথক রাখাই সমীচীন। কেন না যৌবনের প্রেক্ষাবে পদাশ্রয়নের যেকোন পথে পথে সজ্ঞানী এবং পদাশ্রয়ন নারীর পক্ষে যখন তীব্র সামাজিক শাস্তি বহন, তখন ইচ্ছাপূর্বক

আগুন হাত দিয়া গাত পুড়াইতে যাওয়া কেন? নারীরা লেনক H. G. Wells লিখিয়াছেন,—

"Overcrowded working class people's homes daily witness the mother's prostitution or constant danger of incessant attacks from drunken father or brother."

উহাও বাংলা গুজ্জর করা অসম্ভব। যাহা যখন পৃথক-প্রকৃতি, তখন আধাভক্তিরা পুরুষ ও নারীকে পৃথক রাখিতে বলিয়া কি বড় অন্য কথা বলিয়াছেন? যথা বাড়িক বালা বিবাহের কথা। আধা ভক্তিরা পৌরীদানের কথা বলিয়াছেন বলিয়া তাহারের এখন কোথ কোথ বিদ্রূপ করেন। অথচ নারিন যুগ্মকর জন্ম Ben Lindsey তাহার *Revol of Modern Youth* গ্রন্থে যেনের কন্যাটাই ব্যক্তিদের আধিক্য বোধিতা বলিতে বাধা হইয়াছেন যে,

"Early marriages should be made possible by removing the possibility of children."

অবশ্য তিনি ইহাতে কৃত্রিম উপায় অবলম্বনেরও ইচ্ছা করিয়াছেন (contraception, sterilisation, etc.)। কিন্তু এমনে কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োজন ছিল না। পূর্বে বহুসংখ্যি প্রাপ্ত না হইলে বয়ঃবয় একত্র পদ্ধতির নিষেধ ছিল না। Ellen Key তাহার *Love and Marriage* গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"A real sexual morality is almost impossible without early marriage. Simply to refer the young to abstinence as the true solution of the problem is a crime against the young and against the race, a crime which makes the primitive force of nature, the fire of life, into a destructive element."

পুরুষ ও নারীর যৌনলাঙ্গসাক্ষিত পাপ হইতে স্বাভাবিক রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যবস্থাও প্রতীচোর নদীযীরা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু যখন বালাবিবাহের পাপই এমন হইতে আসরা আইন করিয়া উঠাইয়া দিয়াছি এবং অস্ত্রবিং-পতি হইতে পক্ষিণ বর্ষী তরুণীর বিবাহ দেওয়া বাতীত আশ্রয়ের গভীর নাই, তখন বালাতে তাহারিগকে সংশয়ে পরিচালিত করিয়া ভাল করে-করে বিবাহ বিতে পারি এবং সমাজে শান্তি ও সজ্ঞান আনিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করা অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে কি?

দৃষ্টান্তব্রত সহনকারি কথাই যথা বাড়িক। যদি সহনকারি আশ্রয়ী না করিলে আশ্রয়ের গোটের 'ভাত হুজর না হয়,

আমি হইলে এমন নিয়ম করা উচিত যে ১০ বৎসর পর্যন্ত বাসক-বাগিকা এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করুক, তত্বৎ বয়সের কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের শিক্ষার সম্পূর্ণ পূরক ব্যবস্থা করা হউক। Sir Michael Sadler এখানে ১০ বৎসরের উচ্চ-বয়স্কদের লগ্নিকার্য বিবৃদ্ধে অভিভূত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বহুলা অভিযাচিতা বা বিবাহিতা কন্যাকে আশ্রয়-প্রদানে দেখাওঁতে হইলে আমাদের অভিভাবকদের নিজে সঙ্গে করিয়া যেখান উচিত, তাহাদের গীত-বাত্ত শিক্ষা দিতে হইলে আপনাদের সম্মুখে বসাইয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত, বৃহৎ-কক্ষে পঠাইতে হইলে ইহাও দেখিতে হইবে যে, তাহারা কখন অভিভাবকবিরোধ হইয়া Exclusion Partyতে, Tablennতে, Charity Performances-এ অথবা যে কোন অথবা বিশাশিয়ার প্রদান না পায়। একত্র অভিভাবক ও অভিভাবিকাদ্বয়কেও সঙ্গে সঙ্গে একটু ভাগ ও সাংঘ পালন করিতে হইবে।

বহু বৃহৎ পূর্বে কথিত 'কন্ডাপোং পালনীয়া শিক্ষণীয়া কৃৎসন্ত' বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু পুত্রের প্রায় কন্ডার শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই শিক্ষা যে পুত্রের শিক্ষারই মত হইবে এমন কোন কথা নাই। আমি পাক্কায়া মনীরোয়েরই স্মৃতিস্তম্ভে অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, উত্তরের গঠন, প্রকৃতি, মনোভাব, বসোত্তি প্রায় সবই বিভিন্ন রকমের; একত্র তাহাদের শিক্ষা ও পালনও ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া চাই উহারি স্বাভাবিক।

বাংলায়ান প্রায় ২৪০ হাজার বৎসর পূর্বে তাহার জন-প্রিয় কামব্যয়ে বিনিয়োগে, "নাগ্বেষ প্রকৃতি অনুসারে যেমন কামের সেবা অগ্রস্ত কর্তব্য, তেমনি অর্থ ও বর্ষ অগ্রস্ত সেবা। মাম্বের সময় বৃত্তির সম্যক সূচন ও নিয়ন্ত্রণই সমুদায়। পুঙ্খবহু তিনটি প্রয়োজন, বর্ষ, অর্থ ও কাম। তন্মধ্যে বর্ষই শ্রেষ্ঠ, তৎপরে অর্থ এবং কাম নিম্নতম। তথাপি যৌনে কামের সেবা করা সমুদায়ের কর্তব্য।"

অত্র বাংলায়ান লিখিয়াছেন,—"কাম-পাত্রে বহুতর তত্ত্ব ব্যক্তি বর্ষ, অর্থ, কাম ও লোকসামানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিবে, কিন্তু কখনও তাহা না শুধু কামব্যয়ে কার্যে প্রবৃত্ত হইবে না।"

বাংলায়ান কামব্যয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণ হইলেও সকলকে ভিত্তিহীন হইতে উপদেশ দিয়াছেন, এমন কি বিবাহের পর সম্প্রতি একইজন নিয়ম পালন করিতে বলিয়াছেন,—"লগ্নির দ্বারা সন্তান প্রাপ্ত হইয়া উত্তরে ত্রিভাষি পণ্ডিত তদ্ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কার্যলবণ বর্জিত আগার করিয়া অধ্যবসায় পালন করিবে। সেইজন এক লগ্নাবকাল গীত-বাত্তের সহিত

মনপ্রাণ, প্রসাদন, একখানে লগ্নভোগ, প্রেক্ষা (মার্টাশি বর্ষন) এবং মালা পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করা কর্তব্য।"

যৌনের বহুবর্ষ তরুণ-তরুণীকে কামলালসা চরিতার্থ করিবার যোগ্য অথবা করিতে বঞ্চিত। কিন্তু তাহাকে প্রায় দেওয়া বর্ষ নহে, নীতি নহে, উহা সমাজের মুখলা ও শাস্ত্রিকার অঙ্গুলে নহে। অতএব যে চারুদ্রা লোক আমাদের বক্ষের পক্ষ বহুতর এক তরুণ-তরুণী আশ্রয়তা তপ মহাপ্রাণের অস্তান করিতেছে, স্বামী ভাগ করিবার কত পতী পদভাগ করিতেছে, প্রকৃত কামলতে অনুভূত তরুণী কত পিতা ও ভ্রাতার আগ্রহে বাইতে না চাহিয়া বিনম্র সহিত উপভোগ করিতে চাহিতেছে, সে কত স্বামী কে? আমরা পরিভ্রমত অভিভাবকরাই নই কি?

আমরা তাহাদের যে কামে শিক্ষিত ও দালিত পালিত করিতেছি, তাহারই ত এই সব বিষয় ফল! তবে তাহাদের স্বামীর মত যেত হইতে তাড়না করা কেন? জান হাতে দিহের পাতি তাহাদের যুগের কাছে তুলিয়া ধরিতেছি আর বিধগন করিলে তর্জন করিতেছি, কেন বিধ বাইলে।

আমরা কতকালের প্রাচীন সভ্যতার তত্ত্ববাহক, সে কথা তুলিয়া দিয়া মার কথক শত বছরের সভ্য জাতিদের সব কিছু বোঝাই বেশী অল্পকরণ করিতেছি, আর তাহার ফলে মরিয়া মরিচ্ছি। পথের ভান্দুই লগ্নাই বুদ্ধিমান জাতির কর্তব্য, সেইটুকু তুলিয়া গিয়াছি, তাহাতেই বহু গণ্ডোগল, বিঘ্ন আগল। আমাদের সভ্যতা কত প্রাচীন ও কত শক্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা এক প্রাচীণ পণ্ডিতের কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। অতকাল ত তাহা না হইলে কোন কথা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না।

George Wilson Broot নামক বার্কি পায়তী প্রাচীণ জাতিদের প্রকৃতি প্রমাণ করিতে দিয়া অত্র প্রাচীণ জাতির সহিত আমাদের নিরুপস্থার কথাও সমস্ত প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার উক্ত Hubbard Nye তাহার দেশের New York Times নামক বিখ্যাত সংবাদ-পত্রে দ্বারা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপলব্ধার করিতেছি।

"Is there anything absurd in the suggestion that the India of some twenty thousand years ago—brilliant, cultured, highly civilised, overflowing with population, impressed upon Egypt, Persia, Judaea, Greece and Rome a stamp as ineffaceable, as profound, as potent as the evidence which the Rev. Mr. Brent wishes to impose upon us? Let old superstitions hold anathema, there is proof to hand, for within the last ten days (September, 1927) various metropolitan newspapers carried this enlightening item: Four pages of Sanskrit manuscript, discovered in India, indicate that hydrogen, oxygen, dry batteries, electric plating and balloons were known there untold centuries ago."

যম-যম

লু পড়ি : হঠাৎ থাকি ।

খেয়ালী মন । নাটক-নভেলে কুচি নাট । অবসর
মিলিলেই বেগুনে টাইম-টেবল্ বুলিয়া বসি । ছুটিছাটার
দিনে টোপে চড়িয়া বাহির হই । বাস্তবিক করিয়া মধুসূর বা
সিমলা-বার্জিস্ গাই, তামর । কোন দিন বাট কাচকা-
পাড়, কোন দিন বা খাঁড়ল, অর্থাৎ কম পরসার বহুটুকু হর ।
সৌন্দর্য ভাষণার বাইরে খবর বেকী ; কাজেই সেমিকে বেঁধা
যায় না ।

বাতায়ত পার্ভি ক্রাসে ।

পুকার হুচী কাটাছা হঠাৎে কিংবদন্তি । নামনে কালী
পূজা । টপনি কলকৎ বন্ধ । সহরের পথ-বাটে চটপট শবে
পিটকা ছুটিতেছে ; উড়ন-ভুবতির বিবম উৎপাত শুরু হইয়াছে ।
খালাতন !

হুই দিহির কাছ হইতে মিলিয়া দেল কাইকোটোর রক্ত
বলন কিছু টাক । মিলিয়া আদীর্জাদ কানটকা লিবিয়াছেন,
করাসভাচার ভাল হুচি কিনিয়া বিতোর বিন পরিস্, 'আর
ভাল খাবার...অন্তথা না হর !

আবিলান, মিশের হুচিতে ভোকা চলিয়া যার-কাজ
কি করাসভাচার হুচি পরিয়া বাবু ল্যাবিয়া । তার জের-এ
টাকার টোপে চড়িয়া লবা পাড়ি...

টাইম-টেবলের পাঠা উন্টাইয়া হিলাব করিতে লাবিলান
প্রভু অনোযোবে । সত্যেরীয়া টিটকায়া দিল, মাদ্রব বিলাত
বাইতে বসিয়াও এমন বিলাব কবে না । সে কথার কর্ণপাত
করিল্যাম না ।

বর্জানের ওমিকটা আঘাত লস্বর্ষ অগানা—হুমাত্রা, দ্বিষ্ট-
জাউলগারের বত । অন্তঃ—

কি কলিল্যাম, মতাল গাইব । বত জনন । তনিয়াহি,
কলসার অনেক বনি আছে । দুহিগা বনি বেবিং—একটা
নুতন অভিজ্ঞতা ।

মামি-বাদ ! কোটেল নাই ? না পাক, কোন বাঙালী
গুতে গিয়া না হর

—প্রিয়দর্শন গায়

তনিয়াহি, বর্জানের ওমিকটা বেন-বাইগালীর-দাস,
ভাগা এমিককার মত-কাজ-করু নহ । গুহে-অভিবাং-অসিলে
বিস্তৃত হয় না, বত কলিয়া বাসার টাই বের । তার উপর
আরো তনিয়াহি, বাঙালী পাইলে নিবেশের বাঙালী তাই
হুকিয়া লয় ।

খেয়াল হটল, করাসভাচার হুচি পরিয়া বাবু-ল্যাবিয়ার
পরিবর্তে টোপের সেকেন্ড ক্রাস 'কামগার চড়িয়া বাবুজানী' করি
যাক ! 'অর্থাৎ সেকেন্ড ক্রাসের টিকিট দেখিলে সেকেন্ডের
বাবুজা খাতির করবে । জানি তো, পার্ড ক্রাসের, বাবুজানের
ক্রাস, কি চোখে দেখে । গুলী, মদ্রাসের, ক্রাস টাউন
হটলনের, ক্রাস ! 'আর ক্রাস, পার্ড ক্রাসের বাবুজানের ক্রাস
কোণাক কলিল্যাম বেশের একটা বত হর বুর হইবার আদ
বাসিত ।

বেশের নামে বেঁচালা ওঠে, সে টাকার বেশের হুচিয়া
যুচাইবার সভা বাসনা যদি 'কটী'র চিত্রে এতটুকু মামিক,
তাহা হইলে আর 'কটী'র কলী ধরা পড়িত না, 'আমরাও
বর্জাইয়া বাইতাম ।

চতুর্দশি বারে মোকামা একপ্রশ্নের সেকেন্ড 'কলি
কামগার একটা রিকার্ড বার্থে চড়িয়া বসিল্যাম ।

টোপ হাড়ে-হাড়ে, এক প্রোয়ান কলসের আদ্রি কামগার
চুকিলেন । সাহেবী শোখাক—সাহেব বর্ভ ভামাটে—মামি-
গোল টাঙ্গা—সেখে টটের-প-প্রশ্নের মোটা প্রোয়ান কল ।
বক বক হুচী গোল কীচ । চোখের উপর বেন মোটার লাকীর
হুচী হেডলিট সীটা !

কলসের বত হুচি । হুচি মাঝার, বুর সুরকশ
আর বাহারে মকরিক-কলসো টোপ-খা বিলাব : কল-
লোকের বর্ভ ভামাটে হইলেও চেহারা এবং লালসার-খিৎ
টার হরয় সীমা নাই ।

এ-মমটার কলিকাতা, ছাড়িয়া লোকে বাহিরে পুড়ি
বেশ না । এমন দিহিবার পালা । বাহিরে ভাওয়া খাইতে

দিকা-বহু-পন্ন করিয়া হাতিব আত্মন ভট্টায়া দুলসে
পদগার বাজারে হুৎ বেহি বলিয়া ক'শ পাইবার হোব,
দইগা বলিকাতার কিস্তিতেছে। আমার কামগার চমিকতার
বার্বে হুট বাজার-বাণী হাতির কাপড় তুলিয়া বলিয়া আছে।
কেইয়া-কেইয়া বলিয়া একজন কটকা-বাজারের আগুন
লাগাইবার বাগনাব কণার চমকিত ঠিকিতেছে; আর একজন
কোলের উপর একগামা পদ্ম ও হাতা বাগিয়া নিম্নিকার
নিম্নপ্তভাবে সেগুলার সম্ভাবনার করিতেছে। আগন্তুক
অজ্ঞানকে আসিয়া মাসগানের বার্ষিক বরণ করিলেন।

ঐশ্বর্য্য হাতিয়া বিল। মোট বুলিয়া তুললোক বিদ্বান
পাতিসেন; পর কোটের পকেট হইতে পার্স, ডেন-সমত
যদি এবং চাহির হিং বাহির করিয়া বলিলের নীচে
ওঁকিসেন; কোট এবং গুস্তে কোট বুলিয়া ছাড়া
ফলাইলেন। এ-কাজ সারিরা ৪৪৪ মার্কি সিগারেটের টিন
বুলিয়া সিগারেট ধরইয়া টোটে চাশিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ
করিলেন।

আমি তাঁর পানে অবিলম্বে গেলো চাশিয়া ছিলাম।
জাতিতে ছিলাম—

কিছু সে চিন্তার পরিচয় দিলে আমার দিকা ও
ভ্রমরার সত্যে হানি ঘটবে। তবু এ কামিনী বলিতে বলিয়া
সেইহু গোপন রাশি কি বলিয়া? বাঙালী জিহবাই বেশী বকে।
কেনই বাঙালীর বাঙালীক। অতএব সে চিন্তার খেইহু
মুকতিল বাঙালীর নামে কলক বেগা উচিত হইবে না।

অর্থাৎ আমি ভাবিতেছিলাম, ঐ তো পায়ে রঙ। তবু
এমন সাহেব নাই পাতিতে! লোকটিকে দেখিলে—আমার
নূর কিম্বদ:—আদমার “নূর” উপিয়া পোপনে হারিভেন—এ
বহুগণ ও প্রার-প্রার-প্রার-প্রার-প্রার সবিনী দেখিয়া।

সকল দিক্কা-দুব-পুয়াপুবি উপভোগ করিবার বাগনাব
অজ্ঞানকে একটি পায়রা-পালক পদ্য বলিলের নীচে
প্রাক্ষিপণ। “বুদ্ধিলাব; কানে কাপ চুলকাব; তাই এ বসনা।
সকল লক্ষ্য দেখিলে—অব-বহু—একজনে বাঙালী-বৈশে
বাঙালীর সেরে-প্রাকটী প্রবেশ করিলেন ও-প্রাণে ইত্যাদী
প্রবেশ প্রবেশ লাগিয়া আছে।” বলিলে আমার সন্মোহ
এ বহুগণ নাথায় বাঙালী জীবনের কিবা কৃত্যের হাতে
সমর্পণ করিয়াছেন।

কিছু সে কবী থাক।

কামনা-কোটা প্রবৃত্ত করিয়া তুললোক লক্ষ্য হেদিয়া
পড়িলেন। পড়িলে এ-কাবেক বলে অর্ধ-পাতিত কবি।
হাং বুদ্ধি খোলা হইল। ৪৪৪ টিনটা আমার পামনে ধরিয়া
দিকা বলিলেন,—সিগারেট ইচ্ছা করেন?

পরিচয় করিলাম,—অগাল নেই।

হুট চোখ বিস্তারিত করিয়া তুললোক বলিলেন—
আচ্চা! Modern youth—youth man! এ যুগ বাঙালীর
কোন কোন অঙ্গের এ বস্তুর আদর চলছে। আর
অপনি? বীকা হয় নি?

কহিলাম,—না।

কহিলেন,—বেশ! বেশ! এগুলো বহু এড়িয়ে চলা যায়,
ভাল। তা কির-কর কি করা হয়? ওকালতি?

কহিলাম,—ন পড়ছি।

হাশিরা তুললোক কহিলেন,—ঠিক ধরেছি।

ওকালতি ওকালতি ওকালতি কেমন?

তমৌ বাঙালীর নাস্তোব নাস্তোব পতিরত্না।

হদিক লোক। কোন ওবার দিলাম না। তবু হুট
হাসিলাম।

তুললোক কহিলেন,—কৌখা বাগা হুৎ?

কহিলাম—অগাল।

—অগাল! এমন বয়ে তুললোক প্রতিদ্বন্দ্বি তুলিলেন,
আমি ভক্তকটীয়া গেলাম। বেন এমন কারবার নাম করিয়াছি,
where no traveller...

কহিলেন—সেমস্তর আছে?

কহিলাম—না। এমন বেড়াতে বাজি।

—ও! Pleasure-trip! মনে, to know the
world...

তুললোক হুপ করিলেন। আমি তাঁর পানে চাহিয়া
হইলাম। মনে হইল, তুললোক আঙ্গুর-বাগো নিজকে
খুব একজন ওকালি বলিয়া বিশ্বাস করেন। তমৌ বেশ
মুস্করিত।

বিস্ময়—আইনে কি আছে? ওকালতীর ভয়েই কিছু
ভয়ে গেছে। বাহিরা-বাগিচায় গলে গেলে ভাল কংকনে।
Young man—সেদিকে কেন যে আপনাদের দৃষ্টি পড়ে না?

জ্ঞানের ভাণ্ডার, তথ্য আধার, বাণিজ্যের সমস্ত লক্ষ্যই। বাণিজ্যের চাই বৃদ্ধির আর বিজ্ঞাপনের মাটে ওড়ানো! যদি বলেন, তার অর্থ। তা হলে তবুও কৃত্রিমতা বোধ হবে। মাটির অর্থ নেই বাতলা দেশে! এই রেল-স্টেশন-লাইনেরই দুধারে যেখানে মস্ত মস্ত বাড়ি। চাই তুমি ক'টার জোড়া বস, যান আরেক লাফল আর সেই সঙ্গে একটু ছিটকোয়ান চালা! বাস—আপনাকে তখন কে ধরে?—বাঙালীর ছেলের কবে যে এ-কুছি হবে!

কৌতুক বোধ করিতেছিলাম। এ উপদেশ আর-বাহিরে তুমিবা আশ্চর্য্য জ্ঞান হওয়া ইচ্ছক। আরো কতকাল তুমি! আমরা ধাই মাঠে লাফল ঘাড়ে করিয়া—আর সেই অর্থের স্রোতার ছেলে-ভাইয়ে ভাইপো-ভাগ্যবানের চাপান কত বার লাইসেন্সের দিকে! বটে! কহিলাম,—তাপকে এ সম্বন্ধে যদি একটু লেখালেখি করেন...

তত্বে কহিলেন,—Journalism? ক্যালকটায় ইউনিভার্সিটি Journalism-এর ব্যবস্থা করছে। ছাই হবে। Journalism-এর মানে তো খোঁজাখোঁজি! Journalism a success পেতে চলে চাই ব্যবস্থা বৃদ্ধি! সে বৃদ্ধি কে দেবে?

কথার ভাবে মানে হইতেছিল, তত্বে কহিল মস্ত কোন কাজ করেন। এবং সে পরিচয় সঙ্গোংবে লখের লোক ধরিয়া তথ্যের জানাইতে চান।

কৌতুকের বশে প্রশ্ন করিলাম,—কিছু যদি মনে না করেন, আপনি তেপুটি ম্যাগিষ্ট্রেট?

বাঙালীর সঙ্গে কৃত্রিমতা ও পৌরবের এটাকেই শরম পদ বলিয়া আমার বিশ্বাস।

হাসিয়া তিনি বলিলেন,—না। মানে, আমি টার্নলিং-এজেন্ট। বিখ্যাত গুপ্ত আছে—‘বন-বন’—পেটেন্ট গুপ্ত। আমি তার মোল এজেন্ট কহু ইতিবা।

—বিলিতি গুপ্ত?

—না। খবরই। ‘বন-বন’ নাম শোনেন নি?

বৃত্তির ভাওয়ারকে এ বৎসে বিরাট শিম-বেলায় পরিণত করিয়াছি। জানা-অজানা, চেনা-অচেনা কত কি যে সে ভাওয়ারে ঠাঁইলা রাখিয়াছি! সেট ভাওয়াবের আনাচে-কানাচে সন্ধান করিতে লাগিলাম। মনে পড়িল। ঠিক!

পথে-ঘাটে প্রাকার্ত সেবিয়াছি বটে! তা ছাড়া মানিক ও বৈদিক কাগজগুলার ঘাড়ে-পিঠে

বন-বন

ছনিগার খাবতীর ব্যাধির বন! এ ঔষধ সেবনে জ্বর-বন্দা, পীলা গিভার, হাঁচি-কাশি, হাম-বলন্ত, কলো-টাইফয়েড, খাঁতে পোক, গাঁতের বাত—কি যে না লাগে! মনে পড়িল, বিজ্ঞাপন সেবিয়া ভাঙ্গা কঠিন। আমরা বলিতাম,—এ ঔষধ সেবনে বন্ধার পুত্র হয়, বন্দা-ছেলে প্রেমভরা তারতান পাশ করে, বেকারের চাকরি হয়, অসন্তের মস্ত আইবুড়ার বিবাহ, নাস্তিচোরের মাংসা-ভিত এবং অজ্ঞাতকালে বর্ণগাল হয়!

কহিলাম,—ওষুধের নাম শুনেছি বটে! অল্পত মাত! মনে পড়েছে। তা, এ গুপ্ত এত বেশী বিক্রয় হয় যে, আপনার মত লোককে যেটা টাকা কমিশন দিয়ে এজেন্ট...

হাসিয়া জবাব দিলেন,—এটা হলো বিজ্ঞাপনের গুণ।... লেখার আঁট নিয়ে আজকাল খুব বৈঠক পড়েছে না? সে আঁট এই ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো ফলাফল পাড়ে। এ-আঁটে আমার আছে বিধি-বস্ত কখনো! থাকে বলে প্রতিষ্ঠা!

তত্বে কহিলেন—সুখ-চোখে—লাভিতো থাকে বলে, পৌরবের সীলি—ঠিক সেই সীলি!

কহিলাম, এ গুপ্তের গুণ আপনি নিজে পরখ করেছেন, নিশ্চয়! মানে, খেয়ে ফল পেয়েছেন?

তু কুজিত করিয়া বিভিন্ন এক ভদ্রী-সংসারে তত্বে কহিলেন,—আমি? কখন কালে না।

—তবে?

তত্বে কহিলেন,—বন-বনের সঙ্গে আমার সাংযোগ—সে এক অশূর কাহিনী! শুনে বুঝবেন, ভদ্রী পান আর বাই কখন, বিজ্ঞাপনের আঁট জানা না থাকলে সবই কখন খী ঢালা! জগতে যেখানে ৪০০০০০০, সন্ধান নিলে যেখানে, সেইখানে সে ৪০০০০০০-এর সূল আছে বিজ্ঞাপনের আঁট।

কহিলাম,—অবশ্য আপনার স্বাস্থ্য যে রকম বেশি, তাতে গুপ্ত খাবার প্রয়োজন কীবনে বোধ হয় হয় নি।

তত্বে কহিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—আমার স্বাস্থ্য! হঁ! ছনিগার এমন ব্যাধি নেই, যা আমাকে লক্ষ্য করেনি! মানে, আমি যেচে থাকব, এ আশা কারো ছিল না...

বিষয় বোধ করিলাম। এমন ভোরান শব্দ! হাঃ রে, সে শব্দও ছিঁড়ে যায় ব্যাধির কুসুরে!

তত্ত্বলোক করিলেন,—আশ্চর্য্য হচ্ছেন!...গুণ এখনো পায় নি তো? শুভ্র তব বেগি সে কাছিনী! মানিক পদ্মে কত লোক কত বকরের গর লিখেছে—পড়েন ত! আমার এ গর তাঁরই সে-সব বানানো গরের চেয়ে কম মজার নয়।

কাহিলাম, মম কি! মানিকে বহু পরে লড়ি, লেবক-দেয় সঙ্গে ট্রেণের কামরায় কত অতিথির বেধা হুঃ অংকের কত—সেই অংকের মধ্যেই অতিথি বিচিত্র সঙ্গ কত গর শুবায়। আমার তাগো বহি তেমন গর ছুটো যায়, তাহা হইলে সে গর ছাপিয়া বাঙার কখা-দাহিতো মানিকটা জায়গা বদল করিতে পারিব।

তত্ত্বলোক করিলেন,—আগনি শুনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন! কোথাকার জল কোথায় ঠাঁড়ায়, কেউ জানে না। আর একটা বলা বেধবেন—হুনিয়ায় বা কিছু খুঁটে, তার কোনটা ক্যান্দা নয়। আমার এই শরীর যে ব্যাধি-মন্দির ছিল, তার কারণ আর কিছু নয়, বাৎস-ক্ষেত্রে আমার সিঁচিলাভের কত! ...কণাটা সব শুভ্র, তবে আমার এ আধ্যাত্মিকতার অর্থ বুঝবেন!

আজ বেধছেন, আমার শরীর এমন ঝটপাট মজবুত—আমি ইহা জোহান! কিন্তু আমার পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত এ বেধ ছিল কেন লিঙ্গলিক পাকাঠি! পাকাঠি বলবার যেত, রোগের চাপে বেধ ঠিক পাকাঠির মত মড়মড় করত—কখন চিড় যায়, কখন কাটে! হেন গুণ ছিল না—না পেটে যায় নি! আমার মার ছিল গুণে প্রচণ্ড বিশ্বাস! আমি হীচলে কাসলে বা আমাকে গুণ বাওয়ারে। গীর নিরুৎসাহ একটি ছোটখাট ডিসপেনসারি ছিল বাড়ীতে। গোমিগুণাধির বাস, বই; কবিতাকী বড়ি-পাচন; চোটাকার কুলি; এ্যালোপ্যাথি কুইনিন, হোমোপ্যাথি, টিংচার অ্যারোভিন, হেজিগন্ট, পেন্স, গ্রীমন্ট সিরাপ, লাইকর-অ্যামোনিয়া; গুণিকে জোহানের জল, যৌগিক জল, চুপের জল, নাকতে চিরিতা, লোদরাজ, ছেলো-নিমপাতা। এগুলো আমার গায় নিভা-গাছের সানিল হয়েছিল।

আমার এই বেধ ছিল হেন চামে-চাক। হাডের বোঝা! অল্পশও নিভা হত। মা নিখাস ফেলতেন। মাংস পথনা

ছুঁটেরে নিভা তুলসী-তলায় পুঁতে রাখতেন মানসিক করে; তুলসী-তলায় ছোটখাট একটি কাগেলি পড় উঠেছিল। আত্মার-বলন হাঃ গান কবতেন—ও ছেলের চিকিৎসায় পথনা পর্য্য কতার মানে শুণু অপথায়! বস্মা নিব্ধ—না হলে মিন দিন অমন পাকিগে যাবে কেন?

ব্যাধির মধ্যে লেগা ব্যাধি ছিল, পেটের অল্পব। অর্থাৎ পাকস্থলী—যাং মানে এই stomach, ডাক্তাররা বলতেন, এই stomachটি না সারলে আমার রোগও সারবে না। এই stomachটিকে গঁরা বলেন house of life. অর্থাৎ আমাদের এই গ্রাণ-বাণু, তার বাণ হলো stomach-এর মধ্যে। আমার গ্রাণের বাড়ীখানি কুদিকম্পের হোলদায় অইপ্রায় চলত।

আমি করিলাম—Stomach সারল ঐ ‘বন-বন’ পেরে? তত্ত্বলোক করিলেন—না, না। অধীর হবেন না। ‘বন-বন’ গুণের নাম আমি কাণে শুনি নি তখনো। কানপদ্মে বত গুণের বিজ্ঞাপন ছেপে বেকত, তার কোনোটির নাম, মার বিজ্ঞাপনে ছাপা গুণাংশ পর্যন্ত আমার অজানা ছিল না। সে সব গুণের প্রশংসাপত্র মিটেছে কোথাকার কোন্ রাজা-মহাগোত্র, নবাব বাৎসা থেকে তুল করে নাকীর দেহেরজানার, গ্রেসিডেট পকারে—সে সব প্রশংসাপত্র লাতিনে-লাইনে আমার ছিল নুহ? লতিয়া কথা বলতে কি, ভারতবর্ষের জিও-গ্রাফি লম্বকে আমার জান এট সব গুণের প্রশংসাপত্র থেকে। কিয় সে কথা থাক।

সেবার আমার হ’লো ইনসু-জো—বরদ ছাঙ্গিন বৎসর। কবিতাজো, এ্যালোপ্যাথি—ত’রকম চিকিৎসা সমানে চলছিল। যোগ হুঃ ছুটো কুণের প্রচণ্ড বিরোধের ফলে আমি পেরে বৈটে উঠলুম। সে রকম শরীর—বাঁধার কথা নয়। সে বছর জোহান জোহান কত লোক যে মাথা পেল—1919-এর সেই ইন-সু-জো-এপিডেমিক! ওঃ! মনে হলে এখনো বুক ধপে!

পেরে উঠতে মা আমার কটোগ্রাফ তোলালেন। মার মনে কম হয়েছিল, ছেলের উপর দ্বয়ের যেমন দৃষ্টি চলেছে, কি জানি, কোন্ দিন না! অর্থাৎ কটো থাকলে মায়া বাবার পর সে কটোর গোমাইড এনার্জিমেট করিয়ে খেয়ে দেওয়ারো খাটোলে স্বভাবকার দূরে শাহনা কিছু মিলবে!

এনজেল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎের সৌভাগ্য হ'লো।

বেটে কপো লোক-ভাৰ্য মলিন বেণ শস্যৰ গু'মালি
 তুলসী-কাঠের মালা মাথায় তেঁগ জব্বাৰ করছে। একখানা
 কালি কাঠের তক্তাপোষে বসে আছে-সামনে বোম্বাড-
 কলম, গিঁদের শিশি আর একদালা কাটাংলা।

'পবিত্র' 'সো'। কথ্যার্থেও হ'লো। ফটো 'প্রদান'
বৈশাল্য-বেশে মধ্যস্থি। চেহারা বেশে থাকা অনেক
হয়। আসলে বেশ দেখানো।

কিনেছিলুম ?

বলসুখ—আমি শয়ানগত ছিলাম। নিজের হাতে কিনি নি।
চাকরে কিনে আনেন।

বাবা কণ্ঠ্য পর প্রত্যাহ করণেন, ফটা ছ'খানি ধরি
 তাঁকে দিই, তা হলে সে ফটা থেকে ব্লক তৈরী করিয়ে দে
 ব্লক তিনি ছেপে দেন তাঁর বিজ্ঞানে। তাতে প্রত্যাহ
 দুখিলা এবং বাঙালী জাতের বীচবার আশা হবে। ফটা
 ছ'খানি আমাকে আবার ফেরত দেবেন, বললেন।

সুবিধা যে হবে, বিশেষ এই ব্যাবি-কর্মের বিজ্ঞাপনে
ভোলা বাঙালি নেশে—তা আমি বুকেছিলাম।

ଆମି ଦଳନୁନ—ଆମାକେ କି ଯୁଗା ମେରେନ ?

‘কথা শুনে বনজর সাধা যেন আঁখিক উঠলেন। দুজো
বে-ভয়ী, প্রাণশ-শ্বেন, স্নেহ-স্নেহ, তিনি আর ইরণো-
নেই।

১৯৪৫ সালে বঙ্গদেশে রূক কণ্ঠতে প্রৱ্ত আছিল। একখান
প্রখ্যাত নর, অমর বিন-পাণি সেট রূক কণ্ঠতে ধবে। তা
‘উপন’ একলাখ কাটনিগ হাণ্ডে বজা বুঝ। কার্ণেত বান
হাণ্ডাই অপর, প্রণয়ী, ডাকমাণ্ডল-ইত্যাদি ইত্যাদি।

১০৭. **স্বপ্নি কল্যে** — অমিত্র বধি শাক না ধ'লো অে কটে
সেবার দরকার ?

ধন্য সাধা বললেন,—আপনার ছবি ভাণ্ডা হবে আমাকে
এক লাখ ক্যাটালগো তা ছাড়াও বৈদিক আর বাণি
কগণে। তাতে আপনার বড় লাভ লাভ হবে, ভাবছেন না
নাথ বেদ্যে-ভাবেরই ক্ষেত্রে।

[illegible]

যন্যত্র লজ্জা কলপন—যে পল্ল লিখবেন, ত্যঃ দাসিকে
ছাড়া হবে, সে মবজ্ঞে গৌ প্যাক্ষিত্তি নেটে । কত লেখা ত্তৌ
অমন ছেলেও যাহ ।

আমি বললাম,—একালে বকে বলে রাসাশো গর,
গীতাশো গান কি করিও, তার আর মার নেই। জানেন, এই
কলকাতা সহরে শাত হাজার নশো বহুজনখানা মাসিক কাগজ
ছাপা হয়; তা ছাড়া এক শতখা ও শতখা হাফের সাপ্তাহিক
ছাপা হয় মততো হাজারের উপর। এত লেখক পাবেন
কোথায়? যে কোনো কাগজ খুলে দেখুন, লেখা যে দেখে,
সেই লেখক এবং যা দেখে, সেই লেখা আজকাল এত্নের
কাগজ হাফ খা। স্তরতা ছাপা সবচেয়ে মতের মতবাব
কোনো হেতু নেই।

এই তরুণ উপাধীন বয়েঃ যখনই দেখলে, কানায় যন
লোভে পরিপূর্ণ! তখন বিরাগার হৃদে সে বললে,—বেশ, এত
বলছেন, শুভন দিন এই পাঁচটি টাকা—

—ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମି ଓଡ଼ିଆ ନଈର ଏକ କଟା ଡାକି
ମହା ପ୍ରାଣ କରୁଣ ।

পরেই দিন হনকর সাধ। নগরীতে ছায়ায় গুহে, টেকিঘর
হলেন। বহু বিবেচনা করিতে বস। সংস্কার বদন দেখলেন
আমি ছট, তখন পকেট থেকে একখানি বগ টাকার নোট
বাহির করে আমার সামনে বসলেন, বসলেন—নিম, জগদীশ
অপক্লি করবেন না। ফোটো গ'রামি এনে দিন।

আমি বললাম,—কেনেছেন !

জন্মে বন থেকে গন্ধে, পচিল, পাকা, সস্ত, পঁজা
এবং এত একটা এসে উঠল নগর সাতক চারখোর
বদলি লাগা আহার পা শুধি জড়িয়ে ধর বহলে, -নি
সময়, সাতক চারখো-এব আহার পলায় পা চাপিয়ে বিন
ছাপোয়া বাত্ব আনি।

এই পুড়ে হারশোর উঠে ধনঞ্জয় সাহাৰ লম্বা মেগেছিত
 আৰ একটী মাদ। যাক ধৰে বৰ কত।
 যাকী হুদ। বোম্বী টাৰাটানি কৰা বাৰাণ্ডাৰ কেদে
 হুৰ্ছৰ লক্ষ্য নহ। কটো গুণানি গাঁৱ হাতে দিলুম।
 ভৈৰী কহিবে সে গুটি তিনি কেহত দিহেছিলে।

সেই বঙ্গের পুণ্ডরিক বক্ষেই অসংখ্য সেই স্তম্ভি কামরূপ
কামরূপে ছাড়া হয়ে এক লক্ষ কামাটালবধের গিঠে চড়ে জাঁবা
একরায়ে বাঘি-জর্জর বাতলা হৃৎক প্রখ্যাত করে ফুলল
বহুদিনের সমর ধনসম্পদ সোটা এলেন-বেশই জরাজ
বংশলেন,—কিছু আসল ক' শিশি 'বধ-বর' খেয়ে এল
চোরা-নাড়িভাঙন, বংশলেন ২-

ଆସି ବଳୟ—କେନ ?

সাহা বললেন,—বিজ্ঞাপনের কালে গুরুত্বের বিক্রী মফঃস্বলে কিছু বেড়েছে। তিন নালিশ-লেখ্যে চিঠি আসতে অসংখ্য! তাহা বলছে, 'ডাঃ এল-পার্বেশ' শিশু খেলের গানের হাড়ি গানড়া মাংসে ঢাকা পড়েনি। 'তাই, জানে—

আমি বললাম,—'বিশ্বাস করছেন? একটু শিশু কি, এক বিশ্ব 'বদ-বদ' আমি বুঝে গিয়েছি—কখনো কালে নয়। সত্যি কথা বলতে কি, 'বদ-বদ' বিজ্ঞাপনই বা দেখেছি, শিশু কখনো চক্ষু দেখিনি। আর পছন্দ নয়।

আমার পানে চেয়ে সাহা বেশ কাঁচ হয়ে দাঁড়িয়ে বসল : বহুক্ষণ পরে বলল,—একটা পরামর্শ আছে—

—বলুন।

—আমি বদ-বদ বিক্রী করছি। আনিও কখনো এক কোটা বদ-বদ ফুল বিক্রি। তার মানে, গুরুত্ব আমার তৈরী নয়। আমার এক বন্ধু এটা তৈরী করে। পরসার অভাবে শিশু কোণ্ডাক করতে পারে নি বলে আমার হেডকোয়ার্টারে গুরুত্ব কেউ নেই। আপনাদের চিঠি পড়ে আমার তাক লেগে ছিল। বদ-বদে নাকি এমন চেহারা হয়! তেঁতে বেসব পরামর্শ আছে,—আমি ত জানি। বেগপাতার রস, তুলসী পাতার রস, শিউলি পাতার রস; তার সঙ্গে লেবুর রস, চিনি আর গোলাপ ফুলের শাপড়ি মিশিয়ে জাল দেওয়া হয়। সে মিষ্টিবোরের এমন গুণ! আপনাদের কথায় আমার মত হ'লিয়ার লোকের সত্যি তাক লেগে ছিল। এখন আপনাদের উপর আমার প্রভাও হয়েছে অসাধারণ। আপনাদের মত বুদ্ধিমান লোকের বুদ্ধি আর বাক্য যদি লগ্নাশ পাঠ, তা হলে এই বদ-বদেব সঙ্গে আমাদের বাবসা যে ভদ্রকম্বরে উঠবে, তাতে ভুল নেই। কদিনের মধ্যেই যে বাবসা আপনাকে করছেন, তাতে বাণী আছে। শুধু তার পূর্ণ পরসার একবার খতিয়ে দেখবেন।

পরচের পঠিগান সাহা মহাশয়ের দেখালেন। বদ বা কিছুর, তাই তিনি। লেবু বা পাতা-পাতা বাইরে এখনো বিনা ফুল সংগ্রহ করা চর্চা নয়। তার উপর শিশুর নাম, কানন আর হুগলার বসত। অর্থাৎ পড়ে শিশু-শিশু বসত পড়ে কেউ পয়সা। হুতরাং...

ভালো, মজা কি! লক্ষী ধনজয়-হেল সাবরে আছান করছেন—এ তো বিজ্ঞাপনের বদ! বদ-বদ বদ! আসল কল এ সঙ্গে গুল চাপা পড়েছে! বদ-বদ বদ-বদ কান-

বোঝ। দি গ্রেট আট বদন! এটা বদ-বদেব ভোরে বিয়ের বাজানে ভুলটি বরের মাগর, চাকরি বাজানে লখনাট আকাটেব চত-চতকান, লিটারার বাজানও বিজ্ঞাপনের ভোরে লখনবদ!

সাহা বলল। সেই অর্থি আমিট এই বদ-বদেব একমাত্র একেট। কলকাতার বিক্রী করা কটিন। দেখানে সত্যি নিজেই ভাবে অর্থাৎ চতুর; তার উপর নিজের স্ত্রী-পুত্রকে বিশ্বাস করে না, তা বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করবে কি! কলকাতার বাইরে মাদুরের নবের এমন প্রগতি এখনো হয়নি। কালেই আমাদের অল্প-পোচনার কাগজ এ বাবদ খেটে নি।

কথা শেষ করিয়া তত্ত্বলোক আমার পানে চাহিলেন; তার পর সিগারেটের টিন হাতে লইলেন।

ট্রেণ বামিয়া গেল। নিস্রাসু হয়ে ওদিকে ফুলি হাঁকিল, বর্ধমান!

তত্ত্বলোকের বদ চমক তাকিল। করিলেন,—বর্ধমান! আমার বর্ধমানের সাথ-একটেকে লিখেছিলাম, বাবসা দিয়ে মের পাতেক মিথিলা-সীতেরাগ তৈরী করিয়ে ট্রেণে নিয়ে আসবে। ট্রেণের গুলো তেমন জুগাই নয়। দেখি, সে নিয়ে এস কি না।

তত্ত্বলোক টক্ করিয়া প্লাটফর্মে নামিয়া পড়িলেন। তাঁর তলী বেগিয়া আমার মনেব কোণে কে বদ বাবসার বসিতছিল,—আইনের অনিশ্চিত পরে গিয়া ও-কিছু একেব করিয়ে না। তার চেয়ে এই বিজ্ঞাপনের আট চতুর করিয়া এনি কোন পেটেটের পুঙ্খ বরিখা বদি...

ছুটির পর কলেজ পুঁজিগছে। ল লেকচার এ্যাটেও করিতেছি।

কোটে লগা বিন কোন মতে লখন কাটাওয়া একে-সার মহাশয় কালে বদন টোনাগি এটি বুলিয়া allusion আর delusion বুঝাইতে বলেন, আমার মন তখন যেনজবে লাইনের বুঝারের মাটে ছুটিতে থাকে! মনে হয়, এ বাবন কাটায়া বাই ছুটিয়া তুলসী পাতা আর বেগপাতার লখনে! বদ-বদ বোঝ একটা পেটেট উব বুলিয়া...

অর্থাৎ বাবসার আটে বাত পাকাইতে পারিলে বাঙলা দেশে লগা উপার্জনের সুযোগ ভাড়া লখন! বিজ্ঞাপনের টেকে বাঙালী যেমন ভালে, এমন আর কোন জাত নয়।



পদব্রজে ইংলণ্ডের পল্লীপথে

—শ্রীবিহুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ন্যাক্ উটলিয়াবন্স্ একজন হরুণ আমেরিকান—
তিনি অভিজ্ঞতা লব্ধের ও ভবঘুরের জীবন আখ্যায়িকার



কোন্সে : পল্লীপথ দল্লের দিকের দৃশ্য।

আমাদের সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডের পল্লী-অঞ্চল ভ্রমণ করেন। এই
হাতে অর্থ ছিল না। পথে কাককর্ষ করে অর্থ সংগ্ৰহ
করতেন। এই হরুণ ভবঘুরে-ভ্রমণকারীর দেখার মধ্যে
আমরা ইংলণ্ডের পল্লীজীবনের একটা চমৎকার ছবি পাই :

...রাত জুড়ুধ : ভ্রমণদলের পথঘাট চমৎকৃত, আমি আমার
বালা থেকে বার হয়ে হাট, পার্ক কর্ণারে একটা কফিন
হোকানে একদল লোকের সঙ্গে বিশেষ কফি খেলাম।

কফি-পানের সময় দলের সকলকেই একবার ভাল ক'নে
হেঁথো নিলাম। আমার পাশে একজন বীর্ষাকৃতি দোক,
বোধ হয় সে নৈশদলে কাজ করত, তাইট সঙ্গে আমার
কথাবার্তা শুরু হ'ল।

সে কিজালা করলে—তুমি ইংরেজ নও বোধ হয়—না ?

আমি বললাম—না। কেন ?

—তুমি আস্তে আস্তে কথা বলছ, তাই থেকে মনে হচ্ছে।

তুমি আইরিশ না হ'ও ?

—আমি আমেরিকান।

—আমেরিকান ! জলবেস বেশ দেকে আসছ ?

—আসছি বটে, কিন্তু আমি নিজে প্রায় নিশেষল।

আমি পায়ে হেঁটে ইংলণ্ড, গ্রেগেন্স ও স্কটল্যান্ডের সর্বত্র বেড়াই
দ্বিধা করছি। পথে কাক পুঁতে মনে অর্থ উপার্জন করার
জগত।

—কাক কোথায় লাগে ? ইংলণ্ডের লোকট কত বলে
আছে কাকের অস্তিত্ব।

—বেশাট বাক, অস্তি ছাড়া পদ নেই। শেনি, আর
সারা হাত লগুন সহস্রটা হেঁটে বেড়িয়ে দেখব। এস না
আমার সঙ্গে ?

—সে বেশ হবে—আমার কোন আগ্রহ নেই।

কফি-পান শেষ করে ক'নে টাটাতে শুরু করি। টেবুসের



কোন্সে : কনসে শহরীর কনসে কাসেল (Conway castle)

ঘরে এম্বায়াবন্ট প্রায় চমৎকৃত, ও একজন পুলিশম্যান
কেবল এখানে এখানে ঘুরে, একতানে একটা দীলোক পথ

ধায়ে ঘুরছে। লগনের মৈল কীমন বড় বিভিন্ন, কত অসংখ্য গৃহস্থায়ী হতভাগ্য লোক যেখানে পালকের বেঁকিতে, পানের ধায়ে একত্রে নিতের ব্যতি দাপন করে।



অকলস : পাল্লয়া সকলে সেখানেই খাবার।

ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিডের কাছে একজন লোক ঘোঁড়াতো ঘোঁড়াতো কাছে এল। একটু ইতস্ততঃ করে বললে—একটা সিগারেট আছে কি?

আমি বাক্স থেকে একটা সিগারেট বাব বলে তাকে দিলাম।

লোকটা বললে—বড় বাতের বেননার ভুগছি। আজ রাতে একটা বিছানা-ভাড়ার হাম দিতে পার?

—কত ভাড়া লাগবে?

—আট পেনি।

আমি পরমা বাব করবার পূর্বেই আমার বড় একটা নিমিঃ তাঁর হাতে দিয়ে বললে—কিন্তু সাবধান, এই পরমার সব খেণ্ড না বেন। ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিড থেকে আমার চম্ভা-লোকিত টেম্পেল দিকে চেয়ে বইলান—বাকি থাকে নতুন কি মালমোহাট নৌকা নবী-বন্ধকে একটু চকল করে দিচ্ছে, লগন সত্তর নিরুত, সাবায় গাড়ী ঘোড়ার ভিড় কম।

ল্যাংগের দিকে নবীর ধাতের বেকিগুলোতে অনেক লোক ঘুরছে। এ সব বেকে রাতে শুয়ে থাকি। আইন-বিরুদ্ধ, শাসিত লোকের উল্লিখে দিয়ে গেল একজন পুলিশম্যান। এই সব গৃহস্থায়ী হতভাগ্যদের টেম্প নবীর ধাতের বেকি ছাড়া অন্য পরমের স্থান নেই—কারণ এরা শোওয়ার ভাংগার ভাড়া দিতে পারেনা। পুলিশ পিছন দিকেরেই অনেকটাই আবার শুয়ে পড়ল। উপায় কি দেখাযীদেন?

বড় অকলস, একটা বেকে একটা শাসিত ঘুরছে-হেঁহেঁ উপর আর একটু হ'লে আমবা বেশ পড়েছিলাম আন কি! তবে বেশি একটা বুঝা পেখানে তখন—গায়ে ছেঁড়া একটা আলোয়ান, ভাঙা তোবড়ানো হাটের তলার খাব উঠে। পুতো প্রক চুল দেখা থাকে।

বুঝা একটু নড়ল, তার পর ধীরে ধীরে যেন কষ্টের সঙ্গে পান ফিরলে। তবে তবে চোখ চেয়ে আমাদের দিকে চাইলে, যেন কৃত সেখছে।

আমি বললাম—তব পাখার কোন কারণ নেই। চল তোমার এমন কোনো আরণ্য দিবে বাই যেখানে তুমি ভাল বিছানার শুতে পারবে।

কথা শেষ করেই আমি তাঁর হাতে একটা ফ্লোরিন দিলাম—ট-শিলিং। রৌপ্যমুদ্রা হাতে পড়তেই তার মুখের ঘোর যেন কেটে গেল। সে বললে—তববান তোমাদের ভাল করুন। এতে আমার হ'বিন চলে যাবে।

ক্রীতকালের প্রভাত হবার বেশী নেই বেশী। যদিও এখন তাৎ বায় সাড়ে তিনটে—এইই মধ্যে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিড দিয়ে তরিতরকারী বোঝাই গাড়ী ঘেত প্রক করছে।

আমরা কয়েক গার্ডেনে এলাম—লগনের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় শাক-সবজি ও ফুল-ফলের বাজার এই কয়েকট গার্ডেনে। কলীতা মালমোহাই গাড়ী থেকে ব্যস্তসমস্তভাবে



হাটকারগোয়ার : আলবার্টের স্রোদ প্রধার দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব (দক্ষিণে স্রোদ) : অনেকটা আমদের 'হুজু' মার্জিত।

মাল মালকে, টাটকা গোলাপের পত্র ভূত ভূত করেছে কোরের গাওয়ায়। শাক-সবজি কত ধরনের—চন্দ্রকার লুপত প্রুথেরি, চট-চাউপে উঠার বড় বড় টোনাটো, নটনহু'টি, পুড়ের খাঁটি

বাঁধা কচি এ্যাসপ্যারোগাস শাক, পেঁপা, কচি গোলাপী সংয়ের রুধাব', নানারকম চলক শাক।

তরকারী ও টাটকা ফল বেখে আমদানি ক্রয়ান উঠেই হ'ল—একটা বোকান থেকে আমরা কিছু কনসালেশন ও আগলে কিনলাম।

ফুলের বোকা বেখানে নামাজে, সেখানে চমৎকার চমৎকার খোলাশ, পানিসি, লাগ কার্পেন, হৃদয়ে অটহিস, সাধা হাইড্রান-জিয়া—নানা ফুলের গনিসিত হৃদয়ে কভেট গার্ডেনের সে প্রান্ত আমোদ করেই।

একটা ছোট্ট আইভিসের ভোড়া কিনে আমি ব্রেকফাস্টের করে বাগান ফিরে এলাম।

লণ্ডনের বৈঠে, বোলমাগ ভাল লাগছিল না। ইংলণ্ডের শান্ত গম্বীগ্রাহের ভীষনখারার বোধ আমাকে টানছে। শুধু তাই নয়, হাতে আমার আর মোটে কুড়িটা শিশি অবশিষ্ট আছে—কাজ খুঁজে না বিলে আর চলবে না। লণ্ডনের বা ভয়ানক খরচ, তাতে কুড়ি শিশি এ অর্থ লগাইও চলবে না।

কাজেই হু একদিনের মধ্যেই লণ্ডন ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। সকলে পথে আমার দিকে চাহ—আমার মত পোষাক পড়ে না কোন ইংরেজ।

লণ্ডন আর ছাড়তে পারি নে—চলেছে তো এস আর শেষ নেই। লণ্ডন লম্বা যে কত বড়, গায়ে হেঁটে লণ্ডনে না বেড়ালে তা বুকা শক হবে। লণ্ডন থেকে অল্পদূরের অর্ধেক রাত্রে পথান্ত লম্বা লম্বাই চলেছে—সেই ডিক, সেই

আলোর শাসি, ফুটপাথ, ট্রাম, ঘরবাড়ি। লণ্ডন লম্বা থেকে কুড়ি মাইল দূরবর্তী হাইওয়াটলু বা অতিক্রম করা পথান্ত উল্লু পথী-অকল চোখে লড়ে না।

কিন্তু বশন চোখে পড়ল, তখন মনে হ'ল ইংলণ্ডের এই পম্পোগ্রাফ প্রথম জীবনের দিনে কি মনোমুগ্ধকর! ফুল, ফুল,



টাওয়ার ব্রিজ লণ্ডন: টেম্পলার ইন্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল হুট।

ফুলে আলো করে আছে মাঠ, মাঠের বেড়া, লোকের বাড়ীর বাগান—মাঠে ফুটেছে বাগানবাগান, ও কুইন এ্যানের লেন (এককম দাঙ্গা দাঙ্গা বনপুশা), লোকের বেড়াতে ফুটেছে লতানে গোলাপ।

অন্তর্ভুক্ত থেকে বহন হলাব ট্যাটফোর্ড-অন্-ড্যান্সনে ।
 ট্যাটফোর্ডে পৌছবার কিছু পূর্বেই আকাশ বেয়ে ঘোরালো
 করে এল, বৃষ্টি পড়তে শুরু করে নিলে—আমার সঙ্গে একটা
 ছায়া সেন্‌কোট ছিল—দু'লে পেরে গিয়ে দিলেন । পোপুলার

এখানে অভ্যস্ত বেশী । ট্যাটফোর্ডের শান্ত, শস্যের আবহাওয়া
 মণ্ডী করছে এট চট্টপচিত্ত, আনন্দপ্রিয় ট্রান্সেকের মন ।

ভিড়েও তবে আমি গুব সন্ধ্যাে উঠে হেনলি স্ট্রিটের বে
 বাড়িতে লেক্সিংহাম রাস্তাঘর করছিলাম বলে প্রসিদ্ধি আছে,

সেই বাড়ীর বাগানের সামনে
 গিয়ে পাড়লাম । এলিভাবেথের
 স্নাতকসালের স্থাপত্য-পদ্ধতিতে
 নির্মিত বাড়ী, লেকসেল জানালা,
 বাড়ীর সামনের বাগানে পাছে
 নতুন পাতা পড়িয়েছে, পাখী
 ডাকছে—পড়িয়েছে মধ্যে বড়ই
 মতভেদ থাকুক—আমার পক্ষে
 এট বাড়ীই বসেই ।

এখন থেকে গ্রাম্যপন্থ দিয়ে
 আমি এ্যান ল্যাংগের পিতৃগৃহ
 দেখতে গেলাম নিকটবর্তী শটারি
 গ্রামে । নির্মল, মেঘহীন আকাশ,
 হ্রদ—লগনের ঘোঁষা ও সূর্য-
 সাব পথে চোখ ও মন তৃপ্ত হ'ল
 এখানে এসে ।

একটা বনের মধ্যে ছোট
 একটা গির্জা । গির্জাটা এমন
 নির্জন স্থানে বনের মধ্যে অবস্থিত
 —হটের ‘আই ব্যা ন হো’তে
 বর্ণিত ক্রায়ার ট্যাকের গির্জার
 কথা মনে পড়ে । একই ধূরে
 বন ছাড়িয়েই এানের সুন্দর গুহ
 ছাওয়া ঘর, এমন পরিষ্কার পরি-
 ক্ষর ও সুসজ্জিত বে, মনে হয়
 এ্যান বুক এখনও এখানেই বাস
 করে—আমি তার সঙ্গেই দেখা



দু'বে এলিভা ভাসল : লুইস গ্রান্ডল আট সান্ডারী ।

কিছু পূর্বে এ্যান নদীর উপরিস্থিত রুপটন ব্রিজ পার হয়ে
 আমি আমার কবিতা পদ্যসমূহ ট্যাটফোর্ডে প্রবেশ কর-
 লাম ।

ঐশ্বর্য্যাল, জুন মাস । আমেরিকান ট্রান্সেকের ভিত্তি

করতে চলেছি ।

এানের পৈতৃক কার্শ এখনও আছে—ভিত্তিমা করে
 ভিত্তিমা, এখনও লে কাণ্ডে চাষবাস চলে—বর্ষমান বালিক
 এক মাইল দূরে অল্প একটী গ্রামে থাকেন । আমার পক্ষে

মাত্র আট শিলিং লম্বল, হাথাগ্রেস কাপড় একবার ভাঙা পরীক্ষা করে বেথাই থাক না, সেখানে কোন কাজ পাওয়া যায় কি না!

অল্পকমেই সেখানে পৌঁছে পেলান। ইংরেজ কৃষকদের ফেনে বাড়ী হয়, যেমন ঘরপের বাড়ী—আটতিলতার মণ্ডিত পাখরের প্রাচীর দিয়ে বেধা। আমি চুকতেই একটা তিত্তির পাখী খাঁচার মধ্যে থেকে কর্কশ স্বরে চীৎকার করে উঠল—একটু দূরে গ্রীষ্মকালের মতমৌ ধুলের ক্ষেতের সামনে একটা প্রশংসিত মনুষ্য এমিক ওমিক পাখ্যচাটী করছে।

তিত্ভিরের কর্কশ রব শুনে একটা ঘের ঘর থেকে বার হয়ে ব্যাখ্যার কি দেখতে এল। তার পিছনে পিছনে এল একজন মোটা মত লোক।

আমি তাকে বললাম—এখানে কোন কাজ খালি আছে কি?

—আমি ভো জানি নে, আমার বেলিককে বরং বল। ঐ তার বাড়ী—আচ্ছা, আমি তোমাকে এইবার আন হাথাগ্রেস বাড়ীতে দেখলাম না?

—যেহতে পার, সেখানে ছিলাম বানিত আসে।

—আমি আর আমার স্ত্রী মোটের করে এই মাত্র গুট পল দিয়েই আছিলাম। হুঁতনেই তোমাকে দেখেছি ওখানে। তুমি লাক ছেয়েছ?

—না।

আমার হাতে হাত দিয়ে সে বললে—এল, লাক খাবার লম্বল হ'ল, অর্থে লাক খেয়ে নাও, তারপর তুমি খিঁয়ে আমার বেলিকের সঙ্গে দেখা কর।

কার্পের মালিকের স্ত্রী বেশ শিক্ষিতা—ওদের ছেলের বহল আমার চেয়ে কিছু বেশী, মা ও ছেলে আমাকে লম্বল অভ্যর্থনা করলে। একটা অল্পবয়সী কি অনেকগুলি সুবাস্ত্র ভাগুউইট দিয়ে খেল ও এক বোতল বিয়ার। খাওয়া শেষ হলে কৃষকের ছেলে তার দিগারেটের বাস আমায় দিকে এক্ষিঁয়ে দিলে। পরলার অভাবে আজ দুদিন দিগারেট খাইনি—প্রাণভরে দুধলান করা গেল।

বেলিকের বাড়ীতে গিয়ে বরজার বা নিচেই একজন পুরুষ বার হয়ে এল—সেই বেলিক। আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুনে বললে—তুমি গোন্ধ হুইতে জান?

বেশবোধ্য তাবে বললাম—পূর্ব জানি।

অল্প জীপনে একবার মাত্র একটা কৃষকের বাড়ীতে গেলে ওই কাজটা করেছিলাম।

বেলিক বললে—গোরাগল পরিভার রাখা ও রূপ সোজায় করে একটা লোক আমায়ের লবকায়। আমার মনে হচ্ছে তোমার খায়ই কাজ চলবে। নাইনে হুস্তাথ হিল শিলিং—তার মধ্যে হুস্তাথ সতের শিলিংএল মধ্যে আমি আমায়ের এক প্রোথ বাড়ীতে তোমার খাওয়াব বন্দোবস্ত করে দিতে পারব।

সোজার রাখালি করা কাজটা যদিও আমার নমনুস্ত বর—কিন্তু এমিকেও হাত শালি। নেওয়া থাক কাজটা। হুস্তাথ



ট্রান্সমিট : সেলফিয়ার-জোন্সি আন সত্যগ্রেস বাস্তু।

খাওয়া বাসে ১০ শিলিং বাস্তু—এক মাস এখানে কাজ করলেই আবার খাতাথ হুঁ লম্বল গালিরে এবার মত অর্থ লকর করতে পারব এখন।

কু সত্য পার হয়ে গরীব লোকের ছোট ছোট হুঁড়ে-ঘর। তাইই একটার সামনে আমার এসে ঝাঁকালান। বাড়ীর বাইরেটা খ্রীষ্টান, জানালায় কাঁচ বসানো নেই। একটা ত্রীলোক এসে মোর পুঁলে হিলে। বেলিকের প্রশ্ন শুনে বললে, খাতার ভাষণা সে দিতে পারে না—আমি কি তার ছেলের সঙ্গে এক ঘরে ততে পারব? তার ছেলেও ওই কার্পেই কাজ করে।

আমি বললাম—তাতে আমার কষ্ট হবে না। তুমি কি নেবে?

হীলোকটা একটু ইতস্ততঃ করে বললে—আমার ছেলে বা প্রশ—প্রতি তুমি ৮০, সত্যগ্রেস শিলিং।

বেলিঙ্ক পথে আসতে আসতে আমার বললে—তুমি কোন কাপড় পরে কাক কংকর ? অত কোন পোষাক আছে তোমার ?

এইখানেই ধোলমাল বাবল। আমার আর কোনো পোষাক নেই, অতঃপর সেরার কাছে থাকলে এ কাপড়-চোপড় মরণ্য হতে পারে। কৃতি শিল্পীর কল আমার এক প্রহর পোষাক হবে না। কৃতি শিল্পি কমাতে কমাতে গ্রীষ্ম-



টাইকার্ড-অন-আর্থেন : দেহদীপ্যের সম্মি-প্রস্তর।

কাল কেটে ধাবে। সুতরাং কাক পেয়েও ছাড়তে হ'ল—আবার আমি পথে বেড়িয়ে পড়লাম।

নাশা গ্রামের নদী দিয়ে চলেছি। এ সব গ্রামে লবট পড়ায়।

ক্রমে আমি ওরস্তার সহরে পৌঁছলাম। সহরের পাশেই সেতান নদী ও বোড়মোড়ের মঠ। একজন বৃদ্ধ ভিক্ষালা করলে, আমি থাকবার ঘর বুঝছি কি না। তার ভগ্নীর বাড়ীতে একটা ঘর ভাড়া দেবে।

তার পর সে বললে—আমার কিছু সাহায্য কব না ? সাড় ঘাস আমার চাক্ষুশী নেই, ছেলেসুলে নিয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি।

ওই দেব আবার স্ত্রী—কাছেই একটা ছোট ঘরের দরজার একটা স্লোলোক বলে ছিল—তার কোলে একটা শিশু এবং তার চাষি ধারে মলিন পোষাক পরণে ছেলেমেয়ের মল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

—তোমাকে সাহায্য করতে পারলে দুখী হতাম, কিছু আমার পকেট খালি। চল বরং তোমাকে বিধার খাওয়াই।

একটা মনের মোকাবেলা দিয়ে তাকে বিহার খাওয়ালাম। তার পর সে আমাকে তার ভগ্নীর বাড়ী-ঘর দেখাতে নিয়ে চলল। ইংলণ্ডের শাড়াপায়ে সব বাড়ীতেই লামনের দিকে একটু ফুলের বাগান থাকে, এমন কি অতি গরীব লোকের বাড়ীতেও। বাগানের পেট গুলে ভিতরে চুকতেই একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-পোষাক-পর্যায় মেয়ে এসে ঘরের পাড়াল। সে তার ভাইকে হালিমুখে অভ্যর্থনা করে বললে—ও, তুমি ? পূর্ব সময়ে এসে পড়েছ। আমরা সব চা পেতে বাড়ি—তারের সমর আত একটু খাওয়ার ব্যবস্থাও তালই আছে। সবে এলি কে ?

—উনি একটা বর ভাড়া চান। তোমার তো একটা ঘর আছে, না ?

—খাকতেও পারে, না খাকতেও পারে—

তার পর মেয়েটা আমার দিকে ফিরে বললে—এসে ঘরের মধ্যে ব'ল। উঃ তুমি যে লম্বা।

আমি আঙনের কাছে গিয়ে বসছি, মেয়েটা হাত গুটো উপরের দিকে তুলে আশ্চর্য হবার সুরে বললে—উঃ, লম্বা বটে ! তোমাকে তত বেওয়ার মত খাট আমার বাড়ীতে কোথায় ?

আমি বললাম—চল দেখি, কি রকম খাট তোমার আছে।

মেয়েটা আমার একটা ঘরে নিয়ে গেল, ঘরটিতে বেশ চাওয়া আছে, আর পূর্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে দু'খানা খাটো—একটাতে মেয়েটির ছোট ভাই থাকে—সে নিকটবর্তী কারখানার কাক করে। আর একটা ঘর আছে পাশে, মেয়েটা বললে, সে খবে সে নিজে, তাব ছোট্ট মেয়ে এবং তার বোন থাকে।

—বেশ, ভাড়া কত ?

—যদি এখানে তুমি আস, থাক। আর খাওয়ার ভয়ে তুমি বৈদিক চার শিগি: বিও।

বেশ লজ্জা বলেই মনে চ'ল—আমি নেত্রেটীর প্রতি আনন্দ ভক্ত হবো উঠলাম, এখন সে অগ্নি কিছু টাক। চাইলে না ভাড়া থাকব। চাইলে দিতে পারতাম না।

আমরা আবার বাইরে গিয়ে গেলে, মেয়েটী বললে—তুমি এক পেয়াল। চা খাবে কি?

ভালই খেতে দেব। খাবার শেষে চাট্টে কিছু খেয়ে চাকরী খুঁজতে বার হলো। পরেও চোটেল ছিল কাছাকাছি, তাই একটাতেও কোন কাজ পালি নেই। একটা হোটেলের কর্মী হীলোক—হীলোকটী আমার ঘেঁষে ঘেঁষে উঠে বললে—কাজ খুঁজতে এসেছ? তোমার চাকরীর সরকার কি? তুমি বেশছি আস একজন পাগল। আমেরিকান—বোধহয় তুমি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বাকী ফেলেছ যে, তুমি এই



ক্লিওপাত্রা এখারকেট: পণ্ড: দুই গুলী 'ক্লিওপাত্রার সোঁদী' (Cleopatra's Needle) আছে বাক। টাইপ ১১... অঙ্ক ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার কাউন্টি: ১৮৭০ সনে ইং। ইংল্যান্ডে স্থাপিত হল।

—যদি তৈরী থাকে দিতে পার, কিছু চা করার অধিকার দেখা দেও না।

—চা করার কী আর কি? তুমি কিছুই আর চিক্ পছন্দ কর?

একটু পরে মেয়েটী একটা গ্রেট পানকতক জ্যাকস ও পূর্ব পানিকট। চিক্ দিলে এল। টেবেরপা দিলে তিনবার খায়—ব্রেফট, কাক আর তিনবার—এ ছাড়া কিছুই চা: খায়, রাত আটটার সময় আর একবার চা খায়, একে এরা বলে high tea।

পরদিন এসে পড়িতে ব্রেফট খেবে বুঝলাম ওরা

যাকারও চাকরী খোঁজাও করতে পার কি না এই নিয়ে—টিক নয় কি, লজ্জা কথা বল তো?

হীলোকটীর কথা শুনে আমার কৌতুক হল, বাপও হ'ল। বললাম—কে বললে আমি অংইলিয়ান নই? আর সত্যিই কাজ খুঁজছি না?

সে একটু নম্র হলে বললে—আমি ভেবেছিলাম তুমি আমেরিকান। তা, এখানে কোন কাজ পালি নেই।

এ মেয়ের পাড়াগাঁয়ে একটা অদ্ভুত বিবাহ আছে যে, প্রত্যেক আমেরিকানট টাকার সূঁচের। তাইবের আর চাকরী কবে খেতে পড় না। আনান বেশে খেতে চুটিই বল এসে

এদের মনে এ বিশ্বাসের দৃষ্টি বসেছে। তাই হোটেল-কর্মীরা তুল বেগে দেবার কাজে বদলায়—তুমি সচিঠি আশ্বাস করছে, আমি আমেরিকানাই বটে, কিন্তু আমান পক্ষেটে টাকা কন্ কন্ করছে না। আমি নিচের খবরে কাজ করে চালিয়ে পাবে হেঁটে পাবা ইংলও বেড়াব মতলব করছি।

হোটেল-কর্মী বললে—কাজকন্ এখানে পাওয়া যাবে না। তোমাকে বন্ধু মত বলছি।

সেখান থেকে বার হয়ে অনেকগুলো রেষ্টুরেন্ট, অনেক বোকান পুঁজলাম—সর্বস্ব এক কথা—চাকুরী কোথাও খালি নেই। অনেক কারখানা থেকে লোক ছাড়িয়ে বিচ্ছেদ—নতুন লোক নেওয়া তো দুসের কথা। এতক্ষণ পরে মনে



পেট্রোল্ল্যাণ্ড : ইংলণ্ডে গাড়িরা খার লোক ইটালিয়ানের অর্জসূরে।

চ'ল হাবাওরে কাপের চাকুরীটা না নিয়ে কি অস্ত্রার কাজই কবেচি।

পবনিন আবার পথে বেড়িয়ে পড়লাম—ওয়েস্টের বাকীও পথে। আমার সামনে বড় পাহাড়ভ্রমণী, পাহাড়ের ঢালুতে গিরাবের বন, আর কিছু দিন পরে আগুনের মত রক্তা ছোট ছোট কুল কুটে পাহাড়ের ঢালুতে আগুন লাগিয়ে নেবে। একজন মেষপালক ভেড়া চড়িয়ে ফিরছে, সে আকাশে উড়ন্ত একটা দিহু-পতন দেখিবা বললে—কড়কুরি আগবে, পাখীটা কত বীচুতে উড়ছে, দেখছ না? এট বেলা কোথাও আগ্রহ নাও।

কটাখানেক পরে বৃষ্টি নামল, কিন্তু বাতাস ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজেই পথ চলছি, আগ্রহ নেবার ভাঙ্গা নেই। বার তের মাইলের মধ্যে একখানা মেটরগাড়ীও চোখে পড়ল না। গারপন অছকার হয়ে এল, বৃষ্টি ও অছকারের মধ্যে আমি বাস্তা হারিয়ে ফেললাম। কোথায় যে বাড়ি, কিছুট

টিক করতে পারি না,—যহা নিপনে গড়ে গেলোম। আমার সামনে শুধু ভূপাত্ত গ্রাণ্ডার ও ছোট ছোট পাহাড়—পাহাড়ের পন পাহাড়।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে দুই অছকারের মধ্যে বেন একটা বাড়ী দেখা গেল। আশ্চর্য ও আগ্রহে সে দিকে চললাম, কিন্তু বাড়ীটার খুব কাছে এসে মনে চ'ল বাড়ীটা জনহীন, পরিত্যক্ত। শুধু গরুভাষ গিয়ে যা গিলান। আমার অসুটে ভাগ, একটা দরিদ্র গ্রীলোক এসে বরজা ধুলে বিলে। আমি বললাম—তুমি রাতে আমার একটু ভাঙ্গা নিতে পার? আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।

গ্রীলোকটা বললে—অনন্তর, আমাদেরই ভাঙ্গা হয় না।

আমি যথাসম্ভব স্নানিট করে বললাম—কিছু এক পেয়ালা চা তুমি অবশ্য আমার দেবে?

—আমরা বড় গরীব, শুধু তোমাকে সেন চা দিতে পারি।

ফরে চুক আমি আগুনের কাছে বদলায়। একটু পরে ফরে একজন বগানর্ক গোছের লোক চুক আমার দিকে কটমট দৃষ্টিতে চেয়ে কর্কশ কর্তে গ্রীলোকটাকে তিজাসা করলে, কে এ?

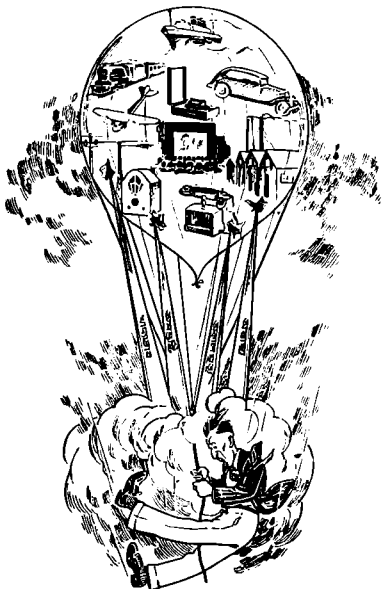
গ্রীলোকটা বেন একটু ভয়ের দুরে ইতস্ততঃ করে আমার ব্যাপার বা জানে বললে। লোকটা তখন নরম হয়ে বললে—এমন দিনে রাত্তার বেয়েতে আছে? আমারে, এখানে তোমাকে থাকতে দিতে পারব না রাতে। আর একটাঘর বর আছে, তাতে আমার ঘরে শোয়। মাইল তিনেক দুরে একটা কাগ্ন আছে, দেখানে যাও।

গ্রীলোকটা চা নিয়ে এল—চায়ের সঙ্গে রুটী, মাখন ও তাম। সব তিনিশ টটিকা, দিহেছেও প্রচুর পরিমাণে। খেয়ে মারামিনের পথ হাঁটার কষ্ট হয় হ'ল। চা খাওয়া শেষ করে বললাম—কত দাম দিতে হবে?

গ্রীলোকটা বললে—এক শিলিং।

আমি গ্রীলোকটার হাতে একটা শিলিং দিলাম—সে গুর ঘেয়েক ডাঙ্গলে—ঘেয়েটার পরণে ছেকর গড়িন, বরল অল, একটু লাফুক। তার না তারই হাতে শিলিটা দিলে—শিলিটা পেয়ে ঘেয়ের চোখ বুজো উজ্জল হয়ে উঠল—কতকাল বোধ হয় পরমা হতে পাইনি।

বাইরে খোর অছকার—বাতাস জোরে বইছে—ওদের বাড়ী থেকে বার হয়ে আমি সেই অছকারের মধ্যে দিয়ে লিঙ-মিনিট্রবের দিকে রওনা হলোম।



বিজ্ঞানের কোথায় বসে উড়ে উঠে
 বাতাসের মাঝে ফেলে, আর বাহি মূটে ;
 কুণ্ডল না'ক আর নয় কোথা বাই পতি
 চার্জিতক অলঙ্কার, কি ঠীংগ করি।

অত্যাশ্চর্য্যের হাথ না হক নির্ধি
 অসংখ্যের মুকতা। বসে বাহি মূটে ।
 বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হ'ল সবাই অজান,
 পলিহাট অলঙ্কার বসে বাহি করি।

ঐক্যিক জীবনে আমরা যে মনন পাবো, পৃথক-পৃথকজীবিত হানে
সর্বদা বাধার কঠি, বাধাযেই সেই মনন নানের উজ্জ্বল অগাধ কন্ডাই।
এক টোপিশের গহিত পলাকগুলির লক্ষ্য দেখাটো ভাষা-বিশ্বায় জিহ্বি
আহত হয়। অতকগুলি চরুটি 'নাম' বলিতে পারায় পর ছোট ছোট
ব্যাক্যের অবাধতা করা হয়। কিছু বাক্য 'বিস্তৃত' পারায় মধ্যে 'বৃদ্ধিতে'
পারায় বহুভাব, বহুভাষ্য তাহাৎ মিত বিভা বাক্য-কণ্ঠের কোন অর্থই হয় না।
উদাহরণ স্বরূপ 'বৌদ্ধ' ক্রিয়াপদটিও লগায় ঘাইক। 'হয়ত' একমি
ক্রমে কোন ভেদে কোন ভাষায় কখনও একজন হইতে অল ভাবে বৌদ্ধাই
কেন। ক্রমেই ক্রমেই লগায় পুটি গাহার উপর পড়িল। দিকক এই
খমার উপর বিস্তৃত করিয়া 'বৌদ্ধ' ক্রিয়াপদটি শিকা দিতে পারেন।
দিকক মহান ক্রিয়াপদ করিলেন—স্বাধে কি করে? স্বাধে কেই
উভা দিতে পারিলে না। জিহ্বি তখন বলিলেন—স্বাধে বৌদ্ধে। জিহ্বি
লগয় হাতকে বলিলেন, জুবি বৌদ্ধাও, জুবি বৌদ্ধাও। অতকবার কল্যা
পরই 'বৌদ্ধা' বলিতে খা-কথা অটোয় গহিত বৌদ্ধ ক্রিয়াটির লক্ষ্য
কেনেই বৃদ্ধিতে পারিলে। তখন একটা বৃহত উপমাৎ মন কেই বৌদ্ধাই
আহত করিলে। 'জুবি বৌদ্ধাও' বাগটির 'প্রা' হাফা উপলভি করিয়া
লইল, বাও বলিল গুণ, ব্যা। তখন দিকক বাগের 'বৌদ্ধি, বৌদ্ধে,
বৌদ্ধে' এই পদগুলি অটোৎ কেনেই বলিতে শিকা কেন। তখন হেলো
বিশেষাই বলিতে আহত করে, মাঝি বৌদ্ধিও, জুবি বৌদ্ধেও, প্রাধে
বৌদ্ধে। কোন কোন হাত হাইরে, গাফাও একটা বৃহৎক বৌদ্ধাই
বেলিল। অমনি যে বলিল উপর—বৃহৎ বৌদ্ধে। এই হাধে মন

মহান মনুষ্যসত্তার মনকে “মনোবান” বিজ্ঞানগণের চাওয়ায় কঠিন, তা’দেরা এক মূহুর্ত ভাব-চিন্তায় জ্ঞানকে করিয়া। এই ভাবে ১৮৭৭ সালে একটি কথিত ‘জৈনধর্ম’ প্রকাশের ফলেই ভাষার কল্যাণ বিজ্ঞানসম্প্রদায়ের নিকা দেওয়া গেল।

কল, বাণ, বিজ্ঞানোদ্ভূত জীবজন্তুর সমস্তই নিকা দিলার আগে পরজন্মের কথাবারের উপযুক্ত অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও। ‘কল’ বলিতে কলম্বু কি মুক্তি, যা’র কোর কল্য কলিতেও বা লিখ নিতে কল্য কলিতেও, এই অল্পাংশ না হইলে, ‘কল’ কথাটি নিকা দেওয়া চলে না। বহুই এইরূপ কথাবার উচ্চ হইলে কল, মনুষ্যের কথাবার হইবার করিয়া লভিতে ‘বহ’। ‘কল’, ‘কলম’, ‘কলক’-সম্প্রদায় সমস্তই কল্য কি পার্থক্য হইয়া সাধারণ শিল্পের ভাবে, মূল-বস্তু শিল্পের কথাবার করিতে করিতে গেল।

জায় পাঁচ কলম্বু, কল্যার করিতে করিতে, মূল-বস্তু শিল্পে হাজার নৈমিত্তিক জীবন। প্রয়োজনীয় সমস্ত ভাষাই কল্যার করিতে পারে। কলম, বাণ, কল্যার লব্ধ সমস্তই ভাষা শিল্পে কথা কল্য হইবার। কলম ভাষার যে কোন প্রকাশের (language formation) কল্যার পূর্বসূরী হইয়া গিয়াছে। ইহা আনন্দিকের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। এ, সাধারণ শিল্পে কল্যার

স্বাধীনতা ও বসিয়া কল্যার জ্ঞানকে করিতে গেল। মূল-বস্তু শিল্পের সৌকর্য্য প্রয়োজন ‘কলম’ ও বসিয়া শিল্পের চাওয়া। হে! ভাষা! কল্য কোর কোর নাই। স্রষ্টা শিল্পের জ্ঞানকে হইতেও, তিনি পূর্বসূরী মনুষ্যের সর্বদা মূল-বস্তু কল্যার শিল্পের, কল্যার হইতেও উচ্চতর কল্যার হইবে। এই মূল্য কোর কল্যার শিল্পে পারে না। কল্যার-বস্তু স্রষ্টা শিল্পের উচ্চতর কল্যার না, ‘কল’ হইলেও উচ্চতর শিল্প করিতে হইলে, কল্যার স্বাধীনতা মূল্যে পারা পড়ে না।

কল্যার কল্যার পেশা-পেশার ইচ্ছা খেল, পেশার স্বাধীনতা করিতে হইবে। কলম তখনই মূল্য, কলমের মূল্যে কল্যার করিয়া, কল্যার কল্যার করিয়া কল্যার শিল্পের শিল্পে। কল্যার পেশা-পেশার মূল্য না হইলে, উচ্চতর কল্যার কল্যার মূল্যে পারা না, কল্যার কল্যারই ‘কলম’ করিয়া কল্যার শিল্পের কল্যার পারা।

মূল-বস্তু কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার, কল্যার কল্যার technical হইবে কল্যার, কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার।

হান বজ্জ হান দেব

হান বজ্জ হান দেব,

এই সব কুন্ত নীচ মস্তুর সজ্জা

হান তব ঠোঁট বজ্জ,

বজ্জ নহ, কল্য নহ, নহ কল্যাবাধি,

কল্য দেব, কল্য পণ্ড, কল্য কল্য-কল্য

কল্য-কল্য, কল্য-কল্য এরা—

গাভীরে উচ্চাধি দিয়া হান বজ্জবাণ।

তোমার পল্লীর মাঝে এ কি সৌন্দর্য্য!

এ কি সব কল্যারের বিস্তারিত বিবরণ

কল্যব! একি সব কল্যারের কল্যার লালসা—

গোভাত্তর, কল্যারানবীন বহু উচ্চাধি লব্ধান

তোমার মনান্ হইতে করে কল্যারবাস!

কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার,

এ সৌর কল্যার?

মূল্য করি হাও, দিব, তোমার—

নিষ্ঠুর, মস্ত, নহ সর্বস্বাধি এদের অলঙ্কারে।

বজ্জ নহ, কল্য নহ—

উচ্চাধি কল্যার কল্যার সব নিরর্থক

কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার

তোমার কল্যার এরা দেব লোণ কল্যার,

হান শিল্প, হান কল্যার উচ্চাধির শিল্পে।

—প্রিয়মন্তকুমার চক্রবর্তী

কোনু নে আদিক কল্যার

মূল্য, উচ্চাধি কল্যার এই পুণিবর্তে

এল এই কল্যার পণ্ডকল্য,

কল্যারের কল্যার কল্যার,

কল্যারের না দিল কল্যার,

আলোকে পল্যার কল্যার কল্যারের বেশ।

সেই হইতে কল্যার কল্যার

কল্যারের কল্যার

কল্যারের কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার।

কল্যার কল্যার, কল্যার কল্যার কল্যার—

কল্যার কল্যার, কল্যার কল্যার কল্যার।

কল্যার কল্যার!

কল্যার কল্যার—

তোমার কল্যার কল্যার, কল্যার কল্যার

কল্যার কল্যার কল্যার,

কল্যার কল্যার কল্যার, কল্যার কল্যার?

কল্যার কল্যার কল্যার? কল্যার কল্যার

কল্যার? কল্যার কল্যার কল্যার?

কল্যার কল্যার, কল্যার কল্যার কল্যার,

কল্যার কল্যার কল্যার, কল্যার কল্যার

কল্যার কল্যার, কল্যার কল্যার,

কল্যার কল্যার কল্যার কল্যার।

বিক্রোহী

—ঐশ্বরসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

সেখস্রত আমার বন্ধ ছিল না। কিন্তু আজ এই কাণ্ডবর্ণন শ্রাবণ-লক্ষ্যায় কলিকাতা হইতে বহু দূর বসিয়া বেশি বয়স পূর্ণের এমনি আর একটি লক্ষ্যায় কণা বার বার মনে পড়িতেছে। রামতল্লা লাইব্রেরীর স্তোত্র-কণা আমরা কখনও টেনিল বিহিগা বলিয়া ছিলাম, আর যেরূপত আমাদের লক্ষ্যে বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। উচ্ছল বৈজ্ঞানিক আলো তাহার উগ্র হৃদয় যুগের উপর পড়িয়াছিল, তাহার বহুকটিন যুগ ধরে বীথে রক্তকীন হইয়া গিয়াছিল, চোটে গুটী হঠাৎ কাপিয়া উঠিয়াছিল—

সমস্ত দৃষ্টান্ত যেন চোখের লক্ষ্যে দেখিতে পাইতেছি।

তখন কলিকাতা ব্যক্তিরা এম-এ পড়ি ও লক্ষ্যায় পর রামতল্লা লাইব্রেরীতে বসিয়া আছা নিই। রামতল্লা লাইব্রেরী করেক বৎসর ধরিয়া আমার মত আরও গুটিকয়েক প্রবোধ চাক্ষুয স্থানী আছা হইয়া পড়িয়াছিল; তখনো যেরূপত ও হুস্তেনবাস উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগণি বিশেষবহীন, তাহাদের নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি।

হুস্তেন দান। একাদিক্রমে বহু বৎসর ল'-কম্পেতে হাত ব্যক্তিরা, অভিজ্ঞত, কলেবর ও বঙ্গোমধ্যায়ার বলে 'সার্কোমো 'মাস' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তনিরাহিসাম যেনে তাঁহার গুটি তিন চার পুত্র-কণ্ডা আছে। আমরা সকলেই তাঁহাকে অভিশপ্ত শ্রদ্ধা করিতাম।

যেরূপত আমার সহপাঠী ছিল; কিন্তু পূর্ণের বসিয়াছিল, সে আমার বন্ধ ছিল না। যেরূপতের বন্ধুতাপাটা ছিল ব্যাপার; আজ পর্যন্ত সে একটিও সভাকার বন্ধ লাভ করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

যেরূপত বড়লক্ষ্যের ছেলে হইয়া লক্ষ্যায়ণ করিয়াছিল এবং তাহার পিতা যখন তাহার তরুণ হাতে কয়েক লক্ষ টাকা ও আরও অনেক বিষয়লক্ষ্যায় গাথিয়া ভবনসমূহে পাড়ি দিয়া-ছিলেন, তখন অনেকই আশা করিয়াছিল যে, এই অভিব্যব-চীন যুগ এটোবার বহু উগ্রায় স্ফটায়িত শিল্প-অর্থ চ'হাৎ উড়াইতে আরম্ভ করিবে। তাঁহাকে কাল্পনিক পাকড়াটায়

চোটেও কেহ কেহ করিয়াছিল। কিন্তু এত লক্ষ্যায়ণ লক্ষ্যেও সে খেঁদন ছিল তেমনই চিহ্না গিয়াছিল; তাহার জীবনব্যাপী বা মতামতের কোনও পরিবর্তন হয় নাই।

আমরা রামতল্লা লাইব্রেরীর আজাদায়াগণ তাহাকে পছন্দ করিতাম না। তাহার বুদ্ধি এমন একটা বৃদ্ধাধীন অনাবৃত্ত নবতা ছিল যে, আমাদের চোখে তাহা অস্বাভাবিক জীবিত রূপান্তর বলিয়া মনে হইত। অমেরা বাহাদুরী জাতি, অনাবৃত্তক তর্ক করিতে লক্ষ্যায়ণ, এ অলম্ব্য কেহ কখনও বিবেচনা করে নাই; কিন্তু যেরূপতের লক্ষ্যে তর্ক বাবিলে আমরা কেমন নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতাম, তর্ক আর কতি থাকিত না। তাহার তর্ক করিবার সীতি দেখিয়াই আমাদের অস্বস্তি নিরস্তি বোধ হইত। বর্ষাবীতি, সনাতন, কবিবাক্য কিছুই সে ধীরাকার করিত না, কেবল বুদ্ধি কখনোই ধার্মিক লক্ষ্যকে কাণ্ড করিবার চোটা কাণ্ডত। বলা বাহুল্য, এজন্য লোক বড়নাগুণ হইলেও তাহার সহিত লক্ষ্যায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।

তাহার চেহারা ছিল উগ্র রকনের হৃদয়। ছ' ছুট লম্বা-গোত্রবর্ণ বাসালো যুগের উপর ব্যাক, নাওটা খেঁদন লক্ষ্যায়ণ-মত উচ্চত চোটা আছে। চোখের চাংগি এত জীব ও নির্ভীক যে, মাধারমত; তাহাকে অস্বস্তি বাস্তবিক বলিয়া মনে হয়।

তাঁহার গর্গ অম্বস্ত তাহা ছিল না, কারণ তাঁকা জিনিষ-টাতে সে গর্গের বস্ত বলিয়া মনে করিত না। অম্বস্তা বড়-মাছুবী করিত তাহাকে কখনও দেখি নাই, সে হাঁটু জলদেও হাঁটত। তাহার গর্গ ছিল শুষ্ক বুদ্ধি। তাহার জীব যেরূপা মনে হইত, বুদ্ধির বলে সে লক্ষ্যায়ণের দৃষ্টে সমস্ত প্রতিভার অকর্ষিত বাসাবাতি ধরিয়া কেলিয়াছে, তাই আমাদের মত লক্ষ্যায়ণের অন্ধ জীব-প্রতি তাহার কখনো মত নাই।

তাঁহার উচ্চত মতবাদ প্রায়ই নাস্তিকতার পূর্ণায়ের দিয়া পড়িত। মনে আছে, একবার কি একটা আন্দোলনের পক্ষে রামা লিখেছিলেন যে, বিবাহ নামক সংস্কারটাই মনুষ্য-সমাজকে দূতভাবে ধর্মিয়া রাখিয়াছে, বাহ্যিক বিবাহ-

বন্ধনকে শিথিল করিতে চায় তাহার সাহায্যে মূল কৃত্যার্থাভি
করিয়াছে। দেবব্রত একটা বিলাসী মাসিকপত্রের ছবি
সেইখানে ছিল। মূল কৃত্যার্থা বলিল, বিলাসী কিসের নাম
মূল্য কি ?

দাদা বলিলেন, পুঁদ্রীকিত কোনো কিনিবেরই স্বকীয়
মূল্য নেই, সব আংশিকিক : বিবাহ আসনের মধ্যস্থতা
সম্পন্ন, কারণ সমাজকে সে প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে।

—‘প্রেমের বন্ধন’ কোথ থেকে এল ? বিবাহের সঙ্গে
প্রেমের সম্বন্ধ কি ?

দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বিবাহ আর প্রেমের মধ্যে
সম্বন্ধ আছে, এটাও বুঝিয়ে দিতে হবে ?

—অনিবার্য সম্বন্ধ আছে, এটা যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন
ত ভাল হয়।

দাদা কটনুপে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,
তা যদি নাও থাকে, তবু সমাজের বন্ধন হিসাবে বিবাহের
মূল্য কমে না।

—কিন্তু তা হলে প্রায় ওঠে, একটা কৃত্রিম বন্ধন দিয়ে
সমাজকে বেঁধে রাখা কি সম্ভব ?

—কৃত্রিম বন্ধন ? মানে ?

—যে বন্ধনে প্রী-পুরুষ যেকোন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট
হয়ে থাকা যায় না, সে বন্ধন কৃত্রিম নয় ত কি ?

দাদা চটিকা উঠিলেন। বৈধব্যচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার মুখে
কোনও কথা থাকে না, তিনি মোটা গলার গাংকার করিয়া
বলিলেন, বিলাসী কৃত্রিম বন্ধন ! অর্থাৎ তোমার পূর্ণ-
পুরুষের বিবাহকেও ভুনি পবিত্র বলে মনে কর না ?

দেবব্রতও মুখী পাকাইয়া গর্জনে করিয়া উঠিল,—না—
স্বীকার করি না—

অশ্রুপূর্ণ ও কণ-পূর্ণ

সঙ্গে তার হস্ত বঁধিল

মন কি ভেবে নবু ও যদি এতই নবু

যেহ না মিলে হলে নবু যদি মিলে ?

অস্তিত্ব হইয়া দেলায়।। স্বকীয়নাথের কবিতা সপক্ষনে
আবৃত্তি করিলে স্নানিত মনুষ্য ওয় না ; বিশেষতঃ নিম্নের পূর্ণ-
পুরুষের বিবাহ অসদ্বিত বিন্দী স্বীকার করিতে যে কুটিল ওয়
না প্রত্যক্ষ বর্জনের মুখে। দাদাও ক্রম হইয়া গেলেন, এত বড়

দেবব্রত যে বাথ হইয়া ঘাইবে, ইটা তিনি প্রত্যাশা করেন
নাই।

কিছুক্ষণ বড় থাকিয়া তিনি বলিলেন,—ভুনি তা হলে
কিছুই মান না বল ?

দেবব্রতও কণ্ঠস্বর কিংবা পরিশ্রমে নামাইয়া বলিল,—
মানি। কেবল একটা জিনিষ।

দাদা বলিলেন,—কিন্তু কি ?

সংক্ষেপে দেবব্রত বলিল,—প্রেম।

দাদা অস্বস্তি করিয়া বলিলেন,—এল কি ? বিবাহ
মান না, তাহা মানে বিবাহ-সম্বন্ধ বৈধব্য সম্বন্ধ সবই
অস্বীকার কর। মাতৃসেহ, মাতৃ-প্রেম এ সব নিম্নের তোমার
কাছে চুহা। অথচ প্রেম মান—তার মানেটা কি ?

—মানেটা খুব সরল। মাতৃ-প্রেম মাতৃসেহ এগুলো
মাতৃসেহ মনগড়া জিনিষ,—তাঁই কখনো কখনো মা নিজের
চাতে সন্তানকে খুন করেছে এ কথা শোনা যায় এবং মাতৃ-প্রেম
যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শৈতন্য সম্প্রতি কাগ-বাতোয়ারা
উপলক্ষে আদালতে দিয়ে উপস্থিত হয় তা সকলেই জানে।
মুত্থাং ও প্রভেদে মূলটো জিনিষ—বাঁটি ময়। বাঁটি যদি
কিছু থাকে ত সে প্রেম—বা মাতৃস্বীকার অগেণ্ডা তাহে না,
যদি মূল্য আপনায় বিবাহের মত আংশিকিক নয়, নিজের
মধ্যেই সম্পূর্ণ ; স্বকীয়।

দাদা বলিলেন,—হঁ। প্রেম ত বড় ভাল জিনিষ
সেখি। কিন্তু মাতৃ-প্রেম বা মাতৃসেহের চেয়ে ওটা উচ্চ
কোনখানে তা এখনও মনুষ্যস্বপ্ন হচ্ছে না।

দেবব্রত তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল,—কনকনন হবে কোথেকে !
কনকের গারশাশে তিন ইঞ্চি পুরু কনককার লম্বা করে রেখেছেন
যে। বৈলে, প্রেমই মায়ের মনে দিয়ে মাতৃসেহে পরিণত
হয় এবং মাতৃসেহ স্বকীয় প্রবেশ করে, কনকও কনকও লম্বা
মত তাই তৈরী করে, এটা বুদ্ধিতে দেখা হ’ত না। মাতৃসেহ
বলে স্বতঃসিদ্ধ কিছু নেই, তা যদি থাকত তা হলে প্রেমাক
না তার সবগুলি সন্তানকে সমান ভালবাসত। কিন্তু
পৃথিবীতে কোনও মা তা বলে না।—এখন দেখছেন যে,
মাতৃসেহ বলে দেবব্রত কিছু নেই। আছে শুধু প্রেম !

দাদা আবার বৈধব্য চাওয়াইলেন ; বাস্তবিক এককম কথা
তিনিও বৈধব্য বন্ধা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি হুই

বাহু পুড়ে আত্মগীত করিয়া উঠে কহে কহিলেন,—নাড়য়েও
বহি না থাকে তবে গ্রেমও নেই। তুমি গ্রেমের এত
শাস্তি করছ কেন তবে? আরকাল গ্রেম করছ বৃষ্টি?

যেব্রত এহার সত্যের হাসিয়া উঠিল, বেশ প্রশংসা
সত্যের হাসি। বলিল,—বাবা, গ্রেম কি চেষ্টা করে করা
যায়? ভটা সহজ—বড়শাখা নয়—তাই এর আর একটা
নাম অইহুত্বী প্রীতি।

পাশা গ্রেম করিয়া বলিলেন,—কম তাৎপর্য! ব্রি ব্রি
এল।

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলাম, এবার খুব শান্তভাবে
বলিলাম, যেব্রত, তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি
কি?

—পার।

—বিবাহকে তুমি এখন সত্যি বন্ধন বলে স্বীকার কর না,
তখন প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মিলনেও তোমার কোন আপত্তি
নেই?

যেব্রত বলিল,—কিছুই না। আর, আপত্তি করলেই
বা তবুও কে?

—তা হলে সুস্থানে ছেড়েও তোমার কোনও নৈতিক বাধা
নেই?

—সুস্থান?—ও! যেব্রত হা হা করিয়া হাসিয়া
উঠিল—বাবা একটুকু থেকে কোলম্বা করবার চেষ্টা
করেছিলেন, তুমি আর এক পথ ধরেছ।—না, বাকি তুমি
সুস্থান বলছ সেখানে যেতে আমার কোনও বাধা নেই।

আমি ভীষ্মবরে বলিলাম,—তবে বাও না কেন?

—কিচি নেই বলে।

—অর্থাৎ কচি থাকলে যেতে?

—আলবৎ যেতুম, একশবার যেতুম।

—ও!—তা হলে আমার আর কিছু বলবার নেই।

যেব্রত হাসিতে হাসিতে বলিল,—বলবার তোমার
কোন কালেই কিছু ছিল না, কেবল ‘সুস্থানের’ কথা যেখানে
আমাকে কাণ্ড করবার চেষ্টার ছিলে। কিন্তু তা হয় না বন্ধু।
ও বার্ষিক গণনা ছেড়ে দাও। তার চেয়ে বুদ্ধিকে প্রবৃত্তি কর,
সম্রাজ্ঞের মতভাবে গণনা করবার চেষ্টা কর। দেখবে সুস্থান
কুস্থান বলে কোথাও কিছু নেই, সুস্থান আলো সর্বত্র সমান-

ভাবে পড়ে। আরও বুঝবে, পৃথিবীতে একটামাত্র বন্ধন
আছে—নাড়য়ের নয়, তারগ্রেম নয়, কোলম্বার গাঠন নয়—
তার নাম গ্রেম। Omnia Vincit Amor!—সবলুন,
যদি শাস্তি নাশারটা বুদ্ধির চেষ্টা কর। বলি: চলে আসছ
বিভিন্ন বধন করিয়া হৃদয় বুঝতে বুঝতে প্রগমন করিল।

চিরকালি বাহার এই ধরনের সে যে স্বস্তি বিপদে পড়িলে
তাঁহা আমার জানিলাম, বুদ্ধির এমন অমিতাচার ভাবনা দৃষ্টি
করেন না। কিন্তু স্বপ্ন-দলিলে যেব্রত যে এমন করিয়া
ভুলিলে তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই।

একটা শনিবারে, গাঠি ন’টার সময় দিনের শেষে
দিয়াছিলাম; দিয়া দেখি যেব্রত পাশের আসনে বসিয়া
আছে। কথাবার্তা বড় কিছু চলি না, শাশুর সত্যি প্রত্যাহ
সেখা হয় তাহাকে নুতন কিছু বলিবার থাকে না। অভিনয়
যেব্রত হইলে তখনে একপক্ষের বিরাম। আমার বেশ ও
যেব্রতের বাড়ী একই রাস্তার উপর; মধ্যে মল বাড়ী
বাড়ীর বাসধান। চৈত্র মাসের সমস্তকার বাহি, তাঁট পদ
অনেকটা হইলেও পরব্রতেই চলিয়াছিলাম।

সন্ধ্যা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল; পথ নির্জন।
মিনিট পনের মাত্রের ইন্টারাল পর, একটা গাড়ির ভিতর দিয়া
ঘাইতে ঘাইতে আমি বলিলাম,—আমেরিকার প্রাপ্তবয়স্ক
সম্রাজ্ঞ যে উচ্ছ্বাস পথে চলেছে, তাতে ও ভারতের অধঃপতন
হতে আর বেরি নেই। সম্রাজ্ঞের কথায় মনের
মধ্যে গুঁতেছিল।

যেব্রত একটু বাহিয়া বলিল, আমার হা মনে হয় না।
থাকে তুমি উচ্ছ্বাসপথে মনে করছ প্রাপ্তবয়স্ক তা উচ্ছ্বাসপথে
নয়। ওরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে, সম্রাজ্ঞের প্রত্যেকটি
বিধি-বিধান নুতন করে বাটাই করে নিচ্ছে। হৃদয় শেষ
পথের ভার্য লাগবে নিঃশব্দেই মনে নেবে; কিন্তু স্বস্তি-
মানে প্রত্যন্ত সম্রাজ্ঞ একটা অসন্তোষ এলছে, তাই তারা—
‘টানিফা ছি’ডিয়া কুন্তলে নুতন করিয়া পড়িতে চায়।’ হারের
চিন্তা করবার পক্ষি আছে, সম্রাজ্ঞের বাহ্য বুদ্ধির আসন
ছেড়ে যেমনি—মেব্রতের কথা শেষ হইল না, তাই বাধা
পড়িয়া গেল।

বেশ্যেই আমরা পৌছিয়াছিলাম সেখানে গলিটা অত্যন্ত
সজীর্ণ, টট ঝাঁঝের। চুপচাপ ঘনসন্নিবিষ্ট বাড়ী, কোলাহল
সংশয় গালাগাতিয় নীচে অরুণ্য ছায়া পড়িয়াছে। হঠাৎ
পালের একটা দৃষ্টান্ত ঘুলিয়া গেল, পুরুষ কণ্ঠের একটা মন্ত
বক্তব্য অগত্যা শুনিতে পাইলাম। তারপর সেই অরুণ্য
হাতখণ্ড দিয়া একটা স্তম্ভিত হইল প্রথম দৃষ্টান্ত তাত্ত্বিক
হইয়া একবারে দেহবস্ত্রের গায়ে উপর আসিয়া পড়িল।
দরজা আঘাত শব্দে বহু হইয়া গেল।

অকস্মিক সংঘাতের ভাল সামলাইয়া দেবব্রত হুঁসেলক-
টিক করিয়া ফেলিল। গায়েলের আলোয় দেখিলাম, একটা
খোল-মস্তের বহুরূপের মেয়ে, পরের শাড়ীখানা ছিঁড়িয়া প্রায়
লজ্জা-নিঃসারণের অবস্থায়। হইয়া পড়িয়াছে, তখন কাটা
বস্তু পড়িতেছে। সে ব্যাকুল ভাবে একবার আমাদের দিকে
তাকাইয়া উঠিয়া গিয়া সেই বহু দরজার উপর আছড়াইয়া
পড়িল, চাপা হোদনকৃত হইল বলিল,—খোল—গুণো—
গোর খুলে দাও।

যারও অপর পার হইতে কিছু কোন লাভ। আসিল না।
সে আশা করিতে থাকিল, কিন্তু এবারও উত্তর আসিল
না। তখন সে বুকভাঙা ব্যাকুলতার সেই দরজার নিকটে
মাথা ঠুকিয়া কুঁপাইতে লাগিল।

আমরা এতক্ষণ ডিম্বাশয়ের মত ঠাড়াইয়া ছিলাম।
এখন দেবব্রত অগত্যা হইয়া গিয়া কঁচিল,—ভয়। এটা
কি আপনার বাড়ী?

সে দুখ ভুলিয়া আমাদের বেন প্রথম দেখিতে পাইল;
লজ্জার ভাঙার বদনবীন পের সঙ্কটিত ভগ্ন ছোট হইয়া
গেল। ছেঁড়া কাপড়ে কোনও বস্তু বহু আবৃত করিয়া
সে শুকনুভবের দরজার পৈঠার উপর বসিয়া বসিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে?

মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না।

দেবব্রত আবার প্রশ্ন করিল,—যিনি আপনাকে বাড়ী
খোঁজবার করে দিলেন তিনি কি আপনার বাবা?
মেয়েটি হঠাৎ হাঁটুর মধ্যে দুখ শুভিল।
দেবব্রত তখন ইহা অসহিষ্ণুভাবে বলিল,—কখন,
আপনাকে এভাবে ফেলে আমরা যেতে পারছি না। এ
বাড়ীতে যদি আপনার কেউ আস্তর থাকে ত বহু, তবে

ডাকবার চেষ্টা করছি; আর, যদি না থাকে তাও বহু, দেখি
যদি অল্প কোন বাহবা করতে পারি।

মেয়েটি তখন অশ্রু বহে বলিল,—আমার কেউ নেই।
—কেউ নেই! আর যদি আপনাকে খাঙ্কা দিয়ে বার
করে দিলেন আপনি তাঁর স্ত্রী নন?
মেয়েটি মাথা নাড়িল।
—কিন্তু?

বিগ্রহাশ্রয়ের মত দুখ ভুলিয়া সে আবার হাঁটুর মধ্যে
দুখ শুভিল।

দেবব্রত বলিল,—হঁ, সবেই আর কোথাও বাবার
বাড়ী আছে?

মেয়েটির চাপা কারা হঠাৎ কোণের ভিতর হইতে
উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—না।

দেবব্রত কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া বসিল। চুপের
অবস্থা পরীতে হঠাৎ এই বিশিষ্ট ব্যাপারে শুকনুভব
আমি সত্তর হইয়া উঠিয়াছিলাম, এই ঠিকে বলিলাম,—
দেবব্রত, চল আমরা বাড়ি—

দেবব্রত দুখ ভুলিয়া মেয়েটিকে বলিল,—পুলিসে যেতে
গতি আছে?

মেয়েটি এবার দুখ ভুলিয়া হাট হাট করিয়া কানিয়া উঠিল,
বলিল,—না—আমি পুলিসে যাব না—

আমরা কপালে প্রকট দৃষ্টি চুপ ভাঙি গিয়া গিয়া-
ছিল, চোখ দিয়া পরস্পর বস্তু ওল পড়িয়া পড়িতেছিল;
পতিতা হইলেও বেশি কষ্ট হয়। কিন্তু দেবব্রত এই সময়
বাগা করিয়া বলিল, তাতা লাহুকৃত বা সমবেদনা নয়, হুঁসেল
পাশলাবি। পতিতার প্রতি দরদ দেখাইতে যোগ্য নাই,
কিন্তু দরবেদও ত একটা সীমা আছে!

দেবব্রত মেয়েটির পুত্র কাছে গিয়া বলিল,—পুলিসে
যেতে হবে না, আপনি আমার বাড়ীতে চলুন। বাবো?
আমি একলা থাকি, কিন্তু কোনও ভয় নেই। আসুন।

মেয়েটি বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ফাল ফাল করিয়া চাহিয়া বসিল।
আমি সত্তর বলিলাম,—দেবব্রত, কি পাশলাবি করছ?
দেবব্রত আমাদের কথা শুনিতে পাইল না, মেয়েটির দিকে
কুঁকিয়া বলিল,—বাবো ত? না গেলে এই গায়ে কোণার
পাকবোন? বাবো বাবো ত আপনাকে নেই। কি,

আপনেন ? আপনি আশ্রয়ী, আমার বাড়ী আছে,—তাঁই দেখানে যেতে অজ্ঞেয় করছি। এখন টেজে হবে গেল আসতে পারবেন। তার করবেন না, আমার মনে কোনো সংশয় নেই।

যেহেটা তবু যৌন হইয়া বহিণ।

তখন দেবব্রত তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া নগর কণ্ঠে বলিল,—চলুন। আমার বাড়ী এখন থেকে মাইল দ্বাদশক ঘূর—হেঁটে যেতে পারবেন না, বড় রাস্তার গিরে ট্যান্ডি পথ।

সেহেটা বাধা বলি না, আপত্তি করিণ না, বহু-চালিভেল মত দেবব্রতের হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

সবর রাস্তার ট্যান্ডি পাওয়া গেল। দেবব্রত তাহারে তুলিয়া দিয়া আমাকে বলিল,—এস মঙ্গল।

আমি নতুন হইয়া বলিলাম,—না, তুমি যাও। আমি হেঁটেই যাব।

চক্ষু-নিষ্কারিত করিয়া দেবব্রত আমার পানে তাকাইল : তাহার মুখে একটা হঠাৎ বাক্য হাসি ছুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—ও—আচ্ছা। তারপর নিজে ট্যান্ডিতে উঠিয়া বলিল,—হীকো।

ট্যান্ডি চলিয়া গেল।

শোমবার সন্ধ্যায় দেবব্রত লাইব্রেরীতে পদার্থপণ করিয়া মাত্র ঘরা বলিলেন,—এই যে ! শনিবার রায়ে খুব রোমাঞ্চ করেছে শুভমুখ ? বলা বাহুল্য, ঘটনাটা আমি আশ্চর্য ব্যক্ত করিয়াছিলাম।

দেবব্রত চোখে বসিয়া সহজভাবে বলিল,—হ্যাঁ।

সকলেই উৎসুক ভাবে তাকিয়া ছিল, কিন্তু দেবব্রত এখন আর কিছু বলিণ না, তখন পান চিন্তা করিলেন,—ভাগ্যপ, রোমাঞ্চ গড়ান কতখান ?

দেবব্রত হাতা ভাবে হাসিয়া বলিল,—বসন্ত পড়ায় নি এখনও, এই ত সবে আরম্ভ। বলিয়া একটা হাসিক-পদ টানিয়া লইল।

পঠিত কাব্যের প্রতি খণ্ডিত চুপা থাকিলে সেই সঙ্গে একটু বোঁহুগে গোবাবহ নহ; বসন্ত: অধিকাংশ সময়েই মনেই ওসকাল লম্বা ও কোঁহুগের নির্দিষ্ট সংমিশ্রণ

দেখা যায়। হাতাও তাহার ব্যতিক্রম নহ। তিনি আমার সঙ্গে করিলেন,—তা ? তাৎ-সাব আলাপ-পরিচয় হচ্ছে ত ?

দেবব্রত মুখ তুলিয়া বলিল,—খুব সামান্য। যেই যে দে-ব্রতের হাতের আশ্রয় কয়েক-এখনও পান নি। কাজেই আলাপের চেয়ে বিলাপই বেশি হয়েছে।

—পঠিত জানতে পার নি ?

—পঠিত নতুন কিছু নেই। দেবব্রতের শিক্ষিতা যেহে। বিয়ে হয় নি—কুলে পড়ত। মাল ছেদক আগে একটা লোকের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে পাগিয়ে আসে। সেই লোকটার লম্বাই ছিল—লোকটা মতাল; তারপর পরত' রাস্তার ঘটনা।

—তা হলে কুলত্যাগিনী—শোনার নহ ? পান। কপা-

গুলি এগ কাথিয়া তা'বগা বলিলেন।

—হ্যাঁ—কুলত্যাগিনী।

—কেন কুল আসে করে ছিলেন, তার কোনও সন্দান শেনে ?

—সন্দান নিইনি।

—হুঁ। এখন তা হলে পঠিতের তোমার কয়েক আবেশণ করে আছেন ? তুমিও একলা বাহুল্য, তার উপর কুল-জ্বরের বাসাই নেই। যোগাযোগটা হয়েছে ভাল। তা—এখন এই ভাবেই বসবাস চলবে তা শেনে ?

—চল। হাতা আর উপায় কি ? বসন্ত তিনি নিজে কোথাও না থাকেন ততক্ষণ আমি তাহাকে গিতে পারছি না। বলিয়া সমুখস্থ কাগজে মনোনিবেশ করিল।

তাৎসব প্রথম বৃদ্ধির প্রথম উচ্চল দুখানার দিকে চাথিয়া আমার মনে কেমন একটা চাপ হইতে লাগিল। সমস্ত-বন্ধন যে মানে না, বিবাহকে যে কুজিন বন্ধন বলিয়া উপহাস করে, তাহার নৈতিক চরিত্র যে এরূপ অবস্থার পড়িয়া অতি সহজে নির্জিয়ে অধঃপথে বাইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ কোথায় ?

হাতাও সেই কথাই বলিলেন ; একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া করিলেন,—বাক, এতদিন শুধু বুকেই জ্বলিত প্রাণের কহছিলে, এবার দগ্ধা দগ্ধি গোলায় খেলো ?

চকিতে মুখ তুলিয়া দেবব্রত বলিল,—তার মানে ?

—তাহা মানে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। তোমার চরিত্রের আমি কোনোর সাহসেও স্পর্শে না। তাহা সকলে ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেখতে পাবে।

দেবব্রত হাসিয়া উঠিল, প্রাণের বলিল,—নাহা একজন পাগল বোধশ্রীষ্ট। বয়স হয়েছে বাট, কিছু বল মনে নি। হৌকি'ন বয়স কত হবে বাবা?

বাস কুন্ত ভাবে একবার তাহার দিকে তাকাইয়া মূখ প্রকীর্ত্তি করিয়া বসিয়া বহিলেন। দ্বীকে লইয়া বলিকতা তিনি পছন্দ করিতেন না।

উত্তর পর্ব বন্দাই দেবব্রত আঁজার আসিত, তখনই আনন্দের তাহাকে নানাবিধ প্রকারে আঁড়ালে তীব্র ব্যথা-বিজ্ঞপের খোঁচা দিতাম। আমায়ের মধ্যে একজন ছিল ভয়ানক পিউরিটান, তাহার নাম বোধ হয় তিনে—সে দেবব্রতের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিল। 'বিশ্রোভীত কিছু কিছুমাত্র ভাব-নিগূঢ়' দেখা গেল না। সে আমায়ের চট্টা-নিজস্বের জন্যে দ্বিত: আশ্রিত বৃত্তী সঙ্কে প্রস্তুত করিলে সঙ্কেভাবে উত্তর দিত—লুকাচুপি করিত না। বহেটোর নাম অমিনা—সে দ্বিধা আনন্দের দেবব্রতের বাড়ীতে বাস করিতেন, চলিয়া ঘাইবার কোনও আগ্রহ নাই। ত' জনের মধ্যে পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠত হইতেন; এ সমস্ত পর্ব তাহার নিজের মুখেই আমায় ভনিতে পাইতাম। কেবল একটা প্রশ্ন শোভা তাহা ব্যাধা ভাবে অনেক প্রকারে করিয়াও আমায় ভাবি পাইতাম না। দেবব্রত কখনও পক্ষীর হইয়া থাকিত, কখনও হাসিয়া এড়াইয়া বাইত, উত্তরটা আনন্দের অবশ্র মনে মনে অস্থান করিয়া লইয়াছিল।

কেন দেবব্রতের আঁজার আসা কনিতে আনন্দের করিল। মাকে নাকে বন্দ আনিত, তখন তাহার মুখে একটা অল্পস্বস্থিত ভাব দেখিয়া আমায় মনে মনে হাসিতাম। বৈষ্ণবক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিত না, কিছুকণ ছটফট করিয়া উঠিয়া চলিয়া বাইত। শেষে তাহার লাইব্রেরীতে আসা একবারে বন্ধ হইয়া গেল।

কলেক্টর তাহাকে জ'বাস দেখিলাম না। বৃন্দাম, পড়াশুনায় আর মন নাই, এখন সে ক্ষত পথে চলিয়াছে। দাদা নাকে নাকে গ্রন্থ করিয়া বসিতেন, ছোঁড়া একবারে

একবার করে গেল। কানচন্দ, ওরকম ভিত্তবৃত্তি দ্বারা, সে এক দিন না একদিন অধঃপাতে যাবেই। তবু আপনামে হয়, দু'ধর হোলে ছোঁড়া মনে হয়ে গেল।

আমায়ের গ্রন্থ হইত। সে তাহা সেটী গৃহ-নিবাসিত। বহেটোর বক্তৃতাখো মূখ ও অঙ্গার অস্থান দেখিয়া বনি তাহার শিভানুরি না কাণিত, হয় ত কোনোবিন তস্থকতের একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া সে স্থনী হইতে পারিত, ক্রমে বৃদ্ধির অস্থকতমুখ নাতিকতাও কাটায়া বাইত। কিছু এখন আর তাহার উচ্চা নাই। অধঃপথের স্বাম একবার বে পাইয়াছে, সে আর ভাল পথে ফিরিবে না।

তার পর একদিন প্রাণের ক্ষান্তবর্ণ লঙ্কার তাহাকে দেখে দেখিলাম। মাস তিনেক তাহাকে দেখি নাই। লাইব্রেরীতে আমায় সকলে বসিয়া ছিলাম, সে আসিয়া ছড়িটা টেবিলের উপর রাখিয়া লাড়াইল।

আকস্মিক আবির্ভাবে আমায় বিষয়ে মূখ তুলিয়া চাখিলাম। দেখিলাম সে অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে, খাগুলো মূখ যেন নাগের অভাবে অতো খাগুলো হইয়া উঠিয়াছে, ওঠে একটা শ্রীহীন শুকতার আভাস।

আমায় কোনও সম্ভাবন করিলাম না; আমায় মনে হইল, দেবব্রত যেন আমায়ের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, কোথাও আমায়ের মধ্যে যোগদ্ব্য নাই। সেও যেন এই বৃদ্ধের ব্যবধান বৃদ্ধিতে পারিল, পলাটা একবার কাঁড়িয়া লইয়া বলিল, বাবা, আপনাদের নেমন্তন্ন কর্তে এসেছি।

বাবা নিমন্তন্ন কর্তে বলিলেন, অনেকদিন পরে দেখছি। বল। কিসের নেমন্তন্ন? বিয়ে করছ নাকি?

দেবব্রত বলিল না, বলিল, হ্যাঁ বিয়ে করছি। আত্মীয় বন্ধন আমার কেউ নেই, বন্ধুর মধ্যে আপনায়। তাই নিমন্তন্ন জানাতে এসেছি, সপ্তাহের উপস্থিত থেকে শুভকর্মে সম্পন্ন করাবেন। তাহার শুভ মুখে পরিহাসের চোঁটা ভাল মানাইল না।

বাবা সঙ্গম জবাব দিলেন না। পকেট হইতে কয়েক পও মুপারি বাহির করিয়া গালে কেলিয়া চিবাইলেন, তারপর বলিলেন, বিয়ে করছ? বিয়েটা অবশ্র ক্রমি বন্ধন, তোমার মত স্ত্রীনা লোক উচ্ছে করে কেন এ ভাল পলায় পড়ছে বুঝা যাচ্ছে না, তা সে থাক। তাহার সেটী অপসেনকাটি বাড়

থেকে নেমেছে, এটাই আমার পূর্ব। কোণার বিয়ে করছে ?

সেবস্ত্রের সুখখান্য ঘোরে নীচে ফাটলে চট্টা গেল ; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর আশে আশে বলিল, আমি ডাকছি থিয়ে করছি।

সামান্য প্রশান্তি-চরিত্র বন্ধ হইয়া গেল : আমবাও বিস্ময়িত হইতে লাগিল। তাহাকেই বিবাহ করিতেছে ! সে কি !

নাথ বলিলেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না। যে ভ্রষ্টা স্ত্রী লোককে তুমি নিজের কাছে রেখেছিলে তাকেই এতদিন পরে বিয়ে করতে চাই—এই কথাটি কি আমারই জানাতে এসেছে ?

সেবস্ত্র হিব হইয়া গাড়াইয়া রহিল, তারপর আশে আশে অবলম্বিত করি হইতে কথা বাহির করিল, সে ভ্রষ্টা নয়। যেসে মানুষ—একজনকে প্রলোভনে পড়ে—কিন্তু সে সত্যি বন্ধ নয়, আমি তার পতিতর পেয়েছি সেবস্ত্রের একজন কর্তব্য—আমি কখনও তুমি নাই, সে বেন মিনতি করিতেছে। তাহার ঠোঁট গুটি কাপিতে লাগিল।

সামান্য তরুন পরে বলিলেন, —তাল-মন্ডের বিবাহক তুমি একলা নয়, আমারও কিছু কিছু বিচার করতে পারি। মাথার উপর সমাজ রয়েছে। কিন্তু একটা কথা ভিজালা করি, তোমরা দু'জনে যেখানে ছিলে সেই তাইকেই পাঠালে পারতে, তাতে কিছ বটে, কিন্তু সমাজের সুখে চুপকালি পড়ত না। এ বিষয়ে তুমিই সমাজের কি ?

তরুন পাণ্ডুর মুখে সেবস্ত্র বলিল, নাথ আমি—আমরা একবারেই আছি বটে, কিন্তু কখনো—তাহার কঠোরবে হইত পূর্বের ভীষণতা কিছা আসিল—ছি ! আপনি কি মনে করেন, বাহ বন পাইনি তাকে আমি—

সামান্য হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—ও সেই পুথোণে পড়—“অপরিণত ও বয়স-পতন” সামান্য আমার খানিকটা হাসিলেন—বা হোক এতদিনে মনে পড়েছে তা হলে ?

—পেরেছি বলতে মনে হয়।

—একবারেই হইতুমি ক্রীতি ! নীতি তিনিই বটে ত ? ও বাহ্যের মেকিও চলে কিনা তাই ভিজালা করছি। সে বাক। তুমি আমায়ের সেবস্ত্রের কথাকে এসেছ। তুমি আমাণ কথ আমরা এই বিষয়ে খোঁজ যেব ? কেন—তুমি বড়লোক বলে ?

সেবস্ত্র নীচেরে বসি শব্দ করিয়া গাড়াইয়া রহিল।

তাহার বিবর্ণ, লালিত সুখখান্য দেখিয়া আমার স্রোত হইতে লাগিল। মাথার কণাগুলি সত্য হইলেও অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তাই স্রষ্টা নয়ন করিবার কল্প আমি বলিলাম,—সেবস্ত্র, তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমার কিছু বলতে চাই না, একজন অপরিচিতা নারীকেও আমরা আলোচনার বাইরে রাখতে চাই—কিন্তু এরকম একটা অধ্যয়নে আমি—

সেবস্ত্র আমার পানে চাহিল, তাহার চোখের মধ্যে একটা কঠোর অশ্রুতর স্রোতে পাইলাম। সে বলিল, নাথ, তুমিও আমার বিয়েতে যাবে না ?

আমি আমার দিকে চাহিলেন, সামান্য ভলম্ব্যস্ত্রীর পরে বলিলেন, —বাস টেকে বেতে পারেন, কিন্তু আমি এসব ভ্রষ্টাচরিত্রের মধ্যে নেই, সমাজের মাথাব দাবা লাগি মানে, তাহা সমাজের সমাজত্বের প্রকাশ্য করে কোন মুখে ?

সেবস্ত্র আমার বলিল,—অম্বল তুমি—?

আমি মাথা নাড়িলাম,—আমি দৃষ্টিই প্রদর্শিত, কিন্তু আমি পারব না।

সেবস্ত্র আর সকলের দিকে ফিরিল, তরুনও কেউ থাকে না ?

সকলেই মাথা নাড়িল।

সেবস্ত্র কিছুক্ষণ হেঁটমুখে গাড়াইয়া রহিল। তারপর আশে আশে ছড়িতা জুগিয়া লইয়া অশ্রুতর পরে বলিল, —আমি যেন—

আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না ; মনে হইতে লাগিল তাহার কাছে কত বড় অসম্ভাব্য করিতেছি।

সেবস্ত্র চলিয়া গেল।

তারপর কোল বহনর সেবস্ত্রকে দেখি নাই। এতদিনে তাহার বহন চলিয়া শব্দ হইয়া গেল। কেন আছে কোণার আছে আমি না, রহত সেই পুস্তকন বাড়িতেই বস্তুহীন আত্মীয়তায় ভাবে বাস করিতেছে।

সেবস্ত্র বিবাহের বিষয়টি ছিল, তবু কেন যে সেই ঘেরটাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল তাহা আতঙ্ক ভাবে বুঝিতে পারি নাই। হয়ত, বাহ্যের সে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে কখনও বুঝে দেখিবে তাহা সহ করিতে পারে নাই ; তাই সেই শ্রাবণ-লক্ষ্যের সমস্ত বৃদ্ধির অধ্যায় বিসর্জন দিয়া আমায়ের সমাজত্বের প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল। কিছা—কিন্তু আর কি হইতে পারে ?

সেদিন প্রভাতের প্রস্তর আমবা দিই নাই ; তাহাকে অশ্রুতর ভাবে লালিত করিয়া তাহার ভালবাসার পাঠকে অপমান করিয়াছিলাম। অস্তর করিয়াছিলাম, এমন কথাও বৃক ভাত দিয়া বলিতে পারি না। তবু আজ এই কান্ত-বর্ণন সমাজ তাহার সেদিনকার পীড়িত বিবর্ণ সুখখান্য মনে পড়িয়া মনটা অস্তর ভাবে বাগিত হইয়া উঠিতেছে।

এখন তাহাও কেন আছে—কে জানে, আছে কিনা তাই বা কে জানে ! আমায়ের সার্বভৌম মাথার ধারণা, চরিত্রতা অধিকদিন ধরার ভাব বৃদ্ধি করিতে প্রয়োণ পায না।

চোখে কেন জল আসে মা ?

—ঈশাবিত্তাপ্রদম চট্টোপাধ্যায়

চোখে কেন জল আসে মা ? পোড়ো চোখের জল
এমন করে' কেন আমার করে মা বিহ্বল !
মুখ চেয়ে এ নয়ন ছুঁতির মেটে না মা ভুখা
মনের কোণে কড় গঠে মা হারিয়ে ফেলি লিশা ।
বুকের মাকে ঘনিড়ে গঠে মা-হারান বাখা
মনে পড়ে' হুয়ারাগীর নির্বাসনের কথা ।
হুয়ারাগীর যুধ ধরে না, কথায় কথায় মান
সেখলে লাগে কুলের ঘায়ে কখন যুজ্জা যান ।
গল্প বলে' চাতিম মাছে ব্যাস্তমা-ব্যাস্তমী
গোয়াল-ঘরে হুয়ারাগীর হুখের নাহি কমি ।
রাজপুত্র মনের হুখে শিকার করার ছলে
হেপাস্তরের মাঠ পেরিয়ে কোথায় গেছে চলে :
মায়ের হুখে রাজকন্তা হলেন বনবাসী
এত ভুখেও হুয়ারাগীর মুখটি হাসি-হাসি—
সে হাসিতে লুকিয়ে আছে কত মায়ের কানন
টনটনিতে উঠেছে বাথায় লক্ষ পাকের বাঁধন ।

তোমার চোখে জল কেন মা, তোমার চোখে জল ?
তোমার বুকেও দাঙা দিলে দানোদরের ঢল ?
হুখের আশ্রন আলিয়ে তোমায় করলে বাঁচি সোনা ।
সতীন গিলে নির্বাসনের অনেক প্রয়োচনা,—
রাজার প্রাসাদ রইল পড়ে' রাজমহিষীর মান
নিজের হাতে রাজাই যদি করলে শতক খান,
নিরুদ্দেশে পুত্র গেল, কন্তা গেল বনে,
রানী নামে খেজা তাত্তেই এল মায়ের মনে ।
—তাই ত মা তুই পায়ে তেলে বাইরে এলি চলে,
নাট না বলুক রানী তোমায় ডাকছে ত' মা বলে ।

ডাকছে তোরে হাজার ছেলে, হাজার মেয়ের ডাকে
আজ এ-দিনে চোখ মুছে যে, উঠতে হবে নাকে !
তোরেই মা যে চাইতে হবে আজকে করুণ চোখে,
নাম-হারানের নাম ধরে' মা ডাকতে হবে তোকে ।
ভুলে যা' মা নিষ্ঠুর যে-জন মিথো মোহের ঘোরে
পরের কথায় আপন ঘরে ঠাই দিলে না তোরে ;
ছেলের মায়্য করলে না ক', মেয়ের অবেষণে .
পাঠালে না লোক-লস্কর রইল আনমনে,
জাবলে না তার পাট-মহিষী চন্দ্রকালের বাঁজা,
এই বয়েসে-ভোগের বাতি আলিয়ে রাখে রাজা
হোক না রাজা, হোক না স্বামী, হোক না কেন পিতা
মু'সে-জন রাজাপাটে আলিয়ে দিলে চিত্তা ।

—সে কাহিনী বলব না আজ—নাই বা কে বা জানে ;
ঘর ছেড়ে মা সকল ঘরে এলি যামের টানে,
তারাই তোরে মাথায় করে' রাখবে নিরবধি
প্রণাম করে' কিরিয়ে দেবে রাজা আসেন যদি ।
আজকে তোরেই যত্ন করে' সাজিয়ে পূজার ডালা,
ঈশ্বর পূজা-মন্দিরে মা আলতে হবে আলা ।
সজ্জা-পূজার ঘটা শুনে পূজার আভিনায়
রাজকন্তা শ্রলীপ দিতে চিনবে রাণীমায় ।
অদূর পথে চলতে একা, সেখবে রাজার ছেলে
মায়ের বুকের হুখের ধারা জিহ্বা কিরে পেলে,
হঠাৎ শুধন মায়ের কথা পড়বে তাহার মনে,
ফিরিয়া ঘোড়া রাজপুত্র মায়ের অবেষণে
হঠাৎ এসে চাঙির হবে পূজার আভিনায়,
ছেলের কি মা দেবী লাগে চিনতে আপন মায় !

বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাস

—শ্রীহরীন্দ্রনাথ সেন

[২৫]

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন বাঙ্গালী সাহিত্যের একখানি প্রেরণ কাব্য। বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিত-কাব্য ছাড়া যেগুলি শতকের সর্বাঙ্গিক; উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে মুকুন্দরামের কাব্য। বৈষ্ণব পদাবলী ও ঐক্যকবচ কাব্য-সমূহের বৈচিত্র্যময় একতানের মধ্যে মুকুন্দরামের বর্ণিত সঙ্গীত, গুনন ও উদ্ভাসের চরিত্র স্বরূপে পরিচয় জানকন করে। অনেকটা এই কারণেই আধুনিক কালে শিক্ষিত সমাজে মুকুন্দরামের কিছু খ্যাতি পাওয়াইয়া গিয়াছে। কাউয়েল (Cowell) সাহেব মুকুন্দরামের কাব্যের কিছু কিছু অংশ ইংরেজি পদ্যায়-বাদ করিয়াছিলেন। ইনি মুকুন্দরামকে চন্দ্রসেন (Chandrasekar) সমেত কুলনা করিয়াছিলেন। ইহাও মুকুন্দরামের খ্যাতির কতকটা কারণ বটে। বহু হউক, এ বিষয়ে মুকুন্দরামকে আধুনিক বাঙ্গালী সাহিত্যের অনেক পঞ্চকের কুলনার সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। যে কারণেই হউক, মুকুন্দরাম যে ভাষার প্রাণী খ্যাতির কতকটা পাওয়াছেন, তাহা প্রাচীন কবির বসন্তকালের সন্বেদ নাই।

[২৬]

মুকুন্দরামের কাব্যরচনার তারিখ শইসা ঘটনেন আছে। অম্বান হু, টহা বোড়শ শতকের চতুর্থ পাবের কোন সময়ে রচিত হইতাহলি। বীর কাব্যের প্রাথমিক কবি তিকিৎ অদ্বৈতচরিত্র বিদ্যাসেন। তাহা হইতে জানিতে পারি যে, কবির ছয় সাত পুরুষের বাল ছিল রত্নাহ নবের তীরে বাহুল্য বা বামিকা গ্রামে (বর্তমান বর্তমান জেলায় রাহান আনার বন্ধি প্রাণে)। বাহুল্য সঙ্গি নাক তিকিৎরার অভ্যাসে উৎপাদিত হইয়া মুকুন্দরাম সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া আড়িয়া প্রাসের (বর্তমান বেদীনিপুত্র জেলায় খাটাল থানার অধুপত্র) ভবিনার বাহুল্য রাহের আগ্রহ গ্রহণ করেন। মুকুন্দরামের খ্যাতি ও কবিত্ব মুখ্য হইয়া পাকড়া বাপ ভাণ্ডকে বীর পুত্রের শিক্ষকতার নিরুক্ত করেন। এই স্থানেই

কাব্যটি রচিত হয়। কাব্যের তদিত্যং হইতে কবির সময়ে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়, তাহা পরে আলোচনা করা যাউতেছে।

তদুর্ভাগ্যচরিত্র বা কবিত্বিত্র বর্ণনা নহে, বর্ণনাত্মক ভঙ্গ ও বাস্তব বর্ণনা হিসাবে কাব্যটির এই অংশ অপূর্ণ। ছয় সাত পুরুষের ভিতরে স্বল্পকমে থাকিঃ কবি (এবং তাৎপর্য স্বগ্রামবাসীঃ) অনির্গতনীর অভ্যাসের ভোগ করিলেন। দেশ ত্যাগ করিয়া বাটবার পথে যে মনোবৈকল্য ও কষ্ট, তাহা আরও ভক্ততর। কিন্তু গুণেতাল্পন তীত্ৰামারত্ৰাহীন এই বর্ণনার লক্ষ্য উপকারের দ্রুতত্বতর কবির চিত্র অপূর্ণ আলোকে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বল্পবিস্তর কাহিনীত্বের মধ্যে প্রেতাপ-প্রচণ্ড শত্রু নান্ন সঙ্গি হইতে আরম্ভ করিয়া শান্নার বহুত্ব তেলি, যে কবিকে ভিন্ন ভিন্নে ভিন্ন দিগাচিন, সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া উঠিয়াছে। আত্মকাহিনী অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিবার নেতঃসংবরণ করিতে পারিলাম না।

সদ্যঃ বিদিত্যতঃ প্রাণেতঃ সন্ধানতঃ

বিদ্যেন বিদ্যাই বৈদ্যন্যে।

ইহার তলুকে খনি বামিকাঃ প্রাণে

বিদ্যাপুত্রঃ প্রাণে

প্রাণে বামিকাঃ প্রাণে

বৈদ্যন্যেতঃ প্রাণে

সে বামিকাঃ প্রাণে

বিদ্যাপুত্রঃ প্রাণে

ইহার প্রাণে

প্রাণে

প্রাণে

প্রাণে

প্রাণে

প্রাণে

প্রাণে

প্রাণে

করিবার নিমিত্ত ঐ দ্বীপে গিয়া কালকটুপ কথোপকথনে
বসন বেনে আনিতে পারিল যে, সে অসুখীকে বিক্রয় করিতে
আসিয়াছে, তখন তাড়াতাড়ি দ্বিভূকীর সঙ্গে বাহির হইয়া
দ্বিভূকীকে সহকা দিয়া প্রবেশ করিল। তাহার পর আদ্যাপ
আপায়ন করিয়া অসুখীকে পরীক্ষা করিয়া বসিল যে, ইহা
দেখান নহে, পিতৃপের। কিন্তু কালকটু ইকিয়ার পাখ
নহে। অবশেষে অসুখীকে পূর্ব স্থানটি দিতে হইল।

বেনে বড় ভুজবল নামে বহুটি মূল
যেথা কোথা করে চাকা ঘড়ি।
পাঠ্য কীর্তি লাভা একেবারে চিত্রের বেড়া
নাগের খায়ে বহু ঘড়ি।

পুত্র পুত্র ভাঙে কালকটু।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।

কীর্তি পুত্রের দ্বিভূকী খায়ে বসে অসুখী
কালকটু বহু পোষায়।

অতঃ পরে পুত্র দ্বিভূকী খায়ে বসে পাঠ্য
কালি বিনে আইলাও তার বেড়া।

অনি কালকটু খাও বস।
কালকটু একবার একবার পুত্রের দ্বিভূকী
বহু পুত্রের দ্বিভূকী খায়ে বস।

তন পো পন পো বড়ি কাগি কিছু মাঝে পুত্র
অসুখী অসুখী বিনে বড়ি।
আদ্যাপ পুত্রের দ্বিভূকী খায়ে বসে অসুখী
কালকটু বহু পোষায়।

কাল এক বস বস লিপন।
পাঠ্য কীর্তি দ্বিভূকী খায়ে বসে অসুখী
কালকটু বহু পোষায়।

অসুখী পাঠ্য কীর্তি খায়ে বসে অসুখী
কালকটু বহু পোষায়।
অসুখী বহু পোষায়।
কালকটু বহু পোষায়।

পুত্র পুত্র ভাঙে কালকটু।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।

কেন বসে আইলাও একবার বহু পোষায়।
এ তার কেন বহু পোষায়।

পুত্র অসুখী পাঠ্য কীর্তি খায়ে বসে অসুখী
কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।
কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।

পোষায় কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।
কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।

কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।
কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।

কেন বসে আইলাও একবার বহু পোষায়।
এ তার কেন বহু পোষায়।

কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।

কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।
কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।

কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।
কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।

কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।
কালকটু বহু পোষায়।
কোথা যে বর্ণকরাম খায়ে লিপন কয়ে
আনি আইলাও তার বেড়া।

প্রাণে করিয়া কীটে তাঁড়ু নিহেঁদেব করে
সবক পাতারান ঘলে খুঁজি ।
চাঁড়ী কখনে বসি দুখে মল মল করি
বন বন সেই বাঁচনায়া ।
হাটপু' বড় প্রতি আসে বসিলে হোমারে সোলে
আগে-গে' থাকিলে তাঁড়ুতে ।
হেঁদেব কাণে লেব তাঁড়ু পশাণে দেখে
কুলটিল কিয় নহে ।
করিলে আসন তার আকাশ ঝাঁড়ার পত
হিনে কুলে আবার হিলে ।
বোম কহে কত দুই চাড়া বোম কত
বিহে কৈশু' কত লক্ষণ ।
পহার ভুলে করে হেঁদেব কাণে মাগে
বোম কহে কত জোবন
পাশে অলসার বিয়া করি দালায়
কো' নাহি কহে লক্ষণ ।

তাঁড়ু, অগ্রেতে তুই হইবার শোক নহে । তাহার মত
চতুর বাক্তি কালকেতুকে হাত কত্রা ভিন্ন কিছুতেই সম্বন্ধে
থাকিতে পারে না । প্রথম দিনেই তাঁড়ু, কালকেতুর কানে
কানে স্বেধাধন ও প্রধান প্রধান প্রজাতিদের বিবরণে মন্থণা
শিরে আরম্ভ করিল ।

সকল বেলায়া গিরে চাঁড়ী প্রভব বীরে
তাঁড়ু বসে কতে কাণকথা ।
দে কিলে প্রজা কৈল কহি আমি সবিলে
এক এক প্রজার বাহা ।
সত্য বালা গিরে মার বহুত কল খান
উচিত করিতে কিয় তার ।
বিস্তার প্রজার দার ভবি দিলে বাণিশ্য
কল বসে যেন প্রজা লর ।
বন্দ্য পাকিলে বন্দ পাণ্ডিলে বিদ্য বন্দ
সম্বন্ধে বাসে লিখ বাহা ।
বাঁচা প্রজার বন বা পালাত বৈল জন
অকালে নাহি পাবে বাহা ।
বিদ্যার ছোট বোটা বহিষ আবার গিঁট
বায়ে বন্দ বন্দ বহন ।
আকিতে সকল প্রজা আত মান বোম পুরা
কত্রা বিধ প্রকার লক্ষণ ।

পারি হা-পারি কাটা ভাবিত আবার কাটা
সেই বোটা বড় লেখক ।
নকসের হোম খাড়া বড়ী জনের ভাড়া
পাণ্ডিলে বড় পার লক্ষণ ।

তাঁড়ু ও তাহার পুত্রের অভ্যাগারে উভ্যন্ত হইয়া প্রজার
কালকেতুর নিকট আসিল করিল । কালকেতুকে সহস্র
তাকাইয়া আনিয়া ভৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিল । তাঁড়ু ও
কালকেতুকে শাসাইল—

হি-বস্ত্রের বোটা হে হে-বস্ত্রের গতি ।
হাটে বহি কোরে বীধে বোড়া হাথী ।
হে বস্ত্রবিত হলে গুহাট বহা ।
সুদর্শন হাটে কান খেঁদে গুহাট ।

অনেক আবিধা চিত্তিয়া তাঁড়ু গ্রিক করিল, কলিঙ্গভাষাকে
নিয়া কালকেতুকে ভুল করিতে হইবে ।

অনুল চিত্রে তাঁড়ু বীরের বিদ্যক । রাজকোট নিল বীরকলা পুইশাক ।
চুপড়ি কলিা নিল কলী । বোম । মহাব বন পতে কুলে বাসে কোটা ।
পাশবাণি খায়ে তাঁড়ু নাহি চাক কেন । কেনের চিলক রক্ত
কৈল লে ।

কৈলিন্জী পাটোবালা নিল লাফানে । ঐহি বসিল তাঁড়ু কলিা বোম
কলনে ।
তাঁড়ু এক ভাট ছিল মনে তার নিয়া । পটিল বস্ত্রেরে যেন নাহি হক
বিয়া ।

হোট ভাট সাধা থাকে বিখারিল লেখ । বিয়া হে নাই তার হই পারে
পোষ ।

বড় তাঁড়ুবত ভাট ২৪ কহি বিয়া । বোম বঙলী পাইল কহাইব বিয়া ।
হোট তাই লইল হোটের কারোবন । বোম বোম তাঁড়ু বত করিল যবন ।

পূর্বকথের শোকনিপক্ষে, বিশেষ করিয়া আচার ও তাহা
লটকা লিপ্য পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যে অবস্থান কাল দেখিতে
পাওয়া যায় । পুরাতন বাঙ্গালী সাহিত্যের চর্চাপথে পাই—

আমি হুং বলালী ভইলী ।

নিম্ন বর্মী চণালী লেগী ।

“হুংহু, আত কুই বাঙ্গালী (= বাঙ্গাল) হইলি, (যেহেতু
তুই) চণালীকে কি প্রকৃষ্টিরূপে লইয়াছিল ।”

কুর্বাণ-দাস ঐ ঐ চৈতন্য ভাগবতে* বলিয়াছেন,
সে, প্রৈচৈতন্য কৈশোরে

বনসেনি থাকা অনুসরণে করিয়া ।

বনসেনিতে বনসেনি হাঙ্গিয়া হাঙ্গিয়া ।

১। ‘কলিঙ্গ’ পরিভাষা । ২। ‘পহার ভুলে’ পাপে লভক কলীন
হলে’ পরিভাষা । ৩। পৃঃ ২৪-২৫ ।

যোড়শ শতকের দিকে পশ্চিম যন্ত্রের অধিবাসীরা নিকট পুন্সগায়ী ভাষা কিতব গোনাঠিত ভাগে নুস্কগায়ের কাব্য চাইতেই আনন্দ প্রথমে জানিতে পারি। নুস্কগায় যে বাংলা নাবিকবিগকে লইয়া যন্ত্রণা করিয়াছেন তাহা অসঙ্গ theoretical বাঙ্গাল : এবং সংস্কৃত নাটকের মাদদী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা নাটকের বাস্কুভাষাণী পরিত্যক্তিকার হানাব মত নুস্কগায়ের বাঙ্গাল নাবিকবিগের ভাষাও অনেকটা পরিমাণে conventional বা কৃত্রিম। তবে তাহা লইয়া হস্তরসের সঙ্গী নুস্কগায়ের কাব্যে প্রথম পাওয়া গেল। নুস্কগায়ের কাব্যে তিন স্থানে বাঙ্গাল নাবিকের রোমন বর্ণিত হইয়াছে।

কখন যে বাঙ্গাল ভাই বাখাই থাকেই। নুস্কগে কানিরা জাপ বিদেশে
হায়াই।

আর বাঙ্গাল কখন শেরক গিরে নিগ হাম। হুদী গুচী হায়াইল চকুতার
পাত।

আর বাঙ্গাল কল বড় লামে মাস মো। বিদেশে হইলু না বেখিলু
মাস মো।

আর বাঙ্গাল কল আদি আই তামে তেল। কালী গণী হুদী মাস মো
কোখ তেল।

এইরূপে শেরক কখনে অসঙ্গ বাঙ্গাল। কখনের মত লমে হইলু বাঙ্গাল।
নামের বাঙ্গাল কখনে পাইয়া যায়। আর না হাইল আই উকীল কব।
এক বাঙ্গাল কখনে বাকই বাকই। বাহ্যার শরক হামল ধন বেগ অল হাই।
আর বাঙ্গাল কখনে জার চক্রে পড়ে মো। জাহেগ হাকনা কোল চক্রে
ক্ষ মো।

আর বাঙ্গাল কখনে হাই বড় হৈল লাম। বিদেশে কানিরা মাদু করিলে
কি কাজ।

আর বাঙ্গাল কল মোর আইস হাই মো। মাস মরিবে আর না বেখিলে
পুনি মো।

কখনের বাঙ্গাল লম বাকই লকই। নুস্কগে কানিরা জাপ বিদেশে হায়াই
পনার খামল ভাই সেলহিরা লোনা। ঐষ্ট মাগা বরি তেলের কীধতিরি
দমা।

আর বাঙ্গাল কল বিদে কৈলু কল। নুস্কগে মতের মুকি বাস্কু কালম
ইহাতি।

তিহিবারের অত্যাচারে কবিকে সাতশতকের অধুনিভ
প্রাণ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কবির মনে ইঙ্গা উঠিয়া
মত বিদ্যা ছিল। ইহাটাই জন্ত চণ্ডীমঙ্গলে যথো মণো
অত্যাচারী কৃষাণীর উপর কঠোর কটাক আছে। বলা—
উজাগ হাই পণ্ড নামতে ভাসুক। নেউই চৌদুরি নহি বা কবি ভাসুক।

বাঙ্গালা অপর বাঙ্গালানির্গত বহুবলিত বচিত কয়েকটি
সংস্কৃত কবিতা বা পদ নুস্কগায়ের কাব্যে পাওয়া যায়। তাহা
হইতে খুবপাঠানী গানটী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

মায় মায় যে বাবা মায়। কি লালিয়া কাল যাহা কি ধন চায়।
চলিয়া আনিব যখন কল। একত কুণের লজক কল ॥
সে কুলে থালিয়া দিয় যে হায়। জাপের লখা যোব না কাল মায়।
যখনকলে গতিব লল। বসিয়া আনিব বহুদায় ॥
সে চাক আনি তরোহ ললাম কোটা। অলি বাড়িয়া দিয় লোনের ভোম ॥
বাওলম খীর খণ্ড মাখাম চুগা। কপুত পাখা পান মলম কুগা ॥
এম পম খোড়া জৌহুর বিলা। হুই মাখার কজা কজাম বিলা ॥
ঈদর জাপে ধোর সেনার মায়। কুদুম বজুরি মাখাম মায় ॥
বাউ বিলা মায় চাকর মায়। অধিবাসনর হুদুম মায় ॥

কবিকল্প নুস্কগায়ের কাব্যে হস্তিরা অচল নাই।
তাঁহার মধ্যে কতকগুলি পূর্ণাঙ্গের প্রচলিত আছে এবং
কতকগুলি পরবর্তীকালে প্রবাসের মত চলিয়া গিয়াছে।
এখানে কতিপয় উদাহরণ দিতেছি।

সেই বহোদয় কজা গোলা কুগা।

বুজিয়া পাইল মেনে বীড়ির মত লয়া ॥১

হলি জগজীবনী আনবার নায়েব ॥২

(কুলবীর :—চতাল—“আপগ মাসে” হিম্মতি বৈরা)

মিত্রকর্ত্তন—“আপগ মাসে” হলি জগজীবনী বৈরা ॥৩

ময়া মিয়া মলম কাপনি মরু মানী।

মিন বিলমের চক্রে চুগারে মনি বেখি ॥৪

পূর্ণাঙ্গকল-মতি অধিবাসনের মতি

হলম পায় অলেক ৩২০ হলে ১০

কল মাল কৈল জিরে জগজীবী পালে।

তিজামনি মল কৈলে মাতের মলম ১১

মায়ী। বৌকন বেকা মাখন

বেবন মলমের কোটা ১২

(কুলবীর :—মিত্রকর্ত্তন “চতাল” বৌকন মাল পাইল কোটা ১৩)

কবনী বীড়িয়া মিল নুস্কগে বাহা।

মলোফিয়া বেব মল বিলমের লোকা ১৪

কুজিল মাগে মায় বেবন হুদী ১৫

কলেক কতি মায়কন মতি

মলেক:মল মল মতি ১৬

১। পৃ: ১১১-১২। ২। পৃ: ১১। ৩। পৃ: ১৩। ৪। পৃ: ১৪।

৫। “পল্ল” পাতা ১৩। ৬। পৃ: ১০, ১১৬। ৭। পৃ: ১২। ৮। পৃ:

১৩। ৯। পৃ: ১৪। ১০। পৃ: ১৫। ১১। পৃ: ১৬। ১২। পৃ: ১৭।

১। পৃ: ১৩৮। ২। পৃ: ১০১-১০২। ৩। পৃ: ১১১। ৪। পৃ: ১১।

[২৮]

পরম্পর কবিত্বের মধ্যে বিশেষ করিয়া তাঁর ১৫০০র উপরই মুকুন্দরায়ের প্রাচীন পড়িয়াছিল। মুকুন্দরায়ের নারী-নিগের প্রতিভা এবং ঐশ্বরী শক্তিকে দেবীর দেবায়ক আদ্য-পরিচয়-সহ এই ছুটিটির মূল মুকুন্দরায়ের কাব্যে বহিরাচ্ছে। যেমন হওয়া উচিত, মুকুন্দরায়ের কাব্যে অপরূপ ভারতবর্ষের কাব্যে উহা আরও বাড়িত এবং পরিপূর্ণ হইয়াছে। মুকুন্দরায়ের কাব্যে হইতে দেবীর আত্মশরিত্র অংশ ছুটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষের বর্ণনাটি স্থপরিচিত বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল না।

দেবী কুমারকে এইরূপ আত্মশরিত্রের দিয়াছিলেন—

ইলাহুত পর মোর আদিত ব্রাহ্মী ।
নিভকাল যৈতে আদি শ্রমি একাক্ষিতী ॥
অন্যকালে জন্ম যাবী যামোদা যোযা ॥
সাত সহস্র পুত্র যাম কিম কল্যান ॥

কোটারের 'মুকুন্দ দেবীর আত্মশরিত্র—

শিখা মোর কুলে বধা কুলে কুলে সবে বিদ্যা
যাবী যোযা পদসল ॥
সপ্তম কল্যা: দমি মরিচ পাইলু' যাবী
কুলে সবে যাব বন ॥
অন্যকালে যাবী হই মনু' কুলি কলি
আনন্দে বৈল বিদ্যমান ॥
সাত সহস্র পুত্র যাবী যোযা
কত পুত্র কবি যাব ॥৩

[২৯]

মুকুন্দরায়ের কাব্যে মতান্তর কবি কত পুত্র দেবী নামেই প্রসিদ্ধ। তথ্যের কবি খ্রীস্ট কাব্যকে প্রায়ই অত্যা-
মঙ্গল এবং কখনও কখনও অবি কামঙ্গল নামে উল্লেখ
করিয়াছেন। কাব্যটি ছুটি বস্তুর অংশে বিভক্ত, কুমার-
কালকেন্তু উপাখ্যান এবং কুমার-ধনপতি উপাখ্যান। প্রথম
উপাখ্যানটি বিশেষ করিয়া চণ্ডীকল কাব্যের নিম্নে। দ্বিতীয়
কাহিনীটির সহিত বন্য-বংশের সম্বন্ধ-ধনপতি উপাখ্যানের
কেই সাধু আছে। বস্তুর মনে হয় যে, বণিকদিগের মধ্যে
প্রাচীনকালে ধৌদাহাছাছাছা একটা নাত মূল উপাখ্যান

প্রচলিত ছিল। তাহা পরে ছুটি বিভিন্ন গোষ্ঠিতে চণ্ডী দেবী
ও মনসা দেবীর মাছাছাছাছা ছুটি উপাখ্যানে পরিণত হয়।
ইহা ৩৬ অধ্যায়ের মাত্র নহে। চণ্ডী ও মনসার (পুত্র ও
পুত্রক পুত্র ?) বিবাহ মনসাফল কাব্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত
হইয়াছে। চণ্ডীকল পেশি পত্রা (মনসা) দেবীর মাছাছা-
কাহিনী অছচরী, দেবীর অপমানকারী ধনপতির ভিত্তি তিনি
ভুবাট্টা বিবনে বণিত হইলেন। কুমার-কালকেন্তু উপাখ্যানে
কিছু পত্রা বা মনসা বা অল্প কোন দেবীর উল্লেখ নাই।

পূর্বে বলিয়াছি, মুকুন্দরায়ের কাব্যরচনার তারিখ পাইয়া
মতভেদ আছে। ছুটি একটি পুথিতে এবং তদবশমতে প্রাপ্ত
বুহিত সংস্করণে রচনাকালজ্ঞাপক এই পর্যাট পাত্তা যথ—
পত্র ৩৯ ১৯ লে পদ্যে বর্ণিত। ৩৩ পিমে দিয়া পিত হইবে বর্ণিত ৥৩

এখানে ৩৯ অর্থে ছুত্র বর্ণিলে মানসিংহের কাল পাওয়া যায়
না, নর বর্ণিলে পাওয়া যায়। ১৪২২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৭৭
খ্রীষ্টাব্দ কাব্যটির রচনাকাল হইতে কোন বাধা নাই। সুতরাং
পর্যট প্রাপ্ত অর্থাৎ কবির রচনা বলিয়া আশ্রয় স্বাক্ষরে
গ্রহণ করিতে পারি।

মুকুন্দরায় যে চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মনে তাহা তাঁহার
উক্তি হইতেই ধরা পড়ে। তিনি অনেক স্থলেই ভণিতায়
বলিয়াছেন যে, তিনি নৃতন সঙ্গীত রচনা করিতেছেন।

উদাহরণ দিয়াছি মনসা নৌহুদ পিত
কুমারী শ্রীকল্যাণ ॥২
রচিত্র শিখা বন্য পাত্তাশী কলি বন
নৌহুদ মঙ্গল পত্র ৩৩

[১০০]

পূর্বে আলোচিত আত্মজীবনী অংশ হইতে কবির জীবনী
সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, ডিহিয়ারের অত্যাচারে
তিনি সপরিবারে সাতপুত্রের বাসভূমি দাখিলা ত্যাগ করিয়া
ব্রাহ্মণভূমি আড়হার দিয়া তথাকার জনিয়ার বাহুড়া গায়ের
আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন এবং সেখানেই তাঁহার কাব্যটি
রচনা করেন। কাব্যের ভণিতা হইতে কবির ও কবির
পুত্রপৌত্রকদিগের সম্বন্ধে কিছু কিছু নৃতন তথ্য পাওয়া যায়।
তাহার আলোচনা করিতেছি।

১। 'কল্যাণে যাব যাব যাবী যোযা' হইবে কি? ২। পৃ: ৩০।
৩। পৃ: ১০০।

কবির শিত্যমহেয় নাম কপিলধ-বিশ্র, রত্নীর জ্যোতির
 আশ্রয়, কোয়ারি গাঞি। উনি মন্ত মাসে ত্যাগ করিয়া কবি-
 লিঙ্গের আশ্রয় অনেক দিন ধরিয়া নশ্বাকর মহ তপ করিয়া
 গোপালের পূজা করিয়াছিলেন। কবির শিত্যর নাম জয়-
 মিশ্র; ইনি শুনিরাজ-বিশ্র বসিয়াও বহুবীর উল্লসিত
 হইয়াছেন, হুতরাং “শুনিরাজ” ইহার উপাধি ছিল বসিয়া বোধ
 হয়।

মহাবীর ভগবান কবির শিত্যে হাত
 কবিজ্ঞ লোকজন।
 অহা! করুণ তপে গৌর আশ্রয় পায়
 বিরহিল ইতিবিকল্প ১১
 কুলাড়ি কুশেত ভাত মহাবীর ভগবান
 একতরফে পুজিল গোপাল।
 কবির শিত্যে বহু বহু ভণি বপাঞ্চল
 মৌন মাংস হাড়ি আশ্রয় ১২
 শুনিরাজ মিশ্র-মুত মসীত কলার রত
 কোয়ারি অনেক পুরাণ।
 মাহিলা নবমহালী মসীতের অভিলাসী
 ইতিবিকল্প ১৩ গান ১২

তনিতা হইতে জানিতে পারি, কবির কোথ ভাতার নাম
 (উপাধি?) ছিল কবিজ্ঞ। আর ‘আশ্রয়ভিত্তর হইতে
 জানিতে পারি যে, কবির সম্বন্ধে জাই ভাষানন্দ (পাঠ্যভূত
 ‘ব্রহ্মনাথ’) ছিলেন। ইনি কি কবির অগ্রজ? না, ইনিই
 কবিজ্ঞ?

তনিতার কতিপয় শুলে শিবরাম, চিত্রলেখা, বগোদা ও
 মহেশের ভ্রাতৃ সৈবীর দ্বা ভিক্ষা করা হইয়াছে। মাথো মাথো
 শুণু শিবরামের ভ্রাতৃ দ্বা ভিক্ষা করা হইয়াছে।

উর গো কবির ভগব কৃপা কর শিবরামে
 চিত্রলেখা কপোদা মহেশ ১০
 কক্সা কলাবরী শিবরামে বহা ১১

প্রোথ অশ্বপারে কবির পুত্রের নাম শিবরাম, পুত্রকণ্ঠ
 নাম চিত্রলেখা, কস্তার নাম বগোদা। এবং ভাষাতার নাম মহেশ
 (‘বহীশ’ পাঠ্যভূত)।

কোন কোন পুঙ্খিত “সৈবকীন্দনে ভণে” ইত্যাকার
 তনিতা পাওয়া যায়।^১ সৈবকীন্দনে কোন স্বতন্ত্র কবি না

হইলে বুদ্ধি যে, কবির বাতীর নাম ছিল সৈবকী। সৈবকী-
 নন্দন তনিতা বঙ্গবাসী সংকল্পের স্মৃতিপি নাই।

সম্ভবতঃ কবি শিত্যকাল হইতে প্রায়শ্চেষ্টা। রামানিত্যের
 সেবাগরায়ণ ছিলেন। কবিলাভা বিশ্ববিদ্যালয় সংকল্পের
 উপলব্ধী পুঙ্খিতে প্রায়শ্চেষ্টার নাম উল্লসিত।

মাহিলা নবমহালী অহু মাহিলা: ১ শিত্যকাল হইতে তার লোক কবি
 নিত্য ১১৬

কবির পুষ্ঠপোষক নীর বাঁকুড়া রায় আশ্রয়কুমার সসীম্বর
 ছিলেন। উহার আশ্রয়, পালাদি গাঞি। ইহার শিত্যর নাম
 ছিল বীরবান্দ, স্বতন্ত্রের নাম মল্ল-লিঙ্গ, ভাষার নাম নবা-
 সৈবী এবং পুত্রের নাম ব্রহ্মনাথ।

বীর বাবুদেব হুত জ্ঞান ভণে অশ্বকুত
 বীর বাঁকুড়া ভাষানন্দ।
 তার হুত ব্রহ্মনাথ রাজকণ্ঠে অশ্বকুত
 ইতিবিকল্পে ভল পান ১৭
 ব্রহ্মনাথ-দিত্যের হুত বলা বসে পাঠ্যভূত
 কুশে মিলে কুশে অশ্বকুত।
 তার হুত ব্রহ্মনাথ কবির বহু বহু
 বৈশিষ্ট্য বহু ব্রহ্মনাথ ১৮

কবি ‘বাড়গায়ে’ বসিয়া ভূতপূর্ণ ছাত্র ও ভানৌদন পুষ্ঠ-
 পোষক রাজা। ব্রহ্মনাথের অংশে কাবাতি বচনা করেন।
 তখন বাঁকুড়া রায় জীবিত নাই। কবি তনিতার মধ্যে বহুবীর
 ব্রহ্মনাথের ভ্রাতৃ সৈবীর দ্বা প্রার্থনা করিয়াছেন।

পালাদি কপোত ভাত বিজ্ঞান ব্রহ্মনাথ
 মস্তান ইতিবিকল্প ১০
 চৌপদ কাঁদি ভিত চৌপদ ব্রহ্মনাথ
 রাজা ব্রহ্মনাথের কোরু ১১
 মস্তিষ্ক মিস্ত্রী হন পান কবির ব্রহ্মনাথ
 কুশে মিলে আশ্রয় নন্দ ১২
 কলিা ভিত্তা ভান ইতিবিকল্পে পান
 ব্রহ্মনাথ মিল অশ্বকুত ১৩

কবিকল্প উপাধি সম্ভবতঃ চৌপদ-ব্রহ্মনাথ অথবা চৌ-
 মল্লের বড় পাঠ্যভূত। বাবুদেব করিভেন। অস্ত্রতঃ ইহা যে
 ব্রহ্মনাথ ছাড়াও ভ্রাতৃ চৌপদ-ব্রহ্মনাথের ছিল তাহাতে
 সন্দেহ নাই।

[ক্রমশঃ]

১। পৃ: ৭, ইত্যাদি। ২। পৃ: ২২০, ২২১-২২, ২২২। ৩। পৃ:
 ৪৫, ইত্যাদি। ৪। পৃ: ৩০২, ইত্যাদি। ৫। কবিলাভা বিশ্ববিদ্যালয়ে

মস্তান, পৃ: ১৪-১৫। ৬। পৃ: ১২৩। ৭। পৃ: ৭। ৮। পৃ:
 ২২১। ৯। পৃ: ৩৭, ইত্যাদি। ১০। পৃ: ৪৭, ইত্যাদি। ১১। পৃ:
 ৮৭, ইত্যাদি। ১২। পৃ: ২৪০।

সুখাকর বড় ভাবিতে লাগিল, ততট বিচলিত হইতে লাগিল। সপ্ন এখন ভাঙিয়া গিয়া, এখন তাহাতে প্রতিবিম্বিত হৃদি বিকৃত বেধা। বিচলিত হিমে সে কেবল অতিরিক্ত মূৰ্ছ প্রতিকৃতি দেখিতে লাগিল। রোগশয্যার ভাষাকে অসহ্য অবস্থার অন্তরে অগ্রগ্রন্থি হইয়া থাকিতে চাইবে, হাস্যাত্মকের কথাই কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল—রোগীরা আহা, পানীর সকলেরই মত শুকনো-কাঠিন্যের দ্বারা উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। সে সবজী ভাবনে বাস্তব লাভ্য করিয়া আসিয়াছে; কতকটা তাহার কাছে রোগীর ভাবনের কল্পনাও অসীম বহুতার কাংশ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

সে কি করিবে ?

সে যং চিকিৎসক। রোগের ও রোগীর অবস্থা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এখন সে কেবল রোগীর ভবিষ্যত ভাবিতে লাগিল; চিকিৎসার কথা, আত্মোগাভ-সম্ভাবনা তাহার মনে স্থান লাভ করিল না। পোষ হয়, আত্মোগাভ কবিরে তাহার আগ্রহও ছিল না; সে জীবনে বাতশুধ হইয়াছিল। সোক তাহাকে সংসারের স্তম্ভে স্থখাই মনে করিত বটে, কিন্তু বাহ্যের অভাবে স্তম্ভের বহু উপকরণ লাভ করিতে পারিয়াও স্তম্ভে স্থখাভ করে না, সে তাহারই অভাব অস্বস্তি করিত। সেহে জীবন আছে বলিয়াই সে বাঁচিয়া ছিল এবং কলের মত প্রতি দিনের কাজ করিয়া গাইত। আজ এখন জীবন বাইবার সম্ভাবনা গটিল, এখন সে তাহাকে প্রাণবান করা আর মনে করিল না। বিশেষ তাহার কৌশিক দৌলীলা তাহাকে যে পথ দেখাইতে লাগিল, সে পথে এত দিন তাহার নীট আরও হয় নাই। বহুদিন কারাবদ্ধ ব্যক্তি কারাবৃত্তের প্রাচীর বহুবার পটীকা করিবার পর একদিন দিগ্গম সহ্য হইয়া, কারাবৃত্তের পথাক তাহার স্পর্শমাঝে নিক্ষেপ আসিল, তখন সে কি মুক্তিলাভ-সম্ভাবনার আগ্রহ মুক্তিপথে আর বৈধাণ্যের থাকিতে পারে তাহাও চুপিয়া সেট পথে বাহির হইতে গার না ?

যে দিন কলেক হইতে নিবিবার সময় সুখাকর সহসা অবসর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার পরদিন সে বধ্যকালে কলেক হইয়া উপস্থিত হইল। সে উপস্থিত হইবার পরই শিককমিদের বিবিবার পরে একটা চটনা আরম্ভ হইল; সকলেই তাহাকে পূর্বদিনের ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুখাকর হাসিয়া বলিল, “তোমাদের সকলেরই কি রোগের এত অভাব যে, আমাদের রোগী করবার চেষ্টায় আছে :—ভাগ্যে গর পড়লে শরীরের মত উৎকৃষ্ট হয় ?”

অধ্যাপকমিদের মধ্যে ঝাংসা তাহার সমবয়সী তাহার বলিলেন, “ও সব ঢালো চলেবে না, সুখাকর। তোমার নিজস্বই একটা অমুখ করেছে, তুমি তা গোপন করছ।”

সুখাকর বলিল, “আমি তা দেখছি, তোমাদের মস্তিষ্কের অমুখ প্রবল হয়ে উঠছে।”

তাহার পর সুখাকর গড়াইতে পেল; ভাবিতে ভাবিতে ঘেল—সে যে বরা পড়িবে !

তখন ঈতকাল—কলেক শব্দবন্ধের আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণতঃ এই গ্রন্থপ্রধান বেশে গ্রীষ্মের সময় তাহা বহু প্রাচ্যতে হয়। পূর্বদিন সুখাকর ছাত্রমিগকে মনোহর লম্বতে বাহ্য বুঝিয়া বিগাছিল, সে দিন শব্দবন্ধের-কলেক শব্দ লইয়া তাহাট বেধাইয়া নিতে হইবে। ছাত্ররা তাহার “নির্দেশা-মায়ে পথ কাটিয়া শিকাগাভ করিবে।

শব্দবন্ধের-কলেক প্রবেশ করিয়া সুখাকর দেখিল, সে দিন যে কলেক ছাত্রের আদিবার কথা, তাহার পূর্বেই আদিয়া উপস্থিত হইয়াছে ও তাহার মত অপেক্ষা করিতেছে। জোমও উপস্থিত আছে। সে আদিয়া শব্দ আনিতে বলিলে জোম ভুইটি শব্দ লইয়া আসিল। শব্দ হাস্যাত্মক হইতে সংকীর্ণ হইল। বাহ্যনিদের আত্মীয়তা সংসারার্থ শব্দ লইয়া যায় না—সেই শব্দ “বার-কো-নাট” শ্রেণীর লোকের শব্দ বেওয়াগিল বলিয়া কলেক ছাত্রমিদের শিকাগ ভর বাবলত হয়—মহিষ্ট মানব মরিয়াও মাহুনের উপকার করে, বেহ দান করিয়া

বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে সাহায্য করে মানুষের রোগরোগ-নিবারণের উপায়-বিভারণে সহায় হয়।

শব ঔষধ-প্রয়োগে সক্ষম করিতে হয়। কিন্তু তাহায়ে অবিবাহিত বিধতি বিলম্বিত হটলেও বিবাহিত হয় না—হটতে পারে না। শবসাংস্কেদ-গৃহে প্রবেশ করিলেই পূর্ণকৃত তাহা জানাইবা যের। বাহ্যিক ডাক্তারী পড়িতে যায়, তাহাবিদের মধ্যে শতকরা কম জন সেই পরিবেষ্টনে কাজ করিতে না পারিয়া সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

ডোম দুইটি শব আনিয়া টেবলের উপর স্থাপিত করিল। বাহ্যিক শব সে বসিষ্ট পুরুষ ছিল; তাহার দৃষ্টিহীন চকু চাহিয়া আছে, মস্তকও স্তবিত হয় নাই। সে বেন সেই চকুতে বিম্বিত কাণে চাহিয়া আছে—তাহার যৌন জিজ্ঞাসা, জীবনে কেবলই সংগ্রাম করিয়াছি, সরিয়াও কি সরিষের নিষ্কার নাই?

ছাত্রী শবের অঙ্গগুলি ভাগ করিয়া লইল এবং এক এক অংশ লইয়া পুস্তক দেখিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। হৃদয়কর ভাবিতে লাগিল, কয় দিন পূর্বে এটি ব্যক্তি সংসারে সংগ্রাম করিয়াছে; আজ তাহার সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে—সে আজ সুখ দুঃখ সকলের অতীত। আজ আর কোন উষ্ম, কোন হর্ষিতা তাহাকে প্রীতি করিতে পারে না; রোগে সে কাহারও সাহায্যপ্রার্থী হয় না—কোপে কেহ তাহাকে হিংসা করে না। সে কি সত্য সত্যই সুখী নহে? কে বলিতে পারে? সে যে অজ্ঞাত রাক্ষসের প্রেতা হইয়াছে, তথা হইতে কেহ কিরিয়া আসে না—কেহ তথার অজ্ঞাতভার বিধি ব্যক্তি করিতে পারে না; সবটী অস্থান। তবে?

বিবাক মূঢ় নিবারণের সহিত যেহেতু গৃহীত হইলে যেমন মানুষকে আচ্ছন্ন—অবলম্ব করিয়া ফেলে, সেই শবসংস্কেদ-কক্ষের পূর্ণকৃত হৃদয়করকে তেমনই আচ্ছন্ন ও অবলম্ব করিয়া ফেলিতেছিল। ছাত্রাবিদের কাণের বাবস্থা করিয়া নিম্ন তাহার চলিয়া বাইবার কথা। কিন্তু সে চলিয়া বাটতে লাগিল না—সেই কক্ষে থাকিয়া শবের উদ্ভাসিত দৃষ্টিহীন চকু দিকে ব্যবহার চাহিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল। সে বুকিতে পারিল, চুপক যেমন সৌরকে আকৃষ্ট করে, কে যেন

তেমনই তাহাকে আকৃষ্ট করিতেছে; সে যে ভূত—তাহাই সে বুকিতে পারিল না।

কটা শেষ চটখা খেলে সে বখন সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে, তখন এক জন যুবক তাহার নিকটে আসিল। হৃদয়কর বখন হটল, সে কিছু বলিতে চাহে, কিন্তু ভয়সা করিয়া বলিতে পারিতেছে না। সে ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে কিছু বলবার আছে?”

ছাত্রটি সাহস পাওয়া বলিল, “হ্যাঁ, স্যার।”

“কি? বল।”

ছাত্রটি যেন অপর্যায়ী এই ভাবে বলিল, “আমার একটা দিন থাকিয়া কম আছে; সেই জন্য আমার এ বয়সের পরীক্ষা দেওয়া হয় না।”

“অপর্যায়িত হ’লে কেন?”

“স্যার, দাদার টাইফয়েড হয়েছিল, তাই তাঁর সেবা করতে হয়েছিল।”

“তিনি সেরেছেন?”

“না—দাদা বেঁচেছেন”—যুবকের গলাটা ধরিয়া আসিল।

হৃদয়কর প্রশ্ন করিয়া জানিল, দাদার যুবকবিদের সংসার প্রতিপালন করিতেন—সংসারে একবার উপাধনকর্ম ব্যক্তি ছিলেন। তাহার সবার যুবকের প্রতি পথার মাত্র হইল। সে বলিল, “আমি কাল তোমার জন্য অতিরিক্ত ক্লান্ত করব। কাল রবিবার আছে।” সে ডোমবিদকে বসিতা-লিল, পর দিন রবিবার হটলেও সে এক ঘণ্টার জন্য আসিবে, তাহারা যেন উপস্থিত থাকে।

এই সংসার বখন ছাত্রাবিদের মধ্যে প্রসারিত হইল তখন তাহাবিদের মধ্যে হৃদয়করের সুখাতি আরও বাড়িয়া গেল। সে ছাত্রাবিদের সহিত অবাধে মিশিত বসিয়া তাহারা তাহার প্রতি আকৃষ্ট ও তাহার অপর্যায় ছিল।

পরদিন দিখিত সময়ে কলেজে আসিয়া হৃদয়কর দেখিল, ছাত্রটি উপস্থিত আছে।

উভয়ে শবসংস্কেদ-কক্ষে প্রবেশ করিল। সে দিন আর কোন ছাত্র আসে না—যুবক কক্ষ প্রায় শূন্য। ডোমরা পূর্ণদিন ভিন্ন শবের অঙ্গগুলি টেবলের উপর রাখিয়া বাহিরে চলিয়া যেন—ছাত্রটি একটি অংশ পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

ছাত্রটির নিকট হইতে অগ্নির শব্দে অস্বাভাবিক অংশ বন্ধিত ছিল। 'কিছুক্ষণ পরে হৃদয়কর একটি অংশ দৃষ্ট। তাহাতে চুরিকা বন্ধ করিল—নবের বিরতি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল—জীবা বিবেচনায় বিবাক।

কিছুক্ষণ উদ্ভটতর ভাবে শব্দে চিত্রিত চিত্রিত সে সংলাপে হৃদয়কর ভূমিকা তাহা দিয়া আপনাতর বাহু হস্তে একটি কান চিত্রিত কেলিল এবং তাহার পর পকেট হইতে ক্যান্সাস বাহির করিয়া সেই কানটী চাপিয়া ধরিল।

হৃদয়কর লক্ষ্য করে নাট, ছাত্রটি তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

ছাত্রটি তাঁত হইয়া আসিয়া বসিল, "সার, হাতে ছুরী লেগে সেল।"

হৃদয়কর বলিল, "ও কিছু নয়।"

"তক পড়েছে?"

হৃদয়কর তাহার কথা উচ্চাটয়া বিবাক চোঁয়া বসিল, "তর পেও না।"

"না, সার, গুহ দিয়ে বুঝে কেলুন।"

"আজ্ঞা—আমি চললাম; কাল এসে তোমার 'উপস্থিত' দিখে সব।"

হৃদয়কর চলিয়া গেল।

ছাত্রটি ভাবিতে লাগিল, একি হইল? এইরূপ শব্দ-ব্যবহারে যে ছুরিকা ব্যবহার হয়, তাহা পরিষ্কৃত না করিলে বিবাক থাকে—তাহা মাহুয়ের বেহে রক্তের সহিত স্পষ্ট হইলে সেই বিব মাহুয়সেহে ব্যস্ত হইয়া যায়; তাহার ফল—মৃত্যু। সে কি করিলে? সে যিনি রবিবার; কলেক্ত বন্ধ; হইলে সে অল্প অধ্যাপকদিগকে এ কথা বলিয়া দিত—ঔষধাঙ্গী ব্যাকর্ষণ করিতেন। উপস্থিত কেবল হাদশাভাসের দ্বারা চিকিৎসকরা, ঔষধাদিগের সহিত হৃদয়করের তেমন বন্ধিততা নাই। সে যদি ঔষধাদিগকে এ কথা বলে—হৃদয়কর হস্ত মনে করিলে, সে অন্ধকারায়িত করিতেছে। সে কি করিলে দ্বির করিতে পারিল না; কিন্তু তাহার মনের মধ্যে অস্বস্তির ভাব প্রবল হইয়াই রছিল।

এদিকে অগ্নির বাহিরে বাইরা হৃদয়কর দেখিল—কত প্রায় হই ঠিক ঠীক হইয়াছে। তখন রক্তপাত বন্ধ হইয়াছে। সে

অল্প পরে হস্ত খোঁচ করিয়া ক্যান্সাসনা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

[১০]

যে ছাত্রটির রক্ত হৃদয়কর সে দিন কলেক্তে আনিয়াছিল, সে বুঝিতে পারে নাট, হৃদয়কর ইচ্ছা করিয়া শব্দব্যবহারে ছুরী দিয়া আপনাতর অল্প অস্বাভাবিক করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, হৃদয়কর অস্বাভাব্য হইয়াই এই ব্যাপার ঘটাইয়াছে। কিন্তু তাহার মনে স্বস্তি ছিল না। সে মনে করিতেছিল, যদি কোন দৃষ্টটনা ঘটে, তবে তাহার মস্তিষ্ক হইবে। সে ছাত্রাবাসে বাইরা তাহার সঙ্গে এক অগ্নির দ্বারা ছাত্রটিকে সব কথা বলিল। সত্যার্থ বলিল, "তুই কি এর মধ্যেই লাগের চেয়ে বড় ডাক্তার হইয়াছিস যে, তিনি যা'তে ভয় পান নি, তাতেই তরে আড়ষ্ট হইল।" ছাত্রটি আর কোন কথা বলিল না।

পরদিন হৃদয়কর যথাকালে কলেক্তে আসিল এবং অধ্যাপনা করিয়া গেল। ছাত্রটি লক্ষ্য করিল, সে ভালই আছে।

এইরূপ কয় দিন গেল। হৃদয়কর চকল হইয়া উঠিতে লাগিল—তবে কি তাহার শরীরে বিবের জিন্দা হইল না? তাহার পর তাহার মন হইল। হৃদয়কর যেন মুক্তির সন্ধান পাইল। প্রথম দিন সে অল্প গোপন রাখিল। দ্বিতীয় দিন আর তাহা সন্তব হইল না। তৃতীয় দিন অগ্নির লক্ষ্য দেখিয়া মনে হইল, অগ্নিরায় সাধারণিক মন।

দ্বিতীয় ব্যস্ত হইল—ডাক্তার ডাকিতে চাইল। হৃদয়কর বলিল, "কিছু নয়—সেরে যাবে।"

কিন্তু হৃদয়কর মন অল্প হইয়া কলেক্তে অল্পস্থিত হইল তখন ছাত্রটি উৎকণ্ঠিত হইল এবং বলিলে কি বলিলে না, ভাবিয়া গেলে এক জন অধ্যাপককে সে দিনের ঘটনার কথা বলিয়া দিল।

তখন কলেক্তের ডাক্তারদিগের মধ্যে সেই কথাই আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বা ছাত্রটির কথা বিবাক করিলেন, কেহ বা করিলেন না! খেবে হই জন ডাক্তার দ্বির করিলেন, ঔষধাঙ্গী পরদিন হৃদয়করকে দেখিতে গাইলেন।

ডাক্তাররা দেখিয়াই বুঝিলেন, ছাত্রটির কথা ও অধ্যাপনা সত্য। মধ্যে মধ্যে ঔষধাদিগের মনে হইল, বিবের জিন্দা যে

অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে জীবন-মৃত্যু-ল-প্রাণে জীবনের কণী হইবার আশা প্রত্যাশা হইত। গীতাংগ প্রথাক্রমে বলিলেন, “কৃষি এমন অসাধ্যবান হ'লে!” যে কেবল হাসিল।

যত্নের বেগে নৌকা বন্দন আরম্ভের মধ্যে দাঁড়া পড়ে, তখন তাহাকে রুকা করা যেমন প্রকৃত, এ অবস্থায় রৌদ্রিক নক্ষা করা যে তেমনই প্রকৃত তাহা মুখ্যকর ভাবিত।

কথাটা শুনিয়া হুয়ার ভাবিল, এ কি? মুখ্যকর যে অন্তর্ক হইয়াছিল এবং অন্তর্ক হইবার পর ঐক্য নামকর করে নাই—ইহা একান্ত স্বাভাবিক বলিয়া সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তবে কি তাহার পিতা ইচ্ছা করিয়াই এ কাজ করিয়াছেন? তবে কি বংশের অস্তিত্বে তাহাকেও অব্যাহতি দেয় নাই? কিন্তু সহসা মুখ্যকরের এই নৌকালোর কারণ কি? হুয়ারের মনে যে সন্দেহের উদয় হইল, সে তাহা বুঝ করিতে বসেই চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহা ততই প্রবল হইয়া তাহাকে নীড়িত করিতে লাগিল।

এদিকে বিবর্তিতার চল রোগের সব লক্ষণই মুখ্যকরের মেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কোন উদ্দেশ্যে তাহার গতি প্রহত হইল না।

কর্ণশাখারী প্রাণের বায়ীর অস্থিরতার ওপর উপলব্ধি করিতে পারে নাই; বন্দন পারিল, তখন গজীর কণ্ঠে পতিত সঙ্করণে অভ্যাসহীন লোকের মত হইয়া পড়িল। তাহার জ্বর বেধিয়া হুয়ার পিতার রোগের কারণ তাহাকে জানাইল না বটে, কিন্তু ডাক্তারদিগের আলোচনা হইতেই তাহার মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। সে হুয়ারকে চিজালা করিল, “ডাক্তাররা কি বহুদিন—ও কি ‘অসহ্যতা’?” হুয়ার বলিল, “কে বলল?”

হুয়ার কর্ণশাখারীর মুখভাব লক্ষ্য করিল। তাহার যে ভালবাসা প্রতিমান না পাইয়া এত দিন তাহাকেই নীড়িত করিয়াছে—হাহার প্রত্যাখ্যানে সে জীবনে বিঘ্ন চাকলা ভোগ করিয়াছে—বন্দ, অর্থ, কর্ণের বাহুলা, পুস্তকের সম্রাট মেহ—কিন্তু এই হাহার প্রতিধানের অভাব পূর্ণ করিতে পারে নাই, তাহার সেই ভালবাসা আজ কর্ণশাখারীর মুখভাবদ্বারা তাহাকে বাধা দিতে লাগিল। সে কর্ণশাখারীর উপলক্ষ্যে উপেক্ষা করিয়া এত দিন তাহার স্বাভাবিকতাব্যবহারে চেষ্টাই করিয়া

আসিয়াছে, আজ কর্ণশাখারীর অস্থিরতায় বহুবিধ বিবর্তিতার তাহাকে চক্ষু করিয়া তুলিল। তবে কি সে-ই তুল বৃষ্টিভায়ে, তুল করিয়াছে? কিন্তু তুল হইলেও জীবিতার আশা ও উপাশ নাই!

কিন্তু কর্ণশাখারীর মুখভাব তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। শব্দে সে ডাক্তারদিগকে বলিল, “এ পাটের মড়া নিয়ে প্রোথানের আচ্ছা বিপর হয়েছে! ভোমরাও বুঝ, আমিও বুঝি—সারবার আর কোন আশা নাই, বড় জোর ছ'দিন বিন; কিন্তু ভোমাদের ছুটোছুটির বিশ্রামও নাই। তা'র চেয়ে আদর্শে হাসপাতালে নিয়ে চল।”

ডাক্তাররা ভাবিলেন, প্রোথারটা বন্দ নহে। হাছন কি কখনও আশনার সুবিধা প্রাপ্য করে?

কেবল হুয়ার আগতি করিল, “কেন বাড়ীতে কি অস্থিতি হচ্ছে?”

হুয়ার বলিল, “এই বছরের অস্থিতি, বাবা। আর ভেবে দেখ, রোগ, রোগী, ডাক্তার—এই পরিবেষ্টনের মধ্যে মরাও কি ডাক্তারের পক্ষে ঠিক নয়?”

তাহার পিতার শেষ ইচ্ছা বুঝিয়া হুয়ার আর আগতি করিল না। কিন্তু তাহার মনে হইল, হুয়ারকর বেন ক্রমে মায়ার সব বন্দন নিজ হস্তে বুক করিয়া কেদিয়ে চাহিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, যে কি তাহাদিগের কাহাকেও তাহার সেবার বঞ্চিত করিতে চাহে—কাহারও সেবা-প্রাণে ক্ষুধিত হইতেছে? না—সে পরবর্ত্তার স্বাভাবিক অনিচ্ছাছে তুল হাসপাতালে থাইতে চাহিতেছে?

হুয়ারকর হাইবার ক্রম একটু ব্যত হইল সেখান ডাক্তাররা তাহাকে লইয়া হাইবার বাবস্থা করিলেন।

বন্দন তাহাকে জীবিতাবস্থায় মৃত্যুশয্যাখারী জানিয়া তাহাকে তাহার পরিচিত পুত্র হইতে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন পুত্র তাহার নৃপী বতক্স সেবা পেল—কর্ণশাখারীর প্রাচীর-বিশিষ্ট প্রতিভূততে বহু রহিল। সে প্রতিভূতি কর্ণশাখারীর তাহার সহিত বিবাহের কর বন্দনের মার পরে গৃহীত ফটো হইতে অস্তিত্ব করান হইয়াছিল। সেই অল্প বয়সের ছবিখানির প্রতি কর্ণশাখারী কখনই সন্দেহ ছিল না—সে বলিত, “ওগাং আবার কেন?” কিন্তু হুয়ারকর সেই খানিকই বড় করিয়া অস্তিত্ব করাইয়াছিল—সেই ছবিখানি

প্রাচীন বনশ্রী-কণ্ঠে রচিত ছিল। তাহা কল্পনাময়ী যে বনশ্রী-চরিত্র, সেই বনশ্রী-সে কল্পনাময়ীকে প্রথম বাণবাসিনী ছিল। আর সে বাণবাসিনী অজস্র উপেক্ষার বিপক্ষে মন্থকে কখনও হানি বা পুণ্য হয় নাই। তাই গৃহভাষ্যের সময় দেউড়ীতে কথার বৃদ্ধি প্রধাৎকরণ মনে পড়িতেছিল।

বনশ্রী প্রধাৎকরণে গাড়ীতে তুলিয়া হটল, তখন বাড়ীর মধ্যে কণা অল্পের ঘরে বসিয়া উঠিল, “আমি বাড়ির মধ্যে বা’ব।” সে কথা প্রধাৎকরণ করি প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষু অন্ধ্রতে পূর্ণ হইয়া আসিল। হায় বাবার বন্ধন!

গাড়ী চলিয়া গেল।

কল্পনাময়ী কথার উপর হইয়া পড়িয়া বৃকভাষা বেনবায় কামিতে লাগিল। তাহার বৃক বিদীর্ণ করিয়া যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার বাস্তবতা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, সুখে তাহা প্রকাশ পাইল না—“কোন অভিযানে তুমি এমন কাণ্ড করলে; কি অভিযানে তুমি বরবার কত বাড়ী ছেড়ে গেলে?”

[১১]

কল্পনাময়ী কল্পনায় এই ভাবে—বন বাহনঃসাহস হইয়া উঠিল, তাহা সে আপনি ভাসিতো গাঢ়িল না। ইহার মধ্যে অল্প আসিয়া গৃহবার তাহাকে ডাকিয়াছিল, উত্তর না পাঠায় আর ডাকিতে লাগল করে নাই।

প্রায় চুই ঘণ্টা পরে কল্পনাময়ী গৃহে বসি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারই তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন। তাহার বেশ দিগি বসিলেন, “তাই ত! আমি সেদিন বন এসেছিলাম, তখনও হুয়ারের সুখে ঐ আত্মহত্যের কথা শুনে আমার গারে বেন কাটা দিবে উঠেছিল। আর তাই হ’ল!”

প্রশ্নবোধের সুখে যে পাথর ছিল তাহা বেন সরিয়া গেল; কল্পনাময়ী কামিয়া উঠিল, “যেহা, সে দিন তুমি আমার বা’ বসেছিলে, তা’তেও আমার চোখ পূলে নি!”

যেহা দিগি বসিলেন, “ছেলে কত রাগ করতে লাগল। তোর কথা শুনে আমি অস্বস্তি হয়ে গেলাম—রোগেও সেবা করবি না! আমি বললাম, তা তুমি উত্তর দিগি অস্বস্তি বা আছে তা’ হ’বেই।”

“সব দেখে আমার—বইলে এমন হবে কেন?” সে কামিতে লাগিল।

বড় দিগি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাঙ্গামাভালে সেল কেন? এ কি কথা?”

কল্পনাময়ী বলিল, “আমি বৃকতে পাগলি, আমার উপর অভিযানই বা’বার কারণ।”

“ঐ ত কান চ’ল—বনশ্রী অভিযান তোর, তেমনিই তা’র।”

“বড় দি, অভিযান নিয়ে ত তিনি যাচ্ছেন—কি পোড়া কপাল আমার—আমার অভিযানের কোন্‌ দ্রষ্টাই রইল? এমন অভিযানের সুখে কেন আসতে গিয়ে নি?”

“তুমি যেতে দিগি কেন?”

“বড় দি, আমার কি আর কোন কথা বলবার সুখ আছে? আমিই যে এত কষ্ট অপরাধী।”

“ছেলেও যাবল কললে না?”

যেহা দিগি বসিলেন, “বড় দি, জন্মে জন্মে তপিতে করেও লোক এমন ছেলে পায় না—ছেলে বাপ-অম্ম প্রাণ। সে কি এ সময় বাপের কথার আপত্তি করতে পারে? হয় ত বা’র উপর তা’রও অভিযান হয়েছে। আমি বনশ্রী আগে এক দিন এসেছিলাম, তখনও বাবার অস্বস্তি নিয়ে বাপ বেরিয়েছিল বলে ছেলে কল্পনার উপর কত রাগ করলে! সেদিনের কথাই আমি তোমাকে বলছিলাম।”

“এখন উপায় কি?”

“তা’ত! তিনি কল্পনাময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জানার কি হল?”

কল্পনাময়ী বলিল, “আমি তা জানি না।”

যেহা দিগি অল্পাঙ্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৌমা, হুয়ার কি কিছু বলেছে?”

অল্পা বলিল, “কেবল বলেছেন, বাবা নিষেধের হাতে হায়র বন্ধন ছিঁড়ে কেনলেন।”

“তবে কি বাচবার আর কোন আশা জাক্কারা করে না?”

“না—বলিয়া অল্পা হুঁপাইয়া কামিয়া উঠিল। বনশ্রীর কষ্ট তাহার যে ছাপ, তেমনি হুঃ সে পূর্ণ কখন অস্বস্তি করে নাই। তিনি তাহাকে কত বেহ দিয়াছেন। পূর্বদিনও তাহাকে বহুবার তাহার দেখা করিতে যেিয়া তিনি বলিয়া ছিলেন, “না, অনেকক্ষণ বসে আছে; যাও একটু বিশ্রাম কর গে।” গৃহ হইতে বাটবার পূর্বক্ষেপ—বিহার লটবার সময়

গ্রামের পেল কাছ, কপাকে একটু বড় পুতুল সেওয়া; সেই শেখ মেয়েপছারের নামকী তিনি যে দিন প্রথম আর বুঝিতে পারেন সেই দিন বয়ঃ বাটরা কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার কণা, পুষ, বাবী, আর সে—তাহাদিগকে ছাড়িয়া তিনি কেমন করিয়া থাকিবেন, অরুণা তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। যত্নের কথা সে বড়ই মনে করিতেছিল, ততই কাহিতেছিল।

স্বাক্ষরকে ধনন লইয়া বাওয়া হয়, কণা তখন হইতেই কাহিতেছিল। অরুণা কিছুতেই তাহাকে তুলিয়া পায় করিতে পারে নাই। গাছের শেষ উপহার পুতুলটিকে সে একবারও মুখ হইতে নামায় নাই। সে কেবলই অরুণাকে ভিজ্ঞাসা করিতেছিল, “গা, পাহ পেল কেন?” সে ভাবিত, বাজের অস্থান হইলে সে বাড়ী হইতে কোথাও যায় না; তাই বাছ যে অস্থান হইল বলিয়া চিন্তা যোগেন, ইচ্ছাতে তাহার বিষয়ে অবধি ছিল না। সে তাহার বাবাকে ‘আর মা’কে কাহিতে দেখিতেছিল, নিজে কাহিতেছিল; এখন সে নিরাক্ষরও পড়িতে দেখিল। সে বুকিল, অসামান্য একটা কিছু ঘটনা—আরও তাহার শিশু-জন্ম পূর্ণ হইয়া গেল। সে আবার অরুণাকে ভিজ্ঞাসা করিল, “গা, বাছ কখন আসবে?” অরুণা উত্তর দিতে পারিল না—কুপাইয়া কাহিয়া উঠিল। কল্পনাময়ীর বড় বিলি কপাকে কোড়ে লইয়া বলিলেন, “চুপ কর, নিমিষখণি।” কণা হঠাৎভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভিজ্ঞাসা করিল, “আমি কা’র সঙ্গে খেলা করব?” হায়, শিত—সে যদি অস্থান করিতে পারিত, তাহাকে ছাড়িয়া ঘাইবার কল্পনায় তাহার সেই খেলার মাঝীট কত বড় অস্থান করিতেছে!

বেগ বিলি অরুণাকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “হালপাতাও খেতে কিরিয়ে আনা যায় না?”

অরুণা বলিল, “না।”

“কেন?”

“টানাটানি সইবে না—এসনিহ”—সে যে গুনিয়াছে, ডাক্তারগা বলিয়াছেন, মেয়েগা আর ছুই দিনের অধিকও নহে—সেই নির্ভর কথাটা অরুণা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

বড় বিলি বলিলেন, “কি সর্বনাশ!”

কল্পনাময়ী কাহিতেছিল—ভাবনার অস্থান নাই; সে কাহিতেছিল, আর কাহিতেছিল। আর সে বুঝিয়াছে—সে

হতদিন বাচিয়া থাকিবে, ততদিন তাহাকে কাহিয়া কাটাটতে হইবে। সে বুঝিয়াছে—তাহার শিশুগতঃপ্রাণ পুষ মুখে কিছু বলুক আর না-ই বলুক, তাহাকেই এই হুঁজুগোব ভয় দাবী মনে করিবে। সে বুঝিয়াছে—যে সাথবোর পরে সে বাবীকেও উৎসেণা করিয়াছে, আর বাবী সেই সাথবা চূর্ণ করিয়া দিয়া, তাহার পরে দ্বাধার মুঁড়িত করিয়া দিয়া—যেন তাহাকে বালক উপহাস করিয়া চির-বিবাহ গ্রহণ করিতেছেন; কীভাবে তাহার আর কোন অবলম্বন থাকিতেছে না। সেখা-জর অবলম্বন স্বকনীতে অস্থান যেন প্রান্তর পূর্ণ করে, আর নিরাশা তখনই তাহার মন পূর্ণ করিতেছিল; তাহার চারিদিকে যেন কেবলই অস্থান—অস্থান পুরীভূত হইয়াছে।

কেহ যদি তাহার চারিদিকে শুষ্ক তৃণমূল সজ্জিত করিয়া ফল না বুঝিয়া তাহাতে অস্থি যোগ করে, তবে তৃণমূল হইতে অস্থিখিা উঠিত হইলে—বাহির হইবার আর কোন পথ নাই দেখিগা—সে যেন করে—আপনার অস্থিযেনার কলে আপনি যেন বয়গা ভোগ করে, কল্পনাময়ী তখনই করিত—ছিল। বিলিনের কথা—গ্রামনিগের মৌখিক সহানুভূতি তাহাকে কি সাধনা প্রদান করিতে পারে?

দীর্ঘ দিন কাটাগা গেল—স্বাধার আসিল না। সন্ধ্যার পর পিতা পুনঃপুনঃ বলায় সে আগরের ভয় এক বার মুখে আসিল; আরাধা সম্মুখে লইয়া বলিল মাত্র—ঘাইতে পারিল না। কল্পনাময়ী বলিল, “কিছুই যে দেখি না!” সে কোন উত্তর দিল না। কল্পনাময়ীর যেত চিরি বলিলেন, “সারাদিন রোগিত কাছে কলে ছিলে, আবার সারারাত্রি আগবে?” স্বাধারের ঘৈরীর বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; সে বলিল, “জঃ এই যে, আর আগতে পা’ব না, সাগীয়া। বাবা আমায়ের তাঁকে দেবা করবার সৌভাগ্য পেয়ে না—তিনি তাঁ’র ভাবনা খেতেও আবারের মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি যদি বংসর কয়েক ভোগপহার গড়ে থাকতেন, আর অনাহারে অনিচ্ছায় তাঁ’র দেবা করতে পেতাম, তা’ হ’লেও আপনাকে ভাগ্যদান কলে যেন করতাম; তা’তেও তাঁ’র মেয়ের জন যোগ হয় না।” অস্থির উচ্ছ্বাসে ও অস্থিমানের চাকশো তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত ও কলিত হইতেছিল। সে কাহিয়া কেলিল। অরুণা স্নানবের শয্যে যোগন করিতে পারিল না।

ককণাময়ীর মুক্তিতে বিলম্ব হইল না—পুত্রের কথা কাগাস চুপ উঠিল—সে কথা কাগাসকে তিরস্কার।

যেও দিদি ভিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু কি বলছেন?”

শ্রমীর বলিল, “কি আর বলবেন? তবে একটা কথা আগে বলতে চুলে গিয়েছিলেন; হালপাতালে গিয়েই বললেন—‘বাপা, একটা কথা বলা হয় নি। অনেক দিনের কথা—তোমার মা একদিন কথার কথার কাঁকে বলছিলেন—‘মায়ী ছাড়া স্ত্রীগণের আর কাঁরও উপর কোন দাবী থাকে না। সেটী কথা শুনে, মা’র আমায় অববর্তনায় তাঁকে কাঁরও উপর কোন দাবী নির্ভর করতে না হয়—তোমার উপরেও নয়—সে বাৎসর্য আমি করে গেছি। সে টাকা তাঁর; তিনি চলে গেলেও তুমি কিছু বাক না।’”

ককণাময়ীর মনে হইল, মায়ীর এত ভালবাসার পঙ্কির স্রোত চুরিকার নত তাহার বৃকে প্রবেশ করিল।

ককণাময়ীর বড় দিদি ভিজ্ঞাসা করিলেন, “কত টাকা ককণাকে দিয়েছে?”

শ্রমীর এত প্রশ্ন অশোভন ও জনহীনতার পরিচায়ক মনে করিল; বলিল, “তা’ বৈখ্যার প্রকৃতি জানাব হয় নি; সে সবও আমার এখন নয়। তবে আমার বিখাল, বাবা শ্রবণভ্রষ্ট করছেন; আর আপনাকে এটুকু বিশ্বাস করবেন যে, তিনি মা’রিতে আশ্রয় করেছেন, আমি তাঁর কিছুতে হাত দেব না।”

এটী কথা বলিয়া শ্রমীর বড় মাসীমা’র দিকে চাহিল। মা’র দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িলে সে মা’র বিবরণ মূখে বেনমায় বিকাশ দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইল।

শ্রমীর হালপাতালে চণিয়া গেল।

সে ষাটবার পরেই ককণাময়ীর বড় দিদি বাড়ী ফিরিবার জন্য বাত হইয়া উঠিলেন। যেম দিদি মক্কাতে বসিলেন, “বৌমা, চাকরকে বলে দাও, আমার গাড়ী এসেই থবর থেবে। নিজেকে নাহিলে দিয়ে যেতে হবে।” অমলক পরে তাহার গাড়ী আসিলে উভয়ে আর এক দফা আত্মপোত্তি করিয়া বিনাশ লইলেন।

অকণা শান্তকীর আচাৰ্য্য আনাটয়া তাহাকে ডাকিল। ককণাময়ী বলিল, “বৌমা, আমি থা’ব না।”

শ্রমীর শ্রম করিয়া ককণাময়ী কেবলই ভাবিতে লাগিল; আর তাহার বৃকের মাথা হইতে বন্ধ ককণা কেবলই আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে তাহার নিম্নাঙ্কণ হইল; সে শ্রম বেনিদ—সম্মুখে ব্রহ্মকর, তাহার মূখে পবের পাণ্ডুতা, চক্ষুতে অস্বাভাবিক দৃষ্টি; ককণাময়ীর সম্মুখে আসিয়া সে ভুই করে খুক চিরিয়া ফেলিল; ককণাময়ী দেখিল, বৃকের মধ্যে আশ্রয় লিখেছে; তাহার মনে হইল, অগ্নির উত্তাপ সে তাহার বৃকে অস্তিত্ব করিল। তাহার দৃশ্য ভাবিয়া গেল।

[১২]

স্বাধিকার স্থির করিয়াছিল, সে জীবনকে উপহাস করিয়া নৃত্যরাজ্যে চলিয়া বাইবে। সেইজন্য তাহাটী সে আশ্রয়কে প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু কাৰ্য্যকালে তাহার সেই সন্মত কাৰ্য্যে পরিণত করিবার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল—মাংস। সে বাড়ী হইতে আসিবার সময় ককণাময়ীর মূখে যে কাতরতার ও নিরাশার ভাগ দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাতেই সেটী সংশয় উদ্ভব হইয়াছিল। বর্ষে যেমন বজ্রের হস্তে তাহার ব্রহ্ম রক্ষিতা যায়, সেটী কাতরতার ও নিরাশার ভাবের স্বতি যেমনটী তাহার মনকে রক্তিত করিয়াছিল। আর তাহার ভাবমালাটী সে ব্রহ্মের মস্ত তম্ব প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। এখন তখন সেটী স্বতি তাহার মনে সেধা বিচেলিল।

হালপাতালে ডাক্তাররা পান্ডা করিয়া স্বাক্ষরের ঘরে থাকিতেছিলেন; আর শ্রমীর পিতৃদেবা যেন শাখার ভাবেই করিতেছিল। স্বাধিকার ডাক্তারদিগের সঙ্গে কথার বাব-বিক্রয়ের অবতারণা করিতেছিল। সকল সময়েই হাসিয়া কথা বলিতেছিল। সে আশ্রয় ডাক্তার; তাহার পর সে যে তাহা নৃত্যর উপায় অলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে পর পর কিরূপ মনস্তাত্ত্বিক হইয়াছে, কিরূপ লক্ষণ-বিকাশ হয়, তাহা সে ক্রমেই ভাবে অন্বেষণ করিয়াছিল। একটর পর একটী লক্ষণ-বিকাশ হইতেছিল, আর পরের লক্ষণ কি হইবে, তাহা সে ডাক্তারদিগকে বলিতেছিল।

যে দিন সে হালপাতালে আসিয়াছিল, তাহার পরদিন প্রাতেই সে বসিল, “আর চলিল পড়ার বৈঠক নয়।”

উপস্থিত ডাক্তার বলিলেন, “কেন?”

স্বধাকর বলিল, “তুমি কি বুঝতে পারছ না?”—সে বোনের দক্ষণবিচারে প্রবৃত্ত হইল, যেন যোগী মেথিয়া সে আর এক জন ডাক্তারের সঙ্গে কর্তব্য স্থির করিবার অভি-
প্রায়ে পরামর্শ করিতেছে।

সে দিন পিতার পরামর্শ ত্যাগ করিতে হইবার মন সজ্জিত ছিল না। “আজ শেষ দিন—আর সে ‘বাবা’ বলিয়া ডাকিতে পারিবে না—আর তাহার ডাকের উল্লস ঘেঁষাট কষ্টে ‘বাবা’ ভুলিতে পারিবে না। তাহার মুখ যেন কাটিয়া ধাইতেছিল। বধ্যাক হই, ভবুও সে উঠিল না মেথিয়া স্বধা-
কর বলিল, “বাবা, পেতে গেলে না?”

স্বধীর বলিল, “আমি খাবার আনিবে দেব।”

“না। বাড়ী বাও। সাহস সব কি করছেন, বেগে এস। এখনও বেরী আছে।”

সে আর একবার বলিলে স্বধীর আর কিছু বলিতে পারিল না—বাড়ী গেল।

অল্প সময়ের মধ্যেই কিরিয়া আসিয়া স্বধীর বলিল, “বাবা, কথা একবার আবার ভাব বড় ঠাণ্ডাছে। ‘আনব কি?’”

স্বধাকর একবার চক্ষু মুদ্রিত করিল—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে যেন আপনাকে সামলাইতে পারিতেছিল না। সে বলিল, “বাবা, আন।”

স্বধীর উঠিল: হাইয়া মোটরগাড়ীর ড্রাইভারকে বলিয়া আসিল, “বাড়ীতে গিয়ে কণাকে নিয়ে এস।”

কণাকে আনিতে গিয়া স্বধাকর পুনঃ পুনঃ ঘরের দিকে চাহিতে লাগিল—কখন সে আসিবে। তাহার পর এখন আর হইতে “বাবা” বলিয়া ডাকিয়া কথা যবে প্রবেশ করিল, তখন তাহার মুখে আনন্দের লীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে স্বধীরের দিকে চাহিয়া বলিল, “একই বলে, কণানে সোনার প্রাণী।”

তাড়াই বটে, হাসপাতাল ব্যাধির গুরু, কৃত্রিম ক্ষেত্র—তথ্য শিল্পের আবির্ভাব কৃত্রিম মুখ দ্বারা বিকাশ—অগ্নানে সোনার প্রাণীই বটে।

কণাকে লইয়া অরুণা আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া স্বধাকর বলিল, “আও মুক্তি ছেলেকে স্নেহেতে এসেছে?”

তাহার পর সে কণার এককথন হাত আপনায় হাতে মথো লইয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল।

ক্রমে লক্ষ্য হইয়া আসিল। স্বধাকর পূর্বেই উই এক বার স্বধীরকে বলিয়াছিল, “বাবা, মা’কে আর বাজবে—বাড়ী বেধে এস—”কিন্তু কেহই ঘাইতে পারে না। এ বার সে বলিল, “বাবা, ঠাণ্ডা লাগলে তুমি বাড়ী বেধে এস।” কথা বলিল, “আমি আবার আসব।” স্বধাকর বলিল, “না, বাত, ঠাণ্ডা লাগবে।”—কিন্তু সেট কথা বলিবার সময় তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

অরুণা আসিয়া ফেলিল—কণাও আসিল।

অরুণা উঠিয়া স্বধাকরের পদদ্বিগ্ন গ্রহণ করিল—কণাও তাড়াই করিল।

তাছাড়া চণিকা ঘাইলে স্বধাকরের মনে হইল, যেন ‘সব অন্ধকার।

[১৩]

অন্ধকারে ও কণাকে বাড়ীতে রাখিয়া স্বধীর শ্বিট কিরিয়া আসিল। তখন অন্ধকার চটাইছে। হাসপাতালে যে যবে স্বধাকর কৃত্রিমভাবে, সে যবে বৈজ্ঞানিক নীতির উচ্চল আলোকের ঐচ্ছিক আবরণ দিয়া ত্যাগ করা চটাইছিল। স্বন বন্ধাভকারাত্মক। স্বধীর আসিয়া পিতার মরকের নিকটে রেখে যলিল। যে ডাক্তার যবে ছিলেন, তিনি বাহিরে গমন করিলেন।

স্বধাকর বলিল, “স্বধীর,—বাবা, সব বেগে এসে?”

স্বধীর বলিল, “হাঁ, বাবা।”

“বাবা আর কিছু বললেন না?”

“বড় ঠাণ্ডাছে।”

স্বধাকর একবার চক্ষু মুদ্রিল। লক্ষ্য বাকল আঘাত অস্বস্ত করিলে স্বধীর যখন করে, সে তখনই করিল; তাহার পর বলিল, “বাবা, দিন কতক ওর বড় কষ্ট হ’বে। ছেলে সাহস—ভুলে যাবে।” যেন সে আপনাকে আপনি বুঝাইতে-
ছিল। তাহার পর সে আবার বলিল, “বাবা, জানি, তুমি কখনও ছেলে মেয়েকে তিরস্কার করবে না; তবুও বলে থাকি—
দিন কতক এ খ্যাতিবোঁতে হ’বে: সে সময়টা তোমারও মন ভাল থাকবে না—যেন ওর আচারে বেঁধে রাখিও না—
তিরস্কার কর’ না।”

স্বধীর আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না; ওট বিচ্ছিন্ন স্বধাকরের কণানের উপর পড়িল।

স্বধাকর বলিল, “বাবা, তোমারও কষ্ট হচ্ছে। তুমি আমাকে কত ভাববাস, তা’ আমি জানি। বাবার বেহ

পাই নি, মার রেহের বিকাশ দেখি নি, তা'র পর দীর্ঘ নিখাল
কেসিয়া হৃদয়কর বলিল, “কিন্তু তুমি সব শূন্য পূর্ণ করে
গিরেছিলে—কোন অভাব রূপ নি।” দেবেছিলাম—”

সহসা হৃদয়করের মনে হইল, তাহার চরণে দুই বিশুষ্ক
পতিত হইল। সে ভিত্তাসা করিল, “বাবা, পা'র কাছে কি
কেউ বসে আছেন?”

হৃদয়কর বখন বাড়ী হঠতে আসে, তখন কল্পনাবদ্ধ
বলিয়াছিল, “আমি বা'ব, হৃদয়কর।” মার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া
সে হৃদয়ের বিষয়—বাহিত ভাব দেখিয়া সে “না” বলিতে পারে
নাই।

হৃদয়কর বলিল, “না।”

হৃদয়কর বলিল, “বাবা, তুমি ত জান আমার আর
বেঁধেছ না।” তখন—এর মধ্যে ঠেকে নিয়ে বিব্রত হয়ে
পড়বে।”

হৃদয়কর কিছু বলিল না।

শেষে লক্ষ্য করবার চেষ্টে ডাক্তার একটা কথা বলিবার
এক হৃদয়কে ডাকিলেন। হৃদয়কর বাহির হইয়া গেল।

হৃদয়করের প্রতি তখন অতীতের রাত্রে চিরন করিতে-
ছিল—কত পুরাতন কথা এক সঙ্গে তাহার মনে উন্মিত
হইতেছিল।

সে কল্পনাময়ীকে বলিল,—“তুমি এসেছ। ত্রিশ বছর
আগে, যি আমাকে কোথাও যেতে হ'ত, তুমি সাগ করত,ে,
কিন্তু তবুও সব এগিয়ে দিতে।” সেদিন অনেক দিন গেছে।
“আর এ বহাব্যাক্ত—এতে ত কিছুই সঙ্গে নিতে হবে না।”

কল্পনাময়ী ঐ পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; তাহার পর বলিল,
“তোমাকে না নিয়ে আমি কিরকম না।”

“তা” হবে না। আমি যে কিরকম উপায় গ্রহণ নি,
কল্পনা।”

আজ হৃদয়করের কথার সেই তরুণ জীবনের তাৎপর্য্য
হুত। কল্পনাময়ীর হৃদয়ের মধ্যে বাধা বেন হুঁরিয়া হুঁরিয়া
প্রবেশ করিতেছিল। সে বলিল, “কেন তুমি এ কাজ করলে?
আমাকে কথা করত পাঠালে না?”—সে হৃদয়করের রোগ
ঘরের মধ্যে হৃদয় লুকাইল—কাঁদিয়ে পালিল।

হৃদয়কর বলিল, “আবার অনেক কাছে তুল ফুকেছ; পেন
কাজে তুল ফুত না। আমি তোমার উপর সাগ করি নি।
বন্দই সাগ করেছি, তখনই সাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা
তাকে ডাকিয়ে নিয়ে গেছে। অভিমানকে জর করতে পারি
নি। চর ত অস্ত্র আশা করেছিলাম, তাই নিজেকে আমি
কথা করতে পারি নি। তাই নিজের উপর প্রতিশোধ।”

হৃদয়কর হাঁপাইতে লাগিল।

কল্পনাময়ী হৃদয়কর রোগঘরের মধ্যে হৃদয় ভিত্তিয়া কাঁদিয়ে
লাগিল।

হৃদয়কর ফিরিয়া আসিয়া নিখিল হানে বলিল।

খানিকটা বিশ্রামের পর হৃদয়কর হৃদয়ের হাত ধরিয়া
ডাকিল, “বাবা!”

অক্ষকলিত কণ্ঠে হৃদয়কর উত্তর দিল, “কি বাবা?”

হৃদয়করের হাত তখনও কাঁপিতেছিল; সে কোনরূপে
হাত তুলিয়া হৃদয়করের হৃদয়ের উপর দিল। হৃদয়কর হৃদয় নামাইয়া
পিতার হৃদয়ের কাছে সরল। হৃদয়কর হৃদয় লগাট চুপ
করিল। তাহার পর সে কবি টেনিসনের একটি কবিতার
কয়েকটি রূপ আবৃত্তি করিল :—

“হৃদয় আমার অস্ত্র—সংসারের দুটে,

আবার আমার ওই দিক দিকে উঠে।”

হৃদয়করের মনে বেন তখন রূপভাষীত সোকের লক্ষ্য
করিতেছিল। সে বহুক্ষণ কথা বলিল না। হৃদয়কর এক
একবার লক্ষ্য করিতে লাগিল—বক্তার স্পন্দন সহসা বন্ধ হইয়া
যায় নাই ত?

প্রায় এক ষষ্ঠী পরে হৃদয়করের বহুক্ষণ আনন্দ হইল—
সে শুভা-বহুক্ষণ। সে কল্পনাময়ীকে বলিল, “কল্পনা, তুমি হুত
সাগ করছ—আমি এখনও বিব্রত করছি। কিন্তু আর
বেঁধেছ না।”

কল্পনাময়ী কিছু বলিল না, কেবল হৃদয়কর তাহার দুর্দশ
পনের তলে কল্পনাময়ীর হৃদয়ের চাপ অমূল্য করিল। আর
তাহার মনে হটল, সে বেন তাহার অধরের স্পন্দন অমূল্য
করিল। এ কি মতা?

টগর পর হৃদয়কর ডাকিল, “বাবা!”

“বাবা!” বলিয়া হৃদয়কর উত্তর দিল।

“এই বার।—তোমার হৃদয় আর ভাল বেধতে পারছি
না।”

হৃদয়কর হৃদয় করিয়া পিতার হৃদয়ের পাশে রাখিল—
তাহার অস্ত্র উৎস তখন মুক্ত হইয়াছে।

প্রায় অর্ধ ষষ্ঠীকাল পরে ডাক্তার হৃদয়কে ডাকিলেন
“আর কেন?”

হৃদয়কর এক বার হৃদয়কাথ বেনাবা ডাকিল—“বাবা!”

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

তাহার পর হৃদয়কর আপনাকে লগত করিয়া বাঁকে বলিল,
“না, উঠ। বাবা জী'র লগত শেষ উৎস থেকেও মুক্তি দিয়ে
গেছেন।”

সে কল্পনাময়ীর হাত ধরিয়া তাহাকে লগাইয়া আনিবার
চেষ্টা করিল। কল্পনাময়ীর সংসারের শেষ হৃদয়কর লগাইয়া
পড়িল। [সমাপ্ত]

আম্বাচেন্দ্রর বেঘনিবিড় অশরাস। একখানি কোমল কাপ সঙ্গল বেঘের ছোয়ার, সৌন্দর্য কণিকাতা সংগঠিত উপর বিস্তৃত্যর আবরণখানি যেনোয়ন হইয়া উঠিয়াছে। কলেক ফেরৎ যীরাগ পাড়ী বাড়ীর শাল গুলকী ছড়ানো রাস্তাটি অতিক্রম করিয়া, ড্রাইভরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পান্ডিতেই যীরা অতিথ্যের আগনিট দ্বার পুত্ৰিয়া নামিয়া কিতরে চলিয়া গেল। বাড়ীতে তাহার শালভূত থোন বসা বেড়াইতে আসিয়া ক'দিন হইতে এখানেই ছিল, যীরাগ বা বসিয়া তাহার সখে গল্প করিতেছিলেন, যীরা তাহার স্বাভাবিক চক্ৰপনে অত্রে চুকিয়াই ভিজাস। করিল, পাহ না কখন এল না!

—পাহ না? পাহ না কোথায়? কে বসলে পাহ এসেছে?

—হাঃ রে, ঠাই! করছ বুঝি? আমি নিজে দেখলাম পাহবাকে।

যারের বিষয় উত্তোত্তর বর্ধিত হইতেছিল, করিলেন, আর কাউকে দেখেছিল চহত, পাহ কই? পাহ ত আসে নি, কোথায় দেখলি? বিষয় যীরাগও কিছু কম হর নাই, কলেক হইতে কিত্রিবার সময় হঠাৎ একবার একটা রাস্তার মোড়ে থাকে চোখে পড়িল, সে কি তবে পাহ প নর? কি অসম্ভব ব্যাপার! হুজনে চোখোচোখি হইতে যীরা হুপ বাড়াইয়া তাহাকে ডাকিতে বাইতেই বৃহর্ষে সে হঠাৎ একটী গলির ভিতর আবৃত হইয়া গেল,—গ্রাসি নর, বঙ্গ নর,—বিলের আলোব এখন পরিকারভাবে তাহাকে দেখিগাও যীরা তাহাকে চিনিতে কুল করিলে? সমস্ত রাস্তাটা যীরা ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, বাড়ী কিরিয়া তাহাকে হঠাৎ চমকিত করিয়া দিতেই পাহুর এই মুকোচুরি বেলা! কিম্ব তু এ পাহ না নর? বৃহর্ষে যীরাগ বিম্বের খোর কাটয়া গিয়া অনেকগুলি কথা মনে পড়িয়া গেল, সেট মাটিক পরীক্ষার আগের দিনের রাত্রিটার কথা। কিম্ব নিজেকে সতর্ক করিয়া লইয়া করিল, তা হোং মা, আর কাউকেই কুল করছি—কিম্ব হাঃ তোমরা যে সব বসে রয়েছ

না, এগনো চাটা বসে না বুঝি আর? পাচটা বেতে গেল বে।

বসা করিল, তুই কাপড় ছেড়ে আস না, তোব অস্ত্রই ত আমরা বসে আছি।

—এই যে মাছি, কতজন আর মাগলে আমার! বাবার টিকিন টিক সত্ব পেছল না?

নিভাস্তই সহজভাবে কথাগুলি বলিয়া যীরা তাহার খর গিয়া চুকিল। আরো যিনিট পনের পরে বসা তাহাকে এ ঘর হইতে হুই তিনবার ডাকিয়াও কোন লাড়া না পাইয়া, বখন পদ স্ফাইয়া যীরাগ খরে চুকিল, তখনও যীরাগ কাপড় ছাড়া হর নাই, টেবিলের উপর বোটুক ও বটখানি রাখিয়া নিভাস্তই অস্বমনকভাবে টেবিলের পাশে পাড়াইয়া, হাতের শেলিগট টেবিলের উপর ঠক ঠক করিতে করিতে চকু ছুটি বুনিয়া বেন অস্ত্রের পরীকৃতন এনেণে কিসের সন্ধান করিতেছে।

—ওরে যীরা।

—কি তাই?

—বেশ ত! কি করছিল তুই, ওনিকে চা তেল টেবিলে আমরা সব বসে রয়েছি, হুড়িয়ে ঠাটা তল হলে গেল বে!

—ওমা তাই নাকি? এই যে হয়ে গেল আমার বসা নি, ইংলিশের একেলর কিলের বেন চার একটা কাপকে নিজে বেতে বসেছিলেন তাই, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

বখারীতি হাসি-গল্প এবং রংস্তালপের সঙ্গে সঙ্গে চাপান পের হইল, তাহার পর চাকর ঠাকুরবের সলখাবার ইত্যাদি দিয়া যীরা একট পানের কি একট শাইন গাহিতে গাহিতে বাগানে নামিয়া গেল। বা রাস্তার তমারক করিয়া আসিয়া উপরের বাস্যগাও দিয়া সেলাই লইয়া বসিলেন, বসা একখানি জিটেকটিত নডেল হাতে যাবীর পাশে আসিয়া বসিল, কাছেই খেলায় রত তাহার গুলজিত গুলব পাচ বছরের পুত্রটির পানে থাকে থাকে তাকাইতে তাকাইতে যীরাগ মা'র বহর্গনের পুর্ষের একটি স্বাতি চকু সঙ্ঘে লাগিয়া উঠিল।

বাগানে গেটের কাছে কাছেই ঘুরিখা ঘুরিখা মীরা অত-
মনস্ক মনে হুঁই বেশি তুপিয়া ছাচল ভরিয়া তুপিল, মাপী পুরে
বসিয়া নতন ফুলগাছ লাগাইবার ৩৩ মাসী হুঁড়িতেছে, মাঝে
মাঝে উপরে দুখ তুপিয়া আকাশের পানে তাকাইতে তাকাইতে
হাতের ভোর তাহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, মীরা মাপীর
দুইয় অতুলন করিয়া উপরে তাকাইয়া বেলিল, তার পানের
ছড়ানো যেখণ্ডি মাথার উপরে ক্রমে ক্রমে পুঞ্জীভূত হইয়া
আকাশটিকে ভাঙাভাঙ করিয়া তুলিয়াছে, যে কোন মুহূর্তেই
নাশিয়া আসিয়া পুনিবাসিকে ঢালিয়া দিবিয়া শুঁড়ি করিয়া
কেদেতেই যেন তাহার সকল আত্মজন। লুপ্তভূতে বানিক-
কন আকাশের আসন্ন বষণোদ্বৈ তমটে কাল যেখণ্ডির
পানে তাকাইয়া থাকিয়া মীরা আবার বীরে বীরে গেটের
কাছে আসিয়া পাড়াইল। রাত্রার কত শোক, জীত সন্ত্র-
দুষ্টিতে উর্ধ্বে আকাশের পানে বারবার দুখ তুপিয়া দেখিয়া
সকলেরই চরণের গতি বাড়িয়া বাইতেছে, বাহিরের ফাটের
আকর্ষণে যে দেখানে গিয়াছিল আসন্ন রাত্রির নাকড় কড় বৃষ্টির
সম্মুখীন সকলকেই গৃহে তাহার কুস্ত্র আগ্রহটুকু কণা মনে
করাগিয়া বিগাছে। একটি পুশিত বক্করবীর আড়ালে,
মীরা রাত্রার বাকুল অন্তার পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া
পাড়াইয়া রহিল,—মনটা কেন যেন কি রকম হইয়া উঠিয়াছে,
বেংলা বনের এই ঈশল জাগরণ স্পর্শটা বাহ্যের মনটার
কি বিশিষ্ট একটা বিরসতার সৃষ্টি করিয়া দেয়!

গেটের বাহিরে বেকির উপর ঘাসোয়ান বসিয়া ছিল,
পিওন আসিয়া তাহার হাতে একটি চিঠি দিয়া গেল।

একখানি পোটকার্ড, ফুলপুর হইতে মুরেন্দ্রনাথের লেখা
চিঠি, মীরা এক নিম্নাঙ্গে চিঠিখানি পড়িল। মুরেন্দ্রনাথ
দিখিয়াছেন, পুরের ব্যবহারে তাহার রুখ ও কোরের আর
মীরা নাই, পরীক্ষার অকৃতকাণ্ডতার শঙ্কার সে এবার আর
কিছুতেই তাহার মাথের সম্মুখে বাইতে পার্বী হইল না, হুতরাং
বাধা হইয়াই এবার তাহাকে তাহার নিজের গৃহে রাখিতে
হইল। তাহার পর আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া দিখিয়া-
ছেন, পুত্র যদিও তাহার, তথাপি তাহার জন্মাবধি এককাল
পর্যন্ত তাহার কোন তার তিনি গ্রহণ করেন নাই, সে তার
গাঁহার হাতে ছিল পাহর সেই মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ হইতে
এখনও সে বঞ্চিত হইবে না, ইয়াই তাহার আশা।

ককনি:খাসে সেইখানে পাড়াইয়াই মীরা বারবার করিয়া
কতবার চিঠিখানি পড়িল, পাহর না এইবারে তাহারের আশ্রয়
শতাসত্যই ছাড়িয়া গেল।

বাড় তাগই হটল, বাবাও আত্মকাল আর পছন্দ করিতেন
না যেচোরাকে।

চিঠিখানি মাপীর হাতে মার কাছে পাঠাইয়া দিয়া, মীরা
পুরণী হাতে মাপীর পরিত্যক্ত কাগজে বসিয়া গেল।

গুঁড়ি গুঁড়ি হুই পড়িতে পড়িতে কখন এক সময়ে প্রবল
বেগে বর্ণন আরম্ভ হইয়া গেল, মীরা তবু উঠিল না, মাপী
আসিয়া সবিস্ময়ে ছই তিনি মার পুরণী চাহিয়া চাহিয়া, অবশেষে
সম্মুখেই একটা গাছতলায় পাড়াইয়া কোন প্রকারে নিজেকে
প্রবল বৃষ্টির দ্বারা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বধ্যালাগা ছেঁটা
করিতে লাগিল। মীরা কিন্তু ভিত্তিতেই লাগিল। অবশেষে
রমা এখন ছাড়া মাথার দিবা কাছে আসিয়া পাড়াইল, মীরা
দুখ তুপিয়া চাহিয়া নিতান্তই ছেদেদাগ্রয়ের মত হাসিয়া
কহিল, ভিত্তিতে কি চমৎকার লাগছে রমা দি।

—হী, চমৎকার লাগছে, কি যেসেই তুই হয়েছিল মীরা !
জানিবে বাপু, গুঁড়ি, ফুলটল ত সব গেছে একেবারে, এখন এই
একগোছা ফুল গাতিরের শুকুবে কি করে? মাপীমা বাপু,
আমার আদরে মাথাটি তোর খেয়েছেন একেবারে।

—না গো না, মাথাটি ঠিকই আছে, চল, ভরে জগজাখ,
তুইও পাড়িয়ে পাড়িয়ে ভিতছিল? বা, বা, হয়ে বা।

মাপী তাহার বসেই তাহার বহনখ্যাক লুইটি বুলি
উচ্চারণ করিতে করিতে রয়ের দিকে ছুটিয়া চলিল।

ছই বোনে ছাড়া মাথার দিবা ক্রতপনে বারাগার আসিয়া
পাড়াইল, রমা ছাড়া বন্ধ করিতে করিতে কহিল, মাপীমা ত
কেট (faint) !

—কেন?

—পাহর বাবার চিঠি পড়ে', তুই পড়িল নি সে চিঠি?
মাপী তও দিক থেকেই নিয়ে গেল।

—ওঃ! পাহর মার বাবার চিঠি? তা কি হয়েছে?
বন্ধ হয়েছে ত, কতদিন মার পরের বাড়ী থাকবে? ওরই কি
তা' ভাল লাগে নাকি?

সবিস্ময়ে রমা বাড়ি ফিরাইয়া মীরার পানে তাকাইল।
অবিচলিত ভাবে পাড়াইয়া মীরা হাতে জড়াইয়া জড়াইয়া

চুলের ভল বগাইবার জেঁটা করিতেছে, বধা কহিল, আশ্চর্য
রকমের পাখা ঘেরে তুই মীরা, আবারই কেন লাগছে, কত
ছোট খেতেই বেখে আসছি ওকে এখানে, কত আপনায় মত,
আর তুই বলছিলি, কি আর এমন হয়েছে তাকে! তোর
একটুও লাগে না?

মীরা মূখ তুলিয়া হাসিতে লাগিল। বধা বিরক্ত হইয়া
কহিল,—খাম বাপু, হাদির যদি তোর আর মাথাবুড় কিছু
থাকে! চল ওপরে, কাপড় ভাষা ত সব একবারে গেছে
ভিজে, সর না হলে হয় এখন।

উভয়ে নিঃশব্দ উপরে উঠিয়া গেল, বাজা ওয় না তখনও
সেই একই ভাবেই চিঠিখানি হাতে বসিয়া আছেন, কব্রার
পানে তাকাইয়া কহিলেন, দেখেছিল ওয় কাওখানা বীক।

মীরা কাছে আসিয়া পাড়াইয়া চিঠিখানা হাতে লইয়া
কহিল, তাকে তুমি এককম করছ কেন মা, বাধে না ও কোন-
বিন নিভের বাড়ী?

—তা বলে এখন গিরে একলা থাকবার ওয় সময়
হয়েছে? কি বে তুই বলিস!

—ওর চেয়ে ছোট বয়সে ছেলেরা বিনেলে বোড়িএ দিয়ে
থাকে না মা? তা ছাড়া পাঠবে তুমি চিরকাল ওকে নিজের
কাছে রেখে নিতে?

বধা তাকা গিয়া কহিল, যা: যা: তোর আর লক্ষ্যী কংতে
হবে না এখানে পাড়িয়ে, জলে যে বাজাও! দিজে গেল
একবারে, বা বাধরুমে গিরে ছাতপালের কাদা বুঝে কাপড়
ছেড়ে আয় যে যা, আমি ততক্ষণ একটু চা করি, বা কুস্তি
নেমেছে!

বহুকাল অজীত হইয়া গেলে মীরা বখন বাধরুমে হইতে
বাহির হইয়া আসিল, বাজা ওয় এক ছায়েল মা তখন একটি
ইতিফ্রারের গুইয়া আছেন, আর হুটকালের কেটনী স্টোভের
উপর বসিয়া রাবিয়া রমা তাহার পাশে বসিয়াই তাহার অর্ধ
দশাণ্ডি টিউকটিও নভেলটির খুইই একটা আতঙ্কজনিত
বটনার উপর উৎকর্ষিত ভিত্তি মনোনিবিষ্ট হইয়া আছে, বার
গোশার শব্দে মূখ তুলিয়া মীরার পানে চাষিয়াই সে চমকিত
হইয়া কহিল, কি সর্বনাশ! জোখ মূখবে একেবারে মুসো মুসো
হয়ে উঠেছে নীক, কলতায় বসে এক বটা ধরে খুঁ বুজি
নেবে এলি?

মীরা উত্তর না দিয়া কুড় চাষিয়া কাপড় বেনিতে চাষিয়া
গেল। মা মূখ তুলিয়া একটাবার দেখিয়া লইয়া কহিলেন,
ওর কি পুষ্টি আছে কিছু! ওই রকমই করে ও বখন যা
ইচ্ছে।

ওপানের পিছনের বাজা ওয় কাপড় বেনিয়া দিয়া, মীরা
খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পাড়াইয়া বাহিরের নিবন্ধকালো
অন্ধকারের ভিতরে বৃষ্টি কব্রার একটা কখন রূপের পানে
তাকাইয়া গহিল, বাড়ীতে কোন কার্যকর না থাকিলে
বাগানের এই নিকটার আলো লাগাবতঃই আসানো হয় না,
ওদিক হইতে আলো পাড়িয়া বেখানটার অন্ধকার লাগাত
একটু বাধা হইয়াছে, সেই দিকে তাকাইয়া মীরা দেখিতে
লাগিল, বেওদানের পাশের গোটােকতক বেনাক গাছ, কয়েকটি
পুষ্টিত অল্প সুলের গাছ মাঝটি একটু মোটে হেলাইয়া কেন্দন
নিঃশব্দে তখন হইতে কেবল ভিত্তিগাই চাষিয়াছে। মীরার
মনে মনে উদ্বাসের ক্ষুদ্র বেধনা বোধ হইতে লাগিল, মনে
হইতে লাগিল, মানুষের অজ্ঞাত যে একটি মূলগ্রাম দিবারায়
ইহাদের ভিতরে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহারই স্কিত
লকল বেননা কি এক একদিন এমনি করিয়া নিঃশব্দে করিয়া
পড়িতে থাকে? পৃথিবীর এত তল, এত শোকবা, এত সুল
ফল হাসি নাচ গান প্রকৃতির বৃকে চতুর্পার্শ্বে ছড়াইয়া
রহিয়াছে, কিন্তু বাধাও ত কম নহে!

চা খাইতে খাইতে মা ও রমা বখন পাতুর বিধানেই কথা
কহিতেছিলেন, মীরা তখন তা পান শেষ করিয়া সমার পুষ্টি
মটর পাশে গিয়া বসিল। মটর তাহার সমাজিকিত রেল-
পাড়টি লইয়া গভীর গবেষণার মত, পাড়ার চেয়েও পাড়িটির
ভিতরে ইজিনের যে বাশ্টি আছে, সেইটিই মটর মনোহরণ
করিয়ছিল বেশী এবং কি প্রকারে সেই বাশ্টিই বাহির করিয়া
আনা যায় তাহাই হইয়াছিল তাহার চিন্তার বিষয় এবং সেই
মটরই মাঝে মাঝে কখনও মরোজার চৌকাঠে কখনও
টেবিলের পাখা বা বাজা ওয় বেশিএ পাড়িটি ঠক ঠক
করিয়া নাকিয়ার জেঁটা করিতে করিতে প্রায় কৃতকাণ্ড হইয়া
আসিয়াছিল। মীরা গিয়া সেইখানে বসিল, তাহার পর
প্রায় আধ বটা গরিয়া ছেলেরটির দখে খেলা করিয়া, কখনও
তাহাকে হাসাইয়া, কখনও কানাইয়া, সম্মুখোপবিষ্ট অপর
ছুইটি প্রাণীকে বাস্ত করিয়া তুলিয়া মীরা নিজের পৃথক পলাইল

এবং স্নেহে পিতার গাড়ী খামিয়ার নকশা না পাওয়া পর্যন্ত আর বাহির হটন না।

[১৮]

দিন ২য় বার পাতের কথা।

কলেক্ট হইতে কিরিয়া স্নাতক পাত্র চা খাইয়া, বাগানের গাছতলায় উঠি চোখাবিটে শুইয়া একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। লগ্না স্নাতকের উপর যেটির খামিয়ার নকশা এবং তন্দ্রাকৃত্তিতে একটি বড়বন ভূমিমা চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। গাড়ীর উপর হইতে কে হাসিয়া কহিতেছে, ঐ যে পাত্র না বৃদ্ধ না, গাছতলায়! পাত্র না ও পাত্র না।

পাত্র সত্যকিতে সবিজ্ঞে অশ্রুসর হইয়া আসিয়া গাড়ীতে নতুনসেবে দাঁড়িতে পারিল, এই সময়ে এই অবস্থায় একবারও সে হঠাৎসে আপা করে নাই, কম্পিত হস্তে দরজা খুলিয়া সে নতুন পত্রটি গ্রহণ করিল। না অতি বীর কোমল কণ্ঠে কহিলেন—পাত্র! তারপর কস্তার পানে কিরিয়া কহিলেন, নার বীত, চল ভিতরে বাই। বাহির পত্রাতে বীরা নামিয়া হাসিয়া কহিল, পাত্র না ত সেখনি গাছতলায় বেশ একটি সুস্থ স্ত্রীর সত্যকিতে নিবে তোলা কবি হয়ে বলে আছে, সেই পানটা তান ত'—সেই যে—“সুস্থ স্ত্রীর দ্বারা অতিথি এলছে আছে—” না হাসিলেন, পাত্রও হাসিতে লাগিল এবং এই হাসির ভিতর দিয়াই ব্যাপারটা সহজ হইয়া উঠিল।

—বাঃ বেশ ত' প্রকার সুলভসি, সুলভানীটিও চমৎকার, বাঃ, এত চমৎকার করে' কে সামিয়ে রেখেছে পাত্র না? ভূমি?

—কেন, আমি কি সাজাতে জানিয়ে না কি কিছু?

—ঠা। ভূমি হই কি, মাদী সুল সুলে এনে সামিয়ে রেখে গেছে, আর তোমার হাতটি এখনো এতে পড়ে নি, নিচ্চ, হাত সন্মত রয়েছে, তোমার হাতটি কই পাত্র না?

—এই যে সেখ না, ভাসিনি এখনো, ভূমি যে ত্রিবাটি বেঁধে দিতেছিল, সেখ বীত, এখনো তেমনি চক্চকই রয়েছে।

—ওবা, তাই ত! বীরা হাসিতে লাগিল।

না চেয়ারে বসিয়া এদিকে ওদিকে তাকাইয়া দেখিতে-ছিলেন, কহিলেন—হ্যাঁ পাত্র কেন কি কোন ছেলে হয় না, আর তার জন্যে বাড়ী ঘর ছেড়ে পালার না কি লগ্না?

পাত্র এক পাশে দাঁড়াইয়া নিরুপায় ভাবে হাসিতে লাগিল।

—এসেছিল, তা একখানা চিঠি পত্রার বেই, তোমার বাবাকে চিঠি দিবে এ বাড়ীর ঠিকানা জানাশুন, ক'দিন মনটা কি ছুটুকুটি করেছে! তারে পাত্র, কি করে চলে এল, একটা মাত্রা পত্রা হ'ল না তোমার জামানের মত?

—না বা তা নয়, কি যে ভূমি ব'লছ লগ্না—

পাত্রের পদার বস কাপিয়া বস হইয়া গেল, কিন্তু অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে তোর কপিয়াই সে কেবল হাসিতেই লাগিল। না কহিলেন, তা নয় বহি তবে চল জামার সঙ্গে, আমি তোকে নিতেই এসেছি।

পাত্র বিপর হইয়া ছল করিয়া পড়াইয়া গেল। না কহিলেন, চল তবে, বই টাইগলো বেয়ে' টোমে নিবে উঠে পড়, আর কিছু বেবার দরকার নেই।

—না বা, আমি বাব, তবে এখন নয়, দিনকতক থাকি না যা একটু ঘুরে, একটু অভ্যাস হোক, ভূমি ছাড়া যে একমত জামার চলে না সেটা একটু সইয়ে নিই।

কলেক্ট আর্দ্র হয়ে না কহিলেন, সইয়েই যে নিতে হবে তার এখন কি কথা আছে, বাছ।

—না বা, মনে কর ঘুরে বিদেশে কখনও যেতে হলে, কি কই তখন হবে বল ত', এখন থেকে, তোমার কাছে কাছে থেকেই সইয়ে নিই, এখন ইচ্ছে হবে, বাব আসব—এই শু এতটুকু স্নাতক না, কতকগুলি বা যেতে আসতে পারেন, কত ছেলে কত ছোট বয়সে বোড়িৎ ফুলে বাস, তাদের মা'রা কি করে থাকে না?

কটে চক্কর জল সন্মত করিয়া নিয়া না কহিলেন, তুই বড় পাখান পাত্র।

পাত্র স্নিগ্ধা আসিয়া দার চেয়ারের হাতলে বসিয়া কহিল, আমি তোমার দ্বন্দ্ব অবাধ বুঝে ছেলে না।

যে জল না কটে সন্মত করিয়া গানিয়াছিলেন, এইবারে চক্ক কাটিয়া তাহা বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল; তাকি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, চল তোমার স্নাতকের বেঁধে আসি।

বাড়ীর চারিদিকে দেখিয়া, ঠাকুরের স্নাতকের বালন কোণে হাঁকি ককাই লগ্না কহিল পরিবার পরিচ্ছন্নতা বিধে

মাকুর চাকরকে দ্বিগুণ করি। তবে বাস বাস উপবেশ দিয়া, যা দিগলে পাহুর শরদকে প্রবেশ করিলেন।—দুপায়ান ব্রহ্ম একখানি পাখরের উপর বসিল একখানি ক্ষুদ্র শব্দ। এলো-বেলো ভাবে পাঠ্য রহিয়াছে, সমস্তই অনুষ্টি অমনোযোগিতায় প্রত্যেক পাঠ্য, চাকররা এটী দিকটার বেধ করি একবারও মনে না—মায়ের বক্ষপানি আবার আশোভিত হইয়া উঠিল। আরও মিনিট কয়েক পরে এটী দিকটার সমস্ত বায়ুটা এখন টিকি হইয়া গেল, যা তখন কহিলেন, কিন্তু পাহুর আজ ত তোকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে, বাড়ীতে আর কাজ আছে একটি।

মুহুর্তে একটি গজাব হইয়া উঠিয়া পাহুর কহিল, কিসের কাজ যা, পাট্টাটী কিছু হুই?

—হ্যাঁ তোমার কাকাবাবুর ইচ্ছে ক'জনকে ঢেকে এনে একটু আখোব-টামোল করা। চারটে কাজে, সবই ত আগ নেই বাবা, একুবি যাওয়া বয়সের—পাহুর মনটা আবার একটু বিস্তারিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু নিতেকে সংবত করিয়া লইয়া কহিল, চল।

বজ্রশাকের বাড়ীর উৎসব যেমন হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে, লাজে লজ্জার বা অস্ত্র কিছুতে কোন দ্রুত কোথাও কিছু নাই, সজ্জার আলো জলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট বড় কত কবরের মোটর আসিয়া বাগানের প্রান্তে থাকিতে লাগিল, শেতলায় বাবা তার চূপ করিয়া গাড়ীয়া পাহুর নীচের এই জনন্যপণের পানে তাকাইয়া রহিল।

গৃহে আসিয়া পৌঁছিবার পথ যথা আনন্দ-কলবল তুলিয়া মঙ্গলমারোহে পাহুরকে অভ্যর্থনা করিয়া দিয়াছে, হাসিয়া কহিয়াছে, দাদীয়া তোমার এই ছেলটিকে উল্লু দিয়ে দাঁপ বাজিয়ে বরণ করে নিতে হবে নাকি?—এমনি করিয়া হাসি ঠোঁটের ভিতর দিয়া বিবরটি লক্ষ্যেই রাখা করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু পাহুর মন তখন হাঁকা হইল কই! হঠাৎ হইতে পারিত, কিন্তু আজিকার উৎসবের এই বিশুল আয়োজন, লগপত বিবরিতের আনন্দ-উজ্জ্বল পাহুরকে ভিতরে ভিতরে আবার কিছাটী করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পরামর্শের লজ্জা যে কত গভীর, প্রতি মুহুর্তে সেই কথাটিই মনের মধ্যে ভাগ্য টগবগ করিয়া দুলিতেছে।

বাড়ী হইতে আসিবার সময় টেমপেন যে কলসানীটা বেধিয়া বোরা এত পূর্ণা হইয়া উঠিয়াছিল, সেটি এবং বাগানে বসত ফুল ফুলিয়াছিল, সবগুলি তুলিয়া একটা ভাণ্ডার দিলভারের ফুলের মোটে সাফাইয়া আনিয়া বোরা তাকে দিয়া পাহুর কহিয়াছিল, এই নাও মোর আতিথ্যের উপহার, ফুলফুলের এসেছিল, ফুলফুলের বসত ফুল ফুলেছিল সব নিয়ে যাও। বোরা একবে খানিকক্ষণ পূর্ণ হাদিল, তাহার পর ছুই হাত বাড়াইয়া পাহুর হাত হইতে সেগুলি তুলিয়া লইল। বাড়ী আসিয়া বোরা নিজের কাজ দিয়া আবে শেওঁপকে লাজাইয়া রাখিল, তার পর অস্ত্র কাজে আসিয়াছে, পাহুর তাহাও লক্ষ্য করিয়া বেধিয়াছে, তবু পরামর্শের এ বেননা তাহার কেন! চিৎ-হাস্যময়ী, চির আনন্দময়ী বোরা তবের আনন্দে তাহাকে ত অবশেষে কবে নাই, মায়েরও চিবসিনের বেগের এটাই বাতিক্রমও ত প্রকাশ পায় নাই, তবু তাহার এত কৃপা এত সজ্জা কেন!

নীচে ছোট ছোট যেয়েদের ছোট একটা গহিনাটা মনিবের কত বাগানে একটি ঠেঁক বাধা হইয়াছে, নির্দিষ্ট অধ্যাপিত পুস্তক এবং মেয়েরা তাহাটী লক্ষ্যে নিজের নিভেচ ভাষায় দিয়া বসিতে লাগিলেন, মাঝখানে শাল সাধু দিয়া পুস্তক এবং মহিলাদের বসিবার স্থানটি বিভিন্ন করা হইয়াছে। অভিন্ন হইতে এখনও কিছু দিলম্ব আছে, তাই বিবৃত বাগানখানির অস্ত্র এক পাশে চেঁচায়ে বসিয়া থাওয়ার পর কহিতেছিলেন, ঠাণ্ডা এখনও দেখানে বসিয়া আছেন। পাহুর নীচে নাথিয়া বাগানখানির এতকৈ গভীরে গিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বীরাণ তরুর বক্ষায় অনেকটী আসিয়াছে, স্পন্দিত বেনে, দৌলখো, চাসো মালাপে বাগানের এক প্রান্তে ইহায়া আনন্দোজ্জ্বল বসাইয়া দিয়াছে।

এই পরিবারের বৃদ্ধ প্রৌঢ় বা যুবক বন্ধুদেরও আজ অভাব ছিল না, ঠাণ্ডা পরস্পর কেহ বা রামনৌতিক, কেহ বা সামাজিক কেহ বা অস্ত্র কোন বিবরণ, এখানে ও ধার্য বসিয়া তর্কে বিতর্কে মত্ত ছিলেন। কোথাও বা একটি মিষ্ট হাসি টুকরা ভাসমান, কোথাও বা সঙ্গীতের একটু স্বর, কিন্তু পাহুর কোথাও কোনখানেই আগমকে প্রতিষ্ঠিত কহিতে পারিল না, সকলের তুলনায় নিতেকে তাহার প্রতি মুহুর্তে এত

বেশী ছোট, এত বেঁট ছোট কোণ হইতে লাগিল যে, কোথাও দেখিতে পড়িল না।

মোরাব না ইচ্ছা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, পাছ শরীর কি ব্যাপার পাছের বাক ?

শ্রাও স্বরে পাছ কহিল, যেমন বাপও লাগতে না বা, পাছ, কিছু খেয়ে বড়ী চলে যায়।

—না, না, না, বাড়ী আস ঘাবি কি ! চমকিত একটু খেয়ে খেয়ে ঘরে গিয়েই হুট করে থাক, বিছানা আঁধি করিয়ে রেখেছি।

কিছু খাওয়া পাছ বিছানার ভেঁটা, বাসিন্দাটিকে মাথা ভাঁজিয়া পড়িয়া রহিল। মোরাব না আদিয়া সমস্তে পাছের নশাটে একবার একটু প্রসঙ্গ করিয়া গেলেন। শরীর খারাপ কহিতেছিল, সঙ্গে নহে দেখিয়া নিশ্চয় মনে বাহির হইয়া

গেলেন। পাছ চাহিয়া দেখিল, একটু কাছে রাখিবার জন্য, ঐ কোমল কোমলপানির উপর ক্রান্ত মাথাটি একটু দিয়া রাখিবার জন্য, পাছ মনে একটি তীর আকাজ্ঞা জাগিল, কিন্তু বুঝ হুটীয়া কিছু বলিবার আগেই না চলিয়া গেলেন।

কে জানে কেন আজ পাছ মনে হইতে লাগিল, বড় মেহ, বড় ভালবাসা বা বড় আকুলতাই থাক, তবুও পরের মা পরেরই মা, নিজেই নহে !

পরের মা যে কোন রকমেই নিজের মা হইয়া যাইতে পারে না, একথা মনে পড়িয়া পাছের চমক জাগিয়া কল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নীচের বাপান হইতে কতকগুলি স্মৃতি হারি কছার ও শিখানোর স্রব চলিয়া আসিতেছিল, অল্প-মনস্কভাবে সেদিকে কাণ রাখিয়া গভীর রায়ে পাছ ঘুমাইয়া পড়িল। [ক্রন্দন :

মধুমানব

—ত্রিশোঁরীসুনাথ ভট্টাচার্য

সত্যান্বিতাংক অসীম সন্তোষোক্ত রূপ-মোলে ওঠে ঘন ছন্দ, রসের মহোৎসবে ওঠে লীলা-উৎসব বলে কুলে হতে ওঠে বন্ধ।

লীলা-বাল্যকালে গড়ের চন্দন কর্তর স্বরি পড়ে বিধে,

মর্ত ওষধীকে কোলাহলি একাকার হতে ওঠে অস্তুরে নৃত্যে।

অন্তরঙ্গ-কুলপত্রের গলে বলে মানব রছিল মধু নীড় গো,

সংসার-কুণ্ডের কুণ্ডলা আদি সেখা মধুমানলাগি করে ভৌড় গো।

মধুভরা সংসার ছোটে মধুমাখার সংসার হোল গুণ-বন্ধিত,

মনস্কী হোল সৌন্দর্য অস্তুরে সত্যান স্বপ্নান পেল ডিবান্দীর।

মধুভরা কর্ণের প্রাঙ্গন হতে তারা ঘরে করে মধু নিজে ফিরতো,

মর্ত যে সেই থেকে হোল সেখা বর্ষের গুহস্তর হোল প্রেমভীর্ণ।

সেই আদি করি অস্তুরে মনী থেকে বিধে বহুচে মধু-বস্তা,

বোলে তরী-হিম্মাল বে সোন্ সে সোন্ সোন্ অস্তুরে

পূন ও কত।

বহু সো ভব নাই ফিরে ওই বৈশ্বংস উপাধিত ভীষনের কুলে,

বিধের বীড়ে থাকে ওই তারি আগমনী ব্যাকুলিয়া ওঠে।

বিদ্যাসিনে দ্বিখালে অনাগত সন্তির দীর্ঘ ওই বর্ষে গড়ে বিধে,

করে বস সিন্ধু পানি করে বুরা ও নাচে বদন্য নৃত্যে।

অজানার কোন্ পথে আসে বেবলনীত ছবিয়া ওঠে প্রাণ নিভা,

তাচারি ছন্দে কবি নছিন্দে ঐ গান ছনিন্দে শিরদাহিয়া।

মর্তের গুহস্তরে পুনঃ রসউৎসব বেশী নাই ঐ বাজে বন্দী,

ঐ শোনা বাহ মনস্কতার কুলকুল ডাক দেহ ওই ততপাশী।

ঐ বৃকে আসে বেবলজের স্তম্ভা গো চিত্তের মৌলপাশী

বিশ্বেশ,

নবজন্মের ঘাটে ভারী বৃগসন্তির বৃত্তির লাগে এসে ছিম্মাল।

পজা সন্তির দ্বি মরিয়া মহাকাল মনী তোলেন হোল রস-তরু,

ঐ নাচে রবি সোম ছনিত দাগা বোম নাভারণ খোয়াই বে

কত।

বিধের ভীষনের উবেগ ভেসে থাকে আন নবজন্মের বাত্মী,

কর্ণের প্রাঙ্গন হোক পুনঃ রসীন অবমান হয়ে আসে রাহি।

তমনার পত্নীকে আলোকের উৎসব পূলে বাহ ঐ বৃহি ঐ দাঁক,

নব্ধগাসিতোর ভেসে ওঠে নটরাজ কছার শোনা গেছে ঐ তার।

ঐ শোনা বাহ বুঝে তারি ভবভঙ্ঘরে নামে বৃহি মধুগুণ বস্তা,

হোল বৃগসিন্ধোল সে সোন্ সে সোন্ সোন্ অস্তুরে

পূন ও কত।

দেবজন্মের পিছে লুকাইয়া আসে ঐ ভাগনতমসের বর্ষ গো,

নব পাণ্ডারণ থেকে দাঁকা পুনঃ মনস্কী বস্তা তলে নামে ঐ বর্ষ।



नीलकण्ठः।

(वेणामी चित्र)

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(পূর্ণাঙ্গতঃ)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

(৪) কলেজ খুলিবার পূর্বেরই বাস্তবাবস্থা

১৮-৩৫ পৃষ্ঠায়, ২৮ তারিখের (১২৪১ বঙ্গাব্দে, ১৮ শাব, দুইবার) নিম্নে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (Lord William Bentinck) একতী নূতন 'মেডিক্যাল-কলেজ' খুলিবার আদেশ দিয়া সাধারণ নিয়মাবলী ঘোষণা করিয়াছিলেন। এখন যে সকল ব্যবস্থা করা হইল, তাহা এই :—

১। লর্ড বেণ্টিঙ্ক, মাইন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলীকে (Mountford Joseph Bramley কে) 'মেডিক্যাল-কলেজের' সুপারিন্টেন্ডেন্ট (Superintendent) নিযুক্ত করিলেন। ২৮ তারিখের তারিখে তিনি নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী ১ ফেব্রুয়ারী হইতে তিনি বেতন পাঠিতে লাগিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন ১০০০ টাকা ধার্য হইল। এতদ্বিধা, সাময়িক-বিভাগে থাকিলে তিনি যে বেতন ও ভাতা পাঠিতেন, তাহাও তিনি গ্রাপ্ত হইবেন।

২। ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডাক্তার এচ.এ.এ. গুডিৎ (Dr. H. H. Goodave) সাহেব, ডাক্তার ব্রামলীর সহকারী (Assistant) নিযুক্ত হইলেন। তখন গুডিৎ সাহেব মেমরীপুত্র ছিলেন। তিনি সেখান হইতে আসিয়া ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে মেডিক্যাল-কলেজের কাফতার গ্রহণ করেন। তাঁহার মাসিক বেতন ৬০০ টাকা ধার্য রহিল। ইহাও নির্দ্ধারিত রহিল যে, ডাক্তার ব্রামলী ও তাঁহার গুডিৎ কলেজ হইতে বাহিরে গিয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন না।

৩। পণ্ডিত হুসুসন ও প্রবন্ধের প্রণেতা: সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র ছিলেন। তৎপরে তিনি সেখানে অধ্যাপকও হইয়াছিলেন। তাঁহাকে 'মেডিক্যাল-কলেজের' আনিয়া 'এসিস্ট্যান্ট টিচার' (Assistant teacher) নিযুক্ত করা হইল। দুই জন বাঙ্গালী হিন্দু তাঁহার সহকারী-রহিলেন।(১)

(১) এই দুইজন বাঙ্গালী 'হিন্দু কলেজ' যং অফিসার করিয়াও তাহা করিতে পারি নাই। যদি কেহ অফিসার করিয়া খরচা দিতে পারেন, তাহা হইলে পরম উপকৃত ও অগ্রগৃহীত হইবে।

৪। 'নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন', 'সংস্কৃত-কলেজ' মেডিক্যাল ক্লাস ও 'মাদ্রাসা-কলেজ' মেডিক্যাল-ক্লাস (Native Medical Institution, Medical Class in the Sanskrit College and Medical Class in the Madrasa College),—এই তিনটি কুলের লাই-ব্রেরীতে যে সকল পুস্তক ও যন্ত্রাদি ছিল, তাহা সমস্তই নূতন মেডিক্যাল-কলেজে আনীত হইল।



এস. এ.এ. ডি. ফিলিপ্পো।

৫। এনাটমী (Anatomy) শিখাইতে হইলে যে সব বস্তু বা বিবরণ প্রয়োজন, তাহা ইংলণ্ড হইতে আনিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইভান্স-সাহেব (Mr. Evans) 'কিউরেটর' (Curator) নিযুক্ত হইলেন। একতী 'মিউজিয়াম' (Museum) প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহার উপর ভার দেওয়া হইল।

৬। ১৮৩৪ পূর্বদিক সমাপ্ত হইতে না হইতেই বেঙ্গা সেল যে, দুইটা মাত্র শিক্ষক (Drs. Bramley and Goodave)

খালা কাক স্নান অদৃষ্টব। আমলী সাহেব 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট' (Superintendent) ছিলেন। তিনি এখন (১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, ৫ আগস্ট) 'প্রিন্সিপ্যাল' (Principal) নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। গুড্ডি সাহেব 'এসিস্ট্যান্ট টু দি প্রিন্সিপ্যাল' (Assistant to the Principal) ছিলেন। এখন তিনি 'প্রফেসর' (Professor) নাম ধারণ করিয়া 'মেডিসিন ও এনাটমী'র (Medicine and Anatomy-র) অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। নতুন শিক্ষকর ঘোষণা অনুসারে 'উইলিয়াম ব্রুক ও'ব্যাংহনেসসি' (William Brooke O'Bhaughnessy) একজন 'অতিরিক্ত প্রফেসর' (Additional professor) হয়েছেন। 'মোটেরিয়া মেডিকা' (Materia Medica) ও রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শিক্ষা দিবার কার্য তীক্ষ্ণরূপে উপস্থিত হইল। (১)

করিতে লাগিলেন। পাঁচাখান্ড তাঁহারা বিচার করিলেন না। বিজ্ঞবর রাতনরায়ণ বহু মহাপুত্রের মূৰ্ণে তনুয়াহি, হিন্দু-কলেজ হইতে ছুটী লইয়া গোলন্দায়ির পক্ষিণ পূর্ব কোণে তাঁহারা আত্মা করিয়া মস্তনান করিতেন। এই পীঠস্থান হুঁড়িলে এখনও শত শতক বোতল প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেনরি হুইট্‌স্‌ ভিরোভিও (Henry Louis Vivian Dorozio) সাহেবের শিক্ষাদানের ফলে হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার মানিতেন না। 'Down with idolatry, down with superstition became the general cry of the students.' তৎকালে 'দি ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন' (The Oriental Magazine) নামক একখানি কাগজে লিখিত হইয়াছিল, 'The Native managers of the Hindu College were alarmed at the progress which some of the pupils were making by actually cutting their way through ham and beef and wading to Liberalism through tumblers of beer.' অর্থাৎ হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ বলিতে লাগিলেন, 'পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার সমাজসে বাক্য।' হিন্দু-কলেজের দেশীয় মেধার-গণ তখন ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা দেখিলেন, "ছাত্রগণ গো-মাংস ও শূকর-মাংসের কথা বিধা উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হইতেছে, এবং বিধার-মত আগ্রহ করিয়া বাণীব্যতীর নিকে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।"

উক্ত উদ্ভাব ও বিন্দুখল ভাব চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে মেডিক্যাল-কলেজের ছাত্রগণও ঐরূপ ভাবোপায় ছিল। তাহারা কুসংস্কার মানিল না। শবচ্ছেদ করা যে হিন্দু-ধর্ম-বিরুদ্ধ, ইহা আর তাহাদের মনে স্থান পাইল না। ক্রমে ক্রমে তাহারা মড়ার হাড় ও মাথা স্পর্শ করিতে বিধা বোধ করিল না।

জাকার ত্রাণবদী, ভূত্বিত ও ওতানবদী, এই তিন জন শিক্ষক মেডিক্যাল-কলেজের ছাত্রগণকে সর্গ শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। ত্রাণবদী ও ভূত্বিত সাহেব এনাটমী ও ফিজিওলজী (Anatomy and Physiology) পড়াইতে আনন্ত করিলেন। সার্জারী (Surgery) পড়াইবার ভার ত্রাণবদী-সাহেবের উপর এবং ফিজিক্স (Physics) পড়াইবার

ভার ভূত্বিত-সাহেবের উপর অর্পিত হইল। ওতানবদী সাহেব, স্বাভাবিক-বিশ্বকর্ষ (Natural Philosophy) কেমিস্ট্রী (Chemistry), বটানী (Botany), মেডিসিন-মেডিকা (Materia Medica) ও ফার্মেসী (Pharmacy) পড়াইতে লাগিলেন। তৎকালে এই সকল গায় পড়াইবার বিভিন্ন উপযুক্ত গ্রন্থ ও বহাদ্রী না থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রগণ নান্ন: অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। তবে শিক্ষক-গণ বেয়শ বয় ও আশ্রিত সহকারে শিক্ষা দিতে



মহেশ্বর গুপ্ত।

লাগিলেন, ছাত্রগণও সেরূপ কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে ছাত্র-সংখ্যা ৫-৬০০ নাম। হস্তগত প্রত্যেক শিক্ষক, প্রত্যেক ছাত্রকে চিনিয়া রাখিতে লাগিলেন। বর্ধমান সময়ে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যেহেতু বাধাবান থাকে, তৎকালে সেহেতু বাধাবান ছিল না। উক্তের মধ্যে যেহেতু প্রীতি ও সৌহার্দ্য ছিল এমন আর সেহেতু নাই। তখন ছাত্রগণকে তিরস্কার বা পত-বিধান করিতে হইত না। একতী মাত্র মিত কথা বলিলেই হেতু ফল

হইত। সে সোণার দিন চলিয়া গিয়াছে। আর সে দিন কিরিয়া আসিবে না। (১)

(৬) মেডিক্যাল-কলেজে শিক্ষকের অল্পতা

ডাক্তার ব্রাহ্মণী, গুড্ডি ও গুডানেশী, এই তিন জন সাহেব ডাক্তারী বিষয়ে সকল বিষয়ই পড়াইতেছিলেন। কিন্তু বিষয় এত অধিক যে, তিন জনে এত বিভিন্ন বিষয় পড়াইয়া তাহা শেষ করিতে পারিতেন না। ইহা দেখিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে চুলাইমাগের 'ইণ্ডিয়া জর্নাল অফ মেডিক্যাল সায়েন্স' (The Editor of the India Journal of Medical



ক্লে. এল. গুড্ডি।

Science, July 1836.)-নামক কাগজের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছিলেন :-

"এখন মেডিক্যাল-কলেজে কিয়দ প্রণালীতে শিক্ষাদান করা হইতেছে, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। ডাক্তার ব্রাহ্মণী ও গুড্ডি এই দুইজন ব্যক্তি কি মেডিসিন ও সার্জারী (Medicine and Surgery) সম্বন্ধে বাবতীর বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন? ইহা কি সম্ভবপর যে, দুই জনে এতগুলি বিষয় শিখাইতে পারিবেন? আমরা বিস্ময় জানি যে,

(১) Alas! it seems as if those golden days are gone by never to return, days, when the teachers could command respect of the taught by affection and love and not by the enforcement of discipline and threats of punishment.—Dr. Mahendra Lal Sarkar, The Calcutta Journal of Medicine 1873.

তাঁহারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ডাক্তারী বিষয়ে সর্বিশেষ পারদর্শী। অতুত: পাচজন 'প্রোফেসর' (Professor) না থাকিলে এতগুলি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করা অসম্ভব। অল্প-পরিমাণে ডাক্তারী-বিজ্ঞান শিখিলে তাহাতে অণ্ডকার তির উপকার নাই। 'এনাটমী' (Anatomy) শিখাইবার প্রোফেসর আছেন, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু 'মেডিসিন', 'মেডিকা', 'বটানী', 'কার্বেলী', 'কেমিস্ট্রী', 'বিডগারাইকারী', 'মাদ্যারী' (Materia Medica, Botany, Pharmacy, Chemistry, Midwifery, Surgery) এই সকল শাস্ত্র শিক: হিবার নিবিত্ত অধ্যাপ্ত প্রোফেসরের প্রয়োজন। এতদ্বিঃ একজন 'ক্লিনিক্যাল লেকচারার' ও 'মেডিসিন'-শিক্ষকের (Clinical lecturer and teacher of medicine) প্রয়োজন। আমাদের বিলম্ব অল্প আছে যে, লওন-নগরে 'কার্পনী' (Carpno)-নামক একজন এনাটমীর প্রোফেসর ২০০ ছাত্রকে এনাটমী পড়াইতেন। তিনি অল্প কোন কষ্ট না করিয়া কেবল এই কার্যেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। 'ব্রুক্স' (Brookes)-নামক আর একজন সাহেবও একবার এনাটমী পড়াইয়া জীবন-কেন্দ্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেককেই একটী বিষয় লইয়া বাপুত থাকিতেন। সুতরাং আমরা ডাক্তার ব্রাহ্মণীকে বিশেষ অঙ্গুরোধ করিতেছি যে, তিনি আরও কতকগুলি নূতন প্রোফেসর রাখিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করেন।"

(৭) কোন বৎসরে, কোন মাসে ও কোন

তারিখে মেডিক্যাল-কলেজ বর্তমান বাড়ীতে

উঠিয়া আসিয়াছিল?

অগ্রগতি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন বুদ্ধিমান, বিবেচক ও-হৃদয়বান লোক ছিলেন। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা জর্নাল অফ মেডিসিন' (Calcutta Journal of Medicine)-নামক বীর সাময়িক-পত্রে লিখিয়াছেন :-

"১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, ১ জুন, [১২৪২ বঙ্গাব্দে, ১২ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার] তারিখে প্রাচীন হিন্দু-কলেজের পঞ্চদশ-তাপে একখানি পুরাতন বাড়ীতে (১) সর্গ-প্রাণমে মেডিক্যাল-

১। ইহাই চানকরল সেন মহাপ্রভু বাড়ী। বঙ্গকাল ১২৪২ এই বাড়ীতেই 'এলবার্ট-কলেজ' (Albert College) স্থাপন হইল।

কলেজ বসিয়াছিল। কলেজ খুলিবার দিনেই ছাত্রাধিন্দ্ৰেণ্টেট
সুপারিন্টেন্ডেন্ট (Superintendent Mr. Bramley) এই
বাড়ীতেই প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বাড়ীতেই কয়েক
মাস ধরিয়া কলেজ বসিয়াছিল; কিন্তু সে কত বাস, তাহা
কোন রেকর্ড দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কতক-
গুলি ‘ফাউন্ডেশন-পপুলা’ (Foundation popila-এর)
মুখে শুনিয়াছি যে, ‘অন্ততঃ ৬ মাসের কম নহে।’ ডাক্তার
ব্রামলী তাঁহার বক্তৃতার ছাত্রগণকে সন্বেদন করিয়া স্পষ্টই
বসিয়াছেন, ‘ডাক্তারী-বিজ্ঞান ব্যবসায়ী বিধি তোমানিগকে
শিখাইতে হইবে। কিন্তু ইহার উপযুক্ত যোগ্যতা এখনও
হয় নাই। উপযুক্ত বাড়ী নাই এবং বন্দারি নাই। এই সব
যোগাড় করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই
বাড়ীও নির্মিত হইবে, এবং বন্দারিও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।
‘তখন ছাত্র-সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।’ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, ২
জুলাই তারিখে একজন পর-প্রেরক *India Journal of*
Medical Sciences নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র
লিখিয়াছেন, ‘আরও প্রোৎসাহের প্রয়োজন। যে ছই তিন
জন আছেন, তাহাতে চলিবে না। কলেজ এই বাড়ী হইতে
নতুন বাড়ীতে উঠিয়া গেলেই আরও কয়েকজন নতুন
প্রোৎসাহের স্বাধা উচিত।’

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ২৪ মার্চ তারিখের ‘ফ্রেন্ড ইন্ডিয়া’
(*Friend of India*)-নামক কাগজে লিখিত হইয়াছে,
‘অন্ত (১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১৭ মার্চ তারিখে) মেডিক্যাল-
কলেজের নতুন বাড়ীতে ডাক্তার ব্রামলী, লর্ড অকল্যান্ডের
(*Lord Auckland*) সম্মুখে নতুন মেডিক্যাল-কলেজ
সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। লর্ড অকল্যান্ড তাঁহার জ্ঞানগর্ভ
বক্তৃতায় বিশেষ সন্তোষ হইয়া তাঁহার কৃত-বন্দন করিলেন (২)।’
কিন্তু ইহা বারী জানা যাইতেছে না যে, ঠিক কেনি তারিখে
নতুন বাড়ীতে মেডিক্যাল-কলেজ আদিয়া বসিয়াছিল। আদ্য

২। “At the close of this eloquent address of
Principal Bramley, which was received with loud
plaudits, Lord Auckland walked round the table and
cordially shook the Principal by the hand, and inti-
mated the deep interest which he felt in the welfare
of this noble Institution.” *Friend of India*, 21 March,
1836.

কলেজের ‘ফাউন্ডেশন’ নিউজপত্রের (উদ্যতরণ বেঠ,
ব্যবসায়ী গুপ্ত প্রচুতির) মধ্যে শুনিয়াছিলাম যে, ডাক্তার
ব্রামলী যেদিন বক্তৃতা করেন, তাহাও একমাস পূর্বেই
মেডিক্যাল-কলেজ খুলাসে বাসী হইতে নতুন বাড়ীতে উঠিয়া
আসিয়াছিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১২ মার্চ [নিবারণ] তারিখের ‘সমন্যাস-
বর্ণন’ লিখিত হইয়াছে:—

‘নতুন চিকিৎসা শিক্ষালয়। এতদ্বারা প্রোৎসাহের



ব্যবসায়ী হইল।

নির্মিত গত বৃহৎসংখ্যায় নতুন চিকিৎসা শিক্ষালয়ের কার্য
আরম্ভ হয়। তাহাতে ব্রীদ ব্রীড গবর্নর জেনারেল বাহাদুর
[লর্ড অকল্যান্ড] ও ব্রীদ ব্রীড সর জার্লস মেটাকাল সাহেব
ও বহুতর বিশিষ্ট বরিত্ত ব্যক্তি এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের সহকারি
এতদ্বারা ও ইউরোপীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন।”

এখন স্পষ্টই সপ্রমাণ হইল যে, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, ১৭ মার্চ
তারিখে [১৮৩২ বর্ষাব্দে, ৬ চৈত্র, বৃহৎসংখ্যার দিবসে]
‘মেডিক্যাল-কলেজ’ চামকরণ সেনের বাড়ী হইতে বর্তমান
নতুন বাড়ীতে উঠিয়া আসে।

(৮) মেডিক্যাল-কলেজে মহাত্মা বারকানাথ ঠাকুরের পুরস্কার-প্রদান

১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, ২৫ মার্চ তারিখে মহাত্মা বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার ব্রামলী শ্যামকে (Dr. Bramley কে) বে পত্র পিছিয়াছিলেন, তাহার কাহারও এই :-

“মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণ আপনার শিক্ষাব্যবস্থার
কণে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহা সর্বমুখ্যতঃ। এত ছাত্র,



ডঃ ব্রামলী।

আমি আপনাকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কলেজের উপ-
যোগ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সামগ্রী না থাকায় আপনি যে
বিষয় অনুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহাও বিশদরূপে বুঝিতে
পারিতেছি। আরও বুঝিতে পারিয়াছি যে, ছাত্রগণকে
পুরস্কার-দান করিয়া উৎসাহিত করিতে পারিলে আপনারও
কিঞ্চিৎ সুবিধা হয়। আমি বাঞ্চালী। ছাত্রগণের মধ্যে
অধিকাংশই বাঞ্চালী। স্বতন্ত্রাং সজ্ঞাতীয়ের উপকার করিতে
পারিলে আমিও খুশি হই।

“ছাত্রগণকে পুরস্কার দিলে তাহারা আরও উৎসাহ সহকারে
শিক্ষাপাঠ করিতে থাকিবে। প্রত্যেক ছাত্রকে ৩ বৎসর

পড়িবার শেষ পরীক্ষা দিতে হইবে। আমি প্রত্যেক বৎসরে
২০০০ (দুই হাজার) টাকা আপনার হস্তে দিব। আপনার
ইচ্ছা যে, ৮ কি ১০টি পুরস্কার বেঞ্জা হউক। এই টাকা
যেন এনেশ্বর ছাত্র-গণকেই বেঞ্জা হয়। কোন বিষয়ের তফাৎ
কত টাকা দিতে হইবে, তাহা আপনিই বিবেচনা-পূর্বক ভাগ
করিয়া দিবেন।”

‘এডুকেশন কমিটী’ স্থির করিয়া দিলেন, বারকানাথ
ঠাকুরের প্রাপ্ত ২০০০ টাকা ১০ জন ছাত্রকেই বেঞ্জা
হইবে। বাহারা ‘এনাটমী শাস্ত্র’ (Anatomy) ভাল
কম বোঝাইতে পারিবে, তাহাদের নিমিত্ত ৩টি পুরস্কার এবং
বাহারা রসায়ন-শাস্ত্রে কৃতজ্ঞ হইবে, তাহাদের নিমিত্ত ৪টি
পুরস্কার বেঞ্জা হইবে :-

‘এনাটমী ক্লাস’ (Anatomy class)

প্রথম পুরস্কার	৪০০ টাকা
দ্বিতীয় “	৩০০ “
তৃতীয়	২৪০ “
চতুর্থ	১২০ “
পঞ্চম “	১২০ “
ষষ্ঠ	৪০ “
১০৪০ টাকা	

‘কেমিস্ট্রী ক্লাস’ (Chemistry class)

প্রথম পুরস্কার	২৭৫ টাকা
দ্বিতীয় “	২০০ “
তৃতীয়	১২৫ “
চতুর্থ “	৪০ “
৬৪০ টাকা	

সর্ব-মুদে ২০০০ টাকা

১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘এনাটমী’ (Anatomy) নিমিত্ত
কোনরূপ পুরস্কার বেঞ্জা হইল না। যদিও ছাত্রগণ অত্যন্ত
বিশেষ পরীক্ষা দিল, ‘এনাটমী-শাস্ত্র’ তাহাদিগকে পরীক্ষা করা
হইল না। ঠেহার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত ছাত্রগণ
কাণ্ডাতঃ ‘এনাটমী’ শিখা করে নাই, অর্থাৎ তখনও মেডিক্যাল-
কলেজে শরীর-শাস্ত্র (অ্যানাটমী) বাধ্যতাকর করা হয় নাই।
১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে, অক্টোবর-মাসের শেষ ভাগেই দক্ষ-প্রথম পদ-

ছেদ করা হইয়াছিল। ছাত্রগণ রসায়ন-শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া প্রথমকারি-গণের নিত্যর আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, ২০ অক্টোবর তারিখে 'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' (Friend of India) নামে পত্রিকা হইয়াছিল, 'ত্রিবিদ্যা' নামে ডাক্তার ব্রাহ্মণী তেজোর কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশনে (General Committee) নিম্নলিখিত পাঠ্যইতিহাসে যে, ছাত্রগণের পরীক্ষার কল অতীত সত্যো-অনুক।"

তৎকালে পরীক্ষার কল অতীত সত্যো-অনুক। তাহা নিয়ে লিখিত হইল :-

CHEMISTRY.

1. Describe what is meant by the "Specific Gravity" of matter. Explain the mode of finding the specific gravity of a solid mass lighter than water, stating in detail the reasons for each step in the process.

2. Describe fully the chemical history of *Cyanogen*, and the mode of effecting its analysis. Describe the compounds it forms with *Hydrogen*, *Potassium* and *Iron*, especially with reference to the subjects of prussic acid and its antidotes, and the manufacture of prussian blue, an exact account of the composition of all these substances is desired.

3. Explain the meaning of the term *isomerism*, and give illustrations of the subject with diagrams.

4. Describe the experimental proofs both analytic and synthetic of the composition of water, especially the evidence derived from the electric and the galvanic agents.

ছাত্রগণ রসায়ন শাস্ত্র-পরীক্ষার যে উত্তর লিখিয়াছিল, তাহা অতি মনোহর। উইলি-বি ও'ডাংহনসী (William Brook O'Donoghue) নামে লিখিয়াছেন, "কড় বড় রসায়ন-শাস্ত্র-বেত্তা পণ্ডিতগণের সম্মুখে এই সকল উত্তর আমি শাষণ করিয়া দেখিয়া যিতছি। তাহার ইহার কোনরূপ যোগ দেন।" তৎকালে একজন ইংল্যান্ড ডাক্তার 'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' (Friend of India) নামে লিখিয়াছিলেন, "ছাত্রগণ যে উত্তর দিয়াছে, তাহা পড়িয়া আমি সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়াছি।" 'ইণ্ডিয়া জর্নাল অফ মেডিক্যাল সায়েন্স' (India Journal of Medical Sciences)-এর সম্পাদক মহাশয় লিখিলেন, "ছাত্রগণ যে উত্তর লিখিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচায়ক।"

ছাত্রগণকে পুরস্কারে বিভাজন করিয়া দেওয়া হইল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, ১০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার লর্ড অকল্যান্ড (Lord Auckland) বাহাদুর মহোদয়ের পুরস্কার বিতরণ করিলেন। ইহাট 'মেডিক্যাল-কলেজ' প্রথম-পরীক্ষার প্রথম-পুরস্কার-বিতরণ। প্রথম-বর্গে ২য় পদক বান করিলেন, একটা স্বর্ণ-নির্মিত ও আর একটা রৌপ্য-নির্মিত। মুক্তহস্ত স্বাক্ষরানুযায়ী ঠাহর মহাশয় ১৫০ টাকা দান করিলেন। বহু-সংখ্যক গণমাধ্যক সৈন্য ও বিদেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। ৬২



ডাক্তার ব্রাহ্মণগণ মহাশয়।

ছাত্রের উত্তর গ্রাহ্য একতরপই হইয়াছিল। তাহাদিগের সর্বনিম্ন পুরস্কার ৫০ টাকা মাত্র। তাহাদিগকে কি প্রকারে পুরস্কার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, ইহাই তখন বিবেচ্য হইল। প্রথমতঃ বিবেচনা হইয়াছিল যে, এই ১৫০ টাকা ৬ জনকে সমান-ভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহা অতি অল্প টাকা হয় বলিয়া বহাদুর লর্ড অকল্যান্ড তখন বহু ৩১৫ টাকা দান করিলেন। তিনি যে পুরস্কার বিলেন, এবং যে ছাত্র যে পুরস্কার পাইল, তাহা নিয়ে লিখিত হইল :-

নাথ	পুরস্কার	বিজ্ঞান ভাণ্ডার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় নিধিরাছেন,	
৭৮৭৬-৮০-প্রাপ্ত	একটা স্বর্ণপদ্রা ও একটা রৌপ্যপদ্রা	“তখন মেডিক্যাল-কলেজের শৈশবাবস্থা। রসায়ন-শাস্ত্রের জ্ঞান প্রকট নাথৈ ছাত্রগণকে পরীক্ষা নিতে হইয়াছিল। তখন ছাত্রগণ যে মতের দিয়াছিল, তাহা তাহাদের বুদ্ধিমত্তায় প্রকট পতিচারক। তৎকালে শিক্ষকগণ বৈজ্ঞানিক প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন, ছাত্রগণও শেটর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া শিক্ষাপাত করিত। কিন্তু উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষাদান করিলে ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষাপাত করিতে পারে, তৎকালের শিক্ষকগণ তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রভেদ, স্বর্গ ও নাগ্নেই শিক্ষাদান এবং অমৃত ও অনাগ্নেই শিক্ষা- দানের মধ্যেও ঠিক শেটর প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। ভাণ্ডার ওস্তাদেশী রসায়ন-শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞ ছিলেন, শেটর হয় ও অগ্নি সহকারে তিনি ছাত্রগণকেও শিক্ষাদান করিতেন। তাহার কলেই ছাত্রগণ মেডিক্যাল-কলেজের শৈশবাবস্থাতেও এক প্রকার উন্নতিসাধন করিয়াছিল।” (১)	
৪৮৮৭-৮০-প্রাপ্ত	১৪০ টাকা	[ক্রমশঃ	
৮৮৯০-৮০-প্রাপ্ত	১৪০ টাকা		
চাঁদের নাম	পুরস্কার		
শিবচন্দ্র কন্দকার	১০০ টাকা		
নবীনচন্দ্র পাণ	১০০ টাকা		
সি-জে সাইমনস্	স্বর্ণ-পদক		
ঈশ্বরচন্দ্র গাঙ্গুলী	১৫০ টাকা		
ডব্লিউ কব	রৌপ্য-পদক		
ঈশানচন্দ্র মজুমদার	প্রত্যেকে ১৫ টাকা		
রাজকুমার দে			
উদ্যোতক শেট			
দ্রামাচন্দ্র মজুমদার			
রামনাথচন্দ্র মজুমদার			
বাসুদেবচন্দ্র গুপ্ত	অতি বৈপ্লব্য-মতক পাটকিফেট	(১) বিজ্ঞান-মুদ্রিত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের কথাক্রমি স্বর্ণ কর্ণ মত। তিনি যে শিক্ষা দিচ্ছে, সে শিক্ষা গাঢ়। বুদ্ধিগত অধিকার বাক্য উচিত। কোন বিষয় কি প্রণালীতে বুঝায় ছিল তাহা ছাত্রগণ জানতেন না, তাহাও তাহাদের জানা উচিত। হুইলিং D.L. Richardson মহোদয়কে বলায় রসায়ন-মতের তিনি অধিষ্ঠিত নিধিরাছিলেন, তাহা আমার বিষয়ে মত। বর্তমান সাইন্স-সালেমার, হুইলিং ডি.ইউ. ক্যান্ডলার মহোদয়ের অধিকার অধিষ্ঠিত ইয়া এক্ষণে দেখাইয়াছিলাম। তিনি ইয়া কেননা মতের অধিকারিত হইয়া থাকিলে “পূর্ণ দান” সে সব প্রেক্ষাপটেও অধিকার বা অন্য যে সব ভাষায় বর্ণিত হইবে না।” জ্ঞানমণ্ডল যতই কথাক্রমি আমরা প্রাণে গণিত করিয়াছি। বর্তমান মতের তত্ত্ব ও শিখ উভয়েই আর কোনভাবে কথাক্রমি বিচার প্রকট।	
নবীনচন্দ্র বিজ্ঞান			
সমরকুমার মজুমদার			
কালিদাস মুখোপাধ্যায়			
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত			
মহেশচন্দ্র নান	বৈপ্লব্য-মতক পাটকিফেট		
বেণীমাধব মজুমদার			
জ্যেষ্ঠ পোষ্ট			

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

বার্ভার্ট দে মেলন, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ কলেজ হাফেল শিক্ষা দেহ এবং পদার্থ গণিতের তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ কলেজের অধিকারিত হইয়া থাকিলে “পূর্ণ দান” সে সব প্রেক্ষাপটেও অধিকার বা অন্য যে সব ভাষায় বর্ণিত হইবে না।” জ্ঞানমণ্ডল যতই কথাক্রমি আমরা প্রাণে গণিত করিয়াছি। বর্তমান মতের তত্ত্ব ও শিখ উভয়েই আর কোনভাবে কথাক্রমি বিচার প্রকট।

ওড়ার বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ

— শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"কে বলে বিমানে স্রমণ বিপজ্জনক? ইটা একটু মত ভুল ধারণা। এরাগেগেনেব মত নিঃশব্দ ক্রান্ত পরিচ্ছন্ন ও অস্বাভাবিক বাতাসের দ্বারা 'আর নাই।' কথাটা খুব সহজ পরিণাম হ'ল না, কিন্তু ইহার মূল হইতে এইরূপ অস্বস্তি স্রষ্টব্য: তিনিশান, বৈমানিক হিসাবে, অস্তিত্ব: ভারতে বাঙালী বৈমানিকদের ভিতরে জীহার মত নিত্যম উপেক্ষার নহ। কাজেই বাণাট্টা একটু বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিবার একটা ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠিল। পথের কাণ্ড পুস্টিসই যেমন বাঙালীর ও বাঙালীর কলহকালিমা বস্ত্রপ স্ত্রীভাতির নিগ্রহ ও ধর্মের বাহুল্যের ছড়াছড়ি দেখিয়া কান্ড পড়া একটা বিতীর্ষিকাঃ মংগা ঠাড়াইয়াছে, সেইরূপ বিমান-শোভার উত্তীর্ণার উত্তীর্ণাও মনে একটা নিত্যমৈমিত্তিক বাণাট্টার মতো বলিয়া মনে একটা ধারণা ছিল; আত ইহাৎ এইরূপ মত ভাবিয়া একটু চমকাইয়া গেলাম; তবে কি একটা ভুল ভাবনা মনে পোষণ করিতেছি? মনে পড়িল, অতি পুরাকালে (মহাভারত যুগে বসিলেও হয়) প্রথম "এওগি শেও" কলিকাতা প্রমথিগেব দক্ষিণা ৪০০ স্ত্রীর বিবিধের সবিসা ইষ্টা একবার এরোগেন চক্কাছিলাম, তখন-কার মনেব ভাব বা experience'ক মনে জাগিয়াতে চেষ্টা করিলাম। লগ্ন স্থিতি সড়া দিল না। অনেক কড়-কাপটাং চাপে সে সাংখ্য experienceএব কথা একবারে লুপ্ত, চেহরা নাই, জাগিবে কিং? কাজেই নিজের অস্বস্তিঃ বিক ইহাতে এই মতামতঃ পোষণতা বা বিচ্ছিন্নতার মাস-মণলা আমার নিঃস্ব নাই দেখিলাম। কথা ইহাতেছিল মনামমত ৮ত্বেব মৃগোপাধার মণাঃপেব মৃগোপা শৌর শ্রীভূক্ত ভবমঃ মৃগোপাধারের স্রমঃ। বিমানগাত ও জীহার চালনা স্রমঃ একটা আলোচনা হইল এবং পরেও জীহার সহিত এইরূপ আলোচনার মৃগোপ গতিভাঃ। আলোচনার বাগা বৃষ্টিয়াছি নিখিলাম, আশা এই যে পাঠ করিয়া হরত আমারই মত অনেকের ভ্রান্ত ধারণা দূঃ হইবে।

এক বন্ধু জানিতে চাহিলেন "আপনি কি 'আজকাল' জেনেন?"

কথাটা বড় কটু শোনাইল। চলিত বাংলায় "উড়ার" সহিত ৮পিপুলেগের কলিকিত পংলাস "আজকাল" বাংলা পুয়ের "কপুেন" আশা অর্ধমের মেন একটা অতি বনিই স্রমঃ প্রজ্ঞঃ থাকে। অথচ চলিত বাংলায় এমন আর পথ নাই, যাঃব বাঃগর বৈমানিকের activiile স্রমঃ প্রাঃপ করা চলে। উক্বে বলিলেন, "আমি উড়িই, অধিকন্তু আজকাল উড়া এত নিঃশব্দ মনে করি যে বিঃস্বার একমাত্র লগ্ন আবার স্রাতুঃপ ও আবার একমাত্র পূঃর উড়াতঃও কোনরূপ বাধা বিই না।" ইহার উপর আর কথা চলে না। ইহার পর কোনরূপ লংগ প্রকাশ করিলে মনে মৃষ্টিগেবের পূঃর উঃস্রগণ ও স্রাতঃ উপরও স্রমঃ প্রকাশ লগ্ন হয়।

"আবার শুভ বংগের নাতিটিও (দৌঃিঃ) আবার লগ্নে ওড়ে। প্রথম লগ্ন উড়িতে নিখিলাম, স্রমঃ দ্বিঃবার আঃগৌর বড়ই অঃব, অঃপ একক উড়িতে তঃ তঃ করে, দ্বিঃ বিশ দ্বঃ একজন স্রাঃ থাকিলে মনে অঃনকটা শক্তি আসিলে: এই যে বিনা পরলাং এমন "কঃকঃবঃ" বাঃর মৃগোপও কেহ মইতে চঃবে না, আবার "কীঃ হাতের" উপর অঃবঃই তাঃগঃ করণ। অঃপেবে কঃপেব সেরা বন্ধ প্রকৃত সঃবঃস্বিঃ কার্য করিলেন, আঃবঃ দ্বাঃ পার্থিঃ অঃবঃগঃর মাঃা তঃগঃ করিয়া আঃবঃ প্রথম right-এর আঃগৌর ইষ্টা আমাকে বঃ ও সঃবঃস্বিঃ নামের মঃগাঃ বলা করিলেন; ওঃ মঃ কি উঃগঃ ও অঃমঃ! তাঃপঃ অনেক হানে জীঃহকে লষ্টা বিঃগঃিঃ কিন্তু সে আনন্ড হয় না; নূঃনঃবঃ অঃমঃই আকর্ষণ ও যৌঃ।

"আজকাল জীঃহঃা একবার আঃবঃ স্রমঃ উঃেন, পুনঃগঃ free ride-এর প্রঃলাভন সঃবঃবঃ করা উঃেব পঃক অঃস্বঃবঃ হয়।"

এই কথাঃ একটা মঃরঃ পর মনে পড়িয়া গেল। পঃরঃ সঃগঃস্রাতঃর অঃবঃ লেখক মাঃা মঃ (এটা সাঃগঃণ সঃস্রাঃবঃকঃ মঃস্বঃ, শুনিতে মঃ লাগে না)। কোনও এক বাঃকঃগঃাঃী ভঃস্রাঃক "এঃগেগেন গঃিয়াছি" এট "নাঃকো ওঃগেঃ"

হবিয়া হটম। ৫০০ পদ্য করিয়া একদিন প্রোথলেনে চড়িয়া বসিলেন। ক্রমি ছাড়া মাত্র সাক্ষর অঙ্কশালায়। আবহু হটল এবং ক্রমশঃই পরোপ-পরিচয় হবিয়া বোধ করিলেন না; নিকটবর্তী হটম প্রাণের সঙ্গে কবুল করিলেন “সেইজন্যেই ৫০০ লিগা উত্তর সেও সাহেব ৫০০ বেগা”। সাহেব অবস্থা বুজিয়া সত্তর ক্রিয়ায় আসিলেন, কিন্তু the mischief was done, এখন plane ক্রমি স্পর্শ করিল তখন “জন্তার না কানি” হটম গিয়াছে; সাহেবের স্রাব্য প্রাণ। “৫০০ কপোতা” আশঙ্ক করিয়াছিল কি না গরুর ডাঙার উল্লেক নাট।

এইরূপ অবস্থা কখনও পাইয়াছেন কিনা ভিজ্যাস কথায় জানিতে লাগিলেন ও বলিলেন, “Sea sickness-এর মত air sickness অনেকের হয়, তবে বাঁকটা বোধ হয় গরুর কোঁকে মাঝা ছাড়িয়া গিয়াছে। কি রকম হয় জানেন? মনে করুন ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়িয়াছেন; আমি সাধারণ লোক হওয়ার কথা বলিতেছি না; এতদূর কড় হওয়ার প্রতিবেদন ঘটায় ৯০ বা ১০ মাইল। সমুদ্রে কড় উঠার সঙ্গে বেগল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহাও একবার ডেউয়ের চূড়া (crest) উঠে এবং পরবর্ত্তী ডেউয়ের খায়ে (trough) পড়ায় একটা ভীষণ সোলানির আশঙ্ক হয়, সেইরূপ আকাশেও কড় উঠিলে air pockets হটাৎ থাকে; এই স্থানে হওয়ার ফলটা অত্যন্ত কঠিন। বরুন আপনি এতদূর ঝড়ের ভিতরে বাইতেছেন, air pocket-এ পড়িলেন, আপনার plane, side slip করিয়া যাও শত ফিট নামিয়া পড়িল, আবার বন হাওয়া পাইগামাঝ ঠেলিয়া উঠিল, আবার পতন, আবার উপাস—অনবরত এই ভাব, গ্রিক ডেউয়ে লগাণের মত বোল বাইতে লাগিল, তথ্য এই যে লগাণের ডেউয়ের উচ্চতা চারি শত ফুট হওয়াও স্বাভাবিক। এখন এই ভীষণ সোলানির মধ্যে stomach পেচারা যদি “রক্তক জ্বাৰ বেহ” তবে তার বেশী বোধ বেগা চল না। একদিন আমি উড়িয়া, উর্ধ্বে উঠিবার ইচ্ছা: ১৫০০ ফিট ওঠার পর ভীষণ কড় পাইলাম, নোঁে কিছু নাই। তাড়াতাড়ি ৫০০ ফিটে নামার কড়ের হাত এড়াইলাম। Aerodrome-এ বেগুর পর আর একটি P.A. F. machine-ও ফিটিল। Pilot report করিল ৮০০

ফিটে সেই কড় পে পাইয়াছে। “কড় ঘটায় মধ্যে সেই কড় পুথিবীতে নৌছিল, তিন দিন খাবা সাক্ষর oyolone চলিল। আত্মকাল “হাওয়া আকিলের” অনেক উন্নতি হইয়াছে, তাহাদের forecast এবং খবর প্রায়ই পাকা হয়; একটু সাবধানে খবরপত্র সংগ্রহের পর long flight-এ বাহির হইলে কোনও অসুবিধার গড়িবার সম্ভাবনা থাকে না।”

প্রশ্ন করিলাম “তবে কি flight-উড়ার-এর এই অবস্থা একটা আত্মবিশ্বাস অসুবিধার মধ্যে পড়া করিতে হইবে?” উত্তরে বলিলেন “কোথার এ অসুবিধা নাই বসুন? ভাড়াতে sea-sickness একটা মত বিতর্কিত; অনেক দোঁতের বেশী চড়িলে sick হইয়া পড়েন, এমন কি সেলে স্রবণের সময়ও লোককে sick হইতে দেখা যায় না কি?”

“আত্মকাল যে তাহা planes পঠন হয় এবং যে পরিমাণ margin of safety রাখা হয়, তাহাতে পূর্বের মত হটাৎ কিছু ভাবিয়া হাওয়ার বিপর ঘটবার সম্ভাবনা খুব কম, এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোন part (অংশ) কত strain বহন করিতে হইবে তাহা অতি সঠিক ও স্থল-ভাবে নিশ্চিত হইয়াছে এবং বড়টা strength (দৃঢ়তা) হইলে ঐ strain বহন করা সম্ভব তাহা অশংক্য অস্বত সাতগুল বেনী মজবুত ও দৃঢ় করিয়া parts তৈয়ারী করা হয়। কাজেই পাখা ভাঙিয়া, strain ছিঁড়িয়া পূর্বে যে সব accident হইত এখন আর তাহা হয় না। এখন শুধু ভয় engine failure (ইঞ্জিন হটাৎ বন্ধ) হইলে। উড়িবার একটা safe height (নিরাপদ উচ্চতা) আছে। সাধারণত ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফাটার ফুটের ভিতর শুক। উচিত। নামিয়ার সময় engine বন্ধ করিয়া নামিতে হয়, তাহাকে vol-planning বলে। দেখা গিয়াছে ৪০০০ ফাটার ফুট উপরে engine বন্ধ করিয়া ঐ স্থানকে কেন্দ্র করিয়া যে কোনও দিকে ক্রমি হ্রাসিবার পূর্বে ১০ মাইল হাওয়া বার এবং ঐ ৪০০০ ফাটার ফুট উচ্চ হইতে দৃষ্টি প্রায় ৪০০০ মাইল প্রসার লাভ করে, অতএব দেখিয়া ও বিবেচনা করিয়া vol-plane করিলে ভারতে ১০ মাইলের মধ্যে forced landing-এর উপযুক্ত স্থানের অভাব হয় না। আমি এক-বার পরীক্ষার জন্য বাণেশ্বরের নিকট একটি আইলবুরু চো

ক্ষেত্রে forced landing করিয়াছিল। বাণের প্রণালী মাত্র ১২০ ফুট।”

কথটা বলা সোজা, কিন্তু এই forced landing-এর মধ্যে pilot-এর ক্রান্তির কতদূর প্রকাশ পাল্টে তাহাটুকি শাখার মানকারি বলিয়া ধরিতে চাইবে? আমি নিজে আর একটি forced landing এর উদাহরণ জানি। আমাদের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ক্রিস্টিন air mechanic-এর কাছা লইয়াছিল, দুইবার দুর্ঘটনার পর মারের সনিষ্কন্দ আগ্রহে এখন অল্প কার্য করে, আর plane-এ উড়ে না। Pilot হাঁকিলেন, engine miss করিতেছে, তখন তাঁহারা প্রায় ৫০০০ ফিট উপরে; ছোট্ট জেট হটল না, কিন্তু তথাপি engine দেখে বন্ধা করিল, vol-planing-আরম্ভ হইল, যখনই landing পাওয়া গেল না, মাগে মিলিবে আশার শেষে এখন crash অবস্থারাবী হইয়া পড়িল, তখন pilot “hold tight Roy” বলিয়াই এক প্রকাণ্ড বটগাছের ঘন শাখার ভিতর plane-কে ফেলিয়া দিল। বোহাগ ভাগ্য অগ্রসর, সেই কল্প pilot ও mechanic উভয়েই বাড়িয়া গেল বলিবার অবসর পাইয়াছেন। এই ঘটনা কাকার নিকট ঘটয়ছিল। কাকার আশেপাশে ১২০ ফুট লম্বা মাঠ বা ক্ষেত্রের অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে তখনও বাবু বাবা করিতে পারেন তাহা সব pilot যে পাবে না এটা সন্দেহিত, কাজেই দুর্ঘটনাও ঘটে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, “আজকাল লম্বা রকম মান-বাহনে প্রতি লক্ষ মাইল গমনাগমনে দুর্ঘটনার বহু লোকের সূত্রা হয় তাহার স্থান (cause বা statistics) হইয়াছে এবং তাহাতে দেখা যায় যে, railway, ship, motor bus এবং car এই সকল যান অপেক্ষা plane এ সূত্রাহার সর্বাপেক্ষা কম।”

অবশ্য এই statistics-এর অথো প্রকাণ্ড fallacy বর্তমান আছে। একখানি জাহাজ বা একটি ট্রেনে দুর্ঘটনার সূত্রাহার একটি এয়ারোপেনে দুর্ঘটনার সূত্রাহার অপেক্ষা অনেক বেশী হওয়াট সম্ভব, কারণ একখানি plane-এ যে সংখ্যক লোক চোড়ল করে, তাহাও বা ট্রেনে তাহা অপেক্ষা সংখ্যা অনেক বেশী হওয়ায় এই দুইয়ের দুর্ঘটনার সূত্রাহারের তুলনার

মানকারি বোধায় হয় না; তবুও এই statistics এয়ারোপেনের দলকে একটা বিধানের ভাব মনে পড়ই লটগা আসে।

লক্ষ্য করতগুলি প্রয়োজনীয় নীতিস কথার পর প্রবন্ধকে একটু সরলতা বিধায় ছোট্ট করাট বিবেচ্য। তখনও বাবু বলিতে লাগিলেন, “দেখুন লম্বার নিক মিরা এতদূর ঘান আর নাট। প্রাতে দুইজন বন্ধু লটগা পাড়ি মিলায়, পুথিতে মিলায় লম্বা মান সাহিত্য, যন্ত্রাদি জর করিয়া (বাস্তবায়ন যে অস্ত্রপত্র প্রাণ) বাড়ী ফিরিয়া যথা মনরে আভাষাদির পর ১১টার লম্বা বখানিরন আকর্ষণে বিদ্যাতি! অল্প ঘানে যে টহা সম্ভবপর নহে একথা মানিতেই হইবে। অল্প তিনজনদের বাতারাতে পর পর ৩০১ টাকা মাদিল, দেপুন কত সত্য, যেলের পার্ট ক্রানের ভাড়া অপেক্ষাও কম।”

চমক লাগিল ঘটে, এত অল্প খরচে এয়ারোপেনে চলে জানা ছিল না।

“সকালে বাহির হইয়া লম্বাঘরনে নিক বোলাজুনিতে মানি-লাম। হবিগ মারিয়া ফিরিয়া আলিগা দৈনন্দিন কাজকর্ম করা গেল। বৃত্তীনাভা তাঁহাঘরি মানব বাইবেনে ঘরিলেন, প্রাতে ব্যাভা করিয়া তাঁহাকে মানব মান করাটহা ও ঘটাব ভিতর বাড়ী ফিরিলাম।”

এইজন বৃত্তান্ত শুনিগে লম্বা বোলাজুনি পাকা মান বিশেষ প্রকৃতির নির্দুষ্টিতার প্রগ্রহ বেগবান মত, যা থাকে বহাতে বলিয়া একখানি এয়ারোপেন সংগ্রহের ইচ্ছা যোগ হয় অনেকের মনেই জাগিয়া ওঠে। তারপর শুনা গেল আজকাল আকার ১৪,০০০ টাকার একখানি ভাল পাঁচ “কিটার” পেন এং মাং ২৫০০ টাকার একখানি “পোলো” ঘেদিন” সংগ্রহ হয়। ঐ রূপ লম্বা অনেক মোটরগাড়ীর রক্ত করিয়া থাকেন।

এর হইল piloting-(চালনা)-এর মধ্যে কোন বিষয়টি সর্বাপেক্ষা কঠিন? উত্তরে বলিলেন, “Landing, আর সব বিষয় plain sailing. প্রথম উড়িবার লম্বা পতির বেগ ক্ষণেই হইলেই plane আপনিই মাটি ছাড়িয়া দিবে, তারপর শুধু একটুকু লম্বা বাধা দরকার কোন পাছের মাধার থাকে না কারণ। Direction ঠিক করিয়া লটগা safe height-এ উড়িবার পর plane ছাড়িয়া দিও, joy stick (পরিচালন-দণ্ড) ধরিয়া থাকিবার আবশ্যকতা নাট, locking

device আছে, look করিয়া অন্যথায় পূরণপক্ষেও হতে পারে। তখন rudder এ পা রাখিয়া চলিতে হইল, নতুবা direction বদল হইয়া থাকিতে পারে। এখানে তখনই বাবুট সাজিয়া উড়িয়া বহন, বিশেষতঃ গিয়া ঠিক জায়গায় বাবুট নামিবে; যতদূরও সম্ভব বেশ-পরি-ভরসারও আবশ্যকতা নাই। তখন নামিবার সময়ই পূর্ব সাংলানতার প্রত্যেক। Cock-hit হইতে উক্ততা দেখা যায় না, মাঝে মাঝে আঘাত করিয়া লইতে হয়, তাইটি ঢাকা ও tail-skid এক সঙ্গে ভবিষ্যৎ করা আবশ্যিক, নতুবা দাফা থাকিতে হইবে, এমন কি কাৎ হইয়া plane উল্টাইয়া পড়িতে পারে। Plane-এর তলুর দ্বিগুণে ভবিষ্যৎ হইবার সময় একটা পতি বহুর থাকিতেই হয়, নতুবা "উড়িয়া নামায়" পতিবর্তে "পলাত" হইতে হয়। আমার plane-এর পতি-বেশ ৫৫ মাইল ঘণ্টায় হয় এবং solo machine পানি ৩০ মাইল গতিতে ভবিষ্যৎ করে। চ চাখিবার একটু সাবধানে উঠা নামা করিলেই অংশনই সহ আঘাত আসিয়া যায়।

"Engine failure ছাড়াও ওইটো কেন খট?"

"তার একমাত্র কারণ আমার মনে হয় অসাবধানতা। যে সব accident সব ভাষায় শতকরা ৯০-৯৫ হইবে এমন pilot-এর খাড়া হইয়া যায় ১০-১৫ মাইল মধ্যে উড়িয়াছেন কিংবা খাড়া ১০০ ফুটের বেগে উড়িয়াছেন। পাকা গাছের খাড়াও অনেক ওইটো খটে। কারণ কি? খাড়া গাছে accident হওয়া সম্ভব confidence আসে না, judgment হয় না, accident হইতে পারে; অথবা ১০ ফুট হইতে ১০০ ফুট উড়িয়াছেন কিত্তর accident প্রায়ই হয় না, কারণ judgment আছে। কিন্তু সাবধানতা ত্যাগ করিলেই দুর্ভাগ্য; over-confidence-ট সর্বনাশের মূল; তারপর হাত পাকিলেও তখন কেবল উড়িয়া আশা খেটে না। Exhibition flight বা stunts বলা, nose-diving, spinning, looping the loop, figure-eight ইত্যাদি উপর বোঁক যায় এবং যে সব সাধারণ নিয়ম অবশ্যপালনীয় তার ব্যতিক্রম হইতে আসন্ন হয়, ফলও গাছের গাছে ফলে। আমার যে accident হইয়াছিল তাগা হইতেও একটা দাফা বেশ করা যায়। Race-এ নাম দিলাম; লার্গেস হইতে start, ৭৫ মাইল

পর finish, আমার bandicap ছিল ১৫টা ৫০ মিনিট। বাক্স মোটোটে এক আত্মবিশ্বাস বাড়ী পাকিলাম, গাছে বোঁকিয়া আসিতে সাধারণ বেগী হওয়ায়, মাঝে মাঝে start-এর ১০ মিনিট পূর্বে Aerodrome-এ পৌঁছিলাম। দেখিলাম ১২টি বাণির বস্তা plane-এ চাপাইয়া বিরাট অফ patrol দিয়াছে অর্ধেক tank Plane patrol গাইবে, বাণি তখন সম্ভব নহে। বলিলাম বাণি কম কর, tank তরিয়া patrol বাণ। তাহাই হইল, অতি তাড়াতাড়ি ৬ বস্তা বাণি নামাইয়া ৩৫ গ্যালন patrol তরিয়া দিল। প্রথম plane-এর ১ ফুট ৫০ মিনিট পরে হওয়া হইল। ৭৫ মাইলের মধ্যে সবগের আগে পৌঁছিলে তবে ভয় হইবে। উপরে উড়িয়া দেখিলাম "নামনের হাওয়া" (head wind) পতির বেশ ছাপ করিয়া দেখ। ২৫ ফুটে হাওয়া নাই, ওই height-এই তীর-গেয়ে ছুটিলাম। ৫০ মত মাইল বাইবার পর দেখা গেল, আমি প্রথম plane খানির মাত্র ২০ মিনিট শক্তিতে আছি এবং এ পর্যন্ত আমার পতির বেশ average ১০৭ মাইল হইয়াছে। Aerodrome-এর মধ্যে লম্বাকাবে দুইটি তীর-চিহ্ন অঙ্কিত ছিল; ওই দুইটি তীরের মধ্যে দিয়া গেলে তবে সময় মইবে নতুবা নহে। নীচ দিয়া উড়ার ক্ষমতা আগে কিছুই দেখিতে পাই নাই; এখন উপরে আসিয়া পড়িয়াছি, দেখিলাম তীর-চিহ্ন right angle-এ cut করিতেছি; পূর্বা আসিতে হইলে অন্ততঃ এক মিনিটও নাই হইবে। Sharp banking করিয়া বাঁকে ঘুরিলাম লাইনের মধ্যে প্রবেশ করিতে। ডাইনে ঘুরিলে plane-এর nose উর্ধ্বমুখ হয় এবং বাঁকে ঘুরিলে নীচের দিকে মুখ হয়। যেমন মুখ নীচ হওয়া, ৬টি sandbag হক্কড় করিয়া মাঝে আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়িতে ভাল বাঁধা হয় নাই, তাহাতে plane টাল সামলাইতে পারিল না, "এক বধূণা" বুড়ির মত "গোং" গাইয়া nose-dive করিয়া মাছড়াইয়া পড়িল। সামান্য কটাকা কুটাকা দিয়াছিল, plane পানি কিছু একে বাসে চুম্বার হইয়া গেল। এখন নতুন কত রকমের অসাবধানতা ও নিরক্ষর ব্যতিক্রমের ক্ষমতা এ accident ঘটিল। প্রথমতঃ অতি তাড়াতাড়ি করিয়া start, তারপর এত low flight, তারপর বাঁকে sharp turn, তারপর loosely tied sandbag ইত্যাদি। তবুও যোগ যোগ হয় বোঁকা

planeকে লইতে হইবে। একবার crash-এর পর আর সে plane এ উড়িতে সাহস বা ইচ্ছা হয় না, engine-টি খুঁটিয়া লইয়াছিলাম।

“যেখের ভিতর বিজ্ঞা বাইতে কিস্তি মনে হয়? সাধা যে দেখে তাহা অত্যন্ত হাস্যকর এবং তাহার ভিতর বিজ্ঞা বাইবার সমস্ত গ্রিক মার্জিনিং-এর ফুয়াশার (fog) মত ঘোঁষে হয়। কতকটা ব্যঙ্গ্যসা হইয়া যায়; খুব বেশী দূরে দৃষ্টি চলে না, কেমন একটা ভিত্তা ভিত্তা ভাব মনে হয়। কালো ঘন মেঘের মধ্যে পড়িলে দৃষ্টি আরো চলে না, তখন compass ও altimeter হয় সেখিয়া চালনা করিতে হয়। এইজন্য মেঘের মধ্যে পড়িলে যেহেতু হুঁড়িয়া উপরে উঠিয়া বাওয়াই মুক্তিসিদ্ধ। উপরে পড়িবার ব্যক্তিগত, নীচে কালো মেঘের উপর উচ্ছল গোলাকার “হামবু”, তাহার মধ্যে বৃহৎ পক্ষীর দ্বারা plane-এর ছায়া ছুটিয়া চলিয়াছে, সে এক চমৎকার দৃশ্য। ১৫,০০০ ফিট উপরে দারুণ শীত অনুভূত হয়। হাওয়ার চাপ হঠাৎ হ্রাস হওয়ার অধিক উষ্ণ উঠিল অনেক সময় মালিকা হইতে রক্তপাত হয়। অধিক উষ্ণ হইতে হঠাৎ নীচে নামিলে আঁধা কটা পর্যন্ত কানে কঁপুই শুনা যায় না। হাওয়ার চাপের তারতম্যের জন্য ঐজন্য হইয়া থাকে। সাত্রে ভড়ার সমস্ত বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় নতুবা কেবল direction হাওয়াইলে বড়ই দুর্ভাগ্য। আমি যার একবার সাত্রে উড়িতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তবে আজকাল তত আশঙ্কা নাই। এখন সবই সহজসাধ্য হইতেছে। বস্তুতঃ সাত্রে মহাপ্রকৃত আপনি এক “পঞ্চতাণ্ডা”; উপায়? উপায় আছে বৈ কি! আপনার যেতার মহাপ্রকৃত ইচ্ছাতে লাগিল, “Croydon Croydon Croydon, Lost! Lost! Lost!” (ক্রয়ডন, পথভ্রষ্ট হইয়াছি) উত্তর দিলিল “পরিচর হাওয়া” আপনার নবর, কোথা হইতে কখন রওনা হইয়াছেন, এখন কত উচ্চে উড়িয়াছেন, আপনার average গতি-বেগ সব জানাইলেন; সেই মহাপ্রকৃত “যেতার বাহ” Croydon হইতে হাজার হাজার মাইল দূর গ্রামের করিল আপনাকে plane সমেত গ্রেপ্তার করিতে, সঙ্গে সঙ্গে হুহু হইল, “maintain height and move in a circle, পুনরায় যেতার দিলিল, পাইয়াছি। ত্রেতার সঙ্গ নিকটস্থ Aerodrome “X”, path দিগায়, মন্ত্রণাৎ ওঃ। তাৎপর্য কৃৎসক বিজ্ঞানেন সে কি উল্লেখ্যলেন খেলা! গাভার

হাজার মাইল দূরে ডকেন পলকে সেই মহাপ্রকৃত আপনার কল্প প্রস্তুত হইল দৃষ্টি কিউ ১৩৩১ এক গদ্য, বাহা হইতে দ্রুত হইবার আর উপায় নাই। কানে buzzer বন্ধ হইয়া যুয়াইল, পথ ছাড়িয়াছেন তাহিনে চাপিতে হইবে, এইজন্য buzzer বাজিয়া ও বন্ধ হইয়া ডাইনে, বাঁয়ে নীচে, উপরে তাড়াইয়া লইয়াচলিল Aerodrome-এর দিকে, যেখানে পথভ্রষ্ট পক্ষিকে আলো দেখাইয়া অভ্যর্থনার জন্য ৫০ মাইল লম্বা beam-এর beacon light, বেতাঁরে লজ্জা হইয়া আপনাকে ইঙ্গাধার ডাকিতেছে। Aerodrome-এর উপরে আসিলেন, flood-light জলিয়া উঠিল, পতি কুপগাহি পর্যন্ত দেখা যায়, safe landing, তার পর বিশ্রাম, নিকরবেগ-বতকণ না মোটা বিল পৌছিল এই বৈকিরি আকল সেলামি বসন্ত।

“আমেরিকায লক্ষ্যটি autogyro বিমান-জগতে বৃদ্ধান্তর আনিয়াছে। লম্বা চার ঘনি পাখা উপর বিক মুক্তে ঘোরে। পুরাতন নিলাঠী windmill-এর ছবিতে ব্রহ্মপ পাখা দেখা যায় অনেকটা দেউড়প। এত stability বেশ যে, মুক্ত প্রায় বি। হইয়া থাকে বার এং একটি বড় ছানের উপরে নামা, উঠা যায়। বিনামের উর্দঃ যে পূর্ব ক্রত হইতেছে সম্বন্ধ নাই।

Stratosphere-এ উঠিয়া experiment হইতেছে বাহাতে গতি বেগ বেগজা বৃদ্ধি করা যায়। এমন দিন উইট আসিবে যখন ভাবতে চা পান কথিা বিলাতে পৌছিয়া বলা চম্ভিবে, I had my tea in India tomorrow (আগামী কল্যা ভাবতে চা পাইয়া পড়না হইয়াছে।) এমন আত্ম এখানে ২০-পে বিলাতে এখন ১০-পে চলিতেছে। এট ১০-পে ও ২০-পের বাবানাইদূর মধ্যেই (বাগা সাহায্য ১০ বটা মাত্র) আপনি ভারত হইতে বিলাত পাড়ি দিয়াছেন।”

উষ্ণ হইতে থাকে, উষ্ণতাযা ও কামোরা আনার মাথার ঘনি বলিয়া বীকার করিতে প্রস্তুত মাছি, তবে বতকণ পর্যন্ত সম্ভ্রত এক বৎসর কাল নিরামিত কিনের পর বিন খবতের কাগজ একটুও এখানেই ওড়নিবার কথা প্রকাশের হুঁশোপ খজিবে না, ততদিন (যদি বাঁচিয়া থাকি) বিধি নিষেধ লম্বন না করিা এট পুণ্যহন নিবপালিত বস্তু মাইল উপবর্ত বাত্যা-গত করা বাক্; আপনাতা কি বলেন?

প্রাচীন শিল্পের ধারা

—শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

প্রাচীন বাবিলন

[খৃঃ পূঃ ৩০০০-১০০০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত]

নীলনদের প্রাচীন মিশরের সভ্যতা
মিস্রের উদ্ভিদ, পশুপালন, মিস্রের শিল্পের উদ্ভিদ এবং



কোলোস (৩০০০ খৃঃ পূঃ) মধ্য এজিপ্টের মিস্রের উদ্ভিদ-পশুপালন, মিস্রের।

তিগ্রীস নদীর মধ্য-ভূভাগে প্রাচীন খালসেয়া এবং আসিরিয়ায় সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। আকাদ-সুদের জাতি খালসেয়া সভ্যতার স্রষ্টা হইল। আকাদ-সুদের জাতি প্রাচীন যুগের তাতাব-ভুলসি জাতির স্রষ্টা হইল। অনেক এট আকাদ-সুদের জাতির স্রষ্টা ভারতের বাহিড় সভ্যতার সংস্কার প্রমাণ করিতে চান।

জানিয়েছেন প্রাচীন খালসেয়ায় দান আছে। বর্তমান ত্রিভাসিকের মধ্যে কোর্ডিস খালসেয়া উৎপত্তি হইয়াছিল এট খালসেয়ায় মিশরালকদের '২০০'। যাহা তাহারা নির্মাণ আকাশের তাতাব-ভুলসি জাতির স্রষ্টা হইয়াছিল এবং এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অধিকার করিয়াছিল। জামিতি এবং স্থপতি-বিজ্ঞানের অনেক বহুপাতি সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খালসেয়া যাহার রাজধানী 'বাবিলন'। বাইবেলে উক্ত বর্ণোক্তান বাবিলনেই ছিল। বাইবেলের 'হেবেল টাওয়ার'-এর উচ্চ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা হইতে নির্দেশ করা হয়। পাথর কাছাকাছি পাওয়া বাইত না বসিয়া এখনকার ইয়ারত হইত যোকে শোভান উট সিংহ। 'বোনেল টাওয়ার' অনেক বহুপাতি ইটের এক বহুপাতি স্থপতি উপরে উত্থাপন দেখায়



বাবিলন (৩০০০ খৃঃ পূঃ) মধ্য এজিপ্টের মিস্রের উদ্ভিদ-পশুপালন, মিস্রের।

মিস্র, বাইত সিংহ 'মিস্রি' উপরে বাহরার।

বর্তমান টেলো নামক স্থানে সম্রাট এবং ধর্মবাহক

গুডিয়ায় রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে—বহু একোটিভুক্ত প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ প্রাসাদ, যেখানে রত্নের 'বোকেইক' কাচ। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ কিন্তু মূর্তিও পাওয়া



এসিয়ার (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) : বুদ্ধবিষয় সম্বন্ধে, অপর কলকে খস খোদিত মূর্তি (ক রিলিফ : [ব্রিটিশ মিউজিয়াম)।

গিয়াছে, সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চট্টেল সম্রাট গুডিয়ায় কর্তৃকই মূর্তি। একই মূর্তির কোণের কাছে স্থাপিত একটি মনবৎ এবং কল্যায় রূপা। এই মূর্তি খৃঃ পূঃ প্রায় ২৮০০ শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করা হয়।

গুডিয়ায় প্রাসাদ হইতে অনেক রোম মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন খাস্মেজা এবং এসিরিয়ায় ইতিমুত ইটের পুত্রক হইতে জানিতে পাওয়া যায়। এই পুত্রক ইটের টালির উপর লোহার ললা বিধা দেখা হইত, এ লিপিকে বলা হয় 'বান-মুখো লিপি।' কেন না, অক্ষরগুলি ছিল ভীষের কলার ন্যায় দেখিতে।

এসিরিয়া

(৮৮৪ খৃঃ পূঃ হইতে ৩০৮ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত)

এসিরিয়ায় বাগদেহদের চত্রে অধিক গুর্ধ্ব ছিল। তাহারা বাগদেহদের কয় করিলেও বিজিতদের দ্বারা পরাজিত হইল। বাগদেহদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, এসিরিয়ায় গ্রহণ করিল। ত্রেমামেজা ছিল সাম্রাজ্যবাহী, বৃহৎপ্রায় ; ললিত কলার দ্বারা খচিত না : তাহারাও ঠিক এমনি ঐক-

সেই কয় করিয়াছিল, কিন্তু ঐক্যেই জ্ঞান এবং শিল্প গ্রহণ করিয়াছিল।

এসিরিয়ায় বাগদেহী ছিল নিম্নের নথ্যে। প্রাচীন সম্রাট অসুহনজিবশাল (৮৮৪ খৃঃ পূঃ) সাধারণ, সেনাচরিত্র, অসুহনজিবশাল (৮৮৪—৮২৮ খৃঃ পূঃ) প্রভৃতির প্রাসাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাগদেহরা ইটের দ্বারা তৈয়ার করিয়াছে, কিন্তু এসিরিয়ায় নিকটবর্তী পার্শ্ব চত্রে পাথর এবং পাথর সংগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রাসাদ এবং মন্দির নির্মাণ করিয়াছে।

এসিরিয়ায় মন্দির ছিল শিরামিদের দ্বারা চতুষ্কোণ, লম্বিতসমিষ্ট, বিস্তৃত স্থানের উপর। প্রত্যেক তল এক এক প্রাঙ্গণ নামে উৎসর্গীকৃত হইত। লম্বিত উপরে থাকিত গোলাকৃতি এক মন্দির, সোনার দ্বারা গঠিত ছিল। উপরিতল ছিল 'বেল' অথবা স্থানান্তরিত অধিকার।

নিম্নের প্রাচীন রাজাদের প্রাসাদের বিবরণ ধ্বংসস্থল হইতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন তরঙ্গ এক সঙ্গে গাঁথিয়া প্রাসাদের আশ্রয় প্রকল্পেই পাওয়া গিয়াছে। স্থাপত্য প্রাসাদের চারিদিকে উচ্চপ্রাকার এবং তাহার দ্বারা ঘেঁষে তত্ত্ব থাকিত। প্রাঙ্গণ-পথে প্রকাণ্ড বড় রোমের তোরণ এবং তোরণের দুইদিকে প্রকাণ্ড বড় মন্দির দেখা এবং পাখা-



এসিয়ার (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) : সিংহবিহার, অপর কলকে খস খোদিত মূর্তি (ক রিলিফ : [ব্রিটিশ মিউজিয়াম)।

ওঘালা সিংহ বা সিংহের মূর্তি থাকিত। সেখানে অনেক বাগদেহ পালিত করা হইত। টালি এবং টুকো কাচ পাওয়া যায়।

নরসিংদেব সিংহীত চিত্র—উৎকল তুলনা পাওয়া নৃসিং কোন পিছে। পিঠের উপরে তিনটি বাণ, সামনের পায়ে তপ দিয়া কোন বকনে অঙ্গদব হইবার চোঁড়া করিতেছে, শিকরের পায়ে আর শক্তি নাই, মজীর সঙ্গে একবারে লমান হইয়া গিয়াছে, কোন বকনে টানিয়া হেঁচড়াইয়া চলিতেছে। সে যুগের্তে কি তীর চোঁড়া, শরীরে বোঝা কি শক্তির পরিচয়!

সকল জন্তুর চিত্র প্রাণবন্ত এবং গতিমান, কোথাও কোন জড়তা নাই, বিধা নাই। হাঙ্গরের চিত্রে এলিগিরি শিল্পী বেন ছিল রাজার দাসকে আছে, জন্তুর চিত্রে সে মুক্তি পাইয়াছে, তাহার কমনা, কলাকৌশল জন্তুর চিত্রে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইয়াছে।

এলিগিরার শির বিদেশ করিয়া প্রভাবিত করিগাছে প্রাচীন পারস্যের এবং ইতিহাস পিছকে।

নতুন বাবিলন সাম্রাজ্য
(৬০৬—৫৬২ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত)

বিনেতা ধ্বংস করিয়া নবুনাটপার (গ্রীক উচ্চারণ —নব নাপর) নতুন বাবিলন সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। উৎকল পুর, নেবুকাডনেজারের আমলে বাবিলন নগর বহু সজ্জিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নগরের পরিধি ১৭০ বর্গ মাইল বিস্তৃত ছিল বলিয়া কথিত। ইউক্রেটিসের দুই তীরেই নগর বিস্তৃত ছিল। এই অংশেই বাবিলনের বিখ্যাত মূর্ত্য-উত্থান নির্মিত হয়; ইহা পৃথিবীর সম্রাট্যের এক আশঙ্ক্য। মিশরের ফেগোরা দ্বিতীয় রামসেসের নত নেবুকাডনেজার উৎসার সাম্রাজ্যে অনেক নবিতা এবং তত্ত্ব নিম্মাণ করাইয়া

ছিলেন; নবিতার সূর্য্যদেবতার অধিষ্ঠান ছিল। নবিতার সোনার মূর্তির উত্তম পাওয়া যায়। নবিতার দু-উচ্চ সোনারী পঙ্খ বাবিলনের নক-পথে ‘কার্তিক’ প্রেরিত পুণ্য দেখাইত।

চিত্রা, ফিনিশিয়ান, যূনের সভ্যতা

এনিয়া মাইনরে এই তিন প্রাচীন জাতির সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা প্রাচীন মিশরের সমসাময়িক।



ফিনিশিয়া : আনুষ্ঠানিক কার্ণা : চিত্র—৫৮৭।

৩০০০ খৃঃ পূঃতেও ইহাদের সভ্যতায় নিদর্শন পাওয়া যায়। ফিনিশিয়ানরা ছিল বলিক জাতি। প্রাচীন সকল মসভা গ্রন্থে তাহাদের বানিজ্যসম্ভাব লইয়া বর্ণিত। প্রতাপ, ফিনি-বিরামনাই গগতে প্রথম ফিনিশিয়ানক বর্ণনালা সৃষ্ট করে।

ভাষ্কর জীবন

হোমরাস দ্য ড্রাক্সা ফেলিয়া হাও, এবং কি, নিরোমের মূর্তি পঙ্খ দুঃর ফেলিয়া হাও—যাও, লক্ষ্যের সাহায্য করে। হোমরাস সর্বদাই বড় বড় কথা বলিতেন—কিন্তু হোমরাসের মূর্তিও কর্তৃকচিত্র ফোলা স্থাপন করিয়া। হোমরাসের এই পুর জীবন ফিল্মের অন্তর হও। যদি এই জাতি জীবিত থাকে, তবে সুনি, আদি, আদ্যের নত জীবিত থাকার সোচ্চ যদি অবশ্যই হও, তাহেই যা জাতি কি?

—বাবী বিবকানন।

[১]

আজ্ঞাকাল কড়াবায়ে কথা সর্বমই কত রকমে আলোচিত হইয়া থাকে। কড়াবার আছে। আছে কঠোর—খবর কি? তাঁত ছড়াইতে পারিলে কাকের অভাব হয় না; টাকা ছড়াইতে পারিলে কড়া যেমনই হউক স্বয়ং অভাব হয় না। চাঁট কেবল এইটুকু যে কড়া বড় নীচ, সরস বস্তুর ভিত্তি কঠোর শিকলীতে ভক্ত লম্বা আর মোটা করিয়া দিতে চাইবে। বাস! তা যদি কেউ পারে, হাওয়া-খাওয়া একটা কালো কড়ার ভিত্তি ও সওয়া গড়া চাঁদের মত বহু বাঁধিয়া আনি যায়।

সুতরাং অস্ত্র বৈদ্য আমদানী—কাঁচা মালের দ্বারা কবে বাঁধিয়া বাঁধিয়া বেড়ান, গঠান, বলাই, হাঁটান, চলাই, পড়ান, লেগান; খোঁপা তুলিয়া ছুল বেধেন, কাপড় তুলিয়া পা বেধেন, জুগাইয়া চোখ বেধেন, আবার গান শোনে, নাচের কলহও তেজ কেহ আত্মকাল দেখিয়া লয়ন। আবার দলকলসানী বিদ্যাক্ষেত্র কি হুঁ বিদ্যাক্ষেত্র বর কেহ কেহ একা গুরে কবে বইয়া দরজা বন্ধ করেন কি বাড়ীর ছাদে গিয়া চোঁপ, বোটক-বিজায়েও বাহির হন। কোর্টশিপে বনে বাগিচায় লটতে চান। এসব বস্তুর লোভ বড় বেতার লোভ; পাইলে না সাপের আত্ম চিত্তাহিত জ্ঞান থাকে না। 'আজ, বর্ম পছন্দ করে, যেহেতু যদি কোনও মতে বাপাইয়া লটতে পড়ি, বিবি হইয়া যে কত বাপের পে মিলে।

সুতরাং সাধারণ লোকের মধ্যে কনের বাঁধাই পাচাই এখনই এখন হইতে থাকে। কিন্তু প্রচুর টাকা দরে থাকিলে কল্লের লাবণ্য বর আবার এখনই বাঁধাই পাচাই করিয়া লইতে পারেন। তেমন তেমন হইলে কনে নিজেই না কোন বস্তুর একা গুরে বাঁধাইয়া লইতে পারে? কি জানি তেমন বনে যোগদান এখনও এখনো কল্লের নাই। তবে তেমন বেশ ভোবাল রূপার শিকলি পলাই পড়িলে, এমন বাপ এমন বর

কমই আছে, পাচাই বাঁধাই করা দূর থাক, নিজেই পাচাই বাঁধাই হইতে সে চান না যা ছাড়াই দেন।

বড় কোনও বৈদিক কাগজে এখনই একটা বিজ্ঞাপন এক দিন বাহির হইল, যথা—

‘কোনও উচ্চপদস্থ ধর্মীয় অধিকারী কল্লার ভিত্তি একটি অতি সুতর ব্রাহ্মণ-আতীর পাতে চাই। পাতে উদার মতা-বলবী ভগ্না আবস্তক। উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি বিলাত গাইতে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই শিক্ষার এবং অল্পরূপ বৃত্তিতে অপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভব ব্যয় কল্লার পিতা বহন করিবেন; প্রচুর যৌতুকও দিবেন। কোটোগ—নং বস্ত্র সমস্ত আবেদন করহ।’

ব্রাহ্মণ-ঈশ্বর প্রাক্টেটনহলে সেদিন একটা লাড়া পড়িয়া গেল। অস্ত্র খুব চাকচাক্যে পিটান লোক জানান, প্রকৃত একটা লাড়া যে পড়িয়াছিল, তাহা নহ। তবে আপন আপন অস্ত্রে আর বিস্তৃত পদে কনে কনে যে লাড়াটা পড়িয়াছিল, তাহা যদি সব বাহিরে সমস্ত একত্রে হইয়া, আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিত, তবে অতি বড় একটা হৈ হৈ হৈ হৈ বাপারই বটত সম্ভব নাই।

পরশার মালিক স্বত্ত, বহু যৌতুক, আবার বিলাত বাগার ও অস্ত্র: ব্যাক্সিট্রোতে বদিলার সব বস্ত্র, যাহা কাল বাড়ি, সেটের গাড়ী, সেডিও সেট—এই পনের মূল অস্ত্র: ধানী পোষাক—কি না মিলিলে! স্বত্তের মেয়ে যেমনই হউক—মেয়ে বদিল। কোন বস্ত্র থাকে কি না থাকে—ইহাতেই যে সকল সাধনার চরম সিদ্ধি, সকল কামনার পরম পূর্তি! আধুনিক শিক্ষিত বস্ত্রীয় দ্বন্দ্বের পক্ষে ইহার বড় ভাষা, টহার উপরে সাধ, আর কি থাকিতে পারে? লাড়া পড়িলে না তেন? সমস্ত একটু শঙ্কায় বাঁধা আছে। কিন্তু অন্যের কার ভগ্ন? তাই অন্যের অন্যের, আপন আপন পদে, বেতার বন আপন, প্রাণ নষ্টান লাড়াই সেদিন পড়িয়া গেল। অস্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণদ্বন্দ্ব সেদিন অস্ত্র এই কলিকাতার মেয়ে বা গৃহবাসে ছিল, যাহা নাকি বিজ্ঞাপন পড়িয়া খুঁটা হু হু

না করিয়া উঠিল, দেহ তরিয়া পুরুষকাক শোণিতোজ্জ্বল চকলে নাড়িয়া শিখায় শিরায় না ছুটিল, ত্রুত কলিত চরণে বে নাহি তখনই দিয়া আনসীতে মূখ না বেশিল।

অপগর্ষিত সকলেই প্রাণ গোঁক কামাইল, শাবান মাঝল, কড় ঠাক্কর্য্য কানিঝ বাহির করিয়া বা কিনিয়া পরিল। কেহ বা টাই-কলার-কোট-ভেঙে সাধেব শাড়িল। তাহপর সাধেব-বাড়ীতে গিয়া খাসা কাথনা-করা 'বাগে'র কোটো তুলিল। কোটোগলাধের খেন সহস্রম পড়িয়া খেল।

কয়েক দিনের মধ্যেই পত পত কোটো সহ আবেদন খবরের কাগজের সেই-নাং বাজে দিয়া পড়িল। ম্যানেজার হানিয়া সেগুলি বস্তা বাবিয়া তুলির মাঝায় দিয়া ল-হুশিচাড়া-বিলসব বিজ্ঞাপনবাতার গুহে পাঠাইলেন।

গৃহে হানির সোল উঠিল। বিজ্ঞাপনবাতা বাবালী সাধেব মিটার দি. তি. গ্যাটাক (চত্ববিছায়ে খটক) কস্তা 'লগা' (লগা) ক চিত্র-বহরমা হইতে আবেশ করিলেন। লগা অনেক বেশিয়া অনেক পুত্ব করিয়া একখানি সেটো বাছিল। তম্বী প্রেসা (হুগা) করিল, "তোহ কর্তিক বলিহারি মিদি। ভটা কি বাছিল?"

লগা উত্তর করিল, "ছবি ত চেহারা সেবেই বাছতে হবে? সব চেয়ে ওই চেহারাটাই ভাল নহ কি?"

"ছবি ভাল! লোকটা—আকালকায় মত কেতাবোস্তই নয়।"

"কিসে?"

"মুখে যে গোঁক চক্কেছ।"

"ভাতে কি হ'ল?"

"হু। বলি কি? আরকালকায় এলিগ্যাক্ট ক্যান্সে কেউ গোঁক মাগে? হস্তি। কি বিস্ত্রীই দেখায়? খেন কিংটারের পেশাই কি খোটা মারোয়ান?"

"আমার চোখে ত বেশ দেখায়।"

"তোহ এতায় চোখে ভাল দেখালেই হ'ল? আমাধের চোখ বুঁকি কিছু নয়?"

"তা আশা বর—আমার চোখে বনি-ভালি বেশি, খেই ডের হ'ল।"

"বর ত ভূই একা দেখবিনি, আমরাও দেখব। দেখে আমাধেরও ভাল লাগা চাই। নইলে খোঁবাই ব'লে আবার করব কি ক'রে?"

লগা করিল, "বাহুটি যদি ভাল হয়, তবেই ভাল। মুখে গোঁক থাকলেই কি বাহুল আমাধের অযোগ্য হয়?"

"তা হয় বই কি? গোঁক যদি থাকল, তবেই বুঝতে হবে জার উঁচু সবাজের উত্তর করি মত রিকাইন্স্টে কিছু হয় নি। কাজেই সে আমাধের আনধের যোগ্য হতে পারে না। জানিল ত শেনিল যে শ্রী চট্টার্জির বিয়ে হল, বর তার কপাল-মত গোঁক কামিয়ে আগে নি—শ্রী কি হুহুহুই বাবিয়ে তুলল। বিয়ের আসরে বর আগে গোঁক কামাল, তবে শ্রী তাকে বিয়ে করল।"

লগা উত্তর করিল, "শ্রীও খোটা বড় বিস্ত্রী বাফাবাড়িই হয়েছিল। বরটা আসতে পুত্বই নয়। নইলে বিয়েও কবে বলতে পারে, গোঁক আগে কানিও, তবে বিয়ে করব? এমন কনকে নাগি ঘেরে চলে গেল না কেন?"

"ইন্! নাগি অধনি ঘারে আর কি? সে বিন আর নেই বিবি। তা ভূই তবে ঐ গুঁকো বর ছাড়বিনি? ওর নাগিই বাবি? জানিল মুখে বার চোখাফের মত গোঁক, নাগি সেই মারে?"

লগা করিল, "তা চেহারাও আর বস্তাবে তেজী ধাঁচের হলেই পুরুষকে বেশী মানায়।"

"তাই বলে তার নাগি খেতে হবে বুঁকি?"

"বলিল কি ক্রোরা? পুত্ব তেজী হলেই কি বেহে-বাহুকে নাগি মারে? তার সীতাকে, অর্জুন হুভ্রাকে কখনও নাগি বেহে ছিলেন? এমন যে রাকব, সেও অকালকায়কে নাগি কখনও মারে নি।"

"ও বাবা। ভূই কে-একবারে রেতা বাপার গিয়ে পড়িল। বহরমা হুজিল কি না? তা রেতা হাপার আর নেই যে। খোর কলিও কেটে থাকে। নতুন আলো বিহে নতুন গতিয়ুল আগছে জালিল? খেই মুগের মত তোর ও বরের কিছুই হইবে। আছে কেবল কদির পোঁকের কলক, আর কিছু নয়।"

হানিয়া লগা করিল, "আর কি নেই রে?"

ক্রোরা করিল, "দেখছিল না শুই কামিক-পরা কোটো, কলার-টাই নেই—কোট নেই—"

"তা এখনও ত বিলম্ব বাহ নি। যখন বাগে, তখন পরবে। সাহেবো গোথাকে বাবা কোটো বুঝেছে, তাগা যে

সর্বদা সাহেবী শেখাক পরেই থাকে তা নয়। অনেক
হুত আর কারওটা ধার করে নিয়ে দিয়েই কোটো
তুলিয়েছে।”

“তা হলেও তাদের এটাই অনেক অস্বস্তি আছে—এটাই
তাঁরা জানে কি ভাবে কি সাজে আমায়েব সামনে উপস্থিত
হতে হবে। অলব-কাহনার জ্ঞান কিছু আছে।”

হাসিয়া লতা কহিল, “তা বাহালীর ছেলে কোট-কমার-
টাইতে না সাকলেই বে-আলব কি বে-কাফা হয় না। আর
জানিস তা বাবা যে বিভ্রাট দেখেছেন—তাতে বড় লোকও
জান নি আর বড়লোকের ছেলে কেউ বিয়ের কত দরখাস্তও
করে নি। দার-করা বড়মানবী সাকের চাইতে পরীষের
মোটো সাকই ভাল। তাতে তার স্বজাতির এইটুকু পরিচয়
অস্বস্তি: পাওয়া যাব যে, জাপনার উপর একটা মর্যাদাবোধ
কিছু আছে।”

“তা যদি বলিল দিদি—তবে উচিত কথাই বলতে হয়।
বাবার ঐ বিভ্রাট দেখে মোটে পড়ে যে দরখাস্ত করেছে,
আত্মদাবাবোধে তার আত্মবোধই নেই।”

বারে বীরে একটি নিখাল ছাড়িয়া লতা কহিল, “টিক
কলছিল ফোরা। বাবা এমন একটা বিভ্রাট না হিলেই
বুঝি ভাল হত।”

বলিয়া কতকগুলি কোটোখানির দিকে চাহিয়া রহিল। আর
একটি নিখাল ছাড়িয়া কহিল, “লোকটি কে জানিনে। তবে
দরখাস্ত যদি ও না করত তা হলেই ভাল হ’ত।”

“কখন পছন্দমত বর তবে কোথায় বিলত?” হি হি
করিয়া ফোরা হাসিয়া উঠিল।

“জানি না। বাক। যা এই কোটো নিয়ে বাথাকে দিলে
যা।”

ফোরা কহিল, “আরও বানকতক বরং থেছে রাখ।
আলাপে যদি লেখা যায় এটা একবারেই জটল, তখন ত আর
একটা খুঁজতে হবে?”

“হুঁ! বর কি একবারে পাঁচটা বাছতে আছে? আহি
ত আর যোগ্য নই।”

“এটা যদি না চলে?”

“চলবে—চলবে—চলতেই হবে! পছন্দ করলান যে!
তুই যা।”

“তা তোর খুদী। তবে আবার এই কোটোর গাঁদি
ঘটিতে হবে বলে রাখলাম।”

বলিয়া কোটোখানি লইয়া ফোরা পিতার কাছে গেল।

[২]

মেছোবালাবের প্রত্যয় এক বেগের বাজীতে পিমন
চিঠির বাস্তব চিঠি ফেলিয়া গেল। হুটপাট কথিা সকলে
ছুটিয়া আসিল। হেমবানী যুবক অনেকই নববিবাহিত,
কেহ বা নুতন প্রণয়ী, আরও অনেক ‘wanted’ বিভ্রাট
দেখিয়া চাকরীর স্বখাত্তও এখানে ওখানে করিয়াছে। শিহ-
তমার প্রেমলিপি অথবা চাকরীখাত্ত কোনও মনিবের বিশেষ
অগ্রসর প্রোত ডাকের সময় অধিকাংশই ইহায়া প্রত্যাশা
করিত। পিমনের মাফা পাইলে হুপহাণ চটপট চরণপথে
গিড়িবারাঙ্গ সব ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। বাহ
বুজিতে খুঁজতেই চিঠি লইয়া কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি পড়িয়া
পাইত, এই কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়িতে চিঠি ছেঁড়াহিঁড়ি
এবং কপড়াকপড়িও কত হইয়া গিয়াছে। চিঠি-বিলির কত
নিম্ন বাধা হইয়াছে, নিম্নের প্রতিলিপি করে আর চালাইয়া
বেগা হইয়াছে। কিন্তু কোনও চেষ্টাই দীর্ঘ দাকলা লাগ
করে নাই। সেদিনও যখন পিমন চিঠি দিয়া গেল, তখন
হুটপাট হুটপাট পড়িয়া গেল, তেমনই বগাবণ চটপট
‘স নম্বজুলাতবৎ!’

করদিন বরিয়া বিরহী প্রেমিক এবং চাকরী-প্রত্যাশী
বাজীত আরও কতপূর যুবকও কিসের প্রত্যাশায় বেন উহা-
য়ের অপেক্ষাও পরতর আবেগে ছুটিয়া আসিত, আতও
আনিয়াছিল। বাহ বুজিতেই দেখা গেল সকল চিঠি বেন
জীব্যার কথিয়া নম্বগোপালের নামের ত্রিকালসর বড় এক-
খানা পুস্তক নামের অধা কাকিয়া রহিয়াছে। নম
গোপাল অবনি বাবা দিয়া চিঠিখানা তুলিয়া লইল।

“কি রে নম্বা! ও কার চিঠি? বেধি—বেধি—”

অনেকে দিয়া নম্বকে বরিয়া চিঠিখানি টানিয়া লইবার
চেষ্টা করিল।

“দূর হ হতভাগারা! যার চিঠি হ’ক তোরের কি?
ছাড়—ছাড়—”

চিত্রখানি ক্রম দৃষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া নব সন্ধ্যাকে ঠেলিয়া
বিয়া ঘরের দিকে চলিল। সকলের কৌতূহল আরও
বাড়িল। কেহ কেহ বলিল, “বিয়ের ডাক শেনি না কি বে ?
ঘরখাত করেছিল ?”

“হটে। বটে। ওর ঘৃণা। সেদি না লোকটা কে ?”

সকলে এবার নম্রকে বিরিয়া চাপিয়া ধরিল। তবে
নবও ছিল এম বশিষ্ঠপুত্রের দূত। দৃঢ়পেনল হুট বাতর
সজোর সফলনে ও বশিষ্ঠ বেহের খাফা সকলকে ঠেলিয়া
ফেলিয়া বহিতে সে আপনাকে মুক্ত করিয়া উঠিল, হুট চুটিয়া
গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সকলে
গিয়া দরজার উপরে পড়িল; কতকগুলি খাফাখাফি কথিয়া
অধ্যাত্ম পেনে নিকশাৎ হইল। নবের প্রতিদ্বন্দ্বীও কেত
কেহ ইহাশের মধ্যে ছিল। মনটার মধ্যে তাহাশের বড়ই
খোচাখুঁচি করিতে লাগিল। কিছ উপায় কি ? নব সে
দরজা খোলই না। দরজা ভাষিয়া ফর সেলে খেলারং
দিতে হইবে যে।

বেলা হইল, স্নানাহার করিয়া কলেজ আসিল যাহাশের
ছিল, বাহির হইয়া গেল। নব তখন দরজা খুলিয়া বাহিরে
আসিয়া স্নানাহার করিল। বলা বাহুল্য ঘটকহস্তি লগা
যে দুকেস অণোকচিত্রখানি পছন্দ করিয়াছিল, সেদুগা-
বাঝাতের বেসবাসী আঘাশের এই নকশোগালেই সেই দুক।
সেলে থাকিয়া সে তখন এম-এ আর ল পড়িতেছিল, যেমন
আর পাঁচ ছেলেও পড়িয়া থাকে। পর সি. ডি. পাঠ্যক্রমের
নিকট হইতেই আসিয়াছিল। তারিখ ও সন্ধ্যা নির্দেশ
করিয়া নব বা এম. জি. খোখালকে তিনি বাড়ীতে তাঁহার
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

সেদিন অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা নব বড় মধুর করনার স্বপ্নে
বিভোর হইয়া কাটাইল। এ বস যে গেবের নব, সে কথা
বলাই বাহুল্য। ইহার মধ্যে ভাবী স্বভাব অস্বস্ত একজন ছিল,
কিছ সেই ভাবী স্বভাবের কথা কোনও সেন্দগ্যমীর অস্তিত্ব
একরূপ ছিলই না। তবে স্বভাব ও বিবাহের কথা এখন আছে,
স্বভাবের কথা কেহ থাকিবেই। কিছ সেই কথা পত্নী কি
পত্নী, মন্ত্রী কি তেজী, এ সবকে কোনও জ্ঞান কি অহুত্ব
নবর ছিল না। এখনও যিশে কোনও চিন্তা সে করিল
না। বসীর কথা—সাধেবী স্বপ্ন—চলনশই অবশ্যই হইবে। তাই

স্বপ্নই। নব ভাবিতেছিল, তারিখ নও হইতেছিল, সে
বিশ্রান্ত বাইবে। শিভিলিগান—না, সে বস কি প্রতিভা
নাই। নাই থাকিল, ব্যারিটো পড়িবে, বিশ্রান্ত হোটেলে
থাকিবে, সেনে কিরিয়া সাধেবী কলিকাতার তাকিত আলো
শাখার সমুদ্র ও হুইলন স্পোচন বাড়ীতে থাকিবে,
বোটর ডাকিয়া হাইকোর্টে থাকিবে, সানভালা সব বড় বড়
খারিহানের সমকক হইবে, টাউন-হলে গিয়া বড় বড় সভায়
বক্তৃতা করিয়া কত বাহবা পাইবে, ছুটিতে পত্নী কঠি রাসে
সেমুন চড়িয়া দুই দুই পাখাছে কি শাখাতোলে হাওয়া বাইতে
বাটবে। ইয়োগোপ তবলেও সন্ধ্যা মধ্যে মধ্যে বাহির
হইবে। উজ্জ্বলজ্ঞা বসীর দুকেস জীবনশিখির পক্ষে শাখা
কিছ কামা হইতে পারে, সব আশ তার হাওর দুইয়ে আশি-
মাছে! নব আর চাই কি ?

কেন সে যোহন শ্বের মোহবিভোরতার জীবনে প্রথম
এই অন্তঃকৃতপূর্ণ অপ্রত্যাশিত নুখানিনার মাধুরী উপভোগ
করিবে না ?

[৩]

চারিটা বাজিতে টিক দুই মিনিট বাকী; নব ঘটক সাধে-
বের বৃহৎ অট্টালিকার ফটক খাব হইয়া চল-সে প্রবেশ
করিল। বেগম সালাব করিল। নব তার হাতে কার্ড
দিল। বেগমার স্বর্নশ্রাবীরের আদন নম্রকে দেখাইয়া
নিঃশব্দ সাবধান পরক্কেপে উপরে গিয়া উঠিল।

সাধেবের হাতে কার্ড পৌছিল। ঘড়ির দিকে তিনি
চাহিয়া দেখিলেন চারিটা বাজিতে আর আপ মিনিট বাকী
আছে। চারিটার সময় সাক্ষাতের সময় নিশ্চিই হইয়াছিল।
হী, ছোকরা কেতমুদ্রক পাঃচুয়ল বটে। ঘটক সাধেব ছুট
হইলেন; একটু মাথা নাড়িয়া বসত সেই আনন্দটুকুও ব্যক্ত
করিলেন।

বেগমার আসিয়া নম্রকে উপরে বাইতে লফেত করিল।
নব উঠিল, সন্ধ্যের বেগালে আঘনার দিকে একবার
চালিল। দ্বিপ্রহন্তে কবালে কপাল ও কপোল দুছিল।
গোম্বোড়ীতে অল্পলোপ্পর্শে দুই একটু চাড়া দিল। পাঁচ
লেকেওর মধ্যে সব সাগিয়া ঘর অস্বস্ত দৃঢ় চরক্কেপে উপরে

প্রিয়া উঠিল : বুধে একটু শুকি হাঙ্গির ভুটিল। যদিও
বুটটা ঈষৎ ঢক ঢক কাপিছেছিল।

বেগারের হাঁকিতে শব্দ। সহাইয়া নন্দ গৃহমধ্যে প্রবেশ
করিল, তাহী শব্দর জামাটার চাবিরকুর মিলন হইল।

বস্ত্র তেঁলে, কান্নাভঙ্গমপ্রাপ্তি আশঙ্ক্য এই বুধক
গুরুত্ব বটে। বেশভূষা—সাহেবী না হইলেও দুর্ভাগ্যের
পরিচায়ক। বাতাসের মতন কেনা নয়—কিন্তু খালি পরি-
ষ্কৃত ও ডিপেন্ডে বৃত্তি পাওয়াই ; তার উপরে মিহি স্তম্ভের
শাসন খণ্ডের উদ্ভূত সন্ধি বাহুর নিয় বিধা বাস স্বকীয়
উপরে উঠিয়াছে। পায়ে পাড়লা মোড়ার উপরে হাল
খালসানের পামপ্র, ডাঙাও সস্তা জোড় নহে, অথচ বেশ
পরিষ্কার। মাথার ঘনকট ঈষৎ কৃষ্ণিত তেল, তৈলনিমিত্ত
নয়, শঙ্কভাবে বিস্তৃত—দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। কপোল ও
চিবুকের দল্ল ভীক জুরে অতি নিম্নগত্রে বৃত্তিত, শুষ্ক ও
প্রতিফলিত, কিন্তু অতিমিত্ত আগা থাকান, কারণ কিছু নাই।
মুখেরা সহজ একটু প্রসন্নভাব ; সাক্ষাৎবার প্রসন্ন বৃত্ত
হাসিত বৃত্তকতার অধস্ত চকু দুটি উজ্জ্বল মধুর এবং অধস্ত,
ওঁ বড় মোহনভকীতে ঈষৎ প্রসারিত ও স্পৃহিত হইল।
ঈষৎ শিব নোজাইয়া শিখিলবৃত্তি পক্ষিগত কুলিয়া তাহী
বস্ত্রকে নন্দ অভিযান করিল। বস্ত্রও বড় প্রীত হইলেন,
মুখের চেয়ারে তাহী জানাভাবে শিরলম্বাভব বসিত
আবেশ করিলেন। সহসা এক পাশের দিকে চক্করভে ঘূর
হাসির ক্ষণি উঠিল। নন্দ চাহিয়া দেখিল, চটুল শিতনয়না,
উৎকল শিতবর্ণনা হলুদী এক তরুণী দুটি পর্দাটা ফাক করিয়া
চাহিয়া রহিয়াছে। সহসা তাহার চকিতবৃত্তি পক্ষিমা মায়
পর্দাটি ছাড়িয়া দিয়া রহিয়া গেল।

ঘটক ধমক দিলেন, “স্টোরা! হিঃ! ও কি?”

নন্দর মুখখানিও একটু লাল হইয়া উঠিল। একটু উক
উজ্জ্বলও বন্ধ বহুতে যেমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নাচিয়া
ছুটিল! এই বৃত্তি তবে—বাঃ—বেশ ত! ঘটক সাহেব
নন্দর দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। তারপর একটু হাসিয়া
কহিলেন, “হী, কুমি তবে এন. জি. ঘোষাল?”

বিনীত ভাবে নন্দ উত্তর করিল, “আজ্ঞে হী, আমায়ই নাম
নন্দগোপাল ঘোষাল।”

“নন্দ—গো—পাল”—দীর্ঘে দীর্ঘে আপন মনে কি

ভাবিতে ভাবিতে নামটি একবার উচ্চারণ করিয়া ঘটক
আবার ভিজাল করিলেন, “তোমার বাড়ী এই কন্দুকের?”

“আজ্ঞে না, পাড়ারগারে।”

“—পাড়ারগারে? কোথায়?”

নন্দ আশনার প্রাণ ও তেলার নাম বলিল।

“—বাড়ীতে কে আছেন?”

নন্দ উত্তর করিল, “অনেক আছেন—মা, বাবা, বুড়ো,
ভাই, বোন—”

“—বাবা আছেন? হঁ!—তাঁর কি করা হয়?”

“তিনি আমাদের জমিদারের নায়েব। গোমের কাছেই
কাম করেন, বাড়ীতেই থাকেন।”

“—হঁ! লেখাপড়া কন্সু তাঁর হয়েছিল?”

“—বাংলা মধ্য জানেন না। তবে ইংরেজি বেশী
পেখেন নি।”

ঘটক কহিলেন, “তা কিছু মনে করো না বাবা, এ সব
বৃত্ততেই পাঠছ—আমার জানা দরকার। তা—বাড়ীর
অবস্থা কেমন?”

“খেয়ে পরে এক রকম চলে যাচ্ছে।”

“পাড়ারগারের মত।”

একটু হাসিয়া নিঃসঙ্কোচেই নন্দ উত্তর করিল “হী, পাড়া-
গারের মতই বই কি?”

—মুখে মনে কহিল, বাবা যদি সহরে সাহেব বড়লোকই
হবেন, তবে বিয়ের ক্যান্ডিডেট হয়ে এখানে হাজির হব
কেন? সুস্থিত ত বাবাই পাঠাতে পারতেন।

“তোমার চালচলন ত পাড়ারগারের মত মনে হচ্ছে না?”

একবার নন্দর একটু হাসি পাইল; কহিল, “আজ্ঞে
ক’রছ ত সাহেব আজি। এমিকের আবহ-কালনা একটু
শিখেছি বই কি?”

“হঁ—তা আরও বেশি হয় শিখতে হবে।”

একটু হাসিয়া ঘটক সাহেবও এই মন্তব্য করিলেন। নন্দও
তেমনই একটু হাসিয়া কহিল, “তা বরকার মনে শিখব বই
কি?”

ঘটক সাহেব চেয়ারে হেলিয়া নন্দর দিকে চাহিয়া একটু
কি ভাবিলেন। তারপর কহিলেন, “তা বাড়ী-ঘর একধম
ছেড়ে আগতে পারবে ত?”

চন্দ্রিকা নম্র উত্তর করিল, “আজ্ঞে—অতটা কি দরকার হবে?”

“তা হবে বই কি? তোমার পিতা কি এই সবকিছু গ্রহণ করবেন এমন কয়?”

“সন্দেহ নহা।”

“তবে?”

“তবে আপনাতা যদি মনোনীত করেন, তাঁর অন্তরে নিজের কর্তৃত্বই বিধে করতে হবে।”

“তা ছল ত বাড়ীঘর আগে করতই হবে। তোমার বাবা কি কমা করে তোমাকে আর গ্রহণ করবেন?”

“এখনই করবেন না। তবে আমি যদি না ছাড়ি, তিনিও একেবারে ছাড়তে পারবেন না। আর না হয় কাল ছেলে বলে আমার আমাকে গ্রহণ করবেনই।”

ঘটক করিলেন, “তা বাবাকে এতটা চটাত কেন চান্ন?”

নম্র উত্তর করিল, “নিজের উন্নতির জন্য। তাঁর আশায় অতিরিক্ত উন্নতি যদি হয়, আর আমার ব্রত যদি তাঁর উপর থাকে—থাকবে বলেই ভরসা করি, সব শেষে তুলে তিনি যাবেন।”

“তবু তাঁর অন্তরে কেবল নিজের কর্তৃত্বই বিধে করা কি ভাল?”

নিঃসঙ্কোচে নিতীক হাবেই নম্র উত্তর করিল, “আগনি যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তাতে নিবাহারী যুবককে তার নিজের কাছেই ডেকেছিলেন, পিতার কাছে নয়। আর তবে একথা কেন ভিজ্ঞাপ্য করছেন? আপনাদের বিজ্ঞাপনের উত্তরে যে আসবে, আমার মতই আসবে। কেনি পিতা যেহেতু এই বকম বিজ্ঞাপনের ভাঁকে ছেলের সবকিছু করতে আসেন না।”

ঘটক উত্তর করিলেন, “ছেলে আসতে চাইলে তাকে অনুমোদনও করতে পারে না।”

“সর্বগণাবোধ থাকলে তাও পারেন না।”

একটু হাসিয়া ঘটক বীরে বীরে করিলেন, “সর্বগণাবোধ থাকলে ছেলে নিজেই কি আসে?”

নম্র উত্তর করিল, “আজকালিকায় পকে লোভটা বড় বেশী বেধেছে। আর থাকে কেউ মেয়ে দিতে চায়, তাকে অস্বর্গ্যপাও করে না। তাই নিজের অস্বর্গ্যপাও

বোধটাকে একটু চেপে ছেলে অনেকটাই আসতে পারে, যেমন আমি এসেছি। আর আগনি ডেকেছেনও ত এই বকম ছেলে। যেমন ডেকেছেন, তেমনি ত পাগেন।”

“বাকো! তোমার হেফাজত বেশ আছে। কিছু মনে ক’রো না বাবা, একটু পরীক্ষা তোমাকে করছিলাম। তা খালা উৎসাহ তুমি। লোভে এসেছ বটে, তা লে লোভও তোমারই অশোভন হয়নি। মন-খোলা সরলতা আর সাহস

কতগাধি থাকে, সব যোগ তাত্তে লাগা করে দেয়। পরা তোমার লোটো পছন্দ হয়েছে; অগাধপেও যদি পছন্দ করে, তবে তোমার সবচেই তার বিবাহ যেন।”

পর্য? ত্রোতা নহ? ঐ মেয়েটি তবে হুঁহি পরার ছোট বোন হইবে। তাই বটে! নইলে—বিবাহ ক’লে কোথাও এত বেহালা হয়?

ঘটক আবার করিলেন, “পর্য যদি পছন্দ করে, বিয়ে আমি দেব। তবে তুমি যেমন নিঃসঙ্কোচে সব কথা বললে, আমিও গোচরিত কথা তেমনি বলতে চাই।”

“বলুন।”

ঘটক করিলেন, “দেখে উপার্কন করেছি আমি; সম্প্রতিও নম্র করিনি। একটু ছেলে দিলেই পড়ছে, আর ঐ ছুটি মেয়ে, এই দায় আমার লক্ষ্য। আমি চাই এরা বেশ সুখে থাকে। তার মতে পরা কলতেও প্রস্তুত। বুঝলে?”

“আজ্ঞে, হাঁ।”

ঘটক করিলেন “হাজার হ’লেও মেয়েদাতার একলাতে ঘাবনি হ’ত পারে না। তারপর যে ভাবেই থাকি আর চলে দিগি, এটা যোগ হয় তান আমি হিন্দু—”

“আজ্ঞে, না। এটা ত—ভানতাম না।”

“তবে কি ভানতে? রাখ?”

একটু অপ্রতিভ হইয়া নম্র উত্তর করিল, “আজ্ঞে—কিছুই ভানতাম না। এটা ভাবিইনি যেটে।”

“বটে! বিয়ে করতে এসেছ, আর বওস্তর হিন্দু কি ব্রাহ্ম কি শূত্র—কোন ধর্মের কোন লক্ষণের লোক—এটা ভাবিইনি যেটে?”

লক্ষ ভাবেই নম্র উত্তর করিল, “আজ্ঞে, আপনাদের মত বড়লোক গণ্য কলকাতার ইমোরাপিয়ান টাইলে

থাকেন, তাঁরই যে কোনও দর্শ আছে বা থাকতে পারে, এটা সত্যিই কখনও মনে রাখিনি। কিন্তু কি ভ্রাক কি পুতান এখন যেটা জড়িয়ে হ'লেই হয়। আর সমাজ—সে ত আপনাদেরই নতুন একটা সমাজ হয়েছে।”

একটু হাসিয়া খটক উত্থর করিলেন, “হাঁ, যা বলেছ ঠিক বাবা। তবে কি জান, সুস্থিরের ভেত্রেই বল আর বাই বল, আমি কিন্তু বলেই পবিত্র দিই। মেয়েটা এই ঠাইগে থাকে হটে, কলকাতাও পড়ে, তবে সামান্য মজাভাবত-টারত এলব হটেও পড়তে দিই যে, কিন্তু আদর্শও কিছু নেবে।”

“হঁ! মেয়ের বিয়েও তবে কিন্তু নতাই দেবেন?”

“সেই বকমই হ'ল আছে। তাই ত বিজ্ঞাপন বাবুন পাঠাই দেবেছি। কেতে আনিও বাবুন কি না? তা তোমার কি এতে কিছু আপত্তি আছে? বেঞ্চ টেক হওনি ত?”

একটু হাসিয়া নম্ব করিল, “আছে না, এসব বাই আমার কিছু নেই। তবে বড় একটা বাই বগাবর আছে বিদেশে থাকার। তাই বিজ্ঞাপন দেবে অবৈধন করছি।”

খটক সাংগে করিলেন, “হাঁ—আবর না বলছিলেন। নেমে মাল্ল—আবর—কিন্তু নেমে একেবারে আদর্শ কিছু আন হতে পারে না। বিয়ে দিলেই বাম্বি অদর্শ হয়ে সাংগার হ'ল করতেই হবে—”

“হঁ—”

“তবে কান বাবা, সর্কং পরবণ: প্রথম—”

নম্ব হাসি লম্বরণ করিতে পারিল না। সত্যিই হেন বস্ত্রের মুখে লম্বা এরণ সাংকৃত শাহবচন—সমস্ত মনটা ভরিয়া চট্টাং বেন অলপনীর একটা শুভ্রুড়ি সে পাইল। হাসিটা গিটটার সীমা লম্বন করিয়া লম্বাঘেটে ধনিয়া উঠিল। কপাল চাপা দিয়া নম্ব মুখ নীচু করিল।

খটক মহাশয় কট হইলেন না। লম্বল সপ্রতিভ এই যুবকের লম্বল কথা লম্বল সাংগারই তাঁহার বড় মিথ্যে লাগিতেছিল। হাসিয়াই তিনি করিলেন, “তা বলে বাবা—হেলেই একটু নেও। আবার মুখে সাংকৃত শুভন—সামান্যই কথা হটে! তা কি জান, সাংকৃতও কিছু পড়ি। আর কিন্তু তেমন ভাল লাগে না। তবে বর্শন—এই সাংগা আর বেনাসটা কিছু আলোচনা করে থাকি।”

নম্ব হাসি খালিল। হাসির উচ্ছ্বাস এরণ অবদার

চাপিতে বেলে আনও বাড়ি। আর যদি কানও করে না লম্বলে চাপিবার সাংগার না হয়, তবে লম্বাঘেটে তাঁটিয়া পড়ে।

কন'লে চকু মুখ বুদ্ধিমা শাস্ত তাইই তখন লোকা হইয়া সে বদিল। কেবল একটু চকু মুখ হাসি গোপের কোণে খেলিতেছিল। বস্ত্রেরও অবস্থা ততশ। চোপে চোপে দৃষ্টি পড়িল। উভয়েই উভয়ের মনটা বেন তাহাতে বেশ চিনিয়া গইলেন।

খটক করিলেন, “কি জান বাবা, যেহে প্রটোকে বস্ত্র ভাল বাসি। তাই ভাবলাম, অদর্শতাও যদি কিছু কমান দান, তবে মুখে থাকবে। বড় বয়ের ঠেঠা হেলেও পেত্যশ—টাকা বস্ত্রও হস্ত কন হয়। কিন্তু সে মনে করত, যেহে বিবাহ করে ভাগ্য অমুগ্রহ আমারে করেছে। বিশেষ একটা প্রদ্বা কি আদর হস্ত তাকে করত না। তবে এমন যদি কোনও হেলে পাঠ, থাকে আমিই সাংগর করে দেব—উচু পদে বস্ত্রের দেব—সে কতজ্ঞ থাকবে। আমার হেলেও খাতির করে চলবে। সে যাতে মুখে থাকে, কিছু অদর্শতা পার, সে দিকেও বেশ দৃষ্টি বেখে চলবে।”

দটক খালিলেন। নম্ব নীরবই রহিল, ভালমন্ড কিছু বলিল না। একটু পরে খটক আবার করিলেন, “তা বাবা, সব খুণে তোমাকে বলান। আমি এটো চাই আমার লগাকে একেবারে চোপে দিবে রাখবে না। সে যাতে মুখে থাকে—ইচ্ছের একটু নড়তে চড়তে চলতে দিগতে পারে—বেন সবল'গ মিতের, কিছুই মল কারও উপরে নির্ভর না করে, কারও মুখ চেয়ে তাঁকে চলতে না হয়—এমনি খাড়া একটা বুদ্ধি তাহে মুখে সে থাকতে পারে, তেমনি বাববা তোমাকে করতে হবে। সেটা পারবে ত?”

কথাগুলি কেমন বেন নম্বর ভাল লাগিতেছিল না। অবস্ত্র এটা এমন বেশি কিছু নয়। বস্ত্রের টাকার বড় হইলে, বস্ত্রের বেলেও খাতির করিয়া চলিতেই হয়। কিন্তু এমন খাড়া একটা কড়ারে আবস্ত হওয়া—সেটা বেন কেমন বড় নিশ্চিই তার লাগিল। বাবা হটক, একটু ভাবিয়া সে করিল, “এটা আর আপনাকে বলতে হবে কেন? আপনাব টাকাতাই যদি সাংগর হই, কতজ্ঞ থাকবেই। আর আপনাব হেলে যাতে মুখে থাকেন, তাঁর ভস্ত্রও বস্ত্র সাংগা চোটা করব।”

ঘটক করিলেন, “ওটা বাবা, পাশ কাটিয়ে এড়াবার মত কথা হ’ল। তা—হ’ক! এ সব মন নিয়ে কথা। মন যদি বিগড়ে যায়, কোনও কড়ারে বেঁধে কাউকে তার কষ্টখা কি প্রতিশ্রুতি কিছু পালন করার যায় না। বা হ’ক, আমার কথা সব খুলেই বললাম, মনে যেন। এখন তবে লগাব সঙ্গে একবার দেখা কর।”

ঘটক সাহেব বেল টিপিলেন—“হুঁ!” ‘বহ’ (বালক তৃত্য) প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল। ঘটক করিলেন, “মিস্ ক্রোয়াফো আনে বোলো।”

‘বহ’ হাতিরে ঘাইতে না ঘাইতেই ক্রোয়া পানের ক্ষয়ের দরকার পূর্ত্যটা সম্বোধিতা চোখবুকেরা মিটিমিটি একগাশি চুই, হাসি চাপিতে চাপিতে গৃহঘরো প্রবেশ করিল। কনিষ্ঠাই নম্বর দিকে চাহিয়া উজ্জ্বলিত হাসিতরা চকু ভিতাইয়া গেল।

ঘটক করিলেন, “তুই বুকি ওই পর্দার আড়ালে হাড়িয়ে সব শুনছিলি? তাই তুই চ’রেছিস ত?”

ক্রোয়া উত্তর করিল, “হুঁ—আমি একাই বুকি শুনছিলাম? না ছিলেন, ‘আব—না, তা বলব না—এখন, তা ডাকছিলে কেন?”

“তোদের বলবার কত প্রক নিষে যা। লগাওও গিয়ে বল—”

“সে গাবে না।”

“গাবে না? সে কি রে?”

“বললে—সব শুনল কি না আড়ালে হাড়িয়ে—তা বললে, তার ‘আব’ বেঁধা কতখান দরকার কিছু নেই। বঙ্কল অত্যাচারে তার।”

বলিয়া টিপটিপি হাসিয়া নম্বর দিকে একবার চািল।

“আজ্ঞা তুই-ই তবে প্রচো আলোপ-সালাপ না হয় করা।

আদি আসছি। জুনি ব’স বাবা, ব’স। আসছি।”

বলিয়া ঘটক সাহেব বাহির হটল মেলেন। তাহিলেন, লগা ত পানের ক্ষরই আছে। যদি একবার আসে।

[৪]

ক্রোয়া তেমনই হাড়াইয়া বুখ টিপিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল, ‘আব’ নম্বর দিকে এক একবার চাহিতে লাগিল। দৃষ্ট বড় চটল, ‘আব’ হাসির হীর কটাগুলি যেন নম্বর চোখে

মুখে লক্ষ লগে গিয়া টিকটাইয়া পড়িতেছিল। ক্রোয়া নীরবে হাড়াইয়া চুইব মত কোনলট চাপিয়া চাপিয়া হাসিতেছিল। নম্বর নীরব; গাশি ‘আব’ বড় পাইতেছিল। অপরিস্রিত এই গুণে অপরিস্রিত। এই তরুণীর লক্ষ্যে মুখে এই হাসির অভিনয়—এখন একটা। অপরিস্রিত কোতুকর অদ্বুত বসেব প্রত্নত্বের বৃষ্টি করিল যে, নম্বর ‘আব’ লহিতেই পায়িল না, একবারে উচ্চ হাজাই করিয়া উঠিল। ক্রোয়া উচ্চহাজে তার প্রতিক্রিয়া তুলিল না বটে, কিন্তু তেমনই বুখচাপা হাসির মুখে হাসিতরা দ্বির দৃষ্টিতে তাগাব দিকে চািল।

নম্বর হাজ লম্বন করিল। ক্রোয়া তখন কহিল “আপনি হাসলেন যে বড়?”

নম্বর উত্তর করিল, “হাসি গেল যে বড়। কি করব?—তা ভালই করলাম, হেসেছিলাম, তাই না তোমার মুখে কথা বেল।”

ক্রোয়া কহিল, “আপনি কথা কিছু বললেন না, আমি নেমে হাজল—গাবে পড়ে আগে কথা বলতে পারি?”

“বুখ টিপে টিপে হাসছিলে ত বুঝ।”

“গাশি পাচ্ছিল—”

“কথা পাচ্ছিল না?”

“হাও পাচ্ছিল। তবে কথা পাওয়া সামলান যায়, হাসি গেলে সামলান যায়। আমি ত পারি না। আপনিও পারেন না। তবু আমি চুপি চুপি হাসছিলাম। ‘আব’ আপনি ত ও-হ’বার হিহি কবেই হেসে ফেলেন।”

নম্বর কহিল, “হী। তবে কি না—গাশি গেলে আমি সামলাতেই কখনও পারি না। ‘আব’ ত এখানে কিছু বেয়াবনাই করে দেলেছি।”

“গেটা ‘আব’ না বললেও হ’ত। আমাধেরও একটু বুদ্ধি আছে।”

“তা বেয়াবনটো হাক করতে পারবে ত?”

“না করে ‘আব’ হাি কোথায়? হাসিতে ‘আব’ চুইখোতে বেয়াবন আমিই কি কম? তবে ভব পাবেন না। বিধি আদার মত নয়। খুব ঠাণ্ডা ‘আব’ গল্পীয়; হাসেও কম।”

“সেইটেতেই বরং ভব পাবার কথা। তোমার মত গালগেট ভাল হ’ত, সমান সমান মিলত ভাল। তা তোমার

হওয়া ত এক বকম পছন্দ করছেন আমাকে। এখন তোমাদের পছন্দটা—”

ক্রোড়া কহিল, “যাও সবতাব তাই চ’রেছে। মিদ বেল পছন্দই করেছে।”

“আর তুমি ?”

“আমার পছন্দে অল্পদুখে এমন যায় আগে কি ?”

“যাও আগে না ? তুমি হ’লে—না হয় হবে—”

“সিটার-ইন্-ল,—শালী নয় কিছ। ওটা বড় বিশি তথা। লোকে ঐ বলে গলাগাল দেয়।”

“বেশ তাই হবে। শালী নয়, সিটার-ইন্-ল। তা সিটার-ইন্-ল—”

“ফিউচার (future)। এখনও হয়নি যে, হবে।”

“বেশ ! তবে হে উচ্চ বি সিটার-ইন্-ল ! ফিউচার যোনাইট যে তোমারও পছন্দ চায়।”

ক্রোড়া কহিল, “আমারও এক বকম হয়েছে। তবে একটু খানি বাকী ছিল, তাও যেন হয় হয় হ’য়ে এল।”

“কি বাকী ছিল ?”

“তা বলব না। বড় লজ্জা করে। দিদির কাছে শুনেব।”

“তোমার দিদির সঙ্গে ত দেখাই হ’ল না।”

“বিয়ের পর হবেই।”

“আগে হবে না ? যেথা শুনে না হ’লে—”

“ক্রোড়া কহিল, “যেথা শুনে—তা বাবার সঙ্গেই আড়াল থেকে দিদির হ’য়ে গেছে। পছন্দও হ’য়েছে। আর ঘরকার কি ?”

“ভীর না থাক, আমার ত আছে। যেথা শুনে আমার ত চ’ল না।”

“আপনার কি তার কোনও ঘরকার আছে ?”

“ঘরকার নেই ? বল কি ? যেথা শুনে করই না

লোকে পছন্দ করে।”

“আপনি ত মিলিকে পছন্দ করতে আসেন নি।”

“তবে কি করতে এসেছি ?”

“বাবার মেয়ে বিয়ে করতে। বিয়ের কথাবার্তা হ’য়ে গেল। মিলিকে পছন্দ করবার অপেক্ষাও ত কিছু থাকেন না। দিদির অবিভি পছন্দের ঘরকার ছিল। তা সেটা ত আড়াল থেকেই তার হয়ে গেল।”

ক্রোড়া অসংবৃত্ত ভাবেই কথাগুলি সব একেবারে বলিয়া ফেলিল। কথাবার্তার ক্রোড়া এমনটাই অসংবৃত্ত ছিল। বা যখন মনে উঠিত, টপাটপ সা বলিয়া ফেলিত, চাপিতে কিছু জানিত না। কথাগুলি সব সত্য। নন্দও অস্থম্ব করিল, অতি কঠোর—অতীতের মানিকর মতা ! মিছরীর ছুরী হইলেও ছুরী হুটে—আর ধারণ বড় তীক্ষ্ণ—যেন পালা ইন্দ্রাজের ! সড় তীক্ষ্ণ তাইবই এ ছুরীর আঘাত নন্দর হৃদে গিয়া বি’ধিল। দিক্ ! পুরুষ হইয়াও এত বড় একটা বীনতার সে মানিয়া আসিয়াছে ! যে নারী তাকে পতিত্বের বরণ করিবে তারই তাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ঘরকাহ ছিল, দেখাও হইল। আর সে পুরুষ—টাকার লোভে উচ্চ পদের লোভে মান ধনীর কল্যাক পত্রাতে গ্রন্থ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে ! সেই কথা যে কি, তার খোঁজ হইবে কি না, পরীক্ষণে তাকে ভাল লাগিবে না, এ সব বিচার বিবেচনার কোনও প্রয়োজনই তার নাই ! দিক্ ! পুরুষের পক্ষে ইহার বড় বীন বীনতা আর কি হইতে পারে ? আরও দিক্, সেই বীনতা সেই ধনীর কল্যাক ধরিয়া ফেলিয়াছে ! সে যে তার বাপের টাকায় কেনা গোলাম হইবে ? বাপও লম্বা তাহার ইতিহাস করিয়াছিলেন। হি হি ! আগে এটা সে বুঝিতে পারে নাই কেন ? তাহে নাই কেন ? সহসা যন্ত্রের সাজান ধর্মা নন্দর চুরবার হঠাৎ দৃষ্টিতে পড়িল। অসীক ইন্দ্রজলের আলোক নিভিল, সব আঁধার হইল ! সব আঁধার ! কিছ সেই আঁধারের মধ্যেই সত্যাকার একটি আলোক তাহার চক্কর সম্বন্ধে যেন ছুটিয়া উঠিল। দিক্ তার নিলাত দাওয়ার, দিক্ তার ব্যাবিটরীতে ! গ্লীহ গোলাম হইয়া তার আবার উচ্চ পদের ও গ্রন্থের মৌরন কি ? ইহা অপেক্ষা তার পিতার সেই নারেরী—তাও যে অনেক বড় !

কথাটা শুনিয়াই নন্দর মুখখানি প্রকম লাগ হইয়া উঠিল। তারপর ক্রমে ক্রমে একটা বেদনার বিবর্তিতা ব্যক্ত করিল। ক্রোড়াও কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াই বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। নন্দর মুখের নিকে দ্বির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বুঝিল, তাহী ভীষণতর মনে বড় ব্যথা সে দিয়াছে। বড় একটা লজ্জা—বড় চাপও তার চইল। একটু কাছে আসিয়া

দীর্ঘ পরে কহিল, “আগনি ভাগ করলেন ? বড় অজ্ঞায় কথা আমি বলছিলাম।”

চমকিয়া নন্দ আশ্চর্যবশতঃ প্রশ্নে পাঠিয়া কহিল, “না না, ভাগ কেন করব ? অজ্ঞায় কি ? ঠিক কথায় তুমি বলছ।”

একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ-ভরা সেই স্বর্গীয় চট্টল নদীর দীপ্তি আর ভাঙিয়া উঠিল না।

ক্লোয়া কহিল, “আমি সামলে রাখবও কথা বলতে পারিবে। যা এখন মনে আসে, বলে ফেলি। ওটা আমার বড় একটা দোষ।”

নন্দ কহিল, “বোধ নহ, বড় এতটা গুণ। মনের কথা এখন সরল ভাবে বলতে সবাই পারে না।”

অতি সন্তুষ্ট ভাবে ক্লোয়া কহিল, “তা হঠাৎ মনে উঠল, নইলে ওটা যে ঠিক আমার মনের কথাই, তা নহ। আর হলেও আমারই কথা। নিশ্চয় নহ, এটা জানবেন।”

তেমনিই শুক দীর্ঘ হাসি হাসিয়া নন্দ কহিল, “ভীষণ হলেও এখন অজ্ঞায় কি অস্বাভাবিক কিছু হ’ত না।”

নন্দ দুইহাতে চোঁটা কপিত্তেছিল, এ কথাই তাহার মনে কিছু আঘাত লাগে নাই। পূর্বের জ্ঞান-রস-ভাসানার ভাবেই কথাটাকে সে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ক্লোয়া সরল বুদ্ধি নহ, বুদ্ধি, বড় একটা অগম্যমানের আঘাত ভয়ীরা পানিপ্রাণীকে সে করিয়াছে।

দোকটা তেজী, কি জানি কি হই ! একটু কি ভাবিয়া দেখে কহিল, “দিবির সঙ্গে একটি বার দেখাই করুন না, তাকে এখানে ডাকি।”

“না, না ! আর থাক ! এরপর যেদিন আসব, দেখা হবে। ইস্ ! ছ’টা বে বাজে, আমি তবে আর। বাইরে বসে জরুরী একটা কাজ আছে। তোমার বাবা কোথায় ?”

“বোধ হয় ঐ বাগানখানায় আছেন।”

“আচ্ছা, উঠি তবে আর। নমস্কার।”

অতি দ্রুত ভাবে ক্লোয়া কহিল, “আমুন তবে, নমস্কার। আগুনকে—বস্তু চন্দন বাবার কাছে পৌছে দিয়ে আমি।”

উজ্জয় বাহিরে আসিল। বটক লাগে নাগান্ধার বেশি হরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ঝাঁড়িয়া নিশ্চি নিতেছিলেন। ক্লোয়া ডাকিয়া কহিল, “বাবা, নন্দবাবু যাচ্ছেন এখন।”

কিরিয়া কাছে আসিয়া বটক তুলিলেন। “এগুলি ! সে কি ?”

নন্দ কহিল, “হী, এগুলি যেতে হবে। বাইরে একটু কাজ আছে।”

“চা’ টা কিছু খেলে না—এগুলি খাবে শিক ? ওর ইঙ্গিতের বা—নিশ্চয় খাবার টাওয়ারের যোগাড় কর ফেলা।”

বিনীত ভাবে নন্দ কহিল, “আজ্ঞে, আর যাক করবেন। জরুরী কাজ, না গেলেই হবে না। চা’টা এর পরে যে দিন আসব, খাব। আর আমি, নমস্কার।”

“আচ্ছা, এস তবে। গুড বাই !”

করমর্দন করিয়া বটক সাংকে নন্দকে বিদায় দিলেন।

ক্লোয়া কেমন বিবর্ণ—কেমন মনোভাণ্ডা ভাবে চাহিয়া রহিল।

“কিহে পাগলী ?”

“না, কিছু না বাবা। তুমি চা খাবে এখন ?”

“হী, আন, —খেয়ে এগুলি খেয়ে।”

অন্তরমত হটবার একটা উপলক্ষ্য পাঠিয়া ক্লোয়া যেন হাঁক ছাড়িয়া বাটিল। চকল চবনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

[৫]

“বাবা ! নন্দ বাবু তার আসছেন না ?”

“সে হতভাগা আর আসবে না ক্লোয়া।”

ক্লোয়া চমকিয়া উঠিল। মূখ্যবানি বিবর্ণ এবং চক্ষু জ্বল ও ছল ছল হইয়া উঠিল। কহিল, “আগুন না ! কেন বাবা ? সব ত ঠিকই হয়ে গিয়েছিল—”

বিরাগে মুখ ঝাঁকিয়া বটক লাগে কহিলেন, “আর ঠিক ! এই সব ছোঁকাবোয় কথার কিছু ঠিক আছে ? ওদের উপর কিছুতে নির্ভর করাটী কুল।”

“কেন বাবা ? সম্ভব কি তিনি কৈশে দিতে চান ?”

অতি ভীত দৃষ্টিতে ক্লোয়া কহিল।

“হী।”

“কেন ?”

“কেন আর কি ? বাবা বুড়ো বৃদ্ধি সব গী থেকে এসে খুব চেপে ধরেছে, এখন ততকৈ গেছে। হতভাগা ! সেদিন কথাবার্তা বেশ বলছিল। তা সব যে ঝাঁকা—আর বাস্তবিক সে যে এত চরম, তা মনেও তখন হইনি।”

“চিঠি এলোছে না কি বাবা? তাই কি লিখেছেন?”
 ষটক উত্তর করিলেন “তাঁর কি আর খুলে লিখবে?
 লিখেছে সব বড় বড় ভাবের তথ্যই করে! সে আগে তার
 মন বুঝতে পারেনি, কেবল টাকার গোতে বিধে করা তার
 বড় হীনতা বর্ষে মনে হচ্ছে এখন। গোতে যে আপনাকে এমন
 বিক্রিয়ে দিতে পারে, তার মত হীনচেতা কাপুরুষের সঙ্গে
 আলাপ মেথের বিধে বেওয়া উচিত নয়—এই সব আর কি?
 এই যে হতভাগ্য চিঠি—শুধু দেখ।”

ক্রোড়া চিঠিখানি পড়িল। দুখখানি লাল হইয়া উঠিয়া
 তখনই আগার একেবারে নিশ্চয় হইয়া গেল। নত বুঝে
 কিছুকাল থাকিয়া শেষে কহিল “বাবা শুনো তিনি ঠিক কথায়
 লিখেছেন।”

“হ্যাঁ ঠিক হই কি? হুতো—সব হুতো! বাপের চাপে
 পেছোচ্ছে—সেটা তাঁ পূলে বলতে পারে না। তাই এখন এই
 সব সেন্টিমেন্টের (sentiment) হুতো বোপাচ্ছে। এসব
 সেন্টিমেন্ট বাপু ভোর আগে কোথায় ছিল?”

“জগা ছিল, শেষে আঘাত পেয়ে মনে জেপে উঠেছে।
 বাবা, তোমার লুতাখ না, লুতাতে পারব না—লুকোন
 উচিতও হবে না। সেদিন থেকে লুতার আঁরি নগ্নে আছি।
 এ আঘাত আনিই তাঁকে দিবেছিলাম। হঠাৎ অশাব্যাসে
 ঘোচাকতক কথা বৃথ দিয়ে বেরিয়ে প'ল। তাতে যে তিনি
 বড় অপমানিত হোষ করলেন আর বাখাও বড় পেলেন,
 তখনই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। কিছু আঘাত একবার
 করলে ত আর তা কিভাবে নেওয়া যায় না?”

ষটক ব্যাধ পর নাই বিস্ময়ে করিলেন, “সে কি রে? কি
 বলেছিলি? আর তুমি কি বৃথ সামলাতে কখনও লিখনি?
 এ যে আচ্ছা এক বিস্মট বাণিয়ে ফেলছিল। ঐ!—তা
 কি হয়েছিল সব বল ত? কি বলেছিলি?”

ক্রোড়া সব কথা বুলিয়া শিতাবে বলিল।

“হু—তাই হঠাৎ অমনি ব'লে গেল—এত বললাম চা
 খেয়েও সেল না। কাজ বাইরে গেলো কি এমন থাকতে পারে
 যে, একইস্থ লুত সইল না? হু—তা চটবেই ত চটবেই ত
 —কণাগুলো বড় বিশ্রীত বলে ফেলছিল। বিশেষ বাওয়ার
 গোরে ছোঁড়িয়ে আকতাল ভাল বসু কান থাকে না, নটলে
 ছোকরার মনে খেপ তেজ আছে! প্রাণী চেষ্টে ত এলছিল,

তা খাতির করে কি মন খুঁজবে একটা কথাও বলে নি,
 তেমন ভাবও কিছু দেখায় নি। ছোকরার তেজ আছে—
 তেজ আছে। এত বড় অপমানটা করনি, সইবে কেন?”

ঐশ কান হইয়া ক্রোড়া কহিল, “এখন তবে কি হবে
 বাবা?”

“কি আর হবে? মাক খেয়ে একটা চিঠি লিখব।
 বিধে এখানে সে আর করবে না। ডেজী ছেলে কেউ
 ভা করতে পারে না। কি করব? বেশ লেগেছিল! খালী
 ছেলে, মিলি চেহারা, আর কথাবার্তার এমন লজ্জিত!
 খালী ছেলে—কেনন একটা মমতাই হবে পিয়েছিল।
 তা সব মাটিকরে দিলি ছুঁড়ী! বাবু কি আর করব, পূব
 শিক্ষা হ'ল, বুঝি অমন বেকাল কথা আর কখনও মেনে
 যুবে না বোঝায়।”

“দিমির কিয়র কি হবে বাবা?”

“বিয়ের কল্ল এমন তাবনা কি? আর একটা এখন যেথতে
 হবে। তবে অমনট কি আর মিলবে? খালী বেছেছিল
 লতা—মুগের চেহারা দেখেই বের মনটা গিয়ে বিয়েছিল।
 তা—তাকে বল আর একটা ছবি বেছে দিক।”

“সে ভা আর দেবে না।”

“তবে পাঠিয়ে দিল কোটোগলো! ওবেলা আমি আর
 তোম মা একটা বেছে নেব। তুইও থাকতে পারিস।”

ক্রোড়া কহিল, “বিছে আর খেঁটে কি করবে? দিমি
 আর কাটকে পছন্দ করবে না।”

“সে কিরে ক্রোড়া, বলিস কি? ঐ!”

“বল্ল অস্তায় হবে গেছে বাবা! মাটিতে আছাড় খেয়ে
 কানতে ইচ্ছে হচ্ছে, কি হবে বাবা? দিমি যে আর কাটকে
 ধিয়ে করবে না। নম্ব বাবুকেই যে বল্ল তার মনে ধরে দিয়ে-
 ছিল বাবা—”

অন্তিমভাবে ষটক সাধেন কিছুকণ বসিয়া রহিলেন।
 শেষে কহিলেন, “লতা কি এই রকম কিছু বলেছে?”

ক্রোড়া কহিল, “পাঠ বলে নি কিছু। বলবেও না।
 দিমি সে রকমই নয়। তা না বললে কি বুঝনি কিছু?
 দিমি সব শুনেছিল, তখনই আমাকে বললে ক্রোড়া ভাল
 করিস নি। তারপর এট কহিন ত একেবারে অনমনা হয়ে
 আছে। আজ আমাকে নিজেই বললে, বাবাকে জিজ্ঞাসা

ক' না ফ্রোয়া, কবে আসবেন কিছু লিখেছেন কি না।
আহা, একথা শুনলে কি করবে আমি না। কি করে বিবিকে
সুখ দেখাব বাবা ? কি করে এ গৃহে সইব ? আমি নিজে যে
তার এই সর্বনাশ করলাম বাবা !”

কি ভাবিতে ভাবিতে ঘটক লাগেব কহিলেন, “হঁ” বুকেছি।
তা—এ ত হতেই পারে। অমন ছেলে ! ভাতী মুকিল হল
ফ্রোয়া। বেচারি একটা পাপসামো এবার করে ফেলেছিল
পাপসো। তবে ছোকরার গ্রাণ্টা বড় আছে। লগার অবস্থা
সব জানলে দয়া করে তাকি হতেও পারে। কিছু সেটা এক
লক্ষ্যার কথা হবে ফ্রোয়া।”

ফ্রোয়া উত্তর করিল, “আমার এ লক্ষ্যার চাইতে কোনও
লক্ষ্যাই যে বড় হতে পারে না বাবা ? যিনি যদি আমার
শোবে এত বড় গুণু পাত, আমি মরে যাব। সে যদি বিয়ে
না করে আমিও করব না, কোন সুখে করব ? হাঁ, তাও কিছু
বলে রাখলাম বাবাব”

“আজ্ঞা যা যা, এখন যা। অন্ত অধীর হ'লেন আপনাই।
যেখি কি কল্লত পারি।”

ফ্রোয়ার হাদির চোখে অচ অক্ষ বহিল, তসু মুছিতে
মুছিতে সে চলিয়া গেল।

[৬]

“যিনি ! যিনি ! আমার কি মাক করতে পারবি ?”

“এসব কি বলছি ফ্রোয়া ! পাপসো ! মাক আমার
কিসের ? তোয় উপর কি আমি রাখ করতে পারি ?”

“সেই যে আমার আরও গৃহে যিনি ? রাখ যদি
করতিস, তাও যে আমি সইতে পারতাম। কিন্তু এত বড়
অপরাধটা যে অপরাধ বলেই থরে নিলিনি, এত ভালবাসিল
তুই, আর এত বড় সর্বনাশটা তোয় করলাম, মনে করতেও
আপনার মনেই যে মরে যাচ্ছি যিনি।”

একটু রান অক্ষ পাভ হাদি হাদিরা লগা কহিল “ফ্রোয়া
মতি তুই বড় পাপস ! আজ্ঞাযেও একবারে নেচে উঠিল
আবার গৃহে কিছু হলেও একেবারে এলিয়ে পড়িল। এখন
হলে কি আর এ গৃহীণীতে কাবও চলে।”

ফ্রোয়া উত্তর করিল, “যেমন তেমন গৃহে একটা হ'লে
কি আর এলিয়ে পড়তাম যিনি ? এ যে সইবার মত গৃহে

মহ। তোয় ভৌনটাট যে মাটি করে নিলাম—আব তাও
নিজেব বেলামাল সুখের বোঝে। ছি ছি ! জিত কেন
আমার থলে প'ল না ? স'ড়াইব নিজে যে টেনে ছি'ড়ে
ফেলতে টেছে টেছে।”

“এই শোন পাগলীর কথা ! ভৌনটা মাটি হ'ল কিসে ?
যিহে—তা যদি নাই হ'ল—তাহেই ভৌনটা অমনি মাটি হয়ে
যাচ্ছে ?”

“কি করবি তব ? বিয়ে কি মতিটাই আর করবি নি—
উনি—উনি যদি—”

“থাক এখন ও কথা ফ্রোয়া—”

ফ্রোয়া কহিল, “বাবা বলেছেন নন্দ বাবুকে চিঠি
লিখবেন।”

গতীর একটি নিখাস চাড়িয়া লগা কহিল, “মাত কিছু
চাই নে ফ্রোয়া। তবে কেউ যদি তাঁকে এইটু বুঝিয়ে দিতে
পারত আমার বাস্তবিক তাঁকে ছোট মনে করিনি, কোনও
অশমন করে তাঁর প্রাণে বাধা দিতে চাইনি, তবে বড় ভাল
হ'ত। বড় লক্ষ্যাই হচ্ছে আমার ফ্রোয়া। আমারের কথা
তিনি কি ভাবছেন ? ধন্যকারে—যিনি স্বামী হবেন তাঁকে
এমন অজ্ঞা আমার করতে পারি—অজ্ঞা করতে আমার
তাঁকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হতে পারি—এত হীন আমার—
এই যে একটা। তাই নিয়ে তিনি পেলেন—সেইটে তাহতেও
লক্ষ্যার মনে মরে যাচ্ছি। অবিশ্রি বড় বাধাও একটা পেয়েছেন
—বড় মর্মান্তিক বাধা—তা কি আব করব ? যা হবার হয়ে
পেছে। তা বাধা যদি একটু বুঝিয়ে দেখেন—”

“লিখবেন ত বলেছেন।”

“বুকে যদি তিনি ক্ষমা করেন—বাধাটা মূলতে পেরেছেন
জানতে পারলে মতি বড় সুখী হব ফ্রোয়া। আর ঐ যে
একটা ধারণা আমারের লগছে যিহে পেয়েছেন, সেটাও মূল
হয়েছে যদি জানিতে পারি—”

“মুখামুখি যদি দুটো কথা তাঁকে বলতে পারতাম যিনি—
তা বাবা ত লিখবেন বলেছেন। যদি একটুগার আসেন—”

“তাই কি আর আসবেন ? কেন আসবেন ?” বলিতে
গলিতে লগা মুখানি ফিরাইয়া লটল। রত জানালায় কাছে
গিয়া ষাঁড়টিল। ফ্রোয়া তসু মুছিতে মুছিতে বাহিরে চলিয়া
গেল।

[৭]

“আজ্ঞে এমন একটা কথা যে স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারি নি। তা আমা হতে এতটা অশান্তির কারণ আপনাদের ঘটেছে, এতে বাস্তবিক বড় লজ্জিত হচ্ছি।”

“তা বাবা, কেবল লজ্জিত হলেই ত হবে না। অতি উগ্রভেদে তা সঙ্গর হৃৎক বলসেই তোমাকে মনে হচ্ছে, তাই একথা বলতে তরসা পাচ্ছি। এখন পেছলে চলবে না বাবা। লগ্নাকে তোমার বিবাহ করতেই হবে।”

ঘটক সাহেব তাঁহার আঁকিলে নম্রকৈ ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। সেখানে নিহৃত এক গৃহে বলিয়া উঠবে কথা বলিতেছিলেন। সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া নতমুখে নম্র করিল, “আজ্ঞে, এ অবস্থায় অস্বীকার করতে আমি পারিনি। যেমন আদেশ করবেন তাই করব। তবে একটি বিবেচন আমার আছে।

“কি বাবা?”

“আপনি আদর করে দিচ্ছেন, আপনার কঙ্কাকে আমি বিবাহ করব, করে কতখানি হবে। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, কোনও রকম আর্থিক সাহায্য আমি নিতে পারব না।”

অতি বিস্ময়ে চমকিত হইয়া ঘটক সাহেব নম্রর দিকে চাহিলেন, নীরবে স্তম্ভভাবে কতকাল চাহিয়া রহিলেন।

“সে কি বাবা! কিছুই নেবে না? বিলেত বাণিজ্য খরচটা ত অল্পতঃ নিতেই হবে।”

“আজ্ঞে না, তাও পাবে না।”

“কি করে তবে পাবে?”

“হাব না।”

“হাবে না? হাবে না—সত্যিই হাবে না? তা হলে—কি করবে?”

“সেপে জেকই বা পাতি, করব। সবাই ত আর বিলেত যায় না।”

“হঁ” কিন্তু তাতে কি আর চলেবে? তেমন টাইলে থাকতে পারবে?”

নম্র উত্তর করিল, “তা পারব না আমি। আপনার মত টাইলে থাকা কখনও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তবে খনীর মত কোনও ভোমস্বয়্য আমার সংসারে না জটিলও

শিক্তি মহাবিশ্ত ভক্তসমাজের নারীদের মত আপনার ঘেরে ঘাটে থাকতে পারেন, তার ভক্ত গ্রাণপন বর করব।”

পতীর একটি নিখাল চাড়িয়া ঘটক সাহেব কহিলেন, “হঁ”? তা বর, তুমি নিজে কিছু নেবে না বলছ, নাই নিলে। কিন্তু আমার ত ঘেরে—টাকাও আছে—আমি যদি তাকে কিছু দিই—”

“বজ্রক্ষেপে দিতে পারেন। নিষেধ করবার অধিকার আমার কিছুই নেই। তবে আমার পরিবার প্রতিপালনের জন্য তা বেচে এক পরশও আমি কখনও নেব না।”

ঘটক সাহেব বলিলেন, “বাবা! স্ত্রীরা বড় অস্বাভাবিক, একটা ভুল করে ফেলেছে, তাকে কি মাক করতে পারবে না?”

নম্র উত্তর করিল, “আজ্ঞে, মাক কিসের করব? তিনি ত অজ্ঞা কিছু করেন নি। বরং বড় একটা উপকারই আমার করেছেন। বড় একটা মোহে আমি আজ্ঞের হয়ে ছিলাম, হিতাহিত জান ছিল না। সে মোহে কান্নের নতুন একটা পুষ্টি তিনি আমার দিয়েছেন। তার জন্য—তাকে বলবেন,—ধারণর নাই স্বতন্ত্রই তাঁর কাছে আমি আছি।”

“বাবু! কানের কথাই এখন হ'ক। তুমি শু কাক-কর্ম এখনও কিছু কর না। আরম্ভ করতেও দেই কিছু হবে। তোমার বাবাও বেধ হয় এ বিয়েতে অসুখোদয়ন করবেন না?”

“সম্ভব নয়। তা—বিয়ে যখন করতেই হবে, তাকে না জাকিয়েই করব। সেবে তাকে খুলে সব লিখব। যদি অন্য করেন কাল। আর যদি না করেন—”

“তবে? কি করবে তবে? তোমার পড়াও ত শেষ হয় দি। বাহুব হতে হ'লে, আরও ত পড়তে হবে। তারপর বর—”

নম্র কহিল, “নিজে কাঁচকর্ম করে পড়ার খরচ চালিয়ে নেব। শুবে ছিয়েটা যদি এখন বসিত রাখতে পারেন—”

বাবা নাকিয়া ঘটক কহিলেন, “না! সেটা—না, এখন বসিত রাখা আর চলে না। বিয়ে এগুনি করতে হবে।”

নম্র একটু ভাবিয়া কহিল, “তাহলে বন্ধিন না আমি বাহুব হ'তে পাতি, আপনার ঘেরে আপনার কাছেই থাকবো।

পেয়ে কারকপণের একটা ছবিতে আমার চলেই তিনি তাঁর নিজের সংসারে গাবেন।”

“এই তবে বাবা তোমার ছবি সংকলন?”

“আজ্ঞে, মাক করবেন, এই-ই আমার ছবি সংকলন। মাক রকম কিছু করতে পারব না। তবে অর্ধে আর গবে না পারি, আমার সেহে আগনার কতটা হুণ বড় হুণ হতে পারে তার কুট কিছু হবে না।”

বড় গভীর একটি নিশাস ত্যাগ করিয়া বটক কহিলেন, “তাল, তাই তবে হবে। বাতীতে গবের সঙ্গে পরামর্শ করে বিবেচ্য বিন একটা ছবি চলে তোমাকে জানাব।”

“যে আজ্ঞে।”

তাহী বড়র মহাপুরুষে সন্তোষ প্রদান করিয়া নম্র বিদায় গ্রহণ করিল।

[৮]

দিন ছির হইল। বধা সময়ে সরল অনাক্ষর্য তাবোই নিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পরেই অকপট ভাবে সকল অবস্থা বর্ণনা করিয়া নম্র পিতাকে পত্র লিখিল। উপলক্ষ্যেই নিবেদন করিল “আমি বাহা করিয়াছি, তাহার পর আপনি আমাকে গ্রহণ করিবেন, একদা ভঙ্গ্য করি না। আমি বাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকেও বাধা করিয়া আগনার গৃহে লইয়া বাইবার চোঁটা কড়া বোধ হয় সন্ত হইবে না। তবে আপনাতা অমমকে মার্জনা করিলেন, এইটুকু জানিতে পারিলে কৃতার্ণ হইব। তাড়নর একবার গৃহে গিয়া আপনাতের চরণ বন্দনা করিয়া আন্তরিক্য প্রার্থনা করিব।”

চার পাঁচ দিন পরেই পিতার পত্র আসিল। এই ঘটনার বতই স্কন্ধ হইয়া থাকুন, তাহাযের পরম বেহাঙ্গল জোঁট পুঙ্কক তাঁহারা ত্যাগ করিতে গাবেন না। বিবাহের পূর্ক সকল ঘটনা জানিতে পারিলে তাঁহারাও উজ্জ্বল হইয়া বিবাহ মিতেন। বাহা হটক, বাধা হইবার হইয়াছে। এখন জীবন্তী নুদাতাকে লইয়া জীবন নম্রপোশাল গৃহে গেলেন তাঁহারা স্ত্রী হইবেন এবং বামলিক অধুনাও লম্পার করিবেন।

নম্র পত্রখানি বাঁধার পড়িল। পিতামাতার সেহ স্তরপ করিয়া তার চক্ৰ কল আসিল। উৎক্রেস্ত পিতামাতার চরণে সন্তান প্রণতি সে করিল।

এখন কি কর্তব্য? অনেকক্ষণ বসিয়া নম্র ভাবিল। মনে হইল, বাহাই শেষ কর্তব্য। হটক লজকে এই পত্র তাহার

নেধান উচিত। পর লইয়া সে বস্ত্র-গুণে গেল। বিবাহের পর মেসেই সে কিরিয়া আনিয়াছিল।

লগা পত্র পড়িল। একটু হাসিয়া কহিল, “তা বেশ ত! আবার নিবে চলে।”

“সে কি লগা? তুমি দেখানে বাবে?”

“কেন বাব না? এখন তোমাতের ঘরের বট বে আমি।”

নম্র কহিল, “লগা! তুমি বৃত্তে পারছ না। একটা তাহের নশেই কথা বলছ। দেখানে গিয়ে একটা দিনও তুমি থাকতে পারবে না। বাড়ার্পেই পুঙ্ককরর সংসারে যে কি, আর নতুন বটকে কি তাহে সেই সংসারে চলতে হয়, কখনও বেখনি ত? বাঁধাও করতে পারছ না?”

একটু হাসিয়া লগা কহিল, “তা কি হবে? তোমাতের ঘরে এখন পড়েছি, তখন না গিয়ে আর উপায় কি আছে? ক্রেশ বাই হুক, তুমিবে সবই লোকের সঙ্গে বাঁধ, সইয়ে নিজেও হয়।”

নম্র কহিল, “লগা, আমাতের বাড়ীতে তোমাকে নিবে ধাব, এটা মনেও কখনও করিনি। তোমার বাবার সঙ্গেও সে কথা হয়নি। তাঁকে বলেছিলাম, বচিন হাতুই না হই, তুমি এখানেই থাকবে।”

“তা না হয় থাকতাম। কিন্তু ওরা যে যেতে নলেছেন।”

নম্র কহিল, “আমাতের সে সংসার—না, না, সে যে একবারেই তোমার যোগ্য হবে না লগা।”

বীরভাবে লগা উত্তর করিল, “আমার যোগ্য অযোগ্য কি হবে, কেবল কি তাই-ই ভাব? আমি তোমাতের যোগ্য হইতে পারি কি না, তার একটু চোঁটা কর্তেও আমাকে বেবে না? সেইটেই যে এখন বড় দরকার। বাহাকে বল, আমাকে নিবে চল। আমি বাব।”

“আজ্ঞা, তাই তবে হবে। তোমার বা তাল লাগে, তাই আমি করব।”

চটক সাহেব আপত্তি করিলেন না। বস্ত্রতঃ লগার ব্যবহারে মনে মনে তিনি বড় একটা গৌরবই অনুভব করিতে ছিলেন। ভাষাতার সঙ্কল্পতা ও উচ্চপ্রাণতা তাহার চিত্তক মুগ্ধ করিয়াছিল, নোটের উপর তিনি উত্তরভেতা ও দৃঢ়স্থান্য থাকিই ছিলেন।

যাত্রার সময় জোঁটা ভরোপাটক প্রদান করিয়া কহিল, “গামাইবা! তোমাকে আমায়ও খুব পছন্দ হয়েছে এখন। দিখিও খুব ভাল। তবে আমি বড় অযোগ্য। এবার কিছু মনে মনে আমায় মাক করো। আমিও দিখির বস্ত হব।”

হাসিয়া নম্র কহিল, “তাই হ’রো। যদি পারি, তবে তোমাকে মাক করব। নইলে কিং নম্র, বুকেল জোঁটা?”



সমুদ্রের আদি ইতিহাস

জীবনের পদচিহ্ন সন্ধান

— প্রোগ্রেসেস্ট্র মিত্র

পৃথিবীর কালে কালে আত্ম যে অসংখ্য বিচিত্র প্রেমের প্রাপ্তি দেখা যায়, সমুদ্রই যে প্রাণের আদিভূমি, সমুদ্র ভয়ঙ্কর কালেই যে সমস্ত প্রাণীকণ্ড কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের কালে কালে কালে অস্তরীকে নানারূপে ছড়িয়ে পড়েছে, সে কথা তোমরা আগেই শুনেছ। সমুদ্রকে 'হে আদি-ভূমি' বলে কবি অর্থহীন কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি, বিজ্ঞানের গুহ্য সমস্তকেই তাই দিয়েছেন।

সমুদ্র সমস্ত প্রাণী আলাদা আলাদা ভাবে চর্চায় একদিন আবির্ভূত হয় নি। একটি কালের ধারা থেকে যেমন অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বেরুতে পারে, তেমনি মূল একটি উৎস থেকে বেরিয়ে অসংখ্য শাখাপূর্ণ সমস্ত প্রাণী-কণ্ড এমন বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। বায়োস্ট্রি: একদিনে যে ফটোনি তা বলাই বাহুল্য। আদি সমুদ্রের আদি প্রাণকণিকা থেকে তার বংশধররা কোটি কোটি বৃক্ষ হবে বিচিত্র খেঁক বিচিত্রতর রূপ গ্রহণ করবে কলং বর্জমান অসংখ্য পৌষ্পে। এক তিলাণে সমস্ত প্রাণী-কণ্ডই পঞ্চম্পরের আতি, সমুদ্রের বিশাল তিনিব লকে আনানের সরের সেওগালের নাকড়বারও সম্পর্ক আছে, কিন্তু সে সম্পর্ক খুঁজে বার করতে গেলে কোটি কোটি বছরের কুলজী হয়ে স্থিতির গোড়ার আদি সমুদ্রে বসে যেতে হবে।

প্রথম প্রাণকণিকা যখন আবির্ভূত হয়, সমুদ্রের চেগাণ্ডা তখন আত্মকালকার মত ছিল না মোটেই। সমুদ্র তখন এমন পতীর নথ, বোনা ত নরট। আকাশ তখন জারট থাকত যন মেঘে ঢাকা আর সমস্ত পৃথিবীতে সাতাষণ অসংখ্য মোট। সেদিন সমুদ্রের নান্দীশিতল কালে আনগা থাকে

মুগল ধারে বসি তার জের অনেক প্রবলভাবে অববরতই পড়ত বৃষ্টি। সেদিন পৃথিবী নিজের চারিধারে আরো বেগে পাক খেত বলে বিন সান্নিও ছিল অনেক ছোট।

এই বিবর্তময়ী বৃষ্টির কালেই পৃথিবীর প্রথম সমুদ্র স্থিতি হয়েছিল। এই পৃথিবী যে একদিন হৃৎকোর মত অসংখ্য আঙনের গোলা ছিল তা তোমরা জান। সেই বাষ্পাকারে অলস গোলাক ক্রমশ: ঠাণ্ডা হয়ে তরল হয়ে উঠবার সময় আবারের চাঁদ একদিন তার বেধ থেকে টিকিয়ে বেরিয়ে যায়। পৃথিবী তারপর আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেল, পৃথিবী-কেহের ভারী সমস্ত পদার্থ মাধ্যাকর্ষণের টানে মাঝখানে গিয়ে জমা হতে থাকে। তাই তরল পদার্থগুলি উপরে ভেসে ওঠে। সেই ঠাণ্ডা তরল পদার্থগুলি প্রথম ঠাণ্ডা হয়ে সরের মত ভসে গিয়ে পৃথিবীর উপরকার খোলস তৈরী করে। মোটা কন্ডলের মত সেই সরের আচ্ছাদন পৃথিবীর ভিতরকার উত্তাপকে আর বাইরে বেরুতে দেয় না। উত্তাপ তাই পৃথিবীর মধ্যে অত্যন্ত ঘন কেন্দ্র এবং নীচের ভারী পদার্থগুলি গলে উঠে আরোয় গিরির লাভার মত উপরে ফিনকি দিয়ে উঠে নেত্রিয়ে আসে বা বাষ্পা উপরকার খোলস ভেদ করে ছুঁইয়ে ওঠে। ভূতরবিদ্যের ধারণা এই যে এই ভারী পদার্থগুলির চাপেই পৃথিবীর উপরকার খোলস অনেক কাঁচগায় বসে যায়। সেই বসে-বাওগা বীচু কাঁচগাগুলিই প্রথম সমুদ্রের আবার। আবার তৈরী হলেও প্রথমে জল সেখানে ছিল না। আকাশে তখন ঘন উষ্ণ বাষ্পের বেধ আর পৃথিবীতে উত্তাপ শাষণ। উষ্ণ বাষ্পের বেধ ঈতল হয়ে বৃষ্টিধারা পে তপ্ত পাখরের উপর পড়তে না পড়তেই আবার বাষ্পাকারে ঘায় উড়ে।

এখনি ভাবে বহুদিন জীবন পূর্ণিমা হয়ে, আর একটি শতাব্দী হ'ল। সুস্থিত তল তখন আকাশ থেকে পড়ছে অবিভক্ত, আর পৃথিবীর উপর দিয়ে পড়িয়ে জমাছে গিয়ে লাগবে। এমনি ভাবে সবুজবস্ত্রের পর, অবশ্য প্রাণের আবির্ভাব হয়নি। অনেক বৃক্ষ যেতে গিয়েছিল তার পূর্বে। তখনও আকাশে মেঘের পর মেঘের পক্ষ আবরণ। মেঘের সে আটপুকুর রেন করে হৃদয়ের আলো পৃথিবীর উপর পড়তেই পারত না। প্রথম প্রাণের আবির্ভাব গ্রিক পৃথিবীর কি অগস্ত্য কেন্দ্র করে হয়েছিল তা বলতে না পারলেও, হৃদয় ও পৃথিবীর প্রথম চোখোচোখি হওয়ার সঙ্গে যে, ব্যাপারটির সম্পর্ক আছে, এ বিষয়ে পরিভ্রমের মধ্যে সন্দেহ নেই। আকাশের মেঘ অপেক্ষাকৃত ছাড়া হওয়ার সঙ্গে হৃদয়ের আলো প্রথম যে মুহূর্তে সাদরের জলে এসে পড়েছিল, জীবনের সে যে প্রথম স্তব্ধতা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথম প্রাণকণিকার রূপ কি ছিল, তা নিয়েও বৈজ্ঞানিকেরা এখনও এতমত হতে পারেন নি। কাকের কাকের মতে প্রথম প্রাণকণিকা ছিল জীবাণু বা উদ্ভিদ জাতীয় কিছু। এর গোড়া থেকেই তাতে উদ্ভিদের প্রধান নিষেধ 'ক্লোরোফিল' বা গ্রাছের সবুজ পদার্থ ছিল এবং তারই সাহায্যে সে হৃদয়ের আলোকে জীবনী শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারত, তথা অনেক জীবাণুর মত শুণু বাতাল ও জলের ক্ষুদ্র পরমাণুকে কাজে লাগিয়েই বৈচিত্র্য প্রকাশ করত। তার ছিল। অনেক আবার মনে করেন যে, কনসার্টে হৃদয় অতীত বৃক্ষ পৃথিবীতে নানা কারণে এমন একটি অগস্ত্য উদ্ভব হয়, যা যখন প্রোটোপ্লাজমের মত তৈরিক পদার্থ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। সেই প্রোটোপ্লাজম তখন বিকৃতি-বিশুদ্ধ রূপে অনেক সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু জীবিত বলতে আবার বা বৃদ্ধি তা সবগুলি ছিল না। অনেকেরই মীমাংসা বংশবৃদ্ধি না করতে পেয়ে মৃত্যু শেষ হয়ে গেছে। শুণু তার মধ্যে যেটি বা যে কয়েকটি নিকটের ভ্রাতাও করে বংশবৃদ্ধি করবার উপায় বার করেনি, তাই পৃথিবীতে চিহ্ন দিয়ে ভাবিকালের জীবন-বৈচিত্র্যের হৃদয়গত হয়েছে।

সুস্থিত বৈশিষ্ট্যে আদিম সবুজে যে ভাবেই প্রাণের উদ্ভব হয়ে থাক, ব্যাপারটা অগোচর। আজকালকার বৈজ্ঞানিকের কল্পনা করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ সে উদ্ভবের

সাক্ষী কেউ নেই, আদিম প্রাণকণিকা নিজের কোন পরিচয়-চিহ্ন রেখে যায় নি।

তখন প্রাণীকরণের যেহেতু ছিল কোমল জৈব পদার্থে তৈরী। সে জৈব পদার্থ প্রাণীর সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যেত। কোন কঠোর বা কঠিন কোন খোলস বেহের সূত্রের পর তার সাক্ষী হিসেবে কালের গর্ভে সঞ্চিত থাকত না। বৈজ্ঞানিকদের অহমান এই যে, অল্পতঃ ৪০ কোটি বৎসর জীবনের উদ্ভব হয়েছে এই কারণে প্রাণীকরণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তারপর থেকে সামুদ্রিক জীবের ইতিহাস খুঁজে উদ্ধার সম্ভব নয়। কারণ তখন থেকে নানাপ্রাণীর কঠোর বা খোলস ছুটতে পর পর শুরুতে সঞ্চিত হয়ে আছে। বহু কোমল-বেহ জীবেরা তখন হয় শুণু-খোলস নয় কঠোর আশ্রয় করতে শুরু করেছে। সেই সমস্ত কঠোর ও খোলস থেকে তখনকার প্রাণীদের পরিচয় ও ইতিহাস বৈজ্ঞানিকেরা গড়ে তুলেছেন। কঠোর ও খোলসগুলি যেন জীবনের নিবর্তনের ইতিহাসে ছেঁড়া পোকা বা কাটা পাখি। বৈজ্ঞানিকেরা বৈজ্ঞানিকদের তাই লিপি উদ্ধার করে সমস্ত বৈজ্ঞানিক পদার্থ অর্ন্ত করতে হয়েছে। জীবের উদ্ধার-করা ইতিহাস সত্যই অপরূপ ও কল্পনাতীত।

আমরা ৪০ কোটি বর্ষ আগে এই পৃথিবীর অনতিদূরত্বের লগোথের তলার নানাপ্রকার পক্ষ, পান্থকের মত জীব ও ট্রিলোবাইট নামে আদিম এককক পোকা বিচরণ করত। তখনও ডায়াই কোন প্রাণী উঠতে পারে নি। সমস্ত বুল ছিল মক-কুমির, চের ও অনপ্রাণীক। আনাতের মত নেকল-বিশিষ্ট কোন প্রাণী তখনও দেখা যেতনি, কোন প্রকাব মাছও নয়। পতিকাণ্ডের কোন পোকা বা মাকড়সা তখন ছিল না। ট্রিলোবাইটই ছিল সেগের সূত্রের অগস্ত্য। ট্রিলোবাইটকে গ্রিক পোকা বা গা উচিত নয়, কারণ সে অনেক নিরস্ত্রের প্রাণী। আজকালকার পোকার মত এত ভীষণ অপ্রভাষ তাই ছিল না। আদিম সবুজের তলার কালার উপর সে ভিতর করত। অস্ত্র প্রাণীর মুখেরই ছিল তার আশ্রয়। ট্রিলোবাইটেরা লগাথ প্রুট পর্যন্ত হ'ত।

ট্রিলোবাইটেরা পৃথিবীতে ৩০ কোটি বৎসর রাজত্ব করেছিল বলা যেতে পারে। তাই পরে রাজত্ব শুরু হয় সামুদ্রিক কীকড়া-বিহীন। এই সামুদ্রিক কীকড়া-বিহীন সত্যিই বর্তমান

কালের ঠাকড়া-বিহীন, দাকড়ন। প্রত্নতত্ত্ব আদি পূর্ণপুঙ্খবোধ জাতি। তারা বীরে বীরে আকাশে ও পৃথিবীতে টিলোবাইট-মের ছাড়িয়ে গিয়ে তাদের জীবনের স্বকল্যে থেকে হঠিয়ে দেয়। সাগর-বিজ্ঞ বা ইউরিট্রিবিডস্ লম্বা নব হুট পথায় পাওয়া গেছে। তারাও সমুদ্রের তলার ঘূষে বেড়াত। বীরে বীরে শিকারের পা তটিক দাঁড়ের মত ব্যবহার করে তারা শাঁহতাজে পারত। সাগর-বিজ্ঞদের সম্বন্ধে সব চেয়ে মজার কথা এই যে, সাগরে উঠত হলে গোড়ার দিকে সাগরেই জীবন কাটালেও তাদের বংশধরেরা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হলে বাবার আসে এই, দুই প্রজন্মের দ্বিগুণের ভগতে বাস করতে শুরু করেছিল। সাগর-বিজ্ঞের জাতগোত্র সবাই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, হুগনি শুধু একটি। তাদের নাম 'রাডকীকড়া'। 'সারকীকড়া' আমেরিকার উপকূলে কোথাও কোথাও এত প্রচুর পাওয়া যায় যে, তাদের স্তন্যসেতু সাহা বিলাখে দেখান-তার লোকেরা ব্যবহার করে।

এই সমস্ত শোকা জাতীয় জীবের সঙ্গে আর একটি প্রাণিও সমুদ্রে নিজের অধিকার বিস্তার করেছিল। সে হ'ল 'তাসামায়ে'র অধিপুত্র। তাসামায়ে'র গোষ্ঠী কেউ সমুদ্র থেকে ভাঙার উঠতে পারে নি, কোটী কোটী বছরের টিভিগলে, তাদের মাথা বলতে অমরা শবীরের বে অংশ বুঝি, তেমন কিছুও সৃষ্টি হয় নি। তারা স্তম্ভির কংক জানোয়ার, স্প্রিংয়ের চেয়ে এক ধাপ উচ্চ। কিন্তু তাসামায়ে'র বংশ একটা অসাধা সাধন করেছে। সাগর-বিজ্ঞদের সময়ে তাসামায়ে'র এখনকার মত বানান ভাবে বিচরণ করতে পারত না। তাদের পুঙ্খবোধ সকলেই পাকত গাছের মত এক চারপায়ে আটকে। বীরে বীরে তারা সেই অত্যাশা করিয়ে উঠেছে। উপরের দিকে দুখ তাদের তোলা থাকত। এখন তাদের দুখ নোড়ের দিকে, পাচরিক পাঠে পাও অনেক পুরে তাদের বেরিয়েছে। আগে তারা এখন পাঠকোণা ছিল না।

টিলোবাইটদের সঙ্গে ৪০ কোটি বছর আগেকার সমুদ্রে যে শামুকের মত প্রাণি দেখা যেত, তাদের দারা থেকেই বর্তমান কালের বিশাল অক্টোপাস থেকে ছোট গুলি শামুক পর্যন্ত গিয়ে এসেছে। অক্টোপাসের পূর্ণপুঙ্খবোধ অনেকটা আভ্যন্তরীণ শামুকের মতই সমুদ্রের তলার

কূলে ছোট্ট ঘূষে বেড়াত। তাদের তখন অনেকটা শামুকের মতই খোলা ছিল বাইরের দিকে। আশ্চর্য বংশ কোটি বছর আগে বর্তমান অক্টোপাসের মত এক রকম জীব দেখা যায়। তাদের বাইরে কোন খোলা নেই। অনেকটা মাঝবেগ বেকসনের মত, খোলসের বগলে তাদের পতীরের ভিতরে হাড়ের শক্ত কাঠান গড়ে উঠেছে। তারা বেলে চলাফেরাও করতে পারে সমুদ্রের ভিতরে।

পৃথিবীতে আজ বেকসনও থাকের আছে, সেই মধ্য জানোয়ারেরই প্রাধান্য। বুদ্ধিতে ও বলে শুধু নয়, আকারেও তারা সব জানোয়ারের চেয়ে বড়। তিনিই ছেয়ে বিশাল জানোয়ার পৃথিবীতে নেই।

স্তম্ভির গোড়ার দিকে এই বেকসনওবিশিষ্ট প্রাণি কিছু ছিল নয়। তখন সাগরে শোকাযাকড় এবং অস্তম্ভ প্রাণিরই রাজপাট। টিলোবাইটদের সময় শেষ হবার অনেক দিন পরে প্রথম সমুদ্রে বেকসনওবিশিষ্ট প্রাণির সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের ভিতরই ছিল বর্তমান হাঙ্গরদের আদি পুত্র। হাঙ্গরদের বেকসনও কিছু ষ্টিক অধিতে নয়, 'কার্ট-লেভ' বা উপস্থিতির দ্বারা। অস্তম্ভ বেকসনওবিশিষ্ট হাঙ্গর তাদের পরে সমুদ্রে দেখা দেয়। তখন তাদের আকার ছিল অসুত। অধিকাংশেরই গায়ে কঠিন বর্ষ থাকত। সে কঠোর আচ্ছাদনে তাদের অভ্যন্তরীণ মাদের আত্মীয় বলে চেনাই কঠিন। তাদের অনেকটা শোকাযাকড়ের মতই দেখাত।

যে কয়েকটি শোকালের মাদের সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের ষ্টিক বংশধর এখন আর কেউ টিকে নেই। কিন্তু তাদেরই বানা অগাধ আত্মীয় আভ্যন্তরীণ পৃথিবীর অসীমের মাহুৎ থেকে সমস্ত বেকসনও প্রাণির পূর্ণপুঙ্খবোধ।

এ পর্যন্ত যত প্রাণির কথা বলা হ'ল তারা সবাই সামুদ্রিক। তাদের সময়ে ডাখা কোন জীব গ্রহ করতে পারে নি। জীবতত্ত্ব তখনও ভুলেই আঁবছ।

বৈজ্ঞানিকেরা অতীত যুগের প্রস্তর-স্তর সন্ধান করতে করতে প্রথম মেসোজোইক যুগে একটি গম্ভীর পান। সে গম্ভীরের মূল্য ও ঐতিহ্য বে কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না। পাথরের ন্যূন অক্ষর ভাবে সূত্রিত সেই পারের দাগ, সামুদ্রিক জীবের স্থলজাত-বিভিন্ন ঘোষণা করছে।

বর্তমান কালের মানুষের পক্ষে মনন গ্রহণ করা কঠিন হয়ে
আদিম সভ্যত্ব জাতীয় প্রাণীর সেই স্থল-বিভিন্নরূপে বিস্তারিত
নয়। ডাক্তার বাতা তখন সভ্যই অজানা, কখনোই না।
কোন প্রাণী দেখানো তার আগে নিখাল গ্রহণ করেন, স্থল-
পথে চলার কৌশল কোন প্রাণী তার আগে আয়ত্ত
করেন।

মেসোজোইক যুগ স্থল-বিভিন্নরের পৌরবন্দর উত্তরাংশের
কতকটা অধ্যয়ন করে আছে। সমুদ্র থেকে নানা প্রাণী
নানা রকমে এই নূতন অজানা ভূপৃষ্ঠে দেখান উপনিবেশ
স্থাপন করেছে। ডাক্তার নূতন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেগন
তারের মানিয়ে চলতে বাধ্য পেতে হয়েছে, তেমনি প্রাণী-
বহুল সমুদ্রে ভীষণের বিংশ প্রতিযোগিতা থেকে ও তারা
দেখান কতকটা সক্ষম পেয়েছে।

স্থল-রাক্ষস এই অভিযান আধারের অগোচর নয়।
এই অভিযানে অনেক দূর গিয়ে আবার যে করেছিল প্রাণী
সমুদ্রে কিংবা এসেছিল, তাদের কথাই কিছু বলব। ইতিপূর্বে
তিনি ও শীলের প্রাণের এ রকম কিংবা আসার কথা জানান
হয়েছে। তিনি ও শীল বিবর্তনের অনেক উঁচু ধাপে উঠে
তারপর কিংবাছিল সমুদ্রে। কিন্তু তাদের অনেক আগে
আরো বহু প্রাণী সমুদ্রে সচায়াগমন করেছে। ইকথিওসের
ও প্রিসোরাস এমন দুই প্রাণী। এ দুইটিই ডাইনোসর
জাতীয় সভ্যত্ব। সমুদ্র থেকে ডাক্তার উঠে বংশ-পরম্পরায়
তারা দেখানো চলার কৌশল ও নিখালগ্রহণের কৌশল আয়ত্ত
করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিসেবে তাদের মন টেকেনি বলা
যেতে পারে। তাদের বংশধরেরা ভুলে নামলেও স্থল-প্রাণীর
স্মৃতি কিন্তু ভুলতে পারেনি, সে প্রাণীর জীবন তাদের
কাছেও লেগেছিল। স্থল-পথে যে পারে তারা হাঁটতে, ভুলে
নেমে তাই সীতার কাটাতে কত তাদের ব্যবহার করতে
হয়েছে একটু আঁচু অমল বলতে, কিন্তু বৃত্তিত ও পদ্ধতিতে
তারা বহুদূর অজ্ঞাত সামুদ্রিক প্রাণীদের চেয়ে বড় ছিল
বলেই মনে হয়।

ইকথিওসের ও প্রিসোরাস আজকাল অবশ্য টিকে
নেই। তাদের স্থলরাক্ষস জাতিতাই ডাইনোসরের মতই

তারা হঠাৎ-মৃত হয়ে গেছে আত্মা ভাবে। সভ্যত্ব বংশের
জাতি এখন টিকটিকি নিরপেক্ষ থেকে আয়ত্ত করে সুখী
ইগুানা প্রভৃতি প্রাণীকে আয়ত্ত করে টিমটিম করে চলছে
মাত্র। সমুদ্রে গ্যালাপাগোস দ্বীপের সামুদ্রিক ইগুানা
ছাড়া আর কোন প্রাণীনিদ্রা তাদের নেই বললেই হয়। সুখী-
পূর্ণ কল্পনা যেমন সত্যিকার হচ্ছিল, তখনকার ডাইনোসরের
মোর্ফ ও প্রাণের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

মেসোজোইক যুগের পর বর্তমান কালের দিকে
এগিয়ে আসা যায়, ততই আধুনিক সমস্ত প্রাণীর সমস্ত মিলনে
পাকে সমুদ্র। অস্ত্রোপাসেরা জন্ম: দেখা যায় পশ্চিম
হয়ে উঠছে, কিছুকাল কাকড়া চিংড়ি নানা বিচিত্রত্ব প্রাণীর
কাছে সামুদ্রিক মাছেরা তাদের সমস্ত বিশেষত্ব আয়ত্ত করে
কেনেছে। প্রাণী মঙ্গলপারের ভুলে প্রাণেরা তাদের দীপ-
নিখালের নিখাল আয়ত্তন শুরু করেছে। প্রাচীন কালের
অজ্ঞাত প্রাণীদের হঠাৎ দিয়ে সমুদ্রে বরষক আধুনিক যে
সমস্ত জীব বহল করে রয়েছে, কালের শতাব্দীর তাদের মধ্যেও
কখন বেঁচে থাকবে কে জানে! টিপোথিওসের, সাগর-বিজ্ঞ-
দের প্রাণবাহিনী রাক্ষসের মত বর্তমান কালের মাছেরে,
এমন কি অস্ত্রোপাসের সাফটিক ও পাওয়া যায় নি। ডাইনো-
সারদের আয়ত্ততার মতের প্রাণী জীব ছিল অজ্ঞাত,
একবারে মরণ। কিন্তু তার পর মৃত-পরিবর্তনের সঙ্গে
তাগাও গিয়েছে বললে। আকস্মিক দিমের অজ্ঞাত মরণ
কোন জীব তবিত্তে হয়ত প্রাণ হতে উঠবে আত্মা
ভাবে। সমুদ্রে জীবজগতের উদ্ভবের ধারণা মানুষ যে
অনেকখানি ওলট-পালট করে বেবে তাও ঠিক। এমি মনো
তার হাতে শীল ও ত্রিবিদ্য মাছ মৃত হতে বলেছে। যে
সমস্ত সাগরে মানুষের আহাঙ্ক জনবসতি চলালে করে,
সেখানকার জল ভেলে নোংরা হয়ে মাছেরে অযোগ্য হয়ে
উঠেছে। প্রাণের ও নোংরা তাগাবার মানুষ সাগর-
রাজ্যে আত্মা ব্যাপক ভাবে হানা দেবার সঙ্গে প্রাণের
নিজস্ব স্বক যে অনেক বহলে গিয়ে এ বিধের কোন সম্ভাব
নেই। তার ফল কি রকম দাঁড়াবে এখন থেকে অনুমান
করা যায় না।

বুকের একটি ব্যাধি

[illegible]

କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠିରେ
 ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ଓ



বিজ্ঞাপনক্রমিক : (৩৬০-০৭৭ খ্রঃ পূঃ)

তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অস্তিত্বের পদতলে আঁকিছ, দুকণের সংস্কারে বিপুল ইতিহাসে, জিহ্বাক গিলে তার সুস্বাদের পান্থ্য বেই, অস্তি বেই। দ্যাব্যবহাস এবং আত্মপ্রতিরোধ আত্মপ্রত্যয়ের সাধনানে আ প্রতির তার গঠে গঠে, লগ্নে বিপর্যয় ভক্তের চিত্তে। কণ-বিন্দু বে-এব বিহে তার লক্ষ্যানে খাল্য সার্থকতার প্রতীকপাথি ধরে ধরে আসে নিজে। সমস্ত জীবনপথি তারে দায়ক-ভরসার বহই বিপুল।

ଭୌରବର ସଂସାର-ମୁକ୍ତ ସାଧୁବଳ୍ଲଭ କେ ନିମନ୍ତେ ଏକାକୀ ନିଃସଂସାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି
 ହେଉ ସହ, ସାଧିବର ନିଜ ନିଃସଂସାର ତର ସଦା ଅବସ୍ଥା । ନିଜ କେହି ସାଧିବର
 ଅଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ ସଂସାର ଚାରିପଟେ ଗଢ଼ିବିତ ହୁଏ ; ତାର ସଦା ସେ ବିନିଷ୍ଠ ସାଧିବି
 ନାସର ଅସୋକାର ସିନ୍ଧୁ, ନେତ୍ର ହେଉ ନିଜର ଏକଟି ସାଧିବ । ନିଜର
 ସାଧିବ ଆସେ ନିଜର ଏକକୀୟ ; ବିଷୟ ତାର ଚିତ୍ତକାନ୍ତ ହୁଏତନିଜର ଏକ
 ସାଧିବି ବଳି-ସେହିକି ନାସରକାନ୍ତର ସେହିକି ନିଜର "ସଦା ସାଧିବ" ଗଢ଼ିବି

—**ଶ୍ରୀ** ଅମିତଭୂବନ ସୁଧୋପାଧ୍ୟାୟ

हेतुजोहं अहं वनां दूह—Consumption, Phthisis, Tuberculosis इत्यादि । Tuberculosis कथामेहकं नास्ति कुरु वनां हेतुजोहं T. B. ननु नास्ति ननु नास्ति ननु नास्ति ननु । नास्ति अहं नास्ति हेतुजोहं नास्ति नास्ति नास्ति—Consumption

আমি নিজে 'চাপর' না হ'য়ে যে-এই কাহিনী লক্ষ্যে আলোচনা করছি
 ত্রুটিও হেতু—এটা যে গ্রীক 'ল্যাণ্ডস্কেপ' ব্যাপার—'কবিতা' না, সে কবিতা
 মাগে বলে রাবি। 'আমি' নিজে একজন এই বোকাই বটে। এই 'মাগ' লক্ষ্যে
 যে কোনো চাকুরীর তাইতে আমার 'interest' এক ভিলত ভব মর—এ
 কথা আমি বলতে পারি মারসের সঙ্গে। 'তরপাণে, এ ছাড়া আরও একটা
 কথা আছে। 'কবিতা' এই, যে তরফদানে এই 'আমি' লক্ষ্যে বৈশেষক 'আমি'র
 করে চতুর্বিধিক বিবাজ করে দুই বিভাজিকার মত, ল্যাণ্ডস্কেপ স্টেডাকট
 'মর' আর এই 'আমি'র দ্বারা যে তরফে হস্তক্ষেপ বিদ্যুতিত, তাতে 'ক'রে যে বিক
 'স্কেট' হ'ক বা কোম, এই 'আমি'র। 'আলোচনা' করবার ক্ষমতা 'অন্তঃকরণ'
 আমার 'আমি'—সমাজের একজন লোক 'দ্বিগত'। 'সু' এই-ই 'মর';
 আরও 'আমি'। এই 'আমি' লব 'সে'য়ে 'ল্যাণ্ডস্কেপ' তাই 'বিভিন্ন' লাভ 'কর'ে
 'ভার' এবং 'দুঃখবল'কের 'ভিতর'। 'মর' 'মর' 'মর'ক 'সে'ত্রিক 'বৌদ' এই
 'আমি'র 'দ্বারা' হস্তক্ষেপ 'কর'ক্তি, 'তর'ে 'লক্ষ্য' 'পতি', 'ই'বা—'কল্পনা' 'প্রতিভা',
 'লজ্জা'—'হস্তক্ষেপ' একজন 'তর'ে 'লক্ষ্য'। এই 'আমি'র 'আলোচনা' 'তর'ে
 'ক'র'বার 'অন্তঃকরণ' 'সু' 'সে'ত্রিক 'মর' 'ক'র'ে 'হয়'। 'আমি' নিজে 'দুঃখ' এবং
 'আমি'র 'বর্তমান' 'অন্তঃকরণ' 'আমি'র 'আমি'র 'লক্ষ্য' 'কর'ক্তি 'দ্বারা' 'ক'র'ে
 'ক'র'ে 'হয়' এবং 'ক'র'ে 'হয়'—এ 'বিলক' 'ক'র'ে 'ক'র'বার 'লক্ষ্য' 'আমি'র
 'আমি'র 'আলোচনা' 'আমি'র 'লক্ষ্য' 'কর'ক্তি 'দ্বারা' 'ক'র'ে 'হয়'।

একতরফে এই ব্যাপ্তি বিস্তার আধুনিক নয়। খামরা সন্ধ্যা বিল
 সেখতে গাং প্রান্তরভাগেও এই ব্যাপ্তি সক্রিয় ছিল। Neolithic
 যুগের New Stone Age যে সময়টাকে বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ
 দলন-সজাচার সেই ব্যাপ্তিরই সময়—কখন ব্যক্তি তারা শত-প্রতিদল,
 অথবা বিচ্ছিন্ন ইচ্ছাধি দল করে, একত্রি হত। তখন থেকে গ্রাম্য
 পাণ্ডা বিস্তার যে, সেই সময়ই বাস্তুক এই ব্যাপ্তি তারা প্রচলিত হতে
 চলেছে। এই যুগের ১০,০০০ বছার সময় ব্যবধান এবং ব্যাপ্তির বি-
 পাণ্ডা বিস্তারিত সেক্ষেত্রে অর্থাৎ। তাই পরে শিল্প বৈদ্য হাইজেনস
 পণ্ডিত করে তারের ভিতরে এই ব্যাপ্তি চিত্র দেখা গিয়েছে। এগুলি ৯,০০০
 বছার। কখনো পুরাতন। ভারতবর্ষে হুয়ান্সি বাস্তুবৈদ্য চিত্রিত
 চিত্র এবং হুয়ান্সি আবিষ্কার করেছেন প্রঃ ১০,০০০ আগে। তারা এই
 ব্যাপ্তি নিয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী। কখনো চিত্র। কখনো চিত্র
 এই ব্যাপ্তি বস্তুতঃই বিস্তার করে এই ব্যাপ্তি কাগ, লক্ষ্য এবং

এই গ্রাম বার্ষিকায় নিম্নলিখ বৈজ্ঞানিক, তথ্যময় গ্রন্থসমূহ প্রাপ্ত হইবে যে হাইস্কুলের
 থেকে প্রাপ্ত, যে খসড়া বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ প্রাপ্ত নীচের তালিকায় উল্লিখিত হইবে।
 তাৎক্ষণিক বিজ্ঞানবিজ্ঞানকে আরও অগ্রগতিতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

অন্যান্য প্রকারের গ্রন্থসমূহের ১৯৩৬-৩৭ সালের আন্তর্জাতিক রিপোর্ট থেকে
 একটি তালিকা দিয়া। যেসব গ্রন্থের কপিও যোগ্য এই প্রকারের গ্রন্থসমূহ
 প্রেরণ করা হইবে।

বই	পৃষ্ঠা	ব্রিটানিক
১-৪-১৯৩৬	—	—
১-১০	৪	১
১-১১	১১	৬
১-১২	১২	৬
১-১৩	১৩	৬
১-১৪	১৪	৬
১-১৫	১৫	৬
১-১৬	১৬	৬
১-১৭	১৭	৬
১-১৮	১৮	৬
১-১৯	১৯	৬
১-২০	২০	৬
১-২১	২১	৬
১-২২	২২	৬
১-২৩	২৩	৬
১-২৪	২৪	৬
১-২৫	২৫	৬
১-২৬	২৬	৬
১-২৭	২৭	৬
১-২৮	২৮	৬
১-২৯	২৯	৬
১-৩০	৩০	৬
১-৩১	৩১	৬
১-৩২	৩২	৬
১-৩৩	৩৩	৬
১-৩৪	৩৪	৬
১-৩৫	৩৫	৬
১-৩৬	৩৬	৬
১-৩৭	৩৭	৬
১-৩৮	৩৮	৬
১-৩৯	৩৯	৬
১-৪০	৪০	৬
১-৪১	৪১	৬
১-৪২	৪২	৬
১-৪৩	৪৩	৬
১-৪৪	৪৪	৬
১-৪৫	৪৫	৬
১-৪৬	৪৬	৬
১-৪৭	৪৭	৬
১-৪৮	৪৮	৬
১-৪৯	৪৯	৬
১-৫০	৫০	৬
১-৫১	৫১	৬
১-৫২	৫২	৬
১-৫৩	৫৩	৬
১-৫৪	৫৪	৬
১-৫৫	৫৫	৬
১-৫৬	৫৬	৬
১-৫৭	৫৭	৬
১-৫৮	৫৮	৬
১-৫৯	৫৯	৬
১-৬০	৬০	৬
১-৬১	৬১	৬
১-৬২	৬২	৬
১-৬৩	৬৩	৬
১-৬৪	৬৪	৬
১-৬৫	৬৫	৬
১-৬৬	৬৬	৬
১-৬৭	৬৭	৬
১-৬৮	৬৮	৬
১-৬৯	৬৯	৬
১-৭০	৭০	৬
১-৭১	৭১	৬
১-৭২	৭২	৬
১-৭৩	৭৩	৬
১-৭৪	৭৪	৬
১-৭৫	৭৫	৬
১-৭৬	৭৬	৬
১-৭৭	৭৭	৬
১-৭৮	৭৮	৬
১-৭৯	৭৯	৬
১-৮০	৮০	৬
১-৮১	৮১	৬
১-৮২	৮২	৬
১-৮৩	৮৩	৬
১-৮৪	৮৪	৬
১-৮৫	৮৫	৬
১-৮৬	৮৬	৬
১-৮৭	৮৭	৬
১-৮৮	৮৮	৬
১-৮৯	৮৯	৬
১-৯০	৯০	৬
১-৯১	৯১	৬
১-৯২	৯২	৬
১-৯৩	৯৩	৬
১-৯৪	৯৪	৬
১-৯৫	৯৫	৬
১-৯৬	৯৬	৬
১-৯৭	৯৭	৬
১-৯৮	৯৮	৬
১-৯৯	৯৯	৬
২-০০	১০০	৬

এই তালিকা থেকে প্রত্যেকের পুঁজি মূল্যে চতুর্ভুজ উপলব্ধি করিতে
 পারেন। তাহা হইলে আর একটি তালিকা দেখুন। এটিও ই প্রাপ্ত
 রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত হইবে। এই তালিকা থেকে প্রাপ্ত পার্থক্য, যেসব
 সংস্করণের লোকের ভিতরে এই বইটির কপিও প্রাপ্ত হইবে। আর
 ভিতরে সর্বসম্পন্ন ভিতরে সংগ্রহ করিতে হইবে। এই বইটি ই
 প্রাপ্ত হইবে।

১-১০	১-১০	১-১০
১-১১	১-১১	১-১১
১-১২	১-১২	১-১২
১-১৩	১-১৩	১-১৩
১-১৪	১-১৪	১-১৪
১-১৫	১-১৫	১-১৫
১-১৬	১-১৬	১-১৬
১-১৭	১-১৭	১-১৭
১-১৮	১-১৮	১-১৮
১-১৯	১-১৯	১-১৯
১-২০	১-২০	১-২০
১-২১	১-২১	১-২১
১-২২	১-২২	১-২২
১-২৩	১-২৩	১-২৩
১-২৪	১-২৪	১-২৪
১-২৫	১-২৫	১-২৫
১-২৬	১-২৬	১-২৬
১-২৭	১-২৭	১-২৭
১-২৮	১-২৮	১-২৮
১-২৯	১-২৯	১-২৯
১-৩০	১-৩০	১-৩০
১-৩১	১-৩১	১-৩১
১-৩২	১-৩২	১-৩২
১-৩৩	১-৩৩	১-৩৩
১-৩৪	১-৩৪	১-৩৪
১-৩৫	১-৩৫	১-৩৫
১-৩৬	১-৩৬	১-৩৬
১-৩৭	১-৩৭	১-৩৭
১-৩৮	১-৩৮	১-৩৮
১-৩৯	১-৩৯	১-৩৯
১-৪০	১-৪০	১-৪০
১-৪১	১-৪১	১-৪১
১-৪২	১-৪২	১-৪২
১-৪৩	১-৪৩	১-৪৩
১-৪৪	১-৪৪	১-৪৪
১-৪৫	১-৪৫	১-৪৫
১-৪৬	১-৪৬	১-৪৬
১-৪৭	১-৪৭	১-৪৭
১-৪৮	১-৪৮	১-৪৮
১-৪৯	১-৪৯	১-৪৯
১-৫০	১-৫০	১-৫০
১-৫১	১-৫১	১-৫১
১-৫২	১-৫২	১-৫২
১-৫৩	১-৫৩	১-৫৩
১-৫৪	১-৫৪	১-৫৪
১-৫৫	১-৫৫	১-৫৫
১-৫৬	১-৫৬	১-৫৬
১-৫৭	১-৫৭	১-৫৭
১-৫৮	১-৫৮	১-৫৮
১-৫৯	১-৫৯	১-৫৯
১-৬০	১-৬০	১-৬০
১-৬১	১-৬১	১-৬১
১-৬২	১-৬২	১-৬২
১-৬৩	১-৬৩	১-৬৩
১-৬৪	১-৬৪	১-৬৪
১-৬৫	১-৬৫	১-৬৫
১-৬৬	১-৬৬	১-৬৬
১-৬৭	১-৬৭	১-৬৭
১-৬৮	১-৬৮	১-৬৮
১-৬৯	১-৬৯	১-৬৯
১-৭০	১-৭০	১-৭০
১-৭১	১-৭১	১-৭১
১-৭২	১-৭২	১-৭২
১-৭৩	১-৭৩	১-৭৩
১-৭৪	১-৭৪	১-৭৪
১-৭৫	১-৭৫	১-৭৫
১-৭৬	১-৭৬	১-৭৬
১-৭৭	১-৭৭	১-৭৭
১-৭৮	১-৭৮	১-৭৮
১-৭৯	১-৭৯	১-৭৯
১-৮০	১-৮০	১-৮০
১-৮১	১-৮১	১-৮১
১-৮২	১-৮২	১-৮২
১-৮৩	১-৮৩	১-৮৩
১-৮৪	১-৮৪	১-৮৪
১-৮৫	১-৮৫	১-৮৫
১-৮৬	১-৮৬	১-৮৬
১-৮৭	১-৮৭	১-৮৭
১-৮৮	১-৮৮	১-৮৮
১-৮৯	১-৮৯	১-৮৯
১-৯০	১-৯০	১-৯০
১-৯১	১-৯১	১-৯১
১-৯২	১-৯২	১-৯২
১-৯৩	১-৯৩	১-৯৩
১-৯৪	১-৯৪	১-৯৪
১-৯৫	১-৯৫	১-৯৫
১-৯৬	১-৯৬	১-৯৬
১-৯৭	১-৯৭	১-৯৭
১-৯৮	১-৯৮	১-৯৮
১-৯৯	১-৯৯	১-৯৯
২-০০	২-০০	২-০০

১২	১২	১২
১৩	১৩	১৩
১৪	১৪	১৪
১৫	১৫	১৫
১৬	১৬	১৬
১৭	১৭	১৭
১৮	১৮	১৮
১৯	১৯	১৯
২০	২০	২০
২১	২১	২১
২২	২২	২২
২৩	২৩	২৩
২৪	২৪	২৪
২৫	২৫	২৫
২৬	২৬	২৬
২৭	২৭	২৭
২৮	২৮	২৮
২৯	২৯	২৯
৩০	৩০	৩০
৩১	৩১	৩১
৩২	৩২	৩২
৩৩	৩৩	৩৩
৩৪	৩৪	৩৪
৩৫	৩৫	৩৫
৩৬	৩৬	৩৬
৩৭	৩৭	৩৭
৩৮	৩৮	৩৮
৩৯	৩৯	৩৯
৪০	৪০	৪০
৪১	৪১	৪১
৪২	৪২	৪২
৪৩	৪৩	৪৩
৪৪	৪৪	৪৪
৪৫	৪৫	৪৫
৪৬	৪৬	৪৬
৪৭	৪৭	৪৭
৪৮	৪৮	৪৮
৪৯	৪৯	৪৯
৫০	৫০	৫০
৫১	৫১	৫১
৫২	৫২	৫২
৫৩	৫৩	৫৩
৫৪	৫৪	৫৪
৫৫	৫৫	৫৫
৫৬	৫৬	৫৬
৫৭	৫৭	৫৭
৫৮	৫৮	৫৮
৫৯	৫৯	৫৯
৬০	৬০	৬০
৬১	৬১	৬১
৬২	৬২	৬২
৬৩	৬৩	৬৩
৬৪	৬৪	৬৪
৬৫	৬৫	৬৫
৬৬	৬৬	৬৬
৬৭	৬৭	৬৭
৬৮	৬৮	৬৮
৬৯	৬৯	৬৯
৭০	৭০	৭০
৭১	৭১	৭১
৭২	৭২	৭২
৭৩	৭৩	৭৩
৭৪	৭৪	৭৪
৭৫	৭৫	৭৫
৭৬	৭৬	৭৬
৭৭	৭৭	৭৭
৭৮	৭৮	৭৮
৭৯	৭৯	৭৯
৮০	৮০	৮০
৮১	৮১	৮১
৮২	৮২	৮২
৮৩	৮৩	৮৩
৮৪	৮৪	৮৪
৮৫	৮৫	৮৫
৮৬	৮৬	৮৬
৮৭	৮৭	৮৭
৮৮	৮৮	৮৮
৮৯	৮৯	৮৯
৯০	৯০	৯০
৯১	৯১	৯১
৯২	৯২	৯২
৯৩	৯৩	৯৩
৯৪	৯৪	৯৪
৯৫	৯৫	৯৫
৯৬	৯৬	৯৬
৯৭	৯৭	৯৭
৯৮	৯৮	৯৮
৯৯	৯৯	৯৯
১০০	১০০	১০০

আমাদের টিউবারকুলোসিস, অ্যান্টিবায়োটিকস এবং
 ১৯৩৬-৩৭ বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা
 প্রেরণ করিতে হইবে।

১২	১২	১২
১৩	১৩	১৩
১৪	১৪	১৪
১৫	১৫	১৫
১৬	১৬	১৬
১৭	১৭	১৭
১৮	১৮	১৮
১৯	১৯	১৯
২০	২০	২০
২১	২১	২১
২২	২২	২২
২৩	২৩	২৩
২৪	২৪	২৪
২৫	২৫	২৫
২৬	২৬	২৬
২৭	২৭	২৭
২৮	২৮	২৮
২৯	২৯	২৯
৩০	৩০	৩০
৩১	৩১	৩১
৩২	৩২	৩২
৩৩	৩৩	৩৩
৩৪	৩৪	৩৪
৩৫	৩৫	৩৫
৩৬	৩৬	৩৬
৩৭	৩৭	৩৭
৩৮	৩৮	৩৮
৩৯	৩৯	৩৯
৪০	৪০	৪০
৪১	৪১	৪১
৪২	৪২	৪২
৪৩	৪৩	৪৩
৪৪	৪৪	৪৪
৪৫	৪৫	৪৫
৪৬	৪৬	৪৬
৪৭	৪৭	৪৭
৪৮	৪৮	৪৮
৪৯	৪৯	৪৯
৫০	৫০	৫০
৫১	৫১	৫১
৫২	৫২	৫২
৫৩	৫৩	৫৩
৫৪	৫৪	৫৪
৫৫	৫৫	৫৫
৫৬	৫৬	৫৬
৫৭	৫৭	৫৭
৫৮	৫৮	৫৮
৫৯	৫৯	৫৯

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

তিনজনে এক সঙ্গে কটকের বাহিরে আসিয়া গড়াইল। অগ্নিপুত্রের ছায়াশব্দ শব্দের ধারে ইন্দ্রবলের গাড়ী গ্রবিক্রে যুগ করিয়া গড়াইয়া ছিল। ইন্দু বলিল, আমাদের সঙ্গে যাবে ত ?

বিমল ইতস্ততঃ করিতেছিল।

—সাতার কোথাও নেমে গেলেই ত হবে।

বিমল বলিল, তা বেশ।

কণা আগে-ভাগে উঠিয়া ড্রাইভারের পার্শ্বের হ্যান্ডি অধিকার করিয়া বসিল; বিমল তাহাকে ভিতরে তাকিল; কণা আড়চোখে জুড়টি করিয়া বসিয়া রহিল। ইন্দু একটু থনি হাসিয়া বলিল, কণা বহুক না, তুমি স্ত্রী।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল, কোন বিকে নাব ?

ইন্দু বিমলের পানে চাহিল, বিমল ইন্দ্র উদ্দেশে কহিল, বাড়ী যাবে ত ?

—বাড়ী ত বাব, তুমি ?

—আমি সাতার নেমে যাব।

—গয়নার ঐ অত বড় পুঁটলী নিয়ে হেঁটে যাবে ? না, না, তার কাজ নেই, চল তোমার বাড়ীতে নামিয়ে নিয়ে যাই।

ড্রাইভারকে তরুণ উপদেশ দেওয়া হইল। জনবিরল প্রশস্ত রাস্তা, গাড়ী উর্দ্ধাশে ছুটতেছে, ইন্দু বিমলের একখানি হাত হাতের মধ্যে টানিয়া শইয়া বহুকণ্ঠে কহিল, কি ভাবছ ?

বিমল বলিল, ছায়ার কথা ভাবছি।

—কি ভাবছ বল না ?

বিমল বসিতে লাগিল, আশ্চর্য্য ঘেরে ও। ক’দিন আগেও সেখিছি, কথাবার্তা শুনেও বুঝি অশোকের ভয়ে ও একটুও ভাবে না। শষ্ট বলত বিজেই হয়েছে যাত্রা, তার ভয়ে ওর একটুও টান সেই। সেখতুমও তাই। ছায়ার কাজিনরা আগত, তাদের বস্ত্রা আসিত, তাদের সঙ্গে হাসি, গান, গর করেই ওর দিন কাটত; অশোককে একখানি চিঠি পঠাত

শিখত না ! কাজিনরা কেউ নাচের আদরে নিয়ে থাকে, কেউ রাত জুড়ে বেড়াতে নিয়ে থাকে, বল বেগে দিনেবা থাকে—কেউ ‘প্রেমেন্ট’ বিকে ‘সেন্ট’, কেউ নিজে শাড়ী, কেউ তুপকে কটো, কেউ গান শেখাকে,—কেউ—বসিতে বসিতে বিমল খামিল, একমুহুর্ত পরে আবার বলিল, সেখ এক এক সময় ওদের সমাজের উপর রণা হত !

বিমল খামিল, ইন্দু সাগ্রহে তাহার মুখের পানে সজ্জনমনে চাহিয়া রহিল; তাহার চুই আঁখিতে সখ্য প্রশ্ন নীরবে জাগিতে লাগিল। বিমল তাহা বুঝিল, পুনশ্চ বসিতে লাগিল, সেই ছায়া আজ তার গায়ের শেব গহনাখানি পথান্ত মূলে গিলে, বেচে তাকেই টাকার পাঠাতে, যার এতটুকু খবর নেবার ইচ্ছে পথান্ত কোনদিন ঘেঁষি নি। আশ্চর্য্য ঘেরে !

ইন্দ্র আঙ্গুরের, আকুলতার অবদান তখনও হয় নাই, তখনও সেই তৃণাব্যাকুলিত হুইট চন্দ্র বিমলের মুখের পানে পাতিয়া বসিয়া আছে।

বিমল বলিল, টাকা পেতুম গড়াফুল, তা ছাড়া আবার সঙ্গে ভারাপ বাবহার কেউ এতটুকুও করে নি, নইলে যা সব সেখতুম, তাতে গুণা হয়ে যেত ! ঐ যে সেই প্রশ্নর বাবু না কি, তোমরা ত তাঁকে ভালই চেন, একদিন রাত একটা পথান্ত ছাছাকে নিয়ে কোথাও মাঠে ঘাটে ঘুরে এসে, পরের দিন মাথার বস্ত্রের ছায়া উঠতেই পারল না, তার পর পোড়ানিচাক। প্যাট পরা দ্ব্যে-দ্ব্যে কাজিনরা কেউ এসে জোখ টিপে ধরছে, কেউ মাথার অভিকলোন ঢালছে, কেউ শাড়ীর কোঁচকানো পোকা ক’রে মিছে—সেখতে যে কি বিস্ত্রীই লাগত ! একদিন সেখি, ঘর অছকা ক’রে হু’ তিনটেতে গিলে ছাই পাশ বেবা করছে—ছায়ার মাথা ধরছে না কি হয়েছে কে জানে ! এসব ছায়াস না জানতেন, সেখতেন, অশচ কিছই বলতেন না, ওদের সমাজে এসব বোঝ হয় লোলের নব। ঐ সবের ভয়েই ত ছায়া অশোকের কথা ভাবতও না, তার খবরও রাখত না।

ইশু ভিজাঙ্গা করিল, তুমি কি করে জানলে—সে ভাবত না ?

—আমি দেখেছি না তো ?

—সোকে গ্রিগরকে ভাবে দুটি পোকে ভানিয়ে-
ভানিয়ে ? সাক্ষী রেখে ? বোতাম বিধে ? না ?

—হু, বেলে বুগা বার না ?

ইশু কুই অফচ পুত করে করিল, না, একা বার না । সপ-
কাল খাওয়া বসন্তে আবার বসিল, বাইরে বেলে খাওয়া কত
টুকু বুঝতে পারে ?

—পারে না ?

—না, পারে না ।

ইশু একটু চুপ করিল, তার পর আঁতে আঁতে আবার
বসিল, বাইরে সেবে যদি কুলা যেত, তা হ'লে তুমিও আমার
বুঝতে ! আমার তুল বুঝে দেখা হলে তুল কাগ করে পারিলে
কেতে চাইতে না ।

তারার কণ্ঠের আঁত বুঝিয়া বিমল মূলের দিকে চাহিয়া
বেছিল, আঁখি-পায়ে হল টল টল করিতেছে, আর একটু
হুইসেই করিয়া পড়িলে । বিমলের তাহাতে কষ্ট হইল ।
হুইসেই কথা, বিমল ইশুকে ভালবাসিত, ভালবাসার ধনের
চোখে জল দেখিলে বাহির চোখে জল না আসে, হয় সে ভাল
বাসে না, না-হয় তারার ভালবাসা খটি সোনা নয়, তাহাতে
খাস আছে, কৃত্রিমতা আছে ।

বিমল কিছু বলিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল, ইশু তারার কাছেই
বসিয়া উঠিল, এতদিন পরে তুমি আমার তুল বুঝলে !—
বলিতে বলিতে তারার গলা ধরিয়া আসিল এবং যে বাস্তবিক
গুলি একতরফ চোখের পাতার জ্বালা ছিল, তাহাই এক্ষণে তার
কর করিয়া বড়িয়া পড়িল । বর্ষার জল যেন পাছের পাতার
জ্বালা ছিল, বাতাসে তাহা বরিয়া পড়িল । ইশু বরাবরই মূখ
চালাইল ।

বিমল ইশুর হাত ধরিয়া কখনও বসিল, আবার মাগ
কর ইশু ; আমি আমার তুল বুঝতে পারছি ।

এইটুকু আনন্দের ভরও ইশু যেন সহিতে পারিল না :
তারার বন্ধ নিষ্ঠাভিরা উৎসাহকে অন্ধ উল্লাসে হুইয়া আসিতে-
ছিল, পাছে তাহাই আবার প্রকাশ হইয়া পড়ে, সে চকু মুদ্রিয়া

রহিল ; দ্বারে দ্বারে মাথাটি কাং ওঠিয়া বিমলের কক্ষের উপর
আশ্রয় গ্রহণ করিল ।

প্রকাশ দিব্যসোকে প'তসহর জানবাঁহিত, লক্ষ লক্ষ নয়
নারী অধ্যুষিত রাঙাশেখ, লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ সুপ্রিয় লক্ষণে এই
ভালে পল চলিতে বিমল যেন মাগাকাটা দাউতেছিল, পল-
চাটারের মধ্যে পরিচিত পোকেও থাকিতে পারে, তাহারা কি
ভাবিতেছে, অপরিচিতরাই বা কি ভাবিতেছে, ইহা ভাবিয়া
মনে মনে অভিযাত্রার পন্থিত ও পন্থিত হইলেও, ঠিক এই সময়ে
প্রবাহিতখানিনী নারীকে জাগাইবার—তারার ভাবাবেশে
বাধা জাগাইবার সাধন বা প্রয়তি তারার হইল না । সেও
সকলের দৃষ্টি একাটবার জর চকু মুদ্রিয়া থাকিতে পারিলে যেন
পাঠিয়া গাইত ।

একটু পরে ইশু নিগলিত অভিমানেরে কহিল, কেন
তুমি আমার তুল বুঝলে ? কেন তুমি—সে চুপ করিল ।
কথাটা যেন বড় কঠিন, বড় মর্শ্বাত্মিক ।

বিমল বসিল, আবার সঙ্গে কোন মজারী মূর্বেদিনী
মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে তুমি তুল বুঝতে না ?

ইশু লুচ ঘরে কহিল না, কখন না । আর সে পরীক্ষা
ত সেদিন হয়ে গেছে ।

—কবে ?

—কেন, প্রণববাসুর বাড়ীর খিমেটারের দিন । তুমি
হাগাকে নিয়ে এসে, আমি ত দেখলাম ।

বিমল সহাস্যে প্রের করিল, তুমি কি ভেবেছিলে ঠিক
করে বল দেখি ? কিছ, বাড়ী এসে গেল যে । আর
একটা যোড় বুঝলেই—

গুলিক হইতে জ্ঞা বসিয়া উঠিল, দিদি, কখনো প্রেমশবীটা
কোন ঘাটে গবে তাতে ?

—সে ত জ্ঞানান পার্কে রে !

—আমি কখনও দেখি নি, এম না তাই দেখে আসি ।

বিমল হাসিয়া ইশুর পানে চাহিল, বিমল হাসিল, ইশুও
হাসিল, বসিল, চল দেখেই আসা থাক ।

ভ্রাইকার, প্রত্নকল্পার যনের ভাব বুঝি। গাড়ীর মূখ
পুহাইয়া লইল ।

বিমল বসিল, এইবার বল ।

ইশু বসিল, প্রথমই মনে হ'ল—দল বলব ?

—নিশ্চয় !

—মনে হ'ল, যেহেতু আমার চেয়ে হুমুরী, পোষাক-আশাক আমার চেয়ে অনেক ভাল, হাব-ভাবও অনেক ভাল ! তোমার কোন আশীর নথ, সে ত আমি জানি ! তবে কে ? যেন মনে হ'ল কে, আমার মনে অমনি বললে, তোমার মুখেই শুনেছে পাব কে, হেরে কি হবে ! সত্যি বলায় এ চাড়া আর কিছুই আমার মনে হয় নি ।

এক মুহূর্ত খাম্বা আমার বলিল, একথা ঠিক, গাভিল সাহেবের উপজাতির কেলানি ভাগে নি গো মশায়, একটুও ভাগে নি ।

—কেন ভাগে নি, সেইটেই ত আশ্বাসের কথা ।—বশিরা বিদল হাসিল ।

টুকু কহিল, কেন ভাগে নি তা' জানি নে, তবে ভাগতেই হবে তার কি মানে আছে ?

—মানে জানি নে, তবে স্তম্ভির নিম্নে নবনারীর মতো ঐ বৈচিত্র্য চিরদিন আছে তাই জানি ।

টুকু হাসিয়া বলিল, তাই না কি ? অচ্ছা, ছায়ার প্রতিবিম্বের বাবহারে তোমার কেলানি হ'ত ?

বিদল বলিল, দুঃ ! তা কেন হবে ? আমি কি তাকে ভালবাসি ?

টুকু মুখটি নত করিল । ঐ কথাটিই সে শুনিতে চাহিতেছিল, আরও স্পষ্ট করিয়া, আরও শুষ্ক প্রোথল ভাষায় শুনিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছিল । ভালবাসার একমাত্র অবিকারিত্তি জানিয়াও নারী কেন যে আশ্রয় প্রেরণাপ্রদেয় নুখে ঐ কথাটি বারবার শুনিতে চাহে ইহা এক পরম বিস্তর ।

বিদল সহভাষী । তাহার গভীর মনে প্রোথলতার অভাব না থাকিলেও কণ্ঠের বাধা তাহার অপরিণাম । কত কথাই সে বলিতে চাহ, কথা কহে আদিয়াই শেষ পায় । কিন্তু আত্ম তাহার কণ্ঠেরও বাদকতা আদিয়াছে । নিজেই কথাটার মের টানিয়া বলিল, আমি যদি ছাত্রকে ভাল-বাসতুম, তার কামিনিসের সঙ্গে পাঠোপাধি হ'ত ; আর তা হ'লে কামিনিসাও আমাকে ছাড়িত না ।—বশিরা সে হাসিল, আমার বলিল, আমি থাকে ভালবাসি, যে শুধুই আমার, তা'কে অন্তরে সঙ্গে বাসনা-রাজে নির্জন গড়ের মাঠে বেড়াতে দেখে আমার ভাল লাগে না, লাগতে পারে না । বুঝলে ?

—বশিরা সে বাহুল্য বিদা ইন্দুর কাছে একটু চাপ দিল । আবেশে ইন্দুর চক্ষু মুদ্রিয়া আসিল ।

শঙ্করও পাকও হাসিয়া পড়িল । কথা বশিরা উঠিল, এত যে লাগান আরম্ভ হয়ে গেছে । ভা'তা' হইবে ত ! পরন্তু মূল্যে না ভাই দিদি !

ড্রাইজার উত্তানের ফটকের সম্মুখে গাড়ী পামাইবার উত্তোষ করিতেছিল, কথা বলিল, না না, খাম্বাতে চলে না । শিগালদান দিক দিবে বিদলনা'র বাড়ী হয়ে যেতে হ'বে ।

কথা বক্তব্যটা গ্রহণেই স্নেহ করিল না, একবার এমিকে দুখ কিরাইয়া, উত্তানের দেখিয়া লুটয়া বলিল, বিদল না' আর কোথায়ও একজিবিসন-টিবিসন হবে না, সে পাকগুলোও দেখে নিতুম !

টুকু ও বিদলের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল ; ইন্দু হাসিয়া বলিল, বড় জ্যাঠা হইছিল তুই কথা !

কথা বিদলকে বলিল, আপনাতঃ কি সেই মত বিদল না ? আমি জ্যাঠাইনা হইছি ?

বিদল কুঁকিয়া পড়িয়া কথার পিঠি ছুঁটা আখরের চক্ষু মারিয়া কহিল, না, না, না, তুমি বড় ভাল মেয়ে !

হঠাৎ একটা গিফ্টার গলুয়ে খড়ি দেখিয়া বিদল মনে চমকিত হইয়া বলিল, লাঞ্চে ন'টা বেছে গেছে যে !

টুকুও মুখ বাড়াইয়া ঘড়িটা দেখিয়া লুটল । মন তাহারও শঙ্কিত হইল, কিন্তু মুখে বলিল, বাতুল পে ! তারপর কাগের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল, আর কত কাল পরে, বল ত ?

বিদলও প্রতিধ্বনির মত বলিল, কত কাল !

টুকু পূর্ববৎ নিরবধরে কহিল, কত কাল পরে তোমার কাছে পেন্সন বস ত !

বিদলের বাড়ীর শায়েন আসিয়া গাড়ী থামিতে, বিদল পুঁতলী লইয়া মাঝিয়া পাড়াইতে ইন্দু বলিল, ভিতরে গিয়ে একটু বসবার কি যে ইচ্ছে করছে তা বসবার নথ । কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে, গাজে আর নামব না । কিন্তু আবার ক'বে দেখা হবে বল ?

—তুমি বল ?

ইন্দু হুস্তান কহে কহিল, কোথায় বা হবে ?

কথা অত্যন্তিক সুখ কথিত। অত্যন্তভাবে বলিয়া ছিল, এমনকি কছিল, দিদি, ছায়া-দি'র নতুন বাড়ীতে বাধি বসিছিন না ?

উভয়ের অন্তরেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। ইশু বলিল, ছায়া'র স্বতন্ত্রবাড়ী যেতে পারি ত আদর ?

—তা বোধ হয় পার। কাল পরশু 'ত আমি যাচ্ছি, 'ব বেখে আসি। এসে পবর দেব।

—সেবে ?

—সেব।

—কিন্তু কি ক'রে দেবে ? তুমি ত চিঠি লিখবে না প্রতিজ্ঞা করেছ।

বিমল হাসিয়া বলিল, আমি ভীষণতঃ মট, প্রতিজ্ঞা ভুল করতে পারি।

ইশু বলিল, হোমার পারে পড়ি, তাই ক'রে।

কথা হার পুনিয়া একিকে আসিয়া দিদি'র পার্শ্বে বসিতে বসিতে নিম্ন কণ্ঠে বিদগ্ধক ভদ্রাইয়া বলিল, আর ঠাড়িয়ে কেন ঘণাই, বেলা যে পড়ে এল, ভাল মাথায় মেয়ে ছুটি বাড়ী ফিরবে না ?

বিমল বেহুতবে কণ্ঠের গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া, পবনহুর্গে চলিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদটিকে চার খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিতে হইবে। প্রথম খণ্ড—প্রভাত, দ্বিতীয় খণ্ড—বধ্যাহ, তৃতীয় খণ্ড—অপরাহ্ন, চতুর্থ খণ্ড—সন্ধ্যা।

প্রথম খণ্ড—প্রভাত

গাড়ী বাড়ীর বত কাছে আসিতেছে, যে মায়াবানকণিনি আজ সারা সকাল ধরিয়া গতিত হইয়া, তাহারই মতো নাককণার মত ইশুকে আবদ্ধ আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, তাহা ততই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গাইতেছে। বেলা দশটা বাজে, নৃনবাসান-খানি রৌদ্রের মতো ঠাড়াইয়া বেন ঈগিতেছে। দাপ কতগামুত পথ হইতে, গাছপালায় ঈষৎ হটতে, সর্বত্রই বেন একটা কলখান শিখা উঠিয়া কণিতে কণিতে রৌদ্রে বিশিষ্ট গাইতেছে। বাগানের মালীরা মাথার গামছা জড়াইয়া এখব-এখব ঘাওয়া-আসা করিতেছে, মারোখান তাহার পাটের উপর

ভুঁড়ি কাং করিয়া শুইয়া পড়িয়া আছে, গাড়ী কটকে প্রবেশ করিতেই নকলে লম্বা হইয়া উঠিল। প্রবাবত মগোখান ছুঁইয়া আসিয়া গাড়ীর ঘার পুনিয়া দিল।

—বাবু কাহা মরোখান ?

—ছাত্র ত বচস ঘায়া শিলিখদি।

হুই বোনে নোয়র ভাষায় বে কথাটি কহিল, তাহা এট বেন, নবাকে হত ত ট্যান্ডি করি। বাহিরে হুইতে হইয়াছে।

কথা তাহার 'সেটেটেট' হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ট্যান্ডিয়ে গিয়েছেন ছায়া ?

মরোখান বলিল, জী ! অর্থাৎ হ্যাঁ।

মা টিক দিগির মুখেই ঠাড়াইয়া ছিগেন—নুধে মাথাডের আকাশ নাসিয়াছে। ইশু আগে, কথা লিখনে উঠিতেছিল, মা ইশুকে কিছু বলিলেন না, বেন বেশিলেন না, কণার বাড়ীটা ধরিয়া ক'ণানি দিয়া পক্সকণ্ঠে কহিলেন, কোন্ চুলোয় গেছলে তনি ? কোর বেলা না থাওয়া, না পকা—কোখায় গেছলি বেলা এগরেটা পর্বাত ?

কথা বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, সপ্রস্তুত কাবে কহিল, কোনও চুলোয় নর না, বেড়াতে গেছলুম।

মা অমিত্তর কণ্ঠে হইয়া বলিলেন, কোখায়, কোন্ চুলোয়, কোন্ নোশাগিলের বাড়ী গেছলি আজ্ঞা দিতে, তাই শুনে চাই।

—চিনতে পারবে না বোধ হয়, অবশ্য ছায়া-দি'র বাড়ী গেছলুম।

মা বুঝিলেন। চোখ দুইটা খুঁজত খুঁজিতে ইশুর উপরেও পড়িল। বলিলেন, বজ্ঞ আমকা বেড়েছে তোমাদের, স্বাম্যন জেনানা হয়েছ। কাজিক বলা নেই, কণ্ডা নেই, গাড়ী নিয়ে যেখানে খুশি গেলেই হ'ল, না ?

কথা উত্তর দিবার ভক্ত হা করিয়াছিল, মা পুনরায় বলিলেন, আসিসের কাছ, বশ ভাষায় খুঁজতে হবে, আর গাড়ী নিয়ে ওয়া গেলেম আজ্ঞা দিতে বেড়াতে, আর ট্যান্ডি নিয়ে কাণ্ডে বেরতে হ'ল।

কথা বলিল, তার ভক্তে তুমি অত ভাগছ কেন না, বশ বিশ টাকা খরচ করতে আবার বাবার কট হ'ল না। আমার বাবা পরমা মোগোখায় কখনওও ভরান না, পবত করতেও ভরান না, পরত করতেও পেছোন না।—বলিবাই সে ছত-

পদে—এক বক্সন সৌভাগ্যই চমিয়া গেল। টঙ্ক বাঁধে ঘীর
ক্ষণের অতুলন করিয়া চলিল।

মঃ আৰু কিছু বসিলেন না বটে : কিন্তু বহর সন্ধানলের
বশেষ বধন আনা বাব না, পাশ্চিৎ বধন দেওয়া চলে না,
সেই সময়কাল যে ভীষণ মনোভাব, সেই পরিতাপের অতুলন
বলি লটক : সেইখানেই পাড়াইয়া বসিলেন।

যে কুকিয়া কণা ছাৰ বন্ধ করিয়া, দিল দিয়া, দিলি
সমুখে আসিয়া বসিল, কেনন বসিছি, দিদি ?

ইচ্ছা বসিল, বেশ বসেছিল। আত্ম দিকের বাক্ হুনে
হোকে উপহার দেব।

হুতবে অনেকক্ষণ ধৰিয়া হাসিল, পর কহিল, তারপর
স্নানাহারের সময় হঠাৎই বুকিয়া বান-ককে কুকিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যাহ্ন

বাড়ীর কথা আহারে বসিয়াছেন। কর্তার মত হুঁড়ি,
মত আলন, মত খালা, মত গোলস, অনেকগুলি বাটী, ছোট,
ন', দেহ, প্রভৃতি, বড়, অনেকগুলি বেকাদি—কোনটার কল,
কোনটার খিটো, কোনটার ভাঙা-হুঁড়ি।

দাননে পাখা হাতে গৃহিণী। পাখা হাতেই আছে, বন্ধ
নকিহেতে না : মড়ার সবকারও বন্ধ নাই, কারণ পাখার উপরে
দিশাং-পাখা বুঝিতেছে।

কর্তার দুই দিকে, প্রায় আধ গাভ করিয়া হুনে দুই কড়া
উপনিয়া। কর্তা কখনও কাহারও হাতে একখানি বেগুনি,
কাহারও হাতে বানিক পাখর, কাহারও হাতে একটু মাছ
বা একটু বাসের টুকরা তুলিয়া নিজেছেন, কিন্তু যে ভাবে
বেহ-বলিদের প্রাণ 'ধারণ' করে, মেয়ে ভাট্ট ঠিক সেই
ভাবে শিবার দান গ্রহণ করিতেছে।

কর্তার দুই ভাষা প্রায় স্পর্শ করিয়া গুটি গুটিকার মার্জার
বসিয়া আছে। কর্তা হাতের কাটা, মাসের চাড়, স্বতক
এ পাশে, স্বতক ওপাশে রাখিতেছেন। মেয়ে গু'টিও তাছাই
করিতেছে। মার্জার গুটি বোধ হয় নিভ্রাঘর। চক্ষু চতুর্ভুজ
হুস্তিত, মেহ নিঃশাড়, নিশ্পক। নিভ্রাঘর বরি নাও চয়,
জহায়া ভাবঘর, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন একখানি
শূণ-নীড় দেখিলে কাঁপল না নয়ন বৃদ্ধি ভাবাবেশ চণ পা ?

কর্তা আনন্দের হেতু বাব। দৃষ্টান্ত অস্তর দুইদণ-
গুণের পরিচয় প্রদান নিশ্চয়জ্ঞান। তবে মার্জারঘরের সবচে

ভাট্ট কথা বলার প্রয়োজন আছে। তাহার চিরদিন এমন
শান্ত শিষ্ট সত্তা ভবা ও ভাবপ্রবণ ছিল না, তাহারের মাঝে
মাঝে কাটাটা-আলটান ভক্ত মুখ-বা হুলা যে না বাড়াইত,
এমন নহে, কখন তাহারের মাঝে উটের হুগান পর হইতে
তাহারের অসন্তুষ্ট পরিবর্তন পট্টাচ্ছে। কণা শিখাইয়াছে,
বাংবা শাওয়া ইটরা গেলে, মা প্রাণে পাইবার পরে তাহার
বাগা খুঁধি করিতে পারে, তৎপূর্বে বেগাদপি করিলে তাহারের
পৃষ্ঠের রোম, ছাল, মাংস কিছুই থাকিবে না, এই বুকিয়া
তাহার বেন কাক করে। তাহার অতুল নয়, বুকিয়াছে ও
তদনুসারে কার্য করিতেছে। কণা তাহারের বসিয়াছিল,
সেখ, তোমাদের দুই ভাল নয়, শোকে বধন খাইবে, তখন
তোমরা বাপু, পেনিকে দুই বিও না। এটা নিশ্চিত জানিও যে,
শোকে বাঘাই থাক্ আর বতাই থাক্, তোমাদের প্রাণা হইতে
কেহ তোমাগিকে বাকিত করিতে পারিবে না। হুতমাং
একটু বৈধা ভারণ করিয়া থাকিতে সোধ কি ! তাহারও
ইসানী এমনই শুভ চিহ্নস্বেন হইয়াছে যে, একদিনও একটু
এবিক-ওবিক করে না।

কর্তার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বুকিয়া ঠাণ্ডর
ও চাকর বাহার্য আদেশ-প্রতীকার এতক্ষণ ধারণার্থে দণ্ড-
মান ছিল, তাহার নিশ্চয়ই চমিয়া গেল।

সেই ঘরেই একখানি ইন্ডি-চেয়ার থাকিত, দুই পার্শ্বে
দুইখানি চেয়ার ও একটি মার্জেল পাথরের টিপ থাকিত।
আচমনান্তে কর্তা আসিয়া ইন্ডি চেয়ারে শুউলেন, কতখ
দুই পার্শ্বেও দুই চেয়ার দণ্ড করিল : কেহ পাকা ছুন বাহিতে
মন দিল, কেহ পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল : টিপের উপর
পানের কোটা, পড়িকা ও ভলের মাল বসিল : হুতা সায়িক
কলিকাপোভিত রূপের আগ্নেয়াগ্নি দুই বসাইয়া নলটি কর্তার
ইন্ডি-চেয়ারের আগুটার অটুকাইয়া দিয়া গেল : গৃহিণী
চোমনে বসিলেন : মার্জারঘর নয়ন বেশিয়া পরিবর্তনাবি
পর্নাবেক্ষণ করিয়া পুনরায় চক্ষু হুস্তিত করিল।

বেদিন আপিলে বাহির হইতে হইত না এবং অসময়ে
'তাস পাখা পাঁচালী'র আঙ্গা বসিত না এবং বাহিরে বাঘি নাচ
বা বাহার্য আসনের আকর্ষণ থাকিত না, বেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজ-
নের পর আসর ঐক্সণ ভাবে ভদিত এবং আসনের বেগাংশে
কড়াবের সেনাসঙ্কে দিত। গম করিতে করিতে ইন্ডি-চেয়ারেই

দুখাইয়া পড়িলেন। আজ আপিসে গাইয়েন না, শীঘ্রই না
কম বিক্রয়ের কাজ ছিল, ভাল-লক্ষী নাচেয়েন পাড়ে চাপাচকা
দিয়া আনিয়াছেন, সেই কথাটিই আসবোনা টানিতে টানিতে
বলিলেন।

কথা শুনেই খুঁজিতেছিল, বলিল, বাবা, কত টাকা
টানি কাড়া লাগল আজ ?

—মহেন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত, কত আর, সেও টাকা বুঝি !

তারপর ত মহেন্দ্রের বাড়ীতেই ব্রহ্ম, সেই ত বাড়ীতে
নাথিয়ে ছিল সেল।

কথা বলিল, না ত চেয়েই অজান, না জানি কত কত
টাকা। তোমার আজ টানিতে পরত হয়ে সেল।

পিতা বলিলেন, কতক তারবারই কথা বটে !

কথাটা শ্রী হইল না—বোধ হয় অর্থও নির্ণীত হইল না।
পাছে কেহ শ্রী অর্থ করিয়া গইতে চার, তিনি তৎক্ষণাৎ
বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু না-লক্ষীয়া সভাপ বেলা কোথায় গুত
এলে বল ত ?

ইন্দু বলিল, বেশ শ্রী মধুর কণ্ঠে কহিল, আপিসের সেই
জ্ঞান সাহেবের বাড়ী গেছলুম বাবা। সেই যে আর একদিন
তোমাকে আনাতে ধাব বলে বেরিয়ে ঠিকানা পেছলুম না, কিরে
এলুম।

এক মূখ বোঁরা ছাড়িয়া পিতা বলিলেন, সেখা হল ?
জ্ঞান সাহেব কি বললেন ? হ' মাস কীসী না, এক সেকেও
কেন ?

কথা হাসিয়া বলিল, আসসা বুঝি জ্ঞান সাহেবের সঙ্গে
সেখা করতে গেছলুম ?

—ও, তাঁর সঙ্গে নয় ? তবে ?

—জ্ঞান সাহেবের মেয়ে ছায়া দি'র সঙ্গে সেখা করতে।

পিতা গভীর পরিহাস কণ্ঠে কহিলেন, তারপর ছায়া-দিদি
কি বললেন ?

কথা বলিল, ছায়া দি' স্বত্তরবাড়ী গিয়েছেন, সেইখানে
আনাথের ছেতে বসেছেন। আসসা একদিন ধাব, কেমন
বাবা ?

—এই নতুন দিদিটির স্বত্তরবাড়ীটি কোথায় কুহুগুগু ?

জ্ঞানদার দাব জানো ছিল না, কথা দিদির পানে বিব্রাভ
ভাবে চাহিতে পালিল।

ইন্দু বলিল, জান বাবা, ছায়ায় স্বামী বিলেতে পড়ছিলেন,
ছায়ায় বা তাঁর স্বয়ং বসু কবে চিতে সেখানে তাঁর পূর্ব কই
হয়েছে, তিনি ছায়াকে চিঠি লিখেছেন। ছায়া বাপ থাকে
না বলে তবে সমস্ত গল্পনা বেচে বিলেতে স্বামীকে টাকা
পাঠিয়েছে।

পিতা আসবোনার মুনসুটি সরাইয়া গ্রন্থসম্মান পুষ্টিতে
কমার পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইন্দু বলিতে লাগিল, ছায়া তার বাপের বাড়ীতেও থাকবে
না বাবা। তার স্বত্তর ছব গরীব, কোন অত পাড়ারিয়ে
তাঁদের বাড়ী, ছায়া অত বড় লোক, বিলেতকরত কত
সাহেবের মেয়ে ত, তবু কাশী চলে যাচ্ছে দেখানো : এখানে
আর আসবেও না।

কথাগুলি বলিতে ইন্দু যে বিবেচন গরু বোধ করিতেছে
তাহা তাহার গুপ্ত কণ্ঠের স্বরেই সুপ্রকাশ। কথা বলিতেছে
এমন ভাবে, যেন সে কতকাল হইতে সেই ছায়াকে, 'ছায়ায়
পিতামহা, স্বত্তরবাড়ী, তাহারে বরলসার সমস্ত জানে।
সেই একদিনের, একবেলার সেখা নারীটির উচ্ছল তাসের
মহিমায় পরব গৌরব অতীব করিতে তাহার আনন্দ
হইতেছে।

না এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, এতক্ষণে কথা কহিলেন।
গলায় স্বরটি বেশ বানিক বাঁকা কবিতা বলিলেন, ও-ও এক-
তকম বিলাতি জ্ঞান আর কি ! বাপ দার সঙ্গে বদল না, মেয়ে
এক-বহে চলেছেন—

ইন্দুর মনখানি তখনও ছায়ায় গৌরবে গৌরববীর্ণ ছিল,
মধুর নুতন কণ্ঠে কহিল, তোমাদের বানাময় মধ্যকারতের গীতা
মধ্যবর্তী ও ত অমনি একবহে পেছলেন যা, সেখা কি
বিদিতী চ ?

না বলিলেন, তাঁরা হলেন সেখা। তাঁদের সঙ্গে কার
কথা !

ইন্দু হাসিয়া বলিল, তা হলে তোমার ক্ষতে সেখা আর
বিলাতী সাহেব এক, না না ?

—তাঁরা সাহেব !

—সেখাদের গেম নেই, সাহেবদেরও গেম নেই, স্বত্ত
গেম কি এই মাহুয়ের বোনা !

কথা নিবিষ্ট মনে পিতার কেশবিহীন মস্তকে পাকা চুল
দৃষ্টিতে ভূঁটিতে বলিল—

বেবতার বেলা মৌল খেলা

পাপ লিখেছে মায়াবের বেলা ।

না আসন ত্যজ করিয়া উঠিতে উঠিতে বসিলেন, খাম,
পাকা ঘের? বই খাড়া নিজে আর কথা, বেশি কদিন কি
করিছিল!

না মুখ হাত বুটতে বাহিরে গেলেন, মাঝারি পবিত্রতাক
পাতের চুই পিত আকর্ষণ করিল। কথা নিঃশব্দে কক্ষান্তরে
চুকিয়া অকাতরে 'মুদ্রার' পড়িল।

তৃতীয় খণ্ড—অপরাক্ষ

বাঙালীর ছেলে বাঙালীকে কোন্ পোষাকে মানার ভাল
হল ত? আমি অনেক শ্রীমান, কাক্সিমান, তবর্নন বাঙালীর
ছেলেকে কেবল পোষাকে দেখিচ্ছি, মনে মনে কখনও যে
তাহাদের পোষাকের প্রশংসাও না করিচ্ছি এমন নহে;
আবার তাহাবিগকেই বাঙালীর স্মৃতি-চাবির-পাজারী-পরি-
পোষিত দেখিয়া বাস্তবতার বলিচ্ছি, ইহারা অল্প পোষাক
পড়ে কেন? বাঙালীর ছেলেকে বাঙালী পোষাকে যেমন
মানার, এমনট যে আর কিছুতেই মানার না একথা তাহারা
হবে না কেন?

প্রথমকুমার সাতের পোষাক ছাড়া পরিচেন না। তিনি
সূত্রী, কাক্সিমান, প্রিয়বর্নন, কিন্তু আটপেঠে বাঁধা লাহেবী-
মানার মধ্যে তাঁহার কমনীয়তাহীন সূত্রিতে পাটের বলিয়া কোন
দিনই মনে হয় নাই। আজ তাঁহাকে স্মৃতি-পাজারী চাবিরে
দেখিয়া মনে হইল, বাঙালী জাতিটার ব্যাধি নাই সত্য, কিন্তু
গোষ্ঠা-সৌন্দর্যের অভাব এ জাতির এখনও হয় নাই।

ইন্দুর ঘনটী আজ মনে সুকণ্ঠক বিবেকের মত বাতালে ভর
করিয়া বেকাইতেছিল, পূব সহজেই সে প্রথমকুমারকে অস্বাভাবিক
করিয়া বাগানের বেকেই বসাইল। বাগানে আজ ফুলের
কতকগুলি কচি চারা বসান হইতেছিল, মালীরা গাছ
বসাইতেছিল, ইন্দু তথাক কহিতেছিল, এমন সময় প্রথম-
কুমারের প্রত্যাপন।

চাকরকে ডাকিয়া চায়ের করবাল করিয়া ইন্দু বলিল,
গাছ কটা বসান হয়ে থাক, আগনি ততক্ষণ এখানেই বসন,
তাহার উপরে দিয়ে চা খাবেন, কেমন?

প্রথমকুমার বসিলেন, বেশ ত! কিন্তু তুমি একটি বারি
নিরে আলবালে গল সিকন কর, দেখে আমিও আকৃতি
করি—

ইন্দু হাসিয়া বলিল, চুপেখের বিধর এই হবে যে, এটা কব
মুণির আশ্রয় নহ, পিতা কব প্রবাসবাসীও নহ। তিনি
আজ গৃহবাসী আর আমিও প্রত্যন্ত-প্রাণিত শক্তল্য নই।
আপনার প্রোক-আকৃতি নিশ্চয় হবে।

কথাওনার মধ্যে আর বাহাই থাক, উত্তাপ ছিল না,
অবজ্ঞা ছিল না, অহংগোও ছিল না। কিন্তু প্রথম-প্রত্যন্ত-
খানের যে গুচ্ছ ইচ্ছাটী ছিল, প্রথমকুমার তাহা অল্পমান
করিতে পারিলেন না। বসিলেন, সেকালের কবমুণির আশ্রয়
ত দেখছি নে ইন্দু, আমি দেখছি—

—বেশ ত, দেখুন। আপাততঃ আমাকেও দেখতে
হচ্ছে, মালীটা সারটা বেঁকিয়ে ফেলছে। ওরে পুণ্ডরীক, ও কি
করলি—বসিতে বসিতে ইন্দু চলিয়া গেল।

পুত্র তথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরাক্ষের স্বর্ণরশ্মি
যদি কোন ওরুণীর অভ্যন্তে তাহার মূণের উপরে আসিয়া
হারিষ লাভ করে, সেই ওরুণী যদি আবার সুন্দরী হয় এবং
তাহার বসনভূষণ অস্বাভাবিক চাপ বা গুরুত্ব না থাকে, তাহা
হইলে বুঝিতে যে গোলা লাগে, তাহাকে টেকাইয়া রাখা কে?
প্রথমকুমারকে ধোম সেওয়া খায় কি? প্রথমকুমার বেঁকি
ছাড়িয়া উঠিলেন। বেগানে বলিয়া ইন্দু মালীকে গড়ি ধরিয়া
সারির সরল রেখা বুঝাইতেছিল, সেইখানে আসিয়া থাড়াই-
লেন। ইন্দুর বস্মাকল বৃশাণ বুটাইতেছিল,—বাগানে কাজ
করিতে গেলে এমন কত বুলাকাটা লাগে—প্রথমকুমার তাকা-
তাকি বস্মাকলখানি তুলিয়া ধরিতেই ইন্দু থাড়াইয়া উঠিয়া
বলিল, চলুন, এক্ষণে চা হয়ে গেছে।

—চায়ের জলে আবার তাক্কা নেই, ইন্দু।

—চায়ের কিছু ঠাণ্ডা হ'বার তাক্কা আছে।

তাহারা বনন দ্বিতলের দিগ্গি উঠিতেছিল, কনার ক্ষয়
যাত্রা হইতে মূখ তুলিয়া না একবার ইহাদের দেখিয়া গুলিলেন
নাহ। আবার কলকে সজ্জা দ্বিতলাক পিছাইতে বননসংযোগ
করিলেন।

চায়ের পেয়ালায় চাক দাড়িতে দাড়িতে প্রথম বসিলেন,
আজ "কিশোরী"র ড্রেস-রিটার্নাল।

ইশু নিশ্চয়।

—সেখতে যাবে ত ?

ইশু শতধরে কহিল, না।

প্রণয়কৃত্যার বিষয়টিভূতের মত কহিলেন, যাবে না ?

কেন ?

—এখনই ; কোন কারণ নেই।

—কারণ এখন নেই, কারণও এখন নেই, এখন যাবে না

কেন ?

—অকারণেও ত অনেক কাজ হয়।—দস্তীরাভাবে কথা

কয়টি বলিয়া ইশু নীচের বাগানের দিকে চাহিয়া রহিল।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে যে অনেকগুলো দরকারী কথা ছিল। তোমার সেই কি-বলে-তার চাকরীর কথা।

ইশু কথা বলিল না।

প্রণয় বলিতে লাগিলেন, সে সব কথা অবশ্য এখানে বসেও যে হতে পারে না, তা নয় ; কিন্তু বড় ভয়গার বলে ভাল করে কথা বলতে আবার ভাল লাগে না। রিয়ার্গালে না যাও, নাই গেলে, চল, খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

ইশু বলিল, না।

প্রণয় বলিলেন, গেলে কিন্তু খুব ভাল হ'ত। তার—অর্থাৎ তোমার কি-বলে তার কারণের সব ঠিক ক'রে কেসেছি আর, চল-না ছুঁতে আসি একটু, সব বলব'খন।

ইশু পুনরু কহিল, না।

প্রণয় খানিকক্ষণ নীরবে বলিয়া রহিলেন।

তারপর বলিলেন—যাবে না ত ?—তাহার কণ্ঠস্বর যেন গুঞ্জে গগনয়।

ইশুর সেই উত্তর—না।

প্রণয়কৃত্যার অর্জনমাপ্ত পোলাগি ট্রেসিয়া লম্বাইয়া রাখিয়া আবার বলিলেন—যাবে না ?

এইবার লইয়া পাচবার ; ইশু বলিল, না।

প্রণয়কৃত্যার অভিমানকর কণ্ঠে কহিলেন, কেন যাবে না, সেটা কি জানতে পারি না ইশু ? না, তাও বলবে না ?

ইশু বলিল, আমি ত হলেছি, কোন কারণ নেই।

—যাকীর কেউ কি—

—আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, প্রণয়বাবু।

প্রণয়-অভিমানী প্রণয়ীমূলক কণ্ঠে কহিলেন, তবে যাবে না

কেন বল ? তার যাবে কি এতদিন পরে এট বৃদ্ধ আছি যে, উই জোট লাটকু মি ? (তুমি আবার পছন্দ কর না ?)

ইশু কথা কহিল না। শানের দর চটেতে ক্ষণের পড়ার পত্র আলিভেছিল, ইশু তাপ পাতিয়া যেন ত্রাহাই গনিতে লাগিল।

প্রণয়কৃত্যার উদ্বেগিত অভিমানকরে কহিলেন, কিন্তু আমি যে তোমাকে—

ইশু উত্তিঃ গাড়ারিন ; করতোকে ক্ষুদ্র একটি নদয়ার করিয়া বলিল, বাপ করলেন ; বাগানে আবার কাছ বাকী আছে। - বলিয়া ক্ষণমাত্র বিদায় না করিয়া সে নীচে নামিয়া গেল।

প্রণয়কৃত্যার ছুট এক মিনিট হৃৎকর বত গাড়াইয়া বহিলেন ; তারপর চারটি স্তম্ভাটয়া ছড়িটি লইয়া নীচে নামিয়েছেন, ক্ষণা বই হাতে জানালার দ্বারে আসিয়া ভিজ্জালিল, শি আর ই গুই—প্রো যানে কি প্রণয়বাবু ?

প্রণয়কৃত্যার গাড়াইয়া পড়িলেন ; চক্ষু'র হইতে জল ধাবিত হইতে লাগিল।

ক্ষণা আড়চোখে এক গুপ্তিতে দেখিয়া লইয়া, বইয়ের পাঠটি খুলিয়া আড়ল দিয়া দেখিয়া বলিল—এই দেখুন, যাবের গল্প—He is in search of a new prey. যানে কি প্রণয়বাবু ?

খুব তৈরী হয়েছি দেখছি জোতা ঘেয়ে !—বলিয়া ক্ষণাকে আর তবু কহিয়া দিয়া প্রণয়কৃত্যার অন্ত হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড—রাতি

রাত্রি কর্তা-গৃহিণীতে মাগা হইতেছিল।

গৃহিণী। ছায়ার গল ত গুলে। কি বুলে বল দিকিন ? কর্তার তজ্জাবেশ হইতেছিল, কহিলেন, বড় ভাল ঘেয়ে !

গৃহিণী কর্তার দিয়া বলিলেন, তুমি খাদ, গুন বাখানো তনতে কে চেয়েছে ?

চট করিয়া তজ্জা ছুটিয়া গেল ; কর্তা বলিলেন, কি বলছ ?

গৃহিণী ভিজ্জালা করিলেন, ঘেয়ের কথা কি ভাবছ ?

—তাই ত !

—ঘেয়েটা অমঃপাতে যাবে, বাপ হয়ে বসে বসে তাই দেখবে ?

কর্তা শিখরিয়া উগ্রিসেন, বলিলেন, ওকে বলি, কি বল ?
গৃহিণী চিহ্নিতভাবে কহিলেন, বলে' কি বাণীগজের
নেকের জলে সেই কাও করাবে ? যে দিনকাল, মা-বাপের
কড়া কথা মেরেয়া বরনাস্ত করে ?

কর্তা নীরব ।

গৃহিণী বলিলেন, একটা উপায় যা-হয় কর গো, নইলে
সেই হা-ভাতে হা-ঘরে ছোঁড়াটা আবার যেতের মাথা থাকে ।
দুঃখে না, যেবে ভোর রায়ে কাউকে না বলে' তারই উদ্দেশে
ছুটল, ও ছায়া-টাগা সব বাজে ।

কর্তা তথাপি নীরব । গৃহিণী উচ্চ হইয়া উগ্রিসেন,
অজ্ঞকারে স্বীয় লশাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি চূপ
ক'রে আছ কেমন ক'রে গো, আবার যে মাথাযুড় খুঁড়তে
হচ্ছে করছে । তবুও চূপ করে রইলে, ইগাণা ? সব দায়
কি একা আঘাটই, সব ভাবনা কি একা আমিই ভাবব ?
তুমি কি ওদের বাপ নও, তোমার কি কোন কাজ নেই !
মাগো, আমি কি করি গো ?

কেন এই প্রকারে উত্তরশব্দ গ্রহণ এই সময়ে কর্তার
নাসিকা গজ্জন করিয়া উঠিল । গৃহিণী বিছানায় আছাড়িয়া
পড়িয়া কানিয়া কেলিলেন ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চারের পেরালায় কড় উঠিয়াছিল । হুটিল সাত্রাকোর
ধর্মাদিকরণের আইনজ্ঞানের অভাব আছে, ইহা প্রতিপন্ন
করিবার চেষ্টা হইতেই বস বিয়োম । ব্যাপারটা খেলসা
করিয়া বলিতেছি ।

মিলেগ ঘোষ বলেন, সে বিয়ে কিরৈই নহ, আমি আবার
আবার যেতের বিয়ে দোব ।

জ্ঞ সাহেব দিটার ঘোষ বলেন, সে হয় না, হবার নয় ।
হিন্দু পুরুষ বতহার খুঁধ, বিয়ে করতে পারে, কিন্তু হিন্দুর মেয়ে
এক স্বামী বেঁচে থাকতে কোন অবস্থাতেই আবার বিয়ে
করতে পারে না ।

—পুরুষ বা পাগে, মেয়েরা তা পারবে না কেন ?

—কেন, তা বলা শক্ত ; তবে একটা কারণ এই যে
আইন পুঙ্খানুপুঙ্খানুসারে নিষেধে, মেয়েদের তা দেয় নি ।

—সাহেবদের পুরুষ এক দ্বী বর্জ্যমানে আবার বিয়ে

করে ডাইভোর্স করে, মেয়েরাও তাই করে । হিন্দু আইনে
ডাইভোর্স নেই কেন ?

—হ্যাঁ, আইন তৈরী করেছিলেন, তাঁদের ভিজেন্স
করতে পার ।

আইন বললেন নংকার । তোমরা আছ কি করতে ?
এই সব বুঝে আইন খাটতে তোমাংের লজ্জা হয় না ?

জ্ঞ সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমরা লজ্জাহীন হয়েই
কাটিয়ে খেলায় ; কিন্তু বেশী বেতী নেই তবু, (তাঁহার স্ত্রীর
নাম তরলতা) হয়ে এল বলে । হিন্দু সমাজে যাতে ডাইভোর্স
চলে, তার চেষ্টা হচ্ছে । আইন-সভার আইন পেশ হল
বলে । সে আইন পাশ হলে হিন্দু পুরুষও এক স্নেহে ভাগ
করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে, হিন্দু স্ত্রীও স্বামী ছেড়ে
পত্যস্তর চেষ্টে বেড়াতে পারবে ।

জ্ঞ-পত্নী তরলতা উদাসকরে কহিলেন, তাই হওয়াই
উচিত । এই দেখ না, কার সঙ্গে ছায়ায় একত্রায়ের একটা
দালা-বল হয়ে গেছে, সে বিশেষতঃ বা খুঁধী কলক, বত রোগই
নিরে আত্মক, ছাত্রকে বাধা হয়ে সেই পাকওর স্ত্রী হয়ে
থাকতে হবে ।

জ্ঞ সাহেব বলিলেন, হিন্দু আইন এখন তৈরী হয়েছিল,
তখন এ সমস্ত ভাগবার সম্ভাবনা ছিল না । তখন পতিকে
পত্নীরা সেবতা জ্ঞান করতেন, মেঘবর্ষন যেমন তোনমিদই
স্বলত বস, পতিসেবতানর্শন স্ত্রুপুণ্ড হলও পত্নীরা তাঁদের দ্যান
করে পূজা করেই জীবন কাটিয়ে বিতে পারতেন ; পত্যস্তর
গ্রহণের করনাও জাগত না তাঁদের মনে । আবার এক-
জন স্বামী দম্ভী স্ত্রী গ্রহণ করলেও স্ত্রীরা রাগ করে ডাইভোর্স-
আদালতের শরণ নিতেন না । বলিয়া জ্ঞ সাহেব একটি
কৃত্রিম দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেলিয়া বলিলেন, হায় যে সেকাল ।

শয়নকক্ষে বসিয়াই এই সব আলোচনা হইতেছিল, তখনও
প্রভাতের সৌন্দর্য কড়া হয় নাই, এইবার দুঃখাত দুইয়া থানা-
কায়ায় প্রবেশপন্থার ছোট্টা হাজরী খাইবার কথা ।

ছায়া কক্ষের বাহিরে পাড়াইয়া বলিল, বাবা, আমি
আলব ?

—আর রে !—বলিয়া জ্ঞ সাহেব বাস্তবলনের উপর
কিনোটি ওড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন ।

বীরমহরপরিবেশে চায়া হয়ে চুকিল। তাহার বেশ-
কুশা দেখিয়া পিতামাতার বিষয়ের অধি রহিল না। ফিলস
পাল পাড় একখানি শাড়ী, পায়ে ছত্রা বাই, তার বসনে পুঙ্ক
করিয়া আস্তা পরা, কপালে নির্মূলের প্রকাণ্ড একটি আঘা
টপ, বামহস্তের মনিবকে সোনারাধা পোতা গাছি ছাড়া দেখে
বর্ণের চিক্চিকুও নাই।

ফিলসের ঘোর কাটিলে দ্বিষ্টার ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ
যোগিনী বেশ কেন ছায়া? প্রশ্নর মাঝার তিরোটারে পাট
নিইলি নাকি রে? স্বীর পালে চায়া বসিলেন, বেশ
সেখানে ছায়া কে না?

ফিলস ঘোষ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, ককাক
ইংরাজীতে প্রশ্ন করিলেন, হোয়াট উই দিল হাউসেল ছায়া?
(এ সব নোংরাবী কি?)

ছায়া নতমুখে, নরকণ্ঠে বাজালায় কহিল, মা, আম
হুপ্রভাতে আমি তোমাদের প্রণাম করতে এসছি।

—ডোট বি সিলি (বায়ে ব'ক না)। হোয়াট ডু ইউ
মিন? (তুমি কি বলতে চাও?)

—না, তোমাদের প্রণাম করে আমি এখানে থেকে চলে
যাব।

পিতা লাফাইয়া উঠিলেন, সেল হাবি? কোথায় রে?

ছায়া কহিল, আমার স্বতন্ত্রবাড়ীতে, বাবা।

ফিলস ঘোষ তিক্ত কহু কণ্ঠে কহিলেন, স্বতন্ত্রবাড়ী!

তোমার স্বতন্ত্রবাড়ী? কোথায় তোমার স্বতন্ত্রবাড়ী?

ছায়া মুখ তুলিল না, নতাননে কহিল, রামনগর।

—না, না, না। সেখানে তোমার কেউ নেই। সে
বিষেকে আমি বিয়ে বলেই মনে করি নে।

পিতা জাকিলেন, এখানে আছ ছায়া, বস।

ছায়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া ঠাড়াইতে, পিতৃ গল্লয়ে
বসিলেন, বস ছায়া।

ছায়া বসিল না। পিতা তাহার ঘনের তাব বুকিলেন,
আর অল্পবোষ করিলেন না। কঠোর কথাবারা স্নেহনিক্ত
করিয়া বসিলেন, কিন্তু ছায়া সে যে ভারী পাড়াশী, দালি
মালেশিয়া, আর কেই বা আছে সেখানে, সেই বনের মধ্যে?
সেখানে গিয়ে থাকতে পারবি কেন?

ছায়া বৃদ্ধকণ্ঠে কহিল, পারব বাবা।

না পুরুষকণ্ঠে কহিলেন, পারলেই না কে তোমার থাকতে
দিয়ে!

ছায়া নীরব।

—হুটো! নাম ওল্ড ভাতের কুলন্ (মদভা বর্গের বোকা)
সেবার কম মপননেটা আখানের করেছে, আখায়া তাবের
ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছি, আখায়া চাইনী! বুসো
উইভার্ড উইচ কোথাকার! সেইখানে গিয়ে থাকবে আমার
মেয়ে!

ছায়া নীরবে হুট চকু তুলিয়া পিতার পানে চাছিল।
হুট চকু ভুলে তরিয়া উঠিয়াছে—পত্নের পাশ্চাত্যির খ্যা
বারি লজিত হইয়াছে। তারপর আন্তে আন্তে নত হইয়া,
মল্লিত মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া চরণ স্পর্শ করিল।

পিতা বসিলেন, তুমি কি এখনই যাবি না কি ছায়া?

—হ্যাঁ বাবা।—বসিয়া সে মাকেও প্রণাম করিল, পায়-
স্পর্শ করিয়া আবার নতমুখে জোড় হাতে ঠাড়াইল।

মা হোষতরে কি বলিতে উত্তর হইয়াছিলেন, পিতা
ঠাঠাকে থানাইয়া দিয়া, শান্তবরে কহিলেন, রাগারাগির কথা
নহ, পোন্ ছায়া। তুমি যে যাবি ঠানগানে, তাঁদের কোন খবর
রিসেছিল?

—না।

—তবে? তাঁরা যদি—তোব স্বতন্ত্রবাড়ী পাড়ারপে
লোক, আখায়া বিলেন্ডকরত ত্রাশ বলে যদি হোক তাবের
বাড়ীতে না চুকতে সেন? তার চেয়ে আমি বলি, তুমি যেতে
ইচ্ছে করেছ—বাও, আমি মানা করব না, কিন্তু একটি চিঠি
লিখে তাঁদের মত দিয়ে পাওগাই কি উচিত নহ?

ছায়া নীরবে ঠাড়াইয়া কহিল।

ফিলস ঘোষ বসিলেন, কি তুমি পাগলের মত না-ভা
বচ্ছ? আমার মেয়ে যাবে সেই গো-ভাসাক মেয়ে? সেই
হোউলোকদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক আখাযের? সেই হোউ-
লোক, যারা কল্লোলের সঙ্গে কথা কহতে জানে না, যারা
মানীর মান রাখতে শেখে নি, তাদের বাড়ীতে যাবে আমার
মেয়ে? তুমি কি পাগল হয়েছ? না, তোমার ভীমব্রতি হয়েছে?

ছায়া বিনীতকণ্ঠে কহিল, আমি জাই বাবা!—বসিয়া
উজ্জ্বল প্রতীকী না কবিয়া আন্তে আন্তে বাহির হইয়া গেল।

ছায়ায় পিঠামাড়া সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া সেধিলেন, গাড়ী-বাকালার ট্যাক্সি পাড়ায়। ট্যাক্সির পার্শ্বে বিমল বসিয়াছেন।

ডাচাকে সেধিয়াই মিলে ঘোষের ছুই চকুতে আগুন ধরিয়া গেল। ৬২ নম্বরের খোলসটা যেন এক মুহূর্তে জ্বিয়া পড়িল। কক পরবর্ত্তে কহিলেন—তুমি কি পরামর্শনা?

ছায়া বলিল, উনি শুধু শৌণ্ডে নিগেই কিরে আসবেন। পরামর্শ ওর নয়, আমিই শুকে নিয়ে যচ্ছি। আমি বাবা! ছুই হাত তুলিয়া ছইবার কপালে ঠেকাইয়া ছইজনকে নমস্কার করিয়া ছায়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল। পাছে চোখের জল ধরা পড়ে, উঠিয়া ক্ষুদ্র মিকে মুখ করিয়া বলিল। বিমল ট্যাক্সির দ্বার বন্ধ করিয়া চালকের পার্শ্বে বসিতে বাটতেছে, অগ্রদানে তাহা বুঝিয়া ছায়া বলিল, না বাবা, আপনি এই-খানেই বসবেন আসুন।

ট্যাক্সি চলিয়া গেল, প্রথমে বাগানের দ্বারা ঘুরিয়া, কটক অতিক্রম করিল; আবার তখন পিছু হঠিয়া সেই গাড়ী-

বাকালার নীচে আসিয়া থাকিল। ছায়ায় পিঠামাড়া সেট-বানেই পাড়াইয়া ছিলেন।

ছায়া বলিল, বাবা আমার পরমাগাটি লা ছিল, সব আপনায় দেওয়া—আপনি আমাকে দিয়েছেন, সেগুলো বেচে আমি শুকে বিলেতে টাকা পাতিয়েছি, বেশে দেববার করে। এশে তিনি তার বেগেই থাকবেন। আর আমার কাপড়-চোপড় সবই রটল, আমি শুধু বিয়ের দিনের লক্ষ্যবস্ত্রটি পরে আপনার বাড়ী থেকে একবারে সেলাম।—বলিয়াই সে ফুরিয়া গিয়া উঠিল। দামার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া বিমলকে বলিল, এখন বাবা, তোলে গাশাতে বসুন।

ঘরে-বিনায়ের সঙ্গে বাম্বালাদেশের মায়ের জ্বয়ের কি করল বাগাবোগ! কোথায় রহিল আধুনিকতা, কোথায় রহিল উন্নতবৃত্তাব, আর কোথায় বা রহিল সত্য সমাজ—মায় চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল। পিতা কিনমোর চকুয় বার্কানা করিয়া পতীর বাহু ধরিয়া কহিলেন, চল, ঘরে যাই। [ক্রন্দন

পথে-পথে

জীবনের কলহর স্রব হ'ল সব,
পৃথিবীর পথে তুমি শুক কলরব,
পতঙ্গের কোলাহল। কান্দার তুলি
ওড়ে কালবৈশাখীর কাপা বড় তুলি'
বিক্ হ'তে বিগড়ের—বিবাক বাতাসে,
প্রকৃতির হৃদয়স বড় হ'বে আসে।

—শ্রীবীণেশচন্দ্র দাশ

মেঘি আভ মেঘতন প্রকান্ত বহতা
কর্কর বৃণের গড়ে আকর্ক-দহতা,—
প্রতিভার পরিচয়! নিত্য অতিনয়
তুণ্যকার দীন স্ততি প্রেম-অনুর;
মোহর্ষ বর্জের নয় বেহের উৎসবে
আত্মার আত্মতি মেঘ। ম'য়ে সেল কবে

শিব-সৌন্দর্য-বোধ? এখানেতে আভ
দগপ্রায় দীনকেতু যেন সহায়তা!

আলোচনা

অনিশ্চয়তার ও বসন্ত

[দৈনিক বসন্ত (১০ই আশ্বিন) হইতে উদ্ধৃত]

গত ২ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার “অনিশ্চয়তার পত্রিকা”র “পূজার সঃ”-উক্ত বসন্তের যে সন্যাসোচনা বাহির হইয়াছিল তাহার প্রতিবাস্তবত্ব নিম্নলিখিত পত্রখানি অনিশ্চয়তাতে একাধের ভিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহারা তাহা প্রকাশ না করার আপনাদের বহু প্রচারিত পত্রিকার একাধের ভিত্ত প্রেরণ করিলেন।

ঐচ্ছিক অনিশ্চয়তার পত্রিকার সম্পাদক

মহাশয় সমীপে

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

আপনায় ১ই আশ্বিন তারিখের কাগজ দেখিলাম, আপনারা আমাকে “পূজার সঃ” সাঝাইয়াছেন।

আপনারা আমাদের “পদপতি”। আপনারা যে নাজিকর যে অংশ অভিন্ন করিবার তার আমাকে বিদ্যাছেন, তাহা আমার মাথা করিয়া গইতেই হইবে। আমি বুঝিতে পারিতেছি, আমার ক্ষুদ্র হইবার অধিকার নাই। পরন্তু আপনাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। প্রাক্কর নামে আজ বসন্ত হইয়া কত কথা বলিয়া আসিতেছি। আপনারা বসন্ত করিয়া এতদিন তাহা কেহ পড়িলেন না এবং তুলিলেন না। এতদিন পরে তবু কয়েকটা কথা আপনাদের কাছে প্রবেশ করিয়াছে এবং বাহ্য হউক একটা লক্ষ্য আমাকে বিদ্যাছেন। কাজেই ধন্যবাদ না বিদ্যা পারি কি ?

কিন্তু এখনও আপনাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ থাকিবে। এই বসন্ত মাস ধরিয়া আমি বসন্তের “বে সন্ত” “রাবিশ” লিখিয়াছি, তাহার কিছুই আপনারা মনোযোগ দিয়া পড়েন নাই। যদি পড়িতেন, তাহা হইলে আমি যে বাস্তবিকই সঃ-এর অভিন্ন করিবার উপযোগী এবং তাহার উপকরণ যে আমার লেখার আছে, তাহা উহা। হইতে জনসাধারণকে দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। আপনারা সংবাদপত্রেও বালিক। আপনাদের উপদেশে আমাদের

জনসমাজের উন্নতির বসিবার কথা। আর আপনারা ঐ জনসমাজের একজন “রাবিশ”-লেখকের লব্ধে এতগুলি মন্তব্য পাশ করিলেন, অথচ সেই রাবিশগুলি পড়িলেন না এবং মন্তব্যগুলি একটিও প্রত্যক্ষভাবে প্রস্তুত হইতেছে কি না তাহা বুঝি তাহা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না? বুঝি না দেখাইয়া কারারও লব্ধে মন্তব্য পাশ করা কি কোন কারণের দ্বারা সম্পাদনের রীতিমত? জনসমাজ যে “রাবিশ”ই লিখিয়া থাকে—এটা চিরকল সত্য। তাহারা তাহাদের চালক, তাঁহাদের কারারও লব্ধে মন্তব্য পাশ করিতে হইলে, তাহারা এই রাবিশ পড়িতেন এবং কোথায় কে “সঃ”-এর মত ব্যবহার করিতেছে এবং কেন তাহাকে “সঃ” বলা হইতে পারে তাহা বুঝাইয়া দিতে বাধ্য নহেন কি? আমার কি বুঝিতে হইবে যে, আশ্চর্য বর্তমান জগতের কল সন্নিবিষ্ট হইয়া দিগাঙ্গে ?

আমার বিরুদ্ধে আপনাদের যে কয়টি মন্তব্য পাশ হইয়াছে আমার বিবেচনা অনুসারে তাহার একটিও প্রত্যক্ষ হয় নাই। আমি আমার বক্তব্য বলিয়া হইতেছি। বিচারের তার থাকিবে আপনাদের উপর।

আপনাদের প্রথম কথা যে আমি “সব কুট ছায়া” “সব কুট ছায়া” বলিতেছি। “সব গোপনালয়ে দির দিগা” বসন্ত দেখা হইতেছে, তখন “সব কুট ছায়া” বলা কি অসঙ্গত? সোনার কারিতে চাখা সব চাখ ছাড়িয়া দিয়া কলের চাকুরী চাখিতে আরম্ভ করিয়াছে, চাপসান খেলেগুলি সাধারণ পায়ের পাশ করিতেছে আর প্রতি বছর একাত্তরের সংখ্যা বাড়িয়া হইতেছে—এইরূপ কাজে যদি আর কিছুদিন চলিত থাকে, তাহা হইলে কি আপত্তি করা যায় না যে, অসুস্থ/বিস্মৃত কারতর্থে মানুষের বাড়িয়া থাকা কতকর হইবে? হাজার পর যদি কেহ মানব বেৎনায় বলে যে, “বিভালা নাম যে যো চলত।” ইহা উপরে সব কুট ছায়া, পশ্চিমক নামে যো লব

আমরা হাংগারিতে সেলাম লাভের পর ও শোকাকিত্তক বিবরণ শুনবার পরে তাহা হইলে কি বড় ভাল কথা হইবে? যে বিচার এবং প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করি না—আমাদের পক্ষে সে বিচার ও প্রতিষ্ঠার পার্থক্য কোথায়? আপনাদের দ্বারা করিয়া ভাঙা মাগে প্রকাশিত “ভারতের বর্তমান সমস্তা ও তাহার পূরণের উপায়” শীর্ষক প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবেন কি?

আমি বর্তমান ‘বিজ্ঞান’কে ‘জ্ঞান’ বলিয়াছি, তাহা সত্য, কিন্তু কেন বলিয়াছি তাহার বুদ্ধি ভাঙা মাগে প্রকাশিত “বর্তমান বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক শীর্ষক প্রবন্ধ এবং আধুনিক মাগে প্রকাশিত “ভারতের বর্তমান সমস্তা ও তাহার পূরণের উপায়” শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। আপনাদের দ্বারা পড়িয়া তাহার প্রতিবাদ করিবেন কি?

আমি বর্তমান সাহিত্যকে ‘বিস্তৃত সাহিত্য’ বলিয়াছি তাহাও সত্য, কিন্তু কেন বলিয়াছি তাহার কারণ দেখাইয়াছি প্রায়শ মাগে প্রকাশিত “ভারতের বর্তমান সমস্তা ও তাহার পূরণের উপায়” শীর্ষক প্রবন্ধে।

যে ভাষায় ভারতীয় জীবন বৈ ও বর্ণনাদি লেখা তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা এবং প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা অল্পতঃ পক্ষে ছয় হাজার বৎসর হইতে নাথায় ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এখন আর কোন মানুষ এত সংস্কৃত ভাষা জানেন না এবং এখন বৈদ্য ও বর্ণন বৈ অর্থে চলিতেছে সেই অর্থ আমাদের জীবনের ভাষাসমস্ত নহে—এই ভাষার কথাও আমি বলিয়া আসিতেছি তাহাও সত্য। কেন এত কথাকে বুদ্ধিসমস্ত বলা যায় তাহা প্রথমতঃ যেমন চাইয়াছে—প্রায়শ মাগে প্রকাশিত “ভারতীয় বিজ্ঞান ও বর্ণনের বর্তমান অবস্থা” শীর্ষক প্রবন্ধ এবং আধুনিক মাগে প্রকাশিত “ভারতের বর্তমান সমস্তা ও তাহার পূরণের উপায়” শীর্ষক প্রবন্ধে। আধুনিক ভাষাও এই কথা “ভারতের বর্তমান সমস্তা ও তাহার পূরণের উপায়” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রত্যেক লক্ষ্যের বলা হইয়াছে।

আপনাদের আমাকে বুঝিয়া দিবেন কি যে, আমি কোথায় ভুল করিয়াছি এবং কেন তাহাকে ভুল বলা যায়? “পতিভক্তা” সংস্কৃত জানেন না বলার আপনাদের ক্ষমতা হইয়াছে এবং যেমন পাইয়াছেন। আপনাদের যুব সম্বল জানেন না যে, আমি বৈজ্ঞানিক সংস্কৃত ভাষার মত বলিয়া নিষা

করিতেছি, তাহাও বৈজ্ঞানিক ভাষা এবং আবার নিজের নিজের ঐ বাক্য এখনও প্রচারিত হইতেছে। “কালানুগত” এবং “পাণিন” না হইলে আমি পতিভক্তকে “অজ্ঞ” বলিতে পারিতাম না। তাহা সত্য, কিন্তু কত বৈজ্ঞানিক সহিত কেন এই কথা আমার বলিতে হইতেছে, তাহা আপনাদের আমার প্রবন্ধ পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা কি করিয়া পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহার একটা বর্ধ আদি আধুনিক মাগে “ভারতের বর্তমান সমস্তা ও তাহার পূরণের উপায়” শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি তাহা সত্য।

কিন্তু আমার “বুল হওয়াগণে” সমস্ত ভুল অবশ্যই হইয়া যাইতে পারে এই ভাষার ভাষাও আমার নাই। আপনাদের আমার কোন লেখা ঐ শ্রেণীর মধ্যে দিক দেখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন কি? যদি না পারেন—তাহা হইলে কি আপনাদের স্বীকার করিবেন না যে, কাগজের সম্পাদক হইলে সত্য বিস্তৃত করিয়াও মানুষকে পালাপালি করা যায়?

আপনাদের বড় অভিযোগ যে, আমি কোন প্রকৃত পতিভক্ত প্রচারক বলিয়াছি, তাহা হুস্তে দাম্পত্যকে অজ্ঞ ও বুল বলিয়াছি এবং তাহা হুস্তি চাটুয্যকে নিষা করিয়াছি।

আমার লেখা মনোযোগসহকারে পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমি কাগজকে ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা বলি নাই। পরন্তু অনেকেরই উপর আমার ব্যক্তিগত অভিযোগ আছে।

পতিভক্তের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃত সংস্কৃত না জানিয়াও যে সাধারণের মধ্যে সংস্কৃত বলিয়া প্রচারিত হইবার চেষ্টা করেন, অজ্ঞ তাহারা যে প্রকৃত সংস্কৃত জানেন না, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার জন্য তাহাদের কাহারও নাম ধরিয়া সংস্কৃত পদজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা আর তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রচারক বলা কি একই কথা?

ডাঃ হুস্তে দাম্পত্য সম্বন্ধে দ্বারা বলিয়াছি তাহার বৈজ্ঞানিকতা কোথায় তাহা যেমন হইয়াছে—“ভারতীয় বিজ্ঞান ও বর্ণনের বর্তমান অবস্থা” শীর্ষক প্রবন্ধে। আমার কথা যদি অসৌক্যিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডাঃ দাম্পত্য বুদ্ধি দেখাইয়া তাহার প্রতিবাদ করুন না কেন? যদি অসৌক্যিক

না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐরাগ বিশেষে গিগা না বুদ্ধি
বিশেষণ ভারতীয় কবিগণের কালিক আশা দিতে পারেন,
ঐরাগ প্রত্যেক ভারতবাসীর নির্ধারণ নহেন কি? আপনাদের
আমাদের স্বপ্নপতি, অথচ আপনাদের আশাভেদ কবিগণের
নিষ্কাশ্যের শোষণতা করিতে সক্ষম হন না। ইহাই কি
বর্তমান ভগ্নতের শোষণভেদের পরিচয়?

ডাঃ সুবীতি চট্টোপাধ্যায় সবেই আমি লিখিয়াছি—“ভারতীয়
শৌর্যবৎ থাকিবে অথচ নিজস্ব ভাষাও বিসর্জন করা চলিবে—
এমন লক্ষ্যের সোনার পাকেরের গাঠী যেখানকার জিনিষ বটে।
কিন্তু তাহাও যদি পরমা থাকে, তাহা হইলে ডাঃ চট্টোপাধ্যায় মাথাটি
কিনিয়া থাকিবেন, সময়ে কবির সাহেব কাঁধা চলিবে।”

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় যে আমাদের বাঙালী অক্ষরের লিখন-
প্রণালী পর্যন্ত পরের নিকট যাব করিতে চান, ইহা কি বেশ-
প্রেমিকতার লক্ষণ? আপনাদের কি ইহার শোষণতা করিতে
চলেন? ইহার বিরুদ্ধে কথা কও যে কি প্রাণের সৈন্য জানান
নহে? তাহাতে কি শাস্তিকতার পরিচয় দেওয়া হয়?

তাহার পর যদি আপনাদের বুদ্ধিগা দেখেন, তাহা হইলে
জানিতে পারিবেন যে, ভগ্নতের একমাত্র সংস্কৃত ভাষা সম্পূর্ণ
বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন পালি, বিষ্ণু এবং
আর্য্য ভাষাও অনেক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক বটে, কিন্তু
সংস্কৃতের মত সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক নহে। সংস্কৃত ভাষার
সম্মান যে কষ্ট ভাষা আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক না
হইলেও, আধুনিক অস্ত্র ভাষার তুলনায় অনেক পরিমাণে
উৎকর্ষসম্পন্ন। ইংরাজী ভাষা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক। তাহা
জানার প্রধান উদ্দেশ্য, পণ্ডের মনের ভাব নির্ণয় ও নিশ্চিত-
ভাবে বৃত্তিতে পড়া। ইংরাজী ভাষায় তাহা পরা যায় কি?
যদি পরা যায়, তাহা হইলে একই অর্থে লিখিত আটনের
ধারাগুলির বিভিন্ন অর্থ করা সম্ভব হইতে কি? এতদূর
ইংরাজী অক্ষরের লিখন, প্রণালীর ভগ্ন নিষেধের বকীর
লিখন-প্রণালী বিলাইয়া দিলে কি cultural conquest-এর
সহায়তা করা হয় না? তাহার শিক্ষা করা কি বড়ই গঠিত?

আমি হয়ত আমার স্বীয় অসুপস্থিততার ভগ্ন বাঙালীর
আমাদের স্বপ্নপতি নষ্ট করিয়া ফেলিব, এই আশঙ্কা আপনাদের
মনস্বাধাৎকে জানাইয়াছেন। আমি স্বপ্নপতির মানেভিঃ
ভিত্তিক নহি, অথচ আমি যে কাঁধা: ইহার প্রধান কণ্ঠস্বর
তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। এতাবৎ স্বপ্নপতির কোন
অনিষ্ট আমার দ্বারা হয় নাই এবং স্বপ্নপতির অস্বা ক্রমশ:ই
উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা তাহার Balance Sheet
দেখিলেই বৃত্তিতে পরা যায়।

যেহেতু যে অন্যত্র চলিতেছে তাহাতে অসুপস্থিততাকে
প্রত্যেক ব্যক্তির এবং প্রত্যেক ব্যবহার বিশেষ বিশেষ হইবার
আশঙ্কা আছে—ইহা আমার অভিমত। অথচ ভগ্নপাথর
গড়ন:মেষ্টার দ্বিতীয় মিলিত হইয়া এখনও চোঁটা করিলে, আমাদের
প্রত্যেক ঐ বিপদের হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও বহু
পরিমাণে রক্ষা পাউতে পারি। কি উপায়ে তাহা হইতে
পারে, তাহা ভগ্নপাথরগণকে জানাইবার ভগ্ন আমি আমার
বক্তব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাঙালীর সর্ব-
প্রধান সংবাদপত্রের পরিচালক—আপনাদের মনোবৃত্তি দেখিয়া
আমার অনেক বিষয় আবার নতুন করিয়া ভাবিতে হইতেছে।

যেহেতু যে দিকে চলিতেছে তাহার পরিবর্তন সাধন করিতে
না পারিলে যেহেতু প্রত্যেক ব্যবহার বিশেষ হইবে বলিয়া আমার
আশঙ্কা, ইহা আমি আগেই বলিয়াছি। তবুস্বপ্নপতির বক্ত-
ব্যপত্রও বিশেষ হইবার আশঙ্কা আছে এবং যেহেতু আর্থিক
অবস্থা পরিবর্তিত না হইলে আমি যে তাহাকে রক্ষা করিতে
অসমর্থ হইব, তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য। আপনাদের চোঁটা
করিয়া উপস্থিত পাতকের সম্মান করিয়া স্বপ্নপতির মনোরম
পদোত্তে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন কি? আমি ও
আমাদের বন্ধ সত্যপত্র তাহা মূল্য পাটশেই দণ্ডি ছাড়িয়া দিতে
প্রস্তুত আছি।

আপনাদের আমাকে বড় পারেন গোলাগুলি বন্ধ তাহাতে
আমার আশ্রয় নাই। মাথার গোলাগুলি না হইলে কি
কখনও কেহ একবিধ অবস্থায় যেহেতু কণা ভাবিতে ও কহিতে
আরম্ভ করে? তাই একটু ভাবিয়া দেখুন, আমার মাথার এই
গোলাগুলি হইল কেন? নেত্রগিরির ভগ্ন গোলাগুলি আসিলে
প্রায়ই নামের ব্যবহার ও সভ্যসমিতিতে না যাওয়া থাকিত
কি?

আমার অসুপস্থিত, নিরপরাধ ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুরকে
ইহার মধ্যে কড়াইবেন না। তিনি বহু কথায় আমার পক্ষ
সর্বভোভাবে একমতাবলম্বী পক্ষ নহেন। তাহার অনিষ্ট
করিয়া আপনাদের কি লাভ হইবে?

বহুশ্রীকে ভগ্নপাথরগণের অগ্রিম করিবার ভগ্ন তাহার
বাড়ি কোন অসুপস্থিত অস্বাধ অবস্থা চাপাইলেই বা কি
কলোদয় হইবে? ইতি—

বিনীত—শ্রীগজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য,

স্বপ্নপতি কটন মিলের অফিস

কলিকাতা, ২৭/১০/০৪।



অন্তঃপুর

বাক্সালার তুর্গোৎসব ও বাক্সালীর মেহের

— শ্রীকাকমদালিকা দেবী

বাক্সালানদেশের সর্গপ্রধান উৎসব। শারৎবৎসব হইয়া গেল। পরতে অঙ্গুষ্ঠিত হয় তাই ইহার নাম, শারৎবৎসব। নহিলে ইহা তুর্গোৎসব। ইহাকে তুর্গোৎসব বলিলেট ঠিক হইবে; কেন না, এই উৎসবের সর্গপ্রধান অঙ্গ, মনহুতা তুর্গার পূজা। ইহাকে অকালবোধনও বলে। সাকস-সম্মখে বিপর্যস্ত শ্রীগনচর মনপ্রহরণবারিণী তুর্গার পূজা অকালে করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম অকালবোধন।

তুর্গোৎসব কি কেবল তিনটি উৎসব? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় এই উৎসবের কোন না কোন অংশে সতল ধর্মের নোকেই যোগদান করে। আরকাল মূলমননের তিনটি তুর্গোৎসবে যোগ বড় বেশি না, কিন্তু পনের তুর্গি বৎসর আগে, আমি দেখিয়াছি, মূলমনন মেহের ও ছেলেরা আমায়েরই মত নৃতন ও রত্নীনা ভাবা ও কাশক পড়িয়া তিনটি ঠাকুর-গালানের দি'ড়ির নীচে ঠাড়াটরা তিন্ম মেহের ও ছেলের মতই তল্লব হইয়া গরিমা দেখিত : পূজার বা আচরিত্রেরে তিন্ম: বেমন গড় হেঁত, তাগাও তেমনই গড় হইয়া ঠাকুর প্রণাম করিত; আবার পুরুত মহাশয় বখন মত বড় বরেকোব বা দিতলের পালা হাতে প্রসাধ বিতরণ করিতেন, তিন্ম ছেলে মেহেরের মত মূলমনন ছেলে মেহের ও বোড়কের তকিধরে প্রসাদ লইত। মাগ, কলা, ছোলা, মুগভেজা, নীকআলু, কেশব, বাতাসা, মাড়া প্রভৃতি পাইয়া তাহারও মা-তুর্গার প্রণাম খাইয়াছে, আর অল্পখ বিস্রম হইবে না ভাবিয়া আকস্মে আটখানা হইত। আমায়ের বে গ্রামে বাড়ী ছিল, সে গ্রামে অনেক মূলমননের বাস ছিল, আমি দেখিয়াছি পূজাবাড়ীতে পাত পাতিকা মূলমনন বয়ো-বুদ্ধদের লুচি মোড়া সন্দেশ খাইতে কোনদিনই মনিচ্ছা, অকুচি বা অবিদ্যা হয় নাই। সেট গ্রামে একবার শৈবী যুতান বাস করিতেন, তাহারও তুর্গাপূজার সময় পূজাবাড়ীতে প্রায়

সর্গকণ থাকিতেন, আমায়েরে যোগ দিতেন, আহার করিতেন। আরকাল মূলমননের বা তিন্মের কোন পূজাপার্জন বা উৎসব যোগ বেশি বলিয়া শুনি না। শৈবী যুতানবধ কি কেনে সে লেবাবও আমি বলিতে পারি না। লবের সাহেবেরা তুর্গা-পূজার ছুটির কতটি দিন খুঁ আয়ো-আজ্ঞার করিয়া বেড়ান ইহা দেখিতে পাই। মূলমনন বা যুতানেরও তাহা করেন। কাজেই তাহারও যে এক রকম পূজার আনন্দোৎসবে যোগ দিতেছেন, ইহা বলা আবার পক্ষে হুইতা হইবে কি?

আমিও কথা আছে। সাহেবেরা যে এই পূজোৎসব নানেন তাহার মন্ত-প্রমাণও আছে। আমি এই কলিকাতা শহরের পুঠাও দেখাইব। কলিকাতা এক কালে ভারত সাক্ষে বাতখানী ছিল, এখন আর নাই এবং সাক্ষেখানীতির নাকে নড়ি নিগা ইঙ্গপ্রশ্নে টানিয়া লওয়া হইলেও কলিকাতার প্রাধাত একইও কবিগারে কি? আরও কলিকাতাতেই সাহেব-যের বত বড় বড় থাকিল, সোফান, আদালত ইত্যাদি আছে। বড়লটি সাহেব মরতমের সময় কলিকাতাতে আদিগা থাকেন। দেখাযেবি বত বড় সাহেব-যের আর বত সাক্ষের সাক্ষ-সাক্ষী, মহাসাক্ষ-মহাসাক্ষী হইতে টুটেইকানী সকলেই শ্রিতকালের বরমিসের বড় উৎসব বাগন করিতে তুতপূর্ণ সাক্ষেখানী কলিকাতার আদিগা বাস করেন। কলিকাতার সাহেবের খুঁ প্রাধাত ও প্রতাপ। এই কলিকাতার সাহেবের বড় বড় সোফানগুলিকে তুর্গাপূজার সময় নানা সাক্ষসাক্ষা দিয়া সাক্ষেখানী থাকেন এবং বিজ্ঞাপনে 'পূজার আয়োজন', 'পূজার দেশ', 'পূজার কনসেনস' এই সতল কথাও লিখিতে লজ্জা করেন না। মূলমননের সফলও আমার এই কথা বাটে কি না মূলমননবধই তাহা বলিবেন।

এত কথাই পর যদি তুর্গোৎসবকে বাক্সালানের সাক্ষেখানী উৎসব বলি, কেহ তাগাতে মন্ত আপত্তি করিবেন কি?

শবের হৃদয় বৎসরে কত পরিবর্তন না দেখিতে পাঠ-
সাধ। আমি পরীক্ষারের মধ্যে, পরীক্ষারের জন্য, চৌদ্দ বৎসর
সময় পরীক্ষারেরই কাটাঁইয়াছি। পরীক্ষারের আমার ছেলে
বয়সে বয়স উৎসব বেশিরাছি, তাহার সঙ্গে সন্তানের উৎ-
সবের একটুও মিল নাই, পরীক্ষারের এমন যে উৎসব হয়
তাঁহার সহিতও কোনরূপ সাদৃশ্য দেখি না। আমার সেই
সময়ে কি দেখিয়াছি তাহা বলিব।

আমাদের গ্রামে একখানি মাত্র পুন্ডা, বন জেলের মধ্যে
আর ছিল না। এই বন জেলের মধ্যে বন গ্রাম আছে সমস্ত
গ্রামের লোক মতক মতক কতারে কতারে এই পুন্ডাখানি
বেসিতে আসিত। বেহেমা বন বাঁহিয়া আসিত, পুন্ডাবন
আলাবা আলাবা বলে আসিতে দেখিতাম। ছোট ছোট
ছেলে মেয়ে পুন্ডাবনের সঙ্গে থাকিত, বেরেরের সঙ্গেও
থাকিত। পুন্ডাবা কোয়া কাগড় (সাগরপতঃ) পরিত,
যোয়া চামর চুপোট-করা ও পাকান পলায় কুলিত। সেই
সময়ে জুতার চলন বড় ছিল না। কটিং কাগরও পরে
খুব বোটা চট বা জীং-জীটা কাপড়ের ত বোনা হাইত।
পুন্ডাবাড়ীতে প্রবেশ করিবার আগে তাঁহারা বাড়ীর বাহিরে
কোণাও হুতা পুগিয়া, নিকটবর্তী পুন্ডে পা হুতা আসিতেন।
শ্রীলোকদের মধ্যে অ-খোয়া জুয়ে ও বিলাতী বা মিলের মা-
পাড় বাড়ীর খুব চলন তখনকার দিনে ছিল। ছোট
মেয়েবা, বাগানের বিয়ে হয় নাই, তাহারা নীলাবরী বা জুয়ে
পরিয়া আসিত, রঙীন শাড়ীনের জামা (জাকোট ?) দুই বশটা
সেবিতাম। ছোট ছেলেরা নীল জামা (অ-খোয়া) দিকি
কাগড়, তার উপরে শাটিন বা পাংলা বেশেরের জামা পরিত,
তার উপর চুপোট-করা পাকান চামর। যে বাড়ীতে পুন্ডা
হইত, তাঁহাদের অবস্থা ভাল। তাঁহারা সকলকে পাঠা
পাঠাইয়া বাইতে দিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু বাড়িরেলে
নান্দ্র, চিচা, মুকী, মুকী মকলক পেট করিয়া বাড়িহইতেন
—হিন্দু মূলদান দর্শন তেব ছিল না। বিজ্ঞান বশীর
দিন প্রতিমা-বিদ্যারের পর তাঁহাদের নীচে বিদ্বত
অন্যে বন চাকের সঙ্গে পাড়ার লোকের নৃত্য হইত, তখন
বাজনার ভালে ভালে ছেলে বড়ো, হিন্দু মূলদান পরায় বড়-
লোক সবাই নাচিত। প্রতিমা বিদ্যারের বিজ্ঞা আসিয়া লোকে
বন পাপল হইয়া উঠিত; সে নৃত্য যিনি না দেখিয়াছেন

তাঁহাকে বুঝাইতে পারি এমন কি সঙ্গ আমার ? ঢাকী
নাচিততে, ঢুলী নাচিততে, সানাইয়া নাচিততে, কাদিলা
নাচিততে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বড়ো সবাই নাচিততে।
না চলিয়া গিয়াছেন, কৈলাস হইতে আসিয়াছিলেন, পুন্ডাব
কৈলাসে কিরিয়া গিয়াছেন, আমার সেখানে সেই হৃত-
পেতের সংসার করিতেন, তাহা বৃষ্টিবন, জোলায় সঙ্গে
অশ্বিনে-অশ্বিনে কুগরেন, তাহা ত সৌর্য বাণের বাড়ীর ও
বাণের বাড়ীর দেশের লোকের সঙ্গে গুপেই কথা, তবুও
লোকে নাচে কেন ? শুনি, হাইবার সময় সৌর্যর কাণে কানে
সেই যে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমার আসিত, সেই পুন্-
রাগমনের কলম করিয়া লোকে আনন্দে নৃত্য করে। এ সময়ে
পাতের কোন ব্যাখ্যা আছে কি না তাহা আমি জানি না।
আমরা ঠাকুর না, শিগা, মালীবা, বিন্দার কাছো বাহা
তিনিয়াছি, শুণু তাহাই জানি।

ইহার পরে লগে কালীর বোয়াত আসিত, অরব কলম
ও ভালপত আনা হইত। প্রত্যেকে ১০৮ প্রণাম দিখিয়া
মাথার ঠেকাইতেন, তারপর ভাত খাওয়া হইত।

পুন্ডাবিত মধ্যম শাস্ত্র-বয় উচ্চারণ করিয়া শাস্ত্রজল
ছিটাইয়া দিতেন, লোকে যা ঢাকা দিয়া বসিয়া সর্বাঙ্গে
শাস্ত্রজল লইত আর ভাবিত, সকল অব্যক্তি বুর হইয়া পেল।
আমি দেখিয়াছি, তার পাচ ক্রোশ দূর হইতে কেহ কেহ কল
ছেলেদেরকে কোলে করিয়া বিজ্ঞার দিন বিকাল হইতে
পুন্ডাবাড়ীর আসিবার বসিয়া থাকিত, শাস্ত্র-জলটুকু আশায়।
শাস্ত্রজল স্পর্শে কোন রোগে শিশু অস্থির সাতিথ্যে অথবা
সারে তাহা আমি বলিতে পারিব না, তবে বহুবেশ পর বছর,
প্রতি বছর নৃতন নৃতন রোগকে দেখিতাম, সেই ভয় মনে
হইত, ভয়ত বা রোগ সাহিত। আচকাল সংসার আত্মিকের
কাছে বন এই গর করি, সবাই হাসে, ঠাট্টা করে। আমার
এক ‘বাটার অক সাংবল’ বেবর আছেন তিনি রহ করিয়া
শাস্ত্রজল পেটের করিয়া বেচিয়া লকপতি হইবেন এবং
আমাকে ‘রায়দুটি’ যিবেন বলেন।

রক সবাই করিতে পারে, সব বাণীরেই রক করা যায়;
কিন্তু লতাই কি কিছু ছিল না ? কিছুই যদি না থাকিত
তবে লোক এমন করিয়া আসিত কেন ? এই সকল গুহুতর
কথার অর্থ ও রহস্ত কেবল কত আমার কর্তব্য নয়, তাহা আমি

মানিতেছি। সেই সনে ইহাও মানিতেছি, এতকাল পূবে
আতও আবার ঘনে সেই সময়কাল বিখ্যাপ বহুদূর হইয়া
আছে যে, 'বিখ্যাপে দিলার বহু, অর্কে বহু দুঃ'। অং আমরা
একালে কল্যাণেগেও, আমাদের ঘন হইত লোকগেও, সেই
হা। তা কি করিব!

কলিকাতার এখন যেখি, বাব-ইয়াসী পূজার বহু বৃন্দ।
এখানে বাবোয়ারী পূজা বলে না; বলে, সর্গজনীন চূর্ণা পূজা।
বহুদূর কালকে পড়ি কলিকাতার প্রত্যেক পাড়ার সর্গজনীন
পূজা হয়। কোন কোন পাড়ার বলাবলির মধ্যে দুইটি,
তিনটি সর্গজনীন পূজাও হয়। পাড়ার ছেলেদেই ইচ্ছাপ
আগেজন করিয়া টাধা তুলিয়া, আটচালা বাঁধিয়া, ঢাক-ঢোল
সানাই বাজাইয়া, বিহুৎ ভালোকে মণ্ডপ সাঙাইয়া পূজা
করে। বহিঃ-নাগাধন্যের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করে; আগল
খিচুড়ি করে, বাবোজোপও বেধায়। পাড়ার পূজার করনি
সভা সভা চূর্ণাখণ্ড সাঙ্গিয়া থাকে।

আমি জানি না সর্গজনীন চূর্ণাপূজা বাবো করে, তাহার
'সর্গার্থপাটিকা'র প্রতি তক্তিতেই তাহা করে, অথবা হুজুপ
যাতিয়া করে, এত লোক তক্তিতে আছুত লবধে যদি না
বলিয়া জাকিত, শক্তিময়ী আগাধনা করিত, তাহা হইলে
না-চূর্ণে চূর্ণতিনাশিনী বিশদতরবারহিই মহিমাবিনী অম্ব-
বিনাশিনী ত্রিমূলবারহি চূর্ণা কি সভ্যদের চূর্ণিত দূর না
করিয়া থাকিতে পারিতেন? কিন্তু আগাধন চূর্ণা ত দূর হওয়া
কুর কবা, চূর্ণিত বৃদ্ধিই পাইতেছে না কি?

বাখলাৎ সর্গপ্রধান উৎসব—চূর্ণোৎসব। চূর্ণাকে কবি
আনন্দবদী আখ্যা দিয়াছেন, "আনন্দময়ী আনন্দে আনন্দে
দ্বিগাহে বেগ ছেয়ে" কবিত্বভূতে কবি তাহাও দেখিয়াছেন।
কবিয়া বাহা দেখিতে পান, সাধারণ লোকে সব সময়ে তাহা
দেখিতে পায় না; অথচ কবি বৃষ্টি তুলও দেখে না। তাই
কবি মত সাধারণ লোকে আনন্দের সন্ধান পাইলেও, আনন্দে
সেই হাইয়া বাইতে দেখিতে পায় না। যদি সভা কথা বলিবার
সাহন হয়, তাহা হইলে এমন কথাও বলা যায় যে, বেশ হইতে
আনন্দ অল্প হইয়াছে। কলিকাতা সহরে সর্গজনীন পূজাও
যেখিলায়, সাম্র লম্বত নবনারী বালকবালিকাকে উলস-ফুল
উপহিত থাকিতেও বেধা সেল, তন্মধ্যে একপত বালক-
বালিকাকেও নবম্রস্থে স্থিত দেখিতে পাওয়া সেল কি না

সম্বোধ। পূজার আনন্দের সঙ্গে মূচন কাপড়-জামার এখন
একটা সম্পর্ক আছে যে, মূচন জামা-কাপড় না পড়িলে
সেই আনন্দ আদিতই পাবে না। পূজা সর্গজনীন হইলেও,
সর্গজনীন আনন্দ উৎসব কেমন করিয়া বলিব?

একটা কথা অত্যন্ত লক্ষ্য করিতে হইতেছে।
অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, বাঙ্গালী মেয়েদের
বসন-বৃত্তের আড়ম্বর পতন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পট্টাভাষের
কথা আমি (আতকালকার) জানি না, আমি কলিকাতার
কথা বলিতেছি। কলিকাতার মেয়েদের কাপড়-জামার এত
বৈচিত্র্য বস বসলয় আগেও ছিল না। ইংরেজ এই জাঁকজমক
বৃদ্ধি পাইল কেন, তাহা আমি জানি না। তবে এই জাঁক-
জমক যে অধিকাংশ তন্ত গৃহস্থকে বিশদায়ক করিয়াছে তাহা
বুঝিতে পারি; সে বহুদূর পাই। শাস্ত্রে (তুনিয়াছি) কর্ম
করিয়া বি বাওয়ার (বি বা আছে, এখন কর্ম করিয়া কাপড় ক্রয়
করিবার বাবদ্য চলিয়াছে। সহরে কাপড়ের হোকাইনগুলির
সামনে বিজা চলিলেই ইহা বুঝা যায়। যে-জিন্সের বহিষ্কার
নাই সে জিন্স হোকাইনগেহা কখনও লাগাইয়া তাহে না।
যে জিন্সের বহিষ্কার বহু বেশী, হোকাইনগে সেই জিন্স
অল করিয়া লাগাইয়া তাহার বাহার দেখাইয়া হোকাইন
তুলাইয়া রাখে। যে কোন কাপড়ের হোকাইনের সামনে গেলই
বেধা বাইবে যে, বহু বহুদের হঠাৎ, গোবিন ও গাখী পাড়ার
বাহার!

আমাদের শিতাবহদের সম্বন্ধেও পুরুষের কাপড়-জামার
কিছু কিছু সৌন্দর্য ছিল, এখনকার পুরুষের পোষাকে
তাহা একটুও নাই। একদর মধ্যে নিরানন্দই জন পুরুষ হিসের
মুতিতেই সজ্জা, একজন ক্যাসডায়া বা শাখিগুতী কাপড়
পড়েন। তাহারের জামা অধিকাংশেরই সাফা, তটীন জামা
কহাতিও কোন রঙলোকের মধ্যে উঠে। বাহুল্যবাহে
তাঁহার উত্তরী বর্ধন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়—ইহা ভাল
হইয়াছে অথবা মন্দ হইয়াছে তাহা বলা আমার পক্ষে সাজে
না। পাড়ী-অভ্যুদয়নের পর হইতে, পুরুষের পোষাকের
বৈচিত্র্য বা বাহুল্য একেবারেই ভাঙ হইয়াছে, ইহা সকলেই
লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মহাত্মা-প্রবর্তিত বহুদ-অভ্যুদয়
সকলেই (তাই বা কেন, অনেকট) গ্রহণে নাই সভা; কিন্তু
বেশকুহার বাহুল্যও বেশ করেন না। বাঙ্গালার মত পট্টীন

যেণ ও বাহালীর মত বসন্তে জাতিত পড়ে জীবনভাষ্য কোন
অপেনই বাহলা করা চলে না। পুস্পতা তাহা বুঝিয়াছেন ;
কিন্তু আশা ? মিলের কাশভেদ কথা বাউত, আশাসের
কলনের পশ্চিমুর কলসজাচার কাপড়ে মন টেট ? আশা
এই কথাতলা পুং কল্লের তাহা জানি ; কিন্তু সত্য কথা নহ
কি ? আমি একটি পুং পুস্প পরিবর্তনের কথা জানি ।
ঊহাসের বাতীর বৃষ্টি বসন্তের জন্মেইত কাপড়ের বাহনা
বহিয়া না পাইয়া বসন্তবাতীর জোকাঠে লাগি যারিয়া যোনের
বাতী চলিয়া গিয়াছিল। বহু বসন্ত বসন্তের দিন বাস-
যের করিয়া ৩২ টাকা বিয়া একখানি জন্মেইত কিনিয়া দ্রাব
শিক্ষার পঠাইতে সে বাহ্যের অধ্যাহতি পাইলেন । কোথার
বার করিয়াছেন, কে ঊহাতে বার ছিল, এই সকল সংবাদ
কায়ার ও বাসিবার কথা নহ ; কেহই বাসিত না। কিন্তু
কিন্তুদিন হইতে কোর হইতে না-হইতে ইচ্ছা-নিচ্ছা-তাহা,
কক পাপকী ও লঘা গাঠি দেখিয়া সবই বুঝা গাইতেছে ।
এই জন্মলোকটি নিজের ছেলেকেরক এমন সত্যবাসী চৈতন্য
কল্পিতেছেন, তিনি বাতী থাকিলেও ছেলেকেরক বাতী
বসন্তের লোক দেখিলেই কলে, 'বাহা ত বাতী বৈই'
কল্পকেরক মহাজনের সংখ্যা করা যায়। পাড়ার লোকে
কলে, ঊহাদের লম্বীবস্ত্র দ্রাব কল্যাণেই সন্তত ।

কল্যোকেতা বাহা করেন, বাসিবার তাহা অলুসরণ
করেন, বাসিবারক দেখাযেই পসীয়া সেই পুং চলিতে
আরম্ভ করেন । ইহা সর্বক্ষেণে দেখা যায়। আশাসের
ক্ষেণেও তাহাই দেখা গাইতেছে । বহু লোকের দেখাযেই
জন্মের কল্যাণিকক এমন পাইয়া বসিয়াছে যে, পুং
পসীয মেয়েও দেখাযেই মিলের রক্তার পাতী ছাড়া পড়িতে
চলেন না। কল্যোকেতার লম্বা সাজে, সাবাল লোকের
ভাষা সাজে না, ঊহাদের বাহা পোকা পাথ, আশাসের তাহা
পোকা পাথ না ; ঊহারা বাহা করিতে পারেন, আশা তাহা
পারি না, ইহা যে আশা কেন বুঝি না, কে জানে !
কাপড় শুধু বহি মেয়ের অম্বা মনের তরুণ বসন্তই
জানিতে পারিত, তাহা হইলে নিবার কিছু ছিল না। কিন্তু
বাহাযেই বাহালীর মেয়ে মেয়ের বর্ষ বিবর্ষ। মেয়ের বর্ষ
বিবর্ষ হইলে মনের বর্ষ উজল থাকিতে পারে কি না তাহা
বিজ্ঞান ভাসে জানেন ।

আর একমিকে বাহালীর মেয়েদের বাহ বুঝি হইয়াছে ।
আশে বাহালীর মেয়ে আট মন বহু বহু হইলে পারে
কখনও জুতা উঠিত না, এখন বহু বহু বহু, জুতার বাহার
ও ত থাকে । একটি সময় ছিল, এখন বসন্তের চল-মলোকে
বর্ষা করিতেও কবিদের লেখকীর আশা করিত না। মনে
হয়, সেই সময় কোন কবি লিখিয়াছিলেন, বসন্তের অলঙ্কার-
জন্মিত চন্দনের স্পর্শে অর্থাৎ লগনা-চন্দাখাট—না পাইলে
অলঙ্কার জন্মিত না। তখনকার মেয়েরা বহি জুতা পরিতেন,
তাহা হইলে কবি মনে এই কাগজপুণ জন্মিত কি ? জুতা-
পরা বসন্তের এমন একটি কথাও আমি বলিতেছি না—
বসন্তের বুঝি বা কে ? আমি বলিতেছি, জুতার কল
একটি বহু বাড়াইয়াছে। যে সে জুতার আশার অলঙ্কার
মন ওঠে না। মেয়েদের মত চাঁদাছিল জুতার চলন আজ-
কাল পুং বাড়িয়াছে। এ বিবর্ষেও ঊহাদের বাহাযেই
পুংকক ছাড়াইয়া গিয়াছে ।

অনেকে মনে করেন, কল-কলকে হইতে এই সময়
বাড়িয়ার জন্ম। বসন্ত মেয়েরা কল বা কলকে বিবর্ষ নব
জন্ম-কাপড়, জুতা পরিয়া আসেন, ঊহাদের সেই সকল
চাকচিক্যের বেগুলা সংগঠিতবীর লুপ্ত কলসাইয়া দেয় ;
তাহারকও ঊত্থণ গোলাক-আশা না কলে চলে না ।
তাহারা বাতী করিয়া আশার বহিয়া কলে। পিতামহা
জাতা বা অভিত্যক্তের তাহাবিন্দক বিবৃণ করিতে প্রায়
অবিকালে সময়ই পাঠেন না। কালান এইক্ষেণেই সংজ্ঞায়িত
হইতে থাকে ।

ওত ওত্থের কথা, একটি হুখের কথাও আছে। পস্মা-
পস্মির কল বসন্তবীরের আশার অঙ্গের মেয়ে কলিয়াছে
বসিয়া অনেক মনে করেন। পস্মা পস্মার বেগবাটীও বেন
কলিয়াছে বসিয়া অনেকের গাড়া। সকল মেয়ে অলঙ্কার
পরিয়া চলত কলসাকীর মত কল কল কল করিয়া
সাক্ষর নিচ্ছনে বাইতে আজকালকার কোন বসিয়া পস্মা
করেন বসিয়া শুনি নাই। এখন চাই চাখিখানা সৌখীন
পস্মা হইলেই মেয়েরা লক্ষ্যে। পস্মার চেয়ে এখন কাপড়-
জানা-জুতার মন অনেক অধিক পড়িয়াছে ।

অনেকে মনে করেন, ইহা একটি চল-কল। ঊহারা
বসিয়া থাকেন। পস্মা পড়াইলে, আর সোপাটা থাকিত,

দায়ে-অদায়ে সেণ্ডা বেচিগা লম পাওগা বাইত, কাকড়ার
যোকা শুকুট যোকা। একথা খুব ঠিক। দাবার গমনা
বিবাহ কখনো কখনো গিতা হা কখনো বাঘীর যে আছে তাহা
বলা শক্ত। এ কথাও খুব ঠিক।

আমি যে কথাটা আমার ভগিনীদের বলিতে চেষ্টা
পাইয়াছি, তহুত তাহা শুদ্ধাইয়া বলিতে পারি নাই, তবু
কথাটা এই যে, আমাদের যে অবস্থা আমরা (মেয়েগা)
তাহা না বুঝিয়া চলিতেছি বলিয়া আমাদের অবস্থা প্রতিনিয়ত
খারাপ হইতেছে। যদি কেহ বলেন, বাগবাছালাকর
বস্ত্রাদি পুরুষগা সের বলিয়াই ত আমরা নিই। ইহা কি ঠিক
কথা হইল? পুরুষ নারীর মনোভেদ করিবার চেষ্টা করিবেই,
নারীর কি উচিত নয়, আকাশের চাঁদ ধরিবার বাঘনা না
করা? সংসার গঠন ও রক্ষা করিবার জন্যই ত নারীর দায়িত্ব,
করিনে না?

যে নারী তাহা করিতে পারেন, তাঁহার নারী-জীবন সার্থক
হয় এবং যে নারী তাহা না পারেন, তিনি দুঃখের আর নাই
বুঝুন, স্বীকার করুন আর না করুন, তাঁহার নারী-জীবন
বিকল। সংসারের অনবরত বৃত্তি করিতেও যেমন নারী অসীম
শক্তিশালিনী, সংসারকে ঐ দিতে শান্তির আদ্যার করিতেও
তিনি যেমনই পারেন। সব কথা খুলিয়া বলিতে পারিব না,
কিন্তু আমার পাঠিকাণ্ডের মধ্যে বাছায়া নারী, ওহায়া নিশ্চয়ই
তাঁহা বুঝিতে পারিবেন।

বাছায়ায় নারী চেষ্টা করিলে বাছায়ায় ঐ কিরিয়
হাইতে পারে। তাঁহাদের চেষ্টার যেমন সংসারের, তেমন
কেশেরও ঐ কিরিতে পারে। সেই চেষ্টা কি নারীগা
করিনে না?

সুখে-দুখে

ঐ-কাকড়ত কাকড় নাথ
রক্তিম নব রাগে,
নীহার-নয়নে ধারা মেঘাশিরা
বাণ-বহি হবে ভাগে;
বিহ্ব শান্ত অন্তরহলে
ফুল ফুল্যে হাসে হাসে বলে,
তখন কি তুমি অরুণের ছলে
চকিতে ছুঁইয়া যাও,
অশান্ত মন ব্যাকুল হিয়া
সম্বাদিত করে' যাও?

মধ্যাহ্নের বস্তুর পথে
চলিতে পছা তুমি,
অজানা কাহার পরশন আগে
যবে চটি বাহু তুলি,
চারিদিকে শুধু অসির মালা
সাহসার মত বরিহীন জ্বালা,
তখন কি তুমি মাতাল-উত্তাপা
শীতল মলয়া-বেশে
নব-বাসন্তী কেতন উড়ালে
ছুঁয়ে যাও হেসে হেসে?

—শ্রীকিরণচাঁদ মরবেশ

সন্ধ্যায় ধবে অন্ধকারের
ছায়া পড়ে ধরাপর,
নিকম কাঞ্চল মাখিয়া তিমির
ক্রমে ছায় চরাচর,
বিধা-ভর লয়ে শঙ্কিত প্রাণে
চারিদিকে খুঁজি, আসো কোনখানে,
তখন কি তুমি খুঁজি বিদ্যানে
চাঁদ হয়ে দেখা যাও,
আমায় সকল তিমির নাশিয়া
হাসিয়া ভাসিয়া যাও?

প্রতি মিলনের প্রতি অংগানে
তুমি আল ধরা দিতে;
এ কেমন দুঃখ, অস্তুর মন
পারে না তো চিনে নিতে।
তোমার আলোক, তোমার আঁধার,
সুখ-দুঃখ তালি কান্না তোমার,
এ কথা বুঝিতে দেহ অধিকার
ওলো ও পাপল-করা!
গতি বিপদের প্রতি অংগানে
অস্তুরে দেহ বরা।



আবদী-কোকা

জা-ল

কিত্ত

বিদ্যালয়ে যিনি পড়েন কেতার
 হাওয়ায় অক্ষরগুলি চুকাই যখন
 এ যেন চার শিখা গতি ধরে প্রাণে
 হলে মোটে সাধা বেশ বিজ্ঞ-বিদ্যায়
 একমাত্র এইক দায়-দায়-এসকলের দায়

এই দায়ের দায়-দায়-এসকলের দায়

যেই ঐতিহ্য কথা একমাত্র মুক্তি পায়
 যখনই কঠিন যত্ন বৃদ্ধি পায়
 তেই কণা যত্নাধায়ে কেই কিয়ৎ ইচ্ছায়
 লুইয়ে শ্রমের দায়-দায়-এসকলের দায়
 যত্নে যত্নে যত্নে যত্নে যত্নে যত্নে

এই দায়ের দায়-দায়-এসকলের দায়



(সম্পাদকদের সম্মতিসহ বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত)

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষর এবং ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরগুলি যাহাতে রোমান টাইপে লিখিত হয়, তাহার জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষা-তত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা উদ্যোগ লেখা গঠিত হইছে। তাহার মধ্যে সংস্কৃত অক্ষর-মালায় বিভাগে (arrangement) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হইলেও তাহার যুগ্ম-কার্যে তিনটি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রথমতঃ, ঐ অক্ষরগুলি যে আকারে লিখিত হয়, তাহা শিক্ষার্থীদের দৃষ্টান্তিক নষ্ট করিয়া দেয়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ অক্ষর ছাপাঠাতে হইলে ছোট ছোট টাইপ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না এবং তাহার ফলে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা অবশ্যজারী হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষর-মালায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলির (conjunct consonants) যুগ্ম অতিরিক্ত ব্যবহারপেক। রোমান টাইপ ব্যবহৃত হইলে উপরোক্ত অসুবিধাগুলি ভোগ করিতে হইবে না। “অতএব সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরগুলির বর্তমান লিখন-প্রণালী পরিত্যক্ত হইয়া রোমান অক্ষরে লিখিত হওয়া বিশেষ”—ইহাই তাহার সার কথা বলিয়া আমরা বৃত্তিচ্ছ।

অক্ষর কাছাকে বলে, অক্ষরের “স্বাত্রাংগণ্য”, “কবিশ্রবণ” এবং “বর্ণগ্রহণ” কি বাঙ্গাল, অক্ষরমালায় “প্রজ্ঞাহার” এবং “অনুপ্রতি” কোন শ্রেণীর কাগ, “ভাষাতত্ত্ব” কাছাকে বলে এবং “ভাষাতত্ত্ব” অক্ষরের স্থান কোথায়, এবং বিধ কোন আশোচনা। মানুষের মনে উপস্থিত হইলে অক্ষরের উচ্চারণ-প্রণালীর এবং লিখন-প্রণালীর কি সম্বন্ধ তাহা সর্বপ্রথম মানুষ নৃতির চোখে করে। অক্ষরের উচ্চারণ-প্রণালীর এবং

লিখন-প্রণালীর স্বাভাবিক সম্বন্ধ কি, তাহা জানা থাকিলে, কোন লিখন-প্রণালী যথেষ্ট পরিবর্তন করিবার ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না।

অক্ষর কাছাকে বলে এবং কি উপায়ে তাহা বুঝিতে হয়, তাহা একবার ভাবতীর্থ লিখন আশোচনা করিয়াছেন। তাহারদের স্ব, বন্ধ, ও সাধ এই তিনটি বৈশিষ্ট্য আশোচনা করিয়া লিখন। অক্ষর হইতে তাহার উৎপত্তি হয় কি প্রকারে তাহার কথা আছে “অক্ষর বৈশিষ্ট্য”। তাহার বৈশিষ্ট্য ও লিখন প্রকৃতি কেন এবং কত রকমের হয়, তাহার কথা আছে “পূর্ণ বীজাংশ”। আশোচনা তাহারদের আত্ম সম্বন্ধ বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণ বীজাংশ বিস্তৃত অর্থে প্রকাশিত রহিয়াছে। “অক্ষর” ও “ভাষা” সম্বন্ধে যে কি শ্রেণীর কত কথা ঐ সম্বন্ধে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহা “প্রকৃত” সংস্কৃত ভাষার “প্রকৃত” ব্যাকরণ “প্রকৃত” অর্থে প্রকাশিত না হওয়া লগ্নাত পাঠকদিগকে বুঝান হইবে না। পাঠকগণও প্রকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণকে প্রকৃত অর্থে না জানিতে পারিলে অক্ষর ও ভাষা সম্বন্ধীয় ঐ সম্বন্ধ গুলি কথার সম্পূর্ণ হয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। কাজেই অক্ষর সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষার কি কি কথা আছে, তাহা লিখনের জন্য বৈশিষ্ট্য ও বীজাংশের সাহায্য লগ্নাত চিনিবে না।

ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত ভাষার “অক্ষর” লগ্নাত বিস্তৃত ব্যাকরণে লগ্নাত আত্ম করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের লিখনের জন্য “অক্ষর” সম্বন্ধে “ঐতিহাসিক” প্রকৃতি প্রকাশিত হইছে কি কি কথা আছে, তাহা আমরা পাঠকদিগের সম্বন্ধে উপস্থাপিত করিব।

করিতে প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে, শরীরের বিভিন্ন স্থানে বায়ুর ক্রিয়ণ স্পর্শ পাওয়া গাইতেছে, দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহার কাব্যগুণিত ক্রিয়ণ পরিবর্তিত হইতেছে এবং তৃতীয়তঃ লক্ষ্য করিতে হইবে, চক্ষুগাদি ‘বী-’ইন্দ্রিয়গণের ও ‘গাগাদি’ কণ্ঠযোনিগণের কাব্যোচ্ছাস। ক্রিয়ণ পরিবর্তিত হইতেছে। নৈমিত্তিক বিকার বধ্যাহিত রেখার উপর জিহ্বার অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়া ‘ত’, ‘ক্’, ‘ত্’, ‘ব্’, ‘জ’ এই পাচটা শব্দের মিশ্রিতরূপ চিত্রা করিতে করিতে এই পাচটা শব্দকে উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করা এবং তৎসময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যোচ্ছার পরিবর্তন উপলব্ধি করাকে আভ্যন্তরীণ ‘পূর্ব’কে ব্রুব্যের চতুর্থ কাব্য বর্ণিত হইবে। এই চারিটা কাব্যে অত্যন্ত হইবার পর পুনরায় নৈমিত্তিক বিকার বধ্যাহিত রেখার উপর জিহ্বার অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়া প্রথমতঃ ‘অ’ এই শব্দটির রূপ চিত্রা করিতে করিতে উহা উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, ‘অ’, ‘হ’ এই দুইটা শব্দের মিশ্রিত রূপ চিত্রা করিতে করিতে ‘অহ’ এই মিশ্রিত শব্দটা উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ ‘অ’, ‘হ’, ‘অহ’ এই তিনটা শব্দের মিশ্রিত রূপ চিত্রা করিতে করিতে ‘অহঃ’ এই মিশ্রিত শব্দটা উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পূর্বোক্ত উপায় ‘অ’, ‘অহ’ এবং ‘অহঃ’ এই তিনটা শব্দের তদুচ্চারণ এবং উচ্চারণকালকালে চক্ষুগাদি দশটা ইন্দ্রিয়ের কার্যোচ্ছার ক্রিয়ণ পরিবর্তন হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। পূর্বোক্ত উপায় ‘অ’ এই শব্দটির তদুচ্চারণ-চিত্রা এবং উচ্চারণকালকালে চক্ষুগাদি দশটা ইন্দ্রিয়ের কার্যোচ্ছার যে অবস্থা হইবে, তাহার নাম পূর্বের ‘গাভিক’ অবস্থা। ‘অহ’ এই শব্দটির তদুচ্চারণ-চিত্রা এবং উচ্চারণকালকালে চক্ষুগাদি দশটা ইন্দ্রিয়ের কার্যোচ্ছার যে অবস্থা হইবে, তাহার নাম পূর্বের ‘গাভিক’ অবস্থা। ‘অহঃ’ এই শব্দটির তদুচ্চারণ-চিত্রা এবং উচ্চারণকালকালে চক্ষুগাদি দশটা ইন্দ্রিয়ের কার্যোচ্ছার যে অবস্থা হইবে, তাহার নাম পূর্বের ‘গাভিক’ অবস্থা।

‘পূর্ব’কে উপলব্ধি করিবার উপায়োক্ত চারিটা কাব্যে অত্যন্ত হইতে পারিলে পূর্বের কোন অবস্থা সাদৃশ্য তাহা সঠিকভাবে জানা যায়। অবস্থা সঠিকভাবে সাদৃশ্য অবস্থা অবলম্বন করিবার উপায়,—পূর্বকে উপলব্ধি করিবার

উপায়োক্ত চারিটা কাব্যে অত্যন্ত হইবে এবং জিহ্বার অগ্রভাগকে নৈমিত্তিক বিকার বধ্যাহিত রেখার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ‘অ’ এই শব্দটির রূপ (অবস্থা নিম্ন-প্রণালী) চিত্রা করিতে করিতে তাহার উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করা। সঠিকভাবে সাদৃশ্য অবস্থা অবলম্বন করিয়া ‘অ’ এই শব্দটির রূপ নৈমিত্তিক বিকার উপর চিত্রা করিতে করিতে তাহা উচ্চারণ চেষ্টাকালীন শরীরের অত্যন্তের কি বস্তুতে, তাহা উপলব্ধি করিলে অসুতব করা যায় যে, আভ্যন্তরীণ শব্দাং, অহঃ ও শব্দভাষ্যে যে কাব্যার্থে সর্বাংশে অধিকতম প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা ‘অ’ এই শব্দটির নিম্ন-প্রণালীর অসুতব। হান ও সম্বন্ধে এই রেখার কিছু পরিবর্তন হইবে, কিন্তু মূলতঃ এই তিনটা রেখার সমাবেশ এক—ইহা বলা হইতে পারে। শরীরের বাহিরের সমস্ত নিজ শব্দকে কি রূপ গাইয়াছে, তাহার উপলব্ধি করিতে ক্রিয়ণ করিলে কতক হইতে নিজের শরীরে বায়ু আসিতেছে এবং ঐ বায়ু কত রকমের স্পর্শদ্রব্য হইতেছে এবং উহা সাদৃশ্যকর মধ্য দিয়া শরীরের অত্যন্তের প্রবেশ করিয়া ক্রিয়ণে চক্ষু ও কর্ণের আভ্যন্তরীণ ভাগের সহিত মিশ্রিত হইতেছে এবং আভ্যন্তরীণ বায়ু কত রকমের তেজের ও ভগ্নের স্পর্শদ্রব্য হইতেছে, তাহা অসুতব করা যায়। শব্দগত অর্থাভিধানের ‘ত্রৈলোক্য-কল্প’ অর্থ ‘অহুত তেজ’ এবং ‘যোগ্যত স্পর্শদ্রব্য’। প্রাক্কলন যে বৈবিক সত্য করিয়া থাকেন, তাহাতে আগ, জোতি, ক্ল এবং অসুতের মিশ্রণকে ‘ত্রৈলোক্য’ বলা হইয়াছে(১)। প্রকৃত সাদৃশ্য অবস্থা অবলম্বন করিয়া ‘অ’ এই শব্দটির বিবিধ উচ্চারণ করিতে পারিলে, কোথা হইতে কত রকমের স্পর্শদ্রব্য বায়ু শরীরের অত্যন্তের প্রবেশ করিতেছে এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ বায়ু কত রকমের তেজের ও ভগ্নের স্পর্শদ্রব্য হইতেছে, তাহা অসুতব করা যায় বলিয়াই নবিকেশ্বর তাহার কানিকার অকারকে ‘ত্রৈলোক্য তদ’ (৩), ‘প্রকাশের কারণ’ এবং ‘পরমেশ্বর’ (১) বলিয়াছেন।

প্রকৃত সাদৃশ্য অবস্থা অবলম্বন করিয়া ‘অ’ ‘অহ’ এবং ‘অহঃ’ এই তিনটা শব্দের বিবিধ উচ্চারণ করিতে পারিলে

১. অগ্নিকার্য্যে সত্যতঃ তদ।

২. অহুতঃ তত্রৈলোক্যঃ সত্যতঃ তদ।

৩. অগ্নিকার্য্যে সত্যতঃ তদ।

৪. পর শব্দাং তদ।

পুঙ্খবহু সর্ববিধ অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া তার বলিষ্ঠা নবিকল্পের বিনিমোহন—আদি এবং অন্তের সংযোগে পুঙ্খবহু অবস্থা পূর্ণ ‘অম্ব’ এর উৎপত্তি হইয়া থাকে (৮)।

পূর্ণোক্ত উপায়ে প্রকৃত সাহিত্যিক অবস্থা অবলম্বন করিলে আদি অক্ষরের উচ্চারণ-প্রণালীর সহিত তাহার রূপ অথবা লিখন-প্রণালীর কি সম্বন্ধ তাহা পরিজ্ঞাত হইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলে, পুঙ্খবহু কোন্ চেষ্টার পর কোন্ চেষ্টার উত্তর হয়, তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। কোন্ চেষ্টার পর কোন্ চেষ্টার উত্তর হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার নাম অক্ষরের ‘অকৃত্যক্তি’ পরিজ্ঞাত হওয়া। এখন যে চেষ্টার উত্তর হয়, তখন দশীরের পক্ষাৎ, অক্ষর ও সম্মুখভাসের আভ্যন্তরীণ অংশে কাথারেকা কোন্ রূপে সঙ্গীপেচ্ছা অধিকতর প্রতিষ্ঠাত হইতেছে তাহার পর্যবেক্ষণের নাম—অক্ষরের ‘বর্ণপ্রবণ’ অথবা অক্ষরের লিখন-প্রণালী কি হইবে তাহার দ্বিতীকরণ।

সংস্কৃত অক্ষরের লিখন-প্রণালী যে কবিগণ উপরোক্ত উপায়ে স্থির করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যিক অবস্থা অবলম্বন করিয়া বিবিধ উপায়ে প্রৈয়িক ক্রিমার মধ্যস্থিত রেখার উপর ভিত্তিয়ার অগ্রভাগ স্থাপিত করিলে এবং যে কোন অক্ষরের রূপ প্রৈয়িক ক্রিমার উপর চিত্রা করিতে করিতে উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, বাঙ্গালা অক্ষর অথবা নাগরী অক্ষরের লিখন-প্রণালীতে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে, কিন্তু অক্ষর সম্বন্ধীয় উপরোক্ত চিত্রায় অত্যন্ত হইলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, অকার্য্যগ্ৰাহি অক্ষরসমূহ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার বর্ণ-মালায় বিভিন্ন লিখন-প্রণালীতে সুলভ: কোন পার্থক্য নাই। আপাতদৃষ্টিতে যে যে প্রেতের বেগা যায়, তাহা হান ও কালের প্রেতের দ্বারা এবং উহা অতি নূন্য। বর্তমান ভগ্নতে হান ও কাণ কি বস্তু, তাহা সাধারণত: জানা নাই বলিয়াই ভারতীয় বর্ণমালায় বিভিন্ন লিখন-প্রণালীর পার্থক্য অনেক-খানি বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে প্রা’।

এই প্রবন্ধের আগেই বলা হইয়াছে যে, অক্ষর কাথাক

বশে এবং কি উপায়ে তাহা বুঝিতে হয়, তাহা একবার ভারতীয় কবিগণ আলোচনা করিয়াছেন।

হিন্দু ভগবদ্বিষ্ণুর আবার কখনও সমগ্র পাদিনি প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠাত হন, তাহা হইলে দ্বাদশ ভানিতে পারিবে যে, ভারতীয় কবিগণ সমগ্র চর ও অচর বস্তুর শব্দের সমতা কোথায়, মৌলিক নব কি কি, তাহার মিশ্রণের অকৃত্যক্তির বস্তু কি, ভাবের সমাধি অবস্থারেরে শব্দের ভেদ কিরূপ হয় ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন। কবিগণ চর্য্যার সমস্ত ভাবের শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কৃত ভাষা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই পতঞ্জলি মেঘ প্রকাশ্যন্তের বলিয়াছেন যে, প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান হইলে সমস্ত গ্রাণী কি অতিপ্রাণে কিরূপ লক্ষ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়(২)।

পাদিনি ব্যাকরণ বর্তমানে যে অত্যন্ত বিকৃত অর্থে প্রচলিত রহিয়াছে এবং তাহার ফলে অস্তিত্ব যে সমস্ত ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বলিয়া প্রচলিত, তাহার কোন খানিই যে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ নহে এবং বর্তমানে কবিগণের বেদ, মর্শন, সংহিতা ও পুরাণের কোন গ্রন্থই যে যথার্থ অর্থে প্রচলিত নহে, তাহা অনেক রকমেই প্রমাণ করা যায় বটে, কিন্তু কোন প্রমাণই বর্তমানের সংস্কৃতগ্রন্থ পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের চেষ্টা করিবেন না বলিয়া আমাদের মনে হয়। ভগবদ্বিষ্ণু বলিয়া ধাওয়া মনে হইতেছে, তাহাতে বলা যায়, যখন বেশী হইলেও পাচ বৎসরের মধ্যে পাদিনির চারি সহস্র হস্ত আবার প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠাত হইবে এবং শিকা ও শাখান্যেই ভারতীয় কবির হান যে কোথায়, তাহা আবার জগৎ ভানিতে পারিবে। আমরা অক্ষর সম্বন্ধে এবং পুঙ্খ বুঝিবার কাণ্যাদি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে বাহা বাহা বলিয়াছি, তাহা সমস্তই পাদিনির কথা এবং এই সমস্ত কথাই প্রত্যক্ষ করা যায়।

পাদিনির অর্থ বিকৃত হইবার পর আর বহুদিন জগৎ ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা করে নাই। ভাষাতত্ত্ব

১। শব্দার্থভগবদ্বিষ্ণুর ভাষাভাষা দ্বন্দ্বভাষা.

অধিকাংশবর্ণনা সর্বস্বত্বকোষ.

পাঠ্যভাষা ২য় খণ্ড—বিশুদ্ধিভাষা। ১৭৭ দৃষ্ট।

সময়ে প্রীতবিশেষ অথবা প্রেমকবিত্বের প্রবীণ কোন গ্রন্থ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। বর্তমান জগতে তাহাভয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। তাহাভয় সম্বন্ধে বর্তমান জগতের যে কয়েকজন প্রখ্যাতের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হুইটনি (Whitney), পিল (Peile), ব্রাগমান (Bragmann), ব্রিল (Broel), সুইট (Sweet), গিলস (Giles) এবং এডমন্ডস (Edmonds) -এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের বক্তব্য সমালোচনা করিতে হইলে “ভাষাতত্ত্ব” ও “ভাষার প্রবেশ” - এই দুইটা শব্দের ভিতর কি পার্থক্য তাহা মনে রাখিতে হইবে। আমি বহুদূর ভ্রমিতে পারিলামি তদুপায়ে বর্ণিত হয়, ইহাদের কেহই ভাষার ভিত্তি অথবা সমস্ত ভাষার পক্ষে সমস্ত ভাষা কোষ, অথবা শব্দের মৌলিকতা বিতর্ক ভাবে নির্ণয় করিতে হয়, অথবা শব্দের বিশ্রণ কাহাকে বলে এবং বিশ্রণের বিধি কি তদসম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। তাহারা সাধারণতঃ বিভিন্ন স্থানের বাহুরের ভাষার প্রভেদভেদে কি কি পার্থক্য ও সমতা দেখা যায়, তাহার আংশিক আলোচনা করিয়াছেন মাত্র। তাহার প্রকৃত তত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা তাহাদিগের জানা না থাকায়, তাহাদের আলোচনা শুনি তদন্ত হয় নাই এবং অসমুখি বাহুরকে বিব্রত করিয়া তুলে। তাহানি তাহারা যথাক্রমে বক্তব্যবোধগা, কারণ ভাষার ভাবের অথবা তাহারা তাহাদের সাধাৰণ পৰ্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বাঙ্গালী দেশের ভাষাবিদ অথবা ভাষাসংকীর্ণ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যে বক্তব্যনি এইরূপে সহিত আমি পরিচিত হইতে পারিলামি, তাহাদের কোন খানিতে ভাষাতত্ত্ব সংকীর্ণ জানের কোন চিত্তের অভাবের পরিচয় থাকিবে? হুইটনির কথা, ভাষা-ভবু ও ভাষার প্রবেশ, এই দুইটা শব্দের অর্থে যে পার্থক্য আছে, তাহাও তাহার জানা আছে কি না তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালী ভাষার অক্ষরমালাকে রোমান টাইপে লিখিবার জন্য তিনি যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগেই দেখান হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ব জানা থাকিলে অথবা তাহার তত্ত্ব কি প্রকারে জান তদসম্বন্ধে কখনো পক্ষি থাকিলে অক্ষরমালারকাহা কোন

উপায়ে লিখিবা অথবা অক্ষরমালা আনিতে পারিবে, দুপাতঃ তাহা চিত্তাই আনিতে পারিত কি?

বর্তমান জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অথবা দেশি ভাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত বিশেষজ্ঞকে উপেক্ষা করা হইতে পারে বটে, কিন্তু একজন চিন্তা অথবা একজন ভারতবাসী ব্যাপকত্বের “বাক্যকর্তৃকবাহু”, “অক্ষরকর্তৃকবাহু”, “অবাক্যকর্তৃকবাহু ইত্যাক্তবাহু: পদবাঃ পরিচয়” ইত্যাদি বাক্যকে বিলুপ্ত হইতে না দিতে পারিবা এতদূর উপেক্ষার চক্রে দেখিতে-ছেন এবং যথেষ্ট সংস্কৃত অক্ষরমালায় লিখন-প্রণালী পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা কোন একজন চিন্তা অথবা ভারতবাসীর পক্ষে কখনো যোগ্য কি?

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে তাহাভয়ের আলোচনার পদ হইতে নিবন্ধিতাদয়ের দ্বাপাধ্যায় তাহাবানকাহা নিমুক্ত করা কেন হইবে না, তাহা আমবা নিবন্ধিতাদয়ের কর্তৃপক্ষপক্ষে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

ভারতীয় রাজনৈতিকচাক্ষু ও বাঙ্গালীর শিক্ষা-সংস্কার

ইংরাজদিগের মধ্যে একমুদ্রা আছে তাহারা মনে করেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে বসিরাট ভারতীয়গণ বিভিন্ন স্থানীয় দেশের অথবা পরিজাত হইতে পারিয়াছেন এবং স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের মতে ইংরাজীশিক্ষার বিস্তার গোচর করিতে পারি-নেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চাক্ষু দৃষ্টিভূত করা সম্ভব হইবে। বাক্যগার শিক্ষা-সংস্কারের নামে জনসাধারণের সমুদ্রে যে প্রস্তাবগুলি উল্লেখিত করা হইয়াছে, তাহার সূচ উপ-রোক্ত মতবাদের কোন সংগ্রহ আছে কি না তাহা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ না থাকিলেও ঐ প্রস্তাবগুলি কাহাে পরিণত হইলে ইংরাজী ভাষাশিক্ষার বিকৃতি যে কদা করা হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ইংরাজীশিক্ষার বাহাতে বিকৃতি ঘটে, তাহা দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক চাহিতেছেন, অথচ গভর্ণমেণ্ট এমন একটা কাব্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে বসিয়াছেন, বাহাতে ইংরাজী শিক্ষার পরিসর প্রসারপ্রাপ্ত হইবে। এতদূর অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের কাব্য জনসাধারণের সূত্রিত

স্বকোত্তমক হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক। যে কাম্য করিলে দেশের রাজনৈতিক চাকলা দূরীভূত হইতে পারে, তাহা জনসাধারণের অগ্রের হইলেও গভর্নমেন্টের পক্ষে অবগনন করার যৌক্তিকতা আশঙ্ক্য বীভৎস করি বটে, কিন্তু ইংরাজীশিকার বিস্তৃতি বন্ধ করিলে দেশের রাজনৈতিক চাকলা দূরীভূত হইবে কি না তাহা চিন্তার যোগ্য। কোন কাব্যগুণ্ডিত দেশের রাজনৈতিক চাকলা দূরীভূত করিতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রত্যেক, রাজনৈতিক চাকল্যের উদ্ভব হয় কেন তাহার অঙ্গসন্ধান করিতে হইবে।

রাজনৈতিক চাকল্যের উদ্ভব হয় সাধারণতঃ দুই কারণে।
 ১—অল্প বয়সের তুলায় কোন দেশের প্রভাববর্ণের সামান্য নৈতিক অধিকার অপেক্ষাকৃত কম হইলে ঐ অধিকারগুলি লাভ করিবার চেষ্টা।

২—যখন প্রভাবণ ব্যাপক ভাবে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনমাষ্য নানাতর আর্থিক দুঃখগরিস্ত্রা নিপতিত হয়, তখন ঐ দুঃখগরিস্ত্রা দূর করিবার চেষ্টা।

অল্প বয়সের তুলায় কোন দেশের প্রভাববর্ণের সামান্য নৈতিক অধিকার কম হইলে, যে রাজনৈতিক চাকলা উপস্থিত হয়, তাহা সাধারণতঃ বধ্যবিত্ত পোকগণের মধ্যে বাহ্যিক বস্ত্রবান কালে শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত, তাহাদের ভিতরই আবদ্ধ থাকে। গভর্নমেন্টের কর্তব্যরিগণ নিত্যই অকর্ণনা না হইলে এই শিক্ষিত পোকগণের চাকলা অথবা আকোলন বশতঃ রাজশক্তির পরিবর্তন হওয়ার আশঙ্কা প্রায়শঃ উপস্থিত হয় না। ইতিহাসে বধ্যবিত্তগণের অসদৃষ্ট ও বড়বয়সের ফলে যে যে রাজশক্তি পরিবর্তন হওয়ার চেষ্টার পাওয়া যায়, তাহা রাজকর্তব্যরিগণের অকর্ণনাতার পরিচায়ক।

কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রভাববর্ণের দুঃখগরিস্ত্রার উদ্ভব হইলে, যে রাজনৈতিক চাকলা উপস্থিত হয়, তাহা বেশব ব্যাপক হইয়া থাকে। দুঃখগরিস্ত্রার প্রকৃত কারণ অপসারিত করিয়া বাস্তব শিক্ষার দ্বারা প্রভাববর্ণকে পরিবর্তনসম্পন্ন না করিতে পারিলে এতদংশ চাকলা বোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং অবশেষে রাজশক্তির পরিবর্তন হওয়া অনিবার্য হয়।

যে কাম্য শিক্ষা করিলে বিভিন্ন দেশের অবস্থা জানিতে

পারা যায়, তাহার প্রকৃতকর্ত্ত দেশের রাজনৈতিক চাকল্যের দূরী হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে রাজকর্তব্যরিগণের অপসারিত হইবার কোন দৃষ্টিভঙ্গ কারণ দৃষ্টিয়া পাওয়া যায় না। সম্ভব দেশে যখন সর্বসাধারণের দুঃখগরিস্ত্রা উপস্থিত হয়, তখন গভর্নমেন্টের কোন কাম্য দ্বারা বাহ্যতে রাজকর্তব্যরিগণ প্রভাববর্ণের অসদৃষ্টতাচন না হন, তাহা সম্ভব্য লক্ষ্যইহ।

বর্তমানে ভারতবর্ষে যে অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রায়শঃ সর্বসাধারণের অবদীর্ঘ দুঃখগরিস্ত্রার উদ্ভব হইয়াছে, ইহা বশিত আশঙ্কা বাধ্য। বর্তমানে যে জাতীয় শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাতে একটা ভাববিশেষ দৃষ্টিতে ও পড়িতে আসা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় কোন বিজ্ঞানের অথবা বিদ্যার শিক্ষা হয় না এবং তদ্বারা ঐ সর্বব্যাপী দুঃখগরিস্ত্রার কারণ অপসারিত করা উ' পূর্বের কথা, তাহা দৃষ্টিয়া বাহির করাই সম্ভব হইতেছে না। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে ইজোরোপ ও মার্কিন দেশে একত্র সর্বব্যাপী দুঃখগরিস্ত্রা থাকিতে পারিত না। এই শিক্ষার বিস্তার না হইলে জনসাধারণের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে ইহা মনে করিবার কোন দৃষ্টিভঙ্গ কারণ নাট বটে, কিন্তু গভর্নমেন্টের যে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দেশের সর্বসাধারণের দুঃখগরিস্ত্রা বেরূপ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে বুঝি আসা করা যায় যে, জনসাধারণ একদিন এই শিক্ষা ও সভ্যতার ঘোহ অপসারিত করিয়া কলিকর এবং ঐ দিন পূর্ব দূরবর্তী নহে। বাহ্যিক দেশের নেতা ও শিক্ষাদায়ক, তাহাদের মধ্যে বর্তমানে বেশবয় বেরূপ বিভিন্ন প্রদেশের অভিন্নর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ঐ দিনের বিকটতা কিরূপ ভীষণ, তাহা কেহ যে অস্বপ্নান করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা মনে করা যায় না বটে, কিন্তু শাস্তিকামী জনসাধারণের পক্ষে ঐ বিকটতা স্পষ্ট হইতে পারে না।

কবেই আশা এখনও যদি—শিক্ষাসংস্কারের যে অভিন্ন চপিতেছে, তাহা অবিশেষে বন্ধ হইয়া বাহ্যতে দুঃখগরিস্ত্রা অপসারিত করিবার উপযোগী প্রকৃত শিক্ষার প্রবর্তন হয়,

করা ত' হুতের কথা—অনেকেই সহরের অস্বাস্থ্যকর গৃহে নিজে নিজে দাড়া তিল তিল করিয়া বিশ্রাম দিতে বীড়িত হইয়াও উল্লসের পথান সংস্থান করিতে পারিতেন নাই—কিন্তু তথাপি দেশের যে ধপেই উচ্চত সাধিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা হইবে না, কারণ ইহা আমাদের সমস্তকালের বহুশ্রমের ফল! স্বাস্থ্যসংকে, নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে পারিবারিক শক্তি সম্বন্ধে দেশের উন্নতির বাকী চিত্র য' য' যথোপযথো অঙ্কিত করিয়া আপনাতা দেখিয়া লউন। আপনাদের দেশেরা যৌর উদারতার সংস্থান কি করিয়া করিতে হয় তাহা দেখিতে পারুক আর না পারুক, জীবনের একটী দিনও কি করিয়া সম্পূর্ণ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে হয়, তাহা আপনাতা দেখিতে পারেন আর নাই পারেন, আপনাদিগকে সর্বদা ঘনে রাখিতে হইবে যে, আপনাদের দেশের ধপেই উচ্চত সাধিত হইয়াছে, কারণ এই কথা বিশ্ববিজ্ঞানের কথিটো বাক্য বাছা বাছা সমাজের অভিমত অনুসারে পাণ হইয়াছে!

এই কথিটির দ্বিতীয় কথা—

"তথাপি এই নিম্নোক্তকর সংস্কার অবশ্যকমতে হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যে সংস্কার হইবে উপকার অংশ করিল, উহার অনুসরণের সহিত অসুস্থ করিত হইবে।"

এই কথাটী যে ডিমোক্রসীর যুগের সমস্ত তথ্যের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাতে বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট সন্দেহাগ্রাসের পরিচয় আছে। জনসাধারণের সহিত উপর উদারতা এমন এত প্রচণ্ড, তখন উদারতা নিশ্চয়ই বাহ্যতে জনসাধারণের ও বিশেষজ্ঞদের পার্থক্য অসংস্কৃত হইয়া দিমোট-সময়ে "অ-বিশেষজ্ঞ" জনসাধারণের হান হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

পারে হাঁটিয়া চলিতে মানুষের পক্ষে কেবলমাত্র উত্তম হয়। এতদিন বহুজ্ঞানটি পারে হাঁটিয়া চলিয়া আসিতেছে, কারোই মানুষের পাগলি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যথাক্রমে অনেক দিন হইতে বিস্রাম করিয়া আসিতেছে। আমাদের অত বর্তমানে পাগলিক বিস্রাম দিয়া যথাক্রমে ভ্রমণে হাঁটিতে হয়, তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে মানুষের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে। আশা জনসাধারণ। কারোই বিশ্ববিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় আমাদের

সহিত অসুস্থ শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ার দাবী আমাদের করিতে পারি। আমাদের শিক্ষাসম্বন্ধী বিশেষজ্ঞগণ আমাদের এই দাবী পূরণ করিবেন ত ?

এই কথিটির তৃতীয় কথা—

"যদি যথাসম্ভবই সাধারণতঃ থাকারি হেলের পাঠ্য-কিতাবের দেশে অধ্যয়ন করিয়া লওয়া হয়, তবে দেশের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত ও উন্নতির চরিত্র পক্ষ বিস্তারিত যথাক্রমে হইবে।"

যুব আশঙ্কার সময় আসিতেছে তথ্যের সম্বন্ধ নাই। বর্তমানে এই আশঙ্কার কোন কারণ নাই; এখন হেলেরা যুগের অথবা যুগের পরপর কেহ বা ভয়ভরবে বসিয়া আর কেহ বা বিলাতে বসিয়া বিভিন্ন-শিক্ষণে বছরের পর বছর কাটাষ্টতে পারিতেছে!

মানুষের অবস্থা কতকগুলি কথা দেখিয়া একটা বিশদ রূপে দেশ করিলেও পি-এইচ-ডি, ডি-এস-সি প্রভৃতি উপাধি লাভ করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারীর সংখ্যাও থাকার পাবার বাড়িয়া হইতে পারিতেছে। উপরোক্ত আশঙ্কার সমস্ত উপস্থিত হইবার আগে বাহ্যতে দেশের সাম্প্রতিক ও উন্নতির উন্নতির চরম নৃপতি দেখান হইতে পারে, তদন্তরূপ একটা ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের এখনই করা বিবেচ্য নহে কি ?

এই কথিটির চতুর্থ কথা—

"যদি যথাসম্ভবই পড়াশুনা করিত হয় তাহা হইলে পড়াশুনার সংস্কার হওয়াই সম্ভব। গ্রাম পড়া, গ্রামজীবন কৃষিকৃতি বিভাগ দিক লক্ষ্য করিয়া সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংস্কার করিলেই উন্নত করা পারা হইবে না।"

ইহাও যুব পাঠ্য কথা! গ্রামে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা হউক আর না হউক, গ্রাম বাসের যোগ্য থাক আর না থাক, চিত্তার প্রশান্ততা, জীবনের উচ্চতা প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহা জানিবার উপযোগী শিক্ষা যুবকগণকে দেওয়া হউক আর নাই হউক, শিক্ষক অথবা শিক্ষার বিশেষজ্ঞগণ চিত্তের প্রশান্ততা, জীবনের উচ্চতা প্রভৃতি কাহাকে বলে তাহা জানুন আর নাই জানুন, যুবকগণ বাহ্যতে এই কথাগুলি কেবল টিরাপানীর মত অজ্ঞান হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

ইহা ছাড়া উপরোক্ত প্রেক্ষার আরও অনেক কথা এই কথিটির কলম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। আসল বাস্তব

শূন্য না করিয়া কঠকগুলি অর্থীন ও অমৌলিক টাকা
কথার রিপোর্ট বোকাই করিলে দেশের কোন উপকার সাধন
করা যায় কি ?

কমিটির সভাপণের বাক্যের পরীক্ষা করিতে বসিলে হঠাৎ
আমরাও বসিতে বাধ্য হইব যে, ইংল্যান্ডের মধ্যে এমন পোক
আছেন, ইহার অপেক্ষা বর্তমান সময়ে দিকার সাবখা-
গ্রহণে অধিকতর উপযুক্ত লোক বাঙালী দেখে নাই। তাদৃশ
লোক এই কমিটির চিত্তে থাকে সত্ত্বেও এখন উহা হইতে
কোন আশা কারের কথা বাঙালী ভাবিতে পারে নাই, তখন
কি বুঝিতে হইবে না যে, বাঙালী দেশের অবস্থা প্রায় সমস্ত

বিভাগেই অত্যন্ত ভীষণ হইয়া পড়িয়াছে এবং বিশেষজন-
দলকে বাঙালী জনসাধারণের অধিকতর সতর্ক হইবার
প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

বিশেষজনগণের নিকট আশ্বাসের অহুগ্রহণ, এখনও তাঁহারা
তাঁহাদের টাকার খোঁজা বন্ধ করুন, তাঁহারা এখনও চক্ষু বেশি-
বার চোঁকা করুন। তাহা হইলে বেখিতে পাইবেন যে, কি
ভীষণ অকৃতপূর্ণ নিমিত্ত দলিকি ভুগার মালার জাগ্রত হইয়া
উঠিতেছে। এখনও ঐ দলিকি ভুগিরি করিবার প্রয়োজন ও
অবসর আছে। আর কিছু দিন এইরূপ বেলায় নিম্নত
ধাক্কিলে ঐ দলিকি কল্যাণে সকলের উদ্ধিগা হইতে হইবে।

সংবাদ ও অন্তরা

শ্রীকৃষ্ণ।

কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের স্বাস্থ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য। ১৯০৪ সনের

বিষয়টিতে একজন, দুই ও তিনের মতের মধ্যে দুইজন থাকে।
অথবা এক, বহুসংখ্যক অথবা উচ্চতরক কয়েকজন পাইয়াছে।

তবু কেহ আকার করিবেন না যে, কোন দ্বন্দ্ব ও বাসস্থান
ভাল তাহার বখাখণ্ড জান না আকার আশ্বাসের ছেলেনের এত
দুর্গতি হইতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য !

লোকবুদ্ধি

ভারত সরকারের সাধারণ স্বাস্থ্য আয়োগ্য কর্মচারী (Public
Health Commissioner) কর্তৃক রাসেল 'ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল
ফ্রেজট পুস্তিকার ভাঙের লোকবুদ্ধি সমস্ত লম্বে এবং টীকা এবং
নিবন্ধনেন। ইংরেজ স্বাস্থ্য আয়োগ্য পোক-মাকড়সি ভাঙে সাধারণ দৃষ্টি
পাইয়াছে। ভারতমণ্ডলের জনসাধারণের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিতঃ
তৎকালীন লোক-সংস্কার হ্রাস না হইলে অধিকতর ভাঙতর
বাক্যের বসিবে।

পারস্যের নয়া শ্রম কার্ণেট ইন্ডিয়ানও লম্বে। এক বহুতর
ভাঙের লোকবুদ্ধিতে ইংরেজ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ ! চল্লিশ বৎসর আগেও এখন
মেখা যায়, ভারতবর্ষে বিক্রেতী উৎপন্ন শতের হাজার বিপণ
ছিল, তখন লোকসংখ্যা বাড়িয়া গেলে পাণ্ডারাব অধিকাংশ,
এবং বহু বর্তমান চিকিৎসাগো নহে কি ? ঐ বর্তমান এখন

গভীরমোটের স্বাস্থ্যবিভাগের একজন কর্মী লাহেব এবং
পারস্যমোটের একজন সন্তোষ দুখ হইতে নিম্নত হইয়াছে,
তখন উহা নিম্নতই অত্যন্ত এবং সত্য ! এই শ্রেণীর কর্মচারী
মানুষগুলির চিকিৎসার কারণে যে উৎপন্ন বর্তমান অবস্থায়
উপনীত হইয়াছে, তাহা আমরা কবে বুঝিতে পারিব ?

বর্তমান অগ্র-চিকিৎসা

ব্রিটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের অন্তরম আইন-প্রসিডিউর
ইংল্যান্ড এক দি. পাইলস বর্তমান অগ্র-চিকিৎসা আর বিশেষ উচ্চতর উচ্চতর
কলিকাতার এক বহুতর লিখিতেন। ইংরেজ স্বাস্থ্য, বসিও অগ্র-চিকিৎসা
বিকা বানা অগ্রত সাধন করিতে পারে—নাগুনো কুলকুলের মিত্র
বিবালে এবং মসিকের অগ্র-চিকিৎসা অগ্রত উচ্চতর সন্তোষ ভাঙই অগ্র-
চিকিৎসা লম্বে, তথাপি ইংরেজ কোন লম্বে নাই। একটী সন্তোষ
ভাঙি কলিকাতা বা কলিকাতা কোন লম্বে বিজিৎ—এখন অগ্রত
আকাশের বসে। বর্তমানে আশ্বাসের চোঁকা কথা উচ্চতর কলিকাতা
না হইতে পারে।

বাহ্যেতে বাধি না হইতে পারে, তবুতর চোঁকা আশ্রয়
হইলে যে, মানুষের প্রকৃত হিতের কার্যে হতক্ষেপ করা
হইবে, তাহা নিঃশঙ্কেই বলা হইতে পারে। কিন্তু বাধির
প্রকৃত নিরোধ-বাসস্থান প্রবর্তন করিতে হইলে বর্তমান
অগ্রতগণের বন্ধ করিবার প্রয়োজন আছে, তাহা আশ্বাসের
ডাক্তারগণ আকার করিবেন কি ?

বিজ্ঞান

কৃষি ও বৈজ্ঞানিক

কলিকাতার এক বিজ্ঞান-বিতর্ক সভায় ডা. সি. ডি. রায়
বলিচন্দ্রের—একদিন পূর্বে যখন ছিল যে, রাসায়নিক ও পুষ্টিবিজ্ঞান
(engineering)। রাসায়নিক সমস্ত পুষ্টি কলিকাতা পালিকা। কিন্তু
তাদের পুষ্টি-পদার্থ (basic industry) কৃষিক আবিষ্কারের ব্যবস্থা
সাধারণতঃ রাসায়নিক ও পুষ্টিবিজ্ঞান না করিলে আর চলিতে পারে না।

ইয়োহান্নিসের প্রকারোপযোগী “কৃষি”কে “শিল্প”ের অন্তর্ভুক্ত
করিয়াছেন তাহা সত্য; কিন্তু “শব্দ-সাহিত্য” উপর কোন সম্মতি
থাকিলে “কৃষি”কে “শিল্প” বলা যায় না। “কৃষি” প্রকৃতির
কার্য আর “শিল্প” মানুষের কার্য। দুই-এক ভিতর অনেক-
খানি পার্থক্য। তত্ত্ব রূপের মত কৃষি পুষ্টিবোধের মধ্যে শব্দ-
ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। বৈজ্ঞানিক হস্তাধার হইতে হয়।

প্রাচীনত্বের পক্ষে। যাহা কৃষিভিত্তিক জ্ঞানলাভ করা
অসম্ভব নহে, তাহা সত্য হইলেও বর্তমান প্রাচীনত্বকে যে অধার
সভায় পাওয়া যায়, তাহার কৃষিভিত্তিক কি সম্ভবতা সম্বন্ধ
হইতে পারে, তাহা আশা বৃদ্ধিতে পাই না। বড়লোকের
মত বড় কথা আবাদিগণকে সন্তুষ্ট রাখেন চাহিয়া থাকিয়া
অনিশ্চয় হইবে।

শিল্প ও বুদ্ধি

কলিকাতার টেলিফোনিক্যাল কংগ্রেস অব সায়েন্সের কলিকাতা সম্মেলন
যাহা বর্ত্তকালে বিজ্ঞানের যে সকল কার্যকরী পক্ষেণ হইয়াছে তাহার
একটি প্রধান-সম্মেলন (congress)। এক-দেখ বড়-সম্মেলন—
মাস্তুলের বুদ্ধিভিত্তিক উৎসাহের ফলে শিল্প-ব্যবস্থা (industrialism) :
তাহার কোন মাত্র-ব্যবস্থার কি অব্যবস্থিত অবস্থায় ইহার স্থান অধার
নাই।

“বুদ্ধি” এবং তাহার “বৃত্তি” সম্বন্ধে অন্তর্ভুক্ত্যধার জ্ঞান ও
অভিজ্ঞতা না থাকিলে ঐ প্রণীতির উক্তি কাতারও মুখ হইতে
নিষ্কৃত হইতে পারে না! অসত্য ভারতীয় কবিগণ বর্ষের
ছন্দে বসিয়াই বৈজ্ঞানিক আশ্রয়ণের উপবেশাধীন করিয়া-
ছিলেন—ইহাই কি আবাদিগণকে বুদ্ধিতে হইবে?

বিজ্ঞান ও অর্থনীতি

বিজ্ঞানের “পদার্থ” পরিচয় একজন অর্থনীতির বিদ্যাক্ষেপিত
বিজ্ঞানজ্ঞানের জ্ঞান-অধ্যয়ন যোগ্য-পুষ্টিভিত্তিক ব্যবস্থার
প্রাথমিক স্তর বলিয়াছেন :—এই বিজ্ঞানের বর্ত্তমান পুষ্টিভিত্তিক
রূপে আবাদী বসায় পুষ্টিবোধ সমস্ত বিজ্ঞান হইতে, প্রাথমিক-
স্তরে

আদর্শ আদর্শ হইতে বর্ত্তমান পুষ্টিভিত্তিক হইতে না। কিন্তু অর্থ-
নীতিভিত্তিক কলিকাতা ইহা সম্বন্ধে হইতে না। বৈজ্ঞানিকের পক্ষেণের
যে মাত্রা বাধিয়াছে তাহার কারণ তাহা হইতে, ইহাতে বৈজ্ঞানিক
সম্মেলন হইতে। সমস্ত বৈজ্ঞানিকের বিজিত সমস্ত অর্থনীতিভিত্তিকের এই
কলিকাতা প্রাথমিক হইতে উচিত।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানে যে এতখানি তথ্য কোথায় আছে তাহা
আমাদের জানা নাই। বিজ্ঞানের কোন পুষ্টিভিত্তিক পুষ্টিভিত্তিক
বর্ত্তমান সমস্ত এবং বুদ্ধি ও কলিকাতা হইতে উৎসাহিত উপবেশি
জ্ঞানের সমস্ত আছে, তাহা কোন বৈজ্ঞানিক আবাদিগণকে
নিস্তা দিবেন কি? আমাদের মনে হয়, আদর্শকাল উপাদি
থাকিলে আর মুখে সাধারণ সাধারণ প্রয়োজন হয় না।
অর্থনীতি কোন বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহে কি? যে
প্রাথমিকতার দলে এতখানি আদর্শের উৎসাহ হয়, তাহার
উৎসাহিত হয় কেন, তাহা কোন বৈজ্ঞানিক চিন্তা করিয়া
দেখিবেন কি?

শ্রীশিক্ষা

পূর্বে যাহা হইল বর্ত্তমান বিজ্ঞানের বুদ্ধি উৎসাহে যোগ্য
আমাদের সাধারণ যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও বুদ্ধিভিত্তিক
প্রাথমিক অর্থনীতির পক্ষেণ তাহার কলিকাতা হইতে আরও
বুদ্ধি অর্থনীতির পক্ষেণ, এই বিজ্ঞান কলিকাতা।

ইংলণ্ডে ব্যাণ্ণকভাবে বর্ত্তমান শ্রীশিক্ষার প্রাথমিক
ইংলণ্ডের পুষ্টিভিত্তিক পুষ্টিভিত্তিক বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি
পাইয়াছে, তাহাতে ঐ প্রণীতির শিক্ষা আমাদের অন্তর্ভুক্ত্যধার,
ইহা বর্ত্তমানের বানিয়া না পাইয়া, ইংলণ্ডের পুষ্টিভিত্তিক
পুষ্টিভিত্তিক প্রাথমিক রূপ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য হইবে
হইলে, বর্ত্তমান শ্রী-শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান ইহা বীকার
কলিকাতা বাহ্য হইতে হয়।

শিক্ষা ও ইংলণ্ড

যাহা হইল এক বুদ্ধিভিত্তিক বুদ্ধিভিত্তিক বৈজ্ঞানিকের
প্রাথমিক বুদ্ধিভিত্তিক বুদ্ধিভিত্তিক :—প্রাথমিক, চিত্তবৃত্তি, আদর্শ
বুদ্ধিভিত্তিক ইহা হইলে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিভিত্তিক বুদ্ধিভিত্তিক।
বুদ্ধিভিত্তিক ইহা হইলে বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিভিত্তিক বুদ্ধিভিত্তিক।

শিক্ষা ইতিহাসের এই নতুন সংবাদটি আমাদের কোন
ইয়োহান্নিসের প্রকারের প্রাথমিক বুদ্ধিভিত্তিক পাই নাই। ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যের বুদ্ধি প্রাধান্য : বুদ্ধি হইয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে

ব্যবসা-বাণিজ্য

অটোমোবাইল

ভারত সরকারের ১৯০৭-০৮ সনের অটোমোবাইল কার্যবিধানী
তৈরী হইয়া ফরাসী-পলিশে পেন হইয়াছে। অসামান্য অধিকার
হইয়া আসিয়াছে। ইহা। ব্রিটেনের মত—এই গিগেট হইতে
ম্প্রে অটোমোবাইল হইবে। ভারতের ইন্দো-বাণিজ্য দ্বারা চাইতে এক
খ্রিস্ট বাজার যে সকল পণ্যবাহার অসম্ভবতঃ সবার (pre-
ference) লাভ করিবার কথা, ১৯০৮-০৯ সনের ইন্দো-বাণিজ্যের
পর্যায় ৬২ খণ্ড সেই সকল প্রকারে গড়।

পাও ত হইতেছে কিন্তু পোক পেট ভরিয়া পাউতে
পার কে ?

কর্ণ-ব্রহ্মাণী

কর্ণ-পরিচয় কর্ণ-পরিচয় এক প্রকার অসামান্য সম্পদ
মিলাপ দেখাইয়া বিঃ পি. সি. ট্যাকটন কলিকাতা :—কর্ণ-
ব্রহ্মাণীতে অসামান্য ৩০ কোটি টাকা লাভ হইয়াছে।

ভারতের ভাষা ভাষা বর্ণিত হইবে।

ব্যবসায়-শিক্ষা

ব্রিটেনের এক ব্যবসায়ের উক্ত মন্তব্য যে. ই. এ. পোয়াইল
কলিকাতায় যে, ভারতীয় ব্যবসায়িকের পাশ্চাত্যে শিক্ষা দেখানোর
অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শিক্ষা কথিা খালা উচিত।

বহিষ্কৃত বোধ হয় এই প্রেরিত পোকেস উদ্দেশ্যেই
বিশিষ্টাঙ্কিত, পাশ্চাত্যের কৃষ্ণ হইতে পণ্ডিত লক্ষ্যেই পূজা।

বণিক সম্মেলন

স্পেশাল ট্যাক্সি বোর্ড-সম্মেলন ভারত সরকারের কাউন্সিল
মিলে ভারতীয় বণিকসম্মেলন কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং
বোর্ডে ভারতীয় ব্যবসায়কে স্থান না দেওয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন।

বোর্ডে ভারতবাসীকে স্থান দিলেই বেন সব সমস্যার সম্ভব
সমাধান হইয়া কহিত।

আমদানী-রপ্তানী

কলিকাতা কলিকাতা বোর্ডের মাস ১ ২০ কোটি টাকা কলিকাতা পণ্য
প্রকার আমদানী এবং ১০ লক্ষ টাকা রপ্তানী হইয়াছে। বহু বন্দর
হইতে আমদানী ১০ লক্ষ টাকা কম এক বন্দর ১১ লক্ষ টাকা বেশী।

হিসাবনিকাশে সব পরিষ্কার।

নরইউইচ ও ভারতবর্ষ

বহু বন্দর ভারতবর্ষে নরইউইচ ও পুরানো বন্দর।
পশ্চিমের এক প্রকারী উপায় উপায় ভারতবর্ষে হাই-কলিকাতা
তাহা কলিকাতা বোর্ড করিয়াছেন :—নরইউইচ প্রকার 'নরইউইচ' ও

বহু—ভারতবর্ষে নরইউইচ ও পশ্চিমের ভারতবর্ষে হাই-কলিকাতা
কলিকাতা :—নরইউইচ প্রকার ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
পশ্চিমের বহু বন্দর হাই-কলিকাতা পশ্চিমের ভারতবর্ষে।

এইবার তাহারা বিজ্ঞান কলিকাতা কলিকাতা।

ভারতের অবস্থা

বহু বন্দর ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
পশ্চিমের ভারতবর্ষে এক ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে :—ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে

পূর্ণাঙ্গের অবস্থায়, পশ্চিমের ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে

সম্রাটের বাণী

ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে

সম্রাটের ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে

রাজ্য-শাসন

অসম্রাট ও রাজা সরকার

বহু বন্দর ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে

ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে

সম্রাটের ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে

সৈন্যদল ও ভারতীয় কলিকাতা

বহু বন্দর ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে
ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষে



বীরদ্বারা

শ্রীমৎ—শ্রী বিজয়চন্দ্র ৫৫০ পাখা



ভারতের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

— শ্রীসজ্জিনন্দ ভট্টাচার্য

পূর্বাভাস

সভাষাতের বেগান হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের অথবা ভূ-
ভারতবর্ষের কেন, সমস্ত ভগ্নতের বর্তমান সমস্যা প্রধানতঃ
তিনটী, যথা :—

- (১) কৃষক, তাঁতী, দ্বীপ, কৃষক এবং কর্মকার প্রভৃতি
শ্রমজীবীদের অস্বাভাব ;
- (২) শিক্ষিত যুবকদের ও শ্রমজীবীদের বেকারগণতা
এবং অসুস্থতা ;
- (৩) সমস্ত অধিবাসীর স্বাধীনতা, অকাপনুত্ব,
অসুস্থতা এবং পরদুর্ভাগশক্তি।

অসুস্থতা এবং পরদুর্ভাগশক্তির ভিত্তি বাহারা সর্বোপেক্ষ
অধিক বিস্তৃত, তাহাদের মধ্যে উকিল, বাসীলার প্রভৃতি
আইন-ব্যবসায়িক, চিকিৎসা-ব্যবসায়িক এবং বহিঃক্ষেত্র
নাম সর্বোপেক্ষ অধিক উল্লেখযোগ্য।

উপর্যুক্ত দুইবিধের কারণ তেরটী, যথা :—

- (১) জমীর উর্বর্যাপ্রতির হ্রাস ;
- (২) পণ্যজীব্য ন্যূনতর দামের অভাব (want of
parity) ;
- (৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকাকর্মের চাক্ষুণ্য পদ্ধতিতেই বাহাতে
ন্যূনতর গরীবানা ভাবে পরিবার প্রতিপালিত
হইতে পারে তাহার ব্যবহার অভাব ;
- (৪) উপর্যুক্ত চাক্ষুণ্য পদ্ধতিতেই বাহাতে শ্রমজীবীদের
পারিশ্রমিকের সাদৃশ্য থাকে তাহার ব্যবহার
অভাব ;
- (৫) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার
পরীক্ষা দ্বারা বাহাতে শ্রমজীবী (manual
workers) ও নিম্ন পরিচালকদের (officers

and sub-ordinate officers) পদসৌরভের
ভারতমাত্র স্থিরীকৃত হয়, তাহার ব্যবহার অভাব ;

- (৬) বুদ্ধির উৎকর্ষের ভারতমাত্রাধার বাহাতে মাদুরের
উপার্জনের ভারতমাত্র হয় তদনুসৃত ব্যবহার
অভাব ;
- (৭) জীবিকাকর্মের চাক্ষুণ্য পদ্ধতিতেই বাহাতে সর্বোচ্চ
(maximum) উপার্জন একতর হয় তাহার
ব্যবহার অভাব ;
- (৮) সম্পূর্ণ ও নিদূর্ণ শরীরগঠন বিজ্ঞান (Anatomy)
অভাব ;
- (৯) সম্পূর্ণ ও নিদূর্ণ শরীরবিদ্যা (Physio-
logy) অভাব ;
- (১০) সম্পূর্ণ ও নিদূর্ণ পরাধর্মবিদ্যা (Physica)
অভাব ;
- (১১) সম্পূর্ণ ও নিদূর্ণ রাসায়নিক (Chemistry)
অভাব ;
- (১২) জল ও বায়ু বাহাতে অস্বাভাবিক না হয় তদনুসৃত
ব্যবহার অভাব ;
- (১৩) শিক্ষাপ্রতি বেক্ষ হইলে ছাত্রগণ য য বুদ্ধির
উৎকর্ষ সাধন করিয়া বাবদী হইতে পারেন, সেই
শিক্ষাপ্রতির অভাব।

ইহা ছাড়া আরও যেখান হইয়াছে যে, দুইবিধের এই
তেরটী কারণের উত্তর হইয়াছে আমাদেরই পূর্বপুরুষদের
জ্ঞান ও বিদ্যা হইতে এবং যদিও বিশেষগণ আমাদের
ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন, তথাপি
তাহাদের উপর বিশেষ শোষণ করিবার কোন চূড়ান্ত দৃষ্টি
বুদ্ধি পাওয়া যায় না।

কি উপায় দ্বাৰা সেই উপশোধ হইবে তা বুঝি কৰা যাইতে পারে অথচ বর্তমান সংস্কার আলোচ্য।

ভারতবাসীর বর্তমান দুঃস্থতা দূর করিবার উপায় ও তৎসংক্রান্ত মূলসূত্র

যোগেশ কারণ অপসারিত হইলেই যোগ প্রশমিত হয় এবং আয়োগাসক্ত কষ্ট যায় উঠা চিরকাল সত্য। তদনুসারে, আশ্রমের ব্যবস্থার যে তেরটী কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অপসারিত করিতে পারিলেই আশ্রমের দুঃস্থতা দূরীভূত হইবে এবং সমগ্র ভারতবাসী আবার স্বার্থ মনুষ্যত্বের যোগ হইবে, উঠা আসা কষ্ট যাইতে পারে।

কাজেই বলা যা় আশ্রমের ব্যবস্থার তেরটী কারণ অপসারিত করিতে পারা যায় তাহাই হইবে ভারতবর্ষের বর্তমান দুঃস্থতাব্যবস্থার মূলসূত্র।

আশ্রমের ব্যবস্থার তেরটী কারণ অপসারিত করিবার উপায় নির্ধারণ করিতে হইলে আনানিগকে প্রশ্নবতঃ দেখিতে হইবে, ঐ ঐ কারণ নির্মূল করিবার পদ্ধতি কি কি (method of removing the causes) এবং প্রচেষ্টাঃ দেখিতে হইবে যে, কে-পদ্ধতিতে ঐ ঐ কারণ নির্মূল করা যায়, তাহা কথায়ঃ প্রত্যেক করিবার পথ কি কি, (practical means of applying the methods for the removal of the causes)।

ভারতবাসীর দুঃস্থতার কারণ নির্মূল করিবার পদ্ধতি (Method of removing the causes of distress)

যে তেরটী কারণের উক্ত ভারতবাসী অথবা মনুষ্যসমাজে ব্যবস্থাপন হইয়াছে, তাহানিগকে চারি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম কারণ (অর্থাতঃ জীবীর উর্দ্ধগাশক্তির হ্রাস) সম্বন্ধীয় আলোচনা "রূপি"-বিষয়ক।

দ্বিতীয় (পদাভ্যাসের ন্যূনত্ব বা দুঃস্থতার অভাব), তৃতীয় (জীবিকাভ্রমের চারিটী পন্থাতেই বাহ্যতে নানকল্পে বণীকৃত ন্যে পরিবার প্রতিপালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থার অভাব), চতুর্থ (চারিটী পন্থাতেই বাহ্যতে শ্রমজীবীগণের

দুঃস্থতার লাভ প্রাপ্ত থাকে তাহার ব্যবস্থার অভাব), পঞ্চ (বুদ্ধির উৎকর্ষের ভারতমাতৃসমাজে বাহ্যতে মাদুসের উপার্জননের ভারতমাতৃ হইতে দুঃস্থতার ব্যবস্থার অভাব), এবং সপ্তম কারণ (জীবিকাভ্রমের চারিটী পন্থাতেই বাহ্যতে সর্বোচ্চ উপার্জন একজন হইতে তাহার ব্যবস্থার অভাব) সম্বন্ধীয় আলোচনা "বাণিজ্য"-বিষয়ক।

অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ এবং ত্রয়োদশ কারণ সম্বন্ধীয় আলোচনা "শিক্ষা"-বিষয়ক।

চতুর্দশ কারণটী (অর্থাতঃ মূল ও বাস্তু বাহ্যতে অস্বাস্থ্যকর না হইতে দুঃস্থতার ব্যবস্থার অভাব) "শাসন" (administration)-বিষয়ক।

কাজেই ভারতবাসীর দুঃস্থতার কারণ নির্মূল করিতে হইলে বর্তমান রূপি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান সমাজের চক্ষে দেখিয়া তাহাদের কোথায় এবং আছে তাহা বুঝিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তদনুসারে পদার্থ-মোচের রূপি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন-বিভাগের পরিচালনা-প্রণালী বাহ্যতে পরিবর্তিত হইতে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। মূল কিন্তু হইয়াছে তাহার পরীক্ষার দ্বারা বুদ্ধিমত্তা উৎকর্ষ ও অপকর্ষের পদ্ধতির প্রকাশ হইয়া থাকে—ইহা একটী প্রাথমিক সত্য।

যখন পরিচালনা দেখা যাইতেছে যে, রূপি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন বিষয়ক কারণে প্রচুর দুঃস্থতার উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ ঐ বিষয়ের জ্ঞান এবং পরিচালনায় যে ভ্রম আছে, তৎসংক্রান্ত অস্বাস্থ্যকর করার কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। তাহার পর যখন জানা নাই যে, ঐ ঐ বিষয়ক বিষয় জ্ঞান ও পরিচালনায় নিম্নের মধ্যে কোনটী ভ্রমাত্মক এবং কোনটী ভ্রম-পরিহৃত, তখন তৎ তৎসংক্রান্ত প্রত্যেক জ্ঞান ও পরিচালনায় নিম্নের পুনঃ পরীক্ষা ও পুনঃ সংস্কারযোগ্য তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সারা ভারতমাতৃের প্রতিবিধা জীবীর উর্দ্ধগাশক্তির যে প্রতি বংশধরে কিছু কিছু হ্রাস হইতেছে তাহা প্রাথমিক পদার্থবৈজ্ঞানিক বাস্তুগিক রূপি-বিষয়ক পন্থাআলোচনা করিলে এবং ব্যক্তিগত ভাবে কোন জীবীর বাস্তুগিক উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ কতক বংশের ধরিয়া পন্থাআলোচনা করিলেই বুঝিতে

পাওয়া যায়। কেন যে ভয়ী উপগ্রাণ্তিক কৃষিকা হাইয়েতে তাহা বিপ বসিতে চাইলে, প্রথমতঃ উপগ্রাণ্তিক কাহাকে বলে এবং দ্বিতীয়তঃ ভয়ী বাহ্যেতে উপগ্রাণ্তিক পান, তৎক্ষণ প্রতিক্রিয়া দেখি কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় কি কি কথা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আছে, তাহাৰ অংশবিশেষ কথিতে চাইবে।

নিম্নলিখিত জ্ঞানসংগ্রহক ভগ্নেতের জ্ঞান-ভাণ্ডার বলা হইতে পারে :-

- (১) বৈদিক কৃষিবিদ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
- (২) হিন্দুদিগের ৩ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
- (৩) বৌদ্ধদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
- (৪) শূদ্রদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
- (৫) মুসলমানদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
- (৬) খ্রীষ্টদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
- (৭) গোথানদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক,
- (৮) আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকবিদ্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তক।

ইহা হুজ্জা আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে প্রাচীন মিশরবাসী, ফিনিশিয়ান এবং চীনাগণের একটা প্রকাণ্ড জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিচয় আছে। আমি বহুতর জানি, তাহাতে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ উপরোক্ত মধ্যে একটা যত্নবান আলোচনা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের যত্নবান প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা হইতে

• প্রথম বৈদিক কৃষিকার সময় হিন্দু ধর্মের স্মৃতিতে এবং হিন্দুগণ ঐতিহাসিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কৃষিবিদ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা জানি হিন্দুদিগের বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বৈদিক কৃষিকার জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করি। তাহার কারণ, যে তাহার কৃষিবিদ্যার মূল বেদ, লব্ধ, যজুর্বেদ, সুধা, সাহিত্য, ভেদ এবং কল্যাণী লিখিত, তাহা বর্তমান হিন্দুদিগের অপরিসীম এবং ইহাদের এই সমস্ত লিখিত কোড প্রাচীন জ্ঞান কোন বর্ষ উপলব্ধি করিতে পারে তৎপরে কথা, কোন ভাষায় কিম্বা সহায়তার মাধ্যমে পরিচিত অক্ষর। এখন যাহা বৈদিক কৃষি জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া প্রচলিত তাহা মূলতঃ পান্ডিত্য ভট্ট, অজাণ, বিদ্য এবং দ্বায়ী প্রকৃতি ভাষ্যভাষ্যের বঙ্গোপকৃত কথা। তাহাও, ভট্ট, অজাণ, বিদ্য এবং দ্বায়ী প্রকৃতি ভাষ্য ভাষ্য ও যৌনিক প্রকৃতিগত পৃথক্ ভাবে হিন্দুদিগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তক বলা হইতে পারে।

ঐ প্রাচীর উল্লেখযোগ্য জ্ঞান বিজ্ঞান-বিদ্যক কোন প্রাচীন বাহ্যাবৃত্তিক এবং অত্যাধিক পাণ্ডিত্য নয় নাই। কায়েত ভয়ী অত্যাধিক কৃষি-বিদ্যক কোন বিজ্ঞান প্রাচীন মিশরবাসী, ফিনিশিয়ান এবং চীনাগণের ছিল কি না তাহা অসম্ভবতঃ করিয়াও গ্রহণে আসিবে চাই নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, শূদ্র, মুসলমান, খ্রীষ্ট এবং গোথানদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডার খোদাখোদা অসম্ভবতঃ করিয়াও কোন পুস্তকে উপগ্রাণ্তিক কাহাকে বলে এবং তাহার প্রাকৃতিক নিয়ম কি, তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কেবলমাত্র আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-বিদ্যের মধ্যে কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কিছু কিছু আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, উল্লেখ পুস্তকীয় মতামতে এবং তাহার প্রকৃতি বিবরণ তর্জমার রকম ডাবউইন।

ডাবউইনের পথ বিশেষ প্রকারের প্রথম ভাগে লেখেন এবং লিখিত এই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

উহারা প্রত্যেকেই উদ্ভিদ ও জীব কি করিয়া কল্প পরিচয় করে, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ভয়ী উপগ্রাণ্তিক কাহাকে বলে এবং প্রাকৃতিক কোন নিয়মবশতঃ ভয়ী উপগ্রাণ্তিক লাভ করে, তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। আধুনিক বিজ্ঞানাত্মকভাবে ভূত্বিকাব (soil) উপাদান (ingredients) গুট প্রকৃতিঃ বলা—

- (১) খনিজ পদার্থ (mineral matter) অর্থাৎ বাস, এটেল কক্ষ (clay) এবং চুর্ণিত অক্সাল (carbonate of lime)।
- (২) উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষয়শেষের দ্বিতীয় পদার্থ (organic matter or humus resulting from the decay of plant and animal material)।

কোন ভয়ীতে কতটুকু বায়ু, কতটুকু কক্ষ,

• জর্জি হার্ট ডাবউইনের এই নিমিত্ত পুস্তকের নাম—The Variation of Plants and Animals under Domestication। ইহা ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

• গার্নের পুস্তকের নাম—The Flower and the Bee। ইহা প্রকাশিত হয় ১৮৬২ সালে। লিখিত পুস্তকের নাম—Problems of Fertilisation। ইহার ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

কতটুকু চূর্ণিত অঙ্গার এবং কতটুকু বার্ষিক পলার্ধ (barrenness) আছে, তাহা নিষ্কাশন করিবার চেষ্টায় পরিচর্য আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বশেষে পরিমাণে আছে, কিন্তু কোথা হইতে, কি উপায়ে, কোন নিয়মে ভূমিতে বাস্প, কার্বন, চূর্ণিত অঙ্গারের উৎপত্তি হয় এবং ভূমি কেন শক্তপ্রাপ্তিবিশিষ্ট হয়, তাহার কোন আলোচনা আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য ও য়াংকিন জাতিগণের কৃষিসম্বন্ধীয় জ্ঞান যে অসামান্য, তাহা ঐ ঐ জাতির কৃষকদিগের চেষ্টা এবং উপর কৃষিজাত প্রবোধ পরিমাণ প্রয়োজনীয়রূপে কি না তাহা পরীক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু যখন করেন, কয়লা, জার্মান, রাশিয়ান এবং মার্কিনগণ তাহাদের স্ব স্ব দেশীয় কৃষির দপেট উন্মুক্ত রাখেন কখনো সন্দেহ হইয়াছে না। আবার বিবেচনাও লাগে ইহা একটা মনোহর ব্যাপার এবং কাব্যিক অর্থহীন।

প্রথম প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইলে কৃষকগণ স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করিতে সক্ষম হইল এবং তৎকালে তাহাদের ভৌমিক নির্যাস করা সম্ভব হয়। যে দেশে কৃষির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়, সেই দেশে কৃষকের অস্বাভাব ও বেকার সমস্যা থাকিতে পারে না। যখন পরিচর্য দেখা দাড়াইতেছে, তখন কোন দেশে কোন দেশে এখন আর প্রযোজ্যত্বক স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেনা। ভৌমিক নির্যাস করিতে সক্ষম হয় না, প্রত্যেক দেশেই কৃষকের অস্বাভাব রহিয়াছে এবং বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি, তখন কোন দেশে প্রকৃত কলপ্রাপ্ত কৃষি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব রহিয়াছে ইহা মনে করা সুক্লিষ্টবুদ্ধি।

প্রকৃত (আ-বৃষ্ণ) কৃষি-বিজ্ঞানের অগ্রদূত পাওয়া যায় একবার ভারতীয় কবিগণের গ্রন্থে। ঐ সমস্ত গ্রন্থ সাধারণত অধ্যয়ন করিয়া আবার বাহা মনে হইয়াছে, তৎকালে বসিতে হয়, প্রায় ষাট হাজার বৎসর পূর্বে আমাদের আরাধ্য, সেবোপন কবিগণ প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞানের অগ্রদূত পাইয়াছিলেন এবং তৎকালে সারা ভূমতের ভূমীর উর্বরশাস্ত্রের বাহাতে উন্নতি সংঘটিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহারা প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞানের অগ্রদূত

পাইয়াছিলেন এবং সাধারণকে তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন বসিরাই ভারতের প্রত্যেক কৃষক জিহ্মদিন পূর্বেও স্বাধীনভাবে স্বাবলম্বনে ভৌমিক নির্যাস করিতে পারিত। প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞান তখন প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়াই সমাজের অবিকাংশ লোক তখন কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিত এবং কৃষকের উপর ও কৃষিজাত প্রবোধ বশিকের উপর নির্ভর করিয়া অবশিষ্ট লোকেরও সুখ-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা হইতে পারিত। ভারতীয় কৃষির এই কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-ব্যবস্থার কলে ভারত-বাদী সহজাতিক বংশের হইতে রাষ্ট্র-পরিচালনার পরাধীন হইলেও সেনিন পর্যন্ত আর্থিক স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছে। ভগ্নতে বর্তমানে আমরা বাহ্যবিশিষ্ট স্রষ্টা এবং সুশিক্ষিত বসিরা মনে করি, তাহাদের মধ্যে এমন একটা জাতি অথবা দেশ নাই—তাহাদের উন্নয়নের জন্য ভিন্ন জাতির সাহায্য হইতে হয় না, অথবা কিছু না পাটগাও অপর জাতিকে কিছু দান করিলে তাহারা বিপন্ন হন না।

বিনিময়ে কিছু না পাইয়া অস্বস্তি চিত্তে নিরাপদ মাথবা ছিল একবার আমাদের ভারতবাসীর। আমাদের মা-র যে মাথবা হইয়াছিল তাহা আর কোন দেশের হয় নাই। আমাদের মা-র সন্তানগণের উন্নয়নের জন্য কোন দিলকাহারও প্রাপ্ত হইতে চর নাই। অবিকল্প মা আমাদের অস্বস্তি দেশের সন্তানগণকে চিরদিন অন্ন বিতরণ করিয়া আসিতেছেন এবং সমগ্র ভগ্নের প্রজ্ঞা করিতেছেন। যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে এখনও ভগ্নের প্রত্যেক জাতি মনোশা-স্ত্রের অন্ন অস্বস্তি দেশকে উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে আসেন কেন? অতি পুরাকাল হইতে যদি ভারতবর্ষ সমগ্র ভগ্নের প্রজ্ঞাভাজন না হইত, তাহা হইলে নব শতাব্দীতে যখন ইয়োরোপীয়গণ প্রথম অন্নভাবপ্রাপ্ত হইয়া স্থিতিশীল গমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন, তখন ভগ্নের অস্বস্তি দেশের কথা শ্রবণ না করিয়া একবার ভারতবর্ষে আসিবার জন্য কাল্প হইয়াছিলেন কেন?

ভারতবর্ষ যে ভগ্নের সর্বোচ্চ স্থান সর্বজ্ঞতাভাবে অবিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা একটা ভাবুকতার দৃষ্টি ইতিহাসের পৃষ্ঠা উন্মোচিত করিয়া দান না। ভারতবর্ষের এই সর্বোচ্চতা কাহার দান অথবা কাহার সংগঠনের

কল, ভাণ্ডা চিত্রা করিতে যদিও স্মৃতি প্রতীকবান হইবে যে, পরবর্তী অর্থাৎ অর্থসংগ্রহণ অথবা সন্ধানাগণ, অথবা ভট্ট, আচাৰ্য্য, মিশ্র প্রভৃতি বর্জমান বিদ্যুৎপ্রেরণ প্রকৃতিভা ভাণ্ডারগণ ভাণ্ডারবর্জ্য এতদূর উন্নতি বিধান করেন নাই।

অতঃপূর্ব্ব অথবা বর্জমান বুদ্ধি করনাতো এই উন্নতি সংশোধিত হইয়াছিল ভাণ্ডার কথিব্যবহারে দ্বারা। এই উন্নতির বিকৃতি প্রথম দৃষ্ট হইয়াছে ভাস্কর্যগণের দ্বারা এবং এই বিকৃতির পূর্বা বস্তুদ্বারা তথাকথিত সন্ধানাগণ দ্বারা। এই দ্বারা দ্বারা বস্তুদ্বারা মনেই ভাণ্ডার একবার ভাণ্ডারবর্জ্য প্রাচীন বর্জমান কালের মতই বিপন্ন হইয়াছিল। বর্জমান কালে বস্তুদ্বারা সন্ধানাগণ উন্নতির দ্বারা উপায় হইয়াছে, তখন তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু তখনকার দ্বারা দ্বারা বস্তুদ্বারা হয় নাই। তখন ভাণ্ডারবর্জ্য অথবা ভাণ্ডারক আংশিক ভাবে দ্বারা করিয়াছিলেন বুদ্ধিব্যবহার। কি করিয়া ভাণ্ডার সন্ধান করিতে হয়, তাহার কোন উপদেশ বুদ্ধিব্যবহারে দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা, কিন্তু তাহার কথাকথি ভাণ্ডার সন্ধান প্রতীকভাণ্ডার হইলে, দ্বারা ভাণ্ডারবর্জ্য বর্জমান ভাণ্ডারবর্জ্য ভাণ্ডার উপায় হইতে পারিত না, ইহা মনে করিবার কারণ আছে। ভট্ট, আচাৰ্য্য, মিশ্র প্রভৃতি ভাণ্ডারগণ তাহার কথাকথি না দ্বারা পারিয়া এই কথাকথি বিকৃতি করিয়া ভাণ্ডারগণের অবজ্ঞার বিষয় করিয়াছেন। ভাস্কর্যব্যবহারে বিদ্যেবী একটী কথাকথি বুদ্ধিব্যবহার উপদেশে দ্বারা দ্বারা দ্বারা দ্বারা, পরন্তু ভট্ট, আচাৰ্য্য, মিশ্র প্রভৃতি ভাণ্ডারগণের প্রাচীন প্রকৃতিভা কথাকথি ভাস্কর্যব্যবহারে বিদ্যেবী। যে ভাণ্ডারগণকে ভাণ্ডার ভাণ্ডারগণ দ্বারা অবজ্ঞার বিষয় বনে করেন, তিনি ভাণ্ডারগণের ভাণ্ডার-বর্জ্য সন্ধানের রচনিত। ভাস্কর্যব্যবহারে বিদ্যেবী কথাকথি ভাণ্ডারগণকে বিতরণ করিয়া এতদূর বিপন্নবান করিয়া দিয়াছেন। ভাস্কর্যব্যবহারে বিদ্যেবী দ্বারা ভাণ্ডারগণ “ভাণ্ডার”—

প্রকৃতিভা ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার।

এতদূর ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডার।

ইতি, ১৪ ভাণ্ডার—১০।

অতঃ পূর্ব্ব ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার।

ইতি, ১৫ ভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার।

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার

ভাস্কর্যব্যবহারে ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার।

ইতি, ১৬ ভাণ্ডার—১০।

অতঃ পূর্ব্ব ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার।

ইতি, ১৭ ভাণ্ডার—১০।

ভাস্কর্যব্যবহারে ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার।

ভাণ্ডার ভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার।

ইতি, ১৮ ভাণ্ডার—১০।

অতঃ পূর্ব্ব ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার।

ইতি, ১৯ ভাণ্ডার—১০।

ভাস্কর্যব্যবহারে ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার।

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার।

ইতি, ২০ ভাণ্ডার—১০।

অতঃ পূর্ব্ব ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাস্কর্যব্যবহারে ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার।

ইতি, ২১ ভাণ্ডার—১০।

অতঃ পূর্ব্ব ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার।

ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার।

ইতি, ২২ ভাণ্ডার—১০।

ভাস্কর্যব্যবহারে ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার।

ভাণ্ডারভাণ্ডারভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার।

ইতি, ২৩ ভাণ্ডার—১০।

অতঃ পূর্ব্ব ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার ভাণ্ডার—

গিয়াছেন, তাহা তাহার বিভিন্ন মতবান-নিবন্ধন বিষয়ক কথাগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত মানুষের চুপ কি করিয়া ঘূর্ণ হইতে পারে তাহা এই বার হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে প্রথমতঃ কৃষ্ণসেব চিত্রা করিয়াছিলেন এবং তাহার পর ঐ চিত্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন চৈতন্যদেব। কৃষ্ণসেব এবং চৈতন্যদেব বাতীত আর কেহ সকল মানুষের চুপ-কট কি করিয়া বিবৃত্তি করা চাইতে পারে, তাহার কথা এই বার হাজার বৎসরের মধ্যে চিত্রা করেন নাই। কি করিয়া নিজ নিজ সম্ভাব্যের প্রসারতা সহিত হইবে, তাহার চিত্রা বাতীত সকল মানুষের চুপ-কট কি করিয়া প্রদর্শিত হইবে, এইবিষয়ক কোন কার্যোপযোগী চিত্রা সম্ভাব্যতা প্রকৃতি সম্ভাব্যতার কোন প্রাথমিক পক্ষে বাধা না।

কাজেই দেখা বাটতেছে যে, ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল ব্যাসসেবাপ্রবৃত্তি তথ্যবিশেষ দ্বারা এবং বর্তমানে যে অসীম চরিত্রা আসিয়াছে, তাহার প্রারম্ভ হইয়াছে শতাব্দীসমূহ প্রকৃতি সম্ভাব্যতার দ্বারা এবং আশা যে প্রকৃত অর্থক্য প্রদান ও বৃত্তিতে পারি না, তাহার কারণ আশাশ্রয়িত্বের অভাব নিকা ও সত্যতা।

সকল ব্যক্তিবিশেষের “উর্দ্বার” বলের অর্থ বাহ্যিক রূপ, রস-বিশিষ্ট হেতু, এবং রস-বিশিষ্ট হেতুর কথা। যে ক্ষমতা দ্বারা জীবী তাহার বাহ্যিক রূপ, রসবিশিষ্ট হেতু এবং রসবিশিষ্ট হেতুর কথা অক্ষর রাশিতে পারে, তাহার নাম জীবীর উর্দ্বার-শক্তি। রসবিশিষ্ট হেতুর প্রত্যয়াদ্বারা যে, জীবী উৎপাদিকা শক্তির প্রত্যয় হইবে, তাহা জীবীর দিকে একটু দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জীবীতে জলসিক্ত না করিলে অথবা ঘোঁষ না লাগিলে যে, কোন কলম হই না, তাহা কৃষিকর্মের কথা। জীবীতে তেজস্বী রসের দ্বারা অত্যধিক হইলে জীবী অক্ষর কলমের (maraby) হইয়া যায় এবং রসহীন হেতুর দ্বারা অত্যধিক হইলে জীবী অক্ষর (demon) হইয়া যায়, ইহা সর্বজনবিদিত। জীবী-ব্যবহৃত রসবিশিষ্ট হেতুর পরিমাণের সহিত তাহার রস-বিশিষ্ট হেতুর কার্য প্রয়োজনভাবে জড়িত এবং রসবিশিষ্ট হেতুর কার্যের সহিত তাহার উৎপাদিকা শক্তি প্রয়োজন ভাবে জড়িত। কাজেই জীবীর “উর্দ্বারশক্তি” বলিতে বুঝিতে

হইবে তাহার “উৎপাদিকা শক্তি” এবং ইহা তাহার হেতু ও রস-বিশিষ্ট হেতুর উপর নির্ভরশীল।

কি করিলে জীবীর ও জীবীর উৎপাদিকা শক্তি অক্ষর রাশিয়া তাহার (অর্থ উৎপাদিকা শক্তি) পরিবর্তন সম্ভব হইতে পারে, তাৎপর্যবোধের কথা অর-বিশেষ ভাবে তাৎপর্যবোধের প্রত্যয় প্রার্থিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার বিকৃতির অল্প বর্তমান সময়ে ঐ সমস্ত কথা প্রাথমিক পক্ষে প্রচলিত হইয়াছে। যুগ-ব্যবসায় পাণ্ডিত্য বোধের অর্থ ব্যাখ্যাত না হওয়া পর্যন্ত ঐ সমস্ত কথা উদ্ধৃত করিলে তাহার অর্থ সহজ মত-পার্থক্য উপস্থিত হইতে পারে।

কাজেই ঐ সমস্ত কথা উদ্ধৃত না করিয়া কৃষি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতীয় কবিগণ দ্বারা বর্ণিত হইবে, তাহা বাস্তবতার সহিত মিলাইলে বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও হয়, দৈর্ঘ্যেণে আদি পাঠকবিশেষের সম্বন্ধে উপস্থিত করিব। আমি যে কথাগুলি বলিব, তাহার প্রাধান্য অবগত হইলে বৈজ্ঞানিক বর্ণনা, কথ, বস্তু এবং অর্থক্য বৈধ।

ভারতীয় কবিগণের কথাগুলিতে প্রত্যেক জীব ও জীবীর উৎপাদন পাঠ্য : যথা—বোম, বায়ু, জল (অর্থক্য কল), বহি (অর্থক্য হেতু), এবং কারণ (অর্থক্য ক্রিয়া)। এই পাঠ্য মৌলিক বস্তু-উৎপাদন হইতে বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়। জীব অথবা জীবীর কর্মশক্তির অর্থক্য উৎপাদিকা শক্তির উৎস হলতঃ ঐ পাঠ্য মৌলিক বস্তু-উৎপাদন হইতে হইয়া থাকে।

কি জীব উৎপাদিকা শক্তির প্রকৃত রস হইতে পারিবা মনে করে যে, তাহার গুণ হইতে উৎপাদিকা শক্তির উৎস হইতেছে। এই অবগতঃ জীবীর ও জীবীর উৎপাদিকা শক্তি অকালে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং জীব ও জীবী অক্ষর ও অক্ষর হইয়া পড়ে।

অল্প প্রাক্ত মৌলিক ঐ পাঠ্য উৎপাদন অক্ষর রাশিতে পারিলে জীবীর ও জীবীর উৎপাদিকা শক্তি অক্ষর রাশিয়া যায়। ইহা দ্বারা যথা-বায়ু ও জীবীর উৎপাদিকা শক্তির বোম ও বায়ু-উৎপাদনের অর্থক্য ও তাহার কার্য বর্তমানে পরিচালিত হয়। বোম ও বায়ু-উৎপাদনের অর্থক্য ও কার্য অক্ষর

০ বোম, বায়ু, জল এবং বহি এই পাঠ্য উৎপাদনের মৌলিক বস্তু যে বিভিন্ন ভাবে উৎপাদিত হয়, তাহা হইতে জীবীর বাহ্যিক রূপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ বিভিন্ন রূপের নাম “কলম” অর্থক্য “শক্তি”।

রাশিবার উপায় বাধ্যতালব্ধ হইতে নিশ্চয় থাকে, তদুপযোগি ব্যবস্থা। কিন্তু বাধ্যতালব্ধ নিশ্চয় থাকিলেও রস ও তেজ-উপাদানের অস্তিত্ব ও কাৰ্য্য আপনাই হইতে বধ্যবধ থাকে না। জীব ও জীবী পরীয়ে রস ও তেজের পরিমাণ ও কাৰ্য্য প্রতিনিহিত বৃত্তিগ্ৰাণ হইতে অথবা ক্ষয়গ্ৰাণ হইতে চাহে। রস ও তেজের পরিমাণ ও কাৰ্য্য বধ্যবধ রাশিতে হইলে জীবের প্রবৃত্তি অথবা সাধনার প্রয়োজন হয়।

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রস ও তেজের পরিমাণের তারতম্যাদুশারে জীবী উর্জগাশক্তির তারতম্য হইয়া থাকে এবং তেজহীন রস বৃত্তিগ্ৰাণ হইলে অথবা রস-হীন তেজ বৃত্তি গ্ৰাণ হইলে জীবী অক্ষুণ্ণ অথবা অক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। কাৰ্য্যেই জীবী উর্জগতা লাভন করিতে হইলে জীবীতে বাহ্যতে লবন ভাগে রস ও তেজের পরিমাণ বৃত্তি পাঠেতে পারে, তদ্বিবক বাস্তব অলম্বন করিতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাইক, জীবীর রস ও তেজের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাশিবার এক প্রকৃতি দেখা কি বাস্তব করিয়াছেন। বাস্তব: দেখা যায় যে, স্ত্রীর সঙ্গতগত ভবিতে তলের স্ত্রী হইতে পারে এবং স্ত্রীকেই সঙ্গতগত তাহার তেজের উৎস হয়। কিন্তু বাস্তবিক বৃত্তি ও রোগে যে পরিমাণ রস ও তেজের উৎস হয়, তাহা অতি সামান্য ও স্বল্পগতি এবং তাহাতে জীবী উর্জগা-শক্তি অত্যন্ত নীচাশ্রয় হইয়া থাকে। বাস্তবিক স্ত্রী-এবং বৃত্তিকেই বৃত্তি জীবী উর্জগাশক্তি অক্ষুণ্ণ রাশিবার কেবলমাত্র প্রাকৃতিক উপায় বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির বাস্তবতা অতি অসম্পূর্ণ এই উপসংহারে উপনীত হইতে হয়। অথচ সাধারণতঃ প্রকৃতির বাস্তবতা সূত্রাণ অসম্পূর্ণতা পবিশুদ্ধিত হয় না। কাৰ্য্যেই জীবী অভ্যন্তরে কি বাস্তব অথবা সংগঠন রচিয়াছে তাহার অলম্বন করিতে হইবে।

জীবী অভ্যন্তরে নিয়মিত বাস্তবতা ও সংগঠন সহজেই লক্ষ্য করিতে পারা যায় :—

- (১) প্রত্যেক জীবী গািগী ত্রয়ে বিভক্ত ;
- (২) সর্জনীর ত্রয়ে আছে স্বর্ণ, রৌপ্য, সৌর, কবচা প্রকৃতি তেজোবধ বনিক পরাণ এবং বনিক তৈল।
- (৩) নিম্ন হইতে দ্বিতীয় ত্রয়ে আছে রস, আকর্ষণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ বায়ুর ত্রয়।

(১) নিম্ন হইতে দ্বিতীয় ত্রয়ে আছে রস ও তেজ-বিদ্রিত বাস্প-পরিচালনার শক্তিপ্রাপ্ত বিদ্রিত বায়ু ও কন্দনপূর্ণ বৃত্তিকার ত্রয়। এই ত্রয়ের বৃত্তিকার বায়ু ও কন্দন উভয়েই অস্তিত্ব দেখা যায় নটে, কিন্তু উল্লান্তে বায়ুকার অংশই বেশী।

(২) সর্জনীর ত্রয়ের বৃত্তিকার বায়ু ও কন্দন উভয়েই অস্তিত্ব দেখা যায় নটে, কিন্তু তাহাতে আয়ত্ব কন্দনের অংশই বেশী।

ইহা বাস্তব জীবীর সংস্বে প্রকৃতির নিয়মিত বাস্তব-গুলিও বিশেষভাবে উল্লেখ :—

- (১) প্রত্যেক দেখেই কিছু কিছু বাস্তবতা ছোট বড় কয়েকটা নমুনা থাকে।
- (২) সর্জন-সময়ের সহিত নবীর উৎপত্তি-কালের উচ্চতার তারতম্য, তাহার গভীরত্ব এবং স্রোতের ধারণার তারতম্য হইয়া থাকে।
- (৩) উৎপত্তি-কালের আয়তনের (area) তারতম্য সহিত নবীর প্রবৃত্তির তারতম্য দৃষ্টিগোচর থাকে।

জীবীর অভ্যন্তরীণ ও তৎসংগঠন নবী-গভীর উপযোগ্য প্রাকৃতিক বাস্তবতা গণ্যগোচনা করিলে সহজেই অলম্বন করিতে পারা যায় যে, সর্জনীর ত্রয়িত্তি বনিক পরাণ হইতে প্রতিনিহিত তেজোবধ বাস্পোপস্থিত হয় এবং দ্বিতীয় ত্রয়ের বায়ুকা-অনবিরচিত থাকিলে ঐ তেজবধ বাস্প বসবিস্ত্রিত হয় এবং তৃতীয় ত্রয়ের বধ্যবধ বিদ্যা পরিকল্পিত হইয়া সর্জন-সর্জনোপস্থি-ত্বের রস ও তেজ-সম্বন্ধের বাস্তবতা গণ্যগতি করে এবং তখন জীবীর উর্জগাশক্তি সংস্কারিত হইয়া থাকে। নবীগুলি জীবীর দ্বিতীয় ত্রয়িত্তি বায়ুকা পথ্য প্রতীক থাকিলে বায়ুকা সহজেই অলম্বিত হয় এবং নবীর স্রোতের বেগের তারতম্য-দুশারে নিয়ন্ত্রণের বাস্পোপস্থিত বেগের তারতম্য হইয়া থাকে। কাৰ্য্যেই দেখেন নবীগুলি জীবীর দ্বিতীয় ত্রয়িত্তি বায়ুকা পথ্য গভীর থাকিলে এবং নবীর স্রোতের বেগ বধ্যবপূর্ণ হইলে বেগের জীবী অক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের পাহাড়গুলির উচ্চতায় এক এখানকার নবী-গুলির স্রোতের বেগ যে একদিন পূর্বে প্রচলিত ছিল, তাহা সহজেই অলম্বন করা যায় এবং তাহারই এক ভারতবর্ষের জীবীগুলি সর্জনোপস্থি-অধিক প্রাকৃতিক উর্জগতা লাভ করিয়া-

ছিল। কিন্তু এখন আর নদীগুলি গ্রাম্য: জমীর ভিত্তির স্রবের বাসুগাশি পর্যায় গভীর নহে। পরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গভীরতা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে জমীর দ্বিতীয় স্রবের বাসুগাশি এখন আর নদী হইতে মল পার না এবং বেশের গভীরত্বটি প্রায় সারা বৎসর শুষ্ক হইয়া থাকে এবং তাহাযের অক্ষুণ্ণতা সাধিত হয়। নদীর গভীরতা প্রতি বৎসরই কমিয়া আসিতেছে বলিয়া জমীর উর্বরতাও প্রতি বৎসর কমিয়া আসিতেছে।

কাজেই দেখা যাউতেছে, ভারতবর্ষের নদীগুলি তাহাদের উৎপত্তি স্থান হইতে পর্যন্ত জমীর দ্বিতীয় স্রবের বাসুগাশি পর্যায় গভীর কমিয়া গমন করা হইলে এবং সর্বনিম্ন স্রবের পমিত পর্যায়ে বাকি থাকিলে রসবিম্বিত ভেজের চূর্ণাচল অবশেষে পারিত পান এবং প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তি উন্নতি লভ্য হয়।

যদি, সৌখ্য, পৌর, কখনো প্রকৃতি সর্বনিম্ন স্রবের পমিত পর্যায়ে এখন আর বাক্য নাট। প্রতি বৎসরই ক্ষয়ব্রত ফলে ভাগ্য উত্তোলিত হইতেছে। কাজেই এখন আর জমীর সর্বাঙ্গ প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তি লাভ করা সম্ভবসাধ্য নহে। কিন্তু নদীগুলি উপযুক্ত ভাবে উৎপত্তি-স্থান হইতে দ্বিতীয় স্রব পর্যায় গভীর কমিয়া গমন করা হইলে প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তি কতক পরিমাণে উন্নতি হইবে এবং আবার পমিত পর্যায়ে লব্ধ ক্রমশ: সম্ভব হইবে এবং তখন আবার পূর্ণ উর্বরাশক্তি লাভ করিবার সম্ভাবনা হইবে। নদীগুলিকে গভীর করিয়া গমন করা অসম্ভবপেক এবং দুসসাধ্য বটে, কিন্তু অসাধ্য নহে।

প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তি বা থাকিলে ক্রমি সার দ্বারা যে উর্বরাশক্তির উত্তর হয়, তাহাতে ক্রমি অতিরিক্ত ব্যবসাপেক হয় এবং তাহা কৃষকের পক্ষে লাভজনক হয় না। ইহারই মত ইয়োয়োগে এবং যাকিন বেশে কৃষিকার্য কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতেছে না এবং আর সমস্ত কৃষকই কৃষিকার্য ছাড়িয়া মত্ত বাবলা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেছেন। কৃষিকার্যের উন্নতিকল্পে নতুন নতুন ভাবে পান্যভাষা বেশে যে সমস্ত আয়োজন চলিতেছে এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তর হইতেছে তাহা প্রকৃত কৃষকের প্রতিষ্ঠান নহে। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত: ধনিক দ্বারা পরিচালিত, তাহাতে প্রত্যেক অথবা পর্যাশ্রিত ভাবে ঐ ঐ দেশের গুরুদেবী অর্থ-

সহায়তা করিতেছেন। ঐ অর্থ-সহায়তার ফলে ঐ ঐ দেশে সাময়িক ভাবে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ কিছু বৃদ্ধিগোচর হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানই প্রকৃতপক্ষে লাভজনক হয় নাই এবং গুরুদেবীর সহায়তা (subsidy) বন্ধ হইলে যে কোন সময়ে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি অচল হইবার আশঙ্কা আছে।

পান্যভাষা জাতিগণ জমীর প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তির রহস্য পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়াই বর্তমান জনসিদ্ধ-পদ্ধতির এবং বাস্প-পরিচালিত শাক্ষণের উদ্ভব হইয়াছে।

বর্তমান জনসিদ্ধ-প্রণালী (modern irrigation) কৃষানলুত এবং তাহা প্রকৃতপক্ষে অনিষ্টজনক। যে যে স্থানে বর্তমান জনসিদ্ধ-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে প্রথম কয়েক বৎসর উর্বরাশক্তির দ্বারা অবসর হইয়াছে বটে, কিন্তু ক্রমাগি উর্বরাশক্তির উন্নতি সংঘটিত হয় নাই এবং কয়েক বৎসর পরে আবার উর্বরাশক্তির দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। অধিকন্তু ঐ ঐ স্থানে অবাঞ্ছিত প্রাণ্ডীর্ষা বেশা গিয়াছে। যে যে স্থানে বিশ বৎসরের উপর বর্তমান জনসিদ্ধ-প্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের অবস্থা একটু জীর্ণবুজির সহিত পর্যালোচনা করিলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

বাস্প-পরিচালিত শাক্ষণও জমী এবং কৃষিকার্যের পক্ষে উৎকর্ষ হইতে পারে না।

যে বেগের সহিত এই শাক্ষণ পরিচালিত হয়, তাহাতে জমীর ভিতর অত্যধিক ভেজের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং পরিশেষে জমীর উর্বরাশক্তি দ্বারা অনিবার্য হইয়া পড়ে। ইহা বাতীত কৃষিকার্যে বাস্প-পরিচালিত শাক্ষণের ব্যবহার হইলে সমাজে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যসম্ভাবী। জমী হইতে শক্ত উৎপাদন করিতে হইলে সাধারণত: তিনটি কার্যের প্রয়োজন, যথা—(১) শাক্ষণ সেওয়া, (২) নিড়ান, এবং (৩) শক্ত কাটা। যে পরিমাণ জমীতে শাক্ষণ দিতে ১০ী বাহুরের প্রয়োজন হয়, ঐ পরিমাণ জমী নিড়াইতে এবং তাহার শক্ত কাটিতে ৪০০০ী শেকের প্রয়োজন হয়। ভারত-বর্ষে সাধারণত: কৃষক-পরিবারের কর্তা জমীর শাক্ষণ সেওয়া কার্য নিৰ্বাহ করিতেন, আর নিড়ান ও শক্তকাটা কার্যে কৃষক-গৃহস্থ ও কৃষকের অল্পবয়স্ক বালক-বাণিজ্যপ্রকৃতি সমস্ত কৃষক-পরিবার নিযুক্ত হইত। কাজেই এক একটা কৃষক-

পরিবারে অপর কোন মজুরের বিনা সহায়তায় একটা নিশ্চিত পরিমাণ জমী হইতে শক্তাংশপান করিবার সমর্থ প্রয়োজনীয় কার্য নির্বাহ করিতে পারিত।

পাক্ষ্যভাষ্যে লক্ষণ বেণ্ডা কার্যে বাপের ব্যবহার অসম্পন্ন হইয়াছে। হস্ত-পরিচালিত লক্ষণ ব্যবহার করিলে একজন প্রমত্তবীর যে পরিমাণ জমী চাষ করিতে পারেন, বাস্প-পরিচালিত লক্ষণ ব্যবহার করিলে ঐ প্রমত্তবীর তাহার বহু গুণ জমী চাষ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ঐ জমীর নিদান ও শক্তকাটা-কার্য কোন বাস্প-পরিচালিত যন্ত্রে দ্বারা নির্বাহ হওয়া সম্ভব নহে এবং কার্যতঃ তাহা হইতেছে না। কসে নিদান ও শক্তকাটা-কার্যে কঠকগুলি প্রমত্তবীরকে সাহায্যিক ভাবে নিযুক্ত করা অবশ্য-প্রয়োজনীয় হয়। কাষেই যে সমস্ত প্রমত্তবীরকে সাহায্যিকভাবে নিদান ও শক্তকাটার কার্যে নিযুক্ত করা হয়, তাহার্য্য বৎসরের বাকী সময় বেকার থাকিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। অধিকন্তু সাহায্যিক ভাবে নিযুক্ত করা হয় বলিয়া তাহার্য্যগকে অপেক্ষাকৃত অধিক ভায়ে পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য হইতে হয় এবং তাহাতে কৃষিকার্য্য অতিরিক্ত ব্যয়সাধ্যক হইয়া পড়ে।

জিনিষ-পত্রের আদান-প্রদানের ক্ষমতা ভারতীয় কৃষিগণ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার কসে বাহুরের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ অত্যন্ত সুলভ মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব হইয়াছিল এবং সন্মতের মধ্যে কাহারও প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবের ভয় বিহীন হইতে হয় নাই। পাক্ষ্যভাষ্যভাটিগণ জিনিষ-পত্রের আদান-প্রদানের মূল মূল্য কি হওয়া উচিত, তাহা এখনও দ্ব্যর্থক ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই। স্বাভাবিক উর্দ্ধশক্তিগণ রহিত তাহাদের অভাবনা থাকার শক্তাংশপান-কার্য সাধারণতঃ অধিকতর ব্যবসায়িক হইয়া থাকে এবং তাহার্য্য মনে করেন, জিনিষ-পত্রের মূল্য বাহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে বাহারা সংশয়িত হইলেই প্রমত্তবীরগণের লাভবান হওয়া সম্ভব হইতে পারে। কৃষক বে-সমস্ত ত্রয়া উৎপাদন করে, তাহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইলে আপাতদৃষ্টিতে তাহার্য্য যে লাভবান হয় তাহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অধিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সম্ভব হয় না। কৃষিজাত হ্রাসের মূল্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে শিল্পজাত হ্রাসের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াও অবশ্যজ্ঞাবী এবং কোন কসকের পক্ষেই শিল্প-

জাত কোন না কোন দ্রব্য ব্যবহার না করিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। কসে কৃষক যার কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ লব্ধ করিয়া থাকে, তৎপেক্ষা তাহার অধিক ব্যয় হয় প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য-ক্রয়কাণ্ডে। কাষেই কৃষিজাত হ্রাসের মূল্য বৃদ্ধি করিবার নীতি কৃষকের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হয় না, পরন্তু পরোক্ষভাবে তাহার্য্যে দারিদ্র্য সংঘটিত করে।

বর্তমান পাক্ষ্যভাষ্য বাণিজ্য-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান ও শাসন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলেও বোঝা যাইবে যে, তাহাদের প্রত্যেকটী কৃষি-বিজ্ঞানের ভ্রাতাই বনশত্রুসিদ্ধ। ঐ সকল বিজ্ঞানের মূল মূল্য ও প্রয়োজ্য কি হওয়া উচিত, অথবা কি হইলে মহত্ত্বপাতি হইবে ও বাহুকো দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তাহার্য্য সন্ধান একমাত্র ভারতীয় কৃষির গ্রন্থ পাওয়া যায়। যৎপক্ষে কারণে উত্তর আলোচনা হইতে আদি আশাতঃ নিবৃত্ত থাকিব।

ভারতবাসীর দুরবস্থার কারণ নির্মূল করিবার পদ্ধতি কার্যতঃ প্রেরোগ করিবার পদ্ধতি

আগে বাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বোঝা গিয়াছে যে, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ও শাসন-বিভাগের বর্তমান অবস্থা হইতে ভারতবাসীর, অথবা স্পষ্ট ভারতবাসীর কোন, সমস্ত ভগ্নভের দুঃখব্যয় উদ্ভব হইয়াছে। ইগা ছাড়া আরও সেবা গিয়াছে যে, নদীওগিকে তাহাদের উৎপত্তি-মূল হইতে সর্বত্র জমীর বাসুকায়ের দ্বিতীয় তর পর্যন্ত পতীর করিয়া বন্দন করিলে জমীর স্বাভাবিক উর্দ্ধশক্তির উন্নতি সাধিত হইতে পারে। জমীর স্বাভাবিক উর্দ্ধশক্তির উন্নতি সাধিত হইলে এবং ক্রয়-বিক্রয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাহাতে হ্রাস হয় তৎসম্বন্ধে মূল্য অবলম্বিত হইলে কৃষি-লব্ধীর অব্যবস্থা দূরীভূত হইতে পারে। একমাত্র কৃষি-লব্ধীর অব্যবস্থা দূরীভূত হইলেই যে, দেশের সকলের সমস্ত দুঃখব্যয় দূরীভূত হইবে তাহা বলা যায় না বটে, তবে উদ্যোগ্য বর্তমান সর্ববাসী অত্যাভাব হইতে যে প্রাথমিক স্বক্যা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৃষি লাভজনক হইলে উদ্যোগ্য দেশের ব্যয় আনি সোকেব অন্ন-সম্বন্ধের ব্যবস্থা হইতে পারে এবং তখন বাকী চাষি আনি সোকেবও শিল্প, বাণিজ্য, বাসনা ও চাক্ষুরী ব্যায়া

শান্তবান হওয়া ও স্বাধিকারের চাহিদা নির্ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে।

একই প্রকার হইবে, যদি অথবা অত্যন্ত বিষমক বর্ষবান অবস্থায় দ্বীভূত কবিবার পদ্ধতি বসিয়া বাধা যেন হইতেছে, তাহা কাঁচা: প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি কি ?

দেশের শাসনকার্য্য নৈমিত্তিক শোকেব মতাবস্থায় পরিচালিত না হইলে কোন অবস্থায় দ্বীভূত হইতে পারে না।

কায়দাবর্ষের শাসনকার্য্য বর্ষবান সম্ভবভাবে ভারত-বাসিন্দাদের দ্বারা পরিচালিত নহে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ যদিও পরিবর্তিত শাসনপদ্ধতি অস্থায়ীভাবে রাজ্য-পরিচালনার প্রায় সমস্ত কাঁচাট ভনসাধারণের নির্দোষিত মতাবস্থায় হইতে চলিতেছে, তথাপি এখন দেখা দিতেছে যে, অর্থনৈতিক (finance) ও শৈবিকা (self defence) বিভাগে প্রভাবিত হইতে না, তখন রাজ্য-পরিচালনা মূলত: যে দেশের শোকেব দ্বারা শাসিত হইবে না, অর্থনৈতিক করা চলে না।

কিন্তু দেশের শাসনকার্য্য দেশের শোকেব মতাবস্থায় পরিচালিত না হইলে কোন অবস্থায় দ্বীভূত হইতে পারে না এবং এখন সত্য, যেমনট দেশের শোকেব একতাবস্থায় না অথবা তাহাদের ঐক্য (unity) শাসিত না হইলে রাজ্য-পরিচালনা-কার্য্যের প্রকৃত শাসিত পাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, ইহাও ত্রুটিমুক্ত সত্য।

কাঁচাট দেশের শাসনকার্য্যের প্রকৃত কতক লাভ করিয়া বহিঃপ্রতি বিষমক অবস্থায় দ্বীভূত করিবার পদ্ধতি কাঁচা: প্রয়োগ করিতে হইলে, দেশের শোকেব মধ্যে কাঁচাটে ঐক্য শাসিত হয়, তৎপূর্ব্বক ব্যবস্থা বর্গপ্রকরণ অবস্থান করিতে হইবে। দেশের শোকেব ঐক্য শাসন করাই ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অস্তিত্ব উদ্বেগ ছিল ইহা বলা বাহুল্য। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কংগ্রেসের বয়স হইয়াছে, অথচ দেখা দিতেছে যে, দেশের শোকেব ঐক্য শাসন করা ত দূরে কথা, তাহাদের মতাবস্থায় দ্বারা ও দেশের সংখ্যা ক্রমশ:ই বাড়িয়া গাইতেছে। তাহারা চিহ্নাশীলতা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, তাহারা হয়ত কোন কোন অস্থায়ী পক্ষান্তর। রাজনৈতিকের দ্বারা উদ্ভূত করিয়া প্রমাণ করিয়ে যে, মতাবস্থায় (party-politics) উদ্ভব হইয়াই দেশের মতাবস্থায় সক্ষম। তাহারা ব্যবস্থা

অথবা পথ্যালোচনা করিবার সামর্থ্য লাভ করেন নাই এবং তাহাদের দ্বীভূত-উক্ত কেন্দ্র কোন ব্যক্তিগত অভিমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের কথা বলা দিলে, মতাবস্থায় সংখ্যা বাড়িয়া গেলে যে, দেশের মধ্যে অনৈক্য বাড়িয়া যায় এবং দেশের মধ্যে অনৈক্য বাড়িয়া গেলে যে, শাসনকার্য্যের প্রকৃত শাসিত পাওয়া দ্বারা হইতে পারে না, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

কোনই বসিতে হইবে যে, যদিও ভারতবাসীর ঐক্য-শাসন ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অস্তিত্ব উদ্বেগ ছিল, তথাপি ভারতীয় কংগ্রেস তাহারা এই উদ্বেগশাসনে সক্ষম হয় নাই এবং তাহারা কাঁচা-পদ্ধতি নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থানে প্রমাণক হইয়াছে।

ভারতীয় কংগ্রেসের কাঁচা-পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গের পথ্যালোচনা করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় :—

প্রথমত:—কংগ্রেসের প্রধান উদ্বেগ ছিল স্বায়ত্ত শাসন (Home-Rule or Self-Government) লাভ করা এবং তখন প্রত্যক্ষকর্তার নিকট আবেদন নিবেদন করাই তাহারা উদ্বেগ লাভ করিবার পদ্ধতি বসিয়া দ্বীভূত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত:—তাহারা প্রধান উদ্বেগ হইয়াছিল স্বাধীনতা লাভ করা এবং তখন নিজের বাধা দান (Passive Resistance) ও বিদেশী বস্তু (Boycott of British and Foreign goods) হইয়াছিল ই প্রধান উদ্বেগ লাভ করিবার পদ্ধতি।

তৃতীয়ত:—স্বাধীনতা লাভ করার উদ্বেগ অপরিসীম ছিল, কিন্তু কাঁচা-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়া নিজের বাধা দানের (Passive Resistance) স্থানে অসহযোগ (Non-Co-operation) এবং আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অথচ অসহযোগের প্রকরণ সর্ব্বদে দেশের নেতৃবর্গের মতাবস্থায়ের অভিন্ন সংঘটিত হইয়াছিল।

চতুর্থত:—তাহারা প্রধান উদ্বেগ হইয়াছে স্বাধীনতা লাভ করা। অথচ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যে কি উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, তাহা কংগ্রেস দ্বারা করিতে পারিয়াছে বসিয়া তাহাদের ঠানা

নাই। স্বাভাবিক বাস্তবতা পাঠ করার প্রয়োজন
কংগ্রেসের অধিবেশনে পাশ করাটাইছেন প্রভাষা।
প্রধানতঃ “সোশালিস্ট” (Socialist) এই পন্থা
ইহা বার।

ততদিন পর্যন্ত স্বাভাৱ-পালন লাভ কৰা কংগ্ৰেছেৰ উদ্দেশ্য
ছিল এৰা ঐ উদ্দেশ্য লাভ কৰিবলৈ চকু আবেদন নিকলন
কৰাই পৰা বন্ধা থিয়ৈচিও হইছিল ততদিন পৰ্যন্ত
বোম্বৰ গ্ৰেফট অৰণ্ডাৰ থিয়েৰ পলিভিন লক্ষ্য কৰা
থায় নাই । কেবল আৰু দেখা গিয়াছে যে, দেশ লক্ষ্যে লক্ষ্যেই
নোহোৱা একটা কৰ্মাৰ্থ্যৰ, এই বোম্বাৰ গ্ৰেফট হৈছিল।

স্বয়ং শান্তি কল্পা যখন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইল এবং তখনই যখন বিক্ষুব্ধ প্রতিরোধ প্রকৃতি পূর্ণ। অবলম্বিত হইল, তখনই প্রথম দেখা দিয়াছে যে, দেশের পৌরস্বয় মধ্যে ব্যাঘাত অভাব। হইল, তাহার বন্দন অস্তিত্ব হইয়াছে এবং দেশের যখন হিন্দু-মুসলমানের মত পার্থক্য বলাবলি করি একটর প্রথম উদ্বাহ হইয়াছে।

অন্যরোগ এবং আইন-অমর্ত্য নীতি অনুশব্দের সঙ্গে
সঙ্গে বলাবলির প্রকটতা এবং সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া গিয়াছে
এবং বর্তমানে ভারতবাসী অসংখ্য মণে বিকৃত চরম
পড়িয়াছে। এমন কি ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্য নামে
যদি থাকিলে কংগ্রেস তাহার কোন পরিত্র নাট, ইহা দেখায়
হৃদয়কৃত ভাবে বলা যাউতে পারে।

এক্ষেণে যেথা ঘাটিক, কংগ্রেসের উপরোক্ত ইতিহাস হইতে
কি কি শিক্ষা লাভ করা যায়। আমরা মনে হয়, যে-কোন
যাত্রি বেশে হারি অথবা অহারী ভাবে বাস করেন, তাঁহাকেই
বাহুবল: "দেশের শোক" বশিতে হইবে এবং স্মার্ত্তই হউক
অথবা অস্মার্ত্তই হউক দেশের কোন ব্যক্তি বাহ্যিক তাঁহার
দীর্ঘ স্বার্থ বিচার মনে করেন, তাঁহাকেই "দেশের শোকের স্বামী"
বিশিষ্ট খরিয়া লইতে হইবে। দেশের কায়দার স্বার্থের বিরোধী
কোন নীতি জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান যায়। অবশেষিত হইলে
ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অনৈক্যের উদ্ভ। ইজা অবতরায়ী
এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অনৈক্যের উদ্ভ হইলে তাহা লুপ্ত
হইবার আশঙ্কা অবিসার্য।

অন্তর্গত, যেইর সৌক্য বাহা বাহা তাঁহাদের স্বীয় স্বার্থের অনুসরণ করিয়া গমন করেন, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিগত, কতকগুলি সাম্প্রদায়িক আর কতকগুলি সার্বজনীন (common)। যে স্বার্থগুলি ব্যক্তিগত অথবা সাম্প্রদায়িক, তাহা পূরিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অষ্টদৈব অথবা মতবিশেষে অনিবার্য হইয়া পড়ে, কিন্তু যে স্বার্থগুলি সর্বসাধারণের তাহা অক্ষত করা কোন জাতীয়

প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হওয়ায় ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে কোন-
কোন অনৈক্যের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হয় না এবং ঐ জাতীয়
প্রতিষ্ঠানের অপ্রতিষ্ঠিত গতি অনিবার্য।

শ্রমিক আন্দোলনে (Socialist Movement) বনিক-
গণের সহিত (Capitalist) বিরোধ অব্যাহত। এবং কোন
প্রতিকার হাফা অসম্ভব করিলে তাড়াতাড়ি সমগ্র জাতির জাতীয়
প্রতিকার বলা বাইরে থাকে না।

সেপের মধ্যে কোন প্রান্তিক স্বার্থ সংঘর্ষের ভয়
আন্দোলন আরম্ভ হইলে প্রদেশে প্রদেশে বিদ্রোহ এবং জাতীয়
শক্তির হুমড়া অনিবার্য।

বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা দিচ্ছি। ইচ্ছা, ভারতের বহির্ উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণ ভারতবর্ষে প্রায়শঃ বদ-বাস করিতে আবদ্ধ করেন নাট, তথাপি বাহ্যিকের উদ্যোগকে অস্বাভাবিক ভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা। ভারতীয় কোন প্রতিবেদন উদ্ভাৱণে ভারতের নিয়ন্ত্রণ কোন কথা উপস্থাপিত হইলে উদ্ভাৱণে পক্ষ হইতে বাহ্য উপস্থাপিত হয়। নিয়ন্ত্রণ বাহ্যিক। অস্বাভাবিক হয়, কংগ্রেসে বাহ্যিকতা লাভ, যিনিই বন্ধন, অস্বাভাবিক, 'অস্বাভাবিক' হইতে উদ্ভাৱণের কারণে ভারতের বিজ্ঞানগতক সাম্প্রদায়িক উপস্থিত হইয়াছে বর্ণনা হইতে হয়। এত পলায়নের উদ্ভব হইয়াছে এবং কংগ্রেস বাহ্যিক পক্ষে কামাধিকারী হইয়া পতিত।

এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রকৃতি অথবা কারণ বর্ণনা বাহা বাহা দেখান হইয়াছে, তাহা কোন ব্যক্তিগত অথবা কোন সম্প্রদায়গত নহে। ই সমস্ত বিষয়ে ইয়ো-রোপীয় ও ভারতীয় জনগণ মিলেই অধ্যয়ন করিয়াছে। কি করিলে ই জনসংখ্যার কারণগুলি বিবৃত হইতে পারে, তাহা নষ্টা ক্রমেণের আন্বেষণ আরম্ভ হইলে, তাহার কোনজন বিবেচনিত। ভারত কোন পুষ্টি কাহারও থাকিতে পারে না। পরন্তু বস্তুমান বাহ্যিক সম্প্রদায়গত অথবা প্রদেশগত স্বাধীন-সংস্কৃতির ভিত্তি আন্বেষণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও কেঁকা লাগিতে হইয়া সমস্ত বর্ণনা একটা অপ্রতিভত কঠিনতম প্রত্যয়ন হইবার সম্ভাবনা হইবে।

কাবেই বিশেষ হইবে যে, ভারতবাসীর দুঃখদ্বার কারণ নির্ণয় করিবার ক্ষমতি কাথ্যতঃ প্রাচ্যেণ করিবার পন্থা— ভারতীয় সাধারণ দুঃখদ্বার কারণগুলিকে বিচার করিয়া কংগ্রেস আন্দোলনের সৃষ্টি করা।

বিশেষ কারণে এই প্রাচ্যের অধিকতর বিকৃত আলোচনা
হতে পারে। অতীতের প্রতিনিধিত্ব থাকিতে হইবে।
প্রত্যেক হইলে অতীতের এ লক্ষ্যে আলোচনা আরম্ভ করিবে।

বাক্যনা সাহিত্যের ইতিহাস

— শ্রীহরীম্বর সেন

[১০১]

মুনসা বা বিবাহের কাহিনী আটানকাশে খুব লোক-প্রিয় ছিল তাহা পূর্বে একাধিকবার বলিয়াছি। পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকে লেখা দুইখানি মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বিবাহ শুভ পূর্ববন্ধের এবং বিপ্রদাস পিপলাই পশ্চিমবঙ্গের লোক। বোড়প শতকে, বৈষ্ণব যন্ত্রের আওতার পড়িয়া, মনসামঙ্গল প্রকৃতি নিছক লোকসাহিত্যের আধা পশ্চিমবঙ্গে খুবই কথিত্য বার। কিন্তু 'পূর্ববঙ্গে' এই সাহিত্যের বর্ণেই কথন ছিল। প্রায়শতকে, মনসার কাহিনী পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং বোধ হয় এখনও আছে। ইহাও ফলে বোড়প শতক হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পতঃ পকাশ ঘটি জন মনসামঙ্গলশীতি-কবির হিলাব পাওয়া ঘটিতেছে। ইহাওের লক্ষ্যেই 'অবত এক একটা করিয়া সম্পূর্ণ কাব্য রচনা করেন নাই; অনেকেরই শুধু এক-আধটা পালা লিখিয়াছেন, অনেক আবার অপর লেখার মধ্যে মিশ্রের কিকি রচনা অথবা শুধুই ভণিতাব্যয় যোগ করিয়া কথিত্যবাস্তির প্রকাশী হইয়াছিলেন। বর্তমানে শতাব্দীতেও পূর্ববঙ্গে মুন করিয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। বোড়প শতকে পশ্চিম-বঙ্গে কোন কবি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় নাই।

[১০২]

বোড়প শতকে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে বংশীদাস রায় বা বংশীবদন চক্রবর্তীর পদ্মাপুরাণই সম্বন্ধিক উল্লেখ-যোগ্য। বংশীদাসের কাব্য ১৪৮৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

১। বংশীদাস কায়দার একাধিক সংস্করণ হাণ্ডা হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে ঐচ্ছক প্রকাশন প্রেসবর্তী ও ঐচ্ছক বাহাদুর প্রেসবর্তী সম্পাদিত (১০১৮ সাল) সংস্করণই শ্রেষ্ঠ। বর্তমান যুগোৎপন্ন এই সংস্করণটি এবং তাহা হইতে ঐচ্ছক প্রকাশন বাহাদুর প্রেসবর্তী (১০২২ সাল) সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা বাহাদুর প্রেস। শতক ১০২২ খ্রিষ্টাব্দে বংশীদাস পদ্মাপুরাণ বংশীদাসের বাসস্থান ছিল মহম্মদসিংহ কোলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটবাড়ী বা পাটুগাড়ী বা পাটোবাড়ী গ্রাম। বংশীদাস রাজার ব্রাহ্মণ, বন্যাত্তি গাই। ইহার পূর্বপুরুষ রাজবংশ হইতে আদিয়া ব্রাহ্মপুত্র নদের তীরে বাস করেন।

কথা খট্ট নাই গোরে রাজার প্রধান।

রাজ হৈতে আটকেন লৌহিত্যের পাণ ১০

বংশীদাসের পিতার নাম বাহুবানন্দ এবং মাতার নাম অন্ননা। কথিত্য বহুতলে কবি পিতৃনাম গ্রহণ করিয়াছেন।

কথা—

বিভ বংশীদাসে গায় বাহুবানন্দ-মুখে।

অপুল পুণ্য-শ্রীত রচিতা কোহুকে ১

(অপুল পুণ্য-শ্রীত রচিতা অমৃত ১)

ইত্যাদি

বংশীদাসের একমাত্র কল্পার নাম চন্দ্রাবতী। ইনিও উত্তরাধিকারমুখে কবিকল্পিত। শ্রীত করিয়াছিলেন। ইনি বীর ভাষাধনে যে আশ্চর্যবিচিত্র বিদ্যাছেন তাহা হইতে বংশীদাস শব্দে অনেক তথ্য জানা যায়।

ইহা হইতে জানিতে পারি, কবির পিতার নাম বাহুবানন্দ, মাতার নাম অন্ননা এবং পত্নীর নাম অন্নোৎপা। কবি ব্রহ্মচরিত্ত ছিলেন, মনসার শ্রীত গাথিয়া অতি কষ্টে সংসার নির্বাহ করিতেন।

যাগপ্রোক্ত কুলেশ্বরী নদী বহে গায়।

কবির বাহুবানন্দ করেন স্নান ১

জ্যোতির্বাৎসব কবে কবে অন্ননা যন্ত্রণ।

ইবের পালায় বর মনোর হার্টন ১

কট কলীয়া লখা পুত্র মনসার। বেশ করি সেই দেহু লখী হেতে গায়।

বিশ্ববন্দী পুত্র চৈতন্য মনসার কর। তাসনে বারিধা বিনি বিখ্যাত মনসার।
কর নাই বাহু গাল গাল নাই হালি। আকর্ষিত পড়ে উচ্ছ্বাসের পালি।
তাসনে বারিধা শিতা কোল মনসার। গাল ভড়ি বাহু পান আনি খেন কর ১

গোথাকৃতকৃৎ বিপুলাকে প্রণোক্তন বর্নন ও বলপ্রকাশের চেষ্টা, বিপুলার কৈশোনের ঘাটে আগমন, পরন্তু বিপুলার বর্ণে প্রবেশ, বিপুলার নৃত্যে শিব ও চতুর সন্তোষ, শিবকর্তৃক পত্নাকে দেবসভায় আহ্বান, পত্নার অনাগমনে নারিকেলকৃত পত্নাকে আনয়ন, দেবসভায় বিপুলার নৃত্য, দেবসভায় বিপুল ও পত্নার অতী ও প্রতীকীভাব অবলম্বন, বৃহস্পতির মধ্যস্থতা, পত্নার রোগভাগ্য, চন্দ্রবরেণ্য সূতপুত্রসিগের পুনরুজ্জীবন এবং নষ্টকন্যাপ্রাপ্তি, অবশেষে চতুর আসনে চন্দ্রবর কৃতৃক বিবাহের পূজা।

[১০৪]

এইরূপ বঙ্গীশাসনের কাব্য ও কবিত্বের কিছু পরিচয় দেওয়া হইতেছে। বঙ্গীশাস কৃত্রাপি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তথাপি তিনি যে সংস্কৃতভাষা-ভিত্তি ছিলেন তাহাব বশেষে পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের সাবলা এবং অনাড়ম্বর বর্ণনাভিত্তি বঙ্গীশাসনের রচনার প্রধান বিশেষত্ব।

১কন্য। অংশেব এই কথেকটু ছুইতে তৎককথা বেশ সহজ উপমান লাগায়ো বসিত্ত চরিত্রায়ে ।

প্রশ্নঃ বসিত্ত কথকন্য নিরুজনঃ । পূর্ণ ব্রহ্ম বিরাগঃ কশচি বিদনঃ ।

বিভবন সন্তান কিত্ত নারি কন্দর্যবা ।

নাচে যেন নব কান্তো লন নারি বেথা ।

সকল ঘটো নাথো আশ্রয়ণে থাকে ।

একা আদি কট বচ পতম ভসিছে ।

চায়েত সফল হয় কেন নারি ছাড়া । কলার যোগ্য যেন একপ্রভেত ছোড়া ।

একই প্রাণী যেন করে লীলাসন । চায়েত অবক নগা গায়ে কান্যে কান ।

মনক অর্ধদ্য যেন নারি সেবা কোথা । একর হইল পূব সেই এক শিখা ।

একই ঘটো জন যেন তার ঘাটে । নানাস্যেত জরিলেও তবু নারি চটে ।

একই সুখিই কৃক নান্যভেতে গিবে । একই আকর্ষণে ঠেল নান্যভেতে সেবি ।

একই ক্রোধের কথা বিব উঠে দাবা । রক্তকল মালায়ণ বহিষ্ক কন্য ।

একই বিজয় যেন কট নান্যভেতে । নানা মলমলার জালি কল্পে একপ্রো ।

পূবঃ পূবঃ অংশ সেই নারাল । তাহাণঃ জনমই সৌভঃ চল ।

ইত্যাদি ।

ডোমুনীবেশে চতুর মহাশয়কে ছলনা অংশ হইতে কিছু

অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ।

নান্দেব জালিয়ার নাম করিয়া দ্রুহঃ । বিজয় হইল নবী অংশে পজীঃ ।

কল পূব নৌকা যেন সেই ছলে আসে । নৌকা আসে কৈল চক্রে ডোমুনীঃ
কেনে ।

শিচলার আলমার করিয়া সাজন । হাফাট নিয়া বেশ বাড়িল মোটন ।

কিন্তুবো বিলু যেন কপালে শেরেত চাল । নরকঃ লামে কৈল চক্রে হাফেত

করি হাল ২২

কলার বেড়িয়া শিরে দানবীর দাল । নিরর্থকি জগা বায় কংঃ হাফলীয়া ।

যেতঃ অংশ আসে কোলা আড়াই অংশঃ বাসে । দানিলা দিলিল শিব কথালীঃ
কহে ১১

একা কিছু জালি যারো এড়ান না যার । দানিলা ঠেকিলা শিব সেইতঃ দায়েত ।

সেখিল অংশ নবী অস্তি বহুতঃ । নৌকাঃ উপর কৈবে ডোমুনীঃ কহুঃ ।

ডাকিয়া পতমঃ কল নৌকা আসে ঘাটে । কুহুচেত নাইতে চাই পাণ কর ঘাটে ।

চায়েত কৈবে মহাশয়া আড়ঃ দানিলা চায় । নানান কলিবা করি থৈয়া কুশি যার ।

কল-চাফুটী করে আভিষ্ক ভাগ্যেবে । খোলিল শিরের মল কটাক্ষেরে বহণ ।

শিব কল ডোমুনী দল্লর কর পাণ । দানিলা কলকল পূর্ণ আনিয়াঃ ।

কহেতঃ এড়িয়া এক শরল জালীঃ । তাহাণঃ আশুতিঃ তোলা টিলি যেন দালি ।

এরন দৌলকালে ঘাটেব বেজালীঃ । কাণ দী কাণ কলঃ কর সুবদিলি ।

ডোমুনী কল বাণ দিগিরাক পান্টীঃ । লগায়াই নাম যেরে জালিবে ডোমুনীঃ ।

কলার ডোমুনী হয় শিক নারিঃ । পংকঃ কিলম আরে আশিত্তঃ তাহাণঃ ।

নিরর্থকি জায় খেতে লাই বেড়োত । দিবা উপাধানে নিস্তা অংশঃ কলার ।

সেখিা প্রভেতঃ জ্বল চক্রে অশিমাঃ । দানিলাতঃ প্রভেতঃ কাণা নারি করে কল ।

জাল যার বিলুস লগা করেন কাণাঃ । ছোড়ঃ বড় সফল প্রভেতঃ বিজয়নঃ ।

মুড়া সেখি যেরে কিলুস খোয়াই ঘর হেতে ।

এরন কালঃ দানিলা আদি খোলা দিতেঃ ।

সে জনেঃ বচ কথঃ কহিতে অস্তঃ নাই । ঠাকুর লকলঃ জাম আদি বচনাই ।

কটকন খেঁবোয়াতি অশিত্তে তপালীঃ । কল্যাণী কলানী প্রভেতঃ লগালীঃ ।

আশে কিছু কহি যেরে বচ আদি দিলি ।

অর পায়ে কতি পাণ দানিলা দানিলা ।

খোলা দা দিলা কি বচঃ পাণ হৈতে চাচে ।

কলঃ-কহি কুয়াইয়া হুয়ে উঠে নাচে ।

শিব কল খোলা-কহি কলন জোজলন ।

সিফটে অধিক আশে কলুয়া বচ ।

কহেতঃ লানখায়া নাচে পাণ কর বেরেত ।

তবে সে ইনাথ পাণা লয়ে দানিলা খারকঃ ।

ইহা শুনি মহাশয়া দানিলা কৌতুকঃ ।

কুহুচেত লানখায়া নাচে শিরের লম্বুঃ ।

সেখিা কলকটপঃ সের পকলনঃ । দানিলা দিলি বহিলেক পাচেরে বচনঃ ।

না যোঠঃ না যোঠঃ আদি হই ডোমুনীঃ ।

কুশি জাল কটখালী জাল কল্যাণীঃ ।

চোমের অশী ঘনিষ্ট হুইল ঘটিতাম। আরো কাপড় এঁড়ি হও রতন।^১
ইতামি।

দক্ষিণ পাটনের অধিদ্রাঘণের আকৃতিগ ও বৌদ্ধীতিগ
বর্ণনা বেশ কোঁচকাবর।

বেঁধা ভঙোর লতা টান ফানে মনে। সকল নির্দেশে যেন পুঁথি মগুননে।
এক এক জন বেঁধে দোখল চাপায়। রাঙা রাঙা চকু কঁচা রাঙা জোঁদায়।
যা বাপ সৈল তরা হাৎবে দখাইয়া। কোঁচাই ঘণেশ প্রাণ করে স্রো
পাটনা।

সৈল পুত্র কিছু নহে জামিয়ার অধিকারী।

ললিত খাটরা যেন কোঁচ বর গিরি।

সহোদর ভাই জন বা পায় ছোঁই-৩ সৈল সুখল করে শাফার ঘোঁই।
জামিয়ার জামিয়ার আর জামিয়ার-বোঁচাই। এ সকল শিল্পের কলর হুঁচাইতি।
কলিকাবধু শ্রীত পায় ঘাণাওর নাচে।

কোঁচাইতে পাখোলাক ঘাণার খাটরা করে।

কক দর্জিত পাইলে হয়ে জন সৈল।

কোঁচ আঙ্গুলে ঘাটিকাও বর বেঁধে পালা।

খুচর বন্য পাইলে কল হুঁচাই। হাটকাগি বিজা কল আইলা বে জাটিকা।
বিজা সৈলবে কোঁচুর পাথ মসৌ খাটরাগে।

ককো পায় কোঁচাই হাৎ খাটরা পায় করে।

পালায় বসু বেঁধে রাঙা করক নাচি।^২ পালায় পায় করক বঁচাল কুমিত।
এই বসু বেঁধে রাঙা কোঁচের পালায়। তবে যবে চক্রের কোঁচুর কপার হাৎ

নাটকোলের ওপরকরা বিনা। চক্রের পাতাকে লই
করিবে হেঁদে -

চক্র কল নাটকোলের ওপর করকরা। যে অত নাটকোলের করকরা যবে
বিখারিয়ার যাবে হুঁচ খারিয়ার বসু। আরক চক্রের করে হুঁচের আঙ্গল।
আঙ্গল হুঁচের পুতী পাটনক বসু। আরক বসুর চক্র করে বিহুচক্র।
চক্রটি ও অপরক বসুর করে যাব। তার চক্র ইষ্ট্র খারি কল কলপান।
কুই হুইয়া চক্র আইল বসু হুঁচের রাঙে। রাঙা হুইয়া কুই খারি বিহু
বিখারিয়ার কল করি হুঁচ খারি। আরক হাটিক হুঁচ হুইয় এইকল।
এই বসু খারি চক্র বিহু বসু যাব। বিখারিয়ার নাটকোলের পটিকা আঙ্গল।
বসুচক্র হুঁচ কল বসু বসু কল। চক্রের চক্রের কল কল চক্র।
এই অত নাটকোলের বিখারিয়ার হুই। কোঁচ ইষ্ট্রের পায় করি কল আই।
পুঁথিচক্রের জামিয়ার কল কল কল। আরক ইষ্ট্রের হুইয় বসু যাবে।
কোঁচুলে বসু যবে জামিয়ার কল। খোল পত পিত অত চক্রের আই।

কলিকার কল চক্র খারি নাগ কল।

কল খারিচক্র বসু কল কল কল কল।

রাঙে এক পিত সৈল সৈল এই কল খারি।

সেই কোঁচ নাগাল কলিকার আই।

উপরে না বসু পলী করক বিখারিয়ার। ইষ্ট্র বেঁধে নাগাল কোঁচ করে যাবে।
কলিকার চক্র বিজা কল নাগ খারি। কল হুঁচের খোলাইয়া বেঁধে আই।
সেই হুঁচের কল নাগ লকলচক্র কল। সেই কল হুঁচের পটিকা কল সৈল।
কল নাগের কল চক্র কলিকার কল।

কল খারি খারিচক্র নাগ সৈল লকল।
অপর ইষ্ট্রের চক্র কল খারি। খারি যবে কলিকার নাটকোলের কল।
কল চক্র কল পায় চক্রের পিতক। খোঁচাখারি খারি বসু যবে নাটকোলের।

আখিয়ার দিতে খারি নাটকোলের রাঙ।

কলিকার পটিকা বসু খারিকলের পাট।

ললিত কল কলিকার না করি কল। কলিকার খারিক কল বসু পাট।^৩

চক্রের আঙ্গলচক্রের মহাঙ্গল। বিনা চক্রের কাপড় বসু
করিবে হেঁদে। রাঙা আখি লকলে চক্রের কাপড় পটিকা বসু
কোঁচ কলিকার বসু, কলিকার নাগ খারি। বসু পরিধান
করিবে হেঁদে। "চক্রের কল রাঙা ও সজালকলিকার খারিচক্র
উপর কটাক কলিকার কলিকার হেঁদে না। এই খারিচক্রের আখিয়ার
হাটকাগি বসু উপকোঁচ।

কলিকার ইষ্ট্রের কল খারিচক্র। রাঙা চক্রের কলিকার কলিকার।
বিলক পায় বসু বসু বসু। কলিকার কলিকার কলিকার।
রাঙা পাটের কোঁচুর কলিকার। চক্রের কোঁচুর কলিকার।
চক্রের কলিকার কলিকার। চক্রের কলিকার কলিকার।
চক্রের কলিকার কলিকার। চক্রের কলিকার কলিকার।
চক্রের কলিকার কলিকার। চক্রের কলিকার কলিকার।

হাটিকার চক্র রাঙা। কলিকার খারি। তার পায় কলিকার পায়খারিয়ার।
খারিচক্রের চক্রের কলিকার। খারিচক্রের কলিকার।
খারিচক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার।
চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার।
চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার।
চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার।

চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার।
খারিচক্রের কলিকার। খারিচক্রের কলিকার।
চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার।
চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার।
চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার।
চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার। চক্রের কলিকার।

১. চক্রের কলিকার, পৃ. ১০৪২। ২. 'চক্রের'। ৩. - হেঁদে।

৪. চক্রের কলিকার, পৃ. ১০৪২।

৫. 'খারিচক্র'। ৬. চক্রের কলিকার, পৃ. ১০৪২-১০৪৩। ৭. খারি।

সেই কেহবার লক্ষণ আছে তোষাওটাই। তবে মাত্র বিয়া তোষার লেখ
দিখা নাই।
এই দুইখন বর্ষ ব্যক্তি তোষা। যে ব্যক্তি দেখে আশ্চর্য হইত হার।
চন্দ্র ছন্দ বিয়া তোষা। দুই অঙ্গার। অঙ্গার লেন বৈলে পাতি

হাল-গবিলার ১২

বিবাহ চন্দ্রদ্বয় কোন ক্রমে প্রাপ্য লইয়া তীরে উঠিয়াছেন।
সেখানে কতকগুলি প্রীলোক স্থান করিতেছিল, তাহারা
চন্দ্রদ্বয়কে দেখিয়া নানব ঘনে করিয়া পলাইয়ানগরে পদর দিল।
চন্দ্রদ্বয় নারীদের পরিচয়ক বহু হইতে একপানি লইয়া পরিধান
করিলেন। ইতিমধ্যে নগরীয়া শোক তাড়াকৈ নির্ধাত সাধিয়া
বহু কাড়িয়া লইয়া খেদাতিয়া দিল। এমন সময় চন্দ্রদ্বয়
যেখিল এক বিকৃত শাস্ত্র গ্রন্থ করিতে আসিতেছে।
তাহার নিকট তিনি বহু লক্ষ্যনা করিলেন। বংশীবাস আর
কণাথ একত্রেই স্বাভাবিক ভাষণ গ্রন্থ তাহে দুটাইয়া
কুলিয়াছেন।

সেই কালে এক দিক স্থান করিয়াছেন। অকর্ণ দেখিয়া চন্দ্র কণে
হয়ে যের।

কল্যাণ করি চন্দ্র কেন নকলার। একপানি বহু পানিল পাতি পরিহার।
জিতক প্রাপ্য লানে দারেকের দ্বারা। একপানি বহু পানিল করি মাত্র পৈশ।
পানি প্রাপ্য জাতি করিতে স্থান। পরিহার বহু চিত্ত বিপদ গ্রন্থদান।

হনাদেশল কাবোয় উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গে, রাঢ়। সেই
কাবোয় পশ্চিমবঙ্গী করি কাবো চন্দ্রদ্বয় বানিজ্যবাহার
প্রদেয় ভগ্নিববীর তীরবর্তী স্থানের বধ্যবন উদ্রোহ পাওয়া যায়।
পূর্ববর্তী কবিরের নিকট ভাণ্ডারবর্তীতীরবর্তী অকলের মোটেই
পরিচয় ছিল না, কেবল দুই একটি স্থানের নাম মাত্র জানা
ছিল। সেই কারণে তাঁহাদের কাবো চন্দ্রদ্বয়ের বাণিজ্যবাহার।

ইত্যাদি প্রাপ্যে স্থানের উদ্রোহে verisimilitudo নাই।
সেই যেতুই বংশীবাসের কাবোও দেখি শ্রীপূর নগরের পর
পলাশবাড়ী, তাহার পর নিজায়নগর, গোপালপুর, ভান্ডারবাড়ী,
তাহার পর ত্রিবেণী নিকটেই চন্দ্রকনগর, তাহাও অধার
সমুদ্রের তীরে। এই তো চন্দ্রদ্বয়ের কিংবদন্তি বৈদ্য। আর
বাইবার বেলায় -

নিম্ন প্রাপ্য করিয়া হাত পরিচাল। কাবোয়ই ছাড়াইল কাবির নিজে।
নগর প্রাপ্য করি বহু। দুর্ভাগ্য প্রাপ্যবর্তী ছাড়াইল কাবির।
গোপালপুর ছাড়াইল প্রাপ্য বহু। অকর্ণ করি পদ কাবির প্রাপ্য।
বহু প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্য বহু। অকর্ণ করি বহু প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্য।
গোপাল প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্য বহু। অকর্ণ করি বহু প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্য।

বংশীবাসের কাবো চুট একটি ছোট ছোট পদ আছে,
সেগুলি কল্যাণলগ্নুৎক এবং চন্দ্রদ্বয়। চরত সেগুলি
বংশীবাসের কণা চন্দ্রদ্বয়ীর রচনা। একটি উদ্ধৃত করিয়া
কিলায়।

কল্যাণের কল্যাণ করি প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী
কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী

কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী
কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী

কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী
কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী

কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী
কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী

কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী
কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী

কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী
কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী

কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী
কল্যাণ প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী প্রাপ্যবর্তী

[কল্যাণ]

১। চন্দ্রা নকল, পৃ. ১০১-১০২।

২। কল্যাণের এক দিক স্থান করিয়াছেন। পরিহার। ৩। অঙ্গার
পরিহার। ৪। চন্দ্রা নকল পৃ. ১০১, কল্যাণের নকল, পৃ. ১০১-১০২।

৫। চন্দ্রা নকল, পৃ. ১০১।

৬। বঙ্গ-প্রতি। ৭। চন্দ্রা নকল, পৃ. ১০১-১০২।



বুকের একটি ব্যাধি

পূর্ব্ব অঙ্কটিতে আমি লম্বা জাতির লম্বিত ইতিহাস, এই ব্যাধি আঘাতের সম্বন্ধে কি করে বিবৃত সাহায্যে, কি তাৎপৰ্য্য এটি আঘাতের একটি জাতির সম্বন্ধে হইতেছে এবং কি কি কারণে এবং কি কি কারণে আঘাতের বহু এই ব্যাধি ব্যাধি আঘাতের বহু, এই আঘাতের বহু।
আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু এই ব্যাধি আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।

এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।

অতঃপর এই ব্যাধি আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।

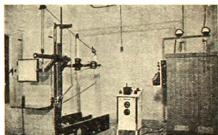
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।

এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।

—প্রিয়ময়ীকীর্তন সুখোপাধ্যায়

করে যা ইচ্ছা করে লাগতে শুরু করেন কল্যাণ। কিন্তু সে কল্যাণ উপলব্ধি
যা কিছুতেই হয় না। একদিন আশ্চর্য্য ভাবে দেখেন, হঠাৎ যেখানে
কবে দেখতে পান, তাতে পরিষ্কার ভাবে হঠাৎ অন্ধ সজ্জাই হঠাৎ; কখনো
কখনো বা কবে কখনো কখনো এই উদ্ভট।

যন্ত্রের ব্যাধি, হঠাৎ এটি এবং এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।



এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।

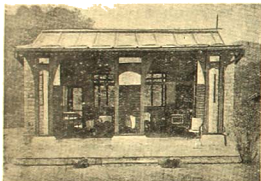
কখনো বা কবে কখনো আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।

এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।

এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।
এই ব্যাধির কারণে আঘাতের বহু এই আঘাতের বহু এবং আঘাতের বহু।

যাৰ একটীয়া কৰ্মকাৰী আছিল, যাৰো হাৰিকল পলি থিও, য'ত ইং, তেওঁ
কমৰতৰ কুলোনে এক প্ৰকাৰে পাহাৰে বহু নিশাভাৰিত পাহাৰে পাহাৰে
যোৱা হাৰাকল বেদ ইত্যদিত লক্ষিত কৰোৱা বন্ধা। কমৰত পাহাৰে
দেৱীৰ দিয়া আৱৰ্তন যেনেকৈ হ'ব।

প্রারম্ভে কাক নিরানুপ্রাণিত অত্যাশঙ্ক। টি বি বোম্বের প্রকার
প্রকাশন। গণপ্রণ, বিদ্য, উচ্চ স্বভাব ইত্যাদি প্রকারটি কাক জি-
বিত প্রকারের পুঁজি কীভাবে প্রকাশ্য হবে। নিরানুপ্রাণিত এক সত্তা বা
কৃত্রিম অথ। ওজন লিখ্য হবে। স্বাক্ষর, স্বাক্ষর, বিদ্যমান, স্বাক্ষর-পত্র
প্রকার অথ। প্রতিদিন নিরানুপ্রাণিত টেম্পারেচার লিখ্য হবে যে তা স্বাক্ষর
লিখ্য প্রকাশ্য হবে। বিদ্য সত্তা এক বিদ্যমান স্বাক্ষর কীভাবে লিখ্য হবে
লিখ্যি এই কাক তা প্রকার স্বাক্ষর লিখ্য প্রকাশ্য হবে। বোম্বের ইত্যাদি



ଡ. ବି. (ଶାସ୍ତ୍ର) କଂସ (ସାମ୍ବାଲି ଗ୍ରାମିଣିୟ) ।

[illegible][illegible][illegible]

এক পাল্ল ১০—১১ স্তমি হয়, এক-আর একটি সৌরী
হয় ২০—২৫ এক পাল্ল ২০—২২ স্তমি—২৫ আশ্বা-
গৌটাইট prognosis ভাল। আর অনেক দলকেই
অতি শীঘ্রই মারা যায়। সৌরী পাল্ল অত্যন্ত বেড়ে
যায়। একর উপর একটু হাল কলস, মাঝে একটুক
কলা বগল, একখানি চিঠি লিখল। হঠাৎ কোন সীতি-
পাত্রকে দেখতে গেল, ডাক্তার দল এসে চুকলে—অতি
সমাজ রকম কোন উত্তরনা। হঠাৎ পাল্ল খেল হেঁচো যায়
—খিঁচন করে যে সৌরী একটু ভাবলো তার তো কথাই
নাই। এই সব উত্তরনার দুখে পাল্ল বিচে বসে, নতুন
দলের বেশ লাভ এক বিশ্রামের অধ্যায় হাড়ির বেশ যা হল
সৌরীটই ডাক্তারকে দেখানোর হাতে পাত্র চুক সাফল
হয়। আর এখন ১ পাল্ল ২ পাল্ল অল্পের নিমিত্ত

সিঃ হাৰ্ভে কৰ্ণেই। গুৰুৰ বৈশাখৰ একটু বিহুৰ আদে। বিহুৰ যে পলটাইত যে পোহৰক গুৰুৰ বিহু গুৰুৰ বৈশাখ হ'বে, পূৰ্বেও বিহুৰ সেই সময়ক এক টুক সেই পোহৰক গুৰুৰ বিহু কৈছিল গুৰু। তা' বা হ'লে গুৰুটো সঠিক হ'ব না।

যেহেতু একটা ছা-রা বর নিলে সেহে যা—তারে পিতৃ হইবে বাহ্যিক
দর্শক,কুন্তী যজ্ঞাবধি। সে কখন বর না থাকিলে তার ভক্ত অসোখ একখানি
বর হইল। কহে—হেতুপিতৃ একবারে খেলা লব্ধা মামোদী জ্ঞান
পরিণাম বিহে। হামান হসে পরে একেবারে হারত উপর পূজা, মিল
ইহাখি নিজে যৌবর ভক্ত কল্যায় বা হৈলী কজা বেত পায়ে। কহে কৈ
কৈ হৈল আসে—কিন্তু যৌবর পথে কৈ কৈল বহেই জ্ঞান না গানে।
গরে। হিহরে অবাকক জিনিগের। কিন্তু থাকবে না এক যজ্ঞকৈ হারত
হবে সঙ্গী। পরিবার, পরিচর্য করে। যৌবর জিনিগের, কল্যাণ-কৌশল
হবে বার বৈ পিতৃ হইবে—এক সেগলি কখন কৈল জ্ঞান লোকে
না থাকে। যৌবক বিবর্ত শত্রু করতো, মধ্য বুটে সেগলি ইহাখি
অম্বা কখনও না হই।



মরুভূমির দেশ আরবে

— শ্রীবিজুতিজুঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাইবেরিয়ার সমর হইতে হাভ্রামাউং প্রদেশ যুগ্মিত্রয়ের ভূত প্রাণিত। হাভ্রামাউং আরও উপন্যাসের দক্ষিণ নিক, এডেন বন্দরের কিছু পূর্বে অবস্থিত। বৈষ্ণব প্রায় ৪০০ মাইল, গড়ে ১৪০ মাইলেরও বেশি। ইহার উত্তর-পূর্ব কোণে বিখ্যাত ক্ব'আলখালি মরুভূমি, পশ্চিমে ইয়েম প্রদেশ।

ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে বিজ্ঞানভার বেট ও লিও হিগ্গ, এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াইয়া অনেক জ্ঞানব্যা তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তাঁরাগা একটা মাগ ও বাড়ী করেন বটে, কিন্তু সে মাগ খুব ভাল নয়। ১৯০২ সালে নেবাব-লাও গভর্নমেন্টের কমান্ডার তান ডার মিউলেন হাভ্রামাউং ও ক্ব'আলখালি মরুভূমি ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তাঁরাও লিখিত বৃত্তান্ত হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল।

“মারব দেশের মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বতের মধ্যে আবিষ্কারের অভিযানটা

সহজ নয় মোটেই, যদি মরুভূমির অধিবাসী বেজুইনদের সাহায্য না পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বিখ্যাতের প্রতি শ্রদ্ধাভাবী। দেশের মধ্যে বর্ণোচ্চ ভ্রমণ করার অনুমতি তাদের কাছ থেকে পাওয়া সহজ নয়। কখন কি অবস্থায় তারা রেগে উঠে, তা কিছু বলা যায় না। তাদের কোপ-গুণিতে শুধু অনেক ভ্রমণকারী ইতিপূর্বে প্রাণ হারিয়েছে। হাভ্রামাউং প্রদেশের অধিকাংশ স্থানই এ ভূত আক্রমণ-অনাধিকৃত, এই বিতীর্ণ রক্তক্ষয় অঞ্চলে কোথায় যে কি আছে, পৃথিবীর লোকের কাছে তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার ফল ডাচ গভর্ন-নেটের লোক থেকে হাভ্রামাউং প্রদেশটা ভাল করে পরিচয়ন করান ও তা'র একটা মাগ করান ভার পড়ল আমান উপর। ঘটনটা এটা। অনেক দিন পূর্বে একজন



লাইন ও হেরিঙ্গের মধ্যস্থিত মারবের প্রাচীন পাহাড় বংশ। (১) হাভ্রামাউং প্রদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে।
ইউরোপীয় বহু পূর্বের ইতিহাসগুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন। এই পাহাড়ের পাহাড়ের উপর প্রাচীন লোক অধিকৃত হইবার কারণ একটা লাইন বসে হইতে এবং একটি মন্দির হইতে নির্মিত।

‘হাভ্রামাউং’ জাতির গির্হাছিল অগোপ্যকন কন্যার ভূত।

জাভাতে বাবশা-গণিত্য করে মোকটা হ' পরশ উপার্জন করলে। পলে সে ডাচ নাগবিকের অধিকার গ্রাস্ত হল। কিন্তু সেখানে কিছুকাল আরিয়ে বাশন করবার পথে তার মনে হ'ল, বেশে কিরে সে বড় একটা কিছু হবে। জাভাতে বড়-নাহু'র করে লাভ কি? টাণ্ডার দার্কিতা কি যদি তার বদলে'র লোকের গোপে সে বড় না হতে পারলে?

সে বেশে কিরে লৈকনস গোপন করলে, বন্ধু ও অন্তঃসত্ত্ব কিনলে, তা'রপর নির্দিষ্টতা বসে হ'ল। পথের সে যে হানেন

অধিবাসীদের উপর উপস্থিত হইল; সে তাহা গাটা মুকামায় জুলতানের অধিকারভুক্ত। অধিবাসীরা স্থলতানকে জানালে। স্থলতানের আদেশে একদল স্থানিক লোক ও একটা ছোট বাঘানি (সিবিওরী) হিংস্র প্রেরিত হ'ল—কলে সিবিওরীর লৈলুলল ছুঁতল হইবে যে যে দিকে চোখ যায় সব পড়ল। সিবিওরী নিজে হ'ল বন্দী এবং স্থলতান তার পুষ্টিপথ বন্ধন অসীম হাজার স্ত্রীহীন চাইলেন।

সিবিওরী তখন নেবারল্যাণ্ড গবর্নমেন্টের কাছে আবেদন করলে যে, সে একজন ডাঃ প্রভা—স্থলতান তাকে বন্দী করে প্রকৃত পক্ষে ডাঃ গবর্নমেন্টেরই অপমান করেছেন, অতএব



“ভোল” : মক্কামি। পথে যে কত কত প্রকারের অসুখ উদ্ভিদ হইয়া বসি লয়িত।

বস লয়িত হই, মুকামায় একখানা ছুঁতল জাহাজ পাঠিয়ে এর প্রতিশোধ নেওয়া হ'ক। ডাঃ গবর্নমেন্ট অবশ্য ছুঁতল জাহাজ পাঠান নি, কিন্তু অল্প ভাগে এই অসুখ প্রকৃতির হাঙ্গা-হানির মুক্তি যাবৎ করেছিলেন। এই ঘটনার পর থেকেই হাঙ্গামাউন্ডের অজান্ত স্থান লকল পরিভ্রমণ করবার অসুখিত পাঁজরা যায় মুকামার স্থলতানের নিকট থেকে।

১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে আমি ডাঃ বিলমান্ এডেন বন্ধুর জাহাজ থেকে নামি এবং হাঙ্গামাউন্ড প্রদেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করবার উদ্দেশ্য করি।

এডেন থেকে ছোট টীমারে মুকামা আসি। মুকামা আরব সমুদ্রের একটি বন্দর। এখানে বাহিনীর সদস্যের

চেউকে বাধা দেওয়া হইত। আধুনিক যন্ত্রের বাধা নেই। ১৫ বৎসর ৬০ই সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যের (ব্রিট) করে দিচ্ছে। পরম ধর্ম কথ। বাক্ষর পশ্চিম মৌজার গায় বন্দর প্রবাহিত হই, তখন সমুদ্রের চেউএর গর্জনধ্বনি স্থানীয় বাজারের কোলাহলকে ডুবিতে দেয়।

মুকামা স্থলিক্ত সহব। মক্কামিবাগী বেহুইন বল সহরের মধ্যে প্রবেশের সময় পুলিশের কাছে তাহের রাইফেল ও টোটো গিয়া নিতে বাধা—হাট-বাজার সেয়ে বাড়ী কিরে বাবার সময় আগার ফেরৎ পাবে। বেহুইনরা অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ, বহুসুস্থিই অনেক প্রকার উপলব্ধিকা—এ ধরনের বাধা তাই আতি প্রয়োজনীয়।

মুকামা বাজারে তাগা মাসে একবার গাবার ভিনিল সংগ্রহ করবার শুরু আসে। সাধারণতঃ তাগা কেনে মধ্যা, চাল, শুকনো খেজুর ও সুটিকি মাছ—প্রধানতঃ সামুদ্রিক মাছের বাজা। বেহুইনদের মাথা কাকড়া চুল, চুল-জ্বলোকে একটা চামড়ার পেটি নিয়ে বেধে রাখে। চৌত্র ও গরম হাওয়ার হলকা থেকে বেহুইন রক্ত। করবার শুরু সাধারণতঃ নীল রং পাখে মাখে। বাজে আবার তার উপর চর্চি মাখায়।

মুকামার স্থলতান বংশের মধ্যে যেইর ভাগ সময় থাকেন তারতনবের

অজ্ঞাত হাঙ্গামা। স্থলতানের প্রধান উজির আবাবের প্রদেশের দিহরে দখল সাধা করলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে একদল পশিক উটেগে শিষ্ট হাঙ্গামাউন্ডের টেরিন সহরের দিকে রওনা হ'ল—আমরাও তাহের সহ নিলাম। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বলবত অবস্থায় হাঙ্গামা মক্কামিহ মধ্যে প্রথম করা বিপজ্জনক। পথ হাঙ্গামার ভয় ভো আছেই—তা হাঙ্গামা আছে রাইফেলধারী দুর্ভিক্ষ বেহুইন সহায় বল। অনেক সময় প্রদেশ গায়ে পড়ে গোটা পশিক বলই মারা পড়ে।

মুকামা ছেড়ে পাথানমর নদীপাতের পথ গিয়ে আমরা উত্তরমুখে গলি। পাঠানের আর্জিয়া ক্রমে ক্রমে আসছে,

দিয়ের উপায় অসম্ভব হইত, কিন্তু রাস্তিতে ষাট পড়ে।
আমর বেগেব এই অকস্ম পৃথিবীর উচ্চতম গবেষণালব্ধ
অস্তিত্ব—তুই উপস্থিত হলেও নয়, এত বন্ধন পণ্ড পূর্ব কয়



হাফালাট : একটি পান্ডুর ও ঘোমটাইয়াসে হুসান, বাগা,
ইয়াং ইত্যাদি বৌদ্ধ-ভাবিবীর সহিত অসামান্যের সন্নিবিষ্ট বি-
বিশ্যাত দৃষ্টি (frankincence)।

বেগেব থাকে। তাত্ত্বিক বলে কোন ভিনিস নেই, তুই আছে
ধূং মরুভূমি আর কেবল পাণ্ডুর আর পাহাড়-পর্বত। পণ
একবার উঠেছে, একবার নামছে, এক একবারে পাহাড়েব
খাড়াই এত বেশী যে, সেখান দিগে উঠের দল নামাতে ভরসা
হয় না—একবার পা পিছলে পড়ে গেলে হুং হাফার ফিট
পড়ার খেদের মধ্যে সবাইকে পড়ে প্রাণ হারাতে হবে।

এই ধরণের নবীঘাতের পথ পাণ্ডুর হয়ে আমরা এলাম
“জোল” বা পর্বতময় মালদ্বীপ মধ্যে। চারিবারে তুই অস্ত্রাণে
উপলব্ধি মরু পূর্ব চক্রবাক্যের পথান্ত বিবৃত। পাণ্ডুর
সঙ্গে লজ্জবতঃ ধাতু মিশ্রিত আছে, কাণ্ড সোহে তা চক্ চক্
করছে। এই “জোল” অকালের কোথাও কল নেই, গাছপালা
নেই। লোকজনও নেই।

মাকে মাঝে ভদ্রির মধ্যে বড় বড় পর্বত, ছোট বড় পাথরে
ভর্তি। হুং একটা এবকম পর্বতের মাঝে মাঝে দৃষ্টি আরম্ভ
পর্বতের গাছ। এই জাকালার একটা পাহাড়ের গুহার আমরা
একজন বেটাইনের মধ্যে পেলাম। আন্তরিকতার অস্ত্রহানের
মত এসা উঠের লোমের উদ্ভূত বাস করে না।

বেটাইনরা আমাদের মধ্যে এগিয়ে এসে দ্বিধা হাড়িল।
ঘেয়েবাও এল। আমায় সোনার বাখানা দাঁত হেলে তাকা
এ এক আশুপ দিগে বেখার—সবাই অস্বাভাবিক হয়ে গেল।

আমাদের পাথরে বং বেগেব তাকা হো বিবাস করতই চাই
না যে, আমরা পাথে কোনো প্রকাশ লাবা বং মাঝি।
আমাদের প্রতি নানাবর্ণ প্রেরণে বর্ধিত হতে লাগল।
আমরা যখন জন্মেছি, তখন থেকেই কি আমাদের বং লাবা,
না, অনবরত সাধন মধ্যে এসকম হয়েছে? আমরা কি
খাই? হুং আমরা পান করি কি না? আমরা কি মাঝে
মাঝে সোহে বেড়াই, না, লং সবাইই খেয়ে যেনো আমর
খাকি?

সবাই আমাদের ব্রাহ্মে থাকতে অগ্রগণ্য করলে। তাত্ত্বিক
বলে, ব্রাহ্মে তাকা সোহে এখন। আমরা অবস্থান করা
সবতে আনন্দের অকস্মতা প্রাপন করলাম, কাণ্ড আমাদের



অভিযোজন মোত হাফালাট।

ভাতে সমস্ত অন্ন এবং বহুতর মধ্যে পাড়ি দিতে হবে।
কথা বললে, মাঝে পাতি, হোমোজেন প্রত্যেকের একটি হুং
হবে। আমাদের চাপি পান দিতে যে লং দৃষ্টি হোমোজ

উপস্থিত ছিল, তাহলে তাকে চেয়ে আমাদের বিশেষ উৎসাহিত হলাম না। ওরা তখন আমাদের মনে ভাব বুকে বললে—না, এরা নয়। অর-বংশের মেয়েটা পশুপল চরিতে দিয়েছে, তাই অস্ত্র ব্যবহার করতে সুরু করেছে।

এখান থেকে বড়না হয়ে আমরা ওখানি চাটামাউরের উপরী ওখানি ডুগানের দিকে অগ্রসর হই। এখানে আমাদের দৌর ভ্রমণেরই চকু সত্যি এমন জুড়িয়ে গেল, ওখানি ডুগানের দৌর ভ্রমণ ভ্রমণের ও বুকশক্তির দিকে চেয়ে।

এখানে গভীর পাখানবীরের মাঝখানে বেটে নদী বয়ে যচ্ছে চকৎক বাতুশা খণ উপর দিকে। নদীপ্রান্ত থেকে



বুক কল্লী সৌন্দর্য।

কিছু উল্কে নদীতটের চারদিকে লক্ষ্য রাখা যাইবে। এই মরুভূমিতে কতক বয়ে এসেছে চোটি বড় জনপদ গড়ে উঠেছে, কারণ মরুভূমির মধ্যস্থ অস্ত্র সব স্থান মরুস্থানের সম্পূর্ণ অস্থলভূমি।

এই স্থানের বাড়িগুলি কাঁচা ইটের তৈরী এবং প্রায়ই চার পাঁচতলা উঁচু। মধ্যাহ্নের প্রথম যৌত্রে এই লক্ষ্য প্রায় অস্ত্র থাকে, কারণ ওখানি তটের খুল্ল ও পৈত্রিক ধর্মের মাটা পাখ থেকে লক্ষ্যের বাড়িগুলোকে পূর্ণক করে নেওয়া যায় না। উত্তাপের লক্ষ্যই বাটবে জনমানবের বেধা নেই, সবাই গৃহমধ্যে বিশ্রামের।

নিরস্ত্র উপত্যাকামিতে এবার নাথাকে হবে। ছোট লক্ষ পথ এঁকে বেঁকে মনে পিয়েছে পাঠাড়ের সা বেয়ে। সে পাঠাড় এত ভয়বোধ নে, সেই সংকীর্ণ পথে ভাঙ্গলমতে উটের দলের লেখাও বদা ভাঙতে আমাদের লক্ষ্য উপস্থিত হ'ল।

বেহুইন পদপ্রদর্শকেরা উপর থেকে নিরক্ষি পর্যন্ত সাধারণতা নিজেদের ছড়িয়ে রাখলে। গুটি করে উটের ভাব নিজেই একজন বেহুইন। মনে হল যে, উটেরাও যেন বুকতে গেছে, তাদের মস্তুরে জীবন-মরণ লক্ষ্য। একবার যদি কোনো কারণে পা পিছলে যায়, তবে নিজের পাখানমর নদীপথে পড়ে গিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হতে হবে। কিন্তু বেহুইন উটচালকের কোনও ও লক্ষ্যে অথচ ওখানি এবং বৃদ্ধমান উটবলের বুদ্ধির লক্ষ্য লক্ষ্য বিপদ উত্তীর্ণ হওয়া গেল এবং আমরা উত্তরাধীরের পথে নামবার পরিপ্রবেশ পথে নিজের উপত্যকার জাঁক খাটিয়ে নে বেলায় মত অবস্থান করার উদ্যোগ করলাম।

ওখানি ডুগানের বৃদ্ধ পাশদর্শী বেশ ভাল লোক। মস্তুরি তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। তিনি তাঁর পাঁচতলা কাঁচা ইটের গাঝির বাড়ীতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে নিরে গেলেন ও নানা প্রশংসা করলেন। লোকটি বড় আত্মসে। চারতলার উঁচু ছাং থেকে আমরা নীচের প্রাঙ্গণ দিয়ে চেয়ে দেখে তাঁর মূখ্য আমাদের পূর্বে যে উত্তরাধীরে লক্ষ্যকারী হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের গায় শুভিলায়।

যদিও সে অনেক দিনের কথা, তবুও বৃদ্ধ বা-হুয়া সে ঘটনা স্মরণ করে রেখেছেন। এর একটা প্রধান কারণ এই যে, এই সব স্থানে নতুন কিছু বড় একটা ঘটে না। জীবন এখানে সাধারণত, ওখানি প্রাচীরের মতই অটল ও বৈচিত্র্যহীন। এই একঘেরে জীবনে হঠাৎ যদি কিছু নতুন বেধা যায়, তা হলে লোকের তা মনে রেখে বেশ চিরকাল।

বা-হুয়ার আবাদস্থান গ্রিক যেন মধ্যস্থের একটি ওর্প। সেই বকম প্রাচীর, তোরণ, বুক, পথবিদ্রি। পাখরা একটা বড় লোহার কটক পার হয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করি। তারপর বড় একটা হল, তার চারিদিকে লক্ষ্য বকী লৈল-দল। মাঝখানে পুস্তপৌত্রপ পথিভূত অন্ধ বা-হুয়া। পাশদর্শীর অতিথিযন্ত্রণ আমাদের প্রতি যে লক্ষ্য প্রদর্শিত হয়েছিল, সাধারণ লোকের কাগো তা জুটে না। কিন্তু ভয়েব বিধর, কয়েকদিন মাত্র এখানে বাসন করবার পথে পুনরাব সতপথে আমাদের বাড়ী লক্ষ হল, কারণ লক্ষ্যের অভাববশতঃ কোণাও লীধকাল কাটান আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আবার নির্জন মরুভূমি ও নির্জনতর নদীপাশ। আবার ভাষার এর নাম শুণ্যমি। ওহামি এখানে বিদ্যুত বটে, কিন্তু ফুলতালবিশীল। চপ্পে অত্যন্ত গরম, ১১০° ডিগ্রী থেকে গরম চড়ল ১১৮° ডিগ্রীতে। কম্পানান উদ্ভাপ-ভরসের যথা দিয়ে অনেক দূরে অস্পষ্টভাবে হাভরাইন নামে একটা গ্রাম দেখা গেল।

এই পথের পাশে পুরাকালের কয়েকটি নদগীর খংসা-বংশে আছে, তার পরে হাভরাইন গ্রাম। আগে এখানে বহুবার বড়ই উৎপাত ছিল, বর্তমানে স্থানীয় একটি ধনী ও সম্ভ্রান্ত গৈরম পরিবারের বিরুদ্ধে স্থানটি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ। এইস্থানের অধিবাসীরা পূর্বে কখনো কোন ইউরোপীয়-জাতির নগরের স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে প্রবেশের অধুমতি বোধ দি। কিন্তু এখন আর সে অসম্ভব নেই। আমাদের আগমন উপলক্ষে বিগটি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে দেখা গেল। সাতার ঘুঘরে পট্টীন কাপড়ের লঠন। গ্রামের মোড়ল এনে আমাদের দ্বারের অভ্যর্থনা করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে চললেন। আগে আগে চললেন বিখ্যাত এল-আস্তান্ বংশের জৈনক ভদ্রলোক। কিন্তু গ্রামের

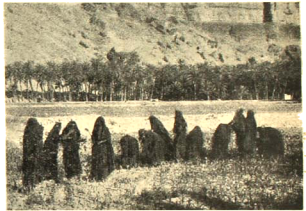
তীক্ষণ চপ্পকই ও অধিবাসীদের বারিত্রা দেখে আমাদের মন যেন নিরাশ হয়ে পড়ল।

এখানে আমরা কয়েক দিন পাকবার পরে যখন পেলাম, ডাচ গভর্নমেন্ট আমাদের জন্তে মোটরগাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছে। একদিন সকালে নগরের অধিবাসিগণ এই নতুন যানবাহন আবিষ্কারে চমকে উঠল—বিকট শব্দ করতে করতে মরুভূমির জিনের মতই সে শব্দ, শুধু নগরের ভাষাধ্বনি দেখা দিল : ছোট ছোট ছেলেরা ছুটে বাড়িবে এতটা দিকে করে ও গরমে ছেয়ে রইল। যেহেতু তাড়াতাড়ি ছাবের উপর উঠে সূর্যের অবলম্বন উল্লেখ্য করলে। আমরা তৈরী বাইরের জগৎতে যা গানি কত আশ্চর্য্য জিনিসই আছে! এটা আবার কি এল দেখ!

এই মরুভূমির পশ্চিম মোটরগাড়ী পাঠাবার খবর অনেক।

টেরিস লগনের পাননকরা আবু বক্শ লক্ষ্মি টেরিস থেকে দক্ষিণ দিকের উপকূল পর্যন্ত মোটরগাড়ী চলারসের সাতা তৈরী করবার হেতু আছে, কারণ তিনি মোটরগাড়ীর উপকরণিত বৃকছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও বটে, বাতঃপাতের স্থানীয় তত্ত্বও বটে, কিন্তু বিশেষ করে এক কারণে থেকে অল্প ভাগ্যের পূর্ণ তাড়াতাড়ি সৈন্তরূপ নিয়ে যেতে পারার সুবিধার জন্য। আবু বক্শ নিজের দরজে এই সাতা তৈরী করছেন।

এক মৎস্য উদ্ভব সীতা-মৎস্যের মোটরগাড়ী আমাদের পি



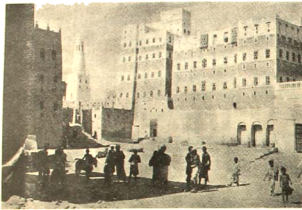
হাভরাইন : প্রকল্পের কৃষিগা আগা পরিবার কর্তৃক।

নগর ত্যাগ হবে আবার বেশিরে শড়লান। মোটরে এত দোক ও মাল বোঝাই করা হয়েছিল যে, তাতে আর ভিল মার স্থান ছিল না। নগরের বাইরে ঘোড় অরুচুমি, আগুনের মত লক্ষ্য সামনের দিক থেকে এনে আমাদের হাত ঘূর্ণ পুড়িয়ে দিচ্ছে। উত্তর-উত্তরোত্তর দিকের তুলা-শীতল হাওয়ার নতই তা অসহ্য। মরুভূমির উপরিস্থিত বাহুর উত্তাপে কেউ চুরে বেঁচে বিকৃত হয়ে দূরে দূরে নানাতরপ অব্যক্ত বৃত্তের স্রষ্টা করছে।

ক্রমে ওহামি বিদ্যুতের হয়ে পড়ছে। ওহামি আমন্ দেখানে ওহামি কাসবে দিয়ে যিশে গেল, দেখানে নদীর উচ্চ পারাবমর তট এত শক্তনে সরে গিয়েছে, আমাদের মনে হচ্ছিল, যেন বিস্তীর্ণ সাগর মগাসবৃহৎ নামে ভাঙাচ্ছে চড়ে আমবা চলছে।

মক্কতুল্লিহ মতো মাক্ক মাক্কে সত্ৰ অথবা স্থায়ী বাস্তু
খাম মেনে আতাকেনে গিরে চৈকক্কে চলে যেমন চলন্তস্থ, এতালো

লেনাপতি আদ্যদের জানালেন, দিগ্বিমসংগত স্থলতান আদ্যদের
পতীকার হয়েছেন। কফি-পানের পর আদ্যরা বিশ্রাম করতে



দিবাসের স্থানসময় প্রাপ্য : একশত বৎসর পূর্বে নির্মিত হুসেইন ইব্রাহিম মিনারপিত্তে অনেক
আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তেনম বাগর সমুদ্র বাস্তুগুপ্ত। এক একবার এবেত ঘরন
সম্মুখীন হইছি, যুগে তেতালো তেত পাত্তিতে বৃশ ভঁকে
সবাই শুবে পড়ছি। এতবার এই ধরনের বাস্তুগুপ্ত সামনে
পড়ে ঘোড়েরে এতিন পেল বহু হয়ে।

কিছুতেই টাট মিতে চার না। টেলে
টেলে অতি কষ্টে আদ্যর চালান গেল।

হঠাৎ বাস্তুগুপ্তের ঘেবপুত্র তেন কবে
বামদিকে ঘুরে দিগ্বিম্ আস্ত সুকৌশল বৃশ
ধরবে উচ্চ স্পর্শর সেবা দিল। বাস্তু
কড়ে তখন অবলম্ব হয়ে পড়েছি, গরম
গরম কফি পান করার ইচ্ছা অত্যন্ত
বলবতী হয়েছিল, একথা স্বীকার করতে
কোনো লজ্জা নেই। আদ্যদের ঘোড়-
পাড়ার হর্ষ তনে এককাল সমস্ত রকী-সৈত্র
স্পর্শপ্রাচীরের উপর আবির্ভূত হল।
তাদের গোণে যুগে বিজয়ের সূত্র, নিশ্চয়ই
ঘোড়পাড়ার প্রাণে ধরনে। আদ্যরা

চৌজি বসগাম—তোষাবের সেনাপতিক ডেকে ধাও।

সুর্গে নথো প্রবেশ করতে আদ্যরা অসুস্থতি পেলান।

প্রাণে মর্যাদিকা বলে ভুল হয়েছিল। লোহার কটকট
মথো দিবে আদ্যরা সমস্ত প্রবেশ করলান। দিবাসের স্থলতান
আনবেদন, বখেই সন্যাসের সঠিত অভ্যর্থনা করে তাঁর



দিবাস-স্থলতানের প্রাপ্যের চতুর্দশ। জায়গার ও কৌশল সেটসংগত সঠিত থাকা-পাতি
কালি এই কালান আধুনিকতার পরিচয় দিগ্বিম্।

গোণানে নিয়ে গেলেন। স্থলতানের বৃহৎ হাসপাতাল ও কাঁচা

ইটের তৈরী। এসেছে কি রাজপ্রাসাদ, কি মগজিব, কি

চূর্ণ—সদ্যে এই উপাধানে নির্মিত। অথচ কি শ্রুত্বও বৃদ্ধি !
কামিখাউতেও প্রপাতিদের প্রপাতি না করে পারলাম না।

হাতের দিকে অধিবাসীদের দৃষ্টি নেই। পূর্বের প্রপাতি
বড় বড় বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ীর সামান্য, সামান্য প্রকৃতি
থেকে তাদের ভিত্তির খোল বার করা আছে হাতের দিকে।
বাড়ীর বাহ্যিক বস্তু নোংরা জল তাদের খোল থেকে হাতের
উপরই পড়ে। হাতের নাকখন থেকে আবার খোলা পাকা
জেন, ঘরনা ও কাঁচকাঁচের তা কানার কানার চিত্র। হাতের
জাগ্রত-এক বিশেষ, সব সময় উপরের দিকে চোখ রাখতে
হবে, কোনো বাড়ীর নোংরা জল নতকে বসিত না হয়।

আমরা এখন নিধানে ছিলাম, বঙ্গেরেই হতো সে সময়
সকলোকে। পরম। দিনমানে একটু রোগ চকলেই মগন

নিম্নক, পথে লোকজন দেখা যায় না, কেবল মাত্র পূর্ব-
পূর্বের হাতের পল্লীর কূপ থেকে কল্যাণালমকারী উঠের
শরৎ ও কীলোকবিগের পাখী তাড়াতাড়ি উড়ে হাতের
ও চৌকর হাড়া অল্প পথ পোনা যায় না। প্রপাতি
নবকায়ী মনেছে চাটবিলে। কষ্ট ভুলে গাফার কষ্ট
পুষ্কার চোঁটা করাই ভাল। পূর্বা অল্প হাতের পরে মগন
মজীং হয়ে ওঠে, হোকানে জেটানের ভিত্তি হয়, পথে পথিকের
ভিত্তি হয়। ধনী লোকে মগনের বাটরে বাগানবাড়ীতে
থিয়ে মান ও সাজা উপাসনা করে, বাড়ীর ছায়ে মজলি
বলে, তা ও কাকি পান মুক্ত হয়।

তবুও বাহ বার এক কথা আমায়ের মনে উঠেছে—এ দেশে
বাগ করে মাথুয়ে কোন্ জুয়ে ?

স্বত্বাহীনতা

—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জীবনের ব্যাপনে বৃথাপনে চাতি ভেঙেছি কি কোন দিন
এ অমৃত লোকে,
অনন্দ-অমোঘজনি খেয়ে গিয়ে সব ঘাটতিয়া বিমলিন
মুষ্টি হয়ে চোখে !
নিবিড় কাকল-যোগে বনীভূত হবে জটুট-ভীষণরাতি
আকাশ ভগ্নিয়া,
দ্রুত অবেগভরা বাতাইয়া বাণী উঠিবে বটিকাছুক
আলোক হরিয়া।
মানবের পূজোদ্ধৃত বেবনার গান শুনিবে বিগমভায়ে
সকল লোকে !

ভাবনী শরীরী আর পোহাবে না পুনা—খড়ীকীর হৃদয়ে
কল্যানের তুণে,
নিঃশব্দ চরণ ফেলি তুমি যাবে বোঝা ? আদর্শে বেবতা হবে
রক্ত ভীষণে,
মহাকাল নিম্ন হতে উৎস্র মজীত কানিবে তরঙ্গ তুলি
বোমপুণী নিরা,
দূর দিগন্তপথে অগাধ অঘাতে যোগদয় তপসীর
চন্দ্রকিবে দিয়া,
এই হ'তে বন্যভবে কাঁচিয়া কাঁচিয়া ধ্বংস হবে বনপতি
মহাকাশবলে !

জীবনের সিংহনাবে কাচরপরাণ পুশল করতুকে
করিয়ে নিম্নে,
সংস্কৃত বিগমভায়া হবে শিশুহারা অকতবে মগ প্রবে
লয়ে গাবে নিম্নে।
মর্দগটে শীলাভিত রক্তমগ্নেগাবে হারাইবে নিঃশব্দে
বন্যের পাখী,
বহনীর প্রানমেহ না পেরে মজিত। চিরতরে মূর্ধিবে যে
আপনার আঁখি
কলাপটির আঁঠিনায়ে নামিবে বহন্য মেঘিনী কাঁপিয়ে সব
বাহুকাঁধ বিধে।

তবে কেন বিলাপের বননার তত ঐশ্বর্যেই লগাটিকা
পরি সাক্ষেপে,
খেয়ে গাবে স্বাধীনতার বিশুল নষ্টন তোমারি আঁখির শিখা
নিম্নে গাবে গেয়ে।
আগুন লেগেছে দেখা অশনিপথে কিরাও তোমারি বন
সেই দিকে আঁখি,
আপনারে হ্রিক্ত করি নিভাও তাহারে উঠুক তোমারি পুণে
অগম্য বাতি,
তোমার জীবন হ'তে বীড়ে বহি জীব, স্বত্বাহীন হয়ে তুমি
ক'র তই হলে।

সনাতন গোঁস্বামী সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যা।

— শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

চরিত্রায়ত রচনার পূর্বে (১৬১৭ খ্রিঃ-অঃ-র পূর্বে)
রূপ-সনাতন সম্বন্ধে অজ্ঞাত।

শ্রীপাদ সনাতন গোঁস্বামীকে কর্ণপূর্ব "গোড়াচিত্রতন্ত্রঃ
সঙ্গীতঃ" বলিয়া পৌরঃপোন্দ্রকৌপিকার বর্ণনা করিয়াছেন
(১৮২ শ্লোক) । সনাতন গোঁস্বামী খ্রীষ্টতন্ত্রের কোন লীলা
বর্ণনা করিয়া কোন গ্রন্থে এমন কি কোন অষ্টকাবিও লেখেন
নাই । কিন্তু তাঁহার প্রস্তুতিতে খ্রীষ্টতন্ত্রের লীলা ও তৎ-
বিশেষ কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায় । সেই সব বইবার গুরুত্ব
বৃত্তিতে হইলে প্রথমে খ্রীষ্টতন্ত্রগোষ্ঠীতে তাঁহার স্থান সম্বন্ধে
কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন ।

বৃন্দাবি ওপু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত ভূটীয়া লঙ্কামেঘ অষ্টাদশ
অধ্যায় বানকর্ণি গ্রামে খ্রীষ্ট১৩৩৮ সপ্তম সনাতনের প্রথম
দিলন বর্ণনা করিয়াছেন । ঐ বর্ণনাগারে মনে হয় যে, সনাতন
খ্রীষ্টতন্ত্রের রূপা পাটবার পূর্বেই সাধনসঙ্কোচ উদ্ভবের
অনন্তর হইয়াছিলেন । খ্রীষ্টতন্ত্র রামকর্ণিতে আদিগায়েছেন
তিনিগাঠ সনাতন তাঁহার সচিত্র সাক্ষ্য করিতে আসিলেন ।
তিনি বৈষ্ণবোচিত বৈষ্ণবলব্ধকারে খ্রীষ্টতন্ত্রের নিকট অস্ত্র-
সমর্পণ করিলেন । খ্রীষ্টতন্ত্র বলিলেন, "তুমি নিকটেই
বৃন্দাবনের পরিকর । আমি তোমার সহিত মধুবা বাটেতে
টঙ্কা করি । তুমি বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ প্রকট করিবে"
(৩১৮৪-৬) । সনাতন তাঁহাকে বলিলেন, "নির্জন বৃন্দা-
বনে জনসংঘের সহিত বাইরা কি হইবে?" তিনি
খ্রীষ্টতন্ত্রের ভগবত্ত্ব শাস্ত্রের দ্বারা নিজের সংসার-মুখল ছিন্ন
করিবার প্রার্থনা জানাইলেন । খ্রীষ্টতন্ত্র বলিলেন, "কৃষ্ণ
তোমার মনোবৃত্ত পূর্ণ করিবেন" (৩১৮১১) । সনাতনের
কথা শুনিয়াই খ্রীষ্টতন্ত্র বৃন্দাবনে বাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়া
পৌরুষে ব্রহ্মচর্য লীলাঙ্গে করিয়া পেলেন ।

কবি কর্ণপূর্ব খ্রীষ্টতন্ত্রচন্দ্রাবত নাটকে ও খ্রীষ্টতন্ত্র-
চরিত্রায়ত বধাকাব্যে সনাতনের সহিত খ্রীষ্টতন্ত্রের দিলন
বর্ণনা করেন নাই । কাশীতে সনাতনের প্রতি খ্রীষ্টতন্ত্রের

ভূপাথ কথা তিনি নাটকে লিখিয়াছেন (২৪৬) । কর্ণপূর্ব
সনাতনকে "গৌড়েশ্বর নৃসিংহবৃন্দাবনি" বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন (২৪৭) ও লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টতন্ত্র অবতীর্ণকৃতি
সনাতনকে দেখিয়াই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । নাটকে
বর্ণিত হইয়াছে যে, খ্রীষ্টতন্ত্র বৃন্দাবন হইতে কিরিবার পথে
প্রয়াগে খ্রীষ্টতন্ত্রের প্রতি ভূপা প্রকাশ করেন ; তৎপরে
বাস্যগণ্যে আসেন ও সনাতনের সহিত মিলিত হন । কিন্তু
বাস্যগণ্যের ঘটনা বলিবার সময় বার্তাধারী প্রত্যাপকভূক্তকে
বলিতেছে—

কলেন ভূপাথমেদিগাঠী

লুপ্তিত ত্য্য ব্যাখ্যাক্রিঃ ধিগিৎ ।

ভূপাথক নাতিথিত মেঘ

ভূপাথক সনাতনক । ২১১৮

অর্থাৎ, কালক্রমে বৃন্দাবন সম্বন্ধীয় খ্রীষ্টকলীলাকথা বিলুপ্ত
হইলে খ্রীষ্টতন্ত্র পুনরায় তাহা বৈশেষকপে প্রকাশ করিবার
অভিপ্রায়ে ভূপা ও সনাতনকে তথায় ভূপাশ্রিত দ্বারা অভিধিক
করিলেন । মোকটীর চতুর্থ চরণের "ভূপাথ" লব্ধে কোন স্থান
বৃন্দাইতেছে? নাটকের বর্ণনার ক্রম দেখিয়া মনে হয়
বাস্যগণ্যে বৃন্দাইতেছে । ১৬০৭ বর্ষাষে অষ্টমতমঃস্বীয় প্রবুদ্বাদ
ত্রাদিকান্নাথ গোঁস্বামী বৃন্দাবন হইতে খ্রীষ্টতন্ত্রচরিত্রায়তের যে
সংস্করণ বাহির করেন, তাহার সংস্কৃত চীকার "ভূপাথ"
— "খ্রীষ্টবৃন্দাবন এব" ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সুদীর্ঘা কলেকের
অব্যাক তাহাযোগ্যবিশ্বনাথ "ভূপাথ প্রয়াগে কাশীপুর্বাঞ্চল দ্বারা
বৃন্দাবনে" বলিয়া পাঠ্যকে বড়ই সুবিধে দেখিয়াছেন
(বাণ—১৫: ৫: ২১১১১১ পর) । ভূপাথক কবিতা
কলেন যে, প্রয়াগে খ্রীষ্টতন্ত্র ও অষ্টমতমের সহিত খ্রীষ্টতন্ত্রের
সাক্ষ্য হয় । খ্রীষ্টতন্ত্র উপদেশ বিহার পর খ্রীষ্টতন্ত্র বন্দন
কাশীতে বাইবার ভক্ত বাহির হইলেন, তখন খ্রীষ্টতন্ত্র তাঁহার
সহিত বাইতে চাহিলেন । খ্রীষ্টতন্ত্র কিন্তু তাঁহাকে বৃন্দাবনে
পাঠাইয়া দিলেন (২১১১১১১-২০১) । কাশীতে বন্দন
সনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষ্য হইল, তখন খ্রীষ্টতন্ত্র লেখান

ছিলেন না। হুতরাং একস্থানে চুই ভাইকে কৃপা করা সম্ভব হয় না। রূপ-সনাতন লম্বে কোন ঘটনা-বর্ণনায় কল্পনামাত্রের সহিত কর্ণপূত্রের বিরোধ থাকিলে, কবিতায় গোবামীর কথাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করিতে হইবে। কেন না কল্পনায় কবিতায় ঐক্যের সঙ্গ পাইরাছিলেন। কর্ণপূত্রের মধ্যে ঐক্যের ঘনিষ্ঠতার কথা জানা যায় না। হুতরাং নাটকে “হট্টবন” শব্দে একস্থলে ঐতিহ্য রূপ-সনাতনকে কৃপা করিয়াছিলেন বলা ভুল।

কর্ণপূত্র রূপ-সনাতন লম্বে আর একটি ভুল সংঘটিত দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে, সনাতন, অহুস ও রূপ, এই তিন ভাই একত্রে ঐতিহ্যকে নীলাচলে সর্পন করিয়াছিলেন ও ঐক্যপ্রবর্তক ব্রহ্মহুতি ঘাটা গাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন (মহাকাব্য ১৭। ২-২৪)। কল্পনায় কবিতায় বলেন, ঐক্য ও অহুস কৃপাশ্রয় হইতে গোড়ে দিরাই আসিতেছিলেন।

এই মতে চুই ভাই নৌদেখেন আইলা।

বৌড়ে যদি অহুসের বসাহাতি হৈলা (৭১)।

ঐক্য একা নীলাচলে দিয়া ঐতিহ্যের ঐক্যে উপস্থিত হইলেন।

সনাতনের বার্তা কবে গোমাকি পুছিল।

রূপ কবে গাঁহ লবে দেখা না হইল।

আদি বসাহুস আইলার চেয়ে চাকসে।

অতঃপর আবার দেখা হইল হাঁহ লম্বে।

প্রাচীন ভলিল চেয়ে দেখা কৃপাশ্রয়।

অহুসের বসাহাতি বৈল বিকল (৭২)।

ঐক্য বোলবাতা পর্ষদ অর্থাৎ বন মাস (১০৪২৪) পৃষ্ঠে থাকিয়া কৃপাশ্রয়ে কবিতা পেলেন (১০১১৬০)।

নীলাচলে হুত রূপ বৌড়ে ঘর ফেলা।

বহুদে হুত সনাতন নীলাচলে আইলা (১০৪২৪)

এই মতে ইহা রূপ দিয়া লম্বে।

ইহা হুত বৌড়ে ফেলিলেন। (১০৪২৪)

এখানেও কল্পনায় কবিতার প্রথম বিবরণ কর্ণপূত্র-বর্ণিত বিবরণ অংশক অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়। এই চুই ঘটনা লম্বেই লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কবিতায় গোবামী কর্ণপূত্রের নাটকের ১০৪৬, ১০৪৭, ১০৪৮ স্লোক উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

দিল হুত কর্ণপূত্র বিবাহ করিল।

সনাতন অহুস প্রলম্ব রূপকে লিখিল। (১০৪২৪৬)

পুনরাব ১০৪৮ স্লোক ১০১১১-১০৪৮ পর উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

বিলম্ব সেনের পুত্র কবি কর্ণপূত্র।

রূপে দিল হুত লিখিয়াছেন অহুস।

কর্ণপূত্র নাটকে আর চুইটি স্লোকে সনাতনের প্রতি কৃপা ও একটি স্লোকে রূপের প্রতি কৃপা বর্ণনা করিয়াছেন। চুইটি বা একটি স্লোকে “বিস্তার করিয়া” ও “লিখিয়াছেন অহুস” বলা কতক লম্বে হুতীসঙ্গ বিবেচনা করিবেন; কবিতায় গোবামী কর্ণপূত্র-বর্ণিত ঘটনা সীকার করেন নাই, তথ্যটি লিখের বর্ণিত বিবরণের বিপরীত ঘটনামূলক স্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাও পূর্বাচরণকে প্রতিবাদ না করাই বৈজ্ঞানিক সীতি, অথবা ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক লেখকগণ বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করেন না। তাই সে লম্বে কবিতায় কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই।

কৃপাশ্রয়নাগ ঠাকুর ঐতিহ্যভ্রমণের সময় অহুসের ঘর

অহুসের ও অহুসের অহুসের প্রথম ঐতিহ্যকে “রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাপুত্র” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রূপ-সনাতন লম্বে তিনি যে সংঘটিত দিয়াছেন তাহা কর্ণপূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ভাষা স্মৃতিমূলক। তিনি অহুসের মন অহুসে লিখিয়াছেন যে, নীলাচলে রূপ-সনাতন একই লম্বে অবস্থান করিতেছিলেন (১০৩ পৃঃ)। অহুসের বিকট ইহাও পক্ষের পক্ষের বিবাহ লম্বে ঐতিহ্য বর্ণিতছেন—

সনাতন বার্তা কবে গোমাকি পুছিল।

বহুদে কবে রূপে লম্বে না হইল।

অহুসের কল্পনায় যে ও হুত (১০৩ পৃঃ)।

পূর্বে ঐতিহ্যভ্রমণের সময় হুত বোলাইয়াছি যে, রূপ নীলাচলে হুত চলিয়া গাঁহবার বসনিন পূর্বে সনাতন তথ্য আশ্রয় করেন এবং নীলাচলে আবার পূর্বে চুই ভাইয়ের মধ্যস্থ সাধ্য হয় নাই। বলা—

সনাতনের বার্তা কবে গোমাকি পুছিল।

রূপ কবে গাঁহ লবে দেখা না হইল। (১০৪২৪)

প্রাচীন রূপ-সনাতনের কথা অতি অল্পই জানিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

উক্ত-চৈতন্য ভট্টাচার্য্য কৃতঃ ।

বহিঃস্থান হই তাই দেখা নীলাসনে ।

বহিঃস্থান পূজায়াঃ সৎকার্য্য কৰ্ম্ম ।

হই তাইই নাম হইল রূপ-সনাতন । ১৪১ পৃঃ ।

রূপাধন্যবাসের মতে রূপের উপাধি বা পদ ছিল বহিঃস্থান অর্থাৎ বাস ঘর (private secretary) । অসানন্দ বাণী তাহার একপাশে অস্ত্র ছিলেন, তাই বহিঃস্থান উপাধিকে বহিঃ ও খাস এই দুই পদে বিভক্ত করিয়া তাহা রূপ ও সনাতনের নাম তাহািহাছেন ।

লোচন “ঐচ্ছন্তমবলম্ব্যে”র প্রাণ্ডে রূপ-সনাতনকে বর্ণনা করিয়াছেন (পৃঃ ৩) ; কিন্তু প্রথমণ্ডে কোণাও তাঁহারই প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই । “শেষবর্ণে” ঐচ্ছন্তমের স্তম্ভাধারীর মধ্যে অবধন ও গুণা বর্ণনা করায় পর তিনি লিখিয়াছেন—

ভক্তি বিহীন সনাতন আর হইলো ;

উৎকলের সঙ্গে কালি হাড়ের নিম্নান । (পৃঃ ১১৭)

ঐচ্ছন্তম ত্রিবেদ্যবানের সময় সনাতন নীলাসনে ছিলেন বা ত্রৈলোক্যবাসী ভীষ্ম ছিলেন, এ কথা অস্ত্র কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না । লোচন এক্ষণে ত্রৈলোক্যবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয় ।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঐচ্ছন্তম-চরিত্রসূত্র রচিত হইবার পূর্বে কোড়ম্বলে রচিত ঐচ্ছন্তমের ভীষ্মনামক রূপ-সনাতনের কথা বিশেষ কিছু নাই ; অথচ সত্ব প্রণয়ী ভীষ্মসিংহের নাম সনাতনে উল্লেখ করা হইয়াছে ।

রূপাধন্য কবিরাও গোঁস্বামী ঐচ্ছন্তমচরিত্রাসূত্রের অধ্যায়-লিপ্যত্র প্রথম পরিচ্ছেদের ২১-৩৬, ৪০-৭৫, ১০৪-২১০, ২২৭-২৩১ ও উনবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ এবং অন্ত্যালোচনা প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে রূপ-সনাতনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন ।

প্রধানতঃ এই বিষয়গণ অণুলবন করিয়া ঐচ্ছন্তম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিচারের প্রথম পঞ্চ-প্রদর্শক বাহ্যিকের ভট্টর বীণেশচন্দ্র সেন তাহার Chaitanya and His Companions গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায় রচনা করিয়াছেন । ঐ অধ্যায়ের একটি ভক্তি সংশোধন করিয়া পাঠ করা প্রয়োজন । ভট্টর সেন লিখিয়াছেন যে, “Rupa met Chaitanya at Benares where the latter took pains to in-

struct him in the cardinal points of the Vaishnava religion (১৮ পৃঃ) । রূপাধন্য কবিরাওয়ের মতে ঐচ্ছন্তম রূপকে প্রাণ্ডে শিক্ষা দিয়াছিলেন । বলা—

এই মত বর্ণনায় অসঙ্গ হয় ।

জ্ঞান পিতা বিল পতি সত্যবিত ।

ভট্টর সুশীলসুন্দর দে “পতাবলী”র যে পাত্তিত্যপূর্ণ সংস্করণসূচক স্মরণ ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ত্রুটিসূচক (xvii পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, কণ্ডিতে রূপ, অহুশর ও ঐচ্ছন্তমের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎ হয় । এ উক্তি রূপাধন্য কবিরাওয়ের বর্ণিত ঘটনার বিরুদ্ধ । যোগ হয় ভট্টর দে ঐচ্ছন্তমসংগ্রহের নাটকের পূর্বোক্তিত্তিত “তৈব্র” শব্দ অহুশর করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন । ঐচ্ছন্তম-চরিত্রসূত্রে বর্ণিত রূপ-সনাতন শিক্ষার ঐতিহাসিকতা তিনি স্বীকার করেন না । “But to hold Chaitanya responsible for every fine point of dogma and doctrine elaborated by Sanatana, Rupa and Jiva would indicate an undoubtedly pious but entirely unhistorical imagination.” (xxv-vii).

রূপ-সনাতনের জ্ঞাত্তি বিচার

রূপাধন্য কবিরাও রূপ-সনাতনের মূখ্য বিষয় বলিয়াছেন—

নীলমণ্ডিত বীণেশ্বরী কবি নীলকোষ ।

চোরাহা অগ্রেতে মদু । করিতে ঘনি লগ্ন । ১১১১১১

চৈতন্যের চৈতন্যসৌ কবি (৪৪৪৪৪৪) ।

চোরাহাঅগ্রেতে মদু । করিতে ঘনি লগ্ন । ১১১১১১

সনাতন বর্ণে—নীলমণ্ডিত যোগ ওষ ।

অর্থ অর্থন বর্জ—সত্যের সত্যবর্জ ।

যে বর্ণে মূখ্য হাড়ি কৈল অলীক ।

চোরাহা কৃপাতে মদু মদু মদু মদু । ১১১১১১

এই সব উক্তি সেবিয়া, বিশেষতঃ “নীলমণ্ডিত” ও “নীল বর্ণ” শব্দ সেবিয়া কোন কোন পণ্ডিতক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রূপ-সনাতন অথবা ভীষ্মের পিতা কৃষ্ণদেব মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন ।

পণ্ডিতবর শ্রীকৃষ্ণ বল্লভসুন্দর চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন— “রূপ-সনাতনের আদিভাবের কিছুকাল পূর্বে গিয়াছিল ঐ নামক একজন মুসলমান শ্রীমদ্বর্ধ প্রাচ্যার্ণব বংশের জেলায় আসেন । রূপ-সনাতনের পিতা ঐ সময় বংশোদ্ভব জেলায় বাস করিতেন ।

সম্ভবতঃ তিনি গিয়াই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন" (ভারতবর্ষ
প্রাণ, ১০৪১, পৃ: ১৭৭-৭৮)।

তপ-সনাতন সঙ্কেত কল্যাণ কবিরাভের অজ্ঞাত উক্তি
যেখানে কিছু এষ্ট অনুমান বর্ণনা বলিয়া মনে হয় না। তিনি
নিশ্চয়ই হে, বামকেলিত্রী ঐতিহ্যের সহিত সাক্ষাৎ
করার পর—

হুই হাই কিল্লারগের উপর পড়িল।

কল্লার গিয়া হুই কল্লার পড়িল।

কল্লার কল্লার হুই পুতুল।

অজিত পাইবের উত্তরকাল ৪ ১০২১-২২

সনাতন সাক্ষাৎকার উপস্থিতি না হইয়া—

কল্যাণ পড়িত লিখিত লগা।

কল্যাণ কল্যাণ করে সঙ্কেত কল্যাণ ৪ ১০২১-২২

যদি তপ-সনাতন বা তাঁহাদের পিতা মতাই মূলসময়
হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের শব্দে পুণ্ডরীকের জন্ম ও
তাপসবিশেষের জন্ম আশ্রয় পাওয়া সম্ভব হইত না। আশ্রয়-
সময়ের অন্তর্ধান তখন খুব প্রবল ছিল। তপ-সনাতন
মূলসময় হইলে সে কথা কল্যাণ কবিরাভের পূর্ববর্তী সকল
লেখক একযোগে চাপিয়া ধাইবেন হইতে সম্ভব মনে হয় না।

ঐতিহাসিক বিচারের একটি মূলত্ব হইতেছে এষ্ট যে,
ঐহায সঙ্কেত কথা তাঁহার নিজের উক্তি পাওয়া গেলে তাহাই
সাধারণতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ অথবা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ
করিত হইবে। অতএব সেই ব্যক্তির যদি সত্যগোপন করা
অভ্যাস থাকে বা বৃত্তিজন্য হইয়াছিল প্রমাণিত হয়, তবে
তাঁহার কথা বিশ্বাস করা যায় না। তপ-সনাতনের ক্ষেত্রে
বৃত্তিজন্যের কথাই উঠিতে পারে না। তাঁহারা যে যেজায়
পিতার বা নিজের ধর্মাত্ম-গ্রহণ-বৃত্তি গোপন করিয়া
ধাইবেন একথাও বিখ্যাত মনে হয় না। তাঁহারা রাজমন্ত্রী
হিসাবে বহুতঃ মানসময় পাইয়াছিলেন—সোতকিন্দার ভয়ে
আশ্রয়প্রদত্ত গোপন করিবার লোক তাঁহারা নহেন।
সংসার জীবনের আশ্রয় গ্রহণ-এবং ত্যগ করিয়া তাঁহারা
ইচ্ছাপূর্বক সত্যগোপন বা বিধাতাশ্রয় করিবেন, ইহা বিশ্বাস
করিতে প্রস্তুতি হয় না।

সনাতন বৃহদ্রথবাস্তুভের তৃতীয় সোতের বহুতঃ উক্তি
নিশ্চয়ই—“শব্দ ও ভক্ত: বহিঃকৃত্যো যো তপ: কণ্ঠি-

বেশবিখ্যাত-বিশ্রুত্যাচাণ্ডী ঐতিহ্য-গুরুবংশভিত্তি-ঐহাযাত্মক
পৌরুষেণৈ: য: ঐতনানা বৈজ্ঞান্যবস্ত্রেন সাংসারি:।”
এখানে সনাতন তপকে বিশ্রুত্যাচাণ্ডী বলিতেছেন। তপ
সনাতনটিকে নিশ্চয়ই—

বহিঃকৃত্যো বহিঃকৃত্যো বহিঃকৃত্যো:

বহিঃকৃত্যো বহিঃকৃত্যো বহিঃকৃত্যো:

বহিঃকৃত্যো বহিঃকৃত্যো বহিঃকৃত্যো:

বহিঃকৃত্যো বহিঃকৃত্যো বহিঃকৃত্যো:

এখানেও তপ-সনাতনকে আশ্রয়বংশকরণ বলিয়া বৃন্দনা
করিয়াছেন। ঐহাযগোবান্দী ভাগবতের লক্ষ্যভাবের অন্তে
তপ-সনাতনের বংশপরিচয় বিবর্তন। তাহাতেও তাঁহা যায়
যে, তাঁহারা আশ্রয় ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত “উত্তরভাগবত”
লিখিত আছে—

সনাতন তপ-সনাতন সনাতন সনাতন

সনাতন সনাতন সনাতন সনাতন (পৃ: ১০২)

ইহাতেও সনাতনের আশ্রয় পড়িত হয়।

তবে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মূলসময়
সরকারে চাহুরী করায় জন্ম তপ-সনাতনের পাতিভাগ্যি লোক
পড়িয়াছিল। সনাতন গোবান্দী ইহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন।
তিনি বৃহদ্রথবাস্তুভে লিখিয়াছেন—“ঐহাযা বহিঃকৃত্যো
অনেকা বা রাণিগা [পুত্রাভী] বা আশ্রয়ীকী প্রাতিগা তজনা
করেন, তাঁহাদের পাতিভাগ্যি লোক হয় না, প্রত্যুত তাঁহারা
বহুতঃ ওপ লক্ষ্যই করিয়া থাকেন।” ১০২১-২২।

ঐতিহ্যের সহিত সাক্ষাৎকার পূর্বক সনাতন

ঐহায ও সনাতন গোবান্দী তাঁহাদের প্রথমভাগে অশ্রয়প্রদ
পাতিভাগ্যি পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা যদি ঐতিহ্যের
সহিত সাক্ষাৎকার পূর্বক বাস্তবতা না করিবেন, তাহা হইলে
একশ পাতিভা অর্জন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।
ঐহায গোবান্দী লক্ষ্যভাবের অন্তে লিখিয়াছেন—

যে ঐহাযবস্ত্র: সনাতন সনাতন সনাতন

সনাতন সনাতন সনাতন সনাতন

সনাতন: ঐহাযবস্ত্র: সনাতন সনাতন

সনাতন সনাতন সনাতন সনাতন

ঐক্যের অসাধারণ বর্ণনা দেখা বাইতেছে। গ্রন্থনতলের তখন-প্রাণালীর প্রবর্তক শ্রিত্তপ—সনাতন নহেন। রত্ননাথ দাস ও তৎকালীন কবিগণের প্রাণবিশিষ্ট ও এই বাণী কল্পে। বর্তমান কালে গোড়ার বৈক্য স্বর্গের সংসারকামী পৌড়োৎ মঠ ও “জগদ্বন্দ্ব তত্ত্ব-প্রাণালী”র পুনরুজ্জীবন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

এইবার সনাতন গোবিন্দীর শুক কে সেই হিসাবে কিত্রিয়া আনা বাউক। বৃহদ্রাগবতাস্ত্রের দশম ও একাদশ স্কন্ধে হইতে জানা বাইতেছে যে, ঐষ্টৈতস্ত্রকেই তিনি গুপ্তবৎ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রকাশনি Pilgrims Progress এর দ্বারা সনাতন গোবিন্দীর আধ্যাত্মিক অহুত্বের রূপক। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ সত্যাস্ত্রসংক্রান্ত গোপন্যূষ বহু সনাতন। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের ৩৩ সংখ্যক স্কন্ধে আছে যে, কামাখ্যা দেবী যন্ত্র উক্ত গোপন্যূষকে বশাকর গোপালময় উপদেশ করেন। এই বশাকর গোপালময় বাবদেহপুত্রীর, ঐশ্বর্যপুত্রীর ও ঐষ্টৈতস্ত্রের উপাসিত হয়। তৎসংস্পর্শবিশিষ্ট গোপন্যূষকে বলিলেন—

কৌতুকাট্টে ভর্যে দাখ্যত্রাক্ষণেরঃ

কল্পনামা কল্পনামাভ্যন্তরং মনঃ কল্পঃ ১ বাণ১২২

অর্থাৎ, “কৌতুকেণে ভর্যে নামে এক দাখ্যে ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি কল্পের অবতার এবং তিনিই তোমার মনঃ গুহ।” পৌড়বশে পক্ষীতরে ঐষ্টৈতস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও কল্পের অবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। সেই জন্য উক্ত ভর্যে ঐষ্টৈতস্ত্রেরই রূপকাকারে গৃহীত নাম বলিয়া মনে হয়।

এই সকল প্রকাশনলে আদি অস্থান করিতেছি যে, ঐষ্টৈতস্ত্রই সনাতনের শুক। অবশ্য এই অস্থান বৈক্য-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের বিরোধী। শ্রীমুক্ত বাণ্যগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন—“বৈক্য শাস্ত্রাঙ্গসারে শ্রীমদ বহাগ্রন্থ হইলেন বহু ভগবান্ ঐষ্টিক। ঐষ্টিক তত্ত্বঃ সমষ্টগুহ হইলেও ব্যষ্টগুহর ব্যক্তি তিনি করেন না; তিনি নিজে কাম্যকেও বীক্ষা যেন না। বোধ্য ভক্ত ব্যক্তি বীক্ষাযান করাইবা থাকেন।”

আলোচ্য মঙ্গলাচরণে সনাতন শার্মভৌব ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাব্যাপ্তি, বিদ্যাক্ষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, বামরূপ ও

বাণ্যবিশালকে বন্দনা করিয়াছেন। ইত্যেবং মধ্যে প্রকল্পাক্ষ ঐষ্টিকন ছাড়া অন্যর চারিজনই নান ঐষ্টৈতস্ত্রগোষ্ঠিতে পাওয়া যায় না। কোন বৈক্য-বন্দনার প্রেক্ষাক্ষ চারিজনই নামের উল্লেখ নাই। সুতরাং অস্থান হই যে, ঐষ্টৈতস্ত্রের সহিত সাক্ষ্য হইবার পূর্বে ঐ ভর্যেন পত্রিতের নিকট সনাতন শিক্ষাগত করিয়াছিলেন। এই অস্থানের সমর্থন হিসাবে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া। প্রথম, সনাতন নীলাচলে বাসকালে শার্মভৌবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন একজন প্রমাণ নাই। সেই জন্য মনে হয় শার্মভৌব বন্দন বৌদ্ধ দ্বেশে থাকিয়া ছাত্রবিশিষ্টে স্তায়শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, সেই সময়ে সনাতন তাঁহার নিকট পড়িয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তত্ত্ব-ব্রহ্মাকর মতে—

ভ্রামহুত বাবা নিমকুত মে কল্পঃ।

সনাতনকল্পঃ বসিল সে কুত হই ১ (৩২ পৃঃ)

সনাতন বৃহদ্রাগবতাস্ত্রের (১৩৩৩) দ্বাদশাঙ্কে জানের পরিচয় দিয়াছেন।

ঐষ্টৈতস্ত্রচরিত্রাস্ত্রের মতে ঐষ্টৈতস্ত্র রূপ-সনাতনকে বসিত্তেছেন—

সৈকল্পদ্বী তিথি বৈষ্ণে পট্টাইলে বাহ্যরে।

সেই স্তম্ভাঙ্গ ভাবি চোমার ঘরায় ১ (১১১৩৩)

ভক্তিহর্যাকর-প্রপেতা বহুবিধ চক্রবর্তী নগোত্তমবিশালপে লিখিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভর বন্দন নংখোলে ছিলেন, “তখনই রূপ-সনাতন তাঁহার নিকট গয় লিখিয়া আত্মগদর্পণ করিয়া ছিলেন ও তাঁহাকে দর্শন করিবার কল্প ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি রূপ-সনাতনের পার্শ্ববাসীভবন বিধে আরও কয়েকটি সূচাবান সংবাদ বিদ্যাছেন। বলা—

কৌতুকাট্টে ভর্যে দাখ্যত্রাক্ষণেরঃ

কল্পনামা কল্পনামাভ্যন্তরং মনঃ কল্পঃ ১

কল্পনামা কল্পনামাভ্যন্তরং মনঃ কল্পঃ ১

সনাতনকল্পঃ বসিল সে কুত হই ১ (৩২ পৃঃ)

সনাতনকল্পঃ বসিল সে কুত হই ১ (৩২ পৃঃ)

সনাতনকল্পঃ বসিল সে কুত হই ১ (৩২ পৃঃ)

সনাতনকল্পঃ বসিল সে কুত হই ১ (৩২ পৃঃ)

সনাতনকল্পঃ বসিল সে কুত হই ১ (৩২ পৃঃ)

সনাতনকল্পঃ বসিল সে কুত হই ১ (৩২ পৃঃ)

সনাতনকল্পঃ বসিল সে কুত হই ১ (৩২ পৃঃ)

সনাতনজন পৌত্তলিক গ্রন্থ অতি।

ঐশ্বর্য্যে সীমা নে আশ্রয় সব তাঁর।

[অগ্ৰত্ব ক্রিয়া—৭: ১]

এংলিং (Egging) নামের বলেন যে, সনাতন গোবান্দী-
রূপ তৎসংবাদীপিকা নামে দেবদূতের এক চীকা India
Office Library-তে আছে (India Office Catalogue,
Vol. II (pp. 1422-23) এ চীকা যদি সত্যি ঐতিহ্য
সম্প্রদায়ের আশ্রয় সনাতন গোবান্দীর রচনা হয়, তাহা হইলে
জানা বাইতছে যে, ঐতিহ্যের রূপান্তরিত পূর্বে সনাতন
সংস্কৃত কাব্যাদিহিত্যে বসাবান করিয়াছিলেন। ঐতিহ্যের
রূপান্তরিত পরে সনাতন গোবান্দী নিকটই দেবদূতের চীকা
লিখিত বলেন নাই।

সনাতন কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ?

ঐক্যগোবান্দী লগুতাব্যবহার অত্রে সনাতনের রচিত বলিয়া
চারিখানি প্রবন্ধ নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

অগ্রত্বকৃত্যচরণ: সনাতনবচন:

হরিতকিবিলাস চীকা: সনাতনবচন:

লীলা সনাতন চীকা: সনাতনবচন:

অর্থাৎ, (১) ভই অগ্রত্ব সনাতন বচন (২)
হরিতকিবিলাস ও আশ্রয় চীকা নিক্কগ্রন্থিনী (৩) লীলাসং
(৪) চীকাচরণ। উগর মধ্যে প্রথম ও চতুর্থখানি সম্বন্ধে
কোন গণ্যপাল নাই। হরিতকিবিলাস নাম দিয়া যে গ্রন্থ
নামনাগরণ বিজ্ঞানের ছাপিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত নাম
তৎসংবাদীবিলাস ও উহা গোপালচীকা। বিজ্ঞানের
মহাপ্রসঙ্গ লিখিয়াছেন—“গোপালচীকা তৎসংবাদীবিলাসকে
প্রায়শই লোকে “হরিতকিবিলাস” বলিয়া থাকে সুতরাং এই
গ্রন্থ হরিতকিবিলাস নামেই অভিহিত হইল।” তিনি ঐ
গ্রন্থের যে চীকা ছাপিয়াছেন, তাহা সনাতন গোবান্দীর লেখা
বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা বাইতে পারে। গোপালচীকা
মহাপ্রসঙ্গের দ্বিতীয় প্রকোষে লিখিয়াছেন যে, তিনি রূপ-সনাতন
ও তৎসংবাদী নামের সম্ভাবনাবিধানার্থে গ্রন্থ লিখিতেছেন।
চীকার রচনাও নামের পরিচয়নামসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—
“ঐক্যগোবান্দী নাম পৌত্তলিকবহুলভাষ্য: পরমভাগবত:
ঐক্যগোবান্দী নাম নিম্নলিখিত: সম্ভাবনাবিধানার্থে।” এ
স্থানে তৎসংবাদী নাম বলিয়া রূপ-সনাতনের কথা চীকার

অগ্রত্বলিখিত গ্রন্থের পেল। ঐ চীকা যে সনাতন গোবান্দীর
লেখা, ইহা তাহার একটি প্রমাণ। অপর প্রমাণ হইতেছে,
ঐক্যগোবান্দী লিখিয়াছেন যে, সনাতন “হরিতকি বিলাসে”র “নিক্ক-
গ্রন্থিনী” নামে চীকা রচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বৃত্তিত
চীকার আছে—

নিম্নতঃ তৎসংবাদীবিলাস বচন:

চীকা নিক্কগ্রন্থিনী নাম তৎসংবাদীবিলাস:

“নিক্ক গ্রন্থিনী” ও “নিক্কগ্রন্থিনী”র মধ্যে বিশেষ কোন
প্রভেদ নাই। কিন্তু গ্রন্থ হইতেছে এই যে, সনাতন কি
বহুত হরিতকি-বিলাসের একবার চীকা: করিয়াছিলেন,
আবার গোপালচীকা তৎসংবাদী-বিলাসের চীকা করিয়া-
ছিলেন? অথবা গোপালচীকা বইয়েরই চীকা লিখিয়া-
ছিলেন, নিক্কের বইয়ের চীকা লিখেন নাই? সনাতনরূপ
হরিতকি-বিলাসের কোন পুঁথি আমি দেখি নাই। অত্যাশঙ্ক
ঐক্য চীকাহরণ চক্রবর্তী মহাপ্রসঙ্গ আমাকে জানাইয়াছেন যে,
বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
পুঁথিখানায় সনাতনের হরিতকি-বিলাসের পুঁথি নাই।
১৮৩৯মহাপ্রসঙ্গ বিজ্ঞানের কিত্ত লিখিয়াছেন—“কোন কোন হানে
কেবল সনাতনরচিত মূল সংস্কৃত হরিতকি-বিলাস দেখিতে
পাওয়া যায়।” এ সম্বন্ধে আরও অগ্রত্বজন হওয়া বিশেষ
প্রয়োজন। সনাতনরূপ হরিতকি-বিলাসের হই তিনখানি
পুঁথি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি হরিতকি-বিলাস লিখিয়াছিলেন
কি না জানা বাইবে না।

সনাতন গোবান্দীর লীলাসং নামক গ্রন্থ স্বতন্ত্রাকারে
প্রকাশিত হয় নাই। ভক্তি-রসায়ন মতে লীলাসংয়ের
অপর নাম বসমতচিত্র। কথা—

লীলাসং বসমতচিত্র নামে বস।

সনাতন গোবান্দীর এই চতুর্থ খণ্ড: পৃ: ৪৭।

চক্রবর্তী করিয়া লিখিয়াছেন—

হরিতকি বিলাস আর তৎসংবাদী।

বসমত চীকা আর বসমত চীকা।

এই সব গ্রন্থ কৈল গোপাল চীকা: ৪১১০০-০১।

বসমতচিত্র বা লীলাসং নামে কোন গ্রন্থই বৃত্তিত হয়
নাই। ১৮৩৯মহাপ্রসঙ্গ বিজ্ঞানের ঐক্যগোবান্দীর “তৎসংবাদী”র
“নিক্কগ্রন্থ-চরিতঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “১৮৩৯মহাপ্রসঙ্গ”
নামক তেইখনি লীলাসংনামক কবিতা ছাপিয়াছেন।

“স্বকোণসংঘাতি চরিতঃ”—এই চীকার বঙ্গদেশে বিজ্ঞানতত্ত্ব বর্ণিত-
 ছেন যে, ইহা শ্রীতপ গোবান্দীর রচনা। যথা “ভগবদগীতাঃ
 বর্ণয়িত্ব শ্রীকৃষ্ণা ভগবদ্ব্যবহাৎকৰ্ণা মঙ্গলমাত্রিত ভীষ্মাচারিণী”।
 বৈষ্ণবচাৰ্য্য শ্রীকৃষ্ণ রসিকসোহন বিজ্ঞানতত্ত্ব শ্রীতাবলী ও
 বঙ্গমহাভারতক শ্রীশ্যামভট্টবিরচিত বর্ণিতাই ভদ্রীর চীকা-
 ংরসে বিখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু আবার চিরদিন হইতে
 তিনিই আশ্রিত হইবে, এই কাব্যও শ্রীশ্যাম সনাতনের রচিত।
 শ্রীশ্যাম করিয়াছেন যে, শ্রীশ্যামসনাতন লিখিত বঙ্গমহাভারত
 নামোক্তে করিয়াছেন, উহা এই ভগবদগীতাকৃত বঙ্গমহাভারত
 রিঃ অত্র কোন কাব্য নহে বলিয়াই আমার ব্যক্তিগত (স্বয়ং
 ভগবদগীতাকৃত, পৃঃ ৪০৪)। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানতত্ত্ব
 সনাতন শ্রীশ্যামের লোক। ভগবদগীতাকৃত বঙ্গমহাভারত
 উহার উক্ত খুব বেশী নির্ভরযোগ্য নহে, কিন্তু আবারের সম-
 সাময়িক কোন ব্যক্তির রচনা কথ্য অপেক্ষা উহার রচনা কথ্য
 কম প্রামাণ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ গোবান্দী লব্ধে কবেকীতে শ্রীকৃষ্ণের
 গঙ্গাসঙ্গের মধ্যে “হৃদয়োহস্তবশঃ” নামে এক প্রবেশ নাম
 করিয়াছেন। “প্রবালার” “অথ স্বকোণসংঘাতিচরিতঃ” পদ্যে
 বিস্তারিত লোকে আছে—

স্বকোণসংঘাতিচরিতঃ কংসনাশ হৃদয়োহস্তবশঃ।

হৃদয়োহস্তবশঃ কংসনাশ হৃদয়োহস্তবশঃ।

এই লোক হইতে অতুল্য হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ কবি
 হৃদয়োহস্তবশঃ প্রবালার আলোচনা পড়ত।
 তাহা হইলে সনাতন গোবান্দীর লোকান্তর বা বঙ্গমহাভারত
 কোথায় গেল? এতদ্ব্যতীত আরও অতুল্য হইবে যে

• প্রবালার।

শ্রীকৃষ্ণগোবান্দী, কংসনাশ করিয়া, নরহরি চক্রবর্তী বা
 বঙ্গদেশে বিজ্ঞানতত্ত্ব সনাতনের রচিত বলিয়া “শ্রীতাবলী” নামক
 কোণে বঙ্গদেশে প্রবেশ নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ
 “প্রবালার” অতুল্য শ্রীতাবলী নামক একচলিত শ্রীকৃষ্ণের
 প্রত্যেকটিই সনাতন নাম কোন না কোন প্রকারে
 উল্লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানতত্ত্ব শ্রীতাবলীর চীকার
 শেষে একচলিত শ্রীকৃষ্ণের কথ্য বলিয়াছেন, যথা—“গাণা-
 ক্যসংঘাতিচরিতঃ যো ব্যাচী শ্রীকৃষ্ণাচারিণী প্রবালার”।
 ৬৭০নামাংগণ বিজ্ঞানতত্ত্ব বহিঃ সংখ্যক কবেকীর পর দ্বন্দ্ব করিয়া
 সংখ্যা দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণাচারিণী করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বঙ্গিক-

যোহন বিজ্ঞানতত্ত্ব ইহা লক্ষ্য না করিয়া লিখিয়াছেন—“ইহা
 বিজ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের” (ভগবদগীতা, পৃঃ ৪০৮)।
 এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব মনে হয়, এ লোক সনাতন গোবান্দীরই
 রচনা। কংসনাশে বঙ্গমহাভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে আছে—

“ইহা সনাতন কংসনাশ

বিশিষ্ট ভাষা হইয়াছে।”

গোবান্দীচরিতঃ, কংসনাশ, ১০ পৃঃ

“গোবান্দী সনাতন কংসনাশ শ্রীকৃষ্ণ

কংসনাশে উল্লিখিত”

(গোবান্দীচরিতঃ, ১০ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণ রসিকসোহন বিজ্ঞানতত্ত্ব করিয়াছেন যে,
 শ্রীতাবলী সনাতনের রচিত (ভগবদগীতাকৃত, ৪০৮ পৃঃ)।
 অথচ শ্রীকৃষ্ণ লিখিত চরিতঃ লোক সনাতনের প্রব-
 তালিকার “শ্রীতাবলী” নাম করেন নাই। পদ্যভিত্তিতে
 “শ্রীতাবলী” অনেকগুলি শ্রীত বঙ্গ হইয়াছে, এবং ৬৭০নামা-
 ংগণ বঙ্গমহাভারতের লোক শ্রীকৃষ্ণ গোবান্দীর রচনা বলিয়া
 নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ “বিশ্ব-
 বশঃ নিজ নামের কবি না হইয়া প্রকোণে উহার পূর্ববর্তী
 অগ্রত সনাতনের নাম লক্ষ্য করিয়াছেন।” শ্রীতাবলী ৩৭
 সংখ্যক শ্রীতি “স্বকোণসংঘাতি” ১০ সংখ্যক “সনাতনসনাতনবর্ণিত-
 চরিতঃ”, ২০ সংখ্যক “গিণি সনাতন সনাতনসনাতন” প্রভৃতি
 যাক বৈষ্ণব মনে হয়, ইহা শ্রীকৃষ্ণের লেখা। কেন না শ্রীকৃষ্ণ
 লিখিতবর্ণের প্রথম অংশে পদ্য প্রকোণে সনাতনকে “সনাত-
 নীনাং হৃদয়ঃ পূৰ্বা” বলিয়াছেন। সনাতন নিজে শ্রীতাবলী
 লিখিলে সনাতনের লিখিত নিজের নাম ভগবদগীতাকৃত উল্লেখ
 করিতেন না। আমার মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীতাবলীতে
 উহার গুরু সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের লিখিত অভ্যন্তরে বর্ণন
 করিয়া “শ্রীকৃষ্ণ সনাতন বঙ্গমহাভারতঃ” (১০) প্রভৃতি পর
 লিখিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের তব লব্ধে সনাতনের উক্তি

শ্রীশ্যাম সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে কংসনাশ বলিয়া বীকার
 করিয়াছেন। বঙ্গদেশে বঙ্গদেশে বঙ্গদেশে বঙ্গদেশে
 বঙ্গদেশে বঙ্গদেশে তিনি শ্রীকৃষ্ণের লিখিত “অভ্যন্তরে
 বর্ণন করিয়াছেন। প্রথম লোকের চীকার শ্রীকৃষ্ণের
 অধিষ্ঠানের কবি নিরলিখিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

“ব্রজপিত্রৈতরুপেণো ভগবতঃপ্রভাবঃ এব, তথাপি প্রেমভক্তি-
বিশেষপ্রকাশনার্থঃ স্বয়মবতীর্ণাভ্যেদেন তদর্থঃ স্বয়ং গোপী-
ভাবোহপি বাজতে ।” তৃতীয় দোহকী এই—

কবিরচনিত্যঃ যো বিভাষা স্বয়ং

স্বয়মবতীর্ণো ব্রজভক্তঃ গোপীভঃ ।

স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং ব্রজভক্তঃ

স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং ব্রজভক্তঃ ।

‘ব্রজপিত্রৈতরুপেণো’ পদের চীকার সনাতন সিদ্ধিগেছেন—

“ব্রজ হইতঁাবঃ নিরুতরুপেণো যঃ প্রেমী, তথাৎ সকা-
নাৎ বসতিহীনঃ কল্যাণঃ ভাবঃ” স্নোক্তির বাখালা অর্থ
“নিরুতরু হইতে বীর ভক্তবর্ণের নিজের প্রতি ভাব আলো-
চনা করিয়া সেই ভাবের প্রতি লোভবশতঃ যিনি ভক্তরূপে
এইভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কনককান্তি “ব্রজবৈশ্যখ্যে
শ্রীশ্রীভগবতঃ, শ্রীকৃষ্ণভক্ত নামক শ্রীহরি সর্বোৎকর্ষে দিগন্ত
করিতেছেন ।”

গোকেশ চীকার “উক্তঃ সার্বভৌমচৌচাখ্যাপাঠঃ” বলিয়া

কালান্তঃ কবিরচনঃ নিম্নঃ

প্রাপ্তঃ স্বয়ং ব্রজভক্তঃ

আশ্রিতঃ স্বয়ং পদাধিকঃ

পদাঃ স্বয়ং স্বয়ং ভিষকঃ ।

স্নোক্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন । এখানে শ্রীশ্রীভগবতঃ ভাবমাধুর্য্য
আধাৰ্ণবের বাহার শ্রীচৈতন্যের আভির্ভাবের কথা স্পষ্ট করিয়া
বলা হয় নাই ।

সনাতন গোবামী শ্রীচৈতন্যের যে অপূর্ণ প্রেম বর্ণন
করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আর কোন সন্দেহ ছিল না
যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীশ্রীভগবতঃ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন
(ব্রহ্মসংহিতায়ুতের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম অধ্যায়ের ২০১২০৪
স্নোক্ত) । ব্রহ্মসংহিতায়ুতে নারদ গোপসুখাচকে বলিতেছেন
“সেই প্রেম নিরূপিতই হইতে পারে না, যদি বা কোনক্রমে
নিরূপিত হয়, তথাপি অতীত ভোমার প্রতীতিবিষয়ও
হইবে না । যদি তাহা প্রেমনিষ্ঠ গোকেস সাক্ষ্য বর্ণন
হয়, তবেই সেই প্রেমভক্ত সাক্ষ্য অবগত হওয়া যায় ।

গোপীপদ মধ্যে স্ত্রীপ্রতিভা পদ প্রেমভক্তবতী শ্রীশ্রীভগবতী
প্রত্যক্ষীভূতা হইবে, তবেই সেই স্ত্রীভাব প্রেম সাক্ষ্য
অনুভূত হইতে পারে । সেই ভগবতীই সেই প্রেম বাখ্যা
করিতে পারেন । এখানে যদি বা কাহারও প্রেমভক্তবর্ণনে
শক্তি হয়, তথাপি সে ব্যক্ত করিতে পারে না । কারণ
উপায়ুগিরি প্রেমনিষ্ঠার সর্বত্র সকলে মহাপ্রভুর ভাব
হইয়া থাকে । অপর, শ্রোতাও তাহা প্রেমভোগপ্রাপ্ত হইয়া
থাকে । কেবল সেই ভগবতীর বর্ণন হইলেও তাঁহাতে
প্রাপ্তভূত মহাপ্রেমলক্ষণ সাধাভূত হইয়া থাকে এবং সেই
প্রেম বর্ণনার্থতঃ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে । তাহা নিরূপণবিভার-
কারী ব্রজভক্তের যদি কোন অবতার হয়, অথবা শ্রীশ্রীভগবতীর
যদি কোন অবতার হয়, তাহা হইলেই সেই প্রেম অনুভূত
হইতে পারে ।”

ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠভগবতীর মনোভাবের সনাতন গোবামী
লিখিয়াছেন—

ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠভগবতঃ স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং ।

স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং ।

সনাতন গোবামী শ্রীচৈতন্যকে পুনঃ পুনঃ ভগবান বলিয়া
ছেন । কিং ব্রহ্মসংহিতায়ুতের চীকার শেষে ভগবান শব্দ
নিরূপিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ততস্ত ভগবান্ভিত—

স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং ।

স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং স্বয়ং ।

অভিপ্রোষেনৈতদিকং ।”

এই হিসাবে তো সে কোন ভাবী ব্যক্তিকেই ভগবান্ বলা
যায় । আমি কাকার বর্তমান পত্রাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলাম, তাঁহার লল্লাবধে “ভগবান্ পত্রাচার্য্য” বাক্যে ভগবান্
শব্দ কি ব্যাখ্য ? তিনি ঠিক ঐ স্নোক্তী আনুষ্ঠিত করিয়া
ছিলেন । গোবামী বৈকুণ্ঠভগবতঃ “ভগবান্” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা
আর কোথাও দেওয়া হয় নাই । সনাতন গোবামী কি ভাব
লইয়া শ্রীচৈতন্যকে ঐরূপ লক্ষণাধিত ভগবান বলিয়াছেন
তাঁহার স্বর্গ সনাতন প্রণোদন ।

ভূমিকা

—সমুদ্র গুপ্ত

বিভিন্নখাণ্ডীর গোপনাল বাসিন্দা গিগায়ে, কেএল
মাকে মাকে কোকুমত্না নদীনাথের তীক্ষ্ণ হাতখননি শোনা
যায়।

ভাস্কর্য্যের তত্ত্বাটমৌ ত্রাতি। সাগরটি বিন ভবিষ্য ত্রাতি-
ধীন বৃত্তীয় ধারা নিরুৎসেপে বহিষ্কা চলিয়াছে এবং ভাষ্কর্য্যই
দিক স্পর্শে আগর শরৎের বিদ্রুমদ্রুব ভ্রামণিগা অন্তকটা রান
চইয়া গিয়াছে। অকাশ পতল ভাষ্কর্য্য আচ্ছন্ন। মকঃবল
সহরের রক্তিম পলভলি কাশাধ ভরা। বাহিরের বস্ত্রাট
মিটাইয়া সকলেই স্বপ্নে আগ্রহ লইতে বাস্তব।

কিন্তু তথালি মনে হয়, যেন এই ক্ষুদ্র দিনটির অস্ত্রতালে
একটি অকথিত ভগ্নকথার ব্যাঙ্গ কোকুমল লুকাইয়া আছে—
যেন বাহা দেখিতেছি তাহা সত্য নয় এবং বাহা সত্য তাহা
কিছুতেই নিজেদের ধরা দিতে চাহিতেছে না—যেন স্রাবণের
অস্ত্রবাতার সাথে আচ্ছিন্নের প্রাণতী নিউলীগড় মিলিয়া এক
বিচিত্র আনন্দলোক সৃষ্টি করিয়াছে।

পল্লবের ভূমিকা কবিতারসের অবতারণা করা অনিবিদিত
অলঙ্কারণায়ের নির্দেশ বটে, কিন্তু কাব্য ও জীবন যে এক
নয় তাহা অতিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব জানেন। আমাদের নাস্তিক
অনুশব্দও তাহা অনেক বার শুনিয়াছিল। কিন্তু যে সনাতন
রণে পূর্ণগাংগব সাথে কলঙ্কের অবিচ্ছেদ্য লব্ধ, সে যেনের
নবীন বৃক্ষ বিহের ত্রাতিতে ধবি সেই জ্ঞানগর্ভ উপদেশটি
ভুলিয়া যায় তবে তাহাকে কোথ বেওয়া যায় কি?

কৃত্তী ছানি অনুশব্দ বিবাহ করিতে আসিয়াছে। পাণ্ডীর
শিটার সর্ষ আছে এবং সামাজিক প্রতিক্রীও কম নয়।
পাণ্ডীর নাম অমলা, বয়স বাহা বগুয়া উচিত তাহাই এবং সে
ইংরেজী লিপ্যন্তর পড়িতে শিখিয়াছে।

যে নিজের মেয়ের ও মনের অর্ধবিকশিত মাধুর্য্য পরিপূর্ণ-
ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তাহাকে ঐলিয়া বেওয়া
হইয়াছে তাহাইই বস্তু অর্ধ-গভেতন অথচ সম্পূর্ণ অপরিস্ফুট
এবং লোকভুক্ত একটি পুরুষের পাশে।

—অমলা!

উত্তর নাই।

কবেক মিনিট বাসিন্দা অনুশব্দ আবার ভাবিল—অমলা!

উত্তর নাই।

অনুশব্দ বেশ কান্নিত যে, অমলা জাগিয়াই আছে। দূরত্ব
যেহাটিকে লক্ষ্যে নিশ্চয় কবিতা তুলিয়ায় প্রয়োজন হওয়াতে
সে নিজের অঙ্গলঙ্কার নিঃসৃত করিয়ায় মস্ত সত্ত্বপূর্ণে চোঁকা
করিতেছে। খুঁট অপর পাশে কিম্বাইয়া সে চইয়া আছে,
কাঁধেই তাহার নিঃশ্বাসের স্পর্শ অনুশব্দ অনুশব্দ করিতে
পারিতেছে না। অমলা অলঙ্কারগুলিকে কিছুতেই মৌনভ্রত
মৌকিত করা যায় না, তাই মাকে মাকে সুস্থ পক্ষ শোনা যায়।
এখনই একটি লুপোণের সাহায্য লইয়া অনুশব্দ কহিল, ভূমি
খুঁমিয়েছ?

—না।

কয়েকটা প্রস্তাব পরে যে, একটা উত্তর দিতে চইবে,
তাহা ঠাকুরমা বলিয়া মিথ্যাছিলে। সমবয়সী বিবাহিতা
লখীয়া আসে। অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তত্ত্বখানি
চটাই নাকি আবার কোন মেয়ে করিতে পারে!

—এখন তোমার জর আছে?

—না। অমলায় মনে চইল, যেন প্রাণগুলি বড় ভাড়াভাড়ি
মিশ্রিত হইতেছে।

—আজ কি দেখেছ?

—চা, মৃদু এই মৃদু।

লুপ্তবানের সময় অনুশব্দ মনে নিজের হাতে অমলায়
কুঁটল বেধেই প্রথম স্পর্শ অনুশব্দ করিল, তখনই তাহার মনে
হইয়াছিল যে, অমলায় বাঁধ হয় জর, হাতখানা বড় গরম।
কালিদাস বিবাহবন্ধনালোচনা দীটার বর্ণনা করিয়াছেন—
পুয়োহিতের বিচিত্র মন্ত্রলিপি কাকে কাকে সেই লোকটি
অনুশব্দের অন্তরে উকি দিতেছিল।

কবিতা ভুলিয়া গিয়া অনুশব্দ ভাবিল—আহা বেডাত্তী!
নাগাঘিনের অনাহাও, উত্তেজনা! বিহের পাঁচ লক্ষানন্তম্বী
কিপোত্রের মনের গোপন কথা কে জানে?

যে কথা কেহ জানে না, অপরিস্ফুট অতিথি অগ্রশয়
তাহার জানিতে চাহিল। জানিল কি না বলা কঠিন। কিন্তু
জানিয়ার প্রণালের মধ্য দিয়া যে পরিচয় সূত্র হইল তাহা
বেশ সুস্পষ্ট অতিক্রম করিয়া কোথাও শেষ হইবে কি না
তাহা অগ্রশয় জানে না।

তজ্জা তাকিলে অগ্রশয় চাহিয়া দেখিল, সুযোগ আসিলে
যে দ্রাবিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং অমলার একখানা হাত
তাহার স্কন্ধ উপর হেলিয়া রাখিয়াছে। হাতে অনন্ত, চুড়ি,
ছোট আঙ্গুলটি খিটখিট ছোট ছোট মাংস। সীকের রক্তিম
লাবণ্যে আলোকিত। কীনা তটিনী যেমন করিয়া তরুণা-
সমাজের রক্তিম প্রায়টিকে যেমন করিয়া থাকে, ঠিক তেমনি
তাবে লজ্জা নীল হাফডাউট অমলার কণ্ঠে যেমন করিয়া
গুলিত আছে। সাগা গায়ে ধিয়ার লাল শাড়ী কড়ানো।

অমলা ঘুমাইতেছে।

অগ্রশয় আবার চোখ বুজিল।

সুযোগ আসিলে যেন অমলায় ঘোরের কোণার মাঝে
লুকায়ি খেলিতেছে।

অমলা স্নান করিয়া কহিল, বাও, ছেলের ভয়ে ভেবে
ভেবে ত আমার ঘুম হচ্ছে না।

অগ্রশয় হাসিল। বেশ। লোকে সকালে ঘুম খেতে
উঠে তোমার ঘুম দেখবে না। ওমংকার হবে।

—না দেখুক সে।

অগ্রশয় কথা বলিল না।

অমলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কি হ'ল?

—কি আর হবে?

—কথা বলছ না যে?

—না, সারারাত তোমার সঙ্গে কথা বলতে হবে
না কি?

—বা ভেবেছি। এতই স্নান হ'ল?

—স্নান আবার হ'ল কোথায়?

—আবার কীকি দিতে পারবে না, আমি সব বুঝি।

তোমার চিনতে আমার কি আর থাকে আছে? ঐ যে আমি
বলছি ছেলে চাই না, অমনি স্নান।

—যদি তাই হয়?

উত্তরেব যখন মিটমাট হইল, এখন নীরত্বে অমলার
বুকে আলোকবৎসর সূচনা হইতেছে, বহু দূরে সমুদ্রের নীল
ভল ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

জাহাজ ছাড়িল।

চৈতন্য লক্ষ্য। বসন্তকল্লুর দৃষ্টি আলিঙ্গনের পরিবর্তে
আমরা বাধা অগ্রহণ করি, তাহাকে স্রীয়েব অলস স্পর্শ বলাই
তাল, তরুণ-তরুণীর কথা অস্ত্র ভিন্ন।

অগ্রশয় অমলাকে লইয়া নিজের বাড়ীতে ঘাইতেছে।
সম্পূর্ণ একটা দিন এবং একটা রাত্রি জাহাজে থাকিতে হইবে।
পরিচিত আর কেহ সঙ্গে নাই।

তাল। সমগ্র বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্নভাবে এমন একান্তে
অমলাকে কাছে পাইবার সুযোগ আর হয় নাই। বাঙ্গালীর
সংসারের লবঙ্গ বন্ধন, লবঙ্গ বস্তুরের সংখ্যাতীত অন্ধ
সংসার—ইহার মধ্যে মিলনপ্রাণীর স্বাধীনতা কোথায়!

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল। জাহাজ নদীর
সীমারেখা পায় হইয়া সমুদ্রে আদিয়া পৌছিয়াছে। অমূল-
বর্তী আলোকবস্তুরের কোণটি মন্ডলমান গৈলগাভির শিখরদেশ
অকস্মাৎ আলোকিত করিয়া তুলিতেছে।

ধীরে ধীরে লক্ষ্যেই তেজ ছাড়িয়া কেবিনে আগ্রহ লইতে
লাগিল। আলোকবস্তুরটি ক্রমে সরিতে সরিতে বিপুল
মিশিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার এবং সমুদ্রের গাঢ় নীল
ভলরাশি মিলিয়া যেন সমগ্র সচেতন পৃথিবীটি একটা ঘনত্ব
বহনিকার আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। নিত্যক একঘেয়ে
কয়েল ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। বিরাট
জাহাজটা মাঝে মাঝে কাঁপিয়া বা গুলিয়া উঠে।

নির্জন ছেকর একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অমলার বাঁহাতের
আঙ্গুল কব্জি নিজের ডানহাতের বুকের মধ্যে ঢকাইয়া লইয়া
অগ্রশয় বলিল, আচ্ছা দেখ দেখি, আমরা তো জীবন-মৃত্যুর
মাকামারি দাঁড়িয়ে আছি। এখন যে কোন সময় জাহাজটা
ডুবে যেতে পারে, জাহাজে আগুন ধরতে পারে, আরো কত
কি বিপদ হ'তে পারে। যদি তাই হয় তবে আমরা কি
করি? ঐই বিপদ অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে কি তাই
নিজের দাঁড়িয়ে রাখি বল তো?

অমলার সুখের হাসি বিভ্রান্তের মত তীক্ষ্ণ ও কণিক নহ, তাহা একাধিশীত কোণাংগার মত শুভ্র, মিষ্ট এবং চিরন্তন। গেই হাসি একটুও জ্ঞান হইল না। কঠিন, নিষ্ঠুর পৃথিবীর সঙ্গে যেন তাহার এখনও পরিচয় হয় নাই—এমনই তাহাে নৃত্যশৈ অমলা উত্তর দিল, তোমার কড়িবে ঘঁরে ভেদে গাই।

ভাঙ্কনের সমস্তার সমাধান করা যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করার চেষ্টা তের সোজা, সে বিষয়ে অল্পশয়ের মনে আজ সন্দেহমাত্র রহিল না।

হাতের মুষ্টি একটু শিথিল হইয়া আবার কুঁচুর হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া ব্রহ্মী মনে স্থান করিল এবং তারপর খাওয়ার অব্যাবস্থা করিতে ব্যস্ত হইল। তাণ্ডাকে উল্লিখিত অমলার মাথা ধোয়ে এবং কুখাত্তা লোণ পাঠ। কিন্তু এবার সন্তুষ্ট নিভাভই পাশ ব্যাধার জাণ্ডে ঘোটেই তুলিতেও না, তাই অমলা বেশ ভাল আছে।

খাবার বখন হাতির হইল, তখন বেলা এগারোটা বাজিয়া দিয়াছে। ভাত, মাছ আর সুগন্ধি মাংস। মিষ্টি মাংসে কাহারও আপত্তি ছিল না। অল্পশয় কলিকাতার কলেজের ছেলে, আর অমলা কিছুদিন য়েহসাহেবের কন্ডেট স্কুল পড়িয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষার সহিত দ্ব্যবসিকতায় সনাতনের কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

খাইতে খাইতে অমলা বলিল, এত জিনিষ আমি খেতে পারিব না। তুমি কিছু নেবে ?

অল্পশয় উত্তর দিল, হাও।

অমলা ভাতের একটা অংশ এবং মাছের একটা টুকরা জালাবা করিয়া অল্পশয়ের স্মেট উঠাইয়া দিল।

অল্পশয়ের সারা মুখে ঢালা হাসির রেখা ফুটুয়া উঠিল, কিন্তু নিভাত্ত গভীরভাবেই সে বলিল, বেশ লোক তো তুমি ! ভাত আর মাছ বেটার বেটার একেবারে সুক্ৰান্ত, অক্ষ মাংসটা সবই নিজের জন্ত। সে সব হবে না। আমার ভাস কিতে হয় তো সব জিনিষ সমানভাবে বিতে হবে।

কিন্তু কৌতুকর ঢাকলো আপনার সারা দেহ সুখচিত্ত করিয়া অমলা কহিল, তুমি যে কত বড় লোভী তা' আমার জানতে বাকী নেই। কিন্তু আজ আমারই ভিৎ। গোমাকে আজ আমি কিছুতেই প্রেরণ হবে না। ভাত আর মাছ

নিজেই তোমার আজ খুসী থাকতে হবে, আর মাংস তুমি পাবে না।

অল্পশয় এতক্ষণে বাদিয়া উঠিল। হঠাৎ চোখাচটা হাতিয়া লাড়াইয়া সে বলিল, বেশ, তাই হবে। মাংস আমি চাই না। তারপর পোটোমাল্টার দিকে মুখ ফিরাইয়া আবার কহিল, কিন্তু আজ যে সুখের মাংস খাওয়া হচ্ছে তা' বখন বাহাধাণ্য জানতে পারতেন তখন কে কাকে প্রেরণ বের তা দেখা যাবে।

অমলা মুখ না তুলিয়া এবং তাহার দিকে না ফিরিয়াই বলিল, আজ্ঞা। বাহাধাণ্য যে পাঠি সেন তা না হয় আমি একাই নেব। কিন্তু আমার ক্ষরে খেতে না দিলে তুমি কি করবে বল তো ?

অল্পশয় বস্ত্রপুষ্টিতে একবার অমলার মুখের দিকে চাহিল এবং পরমুহুর্তেই তাকাতাড়ি আপনার চোখ অস্তমিকে ফিরাইয়া কহিল, বেশ হবে। আমার ঘরটাতে এখন চুই মেয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করলে বাহাধাণ্যকে আমি ভাষ্যক সেজে খাওয়াব।

—সত্যি ? বলিয়া অমলা একবার হাসিল।

সেই হাসির উত্তরে নিজের মুখখানি খণ্ডাঙ্গন গভীর করিয়া অল্পশয় কহিল, সত্যি।

সংগ্রাম আর কতদূর অগ্রসর হইত বলা যায় না, কিন্তু হঠাৎ বাহাধাণ্যর আগমনে পড়ি স্থাপিত হইল। অল্পশয় মাংসের ভাগ পাইল কিনা জানি না, কিন্তু আরো বেশী দখল অনেক কিছু যে পাইল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিকালের দিকে ত্রৌড় পড়িয়া আসিয়াছে। কাহারও সন্তুষ্টের লীমারেখা পৌছিয়াছে এবং মূর্থে তমালভাল-বনজাভীলা বেলাকুনি দেখা গাইতেছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাভার শেষ হইবে, তাই বাস্তবিক জিনিষপত্র গুছাইতে ব্যস্ত।

অল্পশয় ও অমলা ডেকের উপর পাথচাতি করিতেছিল। কাঠ-কাল ডেক, অনমনসম বিরল। নীচের ডেকে সন্ত্র নরনারী একটুখানি বসিবার ভাবনা পাইবার আশা প্রাণপণে টোলাঠলি করিতেছে। কোলাহল, অস্বস্ত পালিধঃখণ্ড বিয়ান নাই।

গ্রেম ঘিরে লক্ষিত্রাকে জ্বল করত। সে সাড়া দিল।
অতঃপর মগা ঘিরে কেটে গেল করেওটা বছর। একটু পিঠর
হাত্রে আশাঘের বর সুখচিত হয়ে উঠল।

ডাক্তারবাবু বাড়িলেন। জনশ্রুত ছেকর নিগন্ততা খেন
কালবৈশাখীও ঘোঁষে ছায়ায় মত তিনকনের চাতিশাণে ঘিরিতা
রছিল।

কয়েক মিনিট পরে ডাক্তারবাবু আবার বলিতে শুরু
করিলেন, তারপর এল দৃষ্টি। হাতিশ্রোয় হাতনা সহ
করবার শক্তি সে হাতাল, তার মনের দৃষ্টি হ'ল। যখন
মন মরে বাহ আর যেহটা হেঁচে থাকে, তখন স্বপ্ন বিধাতাও
বোধহয় সে ব্যাধির প্রতিকার করতে পারেন না। থাক।
তাকে টাকা যেহাও জন্ত আবার বিশেষ আসতে হ'ল। আদি
আত ছুত বেড়াছি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে—অট্টোনিয়া, জাভা,
চীন, তাপান। সে রয়েছে দেশে, তার সংসার নিয়ে।
মাসে মাসে টাকা পাঠাই। সময় সময় তার চিঠি আসে—
অনুকের সুস্থতা বেগুণ হয়নি, ইত্যাদি। একদিন যে
কাচিনীর শেষ ছিল না আত তার পরিচয় দেব কি করে?...
গেযের সত্যিকার উপসংহার—তার ভূমিকার।

ডাক্তারবাবু কথা শেষ হইল। কয়েক মিনিট পরে
কেহই আর কোন কথা বলিল না। শুধু অশ্রুপন একবার
আকাশের দিকে চাহিয়া অমলার দিকে মুখ করিয়াইল।

ততকালে জাহাজ বন্দরে পৌছিয়াছে এবং চারিদিকে হাঁক
ডাক শ্রুত হইয়া গিয়াছে। বাত্ৰাকী এবং উড়িয়া কুটির বল
নিজেরেই মালগর কাখে লইয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর
হইতেছে, এবং চট্রগ্রামের দুগলদানবের প্রকোণে কোলাহলে
এক ভুল্ল একাতানবানবের সঙ্গি হইয়াছে।

হঠাৎ ঘুরে কাণ্ডেনকে দেখিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন,
আজ্ঞা, এখন তবে আসি। আমার কাকের সময় হ'ল,
আপনাদেরও হারাব সময় হ'ল। আমার কোনদিন হজত
আপনাদের সঙ্গে যেথা হবে, কিন্তু আমার মত বরা। পৃথিবী
ঘুরে বেড়াই, তাবের শব্দে পরিচয়ের বন্ধন মুক্ত করা বড় কঠিন।
নবম্বার। বলিয়াই অমলার দিকে চাহিয়া মাথাটি একটু নীচু
করিয়া ডাক্তারবাবু একবার হাসিলেন।

অশ্রুপন বলিল, নবম্বার।

ডাক্তারবাবু হাঁটতে হাঁটতে বেবিলেন যে, অমলা নিজের
ব্যতিক্রান্ত সুখখানি ঘোলাইয়া উদ্বাহকে অধিবাসন করিতেছে।

* * *

আমাদের কাণ্ডার দ্বিতীয় সর্গকে স্মারসমস্তব আখ্যা ছিল
হজত অস্কার হইবে না।

অশ্রুপন বাড়ীর চিত্রিতে তানিল যে, অমলার শরীর বড়
খাণ্ড। কিন্তু সে নিজেও সেকথার কখনও উল্লেখ করে
নাই।

অবশেষে সকল লক্ষ্যেরে অমলান হইল।

অশ্রুপনের সারা দেহ মন খেন কি এক অনগ্রকৃতপূর্ণ
চকিত বিজয়ের ছায়ায় ঘিরিয়া ফেলিল। ইহাও কি সম্ভব?
তাহার নিজের মত, অমলার মত, এমন ক্ষুদ্র ও অসংখ্য হইল
যাহার কি পড়াই নূতন জীবন সৃষ্টি করিতে পারে?

অশ্রুপন ভাবিল, সব মিথ্যা, মায়াকাল মাত্র। সেই
পিঠর মত সরল, মুলের মত প্রকীর অমলা—সে কি কখনও
নিজের ক্ষুদ্র, গুপ্ত বেহটিকে মর্ষিত করিয়া এত বড় বিরাট
রহস্তের সমাধান করিতে পারিবে?

কিন্তু একথাও ত সত্য যে, তাহার ও অমলার বিবাহিত
জীবনের হইল বৎসর এবং তাহার পূর্বে সহস্র সহস্র বৎসর
বাণিশ! এই নবকল্পের স্বপ্নই তো তাহারদিকে বিস্তার
করিয়া রাখিয়াছিল। এই লক্ষ লক্ষ বৎসরের পূজাতন
পৃথিবী, ইহাও হৃদয় কণ্ঠশক্তি, ইহাও অত্মর ঐশ্বর্য, ইহাও
অসীম প্রগাথ, ইহাও ব্যাকুল বাণনা—অমলার মত নারী এবং
অশ্রুপনের মত পুরুষই তো সব সৃষ্টি করিয়াছে!

কিন্তু অমলা কি ভাবিতেছে? বেহের হাতনা এবং
মনের ব্যাকুলতা মিলিয়া কি তাগকে পিটিয়া ফেলিতেছে না?
আহা বেচারী অমলা! কতদিন ত সে বলিয়াছে যে, সে
এত তাড়াহাড়ি ছেঁলে চাষ না। এই অদ্বাহিত অতিথির
আগমনের জন্ত ত সে প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু অমলা কি সত্যই এই নূতন গৌরব বর্ণার্থভাবে গ্রহণ
করিতে পারিবে না? মৌখিক আগন্তির লক্ষ্যগলে তাহার
অন্তরে হুগ্ন হাতুঘের যে নবীভূষণ অশ্রুপন নিশিদিন তলিত
পাঠে, তাহা কি সত্য নয়? একদিন অমলা বলিয়াছিল যে,
পঞ্চম মেয়ে হইলে সে স্থনী হইবে। অশ্রুপন মিজাসা
করিয়াছিল, তেন বল তো? দলজ্ঞভাবে অমলা তাহার

কানে কানে বলিয়াছিল, মেঘেরের প্রবন্ধ কাগজ ও গল্পনা বিবেচনা
সাধাতে আবার বড় ভাল লাগে, ছেলেদের পাশাপাশি বড়
বিশ্রী। অল্পমম চাপিয়া উত্তর দিয়াছিল, আমিও ঘের চাই,
কিন্তু অল্প কারণে। অমলা চিত্রাঙ্গা কথিয়াছিল, কেন?
অল্পমম বলিয়াছিল, এইজন্য যে ছেলেদের মেঘেরের মত ভাগ-
বাংতে জানে না।

সেই রাত্রির কথা অল্পমমের মনে হইল। সেদিন কি
কিছু ছিল তাহা সে কুণিয়া দিয়াছে। কিন্তু একথা ঠিক যে
সেদিন খুব অন্ধকার ছিল। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে
অমলাকে সে নিবিড়ভাবে স্মৃতি চাপিয়া দিয়াছিল।

সেদিন রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে অল্পমম বেহেল, কবি লেইখ
খালিয়া তাহারক বলিতেছে—Lavin, ভাগো। অমলা
Kitty-র পাশে এখন ভোমার বান। অল্পমম চাপিল,
চাপিয়া বেঁধিল যে রাত্রি ভেমনই নিবিড় অন্ধকারে বেগা,
তবু অমলা সেখানে নাই।

ক'ব টলটলের উপদেশ অল্পমম অহুসেস করিতে পারিল
না। বিশেষ ছাড়াই সে অমলাকে কাছে ছুটিয়া গেল।

অমলার তাহারক প্রয়োজন ছিল। অমলা কোনদিন
কোন বিষয়ের জন্যই সুখে নাশিল জানায় না, কিন্তু কোথায়
তাহার মাথা এবং কি তাহার প্রয়োজন তাহা অল্পমমের মত
হৃদয়কে কে বুঝিবে? একটুখানি রান হাদি এবং কম্পিত
ওঠের একটুখানি মুখিই স্পর্শে অমলা জানাইয়া দিল যে, এট
এক আনন্দের উত্তেজনার মধ্যে তাহার প্রিয়তমের সন্ধ্যা সে
একান্তভাবে কাবনা করিতেছিল।

অমলার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে, গায়েব কাগো রঙ আরও
বেঁটে কাগো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু হরিণ-চোখের সেই সুখ
দৃষ্টি এবং শিশুর মত সরল মুখের সেই সহজ হাসি ঠিক
আগের মতই আছে।

অমলা সাগরিন এবং সাগরাত কি তাহা কে জানে।
সারাটি দিন সে গুরিগা বেঁধায়, কিন্তু অমলার পকেটে এবং
পতীর নিঃশব্দে তাহার ক্রান্তি থাৎ পড়ে। রাত্রিতে তাহার
ঘুম আসে না। শরীরে মাথা, চোখে মাথা, মনে বর ও
আশার মিলিত স্পন্দন। সহস্রবার অমলা শাপ করিয়া

শোণ, আর মাঝে মাঝে যেন ক্রোধের আঘাতে তাহার ক্ষুদ্র
দৃষ্টি বেহেচি কাঁদিয়া উঠে।

অল্পমমও ঘুমাইতে পারে না। বলে, এস হ'কনে পর
করি। তুমি যে একা ভেগে থাকবে ভা হবে না। অমলা
আশ্রিত জানাইয়া বলে, বাঃ রে! আমি কত ক'মাণ ধরেই
এখনি ভেগে থাকি। আবার অত্যাশ হলে দেখে, কোন কষ্ট
হয় না। তুমি ভেগে থাকলে ভোমার অল্পম কখন। তুমি
ঘুমাও। অল্পমম কথা শোনে না, পর হুক করে। অমলা
উত্তর দেয় না। কতক্ষণ পরে কখন ঘুমের ঘোরে তাহার
চোখ মুখিয়া আসে অল্পমম তাহা জানে না।

পরৎকালের অনাহুত স্মৃতির মত মাঝে মাঝে এক পল্যা
কপড়া হইয়া যায়। বিঘটা যে কত দুঃখ তাহা হুই জনেই হয়
ত কুণিয়া যায়। তাহারের মনে হয়, যেন পৃথিবীই ইতিহাসে
কোন বহুদুঃখের কারণ ইহার চেয়ে বেশী গুরুতর ছিল না।

একদিন ভোরের দিকে এমনই একটা কপড়া হইয়া গেল।
অমলা যখন পড়নক হইতে বাহির হইল, তখন তাহার মুখ
অন্ধকার। অল্পমম চোখ টিপিয়া একবার তাহার বিকে
চাপিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। বহুদিন আগে অল্প-
মমের রক্তভাগ প্রভুত্বের অমলা চিঠি লেখা বড় করিয়াছিল।
মাসব্যবেক পরে যখন সন্নি স্থাপিত হইল, তখন অমলা
লিখিয়াছিল, "চিঠি লিখতে ইচ্ছে হ'লেও অভিমান এলে বাধা
নিত।" সেই কথাটি আজ অল্পমমের মনে হইল।

সেদিন বাড়ীতে উৎসব, কিন্তু বাহ্যিক যিহা আনন্দের
কোলাহল, তাহার রান মূখশানির বাহ্যিক নীতি নিখিয়া
গিয়াছে। পরিচিত বস্তুগণ ও আত্মীয়জনদের মধ্যে অমলার
নিকটে একেবারেই বেনামান মনে হইতেছিল। সহস্রবার
এ-স্বরে ও-ঘরে বুদ্ধিত বুদ্ধিতে সে প্রাণ হইয়া পড়িল। সকলের
কৌতুক-স্মৃতির অঙ্গুলিতে যে নির্জন ও দীর্ঘ কোণটি সে
বুঝিতেছিল তাহা আর পাওয়া পেল না। বুঝাও বলাবলি
করিতেছিল, মেয়ে বড় লাঞ্ছক। সহস্রবার বাস্তব ও
অবাস্তব চাইয়া তবীতে ব্যস্ততার তাহার দিকে চাইতেছিল।
কিন্তু লজ্জা ও পুঙ্খের সাথে অভিমানের যে সুহৃৎ-স্বপ্ন স্পন্দন
অমলাকে বাস্তব কথিয়া তুলিতেছিল, তাহার সন্ধান কেহই
পাইল না।

অগ্রগণ্য নিজের ঘরটিতে এক। পারিষদ নরনারী
কলোলের মধ্যে আজ তাহার স্থান নাই। নিজের উপর,
অমলাও উপর, সমস্ত শ্রমিকের উপর দাবী রাখে তাহার অগ্রগণ্য
করিয়া গিয়াছিল। কেন অমলাকে বাধা দিবার মত চেষ্টা
আজ তাহার দ্বারা আসিল? কেন অমলা খুশি না যে,
সে বাধা বলিয়াছে তাহা তাহার সভ্যতার মনে কখন নহে?
কেন এই উৎসববিহীন নরনারীর মন আজ তাহার ও
অমলায় মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দৃষ্টান্তের মনে দীর্ঘ বা-
ধানের প্রাচীর তুলিতেছে?

অগ্রগণ্য কয়েকবার অমলাকে ডাকিয়া পাঠাইল, কিন্তু যে
ছোট প্রাণিকটির উপর এই গুরুতর দোষাকারের ভাব
পড় ছিল, সে প্রত্যেকবারই ক্রিষ্টা আসিয়া জানাইল,
নিমি এখন আসিতে পারিবে না। অগ্রগণ্য একবার তাহা
যে, অমলা হইতে কোনকালেও দৃষ্ট এড়াইয়া আসিবার প্রবেশ
পাইতেছে না; কিন্তু পরকালেই তাহার মনে হইল যে, এই
অগ্রগণ্য সভ্য নহে, অমলায় আসিবার ইচ্ছা নাই বলিয়াই সে
দূরে দূরে গিয়াছে। অগ্রগণ্য ইহার প্রতিশোধ লইবে।

প্রতিশোধ লওয়া হইল সাহসিন পয়ে সভ্যতার সমস্ত।
বাড়িতে কোন-কালের সমাধা হইয়াছে। নিমিত্ত ও
অনিমিত্তের মন চলিয়া গিয়াছে, কেবল কয়েকটি বিশেষ
পরিচিত বস্তুই তখনও গৃহকর্তার চাচিপাশে আসার জমাইতে-
ছেন। অগ্রগণ্য বৈকালের দিকে একবার বাহিরে বেড়াইতে
গিয়াছিল, তখন সন্ধ্যায় বাড়িতে ক্রিষ্টা নিজের ঘরটিতে
প্রবেশ করিয়াছে। হঠাৎ অমলা আসিয়া দরজার
গাড়াইল।

হাসিতে অগ্রগণ্য কহিল, আজ আর্মারের নতুন করে
তুলিয়া হ’বে, কি বল?

অমলা হাসিয়া জবাব দিল, তোমার যেমন কথা! এত
বড় বারবার তুলিয়া ক’রবার সব থাকে তবে আর কয়েকটা
বিশেষ কর না কেন?

সমস্ত সময় হইতে অগ্রগণ্য এক কথাই ভাব করিত, কিন্তু
যাক সাহসিনবাসী দেখাওকালের পর এই চকিত চোখটুকু
তাৎক্ষণিক বন্ধ করিয়াছিল। তাই সে গভীর ভাবে কহিল, এখন

দিল্লী তো তুলনাব্যায় হয়ে গেছে অচেতন ছিল, তাই সেট
অসম্পূর্ণ মুহূর্ত্তি আজ সম্পূর্ণ করবে হাট।

তুলনাব্যায় কথা কোন মেয়েই তুলিতে পারে না, অমলাও
পারে নাই। কিশোরীর কুটিল মনের উপর সেদিনকার উত্তরা
হাওয়া যে আশোনের মত নাহি বহে, কোন কবি তাহা লক্ষিত
মুগ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন?

সেই তফাত, নিশান্দাজী রাহিটির কথা চোখে মনে
হওয়ায় অমলায় মনে যে একটু লোভ না জাগিল এমন কথা
বলা যায় না।

পতীর গায়ে। ঘরে ঘরে কর্মজাল নরনারী নিভ্রাম।
অগ্রগণ্য ও অমলা গল্প করিতেছে। সে বেন বস্ত্রের প্রোত,
তাহার আঁধার নাই, অন্ধ নাই—তাহা মাহুকে ভাসাইয়া লইয়া
যায়, কিন্তু কোন পথে তাহার গতি তাহা কেহ জানে না।

অমলায় পতীর বারবার কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মন
বেন চৈতন্যময়ী হৃদয় হাওয়ায় হেলিয়া চলিয়া উঠিতেছে।
অমলা বস দেখিতেছে। কান্সত্রাত বেন বহিতে বহিতে
অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

অমলা মাথের ঘরে গেল।

অগ্রগণ্যের বেন ব্যাপারটা বিবরণ হইতেছিল না। যে
পথম মুহূর্ত্তির প্রত্যক্ষ সে এতদিন ঘরীয়া করিতেছিল, তাহা
কি এত নিশ্চয় আসিয়া পৌঁছিল? যদি আসিয়াই পাকে,
তবে এতদিনের সমস্ত ব্যাপারটা এখন সে লামলাইবে কি
ভাবে?

অগ্রগণ্য কি করিবে?

সমস্ত কাঁপিয়া যায়। সমস্ত আর নাই। অগ্রগণ্যের
ভেঁই বৎসরের জীবনে সে বাস্তবতার এমন কল্পনা আর
কখনও অগ্রগণ্য করে নাই।

পায়ের ঘরে অমলা। তাহার কম্পান মেয়েই প্রতিটি
গায়ে বেন একটা বিরাট আবেগগিরির আকস্মিক প্রাবল্য
পুঁজিয়া ছিঁড়িয়া ধাইতেছে। পতীর নিশ্চয় প্রলয়ের কৃষিকম্প
বেন শূণ্য নরনারীর অচেতন দেহগুলিকে তরলিত ও তরলিত
মত ওলট-পালট করিতেছে। অমলায় বেহের বন্ধ, বন্ধ
বেন কীর্ণ বিভ্রামিকা তাওর নৃত্যে বাতিয়া উঠিয়াছে।

নিভেত ঘনভিঁতে অল্পম এক! তিরুক্ষণ আগে অমলা
 দেখানে শুইয়া ছিল, বিছানার সেই অংশটি এখন লুপ্ত। নবম
 বালিন ও ত্রোৎকেশ উপর অমলার দেহের ভায়ে দাগ পড়িয়া
 গিয়াছে। অমলার চুলের গন্ধ ঘাটের আলো-পাণে তামিরা
 বেড়াতেছে। ভোমের আলোকে অল্পম স্তরে শেঁথে
 পাইল, অমলার চূড়ির আঘাতে তিরুক্ষণ খাণে চাপবের যে
 কোণটি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, তাহা ঠিক তেমনিই আছে।

অল্পম হাসিয়া ছিল, একবার শুইল। হঠাৎ চোপ হইল
 মৃত্ত কঠোর অল্পম তামিল, অমলা তাহার পাশেই আছে।
 মূল্যবান রাত্রে তীতা বহির্দ্বার মত অমলা! আজ তাহারে
 মূল্যবান নূতন সংকরণ।

কতক্ষণ যে সে শুইয়া ছিল তাহা অল্পম জানে না।
 পাশের ঘরে মুহু গজন শোনা যাউতেছে। প্রাচীণ আলোর
 মূল্যবান দীপ্তিকে প্রেরণ করিবার ভঙ্গ বাতি জ্বলিতেছে।
 পাখার কলহের সঙ্গে লোকজনের আনাগোনার সঙ্কট শব্দ
 মিলিয়া যাউতেছে।

তড়াতড়ি বত হইতে বাহির হইয়া অল্পম পাশের ঘরের
 বরজার ভাঁকি নিল, কিছ কিছু দেখিতে পাইল না। তার
 পর কোনরকমে একটি জালকর সন্ধান পাইয়া এক নিঃশ্বাসে
 বলিয়া ফেলিল, ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে
 পারেন? একটু খামিয়া আবার করিল, অবশ্য যদি হেঁটে
 আসতে পারে।

জালকপ্রবর একটু হাসিয়া গিয়া গেলেন। অল্পম
 নিভেত ঘরে কিরিয়া গিয়া ক্ষুণ্ণভাবে পাটের একটা রেলিং
 ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিচ্ছিন্ন
 সহস্রের মধ্যে টাইটানিক আঘাতের মত চলিতেছে। বরজের
 পাখার ক্রমশঃ অল্পম হইতেছে, বর্ষ মর্ত্য অন্ধকারে জ্বলিয়া
 গিয়াছে, অল্পম ও অমলা দুগাই 'লাইফ-বন্ডে' গুঁটিতেছে।

কয়েক মিনিট পরে ঘরের বরজায় অমলাকে দেখা গেল।
 জান আলোকে তাহার মুখখানি সম্পূর্ণ দেখা যাউতেছে না,
 কিন্তু বাসনিক হইতে দেখিল মনে পড়ে, পত্রার যেতার
 নিখিল বালুপত্রের মত। অমলার পা কাপিতেছে, তাই
 বরজার কাছে আসিয়া সে একগালা কবচ ধরিয়া একটু
 দাঁড়াইল। অল্পম তাহার কাছে গিয়া একটু খকিয়া

দাঁড়াইল এবং পথঘূর্ণিতে তাহার হাত হইলি দিয়া যৌত যৌত
 তাগকে আনিয়া ঘাটের একপাশে বসাইয়া দিল।

অল্পম কি বলিলে তাহিরা পাইল না। একটু পরে
 অমলা হির হইয়া বসিয়া একবার হাসিল এবং নিভেত কল্প-
 মান বামহাতখানি অল্পমের কোলে রাখিয়া নিভেত যেটি
 তাহার হৃৎকেশ উপর এলাইয়া দিল। অল্পম মুগ্ধ হইল।
 অমলাকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কানে কানে
 করিল, ভর পাছা?

অমলা কবাব দিল না, কেবল অল্পমের হাতে একটু
 চাপ দিল। হঠাৎ পাগলের মত অল্পম তাহার মূণ, চুল ও
 হাত হইলি হৃৎকেশে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া কয়েকমিনিট যেন তত্ত-
 ভাবে বসিয়া রহিল, তারপর বলিল, ভয়ের কিছু তো এই।
 এরকম তো সবারই হয়। মা! আছেন, এখনি ডাক্তারবাহু
 আসবেন। সব ঠিক হবে যাবে।

—ডাক্তার? অত্যন্ত প্রাণত্যাগে শব্দটি উচ্চারণ করিয়া
 অমলা একবার জানালার দিকে তাকাইল।

মিথ্যা সাহাবা দিতে অল্পমের কঠোর কাপিতে লাগিল,
 তবু নিভেত কোনরকমে সাহায্যইয়া লইয়া একটুখানি হাসির
 ভাণ করিয়া করিল, এ সময় ডাক্তার আনাই তো ভাল।
 তোমার বাতে কেনই কই না হয় সে ভরই তো ডাক্তারের
 সাহায্য নেওয়া। সাহস থাকে যেন, লজ্জাটি।

—আমি ত ভর পাই নি—বলিতে বলিতে হঠাৎ অমলা
 চাপা লম্বা চীৎকার করিয়া উঠিল। অল্পম একটা বৃহৎ
 বিজলের মত চাটিয়া রহিল, তারপর তড়াতড়ি অমলাকে
 বিছানায় পোছাইয়া দিয়া নিভেত বাহির হইয়া গেল। একটু
 পরে সেই জালককে নিয়া সে যখন কিরিয়া আসিল, তখন
 অমলা আবার উঠিয়া বসিয়াছে।

বারের ঘরে বাইবার সময় অমলা পিছনে কিরিয়া কি যেন
 বলিতে চাহিল, কিন্তু বলা হইল না।

অল্পমের চোখের উপর আজ সূর্য ও গ্রহের একদমে
 কোলাহুলি করিতেছে।

কয়েকটা ঘণ্টা কি তাহাে কাটিয়া গেল, তাহা অল্পম মনে
 কহিতে পারে না। পৃথিবীর গতি যেন অসম্ভব ত্বক হইয়া
 দিয়াছে। জীবনের প্রবাহ যেন চলিতে চলিতে হঠাৎ বন্ধ

হইয়া গিয়াছে। নিবন্ধন চূৰ্ণিমান নকিত কি বহুপাতের
অন্যায় বিপদের পূৰ্বেই স্থির হইয়া গেল ?

একবার অঙ্গুণমের মনে হইল, পৃথিবী বড় বৃক্ষণ।
বৃক্ষপাত পৰিমাণ গ্রন্থ গ্রন্থের নিমিত্ত প্রায়শঃ এট পৃথিবীর বৃক্ষে
বহিমা চলিয়াছে। নারী ও পুরুষ এখানে বাঁচিয়া থাকে, স্তম্ভ
বহে। এই পৃথিবীর ভাসো অমলার বীজিত উদ্ভিদ,
এখনকার তরু-লতা অমলার স্পর্শে লজ্জিত। এই পৃথিবীর
কুসমা নাই।

চা-এর নগ্নাঙ্গ মনে লাইমা প্রালকগ্রন্থের অঙ্গুণমের মনে
প্রবেশ করিলেন। তারপর তারার নিকে একবার তাকিয়া
বাহুভাবে চা চাচিত চাচিত বহিলেন, নাও। যে দাবল
ঠাটা পথেই থাকে।

—না, ভাল লাগছে না। এক নিঃশ্বাসে কণাটা বলিয়াই
অঙ্গুণম মনের এক কোণে বাঁচিয়া একটা চেতনায় বহিমা
পড়িল।

প্রালক কর্তব্যে পড়াঘুপ হইবার পাঠ নন, বিশেষতঃ
অঙ্গুণমের এই অকথিত বৈরাগ্যের অর্থ তিনি বুঝিতে পারি-
লেন না। বুঝানি একটু অর্থপূর্ণভাবে বাঁচিয়া বহিলেন,
চা বাঁচি না কেন ?

অঙ্গুণম শুধু একবার মাথা নাড়িল। প্রালক চলিয়া
গেলেন।

ভাবানার পাশে চোকাটায় বহিলে বাহিরের অনেক পুর
পাঠ্য দেখা যায়। বাঁচীর মাঝে অনেকটা ভাঙা কাগজ,
মাঝে মাঝে আনিগাঙ্কের স্মৃতি। তারার ওপারে মঞ্চবল
লম্বের অঙ্গুণম তাকাত এবং তারার ওপারে বহিমা পড়ার
কয়েকখানি ছোট ছোট বই। অঙ্গুণমের ব্রোশোবল
গতক কুয়াশায় ঈষৎ রান চইয়াছে, কিন্তু তাহাতে বৃষ্টি
বাঁচাত হইল না।

অঙ্গুণম বাহিরের নিকে চাচিল। তারার লোককনের
লোকল গুরু হইয়াছে। বাঁচিগতের অঙ্গুণমের মাঝে নিজে
বৈত ও মনের শ্রদ্ধার তুলনা করিয়া অঙ্গুণমের মাথা হুটুনি
করিয়া উঠিল।

পাশের কবে চাপা গলায় কথাবার্তা চলিতেছে এবং মাঝে
মাঝে অমলার আঁধারের নোনা বাইতেছে।

হঠাৎ অঙ্গুণমের চোখে কুয়াশার ছায়া নাথিয়া আসিল
এবং ক্রমে ক্রমে বাঁচিলে পলিত হইল।

অঙ্গুণম কাঁদিতেছে। অমলার চীৎকার বহুই তারার
কানে আঘাত করে, ততই বহুমানী অঙ্গুণম প্রবলবেগে

গড়াইয়া পড়িতে থাকে। সেই বন অঙ্গুণম লুপ্তি পাইবে
না। অমলা বহি লাভাকল অব্যবহৃত আঁধারের কথিত, তবে
তব তব তাহা এত নিরাশ্রয় মনে হইত না। কিন্তু এট যে
কয়েকমিনিট পর পর বিবাহান্ত নিম্নতত্তা পদ পদ করিয়া
কাঁদিয়া উঠে—

অঙ্গুণম নীরবে নীচে নামিয়া গেল। বহুমান কাঁচাকের
ধারীয়া অমলার ক্রমে-তবোব লজ্জনে ক্রিয়ারে—তারার
কি ভাবে তে বলিবে ? অঙ্গুণম পাশের বহুবার কাঁচা আঁধার
ক্লান্তি পাবে না। দেখানে তাহা আঁধার শোনা বাইবে না
অঙ্গুণম দেখানে বাইবে। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে সে
কাঁচিয়া ?

কাঁচিয়া বড় বাঁচিয়া। উপরে পাঁচিয়ার বহু, নীচটা
কাঁচা। অমলা যে বহু ছিল অঙ্গুণম তিক তারার নীচে
গাটকা গাটাইল। অমলার আঁধার ক্লান্তি আঁধার
তারাকে টানিতেছে।

তারার বহু ছেলেব পাঁচি চুনি চালাইতে বাঁচ তখন
মা পদে পাঁচিতে পারেন না, কিন্তু বাহিরে আসিয়া বহুবার
নিকে কবে পাঁচিয়া গাটাইয়া থাকে।

আবার সেই পদ ! অঙ্গুণম তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া
গেল। চোখের কল বাঁচা মানে না, কিন্তু বহুবার বাঁচি
প্রান্তকে বাঁচা ক্রমে প্রান্তকন হই। গাটকা যে নীচে
তারার কাঁচি আসিয়া গাটাইয়াছিল, তাহা অঙ্গুণম লজ্জা
করিয়াছে।

বৃষ্টির বাঁচা কি শুধু মনোবহু তব ? বিবাহান্ত কি
তাহাতে কোনই অংশ নাই ?

লোকচকু কোন বহুনে চোকাটা অঙ্গুণম বহু চইতে চুনি
চুনি অমলার নিকে চাচিল।

অমলা তবোব আঁচি। তারার মাঝে-মাঝে কালো স্তম্ভ
একটা কল তড়ানো। চুনি-চুনি আঁধার। হাত চাঁচানি
বৃক্ষ উপর এলাইয়া বহুতাকে, চুনি-চুনি একটা অঙ্গুণম
দেখা যায়।

পাশে নৃতন অতিথি।
অমলা যে তারাকে লজ্জা কথিত পারিবে উভা অঙ্গুণম
মনে করে নাই। কিন্তু অমলা নিজেই মাথাটি বাঁচি হইতে
সামান্য একটু উঠিয়া একটু হাসিল এবং পরকণেই মাথাটি
আবার নামাইয়া মেঘের নিকে একবার চাচিল।

অঙ্গুণম মেঘকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু মেঘের না যে
তারার নিকে চাচিয়া ঈর্ষা অঙ্গুণম কহি মোগাইতে চাচিতেছে
উভা স্তম্ভ বহু গেল।

একছুটে হরিহর-ছত্র

— শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুত্বের অনেক চাকরো পোহাতেই হবে। কৌশলী
স্বার্থের পোষক-মেজাজে বলাবাত্টিবসে কলিকাতা আসিয়া
বেগাব দাঁড়িয়েন, এখন যেটুকু দাঁড়িয়ে কবির, লঙ্কায় কবির



জোলা বাট। জোলা বাটের অপর তীর। পানদুয়ের লঙ্কায় বসে।

দাঁও। তথাক্। চার পাচ দিন নানাবিধ গাড়ী দেখা এক
saloon-এর হুকুমি দাপটে বসে আর ট্রান্সপোর্টবাহিত
কিংক-র হস্তিক-চিকিৎসাগারের কটক পথায় আসিয়া পড়িবার
উপক্ৰম, তখন তাড়াতাড়ি এক অটোমিগিটার "পলিটিক"

পরিদ করিয়া কেশা খেল। বন্ধু সেট গারেট "ব: পলায়তি
ল কীংকি" করিলেন। আবার কাছে প্রতিক্রিয়া মাঝায়
করিয়া লইলেন যে, তাঁহার নৃতন গাড়ী অথন্তে পৌছাইয়া দিয়া
তাঁহার পুরাতন গাড়ী লইয়া আসিব। একা এতদূর পাড়ি জমান
বড় বেছ্য, তাই জ্ঞানবান্ ও মিত্রকে আরোহিত্রপে সংগ্রহ
করিলাম। তাঁহার্য ও "লতার কিত্তিতে অবখামা ধাম্মার পোত"
সংবরণ করিতে পারিলেন না। একদিন লঙ্কার তিন স্তম্ভি বাসা
করিলাম। তখন কিন্তু জানা ছিল না যে, এই বাসা তবিরতে
"এক ছুটে হরিহর-ছত্রের" মাল-খণ্ডা লম্বগ্রাহ্য করিব।

রাত্রি বাহটার সময় বর্জমান শৌছান গেল। আরোহি-
হরের ইতিমধ্যে জঠরে একদল লাহ ও অনলের স্তম্ভি হইয়াছে
যে, আর বিলম্ব হইলে তাঁহার্য হস্ত নাউ নাউ করিয়া
জদিয়া উঠিতেন। পৌছিবামাত্র তাঁহার্য ছুটিলেন সীতা-
ভোগ ও মিহিমানা সংগ্রহে এবং আমি পালেই এক
পাল্লাবী হোটেলে চাপাটি ও অত্যাংকৃত মালগ্রহযোগে অনল-
নির্দাপণে বাস হইলাম। Hunger is the best sauce.
ক্ষুধার কোঁকে খাইয়া খেলাস, কিন্তু তার ফলে যে অক্ষর
অবিরল ধারা এবং লালার অবাধ প্রবাহ প্রবাহিত হইল, তাহা
গ্রেথের ক্ষমতা নাই: সে কি বাসল বাস! খাল পূর্ববধে
দাম্যপূর্ণ কাঁচালভার ঝোলও খাইয়াছি, কিন্তু এ পাকের
বাহ্যদ্রব্যী তাহাকেও হার মানাইয়াছে। রাজার তারিক করিতেই
হইবে। সন্তান থাকে চালিয়া পরামর্শ দিল, এ কেন রসায়ান
একা ভোগ অতীত স্বার্থপরতার পতিভারক হইবে, অতএব
চুপচাপ খাঁকিয়া তবিত্তৎ কপাকল লঙ্কাবেক্ষণই বিবেহ। হইলও
তাই; বন্ধুর সোত সংবরণ করিতে অপারগ হইয়া অত্যাংকৃত
মাল-চাপাটি খাইলেন; খাইয়া উত্তরেই আবার উপর হারদ্রুণী,
সাবধান করি নাই কেন! আমি বজীর পেশ করিলাম:—

এক হোটেলে বহুদিন পরে দুই বন্ধু খানায় বসিয়াছেন।
পান ও নান্য লুপ্ত ভ্রমের পর অব্যবে চলিয়াছে। এক বন্ধু
সোতল হটেই চাটনী লটগা ভঞ্জে রত হইলেন। আর পরে

অপর বহু লক্ষা করিলেন, বহু চক্রে দরখির্গিলি দাওয়া, What makes you cry? (কিস কেন?) সত্যজন সেক্ষেত্রেও যত্নে সওয়ায় হইয়াছেন, উত্তর দিলি, Fifteen years ago they hanged my poor innocent father here (এখানে ১৫ বৎসর পূর্বে আমার বোকারী নিরপরাধ পিতাকে তাহারা ফাঁসী দিয়াছিল)। শাহজাদী, কিয়দ বিমোহিত ইত্যাদি লাম্বিক লম্বেরনা করিতে করিতে অপর বহুও চাটনী-তক্কে রত হইলেন, সবে সবে অকল্যাণও উল্লিখিত হইয়া উঠিল, প্রথম বহু প্রশ্ন করিলেন, What makes you cry my friend? (তুমি কিস কেন বহু?) বহু তখন ভুক্তোদাধি, উত্তর দিলি, That they did not hang you along with your father. (যেহেতু তোমাকে তোমার বাপের সঙ্গে তাহারা ফাঁসিতে লটকাই নাই)। বলা বাহুল্য, চাটনীটি তীব্র কাল।

আশানুসায়ে শেটোল আদি সংগ্রহের পর পুনরাবরণওনা হইয়া অতি প্রকৃতবে গিরিচি পৌছিলার এবং তথায় কয়েক বন্দী বিশ্রাম ও আহারাদি সমাপন করিয়া জেবোর ঘাটে হইয়া বিহার-পরিচ পৌছিলার ঠিক সন্ধ্যায়। সেখানে হইতে পৌষ-খবর করিয়া দ্বাইতে হইবে “অশখাওগা”—বহু বৌলতী সাহেবের থাকে। সেখানে দিয়া জানিয়া, বহু পাটনার পিতাছেন, তবে তাহার স্বস্তর, মাননীও লভি বহাশর উপস্থিত আছেন এবং আশাবের বর্ণনাতিলাখী। সাফাতে আশর-আশায়ন বকেই হইল; রায়ে থাকিবার জন্য ভিল করিলেন, কিন্তু আমরা তখনই পাটনা দ্বাইতে বহুপরিচর জানিয়া তাহার বাশার উত্তিবার প্রতিশ্রুতি লইয়া এবং সেই মর্মে পত্রাদি পিচ্চিয়া দিয়া বিদায় লিলেন। আশরা পাটনা অভিমুখে চলিল।

কি জানি কেন, রাত্রি বারটা এ দ্বাত্রিঘে আশামের চক্রে কল্পে পরিণত হইতেছিল। আবার বারটাও শেটোল অভাবে বখাণে থাকেই বেধে বন্ধা করিল; নৃতন থাকে, শেটোলের পুরা সঠিক অভ্যাস, কাজেই এই বিমোহিত। অপর্যাপ্ত সাত্তাও থাকেই উর্ধ্ব হাতে সেট বোর নৈশ অন্ধকারে অঙ্গের চটনাও, সাহায্যও—এক প্রত্যাহাও দণি, অর্থাৎ শেটোল অভাবে কেহোঁসিন তৈলের সন্ধান।

সাত্তাও দক্ষিণে গয়াও উর্ধ্ব চটনাও, তপের কৃত করোণ কানে আসিতেছিল, আর আসিতেছিল শৈতের শিরির্গিলি নৈশ লম্বার, যারা আশ্রয়ের বখেই বারনা সবেও হাতে কাপুনি তুলিয়া হাতে হাতে কলিগান্ন পাগাটতেছিল। কিছুই এট ভাবে চলিয়া সাত্তাও থাকে এক “হুশকী” দেখা গেল, সবে সবে হিনটী টর্কের আলো দিয়া পড়িল সেট কুঁড়ের উপর। তার সামনে দিগন্ত এক নাতিপ্রশর অতঃস্থ জল “পাকড়াও” খসাগড়ে নামিয়া গিয়াছে এবং আশাতীত সাদলা,—হুটী মনুদুর্ভি, কুঁড়ের স্বরপরিচর বাওয়ার আপাশমক “সোহর” হুটি দিয়া, হুট পাটনার নিহায়ে বহ। বাক,



সোহর হরিহর-ছত্র দ্বারা। (১৯০০ খ্রিঃ)

মাগুণ বন্দ বিলিয়াছে, তখন আর বিশেষ ভাবনা নাই; লকলে জীংকার আরম্ভ করা গেল—তাহারো যুগ তাহারিতে হইবে। কিন্তু চোটা তথায় গেল, হুচকর্কের কলিগুণের সেই বন্ধ সংকল্প আসলকও অনাশ্রয়ে হাত মানাইল, যুগ তাহা পুরের কথা—তাহারা একটু বড়িলও না, তাবিল শুধু আশ্রয়ের গলা। তখন দলবলসহ লাওয়ার চক্রে করিয়া বহুত্ব এক হুটিকে সজোরে থাকা বিশ্রাম; যার কৌক করিয়া একটি আওথাক ছাড়া কোনও কল হইল না। তখন জোর করিয়া “সোহর” যুগ হইতে অশ্লিষ্ট কথিবা টর্কের আলো দিয়া মাঝ,—প্রকাণ্ড এক লাক। বহুদল বোধ হয় গণ বোধ করিয়া ছিলেন, এক হুটিকাও হিনটীও তথ্যে পড়িলেন, তাহাও



বনভ্রম—৪ম : উদ্যোগ। বনভ্রম ক্রমের অঙ্গসংগ্রহ। অঙ্গসংগ্রহ।
হস্তসংগ্রহ। (১০০ পৃষ্ঠা ৩৩য়)।

উর্দ্ধ ছিটকাইয়া খেল এবং প্রাণ নষ্ট এক মুষ্টি “বাঘা ছো
বাঘা” চৌক্যের মিলনভার প্রকৃতির বসন্ত সঙ্গ করিয়া ছুট

মারিল, যেন এট দৌড়টির উপরই তার এই জীবনের
বাচন মরণ নিভর করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আর এক মুষ্টিও
লাফ মারিল বটে, কিন্তু “সোহব” তার কাপ হইল, জড়িয়া
পড়িল মাটিতে এবং শুধা হইতে পড়িল গিরা বন্ধুত্বের কাছে,
যিনি প্রথম বাঘার-গাণ চাপু লগ্নে পড়িয়াছেন। টাল সাম-
নাটিতে সে দ্রুত বন্ধুর চরণ, ফলে তিনি পড়িলেন তার কাছে,
তারপর দুই প্রাণী পতীর আঁঠুদোষে দ্রুত কাপাটিকা, সরল
করিয়া সেট চাপু লগ্নে মাটিয়া খেল এবং পরক্ষণেই গজাখণ্ড
হইতে শব্দ উঠিল—কল, কল, কল।

চক্ষুর নিম্নে এই যে নানা ঘটনার সমাবেশ, সেস
মাণিক্য প্রদর্শনকেও মৃদুগণের সাহায্যে একত্রিত
প্রকট করা সম্ভব নহে। ছুটিয়া গিয়া বন্ধ ও অমানিতকে
উপরে আনা হইল, তাঁহারা তখন বেতলগন্ধের মত
দরহরি কম্পান। তাগো তীরে কল পতীর ছিল না,
নতুবা সেই গ্রাহের গুণটনার কথা আজ আর দিখিবার
শক্তি থাকিত না। ভোলের শেষ তখনও হয় নাই,
মহা-বাগধের গলায় রাস্তা হইতে হাজার উঠিল, “কোউন হই
রে-এ-এ-এ-এ” এবং হাজির হইল এক শাক্য চারিহত
পরিমিত তৈলপত্র বংশগত, আর আগাখোড়া এবং মহা অর্থাৎ
প্রতি গাটট ভরী শিতল দিয়া ঘোড়া। ঝগ! সে কি
লাঠি! লাঠি দেখিয়াই এমন তাক লাগিয়া গেল যে, মুষ্টি
কিরাইয়া এ যেন কোঁকর মালিককে দেখিব বা কিছু
বলিব, সে শক্তি রহিল না। আবার সেই গলায় গের হইল,
“বৃত্ত কাহে ঘোড়া?” সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি-আফালন। বোধ
হয় এত আক্ষেপে “হাছি দুর্গা” ডাক বুঝ কনই উঠে। বেশ
দুখা খেল, ব্যক্তিটি তার খেঁচের মতই একবারে নিরেট,
বৃদ্ধির আভিষা যেতু যদি হৃদয়ের মত একবার চাপনা
আরম্ভ করিয়া যেত, তবে হৃদয়ের অগ্নিকা কম কাব্যকরী
হইবে না। বলিতে টঙ্কা হইল, “ওরে নির্ঘব! বসতি
বসিয়া শুকনোভিত ‘সপ্ত লাফলের পোরা’ মোহনের
বৃদ্ধ (শিশু) পদবাচ্য হইতে বাধা হইল না, অকস্মাৎ তিনি
নিরীহ বঙ্গ-মস্তানের ভোবার বিশাল কোঁকর আফালন
অন্তর্যাস্য শিতরদ্রুত হইতেছে, দেখিকে লক্ষ্য নাই!” কিন্তু
যদি বসাইয়া শেল, এই ভয় সবাই নীরব। তারপর আবার
হইল গ্রামা হিলীর অবাধ আদান-প্রদান, বৈশিষ্ট্য ভাগই

হুকীয়া, মাঝে মাঝে আগ্রহ হুকীয়া হইতেছিল জ্ঞানবান্ধব
সাক্ষী পাওয়ায়, যথা—“সত্য বৃত্তকে না পেতে সত্যতা, তো
বুঝ তাহার যা না তো তিহ” কতক আশঙ্কে, কতক
কুস্মিতা এবং বাকি fill up the blanks (পাথপূরণ)
করিয়া বুঝা গেল, আশ্বাস পৌছিয়াছিল একেবারে সন্ধ্যায়
(বসিয়ারি গাড়ী! লগ্নাশ্বাসেই বেরতলা করিয়াছে)।
ওট্টী বুদ্ধব্রহ্মের স্তবীঃ বাবলা সেদিন খুব জোর চমিকা-
ছিল; তিনটি শব্দ গাহ হইয়াছে; কাজেই শিত্তা নিস্ত্রিত
পূর্ণমণ্ডকে সাধারণতঃ স্রাবিয়া (বোধ হয় poaching-এর দলে)
এখানে দিয়াছে কিন্তু তরল শব্দার্থ উল্লেখ দিয়া স্রাব অশ্লীলতায়
করিবার ভয়; আর ফেরে নাই। এমন সময় এট উৎপাত।
এই হঠাৎ লজ্জা দেখানো আশ্বাস “শিরেতে”রূপে প্রত্যক্ষ
পূর্ণক তাহার নবর সীতা মন্তক টুটি চর্মেণের টাকার ফল
বসিয়া মনে করা কি তাহার পক্ষে সম্ভব? লোকটি এমন
ভাবে আশ্বাসের বিকে চাফিা হইল, যেন সে এখনও এ বিধে
নিঃশব্দে হইতে পারিতেছে না। কিন্তু পরে আগ্রহক বিকট
চাক্রে বলিল, “আরে নেহি, টে লব বলাবী বাবু”। যেন বুঝাইতে
চারে, “বলাবী বাবু” ও “শিরেতে” অতি নিকট সম্বন্ধ, অতএব
“বুদ্ধ”র এই শ্রম খুবই স্বাভাবিক। তারপর চক্ষু জাগি হটল
“যে বাজা করে হা”—বাজাও বিনা বাতাবারে চোঁচা পৌড়
মিল।

কড়ি হঠাৎ হইয়া পড়িতছিলাম; তবু একটী আশার
কীল আলোক মনে উকি দিতেছিল। প্রথম পলাতক
“বুদ্ধ”র যদি যা থাকে, তবে নিশ্চিত থাকিবে না, দ্বিতীয়
পুত্রের উচ্চায়ে এখনই দ্বিষ্টা আসিবে। বাণ-বাটী তাকি
পাইয়া অস্বাসে বস, প্রাক্ত করিবে না।

আশ্বাস এই মনস্তত্ত্বের প্রবেশগায় তুল হইল না; মর-
ফলের ঘোটে নানা অস্বস্তি বস গ্রাম হইতে হাজির হইল,
সর্বপ্রাণে দ্বিষ্টা আসিতেছে শাবলপাণ্ডিত্য বুদ্ধব্রহ্মসদৌ—প্রাণ
জ্ঞানবান্ধব, তাহার হরায় খন যে বলা বৈশিষ্ট্যের ভয় নিঃশব্দে
হলের লজ্জা হইয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি পড়ায় নাই। হায় না!
তোমার যেহেতু ধারণা উচ্চ, নীচ, মাজল, লজ্জা কোথাও তা-
হা ভয় না, সর্বপ্রাণে লজ্জা অস্বাস প্রবাহ, আর মনে হয়, এট
লগ্নীর মেঘের সীলটি এত অনাগ্রহ মন্তক পলিঙ্গীর লগ্নাতা
গবনের বাধাশ্রম হইয়া তাহাকে ধরিয়া ধাপিয়াছে।

ঘোড়ার “বিশড় গিরা” কুস্মিতা পরিয়া লটল “ভাবি
আবিশি”, লাহেব হওয়ায় আশ্বাস মরে। প্রাণ লকলেই
দেখান নিল, কিন্তু বুদ্ধব্রহ্মসদৌ কষ্টের কষ্টে গের করিল,
“ঘোর বেটুগা?” যখন অল্পনির্ভরশে তার চারানিধি
দেখানো দিলাম, সে তার তি আশ্বাস! যেন মেঘের
উপর এক ললক রৌদ্রকিরণ পড়িল। এক হতে তাহাকে
আশ্বাসেরা পরিয়া অপর হতে আশার পথবারদ করিয়া
হাসিকাতা মিশ্রণ হরে নিবেদন করিল, “লাহেবের হওয়াতে
আজ শিরেতের মাড় হইতে পূর্ণ জিহবা আদিয়াছে।”
মন্তকপ বিখ্যাস কখন অস্বস্ত হইল। বুজিলাম, এখানে
হইতে ভয় বড়ই প্রবল। তারপর ললক আশ্বাসের ঘোড়ার
বলাবীয়া পাকীওক চৌনি প্রাণে হাজির করিল, কোনও মান
চলিল না তবু আশ্বাসের ভয়বাসা পামিল গিয়া পেরিল



শিল্পক অগ্রগতিঃ (লগ্নীর হইল)

ভেলের কল, যেখানে টিউন সল এবং নিশ্চয়ই মোটরবৈ তেল
মিলিবে। হটলও হাট। ইতিমধ্যে হাট কখন ভয় পেটোল
ছিল। পাঁচ ছয় ঘোড়াও সাংগের হইল। তারপর একটু
পৌছিয়াছে ফরোয়ার ডাকবান্দালা, বাকী বহিষ্টক বিধানের
পর প্রাণে পাটনা পৌছান গেল। তিনিলাম, দৌলতী সাহেব
শোনপুতে হরিহরচন্দ্রের বেলো দেখিতে গিয়াছেন। পরদিন
প্রাণে আশ্বাসও শোনপু বাওয়া করিলাম।

পাটনার পাকী রাখিয়া, দিখাঘাটে সীমারে চড়িয়া
পরবারে শোনপু পৌছান গেল। প্রাণ পক্ষার আরেই
মোদা মনে। বি. এ. এ. ও. ডব্লিউ রেগের টেনন আছে।
বেশিলাম truck-এ বোঝাই হইয়া জীত করকটী হস্তী
হানাতরে দাইতেছে। হবিচের চব্বদ মত এত বড় লজ্জা
মেল: ভাকতে মান নাই। এমন কি কুস্মিতা, কুস্মিতার মনে:

এইরূপ মেলার মধ্যে টাওয়ারেই প্রথম বর্ণিত করা হয়।
এই পতনশীল বৈশিষ্ট্যে আরও জানা চলে না। বিভিন্ন
দেশের পতন ওর বিভিন্ন স্থান বিচ্ছিন্ন আছে। পূর্বে এখানে



মালদা : মেলার-কোলা। মেলার-কোলা। বিভিন্ন স্তূপ
উপর মালদা মেলার, নীচের মেলার তাহার মেলার মেলার।

অবশেষে কেনা-বেচা বিস্তার হইত। এমন আর তত হয় না।
এই মোড়কের মধ্যে কোলাই মেলার কথিত প্রমাণ। প্রচুর
হস্তীও আদিয়াছে দেখিলাম। বাকার কিছু বড়ই নব্বা।

১৫০০—২০০০ টাকার কোলাই হাতী বিক্রয় হইতেছে,
অনুগ্রহ করিবারে অচ্যুত। একটি বাজা-হাতীর মত রকম-
সকম (antics) দেখিয়া বড় ভাল লাগিল। জ্ঞান বাবু
সরস্বতীর অতিথি করিয়া গেলেন। ৫০০ হইতে ৩০০ পঞ্চাশ
নামিক, ৪০০ ২০০ টাকার হুঁকি হইতে পারিত, কিন্তু
খোয়াংকোর বহর তনিয়া বড় শিখাইয়া গেলেন। একটি
প্রবাহ হাতীর পায়ে পাটা ফুটিয়া থাকিয়াছে; বহরার মারুণ
চীংকার করিতেছে। তাহার অঙ্গোপচারের ব্যবস্থা দেখিতে
লাড়ান গেল। সামান্য কারবার মত বড় ওষুৎ একবারে
ভূমি-পথ্য গ্রহণ করান হইল। তারপর এক অতিবৃদ্ধ মাহুৎ
নরুণের মত একটি খারাপ কব্জর সাহায্যে অস্ত্র করিয়া পুঁজ
ও পাটা বাহির করিয়া দিল। হাতী যথেষ্ট চোঁচাইল বটে,
কিন্তু যেন বুকিতে পারিতেছিল, তাহারই বহরলাগবের চোঁচা
করা হইতেছে এবং সেই ভয়ই তৎ চীংকার করিয়াই ক্ষান্ত
হয়িল, অন্য কোনওরূপ বিরুদ্ধাচরণের চোঁচা করিল না।

গৃহপালিত সকল রকম শক্তই সমাবেশ দেখিলাম।
অথ, অম্বতর (ambat), গাধা, ঘরিয়, গরু, বলদ, ছাগল,
হেড়া, শূকর ইত্যাদির পাশে পাশে কেনা-বেচা হইতেছে।
হাতী, উট, নানাবিধ পক্ষী, হরিণ ইত্যাদিও বিক্রয়ের ভক্ত
আসিয়াছে। নাচ, গান, থিয়েটার, বাজনাগের খুব মনোহর
চলিয়াছে; সোকান-পশারও যথেষ্ট, মাহুৎয়ের ভিড় ততোধিক।
থানা বসিয়াছে: বড় বড় অফিসারদের তাঁবু পড়িয়াছে, সে
এক হৈ হৈ কাণ্ড। বলা বাহুল্য, তাহার মধ্যে যৌশতী
সাধেবকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মেলার নৈমিত্ত্য দক্ষা
আবরা পাটনা ফিরিয়া আসিলাম। যৌশতী সাধেব তাহার
দুই দিন পরে ফিরিয়া অগ্রগণ্য করিলেন, ছত্রে গিয়া তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিলে কোনও কষ্ট হইত না। মার পাইবার
তর থাকা সত্ত্বেও আমিও বলিয়া বসিলাম, “সেই বলদ-লম্বের
মধ্য হইতে বলাশঙ্ককে বাহির করা was more difficult
than finding a needle from a haystack (খড়ের
গালা হইতে দাঁড় বাহির করা অসম্ভবও কঠিন)। বড়
চালিয়া অস্থির, “বড় ভয় ভাব দিলা।”

সময় বয়ে, মার যৌশতী সাধেব, অগ্নিগোলা বাজা গেল
এবং তাহার তাঁহার আতিথ্যের মধ্যাহ্নভোজের পর এবং পাকী

অনল-অনল করিয়া বিবাহ নষ্টায় পুনরায় কলিকাতা যুগে বসনা হইল।

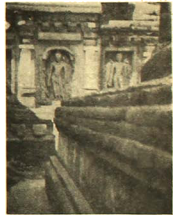
বিবাহের দৌড়িয়ায় কিম্বদন্তী সঁদিয়া বসিলেন, নালন্দা, সাক্ষী ও যথা দেহিয়া কলিকাতা ফেরা হইবে। তথা, নালন্দাতেই হাতি করিল।

বস্ত্রাশ্রয় বিহার লাইট রেলপথ; বস্ত্রাশ্রয় (ই. আই. আব. এর একটি স্টেশন, পাটনার নিকট) হইতে বিহার-সড়িক চট্টা সাক্ষীর কূট স্টেশনে শেষ হইয়াছে। নালন্দা এট রেলপথে একটি স্টেশন; স্টেশন হইতে নালন্দার বিহার 'আব' মাইল দূরে অবস্থিত। মোটের দাঁটবার পথ আছে। বিহার হইতে নালন্দা প্রায় সপ মাইল এবং তথা হইতে সাক্ষীর আই মাইল হইবে, স্ট্রিক সাক্ষীর ধারে ধারে লাইট রেলওয়ে দিয়াছে।

নালন্দার বিহার অংশের কীর্তি। কালে কালে গোপিত হইয়া যায়, চিল মাঝ ছিল না, কিছু ঐ নালন্দার বিহার হইতেই বিহার-সড়িক এবং পরে বিহার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। পোনা ঘাঘ, এক সাক্ষী সাক্ষীর সন্মত বৃহৎ টেমারের কিম্বদন্তী বাহির হইয়া পড়ে এবং বিহার পূর্ণকন্ডে খনন করাটা ফেরেন যে, সেখানে এক অতি বিশাল পূবা-কীর্তি বাটির নীচে রহিয়াছে; এখন পূবা কিম্বদন্তীর খনন করিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে; অর্থাৎ কাঁচা অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছে। বাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতেই নির্দোষ বিস্তার চাহিয়া থাকিতে হয়। কি বিস্ময় পরিকল্পনা এবং কি প্রকল্পভাবে তাহাকে বাস্তবে পরিণত করা হইয়াছিল!

Excavations-এর নিকটেই একটি ancient তৈয়ারী হইয়াছে। অনেক তাম্রকলক পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের পাঠ-উদ্ধার হইতে জানা যায় যে, নালন্দা দশ সহস্র ছাত্র সর্গা সেখানে থাকিয়া বিভাজ্য করিত। হই সন্মত বৎসরের পূর্বে এট ভারতে ১০,০০০ ছাত্রের বাস-উপযোগি Residential University করিয়া কার্যে পরিণত হইয়াছিল—যে সময় আধুনিক সভ্যতাবিদ্যায় অনেকই অর্ধবয়স্ক বয়সে জীবন যাপন করিয়াছে। নালন্দা দেখিলেই বুঝা যায়, এই স্থান অস্বস্ত: হইবার পরিচায়ক এবং পরে তাহার উপর 'আব' ইয়ার্ড তৈয়ার হয়। প্রথম কুরে সীম অধিদায়ের চিহ্ন পরিচায় বর্ধমান আছে। দ্বিতীয় স্তরে পরিচায়ক হইবার কারণ এখনও

স্মৃতিক নির্মিত ৩৭ মাইল। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর 'আব' দ্বারা তৈরি করিয়া তাহার উপর নতুন বসতি নির্মাণ করা হইয়াছিল। লম্বা ভাবে প্রায় ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্যে এবং প্রবেশ-দোরণ, তৎপর সন্ধানে পূর্বের স্থান, সাক্ষী, তাহার, পরিচায়কের গুহ ইত্যাদি এবং 'আব' বসতি-বস্তু, ছাত্রদের বাসগৃহ এবং পরিচালনা এক অতি উচ্চ গম্বুজের উপর আচ্ছাদিত হয়। এই গম্বুজের এখনই অবস্থান, তাহাতে সেখানে হইতে কোথায় কি হইতেছে, অনাগ্রহে তাহা পর্যবেক্ষণ করা যায়। ছাত্রাশ্রয় এক একটি চতুর্ভুজ ফেরা; চতুর্ভুজের ছোট ছোট ঘর, মাঝে বাধান উঠান ও একটি করিয়া কূপ। প্রত্যেক ঘরে একজন করিয়া ছাত্র থাকিত। তাহার মধ্যে পূর্বকথার,



নালন্দা : কলিকাতা।

পড়িবার বাধান বেনী, ততবার বেনী; সপ বসতি-বস্তু নির্মাণ। প্রতি চতুর্ভুজ একজন করিয়া তত্তাবধারণের দর আছে। টি-কুর সেখান বেনী অস্থান হয় যে, উত্তর দিকটি মূল পাশ-পাশি ছিল। এখনও না কি এক-চতুর্ভুজের উদ্ধার হয় নাই। দলদের পশ্চাতে প্রাচীরের বাহিরে কতগুলি করিয়া বাধান লম্বা রহিয়াছে। যে দল আচাধ্য এবং অধ্যাপক ঐ দল সেখানায় করিতেন, তাহাদের সেই স্থানেই সমাহিত করা হইত।

কি ভাবে নালন্দা কুরেই প্রবেশ করে, তাহা নির্ণয় করা করিন। তবে অস্থানে মনে হয়, কোনও সময়ে অতি সীম চমিকন্দে কলেট দ্বারা নালন্দা তাহার সন্মত বিঘাট

নষ্টতা চতুর্থে সমাপিত হইয়াছে । এবারের বিজয়ের কৃমি-
অনন্ত পরাজয়কে পরাজয়ে প্রবেশ করিয়াছে, যাহা
সেখানে বড়োদের ছিল তাহা এখন উল্টায়ে দাড়াইছে ।
সেইদিনে উত্তর ক্যান্সাস প্রজাতন্ত্রের অধিবাস্ত হইতে কি না
কে জানে ।



নাগোয়া রাজ্যের । উত্তর-পশ্চিম । রাজধানীর পক্ষে ।

ঐক্য কৃষিকম্পের আভাস পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদ এবং
কুঙ্গরার মন্দির হটতেও ছিল । সম্প্রতি পনন করিয়া
পাটনার নিকট ঐ প্রাসাদে অবিরত হইয়াছে । কুঙ্গরার
মন্দিরও বহুদূর দূরত্বে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে । আর চুফার
নিকট প্রাচীর ছিল । নাটো বর্জনের বচন বারো পুনরাগ উভার

করান । মন্দিরের প্রবেশ-পথ সোপানবর্তী অসতরণ করিয়া
“পাটালে” প্রবেশের পথ পাওয়া যায় । “পাটাল” “বিজয়পাট”
মন্দির একেবারে অধুনিক । প্রাচীর মাথাবাহারের কীট ।
পুরাতন মন্দিরের ভিত্তি পড়িয়া দাড়াই । পুরাকীর্তি উভার ও
সংরক্ষণ বিষয়ে, ভাঙত, নাটো বর্জনের নিকট অংশে ভগ্ন
হল । পনন করিয়া অনেক স্থলে মাদক্যের বিনিময় পরীক্ষা
করা হইয়াছে । ছবির উত্তর চতুর্কে ঐক্য পরীক্ষার মাদ
পরীক্ষার দেখা হইতেছে । Museum দেখিয়া রাজধানীর
অভিমুখে যাত্রা করা গেল ।

মহাভারত-প্রসিদ্ধ ভরগন্ধের রাজধানী ও বিখ্যাত কারা-
গার রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয় । বৃদ্ধাকার পাথর
ঘরের সমস্ত কৃষিকে চতুর্দিকে ঘেরিয়া আছে, শুধু রাজ-
ধানীর সম্মুখে কিছু স্থান গোলা এবং ঐ স্থান হইতেই কেবল
হিটলে প্রবেশ সম্ভব । অপর কোনও স্থান হইতে উচ্চ
পর্জন্ত লম্বন ব্যতীত প্রবেশ করা যায় না । মাঝে মাঝে
পর্জন্তের উপর নৈসর্গবাসের ধ্বংস এখনও বিদ্যমান । প্রবেশ-
পথের দক্ষিণদিকে মাঝামাঝি এক উচ্চ টিলার (hillock)
উপর বিখ্যাত রাজধানীর কুণ্ড । পাথরের ভিত্তি হইতে পাথরের
বাধান পয়োপ্রাঙ্গণী বিরাট উচ্চতায় অবিরত পড়িতেছে ।
কয়েকটি স্থান বহু হইয়া গিয়াছে । তাহারই নীচে কুণ্ড—পন্ন
ভগ্নে পূর্ণ, বেশ স্থান করা গেল । এই ভগ্নে স্থান করিলে
নরীরের নাকি পূর্ব উপকার হয় ।

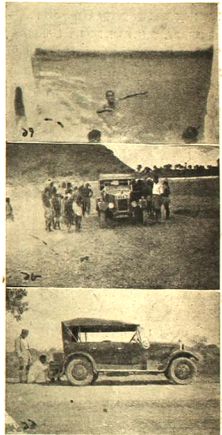
আজ্ঞা যে সময় পিয়াছিনাম, আজ্ঞা ভগ্নদীপক্স রানার্বে
দিয়াছেন দেখিলাম । ভূমিদায় তিনি প্রায়ই পিয়া থাকেন
এবং ঐ স্থান বহু পছন্দ করেন । পরশুটার ছবিতে কুণ্ডের
অবস্থান এবং স্থানবস্ত বাস্তবের দেখা হইতেছে ।
পাথরের উপর যেখানে সাধা সর যেখানে গাছ, ঐখানে কুণ্ড
অবস্থিত । ভগ্নদীপক্স পুঁজিয়া পুঁজিয়া কারাগারের উপস্থিত
স্থান বাহির করিয়াছিল বটে—“পাওবর্জিত” স্থান ! যে সব
রাজ্যের ধরিয়া আনিয়া একবার সেই বাস্তবিক কারাগারে
ভরা হইত, তাঁহাদের আর উদ্ধারের কোনই উপায় ছিল না ।

রাজধানীর হইতে একটা রাস্তা পাটনা নাগোয়া রাস্তার
আগিয়া যিনিগাছে, ঐখানে একটি প্রশস্ত নদী পার হইতে হয় ।
নদী পার হইতে বেশ কিছু জরাজীর্ণ বরফাত করিতে
হইল । নদীর ধারে আসিয়া দেখা গেল, চলন্তা বেশ প্রশস্ত

এবং বাসুদেব তটকৃষি ততোধিক প্রণয়। অশ্বের গভীরতা জানা পরকার। সেখা গেল, গোলন্দক অনেক বাতায়ত করিয়াছে এবং পরিচয় "নিক" পড়িয়াছে—"নিক" থরিতা হাওগাট বৃত্তিমিত। এমন সময় এক ব্যক্তি আদিয়া অঘটিত উপদেশ বিল, তদিকে চল বেই, বন হাত ডাহিনে চাপিয়া গেলে চল কন পাওগা হাইবে। বখা আভা মন হাত ডাহিনে চাপিয়া হাইতে গিয়া দ্রুতর পথে নিমজ্জিত হওয়া গেল; চল বেশ গভীর, অর্ধেক পাড়ী প্রায় চলময় হইয়াছে, এতিন অচল। তীর তইতে চৌকর আরকং প্রস্তাব আসিল, মন কখনো পাটলে ঠেপিয়া তুলিয়া দিতে প্রেরত। কবেক যিনিটের ঘনো বিস্তর লোক জমিল, বেন লকলে ওং পাতিয়া বসিয়া ছিল, গাড়ী আটকাইলে কিছু কাণাই করিয়া লইবে। জ্ঞান বাবু মন কলাকদি আরম্ভ করিলেন, আমি কিছু উৎসাহক নহয়ে পার-স্রত একটি গো-লকটের প্রতি চাহিয়া ছিলো। নিক থরিতা নির্দিবানে একট পার হইয়া গেল; কোথাও চল কেউ ছুটর বেই হইল না। বাপাশ বৃত্তিগায়; কে বলে Indians lack in initiative! ইচ্ছা করিয়া আঘানের বেই চল ও কর্ণে কেলিয়া কিছু অনবান-লতা টাকা টান যারিয়া আলাব করিতে চায়। জ্ঞান বাবুকে চূপ করিতে বলিয়া তাহাবের কগাটেই সম্বত হওয়া গেল। উদ্বিকর্তব্য স্থির করিয়া লইয়া ছিলো। মন বাখিয়া চলা করিয়া গাড়ী ঠেপিয়া পরশারে আনিয়া বিল। পারো আদিয়াই start চালু করাইয়া লইলা, তারপর জ্ঞানবাবুকে বলিলা, jump in, গট, ওঠ এবং gear বিগাই উঠ্বাসে বোড়। কিছুই পিছনে বোড়াটায় মন পিছাইয়া পড়িল। যেমন কুহ, তেমন লগড়াখাত থাইয়া সব অস্ব হইল। গিরিগকে মওহালা রোড থরিতা গমায় আলা গেল এবং বিজুগা ও বুদ্ধমতা সেমিক বগাবর গিয়া হাচারিবাগে স্রায়ের মত ডেরা লইলাব।

হাচারিবাগে শোকের কিছুদিন বাথ পুর্নিবার সন্ধের বড় বাহলা হইয়াছিল। লাল-মোটরের মণি বাবু (আঘানের বেক দাফা) প্রথমে এই দাফা প্রার্থিত করেন। তিনি এক মোড় চিতার বাক্স পোবেন। বহু মন লক্বেও একটি দাফা বাথ, অপরটি বেশ বড় হইয়াছিল। শেষে কিছু দাফা হইয়া যোগকে চিকিৎসাখানার পাঠাইয়া দেন। তাহার পরই চাত্রা

লাল-মিডিসনের অন্তর্গত সৌধেরিয়ার এক মনে পাটট বড় বাগের বাক্সা কর্তৃগিরায় বন থরিতা লইয়া আসে। ওইটি হত-গত কখনে চাত্রার সব-উত্থিননাণে অক্লিয়ার মিটার প্রাইস, একটি পান শালা-মোটরের তখনকার ম্যানেজার মিটার বোলী, একটা দায় আঘানের বিকর লার হাতে, আর বাক্সির চির



গাড়ীঃ বড়। পথে নদী পার। পথে দাফা অচল।

পকণ্ডার সেওয়া হইল। প্রথম দুইটির একটি দাফা বাথ এবং অপরটি সেই বিখ্যাত ডাফা, দাফার বিবরণ বহুবার প্রকাশিত এবং দাফার বহু চিত্র প্রসারিত হইয়াছে। ডাফা কলিকাতা 'ছ' এবং তথা হইতে লডন 'ছ'তে গিয়াছে। মিটার প্রাইস ডাফাকে অত্যা ভাগদাশিতেন। চেপ্টা কথিননাণ মিটার

বাপের বশন ডায়নাকে মাগুরের মধ্যে অবশেষে বাবা দিগজ্ঞানক
দিবার তাহাকে ‘জু’তে প্রেরণের অবশেষে সেন, তখন প্রাইস
সাধারণ প্রায় কাঁদিয়া কেঁপিয়াছিলেন, কিন্তু উপায় ছিল না ;
ডায়নাকে বাবা চাইয়া বিলম্বিত হিতে চইল ।

কায়দা-পোশাক আনাকে প্রায়ই চাতরা বাইতে চইত ।
চন্দনই খাইতাম, ডায়নাকে দেখিয়া আসিতাম । ডায়নার
প্রকাশের বড় উদ্দেশ্যে লভনুপ চট্টা উঠিতেন । আমি
নিতে দেখিয়াছি, তাহাকে চতুর্থে পটয়া দিয়া সাধারণ চাউিয়া
দিয়াছেন, ডায়না ছুটিয়া চপিয়া গিয়াছে, পণ পনেরো মিনিট
কোনও সাড়া নাই, কিন্তু যেই তিনি ডায়না বলিয়া ডাক
ছিলেন, ‘তৎকালে’ আসিয়া তাহার কাছে ঢোকাইয়া পড়িল ।

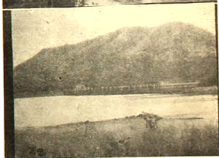


চোকাগার : খোকা বাবু ও বাবুর বাক্স ।

ডায়না গ্রিক শোবা কুণ্ডলের মত আচরণ করিত । তাহান
সেই তখন বৌবনের চলতরঙ্গ । মাগুরের নিজনুপে ডায়না
সংঘে এই গরুটি শুনিয়াছি । প্রাইসের বাবুরো সহরের এক
প্রান্তে এবং তাহার পরই গভীর চন্দন অস্তিত্ব হইয়াছে ।
চাতরা শিকারবহন স্থান ; মাগুরে প্রায়ই হরিণ আসিয়া
তাঁহার বাসলোভ হাওয়া ডাকিত ; সমস্ত সময় চিত্তাব্যব
পর্জনও শুনা বাটত । একদিন রাত্রি আন্ধার মরাতার সময়
সাধারণ বাগানে বলিয়া পুস্তকপাঠে বস, যেমনসাহেবও পাশে
বসিয়া দৃষ্টকণ্ঠ করিতেছিলেন, ডায়না চেঁচানের পাখাতে
সেন দিয়া বাধা আছে । মাগুরের মাগা সহরে খাইবার
চতু চতুর্থে পাখ দিয়া short-out পাকজাতি খরিল,

হাতে হারিকেন লঠন । গ্রিক চাতা ছাড়াইয়াছে, সেনে,
কোলের ধারে ডায়না বলিয়া আছে । ডায়নাকে কাহারও
মহা ছিল না । ‘মাগা ডায়ন ডায়না ছাড়াইয়া গিয়াছে ; “ডায়না”
“ডায়না” বলিয়া আচরণ করিতে গেল । ডায়না কিন্তু গাত
নিচাইয়া থাকা ভুলিল । ‘মাগা ডায়ন বৃত্তিতে পারিল, বৃত্তিল
ডায়না নয়, লভনুপে নয় । চাঁৎকার করিতে করিতে আসিয়া
বাসলোভ বাসলোভ আছাড় খাটয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ
বায়-পর্জন । বহা লোরগেণ, চতুর্ধিক হুড়াহুড়ি ; সাহেব,
যেমনসাহেব বাসলোভ পলাইলেন, তাড়াতাড়িতে ডায়না
বাহিরেই গিয়া গেল । সাহেবের ছই পুত্র শিকারে গিয়াছে,
কনুকাবি ঘাটা ছিল সব তাহাদের সঙ্গে । বাসলো বড় করিয়া
সাহেব চাপে উঠিলেন । দেখিলেন, প্রকাণ্ড এক বাঘ ডায়নার
কাছে প্রেব-মবা ডালি নিতে আসিয়াছে । ডায়না প্রথমটা
একটু আশ্চর্য হইল, তাহপর গোথ চর তাহার মনে হইল,
এট মপদাখটার মতই তাহান প্রভুর বিপ্রায়স্থে বাধা
পড়িল ছে । ভীষণ চক্কারে চেঁচালমতে ডায়না পড়িল ‘আগম্বক
প্রোবাকাক্কর’ হুজ্ঞে এবং এক চপেটাখাতে তাহাকে হুতলে
কেঁপিয়া তাহার পিঠের মাংসে নখর বগটো একটানে লখা
ফালা করিয়া দিল । প্রেমিকবর প্রেমের এ হুঁদাত দাপট
লব করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, চাঁৎকারে লবর, বন
কাপেইয়া পশারমই বীরের লক্ষণ নীতির চমৎকারিষ প্রেরণ
করিলেন । সাহেব বলিলেন, তখনও বাহিরে উচ্ছল আলো
ছলিতেছিল, সেই আলোকে দেখা গেল, ডায়নার বাবার
ধারে পলায়নকালে বুঝা বাখটার আহত স্থান হইতে ফিন্কে
নিয়া ব্রক ছুটিতেছে । পরদিন সেই ব্রকবোখা অঙ্গুরণ
করিয়া তাহার বচন গিয়াছিলেন, কিন্তু সেন পর্বাত রক্তের
দাপ লোপ পায় । তাহপর ডায়না যে, চেঁচা চানিতে চানিতে
বাসলোভ উঠিল এবং তাহার আছরে parring (বড় বড়
নখ) ও মরতা আছড়াইয়া বদিককে ডাকিয়া বলিতে লাগিল,
‘আপনটাকে ছাড়াইয়া দিয়াছি, আপনি আসিয়া বিপ্রায়
করুন এবং বতলন পর্বাত না তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী আসিয়া
পুনরাব বাহিরে বসিলেন, ডায়না কিছুতেই ছাড়িল না ।
ডায়না বুড়ী বাবিনী ; চাতরা সাহের মধ্যেও তাহার
প্রোবাকাক্কর শুভাপন আরম্ভ হওয়াই তাহাকে ‘জু’তে
পাঠানর অন্তত কারণ ।

ডায়নাকে যখন প্রথম জুতে আনা হয়, সে মাগুন দেখিলে ক্ষেপিয়া যাইত। ক্রমে শাস্ত তব। কে জানে যাত্রায় পরিচয়। কণ বেশ তাহার বুক কুলিল অথকা কঠোর বাত্মাছিল কি না। যাত্রার স্রোতের আকর্ষণে যমজ, যজ্ঞাতি-ভাগ্য তাহার নাকে কঠিন যাম তর নাই, সেট কি না কেনে তাহাকে ভাগ করিল? বাত্মনার কদার বটে। ডায়না জুতে থাকাকালীন মি: প্রাটল তাহাকে একবার দেখিতে আসেন। সেদিন জুব অপর দর্শকগণ বে দৃষ্ট দেখিয়াছিল, জোকন তাহারা কুলিলে না। লৌহদিক্তারও ভীষণ বায়ী এক সাহেবের আগ্রহক পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া দগ্ধের উপর পড়িল; এ কি! সাহেব কি শাশল? অন্যদলে পাগল মধ্যে হাত ঢুকাইয়া বাঘিনীকে আদর করিতে লাগিলেন এবং বাঘিনীও সোহাগে গলিয়া চলিয়া পড়িল, সাহেবের হাত বেহ ডাউতে লাগিল, কত কাল পরে দেখা! তাহার আনন্দ জানাইতে সে যে কি করিলে ঘের ডাবিয়া পড়েছিল না। তারপর যখন সাহেব বাধা হইয়া চলিয়া গেলেন, পাগল মধ্যে যুব গুঁজিয়া সে তার কি বুক ফটা কাহা! বলা বাহুল্য, প্রাটলের চক্ষুও শুক ছিল না। ডায়নাকে শাস্ত করিতে চিড়িয়াখানার কতৃপক্ষকে সেদিন বিশেষ বেগ পাউতে হইয়াছিল। তাহাবাই অগ্ৰোধ করেন, ভবিষ্যতে মি: প্রাটলের জুতে না আসাই উৎসব পক্ষে অর কষ্টসাধ্যক হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, ডায়না এখন লওন জুতে। আশা করি সে ভাল আছে, সুখে আছে। দিয়ার ঘোড়ার পানিত বাচ্ছাতিও বেশ বড় হইয়াছিল। যাত্রার মধ্যে শিকলে বাধা থাকিত। যোতলে জ্বল না চল ভরিয়া গিলে সামনের ছুই পাচার মধ্যে যোতল ধরিয়া তাহা পান করার যে কোণল সে শিখিয়াছিল, সেখানে মতান্ত্র সম্ভাব। নিহতির নিষ্ঠুর পরিহালে বড় নির্মমভাবে বেচাঙ্গীল ব্যাঘ নীলার অধসান হয়। এক “লামরিক” গাভী একদিন তাহাকে চুঁ মারিয়া পিঠ জন্ম করিয়া বিল। বনের বাঘ হঠলে চুঁ মারিয়া দূরের কথা, নিকটই হইবার পূর্বেই তাহার সব নীলা লাক হইত। কিন্তু সেই নিরাশ্রিত লতাভার গো-বেচাঙ্গী, বাঘ-নামের অপহরণ ধর্মর কাছে হার পাইয়া যে খা করিল তাহাতেই মারা যায়। যে বাচ্ছাতির ছবি পূর্বেগুণায় দেওয়া হইল, সেটিও মারা গিয়াছে।



মদে মোটর-গুপ্তানা। গোপনীয় : ইং। গোপনা বৃক, মদুখ্যায়। মদর বৃত্ত।

হোজারিয়ায় ছটতে ছটতে ছটতে কঠিন হইল। বাকি এবং বাগানবের ত্রিক মধ্যে গাভ টাক গোডেড

ধারে স্থাপিত অবস্থিত। যাত্রা হইতে কুণ্ডের ধোঁয়া সঞ্চিত পাওয়া যায়। একটি পাহাড়ের কোণে ঘাটের মধ্যে বিশাল কলকের ধারে কুণ্ড অবস্থিত। পাথরের ফাটল হইতে অবিরত উষ্ণ জলধারা বাহির হইয়া বাধান নালী বহিরা ছোট নদীতে পতিত হইয়াছে। জল এত গরম যে, হাত দেওয়া যায় না। জলে অত্যন্ত গরুর গন্ধ। জলের টেম্পারেচার ২১২° এক। অনেক বিনা খরচে ভাত বাঁধিয়া যায়। আনসাও বহুবার জালানী লাগ্র করিয়া ভাত বাঁধিয়া খাইয়াছি। একশত বস্ত্র চাউল, দাল, আলু ইত্যাদি বাঁধিয়া কুণ্ডের জলে ডুবাইয়া দিলে ত্রিক উনিশ মিনিটে চকৎকার ভাতে-ভাত প্রস্তুত হয়। আমি এত উষ্ণ জল কোথাও দেখি নাই বা ভাবতে আছে বলিয়া শুনি নাই। এই কুণ্ডের জলে শুনিয়াছি অত্যন্ত boiling power, রোগনাশক শক্তি আছে। একবার স্নানকুণ্ডে একটি বাঙ্গালী হস্তশিল্পীকে তাহার স্ত্রী ও দুই ছোট পুত্র লইয়া সেই জাপান-সমাকুল ঘাটের মধ্যে কুণ্ডে বাঁধিয়া থাকিতে দেখি। হস্তশিল্পী কলিকাতার একজন এটর্নী; সে সব ঠাণ্ড নাম-ধাম সংগ্রহ করিয়াছিল, এমন ভুলিয়া গিয়াছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে তিনি জল-চিকিৎসার কল দেখানে গিয়াছিলেন। তাহাকে প্রথম বখন দেখি, একটি চিকিৎসার ছুইয়া থাকিতে, নড়িবার ক্ষমতা ছিল না। কিছুদিন পরে বসি ভর করিয়া বেড়াইতে দেখিলাম; তাহার পর গিয়া শুনিলাম, সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া খরের ছেলে হয়ে কিরিয়া গিয়াছেন। অল্প বেশে হইলে স্নানকুণ্ডে স্নানবিধাত হইত এবং জল-চিকিৎসার অল্প রোগের বসবার্থে কত

হোটেল আদি নির্মিত হইত। হাজারিবাগে আরও অনেক গুণি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তার মধ্যে বনু বনু নদীর ভিতর হইতে যে উষ্ণ জল উঠিতেছে, তাহা অতি আশ্চর্য। নদীর তীরে জল বহিয়া গাউতেছে, সেই প্রোভের মধ্যে মাঝে মাঝে কোম্বাগার মত উষ্ণ জল উঠিতেছে এবং তাহার মধ্যে পানের জন্যে গরম করিয়া দিচ্ছে। সে অতি আশ্চর্য, তবে বড় চর্গব রাজ্যে বাইতে হয়। স্নানকুণ্ডের নিকট গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে সের শার নির্মিত রাস্তার পূর্বে একটি অল্পত শীতল প্রস্রবণ আছে। একটি চৌবাচ্চা বাধান আছে, ঘাটি হইতে উল্লিখিত জলধারা সেই চৌবাচ্চার জমা হয় এবং পূর্বের একটি খাওয়ার মাঝামাঝি বাধান একটি ছিটপল আছে, তাহা হইতে রুগিখারার মত অবিরত অতি হ্রসব শীতল জল পড়িতেছে। ইহা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ২৪ নম্বর আইল পোষ্টের নিকট।

চৌবাচ্চার জল (water works) দেখা হইল। কলকাতা বা যন্ত্রপাতির কোনও বালাই নাই। পরেশ নাথ পাহাড়ের দুইটি সমান্তরাল শাখারূপের মধ্যে একটি কীর্ণা পার্শ্বা নদী প্রবাহিত ছিল। এক বিশাল বাঁধ বাঁধিয়া সেই দুই পাহাড়ের মধ্যে এক প্রবিস্তার লেকের সৃষ্টি করা হইয়াছে। নীচে পোদন দায়র (filler beds) মাঝাকর্ষণে জল লেক হইতে সেই দায়র আসে এবং তথা হইতে মাঝাকর্ষণের বলষ্ট করিয়া, ধানবাল প্রভৃতি কল্যাণ-পানের ক্ষেত্রে প্রেরিত ও পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জলকল তৈয়ারী হইবার পূর্বে ঐ সব অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধি বড়ই প্রবল ছিল, এখন আর নাই। চৌবাচ্চার লেকের দুই আগের দুইটি চিত্র বেওয়া হইল। স্থানটী অত্যন্ত রমণীয়।

এইবার সোনা কলিকাতা।

শিক্ষা-পদ্ধতি

বর্তমানে বহু কলকাতা দেখা যায় যে, জেনারেলসহকারী, জেনারেল ও পলিসিয়ার সর্জিতাণী একটি অমনি উচ্চ হইয়াছেন এবং এর দরমাই আর বহু হইত একটি বা একটি অপরায় দুইটি খাজ কলিগেদন, তবে বর্তমান দরমাইগণি যে সেরা, তাহা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কি কি উপায়ে জেনারেলসহকারী, জেনারেল ও পলিসিয়ার সর্জিতাণী অপর বেশী জেনারেলসহকারী পদার্থিত হইতে পারে, তাহা নির্ধারণ করা—জেনারেলসহকারী করিবার কোন নিয়মকর্তি বিস্তৃত হইতে পারে কি?

ସୂକ-ବନ୍ଧିରମିତ୍ତେନ ଶିକ୍ଷା

[४]

ଆବଶ୍ୟକୀୟତାକୁ ଅନୁସାଧନା

গুণ্ড বন বন্যজন্তুর কণা, বৃক, বর্ষাভিষেকের লিঙ্গ-প্রণালী আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংবৎসর অঙ্গ সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত, ক্রান্তি আরও পরিচালিত।
 জর্জরোপ-বিদ্যা জ্যোতিষ (zoologists) ও জ্যোতিষবিদ্যার সমস্ত
 তত্ত্বাধীনে বসে, যার মধ্যেই অসংখ্য সংখ্যক অসংখ্য ক্রান্তি
 আধুনিক সংবৎসর আরো। কোন কোন শিল্প আধুনিক প্রযুক্তি
 (residual hearing) এত ক্ষেত্রে যে, অসংখ্য হারা সাংকেই বর্জিত
 গারি, কোন কল্পে অসংখ্য সংখ্যক। কিন্তু এতদিন ইংরেজ শিল্প
 পরিচালিত গারিয়ার বা। এইজন্য শিল্প সংখ্যক বৃদ্ধি কম কম। অসংখ্য
 এইজন্য অসংখ্য শিল্প শিল্প আরো, আধুনিক প্রযুক্তি এত কম
 যে, চারা শিল্পে বর্জিত চারা বা। কিন্তু প্রযুক্তি-পরিচালিত প্রযুক্তি
 (audiometers) সাংকেই অসংখ্য ক্রান্তি সাংকেই প্রযুক্তি
 শিল্পে বর্জিত চারা। সম্পূর্ণভাবে অসংখ্য অসংখ্য
 কোন প্রকার প্রযুক্তি অসংখ্য বর্জিত। এইজন্য শিল্প সংখ্যক বৃদ্ধি কম।

[illegible]

যে সব হেলেমেয়েরা পড়করা ২০ হইতে ২০ আশ পাশ গুলিত পাঠ,
 একপ্রকারে অনুকূলনা পাইল, তাহাযোগেও যিনি উপকার হয়। তাহাযোগে
 কথো কথোপ্রকারে হয় ও তাহাযোগে হয়, তাহাযোগে তাহাযোগে অপরকার
 লক্ষ্য (natural) হয়। তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে
 দ্বিতীয় করে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে
 না। তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে
 তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে তাহাযোগে

—**ଅଟେଶେନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବନ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ**

ଅନୁକରଣ-ପ୍ରତିସାଦକ କରନ୍ତେ ଶାବିତ୍ରୀଙ୍କେ। ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତେର ସୃଷ୍ଟି ଏହି
ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଉ। ଆଦେଶିତର ଛାକାର ସୋପାନୋର ଓ ଡାକ୍ତାର ଝାଞ୍ଜି,
ହୋଇଲେ ଛାକାର ଝାଞ୍ଜି (singing), ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆହୋରୂପିତ ସୃଷ୍ଟି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି
କି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତେ। ଏହି ଆଦେଶିତ ଆକାଶକି ବାଦକେ କଣ ବାଜେ, ତିଆରି
କରିବେ ଆଦେଶିତ କରନ୍ତେ। ସ୍ୱରାଳୟ ଓ ଆଦେଶିତର ଏହି ଏକ-ମଣିଆ-ଆଳୟ
(sound laboratory) ଯଦିଓ ନିଜେ ଆକାଶକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବସ୍ତୁ (amplifier)
ନିର୍ମିତ ହୋଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କଣ ଗୋଟିଏ କୋଷାଳୟ ହେଉଛି।
ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅନୁକରଣ ଏକ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଦେଶିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଡାକ୍ତାର
ସଦ-ନିର୍ମାଣ-ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅନୁକରଣେ ଆଦେଶିତର ଝାଞ୍ଜି। ଆଦେଶିତର ଅନୁକରଣେ
ଝାଞ୍ଜି ନିର୍ମାଣେ। ଅନୁକରଣ, ଏହି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବାଦକ ଆଦେଶିତ କେବେ, କେଉଁ
ବିଧିରେ ଗାୟେ (pitch) କଣ ବାଦକେ, କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଏ ନା। କେଉଁଠି
ଏକଟି ବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବସ୍ତୁ (amplifier) ଆଦେଶିତ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିର୍ମାଣ
ହେଉଛି। ଏହିଟି ପାଏ ନା। ଏହି ବିଧି ବସ୍ତୁର ବାଦକ ଅନୁକରଣେ ନା। ଆଦେଶିତ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବସ୍ତୁ (amplifier) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗାୟନେ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଆଦେଶିତରେ
ନିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆଦେଶିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବସ୍ତୁ (amplifier) ନିର୍ମାଣ
ଆଦେଶିତରୁହେଉଛି ଏକ କୋଷାଳୟ (pitch) ଓ ଗାୟନ (intensity)
ନିର୍ମାଣ କୋଷାଳୟ। ଅନୁକରଣ ଏକଟି ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବସ୍ତୁର ବାଦକ ଆଦେଶିତର ବାଦକ
ଏକ। ଆଦେଶିତର ଅନୁକରଣେ ନିର୍ମାଣକାରୀ।

বায়বীয় সঞ্চালক, দুইদিকে যথেষ্ট দূরত্ব দিয়া বিভাজক
 ব্যবহৃত। অক্টোমেরি যন্ত্র। যখন কোন বিন্দুতে মাইক্রো
 ফোন (microphone) থাকে এবং ইহা ইলেক্ট্রন পাইপ
 নল (tube) দ্বারা যুক্ত করা হয়। প্রত্যেক পিচের জন্য নলের
 দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট, তাহা প্রত্যেকজন্যই আলাদা (pitch) ও তীব্রতা
 (intensity) দ্বারা 'ইয়ারফোন' (ear-phone) থাকে। বিন্দু
 দুই দ্বারা যথেষ্ট দূরত্ব দিয়া বিভাজক।

সঙ্গীত শিকারী নথায় বহু প্রকার শব্দ (hard-of-hearing) শব্দবিধের এক 'হার্ড অফ হিয়ারিং' (হ্যাণ্ড হিয়ারিং)। এই শব্দটিই 'হি হার্ড হিয়ারিং সোন্টোন কর্পোরেশন' (Sontone Corporation) নির্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে হিয়ারিং পিসার স্থান আছে। প্রকার উপর একটি 'বাই-কন্ডাকশন' এবং অন্যটি 'এয়ার air conduction ও bone conduction ear-piece' আছে। ইহার যেমন বহু নকশার তাহা সিন্ধুর প্রকারে বহু intensity ও pitch-এ বিভিন্ন নকশার করিতে পারেন। প্রত্যহই 'ট্রান্সমিউটার' বস্তু, অভিন্ন বা স্বাভাবিক চলিতের অভিন্ন হয়। প্রত্যেক পিসার 'বুয়েস' (buses) এবং 'সিগন্যাল' (signals) বস্তু। ইহাও 'হি হার্ড হিয়ারিং সোন্টোন কর্পোরেশন' (Sontone Corporation) নির্মাণ করিয়াছেন।

হিম্মতেশ্বর বাড়ী পাকাগায়ে। কলিকাতায় সে প্রথম আসে ঘাট্টিক পাল করিয়া হুড়ি টাকা জলপানি লটরা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে। পরের এঞ্জলিমিন্ডলাও জলপানি লটরা পাল করে; অবশেষে ল' পাল করিয়া গারে গাউন চড়াইয়া সহরে বসিয়াছে বাবলা করিতে।

পাঁচ বৎসরে পশার বেশ ভরিয়াছে। সহরে বত বড় বড় ছুরি, জাল-ভালিয়াতী, কন্দীবাড়ী ও পুনঃসাবি হর, সেওয়ার শেষ ব্যবসিকা পড়ে হিম্মতেশ্বর হাতে। অর্থাৎ বড় বড় কোম্পানী কর্তব্যের হিম্মতেশ্বর এখন সহরের বড় আগামীর বল-বৃদ্ধ-ভরসা। মা-লক্ষী আসলন্তের খারে বসিয়া হিম্মতেশ্বর চট পকেটে তাঁর রাঙার একবারে মুক্ত হয়ে ঢালিয়া দিতেছেন।

সহরে হিম্মতেশ্বর নাম-ডাকের অস্ত্র নাই। সহরের বৃক্ক বত কিছু আবার শান্তি পায়িত বান সজিত আছে, হিম্মতেশ্বর তাহার সবটুকু দিতে সহর বাড়ী সাথে নাই। বাড়ী, গাড়ী, পরমা-কড়ি, বিজলী ব্যক্তি-পাখা; অবশেষে সন্ধ্যার পরের ঘরে প্রিন্সেসী কপিতা সেবাকে পর্যায় তাহার পাশে জীবন-সম্বন্ধী তপে থরিয়া দিয়াছে।

কলিকাতার যেমন রূপ তেমনি গুণ। ইন্টারমিডিয়েট পাল করিয়াছে। বাগের আছে ইংরেজ-পাকায় সাত-আট-পনা বাড়ী; তা ছাড়া কল্ট্রাক্টরী কারখানার পরমা আসিতেছে অভ্রত। এক কথায় ক'বৎসর ভাগ্যলক্ষী হুনিয়ার সকলকে ছাড়িয়া হিম্মতেশ্বর উপরেই তাঁর নোবোগটুকু বোল-জানি সর্বপণ করিয়াছেন।

প্রাণের বাড়ীতে আছেন বিধবা মা, তাই-বোন, বুড়া-বুড়ী, শিসিয়া। তাঁহাদের বুক হইতে হিম্মতেশ্বর লম্বে উপ-ভাইয়া আসিয়া কলিকাতা সহর তাহাকে আজ নিজের বৃক্ক রাখিয়া বেন নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। বনের কোণে যে চারা মাথা তুলিয়াছিল, সে চারা লজ্জিত ভূমি-রুমের দাবী টবে বসিয়া নৃতন আব-হাওয়ায় তপে ও সযুচ্ছিতে রূপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

বিবাহে মা, বুড়া-বুড়ী, তাই-বোনেরা কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন। বেশের বাড়ীতে বিবাহ করিয়ে, হিম্মতেশ্বর অবসর ছিল না। দামলা-মকদ্দমার গুঁহাত নিয়া করিয়া আছে। বিপদ অকলমেই নিকটায় গড়িয়া যথো কেসিয়া হুনিয়ের জন্ত হিম্মতেশ্বর বাহিরে খাইবার উপায় নাই! কাজেই...

এদিকে বেশের বাড়ীতে পুঁটিনাট লক্ষ কাজ। সেকেন্দে পরিবার—সহরে আসিয়া হুনির বিশ্রাম করিয়ে, অবসর নাই। বিবাহের উৎসবী চুকাইয়া মা-বোনের দল দেশে ফিরিয়া যেছেন। কলিকাতা লটরা হিম্মতেশ্বর নৃতন পালার নৃতন মাঝে লাগিয়া উঠিল।

কোটের চুটফাটা হর। সে চুটতে বাদী-বী কখনো বাহ লাজিগ-বেগান, কখনো বা দিলী-আগ্রা। সে চুটতে বেশে গাওয়া খটে না। গনিকটায় বে কের আছে, কাজের চিড়ে উপলভি হয় না। মার নামে মাসে মাসে হিম্মতেশ্বর লুপা আড়াইপো টাকা পায়; টাকা পাঠাইয়া তাবে, গরিকতায় কাজ চুকিল। মনের দিক দিয়া গরিকে কেহ তার কাছে মাথা কিছু প্রতক্ষা করে, কদ বৎসরের লুচর অর্ধ-সাধনার সে কথা সে তুলিয়া দিয়াছে। এ সাধনার যথো বৃত্তি আছে, জীবনের দিন পরিমিত; সে পরিমিত সময়টুকুর যথো কর কাজ! কাজে পরমা আসিয়ে। পরমা আসিলে কোনদিকে কোন অভাৱ থাকিবে না; কোন অল্লোগ উপ্রিবে না; মনের কোথাও এটুকু গড় লাগিবে না।

এক-এইভাবেই তার দিন কাটিতেছে।

বেশ হইতে গিরিপত্র আসে। কখনো তার জবাব দেয়; কখনো বা কাজের চিড়ে জবাব দেওয়া হয় না। সেজন্য মন কোন দিন টনটনিয়া উঠে না।

এখানে লজ্জায় কপিতা মাঝে মাঝে ছোটখাট পাটের বাবলা করে। সে পাটতে পান হয়; পর হয়। হিম্মতেশ্বর সব পাটী ওয়ায় পূরাপূরি লজ্জিয়া দিতে পাতে না; মকল আসিয়া

বলিয়া আছে—এক গালা কাগজপত্র বেচিয়া জেরার পণ্টে
বেটী করিতে ধইবে।

বনি কখনো অবসর নেমে, কণিকা তাহাকে ধরিয়া
গলায় ধানে, নহ তো দেহের নিকে টানিয়া ধইয়া ধায়। তাও
কি ভুলও বলিয়া প্রেমের স্বপ্ন রচনা করা চলে! চম্ভো গাড়ী
ধইতে নাথিয়া ভ্রমণে একটা বেংক বসিয়াছে, কণিকা গা
সেঁঁবিয়া হিম্মন্তর একখানা চাত হাতের মধ্যে টানিয়া
কোনমতে প্রস্থানসে বসিল,—আজকের এ হাণ্ডগাটা কি
চমৎকার লাগেছে। না?

হিম্মন্ত সন্ধ্যায় কবাব বিল,—কেন মাঠে তো চিরদিন
এবনি ছাড়া। চারিদিক খোলা কি না।

কণিকা মুখে কোন কথা বলিল না। শুধু একটা স্তম্ভ
নিখাল বেশিল।

একদিন কি কারণে সত্যেন সন্ধ্যায় আশাশুভের ছুটি ছটয়া
গেল। হিম্মন্ত গৃহে কিসিৎ বোলা উঠায়। কণিকা কহিল,—
এমন অসময়ে বিরুদ্ধ! এখন তো মকেলের কাজ নেই—চল,
একটু বেড়াতে বাট। নিশপুণে কিয়া বাগাকপুর্ন পার্কে। শুধু
দীর্ঘক বসে পাঠাই বেন গেয়াছে গাড়ী না তোলে।

হিম্মন্ত কহিল,—কিছু

কণিকা কহিল—কিছু নহ। বেতেই হবে। আমি
চড়েছি না।

হিম্মন্ত কহিল,—গোন, আমি ভাবছিলাম, ভাল একটা
বস্ত conspiracy কেনের আওতেরে আছে, প্রায় পচিশজন
সাক্ষর এতাহান পড়ে আবার তৈরী হতে হবে...

বাধা বিয়া কণিকা কহিল,—কোট বনি এখন বন্ধ না
হত, কি করতে?

হিম্মন্ত কহিল,—বখন বন্ধ হ'ল...

উজ্জত নিখাল কোনমতে টানিয়া কণিকা কহিল,—সারা
জীবনটাকেই মকেলের হাতে নৈশ সেবে? আমার মস্তে...

অভিযানে কণিকার চোপের কোণে জল চৌলিয়া
আসিল। কঠ রক্ত হইল। হিম্মন্ত বেধিল, বেধিয়া স্তম্ভ
হাশিল।

একটা চৌক বিদিত্য কণিকা কহিল,—আমার কি চিলে
বল তো? আমি...

হিম্মন্ত হাসিল: হাসিয়া কহিল,—বেশ দো, চল
বেড়াতে।

ভ্রমণে গাড়ী করিয়া আসিল বাগাকপুর্ন পার্কে। ভ্রমণে
গলায় বুকে রূপাদি চেটে...এতিকে স্তম্ভ রূপশ্বে বস্তিত
মাঠে...মাঠখানে পথ্যগা।

হিম্মন্তর হাত ধরিয়া টানিয়া কণিকা আসিল খোলা
মাঠে। এতিকাটার এখন তেনন কিছু নাই। একটা বড়
গাছের নোচে ছায়া। সেই ছায়ার ভ্রমণে বসিল। কণিকা
হিম্মন্তর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল; তার মুখের
পানে চাহিয়া কণিকা কহিল,—একটু আদর কর...সতি...

হিম্মন্ত কহিল,—এই মাঠে?

কণিকা কহিল,—এখানে কেউ নেই। বেশ, আদর না
কর, গরম কর।

হিম্মন্ত কহিল,—কি গরম বলব? বস।

কণিকা কহিল,—যা পুই।

হিম্মন্ত কহিল,—বাগবা-বাগমীর গরম তনবে? ছেলে-
বেলার তনবেই থাকবার কাছে। আমি না, তার সবটুকু মনে
আছে কি না! সে গরম তনবে?

কণিকা কহিল,—তাই তনব। তুমি যা বলবে,
তনব—তাই আদর ভাল লাগবে। গরম ভাল লাগবে।

কণিকার বন বেন ঘেরাভুল স্বপ্নের মত অদীর লোপুণ
হটয়া উঠিয়াছে। অদীর বননে সে চাহিয়া রহিল হিম্মন্তর
মুখের পানে।

হিম্মন্ত চুপ করিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার দৃষ্টি
কণিকার মুখের নিকে নহ, অস্ত্র নিকে।

কণিকা বেধিল, বেধিয়া কহিল,—তোমার ইচ্ছে করে না
আমার সঙ্গে ভ্রমণ ও কথা কও—আমাকে একটু আদর কর?

হিম্মন্ত মুখে দৃষ্টিতে কণিকার পানে চাহিল। চাহিয়াই
রহিল—কোন কথা কহিল না।

কণিকা কহিল,—ছনিয়ার শুধু মকেলকেই চিনেছে! শ্রী
একটা অনাবস্তক বোকা?

হিম্মন্ত হাসিল: হাসিয়া বলিল,—কান মস্তে মকেলকে
আদর করেছি? তার পরিচর্যা করি, সে কি নিভের মস্তে?

কণিকা কহিল,—তবে কি আমার মস্তে? আমি তোমার
বলেছি...

হিমাংসু কহিল,—তা কেন বলবে! তোমার কিয় করে তোমার সুখ-দুঃখের ভার নিবেহি, তাই সে ভার পালন করতে মজলসের সেবা করি। পরমা চাই। পরমার আড়ালে দুনিয়ার সব দুঃখ সব অসহ্য চাপা পড়বে।

কণিকা কহিল,—আমি তো পরমার করে বিবে করিনি। যেহেতু তা করে না। তা যদি করতে তো ট্যাকনাটকে কিবা বাথকে বিবে করতে! তোমার কাছে আমি কেহেছি পরমা?

হিমাংসু কহিল,—তুমি চাইবে, তবে আমি সেব!

হিমাংসু চুপ করিল, তারপর একটা নিখাস কেনিয়া বলিল,—পরমার দুঃখ কি, তুমি জান না। আমি জানি। একদিন...

হিমাংসু কণিকা কহিল,—খাক, সে কথা আমি শুনতে চাই না। যদি কোন ভাল কথা জান, তাই বল। তোমার মুখে আর শুধু ভাল কথা শুনতে ইচ্ছা করছে।

—ভাল কথা? বেশ, ভাবি...

হিমাংসু ভাবিতে লাগিল। কণিকা তার কোল হইতে মাথা তুলিয়া চারিদিকে চোখের দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিতে লাগিল। আকাশের নীচে এতখানি খোলা মাঠ। ঐ সস্তু গাছপালা... ঐ গঙ্গা... গঙ্গার ওপারে তরুশ্রীরা কাকে কাকে একত্রাণ চিমনী... চিমনীতলা হইতে কালো ঘোঁসা উঠিতেছে স্তম্ভী পাকায়... নদীর কূলে নোকা জমাণ... সীবে ফেটি। বেন সমস্ত পৃথিবীর একটা ছুত শরৎকণ। বাগা কিছু লটয়া দুনিয়ার কাছাকাছি, সব এখানে আছে। নাই তবু...

দূরে কোণের গায়ে বেগুনী রঙের একত্রাণ ছোট ছোট ফুল। কণিকা নিজেই সস্তু রাখিতে পারিল না, ছুটিল কোণের দিকে।

হাতে কাটা বিবিল। তবু সে একত্রাণ ফুল ছিঁড়িল। ফুল হাতে ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল যেখানে হিমাংসু বসিয়া আছে দেখে।

হিমাংসু তখনো নিশ্চিৎ মনে কি ভাবিতেছে। ফুলতলা হিমাংসু কলের উপর কেনিয়া দিয়া কণিকা কহিল,—কি ভাবছ? ভাববার মত কোন কথা পেলো?

হিমাংসু কণিকার পানে চাহিল। কণিকা হাঁটু গাড়িয়া তার সামনে বসিয়া পড়িল, কহিল,—দাতি, কি ভাবছিলে?

হিমাংসু কহিল,—দাতি বল? রাগ করবে না?
—না।

হিমাংসু কহিল,—কালকের conspiracy কেসে ও পক্ষে ঠাট্টা পাবলিক প্রসিকিউটর। আমাকে কেরানতি বোঝাতে হবে। তাই...

কণিকার মুখ নির্বণ হইল। সে কাঠ হইয়া রহিল। পাখরের কাছে কল চাওয়া কার কবে আশা মিটিয়াছে? ছোট একটা নিখাস কেনিয়া কণিকা কহিল,—দাতি, ছুট বৈধে আমায় হু না। তোমার মন পড়ে রয়েছে মজলসের কাছে... চল, বাড়ী চল। আমার অসহ্য হয়েছে তোমাকে এখানে বসে।

তার দৃষ্ট চোখ তলে চরিয়া উঠিল!...এ বয়েল ঘাটেরা সোরাগ চাহিয়া কোন্ নী...

হিমাংসু কহিল—রাগ করলে?
গাছেরে কণিকা কহিল,—না।

কণিকার ভাবনটা বেন শূন্য হইয়া গেছে। বাড়ীকে সে কতটুকু পায়! কণিতা পড়ে, গল্প পড়ে; সে-সবে দেখে...

তৎকালটির উয়ার কথা মনে পড়িল।...ডোমো-বহেশের—তবু উয়া কাকে পাইয়াছিলেন।

সদী-সহস্রাব্দ আসে। গান গায়, বাজনা হয়। বেন প্রাথোকোন চলিতেছে। সে গান-বাজনা মধ্য মাছুবের প্রাণের বেগা পাওয়া যায় না।

বাঁকুরা দরজা লটয়া যায় সিনেমা... 'না' বলিবে, এমন শিক, কণিকা কোন বিন পায় নাট। তার উপর সুখ কার কণিকা বসিয়া থাকিবে, সখীরা ভাবিবে, মনের দিকে দত্ত একটা ট্যাক্সিডার অর্ডিনার চলিয়াছে...

না, না! প্রাণ পাকিতে এ দুর্ভাগ্যের কথা আর কাহাকেও জানিতে দেওয়া নয়। বাতনার ভায়ে পিঙ্গা দরজা যায়, সেও সহ হইবে। তবু...না!

হিমাংসু অসহ্য দিনে দিনে লুচি হইয়া আসিতেছে। কাজ বাড়িতেছে। বাড়ীর দ্বারে হ'বেলা গাড়ীর ভিড় কবে। বাহিরের ঘরেও সারাক্ষণ ভিড়।

কনিকার বাপ আসিয়া একদিন বলিলেন,— একটু বেড়াবো-
চেড়ানো সস্তকাব । না তুমি এত বেহেনং সইবে কেন ?

হাসিয়া হিমাংশু কহিল,—এবার পুজার ছুটি হলে ভাবছি
কান্দোরে যাব ।

কনিকার বাবা বলিলেন—বাঁধা চাই ।... বেশি খাটালে
কলকলা বেড়ং হয়ে যাবে—এ তো মাগদের দেখ ।...

ভাত্রমাসের শেষাশেষি । কনিকা বসিয়া পড়ার কালর
তৈরী করিতেছিল—হিমাংশু একখানা বই হাতে
কাছারি হুটেতে করিল । কনিকার হাতে বইখানা বিয়া
বসিল—এই নাও কান্দোর-পাইড-বুখ । এবারে তোমার
চাপ আবে বাধবে না । মহালয়ার পনের দিনেই ঘেরিয়ে পড়ব
তোমার নিয়ে কান্দোর—

কনিকা কহিল,—কতলয়া ছাড়বে ?

হিমাংশু কহিল,—সকলকে নোটল বিয়েছি—মহালয়ার
আগের দিন পর্যন্ত বা কিছু কাল করিতে চাও, করব ।
মহালয়ার দিন থেকে মহালয়ার বিশ্রাম । একটি বাপ—
শ্রী কনি, কাছারিতে কোন বকরবার ত্রাবিশ কোণতে
ছিছি না । মহালয়া থেকে এক মাস বিশ্রাম- তুমি উজোগ-
পরের নাম ।

কনিকা কহিল—না ঈশগণে বিশ্বাস নেই ।

হিমাংশু কহিল—বেশ তো, কটাই বা শিন ! ঈশাডে
লেখা বিশ্বাস হবে ?

কনিকা কহিল—হ্যাঁ । তার আগে নয় । মহালয়ার
আগে আমি কিছু করব না । বা কিছু অসোজন করতে
হব, করব মহালয়ার দিন ।

তবু কিতরে কিতরে কনিকা অসোজন করিতে লাগিল ।

হিমাংশুর বাহিরে ঘরে মন্ডলের দিক্, আইন-মন্ডীরের
তরু সন্মানে চলে । হিমাংশুকে যেখান কনিকা যাবে যাবে
শিরিগা উঠে,—ঐ ভিক্ কান্দোরের কথা মনে থাকিবে
ত ? তবু বুখ কুটরা সে সবছে কোন কথা বোলে না ।

এমনি ভাবে হাত্ মাসকে সরাইগা একদিন আশ্বিন
আসিগা দেখা দিল । এবং মহালয়ারও অবশেষে বাকী গহিল
তিবট দিন ।

ভূপুর বেশায় বাহিরের ঘরে কনিকা গিরাদিল বাপের
বাকীতে টেলিসোন করিতে । কি একটা জিনিষের প্রয়োজন ।
টোবলের উপরে পড়িয়া আছে একখানা চিঠি...খানের চিঠি ।
চিঠাংগর নামে আসিগাছে । শিরোনামার দেখা—

পার বেহাঙ্গল

দ্বিমাত্ চিঠাংগর মনুয়ার চট্টোপাধ্যায়

আপাদিক বাখাভিকল

কৌতুহল হইল । খাম পুদিগা কনিকা চিঠি বাহির
করিল । হিমাংশুর মা চিঠি লিখিগাছেন । তাঁর নিজের
হাতে লেখা চিঠি ।

আপাদিকল

কতকাল হোমোরে বেশি মাই বর্কস পাতি না । গানি, কামের দিক্
এখানে আদিগার অবল পাতি না । একদম সকলে ভাল আরত । আশার
পাত—বর্কিতে পাতি না । বর্কলে অকলিগাদিল, এবার পুজার সময়
কনিকার নিগা হোমোরে যেখিল আদিগ ।

বর্গাব বাক, আশাবের একগারে তুমির কেনি ? একটু গিয়ের
কর হো গিতে আর । আর কনিক বা বর্কি ? দ্বিমাত্ কনুয়ারক
সেই খিগারে সময় বেশিগাছি । হোকে বেশিগার কত আশাটা কইবট
কহিতেক ।

সেলে মানা অতুখ-খিগব, মানা অতুখিগা কানি । তবু এক ফোলা
কত হুতি আদিগ ।

এ সবছে বা আশাটা হব, কলি, চিই শিখিল খাখা । হোকে পাত—
একবার খিগা হোমোরে বেশিগা আসিগ হোই । আর কত হইতেছে না ।

আবার কান্দোরের ছুতলে কানিগে । ইতি

ভূতাকাজিনী

মা

চিঠিখানি সে ছ'বার হিনবার পড়িল । শান্তকীর কথা,
শতর-বাকীর আতীর-হুইয়ের কথা মনে পড়িল । সেই
বিবাহের সময় সেখা—তারপর আর সেখা নাই ।

হিমাংশু তো কখনো বাকী যায় না ! অতুত : যে কর
বংলয় সে 'এ গৃহে পৃথিবী হইগা বসিগাছে, তত দিনের মধ্যে
বাইতে সেখা নাই ।

কপার কথাই পাণ্ডকীর কথা কত দিন উঠিগাছে । হিমাংশু
বলিগাছে, বা এগানে আসিগে চান না । বলেন, যে-যত
বোঝা মাত্রা পেছেন, সে গম ছাড়িগা তাঁহার কান্দোর-হরিগার মাই-
বার মাঝে নাই, তা কনিকাজ ! ছোট চাইবোনেগা ? তাঁদের
ছাড়িগা মা থাকিতে পারিগেন না । তারা এখন সেখানে

পড়াশুনা করিতেছে। যেও তাই শুভ্রাং এখানে ম্যাট্রিক
দিয়ে। পাস করিলে এখানে আসিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেখানকার কথা চকিতে উঠিয়া আর পাচটা
কথার চাপা পড়িয়া যায়।

নিজের মাকে কনিকা হারাইয়াছে—তখন তার বয়স
শাত বৎসর। মায়ের অত্যাচার সহিয়া মাতুল হইয়াছে। পুণি,
দেই ভক্তই শাততীর অত্যাচার ভুগিয়া তার চোখে পড়ে না।
তার উপর শে ছিল নিজের সেবাশুভা লইয়া বাত—

আজ এ চিঠি পড়িয়া বার বার মনে হইতেছিল—শাততী!
শাততী! না তানি, তিনি থাকিলে এ সংসারের সৃষ্টি কি স্বকম
হইত! কি বেহ মিলিত! হয়তো এমন করিয়া এই বয়সে
গৃহিণী শাতিকা থাকিয়া উঠিতে হইত না! হয়তো...

হয়তো অনেক কিছু কটিত,—হয়তো অনেক কিছু খটত
না...

কিন্তু চিন্তাত! সত্য,—সে স্ত্রী। হুনির মাঝ পাশে
আসিয়া পাড়িয়াছে, তাকে ঠেলিয়া কাজ লইয়া থাকিতে
তালবাসে। সে আসিয়া কাজের মধ্যেই বেশা দিয়াছে! কিন্তু
শাততী—হিমাংস্তর মা...কাজের ভিড়ে মাকে হিমাংস্ত তুলিয়া
থাকে কি বলিয়া!

মন টানটান করিয়া উঠিল। হয়তো মা সেখানে
ভাবিতেছেন, বহু প্রচণ্ড প্রতিপত্তি। সে প্রতিপত্তি ঠেলিয়া
হিমাংস্ত মায়ের কাছে বেঁধিতে পারে না। এমন তো কত
গল্পে পড়িতেছে...

মহালয়ার হু'দিন আগে হুপুর বেলার সুহরি শিবনাথ
এক পাশা গরম কাপড়চোপড় আনিয়া উপস্থিত হইল।
সুহরি আনাইল, বাবু বলিয়া দিয়াছেন শ'ভিনেক টাকা বাহির
করিয়া দিতে; বার্ষিক বিভাজ্য করিয়া বাবু গৃহে ফিরিবেন।
কনিকা চাকরের বারকৎ বলিয়া পাঠাইল, বার্ষিক বিভাজ্য
করিবার প্রয়োজন নাই। কান্দীরে যাওয়া হয়তো ঘটিবে না।
বাবু ফিরিলে সে লম্বা বাবুর সহিত কথা হইবে। অতএব
ইত্যাদি।

সন্ধ্যার পর হিমাংস্ত ফিরিলে কনিকা কহিল,—কান্দীর
বাওয়া থাক। আমার ইচ্ছা করছে শালতুলীতে যেতে।
তার চপ...সত্যি, বেশ হবে।

শালতুলী হিমাংস্তর বেশ।

কনিকার কথা শুনিয়া হিমাংস্তর হুট চোপ কপালে
উঠিল। হিমাংস্ত কহিল—শালতুলী!

—চাপ। এত আশ্চর্য হবার কি আছে?

চিন্তাত কহিল,—তানি, ঠেঁপ থেকে নেমে পাচ খট
যেতে হবে নৌকোপ—শালের মধ্য দিয়ে? তারপরে নৌকো
ছেড়ে গরম পান্ডী করে চার জোপ সেঁটা পথ!

কনিকা কহিল,—ও পথে মাতুল যায় না?

হিমাংস্ত কহিল,—যাবে না কেন! আমিই তো বেছি
এককালে। তুমি যাতে না। চিরকাল লহবে আজ। সে
তব্বত কত...

—তা হোক। আমি শালতুলী যাব। কান্দীর যেতে

হয়, তুমি যাও, বেড়িয়ে এস। আমার শালতুলী বাবার বাগবা
করে লাগে। নেচে আমার গুণ লাগে হচ্ছে। শাততী
প্রবেশেন। ক'নের ভাগে শাততী বেলে? না বলে মাগা
গোছেন! কি বল, যাবে তুমি আমার সঙ্গে শালতুলীতে?

হিমাংস্ত কনিকার তন্ত্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল কনিকার
পানে; তারপর কহিল—সত্যি বাবে?

—সত্যি।

হিমাংস্ত কহিল,—তা হলে চল, আমিও যাব। কি
করি, মা যে এখানে কিভাবে আসবেন না। যাদের সময়
যে কটে আনা হয়েছিল...মা বুঝ বুঝ করেন। তুমি নিজে
থেকে যেতে চাইছ, এত আমি দুঃস্থ হয়েছি। কিন্তু গিয়ে
আমায় পায়ে না। কটের একবেশ। সন্ধ্যার পর গুণগুণি
অন্তকার—'কি'কি' ডাকছে—তার উপর পাড়াপায়ে লোকজন
সেবাশুভা ভানে না—আমার-কান্দী ভানে না।

কনিকা কহিল,—আমি তো লাহিরা-লনাজী হয়ে সেখানে
মিষ্টা presido করতে থাকি না। আমি থাকি সেখানকার
বৌ।

হিমাংস্ত কহিল,—সেখানকার বৌ হবে যেতে হলে পারে
জুতা-খোজা আটা চপবে না—খামার খোজা দিতে হবে।

কনিকা কহিল—তা কি পারি না? এ ল'বে করি
—জোমরা চাপ, তাই। জোমরা যদি বল, জুতা-খোজা
বুলে তলরের পাড়ী পরে ঠাকুর-ঘরে ঢোক, তাহলে তাই
করবে! জোমারের কথায় পিছনো বাঁধতে বদী—আবার

তোমাদের কথাতাই ঈশ-মোড়া নিয়ে বাটনা বাউতে বন্দ !
সে কি নরক ব্যাভ ? আমার মা-তিমিমায়া যে সে সব
করেছেন । আমি কেন পারব না তুমি ? আমি বিপ্লব
কেবল আসিনি, আবেদিকা কেবল আসিনি ।

দুশী ঘনে হিমাংত বলিল,—বেশ, তাই তোকে । কিন্তু ঘনে
যেখ, কান্দীর হণ চূর্ণ ! আর শালতুলী
বাধা দিয়া কবিকা কহিল,—সে তোমার তত্ত্বভূমি—তার
অপবন গেলো না । জান তো সেট কবিতা—

কেহো কত নীত মলি ভালো অত তপ ।
কবি আর কেত কল, হুপ, হুপ, হুপ !
ভূমি যে মলি কেহো খাও তারি কল—
তারি নিম্নর তব মলি কে কল !

হিমাংত কহিল,—কিন্তু হঠাৎ কান্দীর থেকে শালতুলী !
ভূমি বুঝি তারতবর্ষের মাগণ আচ্ছিন্ন ?

কবিকা কহিল,—তা নহ । মার চিঠি পড়ে ছিল বাউতের
ঘরের টেবিলে ।—তোমার শিগগির । আমি পড়ছিলাম ।

কবিকা হাবীর পানে চাহিয়া কখনে হুপ করিয়া রহিল,
পরে কহিল,—মার চিঠি আমার কখনে! যেখা তুমি কেন ?

হিমাংত কহিল,—মার লেখাপড়া সেকলে । চিঠিতে
নামন তুল হুপ—

—ও ! কবিকা আর কিছু বলিল না ।

কিন্তু এট ছোট কথাটুকু সঙ্গে সঙ্গে চোখে যে দৃষ্টি
হুটিল, তাহা হিমাংতর গারে বিধিল—কাটার মত । সে
আর কোন কথা বলিতে পারিল না ।

শালতুলী ! শালতুলী ! এ বেন আর একটা পুথি ।

ছোট নদী । নৌকা হইতে খাটে নাবিয়া কবিকা
যেখে, তিন-চারিখানা গন্ধর গাড়ী পড়িয়া আছে ; গন্ধ
কোড়া নাই । কালোকোলা কতকগুলো ছেলেমেয়ে—বগনের
খার খারে না—কোমরে দুশী বাধা—কবিকাকে যেখিয়া
কাছেরো চোখ আর ফিলিতে চায় না । এ-জাহাঙ্গীর এমন
মাজব বেন তার কোন দিন প্রত্যাগা করে নাই ।

গুপ্তানা গন্ধর গাড়ী বিলিল । একশাবার শালপত্রসন্দেশ
উঠিল কৃত্য গাও ও গানী বিন্দু । অনরটিতে উঠিল কবিকা
আর হিমাংত । কবিকা নৌকা হইতে নাবিবার সময় পারের

মুখা খুঁটিয়া বিবু। দুটো বিন্দু চাঁপায়েছে, বাবার শিব বুদ্ধিয়া
সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর নোমটা টানিয়া দিয়াছে ।

গাড়ী চলিল । সামনে বত্বর বেগা ঘাও, লক্ষ্য মাত্র
আর নীল নিম্নল অকালে কোলাহুল করিতেছে । দুধারে
বানের কেত, জলা—যাকে যাকে খোড়ো ঘর । বাসের বৃক
ঐ কিংও পুঙ্খ ভূমিয়া নাচিতেছে ।

শিলাহু নয়নের দৃষ্টি দিয়া কবিকা এ মাতুরা উপভোগ
করিতেছিল ।

পুতুর, তাশা শিব-মলির, কানকান্দীর কোণ, বাগড়া-
বন, সালা কানের কাড়, মতা বিল, বাবোয়ারি-তলা পার হইয়া
গাড়ী আদিল গায়ের কাছে । পথে পোক চলিয়াছে । বুধ
ভূমিয়া কেহ চাহিয়া দেখিতেছে—কেহ বা না দেখিয়া পাশ
কাটাইয়া গাড়ীহেতেছে ।

এক ভাষায় একজন জাকিয়া কথা কহিল : বলিল,—
হিন্দু না কি ? ভাল আছ ? ক ঘুগ পরে বেশে এসে—
জ ! সঙ্গে বোমা বুকি ? বেশ, বেশ ! তুমি থাকা হবে
তো ?

এমনি অভ্যর্থনা সারা গা ভড়িয়া । এক ভাষায় এক
বয়সী নারী গাড়ী গাবাইয়া বলিল,—পেঁপ ম', বুধখানি ।
আল—খালো বো !

কেহ বলিল,—হিন্দু ! বা ! আত সকলে তোমাদের
ওখানে গিয়েছিলুম—কৈ ভূমি আসবে, এমন কথা তো তুমি নি ।

হিমাংত কহিল,—না, বাড়ীতে কেউ কানেন না । আমি
খবর দিইনি ।

বদন গাড়ী আসিয়া গৃহে পৌছিল, তখন হুঁদা পন্ডিত
হেলিয়া পড়িয়াছে । বড় বড় ভাল গাছগুলার পাতার ঠাক
দিয়া হুঁদার লাল আলো আসিয়া প্রাণের বৃক পড়িয়াছে !
হুঁদা বেন একটু পাকিয়া যেখিয়া বাইতে চায়, বাড়ীর সকলে
হিমাংতকে সহসা গৃহে আসিতে যেখিয়া কতখানি আনন্দ
প্রকাশ করে ।

গৃহে যে আনন্দ দেখা দিল, তাহা যেখিয়া দিকের হুঁদা
দুশী-ঘনে অন্তর্গত পেল ।

কণিকা অথাক হইয়া গেল। কাহাকেও জানে না, কেনে না। শুধু বেন কত চেনা—কতকালেন কতগানি জানা। প্রাণত্যাগ বেন তাহার উপর পড়িয়া ছিল। এত বয়স, এমন আনন্দ।

সারা আকাশ আনন্দের রঙে রাঙা হইয়া উঠিল। খিটু কথার দিকে দিকে যেন আগের লহর। তার মনে হইতেছিল, এতদিন কিসের সোতে এসে ছাড়িয়া যুগে বলিয়া ছিল! এত ঐশ্বর্য এখানে সঞ্চিত আছে!

হিমাংগ গায়েন জামা খুলিয়া বার কাছে আসিয়া বলিল,
—একখানা গামছা নাও তো যা।

মা বলিলেন,—গামছা কেন রে?

হিমাংগ কহিল,—নন্দা আসে অনেক। ওদের সঙ্গে পুকে একটু নীতায় কাটবে।

মা বলিলেন,—প্রাণ হরে গেছে যে...কত কাণ অত্যাশ নেই। শেরে সুনিদের ওস্তে এসে অগ্রহ করবি।

হিমাংগ কহিল,—কিসের অগ্রহ! কোন অগ্রহ করবে না।

মা বলিলেন,—বাও তো বোমা, কোথায় ওর গামছা আছে, বার করে।

হিমাংগ কহিল—টাক খোঁজার ভর লইবে না, না। তোমার গামছা নেই?

মা বলিলেন,—ওরে টেঁপি,—আমার গামছাটা এনে রে রে তোর বড়লকে।

টেঁপি ননদের ঘেঁরে। গামছা অনিয়া বলিল,—এই বাও বড়না গামছা।

হিমাংগ কহিল,—একটু শরীর তেল দে, মাথায় মাখবে।

তত্নাত্ত কহিল,—সাবান সেয়ে বড়না?

—খেং! সাবান কি হবে?

টেঁপি তেল অনিয়া দিলে দেই তেল মাখার গায়ে মাখিয়া হিমাংগ বাহির হইয়া গেল।

কণিকা কাছেই বলিয়া ছিল। বাড়ীর বত লোক, তাকে খিরা বসিয়া আছে। হিমাংগের স্বকম সেখান তোর বিজ্ঞের দীপা রহিল না। সেখানে উঠিতে বসিতে যে লোক পাল-দাসীর উপর নির্ভর করিত, এখানে সে...

তার বড় তাল লাগিল।

পিন্দাশুড়ী আসিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ মা, তোমার ওস্তে টায়া একটু চা টৈতী করে দিক!

কণিকা কহিল,—না পিন্দা, আমি চা খাই না।

পিন্দা কহিল,—সে কি মা! কলকাতার মেয়ে, পান করেছ—চা খাও না!

কণিকা কহিল,—না পিন্দা। আমার বাবা চাতের উপর বড় চটা। তাই ও অত্যাশ কখনো হয়নি।

পিন্দা বলিলেন,—বা! বেয়াইকে ঘূর তাল বলতে হবে তো।

সারি প্রায় এগারোটা। অগারিটি চুঁকিয়া গিয়াছে। সুড়ার বন হইতে ছোট ছেপেবেরনা পথায় কাহাসো চোপে ঘূর বাই। জুইটগুণা কণিকাকে পাইয়া বলিয়াছে। দয়াইয়ের নুধে শুধু এক কথা,—বৌদি...বৌদি! বড়গা কদার কথার ডাকিতেছে,—বৌদি!

তাকে পাটয়া সকলে বেন পাগল—ভনিয়ার আয় লব চুনিয়া গিয়াছে। তার মনে হইতেছে, এ খিটু মনু আত্মানে বুঝি সে পাগল বাইবে।

...বৌদি! বৌদি...

বৌদি গর বলিতেছে।

পুড়-শাওড়ী বলিলেন,—ওরে, তোরা করিল কি? সারা পল বোমার কত কই হয়েছে। ঝকে ছাড়,—ঘুমেতে সে। বৌদি তো পালাচ্ছে না—ভনিয় গর। ভুবি শুট বোমা—তবে লড়বে। বেলে, বৌকোয়, থকস পাড়ীতে কতের কি দীপা-পরিদীপা ছিল! ছেলে দাশু...কখনো অত্যাশ নেই।

বুড় হাসিয়া খিটু কথার কণিকা কহিল,—আমার ঘুঘু পাখি নি পিন্দা।

বেন বোল! না, ছর্সোৎসব।

সারি প্রায় বারোটা। পুনি, টুনি, কুঁ বৌদির কাছে গর শুনিতে শুনিতে ঘুঘাইয়া পড়িয়াছে। বড়গা চুনিতে চোপতলাকে প্রাণপণে ঘেঁরিয়া রাবিরার ওয়াস পাইতেছে। শাওড়ী আসিয়া বলিলেন,—না বোমা, আর গর থাকে। অনেক প্রাণ হয়েছে। বাও, তব লড়বে।

অজ্ঞ হলে আমার ভাবনার সীমা থাকবে না। ওঁ মা।
বাইরের ঘরে হিন্দুকে নিয়ে ওর ছেলেবেলার বড় সঙ্গীরা
যেন বেঁচে রয়েছে। তাকে ডাকতে পাঠাই। তুমি ওঁ
মা— তারপর এগুলোকে তুলে বিছানার গোসাই।

কদিকা কহিল,—আমি ওদের নিয়ে বাড়ি মা—কোলে
করে।

—না মা, পারবে না। কেন না তো! তবে আছে লব
নিরীহ হতে, ফুলের বাগ এখনি রান-রানবের ঘুড় বাকিরে
নেবে। কম পাখী লব।

—আমি পায়ব মা। লম্বাটি :

কদিকা ছ'একটি ছোটক তুলিতে গেল। তারা
চাঁৎকার করিয়া হাত-পা ছড়িয়া যে কাঁচ করিল। যেচারা
অনাড়ি! একটা লাথি খাইয়া পড়িয়া বাইরেছিল, লাঙড়ী
তাড়াডাকি তাকে ধরিয়া বুকে লটপেন। বলিলেন, পেপেছে
দুঃ?

কদিকা কহিল,—না।

হাসিয়া মা কহিলেন,—বেথ একবার কাও! শুধু শুধু
নাথিও পেলে!...ওরে এই দুলা...ভূত কোথাকারের, নাথি
যারদি কৌণিক!

কাঁকানির চোটে গুন ভাসিয়া তুলু উঠিয়া বলিল—
ডাবডেবে চাই চোখ ঘেঁষিয়া। লাঙড়ী বলিলেন,—মা, ঘরে
গিয়ে শো। শোন—আমার ঘরে শুবি। তারপর কদিকার
বুখে চুমা দিয়া বলিলেন—এস মা ভোমার ঘরে—

কদিকাকে আনিয়া তিনি ঘরে নিলেন। সালাদিগে বস।
ঘরের এক ধারে তার বড় ঝাঁক রহিয়াছে, হটকেল রহিয়াছে—
পালকে বিছানা। ঘরের কোণে কককে পিড়লের পিলহুজ—
পিলহুজের উপর প্রমৌপ জলিতছে।

মা বলিলেন,—তবে পড়। আমি হিন্দুকে ডেকে
পাঠাই। সবাই যেন বেঁচে উঠেছে। ভালবাসা এমন
জিনিস! আহার-নিদ্রা দুটিয়ে বেধ।

মা চলিয়া গেলেন। জানালা খোলা ছিল। কদিকা
আদিত্য জানালার ধারে গাঁড়াইল। জানালার ওয়ারে মিশ-
কলো অন্ধকার। মাঝে মাঝে ভোনাকি জ্বলিতছে। যেন
কলো মথলে সোনালি চুবকির বাহার। আগ বন ছড়িয়া
বিকীর অবিরাম গুহন।

কদিকার কথা মনে পড়িল। আলোর আলো-করা
পথ—কলহের অস্ত্র নাই কখনো। ট্যান্ডি চলিয়াছে,
ছায়াছায়া দৌড়, রিক্শার ছিঃ ছিঃ শব্দ—চাঁচোনিহন
ব্যক্তিভেদে—আত্মজ্ঞান গ্রহণারদের যান চলিয়াছে—দারুণ
হইগোল। মনটাকে এক দণ্ড ছুঁড়াইয়া পাওয়া যায় না।
সেই নিচির কণ্ঠস্বর লগাফল্গু সকলে মাতিয়া মলমল চইয়া
আছে। সে আলোর চেয়ে এ অন্ধকার অনেক ভাল।

তারপর এই ঘেঁহু, এই ভালবাসা। কাপ কোথায় কে
ছিল—দেখা নাই, শুনা নাই। আর আত্ম! এতখানি
প্রাণের হিরোল বহিরা চলিয়াছে এই জর্জন মলিন গৃহে, বনের
কোণে—আত্ম-কালবার অনতিজ্ঞ এখানকার এই নর-নারীর
বুকে!

সহসা শিহন হইতে হিমাংস আনিয়া চোখ টিপিয়া
খরিল।

কিরিয়া কদিকা চোখিয়া রহিল স্বামীর সুখের পানে।

হিমাংস কহিল,—মন কেমন করছে কলকাতার করে?

এখানে এই অন্ধকার! বসেছিলাম তো।

কদিকা নিশ্বাস কহিল,—কথা বল দিল না।

হিমাংস কহিল—কি ভাবছিলে?

—বল?

—বল।

কদিকা কহিল,—তোমার সঙ্গে বদন নিয়ে ছব, তখন মনে
পূন পূর্ণ হয়েছিল—এই তেবে যে, আমার স্বামী শুধু মন
বিধান।

হিমাংস কহিল,—বেশ! তারপর?

কদিকা কহিল,—আজ এখানে এসে সে পূর্ণ অনেকখানি
বেড়ে উঠেছে। আমার স্বামী শুধু মন বিধান নয়—তার
চেহেরে বড়—অনেক বেশ বড়।

হিমাংস কহিল,—তার মানে?

কদিকা কহিল,—সে মানে নাই শুনে!...রাগ হইল
তোমার উপর।

—রাগ?

—হ্যাঁ। লাঙড়ীর এই ভালবাসা—সেও, নন্দ, এমন
সংসার—এ-সব থেকে আমার বাকিত রেখেছিলে—এই তোমার
ভালবাসা!

হিমাংত কহিল,—গোন আমার কথা। কিছু গোপন করবো না।

বাধা দিয়া কনিকা কহিল,—ভেবেছিলাম, আমি পাপ করেছি বলে তুমি বাধীষ নী হতেই চাই—যত্নের বো হতে আমার অসম্ভব? হি!

হিমাংত কহিল,—আমায় কমা কর।

কোলাহল-কণরবের অস্র নাট।

ছোট পেণ্ডর আসিয়া চুপি চুপি ডাকিল,—বৌদি...

কনিকা কহিল,—কি ভাই?

—কমা থাকবে? পাছ থেকে ছিঁড়ে এনেছি। কেমন কঠি! খুব ভাল।

ভুল পলা গিল।

ও-পাড়ার ঠানদি আসিয়া বলিল,—ও নাড়বো, পত্নীদী খোঁপা বাধিল না কেন ভাই! বাপের অচ চুল! আর—সে খোঁপার ভালে হিন্দু একেবারে চিবদিনের মত অটকে থাকবে।

ঠানদি তার মাথা লইয়া পড়িল; হেঁচকি ভরজবে করিয়া চুলগুলি ঝাঁচড়াইতে ঝাঁচড়াইতে কহিল,—আবার মাথা বেখেছি নাড়বো? তোমার কুঁড়ালিমা আমার মাথার চুলের কি যথাসিঁট করত!

শিশ-শান্তকী আসিয়া কহিলেন,—ও ছোট মানো, ও কি করলে! বোমার চুল ঐ দুর্গাকি নারকেল তেল জ্বলতবে কবে মাথালে! কাপড় বাধিল—সব বাবে বে! বোমার কাছে ভাল বাসী গন্ধ-তেল রয়েছে নে!

ঠানদি কহিল,—তুই পান্ন নখ। এই নারকেল তেল ছেড়ে লহবে গন্ধ-তেল যেহে যেহে একালের বৌ-ভিয়েগা কাঁচা বয়সে মাথার চুল যেমন শাশা করছে, তেমন চুল হচ্ছে খাটো! এমন খাটো যে খোঁপা বাঁধতে পরচুল কিসে আসে! সেবারে গিরাছিন্দুর না সেই কালীঘাটে আমার বোনকীনের বিয়েত...বেখে এলু! ইং নাড়বো, নারকেল তেলে তোমার গিরা হচ্ছে না কি ভাই?

কনিকা কহিল,—না ঠানদি...শিশ-শান্তকীর পানে চাহিয়া বলিল,—মাখি নারকেল তেল গিদিয়া। আমার তো দুর্গাকি লাগছে না।

এনি করিয়া আটনশ দিন কোথা দিয়া যে কাটরা গেল—যেন স্বপ্ন! ওদিকে নুতরি পিবনাথ চিঠি গিবিলা,—

এমন অঙ্গিনে ভাগো হই! আস্ত হাই। বাগতুলার সাজার মত নানি কলু করিত হইবে। জুবিয়া চকিল নখরখানু মত পুঁজাশিডি করিগমন, ইত্যাদি।

হিমাংত আসিল মনের কাজে। মাকে ডাকিল। মা উঠয়া ছিলেন। বাতের মাথা পুন বাড়িয়াছে। কলার তোলা উঠন আসিয়া কনিকা ক্রানেলের দৈক দিতেছে। মাখনে লম্বাশুলা। খাইন আসছে। মা নিজেই হাতে লব করেন। কনিকা বসিতেছিল—আমায় লব শিখবে যেবেন মা, নাহলে শিখব কি করে!

ছেলের আঙ্গানে মা চাটিলেন ছেলের পানে।

ছেলে নিইয় চিঠির কথা বলিল। মা বলিলেন,—ওলা, লম্বী পুঁজাটা থেকে বাবি না কি বে? না, না, তা হয় না।

ছেলে বলিল—উপায় নেই মা। মত বড় মক্কানা। শিশু চিঠি গিগেচে। না হলে অনেক টাকা লোকদান হবে।

মা চাটিলেন কনিকার বিকে। ছেলে বৃত্তাইল, মা-লম্বীর পুঁজা—তার আঙ্গান আসিয়াছে—তমির না?

তারপর ঘরের মধ্যে হিমাংতর সঙ্গে কনিকার দেখা।

হিমাংত কহিল,—সব শুখিলে নাও গো।

কনিকা কহিল,—মাংর বাতের এই মাথা...তার উপর বাড়িতে লম্বী পুঁজা। যেতে হয়, তুমি বাও কলকাতায়। মা না লম্বা পর্যন্ত আমি কলকাতায় বাব না। কুলে?

হিমাংতর দুই চোখ বিষয়ে তপিয়া উঠিল।

কনিকা কহিল,—এনিতেই আমার সে মক্কানুখিতে বাবার ইচ্ছা বড় হচ্ছে না—তার উপর মাংর অস্থল। আমি বদি দেখা না করব তো ঘরের বো হইছি কি ভুলে...

কনিকার দুই চোখে...

হিমাংত বে-লোপ্তি দেখিল, এমন সীপ্ত পূর্ণে সে কোথাও দেখে নাই। না কলকাতায়, না শান্তিনিকে পাহাড়, না আগ্রায়। এ-লোপ্তি তার বড় ভাল লাগিল। তার সারা দৃক বেন আসলে আসো হইয়া উঠিল।

নাথকরণ

—श्रीमो सुमानम्

কান্না। সেসব নাম পত্রবোচনের দ্বারা অনেক নিয়মক
ও বিশদার্থের নাম আনাবিদের দ্বারা প্রচলিত আছে।
সু এবেশে কেম, অনেক মেনেই অস্বাদিক পদমাণে এইরূপ
নামকরণ চলিয়া আসিতেছে। নামকরণের প্রতি দক্ষ
কবিত্রেই দেখা যায়, নাম ও নামে “বাগধারিণী সম্প্রদায়”
কান্নে নয়। নামকরণের এবং বিধি ব্যক্তিগত দেখিয়া একজন
প্রাচীন পুথির নাম বাধিয়াছিলেন ঠান্ডা নাম। এইপ্রকার
অস্বাদিক ও প্রচলিত নাম রাখার যেহেতু কি চিত্রাঙ্গা
কথার হিন্দী বলিয়াছেন—

ਘਰ ੮੭। ੬੬. ਬਰਾ ਬਰਾ

स्वयंभू, काँटेला, बाल

ମହାସନ ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ ୧୫୫

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

অর্থাৎ, বাগ্যের নাম ছিল অমর যে বসিরা গিয়াছে, ধন-
পতি বাগ কান্ডিয়েছে, লক্ষ্যে নব্বই বিহীন কবিরেছে : এট
দব বৈবিধ্য আদ্যন মনে হব ঠিকই বাগ নামট ভাগ
বাক্যবিত একটু ভিত্তি কবিরেই বৈদ্য বাগ, আদ্যবিশেষ বৈদ্য
যে সমস্ত বাগ প্রচলিত আছে, তাহান অধিকাংশই নামো
লক্ষ্য প্রদান্য মতে। তাই বসিরা যে, সমস্ত নামট অর্জন
গ্রাহ্যও মতে, কতকগুলি অর্জন্য বা অর্জন্যমতে নামও
আছে। অগ্রস্ত বর্ণন মতো তুমিই লক্ষ্যবান নাম বানস,
কৃষ্ণকব লক্ষ্যবান নাম কৃষ্ণ বা কালী গ্রাম্য বিবর্ধক বস।
এটিও তাহান নাম অংশোণেও হাবের নামকরণ-গ্রাম্য বহুকাল
হইতে চলিয়া আসিতেছে। মগধালা কৃষ্ণকব প্রতিষ্ঠিত
কৃষ্ণকব, বহুকাল প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণকব ও শিখো প্রতিষ্ঠিত
শিববিদ্যায় অগ্রবৈদ্য এটিও তাহান নামা দিতেছে। সুগদান
গ্রাম্যকবলেও সুগদাগ্রাম, অগ্রগ্রাম্যগ্রাম, সুগদা-বিবর্ধক
এবং সমস্তই অগ্রগ্রাম্যগ্রাম, সুগদাকব প্রকৃতি হাবের নাম-
করণও এই কাবেই হইয়াছিল মতেই মতে।

পূন্যাবাহি পাঠ করিলে দেখা যায়, শৌভাবিক নৃপেন্দ্র
অনেক সার্বক নান ছিল, কিন্তু এখন আমরা অনেকেই সেই

সমগ্র সাহিত্যে স্মৃতি-স্বপ্নের অর্থ জানি না। “করুণা চাচি-
সকিতে করুণাছোঁতবৎ স্রুতিঃ” অর্থৎ, করুণারী শ্রাব্য
কর্তৃক সৃষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া বিখ্যাতকৃত বাণকুর নাম
কথনকত হইয়াছিল, ইহা অস্বকর জানা আছে। “সদগুণ
দায়কঃ কৃতিঃ” অর্থৎ সাগরভাষার পুস্তকপ সমূহ খনন করিয়া-
ছিলেন বলিয়া সমুদ্রের নাম সাগর হইয়াছিল, ইহা আদ্যা
অন্যেই জানি; কিন্তু লগন সত্যের নাম সগর হইয়াছিল কেন
তাঁহা হস্ত অস্বকর জানা নাই। বর্তমান কালেও অনেক
স্থানে পৌরাণিক নামে পরিচিত, অথচ সেই সেই নামের
স্মৃতি-স্বপ্নের অর্থ অনেকেই নিজে নিজে জানেন। এবং বিধি কয়েকটি
সার্বিক নামের স্মৃতি-স্বপ্নের নিম্নে দেখা হইল; ইহাঙ্গিরের
কয়েকটির অস্বকর বর্ণনাও আমাদের, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগ-
বতাদি বিভিন্ন গ্রন্থে কতিপয় পার্বক দেখা যায়।

মাক্কাভা — গাভা যুগ্মনাথের একমুখ ভাষণ ছিল, কিন্তু তিনি অসমর্থ ছিলেন। এমনভাবে যুগ্মনাথ শতভাষণেই বনগমন করেন। তত্ৰতা কবিগণ তাঁহাকে শরঙ্গা বিবরণ বোধিয়া রূপায়বন হইয়া তাঁহাকে লক্ষ্যনার্থ ইচ্ছাবৈবতা যথেষ্ট প্রবর্তিত করেন। বজ্র-প্রবর্তন হইলে একদিন যুগ্মনাথ নিশাভাগে তুণিত হইয়া ভলপানার্থ বৃক্ষমবনে প্রবেশ করেন এবং তাঁহান পত্নীকে নিম্নার ওজ যে অতিমম্মিত ওল ছিল, তাহাই পান করেন। পুরোস্তিগণ নিম্নোপিত হইয়া কেশিগন, কলসে ওল নাই এবং অস্তমভানে ভানিলেন, গাভা বহাই ঐ ওল পান করিয়াছেন। পুস্তেৎপাদক ভলপানবন কলে যুগ্মনাথের বকিত কৃকি রেব করিয়া চক্রবর্তী লক্ষ্যাক্রান্ত একটা পুত্র উৎপন্ন হইয়া তখন কবিত্তে লাগিল। তদধ্বনে বিপ্রগণ প্রবর্তিত হইয়া বন বসিত্তে লাগিলেন, “মাধা, এই ফুয়ার বস্ত্র-পানার্থ যোবন করিত্তেছে, এখন সে কাহার বস্ত্র পান করিতে?” তখন বেবস্ত্রক ইষ্ট “নাধায়া” অর্থাৎ আবাকচে পান করিলে, ঐক কণা বসিয়া ঐ বালকের মুখে বস্ত্রী তরুণী প্রবান করিলেন। ঐক কারণে ঐ বালকের নাম হইল মাক্কাভা —

তঃ কাগ উপরূত কৃষ্ণ নিধি লক্ষণং।

বৃন্দাবন তনয়কল্পিত রতনং ॥

৩১ বাহ্যঃ কৃষ্ণঃ কালঃ পুরু বোধ্যঃ ৩২ পদং।

মহাভাঃ কালঃ না গোপীকল্পিতঃ কল্পিতঃ ৩৩।

(দ্বিত্যধ্যায়ঃ, ১ পদ, ৩ অধ্যায়ঃ, বাহ্যঃ, কালঃ, ১০ অধ্যায়ঃ)

সুগন্ধ—রাণা নামক শত্ৰুগণ কর্তৃক অগ্নিগুণ্য হইয়া
অগ্নির সহিত বনগমন করেন এবং তথার তীহার শকুণপ্রাপ্তি
পটে। তীহার সহিত অসুখতা হইবার উল্লেখ করেন,
মহর্ষি তাঁহাকে অন্তর্গত জানিয়া সে উক্ত হইতে নিবৃত্ত
করেন। রাক্ষসবীর শত্ৰুগণ তাঁহাকে শত্ৰু জানিয়া
হিংসাপরহৃত হইয়া ঐ পুত্র বিনাশ করিবার জন্য তাঁহাকে
অস্ত্রের সহিত পর (বিধ) প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু পুত্রের
পুণ্য জীবিতাবস্থায় শত্ৰু (অর্থাৎ বিধের সহিত) কল্পপ্রণেয়
করিয়াছিল। এই কল্প ঐ পুত্রের নাম হইয়াছিল শত্ৰু—

মহাকালঃ শত্ৰুর্জিহবাঃ কল্পিতঃ ৩৪

৩৫ চৌবৈঃ শত্ৰুঃ শত্ৰুগণ্যঃ মহাকালঃ ॥

(দ্বিত্যধ্যায়ঃ, ১ পদ, ৩ অধ্যায়ঃ, বাহ্যঃ, অগ্নিগুণ্যঃ, ১১ অধ্যায়ঃ)

অগস্ত্য—দুর্ভিক্ষের প্রভাব অস্ত্রিতাৎ হুয়েকক প্রাধিকণ
করিতেন। তৎকালে বিদ্যাপিত্র উপাশ্রয় হইয়া একদিন
হৃৎকক বলিলেন, “নাথ, তুমি প্রতিদিন যেমন যেককে
প্রাধিকণ কর সেইরূপ আমাকেও প্রাধিকণ করিবে।” তদন্তঃ
দুর্ভা বলিলেন, “আমি স্বকীয় ইচ্ছামুক্রমে হুয়েকক প্রাধিকণ
করি না; বিশ্বজ্ঞাত আদিত্যের পরিভ্রমণ করিতেছি মাতঃ।”
দুর্ভা উত্তরিত বিদ্যা ক্রোধান্বিত হইয়া দুর্ভা গতি গোণ
করিবার নিমিত্ত সংসা অত্যাচার হইয়া উঠিলেন। তৎকালে
বেদগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া বিদ্যাকে নানাপ্রকারে অস্ত্রোষ
করিয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিদ্যা তীর্থা-
বিশেষ অস্ত্রোষ রক্ষা করিলেন না, ক্রমেই বর্ধিত হইতে
লাগিলেন। নিরুপায় হইয়া বেদগণ মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাগত
হইলেন। অগস্ত্য বিদ্যাকাল-সহিতানে আগমন করতঃ
কহিলেন, “হে কৃষ্ণ, আমি কোনও বিশেষ কাণ্ডবস্ত্রঃ হকিণ
দিকে গমন করিব, অতএব তুমি আমাকে পশু প্রদান কর
এবং বস্ত্রদান আমি শত্যাগমন না করি তুমি আমার অগ্নিকা
করিবে, বর্ধমান হইবে না।” তৎকালীক স্বকীয় করিয়া
বিদ্য মহর্ষিকে পশু প্রদান করিলেন এবং তীহার অপেক্ষায়

কালতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি আর প্রত্যা-
গমন করিলেন না, কাজেই বিদ্যা আর বর্ধিত হইতে না
পরিয়া ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন। অগ্নি (পূর্বকাল বিদ্যা)
তদন্তঃ ইতি অগস্ত্য—অর্থাৎ অগ্নিতে তদন্তঃ করিয়াছিলেন
বলিয়া মহর্ষির নাম হইয়াছিল অগস্ত্য—

কালঃ কালঃ কালঃ কালঃ কালঃ ৩৬

কালঃ কালঃ কালঃ কালঃ কালঃ ৩৭

(বাহ্যঃ কালঃ, ১০ অধ্যায়ঃ, বাহ্যঃ কালঃ, ১১ অধ্যায়ঃ)

কৃষ্ণ, কৃষ্ণী—গোষ্ঠম ও অগ্নিগুণ্য হইতে শত্ৰুগণ অগ্নি
প্রণেয় করেন। শত্ৰুগণের পুত্র অগ্নিগুণ্যের সত্যপুত্রি,
শত্ৰুগুণ্যের পুত্র শত্ৰুগুণ্য। অগ্নিগুণ্যের উৎকণ্ঠিত করণ করিয়া
শত্ৰুগুণ্যের খণ্ডিত শত্ৰু শত্ৰুগুণ্যের পুত্র হইতে হইতে
মহর্ষিগুণ্যের কল্পিত হইতে করে। রাণা নামক শত্ৰুগুণ্যের
বৈদ্যঃ ত্রাণদিককে দেখিতে পান ও ত্রাণদিকের হইয়া ত্রাণ-
দিককে লষ্টা জানিয়া প্রতিপালন করেন। রাণা শত্ৰুগুণ্য
কৃষ্ণার ঐ মহর্ষিগুণ্যের জীবন রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া বালকক
নাম হইল কৃষ্ণ ও বালিকার নাম হইল কৃষ্ণী। কৃষ্ণ কালে
কোরবদিকের আচার্য্য ও কৃষ্ণী ত্রাণদিকের পুত্র হইয়া-
ছিলেন—

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ৩৮

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ৩৯

(দ্বিত্যধ্যায়ঃ, ১ পদ, ২ অধ্যায়ঃ, বাহ্যঃ, কালঃ, ১০ অধ্যায়ঃ)

শান্তকুমার—শান্তকুমার নামক শত্ৰুগুণ্যের পুত্র হইয়া
বালিককে লক্ষ্য করিতেন, সেই বালিকই বৈদ্য প্রাপ্ত হইয়া
উৎকণ্ঠিত শান্তকুমার করিত, এই কারণে তীহার নাম হইয়াছিল
শান্তকুমার—

ক. ক. কালঃ শান্তকুমারঃ কালঃ ৪০

শান্তকুমারঃ কালঃ কালঃ কালঃ কালঃ ৪১

(দ্বিত্যধ্যায়ঃ, ১ পদ, ২ অধ্যায়ঃ, বাহ্যঃ, কালঃ, ১০ অধ্যায়ঃ)

অকুলকুল—এক সময়ে মহাভাগ্য বিদ্যামিত্র কঠোর
তপস্যা আরম্ভ করেন। বেদগণ তৈস্ত, পাণ্ডে বিদ্যামিত্র
তপস্যাশ্রমের তীহার ইন্দ্র-গণ অবিচার করেন, এই কালে
জীত হইয়া তীহার তপস্যাশ্রমের তপস্যা অগ্নিগুণ্যের বেনকা
প্রেরণ করেন। বেনকা কেশদিকের বিদ্যামিত্রের চিত্ত
অকণ্ঠ করিলেন এবং বিদ্যামিত্র বেনকাকে লক্ষ্য করিয়া

তপস্যা পবিত্রায় করতঃ তীর্থায সহিত পরম মুখে কালাতি-
যাত ক্রান্তে লাগিলেন। কিছুকাল পরে যেনক গর্ভবতী
হইলেন এবং যথাকালে একটা কন্যা প্রসব করিয়া তাহাকে
মালিনী নামের দ্বারা নামকরণ করিয়া স্বর্ণে বেদনায় সজ্জা
করিয়া পেলেন। ততঃ পাকিণ্য হিংস্রত্বসমাকীর্ণ নির্জন
বনে সজ্জাভাষ্য অলম্বায় কন্যাকে পতিত দেখিয়া সমস্ত জনপদে
সংবাদে বহন করিয়া যক্ষা করিতে লাগিল। যক্ষি কন্যা
কন্যাকে তৎসংবাদে দেখিতে পাইয়া বকীরা আশ্রমে আনয়ন
করিয়া প্রতিপালন করেন ও পুত্রস্ব স্বার্থে পাকিকর্তৃক রক্ষিত
হৈতাহিন বঙ্গিয়া কন্যার নাম রাখেন পুত্রস্বনা—

নির্জন বৃন্দে বসন্তকুসুমঃ পৰিবারিতঃ ।

পুত্রস্বনং নামাতঃ কৃতকণি পত্নঃ যমঃ ।

(মহাভারত, অষ্টমস্কন্ধ, ১২ অধ্যায়)

আনন্দ চন্দ্রভক্তি—বহুদেবেব অপর নাম আনন্দ-
চন্দ্রভক্তি। তাঁহার ওদকালে স্বর্ণে দেবগণ চন্দ্রভক্তি ও কন্যা নাম
কল্পিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হৈতাহিন আনন্দচন্দ্রভক্তি—

বেদনুজ্জ্বল্যে দেবদানবঃ চরঃ চরনি

কৃতকণিঃ কন্যাঃ তানং বহুদেবেবচন্দ্রভক্তিঃ ।

(ঐতহ্যাসবত, ১ খণ্ড, ১০ অধ্যায়)

ভরতভক্তি—উত্তরা-বনিতা মদন্ত গর্ভাবস্থায় একদিন
বৃহস্পতি গোপনে এই স্রাট ভাঙ্গিয়া বৈদ্যনার্থ প্রত্যাগমনে গর্ত
বালক তাঁহাকে নিষেধ করেন; কিন্তু বৃহস্পতি তাঁহার বাক্য
অগ্রাহ্য করিয়া বাল্যমূর্খ বর্ধাসেক করেন। গর্তে বালক
এক গর্ভে দুইজনের অঙ্গদ্বারা অঙ্গদ্বয় বিবেচনা করিয়া পাকি
প্রসব দ্বারা সেই বর্ধা বাহ্যবানি বহির্দেশে নিঃসারিত করিয়া
লেন। কুপিত সেই পুরু হইতে তৎকালীন এক কুমার
উৎপন্ন হয়। যামিনীতে ভীত হইয়া মদন্তা এই বালককে
ত্যাগ করিয়া ঘাইতে উন্নত হইলে বৃহস্পতি মদন্তাকে বলিয়া-
ছিলেন “বৃদ্ধ ভরতায়নিবাং” অর্থাৎ “হে বৃদ্ধ ভূমি একের ক্ষেত্রে
অন্যের বর্ধা (দুইজন হইতে) উৎপন্ন (বালায় ভাঙে বাতঃ)
এই বালককে ত্যাগ করিও না, ইহার ভরণপোষণ কর।”
মদন্তাও বৃহস্পতিকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন,
এই ক্ষেত্রে এই বালকের নাম হইয়াছিল ভরতভক্তি—

বৃদ্ধ ভরতায়নিবাং ভরতভক্তিঃ কৃতকণিঃ ।

কন্যাঃ বহুতঃ পিতারঃ কৃতকণিঃ কৃতকণিঃ ।

(ঐতহ্যাসবত, ১ খণ্ড, ১০ অধ্যায়)

মন্ত্রক (মন্ত্রক)—(১০৭৭) কর্তৃক দ্বিতীয় পুত্রগণ
নিহত হইলে, দ্বিতীয় কন্যা কর্তৃক পুত্রগণ নিহত হইলে
একটি পুত্র সার্থক্য করেন। কর্তৃক দ্বিতীয় এই প্রার্থনায়
প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন “ভূমি যদি সমস্ত বংশ
নিহত হইলে তৎকালে হইয়া থাকিতে পার তাহা হইলে
উপিত পুত্র প্রসব করিবে।” যদি দ্বিতিকে এইরূপ
আশীর্বাদ করিয়া তাঁহাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন ও নিজে
তপস্কার নিমিত্ত গমন করিলেন। দ্বিতিক ও অশ্রুনিধি নিষেধ
অলম্বন করতঃ তৎকালে তৎকালে হইয়া তপস্কার অশ্রুতানে
প্রসব হইলেন। ইহা নিমাতার এই সমস্ত অবগত হইয়া
দ্বিতিক দ্বিতিক উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত তাঁহার সেবাগতায়
পাকিয়া ততকালের দ্বিতিক অধেষণ করিতে লাগিলেন। একদিন
দ্বিতিক দ্বিতিক চরণ-স্থাপন-স্থানে মন্ত্রক ও মন্ত্রক-স্থাপন-স্থানে
চরণ-স্থাপন করিয়া নিম্নাভিভূত হইলেন। ইহা তাঁহাকে
এতদূর অশ্রুতিভাষণে বৈদ্যা তাঁহার দ্বিতিক প্রবেশ করি-
লেন ও মন্ত্র দ্বারা সেই গর্তে শিশুকে উদগত করিও
বিলক করিলেন। উদগত হইলে গর্ত উন্মেষণে
সোন করিতে থাকিলে, ইহা তাহা দ্বিতিক বলিলেন, “মন্ত্রক”
অর্থাৎ সোন করিও না। এই হেতু গর্তকৃত ঐ গর্তের
নাম হইল মন্ত্রক—

মন্ত্রকঃ কন্যাঃ কন্যাঃ বর্ধস্বনাঃ ।

কন্যাঃ নাম তে মন্ত্রকঃ কন্যাঃ কন্যাঃ ।

(পদ্মপুরাণ)

কৃতকণি—বহুদেবেব বিশ্বতপ কোনও সময়ে দেবতাগণের
পুত্রগণ হইলেন। কিন্তু তিনি বহুদেবেব প্রবাসে বেদনায়
বিশেষ উদ্বেগে ও গোপনে বাহ্যকৃত অশ্রুতগণের উদ্বেগে
বৃদ্ধভক্তি প্রদান করিতেন। ইহা বিশ্বতপের এই ব্যবহার
জানিতে পারিয়া তাঁহার শিরশ্চেন্দন করেন। ইহাতে কন্যা
ইহাও প্রতি অত্যাচার হইয়া ইহাও বিনাশকামনায় এক
বল করেন। বলক কন্যাও বাহ্যিক প্রবেশের পরই বহুদেব
হইতে তৎকালের দ্বিতিক এক রাক্ষস উৎপন্ন হয় ও তাঁহার
দ্বিতিক মদন্ত প্রবাসে সর্বলোক আত্মত করিয়া ফেলে, এই কন্যা
ঐ রাক্ষসের নাম হইল কৃতকণি—

বহুদেবঃ ইমে লোকাত্মনা বাহ্যকৃতঃ ।

ন ইহা কৃতকণিঃ প্রোক্তঃ পাপঃ পাপমাতকঃ ।

(ঐতহ্যাসবত, ১ খণ্ড, ১০ অধ্যায়)

অনন্ত—কঠোর তপস্যায় বড় উপার্জিত চিত্তবৃত্তি
কমাইবার কল্প কামন্যে তাঁহার সযৌবরত্ন হন। মহাশয়
তাঁহা কামিতে পারিয়া ক্রোধাত্তে তাঁহার শরীর নিকট ও বদ্ধ
করিয়া তাঁহাকে অকবিতা করেন। এই কল্প কামন্যের
অপর নাম অনন্ত ও যে স্থানে কামন্যের অঙ্গ দণ্ড হইয়াছিল,
সেই স্থানও অনন্ত যেন বলিয়া বিখ্যাত—

অন্তর্যামিনঃ স্বয়ং যস্যঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

অনন্তঃ কৃতঃ কামঃ কামপত্যাচারী ।

অনন্ত গতি বিখ্যাতঃ কৃতঃ স্বয়ং ।

মহন্ত ইতি যোগেশ্বরঃ পণ্ডিতঃ কামপত্যাচারী ।

[গায়ত্রী, আদিকাণ্ড, ১৮ অধ্যায়]

কার্ত্তিকী—ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বহুকে পুরোবর্তী
করিয়া সেনাপতিগণকে অভিপ্রায়ে পিতামহ দ্বন্দ্বার নিকট
গমন করিল বন্ধা তাঁহাদিগকে বলিলেন “হস্তাশ্বন পক্ষার যন্তে
আম্ববোধে যে অশ্বগা উৎপাদন করিবেন, সেই কুমারই
দেবসেনাপতি হইবেন।” অতঃ পরে অশ্বি পক্ষাপতে
বীরাগত করেন, কিন্তু পক্ষা সেই উগ্র বীরা ধারণ করিতে
অসমর্থ হইয়া উঠে। তৈলাস-পিংগে পরবন প্রবেশে পবিত্রাণ
করেন ও তাঁহা হইতে বাণদ্বয়সমগ্রত একটা কুমার উৎপন্ন
হয়। তখনকর ইন্দ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ, সেই কুমারকে শুভ্র-
প্রদান করিবার নিমিত্ত কৃত্তিকাদিগকে নিযুক্ত করেন।
কৃত্তিকাগণ, এই পুত্র তাঁহাদিগের নামানুসারে বিখ্যাত হইবে,
এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে ইজ্ঞাদিকে বন্ধ করিয়া কুমারকে শুভ্র-
দানে প্রবৃত্ত হন। এই হেতু বেবরণ এই কুমারের নামকরণ
করিলেন কার্ত্তিক—

কুঃ কুমারঃ কৃত্তিকাঃ কৃত্তীঃ সেনাঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

তথা কৌশল্যনামঃ কৃত্তিকাঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

তাঃ কৌশল্যঃ সত্যমসংশয়ঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

প্রাণদায়কঃ পুত্রঃ কৃত্তিকাঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

কৃত্তিকাঃ সত্যমসংশয়ঃ কৃত্তিকাঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

পুত্রদায়কঃ কৃত্তিকাঃ সত্যমসংশয়ঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

[গায়ত্রী, আদিকাণ্ড, ১৮ অধ্যায়]

অশ্বপত্নী—দেব ও বৈতাগণ অশ্ব ও অশ্ব হইবার
দাদার কোরোব-দাদার নানাবিধ গুণবি নিরূপণ করতঃ
মহত্তরিতিকে মনন বও বাস্তুবিক মনন-বন্ধু করিয়া দাদার
মনন করিতে লাগিলেন। কল আলোড়িত হইলে সেই

এবদিত হইতে বসন্তকাল উপস্থিত হইলেন। কল (অশ্ব)
হইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের নাম হইল
অশ্বপত্নী—

অশ্বপত্নী নামঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

উৎপন্নকৃত্তিকাঃ কৃত্তিকাঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

[গায়ত্রী, আদিকাণ্ড, ১৮ অধ্যায়]

সুত্র, অসুত্র—সমুদ্রবনকালে সমুদ্র হইতে—কলসের
বস্ত্রা বাকনি (অশ্ব নাম সুত্র) পরিপ্রভৃতি (অর্থাৎ কল
তাঁহাকে প্রাণ করিবে তাহা) অবেশন করিতে কলিত উপস্থিত
হইলেন। সুত্রকে অর্থাৎ বাকনীকে বেবরণ প্রাণ করিলেন
বলিয়া তাঁহারা সুত্র নামে ও বৈতাগণ সুত্রকে প্রাণ
করিলেন বা বলিয়া অশ্ব নামে অভিহিত হইলেন—

“সুত্রপতিঃ সত্যমসংশয়ঃ কৃত্তিকাঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

অশ্বপত্নী নামঃ সত্যমসংশয়ঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

[গায়ত্রী, আদিকাণ্ড, ১৮ অধ্যায়]

ভিলোক্তমা—দাদার প্রাণ ও উপস্থানের উপস্থানে
অশ্ব হইয়া বেবরণ, লিঙ্গণ ও পরমলিঙ্গণ করবান একার
বদল্য হইলেন। অতঃ পরে প্রাণ ও উপস্থানের তপস্যায়
সমুদ্র হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অশ্বের অশ্ব
হইবে, তেবল তাঁহারা পরমলিঙ্গণ পদমল্লযুদ্ধে সাংহার করিতে
পারিবে। অতঃ কলদিগের কাত্যক্লিষ্টে বিদগ্ধিত হইলেন
ও নিরন্তর প্রাণ বর অশ্ব কলি বুদ্ধকাল চিত্তা করতঃ
বিশ্বকর্মা এক সর্গাশ্বদ্বন্দ্বী রমণী নির্মাণ করিতে অবেশন
হিলেন। বিশ্বকর্মা কলতের বাবতীর উত্তম বস্ত্র হইতে তিল
তিল অশ্ব প্রাণ করিয়া এক লোকলগ্নামভূতা লগ্না নির্মাণ
করিলেন। এই কল্প অতঃ তাঁহাও নামকরণ করিলেন
ভিলোক্তমা—

ভিলোক্তমা নামঃ সত্যমসংশয়ঃ কৃত্তিকাঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

ভিলোক্তমা নামঃ সত্যমসংশয়ঃ সত্যমসংশয়ঃ ।

[গায়ত্রী, আদিকাণ্ড, ১৮ অধ্যায়]

অষ্টাশ্বক—প্রজ্ঞাতর গর্ত্তিত বালক, অষ্টাশ্বক
শিতাকে বাতপত্নী হইতে করিলেন, “হে ভাত, আমি সত্য
প্রাণি অষ্টাশ্বক করেন, কিন্তু আপনীর অষ্টাশ্বক সত্যমসংশয় না।
আমি আপনীর প্রদানে এই গর্ত্তিবস্ত্রাষ্ট লাক্ষ্যবন ও সমুদ্র
প্রাণ অষ্টাশ্বক করিয়াছি, আমি প্রাণ করিতেছি, আপনীর

টিক হইতেছে তা'।" মহদি কংকোড শিষ্যগণবধো গঠন
বালক কর্তৃক এইগণ অবমানিত হইয়া বোম্বকের উত্থাপক
পাণ জেদান করিলেন—“তিনি গড়ে থাকিয়া আয়ার জটিল
এইগণ অবমাননাশূচক বাক্য প্রয়োগ করিলে, অতএব তোমার
কলহের অস্ত্রগুণে ওক হইবে।” কংকোড-নন্দন পিতার পাশাধ-
পাবে বক হইয়াই কলগ্রহণ করিলেন; এই নিমিত্ত তিনি
অষ্টবক্র নামে বিখ্যাত হইলেন—

एवम् नृपः सर्वथाऽपि उच्यते, यथायथा सविवाचोऽयम् ।

म त्रैलोक्यं वक्तुं शक्यं न भवति । अत्रिः । वाचि ॥

(गणित, कक्षा १०, अध्याय १)

জন্মকাল—বাথারবংশে অসাধারণ বীজসিদ্ধম্বর
তপোনিবৃত্ত জিহেত্রিহ এক মহাবি গুণগ্রন্থ করেন। সেই
মহাবি নরীহ অত্যন্ত কাক অর্থিং নাকন ছিল এবং তিনি
করীর গুণস্বাধায়া সেই নাকন নরীরকে নীপ (জীর্ণ)
করিয়াছিলেন বলিয়া ঐহার নাম ইহাছিল জন্মকাক।
বাহুরিক ভগবীর নামও জন্মকাক —

ଉତ୍କଳ ବିକାଶ ଯୋଜନା, କାହାଣୀ, ଗପ ।

पठितः काङ्क्ष इष्टासीत् तत् न वेद्यम् ननुः ननुः ॥

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

॥१॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(यथाकामं, अष्टि पत्रं, ६० पद्याम्)

আত্মীক - বহিঃ জগৎকাল দায়িত্ব বাহকির অঙ্গসংগে
 তাঁহার তপিনী ভবৎকালকে এই অতীকারে বিবাহ করেন যে,
 তাঁহার তপিনী কোনও অপ্রিয়চরণ করিলে বহিঃ তাঁহাকে
 শুৎকণ্ঠ্য পণ্ডিত্যগণ করিবেন। একদিন বহিঃ একান্ত স্তম্ভ
 হইয়া পরীক্ষা অগ্রে শিরোনিবেশপূর্বক গাবিত ও মিত্রিত
 হইলেন, ক্রমে সাংকল উপস্থিত হইল; দাপকতা বাহীর
 শুৎকালোচিত সন্ধ্যাবন্দনা বিক্রাসোপের আশঙ্কিত তাঁহাকে
 আশ্রিত করিলেন ও বিনীতভাবে বলিলেন, দুঃখান্তের সময়
 হইয়াছে বলিয়াই তিনি তাঁহার নিভাতক করিয়াছেন। বহিঃ
 তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমার সূচ নিভত আছে
 যে আমি নিভিত থাকিলে দুঃখের ধাক্কাতে অন্তরমন কবিবার
 সাধা নাই; তুমি আমায় অবমাননা করিলে অন্তঃবে আমি
 আর তোমার নিকট অবস্থান করিব না।" দাপকতা মর্ধ্যহত
 হইয়া বাপা/কলসোপে অবেক অতুহা বিনয় করিলেন, কিন্তু

মহর্ষি দ্বকীশ সঙ্গম হইতে ছাড়া হইলেন না। মহর্ষি গমন উদ্ভট হইলেন, তাঁরান পত্নী তাঁহাকে বলিলেন “হে বর্ষজ্ঞ আবার জাতিবর্ষ মাতৃনাগপ্রভ; আপনার ভ্রম্ভন আবার পতে যে পুত্র জন্মিবে, সেও পুত্র হইতে তাঁরাহিণের শাপবিহোজন হইবে; কিন্তু তাহার ত কোনও চিহ্ন দেখিতে পাটতেছি না, অর্থাৎ আবার গতে পুত্র জন্মিবাছে কি না তাহা বৃহতে পাটতেছি না।” তদন্তরে মহর্ষি “অতি” (অর্থাৎ গর্ভে) পুত্র অর্থে) বলিবা, যে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এই নিমিত্ত ঐ পুত্র কামপ্রহণ করিবা আত্মীক নামে বিখ্যাত হইলেন—

କଣ୍ଠୋଦ୍ଧାତୁ, ଖଞ୍ଜା ବସାଏ ମିଶା ବର୍ତ୍ତମାନର ଉନ୍ନତ

॥ अथ शिवस्य स्तुतिः ॥

(ସଂଖ୍ୟା ୧୪, ଆଦିତ୍ୟପୁର, ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର)

চ্যবন—একদিন মহাত্মা কৃষ্ণ প্রার্থনা পথন করিলে
 পূনোবা নামে এক রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হয় ও
 কৃষ্ণগীতী মনোমগ্নিষ্টি মূর্তি দর্শন করতঃ কামাতুর হইয়া
 তাঁহাকে অশ্রবণ করিয়া যাহুযোগে গলাঘন করে। কৃষ্ণগীতী
 গর্ভস্থ বালক রাক্ষসের এই গহিত আচরণে ক্রোধান্বিত হইয়া
 মাতৃগর্ভ হইতে নির্গত (ছাত—চুসাবেত) হন ও রাক্ষসকে
 কণ্ঠভিত করেন। এই ছেড়ে তাঁ বালকের নাম হয় চ্যবন—

ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା

কোথাকারিও কখনো কখনো মোহিত হয় ॥

(महाकांड, अध्याय-७, अंश-३)

ঈশ্বর-রাজ্য কৃতরীণ্যে ভার্গবদিগের বহুমান ছিলেন। তিনি যজ্ঞান্তে প্রকৃত বনযাত্রাবিধায়া ঐশ্বামিগের তৃপ্তিগাণন করিতেন। রাজ্য পোকাভয়ে গ্রাহন করিলে তৎসংশয় নৃপতিগণের কোনও বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ অর্থের আব্রতকতা হয়। ভার্গবদিগের অর্থান্তিশনা জানিয়া নৃপতিগণ ঐশ্বামিগের নিকট উপহিত হইয়া অর্থ প্রার্থনা করেন; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কত্রিয়গণে ঐশ্বামিগের বিস্ত ভূগর্ভে নিধিষ্ট, ও কেব কেহে ব্রাহ্মণসাং করেন। এই অধমের কোনও কত্রিয় বেজাক্রমে ভূমি ধনন করিতে করিতে ভুগণ গৃহে প্রকৃত বিস্ত সেধিত পান। তাহাতে ভার্গবেগ্য জ্যোতিষিষ্ট হইয়া কত্রিয়দিগের ধপেজ অবমাননা করেন। কত্রিয়োগ্য ক্রুদ্ধ হইয়া ভার্গবদিগের পিতৃশ্রম ও তৎপত্নীদিগের পত্নী অর্জকর প্রাণগহোদে

শ্রুত হইলে, চাবন-ভাণ্ডা আস্তরী সমস্ত তাঁহার উৎসেপে এক
পর্ভ দায়ক করেন। ক্রিয়েরা তাহা জালিত পারিয়া ঐ
পর্ভবিন্যাসে দ্রুতসত্তর হইলে পর্ভব বালক ত্রাশ্বণীর উৎসেপ
বিশেষ করতঃ নির্ভত হইয়া স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে ক্রিয়বিশেষ
দৃষ্টান্তি লংঘন করেন। উক্তসেপ বিন্যাস করিয়া বহির্গত
হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ বালকের নাম হইয়াছিল গুণ—

অন্যেব চ বিদ্যাতে রাজ্য লোকেশ্ব সত্তরঃ।

ন উল্ল ঈদ বিদ্যাবিজ্ঞানঃ কিতা সত্তরঃ।

(আচার্য, আদি পর্ব, ১১২ অধ্যায়।)

ঘটোৎকচ—রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভে কৌমার উৎসেপ
মহাবল, পরাক্রান্ত, কেশপুত্র, হস্তার মন্তকের দ্বারা মন্তক-
বিশিষ্ট এক অমায়িক পুত্র জন্মে। ঘট নামের অর্থ করি মন্তক,
ও উৎকচ নামের অর্থ কেশপুত্র। এই জন্ম ঐ পুত্রের নাম
রাখা হইল ঘটোৎকচ—

অসী হারত্যাৎকচ ইতি যাতা তঃ স্রষ্টাত্যতঃ।

অসীং য়ে নামাত ঘটোৎকচ ইতি স হঃ।

(মহাভারত, আদিপর্ব, ১১৬ অধ্যায়।)

পত্নীক্ষিপ—স্বকনুপ পরিকৌপ হইলে অতিমহাবল উৎসেপ
উত্তরার গর্ভে প্রসঙ্গপ্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া জাঠকের নাম
হইয়াছিল পত্নীক্ষিপ—

পত্নীক্ষিপে কুল্য সোভায়াসমীকনঃ।

পত্নীক্ষিপনং য়ে সোভায়াসমীকনঃ কলী ॥

(ঈদ্যাপর্ব, ২ ভূক, ২১ অধ্যায়, ১ ভূক, ১২ অধ্যায়।)

মহাতত্তে—অথবা বাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ উত্তরার গর্ভে
শিশুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিলে
তৎপন্ন শ্রীকৃষ্ণ ঐ অস্ত্রেতে বিদারণ করিয়া অর্ধককে বলা
করিয়াছিলেন, গর্ভে শিশু ঐ তেজুর্দ্ব পুঙ্খককে ধ্বন করিয়া
চিহ্না করিতে লাগিলেন, ইনি কে; কিন্তু তৎপন্ন তৎকণাৎ
অবহিত হইলেন। তৎপ্রসঙ্গ করিয়া ঐ বালক যে মন্তক
মন্তক বেধিতে লাগিলেন, তাঁহাধিপের মধ্যে গর্তাবস্থায় দৃষ্ট
আকারবিশিষ্ট কেহ আছেন কি না, তাহা পত্নীকা করিতে
লাগিলেন, এই জন্ম নাম হইয়াছিল পত্নীক্ষিপ—

ন এষ সৌম্যব্যাঃ পত্নীক্ষিপিতঃ সঃ স্রষ্টঃ।

পত্নীক্ষিপন্যায়ঃ পত্নীক্ষিপঃ সঃ স্রষ্টঃ ॥

(মহাভারত, আদিপর্ব, ১১ অধ্যায়; সৌত্রিকপর্ব, ১০ অধ্যায়।)

কান্দ্রহুজ (কনৌজ)—রাক্ষসী স্থপনাৎ অপর্যায়
প্রচ্যোত গর্ভে জন্মে জন্মে প্রেট একমত কল্পা উপাধন করেন।
একদিন স্থপনাগণ পঞ্চমো ও মাণো অচ্যুত হইয়া উচ্চান-
বৃদ্ধিতে গীত, বাস্ত ও নৃত্য করিতর্জিলেন, এমন সময় সর্গদ্বপ
বাণু তথায় আগমন করিয়া ঐ বালিকাদিগকে তাঁহাৎ ভাষা
হইতে অপ্রসন্ন করেন। কিন্তু কল্পাধন বলেন, “আমরা রাজা
স্থপনাৎের কন্যা; শিশু আমাদিগকে বাহ্যর দ্বারে সম্বরণ
করিলেন, তিনিই আমাদিগের বাবা হইবেন।” এই উত্তরে
বাণু ক্রুদ্ধ হইয়া কল্পাধনের মধ্যে প্রবেশ করেন ও তাঁহাদিগের
কর্ত্তসেপ তর করিয়া তাঁহাদিগকে স্থপ করিয়া দেন। কল্পা-
ধন স্থপন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ দ্বানের নাম হইল
কান্দ্রহুজ বা কান্দ্রহুজ—

(ক)—আচাধ্যক ৩ ভূক: ৩৩ অধ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা ১১।

কান্দ্রহুজিতি ব্যাঃ ৩৩ অধ্যায় ৩২ পৃষ্ঠা ১১।

(খ)—স্থপনাৎ কল্পাধনঃ ১২ কান্দ্রহুজমুৎ পৃষ্ঠা ১১।

(আচার্য, আদিপর্ব, ১১ অধ্যায়।)

হস্তিনাপুর—রাক্ষসী বৃহৎকরে পুত্র হইল। তিনি
যে পুত্র নির্ধাণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাৎ নামাঙ্গায়ে
হস্তিনাপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল—

বৃহৎকরে পুত্রঃস্থপনাৎ কনৌজপুত্রঃ।

(ঈদ্যাপর্ব, ২ ভূক, ২১ অধ্যায়; মহাভারত, আদিপর্ব, ১২ অধ্যায়।)

চম্পাপুত্রী—সৌরভিতের পুত্র হবিত, হবিতের পুত্র
চম্প। চম্পা যে পুত্র নির্ধাণ করেন তাহার নাম চম্পাপুত্রী—
হস্তিতা সৌরভিতঃ পুত্রঃসৌরভিতঃ।

চম্পাপুত্রী হস্তিতাঃ সৌরভিতঃ।

(ঈদ্যাপর্ব, ২ ভূক, ২১ অধ্যায়।)

মিথিলা—ইক্কাহুজের নিমি বজ্র করিবার জন্ম বহুদি
বশিষ্টকে বশিকর্মে বরণ করেন; কিন্তু বশিষ্ট বলেন, “ইহ
আমাকে পূর্বে বরণ করিয়াছেন, অতএব যে পঞ্চম তাঁহার
বজ্র পঞ্চাধা না হয়, সে পঞ্চম প্রত্যেক কর।” নিমি বিবেচনা
করিলেন, ইজ্ঞপন্ন সমাপ্ত না হইতেই যদি আমায় বজ্র হয়,
তাহা হইলে আমার বজ্র করা হইল না। এইরূপ চিন্তা
করিয়া নিমি অস্ত্র বশিকর্মাৎ বজ্র অবস্থ করিলেন। বশিষ্ট
ইজ্ঞপন্ন সমাপ্তান্তর নিমি তখনে প্রত্যাগমন করিয়া শিশুর
অস্ত্রান্বর্তনে সৌম্যবরণ হইয়া তাঁহাকে অস্ত্রাধন প্রদান

মানস (সত্তোষর)—পূর্ণকালে ত্রাণ কৈলাস পৰ্বতে মানস (মনের) সত্তোষরো একটী সত্তোষর নির্মাণ করিয়াছিলেন। মানস-সত্তোষর বসিয়া ঐ সত্তোষরের নাম হইয়াছিল মানস—

কৈলাসপিকরঃ সাত্ত্ব মনো নির্মিতঃ সতঃ ।

ত্রাষণা প্রাপিকাঃ সাত্ত্বঃ তস্মাকুপনামঃ সতঃ ॥

(ভাষ্য, আদিত্য, ২১ অধ্যায়)

সিদ্ধাশ্রম—তপস্বীরা বিষ্ণু বামনরূপে অরতীর্ণ হইয়া স্মরণ তপস্কারণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আশ্রম সিদ্ধাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল—

এব পূর্ণাঙ্গস্যো সাত্ত্ব বামনতঃ সাত্ত্বম্ ।

সিদ্ধান্তব ইতি যাতঃ সিদ্ধাঃ যঃ সাত্ত্বম্ ॥

(ভাষ্য, আদিত্য, ২১ অধ্যায়)

সপ্তকান্তরণ্য—ইক্ষ্বাকুতনয় গুণের গহিত বাবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া শুকচাৰ্য্য তাঁহাকে এই বলিয়া পাণ প্রদান করেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে বস্তু সাম্যভাবলাভের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইবেন ও তাঁহার রাজ্য তস্মীকৃত হইবে। ত্রাষণাপ্রকারে সপ্তাহমধ্যে গুণের বেৎপাত হয় ও তাঁহার রাজ্য তস্মীকৃত হইয়া কালে অথবা পরিণত হয়। এই যেহেতু ঐ স্থানের নাম সপ্তকান্তরণ্য—

সপ্তাহান্তরণ্যং ক্রুদ্ধঃ স গুণি ত্রাষণতঃ ॥

বস্তু বৎস বিমল্যে বিমল্যলসাঃ সাত্ত্বম্ ॥

প্রাপ্তকৃতি কাহুংসঃ সপ্তকান্তরণ্যতঃ ।

তপ্তবিন্দুঃ বিদ্যাঃ যঃ তপ্তবিন্দুঃ সাত্ত্বম্ ॥

(ভাষ্য)

মৈত্রিস্বাশ্রম—রাজা চর্য্য সপ্তাহে বনব্রত করিতে করিতে একদিন গৌরমুখ সুনয় আশ্রমে উপস্থিত হন। গৌরমুখ রাজাকে বলাবোধ্য অর্থার্থী করিয়া তাঁহাকে সাম্যভাবলাভের নিমিত্ত করেন। আশ্রমে অতিবিসং-কারোপযোগী ব্রহ্মাণী বা থাকার মহাবি চিত্তিত হইয়া যান-বোলে তপস্বীরা নাস্ত্যগতকে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তপস্বীরা

মহাবির হইবে লক্ষ্য হইয়া তাঁহাকে “চিত্তসিদ্ধি” বলি প্রদান করিয়া অতীত হইলেন। মণিপ্রভাবে আশ্রমে দাণ্ড্যাদৌ-পরিণত বহু স্ত্রীরা স্বামী ও উত্তম ভোক্তাপ্রদায়ী লক্ষ্যভূত হইল এবং রাজার সম্মুখেই মণি হইতে বসন্তানন্দ প্রাপ্ত হইয়া রাজার সেবা করিতে লাগিলেন। রাজা সুনয় আশ্রম-লক্ষ্যে পরম আপ্যায়িত হইয়া, সে স্ত্রীরা আশ্রমে বাসন করিলেন এবং প্রভাতে মহাবিক প্রদান করিয়া আশ্রম হইতে বিদায় হইল; কি উপায়ে ঐ মণি লক্ষ্যভূত করিতে পারেন তাহা চিন্তা করিতে করিতে নিত পৈতৃকমতো প্রভাববর্তন করিলেন এবং ঐ মণি আনন্দন করিবার নিমিত্ত এক মন্ত্রকে প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী মহাবির নিকট যাহার লক্ষ্য মণি প্রার্থনা করায়, তিনি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। চর্য্যের তাহাকে ক্রুদ্ধ হইয়া, বলপূর্বক ঐ মণি আনন্দন করিবার নিমিত্ত, এক সেনাপতিক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলপূর্বক মণি গ্রহণ করিতে উত্তর হইলে মণি হইতে অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্রাদি পত্রাশ্রম পৈতৃক নির্মিত হইয়া সেনাপতিক নিহত করিল। তখন চর্য্যের বহু সৈন্যপরিণত হইয়া আশ্রম আক্রমণ করিলেন। উত্তর পৈতৃক তুলস সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, মহাবি চিত্তিত হইয়া তপস্বীরা চর্য্যকে মরণ করিতে লাগিলেন। তপস্বীরা অতিষ্ঠ হইয়া স্বতীয় চক্রবর্তী নিমেষমধ্যে চর্য্যের সৈন্যসিগকে তদ্ব্যস্ত করিলেন ও দৌরভুতকে বলিলেন, নিমেষমধ্যে সতুলস সন্তোষিত নিহত হইয়াছে বলিয়া এই অসংখ্য নাম নৈমিষারণ্য হইবে—

তেন চর্য্য তং সৈন্যবাহকঃ সৌর্য্যঃ সাত্ত্বম্ ॥

নিমেষান্তঃসাত্ত্বম্ সাত্ত্বম্ ॥

একঃ সাত্ত্বম্ সাত্ত্বম্ সাত্ত্বম্ ॥

সাত্ত্বম্ সাত্ত্বম্ সাত্ত্বম্ ॥

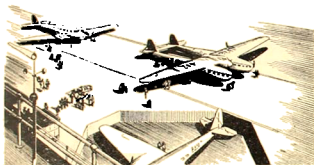
সাত্ত্বম্ সাত্ত্বম্ সাত্ত্বম্ ॥

সাত্ত্বম্ সাত্ত্বম্ সাত্ত্বম্ ॥

(বাস্তবস্থান, ১০-১১ অধ্যায়)

এখানে আর হইতে পারে যে, ডিয়েল ইঞ্জিন এখন সর্বব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থান আরও এতদিন ধন নাই কেন? ডিয়েল ইঞ্জিনের সূতন্য কারণে তাহার কোন অংশই বদলাইয়া যায় না।

ডিয়েলের সূতন্য মোটরটি এই :- সিলিন্ডার (cylinder) চিত্রক পিস্টন (piston) ইত্যাদি সিলিন্ডারের ঘর্ষিত বায়ুদ্বারা সঞ্চিত হয়। তাহার দ্বারা চিত্রের চাপ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। (প্রতি বর্গ ইঞ্চি ৫০০—১০০০ পাউন্ড; সাধারণ বায়ুদের চাপ আর ১০ পাউন্ড মাত্র)। চাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিলিন্ডারের ঘর্ষিত বায়ুদের উত্তাপ আর ১০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পাল্লি ইষ্টে। তখন সিলিন্ডারের মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু বিদ্যুৎ কঠিনে পরাৎপরা হইয়া যায়। তখন সিলিন্ডার বায়ুসমূহকে বহুদূর উৎখতি হয় এবং তাহার দ্বারা পিস্টনটি চলে।



সঞ্চিত বিদ্যুৎ-বীজী। তাৎক্ষণিক দৃশ্য :- প্রতিবারে পরিষ্কৃত সূতন্য বিদ্যুৎ দেখা যায় ইচ্ছা।

পেট্রোল-ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে যে চাপ পড়ে হয়, ডিয়েল ইঞ্জিনের মধ্যে অনেকটা বড়তর অর্ধেক চাপ পড়ে হয়, সুতরাং ডিয়েল-ইঞ্জিনের সিলিন্ডার বড়তর বহুদূর বদলাইয়া যায়। এবং এই অংশের দ্বারা (horse power) পেট্রোল-ইঞ্জিনের বিদ্যুৎ সঞ্চিত পেট্রোল-ইঞ্জিনের দ্বারা অনেক কম হইয়া। ডিয়েলের অংশের দ্বারা বহু অংশের অংশের এবং বিদ্যুৎসমূহ, ডিয়েলের অংশের দ্বারা বহু বিদ্যুৎসমূহ ডিয়েল-ইঞ্জিনের দ্বারা হয়। হইবার অংশের দ্বারা বহু হইতে পারে। অংশের দ্বারা অংশের দ্বারা হইতে পারে না, এবং অংশের দ্বারা (বঙ্গ-এক বর্ষ ১৯০৬ খ্রিঃ) ও সূতন্য অংশের দ্বারা হইতে পারে।

ডিয়েল ইঞ্জিনের অংশের একটি অংশই এই যে, পেট্রোল-ইঞ্জিন অংশের ডিয়েল ইঞ্জিনের দ্বারা (start) করা অংশের দ্বারা হয়।

বর্তমান ডিয়েল-ইঞ্জিনের পূর্ণবায়ু বিদ্যুৎ ১০০০ ট্রাইবের অংশের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের দ্বারা হইতে পারে। ইচ্ছা হইলে একটি বিদ্যুৎ বহু বিদ্যুৎ পর কাঁচি দ্বারা হয় এবং সূতন্য অংশের দ্বারা হয়। এই অংশের দ্বারা হইতে পারে।

১৯০৬ খ্রিঃ চইল কলম্ব ডিয়েল (Dr. Rudolf Diesel) নামক জার্মান জার্মান জার্মান ইঞ্জিন নির্মাণ ও অংশের দ্বারা হয়।

এই ইঞ্জিনটিও জার্মান দ্বারা, বিদ্যুৎ ডিয়েল অংশের দ্বারা হয়। এই ইঞ্জিনটিও জার্মান দ্বারা হইতে পারে।

এই ডিয়েলের নামের দ্বারা ডিয়েল-ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হয়। ডিয়েল ইঞ্জিনের অংশের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের অংশের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের অংশের দ্বারা হইতে পারে।

ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে।

ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে।

ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে।

ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে।

ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে।

ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে।

সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ-বীজী পরিষ্কৃত

ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে। ডিয়েল ইঞ্জিনের নামের দ্বারা হইতে পারে।

লেগল্যান্ডের আদর্শন হইয়াছে। সাধারণ লেগল্যান্ডের দৈর্ঘ্য এই পাড়ীতলি মাথামোড়া দ্বারা নির্ধারিত। পাড়ীর সমগ্র ভাগটি মাটির সমতল কিছু নীচে—কতক ইঞ্চি শিঁড়ি দিয়া সজিতে হয়; উপরে উঁচুবার মত আর একটি শিঁড়ি আছে। সাধারণ লেগল্যান্ড লোক মনসায়ে হাঁটের পায়ে, অত্যন্ত ভালার উচ্চতা একমু কড়া হইয়াছে। এই পাড়ীর আদর্শন হওয়ারত একই পাড়ীর পুরো ছবি তুলি যাকি যখন করা সম্ভব হইয়াছে।

চালকহীন এএরোপ্লেন

“কুইন বি” (Queen Bee) নামক দুইজন এএরোপ্লেনের চালকহীন পরীক্ষার সময়ের চিত্রণ ও যন্ত্রের বিবরণ দেখিয়া পড়িয়া নিয়াছে।



এই চালকহীন এএরোপ্লেন “কুইন বি” লেখিত সাধারণ এএরোপ্লেনের মত।

এএরোপ্লেনের কোর ভাগের অংশের বাইরে, বড়ো পাইকার সমগ্র ইয়াতে একজন চালক ছিল, কোন বায়বীয় বিপদ হইতে রক্ষা উদ্ধার করিবার ক্ষমতা। নতুন ইয়াতে প্রেরিত বোতামের দ্বারা ইয়াৎ লম্বা হাজার দুই তপরে উঠতে পারে। ইয়াতে ২০ মাইল ঘালের মধ্যে ইয়াভার যে কোন দিকে ঘুরান কিয়ান হইতে পারে।

এএরোপ্লেনটি প্রস্তুত সাধারণ এএরোপ্লেন হইতে কোন মানেই ভিন্ন নহে। চলিতে যুদ্ধভাবে এইজন বিমান যখন পরিচালনা যাক্ত হইবে অসম্ভব মনসা হয়।

শব্দ ও দ্রুত পরিচালনা করিবার ক্ষমতা

যখন পড়িত দ্রুত পরিচালনা করিয়া কোন লক্ষ্য বস্তুতে পড়ে, আশ্চর্য্যের ইয়া অবিচার অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু সাংখ্যিক ভৌতিক বস্তুনিষ্ঠ নীতিমূলক পদ্ধতিসমূহ সাধারণত দ্রুত অসম্ভবতর সম্ভাবনা করিবার এক পদ্ধতি পরিচালনা করিয়াছেন।

পরিচালনা যন্ত্রের বাইরে দ্রুত হাবান ভাগাভাগি হয়; এই হাবান পদাঙ্গুলি কঠিন হইলে পরিচালনা করিতে অসম্ভব নবর লাগে, কিন্তু হাবান পদাঙ্গুলি নরম হইলে সমস্যাই হেব করা যায়। পার্যটিক অবস্থার কোনও পদ্ধতি হয় হইতে যায় এবং কোনও পদ্ধতি হয় হইতে কঠিন হাবান পাওয়া যায়, বহুলাঃ বাধ্যতায় বিভিন্ন দ্রুত পরিচালনা করা শিখিতে ও লক্ষ্য লোকের পক্ষ আনন্দ সমর কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

ইয়াতক অক্ষরে একটি ইয়াভার পাঠ দ্রুত লেখতে ৩০০ ইয়াতে ৩০০০ মাইল মাথামোড়া করিয়া তাহার উপর বিলাতের দ্বারা বিশেষ করিয়া লেখা বিবরণ, ইয়াতে দ্রুতের প্রকৃতি কিছু পরিচালিত হয় এবং ইয়া হইতে জাত হাবান নবর হয়; কতকই ইয়া পরিচালনা করা মাথামোড়া সম্ভবসাধ্য।

শব্দনির্ণয়ে নৃতন অস্ত্রপ্রয়োগ

বিপদ কাহ্নের প্রতিক্রিয়া ও অবস্থান নিরূপণ করিবার মত মাথামোড়া এক একরকম অস্ত্র প্রয়োগ হইয়াছে এবং যোগ্যতা বহু পাইয়া। ইয়াৎ বিবরণে ২০ মাইল দূর হইতে অস্ত্রের দ্বারা কাহ্নেরা নিরূপণ অবস্থান নিরূপণ করিতে ২০ মাইল দূর ২০ মাইল ইয়াৎ কৃতকভাবে হইয়াছে। পাইকার সমগ্র বস্তু কাহ্নের উপর মাথামোড়া ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু কৃতকভাবে লক্ষ্যে অস্ত্রের অবস্থানকে কাহ্নের উপর এইজন যোগ্যতা করা সম্ভব হইছে। ইয়াৎ নিরূপণের মত যোগ্যতা কাহ্ন হইয়াছে, কিন্তু যোগ্যতার প্রকৃতিতে ইয়াৎ এএরোপ্লেনের অবস্থান নিরূপণ করিবার দ্বারা পড়িত ইয়াৎ লাভ্যতা যায়।

কাহ্নের দ্বারা পড়িত দ্রুত বোতামের দ্বারা অস্ত্রের করা হয়। এএরোপ্লেনের দ্রুতের এক ভাগে মাথামোড়া অস্ত্রের দ্বারা কাহ্নের এএরোপ্লেন প্রেরিত হইয়া পড়িত মাথামোড়া কাহ্ন প্রেরিত হয়। প্রতিক্রিয়া অস্ত্র কোন্ দূরানে পড়িতেছে, তাহার ইয়াৎ এএরোপ্লেনের অবস্থান দ্রুত ভাবে জানা যায়।

বাতাস-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র

সাংখ্যিক হাবান প্রক্রিয়া অস্ত্রের বাতাসের দ্বারা বিদ্যুৎ-উৎপাদনের প্রক্রিয়া সম্ভব হইয়াছে। ১০ ফুট উঁচু একটি ইয়াভার প্রকার (lower) উপর একটি দুই-“টাইওমিল” (windmill) স্থাপন করা হইয়াছে। টাইওমিলের পাখগুলির অর্ধেকটি ১০০ ফুট করিয়া দীর্ঘ।

পাতের উপর একটি পুং নির্ধারিত হইয়াছে এবং সেখানে ১০০ “কিলোওয়াট” (kilowatt) পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারে একমু একটা অস্ত্রের হইয়াছে। টাইওমিলের পাখগুলি বিভিন্ন দিকে ঘুরিতে লাগত করিলে দ্রুত আশ্চর্য্যের দ্রুত এবং অস্ত্রের দ্বারা বস্তু হইতে হইতে টাইওমিলের দ্বারা কতিপা দ্রুত আশ্চর্য্যের দ্রুত হইয়া যায়। হাবান দ্বারা লেখা ভবিষ্যৎকে যে, ইয়াৎ বস্তু অসম্ভব বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারে একমু অস্ত্র নির্ধারিত হইয়াছে। ইয়াৎ লক্ষ্য প্রক্রিয়া অস্ত্রের একমু অস্ত্রের অস্ত্রের দ্বারা ইয়াৎ একমু অস্ত্রের দ্বারা ২,০০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ বাতাস হইতে উৎপাদন করা হইবে।

একচাক্ষুস্ত্র মোটর সাইকেল

ক্যালিফোর্নিয়া (California) প্রদেশে এক একরকম একচাক্ষুস্ত্র মোটর সাইকেল নির্ধারিত হইয়াছে। মোটর সাইকেলের ইয়াৎ দ্বারা এক সিলিন্ডার (cylinder) দ্রুত। ইয়াতে একটি লক্ষ্যের দ্বারা আর একটি লক্ষ্যের দ্বারা এবং ইয়াৎ দ্বারা আর একটি দ্রুত। ইয়াৎ

যে ডিজেলের কোল যোগে চালান হয় তাহা, কিং পাট্রিট মোটরবিদ্যায়
সবর আয়োজ্য একমিকে কাত, ইহা না বিদ্যা সোয়া বদিল থাকিতে পারে ।

এইরূপ পেট্রল ও ডিজেলের মোটরগাড়িতে ব্যত অনেক বস পড়ে
কাং পেট্রল অপেক্ষা আগুনী তৈল অনেক দূর ।

ডেইলসাহায্যে মোটরগাড়ী চালানোর নতুন ব্যবস্থা

মোটরগাড়িতে সাধারণতঃ পেট্রল আগুন ইয়া থাকে, কিন্তু মোটর-
গাড়িতে ডিজেল-ইঞ্জিন (Diesel engine) ব্যবহৃত আগুনী তৈল
ব্যবহার করিতে পারিলে মোটরগাড়ী চালান'র ব্যয় অনেক সংকোচ করা
হইতে পারে । সাধারণ মোটরগাড়ীর ইঞ্জিন তৈল আগুনীবার চলাকালে
সব—ডিজেল-ইঞ্জিন ও মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের নির্মাণ-কৌশল বিভিন্ন ।

মোটরগাড়ীর ইঞ্জিন না আগুনীবার ব্যবহৃত ডিজেল তৈল ব্যবহার করা
হলে, তাহার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাতে টেইলের একটী খসড়া
আগুন স্থাপন করা হইয়াছে, তথা ইহাতে 'কার্বুরেটর' (carburetor)
বাইবার পথে তৈলময়ী নলটি নির্গম-নল (exhaust pipe) উপর
জড়িয়া যেতলা হইয়াছে । ইহার ফলে কার্বুরেটরে বাইবার সমস্ত তৈল
উত্তপ্ত হইয়া যায় এবং কার্বুরেটরের মধ্যে 'র্যাডিয়েটর' (radiator) ইহাতে
নির্ভিত জ্বলিত থাকে। পর্বেত বিলিত হইয়া যায় ।

অতঃপর চালানোর সময় পেট্রল-ইঞ্জিনই চালান হয়, তাহার পর ইঞ্জিন
প্রথম হইলে পেট্রল স্তব্ধ করিয়া তৈল ব্যবহার করা হয় । পাট্রিট বাসাইবার
পূর্বে তৈল স্তব্ধ করিয়া পুনরায় পেট্রল ব্যবহার করা হয়, কারণ তাহাতে
কার্বুরেটর পরিষ্কার থাকে ।



এক চাকার মোটর সাইকেল ।

প্রেমের জয়

— শ্রীঅক্ষরচন্দ্র ধর

মূলকলি দিয়া সংসে মলিয়া চলিয়া গিয়াছে গুরুবন্দিত,
বাহু বলবান ; মিছে অভিমান মিছে বল তার মিছে বীরত্ব !

মূলমধু আর গৌরবে তার
কই, কিছুই তো নাহি অধিকার

তালনাগা দিয়া দ্বন্দ্ব কিনিয়া অলি সুখিয়াছে সুলেহ তব ।

মানব-শোণিতে রাঙায়ে ধরনী অলি দিয়ে বাসা জিনিল স্বাক্ষর
তার। কেহ নয় স্বাক্ষরের প্রান্ত তাহাঘেরে কেহ করে না প্রাঙ্ক ।

জগিয়া সীতার যিপেছে দুলাব,
সেকেন্দরের তক্তা ভোগার ?

অন্ত জবর ভরিয়া বিগড়ে বৃদ্ধ-সোনার প্রেম-রাজত্ব ।

[১২]

শ্রীচন্দ্রের খেলের তাগ কমিয়া আকাশে পূজাঘরের
মাকার হইয়াছে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে আধাডের দিনগুলি
নানাচক্রে কাটিয়া চলিয়াছে, দিন রাত কেবল দিন রিখ রিখ
হইল।

পান্থর গুহে তাগের স্তূপ লম্বাডিতে এলোনেলো অলংকা
বহির দাতদানে কোন মতে একটুখানি স্থান করিয়া, লক্ষ্যের
পাশে পান্থ আসিয়া শুইয়া পড়িল ; কিছুকাল পরে নিত্যসুত
অবশ্যের লক্ষিত গুহে একদানা বহির পাশে ঘুমিয়া দেহিয়া,
একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে বহিচলি দু'ডিয়া দেহিয়া
দুহিত নৈতে চুল কথিয়া পান্থ শুইয়া বহিল এবং বাহিরের ঐ
রিখ রিখ তালের জ্বনি তনিতে তনিতে কখন এক সময়
দুহিয়া পড়িল।

টেকিলটি হার খালি করিয়া কখন কখন যে বহিচলি
সব লম্বা উপর গিয়া উঠিতেছে, সে দিকে পান্থর দেখালই
নাই, এই স্তূপীকৃত বহির ভিতর হইতে, প্রাণেকমীর থানা
লক্ষ লম্বের আর গুঁড়িয়া পাওয়া যায় না, বিস্তৃত চিত্তে পান্থ
সেই বেলাটা পড়া বন্ধ করিয়া শুইয়াই কাটিয়া দেহ, আর
তাহার পর একটির বদলে আর একটি আসিয়া, পাটের ভজাল
না কমিয়া কেবল বাড়িতেই থাকে।

কল্লের ক্রালের পড়া অনেক অগ্রগত হইয়া গিয়াছে, নানা
ফটিতে পান্থর কেবলই বিলম্ব হইয়া যায় এবং পরে সেই
পুণ্যনো পাশাগুলি খুঁজিয়া দেখিতে পান্থর আর ইচ্ছা হয়
না, ক্রালে আসিয়া বসে, ও কখন একটি অল্পত গুঁড়িতে
প্রোকেশারের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে,—এই ছেলটি
যে কিছুই বুঝিতেছে না বা যা কিছু পড়া হইতেছে, ইহার
কানে সে সব কিছুই ঢুকিতেছে না, প্রোকেশার তাহা বুঝিতে
পারেন। এই আপনতোলা অতি লুপ্ত ছেলটিকে অনেক
প্রোকেশারই সন্মত গুঁড়িতে তাকাইয়া দেখেন এবং কেন যে
সে বুঝিতেছে না, অথ কোন প্রকারে তাহার পড়ার সাহায্য
করা সম্ভব কি না, সে সম্বন্ধে মনে মনে ভাবিয়াও থাকেন, কিন্তু

পান্থর মিক হইতে কোন আগ্রহই প্রকাশ পায় না। পান্থ
বলেছে যাহ, বাড়ী কিরে এবং বৃদ্ধাকার বহি খিঁচিয়া চুল
করিয়া বসিয়া থাকে, নূতন গৃহে পান্থর জীবন এই ভাবেই
কাটিতে লাগিল।

মাকরাহিতে পান্থর ঘুম ভাঙিয়া গেল, বাহিরের ঐ রিখ
কিন তান তখনও চলিতেছে, লম্বার শুইয়া শুইয়াই পান্থর মনে
পড়িল, রাজিতে ৩ খাওয়া হয় নাই তাহার, ঐ ত ছোট
টেকিলটের উপর পান্থর ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তা
পান্থর, এত রাজিতে কে আর এখন ঐগুলি চিবাইতে
বসিবে! লগন লগন বত রাজিই হইল, অধরবাহু হইতে
ঠাঙ্গন চাকর সকলেই তাহার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত।
বিবস্ত্রিত স্নেহ লম্বা লম্বাও বোধ করিয়া করিয়া এখন এ
বিষয়ে পান্থর কড়া নিবেদন ছিল,—অবশ্য তখন বাচ্চুল
কোনল আগ্রহ কাহারই বা আর আছে, তখন বারই বা আর
কাহার!

লম্বা তাগ করিয়া পান্থ কানালার পাশে আসিয়া বসিল,
কত কত বৃষ্টির খায়া অবিব্রাত ভাবে কেবলই করিতেছে!—
বাগানের গাছগুলি, গাছের ফুলগুলি, লতাপাতা ও নূতন
ছোট ছোট চম্পাপাছগুলি বৃষ্টির ভীত আঘাতে হুইয়া
পড়িয়াছে, লম্বা ঘুমভাঙা পান্থ তাহার শব্দ শুটি মেলিয়া
বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল—এমন কত রাজিতেই পান্থর
ঘুম ভাঙিয়া যায়, কানালার আসিয়া বসিয়া বাহিরের পানে
তাকাইয়া দেখে, অন্ধকার আকাশে প্রলয়ের জ্বনি বাড়িয়া
উঠিয়াছে, বাড়ীর কাশাইয়া গাছপালা ভাঙিয়া-চুইয়া যা
হইবে একটা কড়া-হাওয়া পুনিবীর উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে,
পান্থ ধীরে ধীরে টেকিলের উপর হইতে তাহার বাসিটি খুঁজিয়া
লয় এবং বাহিরের ঐ কড়া-হওয়ার ভিতর দিয়া একটি
কোনল স্তূপ কত ঘুর ঘুর করে ঐপিতে ঐপিতে চলিয়া যায়।
মানে মানে কড় কখনও ঘামিয়া গেলে পূর্ব-আকাশের শুক-
ভায়াটি অত্যন্ত মলিন নিম্নত জোড়িতে পান্থর চোখের স্পৃশ্বে

হুটগা উঠে, ক্রান্ত পাহাড় বসিষ্ট তখন নানাইয়া বাণিজ্য টোপনের উপরেই মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

অসিঃ অসহযোগের যুগ,—পুষ্কর ত বনের বনা, পথে পথে সুখ্যা মেয়েরা পঞ্চাঙ্গ লেহিন বে কাণ করিলেন, তাহাতে কলঙ্কের কোন ছায়াই মাথা সহজে ঝিক পাকিত না। কিন্তু এমন অবস্থারও পিতামাতার ভয়ে যে সব ছেলেরা সহজে কলঙ্ক ছাড়িয়া অসহযোগের গলে ভরিত হইতে পারিল না, তাহারাও বশবৎ হইয়া প্রত্যেক মহলে, নিজে নিজে পাড়াই এবং সহর হইতে যুর নিজেদের গমীসাম-গুলিতে নানা বসন সংশ্লিষ্ট। নিত্য করিবার পণ গ্রহণ করিল; পাহাড় ও টায়েবই বলে যোগদান করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজের ঘনীভূত লভ্যতন করিয়া তুলিল এবং ক্রমে ক্রমে বাণিজ্যের ওয়াড়, বিহীনাব দাবনট হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠাণ্যসেব পরে খুঁচ-পাকারী পঞ্চাঙ্গ সমস্তই বহুরের যেটা আকার ধারণ করিল।

ছেলেবেলা হইতেই পাঠাণ্যসেব ঝিক কর্তব্যকর্মটিতে বিবেক কিছু আগ্রহ দেখা না গেলেও অ-কর্তব্যটিতে নির্ভা ছিল অতি প্রগড়, ইহার নলে ক্রমে ক্রমে তাহার বহির লক্ষ সন্দর্ভ একেবারে ঘুঁচিয়া গেল। বাড়ী হইতে বখানিঘমে টাকাকড়ি আনিতে এবং কলঙ্কে বাহিনা দিতেও তাহার হুটি ছিল না, কিন্তু ঐ টুকুই শুধু তাহার অশ্রুতের মধ্যে সন্দর্ভ রহিল এবং এমনি করিয়া, যেখানে পাহাড় মাত্র ক্ষুদ্র একটী সভ্য হইয়া চুকিয়াছিল, বহুবলানেকের মধ্যেই সে তাহারই মর্মেদর্শী হইয়া উঠিল।

যেহে থাকিয়া পিতা এ সকলের কিছুই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু বিনয়বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী লক্ষ কিছুই ভাবিতে পাইলেন এবং একদিন তাহাকে বাড়ীতে ডাকাইয়া একটী বুকাইবার প্রমাণও পাইলেন। পাহাড় নত মস্তকে তাহা ভুলিল মাত্র। কিন্তু তাহাতে তাহার ঐ নতুন বজাবে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটিল না।

সম্প্রতি বড় রকমের একটী যেতাব পাঠিয়া বিনয়বাবু উভার উক্ত নোমায় উঠিয়াছিলেন, নিজেব জীন্মটাকে কোন লক্ষ্যে গ্রহণ-বাঞ্ছনো এবং সর্গদাখারের সম্মানপাড়ে কাটাওয়া গাওয়াটাই তিনি প্রেমাঃ বলিয়া মনে করিতেন,—

বে ছুঁবো, গ্রুপ তাহার প্রাণা বলিয়াই বে সে ছুঁবো, হাফ বে কেন এই লাবাধন কথাটি বুঝিতে পারে না, তাহা তিনি বিস্মিত হইতেন। অন্যথ কালাল আতুর বাহারা, ভগবানের শান্তি তাহারা বহন করিতেছে, তাহাদের অর্ধবি' বুঝ করিতে পারে, হাফের এমন কি কমতা আছে। তবু কেন এই অসহযোগের কোলাহল—ভাবিয়া তাহার বিস্ময় উৎপাদন হইত। পাহাড় ছেলেরা এই বহলে এই সব মাঝে মাঝে বোম্ব দিগাই যে নষ্ট হইয়া যাইলে, ইচ্ছাতে তাহার লক্ষ্যে মাত্র ছিল না। তাহার এই বিস্ময় পাহাড় অজানা ছিল না, তাই মীয়ার না নিতান্তই জোব করিয়া বলিয়া না পাঠাইলে, এ বাড়ীতে সে আর আসিতই না।

মাঝে মাঝে মীয়ার মা যুগ অহুগোণ করিয়া করিতেন, পাহাড়, কি 'কবে' এমন পর হণে গেলি, আনি ত তাবতেই পারি না।

পাহাড় হাসিয়া কহিত, মা ভোমায় বাগানে একটা আখাড়া সৃষ্টি হুগেছিল, সেটাকে উৎকৃষ্ট ভুগে মিগে গেছে, খেন কেনন হুকার সব পনিষ্কার কব্বাক বেখতে, এবং আবার তাববার কি আছে মা?

মাও যুগে আঘাত লাগিত, পাবাণেব এটী নিম্ন বাক্যের উত্তর আশ কিছু মনে আসিত না।

মা মাঝে মাঝে করিতেন, পাহাড়, কত সময় যে তিনি ভোর কথা, লোকের কাছেও কত কথাই তিনি, কি কাজ ভোর ঐ মেঘ-লগ্নী, বুটী-লগ্নী যুগে যুগে মাইট-লগ্ন বহবার? বেগে এত শিক্ত লোক রয়েছে, কোন্ হুগটা তাহের ঘুগ হুগেছে তিনি, এসেব গেশপড়া শিখিঃই বা কোন্ হুগটা তোরা ঘুগ করতে পারনি? একখানা বই পড়তে শিখলেই কি এখা জানী হয়ে উঠবে? এবং সেবে বেশী করবার ক্ষমতাই বা কোণার ভোবের? ভোবেরই বা কতটা জান রয়েছে বল ত আমায়? মাঝে খেকে নিঃশেষের সময় নষ্ট, আশ দেবেও সর্জনশ।

বিস্মিত পাহাড় কহিত, সর্জনশ!

—সর্জনশ নহত কি? একখানা চণালা বই পড়ে এসেব তখন বিধান বলে অহুগার হয়ে পড়ে, সেই অহুগাবে বাপ-ঠাকুদাকে কবে বেমা, নিজেব বাপদায় উপব মাগে বেমা, এ আশি কত মেঘছি, তুই আমায় কি বুঝি পাহাড় তোরা

হেঁদে বক্সীকে আমি বড়, অনেক বেগেছি চাংখানের সব, সেটা ত অতীকার করতে পারবি না ?

পাহ্ উত্তর দিত না, চুপ করিয়া থাকিতে থাকিত—

হা কহিতেন, তাৎপর্য শুনাগম লেখিনু কান কাছে, কোণার কোন্ অমাপ্রম হইবে না কি হবে, তাই বড় হোয়ে কুটীতে গুহে গুহে তুই চান তুলে দেখাচ্ছিস। কি কাজ তোরা এ সব পাহ্, খানের যেমন কল্মস তেমন ভানেই তোদের মৌন থাকে, মাঝে থেকে পরিশ্রম করে ফুর মরাই তোদের কেবল সাং, উৎসাহে বিধান কি মাপ্রমে উল্টিয়ে দিতে পারে ? এ সব কথটা কেন কুটীতে না বাগা ?

পাহ্ হাসিয়া কহিত, কি করে বুঝব মা, ছেলেবেলা থেকে তুমিই ত নিবিয়েছিলে গরীম-গরীম উপকার করতে হা, কত কিছুকত ডেকে কতদিন তুমি হাত দিয়েছ, গরলা দিয়েছ, বাস কাপড় নেই, নীচে কই পাঃ, তাকে কাপড় দিয়েছ, এমননি তুমি যাকে কাপড় দিয়েছ, আজ বড় হয়ে তার ভেত্রে আমি বসি গরম লঙ্কান করতে বেতক, তা হলে উৎসাহে বিধান তখনও যদি উল্টিয়ে বাগ নি, এখনই বা বাগে কেন ?

অপ্রস্তুত হইয়া না চুপ করিয়া থাকিতেন, এবাং মূণ কুটীয়া বসিতে থাকিতেন না, পনের গুণে গুণ হোক এ কাননা তাৎপর্য আছে, কিছু সে বড় যদি নিবেশ ছেলেটিকে গুণে বোণা কহিতে হা, তবে আস তিনি তাগা চাংখেন না।

বিশব বাসু গুণে না থাকিলে পাতক এট ভাবে মাংঘের সাং কপোপকরণ আরও খানিকখন চলিত। এটা সেটা বসিয়া মা আবার পূর্ণ কপার গুণে খরিয়া কহিতেন, পাহ্, হুং হুং দেখিল বলেই কি আর আমার কথা শুনে নেই ? একটু লেখাপড়া কর বাবা, মাপ্রমে মত মাপ্রমে হা, আমতা মরাই ত তাই চাই। আর যদি তোরা মী থাকতেন, এমননি করে ভাবনাটকে নই করে সেলতে কি আর থিতেন তিনি ?

পাহ্ হুং হুই ইচ্ছা করিয়া বহিত, আমার না যদি আজ থাকতেন বা, তা হলে কোর করে তাকে আমার মতেই আমি টেনে আনতুম, আমার মা যদি সত্যিই থাকতেন, সাদারে আমার আরও কই কাজ হত না,—

দিগ্ধ পাশব অকৃতজ্ঞের কথা শুনিয়া আর বাসিত মাড়নেহে গরীম আখাত শাসিত, নীরবে তিনি বাগায়ে

চলিয়া যাইতেন। পাহ্ উঠিয়া মৌরার লঙ্কনে বহিত, মৌরা লঙ্কনাই কয়েক বাস, কখনও ছোকরা চাকরটাকে লইয়া পিতার বাহির হইতে কিরিয়া পরিবার কাপড়-চোপড়-গুলি গুছাইয়া রাখিতেছে, কখন কাড়ন হাতে টেবিল চোরাগুলি বাড়িয়া দৃষ্টিয়া চক্কে কহিতেছে, কখনও বা নীচে ঠাকুরকে কোন একটু তবকারী সাদা দেখাইয়া উপরে উঠিতেছে, হেমনই চকল পরিচালনমুখরা হাসিমুখী ভাব।

পড়িবার অংক মৌরা তাহার ডুগাধ গুলিয়া গুছাইতে বসিয়াছিল, মূণ না তুলিয়াই কহিল—এস পাহ্ মা।

একটু চোখ টানিয়া বসিয়া পাহ্ কহিল, খুং বাস দেখছি যে!

হা, নিবেশ কাকেই বাস আছে, তোমার মত লঙ্কনে উপকার করতে এখনো নিশিনি।

পাহ্ হাসিল, মৌরা কহিল, শুনিছ খুং মেঘের উপকার করে বেড়াচ্ছ, নিবেশ উপকারও যদি কিছু কিছু করতে, তাহলে খুদী হইতাম পাহ্ মা।

মৌরার কাছে আসিলে পাতক বক্সী করিবার প্রবৃত্তি করিয়া আসে, স্তম্ভং চুপ করিয়াই থাকে। সমস্ত দায়—হুই ভনেই চুপ করিয়া থাকে, একজন ডুগাধ বাড়িয়া বাড়িয়া লঙ্কনার কহিতে থাকে, আর একজন চুপ করিয়া তাহাই দেখিতে থাকে। ডুগাধ মোহা শেষ করিয়া মৌরা টেবিল সাভাইতে আরম্ভ করিল, পাহ্ আসও পানিকলপ তাকাইয়া থাকিয়া, চট্টাং ঠাড়াইয়া উঠিয়া কহিল, চন্দলাং।

—বল, বল, এত তাড়া কিসেব, মেঘের উপকার করবার লঙ্ক তোমার নিচ্চই নই হয়ে থাকে না, লেখাপড়া নেই, বলবার কেউ নেই, আজকাল ত অগাধ অসুস্থ অটো সমস্ত তেমনার।

—কে বললে নই হয়ে থাকে না, সে লঙ্কটী বাগ সে আর কিংরে আসেনা, তা জান ?

—তা জানি, আর জানি খুদেই একটা কথা বলবার ইচ্ছে হচ্ছে, রাখবে কথাটি হাং করে ?

—বল শুনি, তাৎপর্য বোঝা গবে।

একটু আহত হইয়া মৌরা কহিল, পাহ্ মা, ছেড়ে যাও এ সব, আমার গুড়া আখাত বয়ে গাও, পতীকা গাও, পান কর।

—সে খাতির আছে নেই।

—কে বললে নেই? সব রকম গোপন্য ছেড়ে নিজে আবার এ বাড়ীতে এসে, আবার তোমার লগ হবে।

পানিকরণ অভিজ্ঞতের মত তাকাটোয়া খাতিরা পাশ্রু করিল, সে আর হর না মীরা।

—হবে, পাশ্রু না এসে,—

—না, না, অসম্ভব; আর তা হবে না।

নির্ভীক গিয়া ক্রান্ত নামিতে নামিতে পাশ্রু নীচে একবারে ঘাবের লক্ষ্যে আদিয়া পড়িল, যা কহিলেন, হাস নি পাশ্রু, শেষে যা।

—না, না, ঠান্ডা-চাকররা বলে থাকবে সব।

পাশ্রু উঠখানে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

[২০]

যে ঠান্ডা-চাকরের কথা বলিয়া পাশ্রু বাহির হইয়া আসিল, তাহার আদিয়া তাহাদের কথা তাহার আর মনেও রহিল না। এ গলি সে গলি গুলিয়া ছোট একখানি ঘিঙল বাড়ীর লক্ষ্যে আদিয়া সে ঠাড়াইল, আর খোলাট ছিল, তিনতরে ছোট একটা টেবিলের পাশে দুইটি চেয়ারে বসিয়া দুইটি ছেলেমেয়ে পড়িতছিল, পাশ্রু আদিয়া ঘরে ঢুকিল।

—কি করছ হুশীল? এগজামিনের পড়া?

—হ্যাঁ তাই। সময় আর কট, দিনও ক্রমে এগির আসছে, বল, তোম্ব দিক কর কবে এসে আচ্ছ, তীব্র একাইটেড দেখা থাকে যে।

যেটো তাহার বই গুছাইয়া দিয়া বীরে বীরে পরমা গরাইয়া তিনতরে চািয়া গেল। ঘরের একপাশে একখানা তক্তপোষে মতরকি পাঠা ছিল। পাশ্রু সেটার গিয়া শুইয়া পড়িয়া কৃষিকা মাত্র না করিয়া কহিল, হুশীল আবার তুমি পড়িয়ে দাও, তোমার কাছে আমি পড়ব, এগজামিন দেব।

হুশীল একটু অধিক হইয়া পাশালালের পাশে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর কাছে আদিয়া বসিয়া কহিল, চমৎকৃত এ দৃষ্টি কেন?

পাশ্রু উত্তর দিল না, হাত দুখানি মাথার উপরে ছড়াইয়া দিয়া অত্যন্ত স্নান ভাবে চোখ বুজিল। হুশীল কহিল, বেশ,

পড়ট পড়ি পড়ি, তববে একশতট পড়ব, সে ত বেশ ভালই, কিন্তু এখন ত আর পড়বে সময় নেই, এই এখন মান-টান কবে খেবে নেওয়া যাক।

চক্ষু বৃষ্টিয়াই পাশ্রু করিল, কটা যাক এখন তাই?

—এখানেটা বেচে গেছে, একটু বিলম্ব কর তুমি, আমি মাতে গিয়ে বসি।

আগর ও পানিকরণ বিশ্রামের পর দুইজন বসিল, এস পড়তে বসি এইবারে।

—তুমি পড়, আমি শুনি,—

হুশীল পড়িতে পড়িতে কখন এক সময় মালা তুলিয়া বেধিল, পাশ্রু গভীর নিদ্রামগ্ন। হুশীল আদিয়া সেট বহিরাশি রাখিয়া অল্প বহির হাতে তুলিয়া লইল।

সেদিন সন্ধ্যাক্ষণ আর দুইজন পাশ্রুকে ডাঙিল না, পাশ্রুও অন্যত কিছুই প্রকাশ পাইল না, একটা আশ্রয়ের তাহার নিভাফট যেন প্রয়োজন ছিল, বহুদল সন্তের বাহ্যগতদের অন্তরেও নিজেকে সে ঢাকা দিয়া অপরকালের জন্য রাড়িয়া গেল।

আরও মাস দুইরক ডাঙিল, উদ্ভিন্নতা: মীরাব ঘাবের দুই দিন দিনের আছানোর পাশ্রু এ বাড়ীতে আসে নাই, কিন্তু কিলের একটা ছোটখাটো উৎসব উপলক্ষে পাশ্রু সেদিন অপর কিছুতেই না আদিয়া আসিল না। মা হুগ অগ্রহাণ কহিলেন, দুখ প্রকাশ করিলেন। পাশ্রু 'সময় তখন না' বক্তা ঘাবের সকল প্রার্থন একটা উত্তর দিয়াই চুপ হইয়া গেল—না মীরাবাল কেলিয়া অল্প অনেক দিনের মত আতিথ্য করিলেন, লল কখনও আপন হর না।

মীরার কলেজের কতক বইও আদিয়াছিল, সঙ্গী একজন পাশ্রুকে বেধিয়া লবিঘবে বসিয়া উঠিল, ও মা, উনিই নাকি তোম পাশ্রু না' মীরা?

মীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার গানে তাকাইয়া কহিল, হ্যাঁ, তাই ত মনে হচ্ছে, কিন্তু তাতে 'ওমা'টা কিলের?

অগ্রদূতের তাবটা গোপন করিয়া ঢাক করিল, কুট পাশ্রু না পাশ্রু না সঙ্গী করতিন্, কিন্তু উনিই যে তিনি, তা ত' জানকুম না, তাই কিংকল কহলুম, এই পাশালাল বাবু ও অঘোষের ওখানে গোকট বাঞ্ছন,—

—তাই নাকি? তোদের সঙ্গে আসেন আছে না কি?

চাকলাতা কঠিন, না? আসাপ ঠিক নেই, তবে সাধারণ সঙ্গে ওর বজ্ঞা ভাব. একটু সঙ্গে পড়াশুনা করেন, মানার কাছে যোগ্যই শু ঘাফেন, ওটা ক'জনে ছিল নাটক-কল করেছেন কতকগুলো, আরও কি কি করছেন,—

—আর কি কি হয় ওদের জাদি?

—ঠিক জানি না, তবে টালা-টালা তোলেদে দেখেছি।

দ্বিধেকানন্দেব ছবিতে যোগ্যই মাথা হুইয়ে নমস্কার করেন সবাই, তাও দেখেছি।

কথাটি বদিয়া চাকলাতা একটু সলজ্ঞ কাণে হাসিল, মীনার খুঁটী জববে তীক হইতে তীকৃতর হইয়া উঠিতছিল, কহিল, তুই লুকিয়ে লুকিয়ে খুব দেখিলে নাকি?

চাকলাতা নিজেও এইবারে একটু কঠিন হুইয়ে কঠিল, লুকিয়ে দেখে কেন, অনেক লুকের ঘর শু আর নয়, আমায়ের দ্বতর ভিতর থেকেই সব দেখা যায়।

দেখিন পাছ কিয়বার সব নীচা কঠিল, পাছ পা' কট, একদিন শু শু বল নি?

—কি বলি নি?

—চাকলের সঙ্গে তোমার এত কাব, এত বাও দেখানে, বলনি শু তা কোন দিন?

—চাক কে?

—ওই তোমার হুশীলবাবু বোন।

—না, আমি চাক-টাক কাউকে চিনিব।

—সে কিন্তু তোমার ছেন।

—হতে পারে।

মীরা কহিল, তা হ'ক যে, কিছু পাছ না, যদি কি

ওট সব কবেই খুঁয়ে বেড়াক? পড়াশুনা কি করছ না কিছুট? পরীক্ষার আর বাকী শু মাস দুট।

—ওই তেমন করছি। ইচ্ছে হলে যদি সময় সময় বই নিয়ে—

—ছি: পাছ না, আমার লজা হয় তুমতে, হেলা করে কবেই তুমি বিনজলো কাটালে, নইলে আমায়ের চেয়ে তোমার বৃত্তবার কনতা ছিল অনেক বেশী। আমার বাহুদ্রী করে ভোর করে বল কি করে, আমি তাই জানি।

—পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে বিশেষ নাই।

—লজা না কি? তবে কেন আর কলকাতার বলে বলে টাকা খরচ করছ? বাড়ী যাও।

—তাও বিশেষ আগ্রহ নেই।

—তবে কি করবে?

—বা করছি, তাই।

—হাল, কিছু জ্যাঠানশাই যদি টাকা না পাঠান আর?

—কি? চাকরী কিছু জুটেবে না কি?

—জুটেতে পারে, শিলালবতে মুটেগিরি। মাটি পাল কেন, এন-এ-পালসিও রাস্তার ধোঁয়ার পড়াগড়ি থাকে।

—তবে তাই আপোঁসি কর মীক, মুটেগিরিই খেন আমাকে করতে চ্য, ওহু তোমাদের ঐ এ্যারিট্রোজেন্ট হবার আকাঙ্ক্ষা খেন আমার না হয় কোন দিন জীবনে।

পাছ বসিতপবে বাহির হইয়া গেলে, মীনার সর্ক-বিক্রিত অস্ত্রর সহ্যা খেন অপমানে ধোঁয়ার পড়াগড়ি দিতে লাগিল। পড়াশুনার আগ্রহ, ভাল করিয়া পাল করিবার অমমা উৎসাহ কোথায় আত বিলাইয়া গেল।—করে চুঁকিয়া আলো নিগাইয়া মীরা শুইয়া পড়িল। [ক্রমশ:

উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধি

...একদে বিদিকলসের একদলগারে ডিগ্রীপাল কঠিলে পারিসেই বাসুদে শিক্তি অলস পাতলাত কঠিলে পালেদে এক: প্রায় সবত বকম পাজীকলার কর্তব্য উপযোগী বলিয়া পরিচািত হু। অক বুদ্ধি কথাকে বলে, পরীচের মধ্যে তাহার জ্ঞান কোথাক, কোন কর্তব্য বুদ্ধি বুঝা হয় এক কোন কর্তব্য জ্ঞানই উৎকর্ষ হু, তদনন্তর কোন শিলা পাইবার ল্যাপে কলকাতা কেওটা হু না।



কতকগুলি প্রসিদ্ধ সিংহাসনের কথা

— শ্রীচামরন্দর ভট্টাচার্য্য

অতি প্রাচীনকালের যে সব রাজার উল্লেখ আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, তাঁদের সিংহাসনের বিবরণ জানতে মাত্রায়ে স্বভাবগতই ইচ্ছা হয়। এটীক সিংহাসনের মধ্যে যেন সেই প্রাচীন রাজাদের স্বর্গীকৃত আত্মা বসে নেন হয়। রাজার রাজ্যের বড়র কেরে গেছে, কিছু ভুল ও কাল এই স্বর্গীকৃত উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অদিকস্থ কালের প্রতিব সঙ্গে এই স্বর্গীকৃত যেন আরও মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে।

“চোর” ছিল হুদা অর্থাৎ প্রভু ও কমান্ডার ছিল বেক, টুল গুজরাণীতেই ব্যবহার হ’ত। প্রত্যেক বড় লোকেরই থাকত একটা করে নিজস্ব “চোর।” সে চোরের ওঁদের কমান্ডার পরিচয় দিত। ১৩০০ সালের শেষে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড (Edward I) ভুল যে “চোর” তৈরী হয়েছিল, সেটি সকলের চেয়ে পুখান ও বিখ্যাত। এটি উপর ব’লে পর পর রাজ্য বয়েছেন ইংলণ্ডের সকল রাজা—আমাদের বর্তমান সম্রাটও করছেন।

রোমের সেন্ট পিটার (St. Peter’s) গির্জার মধ্যে যে চোরটি রক্ষিত আছে তার খ্যাতিও কম নয়। এটিকে সেখানকার সৌভাগ্য সাধারণের ঘটে উঠে না, কারণ এর নশনি পাওয়া যেতে পারে একবার বছরে মাত্র একটিবার। আরও একটা অতি পুখান ও বিখ্যাত চোর আছে হেলেনের (Ravens) গির্জায়। সে চোরের মাংসেল পাখরের তৈরী। তার নাম “দি চোরের দল ম্যাক্সিম” (The Chair of Maxim); তার গায়ে খোদাই করা রয়েছে বাইবেলের দৃশ্য ও লাতুনের দৃষ্টি।

কালের গতির সঙ্গে নক্ষত্র মিলন। এটীক “চোর”ই শেষে সিংহাসনে অধ্যাক্ষিপিত হ’ল। এর কারণ রাজাদের

আগতিক্রম আর বদলিপ্রবণতা। সম্রাটের বিস্তার ও এর সঙ্গে সঙ্গে কলাবিস্তার উন্নতিও কাককর্ণাময় বিচিত্র সিংহাসনকে অন্য দিতে কম সহায়তা করেনি। প্রাচ্য সিংহাসনের কাককর্ণা ও রূপের বাহুল্য পাক্কাতা সিংহা-



মহা-সিংহাসন (৩০০০ খ্রিঃ)

সনের গায়ে বেথা যায় না। পাক্কাতা সিংহাসনের উপর প্রাচ্য সিংহাসনের প্রভাব অসংখ্য আমরা দেখতে পাই, মিজান-ট্রিয়ামের (Mysianum) মধ্যযুগের রাজাদের সিংহাসনে। তাঁরা যে বিখ্যাত সিংহাসন তৈরী করেছিলেন তার নাম

৫ কাকতালীয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন সম্রাট সলোমনের (Solomon) সিংহাসন থেকে। এমন কি সলোমনের সিংহাসনের নামটি পরবর্তী আদর্শ বলে সন্মত। সোলোমন সিংহাসন সিংহাসনকে খিদের সাহায্যে সিত। যখন জৈন বড়বড় চলত তাকে চুপ করে বসে, তখন হালকা হাঁচিতে উঠে গলান করত।

সলোমনের সিংহাসনটি আদর্শের একটি প্রকাশ। এত বড়বড়বড় বসে তাঁর সিংহাসন চিত্র সমগ্রতায়। যখন তিনি তাঁর বেত-



সিংহাসন আদর্শ সিংহাসন : জৈন উৎসবে ব্যবহৃত ছিল।

মণ্ডলে বৈঠকী মণিমাণিক্যখচিত বিভিন্ন সিংহাসনে বসতেন তখন নিজেকে লোকের চেয়ে আনন্দিত ও শৌভাগ্যবান মনে করতেন। তাঁর সিংহাসনগুলির মধ্যে এটি খানিট ছিল স্রেষ্ঠ। বহুলা গোষ্ঠিক পরে এটাই উপর বসে প্রজাবাদের সামনে দণ্ডায় বসতে তিনি দর্পগ্রন্থ অতুল্য করতেন। মহানীর নেপোলিয়নের সিংহাসনে বৈঠকী এমন কিছুই ছিল না। তাঁর সিংহাসন ছিল সোলোমন বৈঠকী, তাতে সিংহাসন কাক-

কাধা, সিংহের মূর্তি ও রাজ-চিহ্ন বরণ ইম্পার (Imperial Eagle) খোদাই করা ছিল।

কিছু সিংহাসন বৈঠকী করার জন্য সর্বাধিক খ্যাতি পেয়েছিল প্রাচ্য কাবিরগণ এবং কাকতালী ও কাকতালিকের দিক থেকে প্রাচ্য সিংহাসনই হান পেয়েছিল লোকের উপরে। ভারতের উত্তীর্ণালে মোঙ্গল রাজত্ব বিখ্যাত যোগদানের এক সজাটের বৈঠকী এক অশুর সিংহাসনের খ্যাতি পৃথিবীর সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সিংহাসনই সাক্ষ্যবাহনের মনুষ্য-সিংহাসন—বিবেকের স্রেষ্ঠ প্রেমিক সজাট সাক্ষ্যবাহনের অশুর মূর্তি। তিনি ছিলেন যুব বিলাসী এবং তাঁর হাসভবন ছিল যেন এক ভাবগোলা। তাঁর উর্ধ্বের দিককে যে সব ভাবে আত্মপ্রকাশ করত, তাহের প্রশ্ন দিতে কোন চেষ্টাই তিনি করত করেন নি।

তাঁর পূর্বের সজাটবের চেয়ে সাক্ষ্যবাহনের অলুচর ছিল বৈঠকী, তাঁর সজাট কাকতালিক ও বড় ছিল অলুচর এবং তাঁর মহাহুতবতা ছিল অসীম। তাঁর অন্তিমবারিতার স্রেষ্ঠ পরিচর, মনুষ্যসিংহাসন।

ভাবানুভব (Teavernier) ছিলেন একজন বিখ্যাত কবিতা। ১৮৬৪ সালে গিল্লো বেগতে গিয়ে মনুষ্য-সিংহাসন দেখে তিনি চমকিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :— মনুষ্য-সিংহাসনের বহুবার সজাট একটি বিদ্বানার মত— ৬ ফুট লম্বা, ৩ ফুট চওড়া। ২০২৫ ইঞ্চি উচ্চ চারিটি পাখা তাকে উচ্চতর করে রেখেছে। বারিট খামের উপরে চাঁদোয়া টাঙ্গান। পাখা ও খাম সবগুলিই মণিমাণিক্যে সুশোভিত। মণিমাণিক্যের মধ্যে হীরা-মুক্তারও অভাব ছিল না। তিনটি দাঁড়ি দিয়ে সিংহাসনে উঠতে হয়। সিংহাসনের উপর তিনটি পোনালী গদি। এই গদির চারিদিক দিয়ে গদা, বর্শ, ধনুক ও তাঁর সাথবার তুল। সবচেয়ে সিংহাসনের পায়ে ছিল ১০৮টি হুপি, ১০৮টি পাখা। যে বারিট খামের উপর চাঁদোয়া টাঙ্গান ছিল, তাহের পায়ে সারি সারি মূল্যবান মুক্তা বসান ছিল। সিংহাসনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ এই খামগুলি।

চাঁদোয়ার তিনের সবটাই হীরা ও মুক্তা বসান ছিল এবং বারিটও ছিল একশার মুক্তা। চতুর্কোণ গম্বুজের উপর ছিল একটি মনুষ্যের মূর্তি। মনুষ্যের পায়ে ছিল

সোনার স্তূপের কাজ। আগার স্তূপের মধ্যে বসান ছিল স্নানার্থে পাথর। মন্দিরের পুষ্কট ছিল নোলা পাথর ও আগর অথবা রক্তচীন পাথরে তৈরী। মন্দিরের বৃক্ক ছিল একটা বড় চুই, তা' থেকে একটা বড় স্তূপের আকারের স্তূপা স্তূপ। স্তূপের ওজন ছিল ৪৬ রতি। চোখোজার সামনেটোকে উচ্ছল করে তুলত একটা বড় হীরা, তার ওজন ছিল ২০ রতি। সিংহাসনের দুটিকে ছিল চট্টা মধ্যবর্ণের ছাতা। মধ্যমলে সোনার করির কাজ করা ছিল এবং তাতে স্নান বসান ছিল। এই ছাতার গা- দুটো উঁচু ছাটে বসান ছিল চুই, হীরা, স্তূপ।

যোগেশ্বরের মধ্যে মধ্যম পাঠই বেশ এই সিংহাসনে বসে- ছিলেন। তাঁরই রাজত্বের সময় পারস্ত-সম্রাট নাসির শাহ বিদ্রোহ আক্রমণ করেন এবং যোগেশ্বরের পরাজিত করে এই সিংহাসন নিয়ে যান নিজের দেশে, তাঁর ভাগ্যের শোভা বাড়াবার জন্য।

উনবিংশ শতাব্দীতেও পারস্তের প্রাচ্য-বরাবরে মন্দির-সিংহাসনের অস্তিত্ব আছে বলেই শুনা যেত, কিন্তু অগৌরব লঙ্ঘন কর্তব্য আশঙ্কায় সে ভুল ভেঙে দিয়েছেন। পারস্ত-ভ্রমণের সময় পারস্তের সিংহাসনগুলি দেখবার দৌড়াগা তাঁর ঘটে- ছিল। পারস্ত লঙ্ঘন যে বই তিনি লিখে গেছেন তাতে আমতা দেখতে পাই যে, সেট বিখ্যাত সিংহাসনের কতক কতক অংশ ছাড়া আর কিছুই অস্তিত্ব নেই। এই সত্যল অংশ পারস্তের বর্তমান সিংহাসনে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দির-সিংহাসন তৈরী করতে সবচেয়ে খরচ হয়েছিল লাঞ্চে চার মিলিয়ন ঠারলিং।

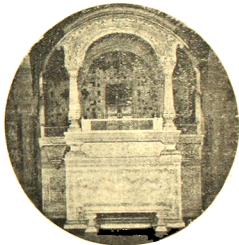
সিংহাসনের মন্দির-সিংহাসন লঙ্ঘন সম্প্রতি আমবা অনেক নতুন কথা শুনেতে পাচ্ছি। লঙ্ঘনের তিনজন সাংগাধিক সম্প্রতি এর লঙ্ঘন কতকগুলি খবর দিয়েছেন।" সিংহাসন লঙ্ঘন তাঁরা তিনজনই একমত। তাঁরা বলেন, এই সিংহাসন এখন আছে পারস্তের রাজধানী তেহেরানে, পারস্ত-সম্রাটের দ্বিভিভায়ে। পারস্ত-ভ্রমণে থাকা থাকেন এই ব্রহ্মসম্ব সিংহাসন তাঁদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করবে লঙ্ঘন নেই।

কিছু উচ্চ লেখকদের ধারণা মতাই ভুল। কর্ণেল গর্ডন চিয়ার্স নামে একজন লেখক এ বিষয়ে লর্ড কর্ণেলের সঙ্গে

একমত। তিনি প্রমাণও করেছেন যে, এই সিংহাসন মতাই তেঁকে দেখান হচ্ছে।

কেনে দেখলে বলতে চাই, মন্দির-সিংহাসনের অস্তিত্ব না থাকতে সত্যল এই ভেত আশঙ্কা হওয়া কিছুই নেই। গত তিন বছরের মধ্যে পারস্তের আর্থিক অবস্থার এত অবনতি হয়েছে এবং অর্থের প্রয়োজন এত বেশী হয়েছে যে, রাজ-সভার মন্দির-সিংহাসনের মত স্নানার্থে সিংহাসন তৈরী শুধু পড়ে থাকতে দিতে পারস্তবাসীরা পারে না।

মন্দির-সিংহাসন লঙ্ঘন একটা স্থির ধারণা করবার চেষ্টা আমতা বড়ই কঠিন, এর পুরাণো টিহাঙ্গ লঙ্ঘন পড়ি, আমতা



সিংহাসন-মন্দির মন্দির-সিংহাসন।

ততই বেশী আশঙ্কা গঠিত; কেনে তত বেশী ব্রহ্মসম্ব বলে মনে হয়, এর ব্রহ্মসম্ব বলে মনে হয়। অনেকের মত, বিদ্রোহে একই সময় সিংহাসনের লঙ্ঘনও প্রচেষ্টা একই ব্রহ্মসম্ব মন্দির-সিংহাসন ছিল। প্রচেষ্টা মধ্যে যেটা বেশী আভ্যন্তরীণ, সেটা ব্যবহৃত হয় কতিং কোন উৎসব উপলক্ষে।

কেউ কেউ বলেন যে, মন্দির-সিংহাসনের অপরূপকর্তা নাসির শাহ মন্দির-সিংহাসন বেশে ঠিক সেই ব্রহ্মসম্ব আর একটা মন্দির-সিংহাসন করিয়েছিলেন। পুর্ন (khurd) নামে এক লোকের লোকের নাসির শাহকে চতুর্ন করে অপরূপ করে নিয়ে গিয়েছিল এই গুটি সিংহাসনের মধ্যে একটিকে। নাসির শাহ শৌর্যের রাজত্বের সময় এই সিংহাসনকে তাঁরা অপরূপ

পাওয়া গিয়েছিল—এমনভাবে সিংহাসনটি তেঁতে গিয়েছিল যে
সামান্যের আন কোন উপায় ছিল না। সামান্যের সিংহা-
সনের অংশগুলি থেকে আগা মরুতর খাঁ তৈরী করেছিলেন
আর একটি সিংহাসন। তাই নাম তিনি দিয়েছিলেন
“তম্ভ-ই-নাতিরি”। এই সিংহাসনটিই এখন পারস্য
সরকারে বর্তমান।

সন্ন্যাসী লাক্সার্ন ও তাঁর মৃত-সিংহাসন লতাই রক্তময়।
বার্ণিয়ার (Bernier) নামে এক পরিভ্রমক এই
সময় বোম্বাই বাবসাহের বরবার বেঞ্চতে আসেন। তিনি
লাক্সার্নের মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছিলেন, “মৃত্যুর
এক প্রকাণ্ড ঘর, তারই এক কোণে অসুস্থ লাক্সার্নকে
সন্ন্যাসী বসে আছে। সাধা সাদা টাউর তাঁর ভিতরের কামা
তৈরী। সোনালী কাপড়ের পাগড়ী, তাতে সূতান
বড় বড় হীরা বসান। পাগড়ীর মাঝখানে একটি
শোষণীয় টিক ঘুঁষে মত জল মল করছিল। সে
সময় এটির মত শোষণীয় আর ছিল না। তাঁর গলায় শোভা
দান করছিল একটি দীর্ঘ মুক্তা মালা।”

ব্রহ্মদেশের মৃত-সিংহাসনের সঙ্গে অনেক রাসদার
গন্ধ ভর্তি আছে। মাঝামাঝি রাজা মিন্ডন (Mindon)
এক প্রাণসম তৈরী করেছিলেন। এট প্রাণসমের শোভা
বন্দ করত নব্বই সিংহাসন—মৃত-সিংহাসন তাইবই মতো
কেনী।

প্রত্যেক সিংহাসনটি ছিল সেতুকার্ণের তৈরী, কাঁঠের
উপরটা সোনার পাতে বেঁটা ছিল; আর তার উপর আবার
নিদ্রাশক্তিয়ার কাজ। এই নব্বই সিংহাসনের মধ্যে প্রধান
ছিল “সিংহ-সিংহাসন (lion throne)”; তাকে রাজা হয়েছিল
শাক্যবীর্যের ঠিক মাঝখানে এবং তারই উপর উঠেছিল রাজ-
প্রাসাদের চূড়া। ব্রহ্মদেশীরা তাদের রাজপ্রাসাদকে বলত
“ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল”।

বিশেষ কোন উৎসব ছাড়া সিংহ-সিংহাসন ব্যবহৃত হত
না। কিন্তু বাকী আটটির মধ্যে তির তির সিংহাসন তির
তির কাজের সময় ব্যবহৃত হ’ত।

প্রাসাদের ভিতরের একটি ঘরে সিংহ-সিংহাসনের পিছনে
ছিল “হংস-সিংহাসন”। সভার বিবেচী উচ্চপদস্থ
কর্তৃত্বকে সম্মান করবার সময় এই সিংহাসন ব্যবহৃত হত।

একটি পিছনে রাজার ঘরের আরও কাছে ছিল একটি
সিংহাসন, যার ব্যবহার হত জলাঞ্জলি সময়। নৃতন বছরের
আগমনে রাজা এই উপর বসে এতক সম্মানিত করতেন।

তারপর “হস্তী সিংহাসন”। এতে বসে রাজা দেখতেন
তাঁর বেতহস্তীর খেলা। “মৃত-সিংহাসন” (empty
throne) স্থান ছিল হংস-সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে। এই
সিংহাসনের ব্যবহার হয়েছিল মাত্র একবার, যখন রাজা তাঁর
উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে তাঁকে স্বরাজ্যে ক্ষমতা
দিয়েছিলেন।

উৎসবের সময় রাজহস্তী দেখবার চত ছিল তাঁর “মৃত-
সিংহাসন”। প্রাসাদের ঠিক দক্ষিণ দিক অধিকার করে
ছিল ব্রহ্মদেশের “হংস সিংহাসন”। রাজার স্পর্শ পাবার
সৌভাগ্য। এই সিংহাসনের তখনই হ’ত, যখন রাজ-অধিকার
তাদের খেলা দেখাত রাজার সামনে।

ব্রহ্মদেশের সিংহাসনগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রথম ও চমক-
প্রব ছিল “মৃত-সিংহাসন”। পৃথিবীর সব জায়গাতে সকলে
সৌন্দর্যের আগর চিরকাল সমভাবে কবে এসেছে। সৌন্দর্যের
আধার নাইকে সম্মানিত করতে ব্রহ্মদেশের রাজাও যোগ
দেখতেন। সেই ক্ষুদ্র বোধ চর ব্রহ্মদেশের রাজা তাঁর
সবচেয়ে প্রথম সিংহাসনে বসে হংসী রমণীর অত্যাচার
করতেন। “মৃত-সিংহাসন” প্রাসাদের পশ্চিমে অবস্থিত
ছিল।

নবম সিংহাসনের ব্যবহার হত বিচার করবার সময় মাত্র।
এর স্থান রেখেছিল রাজার বিচারালয়ের ঠিক মাঝখানের ঘরে।
বিচার আরম্ভ করার সময় মহা আড়ম্বরে রাজা বসতেন এই
সিংহাসনের উপর।

প্রত্যেক সিংহাসনটি নানী থেকে ৩৫ ফুট উঁচু ছিল।
প্রত্যেক রাজা সিংহাসনে বসলে, মাটিতে বাগা বসে থাকত,
তাদের সর্দারকেই ভাল করে দেখতে পেতেন।

রাজা থিবো (Thebaw) ব্রহ্মদেশের রাজা হয়ে প্রত্যেক
সিংহাসনকে প্রাণেই ব্যবহার করতেন। রাজা মিন্ডনের মত
কিছু এদের সূতানদের মদ্যপানের শাসন থাকে থাকে ব্যবহার
করতেন না। থিবো ছিলেন রাজিক, মধ্যকারী ও
উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তিনি তাঁর সূতানী রাণীর বন্ধিত
ছিলেন। রাজ্যশাসনে রাণীর কথার উপর কণা বলায় শাসন

ঊরু হত না। যে কেউ রাণি সুপ্রাণলতক (Supralat) অস্বহাস্য করত বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলত, তাঁর পাতি ছিল অনিবার্য।

সিংহ-সিংহাসন ছিল রাণির গির সিংহাসন। এর শিখরে তিনি তৈরী করিয়েছিলেন এত উঁচু ঘর—যেখানে বসে তিনি সব দেখতে পেতেন। কত বিদ্রোহ সঙ্ঘাত এখানে বসে তিনি ঘটার পর ঘটা কাটরেছেন সূত্রের পরিকল্পনা করে। আবার গিরের পতনের পর, এতই উপর বসে ভয় ভয় করে রাণি বেঁচেছিলেন বিক্রমী টংরাও গৈলুদের পুণী পবেশ করত—পশ্চিম ঘর দিয়ে।

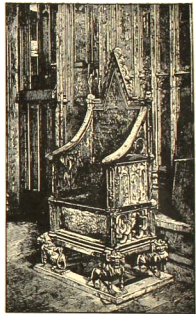
সম্রাতি সিংহলের রাজ-মহাবার থেকে টংরাও গরুদেউকে অস্বহাস্য করা হয়েছে সিংহলেশ রাজবংশ ব্যবসায় পুরানো মুকুট ও সিংহাসন তাদের কিরিয়ে দিতে। এই মুকুট ও সিংহাসন এখন আছে উইগলার কাসেলে। এই সিংহাসন অস্ত্র এর সমসাময়িক যোগ্য সিংহাসনের মত সুলাবান নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক বস্ত্র ও কাককাধার নিক থেকে যেখানে সেখানে বলতে হয় যে, এই সিংহাসনই সাধারণের মন-সিংহাসনের একমাত্র প্রতীক।

এই সিংহাসনের স্থান ছিল সিংহলের রাজাদের “মহা-প্রাণেশ”। এখানেও আবার যেখানে পাই মনুর প্রভাব, শুধু সিংহাসন-নিষ্ঠার উপর নয়, প্রাণেশ-নিষ্ঠার উপরও। এই প্রাণেশকে মনু-প্রাণেশ বলা হত ব্রটি কারণে। তার বাইরে ছিল অপূর্ণ হস্তের খেলা, আর চারদিকে ছিল সুলাবান পাথরের প্রাচীর এবং সোনা ও রক্তার কাককাধার শোভা।

ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি কোন রাজা বা রাজপুত্র শ্রম করত বেরিয়েছেন তাঁর ভিন্নপত্রের সঙ্গে সোনার সিংহাসন নিয়ে। কিন্তু আমরা দেখছি এক রাজপুত্রকে তাই করতে হয়েছে। তিনি আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভূতীয় পুত্র ডিউক অফ গ্লোচেস্টার (Duke of Gloucester)। কাম্বির সিংহাসনকে সিংহলে পৌছে দেবার তার ঊরু উপর সম্রাট বেরিয়েছেন। কাজেই তিনি অস্বহাস্য বাবার পক্ষে এই সিংহাসনকে তার স্বপক্ষে কাম্বির গিরে পেরিয়ে।

চোরাগার বৈচিত্র্য এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অতি পুরানো একটি “চোরাগার” ঘর শিখরটা উঁচু হবে আকার লাড়ো পাচ

ফুট। চন্দ্রকাঠে তৈরী তার দেহের উপর জড়ান আছে পাচলা সোনার পাচ, রক্তে দামী পাথর বসান। সিংহাসনের চারদল গুটো সোনার সিংহ—এই গুটোই আকর্ষণ করে লোকের দৃষ্টি স্কলের চেয়ে বেশি। চন্দ্রকার কাককাধার অনেক গায়ে, আর চোপে বসান বড় বড় গুটো নীল পাথর। সিংহাসনে চেপান দেবার আশ্রয় ত্রিক মাথানে আছে একটা বড় সোনার হৃদয় মূর্তি—কাম্বির রাজারা হৃদয়বানীয়ে তাই জানাতে। হৃদয় হৃদয়ে বসে আছে দুই ধর্মী মূর্তি।



গুটো দিষ্টার আছে : কাম্বির-সিংহাসন।

বলবার ভাষাটি শুল মনমলে বোড়া। এই ত বেশ সিংহাসনের কথা। আবার তার সঙ্গে আছে একটি ছোট টুল, পাথ বংশে বোড়া। তার উপর রাজারা পা রেখে বসতেন।

নিজের বেশ ছেড়ে, সাত হুহুদুর তেরো মনো পাড়ি দিয়ে এই সিংহাসন যেতামনের যেনে গিরে কি করে পৌছল, তার ইতিহাসের সঙ্গে সিংহল-বিজয়ের কাহিনী জড়িয়ে আছে। রামায়ণের দুগ থেকে আমরা দেখে আসছি, ভারতে কখনো বিজয়বের অভাব হয়নি। বিজয় অত্যাচার হলেও রামণ ও

ইচ্ছাতিতর মত সীমিতব বধ করে দিগেন চর্য করা সামান্যের
পক্ষে সম্ভব হত না, বিলাসের সাচাচ্য না পেলে। এখনও
আমরা বলতে পারি 'সিংহলবাসী' সাচাচ্য না পেলে পাণ্ডা
পক্ষিতে ঘেমা, বন্য পুষ্করিত সিংহল কর কন্য ইংরাজ
বাহ্যব্রহ্মের পক্ষে প্রকটন হত। দেবী বিখ্যাত ১৮১৪ সাল—এ
বৎসর মেশেকিয়ারের পুণ্ডরীকানন্দ সামাজ্য স্থাপনের অল্প
কয়েক চুখে হুয়াটাসন্থ দুর্ভিক্ষের, গুয়েলিটনের অসাধারণ
দুর্ভবীশলের সামনে হুদিসাং হয়ে গিয়ে ছিল—সেই বছরই
আমি কর বরেন্ধলেন ইংরাজ বাহ্যচরণ। রাজা শ্রীকৃষ্ণ
রাজসিংহের অত্যাচারে ভক্তচিত্ত হয়ে এহেলোপোলা ও
অত্যাচার সত্তাস্থ সিংহলী ইংরাজের গলে হোগ দিলেন;
ইংরাজও তাদেরই সাহায্যে সিংহল কর করলেন। এক রাজার
চাত থেকে বেশ অল্প রাজার হাতে গিয়ে পড়লে প্রায়ই

নিম্নোক্ত দেখা যায়। এখানেও দে নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম ঘটল
না, কিন্তু বিশ্রোহ ধমন করতে ইংরাজের দেবী হল না।
সিংহলীশের বিদ্যাল আশি থেকে সমস্ত পর্যন্ত রাজ্য ধার
ঠেঠী করতে পারবেন, সিংহল কর করতে পারবেন একমাত্র
ভীরাট। ইংরাজেরা এট রাজ্য ঠেঠী করে সিংহলীশের
আনিবে দিলেন যে, ভীরাট সিংহলেশ ভাণী অধীশ্বর। কামিন
রাজা হলেন নির্জাতি; কিন্তু পড়ে রইল রাজার সব চিহ্ন
আর ভীরা ভীকতমকপূর্ণ নকল পোষাক ও আদ্যাব কামিন
রাজপ্রাসাদে, প্রভাদের ডোলের সামনে তাদের রাজ্যের
পূর্ণ পোষাব উদ্ভাসিত করে তাদের উত্তেজিত করায় মন্ত্র।
রাজার মত সিংহলনকেও ভীরা নির্জাতি করলেন। তখন
ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ। সাত বছর তের নখীর পারে
ইংলণ্ডের রাজসভার এই সিংহলান স্থান পেলে।

প্রতিগ্রাহী

—শ্রীশরদিস্থ বন্দোপাখ্যায়

তুমি বা নিলে লান
গোপন মনে মনে
ভাসিল বের-প্রাণ
পুলক শিরসে।
ভাঙেত মান, সে ত
ভ'ভাঙে নিতে পারি
বৃক্কের মান এত
বৃকে সে লাগে ভাবি;
কোথায় রাখি তাকে
ভাবিয়া নাহি'পাউ,
তোমানে নাচে নাচে
কিবে তা নিতে চাই।
ছবর খালি করে
নিবাস হ'উ তার,
তবু সে করে পড়ে
উপচি চারিখান।

ভাবিবাড়িহু মনে
চারিখান সব কিছু
দিনের সুখমনে
নমন করি নীচ—
চুলের গুটি কুল
হাতে রাজারানী
হাসিটি অগ্রকূল
অথবা স্মিত আঁধি।
তুমি তা ব্যক্তিখার
দিলে না অবলম্ব
* দেখের ব্যক্তিখার
চালিলে শিরশর।
কিরিতেছিহু মান
কি লব তাই বুঁকে,
অতুল দিলে মান
আমার মন বুঁকে।

১. জীবিত পলিডেল্টা

সত্যাক্ষর ঘোটকের পথ আছে বটে, কিন্তু বড় ভূপদ পথ।
কলিকাতা হইতে কিছুদূর পিঁচ-চাপা রাস্তার পথই ঘোড়া-রাস্তা
সুস্থ হইল। কোথাও চরা-ক্ষেতের উপরে পক্ষর গাড়ীর 'বিন্দু'
ঘরিয়া, কোথাও শুক নদীর বুকের বাগুনের উপর দিয়া,
কোথাও গৃহস্থের আঙ্গিনা হেঁদ করিয়া রাস্তা গিয়াছে।
মাথায় উপরে প্রেত যৌত্র, ঘোটকের ছাদ তরিয়া আরোহী
হুঁকিও বন্ধ করিয়া কেলিতেছে। ছায়ার প্রভাতকৃষ্ণের
মত বিন্দু কোমল সুগন্ধি আতপতাপময় কমলিনীর মত
জ্যকটাগ বিবর্ন হইয়া উঠিয়াছে। কঠ তাদৃ বিপুল, নিখাল
কেলিতেও কঠ হইতেছে, তবুও বিশ্রাম সইয়াই প্রত্যবে
চায়া সম্মত হই নাই। কোন গ্রামান্তরে গাড়ী থামাইয়া
চুকা নিবারণ করিবার পরামর্শ নিমল দিয়াছিল, ছায়া বলে,
না বাবা, একঘায়ে বাড়ী গিরে চল পাব। নিমল খুব,
বাগিচায় বসে কঠোর সংগ্রামে রত থাকিয়া কঠোর হইয়াছে,
এই সকল তুচ্ছ ও বৈধিক কঠকে সে কঠ বলিয়া মনে করে
না। কিছু দূরে সাদিত পালিত, বিলাস-বাসনে ভিরাভাস
স্বভাবভূষণ কোমল। বসবালা এত কঠ সহিতে পারিবে কেন ?
গাড়ী থবন রানবন প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন বেলা
গুইট। গ্রামসীমান্তে অবস্থিত বিরাট গুই বৃক্ষটের স্নগত
শিকড়ের উপর কতকগুলি রাখাল-বালক ভটয়া দিমানিষ্টা হাই-
তেছিল, ঘোটকের পথে উঠিয়া পড়িয়া গথমে নিম্নের হতবাক
হইল, পরে কোলাহল করিয়া অশ্রুপূর্ণ বন্ধ ও আত্মগোপন
নাম ঘরিয়া ডাকডাকি শুরু করিয়া গিল। মোটর থামাই-
বার প্রয়োজন হইয়াছিল। বাড়ী কেহই জানে না, রাখাল-
বালকদের প্রের করা হইলে, তাহারা পত্রপত্র সুখ চাওজাও গি
করিতে লাগিল; জারপার একজন বলিল, ঘোড়ার ছেলে
বিলেত গিরে বেঘ বিঘে করছে, তেনাদের বাড়ী যাবেক ত ?
সে ঐ ঘোড়া!

'ঘোড়া' বলিলে বৃত্তিতে পাবিবে এখন বিস্তা ইহাদের
ছিল না। সপ্রতিত বালক বলিল, সেটা গিরে মোড়-

গিরের মন্দির দেখবেক ত, তাইই বায় যে রাস্তা, সেই
রাস্তায় তেনাদের বাড়ী।

পাঁচবাড়ী দূরে একটি নব শিশু করিল, মোকে হাওয়া
গাড়ীতে তুলে নাও, সুই বাড়ী দেখিবে নিবক।

বিমল ছায়ার পানে চাছিল, ছায়া নীরবে অশ্রুপূর্ণ জ্ঞাপন
করিল। মুগ্ধসুরিত বিগবন বালক ও তাহার সঙ্গীদের
দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া তাহার লহবে মনটা আবার শিল্প
হাটতে আরম্ভ করিয়াছিল। করিল, চলুন-না, জেঁকা-
শিবের মন্দির দেখতে পাবই অশন।

কৌতূহলী বালককুম কিজাল করিল, তোমরা কোনদেবের
কে গা ?

ছায়া বলিল, গাড়ী চলে না কেন বাবা ?

গাড়ী চলিল। রাখাল-বালকগণ কিছুদূর পথায় ঘোটকের
শিঙ্কনে ছুটিয়া নিবন্ত হইল।

জেঁকা-মন্দির। মন্দিরের দ্বার ভায়া, ভিতরে ঘন অন্ধ-
কার, শিগলিমা আছে কিংবা নাই, মন্দিরের চাতালে নানাবিধ
বৃক্ষ-লতা গড়াইয়াছে, দেখিয়া মনে হয় না যে, কোনদিন কোন
ভক্ত ভক্তি-অর্ঘ্য সইয়া এই মন্দিরে ঘোড়াদেবের নিকট
চালি বিতে আসে। বান ঘিকে একটি পক্ষর গাড়ীর রাস্তা গুই
পার্শ্বের বনানীকে ঘিরন্ত করিয়া ভিতরের দিকে অগ্রসর হই-
য়াছে। এই বনমধ্যে মাংশেণ বাল পাশ্বেত পথে ইয়া মনে
করাও করিল। টাঙ্কি-ডালক বোড়ে গাড়ী রাখিয়া কিছুদূর
দেখিয়া আসিয়া গাড়ী চালিত করিল।

একটি কামারখানা। এক বৃদ্ধ কামার উত্তর
লোহের উপর হাতুড়ী পিটুতেছিল, একটি নব বালক বসিয়া
দ্বারের বড়ি টানিতেছিল, ঘোটকের পথে উল্লসেই পথের
পথে আসিয়া গাড়ী হাইল। বিমল প্রসন্ন করিয়া জানিল, এই
রাস্তায় শেষে যে বাড়ী, সেই বাড়ীর ছেলে বিলাতে গিয়া
বেদ কিং করিয়াছে। গাড়ী আবার চলিল।

ভানঘিকে একঘাণি মটের বগলুর টেকিশালে গুইটি
নাই ঘান জানিতেছিল, গাড়ীর পথ তাহাদিগকেও বিস্তৃত

বসনে পথের ধারে আনিয়া ঠাঁড় করাইয়া দিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

একটি পান-চাকা ডোবা। তাহারই তীরে সান্নিধ্য গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পাশে ছিল ফেনিগা, চাও, চোপ, কাতনা, খালুট, লুটিয়া পাড়ে আনিয়া ঠাঁড়াইলেন, গাড়ী পানইয়া অমনা কোঁঠুল নিরুত ওবিদ্যে আশা উৎসাহ হইয়া পড়িলেন; তাহারের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া না করিয়াই গাড়ী অগ্রসর হইয়া চলিল।

করক বর সীওতালের বাস। এক বৎসর ভ্রম উপর ছোট ছোট কতকগুলি কুঁড়ে, অমনে খাটিয়া বসিয়া নথ-কম্বার নীওতাল পুরু ও রমণীয়া, কের তামাক খাইয়েছে, কোন রমণী কাণে কলিকা কুল ওঁড়িয়া ক্রকাক্ষে উত্তরগত হাসির লহর তুলিয়া গল্প করিতেছে, নথকাষ বালক-বালিকারা একপাল ছাগল-ভেড়া, গরু-মরিচ, মুগুটির সঙ্গে মিশিয়া খেলা করিতেছে। গাড়ী লব্ধ তাহারদিককে মচকিত করিয়া তুলিল, তাহারেও সর্দার কণ্ঠ পরিহার করিয়া পথের ধারে আনিয়া ঠাঁড়াইল। নীওতাল পদগণের যে নীওতাল পুরু-রমণী দেখিয়া বাসালী নথ-নারী নিরুত রম, যব অস্ত্রের নিখা-বার কলেন, হিংসা ও কলেন, বস্ত্রপ্রাণী নীওতালের দেখিয়া হায়া করিতে হয় না। পাচাত দেখিয়া নিদ্রা কাণে, টিলা না উঠিয়া কাহারও বিদ্রব উদ্ভিষ্ট করিতে পারে না। মনে হয়, বাবালার পল্লীগ্রাম তাহার পরিপূর্ণ ধন্যতা, পুণ্ডিত ভলয়াওয়া, অগ্রভাণের প্রাণের বিস্তার করিয়া এই প্রকৃতির ওলালয়েরও লমতলবাসীসের সঙ্গে সম্বন্ধিত আনিয়া ঠাঁড় করাইতে বিলম্ব করে না।

আরও ওট একটি হাওনা পুরু, বাপতাক, কলা গাছের সারি, কুঁড়ি ও অট্টালিকার কড়াল অতিক্রম করিয়া সর্দার পলট বেখানে শেষ হইল, ঠিক তাহার সম্মুখে ধানের বেড়া বেড়া একখানি জীর্ণ কোঠাবাড়ী, বেন কুতপুট, দাসের সঙ্গে-সঙ্গে মত পরকালের পানে জ্যোতির্জনী চক্রে দেখিয়া ঠাঁড়াইয়া আছে। চ্যাপ্রিস চালক নথ কিসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হিহা ?

প্রান্তি ছায়ায় নমাইকে বেন কনাত দিয়া কাটিয়া ফেলিল। তৎকর্ত্তাভি বিমলকে বলিল, গদ্য, বেনে সেখান না, বহি কাউকে দেখতে পান !

বিমলকে নানাইয়া লুকান করিতে পাঠাইল বটে, কিন্তু তাহার মন বলিতেছিল, এই গুহাই বটে ! তাহার বেশ মনে আছে, সেখের বাড়ীর কথা উঠিলে অশোক বিষম হইত। অশোক বাতুল-গুহে বাহুধ, —বাতুল লহরগানী, পল্লীগ্রামের বন-বাগদ, তাহার বাড়ী অশোকের মনকে পীড়া দিত, তাই কলকুদিস নামধারে সে লুকুচি হইত।

বিমল বেড়াটার পানে ধারে গুঁহিয়া ফিরিয়া আনিয়া বলিল, কাউকেই দেখতে পেলুম না ছায়া।

—আমি দেখছি, বলিয়া কণ্ঠিত পদে ছায়া গাড়ী হইতে নামিল। পা টুটা কাণিল কি ? কুঁহর ভিতরকার স্পন্দন বন্ধ হইল কি ? না, না—অন্য জুল ! কিন্তু চোখের দৃষ্টি বাপসা চইয়া আসে কেন ?

বেড়ার একস্থানে প্রবেশের পথে ওটটি বংশধর আড়া-আড়ি ভাবে রাখা ছিল। প্রবেশার্থীরা অগ্রগমনেই তাহা লম্বাইয়া ফেলিতে পারে, অথচ গরু-বাতুল চুকিয়া বাড়ীর অমনে উৎপাত করিতে পারে না। ছায়াপট্টকতরে চুকিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ঘরের যোগ্যকে উত্তীর্ণা দেখিল, প্রাণাঙ্কুরার ঘরের মধ্যে ছেঁড়া কাপড় উপরে লতছির একখানি কাঁধা ঢালা দিয়া একটি ছেলে শুইয়া বেন দু'কি-তেছে। ছেলের ঘরের পানে চাহিয়া শুইয়া ছিল, ঘরলম্বা অপরিসীম ও অপরূপ তপলাবগাশালিনী এক মাসিকে দেখিয়া তবে তাহার অন্তবাস্তা পিরমন্ত হইবার উপক্রম করিল। তব পাইয়া হুমিয়ার ছেলেরা বাহা করে, এই ছেলেরও তাহাই করিল; অগ্রসরে চীংকার করিল, বা ! অ ! বা !

ছেলেটি যোগ্য হইল, অগ্রের যোগ্য বড়িয়াছে। যোগ্য মনে বেন নানাবিধ কুৎস বেষে, এ তপলাবগাশালীও তরুণ। এই প্রাণে, এই হলাটে এখন প্রকৃতি হইল মত রমণীমুর্তি কে দেখিওছে ! নিশ্চয়ই অগ্র-বিভাগের সে বস দেখিতেছে। তাই প্রাণরূপ নিকট চীংকার করিতে লাগিল, বা ! অ ! বা !

ছেলেটি বা অনতিদূরেই ছিলেন, ঠাঁড়াইতে ঠাঁড়াইতে ছুটিয়া আনিয়া পুহের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার কপালে হাত রাখিলেন, কি বাগা, কি হইছে !

ছেলে আতুল দিয়া হার দেখাইয়া দিল। প্রাণলম্বের সম্বৎসরে বা তা বলে, বা তা করে। না ঘরের পানে

চাফিলেন না, পুখিলেন, দিকার, মনে মনে একপাশ আট
চর্ণানাম যরণ করিতে করিতে বলিলেন, ঘাট্টে ঘাট্টে!

করে-করে খিটখিটেবদন ধ্যেলে, দাঁতদুশ বিকৃত করিয়া
বলিল, বেশ না ঐ গোতের গোড়ার কে!

এবারে না কিরিয়া চাহিলেন। চাহিতে চক্ষু মুড়াইয়া
গেল। মনে হইল কৃষ্ণ বা বর্ণের কোন দেবী তাঁহার পুত্রের
উপর ককণাধরতঃ বধাব্যবে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার আদি-
বাদি দ্রুপ করিবার ভক্ত। তেমনে অচেতন হইয়া বৃদ্ধা
নির্জাক্ত রহিলেন।

বৃদ্ধা বিধবা। ছায়া আনিত তাহার গুণে আছেন, শান্তকী
আছেন, আর একটী বালক সেব্য আছে। এই বিধবা কে,
তাঁহা কৃষ্ণিতে না পারিয়া এবং কৰ্ত্তব্য নিতরণ করিতে না
পারিয়া সেইভাবেই দাঁড়াইয়া বসিল। 'তু' ভিতরে কুকিনার
এবং কণা বলিবার ভক্ত তাহার গা প্রাণনি নড়িল, টোট
ক্যানি কাপিল। ইহা বৃদ্ধা দেখিলেন।

শব্দে কিরিয়া পাইয়া বলিলেন, তুমি কে বাছা?

ছায়া লঙ্গা কথা কহিতে পারিল না। বৃদ্ধার বিধবা
বেশ দেখিয়া একটা অজানা আনন্দের তাহার ভিতরটা
কাপিয়া কাপিয়া উঠিতেছিল।

বৃদ্ধা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা থেকে
আসছ বাছা? কাদের বাড়ী এসছ?

ছায়ায় মন কাপিল, বের কাপিল, টোট কাপিল, কল্মস
কণ্টে কহিল, আমি কলকাতা থেকে আসছি, আমার নাম
ছায়া।

—তুমি কলকাতারের ঘরে?—কথা কহতি বলিতে বলিতে
বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিলেন। শতছিন্ন মলিন বসনের প্রান্তে
দুশ ঢাকিয়া কানিতে কানিতে বলিলেন, কি দেখতে আর
এখানে এসে বাছা?

ছায়া বুকিল, শতবের সূতা হইয়াছে, বিধবা তাহার
শান্তকী। যে শতবের বেগনজোগের মোতাগা হয় নাই,
যাহাকে কোনদিন চোখেও যেনে নাই, তাঁহার বিগোপ-
দামার তাহার অন্তরও কাঁদিয়া উঠিল। নারীর বৈধব্যা
নারীমাজেরই অন্তর বুকি কানে। ছায়া ভিতরে কুকিনা
শান্তকীর পাশে বলিয়া গড়িল। নিঃশব্দে শব্দ পায়ে হাত
গুণাইতে গুণাইতে অঙ্গপ্রবণ করিতে গেলিল।

করুণ ক্রন্দনের ইতিহাস অতীব করুণ। তাঁর পুত্র নরেশের
বিস্ময়-বেগনা কৃত শিতা বহুদিন লুপ্ত করিতে পারেন নাই।

নরেশের (অশোকের) আগল নাম নরেশ; মাউগালার
সে মৌদীন অশোক নাম গ্রহণ করিয়াছিল। বিবাহ ও বিলাস
গমনের চার মাসের মধ্যেই কৃষ্ণের প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।
নিঃসঙ্গার, নিঃশব্দ, অনাথা শিশু ও অযোগ্য একটী বালককে
কেলিয়া রাখিয়া পুত্রবিবাহের বৃদ্ধ অতুণ মায়ায় অনন্ত ক্রিয়া
লইয়া শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজও গায়ে বৃদ্ধা
দেখিতে পান—এই বাড়ী, এই ঘর, ঐ সজিনাগাছের তল,
ঐ গোলাপ-ঘর, ঐ কাকির বেড়া, লকল হানে বাতুল শিতার
আত্মপ আঁখিতারা অরণ্যের সন্ধান করিয়া কিহিতেছে। আজও
কৃষ্ণের আত্মপ, আঁখি কণ্ঠের রাগের নিঃশব্দ বাহ্যে প্রগোহণ
করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, বৃদ্ধা তাঁহা নিঃশব্দ কানেই শুনিতে পান।
অর্থাভাবে পরোপের চিকিৎসা হয় না; পথ্যভাবে তাহার
পরীর বাখারী হইয়া পড়িয়াছে; তাহার শরণে একখানি বস্ত্র
নাষ্ট, গায়ে একটী জামা নাই। নরেশ যদি তাঁতানের
এমন করিয়া না তালাইত, তাহাৎবে কিসের হৃদয় থাকিত?

বিধবা মাত্রা কতদিন কতগ্রামি কাঁদিয়াছেন, চোখের
তলে নদী বহিয়া গিয়াছে, পাশাপাশি গিয়াছে, পেনের
সুন্দর-শেখাল তাঁহার হৃদয়ে আঁতরান করিয়াছে, গাছের শাখার
চোখেও লল করিয়াছে; কিন্তু অত্যাশীনের নমনবির প্রাণ
এমনই কঠিন হাড়ের প্রান্ত, সে-ই তবু আসে নাই, সে-ই
কেবল কানে নাই। তাইনোতে তাহাকে ধরিয়াছে, হরত বা
যাইয়াছে। সে প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না তাহাও কেহ
জানেন না।

ছায়াও কাঁদিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, লব
যেহ তাহারই। পুত্রদুর্লভবলিত বৃদ্ধ শতবের সূতাভানিত
অপরাধ তাহার; ঐ যে অযোগ্য প্রসন্ন শিতা বধাব্যবে জীর্ণ,
পথ্যভাবে শীর্ণ, সে, অপরাধও তাহার; শান্তকী যে শতছিন্ন,
সহস্রপ্রবন্ধক বদন পরিধান করিয়া কোন মতে লজ্জানিবারণ
করিতেছেন, সে অপরাধও তাহার, তাহার, তাহার! নিঃশব্দে
শেষত অপরাধী মনে করে, তাহার চক্ষু বিগা ততই অঙ্গ-
উৎস বাহিরিয়া আসে।

ঘট বড় শোক, ঘট বড় দুঃখ হউক, মাত্র ঘটই কাঁচক,
এক লম্বের তাহাকে ঘাঁড়িতেই হইবে। ক্রন্দনের উজ্জ্বল

নামিতে নামিতে নরম পর্দার দ্বারা এক সময় শুরু হইয়া আসে; ক্রমবশতঃ শব্দ বন্ধ হয়, তখন শুধু নিঃশব্দ কাণে।

ছাত্রের পাভড়ী বলিলেন, তোমার বাবা-মা এসেছেন না কি বাছা?

ছাত্র চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, না মা।

—তবে তুমি তার সঙ্গে এলে?

—আমি একাই এসেছি মা; আমার এক দাদা আমাকে রাখতে এসেছেন।

বৃদ্ধা অসন্তোষিত আরক্ত চক্ষুদ্বয় ছাত্রের সুখের পানে প্রাণিত করিয়া কহিলেন, রাখতে এসেছেন? সে কি বাছা! তুমি কল্যাণের বেলা, আমার এই দাদা ঘরে হা-তাতে সংসারে থাকবে, কি বল?

ছাত্রা বিনীত কণ্ঠে কহিল, আমি থাকতেই এগেছি মা। বলিয়া সে বৃদ্ধার হই চরণের মাঝে মুখ বন্ধা করিল।

—সে কি করে হবে বাছা? সে কি হয়?

—কেন হবে না মা? পরেশ যদি থাকতে পারে, আমিই বা পাব না কেন?

—পরেশ! সে আর ক'দিন! তারও গণ্যদীন হুগিরে এসেছে। তিনি সুখ এই কথাগুলি বলিলেন বটে: কিন্তু মনে মনে ব্যর্থতার জিত কাটিলেন, ব্যর্থতার পরশের লতায় কান্দা করিলেন।

ছেলেটি এতক্ষণে উঠিয়া বসিয়াছিল, একপাশে ছাত্রের এক পানি হাত তাহার চর্মহীন কপালে ধারণ করিয়া বলিল, তুমি আমার বো-দিদি?

ছাত্রের সুখের মধ্যে চিরশান্ত, চিরশুণ্য দেহলমুহুর্তে জোলাইয়া উঠিল। পরশকে ছই হাতে বুককে কাছে, সুখের কাছে টানিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিল, ইয়া তাই, আমি তোমার বোদিদি। তুমি আমার ঠাকুরপো!

পরেশ কতকটা নির্ভরতা, কতকটা সন্দোহের সহিত ঐচ্ছিকায় হাতখানি অবিকতর কোরে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বোদিদি, তুমি আর কলকাতায় থাকে না ত? এখানেই থাকবে? ও কি তুমি চুপ করে রইলে যে বড়! চুপ করে থাকলে হবে না, বল, থাকবে?

ছাত্রা শব্দ কর্তে কহিল, ইয়া তাই, থাকবে।

বৃদ্ধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, পেটের ছেলের বো,

আমিও হারানন বয়েশের বো, কত আশ্রয়ের ঘন, কিন্তু তোমার ত এখানে থাকা হবে না বাছা।

—কেন হবে না মা?

—তিনি থাকলে যা ভাল বুজেন, করতেন, তিনি নাই, আমি ত এই আশ্রয়ে-বিশ্বাস।

ছাত্রের মনে একটা সন্দেহের কাল মেন উঁকি মাটিতেছিল, বলিল, ইয়া মা, ঠাকুর কি বলে গেছেন—

বৃদ্ধা কহিলেন, না বাছা, তিনি কিছুই বলেন নি। আর বলবেনই বা কেন? তুমি বড়লোক জগদাধারের মেয়ে, তুমি যে কোনদিন আমার এই ঠুঁড়ে-থব পা রাখতে আসবে, এ কি কোনদিন কেউ ভাবতেও পারে বাছা।

ছাত্রা গায়ে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমি আপনাকে কাছে থেকে আপনার দেখা করব না কেন মা?

বিশ্বাস নিরুত্তর। নীরবে নতমুখে বলিয়া পরশের শিরে হাত খুঁটতে লাগিলেন। একটি একটি মিনিট এক একটি ঘণ্টার নত নীরব মনে রইতেছিল।

ছাত্রা ডাকিল, মা!

বিশ্বাস ব্রাহ্মকে চক্ষু মুছিলেন মাত্র, কণা কহিলেন না।

ছাত্রা তাহার পা চাপিয়া ধরিয়া আবার ডাকিল, মা!

ছাত্রের মনে আরও একটি সন্দেহ লাগিয়াছিল, বলিল, আমার বাবা-মা ব্রাহ্ম-পন্থার, তাইই কহে—

বৃদ্ধা কহিলেন, না বাছা।

ছাত্রা এবার প্রাণপণ বলে পাভড়ীর পা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তবে কেন আমি আপনার দেখা করতে পার না মা? —বলিতে বলিতে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

এইবার বৃদ্ধা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; বলিলেন, মা, মা, রাজলক্ষী আমার! আবার কহে থাকবি, কি থাকি না? কোথেকে তোকে জব্বলা হুঁহুটো খেতে দেব মা? ঐ একরকমি ছেলে যাদের মধ্যে পনেরো দিন একবেলা আঁখ পেটা খেয়ে কোন গতিকে বেঁচে আছে; অর্ধেকদিন এক আঁখলা খুঁড়ি বাছার পেটে যায় না। দু-মাস ছেলের প্রাণ সহজে বার হয় না, তাই আজও বেঁচে আছে, নইলে কবে আমার কাঁকী দিয়ে পালাত। তুমি এত কষ্ট করতে পারবে কেন মা?

—আমি পারব মা।

—না বাছা না। সে আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। বাপ-মার নিদি, তাঁদের কাছে থাকবে না। না খেতে দিলে পরের বাছাকে আমি মারতে পারব না।

ছায়া চোখে কল ভরিতছিল। অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, না মরতে হয়, তিনজনকে এক সঙ্গে মরবে; আপনাদের কাছ থেকে আমি আর কোথাও যাব না। মা, আমি অনেক শিরকাজ জানি, কলকাতার অনেক প্রাণবীথে আমার শিরকাজ অনেক টাকার ভিত্তি হয়েছে, তার কিছু টাকা আমার কাছে আছে, তাই দিয়ে আমারের কিছুদিন ত চলুক; তার পর তিনি এলে—

বিবধা দুইটি ব্যাকুল, বিস্তারিত নবন তুলিমা তাহার পানে চাহিলেন।

ছায়া বলিল, তিনি এলে আমাদের আর ভাবনা কি ?

—নক ! সে কি আর আসবে ? তেমন বসন্ত আমার নয় বাছা !

—হ্যাঁ মা, তিনি আসবেন। আমারকে আসবার পরচের টাকার ভিত্তি লিখেছেন, আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।

মরণোন্মুখ রোগীও যেমন মকরজ্বর প্ররোপে চন্দন করিয়া উঠে, এই কথাগুলিতে বুঝাও সেইরূপ উন্নতি হইয়া উঠিলেন। অকস্মাৎ দুই বাছ প্রসারিত করিয়া পুষ্পবৃক্ষ বৃক্কের মধ্যে টানিয়া অম্ল প্রবনে অতিথিক করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ মা, মতি করে বল, নক কি আমার আবার আসবে ? আসবে ?

—হ্যাঁ মা, আসবেন।

বুঝা চিত্তিত মুখে কহিলেন, তবে সে তুমি সে যেম বিয়ে করেছে। মেয়ে নাকি কামজপ-কামাখ্যার গোপিনী, ফাটকে ছাড়ে না।

ছায়া নিজের মনে যে স্বেপ্নই থাক, সুখাক্ষেপ তাহা প্রকাশ করিতে সে পারে না; বলিল, না মা যেম বিয়ের কথা দিখো। তিনি আমাকে চিঠি লিখেছেন—

—কবে আসবে লিখেছে ?

—তিন সপ্তাহের মধ্যে।

—তিন সপ্তাহ—ক'দিন বোমা ?

—একশ দিন মা।

—একশ দিনের মধ্যে আমার হাঙ্গামি আমার ঘরে আসবে বোমা ?

—হ্যাঁ মা।

—তুমি ব্যক্তগণিত হও মা, শতপুত্রের জননী হও। নক আমুক, তার হাতে তোমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেন মা-গঙ্গার ঘাটে।

পবেণ বলিল, হ্যাঁ বৌদি, বামা নাকি গরু খায় ?

পাড়াখাংয়ের দরজাবাসী ও সংসারজ্ঞর ঘেপেটির মনের ভাব বুঝা গইতে ছায়াব বিদগ্ধ হইল না; বলিল, না তাই, হিন্দুর খেলে কি গরু খায় ?

—দেখলে ত মা ! গরু যে ভগবতী, বামা কখন তা খান ! এইবার যে বলবে তোর মাথা গরু খায়, বাই ক'রে তার মাথাটা চাটো না দিই ত আমি কি বলছি !

কি ভাবে ও কিজন বেগে চাটো দিতে হইবে তাহারই বিহঙ্গালি বিতে মিছা ভুলগল পংক মাথা খুঁটিয়া পড়িয়া গইতছিল, ছায়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কোলের উপর মাথাটা চাপিয়া গোঁড়াইয়া দিল। পরেও সামলাইয়া লইয়া দুই তুলল কণি হয়ে বস বল দিল, তাহা দিখা বৌদিসিকে জড়াইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া গহিল।

বাহিরে ইতাবসরে পল্লবানী ও বাদিনীসের চিড় কামিয়া উঠিতেছিল। পরশেণ মা তাহা বুঝিয়া অরের বাহিরে গেলেন।

পরশ বস জোরের পায়ে চাপিতে চাপিতে কহিল, আর ত আমি তোমাকে ছাড়িব না বৌদি !

ছায়াও তাহার উত্তর আননের উপর মুখ রাখিয়া কণ্ঠে মেয়ের লাগর চালিয়া দিখা কহিল, আমিই বুঝি তোমাকে ছাড়িব কেবেছ !

পরশ একটু পরে বলিল, বৌদিদি, কলকাতা থেকে আমার ভক্তে ভাল ভাল খাবার এনেছ তুমি ?

ছায়া মনে মনে কিত কাউজা বলিল, তুমি কি কি ভালবাস কেনে আমার মাথাকে দিয়ে আঙই আনিরে নেব তাই। বল-না তাই, তুমি কি কি ভালবাস ?

—আমি সব ভালবাসি বৌদিদি !—একটু খামিয়া আবার বলিল, মা'র যে পয়সা নেই, আমায় যে বড় গরীব, আমি যে কিছু খেতে পাইনে বৌদিদি !

ছায়া কামিয়া ফেলিয়া বলিল, এইবারে পাবে তাই।

ছায়া চুপ হুঁটিতে হুঁটিতে তাবিল, এই চির-অনুভূত

দ্রুতিত লিপ্তক বন্ধ। কপিত পারিলে তাহার নারী-জীবন
সার্থক হইবে।

প্রেম বালিল, বৌদিতি, এখানেও কামিনী বোহমীর
যোগানে বড় বড় রসগোমা, গজা, পাখরা পাওয়া যায়। গায়ের
নখাই কোন, বাঘ, আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি। তোমার
কাছে পরমা থাকে ত হাত না, আমি ছুই গিয়ে চাপটে বড়
রসগোমা আমি। কুন্ডি তুটো, আমি তুটো।

—কিছু তোমার যে জগৎ হলেছে তাই।

—হে! ও জগৎ আমার জগৎ! ও ত রোজ হয়, রোজ
হেতে যায়। আমি জানি কতি, ঘরে যে বিন ভাত থাকে খাই,
সেই ভাত না থাকে, যা কলম্বীপাক লেগে করে দেয়, তাই
পাট। তোমার কাছে তাহান পরমা আছে বৌদিতি?

—পরমা নয় তাই, টাকা আছে।

—পার না, তাহিয়ে রসগোমা আমি। বল ত চারখানা
গজাও আনিতে পারি।

চায়া চলিয়া বালিল, আর পাখরা বুকি ভাল নয়
মহুগোমা? তা'ও চাপটে আনবে না?

প্রেম হাসিয়া বালিল, হুঁ, তা'ও!—বলিয়া চায়ায় হাত
হাতে টাকাতা একতল ছিনাইয়া লইয়া চুটিয়া চলিয়া গেল।

প্রেমের সুখানির আবল আসে অপোকেয় সুখের মত।
অপোকেয় মত উন্নত নাসিকা, তাহারই মত দীর্ঘায়ত নখন,
গোমট মত হৃদয় বর্ণ! আর চলটি—স্ববহু অপোকেয়
মত। বিচিত্র মস্তকের মনের গতি। ঐ রূপ, পাণ্ডুর ছেলোটর
নিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যে-কাধনা, যাগর তাবনা
কোনদিনই তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া যেন নাই, তাহারই
পাইয়া বালিল এবং ঐ ছেলোটকে ভুট করিয়া সেই বহু সন্ত
মাইল হৃৎকো সোকটিকে ভুট করিতে পাত্ৰিবে তাহিরা নারী
নববলে বসী হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ছায়া তাহার শিতামাতার সহিত লজল সংস্রব বিচ্ছিন্ন
করিয়া আসিয়াছে তনিরা তাহার শক্তকী ঠানুগায়ের মনতাপের
অবধি রহিল না। বাপ-মা যে কি সম্ভাব, যে ছেলে-মেয়ে
তাঁরা না বুঝিয়া তাঁহাদিগের মনঃবহনার কারণ হয়, ইহকালে
ত নাই, পরকালেও তাহারা স্থবী হইতে পারে না।

ছায়ায় মত হুঁপলা ঘেরে যে কিভাবে বাপ-মার মনে কই মিথ্যা
তাঁহাদের ক্ষমত এক বয়ে শাখা হাতে চলিয়া আসিল, তাহা
তিনি তাহিরাই পাইলেন না।

ছায়া বালিল, নইলে যে তাঁরা আমাকে আপনায় কাছে
পাঠাতেন না মা।

—নত বাড়ী আসছে; সে এগে তোমাকে তাঁরা না
পাঠিয়ে পারতেন না। কটা দিন বৈ ত নয়, চুল ক'রে বাপ-
মার সুখ চেয়ে থাকতে হয় বাড়ী।

তাঁরাও চলিয়া আসিবার একটি ভরসার কারণ ছিল।
মা যে তলে তলে একটা ষড়্‌ঘর করিতেছিলেন, এমন কি তাহার
শিতার অজ্ঞাতে কোন উকীল কি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে তাহার
দ্বিতীয় বার বিবাহ দ্বিবার পরামর্শ ঈর্ষিতেছিলেন, বৈবাহিক
ছায়া তাহা জানিতে পারে। জানিরাই মনটী তাহার বিতৃষ্ণার
করিয়া উঠিয়াছিল। অপোকেয় উপর তাহার যে খুব মন
পড়িয়াছিল, তাহা নয়; বিবাহান্তে বর-বধূ মনো স্বাভাবিক
নিরবে যে প্রবোধের বন্ধন হুচিৎ হয়, ইহাদের তাহাও হয় নাই;
পরে অপোকেয় আচরণে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধাবও অস্ত ছিল না,
মনে মনে ছায়া যেন তাহাকে দৃঢ় করিতেও অসম্মত করিয়াছিল,
সব মত; তবু এক নারীর হৃদয় হুটী পূর্বের মতো বিবাহের
করনামারে নারীর মন সচ্ছিত হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে
অপোকেয় প্রতি মাতার নির্দম ব্যবহার কঠোর ও ক্রুর রূপ
ধারণ করিতেছিল। মা তাহার বিলাতের পরত বড়
করিয়াছেন ছায়া তাহা জানিত, কিন্তু ইহার স্তম্ভ যে কতখানি,
তাহা সেই দিনের পূর্বে সে অজ্ঞানবৃত্ত করিতে পারে নাই,
যেদিন অপোকেয় চিরিখানি তাহার হাতে আসিয়া গড়িল।
সেইদিন মনে হইল, এ জগতে একমাত্র সেই যেন অপোকেয়
অপ্রবন্ধল আর অপোকেয় জন্তই যেন তাহার এই ঘেহ, এই
জীবন, এই পুনরুত্থ, এই মণিমাণিক্য, এই রত্নালকার!
অপোকেয় সেই ক্ষুদ্র প্রবাল চাইতে তাহারই সুখ চাহিয়া
পত্র লিখিয়াছে; আর কাহারও ভরসা সে করে নাই, আর
কাহারও কাছে গাফা কবে নাই—তবু—কেবলমাত্র
তাহারই কাছে বাড়ী করিয়াছে, তাহারই মাঝে ভিক্ষাপাত্র
হস্তে লইয়া গাড়িয়াছে। কিন্তু দেব-দেবীর চিত্তায় অনন্ত
ছায়ায় মনে কেবল সেবা একখানি পটের চিত্র উদ্ভাসিত
হইয়া উঠিল। দেব-দেবীর নাম তাহার মনে নাই, তবু চিত্র

প্রাণটি পাচ মাল ৫৫ বন্ধ করিয়াছিল, তাহার ষাটের ৫৫ দিগ্নিমা আসিল।

পল্লীগ্রামে বাহারা বাল করে, তাহারানিকে সমসংসার্য নগর পরমাণু জীবনধারণ করিতে হয় না। অতিবৃত্ত মস্তিষ্ক ও পুঙ্খবে কলসী, শুভনি শাক পাথ, ঘরের বেড়ার লাউ, কিঙা, উজ্জ্বল করে। কথক নৃশি তুলসী ছুঁলে চরিত্র্য অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সহরের মেয়ে, ধর্মীর ডগালী ছাড়া শাকড়ীর সঙ্গে পাচ বাতী বেড়াইতে গিয়া লট লট করিল। সাহসের সঙ্গে তাহার নবীন বস্ত্র হইল, তাহাদের নিচুট হইতে শাকসবন বীজ বা গাফা চাহিয়া লইয়া উঠানের জমিটুকু লম্বাঘাগ করিল। কহনিকের ঘরের শ্রী করিয়া গেল।

আশ্চর্য্য নারী বন, আর ত্রুতাহনিক আশ্চর্য্য তাহাদের কৈরিক শক্তি। এট মস্তিষ্ক পল্লীগ্রামে, মস্তিষ্ক প্রকৃতিষ্ঠায়ী ছাড়াই আর না দেখিলে, তুমি পাঠক মহাশয়, কলসী করিতেও পারিবে না, কেন নারীকে শক্তিকপ্তি বলিয়া পূজা করিবার প্রথা আনাদের দেশে প্রচলিত আছে। তুমি ছাড়াই যোগ সাধনের দুঃখ-কমে সোকা-সেটিতে বসিয়া বহু-বোনা-বান্ধিত গায়ের পেশালার চূক বিতে দেখিয়াছ; আরা তাহার চরমসংসারে দিল্ট-একড ছুতার বগলান্ জাঁটিয়া বিতেছে, ইয়াও তুমি দেখিয়াছ; প্রণয় বাহার সঙ্গে মোটরে বাতুরেরদার বিলাপ ভ্রমণ করিতেও দেখিয়াছ। আর আর বেশ, পোশাক-বঃ ছায়া, বন্ধনপালায় ছায়া, যে যে কোনদিন কোনের কাপড় চড়াইয়া কাড়ুয়ে উঠান কাঁটাইতে পারে, ইয়া চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন নয় কি? প্রত্যন্তে, নিম্নাভে বাহাকে সে কোনদিন ডাকে নাই, কি বলিয়া ডাকিতে হয় তাহাও জানে না, তিনি কে তাহাও অজ্ঞাত, তাহাকেই ডাকিয়া বলে, আনাকে তুমি শক্তি দিও, তোমার কাছে আর কিছু চাহিব না। তুমি আনাকে শক্তি দিও, কোন কাজে আমি বেন অসক্ত না হই।

শাকড়ীর মুখে বিশ্বাস্যন্ত নিতাই সেট এক কথা।

—হ্যাঁ বোমা, আর কদিন বাকী হইল না?

—চ মণ্ডা, না।

—তু লক্ষ্যে কদিন বাছা?

—দুইদিন দিন না।

দুইদিন পরে ছায়া বলিল, তেরদিন বাকী না।

শাকড়ী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কতদিন আগে ত তুমি বললে তেরদিন বাকী, আজও বলছ তেরদিন। কি রকম কথা বাছা তোমার?

এ কথাই কি উত্তর ছায়া দিবে? যে প্রশ্ন করিতেছে সে যে মনি-বাগা কলী, পুত্র-বিবাহবিভূতা জননী! তাহার কাছে এক মত যে একবৎসর তুলা! কোন কৈরিক তাহাকে দস্তাবে দিত পারে?

একদিন বৈ বৈ করিতে করিতে দুইখানা মোটর বোকাই শিবিগত আসিয়া পড়িল। পিতার বর সঙ্গে আসিয়াছে। আর এক বৎসর একটী বৃহৎ সংসার প্রবেশ-বাচ্ছন্দ্যে চলিতে পারে এমন সমস্ত তিনি পিতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। বরকে কাছে বসাইয়া চায়া পিতামাতার সংবাদ লইতে গিল। তবিল, কাল রায়ে তাহারা বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন।

—ঠাং বিশেষ কেন বণু? শরীর ভাল আছে ত?

—চন্দ্রের শরীর খাপস ছিল দিগ্নিমা।

—না।

—মেব সাহেব ভাল আছেন।

একটা প্রশ্ন বৃষ্ট ভেদিয়া ছিজার উপরে তাণ্ড করিতে ছিল, কিন্তু প্রকাশ করাও সহজ ছিল না। রণু নিজেই কৌতুক চরিত্র্য করিয়া কটিল, হৃদয় কাল আলোকের গিরে আনাকে টাকা আর বন্ধ দিবে দিলেন, বললেন, তিনি বিদেশ থেকে আনাকে চিঠি লিখবেন।

প্রশ্ন কন্যার পাগল গেল, না এ শব্দে কিছুই জানেন না; বাবা তাহাকে কানাইতে ভরসাও পান নাই। চোপের কোণে কল আসিয়া পড়িয়াছিল, চায়া বলিল, ঠাকুরা রণু, হোদের খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

কিন্তু একবার নির্জন হবে এই সমস্ত শিবিগতের বাব-খানো ঠাকুরিয়া নিশ্চয়ে বাবা বাবা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল; একবার প্রাণ তরিয়া কাদিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছিল; একবার শিবিগতের মধ্যে পিতার দেহতল হৃদয়ের উত্থাপ গ্রহণ করিতে ছায়ায় বুক বেন কাটিয়া মস্তিষ্ক ছিল। পিতা তিরদিন গাফা-বক্তার সোকা, ...কখনও কোন বিধে উজ্জ্বল প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ, ছায়া বেশিতেছিল, সকল তিনিই বেহেরে প্রাণ উজ্জ্বল—নীর প্রাণোজ্জ্বল শিবিগত-রহিয়াছে।

পত্রেণ কোন্ সানত্রী অদিক ভালবাসে, কোনটি এখনই পরীক্ষা করিবে, ইহার বিচার-বিবেচনার বাহিৰ্য্যত্বই বা পক্ষিণেও বোধিদিত্ব কর্ষে। লক্ষ্যবস্তা করিতে একটুও তুলে নাই। ছায়া ভাঙের হাঁড়ীতে তল চলিয়াছে নাকি, পত্রেণ পুঙ্খ হইতে কুম্ভী করিয়া চাল বুটয়া আনিয়া হাজির। কথ-বিন ভাষার অঙ্গ হয় নাই, পেটভার অত্যাধিক হইতে তাহার ফাট্ট বুক অক স্তোভিৎ বামি বাহির হইয়াছে। শুকুই বাহির হয় নাই; বোধিদিত্ব তাহার অঙ্গে একটু ব্যাধেট পড়াইয়া দিয়াছে, আর ভিতরে প্রত্যেক শব্দের পাশে অর্থ লিখিয়া দিয়া কঠিন পাঠ লব্ধ করিয়া দিরাছে। হাঁড়ীতে তল চলিয়া বোধিদিত্ব কাপাধিগাভার গলটা আর বলিলে কথা আছে, বোধিদিত্ব পুঙ্খ চাল বুটতে গেলো বিলম্ব হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় পত্রেণ বোধিদিত্ব মানাপ্রবেশে তল গাঁটগলে। যদি লম্ব থাকে, কাপাধিগাভার পবে ত্রিশ তান উটকলেন গলটিও আতঙ্ক শুনা হইয়া যাউবে।

তবু ছায়ায় পাতড়ীকে প্রণাম করিয়া এখন তাড়াতাড়ি লগান করিতে আসিল, তখন ছায়া আঁচল দু'খিয়া একটু ঢাকা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি দিতে গেল। তবু বলিল, তেবে ত্রি-বিশি, বাও, সাংবে কিছ পাচটাকা বংশিন আগেই নিয়েছেন। এই দেখ।—তবু টাঁক হইতে একজন পাতড়ীকার নোট বাহির করিয়া দেখাটল। অপর টাঁক হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, সাংবে বলেছেন, তোমার গুহনাগুলো বিলম্বাব্যুৎক্ষেপে দিবে ভাড়িয়ে এনে যেরেচেন। আর এই টাকার তুমি হাত-খরচ কর।

আবার চোপে তল আসিয়া পড়িতেছিল, তাড়াতাড়ি হাত পাতিয়া নোটের তাড়া লইয়া ছায়া চলিয়া গেল।

পাতড়ী বলিলেন, 'এনা, অত টাকা কি যত্নে রাখতে আছে? যে দিন কাগ পড়েছে বা, চোর-ডাকাতে লুটপুটে নেবে, চাই কি প্রাণেও রাখতে পারে।

ছায়া বলিল, যা, আমি ঠাকুরগোব জগ্রে ভবি কিনব। ঠাকুরগো চাষবাস করবে।

তুচ্ছ হাসিয়া বলিলেন, কাষেত বাবুনের ছেলে লেখাপড়া ছেড়ে—

ছায়া বলিল, লেখাপড়া ক'বে ত সব হয়! ঐ যে নিমল মানা এনেছিলেন, ছ'টা পাস বলেছেন, পু' বিধান, একটা

বিশটাকা বাবনের চাকরীও হচ্ছে না। কি হবে বা, লেখা-পড়া করে? ঠাকুরগো চাষবাস করে আঁতার হালে থাকবে।

পত্রেণ এই সময়ে যত্নে আসিয়া চুকিল। ছায়া হাসিয়া বলিল, আর ঠাকুরগো'র যে বকম বুদ্ধি, তাতে ওর লেখাপড়া হয়েছে না, তা আর কথা! আসেন বা, ভাষের আধার এমন বুদ্ধি, বলে বি ইউ টি যদি বাট হয়, সি ইউ টি শাট হবে না কেন? এট বুদ্ধি নিয়ে ও আবার লেখাপড়া করবে! না যা, আপনি চাটুযো মণাইকে বিবে তদিত লছান করন, পাচগো টাকার অনেক ভবি হবে।

—বেশি বাছা!—তুচ্ছ কোলের ছেলের বিজ্ঞানীয়তার সংবোধে শুকু হইতে পাগেন নাট, তাঁহার দূর দেখিয়াই তাহা বুঝা গেল।

আরও ত্রির্দল কাটিল। প্রত্যাহে দুর্গানাম অবশ করিয়াই তুচ্ছ ভিজ্ঞান্য করিলেন, আর ক'দিন দেখি বোমা?

—আর বপলিন বাকী না!

—বোমা, তুমি কি আবার মিথো কথা বলছ বাছা?

—মিথো বলব কেন মা?

—তুমি বলছ আর বপলিন বাসেই আমার মক বাছী আসবে। তাই বলি হয়, যে কি একটা চিঠিও লিখত না?

এ কথায় কি কোম উত্তর আছে? এত প্রশ্ন কি তাহাকেও পীড়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল না? যে দিন 'কেব্রে' টাকা পাঠাইয়াছে, সেই দিন হইতে একটি তাংয়ের খবরের প্রত্যাশা অগ্রহণ কি তাহার মনও করে নাই? কিন্তু আশা ত পূর্ণ হয় নাই। স্বস্তর প্রবেশ কথায় তখনই না লিখে নয়; বলিল, বাছী ত আসছেনই, বোম্ব হয় সেই হস্তেই আর চিঠি লেখেন মি।

যত্ন চুপ করিয়া গহিলেন; কথাগুলি তাঁহার মনোপুত্ব হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, বুদ্ধিভার ছায়ায় মনও লাড়। ঘের নাই। তাই সে আবার বলিল, আর মা কাহাও খেতে চিঠি ত ডাকে পাঠান যায় না।

পাতড়ী তবুও কথা করিলেন না।

নিম ত্রিবেক পরে একদিন বিকাল বেলা অল্পত ঘোটেতে চড়িয়া প্রণবকুম্বারের শুভাগমন। কটল। তাঁহার সাংহী পোষাক, মাথার ছাট, চোপে মোটর-চপনা চেঁখিয়া চাষাব পাতড়ী লগানে সঠিয়া গেলেন; পত্রেণ আঁড়াল হইতে উঁকি

মাঝিরা গাছেরকে দেখিতে পারিল, সামনে আসিতে তাহা ব
নাহলে কুলাইল না।

তাহাকে দেখিয়া যে জীবনকে ছায়া বহুদূর পক্ষান্তে
দেলিয়া আসিয়াছে, এক বৃহৎ তাহাট প্রকাশ হইল।
সঙ্গে সঙ্গে বন চাবুক খাইয়া উঠিয়া পড়িল। তবুও, সংসারের
চলন নিরুপ, হাদিহুপেই আগন্তকে অভ্যর্থনা করিয়া
দাঁড়িতে হয়।

ছায়া প্রথম মাঝিকে চা করিয়া দিল; বলিল, প্রথম মাঝা
ত এমনি বাজ না, রাতে খাবার ক'রে ঘেব, ঘেবে থাকবে।
কেমন?

প্রথম বলিলেন, সে হবে—হবে! তার কক্ষে বাত হতে
হবে না। আমি বলছি কি সোতার বনবাস শেষকৃত্য করে?
ছায়া হাসিয়া বলিল, বাতস্ত্র কিরণেই।

প্রথম তাহাশব্দকে ঘেবে করিলেন, সে আর কিছেছে!
ছায়াব দুঃখানি শুকাইয়া গেল। বলিল, না কেমন,
বনবাসেই জীবন কাটবে।

প্রথম বলিলেন, বা-বা, কোঠামো করতে হবে না।
এখানে কখন ভক্তলোক পাগকে পাবে?

ছায়া হাসিয়া বলিল, ভক্তলোক পায়ে না, আমরা পারি,
প্রথম মাঝা। দিন পনের ত হয়ে গেছে, কেন, বেশ ত
আছি। কিছু মক দেখছ? মেঘেরাভূষ হয়ে অঝোত দি,
যত-যত কি জিনিষ, জানতে পারতে!

এবার বলিলেন, কথামালা দুইয় পথ ধরিতেছে; তিনি
মোত গুয়াইয়া লইয়া বলিলেন, চল ছায়া, একটু বেড়িয়ে
আসি।

—কোথায় যো?

—এই কাছাকাছি কোথাও। গাউঁ বৃকে বেশদিন
কাছেই লগ্ন্যয়। লগ্ন্যয় জানি ত? সাতর্গা রে।
বাগলা বেশের প্রধান বন্ধ ছিল লগ্ন্যয়! বাতাকী, গুণ
—এ লগ্ন্যয় চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। চল বেশে
আসি।

ছায়া গুটি গাভ বন্যারের ভিত্তিতে মাঝার ঠেকাইয়া
কহিল, কক্ষে কয় প্রথম মাঝা, এ তোমার কলকতা সরর নহ
যে, মেঘ-পুঙ্খ এক সঙ্গে যেটির বেড়াতে যাবে! এখানে

সাতর্গুরের আগে স্বামী-স্বী বনোও দেখা হওয়ার নিয়ম
নেই।

প্রথম তাচ্ছিকের হাসি হাসিয়া বলিলেন, যে নিয়ম
পাড়ারঘে কুতবের কত।

ছায়া বলিল, আমিও সে কুতবেরই একজন হয়ে গেছি
যে প্রথম মাঝা।

—তবে চল, কলকাতা যুব আসি। কতকদই বা
লাগবে? চাব পাঁচ ঘটায় মধ্যেই কিয়ে আসব। বস
এবদ, বাবা-মা নিতে পারিয়েছেন।

—জীয়া ত এখানে নেই, প্রথম মাঝা।

—নাই বা পাগল, ঐ বলে কখনে থাকিও ভ্রাইত করে
আসি। কতদিন এক সঙ্গে বেড়ান হয়নি বস।

ছায়া কদমকটে কহিল, বোহাই প্রথম মাঝা, আর আমার
ওসব কথা বল না, তোমার পায়ে পড়ি।

প্রথম বলিলেন, লক্ষ্যটি, চল।

—সাত মোহাই তোমার! আমার মাগ কর। অতি
কটে কলকাতাকে তুলেছি; আর আমার কলকাতার কথা
মনে করিয়ে দিও না। আমি বেশ আছি প্রথম মাঝা।

—বেশ আছ কেমন তা আর দেখছি নে! কাপড়ে
এক গামা হপুদের মাগ, পায়ের নোচে একবাগ লুল কালি,
হাতে ওসব মাগ কিয়ে? তা'থতে হয় বৃষ্টি?

—তবু তা'থতে? প্রথম মাঝা, আমার একটি গক আছে,
যে ঘেবে সঙ্গ থাকে, তা'কে গোয়াল-ঘর বলে জান ত? সেই
গোয়াল-ঘর আমি নিজের হাতে সাক করি; পুঙ্খপাথে বসে
বালন মাতি। আমার শাত্তী একা, বুড়া নাকুল, সব
কাছই আমি করি। বলিয়া ছায়া হাসিল।

প্রথমমাঝার বিস্তৃত হইয়া কহিলেন, তবু বদলিও বেশ
আছি?

—সত্যি প্রথম মাঝা, সত্যি বেশ আছি। কলকাতার
ছায়া কি আর আছে? সে হবে গেছে, এখন যে আছে
সে এই কুতবের পেশের ছায়া।

—ও সব কোন কথা আমি শুনি না। যেতেই হবে,
চল। বলিয়া থপ করিয়া ছায়াব একটা হাত ধরিয়া
কেলিলেন।

ছায়া কিছু মাত্র বলপ্রয়োগ না করিয়াও হাতটী ছাড়াইয়া
লইয়া বীরকর্ত্তে বলিল, প্রণব মানা, তুমি যাও।

ঔহাঃ আরক্ত মুখ, নৃশিখ নয়ন, তীব্র স্তোত্র মিঃখাল,
শীত বস্ত্র, ঔহাঃ কৃত নক্ষত্রাশ্রম দেখিয়া বৃহত্তের জন্ত ছায়া
নতুড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। আশাও মনুষ্য মনোই আপনাকে
সংবত করিয়া গেল।

ছায়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পরেণ্ডক ঢাকিয়া বলিল,
ঐক্লেশে, মাঝে বল, প্রণব মাঝা বাজে, ঔহাঃ নমস্কার
করেন। বরজার পাশে এসে গাভাতে বস।

পরেণ এক মিনিট পরে বলিল, বৌদিদি, মা এসেছেন।

প্রণব না গাভাটলেও, ছায়া বলিল, মা, প্রণব মাঝা
এশান করছেন।

পরেণ বলিল, মা আশীর্বাদ করছেন, শৌখিনি।

প্রণব শুখনও মীমবে বলিয়া ছিলেন; ছায়া নিরবধি
বলিল, আর বেরী-ক'ও না প্রণব মাঝা!

প্রণব রাগে ফুলিতেছিলেন। এতদ অবস্থায় গংগন করাই
স্বাভাবিক। বলিলেন, তুমি কি কোন দিন একলা একলা
আমার সঙ্গে রাগে গড়ের মাঠে ঘোড়ায় বেড়াওনি ছায়া?
আজ হঠাৎ প্রাকারী করছ যে বড়!

ছায়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, প্রাকারী নয় গো মনাই,
নয়। এটা যেমন কলকাতা নয়, এ ছায়াও ডেমনাই দে ছায়া
নয়। হাতিম লোক, এটা বোক না কেন?

প্রণব অলপ ফুলিবৎ কক পরিভাণ করিলেন। ছায়া
লম্বত উত্তান কাড়িয়া ফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া
বলিল, আশার কথা কর প্রণব মাঝা।

প্রণব ভিত্তিা চাছিল; আশার ভরসাও ঔহাঃ মুখ
প্রকাশ হইল। ছায়া বলিল, বড় কথা বলে কেলেচি, ঔহাঃ
কল্পে মাপ চাইছি। প্রণব মুখ কিরাটরা ঘোড়ার ঘার
পুড়িয়া ফেলিলেন।

ঘোড়ার ঘিরায়া এক রাশ হেলে কলকাতা করিতেছিল,
প্রণব ইংরাজী গালাগালির তাহাখিনকে আক্রমণ করিতে
তাহাও যে যেমিকে পাবিল পলায়ন করিল। তিনি গাভীতে
উঠিয়া গাট দিলেন।

ছায়া হিজায়া করিল, প্রণব মাঝা, ইন্দ্রের খবর-কান?

প্রণব কি ভাবিলেন কে জানে। বলিলেন, কানবার
মরকার দেখি নে।

—বিমল দার?

—কে বিমল-দা? ওঃ, সেট ঘেঁটেটার লাভার!

'গোল্ড' (লব বসমাঙ্গ)?

গাভী চলিয়া গেল।

পরেণ প্রকাশ হইয়া বলিল, বড় রাগী লোক উনি, মা
গৌদিদি?

ছায়া হাসিয়া বলিল, মাঝেবী পোখাক পরাইতে লোকের
রাগ বাড়ি তাই।

পরেণ চিত্তা করিয়া বলিল, মাঝা যদি বিশেষ কোক
মাঝেবী পোখাক পরে আসেন?

—আমি আগে বুঝি পরাব, তবে অল্প কথা!—বলিয়া
হাসিয়া, পরম বেগে ঘেঁটেটির গলা জড়াইয়া ফরের মধ্যে
চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কলকাতারের চিঠি পড়িয়া ডানকান সাহেব মহাদামদে
অতর্কিত করিয়া বসাইয়া বিমলকে কহিলেন, তুমি এম-এ,
বি-এল পাশ করিয়া ক্রমিকার্থে অগ্রবাসি হইয়াছ ইহা অতীব
শ্রমের বিষয়। তুমি যে-কতলোকের পত্র আনিয়াছ, তিনি
আমার বিশেষ উপকারী হুজব। ঔহাঃ অক্লান্ত রক্ষিতে
পারিলে আমি নিজেও শোভাপ্রদান মনে করিব। তুমি আমার
কাছে অকপটে বল, ক্রমিকার্থে যেজন কারিক প্রদ করিতে
হব, তাহা কি তুমি পারিবে? আরও এক কথা, বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যেজন কারিক প্রদক পুণা
করেন ও কারিক প্রদকীসের নিরন্তরের লোক ভাবিয়া
অপারকের করিয়া রাখেন, তুমি কি সেই অধিকার ও সংস্কার
দূর করিতে পারিয়াছ? তুমিই হইলাম, তোমার
দিক্কাতিমান নাই এবং অমাব মনও কুলাকাঙ্ক্ষা নহে।
কিছ আরও কথা আছে। তুমি দ্বন্দ্বত জান না, বস্তমানে
তোমাদের বেশে ক্রমিকার্থের সুনই প্রদখা যে, বাহ্যিক
জাত-কৃষক, ক্রমিকার্থে তাহাওই উদয়ের অধের দখ্যান
হইতেছে না। তাহাদের অভাব সামান্ত, আকাঙ্ক্ষা অল্প,
প্রয়োজনও বৎসামান্ত, উদ্বৃত্ত তাহাও তাহাদের অভাব,

আজ্ঞা ও নিয়ম-প্রণালী প্রণয়ন সংস্থান করিতে পারিতেছে না। কৃষির এই দুঃস্বভাব ভ্রম-লজ্জানেন্দ্রা তাহাদের অন্তঃকরণের উপর ক্রিয়াকার্য হইতে করিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শনি বল, আমি এক কবে কেন করিতেছি। আমি তাহাও উত্তর দিতেছি। ভূমি বোধ হয় মান না, আমি গবর্ণমেন্টের চাকর্য করিতাম, যদিও খোটা ছিল, এখন বাসা পেলাম নাই, তাহাতে আমার একার সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। ব্রী অর্থে গিয়াছেন, একটিনা পুত্র আশ্রয় হইতে প্রাণ নিরাশে; দুইটি কন্যা ছিল, তাহারা তাহাদের স্বামী-পুত্র লইয়া উত্তরাংশের চৌর্য কখনও তারতে, কখনও চান্দনায়, কখনও আক্রেপিয়ায় ভ্রমণ বেকাইতেছে। তেঁহে আমার বল-বাড়ী নাই, আত্ম-স্বজনও নাই; বুড়া হইয়াছি, অট্টাল বৎসর বয়সে তারতবর্ষে আসিয়াছিলাম, অট্টাল বৎসর বয়স হইয়াছে, পঞ্চম বৎসর ভারতবর্ষে—বাঙ্গালদেশে কাটাইয়াছি, এই দেশেই ভাল বাসিয়াছি, এ দেশও আমার ভাল বন্দিতা; এর ভল-হাওয়া বুড়া হাড় বেশ লজ্জ হইয়াছে, এ দেশেই থাকিয়া গিয়াছি। পেঙ্গন লইয়া যদি চুপ-চাপ বসিয়া থাকিতাম, বাতে ধরিত, অস্থির পড়িতাম, হয় ত বা অগম্যে যাত্রা হইতাম। সমস্ত ভাবনটা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াছি, এখন একবারে নিষ্কণ্ট থাকিতেও পারিব না তাহা। সামান্য খা-কিছু লক্ষ ছিল তাহা দিয়া হৃদয়বলে মনি কিম্বা চেষ্টা করিতে পারিলাম। পেন বৎসর এই কাজ করিতেছি, পাত বে কিছু না হইতেছে তা'ও নয়; তার উপর পেঙ্গন আছে, একলা লোক, বেশ চলিয়া যায়। বৎসরের শেষে আর-বারের দিবার-বিকাল করিয়া বাহা আমার লাভ হয়, অর্থাৎ বাহা উৎসৃত থাকে, তাহা এখনকার পরীষ গণ্যমান্যের বাক-বানে, বয়ে বরচ করি। এসপের পরীষ প্রমোদীয়া বড় ভাল, বড় লয়ল। আমি তাহাদের কতটুকু উপকারই বা করিতে পারি, তাহারা আমাকে কিছু লোকজন করে। সেখ, আমি যদি পাত্রী হইতাম, এই পাচ সাত পত বাঙ্গালী-বিশ্ব-ভ্রমণ-পরিষায়কে একদিনে বীজপুত্রের উপাসক করিয়া কোমিতে পারিতাম। চতুর্থ বিষয় আমি পাত্রী নহি। সেই ক্ষুদ্র হিন্দুধর্মী এ-বাক্য এখানে বাচিয়া রহিল।”

। বলিয়া সাধে হাসিলেন।

“ভূমি ভাবিও না আমি তোমাকে একবারেই হত্যা করিয়া দিতেছি। আনো অহা নহে। তবে সকল বিষয়ের সহিত আমি তোমার পরিচিত করাইতে চাই। সব ভবিষ্য ক্রিয়াকার্যে অবহিত হইলে, আমি সানন্দে তোমাকে আমার সন্না ও সহকর্মী করিয়া লইব। আগেও অনেক বাঙ্গালী যুবক আমার কাছে আসিয়াছে, তাহাদেরও সব দেখাইয়াছি, বুঝাইয়াছি, জানিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের বিরস আনন, পাণ্ডুর বেস দেখিয়া আমার কত কষ্ট হইয়াছে তাহা বলিবার নয়; কিন্তু কি করিব বল? খোটা যদিও দিয়া কর্মচারী রাখিবার সামর্থ্য আমার কৈ? আমি আপা করি, ভূমি পূর্ববস্ত্রিগণকে মহাজন ভাবিবে না এবং তাহাদের অস্থির পণ্ডকই একবার পণ্ডা বিবেচনা করিয়া হৃদয়ে অভিসম্পাত দিয়া চলিয়া যাইবে না।

“কাজে নাহিয়া দেখিলাম, দেশের শিক্ষার আশু পরিবর্তন সাধিত না হইলে দেশের অবস্থা উন্নত হইবে না। তোমাদের মধ্যে অনেকে আইন শিখিয়াছে, বিজ্ঞান শিখিয়াছে, সাহিত্য শিখিয়াছে, কিন্তু চাকরী না পাইলে তোমাদের লব্ধ বিজ্ঞা নিমল। গবর্ণমেন্ট তাহা দেখিতেছেন, তোমাদের বিশ্ব-বিজ্ঞানবির কর্তৃত্বও তাহা দেখিতেছেন; তাই যে তাহারা শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন করিতে চেষ্টা হইতেছেন না কেন, তাহা আমি জানি না। আমাকে যদি এক দিনের গুপ্ত শিক্ষাবিভাগের হিটলার কি কুলাগিনী করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি কি করিব জান? আমি প্রথমই তোমাদের আইন-বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-বিজ্ঞানগুলির দ্বারা ‘টু লেট’ (To Let) বাড়ী-ভাড়ার স্বেচ্ছা আটখা দিব। ভূমি হাসিও না, আমি বলিতেছি, ভারতের মুক্তি ক্রিয়; কৃষি ছাড়া ভারতের মুক্তি নাই। তবে কৃষি এখন যে ভাবে চলিতেছে, সে ভাবে নয়।

“আমি আগেই বলিয়াছি, আমাকে তোমরা হের হিটলার বা দিনর মুসোলিনী করিয়া পাও, আমি অশেষ দিব সরকার ও দেশের লোক মিসরা দেশের দত্ত নব-নবী আছে, সব কাট, সব নব-নবীতে সারা বৎসর বাহাতে মল থাকে, তাহা কর। নদীর জলের রস না পাটলে জমির উর্বরা-শক্তি কখনও বাড়িতে পারে না। মাও সমগ্র দেশের চাষীর এই যে দারুণ দুর্দশা, জমির উৎপাদিকাশক্তি কমিয়াছে

বসিগাই না তাহা হইয়াছে? আমার তৃতীয় 'কাগজট'—
 আমি হইতে খনিজ পদার্থ লব্ধ ত্রোণা বহু করিতে হইবে।
 কখনো আমারের কাজ কি! বেশে বন-ভরণের অভাব
 নাই, মাল্যের কাঠের অভাব হইবে না। কি কাজ থাকা
 থাকা সেবার? সেবার কর্ত্তব্য-প্রণালী দিয়া বাড়ী তৈয়ার
 না করিলেও চলিবে। সন্ধ্যাক আমার মত তাকাত্তি-ব্রত
 বাস করিতে হইবে: তাহা হইলে অল্প-বিশ্রাম কম হইবে।
 তুমি বিবাহ করিবে কি না জানি না, বন-বহুর এত
 কুৎসে গর বাস করিয়া আমি সেতপ অক্লান্ত বাহ্য উপভোগ
 করিতেছি, কখনে আর কোন দিন তাহা করি নাই।
 পনি হইতে কোয়াদিন, পেট্রোল তুলিবারই বা কি প্রয়োজন!
 ত্রোণের তৈল কি গরুর অঙ্কুরের পুত্র না! রাত্র, তুমি কি আমার
 উদ্ভাব তাহিতেছ? না! হুত্বান। অবশ্য উদ্ভাব বসিলেও
 আমি রাস করিব না। সত্যই, এসপের অগাধতা possi-
 bilities আর লোকের উদ্বাসিত ভাবিলে আমার মাথা গরম
 হইয়া উঠে, আমি উদ্ভাব হইয়া পাই। এসপের মত possi-
 bilities আর কোনও দেশে ছিল না, আজও নাই। এম,
 আমি তোমাকে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই।

“এই মাগ—ভারতের মানচিত্র। এই তোমার বামালা
 বেশ। কত নদী বেধিতেছে? নদীগুলির উৎপত্তি-স্থল,
 বিমান্য। বিমান্য-লক্ষিত বৃষ্টির ভলগায়া বৃক্ষে মরগা নদীগুলি
 বামালা বেশকে চিত্রপতালিনী করিয়াছিল। তাই বামালা-
 বেশ ভারতের, আর ভারত সারা ভূপৃষ্ঠের নিকট অঙ্গপূর্ণ
 হইয়াছিল। কালে নদীগুলি শুষ্ক, হস্তিভা-বস্তিরা শেষ
 হইয়া গিয়াছে, কথিরা সন্ধ্যা বেশও ‘কুস্মে গিয়াছে’ (gone
 to dogs)।”

একটি ঘটপুটকার বেশ কুস্মে মায়েবের চেয়েবের পাশে
 বসিয়া কিম্বাইতেছিল, dog দলটি কানে বাইগামার তাহার
 কান হুইটা বাড়ী হইয়া উঠিল, সে-ও গাড়াইয়া উঠিল।
 মায়েব কুস্মেবের কাছের কাছে টানিয়া দিয়া তাহার পাশে
 হাত বুলাইয়া আবার বসিতে লাগিলেন।

“তোমরা আমাকে ডিষ্টেটের করিতে রাজী আছ? যদি
 রাজী থাক, বন, আমিও অস্বীকার করিতেছি, বন বৎসরের
 মধ্যে সেসের অল্প ভগ্ন করিয়া দিব। তবে গোড়াতেই বলিয়া
 রাখি, সন্ধ্যাক ভরক হইতে হইবে। তোমাদের বেশে ক্রমিক
 হওয়া অসম্ভব ত নিবারণ ছিল না। আমার এক বামালা বহুর
 কাছে ভনিয়াছি, অমোঘ্যার রাণী, সীতার বাবা রাজা ভরকও
 নিজে হল কর্ত্তব্য করিতেন। ইহা কি সত্য নয়? যোগ্য হয়
 আমরা আমাদের বেশ হইতে যে শিক্ষা ও সত্যতা আনিলাম,
 তাহাও সন্ধ্যাক তোমাদের বিস্তৃত অধিবাস দািল।

“খাদ্য, বাজে কথা অনেক হইল। এবার কাজের কথা
 হউক। তুমি এখানে থাকিবে?”

বেশপাশি, দিগন্তবিহীন তমসাবৃত আকাশের একপ্রান্তে
 রক্তিম অশ্বপাচা গলিত্ত্ববান হইতেছিল, বিঘল বেন তাহারই
 পাশে তাহিরা বিমূঢ় হইয়া বসিয়া ছিল। সাহেবের প্রবেশ
 লক্ষিত হইয়া বসিল,— থাকি।

—বেশ। তোমার আমি চাকরী দিব না, দিতে পারিব না,
 কাজেই বাহিনীর কথা উঠিলে না। তবে তোমার গখন বা
 বরকার, তাহা তুমি পারিবে। গ্রাম, তুমি বিবাহিত?

—আজও নয়।

—বিবাহ করিবে না?

—করিব।

—নাই বা করিলে?

—আমাদের ধর্ম্ম পাইয়া-বর্ষ শ্রেষ্ঠ। শুধু তাই নয়,
 আমার মা আছেন, তাহার মতেই আমার মত। তিনি জান,
 আমি এখনই বিবাহ করি।

—নাগর্য্যটকে কি?

—বিক্রেয় বাহা পাইব।

—ঐখানে তোমার সঙ্গে আমার মিলিবে না। যথেষ্ট
 নিতপানী না হইয়া বিবাহ করা আমবা যোগ্যের অগ্রহ অনেক
 করি।

বিঘলকে নীরব বেশিরা, মায়েব বসিলেন, নিজে দুঃখ-কষ্ট
 করিতে পারি, কাজেক্ষে কৌন কাটাতেও পারি, কিন্তু যে
 মরগা হুইটা নারীটি আমার কৌনের লক্ষনী হইয়া আসিবে,
 তাহাকে কষ্ট দিবার, দুঃখ দিবার কি অধিকার আমার আছে
 বন? ইহা যোগ্য হয় তুমিও স্বীকার করিবে, নারীসেব মগ
 অধিক, আকাশাও অধিক, তোমার অর্ধাভাবজন্য তুমি যদি
 তাহার কোনটাই পূরণ না করিতে পার, সে কি স্থানী হইবে?

বিঘল সাহেবের প্রবেশ উত্তর দিল না বেশিরা হাসিয়া
 তিনি আমার বসিলেন, আমি বৃহিতোচি, বিবাহ করিবার প্রস্ত
 তুমি লাগানি। তোমাদের দমাকে ত পূর্ণমাগ অধিবাস
 প্রকৃতি নাই ভনিয়াছি। তুমি বাহাকে বিবাহ করিবে,
 বিবাহের পূর্বে তাহাকে জানিবার বৈধবার হুমো তোমার
 নিশ্চয়ই হয় নাই!

বিঘল হাসিল।

—হাসিলে যে?

—আমার বেশা ঘটনা অল্পতপ।

—অর্থাৎ, তোমার সঙ্গে তোমার জীব-বৃদ্ধি আর
 আছে? তোমাদের দমাকে উত্ত হইতেছে সেগিতেছি।

—বিঘল বসিল, উচ্চি-অবনতি বৃষ্টি না, তবে আমাদের
 দমাকেও ছেসেরা এখন বিতপালী না হইয়া বিবাহ করিতে
 চাহ না। আমের আমাদের দমাকে এতদ ছিল না। বৈশ্বের
 বা কৌনের প্রাকৃতিক গঠনধাতাই পিতৃধাতার আমনে
 ছেসেরা বিবাহ করিতে কিছুমাত্র থিমা করিত না।

স্বাভাবিক বিন্দু, তাহার কারণ ছিল। তোমাদের দেশে
যাদের অতীত কোনদিন ছিল না। তাই তিনিও, এক-
একজন পুরুষ মন বিপত্তা বিবাহ করিতেও চাইত না।
তোমাদের দেশের আর্থিক দুঃস্থতা যেমন কষ্ট, সেখানে বিবাহ
সংক্রমে আবার সেই পূজাবতী ক্রিয়া আসিবে। “পলিগেমী”র
সাধনে তোমরা সত্যকে হাসিয়া দেয়াছ।

সেহেব এক ঘিন্টি পাখি পুনরায় বিন্দু, বেধ বার,
তোমাদের এই দেশকে আমি নিজে করিয়া লইয়াছি।
আমার মনে হয়, এই দেশও আমাকে আসন্ন করিয়া লইয়াছে।
এখন এই দেশ ও আমার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক
শুধুনিহা—দেশের উন্নতিতে আমার উন্নতি, দেশের
অনুন্নতি আমার অনুন্নতি। আমি সেই ভাব লইয়াই সমস্ত
দমলার সম্মুখীন হইতে চাই। আমার মে কক্ষে তোমার
মত বসন কক্ষের সংযোগে পাইলে আমার আনন্দের
সীমা থাকিলে না। তুমি আমাকে কথা দিয়াছ, আমার
মত কাম করিবে। তবে হইতে যোগদান করিবে বল ?

বেধ বলিল, আমি চাই তিনদিনের মধ্যেই আসিব।
কলিতার আমার একই বিশেষ দরকার আছে—

সাহেব বিন্দু, প্রেমছিন্তার নিকট বিবাহ লইতে চাইবে
ত ?

বেধ হাসিল, হাসিল, কতকটা তাই। আমার মাকেও
হাসিলে আসিতে হইবে। আমার মায়ের অনুমতি না লইয়া
কোন কাজ করি না।

—তোমার মাতৃভক্তি যেখান দৃশ্য হইল। বালক,
তবু তোমার মতল করিবেন।

সাহেব দৃঢ়তার সত্য করদমন করিয়া বিসর্গ দিলেন।

ভাবন—বে জীবন এতদিন অনিচ্ছিত অজানা আত্ম-বাঁকা
পথে চলিতেছিল, যাহার কোন একটা স্থির লক্ষ্য ছিল না,
সেই জীবন একটা গম্বুজ ঘাসের সজান লাভ করিতে চলিল
কিন্তু কল্পে বিঘল সুখালুপ করিতেছিল। বৃদ্ধ সাহেবটির
প্রতি প্রথম সন্দেশে তাহার চিত্ত অবনত হইয়া পড়িয়াছিল।
বিশেষ মাহুতি এই দেশের বঙ্গচিহ্ন। বঙ্গধর্মী করিয়াছেন,
যেদের কল্পন লোক তাহা করিয়াছে ? দেশের কথা অর-
বিশ্বের কথাই ভাবে মতা, দেশের উন্নতি-অনুন্নতির সঙ্গে
যাযাবরতারই স্বপ্নের ছাঁই একটু তার যোগদানে বাধা থাকে
মতা, চিন্তাশীল সাধক না হইলে মাহুতের চিন্তাধারাকে কার্য-
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে কেহ পারে না, বাধা তারেও কভার
উঠে না। বিশেষ সাধক ভাষাসেবাই একজন, তাহার
চিন্তাকে পথ দেখাইতে পারেন, তাহে কভার বিতে পারেন।

কলিতার আসিয়াই বিঘল ইন্দ্র পত পাইল। পর
কৃত্র, এইজন্য :—

আমরা তবুবার লক্ষ্যে সেই একজিবিদ্যে
যাইব।

একজিবিদ্যে-প্রাণে সাফা হইল। কপা নাগরবোলা
তলিতে গেল। বলিয়া গেল, পুরা একটা ঘটা হুদিনে।
ইন্দ্র বলিল, এইবার বল।

—কি বলব ?

—কবে আমার তোমার কাছে নিবে যাবে ?

বিঘল নীরব।

ইন্দ্র বলিল, না যে কি কাণ্ড করছেন কি বলব ! মোক
পাচ লাভ দল লোক আমার দেখতে আসছে, ঘটক-ঘটকীর
ডিড়ে বাড়ীতে তেঁরান দায় হয়ে পাড়িয়েছে। এ আর আমার
সহ্য হয় না। কাল একজনকে লেগে গেছে, তাবের সামনে
বার হতে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গেছে, তাহা এই
অজ্ঞানেই দিন টিক করতে চায়। তার আগে—

—কিন্তু ইন্দ্র—

—তোমার পায়ে পড়ি, আর তুমি কিছু কর না।

—কিন্তু একটা—

—তুমি যদি বল, আমি প্রেমের বাস্তুকে ধরে এখনই তোমার
একটা কাজের জোপাক করি।

—না।

—কি বোঝ ?

—তার মত লোকের কাছ থেকে উপকার নিতেও আমার
প্রবৃত্তি হয় না।

—কিন্তু যদি এই অজ্ঞানে তরা—

—দিন টিক করে ? বেশ ত !

ইন্দ্র বুকে ছাঁৎ করিয়া উঠিল ; বিঘলের মুখের পানে
চাহিয়া দেখিল—না : বিঘলের স্বপ্নের সুখধানি অন্ধকার
হইয়া গিয়াছে। সেখান তরঙ্গ পাইল, আত্মকলকটে বসিল,
কি করবে বল ?

—গোম ইন্দ্র, তোমার বলি। আমি স্কন্ধবনে চাষের
কাজ করতে থাকি ; এক কথাই থাকে বলে চাষ হতে থাকি।
চাষের কৃষ্ণে অরে তোমার মত ইন্দ্রাণিকে নিয়ে যেতে আমার
প্রাণ চায় না ?

—ও কি ? না যে ! উঃ, না একবারে গোয়েলাগিরি
করেছেন :—না না, তুমি যেও না। বা হুহ আছই একটা
হবে থাক, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেও না।

তাহার আর্ন্ত আত্ম কষ্টের লোক-কোলাহলে বিলীন
হইয়া গেল। ফিরিয়া চাহিতে বিঘিত দৃষ্টিতে দেখিল, নিকটে
অথবা দূরে বিঘল কোথাও নাই। [ক্রমশঃ]

বিত্ত-সাধেই স্বাক্ষর উক্ত শব্দের-ঘটনা সেপেনে মাই।
এ-এ গুড্ডি-সাধেই যুগে তিনি ইহা গনিয়াছিলেন তার।
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গুড্ডি-সাধেই মেডিক্যাল কলেজে যে
বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি উক্ত ঘটনার কথা
বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থানে বর্ণনা রাখা উচিত যে, শব্দের-
ঘটনার ১২ বৎসর পরে গুড্ডি-সাধেই এই কথাটা উল্লেখ
করিয়াছিলেন। গুড্ডি-সাধেই মনুস্মৃতি প্রথম শব্দের-
কর্তা বর্ণনা করিয়াছেন। শব্দের-ঘটনার ১২ বৎসর পরে
এখন গুড্ডি-সাধেই এই কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তখন যে তাহা
দ্বন্দ্ব ছিল না, ইহা বিস্ময় বোধ হয়।

মন্ট্‌ব্রামলি ব্রামলি (Mountford Joseph Bramley) মেডিক্যাল-কলেজের সর্গ-প্রথম প্রিন্সিপাল (First Principal) ও ডক্টর-সাহেব তাঁহার সহকারী অধ্যাপক (Assistant Professor) ছিলেন। ব্রামলি-সাহেব শব্দের সমস্ত বিষয় সেটী স্থানে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনায় ও মাস পরে তিনি শব্দের-সমস্ত ব্যাখ্যা নিশিগ্ধ গিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ নিয়ে উচ্চ হইল (১)।

“১৮৬৬ সপ্তম ১৮ অক্টোবর [১৮৬৬ বৎসরে, ১০ কার্তিক, শুক্লাবার] দিন উপস্থিত হইল। ইহা কলিকাতা-মেডিক্যাল-কলেজের ইতিহাসে অতি সুপ্রসিদ্ধ। গারিজন ব্রামলি ও সত্যজি ছাত্র শব্দের কবিরায় ভূক্ত গুণে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর গারিজন সাহায্যী ও কলেজের প্রোগ্রেস-গণের সম্মুখে তাঁহার শব্দের কবিরায় ব্যাপ্ত হইলেন। গারিজন সাহায্যী তাঁহারিগণকে তৎকালে সাহায্য করিতে লাগিলেন। শব্দেরকারিগণের মধ্যে উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে শব্দের কবিরায় লাগিলেন, তাহা দেখিলে অত্যন্ত আনন্দ উপস্থিত হয়।”

তাঁহার ব্রামলি-সাহেব কেন যে এই গারিজন ছাত্রের নাম শব্দের উপস্থাপন করেন নাই, তাহার কারণ আছে। তৎকালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অত্যন্ত ছিল। কেহ কোন প্রস্তুত বিষয়ের বিবরণ্য কবিরায় তাঁহার শাস্ত্রাণ্ড ও

অধ্যয়নের সীমা থাকিত না। তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া কেহ আহার করিত না। তাঁহার খোঁজ ও বাণিত বন্ধ করা হইল। তাঁহার বাণিতে কেহই অমান-প্রদান করিত না। অপর্যাপ্ত তাঁহাকে ‘একঘরে’ থাকিতে হইত। পাছে শব্দের-কারী ছাত্রগণকে সামাজিক বিধাতন সহ করিতে হইত, এই যেহেতু ব্রামলি-সাহেব তাঁহারে নামে-মে-ব করেন নাই। ব্রামলি-সাহেব যুগান্তের অধুনা-ভ্রমের নামোচ্চারণ করিয়া যান নাই। অধুনা-সর্গ-প্রথমে শব্দের করিলে ব্রামলি-সাহেব নিশ্চিতই তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়া বাইতেন।

উক্ত যে গারিজন ছাত্র প্রথমে শব্দের করেন, তাঁহার নাম মাধু উচ্চারণ শেঠ, বাহিকানাথ গুপ্ত, রাজহক শেঠ ও নবীনচন্দ্র মিত্র। সর্বত্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন হৃদয়বান ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক ছিলেন। তিনি কাহারও কোন কথা সহসা বিশ্বাস করিতেন না। তবু তবু করিয়া বিশ্বাস করিতে তিনি ভাল বাসিতেন। ১৮৭২ সপ্তম তিনি স্বীয় Calcutta Journal of Medicine নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন, “মেডিক্যাল-কলেজে কোন ছাত্র সর্গ-প্রথমে শব্দের করেন, ইহা জানিবার ভয় বহুকাল পরিয়া আমায় কেঁদুনি ছিল। একদিন উচ্চারণ শেঠ ও বাহিকানাথ গুপ্ত মধ্যমক এক স্থানে একত্র বসিতে পাইয়া প্রথম শব্দেরকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ‘আমরা গারিজনে সর্গ-প্রথম শব্দের করি। তবে আমায়ের গারিজনের মধ্যে রাজহক শেঠ সর্গ-প্রথমে শব্দের করেন।’ (১)

“On that day that is the 28th October, 1866 which may be regarded as an eventful era in the annals of the Calcutta Medical College, four of the intelligent and respectable pupils at their own solicitation undertook the dissection of the human subject, and in the presence of all the Professors of the College, and of four of their brother-pupils demonstrated with accuracy and nicety, several of the most interesting parts of the body; and thus was accomplished, through the admirable example of these four native youths, the greatest step in the progress towards true civilisation which education has yet effected. At this first attempt, all their companions present assisted, and it was delightful to witness the emulation amongst them in displaying their willingness to recognise the importance of, and adapt, a mode of study hitherto contemplated with such horror by their fellow-countrymen.”—*Dr. Bramley's First Report of the Calcutta Medical College.*

(১) Dr. Mahendralal Sarkar, M. D. writes :—“Nabu Umacharan set has just retired from an honourable service of 31 years. Nabu Dwarkanath Gupta has been practising as a private practitioner ever since he graduated. Nabu Rajkrishna Dey was the individual who was the first to plunge the scalpel into the dead human body, and to whom therefore the meed of being the pioneer of dissection in Bengal is due.”

Nabu N. M. Koar writes :—“Of these 4 passed students the first named (Nabu Umacharan) entered Government service and was placed in charge of Agra Dispensary, the second (Nabu Rajkrishna) died prematurely, the third (Nabu Dwarkanath) amassed a large fortune in private practice, and the fourth

যখন শেঠ মহাশয় ও গুপ্ত মহাশয় মহোদয়গণ সবকামকে স্পষ্টাক্ষরে একথা বলিয়াছেন, তখন উহা অপেক্ষা আর কি তৃপ্ত প্রার্থণ পাওয়া যাইতে পারে?

তৎকালের ছাত্রগণ কিঞ্চদ শিক্ষা-লাভ করিয়া কিঞ্চদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখুন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২১ নভেম্বর তারিখে S. Nicholson (Surgeon General Hospital), J. Grant (Surgeon Apothecary to the H. E. I. & Co), R. Martin (Presidency Surgeon, and Surgeon, Native Hospital), D. Stewart (Asst Surgeon. Supt. Gen. of Vaccination), এই চারিজন সাহেব, H. T. Prinsep (Secretary to the Government of India) মহাপুরুষকে উক্ত প্রথম-পরীক্ষিত ও তৎকালের বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

1. Umacharan Sett—Most satisfactory in every respect evincing thorough knowledge of the subject.
2. Rajkrishna Dey—Most satisfactory in every respect evincing thorough knowledge of the subject.
3. Dwarkanath Gupta—Most satisfactory in every respect evincing thorough knowledge of the subject.
4. Nobinchunder Mitter—He was examined for two hours very searchingly, and exhibited excellent knowledge of his subject; but somewhat obscured by a diffidence of manner already alluded to. He has been employed for some time as apothecary to the little... attached to the College and has given great satisfaction.

(Nabu Nabin Chandra) acquired a very high reputation, for high profession skill, integrity, strong sense of duty and an abiding desire to serve the poor."

ডেভিড হেয়ার সাহেব লিখিয়াছেন :—

"During the Examinations (১৮৭৪-১৮৭৫) of Nabin Chunder Mitter, two of the Examiners and some of the officers of the College proceeded to the dead-room to see operations performed on the dead body by L'machurn Sett and Rajkrishna Dey who performed the operations of amputation in a very neat and satisfactory manners."

বর্তমান সময়ের ডাক্তার বাহাদুর বলিয়া থাকেন যে, মেডিক্যাল-কলেজের প্রথমাবস্থায় যে সকল ছাত্র পরীক্ষা নিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যে সকল অধ্যাপকের নিকট তাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রে নিচঞ্চ ছিলেন না। তাঁহারা ঐক্যতামায় কাজ সাধিয়া দিতেন। বর্তমান কালের ডাক্তার বাহাদুরের এই কথা সম্পূর্ণ অসত্য। তাঁহারাষ্ট বরং ঐক্যতামায় কাজ সাধিয়া ও কিছু-নাথ না লিখিয়া সেনেট হাউস (Senate House) হইতে পাস্টিকিটে আসিয়া করিয়া বাহির হন। তখনকার অধিকাংশ ডাক্তারই রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে ও ঔষধাদি ঔষধ দিবার তাহাকে রোগদূর করিতে পারিতেন। এখনকার ডাক্তার-গণ রোগীর রোগ নির্ণয় করিতে ভাবেন না এবং তাহাকে হৃদয় করিতেও পারেন না। তখনকার প্রাচীন ডাক্তার হুইটী টাকার দর্শনী পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতেন। এখনকার ডাক্তার বহিঃস্থ যন্ত্রা না পাইলে রোগীর গৃহে প্ৰদীপ করেন না। কোন এক বিলাত-প্রভাণ্ডিত বিখ্যাত ডাক্তার রোগীকে দেখিতে আসিয়া বলিয়া গেলেন, "হেল্পেট বেশ ভালই আছে। আর কোন ভয় নাই।" এই মধুময় বাক্য-বিস্তার করিয়া ও বহিঃস্থ যন্ত্রা পকেটস্থ করিয়া তিনি তাঁহার পাড়ীতে উঠিয়াবাস্য ছেলেরী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিন দিনের মধ্যে এই ঘটনা! এই অকৃত ঘটনা আশ্রয় লক্ষের সমুদ্রেই ঘটিয়াছিল। হার যে বৈদ্যাতিক ডাক্তার সাহেব!

(আদারী সংখ্যায় লক্ষ্য)

কাঁদি তাই নিরালায়

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

তোমার কথাটি মনে পড়ে শুধু
আর কাঁরো কথা নহ,
বুঝি তুমি নাই বঁধে—
তোমার স্মৃতির মাধুরী শক্তিতে
আমার নমনে প'লে !

যেখানে বন্দী কাকন তোমার
কহিলে, "ভরার খোল
বেশি তা'রে একবার,
যে জন আমায় বেঁধে রেখে গেছে
শ্রীকৃষ্ণ-নিঃসঙ্গ তা'র।

এক দিন নহ—পরিচয় শুধু
এক বছরের চ'খে,
মধু-মিলনের রাত্রে—
আমারে তুলিয়া নিখাছিল তা'র
সুগল-বিকসী-হাতে।

তা'র সিঁদুরের রক্ত লেগে মোর
বর্ষ হ'চ্ছে বাঁচা
সরমে লুপ্তান্তে গিয়া,
প্রথম-পতন-বিক্রম-মুখ
বাহুর অড়াল মিমা।

তা'র দহিতের প্রেম-চূষন
ভুল ক'রে মোর গুলে
মাদিয়া সেদিন রাত্রে,
চকলি বুক তুলেছিল মোর
তাদের অসাক্ষাতে।

তা'র হাসি বেধে কত দিন মোর
স্মৃতিতে ত'রেছে হিয়া,
বাখার কৈসেছে প্রাণ,
ছোট-বড় তা'র কত স্মৃতি অঙ্গে
এ-তোপে কোতিছান্।

মনে পড়ে শেষ-বিদায়ের দিন
থেকে থেকে কানে বেবে,
আঁখিপের চোখে জল,
সুখালী পবন চলে উড়ান।
গাখী পাখে চকল।
মেলিল না আঁখি সারা দিনমান
দেখালে না রান মূখ
তপন অদহ শোকে :
দহিতের কোলে আমার লবীর
শেষ ঘুম এল চোখে,
খোল খোল হার, সেখি একবার
এখনও কি শুয়ে আছে
যেখী সেই অমরার ?

তোমার কাকনে বুঝায কেমনে
নাই তুমি গুণে আব,
সাব ক'রে কেনা হাতীর গীতের
কোটার ভরা তব
দি মূর কাঁদিয়ে ওঠ।
তোমার সিঁথিতে শেষ চুমা তা'র
হাখে মিলেছে, দই,
তোমার মাথের চরনা-টিয়া
কত না আমার সাথে
অভিমানে কোনো কথা।
ভুলদো-তলেত ঘন আঁখাতের
বুঝি না মর্ষগাণা,
আঁখাতের পর আঁখাত আদিতা
ভিড় ক'রে নিঃশেষে
মহাণ কত করে,
লভ্যা হইতে মরাটি রক্তনী
আমার শূন্য করে।
হায়ানো দিনের কত কথা মোর
স্বপ্নের ধারে এসে
আগল পুঁলিতে চাপ,
আমার এ বাপা বুঝিবে না কেহ
কাঁদি তাই নিরালায়।



গুরুবাদ

—শ্রীকামমালিকা দেবী

ছেটি মূণে বড় কথা শোভা পায় না, আমি তা জানি।
আমি যে কথা ছাড়া বলিতে অসিদ্ধাছি, সে কথা বলিবার
অধিকার চর বা আমার নাই, তা'ই আমি জানি।
তবুও বলিতেছি, কেন না আমার মনে হইয়াছে, যে-বাপান
আমি বলিব, অতঃপরকে তা অনেকখানি প্রভাবিত করে।
এই অতঃপরের পাত্রিকাদের কাছে কথাগুলি বলিতে
আশঙ্কায়। আমি কোনকণ মন্থনা করিব না। শুধু যাহা
দেখিয়াছি, তাহাই বলিব।

প্রবাদ আমাদের দেশে অনেকদিন হইতেই আছে।
আমার বিচার দৌড় অনেকদিন পড়ায় নহ, "উত্তরমঙ্গল"
পড়ায়। সেই উত্তরমঙ্গলের দেখি, প্রবাদে 'কোনো'
লোকের ক্রোধও স্তম্ভি, প্রবাদে আমাদের দেশের অনেক
কালের সম্পত্তি। আমরা ছেলেরাও বাড়ীতে দেখি হাম,
বংশের একবার আমাদের পৈতৃক গুরুদের আদিতে।
শেখিলেই দুকা ঘাইত, খুব গদীর লোক। তাতে কারিদের
একটা ব্যাগ, নতুনদের সমস্ত সাপা বেড়ের ছিল। এখন ছাত্র
গরের হইয়া গিয়াছে, গারে ছেঁড়া ত'পাতি উই, খলায় এক-
গোছা সল দৈতা, আর গারে একখানি উকলীও। ঠাকুরমা,
বাবা-মা সকলেই উত্তর চট্টা পড়িতেন ঠাকুর মহাশয়
আগিলে। সকলে সাষ্টপথে প্রণাম্যত হইতেন, ঠাকুর
মহাশয়ের স্থান-স্থপিত চরণের স্থান ভুলিয়া ছোট্ট হেঁকাইতেন,
মাথায় দিতেন আর বুকেও মাখিতেন। মা নতুন গাছতে
জল আনিয়া পা দৌড় করিয়া দিতেন, নতুন গামছার পা
মুছাইয়া দিতেন। যে স্থানে পা বোমা হইত, সে স্থানটি
গোমত দিয়া মুছিয়া মুছিয়া ফেলা হইত। গাছে কেহ সেই
পদিত স্থানে পলকেশ করিয়া পদবিশ্রাম আশ্রয় করে, তাই
সেই সাবধানতা। প্রকৃতির কারিদের ব্যাগ হইতে বাহির
হইত, একটু ছোট হাঁকা আর একটু কলিকা। আবার

দিখিলেই চাকল-বাওরের আভার ছিল না, তাহাও চুটিয়া
হামাক লাড়িয়া আঁতর, পুতল-গাটে দিয়া প্রবাহ জল ভরিয়া
আঁতর। প্রকৃতির বস্তুই বসিয়া হামাক ঘাইতেন, আর গার
করিবেন। ইমান মাগাইয়া, সিদা সাড়াইয়া দিতেন,
ঠাকুর মহাশয় নিজে পাক করিতেন। সিদা জিনিষটা কি
তা'ই হইত অনেক কামের না, তাই জিনিষটা কি
সে সম্বন্ধে কিছু বলা পত্রের মনে করিতেছি। একটা
খাগড়াচাল, ডাল, মুন, বেগ, হরী ভরকাণা, মসলা
সাড়াইয়া দেওয়া হইত—আজকের সিদা বলে। ঠাকুর
মহাশয় যে ঘরে পাক করিতেন, সে ঘরে আমাদের কাহারও
প্রবেশের অধীনত ছিল না। বরফাংশে, আগাবাণি বেশ
করিয়া তিনি বাহিরে বসিতেন। তখন মতের দললের কথা,
পুইবের নাচের কথা, কলম বাগানের আম-কাঁঠালের কথা,
নানা বিষয়ের গল্প হইত।

ঠাকুর মহাশয় চর একটা জিন করিতেন। বাহিরের
ঘরে হইতেন। বিশাকালে বাসিক প্রাণা, মূঁড়, হালি ও
চর চাণিটী ঢাকা নজিরা লইয়া সেই কাঁথাসল ব্যাগ, চাড়া
ও লাতি তাতে চলিয়া বাহিরে। বাহিরের সমস্ত বাড়ীজুড়
সকলে বড় হইয়া গারে বলা লইয়া যেন বড় হইত। ত্রিভি
যে যেখানে আছে, বাতীর নাকর বাকর পড়ায়, সকলের
কলাগ কামনা করিতে করিতে ঘাইতেন।

আমার ঠাকুরমার স্বর্গপ্রাণি হইবার পর ঠাকুর মহাশয়
আর পূজের মত প্রতি বৎসর আদিতেন না। এক বৎসর
মুতি-চালি আমাইয়া তুলিয়া বাহিয়া দিতেন। বৃক্ষ
আদিতেন, এমন পূজের মত টাকা ও কালঙ্কাফা হাঃ
কর্ম্মে থাকিত, দিয়া দিতেন। সন্নিহিৎ এখনও আছে,
যে বই বৎসর সব সব আসেন। না বলেন উনিতে পাছ,

আমার দাঁতের দাঁত হইলে ঠাকুর মহাশয় আদিবেন না।
লাগার দিন দিন যে রকম লাগেই হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে
তাঁহার বেবজির তক্তি করিবে এমন ভাবনা তাঁহার
একটুকুও নাই। আমার মাথের ঘড়টা কিন্তু অত্যন্ত রক্তবহ।
যা হলেন, ইহাচি লেখাপড়া বেশী শিখিলে লোকের প্রেম-
ভাবের হট্টা পড়ে। ঠাকুর-কোথায় নানো না, যে-বিশেষ
তক্তি করে না, বাপ-মাকেও ভয়ানক কেঁদে করে না।

মাথের মত অত্যন্ত বলিতেছি, সেই সঙ্গে বীকারও করি-
তেছি, এইজন্যই সেখা যায় বটে।

বেশী তক্তি, বেশী মাত্র কেহ যেন কাহাকেও করিতে
চায় না। শুধুসেব আসিগাছেন, আসিগাছেনই! পূজা
পূজাই! এই রকমের ভাব। বাড়ীতে একটা টেবুল-সাথের
আসিলে হলুদ পড়িয়া যায়, শুধুসেব আসিলে বাত্বের লাড়া
পাওয়া যায় না। কেহ সাহেব-পাটিতে নিষ্পন্ন করিলে
বাত্বা যে রকম প্রস্থ হইয়া ওঠেন, পাকার চর্যাপ্রত্যয়
সে রকম হইবে না। আমরা ইহাই ত দেখিতে পাই।

কলিকাতা সহরে হঠাৎ একদিন অল্প রকম সেখিয়া আমরা
সবাই অথাক হইয়া গিয়াছিলাম। সেই কপাটাই বলিতে
আসিয়াছি। ‘আমার কা’ কোথা হইতে যবর লইয়া আদি-
লেন, জ্বালীপুরে এক সাধুবাণী আসিগাছেন, তিনি নরসেহে
সেবত। তাঁহার হাতের রোগের রোগ শুধু চোখের দৃষ্টি
দ্বিগ্না সত্যইয়া গিয়াছেন। যত-যত বস্তুগোষ্ঠীর উপর দ্বিগ্না
হইয়া গিয়াছেন, আর তাহায়া সত্যিগা গিয়াছে; কত লোক
মালায়া জলাত করিয়াছে, বাহাদের সত্যন-সত্যবান ছিল না,
তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে কোলে ছেলে পাইয়াছে; যে ‘মজুকে’-
গোহাতীর ছেলে হইয়া বাঁচে না, সাধু-বাণীর সেওয়া বিধপত্র
খাইয়া তাঁহার ছেলে যত বড় হইয়াছে, এমনি আরও কত
কথা। দিদি ঠিক করিলেন, সাধু-বাণী খেঁবিত্তে বাঁচেন।
বেশ ত, দিদি দান না। ওহা! দিদি একলা বাঁচেন না।
আমাকে সঙ্গে লইবেন। তাঁহার কোন যতকার নাই।
আমার ভবই তাঁহার বাওরা। আমি ওঁচাকে কত বুঝাইলাম,
কত শাখিলাম, দিদি বুঝিলেন না।

অতঃপর কত দিগা গান করাই!

শেষ পঞ্চাশ দিগির গোড় গোড় মিটে হইল। দুপুর বেলা
সাবুয়া বাড়ী নাই, সেকের ওয়াস ঠিক-পাকী আনাইয়া আমরা
চলিলাম, সাধুবাণী গর্বনে। পাকার এক বিধবা খোদ-মানী
আমাদের সঙ্গে লইলেন। পুর জাখিয়াছি, ইনিই দিগির
সুখাঘাটী। তিনি বাড়ী-জানিতেন, বাড়ী খুঁজিয়া পাইতে
কষ্ট হইল না। গাড়ীটা আমরা ছাড়িলাম না, গাড়ী লাড়
করাইয়া রাখিয়া আমরা তিত্তর চুকিলাম।

কি তিত্ত! যতর ত কথাই নাই, সিঁড়িতে, উঠানে
পাখার লোক খরে না—আমাদের গাভই সব। পুরুষ হই

একজন ছিলেন, তাঁহারা বাড়ীর গাছেরে ছাড়িয়াই। বাড়ীটা
পূর্ব বড়, চকুখিলানো, সাজান-গোড়ান। খেলিলেই ননে
হয় বড়লোকের বাড়ী। খোদ-মানী এই বাড়ীর লোকদের
জানেন, কতটা দিনি, তিনি মাস তিন চার আগে মারা
গিয়াছেন, হাটকোটের বড় কাউন্সেল ছিলেন। সাধুবাণী
তাঁহার ভক্তসেব। খোদ-মানী কোল ঠাট্টাই জানিতেন। যে
রোগাক্রান্ত বসিয়া আমরা সাধু-বাণীর আশায় ঘড়ীর পর
ঘড়ী কাটাটাইতেছিলাম, সেখান আসবও অনেক ছিলেন।
তাঁহারা যে সকল গর বলিলেন তাহা খুব মাঝখানক।

বাড়ীর দিনি কতটা তাঁহার বড় ছেলেরি বয়স যখন এক
বৎসর, তাঁহারা সুমান পূর্ণিতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন।
সেইখানে ছেলেরি নিউমানিয়া হয়। ডাক্তারেরা যখন
আশা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল, সেই সময় এই সাধুবাণী
কোণ হইতে আসিয়া কতক বলিলেন, তোমার ছেলে আমি
দেখি। বাস্তবিক সাহেব গ্রাহক করিলেন না। কিন্তু তাঁহার
দী তিত্তর হইতে যবর পাইয়া ছেলে কোল লইয়া আসিলেন।
সাধুবাণীর পাথের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—বাণী সকে
কব।

সাধুবাণী ছেলেরি পানে একবারটি চাখিয়াই চকু বুঁজিয়া
ফেলিয়া দিলেই বলিলেন, তুমার বোটা আছা হো গিয়া।

যেমন না, এই কথা বলা, ছেলে চকু খুলিয়া কানিয়া উঠিল,
একটু পরে ‘আম্বা-আম্বা’ করিতে করিতে হাত-পা ব্যক্তিত্ত
লাগিল। খানিক বসে সেই ছেলে যতময় খুটখুটি করিয়া
বেড়াইতেছে, কিন্তু অস্থগ যেন তাহার হয় নাই।

পাশে একজন স্ত্রীলোক বসিয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া
উঠিলেন, সাক্ষাৎ ভগবান।

আর একজন দীর্ঘনিখা ফেলিলেন ও বলিলেন—তাতে
কি আর কথা আছে দিদি।

দিনি গর ব্যক্তিত্তছিলেন, তিনি আপের মতই বলিয়া
চলিলেন ছেলের বাপের ততক্ষণে হাঁস হল, সাধুবাণীর পা
ছড়িয়ে ধরলেন। সাধুবাণী বললেন, দীক্ষা নাও। কতটা-পিত্ত
ভাল দিন দেখে দীক্ষা নিলেন। সেই লোক সাধুবাণী—এসের
গুরু। এসের বাড়ীতে কখনও কোন বিপদ-আশপ হয় না।

যে আনান্দুসী স্ত্রীলোকটি থাকিয়া থাকিয়া কোরে কোরে
দীর্ঘনিখা ফেলিতেছিলেন, তিনি খুব কোরে আর একটি
নিখা ফেলিয়া বলিলেন—সাক্ষাৎ ভগবান, দিদি, সাক্ষাৎ
ভগবান।

আর একজন অমনি বলিয়া উঠিলেন—তা নইলে কি
এমনটি হয়!

দিনি গর বলিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—এইবার যখন
কতটা গেলেন, সাধুবাণী ছিমাগেরে ছিলেন, তখন এঁরা তাঁকে
যবর যেন দি। সাধুবাণী এসে ভুললেন শিখ মারা গেছে।

তবেই তিনি এসে বসে লাগলেন, এঁরা তাঁকে খবর দেন নি কেন ? গিন্নী কি দাঁড়াই না বসলেন । সাধুবাবা বললেন, তিনি এসে পড়লে শিশু কখনও তাঁকে দিবে যেতে পারতেন না ।

এই সময় সিঁড়ির উপরে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল । নানান গোলমালেন বহা চাইতে তখিত পাওয়া গেল যে, সাধুবাবা মহাশয়-কাকনের পর বিদ্রোহ করিতেছেন, আজ আর দর্শন হইবে না ।

আর নেড়ণো জন স্ত্রীলোক ছিলেন, এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনের ভাব ভিন্ন হইল, তাহা আমি আপনাদিগকে অজ্ঞান করিতে অহরোধ করিতেছি ।

মিনিট কয় পূর্ব গোলমাল চলিল, কেহই নড়িতে চাহ না, সাধু দর্শন না করিয়া ঘাইবে না । পূর্ব গোলমাল ।

একজন গিন্নী-বাগি লোক সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া পূর্ব দিকভিত্তি দ্বারা বসিলেন, ঠাঁহুর খেয়ে শুয়ে পড়লেন, পতীর ভাল খোদ করছেন না । আপনাদের অনেক কষ্ট হল, কিন্তু কি করি বলুন । কোন ঘোষ নেবেন না, আর একদিন আসবেন ।

স্বিটার চেয়ারটি ভাল, সুখানিতে বাস্তুভাব চল চল করিতেছে, আর কথাগুলিও নতুনখা । গোলমাল শুনি ধামিয়া গেল । লক্ষ্যেই চলিয়া ঘাইতে উদ্ভত হইলেন ।

এমন সময় একজন বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ মা মা, সেই ধাপাখাড়া গোবিন্দপুর বেলেঘাটা থেকে এই রোডদূরে আসছি, তোমা মেয়েটিকে গর্ভাক্ত টানতে টানতে এনেছিলাম মা, বাবার পতীর বদন ভাল বেই তখন কি আর বলব, আমাদেরই অসুখে, তবে মা, কথাবার্তা আর একদিন হবে, আজ যদি একটি বার চোখের সেবাটি দেখে যেতে পারি মা, মন খানিকটা 'প্রসূতি' মানে ।

গৃহিণী সতাই লজ্জা লোক । বলিলেন—তা বেশ ত । সাধুবাবার ঘরের জানালা খোলাই থাকে, তখু ঘেঁরতে চান আসুন ।

যেই বলা আর সবাই কিরিয়া দাঁড়াইল, না দেখিয়া ঘাইবে না । ঘোষ-মালীকে লইয়া আশ্রয় দর ঘরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। ছুটাখট পাগ হইলেই পাড়ীতে উঠা হয় । কিন্তু ঘোষ-গিন্নী দুইখা দাঁড়াইলেন । আমি বলিলাম, মালী কেব কেন ?

মালী বলিলেন—ওমা ? তাও না কি আশ্রয় হয় ! মলিমে এসে ঠাঁহুর না দেখে বৃষ্টি ধাওয়া যায় ? চল যোমারী চল ।

আমি বলিলাম—আবগ একদিন যখন আগতেই হবে, তখন আজ আশ্রয় কেন ?

ঘোষ-মালী খনক গিরাণ আশ্রয়ে মিথি তোষ টিপিয়া বলিলেন—চল না দেখেই আসি ।

প্রই ঘটা ঠাঁহ বলিয়া বলিয়া আমার কিছু বেন ভাল লাগিতছিল না, আমিও চোখ টিপিয়া দিহিকে জানাইলাম, থাক না !

কিন্তু মিনি শুনিলেন না সে কথা, কিবা বৃষ্টিতে পারিলেন না, অথবা ঘোষ-মালীর কবে আশ্রয় করার সাধ দিতে পারিলেন না, আমার হাত ধরিয়া কেলিলেন, বলিলেন, কতক্ষণ আর লাগবে !

বাস্তাব্য বিকে একটি জানালার সম্মুখে লোকে লোকারণ্য । বাড়ীর গৃহিণী লক্ষ্যেই তুট করিতে চান, কেবল কিছু সরাইয়া সরাইয়া দিতেছেন । যখন আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন গিছনে আর কেহ বাকী নাই । কিছু সরাইয়া গিন্নী আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এ বেশ মা ঠাঁহুর শুভেছেন । যেটি পারে হাত খুলোজে উঠি আমায় বড় বেটার বৌ ; আর একটি আমার মেয়ে । হাইকোণের জেজের মেজ-মেজের সঙ্গে এক বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে । জেজেরা এল পছন্দ করেন না, আনি-কে আগতে দিতে চান না, অল্প কথা বলে আনি-বেছি । আমি না এলে ঠাঁহুরের কিছু ভাল লাগে না ।

বাড়ীর গিন্নী আমাদের সাথে কথা বলিতেছেন দেখিয়া যে কিছু আসাইয়া সিঁড়ির বিকে চলিয়া গিয়াছিল, সেই কিছু ঘোড় কিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিয়া আমি দিহিকে খাড়া দিয়া বলিলাম—চলুন না দিহি ।

ঘোষ-মালী ঠক ঠক করিয়া জানালার কাছে মাথা ঠুকিয়া বিড় বিড় করিয়া কত সব কথা বলিতে লাগিলেন । আর একবার ঘরের ভিতরটি দেখিয়া লইয়া আমি দিহিকে আর একটি খাড়া বিলাষ ।

ঘরের ভিতরে সাধুবাবা পান চিরাইতে চিরাইতে দেখা : কারিগরদের সঙ্গে হাসি-পল্ল করিতেছেন । কেন জানি না ইহা আমার ভাল লাগিল না । আমি বেন চলিয়া গাইতে

পারিলে ঠাঠি। ঘোষ-মালীও প্রণাম করা আর শেষ হয় না। বিদি কোন কথা বলেন না দেখিয়া আমিই স্টেটকোর্টার মত বসিয়া ফেলিলাম, আমি চলুন, বেলা যে পড়ে এল।

বিদি উঠানের দিকে গাইয়া তর পাঠলেন। বেলা শেষ হইয়া আসিল বলিয়া। বাহুবা যদি আমাদের আগে বাড়ী আসিয়া পড়ুন, তাহা হইলে কি যে হইবে, কে তাহা বলিতে পারে। বিদি মাসীকে ডাড়া দিতে মাসী আবার কতকগুলি ঠক ঠক করিয়া মাথা টুকিয়া চলিতে লাগিলেন। গৃহিণী মাসীর তক্তি দেখিয়া পুরই লম্বট হইলেন বলিয়া মনে হইল। ভিজ্ঞাণা করিলেন—কবে আপনাতা আসছেন আবার?

বিদি বলিলেন—কাল আসব না।

—একটু লকাল-লকাল আসবেন। সবায়ের আগে বাবাব সাথে দেখা করিয়ে দেব। কাকর অত্থব-বিপ্লব আছে বুঝি?

এই প্রস্তর যে কবাব বিদি দিবেন তা আমি স্থানি, তাই আমি একটু আগে সরিয়া গেলাম।

বাড়ীতে মাগিয়া বলিলাম—আমি ঘাব না আস।

আমার ঘরগম্বা, আমি মরিগে তিনি বাঁচেন (যদিও আমি সতীন নই, তা) আনাব রক্ত তাঁহার কোন তথ নাট, এট সব গালি স্নিগ্ধে স্নিগ্ধে অচাত্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, যায়ে যায়ে না। তাই আবার বলিতে পারিলাম, আমি ঘাব না।

কিস্ব তিনিকে পারিব্যার ভো নাই। শরের দিন হেঁচকাইয়া টানিয়া আমাকে বাড়ীতে তুলিলেন। তিনি ও ঘোষ-মালী উঠ ঘনে আজ মনের মাল মিটাষ্টা আবার পিও চট্টকাইতে চট্টকাইতে চলিলেন। আমি থাকিলাম চূপ করিয়া।

বাবাব পত্র নাট।

সেদিন আরও ঘট। লোক অনেক বেঁধ। পুরুষ অনেক।

মাগো! অত পুরুষ মানুষের ভিত্তর ভিতর বিদ্যা বাই কি করিয়া? ঘোষ-মালী ভিনী মাগিয়া চৌলিয়া টুলিয়া চলিত লাগিলেন। আবার তাঁহার শিষ্টন চলিতেছি।

সাবুবার ঘরে যে কত লোক বসিয়া আছে শুণিণা বলা যায় না। অনেক কালী-কালী চেহারা পুরুষ মানুষও বহিচ্ছেন। তাঁহাদের দেখিয়া মনে হয় তাঁহারা লকলেই বন্ধস্থি।

পাগলা ঘোড়ার মত আমিও অনেকবার বাঁকিয়া দাঁড়াইলাম, যদি পাণ কাটাইতে পারি। বিদি কঠিন করিয়া আমার হাত ধরিয়া গেলেন।

সাবুবার চেহারা দেখিলে তক্তি হয়। মোটা-মোটা ঘোষ-গাল করা চেহারা। পরিচ্ছন্ন শাবা দিগের কাপড়, গায়ে পেকরা দিগের আংবাখা (কতকটা ফিরাইবা কতুয়া মত)। মাথার ঘন চুল না থাকিলেও চেহা শিখি কাটা, বাড়ী কাঁচ-পাকা মেথা, কৃষ্ণিত। সাবুবার সৌখীন লোক তা বেশ বোকা যায়।

আমরা যখন ঘরে ঢুকিলাম, তখন সাবুবার বসিচ্ছ-ছিলেন—হাছত্রাবাদের হাইকোর্টের জজসংঘে য়োক চিঠি লিখছেন বাবার ভগ্নে, আজ আবার টেলি পাঠিয়েছেন। আব এলিকে ত দেখছই, মিত্রিব পা ছুটার উপর জয়ে পড়ল, তার বাড়ীতে তিন গাছি ধাল না করে বেলে সে আয়তগা করবে। কি করি তা তোমরাই বল?

কেহই কোন কথা বলিল না।

সাবুবারই বলিতে লাগিলেন—আমি বলি কি গুরুদেবকে কেটে তোমরা সবাই ভাগ করে নাও। আমিও নিশ্চিত হই, তোমরাও বাচ।

গুরুদেব নিজেই বুঝ উঠ লব করিয়া চলিতে লাগিলেন। আব লকলে চূপ করিয়া রহিল।

—আবার বলি কি মতা হচ্ছে জান? হাইকোর্টের পুত্রগা ছেঁটেসলুন পাঠাবেন বলে চিঠি লিখেছেন, পুত্রগা পুত্রগা-বাগ করবেন, গুরুদেবকে না হলে হবে না।

কতকণ বলিতে পারি না, তবে অনেককণই বটে, এই রকম কথা তিনি একলাই বলিতে লাগিলেন; আর সকলে কেবল স্নিগ্ধে লাগিল।

গুরুদেবের রক্ত বাছত্রাবা আসিল। একজন মানুষের রক্ত যে এইরূপ বিসর্গিত আয়োজন করার দরকার হয় ইহা মনে করায় হুঃসাধা।

গুরুদেব ঘাইতে ঘাইতে গল্প করিতে লাগিলেন। ঘোষ-মালী কতবার গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করিয়া দিগির মনোহুগ্ধের কাগলি বসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তুতেই পারিলেন না।

শেষ পর্যন্ত বেলা পড়িয়া আসিল দেখিয়া আগের দিনের মত অনেকই চলিয়া বাইতে লাগিল। গুরুদেব তখনও হাছত্রাবাদের, হাইকোর্টের গল্প করিতে লাগিলেন।

আমরাও চলিয়া আসিলাম। বিদিও আর বাইবেন না বলিয়া আমাকে বাঁচাইলেন। তবে তাঁহার সে দ্বন্দ্ব খুলিল না তাগ বেশ বুঝিলাম।

সেকালের গুরুদেবও দেখিয়াছি, একালের গুরুদেব দেখিলাম। আমি না কে বড় আর কে ছোট।



[সম্পাদকদের সম্মতিসহ প্রকাশিত কর্তৃক নির্দেশ]

আমাদের কথা

আমাদের গ্রাম প্রতি সংখ্যাত্তেই কোন না কোন বিষয়ের কোন না কোন পত্রিতের পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে হইতেছে। তাহাতে চরম ফের ফের মনে করিবেন যে, বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে চীন প্রতিপন্ন করিয়া দ্বীপ পাণ্ডিত্য চাহিব তরাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাগা মতা নহে। আমাদের পত্রিকার পত্রিকালক যে কয়েকজন বণিক তাগা পূর মস্তর আমাদের পাঠকগণ বিদিত আছেন। বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া গীর্জায়া জীবিকা অর্জন করেন, গীর্জায়েব পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার বিশেষ কোন পয়োজন নাই—ইহা অস্তর্যপক্ষে আমাদের পরিচালকগণের অভিমত।

আমাদের চোখের সম্মুখে আছেন বেকার ও ভবনস্থাপন শিক্তিত বৃদ্ধগণ। আমরা গীর্জায়াগণকে দেখিয়া বহুব বুদ্ধিতে পারিমাছি, তাহাতে বলিতে চব যে, গীর্জায়া গাভর: বহুবাহ: বুদ্ধিমান, বিনয়ী এবং পরিশ্রমী। প্রকৃতি বহুগুলি ওষ বাঙ্গালী বৃদ্ধগণকে দিগছেন, তাহাতে বাঙ্গালী বৃদ্ধগণের প্রাথম: কোন না কোন কৰ্মে নিযুক্ত হওয়া এবং প্রয়োজনানু-রূপ উপার্জন হওয়া উচিত ছিল—ইহা আমাদের অভিমত। অল্প বাক্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বাঙ্গালী শিক্তিত বৃদ্ধগণের মধ্যে অনেকই বেকার হইয়া পড়িতেছেন এবং গীর্জায়া কোন না কোন কৰ্ম-নিয়োগ পাইতেছেন, গীর্জায়েব মধ্যেও অনেকই প্রয়োজনানুযায়ী উপার্জন পায় হইতেছে না। এতদূর বিষয় অবস্থার কি কারণ হইতে পারে, তাগা চিন্তা করিতে বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, শিক্তি ওঠ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের নিরপরাধ উদ্ভব-বহুগুলি জীবনকেই গাড়ু-বু-খাইতেছেন।

বৃদ্ধগণের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও পরিশ্রমানুযায় বাগা দেখা যায়, তাহাতে বহুকেই অস্থানান করা যায় যে, বহা সময়ে গীর্জায়াগণকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্তিত করিলে গীর্জায়া প্রায়শ: চাকুরী না করিয়া বহু জীবিকা-ক্ষেত্রেব সামর্থ্য লাভ করিতে পারিতেন। অল্প বাক্য-ক্ষেত্রে চাকুরী না পাইলে প্রায়ই তেও বহু জীবিকা-ক্ষেত্রেব পারিতেন না এবং চাকুরী পাইলেও কি করিলে নিয়োগকর্তাকে লাভবান করিতে পারা যায়, তাহাও সম্ভাবন করিয়া উল্লিখিত পারিতেন না।

বৃদ্ধগণের এই অবস্থার মূল কারণ শিক্তিতগণের স্বাভা-বিক্রমের অভাব এবং শাক্তি পূরকেব অসম্পূর্ণতা ও প্রাণি-ইহা আমাদের বিশ্বাস। কায়েই বাগ: চইয়া প্রখ্যাতনামা অধ্যাপকগণের ক্রমী কোথায় তাগা আমাদের দৃষ্টেব হইতেছে।

কোন অধ্যাপকের প্রতি স্বাক্ষরিত কোন বিষয় আমাদের নাই। আমরা যে সমস্ত অধ্যাপকের ক্রমী দেখাইয়াছি, গীর্জায়া কেবল ক্রমীপূর্ণ ইগাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। পবন গীর্জায়েব বর্ণকেও বহু কথা বলিবার আছে।

আমরা এতাবৎ ডা: হুবেস্ত্রনাথ দাশ গুপ্ত, ডা: শিশির-কুমার মিত্র ও ডা: সুরীশচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছি।

ডা: হুবেস্ত্রনাথ দাশ গুপ্তের পুস্তকগুলিতে চিন্তাশীলতার কোন পরিচয় প্রায়শ: পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু সেগুলিতে পরিশ্রমশীলতা ও অধ্যয়নশীলতার বশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ডা: শিশিরকুমার মিত্রের এককী বহুতার বিরুদ্ধে আমরা

সদাশোচনা করিয়াছি বটে, কিন্তু এতাবৎ আমবা তাঁহান যে
পরিচয় পাইনাই, তাহাতে আমবা বলিতে বাধা যে, তাঁহাব
অপেক্ষা বর্তমান সময়ে বোগ্যতর বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পাওয়া
সম্ভব নহে। মন্থন ভুলভাষিণী হইতে পারে না, কিন্তু যে-
মান্থন বীর ভুলভাষি আপনা হইতেই বৃদ্ধিতে পারেন, অথবা
অপর কেহ তাহা দেখাইয়া দিলে উপলব্ধি করিতে পারেন,
তিনিই প্রকৃত ছাত্র এবং তাঁহারই পক্ষে প্রকৃত অধ্যাপক
হওয়া সম্ভব।

ডাঃ হুমীতিসুন্দার চন্দোপাধ্যায় আমাদের অধ্যাপক। তিনি
যে সময় পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পড়িলে তিনি যে স্বভাবতঃ
চতুর তাহা বুঝিতে পাষা যায় অটে, কিন্তু কোন পুস্তকে

তিনি তাহাতর লক্ষণে বিশেষ কোন চিত্তা করিয়াছেন, অথবা
ঐ লক্ষণে যে সময় বিষয় প্রভৃতি, তাহা যে তাঁহান সম্পূর্ণ
জানা আছে ইহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রয়োজন
হইলে তাঁহার এক একখানি পুস্তক অবলম্বনে তিনি কোন
শ্রেণীর পণ্ডিত এবং তাঁহান লেখা যে কত অসঙ্গ, তাহা আমবা
সাধারণের লক্ষ্যে উপস্থিত করিব। আমাদের মনে হয়, ডাঃ
চন্দোপাধ্যায় শ্রেণীর অধ্যাপক আমাদের যুগকালের সর্বাপেক্ষা
অনিষ্টজনক আদর্শ।

অত্যন্ত তিক্ত বিষয় লইয়া আমাদের আলোচনা করিতে
হইতেছে লিখা আমবা গুণিত এবং তৎক্ষণ আমবা ভগ্ন-
নামের নির্দেশ প্রার্থনা করি।

বান্দার বর্তমান গভর্ণর ও কৃষির অবস্থা

কৃষির কথা ভাবিতে বলিলে কৃষকের কথা ও
জমীদারের কথা মনে আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বান্দার কৃষিয়ারা তিন শ্রেণীর লোক প্রাত্যহিকভাবে
এক বাহী লোক প্রত্যেকভাবে চিরদিন জীবিকা নির্মাচ করিয়া
আসিতেছিলেন। যে তিন শ্রেণীর লোক প্রাত্যহিকভাবে চির-
দিন কৃষিয়ারা জীবিকা নির্মাচ করিয়া আসিতেছিলেন
তাঁহাদের নাম—(১) কৃষক, (২) পাটোয়ার, (৩) জমীদার।

কৃষি-লক্ষ্যে এই তিন শ্রেণীর লোকের কাহার কি দায়িত্ব
ছিল তাহা বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিতে চইলে বলিতে চই
যে, কৃষকের কার্য সাধক অথবা যোগ্য বস পরিচর্য করিয়া
যাওয়া। সে কৃষিতে রোপ অমূল্য করিতে পারিলে না, যৌতু-
তালের প্রাণনা তাহাকে বসন্তের বিপত্তা বলিয়া মনে করিতে
হইবে; জমীর উর্বরতা, উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে কাহারও
যুগ্মশক্তি না হইয়া আন্তরিকতা অবলম্বনে তাহাকে জমী
হইতে শত উৎপাদন করিতে হইবে; বাহার বাহা পাওনা-পড়া
তাহা তাহাকে সম্মানে চুকাইতে হইবে এবং তাহার নিজের
অথবা পরিবারের অন্নবস্ত্রের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকিল কি না
তদ্বিষয়ে সে দক্ষ্য করিতে পারিলে না। সে পেট ভরিয়া
বাইতে পাক আর না পাক, অর্ধাশন অথবা অনন্দের জন্য
সে দুর্বল অথবা সবল হউক, সুখ অথবা অসুখ হউক, জমীর
স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি থাক আর নাই থাক, পাওনা-

দায়ের পাওনা-পড়া যদি কৃষক দ্বারাসময়ে চুকাইতে না পারে,
তাহা হইলে কৃষককে ‘অলস’ এবং ‘অলস’-বিশেষণে অভিহিত
করিতে হইবে।

পাটোয়ারের কার্য এক সময়ে ছিল গ্রামে থাকা, জমী-
দারের ন্যেয়গণের সহিত লম্বা বাক্য, তাঁহাদের আদ্যোদ-
প্রমোদের ভ্রমগানি সংগ্রহ করা এবং কৃষকগণের নিকট হইতে
বাধ্যতে অতিশয় কিছু আদায় হয় তাহার ব্যবস্থা করা।
কৃষকগণের মধ্যে একতা থাকিলে তাহাদের নিকট হইতে
অতিরিক্ত আদায় করা ক্রেশ্বর হইত। কাহেই তাহাদের
একতা বাহাতে না থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে বগড়া-বিবাদ
যাচাতে বাড়িয়া যায়, তদ্বিষয়ে পাটোয়ারগণকে পরীক্ষা হইতে
হইত। আজকাল পাটোয়ারগণের আর সে বালাই নাই।
পেক্টের জন্য তাঁহাদের অধিকাংশেরই গ্রাম ছাড়িয়া সহরবাসী
হইতে হইয়াছে।

জমীদারগণের কার্য একসময় ছিল গ্রামে থাকা, প্রোচ-
নিষের নিকট হইতে কিছু-না-কিছু জোরপূর্বক কাড়িয়া লইয়া
তাঁহান যে জমীদার তাহা তাহাবিলক জানাইয়া দেওয়া,
আদ্যোদ-প্রমোদ করা এবং পরস্পরের মধ্যে কে কত কে
ছোট তাহা লইয়া বগড়া, বাবামতি এবং দলদলি করা।
জমীদারগণেরও এখন আর প্রাথমিক গ্রামে থাকার বালাই
নাই। কড়া শাসনে বাহাতে প্রোচগণের নিকট হইতে পাওনা-

পণ্ডা যোগ আনয়ন হলে আঠার আনা আদায় হয়, নাৎকরণের সহিত তদ্বিধক চুক্তির ব্যবস্থা করিয়া সত্তরে বাস করা, বেনা করিয়া ধনিবপণকে আদায়-আপায়ন করা এবং উঠানের মধ্যে প্রতিপত্তি অর্জন করা, চাকর-বাকরের (house servant) সংখ্যা বৃদ্ধি করা, তিন টাকার তিনি পাঁচ টাকার কেনা, অস্বাভাবিক সময়ে মিশ্রা বাঁধা ও ভাগ্যের পাক—এখনকার জমিদারদিগের কার্য।

কৃষি সম্বন্ধীয় এই তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যেও বর্তমান যুগের অবস্থা যেখান বলিতে হয় যে, কাহারও জমীর উর্বরতায় দিকে লক্ষ্য করার দায়িত্ব ছিল না, অথবা কেহই ঐ দায়িত্ব প্রতিপালন করিতেন না। অথচ ভারতীয় কৃষি-গণের জমী-বিষয়ক কথাগুলি অতিবিশেষ সহকারে পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জমী সম্বন্ধে তিন শ্রেণীর লোকেরই যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল এবং ঐ দায়িত্ব বহাষণ প্রতিপালিত হইলে, ভারতবর্ষে কাহারও অস্বাভাব অথবা অস্বাভা আসিতে পারিত না।

প্রধান কৃষিকারীর অথবা জমিদারের যে যে দায়িত্ব ছিল, তদ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :—

- (১) কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ জমী কোন্ কোন্ শত উৎপাদনক্ষম তাহা লক্ষ্য করা ;
- (২) বিভিন্ন বৎসরের একই ক্ষেত্রে একই জমীর উৎপাদনক্ষমতার তারতম্য কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করা ;
- (৩) বিভিন্ন কৃষিপদ্ধিতে একই জমীর উৎপাদন-ক্ষমতায় তারতম্য কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করা ;
- (৪) কোন জমীর উৎপাদন-ক্ষমতা অত্যধিক যাত্রার দ্বারা প্রাপ্ত হইলে তদ্বিধে প্রবীণ ব্রাহ্মণগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা ;
- (৫) কোন্ জমীতে কোন্ সময়ে কোন্ বীজ বপন করা হৃদয়সম্মত তাহা প্রবীণ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা ;
- (৬) য য এলাকার (territory) প্রয়োজনীয় কোন্ কোন্ কৃষিজাত দ্রব্য অল্প কোন্ এলাকা হইতে আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করা ;

(৭) কৃষকগণকে কৃষিকার্য্য হইতে অবসর-সময়ে কোন্ কোন্ শিল্পকার্য্যের দায়িত্ব দিতে হইবে তাহা স্থির করা ;

(৮) য য এলাকার কোন্ কোন্ ব্যবস্থার প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে প্রবীণ ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করা ;

(৯) মধ্যবর্তী কৃষাদিকারিগণের কি কি কর্তব্য এবং তাহাদিগকে য য কর্তব্য প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা কি কি শিক্ষা করিতে হইবে তাহা স্থির করা এবং তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ;

(১০) কৃষকদিগের কি কি কর্তব্য এবং তাহাদিগের য য কর্তব্য প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা কি কি শিক্ষা করিতে হইবে তাহা স্থির করা এবং তদ্বিধে মধ্যবর্তী কৃষাদিকারিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

মধ্যবর্তী কৃষাদিকারিগণের অথবা পাটাদারগণের যে যে দায়িত্ব ছিল, তদ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য :—

- (১) প্রধান কৃষাদিকারিগণের নিকট হইতে য য কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা এবং তদনুসরণ কার্য্য করা ;
- (২) প্রধান কৃষাদিকারিগণের পরামর্শমুখাৱী কৃষক প্রকৃতি প্রমত্তবিগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তাহারা তদনুসরণ কার্য্য করিতেছে কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা।

মধ্যবর্তী কৃষাদিকারিগণের নিকট হইতে য য কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা, তদনুসরণ কার্য্য করা, যথেষ্ট পরিচর্য্য করিয়া জমী হইতে উৎপাদন করা ছিল কৃষক প্রকৃতি প্রমত্তবিগণের প্রধান কার্য্য।

ব্রাহ্মণ, প্রধান কৃষাদিকারী, মধ্যবর্তী কৃষাদিকারী এবং কৃষক প্রকৃতি প্রমত্তবিগণের কর্তব্য-সম্বন্ধীয় কৃষিদিগের কথা অতীব বিস্তৃত এবং এইখানে তাহার সম্পূর্ণ ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে। উপরে বাহা বলা হইয়াছে, তাহা একটু চিন্তা করিয়া পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই চারি শ্রেণীর লোকের মধ্যে অতীব গুরুতর দায়িত্ব দ্রষ্ট ছিল। ঐ চারি-শ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া যে কার্য্য নির্বাহ করিতেন, প্রধানতঃ তাহারই ফলে ভারতবাসীর হৃৎ-দায়িত্বা দৃষ্ট হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষ অনন্তসাধারণ আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

বহুদিন হইতে আমবা আমাদের গৌরবের বাহা কিছু ছিল তাহা হঠাৎই থাকি উঠা যুব সত্য, কিন্তু কিছু দিন আগেও আমাদের গৌরবময় সংগঠনের কাঠামোটা বিস্তারিত ছিল এবং আমাদের অজ্ঞানতা ছিল না।

যে দেশে অজ্ঞানতার কারণে গলে তাহা মৃত্যু ভানিত না, কে-দেশে অজ্ঞানতার ভয় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে হইত না, সেই দেশে বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার কলে এখন প্রায় প্রত্যেকের অজ্ঞানতার ভয় প্রতিনিবৃত্ত হইতে থাকিতে হইতেছে। এইজন্যই আমরা কিছু দিন চলিলে আমাদের গৌরবময় সংগঠনের কাঠামোটা পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ হইবে।

কৃষকের কৃষিকার লাভের পরিমাণের ওপর বর্ষীয় গড়পড়মধ্যে কিছুদিন আগে কৃষি-কণ লাভের বিল অনবদ্য পরিচালিত, তাহা আমাদের পার্থক্যের অঙ্গভূত হইবে।

সৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, উত্তর-বঙ্গের জমিদারবিশেষের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি বাঙ্গালা সরকারের প্রাথমিক-সচিব হইতে বি. এল. মিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া জমিদারবিশেষের প্রশ্নের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন :—কৃষকবিশেষের সরকার হইতে তাঁহারিণকে কণ বিবরণ বাবদ্য করা হইত এবং বর্তমান পর্যন্ত জমিদারবিশেষের কণ দেখে না হয় ততদিন পর্যন্ত সরকার তাঁহারের জমিদারী পরিচালনা-ভার গ্রহণ করুন—ইহা হইল জমিদারবিশেষের প্রতিনিধি-বর্ণের কথা। রাজস্ব-সচিব এই কথাই উত্তরে বাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে জমিদারবিশেষের প্রার্থনা আংশিক পরিমাণে পূর্ণ হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়।

কৃষি-কণ লাভের বিল ও জমিদারবিশেষের উপরোক্ত প্রশ্নের কাহিনী বাঙ্গালার কৃষিকারের বর্তমান প্রবর্তনার পরিচালক।

কৃষি লাভজনক থাকিলে কৃষকের সেনা করিবার প্রয়োজন হইত না এবং পঞ্চাশ বৎসর আগেও বাঙ্গালার কৃষকের এতদূর সেনার পক্ষে কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যে দিন হইতে কৃষিকারের লাভাংশ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে কৃষকেরও সেনা আরম্ভ হইয়াছে।

জমিদারবিশেষের অসম্মান জটিলতা ও কণ আরম্ভ হইয়াছে সেই দিন হইতে, যেদিন তাঁহারা জমী ও গ্রাম-সম্বন্ধীয় ব ব কর্তব্য অবহেলা করিয়া অস্বাভাবিক ও অসম্মান

প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিবার প্রয়াস হইয়াছেন। যদি তাঁহারা জমী ও গ্রাম সম্বন্ধীয় ব ব কর্তব্য মনোযোগী থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর্থ-অপেক্ষা অধিকতর বাহ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠালাভের কথা মনে স্থান বিহার অবসর হইত না এবং তাঁহারা অসম্মান কৃষকগণ দ্বারা হইতেন না।

বর্ষীয় গড়পড়মধ্যে এই দুইটা কথা কৃষক ও জমিদার-বিশেষের প্রবর্তনার প্রতিনিধি সম্মেলনের পরিচালক এবং এই সম্মেলনের ওপর গড়পড়মধ্যে জনসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র বটে, কিন্তু বর্তমান গড়পড়মধ্যে কার্যতঃ বাহা করিতে চলিয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের এবং গড়পড়মধ্যে কোন উপকার হওয়া তৎপূর্বের কথা, অসম্মান হইবারই আশঙ্কা আছে।

যে কারণে কৃষি লোকগণ-জনক এবং কৃষক কৃষিকারপ্রত্ন হইতেছে, তাহা অসম্মানিত না করিয়া কৃষকের কৃষিকার আশ্রিত লব্ধ করিয়া দিলেও পুনরায় কৃষকের কৃষিকার হইবার আশঙ্কা থাকিবার থাকিবে। পরন্তু মহাজনের প্রাধিকার প্রাধিকার টাকা বণ্য সময়ে পরিণাম না করিবার লক্ষ্যে কৃষককে দেওয়া হইলে কৃষক ও মহাজনবিশেষের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী বিকৃত মনোভাবের সৃষ্টি হইবে। অত্র মহাজনবিশেষের অনিষ্ট সাধন করিয়া কৃষককে কৃষিকার হইতে দূর করিলে, কৃষকের যে অজ্ঞানতা পানীয় সহ্যতা করা হইবে, তাহাতে কি কৃষকের অধিকতর অজ্ঞানতা বাহা করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত করা হইবে না? এই অজ্ঞানতা প্রবৃত্তির ফলে কৃষক যে একদিন ঐ জাতীয় অজ্ঞানতা বাহা গড়পড়মধ্যে সম্মেল উপস্থিত করিবে না, তাহার কোন নিশ্চয়তা আছে কি? অধিকন্তু মহাজনগণও যেসম্মান লোক ও গড়পড়মধ্যে প্রভা। যে কারণে কোন প্রকার প্রতি কিছুমাত্র অবিচার হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা করা কি কোন গড়পড়মধ্যে কর্তব্য? তাহাতে কি জনসাধারণের মধ্যে অসম্মান উৎপাদন করা হইবে না? অতএব কারণ অসম্মানিত না করিয়া এইজন্য ভাবে কৃষিকার লব্ধ করিয়া দিলে কৃষকগণেরও অনিষ্ট হইবে। কারণ, আমাংক বধন তাহাদের কণ করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন কণ পাওয়া ক্রেতকর হইয়া দাঁড়াইবে।

জমিদারবিশেষের কাছে জিজ্ঞাস্য যে, জমিদারী হইতে উপার্জন বাচাতে বাড়িয়া যায় এবং ব ব সৃষ্টি বাচাতে বজায় থাকে, তাহার বাবদ্য না করিয়া কে-লক উপরে কণ-

এরূপের কৃষিকা চাইবে, তাহার বাসস্থান করিলে অথবা কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাউসে কর্মীসংরক্ষণ পরিচালনা-দ্বারা ছাড়িয়া দিলে কোন সমস্যার চেষ্টা কি? এতদ্ব্যতীত যে কর্মী কর্মীসংরক্ষণ কল্যাণকর হইয়া কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাউসে গিয়াছে, তাহার মধ্যে কর্মী সংস্কৃত হইয়া আবার কর্মীসংরক্ষণের হাউসে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন কি?

বাংলায় গবর্ণর স্তম্ভ জন এগার্সনের কাছে আমাদের ভিজাত যে, তিনি বাংলা করিতে চাহিতেছেন, তদ্বারা ব্যক্তিগতভাবে তিনি সাময়িক বাহা অর্জন করিতে পারিবেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অথবা ভারতীয় প্রজাণ কোন দ্বারা উপকার সাধন করা চাইবে কি?

পল্লী-উন্নয়ন এবং গভর্ণমেন্ট

ভারতীয় এবং প্রান্তিক গভর্ণমেন্টগুলির মধ্যে পল্লী-উন্নয়নের কথা লইয়া যে বেশ একটু সাদা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। গ্রামের উন্নতি কাছাকাছি বসে এবং তাহা সাধন করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের কি ধারণা, তাহা আমরা এখনও কোন বিবৃতি হইতে স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারি নাই।

সম্রাট মুক্ত-প্রবেশের গভর্ণমেন্ট পল্লী-উন্নয়ন বিবি (The Manual of Rural Development) নামক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন।

“বাংলাতে পল্লীসংরক্ষণ অগভীর হুগ প্রাপ্ত হয় এবং স্থান-স্বাধীনতা, উপার্জন সম্ভাবনা (resources) ও যত্ন-সকল বাড়িয়া যায়, তাহার অবস্থা করা গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য—ইহা ঐ পুস্তকের কথা। ইংরাজী ভাষায় গভর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ যে সমস্ত কথা কহিয়া থাকেন, তাহা সাধারণতঃ স্রুতিমূলক হইলেও তাহার বাস্তব অর্থ কি তাহা প্রায়শঃ স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় না। ইহার অন্তর্গত দ্বারা আমাদের বিজ্ঞা-বৃত্তি, না ইংরাজী ভাষা, না সরকারী কর্মচারিগণের স্বভাব—তাহা বলা শক্ত।

প্রত্যেক মানুষ কি চাহে এবং বাস্তবের কি পাওয়া উচিত তাহা বিবর্তিত না হইলে, বাস্তবের সংগত কোথাও, মানুষ

কৃষিকার চক্র নিজেকে অনুসরণ মনে করিতেছে অথবা বাস্তবিকই সে অনুসরণ ইত্যাদি নির্দেশ করা যায় না।

প্রত্যেক মানুষ চাহে অন্ন, স্বাস্থ্য, গৃহ, কিছু কিছু আশ্রয়, স্বাস্থ্যজনক, সচ্ছন্দ, সত্যতা, স্বাধীনতা এবং দীর্ঘ জীবন। ভারতের প্রত্যেক পল্লীগ্রামের প্রায় প্রত্যেক মানুষের তাহা চরিত্র বৎসর আগে বহুলাংশে বর্তমান ছিল। আজ তাহা নাই কেন এবং আগে তাহা ছিল কি উপায়ে, তাহা প্রথমতঃ স্থির করিয়া না গিলে কোন প্রকৃত পল্লী-উন্নয়ন সম্ভব হইবে কি?

গভর্ণমেন্ট কর্মসাময়িক পল্লী-অভিযানী হইবার চক্র উপলব্ধি দিতেছেন। আমাদের মতে ইহা খুব ভাল কথা। ভারতবাসী যে চিরদিনই গ্রাম্য: পল্লীবাসী ছিল, তাহার প্রমাণ ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে ভারতের সমস্তের সংখ্যা। এখন যেদিক কোলাহল কোলাহল, মহামার্য মহামার্য, পানির খানার সমস্ত গড়িয়া উঠিতেছে—ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে ভারতবর্ষে এত সমস্ত ছিল না। বড় বড় কর্মসাময়িক-মহামার্য-দিগের কথা বার দিলে, অজ্ঞাতবস্তুর তাড়নায় ছাড়া কোন ভারতবাসী আরাম-উপভোগের চক্র দেখাব সম্ভাবনামূলক হয় নাই। ভারতবাসীর কোন অজ্ঞাতবস্তুর তাড়না উপস্থিত হইল, কেন সে সম্ভাবনামূলক হইতে বাধা হইল, তাহা আমাদের সমস্ত গভর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি?

চরিত্র বৎসর আগে দেশের যে অবস্থা ছিল এখন আর তাহা নাই। অজ্ঞাতবস্তুর না থাকিলে দেশে ও সমাজে গল্প-গুজন ও ঝগড়া-কণা চালাইলেও চালান হইতে পারে। কিন্তু এখন আব ঝগড়া-বণাধি চিড়া চিড়াইতে হইয়া করিলে তাহা সম্ভব হইবে কি?

বঙ্গীয় সরকার এবং অন্তরীণদিগের কৃষি ও শিল্প-শিক্ষার পরিকল্পনা

অন্তরীণগণ বাংলাতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষা কল্যাণ স্ব স্ব জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন এবং তাহাদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয়, তদ্ব্যবস্ত্রে বাংলাদেশের গভর্ণর স্তম্ভ জন এগার্সন একটী বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, উন্নয়নমূলক অন্তরীণ শিক্ষালাভেচ্ছা ইহা গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

অন্তঃপন্থকও জেলে পড়াইয়া সারা অপেক্ষা তাঁহারা লাহাতে বিভিন্ন মনোবৃত্তি লাভ করিয়া সংসারী হন এবং য য কোবিলা স্বর্জন করিতে সক্ষম হন, তাহাৎ বাৎসর্য কত্রে দেশের ও দেশের মঙ্গলজনক, তথ্যেই কোন লক্ষ্যে নাই। তর জন এওগুন এই বাৎসর্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন বসিয়া দেশবাসীর বহুবাদভাঙন। কিন্তু যে বাৎসর্যস্বারা অথবা শিক্ষাস্বারা এতাবৎ কাহারও চাকুরী না পাইলে স্বাধীনভাবে অস্ব-বস্থের সংস্থান হয় নাই, সেই শিক্ষার অন্তঃপন্থক য য অযোগ্যজন করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবেন কি ?

গতর্পক্ষেটর বিভিন্ন কৃতি ও শিল্প-বিভাগের হইতে যে সকল ছাত্র এতাবৎ পাঠ সমাপ্ত করিয়া সংসারবাসী নিকীহ করি-বার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কতজন স্বাধীন ভাবে কৌবিকার্ম করিতে পারিতেছেন, তাহা গতর্পক্ষেট একটু অসুস্থজন করিয়া দেখেন কি ? বর্তমান সময়ে যেনে কৃষি ও শিল্পের যে অবস্থা, তাহাতে ঐ ঐ ব্যবসা বাণ্য যদি কৌবিকার্ম করা হুগাধা হয়, তাহা হইলে কৃষক ও শিল্পীগণের পক্ষে লাভবান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে কেন ? যখন পরিহার দেখা বাইতেছে যে, কাহারও ঐ ঐ ব্যবসা অবলম্বনে কৌবিকার্মের চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের পক্ষেই বাঁচিয়া থাকা হুগাধা হইয়া পড়িয়াছে, তখন অন্তঃপন্থক কৃষি ও শিল্পশিক্ষাস্বারা কৌবিকার্মক্ষম করিবার চেষ্টা কত্রে কি “একে কথা” বলিয়া আখ্যাত কথা বার না ?

শিক্ষা ও ভারতের ভবিষ্যৎ

শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কোন্ বস্তু অথবা কোন্ বাৎসর্য মানুষের ইষ্টপ্রস অথবা অনিষ্টপ্রস তাহা জানা। শিক্ষা কথায় হইলে কোন্ কোন্ বস্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষণীয় এবং তাহা কি উপায়ে উপার্জন করিতে হয়, অতর্পক্ষে কোন্ কোন্ বস্তু মানুষের বর্জনীয় এবং তাহা কি করিয়া বর্জন করিতে হয়—তৎসব্বকে জানিলাত করা যায়। আখ্যাদের মতে আখ্যাদের শিক্ষা বিকৃত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের রাজ্য-পরিচালনার ভার বিবেচনীয় হইতে রহিয়াছে। যেদিন আখ্যাদের শিক্ষা কথায় হইবে, সেই দিনই আখ্যাদের রাজ্য-পরিচালনার ভার আখ্যাদের হাতে করিয়া আসিবে, কাহারও বাধা দিবার দায়বর্তী থাকিবে না।

বর্তমান রাজ্য-পরিচালনার সংগঠন (Constitution) অসুস্থতার বহু কার্য আখ্যাদের দেশীয় মহিদিগের হইতে হুত রহিয়াছে। তাহারা সক্ষেপেই কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাহাদের শিক্ষা যদি যথোপযুক্ত হইত, তাহা হইলে কি করিয়া য য পেট্রোটরি-পণের অথবা গতর্পক্ষের যুগ্মশিক্ষা না হইত, তৎসব্বাধানের হিতকর কাণ্য করিতে হয়, তাহাৎ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন এবং তৎসব্বাধার গতর্পক্ষেটের কোন কার্যে অসুস্থতা অসুস্থতা না করিয়া তৎসব্বাধিত আটাই হইতে পারিত। দেশময় যে চাকলা ভাগ্রত হইয়াছে, তাহাৎ বহুগুলি কারণ আছে, তন্মধ্যে প্রধান—বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও শিক্ষা-বিভাগের অসুস্থ-দশিতা এবং অনাচার।

শিক্ষা এত বিকৃত হইয়াছে যে, এখন আর মানুষ কি হইলে তাহার নিজের ভাল হয়, তাহা পর্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিতে জানে না। স্বপড়া-কাঁটিতে মানুষের কখনও ভাল হয় না, ইহা প্রাথমিক সত্য, অতর্পক্ষে এখন আর মানুষ স্বপড়া-কাঁটির কথা ছাড়া অতর্পক্ষে কোন কথা বলিতে জানে না।

সম্প্রতি বঙ্গ-ভারতের কৃষক ও শ্রমিক সত্যের কতিপয় প্রতিনিধি কংগ্রেসের সভাপতি বাণু রাক্ষসস্বাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই প্রতিনিধিগণের মতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সংস্থাপিত হইলে কৃষকগণের মঙ্গল সাধিত হইবে :—

- (১) উন্নত পরিগণনীয় আইন-সভার এবং কৃষক ও শ্রমিকগণের মঙ্গলার্থে জমিদারগণের সর্বসমতার প্রেরী রহিত করা।
- (২) যে পর্যন্ত জমিদারগণ সংস্কৃত মানসে থাকিলে, সে পর্যন্ত প্রাথমিক মনে সাধারণ নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে লম্বত পদস্বার্থী হইতে না দেওয়া হইবে।
- (৩) জমিদার বা তালুকদারীতে এবং মজাদ্দ অবলম্বন কৃষক-লম্ব পদস্বার্থী আইন অনুযায়ী শ্রমিকগণ, জমিদার প্রভৃতি কর্তৃক বীকৃত হইবে।
- (৪) সোভাল বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচনে প্রায়সংক্রান্তে যোগদানের হুত কৃষক ও কৃষি-অন্যজীবীদের একটি সাক্ষরগণিক অর্ধভাগের প্রতিনিধিত্ব হইবে।
- (৫) সবট জমীর উপায় মুসলিম ও একহারে করা কাঁটিতে হইবে। তৎসব্বাদের হারত বর্তমান সময়ের অপেক্ষা অনেক কম করিতে হইবে।

(৭) ১৯২৯ সাল হইতে পুনরায় সেউলয়েক্টর কলে বর্জিত ছুটি-
তাক্ষর আকর্ষ করা এবং আত্মজ্ঞ প্রবেশের লক্ষিত পুনরায় সেউল-
য়েক্ট বন্ধ করা।

(৮) প্রত্যেক প্রদেশে সেউ ও শিল্পোন্নতির জন্য বস্ত্রের খোঁজটা সমুদ্র
করিতে হইবে। সেউর বাঁধ, বাগ সমুদ্র হইতে যে লাভ হইবে,
ইহার সমস্তই দুর্ভিক্ষ-শূন্য ও অসুস্থ অঞ্চলে সেউর ব্যবহার
উন্নতি এবং হাট্টো-ইলেকট্রিক কীমের প্রসাধনের জন্য ব্যয়িত
হইবে।

(৯) অধিবাসে কৃষকস্বা-কৃষক বিচার্য্য প্রকট, অধাবী প্রকট এবং
অসুস্থ হোট হোট গর নির্মাণ করা আরম্ভ করিতে হইবে।

(১০) বাহ্যতে টেইক-বোর্ড আইন-সমূহ প্রকট প্রতিনিধি-স্বামী এবং
কোন শিক্ষক ব্যবস্থাপন করা প্রয়োজন কি না তাহা বিচার করিবার
হাসি অভিযানে ৪৫, ৩০০০ চাহ পুনর্ব্যবস্থা করা।

(১১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার একত্র ভাবে বসন করা, যেই উহার
মন্তব্য: নতুনকরা ৭৬ চাহ অধিবাস ও মন্ত্রণালয় প্রকট ৮১ সেক্টর
এবং বাহ্যকর ব্যয়িক আয় প্রতি পরিষদের ১০ হাজার টাকার
অধিক। তাহাও ১৫০০০ পতিত হয়।

(১২) অধিবাস ও মন্ত্রণালয় প্রকট ৮১ অধিবাস হইতে লব্ধ মুদ্রণ
২ হাজার টাকা আয়ের উপর অধিবাস আয়কর ৭৫০০ হয়।

(১৩) সেউর আত্মস্বাধীন ব্যয়িকের কেন্দ্রে প্রথম পদক্ষেপের তাড়া
হাল করিতে হইবে।

(১৪) শিক্ষার নিমিত্ত যে টাকা ব্যয় করা হইবে, তাহার নতুনকরা ৭৬
টাকা কৃষক ও প্রাদেশিক এবং তাহাও ৭৫০০০ কেন্দ্রে-সেউর সাধারণ
শিক্ষা ও বৃত্তিপ্রদান প্রকট ব্যয় করিতে হইবে।

(১৫) কৃষক ও প্রাদেশিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ করিয়া এবং অধিবাসী
প্রকারের সেউর ব্যয়ের উপর অধিবাসের অমন্ত্রণা গোপন করিয়া
মুদ্রণ সেউ-আইন পাশ করিতে হইবে।

(১৬) ইনাম-অধীনে ইনামদারী প্রাদেশিক চিকিৎসার বন্ধ বিবে
হইবে।

১৯৩০ সালের পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস পার্টিসম্প্রদায়ী
বোর্ড যে বৈদিক অধিকারের তালিকা প্রচার করিয়াছেন, উহার যে যে
অংশ উপলব্ধি লাবী তালিকা করিয়াই যাবে—ঐ মূল্য অংশ কৃষক-
কে ও কৃষি-অধিকারের মুদ্রণ লাবী অতিরিক্ত অংশ ও উহার অধীকৃত
কল্যাণ স্থিতিত হইবে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, সমস্তক্ষেত্রে যদি পুণাপুণী ঐ
দাব্যস্বাক্ষর করিয়া যেন, তাহা হইলে কি কৃষিকার্যের
লাভজনক হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে? তাহা যদি না হয়,
তাহা হইলে কি ইহাও প্রতিপন্ন হইবে না, আমরা এমন শিক্ষা
লাভ করিমাছি যে, আমাদের প্রকৃত মূল্য কিরূপে হইবে

তাঁহা পথ্যত আমরা জানি না এবং তৎসমূহ লাবী উপস্থিত
করিতেও পারি না?

বৈজ্ঞানিক সভা ও বিজ্ঞানের নমন

গত ১৯শে অক্টোবর বাম্বালোর হোটেল-স্নাবে ভ্রম
শি. সি. মঙ্গল জীবনমঙ্গল বর্ষ-বিতরণতা বিষয়ে একটি বক্তৃতা
প্রদান করেন। এই সভার উদ্বোধনযোগ্য অংশ বক্তার নাম
ডাঃ গিলবার্ট কাউলার।

ভ্রম মঙ্গল ও ডাঃ গিলবার্ট কাউলার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।
বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাদের দুই-মিঃস্বত বিজ্ঞানের বাস্তব
অভিচারিত চিত্রে আমাদের প্রথম করা উচিত। আমরা এই
পদ্ধতি বক্তার সাহিত্যে পারিতোষিক না বলিয়া প্রস্তুত। আমরা-
দের বৈজ্ঞানিকগণ যে সমস্ত কথা আমাদের দিক্‌তে চানাইয়া
থাকেন, তাহার বাম্বাধা ও প্রয়োজনীয়তা কতখানি, তাহা
বোঝাইবার জন্য আমরা ভ্রম মঙ্গল ও ডাঃ কাউলারের
বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিতেছি।

ভ্রম মঙ্গল প্রথম কথা—লব্ধ মঙ্গল-জীবনে অতি
প্রয়োজনীয় এবং পক্ষিপালী অংশ অভিন্ন করিয়া থাকে
(‘colours played a very important and
influential part in human life.’)।

‘বর্ণ’ যে প্রত্যেক মানুষের চক্ষুর উপর অবতরণ পক্ষ, স্পর্শ,
ভ্রম, মঙ্গল এবং গন্ধের প্রত্যেকটিই যে ব্যক্তিগত ও সমবেত
কাণ্ডে অনিশ্চিত মানুষের সমগ্র জীবনের উপর অনেক বেলা
খেলিয়া থাকে, তাহা আমরা বৃত্তিতে পারি বটে; কিন্তু এক
মাত্র ‘বর্ণ’ই যে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সমগ্র জীবনে কি
করিয়া অতি প্রয়োজনীয় এবং পক্ষিপালী অংশ অভিন্ন
করিতে পারে, তাহা আমরা বৃত্তিতে পারি না।

বাস্তব ক্ষেত্রে, প্রথমতঃ চক্ষুর উপরই যে বর্ণের খেলা হইয়া
থাকে, তাহা অধিকার করা যায় না। চক্ষুর উপস্থিতি
ঐ বর্ণের খেলাই যে সমগ্র জীবনীশক্তিতে পরিণত
(Physiology) সাধারণতঃ প্রতিপন্ন করিতে পারেন কি?
যদি শব্দবোধে ভিত্তর প্রতিনিহিত যে খেলা হইতর্থে, তৎসমূহ
বিশুদ্ধ অল্পকৃতি থাকিলে মঙ্গল সাহেব জানিতে পারিতেন
যে, সমগ্র জীবের চক্ষু বর্ণ গ্রহণ করে বটে, কিন্তু মানুষ

অপনার জীবন সফল কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত থাকিলে এই সর্গের কাব্য চক্রে আরম্ভ এবং চক্রেতেই শেষ হইয়া থাকে এবং লোকের অল্প কোন অংশে তাহার অভিনব হইতে পারে না।

রমণ সাহেবের দ্বিতীয় কথা—খোলাটে রঙের উপর আলোকের ইতস্ততঃ নিক্ষেপ হইতে নীলবর্ণের উদ্ভব হইল থাকে ('the blue was caused by the scattering of light in a turbid medium'.)।

এই তৃতীয় ব্যাখ্যা হইলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের দুগ্ধাক্ত হইয়া কথ্য, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। রমণ সাহেবের মতে খোলাটে বস্ত্র থাকিলে উপরই আলোকের ইতস্ততঃ নিক্ষেপ হইতে বসন নীলবর্ণের উদ্ভব হয়, তখন তিনি নিচ্ছই খোলাটে, সাদা অথবা লাল কাচের উপর উত্তাপন (??) আলোক দ্বারা নীলবর্ণের উদ্ভব সম্ভব করিতে পারিবেন। রমণ সাহেবের মনে রাসিতে হইবে যে, তাঁহাকে উত্তাপনীন আলোক ব্যবহার করিতে হইবে। খোলাটে, সাদা অথবা লাল কাচের উপর উত্তাপনীন আলোক ইতস্ততঃ নিক্ষেপ দ্বারা নীলবর্ণের সৃষ্টি করিয়া তিনি তাঁহার ব্যাপ্তি সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন কি?

আমাদের মত সাধারণ লোকের মনে হয় যে, রমণ সাহেব সম্পূর্ণ ভাবে উত্তাপনীন আলোক পাইবেন না এবং সাদা ও লাল কাচ হইতে নীলবর্ণের উদ্ভব হইবে না।

রমণ সাহেবের তৃতীয় কথা—চতুর বর্ণগ্রহণ (অথবা বর্ণ-সাধন) অঙ্গাংগা রকমের ('animal colouration was of numerous kinds'.)।

রমণ সাহেবের মতে জন্তুর বর্ণগ্রহণ (colouration) যখন অঙ্গাংগা রকমের, তখন নিচ্ছই কত রকমে যে বর্ণগ্রহণ (colouration) হইয়া থাকে, রমণ সাহেব তাহার সাংখ্য্য করিতে পারিবেন না। কাষেই যে যে রকমের বর্ণগ্রহণ (colouration) হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে রমণ সাহেব বলিতে পারিবেন না, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিতেছেন—ইহা বুঝিতে হইবে। যে যে রকমে বর্ণগ্রহণ (colouration) হইয়া থাকে, তাহা যখন সম্পূর্ণভাবে রমণ সাহেবের এখনও জানা হয় নাই এবং তাঁহার অজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি নিজেই যখন পরিজ্ঞাত, তখন তিনি বর্ণের কাখাকলাপ

সম্বন্ধে বাহা বলিতেছেন, তাহা প্রাশং-বাক্য হইতে পারে, এই কথা ভগবতের সম্বন্ধে কোন স্বীকার করিবেন না?

আমরা তাঁহাকে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত হইয়া কবু, সাদা, ঘটু, এই তিনটি ধেম এবং বৈশেষিক দর্শন অনু-সন্ধান করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, বর্ণসাধনের কারণ অঙ্গাংগা নহে, মাত্র পাঁচটি, মূলতঃ একটি। বস্তুর যৌগিক উপাদান সত্ত্বেও ব্যাখ্যাত্ত জানা করিতে পারিলে উত্তাপের সাহায্যে, যে-কোন হইটী প্রাকৃতিক বস্তুর মিশ্রণে কোন বর্ণবিশেষের উদ্ভব হইবে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

রমণ সাহেবের চতুর্থ কথা—প্রকৃতি দেবী বর্ণ-ব্যবহারে অপরাধী এবং তাঁহার পরিণতি অজ্ঞান করিবার জন্য অনন্ত রকমের বিস্তার উপর ন্যায়কল্প করিয়া থাকেন ('Nature was lavish in her use of colours and commanded an infinite variety of resources to achieve her effects'.)।

আমরা এতদিন পর্যন্ত জানিতাম যে, প্রকৃতি দেবী কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তা এবং তাঁহার মিত্রের কোন ন্যায়কল্প করিবার সাধ্যা নাই। রমণ সাহেবের কথায় বুঝিতে হইবে যে, তিনি এমন একটি প্রকৃতি দেবার সন্ধান পাইয়াছেন, যিনি যেজ্ঞার বীর বিস্তার উপর ন্যায়কল্প করিতে পারেন এবং করিয়া থাকেন। আমরা বহুদিন হইতে অনুসন্ধান করিয়াও পান্ধাতা বৈজ্ঞানিকের কোন গ্রন্থে কোন প্রকৃতি দেবীর সম্পূর্ণ ও সমগ্র কোন বর্ণনা খুঁজিয়া পাই নাই। রমণ সাহেব তাঁহার অভিনব কর্তৃত্বশালিনী প্রকৃতি দেবীর সম্পূর্ণ ও সমগ্র বর্ণনা ভগবতের সম্বন্ধে ব্যক্ত করিবেন কি?

রমণ সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি দেবী "অনন্ত রকমের" (infinite variety) বিস্তার উপর ন্যায়কল্প করিয়া থাকেন। আমরা "অঙ্গাংগা রকমের" (innumerable varieties) বিস্তার বলিতে কি বুঝা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি বটে, কিং "অনন্ত রকমের" (infinite variety) বিস্তার বলিতে কি বুঝা, তাহার ধারণা (practical conception) করিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, infinite variety ভাটীয় পথ দ্বারা ব্যবহার করেন, তাহাদের শব্দান্তের জ্ঞান বাসকোচিত। তবজ্ঞানোপেক্ষা-

কেবলো বাল্যকালিত পক্ষ-বাসনায় অত্যন্ত অশোভনীয় নহে কি ?

তখন সাহেবের পক্ষ কথ্য—পক্ষীর বর্ণ-দানন তিনটী সীমান্তে নবুনাথ বিভক্ত করা গাইতে পারে,—বর্ণা, বর্ণের 'non-iridescent type', 'iridescent type' এবং বর্ণের তৃতীয় নবুনাথ হইবে পেইটী, যেটা পর্থাৎকণকোণল ('অথবা নৃষ্টির বর্ণন) প্রস্তুত নহে ('The coloration of birds could be divided into three definite types, namely, the noniridescent type of colour, the iridescent type in which the colour changed according to the angle from which one looked at it and that type of colour which was not a function of the angle of inspection.')

তখন সাহেবের পক্ষী বর্ণবিদ্যা গণ্য এই বৈজ্ঞানিকতা। আমাদের অর্থোনা।

অলোক অথবা বায়ু বিশেষ বিশেষ কার্য্য বাস্তবিত্ত কেন্দ্রমাত্র চক্ষুর্দ্বারের ভাবনামাত্র ভক্ত যে, কোন সত্ত্ব বর্ণের ভাবনামাত্র লক্ষ্যেই হইতে পারে, তাহাও আমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

তখন সাহেবের বক্তৃতায় থাকে কথাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথম অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গাইবে এবং তৎসম্বন্ধে কোন কথা আমাদের দ্বারা হইতে পারিবে না খোঁবাই ভাল। আমাদের বোধ হয়, তখন সাহেবের মত নিখাত বৈজ্ঞানিকতা বাস্তবিত্ত হইলে যে বিভ্রান্তির প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। কায়েই তখন সাহেবের প্রত্যাবর্তিত তথ্যগুলি লভ্য অথবা তখন—প্রস্তুত, তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য করিবার অধিকার আমাদের নাই। আমরা শুধু এই প্রস্তাব বৈজ্ঞানিকপক্ষে বিভ্রান্ত্য করি যে, যে কথাতত্ত্ব তথ্যমূলকিত্ব হ্রাসপণের পক্ষে বুঝা অথবা ধারণা করা সম্ভব নহে এবং বাস্তব প্রয়োণে যে সমস্ত কথার কোন পার্শ্বকথা নাই, সেই সমস্ত কথা সাধারণের সম্বন্ধে প্রণয় করিবার কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে ?

পাঠকগণকে কোন কথা বলিবার আগে জানাইয়া রাখিতেছি যে, তখন সাহেবের উপর ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোন ভগ্ন অপ্রভা নাই। পক্ষ-তখন সাহেব একজন বতাবত:

প্রতিষ্ঠাপাদী লোক বলিয়া আমাদের ধারণা। আমাদের বত কিছু বিবরণ, তাহা এই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতায় সহিত। আমাদের বাস্তব, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতা বাস্তবিক অর্থোনা করিয়া তোলে এবং তাহা মাত্রই বাস্তবিক কেন্দ্র নিখাইয়া বিস্তারিত হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক করিয়া বাস্তবিক গাঁথিয়া থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন ভ্রমের উন্নতিসাধন করিতে সম্ভব হয় না।

তা: কাউলারের বক্তৃতায় হইতে আমরা নূতন তথ্যগণ যে, সম্পূর্ণ উদ্ভাবনীয় অলোকের সৃষ্টি হইতে পারে এবং তাহার নবুনা—অলোক। পাশ্চাত্যসৃষ্টিতে অলোকের বাস্তবিক নক্সি নাই এবং তাহার অলোক আছে অলোক উদ্ভাবন নাই, ইহা বলা গাইতে পারে বটে, কিন্তু বতাব: পক্ষ অলোকের বাস্তবিক নক্সি আছে কি না তাহা পরীক্ষাযোগ্য। একটা ভীষণ অলোক প্রমাণিত ভীষণতা হইয়া বত করিয়া অলোকের বাস্তবিক নক্সি আছে কি না, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা গাইতে পারে। অলোকের মধ্যে বাস্তবিক-নক্সি না থাকিলে বত অলোক হইতে নক্সি-বতাব: ভীষণ পক্ষ পাওয়া সম্ভব হয় কি ?

তা: কাউলারের মতে বাস্তবিকপণের উদ্ভাবন আছে অলোক অলোক নাই। আমাদের বোধ হয় এই বতাব: ও ধারণা নহে। যদি উদ্ভাবন বাস্তবিকপণের অলোক নাই না থাকিত, তাহা হইলে তাহা বাস্তবিক প্রত্যাবর্তিত মত কেন্দ্র সম্বন্ধে বাস্তবিক ও ভীষণ-পুলিনের এত প্রণয় কেন ?

পশু-বলি ও আত্মজ্ঞাতিক বস্ত্র-পরিবদ

পশু-বলিমান কর্তব্য অথবা অকর্তব্য, তাহার অলোক-কেন্দ্র তা: নক্সিমান পাঠ্য বস্ত্র আত্মজ্ঞাতিক বস্ত্র-পরিবদ একটা অধিব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। এই অধিব্যবস্থার অনেক প্রণয়নামাত্র পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের প্রস্তাবকেই প্রস্তাবের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের প্রায় প্রস্তাবের কথা হইতে যদি আমরা স্মৃতিতে চাই যে, পশু-বলিমান কর্তব্য, তাহা হইলে তাহা বুঝা গাইতে পারে; আবার যদি স্মৃতিতে চাই যে, পশু-বলিমান ভীষণ পণের কথা এবং তাহা অকর্তব্য, তাহা হইলে তাহাও বুঝা গাইতে পারে। বতাব ইহাই প্রকৃত আধুনিক পাঠ্যের লক্ষণ। একদিন ছিল, এখন কোন বাস্তব অর্থোনা অথবা বিভ্রান্তী-না কথা

কহিলে “পাণ্ডব” বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু অনুনা অনর্পণ কথা কহিতে হইবে অথবা বক্তৃতা দিতে হইবে, অথচ কেহ যেন বুঝিতে না পারে বক্তব্য অথবা সিদ্ধান্ত কি, — অর্থাৎ ঘটা-হোঁতা না যেওয়ার (non-committal) নৈপুণ্য না থাকিলে আর মানুষ পণ্ডিত অথবা চতুর বলিয়া পরিগণিত হয় না।

আধুনিক নৃত্যের মত একটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞানের বিজ্ঞান য এবং তাহার বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক-ও আনন্দের মত অঙ্গ-বুদ্ধি চরিত্রাঙ্গের অযোগ্য এবং বাস্তব ধারণাতীত। কাহ্নেই পাশ্চাত্য নৃত্যের পণ্ডিতগণের যুগ হইতে যে সমস্ত কথা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা যে দেশের লোকেরা ২৭ জন লোক আনন্দের শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সেই দেশের লোকের না ভুলিলেও চকিতে পাবে। অতএব আমরা তাহার অযোগ্যতা কহিব না।

আমাদের আলোচ্য হইবে অধ্যাপক বিদ্যুৎপদ শাস্ত্রীর বক্তৃতা, কীরূপ তিনি “শাস্ত্রী”। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম কথা, অহিন্দা শাস্ত্রবিদ্যাসী হিন্দু প্রাণের বিরোধী নহে (“Ahim-
sism” is not alien to orthodox Hindu tradi-
tion.)।

তাঁহার এই কথাই কি বুঝিতে চাইবে যে, হিংসা কোন কোন সময়ে শাস্ত্রবিদ্যাসী হিন্দু প্রাণসম্মত এবং পণ্ড-বিশ্বাস এবং পণ্ড-হিংসা একই অর্থবোধক? পণ্ড-বিশ্বাস কণি শাস্ত্রসম্মত তাহা বুঝ সত্য, কিন্তু পণ্ড-হিংসা ভারতীয় ভবির কোন গ্রন্থে অস্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রী মহাশয় ভগবৎক শেখরিতা দিবেন কি?

শাস্ত্রী মহাশয় জানিয়া রাখুন, “বলি” শব্দের অর্থ—“অব-
হইতে ভীষণ অস্তিত্বের কারণ ক্রিয়াক্রমে উদ্ভূত হয়, তাহা
বুঝিবার কার্য; আর “হিংসা” শব্দের অর্থ “ভীষণ বুল
উপাদানের কার্য বিদ্যুত হইবার ফলে যে উত্তাপের কার্য
আরম্ভ হয় সেই কার্য।” ভারতীয় ভবিরগণের কথাগুলো
ভীষণ অস্বাভাবিক হিংসার উদ্ভব হইলে যে উপস্থিত হয় এবং
তাঁহা সর্বত্র পরিচায়ক। (পৃষ্ঠা ২৪ অং, ৬৪ প্রাক; ৭৭ অং,
২৭, ২৮ প্রাক); আর বগি বাতীত ভীষণে ভীষণ ধারণ
করিবার উপায় নাই।

ভীষণের প্রধান বর্জ্য, স্ত্রীর স্ত্রী বাহ্যেতে বজ্র থাকে
একই বুদ্ধি-প্রাপ্ত হয় তাঁহার ভক্ত চোঁড়া করা। অথচ স্ত্রীর

নিয়ন্ত্রণসাধে কোন ভীষণ অস্ত্র ভীষণে পান্ড-নাথন অথবা
অস্ত্র ভীষণে রূপান্তরিত না করিয়া ভীষণে ধারণ করিতে
পারে না। ভারতীয় ভবির কথাগুলোতে-বাহা কিছু প্রকৃতি-
ভাষ্য, তাহাই ভীষণ এবং ভীষণ হই প্রকার, বহা, চর এবং অস্ত্র।
চর অথবা অস্ত্র ভীষণে বাস্তবপণে গ্রহণ না করিয়া কোন ভীষণের
পক্ষে বাঁধা সম্ভব নহে। প্রকৃতিক নিয়মের এমনই বৈশিষ্ট্য
যে, কোন বস্তুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া বাস্তবপণে গৃহীত হইলে,
আপাতদৃষ্টিতে ঐ বস্তুর ধ্বংসসাধন করা হয় বটে, কিন্তু
কাঁচাভাষ্য ঐ শ্রেণীর বস্তুর ধ্বংস-সাধন করা ত সুব্রত কথা,
ঐ শ্রেণীর বস্তুর উন্নতিসাধন করা হয়। লক্ষ্য করিয়া দেখুন,
আমরা বাস্তবপণে মল-মূল, মল ও মল-প্রকৃতি যে-সব ভীষণ
বাহ্যের কার্য থাকি, তাহার ভাব্যপণে মলপণে বুদ্ধিকার
সহিত মিশ্রিত হইলে যে-পরিমাণে ভীষণে আমরা বাস্তবপণে
বাহ্যের কার্যের ভক্ত ধ্বংস-সাধন করিয়াছি, তদপেক্ষা বহু
জন পরিমাণে ভীষণে স্ত্রীর সন্তাননা হয়। অত দিকে বুঝা
কোন ভীষণে বিনাশ সাধন করিলে তাহার ধ্বংসসাধন প্রাণক;
অত কোন ভীষণে স্ত্রীর সন্তানক হয় না এবং তাহাতে স্ত্রীর
স্ত্রীধ্বংসের সন্তানতা করা হয়।

ভীষণে বুঝা ধ্বংস-সাধনের নাম “হিংসাপ্রসূত ধ্বংস”
এবং বাস্তবপণে ভীষণে ধ্বংস-সাধনের নাম “বলিপ্রসূত
ধ্বংস”। হিংসাপ্রসূত-ধ্বংস স্ত্রীর সন্তানতা এবং বলি-
প্রসূত ধ্বংস স্ত্রীর রক্ষা ও বুদ্ধিকার। হুইটাই ধ্বংস,
অথচ একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরূপ নিত্য
পণ্ডিত। মাত্র বাহ্যেতে “উত্তমের পণ্ডিত বুঝার থাকে” না
চাপা, উত্তম ভারতীয় ভবি তাঁহাদের প্রত্যেক পুত্র এই
ধ্বংসের বাহ্যেতে মাত্রের বুদ্ধিপণে সর্বত্র ভাব্যত থাকে,
তাঁহার বাহ্যে কার্য পণ্ডিতছেন। “পুত্র” বলিতে কি
বুঝা, “ছাপবলি” বলিতে কি বুঝা এবং যে “বহু”ভলি
বাহ্যত হয়, তাহার অর্থ কি, তাহা বলাবলি জানা থাকিলে এবং
চিন্তা করিলে আমরা “বলি” ও “হিংসা” শব্দকে বাহা বলিমান,
তাঁহার মতান্তর অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

আমরা শাস্ত্রী মহাশয়গ্রন্থ পণ্ডিতগণক। ভারতীয়
ভবির কথা লইয়া দেখা করিতে নিবেদ্য কতি। অসম্মত-
বৎ ঐ কথাগুলি লইয়া মন্ত্র মন্ত্র সংস্করণ পরিচা দেখা
করিবার ফলে দেখিবার ভাবে প্রায় প্রত্যেকের অজ্ঞাত

উপস্থিত চট্টগ্রামে, এমন কি সাধা ভগতে মঙ্গলভাটির অস্তিত্ব বত্বার সাধা স্পেকশন চট্টগ্রামে গড়ে উঠাচ্ছে। আমরা নগণ্য বলিয়া আমাদের কথা উপেক্ষাযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু স্বেচ্ছাতি সেরা যে অস্বাধীন করিয়াছেন, তাহাতে অস্তিত্ব আমাদের এই কথা বাধা হইয়া সকলের স্মৃতিতে হইবে।

শান্তি মহাপ্রভুর বক্তৃতার দ্বিতীয় কথাগুলো—

বৈদিক জীবনে স্বাধীন ও উন্নতির হওয়া বিশ্বাস্য হইবে।

উন্নতির এই স্বাধীনতা ও উন্নতির অর্থ কি, তাহা আমরা জানি না। কারোই উন্নতির সমালোচনা হইতে আমরা বিরত থাকিলাম। আমরা বাহ্যিক জ্ঞান, শুধুমাত্র জীবস্বত্ত্ব সর্বদা বিশেষ বিশেষ নিয়মে পরিচালিত, ইহা ভারতীয় জীবন ধর্ম এবং সর্বদা মানুষের বিবিধ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ধারণ করা কর্তব্য, ইহাই ভারতীয় জীবন উপদেশ।

সংবাদ ও অন্তর্য

শিক্ষা

পারিক স্কুল

১৩ ৩শে অক্টোবর বোম্বেতে ইংল্যান্ড অসুস্থতার কারণে পাবলিক স্কুল খোলা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য—বক্তৃতায় বড়লাট বলিয়াছেন :—কেন্দ্রে ইংল্যান্ড-প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতিতে স্কুল কলে নাই এবং অনেকের মতে সে পদ্ধতিতে কেবল শ্রমিক শ্রম করিয়া জীবিত হইতে চাহিতব্যের দিক হইতে কোন উপকার হয় না। এই পারিক স্কুল এই সকল সমালোচনার উত্তর দানে সক্ষম হইবে, আশা করা যায়। স্কোলা ও স্কোলাসের বিশদত্ব এই বিজ্ঞান বিদ্যার কঠোর পরিচয়। কিন্তু মানুষ বিজ্ঞানের মত উৎকৃষ্ট শিক্ষাই পায় না কেন, জীবনে যে উন্নতি করে, তাহার শিক্ষার দ্বারা অনেকখানি সে নিজেই গ্রহণ করে। এ বিজ্ঞানের কর্তৃপক্ষ এবং ইচ্ছা না যে, যেন কেবল শ্রমিকগণই উৎকৃষ্ট, গাং-বড়লাটের মত করে, যেন শ্রমিকের মত বীর বীর্যের মত অধিকার কবির শিক্ষা বেগাই তাহাদের ইচ্ছা।

বড়লাট সাহেবের বক্তৃতায় এমন একটি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত উন্নতির দেশের শিক্ষা-পদ্ধতিতে যে-সব পরিমিত হইবে, তাহা ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ। আমরা অস্বস্তি অধীকার করি না যে, এই শিক্ষার কতকগুলি দোষ পরমুখ্যপেক্ষী, চাক্ষুসী-বী আনন্দবর মতো অধিকতার পরিচয়; কিন্তু শিক্ষার মূল শ্রম বিধে যে আলোচনা আমরা 'বদন্তী'তে এ বাবৎ করিয়া আসিতেছি, তাহা বাহ্যিক পাঠ করিতেছেন, তাহারা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বর্তমানে গণমাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে, তাহা শিক্ষার অভিন্ন মাত্র। কলিকাতা কিংবা বোম্বেতে 'কোন স্কুলের শিক্ষার সহিত, ইটন, হারো, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড,

হার্ভার্ড, বার্লিন, প্যারিস ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানের স্কুলের শিক্ষার যে পার্থক্য, তাহা কেবল বহিরাবরণের পার্থক্য—মূল দোষ সর্বত্রই বিদ্যমান; সে-দোষ হইতেছে এই যে, জাতিক বাসায়ের অভ্যন্তরীণ জ্ঞান, যেমন মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের বাহ্যিক কি করিয়া কঠোর হইবে সে-ব্যবস্থা করিয়া শ্রম, শ্রমী ও বীর মাতৃ কি করিয়া লাভ করিতে হয়—তাহার জ্ঞান এই শিক্ষার হয় না। সুতরাং বড়লাট মহোদয় আশা দিলেও এই পারিক স্কুল প্রবর্তনার সম্পর্কে আমাদের বিশেষ আশাব্যক্তি হইবার কিছুই নাই। বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—মানুষ বিজ্ঞানের মত উৎকৃষ্ট শিক্ষাই পায় না কেন, জীবনে যে উন্নতি করে, তাহার নিজের শিক্ষার দ্বারা অনেকখানি সে নিজেই গ্রহণ করে। তাহাই যে-বিধে, এ কথা যে এই মানে হয় না যে, মানুষ হইবার মত শিক্ষালাভ বা বর্তমান ভগতে নাই? থাকিলে, নিজের শিক্ষার তার নিজের হাতে লইতে হইবে কেন?

সমাজ ও বিশ্ব-বিজ্ঞান

১৩ ৩শে অক্টোবর বোম্বেতে বিশ্ব-বিজ্ঞানের সমালোচনা-মন্ত্রণা সভায় সভাপতিত্ব করিয়া ইংল্যান্ডের বিশেষজ্ঞ :—সামাজিক অর্থনীতি (social economy) বিশ্ব-বিজ্ঞানের সীমিত কর্তব্য। এম, জর্জ-বিশ্বের সমালোচনা : হই, টার্কিন-কেন্দ্রে ও বাহ্যিক বিশ্ব-বিজ্ঞান-বিশ্বিত হ্রস্ব স্থান পায়, সে দিক দৃষ্ট : ভিন্ন, উৎকৃষ্ট সামাজিক ইচ্ছা।

প্রতিবাদ না করিয়া যদি এই বক্তৃতার প্রতিপাদ্য স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আমাদের বক্তব্য এই যে, বর্তমান সামাজিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞান তাহা কেবল বিশ্ব-বিজ্ঞান

হইতে এই তিনটি উদ্ভেদমূলক শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। অধিকন্তু, সামাজিক সংগঠনের বর্তমানে যে অবস্থা, তাহাতে এই উদ্ভেদ-সাধক শিক্ষা বিখ-বিজ্ঞানসে প্রবর্তিত কথিগেও তদ্বারা কোন প্রচলন কলিবার আশা নাই। বর্তমান সামাজিক সংগঠনই যে ‘হাসেন পদ’ তাহা মহীশূর তাকোর দেওয়ানের ডানিগাথ জুড়িয়া না হইতে পারে, মহীশূরবাসী জন-সাধারণ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহা বৃত্তিতে পারিতেছেন।

পরীক্ষা ও শিক্ষা

হয়গার এক শিক্ষকসংলগ্নী সত্যের বোঝায়ে উইলসন অসম্ভব জিনিপাল হেডায়েও মাকেজি বর্ণনায়ছেন :—হায়গার বর্ণনায় শিক্ষা-বহান ক্রম পরীক্ষার বড়াকৃতি, পরীক্ষা এইকম কল্যাণ জালিত কিসা এসে ছিল না, ইহা উল্লেখ পরীক্ষীতে ইংলও হইতে আশাযনি। ইহার পরিবর্তন হওয়া হজকাহ।

বাহ্যাসেবায় ‘শিক্ষা-সমগ্র্য সজিতি এক সমগ্র বহীতুরে খুয়ায় বর্ণনায়ছেন :—শিক্ষা-বহান এই পরীক্ষা-পদ্ধতি টীনেও হাজকাহ কতি কথায়হে, ইংলওতে ইহা বহিষ্কৃত থাকিয়াও ডিগ্রাণ্ডিত হইয়াছেন যথা এই মতে বর্ণনায় শিক্ষার প্রতিবন্ধক হিসাবে বিখিত হইয়াছে। পরীক্ষার এই পদ্ধতির পরিবর্তন হায়গার হাজকাহ কার্যকারিতার বিচার হই, ইহার সমগ্র্য হওয়া হজকাহ।

আমরাও স্বীকার করি যে, প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রেক্ষাগৃহে অর্থহীন। কিন্তু যে-শিক্ষার্থী গোড়ান তথা হইতেছে, বই মুখক কবা, তাহান পরীক্ষা-পদ্ধতি দ্বিত ভাবে কবা কিস্তিগে চলিবে তাহা বৃত্তিতে পারি না। আসলে টটা বহুবিধেবই এপিঠি এবং ওপিঠি। সমগ্রভাবে সমগ্র্যকে না দেখিয়া, অজ্ঞপ্তিগে দেখিয়া সমগ্র্যানেস ডিগ্রাল সমগ্র আর নাই। সেমগ্র সমগ্র উইটিয়াছে, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি অকেজো, কিন্তু সেট সমগ্র এমন একট লাললাব তাব পাশ্চাত্যেব শিক্ষা এবং অপরাধের বিষয় সম্পর্কে তাগিয়াছে, বাহাতে প্রেক্ষাবাহে হতাশ হইতে হয়। চোখ মেলিয়া আমরা চাহিয়া দেখিতেছি না যে, পাশ্চাত্যেও আমাদেরই হার মতে, আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক হাজারকায় উইটিয়াছে। নিহাও অজ না হইলে একথা অস্বীকার করা হলে না। অপর, আন্তও আমরা লভনে দিলিয়া প্রাপণগ চেষ্টা করিতেছি, বাহাতে উহাদের অল্পক্লম-প্রতিযোগিতায় আমাদেরকে কেহ হার না মানাইতে পারে। তাহা না হইলে, এই যে ‘শিক্ষা-সমগ্র্য’ এবং এই ‘শিক্ষক-সংলগ্নী’—ইহায়েত এমন প্রাচুর্য্যব হইত না। সেম

যে শিক্ষা-সংগ্রহের ‘মুগা’ উইটিয়াছে, তাহা যে প্রেক্ষাবাহেই ‘মুগা’—এ কথা আমরা কবে বুঝিব ?

হাসেন ও সম্প্রদায়

কৃত্তকোমারে এক শিক্ষক-সংগ্রহ উইটিয়া পাঠ্য বর্ণনায়ছেন :—হায়গার মন সম্প্রদায়ের মতো বহীতুর, তাহান পদে আশেপাশিতার ওজ টীকাহ অশোভন। প্রতিবর্তনের পদে মনে এই অসম্ভব অসম্ভব পরিত্যক্ত।

গতীমাত্রই বাগাণ—সে সম্প্রদায়েরই হউক, কিংবা অপর কিছুই হউক। কিন্তু গতীতে অত্যন্ত না হইলে গতী উত্তীর্ণ হইবার শক্তি অর্জন করা যায় না, ইহা বৃত্তিগে চলি কি ?

“চতুর টিয়াপাখী”

জিনিপালগী ইয়ুজ এম. কে. দেবশিখারনি মেনের বর্ণনায় শিক্ষক-সংগ্রহের আশেপাশ পদে অসম্ভব আশেপাশ কল্যাণ টীকাহ বিলাখে তিনটি অজিগেপ আশিগেয়েন। অসম্ভব : ইহা আশা বহীতুর আর কোন শিক্ষার্থী শিক্ষিত করে না। বিলাখে : ইহাতে “চতুর টিয়াপাখী” মত বৃত্তি আশেপাশ বাড়া আর কোন শিক্ষা হই না। কৃত্তকোমারে ইহা পাশ্চাত্যিক পাশ্চাত্যিক হইতে বিলাখে বহীতা শিক্ষার্থীকে মুগেপ লইয়া যায়।

আমরা সর্গাস্ত্র্যকরণে প্রীতু দেবশিখারনিগে সমগ্রন করি। কিন্তু কোন পরীক্ষার-নির্দেশ তিনি দিতে পারিবেন কি ?

শিক্ষা ও বেকার

টীনে শিক্ষিত যুগেরের অমো বেকার-সংগ্রহা দেখা লিখিত। শিক্ষা-এক এক কথায় : দ্বিতিক গ্রাণ গোমোয়া টাফা বেকারের এক চাহুদীও এক তিনশত অবলম্বন পড়ে : হায়গার অমো ১০ জন প্রাচুর্য্যে, ১০ জন ক্লমপূর্ণ শিক্ষক, ১০ জন চাহুদীওর জাণকর্তারী এবং ১০ জন চাহুদীওর সৈনিকভাগের লোক।

আন্তর্জাতিকক লংঘায় মতে। কথ্যে শিক্ষা এবং বেকার সমগ্র্যার মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

কথার অপব্যবহার

অজ, লি-লিগাণেও এক চাহ-সংগ্রহ তা সর্গাস্ত্র্য হাজারকায় বর্ণনায়ছেন—অর্থ না খুঁজিল সেগালিহই, কথ্যবহু, কাগিটদিহই ইহাতি কবা কথার কবা অশুভিত।

ছাত্রদের গোমোই কথার এই অপব্যবহার, না শিক্ষকের গোমো, কে বলিবে! আমরা আশা করি, সর্গাস্ত্র্য রাষ্ট্রকণ মন্যাপণের কোন ছাত্রকেই এটি গোমো অভিজ্ঞ করা পাইবে

না এবং তাঁহার বলিষ্ঠিত লম্বত পুত্রকেই প্রসংহত করায় পরিশূণ্য!

দ্রৌণিক।

পাণ্ডব ইন্দ্রসেনান-কুয়ার হিষ্টকেষর মাহেৎ এক বিজলি অগ্নিহিত হইয়াছে যে, আমের অশ্বার্য্য পরিচরিত করিতে হইলঃ এবে গ্রাম দ্রৌণিকা একজন করা দরকার।

গ্রামবাসী পুরুষকে শিক্ষার 'হেতি ডোক' পাওয়াইয়া তাহাদের লকল রোগের উপশম হইয়াছে, এবার গ্রামবাসী সীলোকদের পালা। সহরবাসী সীলোকের শিক্ষার নিমিত্তই সহরবাসী পুরুষের সংসারের চোকাটা কিসিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

হলোও অল্পবয়স আইওহোভেনবর লিঙ্গিশল সাংখ্যোচিষ্ট্রিত একট বৈজ্ঞানিক ছর পরিকল্পিত হইলকঃ ইহার সাধারণ্যে যে-কোন প্রকার লি-গন অতি কম লমবে নির্ভাণ করা সম্ভব হইবে। এসবিন পর্য্যন্ত যৌর কিস হইতে এই লিগালা লম্ব হই নাই।

হের স্মিথিন লম্বীর চ'লক হায়েদীর আবিষ্কারে একট বহু নির্ভাণ করিয়াছেন। এই বহু হইতে প্রতিফলিত হইল যে বহুত উপর নিশিত হইবে, ইহা অসুত হইয়া গিয়াইবে।

এট বৈজ্ঞানিকগণের বাবতীর বৈজ্ঞানিকের বিচারে কতিয়ান চক্ৰ একট হইবে আদ্যন্তকতা উপলব্ধ হইতেছে। পূত্র এট যে, এমন বহু বিনি আবিষ্কার করিয়েন, তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক আখ্যায় অভিহিত করা চলিবে কি না।

বৈজ্ঞানিক তথ্য

গ্রার আর্কাইমাল কাল টিকন্তের বহু প্রাথমিক্য প্রাপ্ত পরিচয়ন করিয়া সম্ভ্রতি আবেদিকার একজন বৈজ্ঞানিক 'থিথি ট'লিও পুত্র-পত্রীয়ার বহু লইয়া কলিকাতা কিংয়াছেন। লতনের কট পাওলেন ও নিউ ইয়র্কে খোঁটানিকাল পাওলেন উদ্ভবজনি লম্বত রচিত হইবে।

আমরা জানি যে, বিবিধ অভিধানে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ বহুবিধ প্রজ্ঞাপা বহু সংগ্রহ কথিয়া বেশ-বিবেশ পরিচয়ন করেন। ইহার চক্ৰ যে পরিক্রম চক্ৰ এবং ইহার পক্ষাতে যে অঙ্গুলঙ্কিতসা আছে, তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু এই প্রশ্নকে সেই পুত্রাতন গমতি মনে পড়িল সাধারণ্যে দরিয়া নোকার বৈঠা চালাইবা তাঁর বোদার—যে-বাট হইতে নোকা ছাড়িয়াছিল, সেই পাটেই নোকা বাধা বহিয়াছে—এট তথা আবিষ্কারের গমতি। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকগণ বৈঠা টিকই চালাইবহেছেন, কিন্তু নোকা যে গায়েব পাটেই বাধা আছে, এ তথা আবিষ্কারের লম্ব কি তাঁহাদের এতদিনেও হয় নাই?

মম্বুয়াদেই

লকোবের ইদাবোলা খোদান কলকর চাঃ সৌরহরন বহু সম্ভ্রতি হোহর এক হোহর সউর্কখোরে শিঃ বহুদর বাদি গাংলার লল—

কৌখলঃ বহু কলকাতায় কি করিয়া থাকতর সাধারণ্যে অজ্ঞানেব লিঃ অসাধারণ বিলিঃ হই, অকল বহিঃকলিঃ কেন হই কা, সে লিঃ বহু বহুতা বিলিয়েন। এই সাধারণ্যে বিলিয়েন কলই বহুত কৌখলঃ লম্বত হই ইহা হোহর বহু।

ইটা স্বীকার করিয়া লটতে পারি, কিন্তু ততপূর্বে তাঃ পূত্র আদানিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি যে, 'মহুদুদেই' বলিতে কি বুঝে। হোহর তাঁহাঃ, ইংলাজিতে লেখা কলিওলকির পুত্রকে বুলি তলিঃ চাষি না, সেগুলি আমবাও পাঠ করিয়াছি। কিন্তু পাঠ করিয়াও বৈদ্যজিন কৌখনের কোনও কার্য্যকরী জ্ঞানের অধিকারী হই নাই। সুতরাং তাঁহাকে লম্বর 'মহুদুদেই' যে, কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক বুলি না আওড়াইয়া মোটা কলার আদানিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে—'মহুদুদেই' এই লম্বত কৌখন।

কৃষি

কৃষি-বিষয়ক সংবাদের মূল্য

এই অল্পবয়স সাংখ্যের সাধারণ্যে ইদাবোলা একল—

লম্বতঃ বহুদুদেই অসাধারণ্যে।

সাধারণ্যে : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

লোহর উল্লেখ : লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই। লিঃ পত্র ও পত্রের সাধারণ্যে মাহুদুদেই।

উপায়ুক্ত হিসাবে এ বৎসর গড় বৎসর অপেক্ষা ১১০ একর কম জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। এত ভালের কারণ কি? অবশ্য এই ভাল-বৃদ্ধিতে কৃষকের লাভ-ক্ষতি কতটুকু তাহা 'পেবেশা'শাশেক।

পল্লী-উন্নয়ন

পল্লীগ্রামের অনেক ক্ষেত্রেই এক সময়ে প্রকাশ যে, পল্লীউন্নয়ন কাজ ভারত সরকারের বর্ষিক আট লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এক-চতুর্থাংশ পল্লীগ্রামে জন-সুখস্বাস্থ্যের কার্যে ব্যয়িত হইবে, এই দাবী পালন ব্যবস্থাপক দপ্তর পল্লীগ্রাম সরকার এক বিবৃতি দিয়াছেন।

পল্লীগ্রামে জন-সুখস্বাস্থ্যের চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয় তাগাতে সন্দেহ নাই। উপায় লক্ষ্যে মতভেদ আছে।

কৃষি-ঋণ

ভারতের চিনিমূল্য ও রাজস্বপত্রিতে খাবার চাষযোগ্য জমির অধিকাংশ, ভাষামূল্যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকর্ম মন্থ্র করিবার নিমিত্ত রাজস্ব সরকার করিয়াছেন।

কৃষি-ঋণ দ্বারা কৃষকের অবস্থার উন্নতি ও গুণা মন্থ্র নহ। বৎসর অপেক্ষা পব ক্রম বৃদ্ধি পাইবে। বাহ্যতে ঋণ না করিতে হয়, সেই চেষ্টা করাই যে লক্ষ্য, তাহা আমরা টানতুলিতে বলিয়াছি।

ভেজাল নিবারণ

তুলার ভেজাল নির্ধারণ ক্ষমতা সরকার কর্তৃক একটি আদেশে প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা শহরে রেজাল ঘুত, তৈল, গুড়, পাটসরা নিবারণের জন্য কড়া আইন আছে। তাহাতে চল কি হইয়াছে, সহরবাসীরা তাহা অজ্ঞাত নাই।

আসানের ভূমি-রাজস্ব

১৯০১-০২ সাল হইতে আসামে ব্যাপ্তিক আয় পনের লক্ষ টাকা পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধিবশত বেগু হইতেছে। ১৯০৪-০৫ সালও তাহা প্রাপ্তি থাকিবে কি না, আশা সরকার তথ্যের দ্বিকলন করিতেছেন।

বিবেচনা উদাহার করুন। কিন্তু সেই সময়ে লক্ষ ভূমি-রাজস্ব ছাড়বশত দিতে হইতেছে, আলগা ব্যাধি কোন্ অঙ্গে, তাহা নিরূপণ করিতেও চেষ্টা হইল।

আখের চাষ

বাংলা দেশে ১৯০১-০২ সালে আখের চাষ লক্ষ সহস্রার বিস্তৃতিতে পূর্বোক্তাৎ বেগু হইয়াছে যে, এক লক্ষ ৭৫ হাজার ৩৮৩ একর জমিতে আখের চাষ হইয়াছে। ১৯০১-০২ সালে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৮৩ একর জমি চাষ হইয়াছিল।

আখের চাষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, সুগার-মিল প্রস্তুতির সংযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে—কলে গুড় ও চিনি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। এক্ষণে দেশ নিউজাম তথ্য উন্নিবেশিত!

বিহারে ভূমিক

বিহারের প্রাদেশিক বিধান-সভার সম্পাদক মিঃ এ. পি. দিহাই গত বৎসরের মধ্যে ফলে, উত্তর বিহারে ভূমিক-আপত্তা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিহারে সরকার কর্তৃক বিধান-সভার দ্বারা মন্থ্রিত হইয়াছে।

ভূমিক-আপত্তা মন্থ্রিত হইয়াছে, ভূমিক-সামগ্রিক তাহা স্বস্তির নিবাস কল্পিতে পারে। কিন্তু সরকার চিরকাল ভূমিক-আপত্তা মন্থ্রিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকর্ম মন্থ্র নহ, তাহা বৎসর বৎসর পালন করিতে উদ্যত হইবেন, তখন প্রভা বিলম্বিত হইবে। তাহার উপায় কি?

কৃষকের দুর্দশা

১৯০১-০২ সালে ভারতের ভূমিক-সম্পাদক মিঃ এ. পি. দিহাই গত বৎসরের মধ্যে ফলে, উত্তর বিহারে ভূমিক-আপত্তা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিহারে সরকার কর্তৃক বিধান-সভার দ্বারা মন্থ্রিত হইয়াছে।

সেই এক কথা! এতদ্বারা কৃষকের আশা পূর্ণ হইয়াছে, ভূমিক-সামগ্রিক তাহা স্বস্তির নিবাস কল্পিতে পারে। কিন্তু সরকার চিরকাল ভূমিক-আপত্তা মন্থ্রিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকর্ম মন্থ্র নহ, তাহা বৎসর বৎসর পালন করিতে উদ্যত হইবেন, তখন প্রভা বিলম্বিত হইবে। তাহার উপায় কি?

কাম্পোরে ভূমি-রাজস্ব

কাম্পোরে ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধিবশত বেগু হইতেছে। ১৯০৪-০৫ সালও তাহা প্রাপ্তি থাকিবে কি না, আশা সরকার তথ্যের দ্বিকলন করিতেছেন।

কাম্পোরে ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধিবশত বেগু হইতেছে। ১৯০৪-০৫ সালও তাহা প্রাপ্তি থাকিবে কি না, আশা সরকার তথ্যের দ্বিকলন করিতেছেন।

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

গত বৎসর কলিকাতার প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের আদায় আবেশনেষ্ট্রি হইয়াছিল যে, ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার হুগলী নগর কাশ্মিরে অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কলিকাতা অধ্যক্ষিত কারণে ১৯০২-০৩ বৎসরের অক্টোবর মাসে হুগলী নগরে হইল না।

এখনো হুগলী হইতেছে যে এক অক্টোবর আদায়িত কলিকাতার হুগলী নগর নিউজামে অনুষ্ঠিত হইবে।





বঙ্গশ্রীর বর্ষান্তিক অভিবাদন

এই সংখ্যার সঙ্গে আমাদের তৃতীয় বর্ষের সমাপ্তি হইবে। বঙ্গশ্রীর গ্রাহকসংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বাস্তবসী পাঠকবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা অঙ্গুভব করিতে বাধ্য, কারণ যে-সময়ের মধ্যে যে-সংখ্যক গ্রাহক বঙ্গশ্রী কার্যাতঃ আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা আমরা আমাদের কার্য্যপ্রারম্ভে আশা করিতে পারি নাই। অবশ্য গ্রাহকের সংখ্যা যাহা হইলে বঙ্গশ্রীর স্থায়িষ অটুট হয়, তাহা আমরা এখনও অর্জন করিতে পারি নাই। তজ্জন্ত আমরা দুঃখান্বিত করি না। তাহার কারণ প্রত্যেক কার্য্যের সিদ্ধি—সময় ও সাধনাসাপেক্ষ। আমাদের আশা আছে যে, বঙ্গশ্রীর পরিচালক ও সম্পাদকবর্গ যথাবিধি সাধনা করিলে অচিরে বঙ্গশ্রীর স্থায়িষ অটুট হইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গশ্রীর সম্পাদক ও পরিচালকবর্গ যথাবিহিত কার্য্যতালিকা নির্বাহ করিতে পারিতেছেন না এবং অসাক্ষ্যতার দাবিদ্বয় উত্থানের; কায়েই মর্য্যাদাকরণে আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে শ্রীতিসম্মত জানাইতেছি এবং সর্ব্বনিম্নতমকে অরণ্য করিয়া তাহার নির্দেশ প্রার্থনা করিতেছি।

বঙ্গশ্রীর উদ্দেশ্য

মানুষের প্রকৃত অবস্থা কি হইয়া দাঁড়াইতেছে, কেন মানুষের অবস্থার বিকৃতি হইতেছে, কি করিলে তাহা দূরীভূত হইতে পারে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে দেশের মধ্যে মানুষ ও মানব পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তাহার আলোচনা করাই বঙ্গশ্রীর মূল উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমষ্টি, অথচ দুইটী মানুষ সর্ব্বতোভাবে সমান নহে এবং প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি সামর্থ্য এবং কতকগুলি অসামর্থ্য থাকে। যে-জ্ঞান ও কার্য্য-শক্তি অর্জন করিতে পারিলে মানুষ তাহার সন্তিষ অটুট রাখিতে পারে, সেই জ্ঞান ও কার্য্যশক্তির নাম মানুষের সামর্থ্য। যে জ্ঞান ও কার্য্যশক্তির ফলে মানুষ অসুস্থতাব্য এবং অশান্তির আবাস-স্থল হয় এবং তিল তিল করিয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়, তাহা প্রচলিত ভাষায় জ্ঞান ও কার্য্যশক্তি বলিয়া অভিহিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিজ্ঞান ও কৃকার্য্যশক্তি। ঐ বুদ্ধিজ্ঞান ও কৃকার্য্যশক্তির নাম মানুষের অসামর্থ্য।

মানুষের সামর্থ্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাইবে, মানুষের দুঃখবস্থার পরিমাণ তত কমিয়া যাইবে এবং মানুষের অসামর্থ্যের পরিমাণ যত বাড়িয়া যাইবে, ততই তাহার দুঃখবস্থার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, ইহা বাস্তব সত্য। কায়েই মানুষের অবস্থা প্রকৃত পক্ষে কি হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে, দেশের অসামর্থ্যের অথবা বুদ্ধিজ্ঞানের এবং কৃকার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা কমিয়া যাইতেছে, তাহার বিচার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

ওর্ত্তমানে সাধারণের বিশ্বাস যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইতেছে। অথচ একটু

চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখা যাউবে যে, সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের মধ্যে অস্বাভাবগ্রস্ত ও বেকার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাউতেছে।

প্রত্যেক সমাজে সাধারণতঃ চারিপ্রকার লোক থাকে। দার্শনিক ভাষায় এঁ চারিপ্রকারকে ইন্দ্রিয়প্রবণ, মনঃপ্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ এবং আধ্যাত্মিক মানুষ বলা যাউতে পারে। প্রাচীন আর্য্য কবিগণের অর্থনীতির ভাষান্তরসারে ইন্দ্রিয়প্রবণ মানুষকে বলিতে হয় জ্ঞানজীবী, মনঃপ্রবণ মানুষকে বলিতে হয় বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়, বুদ্ধিপ্রবণ মানুষকে বলিতে হয় ব্রাহ্মণ এবং আধ্যাত্মিক মানুষকে বলিতে হয় ঋষি। আর্য্যকবিগণ উভয়ের মধ্যে, জ্যোতিষ্মত্রে, আরণ্যকে, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে, শ্রীমাংসারে, দর্শনে, পুরাণে ও সাংহিতায় যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই দেখা যাউবে যে, যখন মনুষ্য-সমাজে প্রকৃত ঋষি ও ব্রাহ্মণ বর্তমান থাকেন, তখন প্রকৃত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও জ্ঞানজীবীর উদ্ভব হয় এবং মনুষ্য-সমাজে দুঃখ-মারিহোর অবসান হয়।

বর্তমান সময়ে যখন প্রত্যেক দেশে, সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের মধ্যে অস্বাভাবগ্রস্ত ও বেকার লোকের সংখ্যার প্রাচুর্য্য এই নৈমী এবং ক্রমশঃই তাহা আরও বাড়িয়া যাউতেছে, তখন নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, এখন আর প্রকৃত ঋষি, প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য অথবা প্রকৃত জ্ঞানজীবী মনুষ্য-সমাজে নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান জগৎ হইতে লোপ পাইয়াছে। বস্তুতঃ এখন কাহারও জ্ঞানজীবী বলিয়া পণ্ডিত্য দিতে হইলে, তাহা উত্তর পক্ষে অপমানকর বিবেচিত হয় এবং ধাতার্য্য নিচুদিগকে ঋষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া প্রচারিত করেন, উচ্চদিগকে এঁ এঁ নামের অভিনেতা বলা যাউতে পারে। অগ্রিয় হইলেও তাহা বাস্তব সত্য। যে দেশে অগণিত জ্ঞানজীবী প্রত্যেকে অস্বাভাবিক অস্বাভাবে রিষ্ট, বধাবিত্ত যুবকগুলি জীবিকাার্জন-ক্ষেত্রের সন্ধান পায় না, অথবা কঠোর পরিশ্রম করিয়াও ভ্রক্ষে, শাস্তিতে দিনাতিপাত করিতে পায় না, প্রত্যেক লোক অসন্তুষ্ট, অসুস্থ এবং অকালমৃত্যুর কবলে পতিত হয়, সেট দেশে যদি কোন মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান, পণ্ডিত অথবা কার্য্যকুশল বলিয়া মনে করেন অথবা প্রচার করেন, তাহা হইলে উাহাকে কি বুদ্ধিমত্তার, পাণ্ডিত্যের অথবা কার্য্যকুশলতার অভিনয়কারী ভণ্ড বলা যায় না ?

আমরা যাহা বুদ্ধিভ্রান্তি, তদনুসারে বলিতে হয় যে, এখন আর ভারতবর্ষে প্রকৃত বুদ্ধিমান, প্রকৃত পণ্ডিত, অথবা প্রকৃত কার্য্যকুশল লোক আছেন, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। তাই বঙ্গজীর পরিচালকগণ নিচুদিগকে অশিক্ষিত ও মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। ধাতার্য্য প্রকৃত পক্ষে ভণ্ড, উচ্চাদের স্বরূপ যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারেন, তাহার চেষ্টা কল্প বঙ্গজীর অস্ততম উদ্দেশ্য।

বঙ্গজীর টেলিভিশন

একদিন ছিল, যখন ভারতবাসী তাহার জননী, পত্নী অথবা দুহিতাকে অস্বার্থপন্থা বলিয়া মনে করিত। যদি কেহ তাহার মাতাকে, পত্নীকে অথবা দুহিতাকে জনসভায় আনিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে সে অপমানিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন পূর্ব্ব, যাহা করিলে মানুষের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রসার সংঘটিত হয়, ওদমূকপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধীশ্বর হইয়া তাহার দৃষ্ট জনসমাজের

মধ্যে অক্লান্তভাবে কৰ্মনিরত থাকিতেন, আর রমণী জনসমাগতের অন্তরালে থাকিয়া নান্দ্রবের কোন কোন বিষয়ের প্রসারের প্রয়োজন উদ্ভাবন করিতেন এবং যাচাতে য য় সংসার বজায় থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। অপর কেহ মাতা-পত্নী ও ভূতিভাবরূপিনী রমণীকে নগ্নচিত্রে চিত্রিত করিলে অপমান বোধ করা ত পূরের কথা, আমরা নিজেরাই তাহাদিগকে উপজ্ঞাসে, গল্পে এবং ছবিতে অস্বাভাবিক নগ্নভাবে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কালেব এমনই পরিণাম যে, এখন নান্দ্রবরূপিনী রমণীর নগ্নচিত্র আমাদের পণ্যব্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এমন পাঠকও আছেন, যাহারা ঐ নগ্নচিত্রকেই উপদেশ বশিরা মনে করিয়া থাকেন। একদিন সমাজের এমন অবস্থা ছিল যে, কেহ প্রচণ্ড বশে হঠাৎ আমাদের কোন রমণীকে আংশিক ভাবেও নগ্ন করিবার চেষ্টা করিলে শাস্তিপ্রাপ্ত হইত, আর আজ রমণীকে লইয়া প্রকাশ্য ভাবে নগ্ন-কুর্দীন করিতে পারিলে প্রগতি সাধিত হইতেছে বলিয়া বিবেচিত হয়। অস্বাভাবিক, অস্বাভাব্য নান্দ্রবের বৃদ্ধি যে অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে, ইহা তাহারই পরিচয়। কাগরও কাগরও মতে মাসিক-পত্রে এই শ্রেণীর প্রগতিসম্পন্ন চিত্র না থাকিলে তাহার সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত।

উপজ্ঞাস এবং গল্প-লেখকগণ প্রারম্ভ: এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন যে, তাহাদিগের পক্ষে নগ্নতা বাগ দিয়া কোন চিত্র অঙ্কিত করা কুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বঙ্গজীর পক্ষে সম্পূর্ণ নগ্নতাগীন গল্প ও উপজ্ঞাস সংগ্রহ করা আপাতত: কষ্টকর বটে, কিন্তু নগ্নচিত্র যথাসাধ্য বাগ দিয়া মাসিক-পত্রের সাফল্য লাভ করিবার চেষ্টা করা বঙ্গজীর বৈশিষ্ট্য।

যাহারা নান্দ্রবরূপিনী রমণীর নগ্নচিত্র পাইলে পরিতৃপ্ত হন, বঙ্গজী তাহাদের অভিল্যাব পূরণ করিতে অসমর্থ।

যে-জাতীয় প্রবন্ধ বর্তমানে নান্দ্রবের অবস্থা কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কেন সোনার ভারতে ঐ রূপ অবস্থা হইল এবং কি করিলে আবার ভারত বর্ষ প্রসবিনী হয়, তাহা যথার্থ ভাবে বুঝা যাইতে পারে, সেই জাতীয় প্রবন্ধ বঙ্গজীর অঙ্গ যাহাতে পরিশোধিত করে, তাহার চেষ্টা করা বঙ্গজীর অঙ্গতম বৈশিষ্ট্য।

যে সমস্ত গল্প ও উপজ্ঞাস বঙ্গজীর কলেবর সঞ্চিত করিবে, তাহা যাহাতে উহার মূল উদ্দেশ্যের সমঞ্জসীকৃত হয়, তাহার চেষ্টা করা বঙ্গজীর আর একটি বৈশিষ্ট্য।

এক কথায় প্রথম শ্রেণীর মাসিক-পত্রে সাধারণত: যাহা যাহা থাকে, তাহার সমস্তই বঙ্গজীতে পাওয়া যাইবে। কেবল পাওয়া যাইবে না “নগ্নচিত্র” এবং তাহার স্থানে দেশের সর্বব্যাপী ব্যাধির প্রকৃত অবস্থা, তাহার কারণ এবং ঔষধ কি তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা সুপরিলক্ষিত হইবে।

বঙ্গজীর কার্যে তিক্ততা আছে ও থাকিবে তাহা সত্য, কিন্তু দুঃসংসার ব্যাধি নিরাময় করিতে হইলে প্রায়শ: তিক্ত ঔষধের প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই বিবেচনায় পাঠকগণ ঐ তিক্ততা উপেক্ষা করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ভারতের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়

— শ্রীসদ্ধিনন্দ ভট্টাচার্য

পূর্বাবস্থা

এই গ্রন্থে এতাবৎ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত
হইছে :—

(১) রাষ্ট্রের সমস্যা-পূরণের উপায় কি? (How to solve a problem.) (১০৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(২) কোন দেশের জাতীয় সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝি-
বার উপায় কি? (How to solve a nation's problem.) (১০৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৩) "জাতি" বলিতে কি বুঝায় এবং কি হইলে জাতি
উৎকর্ষ এবং অলক্ষ্য লাভ করে। (How to define "nation" and what are the main causes of a nation's rise and fall.) (১০৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৪) "দেশ" বলিতে কি বুঝায় এবং কি হইলে দেশ
উৎকর্ষ এবং অলক্ষ্য লাভ করে। (How to define a country and what are meant by rise and fall of a country.) (১০৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৫) জমি ও বাতাসের বলিতে কি বুঝায় এবং তাহা
উৎকর্ষ কি? (How to define land and atmosphere; and what is meant by improvement of land and atmosphere.) (১০৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৬) মানুষ বলিতে কি বুঝায়? (How to define man physiologically and psychologically.) (১০৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৭) মানুষের মধ্যে ভাবতত্ত্বের কারণ ও তাহার রূপ।
(What are the causes of physiological

and psychological differences among men and how do they appear.)

(১০৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৮) মানুষের প্রাথমিক কর্তব্য। (Primary responsibilities of man.)

(১০৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

(৯) মানুষের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা। (What are the real necessities of life and what do men crave for.)

(১০৪১ সালের পৌষ সংখ্যা)

(১০) মানুষের বিভিন্ন কাৰ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও বিভিন্ন
কাৰ্যানুসারে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস। (How to classify physiological and psychological actions of men and how to classify men according to their physiological and psychological actions.)

(১০৪১ সালের পৌষ সংখ্যা)

(১১) চরিত্রের অনুসারে মানুষ কোন শ্রেণীভুক্ত তাহা
নির্ণয় করিবার উপায়। (How to know a man from his actions.)

(১০৪১ সালের পৌষ সংখ্যা)

(১২) বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পরিণাম। (Different ends of different classes of men according to their different actions.)

(১০৪১ সালের মাঘ, কাশ্বিন, চৈত্র এবং ১০৪২
সালের বৈশাখ সংখ্যা)

(১৩) বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কাৰ্যের স্বরূপ ও তাহার
পরিণাম। (How does the same work become different in the hands of different men and how are the different results achieved.)

(১০৪২ সালের চৈত্র, আশ্বিন, শ্রাবণ, জ্যৈষ্ঠ
এবং আশ্বিন সংখ্যা)

অধারন, অধ্যাপনা, সাহিত্যচর্চা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বৈদেশিকতা ও গবেষণা প্রভৃতি দেশ ও জাতির হিতকর কার্য। কিন্তু তাহা বিভিন্ন প্রেক্ষার মাধ্যমে হাতে বিভিন্ন রকমে সম্পন্ন হয় ও বিভিন্ন প্রেক্ষার কল-পনন করে, তাহা যেখান এই অবস্থার লক্ষ্য। মাত্রই সাধারণতঃ মনে করে, অধারন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্যের সংগঠন করিতে পারিলেই দেশের অধরা বৈদেশিকতার হিত সাধন করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বস্তৃতঃ পক্ষে তাহা স্বার্থ নহে। মাত্রই দেশ হিত সাধন করিতে হইলে অধারন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্যের সংগঠন যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাও সন্দেহ নাই; কিন্তু একমাত্র এই সমস্ত বৈদেশিকতার কার্যের সংগঠন হইলেই যে দেশের অধরা জাতির হিত সাধিত হইবে তাহা বলা যায় না। দেশের অধরা জাতির সমস্ত সাধন করিতে হইলে, তাহাতে দেশবাসীর বৃদ্ধি উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা সর্বোৎকর্ষ। বৈদেশিকতার, ইহা দেখাইবার ক্ষমতা এই অবস্থার নিশ্চিত হইতে-ছিল।

ইঞ্জিনিয়ারিং, মনঃপ্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক মাধ্যম কিন্তু তাহা একই অধারন, একই অধ্যাপনা ও একই সাহিত্য-চর্চাকার বিভিন্ন, অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং, মনঃপ্রবণ, বুদ্ধিপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়া তুলিতে পারেন, তাহা যেখান হইয়াছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বৈদেশিকতা ও গবেষণা এই কয়টি কার্য বিভিন্ন প্রেক্ষার মাধ্যমে হাতে কিন্তু বিভিন্ন হয়, তাহা এখনও দেখান হয় নাই। ইত্যবসরে পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণ করিবার ক্ষমতা প্রবণের মূল বক্তব্য কি তাহা বলা হইয়াছে এবং তাহার পর আলোচিত হইতেছে—

(১৫) ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যার সংক্ষেপবর্ণনা।
(Summary description of the present-day problem of India.)

(১৩৪২ সালের কাণ্ডিক সংখ্যা)

(১৬) ভারতবাসীর বর্তমান দুঃখদ্বার কারণ। (Causes of the present-day troubles of India.)

(১৩৪২ সালের কাণ্ডিক সংখ্যা)

(১৭) ভারতবাসীর বর্তমান দুঃখদ্বার দূর করিবার উপায়।
(Means of removing the present-day troubles of India.)

(১৩৪২ সালের কাণ্ডিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা)

ভারতবাসীর বর্তমান দুঃখদ্বার দূর করিবার উপায় কি— এই প্রশ্নের উত্তর মূল দুই (fundamental principles of removing the distress), পদ্ধতি (method of removing the causes of distress), পদ্ধতি কার্যতঃ প্রয়োগ করিবার পথ (how to make practical application of the method for removing the causes of distress.) কি তাহা দেখান হইয়াছে।

ভারতবাসীর বর্তমান দুঃখদ্বার দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে যে যে কথা পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ এখনই বলা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার আলোচনা শেষ হইলে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বৈদেশিকতা ও গবেষণা প্রভৃতি কার্য বিভিন্ন প্রেক্ষার মাধ্যমে হাতে কিন্তু বিভিন্ন হয়, তাহা দেখান হইবে।

ভারতবাসীর তথা জনগণের বর্তমান সমস্যা বিভিন্ন সাধারণতঃ তিনটি এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহারি মত সংখ্যার দ্বারা বলা হইয়াছে তৎকালগত এই সমস্যাগুলির চারি প্রেক্ষার, ইহা বলা গাইতে পারে। সমস্যাগুলির নাম—

- (১) কৃষক, উদ্যোগ, শ্রম, ক্ষমতা এবং কলকার প্রভৃতি শ্রমজীবীদের অসুখ;
- (২) শিক্ষিত যুবকগণের ও শ্রমজীবীদের বেকারত্ব এবং অসুখ;
- (৩) উচ্চ, ব্যক্তিগত প্রভৃতি আইন-বাহ্যাদিগণের, চিকিৎসা-বাহ্যাদিগণের এবং বুদ্ধিগণের পর-মুখ্যপেক্ষতা, অর্থহীনতা এবং অসুখ;
- (৪) সমস্ত অধিবাসীর স্বাধীনতা, অকালমৃত্যু, অসুখ এবং পরমুখ্যপেক্ষতা।

উপরোক্ত সমস্যাগুলির কারণ তেরটি। তাহাদের নাম—

- (১) জমীর উর্বরতার হ্রাস;
- (২) পণ্যপ্রবণের স্থানীয় দারিদ্র্যের অভাব (want of parity);
- (৩) কৃষি প্রভৃতি জীবিকাধর্মের চারিটি পদ্ধতিতেই বাহ্যতে নানকরমে পত্তিবান। তাহা পরিবার প্রভৃতি-পালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার অভাব;
- (৪) উপরোক্ত চারিটি পদ্ধতিতেই বাহ্যতে শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিকের দারিদ্র্য থাকে, তাহার ব্যবস্থার অভাব;

- (৪) প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না তাহার পরীক্ষা দ্বারা বাহ্যতে শ্রমজীবী (manual workers) ও বিভিন্ন পরিচালকগণের (officers and sub-ordinate officers) পদমোস্তবের তাৎপর্য প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গি ;
- (৫) বুদ্ধির উৎকর্ষের তাৎপর্যমূল্যে বাহ্যতে শ্রমজীবীর উপাধিকারের তারতম্য হয়, তৎসমুদায় ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গি ;
- (৬) জীবিকাক্ষেত্রের চারিত্রীয় পদ্ধতিতেই বাহ্যতে সর্বোচ্চ (maximum) উপাধিকার একরূপ হয়, তাহার ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গি ;
- (৭) সম্পূর্ণ ও নিম্নলিখিত প্রাণগঠন বিজ্ঞান (Anatomy) অঙ্গাঙ্গি ;
- (৮) সম্পূর্ণ ও নিম্নলিখিত প্রাণবিজ্ঞান বিজ্ঞান (Physiology) অঙ্গাঙ্গি ;
- (৯) সম্পূর্ণ ও নিম্নলিখিত পদার্থবিজ্ঞান (Physics) অঙ্গাঙ্গি ;
- (১০) সম্পূর্ণ ও নিম্নলিখিত রসায়নের (Chemistry) অঙ্গাঙ্গি ;
- (১১) মন ও বাহ্যিক তাৎপর্যের অঙ্গাঙ্গি ;
- (১২) মন ও বাহ্যিক তাৎপর্যের অঙ্গাঙ্গি ;
- (১৩) শিক্ষাপদ্ধতি বৈশিষ্ট্য হইলে চারিত্রীয় বা বা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্রাপ্য হইতে পারে, সেই শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গাঙ্গি ;

সমস্তর কারণ দৃষ্টান্ত করিতে পারিলেই তাহার পূর্ণ সম্ভব হয়। তৎসমুদায় দ্বারা ভারতবর্ষের বর্তমান দুরবস্থার তেরটী কারণ দৃষ্টান্ত হইতে পারে, তাহা অঙ্গুলি দ্বারা বাহির করা এবং তৎসমুদায়ের কাব্য কবিতা সমস্তাঙ্গের মূল হয় বলা বাইতে পারে।

জীবীর স্বাভাবিক উন্নয়নশীলতার বুদ্ধি কল্পে সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা গুণ সংখ্যার আলোচিত হইয়াছে।

সমস্তর এই তেরটী কারণ যে কবি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন-বিভাগ সম্বন্ধীয়, তাহাও গুণ সংখ্যার দেখান হইয়াছে। কবিই গভর্ণমেণ্টের এই চারিত্রীয় বিভাগের সংস্কার কবিতা বর্তমান সমস্তাঙ্গের পদ্ধতি বলা বাইতে পারে।

দেখিবার লোকের একতা সাধিত না হইলে, গভর্ণমেণ্টের এই চারিত্রীয় বিভাগের কোনটাই ব্যবস্থাপনা সংস্কার সাধন সম্ভব হইবে না। বাহ্যতে সাধারণের দুরবস্থার এই তেরটী কারণ অঙ্গুলি হইতে পারে, তৎসমুদায় লক্ষ্য রাখিয়া যদি কংগ্রেস হইতে কোন জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে দেশের লোকের একতা সাধিত হইতে পারে। স্বাধীনতা, অসহযোগ, অথবা আইন অমান্য আন্দোলনে দেশের গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সহিত অঙ্গাঙ্গির লোকের বিবাদ অঙ্গাঙ্গি, শ্রমিক অথবা সমাজ-সামান্য আন্দোলনে (Socialism) শ্রমিকগণের সহিত বিবাদ অঙ্গাঙ্গি, কিন্তু দেশের লোকের দুরবস্থা অথবা অসমুদায় দুর কঠোরতা যে যে আন্দোলন, তাহাতে ব্যাপকভাবে কোন বিবাদ অথবা অনিয়মিত সম্ভব হইতে পারে না। জাতীয় একতাসাধক কংগ্রেসের এই আন্দোলনকে ভারত-বাসীর বর্তমান দুরবস্থা দুর কঠোরতা পদ্ধতি কাব্যতঃ প্রয়োগ করিবার পদ্ধতি বলা বাইতে পারে।

ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্তাঙ্গের কংগ্রেসের কর্তব্য

যে যে কারণে ভারত বর্তমান দুর্দশায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দুর করিতে হইলে, প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্টের নিকট কংগ্রেসের কতকগুলি দাবী উপস্থিত করিতে হইবে এবং দেশের জনসাধারণকে জানাইতে হইবে যে, এই দাবীগুলি গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। কংগ্রেস যে সমস্ত দাবী উপস্থিত করিবেন, তাহাদের প্রত্যেকটী দাবীতে জনসাধারণের, বিশেষ-মুসলমান প্রকৃতি জাতিবিশিষ্ট অথবা বাহালা, বিহার প্রকৃতি প্রদেশবিশিষ্ট প্রত্যেকের গুরুত্বের অঙ্গাঙ্গির হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। জনসাধারণের দুরবস্থার অঙ্গাঙ্গির এই দাবীগুলি উপস্থিত করিবার সময় গভর্ণমেণ্ট ও দেশবাসীকে জানাইয়া দিতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট যদি যে যে কারণে ভারতবাসী বর্তমান দুর্দশায় উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল কারণ দৃষ্টান্তে সমর্থন না হয়, এবং তাহাদের অঙ্গাঙ্গির কথায় বাক্যের কঠোরতা কংগ্রেসের সহিত প্রকৃত (sincere) সংযোগিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, বাহ্যতে ভারতের এই দুর্দশায়

দ্বীকৃত হইতে পারে, তদনুসরণ পূর্বা পৰ্যবেক্ষণের সহযোগে
কংগ্রেস অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছেন।

গভর্নমেন্টের নিকট কংগ্রেস যে সমস্ত দাবী উপস্থিত
করিবেন, তাহা সাধারণতঃ কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা এবং শাসন-
বিভাগ সম্বন্ধীয় হওয়া কর্তব্য।

যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি এতদূর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত
হয় যে, প্রত্যেক আট বিঘা জমীর উৎপন্ন শতের দ্বারা অথবা
তাহার স্কোয়ার দ্বারা কৃষির খরচ এবং জমীদারের খাজনা ও
সেম্ প্রভৃতি নির্বাহিত হইয়া একজন কৃষক, একজন কৃষক-
পত্নী এবং দুইটী কৃষক-সন্তান, তাঁহাদের আহার্য, পরিবেশ, শাস-
নাদি প্রভৃতি একান্ত প্রাণোজমীয় ভ্রা অর্জন করিতে পারেন,
—তদনুসরণ বাবস্থা হইবে কৃষি-বিভাগ সম্বন্ধীয় দাবী।

বাণিজ্য-বিভাগীয় যে যে বাবদ্যের দাবী করিতে হইবে,
সেগুলির নাম—

(১) পণ্যপ্রবাহের স্থলা বাগাতে সাদৃশ্য থাকে তদনুসরণ
বাবদ্য।

একজন কৃষক যে কয় বিঘা জমী সাধা বৎসরে
চাষ করিতে পারে, ঐ জমীতে ধান চাষ করিলে
যদি কৃষির খরচ, খাজনা, সেম্ প্রভৃতি বাদে
গড়ে ৫০ মণ ধান উৎপন্ন হয়, অথবা তুলা
চাষ করিলে খরচাদি বাদে যদি গড়ে ৫ মণ তুলা
উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ৫০ মণ ধানের মূল্য বাগাতে
৫ মণ তুলার স্থানের সমান হয়, তদনুসরণ বাবদ্য
করার নাম পণ্যপ্রবাহের স্থলা সাদৃশ্য বজার রাখা।
ঐ রূপ খরচাদি বাদে ত্রীভা, দ্ব্যভাব, কর্মকার
প্রভৃতি সাধা বৎসরে যে যে পরিমাণ ভ্রা উৎপন্ন
করিতে পারে, তাহার পরিশোধের মূল্য বাগাতে সমান
হয়, তদনুসরণ বাবদ্য ও স্থলা সাদৃশ্য বজার রাখি-
বার বাবদ্যের অন্তর্গত।

(২) যেকোন চনসামান্যের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ
বাগাতে ১ ব মজুরী দ্বারা ন্যূনকমে পরীবার্য্য ভাবে
একটী স্ত্রীলোক ও ৭টী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক অথবা
বালিকা প্রতিপালন করিতে পারে, তদনুসরণ মজুরীর
বাবদ্য।

(৩) পরিপ্রসূত প্রবাহের স্থলায় তারতম্যবিশেষ
বাগাতে পারিশ্রমিকের তারতম্য স্থির করা হয়,
তদনুসরণ বাবদ্য।

(৪) মস্তিস্কের পরিপ্রসূত দ্বারা প্রত্যেক অথবা পরোক্ষ
ভাবে দ্বারা দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য নির্ধারণ
করবার বাবদ্য।

(৫) মূলধনের দ্বারা প্রত্যেক অথবা পরোক্ষ ভাবে দ্বারা
দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য নির্ধারণ করবার
বাবদ্য।

শিক্ষা-বিভাগীয় যে যে বাবদ্যের দাবী করিতে হইবে,
সেগুলির নাম—

(১) যাহাতে যেকোন প্রত্যেক অপরিত্রাণের বালকের
দ্ব্যভাবাদি কর্মপ্রসূত এবং চক্ষুগণি জ্ঞানোপায়
ব্যাখ্যার ভাবে লক্ষ্যতা লাভ করিতে পারে, তদনুসরণ
বাবদ্য।

(২) কোন কোন ক্ষেত্রে, পরিচ্ছন্ন ও বাসস্থান ব্যতীত
উন্নতিকর এবং কোন কোন অবনতিকর, তাহা
যাহাতে যেকোন প্রত্যেক অপরিত্রাণের বালক
জানিতে পারে, তদনুসরণ বাবদ্য।

(৩) স্ত্রী ও পুরুষের কর্মের ও বাণিজ্যের পার্থক্য
কোথায়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ
জানিতে পারে, তদনুসরণ বাবদ্য।

(৪) জীবিকাকর্মের ক্ষেত্রে যেকোন কোথায় কত
লোকের উপযোগী কি বাবদ্য আছে এবং ঐ ঐ
বাবদ্যবিশেষে কি কি শিক্ষা করিলে জীবিকাকর্ম
করা সম্ভব হয়, তাহা যাহাতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক
বালক জানিতে পারে, তদনুসরণ বাবদ্য।

(৫) দ্বারা দ্বারা শিক্ষা করিলে জীবিকাকর্ম করা সম্ভব
হয়, তাহা যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক বালকগণ ইচ্ছানুসরণ
শিক্ষা করিতে পারে, তদনুসরণ বাবদ্য।

(৬) যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বালক উচ্চশিক্ষা অর্থাৎ
বিজ্ঞানশিক্ষার প্রার্থী হইবে, তাহাদের ক্ষেত্রেপরি
কর্মপ্রসূত ও চক্ষুগণি জ্ঞানোপায় উচ্চশিক্ষার
উপযোগী হইয়াছে কি না এবং যন ও বৃত্তি ভিত্তিতে
তদনুসরণ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে কি না,

তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং বাহ্যতে অল্পতরুণ
বালকগণ উচ্চশিক্ষার প্রবেশ লাভ না করিতে
পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(৭) কোন বস্তুনিষ্ঠক বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে
ঐ বস্তুও কত রকম পরীক্ষা ক্রিয়ণ তাহে কথিত
হয় এবং নিত্যকোই বা ক্রিয়ণ তাহে প্রস্তুত করিতে
হয়, তাহা বাহ্যতে উচ্চশিক্ষার্থী বালকগণ শিক্ষা
করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(৮) বস্তুর কত রকম পরীক্ষা ক্রিয়ণ তাহে কথিত হয়,
অথবা নিত্যক টেলিফোন, মন ও বুদ্ধি ক্রিয়ণ তাহে
গঠিত করিতে হয়, তাহা না শিখিয়া বাহ্যতে কেহ
উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত না হইতে পারে
তাহার ব্যবস্থা।

(৯) উচ্চশিক্ষিত না হইয়া বাহ্যতে কেহ পাঠ্য পুস্তক
প্রণয়ন করিতে, অথবা শিক্ষকতা করিতে, অথবা
চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে,
অথবা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে, অথবা বিচার ও
শাসন বিভাগে প্রবেশ লাভ করিতে না পারেন,
তাহার ব্যবস্থা।

বাহ্যতে দেশের ভল ও বাবু কন্থিত হইয়া জনসাধারণের
বাধ্য ঋতি করিতে পারে, তাহা বাহ্যতে বন্ধ হইয়া যায় এবং
যাহা করিলে দেশের ভল ও বাবু বাধ্যপ্রস হইবার ব্যবস্থা
হয়, তাহাট হইবে শাসন-বিভাগ সম্বন্ধী নাবী।

কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা ও শাসন-সম্বন্ধী উপবোক্ত বোলগী
নাবীর প্রত্যেকটী জনসাধারণের প্রত্যেকের হিতকর।
তৎসম্বন্ধে কোন মহত্বের অথবা ফলাফল হইতে পারে না। ঐ
বোলগী নাবী কংগ্রেসের দ্বারা পর্ত্তমেন্টের নিকট উপস্থাপিত
হইলে দেশীয় জনসাধারণের ঐক্যবোধের অনিবারণ্য হইবে
এবং দেশের প্রত্যেকের পক্ষে কংগ্রেসের সভা হওয়া সম্ভবপর
হইবে।

পরর্ত্তমেন্টের নিকট ঐ বোলগী নাবী উপস্থিত করিবার
সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের একটী কেন্দ্রীয় বাধ্য-প্রণয়ন বিভাগ
(Central Construction Committee) গঠন করিবার
প্রয়োজন হইবে। কি কি পদা অবলম্বন করিলে উপবোক্ত
বোলগী বাধ্যবাধ্য সংশ্লিষ্ট হইতে পারে, তাহা স্থির করাই হইবে

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় বাধ্য-প্রণয়ন বিভাগে প্রথম কর্তব্য।
কংগ্রেসের এই বাধ্য-প্রণয়ন বিভাগে প্রকৃত চরিত্রবান,
দেশ-প্রেমী, কাণ্ড-স্বপ্ন, অধ্যয়ন-নিরত, বাদ্যবন বুদ্ধি-
সম্পন্ন মাত্র দুই তিন জন ভারতবাসীর মিলন সম্ভব হইলে,
প্রত্যেকজনীর শক্তি নির্ধারণ করা অসম্ভব হইবে না। কোন
কোন পদার্থ ঐ বাধ্যবাধ্য শিক্ষানিত হইতে পারে, তাহা
কথিনিবেশ প্রাচীন গ্রন্থ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন বাস্তব
সংগঠনে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতবাসিগণ সামান্য পরিচয়
করিয়া চোঁকা করিলেই তাহা অসুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে
পারিবেন।

এইখানে মনে হইতে হইবে যে, ভারতীয় কথিনিবেশ যে
সময়ের লোক, সেই সময়ের হিন্দু, খোঁচ, খুঁচন এবং মুসলমান
বলিয়া পৃথক পৃথক ধর্মের অথবা সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব
দৃষ্টমান ছিল না। ইতিহাসের কথাই আত্ম স্থাপন করিলে
বুঝিতে হইবে যে, সেই সময় জগতের প্রত্যেক মানুষ
হয় কবি, নৃত্য বা কথিনিবেশ সম্বন্ধে অথবা শিল্প ইহাছিলেন
এবং ভারতীয় কথিনিবেশ সম্বন্ধে ও শিল্পবর্গই উত্তম-
কালে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন।
কথোই কথিনিবেশ প্রাচীন গ্রন্থে চিত্র, খোঁচ, খুঁচন ও মুসলমান
প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সমান অধিকার এবং ঐ
প্রভৃতিতে যদি যোগদেব কিছু আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়
তাহা সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই যোগদেব বস্তু। এক
কথার কথিনিবেশের প্রভৃতিতে মানবধর্মের গ্রন্থ অথবা জীব-
প্রকৃতির বিজ্ঞান যথা বাইতে পারে। যদি কেহ মনে করেন
যে, ঐ সকল গ্রন্থ সম্প্রদায়বিশেষের বস্তু, তাহা হইলে তাঁহাকে
জ্ঞান মনে করিতে হইবে।

মানুষ বহন আবার প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা আনিতে পারিবে,
তখন আমাদের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে। তৎকালে
জগতের সর্বত্র সমস্ত বিস্তারভাবে সংগঠিত হইয়াছিল,
তাহা ঐ প্রভৃতি সমাক্রমে অধ্যয়ন করিতে পারিলে
বুঝিতে পাওয়া যায়। অস্ত্রান্ত সমস্ত দেশের সেই সংগঠন
বহুদিন পূর্বে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখনও সেই সংগঠনের
অংশাংশে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে দৃষ্টমান হইয়াছে।
কথোই যদি কোন ভারতবাসী প্রাচীন সংগঠনের ঐ বাস্তব
অংশাংশের সত্য মিলাইয়া কথিনিবেশের প্রভৃতি অধ্যয়ন

করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে উহা বৃথা সস্তব হইতে পারে। অল্প কোন জাতির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। অল্প কোন জাতির পক্ষে যে ঐ গ্রন্থগুলি লিপ্যবলভাবে বৃথা সস্তব নহে, তাহার পরিচয় জার্মান প্রকৃতি পান্ডিত্যে গ্রন্থকারণ। অ্যাভিলন (Avellan), বাক্রে (Bakre), ব্লুমফিল্ড (Bloomfield), বোহলিংক (Bohtlingk), ক্যালান্ড (Caland), ফ্রানক (Franke), গ্যাস্ট্রা (Gaasira), গারবে (Garbo), গিগার (Geiger), গোল্ডনার (Goldner), কিল (Keith), কিলহর্ন (Knilhorn), লেভি (Levi), ম্যাকডোনেল (Macdonell) ম্যাকমুলার (Maxmuller), ওল্ডেনবার্গ (Oldenberg), পার্গিটার (Pargiter), থিলান্ত (Thilant), শ্রোডার (Shroder), হট্টেনী (Whitney) প্রকৃতি মনীষিগণ ভারতীয় কবিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান-উদ্ধারকরে যে পরিচয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা অনন্ত-সামান্য। কিন্তু তাহাও যে পরিচয় সার্থক হইয়াছে কি? যদি হেঁত, তাহা হইলে ভারতীয় কবির কথা প্রয়োগযোগ্য অর্থনীতি-নাশ্রে অথবা রাষ্ট্রনীতি-নাশ্রে অথবা শিকানীতি-নাশ্রে স্থান পাইত না কি? যখন বেধা বাইতেছে যে, প্রচলিত অর্থনীতি-নাশ্রে অথবা রাষ্ট্রনীতি-নাশ্রে অথবা শিকানীতি-নাশ্রে ভারতীয় কবির কথা স্থান পায় নাই, তখন কি ইহাই বৃত্তিতে হইবে যে, ভারতীয় কবির গ্রন্থে কোন প্রয়োগযোগ্য কবির কথা নাই?

বস্তুতঃ ভারতীয় কবির গ্রন্থে যে প্রয়োগযোগ্য কথা আছে, তবৎসুপায়ে মানব-সমাজ সংগঠিত হইলে, মাজ্জের চূপ আবার ঘূর্ণিত হইবে এবং জনসংখ্যা সর্বভাষ্যভাবে জ্ঞানের আগার হইয়া থাকিবে। একতর সেন্সেটিক ও কার্ণাকুল কোন ভারতীয় বহুদিন হইতে তাহার অঙ্গুলকান করেন নাই বলিয়াই ঐ প্রয়োগযোগ্য কথাগুলি বিস্ময় হইয়া রহিয়াছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে দেশপ্রেমের যে সাক্ষ্য পাওয়া বাইতেছে, তাহাতে কোন দেশপ্রেমিক কিংবা কার্ণাকুল ভারতীয় সচিব প্রকৃতি হইলেই আবার অনন্তসামান্য ঐ কথাগুলির অঙ্গুলকান পাইবেন এবং ভারতবর্ষ ও জনসংখ্যা আগার বিপন্ন হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা বাইতে পারে।

জনসংখ্যা এই আগার বিপন্নের কারণ কি, তাহা পান্ডিত্য ও দাক্ষিণ দেশের বেলায় এতদূর অঙ্গুলকান করিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। টল্টের, সেমিন, কার্ল মার্কস, হেনরি জর্জ, হিটলার যে অসামান্য লোক, উদ্বিগ্নে কোন সমস্যা নাই এবং মার্কসবান চরমসামান্যতঃ তাহারা যে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া বহুবিধ লোকসংস্কার পথের উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু কাহারও নির্দোষিত পথ যে সর্বভাষ্যভাবে অতীত কল প্রদান করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। যদি তাহাদের নির্দোষিত পথ অতীত কল প্রদান করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে তাহাদের স্ব স্ব দেশে বৈশ্ব-সমাজ, দাক্ষিণ-সমাজ এবং জনসংখ্যা পাকিতে পারিত না। কি করিলে জনসংখ্যা আগার বিপন্নের ঐ কারণসমূহ ঘূর্ণিত করা সম্ভব হইতে পারে, তাহাও যে পান্ডিত্য জাতির মধ্যে কেহ অঙ্গুলকান করিতে সক্ষম হইত, তাহাও যে পান্ডিত্য জাতির মধ্যে কোন মুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অতঃপর তাহাদের দেশ-জাতীয় শিক্ষা ও সাধনা, তাহাদের তাহারা যে সমস্যা তাহাদের অসামান্যের কথা খোঁজার করিবেন, তাহাও যখন করা যায় না।

কংগ্রেসের দ্বারা দাক্ষিণ উপস্থাপিত হইলে, বৃহৎ সমস্ত গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বহু অর্থদান কথার উল্লেখ হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট যে জনসাধারণের চূপ দুই করিবার প্রকৃতি চেষ্টা ও পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইবে। গভর্ণমেণ্টের ঐ কথাগুলি যে ভিত্তি ও অর্থদান, তাহা জনসাধারণ দ্বারা হইতে বৃত্তিতে পারেন, তাহাও চেষ্টা ও বাবদ্য কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় বাবদ্য-প্রদান বিচাষণে করিতে হইবে।

যাত্রার ক্ষেত্রে, ভারতবাসীর চরমসামান্য পরিমাণ বৈজ্ঞান-গতিতে বাড়িয়া বাইতেছে, তাহাতে কংগ্রেস সভাপতি থাকিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আর বেশী দিন জনসাধারণকে অর্থদান কথার দ্বারা সমস্ত করা সম্ভব হইবে না। কাজেই বাধা হইয়া গভর্ণ-মেণ্টকে তাহাদের অসামান্যের কথা খোঁজার করিয়া লইতে হইবে এবং কংগ্রেসের সংযোগিতা দ্বারা গতিতে হইবে। তখন যদি কংগ্রেস তাহার প্রতিষ্ঠিত বাবদ্যগুলি গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের নিষিদ্ধ পথে দেশের শাসন পরিচালনা করিতে বাধ্য হইবেন এবং তখন কার্ণাকুল দেশীয় কার্ণাকুল পরিচালনা-ভার সর্বভাষ্যভাবে

কংগ্রেসের হস্তে ক্ষত হইবে এবং ভারতবর্ষের বর্তমান সমতা পূরণ করা সম্ভব হইবে ।

কংগ্রেসের দ্বারা উপত্যাক যোগেনী দাবী গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত হইলে এবং কংগ্রেস যে, দেশের সর্ব-সাধারণের প্রবন্ধা দ্ব্য করিবার মানসে গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী উপস্থাপিত করিষাচ্ছেন, তাহা বাধাতে জনসাধারণ আশঙ্কিত পালে, তাহার বাধ্য হইলে, আনৈতিক কাউন্সিল সমূহ ও ভারতীয় আয়েল্ড্রি কংগ্রেসের মনোনীত সভা পূর্ণিষ্ঠ হইয়া যাইবে । দেশের সর্বসাধারণের প্রবন্ধা দ্ব্য করণমানসে কংগ্রেস রতী হইলে, কংগ্রেস বাধাকে সভা হইবার ক্ষমতা নির্ধারিত করিবেন, উচ্চকর্তৃপক্ষের সম্মতি হইয়া কাহারও বিরুদ্ধিতা-বশে কতী হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে কি ? কাউন্সিল ও আয়েল্ড্রি সভার কংগ্রেস-মনোনীত হইলে, সমস্ত দলী ও কংগ্রেসের মনোনীত হওয়া অবশ্যকারী । প্রত্যেক কাউন্সিল ও আয়েল্ড্রিতে সমস্ত দলী যদি কংগ্রেস-মনোনীত হন, তাহা হইলে লোকসভায় দেশের পরিচালনার কার্য বেশবাসীর হস্তে আনিয়া পড়ে না কি ?

যে নিষ্ক সিদ্ধান্তে গাংক না কেন, উপত্যাক যোগেনী দাবী কংগ্রেসের দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত হইলে এবং তি উপরে জনসাধারণের প্রবন্ধা বোজন হইতে পারে, তাহা কংগ্রেসের কেবলী বাধ্যতাক সভা দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে,

ভারতের তথা সমগ্র গণ্যেয় বর্তমান সমতাপূরণের সম্ভাবনা যাইবে ।

কায়েট বাধাতে ঐ দাবীগুলি কংগ্রেসের দ্বারা গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করা হয়, তাহার বাধ্যতা কত প্রত্যেক কংগ্রেস-সভার একান্ত তর্কণ । দেশের সর্বসাধারণকে মনে রাখিতে হইলে যে, কংগ্রেস কাহারও নিষেধ নহে, উহা সমস্ত ভারত-বাসীর মিলন-ক্ষেত্র । যদি দেশের কোন প্রেক্ষিত লোকের কংগ্রেসের প্রতি সংশ্লিষ্ট হওয়া অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধিতে হইবে, কংগ্রেসে অন্যতার-এবং প্রতীতি প্রবেশ লাভ করিষাছে । এই অন্যতার এবং প্রতীতির প্রতিবিধান করিবার অধিকার ও ক্ষমতা দেশবাসী প্রত্যেকের আছে । মিলন-ক্ষেত্র যে আদ্যের অভ্যন্তর প্রয়োজনীয়, তাহাও কোন সবেহ থাকিতে পারে না । কংগ্রেস আদ্যের সেই মিলন-ক্ষেত্র । তাহাতে অন্যতার অথবা প্রতীতি প্রবেশ লাভ করিষাছে বলিয়া তাহার উপর ভাস করিয়া তাহা হইতে মুক্ত থাকিবার প্রকৃতি গুণিতমত নহে । সর্বসাধারণের প্রবন্ধা বাধাতে দ্ব্য-কৃত হইতে পারে, তৎপূরণ বাধ্যতার দাবী কংগ্রেস হইতে উপস্থাপিত হইলে, তাহার অন্যতার এবং প্রতীতি আগনা হইতেই অসম্ভব হইবে । কায়েট ঐ দাবীগুলি বাধাতে কংগ্রেস হইতে উপস্থাপিত হয়, ২২মার্চের লক্ষ্য রাখা বেশবাসী প্রত্যেকের কর্তব্য । [ক্রমশঃ]

ছিন্নমস্তা

—শ্রী বসন্তকুমার ঘোষ

‘সত্যতা’-র পূর্বপক্ষে বশনের মোহ-ভাল আসি
বহাব-চন্দ্রের মুখে আনিয়াছে বীণা ফুর চাপি,
সত্যতা-নিয়ম সত্য চটুল, চকস সে-মতি
বর্ষসূদ লভিবার আগে চলে মত, ক্ষত তার গতি ।

বসন্ত-বিশ্বতা নারী !

যেবীর লালন তাকি কোথা যাও কুঠিতে না গারি ।

ব-রাজ্যের রাজত্বাণী, বাত্মা তব অন্ধকার পথে,
দুঃখ শান্তি লক্ষিত অশান্তির চমিবার স্রোতে,
বানীত্যা নামে যেজ্ঞা-চামিটার হই মস্তকভে,
কপট হাজতে প্রাণ-বিভাজিতে পদাধাত করে ।

বিশ্বপদমিনী নারী !

তব প্রগতির পথে ধ্বংসিত কিরিছে সারি সারি ।

কোন স্থানে যাও কেণি অস্তঃপুর-ছায়া হুণিতল ?
পতি নহে প্রণয়া তোমার, সংসারের সলাহ কেবল :
রেংছায়া শিত কাঁবে অধিরণ পুহের মাঝার,
মাতৃহত্যাত্মা হাথ নারী বর্ণে তুমি নির্জিকার ।

কল্যাণদায়িনী নারী !

তত্ত্বিত করিলে খরা পথোপথে অলল উপারি ।

পুরুষের সাথে কেন নিতা-কর্ণে তব অভিধান—
তুচ্ছা নিষ্পত্তিতে কেন নিম্ন হস্তে তব বিধপান ?
আধিষ্টাটী উদ্ধৃত্তি করি, হের রংগো মন-উদ্ধাদিনী,
সুভার নিদান করে মতিমাহ বিশ্ববিদ্যাদিনী !

গুণো কক্ষতরী নারী !

বহানে কিরিয়া এস ছিন্নমস্তা অবিভা সংহারি ।

কলিকাতা মেডিক্যাল-কলেজ

(পূর্বাঙ্গতত্ত্ব)

—প্রিণ্টিং চন্দ্র দে

(১০) মেডিক্যাল-কলেজে সর্ব-প্রথম

হাসপাতাল স্থাপন।

বৈদ্য

০

খর্ষকার

২

গদ-বন্দিক

১

তত্বদায়

৩

স্ববর্ণ-বন্দিক

৮

অস্ত্রাভ্যাস

১০

৫০ জন

১৮-৩৮-বৃষ্টাব্দে, এপ্রিল মাসে একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল খোলা হইল। ইহাই মেডিক্যাল-কলেজের সর্ব-প্রথম হাসপাতাল। এই হাসপাতালে ৩৬৮টি যোগ্য আশ্রিত চিকিৎসিত হইতে লাগিল। এই সঙ্গে, বাহিরের যোগাযোগের নিমিত্ত একটি ডিসপেন্সারীও খোলা হইল। যে কয়েকটি যোগ্য চিকিৎসিত হইতে আশ্রিত ছিল, তাহারা সকলেই আবেগের লাভ করিয়া স্ব-স্ব গৃহে চলিয়া গেল। মেডিক্যাল-কলেজের অধ্যক্ষ এক বৎসর পরেই হাসপাতাল লব্ধে কৃতকাণ্ডতার কথা গভর্ণমেন্টে লিখিয়া পাঠাইলেন। গভর্ণমেন্ট অস্ত্রাভ্যাস হইয়া একটি অশেফাকৃত বৃহৎ হাসপাতাল স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেখানে এক শত যোগ্য থাকিবার ব্যবস্থা হইল।

(১২) প্রথম তিন বৎসর পাঠ করিবার কাল।

১৮৩৮-বৃষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট বাঙ্গলা-বোর্ডে ও তাৎকালিক অস্ত্রাভ্যাস হইলে ডিসপেন্সারী স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া “জেনারেল-কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশনের” (General Committee of Public Instruction) তাৎকালিক সেক্রেটারী জে-সি-সি সাহাবুল্লাহ সাহেবকে পর লেখেন। তাৎকালে গভর্ণমেন্ট এই নথি লিখিলেন, “আমরা চারতরবারেই নানা স্থানে ডিসপেন্সারী স্থাপন। আপনাদের মেডিক্যাল-কলেজের যে সকল ছাত্র কৃতকৃত হইয়াছে এবং তাহারা এই সকল ডিসপেন্সারীতে গিয়া যোগ্যদিগকে চিকিৎসা করিবার উপলক্ষ হইয়াছে, তাহাদের নাম লিখিয়া সবর পাঠাইবেন।” তাৎকালে মহাশয় ডেভিড হোয়াস সাহেব মেডিক্যাল-কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ১৮৩৮-বৃষ্টাব্দে, ১২ই এপ্রিল তারিখে, মেডিক্যাল-কলেজ-কাউন্সিলের আবেদনগ্রন্থে গভর্ণমেন্টকে জানাইবার জন্য সাহাবুল্লাহ সাহেবকে যে পত্র লেখেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১১) মেডিক্যাল-কলেজে তাৎকালিক

ছাত্র-সংখ্যা।

সর্ব-প্রথমে ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল। তাহারা ৭ টাকা হইতে ১২ টাকা পর্যন্ত মাসিক ভূতি পাইত। ওয়াশ-নগরেই তাহারা ভূতিপ্রাপ্ত হইত। পুরাতন হিন্দু কলেজ (Old Hindu College) ও কেনরেল এলফ্রিড ইন্সটিটিউশন (General Assembly's Institution) হইতেই অধিকাংশ ছাত্র আশ্রিত ছিল। উক্ত ৫০ জন ছাত্র তিন আরও অনেকগুলি ছাত্র আসিল। ইহারা এই মেনেই লোক বটে, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ইষ্ট ইন্ডিয়ান্স (East Indians) ও গল্লাবীশবাসী (Ceylonese)। উক্ত ৫০ জন ছাত্র কোন্ কোন্ কাজী ছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

জে-সি-সি সাহাবুল্লাহ,

সাধারণ, জেনারেল-কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন

কলিকাতা

আমদ

৫ জন

মহাপ্র,

কাহন

১৫

কলেজ-কাউন্সিলের আবেদনগ্রন্থে আপনাকে জানাইতেছি

যে, ৩১ মার্চ তারিখে (১৮০৮ বৃষ্টাব্দে) লিখিত আপনাদের পত্র (৩২৭নং) পাইয়াছি। ইহাতে আপনি লিখিয়াছিলেন, ঢাকা, দুর্গানাবান, পাটনা ও চট্টগ্রামের ডিসপেন্সারীতে নিযুক্ত ৪১১ সলোংকট ছাত্রের নাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

ইহার উত্তরে আমি কলেজ-কাউন্সিলের অগ্রদূত লইয়া আপনাকে জানাইতেছি যে, এখনও এখন কোন ছাত্র একজন কৃতবিদ্য হই নাই যে, সে ডিসপেন্সারীতে থাকিয়া রোগিণ্যের চিকিৎসা করিতে সমর্থ হই।

১৮০৮ বৃষ্টাব্দে, ২৮ জানুয়ারি তারিখে লর্ড উইলিয়াম বেডিংহাম এট অর্গে আপন করিয়াছিলেন যে, বেডিক্যাল-কলেজের ছাত্রগণ ৪ বৎসরের কথ ও ৬ বৎসরের বৈদ্য কাল কলেজে পড়িতে পারিবেন না। ১৮০৮ বৃষ্টাব্দে, ১ জুন [১৮০২ বঙ্গাব্দে, ১২ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার] তারিখে কলেজ শোনা হইয়াছে। স্ততঃ ২ বৎসর ১০ মাস মাত্র অতীত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য হওয়া ছাত্রগণের পক্ষে নিত্য সম্ভব। ইংলণ্ডে ৪ বেডিক্যাল-কলেজ আছে, তাহাতে ছাত্রগণ স্ততঃ ৪ বৎসর চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ৬ বৎসর পড়িলে তবে ছাত্রগণ কৃতবিদ্য হইতে পারে।

বেডিক্যাল কলেজে এখনও নানা অগ্রবিধা ত্রোপ করিতে হইতেছে। পরীক্ষা করিবার স্থান এদেশে নাই। যদি করিতে হয় তবে অতি সাবধানে ইহা করিতে হইবে। পরীক্ষকের উপস্থিতি নাই। রসায়ন-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার ল্যাবোরেট্রী পুত্রক ও অজ্ঞাত উপায় নাই। নামে মাত্র কলেজ চলিতেছে। বহুদিন অনেক বর ইংলণ্ড হইতে আনিতে হইবে।

আজ ১২ দিন হইল, একটা কুস্তি হোসপাতাল খোলা হইয়াছে। ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পুত্রক ও অজ্ঞাত সুবিধা নাই। আরও ৬ মাস অতীত হইলে তবে ছাত্রগণ কতকটা উপযুক্ত হইতে পারিবেন। ছাত্রগণ রোগনির্ধর বিলম্ব লিখিয়াছে, কিন্তু উপযোগী বহুদিন না থাকায় তাহাদের নানা অগ্রবিধা হইতেছে।

কলেজ-কাউন্সিল বলিতেছেন যে, পূর্ব ৪ বৎসর না পড়িলে শিক্ষা করিয়া ছাত্রগণের হস্তে চিকিৎসার ভার দেওয়া হইতে পারে না। তাহার কারণ বসেন যে, আগামী

অষ্টাব্দে হাঁসের শেষ তাপে উক্ত প্রেষীর কয়েকজন সর্কোংকট ছাত্রকে কৃতবিদ্য করিয়া লওয়া হইতে পারিবেন। ওজস্বী ওয়াহা প্রাপ্যপত্র পরিশ্রম করিবেন।

কলেজ-কাউন্সিল ইচ্ছা করেন যে, আগামী অষ্টাব্দে হাঁসে ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতে হইবে। কলেজের কোন শিক্ষক পরীক্ষক থাকিবেন না। বাহিরের পরীক্ষকগণই পরীক্ষা করিবেন। যে সকল ছাত্র পরীক্ষার সম্ভাব্যজনক ফল দেখাইতে পারিবেন, তাহাদিগকেই পত্রফর্মট ঢাকা, দুর্গানাবান, পাটনা ও চট্টগ্রাম ডিসপেন্সারীতে পাঠাইবেন। ছাত্রগণকে এক একখানি করিয়া প্রতীক-পত্র (diploma) দিতে হইবে। তাহাতে লিখিত থাকিবে যে, এই সকল ছাত্র স্ততঃপর্বৎ যে কোন স্থানে বিধা চিকিৎসা করিতে পারিবেন। প্রত্যেক উত্তীর্ণ ছাত্র "College of Native Surgeons of British India" নামক সভার সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন। তাহাতে আমরা এই কার্যে অগ্রসর হই, তদ্বিষয়ে আপনাদের সমস্ত অগ্রদূত দিবেন।

বেডিক্যাল-কলেজ	}	আপনাদের বৎসর কৃত
১২ এপ্রিল,		ডেভিড বেচার
১৮০৮ বৃষ্টাব্দ		সেক্রেটারী, বেডিক্যাল-কলেজ

(১৩) বেডিক্যাল-কলেজে ছাত্রগণের সর্ক-প্রথম পরীক্ষা।

ভারত-পত্রফর্মের তাৎকালিক সেক্রেটারী এ. টি প্রিন্সেপ (H. T. Prinsep) সাহেবকে পরীক্ষকগণ যে সুবিধা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ নিয়ে লিখিত হইল :—

১৮০৮ বৃষ্টাব্দে, ৩০ অক্টোবর [১২৪৪ বঙ্গাব্দে, ১৪ কাঠিক] তারিখে ছাত্রগণকে পরীক্ষা করা হয়। ইহাই বেডিক্যাল-কলেজে ছাত্রগণের সর্ক-প্রথম পরীক্ষা। ১১ জন কৃতবিদ্য ছাত্র পরীক্ষা দিতে আনিল। তাহাদের জাতি ও নাম-খান এই :—

ছাত্রের নাম	জাতি	বাসস্থান
১। উমাকান্ত শেঠ (১)	কায়স্থ	কলিকাতা
২। দারিকানাথ গুপ্ত (D. Gupta)	বৈদ্য	"

১। পর্বত উমাকান্ত শেঠ আপন জাতিতে বহুদায় ছিলেন। অল্প কাল কায়স্থ লেগা হইয়াছেন।

০। রাওলফ দে	কাবু	"
০। গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	বৈজ্ঞ	"
০। কালাচাঁদ দে	কাবু	"
০। গোপালচন্দ্র গুপ্ত (১)	বৈজ্ঞ	"
১। চন্দনলাল	কাবু	দিল্লী
৮। নবীনচন্দ্র দিত্ত	কাবু	কলিকাতা
৯। নবীনচন্দ্র ব্রূপাশাখ্য	ব্রাহ্মণ	"
১০। বনেন্দ্র চৌধুরী	ব্রাহ্মণ	"
১১। জেম্‌স্‌ গোট	ক্রিস্‌চিয়ান	"

বর্তমান সময়ে ছাত্রগণ পূর্ণ ৬ বৎসর পড়িয়া তবে পরীক্ষা দিয়া থাকে : কিন্তু উল্লিখিত ১১ জন ছাত্র ৩ বৎসর ৫ মাস পড়িয়া পরীক্ষা দিয়াছিল। ১ দিন পরীক্ষা করা হয়। কোন দিন, কোন ছাত্র, কোন বিষয়ে কিঞ্চৎ পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

(প্রথম দিন)

(৩০ অক্টোবর, বুধবার, ১৮৮৮)

Present—Messrs. Corbyn, Grant, Martin, Stewart, Green and MacIntosh.

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। উমাকরণ শেঠ	অত্যন্ত সন্তোষজনক
২। রাওলফ দে	"
০। হারিকানাথ গুপ্ত	"
০। গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	মন্দ নহে, তবে চকল-সোদ

(দ্বিতীয় দিন)

(৩১ অক্টোবর, বুধবার, ১৮৮৮)

এনাটমী ও ক্রিস্‌টলজি।

Present—Messrs. Corbyn, Grant, Stewart, Goodeve, and O'Shaughnessy.

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
৫। কালাচাঁদ দে	কতকগুলি উত্তর অতি সুন্দর। এক জন ভাল এনাটমিষ্ট।
০। গোপালচন্দ্র গুপ্ত	কিছু দ্বাখ্যাত; চিকিৎসালতার অত্যন্ত; মেটের উপর উত্তরগুলি ভাল।

১। বর্ষের গোপালচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, দুইদিন বর্ষের বহুসংখ্যক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার পূর্ণ।

১। চন্দনলাল	{ হিরণ্যি। উত্তরগুলি বিস্তৃত। ভাল এনাটমিষ্ট।
৮। নবীনচন্দ্র দিত্ত	{ বৃদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ। উত্তরগুলি সর্বদা সুন্দর। দ্বন্দ্ব-বিধান কিছু অল্প।
৯। নবীনচন্দ্র ব্রূপাশাখ্য	উত্তর সাধারণতঃ সন্তোষজনক।
১০। বনেন্দ্র চৌধুরী	ঐ ঐ ঐ
১১। জেম্‌স্‌ গোট	আর উপনি-উক্ত দুই জনের মত।

(তৃতীয় দিন)

(১ নভেম্বর, বুধবার, ১৮৮৮)

কেমিস্ট্রী ও ফাণেরী। (২)

Present—Messrs. Corbyn, Grant, Martin, Goodeve, O'Shaughnessy,

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। উমাকরণ শেঠ	{ সঙ্গোপক: প্রশংসনীয়, চিকিৎসাল, অত্যন্ত সন্তোষজনক।
২। হারিকানাথ গুপ্ত	প্রশংসনীয়, চিকিৎসাল, সন্তোষজনক।
০। রাওলফ দে	ঐ ঐ একান্ত-চিহ্ন।
০। গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত	{ কতকগুলি উত্তর সুন্দর, কিন্তু অল্পগুলি ভাল নহে। আরও ১১মাস পড়ুক।

(চতুর্থ দিন)

(২ নভেম্বর, শুক্রবার, ১৮৮৮)

কেমিস্ট্রী ও মেটেরীয়া-মেডিক।

Present—Messrs. Corbyn, Grant, Martin, Stewart and T. Halliday (Secretary to the Government of Bengal)

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। কালাচাঁদ দে	{ উত্তর অত্যন্ত সন্তোষজনক, তবে ছাত্রী অধিক।

১। Dr. Martin writes, "This day, we all the examiners examined the boys in dissection. We proceeded to the Operating room, when Umacharan Sett, Dwarkanath Gupta, Rajkrishna Dey and Nobin Chandra Mita performed various operations on the dead human body in a very good style."

২। গোপালচন্দ্র	{	কতকগুলি উত্তর উত্তর, তবে এক
গুপ্ত		এক সমর লিখিতে গোলমাল করে।
৩। হুমলগাল	{	আরও ৬ মাস পড়ুক।
		স্থিতি ; উত্তরগুলি অতি স্থলত।
	{	একজন ভাল রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ।

৪। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একভাবে প্রবৃত্ত উত্তর দিচ্ছিলেন।

৫। নবীনচন্দ্র মিত্র অতি মনোহর। বস্তুর-মত বুঝিচ্ছিলেন।

চতুর্থ বিবেকে ১১জন ছাত্র পরীক্ষা দিল। কিন্তু প্রস্তাবিত কাস্ট্রি গোপনা ৭জন ছাত্র অগ্রহণ করিল। অবশেষে ৪জন ছাত্র পরীক্ষা দিতে লাগিল। ইংরেজের নাম, উমাচরণ শেঠ, হারিকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র। উক্ত ৭জন ছাত্র ৬ মাস পরে পুনরায় পরীক্ষা দিগ্ধিল।

(পঞ্চম দিন)

(৭ নভেম্বর, বুধবার, ১৮৮৮)

মেট্রিক্স-মেডিকা ও চিকিৎসা।

Present—Messrs Nicolson, Grant, Martin and Stewart

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। উমাচরণ শেঠ	{ প্রত্যেক বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে সহায়-কারক। সকল পাঠ্যেই জানী
২। রাজকৃষ্ণ দে	
৩। হারিকানাথ গুপ্ত	{

(ষষ্ঠ দিন)

(৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৮৮৮)

চিকিৎসা ও মেট্রিক্স-মেডিকা

Present—Messrs Nicolson, Carbyn, Grant, Martin and Stewart.

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। নবীনচন্দ্র মিত্র	অত্যন্ত সহায়-জনক

(সপ্তম দিন)

(৯ নভেম্বর, শুক্রবার, ১৮৮৮)

সার্বভৌম ও অস্থাপত্য।

Present—Messrs Nicolson, Corbyn, Grant, Martin, Stewart, Goodeve and O'Shaughnessy,

ছাত্রের নাম	পরীক্ষার মন্তব্য
১। উমাচরণ শেঠ	সর্বোৎকৃষ্ট উত্তর ও মনোহর
২। রাজকৃষ্ণ দে	ঐ ঐ
৩। হারিকানাথ গুপ্ত	ঐ ঐ
৪। নবীনচন্দ্র মিত্র	ঐ ঐ

১১ জন ছাত্র পরীক্ষা দিগ্ধিল। ৩ম-৪ম উক্ত ৪ জনই বিশেষ-রূপে কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ উমাচরণ শেঠ মহাশয়ই বর্তমান সর্বোৎকৃষ্ট হানে অবস্থিত।

পরীক্ষক-গণ উক্ত ছাত্রদিককে পরীক্ষা করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

“The Supreme Government will see from the above results that the ordeal through which these young men have passed, is one of no common kind, and affords a very gratifying measure of capacity and acquirements. The result is such as to satisfy us that their average knowledge is of a solid and well-grounded character.”

পরীক্ষক-গণ গভর্ণমেন্টকে এই মর্মে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, “উমাচরণ শেঠ, হারিকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে ও নবীনচন্দ্র মিত্র এই চারিজন ছাত্র আমাদের মতে সর্বোৎকৃষ্ট। চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাহাদের জ্ঞান বিশেষ-রূপে কৃতজ্ঞ। তাহারা যোগ্যের যোগ নির্ণয় করিতে বদ্ধ। বিশেষতঃ, যোগ্যের অবস্থা বুঝিয়া তাহারা ঐক্যব্রহ্মের লিখিত নিম্ন। অত্র-চিকিৎসাভ্যন্তরে তাহারা বিলম্ব পায়বনী। এই ছাত্র-গুলির বর্তমান-চরিত্রও অতি স্থলত।”

পরীক্ষকগণ গভর্ণমেন্টকে আরও লিখিলেন, “উক্ত চারি জন সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে দ্বিতীয় ১০০ (এক শত) টাকা হিসাবে বেতন দিওয়া হউক। ছাত্রগুলি বিলম্ব কৃতজ্ঞ হইয়াছে, বিশেষতঃ তাহারা সজ্ঞিত। তাহারা যোগ্য হুমক্যের বশবর্তী না হইয়া লক্ষ্য-কার্যে অগ্রগত হইয়াছে। আমরা আরও বলি যে, উক্ত চারি জন ছাত্রকে যে কোন গভর্ণমেন্ট ভিল্পেন্সারীতে পাঠাইতে পারেন। তাহারা দ্বিতীয় বেতন বাতীত বাহিরে লোকের বাটীতে গিয়া চিকিৎসা করিতে পারিবে।”

পরীক্ষণের মেডিক্যাল-কলেজের মান ও সম্মান বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেন্টকে জানাইলেন, "উক্ত ছাত্রগণ চিকিৎসা ও বার্খোপার্জনে করিয়াই নিশ্চিত থাকিতে পারিবে না। ৪ বৎসর পরে কলিকাতার আলিয়া তাহাদিগকে পুনরায় একটা পরীক্ষা দিতে হইবে। তাহারা যখন কলিকাতায় আসিবে, তখন তাহাদের স্বাস্থ্যবোধের ব্যবহার গভর্ণমেন্টকেই বহন করিতে হইবে।" অর্থে নিম্নুক্ত করিবার সময় তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানি প্রতীষ্ঠা-পত্র (diploma) দেওয়া উচিত। চাকরী লইয়া ঘাইবার সময় গভর্ণমেন্ট যেন তাহাদের প্রত্যেককে নিম্ন-লিখিত পুস্তকগুলি উপহার প্রদান করেন। এই পুস্তকগুলি সঙ্গে থাকিলে তাহারা সর্বদাই ইহা পড়িতে পারিবে। পুস্তকগুলির নাম এই :—

1. Phillips' Translation of the London Pharmacopoeia,
2. Thomson's Elements of Materia Medica Therapeutic,
3. Dr. O'Shaughnessy's Manual of Chemistry,
4. Cloquet's Anatomy by Know,
5. Sir C. Bell's Institutes of Surgery (Just Published),
6. Dr. Geo. Gregory's Elements of Medicine,
7. Twining on the Diseases of Bengal,
8. Cooper on Dislocations and Fractures,
9. Clarke's Commentaries on the Diseases of Children.

We have also.

S. Nicolson
Surgeon, Gen. Hospital.
J. Grant
Surgeon, Apothary, to the
H. E. I. Co.
J. R. Martin
Freedy. Surgeon, Surgeon
Native Hospital
D. Stewart
Asstt. Surgeon, Supt. Gen.
of Vaccination,

Calcutta
21st Nov—1838

(১৪) চারিজন ছাত্রের পুরস্কার-লাভ ও চাকরী-প্রাপ্তি।

সর্বোত্তম ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত মেডিক্যাল-কলেজে মহা-সমারোহে একটা সভা স্থাপিত হইল। ১৮৫০ গুণায়ে, ১৫ মার্চ, শুক্রবার বিসেপ এই পুরস্কার-সভা বসিয়াছিল। লর্ড অক্লামও বাহাদুর তখন এরূপের গভর্ণর জেনারল। বড় বড় বাদ্যাদী ও সাতের সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। অক্লামও বাহাদুর স্বয়ং পুরস্কার ও প্রতীষ্ঠা-পত্র প্রদান করিয়া হৃদয় বহুতা করিলেন। সমবেত ছাত্রগণকে প্রোৎসাহিত করাই তাহার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য। উদাহরণ শ্রেষ্ঠ মহাশয় ব্যাপার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এই হেতু অক্লামও বাহাদুর তাহাকে ৩০০ টাকা মূল্যের একটা উৎকৃষ্ট সেপার ঘড়ী উপহার ও প্রতীষ্ঠা-পত্র প্রদান করেন। অত্যন্ত ভী ছাত্র পুস্তক পুরস্কার এবং প্রতীষ্ঠা-পত্র লাভ হইলেন। (১)

উক্ত চারি জন ছাত্রের প্রত্যেককে মাসিক ১০০ টাকা বেতনের চাকরী প্রাপ্ত হইলেন। উদাহরণ শ্রেষ্ঠ আগাগ ডিসপেন্সারীতে, রক্তক্ষণ বে দিল্লী ডিসপেন্সারীতে এবং নবীনগরে দ্বিধ শস্তা ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার নিযুক্ত হইলেন। ষাটকানাপ শুণ্ড কলিকাতা ত্যাগ করিলেন না। মহাশয় ষাটকানাপ ঠাকুর তাহাকে বাতির বাটেতে না দিয়া তাহার ওর বর্ধতলায় একটা ডিসপেন্সারী করিয়া দেন। ইহার নাম Metropolitan Dispensary. ইহাই বাদ্যাদীর সর্ব-প্রথম ডিসপেন্সারী। রক্তক্ষণ বে চাকরী লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু এক বৎসর পরেই তিনি সেখানে বেহত্যাগ করেন। তিনি ১১ বৎসর বয়সের একটা বালিকাকে বিবাহ করিয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। মহাশয় লর্ড অক্লামও বাহাদুর রক্তক্ষণের দুইরা কণা শুনিয়া তাহার বালিকা স্ত্রীর সাহায্যের নিমিত্ত ৩০০ টাকা পাঠাইয়া দেন।

(১৫) সর্বোত্তম ছাত্রগণের চাকরী-প্রাপ্তি।

মেডিক্যাল-কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যে কয়েক জন কৃতবিদ্য ছাত্র প্রথমে গভর্ণমেন্টের চাকরী পাইয়াছিলেন, তাহাদের নাম নিয়ে লিখিত হইল :—



(25) 2003

[Chorus]

স্বর্গীয় বিশাল জিউটিবিটার

નોંધો—સિદ્ધાન્તેશ્વરનાથ મઠ તોષ્ટીની કાંઈક સંખ્યા મલખાનમાં જઈ રહ્યાં છે.



কারিকুলাম

—শ্রীকাকনমালিকা দেবী

আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা কবিরাব আসেন হইয়াছে। আসেন নিম্নোদ্ধারী :
১.৫৫ অংকে আসেন ছাত্র হইয়াছে, সম্প্রদায়ক মহাপ্রবন্ধে প্রকাশ্যে বাবে জানাইয়া দিতে আমায় একটুও সঙ্কোচ বোধ হইতেনে না। যে চক্রতর বিষয় লইয়া মনোবিদ্যা নাশা বানাইতেছেন, সেট বিষয়ে কথা বলা আমাদের পক্ষে ছোটমুখে বড়কথা হইয়া পড়িলে না কি ?

শিক্ষার বিষয়, ইংরেজিতে যোগ্যে 'কারিকুলাম' বলা হয়, কি হওয়া উচিত, তাহা লইয়া কথা বলা আমাদের মত "অ-শিক্ষিত" বা অর্ধ-শিক্ষিত গুরুজনাবীর পক্ষে অসম্বন্ধীয় হইয়া বসিয়া বসি বিরোধিতা হয়, তাহা হইলে সেজন্য লজ্জা হইলেন কে, সেট কথাটির নিম্নোদ্ধার। অধো-ভাগেই হওয়া সম্ভব। সেট নিম্নোদ্ধার ভাগ আমাদের পাঠিকাদের উপরে তুলিল।

এখন হেঁচা করিয়া দেখা যাক, কোনজন মন্তব্য প্রকাশ্যে না করিয়া এই বিষয় সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি কি না। কোনও রূপ মন্তব্য করিব না। কথা সাজে না, শোভা পায় না, বলিয়াই করিব না। কেন সাজে না বা কেন শোভা পায় না, তাহা বিচার্য্য কহে করিয়া আমার অকিকিংকর লেখাটা পড়িলেন, তাহাও অসম্মানে অস্বাদন করিয়া লইলেন, এ আশা আমি পুহই করি।

আমার জানাশোনা বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সাধারণতঃ হই প্রেমীর নাস্তি দেখিয়া থাকি। এক প্রেমীর নাস্তি আছেন, বিচার্য্য আমাদের মত একটু আশু লেখাপড়া জানেন—ইংরেজিতে লেখা চিত্রি, টেলিগ্রাম, বিল প্রভৃতি পড়িতে ও বুঝিতে পারেন, বাংলাবার লিখিতেও পারেন। আর এক প্রেমীর নাস্তি দেখি, বিচার্য্য কলোকে পড়িয়াছেন, কেহ হইয়া,

কেহ বা তিনটা পাশও করিয়াছেন। একেবারে অক্ষর-পরিচয় নাই, বাংলালী মধ্যবিদ ঘরের এমন সীলোক এখনকার দিনে বড় দেখি না। যদি বা দেখি, তাঁহাদের সংখ্যা পুহই কম।

আমি নাস্তির যে হই প্রেমীতে বিতর্ক করিয়াছি, তৎক্ষণাৎ প্রথম প্রেমীর সঙ্গে অনেক পাঠিকারই পরিচয় আছে। কেন না, আমি মনে করি, প্রত্যেক সংসারেই আত্মকাল ঐ প্রথম প্রেমীর নাস্তিই আছেন। দ্বিতীয় প্রেমীর নাস্তির সংখ্যা সাধারণ গৃহস্থের সংসারে কিছু কিছু বাড়িতেছে মত, তবে সংখ্যায় পুহ বেশি নয়। আমাদের বিশেষ জানা একটা সংসারের ঘরের দরজা আমাদের জানা আছে, আমাদের আত্মিকার প্রবন্ধের উদাহরণ স্বরূপ সেট ঘরের দরজা লিখিলেই, সম্প্রদায়ক মহাপ্রবন্ধের আসেন প্রতিপালিত হইবে ও সাধারণ পাঠিকারও ঐ বিষয়ে য য মতামত গড়িয়া লইতে পারিবেন। আমার কোনজন মন্তব্য করায় প্রয়োজনও হইবে না।

এই সংসারীতে চারিটা নয়, পাঁচটা নাস্তি। অতিরিক্ত নাস্তি গৃহের প্রধান গৃহিণী, বাবুদের জননী; বলা নিশ্চয়ই বাছা, অল্প চাকরি নাস্তি বাবুদের "মহাশয়ি", স্ত্রী বা ওয়াইক। গৃহিণীর হইটা কলা, তাহাও স্বস্তরালয়ে থাকে, কতিং কদাচিং নাস্তিালয়ে আসিয়া থাকে। বাড়ীর বড়বাবু সম্প্রতি নিরীতে বদলি হইয়া গিয়াছেন, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। বিদেশে একাকী থাকিতে ছেলের কষ্ট হইবে বুঝিয়া গৃহের প্রধান গৃহিণী উদ্যোগ আয়োজন করিয়া বণ্ডকে পুত্রের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বড়বাবু চলিয়া যাওয়ার পর হইতে বাড়ীতে, নানা বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। বাড়ীর বিনি গৃহিণী, তাঁহাকে প্রায়ই অসম্মত দেখা যায়। এতদিন তিনি যেন 'বিটাঘর' করিয়াছিলেন; লগ কহি হইতে অগাধিত

নিশিগাছিল, বড়বু চলিয়া গাওয়ার আবার সমস্ত উলোটুক পালোটাই হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মনে লাগি নাই, এক দিনও বিশ্রাম নাই, এমন অবস্থাই হইয়াছে।

ব্যাপার কি হইয়াছে, সেই কথা বলিবে। বড়বু দেখেলে মাথু, দিল্লীন্দার তাঁহার তুলনা নাই। সম্ভাব্য সমস্ত অগ্নি কাজের তার তিনি দ্রুতের খাড়ে লটকাছিলেন, কাছাকাড় কিম্বা দেখিতে বা করিতে হইত না—লোকজনদের দিয়া হটক, নিজের গতর দিয়া হটক, তিনি সবই করিয়া দিতেন। ভোরবেলার উঠিয়াই তিনি বাড়ীর বাবু, ছেলেমেয়ে, বউ—সকলের গল্প ভলখাবার করিয়া ফেলিতেন; অল্প বউ-মেয়ে চা তৈরী করিবার আগে বড়-বো কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন গুচি-আমুভাজা, কোনদিন বা কড়াইভট্টী ভাজা, কোনদিন পাপরভাজা, আবার কোনদিন চালভাজা, ছোলা-ভাজা প্রভৃতি করিয়া ফেলিতেন। বাসুনঠাকুর হস্ত তখনও কাগজ কাচিয়া রাত্রাঘরে ঢুকই নাই। চায়ের আলস চলিতেছে, ইহারই মধ্যে সেইখানে বসিয়া বড়বু দিনের রাহার সমস্ত যোগাড় করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরকে চাল মিলেন, ডাল মিলেন, তরকারী মুখাইয়া মিলেন, মলমাপাতি দেখাইয়া মিলেন। বড় বো ঠাকুরাণীর এত সম্বন্ধকার দৃষ্টি আমি দেখিরাছি। কত লালপাড় গরুর একখানা শাড়ী পরলে—কি ঈদ কি ঈদ, এ সম্বন্ধটা তিনি কোন দিন মায়া, দেখিও পড়িতেন না। তাঁহার অল্প ভায়েরা ঠাট্টা করিত, কত সব কি বলিত, হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। বড়বু সকলের সঙ্গে চা খাইতেন না। চায়ের আলসের কাছে বসিয়া তিনি রাহার যোগাড় করিতেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। তিনি চা না খাইলেও, বাহারা খাইত, তাহারা নানা বিষয়ের গল্প-মাহা করিত, তাহা শুনিতে ও সে-সকলে যোগ দিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা হইত। পুত্ৰা অর্জনা সাধিয়া সেই ‘তিন পোরা’ বেলায়—বেলা প্রায় নটার, তিনি আলান বাসনে প্রস্তুত করিয়া এক বাতী চা খাইতেন।

বেলা নটা হইতে পূর্বঘণ্টার বাড়ীতে হৈ হৈ পড়ে। ছেলেসকলে দান করিয়া ভাতের গল্প খাবার-ঘরে ঢুকিল, কে ভল-ঘরে ঢুকিয়া বাসতি বাসতি ভল ঢালিল, কে ইকুলের সমস্ত ভূমিখা খলি খেলিতেছে, বড়বু নতুন সব দিকে। ইহাকে বন্ধকহইতেছেন, উহাকে বাপু বাছা বন্ধি আনত করিতেছেন,

চাকরকে তাহার মত, ঠাকুরকে ঠাকুরের মত, আনান বাবুদের বাবুদের মত চট্টয়া চুপিতছেন। এত ছবি দেখিবার মত।

কাজে কিছু বা কলি বাড়িয়াই চলিল। বাবুরা দান সাধিয়া আহার করিতে আসিলেন, ছেলেমেয়েরা ইকুলের গল্প তৈরী হইয়া খাইতে বসিল। একটী ঠাকুর, সব দিকে খুটো-খুটী করিতে সে লাগিবে কেন? তাই বড়বু ছেলেদের ঘরের সম্পূর্ণ ভার লইলেন। ঠাকুরের নিকট চটতে যতই পায়ে লজবিশ আগাখা প্রমাণ লইয়া তিনিই ছেলেদের পরিবেশন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে বাবী ও দেবদেবের খাওয়া দেখিরা আসিরা পাচককে বখাবিহিত উপবেশ দিতে লাগিলেন।

বাবুখা আসিলে খেলেন, ছেলেমেয়েদের ইকুল খেল, ছোট ছোট বাগায়া রহিল, তাগারা পরে খাইবে। এত সময় বড়-বুঝ অবসর মিলিল। দান করিয়া, বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া তিনি নিরাশ্রয় রাত্রাঘরে শান্তভীত ভল রাত্রা করিতে গেলেন। শান্তভী পূর্ণে বশাক আহার করিতেন, বুদ্ধ বয়সে আন্তন-ভাতে তাঁহার বেশ বট হইত। বুঝ হুটীয়া কাছাকাড় কিম্বা বলিতেন না সভা, আর তাঁহার গাছবিভেদে বস্ত্র বেশী, অস্ত্রের ছোঁয়া লেগা খাইতে তাঁহার অসহ্য দাক্ষিণ্যে ও পাতে, তাই বশাক-ব্যবস্থাই চলিরা আসিতেছিল। বড়বো অকস্মাৎ একদিন তাঁহাকে হাঁড়ী খুঁইতে না দিয়া, নিতেই তাঁহার গল্প শুচিভাবে রাত্রা করিতে বসিলেন। শান্তভী বলিলেন, তুমি একলা মাথু, কত দিক সামলাবে বোন, ভাগি ত ঐ রাত্রা, আমি ও খুটী খুটীয়ে দোব।

বড়বু সে নিবেশ মানেন নাই।

মধ্যাহ্নী বড়বুঝ সভা সভাই বিশ্রাম। মধ্যাহ্নের বে সমস্ত কাজ, সেগুলি তাঁহার ভায়েরা নিপুণ ভাবে সমাধা করিয়া থাকেন। ছেলেমেয়েদের ভাষা ইজের দেয়াই, বাসিনের গল্প তৈরী, কোন কিছুতে তিপুর্কণ্ড করা, এই সব কাজগুলিতে তাঁহার ভায়েদের অংশ পারদর্শিতা। কি করিতে হইবে, শুধু সেইটী বসিয়া ও খুটীয়া দিলেই হইল, আর দেখিতে হইত না। বড়বুঠাকুরাণী এত সময়ে পূর্ণ পারদর্শিতা দিয়াবিস্তা দেন। ঈদকালে বিবাহিত্রায় ফলে তাঁহার পত্নীর পায়ে খাওয়া হয়। অন্ন, অর্জনা, ভোজ্য ভোজ্য এত, যা হাত পা

মাঝে মাঝে কথা—এই সময় তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যেগ। তবুও এই কু-অভ্যাস ছাড়িতে পারেন না। কিন্তু ঐ কু-অভ্যাস সত্বেও কেহ কিছু বলিলে তাহাও সহ্য করিতে পারেন না। শরীর তাঁহার যেমনই হোক, কোন কাৰ্য্য তাহা তিনি করেন।

বিকালে আবার কাজের তাড়াহুড়া। একদিক হইতে ছেলেরা, অপর দিক হইতে মেয়েরা ইহুদ হইতে আসিয়া পড়ে। তাহাদের ভলপ্যাবার নেওয়া এক বিবদ ব্যাপার। কেহ লুচি খায় ত দিমি খায় না, আর প্রমেল বাটী ফেলিয়া পালাইবারই চেষ্টা সতলের। রাম-সাবনের দুই করিয়া তবে তাহারাদিক এক বাগাইতে হয়। তাহাদের জল খাওয়া হইলে তাহারা বতব্ব না খেলিতে যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্রাম নাই। তাহারা ছেলেনেয়েদের গা দুধাইয়া ভাত-কাপড় বু ইকের বহলাইয়া, মাথার চিকিট লিখা দেন, তাহারা খেলিতে বা খেড়াইতে যায়।

সন্ধ্যার সময় বাবু এক একে আসিতে থাকেন। বড়-বাবুর মিত্রের সবচেয়ে গোড়াপন্থের বাল্য চাই, তৎসহ ছুটি বয়স-তৈরী সংলগ্ন। মেজবাবু ও মেজবাবু চা, কুচি, মিষ্টান্ন। বাইরা নন্দীনের বৈঠকখানার গিন্নি খেলিতে যান। ছোট-বাবু কোকো বাইরা ঘরে বসিয়া কাব্য পাঠ করেন। ছোট-বাবু সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছেন।

এই সময় তাহুরকে আবার রামা দুধাইতে হয়। এক প্রান্ত লুচি, এক প্রান্ত কুচি, এক প্রান্ত ভাত—আর সর্বজনীন ভাল-বাসার, বাবু ও তাহারক করিতে বসিয়া থাকেন। লালিয়া বাবু। আটটা না বাজিতে আবার হৈ হৈ! অনুক হেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে তুলিয়া আনিতে হইবে, অনুকর গা অঙ্গ অঙ্গ ঘরম হইয়াছে, কোনও কালে সে ঘনি ভাত খাইয়া না খেলে, লক্ষ্য রাখিতে হইবে, দুকীর সন্ধিকালি, তাহাকে এক কোঠা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতে হইবে, এই বিষয়ের তদারক শেষ করিতে করিতে হেলেনেয়েদের মাঠের মহাশয়রা চলিয়া যান, আর তাহারা বাবার-ঘরে আসিয়া খণ্ড এলায় বাধাইয়া দেয়। বড়বাবু আসিয়া তাহাদের খাইতে দেন।

বাবু, বড়পন পাটখা গেলে চাকর, ভি, ঠাকুরের পালা। পাভড়ীর সামনে বসিয়া তাহাকে ‘জল’ খাওয়াইয়া বড়বাবু বসন খাইতে বসেন, তখন অনেক গাতি হইয়া যায়। তখনও সব

ঘরে ঘরে একবার করিয়া সকলের বৌক-পবর লইয়া তাহাদের দ্রুত হয়।

বাকীর সেই বড়বো চাই অঙ্গর চলিয়া বাওবার বাড়িতে যে গানিকটা বিশৃঙ্খল। আসিয়া পড়ানি বাতানিক, তাহা বেশ বুঝা যায়, কিন্তু এই বাড়িতে এতগুলি বৃদ্ধ পাকিতেও এতখানি বিশৃঙ্খলা চাইতেছে কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, নানী হইয়া নারানিকা করিতে চয়। পর-নিম্না পাপ, অনেক বলেন, স্বাভাভি-নিম্না মহাপাপ। আনাকে মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইতেছে।

যেতব্বু বি-এ পাপ। মেথিতেও হুন্দরী, স্বভাবটুকু বড় মিষ্ট। নীর গুণের মেথ, কিন্তু সেমাক কাধাকে বলে তিনি তাহা জানেন না। আট নয় বৎসর এ বাড়িতে আসিয়া-ছেন, একটি কথা কথ্যে তাহা বুঝিতে কোনদিন তদন নাই; জোরের কথাও তাহা বুঝে নাই। শরীরটা শক্ত নয়, বরং বড় বেরি হালকা। তিনি চারটি ছেলেনেয়ে হইয়া তিনি ঘনি আরও অনেকটা চাইয়া গিয়াছেন। সকল কাজেই বৃদ্ধ উৎসাহ, কিন্তু শরীর দুর্বল বলিয়া কোন কাজই সুচলভাবে করিতে পারেন না; বৌদ্ধক’প করাও সহ্য হয় না। ছেলেরা তাহাকে মানে না, তিনিও তাহাদের খাটিয়া উঠিতে পারেন না। কেহ আধপোতা খাইয়া, কেহ ঠাকুরের সঙ্গে কণ্ডা করিয়া একবারেই না খাইয়া ইতুলে যায়। তাহা কালের মেথেরা বতব্ব আসিয়া থাকে, তাহাও কাজে বসিয়া বৃত্তিগা নেড়ায়, এক দিনটি কাছাকাছি হয় না, তাই পাভড়ী অচুতি হয়ে তাহা হাতের রামা খান না, তিনি আবার নিজেই রামা করিতেছেন।

সেই বৌ বি-এ পড়িতেছিলেন, এমন সময় তাহা হইবে। তাহা পদার মহাপাতী বড় তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া-ছেন। তিনি বড়লোকের বাড়ীর বেয়ে না হইলেও স্বরের কাঙ্ক্ষা শিখিতে পারেন নাই, কেবল কলেরের পড়াই করিতেন। শরীকায় তিনি বেশী নয়র পাইতেন, ভাল ঘেরে বসিয়া কলকে খুব নাম ছিল। সংসারের কাজে সেখানেও অচল, তবে মাঝবট খুব ভাল।

ছোটবাবুটি খেলেনাছয়। সেও মাটিক পাপ। বাপ-মায় বড় আসনের মেয়ে। বাপের বাড়িতে তাহাকে কোন কাজ করিতেই চাইত না, এমন পদাঙ্ক এখানেও কিছুই করিতে হয়

নাই। কাজেক্ষেত্র তাহাকে কেহই ডাকে না। কিন্তু সকাল-সন্ধ্যা তাগাব হুতী নাই, ছোটবাবু হতভম্ব বাড়ী থাকেন, ছোট যথুকে তিনি চোখের আড়াল করিতে চাহেন না। অঙ্গ ভায়েয়া তাই ভীষণ কোন কল্পনও করেন না। এবাড়ীম ভায়ে ভায়ে খুব সম্মতি। অজ্ঞানলোকের সময়ে এমন সম্মতি খুব কম বাড়ীতে দেখা যায়। আমাদের মেয়েলি একটি ওন্দান আছে। তাই তাই বেশ থাকে, পরের মেয়ে বরে আনিয়া হত ভয়াল ঘটায়। ওন্দানটি সত্যি অথবা পুঙ্খবহন বহন, তাহা আমি বলতে পারি না।

সে কথা থাক, এই সংসারের যৌথেনের মধ্যে যে সত্যাব দেখা যায়, তাহা উচ্চ প্রশংসার বিষয়।

কিন্তু বিপদ হইল, সংসার লইয়া। বড়বড় চলিয়া যাওয়ায় পরদিনই সকালে বিপদ কাট। ছেলেমেয়েরা চায়ে বসে আনিয়া দুধ পাইল ও খাবার পাইল না, খাবার না পাইয়া তাহারা গড়গোল পাঁকাইয়া তুলিল। মেজবু সামলাইতে না পারিয়া মেজবাবুকে খবর দিলেন। তখিত পাওয়া গেল যে, খাবার প্রস্তুত করা হয় নাই। ঠাকুরের উপরে ভায় ছিল, সে পারিয়া উঠে নাই। মেজবাবু বেতগায় মোড়ের মণিগাঠী নোকাই হইতে একটিন বিকৃত আনিয়া তখনকার মত গোগ দিটাইলেন। একটিন বিকৃত একটি সকালেই নিঃশেষিত হইল।

ঠাকুরের ভাতের সময় আরও বিস্ময়। ঠাকুর একা বাবুদের বণ, ছেলেদের বণ সামলাইতে পারে না। এতদিন ছেলেদের সময় ভায় বড়বুধ উপরে ছিল, মেজবু সে তার অংকটে লইতে পারিতেন, কিন্তু তাহার কোলের মেয়েটা ভীষণে কন্দ-হাই ছিঁড়িয়া খাদ বলিয়া পারিলেন না। মেজবু কোরের আঁচল ভড়াইয়া ভাতের মত বড় খাল লইয়া পরিবেশনে নামিলেন। অনভ্যাসের ফোঁটা, ছেলেরা এমন গড়গোল তুলিতে লাগিল যে, তিনি 'ছেড়ে যে মা কেঁদে বাঁচি' করিয়া লালাইলেন।

এদিকে ছেলেরা তাগাব নাচ নাচিতেছে। তাহাদেরই মধ্যে কে একজন উজ্জিত ডালের বাতী ঠাকুরের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়াছে। ঠাকুর কানিতে কানিতে স্তম্ভবনে চীৎকার করিতে করিতে প্রাঙ্ঘে বাহির হইয়া, তাহার জাতকন্ড গিয়াছে বলিয়া যশাব্দ খুঁড়িবার উপক্রম করিতেছে।

বৃদ্ধা শাওড়ী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। মালা কপ ফেলিয়া, কেটের কাপড় পরিয়া হেঁদেলে চুঁকিয়া

পড়িলেন। ছেলেদের ও বাবুদের খাওয়া-পাওয়া বেশ চটলে খান করিয়া বেলা একটায় সমস্ত নিকের ওস্ত একমুঠি চাউল লিঙ্গ করিলেন।

সেদিন বিকালেও বিপদ বাড়। ঠাকুর সেট যে সকালে কাগাকড়ি করিয়া সাতায়ন চইতে বাহির হইয়াছে, আর সে ঘরে ঢুকে নাই। ছেলে-মেয়েলি বিকালের জলখাবার হইয়া উঠে নাই, বোকানের খাবার দেখিয়া তাহারা তিক্তমিড়িং লাগাইতেছে। বড়বু কোন দিনই বোকানের খাবার এত বাড়ীতে চুকিতে দিতেন না।

সাতের কথা সবিস্তারে না বলিলেও চলিবে। তবে এত টুকু বলা বরকার যে, দিনের বেলায় চেয়ে অবস্থা বিশেষ ভাল নয়—বস্ত্র খাওয়া।

এইতপ ভাবেই চলিতেছে। ঠাকুরটির ভাতকন্ড ফিরিয়া আসিতে তথেষ্টদিন সময় লাগিল। সেট সময়ে একদিন একটি ঘুঘটনা ঘটিল। বেত ও সেত-বৌ দুইজনে বহনশালায় ভায় লইয়াছিলেন। মস্ত বড় হাঁড়ীতে ভাত হইয়াছে, একজনে হাঁড়ী নামাইতে না পারিয়া, দুইজনে প্রহরিক খরিয়া হাঁড়ী নামাইতেছিলেন, হাঁড়ীর কানা খরিয়া গিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, আর সেই ভস্ত ভাত ও কেন পড়িয়া সেতবুধ ভুটশানি পা পুড়িয়া-ছুঁড়িয়া একাকার। বেত-বৌয়ের পায়েও লাগিয়া-ছিল, তবে বেশী নয়—দুই একটা ফোঁফা উপর দিয়াই গিয়াছে।

সেদিন মাঝী-পুনিয়া ত্রিখ, শাওড়ী গঙ্গাগানে গিয়াছেন, হাংবা কি করিবেন, কি দিবেন কিছুই জানেন না। হুটীনে ভাঙার আনিতে। বাড়ীর কাছে যে ভাঙারখানা, তাহার ভাঙার 'কলে' বাহির হইয়া গিয়াছেন; কাছে আর ভাঙাব নাই। অনেক দূর চইতে টাক্সি করিয়া ভাঙার ডাকিয়া আনিতে প্রায় বেড় ঘটা সময় কাটিয়া গেল। ততলগে সেত-বৌ খরগায় হতজান হইয়া পড়িয়াছেন।

এই সকল গাফালায় মধ্যে ঠাকুরটি কি তাবিয়া মান ভাগ করিল কে জানে। ভাঙার, প্রথম প্রহুতি—হালাখা কাটিয়া সব বিকৃত হইলে দেখা গেল, ঠাকুর মৃত্যন হাঁড়ীতে ভাত ভড়াইয়া দিয়াছে।

বৃদ্ধা শাওড়ী গঙ্গাগানে চইতে ফিরিয়া সব শুনিয়া বোঝাকে পা ভড়াইয়া বলিয়া নিজ অঙ্গুষ্ঠের দিকার নিতে লাগিলেন। পোড়ারনখ বিদ্রো অফিসকে বস্ত্র বিস্তার বেন, অঙ্গুষ্ঠেরও তত লাগনা করেন। বড়ছেলের আঁকিল ঘনি বিদ্রো না ঘটত।

ঊর্ধ্বাঙ্গ লম্বী জাতি বড়-বৌকেও এখানকার সোনার সংসার খাড়িয়া ও সকলকে 'আজ্ঞাব্যব' কোলাহাতে হইত না। সে না থাকিলে ঊর্ধ্বাঙ্গ সংসারেবও এমন হাল হইত না। নিম্নাঙ্গ আফিস ও অঙ্গুরি ছাড়া আর কাহারও ত্রিভি শ্রেণে ছিলেন না, অথবা অঙ্গ কাহারও নিকা করিগেন না। আর ত্রিভি শ্রেণে কতিবেনই বা কেন? ঊর্ধ্বাঙ্গ বন্ধু বন্ধি ইচ্ছা করিয়া কাকে হাত না দিত, কিংবা কাকে জানা সংশয় বন্ধি না করিত, তাহা হইলে কথা হইতে পারিত। ঊর্ধ্বাঙ্গ বন্ধুর ইচ্ছা করিয়া তাহের ইচ্ছা কাকে নাট, ইচ্ছা করিয়া তাহার তাহাদের পা পোড়াইয়া পথা লগ নাট, ইচ্ছা কি আর ত্রিভি বৃত্তিতেছেন না?

সাংসারিক এই সকল বিভ্রাটকে আমরা প্রাপ্ত নিষিদ্ধ ও পক্ষিয়ার সময়ে বড় সচক করিয়া দেখিতেছি, সংসারে বাস্তবিক শব্দে এতগুলি তুচ্ছ ত নষ্ট, বৎ বিশেষ গুরুতর। সাংসারে যদি কোলাহালই থাকিবে গেল, যদি সেখানে অসাব্যস্থি বাগা বাধিল, অশান্তি ও কোলাহল স্থায়ী হইল, তাহা হইলে সংসার-চিত্র সুখকর হইল কি? সাংসারকে আশ্রম বলা হয়; অঙ্গ যে কতি আশ্রম আছে, সাংসার-আশ্রম তাহাদের কাহারো চেয়ে ছোট না হইবে। আশ্রম বসিতেই সকলের মনে একটি শান্তিপূর্ব্ব, একটি আনন্দময়, রোগশোকভয়শূন্য আশ্রমের স্মৃতি জাগে। কবি কালিদাসের অক্সিজান-পুরুষদ্বায় কবির আশ্রমের বর্ণনা অনেক পারিতোষি পড়িয়াছেন; বনবধো অঙ্গরিত থাকিলেও কবি কবির আশ্রমকে সাংসার-আশ্রমই বলা যায়। সাংসার-আশ্রমের তাহাই বহি আশ্রম বলিয়া বলা যায়, তাহা হইলে একটি সাংসারও আশ্রম সাংসার বলিয়া পণ্য হয় কি?

আমি তুল করিয়া আবার বড় বড় কথা বলিয়া দেখিতেছি। আবার বক্তব্যের পণ্ডার মধ্যেই আবার থাকা উচিত।

বেদের ভাষা আশ্রম আশ্রম জানি না, বৃত্তি না, এই পরিভাষা সত্যতঃ শ্রেণ্যের মতে, বেদের ভাষা বৃত্তিগণ কন্যতা এবেদের শ্রেণ্যের এমন নাই বলিয়াই বড় গুরুতর উত্তর হইতেছে। বেদের ভাষায় (আমি গুরুতরবেদে বুঝে গনিমি) ব্রাহ্মণ্যের সাধারণ নাম ব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম শব্দের অর্থ বৈদ্য। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মবৈদ্যিক বৈদ্য নয়, ব্রাহ্ম সাংসারের বৈদ্য। ব্রাহ্মকে বৈদ্য লাক করিবার কত কোন অক্সিজান উপায় অঙ্গ-লবণ করিতে হয় না। ব্রাহ্ম অঙ্গ বৈদ্য। শিশু যে দিন হইতে জান অঙ্গ করিতে শিক' করে, সেদিন হইতে তদীয়কে সে বৈদ্যহলেই দেখিতে পার। তাহাকে লালন-পালন-ভালন সবই করেন তদীয়। ব্রাহ্মের প্রাণতঃ বা বৈদ্যের সেই পৈশবকাল হইতেই তাহার মনে জাঁকিয়া বসে। কোন সময়ে

কোন অবস্থায় এই মনোভাবের বিদ্যুতি ঘটিলে সেও আহত হয়, ব্রাহ্ম আশ্রম ও খাটো হইয়া যায়।

কোন ছেলের বা কিছুর বক্তব্য করিতে পারেন, ইচ্ছা লইয়া কোন ছেলে মাথা ঘামায় না। কিন্তু তাহার মা তাহাকে কত ভালবাসেন, কত বড় করেন, কত আদর করিয়া থাকিতে কেন, অল্পবেগে সমস্ত কত দেখা করেন, তাহার নিয়মের কাছে বসিয়া কত বিনিমিত বাহি বাপন করেন, তাহা মনে করিয়া আনন্দ পার না, এমন ছেলে সাংসারে কতি আছে?

যে ব্রাহ্মীতির কথা আমি এতক্ষণ ব্রাহ্মা বলিতেছিলাম, তাহাদের ব্রাহ্মীতে ছোটখাট বিভ্রাট কত যে ঘটতেছে, তাহার সংখ্যাই নাই। সেতব্দু যে বিন পা পুড়ে, তার পরদিন তাহার ছেলেটি পাশের একটা মনু ব্রাহ্মীর কাগ-বাগা বাগের উপর হইতে পড়িয়া বাব পা ভাঙিয়া আসে। ব্রাহ্মীতে ব্রাহ্মা তখন কেহ নাই, ব্রাহ্মী অঙ্গ পাড়ায় সাধারণ তনিতে পিঠাছেন। সেদিন তাহাদের ব্রাহ্মীতে যে কাণ হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। বড়ব্দু দেখা পড়া বিশেষ জানিতেন না, কিন্তু সাংসার করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা এতদ প্রয়োজন, যে সাধারণ শিকা ও কর্তব্যপটুতা থাকা নিত্য আবশ্যক, তাহা না থাকিলে সাংসার অঙ্গার হইয়া পড়ে, তাহা বড়ব্দু ছিল বলিয়াই কোনকল্প বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে নাই। বি-এ, আই-এ পাশ যদি সাংসারের কাছে লাগিত, তাহা হইলে বড়ব্দু অজ্ঞাবে এই সাংসারখানিও এত কোলাহল উল্লিখিত হইত কি?

আমি বক্তব্য করি না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিতেছি, আমার অজ্ঞাতে আমার কলম হইতে হাক্ষর্যের স্রোতঃ মত কথাতলি একটি একটি করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। সেতব্দু আমি সকলের দিকট কথা চাহিতেছি।

আমি যে চিত্র লিখিতে বসিয়াছিলাম, তাহা দেখা হইয়াছে, এইখানে আমি শেষ করিব। তাহা করিবার পূর্ক্স মনসী বামী বিবেকানন্দের একটি বক্তব্যের একাংশ উদ্ধার করিব। সর্গদ্বায় প্রতিভার অসীমের দ্বায়ী বিবেকানন্দ ভাবতবর্গের দ্বায়ী বিদ্বদের বিচার করিয়াছিলেন। বেদের পূর্ব্ব ও ব্রাহ্মী-সংসার প্রভিও ঊর্ধ্বাঙ্গ প্রতিভার তীক্ষ্ণ আলোকসম্পাত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—যেবেদে বর্ণশিক্ষা দাত, পুণ্ডরিকবিজ্ঞান লব্ধে তাহের শিকা দাত, দেবা, ব্রহ্ম, ইতিবাধা, শ্রীত পালন সাংসারগণ, লজ্জানপালন প্রভৃতি বিদ্বদের তুল মণ্ড শিকা দাত। ব্রাহ্মীদের লক্ষন সর্গদ্বায় আশ্রম ব্রাহ্মীতির বৎ। ব্রাহ্মীর উচ্চ আশ্রম, ব্রাহ্মীর কর্তব্যগারগণ, ব্রাহ্মীর তাগিতঃ তাহের অঙ্গদ্বায়ী কণ।

যেবেদের কাহিনীলাপ কি হওয়া উচিত, ব্রাহ্মী বিবেকানন্দই তা বলিয়া দিচ্ছিলেন। আমরা, ব্রাহ্মা বিবেকানন্দের লেগা পড়ি নাই বা পড়ি নাট, তাহারা যেন তা পড়ি ও পড়েন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সুভূতর্জনা ইন্সর সমস্ত মন বিদ্যা উরিপ। যেহে, কোচে, রূপা, অবিদ্যে মন যেমন নিয়ক, বেহে তেমনই তিক্ত হইয়া পেল। ইহায়া পুন্স ? ইহায়াই পৌন্স বেগাইয়া নারীর চরম অধ করিতে চায়, নারীলভের অশা পৌন্স করে ? ছিঃ ছিঃ ! ইহায়া যদি পুন্স, তবে কাপুন্স কে ? তাহার এই আঠারো উনিশ বছরের জীবনভোর পুন্স ভাবিয়া সে কি কাপুন্সকেই কামনা করিয়াছে ? ঐ কাপুন্সের জন্তই সে সকলের নিরস্ত্রিত কারণ হইয়াছে, স্বরে গরে লাহনা সহিয়াছে ? এখনই কাপুন্স সে, মা'র যোগায়ে অবহেলে তাহাকে নিশেপ করিয়া পুন্স পলায়ন করিতে পারিল ? পুন্সের আকর্ষণ কি এতই দূরীকর যে, বাঙলা দেশের মেয়েরা এই সব পুন্সবন্দী কাপুন্সকে পূজা করে, ভালবাসে ? এত কাপুন্সমিগকে জীবনের সতীকপে না পাটলে তাহাদের জীবন গল্প ও অলে হইয়া পড়ে ?

ইন্সর পা দুটি কাপিতেছিল। তাহার ভর হইতেছিল, বৃষ্টি বা পড়িয়া বাটবে। বেহের সমস্ত শক্তি দিয়া মাটির উপরে পা দুটিকে খাড়া রাখিবার চেষ্টা করিতে করিতে তাহার দুচোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। বিষ্ণু চোখের মলম এ সময় নয়। আস, কাহার জন্ত চোখের জল ? সেই কাপুন্সের জন্ত চোখের জল কি অসংভব নয় ?

ইন্স একটি বার মাত্র থাকে আঁপিতে বেশিয়া আর সে দিকে মূখ ফিরাই নাট ; ফিরাইলে দেখিত, যা একা নহেন, তাহার সঙ্গে যেকোন, যুবক, যুবক একটি প্রাণপুন্সও আঁপিতে ছিলেন।

কাছে আসিয়া যা মেহনিকভাবে কহিলেন, এখানে একা সোজে পাড়িয়ে কেন ইন্স ? মাঝার যে রোগ লাগছে যা ! কশা কোথায় ?

—ক্যা। মাঝরোগালায় এসেছে—বদিতে বদিতে প্রাণপণ চেষ্টা মনেও তাহার কষ্ট অস্ত্র বাপে ভরিয়া গেল।

বৃষ্টি কয়েক বিষ্ণু বারি চোখের কোণেও আসিয়া পড়িয়াছিল, মা'র চোখে তাহা খোপন বহিল না। তিনি ব্যস্ত হইয়া বসিলেন, ছায়ায় আশ্রয় লইল, সোলে মূগচোপ হোর কলসে দাঙে যে। বসিয়া কস্তার বাহু ধরিয়া তাহাকে একটি বোকাসের ছায়ায় আনিয়া শাড়ি করাইলেন। নিজেই কটীয়েন হইতে ভদ্র বেগনী কলসখানি টানিয়া, কস্তার মূখটি তুলিয়া ধরিয়া দুহাইয়া দিলেন। ইন্স চক্ষু মুদ্রিয়ারি ছিল, বোধ হয় চক্ষু বদিয়া থাকিলে অস্ত্র উৎস কতকটা বাধা মানে।

বৃথ দুহাইয়া, বাহুবিশিষ্ট কৃষ্ণশূর্ণগুণি বখাবিস্তর করিয়া যা বদন আনতরুরে মূখখানি হইতে হাত সরাইয়া লইলেন, ইন্স চক্ষু মুদ্রিতেই বেশিল, হুট বেহে প্রাণপণের প্রবাহ লইয়া মমুখে বতাসবান প্রাণকুমার ! হুটর কলসাতেও সে প্রাণকুমারকে এ সময়ে এখানে আশা করে নাই ! তবে আশা যে করে নাই, করিতেও পারে না, সে কথাও মনে বহিল না। তাই মনে বিকৃত ভাবেরও উল্লস হইল না। একটি বার মাত্র বেখিয়ারি চক্ষু মাঝিয়া লইল। সেট এক মুষ্টিতেই বেশিল, প্রাণকুমারকে আজ বড় রান, বড় বিম্ব বেখাইয়েছে। অকের সে লাগণ্য নাট, চক্ষু সেট নীতি নাট, আনবের ঔচ্ছা নাট, নিশায়ের পাণ্ডুর ক্ষেত্র মত মলিন, পাণ্ড।

অভ্যাসমত বৃত্ত কর মস্তক স্পর্শ করিল। প্রাণকুমার রান হাতে অতি-মমতার করিয়া নীরবে শাড়িআ বহিলেন।

মা বসিলেন, প্রাণ মক্ষণেলে বন্দী হয়ে থাকেন, তাই তোকে লগে বেখা করিতে এসেছিলেন।

ইন্সর কান চক্ষু দুটি আশান। হইতেই প্রাণকুমারের পানে ফিরিল। প্রাণের নীরবে অর্থহীন দৃষ্টি দিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া দিলেন মাত্র।

মা ছিছায়া করা ভাল দেখায় না বদিয়া ইন্স ছিছায়া করিল, কোথায় বন্দী হলেন ?

প্রাণকুমার বসিলেন, অনেক দূর, মুখিয়া।

ইন্স আবার ছিছায়া করিল, কবে যেতে হবে ?

—কালট দাও ।

না এনিকে এনিকে ঘাটতে চাটতে বলিলেন, দিও! যেহেতু গেল কোন দিকে বল ত?—এই অনাবরণ প্রস্তুত করিয়া, যা যেদিকে মাগরশোখা ঘূর্ণিতছিল, সেদিকে চলিলেন । কয়েক পা গিয়া, এদিকে কিরিয়া বলিলেন, তোমার এইখানেই থাকিস, আমি আসছি রুখাকে নিচে ।

পারের কাছে দাঁড় নাই, তাই প্রবলভাৱে নাই । চাচা-চোনো, জীর্জন হৃৎকণ্ডের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ইন্দু পাড়াটয়া রহিল । প্রবলভাৱেও সহসা কোন কথা বলিলেন না । ইন্দুর মা এখন সম্পূর্ণ ভাবে অন্ধ হইয়া গেলেন, প্রবলভাৱে গাড় দবো ডাকিলেন, ইন্দু ।

মুখ তুলিয়া চাটতে ইচ্ছা হইলেও ইন্দু তাহা পারিল না, সড়ক-সিঁথার টাক্স সহযোগে কণ্ঠ শব্দ বুলিল না ।

প্রবলভাৱে পুনঃ ডাকিলেন, ইন্দু ।

ইন্দু পূর্বেই নিশ্চয়, নিশ্চয় গার ।

প্রবলভাৱে বলিলেন, তোমার কাছে আমি আচ্ছা ফলা চাইতে এসেছি ইন্দু!—কণ্ঠশব্দ গাঢ়, অস্বস্তি অস্বস্তি ভাষা ।

ইন্দুর মনট নড়িয়া উঠিল ।

প্রবল বলিতে লাগিলেন, অনেক অপরাধ করেছি ইন্দু, তুমি আমায় ক্ষমা কর । কতকালে চলে যাকি, কলকাতার আস-কিরব না, বাবার সময় তোমার ক্ষমা পেলে আমি হাফা মনে যেতে পারি ।

ইন্দু বলিল—কলকাতায় কিরবেন না কেন ?

প্রবল বলিলেন, যে তাকে চলে যাকি, সেট বড়ই কিরব না । সে অনেক কথা, বাক । তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, তুমি আমায় ক্ষমা করবে বল ?

—আমার কাছে ক্ষমাই বা চাইতে হলে কেন ?

—তুমি যদি বল কোন অপরাধ চর নি, তা হলে ক্ষমা চাইব না ।

—অপরাধ আমার কি !

প্রবলের কণ্ঠশব্দ প্রবল হইল । ইন্দু যদি যেদিকে, তাহা হইলে যেদিকে পাইত, এট যুদ্ধের সীমান বসবাসমিতও প্রবলভাৱে কিরিয়া আসিয়াছে । বলিলেন, তোমাকে ধন্যবাদ ইন্দু ! এক যুদ্ধের পাখি পুনরাবৃত্তি করিলেন, অনেক চেষ্টা

করে আমি বন্দী হতে পেরেছি । পরন্তু বন্দীর অর্জন হইলে, সেট থেকে কেনবই ভাবছি, তোমার কাছে ক্ষমা না চাই আমি কিছুতেই যেতে পারব না । আমি কেতে পারব না, তবু ছাটনি কেনবই হইবেছি তোমার কাছে আসব কি আসব না । যদি তুমি বিরক্ত হও, যদি তোমার ভাল না লাগে, খাবার নাগে, এই হেবেই ছাটনি কেটে গেছে । আজ সকালে আর থাকতে পারলুম না । তাৎপন্য, আর ত কখনই দেখা হইবে না, শেখবাবের মত দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যাই । এলে তখনমুখ, তোমার স্বদেশী একজিবিমানে এলো । তোমার মাকে বন্দীর কথা বলেই চলে গেতে পারলুম না । ঠেকে বললুম, চলুন না, একজিবিমানে ইন্দু সহজে দেখাটা করে আসি । এলে তোমার বিরক্ত করলুম না ত ? যদিই বিরক্ত হয়ে থাক, জীবনে আর কোন দিন দেখা হইবে না, কখন বিরক্ত করতে আসব না, এই হেবে আমার এ অপরাধও আজ হলে যাও, ইন্দু ।

নারীর চোখ, সহজেই তাহাতে জল আসিয়া পড়ে । কেন, কে জানে ! অস্বস্তিক মুখ কিয়াটয়া ইন্দু অঙ্গ গোপন করিতে চেষ্টা করিল ।

কতকগুলি অতিমাত্রায় কোঁকরানো লোক লক্ষিত দৃষ্টিতে তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে দৃষ্টিয়া প্রবল বলিলেন, ঐ ছাত্রগণ বিকিটায় বলবে ?

ইন্দু নিশ্চয়ের মত বলিল, চলুন ।

অনুভব কোঁকরানের অধিকারিণীগণ কোঁকরানের অনশন তথাপি চইল না । অনেকে চলিয়া গেল, অনেকে হাটতে হাটতেও বেহিতে লাগিল, অনেকে দেখন ছিল, তখনই রহিল, অনেকে গোপনে আলোচনাও করিতে লাগিল । তবে ইহার আর তাগদের বেহিতে পাইল না ।

প্রবল বলিলেন, আর একট অস্বস্তি করব, রাখবে ? অবশ্য ক্ষমা পেরেছি বলেই কথাটা বলতে পারছি ।

ইন্দু মুখখানি আর একটু তুলিয়া চাটিল ।

প্রবল বলিলেন, আমাদের কোর্ট থেকে আজ আমাকে একটা কোয়ার্টারেল পাঠ দিচ্ছে । বাবে যেহেতু ?

ইন্দু বলিল, আমি ! কেন ?

প্রবলভাৱে ঐহং আবেগের সহিত বলিলেন, কেন-ত উত্তর দেওয়া শক । তবে তুমি গৌণ আমার পূর্ব ভাল লাগবে ।

টঙ্ক চূপ করিয়া বসিল।

প্রণবকুমার ভিঃমণ্ডলের কহিলেন, বাবে ?

টঙ্ক তথাপি নীরব।

প্রণবকুমার বদিলেন, তুমি আমার টঙ্কে নেই : তবে থাক।

ঐহার কর্তৃত্বের ভাষা ও ভাষণে স্নানিত হটল।

—আর কে বাবে ?

—আমাদের বাড়ীর ঘরেরা এবং ত বাবের, আরও অনেক বাবের।

—নাকে বলছেন ?

—না। তোমার মত তেমন তবে তাঁকে বলব।

—বলবেন।

প্রণবকুমার প্রথম মুখে কহিলেন, পাচটার পাট। বল ত আমি এলে তোমাদের নিয়ে যাব।

মা কণাকে লইয়া কহিয়া আসিলেন। টঙ্ককে বদিলেন, একতিবিন্দু দেখবি না কি সে ?

—না, বড় রোদ।

—তবে চল বাড়ী গাও।

প্রণব বদিলেন, আর বিকেল পাচটার আমাদের কোট থেকে আমাকে কোয়ার্ডবেল পাট দিচ্ছে, আমি ঘন করছি টঙ্কের নিয়ে যাব।

মা টঙ্ককে মূগের পানে চাহিয়া, বিস্ত্রোহের ভাব না দেখিয়া প্রশংসা ঘন করিলেন, তা বেশ ত !

পেটের বাহিরে গাড়ী ছিল। প্রণবকুমার বদিলেন, আমি লাঞ্চে চারটেই আসব, টঙ্ক। তোমরা তৈরী থেক।

টঙ্ক খাড়া বাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বাড়ীতে আসিয়া মা সর্দাঙ্গ্রে নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। কণার পরে, টঙ্ক বাড়ী হইতে নামিতে উদ্ভত হটলে, ড্রাইয়ার নিঃশেষে হাত বাড়াইয়া তাঁতকরা একটি কাগজ তাহার হাতে দিল।

তাঁত পুড়িত যে হাতের লেখা সেখা গেল, তাহাতে টঙ্ক মন আবার বিরক্তিতে করিয়া উঠিল। তথাপি পড়িতে হইল। লেখা ছিল :—

হাটার ধারীর অধিকার নাই, সে চোরের অধার। আমি চলিলাম।

চিত্তিপানা শতছিন্ন করিয়া ফেলিয়া তিলেট বদি সমস্ত যাপাব শেষ হইত, তাহা হটলে টঙ্ক কোন ভংগেট ছিল না।

কিছু তা হয় কই ? শ্রাবসিন সেই অক্ষর করিয়া সন্নিকটের মত তাহার মনের মধ্যে গ্রামাভি দিঃ বেড়াইতে লাগিল। থানে ইচ্ছা ছিল না, শরীর খাপ খাপ বদিয়া কাটাওয়া দিল : আজকের প্রতীতি হটল না, কখন নাই বদিয়া এড়াইয়া গেল। সে সময়ে পরের টঙ্ক-মোড়ার খুব উপদ্রব চলিতেছিল, সাবানের বিন্যাস নাই দাবিয়া মা'ও খাটবার কষ্ট বিশেষ পড়াপাড়ি করিলেন না। ভোর করিয়া শুধু এক বাটী গরম চূপ খাওয়াইয়া দিলেন।

পড়িতে তিনটা বাজিতেই মা মেয়েদের শোবার ঘরে আসিয়া চুকিলেন। কণা ছদিস বদি দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, পাচা-খোলা বহিঃস্থি শব্দ্যার উপরে ইতস্ততঃ বিক্শিপ্ত : টঙ্ক যেটা একখানা চানর গারে দিয়া চূপ করিয়া শুইয়া ছিল, পরশবে চকু মেদিয়া নাকে দেখিয়া আবার চকু নুদ্রিত করিল। মা আসিয়া তাহার কাছে বদিলেন। চানরখানি সরাইয়া মেয়ের কপালে, বুকে, কপলের নীচে হাত দিয়া উদ্ভাণ পরীক্ষা করিয়া বদিলেন, এখন শরীরটা কেমন বোধ হচ্ছে বে ?

—ভালট।

—কিছু খাবি ?

—এখন আবার কি খাব ?

মা হাসিয়া বদিলেন, কি-খাব কেন ? শ্রাবসিন ত কিছু খেনি বে। ঠাকুর দিক না খাবার-টাবার কিছু করে। খান-কতক 'টোষ্ট' করে নিতে বলব, খাবি।

টঙ্ক বলিল, না।

সে ঘরে গড়ি ছিল না। মা তাহিতেছিলেন, হঠাৎ লাঞ্চে তিনটা বাজিয়া গেল। প্রণব হঠাৎ এখনি আসিয়া পড়িবে। কিছু-এই কথাটা ঘেয়েক শব্দেতে বতটুই সাবানের দরকার, সেটুইও তাহার ছিল না। থাকিবেই বা কিরূপে ? প্রণবের উপর ঘেরের মনের ভাব জানিতে ত আর তাহার বাকী নাই। অথচ বেলা যে অবসানপ্রায়, সেটিও জানাইয়া সেও দরকার। তাই নিশ্চিত কণার শানে চাহিয়া বদিলেন, কণাটা কত বুচ্ছে ! চারটে বাজে, এখনও ওঁরবার নাম নেই।—বদিয়া তিনি কণাকে ডাকিতে লাগিলেন।

ঐহার উদ্বেগ দিঃ হটল। টঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল, কত বাজল মা ?

—সেই। পাড়ে তিনটে চাপ খসে গেল।

পাশের ঘরে থাকা খড়ি দেখে মা বলিলেন, তিনটে বেগামিল।

—তা হলে দেখি আছে, নিজের মনেই কথা কবুট বলি।
ইন্সু আবার চাপ খড়ি দিল।

মা পাশের ঘরে কাগ পাতিয়া বসিলেন। ইন্সু উঠিল না, তাহা বলিলেন; কিন্তু কোন কথাও বলিলেন না। কিছুক্ষণ পরে চাপে করিয়া চারটা বাজিল। মা বলিয়া উঠিলেন, কণা উঠল রে?

—ওঠে নি মা। পাড়াও আমি তুলে দিচ্ছি।

ইন্সু নিজের খাট হুটেতে নামিয়া, কণাল খাটে গিয়া দক্ষাধিক করিয়া কণাকে তুলিয়া গিয়া বাতর বাহির হইয়া গেল। মান-কম্বল দ্বার খোলা ও বন্ধের শব্দ শুনিয়া মা কতকটা আশাবিহীন হইলেন।

নিম্নাঙ্কে কণা দ্বার কাছে থাকা বলিলে, মা ভিজ্জালা কনিলেন, তুটুও বাজিল নাকি দিদির সঙ্গে?

—কৈ, দিদি ত কিছু বলে নি!

মা হাসিয়া বলিলেন, প্রণব ত তোকের বেতে বলেছে।

কণা সুখখানা গোমড়া করিয়া বলিল, আবার নাম খসে ছবিজি বলে নি, তবে 'ইন্সুনের' 'তোমরা' এই সব 'স্বয়ং' নাথায়' দিয়ে কথা বলেছে। প্রকম বলার আমি ঘাই না।

মা হাসিলেন, বলিলেন, তুটু না গেলে ভাল ত প্রণবের সোখ থাকবে না।

কণা হাসিয়া বলিল, আবারই বেন হুং থাকবে বড়।

—না থাকে না থাকবে, যা হুং খেলে আর।

কণা নিঃশব্দে নীচে চলিয়া গেল।

ইন্সু ঘরে ফিরিয়াছে বুঝিয়া মা বলিলেন, কণা বলে না কি রে?

ইন্সু কাগড় বদলাইতেছিল, বলিল, চলুক না।

মা নিশ্চিত মনে অতিরিক্ত নিঃশব্দ কেসিয়া কহিলেন, ও বলেছে প্রণব ভর নাম খসে ভাল করে বলে নি, ও খাবে না।

ইন্সু হাসিয়া বলিল, তাই না কি?

মা বলিলেন, ঐ ত পাড়ারদুই নিজে এসেছে, ভিজ্জেল কর না।

ইন্সু ঢাকিল, কু নিদি, একবারটা শোন ত লক্ষ্মী-বিদী-দ্বি আবার।

—আবার তে খসে গেল না? বলিয়া ইন্সুর ঘরে আসিয়া কণা কলকল করে পাশে হাঁট সিঁচা বাড়াইল; তার পর বলিল, ওমা! 'আপনার' বে সাক্ষ্যোক্ত হয়ে গেছে সেখানি।

ইন্সু প্রজ্ঞা দমন করিয়া বলিল, তুটু বাবি নে?

—তুমি বলেছ আবার?

—যা পাউ, তিনি ত বলেছেন।

—আজ্ঞে না, থাকে তার বলবার, তাকে তিনি ঠিক বলেছেন। দেখলে বহুজন বাববার করেছেন দ্বার।—
বেবের কথাগুলো সে নিরুত্তরে কহিল।

ইন্সু বলিল, তার ত তত্পর নয় যে গলায় চাপ দিয়ে জোড় হাত করে সবাইকে নাম খসে-খসে বলবেন? নে, কাগড় পরে নে, চল।

কণা বলিল, উহঁ। তুমি কিন্তু আমা মা সোজেক, একে-
নাথে 'কিনিং'।

এই সময়ে নীচে, বাগানে বোটরগাড়ীর হৃদয়ীয় স্বনি উপিত হইল। কণা পড়খড়ির ঠোক দিয়া বেগিয়া লইয়া বলিল, এসেছেন, হাকিম সাহেব এসেছেন।

—তুই বাবি না ত?

—না, না, না। 'বাটু আই উইন্সু ইউ সাকসেস্'।

—তা হলে আমি যাব না, বা!

—যাব মা বললেই হ'ল আর কি! ঐ যেন—

চোটা করিয়া মনকে বতখানি শাড়, সংবত ও শুদ্ধ রাখিতে পায়া দায়, ইন্সু তাহাই পারিয়াছিল। তাহা না পারিলে, আবার সেই মোটরে, সেই শোকের পার্শ্বে বসিয়া কখনই সে ঘাইতে পারিত না। গাড়ের দ্বারের মধ্য দিয়া ঘাইতে ঘাইতে পুরাতন কথাগুলো যে মনে তাগিয়া উঠিতেছিল না তাহা নহে; শোটা করিয়াই সে ভাবগুলিকে দূর করিতে হইতেছিল।

প্রণবও আজ বিশেষরূপ শান্ত। পথে কথাবার্তা হইল না বলিলেও হয়। প্রণব এক মনে পাড়া চালাইতেছে, আর পার্যোপবিষ্টা নারী নিজের মনকে কেবলই বাঁচিতেছে।

বিরাট দামিয়ারান তলে বিরাট দত্ত। প্রথম বিলাস-দ্ব্যন্ত দ্বিত হইল। তারপর দুটি স্বপ্নর বেয়ে দুই গাছি পুষ্পালাস আসিয়া প্রণবের গলায় ঢলাইয়া দিল। আবার একটু দ্ব্যন্ত, তারপর দ্ব্যন্তের দ্ব্যন্ত ও অভিনবন পাঠ।

একটি স্তম্ভ, স্তম্ভচিহ্নিত সৌপাখ্যে বসিত অভিনন্দন-পত্রখানি সভাপতি প্রদক্ষিণার পরে হাতে দিলেন; প্রায় প্লেথানিকে মাথায় স্পর্শ করাটা টেবিলের উপর রাখিলেন।

এইবার তাঁহাকে চমক দিতে হইল। বলিতে বলিতে প্রায়ের কণ্ঠ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল; এক সময়ে মনে হইল তাঁহার চোখে যেন জল আসিয়া পড়িতেছে; পা ছুটি কাঁপিতেছে;—হঠাৎ একসময় “আপনারা অবাক ক’রা ক’রন” করুনকণ্ঠে এই কথা কণ্ঠে বসিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। বিপুল করতলবিশিষ্ট সভাস্থল ঘুরিত হইয়া উঠিল।

বক্তার পর বক্তা উঠিয়া, প্রায়ের সমাপনভার, আশ্রিত-বাৎসল্যের, সজ্জিততার, নহাঙ্গনবস্তার কথা বিমোহিত করিয়া তাঁহার বন্দীতে আত্মিক গুণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন বৃদ্ধ—উকীল অথবা বোকার, মাথায় সেকেন্দ্রে সামলা, গলায় পাকান চাবর—বক্তৃত্তা করিতে উঠিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রদক্ষিণার পরে তরুণ হইলেও তিনি সে কর্তৃত্বাধী ও কর্তৃত্ববোধের পিতা-মাতা বরুণ ছিলেন এবং তিনি চলিয়া গেলে তাহারই যে একটা অমাণ হইবে, অভিনব ভাবাবেগের সহিত কথাগুলো বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ভ্রত বক্তৃতি স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সভায়ে চা ও নানাবিধ মিষ্টান্ন বিতরিত হইল। ইন্দ্ৰ মেয়েদের মারিতে এক পাশে চূপ করিয়া বসিয়া ছিল, প্রায়-হুমার তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন, কিছু খাবে ইন্দ্ৰ?

ইন্দ্ৰ তরু হইয়া ছিল। যে পোকটির উচ্চ গুণ্যবাসেন প্রশংসা করিয়া বক্তার পর বক্তা পুষ্পাঞ্জলি দিতেছিল, সেই পোককে একবারে তাহারই সম্মুখে দেখিয়া সে নহা গৌরব-বোধে সমস্তই পাড়াইয়া উঠিল।

প্রদক্ষিণার স্তম্ভচিহ্নে পুনরুৎপ্রাণ করিলেন, কিছু খাবে ত?

ইন্দ্ৰ না বলিতে পারিল না; হাঁ বলিতেও পারিল না। ভিতরটা তাহার তরুণা গিয়াছিল, চূপ করিয়া পাড়াইয়া রহিল। ইহাকে তাহার সম্মতি মনে করিয়া প্রায় বসিলেন, এস আবার সঙ্গে। আবার ঐ টেবিলটার বসি।

ইন্দ্ৰ জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

প্রায় বলিলেন, কিছু খেতে চলে নে!

চারিদিকে অগণিত পুরুষ আর স্ত্রীকে প্রদর্শিত

অগণিত তাহারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাহারই নাকে বসিয়া পাইতে চাইবে শুনিয়া ইন্দ্ৰ পিছাইয়া গেল; বলিল, না, না, আমি কিছু খাব না।

—একটু চা?

—এখানে না।

প্রায় তাহার মনের ভাব বৃত্তিতে পারিয়া বসিলেন, আজ্ঞা চল, আমরা অত কোথাও বসে চা খেতে নেব। এস ভূমি।

প্রায় সভাপতি ও অত বৃহৎ চারিদিক গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট বিস্ময় লইয়া বাহিরের দিকে চলিলেন, ইন্দ্ৰ তাঁহাকে অহরণ করিয়া চলিল।

গাড়ীতে ভিতরটা অভিনন্দন-পত্রাধারে, পুষ্পমালা, পুষ্প-স্তবকে ভরিয়া গিয়াছিল। তাহারই ঘরা হইতে শুভি কতক স্তবক লইয়া নিকটে বসারমান ছেলেরেরগুলির মধ্যে বস্টন করিয়া বিগা, প্রায় ইন্দ্ৰকে গাড়ীতে উঠাইয়া, নিজে উঠিয়া বসিলেন। তখনও স্তম্ভবাসের ও গজনের অবশান হয় নাই। নারায়ণ নমস্কার করিয়া কোনমতে একাইয়া, গাড়ী চালাইয়া নেওয়া হইল। গাড়ীতে আবার চূপচাপ।

গাড়ীর ভিতরে, নদীর তলে তানবান একটা ভেটের উপর—কাব কুন্ড হোটেলের বাসান্ধার বসিয়া উভয়ে চা পান করিল। তখন সভা হইয়া গিয়াছে। পরায়ের কলগুলিতে লক্ষ লক্ষ অগ্নি। উঠিতেছে, গাড়ীর বৃক্ অগ্নোজ্বিত জীবাগ্নি ছুটাইয়া উঠিতেছে, নদীর তলেও মাঝে মাঝে নদীর মাঝে জ্বলিয়া উঠিতেছে,—অগ্নিতেছে, নিবিতেছে। দৃষ্ট মনোরম। ইন্দ্ৰ একাগ্রদৃষ্টিতে নদীর তরঙ্গাবিত কাল তলের পানে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

প্রায় সমস্তোচ্চ করিলেন, তোমার খাওয়া লাগে নি ত ইন্দ্ৰ?

—কি?

—আজকের সভা—

ইন্দ্ৰ উজ্জ্বলভাবে বলিল, না, না, আমার খুব ভাল লাগেছে।

সভা সভাই তাহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। অভিনন্দন-সভাদিতে অতিশয়জ্ঞের যে প্রদান বস্তা বহিরা যায়, ইহা ত সে মানে না। অভিনন্দন ও পোকসভাগুলিতে নীর তাহা যে কয়েকটি উজ্জ্বলিত প্রশংসা করিতে হয়, ইহা সে কখনো

জানিবে? তারার কেবলই মনে হইতেছিল, প্রেরণাব্যবস্থা
মত উচ্চমনস্ক, মহৎ লোকের সম্বন্ধে কি ত্রাণ ধারণাই না
সে এককালে হরিষ্য প্রাণে পরিণত হইবে?

প্রেরণাব্যবস্থা উচ্চাঙ্গভাবে বলিলেন, তোমার ভাল দেখেছে
তুমি আমার যে কত আনন্দ হ'ল তোমাকে তা আমি
বুঝতে পারব না।—পর মুহূর্ত্তই নিভেছে সংবত করিগা
বলিলেন, চল, তোমার বাড়ী রেখে আসি।

পথে আবার সেট মৌরবতঃ। এগার মৌরবতা ইশ্বর
ভাল লাগিতেছিল না। সে প্রবাহের প্রত্যক্ষা করিতেছিল,
প্রাণের কোনও প্রেরণ আরম্ভ করিলে ইশ্বর সানন্দে তাহাতে
যোগ দিত।

কিন্তু প্রাণের কোন প্রেরণই ভুলিলেন না। এগার ঘণ্টার
দ্রুতও শেষ হইল, গড়ের ঘাটের আগো-আধারের পথ পরিখা
গাড়ী অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিল, কত গাড়ীর ভিতরে
কত আলো, কত হাতকর মনুষ্য সুখ, কত আনন্দময়ীত বন্ধ
অভিজ্ঞান করিগা তাহাও গাড়ী চলিল, কিন্তু সে কি নিশ্চয়
করাই রতনিতা,—নিরবচ্ছিন্ন মৌরবতঃ অবলান হইল না।
প্রাণের কথ: আমার বলিতে পারিব না, কিন্তু বন্ধ-বশিত-করা
কত নিঃশ্বাস ইশ্বর যে সময়ে ধমন করিগাছে, তাহা সে-ই
জানিবে!

গাড়ীর বাহিরে গাড়ী থামাইয়া প্রাণের বলিলেন, তুমি কথা
করছে কেনও একটা কথা না! ব'লে পারছি না ইশ্বর।
তোমার কখন কখন বিরক্ত না করেছি তা নয়; কিন্তু কেন
বিরক্ত করেছি, তা বলি জানতে!—কথাটা তিনি শেষ
করিলেন না। বায় হইতে গাড়ীর দ্বার খুলিত খুলিতে
বলিলেন, একটু অগ্রসর করব? রাখবে?

'না' বলিবার সাধ্য ছিল না; ইশ্বর বলিল, বসুন।

—আমার পত পোষ ক্রীড়া আছে আমি জানি; তবু এখন
কথা করছি বলছে, এখন আমি এসে পৌঁছব না, আসব না,
তখনও মনের একটু কোণে একটু স্থান দেবে কি?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ইশ্বর বলিল, আমি
এখানেই নামব না কি? আপনি ভিতরে আসবেন না?

—আজ আসব না। বাইরে একটা চিনার আছে, চটা
বাড়ি!

—হাল একবার আসবেন?

—আসব?

ইশ্বর হাসিয়া বলিল, বা রে! বাবার আগে একবার
আসবেন না?

প্রাণের উত্তরিত হইয়া কহিলেন, বেশ, আসব।

মুড়িহিংস্র পরিচয়

অনেক রাতে বাড়ী করিগা হেরম্বনাথ নিজের উপক্রম
করিতেছিলেন, গৃহিণী আসিয়া আনো আনিলেন; মশারির
পার্শ্বে ঝাড়াইয়া বলিলেন, মশারির ভিতর মশা ঢুকেছে না কি
গো? কাল কাল ওজলা কি বদ ত?

হেরম্বনাথ চক্ৰবর্ত্তীকরণ করিলেন না; মনে মনে হাসিয়া
কহিলেন, মশাই হবে বোধ হয়। দেখ না!

গৃহিণী ঘাটের উপর উঠিয়া বসিয়া হেরম্বনাথকে একটি
খাড়া দিয়া বলিলেন, চোখ চেয়ে দেখ-ই না গো। বোধহয়-এ
দরকার কি!

হেরম্বনাথ চক্ৰ বেলিলেন, চোখে চোখ মিলিল, উভয়ের
মুখেই হাসি দেখা দিল। হাসির কোন অব ছিল কি ছিল না
তাহা কে বলিতে পারে? বুড়া-বুড়ীরা এমন অনবর্ক হাসে
কি?—কে জানে হাসে কি না! আমি বুড়া নহি, বুড়া-বুড়ীর
মনের কথা কিরূপে জানিব? হেরম্বনাথ হাতবুজে কহিলেন,
শরমে পশ্চাদাটো কি তবে এখানেই হবে?

—আহা! রম বেগে আর বাড়িলে!—বলিয়া গৃহিণী
ছোট-খাট আর একটি খাড়া নিলেন। তারপর কষ্টকে
খানিকটা সরাইয়া দিয়া পাশটিকে শরম করিলেন।

হেরম্বনাথ বলিলেন, তা বেশ। এখন মশা করে আসোটা
দিয়ে নিলে একটু শ্রমের বাড়ি। মশেঁহটা আস বা
হারানু হেরেছে, তিনিমনি তার পারের বাধা দরবে না। তার
বাড়ী দেখেছে,টার বারই মাং।

গৃহিণী বলিলেন, বলি, মাথটা করলে কে?

হেরম্বনাথ বিস্ময়িত নৈবে চাহিয়া কহিলেন, কেন, আমি!

—তুমি পূব বীর!—বলিয়া হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিয়া
আনো নিরাইয়া দিয়া গৃহিণী বলিলেন, শোন, পূব পূবে হলো
হবে, এখন বিশেষ কথা আছে।

—এট রাতে! এতরাষ্ট্র প্রাণ—

গৃহিণী তাড়াহাতি কর্তব্য সুখের উপর হাত চাপা দিয়া বলিলেন, থাক্ থাক্, পুত্র আসন্ন হইতেছে।

হেরঘনাথ গৃহিণীর হাত সরাইয়া দিয়া বলিলেন, কেন লাব্, তোমার আমি আসন্ন করি নে? শুনবে তবে, প্রিয়ে, প্রিয়তমা, প্রাণেশ্বরী—বলিতে বলিতে হেরঘনাথ সত্যই একটু হার-বে-লোকালো-আচরিত আনন্দ করিলেন। বহন বহুই কেন হোক না, লাব্ তাহাতে অসম্মত হইলেন, একথা যদি কেহ মনে করেন, তবে ভুল হইবে। কক্ষে আলোক থাকিলে একটুখানি লজ্জা হইত অশ্রুচব্ব করিতেন।

—শোন, ভগবান বোধ হয় এতদিনে সুখ ভুলে চেষ্টাছেন। একটু আনন্দ করিয়া কর্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে তাহারা কর্তব্য নিম্নোক্তরূপ তপস্তার মন দিতেছিলেন, বলিলেন, ভগবান মঙ্গলময়, চিত্রদিনই সুখ ভুলে চেষ্টা আছেন।

—না গো না, তা বলি নি।

—ও, তা নয়!—হেরঘনাথ পান কিরিবার উপক্রম করিতেছিলেন, গৃহিণী বাধা দিয়া পুত্র চুপে-চুপে, বিশেষ গোপনীর কথার ভঙ্গিতে বলিলেন, এখন প্রণয়কে ইচ্ছা ভাল দেখেছে।

হেরঘনাথ লজ্জিত, নীরব।

—প্রণয় আর ওকে পাতিতে নিয়োগেছল। এসে পয়স্ব ইন্দুর সুখে প্রণয়ের প্রণয় ছাড়া অস্ত্র কখাই নেই।

মহেশ্বকে মাংস করিবার যে আনন্দে হেরঘনাথ মগ্ন ছিলেন, মুহূর্ত্তব্যথা তাহার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিল।

গৃহিণী বলিলেন, ইন্দু কাল হুপুরে প্রণয়কে খেতে বলেছে। ওকি তুমি বুঝে নাকি?—বেশ পোক ত তুমি!

সুখ! হায় রে, ত্রিগীষ্মনা ছাড়িয়া ঘুম কোণার পলায়ন করিয়াছে তার টুকানাই মাই। কিন্তু সে কথা বলিলেন না, চুপ করিয়াই রহিলেন।

—আন ত! আগে আগে প্রণয়ের নামে ও অঙ্গে উঠত, হঠাৎ গেতে তাকে পেখতে পারত না। আচ্ছ হঠাৎ তাকেই খাওয়াবার কথা মনে হ'ল, বলি, বুঝে?

হেরঘনাথ কবুল করিয়া বলিলেন, না।

গৃহিণী গুরুত্ব করিয়া উঠিয়া বসিয়া, নিলেন 'আলো আদ্যা'। অধঃপন্ন বলিলেন, কি বুঝে না, তাই বল।

হেরঘনাথ তর্কে প্রবৃত্ত না হইয়াই বলিলেন, কাল বল।

—কাল কেন, এখনই বল।

হেরঘনাথ বুঝিলে গড়িয়া গেলেন। এমন জানিলে 'বুঝি-না' না-বলিয়া 'বুঝি' বলিলেই হইত তাহারা তাহার মনে অহু-শোভনা উপস্থিত হইল। পুত্রের প্রণয়বস্ত্র বাধা পাইলে পুত্র চট্রিয়া দাব, পুত্র না হইলে তাহার শরীর পাবাপ, যেভাবে পারাপ হয়। কিন্তু সে পোক অশ্রুভীর রাতে মুক্তোদয় শব্দা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া মুক্ত হইবে বুঝে আশ্বাস করিয়াছে, তাহাকে নিবৃত্ত করাত সঙ্গ মগ্ন তাহারা তাহার জন্মভার অধিগ্রহণ না।

গৃহিণী বলিলেন, কি চুপ ক'রে রইলে নে!

—তাবছি।

—কি তাবছে?

জঃ জঃ করিয়া ঘড়ি বাজিয়া উঠিল; হেরঘনাথ লম্বায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, কটা বাজে?

গৃহিণী ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, বায়টা।

হই ৫কু বিচ্ছারিত করিয়া হেরঘনাথ বলিলেন, বাস্ রে! বায়টা বেজে পেল! কাণ আবার তোরেই বেকতে হবে নে। বসিয়া চকু বুসিলেন।

গৃহিণী রাগতভাবে কহিলেন, তোরেই বেরোও আর এখনি বেরোও, কাল হুপুরে তোমার বাড়ী থাকতে হবে।

—হুপুরে, তা নিশ্চয় থাকব।

—তোমার নিশ্চয় ত!

—বেশ, ঠিক থাকব।

সেখা গেল হেরঘনাথ বধলমনে গৃহে অঙ্গপতিত রহিলেন। প্রণয়কে আহ্বানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। মা'র অহুগোষে ইন্দুর তাহাকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল এবং সাধারণ ভক্ত-শোকের গৃহে যেমন হইয়া থাকে, সেদিন সে নিজে অনেকগুলি সৌখীন রাজ্য রাধিয়া ফেলিল। ঘর-দুসার, রাজ্যবাসীর কাছে ইন্দুর চিত্রদিন প্রদর্শন আগ্রহ। এ সকল কাজ পাইলে আর কিছুই সে চাহে না। আচ্ছ লকাল হইতে সে একা একজন হইয়া খাটিতেছে। তাহাকে অধিকতর উৎসাহিত করিবার জন্য মা বাব বাব রাজ্যবাসে আসিতেছেন, মঙ্গলময় পরীক্ষা করিয়া খাটিতেছেন, টমুও মা'র কাছে নানা পরামর্শ জানিয়া লইতেছে।

ইন্দুর এই অপরিণাম স্বয়ং, শ্রমশ্রমতা দেখিয়া মা'র মনে দারুণ আনন্দের অধিগ্রহণ। এই স্বমতিটুকু থাকতে বজাৎ

থাকে, তাহার ক্ষুদ্র তিনি লাভকোটা দেবতার আশ্রয়স্থান হিঁকা করিতেছেন।

প্রথম আলিঙ্গনে, ইন্দু তাহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। বলিল, আপনাকে কি টেবিলে বসে ?

প্রথম হাসিয়া কহিলেন,—As you like! (বলা অভিজ্ঞ)।

টেবিলে থাকার সাজাইয়া, ইন্দু তাহাকে খাবার-পত্র ডাকিয়া আনি। প্রথম বলিলেন, তুমি খাবে না ?

—আপনার যেক।

—এক একা খেতে আমার ভাল লাগবে না।

—এক কেন, আমি ও এখানেই আছি। আপনি বসুন।

—তুমি বসলে কিছ বেস হ'ত। প্রুতনে গ্রু করতে করতে—

—গল্প এমনই করতে পারবেন, আমি ও এখানেই আছি। খাব গ্রাহ্য, সম্মানিত অভিযুক্ত না খাইবে সে খেতে পারে কি ?

প্রথম সজ্জিত আহার্যের পানে চক্ৰ রাগিয়া বলিলেন, তুমি এত সব রে'খেছ ইন্দু !

লক্ষ্যাক্ষণ আনত মুখে ইন্দু কহিল, আপনি বসুন তো। খেতে পারেন, তবে না ?

ইন্দু টেবিলের অপর প্রান্তে চেয়ার টানিয়া বসিল।

প্রথম সামান্য কিছু পাইয়া প্রথমবার পক্ষবৃণ হইয়া উঠিলেন।

ইন্দু বলিল, আপনি খেলেন কৈ যে, এত ছদ্মযাত্রি করছেন ?

প্রথম আবার অহায়ে মন গিলেন। যে বাটী হইতে যে পাত্ৰ মুখে ফুলেন, তাহার নিকট তাহাই অদৃষ্টতুল্যা বোধ হয়।

ইন্দু হাসিয়া বলিল, আমি রে'খেছি আর আপনার সাধনে বসে আছি, প্রশংসা না করে উঠার কি !

—বেশ, তা হলে একটু মিষ্কাই করি, কেনন। এই দেশ, নূরেক তেজের একটা আন্ত ডেলা।

ইন্দু হাসিল। প্রথম বলিলেন, কেনন, নিন্দে করতেও পারি। মেগলে ?

লক্ষ্যাক্ষণ কথা কিনি-না জানি না, প্রথম তোক্তা ভাল,

আধুনিক যুগকদিগের মত নৃত্য-পরিচালনা ভোজন করিয়াই হাঁস-ফাঁস করেন না। অন্ন-বাওনা'দি পরিভোজনপূর্বক ভোজন করিলেন। অহারের শেষে চট্টা আলিঙ্গাচ্ছে, বলিলেন, তীব্রনে এমন চপ্তির মধ্যে আর কোন দিন খাই নি ইন্দু।

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল। তবে কথাটা যে তাহাকে অতীব প্রীত করিয়াছে তাহা তাহার মুখ বেশিখাই বুঝা গেল।

প্রথম বলিলেন, ইন্দু, আজ তুমি আমাকে যে আনন্দ দিচ্ছে, তার বিনিময়ে তোমাকে আনন্দ বেওয়াই উচিত ; কিন্তু তার বদলে আমি তোমার ছাংখই দেব।

ইন্দু বৃণ তুলিয়া তাহার শাশু চাখিত পারিল না। তবে তবে তাণ পাতিয়া একাগ্রচিত হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রথম বলিলেন, সব কথা হয়ত শুধিবে আমি বলতে পারব না, তবু আমার বিশ্বাস, আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে।

ইন্দুর পা ডটা বেন ধাপিয়া কাপিয়া উঠিতেছিল।

—তুমি জান বোধ হয় আমি বিশপ্তীক। বৌদি সে কথা তোমাদের বলেছিলেন বোধই শুনেছি। বিশপ্তীক হবার কিছুদিন পরেই বৌদি আমাকে তোমাদের কাছে আনেন। যে উদ্দেশ্যে আনেন, তা বোধ হয় তুমিও জান। প্রথম তিন থেকেই তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু—

ইন্দু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল, প্রথম বলিলেন, আমার কথা অনেক বহু, এক মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। তুমি সেই একটু মিনিট ব'স।

ইন্দু বলিল : কিন্তু তাহার সঙ্গীতে যেন ছুটিতেছিল।

প্রথম বলিলেন, তোমাকে পাবার আশাই আমি করেছিলাম, কিন্তু তুমি ছিলে একান্ত বিরক্ত। তুমি বহু দূরে চলে যেতে চেয়েছ, আমাকে তত পাপল করছে। আমার সে অবস্থার আমি যেখানে সেখানে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি। অনেক বেড়িয়ে তোমাদ্বয় চেরে ভাল কাটিকে খুঁজে নিতে পারব, সেই আশাতেই ছুটে বেড়িয়েছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত—তোমাকে ত বই, তোমার মতও কাটকে পাই নি। তবুও ছুটোছুটির অর্থ নেই, কলকাতায় থাকলে তার আর শেষ হবে না। তাই আমি কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি। আজ ঘাটার নিম্নে তোমার বেহ-বহু পেয়েছি নবনৈ একটা কথা বলে গাই, ইন্দু, আমি সম্পট নট, অলক্ষিত্রাও নট, বহু প্রাপ্য বলে তুমি

আমাকে ডাব, ততটা খাবারও আমি নই। তুমি যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে, তাঁরনকে আমি দ্বন্দ্ব হয়ে বেনে নিতে পারতুম।

কথা শেষ চট্টেই ইচ্ছা হাড়টায় উঠিল। তাহার মূখ পাতে, চক্ষু নিশ্চিন্ত, দেহখানি সেন দেহলগ্নের মত কাঁপিতেছে।

প্রশ্নের ভীত কর্তে কহিলেন, অপরূপ বিগ্ন না, ইচ্ছা।

ভাবের সব চেয়ে বড় সত্যটা। আজ সন্ধ্যা হবে বলে কেশব।

—আশনার পান আমি, বসিমা ইচ্ছা ত্যাগাতি বসিমা

ইচ্ছা গেল।

সম্ভবিত্ব পত্রিকাজল

অসম্ভবের সঙ্গে আইন অমান্যের প্রবল আন্দোলন। হিমাশ্রয় ইহতে কল্যাণবিকাশ কাপিয়া উঠিয়াছে। কেশবের পীড়ন আরও তীব্রতর, কুল-কলেজে ছেলে নাই, বাবলা-বাগিচা দ্বিগুণ নাই, পোকেস অস্বাভাবিক নাই, কোম্পানীর কাগজের ঘন ঘোড়ই নাহি। বাইরে, কংগ্রেসের লোক সত্যের আইন অমান্য করিতেছে, বৈধের নিষ্পত্তি। ছেলেকেও বাপ-মার কথা অমান্য করিতেছে, সমাজের ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে। অমৃত স্থানে বসিয়া নান্দী সেন মাথা নাড়া দিতেছেন। ধর্মের মনে মনে নাই, গৃহস্থের ঘরে শান্তি নাই, লকসেই সেন ভবে ভবে কোন রকমে বিন বাপন করিতেছে। সর্বত্র অশান্তি। এত অশান্তির মধ্যে শান্তি, এমন নিষ্পত্তির মধ্যে শৃঙ্খলা আসিবে কেমন করিয়া কে জানে!

জেলের বাগানের বড় ধূম পড়িয়াছে। নেতার আগুণে গিয়াছেন, বেকাসেরকোষও তাঁহারের অঙ্গুলি করিয়াছেন, এমন কুল-কলেজের ছেলেরের পালা। তাহার কুল বা কলেজের কটকটিকে করিয়া জেলের বাইরে। যে বেকাসের লগ্নে বিচারের আশ্রয় পুরিয়া পুরিয়া প্রাক্ত, প্রাক্ত, অসম, তাহার দিন কালের মত বিগ্রহাশ্রয় পুঙ্খপাণ্ডে বা নবীর ধারে উত্তর আলিয়া তাঁড় চড়াইয়া নুন তৈরি করিতে লাগিয়া গিয়াছে। পবর পাওয়া পুণি আসিবেছে শুনিতেই তাহার বিত্ত উৎসাহে উত্তর আলানি-কাঠ টেলিয়া নিতে। বাবলা-বাগিচার বাগেরে অগুন, কলেজের দুটে-মজুরের বেকার হইয়া পড়িয়াছে, তাহারও তাঁড়া কেলিয়া “বকে মাতর” হাঁকিয়া পুণি পুণি গাড়িতে আরোহণ করিয়া রাজ-আতিথ্য বরণ করিতে চলিয়াছে।

সকাল ইহতে সন্ধ্যা পর্যন্তের সন্ধ্যাশ্রমে এই ভূতই তব্বে বোলা যায়। মাথার মরগা পক্ষের ইপি, অঙ্গে যেটা মলিন পক্ষের বমন, কাহারও বা পক্ষের চাবরে আবৃত দেহ, কাহারও পক্ষের উপর্যুক্ত নথ, গায়ে কল্যাণ অর্থাৎ কিবা নাই—থলে

থলে লোককে একটি মাত্র পুণি-প্রবর্তী বন্ধনে গাঁথিত করিয়া লইয়া বাইরে। বুক, দুই, বালক বেকার, হামিগুণে চলিয়াছে। পক্ষেরের চোরা নাই, বেকার ভর নাই; মধ্যা মধ্যা কেশব বন্ধনাত্মক পক্ষেরে লহর মচকিত হইয়া উঠিতেছে।

সরকারের জেলখানার স্থানে অস্বাভাবিক। বহুবার বেড়া দিয়া নাই দ্বিগুণ নতুন নতুন জেলখানা গঠিত হইতেছে। পক্ষেরের নিকটবর্তী হামিগুণে খোলা নাই আর নাই বসিলেও গেল।

কুল-কলেজের ছেলে বমন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন কেশবের পালা। তাহার ইতিপূর্বেই বাড়িতে, কুল-কলেজে, গুরুত্বপূর্ণ কথা অমান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এখন বৈধিক সংবাদপত্রে কেশবাত্মক সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে বৈধিক, তখন তাহারও ভেতর বৈধিক বেকারের লগ্নাভাব হইয়াছে অঙ্গুলি হইল। নারীরের মত বহু জেলখানা নাই পড়িয়া পক্ষেরের উপর বসিল না।

লগ্নের অস্বাভাবিক বেকার লোকের বড় অস্বাভাবিক, লগ্ন প্রবর্ত করিয়া সে অস্বাভাবিক বেকার এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল না, সরকারকে বাহিরের করাই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা যে কতকালে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সে আন্দোলনের লোকের অঙ্গুলি পক্ষের ছিল না, সে আন্দোলন বেকার অগুনের মত বগ করিয়া দগিয়া উঠিলেও অধিকতর হারী হয় না।

তা না হউক, অগুনিতা বহু পুণি উঠিল এবং বহু পুণি ছড়াইয়া পড়িল। লহর ছাড়িয়া পক্ষপ্রাণ, লগ্নপ্রাণ ইহতে গতগাম্য গুলিতেও পরিণাম হইল।

ছায়ার বহুভাবাভীর বেকার বাবল প্রাণেও বেকার ভেতর লাগিল। ছায়ার বেকার কুলের লগ্নপ্রাণের সঙ্গে কোন নবীর ধারে নুন প্রবর্ত করিতে গিয়া, পানায় হাততে হই দিন হই রাহি বহু পাখি, কাদিয়া-কাটিয়া, কদা গাহিয়া, নাকে পং দিয়া তৃতীয় দিবসে তকাইয়া আশ্রয়না হইয়া বাড়ী ফিরিল।

ছায়ার পাড়ী তৎপূর্ণই শয়্য প্রবর্ত করিয়াছিল। অশোক আসে নাই, একটী একটী করিয়া দিন কাটিয়া গিয়াছে, গোপের কুলে বুক হামিগুণে, অশোক আসে নাই, কোন পবরও বেকার নাই।

ছায়ার মূখে আর কথা নাই। শান্তির মাঝে আসিতে তাহার মাথা কাটা যায়। তাহার বাবল ছল ছল আনি হুইট অঙ্গুলি ছায়ার মূখের উপরে গাহিয়া যে প্রবর্তের উত্তর পুণিহইতে, সে প্রবর্তের শেষ উত্তরটিও যে ছায়ার নিগূণ হইয়া গিয়াছে! বসিবার, মাঝের দিবার কোন কথাই কি আর তাহার আছে? সে যে প্রাণ গাহিয়া, নিগূণে কদা শান্তির সেবা করিলেও, তাহার সঙ্গে কথা বলিতে পারে না, কথা বলিতে গেলে চোখে ছল আসিয়া পড়ে, ছায়ার

শাক্তী যে তাহা না বুঝিতে পারেন, তাহা মতে : তাই ত তিনি প্রথমেই অপ্রত্যক্ষভাবে তাহাকে কাছে ডাকেন। কোন কথা বলিয়াই না থাকিলেও ঘা-তা একটা কথা বলিয়া, তাহার মাথার হাত দিয়া আশীর্বাদরূপে অঙ্গ বন্দন করেন, তাহা দেখিয়া ছায়া যে কিছুতেই আপনাকে সম্বন্ধ করিতে পারে না। তাহার সম্মুখ হইতে ছুটয়া বাহির হইয়া কোন যোগেন স্থানে গিয়া কাঁদিয়াই তবে সে একটু শান্তি পায়। অন্তরে তাহার সঙ্গে প্রাণপ্রাণ করিয়া তাহাকে সঙ্গীত করিগাছে, তাহার চক্ষু হৃদয় হৃদয় না তাহা মতে : কিন্তু সে এই পুণ্ড্রপ্রাণাঘাতকে যে নিতুন প্রাণপ্রাণ করিগাছে, সে হৃদয়ের সীমা কোথায় ? একটি কথিয়া বিন করিগাছে আর আশা-নিরাশা, হৃদ-বিহাদের হৃদয় বৃদ্ধার হৃদয় সময়ে যে কড় বহিয়াছে, তাহা জোষ বে না দেখিগাছে, তাহার সঙ্গে অগ্রসর করণ কর্তন। এক একটি নিঃশব্দের সঙ্গে এক একখানি পাওয়া পথিয়া গিয়াছে। ছায়া নিমিত্তের পর নিমিত্ত পড়া পর পড়া, দিনের পর দিন, সে মুগ্ধ দেখিগাছে। দেখিগাছে, আর তাহার নিভের বিকসিত, অচিন্ত্য জীবনের হৃদয় চান হইয়া গিয়াছে। ছায়ায় কর্তিত দিনের পর আরও কয়েক দিন বন্দন করিয়া গেল, তখনই বৃদ্ধা শয়্যি পড়েন। পাছে পরে জান না থাকে, বলিতে না পারেন, তাই আগেই ছায়ায় বন্দিয়া রাখিলেন, বই না, ছোঁড়াটাকে দেখে। না খেতে পেতে যেন মরে না।

ছায়া বলিল, আমি বেঁচে পাকতে ঠাহরপোকে কোন প্রাণ কই স্পর্শ করবে না না !

বৃদ্ধা কতকটা শান্ত হইলেন। না হইয়া কি করিলেন ? চায়া অনাথা নিঃসঙ্গায়া হীলোক, তাহার অভয়ানের মূল্য কি ? মূগ্ধের সাধনা ছাড়া ইহা যে আর কিছু হইতে পারে না, তাহা তিনি বুঝিলেন। কঠোর সংসারে তাই বা কে বেশ ? তাই বা কোথায় পাওয়া যায় ?

এমনই এক চক্ৰিবে হৃদয়বাহ আসিল, পরেবকে পান্নার লোক গরিয়া লইয়া গিয়াছে।

পত্রাশ্রমের শোক সর্বল, পরোপকারী, কিন্তু তাহাদের পাথে মাথা পুঁজিলেও ধান্যের জোকাঠ তাহার বাড়িতেই না। এই দিন এই গুই নারীর কি ভাবে কটিল, তাহা কেবল অকর্ণ্যবায়ী জানিলেন।

কয়েক দিন পরে বৃদ্ধার অবস্থা বন্দন পুণ্ডি শব্দাকনক, সেই সময়ে একদিন মন্যাকে প্রাণহৃদয়বাহের হৃদয় গাড়ীখানি আসিয়া সেট কক্ষির বেড়ার পাথে পাড়াইল। ছায়া পাড়ীর সঙ্গে

বাহিরে আসিয়া পাড়াইয়াছিল। প্রাণের সঙ্গে ইচ্ছুকে আঁসিতে তাহার মোথের দৃষ্টি যেন কাপসা হইয়া আসিল।

তাঁহার কাছে আসিতে সন্ধির সূত্রিতে চায়া ভিজালা কটিল, বিমল-না ?

ইচ্ছুক নৌহু কটিল। প্রাণের বলিলেন, নিষিদ্ধ বই পড়ার, ছ' মাস জেল হয়েছে।

গুইট নারী একই সঙ্গে যেন আশ্রয় কথিয়া উঠিল—
ছ' মাস জেল—বিমল-না'র ?

প্রাণ দীর্ঘকণ্ঠে করিলেন, আবার কাছেই বিচার হয়েছিল। অনেকের এক বন্দন পঞ্চাৎ জেল হয়েছে। বিমল বাবুকে ছেড়ে দিতেও পারতুম, তাঁকে সে জযোগ্য বিবেচনায়, তিনি জেলই বেছে নিলেন।

—আবার বল-না ?

ইচ্ছুক কাপে মুখ তুলিয়া প্রাণের নিকে চাহিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। প্রাণ তাহাকে বাহুবোঁনে ধরিয়া ফেলিলেন।

ছায়া কিয়ৎকাল তক্তিতের মত পাড়াইয়া থাকিয়া বলিল, বিমল-না'র বুড়ী না ?

প্রাণের বলিলেন, তাঁকে কাশী পাঠান হয়েছে। যেদিন বিমল বাবু জেল হয়, সেট দিনই আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে সঙ্গে লোক নিয়ে না'কে কাশী পাঠিয়ে দিয়েছি।

ইচ্ছুক সতল হুই চক্ তুলিয়া একবার চাহিল মার।

ছায়া নিভের মনেই বলিল, ছেলেরা বড় হ'লে না'রা আর বেঁচে থাকে কেন, তাই জানি ! এখানেও এক বৃদ্ধা না'কে নিয়ে যেন মারলে টানাটানি চপছে : প্রাণ বাহ-বাহ, তবু যায় না !

ইচ্ছুক বাগ্যার উপরে উঠিতে ছায়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। এক বৃদ্ধার, কি-বোন-কি মনে হইল, কি-বোন-কি ভাবিল, তাহাও তাহাকে সম্বন্ধী জানিয়া বুকের পাণে ঢালিয়া ধরিয়া বলিল, তিত্তে এল ভাই।

ইচ্ছুক তিত্তে প্রবেশ করিলে, ছায়া প্রাণকে বলিল, প্রাণের নাম, পুণ্ডিরীতে চিরদিন কি এমন বিপতীত ঘটনাই ঘটে ?

—কি বিপতীত ঘটনা ছায়া ?

—কোনটা নয় ? কিন্তু, এই যে, ছেলের মতো না'র প্রাণ বাহ, ছেলে না'র খোঁজও নেব না—

কণ্ঠটা শব্দ হইল না। নীর বাহ ভাবিয়া যে বস্তা

বহিল, —তা'র শেষ কোথায়, কে জানে ! নদী, নদী হইতে সমুদ্র, সমুদ্র হইতে মহাসাগর, তারপরে—কে জানে বস্তার শেষ কোথায় ?

[ক্রমশঃ]

ভাষার অন্তর

—প্রদীপেশ গঙ্গোপাধ্যায়

পুরুষ যেদিন পেল প্রকৃতির প্রেম অনাবিল,
প্রথম উঠিল কাঁপি এ বিশ্ব-নিখিল,
অঁপির ভ্রতরী-তলে,
ধরা দিল পলে পলে,
পরম্পরে অতি সন্নিহিতে,
অঁপি হ'তে স্বরূপের পাটে ;
—সেই দিন বিকশিল জীবনের প্রথম অঙ্কুর
আদিত্য মানব-শিশুর ॥
জন্মের আনন্দ-জালে
জড়াইয়া অন্তরের অতি অন্তরালে
মেঘের তেলায়,
বৃত্তিকার রস-ঘন আনন্দ-বেলায়,
এল তারা বেলা-অবেলায় ।
অনন্তুর অমৃত হ'তে অমৃতের প্রসাদ-পাত্র খানি
প্রকৃতি তাহারে দিল 'অনি'
বাস্তবে আনিল দোল, আকাশের নত চন্দ্রতাল
প্রভাত আনিল মূল,
তপসিনী মাছিল দৈকাল ;—
গাছে গাছে লতায় পাড়ায়
কানল বনানী
শয্যাপানি পেতে দিল 'অনি'—
দিল তারে ডাল
রসঘন পরম-নির্দ্বন্দ্ব ।
সমুদ্র আনিল তার লাগি'
সারা রাহে ভাগি'
নিখিলের সহীত-পিপাসা
সর্ব্ব মনে বিলিবার আশা,
যে আছে যেথায় ;
অনন্ত নিখিল হ'তে অতি ক্ষুদ্র বৃক্ষ বাণুকায়,
কোন্ বন, কোন্ গান—
করে কানাকানি,
কোন্ সে রহস্যখানি
অরণ্যের মনে
কণে কণে বাটায় 'অনন্য'ধর্মে ।

কৌতূহল-জিজ্ঞাসার সেই পথখানি
বসন্তের গানে গানে তরে দিল "বাণী"—
বাণী এল অরূপা অ-রূপা—
প্রথম বন্দনা তার নব মধু-করা
প্রকাশের ব্যাকুলতা ভরা ।
অরূপ লভিল রূপ
অতি অপরূপ ;
তাদিয়া কঙ্কর বাসা,
সোনায় পাইল মৃতি অসীমের আশা ।
প্রথমা যে অনাদি প্রকৃতি, স্বেদার্থ চুবনে
মানবের শাবকেরে আনিয়াছে প্রথম ভুবনে,
তারি ছন্দে ছন্দে বাজে অরূপ অরূপ
শিরার স্বচ্ছারে গঠে দর
প্রকৃতির অতি কণ্টলীন।
একাধুই তার অগ্রগামী ;
স্বপ্নের প্রথম রস রসনার তলে তলে 'অনি'
সেই ত জ্বালিল তারে
অমৃতের সরোবর-পানে !
বিকশিত হেতু-পত্র প্রায়
অতি মনোহোভা,
তার সে মধেব প্রেম,—বেদনা নিভান,
স্নেহ অবিয়ান
অমৃত-উজল-করা সে বাণীর সোনা
নিল স্থান হংস-মণ্ডল মাঝে,
হৃদরূপা, নাভি-পদ্মমূলে,
নিঃ-শ্বাসে নিঃশ্বাসে গঠে বাণী
আলসে ধনিয়া চলে প্রকৃতির বীজ-মন্ত্রখানি
ত্রাণ আর বৃত্তিকার গুপ্ত কানাকানি ॥
মন্ত্রের মজায় মজায়
বিশিয়াছে প্রকৃতির যেই আশীর্বাদ,
তাগানি গীতালি
ভাষায় পাইল পুঁতি মনের নিতালি ।

ভাষা আর প্রকৃতির সঙ্গম-প্রয়াগে
নিষ্ফল্য বাণী-মুষ্টি ছাণে
নব রাগে রাগে ॥

নিমিল নয়ন-তলে শাস্ত্র মুহু হাসি
অনিদ্রাশী শব্দ-যন্ত্র করে
প্রোক্ষল কিবীট 'পরে
নব-জ্ঞাত বালার্কের শিখা :

প্রকৃতিত স্বেত-পদ্মাসনা,
লীলাকঙ্গী-মরাল-গমনা,
এলায়িত আকুল অলকে
পলকে পলকে,

নব নব মূর্তিনায় লেট-তরুণী-তারে
মিলেটেল বারে বারে
ইন্দ্রিয়ের সর্ব লোকে, লোকে,

দেশের প্রকৃতি পেল ভাষার আলোকে
আপনার বিকাশের পথ,
তাহার অস্তিত্ব সাথে যুক্ত চ'ল প্রকৃতির আশা
বাণীকে সাড়ায়ে নূলে
নেবে এল ভাষা

প্রকৃতির শাস্ত্র ভালবাসা, পেল সেই ভাষার প্রণাম।
ভাষায় রছিল বাঁচি প্রকৃতির যত কিছু গান :
সুস্থ দেশ-প্রাণে
সে ভাষা অনর হ'ল মানুষের গণনে ॥

যুগে যুগে প্রকাশের এই আয়োজন
নিত্য প্রয়োজন,
মিটিতেছে স্বদেশের কৃত্তিকার কাঁছে :
কৃত্তিকার ঘেই রসে সে দেশের ভাষাটুকু বাঁচে,
প্রভাত-শিশির ভেজা
যার ঘাসে ঘাসে
অস্তুরের বাণী তাব নাচে,
সেই নাচি মর্মে তার সত্য হ'য়ে আছে :
—রবে চিরকাল।

অনর অশেষ তাহা, বৃহত্তীর্ন, প্রাণের পাথর,
মহে অপাংক্ৰয়।
(লয় তার নাই ;—কেবল প্রলয় আছে
বাঁচিচারী মানুষের হাতে) ।

দেশ-প্রকৃতির সাথে
ছিন্ন চ'ল মানুষের সর্ব যোগাযোগ
সৌন্দর্য্য-সংস্কার,
নাটির এই অনাবিল শাস্ত্র রসধারা
যেখানে হইল তার।
মানুষের অস্তুরের মক-বাণুকাত,
—আছে সেই ক্রুর পরিণাম,
ভাষায় পেল না আর মানুষের প্রাণের প্রণাম ॥

স্বদেশের কৃত্তিকার মর্ম চ'তে ছি'ছি'
তাহারে রাখিলে ঘিরি'
প্রস্তরের কঠিন প্রাচীরে,
লুপ্ত করি' জন্মাস্থির মায়া-লক্ষণটির
লুকায়ে রাখিলে তারে, বন্দীবেশে, মানবের মল
—নিষ্করণ সঃসার-উচ্চল,
চিহ্ন-তল চ'তে তার অকস্মাৎ খ'সে যাবে
সত্যকার বাণীর প্রতিমা
প্রাণহীন দেহ র'বে ল'য়ে তার কুহতার সীমা,
প্রাণলক্ষণহীন সেই সীমা-তলে
পলে পলে

দেশ যাবে ম'রে,
ওধু তার শব্দ-দেহ পরে
পূজীভূত হবে আসি' ভট্টরূপা ছড় অলঙ্কার,
মানুষের লুক অলঙ্কার।

কুশান-ভূমির সেই প্রাস্তরেণে আসি'
চয় ত উঠিবে হাসি'
অপকূপা যোগভট্টা বাণী
নবরূপা, নহে নিভারূপা
নহে সে কল্যাণী ;

মানুষ পাবে না আর তাহার অস্তুরে—
স্বদেশ-বাণীর সেই
সহজাত প্রেম-লক্ষণানি।

ভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী

— শ্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির একটি বিশাট তফস্ব দেখিতে পাই যে, প্রাচীন ভারতের মানবজীবন, একটি বিশেষ গভীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, এই বিশাট প্রকৃতির অস্তিত্ব অপরূপ রসভাণ্ডার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। ঔষাদের সমগ্র জীবনের যে কোন বিভাগে যখনই আবার কোন একটা তার ছন্দোবদ্ধ হইয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিষ্কাশন ও অস্তিত্বের স্পন্দন সন্ধান পাইয়াছে, তখনই উহা ঔষাদের নিকট রস-কলায় জীবন্ত হইয়া পরিদ্রবণ লাভ করিয়াছে। ঔষাদের মন্ত্রট ছিল, "চোগা: যোগাজতে মোক্ষা-রতে চ সংসারঃ।" অর্থাৎ, সংসারের রূপ-রঙ্গ-গন্ধের বহুধনো-দ্বন্দ্বের ভিতর মানুষের অমূল্যত্ব প্রাপ্ত অসীম সৌন্দর্য্যে ধ্বনিত হইবে।

কিছু ভারতীয় সভ্যতার এই অন্তর্গত অর্থপ্রাণ, আধুনিক কৃত্রিমজ্ঞানের সভ্যতার চাপে মানুষের জীবনে নানা বিভাগে খণ্ড খণ্ড হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে রস-কলা, 'ব্রহ্মকল', 'কলাভিনয়' হইয়া সাধারণ মানুষের জীবন হইতে আত্ম বিস্ত্রিষ্ট এবং নান্ন করেকজন স্তম্ভনের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের বোধগম্য অথবা চর্চ্চার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। সেই মন্ত্র সাধারণের নিকটে এই-রূপ ভিন্ন-প্রদর্শনী আশার সংবাদ তাহাতে সঞ্চেদ নাই।

ইহার উদ্ধাবন ও উপলব্ধির পরিচালনা মনে হয় অসম্ভব বিকারপ্রবৃত্তি বাস্তবী সমাজের কায়বিল্লাস, কথ্যভার আত্মকলন ও সর্বপ্রকার পীড়নাবাহক অসমতা হইতে রূপভানোর পাথরগুল পুন: প্রতিষ্ঠিত করিয়া উত্তরাধিকারিকের সেই সহজ অসংকীর্ণ পুঙ্খক অগ্রপ্রাপ্তি হইয়া উপস্থিত করিবে,।

কন দেখি যব হত এই সন্ধ্যাকল,
শৈল দেখি মনে হয় সেই যৌবনকাল।
যশ: নদী ওর তীরে মাঝে মাঝে
যহা যেখানে যাই এই পথে কালি।

ভিত্তিক চিত্রকলা

অবশ্য আত্মনামগুণের প্রকৃতি প্রতিটি ভিত্তিক চিত্রাট এই রূপ-সংস্কৃত যাহাতে বিশ্বমানের উপভোগ্য হয়, সেট বাবদাই



মহাভারত।

চিত্রকলা

কল্পিত হইবে। কেন না স্তম্ভন যুগের বান-বাহন এ যুগের পথে পথপ্রাপ্ত নয়—সে যুগে বাস্তবাত্মক পন্থাগুলি এখন বিপদাপ্ত ও কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

এই হিসাবে লক্ষ্য-শিরের এই ক্ষুদ্র অঞ্চল বিচিত্র অলিন্দে প্রবে প্রবে সজ্জিত চিত্র-প্রদর্শনীটি অতি সাফল্যান্বেত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রদর্শনীতে অথাক অদিত্যবাবুর চৌধুরি বানি, প্রবাস নির-শিক্ষক বৌদ্ধের বাবুর সাত বানি এবং প্রাক্তন ছাত্র কিশোর ধর্মের চম্পি বানি ও অস্তিত্ব ছাত্রের অস্তিত্ব কিছু চিত্র সমগ্র প্রদর্শনী-কক্ষটিকে মল্লভূত করিয়াছিল। ইটালি বাইবার অধ্যবহিত পুঙ্খ কিশোর বাবুর অস্তিত্ব ছোঁ ও



ମହାଶୟା ।

[ବିକିଟକର ବାହୁ]



ମହାଶୟା ।

[ବିକିଟକର ବାହୁ]



ବ୍ୟା ।

[ବା. ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ]



ମହାଶୟା ।

[ବିକିଟକର ବାହୁ]



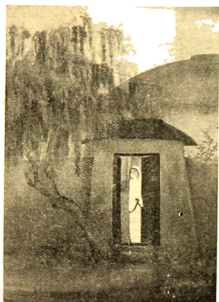
କବି ।

[ଆପ. ଟାଟ:ଲୋ]



ରବିଶ-ଆମ୍ବେ ।

[ଶିବିକେତେର ବା]



ଉଦ୍ଦେଶ ।

[ଶିବମିନିଷ୍ଠ ମେନ ଶାସ]



ବୌଦ୍ଧ-ଭିକ୍ଷୁ ।

[ଶିବମିନିଷ୍ଠ ମେନ ଶାସ]

উন্নত এবং তাঁহার ও লক্ষ্মীবিজ্ঞানের শিক্ষক ও ছাত্রদের
 তাঁহার এই রকম একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহের রসগ্রাহ্যে বাগানী
 জনসাধারণকে সুযোগ দিয়া আমাদের অনেক ধন্যবাদভাজন
 হইয়াছেন।

এই বিবেচ্য-সময়ের মানাবিশ্ব চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির বৈচিত্র্যের
 মধ্যে “চলোৎসব কল্প অঙ্কিত কথেকথানি চিত্র” দেখিলেই মনে
 হয় যে, ইহাখানায় শক্তি লইয়া দেখা দিয়াছে, উহার রূপ, রস,

চিত্র। “ভগ্নমো” “পথের পাথের বোঝাবাদক” (৪১ নং),
 “কল্প-প্রাণাংগের দড়ির পুল” (৪৮ নং), “পাহাড়ী মেয়ে”
 (১০ নং)। এই তিনটি ছবি দেখার সারলীলতার ও বস্ত্র-
 সন্মিলনের সঙ্গে সত্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরই সঙ্গে তাঁর
 আর সংখ্যের উপর “হৃদয় ভুলির স্মরণ” অঙ্কিত ছবিগুলি দ্বারা
 যায়। যেমন “নৃত্য-রতা” (৪২ নং), “পাহাড়ী মেয়ে”
 (৪৩ নং) ইত্যাদি।



স্বামী।

[অঁকিতঃ ৭৪]

হটির প্রকৌতুহল আধুনিক বস্তুর চিত্রকলায় এক নতুন অধ্যায়
 সৃষ্টি করিয়াছে। উহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে বৌদ্ধের স্নেহের
 নিপুণ ভুলিকা-পূর্ণ। তাঁহার চিত্রাঙ্কনে কোথাও তুচ্ছ অথবা
 অত্যাশ্রয় বর্ণবিভ্রাণের স্থান নাই। চিত্রগুলি কৌতুহল হইয়া
 চলনের সম্মুখে দ্বারা বিদ্যা পাকে। তাহার গঠই প্রদর্শনী-
 রূপে প্রদর্শন করিলে যে সমস্ত চিত্রাবলী নয়নপথে গোচরী-
 হৃত হয়, তাহার অধিকাংশই অসুখ কিসকল ধরেণ অঙ্কিত।

এই চিত্রশিল্পের শিল্পী অসুখাভ্যাসের বেদনভাবে
 পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। প্রথম—রেখা-

তাঁর দ্বিতীয় পর্বাংগের চিত্র
 মাতুল বা দেবতার কৌশলের কোন
 বিশেষ ঘটনার প্রতিকৃতি, যেমন
 “সত্যোত্তর মতালোচ” (৩৪ নং)।
 মতালোচন এই ঘটনাগুলির চিত্র-
 থানি অঙ্কিত করিয়া চিত্রকর তাঁর
 কল্প ভিত্তিরে পরিচয় দেন নাই।
 তাঁর আরও দু'খানা ঐ ধরনের
 ছবির মধ্যে একখানা “স্বপ্নিত
 বর্ণাংগের,” অপরখানা “স্বপ্নী”।
 কিসকল প্রকৃতির পর্বাংগের ছবি,
 ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত
 oloof skelob “বিশ্রামের
 মন্দির” (১১ নং), “একখানা
 প্রতিকৃতি” (২১ নং), এই দুই-
 খানা ছবি দেখিয়া ইউরোপীয়

পদ্ধতিতেও তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অত্যন্ত ছাত্রের মধ্যে প্রথম রায়ের “প্রাণধন” চিত্রখানি
 নিবৃত্ত রেখাপাতি ও সহজ রং-বিশ্রাণের সরলতার অভাব
 অনোন্নত হইয়াছে।

এইরূপ আরও কয়েকটি বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতি-শিল্পিক-
 লয়ের চিত্রকলা-প্রদর্শিত এই ত্রি-বৈশিষ্ট্যের পর্য্যক হইয়াছে
 লক্ষ্য নাই। এইরূপ প্রদর্শনীর চিত্র বিদ্যাই দেশ-বিদেশের
 শিল্প-প্রাণের আধার-প্রদানে জনসাধারণ উপকৃত হইবেন
 আশা করি।

ষষ্ঠ-বছর বর্ষার পেরাশেলি একটি পকাও মাছ-খরার উৎসব হয়ে থাকে রায়-বাহাদুরের পল্লী-আশালে। তন্ম-লোকের সন্তানের পাঁচ ছয়টি আত্মীয়-সুত্নের পরিবার থেকে পনের বোলজন বুনক, আধা-বরদী, তর-বেতর হইল-লাগান লম্বা লম্বা ছিপ, চার-কাঠি, তিনের কোটা, ভাড়া মল্লা-ভড়া, পনীর, পাউরুটি প্রভৃতি সাজসজ্জাম নিয়ে ট্রেনে চেপে চাড়ির ঘন রায়-বাহাদুরের বাড়িতে। কন্নীদার মহাপ্রবেশ তিন চারটি প্রকাও পুকুর, নদীর মত একটি লম্বা ঝিল,—সব মাছে ঠাণা। কণাধ কাণাধ বর্ষার কলে ভরা দেউ লব কৌদি আস কিলে মাচাং বেঁধে সাতদিন (অক্টোবর বঙ্গলই হব) দাতনাব দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাছ খরার সে যে কি বিপুল মানস, তা আর বলা যায় না। সন্তানের একঘেরে, স্নান্য জীবনকে একটু বিস্তার দেখান জন্তই দোক, অথবা বর্ষার পল্লীস্থি দেখবার পোত্রেই হোক, মালেশিয়ার ভব তুচ্ছ করে, তিন চারজন স্ত্রীলোক ও তাঁদের লম্বা মালেন।

এবারকার মীনোৎসবের মাছ-খরা পরীক্ষায় শেষ হয়ে এসেছে। আর পল্লীভাষের শেষ-সতনী। রায়-বাহাদুরের ডে-লাইটে আলোকিত প্রকাও বৈঠকখানায় প্রাপ্ত টেবিলের চার পাশ দিয়ে চেগারে বসে আছেন এগার জন মন্ত-শিকারী, আট জন মহিলা, রায়-বাহাদুর নিজে ও তাঁর গৃহিণী এবং স্থানীয় ডাক্তার রমেশবাবু। টেবিলটি নানা রকম ফল ও পাতার সাজান। বাহিরে জ্বল জ্বল করে সূর্য হুচ্ছে।

কথা হুচ্ছিল ভালবাসা নিয়ে,—তবু কথা নয়, স্ত্রীতিমত তর্কই চলছিল,—দেউ সনাতন মাছলি তর্ক,—মাছের জীবনে একবারের বেশী ভালবাসায় পড়তে পারে কি না।' তর্কে যেমন হয়ে থাকে,—পূর্ণপক্ষ, উত্তরপক্ষ, তু'টি মলের অকাব ঘটেনি। এক পক্ষ জানা-অজানা অনেক লোকের জীবনী থেকে দেখা-জিলেন যে, তাঁরা জীবনে একবার মাত্র প্রেমে পড়েছেন। অপর পক্ষও এক বাহের বেশী প্রেমে-পড়া লোকের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করতে কল্পর স্রুহিলেন না। অনেকের মত

এই যে, ভালবাসা একটা ব্যাদি এং: ন্যাধির মতই অনেক-বার একই লোককে অক্রমণ করতে পারে এবং বহি কোন রূপ-আ বাধা এর অকাব গতিতে প্রতিহত করে, তা হ'লে সেই প্রেমপ্রসক্তকে মরণের পথেও নিয়ে যেতে পারে। এ বৃত্তি একেবারে অকাটা বটে, কিন্তু মেহেতা (দামের অতানত বাস্তব বটনাবলী) ছেয়ে কবি-কল্পনার চিত্তির উপরই বেশী প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা সকলেই একবারো বললেন যে, ভালবাসা—সংঘেব প্রস্তুত পেম মাপ্রসেব জীবনে একবার নাও আসতে পারে। প্রেম পদার্থটা সৌন্দর্যিনী-সংস্পর্শেব নয়, একবার যে জনকে ছোঁয়, তাকে এমনি করে খুস, ফলে ও মন্ত করে দেড়ে দেয়, এমন মহর্ষিব কবে তোলে যে, তাকে আস কোন কন্নীদ কোমল ভাবের সকার হুতেই পারে না, এমন কি নিত্যাবস্থায়, বঙ্গের নয়।

রায়-বাহাদুর নিজের জীবনে একাধিক বার ভালবাসায় পড়েছেন; তিনি পূব কোন কবেই এই মতের প্রতিবাদ করলেন। “আমি বলছি, মানুষের সনত মন-প্রাণ দিয়ে অনেক বাবই ভালবাসতে পারে। বিতীর্থবার যে ভালবাসা যায় না, এটিই প্রদান করবার জন্ত আশনারা এমন সব লোকের জীবন-কাহিনী বিবৃত করছেন, তারা প্রেমে ততাপ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। উত্তরে আমি এট কথা বলতে চাই যে, যদি সেই আত্মহত্যা নিজের জীবনকে একপ নির্ধ্ব ভাবে ধনন না করত, তা হ'লে তাঁরা ক'লক্রমে এট শুকপ্রাপ্তার বার থেকে অকাব্রতি পেয়ে-এই জীবনেই আবার লম্বী হতে পারত; জীবনকে বহুধা গতি বলপূর্ণক রোপ করে বেগলাহেট তো হস্তভগোয়া বিতীর্থ প্রেমাম্পন্ন থেকে বঞ্চিত হ'ল। প্রেমের বেশা আর মদের বেশা হুট-ই লমান। একবার যে মম পেয়েছে, সে আবার থাকে; একবার যে ভালবেসেছে, সে আবার ভালবাসবে। এটা মানুষের প্রকৃতি ও প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ ছাড়া আর কিছুই নয়।”

ওই পক্ষই তখন ডাক্তার রমেশ বাবুকে অধ্যক্ষ মানলেন। রমেশ বাবু আধা-বরদী গন্তীর প্রকৃতিব লোক। আগে

সরসেই থাকতেন, কিছুকাল পরীতে এসে বাস করতেন, ডাক্তার বাবু মত নাক্ত কবাবও ভক্ত সহাই থাকে সেপে ধরল।

বেশা গেল ডাক্তারবাবুর নিজের মতাবস্থ বিশেষ কিছুই নেই।

“গায়-নাগড়-বা বসলেন, এটা সম্পর্কই মাগের প্রবৃত্তির ও প্রাকৃতিক উপলব্ধি নির্ভর করে। সে যা হোক, আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি এমন একটি ভালবাসার বাণীর কানি, যেটা লক্ষ্য বস্তুর দ্বারা সমান ভাবে, অধিক্সে অধিক্সেই বৈদ্যমান ছিল; মগ হ’ল, তবে গেল।”

গায়-নাগড়-বা-পুত্রী উৎসাহে কহতালি দিয়ে উঠলেন।—
“খাসা, খাসা, কি চমৎকার! কি সুখ এরকম ভালবাসা পাওয়া! সীম পক্ষাট বন্দব হয়ে এক প্রান্ত্রাভ তীর প্রদানসময় আনন্দ হবে থাকা! যে ভালবাসেছে তাইই বা কত সুখ!”

ডাক্তার বাবু একটু হাসলেন।

“আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে ভালবাসার পাখি একটু পুস। আপনারা সকলেই তাকে চেনেন;—মগরটি গুল ম’শার, যার নত ওদনের ঝোঁকান আছে। আর হোণোকটি? সেও আপনাদের পরিচিত,—সেই যে ডোনের বেগে, বড় বড় এক কালে এসে থানা-চেয়ার বসায়িত কবাব ভক্ত কেরি করে বেড়াত .. বাণেশটা আপনাদের গুলে বলি।”

ডাক্তারের আগেকার কথাই মেয়েদের মনে যে একটা উদ্বেগনার ভাব বেগা গিয়েছিল, শেষের কথাই তা একবারে মুছে গেল। হীতিনত বিস্তারিত তার কুটে উঠল তাঁদের মুখে, যেন ভালবাসা জিনিষটা তাদের মত অজিহাত নবী ও নিকিতদেরই একচেটিয়া,—ছোটগোক-মহলের প্রেম-কাহিনী শোনারাই যোগ্য নয়।

ডাক্তার কিছু বলতে লাগলেন।

“মাল তিনেক আগে ‘কণ’ পেয়ে আনাকে এই স্ট্রীলোক-টির নৃত্যানবার পাশে যেতে হয়েছিল। আর তার আগের দিন সাত্তে সে এ গ্রামে এসে পৌঁছেছিল, চুটো বলস টানা তাড়া করতের চৌকোবা ছুট দেওয়া সেট পাড়ীখানা করে, আর চুটো প্রকাণ্ড কাল কুহুর সঙ্গে নিয়ে। পাড়ীখানা আপনারা সকলেই দেখেছেন। ঐ গাভীই ছিল তার বাড়ী,

ঐ তার গর, ঐ তার সব। আর ঐ কুহুর চুটোই তার বক্ষ, তাই সমী, তাই বন্ধ। গিয়ে দেখলাম আশ্চর্য বৈরাগী ঠাকুর আগে থাকতে এসে হাজির হয়েছেন। স্ট্রীলোকটি একখানা উইল করছে, আর আমাদের সেই উইলের একমি-তিউটার কল। এ ভাবে তার টাকাকড়ির নিলি-বাবস্থা করছে কেন, সেই উদ্দেশ্যটা আমাদের বোঝার মত সে তার কীকনের সমুদয় উত্তিহাসটা গুলে বলল। আমি তীব্রের এর চেয়ে কৌতুকাবহ অথচ নব্বাপনৌ কখন কাহিনী আর কখনও শুনি নি।

“তার বাপ-মা ছিল বাবাব থানা-চেয়ার-মাস। পৃথিবীর মাসের উপর বৈরাগীকরা বয়-বাড়ীতে সে তীব্রের কখনও বাস করে নি।

“যখন বেহাং ছোট, সে উকুম পোকাব ভক্তা মল্লা হেঁড়া জাক্কা পরে খুঁজ খুঁজ বেড়াত। তার বাপ-মা গ্রামের গ্রাম-সীমার কোন খানার কাছে তারের ডোরা ফেলত; কল চুটো ছোঁয়াল থেকে পাশাপাশি পেয়ে হাওয়া ধারে বাস বেঁধত; কুহুর চুটো মানবের পাথের চুট বাবার মতো নাকট রেখে নিশ্চিত মনে খুব দিত; ছোট ঘেরটা খালের উপর বেড়াত, গড়াত; আর বাপ-মা অশপ গাড়ে তলায় বসে, গ্রামের মত তাড়া থানা-চেয়ার-বাড়ী—সব নির্দিষ্ট ছিবে মেরামত করতে লেগে যেত। এট বাবাব পরিবারের ভিতর কণাবার্তী খুব মজুট ছিল। সেট চিচাভাত সর্পকননিমিত্ত “বামা সাগবে গো” “চেয়ার সাগবে গো” “মোড়া সাগবে গো” বুলি আঙড়াতে আঙড়াতে আঙ ক ক পাড়ার বেকবে, ও এক কথায় ঐটুই হাধা হয়ে বেলে, তাগা কখনও বা সামান্য-সামনি, কখনও বা পাশাপাশি বসে কাজে লেগে যেত—কণা নেই, লব নেই, শুধু বেতের পাট মোচড়ান বোমড়ান। বেতের খেলতে খেলতে যখন একটু দেনী কুবে গিয়ে পড়ত কি পাড়ার কোন বজ্জাত ছেলের সঙ্গে কথাবার্তী কইবার উপক্রম করত, বাগের কুহু বস নিতম্ব গ্রামপ্রান্ত প্রতিক্রিয়া করে যেতে উঠত—
“কিবে আর কলছি হাধা-মজাধী।” এর চেয়ে কোনদ আশ্রয়ের সম্ভাবন জীখনে সে কখনও পাব নি।

“মাস একটু বড় হলে, বাপ-মা তাকে তাড়া থানা-বাড়ী-চেয়ার-মাসের মত পাড়ার পাঠাত। তাকে করে অনেক পথের ছেলের সঙ্গে হাণ” কানাকনা হত; কিন্তু তার মতন

নতুন বাপ-মা অতি কর্তব্য করেই হৈকে ডাঙিয়ে নিত—গলে আর বসতি, পাখী। কেন যদি স্বাক্ষরপত্র হা-বগে ছোট-লোকের সঙ্গে কথা কবি, তবে সেখানে পানি নকা।

“পাড়ার বেতলে গুই ছেলেরা ইট-পাটেলের চুড়ে মারত।

“কোন দজাবতী এক সময়ে আট দশটি পরমা তাকে নিয়েছিল। সে অতি ঘরে সেগুলি জমিয়ে রেখেছিল।

“একবার যখন তারা এ গ্রামে আসে, তখন একদিন (সে সময় তার বয়স বছর আটেক হবে) ঠাকুরবাড়ীর পাটিলের ঘরে জমীদার গুপ্ত-বাবুরের ছোট ছেলের সঙ্গে তার দেখা। একজন খেড়ুড় তার কাছ থেকে জোর করে চট্টা পরমা

কেড়ে নিয়েছে, ছেলেটি হাপুল নয়নে কাঁদছে। বড়বরের বড়-মাছবরের দৌড়পায়ের বে কলিত ছবি এতদিন সে তার ছোটলোকে ছোট বাপের এঁকে রেখেছিল, ছেলেটির কাছা ঘেঁষে তা একবারে গলট-পালট হয়ে গেল। সে এগিয়ে গেল তার কাছে এবং তার কাজার কারণ তখন তার বহুদিনের সখ-সজিত দশটি পরমা একবারে তুলে নিল তার হাতে। ছেলেটি হাত বাড়িয়ে পরমা কটি নিল; তার কাছাও পেনে গেল। আনন্দ মেয়েটির বেশ ধর পর করে কাঁপছিল, সাহসে ভর করে ধরল সে তার গলাটি কড়িয়ে। পরমা পাওয়ার আনন্দে ছেলেটি তখন ভরপুর, সে কোন আশঙ্কিই করল না। যেহেতু যখন বেশল সে, বাবুরের ছেলে তাকে মারলও না, ধমকালও না, সে তাকে কাছে টেনে নিয়ে কোব করে তেঁপে ধরল তার বুক এবং তাই হাত ছুটি উপর বত পারল অকস্ম চুমা বর্ণন করতে লাগল। তাবপর চুটে পালাল।

“বেচারি মেয়েটির হল কি? তার আত্মবন-সজিত কথা-সর্ব্বই সে ত সঁপে নিল ছেলেটির হাতে, তার প্রথম আঘাতের চুমা অজন্ম বর্ণন করল তার করপরে। এ কি অসুরাগের অত্ম? কে জানে। কাণবালা ডিরদিনই রক্তবহ, কৈশোরেই হোক আর যৌধনেই হোক।

“তারপর কতদিন ধরে সেই ঠাকুরবাড়ীর পাটিলের দ্বারটি আর সেই ছেলেটির স্বন্দর মুখখানি শব্দে, বগ্নে, ভাগরনে তার চোখের সামনে নাচতে লাগল। তাকে আর একবার দেখতে পারার আশায় সে, ধার্মা সার্বা পরমা থেকেই হোক, আর বাতায় কববার পরমা থেকেই হোক, পরমা সন্নিহিত করতে লাগল।

“আবার যখন সে-পাড়াই গেল, তখন তার হাতে দেড়টি টাকা কমেছে। সে ছোট-ভগ্নন দেখা গেল, কিন্তু তার পৈতৃক দাওয়াইমানার ভিতর। একটি বড় কাতের কানে হাত গুট লগা একটু ক্রমি আংকে সজিত হলেছে, তারই পাশে পাড়িয়ে আছে ছোটবাবু। মুখখানি তার বেশাঙ্জিল বড়ই উজ্জল, বড়ই চক্কে; সেই চক্কে কাতের রঙিন তরল পদার্থের ভিতর দিয়ে যোগ হজিল বড়ই মগ্ন। মেয়েটির সোণে জেগে উঠল এক অশ্রু পিচ্ছন।

“যদি হতে এতুখ আর মুছল না। তার পরের বছর ফুলের পিচ্ছনের মাঠে তার সঙ্গে আবার দেখা: ছেলেবেলায় সেবে মার্গেল খেলছে। যেমনি দেখা, জমনি চুটে দিয়ে একেবারে তার গলাটা কড়িয়ে ধরা আর প্রাণ আংগে তার হাতের উপর অকস্ম চুমন। ছোকরাটি তেঁা করে একেবারে আংকে উঠল। তখন তাকে শান্ত কববার অত তার হাতে গুঁড়ো নিল তার সজিত বা কিছু ছিল,—তিন টাকা পাচ আনা। ছেলেটি কাল্য ফাল করে শুশু চেয়ে রইল।

“ছেলেটি টাকা-পরমা স্থলি নিল আর তার ইচ্ছাযত তাকে আরও কবতে কোন বাপা নিল না।

“তার বয়স যবে মেয়েটি তার সজিত দাবতীর সবই তুলে নিতে লাগল ছেলেটির হাতে। ছোট-ভগ্ন মগ্নার সেগুলি নিতে লাগলেন বিনা ওজন-আপত্তিতে, আর তার বিনিময়ে দিতে লাগলেন মেয়েটিকে ইচ্ছাযত তাকে আদর চুমন করতে। প্রথম বার চৌদ্ধ আনা; দ্বিতীয় বয়স এক টাকা দশ আনা; তার পরের বছর মাত্র বার আনা (সেবার কিন্তু পরমা কটি দিতে গিয়ে মেয়েটি কৈর কেঁপেছিল, আর অনেক মিনতি করে জানিয়েছিল যে বয়সটা বড়ই দুর্দ্বংস যাচ্ছে); শেষবার একবারে চার টাকা! তাতে গুপ্ত-বাবু খুব খুসী হয়ে যেয়েছিলেন।

“গুপ্তবাবু ছাড়া মেয়েটির আর কোন চিত্তার বিবদই ছিল না। গুপ্তও অইবরা হয়ে তার আগমন প্রতীক্ষা করত, আর তাকে দেখতে পেলেই তার মিকে চুটে যেত। তাতে মেয়েটির প্রাণ যেন আনন্দে মোহে উঠত।

“তারপর গুপ্ত একেবারে গুপ্ত হয়ে পড়ল। সে এখন শব্বের ফুলে পড়ে। অনেক চট্টা ও সন্ধান করে মেয়েটি এই তথা লাগ্নহ করল। তৈরী আংকে চুটীর সময় বাতীতে আগে। গ্রীষ্মকালে এই অকল তদেব আগমন সন্ধ্যা করতে

মেঘটিকে তার বাগ-মাঝ কাছে নানা কলি, নানা নিকিন খাটতে হ'ল। বনসবায়ী বহু ছোটো পল তবে সে বাগ-মাঝে হাজি করাল। হু বনসর সে ছেলেটিকে দেখে নি—
 “তাকে আস ডেনাই যায় না, ডেয়ারা সম্পূর্ণ বনসে গেছে,—
 বেশ বড় হয়ে উঠেছে, সাহসবন্দী চকচকে মেগাণার বোতাম দেওয়া কুন্ডের পোষাকে অক্ষর ডেয়ারাটি তার খাগা মানি-
 গেছে। ছেলেটি কিছু দেখেও তার দিকে চাইলে না,—পট গট করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

“ও’টি দিন ধনে সে শুভু কী বল,—কী বল। তারপর থেকে তার গুণ-কণ্ঠের আর বিদ্যম নেই।

“প্রতি বনসর সে এ অফলে আসিত, তার পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করত, বনসা করে কথা কইতে কি একটা গড় কবতেও পালে নি; সেও তার দিকে একবার ঘিরেও চায় নি। সমস্ত মন-প্রাণ নিয়ে মেঘটিকে তালপেয়েছিল।

“ডোম হীলোকটি আমার বলল—‘ডাক্তার বাবু, এট পৃথিবীতে ঐ একটিনাও লোককে আমি জীবনে চোখ ঘিরে বেরেছি। ওরকমটি দ্বিতীয় আর কেউ আছে কি না জানি না।’

“তার বাগ-মা মারা গেল। সে তখন একাই বাবলা চালাতে লাগল। তবে একটা কুন্ডের তাগবায় গুটো বাঘের মত প্রকাণ্ড কুন্ড পুষল,—কেউ বাতে তার উপর কোন অত্যাচার করতে না পারে।

“তার মনটা ত পড়ে থাকত এই গ্রামেই। এক বছর এখানে এসে দেখল ছোট-গুপ্ত বাবু হাসতে হাসতে হাত ধরে একটী বৃষভীকে লাগোতে তুলে ঘিরে তার পাশে নিয়ে বেঁলে বসল। এ তবে তার স্ত্রী! তার তবে বে হয়ে গিয়েছে!

“সেই রাতে টাইন-হলের কাছে একটা বে মস্ত খোড়া নাগরায়ার পুঙ্খ আছে তাতেই মেঘটিকুবল। হু একজন পদ-চলতি লোক দেখতে শের বাছ-খোঁড়া করে তাকে ভাল থেকে তুলল আর ধরাধরি করে এনে ফেলল গুপ্ত-বাবুর গাওয়াইখানায়। মরহরি বাবু নেমে এলেন, ডাক্তারি পোষাক পরে চেতনাস্ফার করলেন তার এবং তাকে চেমন এরকম কোন ভাব না দেখিয়ে কর্কশ স্বরে বললেন—‘তুই মাশী পালল না কি? পরমদার, আর কখনো ধেন এ রকম পাগলামি করতে হাসি নি।’

“সেইটাই তার অনেক ঘামি সেবে গেল। ছোটোবাবু তার

সঙ্গে কথা কয়েছে! কিছুকাল ধরে রইল সে এই আনন্দেরই মনস্তপ হয়ে।

“বিশেষ জিন ও পীড়ানীড়ি লেগেও গুপ্ত মহাশয় পারিশ্রমিক হিসাবে তার কাছ থেকে কিছু নিতে রাজী হলেন না।

“এই রাতে মেঘটির জীবন কাটিতে লাগল, খান্না-চেহারে মেঘানত করে আর ছোট-গুপ্তর কথা চেবে। বছর বছর আসে এই গ্রামে, বাওয়াইখানায় শাদি-বেওয়া জানালার চিত্র দিয়ে চেয়ে থাকে তার পানে। মাঝে মাঝে চিত্রের চুকে এটা-ওটা গুণ্য কিনতে যায় তার কাছে;—উদ্ভেদ তাকে ভাল করে দেখা, তার সঙ্গে গুটো কথা কওয়া, নিজের উপাধিত টাকা তাকে দেওয়া।

“মাগেই বলেছি, পত্নীমার্ত মনে সে মারা গিয়েছে। তার এই রকম জীবন-কাহিনী বিবৃত করবার পর সে আবার বিশেষ জিন করে ধরল যে, থাকে সে মারা জীবনটা বৈধব্যের সহিত সমস্ত মন-প্রাণ ঘিরে ভালবসে এসেছে, তার পেই একবার মালবাসার পাতক তার সমস্ত জীবনের উপার্জনের পরমা-গুলি ঘিরে আসতে হবে। সে যে সমস্ত জীবন পেটেছে, তা শুধু ঐ তালবাসার পাতার গুপ্ত। নিত্যই প্রোভনীয় জিনিষ থেকেও আপনাকে বঞ্চিত করে সে ভবিষ্যে রেখেছে এই টাকা ক’টি। এই টাকা ক’টি গাড়ে পড়লে স্ত্রীলোকটির বৃত্তার পর অন্ততঃ একবারও যদি তার এই ভোমের মেঘটির কথা মনে পড়ে!

“এই বলে স্ত্রীলোকটি একহাজার সাতানব্বই টাকা এগার আনা আবার গাড়ে মিল। আমি সাতানব্বই টাকা এগার আনা দিলাম আনন্দের বৈধব্যী ঠাকুরকে, স্ত্রীলোকটির অশ্রুটি কিনা, সমাধি প্রকৃতি অস্তিম কামের জন্ত; তার বৃত্তার পর বাকী টাকা নিজেই দিয়ে বেলায়।

“তার পরদিনই গেলান গুপ্তের ছোটোবাবুর কাছে। বাওয়া-নাগরায় শেখ করে তাঁরা স্ত্রীপুরুষে মনে আছেন চেহারের উপর সাদনা-সামনি হয়ে। তখনই বেশ ছোটুই, নাচস-হুঙ্গল, নিরস্তর বাওয়াইখানার নানাজন গুণ্যের গড় ভঁকে ভঁকে বিসতগামি, আপনাদের পরবেই আপনাজ্ঞা পরীক্ষান, বেশ সুস্থিত।

“মাগকে একখানা চেয়ারে বসালেন। এক কাপ চা’র গুণ্য হল। চা-পানিতে আমি চড়িত কণ্ঠিত কর্তে আবার

গর হুক করলাম। যেন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কাহিনীটা শুনে তাঁদের চোখে জল আসবে।

‘বেশি শুভলেন যে, সেই হা-ঘরে খানা-দায়া ছোটলোক জোনের মেয়েটা তার প্রেমালস্ক হয়েছিল, ছোটলোক একবারে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন চোখের থেকে,—রাগে তাঁর চোখ মুখ লাল, যেন সেই হতভাগিনী তাঁকে নীরবে যেন মনে ভাসিয়েছে তাঁর মান, সন্তান, ইচ্ছাও মন হরণ করে নিয়েছে।

‘তাঁর স্ত্রীও বেশলাল দুই চোখেছেন। রাগে বলবার কোন কথা খুঁজে না পেয়ে চণ্ডাকরে বারকতক শুণু বলতে লাগল—‘আ ম’লো! সেই হা-ঘরে তিথিবিটা! সেই হা-ঘরে তিথিবিটা!’

‘নরহরি বাবু তো লম্বা লম্বা পা কেলে ঘরের ভিতর পাখ-চারি করতে হুক করলেন। তাঁর কাপড়-চোপড় এলোমেলো হয়ে গেল। তিনি ভাতা-ভাতা ঘরে বলতে লাগলেন,—‘ডাক্তার বাবু, বাগারটা কিছু বুঝতে পারেন? এ যে ভয়ানক কথা! মাগি বেঁচে থাকতে যদি এটা জানতে পারতুম, তাকে নাভানাবু করতুম, পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে তেল খাটাইতুম, জেল থেকে যাতে বেরতে না হয় এমন করতুম।’

‘আমার উদার নৌতার পরিণামটা দেখে আমি তো হুচকিয়ে গেলাম। কি বলব, কি করব বুঝতে পারলাম না। কিছু আমার নৌতা-কার্যের শেষ পর্যন্ত তো এগুতে হবে। আমি বললাম,—‘বুড়াকলে স্রীলোকটি তার সারা জীবনের উপার্জন এক হাজার টাকা আশনাকে দিতে বলে দিয়েছে। এই বাগারটা এখন আশনার এত অস্বস্তিকর হচ্ছে, তখন সে কেনে টাকাটা নিয়ে না হয় কোন জনহিতকর সংকার্যে ব্যয় করবে।

‘এই অত্যাশয়ী সংবাদে অস্তিত হয়ে তাঁর প্রকটনট—স্রী ও পুন্ড, চোরে হইলেন আমার দিকে বিশ্বাস-বিস্ফারিত নেয়ে।

‘আমি পকেট থেকে বের করলাম তাঁকার খলিটা—সেই অবজাত রূপিত টাকা,—নানান সেধের নানান রকম মুদ্রা,—গোলা, রূপো, তামা। জিজ্ঞাসা করলাম,—‘এখন কি করবেন?’

‘নিম্নীই আগে কথা কইলেন। বললেন,—‘হাঁ, এখন স্রীলোকটির মুদ্রাকালীন শেষ ইচ্ছাটা এই রকম, তখন এ টাকা তো কোন রকমে প্রত্যাবান করা যায় না।’

‘বাসী মহাশয় একেবারে ভাবাচাকা খেয়ে গিল্লেন। ঘলে উঠলেন,—‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। ও টাকাতে না হয় ছেলেমেয়েদের কোন আদৌ-প্রসাদের জিনিষ কিনে দেওয়া যাবে।’

‘আমি নিভাত নীরস ভাবটাই বললাম—‘তা যা’ আশনারের অস্বস্তি।’

‘ছোটবাবু বললেন,—‘স্রীলোকটি এখন টাকাটা আমার বেবার কল্প আশনাকে তার নিয়ে গেছে, টাকাটা নিয়েই যান। কোন সংকার্যে ওটা ব্যয় করলেই হবে।’

‘আমি টাকাটা শুধে নিয়ে নব্বাংর করে দিলার হলান।

‘তার পর দিন সকালেই ছোট শুশু মহাশয় আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। হুচ-বুচ হয়ে বললেন,—‘হ্যাঁ, ভাল কথা, তাঁর একখানা মাগবোকাই গাড়ী ছিল না, সেট—সেট মেয়ে মাদ্রাসটার।’ সে পুনশ্চো গাড়ীখানা নিয়ে আশনি কি করবেন?

‘কিছুই নয়; সরকার হয় নিয়ে ছেড়ে পারেন।

‘বেশ! বেশ! ঠিক ঐ রকম একখানাই আমি খুঁজ-ছিলাম। আমার মূলবাগানের মালীর বহুপাতি রাখবার একটা পেড় মত করব।

‘বলেই হু হু করে এলে বাজিলেন। আমি ডাকলুম। ‘তাঁর ছোটো বুকা বলল আর ছোটো কুকর আছে। সেগুলোও কি আশনি রাখবেন?’

‘নরহরি বাবু পরমত খেয়ে শাড়লেন। খানিক পরে বললেন—‘জ্যা—না, না। কি লক্ষ্যমান! ওগুলো আমার কি হবে? ও আশনি যা উচ্ছে তাঁর কখন।’ বেলে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

‘আমিও নিদান এক ক’কানি। কি বলেন? আমি ডাক্তার, আর উনি হচ্ছেন নাওয়াইকার; এক কাষগার থাকি, অমদ্যাসটা ভাল নয়।

‘কুকর ছোটো নিকটে রাখলাম। আশনার খোষ্টন টাকুরের খানিকটা খান-কমি আছে। তিনি বলল ওটাই তার নিলেন। গাড়ীখানা ছোট শুশু মহাশয়ের বাগানের বহুপাতি রাখবার ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর টাকাটা নিয়ে তিনি পাঁচখানা বেলে গবে শেয়ার কিনে কেলেছেন।

‘সাগর অম্বাশেব, সত্যিকার গেরেন—নিখুই সেই

আমিবাণিবে বলে ভালবাসিন

আমার বহাৎ এই তোমার এই আমার জানিনে—

এই ধরণের ভালবাসার নীরব উৎসর্গে, কোন কিছু প্রত-বানের প্রত্যাশা না করে নীরবে নিজের সমস্তটাকে দহিতের চরণে নিঃশেষে দিলিরে বেবার,—এই একটা মাত্র ঘটনা আমার জানা আছে।’

ডাক্তার বাবু চুপ করলেন। দেখা গেল তার-বাহাছরের গৃহিণীর চোখ চটো কলে টু টু করছে। তিনি কাদ-কাদ হয়ে বললেন—‘সত্যি, সত্যি, যেবেদাশুখই শুণু আসল ভালবাসতে জানে। ও

বাখাশ্রেষ্ঠ লালমোহন

डेभकुवर्गिक।

প্রাচীন কাল হইতে জাতিগত ভেদে, "সভ্যতা-বাহুশূন্যতা" সংগ্রাম-
খণ্ডের একটী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুতঃ ইহাও প্রকৃত বাস্তব।



হাফিজা নাসিমা বেগম ।

গীতায়ের অন্তর্ভুক্ত অল্প একটি সাময়িক পটভূমিতে পারে বা একটি সামান্য
 ভাষা কল্যাণের কল্পিত পারে, গীতায়ের উদ্দেশ্য একটি প্রকৃত জটিল ইতিহাস,
 জটিল ও উদ্ভাসিত ইতিহাস, গীতায়ের কল্পিত ইতিহাস নিম্নলিখিত
 কল্পিত আখ্যায়িকায় উদ্ভাসিত কল্পিত পারে, সাম্প্রতিক বহু ইতিহাস
 কল্পিত উদ্ভাসিত ও কল্পিত পারে, সেই কল্পিত আখ্যায়িকায় উদ্ভাসিত
 কল্পিত-আখ্যায়িকায়। ইতিহাসের বিভিন্ন ও উদ্ভাসিত বহু কল্পিত-আখ্যায়িকায়
 কল্পিত-আখ্যায়িকায় কল্পিত ও উদ্ভাসিত উদ্ভাসিত বহু, কল্পিত-আখ্যায়িকায়
 কল্পিত ও কল্পিত-আখ্যায়িকায় উদ্ভাসিত কল্পিত-আখ্যায়িকায়, কল্পিত-আখ্যায়িকায়
 কল্পিত-আখ্যায়িকায় উদ্ভাসিত কল্পিত-আখ্যায়িকায়, কল্পিত-আখ্যায়িকায়

উল্লিখিত পত্রাঙ্গীর জারসে, জামাবের বেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের
 প্রথম পুং. যে সকল মনীষী বাস্তবিকর ভক্ত স্বাভাৱণ ইংরাজিগেন, তখনো
 "ভারতবর্ষে ত্রিবিদীশী" প্রাকলোপাল বোম্বো মার আশাযেব মিকট ডিগমত-
 িয় হইত। আশিবে। ইংরেজ লক্ষ্যে অমর কবি লীলকন্ঠ গিথিয়ায়েন—

“ଆକାଶ-ରାଜ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମହତୀ
 ବସନ୍ତ ଋତୁର ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ,
 କଲ୍ୟାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ,
 ମହାତୀର ମହାତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ।”

—**শ্রী রামকৃষ্ণনাথ ঘোষ**

চাম্পোপালার সামলমজিক অস্ত্রের ব্যাপ্তি—কিংবাগিটাল জিহ্বা, চাম্পো-
পাল জিহ্বা, পিঁপেজিহ্বা যেন প্রভৃতি বলা হাত অনেকই বিদ্যুৎ বৈদ্যুতন
কিছু প্রদান করবে প্রদেয় সেই মুহুর্তে বহু প্রকারে কথ্য বিদ্যুৎ
বৈদ্যুতন। সেই—

"হীৰাজি আৰু শ্ৰী কেশৱ বিদ্যাৰ
মৰিৰে চাওঁও কৈছে ভাৱে কিল্লা কেল
আৰু ম'হনাৰ বাপী ধৰ্ম টান্ধন"

দে ম্হি কি পুণ্যায়ঃ? বার্মাদেশবন্ধনপর বেদান্ত আবিষ্কার
 হুদয়ভিগ্নেন, রাজনীতিক মোক্ষপন্থে নহেন। তাহার পর রাজনীতিক ক্ষেত্রে
 জ্ঞান একই দ্বার তিনটি উৎস জ্যোতিষের আবিষ্কার হইল— জ্যোতিষ্য
 বংশোদ্ভাব্য, কালীভক্ত বংশোদ্ভাব্য, ও দ্বাপরবোধে বোধ। ইহারপর মধ্যে
 উনিশে শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে লালমোহন বসু ও বিবেকানন্দ
 ভূষণে বেদান্ত ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন, আর কেহ কেহ ভেদান্ত ব্যাখ্যাত করিতে
 পারেন নাই। ইংলণ্ডের লর্ডব্রট্ট বাস্তব জ্ঞান ত্রাট্টি আব্দুহ দ্বিতীয় গুপ্তায়
 বহুতঃ পুণ্যায় হুদয়ভিগ্নেন, ইংলণ্ডের তিনটি জ্ঞান তাহারের প্রতিবিম্ব
 ভূষণে শাস্ত্রাভ্যাসে জ্ঞান করিতে উৎসাহের উৎসাহে লর্ডব্রট্ট একজন
 জ্যোতিষ্য— দ্বাপরবোধ— অধ্যাপক করিয়াছিলেন এবং আইজি বসু
 জ্যোতিষ্য লিখিত কোন বিষয় লিখিত হইতঃ হুদয়ভিগ্নেন জ্ঞান করিয়া



अथवा (अथवा) ५६।

ଏକ ପଟିରେ ହସ୍ତ ଦ୍ଵିତୀୟ ତାହାହୋଇଥିବେ ସତ୍ୟେ ମର୍ଦ୍ଦାପ୍ରାପ୍ତ ପାଲିତାବେଳିର ମହାପ୍ରଭୁ
ହୋଇବ ନାହିଁ କହିଥିବେ । ଦୂରସ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆସିବା ସମୟେ ଏକାକୀ

କମ ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଭହୋଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେକାନ୍ତ କଞ୍ଚିତ ସମୟ
କରିପାରି ।



ଜାତୀୟତା ଦେଖ ।

କନ୍ୟା ଓ ବଂଶାବିବରଣ

୧୦୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ୬-୧୧ ଡିସେମ୍ବର ଦିନରେ ଜାମାୟାରେର ସେନା ନବୀରା ଚୁକ୍‌ନାମରେ
 କନ୍ୟାବ୍ରହ୍ମଣ କଲେ । ଇହାର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଡାକା ଜିଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜୟପୁର
 ସୀମା ଅବସିତ । ଏହିର ଆଉଁର ସିନ୍ଧୁନାମରେ ନାୟକାଠୀର ବିକଟବିଳା ତରାଫିର
 ଆସେଇ ଇହାର ଐତିହାସିକବାଣୀ ଉପସାର ଦିଅନ୍ତେ । କାହିଁକିନାମା ଏ ପ୍ରାଚୀନ
 ଚୁକ୍‌ନାମ ନାୟକାଠୀ ଓ କଳାପିତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କବିର ସାମ୍ବନ୍ଧେ ହୁଏତ । ଶେଷର ସେନା
 ନାୟକ କୈଳାସ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି ଶିବ ପୁତ୍ର ସାହିବା ବର୍ମାମୋହନ କଲେ । ଏହି
 ନାୟକ ଇତିହାସ-ଅନୁସି ଗଜା ଗଜବନ୍ଧେର ମୁର ଗଜା ସୋମନାଥଙ୍କ କୋର
 ବାହା-ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିବାର ଏକ ଚକ୍ରର ଗତିର ଉକ୍ତ ଶିବପୁତ୍ରଙ୍କର ସେବା ଏକଲବ୍ୟର
 ବିବାହ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲେ । ତିନି ଶତବ୍ଦରେ ଆସିତେ ପାଆନ୍ତେ ତରାଫିର
 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶକ୍ତିରାସ ବାରିବା ନାୟକା ଇତିହାସରେ ଶ୍ରୀରାମବାଣୀର ଉପସାର ଏକ ଶ୍ରୀ
 ଚୌଧୁରୀ ପରାମର୍ଶ ହୁଏ । ଗଜା ସୋମନାଥଙ୍କର କୁରୁବାହାଣର ଶେଷର ହେତୁ
 ଶିବ ହୁଅନ୍ତି କଳାପିତା ଏବଂ ନାୟକ ଗଜା ଶେଷର ଶାନ୍ତିରାଜ ଶେଷର ହେତୁ,
 କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ କଳାପିତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିରାଜର ବିକଟ ତରାଫିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।
 ଶେଷର ଗଜା ଶ୍ରୀବିହାରୀବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପସାର ବାରିବା ଚକ୍ର ସେନା ସାମ୍ବନ୍ଧରେ
 ତିନି ଶେଷ ଓ ଶେଷର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମ୍ବନ୍ଧ କଲେ । ଶେଷର ଇହାର ଡାକା
 ୧୦୦୦ ବାରିବା ଶ୍ରୀବିହାରୀବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ବାରିବା ଶେଷର ନବୀରା ଚୁକ୍‌ନାମରେ
 ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୀମା ସ୍ଥିତିର ଗଜା କଲେ । ଶେଷର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଶେଷର ଶ୍ରୀବିହାରୀ
 ନାୟକାବ୍ରାହ୍ମଣର ଶ୍ରୀବିହାରୀବ୍ରାହ୍ମଣ ସେନା ଆସିବାର ଶିବର ନାୟକା ଶ୍ରୀବିହାରୀ
 ଏକଲବ୍ୟର ଶାନ୍ତିରାଜ ସାମ୍ବନ୍ଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ଏକ କଳାପିତା ।

ଜାତୀୟସ୍ତରରୁ ମିଳିତା ସାମ୍ବଲୋଚନା ସେକ୍ସ ଉପାଦେୟ ମାନବବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

ঐতিহ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন দাসের অন্ততম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার স্বর্ণ ও সমাজ-সেবারিক অসুখাবস্থাতে তাঁহার আর্থিক সাহায্যই ছিল। ইংল্যান্ড-শিক্ষা-বিষয়ে তিনি অন্ততম দিকটাই এই লোক মনোহর। তিনি অন্ততম ঐতিহ্যে ছিলেন। তিনি উকালতের দপ্তরী কার্যেও করিয়াছিলেন এবং দলবদ্ধে তাঁহার দপ্তরার্থে তাঁহার নামে একটি জাহাজের ঐতিহ্য করিয়াছেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন লর্ড অলম্যান্ড কর্তৃক লন্ডন বারীর পক্ষ (সমরক) বিজুত হন। এই পর সেখানে প্রবাসেও অশেষ। যেরকম কষ্ট লভ্যের ছিল। রামমোহন তিন পুত্র রাখিয়া যান। কোট বনামকর্তা ব্যক্তিরা রামমোহনের ঐতিহ্য আলাদাভাবে বৈধাঙ্গিকত করিয়াছেন, মনোহর লালমোহন শিখার উকালতী কর্তৃক লন্ডন পক্ষের প্রত্যক্ষ করেন। কনিষ্ঠ দুগলামোহনও এই প্রকারেই অসুখ করেন।

चित्र 1

দৈনন্দিক জীবনে প্রচলিত অসংখ্য ভুলের কারণ হওয়া বিদ্যা-
ভিত্তিক। সত্যকে বস্তুকে পরিচিন্তা না করেই কিছু-কিছুকেই ‘হাতে খড়ি’ হু হু
কিছু ‘হাতে খড়ি’ হওয়ায় পুণর্জন্ম লাগে। অতীতের পন্থা পুণর্জন্ম
ও অতীতের পন্থার উপর নির্ভর করেই ও পুণর্জন্ম পুণর্জন্ম। অতীতের
কোনো ভুলে ভুলে পুণর্জন্ম হয়। পুণর্জন্মের পন্থা পুণর্জন্মের পন্থা



কবিতা/গল্প/ভাষা

ଆମିଲେ ତିନି ଆଙ୍ଗୁଳ : ଝିଅଛାଲେନ : ବୁଦ୍ଧବୟସେ ଲାଲଗୋବିନ୍ଦର ବିଦାୟ
 ହେ : ୧୯୭୭ ବୁଝିଲେ ତିନି କଳିକା : ବିପଦାଳୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳକ : ମାଳିକା

वाचस्पत्यः हिंस्रकृत्तः बलिनाः यज्ञकालिकम् ।

[illegible]

যদি পুণ্ড্রভন দলিলে উদ্ভঙ্গ কালিঙ্গ আতাস পাওয়া যায়,
 কিংবা নতুন দলিলে পুণ্ড্রভন কালিঙ্গ লেখা দেখা যায়, এবং
 যদি তাহার অঙ্গর ভাঙা বা মোছা হয়, তবে তাহাকে কুট
 দলিল বলা হইবে।

ହାର୍ଡିଡେ ନା ଓହା ବାବ : -

ସଞ୍ଚ କାଳମାର୍ଗୀ: ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: କୁଟୁମ୍ବିକା ।

विष्णुनाडिकाकोनः पद आह्वितः डिङितः ७ ४२ ॥

যে লেখা কাকের পাখের মত অবিকৃত হইয়া থাকে,
তাহাকে ভাল বলিয়া গণ্য। কিন্তু যাহা বিহীন হইলেও
হলিল অগ্রাহ্য, বাহ্যতে কিছু নূতন পরিবেশ হইয়াছে কিংবা
যাহা ছিন্ন তাহাও মূল্যবান নহে।

(গ) - কংক্রেট অথবা অন্য কোনও অস্বাভাবিক
 বিকଳ রঙ ।

ସହମ୍ପାଦିତ ସଂସ୍କରଣ—

६६३-लिङ्ग-की आर्चणोपसङ्ग आत्मनाहृतः ।

निष्प्रार्थनविनायकादकृष्टं ज्ञेयम् न सिद्ध्यति ॥

বুধু' যদি বলিল কহে, সে ব'লিল ফলহীন ; শিশু, ছোট
 ব্যক্তি, যৌলোক, উন্নত, বামন ও যোগ্য যদি বলিল কহে
 তাহাও অগ্রাহ্য, নিশাকালে, ঠাকি দিন কিংবা বলপ্রয়োগে
 প্রভু লেপাও পিত্ত হয় না ।

ସାମଗ୍ରିକ ବୟସ : -

महाविद्यालयकला२०॥१३: ३ १२।

५३०५१: लिखितः अभिलेखः ८५०५१: ८५०५१

काश्चातिवेत्र वदन :-

कलःआनापिकेःतम रुपाग्रसन भिडिरेः ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣୋଦୟଃ କୃତଃ ସେବାଃ ନ ନିବର୍ତ୍ତତି ॥

যথক ত্রযা সেবনে যত কিংবা উন্নত, অক্লান্ত ব্যক্তি
 কিংবা ভীত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত সেবা অগ্রাহ্য। জলচরী
 সাহায্য করিলেও ত্রযা অসিদ্ধ, অবতর ব্যক্তি বা পীড়িত
 ব্যক্তি করিলেও তাহা অগ্রাহ্য। এই তালি অসিদ্ধ হইবার
 কারণ এই যে, এই সময় কেহে অবাধ্য। ঘটনার দিবস
 সম্ভাবনা আছে।

লেখক কিংবা সাক্ষী যদি মুদ্রিত থাকি হয়, তাহা হইলেও
হালিল অসিদ্ধ হইবে।

ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ :—

ପ୍ରାୟତଃ ଏକପ୍ରକାର ବା ମାତ୍ରା ସହ ବିଶେଷିତ :

৪ টুলমা: ৩ ৫০ গ্রাম: (লক্ষ্য) বার্ষিক উৎপাদ: ১০

ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ :-

সাক্ষ্যসোপানপুস্তক টি পড়' বৈ লেখকগণ বা ।

ସମ୍ବିକଳାପି ବା ହୋତା/ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ୧୩ ।

সাকো, লোকক, বনিক বা দারুণক ইহাভেদ নথো কেহ বনি
নিম্নবীষ চাৰিভেদ ওন, তাহা হইলে লেখা চুট বলিমা পৰিতা:বা
কৰিবে।

লেখা-সোঁপের মধ্যে যে গুলি অশ্রু কট এবং গুলি সে গুলি
বিগলীকে বাহির করিতে হইত, অশ্রু গুলি বিচাফক বা সত্যদণ
বাহির করিয়া দাউতেন। কিন্তু প্রমাণ শেষ হইলে অণ্ড পক্ষ-
গণ নূতন বোম্ব বাহির করিয়া গুলিগের সত্যতা সম্বন্ধে বাবা
উৎপন্ন করিতে পারিতেন না।

নিলিমে তার নাম আছে সে নিলিমে দেখে নাই, আরও
সাক্ষী সাক্ষা দিল না, বিবাহী বধন এই কথা বলে, তখন
লেখককে জাল বলিয়া মনে করিয়া বিচার করিলে। যদি বামী
বিবাহীর কথিত বোধ নিরাকরণ করিতে না পারিত, তবে
বামী যোদ্ধাও হারিত, উপনন্দ দিপ্যান্তিযোগের ভুল
হিত হইত। ধনী যদি বহুতে সাক্ষীসম্মিত দেখা লিখিতেন,
এবং সেই উপদত্ত দেখা দ্বারা যদি স্বীকার না করিতেন, তবে
তাহা কুট বলিয়া বিবেচিত হইত।

ਕਾਟਾਫ਼ਰਮ ੩੬੨ ਪਾਏ :—

पवित्रेण वाचस्पत्ये लिखितः सप्तविंशतिः खण्डः

उत्तर कठः न उत्तर कर्षी कठः इति विज्ञाप्यते ॥

যদি কণী নিজে লিখিয়া লেখে নাই বলিত, তখন পরস্র
সাক্ষিপদের দ্বারা হুটে কি অল্পটো ভাণা বিবেচিত হইত। বলিল
নিশ্চয় কি বেশ নাই। সে বিষয়ে সাক্ষ্যটো গ্রাহ্য।

ਕੀਰਤੀਮਤਿ ਅਨਾਮਕ :-

କୃତାକୃଷ୍ଣବିବାହେନ ମାନ୍ବିତିଃ ସଂସ୍ତମିର୍ଭଃ ।

ପଞ୍ଚିତ ଲେଖାବିର୍ମଳେ କବି ଗୋବିନ୍ଦ ଶିଖର ଦିକ୍ଷିତଙ୍କ :—

[illegible][illegible]

যখন কোনও পত্রসংকে সংশয় হয়, তখন তাহার সত্যতা
প্রমাণের জন্য পত্রের ব্যক্তিগতের হস্তলিপি পরীক্ষা করিলে,
লেখকের ক্রিয়া ক্রম, বিশেষ চিহ্ন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তু

এবং ঘটনার সত্যতা কিংবা অসত্যতা বিবেচনা করিয়া সত্য নির্ণয় করিবে।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

স্বকিত্ত্বলব্ধাঃ স্তম্ভাঃ প্রাণং যদন্তিমিতিবিস্তৃতিঃ।

বুদ্ধি-প্রাপ্তিঃ ত্রিমা-ত্রিমা-স্বকিত্ত্বলব্ধাঃ।

সংশ্লিষ্ট মনিস্থান সত্যতা-নির্ণয় কর্তৃক বুদ্ধি হস্তমিতিবিস্তৃতি অতিবুদ্ধি লেখ্যের লেখ্যত্ব তুলনা করিবে। সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা বিশেষ চিত্ত, পক্ষপদের সম্বন্ধ, আগমনেরূপ এবং লেখ্য হইবার কারণ, পক্ষপদের মনিল করিবার সম্ভাবনা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া তত্ত্ব নির্দেশ করিবে।

যখন লেখ্যসত্যতা ভাবিত না থাকিত, তখন তাহার বহু-কৃত অল্প লেখ্যের সহিত তুলনা করিয়া লেখ্য নির্ণয় করা হইত। মিশ্রিত বিষয় মিশ্রিত বিষয়ের দ্বারা নির্ণয় হইত। কাকেই যখন লেখ্যসত্যকে সংশয় হইত তখন অল্প লেখ্য দিয়া তাহার তত্ত্ব বা অতত্ত্ব নির্ণয় করা হইত। দৈনিক সাধো কখনও লেখ্য হইত বা অসত্য বিবেচনা করা হইত না।

৩। প্রাচ্যেন্দ্রিয় বস্তু পাঠ :—

অন্তঃকরণস্থানান্ন ন কদাচিৎ প্রবাহতে।

ওষোষ্যাদাঃ ক্রীড়া কদাচিৎ সর্বাণিঃ প্রবাহতে।

প্রত্যক্ষকে কখনও অনুমান দিয়া বিপ্রতিপন্ন করিবে না, সাক্ষ্যপদের বাক্যেই কখনও লেখ্যকে চুই বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

বসিলে যখন সাক্ষী থাকিত, তখন তাহার মনিলের সত্যতা বা অসত্যতা বিষয়ে বলিতে পারিত, কিন্তু যে মনিলে কোনও সাক্ষী থাকিত না, সে মনিল লেখক ও পক্ষপদের হস্তমিতি তুলনা ব্যতীত প্রমাণিত হইত না।

বিদ্যুৎপ্রবাহের বিদ্যুৎ বলিমাছেন, যেখানে ভূমি, বন, সাক্ষী বা লেখক নৃত, সেখানে তাহার বহু প্রমাণ দ্বারা লেখ্য সিদ্ধ করিয়া লইবে।

পঞ্চাংকায় বলিয়া যে সব অল্পমাত্র বেগ বা হইত, সত্য সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমুগ্ধ হইলে তাহাকে প্রমাণ গণ্য করিতেন। কিন্তু অল্প হইলে পুনরাবৃত্তি নির্ণয় করিতেন। অত্যাধিক তথা কবে স্থাপন করিলে বারম্বার পঞ্চাংকায়ও অগ্রাহ্য করিবে। চাতুরী না থাকিলে বর্তমানের সমন্বিতকর ব্যাপারে পূর্ণপ্রবৃত্তি ভিত্তি বিচারবিস্তারিত ওয় আর

পুনর্নির্ভাষ হয় না। লোকলোপের *Non Judicate* পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র ছিল যেহেতু—সেখানে সত্যতা যদি তথ্য বলিয়া গৃহীত হইত, তাহা হইলে পূর্বের ওয়পত্র অপ্রমাণ্য বলিয়া মনে করা হইত।

শাসনবিধানে সংশয় হইলে সাক্ষ্যের দ্বারা, সুপ্রাচ্যেতি বেশি সত্যনির্ণয় হইত।

কাহাংকন বলেন :—

দ্ব্যতকঃ ত্রিমাণ্ডঃ বুদ্ধিভ্যঃ স্তম্ভিকতঃ।

পক্ষাঃ প্রাণসংক্রমঃ স্তম্ভিকতঃ পক্ষিকতঃ।

যে শাসনে ঐক্য সুপ্রাচ্যে, বাহ্যের অর্থ শুদ্ধ, বাহ্যেতে সাক্ষ্যত চিত্তাবি আছে এবং সাক্ষ্যের বহু আছে এবং যে শাসন বিষয় তুল্য হইয়াছে তাহাকে শুদ্ধ গণ্য করিবে।

ভোগের দ্বারা কানন্দ-লেখ্যও শুদ্ধ হইত।

পক্ষপত সর্বাধিকার কেন বেগম সুপ্রভেত।

যদিও নির্ণয়ঃ প্রাচ্যঃ পক্ষঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ।

লেখ্যসংলগ্ন যখন পক্ষ প্রাপ্তির পরিধানে বিশ বহু ভোগ হইয়াছে, তখন সে লেখ্য সর্বপ্রমাণবিস্তৃতি বলিয়া বিবেচনা করিবে।

মনিল মূল যদি কিছু লাভ হইয়া থাকে, কিংবা মনিলের যদি প্রভাব হইয়া থাকে, তবে সাক্ষ্যপদ মনিতা গেলের লেখ্য সিদ্ধ হইবে। প্রভাব প্রাচ্যেতি পক্ষিকত পক্ষ।

নাগর তাহার অর্থ পাঠ—

পক্ষিকতঃ স্তম্ভিকতঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ।

লেখ্যঃ স্তম্ভিকতঃ পক্ষিকতঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ।

যে লেখ্য যথাকালে প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ অল্প তাপনা করা হইয়াছে এবং লোকসদকে প্রচার করা হইয়াছে তাহার 'প্রভাব' হইয়াছে—এইরূপ লেখ্য সাক্ষ্যপদের সুপ্রাচ্যের পরেও বলমান থাকে।

তখনকার দিনেও বেনামি মনিলের খুব প্রচলন ছিল। বেনামি মনিল সম্বন্ধে বাহ হইলে বাহ্যের হাতে মনিল থাকিত, সাধারণতঃ তাহারই ভোগ নির্দেশ হইত।

প্রাচ্যপতি বলেন :—

যেহেতুতে পক্ষঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ।

লেখ্যঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ প্রাচ্যঃ।

প্রাচ্যপক্ষকে বক্তব্য করিবার ক্ষমতা মনিল বাহ্যের হাতে থাকিবে তাহারই ভোগ নির্দেশ করিবে।

নারদ বলেন :—

লেখা: অক্ষরান্যাক্ষরঃ যেষ্বরক্ষতঃ তৎকথং ।

বিগ্রহাণ্যে পঠীক্য: তৎ লব্ধবাক্যেতুতঃ ॥

ধ্বন্য কাটাক্তেও তাঁকী দিবার ক্ষম অক্ষর নামে মলিল কড়া ঘাট, সেট, বেনামি মলিল লব্ধে বিলংবান চটলে, সেট মলিল লব্ধে মনবান-প্রতিবান চটগাছে কি না, তাহার উৎপত্তির কারণ ও হেতু, স্থির করিয়া দিবার করিবে ।

বৃহস্পতি বলেন, লিপিক্রাননীন স্ত্রী, শালক ও অর্ধকেক বক্য্য করিবার ক্ষম তাহাদের আত্মীয়গণ লেখা করে বৃক্ষ ও আগুন বেশিরা তাহাদের নির্ধর করিবে ।

মাহুয মাহুযই, অতীতেও জাল অগ্নাহুই চলিত ।

বৃহস্পতিতে পাই—

জায়া কাণ্ডে বেনকালকলনঃ কুটাকলনঃ ।

কুর্জয়ি মনু: লেখা: তৎ কলন কিতাব্যে ॥

জালিগাহেরা বেনকালকলন, কাণ্ডা জানিয়া জাল মলিল তৈয়ার করে, তাহা জানিয়া বহুপূরক মলিল পঠীকা করিবে ।

কাত্যায়ন বলেন, মর্পণে যেমন প্রতিকলিত বিধ অসং হইলেও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, তেমনই কুলী লোকে জাল মলিল করে । নারদও কুটলোখাকারক চব্বাছায়েন কণা উল্লেখ করিবারছেন ।

বখন নাম গোত্র তুলাত্বং হটত এবং কণীত বহুত্বং হুগে টেত, তখন যদি কণি খন লট নাট বলিত, তখন উপাযাত্বং না থাকায় বিধা প্রধাণ গ্রহীত হটত ।

প্রমোদতি তাহার বিধান দিবারছেন :—

বগমণ্যোত্রেন্দ্রগজকশ: লেখা: তত্ত্বং তৎকথং ।

অকুলীতে খান হত কাণ্ডে বিধান নির্ধর ॥

বহি অধর্ম্য বলিল বেশিরা ও বিন বহুব্যেব মধ্যেও কোনও প্রতিবাদ না করিত, তবে যে মলিলকে স্থির বনিয়া গ্রহণ করা হইত ।

হাব্যের কবালী বা বেরেনি বত কেহ জাল কবিলে তাহাও বিশেষ দণ্ড হইত, তাহারো চিহ্না, পাণি ও পাণি কর্তন করা হইত ।

যে সমস্ত লেখার বিষয় বলা হইল, তাহাও উপগত

লেখার চেয়ে আনান্দিক বহুশ্লিষিত লেখা বলবান, আনান্দিক বহুত্বের চেয়ে সনানিক বহুত্ব, সনানিক বহুত্বের চেয়ে অক্ষরত্ব, অক্ষরত্বের চেয়ে বাচকীয়, বাচকীয়ের চেয়ে শব্দন বলবান । শব্দশব্দ বিবোধ হইলে খেদগতি পূর্ণাংশেকা কাব্যকর । লেখামাহুই মৌলিক সাক্ষ্য চটতে বদবান বলিয়া বিবেচিত হইত । এবং লেখার দিক্ত মৌলিক সাক্ষ্য প্রতিগৃহীত হইত না ।

বৃহস্পতির বচন :—

যজুর্বেদম্ব জমর্পনকলনঃ কিতাব্যে ।

কিতাব্য: মর্পনকলনঃ জমর্পনকলনঃ ॥

বহি সাক্ষ্য অক্ষরকে মৌল কবে, তবে কিতাব মর্পনকলন হয় এবং বৈধিক বাণ্যবের অনবস্থা হয় । এট বচনের সছিত বর্জমানের সাক্ষ্যনির্ধর ১০ দ্বারা বিলাইয়া বেশিগে উল্লেখ শুক্ল উপলভি করিতে পারিবে ।

লেখা কখনও সাক্ষী বা শব্দের দ্বারা মৌল হয় না । লেখার দ্বারা লেখা নির্ধরিত হয় । অতএব সাক্ষি প্রমাণ বা দ্বিবা প্রমাণ দ্বারা কখনও লেখাকে অগ্রাহ্য করিবে না । কিন্তু লেখা যদি প্রমাণিত না হয়, যদি পঠিতা গোমান না হয়, কিংবা উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে লেখার দ্বারা হয় । বিশ বৎসর যদি কোনও মলিল মণিত বা প্রত না হয়, তবে তাহা সাক্ষী বাচিয়া থাকিলেও অক্ষর্য্য হয় । লিপিরায় পর কিংবা ব্রহ্ম পাণ্ডরায় কাল শেষ হইয়া গেলেও যে মলিল লেখানো হয় না, কিংবা কণীত নিকট গাচ্চা করা হয় না, তাহাকে সন্ধি বলিয়া বিবেচনা করা হইত ।

উপরে যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে আশ্চর্য্য দেখায় পণ্ডিতগণের অপমানিত নী, লোকচিত্তের জ্ঞান, বিশেষণ-পদ্ধতি এবং কুট নৈধারিক বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হই । এই সমস্ত বিষয় চটতে আমরা হিন্দুগণের বাণ্যমারিক জ্ঞানেরও বশে পরিচয় পাই । ব্যবহার-নির্বাচক ও শ্রুতিকার ও নিবন্ধকারগণ অতিশয় বহু ও অধ্যবসায়ের সহিত অক্লান্তন করিয়াছিলেন—নবজ্ঞানদৃষ্ট বদ্যগণ তাহাদের সেই পঠি-শ্লিষন হইতে নবগুণের ক্ষম নূতন বাস্তী ও নূতন পদ্যা আবিষ্কার করিতে পারেন ।

বঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

—শ্রীহরকুমার সেন

[১০৪]

নারায়ণপুত্রের কথা

স্বকবিতায় হই

যোনের কাক বিল বহন ।

নিরাকৃত ভগিনী হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, কবির পুত্র নাম "রামনাথার সেন" ।

স্বকবিতায় যাহা বলা গিয়াছে । একটি লাগি কহি শুনি বিলা যব ।

[১০৬]

নারায়ণপুত্রের কাব্যের উপাখ্যান অংশ বংশীবাসের কাব্যের অন্তর্ভুক্ত । নারায়ণপুত্রের রচনার নিদর্শন বিলাসে আর কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।

অপর আশ্রমে কেন চলিলে কত দিন ।
এই ভ্রম চলিল যোগে কলি

হয় কতক্ষণি গোলায় মদ্যে বাচি ।
যাহা কহে শুনি গুলি যেন হস্তে

হুত্ব কবেয়া যেন বসন্তে বিস্তর ।
সেই মত চলিয়া পলিলা যাত্রা

যেহাথে যোগে গেল যেনেক পাতক ।
যেহাথে যাহা যেনে উল্লিখিত পদ্য

গোলাক বেধিয়া যাহা যাহ পাইল হস্ত ।
আসে মত যিগ যাহ না গিলে

কহিলা বসন্ত গেল যেন পাইল হস্ত ।
এই মত চলিয়া পলিলা যাত্রা

কেন নাগের মারে যেনে হস্তে গেল ।
কুমিত পড়িয়া যাহ যাহে গেল

হস্ত হস্ত যাহা যাহিলে মস্ত ।
গোলাক বেধিয়া যাহা যাহ পাইল হস্ত

যকত বেধিয়া যেন যাহ পাইল হস্ত ।
এই মত যাহ যোগে যেনে হস্ত

[১০৭]

যোড়ন পত্নীতে বঙ্গালা সাহিত্যের সূচনাগত প্রথম আলোচনা করা হইল । এইরূপ পত্নীত্ব একান্ত প্ৰথম গঠিত কথনখনি বৈজয় যাত্রা এবং কাব্যগ্রন্থের আলোচনা করিয়া বঙ্গালা সাহিত্যের সাহিত্যিক ইতিহাস যোড়ন পত্নীত্ব এবং পরমা জনিতা উপলব্ধি করিব । পরবর্তী ইতিহাস সাহিত্যিক অপর প্রবন্ধসম্পাদক ।

মনসামঞ্জলি বা 'মনাপুত্র' রচয়িতা নারায়ণপুত্রের কাল জানিবার কোন উপাখ্যান বর্তমানে নাই । মুক্তিধীন অসুখানের উপর নির্ভর করিয়া নারায়ণপুত্রকে কেহ কেহ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ; কেহ কেহ বলেন, ইনি চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । যেহেতু কেতকাবলি-কোনাবলি যাহা মনসামঞ্জলি কবিতা নারায়ণপুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, সেট কেতু অত্রমনি হইবে, ইনি অন্ততঃ যোড়ন পত্নীত্বের বর্তমান ছিলেন । বঙ্গালা কাব্যের ইতিহাসে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বকল্লভ মহাপুত্রের সম্প্রদায়ের কেতকাবলি-কোনাবলি কবিতার যে সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নারায়ণপুত্রের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু এই সংগ্রহটির মূল এক প্রাকৃতিক একটি সংক্ষিপ্ত পালা পুঁথি ; হস্তগত হইতে অসংখ্য বঙ্গাবলি অংশ না থাকায় তাহা ।

নারায়ণপুত্রের পদ্মাপুত্রের খচিত পুঁথি বংশে পাওয়া যায়, তবে সম্পূর্ণ পুঁথি চম্প । প্রায় চম্প বংশের পূর্বে বঙ্গাবলি হইতে কাব্যটি ছাড়া হইয়াছিল । প্রথমে বটতলা হইতে নারায়ণপুত্রের কাব্য প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ব এই পুঁথি চম্প চইয়া পড়িয়াছে । নারায়ণপুত্রের কাব্যের একটি আনন্দিক সংগ্রহ পুঁথি আনন্দিক হইয়া পড়িয়াছে ।

রচনার কাল দেখা না থাকিলেও নারায়ণপুত্রের কাব্যে তাঁহার পরিচয় কিছু কিছু দেখা আছে । তাহা হইতে জানিতে পারি যে, ইহার নিবাস ছিল মধনগিরি কোলায় । শিখর নাম নরগিরি, মাতার নাম কলিঙ্গী, পিতামহের নাম নরহরি ।

নারায়ণপুত্রের বঙ্গাবলি হস্ত । পদ্মাবলি যব হস্ত এই মত ।

অপর এক মনসামঞ্জলির কবি বসিকানন্দেব মত নারায়ণপুত্রেরও উপাধি ছিল "স্বকবিতায়" ।

১ । বঙ্গাবলি সাহিত্যে প্রথম গঠিত পাঠ্য পুঁথি বিলাস, মনসামঞ্জলি, পদ্মাবলি, পুঃ ১১১ । ২ । 'গোলাক' পুঁথি । ৩ । বিলাস । ৪ । 'কলি' । ৫ । 'কলি' । ৬ । 'কলি' । ৭ । 'কলি' । ৮ । 'কলি' । ৯ । 'কলি' । ১০ । বঙ্গাবলি সাহিত্যে প্রথম গঠিত পাঠ্য পুঁথি বিলাস, মনসামঞ্জলি, পদ্মাবলি, পুঃ ১১১-১১২ । ১১ । 'কলি' । ১২ । 'কলি' । ১৩ । 'কলি' । ১৪ । 'কলি' । ১৫ । 'কলি' । ১৬ । 'কলি' । ১৭ । 'কলি' । ১৮ । 'কলি' । ১৯ । 'কলি' । ২০ । 'কলি' । ২১ । 'কলি' । ২২ । 'কলি' । ২৩ । 'কলি' । ২৪ । 'কলি' । ২৫ । 'কলি' । ২৬ । 'কলি' । ২৭ । 'কলি' । ২৮ । 'কলি' । ২৯ । 'কলি' । ৩০ । 'কলি' । ৩১ । 'কলি' । ৩২ । 'কলি' । ৩৩ । 'কলি' । ৩৪ । 'কলি' । ৩৫ । 'কলি' । ৩৬ । 'কলি' । ৩৭ । 'কলি' । ৩৮ । 'কলি' । ৩৯ । 'কলি' । ৪০ । 'কলি' । ৪১ । 'কলি' । ৪২ । 'কলি' । ৪৩ । 'কলি' । ৪৪ । 'কলি' । ৪৫ । 'কলি' । ৪৬ । 'কলি' । ৪৭ । 'কলি' । ৪৮ । 'কলি' । ৪৯ । 'কলি' । ৫০ । 'কলি' । ৫১ । 'কলি' । ৫২ । 'কলি' । ৫৩ । 'কলি' । ৫৪ । 'কলি' । ৫৫ । 'কলি' । ৫৬ । 'কলি' । ৫৭ । 'কলি' । ৫৮ । 'কলি' । ৫৯ । 'কলি' । ৬০ । 'কলি' । ৬১ । 'কলি' । ৬২ । 'কলি' । ৬৩ । 'কলি' । ৬৪ । 'কলি' । ৬৫ । 'কলি' । ৬৬ । 'কলি' । ৬৭ । 'কলি' । ৬৮ । 'কলি' । ৬৯ । 'কলি' । ৭০ । 'কলি' । ৭১ । 'কলি' । ৭২ । 'কলি' । ৭৩ । 'কলি' । ৭৪ । 'কলি' । ৭৫ । 'কলি' । ৭৬ । 'কলি' । ৭৭ । 'কলি' । ৭৮ । 'কলি' । ৭৯ । 'কলি' । ৮০ । 'কলি' । ৮১ । 'কলি' । ৮২ । 'কলি' । ৮৩ । 'কলি' । ৮৪ । 'কলি' । ৮৫ । 'কলি' । ৮৬ । 'কলি' । ৮৭ । 'কলি' । ৮৮ । 'কলি' । ৮৯ । 'কলি' । ৯০ । 'কলি' । ৯১ । 'কলি' । ৯২ । 'কলি' । ৯৩ । 'কলি' । ৯৪ । 'কলি' । ৯৫ । 'কলি' । ৯৬ । 'কলি' । ৯৭ । 'কলি' । ৯৮ । 'কলি' । ৯৯ । 'কলি' । ১০০ । 'কলি' ।

১ । বঙ্গাবলি সাহিত্যে প্রথম গঠিত পাঠ্য পুঁথি বিলাস, মনসামঞ্জলি, পদ্মাবলি, পুঃ ১১১-১১২ ।

পরিচালন), প্রেম রস (২) (রক্ত ও কলিঙ্গের পেমভাব বর্ণনা)।
 ক্ষুদ্র রস (১) (স্রষ্টা ও ভোগ্যগোচর সংস্থান বর্ণনা), শিখা রস
 (কমলকর বিহার), স্বস্তিরস (রক্তের লোভাতর বর্ণনা), ভেদ
 রস (ভোগ্যের উত্তমমধ্য অবস্থার যেহেতু বিহার), পূর্ণার রস
 (নিভা কৃষ্ণাবনে বর্ণনা), প্রেম রস (২) (কৃষ্ণাবনে লীলা ও
 গোপীপ্রেমের উৎকর্ষ বর্ণনা), শান্তি রস (সাধকের পথ
 বর্ণনা), ভাব রস (ভক্তি বিহার), ভজন রস (অবতারতত্ত্ব
 ও প্রতিমাপূজা তত্ত্ব বিহার), বীররস রস (সাংসারিক
 ক্রোধাদি বিহার), অজ্ঞা রস (জ্ঞতিপথের গোপনিতপে ভজন),
 ভক্তিরস (রক্তের বৈষয়িক উপস্থিতির মাধ্যমে ভক্তি বর্ণনা),
 ভীত রস (পাপের ফল ও নরক বর্ণনা), বিষম রস (রক্তের
 ধারক্য অবর্তমানে তরতা রক্তের খোড়ন সহস্র ভাব্য
 রক্তশ্রীত সন্ধাননে নারকের বিষম), কলন রস (নারক সত্য-
 ভামাকে রক্তের ঐক্যলীলা বোঝাইয়া তাঁহার হৃৎবেদনাইলেন),
 বীহরস (পারিজাত তরুর নিমিত্ত রক্তের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ),
 বীক্যরস (রক্তের কলিঙ্গ ও সত্যভামাকে কিশোর রূপের সহ
 দোলা দিলেন)।

এক একটি পদের গোবন্ধে এক একটি বিশেষ রাগ বা
 বাগিনীর উল্লেখ আছে। সুপ্রতি পুস্তকে (এং তদবলম্বিত
 পুঁথিগুলিতেও বোধ হয় প্রচলিত) পদম, অষ্টম, দশম ও
 পদমল অধ্যায়ের ঐর্থে কোন রাগ বা বাগিনীর উল্লেখ নাই।
 বসন্তরসে দ্ব্যধিক্রমে এই রাগ-বাগিনীগুলির উল্লেখ আছে—
 আহিন, লসিত, পঠমজবী, রামকেলি, হুহট, বলাগ, বসন্তী,
 আশোয়াসী, পালাভিরা, সারঙ্গ, থিনোরা, নট, গাফার, ছাতি-
 দাল, তুড়ি, কানোড়া, গোয়ী, কেমার।

বসন্তরসের মধ্যে যে বসন্তকিন্তে দ্ব্যধিকার আধারিক্য
 আছে তাহার কারণো এইরূপ। রক্ত রক্তবীকে পরিচালন
 করিতে রক্তবী বাধা পাইলেন। তখন রক্ত তাঁহাকে সাধনা
 দিবার জন্য নিমানে চড়িয়া হুইলেন তৈরহকে বাধা করিলেন।
 পদিনয়ে রক্তবীর প্রেরণ উদ্বাহলে রক্ত প্রতিপাত বিধ
 সকল বলিয়া গঠিতহে। এই হইতেছে চতুর্থ হইতে ষোড়শ
 অধ্যায়ের কথা। তাহার পর বৈষয়কে গৌলিলে নারক
 রক্তকে একটি পারিজাত পুণ উপহার দিলেন, রক্ত সেটি
 রক্তবীকে দিলেন। ইহার পর পারিজাত হরণের ব্যাপার।
 হুহট প্রতিপাত সকল বিষয়ই রক্তের উক্তি।

[১১০]

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তত্ত্ব অবলম্বনিত অমর
 কথাবানি মৌলিক এবং রচিত হইয়াছিল, বসন্তরস তাহার
 মধ্যে অন্যতম। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের কথা ছাড়িয়া
 দিলে এ বিষয়ে বসন্তরস ভিত্তি-বহিত। কবি যে শুধু পণ্ডিত
 ও তত্ত্বজ্ঞাতা ছিলেন তাহা নহে, তাহার উপর তাঁহার অসা-
 ধারণা অধিকার ছিল। কোথাও কবিরের আভাস না
 করিয়া বসন্তরস সত্ত্ব বসন্তরসের অর্থ স্মৃতি ও পরিচয় তাহে
 বৈকল্যবিদ্যাক্ষেপের সাবমর্থ সহজভাবে বুঝাইয়াছেন। তত্ত্বকার
 মধ্যে প্রাকৃতকমোচিত বসন্তা, গর বা উক্তি প্রকৃতি থাকিলে
 লোক পাছে অগ্রাহ্য করে, সেই জন্য কবি পাঠককে সাধন
 করিয়াছেন।

প্রাকৃত কালস গোচর বসন্তরসে। কবিগণের মধ্যেই প্রাথমিক নহে।

প্রথম নাম কেন “বসন্তরস” হইল তাহার উত্তরে কবি
 বলিতেছেন—

পূর্ণার বিরহ সর্ব রস বিপজিল। তে কালসে নান মলকর্য হাশিল।

কবি যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা লেখক, পাঠক,

স্রোতা ও গায়কের প্রতি কবির উক্তি হইতে সোচ্চা যায়।

লেখক পাঠক স্রোতা গায়ক লক্ষণে। ভাব ভাবিলেই প্রতি অর্থ। অর্থের।

একিণ্ড প্রবর্তন হইতেই কবি করি। অর্থের মধ্যে তখন বা হেরে যায়।

অর্থ অর্থের অর্থ মনসে লক্ষণে। পূর্ণপদ বিচারিত নহে লক্ষণে।

তে কালসে নানা কালসে নিজ মন। পূর্ণ পদ যে বসন্তরসে সেই

কালসে ১১

উপমাসির প্রমাণে কবি কালসে বৈচিত্র্য ও মলকতা দেখা-
 ইয়াছেন। সর্গদর্শে সন্দেহী এং আভ্যন্তর কবির উচ্চ-
 চরিত্রতা জ্ঞাপন করে।

উদয় বসন্ত আ। প্রাকৃত পদটি। প্রাকৃত পদটি এই পুঁথি তিন গাতি ৥

উদয় বা গর বসন্ত পদ কালসে। প্রাকৃত পদটি এই পুঁথি তিন গাতি ৥

বসন্ত পদ লক্ষণে বসন্ত কালসে। সর্গ দ্বা পুঁথি তিন গাতি ৥

বসন্ত পদ লক্ষণে বসন্ত কালসে। সর্গ দ্বা পুঁথি তিন গাতি ৥

অর্থের ভাবিলেই প্রতি অর্থ। অর্থের মধ্যে তখন বা হেরে যায়।

অর্থ অর্থের অর্থ মনসে লক্ষণে। পূর্ণপদ বিচারিত নহে লক্ষণে।

তে কালসে নানা কালসে নিজ মন। পূর্ণ পদ যে বসন্তরসে সেই

কালসে ১১

উপমাসির প্রমাণে কবি কালসে বৈচিত্র্য ও মলকতা দেখা-
 ইয়াছেন। সর্গদর্শে সন্দেহী এং আভ্যন্তর কবির উচ্চ-
 চরিত্রতা জ্ঞাপন করে।

উদয় বসন্ত আ। প্রাকৃত পদটি। প্রাকৃত পদটি এই পুঁথি তিন গাতি ৥

উদয় বা গর বসন্ত পদ কালসে। প্রাকৃত পদটি এই পুঁথি তিন গাতি ৥

বসন্ত পদ লক্ষণে বসন্ত কালসে। সর্গ দ্বা পুঁথি তিন গাতি ৥

অধ্যাপকের অগাধতানে ইউরোপের জ্ঞানাত্মিক নাবিকগণ “সোনার দেশ” কাহিনী শুনিয়া অল্প অল্পে মন্থে ওয়া তালটাইছিল একটু স্বপন-বেগে দেশ আবিষ্কারের আশায়। “সোনার দেশ” তাহারা পুঁজিয়া বাতির করিতে পারে নাই—অপন ত্যাগের দার্ক রূপ নাই। কিন্তু যাহা তাহারা আবিষ্কার করিল তাহা তাহাদের আশায়ও অসীত।

জীবনসমুদ্রে বিভাগও জ্ঞানাত্মিক নাবিক। কিশোর বয়স হইতে সে বাহির হইয়াছে সেই অসংখ্য নৌকাধার অঙ্গুষ্ঠানে, বাহার পও পও টুকরা বিকিন্ন হইয়া রহিয়াছে বিশ্বের ভক্তগণের ত্রপের ছায়ায়। সে উপলব্ধি করিতে চায় সেই গভীর প্রশান্তি, যাহা মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। সে অকৃত্রিম করিতে চায় সেই বিশুদ্ধ পুঙ্খ, যাহা যুগে যুগে মানুষের আশা ও কল্পনাকে উদ্ভাস করিয়াছে, কিন্তু স্বপ্নও ধরা দেয় নাই। সে পাইতে চায় সেই আনন্দ পরিপূর্ণতা, যাহা অস্তিত্ব বিধ-সংসারে নাই। যাহা পাইবার নয় তাহাই পাইবার জন্য এমন একটা আকৃতি লক্ষ্যেরই আবেশে ভাগে— কিন্তু যোগেনে পা নিতে না নিতে কৈশোরের স্বপ্ন যাত্রা-মহী-চিকার বত কোথায়ে মিলাইয়া যায়। বাস্তব জীবনের কর্ম-কোলাহলের মধ্যেও যে হুই চারি জন লোকের মন হইতে সেই স্বপ্নের মোহ কাটে না, বিভাগ তাহাদেরই একজন।

ব্যাপ্তিগত উপলক্ষ্য করিয়া বেশ-বিশেষে তাহার হারানো আনন্দকে পুঁজিয়া দেড়ানই তাহার বাসনা। ছাত্রীণ বৎসর বয়সে ব্যাপ্তিগতী ব্রত করিয়া ছয় বৎসরের মধ্যে সে তিন বার জাহায়া বন্দাইয়াছে। তারতের পূর্বাংশে কলিকাতার তিন বৎসর হাইকোর্টে বাতাভ্যন্ত করিবার পর সে পাণ্ডি কিল ঐক্যবাবে পন্ডিত প্রান্তে, বোম্বে। দুই বৎসর সেখানে প্রোফেসর করিবার পর যখন সে বেশ শুভাইয়া লইয়াছে, তখন গিয়া আসিল লন্ড্রোয়ে। জীবিত্যার উপলক্ষ্য হইল অযোগ্য প্রবোধের এক বনী তাৎক্ষণিক বন্ধুর সনির্ভর অঙ্গুষ্ঠা। কয়েক লাখ টাকা আয়ের বিহারের এক বহু-

বিশুদ্ধ ভবীদায়ের তিনি পানিদায়। অনেক দিন ধরিয়া বোকন্দা চণিবার সম্ভাবনা প্রেনিয়া তিনি বিভাগকে লন্ড্রোয়ে আনাইয়াছেন। তাহারই বোকন্দা চাপাইবার তত বিভাগ পটিনার আশিয়াছে।

বিভাগের মত লোকের পক্ষে নবীপত্র ও মক্কেল লইয়া লঙ্কার প্রান্তালে যেন বসিয়া থাকি অসম্ভব। লঙ্কার বহুসময় আবিষ্কারে অকৃত্রিম তাহাকে সেন চাতছানি দিয়া বাহিরে চাকে। সে ডাককে উপেক্ষা করিবার সাধা তাহাও নাই। লোকালয়ের কোলাহলকে দূরে পরিহার করিয়া বিভাগ তখন নবীপত্রে বা কোন বিপ্লবী মননানে ঘাইয়া বসে। যেনে সাধে বোম্বাডা করিবার এই তাহার লব্ধ। বিভাগের সৌন্দর্যবোধকে তপ্ত করিতে পারে এমন ভাষণে শটিনার পুঙ্খ কম। সবকারী আকিস আর কণ্ঠচাকী বিনিয়া গভা-তীরকে একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। সেই একচেটিয়া অধিকারের ক্ষীণ প্রতীতির স্বরূপ আদ্য মাইলটাক একটা সন্ধ্যা মেডিকেল কলেজ হইতে টিকিনাখানি কলেজ পর্যন্ত গিয়াছে। তাহারই শেষ প্রান্তে বিভাগ বসিয়া ছিল।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলেজের ছেলেরা যেনে হঠাৎ কিরিয়াছে। পথ নির্জন। তাহাদের গুলা পক্ষীর চান বিভাগের মুখের উপর পাতুব আভা ফেলিয়াছে। সে সন্তোষের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দ মনের অভ্যন্তরে কিসের বেন প্রতীকী করিতেছে। এমন সময় অধ্যাপক অবনী তাহার এক বন্ধুকে লইয়া উপস্থিত হইল। অবনী আর বিভাগ এক সঙ্গে এ-এ পড়িত। অবনী বিভাগের কাছে আসিয়া বসিল—বেথতো বিভাগ কাকে এনেছি।

বিভাগ উঠিয়া পাড়াইল। অবনীর বন্ধুর মুখের উপর চুর্কলাইটের ধরণে নিঃশব্দ নৃষ্টি বিক্ষেপ করিল। বন্ধুটি চোখে তুলিয়া চাহিলেন। চোখাচোখি হইতেই দুজনের চোখের কোণে একটু হাসি দেখা দিল।

বিভাগ কহিল—চোখে দেখে নহে হচ্ছে হারানো, বন্ধু, কিন্তু নাম-ধাম কিছু মনে করতে পারাছিনে।

বহুটুকি করিলেন—মনে পড়বার কথাও নয়। পনের বছর আগে একদিন আপনার সাথে বেগা হয়েছিল রক্ত-নগরে।

একটু ভাবিয়া দুইয়া বিভাগ বলিল—পনের বছর আগে রক্তনগরে রক্তহরণ বাবুর বাড়ীতে কি? আপনি কি ঐরূপ?

—ঠিক হবেছেন। আপনার কোন লেখা এখনই পড়ি, তখন আপনার চেহারাটা গোখর লাগবে ভেবে ওঠে। কিন্তু লেখার সঙ্গে আপনার সে সময়কার চেহারাটার কিছুতেই খাপ খায় নাতে পারি নি কখনো।

—কি করে পারবেন? তখন ছিলাম বৈরাগী—মনের তার ত্যাগের সুরে বাঁধা।

—তবু মনের দর নর বে অবনো! ঐর চেহারাটাও একটা লেখাও বতন তিনি ছিল। পুণ্ডার ভূটিতে মাথাখাড়ী গিয়েছি বেড়াতে। আমার লম্ববসরী এক মাথোতো বোন বন্দন, মাথা বেগে এম পাটেরেরী-হলে এক অল্পত ভীষের আনির্ভাণ হয়েছিল। ধান্যশস্যের সাইরেবরীতে গিয়ে সেপি মাথা বুজান, গলায় মোটা মোটা ভূপসীর মালা পরা একটি ছেলে পাশি গায়ে বেজের বসে একখানি পুঁপির নকন করছে। আমার পাতের নথ পেয়ে সুখ তুলে চাইলেন। আমাকে হোক বললেন—বেরুন আপনার খটাখানিক লম্বর আচ্ছ হাতে? আমি একটু আকর্ষা হয়ে বললাম—কেন বসুন তো? উনি বললেন—সুবারলম্ববের একটা নৃতন টীকা পেয়েছি, একটু যদি ডিক্টেট করেন, বকী খানেকের আমার দরকারী অংকুটু নিশে নিতে পারি। ঐর কথা শুনে লক্ষ্যের তো আমার মাথা কাটা পেল। আমি আবৃত্তা আবৃত্তা করে বন্দন—আনি লম্বব পড়ি, লম্বব অক্ষর তো তিনি না। তিনি হেসে বললেন, লম্বব পড়ুন—তা হলে ব্যাটিক-পাশ করছেন—কীকি গিয়ে পাশ করেছিলেন বৃষ্টি? এমন লম্বব আবার সেই মাথোতো বোন তথা পর্দা সন্ধির পরের মধ্যে এসে বন্দন—আপনি আমার হাংকে অশমন করছেন কেন? দিন আমি ডিক্টেট করছি। উনি মাথা নীচু করে বললেন—আজ্ঞে না, আমি মেয়েদের কাছ থেকে কোন লাগণা নিই না।

কথার মাঝখানে বিভাগ মাথা নিম্না বলিল—সেদিন আপনারা চাইবোনে আমার উপর দুই রাগ করেছিলেন,

না? কি করব, তখন যে আমার মনে সব সময়ে জাগত ছোট ছবিদলের কথা, যিনি এক বুঝা বৈকলীর কাছে ভিক্ষা নিষেচিপের বলে মধ্যপ্রবৃত্তি তার সুখ বেগা বন্ধ করেছিলেন। জানেন খ্রীতপ বাবু, আপনার লেখা সেদিন যে রক্ত বাবুয়ার করেছিলেন, তা ভেবে এখন আমি লক্ষ্য পাই। হৃদ্যসেবীর সেই দুঃস্থ বৃষ্টি, আমার পানে উপেক্ষা ও কথবার দৃষ্টি নিষেচন করে চলে যাওয়া আজও আমার শ্মশি মনে পড়ে। সেই জন্তই ও রক্তনগরের কথা বলতেই আপনার নাম মনে পড়ল।

অবনী এতক্ষণ ইহাযের ছবি মনের অতীত স্মৃতির সোমহন-ধারি চূপ করিয়া চমকিতছিল। আর কৌতূহল বন্দন করিতে না পারিয়া কহিল—বাপাটা ঠিক বুঝতে পারছেন যে বিভাগ! রক্তনগরে এখন পড়তে তখন কি প্রায়ই তোমার সঙ্গে হৃদ্যসেবীর দেখাওনো হত না কি?

বিভাগ জবাব দেবার আগেই খ্রীতপ কহিল—আমার সঙ্গে যেমন সেই প্রথম দেখা, হৃদ্যের সঙ্গেও তাই। ঘটনাটার মধ্যে সৈচিত্র্য থাকলেও সোমহন কিছু ছিল না।

বিভাগ বলিল—সোমহন যে একবারে ছিল না তাই বা বলি কেনন করে? রক্তনগর বাবুর পাটেরেরীটা ছিল রক্তনগরে আমার লম্ববের বেদী আকর্ষণের বস্তু। একটু লম্বব পেলেই পাটেরেরীতে গিয়ে হাতে লেখা পুঁপির ল্প ল্পে বন্দনাম। বন্দন লম্বব মনে পড়ছি বা শিগছি, তখন হস্ত পর্দার আড়াল থেকে চুড়ির স্তম্ভস্থ ধারি এসে কানে পৌছাত। মনে হত, হুগে হুগে বায়া হুনি কবির তপস্রা ভব করেছে, তাহলেই একজন এসে আমাকে প্রলুব্ধ করছে। পড়া থেকে মনটা বত আপসা হয়ে যেত, তত বেদী রাগ হত অস্ত্রাণ-বস্ত্রীর উপর। তাই সেদিন লম্বব হৃদ্যসেবী বাইরে এসে আমাকে সাহায্য করতে গাইলেন, তখন এতদিনের পুঁপীহৃত রাগের কাগজটা গিয়ে লক্ষ্য তাঁর উপর। জাগ আর অস্ত্রাণ বন্দন আকর্ষণের এনিষ্ট আর বসিষ্ট, তখন হৃদ্যসেবীর সঙ্গে আমার লম্ববটাকে সোমহন বলতে আর তোমার কি?

সোমহনের গল্প শাটসা সাহিত্যের অধ্যাপক অবনী একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আগ্রহভরে বিভাগ করিল—তখন তুমি কোন ঠিকায় পড় বিভাগ?

বিভাগ চূর্ণ করিয়া বলিল। শ্রীমন্ত একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল—তাঁরা বোধ হয় তখন ফাঁদে ইয়ার, আমি তখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি।

অবনী বলিল—ওঃ ফাঁদে ইয়ার! ছেলেদের অবস্থাটা তখন হয় ঠিক খেন সন্ত ডিমের খোলস ছাড়া পাখীর ছানার মত। দুকু বাবা, পুত্রের আশা, প্রাণে স্বামীনতানে উড়বার অবস্থা ইচ্ছা, অল্প তখনও ডানার মড়তা কাটে নি—তাঁট পড়ে পড়ে বাধা। তা ও-বয়সের গোমালটা চুড়িদি আঁতড়াতে অবশ্যন করেই গড়ে ওঠে বটে।

বিভাগের বোধ হয় এ সব কথা বলিতে মন ছিল না। সে যেন সহসা মাগিয়া উঠিয়া বলিল—খাতক পুরাতন কথা। অতীতকে নিয়ে টানাটানি না করে বর্তমানে ঘিরে আসা বাক্য। নিত্যন্ত গভীর কথা দিয়েই আশ্রয় গ্রহণ করি, কি বলেন শ্রীমন্তবাবু! আপনার ছেলেদের ক'টি বলুন।

শ্রীমন্ত একটু হাসিয়া বলিল—মাত্র একটি মেয়ে।

বিভাগ যেন হাজার দুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—মাত্র একটি মেয়ে—বলেন কি? কতদিন হ'ল বিয়ে হয়েছে আপনার? যেহেতু কত বড়?

—মেয়েটি এই বছর চারেকের হবে। বিয়ে আট বছর হ'ল হয়েছে। আপনার ঘরের খবর কি?

—আমি অক্ষরে অক্ষরে মন্বাদ আসেন পাশন করেছি—“পূজার্তে ক্রিরতে ভাষণ”; আমিও আট বছর আগে বিয়ে করেছিলাম—দুটি ছেলে একটি মেয়ে সেনকে উপহার দিয়েছি।

—উপহার দিয়েছেন, ঠিক জানেন? যদি কিছু মনে না করেন ত বলি নিরন্ত পদ্ম বেশের গদ্যর আরও তিনটি ছোবের ভাগ সুনির্নে দিয়েছেন। এরা অল্প উপাধন করবে না, বরং গাঙ্গা উপহার করে তাদের পোষণ করবে। এ দেশের আর্থিক জীবনে হুদ্রলোকের লড়াইয়েরা এই করতেই অধ্যস্তর করে।

—শোষণ নয়, পোষণ করতে এরা চম্ভার। ভারত-বর্ষের পরিশ্রম কোটা লোকের মধ্যে দুইয়ের ভ্রমলজানকে যদি আত্ম মেয়ে ফেল দেওয়া যায়, তা হলে চাষী-বহুরদের অরুণ্ট দুই হবে না; বরং তাদের অবস্থা-পরিস্থিতির যে একটু আশা বেধা থাকে তাই দুই হবে। ভ্রমলজানের নেতৃত্ব ছাড়া চাষী বহুরদের আর্থিক উন্নতি কেহে, এমন কোন দেশের নাম

আপনি করতে পারেন? করাসী বিপ্লব, চীনের আশ্রয়, ক্যানিডবের প্রতিষ্ঠা সব কিছু করেছে যে, ছাত্র, উকীল, ডাক্তার অধ্যাপকের দল।

—দুগ দুগ ধরে শত সহস্র হুদ্রলোক পরীক্ষনের যে পোষণ করে এসেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি ছ'গার জন বিদ্যাবী, ধাত, মাত্র, সান্টাটাসেন, লেনিনের জীবন দিয়েই দেশ হয়ে বাবে? পরশুরামের এশুপবার নিকেন্সি করার মত করে তিন সাতের এশুপবার ভ্রমলজানকে কচুকাটা করতে পারলে তবে চাষী-বহুরেরা নিজেদের জন্য প্রাণ অধিকার করতে পারবে।

—শ্রীমন্ত বাবু! উদ্ভেদনাগণে ভুলে যাক্ছেন যে আপনার পরশুরামের উপাধরগটা মুখিক পরালো বসোয়াল। পরশুরামকে যে এশুপবার ধরাকে নিকেন্সি করতে হয়েছিল তা থেকেই প্রমাণ হয় যে ক্ষত্রিয় না থাকলে ধরার চলে না। তেমনি শুধু চাষী-বহুর নিয়ে সমাজ বেঁচে থাকতে পারে না। রক্ষিতাব বনাদিত প্রৈণীকে প্রায় উচ্চের করা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও রাই এক মৃত্যু চত্রেপ্রৈণীকে বসিয়ে পাওগক্ষে। এরা কবি, শিল্পী, অধিনেতা, বৈজ্ঞানিক, উপল্লাসিক। এমন চাষী-বহুরেরা দিনান্ত পরিশ্রম করেও পেট করে খেতে পার না, ঈত নিবারণের বস্ত্র পার না, ওজনও সমবায় ভাণ্ডার। থেকে তাদের মাগন-কটি বেওয়া হয়।

—সমাজ জীবনে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজনকে অস্বীকার করি না, কিন্তু হুদ্রলোকের দরতই যে তাঁদের চম্ভ হবে এমন কোন ধর্যাবীদ্য নয় নাট। আর যদিই বা তা থাকে, তবু কবে কোণা, এঁরা অম্মায়েন বলে একটা বিরাট শোষণ-মস্ত্রাধরকে চাষী-বহুরদের বুকল রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারিবে।

—ভ্রমলজানদের একটা দিকই একান্ত করে আপনার চোখের সামনে আসছে। আপনার মত বোকাও যে চম্ভ সজ্ঞান এবং বেশ যে আপনারদের ভাষকে কিছুতেই ধরবে হতে দিতে পারে না সেটা ভাবছেন না কেন?

—যুব বেশী করে চেয়েছি বলেই আমাদের হুদ্র-লোকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে উঠেছি মিঃ চৌধুরী! অনেক দিন ধরে পরামর্শ থাকার ফলে আমাদের নেতৃত্বও কেমে গিয়েছে, চান্দ্রী ছাড়া আমাদের গতি নাই, কেন না

চাকুসী ছাড়া এমন নিশ্চিত আসামটুকু আর কিছুতে পাওয়া যায় না বলে আমাদের ধারণা আছে। অস্ত্রাঘের প্রতিবাদ করবার ভয়ে যে সাহস, যে বীর্যের প্রয়োজন তা আমাদের হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের মত দুর্বল হাতির লোকের আর সমাজে প্রয়োজন নেই বলেই আমি কতকগুলি অপোগণ্ডের কৃতি করিনি।

—কপাটা নিত্য ব্যক্তিগত অভিযোগের মতন শোনাকে যেন শ্রীতপসাবু! আপনায় সাথে আর একটু ভাল করে না মিশলে, আপনার অভিযোগের মূল কোণার খরতে পারছি নে। কি হে অননী, একেবারে যে চুপচাপ! ঘুমিয়ে পড়লে না কি?

অননী হাঁটের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিল। তারপর হঠাৎ শ্রীতপট উত্তর দিল—তুমায় নি, কিছু চাকুসী বজায় রাখতে হলে এ রকম কথাবার্তাও ভয়ে প্রবণ ভাণ করে থাকতে হয়।

অননী এটবার মাথা তুলিয়া বলিল—বল বাবা, মত পুণী বন, কলান তোমাদের স্থানীয় বাবায় করতে লগেগে গিয়েছেন—আমি পূর্ণ আশা কর। কিছু তোমাদের আশাগুলির আরম্ভটা যেমন মনোহর হয়েছিল, তাতে চেয়েছিলাম আর সম্ভাট্টা বেশ কখনো রকমের নতুন হয়ে উঠবে। আচ্ছা বিজ্ঞান! একবার ত জিজ্ঞাসাও করলে না স্থানবন্দী এখন কেমন আছেন, কোথায় আছেন?

বিভাস একটু উলস করে বলিল—ইচ্ছা করে না জিজ্ঞাসা করতে। বাঙ্গালীর মেয়ে—কেমন আবার পাকবে? বন আমি হয় ত ভাল হয়ে, ভাল হয়ে বিয়ে হয়েছে, ইংকট ছেলোবোরে হয়েছে, বসে বসে খেয়ে তাঁর মেনুজি হচ্ছে; সে চাকুস-চাকুসকে ধরকার, স্থানীয় উদর পাসন

চালার, গরনা গড়ার, আর মেয়েদের মজলিসে বলে গল্পের কুৎসা করে। আর নব ত গরীবের সংসারে এক পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে যোগে শোকে কর্মজিহ্ন হয়ে পড়ছে —বৈশ্ব আর আমাদের মধ্যে এমন বাড়িয়ে পড়েছে যে বাইরের দিকে তাকাবারও অবসর নাই। সে এখন যেমনটা পাক, তার চোখে সেদিন আমি উপেক্ষা আর করণার অশরুণ ছিল বটেমুখ হুং হয়েছিলাম, সে আর আর বেঁচে নাই। কোন এক সময়ে যাদের ভাল লেগেছিল, কিছুদিন পরে তাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে দেখি, যাকে ভাল লেগেছিল সে মারা গিয়েছে, তার কাঁধটা নিয়ে কে একজন অপরিস্রুত লোক মাঝে বাড়িয়ে আছে।

দুই একটা প্রবল কাঁহুনি দিয়ে মাথাটা নেড়ে বিভাস যেন তার মনের আশ্রয় বিধানের ছায়াটাকে হঠাৎ দিয়ে বলিল—বাক পে মন যাকে কথা। আপনাকে বড় ভাল লেগেছে শ্রীতপ বাবু। আপনি এখানে কি করেন? অননীটা তো আপনার সাথে পরিচয়ও করিয়ে দিলে না!

অননী বলিল—বিনা পরিচয়েই এমন ভবিষ্যে তুলেছ যে তোমাদের দু'জনার মাঝে নিজেই যেন intruder বলে মনে হচ্ছে। এখন যদি আমার ভুল শোধনতে বাই তবে কি রকম বেগাবে আন? বেন চুপচাপের রাতে বনের মধ্যে বহু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মত।

অননীর কথা শ্রীতপ ও বিভাস উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। এই মরণ হাসির কথা দিয়া যেন তাহাদের পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিল। যাত্রি অবকগানি হইয়াছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। পক্ষীর অশ্রু পায়ে যে দুই একটি আসে। খিটখিট করিয়া জলিতেছিল তাহাও নিদ্রিয়া গেল। বহুদূর বৈঠকী সম্ভালাপ শেষ করিয়া ঘরে ফিরিলেন।

নারীর আদর্শ

—এইদিন সন্ধ্যাবেলা, আমাদের বাড়িঘরটিতে আনুষ্ঠান করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, যদি কেউজন বাড়ীতে নারীর আদর্শ হইতে হুং নইতে পারে, একেবারেই বর্ষ!

—নিবেদন



মাইক্রোনেশিয়ার অজ্ঞাত অঞ্চলে

— শ্রীবিজুভিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপপুঞ্জকে মাইক্রোনেশিয়া নামে অভিহিত করা হয়। মাইক্রোনেশিয়ার এখন অনেক দ্বীপ আছে, যারগে ইহার পূর্বে কোন ইউরোপীয়ান পর্যটন করেন নাই। লিগ অব নেশন্স হইতে অনেকগুলি দ্বীপের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য তাহানকে দাবী করা হইয়াছে এবং অনেকের নতঃ তাহান এই অঞ্চলে রণতরী-বহরেন একটা কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা আছে। যেহেতু বড়দের বিবরণ হইতে, মাইক্রোনেশিয়া-সংক্রান্ত নির্যাক্ত জ্ঞান-কাহিনী উদ্ধৃত করা গেল।

“এখনের সুবিধা আজকাল এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, এত শতাধীর প্রবেশে যে সকল স্থান প্রায় অজ্ঞাত ছিল, বর্তমানে সে সকল স্থানে বড় বড় ‘লাইনার’ যাতায়াত শুরু করিয়াছে, এবং ঐ সকল স্থানের পোকের চোখে খেতকার বাড়িয়াছে। এতই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেক স্থানেই তাহাদের আগমন নৃতন ঘটনা বলিয়া আর গণ্য হয় না।

“আদি চার বৎসর ধরিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছি এবং সর্বত্রই এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি। ইউরোপীয়দেরা যাব নাই এরূপ কারণ তো বড় একটা দেখি না। বৃত্তান্ত ব্যবসায়ী, নারিকেলের তৃক্ষ দাঁড়ের রপ্তানী-কারক, ককি-চালী, সিনেমার হল প্রায় সর্বত্রই নিরাছে; ইহাদের অগম্য স্থান নাই সুনিহায। কাজেই চার বৎসর পরে এখন লড়াই এখন দেশের সন্ধান পাইলাম, বাহার কথা টোপাল ফুকের ভ্রমণ-তালিকার মধ্যে উল্লিখিত নাই, তখন মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছি, সে ক্ষণে একবার ঘাইতেই হইবে।

“কেন এই অঞ্চলে লোকের যাব নাই তাহার কারণ আছে।

সড় বড় ভাড়াতের লাইন হইতে এত দ্বীপপুত্র অনেক দূরে অবস্থিত, নিকটতম বন্দর ইথোপোয়া ডা’হাভার মাইল দূরে।



গোপা (মায় দি) : আদি অধিবাসীদের ঘির্ন-দৈর্ঘ্যগট পুত্র (All Men House)

এ ছাড়া এই দ্বীপপুত্রের দ্বীপগুলি বহুবিবৃত্ত মহাসমুদ্রে মধ্যে এরূপ ভাবে দূরে দূরে অবস্থিত যে, ইহার পূর্বে প্রায় হইতে পন্ডিত প্রান্তের দূর প্রায় দুই হাজার চারশো মাইল।

“তাপানী ছোট ছোট মানববাহী কাহান বার্তা এ অঞ্চলে বহিবার অল্প কোনো উপায় নাই। তাই তা কখন ঘাইবে না ঘাইবে, কেহ বন্দিতে পারে না, কারণ তা-

নাট্যের উল্লেখ প্রসিদ্ধিত, ভাষণ-কারীর সুবিধাব্যবস্থা নয়।
 মাদ্যবাহী ভাষণী ভাষণে আয়োজী হওয়া যে কত সুখ,
 তিনি একবার ইটার ব্যক্তিগত অভিভাষা লাভ না করিয়াছেন,
 তিনি কিছু বুঝিবেন না। এলব ছাড়া আছে লক্ষজন-
 ভাষীগ্রন টাইকুন—প্রশান্ত বহাগ্যবাহের অতি ভাষণ
 ঘণ্টা হা।

“আমার বন্ধু ওয়ালটাগ হারিস্‌ আবারও এই দীপপুত্র
 দেখিতে পরামর্শ দেন। কাশানী অধিকারচক্র কংগার নগরে
 তিনিই প্রথম টংগেট, তিনি এখানে অসিদ্ধাঙ্কিতেন এবং
 রোদহর আদিত প্রথম টংগালোদান, যে এই ১৯০০ মাইল
 দূরত্ব দীপপুত্রের প্রত্যেকটী দীপ পরিদর্শন করিয়াছে।



১৫৭। সাইমসি : এই লোক সম্ভবতঃ হৈমালয়ী। কিন্তু মুম্বাইয়ে বাস করত। তারা পালাত
 হওয়া হঠাৎ ২০০ মাইল দূরবর্তী আর একটি ঘোণ। কোন আশির্বাদে পালাত হইতেই যে
 এই লোক সম্ভবতঃ দাবীত হইয়াছিল, হঠাৎ সম্মান পাওয়া গিয়া। পশ্চিম ভারতের ঘোণসুভাষ
 বলাই হঠাৎই এমন পদার্থ কোমল মিশ্রণকারী। গলায় হঠকাই।

ইউরোপ বা সিনেবাতে বাহা সউব-দি বাপপুত বলিগা
অভিহিত হয়, তাহা প্রধানতঃ ডাচ ইণ্ডিয় বাপগুলির অধ-
স্থূল। অনৈরিকার প্রথমকারীদের কণাশে এমন দিকে
এমন বড় বড় শাইসের জাহাজ অববরত গাভাগাত করে এবং
নেপের শিল্পপ্রথা বলিগা গাছা সিক্তই হয়—তাহার অধিকাংশই
প্রথমকারীদের মধ্যেই বেচিবার উদ্দেশে জাপানে প্রবৃত্ত হইয়া
থাকে। 'কিউরিও'-বেচাকেনা এখন একটা ব্যবসাসের মধ্যে
পাড়াইয়া গিয়াছে।

“এখন আবাসের ছোট ভাণ্ডারী জাহাজ ক্যারোলিন
 বীপনুভের অঙ্গুরে নোঙর করিল এবং ঈশ্বর হৃদেতে নামিয়া
 দ্রুত করিয়া আত্মা তাঁর অভিব্যক্তি ব্রহ্মা হটলান, তখনই
 দেখি কেঁতে দক্ষিণত দিক্ কনিয়া গিয়াছে। তাহার

পূর্বেই ভাণসিনী কোয়ার্টার্টাইন-অফিসের বিকট গুমিগছে যে, এই ভাণসে একজন বেডক্যাম লোক আছে এবং সে তাঁকে নারিতবে। অনেক বিপদ সহ্য করিতে না পারিয়া হেলা বা হেলী কোয়ার্টার্টাইন আদ্যের ভাণসের কাছে অফিস কোয়ার্টার্টাইন ভাণসের ডেক নিরীক্ষণ করিতেছে, বেডক্যাম লোকটা যদি চোখে পড়ে।

“প্রশ্নকৃত্তমে বলিগা রাশি যে, দেখি নিম্নতর। যা ‘কিউরিও’
এখানে পাওয়া যায় না। ও সব জিনিষের ব্যবহার যে চলিতে
পারে, তা এট সকল রকমের শোক গণির নিকট অজ্ঞাত।
সভ্যতার হাওয়া এখনও ইংলিসকে নষ্ট করে নাই।
কাগোশিন যৌনে কোন জিনিষের কোন ব্যবহার মাঝ আছে
বলিয়া মনে চইল না, কারণ এখানে
মৃত্যব প্রচলন নাই। প্রকৃতির জোড়
পাশিতপাশিত এই সব মরল যাহার মৃত্যব
বুঝা আসে। বুঝে না। তুমি একটা
অগুণ্ট ছায়েল জিনিতে চাও—ছায়েলের
মালিককে একবার সিগারেট বিয়া
ছায়েলটা লও, অতাবে একখনি মাঝান,
কিংবা একখনি চরি।

সহ ১৬। শালাও
শালাও হইতেই যে
মারোজিন খাপসুড়র
আনিয়াছে—সঙ্গে কেহ আনিয়াছে কলার পাতে ঘোড়া
করেকটা ডিম, কেহ এক কুড়ি পাকা পেপে, কেহ বা নাহে
দড়ি বাঁধিয়া আনিয়াছে একটা শুকরের বাচ্চা। এতদিন
পর্যন্তে তাহারা লোকান হইতে নষ্টয়া যাউত্বেছে তালাক,
রত্নান কাপড়ের চিট কিংবা চকোলেট বা লুচুকুল।

“ইমোকোহামা” ছাড়াইয়া এ পথে আসিতে প্রথম বন্ধর
পড়ে সাইপান, মারিয়ানা বীপপুঞ্জে অবস্থিত। তাপানের
পূর্বে নিকটবর্তী বণিগ এছানের পোকে অপেক্ষাকৃত সভ্য ও
চতুর হইয়া পড়িয়াছে—সুতরাং সেদিক হইতে সাইপানে
যিশের উঠিয়া কিছুটা নাই। এখানকার বড় বড় আখের
ক্ষেতগুলি সমুদ্রবক হইতেই চোপে পড়ে। তাপানীরা খুব
আখের চাষ হুক করিয়াছে এখানে, এমন কি আখের গুল

হঠাৎ হঠকি চোপাই করিবার একটা কারণনাও খুঁজিলাম।

“আগের শুভ হঠাৎ হঠকি, কেহ কখনও শুনিগাছে কি? কিন্তু ভাগানীরা হঠবার পায় নহ। হঠকির বোতলগুলি বেশিতে রিক আনানের মেগের চটকির বোতলগুলি মত—ভার গায়ে দেগেল খাঁটা আছে—“পাটী পুণ্ডন কত চটকি, লাইপানে প্রস্তুত”—এবং সত্তর হাজার কোয়ার্ট এই হঠকি প্রতি বৎসর এখানে হঠাৎ টকিতে রপ্তানী করা হয়। কাষখানার মাঝেকার আঝে কাষখানার সঙ্গত দেখাইয়া লইয়া বেড়াইলেন এবং একটু গর্গের সুয়ে বসিলেন যে, আগামী বৎসরে তিনি ঐ কোলাভু হঠাৎ ‘শোট এগার্টন’ চোপাই করিবার মতলব করিতেছেন এবং আশা করেন, ইত্যতে স্তম্ভকাণ্ড হইলেন।

“শাটপান ছাড়িয়া আমরা পাড়া পূর্বদিকে চলিলাম, তিন দিনের মধ্যে ডাঙা চোখে পড়িল না, শুধু জল আর জল। বাগিচাখা প্রচণ্ড চটগা উত্তিগা প্রতিপদে আবাদিগকে বাধা প্রদান করিতেছিল। অবশেষে একদিন আমরা একটা অপরিমিত খাড়ির মধ্যে চুকিয়া প্রাণাল-বাগের মধ্যবর্তী স্থিত সমুদ্রে নোঙর করিলাম। এই বন্দরের নাম টাক।

“পাটখ-দি বীণপুঙ্কের অস্ত্র সব গুলির মত ট্রাকেরও এমন একটা অসঙ্গত সৌন্দর্য আছে, যা রিকমত বর্ণনা করিতে পারা যায় না, অথচ বা প্রকাশ না করিতে পারিলে মনকে পীড়া দেয়। ভাপানের শাপনাবীনে আগার বন্ধন এখানে একটা বড় উপকার হইয়াছে এই যে, কোন প্রকাণ্ড ট্রাক্যাল রোগ এখানে নাই। এমন কি ট্রাক্সের অতি-সাধারণ রোগ ম্যালেরিয়াও না। ম্যালেরিয়ায় নীচবাটী মরা এখানে নাই।

“কিন্তু সত্যতার সংশ্লিষ্ট আসিয়া হাওয়াই ও টাইটি বীণের আদিম অধিবাসীদের যে ধ্বংসা হ্রস্ব হইয়াছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার হ্রস্বতা হইয়াছে। অর্থাৎ হাওয়াই ও টাইটি বীণের অধিবাসীদের মত ইহার মরিয়া উন্মাদ হইয়া এখনও যায় নাই বটে, কিন্তু চামোয়ো ও কানাকা জাতিদের মধ্যে বর্তমানে কম্ব অশেষ দুঃখার হার বেশী দেখা যাইতেছে।

“ট্রাকের একটা মৌরব করিবার বিষয়—এই যে, বীণটী টাইটুদের অঙ্গস্থান। টাইটু বা খুণ্ডক অনেক সময় পাচন নাইল বাস লইয়া বহিতে থাকে” এবং বৎসরে কোন কোন

কতৃৎ উত্তর-প্রাচ্য মহাদেশের প্রাণ বাধাটা তোলেন। কিন্তু টাক টাইটুদের জগতের চাইলেও বায়ুমণ্ডল এখানে সব সময়েই প্রাণায়। সমুদ্রতীরে মাড়াইয়া দূতের তানীবনের সঙ্গত শাখার মধ্যে বাতালের গতিবিন্দু লক্ষ্য করিতেছিলাম। বাতাল তুরিগা তুরিগা বহিতেছে বটে, এখনও কচি শিক্ত মতট প্রাণাল-সংযোগের তেলানের বেশ দিতেছে, তাপ-নারিকেলের পদপুত নাড়িয়া খেলা করিতেছে...

“কিন্তু এবান হঠাৎ একশো নাইল পশ্চিমে বন্দ গিয়া পড়িলে, তখন ইহার এই বৈশব চলিয়া যাইবে, তখন ইহার



গোলাপি (সোমসি) : হেতমর অধিবাসীরা। কানায়েলেন।

এই স্থান কবে কাহারো নিখোঁজ করিয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহা যে এই বীণের বলা অধিবাসীদের খাণ্ড খিঁচিও হয় নাই, তাহা সন্দেহে অবধান করা যায়।

(পশ্চীমা হইয়া)

সমুদ্রের জেলে-ডিভিগুলি বাতরমত তাহে আশ্রয় অতিমূলে উচ্ছ্বাসে নোড় দিবে। আরও একশো মাইল দূরে গেলে, তখন বেতায়-ট্রেন হঠাৎ সকল কাহাজকে কড়ের গতি সহজে সঙ্গত করিতে থাকিলে, বিভিন্ন বীণের অধিবাসীরা বড় ও কৃত্রিম মধ্যে তাহাদের নারিকেল পাতার কুটীরে মাথা গুঁড়িয়া ভণে কাপিলে এবং বড় বড় মারীকাহাণ পক্ষতপ্রাণ জেউয়ের মধ্যে পড়িয়া হারুতু খাইবে।

“টাইফুন কখনো একটিকে চুষে না। ঝাঁক হইতে পক্ষিম্বিকে বাগা কবিতা বেগে বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিক ছড়াইয়া পড়ে। হুগোও তিনিপাইনে তবু পূর্ণ কড়-বৃষ্টির উপর দিখাই যেন, হুগোও আটকনিশ কটার জন্ত তাহাজে-সলাচন বড় থাকিল, কিন্তু হুগোওর নিকটতর বন্ধর এঘরের (Amoy) দল্লনাশ খটিল, অথচ ফরমাশা ঘোণে তবু বেতারের নারকত কড়ের দরদ পৌছিল নাহ।



মোমালি (মডন বি.) : হুগোবিশ্বকোষে ম্যাকগারগের
সম্পাদিত (মডন পত্র) : সেনীচলন বড়ক নির্মিত
দ্বি-মাকারো প্রদেশে তৈরি।

“টাইফুনের নামধেয়ানো পতির শির কেছ কিছু বসিবে
পারে না ঠিক বটে, কিন্তু টাইফুনের নির্ধর কবলে নড়িলে
তাহাজ, প্রাণ ও কৃষিক্ষেত্রে কি দুর্দশা ঘটে, তাহা কাহারও
ভানিতে বাকী নাই। আমি হুইবার প্রততির এই রক্তলীলার
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। পুনরায় টাইফুনের সম্মুখীন
হইবার ইচ্ছা আমার নাই।

“কার্যোলিন যৌগপুত্রের মধ্যে মোমালি নামে একটি বীণ
আছে। তাহাতে দুই আঙ্গুরা ভিনিষ দেখা যায়। এখন,

প্রায় হুগোওর দুই উচ্চ একটা পলত, এ অঞ্চলের প্রায় কোন
ঘোণেই এত উচ্চ পলত নাই, আর দ্বিতীয়টি হইতেছে একটা
বহু প্রাচীন যুগের চূর্ণ। এই চূর্ণ কাহারো নির্মাণ করিয়াছিল
তাহা কেহ জানে না। কিন্তু একথা ঠিক যে, তাহা এই
বীণের অধিবাসীদের দ্বারা নির্মিত নয়।

“এই প্রাচীন কীর্তি লম্বকে নানাতরুণ কোকুলাম্রণ কাহিনী
প্রচলিত আছে। অধিবাসীবিশেষের মধ্যে কোন কোন অতি-
বৃদ্ধ লোক না কি টেহার গোপনতর অবগত আছে, কিন্তু
তাহাদের বিশ্বাস বিশেষের কাছে তাহা প্রকাশ করিতে নাই।
একজন আপানী বুলমাটোরের সহিত আমার আলাপ হইয়া-
ছিল। তাহার যুগে তিনিলাষ, একজন বৃদ্ধ লোক উদ্ধার নির্দোষ-
তিনবো দুনিয়া ওপ্ততপাটী তাহার কাছে প্রকাশ করিতে
চাতিয়াছিল। কিন্তু বলিবার পূর্বেই বৃদ্ধ ব্যক্তি মারা যায়।
দেই চটতে এই সংসার অধিবাসীবিশেষের মধ্যে আরও বহুল
হইয়াছে।

“এই চূর্ণের ধ্বংসরূপ প্রায় পাচবর্ষ মাইল ভবি ভূমি
অবহিত। বড় বড় চৌরস করিয়া কীর্তি প্রস্তরপথে টেহা
নির্মিত। মিল মাইল দূরত্বী কোন স্থান হইতে যে এই সকল
প্রস্তর আনীত হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।
প্রথম দর্শনে মনে চয়, চূর্ণটি যেন সন্মুখগত হইতে উপিত
হইয়াছে। আসলে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্রকার বীণের উপর
বাঁকীগুলি নির্মিত। বড় বড় খাল দ্বারা সেগুলি পরস্পর
সংযুক্ত। চূর্ণের সম্মুখভাগে একটা বড় প্রাচীর পূর্বে যোগ
অবলে আকৃত ছিল, এখন ওকল পরিষ্কার করা হইয়াছে।
এক সময়ে এই প্রাচীরে বড় বড় কক ছিল এবং ভাল হইতে
প্রাচীরে উত্তিরার হ্রস্বং সোপানাবসীদ ধ্বংসাবশেষ এখনও
দৃষ্ট হয়। চূর্ণের প্রাচীর তিন চার ফুট পুরু এবং ক্রমশঃ
শিথলম্বিকে ঢালু। শিকিং সহরে এই বরলের গাঁথুনি দেখা
যায়।

“সমুদ্রের নামে একটা প্রাচীনকালের পোতাশ্রয়ের ধ্বংসা-
বশেষ আছে। এক সময় পোতাশ্রয়ী যুগ পকীয় ছিল বলিয়া
বোধ হয়, বড় বড় তাহাজ আশ্রয় গ্রহণ করিত। চূর্ণের
বাকী অংশ ম্যান্‌গ্রোভের ভঙ্গলে আবৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু
গাঁথুনি এত মনোহর যে, ম্যান্‌গ্রোভের ভঙ্গলও তাহাকে সম্পূর্ণ
রূপে বিধ্বস্ত করিতে পারেন নাই।

“সাঁউথ-সিডী পশুজের সহিত গাছারা পরিচিত, ক্যামোশিন বীণে এতদ একটা প্রাচীন চূর্ণের অস্তিত্বের নিদর্শন তাহাদের নিকট অব্যাহত বলিয়া মনে হইবে। আমিও যখন প্রথম তন্নির্যাহিত্য, তখন বিখ্যাত করি নাই—নিবের আলোচনা না দেখা পর্যন্ত।

“এদিয়া মধ্যযুগের কোন স্থানে প্রাচীন নগর অবস্থিত হইলে তাহা বিশ্বাসের কারণ হয় না, কারণ অনেক সময়েই তাহার একটা টিভহাঙ্গ ও বাহির হইয়া পড়ে। জাতীয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকীর্তি কুব্জাবদর দীর্ঘ নয় শতাব্দী কাল অরণ্যায়ত ছিল, কিন্তু যখন তাহা আবিষ্কৃত হইল, তখন সেটাকে তদানন্তক আশ্চর্য ঘটনা কেহ বলে নাই। কুব্জাবদরের উৎপত্তি ও তাহার স্থাপত্য সম্বন্ধে আশ্চর্য্য করিতে দিয়া সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

“কিন্তু সাউথ-সি বীণপুঞ্জ, যোথাকার অধিবাসীরা অসংখ্য কাল ধরিয়া নারিকেল পাণ্ডা হাওয়া কুঠিরে বাস করিয়া আসিতেছে, এত বড় গোলাব-চূর্ণের অস্তিত্ব পাওয়া সহ্য হইত কিম্বা ও কোকুদের দিন। এত চূর্ণ ও পোতাশ্রয় নির্মাণে যে উচ্চশ্রেণীর স্থাপত্যবিজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে, অল্পমাত্র স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে তাহা সম্ভব না।

“গোড়শ শতাব্দীর শেষের দাবিরে তাহাদের সম্বন্ধ-কাহিনীর মধ্যে এই সহজাত ও গোলাব-চূর্ণের উল্লেখ করিয়াছে এবং ইহা বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছে যে, স্থানীয় অধিবাসীরা নিত্যকাল বর্ষা, তাহাদের মধ্যে অনেক নরমাংসভোজী। পুত্রস্বয়ং বৃদ্ধা গাইতেছে, তাহাদের অবস্থা এমন অপেক্ষা গোড়শ শতাব্দীর বিশেষ কিছু উন্নত ছিল না। এই চূর্ণের উৎপত্তি অসম্ভবত্ব করিতে আমাদের আরও হৃৎকোষ অনেক পথ বৎসর পিছাইয়া বাইতে চাইবে, ইচ্ছতে। হাজার বৎসর পিছাইতে হইবে। এদিয়া হইতে আসত কোন সভ্যজাতির কথা ভাবিতে হইবে, বাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ছিল, গাছারা বড় বড় আশ্রয় নির্মাণ করিতে ও মহাপ্রকৃতির পথে চালনা করিতে সক্ষম।

“পতীর সহস্রের অধুভূতি লইয়া এই অরণ্যায়ত ললিতপুত্র পরিভ্রমণ করিয়া। কেহ কোনদিন এ সহস্রের সমাধান করিতে পারিবে কি না কে জানে।

“আর্শান বীণপুঞ্জের ভাস্কট নামে একটা ছোট বীণে আমাদের জাহাজ লাগিল। ইন্ডোনেশের উপত্যক ও সমুদ্রতটে যে শতাব্দের প্রাচীন-বীণের বর্ণনা আছে, ভাস্কট সেই শ্রেণীর বীণ। প্রায় পঞ্চাশ বার্ষিক পরিচিতি ব্যাপিতা প্রবালের একটা বাঁধ, ওল হইতে তাহার উচ্চতা তিন ফুটের বেশী নয়। নারিকেল পাছ ছাড়া আর কোন বৃক্ষভা দেখানো গেল না, অস্তিত্ব আমাদের চোখে পড়ে নাই। সমুদ্রের ওল



সাঁউথ-সি : মাগান বীণপুঞ্জ
বীণা।

এত বড় যে, গভীর জলের তলার সমুদ্রবর্ণীল স্বামকর মত বিচিত্রবর্ণের মাছের স্বাক্ষর শব্দ দেখা যায়।

“এখানে বড় বড় সামুদ্রিক ক্রীড়কের খোপা দেখিয়া। বড়তালিতে ছোট ছোট ছেলের নামের টব হইতে পারে। সমুদ্রের তীরে ভোমার মাঝিরা গেলে এই সব ক্রীড়ক ইতস্ততঃ ছুড়াইয়া থাকে। ছোট ছোট ক্রীড়কও অনেক, কত বিচিত্র তাদের রং, চর্মের মত, ইন্দ্রনীল মণির মত, আল

সেবাদের বড়দিনের ছুটির আগে বেলগরে উত্তরবাহার
রপজিং বুখাচ্ছি এসে মরল, ছুটির কদিন তার সঙ্গে ডানের
বেশে গিয়ে থাকতে হবে—ছুটিটা তা হ'লে বেশ হ'লে নিলে
শিকার ক'রে ও বাড়ি হ'রে কাটান যাবে। আমি তখন ব্যার
কয়েক মাস হ'ল বিহুপুণে সবদী হয়ে এসেছি। এই
মহা দিনের মধ্যেই আবার ও রপজিংয়ের মধ্যে বেশ কিছুই হ'লে
উঠেছিল। এমন দিন নেকেরই আবার বড় ভাল সেগে সেল
এই মরল প্রিয়পর্শন অমারিক দূরকটকে। ওর সবাবের
মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ শক্তি আছে, যাতে করে ও
সাময়কে হু' মিনিটে আগনার ক'রে নেয়।

এ বছর দিল্লীতে নিখিল-ভারত সন্থীত প্রতিযোগিতার
দ্বারা বিশেষ ইচ্ছা ছিল; নিবন্ধন স্বীকার করেছি, বাবার
স্ববরও দিয়ে ফেলেছি। এমন সময়ে রপজিংয়ের এই অহুযোগ।
অহুযোগ ঠিক নয়, বেন মিনতি। অহুযোগ যদি না এড়ান
যায়, মিনতি এড়ানো কঠিন।

ছুটি হ'তেই হুই বন্ধুতে রওনা হওয়া গেল সকালের
একটা ট্রেনে। রপজিংয়ের গাড়ী বাঁকড়া মেসার একটা
গ্লাবে। গ্রামটো বেলগরে ট্রেন থেকে তিন চার মাইল দূরে।
ট্রেনে গাড়ী পাখার আগেই বেলগাম একটা ভ্রমকণ, কৃষ্ণা,
আমদারী ভ্রমকণ—“এই যে এই গাড়ীতে রে! তোরা
সব ভাড়াভাড়া আর—চটপট ভিনি পর নাড়িয়ে ফেল”—
ব'লে প্রগটকরবের উপর ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে লাগলেন।
রপজিং পরিচয় মিল—“ইনি আমাদের নারের—কমলেশ
চট্টোপাধ্যায়।” ট্রেন থামতেই আমরা দুজনে ভাড়াভাড়া
নেমে পড়লাম। কমলেশ বাবু আমাকে শও রপজিংকে
সহায়ত বসবে অভিবান ক'রে ভাড়াভাড়া বাস্তবসত্য হ'রে
আবারের ভিনিপত্রগুলো পোকজন দিয়ে গাড়ী থেকে
নাখাতে লাগলেন। আমি ভতকণ একবার ট্রেনের চারি-
মিক বেধে নিলাম। লাল কাঁকর বিছানো প্লাটফর্মের উপর
কয়েকটা লাইট-পোষ্ট, এখানে সেখানে হু' একখানা বেঁকিও
এবং সামনে ছোট একটি লাল বাড়ী। চারটে পাল দিয়ে

চলে গিয়েছে—অন্যপ্রদেশের একটি রাস্তা। অহুয়ে চুই
একটি বোড়ান গাড়ী দ্বারীর অপেক্ষার দাঁড়িয়ে আছে।

ভিনিপত্র নামান হয়ে গেলে কমলেশবাবু এসে বললেন—
“আছে, আগনারের গাড়ী ঠিকই আছে। পরা করে উঠুন
এসে।”

আমি বললাম—“গাড়ী কত দূরে? হেঁটে বাওয়া যায়
না? এখনও ত রোদের তেজ তেমন হয় নি। চুই তিন
মাইল ত আমরা হেঁটেও যেতে পারি। কি দল রপজিং?
আমাদের আচকের মনি-ওয়াকটাও চ'রে বাবে তা হ'লে।”

কমলেশবাবু ভাড়াভাড়া ব্যস্ত হ'রে বলে উঠলেন—
“আছে না, না, সে আবার একটা কথা হল! আগনার
এই রোজকের মধ্যে এতটা পথ হেঁটে যাবেন! না, না, সে
কিছুতেই হ'তে পারে না। রোপু না থাকলে তবু কথা
ছিল। তা ছাড়া, গাড়ী এখন রপজিংয়ে তখন আর কিছুমিছি
কইই বা করতে যাবেন কেন?”

রপজিং দ্বিতরিতে আমায় নিকৈ তাকিয়ে বলল—
“গাড়ীতেই চলে। মইলে কমলেশবাবুও সামনের ‘সীটে’
থাকবে না।”

আমি আর বিকল্প না করে চললাম গাড়ীতে উঠব বলে।
আমরা গাড়ীতে উঠলে পরে কমলেশবাবুও সামনের ‘সীটে’
এল বসলেন।

পন্নীজামের সেই উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলল কীকানি
দিত্তে দিত্তে। গাড়ীতে উঠেই রপজিং বেন একই অগ্রমনক
হ'রে গেল—বলে হ'ল বেন তার বহু পুরাতন বৃত্তি আজ
আমোদিত হ'রে উঠেছে—অনেক দিনের অনেক ভুলে বাওয়া
কথা বেন আবার জেগে উঠেছে তার মনে। গাড়ীর খোলা
দরজা দিয়ে সুখ বাড়িয়ে সে উদাস দুইতে একবার তাকান
দূরের দিকে—বত দূরে চোখ যায়। সেই জনবিরল ছায়াবহুল
পন্নীপথ, সুখময় প্রভাত সন্ধ্যার, শীতের ত্রিভোজ্য ত্রিভ-
কিরণ, দ্বারীর উপরকার ঘননীল চন্দ্রাতপ, পথের চুই পাথর
আলাপালাবিত্তি গাছ-শাখাগুলি, উজ্জ্বল বিহুস্বপিত্ত প্রাঙ্গণ,

শল্যকেন্দ্রের জ্ঞানই দীর্ঘ দিনে বেন তার মনের উপর এক অপরূপ ন্যায্যতা প্রদান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখেও সে বেন শেষ করতে পারছে না। গাড়ীতে কলপেশবারও বিশেষ কোনও কথাবার্তা বললেন না। সেই যৌনতা ভর্য ক'রতে আশাব্যবস্থা উঠে। হ'ল না। আমিও তাই নীরবেই দুই পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম। রথজিৎসের বাগানের কাছাকাছি গাড়ীটা বন্ধ এলে পড়ল, কলপেশবার তখন সেই দিকে চেয়ে বসে উঠলেন—“আমরা ত বাড়ী এসে পড়লাম ব'লে। ঐ যে আমাদের বাগান দেখা যাচ্ছে।” বনশ্রীজিৎসের মত রথজিৎ ব'লে উঠল—“হ্যাঁ! এরাই মতো বাড়ী এসে পড়ল।”

খানিক পরে গাড়ী এসে খামল মত বড় এক খেঁটের সামনে। সামনেই গোড়া এক রাস্তা চ'লে গিয়েছে। তারই খেঁটে প্রকাণ্ড বড় একটি বাড়ী। বাটের থেকে বেধে মনে হয় অস্বাভাবিক তার অবস্থা। নাকে নাকে দেওয়ানের চূপবাতি পলে গিলে টেকের শ্রীহীন নয় মূর্তি বেহিমে পড়েছে। দুই একটা ফাটলের দ্বারা থেকে ছোট ছোট বট, অপরূপ গাছও গড়িয়ে উঠেছে। গাড়ী আসতেই ১৯১৭ বছরের একটি যাকচ চুপা ছুটে ছুটে এসে খেঁট ধরে হাড়িয়ে হালিমে আবারের হুঁককে নমস্কার ক'রল। আমরা গাড়ী থেকে নামতেই কিপ্রসন্ন সহিলের সঙ্গে আমাদের তিনিশ-পত্নী নামাতে লাগল।

রথজিৎ বলল চল, আমরা ভিতরে যাই। খেঁট দিয়ে ঢুকতেই চোখে প'ড়ল—রাস্তার দুধারে অস্বাভাবিক গাছ-পাশাগুলি। এনিকটার বোধ হয় কোনও এক কাণে একটু সন্দ-বাগান করতে চেষ্টা করা হ'বেছিল। সে বাগান আজ হতভী। কয়েকটি জবা, করবী, বেল, খুঁই ইত্যাদি কৃপের গাছ অকরও বোধ হয় বয়ে নি। তাঁরাই আজ বিগত পৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। গৃহবানীর আগমন-সংবাদ পেয়ে বোধ হয় হাস ও আশা। তুলে এনিকটার এই বাগানটি একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। আমরা বাড়ীতে ঢুকলে কলপেশবার বললেন—“রথজিৎ তোমাদের ভর্তে আমি উপরে বসিনিককার গুটো বস পরিষ্কার করিয়ে রেখেছি—তোমার বরটা ও তার পাশের বরটা। তোমরা বাও, কাশড়-চোপড় ছেড়ে বস হাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম কর খে। তোমরা-

দেব তিনিশপত্নীমা আমি এখন গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের ভর্তে চলখাবারও ঠিক রেখেছি। একটু চা'ও ক'রে বিতে বসি খে, কেমন... প্রভু, ও সোফিন, এতক্ষণ কি করছিল রে? নিয়ে আর না বাবুদের তিনিশ পত্নীমা শ্রীমণি ক'রে?” ব'লে তিনি এক হুজুর ছাড়লেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়ায় পরে দুপুরে বেশ কয়েক বটা বিবানিরা দেওয়া গেল। রথজিৎ এলে এখন আমাকে বিকাশে চা খাবার জন্তে ডাকল, বেশা শেষ হ'তে তখন আর বাকী নেই। চারের টেবিলে ব'লে ব'লে খানিকটা গল্প-সল্প হ'ল। আমরা এখন চা খেয়ে উঠলাম, তখন একবারে সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে। রথজিৎ বলল—“চল একটা টর্চ নিয়ে বেহিমে পড়া যাক। বেশী দূরে যাব না—বাড়ীর কাছাকাছিই একটু দূরে আসব।” বলতে বলতেই চাকর এসে খবর দিল কয়েকজন লোক তার সঙ্গে যোগ্য করতে এসেছে। “আমি এগনি আসছি”—বলে রথজিৎ চলে গেল। অনেকক্ষণ বেটে গেল, তার সেশাই নেই; খানিকটা চূপচাপ বসে থেকে গেলে আমি একাই একটা টর্চ নিয়ে বেহিমে পড়লাম।

বাড়ী ভিতরে এসে বেশি রথজিৎ বৈঠকখানা ঘরে বসে কলপেশবার সঙ্গে গল্প করছে। আমার দেখেই সে বলে উঠল—“এই যে তুমি এসে পড়েছ! তোমার হুঁকতে আমি এখন লোক পাঠাব মনে করছিলাম।” “আমি পথ হাড়িয়ে কলোছি ভেবেছিলাম না কি? বাড়ীর সামনের এই গোড়া রাস্তা ধরে একটু দূরে এলাম। সায়াধিন আজ ত অরুই বসে আছে।” বলে আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। আমার হুঁকতে দেখেই কলপেশবার উঠে হাড়িয়েছিলেন। আমার কথা বলে হ'তেই আমার দিকে তাকিয়ে শ্রিতহাতে বললেন—“এখানে এগে আপনার পরীর ভাল আছে ত? আমি ত আর... তোমরা তারপর কোনও খবর দিতে পারি নি। আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ত এখানে? আমাদের এই পাড়াপায়ে আপনাকে কি নিয়েই বা আসব-মাগারিত করব।”

“না, না, আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আপনার আতিথ্যে আমি পূর্ণ আনন্দেই আছি। আপনি আমার ভর্তে যাক চলে ন। অর্থাৎ আর আপনার পর নই।”

“মাই দেখি রাজার কতদূর হ’ল। একটু না দেখলে হয় ত ওরা সব ডের রাত ক’রে ব’লে থাকবে।” বলে কমলেশ বায়ু চলে গেলেন। তিনি চলে যেতেই রশ্মিও একটু হেসে বলল—“কমলেশনা একটুতে বস্তু বাত্ব হ’য়ে পড়ে। ওর চিত্তকানই ঐ স্বভাব।……বাইরের লোকেরা সব একটু পরে চলে যেতেই আমি তোমার খোঁজে ভিতরে এসে দেখি ভূমিও বেগিয়ে গিয়েছে। একা একা বাড়ী বলে কি করি ক’বছলাম। এখন সময়ে কমলেশনা এল। আমি এতক্ষণ ওর কাছে থেকেই গ্রামের সব সবজিখবর নিচ্ছিলাম। অনেক দিন পরে পরে বাড়ী আমি। বস্তু জানতে ইচ্ছে করে সব খবর।”

এখন সময়ে চাকর এসে খবর দিল—“গ্রাম হ’য়ে গিয়েছে।”

রশ্মিও বলিল—“গ্রাম হ’য়ে গিয়ে থাকলে আমাদের বাবার দিতে বল দে। কিছুনিছি রাত করে লাভ কি? কি বল, সাজীবা? খেয়ে সেবে না হয় গর করা বাবে।”

“বেশ, কোনও আপত্তি নেই।”

খণ্ড সময়ে আবার খেতে বসলাম। আহারের সময় কমলেশবাবু নিজে হসে থেকে ‘এটা খান’ ‘ওটা খান’ করে পুত্ব কর’য়ে থাকতেন। আহার বস্তু ভাল লাগল এই যোগ্যেবন বাহুখটির অন্যতম স্বাভাবিকতা। আহারের পাওয়া এখন শেষ হ’ল রাত তখন সাড়ে আটটা আন্ধার হবে। কিন্তু সেই অজনিবিড় পটীলক্ষ্য স্বপ্নভীর রাতের মত নিস্তব্ধতার খন্ খন্ করছে—যেন হ’ল রাত যেন তখন অনেক পতীর হ’য়ে গিয়েছে। বাইরে থেকে হেসে আসছে কৃষ্ণকল্লবের ঘর্ষকল্লবী ও বাতাসের শব্দ পন্ পন্ শব্দ। মাঝে মাঝে হু’ একটা নিশাচর পাখী একগাছ থেকে আর একগাছে উড়ে যাচ্ছে—যথো যথো তাদের ডানা-কাপটার শব্দ ও কীরী অধিব্রাহ্ম ‘কিকি’র ব’লে সেই বিশাট স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। দু’য়ে মাঝে মাঝে হুই একটা কুসুর খেউ খেউ করে ডেকে উঠছে। আহারের পাওয়া শেষ হতেই কমলেশবাবু ব’ললেন—“আমি তাহ’লে আজকের রাতের মত আমি, তারা। তোমরাও আর আর দেখি রাত জেদো না।” “আজ সব রাত হুই—তাকাতাকি শুবে পড়।”

তিনি চলে যেতেই আমি রশ্মিওকে বসলাম—“বস্তু

যেহেঁদে অস্তর কিছু তোমার এই কমলেশনাটির। তোমার একবারে নিজে ছোট ভাইএর মতই দেখ করেন ব’লে মনে হয়। বাহুখি বস্তুই স্বাভাবিক।” একটু চুপ ক’রে থেকে রশ্মিও বলল—“ওম্ তাই নয়। ও তার চেয়েও ডের বস্তু—বস্তু। ওর ভাবনাও লক্ষ জড়িয়ে আছে ঘর্ষকল্লবী সেনার একটা মকরুপ টিউপ, তার ভেত্রে আমি নিজেও স্বাভাবিকভাবে পতী মনে করি। ওর ভাবনের ইতিহাসটা আর আমি তাহ’লে তোমার বলি?”

“দে অনেক দিনের কথা। আমার বয়স তখন বছর মশেকের বেশি হবে না। কমলেশনা বাবার কাছে কাণ্ডের প্রার্থী হয়ে আসে। তোমার ব’লেছি বোদ হয় আমার বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কমলেশনাকে দেখেই বাবার কোনও যেন ভাল সেগে গেল। বিশেষ ক’রে এখন ওর সব কথা শুনেলেন বাবার তখন বস্তু বাবা হ’ল ওর ওপরে। স্বাভাবিক ছেলে—ছোটবেলায় মা বাপ ম’রে যায়। পৈতৃক ভবিষ্যৎ বা কিছু ছিল জ্ঞাতরা সব ঠিকিয়ে নেয়। পড়াশুনা বেঁধেই কর’তে পারে নি—কুপে অতি কষ্টে সেকেন্ড ক্লাস অবধি প’ড়েই পড়া ছেড়ে দিতে হয়।……বাবার সমস্ত ছিল ভারী কোমল ও উদার। বস্তু ভবিষ্যতে কোনও কাজে চুকিয়ে দিতে পারেন এই চেয়ে তিনি ওকে কিছুদিন বাড়ীতেই রাখলেন। বাবা মা হ’লে ঠিক বাড়ীর ছেলের মতই দেখতেন, আর আমিও জানতাম ও আমার বস্তু ভাই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ও আমাদের বাড়ীতে নিজের তখন ক’রে নিতে পেয়েছিল। মা, বাবা কিংবা আমার—আমাদের—কারই ওকে মইলে যেন চ’লতই না। এখন সময়ে আমাদের পুরাণে নায়েব হ’তে যায় গেল। মার লক্ষ পরামর্শ ক’রে বাবা ঠিক কর’লেন কমলেশনাকেই আমার নায়েবের কাজটা দেওয়া হবে। ওর বয়স তখন বৃদ্ধি একুশের বেশি হ’বে না। কিন্তু বয়স কম হ’লে হবে কি! বাবা দেখলেন একদিকে ও যেমন চাপাক চতুর আর একদিকে ও তেমনি লজ ও ঘমচোক। এই ক’মলেশের মধ্যেই বাবা ওর বৃদ্ধি ও লজতার মধ্যে পরিচয় পেয়েছিলেন। হুতরং আর কোনও বিধা না করে বাবা কমলেশনাকেই নায়েব করে তাবাদের কর্মসিদ্ধিতে পাঠালেন। সেই অবধি ও এখানেই আছে। তার বছর

দশেক পরে বাবা কাণ্ড থেকে অবসর নিয়ে আবারে এই শৈশবিক বাড়ীতে বাস করতে এলেন। আমি তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি—সেবার বি-এস-সি পড়ি। বস। এই সময়ে আবারের সঙ্গে এসে একটি মেয়ে। নাম ছিল তার 'সুখা'। সন্ধ্যারও একটু ইতিহাস ছিল।" বলে রণজিত একটি খাম্বল। তারপর সে আবার বলতে লাগল।

"সন্ধ্যা বসন্ত প্রথম আবারের বাড়ীতে আসে তখন সে পাঁচ বছরের মেয়ে। ও প্রথম যেদিন আবারের বাড়ীতে আসে সেদিনকার কথা আবার বেশ মনে আছে। আমি তখন এগারো বাত্রে বছরের ছিলাম। বাবা তখন মেসিনিস্টর ভোলা ৩-মুকে ছিলেন। সেবার তমসূকে খুব কল্যা হয়েছিল। সন্ধ্যার বা বাবা দু'তিনটে একদিনে কল্যা হয়ে যায় বাহ। না তখন সে মেয়ে এই অন্যথা বাঁচপিত্তরীনে ঘেরোটিকে প্রতিপালন করবার জগে নেই। তাম্বলপট্টে আছে—আবারের স্বভাব, বা গুকে নিভে মেরের মত করেই ঘরুয় করছিলেন। আবার বিদ্যা সফলত আবার তেরে চের বড়—বহুতাল আগেই তারে সফলতই বিধে হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে একটিও মেয়ে নেই বস না প্রায়ই ৩:৩০ করতেন। এমন সময়ে তখনই তাঁকে ছুটিয়ে দিলেন সন্ধ্যাকে। বাড়ীর মধ্যে ছিলাম আমিই সব তেরে ছোট এবং একবার পুত্র। কতই এতদিন বাড়ীতে আবারই একাধিপত্য ছিল। চাঃঃ কোণাকার কে একটি মেয়ে এসে আবার মায় আবারের উপর হাগ বলাব নেমে প্রবর্তা আবার নিভ-বনে যে একটু গাগ বা হিংসে হয় নি তা নয়। তারপর ক্রমে সন্ধ্যার উপরে আবার কেমন বেন এতটা মনতঃ গিয়ে গেল। স্বয়ং যে মাতে মাতে হত না তা নয়। কিন্তু সন্ধ্যাকে বকলে কিংবা মাত্রিলে বা আবার গোলায়েন, বগতেন, 'ছি! গুকে গুকে করতে নেই। ওর মনে কষ্ট হবে। তোমার বা বাবা মই আছে। কিন্তু আবার ছাড়া ও কোটার পৃথিবীতে কেউ নেই, একটু ভালবাসবার, আলস করবার। বা হোক *রে ক্রমঃ ক্রমঃ সন্ধ্যার সঙ্গে আবার বেশ ভাল হয়ে গেল। সন্ধ্যাও আবার খুব অহংকৃত হয়ে পড়ল।

"আমি গুকে পড়াভাষা, নিভে হাঃহঃ থেকে পরসা হাঃহঃ এটা এটা ক্রমে বিভ্রাম। বত বড় হতে লাগল সন্ধ্যার

কপঃ ততই যেন ঘেটে পড়তে লাগল। যেদিন হঃ তেমনই নাক খুশের চোখাঃ, তেমনই পড়ন! তার পর আমি খ্যাতি-মূল্যেদন পাশ করে বাড়ী ছেড়ে কলকাতার কলেজে পড়তে য়োম। অনেকদিন পরে যখন ছুটিতে বাড়ীতে এলাম, সন্ধ্যা আর তেমন করে আবার কাছে এসে না। এতদিন পরে আবার তেরে ওর বোধ হয় একটু সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা হয়ে থাকবে। আমি কোন কথা বিজ্ঞেয় করলে কোন গুকে তাড়াহুড়ি একটা উত্তর দিয়েই চলে যেত। কিন্তু আমি যখন ঘরে থাকতাম না, তখন ও লুকিয়ে লুকিয়ে আবার পড়ার টেবিল গুছিয়ে দিত —আবার আবার বোতাম ছিড়ে গেলে সেপাই করে রাখত। আমিও গুকে কখনও কখনও গুই, খাতা, পেনসিল, কলম, ব্রোচ, ক্রিপ ইত্যাদি উপহার দিতাম। একটু খিট করে আবার করে কথা বলতাম। সন্ধ্যার উপরে আবার তখনকার মনের ভাবটিকে ঠিক প্রেব বলা চলে না—এ যেন আবার সেই নবজাগরণ-চকল কিশোর জন্মের স্বপ্নোদয়বির প্রেবভাবার প্রথম উদ্বোধ—বিক্রোদাধু বোধনের নব্যকণ্ঠস্বরের প্রথম আভাস। তারপর বাবা যখন কাণ্ড থেকে অবসর নিয়ে বেশের বাড়ীতে স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন, সন্ধ্যা তখন পনেরো বোল বছরের মেয়ে। বা বাবা ওর বিয়ের করে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। জানই ত, আবারের বাঃদানে গুরুত্ব আবার বাস্তবপিত্তরীনে ঘেরের বিধে মেওয়া এক কঠিন ব্যাপার। অত অত বড় মেয়েকে বিধে না বিধে করে রাখাও চলে না—বিধে করে পাড়াগায়ে। ওর একটা ভাল মত বিধে নিতে না পারলে বা বাবা কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। বা একদিন কনসেশনবাক ডেকে বললেন "কনসেশ, বাবা, সন্ধ্যার জগে একটা ভাল পাতিয়-টারত বেশো। ও ত মেখতে মেখতে বড় হয়ে উঠল। এখন ও আর ওর বিধে না বিধে চলেছে না! ওর একটা ভাল মত বিধে নিতে পারলে আবার নিশ্চিত হই। আঃহঃ আর কিছুই চাই না। ঘেসেটি যেন বেশ মজার হয়—সন্ধ্যার খাগা-পরার যেন কোনও কষ্ট না হয়। মেখ ত' একটু সন্ধ্যা করে—তোমার জানাণোনা খবি কেউ গুকে বিধে করতে স্থায়ী হয়। যেতেই বড়ই পট্টা! পড়াভাষাও যেটাখুট একরকম নিখেতে। স্বয়ংজীর কাণ্ড ত' যেন ভালই ভাবে। তা ছাড়া সন্ধ্যাকের মেয়ে—আবারেরই স্বয়ং।"

কমলেশ মাথা নীচু করে বলল—“আজ্ঞে আপনারা যদি আমাকে খুব অবোধ্য না মনে করেন ও আমিই সন্ধ্যাকে বিয়ে—”

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মা বলে উঠলেন, “তুমি সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চাও? এত খুল ভাল কথা! সন্ধ্যার মতো তোমার চেয়ে ভাল পাঠ্যই বা আমার! পান কোথায়? ওর ত্রা হলো কপাল ভালই বলতে হবে।”

সেদিন জুপুরে বাবা ভাত খেতে বসেছেন। মা সামনে বসে একখানা হাতপাখা নাড়ছেন ও খাওয়া বেরছেন, বা বললেন—“ওগো শুনেছ, কমলেশ সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চায়।”

বাবা শুনে বললেন—“তাই ত! কমলেশের কথা এতদিন আমাদের মনেই হয় নি! ওকে ত আজ এত বছর ধরে সেয়ে আছি। ভারী চমৎকার ওর স্বভাবটি কিন্তু। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে সন্ধ্যা হুখেই থাকবে।”

মা বললেন, “তা সন্ধ্যাকেও একবার জিজ্ঞেস করা দরকার।”

“ওকি স্ববোধা হবে না কি? ওকে আবার কি জিজ্ঞেস করবে?”

“না না, ও বড় হয়েছে। ওর মতটাও জানা দরকার বই কি। তবে একটা কথা, বসে ওদের হৃদনের খুল তফাত হবে কিন্তু; কমলেশ সন্ধ্যার চেয়ে অস্বস্তি: ১৫১৮ বছরের বড় হবে।”

—“তা ওরকম ত খেতে থাকে।”

“মা একদিন সন্ধ্যাকে কাছের ডেকে নিয়ে আস্তে আস্তে কথাটা পাড়লেন। শুনে সন্ধ্যা প্রথমটা কোন কথা বলল না, তার চোখ বিয়ে খালি টপ টপ করে চল পড়তে লাগল। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে সে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কানতে লাগল। মা তাকে অনেক আদর করে শান্ত করলেন। তারপর সে বলল, “মা, আমি বিয়ে করব না।”

“বিয়ে করবে না, সে আবার একটা কথা হল! আমরা ত আর মা, চিরকাল বাঁচব না, বুড়ো হয়েছি, তোমার একটা ভালমত বিয়ে দিতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হই। আর কমলেশ ছেলেটিও বড় ভাল। ও তোমার খুল হয়ে থাকবে।”

“আমি কমলেশদাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।”

“তার কণ্ঠস্বর দুকড়া বৃষ্টি হল। মা অবাধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কেন?” কোনও কথা না বলে সন্ধ্যা নীরবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মা বললেন “আজ্ঞা কথাটা তুমি একটু ভেবে দেখো। ওর চেয়ে ভাল ছেলেই বা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে! যার তার হাতে ত আর তোমার বেওয়া যায় না। অশ্রু বিয়ে নিতেই হবে।” শেষের কথা কবিতা মা যেন কতকটা নিঃশেষ মনেই বললেন।

“তারপর বাস হই কেটে গেল। মা বাবা সন্ধ্যাকে খুবই নীড়াপিড়ি করতে লাগলেন কমলেশদাকে বিয়ে করার মতো। কমলেশদাকে তার বিয়ে না করতে চাওয়ায় কোন সন্ত কায়ণও তাঁরা খুঁজে পেলেন না। তাঁরা মনে করলেন বাণিকামূলক লক্ষ্যবস্তুই বোধ হয় সন্ধ্যা বিয়ে করতে আপত্তি আনছে। তার পর মা তাকে অনেক বোকাতে লাগলেন, অনেক ভয়ও দেখালেন। শেষে কি জানি কি ভেবে সে—কমলেশদাকে বিয়ে করতে রাজী হল। মা বাবাও নিশ্চিন্ত হলেন। যাতে ওদের অস্বস্তি আর একটু বজ্রহণ হয় সেজন্তে বিয়ের যৌতুকবস্তু বাবা সন্ধ্যার নামে কিছু জমিও দেখাপড়া করে দিলেন। মাও বিয়ের সময় সন্ধ্যাকে গা শাড়িরে পরান দিলেন, নিজের গ’ একটা অলঙ্কারও উপহার দিয়েছিলেন। বা হ’ক কমলেশদার সঙ্গে সন্ধ্যার বিয়ে নিশ্চিয়ে হয়ে গেল। আমি তখন বি-এস-সি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতেই ছিলাম, বিলেত যাবার উদ্দেশ্য করছিলাম। সন্ধ্যার বিয়ের কথা শুনে আমার মনটা কেমন করে উঠল।

—“কি জানি কেন, এঁতে আমার অস্তর যেন তেমন শয় বিল না! ওখ ত’ বা নিজের অজ্ঞাতে গুই একটি বৌদ্ধ শ্মশন পড়ে থাকবে—কোন এক অজানা ব্যাখ্যা। তা হ’ক সন্ধ্যার বিচ্ছেদ ক’দিন ধরে কোথার বেধে আমি খুব খাটলাম। মনে পড়ে বিয়ের পরে সন্ধ্যা যেদিন আমাদের বাড়ী থেকে চলে যায়, মা সেদিন তার সব জিনিষ-পত্র মোহ-গাছ করে দিতে বাধ্য ছিলেন। তাই তার খোঁজ পড়নি। তারপর বহন যাবার সময় হল, তখন তাকে আর সারা বাড়ী খুঁজে পাওয়া যায় না! শেষে দেখি সে ঠাকুরঘরে গিয়ে গলাধঃকৃত দিয়ে গড় হয়ে ঠাকুর প্রণাম করছে—আর তার গুই গড় বেতে অকোরে অঙ্গ ঝ’রছে। জানি না সেদিন

ঠাকুরের পায়ে সে কি নিবেদন করছিল! এ দৃষ্ট দেখে আমি প্রথমে খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—তবে শেলাম না কি করব। পরে ধীরে ধীরে ডাকলাম—“সন্ধ্যা”, “সন্ধ্যা”। আশ্চর্য ভাবে সন্ধ্যা চমকে উঠে এসে উঠে বসল—ত্যাঁত্যাঁড়ি চোখ মুছে একটু শান্ত হবার চেষ্টা করল। তারপর দেখনি থেকে উঠে এসে আমাকে প্রণাম করবার জন্যে আমার পায়-পাশ করল—হুঁ গোটা তত্ত্ব অস্ত্র করে পড়ল আমার পায়ের উপরে। প্রণাম করেই সে এক রকম ছুটে সেখান থেকে চলে গেল।

“তারপর, কিছুদিন পরে আমি বিশেষ চলে গাই। বিশেষ বাবার আগে সন্ধ্যা একদিন তার বাড়ীতে আমার সেবায় করে নিজের হাতে রঁবে খুব ব্যস্ত করে খাইয়েছিল—আমি হা’ হা’ খেতে ভালবাসি। বিস্ময়-কালে প্রণাম করে আমার কাছে চেয়েছিল আমার একখানি ফোটা। তার সেদিনকার বিস্ময়ব্যাখ্যার অন্তঃসত্ত্ব্য চাইনিটি আজও বেন আমার চোখে ভাসছে!

“তিন বছর পরে—আমি তখনও বিশেষে—হঠাৎ এক মেয়ে খবর শেলাম সন্ধ্যা মায়া গিয়েছে—খাটসিলে। তার অন্তঃসত্ত্ব্য খবর এর আগেই মা’র চিঠিতে পেরেছিলাম। কিন্তু সে যে এত ধর্মগিরি চলে যাবে তা’ কখনও ভাবতেও পারিনি। সেদিন সেই প্রব্রু প্রবলে তার স্তম্ভসংঘটনা বখন শেলাম, আমার অন্তঃসত্ত্ব্যই বেরিয়ে এল বর্ণনামিত করা একটা বীথ বিবাস—খনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। মনে কেলে উঠল প্রগান বিনের অনেক মুছে যাওয়া স্মৃতি—অনেক ছোটখাট কথা, যা এতদিন বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে ছিল।

“পরের বছর আমি মা বাবাকে ও হারানাম। শেষ সময়ে হারের কারও সঙ্গেই যে আমার দেখা হ’ল না এ হুঃ আর হারবার ভুলবার নয়। আমি তখন পান করে বেরিয়ে গিয়েছি, কিন্তু টেনিয়েছিলাম।—প্রথমে গেলেন বাবা। তাঁর গড়-প্রোঙ্গার অত্যন্ত বেশী ছিল। তাই তাঁর ক্ষেত্র মা সর্বমাই গম্বির থাকতেন—কখন কি হয় ভেবে। বাবা মায়া হারার ময়কমাস পরে লাগে চলে গেলেন। আগে থেকেই তাঁর গুট খারাপ ছিল—তাই অত বড় শোকটা সামলাতে পারেন না।

“বিশেষ থেকেই আমি চাকরী নিয়ে আসি। ফিরে এসে বছর দুই প্রায় আমাকে ঘুরে ঘুরেই কাটাতে হয়েছে।

এর মধ্যে কমলেশবা’ অনেকবার আমাকে লিখেছে বেশের বাড়ীতে একবার এসে ক’দিন থাকে যেতে। একে ত আমার প্রায় ছুটাই নেই, তাছাড়া এ শ্রুতপুত্রীতে দুঃস্বস্ত আমার কিছুতেই ঘন সরছিল না। তারপর কি একটা কাজে একবার আমার ক’দিনের মধ্যে কলকাতার বেতে হয়েছিল। তখন হঠাৎ কি জানি কি মনে হ’ল—ইচ্ছে হ’ল একবার আমারই এ বাড়ীটা দেখে গাই। একদিন কাউকে কোনও খবর না দিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীতে বখন এসে পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আর আর স্মৃতি পড়ছে। আমার আসার খবর পেয়েই কমলেশবা’ ছুটে এল আমার বেগতে—আমার বুকে ঝড়িয়ে ধরে তার সেদিন কি কান্না! মনে হল তার এতদিনকার সমস্ত পুত্রীভূত বেদনা ক’রে পড়ছে আর অস্ত্র আকারে—তরল হয়ে।

“মামি অর্থাৎ হয়ে চেয়ে বেগলাম—কমলেশবা’র সব চুল এর মধ্যে একবারে লাল হয়ে গিয়েছে। তার বখন তখন চলিও হয় নি।—তারপর চোখ মুছে শান্ত হয়ে কমলেশবা’ আমার বসল—“কাপড় গোড় ছেড়ে কিছু খাও। গোবিন্দকে বলি হাতমুখ ধোবার জন্য টল দিতে।” সেদিন ও নিজে লাঞ্জন বলে থেকে আমার এই রকম ব্যস্ত করেই যাওয়া। সেদিনও আমি এই টেবিলে বসেই খাচ্ছিলাম—কমলেশবা’ বসেছিল ঐ চোরারীতে। উঠানের এক কোণে একটা ঢালাঘরে একটা কুকুর অশ্রান্ত বেউ বেউ পল করছিল। মাকে মাঝে সেটা একটু খামলে শোবা খাচ্ছিল বাইরে গাছের পাতার উপর বুড়ির জলের টুপুর চাশুর লম্ব। যাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে বসে আছি। চাকর টেবিল পরিষ্কার করে নিয়ে গেল। কমলেশবা’ বেন তার যাওয়ার ক্ষেত্রেই অপেক্ষা করছিল—সে চলে যেতেই আমার আবেগকন্ড হয়ে ডাকল—“রপজিৎ।”

“মামি একটু লম্বাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিলাম—“কি?”

“তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।”

“বল, কমলেশবা।”

“আমার স্ত্রী সন্ধ্যাকে তোমার মনে পড়ে?”

“নিশ্চয়ই।”

“সে তোমার একটা কথা বর্ণিত বলে গিয়েছে।”

“কি কথা?”

“সরপকালে আবার কাছে দে বীকার করে গিরেছে তার মনের কোনও গোপন ব্যাখার কথা।”

“আমি চূপ করে রইলাম”—এ কথার পরে কি সে বলা উচিত ভেবে পেলাম না।

“কমলেশ্বর! আবার বলতে লাগল—কথাটা তোমার বলতে আবার কেমন বেন বাচ্ছে!...না না, তোমার আমি কিছুতেই বলতে পারব না। না, আমার বলতেই হবে। না বলে উপায় নেই। তুমি বোধ হয় শুনেছ সন্ধ্যার বন্দা হয়েছিল। তা ষোটেই নয়। সে মারা গিরেছে আসলে মনের দুঃখেই। বিয়ের পরে যখন সে প্রথম এসে আমার বাড়ীতে, তখন থেকেই দেখলাম সে বেন সর্বনাশই পূব বিঘ্ন হয়ে থাকে—মনে তার কোনও আনন্দ নেই, ‘কুষ্টি’ নেই। দিন দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগল। ছ’ মাসের মধ্যে তার এমন চেহারা হয়ে গেল যে, তাকে দেখে চেনাই যেত না সে, সে নেই সন্ধ্যা। তাকে এবিঘরে কোনও প্রের করলে সে কিছুই বলত না—তবু একটু রান হাসি হাসত। সে হাসি কাহার চেয়েও ককণ, ব্যাধার। তার আপত্তি সব্বও আমি একদিন ডাক্তার ডেকে আনলাম। গ্রামের গোহাল ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলল—ও কিছু নয়। দিম্বারের একটু বোধ হয়েছে, সেয়ে ধাবে শৈশুগির। বলে কি একটা বড় বড় রোগের নাম করল। আমার তাই ওগব বড় বড় নাম মনেও থাকে না। আমি সন্ধ্যার জন্তে শিশি শিশি ওষু কিনে আনতে লাগলাম। ডাক্তারের কিত্তে ও ওষুপণয়ে আমার অনেক টাকা খরচ হতে লাগল। কিন্তু সন্ধ্যা কিছুতেই ওষু খেতে চাইত না। ওষু গিতে গেলেই সে একটু হেলে বলত—ও খেবে আর কি হবে? ওষু আমার অসুস্থ সাধবার নয়।

“আমি ক্রমে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওর কোনও গোপন ব্যাখা আছে—বা ও আমার বলতে পারছে না। একা থাকলে অনেক সময় দেখতাম ও শুয়ে শুয়ে কান্দে—চোখের জলে ওর বালিশ ভিজে থাকে। আমি বুঝতে পারতাম না আমার কি করা উচিত। তাকে প্রহর রাখবার জন্তে আমি তাকে কত মতুন নতুন হস্তার হস্তার শাড়ী, গয়না এসেঙ্গ, সাগান উডাদি সৌখীন ভিনিধ কিনে, এনে দিতাম। কিন্তু

কিছুতেই তার মুখে এতটুকু হাসি ফুটতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম সন্ধ্যা তার নিশ্চিত। তখন দাঙনের শেষ। আর আর গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে। একদিন রাতে আমি সিঁচানার শুয়ে আছি—তখনও ঘুমোই নি। সন্ধ্যা আসে আস্তে কীপখবে আমার ডাকল—“প্রণা! শুনেছ?” আমি তাকাতাকি উঠে তার সিঁচানার কাছে গেলাম। মশারি তুলে তার মুখের উপর হুঁকে পড়ে ভিজেল করলাম—“আমার ডাকছ সন্ধ্যা?”

“হ্যাঁ। তোমার আমি একটা কথা বলে যেতে চাই। আমি ত আর বাচনই না।” বলে সে একটু থামল। আমি অবনি তাকাতাকি বলে উঠলাম—“ছি! একথা বলতে নেই, সন্ধ্যা। তুমি সেয়ে উঠবে।” সে একটু অস্বী হয়ে বলল—“না, না, আমার মরণের দিন বনিরে আসছে আমি বেশ বুঝতে পারছি। এর পরে হয় ত আর সময় পাব না। ধাবার আগে আমার সব অপরোধ বীকার করে তোমার কাছে কথা চেয়ে দাও। বল, আমার কখন করবে আর আমার একটি অমুগোষ রাখবে?” বলে সে আমার একটা গাত চেপে ধরল।

“আমি বললাম—“নিশ্চয়ই রাখব। তুমি বল, তুমি কি বলতে চাও।” একটু চূপ করে থেকে সন্ধ্যা আমার আস্তে আস্তে বলতে লাগল—“বিসের পর থেকেই প্রাণপণে চেষ্টা করেছি তোমার সুখী করতে, কিন্তু আমার ভাসা-বোয়েই বোধ হয় তা পারিনি। আমি নিভেও সুখী হতে পারলাম না, আর তোমার জীবনটাও বাধ করে দিলাম। সেজন্তে আমার অপরোধ নিও না—আমার তুমি ক্ষমা কর। তবে এটুকু বলতে পারি তোমার কাছে গাতি থাকতে আমি অপ্ৰাণ চেষ্টা করেছি। বিবের আগে কিংবা পরে অস্তায় কিছুই করিনি—এটা অসুস্থত: আমি জোর গলায় বলতে পারি। আমি আচ্ছ মরতে বলেছি। কিন্তু এর কারণ কি জান?” বলে সে আমার মুখের দিকে তাকাল।

“তার ব্যাখার কাছেই খোলা জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছিল তার ভোগপাতুর মুখখানির উপরে। আমি ব্যাহুল হয়ে বসে উঠলাম—“বল কি কারণ? এখনও যদি তোমার বাচাতে পারি কোনও রকমে!” কীপ হাসি চেপে সন্ধ্যা বলল—“না, আমার বাচাতে তুমি পারবে না

আর আবার বেঁচেও কোন স্বপ্ন নেই। মিত্রও কষ্ট পাবে—তোমাকেও কষ্ট পেরে। আমি বড় ভালবাসতাম একজনকে। সে আমার ছোট বোনাকার খেলার সখী, কৈশোরের সখা, যৌবনের প্রিয় বর্ণভিনা।

“কিন্তু কম আমার কেউই কোনও কথা বলতে পারলো না—হুতনেই চূর্ণ করে রইলো। একবার উত্তরে আমি তাকে কি যে সাধনা সেব ভেবে পেলাম না। তারপর লক্ষ্যেই সেই অস্বস্তিকর নিরাশ্রয়। তর করে আমার বসতে লাগল—“আজ তুমি বল, আমার এই পবিত্র নিরুপদ ভাল-বাসতে কোন রোগ, কোন পাপ আছে কি না? এই ভাল-বাসাই হল আমার কান। এই আগুন বৃক্কে চেপে আমি তিলে তিলে মলে মরেছি। এক এত সবার আমার তর হত আমি বৃক্কে বা পাগলই হয়ে যাব। বড় সুখ ছিল মজার মধ্যে রপুসিংলাকে একবার দেখব। তা আমার মনের এ বাসনা পূর্ণ হল না। তিনি কিছু কিছুই জানেন না এ সব কথা। তাঁকে কোনও দিন জানতে চিট নি আমার মনের কথা। মনের বাণী এতকাল আমি নবই চেপে রেখেছিলাম। আজ এই তোমাকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কতকই বসি নি আমার এই গোপন রাখার কথা। আমি যখন আর এ ভাগ্যে থাকব না তুমি রপুসিংলাকে ব’ল আমার কথা। ব’ল কত ভালবাসতাম আমি তাঁকে। তুমি বল, তুমি বলবে তাঁকে আমার এই কথাটি? আমার এই মরণ-সময়ে আমার কথা পাও। আমি বেঁচে থাকতে যে কথা তাঁকে বলতে পারিনি, আমি মরে গেলে আমার সেই কথা তুমি ব’ল তাঁকে। কোনও একদিন যে তিনি ভাববেন, কত ভালবাসতাম আমি তাঁকে, সেই কথা মনে করেই আমি মরণ-সময়ে একটু সাধনা পাব।”

“আমি তাকে কথা দিলাম। রণভিৎ, ভাই, আজ কথাটা তোমার বলে আমার মনটা হাল্কা হয়ে পেল। আমি তার শেষ অঙ্গুরোধ রাখতে গেরেছি—নিজ প্রতিক্রিয়া পাশন করছি।” ব’লে কমলেশনা চূর্ণ করল। বেগলায় তার গুট চোখে অঙ্গ টল টল করছে।

“খানিকক্ষণ চূর্ণ ক’রে থেকে রণভিৎ আমার বসতে লাগল—“লক্ষ্যের স্তুতির এই কর্তব্য কাঁচনীট মনে সেদিন

আমার মনের ভিতর যা ক’রে লাগল তার শব্দ শুধু আদ্যন অজ্ঞান্যবোধী জানেন। তোমার আর কি শব্দ রাক্ষসের। আমার কোনও মনে হতে লাগল—আমি এই পুরষ বেহেশন শোষণশোষণ লোকটির স্ত্রীর স্তুতির কারণ। আমার ভবনেই এ লক্ষ্যকে মিশে হৃদের নীড় বাগতে পারে নি। থাক। তোমার আমি যে কথা বলছিলাম সেটাট পেশ করি। সেদিন কমলেশনার কথা শেষ হ’লে আমি তাকে সাধনা দেবার বৃত্ত কোন কথায় ছুঁতে পেলো না। শুধু তার একশা না হাত আমার হাতের মধ্যে চেপে ধীরে ধীরে অপরিসীম বৃত্ত বললাম, “কমলেশনা আমার তুমি কমা কর।”

“কমলেশনা” অধনি আড়াআড়ি ব’লে উঠল—“ছি! ও কথা ব’লছ কেন ভাই? তোমার ত এতে কোনও যোগ নেই। তুমি চিরদিনই আমার সেই মেহের ছোট ভাইটিই থাকবে। তোমার উপরে তোমার কমলেশনার মেহের এক কথাও কোনও দিন কোন কারণেই কমবে না। সবই নিশ্চিতি। তাকে আমার কেউই ব’লতে পারি না।” ব’লে সে নিজের কপালে হাত তৈল।

“আমি আর কোনও কথা বলতে পারলাম না—নিঃশব্দে তার একটা হাত চেপে ধ’রে ব’লে রইলাম। অনেক দিনের জন্যেই অঙ্গ...অনেক কালের দক্ষিত বাণী আকুল হ’য়ে উঠল আর বেরিয়ে আসবার ভরে আমার ছ’ চোখ ছাপিয়ে—সে দিন, অনেক দিন পরে কাঁদলাম, শৈশবের অনেক দৃষ্টি মনে ক’রে। মা-বাবাকে হারানোর দুঃখ, লক্ষ্যকে হারানোর ব্যথা আমার মনে নতুন ক’রে জেগে উঠল—আর এই হতভাগ্য মাল্গারটির নিরুপদ প্রেমের বিকৃত্যাপূর্ণ জীবনের কথা মনে ক’রেও বুঝি বা আমার সেদিন কয়েক কৌটা চোপের জল প’ড়ে থাকবে।...তারপর খানিকক্ষণ সেইভাবে বসে থাকার পরে কমলেশনা বলল—“বাবো বেগতে লক্ষ্যের সখা? সে যে বরটিতে শুভ তারই কাছে তার শব্দের স্তম্ভবাসনের মধ্যে রেখেছি তার চিত্তাঙ্গ—জায় বেহাশবে।” আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না। শুধু থাক ব’লে সম্মতি জানালাম। তখনও বৃষ্টি ধামেদি—অঙ্গ অঙ্গ কৌটা কৌটা পড়ছিল। বহিঃপ্রতিক্রিয়া মনে ছুটি বাখাতুর মানব-জনকের হৃদয় সমবেদনার অঙ্গ করছিল—টপ টপ। আশ্রয় চাননা সেই বৃষ্টির মধ্যে

বিরোধে। রুইর ঘরের ফোটা টপ টপ করে পড়ছিল
আমাদের মাথার উপরে—সেদিকে আমাদের পেয়ালট নেট।
কমলেশবা' এসে পাড়ালে তার বাগানের মধ্যে একটা উঁচু
গেণ্ডিবেয়া তাম্রগার-সামনে—পকেট থেকে চাবি বার করে
পুল একটা ছোঁই গেট। ছোঁই একটা সমাধি—বার্গেল
পাথরে রাখান। কমলেশবা' টেবের আলো তার উপরে
ফেলল, বেগলাব লেগা। আছে—ক্রীড়ার সজ্জাগাড়ি বেরী।
তার নীচে কংকট লাইন—

“লস পাতি, লস পাতি
সেই মাগে সব রাতি
“হুজ য়োচ্ বাই।”

“কমলেশবা! বলল “এই লাইন ক’টি পে তার লম্বা
উপরে দিখে রাখতে বসেছিল আমায়।

“আমরা ছ’জনে বীরবে সেই ফিরে ঘালের উপর স্তম্ভ হ’লে
দাঁড়িয়ে রইলাম সজ্জার সমাধিবনীর সামনে—ছ’জনে পাশা-
পাশি—একজন যে সজ্জাকে ভালবাসেছিল, অরে একজন সজ্জা
বাঁকে ভালোবেসেছিল। আমাদের উচরের মধ্যে সেই স্তম্ভ
নারী বেন একটা অজেন্দা যোগফল বেঁধে দিল। বেশলাম

পাছের পাতা থেকে রুইর ঘরের ফোটা টপ টপ ক’রে
পড়ছে সেই খেতপাথরের সমাধির উপরে। মনে হ’ল
সেই পাথরবেদীর নীচে সজ্জা বেন ঘুমিয়ে আছে। তার
নিচলস ভালবাসার ভরা জনগতির কথা মনে প’ড়ে গেল—
যোধ হ’ল বেন সেই জনের স্পন্দনও স্পষ্ট চোখের মাঝে
বেগতে পাচ্ছি।

“তার পর থেকে প্রতি বছর আমি একবার ক’রে এখানে
আসি—ভানি না কিসের টানে। একবার বেগে বাই সজ্জার
সমাধিটা। কমলেশবাকে বেগদেই আমার মনে পড়ে যায়
তার জীবনের যে ঘরা ক্ষতিটা আমি ক’রেছি—ওর কাছে
নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী ব’লে মনে হয়। কিন্তু ও বেন ওর
সহিষ্ণু চরনের অশেষ জ্বা দিয়ে আমার সর্পলাই ঢেকে
রাখতে চায় অসীম মেহের পক্ষপটে।”

কথা শেষ ক’রে সবজিৎ—একটা দৌরনিগাম ফেলে
পানিকটা টপ ক’রে রইল। “আমাবও নিজের অজান্তে
বেরিয়ে এসে একটা বীণ নিঃশব্দ। তারপর সবজিৎ ফুরার
ঘড়িটার দিকে তেরে ব’লে উঠল—“অনেক রাত্রি হ’লে
বিরোধে। এস, আমরা গুণে পড়ি।”

ধন্য

—শ্রী প্রতিভা ঘোষ

তোমারি নেওয়া গুণ সহিতে শক্তি

তুমিই দেবে তাহি’ তোমারে ডেকেছি।

তোমারি পাশে, এত উজাড়ি’ তুমিই

ব্রতের পথ-পুলি অসে বেগেছি ॥

কপোলে বেয়েছিল যতক আঁখি-ভল

আমায় কর-পুটে ধরিয়া সে লগন

অর্ঘ্য দেখি তোমা ঘোন-নিশি

মনের সম্বিরে স্মৃতি গড়িয়া।

বেবেছি পূজা ঘোর লয়েছ দেবতা,

খুশিতে মন হাই উঠেছে তরিয়া ॥

তুমি যে আসিয়ে না মন তা ধলনি,

কঁদাতে ভালবাস আসেনি স্তম্ভে।

তাবিনি স্তারও শাবি ও মন গলেনি

বেবেছে যে তোমার জীবনে মনমে ॥

কৈবেছে হৃদয়মতী, “গোপাল কোথা” ব’লে,

সামান আঁখি-ভলে পাম্বা বেছে গ’লে,

ক’ল-কাঁধাগারে কৈবেছে বেরকী

নন্দ শিতা কৈবে অঙ্গ হয়েছে।

তবু পথক তুমিই বয়েছ

তারেই কানালে যে মনন লয়েছে ॥

অন্ত মন মোর বুঝলে হুক না

তোমারে ডাকে তবু ধরান ভাগিয়া।

তুমি কি পরায়, যুক্তি বুঝে না,

তুমিই ভাগ্যেত সবারে চাপিয়া ॥

দারন নিশিখরী, আঁখিও তোমা লানি’

জ্বাধ গুণে, প্রকৃত, রয়েছি একা ভাগি’

অন্ধ-বহুনাথ উজান বহিরে

এস যে, গিরিধারী, এ প্রেম-স্বপ্নে।

এ বেহ-শ্রীমতিকা বঁধ হইবে

তোমার সুনিবিড় পরণ ভূতে ॥

[illegible]

সংস্কার

— শ্রীলোককুমার রায় চৌধুরী

জুলের ছেলেরা নিত্যই ছেলেমানুষ। মাথা হেঁচা ঠাড়াইয়া কোন কাজ কবিরাজ শক্তি তাহাদের নাই। ঐশ্বর্য চুপির সময় কলেজের ছেলেরা কিবিদ্যা অসিয়া হৈ চৈ বাহাইল।

এত বড় একটা গ্রাম, গ্রাম আট ভাঙাব লোকের বাস। সে গ্রামে এট একট মাঝ পানীর ভলের পুতুল। বর্তমান চন্দ্রানন্দ বংশের কোন পুণ্যপুণ্ড্র প্রতিষ্ঠা কবিদ্যা বিগাছেন। তাহার পর এই দীঘ বেড় পত বংশের বধো আর তাহাব সংস্কার চর নাই। বাবা-বাবার কাছে হাত পাঁজের পাঁক জমিগাছে। মাক বিদ্যা সদ এক কালি রাত্তা হইয়াছে। এক জন কবিতা লোক কোন রকমে থিরা মাথা ডুবাইয়া আসে, আবার এক জন যায়। একটু শাপ কাটাতে গেলেই জন ভর কবিদ্যা পাঁক উঠিয়া সবত স্থান পড়িল হইয়া উঠে।

কলেজের ছেলেরা একপানা খাড়া বগলে চামচাংগারে হারিব হেল। চন্দ্রকান্ত এন-এ পড়ে, সে-ই সকল কাজের শাড়া। মাথার লাগড়ী বাঁধিয়া আগে আগে চলে সে, পিছনে কলেজের অস্ত্র ছেলেরা এবং তাহাদের লিঙ্কনে ধ্রুগেব উর্ধ্ব স্রাসেব ছেলের বগ।

গ্রীষ্মকালের বেলা। একটুতেই গোধ ক' ক' করে। চন্দ্রানন্দ হৈলোককুমারু হিতরে স্থান করিতে বাওগাব চন্দ্র উদ্ভিতছিলেন। এমন সময় চন্দ্রকান্ত সগল বংশ আসিয়া জাগতে প্রণাম করিয়া ঠাড়াইল। হৈলোককুমারু হিতরে গওগা হইল না। নিজের পুণ্ড্র আসনে বসিয়া তিনি গুরুক বসিতে বলিলেন।

চন্দ্রকান্ত অনতিদূরে একপানা আসনে বসিল। হৈলোককুমারু সমুপে ছেলেরা কোন বিনই বড় একটা চিড়িত না। তাহার্য কেহ বাবের ভাড়াগে, কেহ সিঁড়ির পৈঠার পিছন কিরিয়া নিগদন্ত কানে বসিল, কেহ বা সমুপের ভলনের আনদাছটার চারিধারে গুঁরিয়া অর্ধপঙ্ক আন্তগুলির প্রতি লোমুশ নৈরে চাহিতে লাগিল।

চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে কেবলই খাড়া উন্টাইয়েছে দেখিয়া

হৈলোককুমারু নিজে হইতেই তিচ্ছাস করিলেন—কি ব্যাপার? টালা?

—আজ্ঞে, বীথির পকোড়ার না করলে তো আর চলবে না। বাটের গোড়াতেই এক হাঁটু পাঁক। জলও হজ্জে হেঁমনি, কাণাখোলা, অশচ গ্রানের আর কোন পুতুলে একটু কোঁটাও মল নেই, লোকে মানট বা বলে কোথায়? খাবার চলই বা আসে কোথা থেকে? দেখতে ভাবছি.....

মধ্যপথে মাথা দিয়া হৈলোককা বাবু বলিলেন,— তা হেনর্য তো এমদে হুণা খানেক হ'ল। এন আগে লোকে স্থান করত কোথায়?

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিল,—আজ্ঞে, ঐ খানেকই। আমার্য যদি চামা তুলে পকোড়ার না করি, তা হলে গ্রীষ্মকোর ভট চলই পালে। এখন তাও মিথ্যে না, তখন গাড়ীতে ক'বে পালের গ্রাম থেকে মল আসবে। তবু নিঃস্রা উৎসাহ ক'রে কোন কাজ করবে না। এত বড় গ্রাম, হাড়ীনিষ্ট এক জন তবে লোক যদি কোথাল পবে, পকোড়ার হ'তে কতকণ? একটু লগদাও খসত চর না। কিন্তু তা তো হবে না। সব ঠাকিব উপর চলতে চায়।

চন্দ্রকান্ত হহ ত আরও অনেক কথা করিত। কিন্তু হৈলোককুমারু মত পছীর লোকের নুণে কোঁকুরের কীণ সেবা নুঠিতে বেশিয়া থামিয়া গেল।

হৈলোককুমারু হান্ত মদন করিয়া কহিলেন, এখন আমাকে কি করতে হবে?

চন্দ্রকান্ত ত্রিষ্টুই না বলিল তবু টালায় পাড়াটা উন্টাইতে লাগিল।

হৈলোককা বাবু কহিলেন,—কিন্তু আমি তো বীথিতে স্থান করি না। আমিও না, আমার হাড়ীর কেউও নহ। আমার হাড়ীতে ইমাগা তথুচ্ছ। খাওগাব, মানে আনদা সবাই সেই চল বাবহার করি।

আনদাছের আগে,পাশে জমাগা গুঁড়িতছিল, একপা তনিন,

ভাষায়া সরিয়া পড়িল এবং প্রাণের অন্তরালেই ছেলেগুলি নিঃশ্বাস ছেলেগুলির পাশে সরিয়া আসিল।

কিন্তু চন্দ্রকান্ত ওপাশি চাল ছাড়িল না। কহিল,—তা হলেও সাধারণের উপকারের জন্য...

যা যা বিধা ঠেলেকাঠানু বলিলেন,—ঠিক। কিন্তু চন্দ্রকান্ত, তোমরা আজকাল ইংরিজি লেখাপড়া শিখছ, তোমাদের মুখে নিভা নতুন কথা শুনতে পাই। তোমরা দেখ-বিজ্ঞান খান না, জমিদারের অধিকার স্বীকার কর না, তোমাদের কাছে প্রত্যেক মানুষের অধিকার সমান। দোষের পরোক্ষারে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমাকে যদি চালা দিতে চর তো প্রত্যেকের স্বার্থের জন্যে। কিন্তু জমিদারের প্রত্যাহার সম্পর্ক তাই তোমরা রাখতে চাও না।

চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিল। চালা আমার করিয়া করিয়া তাহার বুদ্ধি পাকিয়া গিয়াছে। সাধারণের কাছে নানিতে গেলে পাঁচতনের পাঁচ বণা শুনিত হইত। যে ইহা না পারে সাধারণের কাছে তাহা না মানাই ভাল।

ঠেলেকাঠানু আশা বলিলেন,—যে দীর্ঘের আজ তোমরা পরোক্ষার আয়োজন করছ, সেই দীর্ঘ আমারই পূর্ণ-পুরুষের কীর্তি। তাঁরা জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে অত বড় বাধ বন্ধন করেছিলেন, আর আমি তাই পরোক্ষারও করতে চাচ্ছি নে। কেন জানি? তোমাদের ওই বড় বড় বক্তৃতাও শুধু ওই দীর্ঘ নয়, এই গ্রামে এবং মাঠে বসে পুষ্করীতে আছে তাঁর শব্দভাষা নকলুইটা জমিদারের দান। তাঁরা প্রজাঠেদিয়ে থাকেন আমার করতেন, কোথাও কোথাও অত্যাচার যে না করতেন তাও নয়, কিন্তু তাঁর শব্দে টাকটাকি বাক্তে জমা বেধে নিশ্চিতে হুদ উপভোগ করতেন না। তাঁর অধিকাংশই দেওয়ান প্রতীতি, পুষ্করী প্রতীতি, রাজ্যঘাট দেওয়ানে বার করতেন। তোমরা আজকে সে বিধান উল্টে দিতে চাও। প্রত্যেক রাজার আজকে শুধু বাতনার সম্পর্ক। পুষ্করীতে দেওয়ানের কাজ আজ আর তাই জমিদারের নয়। তাঁর কল্পে চালা তোমার প্রয়োজন। কিন্তু কত চালা ওঠে শুনি? তোমার বাড়ীটা দেখতে পারি?

প্রাণ পক্ষাণন চালা সহি করিয়াছে। মোট পক্ষেটা চাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। বাতানানা ঠেলেকাঠানু চৌলিয়া সরিয়া দিলেন। একটু প্রাণের সঙ্গে হাসিয়া

কহিলেন,—এ প্রাণে প্রাণ বাতানার বর দোকান হবে। তাঁর মধ্যে প্রাণের বর চাকি, বাতান, বৃত্তি টাকাদি। তাহা দিন আন দিন যায়। জনজিতে একটা দিন বেজার বেজার খেতেও রাজী হইবে না। আরও প্রাণের বর নিবে। তাহাদের বার নাও। বাকী ছ'শো বরণের মধ্যেও অনেক পাণ কাটাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু পরে নিলাম তাহা দেবে। তা হ'লেও যে পড়তাব চালা উঠেছে, তাতে প্রাণে টাকার বেশি উঠবে না। ওই তোমার কাজ হবে?

চন্দ্রকান্ত গাড় নাড়িয়া জানাইল,—গাড়ার কখন হইবে না।

—একি আশ্রয়?

চন্দ্রকান্ত গাড় চুলকাটতে গাশিল।

ঠেলেকাঠানু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—চুটো টাকার আমার নামে ফেল। কাল যে কোনো সময় সরকারের কাছে থেকে নিবে বেত।

বনিরা শব্দেই শব্দ করিতে কহিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। বহুদশ অসুবিধার পর ছেলেগুলি খেদ বাড়িয়া গেল। কেবল চন্দ্রকান্ত কি যেন চিন্তা করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

এত বড় একটা ব্যাপারের দ্বার লইয়া চন্দ্রকান্ত বিব্রত হইয়া উঠিল।

প্রাণের যে সমস্ত অসুবিধা ও উৎসাহ বিধা তাহাকে এ কাজে নাধাইয়াছেন, এখন আর তাহাদের দেখাও পাওয়া যায় না। তাহাদের অনেক এখনও চালায় খাতির হই পক্ষ্য করেন নাই। তাহারা একতরফে চারি অনা সই করিয়া গিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত তাহাদের কাছে নগদ কি যে আদার হইবে ভাবনা জানেন। প্রাণের অসুবিধা লোকও যে পাশাপাশি তাহা নয়, কিন্তু ইহা চন্দ্রকান্ত অথবা তাহার দলবলকে দেখিলে সকলেই গাঢ়া দিতে অবস্থ করিয়াছেন। ব্যাপার দেখিয়া চন্দ্রকান্ত সুখকাঁচা পড়িয়াছে। তাহার দলের সকলেই ছোট। তাহাদের উৎসাহ আছে, কিন্তু শুধু উৎসাহে তো পুষ্করীর পাক উঠিবে না। সকল বাধিষ তাহারই। আর সে দাবি কত নয়। উপযুক্ত পরিমাণ চালায় অভাবে যদি পরোক্ষার না হয়, বাতান চালা দেখ নাই, তাহারাও সেদিন

নিশা করিতে দ্রুত করিবে না। বেন একটা সাধু সঙ্গর করিয়া চন্দ্রকান্তই চোর হইয়াছে।

সেদিন সকালে চন্দ্রকান্ত সূক্তকার পাড়ার গিয়াছিল। সঙ্গে বৈষ্ণোকাব্যাব্দু হেলে চম্বিকেশ ছিল বগিহাই হকা। নব্বিলে হক তো কেহ দেখাই করিত না। তাহারা কনিয়ার-মন্ডনের কাছে কাঁদিয়া পড়িল, চাণা দিবার শক্তি তাহাদের নাই।

চম্বিকেশ বলিল,—সে বললে তো হবে না। শচন্দ্রের অজ্ঞ, তোমাদেরই মান এবং পানীর জলের ব্যবস্থা হচ্ছে। চাণা না দিলে চলবে কি করে?

চম্বিকেশ ভালে, তাহার শিতাবহের শ্রাঙ্কের সমস্ত তপু এই একটা পাড়া হইতেই একশত টাকা উন্নিয়াছিল। তাহার চেয়ে এ কাক কত জরুরী। কিন্তু সেখানে না, ইহারা কনিয়ারের হুকুমে গ্রাণোজন হইলে একশত টাকা কেন, দুইশত টাকা উঠাইয়া নিতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত জরুরী কালেও যেহেতু এক টাকাও দিতে পারে না। চাণা সেওয়ার বিষয়ে সে কোনো বাধ্যবাধকতা নাই, সে সংযোগ ইহাদের কর্তৃপক্ষের হইয়াছে। তাই চম্বিকেশের কথার ইচ্ছা আর একবার হাত জোড় করিল।

এ তাৎক্ষণিক চন্দ্রকান্ত এবং চম্বিকেশ উভয়েরই মন গিলিল। বেচারীরা সত্যই যে বড় গরীব, সে বিষয়ে সন্দেহ আর সন্দেহ নাই।

চন্দ্রকান্ত খানিকক্ষণ মন ধরিয়া বসিয়া থাকিয়া অঙ্গশ্রেয় বলিল,—আজ্ঞা চাণা তোমাদের দিতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ী থেকে সপ্তাহে একজন করে বেগার দিতে হইবে। তাতে তো আর পক্ষা ধরত নেই।

সূক্তকারেরা তখানি হাত জোড় করিয়াই রহিল। কহিল,—আজ্ঞে বাবু, তা হ'লে সবার শা দেওয়া হবে।

বাগদারটা সমাধা হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া চন্দ্রকান্ত উন্নিতেছিল। বিব্রিত ভাবে কিরিয়া পাড়াইয়া কহিল,—কেন?

—আজ্ঞে মালোয়ারীরা অত্যাচারে পাড়ার একটা মুনির গাড়া নেই। একদিন ভাল থাকে ত সাত দিন আর উঠতে পারে না।

—তবে, তোমাদের কনি চাষ ক'রে দেখ কে?

—আজ্ঞে, যা নিত্যন্ত না করলে নয়, তা না ক'রে উপায় কি?

চম্বিকেশ রাগিয়া বলিল,—ও! কেবল তুমি আহারের ব্যাপার করলেই হ'ল? পানীর জলের ব্যবস্থা করা বৃষ্টি কিছুই নয়? পানীর জলের ব্যবস্থা সেই বললে তো এত মালোয়ারী। দীর্ঘ সংসার না করলে ব্যবসাস এমনি ক্রান্ত হবে।

চন্দ্রকান্তের বলের অপর একজন তর্জনী আশোপিত করিয়া কহিল,—আমরা নিজেদের ব্যবসার জন্তে চাণা চাইতে আগিনি যুবক পালাজি?

পালজি ভিত কাটিয়া বলিল,—আজ্ঞে বাবু মগাই, ও কথা যদি মনেও এনে থাকি আমার ভিত বেন খসে যায়।

চন্দ্রকান্ত তাহারকে নরম দেখিয়া আশ্চর্য ভাবে কহিল, তা হ'লে ওই মুনিদের কথার ঠিক হইল তো?

পালজি আবার হাত জোড় করিয়া বলিল,—আজ্ঞে, ঘর-শিল্প সপ্তাহে একটা করে মুনির পারাব না।

চন্দ্রকান্ত ক্রমেই অসহিষ্ণু হইয়া উন্নিতেছিল। কহিল,—তা হলে কি পারবে তাই তুমি?

পালজি বাগ করেক হাত কচলাইয়া, কয়েকটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—আজ্ঞে আমি একা আর কি ক'রে বলি? পাচকনের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হবে, আপনাদের হ'তিন মনের মধ্যে জানাব।

বলিয়াই চট করিয়া একটা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল,—আজ্ঞে, তাও বলে রাখি, বড় পালজির কথা আমি বলতে পারব না। আমি এই আশ্রমের সাত ঘরের কথা বলতে পারি।

—সে আবার কি কথা! তোমার সংসার তাই—

ছোট পালজি বাথার একটা বাকি দিয়া বলিল,—আজ্ঞে, ওদের সঙ্গে বাতালান নেই।

ইহার দিন কয়েক পরে একদিন ছেলেরা আগিয়া জ্ঞান দেবে চন্দ্রকান্তের বৈঠকখানায় বলিল। বেলা শুণন ব্যস্ততা ব্যক্তিরা গিয়াছে। ত্রোহে সকলের মূখ বলদ্বিধা গিয়াছে, সর্বত্র দিগা কল কল বাজে ঘাম বরিতেছে। কহা দিনে ঘাম ইহারা বিদ্রোহ হইতে! আদিয়াছে,—এই কথ দিনেই দেখে

যক কর্ণক ও বর্ণ ভাস্কর হইয়াছে। হেলেনা যে যেখানে পারিল, বসিয়া আসিল ঘুসাইয়া হাওয়া পাইতে লাগিল।

সমুখের ঘরটি চক্ৰকান্তের পড়িবার ঘর। চারিদিকে যেওয়ালের গা বেঁসিয়া বড় বড় আলমারী,—বইতে ঠাণা। মধ্যে একটি টেবিল, এখানে বসিয়া সে পড়ে। ওদিকে একটি পোকা, খাখার দিকে একটি টিপার। একদিকের দেওয়ালে একখানি ভগ্নতবের মানচিত্র। ঘরের যেওয়ালে যে কথখানি ঝাড়াই করা ছবি টাঙানো আছে, তাহাতেও তাহার কঠির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ঘরে চক্ৰকান্তের ছোট বোন মজ্জী বাবার বেওয়া টার তৈরী করিতেছিল। এতগুলি লোকের সমন্বয়ে বাহিরে আসিয়া তাহাদের সৌভাগ্য সুখের অবস্থা যেখানি পাশে হাত দিল।

—এই ডাকাতের দল নিয়ে সমস্ত চোখুহটা কোথায় কোথায় ফুৎসে যাবা? সুখ যে ক'দিনেই কালী কর্ণ হল!

মজ্জী বাবার মত অভাবানি কর্ণ নহ। কিন্তু সুখের গড়ন দাগের চেয়ে ঢের ভাল। ছোট মন্থন লগাট, ভাল-ভাল বড় বড় চোপ, উ ছুটিং যেন তুলি দিয়া ঝাঁক। ছেলেরা সবাই একবার বাতাস খাওয়া তুলিয়া সুখ তুলিয়া জ্বাঝর পানে চাছিল।

চক্ৰকান্ত হাসিয়া বলিল,—ডাকাতের দলই বটে! তুই চট করে রোডের থেকে একটা বড় ঘটিতে করে এক ঘটি তল, আর একটা মাল নিয়ে আর তো। তেঁতার ছাতি কেটে যাচ্ছে।

মজ্জী দুটিবা বাড়াব তিতর গিয়া একটা বাটিতে করিয়া এক বাটি শুক, এক ঘটি তল ও একটা মাল আনিল। বেথিতে সেথিতে সমস্ত নিবেশ হইয়া গেল। তবু তৃষ্ণা দিইল না। মজ্জী আর এক ঘটি তল আনিয়া দিল।

এই তৃষ্ণাও ছেলের দল বেন বকত্বির মত সমস্ত তল ভরিয়া লইল দেখিতে মজ্জীর বড় কোতুক খোদ হইতেছিল।

হাসিয়া কহিল,—আজকে কত টাকা উঠল যাবা? একশো? দুশো?

চক্ৰকান্ত মান হাসিয়া কহিল,—ও সব হবে না যে। কদিন বিধো সোণে পুরলাস। এখের পানীর জলের দরকার আছে, কিন্তু কেউ দিলে এক পল্লা দিতে রাজি নহ। অস্ত্রে করে বেধ তো বেধ হয়।

মজ্জী লম্বিকেশের দিকে অশ্রুতে একটা পোঁচা দিয়া কহিল,—তা বাপু এই কটা টাকা তোমরাই নিয়ে যাও না। তুমি ভবেছ, তুমি বাবা রহেছ, তোমরা নিয়ে দিতে পার না?

—তুই কি বলিস মজ্জী? আমাদের বা বেবার আছে তা আমরা দেব, বত পাটতে হয় তত পাটব, কিন্তু সবটা যাব কেন? পাইব বা কোথায়? আর পেলেই বা দেব কেন?

মজ্জী আবার হাসিয়া কহিল,—সেবেই না বা কেন? চোখুর লোকের দোরে দোরে পুর জ্বা করবে তো? তাহেই ও টাকাটা সেখানে যাবে।

এ উত্তরে সকলেই হাসিয়া উঠিল। লম্বিকেশ যে বড় লোকের ছেলে, তার পিতা যে জোর করিয়া প্রতার কাছ হইতে বাজানো আদায় করেন, এই লজ্জাব পাচকনের মধ্যে সে সর্বদা মুগ্ধ হইয়া থাকে। সে বৃত্তিগাছিল, টাকাটা বিশেষ করিয়া তাহাকেই দিবার কল্প মজ্জী টেনিও করিয়াছিল। তাই এতক্ষণ পর্যন্ত মাথা নীচু করিয়া ছিল। এখন যুগ তুলিয়া কহিল,—মজ্জী, চক্ৰকান্ত টাকা পাবেন কোথায়? আমিই বা কোথায় পাব? টাকা বসি থাকে, সে বাবার, আমার নহ। কিন্তু সে কথায় নহ। শুণু বীথি-সংসারই ত আমাদের লক্ষ্য ছিল না। আসল কথা, মানুষের মনে *divio sensa* ভাগতে হবে। বিত্তত তল, বিত্তত হাওয়া, পশাপ আসো, ভাল সন্তাষাট, অগাব এবং বস্ত্রের মতই এজলাও মানুষের জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। সেই কথাই যে তারা বুঝতে চাচ্ছে না।

মজ্জী বুককঁটে কহিল, বুঝতে চাচ্ছে না টাকা নেই বলে।

—টাকা নেই? নকড়ি খোদ ন'বছরে ঘেঘর দিয়ে বেবার করে পকাশ টাকা কর্ণই করে ফেললে। সে টাকার দারে হাওয়া কোত্তা সর্গাখাত হবে। কিন্তু তবু নিয়ে দেওয়াই চাই। কারণ পরলোকের সবকিছু তার *sona* ভেগেছে। তার মনে বিশ্বাস ভেগেছে নবম বংশের পৌরীমান না করলে সর্ব্বের একটা বিশেষ কোন জাগসা সে পাবে না। কাজেই *beg, borrow or steal*—যে কোন প্রকারে ঘেঘর দিয়ে তাকে ন'বংশের দিতেই হবে। বুক আলো বাতাস এবং বিত্তত পানীর সবকিছু সে বুদ্ধি যদি তার ভাগত, আমাদের কিছুতে ফেছাতে পারত না।

একটা মাছটা চক্ষিকণ তেমন উদ্ভল চোখে আবার বলিল—টাকা নেই? কিন্তু আবার সকলের কাছে টাকা ও গাইনি। বার টাকা আছে আরই আছে চেয়েছি টাকা, বার নেই তার কাছে চেয়েছি সেতের পরিগ্রহ। কিন্তু এরা তাও নেবে না, একবারে সাক্ষিক গুণ সব কিছু চায়।

কিন্তু তথাপি মন্থরা যে ইংরেজের ওপর উপলব্ধি করিল তাহা মনে হইল না। সে তেমন পরিচাল-চট্টল চোখে চাহিয়া কটিল, তা তলে দৃষ্টমি না *to view* *conno* তাগে, তখন কি কংবের গ্রিক কংব? অপেক্ষা করবে?

ক্ষতিকণ এত পরিচালের উত্তর দিল না, তবু বাধিত দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিল।

কংব দিল চক্রাক্ত। কহিল, অপেক্ষাই করত হবে নিতি। পালের ভোবে ত শুভবুদ্ধি ভাগ্যে থাকে না। তবে অপেক্ষাও আর বেশী দিন করতে হবে না। এ বছরটাও পক্ষে-কলে পাবে, আসছে বছরে তাও বন্দ পাবে না, তখন সেদিন কংব আবার আবারের কাছে আসবে নিজে থেকে।

ওপাড়ার কথা মনে পড়ায় চক্রাক্ত আপনায় মনেট হানিয়া ফেলিল।

—সাক্ষিক গুণের গোটা গায়েই জীবন নির্ভর করছে, তবু এ পাড়ার কথা। সেল বছরে আমরাই লেখালেখি করে জেলাবোর্ড থেকে ওপাড়ার একটা ইন্সপেক্টর করিয়ে দিয়েছিলাম। এবারে শুভলাভ, কে একটা ছেলে তার মধ্যে একটা মগা সুখবছানা ফেলছিল। ওরূপে চারিপাশের গোবের টোকা যায় হয়েছিল। তবু সবাই এমনি ব্যস্ত যে, সেটাকে কেউ বার করেও ফেলে দেয়নি। বেগে এলাস লেখালে চমৎকার ব্যাটের চাষ হচ্ছে।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

মন্থরা কহিল, তাই বলে চোখের ওপর রাগ করে নাড়িতে ভাত খাবে? কাল যে কলগা আরম্ভ হবে। তখন?

চক্রাক্ত উত্তরিয়া গাড়াইয়া আড়ামোড়া তামিয়া বলিল, তখন আবার গোল হাঙ্গিরে জাঁকালো করে হরিমান মসকীর্জন বার করব। তিনিই আবারের বাটেরে রাখবেন। কিন্তু সেও ত কালকে। আজ ত মান করে থেকে নেওয়া থাক। কি বল?

বলিয়া সে সকলের সুখের দিকে চাহিল। তাহার ও উত্তরিয়া গাড়াইল। বেলা অনেক হইয়াছে।

দেই দিন অপরালে—সৌভ্রের তখনও বেশ তেজ আছে, চক্ষিকণ বীরে নোবে চক্রাক্তের বাহিরের ঘবে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবারি চেয়ার টানিয়া বসিয়া চিত্তাসা করিল, আর কেউ এখনও আসেনি?

এই চাইতে সুখ তুলিয়া চক্রাক্ত বলিল, এই তো ঘোটে চারটে বাজল। আসবে সব একে একে পাঁচটার মধ্যে।

একটু উত্তপ্তঃ করিয়া চক্ষিকণ বলিল, চক্রাক্ত আমি ন পাঁচেক টাকার ব্যয়সা করছি।

একটি দ্বিপ্রহরের কয়েক ঘটায় মধ্যে শ' পাঁচেক টাকা! চক্রাক্ত বিস্ময়গুণ্ডিতে তাহার পানে চাহিল। চিত্তাসা করিল, কি রকম?

ক্ষতিকণ ছোট টিশিয়া হাসিয়া কহিল, টাকাটা মা নিচ্ছেন। আমার সুখ-চোখের অবস্থা যেবে তিনি শক্তি করে উঠেছিলেন। আমি একবার চাইতেই সাক্ষিক হয়ে গেলাম।

চক্রাক্ত নিঃশব্দে চিত্তিত সুখে বসিয়া রহিল। পাঁচটের চক্র চিত্তা করা এবং পাঁচটের কাছে পরিগ্রহ করা তাহার একটা যোগ। চেয়ারে বসিয়া এ বই সে বই-এর পাঠ্যভলি কিছুক্ষণ ধরিয়া উন্টাইয়া-পাঠাইয়া অবশেষে কহিল, আমি কেবে দেখলাম ও টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারি না। তুমি জান, ধনীরা মান আমি গ্রহণ করি না, বহু লোকের বহু ছোটখাটো মান নিয়ে আমি বড় জিনিষ গড়তে চাই, সাধারণের ব্যাপারে এক জনের মাৎসর্যকে প্রেরণ দিতে চাই না।

ক্ষতিকণ চুপ করিয়া রহিল, টাকাটা লইবার চক্র তেজ করিল না। চক্রাক্ত বলিতে লাগিল, একজন পুত্র দান করে দেছেন, সেই মানের মর্যাদা রাখা করার শক্তি এদের নেই, হুংব না পেলে মানুষ শক্তি অর্জন করতে পারে না। হুংব এদের অনেক, কিন্তু হুংবোষ নেই, যেটুকু আছে সাক্ষার এক-কালীন মানে তাও থাকে মরে। তার চেয়ে এরা গুংবই থাক,—বহুক্ষণ না সে গুংব অসহ হয়ে উঠে।

ক্ষতিকণ তথাপি কোন কথা কহিল না।

চন্দ্রকান্ত আবার বলিল, আমি কি ভাবছি তান ?
ভাবছি তোমার বাবার কাছে যাব, এবং.....

ছদ্মবেশ-সমিধয়ে যুব তুলিয়া চাছিল, সে নিকে ভ্রক্ষেপ
না করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিয়া চলিল,—এবং তিনি যদি মধ্য কয়ে
তার নিতে গতি হয়, তাঁরই গণের তার দেখ। গয়ের গবে
দ্বিতে তাঁর মত কেউ পায়ে না।

ছদ্মবেশ লম্বয়ে বলিল, কিছু বাবা যে—

চন্দ্রকান্ত হাত নাড়িয়া তাঁর কণা উড়াইয়া দিয়া বলিল,
না, না, সে যোগের যে গুণ। উনি হাড়া গেরের যোগ
সাধাতে আর কেউ পায়ে না যে। আরেই তিনি বাড়ীতে ?
তা হলে তাঁর কাছেই যাওয়া থাক। ওঠ।

ছদ্মবেশ উঠিল, কিছু হাত তোক করিয়া বলিল, আপনিত
যান চন্দ্রকান্ত, আমাকে আর টানবেন না।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিল, কেন ? ভয় করে ? আমায়
বাবা তো আমার সঙ্গে যাবা বলেন। আচ্ছা তোমাকে
আস ঘেতে হলে না। আমি গেলেই হবে। ছেলেরা যদি
আসে, তাহের এইখানে অপেক্ষা করতে বসে। আমার বেশী
যেই হবে না।

তাহার কিয়তে দেহী হইল না। শিটার মধ্যে কোন
এমন উত্তীর্ণ উপক্রম হইলেই আনন্দের ছদ্মবেশের বুক ঢক
ঢক করে। এট নগট ভবিষ্যত প্রণায় বোহর্য বিবেচনা।
ছদ্মবেশ নিজেও তাহাবেরই পথী। তথাপি পনের দশ
শিটার মধ্যে অপ্রিয় আগোচনা তাহার পক্ষে প্রীতিকর
হয় না।

কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল ? হ'ল না ?

কোন উত্তর না দিয়া চন্দ্রকান্ত কথনের একপ্রান্তে
আদিত্য বলিল।

—কি বললেন ?

একটু রান হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, তিনি বললেন, সকল
নাহুদের একই সময়ে একই সাধু ইচ্ছা হয় না। সে চক্ষে
অপেক্ষা করতে গেলে অনন্ত কাল অপেক্ষা করতে হয়। বাবা
কাজ করতে চান, তাহের বাড়ি হ'লে স্বাভাবিক কথায় নক্তি
লাকা চাই। নইলে কাজ হবে না। আমি বাড়ি হ'লে
কথাটার আপত্তি করতেই তিনি লম্বয়ে বসলেন, আচ্ছা গায়ে

হাত বুলিয়েই না হয় হ'ল। কিন্তু গায়ে সে-ই হাত বুলিয়ে
কাজ হয়, যে ইচ্ছা করলে বাড়িও গরতে পারে।

চন্দ্রকান্ত হুপ করিল।

—তা হলে উনি যাকি হ'লেন না ?

চন্দ্রকান্ত কহিল,—যাকি হওয়ায় তো কথা নয়। উনি
যাকিয়েন, আবার পাবেন না। সেই ভেবে উনি নিজেই এ
কাজটা হাতে নেওয়ার সময় ক'রেছিলেন। এ তো আর
আমাদের একচেট্টা অধিকার নয় যে, আমরা ছেড়ে না দিলে
তিনি নিজে পায়েন না। আর তাঁর পাইক বার হ'ল,
বললেন, কাল সকালে সবাই তাঁর কাছাকাছি হাজির হবে।

একজন উত্তেজিত ভাবে বলিল,—আমাদের কি এট অপর-
গণিতে বাধা দেওয়া উচিত নয় ?

চিন্তিত ভাবে চন্দ্রকান্ত কহিল,—কি আনি ! কিছু
তা হ'লে গোধ হয় বোধি-সংসারের বাহিরও নিতে হয়।

ছেলেমা চিন্তিত ভাবে বলিয়া বলিল।

অতঃপর সে কাণ্ড ঘটিল তাহাকে ভোজন্যাকি বলা হলে।

পরের দিন সকালে এদের প্রত্যেকটি প্রকা সকল কাজ
ফেলিয়া কাছাকাছি উপস্থিত হইল এবং এক দণ্ডের মধ্যে
আটপাট টাকা এই দ্বিতীয় গান চইতে উত্তীর্ণ প্রতিক্রিয়া
পাওয়া গেল। বড় পালঙ্কিতে ছেলেরা এক সপ্তাহ পুঁজিয়াও
বাহির করিতে পারে নাট। কনিষ্ঠের কাছাকাছি সে-ই
সক্সায়ে উত্তীর্ণ পাচ টাকা টাকা দিতে বীরত্ব হইল এবং
পরবর্ত্তেই ছোট পালঙ্কি উত্তীর্ণ সাত টাকা টাকা হাজিরা
সম্পূর্ণ বড় পালঙ্কি যে নিকে বসিয়া ছিল, সেট নিকে
চাছিল।

—পাচতনের কাজ, কি বল পিলে !

—মটেই তো বাবাতি। বিশেষ বাবু এখন নিজে
দাড়িয়েছেন, তখন আর কথা আছে ? সাতটা টাকা আমার
টাকা !

পিলে বাবাতির উপর টোকা দিয়া দণ্ড টাকার প্রতিক্রিয়া
বিল।

চারিদিকে বড় বড় পড়িয়া গেল। ঠিকোকা বাবুর দ্বিতী-
করনে কাছাকাছি যুবর হইয়া উঠিল। এত বড় কাজ আর যে
কেহ করিতে পারিত না, সে তো জানা কথা। বাবু যে

স্বয়ং এ বাগানে চম্পার্পণ করিতে লগ্ন হইয়াছেন, ইচ্ছাতেই গভীর প্রকাশ কর্তব্য হইয়াছে।

ছোট পালকি করথোড়ে নিঃস্বন্দন করিল,—ছোটখাবু বখনই গেলেন, তখনই বললাম, বাবু এতো ভাল কাজ। আমার যা সাধি হই তাই করিতে প্রস্তুত। কথাই বলে, চলুন। ওর চেয়ে আর পুনি আছে না কি? কি বলিলে?

—যট্টে তো। এক টোটা পাকলস তাই মাহুনে কেতাত হয়ে থাকে। এবার পাছে, আগছে বার তাত পায়ে না। আমারের বাবুর দ্বারা নবী, তাই...

সরকারি দিগার করিয়া জানাইল, আটশো পবত্রিশ টাকাই প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে।

ইচ্ছাকৃত্যাবু বলিলেন,—ওহে বড় মোড়ল, "তুমি তো এসব কাজ ভাল বোধ করিতে পাই।" দীর্ঘি সংসারে কি রকম পদই হইবে একটা আশঙ্ক্য মাত্রে যে?

বড় মোড়ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। সে ব্যক্তি ইচ্ছানিহিতও নহ, উদ্ভাবনশীলও নহ,—তাঁহার উদ্ভাবন মতো ভাল মন্দির মেওলাল নেই। এতাবৎ এ সবছে যে সব কথা হইয়াছে, তাঁহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল,—আজ্ঞে হাজার বেড় হাজার হইবে।

ইচ্ছাকৃত্যাবু মনে মনে হাসিলেন। হাজার ও বেড় হাজারের মধ্যে পাঁচশো টাকার ব্যয়মান।

কহিলেন,—আজ্ঞা, বাকী যা পত্র হইবে সেটা আমিই দেব।

নিত্য ইচ্ছাকৃত্যাবু মত ভবনসম, পতীর প্রকৃতির লোক না হইলে লোকে আনন্দের আতিশ্রব্য "চরিত্র" দিত। ততখানি পারিল না বটে, কিন্তু "সুখ" বৈদ্যা বোঝা গেল আনন্দে তাঁরা উৎকর্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

হরিণ তদ্ব্যয় পাঁচা খার এবং বেবধিতে তক্ষিমান। আনন্দের আতিশ্রব্য সে সেইখানেই পত্র হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—সত্যং বোধ্য! আমার দেবতা কাকে বলে! আমার ভাগ্যদেবীকে তট্টে তো বলি, বাপু, কেন ওখানে প্র' কাঠা ভসির ভয়ে লাগি-ভাঁটা থাকিল,—দুঃ বিক্রি-বিক্রি ক'রে এইখানে চলে আস, বাম-সাক্ষর কাকে বলে দেখে বা।

উপস্থিত সকলে মাথাগলা নাড়িয়া তক্ষি করে শুদ্ধবাসের কথাই সাধ দিল।

ইহার পরের দিন ওই হরিণকেই দেখা গেল আঁলের ঘুঁটে কি কতকগুলো লুকাইয়া লইয়া শিকারী দ্বারা দিয়া চক্রকাণ্ডের মাঠে এসেছিল কহিতেছে।

—মাঠাকরুন কই গো?

মাঠাঠাকুরাণী রাজ্যের হইতে ডাক শুনিয়াই বাগানটা আম্বাজ করিতে পারিলেন। হাতের উল্টা পিঠ দিয়া মাথার কাশক টানিয়া হাত দুইটা আগলোকে রাখিয়া সমুখে আঁদিয়া দাঁড়াইলেন। আগে লুকানো বস্ত্রগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন,—এল, বাবা।

চারিদিকে চাওয়া হরিণ কহিল,—মাঠাঠাকুরকে তো দেখছি না, মাঠাকরুন? পাড়ার বেড়িয়েছেন বুঝি?

মাঠাঠাকুরাণী কথার দিগা বলিলেন,—কোথায় বেড়িয়েছেন তিনিই জানেন। আমাকে কি একটা কথা জানাব? শুনি, বাপ্পা-পাড়ার কার নাকি কদেতা হয়েছে। হরতো সেই-খানেই গেছে।

ভাল করিয়া নি'কির শৈঠায় বলিয়া হরিণ কহিল,—অলস্তব নর মাঠাকরুন, ওব তো আশ্রয়-ভেদজ্ঞান নেই,—ছোট বড়ও বাছেন না। মন তো নর, মন গছাচল। সাধনে দিগে হেঁটে চলে নর মাঠাকরুন, মনে হয় দেবতা চলেছেন।

—বেবস্ত্র মুখে আগুন বাধা! একে নিয়ে আমি দিন রাত্রি সনাক্ত থাকি, কখন কি রোগ টেনে আবে। তার চেয়ে ও বাইরে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

হরিণ হো হো করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল,—উনি যে ভোলা মহেশ্বর মাঠাকরুন। আমারের হিসেবে তো চলবেন না। আপনার মুখে তো হেঁটে মা, নন্দ্যাস্থির কণাটা কাবুন। দেবতা পেতে দ্বারা যে অনেক কষ্ট!

হরিণ নিজের রসিকতায় নিজেই আর একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই পতীর হইয়া বলিল,—এ পায়ে ভাল মত লব রকম লোকই তো আছে, কিন্তু গভীর উন্মত্তের প্রশ্ন অমন কথা কখনও বেখেছেন? এই যে অত বড় বাবুতা হয়েছে—

হরিণ আরও একটু দূরিয়া আশ্রয় চালা গলার বলিল—
টাকার তো উদ্দেশ্যে আসার নেই। তবু নিজেদের পুত্র
সারাবার কষ্টে-প্রাণের ওপর কি প্রকম টাকারটা খালাসেন,
অনেকের তো সখ। ও টাকারটা কি আর উনিই কেনে নিজে
খাওতেন না?

—তা তোমরা বিলে কেন গাছা? বললেই তো পাওত,
বোঝ না?

হরিণ রানভাবে একটু হাসিয়া কহিল,—এ কি আশ্রয়ের
পাশলা নাশাটুকুর মাঠাকরন যে, বোঝ না বললেই যেহাট
পাব? এ তমিয়ার। না বিলে কাল আর আমাকে এ
পায়ে বাস করতে হবে না। জানেনই তো!

চক্রবর্ত্তের ভদ্রনী নীরবে হরিণের আসল কথাটির
প্রত্যেকটি করিতে লাগিলেন। বামীর প্রথমত কিছু টাকা
উদ্ধার নিজেদের কাছে আছে। তবে খাটাইয়া এই কয়
বৎসরে তাহা বেশ খোটা টাকার পরিণত হইয়াছে। তবু
এই বাবসা উদ্ধারে অভাব সন্দেহে চালাইতে হয়। একবার
চক্রবর্ত্তের কানে বাইতে সে সমস্ত বন্ধুরা গহনা ফেরৎ দিয়া
আনিয়াছিল।

সে বলে,—যার সেওয়া ভাল। সবধর অলঙ্কারে মাঝেবর
অনেক উপকার হয়। কিন্তু এই বাবসা যে করে তার আর
কিছু থাকে না।

বাহারী খার লইতে আসে, তাহারাও সে কথা জানে।
এই চক্রবর্ত্ত বাড়ীতে আছে কি নাই সে সংবাদ সর্ব্বাগ্রে
লয়।

হরিণ তত্ক্ষণে আর একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি হানিয়া
জঃলের খুঁট হইতে কয়েক বাসা গহনা বাহির করিল—এক
কোড়া রূপার বালাকাটা, তাহার গৌণের অগ্রপ্রাণ উপলক্ষে
অল্প দিন পূর্বে এক কোড়া কোড়া ঠেংগারী করিয়া বিক্রাছিল,
সেই কোড়াটি, আর তাহার বড় না ভনীটি কয়টি হইল স্বতঃ-
স্বাক্ষী হইতে আনিয়াছে, তাহার কানের এক কোড়া মাকড়।

সেগুলি চক্রবর্ত্তের ভদ্রনীর পদপ্রান্তে নামাইয়া রাখিয়া
হরিণ লক্ষ্যের বলিল,—পাচটা টাকা আমার না হলেই নয়,
মাঠাকরন। মশি টাকার টালা। তার অর্ধেকটা কাল
দিয়েই হবে।

চক্রবর্ত্তের ভদ্রনী সেগুলি চুপিয়া লইলেন না। অগ্রদ

বুঝে বলিলেন,—এই সেদিন টাকা নিয়ে গেলে, তার একটা
পরমা প্রম পেলান না এখনো। আর বাছা আমার কাছে
হইয়া হবে না। টাকার নেই।

হরিণ বুঝানি একটি চন্দ্রকর বিনীত ভঙ্গিতে বাকিটা
কহিল,—নোং বইকি, মাঠাকরন। আর মশি দিন মশি
করন। দৈতলীটা উঠুক। শুধু হুস কেন, আসলও কিছু
নিয়ে যাব।

বলিয়া হরিণ ধুঁতের মত হি হি করিয়া আর একবার
হাসিল। কিন্তু তাগালি চক্রবর্ত্তের ভদ্রনী দ্বিধা করিতে
লাগিলেন। বলিলেন,—তুমি বরং আর আরও কাছেই
বেধে বাছা, আমার টাকারই কম আছে।

এবারে হরিণ আর এক প্রকমের হাসি তালিল,—অনেকটা
উজ্জ্বল ভঙ্গিমাধে হাসি। বলিল,—ভদ্র কথার আগনি
অন্ত লোকের কাছে বলবেন না, কিন্তু হরিণ তত্ক্ষণে যে
কিনিস আপনায় পায়ের তলায় ফেলে দিয়েছে তা আর তুলে
নিজে না।

চক্রবর্ত্তের সঙ্গে কথা বলিবার সময় হরিণ তত্ক্ষণে
‘তত্ক্ষণে’ বলে।

চক্রবর্ত্তের ভদ্রনী আপনায় মনেই কি যেন ভাবিলেন।
বলিলেন,—তা হলে তিনটি টাকা নিয়ে পাও বাছা। পাচ
টাকা আমার কাছে নেই। আমি কি মিছে কথা বলছি?

হরিণ লব্ধে কিত কাটা বলিল,—আজ্ঞে তা কি আমি
বলছি? কিন্তু পাচটা টাকার কম কিছুতেই হবে না যে?
ওই যে বললাম—

চক্রবর্ত্তের ভদ্রনী প্রমাদ গিলিলেন। এমিকে চক্রবর্ত্তের
কিঃবীর সময়ের আগুন হইয়া উঠিতেছে। বেশী সময়ের
করিবার অবকাশ নাই। হরিণ যে বাকি, টাকা না গইয়া সে
কিছুতেই উঠিবে না। বাবা হইয়া উদ্ধারে উঠিতে হইল।
তিনিমন্তলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া ভিতরে
গেলেন। বলিয়া গেলেন—সেখি যদি থাকে তো বাছা পাবে,
নইলে ভিতরে হবে বলে দিচ্ছি।

হরিণ কিছুমাত্র বিরূপাধ না হইয়া হাতে হাতে গলিতে
লাগিল। চক্রবর্ত্তের ভদ্রনীর কিঃবীর হইল না। একটু
পরেই পাচটা টাকা হরিণের কাছে নামাইয়া দিলেন।

—যেখো বাছা, চৈতালী উঠলে যেন হৃদয়ের ঢাকা কটা গাই।

হৃদয় ততক্ষণে ঢাকা কবুটী টাটকে গুটিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিয়া গেল, আরে সে আর বলতে হবে না।

তার পরে আরও ছইল সংসার পক্ষ।

দীঘির তলপাটী পূর্ণে প্রসারিত বড়ই ছিল। এখন মজিতে মজিতে ও বাহা আছে তাহার পরিমাণ একশ বিঘার কম হইবে না। কিন্তু তাহাতে কল কদ, পড়ই বেশী। আর আছে চুড়চর দান ও কাঁটাগেললা। ডিগা-সবুজ রঙের দলানের পাংলা সর উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে এক এক কাগগার শালুক ফুলের বড় বড় পাতা এমন ভাবে উপরটা ঢাকিয়া আছে যে, কল দেখা যায় না।

উত্তর দিকে মেঘ-ঘাট ত একবারে অব্যবহায়া হইয়া উঠিয়াছে। কেবল প্রথম সিঁড়িটাই এখানে যে ঘাট ছিল, তাহার দাফা ফিরেছে। তার পরেই পল্লভ প্রমাণ পড়। কলের চিকম্বাধর নাই। মেয়েরা সে বাট বর্জন করিয়া পশ্চিমদিকে পুৰে ঘাটে গান্না দিয়াছে। সেটিরও অবস্থা শোচনীয়। চই পাশে উঁচু উঁচু পাকের পাছাড়ের নাতখানি বিধা একটী নাতখের চলবার মত সন্ধ্যা এক ফালি পথে বালি জমিয়াছে। তাও বেশীদূর পর্য্যন্ত নয়। হাঁটু-কলেই নান সাহিতে হয়।

তিন দিকের তিনটি ঘাটে মন বারখানা করিয়া দুনি পড়িয়া গেল। কল বড় বেশী ছিল না। সে কল কল সাহিতে বেরোও বেশী হইল না, ব্যরও বেশী হইল না এবং আরও একটী বিঘরে আশাতীতরূপে ব্যর সংকেপ হইল। এতদিন পর্য্যন্ত লোকে কেবলই ঢাকার হিসাব করিয়াছে। দীঘির পাক য জমির সার হিসাবে কত মূল্যবান তাহা কেহই ভাবিয়া দেখে নাই। কল ম'রগা হাইয়েই লোকের সে খোলাশটা হইল। তখন আর পাক ভুলিবার কল্ল খরচ করিতে হইল না। লোকে গাজী লইয়া আসে, নিজের ঘরতে পাক তোলে, আর কনোতে দেয়। তৈলোকাপাণু হই তিন সস্তাহ কনদুর রাখিলেন। সে করবিন রাতি তিনটা হইতে সকাল আটটা এবং বিকাল চারটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত গাজীতে গরুত মাগ্বে এবং রাত্রিপ্রাণার হারিকেনের আলোয় নদা-কোঁকত যে উৎসব ও সমারোহ পড়িয়া গেল, কৌমিত দীঘির অশ্রুইও বোধ করি সেই প্রথম একবার মাত্র তত সমারোহ হইয়াছে। রাসে পরে হাসিতে বহুমানের কলসবে মদা-দীঘি যেন কলকথার রাজপুত্রী মত এক বহুর্ভে জাগিয়া উঠিল।

সকালে সকাল লোকে ভিড় করিয়া এই উৎসব দেখিতে আসে। বাছুবাহার চতীমতশে, ঘোমতের দাগজাৰ এবং স্তিক্রার মোকানে যে ভাল-পাশা বাবাণ আছা বসিত, সে-গুলি দীঘির বটজাগার উঠিয়া আসিয়াছে। একটা দিকের চৌনে ছেলেগুলি সকালে গেলে গুলি-ভাড়া, বিকাশে হা-ডু-ডু। পুষ্করিকের বটগাহটা চেলেদের ফালফুল খেলার উৎসাহে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কতকগুলি ছেলে তালপাতার তেঁপু তৈয়া করিয়া অশ্রাজ্জবাবে বাজাইতেছে, কোথাও কয়েকটি নরবেদ বালক তালপাতার সুনি তৈয়া করিয়া এবিধ হইতে গ্রন্থিক ছুটাইয়া করিতেছে। আর দুইটা কলকথার মত হ'বা হাতে চারিবার সুরিয়া বেড়াইতেছে।

—হবে ও কলকথার, এক ব্যর থেকে পাক তোলা। এখানে এক ফালি কথানে এক ফালি করে নিলে চো হবে না। ওই ডোনার বা দিকে সাঁত্টি কি রকম করে পাক তুলছে দেখ। ওই রকম করে—ই।

—আজ এই ছেলেগুলি কাদের হে? অ-পাণ ছেলে! তেঁপু বাড়িরে বাড়িরে কান আনিবে তুলল!

ছেলেগুলির মজা বাড়িয়া যায়। তাহারা বুড়াদের কাছে কাছে বেয়ের আর বত পারে তেঁপু বাজায়।

—সে বাবা! বাড়ির ওপর পড়বি না কি? যেনে চলতে জান না? একটা ছেলে তালপাতার সুনি লইয়া ছুটাইয়া করিতেছিল। তাহারই সঙ্গে দাফা গাণিয়াছিল ছেলোটা উঁচুবাগে ছুটিয়া পলাইল।

বেলা বলিলেই হয়। কেবল কয়েকখানি মোকানের আঁচ।

পুষ্করিকটাই নিরিবিশ। মেদিকের একটা গাছের ছায়ায় চন্দ্রকান্তের আছা বসিত। এটী মলটির সঙ্গে গ্রাঘের অস্ত্রাঙ্গ লকলের আচার-ব্যবসানে সকল দিকেই একটা বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রাঘের মধ্যে ইহার যখন যোগ্য করা করে, মনে হয় ইহার যেন এখানকার মাটির নয়। অস্ত্রাঙ্গ ছেলেরাও বড় একটা ইহাদের সঙ্গে ঘেঁষে না।

গাজীতে গাজীতে রাশি রাশি পাক উঠিতেছিল। মাখনের মত কোমল পাক। উজ্জল কুম্ববর্ণ। জ্বিকেন আপন মনেই আঙুলু-বাড়িয়া এক একবার তাহার স্পর্শ লইতে-ছিল। নিদ্র স্পর্শ।

—ও কি করছ? চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিল।

জ্বিকেন অঙ্গপুষ্পের মত হাসিয়া কহিল, বেশ লাগছে। কোমল এবং নিদ্র। আবার তারি শোভ হুচ্ছে জ্বকের মত পাক বাট।

জ্বিকেন আর একবার হাসিল।



কোটরাডোয়ার তপ্তবার

§ ১১৮৬. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-বিবরণ

—ଶ୍ରୀପ୍ରମେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର

কাপড় সবকান বলে তাঁতকে পথ দিলাম । তাঁতী
 শুধু হাতে বাড়িতে উপবিষ্ট হয়ে বললে,—“বসুন কোম ঘরে
 বুনুন।” অতীত হয়ে বিজ্ঞানায় কললাম, “শুধু ঘর নিয়ে কি
 হবে। কত তোমার হুতো, কত তোমার তাঁত?” তাঁতী
 বললে,—“দেখতে পাচ্ছন না আমি নিকটে এসেছি।”—এই
 পথায় পড়ে কেউ যদি মনে করে, কোন পাগলো তাঁতীর
 অজ্ঞানতায় বসে গীতা হয়েচে, তা হলে তাঁকে বেশ বেধা
 বাহ না। কিছু বাগলাটো মট্রিট অজ্ঞানতায় নয়, মস্তিষ্ক-
 তাঁতীর পক্ষে অসম্ভব বলেও কীট-জগতের তাঁতীর পক্ষে
 কলাভুলো সম্ভবিত্বের মত। কীট জগতের তাঁতী নিকট
 ছাভিন হলোই ধপেট, বগলাটি, তুলো, হুতো সবই তাঁর নিকট
 মতো আছে।

কোট-ব্যাংকেন তাঁরা যে মাকড়শা বা অন্ধর বৃত্তিবে বলবান
প্রয়োজন নেই। তবে ব্যক্তিবে নানা চাঞ্চল্যে তার অধুত
বসন-কৌশল সতঃসমত গোপে নিহত হচ্ছেছে। বড়ন বহুল
যেবে যে নোংরা কুল আদ্যেব পণিকার কণ্ডে চর, সেগুলি
এবেসত অপকীর্তি। হাথা অন্ধর দ্বিতী পলবান কাণ্ড বুনে
না, হাথা বুনে কীকার ধলবান কাণ। তাঁরোঁ গেষে ডালেব,
শোকাঝাকড়নেব ব্যাংকেন বাধা বলটি বোঁব চর বেঁধে গলত।
মাকড়শর পর সমস্ত টাংর প্রাকীর্ষনে মনো একবার তাগাই
প্রাচ্যঃপ্রাচ্যেব এই অদ্বত পদ্ধতি আবিষ্কার কণেছে।

অন্য মাকড়শদ্বারাও যে ভাল বুঝে গঠন। বহু
 দিনের মত গোকালাকড় শিকার করে বেবে এমন অনেক
 মাকড়শও আছে। ছোট ছোট এক জাতের মাকড়শ
 গুল্মবালেশ্বর বনবাড়ির আশে-কাণ্ডে দেখা যায়, তাই
 ভাল বুঝে জানে না, হিংস্র বাগদেব মত গোকালাকড়ের
 ব্যাঙ লক্ষ্যে পড়ে তাকে হত্যা করে।

কাল বাধা বুনে, ত্রাণের মধ্যেও অনেক সৌভাগ্য
 আছে। চাকরি মসলীন্ ত আব সব ঠাট্টা গাভ দিলে
 বোকাও না, খামচা বুঝতে কোলাও আছে। মাকড়শকে
 মধ্যে লগায়েও গুটি কাটিয়েলা যে কাল বুনে তার সুখো
 যেমন বেশেরে মত হুক, তেমন নিশ্চয় গোলাকাব তার



ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ

ଖଞ୍ଜନ । କେ ବଳେ ସେ ଜାଲିବି ଖୁଣେ ଗୋଟିଏଟି ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟତାପ
 ବଳେ ସେ ଜାଲ ଖଞ୍ଜା ଟଙ୍କା ।

গোণ ভাগ বাণী খণ্ডে হাতের অধিকাংশেই বৈজ্ঞানিকতা।
'একিথোপিডি' বলে এক বড় গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলেছেন। এল
চিত্র সব ডেবে বড় "কোমল" বা "গল" হল "আলোনিয়াস"।
সদাশব্দ: এ হাতের মাকড়সা মিশ্রণ।

এই গুলি মাকড়শা কেমন করে তাদের অঙ্গরূপ ভাল
নিয়ে গ্রহণ দেখা যাক। তাদের বহুপাক্ষি মাগমগলা মনটে
যে তাদের নিকটে রেখে আছে, দেখা আসতে বলা হয়েছে।
গুলি মাকড়শার একটিকে ডিঙ করে ফেললে দেখা যাবে,

তাদের পোটার তলার কুঁদে কুঁদে মাছুলের মত করে কচি
 তি নিব আছে। এগুলির নাম “শিনারেটে”—এইগুলিও তাদের
 ভাল বুনবার মাস। একটা বড় কাঁচের পাত্রে মধ্য একটি
 মাকড়শকে ছেঁড়ে দিলে এট “শিনারেটে”গুলির পরিচালনা-
 কোণল দেখতে পাওয়া যেতে পারে। কখনও মূল, কখনও বড়
 হয়ে, আশাব্যবস্থার মত কখনও পরস্পরঃ সজে চড়িয়ে,
 কখনও ঝাঁক হয়ে এই মাকড়শলি নিত্যের ভিতর থেকে মিহি
 হুতো বাব করে, খানিকক্ষণের মধ্যেই কাঁচের পাত্রে বহিঃরত
 জালে ছেক ফেলবে।

নানা ভাবের মাকড়শাব শেটে ৬টি থেকে আটটি পর্যন্ত
 “শিনারেটে” দেখা যায়। বেশীর ভাগ মাকড়শাব থাকে ছুটি।
 যে ভাব মাকড়শাব কথা উপরে বলা হয়েছে, তাদের শেটে
 আটগুলি করে তিন কোড়া ছুটি বাহুই আছে। বাণি চোখে
 এ মাকড়শলি দেখা গেলেও তাদের অপরূপ রঙের চান্নেতে হলে
 অপরীক্ষণের সাহায্য নিতে হয়। অপরীক্ষণের তলার দেখা
 যায়, প্রত্যেক “শিনারেটে”র ভিতর অবঃখা দশ নল রয়েছে।
 নলগুলি বেশীর ভাগ গোলাকার, সেগুলিকে “স্পুন” বা ক্যামিন
 বলে। মাঝখানে মোটা থেকে ছুঁচ লাঠি’র তলার নিকটায়
 মত এক বকম নল দেখা যায়।

এই মোটা থেকে দশ ছুঁচ নলগুলিকে বলে “শিগট”
 বা গুঁড়ি। এই ক্যামিন ও ছুঁচল ছিপিগুলিও প্রত্যেকটির
 সঙ্গে বহুতম নল নিয়ে মাকড়শাব শেটের একটি করে গ্রহিব
 যোগ আছে। সেই গ্রহিবলি থেকেই মাকড়শাব জালের
 বেশী হুতো বোতায়ে। গ্রহিব ভিতর অবঃ হুতো কমা হতে
 নেই। সেগুলির বিশেষ রঙ “স্পুন” বা “শিগটে”র ভিতর
 নিয়ে বাইরে বেরিয়ে চাওয়ার স্পর্শ করিয়ে হুতো হয়ে যায়।
 মাকড়শা চলাচলকার সময়েই টেনে সে হুতোকে দীর্ঘ করে।

যে মাকড়শাব কথা বর্ণনা করছি, তার তলার “স্পুন”
 ও “শিগটে”র সঙ্গে মূল এমন ৬-০০টি গ্রহি আছে। কিন্তু
 স্পুন ও শিগটগুলি তাই হলে সেই সমস্ত গ্রহিব হুতো এক
 দিকে ছড়িয়ে হুতো থাকায় না। তার কারণ এই যে, সব
 গ্রহি থেকে একত্রকম হুতো বাব হয় না। পাঁচ ধরনের
 বিভিন্ন গ্রহি থেকে আসা আসা পাঁচ বকম হুতো উৎপন্ন
 হয়। বিভিন্ন ধরনের হুতো বিভিন্ন কাজে লাগে। যখন যে
 বকম হুতো ব্যবহার, মাকড়শা উপযুক্ত গ্রহিগুলিকে তদন
 হয়ে তা বাব করে নেয়। অত্র গ্রহিগুলির তখন ছুটি।

প্রত্যেক “শিনারেটে” অনেকগুলি করে স্পুন ও কয়েকটি
 শিগট আছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। স্পুনের সংখ্যা
 প্রায় ১০০। মাকড়শা স্পুনগুলি শুধু জালের হুতো কোথাও
 আটকাবার ব্যবহার মনে বা কোন ঠিকার জালে পড়লে তাকে
 বেঁধে ফেলবার কাজে ব্যবহার করে। স্পুনগুলি থেকে এক
 বকম আটাল হুতোতে ছোট হুতোই বোতায়ে। সংখ্যা সেই
 বকম আটাল হুতোর জালে আটক ঠিকার একেবারে আট-
 পুটে বাঁধা হয়ে যায়। “শিগটে”র কাজ বৃকটে হলে প্রথম
 তামা শিনারেটে কি চাবে সাফান থাকে জানা ব্যবহার।
 সামনের শিনারেটে ছুটিতে দুটি শিগট থাকে। মাঝের
 কোড়ায় থাকে প্রত্যেকটিতে তিনটি করে ও পিছনের কোড়ায়
 থাকে পাঁচটি করে। সামনের শিগট দুটিই লম্বা চেয়ে বেশী
 কাজে লাগে। মাকড়শাব জালের সমস্ত হুতো এই দুটি
 শিগটেই কোঁপায়। মাকড়শাবের শিনারেটে দুটিতে মোট দুটি
 শিগট আছে। প্রত্যেক শিনারেটে দুটি থাকে আগায়
 দিকে ও একটি পিছনে। মাঝের শিনারেটের পিছনের
 শিগটগুলির ডাক পড়ে জালের হুতো শক্ত করবার ব্যবহার
 মনে। তখন সামনের দুটি শিগটের ডালের হুতোর সঙ্গে
 এই দুটি শিগটের প্রবেশতা হুতো যোগ হয়ে মোট চার
 কোঁড়া হুতো একত্রে কমা হয়। মাঝের শিনারেটের
 উপরকার চারটি শিগট ভাল বুনবার কঠোর নয়, তাদের
 প্রধান কাজ কি তা পরে বলা হয়েছে।

পিছনের শিনারেটে দুটির প্রত্যেকটিতে যে পাঁচটি করে
 শিগট আছে তা আগেপিছে তিনটি ও দুটি করে সাফান।
 সামনের তিনটি করে দুটি শিগটেই ভাল বুনায় কাজে লাগে।
 তাদের কাজ কি তা জানবার আগে মাকড়শাব ভাল পাঠ্যার
 বীতিটি বোঝা দাক। মাকড়শা প্রথম বেশ একটি হুতিয়ে
 মত জালার চাক্ষুসতা হুতোয় বহুবৃত্ত করে জালের
 হেঁকেবা বা পাঁচকেবা ফ্রেমটি গাঠিয়ে নেয়। এই ফ্রেমের
 সমস্ত লাইনগুলি থেকে মধ্য-বিন্দুতে চাকার “শোকার” বা মণ্ডের
 মত অনেকগুলি হুতো তারপর মাকড়শা পেতে ফেলে। সেই
 কাঠামের ওপর গোল করে গুরিয়ে গুরিয়ে মাকড়শা এগায়
 হুতোয় পাঁচও ওড়ায়। মাকড়শাব পাঠ্য এই ভাল ভাল বনে
 শীতলা করলে দেখা যায়, বাইরের ফ্রেম ও চাকার শোকার
 মত কেন্দ্রাবিশিষ্ট হুতোগুলির সঙ্গে বুজাভাবে ওড়ান
 হুতোয় তফৎ আছে। গুরিয়ে গুরিয়ে ওড়ান হুতোজাল

আটার মত চটতে। তাতে বা লাগে তাই তড়িয়ে যায়। পেড়ির কড়ান হুতোগুলি সামনের সাধারণ পিগট থেকে উৎসাহ হলেও এরকম চটতে হয় শুধু পিছনের পিগটেরে। হুতোয় সাধারণ হিনট করে পিগটের ভণে। এই পিগট গুলি থেকেই আটার মত এক রকম বস বাব করে মাকড়শা হুতোয় মাগিয়ে দেয়। অত্যন্ত গ্রহিণ হলেব মত মাকড়শার এই গ্রহিণগুলি বস চাওয়ায় সম্পর্কে তড়িয়ে পড় চরে যায় না।

মাকড়শার সমস্ত পিগটের মধ্যে এমন শুধু দুইটের চারটি ও পিছনের চারটির কাজ কি তা জানা যায় নি। এগুলি ভালের কোন কাজে লাগে না। এগুলি থেকে যে হুতো দেয়োর লেগুলি লুচকে ছেঁড়া যায় না, লেগুলি টানলেও বাড়ে। এই হুতোয় মাকড়শা তার চিহ্ন রাখবার খলে তৈরী করে।

মাকড়শার ভাল-বসন সাধারণ যে কি জটিল, তা বোদ হয় এতক্ষণে ভাল কবেই বুঝা গেছে। এক একটা মাকড়শা নিজের বেড়ে বেন গোটা একটা কাপড়ের কল বয়ে নিয়ে বেড়ায়। অল্প কীট-জাতির বিশেষতাই তাই। মাকড়শের মত তালো বাটনের উপকরণ কাজে লাগতে পারে না, কিন্তু নিজের দেহকেই এমন লব হুতো পরিণত করতে পারে, মাকড়শের বুদ্ধি যাব কাছে অনেক বমরে হাব মানে।

ভাল বাতা বুন দেই মাকড়শারের উট বড় বড় খোপ্তিতে ভাপ করা হয়।

এক লেব তলগেটে পিনায়েটগুলি উপর একটি পল্ল চাকনি পাকে। পিনায়েটের হুতো দেই চাকনির নানা হস্ত কুটার চিত্র দিয়ে বাটলে বেবোব। আদগা এতক্ষণ যে মাকড়শা কলা আলোচনা করায়, মাকড়শারের দেই শুই শুইবের এই চাকনি'দেই। পেটে চাকনি দেওয়া মাকড়শার সাধারণত: দীর্ঘে ভাল বুন, হুতো তলেব চিত্রব এষ্ট.জাত খোলাকার ভাল পাতার বিজা গ্রাণ আতানিড হাতীয মাকড়শার মতই আতর কইর দেখেছে। অত্যন্ত পেটে চাকনি দেওয়া মাকড়শারের ভাল-বস্তু হয়। দীর্ঘ উপরে

উট ভাল পাতা পাকে। তার উপরেই সমস্ত ও তার বুনো বন, দীর্ঘেট টাক টাক।

চেটবড় পাছপালাব কোণে জটিল বন অগোছালো এক রকম ভাল অনেকটাই চোখে নিস্তর পড়েছে। লতার পাতার ভালে বেন বেন-হেনন তারে এই ভাল কড়ান হলে মনে হয়। ভালের চাখিধায়ে চটতে অনেকগুলি হুতো স্থানীয় মত স্থানীয় বোবা যায়। এই ভালগুলি পেটে চাকনি দেওয়া এক জাতের মাকড়শার বালা। এই জাতের মাকড়শা একলা বন, বন বেবোই উপনিবেশ পেতেই বাব করে। শীতল পড়বা যায় তারা বেরিয়ে এসে শীতরক ভালের চিত্রব টেনে নিয়ে আসার করে।



বিন মাগির মাকড়শার মাকড়শা।

জঙ্ঘাভিন্ন বসন-নিপুণ মাকড়শারের একটি জাতিকে আনিয়ে মাঠে মাঠে বাগানে আদগা সবার দেখাছি। ঘোলাকার ভালগুলি দেখতেই হুতোব মৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এসে আদ একটা জাতি বাগলা বেশে বড় বড় খাছে বিশাল সব টার পেতে যায়। বসাব শেষে এদের হস্ত-বড়ের হুতোব গ্রাণ হিনটাত লগা ভালগুলি কললের নানা বাহ্যিক বোবা যায়। এই মাকড়শাগুলি খাগুলি লুচের লগায চড়ায় এক একটা গ্রাণ আদ ছুট। এদের গায়ে সূত ও হস্তে বড়ের ছিট থাকে।

ভাল পেতে যে মাকড়শা এমন করে শীতল করে, তার: লগাই কিয় মাকড়শা-বাড়ি বগি। মাকড়শারের কর্তব্য: নিত্যন্ত নিত্য। খুঁবে অকর্তব্য প্রাপ্ত। অকালে তারা অনেক ছোট হয়। বাড়ির বাগি ও লিঙ্গ বসাব উপর নির্ভর করে, শীত প্রাপ্তি পেয়ে, ভালের এক জাতি কোন রকম কর্তব্য দিন কাটে। মজা বগির চরে হিন সাবাক্ষণ লববাস।

অবশ্য সব জাতের মাকড়শাদের ভিতর কঠোর-গিঠীয়
একজন সন্ধান নহে।

বেকড়ে-মাকড়শা হাতির বলা হয়, তাহের স্বামী-স্ত্রী
ভিতর পুত্র বসিন্দার। বেকড়ে-মাকড়শাদের ভিতর সাত-
দশত ভাগ্যগণ পুত্র বেশী দেখা যায়। সাধারণতঃ এ জাতের
কেউ ভাল হুঁদ না। স্বাধীনতা মত ঈকার করে আশ্রয়
সংগ্রহ করে। এবের নাম বেকড়ে বেওয়া হলেও বেকড়ে
বাধের মত এরা কিছু বল বেঁধে থাকে না। একা একাই
কেনে। এবের ভিতর একটি জাত কোপের উপর বা ঘাসের
ভিতর গুড়কের মত এক রকম দাঁদি পাতে। কঠোর থাকেন
গুড়কের মতো আঁদ গিঠী ভিতরে বিশ্রাম করেন। গুড়কের
মতো ঈকার এসে পড়লে কঠোরই থাকে নেও ভিতরে নিজে
যান।

বেকড়ে-মাকড়শার মত আর এক জাতের মাকড়শা ভাল
না হুঁদ মাওয়া করে ঈকার করে। এবের নাম ‘ম্যাটিভি’
বা লাকানো মাকড়শা। এদের গতিবিধি ভাগী অস্থির, ছোট
ছোট করে কটা গান দিয়ে এরা বানিকরণ একেবারে দ্বি-
গুণ থাকে, তাই পর আগ্রহ করে কটা গান ধরে। ঈকার
দগাও এই হ’ল এদের ভাষা। এই লাকানো মাকড়শাদের
অনেক পি’পডেনের চাল-চলন, এমন কি চেগারা পর্যন্ত
অস্থির ভাবে এক এক সময়ে নকল করে। এবের একটি
জাতের চেগারা এমন যে, মাঠের কালো পি’পডেনের থেকে
তাদের চেগার ৫০ কণে বুঝাই যায়।

পোক গিঠায়ে মাকড়শাকে আনতে পুত্র ভাল চোখে
দেখেন। বেশ একটু রুগা এমন কি একটু ভয়ও করে।
কিন্তু সত্যি অধিকাংশ মাকড়শাই নিরস্ত্র নিরীহ। আশ্রয়
হয়নিহিত যে সব মাকড়শার লাকানো পাওয়া যায়, চ
একটি ছাড়া তাহের অধিকাংশ জাত আশ্রয়ের উপকারই
হয়। মশা, মাছি, আর সলা প্রভৃতি ক্ষতিকর পোক-
মাকড়ের ভাষা গুরু। লাকানো মাকড়শাদের একটি জাত শু
লায় ঘন। তাহের লাটিন নাম মেসোপ্লেক্সিপ্পাস ক্যালিভোরাস-
plexippus calivorus)-এর অর্থ, হ’ল ‘মশাখোকা’।
আশ্রয়ের বাড়িঘর থেকে হাড়াতে যদি কাউকে হয়, তা
লে আটটা আটগাটা নামে এক জাতের মাকড়শাকে।
এদের চেনা যেতেই কঠিন নহে। হাতের মত নিচি প্য
ও ক্ষুদ্র এদের বিশেষত্ব। মূখে ডিম নিয়ে জালের
কপালে সেট উপর দিকে করে এরা ঘসে থাকে। যেখানে

সেখানে ভাল পেতে এরা আশ্রয়ের বাড়িঘর ফুলে বোলা
করবার ব্যবস্থা করে।

সাধারণ মাকড়শাকে তর করবারও কিছু নেই। মাকড়শা
মাহেরই মূখে হাতের খোঁড়া চুটি করে শিঁধের খিল আছে
বটে, কিন্তু খুব কম মাকড়শাই মাহেরই মূখে বিন প্রয়োগ
করবার ক্ষমতা রাখে। অনেক মনে করেন, মাহের চেয়ে
মাকড়শার শিঁধের শিঁধের ফলের উপর মশল বেশী আছে।
নিরস্ত্র সাপ যেমন কামড়ালেই শিঁধ, বাধের ভিতর পড়িয়ে
আপে, মাকড়শার তা হয় না। মাকড়শা ইচ্ছামত বিন
প্রয়োগ করতে পারে।

যে সব মাকড়শা বিন প্রয়োগ করে মাহেরই ক্ষতি বটে,
তাহের আসল মাকড়শা থেকে আর এক ভিন্ন গোষ্ঠিতে ফেলা
হয়। শিঁধ-হাতের গড়নের পার্থক্য থেকেই এই প্রভেদ করা
হয়েছে। টাওয়ার্টুল্লা নামে বড় বড় মোহন বিশাল মাকড়শা
এই পুথক গোষ্ঠীভুক্ত। বহন-নিপুণ যে সব মাকড়শার কথা
পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, তাহের বলা হয় আসল
মাকড়শা। অতিক্রম সমস্ত মাকড়শা টাওয়ার্টুল্লা জাত-
গোষ্ঠীর মধ্যেই পাতরা যায়। এবের অনেকে এত বড় ও
এমন শক্তিশালী হয় যে, পানী ও ছোটখাট জানোয়ার
অন্যভাবে ঈকার করে। এবের একটি জাতের ঈকার মরবার
কৌশল অসুপর্ণ। মাটির ভিতর গর্ত করে এরা বাস করে।
গর্তের মুখে একটি কপা-বেওয়া ঢাকনি থাকে। সে ঢাকনিটির
উপরে এমন তাই মাটি লাগান থাকে যে, তাকে অল্প পাথের
চুনি থেকে আলাদা করে চেনাই যায় না। মাকড়শা গর্তের
ভিতর বসবার নীচে ওত পেতে থাকে। কোন পোকামাকড়
বা মাছি সেই কপা-বেওয়া ঢাকনির উপর বসলে মাত্র সে
বিজ্ঞানবোধে ঢাকনি টেনে তিরের গর্তে ঈকারটিকে ধেলে
হয়ে নেয়।

মাকড়শাদের মাত্র কয়েকটি জাতের মোটামুটি পরিচয়
এখানে দেওয়া হ’ল। তারা পৃথিবীর অত্যন্ত প্রাচীন জাত।
আধুনিক মস্তুরে যে বিখ্যাত সাগরবিজ্ঞান একদিন সাহস করে,
তাহেরই মাথা পেছে মাকড়শাদের ইংলিশ হয়েছে। ঈকার-
বিহীন ও মাকড়শার এক হিসেবে বৃহৎ সম্পর্কের জাতি।
অসংখ্য পোকামাকড়ের থেকে এবের খাড়া পুথক। বহু যুগের
বিশ্বব্রহ্মের ফলে মাকড়শা মাঝে মাঝে বিভিন্ন রূপ
নিজেছে। আশ্রয়ের বেশে অস্থিত; বৈজ্ঞানিকেরা এখনো
তাদের গুণের মধ্যেও পণ্ডিত পাঠের নি। এখনো অনেক
নতুন নতুন জাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে।

[২১]

ঐতিহ্যবাহিনী এক ফোটা চার কখন আকাশে উঠিয়া কখন অস্তে নামিয়া গিয়াছে । আকাশ গ্রাম অন্ধকার, আকাশের নীচে পাহাড়-কর্তাদের ক্রমাগত অশ্রুস্রব ছোট ছোট গলিগুলিও তেমনই অন্ধকার । বহু পূর্বে পূর্বে এক একটা লাইটপোস্টের কাছে কাছে একটুখানি করিয়া তাহারা আলোকিত হইয়া আছে । তাহারই কাছে কাছে বাড়ীগুলির সমুপরে গন্ধক বসিয়া দুই চারিজন ভ্রমলোক বিশ্রাম-স্থলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানা আলোচনার মত ।

আলোকোজ্জ্বল বড়সারি ছাড়িয়া একটা পথ একটা এত রকম গলি অতিক্রম করিয়া একাকী পাহাড় অন্ধকারে পথ চলিয়াছে । পাহাড় মাঝে মাঝে এইভাবে গলিতে গলিতে ঠাটবৎ কি রকম একটা অসুস্থ শ্রেণীর মত ।—বড় সারিগ্রাম উপরে প্রণোদিত, আলোকোজ্জ্বল বাড়ীগুলির একটা গলি আছে, গলি আছে এবং গলিও আছে ; কিন্তু এই ক্ষুদ্র গলিগুলির দ্বিতীয় ও অন্ধকারের তিনতম একটা যে কোন প্রকারে আছে, এক একদিন মনটাকে যেন তাম্র কেলসেট টানিতে থাকে ।

গলির পর গলি অতিক্রম করিয়া পাহাড় অনির্দিষ্ট পথে কেবলই চলিতেছে । উপরের ও আকাশের মত, সমুপরে, পাহাড়ের ও গলিগুলির আশ্রয় সমুদ্রের মত তাহারও বৃক্ক অন্ধ আলোর রেখা মাত্র নাই । মনটা যেদিন এমন ভয়ংকর হয়, সেদিন আর পাহাড় যত বসিয়া দ্বিধা হইয়া তাণ্ডিত পায় না । আদিশীন, অসুস্থের পথে লক্ষ্যহারা মত দুটিয়া দুটিয়া পাহাড় অগনাকে শান্ত করিয়া রাখে ।

আজ যে কতদিন কথামূলকী মীরাকে পাহাড় বসিয়া আসিল, তাহার মন জানে, এই গলি সত্য নয় । বার্ষিকের যে দাপল বেদনা অহর্নিশ তাহার অন্ধরে থাকিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়া আসিতেছে, এই গলি তাহারই বিদ্ধকাম্যামাত্র ।

যদিও দুই পথে পাহাড় যখন গুলে পৌঁছিল, সেখানে নীচের হলধরে, তখন তাহার কল্লীরের জনকরকম বস্তুর মত এক

সদা বসিয়া গিয়াছে । প্রাপ্তমত লক্ষ্য করিয়া পাহাড় মনটা পূন্য হইয়া উঠিল যে, অদূরবাসু তাহার আশ্রয়ের কিছু মাত্র জ্ঞান রাখেন নাই, টেবিলটির উপর নিম্নকী, লক্ষ্যের স্টেট এবং পূর্বাভাস চারের পেছালা দ্বিধা দ্বিধা পোতা পাইতেছে । পাহাড় আশ্রয় গুলে গাড়াইতেই ছেলেগা বলরন করিয়া উঠিল ।

কাছে অগ্নির হইয়া টেবিল ধরিয়া গাড়াইয়া পাহাড় করিল, —‘বাণীয়া কি ? হঠাৎ সব ? কিসের মত ?’

—‘কোণার ছিলে তুমি এত রাত অবধি ? কলসেতে পিষেফততুমি চলে এলে, প্রেসিডেন্ট তোমার পুঁজিহলেন ।’

—‘মি. মার্টিন ?’

—‘হ্যাঁ । আমিই তাই, আমারের প্রোগ্রাম প্রেসিডেন্ট আগাগোড়া বদলে দিলেন সব । বললেন, এককামিন এসে পড়ল প্রায়, এখন বাইরের কাজ কমিয়ে আনতে হবে । তার চেয়ে এই প্রীতের দুটিতে নিচের নিচের গ্রামে গিয়ে, পড়ার সময়টা বাহু দিয়ে অল্প যে কোন গ্রাম-ভিত্তিক কাজ, যেমন নিরক্ষরকে পড়ান বা আর কিছু তাই করতে হবে সবাইকে । আর কে কি করতে চায়, তাই ঠিক করে নিতে হবে আজই, কাল প্রেসিডেন্টের বাড়ীর মিটিং এ তাকে দিয়ে সব জানাতে হবে ।’

পাহাড় করিয়া গাড়াইয়া কথাগুলি শুনি, তাহার পাহাড় টেবিলের কাছেই একটা পাতে গিয়া শুইয়া পড়িল ।

—‘কি যে ভয়ে পড়লি যে ? কি হয়েছে তোমার বল ত কি রকম বেঝাচ্ছে যেন !’

হাই তুলিয়া, গোটা হই পাহাড় করিয়া পাহাড় করিল, ‘হ্যাঁ, কিছুই, কিন্তু তোমার থাকিল না কেন ? চা খুঁড়ি’ থাকে না ?’

—‘খাচ্ছি, মিসেস মার্টিন একটা লোভের কথা বলেছেন শুনেছিলি ?’

—‘না, কি কথা ?’

—‘এ বাইরে এই দুটিতে গ্রামের কাজ এবং পড়ার কাজ দুটোই বাহু কাল হবে সব চেয়ে, দুটির পথের মিটিং এ তা’

তিনি একদিনের জন্য গোষ্ঠ-সেউল হইলেন। তাঁকি দেওয়া চলবে না কিয় ?'

পাহু মাথাটা তুলিয়া নিভাঙ্ক উদাসীন ভাবে একটা হুঁ বলিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

—‘এত ভ্রান্ত হয়ে পড়িল কেন ? কোথায় যেচলি ?
এই শোন; মিঃ এবং মিসেস মার্টিন হুইলনেট তোব কথা
বিরুদ্ধে করছিলেন। বলছিলেন, দেখেচোঁর কি চ’ল ?
তোব কি চ’ল বল ত ?’ এরই মধ্যে উৎসাহ সব নিজে গেল
না কি ?’

হেলেনা চলিয়া গেলেও পাহু সেখানেই শুইয়া রহিল।
কাক ! কাক ! কাক ! চারিদিক হইতে কেবলই কাকের
আজ্ঞান। তাহার কাছ হইতেই সকলে ঘাবী করে, কিন্তু
তাঁহাও কি ঘাবী কাহারও উপর নাই ? ঘেহ নাই, গ্রেম
নাই, গালগামা নাই, সংসারে কোন কিছু তাহার কজ নাই,
কেনে ভিত্তি করিয়া করিয়া কতদিন চলে ? বাবে কিছু নাই,
চারিদিকে বাব মতীর স্তব্ধতা, কাক করিবার শক্তি সে কোথা
হইতে পাইবে ?—হায় মা, কেন তুমি ওস্তা দিয়া অন্যায় করিয়া
সংসারে ছেলটাকে ফেলিয়া গেলে ? বাব না নাই, মাতৃ-
স্নেহ যে পার নাই, তাহার কাপাল বৃত্তি কি পৃথিবীতে কোন
দিন ঘুচে ?

অত কঠিন করিয়া কথাগুলি বলা, আজ মৌর্যকে চরিত
উচিত হয় নাই। অক্ষমতার বেঘন চাকিতে গিয়া যে মিথ্যা
ভেদেব আশ্রয় সে গ্রহণ করিয়াছিল, উহা কি তাহাকে চির-
দিন ধাটাইয়া চলিতে পারিবে ? সে নিজে জানে, কত ভুল,
কত হেয় সে। ‘অত ভুল’ বসিয়াই ত মায়ার কাছে তাহার
লগ্নভয়ের বেঘন। তাহার চিরদিনের সাথী মৌর্য, আজ
কত উজ্জ্বল উঠিয়া তাহার মাগালের বারিমে চলিয়া গিয়াছে।
দূরে দূরে কত অমূল্যকৌ তরবার যে এই একটা মূল্যহই পাবে
কুটী সাধিয়া স্তবন করিয়া কিরিতেছে, অলসই হইলেও পাহুর
জাহা অজ্ঞাত নাই।—পাহুর আজ আর মৌর্যের সমকক্ষ
হইবার কোন সম্ভাব্য নাই, তাই মার্কণ একটা ‘অভিমান’ পাহু
দিনে দিনে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ উঠিতেছে। নিজেই বেঘন বিয়া
বৎ অস্ত্রকেও আঘাত করিয়া করিয়া যে মর্শ্বভরী আগ্রাম
স পাহু, তাহা যে তাহার অন্তরকে দিনে দিনে এক বিধাক্ত

হতে পরিবৃত্ত করিয়া ফেলিতেছে, কতদিন আর তাহার মাহ
দে পক্ষ করিবে !

পরদিন স্রোতে ঘান এবং চা-পান সন্ধান করিয়া পাহু
নিভাঙ্কট অবসর মনে মৈনিক খবরের কাগজখানি তুলিয়া
বসিবেই প্রাপ্তমহে তাহাকে উপরের বড় বড় অক্ষরগুলি
মচকিত করিয়া তুলিল। বিপুল নামে খবরের ধানী বাড়িয়া
উঠিয়া সেখানকে আঙ্গান করিতেছে, খবরের আঙ্গান বসিয়া
খবরের পূজারী পূজার মকিরে ‘অক্ষর’ যে বীহৎস গোপন
মৌলার স্রুতি করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে এ সংগ্রামের
অ’ঙ্গান, - পাহুর রক্ত গমন হইয়া উঠিল, খবরের কাগজ
টেবিলে ফেলিয়া রাখিয়া সে চকল প্ৰব পুঁহে পাখ্যানী করিতে
লাগিল।

সেদিন দুপুরে কলমে গিয়া প্রদর্শনই সে হুইলকে বলিল,
‘জানকেশ্বরের বাপার কেবেছিল ? আমায় কি কোন কাজ
দেই এত ?’

শান্তভাবে হুইল কহিল, ‘জানকেশ্বরের সত্যগ্রহে ?
কাক হইত আছে, কিয়—’

‘অবয় হইয়া পাহু কহিল, ‘কিছু কি ? কাকের মরকার
পড়েছে, কাক করত হইবে, আমি এই বৃত্তি, এম ভিতর আবার
কিছু কি ?’ আশ্রয় করত চাইলে পরে বসে অনেক আশ্রয়
করা যায়, তোমার তব তাই কর বসে, এবারে আমার ডাক
পড়েছে সত্যগ্রহে,—আমারই এবার পালা, আমি চললুম।’

হুইল কহিল, ‘তাই বাস্তব হবার কথা নয়, এখন আমার
সময় হয়নি, শক্তির সকার না হইতেই যদি এখনি করে মরণ-
যজ্ঞ কাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের মতে করে দিই, তবে বুঝাই কেন
এতদিন শক্তির সাধনা করলাম ? তার চেয়ে শক্তির পূর্ণ
সকার করে নিজে, পক্ষিমান হয়ে, সে মরণ-আগুন নিজে
যদি নিজের হাতে পুড়ি, লেইটেই কি বড় আশ্রয় নয় ?’

পাহু কহিল, ‘আমি ও লক্ষ্য বৃত্তি না, আমি বৃত্তি হযোগ
সত্যগ্রহে আসে না। হযোগ ছাড়তে দেই।’

হুইল কহিল, ‘তবে তুমি হযোগ গ্রহণ কর’ বাও, কিন্তু
এস পরে বসন কিংব আশ্রয়, তখন হইত সমস্ত শক্তি হারিয়ে
আসবে। আর তা ছাড়া যে জানে, সত্যিকারের আশ্রয়ের
পন থেকে তোমার তখন হইত অনেক দূরেই গিয়ে পড়তে

হবে। কেন না, একবার কোনও রকমে জেল-টেল খেটে এসে, তাকে দিবে লংসারেন অনেক কাজই হবে না।’

—‘না খোঙ্ক! আমি একবার নিঃশব্দ পক্ষির পরীক্ষা করতে চাই, প্রাণটা কত দরজের বিলিবে নিতে পারি, সে পক্ষির পরীক্ষা ছোক।’

—‘পক্ষির সন্ধান হল বনে যে এখনি তার পরীক্ষা তাই? বহু এখন, এই দিকে, এই সব ছোট ছোট কান্ডগুলোতে আমাদের বরকার বেশি; তুমি বা আমি একলা প্রাণ বিলেই ত হল না, ঘরের আদার ভৈরী করছি, যেমনি খবরের আলোনে প্রাণ বেগার মত মন তাগেরও গড়ে তোলবার বরকার তাই। একজন বা দুইজনে প্রাণ বিলে বা হবে, হাজার কনে প্রাণ বিলে, তার চেয়ে বেশি কাজ হবে না? সেই প্রাণগুলোকে গড়ে তোলবার ভরতই এখন আমাদের থাকবার বরকার বেশি।’

—‘তাই, আমার মন এখন ভরুর চকল, ও সব কথা এখন আমি আর ঠিক বুঝি না, আমাকে ভাবতে হবে।’

কিছু ভাবিয়া বিশেষ কিছু হইল না; তারকম্ববন বোহাং-বিনাশী আঙনের বে নিশাপতে সমস্ত ভাবসত্ত্ব কিলিক ছাড়া উঠিতছিল, পাহুর বসাবচকল একত্রেই মন অবিলম্বে তাগাতেই ক’পাইয়া পড়িল।

[২২]

—‘কে? হুশীল না?’

—‘পাহালাল, এম তাই এম, রমেশের কাছে থবর শেষে, আজ তিনদিন রোজ আমি এখানে আসছি, রোজই সিরে গাছি। ঠিক দিন ত জানবার যো নেই।’ বলিয়া হুশীল পাহুর পানে চাহিল; পাহালালের অধরে সুত চাক কুটা উঠিল।

ক্রমক্রমে হইয়া হুশীল হুট বাগ্ন হাতে বুককে আলিঙ্গন-বৎ করিয়া ফেলিল। সুত, কোয়ল কণ্ঠে পাহালাল কহিল, ‘হ্যা, ছাড়া পাওয়ার সৌভাগ্য আজই হল, এই দু’দিন ত ছাড়ার কথা ছিল না, তুমি মিছে এসে ঘুরে গেছ; তা আজই বা কেন এলে? হাফো থেকে বাড়ীটুকু চিনে যাবার পথ আমি কুলে গেছি, এই তোমার ধারণা হল না কি?’ সুত হাসিয়া হুশীল কহিল, ‘হ্যা, তা’ একটু দুর্ভবিকি! ভাবদান

এসে পৌছতে পৌছতেই সিরে গাড়ীতে ফের না বওনা হবে বাও। তোমার বুদ্ধির কলগুণো এখন কোন দিকে ঘুরতে থাকবে, তা বোধ হয় বহুঃ রূপবানও জানেন না। কিছু আমার ভুলই হচ্ছিল তাই, যা করে কাপড় চলির বুদ্ধি বিবে নেমেছে, আমি ত চিনতেই পারিনি।’

লম্ব্ব্ব্ব একটা লাইটপোষ্টের কাছে আসিয়া হুশীল কহিল, ‘শাক্তাও, এই দুই মাসে চেহারাটা কেমন ভৈরী করে সিরে এসে একটু দেখি, কণ্টো তোলবার মত ত?’

চবির সত্যিইয়া সুখখানি তুলিয়া পাহালাল বন্ধুর পানে চাহিয়া হাসিল। পল্লভক্ষ্মভূত সুখখানি শুকাইয়া একটুকু হইয়া গিয়াছে; কালীমাটির টাকে কাকে সেই উজ্জল, পৌর-বর্ণ বেধখানি নিতান্ত কয়াকাশে ও মলিন দেখাইতেছে, বেধখানি স্তব্ধ, পরিবেশ বন্ধখানি মলিন, কিন্তু চকু গুটী অস্ত্রস্ত উজ্জল, দৃষ্টি ভীত, প্রবল।

পাহালাল হাসিয়া কহিল, ‘বিবেক বস বেগছ না কি কে?’

—‘তা বেগছি বট কি! এমন বসতি গেলে, ধার নিতাইই দ্রুতগা সেট কেবল ছাড়বে।’

—‘কনের বাণের গাননে ঠাড়িয়ে ও মাটিকিকেটী দিও, বহিই বা তার। এমন সুলাবান কণ্ঠাটা কুলে যায়!’

—‘মাল ভট আতিথ্যের পরমাত্তোজ্ঞ শেষেও বলিকতা-টুকু তোমার চাপা পড়ে যায় নি দেখছি।’

পাহালাল হাসিয়া কহিল, ‘না তাই, হল বহুঃ বেছেছে আবে।’

পথ পর দুই খানি টান আসিয়া হাসিল চটল, লাফাইয়া একটী ব পা-মানীতে উঠিয়া হুশীল বন্ধুর খাত খরিয়া টানিল, পাহালাল কহিল, ‘তুই বা তাই, আমি একবার শিয়ালার’ ধাব, একবারটা ওখানে যোগ্য করে, তার পর বাড়ী ফিরব।’

হুশীল হাসিয়া পড়িয়া কহিল, ‘কিন্তু আমার ওখানে না যে আজ ভোর জেতে, বেঁধে যেন আছেন, তিনি আশা করেছেন, তুই আমাদের ওখানেই উঠবি।’

পাহালাল কহিল, ‘উঠব বই কি, নিশ্চয়ই উঠব, মার রান্না খাব না? তুই উঠে পড় না; আমি পটাপানেকেন ভিতরই কিচ্ছ।’

এই বন্ধু ভট টায়ে উঠিয়া বিভিন্ন পথে যাত্রা করিল।

•

সহদিন পর আবার সেই গৃহ! সেই চিরস্থায়ী, চির-
পরিচিত, চির প্রিয়। খেচের সম্মুখে ঝাঁড়াইয়া পাহাড়ের,
সকল বনের বিরাট সত্ত্বা বাতীখানিকে যেন অতিশীত করিয়া
দিল।

বিশ্রল বাগানটির সামনের বড় চলাখানিতে বহুবাহনস্বর
সদীক বিনবাবু বসিয়া ছিলেন। পাহাড়ী হইতে উঠা বাসিখ
ধনি ও কথাগতন তিনিত পাইল, এক বৃহৎকালের বৃক্ষ
পাহাড় একটু ঘিরা করিল, তাহার পর বীর পথক্ষেপে উঠিয়া
গিয়া ঘাবের সম্মুখে ঝাঁড়াইতেই সেই উচ্চ হাসি, সেই কথাগ-
তন নিমিষে বাসিয়া গেল, বিশ্রয়কিত দৃষ্টি বেলিয়া সকলে
পাহাড় পানে চাহিয়া রহিলেন। ঘাবের পাশের চেয়ারটীতেই মা
বসিয়া ছিলেন, অতি মধুর স্বরে ‘পাহাড়’ বসিয়া, ভাঙিয়াই
তাহার বিকে হাতখানি বাড়াইয়া ছিলেন। পাহাড় নীরবে
কিতবের বিকে অগ্রসর হইয়া অগ্রে বিনব বাবুকে প্রণাম
করিয়া ঘাবের পায়ে প্রণাম সর্গাধ লুপ্ত করিয়া দিয়া তাঁহারই
পায়ে কাছ কাপ্টের উপর বসিয়া পড়িল। মা কোনল
দুটি হাতের স্পর্শে পাহাড়কে আরও কাছ টানিয়া নিলেন।

প্রথম বিজয়ের নীরবতাটুকু কাটিয়া গিয়া, গৃহে তখন
একটা অস্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিনব বাবু তাঁহার
আগনে সোজা হইয়া বসিয়া একটু বাতুল ভাবে অশ্রুত বয়ে
কহিলেন, দুহিল! পাহাড় কি হাঙড়া পেয়ে আসছে নাকি
একুনি?

‘—আজ্ঞে হাঁ, আকই ছাড়লে—’

‘—আকই ছাড়লে! তা তা—হবে—’

বিনব বাবু চেয়ারটা হাতা বিয়া লগাইয়া, অত্যন্ত অস্থির
ভাবে গৃহে পনচাংগা হস্ত করিয়া দিলেন। পরসূহুর্ন্তই
আবার পাহাড় সম্মুখে আসিয়া ঝাঁড়াইয়া কহিলেন, ‘আকই
ছাড়লে, তা হলে এই ভাবেই তোমার কি কোথাও গয়া...
...তোমার আগে বাতী গিয়ে পরিচার্য হওয়া সহকার ছিল।

এভাবে এইখানে তোমার আসাটা...হস্ত তোমার পেছনে
এখনও লোক লেগে রয়েছে, না এগেই পাঠতে আভ, পরে
অভ এক সময়...’

বিনব বাবু সবার দৃষ্টি ও চেয়ারের একটা উৎসর্গ ও
ভাঙির চিত্র ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে গৃহের অগত সকলে

কেমন যেন একটু সময় চাইয়া পড়িল। সেই আলোকোজ্জ্বল
প্রভাত গৃহখানিতে বৃহৎ নীতিব একটা কালোছায়া পড়িয়া
তাহাকে যেন অন্ধে কৃতপ্রসন্ন এবং মলিন করিয়া তুলিল। বিনব
বাবু অত্যন্ত স্নেহভাবে বস করিয়া নিজেই চেয়ারটার বসিয়া
পড়িলেন এবং কহিলেন, ‘তোমরা ছেলেগুলো সব ‘আজকাল
বাপ মাঘের কথা শুনেই না, বস সব বাক্যে কাজে গিয়ে কাজে
পড়ে, তাই পর নিজেও বিপদ, অস্ত্রেরও বিপদ...’ বৃহৎ
পাহাড় ঝাঁড়াইয়া উঠিল এবং বোটা চান্দখানিতে সর্গাধ আক-
ষিত করিয়া মাঝ উৎসর্গে পরিচার্য কর্তে কহিল, ‘মা, আমার
বন্ধ দুল হয়েছে, আমি একুনি দাচ্ছি।’

নীরবে পাহাড় তখন শান্ত পরবিক্ষেপে সকলের সম্মুখে
বাহির হইয়া গেল। মা শিখনে শিখনে বাগা প্রাণ বাহির হইয়া
আসিয়া, অক্ষয়কর্তে কহিলেন, ‘পাহাড় তৈরী আছে পাহাড়,
একটু কিছু মুখে দিয়ে যা বাবা।’

শিঁড়ি বিয়া ক্রত নানিতে নানিতে পাহাড় কহিল, ‘আজ
না মা,—আজ নয়—আর একদিন।’

ক্রত পরে সবার দরজা বিয়া বাহির হইয়া আসিতেই পরল
কিনের শব্দ তিনিয়া পাহাড় পক্ষিতে দিগিয়া তাকাইল। এক
রাস্তার নানাইয়া চাই হাতে দরজার কপট ধরিয়া সম্মুখে
কুঁকিয়া পড়িয়া বীরা ডাবিয়েছে—‘পাহাড় না, পাহাড় না।’

পরপরবিহীন দুটি প্রাণ পক্ষির গহিত সংগ্রাম
করিতে করিতে কোকের মাধ্যমে পাহাড় প্রাণ ফুটিয়াই বহু দূরে
আসিয়া পড়িল। দূরে একটি ট্রাম আগনের গোলা বৃক
লইয়া সম্মুখে ছুটিয়া আসিতেছিল, উৎসর্গে তাহারই পানে
অগ্রসর হইতে হইতে সত্ত্বা পাহাড় একবার পক্ষিতে দিগিয়া
চাহিল—বীরাই সেই আহ্বান তাহাকে অগ্রসর করিতে
করিতে এত দূর কি করিয়া আসিয়া পড়িল!—যেন সেই
অর্ধ আকুল কর্তব্য তাহাকে তখনও আহ্বান দিতেছে,
পাহাড় না। পাহাড় না।

সকাল বেলা মধ্য হইতে ভাঙিয়া তুলিয়া, দুইটি বন
পাশে আসিয়া বসিল, তখন ঘরের গোবে পাহাড় চকু ফুটিয়ে
রক্ত বেন কাটিয়া প্রভিক্তেছে। বৃহৎকাল বসিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে
গৃহখানি চানিপাথে তাকাইয়া দেখিয়া, যেন রাতির স্বপ্ন-
বোতের বোতাই হু হু করিয়া ধীমা, পাহাড় আবার হইয়া পড়িল।

সীত বাত হইয়া স্তম্ভিল করিল, 'ঠা' বস্তু আর যে, কখন হ'ল পাঞ্জালাল ?'

—'হাতিগেই !'

—'হাতিগেই ! কই, তখন ত ছিল না ! তাই কি আমা-
দের ওখানে যাও নি ? ওদের ওখানেই যেহে এগেছিলে
মুজি ? তাত বাতটা লাড়ে বাতটা পথায় আমরা ঠা'র বগে ।
তারপর চাক বললে, মীরা'র না এতদিন পর কি আর না খাইয়ে
ছাড়বেন । তখন আমরা খেয়ে তবে শুতে গেলাম । না
তাই আক ভোরেই পাঠালেন, তোমার নিবে যেতে ।—তা
এত আর কখন হল, পাঞ্জালাল ?'

পাঞ্জালাল রক্তিম চক্ষু দুটি দেখিয়া স্তম্ভিলের পানে তাকা-
ইল । স্তম্ভিল কহিল, 'মহাস্মৃতিতে ফেললে যে ! নিরেই বা
তোমার বাই কি করে ? কিন্তু এই রক্তিম আর, এখানেই বা
থাকবে কি করে ? একটা গাড়ী ডাকাই, কেমন ?'

মাথা নাড়িয়া পাঞ্জালাল নীরবে জানাইল, 'না ।'

—'না কি ? ছেটে যাবে ?'

—'যা' না ।'

—'যাবে না ! তা কখন হয় ? কে তোমাকে দেখবে
এখানে বস, ওইত কেবল একটি ঘোরোয়ান রয়েছে দেখতে
পাচ্ছি, তখনাম তোমার বাবা তোমার উপর রেখে চাকর
ঠাকুর সব ছাড়িয়ে দিচ্ছেন, অথবা বাবু কোন্ মেলে আছে,ন,
সেইখানেই থাকেন, থান, এখানে কুঁচি কোথায় থাকবে ? তা
তাল পরের বাথোক করে চলে যেত, এই অরের উপর তোমার
আমি এখানে একলা ফেলে যেতে পারি নে ।'

পাঞ্জালাল ঘাড় নাড়িয়া ক্ষুণ্ণ ভাবেই জানাইল,—না সে
কিন্তুতেই লাইবে না ।

পাঞ্জালালের এই মৃত্যুতাই স্তম্ভিল কাল করিয়াই চিনিত,
দে হতাল হইয়া বলিল, 'তবে শেয়াগর বাবে ? চল দেখানোই
তা'হলে পৌছে দিই সে—'

—'না ।'

বিরক্ত হইয়া স্তম্ভিল বলিল—'না ? তবে থাক, থাক তুমি
একলাগী পড়ে । আমার কর্তব্য ছিল তোমার বলা, বললাম ।
তবে তোমার বাথাকে টেলিগ্রাফ করা আর একটা কর্তব্য
আমার বাকী রয়েছে, সেইটাই এখন করে দিগে, বাই,
তারপর তোমার বা খুলী হোক—'

স্তম্ভিল সব ছাড়িয়া চিনিয়া গেল ।

—'স্তম্ভিল—'

বাগাভার গিয়া স্তম্ভিল দাঁড়াইয়া ছিল, ছুটিয়া করে আনিয়া
সাপ্রহে কহিল, 'ডাকলে ?'

—'টেলিগ্রাফ ক'রো না—'

—'কেন ? তারপর এদের বাড়ি যাবে কে ?'

রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বীতে সারল বিরক্তি প্রকাশ করিয়া
পাঞ্জালাল কঠিন ভিত্তবরে কহিল, 'ক'রো না টেলিগ্রাফ,—
বাস,—যাও ।'

স্তম্ভিল সব ছাড়িয়া বাতির হইয়া গেল ।

ঘটনাক্রমে পরে যারে একটা গাড়ী আনিয়া বাসিল ।

দয়ের ঘোরে পাঞ্জালাল তখন স্বপ্ন দেখিতেছে । সেই
ভারতবর্ষের মন্দির, সেই গোলদাল, মাথায় একটা ভীষণ
আঘাত, তারপর দিন চুট পরে সেই চাকতে কয়েক । মাগার
অনন্ত যন্ত্রণা তখনও লাগে নাই, সেই অবস্থাতেই আধারের
অবস্থা বা কুণ্ডলার ফলে প্রায়োগবৎসন, দুর্ভাগ্য দেহ কণ
হইতে লাগিল, কঠিন মন শুধু কিছুতে ভাঙে না,—বাকল
পিপাসা, এক কোটা চল তু' পাশু যুগে তুলিল না । অবশ দেহ
ক্রমে ভিন্ন লগে দিলাইয়া খাইতেছিল, এমন সময় চারিদিক
গাড়ীর লগে ঝাঁপাইয়া, মীরা'র না আনিয়া যারে দাঁড়াইলেন,
হাসিয়া করিলেন, 'পাহ উঠে আব, তাকে নিতে এগছি ।'
মীরা আনিয়া ছুঁচুচু কহিল, 'আঙটিটা নেবে পাহু না ?
নতুন পড়িয়েছি, দেখ, এটা নাও, পর ।' হাসিয়া পাহু হাত
বাড়াইয়া দিল । অস্ত্র অস্ত্রের মীরা'র সেই ভগ্নবিনের দেওয়া
আঙটিটা তখনও ক'ক ক'ক করিতেছে । না আবার ডাকিলেন
'ওঁ পাহু, ওঁ, বাবি না ? ইন্স. একি রে ? মাগার এত রক্ত
কিনের ?' আঙে টানিয়া যা দুই হাতে পাহুর মাথা চালিয়া
যাছিলেন ।

মহলা হস্তশিল্পে পাহুর বস্ত্রের ঘোর ভাষিয়া গেল,
চমকিতভাবে চাহিয়া ডাকিল,—'মা ?'

'আমি বাবা, এত অস্থ'ল কেন পাঞ্জালাল ?'

গলা'র বস্ত্র চিনিতে না পারিয়া মূগ তুলিয়া পাহু লম্ববে
চাহিল,—কে ? মা ? না কই ? না কোথায় ? একে ?

—'কিন্তু পাঞ্জাল না বাবা ? আমি যে স্তম্ভিলের না ।'

পাত্রের অন্তর হাফকার করিয়া উঠিল, হুকলের মা ?
হুকলের মা কেন ? তাহার মা কই ?

সম্মুখোপবিষ্টা অতি মধুর স্বরে কহিলেন, ‘ওঠ ত বাবা,
চল, আমি তোমার নিতে এসেছি।’

—‘না মা।’

—‘কেন বাবা ? আমি তোমার নিতে বাব বলেই এসেছি
বো।’

অস্বিনাসের মত গলা হইতে বহু বাহির করিয়া পাত্র
কহিল, ‘আমি কোথাও যাব না মা।’

—‘যাবে না কি বাবা ? মা হয়ে আমি কি তোমার এমন
করে কেনে যেতে পারি ? ওঠ।’

ঘরের ঘরে পাতালালের চোখের কোণে জল ফুটিয়া
আসিল, শান্তস্বরে কহিল, ‘আমি কেনের কয়েমি মা, আমার
ঘরে নিলে আপনার অমঙ্গল হবে না ?’

—‘পারল ! মঙ্গল অমঙ্গল কিসে ভয় না হয় আমি কি
জানিনে, বাবা ? আর হুইই যদি, মা তবে আমি কি তোমার
এমন করে কেনে যেতে পারি ?’

বোকার মত বানিকজন অতি অদ্রুত দৃষ্টিতে পাত্র অশ্লিলের
মাথের পানে তাকাইয়া রহিল।

মা কহিলেন, ‘আমি কটিকে ডরাই নে বাবা, ওঠ।’

পাত্র বীরে ঘোরে উঠিয়া বলিল।

[২৩]

বচর বেড়েক কাটিয়া গিয়াছে। বি-এ পরীক্ষার কল
এবং বীরাণ বৃত্তি পাইয়া সদস্যপদে পানের খবরও বদামময়েই
পাওয়া গিয়াছে। শিতানাতা এইভাবে কতরা বিবাহ নিবারণ
কল্প উৎস্রুত হইয়া উঠিলেন। মনের ইচ্ছা একবার বাহিরে
প্রকাশ হওয়া নাহিই চারিদিক হইতে কত রকমের লজ্জের
খবর আসিতে লাগিল, শিতানাতা কোনটা প্রস্তাভাষান
করিলেন, কোনটা হাতে রাখিয়া আরও ভালর আশা
রহিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে সহসা মীরার মা ‘অতি কঠিন টাইম’য়ে
আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, অত্যন্ত গাফাতিহর অবস্থায় পাত্রকে
বেধিয়া কল্প অস্থির হইয়া উঠিলেন। এই ঘোব বেড়
বৎসরে পাত্রের নবম তাঁহারের সকল সম্পদ হুই হইয়াই
চলিতেছিল, কতিং কখনও কাহারও কাছে পাত্র ভাল আছে,

এই খবর পাইয়াই মা লম্বট বাকিহেন। ইহার বেশি আশা
‘আর তিনি করিহেন না, সেই একদিনের কথা মনে পড়িলে
এখনও ঢকে তাঁহার জল আসিয়া পড়ে।’ কিন্তু এই লজ্জা
অল্পবয়সের সময় তাঁহার বৈধব্যের বাধ টুটুয়া গেল, পাত্রকে
দেখিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

সামান্য দ্রুতি চটিছড়া পায়ে, একটা অতি লজ্জাময়ের
গেলির উপর বন্ধরের চাপরে বেহ চাকিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে
পাত্র ঘোনে ঘোরে গোমিষ্টীর গুকে প্রবেশ করিল।

মীরা মাথের কল্প বোনানার মত প্রস্তুত করিতেছিল, শয্যা-
পার্শ্বে হুইজন নার্স আইসক্যাণ ও শাবা ধরিয়া বসিয়া ছিল,
এক পাশে একটা টেবিলের উপর পা চুটু তুলিয়া দিয়া, অন্ধ-
মুখিত বেয়ে বিনম্রাণু চেহারে বসিয়া ছিলেন, পাত্র নীরবে
আসিয়া মরজা ধরিয়া গাড়াইল। পদক্ষেপে চকু তুলিয়া
চাহিয়াই, হঠাৎ মীরার হাতছাড়া মুখেরে কল্প একবার ঘেঁ
অবশ হইয়া আসিল, তাহার পর অতি মুহুর্তের ডাকিল,
‘এল,—’

পাত্র ছুতাভোড়া বগাভাষ বুলিয়া রাখিয়া, পা টিপিয়া
লম্বাপার্শ্বে আসিয়া গাড়াইল।

চকু তুলিয়া, পা নামাইয়া বিনম্রাণু সোভা হইয়া চেহারে
বসিলেন; বাতির মৃদ আলোকে, চকুই লজ্জা পাত্রকে বেধিয়া
ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন।—সেই শৈশবের লজ্জাচকল,
তাঁহারের অপ্রিত হুইয়া পাত্র আর নাই। আকৃতির বৈধো,
খর্ষ, ওজস্বো, চকুহটির পতীরতা, তরল পাতালাল অপূর্ণ
ক্রীন্দন্য হৃদয় হুই হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ পূর্ণকালের
সেই চকুশাটীর ত্রাণ-তবের জ্ঞান, ত্রাণ হৃদয়, অতি সাধারণ
বেশ, বিনম্রাণু চেয়ে পাত্রকে যেন, এই হালক প্রসময়ে
সহসা দেবব্রত বসিয়াই বোব হইল। মুহুর্তের তিনি কহিলেন
‘তিনি তোমার জন্য অস্থির হয়ে আছেন পাত্র, আজ তিন চার
দিন তোমার বাড়ীতে লম্বনে লোক পাঠাচ্ছি।’

—‘আমি এখানে ছিলাম না কাঁকাণু, আজই বানিক
আগে এসে পৌঁছেছি।’

বানিকজন নীরবে শুভ্রবাঁকা দেখিয়া, একজন নার্সকে
সহিতে বলিয়া, পাত্র নিজে আইসক্যাণ ধরিয়া বসিল।
গোমিষ্টী ত্রাণাজ হইল ছিলেন, এই তাহেই প্রাণ সাহায্য
থাকেন, কতিং কখনও হুই একটা কথা বলেন।—নীরব আর

ফড়িটার টিক্ টিক্ শব্দে প্রবেশের পর প্রায় অতীত হইয়া চলিয়াছিল, মনসা মীরা যুগ্ম গরে করিল—

—‘পাহু বা তোমার ত রাত হয়ে থাকে,—’

পাহু কহে পাহু করিল, ‘চোক, আক আর দাব না—’

গভীর কনসায় বিনয়বানু পাহুর পানে কিরিয়া চাহিলেন, মীরা করিল ‘চল বাবা, তোমাকে হবে খেতে দেই নে, পাহু না বলুক মার কাছে ।—’

—‘পাহু বাবে না ?—’

—‘আমি খেতেই এলছি ।’

মীরাই পিতাপুত্রী বাহির হইয়া গেলেন ।

খিনিট পাঁচেক পরেই মীরা গুরে চুকিয়া কুঠরতে করিল, ‘মাকে ত’ রস বেগার সম্বৎসর পাহু বা, আমি দিবে বাই রসটা তৈরি করে কেমন ? তুমি যাওয়াতে পারবে ত ?’

একটু হাসিয়া পাহু করিল, ‘বাও তুমি, সে সব হবে—খন, তোমার ত’ শুধু মাথের জুই এই প্রথম করা, আর আমার ত করে কসে হাত পেকে গেছে ।’

হঠাৎ আর একমিনের কথা মীরাই মনে পড়িল, শিয়ালঘরে মুটগিরি বেওয়ার পরমার্শ বেওয়াতে গর্জিত মাথা তুলিয়া পাহু করিয়াছিল,—সাতেরে সাক্ষার চেয়ে সে অনেক ভাল,—মনে মনে এই দ্বিতীয়বার মীরাই বিজ্ঞা-বিজ্ঞগর্জিত মন্তক পাহুর নিকট অবনত হইল । কিন্তু মনের তাব গোপন করিয়া যুগ টলিয়া হাসিয়া মীরা করিল—‘তা’ ভাল, তা আজকাল এই নাস’গিরিই ধরেছ বৃষ্টি, মুটগিরিতে হৃদয়ে হল না তেমন ?’

—‘না সে সবও চলছে, নাস’গিরি মুটগিরি খানলামা-গিরি সবই চলছে; মার জন্ত তোমার ভাবনা নেই, তুমি স্বচ্ছন্দে খাও গে বাও,—হ্যাঁ, কখন যেন রস মাকে দেইটে শুধু বলে বাও, এতুনি কি ?’

যড়ি দেখিয়া মীরা করিল, ‘না, আর ১১শ মিনিট পরে দিও,—মীরা চলিয়া গেল ।’

অর্ধঘণ্টা পরে বিনয়বানু কিরিয়া আসিয়া করিলেন, ‘পাহু একটু-চা খাওসে বাও, মীরা তৈরী করছে । রইলে যখন, সারাতাত হরত জেগে কাটাতে হবে, বাঁও না আইসবাপটা, ওয় হাতে বাও ।’

নিজে খাইয়া, ঠাকুর, চাকর, কি, সকলের আহারের তথা-যখন করিয়া মীরা রাত্র্যেরের বাতীটার বসিয়া পাহুর জন্ত চা তৈরী করিতেছিল, পাহু আসিয়া একটী ঘোড়ার বসিয়া বলিল, ‘বরকার ছিল না কিছু, কেন আমার ঘিছে কই করতে গেলে ?’

সহাত বেছে মীরা প্রশ্ন করিল, ‘কেন, ঘেছে দিবেছ না কি ?’

—‘ছাড়াছাড়ি আর কি ! পেলে খাই, না পেলেও অজব কিছু বোধ করি না ।’

চা দিয়া সন্ধ্যাকৈ মীরা হাসিয়া করিল, ‘পাহুবার আজও কি সেই রোগ আছে নাকি ?’

—‘কি রোগ ?’

—‘সেই বেশ উচ্চার করা রোগ ? বেশের কোন দিকটা উচ্চার হ’ল ?’

—‘সর্জনান, ওই ত:সাহল বা পঙ্কা আমার কোন দিন হয় নি । আমার এই এতটুকু একটা প্রশ্ন, তা চলে গিলেও ত’ এতবড় সেপটা উচ্চার হবে না, যে বেব । তবে বড়-লোকের পথগলিত রু’চাটতে লোকের গায়ে হাতে হাত কুলোতে বাই, এই মার ।’

মীরা হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি আসিল না । পরম চা খাইতে পাহুর দেহী হইতেছিল, তাড়াতাড়ি-বরে ভাল নিতে নিতে মীরা করিল, ‘ও’বহর আর আস নি, মা প্রায়ই বলতেন তোমার কথা ।’

এ কথার পাহু আর উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না, কেন না, তাহাব না আসিবার কারণ তাহারও অজ্ঞাত ছিল না, পাহু তাহা জানিত ।

চাখের পেচালা নামাইয়া রাখিয়া পাহু করিল, ‘অনেক দিন পরে বেশে মগিবে, ঠাকুরমার বাস্তু দেঁটে, আমার মাথের একটী ঘাঘলী পেলোম । বিবেক পর এ বাড়ী এলে মা বড় ভুগতেন বলে, ঠাকুরমা ঐ বাহুলীটা করিবে দিবেছিলেন । অনেকখানি সোনা ছিল ওটার, আমি এবারে ওটা নিয়ে এসে একটা আঙঠী গড়িয়েছি, মাথের ঐ একটুখানি তিনখই আমি পেলোম । কিন্তু পথে পথেই ঘুবে বেড়াই, স্বভাব ত জানে, কোথায় ফেলি কি করি কিছুই ঠিকানা নেই, তুমি গেটা মাথবে মীরা ?’

হাত পাতিয়া মৌল করিল, ‘পাহু আমায়, আমি নেই।’
পাহু হাতুলে হুইটী আঙুলী ছিল, একটা শব্দ, আর
একটীর পানে চাতিয়া মৌল করিল, —‘এটা?’

পাহুভাবে চকুচকী মৌলার পানে তুলিয়া, পতৌকহনে পাহু
কহিল, ‘না, এটা আমায় থাকবে,--’

ইহার পর আর কথা কিছুই হটল না, ঐ আঙুলীটির দৃতি
উভয়েরই মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উভয়ে মৌলরে আসিয়া
মাতার কক্ষে প্রবেশ করিল।

দিনের বেলাটা বন্ধুগণেরই আসা-যাওয়াতে এক রকম
চলিয়া বাইত, কিন্তু রাতের অন্ধকারে যোগিতীর মৌলব শব্দ-
বন্ধে শিতা ও কলার কেন্দ্র একটা অশ্রুচর সমন্বিত।
সমালস্রব্য বোঝে খবর লুপ্তে যাহারা আলিহেন, বাতের বেলা
সমালস্রব্য পাইবার মত কোন ভয়না শিতা বা কলার তুঁতাদেব
উপস্থিত করিতেন না এবং সেদৃশই ইহাদিগকে লটকা পাড়ে
মিছাবিছি বিব্রত হইতে চত, এত তরে ইহাদিগকে থাকিতেও
কখনও ইহারা বলিতেন না।

আজ পাহু আসিয়া আপনি যোগিতীর পলাপার্পে বান
প্রণে করাত, মনে মনে উভয়েরই লবিলে আসন্ত হইলেন।
এবং এত দূরে চুই বংশব পূর্ণে উত্থানের চিত্তে যে একটা
মাল মেঘ কমিয়া উঠিয়াছিল, আপনিই কখন তাহা অদৃশ
ইয়া গেল।

২য় অর্ধাঘ এবং বহু ভ্রমণের পর দীর্ঘ বেড় মাসে
গোয়ার মা গোথমুক হইয়া উঠিলেন। এই বেড় মাসে পাহু
যখনও তাঁহাকে ছাড়িয়া যায় নাই। তাঁহার গুরুত্ব অত্যাশ্রয়,
নিম্ন ভাবে নানা রকমে তাঁহার বড় করিয়া, সেবা করিয়া,

তাঁহার যোগবন্দনা তুলাইয়া দিয়া, তাঁহাকে আশ্রয় দিতে
চেষ্টা করিয়াছে। পূর্বের যেমন করিয়া মাতাকে সেবা করা
উচিত বা করিতে পারে, পাহু কোন দিক দিয়া তাহার
এতদৃশ্য তত রাখিল না। তাহার পর, পূর্ণ বাহ্যি করিয়া
পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিয়া মাতার পাহু তাহার নিজের বাড়ীতে
বাটবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।—মাতা গ্রহণ করিলেন, অভিমান
করিলেন, রাগ করিলেন, কিন্তু তাকে লক্ষ্যচ্যুত কহিতে
পারিলেন না।

করণ কান্তর কণ্ঠে মাতা কহিলেন, ‘তবে রোজ একবারটা
করে মাকে দেখতে আসনি, এই কথাটি বলে যা—।’

হাসিয়া পাহু কহিল, ‘মা, মাতের চেয়ে বড় সংসারে আমার
কিছু নেই, কিন্তু কাজে আটকে পড়ে’ যদি রোজ না আসতে
পারি, তা হলে ভগ্নে ক’রে না।’

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ‘তবে, আর একটা কথা
বল।’

‘কি মা?’

—‘প্রাণের ঘাতে গানি হয়, এমন কাজ কিছু করিল না,
যা বা।’

—‘কাজ না করেও যদি, এই মুহুর্তে আমার হাটফেল ঘে
যাও, তা হলে, তুমি বা আমি কেউই কি সেটাকে ব্যরণ করতে
পারব না?’

বাট বাট করিয়া মা জিত কাটিলেন। পাহু হাসিয়া ঘর
ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল এবং গেটের বাহিরে দিয়া চকু
চকী প্রান্ত ভাগে গাথের চাবরপানি তুলিয়া, ভাল করিয়া
দুধিয়া লইল।

[ক্রমশঃ]

ভারতবর্ষের জমী

ভারতবর্ষ ৯০ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমি আছে, ইহার মধ্যে ১২৫৬-৭০ মাল হইতে ১২৫২-০০ মাল পর্যন্ত কোন প্রকার জমি অশ্রুত হইল :—

	লক্ষ একর	লক্ষ একর
	১২৫২-২০	১২০১-০০
গোট জমির, পরিমাণ	৩৬৭০	৩৬৭০
ভূমিকারের মত মতাপ	১৭২০	১৭২০
কন-জমাল	২০০	২০০
পতিত জমি	২০০	২০০
আবাদযোগ্য পতিত জমি	১২২০	১২২০
যে জমিতে বীজ উপর	২১২০	২১২০
যে জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে	২১২০	২১২০

— জমি

মুক-বধিরদিগের শিক্ষা

—ঈশানে স্ত্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩১ সালের Census Report ১০,০০০ জন মুক-বধিরের সংখ্যা কেবল হইত। মুক-বধির, অন্ধ, কুষ্ঠরোগী প্রভৃতির যেসব Census Report হইতে আমরা পাই, তাহা অাবলম্বে ইহা আমরা সঠিক বলিয়া বলিয়া এবং বলিতে পারি না। আমাদের দেশ ইংরেজের সীক লগায়া আরও অনেক বেশী। যেসব একটী সনের পূর্বে পুজাপ্রস্তুতকরণ নিষেধক আদা অনুসরণ করিয়া সেখানে আশ্রয় করা হইতে পারে, Census Report-এই সংখ্যক দ্বারা মূলতঃ ১৫০. Minor কুষ্ঠরোগীদের দ্বারা এইজন্য অনুসন্ধান করিয়া অনুমান করেন যে, আমাদের প্রকৃত সংখ্যা Census Report-এর যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অল্পতঃ কমপক্ষে বেশী। অল্প মুক-বধিরের সংখ্যক এতটা পার্থক্য হইবে না, কারণ পরিবারের মধ্যে কুষ্ঠরোগ সেরে গিয়া মুক-বধির হইতে চলে, মুক-বধির হইতে মুক-বধির হইতে চলে না।

আমরা এই একজনকে Census Report-এ কেবল সংখ্যাটী এবং বলি। আদ্যটী লক্ষ মুক-বধিরের মধ্যে অর্ধেক পুণে হইবার উপস্থিত অল্প বলিয়া বলিতে পারি। ইংরেজের মধ্যে মাত্র ১০০ জন বিজ্ঞানে যায়। এই সংখ্যক পূর্ণে দ্বিতীয় মুক-বধির বিজ্ঞানের অল্প কিছু কালিগাণিত ভাষায়া লম্বা পুণে দ্বিতীয় দ্বিতীয় এই সংখ্যা পূর্ণে বলিতে পারি। বহু বহু বহু ইংরেজের সংখ্যা লম্বা কিছু বহুতঃ বলিতে পারি, কিন্তু মোট ১০০ জনের উপরে যায় না, ইহা নিঃসন্দেহ বলিয়া বলিতে পারি।

আমি ১০ বছর পূর্বে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে, যেখানেই সনের মুক-বধিরের তত্ত্ব ব্যবহার প্রথম বিজ্ঞান বলিতে চাই। আর ১০০ খ্রীস্টাব্দে আমরা দেখিতেছি যে, সত্তা লক্ষ মুক-বধির বাসক-বালিকার মধ্যে মাত্র ১০০ জন শিক্ষালাভ করিয়াছে। আমেরিকায় মুক-বধিরদিগের শিক্ষা আরও কম ১০০ জনের পূর্বে, কিন্তু যাহা দেখানে একজনও অশিক্ষিত বধির নাই। বৃত্তান্তে আর সব দেশের অশিক্ষিত বধির নাই বলিয়াই চলে। তাহা হইলে মুক-বধিরের শিক্ষা আমাদের দেশ হইতে অনেক পূর্বে আরও হইত। কিন্তু যাহা দেখানে তাহাদের শিক্ষার বাধাগুলি।

কালো প্রদেশে মুক-বধিরের সংখ্যা ১০,০০০। ইংরেজের শিক্ষা বিচার এক কলিকাতায়, ঢাকায়, বিনোয়ে, ঢাকাদ্বীপে, বরেন্দপুরে, সৈয়দপুরে ও চট্টগ্রামে—এই গুলি বিজ্ঞানের মধ্যে। একটী প্রদেশে গুলি পুণ, ভবিষ্যৎ জাণ। কিন্তু কলিকাতায় মুক-বধির বিজ্ঞান কল্পনা অল্প কল্পনা নাই। পুণ পুণ হাজারকাল ১০১২ জনের বেশী নয়। ঢাকায় কয়েকজন আর ১০ জন হইবে, কিন্তু তাহাদের তত্ত্ব জিনিস শিক্ষিত (trained) শিক্ষক দ্বারা একজন। কলিকাতায় মুক-বধির বিজ্ঞানের হাজারকালী সংখ্যা ২০০ জন। সব দিক হইতে এই বিজ্ঞানটি ভারতবর্ষে সেরে সমস্ত শিক্ষকই কিনে দানে শিক্ষিত।

আমাদের মুক-বধিরের সংখ্যা ১,৭০০। কেবল পুণ নাই।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে মুক-বধিরের সংখ্যা ২০,০০০। একটী পুণ নাই।

মুক-বধিরের মুক-বধিরের সংখ্যা ১০,০০০। এতদ্বারাও নাই মাত্র একটী পুণ আছে।

পঞ্জাব প্রদেশে ১০,০০০ জন মুক-বধির আছে, কিন্তু তাহাদের তত্ত্ব একটী পুণ নাই।

বেংগাল প্রদেশে মুক-বধিরের সংখ্যা ১০,০০০। ইংরেজের তত্ত্ব দ্বিতীয় পুণ আছে, কিন্তু কোনটাই উপস্থিতকালে প্রচার করা করিয়াছে না।

মধ্য-প্রদেশে ১০,০০০ জন মুক-বধির আছে। দাশপুত্র নামের দ্বারা একটী পুণ আছে।

মাদ্রাস প্রদেশে ১০,০০০ জন মুক-বধির আছে। ইংরেজের তত্ত্ব মাদ্রাসপুত্র ও পাল্লুকটায় বেনারস-বিনোয়ে অদ্যে দুইটি বিজ্ঞান আছে। ইংল ভিলসনকে শিক্ষালাভী উচ্চ ও মাধ্যমিক, হাজারকালীকালী মোট প্রায় ১০০, শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণ প্রায় সত্ত্বাশী বিজ্ঞানপ্রদেশে শিক্ষিত।

সেইর মাদ্রাসগুলির মধ্যে কয়েকটি দুইটি ও মাদ্রাসপুত্র একটী বিজ্ঞান আছে। উচ্চ হাজারেই মুক-বধিরের তত্ত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যয়ন, কিন্তু মাধ্যমিক নয়। সেইর মাদ্রাসগুলির মধ্যে কালীর মুক-বধিরের সংখ্যা সত্ত্বাশীকালী বেশী, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার তত্ত্ব কোন কল্যাণী নাই।

পূর্ণাঙ্গ বহুর পূর্ণতা আবার প্রাথমিক, হাজারকাল মুক-বধিরের শিক্ষার প্রচার আদ্যে হয় নাই। ইংরেজ কাল কি? গাংলা কলিকাতায় বহুতঃ দ্বিতীয় প্রদেশে, গাংলায় মধ্যে অনেকই বিনোয়ে, পূর্ণাঙ্গেরই ইংরেজ বালী। পূর্ণাঙ্গেরই যে মোটটী বালী নয়, গাংলা অধ্যয়ন নাই না। পূর্ণাঙ্গেরই যে পরিচালনা গাংলায় প্রদেশ, তাহা অতি সামান্য। কিন্তু তাহাদের উপর সমস্ত বলিষ্ট চাপাওয়া গিল, প্রীক উচ্চতঃ বলা করা হইবে না। কাল, আমাদের দ্বারা অতিক্রম হইতে জানি যে, আমাদের দেশের গাংলা বালী, গাংলা মুক-বধির, অন্ধ, কুষ্ঠরোগীপ্রভৃতির শিক্ষার কল্যাণ করিবার তত্ত্ব কিছু সময় দিতে ও গাংলা বালীর পূর্ণতা এই অল্পকাল করিতে মোটটী প্রকৃত নয়। কলিকাতায় মুক-বধির বিজ্ঞানের পূর্ণতা, বহু যাহা বলা হাজার টাকার প্রদানের হও, তবে বেনারসের কাল কেবল অল্পকাল জানাইতে একটী গাংলাও আদ্যে না। গাংলা বালী গাংলা বালীর দ্বারা হইতে হইবে। এই কল্যাণের কোন শিক্ষালাভের সম্ভব-প্রচার হয় না।

ইহা দ্বিতীয় মুক-বধিরের শিক্ষার প্রচারে আরও দুইটি প্রধান অধ্যয়ন,—সেইর অধ্যয়ন ও গাংলা। শিক্ষা দিলে মুক-বধিরের মধ্যে বলিতে পারে এবং গাংলাই হইতে পারে, ইহা সেইর দ্বারা প্রচারিত হইবে না, অদ্যেও বিজ্ঞান করিতে চাহেন না। গাংলাই তাহাদের মুক-বধির কেমনকালের পুণে পড়াইতে চান, তাহাদের মধ্যে আবার অধিকাংশ লোকই যাহা ১০, ১৫, টাকা ব্যয় করিতে অক্ষম। কাল-বোর্ডগুলি



[লক্ষ্যকল্পের সম্মাদকল্পে সর্বজনীনতা উপায় বর্ণিত]

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষের প্রাচীনতা

গত বৎসরে অসম্ভাব্য অশ্রদ্ধার ঘিরেটোবে রবীন্দ্রনাথের "গীতা" নামক নাটকখানির অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ঐ নাটকের "ঐশ্বর্যবাদ" কৃষিকার অভিনেতা ছিলেন বহু রবীন্দ্রনাথ এবং ভক্তদের বৃদ্ধ ও যুগোপগ অসঙ্গত অংশের অভিনয় করিয়াছেন।

আমাদের সাধারণের বিশ্বাস যে, রবীন্দ্রনাথের এতৎ ও ঐশ্বর্যবাদে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রতি সজ্ঞার নিবন্ধন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মনে চ্য, সাধারণের ঐ ধারণা সত্য নয়।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও শিকার যখন যুগের বহুতর্য হইয়াছিল, তখন নাটক লিখিত হইত এবং তাহার অভিনয়ও হইত ইহা সত্য বটে; কিন্তু যে নাটকের অভিনেতা অথবা তাহার যাদু অভিনয়ে কান-কোথাখানি নিগূঢ়িত না হইয়া তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে, সেই নাটকের রচনা অথবা যাদু অভিনয়ের প্রসঙ্গ তখন দেওয়া হইত না। ছন্দ ও শব্দার্থ সম্বন্ধে ভারতীয় কবিদিগের যে সমস্ত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহার মূল্যবোধ অধিকবিশেষ সঙ্গতাবে অধ্যয়ন করিলেই আমাদের কথার সভ্যতা প্রতিপন্ন হয়। এইখানে মনে বাসিত হইবে যে, কালিদাস প্রভৃতি যে সমস্ত কবি বিদ্বৎ বলায়ক নাটকের রচয়িতা, তাহারা ভারতের কবিদিগের সমধীনমণিক নহেন।

রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত নাটক লিখিয়াছেন, অথবা তাঁহার অভিনায়ককে যে ভাব-ভঙ্গীতে নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে, তাহাতে বর্ণকণ্ঠের মনে কান-কোথাখানি উদ্ভব হয় না—এই কথা পূর্ব সমস্ত ঐশ্বর্যবাদ একমুখি নিশ্চয়ণ শব্দভ্রম বহু হুঁক হাত ত্যাগ বলিতে পারিবেন না।

কানেট বলিতে চাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বর্য মূখের সঙ্গতবশতই ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার উপায়ক হইন না কেন, তিনি কাব্যঃ বাহ্য কিছু করিতেছেন, তাহাতে ভারতীয় নিজস্ব প্রকৃত সভ্যতা ও শিকার পরিপন্থী অনেক কিছুই বিকৃতি সাধিত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কথা অথবা আত্ম-সম্মান সম্বন্ধে সঙ্গতবশত কথা আমাদের অজ্ঞাত নহে। "অতকাল কোন কোন বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে "কবেছ", "পেয়েছ" প্রভৃতি শব্দবলিত ব্যাকরণ-ভীম যে ভাষা চলিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী। এতদূর ভাষার সঙ্গী বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালীর চিত্ত অথবা অধিত সাধন করিয়াছে, তাহা এত প্রবলভাবে আলোচ্য নহে। তাহার উদ্দেশ্য কি এবং তাহার মূল্য কি বহু হইলে তাহা উদ্দেশ্যের সমস্তলীকৃত হয়, ইহা বিচার করিতে বলিলে বহুতর্য প্রতিপন্ন হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ ভীম ভাষা বাঙ্গালীর উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকার সাধন করিয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি একটা মূর্খ ভাষার সঙ্গী করিতে পারেন, তিনি যে অসম্ভাব্য প্রতিভার অধার তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যে-উপাখ্যে ভক্ত সাধারণতঃ যাদুগ লালসিত হয়, সেই উপাখ্য অথবা যৌনি সর্বজনীনত, তাহাতে কৃত্রিম হইয়াও বিদেশবাসীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধরূপ অবলীলাক্রমে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তিনি যে অসম্ভাব্য পরিমাণে আত্ম-সম্মান-জানসম্পন্ন, ইহা অতি সাধারণ পূর্ব দোক ও অবীক্য করিতে পারে না।

কালেই আমাদের কাছে দীক্ষনাপ পারিচয়ী না হইলেও শ্রদ্ধেয় এবং অসাধারণ।

যেদের এই দৃষ্টিকে ব্যাচতে বৃদ্ধ ও দুর্বলতাপের চরিত্র-পটনের সহায়তা হইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, জাহাতে তাহার বিদ্বৎপণ্ডিত্য পাতিয়া রাখিত হইতে পারে, তাম্বল কাফ্য রসীকতায় কলিত হইত, টা যেখানে আমাদের বসিতে হয় “প্রাণ: সশাশ্বতবিশুদ্ধিকালে বিদ্যাহসি পুংসাঃ মনিনা ভবতি”।

কত শিক্ষিতা দুর্বল অবিদ্যাসিতা রসিকা বাইরেছেন, দুর্বল-দুর্বল পারিচয়িক ভাবন কতক অস্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা রসীকতাপক্ষে তাঁহার কর্তব্য নির্ধারণ করিতে অগ্রসর করি।

শিক্ষার প্রকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

বটম্ চার্লস কলেজের পুণ্ডিত-বিতরণ লতার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রাণাশ্রমার মুখোপাধ্যায় বেকার সমস্তা ও শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে একটী বীর্ষ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতা বেকার-সমস্তা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। কি হইলে বেকার-সমস্তার সমাধান হয় না, তাহার অনেক সংবাদ ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয়ের বক্তৃত্যর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কি কহিলে যে বেকার-সমস্তার সমাধান হইতে পারে, তাহার কোন সন্ধান ঐ বক্তৃত্যর দৃষ্টিয়া পাওয়া যায় না। কি হইলে বেকার-সমস্তার সমাধান হয় না, তাহা যে কোন বেকার কলেক্টর দিকট দিচ্চালা কহিলে জানিতে পারা যায় বলিয়া মহোদয়ের বিশ্বাস। ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয় কহে করিগু চন্দ্রসম্বন্ধে এত কথা কেন বলিলেন, তাহা বুঝিয়া ইচ্ছা নহে।

ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয় তাঁহার প্রোত্বর্গকে জানিয়া দিয়াছেন যে, “যুব তাল তাল ভেলে উজ্জ্বল, এনিবিশ্বাসী, বিজ্ঞান এবং শিল্পবিষয়ক শিক্ষা লাভ করিগাও বেকার হইয়া গিয়াছে। কালেই (অগ্রস্ত তাঁহার মতে) বৃদ্ধি হইবে যে, যাহার সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিলেও বেকার-সমস্তার সমাধান হয় না।” তাঁহার এই দৃষ্টি: অস্বাভাবিক কহা আমাদের পাত্যাতীত। ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞা ব্যবসায় তাহা পাঠ করিতে

পাশিলে যে, কাহারও বেকার থাকিতে হয় না, পরন্তু দনদান হওয়া যায়, ইহা অতীতের ইতিহাস লক্ষ্য করিলেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। এখনও যে কোন ব্যবসায়ের পরিচালক অথবা ব্যবসায়ী যুব লম্বা বীকার কহিলেই যে, বর্তমান সময়ে বাকারের অবস্থা নষ্টা বটে, কিন্তু উপযুক্ত সহকারী পাইলে প্রত্যেক ব্যবসায়েরই অশেষকরত অবিকরত উন্নতি সাধন কহা সম্ভব। কেবলমাত্র কোন কাণ্ডাশি হইলে, তাহা পূর্ব করিয়াই প্রস্তাব অসংখ্য বৃদ্ধ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ব্যবসায়-পরিচালনার কাণ্ডে উপযুক্ত সহকারী পাওয়া ক্রমশ: দুর্ঘট হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থা যাহার হইলে ইচ্ছা কি-বৃদ্ধিতে হইবে না যে, বাহ্যিককৈ ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয়গণ অথবা তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ উজ্জ্বল এনিবিশ্বাসী, বিজ্ঞান এবং শিল্পবিষয়ক শিক্ষিত বলিয়া ছাপ বিদ্যা থাকেন, তাহানিকে যথার্থ উজ্জ্বল কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং তাহাদের বাকী কোন অসংখ্য না থাকিলেও, কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহ্যিকজনীনতা কল্পই তাহানিকে বেকার থাকিতে এবং নানাবিধ কল্পেতাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়।

এই বক্তৃত্যর প্রাণাশ্রমার বাবু আর বাহা বাগ বলিয়াছেন, তাহা হইতে বৃদ্ধিতে হয় যে, শিক্ষার-প্রকার (type) তিনটী, যথা, সাহিত্য-বিষয়ক (literary), বিজ্ঞান-বিষয়ক (scientific) এবং শিল্প ও যন্ত্র-বিষয়ক (technical)। বর্তমান সময়ে আমাদের সমীচরণ সাধারণত: যে শিক্ষার শিক্ষিত হইয়া উজ্জ্বল হইয়া থাকেন, তৎপ্রকারে শিক্ষাকে ঐকম ভাবে শ্রেণীবদ্ধ কহা হইয়া থাকে এবং তাহার মত কাহারও কোন দেওয়া যায় না।

কিন্তু ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল, যখন মানুষের অগাধ হইতাহিল জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ কহা এবং ঐ জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, প্রথমত: বাকরণ, দ্বিতীয়ত: শিক্ষা, তৃতীয়ত: কল্প, চতুর্থত: নিকট, পঞ্চমত: জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতে হইত। তখন সাহিত্য বলিতে বৃদ্ধিতে হইত, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ এবং শিক্ষা বলিতে বৃদ্ধিতে, মানুষ সম্বন্ধসম্পন্ন হইয়া যে-যে অর্থে যে-যে ভাবে লব্ধ করে, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালিত ও গার কাণ্ড। এখন “বিজ্ঞা” বহু বক্তব্যের বলিয়া বিবেচিত হইত বটে এবং শিক্ষার অঙ্গ ও বহু বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু “শিক্ষা” বলিয়া একটী মাত্র কাণ্ড। তখন

জ্ঞান কাহাকে বলে, বিজ্ঞান কাহাকে বলে, ব্যাকরণ কাহাকে বলে, শিল্পা, কলা, নৈরুক্ত, জ্যোতিষ কাহাকে বলে, অথবা ঐ সমস্ত পদের প্রকৃত সংজ্ঞা কি, তাহা মাত্রকেই বর্ণনা করা ছিল। তখন মাত্রমাত্র কোন পদের প্রকৃত সংজ্ঞা কি তাহা না জানিয়া ঐ পদ ব্যবহার করিত না। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন তাহার বহু রকম পদের ব্যবহার হইয়া থাকে, অথচ কোন পদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ(?) যথো যথোরা সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য, তাহার পঞ্চাশ প্রাণন: জানেন না।

আমরা ক্রমাগত প্রাণন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি যে, সাহিত্যচর্চা বিজ্ঞানশিক্ষা অথবা বিজ্ঞানচর্চা সাহিত্যশিক্ষা, অথবা পদ-বিষয়ক জ্ঞানচর্চা বিজ্ঞানশিক্ষা কোন্ শ্রেণীর কাৰ্য্য, তিনি তাহার হস্তবিষয়ক ব্যাখ্যা দিবেন কি? যদি সাহিত্য না শিখিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা করা অসম্ভব হয়, অথবা তাহার বিজ্ঞান শিক্ষা না করিয়া প্রকৃত ভাবে সাহিত্য শিক্ষা করা অসম্ভব হয়, অথবা বহু-বিষয়ক জ্ঞান লাভ না করিয়া কোন বিজ্ঞান শিক্ষা করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সাহিত্য-বিষয়ক, বিজ্ঞান-বিষয়ক অথবা বহু-বিষয়ক শিক্ষা,—তিনটি যে বিভিন্ন রকমে, ইহা বলা অথবা মনে করা উচিতক নহে কি?

আমাদের শিক্ষার কর্তব্যগণ শিক্ষাকে এই ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন বলিয়াই এখন আর ভাল ভাল ছেলে ভাল ভাল পাণ করিয়াও কোথাও চাকুরী না পাইলে পেটের আর পূর্ণতা পূটাইতে পারেন না, ইহা ক্রমাগত প্রাণন বাবু বৃত্তিতে পারিবেন কি?

শিক্ষা কিন্তু হইলে বেকার-সমতার সমাধান হইতে পারে, তাহার অল্পসংখ্যক আশ্রমে এই সংখ্যার প্রকাশিত "ভারতের বর্তমান সমতা ও তাহার পূরণের উপায়"-দীর্ঘক প্রবন্ধে বিস্তৃত পারে। আমরা তাহা শিক্ষার কর্তব্যগণকে পড়িতে অগ্রগণ্য করি।

ক্ষুধা, মস্তিষ্কশক্তি ও পণ্ডিতগণের প্রভাবপ্রাণ

কি হইলে মাত্রমাত্র সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তৎসংক্ষেপে ওয়াশিংটন সংঘের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভট মনস্তত্ত্ববিদ কতকগুলি গবেষণা করিয়াছেন। ঐ উদ্ভট মনস্তত্ত্ববিদের নাম ইলিয়ট (M. H. Elliott) এবং ট্রেট (W. C. Treat)।

বিদ্যাতের সফলতায় ইচ্ছার মস্তিষ্ক দীর্ঘ প্রাণন করিলে তাহার শরীরের কোন কোন অঙ্গ বিশেষভাবে প্রভাবপ্রাণিত হয়, তাহা পরীক্ষণ করিয়া তাহার স্থির করিয়াছেন যে, যাদুশক্তির মধ্যে তৎকালীনগমনের রাস্তা প্রকৃত করিতে পারিলে মস্তিষ্কের প্রভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহার আরও বৈশিষ্ট্যযুক্ত যে, ইচ্ছার শক্তিশালী বস্তু থাকিলে, তত তাহার মস্তিষ্কে প্রভাব বাড়িয়া যায়।

ঐ শরীর হইতে তাগনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, শক্তিশালী যখন থাকিলে, তখনই মস্তিষ্ক পরীক্ষণে ক্ষমতা গতিতে শিক্ষা লাভ করিবার ক্ষমতা অক্ষম করে।

ইহাদের সিদ্ধান্ত হইতে বস্তুই মনে হয় যে, মস্তিষ্কই শিক্ষার একমাত্র অঙ্গ এবং মাত্রমাত্র উপস্থান অভ্যাস করিলে, ততই সে বীর শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে।

কিন্তু বস্তুতঃ মস্তিষ্কই শিক্ষার একমাত্র অঙ্গ নহে এবং উপস্থান অভ্যাস করিলেই শিক্ষার উৎকর্ষ লাভ হয় না।

ভারতীয় ঐতিহ্যের কথামতে, শিক্ষা করিতে হইলে যেমন মস্তিষ্কের প্রয়োজন, তেমন শরীরের অঙ্গের অঙ্গেরও সমান প্রয়োজন আছে। শিক্ষার প্রাথমিক অঙ্গ যে চকুরাদি পাঠ্য জ্ঞানোত্তর এবং হস্তাঙ্গ পাঠ্য কথোবানি, তাহা বাস্তব জীবন লক্ষ্য করিলেই বৃদ্ধিতে পরা যায়। মস্তিষ্ক হয় না থাকিলে চকুরাদি পাঠ্য জ্ঞানোত্তর কর্তব্যমত থাকে না, আর মস্তিষ্কের নিম্নপ্রাণের অংশ হয় না থাকিলে হস্তাঙ্গ পাঠ্য কথোবানি কর্তব্যমত থাকে না। কায়েই সর্বোচ্চ শিক্ষার ভর যে, সমস্ত অবস্থার পূর্ণ বাস্তব প্রয়োজন, তাহা সহজেই বৃত্তিতে পরা যায়।

সদ্য অবস্থার পূর্ণ বাস্তব লাভ করিতে হইলে, সারা জীবন বাহ্যেতে পরীক্ষা পূর্ণ পরিমাণের অঙ্গ, জ্যোতি, রস এবং অঙ্গের প্রভাব পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তথ্যবৎ লক্ষ্য থাকিতে হয়। নাগরাজু এবং প্রোবরকে বস্তু দিয়া মস্তিষ্ক-গুহা বাস্তব প্রোব অপ্রতিহত থাকিলে মস্তিষ্কাত্মকে অঙ্গ, জ্যোতি, রস এবং অঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং ঐ চারটি পদার্থ মস্তিষ্কের সত্য-ক্ষেত্র হইতে মস্তিষ্ক পদার্থ অঙ্গাঙ্গলই প্রবাহিত হইতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যে অঙ্গ, জ্যোতি, রস এবং অঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাহা মস্তিষ্কের নিম্ন ভাগে কিছুতেই প্রয়োজনাত্মক গমনাগমন করিতে পারে না।

নাতিদূরেব নিকট পাঞ্চ সন্ধিত থাকিলে তাহা হইতে ঐ স্থানে অশ্ব, গোহাতি, বস এবং অমৃতের উৎপত্তি হয় এবং ঐখানে হইতে নাতিদূরেব নিকটগো ঐ চারিটা লোকের পদ্মপাশমন সম্ভব হয়। তাহাটী সমস্ত অবস্থার পূর্ব বাস্তব বহুদূর রাখিতে হইলে খাচ কোষ প্রত্যেককীরে। তাহা খাটিলে অশ্ব হইতে অমৃত পর্যন্ত উৎপত্তি হয়, তাহা পাঞ্চকণে গ্রহণ করাই কবিরূপের পরামর্শ এবং তাহারই চক্ৰ স্বাক্ষরণ খাচ গ্রহণ কবিরূপ প্রকাশে 'অমৃতমুপপন্নমসি বাহা' এবং খাচগ্রহণ সমাপ্ত হইলে 'অমৃতমপিধানমসি বাহা', এই বহু উচ্চারণ করিয়া থাকেন। খাচ গ্রহণ কবিরূপ পর কিছুকণ পর্যন্ত নাগ্নম খাচ হইতে অশ্ব, গোহাতি, বস এবং অমৃত সঞ্জন করিতেই বাস্তব থাকে। তখন মস্তিষ্কের কার্য সম্ভব হয় না। খাচ হইতে ঐ চারিটা উপাধানের উৎপত্তি সমাপ্ত হইলে, নাগ্নম ঐ চারিটা উপাধান ব্যবহার করিতে আদিত্য করে এবং এই সময়ের মাগ্নবেব বাহ্যে সর্গক্ষেপক। তাহা থাকে ও তাহার মস্তিষ্কের সর্গাধিক কাব্যাকমতা সম্ভব হয়। কিছুকণ পরে ঐ চারিটা উপাধান আবার সূর্য্যটীবা দায় এবং তখন আবার খাচের প্রয়োজন হয়।

কালেই দেখা যাইতেছে যে, পাঞ্চ বাস্তব নাগ্নমের মস্তিষ্ক-পদ্ধতির উৎকর্ষ সম্ভব হয় না; আত্মতত্ত্ব পর কিছুকণ বিজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন এবং কিছুতেই মাগ্নবেব সজলা মস্তিষ্কের সমান কার্যাকমতা ব্যবহার রাখিতে পারে না।

এখন পাঞ্চকণ বুদ্ধিযা দেখুন, আমাদের ভারতীয় কবিরূপ বৈজ্ঞানিক ছিলেন, না, বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন।

আমাদের মনোবিদগণ সংস্কৃত ভাষা না জানিয়া, ঐ ভাষার যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত আছে, তাহা প্রায়শঃ বখাখব না পড়িয়া, ভারতীয় কবিরূপ কি জানিতেন অথবা কি না জানিতেন, তাহাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি কি ছিল, অথবা তাহারা কোন পদ্ধতি নিদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া থাকেন। ইহাকে কি পণ্ডিতগণের প্রভাৱণা বলা যায় না?

ইতিহাসের উপকরণ এবং 'ষ্টেটস্ম্যান'

লক্ষ্য পটভাষা নিকট একটা স্থানে প্রায় ২২ ফুট মাত্রী মিত্রে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ একটা কাঠনির্মিত সন্ধ (platform)

বুনিদা পাতিয়াছেন। মকী গাথ ১০০ ফুট লম্বা, ৪২ ফুট চওড়া, ৭ ফুট পাতালি। পটিনা ও বাঁকপুয়ের প্রাচীন নাম পাটলিপুত্র। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে পাটলিপুত্রে যে একটা বন্দব ছিল, তাহাও অল্পতম প্রমাণ ঐ মকী। ষ্টেটস্ম্যানেরও বিশ্বাস, পাটলিপুত্রে একটা বড় বন্দব ছিল এবং ঐ প্রদেশে ষ্টেটস্ম্যান ভাষার সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ সন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

যে সময়টা ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ উন্নতির সময় অর্থাৎ এখন ভারতবর্ষের প্রকৃত কবিরূপের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তখন ভারতবাসিগণ বৈশেষিক বাণিজ্যের প্রবর্তন দিয়াছিলেন কি না, বৈশেষিক বাণিজ্যের চক্ৰ ভারতবর্ষের কোন বন্দব ছিল কি না, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। কারণ, আমাদের বিশ্বাস প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ জানিয়া কবিরূপের পুস্তকগুলি বখাখব অর্থে অধ্যয়ন করিবার সাধারণতঃ ভারতবাসীর উদ্ভব হইলে, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস সত্যই উদ্ভাসিত হইবে। ষ্টেটস্ম্যান ভারতবর্ষের ইতিহাস সন্ধে ও প্রাচীন ইতিহাস প্রবর্তনের উপকরণ সন্ধে বাহা বাহা বলিয়াছেন, তাহাই এখনে আমাদের আলোচ্য।

ষ্টেটস্ম্যানের কথার মনে হয় যে, বর্তমান সভ্যতাভিত্তিক ইতিহাস পুথ পঠিত্যর ভাবে লিপিত হয়; এখন বেতন পরিষ্কার ভাবে ইতিহাস লিপিত হয়, প্রাচীন ভাষাগুলি ঐরূপ পরিষ্কারভাবে ইতিহাস লিপিতে জানিতেন না এবং যে সময় ভাষার লিপিত ইতিহাস নাট, তাহাদের প্রাচীন কৃত্য উচ্চারণ করিবার উপায় শিলাখণ্ড, তত্ত্ব, অলঙ্কার পাত্র (vase) এবং খোলাকুঁড়ি (shard) উপর যে সমস্ত লিখন পাওয়া যায়, তাহার পর্যালোচনা করা।

আমাদের মতে ইতিহাস-প্রবর্তন-সম্বন্ধীয় ষ্টেটস্ম্যানের এই মন্তব্যগুলি বুদ্ধিবৃত্ত নহে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যত যে, বর্তমান ভাষিকগুলি ইতিহাস পরিষ্কৃত হইবে, কিন্তু তাহা যে ঠিক নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সময় যে বুদ্ধগুলি হইয়া দিয়াছে, তাহার বয়স এখনও ১৪০ বৎসর হয় নাই। অল্পকিছু প্রবর্তন ঐ বুদ্ধগুলির যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বিভিন্ন। কোন গ্রন্থকার বিশ্বাসযোগ্য অথবা কে বিশ্বাসের অযোগ্য,

তাহা ভিত্তি করিতে বলিলে ঐ ইতিহাস অক্ষতাব্যাহার চরিত্র পড়ে। ১৮৭০ সালের জাভো-প্রাদেশিক বুদ্ধ অথবা কল ও কাপানের বুদ্ধ, অথবা নিং-শতাব্দীর ইয়োহোপীর মহাপুঙ্খের ইতিহাসের অবস্থা ও তত্ত্ব। দুইজন গ্রন্থকারের বর্ণনা সঙ্গতি-ভাবে সমান নহে এবং তাহার কলে কাহার বর্ণনা নির্ভুল ও বিখণ্ডযোগ্য, তাহা সুকিরা উঠা তবিত্য কালের পাঠকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বেণের সমসাময়িক অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গাইতেছেন। বস্তুতঃ কোন একটা ঘটনা ওইজন মাহুধ একজন ভাবে দেখে না ও শুনে না এবং তাহার কলে একই ঘটনা বিভিন্ন মাহুধের বিবৃতিতে অথবা রচনাধি বিভিন্ন হইয়া পড়ে। কায়েই বলিতে হইবে যে, বর্তমান সময়ে ইতি-হাসের নামে বাহা পরিষ্কৃত হইতেছে, তাহা বাহা তবিত্য-কালে বর্তমান কালের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা করনা করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না এবং হইবে না। শিলাখণ্ড এবং গুপ্ত প্রত্নতত্তে বাহা লিপিত হয়, তৎস্বারাও তাত্‌কালিক ইতিহাস সম্বন্ধে একটা করনা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের জ্ঞান হওয়া সম্ভব হইতে পারে না এবং হইবে না।

কোন মাহুধের কি ব্রহ্ম উন্নতি অথবা অবনতি হইলে তাহার রচনা ও কাব্যাবলী কিম্বদন্তি হয়, সমাজের কোন অবস্থায় কিম্বদন্তি গ্রন্থকারের উদ্ভব হয়, এবং বিধি তথ্যগুলি জানা থাকিলে, যে কোন সময়ে যে কোন দেশের ইতিহাস ঐ দেশের এবং ঐ সময়ের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে বৃত্তিতে পাওয়া সম্ভব হয়। মাহুধ নিখা। কথা বলিতে পারে বটে, কিন্তু যিনি নিখা কথা বলেন, তাহার ভাবভঙ্গিতে অথবা রচনাধি যে অবস্থান-বিক্রম উদ্ভব হয়, তাহা প্রকৃত বৃত্তিমানের দৃষ্টি হইতে সূক্ষ্মান্বিত সাধা যায় না। কায়েই প্রকৃত ইতিহাসের প্রধান উপকরণ তিনটী—বখা (১) যে সময়ের ইতিহাস জ্ঞানিত হইবে সেই সময়ের বিভিন্ন রচনাবলী, (২) বৃত্তিমান পাঠক, (৩) রচনাবলী হইতে গ্রন্থকারের চরিত্র এবং তাহার সম-সাময়িক সমাজ-চিত্র প্রত্নতত্তি কিম্বদন্তি বৃত্তিতে হয়, তাহার তথ্য।

যে পঠনীয় ভাষাতে মাহুধ বহুত্বাকারের যে কৌশল বহু-

ভবে আশ্রয়িত ও হীপুত্বের সূক্ষ্মনাথ সাধন করিতেছে এবং প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন নতুনত্বানবের অবস্থা হইয়াও নতুনত্বের অভিব্যক্তি করিতেছে, সেই ভাষাতত্ত্ব ঐ দাপ্তিক মাহুধগুলির পিতৃপুরুষগণই একদিন প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ কি হইতে পারে এবং কি করিলে ইতিহাস চিত্রকালের তত্ত্ব পরিষ্কৃত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ ভাষায় আলোচনা ভগ্নভেদে অস্ত্র কোন ভাষায় কোন একই পুঁজিখা পাওয়া যায় না।

বর্তমানে পঠিতগণ (?) বাগ্মন্যের পুণ্যগুলিকে যে অর্থে প্রচারিত করিয়া থাকেন, তাহাতে ঐতিহাসিক অসত্যের সমস্ত পুঙ্খক বলা গাইতে পারে, তবিত্য সমস্ত নাই। কিন্তু যদি কোন দিন প্রকৃত সত্যত্ব তাহা মাহুধ আবার জানিতে পারে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, ঐ পুণ্যগুলির মধ্যেই ইতিহাসের উপকরণ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণলিপিত আলোচনা-গুলি আছে এবং তাহার মধ্যে অসত্যের কোন গল্প নাই।

বৃষ্টি শিকার সামাজিক উদ্দেশ্য এবং আন্তর্জাতিক বক্ষীর পরিষদ

আন্তর্জাতিক বক্ষীর পরিষদে শিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্মতি আলোচনা হইয়াছে। এই আলোচনার ডাঃ সেরেভ নাথ বাগমন্ত, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ শাহা এবং প্রোফেসার বিনয় সুন্যর সরকার মহোদয় বাহা বাহা বর্ণিয়াছেন, তাহা আংশিক ভাবে দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

মূলকাঠের, মিল্টন, লক্ এবং স্পেন্সার শিকার সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহা ডাঃ সেরেভনাথ বাগমন্ত বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রোডুস্বর্গকে তদ্বিহাছেন। তাহারের মধ্যে কাহার কোন কথা কেন গ্রহণের অথবা বক্ষণীয়, তৎস্বন্ধে কোন আলোচনা ডাঃ বাগমন্তের বক্তৃতায় যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নাই। কায়েই শিকার সম্বন্ধে আমাদের তদ্বিহাধারণের কি কর্তব্য, তৎস্বন্ধে ডাঃ বাগমন্তের যে কোটিয়া আছে, তাহা তাহার বক্তৃতায় প্রকাশিত অংশ হইতে বুঝা যায় না। ডাঃ বাগমন্ত বহুত্ব ভাবে মূলকাঠের, মিল্টন লক্ এবং স্পেন্সারের শিকার-সম্বন্ধীয় কথাগুলি বিশ্লেষণ করি দেখাইয়াছেন, তাহা সুশাস্তিঃ মূল্যের চেয়েনবের প্রাধিকার হইলেও, বর্তমান অবস্থায় প্রাণসংশয় যোগ্য, কারণ ঐ ভাঃ

বিভিন্ন দেশে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আছে এবং তাহা আত্মজ্ঞানকাম
পতিতবিশেষের কথার প্রায়শঃ স্বীকৃতি লাভের কারণ না।

বর্তমান ইংরেজেরা তথা ইংল্যান্ডে যে যে দ্বারা শিক্ষা
প্রচলিত, তাহাতে যদিও সঙ্গীতবিশেষত কোন মূল নীতি
নাই, তথাপি বিভিন্ন দেশের শিক্ষার নীতিতে যে যে সামগ্রিক
সমতা দেখা যায়, তাহাকে তাহার প্রাথমিক বলা হইতে পারে
এবং ক্যান্ট, পোস্তালজি (Postolazzi), ডেকার্টে, ব্রোয়েল
এবং হাগেটস (১৭৭৬-১৮৪১) তাহার পরিবর্তক বলা
হইতে পারে।

ডাঃ হার্ডিং প্রভৃতি আলোচনার অন্তঃসংক্ষেপে ক্যান্ট, ক্যান্ট,
পোস্তালজি এবং ডেকার্টের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ স্থান পাইলে
আমরা আরও জানাশ্রুতঃ কহিতে পারিতাম।

কি ভাৱের শিক্ষা হইলে আমাদের শিক্ষিত যুবক-
গণ বেকার না থাকিয়া জ্ঞানের সংস্থান করিতে পারে, তাহা
আমাদের বিশেষ চিন্তনীয়, তাহাও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু
ঐ চিন্তার ইংরাজ ভাৱের শিক্ষানীতি সৰ্ব্বত্র আলোচনার
স্থান করতঃ, তাহা বিশেষ প্রসিদ্ধানবোধে। কোন বিষয়ে
অগ্রকরণ করা যায় কেবল মাত্র তাহার বিপক্ষে, তাহার ঐ বিষয়ে
স্বাক্ষর লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিক্ষার নীতি কি
হওয়া উচিত, কি ভাৱের শিক্ষা হইলে শুদ্ধাচার-সমস্তার
মনোবান হইতে পারে, তাহাও ইংরাজগণ এখনও পর্যন্ত
কল্পিত হইয়া করিয়া উঠিতে পারেন নাই এবং তাহাদের
প্রচলিত শিক্ষানীতি সাক্ষর লাভ করে নাই। তাহাদের
প্রচলিত শিক্ষানীতি যে সাক্ষর লাভ করে নাই, তাহার
প্রমাণ ইংরাজ ভাৱের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এবং
ইংরাজ ভাৱের পরম্পরাগততা।

ইংরাজদেশের বর্তমান উচ্চশিক্ষার নীতি প্রচলিত হইয়াছে
ঐক্যবিশেষ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ঐক্যবিশেষ শতাব্দীর প্রথম
ভাগেও যে-সংখ্যক ইংরাজ নিজেদের দেশেই উৎপন্ন প্রায়ঃ দ্বারা
শৈবিক শিক্ষার কথিতে পারিতেন, ঐক্যবিশেষ শতাব্দীর
পর ভাগ হইতে এখন আর সেই সংখ্যক ইংরাজ নিজেদের
দেশেই উৎপন্ন প্রায়ঃ দ্বারা শৈবিক শিক্ষার কথিতে পারেন
না। এটী সত্যটা বিভিন্ন ইংরাজ গ্রন্থকারও স্বীকার
করিয়াছেন। ‘কায়েই ইংরাজের বর্তমান শিক্ষানীতি তাহার

নিজের দেশেই সাক্ষর লাভ করে নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা
হইতে পারে।

শিক্ষা (Education) শব্দের প্রকৃত অর্থ-শিক্ষা, তাহা
পঞ্চম ইংরাজগণ এতাবৎ গ্রিক কথিত উঠিতে পারেন নাই।
১৮২৮ সালে প্রকাশিত বাটলারের (N. M. Butler)
“The Meaning of Education”, ১৯১০ সালে
প্রকাশিত স্ট্যানলি লেন্থের (Stanley Leathes) “What
is Education”, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত ওয়েলটনের (J.
Welton) “What do we mean by Education” এবং
১৯১৫ সালে প্রকাশিত মুরের (E. C. Moore) “What
is Education”—এই চারিখানি গ্রন্থ পড়িলে ইংরাজগণ
যে এখনও পর্যন্ত শিক্ষা শব্দের ব্যাখ্যা অর্থ কি, তাহা নির্ধারণ
করিতে পারেন নাই এবং ইংরাজ গ্রন্থকারগণ যে তাহা
স্বীকার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ইংরাজ
ভাৱের মধ্যে অনেক সত্যাত্মকবিশেষ, সব প্রকৃতির সত্যবাদী
লোক আছেন। তাই তাহাদের অক্ষমতার কথা অনুষ্ঠিত
ভাবে কল্পনামতে প্রচারিত হয় এবং তাহাদের ভাৱের
কোনোই বস্তু নগণ্য হইলেও, জগতের মধ্যে তাহাদের ভাৱের
একটা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজ
ব্রতাবতঃ ভাল লোক, তাহাও সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের যে
কোন সৃষ্টিবিশেষ শিক্ষা-নীতি নাই এবং তাহা শিক্ষা বলিয়া
কহিতেছে, তাহা যে সত্যক প্রমাণ তবে নাই এবং তাহাদের
অগ্রকরণযোগ্য নহে, ইহা সর্বত্রই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

অপ্যত আমাদের পণ্ডিতগণ ইংরাজের শিক্ষা-নীতিঃ কথা
নাই। এত মাথা ঘামাইতেছেন এবং সমস্তকণ করিতেছেন
—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? কায়েই আমাদের পতিত-
গণের ইংরাজের জ্ঞানের প্রতি স্মৃতি-বিষয়ে জনসাধারণকে
সতর্ক হইতে হইবে।

ইংরাজের শিক্ষা সৰ্ব্বত্র আলোচনার প্রসঙ্গে ডাঃ মের্সনোথ
দ্বারা বিশদাছেন যে, বিশুদ্ধ শিক্ষা (collare) ও পাঠ্য-
শিক্ষার মনোজ্ঞ (psychology) বিশেষ কোন পার্থক্য
নাই। “শিক্ষার মূলনীতি” (fundamental principle)
বলিয়া একটা শব্দ অর্থব্যাপক হইতে পারে এবং আমরা তাহা
বুঝিতে পারি, কিন্তু “শিক্ষার মনোজ্ঞ” বলিতে কি বুঝি, তাহা
আমরা বুঝিতে পারি না। প্রকৃত সংস্কৃত চাণ্যদ্বারা

‘শিক্ষার মনস্তত্ত্ব’ এই শব্দটিকে “বৃহৎ শব্দ” বলিতে হয়। বাংলা হটক আদরা ডাঃ লাহার ‘শিক্ষার মনস্তত্ত্বকে’ শিক্ষার মূলনীতি, এই-অর্থে গ্রহণ করিব।

তারতম্যের আচরণ, ভট্ট, নিম্ন এবং বামী প্রভৃতি তাত্কারগণ ‘শিক্ষা’ লব্ধে বাংলা বলিয়াছেন, তাহাকে যদি হিন্দুর শিক্ষা বলা যায়, তাহা হইলে পান্ডিত্য ভাষিত শিক্ষার সঙ্গে হিন্দুর শিক্ষার আংশিক সমতাও উপলব্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু বিত্তরতাই সর্বাঙ্গপেক্ষা বেশী পরিপাকিত হয়। পরন্তু হিন্দুর শিক্ষা বলিতে যদি ভারতীয় জীবনধর্মের প্রকাশিত মূল শিক্ষাপদ্ধতি বুঝিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুর শিক্ষা ও পান্ডিত্য শিক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহা বলিতে আমরা বাধ্য। আমরা এই সংখ্যার এই লব্ধকে অধিক আলোচনা করিব না। শুধু ডাঃ লাহারকে অধিকন্তর মতক হইয়া সাধারণের কাছে বাণী প্রচার করিতে অগ্রসর করিব। ভারতবর্ষ বর্তমানে অত্যন্ত বিপর্যয় এবং মতক না হইলে এই বিপর্যয় আরও ঘনীভূত হইবার আশঙ্কা আছে। আমরা বর্তমান জাতি, তাহাতে ডাঃ লাহা জনসাধারণের কাছে অসামান্য পরিমাণে ভ্রষ্টা পাইয়া থাকেন। তাহার কথা অনেক প্রমাণযোগ্য বলিয়া মনে করে। তিনি চিন্তা না করিয়া ‘আত্মপরিচয়’ দ্বাৰা কখনো ‘বলিলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইতে পারে এবং তাহাতে আমাদের প্রত্যেকের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। তিনি কি আমাদের এই অগ্রসর বন্ধা করিবেন না?

শিক্ষার কথা প্রসঙ্গে প্রোফেসর বিনকস্টনার লরকার বলিয়াছেন যে, বিংশ শতাব্দীতে জগৎ সর্বত্র স্পেন্সারের আদর্শবাহাদারগণের চলিতেছে। এই কথার সার্থকতা কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। “যে শিক্ষার দ্বারা জীবিকা অর্জন করা সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা বাংলাতে প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে”—এই জাতীয় কথা স্পেন্সার বলিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষা জগতে প্রচলিত হইয়াছে কি? বর্তমান জগতে এমন কোন দেশ আছে, যে-দেশে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা পাইয়া মানুষ সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিকলব্ধ্য লোকের জীবিকাকর্মের সাহায্য করিতে পারিয়াছেন? পরন্তু ইহা কি সত্য নহে? যে-সমস্ত মানুষ সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিকলব্ধ্য লোকের বিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহারা প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন

নাই? ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কি বলিতে হয় না যে, স্পেন্সারের শিক্ষানীতি জগতে প্রচলিত হয় নাই?

চিন্তা করিয়া আমরা বর্তমান বুঝিতে পারি, তাহাতে কোন পান্ডিত্য প্রকাশের স্পেন্সারের শিক্ষানীতিকে কার্যতঃ জনসাধারণ স্থান দেন নাই, কারণ স্পেন্সার আংশিকভাবে একটা শিক্ষানীতির কথা মাত্র বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ঐ নীতি কিভাবে কার্যতঃ প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে কোন কথা বলেন নাই। ইংলণ্ডের কোন কোন শিক্ষানৈতিকতার আধুনিক কমিটিতে যে যে মতবাদ আলোচিত হইয়াছে, সেগুলিকে আংশিকভাবে স্পেন্সারের মতবাদ বলা যায় বটে, কিন্তু তাহাও কেবলমাত্র স্পেন্সারের মতবাদ নহে।

শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি লব্ধে যে সমস্ত পান্ডিত্য প্রমাণ উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমাদের ধারণা, তাহাদের নাম—

1. Essays on Educational Reformers by R. H. Quick, 1868.
2. Teaching & Organisation, by P. A. Barnett, 1897.
3. Common Senses in Education by P. A. Barnett, 1899.
4. Education : Intellectual, Moral and Physical by Herbert Spencer, (reprint.) 1903.
5. The Educative Process by W. C. Bagley, 1905.
6. A Text Book in the History of Education by P. Monroe, 1905.
7. Sonnenschein's Cyclopædia of Education, (Edited by A. E. Fletcher.) 1906.
8. The School & Society by J. Dewey, 1910.
9. Cylopædia of Education by P. Monroe 1911-1913.
10. Educational Problems G. S. Hall, 1911.
11. A Text Book in the Principles of Education, by E. N. Henderson, 1911.
12. Principles of Education, by F. E. Bolton, 1911.

17. The Evolution of Educational Theory by John Adams, 1912.
18. What is Education by S. M. Leathes, 1913.
19. From Locke to Montessori, by William Boyd, 1914.
20. Principles of Secondary Education, by P. Monroe, 1914.
21. What do we mean by Education by J. Welton, 1915.
22. Schools of To-morrow by J. Dewey, 1915.
23. What is Education by E. C. Moore, 1915.
24. The New Teaching by John Adams, 1918.
25. Experimental Education by R. R. Rusk, 1919.
26. The Measurement of Intelligence by L. M. Terman, 1919.
27. Short History of Education by J. W. Adams, 1919.
28. Education : its Data and First Principles by T. P. Nunn, 1920.

এই সমস্ত গ্রন্থই খুব সম্ভব আমাদের কপায় পৌঁছকরা করিতে।

শেন্সনের “আদর্শবাদ” কি বস্তু, তাহা কাণে পরিপূর্য করিবার জন্য শেন্সনকে কি কি প্ররোগদোষা পক্ষা অবলম্বন করিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহার উপদেশগুলি কোথায় কোথায় কার্যতে পূর্ণীত হইয়াছে, প্রকোশের সরকার তাহা অনুসন্ধানপক্ষে দেখাইয়া দিয়া তাহার বক্তব্য প্রতিপন্ন করিবেন কি ?

প্রকোশের সরকারকেও জিজ্ঞাসা করি যে, যৈশের আগর বিপদের সময় বাহাতে অনুসন্ধানের বিপদগ্রামী না হইতে পারে, তদনুসরণ চিত্রা অবলম্বন করিয়া অন্ততঃ তাহার মত লোকের কথা বালা মুক্তিযুদ্ধ নহে কি ?

প্রকোশের সরকার উপলংঘ্যে বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হয় যে, বড় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িয়া গাইতেছে, ততই বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। কখনো তাহার মতদ্রুপাবে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাহাতে বাড়িয়া না যায়,

তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পণ্ডিতের কথা বটে! ইহার উত্তর আমরা বলি যে, বনিসরকারী ও বনিসরকারী চাকুরীগুলি না থাকিত, তাহা হইলে বর্তমান সময়ে শিক্ষার নামে বাহা চলিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৃদ্ধিগুলিকে যে শিক্ষার শিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, তাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাহ প্রত্যেক তথাকথিত শিক্ষিত পণ্ডিতকে বেকার থাকিতে হইত এবং অস্বাভাবিক ধরণ উপলংঘ্য করিতে হইত। কবেই আমাদের মতদ্রুপাবে বলিতে হইবে যে, বর্তমান সময়ে প্রকৃত শিক্ষা বিদ্যুৎ হইয়াছে এবং তাহার জন্যই কখনো প্রদর্শনের উৎস হইয়াছে। তাহার প্রতিপন্ন শিক্ষার সত্যতা-সাধন নহে, পরন্তু বাহাতে প্রকৃত শিক্ষা কি তাহার অনুসন্ধান হয় এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রসার সাধিত হয়, তাহা কখনো বর্তমান প্রদর্শন হইতে হইয়া পাইবার প্রথম উপায়।

গুড়ের সার ও অধ্যাপক নীলরতন ধর

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলরতন ধর কলিকাতা সায়েন্স কলেজে গুড়ের সার সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। অধ্যাপক ধরের মতে শুদ্ধ সার রূপে বাহ্যত হইলে শরৎ শিল্পের পরমোন্নতি হইবে এবং ভারতবর্ষের জমীর উর্বরতাশক্তি বাড়িয়া যাইবে।

বড় বড় পণ্ডিতের বড় বড় কথা আমাদের মাথারপ লোকের বুঝিয়া উঠা যে শক্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের মনে হয় যে, বাহা করিলে জমীর আভ্যন্তরীণ রস ও তেল সংরক্ষিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া জমীর উপরিভাগে সার দিয়া তাহার উপলংঘ্য-শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা আর মানুষের পেট কাটিয়া ফেলিয়া তাহার মাথার দিগ্ভর তেল মাখাইয়া তাহা হইতে ভাল ভাল জিন-বিজ্ঞানের কথা প্রদব করাইবার চেষ্টা করা একই কথা। এই কথাটি সমস্ত বহির্গাই বোধ হয় আমাদের অসামান্য পণ্ডিতগণ তাহা বুঝিতে পারেন না।

জমীর উপরে, উপরে সার ব্যবহার করিয়া তাহার উৎ-পাদিকা শক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিলে শরৎ পোষাইতে পারে কি না, তাহা অধ্যাপক ধর চিত্রা করিয়া দেখিয়াছেন কি ?

শিক্ষা ও জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে

অধ্যক্ষ ডি. এন. সেন

মিঃ ডি. এন. সেন বাঁকাপুর বি.এন্স কলেজের চূড়ান্ত অধ্যক্ষ। “শিক্ষা কেন বিফল হয়,” তৎসম্বন্ধে তিনি লম্ভিত পাটনার ব্রাহ্মসমিতির একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তাহাও তিনি ঐ বক্তৃতাগণকে বলিয়াও চেষ্টা করিয়াছেন।

আজকাল অনেক বক্তৃতারই বক্তব্য বিধর পূর্ব ভাল হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়শঃ বক্তা তাঁহার বক্তব্য পরিষ্কৃত করিতে পারেন না, অথবা কখন না। আমাদের শিক্ষা কেন বিফল হয়, তাহা জানিবার জন্য উৎসাহক সকলেরই উপস্থিত হয়। একজন প্রায়শঃ অধ্যক্ষ তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন— বৈদিক কালকে তাহা দেখিবার আশ্রয় গ্রহণের সহিত মিঃ ডি. এন. সেনের বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি। ঐ বক্তৃতার কত বৈশেষ্য কথা, বৈদ্যের কথা, বৌদ্ধ ধর্মের কথা, কিছু-কিছু কৃতিশক্তির কথা পর্যন্ত পাওয়া যায়, এমন কি আমাদের বর্তমান জীবন যে অত্যন্ত পোষামণ্ডে পরিপূর্ণ তাহাও বুঝা যায়, কিন্তু বক্তৃতার দ্বারা প্রতিপত্ত “শিক্ষা কেন বিফল হয়,” তাহা একেবারেই বুঝা যায় না।

মিঃ সেন বলিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ে আমরা শিক্ষার আদর্শ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া থাকি, গ্রিক ও রোমান গোলমাল হইয়া থাকে আমাদের জীবনের আদর্শ বৃত্তিতে। অর্থাৎ জীবনের আদর্শ কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে তিনি প্রাচ্যপ্রাচ্য কোনো কথা বলেন নাই। তাঁহার মতে, ‘বৈদিক কালে ভারতীয়গণ সম্ভ্রান্ত-সম্ভ্রান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন, যবের জন্য প্রার্থনা করিতেন, শত্রু-বিক্রমের জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং পরকালের সুখের জন্য প্রার্থনা করিতেন। পরবর্তীকালে ভারতীয়গণের জীবনের ও শিক্ষার একটি নতুন আদর্শবাহ গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তৎকালিক ছাত্রগণ বেদের মত অধ্যয়ন করিয়া এবং তৎসংক্রান্ত অজ্ঞাত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ সমস্ত অধ্যয়নে মনোনিবেশ হওয়া যায় বটে, কিন্তু আত্মনিবেশ হওয়া যায় না। কাহেই এখন শুদ্ধগণ ছাত্রগণকে তপস্বীর আশ্রয়ের নিয়মগ্রন্থতা অধ্যয়ন করাইতেন এবং পরিণতের আদর্শ-তব বিধাইতেন।’

শিক্ষা ও জীবনের আদর্শবাহের সহিত মিঃ সেনের ঐ সমস্ত কথা মংগল্য (relevancy) কি, তাহা দৃষ্টিগোচর। আমাদের কি বৃত্তিতে হইবে যে, মিঃ সেনের মতে সম্ভ্রান্তি হইতে পারিলেই শিক্ষার ও জীবনের আদর্শবাহ বৃত্তিতে পাবা যায় এবং জীবন পোষণ ভাবে অভিযান্ত্রিক করা যায় ?

সম্ভ্রান্তি হইতে পারিলেই যদি জীবনের বিপুলতা বৃত্ত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে সম্ভ্রান্তিগণ নিশ্চয়ই নীরোগ এবং দীর্ঘ জীবন উপভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে অসংখ্য সম্ভ্রান্তিগণ মরণ করতেন সম্ভ্রান্তিগণ নীরোগ ও দীর্ঘজীবন দেখা যায় ? বাস্তব জীবনে বাধা দেখা যায়, তাহাতে বৃত্তিতে হয় যে, বাস্তব সংসারক্ষেত্রে বর্তমানে চঃ-কঃের মধ্যে হাবু-ডাবু খাইয়া থাকেন, তাহাও যেমন সর্বদা একটা না একটা শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিতে করিতে অকালে মৃত্যুবৃত্তে পতিত হন, সম্ভ্রান্তিগণের মধ্যেও অধিকাংশেরই মৃত্যুবৃত্ত শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিতে এবং অকালে মৃত্যুবৃত্তে পতিত হইতে হয়। কতিপয় সম্ভ্রান্তিগণও বেদগণ নীরোগ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকেন, কতিপয় সম্ভ্রান্তিগণও তাহা লাভ হইয়া থাকে। কাহেই সম্ভ্রান্তি ও সম্ভ্রান্তিগণ জীবনে বাস্তব কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

মিঃ সেন কখনো অথবা এখানে যে সমস্ত কথা আছে বলিয়া তাঁহার বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা তিনি কোথায় পাইয়াছেন, আত্মনিবেশ গণিয়া দিবেন কি ? তিনি খুব সম্ভব প্রকৃত মংগল্য তাহা জানেন না এবং বেদের মূল তাঁহার পড়া নাই। তাহাকে মনে রাখিতে হইবে, চারিটি বেদ পরস্পর সম্মিলিত এবং মন্ত্রভাগ, শ্রোতৃভাগ ভাগ, অধ্বন্য ভাগ, আত্ম ভাগ ও উপনিষদ ভাগ গঠিত। প্রত্যেক বেদের সম্পূর্ণতা। কোন একটি বেদের কি বক্তব্য, তাহা ব্যাখ্যার ভাবে বৃত্তিতে হইবে, চারিটি বেদের সমগ্র মত, শ্রোতৃ, অধ্বন্য, আত্ম ও উপনিষদ ভাগ বৃত্তিতে হয়। তিনি সমগ্র বেদ ঐক্য ভাবে পড়িয়া বৃত্তিগার চেষ্টা করিয়াছেন কি ? আমাদের বিশ্বাস, তিনি ভারতীয় কবির শাস্ত্রে বিদ্বান্ধও প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। যদি ভারতীয় কবির প্রকৃত শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিয়া সৌভাগ্য তাঁহার হইত, তাহা হইলে বৈদিক কালে ভারতীয়গণ শত্রু-বিক্রমের জন্য প্রার্থনা করিতেন, অথবা পরকালের সুখের জন্য প্রার্থনা

প্ৰৱেশ ও সৰ্বসন্ধান পণ্ডিতগণের (?) কথা অনিলে বশিষ্ঠে ইচ্ছা হয় যে, "কে নাহিঃ বহুশব্দে, বিধা ওত, আমি তোমার চিত্তের প্রবেশ করিব"—

না, আমি আশ্চর্য্যে চট্টিয়া যাউতেছি। আশ্চর্য্যে চট্টলে চলিলে না। অন্যভাবে, অর্থাৎভাবে, সমস্ত মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে টলটলারমান হইয়াছে। পণ্ডিতবিশেষের (?) কোন সোব নাট। আমরা তাঁহাদের উপর যেরূপ শোষণ করিতে পারি না। কালের প্রভাবে অশৌক্যের বেতের অবস্থা যুগে যুগে এইরূপ হইয়াছে। তাহার জন্য কোন পণ্ডিতের (?) দায়িত্ব নাট। আশ্চর্য্যে মত সাধারণ লোকের যুগে যে, পণ্ডিতগণ নিজেবা যে কিছুই বুঝেন নাট, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা বুঝেন না। তাঁহারা বুঝেন না যে, অস্তিত্বশুদ্ধিবৎ কণিগণের কথা লইয়া খেলা করিলে তাহার মধ্যে পতনবৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হয়। তাঁহারা বুঝেন না যে, ঐ আশ্চর্য্য লইয়া খেলা করিবার সঙ্গে বর্তমান জগৎ তাহার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। বর্তমান জগতের দুর্দশা যুগ করিতে হইলে, প্রথমতঃ কণিগণের এই কথাগুলিকে লইয়া খেলা করা বাহ্যতে বন্ধ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা বাহ্য বলিদান, তাঁহা মিঃ সেন বুদ্ধিতে পারিবেন কি ?

মিঃ সেন তাঁহার বক্তৃতার শেষাংশে বাহ্য বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুদ্ধিতে হয় যে, ইয়োয়োগের ছোট ছোট প্রবেশে শিক্ষার যে সম্পূর্ণতা আছে, তারতম্যে তাহা নাট। আশ্চর্য্যের ক্ষেত্রে এই কথা সত্য নহে। তারতম্যের বর্তমান শিক্ষা বৈষ্ণব অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল হইয়া থাকে, ইয়োয়োগের শিক্ষাও ঠিক সমান ভাবে অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল হয়। ইয়োয়োগীজগতের শিক্ষা অসম্পূর্ণ এবং নিষ্ফল না হইলে তাঁহাদের সেন বেকার-সমতা, বাহিষ্ঠা-সমতা, ধনের অসমতা বিতরণ-সমতা এত প্রকট হইত না। ইয়োয়োগের এক আমেরিকার সমষ্টি যে তারতম্যের সমতা হইতেও অসম্পূর্ণতা, তাহা টলটল, হেনরি জর্জ, লেনিন, কার্ল মার্কস, এবং তার অম্বা ভোল্‌সেব প্রমুখদের ও সের টলটলারের বক্তৃতা অম্বাধন করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। ইয়োয়োগীজগতের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল, ইহা বলা এত সহজেই বুঝা যায়, তখন তারতম্যের ঐ শিক্ষার

অনুগ্রহণ করা অম্বা তাহার পরামর্শ বেওয়া মুক্তিসম্বন্ধ কি ?

ইহা ছাড়া পুণ্ডিতসংক্রান্ত বিজ্ঞানের (intellectual conquest) কথাও যথন বাধিতে হইবে।

অনন্ত যদি দেখা বাইত যে, পাশ্চাত্যগণ তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বাহ্য তাঁহাদের সর্বসাধারণের জন্য পুণ্ডিত করিতে লক্ষ্য চট্টাচ্ছেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অম্বা শিক্ষার উৎকর্ষ বোঝার করিতে কোন অংশিত্ব হইতে পারিত না। কিন্তু যখন পরিহার দেখা বাইতেছে যে, তাঁহাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান বাহ্য তাঁহাদের নিজেদের প্রবর্তী বৃত্ত হইতেছে না, তখন মুক্তিসম্বন্ধ ভাবে ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ কিছুতেই বোঝার করা যায় না। আমাদের যুগকগণ অম্বা ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুগ্রহণ হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে উন্নতি অনুগ্রহণ হন, তাহাও জন্য বাহ্য মিঃ সেনের মত শিক্ষা-বিজ্ঞানের অধ্যয়নকগণ। অম্বা ভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অম্বা শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইলে পাশ্চাত্যগণকে গুরু করে বরণ করা হয়। গুরু ভিত্তিই শ্রুত এবং শিষ্ট তাহার দান। প্রকৃত শিক্ষার, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যগণ প্রকৃত ভাবে "গুরু" হইলে তাঁহাদের "শিষ্ট" হইতে তাহারও অংশিত্ব থাকিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাট বলিয়াই, যে যে জাতি তাঁহাধিককে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাহাদের অনুগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। কাজেই তাঁহারা শ্রুত, অম্বা তাঁহাদের দান, এই ভাবে বহু শ্রুত বিদ্বৎ হইয়া প্রকৃত শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুগ্রহদান কোথায় পূর্ণতা বাইবে, তাহার জন্য প্রবর্ত অংশিত্ব হয়, ততই যথল।

শিক্ষা সম্বন্ধে বর্তমান আন্দোলন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার জীবদ্রু জামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কিছুদিন হইতে ভারতের সমস্ত প্রখ্যাতনামা লোক বৈষ্ণব ভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে আগোচনা অংশিত্ব করিয়াছেন, তাহা অম্বাধন করিলে তারতম্যের শিক্ষা সংগ্রহ করিবার জন্য যে একটা চেষ্টা হইতেছে এবং সেই চেষ্টার উদ্দেশ্য যে শিক্ষিত যুগকগণের বেকার-সমতার সমাধান, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান

৪৮। এই শিক্ষা-সংস্কারকাণ্ডে ভারতীয় বিন্যাস ব্যক্তিগত ইংরেজ কৰ্মচারিগণ সমান করে বসেই হইয়াছেন। বিশেষজ্ঞাণ দ্বারা বলিতেছেন, তাহা। বিশেষণ করিয়া পড়িলে লেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষাবিভাগের ইংরেজ কৰ্মচারিগণ কিছু নূতন নূতন কথা কহিতেছেন বটে, কিন্তু সেইসব বিন্যাস পুরুষগণ দ্বারা বলিতেছেন, তাহা বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন সীকাউন্নীতে ইংরেজ কৰ্মচারিগণের কথাগণ প্রতিফলিত আছে। কাহেই আশা করা যায় যে, যদি আমাদের শিক্ষার কোন সংস্কার হয়, তাহাশ নূতন থাকিবে ইংরেজ কৰ্মচারিগণের কথা এবং কর্মনা। যে শিক্ষার দ্বারা দেশের দক্ষিণাঙ্গী অগ্রভাগ, পশ্চিমাংশে কিছু, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গ হইতে পারে, তাহা ইংরেজ কৰ্মচারিগণের পক্ষে কর্মনা করা সম্ভব নহে, কারণ তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের যেখানেই ই ভারতীয় শিক্ষার প্রাথমিক করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

কোন শিক্ষার জনসাধারণের বেকার-সমস্যা, অগ্রভাগ, পশ্চিমাংশে কিছু, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গ হইতে পারে, তাহা যদি ইংরেজিগণের কান থাকিত, তাহা হইলে ইংরেজ জনসাধারণের মধ্যে এই সমস্যা সমস্যা থাকিত পড়িত না। কিন্তু বস্তুতঃ ইংরেজের এই সমস্যা সমস্যা ভারত-বর্ষের বহিঃসমস্যা সমস্যা অপেক্ষাও গুরুতর।

কাহেই ইংরেজ কৰ্মচারিগণের কর্মনা হইতে যে নূতন শিক্ষাবিধি উৎপন্ন হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষে শিক্ষা সংস্কার একটা নূতন পরীক্ষার (experiment) বসি হইবে বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি সাধিত হইবে না এবং প্রকৃত সমস্যার সমাধান হইবে না।

এখানে শিক্ষা-বিভাগের ও পাশ্চাত্য-বিভাগের ইংরেজ কৰ্মচারিগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষেরও ইংরেজের সমস্যা বেকার জটিল ও গুরুতর, তাহাতে এখন আর কোন পরীক্ষার সময় নাই। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এখন বঙ্গ দেশে ছিল এবং ভারতবঙ্গীয় পতকতা ৮৫ জন বঙ্গ কৃষিকারী হইবে দুইশে মিলিত জীবন একতরুণ ভাবে অভিব্যক্তি করিতে পারিত, তখন যে দ্বারা করিয়াছে, তাহাই একতরুণ ভাবে চলিয়া গিয়াছে। নিবন্ধ ও বাস্তবিক-এর শৈলশিখরে জানকী নৃত্য করিতে করিতে অথবা পান-ভোজনের আয়োজ

উপকরণ করিতে করিতে তখন রাজকাণ্ডে পর্যালোচনা করা সম্ভব হইত। তখনকার রাজকৰ্মচারিগণের দৃষ্টান্ত দ্বারা পাকিলে হয় ও ইংরেজের ও ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থার এত জটিলতা বর্তমানে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ এখন বঙ্গ দেশেই হইয়া গিয়াছে, প্রতিবিদ্যা ভবিষ্যৎ উৎপন্ন পথের পরিমাণ বেগুন কর্মনা করিয়া গিয়াছে, কৃষকবিশেষ পক্ষে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করা বেকার জটিলতা হইয়া গিয়াছে, পতকতা ৮৫ জন বঙ্গ কৃষিকারী অল্প বৃত্তি আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইবার অস্থায়ী প্রত্যেক বৃত্তি বেকার অভিব্যক্তি জনসাধারণ (overcrowded) হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অভিব্যক্তি বেকার শিক্ষার প্রাথমিক না হইলে ভবিষ্যৎ রাজকৰ্মচারিগণের পক্ষে অগ্রগতিচালনা করা আরও জটিলতা হইবে, ইহা আশঙ্কা করিবার কারণ আছে।

শিক্ষা কিন্তু হইলে ইংরেজের ও ভারতবর্ষের সমস্যাসমস্যা প্রকৃত সমাধান হইতে পারে, তাহা ভারতীয় বৃত্তিমান পুরুষগণ তাঁহাদের বর্তমান সংস্কারভবিষ্যৎ পরিচালনা করিয়া কার্যনা-বাক্যে চেষ্টা করিলে তখন অল্পকাল কথিয়া বাহির করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তাঁহারা করিতেছেন না। বাহ্যিকের প্রাণ প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ জনসাধারণের ভবিষ্যৎভবিষ্যৎ কাহিনী উদ্ভিষ্টাছে, তাঁহারা পতকমন্ডলের ইংরেজ কৰ্মচারিগণকে ভিয়েনা চক্রেতে দেখিয়া থাকেন। আর বাহ্যিক তাঁহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন, তাঁহারা ইংরেজের সামাজিক নীতি-নীতি শিক্ষা করিবার জন্য যে সমস্তই অভিব্যক্তি করেন, অথবা নথিভুক্ত যে অসম্পূর্ণ বাহ্যিকী করিয়া থাকেন, তাহাও অর্ধেক সময় মধ্যম নথিভুক্ত অর্ধেক আশ্রয় দেশের জন-সাধারণের দ্বারা কি করিয়া দৃষ্টিভঙ্গ হইতে পারে, তাহাও চিন্তায় বাধ্য করেন না। এই অথবা দেশের জনসাধারণের চরিত্রগোষ্ঠী পৃষ্ঠিচারক বলিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতীয় এই মনোবিপ্লবী আবার বঙ্গ প্রজাভিমান হইবে, তখন এই রাজকৰ্মচারিগণের দ্বারা করিবেন এবং তাঁহারা শিক্ষিত যে তাঁহাদের সামাজিকভাবে কার্য করিতেছেন না, তাহা বিপ্লব হইবে।

কায়েই বলিতে হইবে যে, দেশপনীর অথবা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ও ইংলণ্ডের বর্তমান সমস্তা সমাধানকরে ১২ম্বর হইবার সময় আসিয়াছে।

আমাদের মতে বাঙ্গালীর দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর স্তম্ভ কি, পৃথিবীর কোন্ হানের দহিত পুথের কি দহিত, পুথি হইতে বিভিন্ন হানের ব্রহ্মের বিভিন্নতাহুগুয় ঐ ঐ হানের চর ও অ-চর ভাবে বৃত্তিত করণ তাহারা হত, তাহা এখন বাহ্য বর্ণাধিকারে জানিতে পারিলে, এখন মানব-জীবনের সমস্ত-সমাধান যে বাঙ্গালীর দাবির পূর্ণ ওকতর, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। বাঙ্গালীকে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্তমানে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-ভাগিত যে শিক্ষা প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা পুঁতি হইয়াছিল বাঙ্গালীর দ্বারা। তাহাতে যদি কোন ফল কলিমা থাকে, তাহা বাঙ্গালীর কতিব এবং যদি কোন ফল কলিমা থাকে, তাহাও বাঙ্গালীর দাবির প্রসূত। এখন এখন দেখা যাই-তেছে যে, ঐ শিক্ষার সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, এখন বাঙ্গালীকেই তাহার কত খাশাখা চোঁতা করিতে হইবে। বাঙ্গালী যদি তাহার কর্তব্য নির্ধারণ না করেন, তাহা হইলে একদিন আসিতে পারে, যখন ভারতীয় অস্ত্র ভাতি বৃত্তিমূলক ভাবে তাহাদের মুখে কলক-কলিমা লেপন করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালীর শিক্ষিত লোকের অবস্থা ক্রমশঃ অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভাইল-চ্যাপেলারের কার্যাবলী হ্রাস হইলে পর্যায়েষণ করিলে বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্ভাব্যের অবস্থা যে কি ভয়াবহ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

আনন্দবাজার প্রকৃতি করেকটী মৈনিক পত্রিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার ভাইল-চ্যাপেলারের কার্যাবলী সৎকে যে সৎক মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে মনে হয়, যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ও অধ্যাপকগণ তাহাদের কর্তব্য বর্ণাধিক নির্ধারণ করিতেছেন। অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের প্রিন্সিপাল দাতা কি, তাহারা যেনে শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা সৎকে কিছু চিন্তা করিতেছেন কি না, তাহা, তাহাদের বক্তৃতা যে সমস্ত কথা

প্রকাশ পাত, তাহা হইতে নির্ভারণ করিতে হইলে অস্ত্ররূপ প্রতিভাত হয়।

সৎক অস্ত্রক বিনেত্র মধ্যে এলাহাবাদে ও পাটনার মিঃ সন্ত, আলিপুরে স্তম্ভ নিরীকণের বাহুপাতী, পিলাই গেডি কৌন, আশ্রয় মহাত্মক আনন্দবাজার, কলকাতা মিঃ পরাশ্রয় এবং নগপুরে মিঃ জয়কর শিক্ষা সৎকে বিভিন্ন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইল-চ্যাপেলারের ক্রমাগতীয় বাবু ও. কৃষ্ণ চার্ক কলেজে ঐ সৎকে বক্তৃতা দান করিয়াছেন। মিঃ সন্ত প্রকৃতি যে যে বক্তৃতা নিয়াছেন, তাহা যে সৎকভাবে বর্ণাধিক অবস্থা হ্রাস হইয়াছে, তাহা কলা বাহু না হইত, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের বক্তৃতার বক্তব্য পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং চিন্তার বাহু আছে। ঐ বক্তৃতাগুলির দহিত তুলনা করিয়া ক্রমাগতীয় বাবু বক্তৃতা পড়িয়া হতান হইতে হয়। তাহার বক্তৃতার তাহার বক্তব্য পরিষ্কৃত হয় নাই এবং তাহাতে কোন চিন্তার বাহু ও পুঁতিয়া পাওয়া যায় না। প্রত্যেকের কলেসর অত্যন্ত বাকিমা যাইবে বলিয়া এই সংস্কার ঐ বক্তৃতাগুলি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের মন্তব্য যে বর্ণাধিক, তাহা কেবলিহার বর্ণাধিক হইল না। প্রত্যেকন হইলে আমরা তাহা ভবিষ্যতে দেখাইব।

আমাদের মনে হয়, আনন্দবাজার পত্রিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছা নায়েই পুঁতিয়াবক্তা করিয়া দাবির-জানদীনতার পরিচয় বিদ্যা থাকেন এবং ক্রমাগতীয় বাবু ও সংস্কার-পত্রের বাহুপ্রাপ্তির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা বাঙ্গালীর শিক্ষা সৎকে তাহার দাবির কি এবং কি কর্তৃক ঐ দাবির নির্ধারণ হইতে পারে, তাহার চিন্তার বর্ণাধিক ভাবে ব্যাপৃত থাকেন না। অতকাল খাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে হল গঠন করিবার ক্ষমতা ও কি করিয়া প্রচারশালী সংবাদপত্রগুলির হুমত্বা অর্জন করিতে হয় তাহার নিপুণতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্ণাধিক ভাবে স্তম্ভ দাবির নির্ধারণ করিতে পারিলে, সংবাদপত্রের মন্তব্যের কত আগ্রহাধিত হইতে হয় না। ধামতা বর্ণাধিক ভাবে কাছা নির্ধারণ না করিয়া, কেবল মাত্র সংবাদপত্রের মন্তব্য ও বাহুবার আশা করিয়া থাকেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইল-চ্যাপেলারকে আমরা তাহাদের সৎক মৈনিক দাবিত হইব।

হলীদ শ্রম আভ্যন্তরে কাছাকাছি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা যায় কি না, তাহা আমাদের এই প্রবন্ধের বস্তু নহে ; কিন্তু শ্রম আভ্যন্তরে সমর্থন নৈমিত্তিক কারণেই অবশ্যভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যায় নাই। জনসাধারণ যোগ্যে বিভ্রান্ত হইতে পারেন, তাহা আমাদের বাবু ও আনন্দের পত্রিকা দ্বারাও না করেন, তজ্জ্বল আমরা তাড়াতাড়ি অগ্রসর করি।

আমরা আমাদের বাবুর বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম বলিয়া তিনি স্বতঃ সত্যিই যে, আমরা তাঁহার উপর কোন বিবেচনা পোষণ করি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার উপর আমাদের কোন বিবেচনা নাই। তাঁহার কোন বক্তৃতা অথবা প্রবন্ধের কাহারও তুলনায় নিম্নমান হইলে, সমস্ত বাস্তবী জাতির মধ্যে কলঙ্ক-কালিমা নিপতিত হইত বলিয়াই কথাতুলি বর্ণিত যথা হইল। তাঁহার যে পত্রপ্রসংগ-পত্র ও বীরা আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি, তাহাতে অপেক্ষাকৃত একটু অস্বাভাবিক ও চিত্তাশ্রিত হইলেই তিনি তাঁহার দায়িত্ব সুকলমে নির্মাল্য করিতে পারিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

হিন্দুধর্মের শুদ্ধি ও ডাকার সুনীতি- কুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের মধ্যে যাহারা ছেলেবেলায় খুলে ইতিহাস পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই অস্বস্তি ভেঁড়ার সঙ্গে হিন্দু ধর্মের পার্থক্য কি কি তাহা জানিয়াছেন। হিন্দু ধর্মের শুদ্ধি নাই, অর্থাৎ অল্প কোন ধর্মের লোক হিন্দু হইতে পারে না, কিন্তু অস্বস্তি প্রত্যেক ধর্মের শুদ্ধি আছে, ইহা বোধ হইত লক্ষ্যেই শুনিয়াছেন।

আমল কপালী এই যে, তপস্বে একদিন ছিল, এখন সারা-জন্য বৈদিক আচার গ্রহণ করিয়াছেন। তখন নর্থ বর্ণিত যুগা হাইট মানব-ধর্ম—এবং তপস্বে-একাদিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তখন মাহুয়ের বিশ্বাস ছিল যে, জীবন সুখের কঠিন হইলে বিবেচনামূলক হইতে হইবে। সমাজে একজন ছোট, একজন বড়, এই ধারণা বিস্তারিত থাকিলে মাহুয়ের মধ্যে বিবেচনা অপরিহার্য হয়। অল্প পক্ষে সমাজের প্রয়োজনীয় নীতি কঠিন হইলে, তাহাও সমাজের পক্ষে চিত্তকর, তিনি মাহুয়ের

কাজ করেন, তিনিই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আর তিনি শিক্ষকতার অথবা বিদ্যান-বিভাগের কাজ করেন, তিনিও সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়,—এই ধারণা থাকিলে সমাজে বিবেচনা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না এবং সমাজ সুখের আগাশ হইতে পারে। বেনারসি গ্রাম অতিনিবেশনস্বাক্ষরে বর্ণনায় তাহা পড়িতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সমাজ যাহাতে বিবেচনামূলক হয়, তজ্জ্বল তাহারই অর্থ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

একাদিক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত না থাকিলে এক ধর্ম হইতে অন্যতর গ্রহণ করিবার কোন কথা আসিতে পারে না। কার্যেই বৈদিক আচারের প্রত্যেককালে বর্ণান্তর গ্রহণ করিবার কোন প্রথা বিস্তারিত ছিল না।

কালক্রমে বৈদিক আচারের প্রভাব নষ্ট হইয়া বর্ধমান বর্ণান্তরমূলক হিন্দুধর্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং সমাজে মাহুয়ের বিভিন্ন বিবেচনা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল—এবং তাহারই ফলে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ, শ্রীমান এবং মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের ও সমাজের উত্তর হইয়াছে।

বর্ধমান বর্ণান্তরমূলক হিন্দুধর্ম মূলতঃ বৈদিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার হইলেও হিন্দুধর্ম তাহারই আচারে ও কাব্য-কর্মে প্রাচীন বৈদিকতা রক্ষা করিয়াছেন এবং বর্ণান্তর গ্রহণ করিবার প্রথা নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

বর্ধমানে মতান্তর-সমাজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বর্ণান্তর গ্রহণ করিবার প্রথা সমস্ত অথবা অল্পত তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়-কালে এবং বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ের প্রাচীন যুগে, বর্ণান্তর গ্রহণ করিবার কোন প্রথা তপস্বে ছিল না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তখন যে বিভিন্ন বর্ণের লোক বিভিন্নভাবে বৈদিক আচার-মূলক অথবা হিন্দুধর্মের বলিয়া মনে করিতেন, তাহা প্রাচীন গ্রন্থগুলি একটু অতিনিবেশনস্বাক্ষরে আমরা কল্পনায় প্রতিপন্ন করি। বৌদ্ধ, শ্রীমান এবং মুসলমান ধর্মের অভ্যুদয়ের পরবর্তী কালে, তপস্বে বিভিন্ন স্থানে যাহারা ঐ ঐ ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তাহারা প্রকৃত অর্থে বিস্তৃত বৈদিক আচার রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমাদের এই কথাগুলি বৃত্তিতে পুনঃ পুনঃ পাঠকর্মের বিশেষ সন্মানসূচক বৃত্তিতে প্রবেশ না এবং ইহা হইতে হিন্দু

যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার প্রথা ছিল না এবং কোন তাহা ছিল না, ইহা বুঝা যাইবে।

অন্য ভাঃ হুদীতিক্রমার হিন্দুনিবনের পরিচয় এক প্রকারে প্রমাণ করিতেছেন যে, হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার প্রথা বিস্তারিত ছিল। তাহাতে কুলের বালকের মত চিত্রাচীন অধ্যয়নের এবং ইতিহাসকে বিস্তৃত করিবার পরিচয় আছে। এই কল্পই অমরা বলি যে বাগালী জনসাধারণের মধ্যে সকলেই কুলের বালক নহে এবং ভাঃ হুদীতিক্রমার বৃত্তপারেন, তাহার বিবিসিদ্ধান্তের রূপে আরও কিছুদিন তাহার বিস্তারিত করুন, তাহাতে আশঙ্কের আশঙ্কি নাই। কিন্তু সাধারণের বিভ্রান্তিকর এবং ইতিহাসের বিস্তৃতকর কোন কথা লোকমুখে তাহার না বলাই সম্ভব।

কলিকাতা কর্পোরেশনে মুসলমানদিগের চাকুরীর দাবী ও আগামী নিক্কাতন

কর্পোরেশনের চাকুরীর এক-চতুর্থাংশ বাহাতে মুসলমানগণ পাইতে পারেন, তাহার বাস্তবায়ন এক একটা প্রস্তাব মুসলমান কাউন্সিলারদিগের পক্ষ হইতে উপস্থাপিত হইয়াছিল। কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ফলে মুসলমান কাউন্সিলারদিগের অনেকেই কর্পোরেশন পরিত্যাগ করিয়াছেন।

উদ্দেশ্যের কর্পোরেশন পরিত্যাগ করা সম্ভব হইয়াছে, অথবা অসম্ভব হইয়াছে, উদ্দেশ্যের দাবী সমস্ত অথবা অসম্পূর্ণ, ইহা বিচার করিতে বসিলে মতভেদের উদ্ভব হওয়া অবশ্যসিদ্ধ। কারণ প্রত্যেক কাষের বশকে ও বিশেষ গুণিত-ভর্য উপস্থিত কর্য যাইতে পারে।

কোনই তাহা না করিয়া বাহাতে মুসলমানদিগের প্রথমতঃ কদিয়া বাহ, তাহার চেষ্টা করাই প্রথম কর্তব্য।

বাংলাদেশের মধ্যে চিত্রা করেন, অথবা দেশের বিবিধ প্রসবায়ন এক বৈদ্য অমৃতবন্ধন, তাহাদিগকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, দেশে একটা স্থাপিত না হইলে, সর্বদা সীমিত বর্তমান প্রসবায়ন লাভ সাধন করা সম্ভব হইবে না। কোনই বাহাতে মতভেদ উপস্থাপিত হইতে পারে, তাহা না কদিয়া, দামতে বলাদিগের প্রথমতঃ কদিয়া বাহ, তাহার চেষ্টা করাই প্রথম কর্তব্য।

কর্পোরেশনের বলাদিগের প্রথমতঃ সন্তুষ্ট করিতে হইলে, প্রথমতঃ চিত্রা করিতে হইবে, কর্পোরেশনের অন্তিমের প্রয়োজন কি।

কলিকাতা সহরের জল-বায়ু বাহাতে বিস্তৃত থাকে, সহরের বাতাস কঠিনে অবিদ্যাস্থানের বাহাতে কোন কঠিন না হয়, বিস্তৃত বায়ু ও বিস্তৃত জল বাহাতে প্রত্যেক অবিদ্যাস্থান পাইতে পারেন, প্রথমতঃ তাহার বাস্তবায়ন করিয়া এক একটা সহরে এক একটা কর্পোরেশনের অথবা মিউনিসিপালিটি কর্তৃক করিবার প্রয়োজন হয়।

সহরের জল-বায়ু বিস্তৃত থাকিতে হইলে, একজন গৃহস্থানীয় জীবন-বাপন-প্রণালীতে বাহাতে অপর একজন গৃহস্থানীয় অধ্যায়ের উদ্ভব না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবিধ গৃহস্থানীয় বিভিন্ন গৃহ নির্মাণ করিবার প্রয়োজন হয় : বাহাতে প্রত্যেক গৃহের মধ্যে জল সহজে নিত্যাপিত হয়, তাহার ব্যবহার করিতে হয়; বাহাতে প্রত্যেক গৃহের আবাসনা প্রত্যেক পরিবার হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং বাহাতে বিবিধ সন্তান না হইতে পারে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইহা ছাড়া বাহাতে জল-বায়ু সন্তান কোন বিদ্যায় ভগ্না মিশ্রিত না হইতে পারে, তাহাকে সন্তান হইবার প্রয়োজন হয়।

অবিদ্যাস্থানের বাতাস কঠিনে বাহাতে কঠিন না হয় : তাহার বাস্তবায়ন করিতে হইলে বাহাতে স্থান বাস্তবায়ন : এবং বাস্তবায়নের প্রথমতঃ সন্তান হয়, তাহাদের লক্ষ্য করিয়া প্রয়োজন হয়; বাস্তবায়ন বাহাতে আলোকিত হয়, তাহা বাস্তবায়ন করিতে হয় এবং সহরের মধ্যে বাহাতে সন্তান বাস্তবায়ন থাকে, তাহাদের লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হয়।

প্রত্যেক গৃহস্থানীয় বাহাতে বিস্তৃত বায়ু ও বিস্তৃত জল পাইতে পারেন, তাহার বাস্তবায়ন করিতে হইলে প্রত্যেক বাস্তবায়ন : উপস্থাপিত করিয়া প্রথমতঃ প্রথমতঃ বাস্তবায়ন : বাহাতে প্রথমতঃ বাস্তবায়নের বাস্তবায়ন থাকে, পাকস্থলী হইতে পুনঃ নির্মিত হইয়া বাহাতে বাস্তবায়নের বাস্তবায়ন করিতে পারি, মস্তক-পরিচালনের জন্য বাহাতে বাস্তবায়ন না হইতে পারে, যে সমস্ত সম্ভাব্য পদার্থ প্রচলিত কদিয়া বাস্তবায়ন হয়, তাহা বাহাতে প্রচলিত না হয়, সমস্ত প্রথম পরিচালিত হইলে বাস্তবায়ন হইতে পারে,

যাহাতে সহস্রের মধ্যে পরিচালিত না হয়, এবং বিধি বাধ্য করিতে হয় এবং যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিতর্ক চল-বাহু সহস্রের হইতে পারে, তাহাও বলাবাক্য করিতে হয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থাপতি করিবার জন্যই কর্পোরেশনের প্রতিবেশ প্রেরণজন।

কোন ব্যবস্থা করিতে গেলে তাহার জন্য খরচ আছে। কর্পোরেশনের যত কিছু ব্যবস্থা, তাহা সমগ্রই গৃহবাগিনের হইবার জন্য। কাষেই কর্পোরেশন-পরিচালনকারী গৃহ-বাগিনের নিকট হইতে টাকা লইবার প্রয়োজন হয়। গৃহ-বাগিনের নিকট হইতে তাহাদের সমুদয় ও ব্যক্তিগত উপরোক্ত প্রদানসমূহের জন্য যে টাকা লওয়া হয়, তাহাকে কর্পোরেশনের টাক্স বলা হইয়া থাকে।

প্রতিবৎসর: নান্দ্রব সর্বস্বটি কম খরচে সন্তোষজনক হইয়া থাকে। করিয়া থাকে। অতএব যে যে সহস্র প্রাপেক্ষ। কম টাক্স গ্রহণে সহস্রের চল-বাহু বিতর্ক, তাহাদের রাজ্যের সুসমতা, যথেষ্ট বিতর্ক বাহু ও চলনের হেতু পরিচালিত হইতে পারে, তাহাও বাধ্য করা। কর্পোরেশনের পরিচালকবিশেষ সর্বাঙ্গের প্রাধান্য কর্তব্য ও হইবে।

উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাপতি সম্প্রদায় কর্পোরেশনের তিন বিভাগে যে যে কর্তব্যীয় নিযুক্ত হন, তাহারা বর্ণনাদি প্রাপ্যকেন হইলে এবং তাহাদের প্রত্যেক বাহাতে সর্বাঙ্গ কম খরচে যে যে কর্তব্য নির্বাহ করেন, তাহার জন্য যদি প্রত্যেক প্রত্যেকের দায়ী করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা লে অসম্ভাব্যভাবে নিকট হইতে সর্বাঙ্গের কম টাক্স হার করিয়া কর্পোরেশনের কার্য সুচারুরূপে নির্বাহিত হইতে পারে।

বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কর্তব্যপ্রাপ্তকেন তাহাদের যে যে দায়ী সর্বাঙ্গের কম খরচে সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার দায়ী করিতে হইলে, তাহাদের সহকারী সংখ্যা বাহাতে তাদের দায়ী নির্বাহিত হয় এবং সহকারী যে সংখ্যা দায়ী নির্বাহিত করেন, তাহার প্রত্যেক বাহাতে তাহাদের দায়ী মনোনীত হন, তাহাদের লক্ষ্য বাহা একান্ত প্রয়োজন।

কাষেই কর্পোরেশনের কার্য সর্বাঙ্গের কম খরচে সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সুদক্ষ ব্যক্তিগণ বাহাতে

ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্তব্যপ্রাপ্তকেন নিযুক্ত হন তাহাও বাধ্য, দ্বিতীয়তঃ ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কর্তব্যপ্রাপ্তকেন বাহাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে খরচের মধ্যে তাহাদের কর্তব্য সুচারুরূপে নির্বাহ করেন তাহাও বাধ্য, তৃতীয়তঃ প্রত্যেক বিভাগের সহকারী সংখ্যা ও তাহাদের নির্বাচন ও নিয়োগ বাহাতে ঐ ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্তব্যপ্রাপ্তকেন নির্দেশনামূলক সাধিত হয়, তাহাও বাধ্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

উপরোক্তভাবে কর্পোরেশনের কার্য নির্বাহ করিবার বলাবাক্য হইলে, কিন্তু সহকারী নিযুক্ত হইল অথবা মূল্যমান সহকারী নিযুক্ত হইল, তাহা লইয়া কোন কথ-কলহ থাকিতে পারে না।

বর্তমান কলিকাতা সহর যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এখন আর এই সহরে চল-বাহু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না; এবং বাহাও বা যায়, তাহাও বিতর্ক করে, ইহা বলা গাঠিত পারে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অনুভবিতবে সর্বজন হইলে অসুবিধিত্বের এই সহরবাসের অযোগ্য হইবার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ যত আশ্রয়ের কথা বলা করিবেন না। কিন্তু যেতিয়া, যত ও যতের জন্য প্রকৃতি সৌন্দর্য প্রাপ্তকেন দিন দিন বেকশ বাড়িয়া গাইতেছে, তাহাতে সাধারণবুদ্ধিমান লোক যত যত আশ্রয়ের কথা অব্যবহার করিবেন না।

বর্তমান কর্পোরেশনের টাক্সের হারও অত্যন্ত অধিক। এই টাক্সের হার আরও বৃদ্ধি করা হইবে এইরূপ কাণ-বুঝা শুনা গাইতেছে। অথচ কর্পোরেশনের বাজেট, কলিকাতার আয়তন, রাজ্যের পরিমাণ প্রকৃতি শাখাগুলো করিলে কলিকাতা সহরের অধিবাসিনৃদের উপরোক্ত প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি যে অশেষকৃত অনেক কম খরচে নির্বাহিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের কথা যে সত্য, তাহা আমরা ভবিষ্যতে প্রতিপন্ন করিব।

এক অধিক বর্ষের মধ্যেই কলিকাতা সহর বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার কারণ কর্পোরেশনের পরিচালকদের অসুদক্ষতা।

কাষেই অশেষকৃত কম খরচে তাহারা সহরবাসীর প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে স্বীকার করিবেন এবং তাহা করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে,

আমরা বাহাতে আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত হন, তখন
 ১৯৮৩ খ্রিঃ ৮ই আগস্ট তারিখে প্রত্যেক কনসালার চেঁ। করা একান্ত
 কর্তব্য।

করবার্তাটিকে মনে রাখিতে হইবে যে, উদাহরণকে
বিশদগামী করিবার জন্য বহু প্রতিনিধি নিরন্তর চাবিটিকে
দুহিয়া বেড়াইতেছেন। উদাহরণের বহু বার্ষিক, তাহা
উদাহরণ নিজেরা বুঝিতে চেষ্টা না করিলে, অথবা না বুঝিলে,
অথবা তাহা বলা করিবার গেষ্টা না করিলে, কর বহুই হই-
বার ও উদাহরণের বাস্তবায়ন বাদে অযোগ্য হইবার আশঙ্কা
আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের
আশুতোষ-চৈয়ার

আমরা তবিত পাইবাছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের আন্তঃভাষ্যেচারি পালি ইইবাছে এবং বহু সংস্কৃতভাষ্যাপক ই ভোরা পাইবার ভর ভোরা ভক্তিতছেন। আমবা ভতহর ভানি, ভাহাতে ভলিত হর, বর্তমানে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার ভোনি প্রকৃত ভাষ্যাপক পাওরা একভগ্নু সন্তব। বাঁহারা এ-এ পরীকার সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ কবিরা পাওকেন, ভাহাভের শিক্ষা এত বিকৃত ইইবা বাব যে, ভাহারা ভে কখনও প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবেন, ভাহার

আশা পূর্ণায় থাকে না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমনও দেখা যায় যে, কেহ কেহ প্রচণ্ড অসুখপেক্ষে বিবাহ উল্লাসে অকলঙ্ক করিয়াও কেবলমাত্র নিজেকে কি করিয়া বাহির করিতে হয়, তাগণ্য করতা অর্জন করিয়া উল্লেখযোগ্য পর লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই ভাত্যর লোক আমাদের দেশেও কতখানি অন্তিষ্ট দেখা যাইবে, তাগা বর্তমান সময়ে পরিষ্কৃত না হইলেও, অবশ্য ভবিষ্যতে সেনাপাণী তাগা হকিতে পারিবেন।

বর্ষাষ্মেব সংস্কৃত ভাষা ও উহার পণ্ডিতগণের যে অবস্থা, তাহাতে বেশে প্রকৃত সংস্কৃতবিদ্যের অচয় আছে, ইহার চিত্র-বরূপ আশুতোষ-চোষার বীৰ্যকালেস তত্ত্ব খানি কাশ্য সম্ভব । বহিৰ্জ্ঞানই তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কোন প্রকৃত প্রত্নভাষ্য, অভিমানবীন, স্বাধীনবাসন্য পণ্ডিত-অন্তঃকর ইত্যদ্বর্ণ্য পর পাণ্ডা উচিত । তাহা হইলে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষার পুনরুদ্ধার হইবার সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে । নতুবা সংস্কৃত ভাষা কেবল মিত্রোত্তমোদয় হইবা পড়িয়াছে, ভিত্তি-এইতপুই থাকিবা হইবে ।

বিষয়বিশালসম্বন্ধে বর্তমান পরিস্থিতিসম্বন্ধে চট্টোপাধ্যায়
প্রদান হইতে আপনাবিধিকে স্বাক্ষর করিয়া আমাদেগ পশ্চিমবঙ্গ
‘কর্ণপাত-কল্পিত’ পারিবে কি ?

সংসদ ও মন্ত্রণা

শিক্ষা

श्रीशक्ति

এম্বায়াব বিখ্যাত। এম্বায়াব এক মৃত্যুর দি। ইতিহাসে যে, মাদি-
 তিহাসে কহা শিখা-বিজ্ঞান। এম্বায়াব এক মৃত্যুর দি। ইতিহাসে
 মৃত্যু দি। ইতিহাসে।

পর্যায় যদি করিতেই হয়, তবে বৈশিষ্ট্য-মিতারের দ্বারা
উপস্থাপিত হইবে যে, উক্ত বৈশিষ্ট্য-মিতারের দ্বারা
এক তদ্বারা সংসার ও সমাজের কল্যাণ সম্ভবপর কিনা, তাহা
নিবেদন করিবার পর্যায়পর্যায় সর্বপ্রথম গণিত হওয়া উচিত।

হাওয়াবাহন এক নারীসত্তা। শ্বিত্য ত্রীকালীন বেহাশ বসিগায়েন
যে, তাত্তলয় নারীকিষ্কণ্ড এখন চায়ে শিখা বিহন হইবে যে, জ্ঞানবান
হইলে তাহারা যেন বাহোন তাহে ক্রীড়িকাৰ্য্যস করিত্ত থাকে।।

শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে। পুঙ্খবহা যে কত বাধীনভাবে ঐহিক-
 কার্জন করিতেছেন, গাভার চাকান বেকার-সংস্কার প্রতি লক্ষ্য
 করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অগার নারীশিক্ষা শিক্ষা-মন্ত্র
 করিয়া বাধীনভাবে ঐহিক-কার্জনে ব্যস্ত হইলে নারী-বেকারের
 তালিকা নূতন কনিদা গড়িতে হইবে না কি? আরও এক
 কথা। যে সকল দেশের নারীশিক্ষা 'শিক্ষা' ও 'বাধীনতা' নাম
 করিয়া বাধীনভাবে ঐহিক-কার্জন করিতেছেন, সে দেশের
 অবস্থা কি?

ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିଧିମି ଜାଣି ଯିଲେ । ମହାର କୋଷିକେ
 ଦୁହାଞ୍ଜି ଦିମିବାଜେ । ସେ ବେଳେବର ନନ୍ଦ ପାତା । ମିତ୍ରା ଡାକେଇଁ ନୟନେ ।
 ଦୁଃଖି କେତେ । ସାହାଯେ ପୁରକେଶୋମାଣି । ନିକା ମଧ୍ୟ ହାହାହାହି ବନ୍ଧ
 କରା ଇତି ।

